সন্তোষকুমার ঘোষ

[২৪]

মালা হাসছিল। এক রাশ রুক্ষ চুল পিঠের উপর ঢালা, রুক্ষ, বাদামী রঙ-ধরা। এক চোখে কাজল ছিল মালার, অন্য চোখে নেই। যে-চোখে কাজল, সেই চোখটা হাসিতে আরও যেন কালো হয়ে গিয়েছিল, অন্য চোখের মণি আরও সাদা। দুটোতে মিলে উদ্‌ভ্রান্ত চপল দৃষ্টি—সৌর ভয় পেয়েছিল।

অগোছালো শাড়ির আঁচলটা মালা মাঝে মাঝে মুখে পুরছিল, হাসির তোড় সামলাবে বলে। তখন ওর গাল আর চিবুক আর নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠছিল, কপাল টকটকে।

যে-হাসিতে চোখ ঘোলাটে হয়ে যায়, সে-হাসি কখনও স্বাভাবিক নয়, সৌর বুঝেছিল, কিন্তু বুঝেও নড়েনি। কারণ এক-একবার হাসি থামিয়ে মালা নির্নিমেষ চোখে ওকে লক্ষ্য করছিল। তখন ওর দৃষ্টি স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সকৌতুক, অংশত নিশ্চিন্তও। সৌর নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিল, কে জানে, তার চেহারাতেই বুঝি কোথাও হাস্যকর কিছু আছে। হয়ত তার টেড়িতে, হয়ত মুখে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সৌর মাথায় হয়ত বুলিয়ে পরখ করছিল, চুলগুলো অবিন্যস্ত কি না।

আবার যেন লজ্জা পেয়েই মালা আঁচল দিয়ে সমস্ত মুখটা ঢেকে ফেলছিল, তার চোখ, চিবুক, হাসি সব আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। ব্রীড়াবতীর ভঙ্গিতে এখন চপলতার লেশমাত্র ছিল না।

সৌর মনে মনে বলছিল, তোমার পায়ে পড়ি, ওই হাসি একটু থামাও, আমাকে ছুটি দাও, আমি এবার যাই।

ওকে ত ডেকেছিল মালাই। হাতছানি দিয়েছিল। সৌর প্রথমে অবাক হয়েছিল। তারপর, এই মেয়েটি হয়ত তাকে কিছু বলতে চায়, এই কথা ধরে নিয়ে সৌর এগিয়ে গেল।

মালা কিন্তু কিছুই বলল না, হাসতে থাকল। দরজায় তালা, জানালায় শিক, ও-পাশে মালা, এ-পাশে সৌর, মালা হাসছে ত হাসছেই। সে যে কত হাসতে পারে, তাই জানাতেই মেয়েটা হাতছানি দিয়ে সৌরকে ডেকে আনল নাকি।

ধৈর্য হারিয়ে সৌর চলে আসতে যাবে, হঠাৎ মালার হাসি থামল। চোখ দুটো চকচকে; মালা কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল, প্রথমে নিঃশব্দে, পরে তার সঙ্গে ফোঁপানি যোগ হল। এই ফোঁপানির একটানা এক-ঘেয়ে সুরে সৌরের চেনা, আরও কতদিনের শব্দে উজ্জ্বল হয়েছে।

ঠিক, তখনই তার জামার আস্তিন ধরে কেউ টান দিল। সৌর ফিরে চেয়ে দেখল, নয়ন।

নয়ন ফিসফিস করে বলল, "এস।"

সৌর তবু নড়ল না।

এবার ধমকের সুরে নয়ন বলল, "চেয়ে চেয়ে দেখছ কী। এদিকে এস।

"কেন?"

"আসবে না, তবে কি সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলের হাসি দেখবে আর কান্না শুনবে?"

সৌর বলল, "পাগল?"

"তা ছাড়া কী। মালা কাল সন্ধ্যা থেকে ওই রকম করছে। পাগল হয়ে গেছে।"

মালা পাগল হয়ে গেছে, কথাটা নয়ন অনায়াসে উচ্চারণ করল, যে-ভাবে লোকে বলে আমার মাথা ধরেছে।

ওই ভঙ্গির জন্যেই জ্বলে উঠল সৌর, সেই মুহূর্তে ঘৃণা করল নয়নকে। বলে উঠল, 'এর জন্যে দায়ী তোমরা। নিজেরা পাপে ডুবেছ, ডুবে আছ, সেখানে নেমে নামাতে চাইছ ওকেও।'

নয়ন রাগ করল না, বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইল। সৌরর তখনও বুঝি জ্বালা যায়নি। বলল, তোমরা—তোমরা খারাপ।

এবারও প্রতিবাদ করল না নয়ন, আবার হাসল। সৌরর কথাতেই সায় দিয়ে বলল, "ঠিক। কিন্তু তুমি এবার এস ত! ওখানে ওভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে না।"

সৌর যখন বলল, "না যাব না", নয়ন তখন আরও কাছে ঘেঁষে এল। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "একেবারে ছেলেমানুষ।"

সৌর তবু রোখ ছাড়ল না, বলল, "আমি যদি পুলিসে খবর দিই?"

"কী খবর দেবে?"

"এই এই একটা মেয়েকে তোমরা জোর করে ধরে রেখেছ।"

"আমরা?"

"ওই একই কথা হল।"

"পুলিস হদিসই পাবে না। চিত্তবাবুরা ভারী সেয়ানা। ওদের তুমি ত চেন না ভাই। পাখি টাকে নিয়ে অন্য খাঁচায় পুরবে।"

নয়নের ঘরে গিয়ে পাটিতে বসল সৌর। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নয়ন বলল, "বন্দিনীদের উদ্ধার করে বেড়ানো ত তোমার কাজ নয়, ও-সব করত সেকালের যোদ্ধারা আর—বীর হনুমান!"

বলতে বলতে নয়ন সৌরর নাকের ডগা নেড়ে দিয়ে অস্পষ্টভাবে একটু আদর করলো।—"একটা পাগলী মেয়ের কথা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছ, কৈ আমাদের কথাতো একবারও ভাব না?"

সৌর বলল: "সেকালের বীর যোদ্ধাদের কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?

নয়ন বললো, "বারে, নিশিবাবু নাটক লেখে না? বই না পড়ি শুনি তো! এসব যা কিছু শিখেছি সব নিশিবাবুর বই থেকে। নয়ন একটু থেমে বললো, "কিন্তু কৈ তুমি আমার কথার তো জবাব দিলে না?"

সৌর বললো, "আমি কি করতে পারি। আমি এখনো ছাত্র, তাছাড়া—" ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নয়ন বললো, "তা ছাড়া তুমি এখনো ছেলেমানুষ।"

ফোঁস করে উঠে সৌর বললো, "বার বার ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলবে না। আমার বয়স কতো জান?"

নয়ন ভ্রূভঙ্গি করে ভালো করে ওকে দেখে নিয়ে যেন বয়সটাই যাচাই করতে চাইলো। মুখ টিপে হেসে বললো, "কত আর, পনের-ষোল?"

সৌর গম্ভীর গলায় বললো, "উনিশ উতরে গিয়ে বিশে পড়েছে।"

একটু একটু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো, আর নয়ন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছিলো। হঠাৎ সৌরর মনে হল তার আর বসে থাকা উচিত না, নয়ন তা চাইছে না, কী কাজ যেন বাকী আছে নয়নের, সে উঠলেই তাতে হাত দেবে। তাই এত উসখুস করছে নয়ন।

হাতে একটা ফরাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে, সেই মেয়েটি—নাম যার পাখি। তাকে দেখে নয়ন বলল, "এসেছিস, আয় ভিতরে আয়।" সৌরর দিকে ফিরে চেয়ে বলল, "কিছু মনে করো না ভাই একটু উঠবে? এটা এখানে পাততে হবে।" সৌর উঠল, তবু চেয়ে রইল কতকটা জিজ্ঞাসু চোখে। তার জিজ্ঞাসাটাই যেন অনুমানে ধরে নিয়ে নয়ন বলল, "আজ সন্ধ্যা বেলায় এখানে নিশিবাবুর নতুন নাটকটার মহলা হবে।"

মাথা নীচু করে সৌর আস্তে আস্তে চলে এল।

সেই সন্ধ্যার যন্ত্রণা সৌর সহজে ভুলতে পারেনি। ইকনমিক্সের বইয়ের পাতা আপনা থেকে উড়ছিল। সৌরর চোখ ছিল বইয়ের পৃষ্ঠায়, কিন্তু মন অন্যখানে। সৌর পড়ছিল না, পড়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা মাঝখানে তো শুধু কাঠের পার্টিশনটাই, তার ওপার থেকে কয়েকটি মিলিত গলার হল্লা আর চিৎকার ভেসে আসছে। বার বার সৌর নিজেকে বলল, এ ভাল নয়, এসব শোনা উচিত নয়। তবু ইকনমিকসে কিছুতেই মন দিতে পারল না।

ক্রমশ সৌরর এই ধারণা হচ্ছিল যে, বইয়ে সব কথা থাকে না। ছাপানো হরফে সব জ্ঞানের কথা নেই। জীবনে অনেক কিছু জানতে হলে বাঁচতে হয়, বেঁচে বেঁচে দেখে, বেছে নিতে পারলে তবে সব বস্তুর স্বরূপ জানা যায়।

শুরু গলায় এক কলি গান গেয়ে উঠল, ও কে? নয়ন, না পাখি? ঝন ঝন শব্দে হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ল কার? চিত্তবাবুর, না নিশিকান্তর। হঠাৎ এক জোড়া ঘুঙুর বেজে উঠল কেন, কে নাচবে? নয়ন? নয়ন কি নাচ জানে?

সৌর কল্পনায় নয়নের নৃত্যরত রূপ দেখতে পেল।

দেখা যে শুধু চোখ দিলেই হয় না, কান দিয়েও চলে, এই অভিজ্ঞতা সৌরর সেই প্রথম। এই ত চোখ বুজে কান খাড়া করে শুনেছে, কই, কিছুর ত ঘাটতি নেই। কেঁপে-ওঠা ঘাঘরার রঙও যেন সৌর দেখতে

পেল, চিত্র আর নিশিবাবু এক হাতে গ্লাস ধরে, অন্য হাতে তুড়ি দিয়ে তারিফ করছেন, এ-চিত্রটাও মনে মনে এ'কে নিতে কষ্ট হল না।

আমি যদি এখন ওখানে থাকুতুম, সৌর ভাবছিল, তাহলেও এর চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পেতুম না। বড় জোর অভিজ্ঞতাটার স্বাদ আলাদা হত। কিন্তু সেটাই সত্য আর এখন যা দেখছি, তা কল্পনা এ আমি কিছুতে মেনে নেব না। দুই-ই ঠিক। আসলে বাইরের যে পৃথিবী তার অবিকল একটা প্রতিচ্ছবি আমার মনেও আছে। সেই পৃথিবীটারও কতকগুলি নিয়ম-নীতি আছে। তাকে ভুল বলে উড়িয়ে দিই কী করে। এই পৃথিবীও আমারই কতকগুলি অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি। আমার কল্পনাই সেখানে বিধাতা।

ঘুঙুরের বোল ক্রমশ দ্রুততাল হচ্ছিল। চড়া পর্দায় হারমোনিয়াম বাজছিল। আর সংকোচে লজ্জায় সৌর যেন এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল। পা তুলে নিয়েছিল চেয়ারের উপরে। যেন মেঝে দিয়ে কতকগুলি কেঁচো হেঁটে যাচ্ছে, পা ঝুলিয়ে বসলে তাদেরই গায়ের কস ওর পায়ে লেগে যাবে। মনের ঘৃণাবোধ দেহের স্নায়ুতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

নয়ন নাচছে, পাখি গাইছে, আর রক্তলোচন দুটো লোক ঢুলতে ঢুলতে বাহবা দিচ্ছে- এই তোমাদের নাটকের মহলা, ছিঃ! তোমরা বড় মিছে কথা বল, বড় ঠকাও। তোমাদের চেয়ে পাশের ঘরের ওই মালা বরং ভাল। সে এখন কী করছে? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে, কেবলই হাসছে? অথবা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে অন্ধকার ঘরে দেয়ালের কোণে সরে গিয়ে কাঁদছে? একি পাগলামি? পাগল ত তবে সৌরও। সে-ও ত নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

তাল কাটছিল বলে কে যেন নৃত্যপরা মেয়েটির গালে কষে থাপ্পড় মারল, গান গাইছিল যে মেয়েটি, ভয় পেয়ে সে থেমে গেল, আর হঠাৎ অশ্লীল গলায় গালি-গালাজ শুরু করল অন্য লোকটি। এই অকস্মাৎ রসভঙ্গ তার বুঝি মনঃপূত হয়নি।

আর তখনই সৌরর মনে হল, ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে ওই ঘরে, দেয়ালে খান খান হয়ে ভাঙল হয়ত গোটা দুই বোতলই, তার পরেই হঠাৎ আলো নিবে গিয়ে ঘরটা যেন বোবা হয়ে গেল।

সৌরর গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, সৌর ঘৃণায় কাঁপছিল। কখন ঘুম এসেছিল, সে টের পায়নি।

ওর গালে টোকা দিয়ে নয়ন বলেছিল, "কী ভাই, রাগ করেছ?" —এটা পর দিনের ঘটনা।

সৌর ছাদে এসেছিল। বলল, "আমি তোমার ভাই নই।"

"নও? ও মা, কেন?"

"তুমি—তোমরা খারাপ। তোমরা ত—" বলবে না বলবে না করেও সৌর কথাটা বলেই ফেলল, "তোমরা ত বেশ্যা!"

নয়নের হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সে যেন অবাক হল। সৌর ভেবেছিল, নয়ন লজ্জা পাবে, আহত হবে। হয়ত রাগ করবে। আশ্চর্য, সে-সব কিছুই ঘটল না, নয়ন বলে উঠল, "তাতে কী।"

আশ্চর্য এত উষ্মা ছিল সৌরর মনে, নয়নের ভঙ্গি দেখে সব যেন উড়ে গেল। নিজেকে বলল, পালাও, এখান থেকে পালাও তুমি। এই ডাইনী মেয়েটা নির্ঘাত জাদু জানে। তোমার রাগকে নিমেষে জল করে দিয়েছে, সময় পেলে হয়ত তোমাকে সুদ্ধ বদলে দেবে। ছেলেবেলা থেকে পড়ে পড়ে আর শুনে শুনে যা-কিছু ভাল বলে শিখেছ তুমি, ওর চোখের ঢলঢল চাউনি দিয়েই সব ভুলিয়ে দেবে। সৌর পালাও।"

সেদিন রাত্রেই স্বপ্নে মালা সৌরর কাছে এসেছিল।

(ক্রমশ)

পাখি

গোবিন্দ চক্রবর্তী

ওরা সব
সোনার খাঁচার পোষা পাখি—
স্মৃতিগুলি
যাদের এখনো ধ'রে রাখি,
রাখি বারবার।

যত ভাবি—ভুলে যাব, ভাব্‌ব না আর।
চড়ুই কি দোয়েল-শ্যামার
কানে আসে যেই কারো ডাক—
আহা, প্রাণ নিমেষে অবাক
কেন ফিরে ব'লে ওঠে—থাক,
আছে যারা থাক।

যে গিয়েছে ভেসে তীর হ'তে
সুদূরে সাগরে দিতে পাড়ি
অবুঝ-অচেনা নীল স্রোতে
চেনা গ্রাম, পাহাড়ের সারি
তবু তার সাথী হয় না কি!

বুঝি তাই যেখানেই থাকি
—নীড়ে, নভে, মরু বা মেরুতে—
যে বাঁধাই যত উঁচু চাই না পেরুতে
ওদের যদিও দিই ফাঁকি
হৃদয় কি হ'তে চায় দলছাড়া পাখি!

শব্দিত নির্ঝর

আলোক সরকার

আমি বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করবো একা-একা
পাত্রী ওই গাছ ওই পাখি ওই নারী।
নিস্তব্ধ দুপুরবেলা সানাই বেজেছে। মালা, স্পন্দিত অদেখা।
জলের সহজ, দ্যাখো, সব গাছ পাখি সব নারী
আমার প্রেমিকা আর অচেনা বাড়িটা
তার ভিতরের প্রতিটি বেদনা।

যখন-ই ঝরেছে ফুল মুখ তুলে তাকিয়েছি, কখনো মানবো না
সে আমার জন্যে নয়। যে-ছবি এঁকেছি
প্রথম মিলনলগ্ন মনে রেখে, প্রেমিকাকে আবশ্যিক দূর দেশান্তরে
ভুলে গিয়ে—আজ তো আকাশে তাকে
স্পষ্ট করে টাঙিয়ে রেখেছি।
আনন্দ আমার যেন মাঘের শিরীষ,
কেঁপে ওঠে সংহতির শব্দিত নির্ঝরে।

আমাকে সবাই ভালোবাসে আমি [illegible] জানি, নন্দিত উৎসব
হাওয়ায়-হাওয়ায় সান্দ্র শিখা, নীল সমস্ত সময়
লাল বেনারসী আর চন্দন-রঞ্জিত মুখে লজ্জিত নীরব।
আমি মনে-মনে ভাবি, আমি স্পষ্ট জানি এক রাত্রি-অভিসার
[illegible]

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রবিবার বিকেল। বাড়ি থেকে বেরুবো বেরুবো করছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চেনা-চেনা মুখ, অথচ ঠিক চিনতে পারছি না। তুমি শৈল? বলে' তিনি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। ঘর-জোড়া নীচু তক্তাপোশের ওপর সতরঞ্চি পাতা। আমাদের পড়বার ঘর।

হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জুতো খুলে তক্তাপোশের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিলেন।

—শিয়াড়শোল ইস্কুলের টিচার আমি। নজরুল আমার ছাত্র।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাল করে চেপে বসলেন তিনি।

বিপদে পড়লাম। নজরুল ওদিকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাস্টারমশাই বললেন, দেখি কি লিখেছ তুমি!

সর্বনাশ! কে বললে আপনাকে?

—নজরুল বললে, তুমি নাকি খুব ভাল পদ্য লিখতে পারো।

বললাম, ভুল বলেছে। নজরুল আমার চেয়ে অনেক ভাল কবিতা লেখে।

ভদ্রলোক কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, খালি-খালি বলতে থাকেন, বাংলায় ভাল 'এসে-টেসে' লেখ শুনেছি। আমি তো বাংলা পড়াই না! তবে তোমার কথা শুনলাম আমি নজরুলের কাছে—চণ্ডীর কাছে……। কই দেখি, নিয়ে এসো তোমার খাতাটা।

খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। কবিতা লেখা, গল্প লেখা—এ-বাড়িতে অমার্জনীয় অপরাধ। খাতাটা আমি লুকিয়ে রাখি অন্য ঘরে। এনে যদি দিই, এক্ষুণি উনি জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করবেন, আর সেই পড়া যদি সীতু-চাকরটা শোনে তো যেমন করে হোক, ওপরে গিয়ে রায়-সাহেবকে জানিয়ে আসবে।

তার চেয়ে কবিতার খাতাটা পকেটে নিয়ে মাস্টারমশাইকে বাগানে নিয়ে গিয়ে বসাই ভালো। বাগানের পাশেই নজরুলের বোর্ডিং। ছুটে গিয়ে তাকেও ডেকে আনবো।

চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে বললাম, আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

ওঠবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বললেন, তার চেয়ে তোমার খাতাটা আমাকে দাও, কাল আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

—খাতা নিয়েছি, আপনি আসুন।

বলেই তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে নিয়ে গেলাম।

আমার খাতাটা তাঁকে দেখাতে লজ্জা করছে।

বাগানের দিকে যেতে যেতে মাস্টারমশাইকে বললাম, আপনি স্যার নজরুলের কবিতা পড়েননি তাই বলছেন। আমার খানিকটা মুখস্থ আছে, শুনবেন?

এই বলে নজরুলের 'রাণীর গড়' কবিতার আরম্ভটা তাঁকে শুনিয়ে দিলাম।

ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি
রাণীমার!
ও যে—দপ্ দপ্ জ্বলে, লোকে বলে
আলো আলেয়ার।
এই নিবে যায় এই জ্বলে ওঠে
থমকি চমকি পিছু দিকে ছোটে,
মিশে যায় শেষে রাজ-গড়ে উঠে'
আবার তেমনি আঁধিয়ার!
ওই শোনা যায় দুপহর রাতে
ঝটিকার মুখে হাহাকার।
ওগো রাণীমার—আহা রাণী-মার!
ওই ঝাউবনের পাহাড়ে
নীরব চিতাটি রাণী-মার!

আরও বলতে যাচ্ছিলাম, মাস্টারমশাই আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, তাহলে নজরুলকেই বলি। না কি বল?

—কি বলবেন?

এতক্ষণ পরে তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। বললেন, শিয়াড়শোল ইস্কুলের একজন পুরনো টিচার এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায় যেন চলে যাবেন। তার জন্য ছাত্রদের তরফ থেকে দুঃখটুঃখু জানিয়ে বেশ ভাল করে একটি পদ্য লিখে দিতে হবে। সেই পদ্যটি তাঁরা ছাপাবেন। তারপর একটি বিদায়সভা আহ্বান করে তাঁর গলায় ফুলের মালা দিয়ে সেই ছাপা পদ্যটি তাঁর হাতে দেবেন—এই তাঁরা স্থির করেছেন।

বললাম, তাহলে তো আপনাদের উচিত নজরুলকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া। নজরুল শিয়াড়শোল ইস্কুলের ছাত্র, আর আমি রাণীগঞ্জের।

বলতে বলতেই দেখা গেল, বাগানের পথ ধরে নজরুল আমাদের দিকেই আসছে হাসতে হাসতে।

বললাম, বেশ মজা তো! মাস্টারমশাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ?

নজরুল তখনও হাসছে।

বললাম, তোমাদের টিচারের বিদায় অভি-নন্দন আমি কেন লিখলো? তুমি লিখবে।

কবিতা লিখতে পারে না বলে প্রথমে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমিই তাকে রাজি করলাম। মাস্টারমশাই-এর ওপর রইল আদায় করবার ভার।*

আমি বেঁচে গেলাম। আমার কবিতার খাতা আমার পকেটেই রয়ে গেল!

মাস্টারমশাই চলে যেতেই নজরুল বললে, এ তুমি কি করলে বল তো?

—কি করলাম?

নজরুল [illegible] এইবার লেখো বানিয়ে বানিয়ে যত সব মিথ্যে কথা!

তা হোক্। ঐ আর তোমার লিখতে [illegible]

[illegible] বললে, না না, এইগুলো লিখতেই দেরি হয়। [illegible] আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছি আমরা। হাতেই কোয়ার্টারলি পরীক্ষা। ভাবলাম বুঝি পরীক্ষার পড়ার কথা বলছে।

বললাম, তুমি তো ভাল ছেলে, তোমার পরীক্ষার জন্যে ভাবনা কিসের?

নজরুল বললে, না, পরীক্ষার ভাবনা নয়। চল একটা মজা দেখিয়ে আনি তোমাকে।

এই বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল রাস্তা দিয়ে।

পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল বংশী আর দ্বারকা। রাণীগঞ্জ ইস্কুলের ছাত্র। নজরুলকে খুব ভাল করেই চেনে। ধরে বসল, চা খেয়ে যাও।

বসতে হল তাদের বাইরের ঘরে।

বংশী বলছে, চা খাও, আর দ্বারকা বলছে, একটি গান গাও।

নজরুল উসখুস করছে। দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে আর আমাকে চিমটি কাটছে। বংশী বাড়ির ভেতরে গেল চা আনতে, আর দ্বারকা হারমোনিয়াম আনবার জন্য প্রস্তুত।

দ্বারকা আমাদের চেয়ে বয়েসে ছোট, পড়েও দু' ক্লাস নীচে। তবু সে আমাদের অনেকদিনের বন্ধু। বন্ধু হলেও তাকে তিরস্কার করতে আটকায় না। ধমক দিতেই সে চুপ করে বসল।

চা আনতে দেরি হল না বংশীর। চা খেয়েই উঠলাম।

বললাম, খুব জরুরী একটা কাজ আছে নজরুলের।

জরুরী কাজটা যে কী, তখনও আমি জানি না কিন্তু।

পথে যেতে যেতে আবার ডাক পড়ল পেছনে—শোনো! শোনো! যাচ্ছ কোথায়?

এই রে! গোপেশ্বর ডাকছে। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর গোপেশ্বর পাল। বিলেত থেকে যিনি যথেষ্ট সম্মান নিয়ে এসেছিলেন। ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে প্রতিভাবান শিল্পী—স্বর্গীয় সেই গোপেশ্বরের জীবনের একটি অজানা অধ্যায় আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর এই ভাস্কর শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিল ইংরেজের রাজত্বে ভারতবর্ষের এই বাংলাদেশে। তাই তার [illegible] সেকালে। যে শিক্ষায় ছিল তার অধিকার, তার কোনও সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, কি করবে সে কোথায় যাবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে একদিন একটি স্যুট-কেস হাতে নিয়ে নিজে হাজির হয়েছিল আমাদের সেই কয়লাকুঠির দেশ—রাণীগঞ্জে। আমাদের সঙ্গেই হল তার প্রথম পরিচয়। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর কাজ দেখে। আমাদের ইস্কুলের [illegible] নিয়ে [illegible] একটা সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে যাকে দেখলে তারই চেহারা এঁকে দিলে এক মিনিটে। [illegible] রাস্তার ধারে ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আস্তানা গাড়লে। তারপর আরম্ভ হল তার মাটির কাজ। আমাদের যাকে হোক একজনকে টুলের ওপর বসিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাটি দিয়ে তার এমন মূর্তি গড়ে দিলে—আমরা দেখে তো অবাক! ঘড়ি ধরে মাত্র পাঁচ মিনিট! তার ভেতরেই মূর্তি শেষ! নিখুঁত, নির্ভুল একেবারে হুবহু প্রতি-মূর্তি! কিন্তু বিনা মূল্যে এরকম বন্ধুকৃত্য আর কতদিন চলে? টাকা কোথায়? গোপেশ্বর বললে, দশটা টাকা পেলেই এই-রকম মূর্তি গড়ে দেবো। আমরা প্রচার করে দিলাম সর্বত্র। সারা শহর ভেঙে লোকজন আসতে লাগল। কিন্তু টাকা দিয়ে কেউ কাজ করাতে চাইলে না। আমরা যাই, বসি, গল্প

* এই কবিতাটি নজরুল লিখেছিল। বিদায় অভিনন্দনের জন্যে একটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় তা ছাপাও হয়েছিল জানি। তার কপি কিন্তু আমার কাছে নেই। যদি কারও কাছে থেকে থাকে তো তিনি দয়া করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

থাকে। আমরা বলি, ইস্কুল কর, আমরা সবাই তোমার ছাত্র হব। গোপেশ্বর হাসে আর বলে, সেরকম ইস্কুল এখানে চলবে না। বড় বড় মূর্তি গড়বার কিছু অর্ডার যদি পাই তো আরও কিছুদিন থাকি তোমাদের কাছে।

কিছু না পেয়েও সে রইল।

আমরাও তাকে ছাড়তে চাইতাম না, সেও আমাদের ছাড়তো না।

নজরুল একদিন গিয়েছিল আমার সঙ্গে। শিয়াড়শোল ইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বন্ধু। এই তার পরিচয়। গোপেশ্বর তার মুখের পানে বার কতক তাকালে। তারপর আমরা যখন উঠে আসছি, গোপেশ্বর আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রবিবার দুপুরে তোমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে এখানে আসবে?

মূর্তি তৈরি করবে বুঝি?

গোপেশ্বর বললে, হ্যাঁ।

বললাম, তবে যে সেদিন বললে, টাকা পয়সা না পেলে ও কাজ আর করবে না?

আজও আমার বেশ মনে আছে—গোপেশ্বর বলেছিল, তোমার এই বন্ধুটি একদিন খুব বড় হবে। সে চিহ্ন আমি দেখেছি ওর মুখে।

নজরুলকে আমি সেকথা বলেছিলাম।

বলা বোধ হয় আমার উচিত হয়নি।

বলেছিলাম বলেই বোধ হয় কোনও রবিবারের দুপুরেই তাকে আনতে পারিনি গোপেশ্বরের কাছে।

আজ সেই গোপেশ্বর ডাকছে।

নজরুল বললে, বল আর একদিন আসবো।

পেছন ফিরে সেই কথাই বলে গেলাম গোপেশ্বরকে।

কি মজা দেখাবে নজরুল—দেখতেই আসা হল!

একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হল। নজরুল বললে, তুমিই দেরি করে দিলে। অর্থাৎ বংশীর বাড়িতে চা খাওয়ার অপরাধে অপরাধী আমি।

বললাম, মজা দেখা তাহলে হল না বল।

নজরুল কিন্তু তখনও ছাড়েনি। বললে, চলই না!

গেলাম স্টেশনে। ওভার-ব্রিজের ওপর দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে।

হাওড়া থেকে একখানা ট্রেন আসবে। লোকজনের যাওয়া-আসা শুরু হয়ে গেছে। এসময় এখানে আসা আমাদের উচিত হয়নি। তবে স্টেশনের কর্মচারীরা সবাই আমাদের চেনে—এই যা ভরসা। নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ আসবে নাকি?

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের দিকে উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে নজরুল। জবাব দিলে না।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

সামনের কামরায় বাঙালী পল্টনের দল। খাকি পোশাকপরা নানান বয়সী ছেলেরা যুদ্ধে চলেছে। নজরুল প্রথমেই হাত তুলে বলে উঠলো, 'বন্দে মাতরম্!'

তারাও সমস্বরে জবাব দিলে, 'বন্দে মাতরম্!'

গাড়ি থেকে নেমে যে-সব যাত্রী চলে যাচ্ছিল, তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের পেছনে। দল আমাদের ভারি হয়ে গেল। বুঝে না বুঝে তারাও চেঁচাতে লাগল আমাদের সঙ্গে। সারা স্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে। লোকজন সব দাঁড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। জানলায় মুখ বের করে হাত নেড়ে রুমাল নেড়ে পল্টন-ছেলেরা চলে গেল। নজরুল একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

যারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাদের ভেতর থেকে কে একজন যেন জিজ্ঞাসা করলে, এরা কে ভাই? কোথায় যাচ্ছে?

জবাব আমাকে দিতে হলো না। তাদেরই একজন বললে, বাঙালী পল্টন। লড়াই করতে যাচ্ছে।

তার পরেই শুরু হল মন্তব্য।

—এরা লড়াই করবে কি বলছেন? কামান-বন্দুকের আওয়াজেই দাঁত লেগে যাবে যে!

আর-একজন বললে, অকালে মৃত্যু আছে কপালে, তাই চলল মরতে।

—সবগুলোই তো ছেলেমানুষ। বাপ-মা ছেড়ে দিলে কেমন করে?

এমনি-সব কথা শুনতে শুনতে আমরা বেরিয়ে এলাম স্টেশন থেকে।

নজরুল এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। আমিই প্রথমে তার নীরবতা ভঙ্গ করলাম। বললাম, এই মজা তুমি আমাকে দেখাতে নিয়ে এলে?

জবাবে সে শুধু আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, যাবে?

কি সে বলতে চায় বুঝলাম।

কেন জানি না, সেদিন তার এই প্রশ্নের জবাব দিতে আমার এক মুহূর্ত দেরী হয়নি। বললাম, হ্যাঁ যাব।

পথের ধারে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে।

মাথার ওপর প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের পাতায় পাতায় একটানা আওয়াজ উঠছে। পথের ধুলোর ঝাপটা এসে লাগলো মুখে। চোখ মুখ বন্ধ করে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম।

শহরে তখন নিত্য নতুন পোস্টার পড়ছে। নানারকম রঙ-বেরঙের বড় বড় পোস্টার আঁটা হচ্ছে শহরের অলিতে গলিতে। কত বিচিত্র তার ছবি, কত বিচিত্র তার ভাষা।

বাঙ্গালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চলছে ক্রমাগত। কে বলে বাঙ্গালী যোদ্ধা নয়? কে বলে বাঙ্গালী ভীরু? জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা' পারে একমাত্র বাংলার যুবশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ বিক্রমে। বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দাও।

ইংরেজ যুদ্ধ করছে জার্মানীর সঙ্গে। আমরা তখন এইটুকুমাত্র জানি। ইংরেজের প্রতি আমরা কেউ প্রসন্ন নই, তার ওপর রাজার প্রতি ভক্তি যেটুকু থাকা প্রয়োজন, তাও নেই। তবু আমরা ইংরেজের হয়ে তার শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে কেন যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করলাম নজরুলকে।

নজরুল বললে, যুদ্ধ একটা বিদ্যা তা জানো?

বললাম, জানি।

—সেই বিদ্যেটা আমরা শিখে নেবো।

বললাম, শেখা শেষ হ'লেই তো দেবে ঠেলে।

—দিক না!

—তখন জার্মানীর একটি গুলি, ব্যস্, সেইখানেই খতম্!

—মরে যাব? বেশ তো! যুদ্ধ করতে করতে মরে যাওয়া—ভারি মজা। মারতে মারতে মরবো।

নজরুলের সে কি উল্লাস!

কিন্তু সত্যি বলতে কি, যতই ভাবছি, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। নজরুল মারতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি জানি, আমি পারবো না। হাতে বন্দুক আছে বলেই জলজ্যান্ত একটা মানুষকে শত্রু কল্পনা করে' নিয়ে মেরে ফেলবো—সেটা বোধ হয় আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

নজরুল বললে, তোমার দ্বারা না হ'লেও তার দ্বারা হবে। সে মেরে দেবে তোমাকে। আত্মরক্ষা করবার জন্যে মারতে হয়, নইলে নিজে মরবে।

সেকথা আমি কিন্তু ভেবে দেখিনি।

নজরুল যুদ্ধ বিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে কি বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে' দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে—তার এই গোপন মতলবের কথা আমাকে বলেছিল একদিন।

আমার কিন্তু কোনও মতলব ছিল না। ... ...

আমি এইখানে একা পড়ে থাকবো, রোজ দশটার সময় বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যাব, আর বিকেলে ফিরে আসবো—সে একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন আমি চাইনি।

তার ওপর যুদ্ধ কথাটার একটা উত্তেজনা আছে। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক এক কিশোর। সে উত্তেজনা, সে উন্মাদনার হাত থেকে নিস্তার নেই।

নজরুলের সঙ্গে নিভৃতে বসে বসে পরামর্শ করলাম—কেমন করে' যেতে হবে। ছিনু চলে গেছে তার দেশের বাড়িতে বিয়ে-সাদি করতে, নইলে নজরুলের বোর্ডিং-এর খাটে বসে এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা সম্ভব হতো না। তাও বেশির ভাগ দিন আমরা চলে যেতাম ক্রিশ্চানদের কবর-খানায়। শহরের এত কাছে অথচ নির্জন জায়গা সচরাচর পাওয়া যায় না। কবরখানার ত্রিসীমানা মাড়াবে কে?

বাঙ্গালী পল্টনের পোস্টারের নীচে ছাপা থাকতো মহকুমার সাব ডিভিশ্যানাল অফিসারের (এস ডি ও) সঙ্গে যোগাযোগ করুন!

রাণীগঞ্জের মহকুমা-শহর আসানসোল। বেশি দূরে নয়। যাওয়াও সহজ। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলেই হ'লো। টিকিটের দাম তখন কত ছিল আজ আর ঠিক মনে নেই।

শুধু মনে আছে এস্-ডি-ও ... তিনি সাহেব। খাস্ বিলেত থেকে ... এসেছেন বাংলা দেশে আই-সি-এস্ পাশ করে।

তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাঁর ইংরেজী যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে কি হবে? তবে ভরসা এই যে, পুরো দুটি বছর ধরে' আমাদের রাণীগঞ্জ ইস্কুলে প্রতি শনিবার খাস বিলেতী এক পাদরী-সাহেব আমাদের বাইবেল পড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে বলে আর ইংরেজী নভেল পড়ে পড়ে ইংরেজী খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছি।

নজরুল বললে, চলতো যাই আসানসোলে, দেখা করি সায়েবের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে।

হাতে কোয়ার্টারলি পরীক্ষা। বললাম, পরীক্ষার কি হবে?

নজরুল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। বললে, রেখে দাও তোমার পরীক্ষা! কী হবে পরীক্ষা দিয়ে?

আমি কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে কিছুতেই আসানসোল যেতে চাইলাম না। কাজেই কয়েকটা দিন আমাদের দেরি হয়ে গেল।

এদিকে আমার মনের ভেতর তখন দুটো প্রশ্ন। কিছুতেই তার মীমাংসা করে উঠতে পারছি না। আমরা যুদ্ধে চলে যাচ্ছি— ... রাজনীতির আর ... জানাবো

চক্রদত্ত

হাপুরে ভারতের প্রথম ১০,০০০ টন যান্ত্রিক শস্য উন্নায়ক যন্ত্র বসান হয়েছে। উন্নায়কটি আমেরিকা ভারতকে উপহার দিয়েছেন। যন্ত্রটির দাম প্রায় ২,০০০,০০০ টাকা। ভারত সরকারের এটি বসাবার জন্য ৮০০,০০০ টাকা খরচ পড়েছে। যন্ত্রটির সমস্ত কাজ যন্ত্রচালিত। উন্নায়কটি শস্য বোঝাই করা, নামান থেকে আরম্ভ করে গুদামে জমা করা সমস্ত কাজই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করতে পারে। ১ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ টন শস্য যন্ত্রটি উদ্ধারক করতে পারে। এছাড়াও গুদামে শস্য ৫ বছর পর্যন্ত সঞ্চয় করে রাখলেও তা নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কলিকাতায় আরও একটি এই ধরনের শস্য উন্নায়ক যন্ত্র বসাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

*

রাশিয়ার ক্রিভই নামক স্থানে স্বয়ংচালিত যন্ত্রের সাহায্যে একটি লোহার খনির কাজ শুরু করা হয়েছে। এই যন্ত্রের দ্বারা তারা এই খনি থেকে বছরে প্রায় ৮ কোটি টন খনিজ ধাতু তুলতে পারবে।

*

বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন যে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ প্ল্যাস্টিকের তৈরী বাড়িতে বাস করতে আরম্ভ করবে। কারণ হিসাবে তারা বলেন যে, প্ল্যাস্টিককে প্রয়োজন মত যে কোন আকৃতি খুব সহজেই দেওয়া যায়। এছাড়া প্ল্যাস্টিকের তৈরী বাড়ির খরচও কম।

*

কুল যে ফল হিসাবে একটা বিশেষ মূল্যবান খাদ্য তা আমরা কোনদিনই ভাবিনি। কুল ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। সংস্কৃতে কুলকে 'বদরী' বলে। পুরাণে দেখা যায় যে, শবরী রামকে এই বদরী খেতে দিয়েছিলেন। কুলকে আমরা হেয় করলেও এতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য প্রাণ এবং ভিটামিন আছে। ভিটামিন 'সি' এতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও ভিটামিন 'এ' এবং 'বি' এতে খুব কম নেই। কুল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এতে শতকরা ৮৫·১ জল, স্নেহ ০·১, কার্বোহাইড্রেট ১২·৮, ক্যালশিয়াম ০·০৩, প্রোটিন ০·৮, লোহা ০·৮ এবং অন্যান্য বস্তু ০·৪ ভাগ।

*

প্লাস্টিকের তৈরী বাড়ি

ইংলণ্ডের ইলেকট্রিক্যাল এবং ইঞ্জিনীয়ারিং প্রদর্শনীতে একটি ঘড়ি থাকবে, যেটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘড়ি। এই ঘড়িটির ব্যাস ৬০ ফিট। মিনিট নির্দেশক কাঁটা হচ্ছে ৩৫ ফিট। এক মিনিট থেকে আর এক মিনিটের দূরত্ব তিন ফিট। সমস্ত ঘড়িটা তৈরী করার খরচ পড়বে ১১,৫০০ পাউণ্ড। ঘড়িটি বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলবে এবং ২৪ ঘণ্টা চলবার জন্য এক ইউনিটের চেয়েও কম বিদ্যুৎ পুড়বে।

*

ভর্টেক্স রিং প্যারাস্যুট একটি নবাবিষ্কৃত জিনিস। "ভর্টেক্স রিং" আকাশ থেকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় নামবে। এই প্যারাস্যুটটিতে চারটে কাপড়ের তৈরী পাখনা লাগান থাকার দরুণ চারটি পাখাযুক্ত হেলিকপ্টারের মতই ঘুরতে ঘুরতে নামবে। আজকের দিনে অত্যধিক গতিবিশিষ্ট জেট এয়ারক্রাফট বা উঁচু জাহাজ থেকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে লাফিয়ে পড়তে গেলে সহসা বায়ুর চাপের সঙ্গে বেগে ধাক্কা লাগতে পারে কারণ পুরনো ধরনের প্যারাস্যুট খুলতে একটু সময় লাগে এবং নামার গতিও সোজা হয় না। "ভর্টেক্স রিং"এর সাহায্যে নামতে গেলে ঐ ধরনের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা কম কারণ এটি খুব সহজেই খুলে যায় এবং সোজাসুজি নীচের দিকে নামতে থাকে। আগের প্যারাস্যুটের চেয়ে "ভর্টেক্স রিং"-এর ওজন অনেক কম এবং এটি ভাঁজ করা অবস্থায় একটি ছোট চামড়ার ব্যাগের মধ্যে পুরে নেওয়া যায়। ৩২ ফুট লম্বা একটি ভর্টেক্স রিং-এর ওজন মাত্র আট পাউণ্ড এবং আগেকার প্যারাস্যুট অপেক্ষা শতকরা ৬০ ভাগ কম কাপড় লাগে। ভর্টেক্স রিং দ্বারা মাটিতে নামলে আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম থাকে।

*

তাসের এক সংবাদে প্রকাশ সোভিয়েট দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রিদল পৃথিবীর সবচেয়ে ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজে বার করেছেন। এই স্থানটির নাম ভোস্টক। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে এই স্থানটির উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী থেকে ১২৬ ডিগ্রী নীচে ছিল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই এর চেয়ে কম তাপ পরিলক্ষিত হয় নি। ভোস্টকের তাপ মাত্রা এত কম যে, কোন তরল বস্তুকে গরম করতে ৫ ঘণ্টা সময় লাগে।

হল, এই ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ত্রুটি দূর করা এবং সে কারণে তিনি বিশেষ বিশেষ সীমাবদ্ধ সংস্কারের প্রস্তাব করে থাকেন। এই প্রকৃতির সমালোচনা রক্ষণধর্মী এবং দায়িত্বশীল এবং এই ধরনের সমালোচকরা সাধারণত আপন আপন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। নৈতিক সমালোচকও খুঁটিনাটি সংস্কারের সমর্থন করতে পারেন; কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য হল তিনি বর্তমান ব্যবস্থাকে এক কাল্পনিক আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করে থাকেন। ন্যায় এবং অন্যায়, উচিত এবং অনুচিত বিষয়ে তাঁর কতগুলি দৃঢ় নৈতিক প্রত্যয় আছে; এই প্রত্যয় অনুসারে বর্তমান ব্যবস্থায় যা-কিছু গর্হিত, তিনি তার আমূল বিরোধী। এই ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা সম্ভব, অথবা সেই প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থার চেহারাটা কি রকম, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন স্পষ্ট ধারণা না-ও থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে বিচার করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর নৈতিক প্রত্যয় অনুসারে বর্তমান ব্যবস্থায় যা-কিছু অন্যায় তার সঙ্গে তিনি কোন কারণেই রফা করতে প্রস্তুত নন। অপরপক্ষে মতবাদগত সমালোচনা বর্তমান সমাজের সম্পূর্ণ বিরোধী; এই প্রকৃতির সমালোচকেরা সংস্কারের সার্থকতায় অবিশ্বাসী। এঁদের মতে বর্তমান ব্যবস্থার সমস্ত ত্রুটি এই ব্যবস্থার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এঁরা প্রথমেই এক আদর্শ ব্যবস্থার পরিকল্পনা তৈরী করে নিয়ে বর্তমান সমাজকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ঐ আদর্শ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী। এই মতবাদগত উগ্র গোঁড়ামির ফলে এঁরা বর্তমান সমাজ থেকে বিযুক্ত এবং সে-কারণে বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে এঁদের ধারণায় বস্তুনিষ্ঠা অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, এঁদের মতবাদগত অসহিষ্ণুতা এঁদের নীতিবোধকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলে; মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের নামে মানুষকে বলি দিতেও এঁদের বাধে না। আরাঁর মতে মতবাদাশ্রয়ী সমালোচকেরা নীতিজ্ঞানহীন, যুক্তিবিমুখ, অসহিষ্ণু বৈনাশিক-বুদ্ধিচালিত, বিপ্লবী।

এখন আধুনিককালে বিভিন্ন সমাজে বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন প্রকৃতির সমালোচনা অবলম্বন করেছেন। মোটামুটি বলা যায়, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় বুদ্ধিজীবীদের ঝোঁক নৈতিক সমালোচনার সঙ্গে সীমাবদ্ধ সংস্কারের প্রস্তাব মেশানোর দিকে। অপরপক্ষে ফরাসী বুদ্ধিজীবীর সমালোচনা নীতিবোধ এবং মতবাদের মাঝখানে দোদুল্যমান। নীতিবোধ সম্ভবত সব সমালোচনারই উৎস; তাকে যিনি দায়িত্বশীলতা এবং বিশেষজ্ঞতার অধীন করেন, তিনি সংস্কারক; যাঁর নীতিবোধ আপোষহীন, তিনি বিদ্রোহী; আর যাঁর নীতিবোধ মতবাদের দ্বারা পরিচালিত, তিনি বিপ্লবী। ফ্রান্সে তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আরাঁ-র মতে কোন সমাজে বুদ্ধিজীবীরা সমালোচনার কোন ধারাটির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হবেন, সেটা অনেকটা নির্ভর করে চার্চ এবং শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ওপরে। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপে আধুনিক অর্থে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখনকার শিক্ষিত জন ছিলেন প্রধানত চার্চের কেরানী। রেনাসাঁসের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব ঘটে।
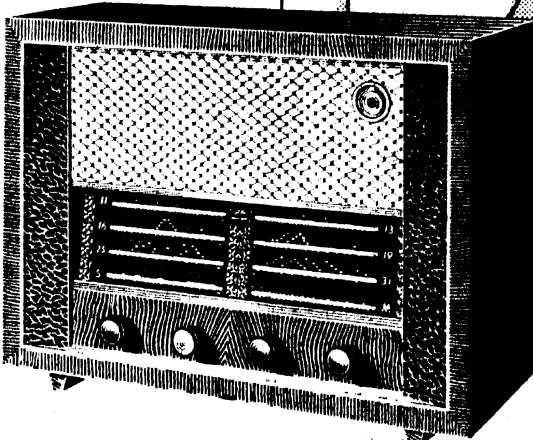
বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন চিন্তার দাবী এবং চার্চের গোঁড়ামির মধ্যে সংঘাতের অন্যতম ফল রেফর্মেশ্যান। রেফর্মেশ্যানের পর কয়েক শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে চার্চ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা রফার মনোভাব গড়ে ওঠে। চার্চ বুদ্ধিজীবীদের দমনের চেষ্টা কমিয়ে আনে; বুদ্ধিজীবীরাও চার্চের প্রতি সহিষ্ণু হয়। বুদ্ধিজীবীদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় চার্চ পদে পদে বাধা সৃষ্টি না করে অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিতে থাকে। এই কারণে ইংল্যাণ্ডে (এবং ইংল্যাণ্ডের প্রভাবের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) বুদ্ধিজীবীরা ক্বচিৎ ধর্মব্যবস্থার আমূল উচ্ছেদের জন্যে আন্দোলন করেছেন।

অন্যধারে সতের শতক থেকেই ইংল্যাণ্ডে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসকশ্রেণী নিজের দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে ভয় কিম্বা ঘৃণা করে সরিয়ে রাখেনি; নিজেদের শক্তির ওপরে আস্থা থাকার ফলে তারা বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা থেকে শিক্ষালাভ করেছে, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সংস্কারের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে তারা দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের বিশেষজ্ঞগণকে তারা নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। ফলে ইংরেজ বুদ্ধিজীবী কখনো সমাজজীবন থেকে বিযুক্ত হননি; শক্তিহীন সামর্থ্যের যন্ত্রণা তাঁকে বৈনাশিকতায় প্রবৃত্ত করেনি; তাঁর সমালোচনা কোন অসহিষ্ণু মতবাদে আশ্রয় খোঁজেনি। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা তাই বাস্তববাদী, দায়িত্বশীল, পরমতসহিষ্ণু সংস্কারক।

কিন্তু ফ্রান্সের ইতিহাস অন্যরকম। ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চ বুদ্ধিজীবীদের দমনে তার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করেছিল; আর তাই ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে চার্চের উচ্ছেদ দেখা দিয়েছিল তাঁদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে। চার্চ এবং বুদ্ধিজীবিদের এই অহিনকুল সম্পর্কে ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় উগ্রতা এবং অসহিষ্ণুতা এনেছে। অন্যধারে ফরাসী শাসক সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোন সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। শাসকরা বুদ্ধিজীবীদের দেখেছে ঈর্ষা এবং সন্দেহের চোখে এবং বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের কল্পনা করে নিয়েছেন চিরকালের বিরোধীপক্ষ হিসেবে। সমাজ-পরিচালনায় কোন দায়িত্ব না থাকায় ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা সম্ভাব্য সংস্কার বিষয়ে চিন্তা না করে বিশুদ্ধ আদর্শের পরিকল্পনায় ব্রতী হয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনে ছোটখাট ব্যবহারিক সুযোগ-সুবিধার প্রতিষ্ঠা তাঁর বিচারে মূল্যহীন; তত্ত্বের জ্যামিতিক আদলে জীবনকে আকার দেওয়াতেই তাঁর একমাত্র আগ্রহ।

মজা হল ধর্মের উচ্ছেদ ঘটাতে গিয়ে ফরাসী বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর চর্চা করেন নি, উগ্রতর ধার্মিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীর কাছে যুক্তি অভিজ্ঞতানির্ভর; ফ্রান্সের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিকে অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থেকে বিযুক্ত করে তাতে দেবত্ব আরোপ করেছেন। মিশেলো লিখেছিলেন, ফরাসী বিপ্লব কোনো প্রতিষ্ঠিত চার্চকে মেনে নেয়নি; কারণ বিপ্লব নিজেই ছিল একটা চার্চ। যেকোবিনরা ছিল এই নবধর্মের পুরোহিত। এই নবধর্মের বৈশিষ্ট্য হল, এটি নরীশ্বরবাদী। কিন্তু তাছাড়া ধর্মের বেশীর ভাগ লক্ষণই এতে বর্তমান। যেকোবিনদের প্রবর্তিত ধর্ম পরিপূর্ণতা পেল কম্যুনিজম্-এ; লেনিন তাই মার্ক্সবাদকে আধুনিক যুগের যেকোবিনিজম্ আখ্যা দিয়েছিলেন। যেকোবিন-ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই কম্যুনিজম্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

কিন্তু কম্যুনিজম্‌কে ধর্ম বলা কি যুক্তিসঙ্গত? পূর্বেও কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, আর'-র বিচার মোটামুটি তাঁদেরি যুক্তির অনুগামী। ধর্মের মত কম্যুনিজম্-ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি তত্ত্বের সূত্রে ব্যাখ্যা করার দাবী করে, কম্যুনিস্টদের পরমত অসহিষ্ণুতা এবং পৃথিবীর সব মানুষকে নিজের মতে দীক্ষিত করার উগ্র উদাম ক্রুসেডারদের কথাই মনে পড়ায়; এই মতবাদ অনুসারে মানুষের সমস্ত কর্তব্য অকর্তব্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট, তার মধ্যে কোনো বিকল্পের অবকাশ নেই। ধার্মিকদের মত কম্যুনিস্টরা-ও বর্তমানকে নাকচ করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তবে সেই ভবিষ্যতে উত্তরণ ঘটবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে নয়, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে। এবং সেই উত্তরণের মাধ্যম ঈশ্বর প্রেরিত কোনো অবতার বিশেষ নন, সে মাধ্যম ইতিহাসের নির্দেশবাহী একটি বিশেষ শ্রেণী। কম্যুনিজম্-এও শাস্ত্র আছে, গুরু আছে, মন্ত্রজপের দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আবিষ্ট করার ব্যবস্থা আছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন অবতারের নামে চার্চ প্রতিষ্ঠান চিরকাল ভক্তদের পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে এসেছে, কম্যুনিজম্-এও তেমনি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দোহাই দিয়ে পার্টি প্রতিষ্ঠান একচ্ছত্র ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যোগী। ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও চার্চের বিধান না-মানা যেমন "হেরেসি", তেমনি মার্ক্সীয় তত্ত্বে আস্থাশীল হয়েও কম্যুনিস্ট পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব স্বীকার না-করা মহাপাপ। সংসারের সমস্ত ঘটনাকে কয়েকটি পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় কম্যুনিস্ট চার্চও এক নব্য-স্কোলাস্টিক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে তুলেছে। কোন্ ঘটনা কী ভাবে ঘটেছে, অথবা আদৌ ঘটেছে কি না, এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান না করেই এই নবধর্মের ব্যাখ্যাতারা সে ঘটনা কেন ঘটেছে তার সমস্ত যুক্তি কল্পনা করতে সক্ষম। অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য যদি তাঁদের প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে যায়, তাতে তাঁদের মনে কোনো সংশয়ের উদ্রেক হয় না। তাঁদের চিন্তা অবরোহী; এবং তাঁদের যুক্তির প্রথম প্রত্যয় হল, পার্টি অভ্রান্ত।

পার্টি অভ্রান্ত; এটি পার্টির নির্দেশ; সুতরাং এ নির্দেশ অভ্রান্ত। এ বিষয়ে যাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় আছে, কম্যুনিস্ট ধর্মসাধনায় তাঁর সিদ্ধি অসম্ভব।

সব ধর্মের মত কম্যুনিজ্‌ম্‌-এও চার্চের সর্বময় ক্ষমতা এবং স্কোলাস্টিক চিন্তার প্রভাব ভক্তদের নীতিবোধকে বিকৃত করছে। পুণ্যলিপ্সা, শাস্ত্রীয় বিধান এবং পুরোহিতদের নির্দেশ মানুষকে যে কতখানি হৃদয়হীন করে তুলতে পারে, অন্ততঃ ভারতবাসীর তা অজানা নয়। ভক্ত কম্যুনিস্টরাও তেমনি ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশের নামে, পার্টির প্রতি নির্বিবেক আনুগত্যে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে, শ্রেণীহীন সমাজের স্বর্গে উপনীত হবার অদম্য আগ্রহে হেন অন্যায় নেই যা-করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক। ক্রমে তাদের বিবেকবুদ্ধি এমনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে কল্পিত উদ্দেশ্যের অজুহাতে প্রত্যক্ষ অন্যায়কে সংগত বলে ব্যাখ্যা করতে তাদের আর এতটুকু বাধে না। মিথ্যাভাষণ এবং মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুণ্ডামি, গুপ্তহত্যা, দুর্বলের ওপরে অত্যাচার—পার্টির হুকুম পেলে গোঁড়া কম্যুনিস্ট সব কিছুই সমর্থন করতে প্রস্তুত।

মার্ক্স লিখেছিলেন, ধর্ম জনসাধারণের আফিং। এরই মৌতাতে মানুষ নিজের দুঃসহ দশার কথা ভুলে স্বর্গের কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকে। শ্রীমতি সিমোন ভেইল বলেছেন, ধর্মের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা মেনে নিলে সন্দেহ থাকে না মার্ক্সবাদ নিজেই একটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির ধর্ম। কারণ জনসাধারণের ওপরে মার্ক্সবাদের প্রভাবের সঙ্গে আফিং-এর নেশারই যথার্থ তুলনা চলে। কিন্তু আর'-র মতে কম্যুনিজম্‌ এখনো কোথাও জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেনি; এই নিরীশ্বরবাদী ধর্ম এতাবৎ মুখ্যত বুদ্ধিজীবীদের ওপরেই প্রভাব ফেলেছে। এরই নেশায় বুদ্ধিজীবীরা বাস্তবের অনুসন্ধান ত্যাগ করে কল্পলোককেই একমাত্র সত্য বলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মধ্যযুগে যেমন চার্চের কেরানীকুল উক্ত প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দুর্নীতি এবং অত্যাচারকে শুধু কথার মোহজাল দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন, এখনকার মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী তেমনি রাশিয়া এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সমস্ত গলদ ডায়ালেকটিক মিথ্যাভাষণের সাহায্যে সমর্থনে ব্যাপৃত। কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর আফিং সেবনের ফলে তাঁদের বিচারবুদ্ধি এবং বিবেক সম্প্রতি জড়ত্বগ্রস্ত।

আর' মুখ্যত ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের ওপরে কম্যুনিজমের বিষক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন। তবে প্রসংগক্রমে এশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের ওপরে এই মতবাদের প্রভাব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সব ধর্মের মতই কম্যুনিজ্‌মের আবেদনও কয়েকটি পৌরাণিক কল্পনা বা "মিথ"-এর ওপরে নির্ভরশীল। আর' এদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান মিথ্‌-কে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমটি হল, বামপন্থা এবং দক্ষিণপন্থার মধ্যে আমূল বিরোধের কল্পনা। ফরাসী বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে এই মিথটির উদ্ভব। দক্ষিণপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীল, আর বামপন্থীরা প্রগতিশীল। আর' নানা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, গত দেড়শ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয় যে, দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থা সম্বন্ধে এই ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। দ্বিতীয় মিথটি হল, সমাজের উন্নতির জন্যে বিপ্লব প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লবের অর্থ শুধু দ্রুত এবং ব্যাপক পরিবর্তন নয়, কারণ সে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে আর কোন দেশ বেশী বিপ্লবী? এই মিথ অনুসারে বিপ্লবের লক্ষণ হল প্রবল অন্তর্যুদ্ধের ভেতর দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার আকস্মিক আমূল উচ্ছেদ এবং তারই ধ্বংসাবশেষের ওপরে নতুন প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা। আর' দেখিয়েছেন, এই অর্থে বিপ্লব না—অবশ্যম্ভাবী না—কল্যাণকর। তৃতীয় মিথটি সর্বহারাদের সম্পর্কে। কম্যুনিস্ট উপাখ্যান অনুসারে আধুনিক সমাজে শ্রমিকরা সর্বহারা; তাদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় বর্তমান সমাজ বিদীর্ণ হয়ে শ্রেণীহীন সমাজ জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু যন্ত্রশিল্পে উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকরা মোটেই সর্বহারা নয়; মার্কিন মজুরদের শুধু ঘরবাড়ি নেই, টেলিভিশন আছে, মোটরকার আছে ব্যাংক আকাউণ্ট, মায় ইনসিওর‍্যান্স পলিসি পর্যন্ত আছে। আর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ মোটেই শ্রেণীবৈষম্যমুক্ত নয়; সে দেশে জনসাধারণের সঙ্গে শাসক এবং পরিচালকদের অবস্থার ফারাক শ্রেণীবৈষম্যদুষ্ট যে-কোনো সমাজের চাইতেও বেশী প্রকট। তবু যে কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা এসব মিথ-এ এখনো বিশ্বাস করেন, তার কারণ মতবাদের আফিং সেবনের ফলে তাঁরা প্রত্যক্ষের স্বীকারে পরাঙ্মুখ এবং অশক্ত।

এই তিনটি পুরনো কল্পনা একটি মূল বিশ্বাসের সূত্রে গ্রথিত। সে-বিশ্বাসের নাম ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ। কম্যুনিস্ট ধর্মে ইতিহাস ঈশ্বরের সিংহাসন দখল করেছে। অন্যান্য বেশীর ভাগ ধর্মে যেমন জগতের সবকিছুর ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কম্যুনিস্ট ধর্মে তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নির্দেশের দ্বারা শাসিত। এই নির্দেশকে সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়াকে কম্যুনিস্টরা বলে মুক্তি। অস্তিত্বের বহুবাচনিকতা, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার বহুমুখী সম্পর্ক, একই ঘটনা সমাবেশ থেকে বিভিন্ন ফলাফলের সম্ভাবনা, কার্যকারণ সূত্রের ওপরে কর্তার প্রভাব, ব্যক্তির দৃষ্টি সামর্থ্য—এ সবই কম্যুনিস্ট ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মায়া অথবা মতিভ্রম মাত্র। আর' সংগত কারণেই কম্যুনিজম্‌-কে বুদ্ধিজীবীদের আফিং আখ্যা দিয়েছেন।

এই আফিং [illegible] কবে নাগাদ কাটবে, অথবা কোনো দিন কাটবে কি না সমাজতাত্ত্বিক জ্যোতিষী নন। তবে মানুষ যে-হেতু অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষালাভ করে সেকারণে আর' আশা করেন যে, পদে পদে অভিজ্ঞতার শিক্ষার সঙ্গে কম্যুনিস্ট ধারণার বিরোধ ঘটার ফলে বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবতঃ ক্রমেই এই মতবাদের যাথার্থ্যে সংশয়ী হয়ে উঠবেন। পৃথিবীর নানা দেশে (এমন কি ফ্রান্সেও) তার কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সংশয়ের ফলে সহনশীলতা আসে। এবং বর্তমানকালের বিপ্লববাদী বুদ্ধিজীবীরা যখন সহনশীলতার মূল্য উপলব্ধি করবেন, তখন এই উগ্রধর্মের মোহজাল শিথিল হয়ে উদারতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

তিন

দার্জিলিঙে নভেম্বর মাসের গোড়াতেই এরকম শীত পড়ে গেল যে, ওখানে আরও দিনকয়েক থাকার অনুরোধ রক্ষা করতে ইচ্ছে করলো না, যদিচ শচীনদাদার মতন আমারও বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবার প্রস্তাবটা তখন বেশ জোরালোভাবেই আমার মনকে আলোড়িত করছিল। তাঁর মুখে বিলিতী শীতের বর্ণনা শুনে আমার অন্তর দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু আশঙ্কাটা যে নিরর্থক, এ সত্য অনুভব করবার চেষ্টাও চলছিল। বিলেতে গেলে যে সমস্তদিন সায়েবী পোশাক পরে থাকতে হয় এবং দুপুরে খেয়ে-দেয়ে শোয়া নিষিদ্ধ, সে সম্বন্ধেও দার্জিলিঙে বসে রিহার্সাল দেওয়ার বাধ্যতামূলক সুযোগ পেয়েছিলুম। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে কোট-প্যান্ট চড়িয়ে ডাকবাক্সে চিঠি ফেলতে বেরোতুম আমরা দুজনে, কেননা, বিলেতে ঐরূপে শুভযাত্রায় নাকি কোনো মানহানি হয় না। টুপি না নিয়েও ও-সময়ে বাইরে বেরোনোয় কোন দোষ নেই। তবে প্রাতভ্রমণ বা সান্ধ্য-ভ্রমণে শিরস্ত্রাণ অবশ্য পরিধেয়। এ-সব নিয়মের পিছনে যে রবি-রশ্মির প্রভাব বর্তমান, সে-কথা বোঝা যায়, কারণ বৈদিক যুগে মাধ্যন্দিন সেবনের বিশেষ ব্যবস্থার মূলে বরেণ্য সবিতার নির্দেশ ছিল। প্রমথ চৌধুরী বলতেন, বৈদিক ঋষিরা ছিলেন সে-কালের সায়েব। ঋষিরা তপশ্চরণ করতেন তার মধ্যেও তপনের আভাস মেলে। সে যাই হোক, ইতিপূর্বে দুবার দার্জিলিঙে যাওয়ায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলুম যে, ঐ স্থান ঋষি-প্রিয় হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং সেখানে মিত্র-বরুণ দুই দেবতারই হাল-চাল লক্ষ্য করার জন্যে ইংরেজরা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করেছে। সেই Observatory Hill-এর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ানো উপলক্ষে একদিন আমি টুপির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি। এস পি সিংহ (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) এবং বি সি মিত্র এক সঙ্গে পদ-চারণ করছিলেন। মিত্র মহাশয় আমার দাদা-মশাই পর্যায়ের, সুতরাং চোখো-চোখি হতেই আমি টুপি তুলে তাঁকে অভিবাদন জানালুম। উত্তরে তাঁরা দুজনেই অনুরূপ আচরণ করায় একটা বিলিতী কেতার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলুম এবং এক নমস্কারের বদলে দুই নমস্কার লাভ হওয়ায় ইংরেজদের প্রতি আমার সহজাত প্রীতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। পরে যখন এস পি সিংহ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন, তখন এই স্মৃতিটি আমার মনে একটু আত্ম-গৌরবের উদ্রেক করেছিল। আর সবুজ-সভায় প্রমথবাবুও আমাদের বলেছিলেন যে সত্যপ্রসন্ন সিংহের সত্যই কালচার আছে।

পাহাড়ে শীত হাড়ে লাগা সত্ত্বেও কলকাতায় ফিরে [illegible] করেছিন। গ্রন্থোক্ত বোধ করি। আসমুদ্র প্রমাণিত হয় যে ওয়ালা হাওয়ায় সে-ও হচ্ছে "সা" প্রচলিত হ্যাট-কোট ছেড়ে ধুতি "গা" নয়। এর মনটাও বাঙালীয়ানার [illegible] যে গা-র মূল্য। এমন সময়ে পেলুম প্রথম গানগুলিতে চিঠিতে সবুজ-সভার ডাক। ১৮ই নভেম্বর কমলালয়ে জমায়েত হয়ে অনেক কথা কওয়া গিয়েছিল। আজকালকার (অর্থাৎ তখনকার) যুবকদের মধ্যে কালচার খুব, আমার এই মন্তব্য শুনে প্রমথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। প্রমাণস্বরূপ আমি সত্যেন বোসকে দেখিয়ে দিই। জহুরীর জহর চিনে নিতে দেরি হয়নি। প্রথম দর্শনেই অনুরাগের সূত্রপাত হওয়ায় উনি ৪ দিন পরেই (২২শে নভেম্বর) আমায় চিঠি দিলেন যেন আমি সত্যেনকে সঙ্গে নিয়ে সামনে শনিবারে (২৫শে) সবুজ-বৈঠকে যাই। পত্রোত্তরে জানালুম—নানা কারণে ঐদিন আমি উপস্থিত থাকতে অক্ষম, সুতরাং তিনি যেন সত্যেনের বাড়ির

ঠিকানায় (২২নং ঈশ্বর মিল লেন) আমন্ত্রণ-পত্র পাঠান। সেই আমন্ত্রণ-পত্রটি আমার হস্তে ন্যস্ত করে বন্ধুবর একাই সবুজ-সভার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। এক্ষেত্রে সেটির প্রতিলিপি প্রকাশযোগ্য:—

১, ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ।
২৪-১১-১৬

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান হারীতকৃষ্ণ লিখেছেন যে, নানা কারণে তাঁর পক্ষে কাল বিকেলে এখানে আসার সুবিধে হবে না। তবে আপনি যদি আসেন তো বড় সুখী হব। যাঁরা লেখা পড়া করছেন, অর্থাৎ মন নামক পদার্থটির চর্চা করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি মিশতে কথাবার্তা কইতে ভালবাসি। পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদানে যে আনন্দ পাওয়া শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকে পেয়েছি, কিন্তু সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্পবিস্তর নূতন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে, তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ভালবাসি। তাছাড়া যাঁরা পড়ছেন, তাঁদের আমি লেখাতে চাই। কেননা, বাঙ্গলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটা আজ পর্যন্ত ফাঁক রয়ে গিয়েছে। আর যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে, ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না, যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়—তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য, প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের প্ল্যান হলে এ-ভূভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, একথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণেই আমি আপনাকে "সবুজপত্রের" আসরে নামাতে চাই।

আমার এখানে আসা অবশ্য তেমন সহজ নয়। কেননা, আমি বাসা বেঁধেছি—প্রথমত শহরের বাইরে তারপরে একটেরে। বোধ হয় ঐ কারণে সাহিত্য সমাজেও আমি কতকটা একঘরে হয়ে রয়েছি। কি সমাজে, কি সাহিত্যে নাগরিক হওয়াটা আমার ধাতে নেই। সে যাই হোক, আপনার যদি সুবিধে হয় তাহলে কাল বেলা সাড়ে তিনটের সময় ল-কলেজে উপস্থিত হলে, আমি আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। তাহলে এতটা পথ উজান ঠেলে আসবার কষ্টটা আপনাকে পেতে হয় না।

ইতি—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এই পত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। সত্যেন আজ ন্যাশনাল প্রোফেসর এবং বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। প্রমথ চৌধুরীর সবুজ-পত্র-আন্দোলনের মূলে উদ্দেশ্য ছিল মৌখিক বাংলা ভাষাকে সাহিত্যে কায়েম

উৎসব নগরী

দিলীপ রায়

প্রপেলার দুটি ভীম গর্জনে হুঙ্কৃত
ফড়িংএর মতো রুপোর প্লেনের পাখা ঘোরে ;
এক্ষুনি ওরা দ্রুত ছুটে হবে উড়ন্ত,
মেঘে মেখে নীল আকাশে আলোক গম্ভীর।

অভিনব রথে মানুষ ছুটেছে অস্থির
দিক দিগন্ত প্রতিধ্বনিতে শাণিত
অস্ত্রের মতো ব্যঞ্জনা হয় রণিত।

জনতার ভিড়ে রাত্রি নামল প্রশান্ত
মাঠে মাঠে ঘন ছায়া কালো এই রাত্রি
মোটরের শুধু তীব্র ধাঁধানো আলো জ্বেলে
হবে কি বিংশ শতাব্দীর এই উৎসব ?

কোটি মানুষের জীবন-মরণ সমগ্র
কামনা তাদের আলোকমালায় জ্বলন্ত
উৎসবমুখরিত নগরীতে শুনেছি ওই
অগণ্য জনকণ্ঠে ধ্বনিত কলরব ॥

অপচেষ্টা

জিয়া হায়দার

দিনকয় থেকে লণ্ঠনটার সলতে
অযথা কাঁপছে। এই বুঝি এই নিভলো।
অনুসন্ধানে রোগ কিছু খুঁজে পাইনে।

কে যেন বললে : হয় তো হাওয়ার পাখনা
অকারণে এসে দোল দিয়ে বুঝি খেলছে।

রসিকা বোনটি বললে চোখটা ঘুরিয়ে
(অনেকটা যেন স্বগতউক্তি আড়ালে) :
হাওয়া তার পথ ভুলে গেছে ফালগুনে।

গম্ভীর স্বরে অনুজের মন্তব্য—
ডাক্তারী পড়ে, এবারে প্রথম বর্ষ :
বুঝেছি বাতিটা হৃদরোগে ঠিক ভুগছে।

বাতিটা নিভিয়ে দেহ পেতে দিয়ে শয্যায়
আলগোছে বুকে হাত রাখি সংগোপনে
কী যেন বোঝার মিছে এক অপচেষ্টায়॥

আচ্ছন্ন শূন্যতা

মানস রায় চৌধুরী

চাদরে সামান্য ভাঁজ, একটু ছাপ রিক্ত বিছানায়
আর কিছু মূল্যবান যায়নি সে ফেলে
দুপুরে যে এসেছিলো ধুলো ভেঙে আকণ্ঠ তৃষ্ণায়।
কতক্ষণ ছিলো ঘরে : মুহূর্তেই ছড়ানো বিষাদ
ছায়া তার: নিয়ে গেছে রৌদ্রকণা পড়ন্ত বিকেলে।

সামান্যই রেখে গেছে মমতার বিচ্ছিন্ন স্মারকে
বালিশে জলের দাগ স্মৃতির কুয়াশা বুত্তাকার,
মনে হয় ভালবাসা ওখানে ঘুমিয়ে। তার স্পর্শবহ ত্বকে
আলো পড়লে শিউরে উঠবে। ঢেকে রাখি খুব সাবধানে
এই টুকু যে সম্বল, অতিরিক্ত চিহ্ন নেই তার।

কিছুই পড়ে না মনে, চেতনায় আচ্ছন্ন শূন্যতা
কে কখন কাছে আসে, সুখের প্লাবনে কাঁপে স্নায়ু,
তারপর অন্ধকারে কিছু নেই...দেহচ্যুত গাঢ় বিষণ্ণতা...
বুকে রাখি একটু ছাপ ব্যক্তিগত, অস্পষ্ট, ক্ষীণায়ু।

উপায় নেই। এইভাবে শুধু খাম্বাজ নয় গ্রন্থে ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলি এবং আরও বহু রাগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে প্রচলিত কয়েকটি অন্ধ মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।

অবশ্য বাদী সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। গ্রন্থকার বাদী বলতে—"প্রয়োগ-বহুলত্বাং বাদী"—এই সূত্রটিই গ্রহণ করেছেন। সংগীত শাস্ত্রে বহুত্ব বলেও একটা শব্দ আছে। অলঙ্ঘন এবং অভ্যাসের দ্বারা উচ্চারিত স্বরের প্রয়োগকে বহুত্ব বলা হয়। স্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করে যাওয়ার নাম লঙ্ঘন; আর স্বরকে বহুল-ভাবে স্পর্শ করাই হচ্ছে অলঙ্ঘন। অভ্যাস অর্থে স্বরের আবৃত্তি বোঝায়। স্বরকে এই দুভাবে ব্যবহার করলেই গানে তার বহুত্বের বিকাশ হয়। এই দুটি প্রাচীন জাতি গানের অংশের পর্যায়েই পড়ে। এই কারণে এদের সম্পর্কে "পর্যায়াংশ"—এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অলঙ্ঘন-জনিত যে বহুত্ব সেটি বাদীর অনুরূপ কেননা এখানে স্বরের অত্যাবশ্যক প্রয়োগ ঘটছে; অর্থাৎ গীতের গতি এবং ভঙ্গী অনুসারে এই স্বরটির বহুল প্রয়োগ এড়াবার জো নেই। আর আবৃত্তি বা অভ্যাস হচ্ছে এমন একটি প্রয়োগ যা উক্ত বহুল প্রযুক্ত স্বরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য বারে বারে আসবেই। এই অভ্যাস-জনিত আবৃত্তিহেতু যে বহুত্ব সেটি সংবাদীর তুল্য।

সর্বদিক ভেবে চিন্তে শাস্ত্রকার বলেছেন—যে স্বরটি সংগীত রক্তকত্ব প্রদান করে, গীতখণ্ডে যায় সংবাদী এবং অনুবাদীর বাহুল্য থাকে, যার থেকে তার এবং মন্দ্রের অবস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়, যে স্বর স্বয়ং বা যার সংবাদী, অনুবাদী স্বর প্রভৃতি ন্যাস, অপন্যাস এবং গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রাধান্য এবং যোগ্যতা অনুসারে সেই বহুল প্রযুক্ত স্বরটি বাদী বা অংশ বলে স্বীকৃত হয়। প্রয়োগে বহুলত্ব এবং ব্যাপকত্বই হচ্ছে অংশের সাধারণ লক্ষণ। অংশ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগ; অর্থাৎ অংশই হচ্ছে জাতি রাগাদি বিভাগের হেতু।

জাতি গানের যে স্বরলিপি শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাতে এই বহুলত্বের সুচিন্তিত প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। কল্লিনাথ ষাড়জী নামক জাতির ব্যবচ্ছেদপূর্বক দেখিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রকার বর্ণিত স্বরের প্রয়োগ-গুলি কিভাবে সংখ্যাগত গুরুত্ব নিয়ে উল্লিখিত সংগীতে বিরাজ করছে।

জাতি গানের পরিকল্পনা এবং বর্তমান রাগসংগীতের পরিকল্পনায় অনেক প্রভেদ আছে। তথাপি যদি সুপ্রাচীন বাদী, সম্বাদী প্রভৃতির প্রয়োগকে রীতিসম্মতভাবে রক্ষা করতে হয় তাহলে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ছিল যাতে রাগসংগীতের কাঠামো থেকে বাদী সম্বাদী প্রভৃতি স্বর প্রয়োগ বহুলত্ব এবং গুরুত্ব অনুসারে নির্ণীত হতে পারে। সেটি আদৌ করা হয়নি অথচ বাগাড়ম্বর অনেক হয়েছে এবং মজা হচ্ছে এই যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অন্ধভাবেই অনেক কিছু প্রয়োগ করা হচ্ছে যাদের সমর্থন করা শক্ত।

অমিয়নাথ সান্যাল যেভাবে বাদী নির্ণয় করেছেন তাতে বাদীর যে সংজ্ঞা ইতিপূর্বে দেওয়া হল সেটি যথাযথভাবে বজায় থাকবে কি না তা পরীক্ষণীয় কিন্তু বর্তমান রাগ-সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতবাদকে অগ্রাহ্য করা বা খণ্ডন করার পক্ষে আমি কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না। গ্রন্থটি সমগ্রভাবে পাঠ করলে তাঁর চিন্তার সূক্ষ্মতা এবং দূরদর্শিতায় চমৎকৃত হতে হয়।

এই গ্রন্থে আর একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ঔড়ব বা ষাড়ব রাগের প্রচ্ছন্ন-স্বর-নিরূপণ। অনেক রাগে দু-একটি স্বরের প্রয়োগ সাধারণভাবে হয় না কিন্তু সেই স্বরগুলি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। এই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান স্বরগুলির অস্তিত্ব নির্ধারণ করবার যে উপায় তিনি বর্ণনা করেছেন সেটি হচ্ছে তাঁর Rule of two fifths; ব্যাপারটি জটিল না হলেও গাণিতিক বলে এখানে উদাহরণ সমেত উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। এই উপায়টি খাটালে অনেক ঔড়ব, খাড়ব রাগের প্রচ্ছন্ন স্বরগুলি আমরা নির্ণয় করতে পারব এবং তখনই আমাদের মনে ধোঁকা লাগবে যে আমরা যাদের বর্জিত স্বর বলে বাতিল করি সেগুলি আসলে হয়ত বর্জিত নয় প্রচ্ছন্ন আছে মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে অনেক গানে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রচ্ছন্ন স্বরগুলি আত্মপ্রকাশ করেও থাকে। যেমন গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে হিন্দোলের ক্ষেত্রে শুদ্ধ মধ্যম বা পঞ্চম প্রচ্ছন্ন রয়েছে মাত্র বৈজ্ঞানিক-ভাবে বিচার করে দেখলে তাদের বর্জিত বলে স্বীকার করা যায় না। অতএব বর্তমানে যাঁরা বলেন যে কল্যাণ ঠাট থেকে দুটি স্বর বর্জন করে হিন্দোলের উৎপত্তি হয়েছে তাঁদের মত বৈজ্ঞানিক বিচারে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ মূল রাগগুলিই কেবলমাত্র সপ্তস্বরে গঠিত হবে এবং ষাড়ব বা ঔড়ব রাগ এই সব সম্পূর্ণ জাতীয় মূলরাগের স্বর-বিলোপ দ্বারা উৎপন্ন হবে—এই মতবাদের পিছনে সংগত যুক্তি নেই। এই কারণেই জনক-জন্য পদ্ধতিও গ্রহণ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এসব নানা তত্ত্ব বিচার করে গ্রন্থকার কিভাবে একটি যথার্থ এবং সম্পূর্ণ রাগরূপে নির্ণয় করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

এই প্রধান বিষয়গুলি ছাড়া আরও বহু বিষয় সম্বন্ধে নিপুণ আলোচনা আছে যার বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থের সাধারণ পরিচয় উপলক্ষ্যে দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থকার বহু স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, নিয়মিত এবং ব্যতিক্রমযুক্ত রাগের উদাহরণ দিয়ে তাঁর মতবাদগুলি যুক্তি সহকারে উত্থাপিত করেছেন। পূর্বেই বলেছি তাঁর মূল্য উদ্দেশ্যই স্বর এবং মূর্ছনার মূল্য নির্ণয়। এই মূল্যায়ণের পদ্ধতিতেই তিনি রাগ রাগিনীর স্বরূপ, বৈশিষ্ট এবং বৈষম্য বিচার করে দেখেছেন। তাঁর প্রদর্শিত রীতিতে রাগসঙ্গীতের বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীকরণ হলে রাগের পরিচয় উপলক্ষ্যে খুব বেশি প্রশ্নের অবকাশ থাকবে না।

বিষয়বস্তুর আলোচনা উপলক্ষ্যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছে। আশা করা যায় তাঁরা এবং তাঁদের অনুবর্তীরা এই মতানৈক্যের কারণগুলি স্থির মস্তিষ্কে আলোচনা করে দেখবেন কেননা অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর গ্রন্থে একটি বিষয়ও বিনা পরীক্ষায় মেনে নেননি এবং একটি কথাও বিনা চিন্তায় বলেননি।

পরিশেষে এই বহুদর্শী, বহুশ্রুত এবং প্রবীণ সংগীতবিদের একটি মত উদ্ধৃত করি। বর্তমান সম্মেলন এবং মহা-সম্মেলনের দিনে বিনা ক্লেশে নিত্য উদ্ভাবিত নব নব প্রচেষ্টার ব্যর্থতা কোথায় সেটি এই অভিজ্ঞের উক্তি থেকে বোঝা যাবে।

The artiste i.e. the artiste with the true instinctive vision of basic motif (Raga vrtti in Sanskrit) will never commit himself to whimsicalities so long as he externalises his contemplation through a particular dominant motif. But of course there are artistes & artistes who sing and sing without the slightest regard for their inner instructive motif, caring only for novelties and Kinematographic presentation of notes. They want us the listeners to appreciate their motion instead of motif. We do appreciate them now and then, just as we appreciate meaningless body movements of infants; movements which are devoid of artistic motif at the start and which never culminate in the artistic presentation at the finish. There lies the difference between motive and motion and between art and activity, and there is such a thing as infantilism in the art of presentation of music.

Ragas and Raginis—Amiyanath Sanyal, Orient Longmans Private Ltd. 17, Chittaranjan Avenue, Calcutta. Rs. 5/-

সতেরো

রামকেষ্টো ছোটকর্তার গা হাত পা টিপতে টিপতে সমস্ত ঘটনা বলে ফেলল। সব শুনে ছোটকর্তা গুম মেরে পড়ে রইলেন। মেজকর্তার মত বিচলিত হলেন না তিনি। মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, সুখে থাকতে যখন ভূতের কিল খাবার সাধ হয়েছে, তখন ব্যাটাদের ত্যালানি নিশ্চয়ই বেড়েছে। এক একজন মহামাতব্বর হয়ে উঠেছে দেখছি।

রামকেষ্টো বলল, "ছোটবাবু, পরশুদিন হাট। জোড়জাড় যে রকম, বুঝি বা রক্তারক্তি লাগিয়েই ছাড়ে যায়। নিকিরিরাও তো ছাড়ে কথা কওয়ার লোক না।"

এতক্ষণ ছোটকর্তার শরীরটা ঠান্ডাই ছিল। রামকেষ্টোর অভ্যস্ত হাতের টিপুনিতে বেশ আরাম আরাম লাগছিল। রামকেষ্টোর ঘ্যানর ঘ্যানরেও তাঁর মৌজ নষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন তার শেষ কথাটা ঝিমিয়ে পড়া দারোগার পেটে চুঁ মেরেই যেন তন্দ্রাভঙ্গ করল। বলে কি ব্যাটা! পরশুদিন এখানে হাঙ্গামা বাঁধবে? খুনে জখম হবে? তার মানে সব ঝামেলা এসে পড়বে তাঁর ঘাড়ে। তখন তদন্ত কর রে, আসামী ধরে চালান দাও রে, ফেরারীদের পিছু পিছু কুকুরের মত তাড়া করে বেড়াও রে, কেস্ তৈরী কর, মামলার তদ্বির কর, হাজারো বখেড়া। গ্রামের কেস্, একটি আধলা আমদানী হবে না। কোন শালা তো একটি পয়সা উপুড় হস্ত করবে না। শুধু নাকের জলে চোখের জলে হওয়াই সার হবে।

খপ্ করে ছোটকর্তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। হাত নিস্‌পিস্ করতে লাগল। শালারা ভেবেছে কি? দেশ অরাজক হয়েছে? কার রাজত্বে বাস করছে, সেটা ভুলে গিয়েছে সব? আচ্ছা, শীতল দারোগা কাল সকালেই সেটা মালুম পাইয়ে দেবেন। তার সঙ্গে চালাকি!

দাঙ্গা হাঙ্গামায় অরুচি নেই দারোগাদের। ছোটকর্তারও না। কায়দা কানুন রপ্ত আছে ছোটকর্তার। অধিকাংশ সময় হাঙ্গামা মিটে গেলেই ঘটনাস্থল থেকে ডাক আসে। তাতেই

সুবিধে। ধীরে সুস্থে
সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রে
এ বিষয়ে একটা প্রধান নিয়ম
যত পুরনো হন, তাঁর হাতে
লোক গ্রেপ্তার হয়। কারণ
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দু
লোকদের মধ্যেই নালিশ করার প্র
দেখা যায়। নিজেদের রক্ষা করার
নেই, তাই রাজার কাছে আশ্রয় চাইতে
এসে আছড়ে পড়ে। রাজা তো বিদে
থাকেন, তাঁর নাগাল পাবে কোথায়। তা
দারোগাবাবুদের সুখ শান্তিই নষ্ট করে
এসে। তার দাওয়াই তাই বের করতে
হয়েছে। কারণ বৃটিশের রাজত্ব আইনের
রাজত্ব। আর আইনের চোখে তো সবল
দুর্বল নেই, সবাই সমান। সাহায্য একবার
চেয়ে বসলে, সে সাহায্য দিতেই হবে। না
দিলে চাকরি নিয়ে টানাটানি। তাই ঘাঘু
দারোগা সুযোগ পেলেই নিরীহ লোকদের
ধরে বেঁধে থানায় টেনে আনেন। তারপর
বিধিমত তাদের উপর এমন অব্যর্থ সব
দাওয়াই প্রয়োগ করেন যে, প্রাণ গেলেও
তারা আর থানামুখো হয় না। ফলে দেশের
লোকের মনে ঈশ্বরভক্তি বাড়ে। তারা যীশু
খৃস্টের মত ক্ষমাশীল হয়। রিপোর্টের

তাং
দেখে
ওঠে বড়
কার্যালয়ে গেছে
টের পাওয়াচ্ছি
জোড়ন করে বলে।
নামটাই শীতল, বুঝেছ,
কত গরম, এবার টের পাবে।

ছোটকর্তা বললেন, "রামকেষ্ট,
সকালে উঠেই গদাধরের বাড়ি যাবি। বলবি
ছোটবাবু ঝিনেদায় বদলি হয়ে আসেছেন।

উপায় নেই। এইভাবে শুধু খাম্বাজ নয় গ্রন্থে ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলি এবং আরও বহু রাগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে প্রচলিত কয়েকটি অন্ধ মতবাদ খণ্ডন করা হয়েছে।

অবশ্য বাদী সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। গ্রন্থকার বাদী বলতে—"প্রয়োগ-বহুলত্বাং বাদী"—এই সূত্রটিই গ্রহণ করেছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে বহুত্ব বলেও একটা শব্দ আছে। অলঙ্ঘন এবং অভ্যাসের দ্বারা উচ্চারিত স্বরের প্রয়োগকে বহুত্ব বলা হয়। স্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করে যাওয়ার নাম লঙ্ঘন; আর স্বরকে বহুল-ভাবে স্পর্শ করাই হচ্ছে অলঙ্ঘন। অভ্যাস অর্থে স্বরের আবৃত্তি বোঝায়। স্বরকে এই দুভাবে ব্যবহার করলেই গানে তার বহুত্বের বিকাশ হয়। এই দুটি প্রাচীন জাতি গানের অংশের পর্যায়েই পড়ে। এই কারণে এদের সম্পর্কে "পর্যায়াংশ"—এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অলঙ্ঘন-জনিত যে বহুত্ব সেটি বাদীর অনুরূপ কেননা এখানে স্বরের অত্যাবশ্যক প্রয়োগ ঘটছে; অর্থাৎ গীতের গতি এবং ভঙ্গী অনুসারে এই স্বরটির বহুল প্রয়োগ এড়াবার জো নেই। আর আবৃত্তি বা অভ্যাস হচ্ছে এমন একটি প্রয়োগ যা ঐ বহুল প্রযুক্ত স্বরের সঙ্গে সংযোগ র জন্য বারে বারে আসবেই। এই জনিত আবৃত্তিহেতু যে ব সংবাদীর তুল্য।

সর্বদিক ভেবে চিন্তে —যে স্বরটি সঙ্গীত গীতখণ্ডে যা বাহুল্য প্র অবশি

পদ্ধতি অবলম্বন রাগসঙ্গীতের কাঠা প্রভৃতি স্বর প্রয়োগ অনুসরে নির্ণীত আলোচনা করা হয়নি অ হয়েছে এবং মজা দোহাই দিয়ে অন্ধভ প্রয়োগ করা হচ্ছে ব অমিয়নাথ সান্যা" করেছেন তাতে বা দেওয়া হল সেটি কি না তা পরীক্ষ সঙ্গীতের প অগ্রাহ্য করা হ কোনও যুক্তি সমগ্রভাবে সূক্ষ্মতা হয়।

এই গ্র অবতারণ ষাড়ব রা"

পৌঁছান মাত্তর তিনি । যদি পিরাণে বাঁচার রের মধ্যেই মেন্দার হও। আর বন্দোরে বিশেবসগেরে দুকামে থন। এক ছিলিম অ।"

তামাক সেজে দিল। ধ্যেই বদলে গেছেন। যার নামে ত্রিভুবন

টেনে ছোটকত্তা শুতে নকাদিন, প্রায় দশ বছর শুতে উঠলেন। ওর রে পড়ল, আজ জোড়া য়েছে। কেন জানি, কেমন ধ বাধ ঠেকতে লাগল তাঁর। ঙ্গ শোয়াই এতদিন অভ্যেস ল। আজ যেন নিয়ম ভঙ্গ। পরে পুরনো অভ্যাসে ফিরতে ধন দশ বছর আগে ব্যবহার করা আবার নতুন করে পা গলাতে হচ্ছে। ঢুকেছে ঠিকই, তবু কেমন অস্বস্তি কচ্ছে।

এই নতুন অবস্থায় পড়ে, ছোটকত্তার মন থেকে হাঙ্গামার চিন্তা আপাতত মুছে গেল। ছোটবউ এখনও ঘরে আসেনি। ওসব কাজ সারা হয়নি এখনও। সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার পর এখন অবসাদ যেন ছোটকত্তাকে কোলে তুলে নিল। এই বিছানা কে পেতেছে, ছোটবউ? ছোটবউ এমন পরিপাটি করে বিছানা পাততে পারছে তাহলে? তাহলে তো সত্যিই সেরে গেছে। আগের মতই হয়ে উঠেছে আবার।...শরীর এলিয়ে আসছে ছোটকত্তার। কিন্তু পাগল হবার আগে ছোটবউ কেমন ছিল? যাচ্চলে, এ আবার কি কথা।...একটা হাই তুললেন ছোটকত্তা। কি কথা মানে, তখন ছোটবউ কেমন ছিল, সেটা না জানলে, এখন সে আগের মত হয়েছে কিনা, বুঝবে কি করে? কেমন করে তখন বিছানা পাতত ছোটবউ? খাবার জল ঢাকা দিয়ে রেখে যেত, না শুতে আসার সময় সঙ্গে করে আনত। কই, মনে তো পড়ছে না। গোপালদাসী জলের গেলাস হাতে করেই ঢুকত, সেটা মনে আছে। কালিগঞ্জের ঐ খানকীগুলোর ওসব বালাই ছিল না, মদে চুর হয়ে বিছানায় পড়ত হারামজাদীরা, সেটাও মনে আছে। কিন্তু ছোটবউ এক্ষেত্রে কি করত, সেটা তো মনে নেই। কিছুতেই মনে পড়ছে না। মসলা দেওয়া পান এনে গোপালদাসী তাঁর মুখে দিত। হেসে হেসে বলত, মুখের গন্ধ না গেলি কি চলে! কালিগঞ্জের মাগীগুলো তো নিজেরাই এক একটা ভাঁটিখানা, এসবের সাড় থাকবে কোত্থেকে। কিন্তু ছোটবউয়ের তো সাড় ছিল। তিনি যেদিন মদ খেয়ে আসতেন সেদিন ছোটবউ কি তাঁকে পান খাওয়াত, নাকি মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকত? কিছুই মনে নেই। তিনি যেদিন জেগে থাকতেন, সেদিন ছোটবউ ঘরে ঢুকে কি তাঁর সঙ্গে কথা বলত? যেদিন ঘুমিয়ে পড়তেন, সেদিন এসে কি জাগাত তাঁকে? কি আশ্চর্য, কিছুই যে মনে নেই। পর পর দুবার হাই তুললেন ছোটকত্তা। মট মট হাতের আঙুল মটকে নিলেন।

তাহলে? তাহলে তিনি কি করে বুঝবেন কতখানি ভাল হয়েছে ছোটবউ? এখনও পর্যন্ত কাছে পাননি তাকে। ঐ যা এক ঝলক তখন দেখা হয়েছে। বুড়ির ছেলের পাশে শুয়েছিল। তিনি ঢুকতেই ঘোমটা টেনে সরে গেল। একটুখানি তাকিয়েছিল যেন তাঁর দিকে। তাকিয়েছিল কি? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে বাঁধা পাগল তো আর নেই। তাহলে তিনি এ ঘরে শুতে পারতেন কি করে? এখানেই তো শিকল তুলে আটকে রাখা হ'ত তাকে। যতবার এসেছেন এর আগে, একই দৃশ্য দেখেছেন। এই ঘরেই সে থেকেছে দশটি বছর। হেসেছে, কেঁদেছে, খেলেছে, চীৎকার করে বাড়ি মাথায় করেছে। একগাদা লোকের সামনে উলঙ্গ হয়ে ধেই ধেই করে নেচেছে। বদ্ধ পাগল ছিল তখন।

প্রথমবার এসে ছোটবউয়ের এই অবস্থা দেখে মুষড়ে পড়েছিলেন ছোটকত্তা। প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন মনে। কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন নি। যে ছিল তাঁর বউ, সে হ'ল পাগল। তাঁকে লাথি দেখায়, কাছে এগোতে গেলে গায়ে থুথু ছোড়ে, আদর করে কাছে আনতে গেলে কামড়াতে আসে। মারে। সমস্ত বাড়িটাকে অস্থির করে তুলেছিল।

ছোটকত্তার মনে পড়ল, সেই বিশ্রী ঘটনার কথা। তাঁরা বারবাড়িতে বসেছিলেন। অনেক লোক ছিল সেখানে। ছোটবউকে দিদি আর বৌদি বোধ হয় চান করাতেই নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তাদের হাত ছাড়িয়ে ছোটবউ বারবাড়িতে এসে পড়ল। একটানে পরনের কাপড় খুলে ফেলে এমন কুৎসিত সব কাণ্ড করতে লাগল যে, ছোটকত্তাদের মাথা কাটা গেল। বড়দা পাঁচজনের মধ্যে বসে দু হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলেন, শীতু শীতু, তুই উটারে ভিতরে নিয়ে যা। ছোটকত্তা বুঝতে পারলেন, বড়-কত্তা গলার স্বরে জমাট ঘৃণা ছুঁড়ে দিলেন। পিছন থেকে কে যেন, হাসি চাপতে পারল না। ছোটকত্তা যেন কি হয়ে গেলেন। তাঁর মনে ছোটবউয়ের প্রতি সহানুভূতি আর সমবেদনার যে উৎসটি সজীব ছিল, সেটি চট করে, সেই মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল। ছোটকত্তা দেখলেন, তাঁর

স্ত্রী, তাঁর সাত পাকের বউ, তাঁরই চোখের সামনে, সেই বারবাড়ির উঠোন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পলক না পড়তেই কোন জাদুকর ঠিক সেখানে রেখে গেল মনুষ্যাকৃতি এক কিম্ভুত কিমাকার একটা জানোয়ারকে। ছোটকর্তা দ্রুত পায়ে উঠোনে নেমে গেলেন, বিনা দ্বিধায় সেই জানোয়ারটার মানুষের মত সরু ঘাড়ে মারলেন তাঁর অসুরের মত হাতের এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সেই জানোয়ারটা ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ছোটকর্তা অবলীলাক্রমে তাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে নিলেন, তারপর ধানের বস্তার মত ভিতর বাড়ির উঠোনে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। কোত্থেকে যেন রক্ত পড়ছিল, ঠিক খেয়াল ছিল না। হয়ত কোথাও কেটে গিয়েছিল সেটার, হয়ত হাত পা ভেঙেগ গিয়েছিল। ছোটকর্তা ভিতর-বাড়িতে ঢুকে সেই কুণ্ডলী পাকানো মাংসের পিণ্ডে খুব জোরে মারলেন একটা লাথি। একটু উল্টে গেল সেটা। তারপর আরেকটা লাথি মেরেছিলেন কিনা, তাঁর ঠিক স্মরণ নেই। কুকুরকে বিড়ালকে আমরা যখন মারি, তখন ক' ঘা মারি তার কি হিসেব রাখি। তাই ছোটকর্তা সঠিক বলতে পারবেন না আরেকটি লাথিও মেরেছিলেন কিনা। কিংবা, হঠাৎ অনেকগুলো লোক (কত লোক তাও তাঁর খেয়াল ছিল না) তাঁকে সেদিন পাঁজা সাপ্টা করে ধরে না ফেললে ঐ জন্তুটাকে তিনি থেঁতলে ফেলতেন কিনা, তাও জানেন না।

শুধু এটা জানেন, ঐ ঘটনার পর থেকে ছোটবউ সম্পর্কে কোন আগ্রহ, কোন ঔৎসুক্য ছোটকর্তার মনে আর জাগেনি। তাঁর মনে ছোটবউয়ের জীবন্ত অস্তিত্বটি যেন শীলাপাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ছোটকর্তার যে মনটি স্ত্রীর প্রেমে, তাঁর ভালবাসায় উষ্ণ হয়ে থাকত, এই ঘটনার পর সেটি যেন মৃত উনুনের মত শীতল হয়ে গেল।

হয়ত এই কারণেই, এখন, ছোটকর্তা বিছানায় শুয়ে স্মৃতি খুঁটেও এমন কোন চিহ্ন, কোন নিশানা খুঁজে পাচ্ছেন না, যা দিয়ে আগেকার ছোটবউয়ের সঙ্গে এই ছোটবউটাকে মিলিয়ে নিতে পারেন।

হঠাৎ ছোটকর্তার সমস্ত ভাবনা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ, অপ্রস্তুতভাবেই, টুপ করে ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেলেন। তাঁর চৈতন্যের উপরতলে নানা ভাবনার যে ফাতনাটা এতক্ষণ ধরে টিপ টিপ করছিল, এখন বিরাট ভারী এক মাছের টানে সোঁ করে সেটা অতলে তলিয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার, তেমনিই হঠাৎ সেটা যেন ভুস্ করে ভেসে উঠল। ঘুম ছুটে গেল ছোটকর্তার।

ছোটবউ এসে যদি সেদিনের সেই অমানুষিক মারের কৈফিয়ত চায়, তাহলে ছোটকর্তা কি তার জবাব দেবেন? এই ভাবনাটাই গুঁতো মেরে যেন জাগিয়ে দিল ছোটকর্তাকে। কি বলবেন তিনি? সেই মারের পর ছোটবউ হাত পা ভেঙেগ অনেক-দিন শয্যাশায়ী ছিল। একদিনের তরেও কোন অভিযোগ করেনি, আহত কুকুরও তো গোঙায়, কিন্তু ছোটবউ তাও করেনি। শুধু, তারপর থেকে, যে দু একবার ছোটকর্তার কাছাকাছি হতে হয়েছে ছোটবউকে, সেই কয়বারই ছোটবউয়ের চোখের মণি দুটো ধীরে ধীরে জ্যামিতিক শূন্যের মত প্রাণহীন হয়ে উঠেছে। তাঁর দেহের স্নায়ুগুলো এক অভাবিত আক্রমণ, অকথ্য অত্যাচার সহ্য করার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে থেকেছে। ছোটকর্তা সেটা যেন এই মুহূর্তে আবিষ্কার করলেন, এই এতদিন পরে!

তাই বোধ হয় ছোটবউ তখন অমন বোবা দৃষ্টি ফেলেছিল তাঁর উপর। সত্যিই তাঁর পানে তাহলে ছোটবউ চেয়েছিল তখন। হ্যাঁ, এখন ছোটকর্তার মনে হল, তাতে আর কোন ভুল নেই।

উঃ, গরম লাগছে বড়। হাওয়া নেই। বাইরের মত ছোটকর্তার মনের মধ্যেও গুমোট। দারুণ অস্বস্তি লাগছে তাঁর। সময় মত ওষুধ পেটে পড়লে, এসব যন্ত্রণা কিছুই ভোগ করতে হ'ত না। নেশার কাছে পুত্রশোকও জব্দ। বিকেল বেলায় নবুনের কাছে চলে গেলেই হ'ত। ঐ একটিমাত্র মনের মত বন্ধু, এক গেলাসের ইয়ার, এখনও তাঁর আছে এই গ্রামে।

তার কাছে গিয়ে পড়তে পারলে এতক্ষণ আর ভাবনা থাকত না কোনও। তা না করে, কতকগুলো ভালো ভাল্গো ভাবের মোহে পড়ে সময় নষ্ট করলেন। এখন তার ফল ভোগ করুন।

ঘুম ভেঙেগছে বটে ছোটকর্তার কিন্তু চোখের পাতা এখনও খোলেনি। চোখ

ব্যুজেই তিনি চারিদিক হাতড়াতে শুরু করলেন। পাখা টাখা রাখেনি না কি? না, কোথাও পাখা পেলেন না। ছোটবউ যদি হাতে করে আনে একখানা, একটু যদি বাতাস করে, তবে এক্ষুণি তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু কোথায় ছোটবউ? আসছে না কেন? কত রাত এখন? হে'সেলের কাজ কি মেটেনি এখনও?

নাকি ছোটবউ আসবেই না তাঁর কাছে? ভেবেছে হয়ত, কাছে গেলেই মার খাবে সেদিনের মত। সত্যি সত্যিই তাই ভাবছে নাকি ছোটবউ? পাগল আর কাকে বলে?

সেদিন কি ছোটবউকে মেরেছিলেন ছোট-কত্তা? মেরেছিলেন তো একটা পাগলকে। পাগল কি মানুষ? সে তো পশুর সমান। সে তো পশু। সেদিন ছোটকত্তা মেরেছিলেন তেমন এক পশুকে। মানুষকে কি কেউ ওভাবে মারতে পারে? ছোটবউয়ের কাছেই যেন বারবার কৈফিয়ৎ দিতে লাগলেন তিনি। না না, ছোটবউ, তোমার কোন ভয় নেই। এস, এস, তুমি স্বচ্ছন্দে উঠে এস খাটে। সরে এস আমার পাশে। এদিকে ফিরে শোও। দ্যাখত, এই হাতের ভয় তুমি করছিলে তো! দ্যাখ এবার, এই হাত কত আদর করতে পারে। কত কোমল, কত স্নেহময়, দেখছ তো। বউকে কি কেউ অমন করে মারতে পারে?

ছোটকত্তা জানতেও পারলেন না, কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে লাগলেন ছোটবউয়ের সঙ্গে।

রান্নাঘরে মেয়েদের খাওয়া দাওয়া চুকল। হে'সেলের পাট চুকিয়ে, কপাটে তালা এ'টে চাবিসুদ্ধ আঁচলটা ঝনাত করে পিঠে ফেলে, বড়বউ ফিরে দাঁড়াতেই দেখলেন, ছোটবউ তখনও ল্যাম্পোটা ধরে তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বড়বউ সস্নেহে বললেন, "কি লো, ছোট, পান খাবি এট্টা?"

ছোটবউ কথা বললেন না। বাধ্য মেয়ের মত ঘাড় নাড়লেন। বড়বউ হেঁট হয়ে পানের বাটাটা তুলে নিলেন। একটা পান ছোটবউয়ের হাতে দিয়ে, একটা নিজের গালে পুরলেন।

বললেন, "নে, খা।"

ছোটবউ বিনাবাক্যে আদেশ পালন করলেন। বড়বউ আর দুটো পান তাঁর হাতে দিলেন।

বললেন, "ঠাকুরপো যদি খাতি চায় তারে দিস্ কেমন?"

ছোটবউ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করলেন।

বড়বউ তাঁর থুতনিটা ধরে একটু নেড়ে দিলেন।

বললেন, "যাও ভাই, অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়গে, কেমন? আমি বিছানা পা'তে দিইছি।"

ছোটবউ অমনি আদেশ পালন করতে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। বড়বউ সেদিকে চেয়ে রইলেন। দেখলেন, ছোটবউ উঠোনে নামা মাত্তর কেমন অন্ধকারে মিশে গেল। একটুখানি এগিয়ে যেতে তাকে আর দেখা গেল না। শুধু কেরাসিনের ল্যাম্পোটার মোটা শিস্‌টাই যেন কাঁপতে কাঁপতে পুবের ঘরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চতুর্দশীর রাত। ঘুরঘুট্টি রাত। আকাশে লক্ষ তারার মেলা। অন্ধকার রাতে কত তারা দেখা যায়। বড়-বউয়ের এইরকম রাত খুব ভাল লাগে। তারাগুলো দপ দপ করছে। ওগুলো যেন

লক্ষ এয়োতির কপালের টিপ। কেমন জীয়ন্ত। এর কাছে পূর্ণিমার চাঁদের স্থির আলো কিছু না, যেন বিধবার ধপধপে একখানা সাদা থান। রান্নাঘরের পিছনকার কেয়াঝোপ থেকে তীব্র গন্ধ আসছে। এই গন্ধে সাপেরা আসে। কি যেন একটা অন্ধকারে স্যাৎ করে সরে গেল। ভুলো কুকুরটা হবে বোধ হয়। ধপ করে তাল পড়ল কার বাগানে। একটা তারা ছুটে হ'ল আকাশে। ফেউ ডেকে উঠলো গোয়াল জেঠির বাগানে। ছোটকত্তার ঘোড়াটা বারবাড়ির গোয়ালে পা ছুঁড়ল খটখট। বাঁড়ির ছেলেটা খ্যাঁত খ্যাঁত করে কাঁদতে লাগল। না, আর না, বড়বউ ভাবলেন, যাই এবার, অনেক রাত্তির হ'ল। কিন্তু মেজদির হয়েছে তো? আর কত পিঠে বানাবে।

বড়বউ ডাক দিলেন, "ও মা'জদি, হ'ল?"

শুভদা চুষির পায়েসের কড়াইয়ে হাতা দিয়ে ঘুটতে ঘুটতে জবাব দিলেন, "এই যে রে মনি, হয়ে আয়েছে। আর একটু।"

বড়বউ নিরামিষ ঘরের বারান্দায় উঠে ভিতরে উঁকি দিলেন। বাস্‌রে, কত পিঠে, এর মধ্যে বানিয়ে ফেলেছে মেজদি, ঘর যে প্রায় ভরে গিয়েছে।

শুভদা বললেন, "শীতুর কাণ্ড তো, হয়ত বিয়ানে উঠেই ঘুড়ায় জিন চাপায়ে কবে চললাম। তাই সব সা'রে রাখলাম।"

একখানা পাটিসাপটা হাতে তুলে বড়-বউয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে শুভদা বললেন, "চাখে দ্যাখ তো বড়বউ, নরম হয়েছে কিনা?"

বড়বউ সভয়ে পিছিয়ে এলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, "আমি কি চাঁপা না ফুলি? এত রাত্তির এসব পেটে গেলি কি আর বাঁচব ভাবিছ কাল?"

শুভদা বললেন, "নে না লো, একখান পাটি-সাপটায় তোর আর কি এমন ক্ষেতি করবে? চাঁপা ফুলি জাগে থাকলি তোরে আর সাধতাম না।"

এমন সময় বড়বউয়ের ঘর থেকে চাঁপার আওয়াজ পাওয়া গেল।

"আমারে ডাকতিছ না কি, ও পিসিমা।"

বড়বউ আর শুভদা একসঙ্গে হেসে উঠলেন হো হো করে।

বড়বউ বললেন, "ন্যাও, তুমার চাখনদারের অভাব মিটিছে তো, ইবার আমি যাই। দেখো, রাত একেবারে শেষ করে দিয়ো না। তাড়াতাড়ি সা'রো।"

চাঁপা চোখ মুছতে মুছতে চলে এল শুভদার কাছে।

শুভদা বললেন, "আসো, আসো, লক্ষ্মী মেয়ে। এতক্ষণ আমার হাতই যেন চলতি-ছিল না।"

•

ছোটবউ ঘরে এসে দেখলেন তাঁর বিছানাটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে আজ। আর ছোটকত্তার বিরাট শরীরটা সে বিছানার অনেকখানি জায়গা এলোমেলোভাবে জুড়ে রেখেছে। আর ঘড়াৎ ঘড়াৎ নাক ডাকছে তাঁর। তা হোক, তাতে অবশ্য এমন কোন মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। যে জায়গা-টুকু খালি আছে, তাঁর রোগা পটকা শরীরটুকু তাতেই এঁটে যাবে। এতক্ষণ তাঁর চলাফেরা বেশ স্বচ্ছন্দেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। বড়বউ চালাচ্ছিলেন, তিনি চলছিলেন। একটা পান মুখে দিয়ে, দুটো পান হাতে নিয়ে, যেমন যেমন বড়বউ বললেন, তেমন তেমন চলে তিনি ঘরে এসে পোঁছলেন। এখন, ও লোকটা যদি আবার নতুন করে কিছু হুকুম দিত তো ভালই হ'ত, সেইমত কাজই তিনি করতে পারতেন। কিন্তু ও তো ঘুমুচ্ছে। কিছুই বলছে না। ছোটবউয়ের স্বচ্ছন্দ গতির বাঁধা সড়কটা এখানে এসেই যেন ভেঙে গেল। এবার তাঁকে নিজের বুদ্ধিতে চলতে হবে। সেইটেই যা সমস্যা।

প্রথম সমস্যা এই পান দুটো। কি করবেন এ দুটো নিয়ে? এক হাতের ল্যাম্পোটা যত সহজে নামিয়ে রাখলেন, তত সহজে অন্য হাতের পান দুটো নামিয়ে রাখতে পারলেন না। সে দুটো তাঁর হাতেই ধরা রইল কিছুক্ষণ। তারপর কি মনে হ'ল, কুলুঙ্গিতে একটা রেকাবের উপর রেখে দিলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। মশা পনপন করছে। মশারি ফেলা নেই। মশারিটা ফেলে দিলেন। তারপর ফুঁ দিয়ে ল্যাম্পো নিবিয়ে দিতে গেলেন। ল্যাম্পোর শিখাটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রথম ফুঁয়ে নিভল না। এবার ছোটবউ কিছুটা সতর্ক হয়ে ফুঁ দিলেন। জোরালো বাতাস ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিখাটার উপর। টুঁটি টিপে ধরল তার। অমনি অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর ছোটবউ খাটের উপর উঠলেন। এ বিষয়ে তাঁর যেমন কোনও আগ্রহ জাগল না, তেমনি দ্বিধাও হ'ল না বিন্দুমাত্র। এক পাশে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পাশে একটা বিরাট শরীর। অন্ধকারে সেটাকে আরও প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। নাক ডাকছে তাঁর। ছায়াময় সেই ভারী বস্তুটার সীমারেখাগুলো তালে তালে উঠছে, নামছে। ছোটবউয়ের কানের গোড়াতেই একটা মশা পনপন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে মশারিটা ঝাড়তে ইচ্ছে করল। নইলে মশার কামড়ে কচি ছেলেটা ঘুমুতে পারবে না। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল, কোথায় কচি ছেলেটা? সে তো এখানে নেই, সে তো তার মায়ের কোলে, অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছে সে। কথাটা মনে পড়তেই ওঠবার, মশারি ঝাড়বার ইচ্ছেটা চলে গেল। পাকা চামড়ায় কামড় মেরে মশা বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না। এখানে শুয়েছেন তো তিনি আর ঐ প্রকাণ্ড শরীরটা। সেটা তাঁর চেনা? সেটা তাঁর অচেনা? ঐ শরীরটা যদি অচেনাই হ'ত ছোটবউয়ের

তবে কি তিনি এত সহজে খাটে উঠতে পারতেন? এমনভাবে শুয়ে থাকতে পারতেন তাঁর পাশে? এ লোকটা তাঁর চেনা বৈকি? ও তো ছোটকত্তা, বড়বউয়ের ছোট্‌ঠাকুরপো, ছোটবউয়ের স্বামী। স্বামী? এই কথাটা মনে ধরতে ধরতেও ফসকে যাচ্ছে। ছবিটা পরিষ্কার ফুটছে না। তাই যেমন অচেনাও লাগছে না ছোটকত্তাকে, তেমন খুব চেনাও ঠেকছে না কিন্তু। তাই ওর পাশে শুয়ে পড়তে যেমন দ্বিধাও হয়নি, তেমন ইচ্ছেও হয়নি।

বেলা করে ঘুম ভাঙেগ ছোটকত্তার। অভ্যাস। পাঁড়ে এক্কু কনেস্টবল ছিল কালি-গঞ্জ থানায়, সে রাঁধত ছোটকত্তার। সেই ভোর বেলা চা বানিয়ে ছোটকত্তার ঘুম ভাঙ্গাত।
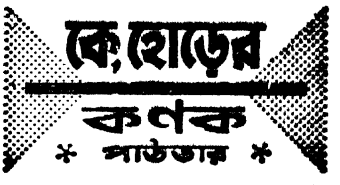
বাড়িতে ঘুম ভাঙ্গানো সিপাই নেই, তাই দেরিটা একটু বেশিই হল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন ঘরে আলো। কিন্তু দ্বিতীয় লোক কেউ নেই। রাত্রে কি এ ঘরে একা কাটিয়েছেন না কি? চট করে পাশে নজর পড়ল। কেউ নেই সেখানে, তবু বেশ বোঝা যায় ফাঁকা ছিল না জায়গাটা, কেউ একজন ছিল। ঐ যে মাথার বালিশে টোল খাওয়া, ঐ যে তোষকের ভাঁজে কার একটা লঘু শরীরের আলতো স্বাক্ষর। ঐ যে লম্বা একগাছি প্রাণহীন চুল। কার ও চুল? ছোটবউয়ের। ছোটবউ তাহলে এসেছিল রাত্রে। শুয়েছিল তাঁর পাশে। তা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব ছোটকত্তার কাছে অনুপস্থিত থেকে গেল! যেমন থেকেছে এই দশ বছর। বড় মজার ব্যাপার তো। ছোটকত্তার সেই বাতিকগ্রস্ত মাছ ধরা ভদ্রলোকের গল্পটা মনে পড়ল। সে সারাদিন চার ছড়িয়ে ছিপ ফেলে পুকুর পাড়ে বসে থাকত, আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ত তখনই, যে-মুহূর্তে মাছ এসে তার বঁড়শির টোপ গিলত। ফলে, সে রোজ উঠে দেখত ছিপখানা অবধি মাছে টেনে নিয়ে গেছে। ছোটকত্তারও কি সেই দশায় ধরল নাকি? কখন এল ছোটবউ, কখনই বা গেল?

যাক গে, সে চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করার কোন মানে খুঁজে পেলেন না ছোটকত্তা। বেলা যথেষ্ট হয়েছে। ছোটকত্তা এক ঝাঁকিতে উঠে পড়লেন। চায়ের অভাবে মেজাজটা কিঞ্চিৎ খিঁচড়ে দিল।

বিরক্তি নিয়ে বারবাড়িতে এসে বসতেই রামকিষ্টোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রামকিষ্টো বলল, "ছোটবাবু, খবর দিয়ে আইছি।"

কিসের খবর? ছোটকত্তা চট্‌ করে মনে করতে পারলেন না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এখন মনে পড়ল বটে, গোটাকতক লোক দাঙ্গা বাধাবার তালে আছে। আপাদমস্তক জ্বলে গেল তাঁর।

হঠাৎ ছোটকত্তার মনে হ'ল, এ গ্রামের, এ বাড়ির লোকজন, এমন কি ঘরদালান পর্যন্ত যেন তাঁকে জব্দ করতে চায়। জব্দ করতে পারলে খুশি হয়। কাল বাড়ি আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ব্যাপার ঘটেছে তার আনুপূর্বিক হিসেব কষতে বসলেন। তিনি বাড়ি এসে বুড়ির ছেলেকে ভাল মনে আদর করতে গেলেন, প্রতিদানে ছোঁড়াটা তাঁকে অপদস্থ করে ছাড়ল। এ তো গেল এক নম্বর কেস্‌। দু নম্বর কেসে তাঁকে ঠকালো এই বাড়িটা। কি যে সব ভীষণ ভাল ভাব উদয় হ'ল মনে বাড়িটাকে দেখে যে, নবনের ওখানে যাবার সময় পার করে ফেললেন। স্রেফ্‌ একটা ধাপ্পায় পড়ে মৌতাত থেকে বঞ্চিত হলেন। সেই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন বড়দা। ছোটকত্তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাশা খেলায় হারিয়ে দিলেন তাঁকে। এটা তিন নম্বর। চার নম্বর কেসের আসামী ছোট বউ স্বয়ং। কাল রাত্রে কি জব্দটাই না তাঁকে করল ছোটবউ।

এতো গেল বর্তমানের কথা। অতীতে গোপালদাসী তাঁকে বোকা বানায় নি? এখন বুদো আর গহর শালারাও জোট বেঁধেছে। ভবিষ্যতে তাঁকে জব্দ করার ভার নিয়েছে এরাই! দেখাচ্ছি মজা।

কাল সন্ধ্যে থেকে যে অসন্তোষ, যে অস্বস্তি, যে বিরক্তি, একটু একটু করে মনের মধ্যে জমছিল, সেগুলো এখন একটা সুস্পষ্ট উপলক্ষ্য পেয়ে ক্রোধের আকার ধারণ করল। রাগটা ফেটে পড়ল এদেরই উপর। দাঙ্গার সাধ দিচ্ছি মিটিয়ে!

ছোটকত্তা এক ধাক্কায় সেই গৃহবিলাসী ভাল মানুষ লোকটাকে যেন সরিয়ে দিলেন। গোঁফে চাড়া দিয়ে এবার উঠে দাঁড়াল সেই ডাকসাইটে, সেই চোয়াড় দারোগাটা। শরীরটা যার পেটা লোহায় তৈরী। চেহারাটা যার মহিষাসুরের মত। চোখ দুটো যার লাল লাল ভাঁটা।

ছোটকত্তা দাঁড়িয়ে উঠেই বাজখাঁই স্বরে হাঁকাড় মারলেন, "রামকিষ্টো, ঘোড়ায় জিন দে।"

বলেই ঘরে ঢুকলেন পোশাক আঁটতে। খাকির হাফ প্যান্ট, খাকির হাফ শার্ট, খাকির ফুল মোজা। চওড়া বেল্টটা কোমরে আঁটতেই অস্বস্তিকর ম্যাজম্যাজে ভাবটা অনেকটা কাটল। এই পোশাকের লেবেলটাই শুধু নয়, চোয়ালে মনটাও শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে ওঠে। ক্রস বেল্ট এঁটে, ভারী বুটটা পরতেই মনে হয়, পরোয়া কোন শালাকেই নেই। তিলমাত্র তেড়িবেড়ি করেছ কি এক লাথিতে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব! এখন আমি কারো বাপ নই, খুড়ো নই, দাদু নই, দিদিমণির জলে পড়া থপথপে সেই কাদার পুতুলও নই। আমি দারোগা। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর পঞ্চম জর্জ, সেই যাঁর সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, আমি তাঁর বান্দা, তাঁর 'ল এণ্ড অর্ডারের' সদাজাগ্রত কর্তব্যপরায়ণ রক্ষক।

ছয়ঘরা পিস্তলটা কোমরে ঝুলিয়ে একটা তকমা আঁটা খাকি রং পুলিসী হ্যাট মাথায় চাপিয়ে বেরুতে যাবেন, এমন সময় শুভদার সঙ্গে দেখা।

শুভদা অবাক হয়ে বললেন, "ও শাঁটু, এ কী, যাচ্ছিস কনে? খায়ে বেরো। খাবার দিইছি।"

ভারী গলায় ছোটকত্তা বললেন, "তুলে রাখ। সময় নেই এখন। ফিরতি দেরি হাঁত পারে।"

শুভদা আর কিছু বলার আগেই ছোট-কত্তা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই হতভম্ব শুভদার কানে ঘোড়ার দড়বড়ি বেজে উঠল। আস্তে আস্তে এক সময় মিলিয়েও গেল। (ক্রমশ)

ঊনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

॥ ৮ ॥

অন্ধকার নগরীর নিদ্রিত মানুষের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া গিরিজা ও আমি বিরাটনগর ছাড়িলাম। কয়েকজন সাথীকে সঙ্গে লইয়া হাতিয়ারগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য নির্দিষ্ট গ্রামের পথে চলিতেছিলাম, চলাপথ এড়াইয়া বেশ খানিকটা ঘোরাপথে ধানক্ষেত আর পাটক্ষেতের আলের উপর দিয়া যাইতেছিলাম। ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে, ক্ষেত-খামার সম্পূর্ণ ফাঁকা, কোথাও এতটুকু আড়াল পর্যন্ত নাই। নিকটে কোনও জঙ্গলও দেখা যায় না, শুধু মাত্র রিক্ত চাষের ক্ষেত। সিপাহী শান্ত্রীর বাঁধাধরা পথ এড়াইয়াই চলিতেছিলাম, তবুও আশঙ্কায় বুক কাঁপিয়া উঠিল। দিনকাল খারাপ অতএব নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না যে, এই পথে তাহারা কোন মতেই আসিবে না। ভয় নিজেদের জন্য নহে। সংগৃহীত হাতিয়ারের অনেকগুলিই আমাদের জিম্মায়। এই জন্য ভীত হইয়াছিলাম। অভিযানের পূর্বদিন রাত্রে কোন অঘটনই ঘটিতে দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব সেই মত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। গিরিজা এবং অন্য দুইজন সাথী রাইফেলে বেয়নেট আটকাইয়া পিছনে রহিল, অপর দুইজন সাথীকে লইয়া আমি সম্মুখে যাইলাম। অবশিষ্ট হাতিয়ারবাহীর মধ্যে রহিল। গুলী করিলে নিকট শব্দ হইবে সুতরাং নির্দেশ রহিল সন্দেহজনক কিছু দেখিলে নীরবে বেয়নেট ব্যবহার করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা নির্দেশ পালন করিবার কোন প্রয়োজন হইল না। গ্রামে পৌঁছাইয়া গ্রামবাসীদের কয়েকজনের গৃহে আশ্রয় লইলাম। স্থির হইল, পরদিন সকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে হাতিয়ারগুলি পরীক্ষা করা হইবে।

অক্টোবর মাসের রাত্রি। শীতের প্রকোপ তখনও অসহনীয় হইয়া উঠে নাই। ধীরে ধীরে মুক্তি সংগ্রামীরা সেই গ্রামের নিকটবর্তী আমবাগানে আসিয়া সমবেত হইল। যাত্রা শুরু হইতে তখনও দেরী আছে, শেষ মুহূর্তের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইতেছিল মুক্তি-সংগ্রামীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গিরিজা এবং বিশ্ববন্ধু প্রথম দল লইয়া পূর্বদিকের জঙ্গলের পাশ দিয়া ট্রেজারী এবং অস্ত্রাগারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবে। ট্রেজারী, ফৌজী পদস্থ কর্মচারীর ছাউনি এবং জেলখানা দখল করিবার ভার এই দলের উপর অর্পিত হইল। দ্বিতীয় দলটিকে লইয়া তারিণী এবং আমি পশ্চিমের পথে জেলখানার নিকটবর্তী একটি অব্যবহৃত বাড়ির নিকট উপস্থিত হইবার নির্দেশ পাইলাম। অস্ত্রাগার, পুলিস ব্যারাক এবং তিনজন অতি উচ্চপদস্থ স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর গৃহ দখল করিবার ভার রহিল এই দলের উপর, স্থির হইল উভয় দল একই সময়ে আক্রমণ করিবে এবং নির্দিষ্ট কার্য সমাপ্তির পর বিরাটনগরের রাজ-প্রমুখ কর্ণেল উত্তম-বিক্রম রাণার প্রাসাদের নিকট সম্মিলিত হইবে। মুক্তি সংগ্রামীদের পরবর্তী কার্য হইবে রাজপ্রমুখের প্রাসাদ দখল করা এবং সম্ভব হইলে উত্তম-বিক্রম রাণাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করা। সমবেত মুক্তি সংগ্রামীর সংখ্যা ছিল দুইশত কিন্তু এতগুলি হাতিয়ার সংগ্রামীদের নিকট ছিল না। ভরসা ছিল সরকারী অস্ত্রাগার হইতে হাতিয়ার দখল করা যাইবে এবং সেই সমস্ত হাতিয়ার নিরস্ত্র সংগ্রামীদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। স্থির হইল, ট্রেজারীর অর্থ এবং বন্দী কর্মচারীদের লইয়া-শিভারীর সেতুতে পাঁচজন সংগ্রামী এই গ্রামে ফিরিয়া আসিবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং লঘু অপরাধে দণ্ডিত অন্যান্য বন্দীদের জেলখানা হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। স্বল্পতম সময়ের ভিতর কার্যোদ্ধার করিতে হইবে নচেৎ ফৌজী ছাউনি হইতে সৈন্যদল রাজপ্রমুখের প্রাসাদে হাজির হইতে পারে এবং সেই অবস্থায় উত্তম-বিক্রম রাণাকে বন্দী করা দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু উত্তম-বিক্রমকে বন্দী করিতে পারিলে সৈন্যদলকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। সুতরাং উত্তম বিক্রমকে বন্দী করা মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের জন্য বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। বাস্তব অবস্থা এবং নিজেদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে মুক্তি সংগ্রামীরা সচেতন ছিল, ইহাও অবিদিত ছিল না যে, শত্রুপক্ষের সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এবং সেই কারণেই শত্রুপক্ষকে সম্মিলিত হইবার কোনরূপ সুযোগ না দিয়া স্বল্পতম সময়ের ভিতর ক্ষমতার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিবার উপর সমস্ত গুরুত্ব অর্পিত হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও একটি অতি অপ্রিয় নির্দেশ মুক্তি সংগ্রামীদের দেওয়া হইল। একান্তভাবে অনিবার্য কোন অভাবনীয় বিপত্তি ঘটিলে পশ্চাদপসারণ করিয়া বিরাটনগর হইতে চার মাইল পূর্বে রঙ্গেলী গ্রামে প্রত্যেক সংগ্রামীকে হাজির হইতে হইবে। শেষের এই নির্দেশ মুক্তি সংগ্রামীদের ভিতর মৃদু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল।

রাত্রি দুইটা। সময় উপস্থিত, সংগ্রামীরা নিজ নিজ হাতিয়ার উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে আমবাগানের বাহিরে আসিল। ধানক্ষেতের আলের উপর দিয়া পথ। নীরবে, নিঃশব্দে সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধ-

বনজঙ্গলের মাঝে বিদ্রোহীদের আড্ডা

নেপালী কংগ্রেসের সদস্যদের গ্রেপ্তার

বন্ধুরের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম দলের পশ্চাতে, তারিণী ছিল সম্মুখে। সেই সর্বব্যাপী নীরবতা সংগ্রামীর সামরিক বুটের সুদৃঢ় পদাঘাতে ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইতেছিল। নিজেকে একান্ত একেলা বোধ হইতেছিল, জটিল চিন্তার অবধি ছিল না। সেই রাত্রে বারে বারে মনে হইতেছিল যে, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া কেন সেই লক্ষ সমস্যা নিপীড়িত দেশের একান্তভাবে অভ্যান্তরীণ সংগ্রামের সহিত নিজেকে যুক্ত করিলাম। ইহা সত্য যে সোস্যালিস্ট পার্টির এই সম্পর্কে নিশ্চিত নির্দেশ ছিল। কিন্তু ইহা ত পালন না করিলেও চলিত, কোথাও কোন বাধাবাধকতা ছিল না। সংগ্রামের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। নিজের জীবনকে লইয়া এইভাবে খেলা করিবার কি প্রয়োজন ছিল। যদি কোন অঘটন ঘটে, তখন লোকে বলিবে যে, আদর্শের জন্য অসীম সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়া শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়াছি। কিন্তু ইহার কোন মূল্য আছে কি? সৃষ্টির আদিকাল হইতে অগণিত মানুষ তাহাদের সর্বকিছু সমর্পণ করিয়াছে আদর্শের বেদীমূলে। ইহার ফলে আরও সুন্দর হইয়াছে কি আমাদের পৃথিবী? কিই বা প্রভেদ আছে সাহস এবং কাপুরুষতার মধ্যে? মানুষ যাহাকে সাহসী বলিয়া জানে, যদি কোন উপায়ে চরম বিপদের মধ্যে তাহার মানসিক অবস্থা নিরীক্ষণ করা যাইত, তাহা হইলে সাহস, এবং কাপুরুষতা সম্পর্কে লক্ষ রম্য-কাহিনী নিশ্চয়ই রচিত হইত না। সেই রাত্রে পুনরায় অনুভব করিলাম—যেমন ইহার পূর্বে হাইদ্রাবাদে সংগ্রামে অনুভব করিয়াছিলাম—যে, জীবন অপেক্ষা প্রিয়বস্তু এই কুৎসিত কদাকার অথচ পরম সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। মানুষ নিজ সৃষ্ট পরিবেশের ভিতর নিজ সৃষ্ট আত্মসম্মান ও কর্তব্যবোধের জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে-জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলে। ইহার ভিতর সাহস ও কাপুরুষতার কোন প্রশ্নই উঠে না।

পথ তখনও শেষ হয় নাই, মুক্তি সংগ্রামীদের চলার গতি দ্রুততর হইল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকগুলি কার্যই সমাপ্ত হইল, একজন সরকারী সৈনিক মৃত এবং দুইজন আহত হইবার পর অস্ত্রাগার দখল হইল, প্রচুর পরিমাণ বুলেটের সহিত অনেকগুলি রাইফেল দখলে আসিল। ইহা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলেও পিস্তলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ নিদ্রিত বিরাটনগরের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইল। কি জানি রাজপ্রমুখের প্রাসাদে পাহারারত সৈনিকদের হয়তবা সতর্কও করিয়া দিয়াছিল। ট্রেজারী হইতে অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। বিরাট সিন্দুকের চাবি ট্রেজারী রক্ষীদের নিকট ছিল না—উহা রাজপ্রমুখের প্রাসাদে রক্ষিত হইত, জেলের বন্দীদের মুক্ত করিবার সময় আরও একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিল, মুক্ত বন্দীদের জয়ধ্বনি পুনরায় সজাগ করিল রাণাসাহী শাস্ত্রীদের।

উত্তম বিক্রম রাণার প্রাসাদের চতুর্দিকে উন্মুক্ত মাঠ। ইহারই একপ্রান্তে মুক্তি-সংগ্রামীরা হাজির হইল, দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে। সময় অত্যন্ত অল্প এবং সম্মুখের বাধা কেবলমাত্র এই মাঠ, কিন্তু সেই যেন এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদের সার্চলাইটের তীব্র আলোকে সমস্ত এলাকা আলোকিত। ইতি পূর্বেই পিস্তলের আওয়াজ এবং

মুক্ত বন্দীদের জয়ধ্বনি সরকারী শান্ত্রীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। মুক্তি সংগ্রামীদের অবস্থা বিশেষ সংকটজনক হইয়া উঠিল। পশ্চাদপসরণের উপায় নাই, কেন না উঠিয়া দাঁড়াইলেই শত্রুর বুলেটের অব্যর্থ লক্ষ্যে পরিণত হইতে হইবে, সেই অবস্থায় প্রাসাদ দখল করা দুরাশা মাত্র। অতএব বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়া হইল, বেশ কয়েক গজ অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র সার্চলাইটের তীব্র আলো ব্যতীত শত্রুপক্ষের সজীবতার অন্য কোন নিদর্শন মিলিল না, আশা হইল হয়ত মুক্তি-সংগ্রামীরা প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে। ঠিক এমনই সময় শত্রুপক্ষের গুলীবর্ষণ শুরু হইল। সম্মুখ এবং পশ্চাৎ হইতে ব্রেনগানের দ্রুত গুলীবর্ষণ নিমেষে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইল। শত্রুর বুলেটের শৃংখলাবদ্ধ জবাব দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। দৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত পরিখার মধ্য হইতে শত্রু সৈন্যের ব্রেনগানের অতিদ্রুত গুলীবর্ষণের জবাবে মুক্তি-সংগ্রামীর স্টেনগান ও রাইফেলের গুলী-বর্ষণ প্রায় দুই ঘণ্টা চলিবার পর একজন মুক্তি সংগ্রামী নিহত এবং গুরুতররূপে আহত হইল আরও কয়েকজন। শত্রুপক্ষের গুলীবর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিল। আশংকা হইল যে, আরও কিছুক্ষণ গুলীবর্ষণের পর শত্রু সৈন্য মুক্তি-সংগ্রামীদের হাতাহাতি সংগ্রামে নামিতে বাধ্য করিতে পারে। এই অবস্থায় বেশীর ভাগ মুক্তি সংগ্রামীর নিশ্চিত মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা থাকিবে না। সুতরাং দ্রুত পরামর্শ করিয়া পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়া হইল, এই সময় মুক্তি সংগ্রামীদের ভিতর কিছুটা বিশৃংখলা দৃষ্ট হইয়াছিল। শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা জানিবার কোন উপায় ছিল না।

অপরিসীম অবসাদ ও হতাশা লইয়া রংগেলী উপস্থিত হইলাম। প্রথম সংগঠিত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা মুক্তি সংগ্রামীদের ভবিষ্যতের সফলতা সম্পর্কে সন্দিহান করিয়া তুলিল, অনেকেই শেষ পর্যন্ত লড়াই না করিয়া পশ্চাদপসরণ করিবার জন্য অভিযোগ করিল কিন্তু সেই সমস্ত অভিযোগের জবাব দিবার সময় তখন ছিল না। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিকটে কোন ডাক্তার নাই, সুতরাং উহাদের যে কোন উপায়ে যোগবাণী প্রেরণ করিতে হইবে। তারিণীর সম্পর্কিত ভ্রাতার পায়ে এবং নর বাহাদুরের হাতে বুলেট বিদ্ধ হইয়াছিল। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাহারা নীরবে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, মুক্তি সংগ্রামী বল বাহাদুরের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বল বাহাদুর আত্মীয় পরিজন, চাষ-আবাদের ছোট এক টুকরা জমি এবং পাঁচ বৎসর বয়স্ক একমাত্র সন্তানকে ছাড়িয়া মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। আজ কেইবা এই প্রশ্নের জবাব দিবে, কোন আদর্শের জন্য অথবা কিসের প্রত্যাশায় বল বাহাদুর আমাদের সহিত আসিয়াছিল। জানি না কেহ বল বাহাদুরের মাকে খবর পৌঁছাইয়া দিয়াছিল কিনা যে তাঁহার সন্তান নেপালের বন্ধন মুক্তির সংগ্রামে শহীদ হইয়াছে। বার হাজার মানুষের গ্রাম রংগেলীতে নেপালী কংগ্রেসের অগণিত সমর্থক ছিল। সরকারী ফৌজ তখনও এই গ্রামে পৌঁছায় নাই। স্থানীয় কয়েকজন চৌকিদারও নেপালী কংগ্রেসের সমর্থক, অতএব রংগেলীতে মুক্তি-সংগ্রামীদের বিরোধিতা করিবার কেহই ছিল না। স্থানীয় দুইজন লোকের সহিত আহতদের যোগবাণী প্রেরণ করা হইল, যখন গ্রামবাসীরা মুক্তি-সংগ্রামীদের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিল, তখন আর বিশেষ বেলা নাই, আহারাদির পর আলোচনা সভা বসিল পরবর্তী কার্যসূচী স্থির করিবার জন্য। রংগেলী হইতে তের মাইল দূরবর্তী ঝাপা আক্রমণ করার বিষয়ে মুক্তি-সংগ্রামীদের অধিকাংশই একমত হইল। ঝাপা রাণাশাহীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং তথাকার ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করা প্রয়োজন। তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, ঝাপার ক্ষমতা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়া মুক্তি-সংগ্রামীরা বিরাট নগরের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে ফিরিয়া যাইবে এবং সেইখান হইতে বিরাটনগর এলাকায় গেরিলা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। সেই অঞ্চলে মুক্তি-

সংগ্রামীদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ পাইয়া গিরিজা ও আমি যোগবাণী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রংগেলী ত্যাগ করিবার পূর্বে বিশ্বেশ্বরের দ্বিতীয় ভ্রাতা কেশব কৈরালার নেতৃত্বে মুক্তি-সংগ্রামীরা ঝাপার উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

ব্যর্থতার বিরাট বোঝা লইয়া প্রাতে যোগবাণী পৌঁছিলাম। বিশ্বেশ্বরের মায়ের নিকট বিরাটনগরের অবস্থা অবগত হইলাম। তাঁহার মুখের রেখায় ব্যর্থতা-জনক হতাশার কোন সন্ধান মিলিল না। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, নেপালী কংগ্রেসের বহু সমর্থক বিরাটনগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা সময়মত শহর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদের অনেককেই বন্দী করা হইয়াছে। রাণাফৌজ যথেচ্ছ ধরপাকড় শুরু করিবার পর নীরব প্রতিবাদ হিসাবে শহরের কল-কারখানা, দোকান, বাজার প্রভৃতি সমস্ত কিছুই বন্ধ হইয়া যায়। শহরে এক বিভীষিকাময় আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। সরকার পক্ষের মোট হতাহতের সংখ্যা বারজন—তন্মধ্যে পাঁচজন নিহত। ইহার পর তাঁহাকে আমাদের পরবর্তী কার্যসূচী সম্পর্কে দুই-এক কথা বলিলাম। কোন-প্রকার মতামত ব্যক্ত না করিয়া আহত মুক্তি-সংগ্রামীদের খোঁজ লইবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না। যোগবাণী হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে নেপাল সীমান্তের ভিতর একটি জংগলাকীর্ণ গ্রামে মুক্তি-সংগ্রামীদের জন্য আশ্রয় ঠিক করা হইল। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে সেই গ্রামবাসিগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল, শুধু ইহাই নহে, মুক্তি-সংগ্রামীদের আহারাদির ভারও গ্রামবাসীরা গ্রহণ করিল। দুই দিন অপেক্ষায় কাটিল। তৃতীয় দিন শেষ রাত্রে পরিশ্রান্ত মুক্তি-সংগ্রামীরা একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লান্তি ও অবসাদে অধিক সংখ্যক সংগ্রামী কোনরূপ কথাবার্তা না কহিয়া সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় বিশ্রামের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা আশ্রয় জুটাইতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া কেশব এবং বিশ্ববন্ধুর নিকট ঝাপার লড়াইয়ের সংবাদ জানিতে পারিলাম। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অবরোধ করিয়া থাকিবার পর মুক্তি-সংগ্রামীরা ঝাপা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পুলিস ব্যারাক এবং ট্রেজারীতে অগ্নিসংযোগ করিবার ফলে সরকারী ফৌজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই অবসরে বেশ কিছু পরিমাণ হাতিয়ার এবং অর্থ মুক্তি-সংগ্রামীদের হস্তগত হয় এবং সরকারী ফৌজের কয়েকজন সৈনিক দল ত্যাগ করিয়া মুক্তি-সংগ্রামীদের সহিত যোগদান করে। সরকার পক্ষের হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন, তবে তিনজন রাণাশাহী সৈনিকের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। মুক্তি-সংগ্রামীদের দুইজন নিহত এবং একজন আহত। নরবাহাদুর এবং মংগলসিং মুক্তি-সংগ্রামীদের পশ্চাদভাগ রক্ষা করিবার কার্যে নিযুক্ত ছিল। ঝাপা পরিত্যাগ করিবার সময় বিশ্ববন্ধু তাহাদের আহ্বান করিতে যাইয়া নরবাহাদুরের এবং মংগলসিং-এর প্রাণহীন দেহ দেখিতে পায়। করিবার কিছুই ছিল না; সুতরাং মৃতদেহ সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া মুক্তি-সংগ্রামীরা ঝাপা পরিত্যাগ করিয়াছিল। উভয়েই ছিল বিরাটনগরের মানুষ—স্থানীয় পাটকলে কাজ করিত। মুক্তি-সংগ্রামের আহ্বানে সমস্ত কিছুর বন্ধন কাটাইয়া তাহারা আসিয়াছিল মুক্তির মূল্য দিবার জন্য। চরম মূল্য দিয়া তাহারা ভবিষ্যতের নেপালবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

ঝাপার সংগ্রামে গুলীবিদ্ধ দক্ষিণ হস্ত লইয়া দশরথ ফিরিয়া আসিল গুরুতর আহত অবস্থায়। কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র দশরথ উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নেপালী সহপাঠীর সহিত সেও আসিয়াছিল নেপালের মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য। মুক্তির মূল্য তাহাকেও দিতে হইয়াছিল। কথাবার্তা যখন শেষ হইল রাত্রি শেষ হইতে তখন আর বেশী দেরি নাই।

পরদিন স্থানীয় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় অধিবাসীকে লইয়া মুক্তি-সংগ্রামীদের আলোচনা হইতেছিল। তৎকালীন পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। উন্নততর অস্ত্র সজ্জিত সংখ্যাধিক শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রাম সফল হইবে না। বেশীর-ভাগ মুক্তি-সংগ্রামী গেরিলা যুদ্ধের স্বপক্ষে। অবশ্য, ইহার জন্য বিশেষ কতক-গুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। মুক্তি-সংগ্রামীদের কেন্দ্রীভূত ঘাঁটির পরিবর্তে বিভিন্ন সংগ্রাম কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইবে। সেই অঞ্চলের প্রত্যেক অধিবাসীর এই কার্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বিরাটনগরের কল-কারখানার দশ হাজার শ্রমিকের উপর। মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক সমর্থন ও সহানু-ভূতিকে সক্রিয় সহযোগিতায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। নেপালী কংগ্রেসের সদর কার্যালয় হইতে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই কার্যসূচীর কোন পরিবর্তন হইবে না। • নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিরাটনগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করিবার আদেশ পাইয়া আমি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

(ক্রমশ)

চার

সুভাষকে নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কম বিপদে পড়েন নি। কত ভুতিয়ে-পাতিয়ে ওকে হাকিম করার চেষ্টা করেছিলেন ডাকসাইটে সাহেবের দল। কিন্তু ওর এক জবাবঃ "তোমরা পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছিলে।" অগত্যা ওরা বিদ্রোহীকে জেলে পাঠায়। কিন্তু জেলে যেতে না যেতে ওর করে অসুখ, ওকে ছেড়ে দিতেই হয়, নইলে স্বদেশী আন্দোলন আরো ফেঁপে ওঠে যে! কিন্তু ছেড়ে দিতে না দিতে ও ফের হুমকি দেয়। সাধে কি সম্প্রতি এক সাহেব Hugh Toye, —ওর নামকরণ করেছেন "The Springing Tiger!" বইটি বেরুলো বলে। কিন্তু সে অন্য কথা।

সুভাষ দেশে ফিরতে না ফিরতে ওকে ওরা জেলে পাঠায়। যথাকালে জেল থেকে মুক্তি দিতেই হয়—কিন্তু সুভাষ অনমনীয়—বাইরে আসতে না আসতে ফের চতুর্গুণ উৎসাহে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিরুপায় হয়ে ওকে ফের ওরা জেলে পাঠায়। কিন্তু মহা মুশকিল! জেলে গেলেই ওর করবে অসুখ—কাজেই ফের ওকে ছেড়ে দিতেই হয়। ১৯৩৭ সালে ও যখন মুক্তি পায় তখন ওর শরীর খুবই খারাপ—ওজনে প্রায় দশ সের কমে গেছে, ঘুষঘুষে জ্বরে। আমি তখন কলকাতায়, ওকে বলি কয়েক মাস বিশ্রাম নিতে পণ্ডিচেরিতে—আমার ফ্ল্যাটে, সমুদ্রের ধারে। সুভাষ ম্লান হেসে বলে—ওর বিশ্রাম হবে শুধু দিনের শেষে—এখন ওর অফুরন্ত কাজ—দেশে কর্মীর অভাব ইত্যাদি। ক্ষুণ্ণ মনে আমি পণ্ডিচেরি ফিরে যাই।

ওর যে কথা সেই কাজ। অপটু দেহ নিয়েই ও ফের কর্মাবর্তে ঝাঁপ দিল। দেশের দুর্দশার তখন চরম অবস্থা। একদিকে বাংলাদেশে দেশবন্ধুর তিরোধানের পর থেকে নেতার দুর্ভিক্ষ, ওদিকে গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত দেশব্রতীদের দেখলে মন কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যায় ভাবতেঃ এঁরা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, চরকা কেটে অজস্র সুতো হলেই স্বরাজ আসবে এক বৎসরে? শুধু চরকা নয় অবশ্য, নিরীহ সত্যাগ্রহবাণও তূণীরে মজুত আছে। কিন্তু সুভাষ কোনোদিনই বিশ্বাস করে নি যে, এ-বাণ মর্মভেদী হ'তে পারে। তবুও চাইত—অহিংস অসহযোগকেও কাজে লাগাতে, প্রকাশ্যে বোমাবিপ্লব বা বিদ্রোহকে আমল না দিয়ে। প্রায়ই আমাকে বলত যে, অহিংস অসহযোগে দেশে যেটুকু নবজাগরণ এসেছে তার সুবিধা নিলে কাজ এগুবে। কিন্তু মুশকিল হ'ল স্বাধীনভাবে কাজ করা নিয়ে। বিশেষ ক'রে সে-সময়ে কংগ্রেসে কাজ করতে হ'লে মহাত্মাজীর প্রতি আজ্ঞা শিরোধার্য না ক'রে পথ ছিল না। কিন্তু সুভাষ স্বভাবে কোনোদিনই কারুর yes-man ছিল না, তাই সে এ-শর্ত পালন করতে রাজী হ'তে পারেনি। তাছাড়া, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়ে এক বৎসরে ঠেকে শিখেছিল যে, কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট মাত্র নামেই লোকনায়ক, কার্যক্ষেত্রে তিনি শুধু মহাত্মাজীর হুকুমবরদার মাত্র। তাই ১৯৩৯-এ মহাত্মাজীর মনোনীত সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ান কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হতে চেয়ে। ওর উদ্দেশ্য ছিল—একটু স্বাধীন হয়ে দেশে বিপ্লবী মনোভাবকে গড়ে তোলা। ভোটে ও জিতল বটে, কিন্তু সে শুধু মুখেই জেতা, কংগ্রেসের রথের প্রতি চাকা তখন ঘোরে মহাত্মাজীর নির্দেশে — ফলে মহাত্মাজীর নির্বাচিত কমিটির সভ্যদের হাতে ও কীভাবে লাঞ্ছিত হয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় সে-বৃত্তান্ত ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে, কাজেই আমার পক্ষে সে-সব কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হবে বাহুল্য। তাছাড়া স্মৃতিচারণে রাজনৈতিক দলাদলির চর্বিতচর্বণ খানিকটা অপ্রয়োজনীয়ও বটে। তাই আমি আজ বলব শুধু সুভাষের চরিত্রের নানা গুণাবলীর কথা, ব্যক্তিরূপের মর্মবিকাশের কথা, আঁকব ছোট ছোট ঘটনার চলচ্চিত্র যা আমার স্মৃতিপটে আজো তেমনি উজ্জ্বল, অবিস্মরণীয় রঙেই ঝলমল করছে।

অতীতের আবছায়া-রঙ্গমঞ্চের দিকে যখন ফিরে তাকাই, তখন যেমন বাল্যপর্বের পটে সব আগে চোখে পড়ে পিতৃদেব, লোকেন্দ্র পালিত, গিরিশ মেসোমহাশয় ও নির্মলদার ছবি—যাঁদের কাহিনী লিখেছি আমার "বাল্য-স্মৃতি"তে—তেমনি কৈশোর-যৌবন অধ্যায়ে জ্বল জ্বল করে ফুটে ওঠে পাঁচজনের ছবি পর পরঃ সুভাষ, শরৎচন্দ্র, সত্যেন, রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এখন এফ আর এস হয়ে পদার্থবিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক—বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি খ্যাতিতে এত দীপ্যমান না হলেও তাঁর ব্যক্তিরূপকে ঘিরে থাকত এমন একটি আশ্চর্য চুম্বক শক্তি, যা কেবল মহত্ত্বের অধিগম্য, প্রতিভার সহজাত। আর কৃষ্ণপ্রেম? চরিত্র, জ্ঞান, নিষ্ঠা ও ভক্তির সমন্বয়ে তাঁর তুলনা ভূভারতেও পাওয়া ভার। এঁদের কথা তাই বলতেই হবে বিশদ ক'রে। তবে শরৎচন্দ্রের অবতারণা করবার আগে। সবার আগে সুভাষের পালা শেষ করি। সবশেষে লিখব রবীন্দ্রনাথের কথা আমার 'দি সুভাষ আই নিউ' ও 'ভূস্বর্গ চঞ্চল' এই দুটি বইয়ে আমি সুভাষ সম্বন্ধে যা যা বলেছি সেসব কথার পুনরুক্তি করব না।

সাহস পাই নি। কেবলই মনে হ'ত—আমার কী যোগ্যতাই বা আছে? কেবল একটা জায়গায় আমার গর্ব খর্ব হয় নি—, আমি শুধু যে গাইতে পারি তাই নয় আমার সতীর্থ বন্ধুদের মধ্যে একজনকেও দেখি নি আমার সমকক্ষ। এখানে আমি শুধু যে অহংকৃত ছিলাম তা নয়, ছিলাম অননুতপ্ত, কেননা আমি বলতাম অকুণ্ঠেই (বেশ মনে আছে): "অহংকার আমার কী? এ যে অকাট্য সত্য। তাই একে অস্বীকার করলেই মিথ্যাবাদী হব, অস্বীকার করলে সত্য কথনের জন্যে সাজা পাব কেন?" আমার অহংকারী নাম রটেছিল কি সাধে?

আমার এক বন্ধু কথায় কথায় আমার গীতিপ্রতিভা নিয়ে অকুণ্ঠ বড়াই করবার কথা সুভাষকে জ্ঞাপন করে। সুভাষ আমাকে পরে হেসে বলেছিল—"আমি তোমার দিকে প্রথম ঝুঁকি এই কথা শুনেই খানিকটা কৌতূহলবশে আর খানিকটা সন্দেহে যে, তুমি মামুলি গড্ডলদের ঢঙে কথা কও না। পরে তোমার গান শুনে বুঝি তুমি সত্যবাদী—আত্মমুগ্ধ নও। তাই তোমাকে ডিবেটিং ক্লাবে টেনে এনে আরো আলাপ জমাতে চেয়েছিলাম।"

কিন্তু একথা আমাকে ও বলে অনেক পরে। সেদিন ও আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে এসে সেদিন ও একথা-সেকথার মধ্যে কেবলই গেটে ও টেনিসনের নাম উল্লেখ করেছিল। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—সেযুগে ছেলেদের কোন বাঙালী ছেলে যে গেটে টেনিসন পড়ে এত রস পেতে পারে এ আমার কল্পনারও অতীত ছিল। আমি এ সময়ে ইংরাজীতে বেশ পাকা হয়েই উঠেছিলাম, সংস্কৃত চর্চা ছেড়ে একরকম ইংরাজী বই পড়ে। কিন্তু সুভাষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জমতে না জমতে দেখি—ইংরাজী ভাষায় তার দখল আমার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয় ইংরাজীতে সে নানা উদ্ধৃতি আবৃত্তি করতেও চমৎকার। আর যাবে কোথা? আমার অহংকার সানন্দেই মাথা নুইয়ে অঙ্গীকার করে নিল তার শ্রেষ্ঠতাকে।

এ-নম্রশীর্ষ হওয়ার ক্ষতিপূরণও মিলল অপর্যাপ্ত: সুভাষ ও আমার মধ্যে হ'ল মিতালি। মনে আছে এ-বন্ধুত্বের অভিনব স্বাদ পেতে না পেতে আমার মন হয়ে উঠল গৌরবে পুলকিত: সুভাষের মতন মহাজন কিনা আমার গলায় মালা দিতে এল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে! ইংরাজীতে বলে—কৃতজ্ঞতা থেকে প্রেম এক ধাপ। অনস্বীকার্য।

সুভাষ ভিতরে ভিতরে বিনয়ী ছিল কি না জানি না, কিন্তু মুখে তাকে দীন করতে কোনদিন দেখি নি। শালীনতা যে ছিল তার মজ্জাগত। অনেকে তাকে অহংকারী বলত তার চাপা প্রকৃতির জন্যে। পরে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার শত্রুদের কেউ কেউ বলত ব্যঙ্গ করে: "অভিজাত কুলতিলক কখনো সত্যি দেশসেবক হতে পারে—সত্যি দেশসেবক হো গান্ধীজী।" সুভাষ একথা শুনে হেসে একদিন আমাকে বলেছিল মনে আছে: "ওদের কথা কি আমি গ্রাহ্য করি দিলীপ? জগতে সর্বত্রই অভিজাতরাই প্রথম এগিয়ে এসেছে দুর্গতদের তুলতে। আমাদের দেশে স্বাজাত্যের প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল কাঁদের মুখে শুনি? —বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁদের মধ্যে কোন্ মানুষটি ছিলেন শ্রমিক চাষা মজুরদের স্বজাতি বলবে আমাকে?" উত্তরকালে বিলেতে ও আমাকে প্রায়ই বলত: "প্রলেটারিয়েটকে জাগাতে প্রথম দিকে এগিয়ে আসতে হয় মধ্যবিত্ত বাবুভায়াকেই, বুঝলে? এ আমার কাঁচা-মনের আবিষ্কার নয়—মহাবিচক্ষণ লেনিনের সাক্ষ্য—স্বয়ং লেনিন, বুঝলে?"

সে-সময়ে লেনিন ও ট্রট্স্কির ব্যক্তিরূপের গুণগান করতে সুভাষ প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়ত—যে কথা অন্যত্র লিখেছি—যদিও পরিণত বয়সে বলশেভিক তন্ত্রে ওর আস্থা টলমলে হয়ে এসেছিল।

ওর সঙ্গে প্রথম আলাপের পরে আমার মনের পটে ওর যে-ছবিটি আজো জ্বল জ্বল করছে সেটি হ'ল ওর হঠাৎ-হয়ে-ওঠা দেশপ্রীতির রূপ—প্রফেসর ওটেনকে সদলবলে প্রহারের অব্যবহিত পরেই। ব্যাপারটা নিয়ে সে সময়ে কী হৈ চৈ কাণ্ডই না বেধেছিল—যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে ও নেড়ে দিয়ে বসেছে! কলকাতায় ছাত্র তথা প্রবীণ সমাজে সে কী অকল্পনীয় উদ্দীপনা, আনন্দ, ভয় ও উদ্বেগ! দুম্দাম পাড়ায় যেন বোমা ফাটলেও সারা শহরে এত চাঞ্চল্য ছেয়ে যায় নি।

ব্যাপারটা সবাই জানে—ইতিহাসের দিক দিয়ে। আমি কিন্তু সেদিক থেকে ঘটনাটি বিবৃত করব না, স্মৃতিকথার স্বধর্মই পালন করব—বলব যা যা ব্যক্তিগতভাবে আমার গোচর হয়েছিল।

তখন আমি পড়ি বি. এস-সি, সুভাষ বি. এ। হঠাৎ একদিন শুনলাম ইংরাজ অধ্যাপক ওটেন তাঁর ক্লাসে এক ছাত্রকে যা তা বলে গালিগালাজ করেছেন। ছাত্রসমাজে সে সময়ে এখনকার মতন কথায় কথায় স্ট্রাইক পিকেটিং ইত্যাদি হ'ত না। তার উপর এখানে অপমানকারী খাস সাহেব—বাহাদুর গোরা! তখনো শ্বেতচর্মের প্রতিপত্তি বাঙালীদের মধ্যে কম ছিল না। (সুভাষ প্রায়ই বলত সখেদে: "স্লেভ-মেণ্টালিটি ভাই, স্লেভ-মেণ্টালিটি!") ফলে ছাত্ররা রাগ করলেও অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কী যে ঠিক করবে ভেবে পায় নি। তাদের মধ্যে দু-দল ছিল—যেমন সর্বত্রই থাকে: নরম ও গরম। একদল চেয়েছিল

ওটেন সাহেবের কাছে গিয়ে সুধামাখা হাসি হেসে বলতে (পিজুদেবের হাসির গানের ভাষায়):

লাথি যদি না খাব তো জন্মেছিলাম
কিসের জন্যে?
তুমি যদি না মারতে—তো মেরে সেটা
যেত অন্যে।
বরং উচিত আগে তোমার পায়ে হাত আজ
বুলিয়ে দেওয়া
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা
মুছে নেওয়া।
পরে বলা ভক্তিভরেঃ "প্রভু অনুগ্রহ ক'রে
পশ্চাতে মেরেছ লাথি, মারো একবার
পুরোভাগে—
দেখি সেটা কেমন লাগে?"

এ গানটি ঈষৎ বদলে উদ্ধৃত করলাম, কারণ পরে ছাত্রসমাজে একদিন এ-গানটি এইভাবে গেয়েই আমি খুব হাততালি কুড়িয়েছিলাম। কিন্তু গানটির হাসির আড়ালে যে কান্না লুকিয়ে ছিল, তারই রেশই পৌঁছয় সুভাষের কানে। গানের শেষে সে আমাকে বলেঃ "এ গানে হাততালি দিল ওরা কী বলে, দিলীপ? শুধু চাই চমকে সচেতন হ'য়ে ওঠা—আমরা কোথায় নেমেছি!" কিন্তু সে অন্য কথা।

ছাত্রসমাজে আর এক দল ছিল বটে গরমপন্থী, কিন্তু তারাও কেমন যেন দোমনা। অর্থাৎ তারা "ঘরে খিল দিয়ে রাজার মা-কে ডা'ন" বলতে পটু হলেও বাইরে এসে দিব্যি নিরীহ সভ্যভব্য বেশেই ঘুরে বেড়াত। এক কথায়, তারা মন স্থির করতে পারছিল না—কিং কর্তব্যম্?—কিছু একটা না করলেও মান থাকে না, অথচ কিছু একটা করতে গেলেও প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

এইখানেই দিঙনির্ণয় করতে অভ্যুদয় হয় "বরন্ লীডার"-এর। জনসাধারণের মধ্যে যে-আগুন চাপা থাকে তাকে প্রকাশ করতে পারে কেবল সেই—তার দুর্দম সাহসে, পরিণাম চিন্তার বিসর্জনে। এ করে সে ভেবেচিন্তে নয়, না ক'রে থাকতে পারে না বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলের ব্যথা অপমানের শরিক হতে চেয়ে। আগুনের স্বধর্মই যে এই—আগুন ছড়িয়ে দেওয়া।

তাই তো সুভাষ এই সময়ে 'পর্বতের চূড়া সম সহসা প্রকাশ" না হয়ে পারে নি। পরে একদিন আমাকে বলেছিলঃ "সত্যি ভাই, আমি গুরুমারা বিদ্যেয় পোক্ত ছিলাম না কোনদিনই। কিন্তু যখন দেখলাম ওদের মধ্যে গরমপন্থীদের মধ্যেও অনেকেই শুধু মুখে বড়াই ক'রেই খালাস, কাজের বেলায় গায়েব—তখন আর থাকতে পারলাম না—দিলাম ঝাঁপ, যা হবার হবে।" শুধু ঝাঁপ দেওয়া নয়, সুভাষ এসে বুকে দিয়ে পড়ে করল এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! দলপতি হতে না হতে সে হয়ে উঠল বেপরোয়া—ছাত্রদের নিয়ে আজ যায় ডীন-এর কাছে, কাল প্রিন্সিপালের কাছে, পরশু ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে। কিন্তু সবাই উপদেশ দেন চেপে যেতে। একজন গম্ভীরানন্দ এমন কথাও বললেন যে, ওটেন সাহেব যে ছাত্রটিকে গালাগাল দিয়েছেন তার কর্তব্য এ-কটূক্তিকে গুরুর তিরস্কার বলে শিরোধার্য করা—যার অন্য নাম আশীর্বাদ। শুনে সুভাষ অগ্নিশর্মা, পিঠোপিঠি জবাব দিল, "স্যার, সংসারে কোন কর্তব্যই একতরফা হয় না—পুরাকালে যখন শিষ্য গুরুর তিরস্কারকে আশীর্বাদ বলে শিরোধার্য করত, তখন গুরুও ছিলেন সত্যিই পিতার প্রতিনিধি। শিষ্য গুরুগৃহবাস করত তাঁকে পিতার সম্মান দিয়ে, কেননা তিনি তাকে বরণ করতেন সন্তান মনে করে। এ অর্থকরী বিদ্যার যুগে গুরু-শিষ্যের সে সম্বন্ধ হয়ে গেছে শুধু পুরাকথা নয়—রূপকথা।"

এইভাবে ও ছাত্রদের বোঝায় যে, রবীন্দ্র-নাথের ভৎর্সনাকেই করতে হবে পাথের দিশারিঃ

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

ফল হল—যা হবার: সুভাষকে দলপতি ক'রে ছাত্ররা এগিয়ে এল দণ্ডনীয়কে দণ্ড দিতে: ওটেন সাহেব বিকেলে ক্লাস সেরে নিচে নামতেই তারা মুখোস প'রে তাঁর উপর চড়াও হয়ে দিল তাঁকে বেশ দু'ঘা উত্তম মধ্যম।

পরিষ্কার মনে আছে, পরদিন সকাল-বেলার কাহিনীঃ মেজমামা চায়ের পেয়ালা খবরের কাগজ খুলেই চিৎকার ক'রে: "মণ্টু, তোদের সাহেবকে যে সুভাষরা দিয়েছে কাল গোবেড়েন।"

আমি লাফিয়ে উঠলাম: "দেখি, দেখি।"

দাদামশায় (সেকেলে সজ্জন—ভারী সাধু): এসব কী করছে ওরা ছি ছি! এর নাম—

মেজমামা (হেসে): পুরোনো দিনে বাবা একালের ধর্মই যে এই। (আমার দিকে কটাক্ষ ক'রে) তুই ওদের মধ্যে ছিলি না তো রে?

আমি (হেসে): না। মেজমামিমা ফুল-প্রুফ অ্যালিবি দেবেন—আমি তিনটের শো-য়ে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম সিনেমায়—ছটা পর্যন্ত তাঁর নজরবন্দী।

দাদামশায় (স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে): বাঁচা গেল। কিন্তু

আর কিন্তু—আমি ছুটলাম এলগিন রোডে। সেখানে সুভাষের সঙ্গে দেখা হতেই দোরে খিল দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললামঃ "আমাকে বাদ দিলে কেন সুভাষ?"

সুভাষ গভীর স্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে বলল: "তোমার ভাই মা বাবা নেই, দাদা-মহাশয়ের কাছে আছ—তোমাকে কেন মিথ্যে বিপদের মধ্যে টানা?—না দিলীপ, এ তোমার কাজ নয়। আমরা শাস্তি দিয়েছি বটে, কিন্তু তার জন্যে ভুগতে হবে।"

আমি: মানে? শুধু তোমাদের—

সুভাষ: হ্যাঁ ভাই। তাছাড়া, এসব ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তি চাই। তুমি যে পেট-আলগা মানুষ—হয়ত কাউকে ব'লে ফেলবে।

আমি ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু ক'রে দিলাম যেন ব্যাপারটা বেশিদূর না গড়ায়—অন্তত সুভাষের বেশি ভুগতে না হয়।

কিন্তু কোথায় এক নাবালক কিশোরের উদ্বিগ্ন প্রার্থনা আর কোথায় বৃটিশ ব্যাঘ্রের গর্জন! সাত সাগরের পারে পার্লামেন্টের তটে গিয়ে সুভাষের অদম্য দুরন্তপনার ঢেউ লেগেছে! সে অনেক কথা—সব বলবার না আছে সময়, না প্রয়োজন। মোট কথা এই যে, সুভাষ ধরা পড়ল "রিং লীডার" কলঙ্কের বরমাল্য পরে। ধরা ও পড়ত না যদি ওর সঙ্গীদের ও বাঁচাতে না চাইত। তারা সবাই ওকে বলেছিল গা-ঢাকা দিতে। কিন্তু সুভাষ বলল: "অপরকে উসকে দিয়ে যে তার দায়িত্ব নিতে পেছপাও হয় তার নাম কাপুরুষ।" ও তদন্ত কমিটির সামনে এগিয়ে এল অকুতোভয়েই। ওর শুভার্থী অনেকেই ওকে বুঝিয়েছিলেন, যেন কমিটির সামনে ও শুধু এইটুকু বলে যে, ছাত্ররা অন্যায় ক'রে ফেলেছে।"

সুভাষ বলল: "আমি বলব যা সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি।" শুভার্থীরা প্রমাদ গণলেন, ধরলেন ওর মেজদাদা শ্রীশরৎ বসুকে। অতঃপর শ্রীশরৎ বসু আমাকে তদন্ত কমিটির সামনে সুভাষের এজাহারের কাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেন সগর্বেই: "সুভাষ নিষ্কৃতি পেত যদি শুধু এইটুকু মাত্র স্বীকার করত যে, ছাত্ররা ওটেনকে মেরে অন্যায় কাজ করেছে। কিন্তু সে এজাহার দিল একটুও ইতস্তত না ক'রে: ছাত্ররা অপমানে জর্জরিত হয়ে তবে মেরেছে—they did it under a grave provocation.'"

এইই ছিল ওর স্বভাব। সে আমাকে প্রায়ই বলত: "আমি সব সইতে পারি দিলীপ, কেবল কাপুরুষতা দেখলে আমার গায়ের মধ্যে যেন রি রি ক'রে ওঠে।"

সবাই ওর জয়ধ্বনি করল বটে, কিন্তু ভুগতে হ'ল বলতে ওকেই সবচেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হ'ল দু বৎসর।

বিষাদে আমার মন ছেয়ে গেল। কিন্তু সুভাষ আমাকে বলল, "দুঃখ কী ভাই, পরীক্ষা না দিলে কি আর বিদ্যা হয় না? ভালোই হ'ল একদিক দিয়ে। আমি কলেজের যতসব অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক না প'ড়ে বাড়িতে ইচ্ছামত ভালো ভালো বই পড়বার সময় পাব।"

ও মুখে একথা বলল বটে, কিন্তু ওর চোখের নিচে কালি দেখে বুঝলাম, ওকে কত বেজেছে। চোখের জল কোনোমতে চেপে আমি পালিয়ে গেলাম।

পরদিনই সুভাষের এক চিঠি: "দিলীপ, আমার অনুরোধ তুমি আমার সঙ্গে এখন দেখা কোরো না। পুলিস আমার পিছনে লেগেছে, আমি চাই না তারা তোমারও পিছু নেয়।" ব্যস্। এইই ছিল ওর স্বভাব। যাদের ভালোবাসত তাদের কথা যেমন ভাবত সব আগে—তেমনি তাদের বিপদে আগেই বুক দিয়ে পড়ত নিজের কথা না ভেবে। সাধে কি দেশ পরে ওকে "নেতাজী" উপাধি দিয়েছিল ওর মহত্ত্বের তর্পণে! কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

(ক্রমশ)

সোমনাথ ভট্টাচার্য

গ্রাম-কেয়াবনের দুঃখী মানুষটি

সারাটা দিন হাট-মাঠ-ঘাট চরিয়ে কোন এক রাখাল বর-দালান কাঁপিয়ে একপাল গরু-মোষ নিয়ে বাড়ি ফিরল। ফেরার পথে ভূপতিচরণকে যেন পাঁচনের বাড়ি দিয়ে গেরস্তর গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ভূপতি-চরণ বাড়ি ঢুকল। হাতে ভূপতিচরণের অকালের সংগী আধমণি ইন্দরটা।

পা-থেকে চোখের পাতা পর্যন্ত ধুলোর পুরু আস্তর। হাঁটুর ওপর তোলা আট হাতি ধুতি। কোন মান্ধাতার আমলের শত তালিমারা রংজ্বলা খয়েরী শার্টের বুকের লাল প্লাস্টিকের বোতামগুলো সবই খোলা। চাদরখানা উঠেছে মাথায় পাগড়ি হয়ে। বকের মত লম্বা লম্বা পায়ে আর বুকের লোমে লেপ্টে রয়েছে পাটের ফেঁসো আর পাকাটির টুকরো। সপ্তাহখানেকের আ-কামানো দাড়িতে ঝুলের মত ঝুলছে কিছু। বাড়ি ঢুকেই ভূপতিচরণ সোরগোল তুলে দিল: পদ্ম, তেল দে, গামছা দে, ভাত দে—।

বসে বসে পদ্ম ফুলছিল। ফস্-দিয়ে নিভোনো পিদিমের একটুখানি আগুনের মত জ্বলছে শুধু পশ্চিম আকাশটা। বাড়ির নোলাছোঁচো বেড়ালটা উঠোনের মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ভূপতিচরণের আসার সাড়া পেয়ে লাফিয়ে গিয়ে উঠেছে টিনের চালে।

লম্বা পায়ে উঠোনটুকু পেরিয়ে ভূপতি-চরণ নতুন ইঁটের গাঁথনির মধ্যে মাটিফেলা এবড়ো-খেবড়ো রকে হাতের ভার নামিয়ে রাখল। বসল—মুখ মুছল। খানিকক্ষণ হাঁফ ছাড়ল। তারপর অন্যমনস্ক চোখে ইন্দরটার দিকে তাকাল। ভাব-পরিবর্তন হল ভূপতিচরণের চোখ-মুখের। ভূপতি-চরণের তামাটে, রেখাকুটিল, পাকানো শিরায় এখানে-ওখানে ডেলা পাকানো মুখের খটাসের মত গোল গোল চোখে এ একেবারে অন্যদৃষ্টি। অন্যরকম একেবারে। নিঃশব্দে ভূপতিচরণের ঠোঁট নড়ছে। বিড়বিড় করছে। পদ্মর এসব জানা। না-শুনেও বলে দিতে পারে। ভূপতিচরণ বলছে, তোর দৌলতেই —তোর দৌলতেই।

ভূপতিচরণের চোখ-মুখে এমন ভাবের উদয় যখন-তখন হয় না। যখন হয় তখন কোন এক গাঁয়ের কোন এক চাষার ফেটে হাঁ হয়ে যাওয়া কপালের কথা ভেবে পদ্মর জিভ সহানুভূতিতে চুকচুক করে ওঠে।

ভূপতিচরণের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করতে করতে পদ্ম বিষোদ্গার করল, রাক্ষা

উঁ—কি? পদ্মর অস্পষ্ট বিষোদ্গারটা ঠিক কানে যায়নি। ইন্দর থেকে চোখ সরিয়ে অন্যমনস্ক কিন্তু খুশী চোখে ভূপতিচরণ পদ্মর মুখের দিকে তাকাল। মুহূর্তের ব্যাপার—ভূপতিচরণ দেশলাইয়ের কাঠির মত ফস্ করে জ্বলে উঠল, 'কমনেকার লওয়াবের বেটির কানে কথাগুলো যায়নি, নাকি? না গতর পড়ে গেছে। এখনও ওঠার সময় হল না—।'

পদ্মও গলা চড়াল। 'আম্মো-ও তাই বলি। বাড়ি ঢোকার কি এই সময় নাকি? প্যাটের পত্তোটা দাস মশায়ের পাটের আড়তে থুইজে এলেই হয়।'

চোখ পাকিয়ে পানদোক্তা খাওয়া কালো কালো দাঁতগুলো বার করে ভূপতিচরণ খ্যাক্ খ্যাক্ করে উঠল, 'সাধ্ পদ্ম, বিয়ে করা ইস্তিরির মত কথা বলিস না। থাকতে হলে যেমুন আছিস তেমনি থাক। নইলে মেয়াদ ফুরুলে বলে থুলুম।'

'কপালে ঝাড়ু আমার': বাতাসকেই ঝাপটা দিয়ে মটকা করতে করতে উঠে পদ্ম তেল দিল, গামছা দিল।

টেনে-হিঁচড়ে কোনরকমে জামাটা গা-থেকে ছাড়িয়ে, খপাত করে খানিকটা তেল মাথার তালুতে থাপড়ে বকের মত সরু ঠ্যাং দিয়ে মাটিতে লাথি মারতে মারতে ভূপতি-চরণ পুকুরে গেল চান করতে।

'আজ কার কপাল পোড়ল।' পদ্ম বলতে হয় তাই বলল।

ভূপতিচরণ তখন বেশ তোয়াজ করে লংকা-পেঁয়াজ দিয়ে গরগরে করে রান্না মহাশোলের কাঁটা চুষছিল। পদ্মর কথায় সারা মুখের কোঁচকানোগুলো দুলতে লাগল। ভূপতিচরণ হাসল। 'কি যে

কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষার ব্যাঙের একঘেয়ে গ্যাঙর গ্যাঙর ডাকের মত মনে হচ্ছিল ভূপতিচরণের কথাগুলো। হঠাৎ বাধা দিল পদ্ম, 'কোন খেনটা ছুট্‌ফটাতে লাগল?'

বাধা পেয়ে ভূপতিচরণ জনলে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পদ্মর চোখে চোখ পড়ল না। সুতরাং নরম হয়ে এল মুখের পেশীগুলো।

'কি যেন হল! ও—হ্যাঁ।' ভূপতিচরণ ছেঁড়া কথার খেই ধরল। ডাকটা থেমেছিল, আবার শুরু হল গ্যাঙর গ্যাঙর—। 'কি আমার হবে! দাস মশাইকে বললাম কিছু চিন্তা করবেন না। ও কমনেকার ঝুট্‌ বিজনেসের সবটাই আমি বুঝে ফেলেচি। এ বাজার আসল নয়। এ বাজার টেকবে না। দাঁত টিপে পড়ে থাকুন ক'টা দিন। দেখবেন তাপ্পর। যেদিন বন্যা তার তিন দিনের দিন বাজার 'আপ্'। তাপ্পর রোজই চড়ে। রোজই চড়ে। দাস মশাই গুদোম খালি করবার জন্যে ছটফট করতে লাগলেন। বললাম, আর ক'টা দিন সবুর দিন। যদিও আমি দালাল মানুষ, আপনারা লেকাপড়া জানা মহাজন লোক, তবু ভূপতি দালালের কতা লোকে শোনে। এট্টু ধৈর্য ধরুন। শেষে আঠারো শিকেয় উঠে বাজার ধরু খেল। দাস মশাইকে বললাম, মাব নাম করে মাল চালান কাটুন এবার। এদিকে মাল আমদানীর ঠেলায় হিমসিম অবস্থা। বাজার তো নয়—সোনা। এ সিজনে এমন বাজার আর হয়নি। এখন গরজ চাষার। আর গরজ বড় বালাই। মহাজনও গররাজী নয়। তবে কিনা ক্ষিদে না-থাকা টেপা ভাব। তিনবার মাল উল্টে দেখে। বস-এর মাপ-জোপ থাকে না। আর যেটি থাকে, সেটি কেনারাম। পরতি মণে আড়াই সের। এর আর তখন ভুল-ভেরান্তি নেই। কেনারাম আর মাস্তর লোহার ডেলাটি নয়। যোয়ান মানুষের যোবতী বউ। অষ্টক্ষণ বুকের কাছে কাছে রাখার অভিলাষ। তেলমাজা চাঁদ হেন মুখখানা করে চাষা জানল, খ-এ-ব দাঁড় করালাম। আর ব্যাওসাদার! ব্যাওসা-দারের তখন অন্যদিকে নজর দেবার ফুরসৎ নেই। দাস মশাই এসে দুটি হাত ধরলেন। খোলোস ছাড়া আরসোলার মত চকচক্‌ করছে দুটো চোখ। ভূপতি, এমন বাজার পাব না, পায়ের ধুলো নে।...বললাম, দু-এক বচ্ছর নয়, আপনার আশ্রয়ে রয়েচি আজ পাঁচ বচ্ছর। আপনি মহাজন কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার বেচারামের সম্পোক্ক নয়। ভূপতির এই দুই হাত আর পেরাণ কেনারাম আপনারই।'

ভূপতিচরণের আবেগে বাধা পড়ল। পদ্ম উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বল কি—। একেবারে'। তারপর হঠাৎ অন্য সুরে এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোমার ও কেনারাম বেচারামকে যদি বাউনপুকুরের পাতালে একদিন না দে আসি তো আমার নাম—।'

তড়াং করে ভূপতিচরণ উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে পদ্মর চুলের মুঠিই ধরতে যাচ্ছিল। খেয়াল হল হাতটা এ'টো। খেঁকিয়ে উঠল চোখ পাকিয়ে, 'দ্যাখ পদ্ম, বিয়ে করা ইস্তিরির মত কতা বলিস না। কমনেকার যেমুন আচিস তেমনি থাক। নইলে মেয়াদ ফুরোবে বলে থুলুম।'

ভূপতিচরণের এইটি ঘরোয়া মূর্তি। পেটরোগা বুড়ার মত খিটখিটে। তিতি-বিরক্ত সদা-সর্বদা। ভ্রূ কপাল কুঁচকেই আছে। মুখে এক চিলতে হাসি নেই। জগত-সংসারটা যেন ভূপতিচরণের কাছে যাওয়া-আসার পথের একেবারে মাঝখানে মজা কুয়ো। তেষ্টার জল নেই—ডুবে মরার মত পাঁক-এ ভর্তি। যেতে-আসতে সাবধানে এড়িয়ে চলতে হয়। পাঁচবার মুখ-খারাপ না করলে গায়ের ঝাল মেটে না।

চৈত্রমাসের রোদটা গা-জ্বালানো। কিন্তু মাসটা ভূপতিচরণের কাছে সেই হাঁসটা- যে হাঁসটা দিন যায় আর একটা করে সোনার ডিম পাড়ে। চোতে টান পড়েছে চাষার ঘরে। এদিকে বাজারটা ভাল। বুনুনীর সময়—এখন বাজার একটু চড়া না দেখালে আসছে বছর চাষা বেশী পাটচাষ করবে কেন। টিকটিকির মত এবার মহাজনের জিভ্‌ বার করার সময়।

অভাব-অনটনের দিনের জন্য এতদিন পুতুপুতু করে ধরে রাখা নিজের পাটটুকু, করেই চাষা পাট এনে জড়ো করে দাস কোম্পানীর সেই কাঁটার সামনে। যেখানে সূক্ষ্ম ওজন ছাড়া ওজন নেই। আর তার বাঁয়ে ছোট একটা টুলে বসে ভূপতিচরণ বাটখারা ওঠাতে-নামাতে গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে। লিখুন মুহুরী মশাই—

মনে শোনা পাঁচিশ
মনে শোনা সাড়ে বাইশ
ডাকের ডাক (একই ওজন)
পুরো মণ।

সব বাটখারা ওঠে নামে। একটা সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া বাটখারা নামে না।

ভূপতিচরণের এখন দিন নেই। রাত নেই।

অনেক রাতে দাস মশাইয়ের গাড়ি বোঝাই করিয়ে বাড়ি বড়া করে দিয়ে মালের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে রওনা হয়। চোত মাসের

রোদ পোড়া মাঠের সরু নির্জন পথ দিয়ে যখন ভূপতিচরণ গঞ্জ থেকে মাইলটাক দূরে গ্রাম কেয়াবনে ফেরে তখন হাতে জোরে জোরে তালি কিংবা তুড়ি দিতে দিতে পথটুকু পার হয়। কেননা, মাঠের নানান ফাটা ফোটায়, আলের ফাঁকে-ফোকোরে রাতের বুকে হাঁটা জীবদের এখন যাতায়াত। বড় বেশী। ভূপতিচরণ হাতের হ্যারিকেনটা রোজই আড়ং থেকে বেরুবার সময় জ্বালিয়ে নেয়। কিন্তু অনেক রাতে যেদিন দেখে মাথার ওপর চাঁদ, ভূপতিচরণ সেদিন ভোতো-পাগলা একেবারে উদোম মাঠটায় নেমে হ্যারিকেনটা ফু দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে সব ভুলে কেষ্টযাত্রার গান গায়। কিন্তু, গাঁয়ে ঢোকার মুখটিতে গান থামিয়ে দেয়।

কাটাকাটা মুখের ছাঁদের মত পদ্মর কথা-গুলো কাটা কাটা। বেপরোয়া, কিছুর মানামানি নেই। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'পাটের কারবারের নাম করে দালাল মশায় কি গঞ্জে অমনি কিছু, লোপাটের কারবার খোললেন—যে অর্ধেক আত্তির ছাড়া লেন-দেন মেটে না—।'

এসব কথায় ভূপতিচরণ বড় একটা রাগ করে না। বরং সুযোগ বুঝে গলা ফুলোয়। 'কমনেকার ব্যাওসাটার রীতি তুইও খানিকটা আঁচ করে ফেলেচিস পদ্ম।'

পদ্ম রাগে গরগর করে, 'বোঝার মুয়ে ঝাড়ু, আমার।'

কিন্তু ভূপতিচরণকে থামানো যায় না। জুৎজাত করে চেপে বসে আরম্ভ করে—'মোটারকাদের দাগ। পঞ্চাশ-ষাট মনের দাগ। চাষার বাড়ি গিয়ে মাপতে হবে। দর দাম ঠিক হল। একশ দুশ টাকা বায়নাপত্তরও হল। বললাম, ভাইরে, কাজকর্মের মানুষ তোরা। কালকের দিনটা আর কাজে বেরোসনি। মালপত্তরগুলো ঠিক ঠাক করে রাখিস। সূর্যি ওঠার আগে গিয়ে ও ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করব। চাষা বাড়ি গেল। গো-গাড়ির গাড়োয়ানকে বলে দিলাম, বেলা দুটো নাগাদ গিয়ে হাজির হোক। পরদিন বেলা চড়চে—ফেরবো ফেরবো। এগারোটা বাজল। বারোটা বাজল। ওদিকে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা চাষার চাপাড়ে রাগ বাড়চে। আর একটি [illegible] চড়চে। [illegible]। [illegible]। [illegible] নয়। বাড়ি বসে থাকা চাষার নাকে এসে [illegible]। এমনি সময় কাটাপাড়া, [illegible] উপস্থিত। নানা অজুহাত। [illegible]। মুখে রাগ [illegible] আর মনে মনে [illegible] কেনারাম বেচারাম।'

মাহুরী মশাই বলে, 'ভূপতির হাতে কেনারাম কাত্তা হয়।'

দাস মশাই বলে, 'ভূপতি উটকো-ফোকর জানে। যেখানে পোঁচ সেখানেই ওর ধান্দা ধান্দা।'

পদ্ম স্থির চোখে তাকায় ভূপতিচরণের মুখের দিকে। 'আচ্ছা, মানুষের শিকার নিয়ে এমন করতে মনটা তোমার না না করে না। পাপ মনে হয় না!'

ভূপতিচরণ টিকাস্ করে জিভে তুড়ি মারে। 'রুজি-রোজগারের কাছে ও পাপ বাপ কথাটা থাকলে চলে না।'

স্থির চোখগুলো পদ্মর বড় বড় হয়। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। 'মরবে, মরবে, ওরাই মারবে তোমাকে একদিন। মেরে তোমার আর কেনারামকে ডোবার পাঁকে ডুবিয়ে পাট-পচা পচিয়ে ছাড়বে। কেউ জানতেও পারবে না।'

ভূপতিচরণ নাক উঁচু করে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস নেয়। নাক কুঁচকে কথা নয়—

বাজখাঁয় বলবার তুমি কে—অ্যাঁ। ও-কতা চব্বিশ ঘণ্টা তুমি বলবে কেন—অ্যাঁ। আমার না-হয় ভাতার পুত নেই। পেটে খাওয়াবার কেউ নেই—তাই আমি বেশ্যা। কিন্তুক যে-মানুষের বউ এক মাসের বাচ্চাটা নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে ঘর থেকে বেইরে যায়। যে-মানুষ পাঁচ বছর ধরে একটা বেশ্যা মেয়ে-মানুষের পাশে শোয় সে-মানুষকে কি বলে—? কি বলে—?'

ভূপতিচরণ পাথর। বরফের মত ঠাণ্ডা। হঠাৎ সাঁড়াশীর মত হাত বাড়িয়ে পদ্মর চুলের মুঠি ধরে চৌকি থেকে নামিয়ে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে ঘরের বাইরে বার করে দিল। চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে পদ্ম চেঁচাচ্ছে তখনও, 'একশবার বলব, হাজারবার বলব। কারো ক্ষ্যামতা নেই মুখ চাপা দেবার।'

সশব্দে দরজা দিতে দিতে ভূপতিচরণ ভয়ংকর রকম হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এইবার কমনেকার কত পারিস ক্ষ্যামতা দেখা।'

পদ্ম প্রথমটা কাঁদল ডুকরে ডুকরে। মরা স্বামী আর ছেলের কথা মনে করে অনেকক্ষণ বুকভাঙ্গা বিলাপ করল। শেষে ভূপতিচরণকে গালাগাল দিতে লাগল। কিন্তু ও-তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার মধ্যে দু খানা লরী বুঝে করে দিতে হবে। ভূপতিচরণের তাই তাড়াতাড়ি। ভোর না হতেই দড়াম করে দরজা খুলে আড়চোখে পদ্মকে একবার দেখে গপাং করে খানিকটা তেল থাপড়ে চলল পুকুরে।

পদ্ম আঁচলপাতা বিছানা ছেড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে তোরঙ্গ হাতড়ে বার করল সিঁদুর কৌটো। এগুলো ভয়ে দুরদুরু বুক চেপে ধরে। কেনারাম আর বেচারাম—ভূপতিচরণের বুকের দুটো কলজে—ভূপতিচরণের চোখে শক্ত করে এঁটে বসা—লোহার দুটো ঠুলি। যে তিনটে লাল চোখের দারুণ লোভেতে মানুষের বিশ্বাস, মানুষের ক্ষিদে, জগৎ সংসারের নিয়ম-কানুন—সমস্ত ভুলেছে ভূপতিচরণ। বেচারামের দুটো লাল চোখের একটা ঘষে ঘষে তুলে দিল পদ্ম। তারপর কেনারামের একটা চোখের পাশে নতুন করে আর একটা চোখ বসাল। তাকাল দরজার দিকে। তারপর রান্নাঘরের মধ্যে লুকোলো নিজেকে।

ভূপতিচরণ শার্ট কাঁধে বকে বেরিয়ে এল। কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে পুব-আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল খানিকক্ষণ। তারপর এক-ফোঁটা দেওয়া কেনারামের আংটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

পুবে সূর্যের তেজ খর হল। পদ্ম বসে। মধ্য গগনের সূর্য গাছ-গাছালির তলা থেকে ছায়া কুড়িয়ে নিল। পদ্ম বসে। পুবের সূর্য পশ্চিমে চলল। পদ্ম বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকাল বাইরে। রোদ খাঁ খাঁ মাঠটা জুড়ে চৈত্রের বাতাস কুটোনাটা উড়িয়ে দৌরাত্ম্য করে ফিরছে। ঝাউমাচাটার একটা বাঁশের আড়ার ওপর বসে মুখ হাঁ করে একটা কাক গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। মাঠের ওপারে সিরিঙ্গে বাবলা আর খেঁজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে বালিওড়া-পথে থির থির করে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল বাস।

বেচারামকে কেনারাম। কেনারামকে বেচারামের ভেক দিয়ে পরিণামের কথাটা ভাবতে গিয়ে পদ্মর গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু বুকের ভেতরটা লাগতে লাগল কেমন ফাঁকা। অদ্ভুত ফাঁকা। পদ্ম উঠে দু-একটা কাপড় চোপড় দিয়ে একটা পুঁটলি বাঁধল। তারপর ঘরের শেকল তুলে দিয়ে রোদ খাঁ খাঁ মাঠটায় নেমে পড়ল।

একদিন গেল। দুদিন গেল। পাঁচ দিনের দিন পদ্ম আবার পুঁটলিটা বুকে চেপে বাড়ি ঢুকল। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। কিন্তু বাড়ির একটি মাত্র ঘরের দরজায় নতুন কেনা মস্ত এক তালা ঝোলান।

ভূপতিচরণ অনেক রাতে বাড়ি ফিরল। তারপরই ভূপতিচরণের শংখের গলা পাড়া-কেয়ারদের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে তছনছ করে দিল। সারা উঠোনময় ভূপতিচরণ প্রায় নেচে বেড়াতে লাগল।

পদ্ম উদগ্রীব হয়ে কান খাড়া করে শুয়ে—। একবারও কিন্তু কেনারাম বেচারামের নাম শুনতে পেল না। পরদিন ভূপতিচরণ একটু বাড়ির বাইরে যেতেই পদ্ম পড়িমড়ি করে ঘরে ঢুকে চৌকির তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যা দেখলে তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে ছল। পয়লা বৈশাখ গেছে। বছর শুরু—নতুন রং লাগিয়েছে কেনারাম বেচারামের গায়ে। টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা কেটেছে। একটায় একটা আর একটায় দুটো। পদ্ম গোলে পড়ল। কি করবে ভেবে না পেয়ে মাথা কুটতে ইচ্ছে হল।

একখানা লরী পাট বোঝাই, দড়িদড়া কষা, দাঁড়িয়েছে রাস্তার ধারে। ড্রাইভার লরীর বনেট খুলে কি সব খুটখাট করছে। লরীর কুলি দুজন ইটের উনুনে একধারে রান্না চাপিয়েছে। রাতে লরীখানা রওনা দেবে চল্লিশ মাইল দূরে মিলের দিকে। বাকী শুধু আর একখানা লরী পাট বোঝাই হতে। সব প্রস্তুত—সাজোন-দার কুলি, মুহুরী মশাই—ভূপতিচরণ। শুধু লরীখানারই দেখা নেই। যে-লরীখানা দুপুরের মধ্যে মিল থেকে খালি হয়ে ফেরবার কথা। পথের দিকে তাকাতে তাকাতে দারুণ বিরক্তিতে ভূপতিচরণ মুহুরী মশাইয়ের কাছে বিড়বিড় করছিল, 'কেউ নেই, কমনেকার সম্বন্ধীদের পোয়াবারো। কোন মাগীর বাড়ি গিয়ে পড়ে আছে। হবে এসব রিপোর্ট হবে। আমাকে কত্তা।'

লরীর গর্জন ভেসে এল। ভূপতিচরণ এগিয়ে গেল। লরীখানা থামল—রাস্তার ধারে। ড্রাইভারের সিট এর পাশ থেকে নেমেলন ঘোষ দাস মশাই। ব্যাপারী ভদ্রলোক। ভূপতিচরণ তাকে হাত জোড় করে নমস্কার করল। গদিঘরের দিকে যেতে যেতে দাস মশাই শুকনো গলায় বললেন, 'কি খবর হে?'

ভূপতিচরণের অনেক কাজ। লরী বোঝাই দিতে হবে। দাস মশাইকে গদিঘরে বসিয়ে দিয়ে কুলি, ড্রাইভার ডেকে তুলে হৈহট্টগোল তুলে দিল। এ সব ভূপতিচরণের দেখার কাজ। বোঝকারের বাইরের কাজ। কী একটা কাজে গদিঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভূপতিচরণ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। কান পাতল। উঁচু গলায় দাস মশাই বলছেন মুহুরী মশাইকে, 'মানে কি এ সব আপনাদের, চালান কাটছেন এক ওজনে মিলে দিচ্ছে পাঁচিশ আর এক ওজন। দেখা করে খাতা লিখছেন নাকি? দশ লরীতে চল্লিশ মন মাল শর্ট। দেড় হাজার টাকা ঘাটতি—মানে কি এসবের।'

ভূপতিচরণের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। মানে কি এসবের? মুহুরী মশাই তো তোতাপাখী। ভূপতিচরণ যা বলাবে তাই আওড়াবে। ওজন মাপামাপি সমস্ত দায়িত্বটাই তো ছিল ভূপতিচরণের ঘাড়ে। সেখানে এমন হল কি করে! ভূপতিচরণের হাত দুটো ওজন ভুল করবে! হঠাৎ কি-একটা মনে হতেই ভূপতিচরণ একরকম ছুটতে ছুটতে গেল গুদামে। সেখানে ছায়া ছায়া অন্ধকারে কেনারামের একটা চোখ

ট্রামে-বাসে

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বিজ্ঞানী স্বপ্ন দেখা সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ঘুমন্ত ব্যক্তির চোখের মণির নড়াচড়া দেখিয়া তাঁরা নাকি অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, সে স্বপ্ন দেখিতেছে কি না এবং দেখিলে, তাহা কী ধরনের স্বপ্ন—"কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি দিবাস্বপ্নের কোন তথ্য আবিষ্কার করেছেন? এ স্বপ্নতো চোখের মণির নড়াচড়ায় ধরা পড়ে না"—বলে শ্যামলাল।

• • •

প্রসংগত লণ্ডনের একটি সংবাদের কথাও মনে পড়িল। শুনিলাম সেখানে একটি নারী ক্রিকেট আম্পায়ার নির্বাচিতা হইয়াছেন। আমাদের এক ক্রিকেট-রসিক সহযাত্রী

বলিলেন—"ক্রিকেট ছিল গ্লোরিয়াস্ আন্‌সারটেনটি, এবার হবে গ্লেমারস্ আন্‌সারটেনটি!!

• • •

এলাহাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল সেখানে কোন এক প্রতিষ্ঠান নেহেরুজীকে একটি নোটের মালা দান করিয়াছেন। সংবাদদাতা বলিয়াছেন ফুলের বদলে নোটের মালা দেখিয়া নেহেরুজী নাকি খুব বিরক্ত হইয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"উপহারের মালায় নোট না মানালেও, মালা বদলের মালায় কিন্তু ফুলটা নোটেরই সামিল;—"মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে রয়েছে ডোর" স্মরণ করুন, অর্থ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে"!!

• • •

চীন ভারতের নয়নতারা"— একটি সাম্প্রতিক সংবাদের শিরোনামা। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী স্বর্গত মুকুন্দ দাসের গান ধরিলেন—"আপন চিনা কঠিন ভবে, চিনবে যে দিন বিশ্ব সেদিন আপন হয়ে যাবে"।

• • •

মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ বাধিলে যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে।—"ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই গরম যুদ্ধের। কিন্তু ঠাণ্ডা-যুদ্ধের খেপলা জালও কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে কম মারাত্মক নয়"—বলে শ্যামলাল।

• • •

'মারাত্মক গুজব এবং সমষ্টিগত আতঙ্ক ও হিংস্রতার নিরোধে পুলিসকে সংগীত ব্যবহার করিতে বলিলে কেমন হয়"—একটি সম্পাদকীয় জিজ্ঞাসা। বিশু খুড়ো বলিলেন—"পরামর্শ" দিতে আর আপত্তি কি? কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। মারেগা রোগ কখনো সা-রে-গায় সারে না"।

• • •

লণ্ডনের একটি সংবাদে শুনিলাম সেখানে কোন এক ব্রিজ খেলার পার্টিতে চার রকমের তাসের তেরটি করিয়া তাস নাকি চারজনের হাতেই পড়িয়াছে, অর্থাৎ একজন পাইয়াছেন তেরটি ডায়মণ্ড, একজন তেরটি স্পেড্স, একজন তেরটি হার্ট আর একজন তেরটি ক্লাব। শ্যামলাল গানে টিপ্পনী কাটিল—"মা, এ কি মজার খেলা তাস। বেঁটে মা আপন হাতে, রঙ্ সব রেখেছ হাতে...

• • •

আমরা ইন্দোনেশিয়ার একটি নারী ফুটবলারের সংবাদ পাঠ করিলাম। তার নাম জহরা। জাঁদরেল জহরার সঙ্গে

সংঘর্ষের ফলে এক বিরাটকায় জোয়ানকে নাকি স্ট্রেচারে করিয়া মাঠ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"নারীর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কত জোয়ান যে ঘায়েল হয়েছেন তার লেখাজোখা নেই, সেইটেই বড় কথা নয়। আমরা ভাবছি প্রিয়ার পদাঘাতে একদিন অশোক কুঞ্জ উঠতো ফুটে, আর এখন তার পদাঘাতে হচ্ছে শুধু গোল"!!

• • •

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সভায় কলিকাতায় স্টেডিয়াম দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"স্টেডি-আম না হলেও অন্ত রম্ভা হয়ত হয়েই যাবে"!!

• • •

• • •

বঙ্গোপসাগরের কোন অঞ্চলে কতখানি গভীরতায় কি মাছ পাওয়া যায় তাহার বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে—
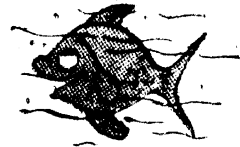
বলিয়াছেন কোন এক সম্পাদক। বিশুখুড়ো বললেন—"কিন্তু গভীর জলের মাছ ধরা-ছোঁয়ার পাওয়া যায় না, এইটে হলো তত্ত্ব কথা"!

• • •

স্বল্প-সঞ্চয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা ১৯৫৮—'৫৯ সালে জমাইয়াছেন এক কোটি এগার লক্ষ টাকা।—"মা লক্ষ্মীদের এই প্রচেষ্টাকে সবাই নিশ্চয়ই অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবেন। কিন্তু এই সংগে কাবোর উপেক্ষিতাদের কথাও যেন তাঁরা ভুলে না যান। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে লক্ষ্মীছাড়াদের দানও নিশ্চয়ই আছে; কথাটা অন্য কেউ স্বীকার না করলেও মা লক্ষ্মীরা নিশ্চয়ই করবেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীনেহেরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন যে, এই বৎসরে বিদেশ ভ্রমণে যাইবেন না। শ্যামলাল বলিল—"নেহেরুজী বলতে পারেন— ওগাঁয়ে যাবো না যাবো না যাবো না রে। কারণ হালে ওগাঁয়ে অর্থাৎ বিদেশে "ফাজিল হাওয়া বড় করে জ্বালাতন"!!!

রম্যরচনা

বান ও বন্যা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ১৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

কতকগুলি বাছিয়া রম্যরচনার সমষ্টি। নামকরণ সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "যে লেখাগুলি ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে তাহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগের বান বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া বন্যার দমকা বায়ু—ইহার সবই নির্বিচারে স্থান লইয়া গিয়াছে।" এই বায়ু-গুলির মধ্যে কোন কোন ব্যাপারে উনপঞ্চাশ বায়ুর আভাস ইহাতে আছে।" অজস্র মজার মানুষ যখন কোন গল্প করতে বসেন, তখন সহজেই আসর জমে ওঠে—কারণ গুছিয়ে কথা বলাই সাহিত্যিকের কাজ। পড়তে পড়তে [illegible] প্রমথ চৌধুরীকে মনে পড়ে যায়, বলার সেই ঢঙটি [illegible]। ইতিপূর্বে [illegible] আনন্দ দিয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলকেই এই খোশগল্পের আসরে দেখা যাবে। পুস্তকটি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। ৫৮০।৫৮

স্মৃতিকথা

নজরুলকে যেমন দেখেছি—শামসুন নাহার মাহমুদ। নওরোজ প্রকাশনী ২১বি, [illegible] রোড, কলিকাতা-১৪। সচিত্র, ১০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

লেখিকার পরিবারের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠভাবে একটি স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তাই কবিকে কাছ থেকে দেখবার ও জানবার যে সুযোগ-সুবিধা হয়েছিল, তারই অবদান এই পুস্তকটি। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বাল্যকাল এবং চট্টগ্রামে যৌবনকাল অতিবাহিতের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ [illegible] এবং পত্রাদির মাধ্যমে বিদ্রোহী কবির মনোবিশ্লেষণ একটি ছবিকে [illegible] পাওয়া যায়—পটভূমিকা যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন। কবির অপ্রকাশিত স্বহস্তে লিখিত পত্রাবলী, চট্টগ্রামের পাহাড়ে জঙ্গলে, ঝরনাতলে, সিন্ধু কিনারে, কর্ণফুলীর তীরে এবং গৃহ-প্রাঙ্গণে তোলা বহু ছবি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। পুস্তকটি দরদ দিয়ে লেখা। ৩৮৯।৫৮

উপন্যাস

সেতুবন্ধন—গৌতম সেন। প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয় প্রাইভেট লিঃ, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—দু' টাকা।

চৌধুরী ও দত্ত পরিবারের পুরুষানুক্রমিক বিবাদ। দু'পক্ষই ধনী জমিদার। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অবশেষে দু তরফের সন্ধি হল, যখন একপক্ষের একমাত্র সন্তান রঞ্জনের বিয়ে হল উভয়ের প্রেমের অগ্নিপরীক্ষার পর। উপন্যাসটি স্বচ্ছন্দে পড়ে শেষ করা যায়,—এইটুকুই লেখকের কৃতিত্ব।

এমন চকচকে প্রচ্ছদপট কদাচিৎ এযুগে নজরে পড়ে। (৫৯১।৫৮)

ভিক্টোরিয়া—কনুট হামসুন। অনুবাদক: শীলভদ্র। লেখক সমবায়, ৫৮ মনসাতলা লেন, কলকাতা-২৩। মূল্য ৩.২৫।

সাহিত্যের ইতিহাসে নুট হামসুন ঔপন্যাসিক হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভিক্টোরিয়া তাঁর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। হামসুনের বহুভোগী জীবনের অভিজ্ঞতায় রেখা-জটিল উপন্যাস এটি নয়, একদিক থেকে বলা যায় এটি তাঁর অ-স্বাভাবিক রচনা। এই প্রেমের কাহিনীকেই ঝরঝরে সুন্দর ভাষায় অনুবাদ করেছেন শীলভদ্র। ভাষান্তর কাজটি মোটের উপর প্রশংসনীয়ই হয়েছে। ছাপা সুশ্রী। ২৭।৫৯

বানিয়ে বলছি না—প্রবুদ্ধ। বলাকা প্রকাশনী, ২৭-সি আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

গল্প-উপন্যাস-নকসা তিন মেশানো এই [illegible] গ্রন্থটি সঠিক করে কাদের জন্য লেখা,

লেখকের রুচি এবং ভাষাভঙ্গি অনুসরণ করে কিছুই বোঝা গেল না। এই ধরনের বাজে কথা এবং কাহিনীতে মশগুল হবার মত পাঠক প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন শ্রেণীর মধ্য থেকে আশা করা হয়েছে জানি না, তবে এই জাতীয় লঘুজীবী রচনাকে বর্তমান সমালোচক কিঞ্চিৎমাত্র সম্মান দিতেও অপরাগ হল সেজন্যে দুঃখিত। ৫৯০।৫৮

কিশোর সাহিত্য

বিদ্রোহী বালক—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৬। দু'টাকা প'চিশ নয়া পয়সা।

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশাইর নাম সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তার বিদ্রোহী বালকের তৃতীয় সংস্করণ।

বিদ্যানন্দপুর গ্রামের বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এই কাহিনী রচিত। বিদ্যালয়ে ভালো ছাত্ররা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে গোবিন্দ। পাঠে অনাসক্তি, রকমারি দুষ্টামির উদ্ভাবন, শিক্ষককে ব্যতিব্যস্ত করা প্রভৃতিতেই এদের মানসিক আনন্দ। কিন্তু এরাও যে উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রভাবে সুস্থ জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারে মনোবিজ্ঞানীরা তা একাধিকবার ঘোষণা করেছেন। আলোচ্যগ্রন্থে লেখক সেই সত্যেরই পুনরুচ্চারণ করেছেন। শত অপমান স্বীকার করে নিয়েও শেষ পর্যন্ত শিক্ষক খগেন্দ্রনাথ কী করে গোবিন্দের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলেন তা-ই বইখানির বিষয়বস্তু। ঘটনা বৈচিত্র্যে ও বিন্যাসে বইখানি অপূর্ব হয়েছে। এবং তা' ছোটদের তো বটেই বড়দের মনকেও আকৃষ্ট করবে সে কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

দামী কাগজে বড় লাইনো টাইপে ছাপা, একাধিক ছবি সমৃদ্ধ, সুন্দর বাঁধাই করা এই বইখানি এত স্বল্প মূল্যে প্রকাশিত করে প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। ৩২।৫৯

ব্যঙ্গ কবিতা

সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা—সম্পাদনা, কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থগৃহ, ৪৩এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯। কবি-পরিচিতি সহ ১৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য চার টাকা।

পুস্তকটির নামেতেই কবিতাগুলির পরিচয় ও লক্ষ্য প্রাঞ্জল হয়েছে। বাঙলা কাব্য-কলার এই দিকটি বহুল-প্রচারিত নয়; কচিৎ কোন পত্রিকায় মাঝে মাঝে এই ধরনের কবিতার দর্শন মিললেও, সেগুলির একত্র সন্নিবেশ ইতিপূর্বে হয়েছে কোন কোন লেখকের নিজস্ব কাব্যসংগ্রহে—যথা সজনীকান্ত দাসের 'অঙ্গুষ্ঠ'। কাব্যের এই বিভাগে যেসব রথী-মহারথী ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই পুস্তকে স্থান পেয়েছেন। তবে কবিতা নির্বাচনে সর্বত্র সমান দক্ষতা প্রকাশ পায়নি। পরশুরাম, সজনীকান্ত দাস, অপরাজিতা দেবী প্রমুখ কয়েকজনের কবিতা যেমন অনবদ্য হয়েছে, তেমনি কয়েকটি অসার্থক কবিতাও স্থান পেয়েছে। যদিও সেগুলির সংখ্যা কমই। সমগ্রভাবে বিচার করলে পুস্তকটি যে অতি উপাদেয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যঙ্গ কবিতার স্বাভাবিক "খোঁচা" সত্ত্বেও কবিতাগুলি প্রচুর রসের খোরাক জোগাবে। রূপসজ্জা রুচিসম্মত। ৩৪৬।৫৮

বিবিধ

সরণী—ভাস। প্রকাশক—বাণীতীর্থ, ২৬-২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। দাম—২॥ টাকা।

ছাপা বাঁধাই ভালো, প্রচ্ছদপট সুন্দর—বই-এর বাজারে এ গুণগুলোর কদর থাকলেও, কেবলমাত্র তারই ওপর বই-এর উৎকর্ষ নির্ভর করে না। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কয়টি কবিতাতেই ছন্দচাতুর্য বর্তমান, শব্দচয়নও ভালোই; কিন্তু এর বেশী আর কিছু বলার নেই। অনেকগুলো কবিতার সমষ্টিতে রূপের মধ্যে একজন কবিকে যদি তাঁর স্বরূপে চিনতে পারা না গেলো, তবে সে সংকলন অসার্থক। ৫১৬।৫৮

Passenger Transport problem in Calcutta [A Study of rush-hour traffic] by S. K. Bhattacharyya. Bookland Private Limited 1, Sankar Ghose Lane, Calcutta-6. Price Rs. 5.00.

ক্রমবর্ধমান যানবাহন ও জনস্রোতের ফলে পথ-সর্বস্ব কলকাতা শহর প্রায় মুষড়ে পড়েছে। একদিকে যেমন নানাবিধ দুর্ঘটনার হার এই সেদিন পর্যন্তও বেড়ে চলেছিল তেমনি মানুষের সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে চলেছে। জীবিকার সন্ধানে মানুষকে দু বেলা ছোটাছুটি করে বেড়াতে হচ্ছে, কর্মক্ষেত্র ধাবিত সেই জনস্রোতের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংসারের লোক। ট্রাম এবং বাস ছাড়া তাঁদের দ্বিতীয় কোন যানবাহন নেই। অথচ দশটা-পাঁচটার সংকটমুহূর্তে ঐ দুটি যানের অবস্থা প্রায় ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাত্যহিক চলাচল-সংগ্রামে মানুষের উদ্যমক্ষমতা এত পরিমাণে ব্যয়িত হতে থাকে যে, ছুটিবিহীন দিনগুলি একই ক্লান্তির অনুবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তাঁর ছাত্রগণের সহায়তায় কলকাতায় অফিসকালীন যান ও যাত্রীর চলাচলের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সংখ্যা এবং তথ্য নানা ছকে বিধৃত করে উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে কতকগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলি আমাদের সমূহ সমর্থনযোগ্য মনে না হলেও অনেকগুলিই নতুন সংস্কারক চিন্তাধারার সূত্র দেখিয়েছে। কেবলমাত্র সরকারকেই নয়, জনসাধারণকেও এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভেবে দেখতে আমরা অনুরোধ জানাই।

৪১১।৫৮

সুর ও স্বর—শ্রীবুদ্ধদেব রায়। নির্মলকুমার সেনগুপ্ত, ১৭, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা—৯। এক টাকা।

সতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দিনেশ দাস প্রমুখ কবিদের রচিত গানের এটি স্বরলিপি গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব রায় গানগুলিতে সুর সংযোজনা করেছেন। কোন কোন গানের সুর সৃষ্টিতে শ্রীযুক্ত রায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

১০৫।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি আলোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে :—

পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প—সুধীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্য পরিচয়—জীবনবল্লভ চৌধুরী।

বনের ডাক—স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ।

দুই মহল—জোছন দস্তিদার।

আমরা ফসল ফলাই—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনুর কল্যাণ—বিনয় ঘোষ।

প্রতিষ্ঠা—শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পাপের প্রায়শ্চিত্ত—শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

শব্দই ব্রহ্ম—শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেতু—শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজ ও সাহিত্য—দিব্যেন্দুকুমার কর।

হিন্দু রাষ্ট্রের রূপ-রেখা—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর
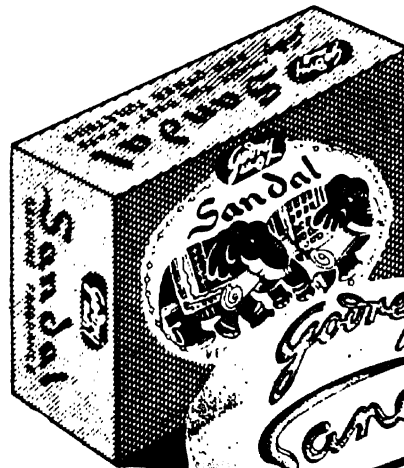
কাঁচা ফিল্ম সমস্যা

রাজশ্রী পিকচার্সের কর্ণধার শ্রীতারাচাঁদ বারজাতিয়া সম্প্রতি কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণ হেতু সরকার কর্তৃক প্রিন্টের সংখ্যা হ্রাস করায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে একটি সর্বভারতীয় হিন্দী ছবি মুক্তির সময়ে ৪০ থেকে ৪৫টি প্রিন্টের মত কাঁচা ফিল্ম পায় এবং ছবি যদি ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে, তবে প্রিন্টের সংখ্যা ছয় সপ্তাহ পরে ৬০ পর্যন্ত ধার্য করা হয়। শ্রী বারজাতিয়ার মতে, এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে কোন ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাঁর মতে কোন ছবির সোমবার দিনের বিক্রী থেকেই বোঝা যায় ছবিটি জনপ্রিয় হবে কিনা এবং এর জন্য ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ ছয় সপ্তাহ-ব্যাপী প্রদর্শনী পর্যন্ত অপেক্ষা করার ফলে ছবির ব্যবসায়িক দিকের ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি অন্য কোন ভাল ছবির মুক্তি ঘটে যায়, তবে পূর্বে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

প্রিন্টের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে ছবির ব্যবসায়িক স্বার্থহানি সম্বন্ধে শ্রী বারজাতিয়া যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তা একেবারে অমূলক নয়। প্রচার-পরিচালনার ফলে কোন ছবি চিত্রমুক্তির সময় চিত্রামোদীদের মনে যে কৌতূহল সৃষ্টি করে, ছয় সপ্তাহ পর তা সহজেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। তদুপরি সংবাদ-পত্রের চিত্র-সমালোচনা সব সময় যে কোন ছবি সম্বন্ধে প্রশংসামুখর হতে পারে না। তাও অনেকাংশে ছবির ব্যবসায়িক দিক প্রভাবান্বিত করে থাকে। হিন্দী ছবি সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত সমস্যা বিবেচনায় প্রিন্টের সংখ্যা বাড়াবার স্বপক্ষে শ্রী বারজাতিয়া যে সকল যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু দেশের বর্তমান আর্থিক সমস্যায় বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের প্রয়োজনে সব ব্যবসা-বাণিজ্যকেই বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে চলচ্চিত্র ব্যবসায়েরও কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণ হেতু সাময়িক সংকট স্বীকার করে নেওয়া ব্যতীত উপায় নেই। কাঁচা ফিল্মের নিয়ন্ত্রণের ফলে চলচ্চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্র যাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকেও সরকারের যথোচিত নজর থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্প থেকে সরকারী আয়ের পরিমাণও কম নয়। কিন্তু দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অন্যান্য ব্যবসাক্ষেত্রের মতো চলচ্চিত্র শিল্পেরও সাময়িক সংকটগুলি স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া উচিত।

ডি লুক্স নিবেদিত 'সাগর সংগমে'র একটি দৃশ্যে ভারতী দেবী ও মঞ্জু অধিকারী।

অস্কার প্রতিযোগিতায় 'জিজি'র জয়

হলিউডের অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের বার্ষিক পুরস্কার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে সম্প্রতি। গত বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে 'অস্কার' লাভ করেছেন ডেভিড নিভেন ও সুজান হেওয়ার্ড। "সেপারেট টেব্‌লস্‌" ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য ডেভিড নিভেন এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সুজান হেওয়ার্ড পুরস্কার পেয়েছেন "আই ওয়াণ্ট টু লিভ"

...রূপ কলাকার, দেখিয়ে। গত ...শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-...ত্রীর সম্মান লাভ করেছেন বার্ল ... ("দি বিগ কান্ট্রি")ও ওয়েণ্ডি ...লার ("সেপারেট টেবলস্")।

শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান অর্জন করেছে রঙগীন সংগীতমুখর "জিজি"। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেন "জিজি"র পরিচালক। এ বাদেও ছবিটি শ্রেষ্ঠ শিল্প-নির্দেশ, শ্রেষ্ঠ রঙীন আলোকচিত্র, শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জা, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা, সংগীতমুখর ছবির শ্রেষ্ঠ সংগীত ও শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের পুরস্কারগুলিও লাভ করেছে। "জিজি" মোট ৯টি পুরস্কার পেয়েছে। অ্যাকাডেমির সর্বাধিক পুরস্কার লাভের রেকর্ড স্থাপন করে "গন্ উইথ দি উইন্ড।"

ফ্রেডারিক লোরি ও অ্যালান জে টার্নার জুটি "মাই ফেয়ার লেডি" ছবিতে তাঁদের সংগীত রচনার জন্য পুরস্কার লাভ করেন।

আরেকটি বর্ণসমস্যামূলক ছবি "দি ডিফায়েন্ট ওয়ানস" শ্রেষ্ঠ চিত্রকাহিনীর পুরস্কার লাভ করেছে। কাহিনীকার নাথান ডগলাস কখনও কম্যুনিস্ট ছিলেন কি না সেকথা আমেরিকার কংগ্রেসের অনুসন্ধান কমিটির নিকট পূর্বে বলতে অস্বীকার করেছিলেন। সে সময় ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রবীণ চিত্রতারকা মরিস সেভালিয়ে রঙ্গজগতে তাঁর দীর্ঘদিনের অবদানের জন্য বিশেষ সম্মানমূলক পুরস্কারে ভূষিত হন।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভের ঘোষণাকালে সুজান হেওয়ার্ড তাঁর আনন্দাশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি। তাঁর দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের সফলতায় তিনি খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন। ডেভিড নিভেন বলেন, সৌভাগ্যের বোঝার চাপে তিনি এত নুয়ে পড়েছেন যে, মঞ্চে তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।

১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে সম্মানিত ইনগ্রিড বার্গম্যান বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে যোগ-দান করেন। বার্গম্যানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী লারস্ স্মিডট্ ও তাঁর প্রথম বিবাহজাত উনিশ বছরের কন্যা জেনি এন লিন্ডস্টরম্।

অন্যান্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম নীচে দেওয়া হল:

স্যাম লিভিট (শ্রেষ্ঠ সাদা-কালো আলোকচিত্র: "দি ডিফায়েণ্ট ওয়ানস্"); ডিমিট্রি টিয়মকিন (শ্রেষ্ঠ নাট্যসংগীত পরিবেশন: "দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী"); টম হাওয়ার্ড (শ্রেষ্ঠ ক্যামেরা কৌশল: "টম থাম্ব্"); জেকুইস টাটি (শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি: "মাই আংকল্"); জন বারটন (শ্রেষ্ঠ কার্টুন: "নাইটটিস নাইটবাগস্"); ওয়াল্ট ডিজনে প্রোডাকশন্স (শ্রেষ্ঠ ছোট বিষয়বস্তু: "গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন"); ওয়াল্ট ডিজনে প্রোডাকশন্স (শ্রেষ্ঠ তথ্যপূর্ণ চিত্র: "হোয়াইট উইলডার-নেস"); ওয়াল্ট ডিজনে প্রোডাকশন্স (শ্রেষ্ঠ তথ্যপূর্ণ চিত্রের বিষয়বস্তু); ফ্রেড হ্যানসেন (শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রহণ: "সাউথ প্যাসিফিক")।

ন্যাশনাল পিকচার্সের নির্মীয়মান ছবি 'সোনার হরিণ'-এর নতুন তারকাজুটি উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

চিত্রালোচনা

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে সম্মানিত "সাগর সংগমে" গত ১লা বৈশাখ মুক্তি-লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উত্তরা সিনেমায় ঐদিন সকালে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবিটির উদ্বোধন করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বহু-খ্যাত গল্পটিতে ঘটনার সমারোহ না থাকলেও মানবীয় আবেদনে তা সুসমৃদ্ধ। লেখার আখরে যার রস ছিল সীমিত, তাই উত্তাল তরঙ্গের রূপ নিয়েছে ছবির পর্দায়। যে রূপকারের প্রয়োগনৈপুণ্যে তা সম্ভব হয়েছে, ত্রিশ বৎসরেরও ওপর তিনি ভারতীয় চিত্রজগতে নানাভাবে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেই ভারত-বিখ্যাত পরিচালক দেবকীকুমার বসুর অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি এই "সাগর সংগমে"। "চণ্ডীদাস", "পূরণ ভকত", "মীরাবাঈ", "সীতা"র যুগ পেরিয়ে এসে দেবকীকুমারের প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় তারাশংকরের

"কবি"-তে, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "রত্নদীপ"-এ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "সাগর সংগমে"-র চিত্ররূপায়ণে সেই প্রতিভারই নতুনতর প্রকাশ।

ছবিখানির প্রধান দুটি চরিত্রে ভারতী দেবী ও নবাগতা মঞ্জু অধিকারীর অভিনয় সহজে ভোলবার নয়। সহশিল্পীদের মধ্যে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিভু, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী, নিভাননী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাইচাঁদ বড়ালের সুরযোজনা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। গোবিন্দগোপাল, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, কীর্তনসুধাকর ব্রজেন সেন, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এ ছবির গানগুলি গেয়েছেন।

*

এ হপ্তায় আরো দুখানি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে। দুখানিই হিন্দীতে তোলা—"দো বেহনে" ও "চাবুকওয়ালী।"

বৃজকলা মন্দিরের "দো বেহনে" দুই যমজ বোনের গল্প। শ্যামা এই দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর শিল্প প্রতিভার আর একটি নতুন নিদর্শন তুলে ধরেছেন ছবির পর্দায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন রাজেন্দ্রকুমার, চাঁদ উসমানী, রামমোহন, রাধাকিষণ, লীলা মিশ্র, পদ্মিনী ... প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ... কাপুর। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব ... দেশাইয়ের।

গোল্ডেন মুভী করপোরেশানের "চাবুকওয়ালী" সেকালের "হাণ্টারওয়ালী"র নবতর সংস্করণ। সমর রায়, মেহরু, হবিব, জীবনবালা, কৈলাস প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। বি জে প্যাটেল ছবিখানির পরিচালক।

*

বছর কুড়ি আগে বনফুলের "কিছুক্ষণ" গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ লেখককে অভিনন্দিত করেছিলেন এই কটি ছত্রে: "সাবাস! তোমার 'কিছুক্ষণ' পড়ে খুবই ভাল লাগল। উল্টেপড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভাল তা নয়, পথ্যও বটে।"

বনফুল-সহোদর পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় সানরাইজ ফিল্মসের পতাকাতলে সেই বিচিত্র কাহিনীটির চিত্ররূপ প্রায় শেষ করে এনেছেন। কাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী ছবিটির দৃশ্য অনেকাংশই তুলতে হয়েছে বাইরে—রেল স্টেশনে, রেলগাড়ি আর রেল লাইন জায়গা থেকে।

একটা লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে ঘটনা। শহরের মানুষ-গোষ্ঠীরই প্রতিনিধি তারা—এই ভাবের স্টেশনে নামের নির্দিষ্ট ওঠানামা। এ ছবি তুলতে বহু শিল্পী সমাবেশ করতে হয়েছে প্রচুর। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্টেরা হচ্ছেন—অরুন্ধতী, শোভা সেন, অসিতকুমার, গঙ্গাপদ বসু, ... প্রভৃতি। নচিকেতা ঘোষ ছবিটিতে সুর দিয়েছেন।

*

নতুন সাড়া জেগেছে এমনি কতকগুলি বাংলা ছবির খবর দিচ্ছি।

লা আর্ট নামক একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠান বাংলা নববর্ষের শুভলগ্নে তাঁদের প্রথম ছবি "আকাশের রঙ"-এর মহরৎ সুসম্পন্ন করেছেন এম-পি স্টুডিওতে। এর পরিচালক ডি কে সু ইতালীতে সিনেমা-বিজ্ঞানের আধুনিক কলাকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। এক ভারতীয় তরুণ ও এক ইতালীয় তরুণীকে ঘিরে ছবির কাহিনী। নায়িকা, ক্যামেরাম্যান ও সম্পাদক হচ্ছেন ইতালীয়। ভারতীয় চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করবেন প্রবীরকুমার, শোভা সেন, অসিতবরণ প্রভৃতি। "ডাক হরকরা"-খ্যাত সুধীন দাশগুপ্তের ওপর সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

সন্ধ্যা রায় একাধারে চিত্রপটে ও রংগমঞ্চে নিজের নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে উঠতি-শিল্পীদের পুরোভাগে স্থান করে নিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ষ্টারের 'ডাক বাংলো' নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করছেন।

৮ই এপ্রিল নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে কে এম পিকচার্স তাঁদের নতুন ছবি "উত্তর মেঘ" এর চিত্র গ্রহণ শুরু করেছেন। রাজকুমার মৈত্র লিখিত গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ছবির পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী। এর মুখ্যাংশে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে দেখা যাবে। তাঁদের সঙ্গে আরো দেখা যাবে মলিনা দেবী, কমল মিত্র, দীপক চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ছবির বিভিন্নাংশে।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে গৌতম চিত্রের প্রথম ছবি "অবাক পৃথিবী"র কাজও পুরোদমে চলছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য অবলম্বনে বিশু চক্রবর্তী ছবিখানি পরিচালনা করছেন। আলোকচিত্রও তিনিই গ্রহণ করছেন। উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এর তারকা-জুটি তৈরি হয়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, গংগাপদ বসু, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অপর্ণা দেবী, মণিকা ও তরুণকুমার। শেষোক্তই ছবিখানির প্রযোজক। সুরসৃষ্টির ভার নিয়েছেন অমল মুখোপাধ্যায়।

*

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেড মাস্টার' গল্পটি অগ্রগামীর পরিচালনায় ও রীডেন অ্যান্ড কোম্পানীর প্রযোজনায় চিত্রায়িত হচ্ছে, এ খবর পাঠকদের অজানা নেই। স্টুডিওর নকল সেটের পরিবর্তে বাস্তবানুগ পরিবেশের মধ্যে যাতে গল্পের নাটকীয় রস দানা বাঁধতে পারে অগ্রগামী পরিচালকগোষ্ঠীর সেদিকে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি নেই। তাই অফিস-অভ্যন্তরের দৃশ্য তুলতে তাঁরা তাঁদের গোটা ইউনিট নিয়ে মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রাসাদোপম ভবনে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় যে সব দৃশ্য এখানে তোলা হয়েছে, পরিচ্ছন্ন শিল্পকারুর দিক থেকে বাংলা ছবিতে তা অভূতপূর্ব। ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য মুখ্যাংশে আছেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, গংগাপদ বসু, শিশির বটব্যাল ও দুটি আনকোরা নতুন মুখ—রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষাল। সুর-সৃষ্টি করছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

হাল্কা-হাসির হাওয়ায়-ভরা

সাধারণ হিন্দী ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য দেখা যায় দর্শক সমাজের একটি বৃহৎ অংশের প্রমোদ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করা। যেখানে সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়ে হাল্কা আনন্দের ফানুসকে ফুঁ দিয়ে বড় করবার দিকে, সেখানে কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারটা যে গৌণ হয়ে দাঁড়াবে তা বিচিত্র নয়। ঠিক

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতারূপে সম্মানিত তমাল লাহিড়ী বর্তমানে বিশ্বরূপায় 'ক্ষুধা' নাটকে সদার ভূমিকায় সকলকার প্রশংসা অর্জন করছেন। তাই হয়েছে রোশনী ফিল্মসের "শরারত"-এ।

ছবির কাহিনীর প্রথমার্ধ গড়ে উঠেছে চাঁদ ও শবনমকে কেন্দ্র করে। অভিভাবকদের মধ্যে তাদের বিয়ের কথা একরকম ঠিকই ছিল। কিন্তু চাঁদের চপল ও উচ্ছৃংখল প্রকৃতি এবং সাংসারিক ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা দেখে শবনমের বাবা তাকে জামাই করবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। কিন্তু চাঁদ নাছোড়বান্দা। শবনমকে পত্নীরূপে পেতে সে বদ্ধপরিকর। নানা রকম অদ্ভুত কৌশলে ও বালসুলভ দুষ্টামির মধ্য দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত শবনমের অন্তর জয় করে। শবনমের বাবা এই পরিস্থিতিতে মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেন অন্যত্র। বিচ্ছেদ-ব্যথা সহ্য করতে না পেরে চাঁদ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। এদিকে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে শবনমকে নিয়ে যাচ্ছে তার বর নিজের বাড়ি। শোভাযাত্রার সামনে দিয়ে চাঁদের বন্ধুরা তার শবদেহ বয়ে নিয়ে যায় শ্মশানে।

বরের ঘরে শবনম তার দেবর দীপককে প্রথম দেখার পর অজ্ঞান হয়ে যায়। চাঁদ ও দীপক দেখতে হুবহু একরকম। এমন কি স্বভাব-চরিত্রেও। উভয়ের নির্মল স্নেহের সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে দিনে দিনে। দীপক রাস্তার এক নাচনেওয়ালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ভাবীর কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সাহায্যও সে পায়। কিন্তু সমাজে তাদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা কথা ওঠে। এক কুচক্রীর প্ররোচনায় দীপকের দাদার মন বিষিয়ে ওঠে সহজেই। পরিবারে ভুল বোঝাবুঝির পালা শুরু হয়। অপমান করে শবনমকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় দীপকের দাদা। তার সন্তানকে রেখে দেয় নিজের কাছে। দীপক পরিবারের সম্মান রক্ষায় আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ভাঙ্গা সংসার আবার কি করে সহজেই জোড়া লাগল তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি।

ছবিতে কিশোরকুমারকে দেখা যায় দ্বৈত ভূমিকায় চাঁদ ও দীপক রূপে। দুজন হুবহু একই চেহারা ও প্রকৃতির হতে পারে কি না সে প্রশ্ন হিন্দী ছবিতে আমোদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে হয়তো অসংগত। চাঁদকে স্বভাব-চরিত্রে হাবে-ভাবে চলনে-বলনে দেখানো হয়েছে অনেকটা ক্লাউনের মতো। সে রাস্তায় অংগভংগী সহকারে গান গেয়ে লোক জড়ো করে, কখনও মহিলার বেশে আবার কখনও বা বৃদ্ধের রূপসজ্জায় প্রেমাস্পদার কাছে গিয়ে হাজির হয়। বিলেত-ফেরত উচ্চ শিক্ষিত দীপকের প্রকৃতিও তাই। তাকে যেমন পার্টিচারিণী দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় কোন এক 'অ-ভৌগোলিক' চরিত্রের বেশে তার প্রণয়িনী রাস্তার নাচনেওয়ালীর সঙ্গে গান গেয়ে নাচতে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কিশোরকুমারের রংগাভিনয়ের জন্যই চরিত্র দুটির এই রকম উদ্ভট কল্পনা। কিশোরকুমারের অনুরাগীদের কাছে এই ছবির আবেদন হয়তো আছে। কিন্তু 'কমেডি' ও পারিবারিক মেলোড্রামার এই যে এলোপাথাড়ি সমন্বয়—যা ফাঁপিয়ে তুলতে অনেক বৈসাদৃশ্য ও গোঁজামিলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে—তা রুচিসম্পন্ন ও বিচারশীল দর্শকদের মনঃপরিমাণে আনন্দ দেবে কি না সন্দেহ। আখ্যানবস্তুতে পারিবারিক মেলোড্রামার বিন্যাসে যে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলিও যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে মনকে নাড়া দেয় না। তবে পরিচালক এইচ এস রাওয়েল কৌতুকাভিনয়ে কিশোরকুমারের দক্ষতার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন এবং নাচ-গানে ও নানা হাসির উপাদানে ছবিখানিকে ভরিয়ে তুলেছেন।

রংগাভিনয়ে কিশোরকুমার তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এ ছবিতে। ছবির শেষের দিকে বিশেষ কয়েকটি নাট্যমুহূর্তে তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। মুখ্য নারী-চরিত্রে মীনাকুমারীর অভিনয় কৃতিত্বের দাবী রাখে। কাহিনীর নাটকীয় অংশে তাঁর অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য। দীপকের প্রণয়িনী নাচনেওয়ালীরূপে কুমকুমের অভিনয় চরিত্রানুগ। তবে তাঁর নৃত্যাংশ তেমন উপভোগ্য হয়নি। শবনমের স্বামীর চরিত্রটি রাজকুমার সহজগ্রাহ্য করে রূপায়িত করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শশীলা কাশ্মীরী, সুন্দর ও রাজেন্দ্রনাথের নাম।

শংকর-জয়কিষণের সুর রচনায় কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। সামগ্রিক কলাকৌশল ও
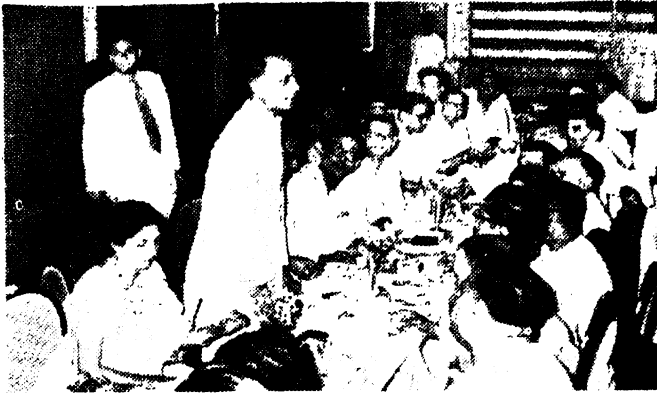
তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকারকে বংগবাসী সিনেমার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এস কে মুখার্জি সম্প্রতি একটি চা-সভায় সম্বর্ধিত করেন

আংগিক পারিপাট্যের দিক দিয়ে ছবিটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

বাঙলা ছবির অনবদ্য দৃশ্যপট

দুদিকে পাহাড়—মাঝখানে সুবর্ণরেখার জলে তৈরী একটি নয়নাভিরাম সরোবর। পাহাড়ের ছায়া পড়ে জলে, জলের বুকে ছায়া পড়ে বন-বীথির। তারই ওপরে একটি নৌকোতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও রবীন মজুমদার। সরোবরের তীর থেকে ওদের লক্ষ্য করছেন জহর রায়। "এ জহর সে জহর নয়"—ছবির নাম। শিল্পী জহর রায়কে নায়ক জহররূপে দেখাবার এক বিচিত্র আয়োজন। ছবির নামকরণের অর্থ এও করা যায়—যে জহরকে চিত্রামোদীরা এতকাল দেখে আসছেন বিভিন্ন ছবিতে, সে জহর এ-ছবির জহর নয়। এক ভিন্নরূপী জহর!

জহর রায়কে নিয়ে ছবির এই দৃশ্য তোলা হয়েছে শিল্প-নগরী জামসেদপুরের অনতিদূরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ "ডিমনা নালা" সরোবরে। ছবিটির প্রযোজক এচ এস মেটা এবং পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় তাঁদের ইউনিট নিয়ে সম্প্রতি গিয়েছিলেন সেখানে ছবির কয়েকটি বহিদৃশ্য তুলতে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জহর রায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, রবীন মজুমদার ও চন্দ্রা দেবী।

"ডিমনা নালা"র উপর অবস্থিত ডিরেক্টর বাংলোতে আরেকটি দৃশ্য তোলা হয় এর পর। মালপত্র নিয়ে রবীন মজুমদার চলে যাচ্ছেন বাড়ী ছেড়ে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে এলেন নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী। বলতে যাচ্ছিলেন রবীন মজুমদার—এমন সময় অদৃশ্য হাতে তার পেটে এক খোঁচা। "অদৃশ্য" জহরের কারসাজি।

ছবিতে "দৃশ্য" জহরকে দর্শকেরা দেখবেন, আর অনুভব করবেন "অদৃশ্য" জহরকে। "অদৃশ্য" জহরের কারসাজি দেখা গেল আরেকটি দৃশ্যে। টাটানগরের সুদৃশ্য জুবিলি পার্কে কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টে খাওয়া শেষ করেছেন রবীন মজুমদার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। বিল মেটাতে যাবেন রবীন মজুমদার—পকেটে মণি-ব্যাগ নেই। "অদৃশ্য" জহর সরিয়ে ফেলেছে।

কোয়ালিটিতে আরেকটি দৃশ্য নেওয়া হল জহর রায় ও চন্দ্রা দেবীকে নিয়ে। জহর রায়কে দেখে চীৎকার করে উঠলেন চন্দ্রা দেবী—"আবার তুমি! পুলিশ! এ্যাম্বুলেন্স! ফায়ার বিগ্রেড!" জুবিলি পার্কে ছবির আরও একটি গানের দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। সুপ্রিয়ার গানে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখার্জি। ছবিটির সুরারোপ করছেন ভি বালসরা। তিনিও উপস্থিত ছিলেন দৃশ্য-গ্রহণের সময়। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন দেওজী ভাই।

"এ জহর সে জহর নয়" নবগঠিত এম এম মুভীজের ভিন্নধর্মী হাসির ছবি। ছবির পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় এর আগে "ভানু পেলো লটারী"র পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ছবির অন্যান্য প্রধান পার্শ্ব চরিত্রে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়।

বেতার ও তথ্যবিভাগের রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় ফিল্মস ডিভিসন প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ডকুমেণ্টারি ছবি তোলবার গৌরব অর্জন করেছে।

এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর এই নয় মাসের মধ্যে নিউজ রীল ছাড়া ফিল্মস ডিভিসনের ডকুমেণ্টারি ছবির সংখ্যা ৬৯—তার মধ্যে ৩৯ খানি প্রামাণ্য চিত্র ভারতের ৪,০৭৭টি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে, বাকীগুলি
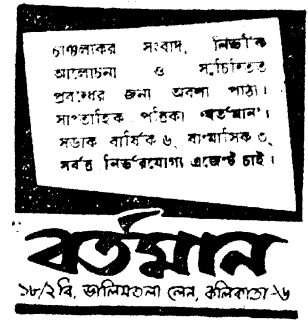
মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে ১৩খানি তুলেছেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যাঁদের নাম সরকারী অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ডকুমেন্টারি ছবিগুলি তেরোটি আঞ্চলিক ভাষায় তোলা হয়েছে। নিউজ রীল তোলা হয় বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী, তামিল ও তেলেগু এই পাঁচটি ভাষায়।

এগুলি ছাড়া ফিল্মস ডিভিসন চারখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করেছে। এই পর্যায় সর্বশেষ ছবির নাম 'ভারতের লোকনৃত্য'। ছবিটি এখনও ব্যবসায়িকভাবে মুক্তিলাভ করেনি।

গত আর্থিক বৎসরে অনুমোদিত ছবিগুলির ব্যবসায়িক পরিবেশনার মোট আয় ৩৩ লক্ষ টাকা হবে বলে ফিল্মস ডিভিসন আশা করেন। এই বৎসরের মোট ব্যয় হিসাব করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা। মোট ৯৫ লক্ষ টাকা এই বিভাগের ব্যয়ের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও প্রকাশ, ১৯৫৮ সালে সেন্সর বোর্ড মোট ২৯৫টি কাহিনীমূলক ছবিকে ছাড়পত্র দিয়েছেন এবং এগুলির মধ্যে ৭টিকে 'এ' (পূর্ণবয়স্কদের জন্য) পর্যায়ে ফেলেছেন।

বেতার ও তথ্য বিভাগের গত বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানির জন্য 'এক্সপোর্ট প্রোমোশন কমিটি ফর ফিল্মস' স্থাপন করা।

বেতার ও তথ্য বিভাগের রিপোর্টে জানা যায় যে, চিত্র-প্রযোজনার সাহায্য হিসাবে উক্ত বিভাগ চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটিকে ৩ লক্ষ টাকা দান করেছে।

যে সকল ছবি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায়নি রিপোর্টে সেগুলিরও তালিকা রয়েছে এবং চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও বিদেশে চলচ্চিত্র-উৎসবে ভারতীয় ছবির যোগদান ও পুরস্কার লাভ সম্বন্ধেও যাবতীয় সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে আরও জানান হয়েছে যে, জনসংযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে দিল্লীতে নতুন আর্থিক বৎসরের গোড়ার দিকে একটি টেলিভিসন ইউনিট স্থাপন করা হবে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা শুরু হবে নতুন বৎসরের গোড়ার দিকে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর গবেষণা বিভাগ এই সম্বন্ধে গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

বিবিধ সংবাদ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅজিত বসু এই বছরে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্য হিসাবে শ্রী বসু সর্বভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছেন। তাঁর এই নূতন সম্মানে বাংলা চিত্রশিল্পের অনুরাগীরা আনন্দিত হবেন।

• • •

আগামী ২৮শে এপ্রিল নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক ফিল্মের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরিত হবে। বাংলা দেশে তোলা চারখানি ছবি এবার এই সম্মানের অধিকারী হয়েছে—'সাগর সঙ্গমে', 'জলসাঘর', 'ডাক হরকরা' ও 'বীরশ্রী ও মায়াপুতুল'।

• • •

গত রবিবার থিয়েটার সেন্টার হলে 'গীতাঞ্জলী' ও 'নৃত্যছন্দার' সভ্যাগণ নৃত্যগীতের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসন্তোৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে আরতি রায়ের প্রার্থনা পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, আশা করের সংগীত পরিচালনা ও শিশুদের একটি মণিপুরী নৃত্য দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। মীনাক্ষী রায় ও মণিদীপা ঘোষের গান উপভোগ্য হয়।

• • •

কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্য-সাংস্কৃতিক

প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্য-তীর্থ'-এর প্রযোজনায় একটি নাটক মঞ্চস্থ করবার আয়োজন চলছে। 'সাহিত্য-তীর্থ'-এর প্রথম নাট্যার্ঘ্য প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'উটরোগ' কৌতুক নাট্য। এই নাটকের স্ত্রী এবং পুরুষ সকল চরিত্রই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের দ্বারা রূপায়িত হবে। আগামী ২৩শে এপ্রিল মহাজাতি সদনে কৌতুক নাট্যটি মঞ্চস্থ হবে। দৃশ্য স্থাপনা, আলোক-সম্পাত, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি সকল দিক থেকে এই অভিনয় অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

*   *   *

নট-নাট্যমের সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আগামী ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল এই দুদিন ধরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হাওড়া টাউন হলে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। নাটক সম্পর্কে আলোচনা, লোকসংগীত ও নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্গত। প্রথম দিনের নাটক "ওরা কাজ করে"। দ্বিতীয় দিন অভিনীত হবে "জনাগোলি"। অভিনয়কালে একটি মাত্র সাংকেতিক দৃশ্য ছাড়া অন্য কোনও দৃশ্যপটের সাহায্য নেওয়া হবে না। নাট্য পরিচালনা, সুরযোজনা ও আলোকসম্পাতে আছেন শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল ঘোষ ও সুনীলবরণ।

*   *   *

বৈতালিক সংস্থার দশম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১লা বৈশাখ থেকে মহর্ষি ভবনে (৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) একটি পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমা চৌধুরী, শান্তিদেব ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি। এ-ছাড়া সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তাব

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গনাট্য-সাহিত্য সম্মেলনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ নাটকের ব্যাপক প্রসার ও দেশবাসীকে নাটক সম্বন্ধে আগ্রহশীল করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙলা নাট্যসাহিত্যের 'বিভিন্ন যুগের নাটক মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ও বিশ্বভারতী কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর অবশ্য পাঠ্যতালিকাব অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব। অন্য একটি প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের নিকট নাটক সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি অপেশাদারী জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের দাবী জানানো হয়। আরেকটি প্রস্তাবে বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় নাটক সম্বন্ধে আলোচনার জন্য নিয়মিত বিভাগ প্রবর্তন করবার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। নাট্যশালার সঙ্গে এককালে যুক্ত ছিলেন এরূপ দুঃস্থ নাট্যকার, শিল্পী ও কর্মীদের জন্য সরকারের নিকট একটি ফ্ল্যাটযুক্ত বাসভবন নির্মাণের দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলা নাটকের শতবার্ষিকী উৎসব পালনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। নাট্যাভিনয় ও সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে এই উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন নাট্য-সংস্থাকে আহ্বান জানানো হয়।

একখানি চিঠির জবাবে

মহাশয়,

১৪ই চৈত্রের "দেশ" দেবব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়ের চিঠি লেখার উদ্দেশ্য বুঝলাম। যা আপনারা বলেন নি এমন একটি কথা তিনি আমাদের বললেন।

'কাবুলিওয়ালায়' পাঠক বা দর্শকমনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তা পিতা ও কন্যার সম্পর্ক আশ্রয় করে—সেখানে একজন আবার সর্বজনচিত্তজয়কারী শিশু। এ সম্পর্ক সহজেই মানুষের মনে বিচলন আনতে পারে। কিন্তু 'নীল আকাশের নীচে'র সম্পর্ক ভাইবোনের—দুটি পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের—যা অত সহজে মানুষের মনে বিচলন আনে না। একটি সহজ উদাহরণ—বিয়ের পরদিন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়। উপস্থিত মানুষেরা অনুভব করে মেয়ের মা কিংবা বাবাকে ছেড়ে যাবার দুঃখ। ক'জনের ভাইকে ছেড়ে যাবার দুঃখ অনুভব করে ক'জন?

দেবব্রতবাবুর খুঁজে পাওয়া তুলনা আমি এই কারণে যৌক্তিক মনে করি না। কাঠামো এক ঘটনাশ্রয়ী হতে পারে, কিন্তু এক ভাবাশ্রয়ী কখনও নয়। সর্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদনে 'কাবুলিওয়ালা' চিত্র যদি সার্থক হয়, 'নীল আকাশের নীচে' সার্থকতর।

আমি সরাসরি কোনওরকম রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার অস্তিত্ব অস্বীকার করি। চীনদেশের ভাই ও বাঙলাদেশের বোনের সম্পর্কের নামে যে কোন রাজনীতি থাকতে পারে, তা ত' আমার মনে হয় না। যদি কেউ সেরকম কিছু পেয়ে থাকেন, তবে বলবো তাঁর কূপমণ্ডূকতা ত্যাগ করার সময় এসে গেছে। এ যুগটা বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের—অখণ্ড মানবাত্মার।

ভবদীয়

রথীন চক্রবর্তী

কোন্নগর।

স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে

কলকাতায় স্টেডিয়ামের অভাব এতদিনে পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য এবার সত্যসত্যই উদ্যোগী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। স্ফীতমান মহানগরীর বুকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ক্রীড়াসৌধটি গড়ে তোলবার জন্যে ছাত্র এবং যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্তমানে কয়েংগে-ইয়ে-মশ্যেংগর ভাব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে এবং স্টেডিয়ামের আশু প্রয়োজনের বিষয় ভালভাবে উপলব্ধি করে ডাঃ রায় সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাটা আলোচনা করে এসেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেননও কলিকাতায় এসে ডাঃ রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দুজনে একসঙ্গে ময়দানে গিয়ে স্টেডিয়াম রচনার সম্ভাব্য স্থান সম্পর্কেও বিচার-বিবেচনা করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন এই কারণে যে, গড়ের মাঠ প্রতিরক্ষা দপ্তরের সম্পত্তি। তাই গড়ের মাঠে কিছু করতে হলে প্রতিরক্ষা দপ্তরের সম্মতির প্রয়োজন। স্টেডিয়াম গড়তে রাজ্য সরকারের হয়তো অর্থেরও প্রয়োজন আছে। তবে সে প্রশ্ন পরে। জায়গাটার সুরাহা হয়ে গেলে ভারত সরকারের কাছ থেকে হয়তো অর্থেরও আংশিক সাহায্য পাওয়া যাবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ মেনন ময়দান এলাকায় ঘুরে এসে বলেছেন, এই বছর ফুটবল মরশুম আরম্ভ হবার আগেই তিনি স্টেডিয়াম রচনার স্থান সম্পর্কে তাঁর সম্মতি জানাবেন। এদিকে কলকাতার নব-নির্বাচিত নগরপতি শ্রী বি কে ব্যানার্জিও স্টেডিয়াম সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তাঁকে সভাপতি করে স্টেডিয়াম দাবী কমিটি নামে এক কমিটিও গঠিত হয়েছে। সুতরাং সব দিক দিয়েই স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে একটি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

একলব্য

তবুও মনে সন্দেহ জাগে। সত্যসত্যই কলকাতায় স্টেডিয়াম হবে তো! কারণ খেলাধুলোর জন্য, বিশেষ করে ফুটবল খেলার জন্য কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের দাবী আজ ওঠেনি। এ-দাবী বহু দিনের। কলকাতায় খেলাধুলো আরম্ভ হয়েছে আজ থেকে প্রায় একশত বছর আগে, আর স্টেডিয়ামের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে অর্ধশত বছর আগে না হলেও প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে। স্টেডিয়াম গড়া সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং ব্লু-প্রিন্টও কম হয়নি। রাজা-মহারাজারা চেষ্টা করেছেন, শিল্পপতিরা চেষ্টা করেছেন, খেলাধুলোর পরিচালকেরা চেষ্টা করেছেন, একাধিক মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন। এক-একবার মনে হয়েছে এই বুঝি স্টেডিয়াম এসে গেল। এই বুঝি শহরের অগণিত ক্রীড়ামোদীর খেলা দেখার কষ্ট লাঘবের উপায় হল। কিন্তু ঘোর আঁধার রাতে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়ে পথিকের দৃষ্টিশক্তিকে যেমন ধাঁধিয়ে তোলে, তেমনি স্টেডিয়ামের কথাটা মাঝে মাঝে আলোচিত হয়ে ক্রীড়ামোদীদের আরও অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। তাই ভাবি এবারও স্টেডিয়ামের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা রঙীন আশার আলো দেখিয়ে আবার ক্রীড়া-রসিকদের অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে না তো?

স্টেডিয়ামের কথা যখন ভাবি, তখন এক-এক করে কত কথাই মনে আসে। সন্তোষের পরম ক্রীড়ানুরাগী মহারাজা পরলোকগত স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী যখন আই এফ এ'র সভাপতি ছিলেন, তখনই তিনি স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে স্টেডিয়াম নির্মাণের এক পরিকল্পনা করেন। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। তারপর কত দিন গিয়েছে। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে মুসলিম লীগ সরকারের হাতে শাসনভার এসেছে, লীগ সরকারের দাপট গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশ মুক্ত হয়েছে, জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, রাজ্যও ভাঙ্গা-গড়া হয়েছে, কিন্তু গড়ের মাঠে স্টেডিয়াম গড়া হয়নি। সমস্ত গভর্নমেন্টই স্টেডিয়াম নিয়ে আলাপ-আলোচনা, নানা রকমের গবেষণা এবং পরিকল্পনা করেছেন। সময়-সময় দিল্লী প্রসাদকুটোও কথাটি পৌঁছেছে —ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ছোট প্রাসাদেও অনেকবার। কিন্তু ছোট-বড় কোন কর্তা-ব্যক্তিই স্টেডিয়াম সম্পর্কে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেননি। অধিকন্তু যখনই কোন বে-সরকারী পরিকল্পনা এসেছে, তখনই সেই পরিকল্পনাকে রাজ্য সরকার ছোট ছোট মিয়াদের জোরে রোধ রেখেছেন। অনেকেরই বোধ হয় মনে আছে, স্টেডিয়াম দাবী কমিটির সদস্যরা একবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে স্টেডিয়ামের কথাটা তুললে ডাঃ রায় বলেছিলেন—'কে চায় স্টেডিয়াম?' উত্তরে কমিটির একজন সদস্য বলেছিলেন—জনসাধারণ। 'কে জনসাধারণ?' প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। তিনি একথাও বলেছিলেন—জনসাধারণ সত্যসত্যই স্টেডিয়াম চায় কিনা, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে এবং একদা 'গ্যালাপ পোলের' প্রয়োজন হতে পারে, হায়! যেখানে স্টেডিয়ামের অভাবে হাজার হাজার ক্রীড়ামোদীর বছরের পর বছর দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে, খেলা আরম্ভের ১০।১২ ঘণ্টা আগে যেখানে দর্শকেরা লাইনে এসে দাঁড়াচ্ছে, যেখানে খেলার টিকিটের কালো-

স্টেডিয়ামের দাবী জানাবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ছাত্রদের আহূত সভায় কলকাতার নবনির্বাচিত মেয়র শ্রী বি কে ব্যানার্জি বক্তৃতা করছেন, চেয়ারে বসে আছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বনামধন্য প্রাক্তন খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল

যাত্রায় সৃষ্টি হয়েছে, খেলা দেখার আশায় গাছে চড়াত গিয়ে যেখানে কেউ কেউ জীবনের শেষ করেছে, সেখানে স্টেডিয়ামের প্রয়োজন নেই? নিশ্চয়ই আছে। তীক্ষ্ণধী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কথাটা না বোঝেন এমন নয়। তবে নানা পরিকল্পনার মধ্যে নিমজ্জিত ডাঃ রায় হয়তো অত্যধিক খরচের ভয়ে দাবী কমিটির দাবী কমিয়ে দেবার জন্য গ্যালাপ পোলের কথা তুলেছিলেন। আমি যদি স্টেডিয়াম দাবী কমিটির সদস্য থাকতাম, তবে ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করতাম—লোকে স্টেডিয়াম চায় কিনা সেজন্য না-হয় গ্যালাপ পোলের দরকার আছে, কিন্তু নগরের সৌন্দর্য এবং রাজ্যের মর্যাদার জন্যও যে একটি স্টেডিয়ামের প্রয়োজন, একথা তিনি স্বীকার করেন কিনা? কারণ কলকাতা শহরের একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। সেই শহরে খেলাধূলোর জন্য একটি স্টেডিয়াম নেই,—এটা রাজ্য শাসকদের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। রাজ্য সরকার নানাভাবে এ-শহরকে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করছেন; কিন্তু যতদিন এখানে স্টেডিয়ামের স্থান খালি থাকবে, ততদিন এ-শহর পূর্ণাঙ্গ প্রথম শ্রেণীর শহরের মর্যাদা পাবে কি?

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, যখন স্টেডিয়াম হতে যাচ্ছে, তখন আর এসব পুরোনো কথা কেন? পুরোনো কথার প্রয়োজন এইজন্য যে, স্টেডিয়াম নিয়ে আবার টালবাহানা না করা হয়। দুধ খেয়ে যাদের গাল জ্বালা করে, দই দেখলে তাদের ভয় হয়। আগেই বলেছি, স্টেডিয়াম নিয়ে অনেক টালবাহানা করা হয়েছে। ডাঃ রায় এখনই কি ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সর্দার ফেলভভাইকে স্টেডিয়ামের স্থান নির্বাচনের জন্য ময়দান এলাকায় প্রথম ঘোরাফেরা করলেন? ডাঃ কাটজু যখন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, তখন ডাঃ রায় তাঁর সঙ্গে গিয়েও স্টেডিয়াম রচনার জন্য ইডেন উদ্যান মাপজোক করে এসেছিলেন। আর ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য তো স্টেডিয়ামের ব্লু-প্রিণ্টই রচনা করেছিলেন। পূর্তমন্ত্রী শ্রী ভূপতি মজুমদার আই এফ এ'র সভাপতি থাকাকালে চেষ্টা করেছেন। রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী বিমল সিংহ চেষ্টা করেছেন। বিদায়ী মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় চেষ্টা করেছেন। বিধান সভায় যে ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল পাশ হয়ে লাল-ফিতের মধ্যে বাঁধাই হয়ে আছে—সে বিলেরও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা। এ ছাড়া আই এফ এ'র মাননীয়েরাও যে কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৫৭ সালে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে মহমেডান স্পোর্টিং ও রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলার পর আই এফ এর সভাপতি ব্যারিস্টার শ্রীনীরেন দে মহমেডান দলের হাতে শীল্ড তুলে দেবার সময় বলেছিলেন,—"এই মাঠেই আমরা স্টেডিয়াম রচনার জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি, আমরা শীঘ্রই স্টেডিয়ামের কাজ আরম্ভ করবো, ক্রীড়ামোদীদের আর কষ্ট ভোগ করতে হবে না।" আরও আগের কথা। মুসলিম লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী মহম্মদ আলী বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের পুরস্কার বিতরণের সময় মোহনবাগান মাঠে দাঁড়িয়ে গর্বভরে বলেছিলেন—"আমি সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আগামী বছর আপনারা স্টেডিয়ামে বসেই খেলাধূলো দেখতে পাবেন।" সে আগামী বছর আর আসেনি। মাননীয়দের প্রতিশ্রুতির মূল্যও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই স্টেডিয়াম সম্পর্কে কলকাতার অধিবাসীদের অভিজ্ঞতা বড়ই তিক্ত। কবির কথায় বলা যায়, স্টেডিয়াম সম্পর্কে ক্রীড়ামোদীদের 'অনানমুখে লেখা শুধু বেদনার করুণ কাহিনী।' স্টেডিয়াম খাড়া না হওয়া পর্যন্ত তাই তাদের সন্দিগ্ধ মন কারো কোন প্রতিশ্রুতিতেই ভরতে চায় না।

স্বীকার করি, স্টেডিয়াম নির্মাণ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। তিরিশ-চল্লিশ হাজার লোকের বসবার উপযোগী একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য ষাট-সত্তর লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু কর্মপ্রেরণার উৎস, পুরুষসিংহ ডাঃ রায়, যিনি রাজ্যের ক্ষমতা হাতে পাবার পর বহু জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, গভীর সমুদ্র থেকে ডাঙায় মাছ টেনে তুলতে চেষ্টা করেছেন, রয়াল বেঙ্গল টাইগার জেলিয়ে বাসের মালিকদের শহর থেকে গ্রামে তাড়িয়ে রুটির যোগাড় করে দিয়েছেন বহু উদ্বাস্তু বেকার যুবককে, কলকাতা কর্পোরেশন ও একাধিক মিউনিসিপ্যালিটি [illegible] আবার ছেলে সেজেছেন, বস্তি [illegible] লবণ হ্রদ সংস্কারের চেষ্টা করছেন, [illegible] অল্প সময়ে বহু লক্ষ টাকা খরচ করে [illegible]

কুঠির দোসর হিসাবে সাদা কুঠি খাড়া করেছেন, আরও কত কি করার চেষ্টা করছেন, তিনি চেষ্টা করলে এতদিনে সামান্য একটা স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে পারতেন না, একথা কে বিশ্বাস করবে? সুতরাং আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এতদিন যে স্টেডিয়াম হয়নি, তা ডাঃ রায়ের আন্তরিকতার অভাবের জন্যই হয়নি। আজ যদি স্টেডিয়াম হয়,—তাও ডাঃ রায়ের জন্যই হবে। কলকাতার ছাত্র সম্প্রদায় স্টেডিয়াম দাবীর আবেদনে দুই লক্ষ ক্রীড়ামোদীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ডাঃ রায়কে উপহার দিয়েছেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে—এ-উপহার ডাঃ রায়ের 'গ্যালাপ পোলের' প্রতি-উত্তর। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিও আশু স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সব কিছুর যোগাযোগ লক্ষ্য করে এবার স্টেডিয়াম নির্মিত হবে—এ-ধারণা পোষণ করে স্টেডিয়ামের স্থান এবং আকার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি।

প্রথম কথা—কোথায় স্টেডিয়াম হবে? শহরের কেন্দ্রস্থান এবং মহানগরীর প্রধান কর্মকেন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ারের সন্নিকটবর্তী গড়ের মাঠই যে স্টেডিয়াম নির্মাণের উপযুক্ত স্থান, এ বিষয়ে বোধ করি কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু গড়ের মাঠের কোন্ জায়গাটিতে স্টেডিয়াম গড়া উচিত? ইডেন উদ্যানের ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে, না বর্তমান ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব মাঠের উপরে, না আরও একটু দক্ষিণ দিকে এলেনবরো কোর্সে? সংবাদে প্রকাশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ মেননের নাকি এলেনবরো কোর্সের উপর স্টেডিয়াম নির্মাণে আপত্তি আছে। কারণ জায়গাটি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের খুব কাছাকাছি। দুর্গের এত কাছাকাছি বড় আকারের কোন সৌধ গড়া হলে সামরিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নাকি বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। সামরিক প্রয়োজন সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। এটমের যুগে দুর্গের কাছাকাছি স্টেডিয়াম গড়া হলে কি অসুবিধা হবে, জানি না। তবে গত মহাযুদ্ধের সময় লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়াম এবং বার্লিনের স্টেডিয়াম যে সামরিক প্রয়োজন মিটিয়েছে, তা কাগজে পড়েছি। এলেনবরো কোর্সে স্টেডিয়াম রচনায় অবশ্য আমাদের আপত্তি আছে অন্য কারণে। শহরের সমস্ত দিকের দর্শক যাতে মাত্র একটি রুটের সাহায্যে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্টেডিয়াম রচনার স্থান নির্বাচন করা উচিত। এসপ্লানেডের কাছাকাছি কোন জায়গায় স্টেডিয়াম হলে সব দিক দিয়ে সবার সুবিধা হয়। ইডেন উদ্যানের ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বা বর্তমান ক্যালকাটা মাঠের উপর স্টেডিয়াম গড়া হলে ক্ষতি কি? প্রমোদ-বিহারের জন্য প্রমোদকানন ইডেন উদ্যানের দিন তো ফুরিয়ে গেছে। আর মাত্র কয়েকশত সম্ভ্রান্তবংশীয় ক্যালকাটা ক্লাবের জন্য পৃথক মাঠেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্টেডিয়াম রচিত হলে ক্যালকাটা মাঠের বর্তমান প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। সুতরাং ইডেন উদ্যানের ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড বা ক্যালকাটা মাঠ—দুটি জায়গাই ফুটবল স্টেডিয়ামের জন্য উপযোগী। ক্রিকেট স্টেডিয়ামও গড়বার কথা উঠেছে। রাজ্য সরকার যদি ইচ্ছা করেন, বর্তমানে সিকি-সমাপ্ত ক্রিকেট স্টেডিয়ামকেই পূর্ণ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তরিত করতে পারেন। না পারলেও আপাতত খুব ক্ষতির কারণ নেই। কারণ বছরে একবার বা দুই বছরে একবার ক্রিকেট খেলার জন্য স্টেডিয়ামের প্রয়োজনের চেয়ে ফুটবল খেলার স্টেডিয়ামের প্রয়োজন অনেক বেশী।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, স্টেডিয়ামের আকার এবং আয়তন সম্পর্কে। কি আকারের স্টেডিয়াম হবে? ফুটবল, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস এবং অন্যান্য খেলাধুলার উপযোগী সর্বার্থসাধক স্টেডিয়াম, না শুধু ফুটবল স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের আয়তনই বা হবে কতটুকু? এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শহরের লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, ক্লাবের সংখ্যা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে খেলাধুলার জনপ্রিয়তা। তাই ছোট আয়তনের স্টেডিয়াম শহরের প্রয়োজন মিটাতে পারবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে যাতে অল্প পয়সায় বেশী দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। ভারতের কয়েকটি শহরে ছোট আকারের কয়েকটি স্টেডিয়াম রচিত হলেও কোন বড় ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরী হয়নি। বিশ্ববাসীর কাছে ভারতের তো বটেই কলকাতা শহরেরও একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। সুতরাং শহরের মর্যাদা অনুযায়ী এখানে স্টেডিয়াম গড়া কর্তব্য।

বিশ্বব্যাপী ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের এবং নানা ধরনের স্টেডিয়াম ছড়িয়ে আছে। এই সব স্টেডিয়াম বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। লণ্ডনের 'ওয়েম্বলী', গ্লাসগোর 'হ্যাম্পডেন,' হিটলার রচিত বার্লিন স্টেডিয়াম, মুসোলিনীর রচিত টুরিনের মুসোলিনী ক্রীড়ানিকেতন, ফ্রান্সের সাদামাটা ধরনের কলোম্বিয়া স্টেডিয়াম, ঘোড়ার খুরের আকারে তৈরি স্টকহলমের পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াসৌধ, প্রাকৃতিক শোভা পরিবেষ্টিত সুইজারল্যাণ্ডের খেলাধুলার নাতিবৃহৎ রঙ্গালয়, সোভিয়েট রাশিয়ার নানা ধরনের খেলার তাজমহল, অসলোর উলেভাল, পোল্যাণ্ডের সেণ্ট্রাল স্টেডিয়াম—আরও কয়েকশত—সবই বিশ্ববাসীর দর্শনীয় বস্তু।

প্রভূত অর্থ ব্যয় করে রিও-ডি-জেনারিওর পৌর প্রতিষ্ঠান তাঁদের ফুটবল স্টেডিয়াম রচনা করেছেন। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের জন্য ইটালীর প্রখ্যাত ভাস্কররাও তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের উপচারে মনের মত করে স্টেডিয়াম গড়ছেন। রিও-ডি-জেনারিওর স্টেডিয়ামে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। বৃত্তাকারে গড়া এই বিরাট দ্বিতল ক্রীড়াসৌধের উপর সুদক্ষ ব্রেজিলীয় ইঞ্জিনীয়াররা ক্যান্টিলিভার পদ্ধতিতে কংক্রিটের ছাত তৈরি করেছেন। তাই এতে দর্শকদের দৃষ্টি অবরোধকারী একটিও স্তম্ভ নেই। স্থাপত্য শিল্পের এ-এক পরম বিস্ময়। এর বৃত্তের বিরাট পরিধি বিদেশীর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়।

কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার আমাদের এখনো সময় আসেনি। বর্তমানে এ ধরনের স্টেডিয়াম রচনা আমাদের সাধ্যেরও অতীত। কারণ জাতি গঠনমূলক আরও বড় কাজ আমাদের হাতে রয়েছে। তাই লক্ষ লক্ষ সাধারণ ক্রীড়ামোদীর আঁধার জীবনে হাজার ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের চোখ-ধাঁধানো রোশনাই যদি না জোটে, ক্ষতি নেই—মন-মাতানো স্নিগ্ধ জোনের প্রদীপই জ্বলুক। প্রয়োজন মেটাবার মত একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিসর স্টেডিয়াম গড়া হোক।

দেশী সংবাদ

৬ই এপ্রিল—দলাই লামা ভারতে পদার্পণ করিয়া কোথায় এখন আছেন অথবা কবে তিনি জনসাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহা শুধু জল্পনা কল্পনার মধ্যেই আপাতত সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, সরকারী মহলের দুর্ভেদ্য নীরবতা।

৭ই এপ্রিল—সমাজ বিরোধী গুণ্ডাদল কর্তৃক শিবপুর থানা এলাকায় আনন্দকুমার রায়চৌধুরী লেন হইতে দিনদুপুরে জনৈক বি এস সি পরীক্ষার্থী যুবককে তাহার পিতার অসুখের সংবাদ দিয়া বাহিরে আনিয়া বলপূর্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের সদর কার্যালয় স্থানান্তর সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট তিনটি সরকারের প্রতিনিধি সম্মেলনে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের সদর কার্যালয় ক্রমে ক্রমে কলিকাতা হইতে পাঞ্চেৎ ও মাইথনে স্থানান্তরিত করিবার এক সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইয়াছে। ১৯৬২ সালের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

৮ই এপ্রিল—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ১৯৫৯—৬০ সালের জন্য কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদ্বয়—শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি মেয়র এবং শ্রীকিশোরীলাল চনটানিয়া ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। নবনির্বাচিত মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নাম ঘোষণা করিয়া বিদায়ী মেয়র ডাঃ ত্রিপুরা সেন তাহার দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে নগরীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির কাজে অসাফল্যের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন।

৯ই এপ্রিল—অদ্য লোকসভার সভাপতির আদেশ অমান্য করার জন্য সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীঅর্জুন সিং ভাদোরিয়াকে সাতদিনের জন্য সাসপেণ্ড করা হয় এবং তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে মার্শাল ও ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকদের সাহায্যে তুলিয়া লইয়া সভাকক্ষ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী অদ্য তাঁহার একমাত্র কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীশ্যামনাথকে ৮ ভোটে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বারের জন্য দিল্লী কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন। জনসংঘের নেতা শ্রীকেদারনাথ কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীদেশরাজকে ১০ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করিয়া ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হন।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের এক বিশেষ সভায় শিক্ষা-সমিতির (অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল) সুপারিশ মত এক বছরের প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স এবং তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের বি-এ পাশ ও বি-এ অনার্সের পাঠ্যসূচীর কাঠামো গৃহীত হয়।

১০ই এপ্রিল—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে জাতীয় জাহাজ বোর্ডের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে এইরূপ আশা পোষণ
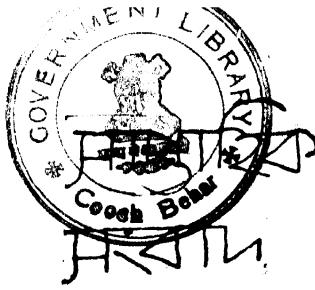
করেন যে, দেশের জনসাধারণ ক্রমশ আরও অধিক সংখ্যায় সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল হইবে এবং নিছক মাটি আঁকড়াইয়া থাকিবে না।

প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেণ্ট ও খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা শ্রীমতিলাল রায় আজ বেলা ৯টা ৪০ মিনিটের সময়ে প্রবর্তক আশ্রমে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১১ই এপ্রিল—সশস্ত্র রক্ষীদের সহায়তায় গতকাল দুই হাজার পাকিস্তানী দিনহাটা থানার অন্তর্গত বড়গাড়লঝোরায় হানা দেয়। তাহাদের আক্রমণে এক ব্যক্তি নিহত এবং ২০ জন গুরুতররূপে আহত হয়। পাকিস্তানীগণ বহু হিন্দু গৃহে অগ্নিসংযোগ করে এবং তাহাদের সম্পত্তি এবং গবাদি পশু লুঠ করিয়া লইয়া যায়।

যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার টিথওয়াল অঞ্চলে ভারতীয় এলাকার অভ্যন্তরে কাশ্মীরের অন্তর্গত মাধুপুরা গ্রামের নিকট রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক দল যখন স্থানীয় একটি ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছিলেন, তখন পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী হাল্কা ধরনের মেশিনগানের সাহায্যে তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে।

১২ই এপ্রিল—রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের প্রশাসনিক ব্যাপারে দুর্নীতির কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে বে-আইনীভাবে ঋণ মঞ্জুর, নিয়ম কানুন লঙ্ঘন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিনা অনুমতিতে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মচারীকে স্বপদে বহাল রাখা কিংবা উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়া উৎকোচ গ্রহণ, স্বজন পোষণ, সরকারী অর্থের অপব্যয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লাসা হইতে ঐতিহাসিক অথচ বিপদ সংকুল যাত্রার শেষে দলাই লামা অদ্য বমডিলায় পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সবর্ধনা জানান হয়। দলাই লামা গত ১৭ই মার্চ রাত্রে অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে লাসা হইতে যাত্রা করেন এবং অবশেষে ভারতে উপনীত হন। এই ঐতিহাসিক যাত্রায় তাহার ২৭ দিন সময় লাগে।

মাদ্রাজ কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস দল একশত আসনের মধ্যে মাত্র ৩৭টি আসন লাভ করায় কর্পোরেশনের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়াছে। কংগ্রেস দল ক্রমাগত গত ছয় বৎসরকাল কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই এপ্রিল—পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পত্নী মিসেস রুজভেল্ট সম্প্রতি ইসরাইলে গিয়া তাঁহার নাতনীর জন্য একটি উষ্ট্র ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু জন্তুটিকে দেশে আনয়নের অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর হইতে গত রাত্রিতে জানানো হয় যে, এদেশে এ ধরনের জন্তু আমদানী আইনে নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

৭ই এপ্রিল—কায়রোর সংবাদপত্রসমূহে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, 'গ্রাজিয়া' নামক একটি সোভিয়েট জাহাজ ৮৫৫ জন সশস্ত্র কুর্দিস উপজাতীয় লইয়া আজ সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। জাহাজটি বউরা বন্দরে যাইবে এবং কুর্দিস উপজাতীয়রা ইরাকের সৈন্যদের সহিত যোগ দিবে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। কায়রোর সংবাদপত্রসমূহ উত্তর ইরাকে তুমুল যুদ্ধের এবং কিরকাক শহরের কিয়দংশে বিদ্রোহীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়াছেন।

৮ই এপ্রিল—যুদ্ধ পূর্বকালের বৃটিশ ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের নেতা স্যার অসোয়াল্ড মোসলে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া, কেনিয়া ও টাঙ্গানিকা কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া আফ্রিকার অবশিষ্টাংশ কৃষ্ণাঙ্গদিগকে দেওয়া হউক।

৯ই এপ্রিল—করাচীতে এক বিশেষ সামরিক আদালত হাজিওয়ালী মহম্মদ ভাট্টিকে "সোনা চোরা কারবারী" অভিযোগে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাহার নিকট ১ কোটি টাকা মূল্যের সোনা পাওয়া গিয়াছে।

১০ই এপ্রিল—লাহোরের রাওয়ালপিণ্ডি হইতে প্রাপ্ত এক বেসরকারী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানের বিমানবাহিনী রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ৩০ মাইল দূরে গুজারখানের নিকটে একখানি ভারতীয় ক্যানবেরা জেট বিমান গুলী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে।

১১ই এপ্রিল—আজ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দপ্তরের এইরূপ দাবী করেন যে, গতকল্য পাকিস্তানী বিমানবাহিনীর যে ক্যানবেরা জেট বিমান গুলীবিদ্ধ হইয়া ভূপাতিত হয় সেই বিমানের পাইলট স্কোয়াড্রন লিডার জে সি সেনগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, কয়েকটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুর আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য তিনি ইচ্ছা করিয়া পাকিস্তানের সীমানা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

১২ই এপ্রিল—গত শুক্রবার পাকিস্তান বিমান বাহিনী কর্তৃক ভূপাতিত ভারতীয় ক্যানবেরা বিমানের পাইলট স্কোয়াড্রন লীডার জে সি সেনগুপ্ত যে বিবৃতি দিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, করাচীর কর্তৃপক্ষীয় ভারতীয় মহল উহা যথার্থ বলিয়া মনে করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

লাসা হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করিয়া নয়া চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানাইতেছেন, স্বায়ত্তশাসিত তিব্বতের প্রস্তুতি কমিটি বা নূতন গবর্নমেণ্ট উহার প্রথম বৈঠকে ছয়টি নূতন সরকারী দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

মুখখানি লাবণ্যমাখা ...
ইনি পণ্ডস ব্যবহার করেন

আপনার মুখখানিও
মসৃণ, কমনীয় ও সুন্দর রাখতে হলে
পণ্ডস
ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন

FOUNDATION
POND'S
Vanishing Cream
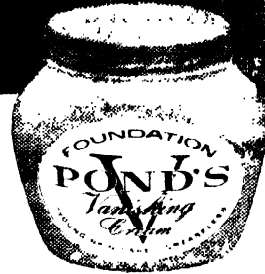
হাল্কা ও তুষার-স্নিগ্ধ পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম আপনার মুখের অনুপম লাবণ্য অম্লান রাখবে—মুখখানি সুন্দর ও কমনীয় দেখাবে। পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। এই ক্রীম চট্চটে নয় অথচ এর ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিখুঁতভাবে পাউডার লেগে থাকে।

ত্বক নির্মল রাখার উৎকৃষ্ট ক্রীম—রোজ রাত্তিরে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে মাখুন। এতে ত্বকের ময়লা দূর হবে ও লাবণ্য অটুট থাকবে।

P 7744 চীজব্রো-পণ্ডস ইঙ্ক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

সূচীপত্র

স্বপনের
ছোঁয়া এসে লাগলো···
Johnson's
BABY POWDER
Johnson's
BABY OIL
Johnson's
BABY CREAM
Johnson's
BABY SOAP
Johnson's
Baby Soap

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

কৃতী লোকদের জন্যে

ডি সি এম শার্টের কাপড়

সাদা এবং রঙীন পপলিন	...	১, টাকা থেকে	৩ টা ৭০ নঃ পঃ প্রতি গজ
সাদা এবং রঙীন সেলুলার	...	১, টাকা থেকে	১ টা ৮৪ নঃ পঃ প্রতি গজ
সাদা এবং রঙীন টুইল	...	১, টাকা থেকে	২·০০ টাকা প্রতি গজ
সাদা এবং রঙীন লিনেন		১·২০ টাকা থেকে	২ টা ৬ নঃ পঃ প্রতি গজ
স্ট্রাইপ ও চেক শার্টিং		০·৯৫ নঃ পঃ থেকে	২ টা ১৫ নঃ পঃ প্রতি গজ

DCM 1602

দি দিল্লী ক্লথ এণ্ড জেনারেল মিলস কোং লিঃ, দিল্লী

সূচীপত্র

প্রচ্ছদশিল্পী—শ্রীগোপাল ঘোষ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র
নতুনতম উপন্যাস

ইদানীন্তনের ভিত্তিতে
চিরন্তনের সৌধ

অচিন্ত্যকুমার সেই এক সাহিত্যিক যিনি ক্ষণকালের উপর দাঁড়িয়ে খুলে দিতে পারেন নিত্যকালের সিংহ-দ্বার। শত ক্ষুধা, ক্ষত ও যন্ত্রণার রাত্রির পরেও, বলতে পারেন, রাত্রি শুচিস্মিতা, সমস্ত অন্ধকার সত্ত্বেও রূপোজ্জ্বলা। গঙ্গা তো শুধু ভোগবতী নয়; গঙ্গা অলকানন্দা। শুধু ভোগই প্রেমের প্রত্যুত্তর নয়। দুঃখের মধ্য দিয়ে করুণার মধ্য দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক সেই প্রেমই প্রদীপ্ত, সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীন। রূপসী রাত্রি সেই সর্বাঙ্গীন প্রেমের উপন্যাসঃ

দাম পাঁচ টাকা

শ্রীসুবোধ ঘোষের
ভারত প্রেমকথা
৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ টাঃ ৬·০০

শতকিয়া
দাম ঃ টাঃ ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত
৯ম সংস্করণ ঃ টাঃ ৫·০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ
৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ টাঃ ১·২৫

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের
চিন্ময় বঙ্গ
২য় সংস্করণ ঃ টাঃ ৪·০০

শ্রীসরলাবালা সরকারের
গল্প-সংগ্রহ
দাম ঃ টাঃ ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
ছিলেনবাবুর দেশে
সুলভ ২·৫০ শোভন ৩·০০
...লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি অতি মনোরম এবং পরিচ্ছন্ন। ভাষাও বলিষ্ঠ ও ঝরঝরে।"
—যুগান্তর
"...লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ ও লিপিকুশলতা গল্পগুলোকে সার্থক সাহিত্য কর্মের মর্যাদা দান করেছে।" —দেশ

কন্দর্পকান্তি মুখোপাধ্যায়ের
মন-ময়ূরীর নাচ ২·২৫
"...বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, ভাষার মাধুর্য ও সর্বাপেক্ষা মানসিক অবলোকনে লেখকের দৃষ্টি যে অত্যন্ত তীক্ষ্ন তা' প্রকাশ পেয়েছে। সূক্ষ্ম রসবোধ তাঁকে সার্থকতার ক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছে অনায়াসে।" —দৈনিক বসুমতী

প্রকাশিত হচ্ছে
সৌরীন সেনের
সুবৃহৎ উপন্যাস
চেনামুখ

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
তিন সর্গ (নাটক)
সুলভ ১·৬২ শোভন ২·০০
"....One must congratulate the author on his challanging. .. three compact and comic one-act plays."
—Amrita Bazar.
"...নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে এই নাটকটি আঙ্গিকের দিক থেকে নিঃসন্দেহে এক নতুন পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে।" —দেশ

মারী স্টোপসের
বিবাহিত প্রেম ৪·০০
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
"...যাঁরা বিবাহিত বা যাঁরা বিবাহ করতে যাচ্ছেন এমন প্রতিটি নারী-পুরুষের বইখানি পাঠ করে নেওয়া কর্তব্য বলে মনে হয়।"
—যুগান্তর
"...এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার দ্বারা গার্হস্থ্যজীবনের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।" —দেশ

ফ্রাঁসোয়া সাগঁর
তৃষ্ণা ৩·০০
(Bo... ...tristesse)
"...সামান্য কয়টি চরিত্রের সমাভিব্যাহারে আঠারো বছর বয়স্কা লেখিকা কি অদ্ভুতভাবে যে এই উপন্যাসের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন তা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে পাঠ না করলে বোঝা শক্ত। সত্যই আশ্চর্য-রকম সুন্দর এই অনুবাদ।"
—দৈনিক বসুমতী

ক্যাসানোভার
স্মৃতিকথা ৫·৭৫
Memoirs of Casanova
"...সুনিপুণ তার তুলিকা, সাহিত্যে তার স্মৃতিকাহিনী অনবদ্য দান। রূপকথার মত অদ্ভুত জীবন-যাপনের এ বাস্তব কাহিনীকে বাংলায় অনুবাদ করে শ্রীমতী শান্তা বসু আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেছেন।"
—যুগান্তর

দুটি প্রসিদ্ধ নাটক
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
ধৃতরাষ্ট্র
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ২·৫০
রুপোলী চাঁদ
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ২·৫০
এমিল জোলার
বৈদেহী—৩·৫০
(দ্বিতীয় সং যন্ত্রস্থ)

তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিক্রমা - ৩৲
ফাগুনের পরশ - ২·৭৫
বারনার দাঁ দে স্যাঁ পীয়ায়
পল ও ভির্জিনি - ৩৲

এমিল জোলার
রেণীর প্রেম - ৪৲
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
স্বপ্নচারিণী - ২·৭৫
মোপাসাঁর একাদশ দাম—৩·৫০

ডন ব্র্যাডম্যান
ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ—৪৲
বালজ্যাক
সোনালী মেয়েটি—২৲

কিরোর
হাতের গোপন কথা
(২য় সংস্করণ)
দাম ২·২৫
হাতের ভাষা—৪·২৫

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স   ৩৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
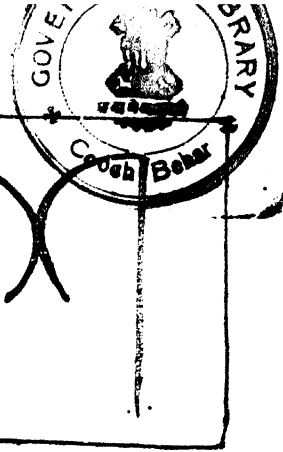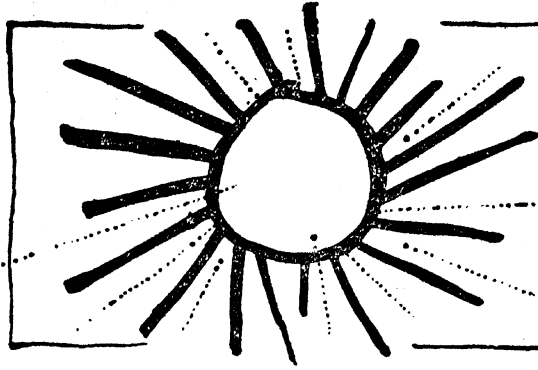
DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 2nd May, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৭ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

'সরকারী ভাষা' সমস্যা

ভাষা কমিশনের রিপোর্ট সংসদীয় কমিশনের হাত ঘুরিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল রিপোর্ট ও সংসদীয় কমিশনের বিবেচিত রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এমন কিছু নাই। সংসদীয় কমিশন ১৯৬৫ সালের পরে হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, তবে সেই সঙ্গে বলিয়াছেন যে, কোন্ কোন্ স্থলে ইংরাজী ব্যবহার করা যাইবে, আইনত তাহা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইহা ছাড়া আঞ্চলিক ভাষাগুলির যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মোটের উপরে সংসদীয় কমিশনের বক্তব্যের ইহাই সারাংশ। অতঃপর উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা ও গ্রহণের উদ্দেশ্যে লোকসভায় উপস্থাপিত হইবে।

সংসদীয় কমিশনের মন্তব্য প্রকাশিত হইবামাত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে তুমুল চিন্তা-বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। ভাষা কমিশনের অন্যতম সদস্য প্রসিদ্ধ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করিলে ভারতের মানসিক সংহতি ব্যাহত হইবে। তাঁহার মতে নিখিল ভারতীয় ভাষা হইবার একমাত্র যোগ্যতা সংস্কৃত ভাষারই আছে। ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের নেতা ফ্র্যাঙ্ক এণ্টনী মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতের জনগণের বৃহৎ অংশ হিন্দীর বিরুদ্ধে। আবার শ্রীরাজগোপালাচারী, মীর্জা ইসমাইল, সি পি রামস্বামী আয়ার প্রভৃতি ব্যক্তিও হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে নহেন। এরূপ হইলে ভারতীয় ভাবসংহতি খণ্ডিত হইবে বলিয়া তাঁহারা আশংকা করেন। অপরপক্ষে বাংলা দেশের অন্যতম মনীষীদ্বয় শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মনে করেন যে, শেষ পর্যন্ত হিন্দী ভাষাকেই সরকারী ভাষার স্থান দিতে হইবে, ইংরাজী চিরকাল চলিতে পারে না। তবে তাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দীকে তাড়াহুড়া করিয়া সরকারী ভাষার পদে বসানো সমুচিত হইবে না। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মনে করেন যে, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এখন যেমন চলিতেছে (ইংরাজী ভাষা), তেমনি চলা উচিত, তারপরে হিন্দী তাহার স্থান গ্রহণ করিবে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, অ-হিন্দীভাষী অঞ্চল হিন্দী ভাষার বড় অনুকূল নয়। এই সব অঞ্চলের আশংকা যে, হিন্দী সরকারী ভাষার গুরুত্ব লাভ করিলে অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশে ও আনুষঙ্গিক কাজে-কর্মে অসুবিধা হইবে। ওই সঙ্গে ইংরাজীর গুরুত্ব হ্রাস হইলে যে-একটি সূত্রে ভারতীয় মন গ্রথিত, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়া দেশে আঞ্চলিকতার প্রকোপ বাড়িবে।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, 'সরকারী ভাষা', 'রাষ্ট্র-ভাষা', 'নিখিল ভারতীয় ভাষা'—প্রভৃতি শব্দ লইয়া চিন্তাশৈথিল্য ঘটিয়াছে। সরকারী কাগজপত্রে কোথাও রাষ্ট্রভাষা শব্দটি নাই—আছে 'অফিশিয়াল ভাষা'—অর্থাৎ সরকারী ভাষা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার্য ভাষা। এই পদ এখন হিন্দীকে দিবার চেষ্টা হইতেছে। 'নিখিল ভারতীয় ভাষা' বলিতে দুই স্তরে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষাকে বুঝায়। এক সংস্কৃত, অপর ইংরাজী। সংস্কৃত ভারতের আবহমানকালের সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য ও শাস্ত্রের ভাষা। তাহার গুরুত্ব কখনও কমিবে না, অন্তত কমা উচিত নয়। তবে উহা যে কখনও সরকারী ভাষা হইবে, এমন কল্পনা করা কঠিন। রাজশেখরবাবু তো স্পষ্টই বলিয়াছেন, ওইরূপ কল্পনা করা যায় না।

ইংরাজী একশ' বছরের উপর ভারতীয় মানসিক ও বৈষয়িক যোগাযোগের ভাষা—এবং উহাই বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগের ভাষা। ইংরাজী ভাষার কাছে ভারতের ঋণ অপরিমিত। উহার গুরুত্ব হ্রাস কল্পনা করিয়া মন স্বভাবতই বিমর্ষ হয়। এই সব পাঁচরকম কথা চিন্তা করিয়া আমরা পূর্বে মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, ইংরাজীকে 'সরকারী ভাষা' রাখিলে মন্দ হয় না। 'সরকারী ভাষার' প্রভাব ও অধিকার সঙ্কীর্ণ। ইহা সকলকে শিখিতে হইবে না—যাহারা কেন্দ্রীয় সরকারী কাজে প্রবেশ করিবে, তাহারা না-হয় কষ্ট করিয়া শিখিয়া লইবে। ইংরাজীকে বিদেশীয় ভাষা কল্পনা করিয়া আস্ফালনি অনুভব করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস, ইহা অন্যতম ভারতীয় ভাষা। কিন্তু তাহা যদি নিতান্ত সম্ভব না হয়, নিতান্তই যদি হিন্দীকে সরকারী ভাষা করিতে হয়, তবে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়, ইহাও যদি কাজের উচিত নয়, তবে কালের উপরে তাহা সমাধান করিবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যে বলিয়াছেন ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এখন যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক—এই পরামর্শ 'আজন্দম' বলিয়া গ্রহণ করিলে সাময়িক বিপদ এড়ানো যাইবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের কালের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আমরাই করিয়া যাইব এ অহমিকায় রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় নাই।

দেশ

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৬

নিম্নলিখিত ১৭জন স্বপ্রতিষ্ঠ কথা-শিল্পীর সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ আলোচনা ২৫শে বৈশাখ দেশ সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ইঁহাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন সমসাময়িক বয়োকনিষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ।

শ্রীরাজশেখর বসু—
শ্রীসুশীল রায়

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—
শ্রীবিমল মিত্র

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—
শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ

শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বনফুল—
শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—
শ্রীরমাপদ চৌধুরী

শ্রীমনোজ বসু—
শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—
শ্রীসমরেশ বসু

শ্রীঅন্নদাশংকর রায়—
রঞ্জন

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—
শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল—
শ্রীপ্রফুল্ল রায়

৺মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীবুদ্ধদেব বসু—
শ্রীবিমল কর

শ্রীসুবোধ ঘোষ—
শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য বিশেষ রচনা

শান্তিনিকেতন স্মৃতিকথা লিখিতেছেন
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

এই সংখ্যার মূল্য ৮০ নয়া পয়সা

প্রসঙ্গত

তিব্বত সম্পর্কে সংসদে প্রধান মন্ত্রীর সর্বশেষ বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য একাধিক কারণে। এদেশে এই বিষয়টি নিয়ে যে উত্তেজনা এবং মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তিনি চেয়েছেন, তার উপশম হোক। তর্কের ধূলি আর যেন তপ্ত হয়ে না ওঠে। দ্বিতীয়ত ভারতের বিরুদ্ধে সম্প্রতি চীনদেশের সরকারী ও আধা-সরকারী প্রচারে যে অসংযম এবং উগ্রতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, তিনি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন এবং সেখানেই ক্ষান্ত হননি, ভারতের নীতিও নূতন করে ঘোষণা করেছেন। এই নীতির প্রথম কথাই হল, ভারতের নিরাপত্তা এবং অখণ্ডতা রক্ষা; দ্বিতীয় কথা, চীনের সঙ্গে মৈত্রী এবং তৃতীয় কথা তিব্বতের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি।

এই এক-দুই-তিন বিন্যাসটাই বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। এতে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের অপপ্রচারের কাঠামোটাই ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং তাদের দেশের স্বার্থবিরোধী ভূমিকাটাই স্পষ্টতর হল। প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্য, সবার উপরে দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা (মানচিত্র সম্পর্কিত মতভেদ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়), তাহার উপরে নাই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর স্থান তার পরে। এই মৈত্রীকেই এক নম্বর লক্ষ্য বলে কোন- কোন মহল প্রচার করছিলেন এবং দেশের স্বার্থের প্রসঙ্গ তাঁরা বরাবরই সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আর "তিব্বতীয় জন-সাধারণের প্রতি সহানুভূতি"র উল্লেখ করে প্রধান মন্ত্রী প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন, ওই দেশের সাম্প্রতিক হাঙ্গামা আদৌ "উপরতলার" মুষ্টিমেয় লোকের চক্রান্ত নয়, অন্তত প্রধান মন্ত্রী তা মনে করেন না।

●

বাংলার দুঃস্থ সাহিত্যিকদের সাহায্য-কল্পে যে-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে, আমাদের কামনা, তা অচিরে ভরে উঠুক। এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি। ইতিমধ্যে সাহিত্যের অনুরাগী এবং সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছে, তা আশাপ্রদ ও জাতীয় শিল্পপ্রীতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। একদা আমাদের কোন মহাকবির দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু ঘটে এবং তা নিয়ে আমাদের পরিতাপের অন্ত ছিল না। নবীনচন্দ্র ত সরাসরি সরস্বতীকেই সম্বোধন করে লিখেছিলেন, "যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল, সেই সে দরিদ্র হবে!" রবীন্দ্র-নাথের 'পুরস্কার' কবিতাতেও কবিজায়া "মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো" বলে আক্ষেপ করেছিলেন। এ-দেশে সাহিত্য-সাধনার পরিণাম দারিদ্র্য, এই প্রচলিত সংস্কারের অবসান কাম্য এবং অবসানের লক্ষণও দেখা দিয়েছে, পরিতোষের কথা সেইটেই; নতুবা আমাদের সাংস্কৃতিক অভিমান মিথ্যে হত।

●

হুজুগপ্রিয় বলে আমাদের কথঞ্চিৎ বদনাম আছে এবং দুর্নামটা যে নিতান্ত অপপ্রচার নয়, সেটা অন্তত "জাতীয় নাট্যশালা" গঠনের উপলক্ষে অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হল। বাংলা-সংস্কৃতির নাট্য-আন্দোলনের ধারাটি শীর্ণ, এ-নিয়ে এই পৃষ্ঠাতেই কিছুকাল পূর্বে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, কিন্তু প্রতিকারের কোন পন্থাই এ-পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেননি। অর্থাৎ রোগটা কি জানি, কিন্তু চিকিৎসা জানা নেই। সম্প্রতি কেউ কেউ রব তুলেছেন, "জাতীয় নাট্যশালা চাই", অমনই স্থির হয়ে গেল, একটি বিরাট নাট্যমন্দির গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পনার নমুনা যতটুকু জানা গিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই যে, আয়োজনে ষোড়শ উপচারের একটিও বাদ যাবে না। দেশ-বিদেশ থেকে রকমারি নক্সা এনে পরীক্ষা করাও চলছে, যার যেটুকু ভাল তার সেটুকু গ্রহণ করা হবে। মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) সর্বোত্তম ও সর্বাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ত থাকবেই, ভোজনাগার, গবেষণাগার ইত্যাদিরও অভাব থাকবে না। আয়োজকদের সম্ভবত অভিপ্রায় সব দেশের ওপর টেক্কা দেওয়া—"এমন বস্তু কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি!" কিন্তু নাট্যগৃহ নির্মিত হলেই যে নাট্য-আন্দোলনের মরা গাঙে বান ডাকবে, এমন ধারণা তাঁদের কোথা থেকে হল? নাট্য-আন্দোলনের মূলে বস্তু নাটক এবং অভিনয়। এ-দুইয়ের যতদিন না উন্নতি ঘটছে, ততদিন আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নাট্যমঞ্চ অন্তেবাসী হয়ে থাকবেই। অর্চনার প্রধান অঙ্গ প্রাণপ্রতিষ্ঠা—শুধু মূর্তি-গড়া নয়।

●

বৈদেশিকী

দলাই লামা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এলে তাঁকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া হবে—শ্রী নেহরু কর্তৃক এই ঘোষণার পরেও, এমন কি, দলাই লামার ভারতে আসার পরেও যখন চীনা কর্তৃপক্ষের এই অভিযোগ-প্রচার বন্ধ হল না যে, দলাই লামাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপহরণ করা হয়েছে, তখনই বুঝা গিয়েছিল যে এই অভিযোগ তিব্বতী "বিদ্রোহী"দের বিরুদ্ধে শুধু নয়, অনতিবিলম্বে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সম্প্রসারিত হবে। কারণ দলাই লামাকে যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তিব্বত থেকে বার করে আনা হয়ে থাকে তবে ভারতে আসার পরে তাঁর পক্ষে সেকথা প্রকাশ করার কোনো বাধা থাকতে পারে না যদি ভারত সরকারই বাধার কারণ না হন। কারণ ভারতে দলাইলামার রক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব যখন ভারত সরকার স্বীকার করেছেন তখন ভারতে দলাই লামার "বিদ্রোহী"দের কবলে থাকার কথা উঠতে পারে না। সুতরাং ভারতে এসে যদি দলাই লামা বলেন যে তাঁকে জোর করে কেউ লাসা পরিত্যাগ করায় নি, তিনি স্বেচ্ছায় এসেছেন,—তাহলে চীনা কর্তৃপক্ষের হয় দলাই লামার কথা বিশ্বাস করে পূর্ব অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হয় অথবা বলতে হয় যে দলাই লামার বিবৃতিটাই ভুয়া, সেটা দলাই লামার মনের কথা নয়, তাঁর ওপর জোর করে চাপানো হয়েছে।

চীনা প্রচার এই শেষোক্ত ধারা নিয়েছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হয়েছে যে, পিকিং থেকে বলা হচ্ছে, ভারত সরকারই এখন দলাই লামাকে আটকে রাখছেন, দলাই লামার নামে যে বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে তা ভারত সরকারের কর্মচারীদের দ্বারা রচিত, তিব্বতের বিদ্রোহের সঙ্গে রাজ্য সম্প্রসারণাকাঙ্খী (expansienist) ভারতীয়েরা জড়িত আছে এবং তাদের পিছনে ভারত সরকারের সমর্থন আছে, ইত্যাদি। তিব্বতের সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা বোধ তিব্বতীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, তিব্বতের স্বাধিকারের পক্ষে কিছু বলা—সমস্তই চীনের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত হচ্ছে এবং তার জন্য ভারতের প্রতি গালিবর্ষণ ক্রমশ ভয়-প্রদর্শনের পর্যায়ে এসে পড়েছে।

পিকিং কর্তৃপক্ষের যুক্তির দুর্বলতা যতই প্রকট হচ্ছে, তাদের গালাগালির

ভাষা ততই প্রবল হচ্ছে। দালাই লামা যে স্বেচ্ছায় লাসা ত্যাগ করেন, কারো কবলে পড়ে নয়—মুসৌরীতে দালাই লামার সঙ্গে দেখা করার পর শ্রী নেহরুর এই প্রত্যয় প্রকাশিত হওয়ায় চীনাদের রাগের আরো কারণ. শ্রী নেহরুর সাক্ষ্যে জগতের কাছে দলাই লামার তিব্বত ত্যাগ সম্পর্কে চীনা প্রচার আরো খেলো হয়ে গেছে। পিকিং-এর পক্ষে আরো রাগের কারণ হয়েছে এই যে, লাসায় চীনা সামরিক কমাণ্ডারের নিকট লিখিত দলাই লামার যে-চিঠিগুলিকে নজির করে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে দলাই লামাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই চিঠিগুলি দলাই লামা বাস্তবিকই লিখেছিলেন একথা জেনেও শ্রী নেহরু বিশ্বাস করেছেন যে, দলাই লামা স্বেচ্ছায়ই লাসা ত্যাগ করেন, "বিদ্রোহীদের" দ্বারা বাধ্য হয়ে নয়। চিঠিগুলি কী সাক্ষ্য দেয় সে বিষয়ে চীনা ব্যাখ্যার চেয়ে শ্রী নেহরুর ব্যাখ্যাই বেশি স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু যুক্তির উপর নির্ভর করার উপায় এখন চীনের নেই। তা না হলে, দলাই লামা ভারতেও পরবশ হয়ে আছেন। নিজের কথা বলতে পারছেন না, অপরের কথা তাঁর নামে প্রচার করা হচ্ছে—এরকম অভিযোগ কেমন করে উচ্চারিত হতে পারে? দলাই লামার ভারতে আসার পরে চীন রাষ্ট্রদূত অথবা চীন সরকারের অন্য কোনো প্রতিনিধি দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে তো তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন যে তিনি স্বেচ্ছায় এখানে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন কিনা অথবা এখনই তিব্বতে ফিরে যেতে রাজী আছেন কিনা। চীন রাষ্ট্রদূত অথবা পিকিং সরকারের কোনো প্রতিনিধি যদি দলাই লামার সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তবে ভারত সরকার নিশ্চয়ই তাতে আপত্তি করতেন না বা করতে পারতেন না। যদি আপত্তি করতেন তাহলে তো প্রমাণই হয়ে যেতো যে ভারত সরকারই দলাই লামাকে এখানে ধরে রাখতে চাচ্ছেন। যে পাঞ্চেন লামার মুখে পিকিং-এ চীনা পিপলস্ কংগ্রেসের সভায় দলাই লামার তেজপুরে বিবৃতির সত্যতা অস্বীকার, ভারতের প্রতি তীব্র তিরস্কার এবং তিব্বতে চীনা নীতির জয়গান উচ্চারিত হয়েছে সেই পাঞ্চেন লামাকেই শ্রী নেহরু আমন্ত্রণ করেছেন ভারতে এসে দলাই লামার সঙ্গে কথা বলতে। যদি চীন রাষ্ট্রদূত অথবা চীন সরকারের অন্য কোনো প্রতিনিধি দলাই লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তবে তিনিও অনায়াসে তা করতে পারেন। সুতরাং দলাই লামা স্বেচ্ছায় এসেছেন কিনা এবং এখানে তিনি স্বেচ্ছায় আছেন কিনা অথবা ভারত সরকার তাঁকে কোনোভাবে আটকে রেখেছেন—এটা চীনা সরকার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অবশ্য তাঁরা সেই পরীক্ষা করার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাবেন এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই।

দলাই লামার ভারতে অবস্থানটাই চীনের তিব্বতী নীতির পক্ষে বিপজ্জনক—দলাই লামা এখানে কোনোরকম রাজনৈতিক কর্ম করুন বা না করুন। তিনি যে তিব্বত ছেড়ে ভারতে এসে রয়েছেন এইটাই একটা গুরুতর রাজনৈতিক কর্মের সামিল। চীনা সরকার তিব্বতে যা করেছেন তার যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে চীনা কর্তৃপক্ষের কথায় দলাই লামা নিশ্চয়ই ভারতের আশ্রয় ত্যাগ করে তিব্বতে ফিরবেন। বর্তমান অবস্থায় ভারত সরকার যদি দলাই লামাকে ভারত ছেড়ে যেতে প্ররোচিত বা বাধ্য করেন কেবল তাহলেই দলাই লামা ভারতচ্যুত হতে পারেন। ভারত সরকার স্বেচ্ছায় তা কখনো করতে পারেন না। তবে হয়ত ভয়ে করতে পারেন, এই ধারণা পিকিং-এর আছে সেইজন্যই বোধহয় কড়া কথার স্রোত ক্রমশ এতো জোরে বইতে শুরু করেছে। তাতে ভারত ভয়ে কুঁকড়ে যাবে, এরূপ মনে করা পিকিং-এর পক্ষে ভুল হবে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, তিব্বতে এবং তিব্বতীদের কী দশা হচ্ছে এবং হবে? সেকথায় পার্লামেন্টে শ্রী নেহরু যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি জানিয়েছেন যে তিব্বত থেকে হাজারে হাজারে আশ্রয়-প্রার্থী ভারতে আসছে এবং ভারত তাদের আশ্রয় দেবে একথাও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। এই সংবাদ থেকে অনুমান করা যায় যে, তিব্বতের ভিতরে চীনা নীতি কী নৃশংস রূপ ধারণ করেছে। পিকিং সরকার কি এই মতলব করেছেন যে মারের চোটে তিব্বতের চেহারা এমন বদলে দেওয়া হচ্ছে যে দলাই লামা বা কয়েক হাজার তিব্বতী আশ্রয়প্রার্থীর ভারতে থাকা না থাকায় কিছু আসে যাবে না? এদিকে শ্রী নেহরু বলেছেন—সাবধান, অবস্থা বড়োই খারাপ, আমরা যেন কোনো বে-ফাঁস, কড়া কথা বলে অবস্থা আরো খারাপ করে না তুলি। কিন্তু অবস্থা যাদের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ সেই তিব্বতীদের কি বাঁচার কিছু সুবিধা হবে এই সাবধানতায়?

মুখের রেখা

সন্তোষকুমার ঘোষ

[২৬]

নয়ন বলল, "মাসি নেই।"

পাখি বলল, "মাসি নেই।"

পাখি কাঁদছিল। নয়নের চোখ শুকনো। আর কারও মৃত্যু-সংবাদ শুনলে মুখটাতে কতটা আহত ভঙ্গি ফুটিয়ে রাখতে হয়, সেটা ঠিক করতে না পেরে সৌর হতভম্বের মত চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল।

কামিনী মাসি মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে আজ দুপুরে, যখন কাকগুলো কা-কা করে ডেকে ওঠে আর গেঞ্জির কলের বাঁশিটা ভাঙা গলায় মরা কান্না জুড়ে দেয়, তখন।

নয়ন সৌরকে সব বলছিল। সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই প্রথমটায় টের পায়নি। মাসি মরবার আগে ওকে ডেকেছিল কিনা, একটু জল চেয়েছিল কিনা, সে জানে না, জানবার এখন উপায়ও নেই।

মাসিকে দুহাতে দিয়ে ঠেলছিল নয়ন, আর বলছিল, "মাসি, ওঠ, ওঠ।" মাসি নড়ছিল না। ওর চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভয় হল নয়নের, সে পাখিকে চেঁচিয়ে ডাকল।

পাখি এসেই ডুকরে কেঁদে উঠল। বয়সে ছোট হলে কী হয়, একবার দেখেই সে টের পেয়েছিল।

পাখি কাঁদছিল তখনও। মাসি তাকে কত ভালবাসত, কবে মেরেছিল, আদর করেছিল কবে, সব এই শোকের মুহূর্তে পাখির মনে পড়ছে। মাসি কী খেতে ভালবাসত, পাখি তাও বলল।

নয়ন ধমক দিয়ে বলল, "তুই থাম ত। আমার দরকারী কথাটা সেরে নিই।" সৌরর দিকে চেয়ে বলল, "ভাই, এখন কী করব?"

সৌর কী আর জবাব দেবে। চেয়েই রইল।

উপায় নয়ন নিজেই ঠিক করল। বলল, "তোমাকে ভাই একটা কাজ করতে হবে। চিত্ত আর নিশিবাবুকে খবর দিতে হবে।"

"ওরা আসবে?"

নয়ন বলল, "আসতেও পারে। খোঁজ কর ত আগে?"

সেদিন, সৌরর মনে আছে, অকাল-বর্ষণে পথে পথে কাদা, কোথাও জল, ট্রাম-বাস থমকে দাঁড়িয়ে আছে, রাগী আকাশটা বিশ্রী রকমের মুখ করে আছে, মাঝে মাঝে আস্ফালনও করছে, সুবিধে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই শহরটাকে রসাতলে পাঠাবে।

পা টিপে কাদা বাঁচিয়ে সৌর এগুতে থাকল।

চিত্তবাবু বা নিশিবাবুর বাসা সে চিনত না। কলকাতার রাস্তা তখনও তার নখ-দর্পণে আসেনি। চিরকুট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে, লোককে জিজ্ঞাসা করে করে যে-বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিল, তার বিশ্বাস, সেই বাড়িটাই চিত্তবাবুর। তবুও চৌকাঠে আঁটা ফলকে লেখা নম্বরটা মিলিয়ে দেখল সে,—এই বাড়িই বটে।

ভারী কাঠের দরজা, সেকেলে প্রাসাদের সদর দেউড়ির মত। কবজাগুলো রাগে

গজগজ করছিল, তবু অনিচ্ছায় সরছিলও একটু একটু, অবশেষে পাল্লা সামান্য ফাঁক হল। সেই ফাঁকে একখানি মুখ দেখা গেল, যার মুখ, সৌরর ধারণা, সেই লোকটা হিমালয়ের সানুদেশের কোন অঞ্চলের হবে। সন্দিগ্ধ, মূঢ়, ভাবলেশহীন দৃষ্টি দিয়ে লোকটা সৌরকে দেখছিল। লেহন করছিল বললেই ঠিক বলা হয়। তার বয়স কত অনুমান করার সাধ্য সৌরর নেই, সে বারো বছর বয়সের বালক, না চল্লিশ পার-করা প্রৌঢ়, তার মুখে অন্তত তার কোন হিসাব লেখা নেই।

সৌর বলল, "চিত্তবাবু আছেন?"

লোকটা তখন দরজার পাল্লা আলগা করে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ভরসা পেয়ে দু-পা এগিয়ে গেল সৌর। না, লোকটা তাকে বাধা দিল না, বরং সৌর কাছে আসতেই মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করল।

সৌর অনুমান করল, লোকটা তাকে পথ দেখাবে। ভিতরে উঠোন, কিন্তু ঢাকা নয়, জাল লাগানো। উঠোনের তিনপাশে বারান্দা, বারান্দা বরাবর ছোট ছোট ঘর—পাখির খুপরির মত। জানলা নেই, ঘুলঘুলি আছে, এসব ঘর মালিকদের কী কাজে লাগে? এরা কি পায়রা পোষে?

পায়রা না পুষুক, অন্ধকার পোষে। কে জানে, অন্ধকার পোষাও হয়ত কোন কোন মানুষের শখ।

উঠোনের এক কোণে এঁটো বাসনের স্তূপ, আম-কাঁঠালের খোসা থেকে পচা-ভাপসা গন্ধ উঠছে, ঝাঁঝরি বন্ধ হয়ে গিয়ে উঠোনটা একটা ছড়ান চৌবাচ্চায় চেহারা নেবার উপক্রম করেছে। কয়েকটি মোচার খোলা জলে ভাসছিল। একটি ঘরে উনুনে আঁচ দিয়েছিল কারা, সৌরর চোখ জ্বালা করছিল: পথ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না, কতকটা আন্দাজে, কতকটা নির্বাক পাহাড়ী লোকটাকে অনুসরণ করে সৌর এগিয়ে যাচ্ছিল।

এক কোণে দড়ির চারপাই বিছিয়ে কারা তাস খেলছে, আশ্চর্য, এই ধোঁয়ায় ওদের কোন ধৈর্যচ্যুতি নেই। ঢিলে পিরেন আর খাটো প্যাণ্ট পরা একজন লোক তার চুল-গুলো চূড়োর মত করে বাঁধছিল। সৌর অনুমান করল, লোকটি পঞ্চনদবাসী হবে। কয়েকটি ছাগল বাঁধা ছিল, এক কোণে, একটি কুকুর ওকে দেখেই তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করেছিল, আর উপবীতধারী সুপুষ্টাঙ্গ জনকয়েক লোক বড় একটা লোটায় শরবত ঘুঁটছিল। আর একটা লোক, এ-ও পাহাড়ী বোধহয়, একটা ধারালো ছুরিতে শান দিচ্ছিল। ছাগল কয়টি ভীত-করুণ চোখে তার কাজ দেখছিল।

এরা কারা, এ-বাড়ি কার?

একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ির নীচে এসে সৌরর পথ-প্রদর্শক থামল। এক নিমেষ মাত্র। তার পরই আবার সে স্ক্রুর মত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। সৌর বুঝতে পেরেছিল, তাকেও উঠতে হবে।

সিঁড়ি টলছিল, বলা যায় না, হয়ত টলছিল সৌরর পা দু'খানাও। অনিশ্চয়তায়, শ্রমে, এককালে যখন রণ-পায়ে চলা অভ্যাস করেছিল, তখনও এ-রকম হত। দোতলায় একটা বন্ধ দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটি সরে গেল।

ভয়ে ভয়ে, সংকোচে সন্তর্পণে সৌর দরজা ঠেলল। বন্ধ ছিল না, ঠেলতেই আলগা হয়ে গেল কবাট, কিন্তু ভিতরটা অন্ধকার, সৌর প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। কোথায় পচা মাছ ভাজছিল বুঝি কেউ, সৌরকে নাকে রুমাল-চাপা দিতে হল।

গলা পরিষ্কার করে সৌর ডাকল, "চিত্ত-বাবু—চিত্তবাবু বাড়ি আছেন?"

ততক্ষণে ঘরের ভিতরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের নিজেরই বুঝি গোপন একটুখানি আলো আছে, প্রথমে সেটা বুজিয়ে রাখে, পরে মুঠি আলগা করে সেই আলোয় নিজেকে দেখে।

ঝাপসা আলোয় সৌর দেখতে পেল, ঘরের মেঝেয় মুড়ি ছড়ানো, কয়েকটি বাচ্চা, গোল হয়ে বসে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, মুরগী কবুতর যেমন করে। হঠাৎ ঝনঝন করে কাঁসার একটা বাটি কার হাত থেকে মেঝেয় খসে পড়ল, এক সঙ্গে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল দুটি বাচ্চা, তারপর ঘরময় কিছুক্ষণ ধরে যা চলতে থাকল, তার একমাত্র উপমা মেছো-হাটায় ভূতের নৃত্য। মোটা, সরু, ভাঙা, খোনা, শিশুদের কণ্ঠস্বর যে কত রকমের হতে পারে, সৌর তার অভিজ্ঞতা অর্জন করল।

এই অনৈকতানকে ডুবিয়ে দিয়ে চিত্ত-বাবুকে ডাক দিতে হবে। সৌর সেই চেষ্টাই করল।

এইবার ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল ছোট একটি ছেলে। আট কি নয় বছর তার বয়স হবে—সৌর অবাক হয়ে দেখল, তার পরনে কিছু নেই। ঘরে অন্য যেসব শিশুরা এতক্ষণ কলরব করছিল, তাদের বসনের স্বল্পতাও সে তখনই লক্ষ্য করল।

ছেলেটি বলল, "কাকে চাই?"

"চিত্তবাবু—চিত্তবাবু আছেন?"

কোন মন্তব্য না করে ছেলেটি ফিরে গেল ভিড়ের মধ্যে, বাকীগুলির মধ্যে মিশে গেল, কানে কানে সে যেন কী বলল একজনকে, যাকে বলল, সে আবার আর একজনকে কানে

কানে কিছু বলল। এক মুহূর্তে চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে সমস্ত ঘরে ফিসফিস আর কানাকানি শুরু হল। তারপর সব ক'টি ছেলেমেয়ে পলকে অদৃশ্য হল, পাশের কামরার দরজা ঠেলে পালাল সকলে, বারান্দায় তাদের দুদ্দাড় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

সৌর বিচিত্র এক নতুন দেশে এসেছে। ঝুলে বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে উঠোনটা ঠাহর করতে চাইল—চারপায়ার তাসের আসর তখনও চলেছে। উঠোনে জল নেই, ধোঁয়াও নেই, খানিক আগে যিনি তাঁর কেশরাশি চূড়ার মত করে বেঁধেছিলেন, তিনি এখন দাড়ির পরিচর্যায় ব্যস্ত। রঙীন ঘাঘরা-পরা কয়েকটি মেয়ে অকারণেই বারান্দায় বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে গেল।

সেই নির্বাক পথ-প্রদর্শককে সৌর কোথাও দেখতে পেল না।

আজ সারাদিনই মেঘ; মেঘে মেঘে কতখানি বেলা গেল সৌর অনুমান করতেও পারল না। এখন বৃষ্টি ধরেছে, কিন্তু আকাশের ঘনঘোর কাটেনি, যে-কোন মুহূর্তেই আবার প্রবল ধারে বর্ষণ শুরু হতে পারে।

ওদিকে, অনেক দূরে, যে-দুটি অনাথ-অসহায় মেয়ে একটি স্ত্রীলোকের শব আগলে বসে আছে, তাদের কথাও সৌরর মনে পড়ল। সে ফিরবে, খোঁজ নিয়ে যাবে চিত্তবাবু বা নিশিবাবুর, তবে কামিনী মাসির সৎকারের একটা হিল্লে হবে।

দেখতে দেখতে গঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল—সৌরর গা ছমছম করছিল। কতক্ষণ সে এসেছে এখানে কে জানে, আরও কতক্ষণ থাকতে হবে, তাও জানা নেই, এখান থেকে এই রহস্যপুরীর অধিবাসীরা তাকে বের হতে দিলে হয়।

একটি গামছা পরনে, আর একটি দিয়ে গা ঢেকে এক মহিলা এক ঘড়া জল নিয়ে এদিকেই আসছিলেন, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে সৌর ফিরে তাকাল। ভাবল, একে কিছু জিজ্ঞাসা করবে কি না। কিন্তু সংকোচে এগুতে পারল না।

একবার সৌর ভাবল, পালাই, চিত্তবাবুর খবর নিয়ে কাজ নেই, তার পরেই তার মনে হল, যাবই বা কোথায়। নয়ন যে আমার আশায় বসে আছে, কী বলব তাকে গিয়ে? সৌর যেন একটু রেগেও উঠল ●সেধে আচ্ছা দায় নিয়েছি নিজের ঘাড়ে। কেন, আমি না থাকলে কী হত? ওদের মড়া কি পুড়ত না, ঘরেই বাসী হত, পচত? এই ত ফের বৃষ্টি শুরু হয়েছে, এর পর দিনটা হঠাৎ চোখ বুঁজবে—তখন এই গোলকধাঁধা থেকে আমি বেরোবার পথও পাব না।

পিছনের দরজা তখনও খোলা হচ্ছে ছিল, যদি কাউকে দেখা যায়, সেই আশায় সৌর ফিরে তাকাল। না, কেউ নেই। সেই নগ্ন-অর্ধনগ্ন কাচ্চাবাচ্চার পাল পলকে অদৃশ্য

হয়েছে, এই বাড়টাতে সবই যেন ভোজবাজি, কারও আর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

সারা ঘরে, মুড়ি, মুড়িগুলো হাওয়ায় আরও ছড়িয়ে পড়ছিল, দু-একটা চৌকাট ডিঙিয়েও এসেছিল এ-ধারে। কয়েকটা চড়ুই কোথা থেকে উড়ে এসে সেগুলো খেতে শুরু করেছিল। বারান্দায় ঝোলানো খাঁচায় একটা কাকাতুয়া তাই দেখে চঞ্চল হয়ে ছটফট করছিল, আর রেলিংয়ে বসে ভিজে একটা ঈর্ষাতুর কাক কর্কশ গলায় চড়ুইগুলোকে ধমক দিচ্ছিল।

সৌর কাকটাকে তাড়িয়ে দিল।

এবারে বুঝি জোর বৃষ্টি নামল, এই বর্ষার দিনকে বিশ্বাস নেই,—এই রোদ, এই প্রলয়। বারান্দায় দাঁড়ানো মুশকিল হবে, সৌর বুঝতে পারছিল অগত্যা দাঁড়াল দেয়াল ঘেঁষে। এখান থেকে আড়চোখে তাকালে ঘরের ভিতরটা আরও স্পষ্ট দেখা যায়।

ওদিকের জানলা খোলা, ছাটে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

যাকে নয়নদের ঘরে দেখেছে, ফুরফুরে শৌখিনবাবু, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর উড়ুনি, পায়ে লপেটা, জরিদার নাগরা, অথবা অ্যালবার্ট বা চকচকে গ্রীসিয়ান, সাবানে ফাঁপানো ওলটানো চুল হাওয়ায় ফুরফুর, যার মনিবন্ধে জড়ানো থাকে বেলফুলের মালা, আর রুমালে আতর-এসেন্সের গন্ধ ভুরভুর করে—(চিত্তবাবু যে কী বাবু, তুমি জান না, নয়ন সৌরকে একদিন বলেছিল) —তার ঘরের এমন চেহারা, ওই হতশ্রী, অলবা বাচ্চাগুলো তারই ছেলেমেয়ে?

সৌরর ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল।

নয়নদের ঘরে চিত্তবাবুরা যখন মাইফেল বসিয়েছেন, সৌর তখন তার কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। সে দেখেছে, চিত্ত-বাবুর হাতে দামী দামী পাথরের চার-পাঁচটা আংটি, যাকে বিজলি আলো ছুঁতে গিয়ে ঠিকরে ফিরে আসে। আর সেই হাতে সরু-কোমর কাচের গ্লাস থরথর করে কাঁপে। গান শোনেন চিত্তবাবু আর স্খলিত গলায় তারিফ করেন। সৌর অনুভব করল, বাইরের চিত্তবাবু আর ঘরের চিত্ত-বাবুতে অনেক তফাৎ।

ঠিক তখনই যিনি ঘরে ঢুকে আলো জেলে দিলেন, সৌর বুঝতে পারল না, একটু আগে তাকেই সিক্ত-সংক্ষিপ্ত প্রচ্ছদে এখান দিয়েই এক-ঘড়া জল নিয়ে যেতে দেখেছে কিনা। এই মহিলাটির আবক্ষ ঘোমটা।

শেষবারের মত মরিয়া হয়ে সৌর জিজ্ঞাসা করল, "চিত্তবাবু আছেন?"

ঘোমটা নড়ে উঠল, সৌর বুঝল, নেই। তবু সে জিজ্ঞাসা করল, "চিত্তবাবু কোথায়?"

ঘোমটা আবার নড়ল, সৌর বুঝল এই ব্রীড়াবতী কলাবউ তার কথার উত্তর দেবে না। হতাশায় অধীর হয়ে সে বলে উঠল, "আর কাউকে ডেকে আনুন না, সে আমার কথার জবাব দিক। চিত্তবাবুকে আমার যে বড় দরকার।"

উলঙ্গপ্রায় একটি ছেলে তখনই কোথা থেকে লাফাতে লাফাতে মহিলাটির পাশে এসে দাঁড়াল। ঘোমটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই মহিলাটি তাকে ঠেলে দিলেন।

ছেলেটি বলল, "ইস! ভারী যে লজ্জা! দাও টাকা দাও।"

ঘোমটার আড়াল থেকে এবার চাপা একটা ধমক শোনা গেল।

একে একে ওরা আবার ফিরে আসছিল, সেই নগ্ন-অর্ধনগ্ন কাচ্চাবাচ্চার পাল। হামাগুড়ি দিয়ে এসেছিল একটি ফড়িংয়ের মত রোগা শিশু, সে তার মায়ের পায়ের বুড়ো আঙুলটায় মুখের লালা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ওরা সকলে আবার কলরব শুরু করে দিয়েছে। নাছোড় ছেলেটি তখনও থেকে থেকে বলছে, "দাও টাকা দাও।"

ছেঁড়া ফ্রক-পরা একটি মেয়ে—সেই সব-চেয়ে মাথায় বড়—ধমক দিয়ে বলে উঠল, "কেন মিছিমিছি বকছিস? জানিসনে, টাকা নেই? বাড়িওয়ালা সকালে মাকে যাচ্ছেতাই কী সব বলে গেল, মনে নেই? আজ তিন দিন খোকাটার জন্যেও মা দুধ রাখতে পারেনি, জানিস না? বাবাও তিন দিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে—"

মেয়েটি আর বলতে পেল না, ঘোমটাপরা মহিলাটি একটি হাত বাড়িয়ে ওর মুখ চেপে ধরেছিলেন।

সৌর এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝেছিল, আর অপেক্ষা করা বৃথা—চিত্তবাবুর দেখা পাওয়া যাবে না।

ঘোরানো, টলমল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সৌরও এ-ও ভাবছিল, চিত্তবাবুর সে যে দেখা পেল না, তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। চিত্তবাবুকে সে আজ দেখতে পেয়েছে বই কি—যার হাতে মদের গ্লাস কাঁপে, ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে যে রসিক ভদ্রলোক নয়নদের ওখানে সন্ধ্যা কাটান, ঠুংরি, কথায় সকলকে মাতিয়ে রাখেন, সেই চিত্তবাবু নন, ইনি অন্য একজন।

এঁর পরিচয় এই নিরাবরণ অশিষ্ট, ক্ষুধার্ত লোভী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

এই চিত্তবাবুকে ঠকিয়ে ওখানকার চিত্ত-বাবু হাজারো মজার মাশুল জোগাড় করেন। এই চিত্তবাবুকে সৌর আজ দেখেছে বইকি। ছেঁড়া গেঞ্জি আর লুঙ্গি-পরা মানুষটি চিটচিটে বিছানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকে, বাড়িওয়ালা আর গোয়ালা আর হরেক পাওনাদারকে সামলায় তার বউ, তার ছেলে-মেয়েরা মুড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

চোখে না দেখেও এই মানুষটির ছবি সৌর মনে মনে এঁকে নিয়েছে।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বিড়িতে টান দিতে দিতে সকালের চিত্তবাবু স্বপ্ন দেখেন, কখন আবার ঘাড়ে-গলায় পাউডার ছড়িয়ে, জামায় আতর ঢেলে আবার বিকালের চিত্তবাবু হবেন। [ক্রমশ]

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মন্মথভট্ট

রুডল্ফ্ রকার : "জাতিবাদ ও সংস্কৃতি"

এখন থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ "ন্যাশন্যালিজম্" প্রকাশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখে কবির মনে আর কোনো সংশয় রইল না যে, ন্যাশন্যালিজম্ বা জাতিবাদ মনুষ্যত্বের শত্রু। বইটিতে তিনটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম প্রবন্ধে কবি আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্নিহিত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক পশ্চিমের সংস্কৃতি ব্যক্তির বিকাশ চায়, অন্ধ সংস্কারের জড়তা ঘুচিয়ে জ্ঞানার্জনে তার উদ্যম অপরিসীম, দূর দূর দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে তার দান প্রচুর। অথচ তারি সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতা জাতিবাদের নামে গোষ্ঠির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিতে উদ্যোগী, ক্ষমতার লালসায় বিবেককে দমন করতে তার বাধে না, দুর্বলকে শোষণ করে সাম্রাজ্যতান্ত্রিক সমৃদ্ধি অর্জনে সে গর্বিত, প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ছলে বলে কৌশলে পর্যুদস্ত করা প্রতিটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের সাধনা। কবির মতে আধুনিক ইতিহাসে জাতিবাদ এক ভয়াবহ মহামারী; এরি প্রভাবে একটা দেশের সমস্ত অধিবাসীকে নির্বিবেক যুদ্ধশক্তিতে পর্যবসিত করে ধ্বংসের কাজে লাগানো হয়। জাতিবাদের উদ্ভব পশ্চিমে; এবং এর হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার না করতে পারলে পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, জাপান পশ্চিমের শিক্ষা গ্রহণ করে ক্রমেই জাতিবাদের দিকে ঝুঁকছে। যথার্থ আধুনিকতা হল মনের স্বাধীনতা, সহযোগিতার ভেতর দিয়ে ব্যক্তির বিকাশ। ইয়োরোপ দীর্ঘদিন ধরে বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার এবং প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে; এই কারণ ইয়োরোপ আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু ইয়োরোপ যেভাবে রাষ্ট্রের কাছে সমাজকে বলি দিয়েছে, ক্ষমতার সাধনায় নীতিবোধকে বিসর্জন দিয়েছে, ব্যক্তিকে যন্ত্রে পর্যবসিত করেছে, সেখানে ইয়োরোপকে অনুসরণ করার অর্থ আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া। আধুনিক জাপানে তারি কিছু কিছু লক্ষণ দেখে কবি শঙ্কিত হয়েছেন, জাপানের চিন্তাশীল সমাজকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে চেয়েছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষে জাতিবাদ। পশ্চিম যেমন একাধারে ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের মানসিক জড়তা ঘুচিয়ে তার কল্যাণ সাধন করেছে, অন্যধারে তেমনি পশ্চিম থেকেই প্রথম জাতিবাদের বিষ ভারতীয় মনে সঞ্চারিত হয়। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ত্রুটি অনেক, কিন্তু জাতিপ্রেম তার অন্যতম নয়। এদেশে নানা স্থান থেকে নানারকম মানুষ দলে দলে এসে বসতি করেছে; কিন্তু তাদের চাপ দিয়ে একটি জাতির সামষ্টিক সত্তায় বিলুপ্ত করার চেষ্টা হয়নি; জাতিগত স্বার্থের নামে প্রতিবেশী দেশের মানুষদের প্রতি উগ্র বিদ্বেষ অথবা ঈর্ষার মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টাও এদেশের ইতিহাসে বিশেষ চোখে পড়ে না। কবির মতে ভারতের বৈশিষ্ট্য হল, এখানে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় অথবা দলের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাদের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আজ পশ্চিমী জাতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষ তার সেই সহনশীলতার ঐতিহ্য ত্যাগ করে আত্মঘাতী জাতিবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। অথচ আজকের দিনে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ পরস্পরের এত শারীর নৈকট্যে এসেছে, তখন জাতিপ্রেমকে প্রবল করার অর্থ এসব সমাজের মধ্যে সংঘাতকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলা। এ যুগের একান্ত প্রয়োজন এমন এক জীবন-আদর্শ যা একধারে ব্যক্তির বিকাশ এবং অন্যধারে সর্বমানবীয় ঐক্যের সাধনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে; যা জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে খেপিয়ে না তুলে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তুলতে উদ্যোগী। নবযুগের এই বিশ্বমানবীয় জীবনদর্শনের বিবর্তনে ভারতবর্ষ হয়ত একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে; যদি না ভারতীয় মন তার পূর্বেই জাতিবাদের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়।*

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী কি পশ্চিমে, কি পূবে শিক্ষিত-সাধারণের কাছে সম্বর্ধনা লাভ করেনি। ১৯১৬ সালে জাপানে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে কবি যে-সব বক্তৃতা দেন তাঁর কয়েকটিকে মার্জিত এবং একত্রিত করে "ন্যাশনালিজম্" বইটি প্রকাশ করা হয়। সাম্রাজ্যলিপ্সু জাপানে এবং যুদ্ধোন্মত্ত মার্কিনে এইসব ভাষণ ব্যাপক

* Rabindranath Tagore. **NATIONALISM.** Macmillan & Co.

বিরূপতার উদ্রেক করে। অনেক শিক্ষিত ভারতীয়-ও তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমন কি, এ ইঙ্গিত পর্যন্ত করা হয় যে, নোবেল প্রাইজ এবং নাইট উপাধি লাভের ফলেই রবীন্দ্রনাথ জাতিবাদবিরোধী হয়ে উঠেছেন। কবি আশা করেছিলেন, মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা মানুষকে নেশন-তন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করবে, বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের আঘাতে মানুষের চৈতন্যোদ্রেক ঘটবে। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় পাগল মানুষ কবির ডাকে সাড়া দেয়নি। দিলে ইয়োরোপে ফাসিজ্‌ম্‌-এর উদ্ভব হোত না; শক্তিশালী জাপান দুর্বল চীনকে আক্রমণ করত না; প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ বছর কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত না। আর আজো তাই পশ্চিমী "নেশন-তন্ত্রের" প্রতিক্রিয়ায় এসিয়া এবং আফ্রিকার অত্যাচারিত জনসাধারণ উগ্রতর জাতিবাদের সর্বনাশা পথ অনুসরণ করে চলেছে।

কিন্তু শিক্ষিতসাধারণ কবির সতর্ক বাণীকে অগ্রাহ্য করলেও জাতিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর এই দ্বিধাহীন ঘোষণা পশ্চিমের কোনো কোনো মনীষীর মনে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। এঁদের মধ্যে একজনের নাম রুডল্‌ফ্‌ রকার। অবশ্য রকার রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে জাতিবাদের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেননি; রাসেল এবং রলাঁ-র মত তিনিও আগে থেকেই বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। তবে রবীন্দ্রনাথের "ন্যাশন্যালিজম" বইটি তিনি যত্ন সহকারে পড়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে উভয়ের মনে যে কত গভীর মিল ছিল রকারের মহাগ্রন্থ "জাতিবাদ ও সংস্কৃতি" পাঠ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।"

রকারের নাম সম্ভবত বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে পরিচিত ঠেকবে না; সুতরাং তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পরিচয় করানোর আগে মানুষটি সম্বন্ধে সামান্য দু' এক কথা বলা দরকার। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে রকার এ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। ১৮৭৩ সালের ২৫শে মার্চ জার্মানীর মাইনৎজ শহরে এঁর জন্ম হয়; তাঁর বাবা গানের স্বরলিপি ছেপে রুজি রোজগার করতেন। রকার ছ' বছর বয়সে মা এবং বাবা দুজনকেই হারান; তাঁর কৈশোর একটি ক্যাথলিক অরফ্যানেজ্‌-এ কাটে। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি একজন বড় দপ্তরীর কারখানায় শিক্ষানবিশ-কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রাচীন জার্মান প্রথা অনুসারে তিনি শিক্ষানবিশীর সময়ে পায়ে হেঁটে জার্মানীর নানা অঞ্চল এবং ইয়োরোপের নানা দেশে ঘুরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন; ফলে তিনি শুধু অনেকগুলো ভাষাই শেখেন নি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে। তাঁর মামা রুডল্‌ক নরমান সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; জার্মান সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। এঁরি প্রভাবের ফলে রকার জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সমাজ-তন্ত্রী আন্দোলনে যোগদান করেন। সেটা বিসমার্কের আমল; জার্মানীতে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন তখন বে-আইনী এবং ফলে গুপ্তভাবে পরিচালিত। বৈপ্লবিক কাজকর্মের অভিযোগে ১৮৯৩ সালে রকার-কে জার্মানী থেকে নির্বাসিত করা হয়। এর পরের দুই বছর তিনি পারী-তে রেফুজি হিসেবে বাস করেন; তাঁর সঙ্গে পিটার ক্রোপট্‌কিন, এলিজে রেক্লু, এরিকো মালাতেস্তা প্রমুখ নৈরাজ্যবাদী মনীষীদের পরিচয় হয়; ক্রমে তিনি মার্ক্স এবং লাসালের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ত্যাগ ক'রে রাষ্ট্রহীন শ্রমিক-সংগঠন তন্ত্রে (অর্থাৎ অ্যান্যার্কো-সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এ) বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন:

"সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বৈপ্লবিক গুপ্ত ক্রিয়া-কলাপ প্রথম যৌবনে আমার রোমান্টিক কল্পনায় গভীরভাবে আবেদন করেছিল। স্বাধীন চিন্তা এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয়কে শক্তির সাহায্যে দমন করার বিরুদ্ধে প্রবল বিতৃষ্ণার মনোভাবও তারি ফলে অতি অল্প বয়সে আমার মনে সঞ্চারিত হয়।... পরে আবার এই কারণেই আমি জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বেশী দিন থাকতে পারিনি। সমাজতন্ত্রীদের সংকীর্ণ মতবাদ-গত গোঁড়ামি এবং কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সামান্যতম পার্থক্যের প্রতিও উগ্র অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে আমি শীঘ্রই বুঝতে পারি যে, এ আন্দোলনে আমার স্থান নেই ...সমাজতন্ত্রের আদর্শ সম্বন্ধে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু জার্মান সমাজ-তন্ত্রীরা দাবী করত যে, প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যার সমাধান তাদের জানা; এবং তাদের এই দাবী আমি মেনে নিতে পারিনি। জমি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং সামাজিক সম্পর্কে মুষ্টিমেয় মানুষের একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত ঠেকেছে। কিন্তু একথাও আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে, ব্যক্তির ব্যক্তিস্ববোধ এবং স্বাধীন উদ্যম ছাড়া সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য; সে সমাজতন্ত্রে কাল্পনিক গোষ্ঠি-স্বার্থের কাছে সমস্ত ব্যক্তি-মানুষের বলি অবশ্যম্ভাবী। অপরপক্ষে আঠারো এবং উনিশ শতকের যে উদারতন্ত্রী চিন্তাধারা একধারে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং অন্যধারে সমাজ-জীবনের ওপরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিলোপ সাধনে ব্রতী ছিল, তারি সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র নতুন এক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষের মধ্যে স্বাধীন সহযোগিতা-জাত ঐক্যের ওপরে এই সংস্কৃতির ভিত্তি। আমি তাই শক্তিবাদী সমাজতন্ত্র ত্যাগ করে মুক্তিবাদী সমাজতন্ত্রের সন্ধানে গড্‌উইন, বাকুনিন, ক্রোপটকিন প্রমুখ মনীষীর লেখা পড়তে শুরু করি।"

পারী থেকে রকার আসেন লণ্ডনে। এখানে দপ্তরীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহের সূত্রে ইস্ট এণ্ডের ইহুদী মজুরদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। নিজে ইহুদী না-হয়েও তিনি তাদের ভাষা ভাল করে শিখে ফেলেন এবং ১৮৯৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ইহুদী শ্রমিকদের একটি সাপ্তাহিক এবং একটি মাসিক পত্রের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯১২ সালে লণ্ডনে ইহুদী দরজীদের দীর্ঘদিনব্যাপী ধর্মঘটের তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার তাঁকে অন্তরীণ করে; তাঁর এই সময়কার অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি HINTER STACHELDRAHT UND GITTER ("কাঁটাতার আর শিকের বেড়ার পেছনে") গ্রন্থে লিখে গেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রকার জার্মানীতে ফিরে যান এবং সেখানে সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর উদ্যোগে "জার্মানীর স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন" প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯২১ সালে ইণ্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং-মেনস্‌ অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্গঠনেও তিনি একটা বড় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু হিটলার ক্ষমতায় আসার পর আরো অনেক মুক্তিতান্ত্রিক মনীষী এবং বিপ্লবী-কর্মীর মত তাঁকেও জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, কাগজপত্র এবং যা-কিছু সঞ্চয় সবই নাট্‌সীরা পুড়িয়ে দেয়; তিনি সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলেন শুধু তাঁর "জাতিবাদ এবং সংস্কৃতি" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি। এরপর তিনি মার্কিন দেশে এসে আশ্রয় নেন; এবং জীবনের শেষ কয়েক বছর মুখ্যত গ্রন্থ-রচনা নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন। তিনি অনেকগুলি মূল্যবান বই লিখেছেন এবং সেগুলি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার ট্র্যাজিক মানস ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্যে তাঁর তিন খণ্ডে রচিত আত্মজীবনী একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

১৯৫৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ছিয়াশী বছর বয়েসে রুডলফ্‌ রকারের মৃত্যু হয়।

"জাতিবাদ এবং সংস্কৃতি" গ্রন্থে রকারের মূল প্রতিবাদ্য হল যে, এই দুই আদর্শ পরস্পরের আমূলবিরোধী। মানুষ পৃথিবীর জটিলতম জীব; একধারে যেমন প্রতি মানুষই অনন্য, অন্যধারে তেমনি প্রতি

---

*Rudolf Rocker, **Nationalism and Culture.** Translated by Ray E. Chase. Rocker Publications Committee, Los Angeles, California. Pp. XVIII + 592.

মানুষের মধ্যে বিচিত্র সম্ভাবনা বর্তমান। এই সম্ভাবনাসমৃদ্ধ অনন্যতা মানুষের সৃজনধর্মে প্রকাশ পায়। মানুষই প্রকৃতিতে একমাত্র প্রাণী যে অন্ধবশ্যতায় প্রকৃতির নির্দেশ না-মেনে নিয়ে নিজের ভাগ্য নিজের ইচ্ছেমত গড়ে তুলতে উদ্যোগী। এটা যে সম্ভবপর তার কারণ বিশ্বপ্রকৃতির ঘটনা-পরম্পরা নিয়মনিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবী বলে কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্যনীয়; কিন্তু মানুষের নিয়ম-কানুন তার নিজেরি সৃষ্টি, ফলে তার পরিবর্তন সম্ভব। খিদে মানুষের পাবেই, কিন্তু মানুষ কি খাদ্য খাবে, অথবা সে খাদ্য সে কিভাবে খাবে, এটা মানুষের রুচি এবং সামর্থ্যের ওপরে নির্ভর করে। মানুষের ইতিহাসেও ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান; কিন্তু সেই কার্যকারণের মধ্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির একটা বড় অংশ আছে। মানুষ তাই অন্য জীবের মত যুগ যুগ ধরে একইভাবে পরিবেশের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজের প্রয়োজনমত পরিবেশের বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়ে ইতিহাসে নিজের সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে।

মানুষের এই সৃজনধর্মের ফল সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মূলে আছে প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজের জীবন নিজেরি উদ্ভাবিত আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। এই চেষ্টার সার্থকায়নের জন্য এক ধারে প্রয়োজন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অন্য ধারে চাই স্বেচ্ছাকৃত সম্পর্কের ভিত্তিতে সমবায়ী সমাজ। স্বাধীনতা এবং সমবায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। চিন্তার, প্রত্যয়ের, প্রকাশের এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বাধীনতার ফলে ব্যক্তি নিত্য নতুন রূপ আবিষ্কার করে; এবং তার সেই উদ্ভাবনা অন্য মানুষদের বিকাশের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। আবার পরস্পরের সঙ্গে সহযোগের ফলে প্রতি মানুষ অপর মানুষের মানসিক সম্বন্ধের অংশভাক্ হয়ে নিজেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; তাছাড়া এরি ফলে মানুষের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবেশের [illegible] সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। [illegible] মানুষের সহযোগ হতেই স্থানীয় সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বমানবিক সমন্বয়ের দিকে প্রসারিত হয়. তবেই মানুষের সংস্কৃতি-পরম্পরা [illegible] বিকশিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃতির উদ্ভব এবং [illegible] সম্ভবপর যখন মানুষের জীবন বাইরের [illegible] নিয়ন্ত্রিত না হয়ে তার স্বাধীন ইচ্ছার তাগিদে বিকশিত হয়ে ওঠে। তার জন্য চাই এমন সমাজ যেখানে কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে একটি মানুষের ভাগ্য নিজের কব্জায় আনেনি। ফলত ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সর্বমানবীয় ঐক্যের মিলন সাধন সংস্কৃতির স্বধর্ম।

জাতিবাদের প্রয়াস ঠিক এরি বিপরীত। জাতিবাদ ব্যক্তির স্বকীয়তাকে বিলুপ্ত করে কাল্পনিক যূথসত্তাকেই মনুষ্যত্বের প্রধান নির্ভর বলে উপস্থিত করে। কিন্তু জাতিবাদীর কল্পনায় ছাড়া যূথসত্তার অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই; ফলে তার না-আছে চেতনা, না সৃজন-সামর্থ্য। দ্বিতীয়ত, জাতিবাদ ব্যক্তিকে গোষ্ঠির কাছে বলি দিয়ে এক গোষ্ঠিকে আরেক গোষ্ঠির শত্রু হিসেবে কল্পনা করে। প্রত্যেক স্বজাতি-প্রেমিকের বিশ্বাস যে, তার নিজের জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম এবং অন্য সব নিকৃষ্ট জাতিকে তার নিজের জাতির ক্ষমতাধীন করাই ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ। এদিক থেকে ওল্ড টেস্টামেণ্টের ইহুদী আর হিটলার জার্মানীর নাৎসীর মধ্যে প্রত্যয়গত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ জাতিবাদ একধারে ব্যক্তির বিনাশ ঘটিয়ে মানুষের সৃষ্টিশীলতার মূলে আঘাত করে; অন্যধারে গোষ্ঠির সঙ্গে গোষ্ঠির সংঘাত সৃষ্টি করে সর্বমানবীয় ঐক্য অসম্ভব করে তোলে। জাতিবাদ তাই সংস্কৃতির শত্রু; জাতিবাদী সংস্কৃতি স্ববিরোধী কল্পনা।

জাতিবাদের এই দুই বৈশিষ্ট্য থেকে তার তৃতীয় এবং সম্ভবত সবচাইতে মারাত্মক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। জাতিবাদী যে ধরনের সর্বগ্রাসী যূথবৃত্তিক ঐক্যের সাধক, কোনো সমাজেই তা থাকা সম্ভব নয়। ব্যক্তির অনন্যতার কথা ছেড়ে দিলেও প্রতি সমাজেই নানারকম পার্থক্য বর্তমান। জাতিবাদ এইসব পার্থক্য জবরদস্তি করে মুছে দিতে চায়। কিন্তু তা করতে গেলে চাই শক্তির কেন্দ্রীকরণ। ফলে জাতিবাদ একান্তভাবেই ক্ষমতানির্ভর। রকার প্রাচীন এবং আধুনিক নানা সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে বিস্তর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, জাতিবাদ আসলে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভীর কল্পিত আদর্শ। জাতির নাম করে মুষ্টিমেয় লোক সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের দখলে এনে সেই শক্তির প্রয়োগ করে একধারে সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্য ধ্বংস করে, অন্যধারে প্রতিবেশী সমাজকে জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়। জাতিবাদী সাধনার প্রধান যন্ত্র রাষ্ট্র। জাতিবাদ একই সঙ্গে রাষ্ট্রবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী।

জাতিবাদের প্রথম কাজ হল সমাজে যে-সব ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত, তাদের বিলোপ সাধন করা। তারপর সমাজে

যে-সব আত্মনির্ভর সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলির উচ্ছেদ ঘটানো। এই দুই বাধা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জাতিবাদ সাধারণ মানুষের মনে প্রাক্-সাংস্কৃতিক কালের পাশব বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অভ্যাসাশ্রয়ীতা, ক্ষমতাবানের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ভয়, বিদ্বেষ, হিংস্রতা —এ-সবের পোষণ এবং বর্ধন ছাড়া জাতিবাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সাধারণ মানুষের মনে এইসব বৃত্তির প্রাবল্য ঘটিয়ে জাতিবাদ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এবং রাষ্ট্রের নির্দেশের ওপরে নির্ভরশীল করে তোলে। তারা স্বাধীন চিন্তা এবং সমালোচনার প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; বিদেশীকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতে শেখে; এবং জাতীয় স্বার্থের নামে পরদেশ লুণ্ঠনের মধ্যে কোনো অন্যায় দেখতে পায় না। জাতিবাদের অন্যতম আদি প্রবক্তা মেকিয়াভেলীর ভাষায়, "পিতৃভূমির কল্যাণ যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ন্যায়-অন্যায়, করুণা - নিষ্ঠুরতা, প্রশংসা - সমালোচনা, এসবই আমাদের অগ্রাহ্য করতে হবে। জাতির স্বার্থরক্ষায় এমন কোনো কাজ নেই যা করতে আমরা সংকুচিত হব।"

জাতিবাদের প্রতিষ্ঠার অর্থ যে সংস্কৃতির উচ্ছেদ, বিবিধ উদাহরণ দিয়ে রকার তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এবং বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে এ সত্যের সবচাইতে প্রামাণ্য উদাহরণ তাঁর নিজের দেশ জার্মানীতে নাৎসী একনায়কত্বের জাতিবাদের আওতায় হিটলারী জার্মানী মানুষের ভাবনা-চিন্তা, আচার-ব্যবহারকে রাষ্ট্রনির্দিষ্ট একটিমাত্র ছকের মধ্যে পুরতে চেয়েছিলেন। তার ফলে সেখানে শিল্প-সাহিত্যের বিনাশ ঘটে, সমাজজীবন থেকে নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়, দেশের সমস্ত সম্পদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়, যুবসম্প্রদায়ের মন বিদ্বেষ এবং উগ্র অসহিষ্ণুতার বিষে বিষিয়ে ওঠে, এবং পরিশেষে সমগ্র মানবসমাজকে বিশ্বব্যাপী হত্যার মধ্যে দিয়ে এই নির্বুদ্ধিতার দাম দিতে হয়। কিন্তু শুধু হিটলারী জার্মানী কেন, সমকালীন এবং অতীত ইতিহাসে এর বিস্তর উদাহরণ চোখে পড়ে। যে-কালে প্রাচীন গ্রীসে কোনো রাষ্ট্রশক্তিকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখনি কিন্তু সে-দেশে এক অসামান্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল। রোম রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ করে ঐক্য রচনা করতে গিয়েছিল; তার সাংস্কৃতিক দৈন্য ভুভুবনবিদিত। রেনেসাঁসের নৈসর্গিক স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল চোদ্দ এবং পনের শতকের ইতালিতে; মুসোলিনীর জাতীয় রাষ্ট্রের আমলে নয়। জার্মান সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম যুগ কি "রাইখ" প্রতিষ্ঠার আগে না পরে? ক্লপস্টক থেকে গোয়েটের সাহিত্য, কাণ্ট থেকে ফয়েরবাখের দর্শন, বেঠোফেন থেকে হ্বাগনেরের সংগীত—এসবই আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা।

প্রশ্ন ওঠে, জাতিবাদ যদি এমনি আত্মঘাতী আদর্শ হয়, তবে তার উদ্ভব কি করে ঘটল, কিভাবে তা এত ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে? রকার তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও সম্ভব নয়—কারণ স্থানাভাব। শুধু আমি একটি সূত্রের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করব। রকারের মতে মানুষের ইতিহাসে আগাগোড়াই দুটো বিরোধী প্রবণতার সংগ্রাম দেখা যায়: সম্পদের উৎপাদন বনাম ক্ষমতার পূজা, মুক্তির স্পৃহা বনাম শক্তির লালসা, সমবায়ী চেতনা বনাম যূথবৃত্তি, সংস্কৃতি বনাম রাজনীতি ও ধর্ম। উভয়েরই উৎস মানুষের চরিত্রে, অথবা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষের টিঁকে থাকার চেষ্টার মধ্যে। আদিম যুগের যাযাবর মানুষ অজ্ঞতা এবং অসহায়তার ফলে প্রকৃতির মধ্যে ভূত প্রেত, দেবদেবী কল্পনা করেছিল; তাদের তারা ভয় করত, নানা উৎকোচ দিয়ে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করত, মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে বশে আনারও কম চেষ্টা করেনি। নিজের চাইতে শক্তিমান কোনো অস্তিত্বের কল্পনা করে তাঁর সাহায্যে নিজেকে ক্ষমতাবান করার মনোবৃত্তি এইভাবেই গড়ে ওঠে। এই মনোভাব থেকেই পরবর্তীকালে ধর্মের উদ্ভব। কিছু লোক এই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ঐ রহস্যময় শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত করে, এবং নানা বুজরুকির সাহায্যে জনসাধারণকে সে কথা বিশ্বাস করায়। এরাই হল প্রাচীন যুগের পুরোহিত সম্প্রদায়। এই একই মনোভাব থেকে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব। এক সময়ে ধর্মীয় ছিল রাষ্ট্রশক্তির প্রধান সমর্থক; সব রাজাই নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন। পরে বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ধর্মের প্রভাব যখন কমে আসে তখন তাঁর সহযোগে রাষ্ট্রশক্তি নিজেকে একচ্ছত্র করে তোলে। সার্বভৌম হওয়ার প্রলোভন ক্ষমতার স্বধর্ম। সমাজের যে মুষ্টিমেয় অংশ এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তারা তখন তাদের প্রয়োজনের উপযোগী নতুন ধর্ম গড়ে তোলে; জাতিবাদ হল এই নতুন রাজনৈতিক ধর্ম। যে কারণে অতীতে মানুষ ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই একই কারণে আধুনিক কালের মানুষ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতিবাদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সে কারণ হল তাদের অজ্ঞানতা এবং অসহায়তা বোধ। অতীতে পুরোহিত গোষ্ঠী যেভাবে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং অসহায়তার সুযোগে শক্তিমান হয়ে উঠেছিল, এযুগে রাজনৈতিক সম্প্রদায় তেমনি সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং অসহায়তার সুযোগে নেশনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে একচ্ছত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে রকার যেহেতু ইতিহাসের কোনো অবশ্যম্ভাবী ধারাকে স্বীকার করেন না, সেহেতু তাঁর আশা আছে যে, মানুষ যদি স্বকীয় সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তবে তাদের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টার ফলে জাতিবাদের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসবে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিচিত্র সমবায়ী সমাজ-সংগঠনের ফলে বিশ্বমানবিক সংস্কৃতির উদ্ভব মোটেই কষ্টকল্পনা নয়।

রকারের বইটি মুখ্যত পাশ্চাত্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মহাগ্রন্থ পাঠ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিবাসীরা বেশী ছাড়া কম উপকৃত হবেন না।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

পাঁচ

দেশ পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর ১৩।১২।১৬ তারিখের চিঠিতে তাঁর রাইট স্ট্রীটের ঠিকানা নেই, আছে টেম্পল্ চেম্বার্সের ঠিকানা। ঐখানে বসে তিনি রিসীভারের কাজ করতেন। রিসীভার শব্দটির বাংলা কি তা জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে, বাবাকে আমার ঠাকুরমা প্রায়ই বলতেন :

—দেখ, অসীম, ঋষিবরকে একখানা চিঠি লেখ।

রিসীভার-কে 'ঋষিবর'-ভাবে ভজনা করার সার্থকতা হয়ত ছিল, হয়ত আছেও। আইনজ্ঞরা বলেন : Receiver is the hand of the court, অর্থাৎ ঋষিবর হচ্ছেন রাজশক্তির হস্ত। রাজশক্তিধর ঋষিবররা প্রাচীনকালে অনেক কল্যাণকার্য করেছিলেন। সুতরাং এ-যুগেও রিসীভার-রা অনুরূপ শুভকর্মে ব্রতী হলে সমাজের মঙ্গল। মনে হয়, প্রত্যেক রিসীভারকে ঋষিবর বলা উচিত, কারণ তার ফলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে ঋষিভাবের উদয় হতে পারে। এ-প্রসঙ্গে আমরা সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার আলাপ হয়। প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তখন "পরমপুরুষ" লিখছিলেন। হীরেন্দ্র এ-সংবাদ আমায় দেন এবং তৎসহ জানান যে অচিন্ত্যের চিন্তাধারা ইদানীং ধর্মের দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত। আমি বলি : —সেটার কারণ বোধ হয় এই যে, এজলাসে বসে তাঁকে রোজই শুনতে হচ্ছে, তিনি 'ধর্মাবতার'।

হীরেন্দ্র এ থিওরিকে পত্রযোগে অচিন্ত্যের কাছে পেশ করায় বিচারক না-কি রায় দিয়েছিলেন যে মতটা তাঁর সম্পূর্ণ অনুমত, তবে সে-রায়ের কোনো প্রামাণ্য প্রতিলিপি দেখাতে পারবো না। শুধু বলে রাখি যে, আর একজন ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে অনুরূপ স্বীকারোক্তি শুনেছি।

ধর্মাবতার শব্দের ব্যাখ্যা করতে গেলে স্মরণ রাখা উচিত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :

'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। এখানে 'যুগে যুগে' মানে 'সব সময়ে', অর্থাৎ 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি'। ধর্মস্থীয় বিচার কার্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মসংস্থাপন। সুতরাং বিচারের সময়ে বিচারকের মনে স্বয়ং ভগবান অবতরণ করুন এইটাই সমীচীন প্রার্থনা।

Temple chambers-এর নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ে আমি অজ্ঞ, তবে "Temple মানে মন্দির, এ সরল সত্যটি মেনে নিলে প্রমথনাথের দেবতুল্য স্বভাব সহজে বোঝা যায়। দেখেছি, সেখানে তিনি সুখাসীন—অর্থাৎ আরাম-কেদারায় অর্ধ-শয়ান—এমন সময়ে কামরায় এলেন একজন কর্মচারী একরাশ খাতাপত্র নিয়ে, আর এসেই অতি-ভক্তিসহকারে প্রমথনাথের সুপায়ে হাতদিয়ে প্রণাম জানালেন। খাতা-পত্র না দেখেই উনি সই করে দেওয়ায় আমার মনে ভয় হল, যদি হিসেব নিকেশে আমলাদের কোনো ফাঁকিবাজী থাকে! শঙ্কাটি নিভৃতে নিবেদন করবামাত্র উত্তর পেলুম : —তা কি হতে পারে? একজন লেখে জাবদা, একজন রোকড়, আরও একজন পরীক্ষা করে দেখে কোনো গরমিল আছে কি-না।

বুঝলুম, ওঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমলাবর্গের মধ্যে দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত সম্ভবপর। এভাবে আমলা-তন্ত্রে নির্ভরশীল চৌধুরী মহাশয়ের চেম্বারে সবুজ-পত্রের প্রুফ-সংশোধন কার্য চলতে ভাল। ওঁর মেজদাদা জে চৌধুরী সম্পাদিত Calcutta Weekly Notes-এর ছাপাখানা থেকে সবুজপত্র ছাপা হয়ে বেরোতো। এই দুই ভাইয়ের কেউই ব্যারিস্টারীতে বিশেষ রোজগার করেননি। কিন্তু একই প্রেসের মারফতে দুজনে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার সার্থকতা সমান, এ-কথা বলা যায়, কারণ একজন পেয়েছিলেন প্রধানত অর্থ আর একজন প্রধানত মান। দুজনেরই বিদ্যা সমান। অর্থকরী হয়েছিল কেননা অর্থ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। একটির তত্ত্বাবধান করেন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ, অপরটির হিসেব রাখেন কেবল চিত্রগুপ্ত। মানব-সমাজে প্রথম প্রকার অর্থের মূল্য সর্ব-জন-স্বীকৃত, দ্বিতীয় প্রকার অর্থের মূল্য যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। এটা জোটা-ভুটির মধ্য না গিয়ে মোটা-মুটি মেনে নেওয়া যায়; তবে প্রশান্ত-চিত্তে স্ট্যাটিস্টিকস্-এর অভাবে এ-সিদ্ধান্ত নির্মল রূপে প্রতিভাত হবে কিনা সন্দেহ।

চেম্বারে চৌধুরী সাহেব সাহেবী পোশাক পরেই থাকতেন, যেমন ব্যারিস্টারেরা পরেন। প্রভেদ ছিল শুধু পাদুকায়; কিন্তু-কাঁচ

শু বা বুটের বদলে তিনি পায়ে দিতেন পাম্প-শু। শোনা যেত যে ইংরেজরা নাচঘরে এরকম জুতো পরে থাকেন। কিন্তু তাঁদের নৃত্য-কর্মপদ্ধতি তখন আমার প্রত্যক্ষ দর্শনের বহির্ভূত। ছেলেবেলায় আমরাও পাম্প-শু পরেছি, তবে সেটা ধুতির সঙ্গে, পায়ে পাউডার লাগিয়ে। পুরুষরা তখন মুখে পাউডার মাখতে চাইতেন না। স্বদেশী আন্দোলনের পর শুঁড়-ওয়ালা লপেটা-জুতো পাম্প-শুর স্থান অধিকার করেছিল। ধুতির সঙ্গে পাম্প-শু পরার রেওয়াজ নাকি শুরু করেন আমার এক জ্যেঠামশায়, যাঁর পিতা নবীনকৃষ্ণ বোস ষোড়শ-বর্ষ বয়স্ক প্রমথনাথের হাতে হরিদাসের গুপ্তকথা দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে। জ্যেঠামহাশয় আমাদের বাড়িতে যে-ঘরে থাকতেন সেই ঘরের লাগাও উত্তর বারান্দায় বসে এখন লিখছি।

এ-বারান্দার Northern light শিল্পীদের বড় প্রিয়। শিল্পী ধীরেন শীল (এখন আজমীরে শিল্প শিক্ষক) এবং শিল্পী অশোক গুপ্ত (সুনীল পালের সহকর্মী) এই বারান্দাটাকে স্টুডিওরূপে ব্যবহার করতেন। শিল্পী না হয়েও এ-আলোর [illegible] অনুভব করি এতটা যে বছর-কয় [illegible] একটা গানই লিখে ফেলেছিলুম এইখানে বসে। সেই অক্ষম রচনা কোনো গানের বইয়ে স্থান পাবে না, [illegible]র একটা অনুভূতিকে প্রকাশ করবার প্রয়াস তাতে ছিল, তাই এই প্রবন্ধের মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে হয়তঃ—

সুর—মিশ্র তাল—আড়খেমটা

ওগো, সাঁঝের আলো!
একটুখানি দাঁড়াও তুমি দাঁড়াও,
ওগো, সাঁঝের আলো।
তোমায় বড় লাগছে ভালো,
মধুর হাসি ছড়াও—
ওগো সাঁঝের আলো!

ভাবছি বসে পথের ধারে,
লোক চলেছে সারে সারে,
কোন্ অজানা অন্ধকারে
তাদের ফেলে পালাও?
ওগো, সাঁঝের আলো
একটুখানি দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও।

রাগ করে কী হলে রাঙা?
না, অভিমান, যায় ত ভাঙা,
জলের মাঝে পেলুম ডাঙা,
হই না তাতে চড়াও।
ওগো, সাঁঝের আলো!
একটুখানি দাঁড়াও, তুমি দাঁড়াও।

নিঠুর তুমি, প্রেমের বাণী
অকাতরে তুচ্ছ মানি
নেশায় নিশার কানাকানি
মন্তরে ঘুম পাড়াও।
ওগো, সাঁঝের আলো!
স্বপ্নে এসে দাঁড়াও,
তুমি দাঁড়াও॥

আমার যে-গল্পকে প্রথমবাবু তাঁর ১৩।১২।১৬ তারিখের চিঠিতে তারিফ করেছিলেন "খাসা হয়েছে" বলে, সে-গল্পের নাম "বিয়ের সম্বন্ধ"। নিজের বিয়ের সম্বন্ধ আশ্রয় করেই গল্পটি কল্পিত, তাই সঙ্কোচ বোধ করেছিলুম নিজের নামে প্রকাশ করতে। প্রমথনাথ চৌধুরী ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র', কেননা ভূপেন্দ্র ছিল তাঁর রাশ-নাম আর মৈত্র ছিল তাঁর বারেন্দ্র পদবী। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি ছদ্মনাম নিলুম 'ভবতারণ সরকার', কারণ ভবতারণ আমার রাশ-নাম আর সরকার ছিল পূর্বপুরুষের পদবী। সবুজপত্রে যখন এ-নামে গল্পটি বেরোলো, প্রথমবাবু মজা করে আমায় লিখলেন ২৫।১।১৭ তারিখে: "এবারকার সবুজপত্র দেখেছ কি? ভবতারণ সরকার নামে একটি নূতন লেখকের একটা লেখা বেরিয়েছে। পড়ে কি রকম লাগলো আমাকে জানিয়ো"। উনি কিন্তু স্বয়ং একটু বিপাকে পড়েছিলেন এই ছদ্মনাম ছাপিয়ে। কলকাতার কোনো ইস্কুলের (বোধহয় কেশব একাডেমীর হেড মাস্টারের নাম ছিল ভবতারণ সরকার। শুনলাম, তিনি তখন মধ্যবয়স্ক এবং অকৃতদার। অনেকে ভেবেছিলেন "বিয়ের সম্বন্ধ" গল্পটা তাঁরই লেখা। গল্পের মধ্যে প্রগল্ভতার মাত্রা এত বেশী যে ইস্কুলের হেডমাস্টারের পক্ষে সেটাকে অঙ্গীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ স্বাভাবিক। কোনো জ্যাঠা ছেলে বললেই হল: স্যার, সবুজপত্রে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ গল্পটি পড়লুম; ও-সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান কত গভীর! সে-ইস্কুলের অন্য মাস্টাররা এর চাইতে খোলা ভাষায় হয়ত বলে থাকবেন যে, ভবতারণবাবু বিয়ের সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন নন, নিশ্চয়ই। ইত্যাকার ইঙ্গিতে সন্তপ্ত হয়ে তিনি প্রমথবাবুর কাছে পত্রদ্বারা দুঃখ প্রকাশ করেন। পত্রোত্তরে তাঁকে জানানো হয় যে গল্পের লেখক নিজের নাম গোপন রাখবার জন্যে 'ভবতারণ সরকার' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছে। এবং সে-লেখকের ধারণায় আসেনি যে ঐ নামে পরিচিত বাস্তবিক কেউ আছেন। আজকের দিনে গোপন করার প্রয়োজন নেই, কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লজ্জা কমে যাচ্ছে, তাছাড়া কন্যাদান-রীতির আজ মুমূর্ষু অবস্থা। পাত্রীরাই পাত্র নির্বাচনে পটীয়সী হচ্ছেন। সুতরাং এখন আমি স্বয়ং-বর হতে চাইলেও কোনো সুন্দরী আমায় মালা দেবে এ-আশা করতে পারি না।

গল্প লেখা কার্যে আমি বড়ই কাঁচা, কেবল গল্প করা আমার ধাতে কিছু সয়। গল্প পাঠেও আমি তাদৃশ অনুরক্ত নই। ছোট গল্প পড়তে পারি, বড় উপন্যাসে ধৈর্যচ্যুতি হয়, আমার মনে তার ঘটনা-পরম্পরার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

বাপ্-ঠাকুরদার এ-দোষ ছিল না, তাঁরা অনায়াসে বড় বড় নভেল গিলে খেয়ে ফেলতেন—আর হজমও করতেন। পিতামহের মনের খোরাক জোগাত মহাভারত, রামায়ণ, আরব্য-উপন্যাস, স্কট, ডিকেন্স, বালজাক, দ্যুমা, জ্যুলে ভার্ন এবং সর্বোপরি শেকস্‌পীয়র আর ভারতচন্দ্র। নেপোলিয়নের জীবনী নিয়ে যত বই বেরিয়েছিল প্রায় সবই তিনি পড়েছিলেন। Alison's History of Europe নামক বৃহদাকার ইতিহাসটিকে বারম্বার পাঠ করতে রত দেখেছি ঠাকুরদাদাকে। একদিন ঐ বইয়ের একটা পাতা খুলে তিনি আমায় দেখিয়ে বললেন : পড় কি লেখা আছে—Such was the great battle of Luchisini—অর্থাৎ 'লুচি' আর 'চিনি'।—সরস ব্যাখ্যা, স্বীকার করতে হয়। বাল্যকালে জিওগ্রাফিতে একটা নাম পড়েছিলাম —Maracaybo; সেটা যে 'মেরে খাইব' এই বাংলা বুলির রূপান্তর হতে পারে, এ-ধারণা না থাকলেও আমরা ঐ—স্থানকে 'মেরে খাইব' বলতুম। কৈশোরে ইংরেজী Etymology শব্দটির অর্থ বোঝাবার ছলে আমার মাস্টারমশায়ের কাছে কান-মলা খেয়েছিলুম, কেননা তিনি কানের দিকে হাত নিয়ে গিয়ে বললেন : ইটি-মলো-জী!

এর বহু বৎসর পরে, ১৯৩০ সালে যখন আফ্রিকায় যাই, সেখানে রেলের টাইম-টেব্‌লে একটা স্টেশনের নাম দেখেছিলুম Kigoma; উচ্চারণে দাঁড়ায় কিগো মা! আসল কথা, মার কোলে বসে যে-ভাষা শিখেছি, সেই ভাষার মাধ্যমেই আমরা সব শিক্ষা পেতে ইচ্ছে করি, তাই বিদেশী শব্দের মধ্যে যে-টুকু মাতৃ-রূপ খুঁজে পাই সেটুকুকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে ভাল লাগে। লজিকের কচ্-কচি কেবল কাঁচ মনকে পাকিয়ে দেয়, আর তর্কের আমলে এলে অনেক চারু-বাক্য বৃথা বাগ্-বিতণ্ডায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

গল্প বলা একটা আর্ট। সে-আর্টেও আমি আদৌ পারদর্শী হতে পারিনি। অথচ ঠাকুরদাদা রোজই সন্ধ্যের পরে নাতি-নাত্নীদের নিয়ে বস্‌তেন আর অনর্গল গল্প বলে যেতেন। শুনেছি ঢের, কিন্তু মনে আছে অল্প। একদিন বর্ণনা দিচ্ছেন রাবণের খাওয়ার : মন্দোদরী সঙ্গে খাওয়াচ্ছেন রাবণকে—পঞ্চাশ ব্যঞ্জনী-ভাত।

—এটা কি?

—ওটা উচ্ছের শুক্ত (ঋগ্বেদের সূক্ত নয়); তার পাশের বাটিতে মোচার ঘণ্ট।

—কী? Moses Ghent? আর ওটা? ......নিরামিষ তরকারির তালিকা লম্বা হয়ে যাচ্ছে দেখে বড়দিদি অধীরভাবে বলে উঠলেন :

—আচ্ছা রাজাদাদা, রাবণ কি কেবল নিরামিষ খেতেন?

—আরে, তা কেন? প্রথমে ত নিরামিষ খেতে হয়। তারপর শোন : রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারী—

—রাবণ রাক্ষসের রাজা, তিনি মাংস খেতেন না?

—খেতেন বৈকী। তারপর : কোফ্‌তা, কোর্মা, কাবাব, দোপেঁয়াজী......।

এতক্ষণে দিদির চমক ভাঙ্‌ল। ওগুলো ত' মুসলমানী রান্না। রাবণের সময়ে মুসলমানরা কোথা?

—এঃ, তোরা ভুল করছিস্। মুসলমান ধর্ম তখনো সৃষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু রাবণ যে ছিলেন সেকালের বাদ্‌শা। বাদ্‌শার খানার মধ্যে কোফ্‌তা, কোর্মা, কাবাব থাকবে না?

আহারের শেষ পর্যায়ে মিষ্টান্নের ফর্দ—সন্দেশের মধ্যে বাগবাজারের কস্তুরী। সিমলের রাতাবী, জনাইয়ের মনোহরা সহজেই এসে গেল।

প্রশ্নোত্তর চল্‌ল—

—লেডিকেনি ছিল না?

—নিশ্চয়ই ছিল।

—কিন্তু এই যে সেদিন বললেন, লেডি ক্যানিং-এর নাম থেকে লেডিকেনির সৃষ্টি?

আরে সে ত' নামটা মাত্র!

সকলেই একটার পর একটা নিজের প্রিয় মিষ্টান্নের নাম করে গেল, রাবণের পাতে সেটি দেওয়া হয়েছিল কিনা তাই শোনবার সদুদ্দেশ্যে। সদুত্তর এল সরাসরি—হ্যাঁ, হয়েছিল প্রত্যেকটি। আমার প্রিয় কৃষ্ণনগরের সর-পুরিয়াও সেইসঙ্গে রাবণের ভক্ষ্য-ভোজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করল।

এখন ভাবি মন্দোদরী নামের মানে কি এ হতে পারে না যে তাঁর উদর-পূর্তির ভাগ্য মন্দ? বাঙালী মেয়েদের মতন তিনি যদি স্বামীর পাতে খাওয়া অভ্যাস করে থাকেন, তাহলে তাঁর উদরাময় হবার সম্ভাবনা ছিল। ফলে, ক্ষুধা-মান্দ্য, সুতরাং তাঁর নাম মন্দোদরী হয়েছিল। কিম্বা দশানন দশ মুখে রাক্ষসের মতন খাওয়ার পর যা তাঁর পাতে পড়ে থাকত, তা পেট ভরার পক্ষে এতই সামান্য যে মন্দোদরীর নাড়ী শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা!

এমন বে-পরোয়াভাবে ঐতিহাসিক গবেষণা করলে অনেক অদ্ভুত "তথ্য" পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে সব ধোপে টিঁক্‌বে না। শুধু একটা কথা এ-প্রসঙ্গে বল্‌তে চাই। রাবণের যে ভোজন-বর্ণনা ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিলুম তা থেকে কি বোঝা যায় না, ঐ ভাবেই আমাদের কাছে রামায়ণের মহাভারতের গল্প প্রাচীন কাল থেকে পৌঁছেচে? কথকরা যুগের পর যুগ ধরে গল্পচ্ছলে ইতিহাস শুনিয়ে আসছেন। শ্রোতার মন আকৃষ্ট করতে গেলে যুগোপযোগী কথকতা চাই। এই

জন্যে রামায়ণ মহাভারতাদিতে কত কথাই স্থানলাভ করেছে যা, রামের বা অর্জ্জুনের সময়ে কল্পনা করাও যেত না। কিন্তু সে-সব সংযোজনাকে সত্যের অপলাপ বলা অনুচিত, কারণ মূল সত্যটিকে লৌকিক চিত্তে অঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে ঐ-সব সংযোজনা সৃজন করা হয়েছিল। "বুঝে লোক, যে জানো সন্ধান"—এ উপদেশ শিরোধার্য করে নিলে অনুসন্ধিৎসুরা এখনো বুঝতে পারবেন, কোন্‌টা মূল আর কোন্‌টা ফুল, কোন্‌টা ডাল আর কোন্‌টা পাতা।

এবারে গল্প-বলা সম্বন্ধে এত কথা কইলুম, তার কারণ অত্র-সংযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর দুখানি পত্রে শরৎ চাটুয্যের নাম আছে। তিনি ছিলেন গল্প-লেখা ও গল্প-বলা এ-দুয়েতেই ওস্তাদ—মিথ্যের রাজা বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের মিথ্যা-প্রিয়তাই হচ্ছে শিল্পীদের আশ্রয়স্থল। ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট চরিত্র সবই কাল্পনিক, এটা আমরা জানি, তবুও উপন্যাস পড়ি। কাব্যামৃতরসাস্বাদ যাঁরা করেছেন তাঁরা জানেন যে, কবির কল্পনা অমৃত-রসের উৎস। চিত্রশিল্পে ভাস্কর্য-শিল্পেও বাস্তব সত্য কাল্পনিক মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আমাদের চোখে দেখা দেয়, সেখানেও রসের ভাড়ার। সুতরাং বঙ্কিম-বাবু, শরৎবাবু যে পরিমাণে রস পরিবেশন করেছিলেন সেই পরিমাণে তাঁদের আমরা আদর করতে বাধ্য। সে-রসে সত্য-মিথ্যার সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী।

আশ্চর্যের বিষয় শরৎ চাটুয্যে আর হেরম্ব মৈত্র (যাঁর সত্যপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত) ঐতিহাসিক সত্য, এবং সেই সত্যকে অবলম্বন করে আমি একটা গল্প লিখি "ধন-সভায় একদিন", যেটা ১৩৬৩ সালের "হোমশিখা" পত্রিকার পূজো সংখ্যায় ছাপা হয়। সবুজপত্রে বিয়ের সম্বন্ধ বেরোবার ৪০ বৎসর পরে আমার এই দ্বিতীয় গল্পটি লেখা। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাংলায় গল্প রচনা করার চেষ্টাও করিনি, কারণ প্রেরণার অভাব। এখন দেখছি, ঐ দুটো গল্পেই বিয়ের সম্বন্ধ করার কথা রয়েছে, হয়ত (আবার Mendelism!) এই কারণে যে ঠাকুরমা বিয়ের সম্বন্ধ করতে ভাল-বাসতেন এবং তাঁরা মুখে B. Sc কথাটিকে বহুবার 'বিয়ে-শ্রী' রূপ ধারণ করতে শুনেছি।

শরৎবাবু শুধু গল্পে মেতে থাকতেন না, তাঁর সঙ্গীতানুরাগও ছিল যথেষ্ট। তাই প্রমথবাবুর ১।২।১৭ তারিখে লেখা চিঠিতে আমরা সংবাদ পাই যে ও'র সঙ্গে একজন গায়কও আসছেন কমলালয়ে-সবুজ সভার আসরে। দুঃখের বিষয় সেদিন আমি চিড়িয়াখানায় যাবার জন্যে আগে থেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় সে-আসরে যোগদান করতে পারিনি। তবু সুর শুনিনি, একথা বলাও উচিত হবে না। প্রাণীজগতে সুরেলা গলা পাওয়া যায়, বিশেষত চিড়িয়াদের মধ্যে, যদিচ 'ষড়জ-সংবাদিনী কেকা', এ-উক্তির যথার্থ প্রমাণ করতে রাজী নই। ষড়াননের বাহন ময়ূর (মতান্তরে মোরগ), এই সংবাদ দেবার জন্যে কেকার দরকার হয়েছিল কি-না তাও আমার জানা নেই। তবে কেকার চেয়ে কুহুর মিষ্টতা যে বেশি এ-সত্য অবি-সংবাদিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' নামকরণেই কুহুর প্রাধান্য প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের গান "এ পারে মুখর হল কেকা ঐ ওপারে নীরব কেন কুহু হায়" সে-সত্যকে অনবদ্য-ভাবে আমাদের শ্রুতিগোচর করে। এখনও এখানে বসে শুনছি কোকিলের ডাক, যেন সবুজপাতার ডাকের সঙ্গে সে গলা মেলাতে চায়!

ময়ূরের পুচ্ছ সুদৃশ্য কিন্তু কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য নয়; অপরপক্ষে কোকিলের স্বর অতি মধুর, কিন্তু তার রং কালো হওয়ায় তাকে রূপবান বলা যায় না। প্রসঙ্গত প্রমথবাবুর একটি শ্লেষের কথা বলি: কোনো সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়েছিল একজন ধনীসন্তানের, যার রং কালো কিন্তু মুখশ্রী ভালো। ও'র অন্দর-মহলে আলোচনা চলছিল, পাত্রটি পাত্রীর উপযুক্ত কিনা। মনুসংহিতায় পাঠ করি:

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

আজও বোধহয় এ-মন্তব্য মেনে নেবে সমগ্র মানব সমাজ। কিন্তু সেদিন দু দল মহিলা খুব তর্ক করছিলেন। একদল বললেন, টাকা থাকলে কি হয়? রং যে কালো। আর একদল প্রবাদ-বাক্য আওড়ালেন—নেকালে ভোকালেই ঘর, আর সাজালে গোজালেই বর। এমন সময়ে প্রমথবাবুর সেখানে আবির্ভাব। একজন বলে উঠলেন: ভালই হয়েছে, তুমি এসেছ। আমাদের মীমাংসা করে দাও।

উনি মীমাংসা করে দিলেন যে বর রূপবান না হলেও রূপোবান ত বটে!

এরপর মহিলাদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল; তাঁরা হাসিমুখে সন্ধি স্থাপন করলেন।

অত্রসহ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের তিন-খানি পত্র সংযুক্ত করা গেল:—

১৬

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৫।১।১৭

কল্যাণীয়েষু,

এবারকার সবুজপত্র দেখেছ কি? ভবতারণ সরকার নামে একটি নতুন লেখকের একটা লেখা বেরিয়েছে। পড়ে কি রকম লাগল আমাকে জানিয়ো।

আসছে রবিবারে বিকেলে আমার ওখানে আমাদের বৈঠক বসাচ্ছি, কেননা, সেদিন সরস্বতীর ভাসান। জানই ত সমালোচকদের মতে আমরা সরস্বতীর পুজো করছি নে, তাঁকে শুধু ভাসিয়েই দিচ্ছি—সুতরাং ঐ দিনটাই আমাদের সভা বসাবার ঠিক দিন।

এবার নভেলিস্ট শরৎ চাটুয্যে উপস্থিত থাকবেন, এইরূপ ভরসা দিয়েছেন, তবে না এলে বিশ্বাস নেই। তবে আশা করছি তোমাদের সেদিন ভাল গান শোনাব। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

পুঃ—সিংহকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

১৭

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১।২।১৭

কল্যাণীয়েষু,

আসছে শনিবারে শরৎ চাটুয্যে মহাশয় একটি উঁচুদরের গাইয়েকে সঙ্গে করে এখানে আসছেন। মণ্টু[1] তো' বলে কলকেতায় amateur-এর মধ্যে সে ভদ্র-লোকের জুড়ি গাইয়ে আর নেই। তোমরা এসে গান শুনলে হয়ত খুসী হবে। সেদিন ল' কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে আমার একটু দেরি হবে। সুতরাং ছটার কাছাকাছি এসো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

১৮

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১৫।২।১৭

কল্যাণীয়েষু,

এবারকার সবুজপত্রের নূতনত্বের ভিতর তাতে আমার কিম্বা রবিবাবুর একটি লেখাও নেই—সব তোমাদের। নূতন লেখকদের দু-একজন ছাড়া আর সবাইকে তুমি চেনো। লেখাগুলো কিরকম লাগল, জানতে ইচ্ছে। আসছে শনিবার বিকেলে আমার ওখানে আসছ তো—না চিড়িয়াখানায় যাবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[ক্রমশ]

১ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র সুসাহিত্যিক ও সুগায়ক শ্রীদিলীপকুমার রায়।

যবনিকা কম্পমান

অমিতাভ চৌধুরী

চার

ভর এপ্রিল মাসেও কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার চড়চাপড়। এক পায়ে দাঁড়ানো ঐ গাছের পাতায় চোলাই করা হাড়-কাঁপানো হাওয়া ঠকাস্ ঠকাস্ ধাক্কা মারছে হোটেলের জানালায়। একে ঠাণ্ডা, তার উপর পথশ্রমের ক্লান্তি। বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। হোটেলের ঘরে আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ে দাশের সংগেই গল্প জুড়ে দিলাম। দাশ টাইপ করার ফাঁকে ফাঁকে হুঁ-হাঁ করছিলেন।

"বুঝলেন, আপনারাতো রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি বলেই জানেন, কিন্তু তিনি যে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে কত বড় ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, তাতো জানেন না।"

"কি রকম?"—দাশের সকৌতুক জিজ্ঞাসা।

"চীন যে তিব্বত দখল করবে, তা তিনি অনেক আগেই বলেছিলেন।"

"কোথায়? কোন বইয়ে? তাহলে আমার এই রিপোর্টটায় লাগিয়ে দিই।"

"বইয়ে টইয়ে নয়, গানের মধ্যে।"

"যাঃ।"

"যাঃ বললেই হল? খুলুন 'গীতবিতান', বের করুন তিন শ' চৌদ্দশ পৃষ্ঠা; দেখবেন, একটি গানের পয়লা পঙক্তি হচ্ছে—"একদিন চীনে (চিনে) নেবে তারে, তারে চীনে নেবে—"

চীন যে তিব্বতকে নেবে, একথা কি সুন্দর স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন দেখুন তো।"

দাশ টাইপরাইটারে চটুল করাঙ্গুলির বিশ্রাম দিয়ে হো হো হেসে ওঠেন।

"দাঁড়ান, আরও বাকী আছে। তিব্বত যে 'অনাদরে কুণ্ঠিতা' রয়েছে, তাও উল্লেখ করেছেন। এবং বলছেন, "সারে সাথে নবারুণ আলোকে, এই কালো অবগুণ্ঠন'—নয়া-চীনের নবারুণ আলোকে অবগুণ্ঠনবতী তিব্বতের লজ্জা যে ঘুচে যাবে, তাও পরিষ্কার বর্ণনা করে গেছেন। তারপরেও রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ব রাজনীতির ভবিষ্যদ্বক্তা বলবেন না?

দাশের আর এক দফা হাসির পালা। কিন্তু হাসির দমক মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘরের দরজায় টোকা। ঠক্ ঠক্ ঠক্। দাশের টেলিগ্রাম নিয়ে পিয়ন এসেছে। জরুরী টেলিগ্রাম। লণ্ডন থেকে ইউনাইটেড প্রেসের অফিস লিখছে, দলাই লামা নাকি তোয়াং হয়ে আসামের দিকে আসছেন এবং ভারতীয় পুলিস তাঁর সংগে দেখা করতে ছুটেছে।

টেলিগ্রাম বলে কি? তাহলে, তাহলে 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত সংবাদের সংগে মিলে যাচ্ছে! কিন্তু খবরটা সঠিক তো? দাশ ও আমি দুজনেই উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকি। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দলাই লামার ঠিকানা তাহলে পাওয়া যাচ্ছে।

এমন সময় কালিম্পং থেকে টেলিফোন এসে হাজির। প্যাট কিলেন নামে একজন মার্কিন সাংবাদিক জানাচ্ছে, পিকিং রেডিও ঘোষণা করেছে, দলাই লামা নাকি তোয়াং অভিমুখে রওনা হয়েছেন। তোয়াং? কোথায় সেই তোয়াং? দুজনেই ভাবছি এখ্খুনি ছুটে যাই তোয়াং।

পরদিন সকালে আপাতত দুজনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটি পলিটিকাল অফিসার আপ্পাসাহেব পন্থের বাড়িতে। গিয়ে দেখি, বিদেশী কাগজের আরও কয়েকজন ইতিমধ্যে হাজির হয়েছেন। আমাদের সকলেরই "আঁখি রইল 'পন্থ-পানে' চাইয়া।"

খানিক পর পন্থসাহেবের অফিসঘরে ঢুকলাম। দীর্ঘদেহ সুপুরুষ আপ্পাসাহেব পন্থ। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পদমর্যাদায় প্রচুর সুনাম কিনেছেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু

ফর্টহিলসে পূজ্যপাদ দলাই লামা : তাঁহার পাশে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের শ্রী পি এন মেনন

শিলিগুড়ি স্টেশনে দলাই লামার মাতা, ভগ্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা

হাসি ও আয়তনেত্রের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন।

আমাদের সকলেরই এক প্রশ্ন,—দলাই লামা আসামের দিকে আসছেন, পন্থসাহেব একথা জানেন কিনা। পন্থসাহেব নেতিবাচক উত্তর দিলেন। বললেন, "দেখুন, আমার পক্ষে বলা মুশকিল। ইয়াতুংয়ের দিকে এলে বলতে পারতুম। আসামের কথা, শিলং বা দিল্লীই ভাল বলতে পারে।

"কিন্তু কোথায় সেই তোয়াং?"

"দাঁড়ান দেখাচ্ছি।"

পন্থসাহেব আসাম-তিব্বত সীমান্তের এক অতিকায় মানচিত্র বের করলেন। দেখালেন তোয়াংয়ের অবস্থান। আসামের উত্তর সীমান্ত নে-ফার কামেং ডিভিশন, ভূটানের পূর্ব সীমান্ত ও তিব্বতের উত্তর সীমান্তে ছোট্ট এক বিন্দু ঐ তোয়াং—সারা পৃথিবী যার দিকে চেয়ে আছে।

তারপরের খবর সংক্ষিপ্ত। পরদিন অর্থাৎ তেসরা এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় সদস্যবর্গের (কম্যুনিস্ট বাদে) বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন, পূজ্যপাদ দলাই লামা গত ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় সদলবলে ভারত সীমান্তে পা দিয়েছেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কামেং ডিভিশনের তোয়াং এসে পৌঁছবেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর কামেং ডিভিশনের সদর দপ্তর বমডি-লা আসবেন। সরকারী লোকেরা তোয়াং যাচ্ছেন দলাই লামাকে স্বাগত জানাতে। কারণ, ভারত সরকার দলাই লামাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে সংকল্প করেছেন।

সারা ভারত জুড়ে হৈ-চৈ। সকলের মুখে দলাই লামা ছাড়া কোন কথা নেই। কালিম্পং, গ্যাংটকে তো মহোৎসবই শুরু হয়ে গেল। তাঁদের 'কল্যাণ প্রার্থনা' এতদিনে সার্থক হয়েছে। দলাই লামা নিরাপদে আছেন। এখানকার বৌদ্ধজগতে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি থাকতে পারে।

কল্পনা করতে পারি, কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে চব্বিশ বছর বয়সের এই তরুণ-ভগবান স্বেচ্ছা-নির্বাসনের পথ বেছে নিয়েছেন। শুধু দুর্গম নয়, অনিশ্চিত সেই পথ। এক অস্বস্তিকর বিভীষিকার করালগ্রাস থেকে মুক্তি কামনায় চিরকুমার ব্রহ্মচারী বাসভূমি পরিত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছেন ভারতের পথে—ভগবান তথাগতের দেশের পথে। বৃদ্ধামাতা, তরুণী ভগিনী, কিশোর ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত অনুচর সংগে নিয়ে তিনি ফেলে এসেছেন লাসার আধ্যাত্মিক বৈভব, সর্বজনের শ্রদ্ধাসম্মান। ভারতের মাটি তাঁকে ডাক দিয়েছে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

দুর্গম হিমালয়ের উপত্যকায় খাম প্রদেশের দুর্ভেদ্য অরণ্যের বুকে আত্ম-গোপন করে আকাশচুম্বী চড়াই ডিঙাবার সময় কিংবা মুখর তরংগিনী সাংপো নদীর উপলউচ্ছল স্রোতধারা অতিক্রমের সময় হয়ত তাঁর মনে পড়েছে মাত্র কিছুদিন আগেই নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব ও হিংসায় উন্মত্ত লাসার কথা। বিদ্রোহী তিব্বতী ও চীনা মুক্তিফৌজের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে। তাঁরই গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ নরবুলিংকার চূড়ো গুলির আঘাতে ধুলোয় গড়িয়েছে। নিরস্ত্র বৌদ্ধভিক্ষুর পীত উত্তরীয় বুলেট-বিদ্ধ বুকের তাজা রক্তে রঙ-বদল করেছে। মঠে, সংঘারামে 'ওম মনি-পদ্মে হুম' মন্ত্র অর্ধোচ্চারিত থেকে গেছে। চারিদিকে শুধু হাহাকার, আর্তনাদ। তরুণাঘনের চিরমধুনিস্যন্দী বাণী কারও কানে গিয়ে পৌঁছয়নি।

তাই তিনি বুঝিবা ভেবেছেন, লোভ-জটিল, ঘোর-কুটিল সেই পথের চেয়ে শান্তির পথ, ভারতের পথ ঢের ঢের ভাল।

গোপনে অতি গোপনে হিংসোন্মত্তদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে ধ্বংসগত-প্রাণ দলাই লামা নিজেকে সঁপে দিলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে—ঠিক নয় বছর আগে তিব্বতের মাটিতে, চীনের আকস্মিক আক্রমণের সময় যেমনি দিতে চেয়েছিলেন। তখন কেউই বোধ হয় জানত না, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শীঘ্রই ঘটছে।

এই চতুর্দশ দলাই লামা নিয়ে আজ সারা পৃথিবী তোলপাড়। তিনি তিব্বতের শুধু রাজা নন, রাজার রাজা—স্বয়ং ভগবান।

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে চীনা প্রদেশ চিংঘাইয়ের আমদো গ্রামে কুকুনর হ্রদের কোল-ঘেঁষা এক দরিদ্র চাষী পরিবারে যে শিশুটি পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিল, সেই শিশুই একদিন পৃথিবীর বুকে আলোড়ন আনবে একথা কে জানত। দলাই লামা নিজেই বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন সেই অতীত ইতিহাসের কথা।

ত্রয়োদশ দলাই লামা মারা গেলেন ১৯৩৩ সালে। নূতন দলাই লামার আসনে কে বসবেন? এতো বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়, বুদ্ধের অবতারের মহামান্য আসনে বসতে হলে বহু লক্ষণ মেলা চাই। সেই লক্ষণ যে মানবশিশুর দেহে, আচরণে প্রকাশ পাবে, তিনিই হবেন ভবিষ্যতের পরম পূজ্য মহামান্য দলাই লামা।

ত্রয়োদশ দলাই লামা, যিনি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে চীনা আধিপত্যে উত্যক্ত হয়ে দার্জিলিং পালিয়ে এসেছিলেন, মৃত্যুর সময় পূবে হেলেছিলেন। মুখ্য লামারা ভাবলেন, তাহলে হয়ত নির্দেশ, পূবে যাও, সেখানে মিলবে নূতনের সন্ধান। রাজপ্রতিনিধিও আভাস পেলেন কিছু কিছু। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সোনার ছাদে মোড়া একটি তেতলা মঠ, সেখানে একটি শিশু।

১৯৩৭ সালে এক অনুসন্ধানী ভিক্ষুদল বেরিয়ে পড়ল নূতন দেবতার সন্ধানে। পূবের দিকে। সঙ্গে নিল ত্রয়োদশ দলাই লামার ব্যবহৃত নানা জিনিস। রাজ-প্রতিনিধির সেই স্বপ্নের অনুরূপ চিংঘাই প্রদেশের আমদো গ্রামে দেখা গেল সোনায় ছাদে মোড়া তেতলা মঠ। ভিক্ষুদল ভৃত্যের ছদ্মবেশে মঠে প্রবেশ করলেন। সেখানে থাকে এক চাষী পরিবার।

প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আড়াই বছরের এক ক্ষুদ্রশিশু পরম উৎসাহে কেড়ে নিল ত্রয়োদশ লামার উত্তরীয়। এবং শিশুকণ্ঠের কলকাকলিতে, কি আশ্চর্য, চীৎকার শোনা গেল—'সেরা লামা, সেরা লামা।'

ভিক্ষুদলের মনে আনন্দ ধরে না। এ ওর মুখের দিকে তাকান। সব লক্ষণই মিলে যাচ্ছে। ভৃত্যের ছদ্মবেশ, অথচ তাঁরা যে 'সেরা' মঠের লামা এই অবোধ শিশু জানতে পেরেছে, ত্রয়োদশ দলাই লামার পরিচ্ছদ চিনে নিতেও ভুল করেনি। এইতো পাওয়া গেছে তাঁদের বহু সাধনার ধন—ঈপ্সিতের সন্ধান। এইতো ভবিষ্যৎ দলাই লামা—রাষ্ট্রগুরু, ধর্মগুরু, ও ভগবান। আনন্দ সংবাদ দিতে তাঁরা ছুটে এলেন লাসায়।

১৯৩৯ সালে এলেন চারজন লামা। স্থানীয় চীনা শাসককে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে সপরিবার পরোমন্ত শিশুকে গোপনে নিয়ে এলেন লাসায়। রাজকর্মচারী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল অজ্ঞাত পল্লীর এক অখ্যাত শিশুকে দিলেন চতুর্দশ দলাই লামার রাজকীয় সম্মান। ১৯৪০ সালে অভিষেকও সম্পন্ন হয়ে গেল।

তারপর শুরু হল সাধনা—দীর্ঘ কঠিন সাধনা। রাজপ্রতিনিধি রাজ্য চালান। আর ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ও তত্ত্ব বিচারে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়। পোতালা প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে একাকীত্বের দিন কাটে। ধীরে ধীরে দলাই লামা সাবালক হলেন। নিজ হাতে নিলেন শাসন পরি-চালনার ভার।

দলাই লামা ১৯৫৬ সালে পাঞ্চেন লামাকে নিয়ে এসেছিলেন ভারত দর্শনে। তিনি আবার এসেছেন ভারতের মাটিতে। কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে।

বিশ্বের সংবাদ শিকারীরা : ফুট হিলসে ভিড় করেছেন; ফটোগ্রাফাররা দলাই লামার ছবি নিতে তৈরী

পাঁচ

কালিম্পঙে এসে দেখি, বিদেশী সাংবাদিকের দল তল্পিতল্পা গোটাচ্ছেন। দলাই লামার পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। এখন তাঁদের লক্ষ্যস্থল তোয়াং। কিন্তু সেখানে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। জঙ্গলের ভিতর শুধু পায়ে-হাঁটা পথ। আর আছে দুর্দান্ত দাফলা উপজাতির দৌরাত্ম্য। তাছাড়া সেখানে যেতে হলে ভারত সরকারের অনুমতিও দরকার। তাঁরা ঠিক করলেন, নে-ফার সদর দপ্তর শিলং কিংবা নিকট-বর্তী শহর তেজপুর পাড়ি দেবেন।

এক মুহূর্তে দেরি করার সময় নেই। ট্রেনে যেতে প্রায় দু দিনের ধাক্কা। তাঁরা ছুটলেন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের এজেন্টের কাছে। 'হেলিকাপটার পাওয়া যাবে?' 'কিংবা চার্টার করার বিমান?' এক্ষুনি দরকার।

এজেন্ট সকৌতুকে হাসেন। বলে কি এঁরা? এখন কোথায় মিলবে হেলিকাপটার আর চার্টার করার বিমান? তার চেয়ে বরং চলে যান কলকাতা; সেখানে চেষ্টা করে দেখুন। কালিম্পং থেকে কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তাই সই। হিমালয় হোটেল খালি করে প্রায় দু ডজন সাংবাদিক এলেন কলকাতা। সেখান থেকে কেউ শিলং, কেউবা তেজপুর। কালিম্পং গ্যাংটকের টেলিগ্রাফ অফিসের বাবুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, হংকং, টোকিও থেকে অজস্র সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান এসে ভিড় জমালেন তেজপুরে। আসামের এই অখ্যাত শহর সদাবাস্ত সংবাদ শিকারীর চঞ্চলতায় মুখর হয়ে উঠল। পৃথিবীর সংবাদপত্রে তেজপুর শিরোনামায় বেরোতে লাগল দলাই লামার বহু খবর। দলাই লামা আর দলাই লামা। দলাই লামা ছাড়া দেশবিদেশের কাগজে আর কোন খবর নেই।

শহরে নেমেই এরা সাড়া জাগিয়েছেন। বিপুল অর্থের বিনিময়ে যাবতীয় ট্যাক্সি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভাড়া করেছেন, দু আনার চা খেয়ে একশ' টাকার নোট দোকানীর হাতে তুলে দিয়েছেন এবং টেলিগ্রাফ অফিসের কাউণ্টারে কাউণ্টারে শত সহস্র শব্দে ভরা গরম গরম খবরের তুফান ছুটিয়েছেন।

এঁরা বমডি-লা যাবার তাক করেন। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অগত্যা প্ল্যাণ্টার্স ক্লাবে আড্ডা জমান আর নূতন কিছু পাঠাবার প্ল্যান মক্স করেন। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই আছে ভেরউইর এলুইনের নে-ফা সংক্রান্ত একখানা প্রামাণ্য বই। তার থেকেই মালমশলা নিয়ে তোয়াং বমডি-লা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠান।

অনেকে আবার ছোট ছোট বিমান চার্টার

শিলিগুড়িতে ট্রেনের কামরায় দলাই লামা

করে প্রায় প্রতিদিনই দিল্লী-কলকাতা শিলং-তেজপুরে মাকু মারছেন। ঐরকম একটা বিমানের মধ্যেই একজন আবার ফটো ডেভেলাপ ও প্রিণ্টের জন্যে ডার্করুম খুলে দিয়েছেন। কেউ-কেউ নে-ফার নিষিদ্ধ অঞ্চলের উপর দিয়ে বিমান চালাবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। ডেলি মেলের নোয়েল বারবার তেজপুরে টেলিফোন করায় অসুবিধে দেখা দেওয়ায় প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ করে বিমানে জলপাইগুড়ি এসেছেন। লণ্ডনে ট্রাংক কল বুক করেছেন। কাজ সেরে তেজপুরে ফিরে গিয়েছেন।

কিছুদিন পরই অস্ট্রিয়া থেকে হাজির হলেন এসে হাইনরিখ হারের। 'তিব্বতে সাত বছর' বইয়ের লেখক; দলাই লামার বিশেষ বন্ধু। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী যুদ্ধের সময় দেরাদুনের জেল থেকে পালিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে লাসা যান। ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণের সময় আবার লাসা থেকে পালান।

হারেরকে বহু টাকা দিয়ে ডেলি মেল নিয়োগ করেছে। তার সঙ্গে এসেছেন খ্যাতনামা সাংবাদিকা ডোনা চার্চিল। হারের তথ্যাদি সরবরাহ করেন আর চার্চিল 'জ্বালাময়ী ভাষায়' পাতার পর পাতা টাইপ করে যান।

সমতল ভূমিতে দলাই লামা কবে নামছেন, তারই প্রতীক্ষায় সারা তেজপুর উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তিনি এখনও আছেন তোয়াংয়ে, দীর্ঘ পদযাত্রার ক্লান্তির অবসানে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের পুরোনো তোয়াংয়ের এই বৌদ্ধমঠ। পাহাড়ের চূড়োয় বহু বৌদ্ধভিক্ষুর উপ-নিবেশ। প্রায় হাজার ত্রিশেক লোক থাকে তোয়াংয়ে। তার মধ্যে মোনপাজ উপ-জাতিরাই প্রধান।

তোয়াং থেকে বমডি-লা প্রায় ৭০ মাইল। পায়ে হেঁটে আসা ছাড়া কোন উপায় নেই। কামেং ডিভিশনের পলিটিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন হরমান্দার সিং তোয়াং গেলেন দলাই লামাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে।

দলাই লামা তোয়াংয়ে তিন দিন বিশ্রামের পর ৮ই এপ্রিল বমডি-লা রওনা হলেন। তোয়াং গুম্ফায় প্রার্থনা সেরে দু দলে ভাগ হয়ে ঘোড়ার পিঠে ভারতের পথে অগ্রসর হলেন দলাই লামা।

দুর্গম গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে পাঁচ দিন হাঁটতে হাঁটতে ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় পৌঁছলেন বমডি-লা। পথে ডিরাং জং সানজং যুকমাডং রাহুংয়ে নিয়েছেন বিশ্রাম। বমডি-লা থেকে খেলাং হয়ে ৬০ মাইল দূরে ফুটহিলস। ১৮ই এপ্রিল দলাই লামার দল এসে পৌঁছল তেজপুরে।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পি এন মেনন এসেছেন বমডি-লা। জয়েণ্ট সেক্রেটারি সমর সেনও এলেন তেজপুরে। দলাই লামা ট্রেনে ২১শে এপ্রিল পৌঁছবেন মুসৌরী। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ২৪শে এপ্রিল তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

স্টেনগানসহ আসাম রাইফেলের এক বাহিনীর আড়ালে দলাই লামার জীপ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে পৌঁছল ফুটহিলস। পিছনে বিরাট কনভয়।

বিধিনিষেধের সমস্ত আইনকানুন উপেক্ষা করে কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে ক্যামেরাম্যানের দল প্রায় লাফিয়ে পড়লেন জীপের পর। সমতল ভূমিতে নামার পর দলাই লামার প্রথম চিত্র সকলেরই চাই। দলাই লামা স্মিতহাস্যে কাউকে নিরাশ করলেন না।

তেজপুরে সম্বর্ধনাসভায় দলাই লামার বহু প্রত্যাশিত বিবৃতি পাঠ করা হল। সাংবাদিকদের সাইক্লোস্টাইল করা ইংরেজী কপি দেওয়া হল। সকলে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটলেন টেলিগ্রাফ অফিসে।

দলাই লামার এই বিবৃতি চমকপ্রদ। তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন, বিপ্লবী-দের জবরদস্তিতে নয়, স্বেচ্ছায় তিব্বত

ছেড়ে ভারতে এসেছেন। দলাই লামা আরও বললেন, চীনা কর্তৃপক্ষ ১৯৫১ সালের চুক্তি উপেক্ষা করে ক্রমান্বয়ে তিব্বতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন এবং তার ফলেই চীন-তিব্বত ১৭ দফা চুক্তি ব্যাহত হয়। ঐ চুক্তিতে তিব্বত পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ভোগ করবে বলে ঠিক হয়েছিল। চীন সরকারের চাপে পড়ে তিব্বত ঐ চুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

দলাই লামা বললেন, ১৭ই মার্চ, নরবুলিংগা প্রাসাদের উপর চীনারা মর্টার দিয়ে গুলীবর্ষণ করে। ঐ সংকটজনক অবস্থাতেই তিনি সপরিবারে লাসা ত্যাগে বাধ্য হন। উন্মুক্ত উদারতায় প্রসন্ন বাহু প্রসারিত করে ভারতবর্ষ তাঁকে আশ্রয় দেওয়ায় দলাই লামা ভারতবাসীকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

দলাই লামার সঙ্গে প্রায় ৯০জন লোক আছেন। সঙ্গে এসেছেন মা, এক বোন, এক ভাই ও অন্যান্য পরিজন। দুজন গৃহশিক্ষক, ভূতপূর্ব মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য, একজন প্রধান গৃহাধ্যক্ষ, তিনজন প্রধান পরিচালক, একজন গৃহাধ্যক্ষ, গন্দেন সেরা ও ড্রেপুং মঠের একজন করে প্রতিনিধি, অন্যান্য অফিসার ও ভৃত্যবর্গ। দলাই লামার বড় ভাই থনডুপ ছিলেন দার্জিলিংএ। তিনি ছুটে আসেন তেজপুরে। আত্মীয়স্বজনের ভিতর দলাই লামাকে বেশ হাসিখুশীই দেখায়।

বেলা দেড়টায় তেজপুর থেকে স্পেশাল ট্রেন ছাড়ে। আসাম, বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশের জনপদ অতিক্রম করে গাড়ি পৌঁছবে দেরাদুন। সেখান থেকে মোটরে মুসৌরী। দলাই লামার সাময়িক আবাসস্থল। [illegible] তার মধ্যে কয়েকখানি এয়ারকণ্ডিশন করা। দলাই লামার [illegible] তিব্বতী, ভারতীয়, ইউরোপীয় তিন রকমের খাবার রাখা হল [illegible]। আলিপুরদুয়ার হয়ে উনিশে এপ্রিল সকাল সাড়ে নটায় দলাই লামার ট্রেন পৌঁছল শিলিগুড়ি। সেখানে সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে।

ছয়

প্রায় দশ হাজার লোক এসে জড় হল শিলিগুড়ি স্টেশনে। তার অর্ধেকই প্রায় তিব্বতী, ভুটিয়া, লেপচা, নেপালী। কালিম্পং, দার্জিলিং, গ্যাংটক থেকে গাড়ি গাড়ি বোঝাই হয়ে তারা এসেছে। অনেকে এসেছে পায়ে হেঁটে। নর্থ স্টেশন প্ল্যাটফর্মের পিছনে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু এক মঞ্চ বানানো হয়েছে। দলাই লামা সেখানে দাঁড়িয়ে ভক্তদের দর্শন দেবেন, আশীর্বাদ করবেন।

রক্তবেরঙের পোশাক, ধূপের গন্ধ, প্রার্থনা পতাকার পতপত শব্দ, 'ওম মনি পদ্মে হুম' মন্ত্রোচ্চারণ ও তিব্বতী অর্কেস্ট্রার শব্দে গোটা স্টেশন গমগম করছে। দলাই লামা কখন এসে পৌঁছবেন তাঁরই জন্যে শুধু অধীর প্রতীক্ষা। ভীড়ের মধ্যে দেখা গেল, এভারেস্ট বিজয়ী বীর তেনজিংকে। দলাই লামা দর্শনে তিনি সপরিবারে এসেছেন।

পুলিসের সশস্ত্র পাহারা চারদিকে। বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকবার সাধ্য কারও নেই। সৌভাগ্যবান শুধু সাংবাদিকের দল আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশিষ্ট লোক। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের আই জি শ্রীহীরেন সরকার, ডি আই জি শ্রীপ্রসাদ বসু, আর ডি আই জি শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত তদারকিতে চরকির মত ঘুরছেন।

ইতিমধ্যে তেজপুর খালি করে দিয়ে বিদেশী সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যানের দল হুড়মুড় করে শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। এই সকল 'কটা চুল নীল চক্ষু কপিশ কপোলের' ভীড়ে 'যবন পণ্ডিতদের গুরু মারা চেলা' ধুতি পাঞ্জাবী পরা আমার মত দু একজন সাংবাদিককেও দেখা যায়। আনন্দবাজারের হয়ে আমি এবং আমাদের স্টাফ ফটোগ্রাফার শ্রীশম্ভুদাস চ্যাটার্জি এইখানে এঁদের পিছন পিছন আছি।

পুলিসের তিন বড় কর্তা দাঁড়িয়েছিলেন মঞ্চের এক কোণে। মিঃ গুপ্ত আমাদের দেখে বললেন, 'কি, বিদেশী কাগজগুলো তো আপনাদের টেক্কা মেরে দিল। খবরে, ছবিতে কাগজ প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছে।'

আমি বলি—'তা আমাদের কল্পনার দৌড় নিতান্তই পরিমিত। ওদের বিদ্যুৎগতি লেখনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সহজ কথা।'

মিঃ বসু এগিয়ে এসে বলেন, 'দিয়ে দিন না গিয়াংসের এদিকে ফাঁড়িতে চিয়াং কাইশেককে দেখা গেছে। বিশ্বস্ত গোপনসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশ থাকে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।'

আমি হাসতে হাসতে বলি—'ভুল বললেন, বরং লেখা উচিত, একটি নির্ভরযোগ্য গুজবে জানা যায় যে—'

আই জি মিঃ সরকারও আমাদের হাসির কোরাসে যোগ দেন।

খানিক পরেই সিকিমের মহারাজকুমার মহারাজকুমারী আর মহারাণী এসে হাজির। গাড়িতে গ্যাংটক থেকে সোজা এসেছেন। তাঁদের পেছন পেছন এসেছেন দেওয়ান শ্রীরুস্তমজী আর সস্ত্রীক পলিটিক্যাল অফিসার শ্রীআপ্পাসাহেব পন্থ। পন্থ আমাকে দেখে কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করলেন। সেদিনের পরিচয় ভুলে যাননি তাহলে।

চলনে বলনে অত্যন্ত সপ্রতিভ সিকিমের মহারাজকুমার! চমৎকার ইংরেজী বলেন। এসেই মুভি ক্যামেরা বগলদাবা করে ছবি তুলতে লেগে গেলেন।

এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি কি দিচ্ছেন দলাই লামাকে।

বললেন, তাঁর বাবা, মহারাজ অসুস্থ, তাই আসতে পারেননি। তাঁর হয়ে দেবেন একখানি প্রার্থনা পুস্তক, বুদ্ধমূর্তি আর স্তূপ।

'রেশমী উত্তরীয় 'খাদা' দেবেন না?'

'দেব বইকি? ওটা না দিলে চলবে কেন? তবে আমি যেটা দিচ্ছি ওর নাম 'খাদা' নয়, 'নাংজক'।'

'সেটা আবার কি?'

'খাদারই' পরিবর্ধিত সংস্করণ। বলতে পারেন এক্সট্রা লং 'খাদা'।

স্মিতহাস্যে বিদায় নিয়ে মহারাজকুমার ছুটলেন আবার ছবি তুলতে।

খানিকপর দলাই লামার আত্মীয়স্বজনেরা দার্জিলিং থেকে এসে হাজির দলাই লামার বড় ভাই থনডুপের স্ত্রী, বোন,

ভাইপো, ভাগ্নের দল—এসেই সিকিমের দেওয়ান রুস্তমজী আর পন্থ সাহেবের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। রুস্তমজী এসেছেন সিকিমী জাতীয়-পোশাক পরে। মাথায় জরীর টুপি, গায়ে ব্রোকেডের ফুল-হাতা জামা।

হঠাৎ সিকিমের মহারাজকুমার ছুটতে ছুটতে হাজির আমার কাছে। আমি এগিয়ে গেলাম,—

'বলতে ভুলে গেছি, দলাই লামাকে সিকিমের তৈরী এক বাক্স অরেঞ্জ স্কোয়াশ আমরা দিচ্ছি। গরমে তাঁর ভাল লাগবে।'

হাসতে হাসতে আবার চলে গেলেন মহারাজকুমার।

দলাই লামার স্পেশাল ট্রেন প্লাটফর্মে ঢুকল ঠিক সাড়ে নটায়। ট্রেন আসতেই কামরায় ঢুকলেন, পন্থসাহেব, সিকিমের মহারাজকুমার আর আই-জি হীরেন সরকার। আনুষ্ঠানিক প্রথায় উত্তরীয় বিনিময় হল কামরার ভেতরেই।

মিনিট দশেক পর দলাই লামা প্ল্যাট-

ফর্মে পা দিলেন। ভুল হল, বলা উচিত আবির্ভূত হলেন। অসংখ্য ক্যামেরার ফ্ল্যাস বালব চোখ ধাঁধিয়ে একসঙ্গে জ্বলে উঠল। স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দেওয়া পুষ্পস্তবক হাতে নিয়ে দলাই লামা এগিয়ে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়ালেন আমাদের সামনে।

দলাই লামার গায়ে খয়েরী 'বাকু', পায়ে বাদামী জুতো, চোখে চশমা। আর মুখে স্মিতহাসি। সারা দেহে ক্লান্তির কোন ছাপ নেই।

দলাই লামাকে নিয়ে যাওয়া হল মঞ্চের উপরে। পিছন পিছন এলেন দলাই লামার বুড়ী মা। আর ছোট ভাই নরি রিমপোচে, বড় ভাই থনডুপ আর ছোট বোন। দার্জিলিঙের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের কাছে পেয়ে অনেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

দলাই লামা মিনিট দুই দাঁড়ালেন মঞ্চের উপরে। তাঁর চরণে নিবেদিত অসংখ্য 'খাদা' ছুঁড়ে দেওয়া হল চারদিক থেকে। দলাই লামা নীচে নেমে বেষ্টনীর চারধারে ঘুরলেন এবং 'দলাই লামা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি অসংখ্য ধ্বনির মধ্যে আবার ঢুকে পড়লেন কামরার ভিতরে।

মাত্র কয়েক মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে এতদিনের উৎসাহ উত্তেজনার যবনিকাপাত হল। কিন্তু ভক্তদের জীবন সার্থক হয়েছে। জীবন্ত-বুদ্ধ ভগবান দলাই লামার দর্শন মিলেছে। দলাই লামার আশীর্বাদপূত একখানি শ্বেত উত্তরীয় আমার ভাগ্যেও মিলেছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দলাই লামার পিছন ঘুরে ঘুরে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছি। কামরার ভিতরে দু চারজন তিব্বতীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম। চেহারায়, পোশাকে, মাতব্বর গোছের যে দুজনকে মনে হল তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুখ পেলাম না। একতরফা আলাপ কাঁহাতক চালান যায়। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজি সব-কিছু মিলিয়ে আমার বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত অঙ্গভঙ্গির আশ্রয় নিই। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা, অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরং।' মাতব্বর ব্যক্তিদ্বয়ের শুধু আকর্ণ বিস্তৃত মৃদু হাসি নিয়েই ফিরে এলাম। হাত নেড়ে বোঝালেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না।

এবারে গেলাম কুলিগোছের দুজন তিব্বতীর কাছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, হাত পা নেড়ে আমি আর আমাদের ফটোগ্রাফার শম্ভুদা ওদের অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ফল হল না। এইটুকু মাত্র জানতে পারলাম, একজনের নাম সিনজে রাপতে, আর অন্যজন থাকে দ্রেপুং মঠে।

হঠাৎ দেখি, টেপ রেকর্ডার, মুভি ক্যামেরা বগলে এক বিদেশী সাংবাদিক একজন তিব্বতীর সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে দিয়েছে।

কে এই ভদ্রলোক?

এগোতেই চিনতে পারলাম। 'তিব্বতে সাত বছরের' লেখক হাইনরিখ হারের। এমন চমৎকার তিব্বতী হারের ছাড়া আর কে বলতে পারে?

'আপনিই কি হের হারের?'

হ্যাঁ, কেন বলুনতো?

আপনার লেখা বই পড়েছি। ওয়াণ্ডার-ফুল বুক।

ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়টাতো পেলাম না?

সাংবাদিক। আনন্দবাজারের প্রতিনিধি।

আনন্দবাজার জিনিসটা কি হারের বুঝলেন না। তার মনের ভাব আন্দাজ করে বললাম, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতিনিধি।

"ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড। গুড পেপার। দাঁড়ান, আরেক জনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। জানেনতো, ডেলি মেলের হয়ে আমি এসেছি। অস্ট্রিয়া থেকে আমাকে ওরা আনিয়েছে, আমার সঙ্গে এসেছেন ডোনা চার্চিল। আমি বলে যাচ্ছি, আর উনি ইংরেজিতে লিখছেন।'

তাকিয়ে দেখি, মাঝবয়সী নিরীহ গোছের এক ভদ্রমহিলা কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে টাইপরাইটার।

হারের বললেন,—'মিস ডোনা চার্চিল, আর— আর—

আমি নিজেই বলি—মিঃ চৌধুরী।

হঠাৎ সিকিমের মহারাণীকে দেখে হারের ছুটে গেলেন, জড়িয়ে ধরলেন মহারাণীর দু হাত।

সিকিমের মহারাজকুমারী ছিলেন আমার পাশে। শিলিগুড়ি স্টেশনের রেস্তোরায় মহারাজকুমারীর সঙ্গে আজই আমার আলাপ। বললাম, 'হারের সাহেবকে চেনেন না কি আপনারা?

বাঃ রে, চিনবো না কেন? তিনি যে আমাদের অনেকদিনের বন্ধু।—

এদিকে এক ঘণ্টা পর দলাই লামার স্পেশাল ট্রেন ছাড়ার হুইসিল বাজল: এবারে বিদায় নেবার পালা। দলাই লামা এসে দাঁড়ালেন কামরার খোলা দরজার সামনে। মুখে সেই পরিচিত স্মিত হাসি, হাতে নমস্কারের ভঙ্গি। জনতার অভি-নন্দন নিতে নিতে তিনি এগিয়ে চললেন পশ্চিমের দিকে।

প্ল্যাটফর্মের গণ্ডি পার হতেই দেখা যায় দূরে হিমালয়ের পাহাড়: শিলি-গুড়ি ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দলাই লামা নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন ঐ পাহাড়ের নীম, আর আকাশের নীলে মেশা উত্তরের দিকে।

হয়ত তাঁর মন চলে গিয়েছে গ্যাংটক, নাথু-লা, ইয়াতুং, ফাঁড়ি, গিয়াংসে ছাড়িয়ে লাসার দিকে। লাসা। তিব্বতের রাজধানী লাসা। দলাই লামার প্রিয় বাসভূমি লাসা। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী দলাই লামার ফেলে-আসা-দিনের অসংখ্য মধুর স্মৃতিতে ভরা লাসা সেই লাসা আজ দলাই লামার কাছে বিদেশ।

দারুণ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি কামনায় তিনি বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনের এই দুর্গম পথ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ইতিহাস তাঁকে কোথায়, কোনপথে টেনে নিয়ে যাবে? আবার কি ফিরে যেতে পারবেন তাঁর প্রিয় বাসভূমি লাসায়?

দলাই লামার মুখের স্মিতহাসি মুছে গেছে। চোখের কোণে বিষাদের কালো ছায়া। ট্রেন এগিয়ে যায়।

ট্রামে-বাসে

পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের সংগে ভারতের "উন্নততর সম্পর্ক" স্থাপিত হইলে উভয় দেশেরই মংগল হইবে।

বিশুখুড়ো বলিলেন—"উন্নততর সম্পর্ক কথাটার অর্থ বোধ হয় এই যে, ভারত এখন কুটুম, তাকে এবার বড় কুটুম করলেই মংগল"!!

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার দলাই লামার নিকট দুইটি সীল-করা চিঠি পাঠাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। —"সীলটা হলো আগেকার দিনের সাড়ে চুয়াত্তরের বিকল্প। পঞ্চশীলের সংগে এ সীলের কোন সম্পর্ক নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিব্বত সম্বন্ধে কোন ভারতীয়ই নির্বাক থাকিতে পারে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"শুধু তিব্বত কেন, কোন কিছু সম্পর্কেই নীরব থাকা আমাদের ধাতে নেই। কিন্তু অনেক সময় উচিত কথায় বন্ধু বেজার হন কিনা, ঐ আমাদের ভয়।"

* * *

রেডিওতে "নেতাদের শিক্ষা দাও" শীর্ষক একটি কথিকা পাঠ করিয়াছেন ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এইবারে যদি শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। নেতাদের অনেকেই অংয় অজগর আসছে তেড়ে না শিখেই আমটি আমি খাব পেড়ে-র পাঠ মুখস্থ করছেন"!!

* * *

রাস্তা ঘাটে মাতলামি বন্ধ করিবার জন্য পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছিল। সংবাদে প্রকাশ, একদিন নাকি ঐ কাজে নিযুক্ত একটি পুলিসই মাতলামির

অপরাধে ধরা পড়িয়াছে। শ্যামলাল একটি গল্প শুনাইল:—"মদ্যপ ছেলেকে বাবা বার বার মদ ছাড়বার জন্য শাসন করেন। ছেলে বলল—আমি মদ ছাড়তে পারি কিন্তু তার আগে তোমাকে অন্তত একটি দিনের জন্য মদ খেতে হবে।" পিতা একদিন মদ খেলেন। খেয়ে ছেলেকে বললেন—"তুই বরং মদ ছেড়ে দে। আমি যে-কটা দিন বাঁচি একটু মদ খেয়ে আনন্দ করে নি-ই"।—মাতলামির অপরাধে ধৃত পুলিস ঐ মদ্যপ ছেলের বাবা কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি।

* * *

হিসাব নিয়া নাকি দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আগুন লাগিবার ঘটনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫৪ সালে ঘটনার সংখ্যা ছিল ৭৮১। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ১৪৮৩টি।—"এই হিসেবের মধ্যে দ্রব্যমূল্যে আগুন লাগা এবং পেটে আগুন লাগার সংখ্যা নিশ্চয়ই নেই"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

অর্থ বিলের বিতর্কে "স্বতন্ত্র" সদস্য শ্রী এস এম বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, মধ্যবিত্ত মাত্রেই মাসের এক থেকে পাঁচ তারিখ পর্যন্ত ক্যাপিট্যালিস্ট, পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত সোস্যালিস্ট, দশ

থেকে পনর পর্যন্ত কমিউনিস্ট এবং ইহার পরে টেররিস্ট। বিশুখুড়ো বলিলেন—হয়ত তিনি ঠিক কথাই সরস করে বলেছেন। কিন্তু শেষেরটার সম্বন্ধে একমত হতে পারলাম না। মনে হয়, মাসের শেষের দিকটা টেররিস্ট না হয়ে হন তিনি "এস্কেপিস্ট", সব সময় পাওনাদারের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে থাকাই তখন প্রধান কাজ"!

* * *

এক সংবাদে পড়িলাম, কলিকাতা ষ্টেডিয়াম নির্মাণে প্রতিরক্ষা দপ্তর অনুমতি দানে সম্মত হইয়াছেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু ষ্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার নিমন্ত্রণে আনন্দে মুক্তকচ্ছ হবার আগে আমাদের সহজেই আঁচানোর কথাটা মনে পড়ছে"!!

* * *

আমাদেরই কাগজ "আনন্দবাজারের" অতীতের পৃষ্ঠার একটি খবর:—ভূতপূর্ব চীন সম্রাট ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেলের কন্যাকে বিবাহ করিবেন স্থির হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, তিনি ভূতপূর্ব মন্ত্রীর কন্যাকেও বিবাহ করিবেন। তবে দ্বিতীয় বধূটিকে তিনি "ফে" বা সংগী হিসাবে গ্রহণ করিবেন। শ্যামলাল বলিল—"দ্বিতীয় বধূটি অনেকের কাছেই "ফে", আমরা শুধু তাকে "ফাউ" বলি"!!

* * *

এক সংবাদে জানা গেল, মাদ্রাজের চর্ম-গবেষণাগারে গদির জন্য ভালো চামড়া তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছে।—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু গদির চামড়ার চেয়ে গদি লাভের পদ্ধতিটা উদ্ভাবন হলো আরো বড় কাজ"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

উনিশ

সালিশের কাজ চুকিয়ে মুচলেকায় দস্তখৎ টিপ নিয়ে ছোটকর্তা যখন ঘোড়ায় চাপলেন তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। লোকজন বিদায় নিতে মাড়োয়ারী হুজুরকে অনেক মিনতি করে পেস্তার সরবৎ খাইয়েছে আর ঠিক ঘোড়ায় উঠবার মুখে পঁচিশটে রুপোর টাকা তোড়ায় বেঁধে এনে গড়ুর পক্ষীর মত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। হুজুর যদি কিরপা করে নিয়ে লেন তো মাড়োয়ারী ধন্যু হোয়ে যাবে। এটা আবার কি? নজরাণা হুজুর। বারে মাড়োয়ারী, এই পিরায়ে দেখছি মানীর মান তুমিই রাখতি জানো। তা দাও, তুমারে ধন্যই করি। ছোটকর্তা টাকার তোড়া পকেটে পুরলেন।

মনে ফুর্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া তাই দুলকি চালে চলেছে। পায়রাগুলো গেল হয়ে দানা খুঁটতে খুঁটতে বকুম বকুম করছিল, কুকুরটা এখন গোপেল ময়রার দোকানের সামনে পাতা ধরাটের নিচের ছায়ায় রোদ বাঁচিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিশ্রাম করছে। ছোটকর্তার ঘোড়া এখন তাদের বিরক্ত করল না। সেই মোরগটা এখন বাঁশের বেড়ার উপর বসেছিল, সে-ও আর ভয় পেলোনা, বরং পরম কৌতূহলে গর্বিত ঘাড়টা নেড়ে সে ছোটকর্তার ঘোড়ার চলার ছন্দটা যেন নিরিখ করতে লাগল।

বাড়িতে পৌঁছাতেই রামকিস্টো এগিয়ে এল। ঘোড়া থেকে নেমে ছোটকর্তা সেটাকে রামকিস্টোর হাতে ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ শুনলেন বাড়ির ছেলেটা তারস্বরে কাঁদছে। বাবারে, গলাখানা কি? ছোটকর্তা উঠে গেলেন ঘরে। দেখলেন, খুবই বিরক্ত ভাব।

মুখ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি গো বাবু, এত গোসা হ'ল কার উপরে?"

অমনি তার কান্না থেমে গেল। ছোটকর্তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হেসে হাত পা ছুঁড়তে লাগল। •

ছোটকর্তা হা-হা করে হেসে উঠলেন। কি রকম পাজী! কোলে উঠবার মতলব!

ছোটকর্তা বললেন, "ও শালা, ভাবিছ ঘুঘু বুঝি বারে বারে ধান খাতি আসবে, না? আর তুমারে কোলে নিচ্ছিনে। দারোগারা লোক চরায়ে খায়, আর তুমি শালা এমন বাহাদুর, সেই দারোগারেও চরাতি চাও।"

গিরিবালা ঘরে ঢুকে দেখল ছোটকাকা তার খোকার গাল টিপে টিপে আদর করছে আর তার খোকা হাত পা নেড়ে মনের আনন্দে কং কং করছে।

তাকে দেখে ছোটকর্তা বললেন, "মা, তুমার ছেলের ভয়ে কাল সকালেই পালাতি হবে। যেমন ভাবে ও অগোয়ে আসতিছে, ভয় হয় গেরেপ্তার হয়ে যাব।"

ছোটকর্তা হাসতে হাসতে নিজের ঘরে পোশাক ছাড়তে চললেন। পোশাক ছাড়া হলে রামকিস্টোকে তেল মাখাতে বললেন। বেশ করে চানটি করে খেতে বসলেন। মেজদির হাতের পিঠে পায়েস, ছোটকর্তার মুখে যেন অমৃতের মত লাগল। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়েও নিলেন।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। পাছে আবার কোন মায়ায় আটকে পড়ে যান, তাই ছোটকর্তা আর কাল বিলম্ব করলেন না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন নবীন তাঁতির বাড়িমুখো। শুধু বড় বউকে বলে গেলেন ফিরতে রাত হবে। বড় বউ বুঝলেন।

বললেন, "ভাত তুমার ঘরেই ঢাকা থাকবে। আ'সে খায়ো কিন্তু।"

ছোটকর্তা আচ্ছা আচ্ছা বলে পাশ কাটালেন।

নবীন তাঁতি হাঁটতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই তার পায়ে জোর নেই। সান্নিপাতিক জ্বরবিকার হয়েছিল। প্রাণে বেঁচেছে, পা দুটো বাঁচাতে পারেনি। তা বলে সে অকর্মণ্য নয়। নাম করা কারিগর সে। তার মত ঘুড়ি কেউ বানাতে পারে না। শুধু কি ঘুড়ি, কত রকম পুতুল বানায় নবীন, কত ধরনের খেলনা। নাচের পুতুল তৈরী করতেও সে বাঘা ওস্তাদ। কিন্তু এসবে এক আধলা রোজগার হয় না তার। দরকারই বা কি? বাবা কিছু টাকা রেখে গিয়েছে। বড় ভাল তাঁতি ছিল সে। তার হাতের সুহাগী শাড়ির খুব চল ছিল সে আমলে। ওয়ারিশ বলতে ঐ তো এক নবীন। আর এক মেয়ে ছিল, শান্তিপুরে বিয়ে হয়েছে। নবীনের সেই দিদিরই এক বিধবা মেয়ে দুই ছেলে নিয়ে নবীনের কাছে থাকে।

নবীন বাড়ির থেকে একটু দূরে, নদীর পাড়ে, তার আস্তানা বানিয়েছে। সেইখানেই সে তার যন্ত্রপাতি, পুতুল খেলনা, ঘুড়ির সরঞ্জাম আর মনোমত সংগী ধান্যেশ্বরীর বোতল নিয়ে পড়ে থাকে।

ছোটকর্তা যখন এলেন, তখন সন্ধ্যে উৎরে গিয়েছে। নবীন হ্যাজাগবাতি জেলে পুতুল নাচের মহড়া দিচ্ছিল। দুটো নতুন পুতুল সে বানিয়েছে। নাম দিয়েছে চন্দ্রাবলী আর চোরা কানাই। নবীনের সুতার টানে টানে পুতুল দুটো কি সুন্দর নড়ছিল।

বিশেষ করে চন্দ্রাবলী। তার চাল চলনে সত্যিকার রঙ্গিণী নারীর মতই চটুলতা। ছোটকত্তার খুব মজা লাগল।

বলে উঠলেন, "বাহবা নবীন, বাহবা। তুমি যে শেষ পর্যন্ত বিধেতারে টেক্কা দিতি শুরু করলে।"

ছোটকত্তাকে দেখেই নবীন খুশী হয়ে উঠল। তার নিঃসঙ্গ জীবনে এই একটা মনের মতন মানুষ সে পেয়েছে।

শশব্যস্তে বলে উঠল, "আসেন আসেন ছোটবাবু।"

ছোটকত্তা বললেন, "ব্যস্ত হয়ে না, ব্যস্ত হয়ে না। আইছি যখন, সহজে যাব না। তুমার এই পুতুল দুটো বড় জবর হয়েছে হে, বিশেষ করে ঐ মন-কাড়া মাগীর্ডে। আহা, কি ছিরেৎ! ইচ্ছে করে সারাজীবন জাপটায়ে ধরে পড়ে থাকি।"

নবীন হা হা করে হেসে উঠল। রসিক মানুষ ছাড়া রসের তত্ত্ব বোঝে কেডা?

বলল, "ছোটবাবু, উনি চন্দ্রাবলী, বিন্দেবনে অনেকের বুকিই আগুন জ্বালিছেন। ইবার বড় জব্দ। আগুন নিয়ে খেলতি যায়ে ইবারে নিজির বুকি পড়েছে কি না ছ্যাকা তাই বিলেপের আর কুলকিনারা নেই।"

অপূর্ব কৌশলে নবীন সুতো ধরে টান দিতেই চন্দ্রাবলী জ্যান্ত মানুষের মতই এক পাক ঘুরে চোরা কানাইয়ের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর দু হাত জোড় করে কানাইয়ের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

নবীন সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল :

"ও আমার কেলে সুনা
তুমি রাতে করতে আনাগোনা
এখন হয়ে রাজ পিয়াদা
আমারে আর চেনো না।"

ছোট কত্তা উচ্ছ্বসিত হয়ে "বেড়ে বেড়ে" করে তারিফ দিয়ে ঝপ করে এক জায়গায় বসে পড়তেই ফাস্‌স্‌ করে একখানা কোঁড় ঘুড়ি ফেঁসে গেল। ছোটকত্তা তো মহা অপ্রস্তুত।

বোকার মত বলে উঠলেন, "ঘরে যে আর জায়গা রাখোনি কিছু। ছিঁড়ল তো।"

"ছিঁড়ুক ছোটবাবু, ছিঁড়ুক, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।"

নবীন ততক্ষণে পুতুল দুটোকে গুটিয়ে রেখে মদের বোতল বের করে ফেলেছে। দুটো গেলাসে পরিপাটি করে ঢেলে একটা গেলাস ছোটকত্তাকে এগিয়ে দিল। তারপর নিজেরটুকু এক চুমুকে সাবাড় করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখখানা মুছে ফেলল।

তারপরে ভারী গলায় বলল, "বলি, সেই ছড়াডা শুনিছেন তো—

"পুড়ুক পুড়ুক ছাওয়ালের মাথা
আরও ছাওয়াল পাব,
আলা তামুক পুড়ে গেলি
কার দরোজায় যাব।"

তা আমরাউ সেই কথা। ঘুদ্রি গেলি আবার ঘুদ্রি পাব, বানায়ে নেব আরেকখান, ও তো এই হাতের মধ্যিই থাকল। কিন্তু আপনি গেলি, কার দুয়োরে খুঁজিতি যাব? পাবই বা কনে?"

ছোটকত্তার শিরা উপশিরা দিয়ে মদের তীক্ষ্ণ স্রোত বইতে লেগেছে। নবীনের কথায় মিচকি মিচকি হাসতে লাগলেন।

নরম গলায় বললেন, "কি সুখি তুমি রাতদিন এত ঘুদ্রি বানাও?"

নবীন আরো খানিক মদ ঢালল গেলাসে, ঢালল গলায়। তার চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। সুন্দর হাওয়া উঠে আসছে নদীর দিক থেকে। শীতল হাওয়া। প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নবীন ধরা গলায় বলল, "ছোটবাবু তিন রকম জীব আছে জগতে। স্থলচর, জলচর আর খেচর। আপনারা হলেন গে স্থলচর। কত জায়গা ঘোরেন, কত দেশ বিদেশে যান। কত কি দেখেন। ভগবান
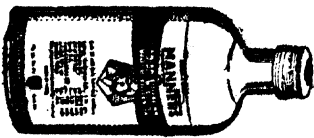
আমারে মা'রে রাখিছেন। এ জীবনে স্থলচর হওয়া আর আমার হ'ল না। তাই খেচর হবার সাধ হয়েছে। ঘ্রুড়ি বানাই, আর এই ঘ্রুড়ির সংগে মনডারে বাঁধে দিই।"

"জানেন তো,"—

নবীন গুনগুন করে গান ধরল,

"চিসে করে টিলে মিলে
কোঁড়ে মারে টান,
পতংগা উঠে বলে আরও সুতো আন।"

নবীন বলল, "ঐ পতংগার সংগে মন বাঁধে সুতো ছাড়তি থাকি। মনে মনে বাসনা, একদিন উপরে উঠে পতংগা সুতোর টান অগ্রাহ্য করবে, সুতো কেটে উঠে যাবে উপরে, আরও উপরে, মেঘের দেওয়ালের পাশ কাটায়ে সুজা ঢুকে পড়বে চাঁদ তারার রাজ্যে। ওর সংগে আমার মনও যাবে উড়ে। দিনরাত বসে বসে আর ভাল লাগে না ছোটবাবু। আমার তো ডানা নেই, নাহলি নিজেই একদিন উড়োন দিতাম।"

নবীনের কথার জন্যেই হোক, কি মদের তেজেই হোক, ছোটকর্তাও উড়ছিলেন এতক্ষণ। নবীনের কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগে তিনি যেন ঠক করে নেমে পড়লেন মাটিতে। আমেজটা নষ্ট হ'ল। ছোটকর্তার মনে হ'ল নবীনটা সাধক লোক। কি আশ্চর্য, জগত সুদ্ধ লোক যখন বিষয় সম্পত্তি নিয়ে, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য, কামড়া কামড়ি, খেয়োখেয়ি করছে, দাংগা-হাংগামা বাধাতে ব্যস্ত, নবীন তখন ঘুড়ি বানিয়ে আর পতুলের জগৎ সৃষ্টি করে কাল কাটাচ্ছে! কি, না চাঁদ তারায় ঘুরে বেড়াবে! এমন লোক কটা হয়!

ছোটকর্তা বললেন, "তুমার এই মন যদি জগতের আধেক লোক পা'তো নবীন তো দেখতে দুনিয়ার চিহারা বদলায়ে যা'তো।"

নবীন বলল, "মন বড় জুয়োচোর ছোট-বাবু, ওর গতিবিধি কে জানতি পারে? ওর কথা ছাড়ান দ্যান। ইবার আপনার কথা কন। আজকাল বড একটা আসেন না ইদিক। দেশ গাঁ কি ছা'ড়ে দেলেন?"

ছোটকর্তা পরিহাস করলেন, "কার কাছে আর আসব কও? ভাবের মানুষ যে ছিল, তিলক কা'টে সে বষ্টোমী হ'ল।"

নবীনও হাওয়া হাল্কা করে দিল, বলল, "মানষির অভাব আছে নাকি ছোটবাবু। পুরনো যায়, নতুন আসে। কটা চাই আপনার। চান তো একেবারে কচি কাঁচার সন্ধানউ দিতি পারি।"

ছোটকর্তা হেসে ফেললেন। বললেন, "বয়েসটা যে চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে নবীন, এই বয়েসে আর কাঁচা রাস্তায় পা বাড়াতি সাহস হয় না, পিছলে পড়ে পা ভাঙলি, বুড়ো হাড় আর জুড়া লাগবে না, বুঝলে। আমাগের এই বাঁধা শড়কই ভাল।"

নবীন বলল, "কথাডা বলেছেন বড় ভাল। তা বাঁধা শড়কে যাতি চান তাই না হয় যাবেন।"

ছোটকর্তা বলল, "কাল তো ঠেকে গেলাম সেইখেনেই। কারুর কথাই মনে পড়ল না। এখন অবিশ্যি মনে হচ্ছে পদ্ম কি কুসুমরি একবার কাঁড়ায়ে দেখলিউ হ'ত।"

নবীন বলল, "সে গুড়ি বালি। শুনি তো কুসুম এখন মেন্দার বনে ফুটতিছে। আর পদ্মরি নাকি মাড়োয়ারীবাবু একবারে পর্দানশীন ঘরের বউ বানায়ে ফেলিছে। শুধু তার হাতে খায় না।"

ছোটকর্তা বললেন, "ক্যান?"

নবীন বলল, "পদ্ম যে বাঙ্গালী, মছলিখোর।"

ছোটকর্তা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "আঃ, ও-শালা মাড়োয়ারীর ধম্মজ্ঞান তো বড় টনটনে! বাংগালী মাগীর জাত খাতি মাছের গন্ধ লাগে আর তার জাত খাতি সে আঁসটে গন্ধ বুঝি নাকে ঠেকে না।"

নবীন চুপচাপ মদ খেতে লাগল। হঠাৎ ছোটকর্তার একটা জরুরী কথা মনে পড়ল। বললেন, "ওহে নবীন, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম, মাড়োয়ারীর কথায় মনে পড়ল, দ্যাখ, ঐ শালা আজ আমারে পাঁচিশটে টাকা নজরাণা দিয়েছে, আমার একটা নাতি হয়েছে জান তো, মা'জদার মেয়ের ছেলে, তা সে শালার মুখ দেখলাম, এখন কিছু একটা দিতি হয়তো, এই ন্যাও, নজরাণার টাকাটা তুমার কাছে রাখে দ্যাও, আমি কাল ভোরে চলে যাব, তুমি একটা স্যাকরারে দিয়ে ভাল একজুড়া বালা গড়ায়ে দিবা।"

নবীনের নেশা ধরেছে। সে চুপচাপ টাকাটা নিয়ে রেখে দিল। তারপর ধীরে ধীরে ছোটকর্তাও চুপ হয়ে গেলেন। তাদের শিরা উপশিরায় অনেকক্ষণ চাঞ্চল্য জাগল।
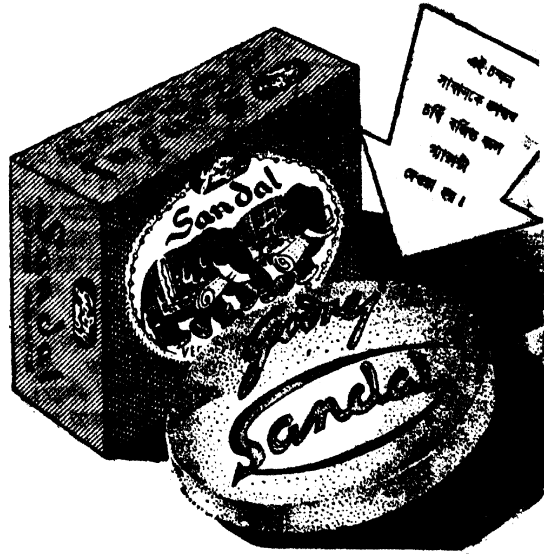
মাথার পিছনটা দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। চোখ বুজে আসতে লাগল। নবীনের মনে হ'ল, সে দৌড়বাজীতে যোগ দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ছোটকর্তার মনে হতে লাগল, তিনি নবীনের পতঙ্গা ঘুড়িতে বসে মেঘের উপর ভাসছেন। কিন্তু এত দুলছে ঘুড়িটা, স্থির হয়ে বসতে পারছেন না। কানে সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। বাতাস হচ্ছে নাকি? ঘুড়িটা টাল খেতেই ছোটকর্তা মেঝের উপর টলে পড়লেন। গোটা কতক খালি বোতল ধাক্কা লেগে গড়িয়ে পড়ল। ছোটকর্তা উঠে বসতেই নদীর দিকে নজর পড়ল। চাঁদ উঠেছে। জলে তার ছায়া পড়ে ঝিলিমিলি খেলা শুরু হয়েছে। ছোটকর্তার মনে হ'ল, কেউ যেন অন্ধকারে টর্চ জেলে নাচাচ্ছে। রাত হয়েছে। চাঁদ উঠে পড়েছে যখন, তখন বেশ রাত হয়েছে। এবার বাড়ি যেতে হয়।

ছোটকর্তা উঠে দাঁড়াতেই শরীরটা টলমল করে উঠল। তিনি সামলে নিলেন।

জড়িত কণ্ঠে বললেন, "চলি হে, নবীন।"

নবীন সাড়া দিল না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে ছোটবউও পড়েছিলেন। কিন্তু আচমকা খাটটা নড়ে উঠতে, ধপ করে একটা শব্দ হতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম ভাঙতেই তাঁর নাকে ঝাঁঝালো মদের গন্ধ ঢুকল। গন্ধটা নাকে ঢুকতেই তাঁর গায়ে পাক দিয়ে উঠল। গায়ে পাক দিয়ে উঠতেই একটা অঘটন ঘটে গেল। একী, এ যে তাঁর অত্যন্ত পরিচিত এক অস্বস্তিকর গন্ধ! যে লোকটা এই অসহ্য গন্ধ বয়ে আনত, সেই অনেক অনেক দিন আগে, বোধ হয় বিগত জন্মে, সেই লোকটা, সেই ছোটকর্তা এসেছে নাকি? ধড়মড় করে উঠে বসলেন ছোটবউ। ওমা তাইতো, ঐ তো, গরমে এ পাশ ওপাশ করছে, সেই যেমন আগে আগে করত!

যে ভারী আবরণটা এতদিন ছোটবউয়ের স্মৃতির উপর জগদ্দলের মত চেপে বসেছিল, এই পরিচিত ঝাঁঝালো গন্ধটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত তাকে ফালা ফালা করে কেটে উড়িয়ে দিল। স্বামীর এত কাছে বসে আবেগের তাড়নায় বুকটা ধুক পুক ধুক পুক করতে শুরু করল। অজস্র খুশি এক সঙ্গে তাঁর নাভিমূল থেকে উঠে এসে কণ্ঠ নালিতে আটকে গেল। এইবার দম ফেটে যেন মরে যাবেন ছোট বউ। অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হ'ল তাঁর কণ্ঠার কাছে, না না বুকের কাছে। আবার মুহূর্তে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এবার একটা বেদনার তীক্ষ্ম শিস্ তরতর করে উঠে আসছে। চোখ ভরে আসছে জলে। সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে। ছোটবউ আর পারছেন না, নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না। ভিতরে ঝমঝম বর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। যে অন্তর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, দশ বছর যাবৎ যে প্রান্তর খাঁ খাঁ করেছে, এখন তা প্রবল বর্ষণে ভিজতে লাগল। কি যন্ত্রণা! কি শান্তি!

ছোটবউ বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন, প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, তারপর জোরে জোরে। কান্নার জোয়ার নেমেছে। ছোটবউ কুটোর মত ভেসে চলেছেন। চলেছেন, চলেছেন।

কান্নার শব্দে ছোটকর্তার তন্দ্রা ছুটে গেল। কে কাঁদে? নবীন? নবীনের চন্দ্রাবলী? না তো। ধড়মড় করে উঠতে গেলেন ছোটকর্তা। পারলেন না। মাথাটা বেশ ভারী। সারাদেহে ঝিমঝিম। বুকে প্রবল তৃষ্ণা। এক গ্লাস জল পেলে হ'ত।

কান্নার শব্দ তখনও আসছে। পিছন থেকে, পাশ থেকে। ছোটকর্তা বিমূঢ়ের মত দু হাতের তালু দিয়ে মুখখানা ঘষে নিলেন। মুখখানা তখনও চিনচিন করছে। গভীর রাত্রে কাছে পিঠে কোথাও যেন একখানা বড় রেলের ইঞ্জিন এসে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটকর্তার কানে তারই সিঁ সিঁ আওয়াজ বাজছে।

এবার তিনি পাশ ফিরলেন। পাশ ফিরতেই দেখলেন ছোটবউয়ের ছায়া ছায়া শরীরটা উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। বারে, এখানে, এই নবীনের ঘরে ছোটবউ এল কি করে? নাকি, এটা তাঁর বাড়ি? তিনিই বা বাড়ি এলেন কখন? ছোটবউ আগে থাকতেই ছিল নাকি এই খাটে? নাকি, এখন এল?

কাঁদছে কেন ছোটবউ? আজ সে কাঁদছে কেন? আহা, দশ বছর আগে, খোকা মরে যাবার পর, ওকে যদি এমন করে কাঁদাতে পারা যেত, তাহলে আর ছোটবউ অমন উদোম পাগল হয়ে যেত না! পাগল না হলে কবে আবার ওর কোলে খোকা এসে যেত! সবাই তখন কত চেষ্টা করেছিল ছোটবউকে কাঁদাতে। একটি ফোঁটাও তখন কাঁদেনি সে। সত্যিই ওর পোড়াকপাল। হতভাগা!

কেমন এক সমবেদনায় ছোটকর্তার মনটা ভিজে উঠল। চোখ দুটো করকর করতে লাগল।

ছোটকর্তা ছোটবউয়ের পিঠে আস্তে হাত রেখে নরম করে ডাকলেন, "ছোটবউ।"

সঙ্গে সঙ্গে ছোটবউ তাঁর চওড়া বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আলুথালু মাথা ঘষতে ঘষতে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "ওগো, আমাকে ফেলে যেয়ো না। আমার ভয় করে, ভয় করে, বড্ড ভয় করে।"

আহা বেচারী, ছোটকর্তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি পরম আদরে ছোটবউয়ের পিঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

তারপর গলা ঝেড়ে বললেন, "নাঃ, তোরে নিয়েই যাব। তবে ইবার না, আমি যায়ে কোয়াটার ঠিক করে নিই আগে, তারপর আসে নিয়ে যাব। ভয় কি, এখন আর তোর ভয় কি, তুই তো একেবারে ভাল হয়ে গিছিস। কাঁদিস নে, ছোটবউ আর কাঁদিস নে।"

ছোটকর্তার সান্ত্বনা পেয়ে ছোটবউয়ের কান্না ধীরে ধীরে থেমে এল। ছোটকর্তার বিরাট শরীরটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তিনি ফোঁপাতে লাগলেন। তারপর এক সময় সব কিছু থেমে গেল। দুজনেই ঢুলে পড়লেন গভীর ঘুমে। এ ঘুমের জাত একেবারে আলাদা। (ক্রমশ)

দিলীপকুমার রায়

ছয়

এহেন আমি যে রাখাল মহারাজের দর্শনের প্রস্তাবে উজিয়ে উঠব, সে কি আর বলতে হবে? স্বয়ং রাখাল মহারাজ—ঠাকুরের সাক্ষাৎ মানসপুত্র—যাকে ঠাকুর বলতেন নিত্যসিদ্ধের থাক—যার সম্বন্ধে উপমা দিতেন, হোমা পাখিরা যে আকাশেই ডিম পাড়ে ও সে ডিম পড়তে পড়তে ফুটমাত্র সদ্যোজাত পাখি ফিরে উধাও হয় আকাশে দিকে, নিত্যসিদ্ধরাও ঠিক এমনি, সংসারে বদ্ধ হবার আগেই ভগবানের দিকে চম্পট দেয়—বলতেন ঠাকুর। কতবারই পড়েছি রাখাল মহারাজের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা, শুনেছি শ্রীম-র তথা স্বামী সারদানন্দের মুখে তাঁর আশ্চর্য বৈরাগ্য, প্রেম ও সমাধিভূমিতে অবস্থান করার কথা। লোকে বলত তাঁকে রাজা মহারাজ। কারণ পরমহংসদেব বলতেনঃ "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট, স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই, বৈরাগ্যের জ্বলন্ত বিগ্রহ, পঙ্কে থেকেও যিনি ছিলেন পঙ্কজের মতন নির্মল। বিবাহ ক'রেও তিনি ছিলেন অনাসক্ত সন্ন্যাসী—আজ তাঁকে স্বচক্ষে দেখব?—মন আমার গান গেয়ে উঠল!

এখানে ব'লে রাখিঃ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার ও বিহারী ভাদুড়ীর সঙ্গে দাদামহাশয় পরমহংসদেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন মাঝে মাঝে। দাদামহাশয় থিয়েটার রোডে প্রায়ই রাতের খাওয়া দাওয়ার পর গল্প করতেন রসিয়ে—ঠাকুরকে কী চোখে দেখেছিলেন। মনে পড়ে তাঁর মুখে শোনা কাহিনী যে সমাধিতে সময়ে সময়ে ঠাকুরের হৃৎস্পন্দন থম্‌কে যেত। আদৌ নাড়ী পাওয়া যেত না। দাদামহাশয় বলতেন ঠাকুরের হাসির কথা, নাচতে নাচতে দিগম্বর হ'য়ে পড়ার কথা—সর্বোপরি, তাঁর মধুর ভাবসঙ্গীতের কথা। দাদামহাশয় প্রায়ই বলতেনঃ "ধেৎ! কী তা না না না ক'রে তানবাজি করিস তুই? তাঁর মতন গাইতে গাইতে যদি বিশ্ব ভুলে যেতে পারতিস তবে বুঝতাম।" (এ-রকম খোঁটা যখন তিনি দিতেন তখন সময়ে সময়ে বেজায় লোভ হ'ত ওঁকে টুকি—ভগবানের নামে বিশ্ব ভুলে যাওয়ার সাধনার মুখেই তিনি আমাকে চালাতে চাইছিলেন কি না আমার জন্যে একটি রাঙা বৌয়ের ব্যবস্থা ক'রে।) আর একটা কথা মনে পড়েছে, দাদামহাশয় বলতেন—ঠাকুর প্রায়ই ভাবোন্মত্ত হ'য়ে গাইতেন একটি গানঃ "রামকো জো ন জানা সো ক্যা জানা হয় রে!" কিন্তু এ-গানটির কোনো উল্লেখই পাই নি পাঁচ খণ্ড কথামৃতে। যাক্‌, যা বলছিলাম।

রাখাল মহারাজ, ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সে-সময়ে কলকাতায় এলে প্রায়ই থাকতেন বাগবাজারে 'বলরাম বসুর দ্বিতল ভবনে। দাদামহাশয়ের মোটর থামল এই তীর্থোপম পুণ্যনিলয়ের সামনে—যেখানে ঠাকুর কতবারই উদ্দণ্ড নৃত্য ক'রে সবাইকে মাতাতেন—মা-র নামে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতে ধূপের গন্ধ ভেসে এল। গায়ে আমার কাঁটা দিল ফের—ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগীর দর্শন পাব আজ!

দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কী সৌম্য পবিত্র মূর্তি! গেরুয়া রঙে যেন আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে! গম্ভীর আনন অথচ এতটুকু কঠিন ভাব নেই। আনন্দময় মহাপুরুষ দাদামহাশয়কে দেখেই বালকের মতন সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেনঃ "এ কী! প্রতাপবাবু! আসুন আসুন! কতদিন বাদে......"

তারপর একথা সেকথা, কত গল্প হাসি ঠাট্টা—ঠাকুরের স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন—যেমন দুই বন্ধুর মধ্যে অনেক দিন বাদে হঠাৎ দেখা হ'লে হ'য়ে থাকে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনি তাঁর মুখে ঠাকুরের কথা আর থেকে থেকে চোখে জল ভ'রে আসে—বহু কষ্টে সামলাতে হয়।

হঠাৎ চমক ভাঙল—আমার নিজের নাম শুনে।

দাদামহাশয় অনর্গল আমার কাহিনী পেশ ক'রে শেষে বললেনঃ "ছেলে ভালোই বলব—পড়াশুনোয় ও গাফিলি করে না—গত বৎসর বি এস-সি অনার্স গণিতে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। কিন্তু আমি মহা-ভাবনায় পড়ে গেছি মহারাজ! হয়েছে কি, ওর বাবা অনেক টাকা রেখে গেছেন। তার ওপর ও এখন সাবালক—কাজেই বেপরোয়া, জানেন তো আজকালকার ছেলেদের কাণ্ড! তার উপর দেখতেই পাচ্ছেন দেখতে শুনতেও (হেসে) নিতান্ত অখাদ্য নয়। কিন্তু হ'লে হবে কি, দুর্দান্ত একগুঁয়ে, তার উপর ঝোঁকালো আর রোখালো। বলে বিয়ে করবে না—ভাবুন তো! এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরী পয়মন্ত পাত্রী হাজির—দু' একজন টাকাওয়ালা বাপের মেয়েও আছে—অতি চমৎকার ঘর—কিন্তু ওঁকে সোজা দুরন্ত ঠাউরেছেন?—একবার গোঁ ধরলে ছাড়ায় কার সাধ্য। কাজেই ওকে বিয়ে করাবে কে বলুন তো?"

রাখাল মহারাজ (ফিক ক'রে হেসে)ঃ বটে! বেশ বেশ। (একটু আমার দিকে চেয়ে থেকেই দাদামহাশয়ের দিকে ফিরে) আমি আপনার ভাবখানা বেশ বুঝছি প্রতাপবাবু। শুধু আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি

সেইটাই ভেবে পাচ্ছি নে। আমি নিজে সন্নিসি ঠাকুর হ'য়ে কোন মুখে ওকে ভুতিয়ে পাতিয়ে বিয়ে থা ক'রে থিতু হ'তে বলি বলুন তো?—তাই বলি শুনুন—ওর উপরেই কেন ছেড়ে দিন না—যে বিয়ে করবে!

দাদামহাশয়ঃ ওর উপরে ছেড়ে দিতে তো আমরা গররাজি নই মহারাজ, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ও ধরেছে বিয়ে না করে বিলেত যাবে এই বৎসরেই। কাজেই আমরা ভয় পেয়েছি বই কি, বুঝলেন না? ও যে রকম ঝোঁকালো ছেলে—ওদেশে মেমরাও যে কী বস্তু জানেন না তো—কী সাজ সজ্জা রংঢং ওদের! ও পড়বেই পড়বে কোনো না কোনো রঙ্গিণীর ফাঁদে আর করবে তাকে ঘরণী। তখন?—(একটু থেমে) তাই তো ভেবে চিন্তে আপনার আশীর্বাদ নিতে ওকে ধরে নিয়ে এলাম মহারাজ!—সাধুদের আশীর্বাদের মতন রক্ষাকবচ সংসারে আর কী আছে বলুন? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) তাছাড়া এখন আর উপায়ই বা কী বলুন?—হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি—তার উপর ও আবার কী বিষম গান-পাগলা জানেন না তো। আর মেয়েরা গান শুনলে—বুঝলেন কি না......

রাখাল মহারাজ (চুপ ক'রে): তুমি গান গাইতে পারো বাবা? বেশ বেশ। শোনাও না একটি—আর নাম। জানো?

আমি 'জানি' বলে আনন্দে অধীর হ'য়ে ধরে নিলাম কথামৃতের একটি বিখ্যাত গান কমলাকান্তের রচনাঃ

মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ
নীলকমলে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হোলো কামনা কুসুম
সকলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয়
মিলে গেল,
প্রাণ অসত্য রিপু মত্ত রঙ্গ দেখে
ভঙ্গ দিলে।
কমলাকান্তের মনে আশা পুরা
এত দিনে,
সুখ দুঃখ সমান হ'ল—আনন্দ সাগর
উথলে!

গান শুনতে শুনতে রাখাল মহারাজের মুখের চেহারা বদলে গেল—যেন একটা অলক্ষ্য আত্মা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল!...... আমার হৃদয়ে জেগে উঠল ভক্তি, চোখে অশ্রু। তারপর......কী যে হল বলে বোঝাতে পারব না, শুধু এইটুকু বলি যে স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার মাথার উপরে মহাযোগীর সব-তাপ-জুড়িয়ে-দেওয়া আশীর্বাদ!......

গান শেষ হ'লে দেখি—কী আশ্চর্য!—দাদামহাশয়ের চোখে জল! হয়ত এই প্রথম তাঁর মনে হ'য়ে থাকবে যে, গান শুধু বিপদে ফেলতেই মুখিয়ে নেই—বিপদ কাটাতেও পারে বা।

ওদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি—মহারাজ সমাধিস্থ! কী সুন্দর!......কী পবিত্র!......

অনেকক্ষণ বাদে তিনি চোখ খুললেন। তারপর ভাবনেত্রে আমার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। আমি চোখ নিচু করলাম। বুকের মধ্যে তখন আমার ভ্রমরু উঠেছে বেজে......

হঠাৎ তিনি দাদামহাশয়ের দিকে ফিরে ধরা গলায় বললেনঃ "প্রতাপবাবু! ভয় নেই আপনার। এ ছেলের কোনো বিপদ হবে না বিদেশে বিভুঁয়ে।"

দাদামহাশয় সপ্রশ্ন নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকটা বিহ্বল ভাবেই বলব। তিনি বললেনঃ "জানেন—ও যখন গাইছিল—আমি কী দেখলাম? দেখলাম ওর চারদিকে ঠাকুরের কৃপার একটি—aura—মণ্ডল। এ-কৃপা হ'ল একটি বর্ম—বুঝলেন প্রতাপবাবু? হ্যাঁ সত্যিই বর্ম—আর আমি জানি তার মর্ম। ও দু একবার হয়ত হোঁচট খেতে পারে কিন্তু পদস্খলন ওর হবে না—আপনাকে বলছি, বিশ্বাস করুন।" বলে আমার দিকে ফিরে: "এসো তো বাবা—একটু কাছে।"

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, তাঁর পায়ে আমার মাথা রেখে ভেঙে পড়লাম......কেবল কান্না আর কান্না।

রাখাল মহারাজ আমার মাথায় ঘাড় সস্নেহে হাত বুলোতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে
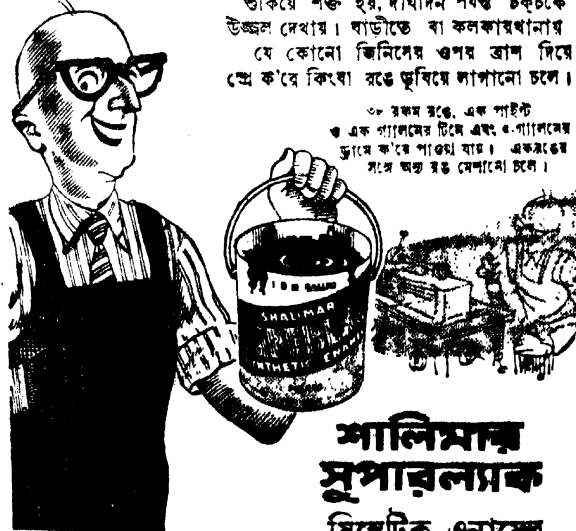
একটা শান্তির প্রবাহ বইতে শুরু করে—মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত।......

যখন আমি ফের মাথা তুললাম দেখি তিনি
আমি (ধরা গলায়)ঃ আমাকে......আমাকে
গভীর স্নেহে আমার দিকে চেয়ে!
কিছু উপদেশ দিন।

রাখাল মহারাজ (একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে)ঃ কেবল একটি কথা......(তাঁর সুর মৃদুল হ'য়ে এল) মনে রেখো বাবা—সদাসর্বদা।

আমি (বিহ্বলভাবে)ঃ মনে রাখব!

রাখাল মহারাজঃ হ্যাঁ বাবা। ঠাকুর আমাদের বলতেন কেবলই এই একটি কথাঃ স্মরণ মনন থাকলেই হ'ল—নিরন্তর মনে মনে তাঁর সংগে মোকাবিলা—এরই নাম হ'ল যোগ—যোগের যোগ। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের কৃপা, বলতে হবে নিজেকে সর্বদাইঃ "আমি তাঁর কৃপা পেয়েছি—এ-কৃপার যোগ্য হ'তে হবে।" বাস আর কিছু নয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

অঘটন নাম দিয়েছি এ-পরম দর্শনের। কারণ যা দেখলাম তার বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা আমার জানা নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের একটি চরণ মনে আসেঃ

যা দেখেছি যা শুনেছি তুলনা তার নাই।

সুভাষকে গিয়ে একথা বলতেই ওর চোখ অশ্রু আভাসে সজল হ'য়ে উঠল। আমার দুহাত চেপে ধ'রে বললঃ "আমিও এই কথাই বলি ভাই—মনে রেখো তুমি।—হ্যাঁ শুধু মনে রেখো যে কৃপা যে পায় তার জীবন বদলে যায়ই যায়।......আর" ব'লে একটু থেমেঃ "আমিও পেয়েছি এ-কৃপার আভাস। তাই তো চাই দেশের কাজে জীবন ঢেলে সার্থক হ'তে। এও তোমাকে বলেছি যে ঐ রাখাল মহারাজই আমাকে কাশী থেকে ফিরিয়ে পাঠান, বলেন, "আমাকে দেশের কাজ করতে হবে।"

আমিঃ জানি সুভাষ। আর এ তুমি পারবে।

সুভাষঃ পারে সবাই ভাই—কেবল চেষ্টা চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই। আমরা আজ বড় তামসিক হয়ে পড়েছি দিলীপ—স্বামিজী বারবারই বলতেন এই কথা।

আমিঃ জানি—

সুভাষ (উদ্দীপ্ত)ঃ না, জানো না জানার মতন ক'রে। তাই তুমি দেশের কথা এখনো তেমন ক'রে ভাবতে পারো না যেমন করে তিনি পারতেন। আমি যদি তাঁর কাছে কিছু শিখে থাকি ভাই, তবে সে তাঁর এই দেশপ্রেম—এই দেখ—(শেলফ্ থেকে নিবেদিতার The Master As I Saw Him টেনে—তৃতীয় অধ্যায় খুলে)—শোনো নিবেদিতা কী বলছেন তাঁর মহান্ হৃদয়ের সম্বন্ধেঃ

"There was one thing, however, deep in the Master's nature, that he himself never knew how to adjust. This was his love of his country and his resentment of her suffering. Throughout these years in which I saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed."

ব'লে সুভাষ ধরা গলায় পড়ে চলল প্রায় পনের মিনিট। এর কাছে বইটি নিয়ে আমি দুদিনে পড়ে শেষ করি। এর সুফল হ'ল এইটুকু যে, স্বামিজীর বাণীর আলোয় যেন সুভাষকে এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখলাম। এর পরে স্বামিজীর নানা বাণী যখনই ওর মুখে শুনেছি তখনই আমার মনে হয়েছে এই একটি কথাই ফিরে ফিরেঃ যে স্বামীজির উদ্দীপনাই ওকে দীক্ষা দিয়েছে জাগ্রত মন্ত্রে; মনে হয়েছে স্বামিজীর সমানধর্মী যদি এযুগে কেউ জন্মে থাকে তবে সে সুভাষ। তাই তো আমার এত দুঃখ হ'ত দেখে যে, ও ধর্মের আলোয় আমাদের দেশবাসীকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"-র মন্ত্রসাম না শুনিয়ে রাজনীতির মিথ্যামলিন আখড়ায় ওর অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে চলেছে। অবশ্য একথা বলছি না যে, ওর এ-ত্যাগ আমাদের দেয়নি কোনো বীর্যের পাথেয়। কোনো মহান্ ত্যাগই সংসারে বন্ধ্যা থাকতে পারে না। গীতা অকারণ বলেনি "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে" —অর্থাৎ কোনো সত্যসাধনার বীজই বন্ধ্যা হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলেছেন তাঁর অনুপম উপমায়ঃ

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না-ফুটিতে পড়েছে ধরণীতে
যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।

আমি শুধু এই কথাটি বলতে চাইছি যে, সুভাষ কুরুক্ষেত্রে না গিয়ে ধর্মক্ষেত্রে গেলে সে হ'য়ে দাঁড়াত বিবেকানন্দের পতাকাবাহী, আর তাহ'লেই তার শ্রেষ্ঠ দান দেশ পেত তার দীপ্ত বিকাশের মাধ্যমে।

(ক্রমশ)

আস্তে কথা বলুন

সবিনয় নিবেদন,

দ্বিতীয় মতে মনান্তর হওয়া সম্ভব। তবে তা নিয়ে মাতামাতি চলে না। মতামত জানাতে গেলেও মনে হয় দূরে পাল্লার ব্যাপার। লক্ষ্মী লোলা। পালিয়ে বেড়ায়। দুষ্ট সরস্বতী ঘুরে ফিরে হাজির হয়। তার তাগিদে কালি কলম মন তিনজনকে তেপান্তর থেকে জড়ো করতে হয়। সালিশি মানাতে নয়, শান্তির জল ছিটোতেও নয়—একটু বিরোধের বুদ্বুদ ফোটাতে। ২৩ সংখ্যা 'দেশ' রঞ্জনের নীরবতার সরব আবেদন নিয়ে এই গৌরচন্দ্রিকা। জেহাদী সুরে লেখা 'আস্তে কথা বলুন' স্লোগান শুনে এই কথাগুলো মনে হল:

ইংরেজকে (তথা পাশ্চাত্যকে) আমরা কপি করেছি। এখনও করছি। ভাল মন্দ নির্বিচারে। এখন বিচারটা করবে কে? সেও এক প্রশ্ন। প্রশ্নের বেড়াজাল ছাড়িয়ে ঘটনায় আসি। আমরা গজেন্দ্র গমনে চলি। জোরে কথা বলি। ইংরেজরা চলে না—ছোটো অপ্রয়োজনেও—কতকটা স্বভাব-দোষে। পথে কলাবতীর কলকণ্ঠ কানে আসে না, নূপুরনিক্কণও নয়—কেবল হাইহিল জুতোর খট-খটা-খট আওয়াজ যা আমার কানের পর্দায় পীড়া দেয় অথচ শব্দ সচেতন ইংরেজের কর্ণ-কুহরে তা প্রবেশ করে না। তারা অভ্যস্ত। ভাবছি বলা যায় কিনা সশব্দ পরিবেশে ভারত-বাসী অভ্যস্ত। শব্দতত্ত্ব আলোচনার গোড়ায় বলে রাখা সঙ্গত শীত আমাদের দেশে ক্ষণ-স্থায়ী শৌখিনতা পশ্চিমে প্রায় বর্ষব্যাপী সমস্যা—এদের ভাষায় অভিশাপ। আসলে ইংরেজ থাকে ছোট ঘরে। বড় ঘর শীতে গরম রাখা ব্যয়বহুল। ওদের সংসার বলতে আপনি আর কোপনি—ফিস ফিস করে কথা বলায় যেখানে মাদকতা। ঝিচাকরের বালাই নেই যে হাঁক ডাক করবে। ঘরের দরজা জানলা বিরল। হাওয়া ঢুকবে এই ভয়ে সামান্যতম ফাঁকেও পুলটিশ এঁটে দেয়। পথে বেরিয়ে ব্রাহ্মমধুসূদন ডাক ছাড়ার ক্ষমতা থাকে না, ছোটে শরীরকে গরম করার জন্যে সে হেন সময় হট্টগোলের ফরমাশ করা আর ফাঁসির হুকুম দেওয়া একই কথা। ভাবছি ওদের জোরে কথা বলার সুযোগ কোথায়। আমরা বাস করি সাতমহলা বাড়িতে। আত্মীয় আশ্রিত লোক লস্কর নিয়ে আমাদের গৌরব। হাঁক ডাক পরখ প্রয়োজনীয় না হলে সংসার অচল। ওদের প্রতিবাদ জানাবার ক্ষেত্র সংবাদ-পত্রে। আমাদের অসন্তোষ জানাবার প্রধান সম্বল ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে প্রসেশন বের করা। আমাদের রাজনীতি ময়দানের খোলা চত্বরে, ওদের টেলিভিশনের পর্দায়। আমাদের আনন্দের উৎস পুজোপার্বণ। ঢাকঢোল কাড়ানাকাড়া তার প্রধান অঙ্গ। এদের পুজামণ্ডপ পাব চরণামৃত সোমরস।

ইংরেজ সুপ খায় বটে। তবে অধিকাংশ ঝাল-ঝোলবিহীন শুখনো খাবার। খায় ছুরি কাঁটায়। আমরা দুধে ভাতে আম গুলে যখন খাই হাপুস হুপুস ভিন্ন কোন পথ খোলা আছে বলে আমার জানা নেই। ফিরিস্তি আর বাড়াব না। চলচ্চিত্রে ছবির নায়ক নায়িকার কথা না শুনে যদি পার্শ্ববর্তীর কথা উপভোগ করতে হয়, আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু বিশল্যকরণীর কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রায় গন্ধমাদন পর্বত টেনে এনেছেন। সূক্ষ্ম রসের ব্যাখ্যা করতে বলে স্থূলত্বের সমাহার। কেবল আর একটা কথা, মণিপুরের সশব্দ জলসংগ্রহের ফলে রামের জন্ম। যার রাজত্বকাল গৌরবোজ্জ্বল ভারতের এক স্বর্ণ অধ্যায়।

শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য, লণ্ডন

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

মহাশয়,—

রবীন্দ্রজন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্র বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাবে রঞ্জন তাঁর দ্বিতীয় মতে (২৮শে চৈত্র, ১৩৬৫) একটাও কিছু ভাল বের করতে পারেননি। রঞ্জন কি চোখে প্রস্তাবটি দেখেছেন আমি জানি না। কিন্তু তাঁর আপত্তিগুলি আমি সমস্ত মানতে পারছি না।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর প্রথম আপত্তি হল—"নৃত্য, নাটক ও অভিনয়ের বিশাল ও ব্যয়বহুল আয়োজনে রবীন্দ্রস্মৃতি সম্মান পাবে সামান্যই।" কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হল যে কোন মহাপুরুষের নামে রাস্তা, সড়ক বা স্টেডিয়ামের নামকরণে বা তাঁর কোন মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে সেই মহাপুরুষের স্মৃতির প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয় না। বরঞ্চ তাঁর রচনা, বাণী বা উদ্ভাবনী চিন্তাগুলির (creative ideas) সার্থক রূপায়নেই তাঁর স্মৃতির প্রকৃত সম্মান করা হয়। সুতরাং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, নাট্য ও নৃত্য প্রতি-ভার একটা সার্থক রূপ দেওয়া যায় তাহলে রবীন্দ্রস্মৃতিকে সম্মান করতে গিয়ে বাংলা তথা বাঙ্গালী সমাজই উপকৃত হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিভার বাস্তবায়নই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—আয়োজনের আতিশয্য এবং আড়ম্বর যেন অনাবশ্যকভাবে প্রতিভা চর্চাকে ব্যাহত না করে। কিন্তু রঞ্জন আগের থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল ও ব্যয়বহুল আয়োজনই যে মূল লক্ষ্য হবে সেটা কি করে অনুধাবন করলেন তা বুঝতে পারলাম না।

রঞ্জনের আর একটি আপত্তি হল: "রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনৃত্য ও রবীন্দ্রনাট্য অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব পাবে। * * * নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কাজ হবে যা বিশ্ব-ভারতীতে ও কলকাতার একাধিক গানের ইস্কুলেই ইতোমধ্যে হচ্ছে। * * * আর তা নয়তো এমন কাজ হবে যা রবীন্দ্রবিরোধী বা রবীন্দ্র-নাথের বিকৃতি।" কিন্তু আশা করি রঞ্জন একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কলকাতার এই সমস্ত গানের ইস্কুলের সাধারণের সুযোগ সুবিধে খুবই অল্প। সেক্ষেত্রে আশা করা যেতে পারে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতা ও সাহায্যের দরুণ রবীন্দ্রসঙ্গীত—নৃত্য-নাট্যের চর্চার সুযোগ সুবিধা সাধারণের কাছে আরও ব্যাপকতর হবে। ('সাধারণ' বলতে আমি তাদেরই বোঝাচ্ছি যারা উপরিউক্ত শিল্প-শিক্ষায় উৎসাহী এবং আগ্রহশীল। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তাদের সেই শিক্ষা সম্ভবপর হয় না।)

বর্তমানে রবীন্দ্রসঙ্গীত—নৃত্য-নাট্য ব্যাপারে যাঁরা authority তাঁদের হাতে নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করলে রবীন্দ্রবিরোধী বা রবীন্দ্রনাথের বিকৃতির সম্ভাবনা খুবই কম। এ বিষয়ে রঞ্জনের অহেতুক আশঙ্কার কারণ বুঝি না।

রঞ্জনের আর একটি আশঙ্কার কারণ—(রবীন্দ্রবিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে)—আমার কাছে দুর্বোধ্য। বরঞ্চ এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি পরস্পর শান্তি-পূর্ণ সহঅবস্থাননীতি অবলম্বন করে তাহলে বাংলা দেশে রবীন্দ্র প্রতিভার সমাদর ক্রমেই বেড়ে যাবে। আর কোন কিছুর অনুশীলনের অভাবের থেকে যদি অনুশীলন করতে গিয়ে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার (healthy competition) সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটা ক্ষতিকর না হয়ে পরোক্ষে মঙ্গলময়ই হবে।

পরিশেষে, আজকাল বাংলা দেশে রবীন্দ্র-প্রতিভার আদর ক্রমেই কমে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে সরকারের এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এবং সেখানে বাংলার সুধীসমাজেরও একটা দায়িত্ব আছে। নিছক সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে সরকারের এই প্রস্তাব সার্থকরূপে বাস্তবে রূপায়িত করে রবীন্দ্র-স্মৃতির প্রকৃত সম্মান যাতে দেওয়া যেতে পারে, তারই ঐকান্তিক চেষ্টা বাংলার সুধীসমাজের করা উচিত। ধন্যবাদান্তে, ইতি—দেবকীনন্দন মণ্ডল, কলিকাতা।

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

= ১০ =

বৈচিত্র্যময় মানব ইতিহাসের বিচিত্র দাবা খেলায় অনন্তকালের একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বারে বারে ইহাই দেখা গিয়াছে যে, মানবতা বিরোধী কার্যের ফলে বর্তমানের শাসক আগামী দিনের শাসিতে পরিণত হয়। বীরগঞ্জেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হইল না। নেপালী কংগ্রেসের মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুবর্ণ-সামসেরের নির্দেশে তেইশ বৎসর বয়স্ক থিরবম মল্ল বীরগঞ্জের মুক্তি ফৌজের পরিচালক নিযুক্ত হইল। রাত্রির অন্ধকারে মুক্তি ফৌজ বীরগঞ্জ আক্রমণ করিল। নভেম্বর মাসের শীতের রাতে বীরগঞ্জের নিদ্রিত অধিবাসীদের তন্দ্রা টুটিয়া গেল মুক্তি ফৌজের রাইফেল আর ব্রেনগানের বুলেটের দ্রুত তীক্ষ্ণ আওয়াজে। সহস্র মুক্তি সংগ্রামীর বিপ্লবের জিন্দাবাদ বীরগঞ্জের রাণা ফৌজের উচ্চ দপ্তরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইল। বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত মুক্তি ফৌজের আকস্মিক আক্রমণে রাণা সৈনিকদের ভিতর অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মুক্তি সংগ্রামীর বুলেটের জবাব রাণা ফৌজ দিয়াছিল, কিন্তু তাহা ছিল একান্তই প্রাণহীন। বন্ধন মুক্তির বিরুদ্ধে দাসত্বে বন্ধনকারীর সংগ্রাম ব্যর্থ হইবারই কথা। রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই বীরগঞ্জ মুক্তি ফৌজের দখলে আসিল। বীরগঞ্জের শাসনকর্তা মুক্তি ফৌজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। রাণা সৈনিক মুক্তি সংগ্রামীদের সর্বময় কর্তৃত্বের নিকট মস্তক অবনত করিল। সৈনিকের রক্তে বীরগঞ্জের ধূলি ধূসরিত পথ আরও একবার সিক্ত হইল। ইহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। মানুষের পথ চলার আদিকাল হইতে বারে বারে বিধাতার কনিষ্ঠা কন্যা এই পৃথিবীর বায়ু বিষাক্ত করিয়াছে শয়তানের পঙ্কিল নিঃশ্বাস। কিন্তু সুস্থ, সুন্দর ও বন্ধন-মুক্ত জীবনের উপাসক মানুষ প্রতিবারেই নিজের রক্তের বিনিময়ে ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। অতীতে অগণিত বার ইহা ঘটিয়াছে। আজিকার পৃথিবীতেও ইহা ঘটিতেছে এবং নিশ্চিত করিয়াই বলা যায় যে, যতদিন এই পৃথিবী মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অত্যাচার হইতে মুক্ত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত এই ধরণীর ধূলি-মাটি বারে বারে শহীদের রক্তে রঞ্জিত হইতে থাকিবে। তবুও নভেম্বর মাসের সেই দিনের ঊষার আলো ফুটিল অগণিত মুক্তি সংগ্রামীর বেদনাময় নীরবতার মাঝে। তাহাদের প্রিয়সাথী থিরবম মল্লের দেহ শত্রুর সাতটি বুলেটের আঘাতে জর্জরিত। তেইশ বৎসর বয়স্ক থিরবমের সম্মুখে অপরিমিত সম্ভাবনাপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের পথ উন্মুক্ত ছিল। সমস্ত কিছু স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করিয়া সে আসিয়াছিল বীরগঞ্জের ধূলিধূসরিত পথে নিজের পদ-চিহ্ন রাখিয়া দিবার জন্য। থিরবমের সংজ্ঞাহীন দেহ রক্সৌলের ডানকান হাস-পাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। চিকিৎসকদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও থিরবমের মৃত্যুহীন প্রাণ তাহার নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিল, নিজেকে উৎসর্গ করিল সে কোটি নেপালবাসীর আগামীকালের জন্য।

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রায় চারি-শত নেপালী স্বেচ্ছাসেবক যোগবাণীতে হাজির হইল। উহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভূতপূর্ব সৈনিক, তথাপি ভারতীয় সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর একজন ভূতপূর্ব পদস্থ নেপালী কর্মচারী সুব্বার নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকদের গণসংগ্রামের প্রয়োজনীয় নীতি পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইহার সহিত আবশ্যকীয় রাজনৈতিক শিক্ষাও উপেক্ষিত হইল না। বিরাটনগরের সন্নিকটে এতগুলি নেপালী কংগ্রেসের উর্দিপরিহিত মুক্তি যোদ্ধাদের উপস্থিতি এবং বিরাটনগর অঞ্চলে মুক্তি যোদ্ধাদের গেরিলা সংগ্রাম—উভয় মিলিয়া নেপালের সর্ববৃহৎ শিল্পনগরীর আবহাওয়া বিশেষ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমুহূর্তে মুক্তি ফৌজের আক্রমণ আশংকা করিয়া কর্নেল উত্তমবিক্রম রাণা নিজ প্রাসাদকে রাণা ফৌজের একমাত্র নির্ভরযোগ্য দুর্গে পরিণত করিল। তারপর গুপ্তচরদের সংবাদে প্রকাশ পাইল যে, ছাদের উপর কয়েকটি মেসিন গান স্থাপন করা হইয়াছে। প্রাসাদের চতুর্দিকে পরিখা খনন করিয়া ট্রেঞ্চ মর্টার বসান হইয়াছে, এবং আরও সৈন্য সাহায্য পাঠাইতে কাঠমাণ্ডুকে অনুরোধ করা হইয়াছে। শাসনকর্তা আশা করিতেছেন যে, ধানকুটার পথে শীঘ্র নূতন সৈন্যদল বিরাটনগরে পৌঁছাইবে। মুক্তি ফৌজের কঠিনতম আঘাত প্রতিহত করিতে কর্নেল উত্তমবিক্রম দৃঢ়সংকল্প। অপরদিকে বিরাটনগরের জনসাধারণ মুক্তি ফৌজের সহায়তা করিতে ততোধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গিরিজা এবং বিহারের সোস্যালিস্ট শ্রমিক-কর্মী কপিলদেও-এর নেতৃত্বে বিরাটনগরের কলকারখানার প্রায় দশ হাজার শ্রমিক নেপালী কংগ্রেসের মুক্তি সংগ্রামের আহ্বানে সমর্থন জানাইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে ধর্মঘট করিয়া কলকারখানা অচল করিয়া দিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত। মুক্তি সংগ্রামকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য আবশ্যকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। এখন শুধুমাত্র মুক্তি ফৌজকে অগ্রসর হইতে আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

আহত সৈনিককে নিয়ে মুক্তিফৌজের গেরিলা-বাহিনী

গোচর বিমানঘাটিতে বিদ্রোহী জনতার সমাবেশ

বীরগঞ্জ দখলের পর সেখানে নেপালী কংগ্রেসের সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। নেপালী কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা মুক্তি সংগ্রামী তেজবাহাদুর বীরগঞ্জের শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন। নেপালী কংগ্রেসের সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে মাতৃকাপ্রসাদ এই সরকারকে স্বীকৃতি দিবার জন্য দিল্লীর নিকট আবেদন জানাইলেন, স্বীকৃতি মিলিল না বটে, কিন্তু ভারত সরকার মুক্তি সংগ্রামীদের কোনরূপ বিরোধিতা করিলেন না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরের উপস্থিতি মুক্তি যোদ্ধাদের চরম প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করিল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় বীরগঞ্জ হইতে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে, কাঠমাণ্ডুর সহিত সংযোগরক্ষাকারী একমাত্র পথের উপর অবস্থিত, অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র আমলেখগঞ্জ হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে, মোহনসামশের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত নূতন সৈন্যদল মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। নবতর উদ্যমে রাণা-ফৌজের প্রতি-আক্রমণ শুরু হইল। রাণা ফৌজের ট্রেঞ্চ মর্টার ও ফিল্ডগানের বিরুদ্ধে মুক্তি ফৌজের ব্রেনগান ও রাইফেল বুলেটের জবাব যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করিতে অসমর্থ হওয়ারই কথা। শুধু মাত্র আদর্শের প্রতি অচল নিষ্ঠা এবং অসম-সাহসিকতা লইয়া আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফলতা সম্ভব নহে, শক্তিশালী হাতিয়ারও প্রয়োজন। বীরগঞ্জের সদ্যলব্ধ মুক্তি সংকটের সম্মুখীন হইল।

মুক্তি ফৌজের সর্বাধিনায়ক মেজর জেনা-রেল সুবর্ণসমশের অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে বিহারের নেপাল সীমান্তের নিকট অবস্থিত ফরবেসগঞ্জে পৌঁছাইলেন। সাময়িকভাবে ফরবেসগঞ্জের জগদীশ গুপ্তের গৃহে সুবর্ণসমসেরের শিবির স্থাপিত হইল। নেপালের বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র, আনু-সঙ্গিক সামরিক সরঞ্জাম এবং সংবাদ আদান প্রদানের বেতার যন্ত্রে জগদীশ গুপ্তের গৃহ এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিল, গেরিলা বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ও মুক্তি ফৌজের অধিনায়কদের সহিত সংগ্রামের

গেরিলা-বাহিনীতে বারো বৎসরের নেপালী বালক দ্বারকালাল প্রধান

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় সুবর্ণসম-শের বহু সময় অতিবাহিত করিলেন। বিরাটনগর এলাকার মুক্তি ফৌজের অধি-নায়ক সুব্বা অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, মুক্তি ফৌজের উপস্থিত লোকবল সর্বাত্মক আঘাত হানিবার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু ন্যূন-পক্ষে আরও চারি শত রাইফেল প্রয়োজন। রাণা ফৌজের বিরাটনগর রক্ষা করিবার জন্য যে পরিমাণ উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, উহা হইতে অনুমিত হয় যে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুবর্ণসমশের তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, রাইফেল সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে এবং উহা ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার অধিক কিছুই নিশ্চিত করিয়া সেই অবস্থায় প্রতি-শ্রুতি দেওয়া সম্ভব নহে। মুক্তি ফৌজকে গণযুদ্ধের আবশ্যকীয় রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিবার উপর বিশেষ জোর দিয়া তিনি বলিলেন যে, সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে রাণাসাহীর বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র অস্ত্রধারী সৈনিকের সংগ্রাম নহে, ইহা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মুক্তিকামী নেপালের প্রত্যেকটি মানুষের যুদ্ধ। নেপালী কংগ্রেস গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করিতেছে। কতক্ষণ আলোচনা চলিয়াছে এই সম্পর্কে কাহারও বিশেষ খেয়াল ছিল না। এমন সময় বন্ধ দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া একজন উর্দি-পরিহিত ব্যক্তি সুবর্ণসমশেরের অনুমতি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ইশারা করিয়া সুবর্ণসমশেরকে সে কি বলিল তাহা বুঝিলাম না। তিনি সকলের অনুমতি লইয়া বাহিরে যাইলেন, আরও কিছু সময় কথা-বার্তায় অতিবাহিত হইবার পর সকলেই উঠিয়া পড়িলাম, গৃহের বাহিরে আসিবার জন্য প্রাঙ্গণ অতিক্রম কালে ক্ষণকাল থমকিয়া দাঁড়াইলাম, সূর্যদেব তখন পাটে বসিয়া-ছেন।

শীতের প্রদোষে প্রকৃতি ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় নিস্তব্ধ নীরবতায় বিরাজমান। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে কি জানি কোন অদৃশ্যের কল্পনায় নিমগ্ন ছিলেন সুবর্ণ-সমশের। সেই মুহূর্তে সুবর্ণসমশের নিশ্চয়ই আগামী দিনের হিংসার তাণ্ডব-নৃত্যের কথা চিন্তা করিতেছিলেন না।

সেইদিন নভেম্বর মাসের ষোল অথবা সতের তারিখ। বীরগঞ্জের পরিস্থিতি বিশেষ উদ্বেগজনক। মুক্তি ফৌজের অপরি-মিত রক্তপাতে বীরগঞ্জের শুষ্ক মাটি রক্তাক্ত। প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্য মুক্তি ফৌজ অকৃপণ হস্তে মূল্য দিতেছে, তথাপি রাণা ফৌজের প্রতি-আক্রমণে কোনরূপ শিথিলতা দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম নেপালের তৃতীয় সর্ববৃহৎ শহর নেপালগঞ্জ মুক্তি ফৌজের আক্রমণে বিপর্যস্ত, নেপালী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্রবিক্রম শাহ শান্ত জীবনের

কোমল পথ ছাড়িয়া বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথ বাছিয়া লইলেন। নেপালগঞ্জের মুক্তি ফৌজের নেতৃত্ব করিবার গৌরবময় নির্দেশ তিনি সর্বান্তঃকরণে পালন করিতে ব্রতী হইলেন। ইতিমধ্যে কাঠমান্ডুতে বিশেষ সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। দিল্লীর নীরবতা আরও একবার ভঙ্গ হইল। কাঠমান্ডুস্থ ভারতীয় দূতাবাস রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার বিমানযোগে তিনশত ভারতীয় সৈনিক প্রেরণ করিলেন।

নেপালের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। নেপাল সম্পর্কে ইংরাজ বিশেষ আগ্রহান্বিত। ইংরাজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নেপালী সৈনিক আবশ্যক এবং ইংরাজের ফৌজে নেপালী সৈনিক ভর্তি করিবার অবারিত অধিকারও মোহন সামসের ইংরাজকে দিয়াছিল। সুতরাং নেপালে কোনরকম অশান্তি ইংরাজের এই স্বার্থের পরিপন্থী। নেপালের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত তিব্বত কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক দখল হওয়ায় আমেরিকা বিশেষ বিচলিত। ইহা আরও বৃদ্ধি পাইল যখন গণ-অভ্যুত্থান তিব্বতের দক্ষিণে হিমালয়ের অপর অংশের অনন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইল। কিন্তু সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় ছিল কম্যুনিস্ট রুশের মনোভাব। বর্তমানকালের সর্ববৃহৎ বিপ্লবের জন্মভূমি, সর্বহারার দেশ রুশের পত্র-পত্রিকা নেপালের গণ-অভ্যুত্থানকে পরিহাস করিল। তাহারা ঘোষণা করিল যে, নেপালবাসীর মুক্তিসংগ্রাম বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহা নেপালের জনসাধারণের মধ্যযুগীয় বর্বরতার বন্ধন-মুক্তির সংগ্রাম নহে। আশ্চর্য মানুষ আর ততোধিক আশ্চর্য তাহার উন্মত্ত বিধান। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা এশিয়া ও আফ্রিকার প্রত্যেকটি মুক্তিকামী মানুষ নেপালের গণ-অভ্যুত্থানকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইল। অবশ্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অগণিত পশ্চিমের মানুষও সমর্থন জানাইতে পশ্চাৎপদ হইল না। জাতি, ধর্ম ও দেশ নির্বিশেষে কোটি মানুষের শুভেচ্ছা সমর্থিত নেপালের মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করিতে একমাত্র মোহন সামসের ব্যতীত আর কেহই সাহসী হইলেন না।

মধ্যরাত্রি, নিদ্রিত যোগবাণীর রেল স্টেশনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মালগাড়ি হইতে বিশেষ ভারী কতকগুলি বাক্স নামাইতে ব্যস্ত। ক্ষিপ্রতার সহিত অতি অল্প সময়ের ভিতর বাক্সগুলি সীমান্ত অভিমুখে প্রেরিত হইল। সীমান্তে অবস্থিত মুক্তি ফৌজের শিবিরে সেই রাত্রিতে কেহই নিদ্রার সুখ-স্বপ্ন দেখিবার সুযোগ পাইল না, প্রায় পাঁচশত

নেপালী মুক্তিফৌজের তিন প্রধান: গিরিজা কৈরালা, লেখক ও শিবজঙ্গ রাণা

মুক্তিযোদ্ধা নীরবে নিভৃতে সমবেত হইয়াছে বিরাটনগর সীমান্তে। সকলেরই মুখ উদ্ভাসিত কি-যেন এক প্রত্যাশায়। অত্যন্ত লঘু স্বরে অতি প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত কেহই কোন কথা বলিতেছে না, কিন্তু সজাগ মানুষের পক্ষে সেই নীরবতার ভাষা বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। স্টেশন হইতে মুক্তি যোদ্ধারা বাক্সগুলি লইয়া হাজির হইল এবং পলক ফেলিবার পূর্বেই সেইগুলি খোলা হইল। রাইফেল! চকচকে, শীতল, নীলাভ ইস্পাতের তৈয়ারী প্রায় চারিশত ৩০৩ রাইফেল। বুলেটেরও কোন অভাব নাই। প্রায় আট বৎসর পরে কলিকাতার নির্বিঘ্ন পরিবেশের ভিতর এই কাহিনী লিখিবার সময় সেইদিন মুক্তি-যোদ্ধাদের নিকট ঐ রাইফেলগুলির কি মূল্য ছিল তাহা কোনমতেই বলা সম্ভব নহে। সেই মুহূর্তের উদ্বেগ, উত্তেজনা ও উন্মাদনাকে আজ আমি ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে একান্তই অপারগ। কিন্তু দুঃখ এইমাত্র যে, যাঁহারা ঐ রাইফেলগুলি নিয়া কোটি নেপালবাসীকে বন্ধনমুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের নেপালবাসীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিব না।

উদ্ভিন্ন ঊষা, পাঁচশত শান্ত্রীর সবুট পদক্ষেপে বিরাটনগরের ধূলি-ধূসরিত পথের ধূলো শীতের কুয়াসাকে আরও গাঢ়তর করিল। মুক্তি ফৌজ দুইটি 'কলামে' বিভক্ত হইয়া রাণাফৌজের ঘাটি কর্নেল উত্তমবিক্রমের প্রাসাদ অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বিরাটনগর জুট মিলের নিকট বুলেটের সুতীব্র আওয়াজে তখনই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিরাটনগরের তন্দ্রা কাটিয়া গেল। বিরাটনগর জুট মিল মুক্তিফৌজ দখল করিল, রাণাফৌজ শহরের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া কর্নেল উত্তমবিক্রমের প্রাসাদে সমবেত হইল। রাজপ্রমুখের প্রাসাদ রাণাফৌজের সর্ববৃহৎ প্রতিরোধ ঘাটিতে পরিণত হইল। বিশেষ কঠিন বাধার সম্মুখীন না হইয়া মুক্তিফৌজ শহরের বিভিন্ন কেন্দ্র দখল করিল। কিন্তু মুক্তি-ফৌজের দুর্বার গতি প্রতিহত হইল রাজ-প্রমুখের প্রাসাদের সম্মুখে উন্মুক্ত ময়দান অতিক্রম করিবার সময়। রাণাফৌজ প্রাসাদের চতুর্দিকের পরিখার প্রায়-নিরাপদ আশ্রয় হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় গুলীবর্ষণ শুরু করিল এবং প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে আসিল মেসিনগান ও ব্রেনগানের অবিরাম দ্রুত গুলীবর্ষণ। উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া ইহার জবাব দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় মুক্তি-ফৌজ আশ্রয়ের সন্ধান করিতে বাধ্য হইল।

(ক্রমশ)

ভারত-চীন মৈত্রী সংঘের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম হাউস-এ গত সপ্তাহে একটি চীনা কারুশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

চীন দেশে কারুশিল্পের রেওয়াজ বহু-কালের। চার হাজার বছরেরও পুরানো নক্সা করা তৈজসপত্রাদি পাওয়া যায় সেখানে। ইতিহাসে পড়া যায় শাং রাজত্বের সময় ব্রোঞ্জ শিল্পে এবং বয়ন শিল্পে চীনারা খুবই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। গালার কাজও চীনে আরম্ভ হয় বহু প্রাচীন কালেই। চীনারা দেখা যায়, সবরকম জিনিসেই রসোত্তীর্ণ শিল্পসামগ্রী তৈরী করতে পটু। চীনা মাটির কাজ, তাঁতে বোনার কাজ, সূচিশিল্প, গালার কাজ, ভাস্কর্য, খোদাই করা কাজ, বেত খড় প্রভৃতি বোনার কাজ এসবে চীনাদের মত পারদর্শী কারিগর জগতে বিরল। চীনা জনসাধারণ স্বভাবত শিল্পরসিক, তাই এসব শিল্পসামগ্রীর চাহিদা কোন দিনই সেখানে কমে না। এই যান্ত্রিক যুগেও সেখানে কারুশিল্পের স্থান সবার ওপরে। সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই কারুশিল্পের আরও উন্নতি হয়েছে দেখা যায়। সেখানকার সরকার অনেক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করেছেন গ্রামের কারিগরদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই শিল্পকলাকে উন্নত-তর করে তুলতে। নক্সায় কেবল প্রথাগত মোতিফ না ব্যবহার করে নতুন নতুন মোতিফ যোজনা করতেও শেখাচ্ছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, গ্রামের শিল্পীদের জিনিস-পত্র দিয়ে, অর্থ সাহায্য করেও এইসব শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করতে সাহায্য করছেন সরকার। চীনের কারুশিল্প এখন উন্নতির নতুন পথে। হাতীর দাঁতের কাজ, জেড পাথরের কাজ, স্ফটিকের কাজ, গালার কাজ, চীনা মাটির কাজ, পাথরের কাজ, বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, মোমের কাজ, ক্রয়েজোন, বেত বা খড় বোনার কাজ প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় ৭৫টি দর্শনীয় সামগ্রী এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি ভারতে এর আগে আর কোথাও প্রদর্শিত হয়নি। কারিগরীর বিচারে হাতীর দাঁতের কাজগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে কুড়িটি স্তরের বলটি, বাদ্য-যন্ত্র হাতে কিশোরীর মূর্তিটি এবং ক্ল্যাসিক্যাল ফিগারটি শিল্পীদের অসাধারণ নিপুণ কাজ করার ক্ষমতার পরিচয় দেয়। রসের বিচারে আমার মনে হয়, এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ চীনা মাটির সাদা ব্যঙ্গ মূর্তিটি। গালার কাজগুলির মধ্যেও বেশ চিত্তাকর্ষক নিদর্শন রয়েছে। সূচিশিল্পের কাজের যেসব নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি প্রথম শ্রেণীর চীনা সূচিশিল্পের পর্যায় নিশ্চয় উঠতে পারে না। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত চীনা চারু ও কারুশিল্পের প্রদর্শনীতে আমরা চীনা সূচিশিল্প দেখে যতটা পুলকিত এবং আশ্চর্য হয়েছিলাম, এ প্রদর্শনীর সূচিশিল্প আমাদের ততটা আশ্চর্য করতে পারেনি। আমাদের দেশেও এ থেকে উন্নততর সূচিশিল্প দেখা যায়।

*

প্রদর্শিত হাতীর দাঁতের একটি কাজ

সম্প্রতি জার্মান ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থায় একটি জার্মান চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়ে গেছে কলকাতায়। 'জার্মান পেইন্টিং থ্রু দি এজেস' এই শিরোনামায় প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় এক সপ্তাহ কাল ধরে। ছবিগুলি সবই ছিল প্রিণ্ট। পঞ্চদশ, ষোড়শ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের শীর্ষ-স্থানীয় চিত্রকরদের কয়েকটি রচনা থেকে এই প্রিণ্টগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। আসল ছবি দেখতে পাইনি বলে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই, কারণ যা প্রিণ্ট দেখেছি, তা আসল বলেই ভ্রম হয়। এত নিখুঁত ছাপার কাজ এর আগে কখনও দেখিনি বললে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ধর্মই ছিল চিত্রকলার একমাত্র বিষয়বস্তু, কিন্তু সে সময়েও জার্মানীতে কয়েকটি বিশেষ ধারা প্রবর্তিত হয় যেমন রিফরমেশন, মিস্টি-সিজম, সেক্টস প্রভৃতি। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে আমরা সে-সময়কার পথিকৃৎ শিল্পী-দের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার পরিচয় পাই। পরে ইতালীয় রেনেসাঁস-এর প্রভাব জার্মানীতেও পৌঁছায় এবং সেখানকার শিল্পীরাও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করতে লেগে যান। সেখানে তখন দেখা দেয় প্রতিকৃতি, স্টিল লাইফ, নিসর্গ চিত্র প্রভৃতি। সে সময় জার্মানীতেই সর্ব-প্রথম চিত্রে মনুষ্যাকৃতির নিখুঁত শারীর-স্থান এবং ত্রিমাত্রিক ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। অর্থাৎ সেখানে সম্পূর্ণ রিপ্রেজেণ্টেশনাল আর্ট-এর প্রবর্তন ঘটে। বি গ্রীয়েন-এর 'দ হোলী ফ্যামিলি' এবং এ ডিউরারের 'সেণ্ট জন অ্যাণ্ড সেণ্ট পীটার' এ ধরনের রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ'রা যতটা নিখুঁতভাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করেছেন আধুনিক ক্যামেরাও বোধ হয় ততটা পারে না।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকও নানান পরি-বর্তনে মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অন্য আর সব দেশে যেমন জার্মানীতেও, তেমনি শিল্পীরা নির্দিষ্ট কোনও পথ পাননি। পরীক্ষণ নিরীক্ষণেরই পালা চলছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এসবের সঙ্গে সেখানকার শিল্পেও নানা মুনির নানা মত। সেখানকার আধুনিক চিত্রকরেরা ফরাসী ইমপ্রেশনিজম-এর কাছে অবশ্যই ঋণী। ফরাসী ইমপ্রেশনিজম-এর প্রভাবে জার্মান আর্টের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই ইমপ্রেশনিজম-এর প্রভাবই সেখানে স্বতন্ত্র তিনটি স্কুল প্রবর্তিত হয়—'দি ব্রীজ', 'দি ব্লু রাইডার এবং 'দি বাউহাউস'। আধুনিক আর্ট-এ এ'দের অবদান আজ সর্বজনস্বীকার্য।

—চিত্রগ্রীব

দেবেশ রায়

রবিবারের সকাল। সবে ঘুম থেকে উঠে পাঁচজন দুটো চৌকির ওপর জমাটি হয়ে বসেছে। কারো গায়ের ওপর একটা বিছানার চাদর, কারো-কারো গায়ে গরম চাদর। দুটো টেবিলের ওপর পাঁচকাপ চা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সিগারেটে টান দিচ্ছে সবাই। পুজো হয়ে গেছে। শীত পড়েনি এখনো। কিছুদিনের মধ্যেই পড়বে। তবু, শীত পড়ছে, এটা ধরে নেয়া হয়েছে এ-আড্ডায়। নইলে, একটা ঠাণ্ডা মেজাজ থেকে ধীরে ধীরে গরম হয়ে ওঠার মতো, আরামটা ভোগ করা যায় না।

রবিই প্রথমে বলে উঠলো, "কী, হবে নাকি একহাত?"

পরেশ সশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিল—"সকালবেলাতেই শুরু করবে?"

"আরে, এখনই তো সময়, টেবিলে যে-যা ফেলবে, দেখো, সবই তোমার পকেটে গিয়ে উঠবে—" রাও একটা চরম উৎসাহীর ভাব করলো।

"ঘুম থেকে উঠলি, একটু জিরিয়ে নে, এখুনি ভগবানের নামে ঝন্ ঝন্ করবি, এটা ভালো দেখায়?" বল্লভ ওর ছোট শরীরের বড় ভুঁড়িটা বেড-কভার দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বললো।

"হরে কৃষ্ণ" একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পরেশের গলা থেকে কথা দুটো বেরিয়ে এলো। পরেশ চোখ বুজলো। ওকে দেখে সত্যি সত্যি সাধু বলে মনে হচ্ছিল।

সুধাময় শব্দ করে টেবিলের ওপর পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে চৌকি থেকে নামলো। শেলফ্ থেকে তাসের প্যাকেটটা নিয়ে এলো। তারপর বল্লভ, পরেশ আর নিজের সামনে তাস ফেলতে লাগলো—"দেখি পরেশ বল্লভের লাক্ কেমন যাবে?"—

—পরেশ তাসগুলো হাতে তুললো, বল্লভ ওর ভুঁড়ির ওপর দুহাত রেখে দাঁত বের করে বসে থাকলো, সুধাময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে নিজের তাস তুললো, হাত বাড়িয়ে বল্লভের তাস তুললো, পরেশ আর সুধাময় দুজনেই "মারো গলি" বলে চেঁচিয়ে উঠলো। সবাই উবু হলো, দেখলো। হাসলো। বল্লভ ওর ভঙ্গি পরিবর্তন না করে হাসতে হাসতে কাঁপলো। পরেশ আবার পুরোন ভঙ্গি করে বললো, "হরে কৃষ্ণ"। রবি চেঁচিয়ে উঠলো, "শালা, এরকম লাক্ তোমার, খেলবে না মানে?"

"চালাও পানসি বেলঘরিয়া"—রাও সামনে এগিয়ে এলো।

"চালাও চালাও"—রবি এগিয়ে এলো।

"হরে কৃষ্ণ, কী যে করো তোমরা"—যেন নেহাত অনিচ্ছায় পরেশ এগুলো।

বল্লভ উঠে দাঁড়ালো—"দাঁড়াও টাকা ভাঙিয়ে আনি।" সুধাময় উবু হয়ে তাস বিলি করতে করতে কোত্থেকে একটা টুল টেনে এনে তার ওপর বসে পড়লো।

একটুক্ষণের থমথমে নীরবতা। সবার ভুরো কোঁচকানো। বাঁ-হাতে পয়সা ঠেলতে ঠেলতে ডানহাতে পরেশ হাঁটু চুলকোচ্ছে। রবি ঠোঁটের ওপর দুটো আঙুল ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে। সুধাময় চিবুকের দুপাশ থেকে হাতটা বোলাতে বোলাতে নিচে নামিয়ে
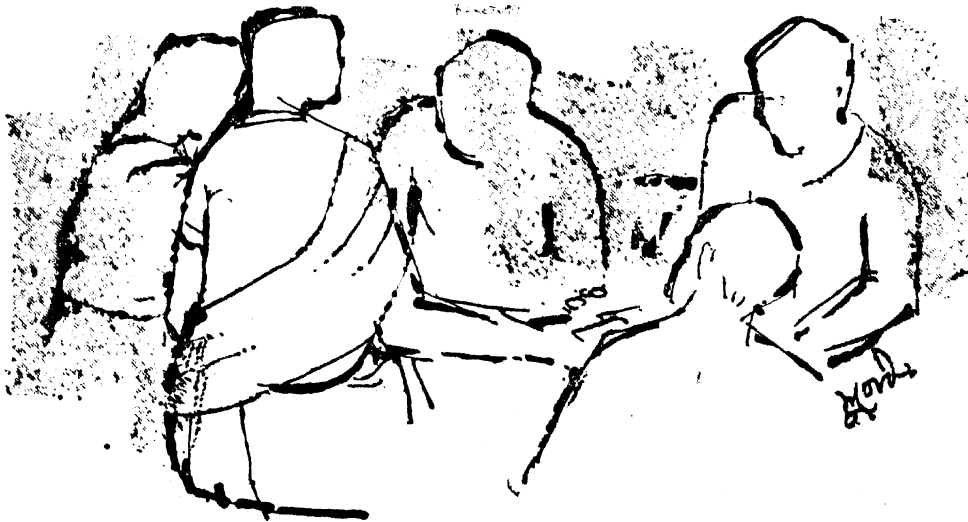
আনছে। বল্লভ ওর ভুঁড়ির নিচে দুটো হাত জড়ো করে রেখেছে। রাও ডানপায়ের তলাটা সামনে দুআঙুল দিয়ে রগড়ে রগড়ে ময়লা তুলছে। পয়সাগুলো জমে উঠছে টেবলে। সবাই ব্লাইন্ড খেলছে। এক-দুই-তিন রাউন্ডও প্রায় শেষ হয়ে এলো। প্রায় নিঃশব্দেই রবি বললো—"স্কুইজ্ড্"। তাস তিনটা তুললো, দুই হাতে ধরলো। আর একটু সরিয়ে সরিয়ে নম্বরগুলো দেখতে লাগলো, মধ্যবিত্ত কেরানীর মতো তার হিসাব, সংশয়ী। প্রথম তাস ইস্কাবনের টেক্কা, দ্বিতীয় তাসটা দেখলো না রবি, তৃতীয়টা ইস্কাবনের চার, রবির আর একবার পাল্লা এলো, দ্বিতীয় তাসটা না-দেখেই পয়সা ঠেলে দিল। দিয়ে ভাবতে লাগলো, যদি দ্বিতীয়টা ইস্কাবন হয়? ইস্কাবন না হয়ে যদি অন্য রঙের টেক্কা হয়? বল্লভ তুললো তাস। সবচেয়ে ওপরের তাসটা দেখে পয়সা ঠেলে দিল বসন্ত-হওয়া লোকের শীতলার থানে পয়সা দেয়ার মতো। রাও তৈরি-ই ছিল, পয়সা এগিয়ে দিল। সুধাময়, রাও, পরেশ ব্লাইন্ড খেলছে। পরেশ হাঁটু থেকে হাত তুললো, পছন্দ-অপছন্দের অতীত দৈনিক কর্তব্যের মতো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে একটা তাস তুললো, আর একটা, আর একটা। পয়সা ঠেলে দিল। রবি তাস ফেলে দিল, দ্বিতীয় তাসটা চিড়ের পাঁচ। সুধাময় ব্লাইন্ড পয়সা ঠেললো। রাও তাস তুললো, বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলো, অপরিচিত হাতের লেখা চিঠির ঠিকানার মতো ফেলে দিল। বল্লভ তাস-গুলো ছড়িয়ে দিয়ে পেছনের দেয়ালে হেলান দিল। পরেশ পয়সা ঠেললো। পরেশ আর সুধাময়ের খেলা। সুধাময় ব্লাইন্ড। সুধাময় এক টানে জুলিয়াস সিজারের ভঙ্গিতে তাসগুলো তুললো, দেখলো, ফেলে দিল। পরেশ বন্দরে পেঁছুনো মাল-জাহাজের নোঙর ফেলার ভঙ্গিতে নিজের তাসগুলো নামালো —টেক্কার জোড়া। পয়সাগুলো কোলের ওপর রাখতে রাখতে পরেশ আবার সেই ভঙ্গি করে বললো—"হরে-কৃষ্ণ"।

সবাই একটু শিথিল হয়ে ছড়িয়ে নিল। হাতটা একটু প্রসারিত করা, কিংবা পা-টা একটু মেলে দেয়া। সুধাময় দু হাতের মধ্যে মুখটা একবার ঘষে নিল। ওর চোখে-মুখে হিসাবের গভীরতা। সুধাময় ছাত্র। বি এস-সি পড়ছে। দিনাজপুরে তার বাড়ি। রবি এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে দোলাচ্ছে একদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে। রবি শিয়ালদা স্টেশনে চাকরি করে। পরেশ খুব নিশ্চিন্ত শিথিলতার সঙ্গে তাস বিলি করা শুরু করলো। অ্যারোড্রমে এমন একটা চাকরি করে পরেশ, যাতে তার মাইনে একশ আশি টাকা হলেও, প্রতি মাসে ব্যাঙ্কে দেড়শ করে টাকা জমায়, আজ সাত বছর হলো বাড়ি যায় না। বল্লভ ওর ভুঁড়ির নিচে দুটো হাত এমনভাবে রেখে চেপে আছে যেন, হাত দুটো সরালেই তার ভুঁড়িটা খসে পড়বে। পূর্ববাঙলায় বাড়ি ছিল বল্লভের। এখন নদীয়ার দিকে কোথাও বাড়ি-জমি করেছে। মাঝে মাঝে বাড়ি যায়। রাও একটু এলিয়ে থেকে পয়সা এগিয়ে দেয়। রাওয়ের তিনপুরুষের বাড়ি কটকে। রেডিওতে চাকরি করে।

খেলা চলতে লাগলো। যেন একঘুম থেকে উঠে আরেক ঘুমের রাজ্যে এরা তলিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত অস্তিত্বকে একত্র করে রেখেছে একটা দিকে। কেউ হাঁটুতে হাত বোলায়, কেউ ঠোঁটে আঙুল বোলায়, কেউ চিবুক মোছে বারবার। সবাই একা-একা যেন কী ভীষণ একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। একা-একা, একেবারে একা, আর সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী। মনের আর সব চেতনা কেমন নিঃসাড় হয়ে যায়।

"বাবু, স্নান করুন" মেসের ঠাকুর এসেছে। ঘড়ি দেখলো রাও, দেড়টা। "বাদ দাও এবার"—রবি বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো। "হরে-কৃষ্ণ"—পরেশ হাত-পা-ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। তার বাঁ হাতের ধাক্কায় রাও রবির ওপর পড়ে গেল। পায়ের ধাক্কায় একটা ডলপুতুলের মতো গড়িয়ে পড়লো বল্লভ। সুধাকর টুল থেকে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে সামলে নিল।

কিন্তু কেউ তাদের ভঙ্গি বদলালো না। রবির ওপর রাও তেমনি করেই পড়ে রইল। আর, রাওয়ের গলার ওপর দিয়ে একহাত ফেলে বিশালদেহ পরেশ শুয়ে রইল, আর পরেশের পায়ের তলায় পড়ে রইল বল্লভ। সুধাময় আপন মনে তাসগুলো নিয়ে ভাঁজতে লাগলো।

রাও বললো, "সুধা, দত্ত পয়সা নিতে এসেছিল?"

"না।"

"সেদিন দেখিয়েছে বটে দত্ত—"রবি বললো।

বল্লভ বললো, "এখন বাবা ওর বিয়ের ফুল ফুটেছে, ও দেখাবে না তো কী আমি দেখাবো?"

পরেশ যেন অনেকটা স্বগতোক্তি করলো, "দত্ত থাকলে কিন্তু জমতো সাংঘাতিক।"

"ও শালার কথাবার্তাই ছিল আলাদা, গোপালবাবুর মতো লোককে ফ্ল্যাসের টেবিলে টানলো—" রবি বললো।

বল্লভ ওর শোয়ার ভঙ্গি একটু পরিবর্তন করতে করতে বললো—"আর, গোপালবাবুর নাকডাকা বন্ধ করলো কি করে?"

তাস নাড়াচাড়া করতে করতে চোখ তুললো সুধাময়, "গাঁজার কল্‌কে কিনে এনে বালিসের তলায় রেখেছিল না?"

সবাই মিলে হাসতে লাগলো। দত্ত নেই, গোপালবাবু-ও নেই। সুধাময় শুধু সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়েছে—তাতেই হাসির ঝড় উঠেছে, সুধাময় কেবল কাঠামোর বাতাসটুকু দিয়েছে, আর পরমুহূর্তে পাঁচজনেরই মনেই সম্পূর্ণ প্রতিমাটি গড়া হয়ে গেছে।

একসময় হাসি থেমে গেল। রবি বললো—"ওঃ সেই দিনগুলো গেছে। পাগলের মতো। এই অফিস থেকে ফিরে রাত বারোটা পর্যন্ত আড্ডা। রাত্রিতেও নিরাপদে ঘুমুবার উপায় নেই। কে কখন কাকে কী করে? রাও-এর মশারি নেই বলে, ও সবাইয়ের মশারির দড়ি কেটে দিল।"

"আর সেই মনে আছে—গোপালবাবু দোকান থেকে সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে এলেন, আমরা বল্লাম, দত্ত তোর শ্বশুর দিয়ে গেছেন"—

রাও আর একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিল।

"দত্ত প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল"—রবি যোগ করলো।

"প্রায় আবার কি? বিশ্বাস তো করেই—ছিল"—বল্লভ বললো।

"সে সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে দত্ত-র কী লজ্জা!" বলেই খিলখিল করে হেসে ফেললো সুধাময়।

"গোপালবাবু দেখলেন, তিনি আনলেন মিষ্টি, নাম হলো হবু শ্বশুরের—" বল্লভ আরো—একটা-কী মনে করিয়ে দিল।

"খাবার ঘরে ডেকে—" ডাকার পরের ঘটনাটুকু মনে পড়ে যাওয়ায় হাসির দমকে কথা শেষ করতে পারলো না রবি।

"দত্তকে সব ফাঁস করে দিলেন—" রাও হো হো করে হাসলো।

"গোপালবাবু এক মাল!" - পরেশ বললো।

"মরে আছে পরেশ, একদিন রাত্তিতে তুই বলেছিস, শালার বুড়ো মরেও না, মর ব্যাটা নাক ডেকে ডেকে জীবন অতিষ্ঠ করে তুললো—" কথাটা আর শেষ করতে পারলো না সুধাময়। সকলের হাসির মধ্যে রাও উঠে বসে কেঁদে কেঁদে দেখাতে লাগলো—"আপনারা আমার মৃত্যু কামনা করেন, হ্যাঁ, আপনারা আমার মৃত্যু কামনা করেন, অ্যাঁ।"

"বাবু চান করুন"—ঠাকুর ডাকলো।

পরেশ উঠলো। বল্লভ উঠলো। রাও উঠলো। যাদের যাদের গায়ে চাদর ছিল কখন একসময় সে সব গা থেকে খুলে গেছে। রবি সে-সমস্ত টেনে-টেনে নিয়ে ভাঁজ করতে লাগলো। এদিকে পরেশ তেলের একরাশ শিশির দিকে তাকিয়ে বললো—" কোন্ তেলটা খারাপ হে?"

"তোমার তেল কি এখনো এসে পেঁছয় নি, পরেশ"—সুধাময় পরেশের দিকে না-তাকিয়ে জিগ্যেস করলো। সে প্রশ্ন যেন চিঠিতে 'আপনি কেমন আছেন' লেখার মতো। কথাটা বলতে গিয়ে সুধাময়কে একবার গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে হলো। এই প্রশ্নটি করবার আগে পর্যন্ত যে-সুরে কথা হচ্ছিল, একথাটা বলবার আগে সে-সুরকে বদলে নিল।

—"আর বলো কেন? সেই যে, সুয়েজ খাল দখল করার সময় নাসের আটকে দিল, আর ছাড়ে নি......ভাবছি ওটা নাসেরকে প্রেজেন্ট করেই দেব।" কথাগুলো বলতে বলতে একটা শিশি থেকে পরেশ বাদামি রঙের তেল ঢেলেছে, গামছা নিয়েছে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কথাটা শেষ করে বেরিয়ে গেল।

চাদর-টাদরগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে রবি নিজের গায়ের গেঞ্জিটা খুলে বারান্দার রেলিঙে চলে গেল।

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে, দেয়ালে পিঠটা হেলান দিয়ে, টুলটার ওপরই আধ-শোয়ার ভঙ্গি করে থাকলো সুধাময়।

চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলো রাও।

চৌকির ওপর গামছা পরে, খালি গায়ে বসে থাকলো বল্লভ।

রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে, নিচের পথের দিকে তাকিয়ে রবির নতুন করে মনে পড়লো আজ রবিবার। তাই ইস্কুলের মেয়েরা যাচ্ছে না।

উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে রাও ভাবলো তার ট্রান্সফারের অর্ডারটা এখনো এলো না। আর বুঝি আসবেও না। কটকে আর যাওয়া হবে না।

চৌকির ওপর গামছা পরে বসে থেকে বল্লভ ভাবলো তাদের দেশের বাড়িতে একটা পুকুর ছিল, দুপুরে সেখানে ঘণ্টা কয়েক সাঁতরাতো।

সুধাময় সেলফের ওপর চার-পাঁচটা তেলের শিশির দিকে তাকিয়ে চুলে হাত দিল, মনে পড়লো—সুজাতা তার মাথায় তেল না-দেয়া পছন্দ করতো, আজ বিকেলে নমিতার সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

পরেশ স্নান করতে করতে গুন্ গুন্ করে গান গাইছে। সাত বছর সে বাড়ি যায় নি। সাত বছর। সাত বছর এতো কম সময়! সাত বছর। সাত বছর এতো দীর্ঘ-সময়। মা এখন কতো বুড়ি হয়েছেন? ছোটভাইটা কতবড়ো।

রবি ফাঁকা পথের দিকে চেয়ে থাকলো। সেই মেয়েটি আজ ইস্কুলে যায় নি। যাবে না। একেবারে মুকুলের মতো চেহারা। কতোদিন মুকুলের সঙ্গে দেখা হয় নি। একসঙ্গে ইসকুলে যেতো। মুকুলটা একেবারে মেয়েদের মতো দেখতে ছিল, ইসকুলে একবার মহেশ থিয়েটারে আমিনার পার্ট করেছিল।

কতোদিন কটক-ছাড়া। প্রায় বছর তিনেক। যদিও মাঝে মাঝে গেছে—তবু কটকের পুরনো জীবনে তো আর ফিরে

যায় নি। জাউলিয়া পট্টির চায়ের দোকানে আড্ডা। রাওকে ইচ্ছা করে বদলি করছে না। কোনোরকমে বদলি হতে পারলে একেবারে সেই দিনগুলোর মধ্যে গিয়ে পড়া যায়। কোনো ভাবনা নেই। সকালে বাড়ি থেকে বেরুনো—সন্ধ্যের অনেক পরে ফেরা। কলেজ ছিল নামে-মাত্র।

পুকুরে স্নান করতে নামলে সারাটা শরীরে জল লাগতো। জলের স্পর্শ অনুভব করতো। শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখলে মনে হতো—জল শরীরটাকে নিয়ে খেলছে। কালো চিকন, গভীর মদির জল। এখানে বল্লভকে কলের জলে স্নান করতে হয়, কৃপণের মতো জল পড়ে।

নমিতা তেল না-মাখা অপছন্দ করে। তবু সুধাময় তেল না-মাখা ছাড়ে নি। এখন আর সবসময় মনেও থাকে না যে, সুজাতাই তাকে এ-অভ্যাস করিয়েছিল কেবল, প্রতিদিন স্নানের আগে, মাথায় তেল না- দিয়ে, তেলু তেলে হাতটা মুখে ঘষবার সময়, গন্ধ একবার মনে করিয়ে দেয়, সুজাতার কথা।

স্নান সেরে, ঘরে ফিরে আসতে-আসতে পরেশ ভাবে, বাড়ির চেহারাটা কি আগের মতোই আছে? নাকি বদলানো হয়েছে! এখন তো বাড়ি যেতে পারে। বাড়ি যাওয়ার কথাটা অন্য সময় মনে পড়ে না বলেই তো যাওয়া হয় না। এই স্নান সেরে ঘরে ফেরার সময়টুকু কেবল বাড়ির কথা মনে পড়ে।

পরেশ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বল্লভ ওঠে। গুনু গুনু করতে করতে বাথরুমের দিকে যায়, ভেতরে গিয়েও গুনু গুনু করে। পরেশ যে গান গুনু গুনু করেছে, বল্লভ তা করছে না, রবি-রাও-সুধাময়ও নিজের নিজের ইচ্ছেমতো গান গাইতে গাইতে স্নান করবে। কিন্তু সব গানের সুরেই সবাইকে মনে করিয়ে দেয়—সেদিনগুলো আর নেই। স্নান সেরে শান্ত স্নিগ্ধ দেহমনে,—স্নানের দ্বারা শান্ত, স্নিগ্ধ, তৃপ্ত হতে হতে,—অস্নাত, রুক্ষ, অশান্ত, অতৃপ্ত, দেহমনে,—ওরা সবাই একই কথা ভাবতে লাগলো—সেই দিনগুলো আর নেই—সেই দিনগুলো। কলের জল একজনের ওপর ঝরে পড়লো, সারা শরীরে প্রবাহিত হলো, শিরায় শিরায় সেই তরল শীতল জলকে একজন গ্রহণ করলো। আর আপনমনে এমন একটা সুর গুনগুন্ করলো যা বাইরের চারজন ভাবছে, একজন রেলিঙে দাঁড়িয়ে, একজন শুয়ে, একজন বসে, একজন জানলায় দাঁড়িয়ে।

বাইরের আকাশে রোদ ঝরছে, ভেতরে জল, ঘরে নিদ্রাতুর নীরবতা। সেই জলের নিচে, রোদের তীরে, নীরবতার মধ্যে—পাঁচজন ভাবলো—এমন কতকগুলো দিনের কথা যা চলে গেছে। সেদিনগুলো একদিন ছিল, এ-দিনগুলো সেদিনের মতো নয়, সেদিনগুলোর স্মৃতিতে ভরাট হয়ে রোদ আর স্রোতের জলে যেন এ-দিনগুলো বয়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে।

ঘরটায় দুপুর এসেছে। যে-যার বিছানায় নানা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। রবি আর রাও এক চৌকিতে, বল্লভ মেঝেতে, পরেশ আর সুধাময় আরেক চৌকিতে। সবাই ঘুমুতে চাইছে। ঘুম যেন ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসেছে, ভেতরে আসতে চাইছে না। কেমন এক অদ্ভুত রাজ্যে সব মনগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে রাজ্যগুলো যেন ঘুমের দেশের চারপাশে। ভেতরে ঢুকবার আগে এ-সব রাজ্যেই তারা থেকে যাচ্ছে। যেন কুয়াশা দিয়ে আঁকা, কিংবা শীতের রাতের নিশ্বাস দিয়ে।

রবি দেখছে—একটা রাঙা ঘোড়া, শরীরের রঙ আগুনের মতো, ঘাড়ের ঝুঁটিটা ধূম্র, একটা পালকি, দরজা দুটো একটু ফাঁক, বাহকদের শরীর বালির রঙের মতো, দূরে মরা-নদীর সোতা,—'অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো' 'আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে—'।

রাও দেখছে—গাছগুলো ত্রিকোণা, নুড়িগুলো ত্রিকোণা, একটা মাকড়সা আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত একটা ত্রিকোণা জাল বুনেছে, আর সেই জালটার ওপারেই মাদুরার মন্দিরটা, মাদুরা-মন্দিরের সিঁড়িতে বাওয়ের ত্রিনয়নী, শুয়ে আছে, রাওয়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে, রাও কিছুতেই সেই মাকড়সার জালটাকে কাটতে পারছে না।

বল্লভ খুব চোরাগলি দিয়ে বল্লভ লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ঘুমের দেশে চলে গেছে। নাক ডাকছে।

পরেশ প্রাণপণে একটা ছোট্ট প্লেনের মধ্যে বসে, উড়ে, সেই দেশে যেতে চাইছে, কোনো মতেই পারছে না। বিরাট মাঠের মধ্যে একটা ছোট্ট প্লেন, ছ আনা দামের। খুড়োমার পরেশ চালাচ্ছে, প্লেনটা দৌড়তে দৌড়তে মায়ের বৌ-আমলের একটা খাটের তলে ঢুকে যাচ্ছে। দমদমে ডিউটি আছে কাল।

সুধাময় একটা খাঁচার মধ্যে খুব বড়ো একটা শঙ্খচিল দেখছে, শঙ্খচিলটা ডাকছে চিঁ-ই-রো-ও, চিঁ-ই-রো-ও, আকাশে ছেঁড়া মেঘ, আকাশ আর মাটির মাঝখানে ছেঁড়া মেঘের দুপুর, সেই বিরাট খাঁচাটার মধ্যে পাখিটা উড়ে উড়ে কাঁদতে চাইছে, কিন্তু পাখা মেললেই ডানা দুটো খাঁচায় আটকে যাচ্ছে।

রবি একটা লাফ দিয়ে উঠে বসলো। "এই রাও ওঠ, সিনেমায় যাবি না?"

পরেশ চোখ খুললো "কটা বাজে?" রবি রাওয়ের বালিশের তলে হাত দিয়ে ঘড়িটা বের করলো—"আড়াইটে বাজে নি এখনো, এই রাও, ওঠ।"

রাও চোখ না-খুলেই বললো, "ও ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাক।"

"তুমি শালা ওঠো না আগে"—পরেশ রাওকে বললো, "চল, যাবার সময় দত্ত-র বাড়ি নেমে, করুণা আর দত্তকে নিয়ে যাই।"

"বহুত্ আচ্ছা"—রবি লাফ দিয়ে নামলো

"এই বল্লভ ওঠ্!"

"এই সুধাময়!"

"আমি যাবো না, দত্তর বাড়ি হয়ে গেলে ইভ্‌নিঙ শো ছাড়া যাওয়া হবে না, পাঁচটার সময় আমার একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে" সুধাময় বললো।

রাও বললো, "আরে না, ম্যাটিনিতেই হবে, চল্"

"যা যা ব্যাটা, তুই আমাকে শেখাবি? এখন দত্তর ওখানে যাবি, গেলেই একহাত তাস হবে, একহাত হতে হতে দুহাত, দুহাত হতে হতে চারহাত, শেষে চারটে বাজবে, করুণা চা করতে যাবে, বেরোতে বেরোতে সাড়ে পাঁচটা।" সুধাময় যুক্তি দেখালো।

"এই বল্লভ, ওঠ্"—পরেশ লাথি দিয়ে বল্লভকে ডাকলো।

বল্লভ উঠে বসে বললো—"কি?"

"সিনেমায় যাবি না"

"কেন?"

"তোর বউয়ের শ্রাদ্ধ বলে।"

"কে দেখাবে?"

"তোর বাবা"—

পা-জামার ওপর রাও একটা শার্ট চাপিয়ে নিল। পরেশ আর বল্লভ ধুতি পরলো। রবির ধুতি নেই। অগত্যা প্যান্ট পরেই রওনা হলো। সুধাময় একা ঘরে রইল। পাঁচটার সময় নমিতার সঙ্গে দেখা করার কথা। মেট্রোর নিচে অপেক্ষা করবে।

সিনেমা হলের কাছে ওরা যখন গিয়ে দাঁড়ালো ঘড়িতে তখন ছটা প্রায় বাজে বাজে। পরেশ বললো—"দাও, টিকিটের পয়সা দাও।" বলেই, বল্লভের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। বল্লভ বাধা দেবার আগেই পরেশ পকেট থেকে মুঠো বের করলো। মুঠো বের করে দেখলো তিন টাকা।

"আরো লাগবে, দাও"—

"নিন না, আমি দিচ্ছি"—করুণা ওর ছোট্ট ব্যাগটা খুললো।

"আরে রাখোই না, সবাই দেবার পর কিছু দরকার হলে তুমি দেবে"—রবি বললো এবং পকেট থেকে টাকা বের করে পরেশের হাতে দিল।

"রাও কিছু কম"—পরেশ রাওয়ের কাছে হাত পাতলো।

"তুই একনম্বরের মাইজার"—রাও পরেশকে বললো।

"ব্যাটা টাকা দিয়ে গালাগাল দে।"

"ঘুষ নিয়ে নিয়ে তো কলাগাছ হচ্ছো।" রাও টাকা দিল।

পরেশ জানালা থেকে টিকিট কেটে আনলো। হাতের পয়সাগুলো গুনলো। পকেটে রাখলো। দত্ত ঘড়ি দেখে বললো—

"চলো চলো আর একটুক্ষণ বাকি আছে"—

ওরা দরজার দিকে এগুলো। রাও, দত্ত, রবি করুণা, বল্লভ। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, টর্চ হাতে দিশারি এলো। ওরা ছজন সারি দিয়ে পরপর বসে পড়লো—পরেশ, রাও, করুণা, রবি, দত্ত, বল্লভ।

বিজ্ঞাপন শুরু হলো। সাবান। মলম। বই। সিনেমা। জামাকাপড়। খাবার। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। রবি ঝুঁকে বললো—"দত্ত।" দত্ত বললো—"আর লাভ নেই।" করুণা বললো—"যান্!"

মাঝখানে ওরা ছ-জন ওপরের রেস্তোরাঁয় গেল। চা খেল। খাবার খেল। দত্ত বললো, "এই রাও, সুধাময় আমার পয়সা দিল না। ও বুঝি ওই জন্যই আসে নি?

রাও বললো—"সুধা ঠিকই বলেছিল। তোমার ওখানে যাওয়ার কথা বলতেই ও বললো—তার মানে ছটার শো। পাঁচটার সময় ওর কোথায় যাবার কথা ছিল?"

"কোথায়?" দত্ত শুধালো।

"তুমি যেমন বাণিজ্য করেছ, তেমনি কিছু করতে বোধ হয়"—রবি বললো করুণাকে দেখিয়ে।

"আজ সুধা মেজাজ পেয়েছে"— বল্লভ বললো।

"আপনারা এখনো ঐ সব খেলেন?" করুণা শুধাল।

"কী করবো সিস্টার-ইন-ল, আমাদের তো আর তুমি নেই, যে জ্যোৎস্নালোকে হাডুডু খেলবো"—রাও বললো।

করুণা ওর ব্যাগ থেকে একটা মশলার কৌটো বের করলো। মশলা বের করে সবার হাতে হাতে দিল। সবাই উঠলো আবার, অন্ধকার সিনেমা হল। আবার দিশারি। আবার একসারিতে ছ-জন।
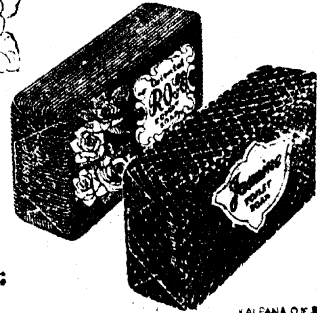
ছবিতে পথ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল, ধুলো উড়লো, আবার একটা গাড়ি, আবার ধুলো, অনেকগুলো লোক, আবার ধুলো, আবার অনেক লোক, আবার ধুলো, ধুলোতে পরদা ভরে গেল যেন, সব আড়াল হয়ে গেল, বাতাসে ধুলোগুলো ভেসে বেড়াতে লাগলো, ছড়িয়ে গেল, খোলা জানালা দিয়ে ঢুকলো, সাজানো ঘরের গোছানো জিনিসে ধুলোর আবরণ পড়লো।

সামনে দর্শকদের সারি সারি মাথা, স্মৃতির মতো অপরিচিত, অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। স্মৃতি-বস্তুর ধূলিঢাকা রূপ। নেপথ্যে একটা যন্ত্র বাজছে। ওদের মনে হলো সেই দিনগুলো আর নেই, এখনকার দিনগুলো মলিন। পর্দায় একটা ঘরের রূপবদল দেখানো হচ্ছে। ভারি খাটের জায়গায়, পাতলা খাট, হালকা আসবাব। সময় চলে যাচ্ছে। একটা কাল। পাতলা খাটে ভারি খাটের স্মৃতি।

দত্ত ভাবলো—কী দিনগুলো কেটেছে, ওদের এখনো সেই দিন আছে, আমার নেই। আমার-ই শেষ হয়ে গেছে। আর ওদের কজনেরই আচরণে, আলাপে কোন্ একটা ফেলে-আসা দিনের ইশারা যেন করুণার মনে এলো। সে-ও কোন্ অদ্ভুত হালকা দিনপুঞ্জ থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে ভাবনা-চিন্তার ভারি দিনগুলোয়। সেই শিমুল-তুলো দিনের আর আর সংগীরা বুঝি এখনো সেই দিনটিই কাটাচ্ছে, আর সেই কেবল ভারি হয়ে গেছে, পানাপুকুর হয়ে গেছে। সেই কোন্ এক হারিয়ে-যাওয়া ফেলে-আসা দিনের স্রোতে ওরা ছজন ভেসে গেল। হলের ভেতরে অন্ধকার। দর্শকদের ধূসর অস্পষ্ট মূর্তি। জীবনের অন্ধকারে আবছা তবু জীবন্ত অস্তিত্ব। সেদিনগুলো ছিল কি ছিল না, কে জানে? ওরা কেবল জানে, সেদিনগুলো নেই, আর আসবে না। সেই যে দিনগুলো চলে গেছে, সেই দিনগুলো সোনা-রঙের দিন, নানারঙের দিন, রামধনুর নিচের অংশের মতো অস্পষ্ট বর্ণিল অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে রঙের ইঙ্গিতের মতো সেদিনগুলো ছিল, আর নেই, আর থাকবে না।

ছবির বৃদ্ধা নায়িকা গোবর জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে দত্ত, করুণা, রাও, রবি, পরেশ, বল্লভের সামনে ঘোষণা করে গেলঃ সেদিনগুলো ছিল, নেই, আসবে না।

লেপের মধ্যে শুয়ে দত্ত খবর-কাগজ পড়ছিল। এ তার বহুদিনের অভ্যেস, একেবারে সেই মেসের দিনগুলো থেকে। সকাল বেলা খবর পড়তো, আর রাত্রি বেলা যতোক্ষণ না ঠাকুর খেতে ডাকতো বিজ্ঞাপন পড়তো। এখনো তাই করে।

বিজ্ঞাপনটা পুরোপুরি পড়ল দত্ত। স্কেল—আশি-দেড়শ গ্রেড্। এখনই তো দত্ত পাচ্ছে দু শ পাঁচ। অবিশ্যি উপরি আছে বলে মনে হচ্ছে। দরখাস্ত করবে নাকি? এখন কিছু করতে গেলে নানারকম চিন্তা এসে মাথায় জড়ো হয়। কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। শরীরটা যেন ভারি হয়ে এসেছে। দিনগুলো যেন ভারি হয়ে এসেছে। এই চাকরিটা পাওয়ার আগে একবার চাকরি ছেড়েছে দত্ত। সে-চাকরি ছেড়ে এ-চাকরিতে ঢোকার আগেও হয়তো নানা-চিন্তা তাকে পীড়িত করেছিল, হয়তো করেনি। কিন্তু আজ, এখন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, মৌমাছি যেমন অনায়াসে এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে এসে বসে, তেমনি সহজে সে একটি চাকরি ছেড়ে আর একটি চাকরিতে ঢুকেছে। যেমন মনে পড়ে আজ আরো ছেলেবেলার দিন। খেলতে খেলতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাড়ি ফেরার পথে কতো ভাবনা, কতো উদ্বেগ, কতো আশংকা, মা কী বলবেন, বাবা কি বলবেন? আর আজ সেই আশংকাটুকু উবে গিয়ে কেবল সন্ধ্যাটুকু আছে। শান্ত, ধীর, সন্ধ্যা। আকাশটা এতো লাল যে, মনে হচ্ছে ওখানে কী একটা ঘটা আছে। পথটা যেন সেই প্রকাণ্ড ব্যাপারের সামনাসামনি উপস্থিত হবে! একটু একটু অন্ধকার, আর তারই আড়াল থেকে মুখ বাড়াচ্ছে নিশুতিরাতের মতো কালো কটকটে বিকট ভয়। আর কী সুন্দর সেই দিনগুলো, কী সবুজ, নিটোল, কোমল, গভীর, মধুর!

স্মৃতি এমন একটা কক্ষ, প্রবেশমাত্র একটা তীব্র সুবাসে দেহ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সৌরভের উৎসটিকে দেখা যায় না।

করুণা ঘরে ঢুকলো। দত্ত খবরের কাগজটাকে বুকের ওপর বিছিয়ে দিল। সে করুণাকে দেখতে লাগলো। করুণা পায়ের দিকে, টেবিল আর খাটের মাঝখানে, জানলাটাতে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘরের মাঝের আলোটা জ্বালা হয়নি। দত্তের শিয়রের ঢাকনা আলোটা জ্বলছে। ঘরটায় একটা আবছা আলো, সকালবেলায় সূর্য ওঠার আগের মতো। জানলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। করুণার শরীরের ওপর দিকটা প্রায় আঁধার। করুণা জানলার গরাদ দুটো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বেণী করে চুল বাঁধা। পেছন থেকে আজো সবাই ভাববে, করুণা কলেজের মেয়ে, বিয়ে হয়নি এখনো। মাথার সিঁদুর আর হাতের শাঁখাটা ছাড়া ওর শরীরে কোথাও সে বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু শরীরের ভেতরে? সেখানে নির্ভুলভাবে আর একটা শরীর গঠিত হচ্ছে।

সেই তৃতীয় দেহটার ক্রমগঠনে প্রমাণিত হচ্ছে চর্ণো আর কুমারী নেই।

করুণা ডাকলো, "খেতে চলো।"

খেতে বসে করুণা বললো—"অনেকদিন পর আজকের সন্ধ্যেটা বেশ ভালো কাটলো, তাই না?"

দত্ত জবাব দিল—"অনেকদিন পর দেখা হলো তো, তুমি তো মাঝে মাঝে ওদের মেসে গিয়ে গল্প করে আসতে পারো, সারা-দিন একা থাকো।"

"নিজে তো ফের আর শোও। কেমন চর্ণো আর কুমারী নেই।

"বাঃ একা একা যেতে পারো না।"

"ওরাও তো তোমারই বন্ধ্, সন্ধ্যেবেলাতে কি আর ঘরে থাকে?

"রাওয়ের সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপ মনে আছে?" দত্তের প্রশ্নের জবাবে খিল-খিল করে হেসে উঠলো করুণা। তারপর বললো, "উঃ কী নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল"—

"সে তো তোমারই জন্য, ও ঘরে ঢ্কে তোমাকে প্রেজেণ্টটা দেবার আগেই তুমি বলে উঠলে—'এতো দেরি করলেন যে রাও?' বাস, সঙ্গে সঙ্গে রাও নার্ভাস!"—দত্ত বললো।

"বাঃ, তুমিই তো শিখিয়ে দিয়েছিলে ও-রকম করতে" খাওয়া বন্ধ করে করুণা বললো। তারপর দুজন একসঙ্গে হেসে উঠলো। হাসিটা থামবার পরও হাসি-হাসি মুখ নিয়ে দত্ত করুণার দিকে চেয়ে রইল। সেই হাসি আর করুণার চউনি—অনেক কথা বললো। ওরা ঐ হাসি আর চাউনির মধ্য দিয়ে সেই কথাটি বলতে লাগলো, যা-বলার ভাষা ওরা জানে না। সেই কথা কইতে কইতে এক সময় ওদের খাওয়া শেষ হলো। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে খাটের ওপর শুয়ে দত্ত ভাবতে শুরু করলো—করুণাকে এখন লাল চেলি আর বেনারসিতে কেমন লাগবে? হয়তো এখন আগের চাইতে ভালো লাগবে, আরো সুন্দর, আরো মদন-মোহন, কেবল থাকবে না সেই কৌমার্যের শান্তি আর প্রতীক্ষা।

দিগবিস্তারী প্রান্তরে সারি সারি টেস্ট-টিউব সাজানো রয়েছে। সুধাময় সেই প্রান্তরের একপ্রান্তে শুয়ে আছে। হাত-বাড়িয়ে একটা টেস্ট-টিউব থেকে নীল রঙ ছুড়ে দিল দিগন্তে। সেখান থেকে একটি মেয়ে হেঁটে আসছে সুধাময়ের দিকে, সুজাতা। সুজাতার ঠোঁটের একটা বিশেষ কুঞ্চন বার বার চোখে পড়ছে সুধাময়ের। সুধাময় শেষ যে-বার সুজাতাকে বলেছিল, কী বলেছিল, সুজাতা অমনি করে ঠোঁটে কুঞ্চন জাগিয়েছিল। একটা লাল টকটকে বেনারসি পরা দেহ সুধাময়কে জড়িয়ে ধরছে। সুধাময় আর নমিতাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছে। নমিতা সুধাময়কে জড়িয়ে ধরেছিল। এখনো ধরছে, বর্তমানের মতো উগ্র আগ্রহে টানছে সুধাময়কে;—স্মৃতির মতো কোমল, শ্যামল, আবছা হয়ে সুজাতা দাঁড়িয়ে আছে।

মাদুরা মন্দিরের দেবদাসীর মূর্তিটিকে কতো মিনতি করছে রাও, সে কিছুতেই নাচছে না।

বল্লভ সহসা একটা গেরিলা হয়ে উঠলো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রইল। কখন একসময় ধানের চারা হয়ে পতপত করতে লাগলো।

সেই রাঙা-ঘোড়াটা ছুটছে আর রবি তার পেছন পেছন দৌড়চ্ছে। সেই রাঙা-ঘোড়ার ওপর কিন্তু রবি-ই বসে আছে। পেছনে কিন্তু রবি-ই দৌড়চ্ছে।

কাল সকালে দমদমে ডিউটি। মাটি ছেড়ে প্লেন আকাশে ওঠে। বাড়ির আকাশ।

করুণা এসে বিছানায় উঠলো। দত্তকে পেরিয়ে ও-পাশে গেল। পা-ছড়িয়ে বসে কোমরের রশি একটু আলগা করে দিল। শাড়িটাকে ঢিলে করে নিল, তারপর বেণীটাকে ঠেলে বালিসের ওপর দিয়ে, শুয়ে পড়লো। তিন চারবার উঁচু হয়ে, পাশ ফিরে, নিজেকে ঠিক করে নিল। দত্তর গা থেকে লেপটা নিতে নিতে বললো—"এই একটু লেপ ছাড়ো, আমার ঠান্ডা লাগছে না?"

দত্ত করুণার দিকে পাশ ফিরলো। করুণা চোখ বুজলো। দত্ত চোখ বুজে বললো—

"তুমি আর রান্নাঘরে যেয়ো না; দেখি, একটা লোক যোগাড় করা যাক্।"

চোখ বুজেই করুণা জবাব দিল, "এ মাসটা চলে যাবে।"
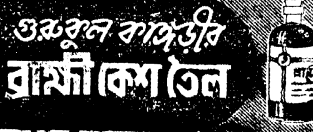
"জোর করে চালিয়ে কি লাভ?"

"অনেক লাভ।"

"আরো বেশি ক্ষতি করাবে তো—"

"সে ভয় তোমার নেই গো, সে ভয় নেই, আমারো কিছু হবে না, বাচ্চারও নয়"—শরীরটাকে একটু মুচড়ে করুণা বললো।

"তোমার আবার এ-কথা মনে হচ্ছে না তো, বাচ্চা না-হলেই ভালো ছিল?"—দত্ত জিজ্ঞাসা করলো।

"যাঃ।"

নিজের শরীরের ওপর দত্তের হাতের ছোঁয়া অনুভব করতে করতে করুণা ঐ "যাঃ"টাকে বিচার' করলো। সত্যি যদি আরো কিছু দিন বাচ্চা না-হলে চলতো। তা-হলে কি হতো! কিছুই হতো না হয়তো! দত্ত অফিসে চলে যাবার পর ঝিমোনো শরীর নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর করতে হতো। শরীর টিসটিস করতো আর সন্ধ্যা-বেলা দত্ত ফেরার আগে পর্যন্ত বসে থাকতে হতো একা একা।

দত্তর হাতের টানে করুণা কিছুটা সরে এলো।

আর যদি দত্তর জন্য অপেক্ষাও করতে না হতো! সেই ষোল সতের আঠার বছরের জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা, হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে থাকতে পরাতো! সেটাই ভালো ছিল, অনেক অনেক ভালো।

কোন্ কোন্ তুলনায় সেই জীবন এ-জীবনের চাইতে ভালো ছিল, সে বিচার করুণা করলো না। দত্তর- হাতের আদর সারা শরীরে অনুভব করতে করতে, শিরায় শিরায় প্রবাহিত করে অন্তরে গ্রহণ করতে করতে, এই বর্তমানকে উপেক্ষা করে মশারির আঁধারের সেই একাকী কুমারী-রাতগুলোতে ফিরে গেল। কী একটা যন্ত্রণা ছিল সে-জীবনে, অনেক কষ্ট আবার অনেক সুখ। কী একটা বাসনা, যা, মুখ ফুটে বলা যায় না, আবার নিজের কাছে বলতে বড় পুলক হতো। বড় সুখ, বড় পুলক, এই এখনটা ভালো নয়, ভালো নয়।

দত্ত করুণার আরো ঘনিষ্ঠ হলো। 'গরম লাগছে' বলে করুণা লেপটাকে লাথি দিয়ে দিয়ে গুটিয়ে পায়ের কাছে ফেলে দিল: পা-টা লেপ থেকে বের করে আনলো, দত্তর পায়ের সংগে তার পায়ের ধাক্কা লাগলো। পা-সরালো না করুণা। পা-ঘষতে লাগলো দত্তর পায়ের সংগে। ডান হাত দিয়ে দত্তর কানের পেছনটা ডলে দিতে লাগলো, নাকটা দুয়েকবার দত্তর বুকে ঘষলো। আর ভাবলো —সেই অন্ধকারের নির্জন ষোল সতের বছরের রাতগুলো বেদনায় ও যন্ত্রণায় অনেক বেশি রঙিন ছিল, অনেক বেশি রঙিন।

বিছানার মধ্যে ছটফট করতে করতে উপুড় হতেই বালিশ থেকে একঝলক গন্ধ সুধাময়ের নাকে লাগলো। সুজাতা এই সুবাস ভালোবাসে না। সুজাতা এই সুবাসের মতো ক্ষীণ, দূরবর্তী, ছায়া। নমিতা এই বর্তমানের মতো মিথ্যে।

বসন্ত একটা ধানপাতা হয়ে পুলকে কাঁপতে লাগলো। আর সব প্রলয়-পয়োধি-জলে একাকার। বসুন্ধরার তখনো নরম মাটিতে একটা ধানের শিষ হয়ে বসন্ত দুলছে, সূর্য তার ওপর কিরণ ফেলছে, সূর্যের চার পাশে পৃথিবী ঘুরছে, ঘুরছে আর শক্ত হচ্ছে। শক্ত পৃথিবীর ওপর শুয়ে থেকে বসন্ত সেই ধানের শিষের স্মৃতি বহন করছে। স্মৃতিকে বরণ করছে, বর্তমানকে ধিক্কার দিচ্ছে।

দত্ত করুণার ঈষৎ স্ফীত নাভিদেশে হাত রাখল মমতায়। সেই ঈষদুন্নত উদরে আবর্তিত হচ্ছে আর একটা দেহ। সেই দেহ ভূমিষ্ঠ হবে। করুণার আর কৌমার্য নেই। কিন্তু এ-করুণা কি ভালো নয়!

করুণা দত্তর হাতটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরলো, আর ডানহাত দিয়ে দত্তকে আকর্ষণ করে নিজের শরীরটাকে মেশাতে লাগলো দত্তর শরীরের সংগে, যেন ঘষে ঘষে মুছে ফেলবে বর্তমানের গ্লানি, এই বিবাহিত রাত্রিকে সেই কুমারী রাত্রিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

আর উদরের ভেতর আবর্তিত হলো চার মাসের পুরনো ভ্রূণটা। শিরা-উপশিরা-তন্ত্রী-মেদের চক্রে বন্দী, বত্রিশ-নাড়ীর জটিল-বন্ধনে নাভিমূলের সংগে সংযুক্ত, সেই ভ্রূণটা আবর্তিত হলো, বন্ধন ছিঁড়তে চায়, রক্তাক্ত অন্ধকার আর ভালো লাগে না, ভালো লাগে না।

আরো ছ-মাস পর, করুণার সারা-শরীরের অনেকখানি মাংসকে ক্লান্ত করে, অনেক পরিমাণ রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে সে-যখন সেই-অন্ধকার থেকে এই-আলোতে এসে পৌঁছুবে, তখন আর ভালো লাগবে না এই আলোর দিনগুলো, ভালো লাগবে না, ভালো লাগবে না; হামাগুড়ি দিয়ে সে আবার ফিরে যেতে চাইবে গর্ভের অন্ধকার দিনগুলোর মধ্যে।

শার্ঙ্গদেব
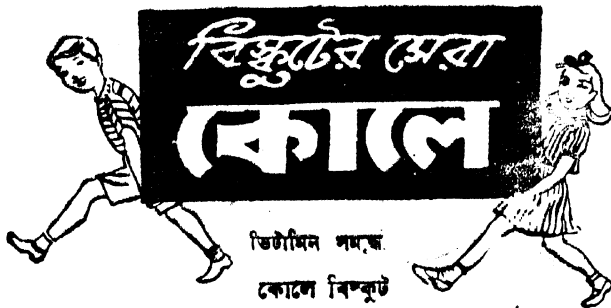
রবীন্দ্র নৃত্য-নাটক-সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়

গত ২৮শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে—রবীন্দ্র নৃত্য নাটক ও সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটি স্থাপিত হবে কবির জোড়াসাঁকোস্থিত পৈতৃক বাসভবনে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য তার নামেই প্রকাশ অর্থাৎ এইটি হবে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের নাটক তাঁর সংগীতের সঙ্গে এত গভীর-ভাবে যুক্ত যে, তাঁর নাটকও স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর সংগীতের সঙ্গেই আলোচনার বস্তু বলে স্বীকৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন এর জন্য বিদগ্ধ ব্যক্তি-মাত্রেই খুশী হবেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল তাঁর গান। একাধিকবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সাহিত্যের যে রকম অবস্থাই ঘটুক, গান তাঁর থাকবেই—বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গান অন্তত কেউ ভুলবে না। রবীন্দ্রনাথের গান আমরা ভুলি নি, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত মূল্যায়নে আজও যত্নবান হই নি। রবীন্দ্র-নাথের জীবৎকালেই তাঁর সংগীত সম্বন্ধে আমাদের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা তা করি নি। এইটি যদি করা হত তাহলে তাঁর পুরাতন গানের যে সব সুর হারিয়ে গেছে তার কিয়দংশ অন্তত উদ্ধার করা যেত, তাঁর সংগীত-রচনার প্রাথমিক যুগের বা তাঁর পূর্বযুগের গীতিকারদের সম্পর্কে আরো অনেক কিছুই জানা যেত না তিনি বলে যেতে পারতেন। এ সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহের গুরুত্বের পরিচয় পেলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার আরও উন্মুক্ত করতেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, যথাসময়ে আমরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হই নি। বিলম্বে হলেও নানা কারণেই রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে একটি বৃহৎ সুপরিকল্পিত বিদ্যালয় আজ বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

অনেকে রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চা আবশ্যিক ভাবে প্রবর্তন করাতে চেয়েছেন। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, রবীন্দ্রসংগীতের বিপুলতা, গুরুত্ব এবং বৈচিত্র্য অনুসারে পরিকল্পিত বিদ্যালয়টি রবীন্দ্রসংগীতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। বিধানচন্দ্র রায় পরিকল্পনাটি পেশ করবামাত্র একটি ক্ষোভ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে কেন রবীন্দ্রসাহিত্যের কোন উল্লেখ করা হল না। এর অর্থ এই যে, অনেকের কাছেই সাহিত্যের তুলনায় সংগীত লঘু বিবেচিত হয় এবং তদনু-সারেই রবীন্দ্রসাহিত্যের তুলনায় রবীন্দ্র-সংগীতকে অনেকেই অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বলে মনে করেন। এই ধারণাটা যে ভ্রমাত্মক সেটি প্রমাণিত হবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবলমাত্র সংগীতকে কেন্দ্র করে সার্থক হয়ে ওঠে। সাহিত্য এবং সংগীত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। আমাদের দেশে সাহিত্যিকরাই প্রধানত গীতিকার;—অতএব যে চিন্তা তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, সেই চিন্তা তাঁদের সংগীতকেও গৌরবান্বিত করেছে। এই কারণে বাংলার সংগীতকে বাংলার সাহিত্যের চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ে বসাবার প্রচেষ্টা আদৌ সমর্থন-যোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সাহিত্য-চর্চা করেছেন, কিন্তু সেই তুলনায় সংগীতের চর্চা কি কম করেছেন? সাহিত্য-নিষ্ঠার চেয়ে সংগীতনিষ্ঠা তাঁর একটুকু কম ছিল না, বরঞ্চ বেশিই ছিল। জীবনব্যাপী সাধনায় যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং গবেষণার প্রচুর অবকাশ যদি থাকে, তাহলে তাঁর সারাজীবনের সৌন্দর্যসাধনার প্রতীক বহু বৈচিত্র্যমণ্ডিত সংগীত সম্বন্ধে গবেষণার যে কত আবশ্যকতা আছে, তা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণার যত সুযোগ আছে, রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে তত নেই, তার তুলনায় কোন সুযোগই নেই বলা চলে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ আলোচনা এবং গবেষণার বিশেষ সুযোগ আছে। প্রতিটি কলেজ বা বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা হয়ে থাকে। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবন এবং কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী রয়েছে। সেই তুলনায় রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা হয় কতটুকু? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্ত সংগীত সম্বন্ধীয় শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গের সংগীত-নাটক একাডেমি যেভাবে চলেছে তাতে সেখানে গবেষণাদি কার্য আদৌ হবে কি না সেটাই সন্দেহ। বড় বড় কলেজগুলিতে সংগীত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। যে দু-একটি সংগীত-বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাদের সংগতি এমন নয় যে, সেখানে গবেষণার যথেষ্ট আয়োজন করা যায়। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাঁরা যে এত-খানি অগ্রসর হয়েছেন এইটুকুই যথেষ্ট। অতএব সরকারের উদ্যোগে যদি রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে যথার্থ আলোচনার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ না করে উৎসাহ প্রকাশ করাই উচিত।

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে গবেষণার যে কত বস্তু আছে তা যাঁরা ভারতীয় সংগীত, বাংলার সংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁরা ভাল-ভাবেই জানেন। রবীন্দ্রসংগীতে রাগমিশ্রণ, রবীন্দ্রসংগীতের সংগঠন, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ পরিকল্পনা, রবীন্দ্রসংগীতে ভারতীয় সংগীতের প্রভাব, রবীন্দ্রসংগীতে পুরাতন বাংলা গানের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক সংগীত, বর্তমান সংগীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তা—এ সবই তো গবেষণার বিষয়। এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাই কি যথেষ্ট? এ ছাড়া নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে বহু আলোচনার বস্তু আছে। তারপর আছে রবীন্দ্রসংগীতের প্রযোজনা, অনুষ্ঠান এবং পরিবেশনের দিক। রবীন্দ্রসংগীতের এই যে সুবিস্তীর্ণ পরিধি—অভিজ্ঞতা না থাকলে এ সম্বন্ধে পরিমাপ করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমাদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় মূল্যায়নের ব্যাপারে আমরা

তেমন তৎপর নই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংগীত সম্বন্ধে আমাদের একদা অতিশয় লঘু ধারণা ছিল। সে সব সংগীতের সারবত্তা নির্ণয়ের কোন চেষ্টাই আমরা দীর্ঘকাল ধরে করি নি। সে যুগের গান যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে এল তখন আমরা তাদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হতে শুরু করলাম। আজ এতদিন পরে আমাদের মনস্তাপের অবাধ নেই যে, সে যুগের সে সব গান একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। এখন আমরা একদা অবহেলিত কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে কতরকম গবেষণাই না করে চলেছি, কিন্তু যতদিন এসব গান প্রচলিত ছিল, ততদিন তাদের উত্তম অংশগুলি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি নি। লোকসংগীত সম্বন্ধেও এক সময় আমাদের কোন উৎসাহই ছিল না, কিন্তু আজ আমাদের আগ্রহ যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছে, কেননা আমরা লোক-সংগীতের মূল্য বুঝতে শিখেছি। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, এখন থেকে যদি রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা এবং গবেষণা না করি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের এই অবহেলার জন্য যথেষ্ট মনস্তাপ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির উৎস খুঁজতে গেলে বাংলার সংগীতকে আমাদের যেমন সমগ্রভাবে জানতে হবে তেমনি রবীন্দ্রসংগীতের সংগে অপর সংগীতের তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলেও সংগীত সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। এই উপলক্ষ্যে ভারতীয় সংগীত এবং বাংলার বিভিন্ন সংগীত সম্বন্ধেও স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা, চর্চা এবং গবেষণার সুযোগ ঘটবে। রবীন্দ্রসংগীতকে কেন্দ্র করে এই যে সংগীত সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তার ঘটবে এর মূল্য অসাধারণ এবং এই সব কারণেই রবীন্দ্রসংগীতকে অবলম্বন করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

তবে, পশ্চিমবংগ সরকারকে আমরা অনুরোধ করব তাঁরা যে পরিকল্পনা করবেন তা যেন সুচিন্তিত এবং ব্যাপক হয়। আজ-কাল সরকার যে কাজেই হাত দেন তাতেই প্রচারের পরিমাণ থাকে সবচেয়ে বেশি আর বাকিটা প্রায় ক্ষেত্রেই অপটু হাতে পড়ে অসার প্রতিপন্ন হয়। আশা করি তাঁরা এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন না যার উদ্দেশ্য হবে কিছু আর্টিস্ট তৈরি করা যারা গভর্নরের বাড়িতে গিয়ে সম্মানিত অতিথি-দের মনোরঞ্জন করবে বা ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শহরে শহরে অভিনয় করে আসবে। বিদ্যা এবং জ্ঞানই যেন হয় এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য; আর প্রয়োগশিল্পের দিকে তাঁরা যেন সর্বাধিক মনোযোগ প্রদান করেন। প্রয়োগ মানে রেডিওর কৃত্রিম আর্টিস্ট তৈরী করা নয়—রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সেইভাবে গাইতে এবং ভাবতে শেখে। পরিশেষে আর একটা অনুরোধ—ছাত্র, ছাত্রী যাদের নেওয়া হবে তারা যেন ইতিপূর্বেই যথেষ্ট সাধারণ শিক্ষা অর্জন করে আসেন তা না হলে গবেষণা এবং আলোচনা—এই দুই-এর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। গলা ভাল হলে গান তুলে দেওয়া যায়, তাদের দিয়ে গাওয়ানো যায়, কিন্তু আলোচনা বা গবেষণার চিন্তা জাগ্রত করা যায় না। অতএব, যদি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হয় তাহলে তাতে প্রবেশের যোগ্যতা বিচার করে তবেই ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করতে হবে নতুবা সব আয়োজনই নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হবে।

ভেবেচিন্তে খুন করার অপরাধের জন্যে ফাঁসির শাস্তি হওয়াটাই হয় স্বাভাবিক। কিন্তু কথায় বলে, এর চেয়েও নির্মমতম শাস্তি হচ্ছে দগ্ধে দগ্ধে মারা। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের বিচারপতি কর্নেলিয়াস জে হ্যারিংটন দুই নরহন্ত্রীকে ঠিক সেইরকমই শাস্তি দিয়েছিলেন। আর্ভিং ল্যাং নামক এক যুবককে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার জন্যে প্রৌঢ়া শ্রীমতী ব্ল্যাংক ডাংকেল ও শ্রীমতী এভেলিন স্মিথ নামক দুই মহিলা অভিযুক্তা হয়। বিচারের ধারা দেখে সবাই যখন প্রায় নিশ্চিত যে, বিচারপতি হ্যারিংটন নির্ঘাত প্রাণদণ্ডাদেশ দেবেন তখন তাঁর মুখ থেকে রায় বের হলঃ "তোমাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হল। শেষ বিচারটা আমি তোমাদের বিবেকের ওপরই ন্যস্ত করলাম। প্রত্যেক বছর ৫ই জুলাই ৬টার সময় তোমাদের দুজনকে নির্জন কারায় একা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হবে যাতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তোমরা তোমাদের অপরাধের কথা ভাবতে পারো। এর দ্বারা তোমরা প্রতি বছর তোমাদের অপরাধের তারিখে ভেবে দেখতে পারবে যে, কি নৃশংস কাণ্ড তোমরা করেছ।"

অল্পবয়স্ক বিচারপতি হ্যারিংটনের হাতে এই প্রথম খুনের মামলা এবং শিকাগোর কুক কাউন্টি জেলে ইতিপূর্বে কোন মহিলা অপরাধিনীর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়নি। চব্বিশ বছর শাস্তি ভোগের পর এখন অপরাধিনী দুজনের ঐ বিস্ময়কর শাস্তি ভোগের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে।

ব্যাপারটির সূত্রপাত হয় ১৯৩৪ সনে যখন আটাশ বৎসর বয়স্ক আর্ভিং ল্যাং সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা ব্ল্যাংক ডাংকেলের সংগে প্রণয়সূত্রে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আর্ভিং শ্রীমতী ডাংকেলের সতের বৎসর বয়স্কা কন্যা ডরোথিকে দেখে তারই প্রেমে পড়ে যায় এবং তাকেই বিবাহ করে। এর দশ মাস পর ডরোথির মৃত্যু ঘটে। শ্রীমতী ডাংকেলের তখন মনে হয় যে, আর্ভিং এবার নিশ্চয় তার প্রথম প্রণয়িনীর কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু আর্ভিং তা করলে না, উপরন্তু আর একটি মেয়ের সংগে প্রণয়ে লিপ্ত হবার চেষ্টা করতে থাকে। শ্রীমতী ডাংকেল তার প্রণয়ী একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে আর্ভিংয়ের জীবন-বীমার দরুণ হাজার পাঁচেক টাকা বাগিয়ে নেবার কথা ভাবতে থাকে।

ডরোথির মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর আর্ভিং বেশ খুশী মনে তার শাশুড়ীর কাছে অগাস্ট মাসে তার বিয়ের সুখবরটা দিতে এল। শ্রীমতী ডাংকেল বাইরে দেখালে কি আনন্দই না তার হয়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখন তার অপরিসীম জ্বালা। আর্ভিংয়ের বীমার দরুণ টাকাটা আর্ভিংয়ের মৃত্যু ঘটলে শ্রীমতী ডাংকেল ও তার কন্যা ডরোথি দুজনেরই প্রাপ্য ছিল এবং এটাও ছিল যে, ওদের দুজনের কেউ মারা গেলে অপর যে জীবিত থাকবে সে-ই টাকাটা পাবে। ডরোথির মৃত্যু হওয়ায় শ্রীমতী ডাংকেলই হয় সেই টাকার উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু আর্ভিং জলজ্যান্ত বেঁচে, তাছাড়া শ্রীমতী ডাংকেল এটাও বুঝতে পারলে যে, পুনরায় বিয়ের পর আর্ভিং তার বীমার টাকার উত্তরাধিকারিণী করবে তার স্ত্রীকে। শ্রীমতী ডাংকেল বুঝলে যে, আর্ভিংকে হত্যা না করতে পারলে টাকাটা সে পাবে না এবং ঘটনাচক্রে ঊনত্রিশ বৎসর বয়স্কা তিন সন্তানের জননী এভেলিন স্মিথ একটা দায়ে পড়ে তার সংগে দেখা করতে আসার সংগে হত্যা পরিকল্পনাটা সে ছকে ফেলে।

শ্রীমতী স্মিথ এসে জানায় যে, সে বাড়ি ভাড়া আর গ্যাস বাবদ দেয় টাকা খরচ করে বসেছে এবং দু একদিনের মধ্যেই তার স্বামীর কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, আর তাহলেই কেলেংকারি ঘটবে। শ্রীমতী স্মিথ জানায়, "এর আগে একবার এই ব্যাপার ঘটতে আমাকে শাসিয়েছে যে, এইভাবে যদি টাকাকড়ি উড়াতে থাকি তাহলে ছেলেপুলে সমেত আমাকে ফেলে চলে যাবে। যদি আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করেন!"

শ্রীমতী ডাংকেল একটু ইতস্তত করল। ও ঠিক করে নিয়েছিল আর্ভিংকে কিভাবে হত্যা করা হবে কিন্তু পরিকল্পনাটা কাজে খাটাতে তার সাহসে কুলচ্ছিল না। শ্রীমতী স্মিথকে পেয়ে একটা যেন পথ পেলে, প্রশ্ন করলে, "হাজার আড়াই টাকা পেলে কেমন হয়?"

"আড়াই হাজার টাকা!" শ্রীমতী স্মিথের মুখ দিয়ে যেন কথা সরতে চায় না, বললে, "অত টাকার জন্যে ত আমি খুন করতেও রাজি।" শ্রীমতী ডাংকেল সায় দিয়ে বললে, "কে না করবে বল, আমিও তা পারি। দুজনে মিলে হাজার পাঁচেক টাকা পাবার একটা ফন্দী আমার মাথায় আছে।" এই বলে শ্রীমতী ডাংকেল তার ফন্দীটা শ্রীমতী স্মিথের কাছে ব্যক্ত করলে। শুনে লাফিয়ে উঠল শ্রীমতী স্মিথ। বললে, "চমৎকার! ধরা পড়ার কোন ভয় নেই, শুধু ঘটনা সম্পর্কে একটা ওজর ঠিক করা
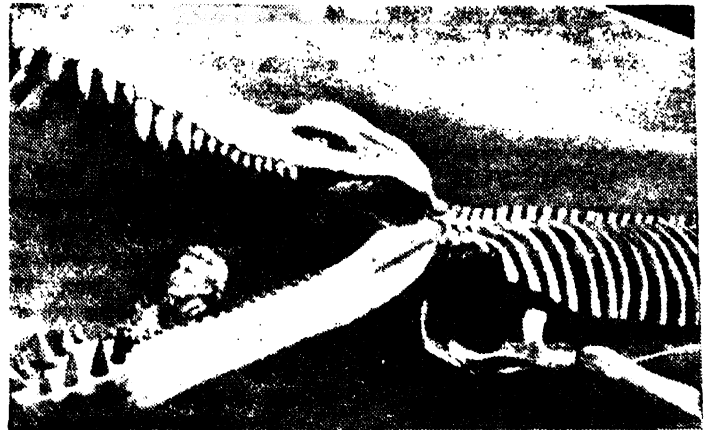
দশ কোটি বছর পূর্বেকার সামুদ্রিক সরীসৃপের কংকাল। ১৯৩১ সনে উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডে প্রাপ্ত অস্থি জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব রক্ষণাগারে এইভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মাংসাশী সামুদ্রিক সরীসৃপের মধ্যে বৃহত্তম এই ক্রনোসরাস। এর কণ্ঠভাগ দেহের তুলনায় ছোট (মাত্র দশ ফিট), মাথার খুলি দৈর্ঘ্যে ন ফিট এবং সবসুদ্ধ আশীটি দাঁত যার মধ্যে বৃহত্তমগুলির এক একটি আট ইঞ্চি লম্বা।

আর সেটা তুমি এমন ভেবেছ যে, কারুর সাধ্য নেই ধরতে পারে।"

১৯৩৫ সনের ৬ই জুলাই আর্ভিংকে হত্যা করা ঠিক হয়। ঐ তারিখে শ্রীমতী ডাঙ্কেল্স একটা ঘরোয়া পার্টিতে আর্ভিংকে নিমন্ত্রণ করে, "তোমার বিবাহের শুভ কামনায়। কিন্তু তোমার ভাবি বধূটিকে যেন এনো না, কারণ পুরনো সম্পর্কে আমরা দুজনেই শুধু মিলতে চাই।"

সেই রাতে আটটার পরে আর্ভিং উপস্থিত হয়ে শ্রীমতী ডাঙ্কেলের সঙ্গে শ্রীমতী স্মিথকেও কেক, মিষ্টি, হুইস্কিতে সাজানো একটা টেবিলের সামনে বসে থাকতে দেখে। শ্রীমতী ডাঙ্কেল জানায় যে, শ্রীমতী স্মিথ বেশিক্ষণ থাকবে না এবং বলে, "তোমার বধূটিকে নিশ্চয়ই জানাওনি এখানে আসার কথা।"

হেসে জবাব দিলে আর্ভিং, "না, আমি ওকে বলেছি বিলিয়ার্ড খেলতে যাচ্ছি।" শ্রীমতী ডাঙ্কেলের ইশারায় তখন শ্রীমতী স্মিথ ইথার মেশানো হুইস্কীর গ্লাসটা দিলে আর্ভিংয়ের হাতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আর্ভিংয়ের চৈতন্য লোপ পেয়ে গেল। হাতের কাছেই একটা দড়ি রাখা হয়েছিল, শ্রীমতী স্মিথ সেটা অচৈতন্য আর্ভিংয়ের গলায় জড়িয়ে তাকে হত্যা করলে। তারপর দুজনে মিলে আর্ভিংয়ের দেহটা খণ্ড খণ্ড করে খবরের কাগজ ও প্যাকিং কাগজে জড়িয়ে শ্রীমতী ডাঙ্কেলের গাড়িতে করে একটা নির্জন জায়গায় ফেলে দিয়ে আসে এই ভেবে যে কাগজের মোড়কগুলো বালির নিচে তলিয়ে যাবে।

পরদিন সকালে এক ট্রাক ড্রাইভার রাবিশ ফেলতে এসে মোড়ক থেকে বের হয়ে আসা একটা হাতের অংশ দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দেয়। টুকরো টুকরো অঙ্গ দেখে দেহটা আর্ভিংয়ের বলে চিনতে অসুবিধে হল না বিশেষ করে ওর হাতে বিয়ের আংটিটা দেখে যেটা মহিলা দুজনে তাড়াতাড়িতে খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিল। এর পর আর্ভিংয়ের গর্ভবিধির তদন্ত করতে জানা গেল যে আগের দিন সন্ধ্যায় সে তার এক বন্ধুর কাছে শ্রীমতী ডাঙ্কেলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী ডাঙ্কেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘকাল ধরে জেরা করার পর শ্রীমতী ডাঙ্কেল স্বীকার করে যে তার বাথরুমে রক্তের ছোপ এবং কেশ-গুচ্ছ যা পাওয়া গিয়েছে তা আর্ভিংয়ের এবং তার কথায় মনে হয় যে, সে-ই একমাত্র অপরাধিনী। কিন্তু পরে এক বিবৃতি দিয়ে সমস্ত দোষটা সে শ্রীমতী স্মিথের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে যে প্রকৃত হত্যা-কাণ্ডটি শ্রীমতী স্মিথই সম্পন্ন করে।

শ্রীমতী স্মিথকে গ্রেপ্তার করতে সে হত্যা ব্যাপারে তার ভূমিকার কথা জানায় কিন্তু বলে যে শ্রীমতী ডাঙ্কেল না বললেও এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তো না। তখন দুজনকেই অভিযুক্ত করা হয় এবং সরকারি উকিল দুজনেরই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দাবী করেন। আসামীপক্ষের উকিল ওদের দুজনকে জানায় যে মামলা যেভাবে সাজান হয়েছে তাতে ফাঁসি থেকে পার পাবার উপায় নেই, তবে যদি অপরাধ তারা স্বীকার করে এবং তাছাড়া মামলাটা বিচারের ভার পড়েছে আমেরিকার কনিষ্ঠতম বিচারপতি কর্নে-লিয়াস জে হ্যারিংটনের ওপর যার হাতে এই প্রথম খুনের মামলা পড়ছে, তাহলে হয়তো প্রাণদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারা-বাস হতে পারে। মহিলা দুজনে উকিলের এই পরামর্শই নিলে এবং তার ফলে যাবজ্জীবন কারাবাসের সঙ্গে পূর্বোক্ত বিচিত্র সাজার আদেশ হল।

চব্বিশ বছর ধরে বছরে একটি দিন করে মহিলা দুটিকে নির্জন কারাকক্ষে বাস করতে হয়েছে এবং এইটাই বোধহয় ওদের কারাভোগের শেষ বছর হবে। চব্বিশ বছরে যেটা বার্ধক্যের ছাপ আসা উচিত কারাগারে থেকে তার চেয়েও ওরা ভেঙে পড়েছে এবং কারাগারে ওদের পাহারাদাররা জানায় যে ওরা যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ওদের সেকথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে নির্জন কারাকক্ষে থাকার দিনটিতেই বার্ধক্য যেন বেশি করে ওদের চেপে ধরেছে।

*

ডাক মারফৎ পাঠ্য বিষয় আনিয়ে কোন কোন বিষয় আয়ত্ত করা নতুন কথা নয়। তবে সে বন্দোবস্তটা থাকে বড়দের জন্যে— কোন ভাষা শেখার জন্য, বা কোন একটা টেকনিকাল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার জন্য। ডাকযোগে পাঠ্য আনিয়ে নানা বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের এই ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। কিন্তু একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে লেখাপড়া শেখা এবং তাও বেতার মারফৎ, এর মধ্যে অভিনবত্ব আছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিউজীল্যান্ডের রোসেটা স্কোডার। এক কাঠ চোলাই কারখানার পরিচালকের মেয়ে। সাউথ আইল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে টুরিহোয়াটে পর্বতের কাছে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বাপ-মা আর এক বোনের সঙ্গে থাকত রোসেটা। কাছাকাছি স্কুলটাও ওদের বাড়ি থেকে ন'মাইল যা দৈনিক যাতায়াতের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই পাঁচ বছর বয়েস হতেই রোসেটা প্রতিদিন বেতারে প্রচারিত পাঠ্য শুনে শুনে অভ্যাস করে নিতে থাকে। রোসেটার উৎসাহ বড় কম ছিল না। বিদ্যুৎ সরবরাহের জেনারেটারটি কোন কারণে বিকল হয়ে গেলে ব্যাটারির সাহায্যে বেতার যন্ত্র চালিয়ে কেরোসিনের বাতি নিয়ে বসতো, এবং বেতারের শিক্ষকরা ক্রমে রোসেটাকে এমনভাবে চিনে ফেললেন যে ও যেন তাদের ক্লাসে সামনের বেঞ্চে বসে পাঠাভ্যাস করছে। নিউজীল্যান্ডে প্রায় তিন হাজার ছেলেমেয়ে প্রতিদিন বেতারে প্রচারিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সূচী থেকে পাঠ গ্রহণ করে, তা সম্পূর্ণ করে এবং তাদের পাঠ ঠিক হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ডাকযোগে বেতারের শিক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে লেখাপড়া চালিয়ে এগার বছর বয়েসে রোসেটা লিখিত রচনার জন্য একটা পুরস্কার লাভ করে এবং গত বছর অনেকগুলি বিষয়ে সম্মানজনক নম্বর লাভ করে হাইস্কুল পর্যায়ে পাস করে। বেতার স্কুল মারফৎ এই কৃতিত্ব লাভ নিউজীল্যান্ডে যে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত আছে রোসেটা তাদের অন্যতমা এবং এইভাবে পাস করার পর শিক্ষকতা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য গৃহীত সর্বপ্রথম ছাত্রী।

রোসেটার এখন বয়স মাত্র সতের। ক্লাসে বসে সরাসরি শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করায় নিজেকে অভ্যস্ত করে নিচ্ছে। অধীতব্য অংশের নোট নিতে এখন অসুবিধে হচ্ছে ওর, কারণ বেতার মারফৎ শোনার চেয়ে সামনাসামনি বক্তৃতা অনেক দ্রুততর হয়, তবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রছাত্রী-দের সঙ্গে যে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া যায় এটা ওর খুব ভাল লাগে। রোসেটার লক্ষ্য হচ্ছেঃ ডাকযোগে লেখাপড়া শেখানো বিষয়ে নিজেকে তৈরী করে নেওয়া এবং টুরিহোয়াটের নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে থাকার সময়ে যে বেতার কেন্দ্র মারফৎ ও লেখাপড়া শিখতে পেরেছিল তাদের বেতার স্কুল থেকে ছোটদের হস্তশিল্প শিক্ষা দেওয়া।

শিক্ষা

শিক্ষা-বিচার—বিনোবা, সর্বসেবা সংঘ প্রকাশন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ মানুষের স্বাধীনতা নয়। মানুষ চিন্তায় স্বাধীন হলে তবেই স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। আবার মুক্ত চিন্তা শিক্ষা-সাপেক্ষ। তাই আমাদের দেশের শিক্ষাবিদগণ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য নব নব উপায় উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা রচনা করছেন। বিদেশী শাসনের পূর্বে আমাদের দেশে যে সনাতন শিক্ষাধারার প্রচলন ছিল তাতে সাধারণ মানুষে সত্যকার জীবনাশ্রয়ী শিক্ষাই লাভ করত। পরে বিদেশী শাসনে যান্ত্রিক শিক্ষার প্রবর্তন হল, আর তার ফলে দেশব্যাপী চলল মানসিক শিক্ষার অপমৃত্যু। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ শিক্ষাচার্যগণ তাই শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ছিন্ন যোগসূত্রে গ্রন্থী বন্ধনের চেষ্টা করলেন। বর্তমান গ্রন্থে চিন্তাবিদ সাধক বিনোবাজীর শিক্ষাসম্বন্ধীয় মতগুলি সংকলিত হয়েছে। এই মতগুলি শিক্ষাজগতে বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই। চিরাচরিত পদ্ধতি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি যেমন তাঁর তীব্র আঘাত তেমনি নূতন সর্বোদয়ী শিক্ষা প্রচেষ্টার ত্রুটির প্রতিও তাঁর কঠোর ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে গড্ডলিকাপ্রবাহ চলেছে তার ভয়াবহ পরিণতির ছবি তিনি সুস্পষ্টভাবে এঁকে দিয়েছেন। আজকাল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের মাথায় অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর যে চেষ্টা চলেছে শিক্ষাবিদ বিনোবাজী তার কুফল সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'ছেলেমেয়েরা কলেজে পৌঁছানো পর্যন্ত টিঁকে থাকে, কিন্তু প্রায়ই কলেজে গিয়ে তারা আছাড় খায়। আর কলেজে যারা টিঁকে যায় এবং পরে পাস করে বেরোয় তারা কর্মজীবনে অক্ষম প্রতিপন্ন হয়। এর একমাত্র কারণ এই যে, কোমলমতি ছেলেমেয়েদের অপরিণত মস্তিষ্কের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপান হয়ে থাকে।'

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিকল্পকগণ যদি বিনোবাজীর এই উক্তিটির প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহলে বহু ছাত্রছাত্রীকে অকালে ঝরে পড়া থেকে দেশ রক্ষা পাবে বলে মনে হয়।

লোকশিক্ষক বিনোবাজী সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার শক্তি ও জীবনের ক্ষেত্রে তার সত্যিকার ও প্রভাব সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা সবই প্রণিধানযোগ্য। গান্ধীজী প্রবর্তিত নঈ-তালিমের প্রয়োগ এবং এই পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণ তিনি নানাভাবে করে দেখিয়েছেন। পরিশেষে, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষাগুরু ও শিক্ষকের মানসিকতা প্রভৃতি বিষয়ে এই গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে বিনোবাজীর সঙ্গে মতভেদ আছে। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেও একস্থানে বলেছেন, 'ত্রিশ বছর আগে আমি যখন বরোদা কলেজে পড়তাম তখন সেখানে ঋতুসংহার, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য পড়ানো হত। ভগবানের দয়ায় আমি কলেজে সংস্কৃতের বদলে ফারসী ভাষা নিয়েছিলাম, তাই উপরোক্ত সকল প্রকার কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম।'

অন্য একস্থানে তিনি বলেছেন, 'যদিও সংস্কৃতে নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি রয়েছে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ওসবে পাওয়া যায় না।' বিনোবাজীর এই কথাগুলির অর্থ সংস্কৃতের এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে যদি রসের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র আদিরসের জন্য এই সকল কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদি বৈশিষ্ট্য হারাবে, বিনোবাজীর এ ধারণা আমাদের মত অনেকেরই মত সমর্থন লাভে সমর্থ হবে না।

নাটক

ছায়ানট—উৎপল দত্ত। প্রকাশক : পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাইরে থেকে চলচ্চিত্র জগতের জৌলুস আর চমকটাই শুধু চোখে পড়ে, কিন্তু তলে তলে শিল্পীদের বাস্তব জীবনে যে নিদারুণ ট্র্যাজেডী ঘটে যায় সে তথ্য কজনই বা রাখে। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকখানিতে শিল্পীজীবনের এই দিকটাই উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন মনোজ নামক এক ব্যক্তির সামান্য এক্স্ট্রা থেকে তারকা অভিনেত্রী সুচরিতার আনুকূল্যে তারকা পদে ঠেলে ওঠা এবং সেই সুচরিতারই বিরাগভাজন হয়ে একেবারে পথের ভিখারী হয়ে পড়ার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলচ্চিত্র নির্মাণে যে কিরূপ অপদার্থ ও অযোগ্য লোক নিয়োজিত রয়েছে; খোসামোদ ও নারীসম্ভোগের সাহায্যে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও আবোল-তাবোল গল্প এবং এলোপাথারি নানা প্রয়োগ করে কিভাবে পরিচালকের কাজ বজায় রেখে চলেছে, সর্বত্র প্রযোজক যে খালি টাকার দিকটাই দেখে এবং এছাড়া চলচ্চিত্র জগতে দুর্নীতি যা দেখা দেয়, নাটকখানিতে তা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। হালকা গান ও বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে এখনকার কোন কোন তারকার ওপর কটাক্ষপাতও স্পষ্ট। নাট্যকার নিজে অভিনয়শিল্পী, ছবিতেও কাজ করেছেন কাজেই অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তার হয়েছে। কিন্তু নাটকখানিতে তিনি চলচ্চিত্র জগতের একটা দিকই চিত্রিত করেছেন—গ্লানির দিক যেটা এবং সেদিকটা চলচ্চিত্র জগতের একমাত্র পরিচয় নয়। তবে একটা আমুদে প্রহসন হিসেবে বৈচিত্র্যের সঙ্গে আনন্দ দেবার উপাদান নাটকখানিতে আছে।

প্রবন্ধ

নাট্যাচার্য ও বর্তমান নাট্যপ্রবাহ—শ্রীসুললিত-মোহন গোস্বামী। প্রকাশক—যোগাযোগ প্রকাশনী, ১৪ ভুবন ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা—৭। দাম—১৲।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শিশিরকুমার ভাদুড়ী একটি নাম, যা অতুলনীয় ঐতিহ্য হিসেবে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সুতরাং শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে সুললিতমোহন যে একটি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার জন্য তিনি প্রশংসা পাবার যোগ্য। কিন্তু এ-গ্রন্থ পাঠকের কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করে না। গ্রন্থকার আগাগোড়া একটা উচ্ছ্বাসে ভেসে গেছেন—তার ফলে হয় অদৃশ্য একপক্ষকে কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন, নয় তো, শিশিরকুমার যে সত্যিকারের একজন প্রতিভাধর অভিনেতা ও অভিনয় শিক্ষক সে-কথা বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছেন। শিশিরকুমারের কিছু শত্রুপক্ষ হয়তো আছে, অন্যপক্ষে তিনি মঞ্চাভিনয়ের যুগপ্রবর্তক, দুটোই সত্যি কথা, কিন্তু শিশিরকুমার সম্বন্ধে এ-দুটো সংবাদই যথেষ্ট নয়। লেখক যদি এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন, তা হলে সত্যি সত্যি পাঠকদের উপকার করতেন। ২০।৫৯

Boris Pasternak—Edited by K. K. Sinha. Publishers—Congress for Cultural Freedom, Calcutta. Price Re. 1|-.

প্রায় প্রতি বৎসরই একজন করে সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেয়ে আসছেন। কিন্তু বোরিস পাস্তারনাককে নিয়ে এ উপলক্ষে যে বাকবিতণ্ডা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তা নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কৌতূহলী পাঠকমাত্রেই এ-সংবাদ জানেন। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক এ-ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে পাস্তারনাক ও তাঁর রচনা, বিশেষত ডক্টর জিভাগো, সম্বন্ধে দেশীবিদেশী বিভিন্ন লেখকের মতামত সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সুতরাং গ্রন্থটি পাঠকসাধারণের কাছে যথেষ্ট সমাদর পাবে আশা করা যায়। বিশেষ করে, আলবার্টো মোরাভিয়া ও কয়েকজন রিপোর্টারের লেখা থেকে পাস্তারনাককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে সুবিধা হবে। শেষোক্তের মতামতটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। তা ছাড়া সম্পাদক আরও বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে সংকলনটির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-প্রচেষ্টা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। ২৮।৫৯

ছোট গল্প

সীমানা—অরুণ চৌধুরী। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। মূল্য ১·৭৫ নয়া পয়সা।

আলোচ্য লেখকের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁর এই গল্প-সংকলনটি পড়ে মনে হলো, তিনি বাংলা সাহিত্যের কথাশিল্পের আসরে স্থায়ী প্রবেশপত্র নিয়ে আসছেন। এই সংকলনে তাঁর রচনাসিদ্ধি প্রকাশিত। এই সিদ্ধির আড়ালে তাঁর একটি বস্তুকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতা যদি নিরুৎসুক হতো, তাহলে এই গল্পগুলি শুষ্ক হয়ে পড়তো, সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিন্যাসধর্মিক একটি রীতিসাফল্য তাঁর রচনায় আছে। পূর্ববঙ্গের জীবন-বিন্যাস এবং জীবন-বোধ এই কাহিনী প্রবাহের মধ্যে ফুটে উঠেছে। দূরে থেকে সেই জীবনকল্লোল তিনি দেখেননি, কাছে গিয়ে দেখেছেন। সেই কাছে থেকে দেখার তন্ময় জীবনরূপায়ণের জন্য অরুণ চৌধুরীকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। তাঁর আরম্ভ প্রতিশ্রুতিবহ, তাঁর পথ যেন কোনো নিক্ষিপ্ত রাজনীতি বা আরোপিত শিল্পনীতির কবলে কবলিত না হয়ে পড়ে—এই শঙ্কিত প্রত্যাশাটুকু তাঁর কাছে জানিয়ে রাখলাম।

কাঠের ঘোড়া—কুমারেশ ঘোষ। প্রকাশক—শতাব্দী, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২·৫০

কুমারেশ ঘোষ প্রবীণ লেখক, এবং ইতিমধ্যে তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকরা লক্ষ্য করেছেন, লেখন চাতুর্যের জন্য তিনি সামান্য জিনিসকেও অসামান্য করে তুলতে পারেন। তবে মোটামুটিভাবে তাঁর রচনা হাস্যরসাত্মক।

কাঠের ঘোড়া, তাই, কুমারেশ ঘোষের অভ্যস্ত পাঠকদের কাছে অন্য স্বাদ এনে দেবে। হাসির খোরাক যে এতে কিছু নেই তা নয়, যেটুকু আছে তা শুধু ভঙ্গিটুকুর মধ্যে; বস্তুত এখানে হাসির গল্প নেই। তাই কাঠের ঘোড়াকে নিশ্চয়ই একটি দুরূহ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তথাপি বলবো, কয়েকটি গল্পে লেখক আশ্চর্য-ভাবে সার্থক হয়েছেন। 'কাঠের ঘোড়া' গল্পটির শেষ দিকটা বড় বেশী নাটকীয় না হয়ে পড়লে পাঠকমাত্রেই সত্যি সত্যি অভিভূত হতো। 'তপতী মাথিজানি' বা 'মানভঙ্গের' মতো গল্প যিনি লিখতে পারেন, তিনি তো সিদ্ধহস্ত। তবু বলবো, দু' একটি কাঁচা হাতের লেখা এখানে স্থান পেয়েছে, সে গল্প কয়টিকে একেবারে বাদ দিলে লেখক ভালো করতেন। ৭৭।৫৯

কবিতা

ঝরা—বাগ্‌বুল্‌ ইস্‌লাম, জাগরণ প্রকাশনী। ঝরে পড়ার মধ্যেও যে একটি চিরন্তনী পাওয়ার সুর আছে সেই কথা তরুণ কবি তাঁর উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের কোন কোন কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। 'ঝরা তুমি আসো নাই মৃত্যু হয়ে শুধুই ফুলের আসো নাই কাল হয়ে আধ-ফোটা কুঁড়ি, মুকুলের। এসেছো আমার গানে, সুরে সুরে তাও টের পাই আমিও ঝরার কবি, ঝরে পড়া কথা গাঁথি তাই'।

সমস্ত কাব্যগ্রন্থখানিতে তরুণকবির মনের একটি মধুর লাবণ্যের স্পর্শ আছে। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলেছেন, 'কবির তরুণ কাব্য সরল ও সুন্দর'। কবি সম্বন্ধে প্রকাশকদের অতি উচ্ছ্বসিত বিশেষণগুলি বাদ দিলেও বলা যায় কবিতাগুলি প্রাণহীন কথার সমষ্টিমাত্র নয়। কবির মন কবিতাগুলির সর্বত্র ক্রিয়াশীল।

তবে একই কবিতায় 'সোহাগের কুলপী বরফ' ও 'পরিস্থিতির বাহুল্বয়', প্রয়োগের দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ধ্বনির দিক থেকে সুখ শ্রাব্য বলে মনে হয় না।

আর একটি কথা—'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' অংশে লেখক বিশেষণ প্রয়োগে আর একটু সংযম দেখালে শোভন হত।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

শুধু ছায়া—পরেশ ধর।

"ঘরের পার্লামেন্ট" (ছোটদের নাটিকা)—সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত।

কাশ্মীরের অমর কথা (শ্রীমৎ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সহ অমরনাথ যাত্রার কাহিনী)—শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ।

চন্দন-যাত্র—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রচনা-সংগ্রহ—১ম খণ্ড—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

Planning Power and Welfare—Dr. Daya Krishna. Kerala Rice Deal Enquiry. An Analysis.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফাল্গুনের ভোর

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

(১)

কুয়াশায় কী প্রসন্ন সূর্যোদয় হ'ল!
উতলা ফাল্গুন, তুমি ভোলো
তোমার মাতাল হাওয়া, রক্তফুল, রৌদ্র আর গান।
সব এ সকালে স্তব্ধ, যেন অভিমান
করে আছে, অতলে নিহিত
বসন্ত উচ্ছ্বাস।

এ কেমন, যেন পরিহাস
তুমিও যে আছো, কন্যা আমার হৃদয়ে
কতোখানি ডুবে!
রাঙা সূর্য পূবে।
আমি ভাবি, তুমি আছ ঘুমন্ত পুরীর
সব ভালোবাসা বুকে লয়ে
শুধু মনে মৃদুশ্বাস দিতে।

আমি শান্ত, সূর্যে চেয়ে থেকে,—
আমার হৃদয়ে, কন্যা তোমাকেই দেখে॥

(২)

কোথায় উৎসব যেন চলে।
আমার নিঃসঙ্গ মন শুধু আঁখিজলে
পেছনে থাকার ব্যথা জানায় প্রাণের দেবতারে।

হে ফাল্গুন, ফুল্ল উপহারে
তুমি ত দিয়েছ কতো প্রাণ!
আমি কার করব সন্ধান
বলতে কি পারো তুমি আজ—
খুঁজব কি সূর্তমিতরমণীসমাজ?

সইবে কি সে আনন্দ এই রুগ্ন বুকে?
বয়েস কৌতুকে
তাকায় আমার মুখে যেন সর্বক্ষণ
চায় সন্তর্পিত আচরণ।

চুপে চুপে বয়ে-যাওয়া বসন্তের আনন্দের ভার
এ নিঃসঙ্গ মনে—তা-ই নিয়তি আমার॥

দেখা থেকে না-দেখায়

হরপ্রসাদ মিত্র

আরো শান্ত ঘর চাই—
খুঁজে খুঁজে এসেছে লোকটা
নিজেরই নিভৃতে তার চেনা ঘরে, পুরোনো চেয়ারে।
সবাই ঘুমোলে তার আত্মলাভ
কিছু না-দেখায়!

সেনেদের মস্তো বাড়ি, চাটুজ্যের ভিটে টিমটিমে,
গলির মোড়ের আলো,
এমন-কি চৈত্রের নিশানা—
হলদে ফুলের ঝুরি,
নিচে দুটো পথের কুকুর—
কিছুই পড়ে না চোখে;
মন তার কিছু না-দেখায়!

অনেক রোমাঞ্চ আশা, ভয়, সুখ, দ্বন্দ্বের ঢেউয়েতে
সে-ও চলে, আমি চলি।
দুই চলা থামে না, থামে না
যেমন নদীর রূপ স্রোতে, আর—
স্রোতের ধ্যানেতে!

মাঠ, দীঘি বাদল, বন নদীময় দৃশ্যেতে দৃশ্যেতে
এই অন্ধ, বন্ধ জ্বালা
—যাকে বলে জীবন-সংগ্রাম,
এই [illegible] অর্পণ
—যার নাম প্রকৃতি-প্রণয়!

চন্দ্রশেখর

ভালবাসার মাশুল

একটি নতুন ধরনের মনোবিকলনমূলক কাহিনীর ছবি বাদল পিকচার্সের "দীপ জেলে যাই"।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত এই কাহিনীর নায়িকা একজন নার্স—মনোবিকারগ্রস্ত রোগীর সেবায় যার অশেষ খ্যাতি। একদিন তারই ওপর ভার পড়েছিল ভালবাসার অভিনয় করে একজন রোগীর মনের অসুখ সারিয়ে তোলবার। নার্স রাধা রোগী দেবাশীষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছিল তার মনের মধু উজাড় করে ঢেলে দিয়ে। অভিনয় করতে গিয়ে রাধা সত্যি ভালবেসে ফেলেছিল দেবাশীষকে, তাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল সে। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তার সে-স্বপ্ন চূর্ণ হতে দেরী লাগেনি। ব্যাধিমুক্ত হয়ে দেবাশীষ একদিন হাসপাতাল থেকে বিদায় নিলো। যথাসময়ে আর একদিন তার বিয়ের খবর পেলো রাধা।

তাই ব্যর্থ প্রেমের আঘাতে অপ্রকৃতিস্থ তাপস যেদিন হাসপাতালে এসে ভর্তি হলো, রাধা সোজাসুজি জানিয়ে দিলো যে নতুন রোগীর সেবার ভার সে নিতে পারবে না। তাপস নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিল সুলেখা নামের একটি মেয়েকে। সে ভালবাসার কোন প্রতিদান না পাওয়ায় তার মনোবিকারের সূত্রপাত। তাই ভালবাসার অভিনয় দিয়েই তাপসকে ভালো করে তুলতে হবে। দেবাশীষের তিক্ত স্মৃতি ভুলতে পারেনি বলেই অসম্মতির মাধ্যমে রাধার এই তীব্র প্রতিবাদ।

ঘটনাচক্রে তাপসের সেবা-শুশ্রূষার ভার কিন্তু একদিন নিতে হল রাধাকে। রোগীর তখন জীবন-সংশয়। আর্তের সেবায় উৎসর্গিত-প্রাণ রাধা কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলো না। দেবাশীষ তখনো তার সারা মন জুড়ে বসে আছে। সে দেবাশীষের স্মৃতি আরোপ করলো তাপসের ওপর—তারপর তাকে প্রাণ ভরে ভালবাসতে তার একটুও বাধলো না। তাপসও ভালবাসলো রাধাকে।

রাধার সত্যিকার প্রেমের পাত্র কিন্তু তাপস নয়, রাধার কাছে তার যা-কিছু দাম তা দেবাশীষের প্রতিভূ হিসেবে। তাই আরোগ্য লাভ করে তাপস যেদিন হাসপাতাল থেকে চলে গেল, সেদিন রাধা তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারলো না। রাধার অনুরাগে বঞ্চিত হয়েই তাপস চলে গেল হাসপাতাল ছেড়ে।

রাধার মনে যে বঞ্চনা তিলে তিলে স্তূপীকৃত হচ্ছিল, তার ভার আর যেন সে সইতে পারলো না। তাপস ও দেবাশীষের মনের যে আঁধার সে তার ভালবাসার আলোয় দূর করেছিল, সেই আঁধারই ধীরে ধীরে নেমে এলো তার নিজের জীবনে। এক সেবাব্রতী নারীর এই মর্মন্তুদ পরিণতির মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

কাহিনীর পরিক্রমা পাত্র-পাত্রীদের অন্তর্লোকে। তাদের মানসিক যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, আশা ও কামনার মধ্য দিয়ে একটি সূক্ষ্ম নাট্যস্রোত বইয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন কাহিনীকার। সে নাট্যস্রোত উচ্ছল

হয়ে উঠতে পারেনি পর্দার বুকে। তার জন্য অংশত দায়ী চরিত্রকল্পনার কৃত্রিমতা, অবচেতনের গহনে আখ্যানবস্তুর বিস্তার ও নাট্যরসকে কেন্দ্রীভূত করবার অক্ষমতা। ছবির পরিসমাপ্তিতে রাধার অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ার মধ্যে বেজে ওঠে একটি নৈরাশ্যের সুর। এই নৈরাশ্যে ট্র্যাজেডির তীব্রতা হয়তো আছে, কিন্তু রসের স্পর্শ নেই। তমসাচ্ছন্ন জীবনে দীপ জেলে যাওয়া ও প্রতিদানে কিছু না পাওয়ার মধ্যে সুস্থ রাধার জীবনের ট্র্যাজেডি আরও মর্মস্পর্শী হতে পারত।

এ-বাদেও ছবিতে মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কীয় বহু আলোচনা ও চিকিৎসা কেন্দ্রের পাঁচমিশেলী দৃশ্যের বাহুল্য একটু অসমঞ্জস মনে হয়। অপ্রকৃতিস্থ তাপসের মনের ভ্রান্তিকে রূপ দেবার জন্যে 'মডেল' রূপিনী এক তরুণীকে নিয়ে একটি দৃশ্যের অবতারণা সহজগ্রাহ্য নয়। তাপসকে ত্যাগ করবার পর সুলেখার মুখে তারই রচিত গান বেমানান লাগে।

কাহিনীর চিত্ররূপায়ণে পরিচালক অসিত সেন অপূর্ব কারুকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন প্রায় প্রতি দৃশ্যে। এমন একটি আঙ্গিক সুষমা সারা ছবিটি জুড়ে রয়েছে যা সহজেই মুগ্ধ করবে শিল্প-রসিকদের। বিভিন্ন দৃশ্য রচনায় ক্যামেরার একাধিক নতুন দৃষ্টিকোণ আলোকচিত্রের মানকে শিল্প সৃষ্টির পর্যায় তুলে ধরেছে। আঙ্গিক সৌষ্ঠবের তুলনায় কাহিনীর নাটকীয় রস আশানুরূপ দানা বাঁধতে না পারলেও অসিত সেনের বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনার গুণে ছবিটি অবশ্য দর্শনীয় হয়ে উঠেছে।

ছবিখানির অন্যতম আকর্ষণ রাধা-রূপিনী সুচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয়। রাধার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ব্যথা-বঞ্চনা তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাঁর অভিনয়ও মনে রাখবার মতো। তাপসের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরীর অভিনয় সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। তাপসের বিশ্বাসঘাতিনী প্রণয়িনীর চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়েছেন কাজরী গুহ। প্রধান চিকিৎসকের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল তাঁর অভিনয়-দক্ষতার নতুন প্রমাণ দিয়েছেন। তাপসের বন্ধুর চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী সহজেই দর্শকদের মন জয় করে নেন। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে দিলীপ চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী ও নমিতা সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছবিতে মোট তিনটি গান আছে। জটিল মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীতে গানগুলির সুন্দর পরিবেশন প্রশংসনীয়। তিনটি গানই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনায় এবং তাঁর, সন্ধ্যা মঙ্গেশকার ও মান্না দের কণ্ঠদানে সুখশ্রাব্য। আবহসংগীত নতুন ধরনের

এবং পরিবেশনাদ্গে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীতরচনাও কৃতিত্বের দাবী রাখে।

আলোকচিত্র পরিচালনায় অনিল গুপ্ত ও চিত্রগ্রহণে জ্যোতি লাহা, শব্দ-গ্রহণে বাণী দত্ত এবং সম্পাদনায় তরুণ দত্তের কাজ প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজও উঁচুদরের।

স্বল্পপর্দে পারিবারিক কাহিনী

ভাই-বোনের একটি ছোট্ট সুখের সংসারে ভাঙা ও গড়ার কাহিনী নিয়ে তৈরী প্রসাদ প্রোডাকসন্সের "ছোটি বহেন"।

দুই সহোদর ও এক খুড়তুতো ভাইয়ের আদরের ছোট বোন মীনাকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার। বড় ভাই রাজেন্দ্রের সংকল্প মীনাকে সৎপাত্রে দান করা এবং ছোট ভাইকে মানুষ করে তোলা। কিন্তু মীনার জীবনে চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে বিয়ের ঠিক আগে এক দুর্ঘটনায়, যার ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। বিয়ে তার ঠিক হয়েছিল এক ডাক্তারের সঙ্গে। তা ভেঙে যায় অনিবার্য কারণেই। কিছুদিন পরে শেখরের বিয়ে হয় এক ধনী কন্যার সঙ্গে। ননদকে নিয়ে ভাবীর ভুল বোঝাবুঝির পালা শুরু হতে বিলম্ব ঘটে না এবং এ-ব্যাপার কেন্দ্র করেই মীনা ও রাজেন্দ্রের সঙ্গে শেখরের বিচ্ছেদ ঘটে। এদিকে স্বার্থান্বেষী খুড়োর চক্রান্তে রাজেন্দ্র ও মীনাকে ঘরছাড়া হয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হয়। এমনি দুর্ভাগ্যের দিনে মীনা সাক্ষাৎ পায় সেই সহৃদয় ডাক্তার রমেশের যার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মীনার খুড়তুতো ভাই মহেশ—যে আপন ভাই-বোনের মতোই তাদের ভালবাসতো—তারই আশ্রয়ে থাকাকালীন শেখর ও তার স্ত্রীর মনে অনুতাপ জাগে স্বকৃত পাপের জন্যে। শেখরের চরম উচ্ছৃংখলতার কথা জানতে পেরেছিল তার দাদা। তাই সে লজ্জায় তাকে মুখ দেখাতে না পেরে চলল আত্মহত্যা করতে। সেই রাতেই অন্ধ মীনা হাতের যষ্ঠি সম্বল করে রওনা হয় শেখরের বাড়ির উদ্দেশ্যে। মীনাকে খুঁজতে বেরোয় রাজেন্দ্র ও মহেশ। যে পথে শেখরের গাড়ি ছুটেছিল সেই পথেই মীনা মোটর দুর্ঘটনায় আহত হল। শেখরের গাড়ি এসে পড়ে সেখানে। ছবির পরের দৃশ্য হাসপাতালে। মীনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার সব ভাইবোন, আর এল রমেশ যে জানাল সবাইকে মীনাকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা। ছবির যবনিকা বিমান ঘাঁটিতে—রমেশ মীনাকে নিয়ে চলেছে ভিয়েনায় অস্ত্রোপচার করে মীনার চোখ ভাল করবার জন্য। সেখানে তাদের শুভেচ্ছা জানাতে এসেছে রাজেন্দ্রের অনুতপ্ত কাকা, রমেশের বাবা, রাজেন্দ্র ও মহেশের ভাবী স্ত্রী অর্থাৎ প্রণয়িনী, শেখর ও তার স্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলেই।

সমস্ত কাহিনীর মধ্যে অপার দুঃখবরণ, সহনশীলতা ও স্নেহের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে একটি আদর্শস্থানীয় নারী চরিত্র। এ-বাদেও ছবিতে রয়েছে আর যে ক'টি চরিত্র তাদের মধ্যে কেউ আত্মত্যাগী, হৃদয়বান, আদর্শবতী, আবার কেউ বা স্বার্থান্ধ ও কুটিলস্বভাবা। এই সবাইকে মিলে গড়ে উঠেছে এই পারিবারিক 'মেলোড্রামা' যার কোন কোন দৃশ্যে পরিচালক প্রসাদ বিশেষ নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অশ্রু-আনন্দে গড়া পারিবারিক জীবনগাথার আনন্দ দর্শকেরা এ-ছবিতে পাবেন। জায়গায় জায়গায় আমোদের উপকরণও রয়েছে ছবিতে যথেষ্ট। তবে বিচারশীল দর্শকদের কাছে ছবির ঘটনা বিন্যাসের বহু গোঁজামিল ও বৈকল্যগুলো সহজেই ধরা পড়ে।

ছবির বিশিষ্ট সম্পদ হল মুখ্য নারী-চরিত্রে নন্দার হৃদয়গ্রাহী অভিনয়। কয়েকটি নাট্য-মুহূর্তে তাঁর ব্যথা-বেদনার অভিব্যক্তি মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। বলরাজ সাহানী বড় ভাইয়ের চরিত্রে তাঁর অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। শেখর ও তার স্ত্রীর চরিত্রে যথাক্রমে রেহমান ও শ্যামার

অভিনয় চরিত্রোচিত। অন্য দুই বিশিষ্ট চরিত্রে মামুদ ও শুভা খোটে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। দুটি কৌতুকপূর্ণ ভূমিকায় রাধাকিষণ ও ধুমল দর্শকদের বেশ মাতিয়ে রাখেন। পার্শ্বচরিত্রে সুদেশকুমার, বদ্রীপ্রসাদ ও বীণার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। ছবিতে কয়েকটি সুখশ্রাব্য গানের জন্য প্রশংসা পাবেন শংকর-জয়কিষণ। ছবির আলোকচিত্র, যাবতীয় কলাকৌশল ও আংগিক পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

চিত্রালোচনা

বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই, নতুন ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু ধারাবর্ষণ। এক সংগে ছ'খানি নতুন ছবির দেখা পাওয়া যাবে এ সপ্তাহে। তিনখানি বাংলা ও তিনখানি হিন্দী।

বাংলা ছবিগুলির পুরোভাগে রয়েছে সত্যজিৎ রায় কৃত "অপুর সংসার।" "পথের পাঁচালী"তে যে গল্পের শুরু, "অপরাজিত"-তে যার বিস্তার, তারই পরিসমাপ্তি এই ছবিতে। আগের ছবি দু'খানির মতই আর একজন নতুন অপুকে দেখা যাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। স্ত্রী অপর্ণা ও শিশুপুত্র কাজলের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন আর দু'জন নতুন শিল্পী—শর্মিলা ঠাকুর ও অলোক চক্রবর্তী। এবারেও রবিশংকরের সুর ছবিটিকে সমৃদ্ধতর করেছে।

বাদল পিকচার্সের "দীপ জ্বেলে যাই" এ হপ্তার আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। পরিচালক অসিত সেনের কারুকৃতির নবতম পরিচয় বহন করছে ছবিটি। সুচিত্রা সেন, বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী, কাজরী গুহ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি এর মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন। সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিখানির সমালোচনা এই সংখ্যাতেই দেওয়া হল।

কে জি প্রোডাকসন্সের "দেড়শো খোকার কাণ্ড" হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি বিখ্যাত শিশু-উপন্যাসের চিত্ররূপ। ছোটদের ছবি, মুখ্য ভূমিকাগুলির রূপায়নে তাই শিশু শিল্পীদেরই প্রাধান্য। বড়দের চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, অনুপ-কুমার, তরুণকুমার প্রমুখ নামকরা শিল্পীরা। চিত্র সম্পাদক কমল গাঙ্গুলী একাধারে ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক। সুরসৃষ্টি করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

* * *

হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে হাল্কা সুর ও হৈ-হুল্লোড়েরই প্রাধান্য।

নিশাত ফিল্মসের "জরা বাঁচকে"র প্রধান তারকা জনি ওয়াকার। সুতরাং এতে হাসির খোরাক যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে তা না বললেও চলে। তাঁর সহ-শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেশ, নন্দা, শাম্মী, টনি ওয়াকার ও হেলেনের নাম। এন এ আনসারী ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং নাসাদ সুর দিয়েছেন।

বসন্ত পিকচার্সের "সার্কাস কুইন" চমকপ্রদ সার্কাসের খেলা ও নানাবিধ কসরতে সমাকীর্ণ। বিগত যুগের বিখ্যাত তারকাজুটি—নাদিয়া ও জন কাবাস—আবার এক সংগে নেমেছেন এই ছবিতে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সমর রায়, শেখ, হাবিব, শীলা কাশ্মীরী প্রভৃতি।

নন্দীর এঞ্জিনীয়ারের পরিচালনায় ও শাফ নাগরীর সুরারোপে ছবিটি দর্শনীয় হয়েছে।

নবশক্তি ফিল্মসের "তুফানী তীরন্দাজ" ঐ জাতীয় আর একটি "স্টাণ্ট" ছবি। কামরান, শান্তাকুমারী, শেখ, হবিব, টুনটুন প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। এ আর জমিন্দার ছবিটির প্রযোজক ও পরিচালক। ইকবাল সুর যোজনা করেছেন।

• • •

সুবিখ্যাত পরিচালক মধু বসু অনেক দিন বাদে আবার ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' এই দুটি বহু-প্রশংসিত জীবনী চিত্রের স্রষ্টা হিসেবে তিনি যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তারই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তাঁকে আর এক মহাপুরুষের জীবনকাহিনী ছবির পর্দায় রূপায়িত করতে। এবার তিনি তুলবেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুপম জীবনালেখ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্রের জীবনকথা মানব সভ্যতার এই যুগসন্ধিক্ষণে নতুন করে প্রচার করবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মধু বসু এই প্রয়োজন পূরণে উদ্যোগী হয়েছেন—এটা সত্যিই আনন্দের কথা।

• • •

দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিত প্রচেষ্টায় তোলা হচ্ছে 'আকাশ পাতাল' নামে একটি বাংলা ছবি। মাদ্রাজের এ ভি এম প্রোডাকসন্স-এর নির্মাতা। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। এর প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে পাহাড়ী সান্যাল, অরুন্ধতী, তরুণকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী, তপতী ঘোষ, মণিকা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে। তাছাড়া বোম্বাইর দুই প্রখ্যাত চিত্রতারকা দুর্গা খোটে ও অচলা সচদেব—দুটি বিশিষ্ট স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করবেন। বলাবাহুল্য বাংলা ছবিতে এই তাঁদের প্রথম অবতরণ।

ছবিখানি ইতিমধ্যেই অর্ধেকের ওপর তোলা হয়েছে। অধিকাংশই বহির্দৃশ্য। স্টুডিওর কাজ আরম্ভ হবে মাদ্রাজে এ ভি এম স্টুডিওতে। পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় দলবল নিয়ে মে মাসের গোড়াতেই সেখানে রওনা হবেন।

• • •

চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের 'জল জঙ্গল'-এর মুক্তি সমাসন্ন। এই ছবিখানির বেশীর ভাগ সুন্দরবন অঞ্চলে তোলা হয়েছে। অসীমকুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুখেন, প্রেমাংশু বসু, শিশির বটব্যাল প্রভৃতি। পরিচালনা ও সংগীতের দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ও রবীন চট্টোপাধ্যায়।

• • •

রবীন্দ্রনাথের তিনটি বিখ্যাত কাহিনীকে ছবির পর্দায় রূপান্তরিত করবার তোড়জোড় চলছে।

বেশ কিছুদিন আগে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় 'গোরা'র চিত্ররূপ দেওয়া হয়। সেই কাহিনী অবলম্বনে নতুন করে ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। উত্তমকুমার নাম-ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন।

• • •

অগ্রদূত পরিচালক-গোষ্ঠী তুলবেন 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। এতেও উত্তমকুমারকে দেখতে পাওয়া যাবে ভৃত্য রাইচরণের ভূমিকায়।

গ্রীন এণ্ড গোল্ড প্রোডাকসনের পতাকাতলে 'ডাকঘর'-এর ছবি তুলবেন সুকুমার দত্ত। চিত্রনাট্য লিখছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

বহুরূপীর নতুন প্রয়াস

আধুনিক নাট্য আন্দোলনে বহুরূপী সম্প্রদায়ের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য একটা নতুন সমৃদ্ধি এনেছে। এই বৈশিষ্ট্যের পিছনে আছে বিভিন্ন শিল্পের একাত্মতা সম্বন্ধে এবং পৃথিবীব্যাপী নানা নাট্যপ্রয়াস সম্পর্কে বহুরূপীর জ্ঞান ও ধারণা।

এতদিন তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্যশিক্ষার এই ধারা অনুসরণ করে এসেছেন। এইবারে সেই শিক্ষার সুযোগ অন্যদেরও দিতে মনস্থ করেছেন। বহুরূপী শুধু উৎসাহী ও যোগ্য ছাত্রছাত্রী বেছে নেবেন। তাহলেই এক বৎসরের পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের নাটক সম্পর্কে, মঞ্চ সম্পর্কে ও অভিনয় সম্পর্কে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে। উপযুক্ত ছাত্র-

ছাত্রীদের এই পাঠক্রমের পর আরও শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ দেবেন বহুরূপী।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের নতুন জাগরণের দিনে এই সচেতন কর্মপ্রয়াসের সুযোগ আশা করি দেশের শিল্প জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। যাঁরা এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে চান তাঁরা ১১-এ, নাসিরুদ্দীন রোড (কলিকাতা, ১৭) স্থিত বহুরূপী কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

পুরস্কারের আগে ও পরে

গত মঙ্গলবার মহাসমারোহে নয়াদিল্লীতে ১৯৫৮ সালের চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। 'সাগর সংগমে' ও 'জলসাঘর' সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঙালীমাত্রই এতে উল্লসিত হবেন।

আঞ্চলিক এওয়ার্ড কমিটির বিচারে 'সাগর সংগমে', 'জলসাঘর' ও 'ডাক হরকরা

ছবি তিনটি যখন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে, তখন চিত্ররসিকদের মধ্যে সংশয় ও সমালোচনার গুঞ্জন শোনা যায়। আঞ্চলিক কমিটির রায় যখন বেরোয় তখনও 'সাগর সঙ্গমে' ছবিখানি জনসাধারণ দেখবার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয়ত এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিগুলির মধ্যে এমন আরও উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল যেগুলির মধ্যে দু'য়েকটিকে অন্তত অনেকেই আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচিত তিনটি ছবির মধ্যে দেখতে পাবেন আশা করেছিলেন। আবার যে দু'য়েকটি ছবি নির্বাচিত হবে বলে অনেকেই আশা করেছিলেন, সেগুলি আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচনে স্থান পেলেই যে জনসাধারণের মধ্যে সকল সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে যেত তা নয়। কারণ কোন তিনটি ছবি সম্বন্ধেই সর্বশ্রেণীর দর্শকেরা একমত হতে পারেন না। বিচারের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের তারতম্য চিরকালই থাকবে।

তবে আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচন সম্বন্ধে বিচারশীল জনসাধারণের মধ্যে এবং যে সমস্ত সমালোচনা-আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে দু'টি বিষয়ই অগ্রাধিকার পেয়েছে। একটি হল ছবির গুণাগুণ সম্পর্কে আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচিত সভ্যদের বিচারের ক্ষমতা অর্থাৎ কমিটির সভ্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং দ্বিতীয়টি হল ছবির গুণাগুণ বিচার ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি।

কিছুকাল আগে প্রযোজক-পরিচালক বিকাশ রায় 'মরুতীর্থ হিংলাজে'র রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন কেন আবেদন করেননি সে-সম্পর্কে সাংবাদিক বৈঠকে এক বিবৃতিদান-কালে এই দুটি বিষয় নিয়ে সরাসরি সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে যে পদ্ধতিতে এবং যে-সমস্ত বিষয়ের ওপর ছবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য নম্বর দেওয়া হয় তা প্রমাদ-পূর্ণ। তাঁর তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী পরিচালনা এবং বিন্যাসের জন্য নির্দিষ্ট ৭০ নম্বর, যাবতীয় কলাকৌশলের জন্য ৪০ নম্বর, কাহিনী এবং মূল বিষয়বস্তুর (theme) জন্য ৪০ নম্বর এবং সামগ্রিক আবেদনের (effect) জন্য ৫০ নম্বর। নম্বর দেওয়ার এই বিধান সম্পর্কে বিচারশীল লোকমাত্রই আপত্তি তুলবেন। ছবির অন্যতম প্রধান দুটি অঙ্গ—অভিনয় ও সংগীতের জন্য কোন নম্বরের ব্যবস্থা নেই এই বিচার-বিধানে। কাহিনী এবং theme-এর পার্থক্য অনুধাবন করাও সহজসাধ্য নয়। 'Effect' অর্থাৎ সামগ্রিক আবেদনের (?) জন্য রয়েছে ৫০ নম্বর। অথচ সামগ্রিক আবেদন মুখ্যত গড়ে তুলে কাহিনীর বিন্যাস, পরিচালনা, অভিনয়, সংগীত ও মূল বিষয়বস্তু। সংগীত ও অভিনয়ের জন্য নম্বরের ব্যবস্থা থাকলে effect-এর জন্য আলাদা নম্বর রাখা প্রয়োজন হয় না। যদি effect-এর অর্থ নৈতিক বা কোন আদর্শমূলক effect বোঝায়, তবে তা কাহিনী এবং theme-এর মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে। এই ভ্রমপূর্ণ নম্বর-দানের ব্যবস্থার মধ্যে অনুপযুক্ত ছবির পুরস্কার লাভের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্সের "অপুর সংসার"-এর নায়ক নবাগত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তন্ময় হয়ে স্ত্রীর চিঠি পড়ছেন

আঞ্চলিক কমিটির সভ্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে সে-সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে আমরা অক্ষম। এবার-কার আঞ্চলিক কমিটিতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর প্রতিনিধিরূপে যে তিনজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এওয়ার্ড কমিটির ছবি নির্বাচন সম্পর্কে বিশদ আলোচনার সুযোগ পেয়ে-ছিলেন চিত্রসাংবাদিকেরা সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে। বৈঠকে আঞ্চলিক কমিটির এই তিনজন সভ্য—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশচন্দ্র নান ও শিশির মুখোপাধ্যায়—সাংবাদিকদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে ছবির নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বিবেক ও বিচারবুদ্ধির দ্বারাই চালিত হয়েছেন। তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে কোন কোন মহল থেকে। কিন্তু তাঁরা অবিচলিতভাবেই তাঁদের কর্তব্য সমাধা করেছেন।

তাঁদের নিজেদের আন্তরিকতা এবং ছবির গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ তাঁরা রাখেননি তাঁদের যুক্তিগ্রাহ্য বিশদ আলোচনার মধ্য দিয়ে। আঞ্চলিক কমিটিতে আরও যে কয়েকজন সভ্য ছিলেন, তাঁদেরও এই কাজের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয়ের প্রশ্রয় দিতে আমরা নারাজ। তবে কোন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিকে পুরস্কার দেওয়া আর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য ছবির গুণাগুণ বিচারের ভার যাঁদের ওপর দেওয়া হবে, তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের স্থান থাকা উচিত যাঁদের যোগ্যতা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বভাবত কোন সংশয় জাগবে না। অর্থাৎ কমিটিতে চিত্রপরিচালক, চিত্রসমালোচক, শিল্পরসবেত্তা বলে সুপরিচিত বিদগ্ধজনের দ্বারা তৈরী কমিটি জনগণের অনুমোদন লাভ করে সহজেই। যদিও তাঁদের বিচারই সব সময় জনসাধারণ নিঃসংশয়ে মেনে নেবেন তা নয়। তবে

বহুজনকে সন্তুষ্ট করে এবং অল্প সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারদানের এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

বাদল পিকচার্সের "দীপ জ্বেলে যাই"-এর নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী ও সুচিত্রা সেন

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র মেলার আসন্ন সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন সমাপ্তপ্রায়। অনুষ্ঠান-সূচী প্রণয়নে রবীন্দ্র মেলার সুনাম আছে, এ বৎসরও তাঁদের সে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে আশা করা যায়। কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার উপস্থিত থেকে এ'দের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। ভারতের রাজস্ব মন্ত্রী এবং শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী বি গোপাল রেড্ডী ৩১শে বৈশাখ মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন। রবীন্দ্র মেলার কার্যালয় ৩এ, বিডন স্কোয়ারে আগামী ৫ই মের মধ্যে সদস্যপদ নূতনীকরণ এবং নতুন সদস্য হবার শেষ তারিখ ধার্য হয়েছে।

অন্যান্য বছরের মত দক্ষিণী রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী পালন করবেন দুটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। ২৫শে বৈশাখ (৯ই মে) দক্ষিণী-ভবনে সন্ধ্যা সাতটায় সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও নিমন্ত্রিতদের প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পরের দিন (১০ই মে) সন্ধ্যা সাতটায় আশুতোষ কলেজ হলে শুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় রবীন্দ্র সংগীতের বিশেষ আসর বসবে।

হাওড়া যুব সভা সংগঠিত রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে কবিগুরুর জন্ম-জয়ন্তী উৎসব এবারও ২৫শে বৈশাখ থেকে ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীঅমল হোম, ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। অনেকগুলি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নাট্যাভিনয়, নৃত্য-গীতাদি পরিবেশন করবেন। একক সংগীতে বাংলার নবীন ও প্রবীণ শিল্পীবৃন্দ যোগ দেবেন।

বৈতানিকের অনুষ্ঠান

১লা বৈশাখ থেকে ৫ই বৈশাখ জোড়াসাঁকো মহর্ষি ভবন প্রাঙ্গণে বৈতানিকের দশম-বর্ষ-পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসব বৈতানিকের সভ্য ও সভ্যাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

"রবীন্দ্র সংগীতের সুরের ছন্দ" সংগীত সহযোগে আলোচিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ভূপতি মজুমদার, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমা চৌধুরী।

একক কীর্তনের আসর পরিচালনা করেন বৈতানিকের বিশিষ্ট সভ্যা রাধারাণী দেবী। রবীন্দ্র সংগীত শোনান শান্তিদেব ঘোষ। "বৈকুণ্ঠের খাতা", "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ও "বশীকরণ"—এই তিনটি নাটিকা সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। ভরত নাট্যম্ নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী ঠাকুর।

• • •

২রা ও ৩রা মে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বংগীয় নাট্যসংসদ মঞ্চে (৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) নাট্যকার সংঘের পঞ্চম একাংক নাট্যানুষ্ঠানে এই পাঁচটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ হবে : সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর "শুদ্ধ ছবি", কানাই বসুর "অবায়", দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "যে সুর হারিয়ে গেছে", কালীদাস রায়চৌধুরীর "রাজদ্বারে শ্মশানে চ" ও শান্তনু দাশের "মরলো কেন?"

• • •

গত ৪ঠা বৈশাখ গীত মালঞ্চের বৈশাখী উৎসব ল্যান্সডাউন রোডস্থিত নিজ কার্যালয়ে সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতাদির পর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। সব শেষে পূর্ব রেলওয়ে সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের "কালমৃগয়া" মঞ্চস্থ হয়।

কে জি প্রোডাকসনের "দেড়শো খোকার কাণ্ড"-র দুই শিশু-কাণ্ডারী তিলক ও ভাস্কর

একলব্য

ভারতের দুটি দল এখন বিদেশে রয়েছে। ক্রিকেট সফরের জন্য ক্রিকেট দল রয়েছে ইংলণ্ডে, আর ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য টেনিস টীম গিয়েছে জাপানে।

ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলা নিয়েই প্রথমে আলোচনা করি। ইংলণ্ডে ভারতকে এবার পাঁচ মাসের সফরে পাঁচ দিনব্যাপী পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ৩৭টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এখানে বলা প্রয়োজন, ইংলণ্ডে ভারত কোনবার পাঁচটি টেস্ট খেলার সুযোগ পায়নি। এবারই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের পাঁচটি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। এর আগে ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে ভারত খেলেছে একটি টেস্ট, ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে খেলেছে তিনটি করে, আর ১৯৫২ সালে খেলেছে চারটি টেস্ট। ইংলণ্ডের মাটিতে এই ১১টি টেস্ট খেলার মধ্যে ভারত আজ পর্যন্ত একটি টেস্ট খেলাতেও জিততে পারেনি। ইংলণ্ড জিতেছে ৭টি খেলায়, ৪টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। অবশ্য ভারতের মাটিতে ইংলণ্ডের সঙ্গে যে আটটি টেস্ট খেলা হয়েছে, তার মধ্যে একটি খেলায় ভারত ইনিংসে জয়ী হয়েছে। কিন্তু ১৯৫১-১৯৫২ সালে সে দলটি ছিল খুবই দুর্বল। ইংলণ্ডের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক দলকে ভারতের পক্ষে পরাজিত করা খুবই কষ্ট—বিশেষ করে ইংলণ্ডের মাটিতে।

তারপর এবার শীত-মরসুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ভারতের খেলোয়াড়রা যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার ফলে দেশব্যাপী যে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে, তাতে খেলোয়াড়দের মনোবল নষ্ট হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাই ভারতের ক্রিকেট খেলার মুরুব্বীরা গোড়া থেকে পত্তন আরম্ভ করবার উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ইংলণ্ড সফরকারী দল গড়েছেন। দলের নেতৃত্বের ভারও দিয়েছেন একজন নতুন অধিনায়কের উপরে। এ নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। লোক-সভায় এবং রাজ্য সভায় পর্যন্ত এ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। তবুও ভারতীয় দলের ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে সবাই অভিনন্দন জানিয়েছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় খেলোয়াড়-দের সাফল্যের জন্য।

কিন্তু ইংলণ্ডে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কতটুকু সাফল্য অর্জন করবেন, সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে কারণ আবহাওয়া এবং মাঠের অবস্থা ক্রিকেট খেলার এক মহা সমস্যা। ভারতের বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই শুকনো মাটির মানুষ। বিলেতের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এঁদের ব্যাটে রান আসা কষ্ট। অবশ্য বোলিং কেউ কেউ ভালই করবেন বলে আশা করা যায়। ভারতের অনেক খেলোয়াড়েরই ইংলণ্ডের নরম মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। যদিও সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংলণ্ড তার ক্রিকেট মর্যাদা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে, ইংলণ্ডের বর্তমান ক্রিকেট মানও নিম্নমুখী; তবুও ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতের তুলনায় ইংলণ্ড প্রবল-পরাক্রান্ত টিম। সুতরাং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত সাফল্য অর্জন করবে এটা আশা করা দুরাশা। তবুও আমরা আশা রাখবো ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের তারুণ্যের শক্তির উপর, আর আস্থা রাখবো নতুন অধিনায়ক দাত্তাজী-রাও গাইকোয়াড়ের উপর।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফর সম্পর্কে কিছু কিছু পুরনো কথার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আশা করি। সরকারীভাবে ইংলণ্ডে দলের এটি পঞ্চম ক্রিকেট-সফর। এর আগে আমরা ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৬ ও ১৯৫২ সালে ইংলণ্ড সফর করেছি। কিন্তু সরকারী সফর ছাড়াও এই উপমহাদেশের আরও চারিটি দল বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ড সফর করে এসেছে।

ইংরেজদের কাছ থেকে ক্রিকেট খেলা শেখার ক্ষেত্রে পার্শীরাই ছিলেন পথিকৃৎ তাই পার্শী খেলোয়াড়দের একটি দল সর্বপ্রথম ইংলণ্ড সফর করে ১৮৮৬ সালে। এই দলে ছিলেন ১৬ জন খেলোয়াড়।

খেলোয়াড়দের নাম—ডাঃ ডি এইচ প্যাটেল (অধিনায়ক), পি দস্তুর, এ মেজর, জে মারেনাস, এস ভেদর, ডি খাম্বাটা, এম ফ্রেমাই, এস বেজোঞ্জি, বি বেরিয়া, বি ভাল্লা, এন ব্যানারী, এ লিবারওয়ালা, জে পোয়েখান্না, পি মেজর, এস হার্ভার ও আর পিত্তোওয়ালা।

এই দলটি ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে তেমন সাড়া জাগাতে পারে না। ২৮টি খেলার মধ্যে মাত্র একটি খেলায় বিজয়ী হয়, ১৯টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে আর ৮টি খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত।

পার্শী দলের প্রথম সফরের দু বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮৮ সালে ১৫ জন খেলোয়াড়বিশিষ্ট আর একটি পার্শী দল ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করে। পার্শী সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্র এবং বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী স্যার দোরাব জে টাটা ছিলেন এই সফরের প্রধান উদ্যোক্তা। এবারকার দলটি ইংলণ্ডে আগের দলের চেয়ে অনেক ভাল খেলে। ৩১টি খেলার মধ্যে ৮টি খেলায় বিজয়ী হয়। ১১টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে, ১২টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে।

দ্বিতয় পার্শী দলে ছিলেন—পি ডি কাঙ্গা (অধিনায়ক), আর ডি কুপার, ডি এফ ডুকাস, এন সি বাপাসোলা, এম ই পার্ডার, জে এন মারেনাথ, এম ডি কাঙ্গা, এস হার্ভার, এ ডিভেচা, কে আর ইরানী, ডি এস মেটা, ডি সি প্যানডোলে, বি ডি মোদি, ডি এন রাইটার ও জে এম ডিভেচা।

দ্বিতীয় পার্শী দল ইংলণ্ড থেকে ঘুরে আসবার পর ভারতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। বোম্বাইয়ে পার্শী এবং ইংরেজদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী ম্যাচ শুরু হয় ১৮৯২ সালে। ১৯০৭ সালে হিন্দু দল যোগ দেওয়ায় প্রেসিডেন্সী প্রতিযোগিতা ট্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার পরিণত হয়। পরে মুসলিম ও রেস্ট দল এতে অংশ গ্রহণ করে, ফলে প্রতিযোগিতা ট্রাঙ্গুলার থেকে কোয়াড্রাঙ্গুলার এবং কোয়াড্রাঙ্গুলার থেকে পেন্টাঙ্গুলারে রূপান্তরিত হয়। যাই হক, সে কথা আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কোন্ সময় কোন্ দল ইংলণ্ড সফর করেছে।

ভারতে ক্রিকেট খেলার জন্য তখনো কোন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠিত না হলেও ১৯১১ সালে পাতিয়ালার মহারাজা ভূপেন্দ্র সিংয়ের অধিনায়কত্বে সর্বপ্রথম ভারতের প্রতিনিধিমূলক একটি দল ইংলণ্ড সফরে যায়।

এই দলে ছিলেন—পাতিয়ালার মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং (অধিনায়ক), মেজর কে এম মিস্ত্রি, ডাঃ এইচ ডি কাঙ্গা, পি বালু, জে এস ওয়ার্ডেন, এস পাই, এইচ এফ মোল্লা, কে শেসাধারী, এ সালামুদ্দিন, সফদার হোসেন, সৈয়দ হোসেন, এম ডি বাজসারা, আর পি মেহরমজী, বি জয়রাম, পি শিবরাম, শিবাজী রাও ও এম পি বাজানা।

কোচবিহার রাজ্যের এম পি বাজানা এবং বরোদার যুবরাজ প্রিন্স শিবাজী রাও এই সময়ে ইংলণ্ডেই অবস্থান করছিলেন। ফলে ইংলিশ উইকেটে এঁদের খেলার অভিজ্ঞতা ছিল। তাছাড়া ডাঃ

কাংগা আগের বছরই ইংলণ্ডের হ্যামস্টেড দলে খেলে এসেছিলেন। বি জয়রামেরও ইংলণ্ডে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল। দলের সবচেয়ে খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন মেজর মিস্ত্রি।

এই সময়ে ভারতের রাজা-মহারাজারা ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়-দের সম্পর্কে ইংলণ্ডেও কিছুটা উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মহারাজা ভূপেন্দ্র সিংয়ের ভারতীয় দল ইংলণ্ডে আশানুরূপ খেলতে পারেনি। ১৪টি প্রথম শ্রেণীর খেলার মধ্যে ভারতীয় দল দুটি খেলায় বিজয়ী হয়ে দশটি খেলায় হার-স্বীকার করে—বাকী দুটি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় না। সবসুদ্ধ ২৩টি খেলায় অবশ্য ভারতীয় দল জেতে ৬টি খেলায়, আর ১৫টি খেলায় হার-স্বীকার করে। ১৯১২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর সম্পর্কে 'উইসডেনে' লেখা হয়েছিল "ভারতের এই সফর ব্যর্থতার ইতিহাসে পূর্ণ, মিছামিছি বিলেতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পর্কে অনেক রঙিন ছবি আঁকা হয়েছিল।"

অবশ্য মেজর কে এম মিস্ত্রির খেলা সম্পর্কে উইসডেনে ভালই প্রশংসা করা হয়েছিল। লর্ডস মাঠে ভারতীয় দলের প্রথম আবির্ভাবে এম সি সি দলের হার্নস, মিগনন, টেরান্ট প্রভৃতি খ্যাতনামা বোলারদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে মেজর মিস্ত্রির ৮০ মিনিটে ৭৮ রান লাভের ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সাসেক্সের বিরুদ্ধে মাত্র ১৭ মিনিটে এইচ এফ মোল্লার ৫৪ রানের কথাও উল্লেখ করতে উইসডেনের ভুল হয়নি। উইসডেনে একথাও লেখা হয়েছিল, মেজর মিস্ত্রি যদি ভারতীয় দলে নিয়মিতভাবে খেলতে পারতেন, তবে ফলাফল অনেক ভাল হত। কিন্তু মিস্ত্রি তিনটি ম্যাচের বেশী খেলতে পারেননি। এই সফরে মেহেরমজী তিনটি, শিবরাম দুটি ও বাজানা, ডাঃ কাংগা, ওয়ার্ডেল এবং সালামুদ্দিন একটি করে সেঞ্চুরী করেছিলেন। বোলিংয়ে সবচেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন পি শেসু, ১০৪টি উইকেট পেয়ে। ব্যাটিংয়ে তার পি মেহেরমজীর হাজার রান পূরে গিয়েছিল।

পাতিয়ালার মহারাজার দলের ইংলণ্ড সফরের পর ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক ঘটনা ঘটে যায়। ভারত ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভা হয়। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের চেষ্টায় আর্থার মিলি-গানের নেতৃত্বে এম সি সি দল আসে ভারত সফরে। ভারতে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সৃষ্টি হয়। তারপর সরকারী-ভাবে ভারতীয় দল ইংলণ্ডে যায় ১৯৩২ সালে। বলা বাহুল্য, ভারতের রাজ-রাজড়াদের সামনে রেখে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডই এবার দল গঠন করেন। পোর-বন্দরের মহারাজার নেতৃত্বে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতীয় দল গড়া হয়।

পোরবন্দরের মহারাজা (অধিনায়ক), কে এস ঘনশ্যাম সিংজী, সি কে নাইডু, ওয়াজির আলী, নাজির, জে নউমল, এন ডি মার্শাল, এস এইচ এম কোলা অমর সিং, পি ই পালিয়া, লাল সিং, ডাঃ জাহাংগীর খাঁ, জে ডি ন্যাভলে, যোগেন্দ্র সিং, বি ই কাপাদিয়া, গোলাম মহম্মদ, এস আর মোদাম্বে ও মহম্মদ নিসার।

প্রথম সরকারী সফরে ইংলণ্ডের ক্রীড়া-রসিকদের মনে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যে ছাপ এঁকেছিলেন ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় আজও তা সোনার অক্ষরে লেখা আছে। তবু ভারত এই সফরে তার দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সাহায্য পায় নি। দলিপ সিংজী এবং পাতৌদির নবাবের আসন এই সময় ইংলণ্ডের ক্রিকেট ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ডবাসীরা দলিপকে 'স্মইলিপ' এবং পাতৌদিকে 'প্যাট' নামে আদর করে ডাকত। স্মইলিপ এবং প্যাট ভারতের পক্ষে খেলাই বেশী সম্মানজনক বলে মনে করেছিলেন—অস্ট্রেলিয়া সফর-কারী ইংলণ্ড দলে এরা নির্বাচিতও হয়ে-ছিলেন, যদিও দলিপ অসুস্থতার জন্য শেষপর্যন্ত সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। 'দলিপ' এবং 'প্যাট' ভারতীয় দলের পক্ষে খেললে ভারতের ব্যাটিং খুবই শক্তিশালী হত। সম্ভবত সেবারকার সফরের সেই একটিমাত্র টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের ক্রিকেট শক্তিকে হার স্বীকার করতে হত ভারতের কাছে।

একদিকে দলিপ সিংজী ও পাতৌদির নবাব ভারতীয় দলের হয়ে খেললেন না, অন্যদিকে অপর দুই রাজপ্রবর অধিনায়ক পোরবন্দরের মহারাজা ও সহ অধিনায়ক লিমডির ঘনশ্যাম সিংজী। ভারতীয় দল দুর্বল হয়ে পড়ল। অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সি কে নাইডু। টেস্ট খেলায় ভারত অবশ্য ইংলণ্ডের কাছে ১৫৮ রানে পরাজিত হল। কিন্তু ক্রীড়ানৈপুণ্যে ভারত অর্জন করলো ইংলণ্ডের ক্রীড়ারসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

১৯৩২ সালের ২৫শে জুন ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন লর্ডস মাঠে আরম্ভ হয় ইংলণ্ডের সংগে ভারতের প্রথম সরকারী টেস্ট খেলা। এই খেলার আগে ভারত চারটি শক্তিশালী কাউণ্টি দলকে পরাজিত করবার গৌরব অর্জন করেছে আর সি কে নাইডু এই মাঠেই তার প্রথম খেলায় এম সি সি-র বিরুদ্ধে নট আউট থাকার কৃতিত্ব সমেত করেছেন ১১৮ রাণ।

টেস্টে ইংলণ্ডের প্রবল পরাক্রান্ত টীম। জার্ডিন অধিনায়ক, হোমস ও সাটক্লিফ, যারা এই টেস্টের মাত্র ১০ দিন আগে প্রথম উইকেটে ৫৫৫ রান করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন, তারা ওপেনিং ব্যাটসম্যান। তার পরের খেলোয়াড় ওয়্যালী হ্যামণ্ড, ফ্রাংক উলী, এর পর রয়েছেন পেণ্টার ও এমসের মত ব্যাটসম্যান। জার্ডিন টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেলেন। কিন্তু ভারতের নিসার ও অমর সিংয়ের বলে এহেন ইংলণ্ড দলও কাহিল হয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই নিসার ছিটকে দিলেন সাটক্লিফের স্টাম্পের বেল, এই ওভারের পরের বলেই হোমস ক্লিন বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। লাল সিংয়ের বলে যখন ফ্রাংক উলী আউট হলেন তখন ইংলণ্ডের ৩ উইকেটে মাত্র ১৯ রাণ। জার্ডিন হ্যামণ্ডের সংগে চতুর্থ উইকেটে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে খেলতে লাগলেন। নিষ্প্রাণ আত্মরক্ষামূলক ব্যাটিং তখন ক্রিকেটের স্বাভাবিক লাবণ্য হরণ করেনি, লম্বা রানের মাত্রাও ছিল না খেলায় নৈপুণ্যের মাপকাঠি। তবু জার্ডিন ও হ্যামণ্ড সি কে নাইডুর ৭ ওভারে মাত্র ২ রানের বেশী করতে পারলেন না। এর মধ্যে হ্যামণ্ডের ব্যাট থেকে দুবার ক্যাচও উঠলো। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় বোলাররা প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডের জাঁদরেল ব্যাটসম্যান দের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে বোলিং করেছিলেন। এ টেস্টের বিশদ বিবরণ দিতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হয়। ভাগ্যদেবীও ভারতের প্রতি সদয় ছিলেন না। নাজির আলীর মাংসপেশীতে টান ধরায়, পালিয়া আহত হওয়ায় এবং সি কে নাইডুর হাতের আঙ্গুলে চোট লাগায় ভারতীয় দলের ব্যাটিং এবং বোলিং দুইই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় ১৫৮ রানে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ উইকেটে অমর সিং ও লাল সিংয়ের মাত্র ৪০ মিনিটে ৭৪ রাণ যোগ করার ঘটনা এবং রবিনসের বলে অমর সিংয়ের পর পর তিনটি বাউণ্ডারী ও চতুর্থ বলে ওভার বাউণ্ডারী মারার ব্যাপার ভারতের প্রথম সরকারী টেস্টের স্মরণীয় ঘটনা।

টেস্ট খেলা ছাড়াও এ সফরে ভারতীয় দল ইংলণ্ডে বিপুল সাফল্য অর্জন করে। মোট ৩৮টি খেলার মধ্যে ভারত জেতে ১৩টি খেলায়, ৯টি খেলায় হয় পরাজিত, ১৪টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে, আর দুটি খেলা বৃষ্টির জন্য একেবারেই পণ্ড হয়ে যায়।

ব্যাটিংয়ে ভারতীয় দলের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসা অর্জন করেন সি কে নাইডু। ৬টি

সেঞ্চুরী সমেত নাইডুর কিছু বেশী ৪০ রানে গড়পড়তার চেয়েও ইংলেণ্ডে বিস্ময় জাগিয়েছিল তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধিনায়কত্ব এবং নয়নাভিরাম ক্রীড়াভঙ্গি। ইংলণ্ড-বাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন দুই কীর্তিমান বোলার মহম্মদ নিসার ও অমর সিং। অমর সিং পেয়েছিলেন ১২৫টি উইকেট, আর নিসার পেয়েছিলেন ৯৭টি। ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা ছাড়াও সি কে নাইডুর ৬৫টি উইকেটের কথা উল্লেখ করবার মত ঘটনা।

৪ বছর পরে বিজয়নগরের মহারাজকুমার 'ভিজ্জি'র নেতৃত্বে ভারত আবার ইংলণ্ড সফর করে ১৯৩৬ সালে। এবারকার দলে স্থান পান:—

বিজয়নগরের মহারাজকুমার (অধিনায়ক), সি কে নাইডু, ওয়াজির আলী, মহম্মদ নিসার, পি ই পালিয়া, এল অমরনাথ, সুটে ব্যানার্জী, আমীর ইলাহি, এম জে গোপালন, ডি ডি হিন্ডেলকার, বাকা জিলানী, এল পি জাই, মহম্মদ হোসেন, কে পি মেহেরমজী, ভি এম মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী, সি রামস্বামী, সি এস নাইডু, অমর সিং, ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, দিলওয়ার হোসেন ও এস এম যোদি।

অধিনায়কের অক্ষমতা, ব্যবস্থাপনার দুর্নীতিবিচ্যুতি, সংঘবদ্ধতার অভাব এবং সর্বোপরি অমরনাথ বর্জন ভারতীয় দলকে রীতিমত পঙ্গু করে তোলে। ফলে ২৮টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় ভারত জয়লাভ করে মাত্র ৪টি খেলায়, ৯টি খেলায় পরাজিত হয়, আর ১২টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে।

তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে দুটি টেস্টে পরাজিত হয় ৯ উইকেটের ব্যবধানে। দ্বিতীয় টেস্টে জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় না। ম্যাঞ্চেষ্টার মাঠে এই টেস্টে বিজয় মার্চেণ্টের ১১৪ ও মুস্তাক আলীর ১১২ রাণ ১৯৩৬ সালের সফরের গৌরবজনক অধ্যায়। ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেন বিজয় মার্চেণ্ট। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রশংসা কুড়োন মুস্তাক আলী। বোলিংয়ে নিসার অমর সিং ও সি কে নাইডু।

১৯৩৬ সালের পর ভারত আবার ইংলণ্ডে দল পাঠায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে। কিন্তু এর মাঝে মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রাজপুতানা ঈগল নামে একটি দল ইংলণ্ড ঘুরে আসে। এই দলের খেলোয়াড় ছিলেন—

কার্তিক বসু, আব্বাস খাঁ, দীপচাঁদ, রাম প্রকাশ, সি এইচ ব্যাংকার, ভি এস হাজারে, এম গোপাল দাশ, কমল ভট্টাচার্য, এন কেমারী, বি ডি শংকর, আসাদ ওয়াহেদ, টি হোসেন, এল রামজী, আক্রম খাঁ, গুলাব সিং, ডব্লিউ বেগ, জানী রাম, চোপরা জি কে কুরেশী, আরিফ হোসেন, সুলতান আব্বাস ও ঝালওয়ারের মহারাজা।

স্বল্পকালব্যাপী ইংলণ্ড সফরে এই দলটি ২টি খেলায় জয়ী হয়, ১টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে, আর পাঁচটি খেলার ফলাফল অমীমাংসিতভাবে থাকে।

পাতৌদির নবাবের অধিনায়কত্বে ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডে যে দল প্রেরণ করা হয় শক্তিসামর্থ্যে সেই দলই ছিল সব দলের সেরা। এবারের সফরে ভারত ১০ বছর আগের নষ্ট গৌরবের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেছিল। ভারত এর চেয়েও হয়তো ভাল ফলাফল দেখাতে পারত, যদি না বৃষ্টি বাদল ভারতের খেলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত।

১৯৪৬ সালের ৩টি টেস্টের মধ্যে একটি মাত্র বিজয়ী হয়ে ইংলণ্ড রাবার পায়, বাকী দুটির ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। সফরের ৩৩টি খেলার মধ্যে ভারত জেতে ১৩টি খেলায়, ৪টি খেলায় পরাজিত হয়, ১৬টি খেলায় জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় না।

এবারও ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সহ অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট। ৭টি সেঞ্চুরী সমেত তিনি করেন মোট ১৩৮৫ রাণ। বিজয় হাজারেও হাজারের উপর রাণ সংগ্রহ করেন। চৌখস খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন বিনু মানকড়। সফর শেষে তিনি যখন দেশে ফেরেন তখন তার ঝুলিতে হাজারের উপর রাণ এবং একশোর উপর উইকেট। এই সফরে সারের বিরুদ্ধে শেষ উইকেটে সি টি সারভাতে ও সুটে ব্যানার্জী—দুজনেই সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব সমেত ২৪৯ রাণ করে ইংলণ্ডের দশম উইকেট রাণের এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এই খেলাতেই সি এস নাইডু করেন হ্যাটট্রিক। শক্তিশালী সারে দল ভারতের কাছে ৯ উইকেটে হেরে যায়।

১৯৪৬ সালে যারা ইংলণ্ড সফর করেছিলেন তাঁদের নাম:—

পাতৌদির নবাব (অধিনায়ক), বিজয় মার্চেণ্ট (সহ অধিনায়ক), এল অমরনাথ, বিনু মানকড়, আর এস মোদী, মুস্তাক আলী, সুটে ব্যানার্জী, সি এস নাইডু, গুল মহম্মদ, এস ডব্লিউ সোহনী, ডি ডি হিন্ডেলকার, সি টি সারভাতে, এ এইচ কারদার, আর বি নিম্বলকার ও এস জি সিন্দে।

ভারত সরকারীভাবে চতুর্থবার ইংলণ্ড সফর করে ১৯৫২ সালে। ভি এস হাজারের অধিনায়কত্বে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে এবারের দল গড়া হয়—

ভি এস হাজারে (অধিনায়ক), এইচ আর অধিকারী, এন চৌধুরী, আর ডিভেচা, ডি কে গাইকোয়াড়, এইচ জি গাইকোয়াড়, গোলাম আমেদ, সি ডি গোপীনাথ, ভি এল মঞ্জরেকার, এম কে মন্ত্রী, ডি জি ফাডকার, জি এস রামচাঁদ, পংকজ রায়, সি টি সারভাতে, পি সেন, এস জি সিন্ধে, পি আর উম্রিগর।

ইংলণ্ডে এবার ভারত খেলে চারটি টেস্ট এর মধ্যে তিনটিতে ভারতকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। একটি টেস্ট কোনভাবে অমীমাংসিত থেকে যায়। সফরের ৩৫টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল জেতে ৬টি খেলায়, পরাজিত হয় পাঁচটিতে, বাদ-বাকী ২৪টি খেলা ড্র হয়।

অমরনাথ, মুস্তাক আলী ও মানকড়ের অভাবে ১৯৫২ সালের দলটি খুব শক্তিশালী ছিল না। মানকড় এই সময়ে ইংলণ্ডের ল্যাংকাশায়ার লীগে খেলছিলেন। প্রথম টেস্টে শোচনীয় পরাজয়ের পর মানকড়কে দলভুক্ত করা হয়। লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে মানকড় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে যে দক্ষতা দেখান তা তাঁর ক্রিকেট জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। লর্ডস টেস্টের দুই ইনিংসে তিনি—৭২ ও ১৮৪ রাণ করেন আর ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৭৩ ওভার বল দিয়ে দখল করেন ৫টি উইকেট। অধিনায়ক হাজারে এবং মঞ্জরেকার ছাড়া এ সফরে আর কেউই তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

৬ বছর পরে ভারত এবার ইংলণ্ডে গিয়েছে বেশীরভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে। এবারকার দলে আছেন—

ডি কে গাইকোয়াড় (অধিনায়ক), পংকজ রায় (সহ অধিনায়ক), সুভাষ গুপ্তে, ভি এল মঞ্জরেকার, পি উম্রিগর, পি জি যোশী, আর জি নাদকার্ণী, এন এস তামানে, আর বি দেশাই, সি জি বোরদে, কে এন ঘোড়পাড়ে, সুরেন্দ্র নাথ, জয়সীমা, মুদ্দিয়া, এ এল আপ্তে, এ জি কৃপাল সিং ও নরী কণ্ট্রাক্টর।

• • •

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ভারতের ডেভিস কাপ টীম টোকিও গিয়ে পৌঁচেছে একথা আগেই বলেছি। মে মাসের পয়লা তারিখ থেকে টোকিওতে ভারত ও জাপানের সেমি-ফাইনাল খেলা আরম্ভের কথা।

১৯৫৬ সালে ডেভিস কাপের খেলায় জাপানকে ভারতের কাছে ৩—২ ম্যাচে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সেবার খেলা হয়েছিল জাপানে। এবার জাপানেরই ভারতে এসে খেলবার কথা ছিল। কিন্তু ভারতের বর্তমান গরম আবহাওয়া টেনিস খেলার পক্ষে অনুকূল নয়, এই কারণে জাপানের টেনিস কর্তৃপক্ষ ভারতীয় দলকে জাপানে গিয়ে খেলবার আমন্ত্রণ জানায়। ভারতও সম্মত হয়। নরেশকুমার, রমানাথ কৃষ্ণন ও প্রেমজিৎ লালকে নিয়ে ভারতের টীম গঠন করা হয়েছে।
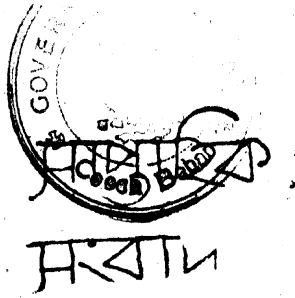
দেশী সংবাদ

২০শে এপ্রিল—শ্রীনেহরু আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, ভারতের সমগ্র পূর্বসীমান্ত সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে। এমনকি পুলিসও সেখানে সেনাবাহিনীর নির্দেশে কাজ করিতেছে। সীমান্তের বহু ঘাটিতে পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে, আবার বহু ঘাটিতে সেনাবাহিনীও মোতায়েন আছে।

গত ১৬ই এপ্রিল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ইতিহাসপত্রের যে ২৯৮টি খাতা খোয়া গিয়াছিল তাহা অদ্য কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। হাওড়া বালিগঞ্জ রুটের জনৈক কণ্ডাক্টর বালিগঞ্জ ডিপোতে একটি ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর ঐ খাতাগুলি ঐ দিনই কুড়াইয়া পায়। খাতাগুলি ট্রাম কোম্পানীর সদর কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। ট্রাম কর্তৃপক্ষ উহা গোয়েন্দা পুলিস দপ্তরে প্রেরণ করেন।

২১শে এপ্রিল—দলের অন্যান্য লোকজনসহ দলাই লামা আজ সকালে মুসৌরী পৌঁছেন এবং মনোরম নির্জন হ্যাপিভ্যালি এলেকায় অবস্থিত বিড়লা ভবনে উপনীত হন। ইহা তাঁহার স্থায়ী বাসভবন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

গোয়েন্দা পুলিসের বড়কর্তা, সি আই ডি এবং আই বি বিভাগের খোদ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী পি কে বসুর বাড়িতে হানা দিয়া এক চোর গতরাত্রে কয়েক হাজার টাকার গহনা নিয়া নির্বিঘ্নে চম্পট দিতে সমর্থ হইয়াছে।

২২শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, চীনের মানচিত্রে কয়েকটি ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে চীনের নিকট লিখিত পত্রাদির যেসব উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা যথেষ্ট বিস্তারিত নয়।

২৩শে এপ্রিল—দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ গাঁজা হইতে আবগারী শুল্ক বাবদ বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আয় হইত। কিন্তু নেপাল সীমান্ত হইতে বে-আইনীভাবে গাঁজা আমদানির ফলে উহা কমিতে কমিতে এখন মাত্র ২০ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

হাওড়া পুলিস আজ দুপুরে রামকৃষ্ণপুর দ্বিতীয় বাই লেনে একটি গুদামে হানা দেয় এবং সোডার সহিত লবণ মিশ্রণের সময় ঐ গুদামের ১৪ জন লোক হাতে নাতে ধরা পড়ে। পুলিস লবণ মিশ্রিত ১৮ বস্তা সোডা ৫৪ বস্তা লবণ ও ৪৪ বস্তা সোডা উদ্ধার করে। ঐ গুদামের মালিক শ্রীঘনশ্যামদাস আগরওয়ালাকেও পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৪শে এপ্রিল—অদ্য মসৌরীতে বিড়লা ভবনে অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় নেহরু দলাই লামার ঐতিহাসিক বৈঠক আরম্ভ হয়। দলাই লামার সহিত আলোচনার জন্য শ্রীনেহরু বিড়লা ভবনে উপনীত হইলে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দন জানান। চার ঘণ্টার কিছু বেশী সময় ধরিয়া উভয়ের মধ্যে বৈঠক চলে।

বিবাহে যৌতুক দেওয়া বা লওয়া নিষিদ্ধ করিয়া আজ লোকসভায় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলে বিহিত হইয়াছে যে, বিবাহের সময় যৌতুক লওয়া বা দেওয়া অথবা এই কাজে সহায়তা করিলে ৬ মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইবে অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

২৫শে এপ্রিল—কলিকাতা কর্পোরেশনের এলেকাধীন জবরদখল কলোনীগুলির সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য এক "মাস্টার প্ল্যান" রচনাকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশন তিন মাথা এক করিয়াছেন। কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। আমরা শুধু এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, এই পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য যে সমস্ত কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই ৯৭ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

শিলং অফিস হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজো গত মাসে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছেন। ফিজো ইহার পূর্বে পাকিস্তানে পলায়ন করিয়াছিলেন। জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তান সরকার ফিজোর আমেরিকা যাত্রার সব ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং ওয়াশিংটনে পৌঁছিয়া ফিজো কয়েকদিন জনৈক উচ্চপদস্থ পাকিস্তানী কূটনীতিকের ভবনে বাস করেন।

২৬শে এপ্রিল—কেন্দ্রীয় সরকার সম্বৎসরব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের চাউলের চাহিদা মিটাইয়া যাইবার আশ্বাস দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত মর্মে ভারত সরকারের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যে পৃথকভাবে চাউল মজুত করিবার আর কোন পরিকল্পনার কথা উঠে না বলিয়া রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র অদ্য এক সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন।

বিদেশী সংবাদ

২০শে এপ্রিল—রাওয়ালপিণ্ডির খবরে প্রকাশ, আজাদ কাশ্মীরের প্রেসিডেণ্ট সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিম খান ও তাঁহার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। গত রাত্রে আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুজফরাবাদ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে ইহা জানা গিয়াছে।

২১শে এপ্রিল—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ২৭শে এপ্রিল ওয়ারস'তে 'ওয়ারস' চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। এই সংস্থার মধ্যে রহিয়াছে রাশিয়া, আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া। এই বৈঠকে চীনও যোগদান করিবে।

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, জাতীয় মহাকাশ সংস্থার সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীআব্রাহাম হায়াট কংগ্রেসের মহাকাশ কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে বলেন, নূতন ধরনের এমন রকেট ইঞ্জিন নির্মাণ করা হইতেছে যাহা ছয় হইতে আট বছরের মধ্যে মানুষকে চন্দ্রলোকে লইয়া যাইবে এবং সেখান হইতে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিবে।

২২শে এপ্রিল—পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই প্রদেশের অনুপস্থিত জমিদারগণের সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা বর্তমান মাসের শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। এই সমস্ত সম্পত্তির মূল্য কোটি কোটি টাকা। দিনাজপুর, নাটোর, দীঘাপাতিয়া, পুঁঠিয়া ও ময়মনসিংহের মহারাজগণের মত প্রসিদ্ধ জমিদারগণ এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

২৩শে এপ্রিল—পিকিং-এর "পিপলস্ ডেলী" পত্রিকায় জনৈক ভাষ্যকার অদ্য লিখিয়াছেন, হিমালয়কে অপসারণ করা কঠিন, কিন্তু তিব্বতকে চীন হইতে বিচ্ছিন্ন করা আরও কঠিন। উক্ত প্রবন্ধে "পররাষ্ট্রে হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানিবার আহ্বান" জানাইয়া বলা হয় যে, ভারতীয় সাম্প্রসারণবাদীরা তাঁহাদের হিসাবে ভুল করিয়াছেন।

২৪শে এপ্রিল—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ অদ্য রাওয়ালপিণ্ডিতে সাংবাদিকগণকে বলেন যে, 'ভারতীয় উপমহাদেশের' আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে ভারত ও পাকিস্তানের মিলিতভাবে তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত।

২৫শে এপ্রিল—আজ পিকিং-এর "পিপলস্ ডেলী"তে তিব্বতের ব্যাপারে 'ভারতীয় সাম্প্রসারণকারীদের' নূতন করিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে 'ডেলী মেল'-এর রাজনৈতিক সংবাদদাতা কর্তৃক প্রচারিত এশিয়ায় চীনের "কাগজে কলমে বিরাট ভূখণ্ড দখলের" প্রমাণপত্র তাঁহার সংবাদপত্রে পৌঁছিয়াছে। এতদনুযায়ী ব্রহ্মের এক বিরাট ভূখণ্ড ও পাকিস্তানের অংশ বিশেষ, নেপাল রাজ্য এবং ভারতের আশ্রিত রাজ্য সিকিম ও ভুটান চীনের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২৬শে এপ্রিল—তিব্বতকে চীনের স্বাধীনতা দান করা উচিত বলিয়া ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী উ নু যে বিবৃতি দিয়াছেন, চীনের কম্যুনিস্ট সংবাদপত্র "পিপলস্ ডেলী" তাহাকে উদ্ভট প্রস্তাব বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

কুওমিণ্টাংদের মুখপাত্র "চায়না পোস্টে" বলা হইয়াছে যে, তিব্বতস্থ চীনা সৈন্যদের জন্য বিমানযোগে রসদ দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। রাজধানীর দক্ষিণপূর্বে বিদ্রোহীদের উপর তাহারা তিন দিক হইতে চাপ দিতেছে।

সম্পাদক: শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

GOV RNMENT LIB
Cooch Behar

নিও-লিট পাবলিশার্সের বই

সমরেশ বসুর
সুবিখ্যাত উপন্যাস

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে সমরেশ বসু অনন্য। তাঁর গভীর জীবন-চর্যা বাঙলা সাহিত্যের এক বলিষ্ঠ ধারারই উত্তর-সাধনা। অসাধারণ রূপবতী এক ধীবরকন্যার বিচিত্র জীবন কাহিনী এই উপন্যাসটির উপজীব্য।

মূল্য : ৪·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মায়াবন

(ছোটদের বই)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বড়দের নয়, ছোটদের গল্পেও সমান শক্তিধর। অজস্র ছবি।

মূল্য : ১·০০

সিন্ধুপারে

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

'বিচিত্রা' যুগের লেখক নীরদরঞ্জন দাশ-গুপ্তের উপন্যাস 'সুশান্ত শা' এক সময়ে বাঙলা সাহিত্য জগতে আলোড়ন এনেছিল। দীর্ঘদিন পরে নীরদরঞ্জন আর একটি অসাধারণ উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তখনই পাঠকমহলের সশ্রদ্ধ প্রশংসা আকর্ষণ ক'রেছিল।

ইংলণ্ডের পটভূমিকায় এক তরুণ বাঙালী ডাক্তারের আনন্দ বেদনায় মিশ্রিত এক আশ্চর্য রোমান্টিক কাহিনী।

ডবল ডিমাই অ্যান্টিকে ছাপা। খালেদ চৌধুরীর আঁকা তিনরঙা প্রচ্ছদপট।

মূল্য : ৭·০০

সমরেশ বসুর
শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন

ষষ্ঠ ঋতু

কত বিচিত্র চরিত্রকে কত বিচিত্র পরিবেশেই দেখেছেন সমরেশ বসু! আর কি গভীর সহানুভূতি তাঁর অমৃত সন্ধানী লেখনীকে উজ্জ্বল করেছে! ষষ্ঠঋতুর প্রতিটি গল্প জীবনের গূঢ় রহস্যে অভিব্যক্ত।

মূল্য : ২·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

একটি মেয়ের মহত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ অথবা বিভিন্ন মেয়ের মহিমার বিচিত্র প্রকাশ সম্বন্ধে শিবরাম চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতার অংশীদার হ'তে হ'লে এ বইটি অবশ্যপাঠ্য।

মূল্য : ২·০০

দুখিয়ার কুঠি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অমিয়ভূষণের নাম আজকে প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত। একটি ব্যাপক জীবদর্শন অমিয়ভূষণের শিল্প-সৃষ্টিকে সংযত সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ করেছে। 'দুখিয়ার কুঠি' অমিয়ভূষণের তৃতীয় উপন্যাস। কুচবিহারের আদিবাসী জীবনের রসরূপে বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন দিগন্তকে স্পর্শ করল।

মূল্য : ৩·০০

অনুবাদক : অশোক গুহ

ভলতেয়ারের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

মূল্য : ২·৫০

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী
অনূদিত।

"প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিসের" লেখিকা জেন অস্টেনের আর একখানি রসসমৃদ্ধ উপন্যাস "সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি"র প্রথম বাংলা অনুবাদ। ঘরোয়া জীবনের মনোময় কাহিনী। মূল্য : ৩·০০

রূপসজ্জা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোটগল্পের আদর্শ শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এটি আধুনিকতম গল্পসংগ্রহ। মধ্যবিত্ত জীবনের ছোট ছোট হাসিকান্না যে কি বিরাট শিল্পানন্দময় আশ্চর্য ইঙ্গিত বহন করতে পারে তার পরিচয় নরেন্দ্র মিত্রের পাঠকের জানা আছে।

মূল্য : ২·৫০

একটি নীল আকাশ

প্রভাত দেবসরকার

মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের আনন্দ-বেদনার রসঘন কয়েকটি কাহিনীর সমষ্টি।

মূল্য : ২·০০

নিও-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিঃ ৯

নিও-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিঃ ৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারীত্রাতা মোহন (১২) রহস্য-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোস মোহন (১৪) মোহনের তূর্যনাদ (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো-যুদ্ধে মোহন প্রভৃতি ২০৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ২, সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন, কিম্বা ২৯-১১-৫৮ তারিখের 'দেশ' দেখুন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকখানি ক্লাসিক রহস্যোপন্যাস। প্রত্যেকটি ২৷৹

চীনের নব-নায়ক
ডুলের হীরার হুল
মুগুরে দাওয়াই
অদৃশ্য-সংগ্রাম
সাংঘাতিক ইউল
আমেনিয়ার মর্মভেদ

শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর উপন্যাস

নতুন দিনের আলো

ব্রিটিশ আমলের বাজেয়াপ্ত আদেশ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাহৃত। মূল্য ৩,

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সদ্য প্রকাশিত

অঘটন যা দেখেছি

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সবই সত্য কাহিনী— লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এই সব অলৌকিক কাহিনী পড়তে পড়তে আপনি বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। ২৷৹

শ্রীশৈলেশ বিশী বি-এল রচিত

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের জীবন ছড়িয়ে রয়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু তাদেরই নূতন করে প্রাণ-সঞ্চার করেছেন এই গ্রন্থে। কোন্ চরিত্র কি ভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনে এসে দেখা দিয়েছিল, তা জানতে পারবেন এই গ্রন্থ পাঠ করলেই। মূল্য ৪,

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

শ্রীকান্ত, অভয়া, কমল, অচলা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মূল কোথায়? সর্বোপরি বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন—রাজলক্ষ্মী, পিয়ারী বাঈজি কি তাঁর জীবনের মূলাধার? সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে। মূল্য ২,

যুগান্তর বলেন, "বর্তমান গ্রন্থদ্বয়ের লেখক শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসসমূহের বিভিন্ন চরিত্র এবং লেখকের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে মুখ্য যোগসূত্রটি অবলম্বন করে উক্ত মনীষীর জীবন ইতিহাসের যে স্বরূপটি উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন তার মধ্যে শরৎ-দর্শনের মূল কথাটি বলা হয়েছে। গ্রন্থ দুখানিকে পরস্পরের সম্পূরক-পরিপূরক বলা যেতে পারে।"

সুভাষ-স্মৃতি ২,

বিশ্ব-গল্পিকা গ্রন্থমালা

[বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন]

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প	২,
ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹
আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹
রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹
জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹
ইটালীর শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹
যুদ্ধশেষের শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹
বালজাকের শ্রেষ্ঠ গল্প	১৷৷৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নবতম

শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য

শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক সাহিত্য-সাধনা থেকেই সৌরীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। এই গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের রহস্যময় জীবনের বহু অপ্রকাশিত তথ্য পাঠকেরা জানতে পাবেন। মূল্য ২৷৹

ভূতে পাওয়ার কাহিনী

ভূতে পাওয়ার দেশী ও বিদেশী বিচিত্র সব কাহিনী এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। দেশী প্রথায় তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ভূত-তাড়ানর কথা অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু বিলাতে বিজ্ঞানীরা ভূত-প্রেতের নানা জাত নির্ণয় করে, তাদের তাড়াবার বিধিব্যবস্থা, কতখানি সার্থক করেছেন তারও বহু বিচিত্র কাহিনী এই গ্রন্থে পাবেন। মূল্য ২৷৹

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

পরলোক সম্বন্ধে অর্ধশতাব্দীর গবেষণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত বহু বিচিত্র কাহিনী। গল্পগুলি সত্য হলেও রোমাঞ্চকর ও অপূর্ব রহস্যময়। এই গ্রন্থদ্বয়ে বাঙলার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জানতে পারবেন। প্রত্যেকটি ২৷৹

শেষ পর্য্যন্ত ৩,

স্ত্রী-ভাগ্যে ২, **কাঁচা ও পাকা ৩,**

সবগুলিই নতন ধরণের কমেডি উপন্যাস

এ লেডিজ ম্যান ৩,

মোপাসাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের ভাবানুবাদ

বাবলা ২৷৹ **সহসা ২৷৹**

চলচ্চিত্রে রূপায়িত

স্রোত বয়ে যায় ৪,
বঞ্চিতা ৩, **ভাঙন ২৷৷৵**
মেঘ-কজ্জলী ২, **কালরাত্রি ১৷৷৹**
কাশী ডাক্তার ১৷৹ **বধূবিপ্লব ১৷৹**
দুর্জয়ময়ী ১৷৹
সোনার কাঠি ২, **আলোছায়া ২,**

রবীন্দ্র স্মৃতি ৩৷৷০

সাধারণ পাঠকেরা অন্যূন দশ টাকার বই ভি, পি-তে নিলে ডাক-ব্যয় লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

২৬ বর্ষ ২৮ সংখ্যা
২৫ বৈশাখ ১৩৬৬
মূল্য ৮০ নয়া পয়সা
DESH
Saturday 9th May 1959.
Price 80 nP.

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মহাভারতকে ভারতবর্ষের হিমালয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমরা ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের গঙ্গার সহিত তুলনা করিতে পারি। হিমালয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাও অন্যায় হইত না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গঙ্গানদীই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃষ্টতম তুলনা। হিমালয়ের তুষারদুর্গম শিখরে রহস্যময়ী গঙ্গার উদ্ভব, সমস্ত উত্তরাপথে তাহার ধীর গম্ভীর পদসঞ্চার, আর অবশেষে 'তমালতালী বনরাজিনীলা' সমুদ্রবেলায় অনন্তের কোলে তাহার আত্মবিসর্জন। ইতিহাসের এমন অলৌকিক বৈচিত্র্য, এমন স্বাভাবিক উপসংহার আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় জানি না কেবল ভারতের গঙ্গা ও ভারতের রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত। স্বপ্নভঙ্গের পর নির্ঝর, বৃহৎ জগতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে কী তাহার সাধ?

> "যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
> যত কাল আছে বহিতে পারি,
> যত দেশ আছে ভরাতে পারি,
> তবে আর কিবা চাই,
> পরানের সাধ তাই॥"

তারপরে উত্তরাখণ্ডের সমস্ত নদ-নদী-নির্ঝরকে আহবান করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া, সকলের শুভ সমন্বয়ে নিজেকে পুষ্টতর, গভীরতর, বিস্তৃততর করিয়া নিরবচ্ছিন্ন অভিযান! মধ্যপথে যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হইয়া যুক্তবেণী-মূর্তি—আবার শত শত যোজনপথ অতিক্রম করিবার পরে বাতাস যেখানে সমুদ্রগর্জন বহিয়া আনে, সেই দেশে আসিয়া পুনরায় মুক্তবেণীতে বন্ধন-মোচন, তারপরে একধারা সহস্রধারা হইয়া সমুদ্র-সংগমে শয়ান। ইহাই কি গঙ্গার ইতিহাস নয়? আবার ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস নয়? ভারতের যুগযুগান্ত সঞ্চিত তপস্যার ফলস্বরূপ মহিমার অত্যুচ্চ শিখরী তাঁহার প্রতিভার গঙ্গোত্রী, ভারতের আবহমানকালের যাবতীয় ভাবধারায় তাঁহার কাব্যদেহ পুষ্ট, আর সমস্ত ভাবধারার সে কী স্পৃহণীয় উপসংহার শান্তিময় পারাবারে। আবার এই যাত্রাপথের মাঝখানে ভাব-গঙ্গায় যুক্তবেণীর বন্ধন ঘটিয়াছে মানব-প্রকৃতি ও ব্রহ্মের চিন্তাধারার সম্মেলনে; সমুদ্রের উপকূলে, জীবনের পরিণামে [illegible] জাহ্নবী [illegible], একধারা সহস্রধারায় পর্যবসিত।

আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর্দর্শী পাঠকমাত্রেই এই উপমার সার্থকতা স্বীকার করিবেন। তাই ভারতের রবীন্দ্রনাথকে ভারতের গঙ্গা বলিয়াছি। গঙ্গাকে না জানিলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না; গঙ্গার পুণ্যসূত্র এদেশের যুগের সঙ্গে যুগকে, প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশকে, এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজকে গাঁথিয়া অচ্ছেদ্য করিয়া তুলিয়াছে; গঙ্গাই উর্বরতার উপাদান বহন করিয়া আনিতেছে হিমাচল হইতে; গঙ্গাই কন্যাভূমি গড়িয়া তুলিতেছে সমুদ্র সীমান্তে; গঙ্গায় শোভা সৌন্দর্য শ্যামলতা, গঙ্গায় প্রাণ, কবিত্ব, মোক্ষ। এমন আর কোন্ দেশের কোন্ নদী সম্বন্ধে বলা যায়, এমন আর কোন্ দেশের কোন্ কবি সম্বন্ধে বলা যায়? [illegible] এক একে [illegible]। নদীর মধ্যে, বাংলা দেশে নদী মানেই গাঙ, গঙ্গা, রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রাণ-প্রকৃতিকে প্রবাহিত দেখিয়াছেন। এমন ইতিহাস বলিতেই [illegible]— [illegible] উপমাটির কিছু বিস্তার সাধন করিলাম।

॥ ২ ॥

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের পার্শ্বে বসাইয়া দেখিতে ইচ্ছা যায়। কোথায় বসাইব তাঁহাকে, ঠিক কোন্ মহাকবির গোষ্ঠীতে? ইউরোপের দুজন মহাকবির সহিত নানা কারণে তাঁহার মিলটা বড় বেশি প্রত্যক্ষ। ইটালীর দান্তে আর জার্মানীর গ্যেটে। বলা বাহুল্য, তিনজনেই মহাকবি। কিন্তু ঠিক সেজন্য নয়। তিনজনে তিন দেশ সম্বন্ধে এমন কিছু করিয়াছেন, যাহা একাধারে সেই সব দেশকে ও সেই দেশের মহাকবিদের বিশেষ একটা গুরুত্ব দিয়াছে। যে ইটালীতে দান্তে জন্মিয়াছিলেন, যে জার্মানীতে গ্যেটে জন্মিয়াছিলেন, আর যে ভারতে রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছেন, তাহা প্রায় অনুরূপ—সে ইটালী, সে জার্মানী ছিন্নভিন্ন ছিল, সে ভারতও প্রায় সেই রকম ছিল। অখণ্ড ইটালী, অখণ্ড জার্মানী যথাক্রমে দান্তে ও গ্যেটের সৃষ্টি। ভারতের অখণ্ডতাও প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর আকাঙ্ক্ষা বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, শিখগুরু গোবিন্দের আকাঙ্ক্ষা বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন—সেসব কতদূর ইতিহাসসম্মত জানি না—কিন্তু উহা যে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, আদর্শ, স্বপ্ন সে-বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরগণের উপর আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবে অখণ্ড ইটালী ও অখণ্ড জার্মানী সম্ভব হইবার আগেই কবি-কল্পনায় তাহা উদ্ভাসিত হইয়াছে, বাস্তবে "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারত গ্রথিত হইয়া উঠিবার আগেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সেই বোধটি আরোপিত হইয়াছে আমাদের মনে। এই তিন মহাকবিকে নিজ নিজ দেশের ঐক্য সংবিধায়ক বলা চলিতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসের বাহিরেও তাঁহাদের গুরুর আসন বিস্তীর্ণ; তাঁহারা কেবল মহাকবি নন, ইতিহাসের নায়কও বটে। এইজন্যই তাঁহাদের নাম একসঙ্গে মনে হইয়াছে, একসঙ্গে মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। ইঁহারা তিনজনে একছত্র কবিতা না লিখিলেও কাব্যেতর অন্য রচনা লিখিয়াই গুরুর আসন লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাঁহারা ততোধিক করিয়াছেন। ইতিহাসের গুরুরূপে ও মানুষের কবিরূপে, স্বদেশের ত্রাতারূপে ও মানুষের আনন্দ-উৎসরূপে—তাঁহারা এমন ঐশ্বর্যময় আসন লাভ করিয়াছেন—পৃথিবীর ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই।

ইঁহাদেরই সমকালে, আমাদের প্রত্যক্ষ-জীবনের মধ্যে এমন একজন বিরাট ব্যক্তির আবির্ভাব গৌরবময়-দায়িত্ব চাপাইয়া দেয় সমকালীনের উপরে। রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমরা গৌরব করি, কিন্তু গৌরব মানেই যে গুরুত্ব। এই গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আমাদের আছে কিনা, গত বছরের চেয়ে আমরা অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করিয়াছি কিনা—পঁচিশে বৈশাখ সেই হিসাবের দিন। বর্তমান যুগের সেই হিসাব দাবি করিবে আগামী যুগ। কী উত্তর আমাদের?

গঙ্গাজলে কেহ স্নান-পান করে, কেহ চাষের জল আদায় করিয়া লয়, কেহ পণ্যতরী বাহন করে, কেহ-বা শোভা সৌন্দর্য দেখিয়াই মুগ্ধ। ভাবী যুগ জিজ্ঞাসা করিবে, এই পুণ্য বারি কী কাজে লাগাইয়াছ তোমরা? আশা করি, সে উত্তর রবীন্দ্রনাথের সমকালীনগণের অগৌরবের বিষয় হইবে না।

এখনো অংকুর যাহা
তারি পথ পানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্জিলিং,
২০ কার্তিক ১৯৩১
শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ভাগিনেয় অংকুরকে কবিগুরুর আশীর্বাদ।

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়ে গেনু ভরি।
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাত বেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ফাল্গুন
১৩৩২

পরিপূর্ণ সাহিত্য

রাজশেখর বসু

রোজগার বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে চাকরি। ওকালতি ডাক্তারি ঠিকাদারি দালালি ব্যবসা ইত্যাদি রোজগার হলেও অগ্রগণ্য নয়, সাধারণ ভদ্রসন্তানের দৃষ্টিতে চাকরিই সর্বোত্তম জীবিকা। সেই রকম, সাহিত্য বললে অধিকাংশ বাঙালী বোঝে প্রধানত গল্প-উপন্যাস, তারপর কবিতা, তারপর লঘু প্রবন্ধ বা রম্যরচনা। ইংরেজীতে literature অর্থে অনেক রকম রচনা বোঝায়, কিন্তু বাঙলায় সাহিত্য শব্দ অতি সংকীর্ণ অর্থে চলে। অমুক একজন সাহিত্যিক—এ কথার মানে, লোকটি গল্প উপন্যাস বা কবিতা লেখেন অথবা তার সমালোচনা করেন।

অনেকে বলেন, বাঙলা কথাসাহিত্য এখন ইংরেজীর সমকক্ষ এবং বাঙলা ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু সেজন্যে আমাদের বেশী আত্মপ্রসাদের কারণ নেই। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের অবস্থা কি রকম তা ভাবা দরকার।

স্কুল-কলেজের টেক্সট-বুক, শিশুপাঠ্য গল্প-কবিতা, ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি কর্ম সংক্রান্ত পুস্তক, রাজশাসন সংক্রান্ত নানারকম বিধিগ্রন্থ—এই সব ছাড়া যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাই বয়স্থ জনসাধারণ অবসরকালে পড়ে। তা থেকেই আধুনিক বাঙালী লেখক আর পাঠকের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত রচনা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে—উদ্‌ভাবী (বা কাল্পনিক) আর ভাবাত্মক অর্থাৎ creative আর emotional রচনা। গল্প উপন্যাস কবিতা ভক্তিগ্রন্থ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই সবেরই পাঠক বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—জ্ঞানাত্মক আর বাস্তুব-বিষয়ক অর্থাৎ informative আর factual রচনা। এই শ্রেণীর উদাহরণ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর', 'বিশ্বপরিচয়', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্র জগৎ', চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিশ্বের উপাদান', বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' সমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস।' প্রথম শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসংখ্যা অনেক কম, পাঠকও কম। এসব বইএর বারো মাসে তেরো সংস্করণ হবার কোনও আশা নেই।

ইংরেজী প্রভৃতি সমৃদ্ধ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা আছে, যেমন, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, দেশ-ভ্রমণ, সার-সংকলন বা digest খেলা, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শন, ইত্যাদি। বাঙলা পত্রিকার বৈচিত্র্য বেশী নেই, সাধারণ

মাসিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকায় সব রকম জনপ্রিয় রচনা ছাপা হয়। এইসব পত্রিকায় নানারকম বইএর যে বিজ্ঞাপন থাকে তা থেকেই বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। আমার অনুরোধ statisticsএর একটি ছাত্র অনেকগুলি বিজ্ঞাপন থেকে একটি মোটামুটি পরিসংখ্যান খাড়া করেছেন। তাঁর হিসাব অনুসারে বিজ্ঞাপিত বিভিন্ন শ্রেণীর বইএর শতকরা হার এই রকমঃ—

বিষয়	শতকরা হার
গল্প, উপন্যাস এবং তার আলোচনা	৭৫
কবিতা, নাটক এবং তার আলোচনা	৫
ভক্তিগ্রন্থ	৬
চরিতকথা, স্মৃতিকথা	৪
ভ্রমণকথা, স্থান-বিবরণ	২
ইতিহাস	২
রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব	২
অর্থনীতি, কৃষি, বাণিজ্য শিল্প	১এর কম
দার্শনিক বিষয়	...১
বৈজ্ঞানিক বিষয়	১এর কম
ফলিত জ্যোতিষ অলৌকিক বিষয়	১
অন্যান্য বিবিধ বিষয়	১

এই ফর্দ থেকে বোঝা যায় যে বাঙলা সাহিত্যের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক এবং ভাবাত্মক রচনা। ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসাদির সংখ্যা বেশী, কিন্তু জ্ঞানাত্মক গ্রন্থের অনুপাত এদেশের মতন অত্যল্প নয়।

সংস্কৃত শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে, তার কতকগুলি ইংরেজী art সংস্কার অন্তর্গত। যেমন, গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য আলেখ্য তক্ষণ। ইংরেজীতে গল্প আর কাব্য-রচয়িতাও আর্টিস্টরূপে গণ্য হন, বাঙলাতেও তাঁদের কলাবিৎ বলা চলে। যাঁরা ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, গীত-বাদ্য-নৃত্য বা অভিনয় করেন তাঁরা যেমন আর্টিস্ট, গল্প-উপন্যাস আর কবিতার লেখকও তেমনি আর্টিস্ট বা কলাবিৎ। এঁদের সকলেরই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্তবিনোদন। যাতে বিনোদনের সঙ্গে মনের উৎকর্ষ আর অনুভূতির প্রসার হয় সেই রচনাই অবশ্য প্রকৃষ্ট। সকল দেশেই সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ আর্ট বা কলাচর্চা।

সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে কথাসাহিত্য কাব্য সংগীত নাট্য চিত্রকলা প্রভৃতি অপরিহার্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কলাচর্চাই সংস্কৃতির সবটা নয়। উদ্‌ভাবী বা কাল্পনিক এবং ভাবাত্মক creative আর emotional সাহিত্যে সব প্রয়োজন মেটে না, জ্ঞানাত্মক আর বাস্তব বিষয়ক সাহিত্যও অপরিহার্য। এই জাতীয় সাহিত্য বাঙলায় যথেষ্ট নেই।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, জ্ঞানাত্মক বাস্তব বিষয়ের চর্চা তো স্কুল-কলেজেই চুকে গেছে, প্রৌঢ় আর বৃদ্ধ বয়সেও যদি তার জের টানতে হয় তবে জীবন দুর্বহ হবে। এ রকম মনোভাব ঠিক নয়। শিক্ষার শেষ নেই, আজীবন তা চলে। ঠেকে শেখা শুনে শেখা আর দেখে শেখার সুযোগ সকল ক্ষেত্রে মেলে না, তাই যত কাল সামর্থ্য তত কালই পড়ে শিখতে হয়। মানুষের যে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা পুরাকাল থেকে সংগৃহীত হয়ে আসছে তা শুধু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সংরক্ষিত গুহ্য বিদ্যা নয়, জনসাধারণের সাহিত্যেও যথাসম্ভব মনোজ্ঞ ভাষায় তাকে স্থান দিতে হবে।

টেক্সট-বুক প্রায় নীরস রচনা, পরীক্ষা পাসের জন্যেই ছেলে-মেয়েরা তা পড়ে। সে রকম লেখা বয়স্থ লোকের উপযুক্ত নয়। শুধু তথ্য থাকলেই চলবে না, রচনা চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, তবেই সাধারণ পাঠকের পড়বার আগ্রহ হবে। ইংরেজীতে এই জাতীয় গ্রন্থ বিস্তর আছে, পাঠকও অসংখ্য। উদাহরণ আর আদর্শস্বরূপ কয়েকটি গ্রন্থের নাম করছি।—

H. G. Walesএর Short History of the World, সদ্য প্রকাশিত Julian Huxlyর Story of Evolution, M. Davidsonএর Easy Outline of Astronomy, Gilbert Murryর Myths and Ethics, A. N. Whiteheadএর Science and the Modern World, নির্মলকুমার বসুর Cultural Anthropology.

বাঙলায় এই জাতীয় গ্রন্থ নেই এমন নয়, কিন্তু যথেষ্ট নেই। বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ নামে বিশ্বভারতী অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ ছোট বই প্রকাশ করেছেন। শুনেছি এই গ্রন্থমালার ক্রেতা অনেক কিন্তু পাঠকও অনেক কিনা জানি না।

বাঙলা গল্প কাব্য আর ভক্তিগ্রন্থ সংখ্যায় এবং উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য রচনায় হিন্দী এগিয়ে যাচ্ছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশের অনেক বৎসর আগেই হিন্দী অনুবাদ ছাপা হয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক আর শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণেও হিন্দী অগ্রণী। বাঙলার তুলনায় হিন্দীভাষীর সংখ্যা অনেক বেশী, হিন্দী বই-এর পাঠকও বেশী। বিহার উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ এই সকল রাজ্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্যে প্রচুর সরকারী সাহায্য আর উৎসাহ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পোষকতা তো আছেই। এ সবের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী সাহায্য অতি অল্প। আমাদের অপূর্ণ সাহিত্যকে পূর্ণতা দেবার জন্যে লেখক প্রকাশক পাঠক আর সরকার সকলকেই অবহিত হতে হবে। বাঙলা সাহিত্য চিরকালই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে থাকুক এমন স্পর্ধা করতে বলি না কিন্তু বাঙলা সাহিত্য সকল বিভাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এই কামনা বাঙালী মাত্রেরই করা উচিত।

শান্তিনিকেতনের প্রথম স্মৃতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

দিনের পর দিন যায় চলে—অন্যমনস্ক ভাবে সেগুলোর প্রতি নজর পড়ে না কখনো; তারপর যখন একটা, দুটো করে করে পঞ্চাশটা বছর গত হতে চলে—তখন পিছনে তাকিয়ে দেখি—কালের একটা ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে।

অর্ধশতাব্দীর পূর্বের কথা। তখন পড়ি কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদে; কেন সেখানে পড়তে গিয়েছিলাম সে সব কথা অত্যন্ত ব্যক্তিগত বলে বাদ দিলাম। বোধ হয় ঈস্টারের ছুটিতে বর্ধমানে আসি মাতুলালয়ে। শুনেছিলাম 'রবিবাবুর' বিদ্যালয় বর্ধমান থেকে বেশি দূর নয়—মাইল ৩০।৩৫-এর মধ্যে, লুপ লাইনের বোলপুর স্টেশনের কাছে।

নববর্ষের (১৩১৬) পরদিন রওনা দিলাম বর্ধমান থেকে কিউল প্যাসেঞ্জারে। গিরিডিপ্রবাসী হিমাংশুপ্রকাশ রায় তখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। তাঁর কাছে গিরিডিতে এখানকার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনি। তিনি বলে দিয়েছিলেন স্টেশনে নেমে "কাচবাংলার পথ" শুধিয়ে নেবে। গাঁয়ের লোক শান্তি-নিকেতন' বোঝে না—পরে তাদের মুখে শুনেছি মধ্যপদলোপী উচ্চারণ 'শান্তি-কেতন'। সাধারণ লোকে 'কাচবাংলো' নামটা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছিল; কারণ এখানকার 'কাঁচের মন্দির' ছিল তাদের আকর্ষণের ও বিস্ময়ের পদার্থ। পাশের গাঁয়ের লোকে বলতো 'বাগান'; কেউ শুধায় যদি 'কোথায় গেছিলে'—জবাব পায়—'বাগান গিয়েলাম।' এদিগরে এমন ফুল ফলের বাগান কেউ দেখেনি তাই এই নামটাই স্বাভাবিকভাবে চলু হয় গাঁয়ের মধ্যে। এখন 'বিশ্বভারতী' নামেরই চল্ বেশি—এমন কি বিশ্বভারতীর নিজের মোটর বাস-এর গায়ে ইংরেজীতে বিশ্ব-ভারতী লেখা—পাবলিক বাস-এও লিখছে 'বিশ্বভারতী' থেকে সিউড়ী—যেন বিশ্ব-ভারতী একটা জায়গার নাম।

বেলা এগারটায় বোলপুর স্টেশনে নামলাম, বাইরে এসে দেখি খান দুই-তিন গরুর গাড়ি—ছই দেওয়া। তাতেই ছোট প্যাঁটরা নিয়ে লোকে উঠছে। আজ সে স্টেশনে গরুর গাড়ি অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দূর গাঁ থেকে যাদের আসতে হয় তারাই চড়ে গো-যানে। এখন অসংখ্য সাইকেল রিকশ বাইরে অপেক্ষা করে থাকে দিনরাত—সকলেরই লুব্ধ দৃষ্টি যাত্রীর উপর—কে আগে গিয়ে কুলির মোটে হাত দেবে।—সেদিনকার সেই রৌদ্রদগ্ধ পথে একাই হাঁটতে শুরু করলাম—হাতে সামান্য বোঁচকা। বোলপুরের বাজারে তখন কয়খানা দোকান! একতলা পাকা বাড়ি দুই-একটা—আর সবই খড়ের ঘর। চৌমাথার পর তেপান্তরের মাঠের মধ্য দিয়ে রাঙা ধুলার পথ চলেছে—দুই-চারটি লোক পথে দেখা গেল। আজ সেখানে ধূলিভরা পথ নেই—টার-ম্যাকাডাম সরকারী সড়ক—প্রতি নিয়ত সাইকেল, রিকশ, মোটর ট্রাক, মোটর বাস, মোটর সাইকেল, ট্যাক্সি—প্রাইভেট গাড়ি সবেগে চলেছে; যে গরুর গাড়ি এককালে ছিল পরিবহণের যান-বাহন—আজ তারা পীচঢালা পথের পাশ দিয়ে ধুলার পথ দিয়ে যাচ্ছে—দ্রুতগামী যান-এর পথ রুদ্ধ যেন না করে।

কাঁচবাংলায় এসে পৌঁছলাম। তখন আশ্রমের ভিতর যাবার একমাত্র পাকা পথ ছিল মন্দির ঘুরে 'শান্তিনিকেতন' অতিথিশালার সামনে পর্যন্ত। সে পথ তখনও জানা ছিল না; বাঁ দিকে একটা চলা পথ ধরলাম—কোথায় যাবো ঠিক জানি না—এমন সময়ে সামনে দেখি এক বিশালকায় পুরুষ হনহনিয়ে চলেছে—পায়জামা পরা, গায়ে ধপ্‌ধপে সাদা পাঞ্জাবী। পায়জামা পরা মানুষ আগে দেখিনি, তবে শুনেছিলাম ঠাকুরবাড়ির লোকে পায়জামা পরে। ভয়ে ভয়ে তাঁর

কাঁচের তৈরী মন্দিরের সম্মুখে উপাসনায় উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ

দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি থামলেন: তাঁকে শুধোলাম, 'হিমাংশুবাবু কোথায় থাকেন?' ভদ্রলোকটি তখনই একটি বালককে ডাকলেন ও আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে সব বলে দিলেন। দুই চারটা যা কথা বললেন, তাতেই তাঁদের কৌলিক ভদ্রতা প্রকাশ পেলো। আমার বয়স তখন বছর ষোলো হলেও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত গ্রাম্য—গিরিডির জোলাদের তৈরী ছিটের জামা, হাতে বোঁচকা—একহাঁটু ধুলো—পায়ের জুতো বিবর্ণ। তিনি তাচ্ছিল্য করে চলে গেলেও আশ্চর্য হতাম না। পরে জানতে পারলাম, ইনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র। পরে তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—স্নেহের দান পেয়েছিলাম যেদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে চলে যান সেদিন আমায় দিয়ে গেলেন একটি পাথরের ত্রিপদ টেবিল—যেটি মহর্ষি ব্যবহার করতেন।
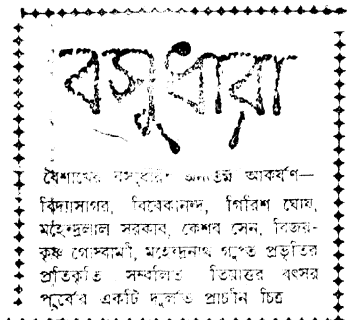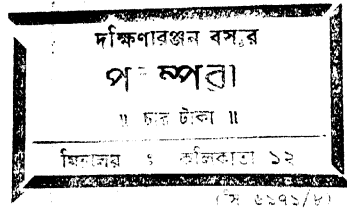
ছেলেটি আমাকে নিয়ে চললো শালবীথি দিয়ে—উঠলাম গিয়ে একটা দোতলা ঘরে—বিরাট চালাঘর—বর্তমান লাইব্রেরীর উপর সেটা ছিল। সেখানে দেখি ছাত্রদের সঙ্গেই এক পাশে হিমাংশুবাবু থাকেন—ছাত্রদের জন্য একটা করে তক্তপোশ—তাঁরও একটা; বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্য ছেলেদের চৌকি যেমন ঘ্যাঁষাঘেঁষি—এঁরটা একটু ফাঁকে। টেবিল, চেয়ার কোথাও চোখে পড়লো না।

একটি ছেলে আমার ভার নিলো; নিয়ে গেল পাকুড়তলার কুয়োর কাছে। স্নান করে গেলাম রান্নাঘরে। সে রান্নাঘর এখন নেই—দেখা যায় শুধু মেঝের একটা অংশ—লাইব্রেরীর পাশে। টিনের আচ্ছাদন—দেওয়াল ঘাসের বেড়া মাত্র—বাইরে থেকে হাওয়া, ধুলো এমন কি পাতাও আসে। মেঝের উপর কম্বলের আসন পাতা—খেলাম শালপাতায়।

নিরামিষ খাওয়া ছিল তখন রেওয়াজ—যদিও রান্নাঘরটা নির্মিত হয়েছিল আশ্রম সীমানার বাইরে। খেতে বসে শুনি নিরামিষ ছাড়া আমিষ ঝোলও আছে। আশ্চর্য হলাম—তা হলে আমিষও চলে—সে কী! পরে বুঝলাম আমিষ অর্থে পেঁয়াজ দেওয়া তরকারী! আমিষ ও নিরামিষ খাওয়া সম্বন্ধে গল্প শুনলাম পরে। তখন ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্ররা পৃথক পংক্তিতে খেতেন—তাঁদের মধ্যে কয়জন ছিলেন বিশুদ্ধ নিরামিষাশী। একবার নরেন ঠাকুর যে নিরামিষ রান্নায় সিদ্ধহস্ত সে গেল ছুটিতে একদিন দিয়ে। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই ডাল আর মুখে রোচে না। নরেন ঠাকুর ফিরে এলো—একদিন তাকে শুধালো—ভাই নিরামিষ ডালকে আর কি করে সুস্বাদু করবো জানি না—হরিবাবু তো রেগেই অস্থির। নরেন বললো 'আমি তো পেঁয়াজ দিতাম না—দিতাম পেঁয়াজের রস চিপে—তাতেই স্বাদ খুলতো'।

ঠাকুর-চাকররা বারোমাস নিরামিষ খেতো—মাঝে মাঝে ঝোলের মধ্যে মাছ দিয়ে তুলে নিতো পরিবেশনের আগে। একবার ঝোলের মধ্যে কই মাছের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হওয়ায় খুব বকাঝকা হয়ে গিয়েছিল। এ সব গল্প শুনলাম।

খাওয়ার পর ছেলেরা নিজ নিজ পাতা ও এঁটো তুলে নিয়ে দূরে ফেলে দিলো—আমিও করতে গেলাম। ছেলেরা তা করতে দিল না—নিজেরাই নিয়ে গেল।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলো—তারপর সারাদিন কাটলো লাইব্রেরী ঘরে। লাইব্রেরী ছিল এখনকার বারান্দায়—দরজা দিয়ে ফাঁকগুলো ছিল বন্ধ। পশ্চিমের ঘরে থাকতেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য—সকলে তাঁকে 'শাস্ত্রী মশায়' বলতো। আসলে তিনি 'শাস্ত্রী' নন—কাশীতে যখন পড়তেন তখন তিনি বন্ধুদের বলেছিলেন—শাস্ত্র পড়ি, আমি নিশ্চয়ই 'শাস্ত্রী' এবং সেই থেকে লিখতেন 'শাস্ত্রী'; পরে তিনি ভট্টাচার্য লিখতেন—যখন বুঝেছিলেন, 'শাস্ত্রী'টা হচ্ছে এম এ-তে প্রথম হলে পাওয়া যায়—শাস্ত্র পড়লেই 'শাস্ত্রী' হয় না।

বিধুশেখরকে নামে জানতাম তাঁর মিলিন্দ পঞ্হোর অনুবাদের জন্য। কলকাতার ন্যাশনাল কলেজে পালি পড়তাম—'মিলিন্দ পঞ্হো' সান্যাল কোম্পানি প্রকাশ করে জানতে পেয়ে কিনেছিলাম; বইটার খবর পাই আমাদের পালি অধ্যাপক চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ভিক্ষু পূর্ণানন্দের কাছ থেকে।

শান্তিনিকেতনে এসে বিধুশেখরকে দেখলাম—তিনি তাঁর ছোট একটি ভাইপোকে নিয়ে লাইব্রেরী ঘরেই থাকেন—চারদিকে গোটা চার পাঁচ শেলফ ভরা বই—সংস্কৃত, পালি আর এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল গোড়া থেকে সব। দেখলাম সারাদিন কাজ করছেন—স্কুলের ছেলেদের পড়াচ্ছেন,—তারপর নিজে রান্না করে খান। তিনি বরাবর স্বপাক খেতেন।

তাঁর ঘরে বসে সারাদিন বই ঘাঁটতাম; তখন কি জানতাম এই লাইব্রেরীতে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কাটবে।

বিকালে কালবৈশাখী ঝড় এলো: সে দৃশ্য এখনো চোখের সামনে ভাসছে—প্রান্তর থেকে এমন ধুলোর ঝড় কখনো আসতে দেখিনি—লাইব্রেরীর সামনে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না—পশ্চিমেও সীমাশূন্য দেশ। মনে হলো পৃথিবীর দিকচক্রবাল যেখানে নেমে গেছে—তার পিছন থেকে এ ঝড় যেন উঠে এলো।

সন্ধ্যায় দেখি ঘরে ঘরে ডিজ্ হ্যারিকেন লণ্ঠন চাকরে রেখে গেলো।

পরদিন ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতেই হিমাংশুবাবু আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'মন্দিরে চলো—কবি উপাসনা করেন রোজ এই সময়ে।'

অন্ধকারের মধ্যে মন্দিরে গেলাম; পূবের তোরণস্তম্ভে বারান্দায় কয়জন বসে—কবি একধারে স্তব্ধ হয়ে ধ্যানমগ্ন। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ভাষণ দিলেন—ধ্যানের মধ্যে যে ভাবনাগুলি আসছে সেইগুলি যেন নির্ঝরের মতো উৎসারিত হচ্ছে।

সকালের আলোতে শান্তিনিকেতনের মন্দির দেখলাম; —লোহার ফ্রেমের বাড়ি—দেওয়াল দরজা নানা রঙের কাচের—মেঝে

শ্বেতপাথরের—বাইরের রোয়াক ও সিঁড়ি সব বেলে-পাথরে গাঁথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল তাঁর দেবতার মন্দিরমধ্যে আলো যেন সকল দিক থেকে অবারিতভাবে প্রবেশ করতে পারে—তাই এটা কাঁচের তৈরী। ভাবটা খুব ভালো লাগলো—সত্যিই তো আমদের মনোমন্দিরে সকল দিক থেকে সত্যের আলো যেন বাধাহীনভাবে প্রবেশ করতে পায়—এই তো সাধনা। মন্দিরমধ্যে কোনো প্রতীক, বেদী—কিছুই নেই—কেবল পূর্বদিকে মুখ করে যেখান থেকে আচার্য উপাসনা করেন—তাঁর বিপরীত দিকে দ্বারের উপর লেখা আছে—একমেবদ্বিতীয়ম্ ও সত্য জ্ঞানম্ অনন্তম্—আর মন্দির-চূড়ায় লেখা ছিল—ওঁ তৎসৎ।

আজকাল মন্দিরের সে চূড়াটা নেই; মন্দির প্রবেশের দুই পাশে দুটো ছোট কুঠরি ছিল সেখানে মন্দির প্রবেশের সময় জুতো, ছাতা রাখা যেতো—সে দুটো এখন নেই। মন্দির থেকে বের হলেই চোখে পড়তো দুটি স্তম্ভ তাতে ব্রহ্মশ্লোক বিষয়ে মূল সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ কালো পাথরে খোদাই করে সোনালি জলে লেখা। সেই লেখা দুটি এখন মন্দির দ্বারে দেখা যায়। সেখানে দুটো ফলক পাথর আঁটা ছিল—সে দুটো ভাঙাভাঙির সময় খোলা হলে, আমি কোনো রকমে উঠিয়ে এনে লাইব্রেরীর বাইরে দেওয়ালে গাঁথিয়ে দিই; এ ঘটনা ঘটে অবশ্য অনেক পরে ১৯২৫ সালে।

মন্দিরের সামনে সুন্দর গোলাপ ও বেল ফুলের বাগান দেখলাম—মাঝে মাঝে ছোট স্তম্ভ—তার চারদিকে ব্রহ্মসংগীতের ভালো ভালো পংক্তি লেখা। ছোট বাগানের মাঝে একটা জলাধার ও তার মাঝে একটা ফোয়ারার কাঠামো। অদূরেই দুটো থামের উপর একটা লোহার ট্যাংক দেখলাম। অনুসন্ধান করে জানলাম—অনেক বছর আগে ফোয়ারায় একদিন নাকি জল-উৎসারিত হয়েছিল।

মন্দিরের পাশেই একটা আধকাটা পুকুর—মহর্ষির ইচ্ছা ছিল এই বারিহীন দেশে একটা জলাশয় করেন। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়—কারণ এদিকে মাটি খুঁড়ে জল পাওয়া যায় না কারণ জায়গাটা ডাঙা এবং চারদিক থেকে অনেক উঁচু। এদেশে বাঁধ নির্মাণ করা যায়—জল জমা হয় চারদিকের বৃষ্টির জল নেমে এসে। তাই মহর্ষির কল্পিত পুষ্করিণী এখনো জলহীন অবস্থায় পড়ে আছে। বহু বৎসর পরে প্যাট্রিক গেডিস্ শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি পুকুরের অবস্থা দেখে বলেছিলেন যে, এটাকে একটা খুব ভালো খোলা থিয়েটার করা যায়। পুকুরের গাবাটা হবে 'এরিনা' বা আসর—পুকুরের পাড়গুলি হবে গ্যালারি!

মন্দিরের চারপাশ দেখলাম—উত্তরে সীমাশূন্য প্রান্তর—লালখোয়াই—দূরে অতি দূরে তালের সারি—তারও দূরে ঝাপসার মধ্যে গাছপালা মিলিয়ে আছে। অবশেষে সকলে মিলে কবিকে প্রণাম করতে চললাম। হিমাংশুবাবু বললেন, উনি এখন শান্তিনিকেতনে থাকেন; কথাটা ঠিক বুঝলাম না—শান্তিনিকেতনে তো নিশ্চয়ই থাকেন। আমরা মন্দিরের কাছে একটা দ্বিতলগৃহের মধ্যে প্রবেশ করে উপরতলায় গেলাম—হিমাংশুবাবু বললেন, 'এই বাড়িটির নাম শান্তিনিকেতন।'

মহর্ষি এই বাড়ি নির্মাণ করে পরে যখন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তার নাম হয় 'শান্তিনিকেতন'। গিয়ে দেখি কবি লিখছেন—শুনলাম আজ প্রাতে যে ভাষণটি বলেছেন সেটি লিখে ফেলছেন। আমরা প্রণাম করে চলে এলাম।

রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে এই প্রথম দেখলাম শান্তিনিকেতনে—প্রাতে অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাইনি। তখন কবির বয়স আটচল্লিশ বৎসর। এর পূর্বে তাঁকে দেখি গিরিডিতে—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাটিতে। শ্রীশচন্দ্র তখন সেখানকার ল্যান্ড অ্যাকুজিশন অফিসার।

আমি গিয়েছিলাম আমার পিতার সঙ্গে; গিরিডিতে ছোট ছেলেদের জন্য একটা বিদ্যালয় হয়েছে। সেটিকে কেন্দ্র করে একটা আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা চলছিল। কবি খুবই উৎসাহিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজি হলেন—একটা আবেদন পত্র লিখে দিলেন—সেটা মুদ্রিতও হয়েছিল। আমি সে-পত্রের কোনো কপি সংগ্রহ করতে পারিনি।

সেদিন অপরাহ্নে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো লাইব্রেরীর পাশের একটা ঘরে (এখন যেখানে রেফারেন্স রুম); তখন তার পূর্বদিকে একটা গলি ছিল এবং দরজার পাশ দিয়েই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সেই গলির ওপারে টালির তৈরী আদি কুটিরের (প্রাক্ কুটির) সংলগ্ন একটা ঘরে থাকতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি যে ঘরে এসে বসলেন তাকে বলা হতো গানের ঘর—আসবাবের মধ্যে ছিল একটা আধভাঙা টেবিল হারমোনিয়াম। আর দুই একটা চেয়ার। আমি কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদে পড়ি শুনে আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন—সেখানকার খবরাখবর নিলেন; তিনিও যে এক সময়ে পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে-কথাও এসে গেল। অবাক হয়ে ভাবি আমার মতো বালকের প্রতি তাঁর এই ব্যবহার! তারপর বত্রিশ বৎসর কবিকে দেখেছিলাম—কত তরুণ, প্রগলভ যুবক এসেছে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে—কত লোকে প্রশ্ন করে পত্র দিয়েছে—কখনো দেখা করেননি বা পত্রের উত্তর দেননি—এ ঘটনা কমই ঘটেছে। শেষ

জীবনে শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর রক্ষী-সেবকরা অনেক দর্শনপ্রার্থীদের ফিরিয়ে দিতেন—তবে সেটা হতো তাঁর অজ্ঞাতে। জানতে পারলে বিরক্ত হয়ে বলতেন—'দেখা করতে এসেছে, ফিরে যাবে না-দেখে!'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রথম বাক্যালাপ—সেদিন তো জানতাম না যে আমার জীবন শান্তিনিকেতনের কর্মের সঙ্গে মিশে যাবে ও একদিন তাঁর জীবনী লিখবো।

দু'দিন আশ্রমে থেকে ফিরে গেলাম কলকাতায়—কলেজ খুলেছে। এই-যে দু'দিন থাকলাম—রান্নাঘরে আহার করলাম—কেউ তো তার জন্য কোনো পয়সা দাবী করলো না! খুব আশ্চর্য লাগলো। আর আমায় মুগ্ধ করলো ছাত্রদের সেবা-পরায়ণতা। আমি অতিথি, সুতরাং আমাকে সেবা করা তাদের কর্তব্য, ধর্ম। পরেও দেখেছি ছাত্রদের অতিথিসেবা—বিছানা করা, মশারি টাঙানো, আশ্রম দেখানো, যথাসময়ে রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সকল কাজ তারা করতো। অতিথিদের সঙ্গে ব্যবহারও যে একটা শিক্ষণীয় বিষয়—তা কবি মনে করতেন। 'কালীমোহন ঘোষের মুখেও শুনেছিলাম তাঁর আশ্রমবাসের অভিজ্ঞতার কথা। তাঁর আতিথ্য করবার ভার পড়ে কবি-পুত্র শমীন্দ্রনাথের উপর; বালক শমীন্দ্র কী নিষ্ঠার সাথে তাঁর সেবা করেছিল—তা তিনি কোনো দিন ভোলেননি।

দু'দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম—জীবনের ধারা কোন্ পথে যে যায়—তা কি কেউ জানে?

(২)

ভাগ্যবিধাতা কি কেউ আছে? কে জানে। পরিহাস-কেশব যে অর্থেই ব্যবহৃত হোক্, আমি দেখছি তিনি সত্যই মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে পরিহাস করেন। তা না-হলে কোথায় হতাম রাণাঘাট বা গিরিডির উকিল অথবা ঐ ধরনের একটা কিছু—তা না হয়ে বয়কট করলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন পরীক্ষা—ঢুকলাম ন্যাশনাল কলেজে।

কালে ক্লাসের বন্ধুরা চলে গেলেন আমেরিকায়—আর আমি এলাম শান্তি-নিকেতনে—এটা ভাগ্য না কি নাম দেবো।

কলকাতায় শরীর টিকলো না, বারে বারে জ্বরে পড়ি। শেষকালে পড়া ছেড়ে বাড়ি গিয়ে বসতে হলো। কিন্তু সেই অলস জীবন কেমন ক'রে কাটাব এই হলো সমস্যা।

একদিন সন্ধ্যার মুখে বাড়ির সামনে দেখি একটি যুবক দাঁড়িয়ে—হাতে ছোট একটা কুঁজো; বললেন, 'একটু খাবার জল দিতে পারেন।' দাদার সঙ্গে পরিচয় হলো—নাম কালীমোহন ঘোষ—অসুস্থ হয়ে গিরিডি এসেছেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। আমাদের বাড়ির সম্মুখে একটা প্রায়-পরিত্যক্ত বাড়িতে আছেন। মা সবকথা শুনে ও যুবকটির চেহারা দেখে দাদাকে বললেন, 'ওকে এখানে এসে থাকতে বলো—ও বাড়িতে থাকলে মারা পড়বে।' যুবকটি খুব কাশছিল—শীর্ণ চেহারা—যে বাড়িতে উঠেছিলেন, সে-বাড়িতে কিছুকাল পূর্বে কয়েকজনই মারা গেছেন যক্ষ্মায়।

কালীমোহন ঘোষ বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেলেন—আমরা তাঁকে 'দাদা' বললাম। তাঁর কাছে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অনেক খবর পেলাম—কারণ তিনিও কবির আশ্রয় পেয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে সেখানকার কথাবার্তা শুনে যাবার ইচ্ছা প্রবল হলো। এমন সময়ে হিমাংশুবাবু পূজার ছুটিতে এলেন—তাঁকে দাদা বললেন, আমার শান্তি-নিকেতনে যাবার ব্যবস্থা করা যায় কি না। হিমাংশুবাবু কবিকে পত্র দিলেন। উত্তরে কবি লিখলেন, ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তখন বিশেষ কিছু জানি না, তাঁর লেখাও যে বেশি পড়েছি—তা-ও নয়—আছে শুধু শান্তিনিকেতনের সেই দু'দিনের স্মৃতি।

১৯০৯ সালের দশই নভেম্বর সকালের গাড়িতে এসে পৌঁছলাম; সেই দিনই বিদ্যালয় খুলেছে পূজার ছুটির পর।

উঠলাম নূতন একটা ঘরে—লাইব্রেরী পাশে তৈরী হয়েছে; সে-ঘরটা ভেঙে, পরে লাইব্রেরীর রীডিং রুমটা নির্মিত হয়। সেই ঘরে থাকি, খাই-দাই আর লাইব্রেরীতে বসে পড়ি।

তখন সেখানে স্কুলে মাত্র—ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ানো হয়। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম স্কুলের ছেলেদের জ্ঞানে ও ধর্মে কী নিষ্ঠা। পরীক্ষার পাঠের বাইরে অজিতকুমার চক্রবর্তী পড়ান এমার্সন, শেক্সপীয়ার—বড় ছেলেরা যায় সে-ক্লাসে—আমিও যাই।

আমার শান্তিনিকেতনে আসার কিছুকাল পরেই এলো সাতই পৌষের উৎসব। তখন একদিনের জন্য মেলা বসতো। মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা করলেন। উপাসনার পর বাজি পোড়ানো। শান্তি-নিকেতনে বৎসর কয়েক হলো একটি মেয়েদের স্কুল গড়ে উঠেছে; এসব মেয়েরা

তখন না যেতে পারতো মেলায়—না-দেখতে পেতো বাজি পোড়ানো। অথচ তারা বাজি পোড়ানো দেখতে চায়; তখন স্থির হলো শান্তিনিকেতনের যে চার-চাকার বড় গরুর গাড়িটা আছে—তাতে তাদের বোঝাই করে মেলার পাশে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাক। আমাদের দলের পাণ্ডা হলেন সন্তোষ মজুমদার—আমেরিকা থেকে সদ্য ফিরেছেন—নতুন শিভালরী রপ্ত করে। সেই গাড়ি মেলার এক কোণে নিয়ে গেলাম সকলে মিলে ঠেলতে ঠেলতে; গাড়ির ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে মেয়েরা বাজি পোড়ানো দেখলো! এই পর্দানশীন ভাবটা কলকাতার ঠাকুর-বাড়ির হাওয়া। তবে সেখানে দুটো হাওয়াই বয়েছিল একদিন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী বোম্বাই থেকে ফিরে যেদিন খোলা ফিটনে করে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকলেন—তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। আবার এক সময়ে তাঁদের বাড়ির মেয়েরা যখন গঙ্গাস্নানে যেতেন—ঘাটাটোপ দেওয়া বন্ধ পাল্কি চড়ে। কিন্তু ঘাটের জলে নামতেন না—তাঁদের পাল্কিসুদ্ধ জলে চুবিয়ে আনা হতো। এই দ্বিতীয় ধারাটা একেবারে উঠে যায়নি—শান্তিনিকেতনে সে যুগে সেই আবহাওয়াই ছিল; মহর্ষির প্রিয় পৌত্র দিপেন্দ্রনাথ, আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি, ছিলেন এই ধারার রক্ষক।

রথীন্দ্রনাথ বিবাহ করেন শান্তিনিকেতনে [illegible] পর। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটক করেছিল মেয়েরা; সে-অভিনয় হয় শান্তিনিকেতনের দোতলার হলে—তার দর্শক ছিল মেয়েরা মাত্র—ছেলেরা কেউ দেখতে যেতে পারেনি। এমন দিন যে শান্তিনিকেতনে ছিল—তা কেউ আজ 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা'র যুগে কল্পনাও করতে পারে না। কালান্তরে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

এখানে এসে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ধর্মভাব। নিয়মমতো সকালে সন্ধ্যায় প্রত্যেককে নির্জনে উপাসনায় বসতে হতো—তারপর ঘণ্টা পড়লে তারা উঠে এসে সমবেত উপাসনা করতো। কিন্তু আশ্চর্য হলাম দেখে যে, বড় ছেলেরা কী নিষ্ঠার সঙ্গে সে নিয়ম পালন করছে!

উপাসনার সময় কাউকে আশ্রমের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখিনি—আমরা ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিতাম; সন্ধ্যার উপাসনার সময়ে সমস্ত আশ্রম কী নিস্তব্ধ থাকতো—রান্নাঘরের চাকর-পাচকরা পর্যন্ত তখন জানতো—উপাসনার সময়ে আস্তে কথা বলতে হয়।

শিক্ষকদের মধ্যে যে ধর্মভাব দেখেছিলাম, সে-শুধু উপাসনার মধ্যে পর্যবসিত ছিল না; তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে সেটি ফুটে উঠতো। বহুকাল এই ধারাটি চলেছিল—তারপর? তারপরের ইতিহাস এখানে আর তার নাই তুললাম। আজ এখানে দলীয়তার বা ধার্মিকতার নানা রূপ নিত্যে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু শান্তিনিকেতন যে আদর্শ নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল, তার থেকে দূরে—অনেক দূরে সরে চলেছি!

শান্তিনিকেতনে ছয় মাস কেটে গেল। কবি হয়তো আমার অধ্যয়নস্পৃহা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে আমাকে বললেন, শ্রীশ রায় চলে যাচ্ছেন, তাঁর জায়গায় আমাকে ছুটির পর স্কুলে পড়াতে হবে—পনেরো টাকা হাতখরচ পাবো। খাওয়া-দাওয়া, ঔষধ-পথ্য, ধোপা-নাপিত সবই বেখরচায় পাওয়া যাবে—যেমন পাচ্ছিলাম। আঠারো বৎসর বয়সে চাকরিতে ঢুকলাম। তারপর দীর্ঘ ইতিহাস—এতকাল কাজ করেছি—চাকরি করিনি—কারণ কবি কখনো কোনো দিন বুঝতে দেননি যে, তিনি মনিব, পয়সা দিয়ে রেখেছেন। রথীন্দ্রের আমলেও কোনো দিন বোধ করিনি, কে ছোট চাকুরে, কে বড় চাকুরে, সে ভেদবুদ্ধি তখনো মুখর হয়নি। কারণ **when Adam delved and Eve span, who was then a gentleman,** আমরা সবাই সমান—স্কুলে হেড্ মাস্টার নেই—সব কাজ সকলকে করতে হয়—ছোট বড়োর প্রশ্ন তখন দেখা দেয়নি। তারপর? তারপর ধীরে ধীরে কি ভাবে প্রতিষ্ঠানের অদলবদল হয়ে চললো—সে ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লেখা হচ্ছে—হয়তো একদিন রবীন্দ্রনাথের সত্যের সহিত পরীক্ষার আনুপূর্বিক ইতিহাস বাঙ্গালী পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে পারবো।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সম্প্রতি আমার প্রীতিভাজন শান্তি-নিকেতনের অনেক প্রাক্তন ছাত্র আমার শান্তিনিকেতন-স্মৃতি কথার অন্তর্গত, রবীন্দ্রনাথের সহিত ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধ কেমন ছিল, সে-বিষয় কিছু জানিতে চাহিয়াছেন। এই লেখায় আমার স্মৃতি-দর্পণে যাহা দেখিতে পাই তাহারই কিছু ইতিবৃত্ত লিখিলাম। কখন, কোন তারিখে, কোন সালে, কোন মাসে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল বলা শক্ত। ঘটনাগুলি প্রায় সব মনে আছে, সাল তারিখ বিস্মৃতির গর্ভে আজ বিলীন।

রবীন্দ্রনাথ যে শিশু, বালক, যুবকদের যথেষ্ট স্নেহ এবং শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন সে কথা তাঁহার জীবদ্দশায় যাঁহারা শান্তি-নিকেতনে ছিলেন তাঁহারা অনেকেই জানেন। বালক, শিশু, যুবক সকলকেই "শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন" বলিতে কি বুঝাইতে চাই তাহাই প্রথমে বলি। শান্তিনিকেতনে সভা সমিতিতে উৎসব উপলক্ষে অন্য দশজনের মধ্যে শিশু এবং বালকদের উপস্থিতিকে তিনি পছন্দ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, ক্লাসেও অল্প বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তিনি গুরু-গম্ভীর বিষয় সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করিতেন যেন শ্রোতার দল সকলেই চিন্তাশীল, বিদ্বান। মনে পড়ে যখন তিনি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে প্রতি বুধবারের প্রাতঃকালীন উপাসনায় উপদেশ দিতেন, সে-উপদেশে অনেক তত্ত্বকথা থাকিত (পরে সেগুলি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত)। যাহার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা ছোট ছোট ছেলেদের থাকে না বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপস্থিত বালকদের কাছে বিনা দ্বিধায় ঐ সব গুরু কথা বলিতেন। তাঁহার সহিত আলোচনাকালে বুঝিতে পারিয়াছিলাম তিনি ছোট ছেলেদের বুদ্ধিকে, বুঝিবার শক্তিকে, কোনো বিষয়ের উপরে তাহাদের কল্পনার দৌড়কে উহাদের বয়সের অংকের সহিত মাপিতেন না। তিনি অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে, দশ-এগারো বছরের ছোট ছেলেরাও বড় বড় বিষয়বস্তুকে বুঝিতে পারে, হৃদয়ংগম করিতে পারে, কিন্তু সব সময় তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারে না। বুঝাইয়া বলিতে না পারিলেও উহাদের তরুণ জীবন্ত মনে ঐসব বড় বিষয়ের বীজ যাহা প্রবেশ করে, তাহা সব নষ্ট হয় না। ভাবীকালে সেই বীজের ফসলের দান তাহাদের জীবনকে, মনকে সমৃদ্ধ করে। বীজ যেমন মাটির নীচে বেশ কিছুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ভিতরে ভিতরে নিজের ভবিষ্যতের বড় সম্ভাবনাকে জীবন্ত করে তেমনি শিশু এবং বালক-চিত্তেও অনেক গম্ভীর ভাব তাহাদেরই অবচেতন মনে সক্রিয় হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁহারা বয়সের অংকের হিসাবে প্রবীণ কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি ও চিন্তার রাজ্যের দ্বার ঐসব কথার মর্ম গ্রহণের জন্য খোলা নহে, মনও তৈরী নাই। বালক বয়সটা মন তৈরীর খুব ভাল সময়। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ রায়ের সহিত গল্প প্রসংগে জানিয়াছিলাম যে, উপাসনা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন ছোট বালকদের কি বলিয়াছিলেন। ধীরানন্দ রায় তখন বালক। তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছেলেদের আধুনিক "প্রাক কুটীরের" দক্ষিণ দিকের

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানরত রবীন্দ্রনাথ

প্রাঙ্গণে সকালে সন্ধ্যায় নিজ নিজ কম্বলের আসন পাতিয়া উপাসনা করিতে হইত। তখন আশ্রমের সীমা ছোট ছিল, লোকজন, শিক্ষক-ছাত্রের সংখ্যাও ছিল কম। ইলেকট্রিক বাতি তখনও আশ্রমে প্রবেশ করে নাই। লণ্ঠনে রাত্রিতে আলোর কাজ সারা হইত। এখন আবার উপাসনার কথায় আসা যাক। ধীরানন্দ রায় বলিলেন যে,—গুরুদেব জানিতেন ঐ অল্প বয়সে ভগবান বা ধর্মচিন্তা স্থির হইয়া বসিয়া করিবে ঐ বয়সের সর্ব ছেলেদের কাছ হইতে ইহা আশা করা যায় না। কিন্তু সকালে সন্ধ্যায় অন্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দশ মিনিট সময় স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া কি কাজ সারা দিনে করিলাম, কত ভাল কাজ কতটা মন্দ কাজ করিলাম, কি করা সংগত আর কি করা সংগত নহে, এই ভাবিয়া দিনের জন্য নিজের শুভ চিন্তার যা হোক একটা কর্মধারা কল্পনা করিলে মন ভাল থাকে। এইরূপ ভাবে নিজের ভাল-মন্দের বিচার করার চিন্তা চর্চার জন্য তিনি উপাসনার সময়টা ঐরূপ শুভ চিন্তায় নিয়োগ করিতে বলিতেন। একথাও বলিতেন যে, উপাসনায় স্থিরতা এবং সংযম শিক্ষার জন্যও উপাসনা সহায়ক।

আমার নিজের স্মৃতিতেও একথা মনে পড়ে না যে, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কোনো বিশেষ ধর্মচিন্তায় উপাসনার সময় নিয়োগের নির্দেশ কখনো দিয়াছিলেন। উপাসনার সময় কোনো ছেলে কোনো ঠাকুর-দেবতার নাম স্মরণ করে কিম্বা কোনো দেবতার চিন্তা করে বা মন্ত্র জপ করে কিম্বা করে না—এমন কথাও কোনো ছাত্রকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া তো স্মরণ হয় না। তবে একথা সত্য যে উপাসনান্তে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত প্রার্থনামন্ত্র: ওঁ পিতা নোহোসি, পিতা নোহ বোধি নমস্তেহস্তু" ইত্যাদি, যাহা প্রতি বুধবারে মন্দিরে (অন্যান্য বিশেষ দিনেও মন্দিরে সমবেত উপাসনাকালে) আচার্য কর্তৃক উচ্চারিত হয়, সেই বিষয় কেন্দ্র করিয়া উপাসনার সময় কিছু চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেহ আগ্রহ সহকারে তাঁহার মত জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে (এক্ষেত্রে তৎকালীন শিক্ষকদের কথাই বলিতেছি) ঐ মন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া আরো গভীর কথা বলিতেন। ঐকথাগুলি উপাসনার সময় চিন্তাযোগ্য বলিয়াও মত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এ বিষয়টা কতকটা ব্যক্তিগত আলাপের কোঠায় পড়ে। যদিও মন্দিরে তিনি বহুবার এই মন্ত্রের তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, মন্দিরে সমবেত সকলকেই।

বালকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাই আজিকার বঙ্গ-সাহিত্যের বিশিষ্ট চিন্তাশীল, সুনিপুণ সুরসিক সাহিত্যিক শ্রীমান প্রমথনাথ বিশী যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের মাত্র বালকছাত্র, তখন তাঁহাকেও রবীন্দ্রনাথ ব্রাউনিং-এর কাব্য-কবিতা পাঠ সম্বন্ধীয় তাঁহার ক্লাসে যোগ দিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। সুযোগ দিয়াছিলেন বলিলে কম বলা হয়। বেশ ভাল করিয়াই ইংরাজী সাহিত্য বুঝাইতেন। যাঁহারা ঐ ক্লাসে উপস্থিত থাকিতেন তাঁহাদের কাহাকেও তিনি কৃপা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। প্রমথনাথ তখন বয়সে ছিলেন কাঁচা কিন্তু চিন্তায়, বিদ্যার্জন-সাধনায় ছিলেন পাকা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, জহুরী। প্রমথনাথের মধ্যে যে ভবিষ্যতের প্রতিভাবান লেখকটি ছিল তখনই রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়া ছিলেন এবং সেইজন্য প্রমথনাথকে স্নেহ করিতেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথের বালকসুলভ সেই সময়কার একটা মজার ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। ঘটনাটি এই,—

অঙ্কের প্রশ্নপত্রের পরীক্ষার সময় উত্তর না দিয়া কিম্বা ভুল জবাব দিয়া তাহার সমর্থনে প্রমথনাথ একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। আর কী দুঃসাহস, প্রমথনাথ অসংকোচে সেই খাতাটি পরীক্ষক মহাশয়ের কাছে দিয়া আসিলেন! এই ব্যাপারে প্রথম বিপদ ঘটিল আমার। যে ডরমেটারিতে বা ঘরে প্রমথ থাকিতেন সে ঘরের গৃহাধ্যক্ষ ছিলাম আমি। আজ আমার বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন আমিও যুবক এবং যুবকবয়সোচিত অনেক কিছু

দুঃসাহসিক কাজ করিবার সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলাম। যেমন বাঘের মাংস ভক্ষণ করা ইত্যাদি। পরীক্ষক মহাশয় তো প্রথমেই আমার উপরে একচোট উষ্মা প্রকাশ করিলেন। আমার মত দুরন্ত যুবকের ঘরে ছিল বলিয়াই প্রমথর অমন দুঃসাহস। আমি তাহার এই কাজের প্রেরণাদায়ক ইত্যাদি বলিয়া তো তিনি বেশ একচোট আমাকে ধমকাইয়া ঐ প্রশ্নপত্র আমাকে দিয়া বলিলেন—"বিশীর কাণ্ড দেখ। এ ছেলের কিছু হবে না।" বিনা তর্কে বকুনি সহ্য করিলাম। কারণ ছাত্রাবস্থায় কয়েকদিন তাঁহার কাছে বাংলা পড়িয়াছিলাম। তখন বেতন পাই সম্ভবত পনের টাকা। খাওয়া-দাওয়ার জন্য কিছুই দিতে হইত না। বড় সুখের চাকুরী। এ-চাকরী গেলে বিপদে পড়িব এই ভয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। শেষটায় মুশকিল-আসানের পথ বাহির করিলাম। সোজা রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হইয়া নিজের বিপদের কথা এবং প্রমথরও কি হইতে পারে সে-কথাও তাঁহার কাছে অসংকোচে নিবেদন করিলাম। কবিতাটির ছন্দ-বন্ধ ঠিক স্মরণ নাই তবে বক্তব্য বেশ মনে আছে। প্রমথ লিখিয়াছিলেন, পরীক্ষক মহাশয়ের উদ্দেশে—

তোমার শরণাগত নহি সতত
শুধু পরীক্ষার সময়
দয়া করি কিছু মার্ক দিওগো আমায়।
ওগো মাস্টারমশায়,
পরীক্ষার সময় পড়ি তোমার পায়।"

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ ছিল। সব কি আর এত দিনে মনে থাকে। ছাত্র-শিক্ষকে এরকম মজার মজার ঘটনা তখন কতই হইত। কে জানিত যে, আজকের দিনে, রবীন্দ্রনাথ আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে লোকের সব কিছু জানিবার এমন আগ্রহ হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অংকের প্রশ্নপত্রের উত্তরে প্রমথনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা দিলাম। রবীন্দ্রনাথ উহা পাঠ করিয়া বেশ মজা পাইলেন। বলিলেন—"ভয় নেই। নগেনকে * বুঝিয়ে বলব, বিশী যা লিখেছে, ঠিকই লিখেছে। তুই যা, নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়া।"

নিশ্চিন্ত হইলাম বটে। কিন্তু নগেনবাবুকে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তাহাও শুনিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক বুদ্ধি খাটাইলাম। নিজেই গিয়া নগেনবাবুকে বলিলাম—'মাস্টারমশায় গুরুদেবের সঙ্গে একবার দেখা করবেন। বিশীর সেই কবিতা গুরুদেবকে দিয়েছি।' আমার কথা শুনিয়া নগেনবাবু চটিলেন অথবা খুশী হইলেন বুঝিতে পারিলাম না।

---

* নগেন্দ্রনাথ আইচ তখন শিক্ষকদের মধ্যে বেশ একজন নামকরা ব্যক্তি ছিলেন।

শিশুবিভাগে রবীন্দ্রনাথ

নগেনবাবুর সহিত রবীন্দ্রনাথের দেখা হইতেই তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলিলেন—'অঙ্কের জবাব দেয়নি। পারেনি বলেই দেয়নি। কিন্তু যা লিখেছে তাতে ওর সত্যনিষ্ঠার এবং প্রয়োজনীয় নম্রতার প্রমাণ আছে। রাগ কোরো না। এ দোষ ক্ষমা করো। কবিতার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবই খাঁটি সত্যি কথা। সে সতত তোমার শরণাগত যে নয় তাও নির্ভয়ে অথচ নম্রভাবে বলেছে। ঠিক উত্তর দিলে তো পা ধরাধরি করে নম্বর চাইত না। উত্তর হয়ত ঠিক হয়নি ভেবেই তোমার দয়া ভিক্ষা করে কিছু মার্ক চেয়েছে।' পরে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে কিছু বলিয়াছিলেন কিনা তাহা জানি না। তবে এইটুকু বেশ টের পাইয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ প্রমথনাথের ঐ কবিতা বেশ উপভোগ করিয়াছিলেন।

প্রমথনাথের সম্বন্ধে এই স্মৃতি প্রসঙ্গে আর একটি মজার ঘটনা বলি। শান্তিনিকেতনের শালবীথিকার দক্ষিণাংশে তখনকার দিনের "নতুন বাড়ির" (বর্তমান "দেহলি"র) কাছে খড়ে-ছাওয়া "বীথিকা-গৃহ" নামে একটি বেশ লম্বা ঘর ছিল ঐ ঘরে দুই সারিতে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী চুন-সুরকী-ইটে তৈরী স্থিতিশীল খাট ছিল। ঐ খাটে ঐ ঘরের ছেলেরা শয়ন করিত। কিছু দিন প্রমথনাথ ঐ ঘরে ছিলেন। আমি তখন ঐ ঘরের গৃহাধ্যক্ষ। শিক্ষকরা ছেলেদের সায়েস্তা করার জন্য মারধোর করেন এটা রবীন্দ্রনাথ মোটেই পছন্দ করিতেন না। সেইজন্য দুষ্টু ছেলেদের দুষ্টামী করিবার সাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু যাহাকে বলে সত্যিকার "প্রহার", সে রকম প্রহার কোনো ছাত্রের ভাগ্যে না জুটিলেও দু-একটি ডানপিটে কিম্বা লেখা-পড়ায় ফাঁকিবাজ ছেলেদের যে সামান্য ওজনের কিল, কিম্বা একটু মোলায়েম চড়-চাপড় না খাইতে হইত এমন নয়। কিন্তু তাহা ছেলেরা গ্রাহ্য করিত না। তাহার প্রধান কারণ, "প্রহার"গুলো ছিল নামেই প্রহার, ঠিক প্রহার নয়। একদিন রবীন্দ্রনাথ একদল ছেলেকে উপদেশ দিলেন যাহার মর্ম হইতেছে—"তোমরা আনন্দ করবে। সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বেড়াতে যাবে—পারুলবনে বেড়াতে যাবে। বনের মধ্যে ছুটোছুটি করবে। তারপর সেখানে পূর্বদিগন্তের প্রথম সূর্যোদয় দেখে বেশ হৈ চৈ করে আশ্রমে ফিরবে।" রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের সহিত একত্রে বসিয়া তাহাদেরই একজন হইয়া বেশ গল্প স্বল্প করিতেন মাঝে মাঝে। সকলেই সেদিন রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া খুব খুশী। যাহার যেমন বয়স সে তেমনি প্রশ্ন করে, রবীন্দ্রনাথও জবাব দেন। হঠাৎ বেশ একটু [illegible] হাসিয়া আমার দিকে আড় চোখে চাহিয়া প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন "গুরুদেব, আপনি তো বললেন তোমরা পারুল বনে সকালে গিয়ে সূর্যোদয় দেখবে। কিন্তু সূর্যোদয় দেখে আশ্রমে ঠিক সময় মত ফিরতে দেরী হয়ে গেলে আমাদের পিঠে সুধাকান্তদার কিলোদয় যখন হবে তখন কে সামলাবে।" প্রমথনাথের কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এমনকি রবীন্দ্রনাথও। পরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন—"কিল-চড় মারিস নাকি? ছেলেরা তো তোকে বেশ ভালও বাসে। তা যাই করিস বাপু মারধোর করিস না। সূর্য দেখার আনন্দ-ভোজে যোগ দিলে যদি দু-এক দিন তোদের ক্লাসে শিক্ষাদানের বাঁধা সময়ের থেকে কিছু সময় বাদ যায় তাতে ছেলেদের কোনই ক্ষতি হবে না, বরং প্রকৃতির কোলে যেদিন সূর্য দেখার, চাঁদ ওঠার যতটুক আনন্দ পাবে তাতে ওদের লাভই বেশি হবে।"

এই প্রসঙ্গে আমাকে লেখা অনেক দিন আগেকার একটি চিঠির নকল পাঠকদের

উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। কোনো এক বাদলা দিনে শান্তিনিকেতনের "বেণু কুঞ্জের" সামনে একদল ছাত্রকে পড়াইতে ছিলাম তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের একটি বিষয়। সমস্ত প্রান্তরে আকাশের মেঘ যেন নামিয়া আসিতেছিল। বৃষ্টি নাই। কিন্তু জোলো বাতাস বহিতেছে। আশেপাশের গাছে গাছে ডাল-পালায় মেঘকুন্তলকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি যেন আসন্ন। ক্লাসে কি আর ছেলেদের মন বসে? কিছুতেই উহারা পড়ায় মন দিতে পারিতেছে না। জোর করিয়া তাঁহাদের মনোবিহঙ্গকে যেন ক্লাসের খাঁচার মধ্যে ধরিয়া রাখার মত অবস্থা। বলিলাম—যাও তোমরা বই-টই ঘরে রেখে মাঠে ছুটো-ছুটি কর। পড়ায় যখন মন-ই নেই, খামকা ক্লাসে থাকা কেন।'

ছুটি তো দিলাম ছেলেদের। ছেলেরাও তো হৈ-চৈ করিয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। আমারও ইচ্ছা হইতেছিল উহাদের সহিত ছুটোছুটি করি। কিন্তু ভয় হইল। একে তো ক্লাসের সময় ছেলেদের ছুটি দিলাম, তাহার উপর যদি উহাদের সঙ্গে ছুটিয়া মাঠে দৌড়াদৌড়ি করি তাহা হইলে বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে বকুনি তো খাইবই, শেষটা চাকরী না যায়। ভাবিয়া ছেলেদের সহিত গিয়া জুটি নাই। কিছুক্ষণ পরেই দেখি জগদানন্দবাবু (রায় সাহেব জগদানন্দ রায়) আমার দিকে আসিতেছেন। আমার প্রাণ তখন প্রায় খাঁচা ছাড়া হইবার উপক্রম। কাছে আসিয়াই মাস্টার মহাশয় বলিলেন—ভাল লোককেই বাবু মশায় * ছাত্র পড়াবার ভার দিয়েছেন। নিজে তো পড়াশোনার ধার ধারে না। ছেলেদের মাথা খাবার চেষ্টায় আছে।'...

তাহার পরেই একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ক্লাসে থেকেই বা কি হত। এই-রকম দিনে বাইরে কি ক্লাস করা চলে। বাচ্চারা এল বলে। ছোঁড়াগুলো জলে ভিজে যেন না বেড়ায়, সেদিকে বাপু নজর রেখো।'

আমি জগদানন্দবাবুর কথায় অনেকটা ভরসা পাইলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ভাবিলাম নিম্ন আদালতের মনোভাব যদি (অর্থাৎ জগদানন্দবাবুর মনের সদয় ভাব) বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে ফ্যাসাদে পড়িতে পারি। সুতরাং হাইকোর্টে একটা জানান দিয়া রাখা ভাল। অর্থাৎ কিনা এই যে ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল, তাহার সঠিক কারণটাই বেশ খোলাখুলিভাবে রবীন্দ্রনাথকে

* জগদানন্দবাবু এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুরের জমিদারীতে কাজ করিতেন। সেই সময় হইতেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি বাবুমশায় বলিতেন।

পত্র দ্বারা জানাইয়া রাখা ভাল। কৈফিয়ৎ তলব করিবার আগেই কৈফিয়ৎ লিখিয়া পাঠাইলাম কবিকে। মনে বিশ্বাস ছিল এ-সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুশীই হইবেন, কেননা তিনি ছেলেদের খুবই ভালবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। যথাসময় উত্তর পাইলাম। তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদায় তাঁহার কুঠিবাড়িতে ছিলেন। যে উত্তর দিলেন, তাহা এই :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দ হল। পেয়ালাভরে তোমরা প্রকৃতির সুধার ঝরণা থেকে সুধা পান কর। একদিনও তোমাদের আনন্দ ভোজের কামাই না যাক। সেদিন যে ছেলেদের ক্লাসের বেড়া টপাটপ ডিঙিয়ে দৌড় দিতে দিয়েছিলে, সে খুব ভাল করেছিলে। আনন্দ-নিকেতনের আনাগোনার রাস্তাটা তাদের খুব করে চেনাশোনা হয়ে যাক। মক্কা-মদিনা, কামাস্কাটকা কোচিন পাটা গোমিয়ার ঠিকানা তারা যখন হয় জেনে নেবে, কিন্তু বিশ্বলক্ষ্মীর স্নেহকোলের ঠিকানাটা যদি এই বয়সে খুঁজে না পায়, তবে যেদিন মস্ত পণ্ডিত হয়ে আমার মত চোখে চশমা লাগাবে, সেদিন আর কোন আশা থাকবে না। আর সকল শক্তির চেয়ে খুসী হয়ে ওঠবার শক্তিটা ওদের যেন পুরোপুরি ফুটে উঠতে পায়—আমার এইসব ছেলেরা যেন আকাশের আলোর সঙ্গে তাদের হাসি মেলাতে জানে এবং নববর্ষার সঙ্গে যেন তারা হৃদয়ের সুর মিলিয়ে 'মেঘমল্লারে' নেচে উঠতে পারে। ওরা অশোক হোক, বীর হোক এবং সহজ আনন্দে সর্বদা ভরপুর হোক, ইতি ২৫ মাঘ, ১৩২১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার প্রচলিত আয়োজন উপকরণের সঙ্গে প্রাকৃতিক সহজ সুন্দর ও সরল পরিবেশটিও সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছাত্রেরা অল্প বয়সে পুঁথিগত শিক্ষাকে যাহাতে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে সচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে, সেই চেষ্টা তাঁহার ছিল। ছাত্রেরা দেহে মনে সবল হোক, সুস্থ হোক এই চিন্তাও তাঁহার মধ্যে সর্বক্ষণ সজাগ ছিল।

বিলাসিতা, ফ্যাশানপ্রিয়তাকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করিতেন না। এই শান্তিনিকেতনে এমনও এক সময় ছিল, যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জমিদারী হইতে ভাল ভাল লেঠেল আনাইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের লাঠি খেলা শিক্ষাদানের এবং জাপান হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে জুজুৎসুর কুশলী শিক্ষক আনাইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের জুজুৎসু ব্যায়াম শিক্ষার সুযোগ দিয়াছিলেন। বর্তমানে সিংহসদনে দেওয়া হইত জুজুৎসু শিক্ষা আর সিংহসদন ও প্রাককুটিরের মধ্যবর্তী অংগনে শেখান হইত লাঠি খেলা। কেবল কি এই। পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের তাগার ছুরি খেলাও শেখান হইত। একটি গোপন দল গঠন করা হইয়াছিল কয়েকটি ছাত্রকে লইয়া। ঐ দলের নাম ছিল 'অভয়ব্রতী'। 'অভয়ব্রতী'দের নেতা করা হইল শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায়চৌধুরীকে। বঙ্কিমচন্দ্র রায়ও (তৎকালের অংকের শিক্ষক) ঐ দলের অন্তর্গত হইলেন। উভয়েই বরিশালের লোক। এই সময় আশ্রমে পূর্ববঙ্গের কায়েত, বদ্যি, ব্রাহ্মণের প্রভাব বেশ ছিল। এই "অভয়ব্রতী"দের একটা বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভয়হীনতা চর্চার জন্য মাঝে মাঝে রাত্রে আশ্রমের প্রান্তরে, শ্মশানে, কবর স্থানের কাছাকাছি যাইতে হইত, কখনো একা, কখনো সঙ্গে দুইজন, কখনো একজন। পাছে এই সাধনায় কেহ ভয় পাইয়া একটা কিছু বিপদ বাধাইয়া বসে, সেই জন্য নেতাদের মধ্যে অর্থাৎ ভূপেশবাবু ও বঙ্কিমবাবুদের মধ্যে একজনকে গোপনে ঐসব ছেলেদের কাছাকাছি থাকিতে হইত। সঙ্গে থাকিত নিভান লণ্ঠন। এই 'অভয়ব্রতী'রা রাজনৈতিক কোনো কাজের মধ্যেই থাকিত না, কিম্বা বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্যও কোনরকমের

এ্যানারকিজম চর্চা করিত না। কিন্তু বৃটিশ রাজের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের নজর আশ্রমের উপর জাগ্রত ছিল। ঐ বিভাগের দ্বারা যাঁহাদের চিঠিপত্র পাঠ করা হইত, তাঁহাদের নামের ভিন্ন ভিন্ন নম্বর থাকিত। রবীন্দ্রনাথ খোঁজ পাইয়াছিলেন যে, ঐরূপে আসামীদের মধ্যে তিনি নিজে ছিলেন ১৩ নম্বরের আসামী। এই ১৩ নম্বর লইয়া রবীন্দ্রনাথ কতবার কত চিঠি খোলার গল্প করিয়াছেন কত লোকের কাছে। একবার ডিটেকটিভ অতি-সতর্কতার জন্য অন্য আর এক নম্বরের আসামীর চিঠি পাঠ করার পর পুনরায় সেই চিঠিটা সেই নম্বরের নামের খামের মধ্যে না ভরিয়া ভরিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের নামের খামের মধ্যে। এইরূপে কয়েকটি কাণ্ড ঘটায় রবীন্দ্রনাথ কেন এইরকম হয়, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, আই বি হইতে তাঁহার চিঠি খোলা হয়, ইণ্টারসেপ্ট করা হয় অর্থাৎ গাপ করা হয়। তবে একথাও সত্য যে, ঐ সময় আশ্রমে উৎকট সরকারদ্রোহীদের আনাগোনা, গোপনে এবং প্রকাশ্যে হইত। বেশ মনে পড়ে 'বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় এক সময় বীরভূমের লাভপুরে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান সুশীল মজুমদার ও ননী মজুমদার তখন আশ্রমের ছাত্র, থাকিত বীথিকা গৃহে। কত দিন বসন্তবাবু, গোয়েন্দার চোখে ধূলা দিয়া কিম্বা ঐ বিভাগীয় পুলিসের সহিত যোগসাজস করিয়া এখানে আসিয়া এক রাত্রি, কখনো দুই রাত্রি বাস করিয়া গিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতসারেই। একবার কি রকমে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তারা এই খবর জানিতে পারে। তাই হঠাৎ একদিন, তৎকালীন বীরভূমের এস পি, মিস্টার শ্লাউডেন, সেক্রেটারিয়েটের একজন বড় সাদা সাহেব এবং আরও একজন উচ্চপদস্থ সাহেবী পোশাক পরিহিত বাঙালী, বেলা ৯টায় আশ্রমে আসিয়া হাজির। দেহলীর উপর তলায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমি জানিনা কি কারণে, নিচের তলার বারান্দায় ছিলাম। সাহেবরা আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা রবিবাবুর সহিত বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করিতে চান। আমি অতগুলো বড় বড় সাদা-কালো সাহেব দেখিয়া ভড়কাইয়া চটু পটু উপরে উঠিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথকে জানাইলাম যে, দুজন সাহেব ও একজন দেশী সাহেব বিশেষ কাজে এখনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি বলিলেন, 'যা জিগেস করে আয় তারা কে, কি কাজ।' নিচে নামিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পুনরায় গুরুদেবকে তাঁহাদের পরিচয় দিয়া বলিলাম, 'ও'রা এনকোয়্যারি করতে এসেছেন, কি বিষয় সেটা তাঁরা আপনাকে সাক্ষাতে বলবেন।'

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সাহেবদের কাছে দেখা করতে গেলে, 'কার্ড' পাঠাতে হয়, দেখার নির্ধারিত সময়ে দেখা করতে হয়। এই হল দেখা করা ব্যাপারে সাহেবদের রীতি। এ'রা তার ব্যতিক্রম করেছেন। অতএব বল্ রবিবাবু এখন ব্যস্ত। বিকেল তিনটার সময় যেন দেখা করতে আসেন। এখন হবে না। জগদানন্দের কাছে এ'দের

পৌঁছে দে। এনকোয়ারি তাঁর কাছে করতে চান করুন।' —আমি তো একটু ভড়কাইয়া গেলাম। বলিলাম, 'পাটটা এখনই চুকিয়ে দিলেই তো পারেন।' নরম স্বরে কিন্তু চরম এবং গরম ভাষায় তিনি বলিলেন, 'সাহেবদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার ও আচরণ করতে হয় আমি তা জানি। যা বলছি তাই কর। আমাকে পরামর্শ দিস না। তোর পরামর্শমত কাজ করতে হবে নাকি।'

যথাসময়ে বৈকালে উঁহারা আসিলেন। উঁহাদিগকে উপরে লইয়া গেলাম। যথারীতি সাহেব দুজন রবীন্দ্রনাথের সহিত করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইতেই রবীন্দ্রনাথ হাত বাড়াইয়া উঁহাদের সহিত নিজের চৌকীতে (যে ছোট্ট খাটের উপর বসিয়া সামনে ছোট্ট ডেস্ক রাখিয়া তিনি মাঝে মাঝে লিখিতেন) বসিয়াই করমর্দন শেষ করিলেন। বাঙালী ভদ্রলোকটি করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইতেই রবীন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন,—'আমরা তো বাঙালী। নমস্কার।' ভদ্রলোকটি একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়াই প্রতি নমস্কার করিলেন। আমার আড়ালে থাকার কথা। কেননা ইঁহাদের এনকোয়ারির বিষয়টা গোপনীয়। কিন্তু আড়ালে যাইবার দরকার হইল না। বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ আমাকে কাছেই থাকিতে বলিলেন। এনকোয়ারির বিষয় ছিল বসন্ত মজুমদার মহাশয় কতবার এখানে আসিয়াছিলেন এবং কি জন্য আসিতেন, আসিলে কোথায় থাকিতেন ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি জবাব দিলেন যে, এখানে যে সব ছাত্রেরা থাকে তাহাদের অভিভাবকগণ প্রয়োজন বোধে আসেন, যে কদিন দরকার থাকেন আবার যান। কবে কে আসেন, কবে যান, কোথায় থাকেন এসব বিষয় সঠিক খোঁজ রাখার দরকার তাঁর হয় না। কাজেই এইসব প্রশ্ন তাঁহাকে না করিলেই ভাল। এই বলিয়াই তিনি জবাব শেষ করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বলিলেন, বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এইরূপ সংক্ষেপে জবাব দিয়া পুনরায় করমর্দন আর নমস্কারের পালা শেষ করিলেন। তাঁহারাও ব্যাপার বেগতিক দেখিয়া আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া নিচে নামিলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে পুনরায় তাঁহাদের জগদানন্দবাবুর কাছে পৌঁছিয়া দিলাম। জগদানন্দবাবুর সহিত কি কথাবার্তা হইল তাহা শুনি নাই, কেননা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকাটা সংগত মনে করি নাই।

এইবার আর একজন ছাত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও শ্রদ্ধার বিষয় কিছু বলি। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ নন্দী এবং তাঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্র দুজনেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। নরেন্দ্রনাথ পরে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির—অন্য দশজনের মত নহেন। সত্যনিষ্ঠায়, কর্তব্যপালনে, সদাচরণে, নম্রতায় তিনি আদর্শস্থানীয়। লোকটি বাহির হইতে দেখিতে নেহাতই বেচারা সাদাসিধা মানুষের মত। অথচ স্বীয় মতামত প্রকাশে সে নির্ভয়-চিত্ত। যাহা তাঁহার মতে অন্যায় অসংগত সে কাজে তিনি থাকেন না। আশ্রমে তখন কাজেকর্মে ধীরে এবং দ্রুত অনেক রকম পরিবর্তন ঘটিতে ছিল। নরেন্দ্রনাথের মনে হইল, ঐ সকল পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায়তনের আদর্শের পরিপন্থী। শিক্ষকদের একটি মাসিক সভায় নরেন্দ্রনাথ নিজের অভিমত সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হইল নরেন্দ্রনাথের অভিমত অযৌক্তিক এবং প্রগতিশীল নহে। সভাপতি ছিলেন সেদিনকার সভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি একটু রুষ্ট হইয়াই বলিয়া বসিলেন—'যাঁরা মনে করেন এখনকার তন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা শক্ত তাঁদের উচিত হবে বিদায় নেওয়া।' নরেন্দ্রনাথ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ নম্রভাবেই বলিলেন—'তাই হোক'। যতদূর মনে পড়ে তখনি ইস্তফাপত্র নরেন্দ্রনাথ দিলেন। তার পর দিন কিংবা হয়তো কয়েক দিন পরে নরেন্দ্রনাথ আশ্রম হইতে চলিয়া গেলেন। সেই যে চাকুরীর সম্বন্ধ আশ্রম হইতে ঘুচাইলেন, আর ফিরিলেন না কর্মী হিসাবে। উৎসবে এবং আরও নানা উপলক্ষে তিনি কলিকাতা হইতে এখনো আশ্রমে যাওয়া আসা করেন।

নরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাওয়ার পর বেশ কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথের টনক নড়িল। তিনি নরেন্দ্রনাথকে শুধু যে স্নেহ করিতেন তাহা নহে, তাঁহার নির্লোভ ও দৃঢ় চরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের কর্মধারার অনেক জায়গায় মিল ছিল না। আমরাও নরেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি, ভালও বাসি, যতক্ষণ উঁহার সঙ্গ পাই—ততক্ষণ বেশ তৃপ্তি পাই। উঁহাকে পরিহাস করিয়া বুদ্ধবাবাজী বলিলেও চটেন না। কিন্তু অমন নরম অমন সহজ হইলে হইবে কি, যাহা মনে করিবেন শত দুঃখের মধ্যেও তাহা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই রকম মানুষ সত্যই আজকাল দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের অভিমান স্নেহরসে কোথায় ধুইয়া মুছিয়া ভাসিয়া গেল। আবার যেরকম করিয়া হক নরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া আনা দরকার এই চিন্তা তাঁহার মনে দিনে দিনে সতেজ হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে চিঠি তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় নরেন্দ্রনাথকে তিনি কী স্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন।

কল্যাণীয়েষু। নরেন নন্দীকে আমার বিশেষ প্রয়োজন এবং অনতিবিলম্বে। তাকে বলেও ছিলুম সে অতি গম্ভীরভাবে বলে গেল বিবেচনা করে দেখবে।

মন্দিরের দক্ষিণদিকের বড় দোতালা বাড়ির সামনে রবীন্দ্রনাথ

বিবেচনা করতে এত দীর্ঘকাল নিল দেখে তার আশা ছেড়ে দিয়েছি। আমি নিজে অবিবেচক—বিবেচনা করে সময় নষ্ট করাকে আমি অপরাধ বলেই গণ্য করি। যাহোক তুই যদি তাকে টেনে আনতে পারিস তাহলে এখানকার একটা বিশেষ অভাব দূর হবে। বজেটে যে টাকা মঞ্জুর হয়ে লোকাভাবে শূন্যে ঝুলছে সে হচ্ছে ৩৫, টাকা। তাতে যদি তাকে আবার সুদীর্ঘকাল বিবেচনা করতে প্রবৃত্ত না করে তা হলে প্রস্তাব করে দেখিস। ইতি—৭ই মাঘ ১৩৩৫

শুভাকাঙ্খী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে এই চিঠি পাইয়া খুব যে উৎসাহ বোধ করিলাম তাহা নাই। যে কারণে নরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছিলেন সে কারণগুলি তো আশ্রমে (অর্থাৎ যেসব বিষয় লইয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গরমিল ছিল) বর্তমান তখনো ছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমার ব্যক্তিগত মত জানাইয়া লিখিলাম তিনি যেন নরেন্দ্রনাথকে নিজেও একটি চিঠি দেন। রবীন্দ্রনাথ চিঠি দিলেন। ঠিকানা জানিতেন না বলিয়া লিখিলেন—

কল্যানীয়েষু। নরেনের ঠিকানা জানিনে। অতএব তোর পত্রের মধ্যে আমার চিঠি তার কাছে পাঠাই। যথাস্থানে যেন পৌঁছায়। ইতি—১২ই মাঘ ১৩৩৫

শুভাকাঙ্খী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে চিঠি তিন নরেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়াছিলেন তাহার নকল আমার কাছে রাখি নাই, সুতরাং মনেও নাই সব কথা সে চিঠির। বেতনের টাকা লইয়া তখন খুব কাংলা হইতে চুনো পুঁটি কেহই (অর্থাৎ বড় বড় গুণী, বিদ্বান যথা, বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু হইতে অফিসের ছোট ছোট কেরানীরা পর্যন্ত) বিশেষ মাথা ঘামাইত না। তখন সকলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাময় কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি এমন একটা আনুগত্য ছিল যে, টাকা পয়সার অভাবটা কর্মীদের মনে কামড়ের দাগ বসাইতে পারিত না। আর তখনকার দিনে খাওয়া পরার খরচ মূল্যও আজকালকার মত এমন দুর্মূল্য ছিল না। কাজেই নরেন্দ্রনাথের পক্ষে ৩৫, টাকা বেতনে কাজ করায় কোনোই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল মন আশ্রম পরিচালন ব্যাপারে যেসব দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইতে শুরু করিল তাহার সহিত সমতালে চলিবার মতন উৎসাহহীনতা কয়েকজনের মধ্যে আসিলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সে কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া গুরুদেবকে তাঁহার কর্মপন্থায় বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। নরেন্দ্রনাথ, কর্মক্ষেত্রে থাকিব অথচ গুরুদেবের নির্দেশানুসারে কাজ করিব না, এমন প্রকৃতির লোক নন। তাই তিনি চলতি কাজকর্মে তাঁহার মতানৈক্য হেতু যাহাতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য আশ্রমের সহিত কাজে

যুক্ত থাকার সম্বন্ধ ছিন্ন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যখন দেখিলেন রবীন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা তখন আমার মারফতেই জানিতে চাহিলেন যদি তিনি আশ্রমে যান তাহা হইলে তাঁহাকে নতুন কী কাজ করিতে হইবে। আমি সে সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, কেবল বিদ্বান, পণ্ডিত, আর বুদ্ধিমান দিয়াই এইরকমের বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলা যায় না। বলিষ্ঠ চরিত্রের এবং অনাড়ম্বর সরল সহজ মানুষেরও বিশেষ দরকার আছে এই বিদ্যালয়ে। সেইরকম লোকের অভাব ঘটিয়াছে নরেন চলিয়া যাওয়ায়। তিনি বলিলেন যে, ছেলেদের মধ্যে নরেনের মত লোক সর্বক্ষণ থাকে, ঘুরিয়া বেড়ায় এটা খুব দরকার। নরেনকে কিছুই করিতে হইবে না, কেবল আশ্রমে থাকিলেই চলিবে, থাকাটাই তার কাজ।

নরেন্দ্রনাথকে আমি যখন এই কথা বলিলাম তিনি হাসিলেন। সংক্ষেপে জবাব দিলেন—'এরকম কাজের কোনো অর্থ হয় না। টাকা নেব অথচ কাজ নেই, খাও দাও বেড়াও।' যত দূর মনে পড়ে তিনি হয়তো অস্থায়ী সর্তে কিছুদিনের জন্য ফিরিয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে যে, বেড়াইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু কাজে যোগ দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের প্রতি একটা গভীর স্নেহ পোষণ করিতেন। বেশ মনে পড়ে একবার একটি ছাত্রকে বিশেষ কারণের জন্য এখান হইতে বিদায় দেওয়াই কর্তৃপক্ষ স্থির করেন। সে ছাত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের খুব যে যোগ ছিল তাহাও নহে। কিন্তু তিনি দুঃখিত হইলেন। বলিলেন—'তিন-চার বছর এখানে রইল, কিছুই তার উন্নতি হল না। এই কথা যদি মানতে হয় তা হলে এটাও বুঝতে হবে ওকে ভাল করার জন্য আমাদের কর্তব্য ষোল আনা হয় তো আমরা করিনি। একটি ছাত্রকে এতদিন পরে বিদায় করাতেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ?'

আশ্রমে শিশু বিভাগের ছোট ছেলেদের চারিবেলা খাওয়ার পাট যাহাতে মেয়েদের তত্ত্বাবধানে হয় সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ (দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) শ্রীমতী হেমলতা দেবীর (যিনি সহজনের কাছে "বড়মা" বলিয়া পরিচিত) উপরেই ভার ছিল তখনকার শিশু বিভাগের। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও পুত্রবধূ (কমলা দেবী) লইয়া শান্তি-নিকেতনের নিচু বাংলায় তাঁহার নিজস্ব সংসার তো ছিলই কিন্তু তাঁহার আর একটি সংসার ছিল রবীন্দ্রনাথের আশ্রমের শিশু বিভাগ। এই শিশু বিভাগের ছেলেদের কতরকমের দৌরাত্ম্য তিনি মাতৃস্নেহ দ্বারা সহ্য করিতেন। অতগুলি শিশুর জন্য রান্নার তরিতরকারী কাটি দিয়া কুটিবার কাজ কতদিন তিনি নিজেই করিতেন। জলযোগের, মধ্যাহ্ন ভোজের, রাত্রিকালে ভোজের সব মেনু তিনি যে তৈরী করিতেন শুধু তাহা নহে—নিত্য ঠাকুরে ঠিক সব জিনিস রাঁধে কিনা, রান্না সুস্বাদু হয় কিনা, সেবিষয়ে ষোল আনা দৃষ্টি দিতেন। খাবার সময় নিজে সামনে থাকিয়া দেখিতেন শিশুদের খাওয়া ঠিক হইল কিনা—সব শিশু ঠিক মত সব কিছু পাইল কিনা। আমি, শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন, শ্রীরমণীরঞ্জন রায় (রমনীবাবু অবশ্য বেশি দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না) বহুদিন শিশুদের গৃহাধ্যক্ষ ছিলাম। কাজেই আমরাও অনেক দিন বড়মার ঐ শিশু বিভাগের সংসারের অন্তর্গত ছিলাম। আমরাও তখন যুবক, কাজেই "আজ এটা খাব কাল ওটা খাব, এই রকমটা করুন, ঐ রকমটা করুন" গোছের নানা ফাই-ফরমাস বড়মাকে করিতাম একেবারে বাড়ির ছেলের মতনই। তিনি পারতপক্ষে সব আব্দার রক্ষা করিতেন। এমন যে বড়মা, তবু তাঁহাকে বেশ ভয় করিয়া চলিতাম। কারণ তিনি যাহাকে বলে প্র্যাকটিকাল ছিলেন। যে কাজের ভার যাহাকে দিতেন সেই কাজে পান হইতে চুন খসিতে দিতেন না। সামান্য বিষয় (হয়তো আমাদের বিচারে তুচ্ছ) তাহাতেও গাফলতি করিবার উপায় ছিল না। তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিশুদের খাওয়া দাওয়ার ভার দিয়া রবীন্দ্রনাথ শিশুদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। শিশুদের ঘরে থাকার ব্যবস্থায়, ক্লাসে পড়ানর ব্যবস্থায় এক কথায় তাহাদের ভালভাবে রাখার ব্যবস্থায় ত্রুটি না ঘটে সেদিকে রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ শিশু, বালক, যুবকদের স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন, একথা যেমন সত্য তেমনি একথাও সত্য যে, তিনি বালকদের বালকোচিত দুরন্তপনা, চাপল্য ইত্যাদি, চলতি কথায় যাহাকে অপরাধ বা দোষ বলে, সেগুলি তিনি অপরাধ বা দোষ বলিয়া গণ্য করিতেন না। কিন্তু কাহারও স্বভাবে বা আচরণে হিংস্র ভাব, নীচতার ভাব, বাঞ্ছনীয় নিয়মানুগত্যহীনতা দেখিলে শুধু যে বিরক্ত হইতেন তাহা নহে, সেই বিরক্তিকে অসহিষ্ণু ভাবে ব্যক্ত করিতেন, অর্থাৎ তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। একটা ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বড় দোতালা বাড়িতে থাকিতেন। সেই সময় জনৈক শিক্ষক উদ্ধত আচরণের জন্য একটি ছেলেকে কায়িক শাস্তি দেন। ছাত্রটির ঔদ্ধত্য যেমন কিছুতেই সমর্থনযোগ্য ছিল না তেমনি শিক্ষক মহাশয় যতটা উত্তেজিত হইয়া যে শাস্তি দিয়াছিলেন তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ বেশ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের সব কাজই পরিদর্শন করিতেন। যে ছাত্রদল শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের উপর তিনি খুবই বিরক্ত হইলেন এবং শিক্ষক মহাশয়ের ব্যবহারেও বিরক্ত। ঐ ব্যাপার লইয়া তখনকার ছোট্ট শান্তিনিকেতনে কয়েকজন শিক্ষক এবং কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভের ভাব দেখা দিল। এই ব্যাপার লইয়া যতদূর মনে পড়ে ঘটনার দু-একদিন পরেই আমাকে এবং শ্রীহিতেন্দ্রনাথ নন্দীকে বৈকালের দিকে রবীন্দ্রনাথ ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা যখন তাঁহার কাছে উপরে বারান্দায় হাজির হইলাম তখন টেবিলে তাঁহার জন্য সন্নাটোজেন, পাকাকলা, সন্দেশ, নোনতা খাবার সাজান ছিল আর ছিল চা-এর আয়োজন। গুরুদেব টেবিলের কাছেই চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমরা দুজনেই প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে পাশাপাশি চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি গম্ভীর। কয়েক মিনিট কোনো কথাই বলিলেন না।

১৯২১ সালে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন-উৎসব

তাহার পরেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোরা কি মনে করেছিস তোদের ছাত্র আর শিক্ষকদের বিশ্রী আচরণকেও সহ্য করব? ছাত্রটির একটুও আত্মসম্মানবোধ, ভদ্রতা যদি থাকত তাহলে ওরকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারত না। আর এর বয়সোচিত শিক্ষকোচিত সম্ভ্রমজ্ঞান থাকলে তিনিও ওরকম শাস্তি দিতে পারতেন না। আশ্রমে এরকম লোকদের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এইসব দোষ যদি ক্ষমা করতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয় তুলে দিতে হবে।" আমরা কিন্তু এরকম ধমক খাইব ভাবিয়া তাঁহার কাছে যাই নাই। হিতেন্দ্রনাথ তো আড়ষ্ট হইয়া বারান্দার উত্তরের কাচ লাগান দেয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহাকে ব্যাপারটা কি হইয়াছে তাহা বলিবার চেষ্টা করিতেই রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'যা ঘটেছে তা নিয়ে ওকালতি চলে না। যা চলে যা, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।' রবীন্দ্রনাথের তখনকার মেজাজ দেখিয়া আর বকুনি শুনিয়া তো হিতেন্দ্রনাথ আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চটপট নিচে নামিয়া গিয়া নিমতলায় দাঁড়াইয়া ইসারা করিয়া আমাকেও নামিয়া যাইতে বলিলেন। আমি নামিলাম না। চুপ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম দেখি বকুনির দৌড় কতদূর চলে। আমাকে তিনি চিনিতেন, জানিতেন যে, আমি বকুনি খাইয়াও তর্ক করি। তবু ক্রোধের বশে বলিলেন—'কি, দাঁড়িয়ে আছিস যে? চলে যা।' এবার কিন্তু বকুনির সুরটা নরম। বলিলাম যে আমাদের তো তিনিই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। অথচ কেন ডাকিয়াছেন সেই কথাই শোনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি—বকুনি খাইব তা তো ভাবি নাই। আমরা কোনো পক্ষের জন্য ওকালতি করিতে আসি নাই। ভাবিয়াছিলাম এটা চা-এর সময়, হয়তো বা ভাল জলযোগ জুটিবে। আর যদি এই ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাহা হইলে যাহা জানি সব কথাই বলিব। আমার কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ নরম সুরে বলিলেন—'ঐ হতভাগাটা গেল কোথায়, ও ভাল মানুষ নেমে গেল। নির্লজ্জ তুই, তাই গেলি না। যা, ওকে ডেকে আন।' আমি আর নিচে গেলাম না। উপর হইতেই ডাক দিলাম, "হিতেনদা, উপরে এসো। গুরুদেব ডাকছেন।" হিতেন্দ্র ভয়ে ভয়ে উঠিয়া আসিলেন। হয়তো ভাবিয়াছিলেন, আর এক কিস্তী বকুনি খাইতে হইবে।

বকুনি আর হইল না। পরিবর্তে জলযোগ। বলিলেন, "তোদের নিয়ে আর পারি না। এমন আচরণ অসহ্য। যাক বকুনি খেয়েছিস, এখন ভাল করে কলা সন্দেশ খা।" হিতেন নন্দীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"বেশ লোক সুধাকান্ত। বকুনি খেলি তোরা দুজনেই। আর ওর মতলব ছিল যা কিছু খাবার ও-ই খাবে, তুই থাকবি নিচে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা বন্ধু জুটিয়ে এনেছিস। আমি বলুম, যা হতভাগাকে ডেকে নিয়ে যায়।" রবীন্দ্রনাথ যখন শুনিলেন ছাত্র ও শিক্ষক দুজনেই নিজেদের আচরণের জন্য অনুতপ্ত, খুসী হইলেন। তার পর আরো কথা হইল। প্রথমে বকুনির তেতো বটিকা পরিবেশন, ক্রোধের ঝটিকার পর্ব। তার পর স্নেহ মিশ্রিত তাঁহার কথা, সেই সঙ্গে চা-সন্দেশ, কলা। মধুরেন সমাপয়েৎ।

খাঁটি খনিজ সোনার কাহিনী

সুশীল রায়

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি। কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে তো নয়ই। পাঠ্যবইয়ের গদ্যপদ্যের সঙ্গে পরিচয়কে যদি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় বলা যায়, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। স্কুলপাঠ্যের বাইরে একটি বই অবশ্য তখন পড়েছিলাম, মানে পুরোপুরি না বুঝেও পড়েছিলাম; সে বই হচ্ছে মেঘনাদবধ কাব্য। পড়তে পড়তে বইটা টানা মুখস্থ হয়ে গেল, কিন্তু তবুও তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, বলা যায় না। কেননা, সব কথার মানেই ধরা যায়নি। সব শব্দের পুরোপুরি অর্থ বোধগম্য না হলেও প্রকৃত কোনো কাব্য পাঠে যে ব্যাঘাত হয় না, সেই সময় থেকে এ ধারণা আজ পর্যন্ত বদ্ধমূল হয়ে আছে।

তখন থেকে মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে। কোনো সাহিত্যিক সম্বন্ধে কৌতূহলের উন্মেষ—সেই হয়তো প্রথম।

মফস্বল শহরে থাকি। গুরুজনদের মুখ থেকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ভাবে যা শুনি, তা-ই তখন কেবল সম্বল। কৌতূহল বাড়তে থাকলেও তা চরিতার্থ হবার কোনো পথ নেই। আমাদের বাড়ি থেকে কান্তকবি রজনীকান্তের বাড়ি বেশি দূরে না, তিনি তখন বহু আগে লোকান্তরিত, তাঁকে কখনো দেখিনি, তাঁর উপহার দেওয়া দু-এক কপি বইতে তাঁর হস্তাক্ষর দেখেছি আমাদের বাড়িতে। এক-এক দিন তাঁর বাড়ির গা-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঐ বাড়িটার চেহারা দেখে-দেখে কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করি। তার, মাঝে-মাঝে যেতাম অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের বাড়িতে। ইনি রজনীকান্তের বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "কাহারও বাণী গদ্যে, কাহারও পদ্যে। রজনীকান্তের কান্তপদাবলী কেবল সঙ্গীত।" মনে মনে তাই আওড়াতাম, আর তাঁর দিকে তাকাতাম। তাঁকে চাক্ষুষ দেখে খুব ভালো লাগত। খুব বৃদ্ধ এবং খুব রুগ্ন দেখতাম তাঁকে। তবু তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে খুব ভালো লাগত।

দুজন সাহিত্যিকের নাম শুনতাম তখন খুব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এতে ধারণা হয়েছিল এই যে, উপন্যাস যাঁরা লেখেন তাঁদের বুঝি একই বংশের লোক হতে হয়—চট্টোপাধ্যায়-বংশের। আর শুনতাম নজরুল ইসলামের ও রবীন্দ্রনাথের নাম। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা, তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, অতএব তিনি সব হিসেবের বাইরে—এটুকু জানতাম। এই প্রাইজটা কোনো ব্যক্তির নাম অনুসারে যে ঐ নামে খ্যাত, তখনও জানতে পারিনি।

পরশুরাম (শ্রীরাজশেখর বসু)

ভাবতাম, প্রাইজটা বুঝি নোবল্। মানুষ মহৎ হয়ে গেলে তবে ঐ প্রাইজ দেওয়া হয়। তাই, রবীন্দ্রনাথকে মহৎ কবি বলে জানতাম।

বিদ্যার দৌড় তখন এই পর্যন্ত। এই বিদ্যার জাহাজে চেপে পৌঁছলাম এসে এই শহরে—এই কলকাতায়।

অনেকগুলো নাম জানা গেল এই সময়। সেইসব নাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও বিস্তর হাসাহাসি শুনতে লাগলাম। কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। সে নামগুলি হচ্ছে—শিহরন সেন, লালিমা পাল; দোদুল দে, বিগলিত ব্যানার্জি।

কারা এরা? শুধুই ভাবতাম, শুধুই ভাবতাম। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগত না যে, এইরকম নামের মানুষেরা সব সাহিত্যিক।

অল্পদিনের মধ্যে আর-একটা নাম শুনলাম—গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া।

ক্রমশ খোলসা হয়ে গেল সব।

অবশেষে আসল নামটা শুনলাম। সে নাম—পরশুরাম।

অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া কোনো গল্প-উপন্যাস পাঠ করা বারণ। এইজন্যে অতিরিক্ত লোভ আর আগ্রহ মিশে যখন ভিতরে-ভিতরে ব্যাকুলতা জেগে উঠত, তখন ভরদুপুরে কোনো-একটা বই চুপ করে নিয়ে ঘুমন্ত গৃহের নিভৃত এক নেপথ্যে বসে সাঙ্গ করতাম পাঠ। এই সময়ে পরিচয় হল শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে, আয়েষা জগৎসিংহ আর ওসমানের সঙ্গে।

দু-এক বছর কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। গাবের সঙ্গে প্রকাশ্য দিবালোকে অভিভাবকবর্গের চোখের দৃষ্টির সম্মুখে বসে পাঠ করতে লাগলাম নানা বই। পাঠ করলাম কজ্জলী, পাঠ করলাম গড্ডলিকা।

সেই বিখ্যাত গণ্ডেরিরামকে পেয়ে গেলাম চোখের সামনে, তার মুখের জবান শুনলাম স্বকর্ণে—

"আপনাদের রবীন্দ্রনাথ কি লিখছেন—
বৈরাগ সাধন মুক্তি সো হমার নহি,
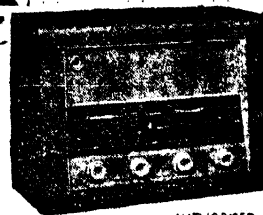
হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোণ্টি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো-চারশত লাগিয়ে দিব।"

গন্ডেরিরাম বাটপারিয়ার মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে কতক্ষণ ধরে হেসেছিলাম, আজ তা ঠিক মনে পড়ছে না।

এই গন্ডেরিরামটি একটি চরিত্রের মত চরিত্র বটে। হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে কিভাবে হাণ্টার দিয়ে মার দেওয়া যায় এই চরিত্রটি তার প্রমাণ। অনেক সাহিত্যিক অনেক গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের অনেক গালমন্দ করেছেন। কিন্তু সেসব যেন হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরশুরাম তাঁর 'শ্রীশ্রীসিদ্দেশ্বরী লিমিটেড' লিখে এক অদ্ভুত কাণ্ডই যেন করেছেন বলে তখনই মনে হয়েছিল।

এখনো সেই কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারদের কথাবার্তা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে

"গন্ডেরি ॥ বকড়ি মারবেন? হামি ইস্মে নেহি, রামজী কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

"শ্যাম ॥ আপনি তো আর নিজে বলি দিচ্ছেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো-বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

"অটল ॥ কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আর ক'মে যাবে। কি হে বৈজ্ঞানিক কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

"বিপিন ॥ কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল শু হতে পারে। এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখব।

এই ভেজিটেব্‌ল্ শু-র কথা প্রসঙ্গে মনে হয় অন্য কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায়কে একজোড়া জুতো উপহার পাঠিয়ে সঙ্গে পত্র দিয়ে লিখেছিলেন—'কেমন জুতো?'

অসাধু ব্যবসায়ীদের তেমনি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, 'কেমন জুতো?'

জীবনে বিস্তর অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং বহু মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না এলে এ ধরনের রচনা সম্ভব নয়।

তাঁর 'কচি সংসদে'র পাত্রবর্গও এক-একটি টাইপ-চরিত্র। অনেকে বলেন, এতে রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার-সভার প্রভাব আছে। প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা তুলে লাভ নেই। কার কোন্ লেখায় কার প্রভাব আছে, সেটা বড় কথা নয়। আর, বলতে গেলে, কারও কোনো রচনাই প্রভাবহীনভাবে রচিত নয়। মধুসূদনের কাব্যও শেক্সপীয়র দান্তে মিলটনের প্রভাবে রচিত, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেও বিহারীলালের প্রভাবের ছাপ দেখানো যেতে পারে। এইজন্যে এ-জিনিসকে আমরা প্রভাব বলব না; বলব, প্রেরণা। এই প্রেরণা যেখান থেকেই লাভ করা হোক চরিত্রগুলির চেহারা কি রকম দাঁড়াল, সেইটে দেখতে হবে। তা যদি দেখতে হয় তাহলে দোদুল দে আর লালিমা পালেরা কেবল অভিনব চেহারা নিয়েই আবির্ভূত নয়, তাদের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। এ-সাহিত্যের ভীষণ তারিক্কে মুখের উপর ফুটে উঠল বুদ্ধিদীপ্ত হাসির রেখা।

দুটি মাত্র বই লিখে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন জেরোম কে জেরোম; শুনতে পাই

ইনি এর পরে যা লিখেছেন তা নিজেরই ওই বই থেকে নকল করা কথা নিয়ে। অর্থাৎ, তাঁর যা রেস্ত ছিল তা তিনি ফুরিয়ে ফেলেন ওই দুই বইয়ের মধ্যেই। অতএব এর পরে তাঁকে নিজের ধন নিজেকেই লুণ্ঠন করতে হয়েছে।

পরশুরামও দুটি বইয়ের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার প্রমাণ দাখিল করেছেন। এর পরে তিনি অনেক লিখেছেন, এখনো লিখছেন, কিন্তু যে চিরায়ত রসসাহিত্য তিনি দুটি গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন, ঠিক সে জিনিস আর আমরা তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

এতে আমাদেরও আক্ষেপ নেই, পরশুরামেরও থাকার কথা নয়। বেদব্যাস একটি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, বাল্মীকিও তাই। কেন তাঁরা আরও মহাভারত লিখলেন না, আরো রামায়ণ রচনা করলেন না—এ দাবি আমরা করিনে।

কিন্তু রচনার উৎসাহ প্রেরণা ইচ্ছে বা শক্তি, কিছুই পরশুরামের কম নয়। এই জন্যে তিনি বিস্তর গল্পও যেমন লিখেছেন, লঘুগুরু নানা প্রবন্ধও। এবং সেখানেই শেষ নয়—তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের মত বৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

বেশি বয়সে যাঁর সাহিত্যজীবন আরম্ভ, তাঁর কাছ থেকে আমরা এত পেয়েছি, এইটেই আমাদের লাভ।

সেই কবে, কত দূর-অতীতে, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে মনে। কিন্তু মধ্যে কত বছর কেটে গেল তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯৫২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর বকুলবাগানের বাড়িতে।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা তুলতেই তিনি বললেন, "জীবনে প্রথম লিখি বেয়াল্লিশ বছর বয়সে, ১৯২২ সালে। সে লেখাটা হচ্ছে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। লেখাটি পড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, এটি কোনো উকিলের লেখা।"

তা মনে হওয়া স্বাভাবিক; একটা কোম্পানী গড়ে তোলার কলকৌশল তিনি যেমন দেখিয়েছেন এই গল্পে, তা ওকালতির কৌশল জানা না থাকলে দেখানো সম্ভব নয়।

কিন্তু আসলে তিনি একজন বিজ্ঞানী; কেমিস্ট্রির এম এ। রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে রসশাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক আছে বলে আগে জানা ছিল না। পরশুরাম তা জানিয়ে দিয়েছেন। রসায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্যেই তিনি কস্টিক পটাশ দিয়ে ভেজিটেবল্ শুদ্ধ তৈরির পরিকল্পনা দাখিল করতে পেরেছেন।

এখন তিনি রচনা করেন দুই নামে। গল্প রচনা করেন পরশুরাম নামে, অন্যান্য রচনা স্বনামে। কিন্তু কে এই পরশুরাম? বললেন, "এ একটি স্যাকরা। পৌরাণিক পরশুরামের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।"

তখন তিনি থাকেন পার্শিবাগানের বাড়িতে। সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটা লিখেছেন। তাঁদের উৎকেন্দ্র সংঘে সেটি পড়া হল। তখন এটি একটি কাগজে ছাপার কথা উঠল, সে কাগজ অবশ্য জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষ। নিজের নামে লেখা ছাপানোয় তাঁর সংকোচ ছিল। তাই একটা নামের খোঁজ হচ্ছে সকলে মিলে।

সামান্য একটু হেসে রাজশেখরবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "দৈবক্রমে সেই সময় তারাচাঁদ পরশুরাম নামে এক কর্মকার কোম্পানীর অন্যতম পার্টনার পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে তার নামটা নিয়ে নেওয়া হল। এই নামের পিছনে অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখব জানলে ও-নাম হয়ত নিতাম না।"

অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য—অর্থাৎ? 'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার, নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব' এই রকম কোনো উদ্দেশ্যের বিষয়ে সম্ভবত ইঙ্গিত করলেন তিনি?

তিনি আরো বললেন, "কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা সব ব্যবসায়ী আর দোকানদার-ক্লাস।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনি তখন কর্ণধার। এই সূত্রেই ব্যবসাদার-ক্লাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লেখেন, "আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্‌ড্‌ নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।"

তার পরেও আরো অনেকবার গিয়েছি তাঁর কাছে। দেখেছি, বয়স তাঁর হয়েছে কিন্তু বার্ধক্যে তিনি কাবু নন। তাঁর এই বয়সে অনেকে স্থবির হন। প্রতিটি কাজ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। প্রতিটি কাজে শৃংখলা। জীবনে বিজ্ঞানচর্চা হয়তো একটু দরকার। এর দ্বারা জীবনে একটা ডিসিপ্লিন আসে। অনেকের ধারণা সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বুঝি থাকা ঠিক না। অনেক সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখেছি তাঁরা বিজ্ঞানের ঘোর বিরোধী, বিজ্ঞানের কোনো বই তাঁরা নাগালের মধ্যে রাখতে রাজি না, এতে যেন সাহিত্যের জাত যাবে। তাঁরা হয়তো জানেন না যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিজ্ঞানের অনুরক্ত ছিলেন, তাতে তাঁর কাব্যের লাভ ছাড়া লোকসান হয়নি। প্রফুল্লচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠির কথা উল্লেখ করলাম, তার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"বসে বসে Scientific American পড়্‌ছিলুম......"

এক সন্ধ্যার সময়ে গিয়ে দেখি তাঁদের আসর জমজমাট। রাজশেখরবাবু, শ্রীচারু-চন্দ্র ভট্টাচার্য, গড্‌ডলিকা ও কজ্জলীর চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন, শ্রীবিমল-চন্দ্র সিংহ উপস্থিত।

নানা ধরনের আলোচনা চলেছে সে আসরে। ভাগলপুরে আবহাওয়া-অফিসে বৃষ্টিমাপক-যন্ত্র কি সব কাণ্ডকারখানা করা হত, যতীন্দ্র সেন মহাশয় তার বর্ণনা দিচ্ছেন। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, কিন্তু পরদিনের বুলেটিনে ছাপা হল বারিপাত আড়াই ইঞ্চি।

তারপর, চারু ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন পুলিশ কমিশনারের নির্দেশনামার বাংলা তর্জমার কথা, ইংরেজিকে হুবহু অনুবাদ করলে অর্থটা কী রকম বিকৃত হয়ে যায় তার নমুনা হিসেবে।

খুব ধুম পড়ে গেল হাসাহাসির।

গুরুগম্ভীরভাবে হাসতে লাগলেন রাজশেখর বসু। তাঁর হাসির ধরনই এমনি।

আড্ডা জমজমাট হয়ে উঠেছে। একটা তাকিয়ায় আধো-ঠেসান দিয়ে বসে রাজ-শেখর বাবু উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন সব তামাশার কথা।

এ যেন তাঁদের সেই উৎকেন্দ্র সংঘের সভা।

রাজশেখরবাবুর সঙ্গে গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৯) দেখা করি। তার পর আর যাইনি।

সেদিন গিয়েছিলাম তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে।

শুনেছিলাম, দু-তিন দিন আগে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এই খবর পেয়েই তাঁর খোঁজ নিই। এবং সুস্থ আছেন জেনে দেখা করতে যাই।

সন্ধ্যা তখন হয়ে গেছে। বকুলবাগানের বাড়িটা স্তব্ধ, শব্দহীন। ভৃত্যটি আমাকে উপরে নিয়ে গেল।

দোতলার ঘরে উঁচু একটা খাটে তিনি বসে আছেন। শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, "জানলেন কী করে? খবরটা রটল কি ভাবে?"

কি ভাবে জানলাম, কি ভাবে কানে এল সব বললাম।

তিনি বললেন, "রবিবার সকাল। ওনাকে নিয়ে বাজারে গিয়েছি। হঠাৎ শরীরটা কেমন যেন করে উঠল। লোকে লোকারণ্য বাজার। তার মধ্যে পড়ে গেলাম। অনেকে এল, ভিড় জমে গেল। কী স্ক্যাণ্ডাল বলুন।"

তাঁর মুখ থেকে এই স্ক্যাণ্ডাল শুনে হাসি পেল। শুনতে লাগলাম তাঁর কথা।

এত কাণ্ড হল, আর খবরটা পেলাম কী করে তা তিনি আবার জানতে চাইলেন দেখে মজাই লাগছিল।

রাজশেখরবাবু বললেন, "এ হল মানুষের রিয়ার্সেল।"

তা, হোক রিয়ার্সেল। অনেক নাটক আছে, যার রিয়ার্সেল দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এও যেন সেই ধরনের নাটকই হয়, আমরা তাই কামনা করব।

আমি উঠলাম। উঁচু খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন রাজশেখরবাবু। ঘর থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন।

বাধা দিলাম, বললাম, "আপনি বসুন। আমি চলে যেতে পারব।"

তবু সঙ্গে সঙ্গে এলেন তিনি, বললেন, "সিঁড়ির আলোটা জ্বালা আছে কিনা দেখি।"

বাধা মানলেন না, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি সিঁড়ি পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর এই সৌজন্যে অভিভূত হয়ে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি মনে পড়ল শুধু—"ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।"
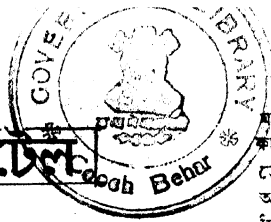
রানাঘাট হিন্দু হোটেল

বিমল মিত্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়লে কিন্তু আমার 'পথের পাঁচালী'র কথা মনে পড়ে না, মনে পড়ে কেবল রাণাঘাট হিন্দু হোটেলের কথা।

কিন্তু রাণাঘাট হিন্দু হোটেলের কথা পরে বলব। তার আগে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসভার কথা বলে নিই।

কোনও সভা-সমিতিতে যাওয়া জীবনে সেই বোধহয় আমার প্রথম। অর্থাৎ সভা-সমিতির সভাপতি বা প্রধান অতিথি কিছুই নই—শুধু একজন নিমন্ত্রিত দর্শক। তখন দর্শক বা শ্রোতা হিসেবেই বা কে আমায় নেমন্তন্ন করবে! কার এত দায় পড়েছে! আমার তখন পরিচয়ই বা কী। তা-ও সে নেমন্তন্ন বলতে গেলে একরকম যেচেই পাওয়া। বন্ধুত্বের একটা ক্ষীণ সূত্র ছিল বিশু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই সুপারিশের জোরেই দেবানন্দপুরে গিয়ে বক্তৃতা শুনে ধন্য হব। কৃতার্থ হব! এর বেশি আর কিছু নয়।

কিন্তু আমার কাছে সভার আকর্ষণটা ছিল আসলে বক্তৃতা শোনবার জন্যে নয়। আসল আকর্ষণ ছিল সভার সভাপতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশুকে বললাম—বিভূতিবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে খুব—

বিশু প্রথমে বিশ্বাস করতেই চায়নি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ থাকাটা তার কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার।

বিশু বললে—কোথায় আলাপ হয়েছে?

বললাম—রাণাঘাটের ট্রেনে একদিন আলাপ হয়েছিল পাঁচ ছ'বছর আগে।—

বিশু তবু ছাড়বার পাত্র নয়।

বললে—কী রকম আলাপ?

বললাম—একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা খুব আড্ডা দিয়েছি তাঁর সঙ্গে—আমাকে দেখলেই চিনতে পারবেন তিনি, খুব আলাপী লোক—

বৌবাজারে শ্রীযুক্ত অবিনাশ ঘোষালের ছাপাখানায় তখন বিশু, আমি আর অবিনাশবাবু রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা দিই। সেইখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ মুন্সী নামে একজন ভদ্রলোক একদিন এসে খুব সমাদরে ওঁদের দুজনকে নেমন্তন্ন করলেন। আমি পাশে বসেছিলাম।

বিশু বললে—একেও একটা কার্ড দাও দ্বিজেন্দা—এ-ও লেখে টেখে—

কার্ড পেয়েই আমি ধন্য। তার ওপর কার্ডে লেখা রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আরো ধন্য হলাম। অনেক-দিন পরে বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা হবে—এ-ও কি কম কথা!

যথাদিনে হাওড়া স্টেশনে আমরা তিনজন ট্রেনে উঠেছি। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-সভায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমন্ত্রিত শ্রোতা—আমিও প্রায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি!

বিশুকে বললাম—আর কেউ যাচ্ছেন না?

বিশু বললে—আর সবাই অন্য কামরায় উঠেছে—ব্যাণ্ডেলে নামলেই দেখা হবে—

ট্রেন প্রত্যেক স্টেশনে থামতে থামতে চলেছে। আমি ভাবছিলাম এতদিন পরে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হবে, কী করে প্রথম কথা বলব কী জানি! নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নেব তাঁর। কিন্তু এতদিন পরেও তো নিজের পরিচয় দেবার মত কিছুই নেই! কী বই আমি লিখেছি? ক'টা বই-ই বা আমার বেরিয়েছে? আমি তো এতদিন লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাকে দেখে কি চিনতে পারবেন তিনি। তিনি তো সুবিখ্যাত লোক, আর আমি অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত! তাঁর কাছে আমি নিজেকে কী বলে চেনাব!

মনে আছে এ-ঘটনারও প্রায় ছ'বছর আগেকার কথা। অর্থাৎ তখন সবে লেখা-টেখার দিকে নজর গেছে। মাসিকপত্রিকা খুলে তখন আমার লেখার চেয়ে লেখকদের দিকেই বেশি ঝোঁক। লেখা পড়ি আর না-পড়ি লেখকদের নামটা ভালো করে মুখস্থ করি। যুদ্ধ তখন সবে একবছর হল বেধেছে। আমার ভাগ্নে কাবুলের সঙ্গে দেশে চলেছি।

কাবুল মানে আমার ভাগ্নেও বটে আবার আমার সাহিত্যগুরুও বটে।

যে-বয়সে প্রাণের কথা খুলে বলতে না পারলে প্রাণ হাঁক-পাঁক করে, কাবুল আর আমি তখন সেই বয়সের ছেলে।

কাবুল হঠাৎ একদিন হয়ত বললে—এই 'সতীর পতি' পড়েছিস?

সতীর পতি!

বললাম—'সতীর পতি' কী রে?

কাবুল বললে—'সতীর পতি' প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছে মাসিক বসুমতীতে—'নীলবসনা সুন্দরী'র চেয়েও ভালো—

কাবুলের দেখাদেখিই বলতে গেলে আমি প্রথম পদ্য লিখতে শিখি।

কাবুল একবার শরৎ নিয়ে কবিতা লিখেছিল। কবিতাটার দুটো লাইন আমার এখনও মনে আছে—

শরতে সোনালী রোদ শিশির-সবুজে—
আমার এ হিয়া হায় কারেছে অবুঝে—

কাবুলকে দেখে তখন থেকেই আমার হিংসে হত। ও একদিন মহাকবি হবে উঠবে। আমি কিছুই হতে পারব না। আমাদের বাড়িতে নবেল পড়াই ছিল

নিষিদ্ধ। লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়তে হত। আলমারীর ভিতর সোনার জল দিয়ে বাঁধানো কয়েকখানা বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের গ্রন্থাবলী থাকত। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র এ'দের সব বই। অনেকদিন বইগুলো পড়তে চেয়েছি মা'র কাছে।

মা বলত—আগে নিজের লেখা-পড়া করো, নইলে মুখ্যু হয়ে বসে থাকবে, কেউ ফিরেও চাইবে না তোমার দিকে—

বাবা বলতেন—ও-সব বই পড়ার ঢের সময় পাবে বাবা, নভেল-নাটক পড়বার সময় জীবনে ঢের আসবে—এখন আখেরের কথা ভাবো—

কিন্তু কাবুলের বাড়ির কথা ছিল আলাদা। তাদের বাড়িতে মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী আসত। তার ওপর পাড়ার লাইব্রেরী থেকে উপন্যাস আনাত দিদি। কাবুল নিজেও একটা উপন্যাস ফে'দেছিল 'বিধি-লিপি' নাম দিয়ে। নায়ক অল্পবয়সে বাপ মারা যাওয়ার পর কী-রকম করে একটা বাড়িতে টিউশ্যানি করতে গিয়ে তার ছাত্রীকে বিয়ে করে প্রচুর টাকা পেয়ে গেল। উপন্যাসের শেষটাও কী-রকম হবে তা-ও কাবুল আমাকে বলেছিল। এখন আর সে-সব মনে নেই আমার। কিন্তু সত্যিই কাবুলের ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার নায়কের 'বিধিলিপি' কী হয়েছিল তা আর আমার জানবার অবকাশ হয়নি। কারণ সে-বই লেখাও হয়নি এবং ছাপাও হয়নি শেষ পর্যন্ত! আর কাবুলের নিজের 'বিধিলিপি' তাকে সাহিত্য-জগৎ থেকে মিলিটারি-জগতে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড়লোক না করুক, হাবিলদার করেছিল সে-কথাও শুনেছি।

কিন্তু যখনকার কথা বলছি তখন আমার লেখা কিছু কিছু ছাপা হয়, আর কাবুল পত্রিকা-অফিসে লেখা পাঠানো ছেড়ে দিয়েছে।

রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে আমি আর কাবুল শেয়ালদ' স্টেশনে গিয়ে ভোরের ট্রেন ধরেছি। যুদ্ধের সময়। ট্রেনের ভিতরে তিলধারণ দূরের কথা বাইরে ট্রেনের ছাদে পর্যন্ত লোক উঠে বসেছে। সেই যে শেয়ালদ স্টেশনে উঠেছি, তারপর টাইট্ হয়ে বসে আছি দুপাশের চাপাচাপিতে। গরমে মাথার তালু ফেটে যাবার যোগাড়।

কাবুল হঠাৎ বললে—ওই দেখ, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'—

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। চেয়ে দেখি পাশেই কোণ ঘে'ষে এক ভদ্রলোক একমনে একটা বই পড়ছেন।

কাবুল বললে—বইটা ভালো লিখেছে—আমি পড়েছি—

বললাম—কার লেখা রে?

কাবুল বললে—'পথের পাঁচালী' পড়িস-নি? তারই লেখা! বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়—তোর দ্বারা কিসসু হবে না, তুই 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' কার লেখা জানিস না, অথচ গল্প লিখতে চাস্—

কাবুল, আমার মতই সব কাগজের অপিসে লেখা পাঠিয়েছিল, কিন্তু সব অপিস থেকেই তার লেখা ফেরৎ এসেছে। তাতে কিন্তু সে দমেনি, আমার ওপর গুরু-গিরি সে তখনও সমানভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক তখন বইটা পাশে রেখে একটু চোখ বুজে রয়েছেন।

কাবুল বইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগল। বইটা বেশ মোটা। প্রায় শ'তিনেক পাতা।

কাবুল বললে—আমার 'বিধিলিপি'টা ছাপলে এর চেয়েও মোটা হবে, বুঝলি—এইরকম ওপরে একটা ছবি দিতে হবে,—বলে কাবুল মলাটের ওপর লেখাটা পড়তে লাগল :

"'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ নূতন ধারার উপন্যাস, পল্লী-গ্রামের বাজারে একটি ভাতের হোটেলকে কেন্দ্র করে তিনি হোটেলওয়ালা, নর-নারীদের দৈনন্দিন জীবন ও চিন্তাধারা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে পল্লীগ্রামের পরিবেশের মধ্যে অতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। পাঠক অল্পক্ষণের জন্য রাণাঘাট টাউনের এই ক্ষুদ্র ভাতের হোটেলের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অথচ সহজ নরনারীদের অপরিচিত জগতে নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে হারাইয়া ফেলিবেন..."

বলে বললে—'বিধিলিপি'র মলাটেও এই রকম একটা লেখা দিতে হবে, বুঝলি.. 'বিধিলিপি' পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকা গণ অল্পক্ষণের জন্য শিক্ষিত অথচ সহজ নরনারীদের অপরিচিত জগতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিবেন।...

বইটা নিয়ে আমিও নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। নতুন বই। আশ্বিন ১৩৪৭ সনে ছাপা।

বইটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম।

চুপি চুপি কাবুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—ওরে, এই ভদ্রলোকের নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কাবুলও চমকে উঠেছে। বললে—কী করে বুঝলি?

—এই দ্যাখ্।

কাবুলকে দেখালাম—বইএর প্রথম পাতার ভদ্রলোক কালি দিয়ে নিজের নাম লিখে রেখেছেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০শে আশ্বিন ১৩৪৭।

কাবুলের চোখ তখন চড়কগাছ।

সশরীরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই গাড়ির ভিতর! আমি আর কাবুল দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক তখনও চোখ বুজে আছেন। খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী পরে। গলার বোতামটা একটু খোলা। মাথার চুল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। এক মুখ পান। পায়ে অ্যালবার্ট জুতো। আপাদমস্তক দেখতে লাগলাম নজর দিয়ে। কে ভাবতে পেরেছিল বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমনি চেহারা।

কাবুল বললে—মুখখানা লক্ষ্য করেছিস—ঠিক লেখকের মত—

আমিও দেখলাম—ঠিক লেখকের মতই চেহারা বটে। শরৎ চাটুজ্যের ছবি দেখেছি—তাঁরই মতন অনেকটা দেখতে! তাহলে লেখকরা এই রকমই দেখতে হয়? ঠিক আমরা যেমন চুল ছাঁটি, তেমনি। কোনও তফাৎ নেই। গায়ের রঙটাও কালো। আমাদের মতন। হাতের আঙুলগুলোও দেখলাম। ওই আঙুলগুলো দিয়েই তো কলম ধরে লিখেছে। ঠিক আমাদের মতই আঙুল। আমি আর কাবুল দুজনেই নিজের নিজের হাতের আঙুলগুলো দেখতে লাগলাম। কোনও তফাৎ নেই।

কাবুল বললে—দ্যাখ্, ওর আঙুলগুলো অনেকটা আমার সঙ্গে মিলছে।

আমি বললাম—আমার সঙ্গেও মিলছে রে, এই দ্যাখ্—

ভদ্রলোক এতক্ষণে চোখ খুললেন। ট্রেনটা কোন্ স্টেশনে এসে থামল যেন তাই দেখে নিলেন একবার। আমাদের তখন অন্য কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা দুজনেই একদৃষ্টে তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি। ভদ্রলোক পাশে রাখা বই-খানা নিয়ে আবার দেখতে লাগলেন।

কাবুলের সত্যিই সাহস আছে বলতে হবে।

সোজা জিজ্ঞেস করলে—এটা কি আপনার বই?

ভদ্রলোক হঠাৎ কাবুলের এই প্রশ্নে যেন একটু ফিরে চাইলেন।

বললেন—আমাকে বলছ?

কাবুল আবার বললে—হ্যাঁ, বলছি বইটা কি আপনার?

ভদ্রলোক বললেন—না, ওঁর—ওই যে ও-দিকে বসে আছেন—ওঁর কাছ থেকে পড়তে নিয়েছি—

গাড়ির একেবারে উল্টোদিকে আর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

কাবুল আবার জিজ্ঞেস করলে—ওই যে ফরসা মতন যিনি বাইরের দিকে চেয়ে আছেন?

ভদ্রলোক বললেন—না, ওঁর পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন—উনিই—

আমি আর কাবুল দু'জনেই চেয়ে দেখলাম। খবরের কাগজের আড়ালে মুখটা আধঢাকা ছিল। ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা দু'জনেই লজ্জায় আধ-মরা হয়ে গেলাম। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবে এতক্ষণ যাঁকে তাঁকে নিয়ে কত কী ভেবেছি।

কাবুল চুপি চুপি বললে—আমি চোখ দুটো দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, এ কখনও বিভূতি বাঁড়ুজ্জে হতে পারে না—

বললাম—কেন? চোখ দুটো কী রকম?

কাবুল বললে—দূর, লেখকের চোখ কখনও ও-রকম হয়? শরৎ চাটুজ্জের ছবি দেখিসনি?

তারপর একটু হেসে বললে—চল্, ওঁর কাছে গিয়ে বসি গে—

বললাম—কেন?

কাবুল বললে—ওঁর সঙ্গে আলাপ করব—

বললাম—ওখানে যে বসবার জায়গা নেই—

কাবুল ততক্ষণে উঠে পড়েছে জায়গা ছেড়ে।

বললে—উঠে আয়, কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, পরের ইস্টিশানে যদি কেউ নামে তো বসে পড়ব ওখানে।

ভিড় ঠেলে উঠে কাবুলের পিছন-পিছন গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি দেখতে লাগলাম বিভূতিবাবুর দিকে। তখনও খবরের কাগজে মুখখানা ঢাকা। সাদা পপলিনের পাঞ্জাবী গায়ে। পায়ে শু। চোখে মোটা শেলের চশমা। গায়ের রঙ কালো। দোহারা চেহারার মানুষ। না-রোগা, না-মোটা!

আমি কাবুলকে বললাম—দেখছিস, কোনও দিকে নজর নেই বিভূতিবাবুর—

কাবুল শুধু বললে—লেখক কি না—

বললাম—আমার একটু একটু ভয় করছে ভাই—

কাবুল বললে—কেন? ভয় কিসের! আমি তো আছি—

বললাম—আমাদের সঙ্গে যদি কথা না বলেন?

কাবুল বললে—তোকে কিছু বলতে হবে না, আমি কথা বলব! আদর্শ হিন্দু হোটেলটা তো সব আমার মুখস্থ আছে, আমিই জিজ্ঞেস করব বইটা থেকে—

—কী জিজ্ঞেস করবি?

কাবুল বললে—আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করবো: আপনার কি ভাতের হোটেল আছে? ভাতের হোটেল না থাকলে অমন বই কেউ লিখতে পারে না, জানিস। অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখকরা লিখবে কী করে! ধর না আমার 'বিধিলিপি'র কথা! অভিজ্ঞতা আছে বলেই তো লিখতে পেরেছি—ও সব আমার চোখে দেখা কিনা! লিখতে হলে সব চোখে দেখা চাই, জানিস, তবেই তো real হয়—

আমি চুপ করে ছিলাম। কাবুল আমার চেয়ে অনেক পড়েছে, অনেক জানে। লেখা অবশ্য ছাপা হয় না কাবুলের। কিন্তু 'বিধিলিপি' ছাপা হলে তখন কাবুলের নাম হবে খুব। আমার যা-কিছু লেখা ছাপা হত 'প্রবাসী, ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, কাবুল পড়ত সেগুলো। বলত, অনেক ডিফেক্ট আছে এখনো তোর লেখায়—

কাবুলের লেখা ফিরে আসত আর আমার লেখা ছাপা হত বলে কাবুলের কিন্তু দুঃখ ছিল না কোনও দিন।

বলত—এরকম হয় রে—বিভূতি বাঁড়ুজ্জের নাম কি আগে কেউ জানত? 'পথের পাঁচালী' বেরোবার আগে কেউ

নাম জানত কি? আমারও 'বিধিলিপি' বেরোলে দেখবি তখন সব সম্পাদকরা কীরকম আপসোস করে—তখন দেখবি যেসব লেখাগুলো ফেরত দিয়েছে, বলব সেইগুলো আগে ছাপো তবে লেখা দেবো তোমাদের—

চারিদিকে ভিড়। রোদ্দুরে গরমে ভিড়ে গাড়ির সমস্ত প্যাসেঞ্জার আই-ঢাই করছে। বাইরে থেকে গরম হাওয়া আসছে—আর সমস্ত শরীর যেন ঝলসে যাচ্ছে। থার্ড ক্লাশ কামরা। দশগুণ লোক ঢুকেছে একটা গাড়ির মধ্যে।

কিন্তু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও খেয়ালই নেই কোনদিকে। তিনি তখনও একমনে খবরের কাগজ পড়ে চলেছেন। যুদ্ধের সময়—খবরের কাগজে নানারকম খবরে ভর্তি। গাড়ির মধ্যে আরো অনেক-গুলো প্যাসেঞ্জার খবরের কাগজ মুখে দিয়ে আছে। গল্প করে, পাশের লোকের সঙ্গে আলাপ করে তখন সবাই ক্লান্ত। সেই রাত থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আমরা দুজন—দেশে পৌঁছোতে যার নাম সেই রাত ন'টা বাজবে। প্রতি বছরে আমের সময় কাবুল আর আমি আম খেতে দেশে যাই। ট্রেন গিয়ে রাণাঘাটে পৌঁছবে বেলা বারোটার সময়। ওখানেই কিছু খেয়ে নিয়ে আবার বেলা তিনটে বেয়াল্লিশের গাড়ি ধরতে হবে।

বললাম—বিভূতিবাবু খুব পান খায় দেখছি—

সত্যিই দেখলাম, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় পকেট থেকে ডিবে বার করে পান মুখে পুরে দিলেন।

কাবুল বললে পানটা খাওয়া ভালো, জানিস, আমিও পান খাবো এবার থেকে—

এতক্ষণে কোন একটা স্টেশন এসে গেল। কয়েকজন ওঠানামা করল। আমাদের দিকে একটা জায়গা খালি হতেই আমি আর কাবুল গাদাগাদি করে সেখানে গিয়ে বসেছি। একেবারে বিভূতিবাবুর মুখো-মুখি। খবরের কাগজটা সরালেই একেবারে সামনা-সামনি দেখতে পাব তাঁকে। কিন্তু খবরের কাগজও তিনি নামাচ্ছেন না আর আমরাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছিনা স্পষ্ট। কী যে অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হল, খবরের কাগজের মধ্যে কী এমন বস্তু আছে যে, এমন মনোনিবিষ্ট হয়ে পড়ছেন।

কাবুল চুপি চুপি আমাকে বললে —তুই যেন কিছু বলিসনি, যা বলবার আমি সব বলব—

খানিকক্ষণ বাদে বিভূতিবাবু কাগজ-খানা চোখ থেকে নামালেন। একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। এদিকে চোখ ফেরাবার নাম নেই। বিভূতি-বাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখ দেখলেই বোঝা যায় যেন বড় স্বপ্ন-নিবিড় চোখ। দেখছেন না, যেন দৃষ্টিপাত করছেন। লেখকের দেখা তো ওই রকমই। ঠিক যে-জিনিসগুলো দেখবার সেই জিনিস-গুলোই দেখেন—আর সব দেখেও দেখেন না তাঁরা। এ-সব কথা আমার কাবুলের কাছেই শেখা! কাবুল আরো অনেক কথাই শিখিয়েছিল আমাকে।

কাবুল বলত—যদি লেখক হিসেবে নাম করতে চাস তো শুধু চোখ নয়, কানও খোলা রাখতে হবে—চোখ কান খোলা না থাকলে কচু অভিজ্ঞতা হবে! আমার 'বিধিলিপি' পড়লে বুঝতে পারবি সব আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখা, নিজের কান দিয়ে শোনা—

হঠাৎ বিভূতিবাবুর কী হল কে জানে। আমাদের দিকে এতক্ষণে নজরে পড়ল।

বললেন—তোমরা কোথায় যাবে খোকা? কাবুল মুখিয়ে ছিল।

উত্তর দিলে—আমরা ফতেপুর যাবো, আমাদের দেশে—আম হয়েছে কিনা, আম খেতে যাচ্ছি আমরা—

বিভূতিবাবু বললেন—তা হলে তো রাণা-ঘাটে নামতে হবে তোমাদের, ভাত খাবে কোথায়? তোমাদের গাড়ি তো তিনটে বেয়াল্লিশে—

কাবুল বললে—আপনার বুঝি হোটেল আছে রাণাঘাটে—?

বিভূতিবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন —তোমরা জানলে কী করে? আমি নতুন হোটেল খুলেছি—

কাবুল বললে—আমরা জানি! আমরা দু'জনে আপনার হোটেলে খাবো আজ!

বিভূতিবাবু হাসলেন একটু!

কাবুল আরো সাহস পেয়ে গেল। বললে—ফার্স্ট ক্লাস পাঁচ আনা আর সেকেন্ড ক্লাস তিন আনা—ফার্স্ট ক্লাসে মুড়িঘণ্ট আর সেকেন্ড ক্লাসে মুসুরি-খেসারি মিশেল ডাল......

বিভূতিবাবু খুব মজা পেলেন। বললেন—তোমরা তো সব জানো দেখছি—

কাবুল বললে—আমরা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' বইটা পড়েছি—

বিভূতিবাবু আরো হাসলেন—তোমরা পড়েছ? ঠিক-ঠিক মিলে যায়, না?

কাবুল বললে—বইটা আমার খুব ভালো লেগেছে, বইটা পড়লে মনে হয় হোটেলে গিয়ে দু' তিন দিন কাটিয়ে আসি, এত ভালো লেগেছে কী বলব!

বিভূতিবাবু হাসতে লাগলেন তেমনি করে।

বললেন—ওই যে ওই ধারের ভদ্রলোককে দিয়েছি, উনি পড়তে চাইলেন, অনেকেই পড়ে ভালো বলেছে বইটা—

কাবুল বললে—হাজারী ঠাকুর এখনও আছে ওখানে? গেলে দেখা যাবে!

বিভূতিবাবু আরো জোরে হাসলেন।

হাসি থামিয়ে বললেন—হাজারী নয়, আমার ঠাকুরের নাম বিশ্বম্ভর, সেই নামটাকেই হাজারী করে দেওয়া হয়েছে—

কাবুল বললে—আপনি 'সতীর পতি' পড়েছেন?

বিভূতিবাবু বললেন—'সতীর পতি'? কার লেখা?

কাবুল বললে—পড়েননি? প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের লেখা? ছোটবেলায় পড়েছিলাম 'মাসিক বসুমতী'তে। সেটাও যেমন ভাল লেগেছিল, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'টাও আমার তেমনি ভাল লেগেছে—

বিভূতিবাবু বললেন—তোমরা কোথায় থাকো?

কাবুল বললে—এ থাকে চেতলায়, আর আমি বালিগঞ্জে, এ আমার মামা হয়—

বিভূতিবাবু বললেন—বেশ—বেশ—দু'-জনেরই দেখছি এক বয়েস—

কাবুল হঠাৎ বললে—এও লেখে—

বিভূতিবাবু আমার দিকে চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী লেখে?

কাবুল বললে—এই গল্প-টল্প—ছাপা হয় কাগজে—এর নাম বিমল মিত্তির—

—কোন্ কাগজে?

কাবুল বললে—এই প্রবাসী-ট্রবাসীতে মাঝে মাঝে লেখে,......

বিভূতিবাবু আমার দিকে এতক্ষণে যেন ভালো করে নজর দিলেন একটু। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললাম। ভাবলাম যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন তো কী উত্তর দেব! আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছি তখন নিজের মধ্যেই।

কাবুল আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি প্রবাসী পড়েন না?

বিভূতিবাবু বললেন—পড়ি তবে সব লেখা সব সময় পড়া হয় না—

কাবুল বললে—আমিও একটা উপন্যাস লিখছি, প্রায় তিনশো পাতা লেখা হয়ে গিয়েছে, নাম দিয়েছি 'বিধিলিপি'—

বিভূতিবাবু বললেন—বাঃ বেশ নাম দিয়েছ তো—

কাবুল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল—আপনার পছন্দ হয়েছে?

বিভূতিবাবু পকেট থেকে ডিবে বার করে আবার একটা পান মুখে পুরে দিলেন। তারপর খবরের কাগজটা নিয়ে আবার পড়তে লাগলেন মন দিয়ে।

কাবুল বললে—উপন্যাসটা নিয়ে এলে ভালো হত, একটু পড়িয়ে শোনাতাম রে—

বললাম—আমার কাছে আমার দুটো ছাপা লেখা রয়েছে সুটকেসের মধ্যে—দেব পড়তে ভাই?

কাবুল বললে—দূর, ছোটগল্প পড়িয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, উপন্যাস হলে আলাদা কথা! গল্প তো সবাই লিখতে পারে, ওতে আর বাহাদুরি কী!

তারপর একটু থেমে চুপি চুপি বললে—আজকে বরং চল্ ও'র হোটেলে গিয়ে দুপুরবেলার ভাতটা খাই—সেকেন্ড ক্লাস না ফার্স্ট ক্লাসে খাবি? তোর কাছে কত টাকা আছে?

আমি পয়সা গুণে দেখলাম—আমার কাছে এক টাকা সাড়ে চার আনা আছে।

কাবুল বললে—কুছ পরোয়া নেই, আমার কাছেও একটা টাকা আছে—ওদিকটা না-হয় তিন কোশ রাস্তা হেঁটে মেরে দেব—

স্টেশন থেকে নেমে তিন ক্রোশ পথ। হেঁটে, নয় তো গরুর গাড়িতে যাওয়া যায়। মাঝখানে ইছামতী পার হতে হয়। তার জন্যে দুজনের মাত্র দুটো পয়সা লাগবে। হেঁটেই যাব। বিভূতিবাবুর হোটেলে ফার্স্ট ক্লাসেই খাব। সেকেন্ড ক্লাসে খেলে মান থাকবে না আমাদের। আলাপ তো হয়ে রইল। হোটেলে উঠে আলাপটা আরো জমবে।

—

বেলা যখন প্রায় বারোটা, তখন ট্রেন এসে পৌঁছুল রাণাঘাটে। আগে আগে রাণাঘাটে এসে পাঁউরুটি আর গরম গরম পান্তুয়া খেয়ে ক্ষিধে মিটিয়েছি। এবার আর তা নয়। এবার গরম গরম ভাত, মাছের ঝোল, ডাল, ভাজা, তরকারী......

সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে।

—এই নিন মশাই আপনার বইখানা নিন্।

আগেকার ভদ্রলোকটি বইটা দিয়ে দিলেন বিভূতিবাবুর হাতে।

বিভূতিবাবু বললেন—তোমরাও যাবে তো? চলো—

কুলি মালপত্র নিতে ঢুকে পড়ল কামরার ভিতর। গরমে এতক্ষণ সব সেদ্ধ হয়েছে। এবার ঢাকা প্ল্যাটফরমে নেমে চা সিঙ্গাড়া খাবে। পাঁউরুটি পান্তুয়া খাবে। খাবার আয়োজন এখানে অনেক।

আমাদের কুলি মালপত্র নিতে দেরি করছে।

বিভূতিবাবুর সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই।

বললেন—তোমরা বরং এসো, আমি চলি—রাণাঘাট হিন্দু হোটেল বললেই কুলি তোমাদের পৌঁছে দেবে—

কাবুল বললে—কী চমৎকার লোক দেখেছিস, এত বড় লোক, অথচ মোটে অহংকার নেই একটুও—

বললাম—আচ্ছা, লেখক মানুষ, তা হোটেল করেছে কেন ভাই?

কাবুল বললে—ঘরে দরজায় খিল বন্ধ করে থাকলে লেখক হওয়া যায় নাকি?—হোটেল করলে কতরকম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়, কত অভিজ্ঞতা হয়, অভিজ্ঞতাই তো সব—সেইটেই তো লাভ—

বিভূতিবাবু চলে গেলেন।

কুলি মাথায় মাল তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাবেন বাবুরা?

বললাম—রেল-বাজারে চল্—রাণাঘাট হিন্দু হোটেল-এ—

আর বলতে হল না। কুলি মাল নিয়ে আগে আগে চলল। আশে-পাশে লোকের ভিড়। ভিড় কাটিয়ে আমরা চলেছি। লোক-জনের কথা-বার্তা কানে আসছে। মনে হতে লাগল সত্যিই যেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশে এসে পড়েছি। যতবার ওদিকে গিয়েছি ততবারই মনে হয়েছে, রাণাঘাটের ওপার থেকে এই বনগাঁ, শান্তিপুর, কেষ্টনগর সব এলাকাটাই যেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একলার। আজও ভাবলে অবাক লাগে, একদিন এই অঞ্চলটাই সমস্ত বাঙলা দেশকে জয় করেছে কেমন করে, হয়ত বা পৃথিবীকেই জয় করেছে আজ। একদিন এই অঞ্চলের একটি শিশুই বাঙলা দেশে এসে হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েছিল। সে-ও তো বেশি দিনের কথা নয়। কালিকলম আর কল্লোল তখন খুব হৈ চৈ বাধিয়ে তুলেছে। হাট বড় নয়, কিন্তু হট্টগোলের ঠেলায় টেঁকা দায়। এ একেবারে নতুন আমদানী। একদল বলছে—এমন জিনিস আগে কখনও লেখা হয়নি। এ মহৎ সৃষ্টি! আর একদল বলছে—এসব কুৎসিত। এটা অসাহিত্য। তখনকার দিনের 'বঙ্গবানী', 'স্বদেশী বাজার', 'সোনার বাঙলা', 'বসুমতী', 'শনিবারের চিঠি'তে

তাই নিয়ে মহা সোরগোল উঠেছে। সে এক দিন গেছে বটে। আমরা তখন একেবারে ছোট। কার কথা বিশ্বাস করি! যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন ওটা অসাহিত্য, তখন বুঝি ওটা অসাহিত্য! আবার যখন শরৎচন্দ্র বলেন, ওটাই আসল সাহিত্য, তখন বুঝি ওটা সাহিত্যই! কয়েক বছর কাটল এমনি করে। প্রথম মহাযুদ্ধ থেমে গেল। তারপরেও কয়েক বছর। অর্থাৎ প্রায় ১৯৩০।৩২ সাল পর্যন্ত বাঙলা দৈনিক মাসিকের পাতায়-পাতায় তার সাক্ষী আছে। কিছুতেই আর সে-তর্ক থামে না। তর্কের ঝড়ে আকাশ যখন প্রায় কালো হয়ে উঠেছে তখন দৈবাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল।

কাবুল আমার তখনকার সংগী। একদিন সন্ধ্যেবেলা দৌড়তে দৌড়তে আমাদের বাড়ি এসে হাজির।

হাঁফাচ্ছে তখনও।

বললাম—কী রে, হঠাৎ কী মনে করে?

একজামিন সামনে। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই আমাদের। কেতাব নিয়ে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছি। একটা পাতা পড়ি তো আর একটা পাতা ভুলে যাই। কোন্‌দিক রাখতে কোন্‌দিক সামলাবো তাল ঠিক রাখতে পারছি না। এমন সময় কাবুলের মুখের ভাব-ভংগি দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

বললাম—কী রে, সব পড়া তৈরি হয়ে গেল?

কাবুল বললে—না, কী করব বুঝতে পারছি না তাই তোর কাছে এলাম—

বললাম—কেন, কী হল তোর?

কাবুল যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠবে।

বললে—একটা যা বই পড়েছি না,...

বললাম—'সতীর পতি'?

কাবুল বললে—দূর, সতীর পতি-টতি নয়, এ বানানো গল্প নয়, এ একেবারে সত্যিকারের গল্প, আমাদের ফতেপুরের গল্প একেবারে, ঠিক সেইরকম আম কুড়োন আর আম-আঁটির ভেঁপু বাজান—ঠিক যেন আমাদের দেখে লেখা...

বললাম—নাম কী বইটার?

কাবুল বললে—পথের পাঁচালী!

বললাম—কে লিখেছে?

কাবুল বললে—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়!

আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নয়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নয়—এ একেবারে নতুন নাম। এ একেবারে আনকোরা লেখক!

কাবুল বললে—অনেক বই পড়েছি ভাই, অনেক লেখা দেখেছি, কিন্তু এ একেবারে অন্যরকম!

সত্যিই অন্যরকম! একেবারে অন্যরকম! অত যে তর্ক উঠল, অত যে ঝড় বইল, সব নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল এক মিনিটে! কোন্‌টা সাহিত্য আর কোন্‌টা অসাহিত্য তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, তা নিয়ে আর বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে না। একেবারে মূর্তিমান সাহিত্য এসে হাজির হয়েছে এবার।

সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সশরীরে পাওয়া গেছে! সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একেবারে এক ছাদের তলায়, চার দেয়ালের মধ্যে পাওয়া গেছে, এ কি কম কথা!

কুলি মালপত্র নিয়ে হাজির হল রেল-বাজারে! একটা টিনের চালের হলদে রংএর বাড়ি। মাথার উপর সাইনবোর্ডে লেখা—

'রাণাঘাট হিন্দু হোটেল'। আর দেয়ালের গায়ে আলকাৎরা দিয়ে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে:

এই যে বড়দা আসুন
ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বাসস্থান
আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

মনে হল যেন অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করে একেবারে এক দেবমন্দিরে এসে হাজির হলাম আমরা। কোথায় সেই মোগল যুগের দুর্গেশনন্দিনী! কোথায় রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশ রূপনগর। একটা বুড়ী কতকগুলো ছবি বেচতে এসেছে রূপনগরের রাজা বিক্রমসিং-এর অন্দরমহলে—

একজন জিজ্ঞেস করলে—এ কার তসবীর আয়ি?

বুড়ী বললে—এ শাহ্‌জেহান বাদশার তসবীর!

মেয়েটি বললে—দূর মাগী, এ দাড়ি যে আমি চিনি, এ আমার ঠাকুরদাদার দাড়ি—

আর একজন বললে—সে কিলো, ঠাকুরদাদার নাম দিয়ে ঢাকিস কেন, ও যে তোর বরের দাড়ি—

এ-সব রাজা-রাজড়া জমিদার-জোতদারদের সদর-দেউড়ি মাড়িয়ে আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলুম অনেক কষ্টে। কলকাতায় এসে দেখি একটা বাড়ির মধ্যে বেশ তখন তর্ক বেধে গেছে—

হরমোহিনী বলেছেন—একটা কথা বলি বাছা, যা কর তা কর, তোমাদের ওই বেয়ারাটার হাতে জল খেও না—

পাশেই আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার নাম সুচরিতা। সে বললে—কেন মাসি, ওই রামদীন বেয়ারাই তো তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে দুধ দিয়ে যায়—

হরমোহিনীর দু' চোখ কপালে উঠল। বললেন,—অবাক করলি মা তুই, দুধ আর জল এক হল?

আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন-কার ইংরেজ-শাসিত নারী-বর্জিত সমাজে ললিতাকে দেখে। ঘুমের মধ্যেও সুচরিতার বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা দেখতে পেতাম স্পষ্ট।

আমাদের সাহস বেড়ে গেল খুব! সাহস পেয়ে আমরা অনেক দূরে গেলাম, আরো অনেক পথ পার হলাম। গৃহস্থবাড়ি ছেড়ে একটা মেস-বাড়ির দোতলায় ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি সে একেবারে অন্য আবহাওয়া। একটা ঘরের সব বাবুরা তখন আপিসে চলে গেছে। একা সতীশ বসে আছে।

এমন সময় সাবিত্রী ঝি এসে ঢুকল। বললে—এ কি, আজ যে ইস্কুল গেলে না বড়?

তারপর জাহাজে চড়ে বর্মামুলুকে গেছি, বিলেতে গেছি, কোথায় যাইনি আমরা? যেন আমাদের আপিম খাইয়ে দিয়েছে কেউ। শ্রীকান্তের সঙ্গে কেঁদেছি, ভালো-বেসেছি, কখনও আবার আমরাও কাঁদিয়েছি, ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে। কখনও-কখনও 'ষোল আনা' গ্রামকে গ্রাম পরিক্রমা করেছি শিবানন্দের সঙ্গে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কুকুর বেড়াল, এমন কি গাছপালাটা পর্যন্ত আমাদের আপনার হয়ে গিয়েছে। চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে আমাদের, মন ভরে গিয়েছে আমাদের। আর কিছু শুনতে চাইনি আমরা। আর কিছু ভালো লাগেনি আমাদের। কেউ পটলডাঙার বস্তির গল্প বলতে এসেছে—আমরা বলেছি: ওসব শুনতে চাইনে। কেউ বালিগঞ্জের লুসি-ললিতার গল্প বলতে এসেছে—আমরা বলেছি: ওসব শুনতে চাইনে! এই বাহা—আগে কহো আর। অন্য কিছু বলো শুনি!

সত্যিই কেউ অন্য গল্প সেদিন শোনাতে পারেনি আমাদের। কেউ অন্য গল্প বলতে পারেনি। আমরা তখন ইংরিজী গল্প পড়তে গেছি। টলস্টয় পড়েছি, ডিকেন্স পড়েছি, বালজাক পড়েছি, ডস্টয়ভস্কি পড়েছি। বাঙলাতে আর গল্প নেই। আমাদের প্রায় হতাশ হবার অবস্থা!

এমন সময় একি!

কোথা থেকে কে একজন এসে কী গল্প শোনাল—আর আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। এ তো আর কারো গল্প নয়, আমাদেরই গল্প যে এ! দুর্গাই তো আমার বোনের নাম, সর্বজয়া তো আমারই মা, ইন্দির ঠাকরুণই তো আমার পিসিমা, আমার বাবার নামই তো শ্রীহরিহর চক্রবর্তী! আর আমার নামই তো...

মনে হল এ যেন তীর্থস্থান। এই রাণা-ঘাট হিন্দু হোটেল—এ যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পীঠস্থান।

কুলী মালপত্র নিয়ে ভিতরে যেতেই দেখি বিভূতিবাবু তক্তপোষের ওপর একটা ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছেন।

আমাদের দেখেই বললেন—তোমরা এসে গেছ—ভালোই হয়েছে—ওরে যদু—

—যাই বাবু—

যদু আসতেই বিভূতিবাবু বললেন—বিশ্বম্ভরকে বল্—এদের দু'টো ফার্স্ট ক্লাস মিল্ দিতে—দু'রকম ভাজা, মুড়িঘন্ট আর পোনা মাছের কালিয়া—তোমরা কলাপাতায় খাবে না কাঁসার থালায় খাবে?

উঠোনের চৌবাচ্চায় হাত-পা ধুয়ে নিলাম দু'জনে।

যদু বললে—ওই ঘরে গিয়ে বসুন বাবুরা, আমি ভাত বেড়ে ডাকবো—

কাবুল চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। বললে—দাঁড়া, ভালো করে চারদিকটা দেখে নিই, ঠিক আদর্শ হিন্দু হোটেলের সঙ্গে মেলে কিনা দেখি—

উঠোনের এককোণে এ'টো বাসনের ডাঁই। কয়েকটা কাক ওৎ পেতে বসে আছে পাঁচিলের উপর। তার ওপাশে একটা সজনে গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে ভিতর দিকে। রান্নাঘর থেকে রান্নার মশলার গন্ধ আসছে।

বললাম—চল্ না, ঘরে গিয়ে বসি—

তবু কাবুল নড়ে না।

বললাম—কী দেখছিস্?

কাবুল বললে—একটু দাঁড়া না, পদ্ম ঝি আর হাজারি ঠাকুরকে দেখা যাবে এখুনি—

আমাদের কথা বোধ হয় কেউ শুনতে পাচ্ছিল।

ভিতর থেকে কার যেন গলা পেলাম—ওখানে কে গা?

আওয়াজটা পাশের ঘরের ভেতর থেকে এসেছিল। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখি একটা কালো মতন লোক খালি গায়ে বোধ হয় লিখছিল আর বিড়ি খাচ্ছিল। লোকটা আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

আবার বললে—বনগাঁ না শান্তিপুর—কোন্টা?

কাবুল আর আমি দুজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। দেখি তক্তপোষের উপর একটা খাতায় কী সব লিখছে লোকটা। হাতে তখনও কলম ধরা রয়েছে। আর এক হাতে আধপোড়া বিড়ি একটা। সামনে একটা কাঁসার বাটিতে অনেকগুলো পোড়া বিড়ির টুকরো। একেবারে ঘুনসি পর্যন্ত পুড়িয়ে খাওয়া।

লোকটা বললে—বোস—

আমরা দু'জনেই বসলাম।

লোকটা আবার বললে—কোত্থেকে আসছো তোমরা? বাড়ি কোথায়?

কাবুল বললে—এ থাকে চেতলায় আর আমি বালিগঞ্জে—আমি এর ভাগ্নে—

লোকটা বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বললে—তোমরা কাকে খুঁজছিলে? পদ্ম-ঝি না কি বলছিলে?

বললাম—ও আমাকে পদ্ম-ঝি আর হাজারি ঠাকুরকে দেখাবে বলছিল—

পদ্ম ঝি?

লোকটা বললে—পদ্ম-ঝি বলে তো এখানে কেউ নেই—আর হাজারি ঠাকুর কে?

কাবুল রেগেই গিয়েছিল লোকটার কথায়।

বললে—পদ্ম-ঝি আর হাজারি ঠাকুর আছে কি না-আছে তা আপনার দেখবার দরকার কী?—আমি একে বলছি, আপনি আমাদের কথায় ফোড়ন দিতে আসেন কেন? আপনি বসে বসে খাতা লিখছেন, লিখুন না—

লোকটা কিছু বললে না প্রথমে। তারপর একটু থেমে বললে—কলকাতার ছেলে, মেজাজ তো দেখছি খুব গরম—

কাবুল বললে—মেজাজ গরম হবে না? আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি, পয়সা দিয়ে খাব, খেয়ে চলে যাব, কারোর তো কথার ধার ধারিনে—

লোকটা বললে—বাঃ এ যে দেখছি গায়ে পড়ে ঝগড়া—কী এমন বলেছি তোমাদের শুনি?

কাবুল বললে—আপনিই তো বললেন, পদ্ম-ঝি এখানে নেই—হাজারি ঠাকুর কা'র নাম?

লোকটা বললে—তা কি এমন অপরাধ হয়েছে তাতে?

কাবুল বললে—অপরাধ হয়েছে কিনা যদি বুঝতেন তাহলে আর হোটেলে বসে খাতা লিখতেন না—বিভূতিবাবুর মত উপন্যাস লিখতেন আর এই হোটেলের মালিক হতেন—

লোকটা বললে—উপন্যাস?

কাবুল বললে—খাতা লিখছেন খাতাই লিখে যান। উপন্যাসের কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো না—

পেছন থেকে যদু ডাকলে—ভাত দেওয়া হয়েছে বাবু, খেতে আসুন—

ক্ষিধেও পেয়েছিল তখন খুব।

কাবুলকে বললাম—চল্, খেয়ে উঠে বিভূতিবাবুকে বলবো, আপনার হোটেলের সব ভাল মশাই, কিন্তু মুহুরিটা তেমন সুবিধের নয়, আপনি যে উপন্যাস লেখেন তা-ই আপনার মুহুরি জানে না—

মুড়িঘণ্ট দিয়েছিল। দুরকম ভাজা! মাছ ভাজা আর পটল ভাজা। চালটা একটু মোটা। তা হোক, যুদ্ধের সময় এর চেয়ে ভাল চাল কোথায় পাবেন। সাহিত্যিক না হয়ে অন্য মালিক হলে ঠকিয়ে ছাড়ত! এর থেকে ভালো খাওয়া কি বাড়িতেও খাই আমরা! খেয়ে উঠতেই দু'খিলি পান।

যদু বললে—খেয়ে উঠে একটু গড়াবেন নাকি ও-ঘরে? আপনাদের ট্রেন তো সেই তিনটে বেয়াল্লিশে—

কাবুল বললে—মাফ করো বাবা, তোমাদের ওই মুহুরিটির সামনে আর যাচ্ছিনে—নীরেট মুখ্যু লোক একটা—চলো বিভূতিবাবুকে গিয়ে বলতে হবে—

আমরা বিভূতিবাবুর ঘরে যাবো এমন সময় হৈ হৈ পড়ে গেল। স্টেশনের দিকে ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ শুনতে পেলাম।

যদু বললে—ওই বনগাঁ লোক্যাল এসে গেছে—

বলেই দৌড়লো সদরে। আর দেখতে দেখতে পিল্ পিল্ করে লোক আসতে লাগল। বনগাঁ লোক্যাল নাকি লেট্ ছিল। হোটেলময় সাড়া পড়ে গেল। এতক্ষণ যে-হোটেল খাঁ খাঁ করছিল, তাই-ই আবার কলমুখর হয়ে উঠল এক নিমেষে।

বিভূতিবাবুর চীৎকার শোনা গেল ও-ঘর থেকে—ওরে, দু নম্বরে দুটো ফাস্ ক্লাস, চোদ্দটা সেকেন ক্লাস—আর পাঁচ নম্বরে তেরটা সেকেন ক্লাস, শিগ্গির—

বিভূতিবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি, সেখানে তখন গিস্ গিস্ করছে লোক। পোঁটলা-পুঁটলি তোরঙ্গ সুটকেশ-এ ভর্তি হয়ে গেছে ঘর। বিভূতিবাবুও ব্যস্ত। প্যাসেঞ্জাররা গায়ের জামা খুলছে। হাত-মুখ ধোবে, স্নান করবে। যদু একবার আসছে এ-ঘরে, আর একবার বেরিয়ে যাচ্ছে!

—কই গো, তোমাদের কলঘরটা দেখিয়ে দাও তো!

—ওহে, যদু না মধু, বলি ফাস্ ক্লাস ক্লাস কত করে তোমাদের হোটেলে?

—ওহে, চৌবাচ্ছায় জল নেই যে তোমাদের। জল দাও—বলি বিনা পয়সার জল বলে এঁটো হাতে থাকবো নাকি?

অনেক গোলমাল, অনেক ঝামেলা। তখন আর বিভূতিবাবুর সঙ্গে কথা বলবার ফুরসৎ নেই, কত কথা বলবো বলে এসেছিলাম, সব নষ্ট হল। বনগাঁ লোক্যাল লেট্ হওয়াতে সময়ের সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল।

তিনটে বেজে গেছে।

কুলির মাথায় মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসবার পথে বিভূতিবাবুর কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, যে-মানুষটি এমন

গল্প লেখে সে-মানুষটি আবার এমন করে হোটেল চালায় কেমন করে!

কাবুলে বললে—দেখলি না, অত গোলমালের মধ্যেও কেমন নির্লিপ্ত-নির্লিপ্ত ভাব —কেমন যেন একটা নিঃসঙ্গ-নিঃসঙ্গ চোখের দৃষ্টি! কোনও দিকেই যেন খেয়াল নেই—টাকা-পয়সার দিকেও তেমন নজর নেই, যা করে ওই মুহুরি বেটা—! বিভূতিবাবুকে ভালো মানুষ পেয়ে মুহুরিবেটা নিশ্চই টাকাটা-সিকেটা সরায়—

এর পর আর কখনও রাণাঘাট হিন্দু হোটেলে ওঠা হয়নি। এর পর কলকাতায় বোমা পড়ল। কলকাতা থেকে লোক পালাতে শুরু করল। তখন রেলে চাকরি নিয়ে চক্রধরপুরে চলে গেলাম আমি। বিয়ে করলাম। দুর্ভিক্ষ হল পঞ্চাশ সালে। লেখার কথাই মন থেকে মুছে ফেললাম। আর আমিও রেলে ঢুকলাম, ওদিকে সেই সময়ে কাবুলেও মিলিটারিতে চাকরি নিলে। তার 'বিধিলিপি'ও আর শেষ হল না। শেষ হয়ও নি। বই-এর জগৎ আর সাহিত্যের জগৎ থেকে চির-বিদায় নিয়ে আমি চাকরি করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে সবই ভুলে গেলাম। কারা লিখতো, কীরকম লিখতো, কার লেখার কীরকম চাহিদা ছিল, তাও ভুলে গেলাম! শেষে যখন বহুদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম, তখন দেখি আবহাওয়া বদলে গেছে। যার নাম ছিল না সে নাম করেছে, যার নাম ছিল তার নাম ডুবেছে। সাহিত্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসে কত যোগ্য-অযোগ্যের পাকাপাকি স্থান-নির্ণয় হয়ে গেছে তারও আর ইয়ত্তা নেই বুঝি!

এতদিন পরে আবার সাহিত্য-জগতের সংস্পর্শে এসে পুরোন কথা সব মনে পড়তে লাগল।

বিশুকে বললাম—বিভূতিবাবু ট্রেনে আসবেন না মটরে আসবেন?

বিশু বললে—এই ট্রেনেই তো যাচ্ছেন—প্লাটফরমে নেমে দেখা হবে সকলের সঙ্গে—

জিজ্ঞেস করলাম—বিভূতিবাবুর সেই ভাতের হোটেলটা আছে এখনও—?

বিশু জানত না।

বললে—ভাতের হোটেল? বিভূতিবাবুর?

বললাম—বাঃ, সেই হোটেলে গিয়ে খেয়ে এসেছি আমি আর আমার ভাগ্নে—খুব অমায়িক লোক সত্যি—অত হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যেও কেমন করে যে লেখেন অমন, আশ্চর্য!

বিশু বললে—ও'র লেখা যেমনি মিষ্টি, মানুষটাও তেমনি মিষ্টি—

খানিক পরেই ট্রেন এসে থামল ঘাটশিলা জংশনে। বেলা তখন প্রায় তিনটে। পিল্ পিল্ করে লোক নামতে লাগল ট্রেন থেকে। চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা গেল কারা মীটিং-এর লোক, আর কারা নয়।

বিশু সকলকেই চেনে। তার আলাপ সকলের সঙ্গে। সব সাহিত্যিক তার হাতের মুঠোয়। এর সঙ্গে কথা বলে, ওর সঙ্গে রসিকতা করে।

কাউকে বলে—এই যে এসে গেছেন দেখছি—

আবার কাউকে বলে—কোন্ কমারায় ছিলেন? হাওড়ায় আপনাকে খুঁজলুম......

প্লাটফরমে নেমে অবিনাশ ঘোষাল, বিশু আর আমি পাশাপাশি চলেছি। আমি কেবল খুঁজছি কোথায় বিভূতিবাবু। সেই চেনা মুখখানা খুঁজছি সকলের চেহারার মধ্যে। কোথাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ বিশু কাকে দেখে বলে উঠলো—এই যে বিভূতিবাবু—

তারপর পায়ের দিকে চেয়ে বললে—এ কি, আপনি হলেন সভাপতি আজ, আর আপনার জুতোয় কিনা তাপ্পি...আপনি দেখছি...

বিভূতিবাবু! বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়! আমি যেন সামনে তখন ভূত দেখেছি।

বিশু বললে—এই একে চেনেন—

বিভূতিবাবু আমার দিকে চাইলেন এবার।

বিশু বললে—চিনতে পারছেন না? এর নাম বিমল মিত্তির, আপনার ভাতের হোটেলে গিয়ে নাকি খেয়ে এসেছে—

—ভাতের হোটেল? আমার ভাতের হোটেল?

বিভূতিবাবু আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন যেন।

আমি হঠাৎ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

বললাম—আমাকে ক্ষমা করুন আপনি—

বিভূতিবাবু বললেন—কেন হে, ক্ষমা করতে যাবো কেন তোমাকে মিছিমিছি—কী করেছ তুমি?

তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম সব।

বিভূতিবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন।

বললেন—ও, তাই বলো, আমাদের অম্বিকা, অম্বিকা একটা হোটেল করেছিল বটে রাণাঘাটে, ওর হোটেলটা নিয়েই লিখেছিলুম আমার 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'—নিজের বইখানাই ওকে পড়তে দিয়েছিলাম মনে পড়েছে—তা আমায় তো সে কিছু বলেনি!

বলে আবার বিভূতিবাবু প্রাণখোলা হাসি হাসতে লাগলেন। আর সেই হাসির মধ্যেই আমি যেন দেখতে পেলাম অপুকে—দেখতে পেলাম হাজারি ঠাকুরকে, দেখতে পেলাম এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিককে!

চীজব্রো-পণ্ড্স ইন্‌ক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

P 7729

রাণুর মেজকা

গৌরকিশোর ঘোষ

আমার কোন ভাইঝি নেই। সেজন্য দুঃখ ছিল না। আফসোস হয়ত করতামও না, যদি না রাণুকে জানবার সুযোগ পেতাম। রাণুকে জানা ইস্তক বুঝেছি, এ সংসারে রাণুর মত ভাইঝি না থাকাটা একটা পাকা রকমের লোকসান।

কেন বলি। সংসারটা স্বভাবতই বড় কড়া নিয়মের ভক্ত। এখানে যার যার জন্য যে কাজটি বাঁটা সেটি ঠিকমত না করলেই বিপর্যয়। আমাদের বয়স যত বাড়ে, আমরা এই বাঁধা নিয়মটির তত বশীভূত হয়ে পড়ি। সংসারের নয় দায়িত্ব নিয়ম মাফিক পালন করতে করতে এক সময় আমাদের অজান্তেই আমরা কাঠ পুতুলে পরিণত হই।

এমন সময় মূর্তিমান উৎপাতের মত রাণুদের আবির্ভাব ঘটে। যেটা তার করবার সেটা করে না, যেটা না করবার কথা তার জন্যই তার বড় মাথাব্যথা দেখা যায়। অতি সহজে সে অনাসৃষ্টি ঘটায়।

রাণুর নিজের জবানিতেই বলি: মেজকা, রাণু হয়েছে বাড়ির আতঙ্ক। 'ওরে ওই বুঝি রাণু ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে—রাণু বুঝি মেয়েটাকে তেল দুধ খাওয়াতে বসেছে, দেখি দেখি—তোকে কে এত গিন্নীপনা করতে বললে রাণু?' হাঁ মেজকা, এত বড়টা হলুম (রাণুর বয়স তখন কুলো আট), দেখেছ কখনও আমায় গিন্নীপনা করতে—কক্‌খনও—একরত্তিও? ......আমরা সব বলে বলে তো হয়রান হয়ে গেলাম মেজকা, যে বিয়ে কর, বিয়ে কর। তা শুনলে গরিবদের কথা? রাণু কি তোমায় চিরদিনটা দেখাতে শুনাতে পারবে মেজকা? এর পরে তার নিজের ছেলেপুলেও মানুষ করতে হবে তো? মেয়ে আর কতদিন নিজের বল?'

রাণুর সঙ্গে প্রথম আমার যখন দেখা হয়, তখন বিয়ের বয়স আমার হয়নি, তবুও কল্পনা করেছিলাম সেদিন, আহা রাণু এসে গিন্নীর মত কেন আমাকে উপদেশটা দিল না। এমন কি আজও, যদিও আমি আর অকৃতদার নই, আজও এসে রাণু যদি পাকামি করে আমাকে ঐ উপদেশ দিতে থাকে তাহলেও যেন কৃতার্থ হয়ে যাই।

রাণুদের অকালপক্কতায়, তাদের গিন্নীপনায়, অসম্ভব দুষ্টামিতে সংসারটার বাঁধা নিয়ম বড় জোরে ঝাঁকি খায়। আমরা একটু মুখ বদলে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। পরিবেশটা মধুর হয়ে ওঠে, কখনও কখনও করুণও। এই সরসতার ছোঁয়া লেগে আমাদের স্তিমিত মন সজীব হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে রাণুদের মত সৃষ্টিছাড়াদের অস্তিত্ব খুবই প্রয়োজন। ঈশ্বরের

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টি এত বড়, তার কোন প্রান্তে কোন রাণু বসে বসে তার মেজকার খবরদারি করছে, আমি তা বলতে পারিনে।

তবে এইটুকু বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যে রাণুকে হাতে ধরে প্রবেশ করিয়েছেন তার মেজকা, বিভূতিভূষণ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

দুই

এই বিশ্বে আমরা যে সংসারটা পেতে বসে আছি তার মধ্যে পরম একটি প্রশ্রয় লুকিয়ে আছে। সন্ধানী মন ছাড়া তাকে কেউ খুঁজে বের করতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসাবে আমাদের পরম সৌভাগ্য এই যে 'রাণুর মেজকা' বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তা আপনা হতেই ধরা দিয়েছে।

প্রশ্রয় দিতে বিভূতিভূষণ কার্পণ্য করেন না বলেই এই বিশ্ব সংসারটা শিশুর রূপ ধরে নির্ভয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে আসে, অসংকোচে মনটাকে মেলে ধরে। বাক্‌ভারে সংলগ্নতা না থাকতে পারে কিন্তু মিষ্টি-মধুর ছন্দ তাতে আছে, তুই তো অন্তর্-কর্ণী।

বিভূতিভূষণের রচনার প্রধান উপকরণ এই অনাবিল রসভাষ। তাই তিনি আমাদের বহু সংগ্রামের দগ-কাটা মনে এমন স্ফূর্তিময়ী স্নিগ্ধ আনন্দের সঞ্চার করতে সহজে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর সংসারে শিশুরা যে পরিমাণ পাকা, বয়স্ক লোকেরা সেই পরিমাণেই ছেলে-মানুষ। আর বিভূতিভূষণের চিরন্তন পিতৃত্ব মনটি সমান উৎসাহে সকলকেই প্রশ্রয় দিয়ে যায়। মুখে নির্বিকার এক মুখোশ এঁটে তাঁর স্নেহময় মনটি আগ্রহের উজ্জ্বল দীপ জ্বেলে অবালবৃদ্ধবনিতার বাচালতা উৎকর্ণ হয়ে শোনে, অনাসৃষ্টি কাজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করে। এই ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বোধ করি বিধাতার মতই নির্লিপ্ত, তেমনই নিরপেক্ষ। আট বছরের অকালপক্ক গৃহিণী রাণু আর কলহপ্রিয়া প্রৌঢ়া গোবিন্দ মাসী কিম্বা বাচাল বন্ধু স্বরূপ মণ্ডল আর ভাগ্যবন্ত গণশা-ঘোতনা-গোরা-

চাঁদ এন্ড কোং অথবা শ্লথগতি কালিঘাট ফলতা রেল আর দামাল দুরন্ত নদী কুশী, কারো প্রতি তাঁর পক্ষপাত নেই অথবা পক্ষপাত সকলের প্রতিই

এদের স্বভাবজ আজগুবি সব ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে সংসারটাকে আর সমীহ করার বস্তু বলে মনে হয় না। এ যেন এক প্রকাণ্ড খেলাঘর। এই খেলাঘরে কেউ শিশু, শিশু খেলা করছে, কেউ বা সেজেছে বড়ঃ ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী, বর বধূ, বরযাত্রী, রেলযাত্রী। ইস্তক একটা খামখেয়ালী দামাল মেয়ে কুশী হয়ে নদী নদী খেলে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত কাণ্ড!

হাঁ, এই চিরন্তন এক দস্যি মেয়ে বিভূতিভূষণের চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নানা রূপে নানা পরিবেশে তাকে এ'কে গেছেন বিভূতিভূষণ। এ'কে এ'কে তাঁর যেন আশ মেটে না, তেমনি ক্লান্তিও আসে না।

কত রকম দুষ্টুমিই না এরা জানে?

১৯১৫-১৬ সাল থেকে কলম ধরেছেন বিভূতিভূষণ, আর এই ১৯৫৯-এ এসেও সে কলমের কালি শুকোতে দেননি। কিন্তু তবুও কি সেই দুষ্টু মেয়েটার স্বরূপ ধরতে পেরেছেন?

'রাণুর প্রথম ভাগ-এ সে আট বছরের পাকা গিন্নী হিসেবে জন্ম নেয়। তারপর ক্রমাগত সে রূপ বদলেছে।

'পীতু' গল্পের টরটরে মেয়ে ছবি-র মধ্যে সেই রাণুরই আরেকটি দিক যেন দেখতে পাই। মেজকাকার জ্ঞানগম্যির অভাব দেখে ছবির যখন ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, "ভগবানের পায়ে বুঝি কাদা লাগে? কি বুদ্ধি তোমার মেজকা?" তারপর একটু চিন্তা করে যখন বলে "ভগবানের পায়ে কাদাও লাগে না, হাতে কালি লাগে না, সাবান মাখলে চোখ জ্বালা করে না, বিষ্টিতে ভিজলে সর্দি করে না, ওরা সব যে ভগবানের চাকর, মশাই;"—তখন যেন রাণুর কণ্ঠস্বরই নতুন সুরে বেজে ওঠে।

কিম্বা 'শ্যামল-রাণী" গল্পের সুধা বিয়ের আগে বরের কাছে চিঠি লিখে বরকে দিয়ে তার পেয়ারের বাছুর শ্যামলীকে বাগাবার যে ফন্দি বের করেছিল, সেই সুধার চিঠিখানা পড়লে, রাণুর দুষ্টু বুদ্ধির কথাই মনে পড়ে। সুধা লিখেছিলঃ

"প্রণামবেহম নিবেদনমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

তোমার সহিত আমার বিয়ে ঠিক হইয়াছে। আমি খুব ভাগ্যবান। কিন্তু শ্যামলরাণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। অতএব মহাশয় বিয়ের সময় শ্যামলী চাই বলিয়া বেঁকে বসবেন। না হইলে আমি আপিম খাইয়া মরিব। আপিম আমার শাড়ির আঁচলেই বাঁধিত থাকিবে। নোট

গেরো তুমি দেখিতে পাইবে। এতে দোষ হয় না। নেতা-পিসিদের বরও সেদিন একটা ঝাড় লালঠেম চাই বলে বেঁকে বসেছিল। নিয়ে ছাড়িল। মা বলেন, জিদই পুরুষের লক্ষণ। এ নিমাই। নিমাই আমায় প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। সেই এ চিঠি লিখে দিয়েছে। আমি অবলা নারী লেখাপড়া জানি না। শ্যামলী ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। নিমাই ভয়ঙ্কর বিদ্বান আর খুব ভাল ছেলে তোমাদের ইস্কুলে 6th Class-এ পড়ে। প্রণাম জানিহ। ইতি

অভাগিনী
Sudha
সুধাময়ি দাসী।"

চিঠি যেই লিখুক, মনে হয় যেন, এর পিছনে রাণুরই নিপুণ হস্তাবলেপ রয়েছে। এ রকম উদাহরণ আরও পাওয়া যাবে। "ধর্মতলা-টু-কলেজ স্কোয়ার"-এর ট্রামে চড়া কলেজে পড়া মেয়ের থেকে "দুয়ার হতে অদূরে"র আমতলা হাটে দেখা নিরক্ষর চাষী দোজবরে গুপীর তরুণী-ভার্যা নারায়ণী পর্যন্ত সব শ্রীমতীই এক সুরে বাঁধা।

আর রাণু তো তারই গৌরচন্দ্রিকা।

তিন

বিভূতিভূষণ বলেছেন, দেশের সমস্যা-মন্থর হাওয়াটাকে হাল্কা করাই তাঁর লেখার মিশন। বিভূতিভূষণের রচনার চরিত্র বিচারে একথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয়। অস্বীকারের কোন পথ তিনি তো কোথাও রাখেন নি। পরিহাস একটি ধর্ম, সে বিষয়ে আমার অন্ততঃ কোন সন্দেহ নেই। এবং এ ধর্মটি প্রচারের দায়িত্ব বিভূতিভূষণ পাকা মিশনারির মতই পালন করেছেন। ঘরোয়া পরিবেশে, সাধারণ সংলাপে এবং অতি সাধারণ চরিত্রের কার্য-কলাপেও মাঝে মাঝে যে কি অসাধারণ হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বিভূতিভূষণ বারবার তা আমাদের দেখিয়ে-ছেন।

আচ্ছা, ত্রিলোচনের বিয়ের ঘটনাটাই ধরুন। "শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘর স্মরণ করিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে বলিতেছে, বাপ রে, দফা সারলে আজ! তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বন্ধু-বর্গ। একটু দূরে কর্তারা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ—কম-বেশি করিয়া। সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, তিনি কতশত জায়গায় বর-যাত্রী গিয়েছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই।......কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্প-বিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর; বরপক্ষীয়েরাই বরং অতিশয় ভদ্র...... এ গ্রামে এরকম বরযাত্রী আর আসে নাই। ......কথাটা অমায়িক মৃদু-হাস্য, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় আরম্ভ হইয়া-ছিল; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল এবং একটা জেদা-জেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, কেমনতরো লোক আপনারা মশাই? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মত ভদ্রলোক দেখিনি, তা কোনমতেই মানবেন না? ভারী জ্বালা তো! ......ওদিককার একজন তাঁরই মত ভারী আওয়াজে উত্তর করিল, আর আমাদের কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহলে মশাই? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হলাম? ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুণে দেন তো, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকের মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিতে যান।"

এই হল বিভূতিভূষণের মিশনের একটি নমুনা। তাঁর সমগ্র রচনায়, কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি ভ্রমণ-কাহিনীতে এই ধরনের নিদর্শন অজস্র ছড়ান আছে। গণশা-ঘোতনা-গোরাচাঁদের আরও অজস্র কীর্তি কাহিনীতে আছে, আছে গুপী-নারাণী-

পাণ্ডবদের কথায়। আর এর উপরেও যাঁরা যেতে চান, তাঁদের স্বরূপে মণ্ডলেশ্বর গল্পগুলো পড়তে অনুরোধ করি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার বিষয়। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও কৌতুক রচনা লিখে যাঁরা উপরের ধাপে পৌঁছে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত চারজনের সঙ্গে বিহারের যোগ খুব নিবিড়। কেদার বাঁড়ুজ্জে, বিভূতি মুখুজ্জে আর বনফুল তো বিহারের বাসিন্দাই। পরশুরামেতেও সেখানকার স্পর্শ আছে। কেন এমন হয়?

বিভূতিভূষণ বলেছেন, বাংলা দেশের মাটি বড় ভিজে এবং মন বড় অশ্রুসিক্ত। বিহারের টান মাটি এঁদের মন থেকে জলীয় উপাদান সম্ভবত কিছু সরিয়ে মনটাকে ঝরঝরে করে দিয়ে থাকবে। এবং এঁদের পরিহাসপ্রিয়তা হয়ত সেই কারণেই সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। হতে পারে, এ আমার আজগুবি কল্পনা।

চার

সহজ পরিহাসপ্রিয়তা যে এই গাম্ভারী, স্বল্পবাক, কৃশ মানুষটির অন্তরে জমাট বেঁধে আছে, বিভূতিভূষণকে দেখলে কে একথা বিশ্বাস করবে? এমন হতে পারে, অনিচ্ছুক রাণুকে প্রথম ভাগে পাঠ দেবার সময় মেজকাকে স্নেহার্দ্র হৃদয়টি ঢাকা দিয়ে রাখতে গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছিল।

বিভূতিভূষণের নিজের কথাতেই বলিঃ 'কর্তব্যজ্ঞানটা সমস্ত দ্বন্দ্বগুলোকে প্রভূত্বে করিয়া প্রবীণ গুরুমহাশয়ের বেশে আমার মধ্যে জাঁকিয়া আসিয়া বসে। সনাতন যুক্তির সাহায্যে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা নিরাকরণ করিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক দিই, রাণু।' কিন্তু এটা যে মেজকার ছদ্মবেশ, সেটা ধরে ফেলতে রাণুর বিশেষ বিলম্ব হয় না। কারণ রাণু জানে, 'শাস্তির কথা ভুলিয়া তাহার মনের গ্লানিটুকু মুছাইয়া দিবার জন্য একটি মেজকার হৃদয় সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছে।'

আমার ধারণা, ঠিক এমনই একটি হৃদয় বাংলা দেশের জন্যও প্রস্তুত করে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। যাঁরা তাঁর দুয়ার হতে অদূরে পড়েছেন, তাঁরা সামান্য প্রয়াসেই আবিষ্কার করতে পারবেন, বিভূতিভূষণ যে চোখে রাণুকে দেখেছেন, বাংলা দেশের গ্রাম-প্রান্তর বন-জঙ্গলকেও সেই একই চোখে দেখেছেন, আর উভয়েই সমান প্রশ্রয় পেয়ে তাঁর গাম্ভীর্যের মুখোশটাকে একটানে খুলে দিয়েছে। বিভূতিভূষণের কাছে রাণুর আর ভুবনের যেন একই অর্থ।

তাই তো বলছিলাম, যতদিন রাণুকে জানিনি, ততদিন আফসোস করিনি। রাণুর পরিচয় পাওয়া অবধি মনে হয়েছে, রাণুহীন সংসারটা একটা বোঝা-ই মাত্র।

স্বরাজ্যে স্বরাট

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তখন কেবল দেশ বিভাগ হয়েছে, কিন্তু পাসপোর্টের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়নি। শুধু কাস্টমসের দুটি ঘাঁটিতে ঘণ্টা দুয়েক বিড়ম্বনা সহ্য করেই দার্জিলিং মেল সোজা শিলিগুড়িতে গিয়ে পৌঁছুত।

তারই একটি দীর্ঘ স্লিপিং কোচে এক-জন কাস্টমস্ অফিসারের আবির্ভাব হল রানাঘাট স্টেশনে। আর জনৈক যাত্রীর সুটকেসে আবিষ্কৃত হল কয়েকটি পেনি-সিলিন এবং স্ট্রেপ্টোমাইসিন।

কাস্টমস্ অফিসার একটু কড়া ধাঁচের লোক। বললেন, আপনাকে নামতে হবে।

ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, সামান্য কটা ওষুধ—বাড়িতে অসুখের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি, কেন গণ্ডগোল করছেন এ নিয়ে?

একটু পরেই ব্যাপারটা হয়তো মিটে যেত, কিন্তু গোল বাধালেন একজন তৃতীয় ব্যক্তি। এস. ডি. ও ছিলেন, সবে রিটায়ার করেছেন, কিন্তু হাকিমি অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি তখনো। [illegible] একটি আপত্তি [illegible] থেকে তিনি [illegible] বললেন, নামালেই হল ট্রেন থেকে? [illegible]

তরুণ কাস্টমস্ অফিসার ক্ষেপে গেলেন। পুলিশ ডাকলেন তিনি। প্রাক্তন এস ডি ওকে শুদ্ধু টেনে নামালেন গাড়ি থেকে। এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং।

কুৎসিত অবস্থা একটা।

আমার পাশের বার্থের সহযাত্রীটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। ব্যাপারটা চরমে পৌঁছেছে দেখে তিনি বললেন, দয়া করে আমার দু একটা কথা শুনবেন আপনারা?

পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি বললাম, ইনি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফল হল অদ্ভুত। সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে তাঁর দিকে ঘুরে গেল। কাস্টমস্ অফিসার উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, হি ইজ দি মোস্ট রেসপেক্টেবল্ প্যাসেঞ্জার ইন দিস ট্রেন। এঁর কাছেই আমি সত্যিকারের বিচার চাই।

তিন মিনিটের মধ্যে সব সমাধান হয়ে গেল।

জীবনে অনেক সম্মান এর পরে পেয়েছেন তারাশঙ্কর। রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদামী পুরস্কার, সর্বভারতীয় লেখকদের নেতা-রূপে সেদিনও তিনি তাশখন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেই আবেগমুগ্ধ কণ্ঠস্বরটি আমার কানে এখনো বাজছেঃ হি ইজ দি মোস্ট রেসপেক্টেবল্ প্যাসেঞ্জার ইন দিস ট্রেন। আমার মনে হয়, এর চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় তারাশংকর আর কখনো পাননি।

দেশের মানুষ তারাশংকরকে শ্রদ্ধা করে। প্রিয় লেখকরূপে প্রীতি অনেকেই পান,

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু অসাধারণ একটি ব্যক্তিত্বরূপে এমন অসামান্য শ্রদ্ধা বাংলা দেশের খুব সামান্য কজন লেখকই পেয়েছেন। তারাশংকর সেই ভাগ্যবানদের একজন।

এই শ্রদ্ধার উৎস কোথায়?

স্রষ্টা হিসেবে তারাশংকর অমিত শক্তিমান। কিন্তু এই শক্তি তাঁর উপন্যাস বা ছোট গল্প রচনায় শিল্পগত সাফল্যের মধ্যেই সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টির মধ্যে, একটি পরিপূর্ণতার ভেতরে।

পৃথিবীর প্রধানাংশ লেখকই কেমন করে লিখতে হবে সেকথা জানেন, কিন্তু কী লিখতে হবে সে-কথা ভালো করে জানেন না। জীবনকে নানাদিক থেকে প্রকাশ করা যায়, সমালোচনা করা চলে, তার সামান্য একটি সংকেতকে আশ্রয় করে পরমাশ্চর্যের ব্যঞ্জনা আনা যায়। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আর এক পৃথিবী, জীবনের ভেতর আর এক জীবনকে গড়ে তুলতে পারা—ইংরেজিতে যাকে বলে "creating one's own world", তা-ই হল মহৎ শিল্পীর নিরিখ। বিশ্বনীতির মতো লেখকের জীবনদর্শন সেই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই নিয়মের ব্যত্যয়ে সেখানে ট্র্যাজেডীর সৃষ্টি হয়, তারই অনুগত্যে সেখানকার মানুষ মানসিক পরি-তৃপ্তি লাভ করে। ঈশ্বরের জগৎকে নকল করা নয়, তাকে ব্যাখ্যা করা নয়, তার ভেতরে স্বয়ংবৃত্ত স্বায়ত্তশাসন, পৃথিবীর সমুদ্রে ব্যক্তিত্বের প্রবাল-বলয়িত একটি লেগুন। তলস্তয়ের জগৎ, রবীন্দ্রনাথের জগৎ, এমন কি হার্ডি, উইলিয়াম ফকনারের জগৎ। যে কোনো মহান লেখকেরই সমগ্র সৃষ্টি এমনি একটি পরিপূর্ণ সাম্রাজ্য, একে গড়ে তোলবার জন্যই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা।

তারাশংকর এই দলের। তার অর্থ এই নয় যে তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথের তিনি সম-শ্রেণীয়; হার্ডি-ফকনারের মহিমাও তাঁর মধ্যে প্রত্যাশা করলে অন্যায় হবে। কিন্তু জীবিত বাঙালী লেখকদের মধ্যে তারা-শংকরই একমাত্র ঔপন্যাসিক, যিনি ধ্রুব সাহিত্যের ধ্রুবপদে তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পেরেছেন। তিনিও একটি নিজস্ব

ভৌগোলিক এবং মানবিক জগতের ভাগ্য-বিধাতা।

তারাশঙ্করের এই জগতে সকলেই মনের আশ্রয় অনুভব করবেন কিনা জানি না। ফকনারের জগতে, তাঁর স্যাংচুয়ারির পৃথিবীতেই বা ক'জন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবেন? ওটা ব্যক্তি এবং মানসিকতার ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু একথা বলতেই হবে 'চৈতালি ঘূর্ণি'র নীহারিকায় যার সূত্রপাত, 'বিচারকে'র নিশ্চিত বক্তব্যে তার পরিপূর্ণ গ্রহরূপ। স্বরাজ্যে তারাশঙ্কর স্বরাট। এইখানেই তাঁর আসল মহিমা।

যতদূর মনে পড়ে, তারাশঙ্করের প্রথম গল্পের সংগে পরিচয় হয়েছিল স্কুল জীবনে। লেখাটির নাম 'মধু মাস্টার', বেরিয়েছিল 'বঙ্গশ্রী'তে। এমন কিছু আকর্ষণ করেনি। চমক লাগল আরো কিছুদিন পরে।

আজকের এই 'দেশ' পত্রিকা তখন আয়তনে বিরাট, দামে অসম্ভব সস্তা। চার টাকা চালের মণের দিনেও সে সুলভতা বিস্ময়কর। তখন সবে কলেজে পা দিয়েছি এবং আমার প্রচুর পদ্য-প্রলাপ নির্বিচারে 'দেশের' পাতায় মুদ্রিত হচ্ছে। সেই সময় 'দেশে'র কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রথম আবিষ্কার করলাম তারাশঙ্করকে—তাঁর 'নারী ও নাগিনী' গল্পে।

কী সে রোমাঞ্চ। কী বিস্ময়।

সেদিন নবাগত তারাশঙ্করের আত্মপ্রত্যয় জাগেনি। সেদিন তাঁর সংশয় ছিল, হয়তো পাঠকের কাছে এই বিচিত্র জৈব গল্প অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। তাই গল্পের কয়েকটি ডিটেল সম্পর্কে তিনি বোধ হয় একটুখানি ভীরু পাদটীকা জুড়ে দিয়েছিলেন, যেন বলেছিলেন, 'সাপুড়িয়াদের মুখে শুনিয়াছি—'

কিন্তু কী প্রয়োজন ছিল তার? কোনো বিশেষ সময়ে সাপকে আকর্ষণ করবার জন্যে সাপিনীর গা থেকে কোনো বিচিত্র গন্ধ বেরোয় কিনা—সে বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেবার কোনো আবশ্যকই স্রষ্টার ছিল না। আগাগোড়া গল্পটিকে তারাশঙ্কর এমন আশ্চর্য সুরে বেঁধেছিলেন, রেখায় রেখায় এমন অপরূপ চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ইঙ্গিতে সংকেতে এমনি একটা উদগ্র আদিমতাকে রূপায়িত করেছিলেন যে, ওই পাদটীকাটুকু তাতে ছন্দ পতন ঘটিয়েছিল। পরবর্তী কালে শক্তি-সচেতন তারাশঙ্কর ওটি বর্জন করেছেন। ভালোই করেছেন।

এই 'নারী ও নাগিনীই' তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে একটা মৌলিক সত্যকে প্রকাশ করে। তাঁর বিশেষ ধরনের পটভূমি, তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির আশা-নিরাশা-কামনা-ব্যর্থতা—এমন স্বতন্ত্রতা আর অপরিচয়কে বয়ে আনে যে পাঠককে চমকে উঠে বলতে হয়: 'এরকম মানুষ আছে নাকি আমাদের দেশে? আর এই জীবন?'

এরা যে আছে—এমনি একটা জীবন যে সত্য—তারাশঙ্করের প্রধানাংশ রচনাতে সেই কথাটাই জোরের সংগে প্রমাণ করতে হয়েছে—যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে ফকনারকে তাঁর 'Yoknapatawpha County'-র অস্তিত্ব। তারাশঙ্করের শক্তির লীলা যেখানে সবচাইতে স্বচ্ছন্দ, সেখানে ফকনারের সংগে তাঁর কিছুটা আত্মিক সংযোগ অনুভব না করেই উপায় নেই।

'নারী ও নাগিনী' লিখবার সময়েই তারাশঙ্কর জানতেন তাঁকে অনেক বেশি

জোরের সংগে বলতে হবে। তাঁর গল্পের স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্য—তাঁর গড়া চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য—সহজে এদের কেউ মেনে নেবে না—মানাতে হবে তাঁকেই। ডোমের ছেলে কবিয়াল নিতাই, বেদের ঘরে মানুষ পানু, হাঁসুলী বাঁকের করালী—সাহিত্যে এদের জায়গা করে নিতে হবে নিজের জোরেই। রাখাল বাঁড়ুজ্জে, পূর্ণ চক্রবর্তী কিংবা ডাইনি—সামান্য শক্তি দিয়ে এদের কাউকেই প্রত্যয়ের মধ্যে নিয়ে আসা চলবে না। এরা যে 'কিউরিয়ো' নয়—অতি স্পষ্ট বাস্তব, সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব তাঁরই।

কী পার্থক্য বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে! একজন আমাদের সকলেরই শৈশব আর কৈশোরকে কী আশ্চর্য সুন্দর করে ফুটিয়েছেন, আমাদের চির-চেনা বাংলা দেশকে কী রূপে রসেই ভরে তুলেছেন। আর একজন আমাদের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর থেকে আবিষ্কার করেছেন গূঢ়-নিহিত এক বিশাল মহাদেশকে—যা আফ্রিকার চাইতেও অন্ধকার—তার অরণ্যের চেয়েও হিংস্র।

অতি-পরিচিতের মধ্যে অপরিচয়ের মাধুর্য আরোপে তারাশংকরের শিল্পি-সত্তার উল্লাস নেই। অতি সূক্ষ্ম ইংগিতে মনঃসমীক্ষার গভীরে তিনি যেতে চান না; প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য-সুষমা তারাশংকরের ভাবলোকে উপস্থিত নয়। তারাশংকরের সাহিত্য-ভূমিতে একদিকে আদিমতার নগ্ন প্রকাশ—অন্যদিকে আদর্শবাদের সংহত প্রশান্তি। সব মিলিয়ে তারাশংকর বিশাল আর বিচিত্র। এত বস্তু-বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যে আর কারো লেখাতেই নেই। আর কোনো লেখকই একসংগে 'রাইকমল', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁক', 'নাগিনী কন্যা', 'পঞ্চ-পুত্তলি', 'আরোগ্য নিকেতন' বা 'বিচারক' লিখতে পারতেন না।

এই জন্যেই তারাশংকরের যে-কোনো উপন্যাসে পাঠক নতুনত্বের সন্ধান পাবেন। অভাবিত চরিত্র—অভিনব পরিবেশ। স্বভাব-সিদ্ধ নাটকীয়তায় আগাগোড়া কৌতূহলের সঞ্জীবতা। তারাশংকরের অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য ঈর্ষা করবার মতো। আর সে অভিজ্ঞতাকে গল্পের মাধ্যমে পরিবেষণ করার কাজেও তিনি অনন্য।

দূর থেকে তারাশংকরকে দেখলে মনে হয় তিনি স্বল্পভাষী, আত্মমুখ, সহজে তাঁকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যাবে, মানুষটি একেবারে অন্য জাতের। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য পাইনি—তাঁর জীবিতকালে আমরা নিতান্তই নাবালক। আমার অভিজ্ঞতায় তারাশংকরের মতো এমন বৈঠকী মেজাজের লেখক আমি আর দেখিনি। প্রীতিস্নিগ্ধ এবং সহৃদয় অনেকেই

আছেন—কিন্তু এমনভাবে গল্প জমাতে আর কেউ-ই পারেন না।

শুনেছি, তারাশংকর ভালো অভিনেতা। তাঁর অভিনয় কখনো দেখিনি—কিন্তু তাঁর মুখে গল্প শুনেছি অনেকবার। চোখে, মুখে, কণ্ঠস্বরে এবং বর্ণনায় সে গল্প যে কী জীবন্ত হয়ে ওঠে—যাঁরা কখনো শোনেননি—তাঁরা তা অনুমানও করতে পারবেন না। একবার একটি নিশি-পাওয়া মানুষের কাহিনী তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—বর্ণনার কৌশলে সারা শরীরে আমার রোমাঞ্চ জেগেছিল। পরে তাঁর 'বিচিত্র' বইতে গল্পটি পড়েছি, কিন্তু মুখে শোনার সেই স্বাদটি তাতে আর ততখানি পাইনি।

আমার মনে হয়, তারাশংকরের সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ এই নাটকীয়তা—এই থ্রিল। তারাশংকর জীবনের গূঢ়-গোপন রহস্য যতখানি আবিষ্কার করেন, তার চাইতেও বেশি আবিষ্কার করেন তাঁর নাটককে। এইজন্যেই তারাশংকরের উপন্যাস ঘটনা ও সংঘর্ষে মুখর। পাঠককে যতখানি মুগ্ধ করে—চঞ্চল করে তার চাইতেও বেশি। বুদ্ধি এবং দার্শনিকতার শান্ত বিস্তৃতির চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে উগ্র স্নায়বিক উত্তেজনা। এ-ও সাধারণ গুণ নয়। জীবনের নাটকীয় মুহূর্তগুলিকে উদ্ঘাটন এবং তাদের উজ্জ্বল বিন্যাসও অসাধারণ শক্তিমত্তারই অভিব্যক্তি।

'রাইকমল', 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন' কিংবা 'বিচারক'—'সপ্তপদী' পর্যন্ত প্রতিটি বইতে তারাশংকরের এই নাট্যগুণের দীপ্ত নির্ভুল প্রকাশ। শুনেছি তারাশংকরের নিজের সবচাইতে প্রিয় বই 'আরোগ্য নিকেতন'। মৃত্যুর এই কাব্যময় রূপকে আবহ-সংগীতের মতো রক্ষা করে তারাশংকর যে দ্বন্দ্ব এতে ফুটিয়েছেন এবং পরিশেষে জীবনমশাই ও প্রদ্যোত ডাক্তারের যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন, তার নাট্যরসই প্রতিটি পাঠক প্রধানত আস্বাদন করেন; তত্ত্বের আবেদন কতদূর পর্যন্ত পৌঁছোয়, জানি না।

জীবনের এই নাটকীয়তাকে আনুকূল্য করেছে অপূর্ব ডিটেলস এবং পারিপার্শ্বিক রচনার ক্ষমতা। কোনো উপন্যাস (কিংবা গল্পেও) যে দৃশ্যটি তিনি রচনা করেন, তার সজ্জায় এবং সমারোহে কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেন না। যে-কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতোই নানা ধরনের চরিত্র এবং নানা ঘটনা তিনি উপন্যাসে নিয়ে আসেন। কখনো কখনো পাঠকের কাছে মূল ঘটনাটির চাইতে পার্শ্বচরিত্র ও পার্শ্বঘটনাগুলিই বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। প্রধান কাহিনীর বক্তব্য যেমনই হোক—পরিবেশের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে।

তারাশংকরের সাহিত্যিক সফলতার এ-ও একটি বড় কারণ। 'কালিন্দী' উপন্যাসটিই ধরুন। কাল্পনিক ব্যাধিগ্রস্ত রামেশ্বরের কাহিনীতে নাটকীয়তা ও উৎকণ্ঠা এই উপন্যাসের ঐশ্বর্য নয়; পড়বার পরে পাঠকের মনে জেগে থাকে গল্পের সাধারণ মানুষগুলি—চরের বাসিন্দা সাঁওতালের দল; লেখকের রোমাণ্টিক কল্পনা নিয়ে গড়া 'রাঙাবাবু' তাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

'চৈতালি ঘূর্ণি'র নীহারিকা থেকে ক্রম-পরিণত হয়ে 'বিচারক'কে একটি সম্পূর্ণ গ্রহরূপে তারাশংকরের সাহিত্যে গড়ে উঠেছে, একথা গোড়াতেই বলেছি। তার জ্বলন্ত নিরবয়তা আছে 'নারী ও নাগিনী', 'অগ্রদানী' ও 'বেদিনী'তে, আছে 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে, 'নীলকণ্ঠে', 'আগুনে'। এই সব লেখায় মহানাগের বিষ-নিঃশ্বাসে জর্জরিত ছাতিফাটার মাঠের আগুনের হলকা আসে, শুকনো নদীর তপ্ত বালির উপর অসহ্য তৃষ্ণা এসে মুখ থুবড়ে পড়ে—আকাশে যেন পোড়া ছাইয়ের রাশি উড়তে থাকে। সেই অগ্নিদহনে-ভরা বিরাট প্রান্তরটি পার হয়ে এসে চোখে পড়ে 'রায়-

বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। সেখানে শ্রীহীন পরিত্যক্ত রংমহলে মৃত রায়েদের প্রেতাত্মা ছায়াশরীরী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বিশাল শূন্য দালানে নিঃসঙ্গ বিশ্বম্ভর রায়ের জুতোর আওয়াজ কালপুরুষের পদধ্বনির মতো শোনা যায়।

রুদ্র প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা আর অস্তগামী আভিজাত্যের নৈরাজ্যে তারাশংকরের শিল্প-চেতনা প্রথম পর্যায়ে বিমুখী। বাজে পোড়া তালগাছ কিংবা পত্রহীন কণ্টকময় বাবলা গাছের মতো কতগুলি মানুষ একদিকে তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে, আর একদিকে মৃত্যুযাত্রী অতীত তাঁর মমতার অভিসেচন লাভ করছে। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য তখনো ফুটে ওঠেনি।

কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যে পরিচয় তাঁর ঘটেছিল—তার ফলে ক্রমে তাঁর মনে একটা আদর্শ রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। গান্ধীবাদ ও বিপ্লববাদের প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে'। কিন্তু গান্ধীবাদের দিকেই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ক্রমশ 'পঞ্চগ্রামে' এসে দেবু পণ্ডিতের মাধ্যমে গান্ধীয়ান সোস্যালিজমের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারাশংকরের নীহারিকা-জগৎ ভৌতিক ও ভৌগোলিক হয়ে উঠেছে।

তারাশংকরের এই মানস-বিকাশ একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে — মন্বন্তরের কল্পনাতীত বীভৎসতায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সর্বাত্মক কদর্যতায় প্রতিটি বাঙালী লেখক হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠলেন—তাঁদের কলমে তলোয়ার জ্বলতে লাগল। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পিসংঘে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন তারাশংকর, লিখলেন 'মন্বন্তর', '১৩৫০'। এমনকি 'মন্বন্তর' পড়ে এই কথাই মনে হতে লাগল যে, তারাশংকর বুঝি কমিউনিজমের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন।

কিন্তু কমিউনিজমের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবন্ধক তারাশংকরের মধ্যে প্রথম থেকেই ছিল। জান্তব-জীবনের নৈরাজ্য চর্চার ভেতরেও তাঁর ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন বার বার কোনো নিশ্চিন্ত শান্ত—কোনো ধ্রুব সান্ত্বনার মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে। তাঁর রাঢ়ভূমির একদিকে বেদে, বাউরি, কাহার, সাঁওতাল, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত আর ক্রম-ক্ষীয়মান জমিদারতন্ত্র; অন্যদিকে পুরনো মন্দির, তান্ত্রিক সাধনপীঠ আর কঙ্কালী-তলার মতো মহাশ্মশান। একদিকে দুঃখ-বঞ্চনা, বিকার-জীর্ণতা, আর একদিকে জাগ্রত দেবতার মহিমচ্ছায়া—শ্মশানের উদার-বৈরাগ্য। দিনের রৌদ্রদহন শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে, কিংবা নিভন্ত চিতার শেষ অঙ্গার-দীপ্তি

যখন রাত্রির কালো জলে ঝকমক করে ওঠে, তখন তারাশংকরের সমস্ত মানসিক চঞ্চলতা—জ্বালাযন্ত্রণা এক গভীর শান্তি আর বিনম্র ভক্তির মধ্যে নির্বাণ লাভ করে।

তারাশংকরের সাহিত্য-সাধনাও সমস্ত ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ অনিশ্চয়তা অতিক্রান্ত হয়ে এই রহস্যময় অধ্যাত্মচেতনার তটে উত্তরণ। তাই 'মন্বন্তর' রচনার জন্য আজ তাঁর মন কুণ্ঠিত, তাই '১৩৫০'-এর কালচিহ্নিত গ্রন্থটির তিনি লুপ্তি ঘটিয়েছেন। সাম্যবাদের সাময়িক প্রবণতা তাঁর সত্য-সন্ধানের পথে একটা অধ্যায় মাত্র। কৃষ্ণেন্দু গুপ্তের পরিণামে—বিচারক জ্ঞানেন্দ্রের আস্তিক্য-দীক্ষায় রাত্রির শ্মশান আর সন্ধ্যার মন্দিরই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। তাই নতুন ও পুরোনোর দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক সমস্যা আর জান্তব-জীবনের উন্মত্ততা—সবকিছুই একটি পরম সমাধানের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। এ গান্ধীবাদের আদর্শও নয়। হিউম্যানিজমের সংগে আস্তিক্য-বুদ্ধির মিলনে তারাশংকরের ভাবলোক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

তলস্তয়ের সংগে একটু সাদৃশ্য যেন পাওয়া যায়। কিন্তু অভিজাত-তন্ত্রের প্রতি সেই জ্বলন্ত ঘৃণা তারাশংকরে নেই, নেই সেই বিশাল দার্শনিক মনন—সেই গূঢ় অনুপ্রবেশ। তলস্তয় একজনই জন্মান; তবু বাংলা সাহিত্যে তারাশংকর তাঁর ভূমিকা অনেকখানিই নিতে পারতেন বিপুল বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে, আধ্যাত্মিক মননে। কেন সে চেষ্টা করলেন না তিনি? কেন বৈচিত্র্যের চাইতে আরো বেশি করে করলেন না গভীরের সাধনা—কেন আর একটু নিয়ন্ত্রণ করলেন না নাটকীয় প্রবণতাকে? কেন তীব্র আবেগের উপরেই নির্ভর করলেন তিনি? জীবিত লেখকদের মধ্যে তারাশংকর কেবল বাংলা দেশেরই নন—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বিশ্ব-সাহিত্যেও তাঁর স্থান নির্ণয় করতে পারলে আমাদের গর্বের অন্ত থাকত না।

তারাশংকর নিজের জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মহান্ স্রষ্টাদের সংগে সেইখানেই তাঁর আত্মীয়তা। বাংলা সাহিত্যে অপরিচিত ব্রাত্যদের তিনি টেনে এনেছেন অপরিসীম শক্তিতে। তাঁর মুখের গল্পের মতো কলমের গল্পেরও আকর্ষণ অসামান্য। কিন্তু সব কিছুর পরিণাম কি এই? এই কি তাঁর জগতের শেষ বৃত্ত?

আমি কিন্তু অনেক বেশি আশা করেছিলাম। তিনি এত শক্তিমান বলেই তাঁর কাছে আমাদের দাবি ছিল এত বেশি। আরও একটি কথা মনে জাগে। মহৎ সাহিত্যিকরূপেই তিনি 'Prophet' হতে পারতেন—'Prophet সাহিত্যিক' না হলে তাঁর হয়তো এমন কিছু ক্ষতি হত না; বরং বাংলা দেশ লাভবান হত।

কিন্তু নিজের দায়িত্ব তারাশংকর নিজেই জানেন—পাঠকের পক্ষে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আর তাছাড়া এ-ও তো কিছুটা রুচির প্রশ্ন। যে জগৎ তিনি গড়ে তুলেছেন সেখানে অনেকেই হয়তো তাঁর মতো শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করবেন। তারাশংকারের কাছ থেকে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করবেন তাঁরা।

একজনকে আমার মনে পড়ছে। 'আরোগ্য-নিকেতন' পড়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'কী একখানা বই-ই পড়লাম মশাই। একে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।'

এমন ভক্ত তারাশংকরের দেশময় ছড়িয়ে আছেন। অতএব আমার কথাগুলি একান্তই ব্যক্তিগত মতামত মাত্র। আর লক্ষ লক্ষ সশ্রদ্ধ অনুরাগীর ভেতরে একজন সামান্য পাঠকের মতামতে তারাশংকারের কী-ই বা আসে যায়!

আর, তাছাড়া তারাশংকর তো এখনো লিখছেন। এখনো হয়তো অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে॥

অনুসন্ধানী

সতীনাথ ভাদুড়ী
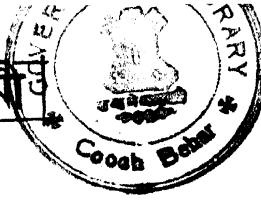
পূর্ণিয়া জেলার বাংগালীরা কেউ 'বনফুল' বলে না। বলে বলাইদা। ঘরের লোক যে। বাইরের লোকের কাছে গর্ব করে বলে বেড়াবার মত এই অগ্রজের-সম্পর্ক-পাতানো নামটা।

বছর কয়েক আগে গিয়েছিলাম মনিহারীতে তাঁদের বাড়িতে, একটা নিমন্ত্রণ-রক্ষার অছিলায়। আমার অছিলা ধোপে টিকবার মত নয়; কেন না গিয়েছিলাম নির্ধারিত সময়ের পূর্ণ আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে। তবু নিজের মনকে আশ্বস্ত করবার জন্য ওই অজুহাতটুকুর প্রয়োজন ছিল। অগ্রজ অনুজের সম্পর্ক, কিন্তু মনের ভাব রাজদর্শনে যাবার। খালি হাতে যাই কি করে। বই নেব নাকি খানকয়েক? না। ওটা একটু সমানে সমানে সম্পর্কের মত দেখাবে। আমি যাচ্ছি একজন অনুরক্ত পাঠক হিসাবে। তবে কী নিই? তাঁরও ফুলবাগানের শখ আছে শুনেছি। আমার প্রিয় একটা পরগাছা সংগে নিয়ে দুপুরের ট্রেনে হাজির হলাম তাঁদের বাড়িতে।

একটি ছেলে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে খুঁজছেন?"

আমি বাংলায় জবাব দেওয়ায় অবাক হয়ে তাকাল ছেলেটি। আমার গায়ে রাজেন্দ্র-প্রসাদী লংকোট; পায়ে চপ্পল; এক হাতে গাছ; আর এক হাতে কম্বল। ছেলেটির দোষ কি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে ভিতরে গেল বলাইদাকে খবর দিতে।

বলাইদা সম্বন্ধে আমার বেশীর ভাগ ধারণাই তাঁর লেখা পড়ে। এর আগে তাঁকে দেখিনি তা নয়। কিন্তু সে দেখা ছিল ভিড়ের আর কাজের ফাঁকে ঝাঁকিদর্শন

বনফুল (শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

গোছের। তাঁর বাড়িতে তাঁকে একা পাওয়া হচ্ছে অন্য জিনিস। সাহিত্যিক 'কেদার-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির আড্ডায়, বলাইদার সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করছিলাম আমরা। তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে-ছিলেন দুটি কথায়। 'খুব forceful'—সুরে মনে হয়েছিল কথাটা অসমাপ্ত থেকে গেল। গড়গড়ার টান কথাটাকে শেষ করতে দেয়নি আর একদিনও 'বনফুল' প্রসংগে গল্পের মধ্যে 'খুব forceful' বলেই থেমে গিয়েছিলেন। এর পরের শব্দটা যেন খুঁজে পেলেন না। এদিন কিন্তু গড়গড়ার নল হাতে ছিল না। লেখা না চরিত্র, কি সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছিলেন জানি না। তবে forceful ঠিকই। বলিষ্ঠ লেখনী, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী, বলিষ্ঠ চরিত্র বনফুলের।

লেখা থেকে লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্র বা রুচি সম্বন্ধে কোনরকম ধারণা করে নেওয়া ভুল। জানি; কিন্তু আবার না করেও পারি না। লেখা পড়ে আমি যে মনগড়া মূর্তিটিকে খাড়া করেছিলাম তিনি নির্ভীক, বৈচিত্র্য-প্রেমী, নিষ্করুণ ও কৌতূহলবিলাসী। ব্যংগতীক্ষ্ন নাকে অষ্টপ্রহর নাটকীয়স্থিতির গন্ধ নেবার চেষ্টা করছেন। কথাবার্তার সুর একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা; ফিকের চেয়ে চড়া রঙ তাঁর পছন্দ। সংগে সংগে একটা হাস্যাস্পদ অবান্তর ধারণা আমার মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি মারত—বলতে লজ্জা করছে তবু বলছি—যে বলাইদা নিশ্চয়ই খুব ঝাল খান।

বলাইদা বাইরে এলেন। খদ্দরের জামা গায়ে; গৌরকান্তি; সুদর্শন; সুন্দর টিকালো নাক; মুখচোখে আপনজনকে নিরুদ্বেগ করাবার স্মিত হাসি।

"ও তুমি! এস এস। কম্বলটা রাখ। জামা-টামা খুলে বস এখানে!"

প্রণাম করে বসলাম বারান্দায় পাতা সতরঞ্চির উপর।

"ওটা কি হাতে?"

"ভাল গন্ধ অর্কিডটার।"

আরম্ভ হয়ে গেল ফুলের গল্প।...তিনি ভাগলপুরে নিজের বাড়িতে ফুলের বাগান করেছেন।...প্রত্যহ বাগানে এক ঘণ্টা করে খাটেন বিকালবেলায়।...বাঁদরের উৎপাত। লোহার জাল দিয়ে ঘর তৈয়ের করাতে হয়েছে গোলাপ গাছগুলোকে বাঁচাবার জন্য।...একটা সাহেবী দোকানে Autumn নামের একটা গোলাপ আনতে দিয়েছিলেন; তারা ভুল গাছ দিয়েছে। সাহেবী দোকানগুলো আজকাল আর আগেকার মত নেই।...মিহিজামের গোলাপের দোকানই তাঁর পছন্দ। একবার সেখান থেকে গাছ আনতে দিয়ে, খুব ভাল ব্যবহার পেয়েছিলেন।...সাদা গোলাপের মধ্যে Snow Whiteই তাঁর সব চেয়ে পছন্দ।....

আমার কল্পনার সঙ্গে কিছুই মিলছে না। সেরকম চড়া রঙের গোলাপের তো তিনি নাম করলেন না!

চা জলখাবার এল।

"খেয়ে নাও। তোমাদের চেনা জনৈক ভদ্রমহিলা তৈয়ের করেছেন। খুব ভাল খাবার করেন তিনি। চলে গেলেন আজ। চমৎকার হয়েছে মিষ্টিগুলো!"

শুনেছিলাম বলাইদার ডায়াবেটিস আছে। নিজে ডাক্তার; তাঁর আরও তিন ভাই ডাক্তার; তাঁর বাবাও ডাক্তার ছিলেন।

এসে গেল সাহিত্যের খোশ গল্প। প্রথমে এলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র বলাইদাকে এক সময় এক মজার গল্প বলেছিলেন। ভাগলপুরের স্টীমার ঘাটের এক সন্ন্যাসী কেমন করে ক্রোধ সংবরণ করে, স্টীমারটাকে ঘাটে ভিড়তে দিয়েছিলেন, তারই কাহিনী। শরৎচন্দ্র কিভাবে গল্পটা করেছিলেন জানি না, তবে পুনরাবৃত্তি করবার ভঙ্গি বলাইদার নিজস্ব। আরম্ভ করবার বেলায়, গল্পটা যে এমন নাটকীয়ভাবে শেষ হবে, সেকথা আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আঁচ করতে পারিনি। তিনি নিজে কিন্তু হাসেননি। কী বলছেন, তার চাইতে কেমনভাবে সাজিয়ে জিনিসটাকে তুলে ধরছেন লোকের চোখের সম্মুখে, সেটার উপর তাঁর দৃষ্টি কম সজাগ নয়। গল্প কি করে জমাতে হয় তা তিনি জানেন। স্বাভাবিক মানুষগুলো অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে অপ্রত্যাশিত আচরণ করে। ঘটনার স্রোত মানুষগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারা বিবেকের চাবুক খায়; ভিতরে তাকিয়ে নিজের বাইরের মুখোশ খুলে ফেলতে চায়; পথ খোঁজে। কেউ ঘাটে পৌঁছয়; কেউবা আত্মঘাতী। স্রোত কিন্তু বয়ে যায় দুর্বার গতিতে। কুতূহলী, পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখেন 'বনফুল'। সবটাকুকে এক সঙ্গে এক নজরে দেখেন না। নাটকের দৃশ্যের মত ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে

দেখেন। বৈজ্ঞানিক বাইনোকুলার দিয়ে যেন পাখী দেখছেন। এক এক সময় এক সীমাবদ্ধ বৃত্তের উপর তাঁর নজর। এই কাটা ছাঁটা ভাবটাই তাঁর পছন্দ। এই টুকরোগুলোকে পরে সাজাবার সময় জোড়ের দাগ মিলাবার চেষ্টাও তিনি অনেক সময় করেন না। অথচ গল্প জমাবার অনায়াস নিপুণতায় অন্তরীক্ষ ও মর্তের দূরত্ব ঘুচে যায়, মৃত ও জীবিতের ব্যবধান দূরে হ... জড় ও চেতনে ভেদ থাকে না। বিষ্ণুশর্মার চেয়েও সহজভাবে টিকটিকি, ভ্রমর মানুষের সঙ্গে কথা বলে; পুরাণের কাহিনীর চেয়েও বিনা আড়ম্বরে স্বর্গের দেবদেবীরা সমস্যা-জর্জরিত মানবগোষ্ঠীর কাছে ভিড় করে আসেন; ভুতুড়ে গল্পের ... না থাকা সত্ত্বেও অশরীরী আত্মার খেয়াল খুশিতে অনর্গল কথা বলে যান; রূপকথার চেয়েও বিনা দ্বিধায় অরুণ বরুণ কিরণমালা বয়স্থ লোকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাই হাইড্রোজেন পরমাণুকেও মানুষের ভাষা পেতে দেখে আমরা আশ্চর্য হই না। তাঁর লেখায় ক... জায়গায় উদ্ভট পরিবেষ্টনী আছে, অস্বাভাবিক চরিত্র আছে, বীভৎস দৃশ্য আছে; কিন্তু গল্প বলবার গুণে তারা যেখানে আছে সেখানে বেমানান নয়। লেখকের নিরঙ্কুশতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন 'বনফুল'। এ সাহস আজকালকার ক'জন লেখকের আছে?

বলাইদা তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুর কথা তুললেন। গিয়েছিলেন সেখানে এক সাহিত্য সভায়। বন্ধুটি আজকাল অন্যত্র থাকেন। বন্ধুর মা বলাইদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন জল খাবার খাওয়াবার জন্য। খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলা অনুযোগ করেছিলেন যে ছেলে একখানা চিঠি দিয়েও তাঁর খোঁজ নেয় না। তারপর মনের দুঃখে বলেছিলেন—"সাহিত্যিকরা বড় নিষ্ঠুর হয়।"

নিষ্ঠুর! শুনেই যে কথা আমার মনে হয়েছিল সে কথাটা চাপবার জন্য জিজ্ঞাসা করি—"খেলেন মিষ্টিগুলো?"

যে কথাটা তখন বলিনি, এখন বলছি। যে অর্থে বন্ধুর মা নিষ্ঠুর শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন সে অর্থে না হলেও বিশুদ্ধ শিল্পী মন স্বভাবত নির্মম। শিল্পী 'বনফুল' আবার হৃদয়হীন অন্য এক অর্থে। একেই আমি বলি বাইরে থেকে দেখা, দূরে থেকে দেখা, বস্তুলীন মন নিয়ে দেখা; চরিত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেখা নয়। ফলে অধিকাংশ সময়েই বুদ্ধি দিয়ে এর রসগ্রহণ করতে হয়। ভাবালুতা পরিহারের হয়ত এইটাই শ্রেষ্ঠ পথ। সাহিত্য-সমালোচকের চোখে হয়ত এটা প্রশংসার জিনিস। কিন্তু আমি একজন সাধারণ পাঠক। হৃদয়

দিয়ে না নিতে পারলে তৃপ্তি পাই না। শরৎচন্দ্রই বোধ হয় আমার এই রুচি-বিকারের মূলে। দুঃখের কাহিনী পড়বার সময় আমি চাই যে চোখের পাতা অজানতে একটু ভিজে উঠুক। কিন্তু বনফুলের লেখা পড়বার সময় তা হয় কই। 'রাত্রি' চরম দুঃখের সময়ও আমার প্রাণ কাঁদেনি; শুধু লেখার মুনশিয়ানায় চমৎকৃত হয়েছি। বই যত বড় ততই যেন এই অভাবের কথাটা বেশী করে মনে পড়ে। এই একই কারণে বনফুলের বড় উপন্যাসের চেয়ে ছোট উপন্যাস, ছোট উপন্যাসের চেয়েও ছোট গল্প, নায়ক নায়িকার চেয়ে পার্শ্বচরিত্র, আমার মনে বেশী দাগ কাটে। 'জঙ্গমের' শংকরের চেয়ে ভণ্টু, ভণ্টুর বউদি, আর করালী জ্যোতিষীর কথা মনে থাকে বেশী দিন। বনফুল বোধ হয় ওটাকে ঔপন্যাসিকের অবশ্য পালনীয় সংযম বলে মনে করেন। ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া অসংযম ঠিকই। কিন্তু সামান্য একটু খাদ মেশালে খাঁটি সোনা যদি গিনি-সোনা হয়, তাতে লাভ বই ক্ষতি নাই। আর দূরে থেকে দেখায় কি অসংযম আসে না? মধ্যে মধ্যে রাশ একটু আলগা হলেই লেখাটা একটা বিবরণ পাঠের শ্রেণীতে গিয়ে পড়বার ভয় থাকে। আর অধীত জ্ঞান, যা কথা শিল্পের ক্ষেত্রে একটু আড়ালে সরিয়ে রাখবার জিনিস, মাঝে মাঝে প্রয়োজনের চেয়েও প্রত্যক্ষভাবে এসে রসসৃষ্টির বিঘ্ন ঘটাতে পারে। পক্ষপাত না করে সব চরিত্রকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, সব সময় সফল চরিত্র সৃষ্টির অনুকূল নাও হতে পারে।

ভারী সুন্দর জায়গায় বলাইদাদের বাড়িটা। পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলেছে। গঙ্গার বুকে বালুচর; ও পারে সাহেবগঞ্জের পাহাড়; আরও দূরে দিগ্‌বলয় ঘেঁষা রাজমহলের নীল পাহাড়ের সার। সব চেয়ে সুন্দর, সম্মুখের হাটের পাশের তেঁতুলতলা। আমি এর নাম দিয়েছি 'বলাইদা—তেঁতুলতলা'—বৃন্দাবনের 'ইমলিতলা-মহাপ্রভু'র মত। এইখানেই তাঁর ছোটবেলা কেটেছে। ওপারের সাহেবগঞ্জের স্কুলে তিনি পড়েছিলেন। আশপাশের কয়েক মাইলের মনোরম পরিবেশই রসসিঞ্চিত করেছিল, 'প্রবাসী'র কিশোর কবি বনফুলকে। কী ভেবে 'বনফুল' নামটি পছন্দ করেছিলেন জানি না। ইংরাজ কবি গ্রে যদি এই নাম বাছবার প্রেরণা যুগিয়ে থাকেন, তাহলে বলব বাছতে ভুল হয়েছিল। লোকের চোখের আড়ালে এ ফুলকে পাঁপড়ি ঝরিয়ে ফেলতে হয়নি। বনফুল নামের এক রকমের ফুলও আছে। তার থেকেও হতে পারে। না ভেবে চিন্তে নিজের নামকরণ নিশ্চয়ই করেননি। ছেলেমেয়ের নামকরণের সম্বন্ধে কেউ আমার পরামর্শ নিতে এলেই আমি তাঁকে বলাইদার লেখা বই-গুলোকে ঘাঁটতে বলি।...হংসশুভ্র চলবে? বাহুকুমারী? অন্তরা? যত খুশি বাছুন। সাবধান! চামেলী কিন্তু ভূতের নাম। আর অরিন্দমকে চেনেন? ইনি সেকেলে ডিটেকটিভ নন। ইনিও গেরস্ত বাড়ির চাকর বলাইদার বইয়ে।......

কাছাকাছি মাইল কয়েকের কত নদীনালা লোকজন, মাঠ, পাখী, গ্রাম, সড়ক, হঠাৎ দেখতে পেয়েছি তাঁর লেখার মধ্যে। আমারও অল্পবিস্তর পরিচিত কিনা এসব অঞ্চল। 'দ্বৈরথ' এর লোকজন আমার চেনা। 'মৃগয়া'র পরিবেশও অচেনা ঠেকে না। পাখীতে ভরা 'জলন্ধর বিল' মনে হয় যেন চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। এই 'মৃগয়া' বইখানি আমার বড় প্রিয়। এই ছোটটো বইখানিকে উল্লেখনীয় মনে করি আরও এই জন্য যে, এরই মধ্যে পাওয়া যায় লেখক বনফুলের বৈশিষ্ট্যগুলোর পূর্ণ উদ্ভাস। রূপায়নে অভিনবত্ব, এবং কৌতূহল বশে তা' নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার প্রবণতা তাঁর দুর্বার। তিন খণ্ডে ভাগ করা। খানিকটা কবিতায়, খানিকটা গদ্যে, খানিকটা নাটকে। বনফুল ছাড়া এ সাহস আর কার থাকতে পারে। বহু বিভিন্নমুখী নরনারীর সমাবেশ। পার্শ্বচরিত্র গোহমনীর আকর্ষণ সব চেয়ে বেশী। পড়বার সময় এর পর কি হল জানবার জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে পাতা ওলটাতে হয়। সব শেষে জ্যোৎস্নার যাদুস্পর্শে অপ্রত্যাশিত পরিণতি। অপ্রত্যাশিত, কিন্তু চোখ-ধাঁধানো-রূঢ়তা বর্জিত। বই বন্ধ করবার সময় পাঠকের মনের চোখেও জ্যোৎস্নার আমেজ লাগে।

শিকারান্বেষীদের সঙ্গে পাঠককে সুগন্ধ চাঁদের পাতা ফাঁদে জড়িয়ে ফেলা, অল্প ক্ষমতার কাজ নয়। ঠিক স্তরে না পৌঁছতে পারলে একেবারে হাস্যাস্পদ হয়ে যেত লেখাটা। স্বাভাবিক মানুষগুলোকে অস্বাভাবিক পরিবেশে এনে মজা দেখলেন লেখক, না অস্বাভাবিক মানুষগুলোকে স্বাভাবিক পরিবেশে এনে সুস্থ করলেন—এই ব্যাখ্যা প্রশ্নটা করবার পর্যন্ত অবসর পায় না, অভিভূত পাঠক। আর একটা কথা। এই জ্যোৎস্নার স্বাদটা শুধু নিপুণ লেখনীর কৌশল মাত্র নয়। এটা 'বনফুলে'র তখনকার মনের গহীনের আস্বাদিত অনুভূতি। এর প্রমাণ, ওই একই সময়ে প্রকাশিত তাঁর কবিতা গ্রন্থ 'চতুর্দশী'।

বারান্দার বাঁশের জাফরিতে চড়ান শীতশীর্ণ ঝুমকোলতার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র ছায়ার বুনানিটা কখন যেন মিলিয়ে গিয়েছে। গল্পে গল্পে সে কথা খেয়াল হয়নি আগে। সন্ধ্যা হয়ে এল। সম্মুখের বৈঠকখানায় পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালান হচ্ছে। "একটু শীত শীত করছে না? চল আমরা ঘরে যাই এইবার'।"

ঘরের ভিতর আলোটার পাশে দুখানা বড় বড় রঙীন ফটো। ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। দু পাশে ধূপ জ্বলছে। বলাইদার বাবা আর মা। ছেলেদের গায়ের রঙ মায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

তখনও সাহিত্যের প্রসঙ্গের জের মেটেনি। নতুন বইয়ের কথা উঠল। বনফুলের নতুন বইয়ের নাম শুনলেই সবচেয়ে আগে মনে পড়ে তাঁর উদ্ভাবন শক্তি আর সৃষ্টির প্রাচুর্যের কথা। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে—"ক্লান্তি আসে না কখনও? এত সময় পান কি করে?" বহু পাঠক বহু সময়ে তাঁকে এই প্রশ্ন করেছেন নিশ্চয়ই। 'রাত্রি'র লেখক-ডাক্তার ঘনশ্যামের উপর এই প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া আমাদের নজর এড়ায়নি। ঘনশ্যাম ডাক্তারকে অনেকেই এই প্রশ্ন করেছেন। তিনি প্রশ্ন কর্তাদের মূর্খতা দেখে ক্ষুব্ধ হতেন। "ডাক্তারি করতে করতে আপনি নিশ্বাস নেন কি করে"?—এই জাতীয় প্রশ্ন ভাবতেন এটাকে। এর থেকেই আমার ধারণা যে বলাইদা এই প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হন; আর মানুষ যেমনভাবে নিশ্বাস নেয় তিনি তেমনিভাবে লেখেন। তাঁর লেখা বইগুলোকে একজন সাধারণ লোক বোধ হয় সারাজীবনে শুধু নকল করে উঠতে পারবে না। সৃষ্টির এই প্রাচুর্যই তাঁর শক্তি ও তাঁর দুর্বলতা। আমরা পাঠক: ভোক্তা হিসাবে প্রাচুর্যে খুশি। প্রাচুর্যের মধ্যের অবশ্যম্ভাবী অপচয়টুকু আমাদের স্বার্থে আঘাত করে না। বরং পরিবেশনে কার্পণ্য দেখলেই আমরা ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু তিনি তো আমার কাছে শুধু লেখক বনফুল নন;

তিনি যে আবার আমার বলাইদা'ও। সেই হয়েছে মুশকিল। সৃষ্টির প্রাচুর্যের জন্য লেখার রস ফিকে হতে দেখলে ব্যথা পাই। লেখবার যোগ্য বলে তিনি যে সব বিষয়-বস্তুকে বেছেছেন সেগুলোর আবেদন যে সর্বজনীন। বাংলার গৃহস্থালীর ছোট ছোট সুখ দুঃখের মধ্যে তিনি নিজের লেখাকে সীমাবদ্ধ করেননি। আদিম মানবের জীবনযাত্রা, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ, হতাশা নিরাশা রোষ ক্ষোভের গোড়ার কথা, প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে তিনি যখন বই লেখেন, তখন এগুলোর উৎকর্ষ মাপবার মাপকাঠিও স্বাভাবিক কারণে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত। এখানে তাঁকে যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াতে হবে বহু দেশের বহু লেখকের পাশাপাশি—ঠেলে নিজের জায়গা করে নিতে হবে। যাক, লেখাটা যাঁর কাছে অনুক্ষণ নিশ্বাস নেবার মত স্বভাবধর্ম, তাঁর সম্বন্ধে এ অনুযোগ করা বৃথা।...দু হাতে বিলাবার দিকে যাঁর প্রবণতা, তাঁর কাছে খুঁতখুতে মন নিয়ে আঁজলা পাতবে কে। এখন যত পার দু হাতে লুটে নাও। বাছাবাছির সময় আসবে পরে।...বলাইদা' নিজে থেকেই বললেন—তিনি প্রতিদিন একটা নিয়মিত সময়ে লিখতে বসেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ তিনি পালন করছেন।

বাড়ির লোকরাও একে একে এসে যোগ দিয়েছেন আমাদের আসরে। ঝালে, ঝাঁজে, ব্যঙ্গ কৌতুকে আসর জমে উঠেছে। গাঁদা ফুলের মালা গলায় দিয়ে যে সাধারণ ব্যক্তিরা, নিজেদের অসাধারণ বলে চালাবার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁদের নিয়েই আমাদের সময় কাটল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর এল এর চেয়ে একটু ভারী জিনিস—সমাজ, শিক্ষার আদর্শ, বুনিয়াদী শিক্ষা, আরও অনেক ওই গোছের বিষয়। কাজেই আমি শ্রোতা। বলাইদা'র দেখলাম এসব বিষয়ে সুনিশ্চিত মতামত আছে; আমাদের মত গোঁজামিল দেওয়া নয়। তাঁর লেখার ভাষা পড়েই বুঝেছিলাম যে কথার খোঁচা তাঁর চঞ্চুশূলে; এখন আলোচনা শুনে বুঝি যে ফেনা সরিয়ে কাজের কথাটা আলাদা করে নেবার কৌশল তাঁর আয়ত্তে। নিজের সঙ্গে না মিললেও অপরের মত স্থির হ'য়ে শোনবার ঔদার্য আছে; যুক্তি দিয়ে বিরোধী মত খণ্ডন করবার নৈপুণ্যও সাধারণ নয়। দৃঢ় যুক্তিসহ মতামত পোষণ করেন বলেই তিনি আদর্শনিষ্ঠ। তাঁর কবিতা থেকেই জানি যে লেখার আদর্শে কচিৎ 'তপোভঙ্গ' হলেও আতঙ্ক হতে সময় লাগে না।

খাওয়ার ডাক এল ভিতর থেকে। ভিতরের চওড়া বারান্দায় বড় ছোট সকলে এক সঙ্গে বসে খাওয়া। এঁদের বাড়ির অতিথিপরায়ণতা এ জেলায় সুবিদিত। বলাইদা বললেন, ভাগলপুরের নতুন বাড়ি দেখে তাঁর বাবা বলেছিলেন—এ বাড়ির সব ভাল, শুধু ভিতরের বারান্দাটা লোকজন খাওয়ার পক্ষে একটু চওড়া কম।

আমার অনুমানে ভুল হয়নি। বলাইদা দেখলাম বেশ ভাল খেতে পারেন। আর মাংসের পরিমাণ? বদনামের ভয়ে সে কথা আর বললাম না এখানে। মাংস খাওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া ভাল। সেইজন্যই বোধ হয় বলাইদাকে আবার দুটো মিষ্টি খেতে হ'ল। বললেন, বেশ হয়েছে ছানার জিলিপিগুলো। চানাচুরের উপর তাঁর কবিতা পড়া ছিল। আর এখন যা দেখলাম তা থেকে বুঝি যে তাঁর দৃষ্টি সত্যিই পক্ষপাতহীন।

আমাকে যে রাত্রিতে ফিরতে হবে বলেছিলেন, বাড়িসুদ্ধ সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ ঠেলতে হল। উপায় ছিল না। কারণটা বলাও সমীচীন মনে করলাম না সেখানে। রাত সাড়ে বারোটার গাড়ি। অন্ধকার রাত্রি। বাড়ির একটি ছেলে লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চলেছে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য। গ্রামের পথে কিছু দূর গিয়ে ছেলেটি আমতা আমতা করে তার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইল। কিসের ত্রুটি? আমাকে হিন্দী ভাষী ভাবার। ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা। হেসে তাকে আশ্বস্ত করতে হ'ল। স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। লংকোটের পকেট আবার এমনভাবে তৈরী যে বাইরে থেকে টিপে বোঝবার উপায় নাই চাবিটা ঠিক আছে কি না। আমার বাড়ির সদর দরজার চাবি। ভুলে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমার চাকরটা হয়ত বাড়ির বাইরে বসে রয়েছে এই শীতের মধ্যে। তবে আমার বদ্ধমূল ধারণা যে চাকরটা তালা ভাঙতে সুদক্ষ। সেইটাই একমাত্র ভরসা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি। দু রকমে লেখা যেতে পারে। প্রথমত, নানান তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে, সেই তথ্যরাশির কার্যকারণ সম্পর্ক দেখিয়ে, তার মধ্যে বিস্তর সন-তারিখ ছিটিয়ে, অতঃপর ফুটনোটের শক্ত কাঁটাতার দিয়ে তাকে বেঁধে দিতে পারি। দ্বিতীয়ত, সব মিলিয়ে লেখক হিসেবে তাঁকে আমার যেমন লেগেছে, বলতে পারি। দ্বিতীয় পথে যদি চলি, এ লেখা তাহলে একটি গবেষণামূলক সমালোচনার চেহারা হয়ত নেবে না। হয়ত-বা সমালোচনাই হবে না। ব্যক্তিগত একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন অবশ্য হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমার আপত্তি নেই। বরং তাতেই আমার অভিরুচি। একটা শুধু আশঙ্কা আছে, লিখতে-লিখতে নিজের কথাও হয়ত কিছু এসে যাবে। গোড়াতেই তাই পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

শরদিন্দু আমার প্রিয় লেখক। তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই আমি দুবার করে, এবং কোনও-কোনও লেখা তিনবার করে পড়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেহাত আজকের নয়, প্রায় বাইশ বছরের। অথচ, ভাবতে বিস্ময় লাগে, তাঁকে আমি দেখেছি মাত্র একবার। কলকাতার এক বৈশাখী সাহিত্য-সভায়। সেখানে আলোচনার ব্যবস্থা ছিল, সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল, এবং প্রচুর জল-যোগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এমন-কোনও ব্যবস্থা ছিল না, যাতে একে অন্যের সঙ্গে আলাপিত হতে পারেন। শরদিন্দুর সঙ্গে কেউ আমাকে আলাপ করিয়ে দেননি। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার আগ্রহের অন্ত ছিল না। কিন্তু গায়ে-পড়ে কথা বলতে যাওয়াটাকে একালে যেহেতু অশালীন আচরণ বলে গণ্য করা হয়, করতলে থুতনি রেখে তাই আমাকে বসে থাকতে হয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, ভুল করেছি। কেননা, লেখা পড়ে যেটুকু বুঝতে পারি, শরদিন্দু ত একালের মানুষ নন। যে-কাল তার সমস্ত সমারোহ নিয়ে বিদায় নিয়েছে, এবং যাবার বেলায় আকাশের গায়ে শান্ত এবং নিরুচ্চার একটি বেদনার রক্তরাগরেখা রেখে গিয়েছে মাত্র, তিনি সেইকালের মানুষ। সুতরাং তিনি নিশ্চয় কিছু মনে করতেন না। তাঁর কাছে অনেক কথা আমার জানবার ছিল। জেনে নিলেই ভাল হত। অনেক কথা তাঁকে বলবার ছিল। না-বলে ভাল করিনি। তিনি দূরে থাকেন, এবং কালেভদ্রে কলকাতায় আসেন। সুতরাং অচিরকালের মধ্যে আর হয়ত দেখাসাক্ষাতের সুযোগ আসবে না। শরদিন্দু আজও নিশ্চয় জানেন না, তাঁর এক অনুরাগী পাঠক সেদিন তাঁর ঠিক পাশেই এসে বসে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তার মুখ খোলেনি, নীরবে ফিরে গিয়েছে।

*

লেখক হিসেবে শরদিন্দুকে যে আমার এত ভাল লাগে, তার অন্যতম কারণ, আমার বিস্মৃত শৈশবকে তিনি আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দেন। আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগেকার কথা বলছি; আমার বয়স তখন পুরো তেরও নয়। কলকাতার রাস্তাঘাট তখনও শান-বাঁধানোই ছিল বটে, কিন্তু তাতে ঝিকিমিকি-বাহার এবং সমারোহ ছিল না। গলিতে গলিতে গ্যাসের বাতি জ্বলত। এবং মনে হত, শহরটা যেন সেই মায়াবী আলোয় ডুব দিয়ে সুন্দর কোনও স্বপ্ন দেখছে। বাড়িতে তখন চারখানি কাগজ আসত। বড়দের জন্য তিনখানি — ভারতবর্ষ, বসুমতী আর প্রবাসী। ছোটদের জন্য একখানি — শিশুভারতী। বাবার ইচ্ছে ছিল, শিশুভারতী পড়িয়ে-পড়িয়ে তাঁর পুত্রের শিশুদের জ্ঞানের দিগন্তটাকে তিনি পোক্ত করে তুলবেন। বাড়িতে শিশু বলতে তখন আমি আর দিদি। ওই জ্ঞানগর্ভ কাগজখানিকে আমরা কিন্তু খুব ভালবাসতে পারিনি। তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক খবর থাকত বটে, কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের গল্প থাকত না। আকাশকে নীল দেখায় কেন, এবং সমুদ্রের জল নোনা কেন, শিশুভারতী পড়ে তা জানা যেত, কিন্তু সিংহ অথবা দস্যুর কবলে পড়লে কী করে তাদের জব্দ করতে হয়, এই জরুরী তথ্য জানবার কোনও উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে, জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে, আমাকে তাই 'মৌচাক' কিনতে হত। পরে একদিন আবিষ্কার করা গেল, বাবা যখন কলেজে চলে যান, এবং দুপুরের কাজ-কর্ম সেরে হেঁসেল ঢুকিয়ে মা যখন 'ভারত-বর্ষ' পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, সেই বয়স্কপাঠ্য কাগজখানি তখন দিদির হস্তগত হয়। ঘড়িতে চারটে বাজবার আগেই দিদি সেটিকে আবার যথাস্থানে রেখে আসে। ওই দু ঘণ্টার জন্য 'ভারতবর্ষ'এর একদিন একটিমাত্র শিশু-পাঠিকা ছিল। এবারে তার একটি

শিশু-পাঠকও জুটল। সেই সঙ্গে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও।

শরদিন্দুর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর পুরুষ-চরিত্রগুলি সম্পর্কে আমার সহোদরার মনোভাব কী ছিল, আজও তা আমি জানতে পারিনি। কিন্তু তাঁর নারী-চরিত্রগুলি আমার দিনের আহার এবং রাত্রির নিদ্রা কেড়ে নিল। এককথায় আমি তাদের প্রেমে পড়ে গেলাম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। কথাটা সত্য বলে আমার মনে হয় না। অন্তত আমার ক্ষেত্রে সত্য হয়নি। হাফ-প্যাণ্ট-পরা অজাত-গুম্ফশ্মশ্রু একটি কিশোরের চিত্তে ভালবাসার যে স্নিগ্ধ আলোটি সেদিন জ্বলে উঠেছিল, এখনও তার নিববার লক্ষণ নেই। তার চোখের সামনে প্রেমে পরিপূর্ণ এবং স্নেহে শান্ত আশ্চর্য এক পৃথিবীর দুয়ার সেদিন খুলে গিয়েছিল। সেই পৃথিবীর আকর্ষণ আজও কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। তার সেই আকাশের নম্র নীলিমাকে, ঝরনার কলস্বরকে, অরণ্যের বর্ণালিকে আজও আমি সমান ভালবাসি। মাঝখানে বাইশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু শরদিন্দু আজও আমার প্রিয় লেখক।

*

এখন প্রশ্ন উঠবে, লেখক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কোথায়। এমন কী তিনি দিয়েছেন, যাতে আর পাঁচজনের তুলনায় তাঁকে একটু বেশী ভাল লাগতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। আগে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান নেওয়া যাক।

স্বাতন্ত্র্য তাঁর সর্বত্র। বিষয়-নির্বাচনে, চরিত্র-রচনায়, পরিবেশ-নির্মাণে। এমন অনেক বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন, তাঁর আগে আর কেউই কখনও যাকে স্পর্শ করবার পর্যন্ত সাহস পায়নি। এমন কিছু চরিত্র তিনি উপহার দিয়েছেন, যার তুলনা সত্যিই বিরল। এবং এমন কিছু পরিবেশের তিনি নির্মাতা, ঘনঘর্ণ বর্ণনার সমারোহে যা আজও আমাদের বিস্ময়ের উৎস হয়ে রয়েছে। সর্বোপরি তাঁর ভাষা। সাধুভাষাও যে এত সহজ হতে পারে, কে তা জানত। সে-ভাষা সহজ, এবং সুন্দর। হয়ত বা এত সহজ বলেই এত সুন্দর। তাই দিয়ে, যেন কোনও জাদুকরের অনায়াস দক্ষতায়, নিটোল মুক্তার মতন এক-একটি গল্প তিনি গড়ে তুলেছেন। পাঠককে কোথাও এতটুকু শ্রান্ত হতে দেননি। কোনও এক আশ্চর্য আকাশের, কোনও এক মায়াবী অরণ্যের মেঘ আর আলো আর অন্ধকারের গল্প শোনাতে শোনাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে এসেছেন। গল্প শেষ হল। পাঠক ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, সেই আকাশ আমাদেরই এই নিত্যকারের আকাশ, যার মেঘ আর বর্ণচ্ছটা আমাদের চোখে

পড়েনি। সেই অরণ্যও আমাদের নিত্যকারের অরণ্য। যার অন্ধকার আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। গল্প শেষ হল, কিন্তু পাঠক তবু মুখ খুললেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কেননা, কথা যদিও ফুরিয়েছে, তার রেশ তখনও ফুরয়নি। শরদিন্দুর গল্প পড়ে মনে হয়, যেন একটি গান শোনার অভিজ্ঞতা হল। কিংবা কবিতা-পাঠের। শোনা কিংবা পড়ার ঠিক পর-মুহূর্তেই যা ফুরিয়ে যায় না।

সতর্ক পাঠক হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, আধুনিক কালের প্রতি শরদিন্দুর বিশেষ পক্ষপাত নেই। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, এ-কালের মানুষদের নিয়ে তিনি লেখেননি। লিখেছেন। বস্তুত, এমন গল্প তাঁর অসংখ্য, এই খণ্ডকালের সমস্যাই যার উপজীব্য। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, কালের খণ্ডতা সেই গল্পগুলির আবেদনকে কোথাও খণ্ডিত করেনি। চার-দেয়ালের মাঝখানে যে অল্প-একটু পরিসর, তাঁর অনেক চরিত্রই সেখানে সংসার বিছিয়ে বসেছে বটে, কিন্তু লেখকের লক্ষ্য ছিল, তাদের আনন্দ-বেদনাও যেন তারই মধ্যে আবদ্ধ না থাকে। সময়ের সেই দেয়াল ডিঙিয়ে নিত্যকালের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে যেন যুক্ত হয়। মানুষগুলি ছোট-মাপের, তাদের অনুভূতির আয়তনও অবশ্য ছোট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই অনুভূতি যেন নিঃসম্পর্ক না হয়, যেন কোনও বৃহৎ অনুভূতির সঙ্গে সে তার যোগ রাখতে পারে।

অনুমানে ভুল হতে পারে, কিন্তু সত্যিই এক-এক সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, বর্তমান কালের ছোট-হাসি আর ছোট-কান্নার ইতিবৃত্ত রচনায় শরদিন্দু তেমন উৎসাহ কখনও পাননি। পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর হাতে ছিল নিত্যকালের তুলি, তাঁর প্যালিটে ছিল লাল, হলুদ, নীল আর সবুজের সমারোহ। এবং তাঁর সামনে ছিল মস্ত-বড় একটা ক্যানভাস। ওই তুলি আর ওই রঙ নিয়ে বিরাট ওই ক্যানভাসে যদি তিনি পটলডাঙার এক ভাড়াটে-বাড়ির ছবি আঁকতে যেতেন ত সেটা প্রচণ্ড একটা ঠাট্টা হয়ে দাঁড়াত। ছবির বিষয়বস্তু খুঁজতে শরদিন্দুকে তাই অতীতে যেতে হয়েছে। কখনও-বা কাছের অতীতে, কখনও-বা দূরের। সেখানে "এমন অনেক জিনিস ছিল —যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশী নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড়-একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত, এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না।"

শরদিন্দুরই বিখ্যাত একটি গল্প (অমিতাভ, জাতিস্মর) থেকে কয়েকটি পংক্তি এখানে তুলে দিয়েছি। তাঁর সব কথাই আমরা মেনে নেব, শুধু একটি কথা ছাড়া—"এ-কালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই।" সম্বন্ধ যদি না-ই থাকবে, ত বারে-বারে কেন একালের এক শ্রেষ্ঠ লেখক তার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবেন। সাদৃশ্য নেই, কিন্তু সম্বন্ধ আছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর না হক, কালের সঙ্গে কালের। এবং আত্মার সঙ্গে আত্মার। শরদিন্দু—ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত তাঁর গল্পগুলিতে—সেই যোগসূত্রটিকেই হয়ত খুঁজে বেড়িয়েছেন। একালের এণ্ট্রান্স-পাশ-করা এক রেল-কেরানীকে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন সেকালের রাজ-ভাস্কর পুণ্ডরীকের সঙ্গে, দুর্গাচরণ ব্যানার্জি লেনের কসাই গোলাম কাদেরকে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছেন সেকালের মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্দিকীর সঙ্গে। এই চেষ্টা অবশ্যই অকারণ নয়।

শরদিন্দু শুধুই গল্পকার নন, কবিও। যদিচ, আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে তাঁর

পরিচয় হয়ত খুব ঘনিষ্ঠ নয়। জেনে তিনি তৃপ্তি পাবেন যে, এ-কালের এক কবিও ঠিক তাঁরই মত—একটু অন্যপথে যদিও—এই যোগসূত্রটিকেই একদিন খুঁজে ফিরেছিলেন। জীবনানন্দ দাশের একাধিক কবিতা তার সাক্ষ্য দেবে।

* * *

শরদিন্দুর গল্প-উপন্যাসকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে নিতে পারি: সামাজিক, ঐতিহাসিক আর রহস্য-কেন্দ্রিক। রহস্যকেন্দ্রিক কাহিনীগুলির মধ্যেও আবার নতুন আর একটি শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব: ভৌতিক এবং গোয়েন্দা-গল্প। গোয়েন্দা-গল্প নামটা অবশ্য তেমন সুবিধের নয়, খট করে কানে লাগে; এবং বাংলা ভাষায় সচরাচর যে-সব শিশুসেব্য গোয়েন্দা-গল্প পড়তে আমরা অভ্যস্ত, তাতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ও-বস্তুর সঙ্গে হয়ত সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক সত্যিই ছিল না। শরদিন্দুকে ধন্যবাদ, সেই সম্পর্ক তিনি ঘটিয়েছেন। তাঁর সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের নানা কীর্তি-কাহিনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সকলেই এ-কথা স্বীকার করবেন। নিজে আমি গোয়েন্দা-গল্পের ভক্ত। কোনান ডয়েলের রোগা গোয়েন্দা শার্লক হোমস এবং চেস্টারটনের বেঁটে-গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন থেকে শুরু করে আগাথা ক্রিস্টির গুঁফো-গোয়েন্দা হারকিউল পোয়ারো এবং স্ট্যানলি গার্ডনারের উদ্র-গোয়েন্দা পেরি মেসনের সঙ্গে আমার অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। নিকোলাস ব্লেক—এই ছদ্মনামে তিরিশের বিখ্যাত কবি ডে-লুইস যে-সব গোয়েন্দা-কাহিনী লিখেছেন, তারও সত্যান্বেষী চরিত্রটিকে আমি চিনি। কিন্তু বলতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই যে, ব্যোমকেশকে এদের কারও তুলনাতেই এতটুকু নিষ্প্রভ বলে কদাচ আমার মনে হয়নি। বরং অনেকের তুলনাতেই উজ্জ্বলতর মনে হয়েছে।

কথায় কথায় অনেক দূরে এসে পড়েছি। আসলে আমার বলবার কথা এই ছিল যে, ঐতিহাসিক অথবা রহস্যকেন্দ্রিক যে-গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হক না কেন, শরদিন্দুর প্রতিটি রচনাই বড় মধুর। চোখে এক অলৌকিক আলো এবং বুকে এক আশ্চর্য ভালবাসা নিয়ে এই পৃথিবীকে তিনি দেখেছেন। তার ফুল-লতা-পাতা, তার আকাশ, তার সমুদ্র, তার অরণ্য আর বিশাল প্রান্তরেই শুধু নয়, তার মানুষগুলিও তাই অসামান্য এক রূপের শরীর নিয়ে তাঁর চোখের সামনে এসে ভেসে উঠেছে। নিমাই পণ্ডিত তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সেতু বেঁধে দেন, কালো মেয়ে রুচিরাও তাই প্রেমের আশীর্বাদে ধন্য হয় এবং গোয়েন্দার বউ সত্যবতীও তাই সুরসিকা হয়ে ওঠে। সত্যিই হয়ত এই পৃথিবী অত সুন্দর একটা জায়গা নয়, এবং মানুষগুলিও হয়ত আর-একটু কুশ্রী; কিন্তু শরদিন্দুর দৃষ্টি যেহেতু প্রেমের, কোনও কুশ্রীতাই সেখানে তাই ধরা পড়েনি। শরদিন্দু দেখাতে চেয়েছিলেন যে, আমরা সুন্দর। তা-ই তিনি দেখেছেন।

কেউ কেউ বলেন [illegible] পৃথিবীটা পূর্ণ-দেখা নয়। কার দেখাটা [illegible] চোখে অণুবীক্ষণ এঁটে [illegible] এক-একটা অপূর্ণতাকে [illegible] বড় করে দেখাচ্ছেন, এবং দেখাচ্ছেন,—তাঁদের? প্রশ্নটা নির্বাচনের। এবং রুচির। আসল কথা, শরদিন্দু সৌন্দর্যনিষ্ঠ শিল্পী। তাই, অলক্ষ্মীর মূর্তি যদি কেউ গড়াতে চান, অন্য কারও কাছে তাঁকে যেতে হবে, শরদিন্দুর কাছে নয়।

নিজের কথা বলতে পারি। সৌন্দর্যে [illegible] আজও আমার অরুচি ঘটেনি। আমি [illegible] শরদিন্দুর কাছেই যাব।

হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

রমাপদ চৌধুরী

"আমরা অতসব শুনব কেনে হে জনার্দন? ষোল-আনা কেনে তা শুনতে যাবেক? পাতিত করলাম উয়াকে। বাস, ইবারে পেমান্ করুক, উ যাথে বিয়ে করে আনলেক সে ঠিক, চিঠি মিছে। বাস, তা-বাদে [illegible]তে। হে'-হে' বাবা, ই কি খেলামাম্[illegible] হে—"

কাগ[illegible] ধীরে ভাঁজ করে পকেটে রাখলে[illegible]টি। তারপর বন্ধুদের মুখের ওপর[illegible] চোখজোড়া এক চক্কর ঘুরিয়ে নিয়ে ব[illegible], আগেরটা না হয় ঠিক হয়েছে, বল্ এবার।

মজা লাগছিলো মন্দ নয়।

যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম, এসে বসতাম চায়ের দোকানটায়। এখন আসে এখনকার [illegible]জের ছাত্ররা। তবু মাঝে মাঝে এসে [illegible] এখানে, ফুটপাতের গা-ঘেঁষা [illegible]টায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি রাস্তার চ[illegible] জগৎ, নারীপুরুষের মিছিল। বাসের দৈত্যগতি, ট্রামের ঠুনঠুন। আর আশেপাশের লোকগুলোর কথা শুনি। কত বিচিত্র বিষয়ে কত বিচিত্র মতামত। ছাত্রদের তর্ক, জনুদে ব্যবসায়ীদের দীর্ঘশ্বাস, কেরানীদের বিয়োদগার, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের 'আমাদের সময়.....'

বেশ লাগে। এই ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে বসে সমস্ত দেশটার একটা ছবি পাই। কেউ আনে আনন্দের খবর, কেউ ইনিয়েবিনিয়ে জানায় তার দুঃখদুর্দশার কথা। দুজন, তিনজন, চারজন—ছোট ছোট দল আসে, বসে, কয়েক পেয়ালা চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে নানা কথা বলাবলি করে, তারপর চলে যায়, পেয়ালা সরে যায়, আসে নতুন আগন্তুক। আবার কথা।

কিন্তু ঐ পাঁচটি ছেলে ঠিক আমার পাশের টেবিলটি জবরদখল করে বসে ছিল অনেকক্ষণ ধরে। চায়ের পেয়ালা তাদের শেষ হয়ে গেলেও খেলার নেশায় মেতে ছিল তারা। সাহিত্যের খেলা, বড় মজার খেলা।

এক একজন লেখকের রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ টুকে নিয়ে এসেছে সকলেই, পড়ে শোনাচ্ছে বন্ধুদের, তারপর সেই প্রশ্নঃ বল্ এবার, কার লেখা?

শুনছিলাম।

একজন প্রশ্ন করলে এবার।—"আমরা অত সব শুনব কেনে হে জনার্দন? ষোল-আনা কেনে তা শুনতে যাবেক? পাতিত করলাম উয়াকে। বাস্, ইবারে পেমান করুক, উ যাথে বিয়ে করে আনলেক সে ঠিক, চিঠি মিছে। বাস্, তা-বাদে উঠুক জাতে। হে' হে' বাবা, ই কি খেলামামা পেয়েছো হে"—

পড়া শেষ করে কাগজের টুকরোটি ভাঁজ করে পকেটে রাখলো ছেলেটি। বললে, বল্ এবার—

—তারাশংকর।

—নারায়ণ গংগোপাধ্যায়। না, না, সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'।

—সমরেশ বসু।

—রমাপদ চৌধুরী।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চার বন্ধু পর পর পাঁচটি নাম বললো।

বলা বাহুল্য, পাশের টেবিলে অচেনা কোন পাঠকের মুখে হঠাৎ নিজের নাম শুনলে ছোটখাটো একটা ঢিল অনুভব করেন সব লেখকই। কিন্তু আমার নিজের মনেও তখন উত্তরটা জানবার আগ্রহ কম নয়। বেশ কিছু দিন পার হয়ে গেলে অনেক সময় নিজের রচনাকেও অপরিচিত ঠেকে বটে, কিন্তু এ-কটি লাইন যে আমার কোন গল্প-উপন্যাসের সংলাপ নয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কার রচনা তা হলে?

চার বন্ধুই এবার প্রশ্নকর্তাকে জিগেস করলো, কার লেখা?

যে প্রশ্ন করেছিল সে লজ্জার হাসি হাসলো।—জানি না।

—মানে? মুখিয়ে উঠলো চারজনেই।

আর প্রথম জন বললে, এখন আর মনে পড়ছে না, লিখে রেখেছিলাম, উত্তরটা হারিয়ে গেছে।

"হারিয়ে গেছে।"

উত্তরটা খুঁজে পেয়েছিলাম কয়েক মাস বাদে, একখানা পুরোনো দিনের ছোট উপন্যাস পড়তে পড়তে। তারপর আলাপও হয়েছিল লেখকের সংগে। শুনেছিলাম তাঁর জীবনের গল্প।

কিন্তু তারও অনেক আগে দেখেছিলাম তাঁকে, দূর থেকে। আমি তখন কলেজের ছাত্র। গল্প লেখার এত না চেষ্টা করি, তার চেয়ে বেশী করি সাহিত্য বিষয়ে তর্ক,

আলোচনা। তার চেয়েও বেশী—বই পড়ি। বই পড়ার অদ্ভুত এক নেশা ছিল তখন। পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছরের পুরোনোই হোক, বা সদ্য প্রকাশিতই হোক। মেসে বসে কিংবা আলো-নিভে-যাওয়া হস্টেলের কুঠরীতে মোমবাতি জ্বেলে রাত জেগে আমরা অনেকেই তখন বই পড়তাম—বাংলা, ইংরেজী, কিংবা অন্যান্য সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ। শৈলজানন্দের রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় সেই বয়সে।

সেই বয়সেই একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এ টাঙানো পুরোনো বই দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। সঙ্গের বন্ধু হঠাৎ বললে, চিনিস ও'কে?

তাকিয়ে দেখলাম। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, প্রায় বাবরী, জোয়ান চেহারা, রোদে পোড়া তামাটে রঙ গায়ের—রেলিং-এর ধার থেকে একখানা পুরোনো বই টেনে নিয়ে দাম জিগ্যেস করছেন।

দু' পা এগিয়ে গিয়ে বন্ধু আবার প্রশ্ন করলে, কে বলতো?

—শৈলজানন্দ? কেন জানি না, সন্দেহ হয়েছিল বলেই নামটা বলে ফেললাম। অথচ তাঁর কোন ছবিও তার আগে দেখিনি। আমার পাঠক-মনের কল্পনার সঙ্গে সত্যি-কারের সাহিত্যিকের মিল খুঁজে পেয়েছিলাম এই একটিমাত্র মানুষের মধ্যে।

তখন কাছে যেতে সাহস পাইনি। অথচ পরবর্তী জীবনে একদিন তিনিই এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন—একজন অখ্যাত অতি-তরুণ গল্পলেখককে।

অন্তরঙ্গ আলাপের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর জীবনের গল্প বলতে বলতে বলেছিলেন, "প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে তখন, ইস্কুলে পড়ি। মনে সাধ জাগলো, যুদ্ধে যাবো। পালিয়ে এলাম কোলকাতায়, আমি আর কাজী। রিক্রুটিং আপিসের মিলিটারী সাহেব কাজীকে নিলো, পাঠিয়ে দিলো করাচী, আমাকে........। কিন্তু তখন মাস কয়েক নষ্ট হয়েছে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, এদিকে রানীগঞ্জের ইস্কুল আর ফিরে নিতে চাইলো না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো রূপসীপুরে—গাঁয়ের ইস্কুলে।"

রূপসীপুর। বড় মিষ্টি নাম, তাঁর রচনার মতই, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির মতই, তাঁর সংলাপের মতই।

কিন্তু সে-সব তো অনেক পরের কথা। শৈলজানন্দ তখনও সাহিত্যিক হননি। কবিতা লিখে খাতার পাতা ভরাচ্ছেন—আর যিনি কবি হবেন সেই কাজী নজরুল লিখতে চেষ্টা করছেন গল্প।

কৈশোর সীমান্তের সেই বয়সে শৈলজানন্দকে ফিরে আসতে হলো দেশের গাঁয়ে, বীরভূমের রূপসীপুরে—যেখানে রূপসীর দেখা মেলে ক্বচিৎ, হাঁটু-শাড়ি চিকণ কালো সাঁওতাল মেয়েদের চোখ-ঠারা উচ্ছল হাসির মধ্যে।

রূপসীপুরের দক্ষিণে শালবন। ঘন নিবন্ধ শালবনের চূড়ায় চূড়ায় রক্তিম ফাগুন জ্বললে, তুমদা বাজে সাঁওতাল পল্লীর আঙিনায়, বাঁশীর সুর ভেসে আসে কানে। নেহাৎ অনিচ্ছায় সাঁওতালপাড়াকে পাশ কাটিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে বই-খাতা হাতে নিয়ে যেতে হয় নাকরাকোঁদা ইস্কুলের 'ম্যাট্রিক' ক্লাসের ছেলেটিকে। কারণ বন পার হয়ে ইস্কুল।

"কিন্তু বন পার হতে ইচ্ছে হতো না আমার। মনে হতো এই বনের মধ্যেই......"

সরল শিশুর মত [illegible] শৈলজানন্দ, সেই হারিয়ে যা[illegible]নের গল্প বলতে বলতে। যেন সেই [illegible] দিনগুলিতে ফিরে গেছেন তিনি, [illegible]শগুল হাসিতে উপছে পড়ে বলেছিলেন, [illegible] ইস্কুলে যাবার পথে, ইস্কুল থেকে ফেরার পথে কেবলই মনে হতো, আচ্ছা আমি যদি এই বনের মধ্যে হারিয়ে যাই, বেশ মজা হয় কিন্তু। হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হতো, হারিয়ে গেলে কেমন লাগে জানতে ইচ্ছে হতো। হারিয়ে যাওয়া বেশ মজা, নয় [illegible] তুমিই বলো?"

কথাটা শুনেই কেমন একটা শিহর[illegible] গিয়েছিল আমার মুগ্ধ মনের শরীরে। মনে পড়ে গিয়েছিল সেই চায়ের দোকানের ছেলেটির কথা। কার লেখা 'এখন আর মনে পড়ছে না, লিখে রেখেছিলাম, উত্তরটা হারিয়ে গেছে।'

*

শৈলজানন্দের জীবনটাই বোধহয় এই হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। এই হারিয়ে যাওয়ার সাধনাতেই তিনি মগ্ন। হারিয়ে যাওয়া বেশ মজা, নয়? তাঁর কাছে এটা 'মজা', কিন্তু আমাদের কাছে, আমরা যারা গল্প-উপন্যাস লিখি, আর আমরা যারা গল্প-উপন্যাস পড়ি, তাদের মন থেকে এই একটি নাম হারিয়ে যাওয়ার মত লজ্জা আর কি হতে পারে!

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে একদিক থেকে তাঁর কাছে ঋণী একথা স্পষ্ট করে কেউ বলেনি সেদিন। কিন্তু এ ঋণ ইতিহাস কোনদিন ভুলতে পারে না। কারণ আঞ্চলিক ভাষার সংলাপকে সাহিত্যে সব প্রথম সার্থক আসন দিয়েছিলেন তিনি। সমাজের অন্তরে, মানুষের হৃদয়ে পৌঁছনোর পথ দেখিয়েছিলেন। আঞ্চলিক সংলাপের আন্তরিকতায় যে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, মানুষকে মানুষ বলে চেনানো যায়, বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সব প্রথম তাঁর রচনায়। শৈলজানন্দের সাহিত্যজীবন শুরু হওয়ার আগে উচ্চস্তরের উৎকৃষ্ট গল্প-উপন্যাস কম লেখা হয়নি, এমন কি

তাঁর কোন কোন পূর্বসূরীর রচনার উৎকর্ষ তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই হয়তো নেই, কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রে তিনি স্মরণীয়—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেয়ে কম স্মরণীয় নন। মাইকেল অমিত্রাক্ষরের আদর্শ পেয়েছিলেন বিদেশী সাহিত্যে, কিন্তু শৈলজানন্দ কোথায় দেখেছিলেন এই সম্ভাবনার ইশারা? জানতে ইচ্ছে হয়।

তাঁর সংলাপের এই মৃত্তিকাগন্ধী আঞ্চলিকতার যথার্থ মূল্য বোঝা যাবে আধুনিক [illegible]ত্যে তার প্রভাব লক্ষ্য করলে। শান্ত[illegible] এবং কোলকাতার ভাষার সংক[illegible]র্ণ গণ্ডী ভেঙে দিয়ে তি[illegible]হত্যের সংকীর্ণ নদীপথকে বি[illegible] সমুদ্রের উদ্দাম উপকূলে পৌঁছে [illegible]ছিলেন বলেই সাঁওতাল-বেদে-পটুয়াদের শিল্প আমরা আজ উপভোগ করতে পারি, কুলি-কামিন, সাধারণ মানুষ, জেলে, বাউরী, বাগ্দী, ডোম,—এমন কি পদ্মা নদীর মাঝি বা পদ্মা-গঙ্গার জেলেদের জীবন সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, এ-কথা বললে কি অতিশয়োক্তি হয়? পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার সংলাপসৃষ্টির মূলেও শৈলজানন্দের আঞ্চলিকতার পথপ্রদর্শন।

কিন্তু সব উদ্ভাবন এবং অভিনবত্বকেই বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শৈলজানন্দকেও হতে হয়েছিল।

সে এক ভিন্ন কাহিনী। কিন্তু কোনটা আগে বলবো, আর কোনটা পরে? কতটুকু বলা শোভন, আর কতটুকু নয়? মাত্র কয়েকটা বছর হলো তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ—অথচ কত কম সময়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন, অন্তরের যে-কথাগুলো মানুষ গোপন রাখতে চায় কত অকপট আবেগে সে-সব কথাও বলে-ছেন। তাই, কখনো মনে হয়েছে শৈলজানন্দ সাহিত্যিক অনেক বড়ো, কখনো মনে হয়েছে মানুষ। কখনো তাঁর লেখার ত্রুটি চোখে পড়েছে, কখনো ব্যক্তিজীবনের। কিন্তু সব মিলে মনে হয়েছে একটি মহৎ মানুষ, খেয়ালখুশীর উচ্ছ্বাস নদীর মত প্রবল প্রাণাবেগের এক বিচিত্র জীবনশিল্পী। ভালো জীবনী হয় না বাংলা ভাষায়, তার কারণ নাকি তেমন জীবন নেই এদেশে? ইচ্ছে হয়, এই মানুষটির জীবনী লিখি। জীবনকে তিনি শিল্পে রূপান্তরিত করতে চাননি, মেনেছেন শুধু জীবনের আবেগকে—যে জীবন শালবনের গভীরেই নয়, বার-বার হারিয়ে যেতে চেয়েছে জীবনের অরণ্যেও।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে চলে এলেন তিনি কোলকাতায়। নজরুলের চিঠি এলো

করাচী থেকে। মজঃফর আহ্‌মদের মুসলমান পত্রিকায় তখন গল্প লিখছেন নজরুল। শৈলজানন্দ লিখছেন কবিতা—বেশীর ভাগই খাতার পাতায়। পড়াশোনায় যতি পড়লো পল্টন ভাঙতেই, যুদ্ধ থামতেই।

নজরুল ফিরে এলেন কোলকাতায়।

আবার সেই দুটি বন্ধু।

আশ্চর্য বন্ধুপ্রীতি শৈলজানন্দের। তাঁর নিজের কথা জানতে চাইলেই শুরু করেন কাজীর কথা, বলতে বলতে যেন অদ্ভুত এক আনন্দের রেশ ফুটে ওঠে তাঁর মুখে চোখে। যে মানুষটা নিজে দুঃখকে দুঃখ মনে করেনি, হাঁদের পালক থেকে দুঃখের দারিদ্র্যের জলবিন্দুকে যে মানুষ ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে সেই মানুষটির জীবনের তুচ্ছতম কোন বেদনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বন্ধুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে, চোখ সজল হয় কোন অবোধ্য প্রীতির বন্ধনে?

*

পড়াশোনার বাঁধা সড়ক ছেড়ে আবার হারিয়ে গেলেন শৈলজানন্দ। কয়লাকুঠীর চাকরী, কুমারডুবি লোহার কারখানায় চাকরী। কোমর ডোবা জল তাঁকে ডুবিয়ে রাখতে পারেনি।

ফিরে এলেন আবার। লিখলেন—কবিতা নয়, গল্প।

কয়লাকুঠী।

সেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক পট-বিস্তৃতি, সেই প্রথম আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ সাহিত্যে আসন পেলো।

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল সে-গল্প। সাহিত্যিকের রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার গল্প যে নিছক গল্প নয়—কয়লা-কুঠীই তার প্রমাণ।

তারপর বলিদান, রেজিং রিপোর্ট, অতসী। ষোল আনা, বান-ভাসি, নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী। মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প বোধ-হয় ধ্বংসপথের যাত্রী, আর সমাপ্তি। উপন্যাস—মহাযুদ্ধের ইতিহাস।

অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেলেন, প্রশংসা পেলেন সাহিত্যরসিক পাঠকের। নতুন দেশ আবিষ্কার করার মতই চাঞ্চল্যকর ঘটনা—তাঁর সেযুগের প্রতিটি গল্প। মধ্যবিত্তের একঘেয়ে শহুরে জীবনের গল্প নয়, কাল্পনিক বিরহমধুর প্রেমোপাখ্যান নয়, গ্রাম্যজীবনের টাইপ চরিত্রের নাটকীয়তা নয়, সব বন্ধন ছিন্ন করে বুকে টেনে নিলেন দূর অপরিচিত স্বেদসিক্ত কয়লাখাদের শ্রমিকদের।

একদিকে যেমন প্রচুর খ্যাতি, পাঠকের প্রশংসা, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক সংলাপ সম্পর্কে সাহিত্যিক ও সমালোচক মহলের সন্দেহ, বিরুদ্ধ আলোচনা।

আপনা থেকেই সংশয় দেখা দিলো তাঁর মনে।

শরৎচন্দ্রও বললেন, ভাষাটা একেবারে দুর্বোধ অবশ্য নয়, কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোক তোমার গল্প পড়তে গিয়ে হোঁচট খাবে।

এমনি যখন অবস্থা, আঞ্চলিক ভাষাকে যখন তিনি বিসর্জন দি[illegible]ন, সেই সময়ে এক অভাবনীয় [illegible] গেল।

'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি [illegible] ছাপা হলো -'সাহিত্যে নবত্ব'। [illegible] নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লিখেছেন [illegible]-সমুদ্রাপথগামী জাহাজ থেকে। প্রবন্ধে শৈলজানন্দের রচনার ভূয়সী প্রশংসা।

পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের দিনে মনের সংশয় প্রকাশ করেছিলেন শৈলজানন্দ। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করবেন কিনা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নিশ্চয়ই কর[illegible]

কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে [illegible] তাঁর হারিয়ে গেছে তখন। নাকরা[illegible] সেই শালবনের নির্জন জঙ্গলে একটি কিশোরের মনের বাসনা, হারিয়ে যাবার বাসনা, বারবার তাঁর জীবনে চতুর দেবতার আশীর্বাদের মত ছলনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

তার পরে আঞ্চলিক ভাষা ত্যাগ করে সাদামাঠা 'ভদ্র' সংলাপেও বহু সার্থক গল্প উপন্যাস তিনি লিখেছেন; কিন্তু সে-রচনার মধ্যে তিনি যেন নিজেকেই খুঁজে পান নি।

প্রকৃত শিল্পী কখনো নিজের সৃষ্টিতেই তৃপ্ত থাকতে পারেন না, অন্যের পথকেও প্রশস্ত করে দিতে চান। সুপ্ত চিন্তাকে দিতে চান আন্দোলনের রূপ। তাই 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি প্রথম থেকেই। বের করেছিলেন 'কালিকলম'। কিন্তু লেখা থামে নি তাঁর।

এরপরও প্রচুর সুখ্যাতি জুটেছে, অভিনন্দন জুটেছে, অর্থ এসেছে—কিন্তু হারিয়ে যাওয়াই যাঁর নেশা, হারিয়ে যাওয়ার মজাটুকু যিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন—তিনি যে আবার সাহিত্য ছেড়ে সিনেমার পথে পাড়ি দেবেন সে এমন কিছু বিচিত্র নয়। সেখানেও তাঁর চেয়ে সফল বোধহয় আর কেউ হয়নি।

•

কলেজে পড়বার সময়, প্রথম যখন আধুনিক সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি, তখন সবে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালের কথা বলছি। তখন যাঁর বই হাতের কাছে পেয়েছি, পড়েছি।

যেগুলি পাই নি, অথচ নাম শুনেছি সেগুলির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছি লাইব্রেরী থেকে লাইব্রেরীতে। অন্নদাশংকরের উপন্যাস ভাল হলে তারাশংকরের রচনা ভাল নয়, এমন গণ্ডীবাঁধা মনোভাব তখনকার পাঠকদের ছিল না। তাই সব ভাল লেখাই ভাল লাগতো, সকলকেই আমরা সমান মর্যাদা দিতাম। বলা বাহুল্য, এই ক'বছর আমার ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছিল তারাশংকরের। প্রতিমা, অগ্রদানী, কালাপাহাড়, যাদুকরী—অসংখ্য উৎকৃষ্ট গল্প আর আগুন এবং ধাত্রী দেবতার মত উপন্যাস পড়ে তখন [illegible] মুগ্ধ। যাঁরা তারাশংকরের [illegible] সরলতাকে স্বীকার করে নিতে চা[illegible] তাঁরা 'আগুন' উপন্যাসখানি পড়লে [illegible]খতে পাবেন সুধাবর্ষী ভাষার ওপরও তাঁর কতখানি দখল ছিল এবং বিশ্বাস করা সহজ হবে যে, অক্ষমতা নয়, ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি সহজ সরল পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে খটকা লাগতো আমার। তাঁর উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ হতাম, তাঁর উপন্যাসে বাংলা দেশের অর্থ-[illegible]তিক চেহারাটার সুস্পষ্ট ছবি পেতাম—[illegible]তন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধের ছবি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের গ্রামে আমার গ্রামটির ছবি পেতাম না, বাংলা দেশের নিরানব্বই ভাগ ছোট গ্রামের ছবি পেতাম না, যদিও গ্রামের মানুষগুলিকে তাঁর রচনাতেও দেখতে পেতাম। তারাশংকরের উপন্যাসের গ্রামে প্রভাবশালী জমিদার আছে, ধনতন্ত্রের প্রতিভূ কলওয়ালা আছে, থানা পুলিস আছে, আবার চাষী-বেদে-কামার-কুমোর আছে, মধ্যবিত্ত বাবু আছে। এমন একটি গ্রাম না নিলে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক বিবর্তন দেখানো সহজ হতো না। তবু, নিজের গ্রামটির মত ছোট গ্রাম খুঁজে পেলে যেন খুশী হতাম। এমন সময় হঠাৎ পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে একখানা উপন্যাস কিনলাম। নাম ষোল-আনা, লেখক শৈলজানন্দ। আর প্রথম কয়েক লাইনেই যে-গ্রামকে খুঁজছিলাম তার বাস্তব ছবি পেলাম:

"বীরভূমের সীমান্তভূমি। অদূরে সাঁওতাল-পরগণার শালের জংগল। সেই জংগলের এপারে ছোট্ট একখানি গ্রাম। গ্রামে না আছে ডাক্তারখানা, না আছে ইস্কুল, না আছে পোস্টাপিস। রেল-স্টেশন হইতে অনেক দূরে।"

শুধু গ্রামের বর্ণনায় নয়, মানুষগুলির চরিত্র বর্ণনায়, ঘটনার উদ্ভাবনে তাই বিভূতিভূষণের মতই শৈলজানন্দকে 'ডকুমেণ্টারি' সাহিত্যের প্রবর্তকদের একজন বলে মনে হতো। বীরভূমের নিতান্ত সাধারণ মানুষগুলির মুখে তারা যে ভাষায় কথা বলে হুবহু সেই ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন বলে মানুষগুলিকে মানুষ বলে চেনা যেতো।

তারাশংকর ঠিক তা করেন নি, তিনি নিম্নবিত্ত চাষী-বেদেদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা রেখেছেন, মধ্যবিত্ত মানুষ ও ধনী জমিদারের মুখে দিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা। দিয়েছেন, তার প্রয়োজন ছিল বলেই। তারাশংকর দেখাতে চেয়েছেন শ্রেণীসংঘর্ষ। শৈলজানন্দ দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃত মানুষ, মানুষের হৃদয়। শৈলজানন্দ করেছেন হৃদয়ের অনুশীলন। আর তারাশংকর এক অর্থে বুদ্ধিজীবী। তারাশংকর অর্থনীতি বা সমাজনীতির গ্রন্থ পাঠ করে বুদ্ধিজীবী হননি। তিনি পাঠ নিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে, সমাজজীবন থেকে। তাই সমাজবিবর্তনের অন্তঃশীল স্রোতটিকে তিনি তুলে ধরতে সক্ষম হন। একই মাটি থেকে কেউ কৃষ্ণের মূর্তি গড়ে, কেউ কালীর। ভক্তের কাছে দুজনই শ্রদ্ধেয়। কেউ শাঁখা বানায়, কেউ শাঁখ বাজায়। একই বাঁশ থেকে কেউ বাঁশী বানায়, কেউ একতারা। একতারায় তার লাগে, লাউয়ের খোল লাগে—তাই তারাশংকরের গ্রামে জমিদার, বণিক, মধ্যবিত্ত সবই এসেছে। সংখ্যায় সে-গ্রাম শতকে একটি, কিন্তু শত শত গ্রামেরই প্রতিনিধি। একজন বন্যার তাণ্ডবে মুগ্ধ হয়েছেন, আরজন অপেক্ষা করে থেকেছেন, দেখেছেন, বন্যা চলে যাবার পর তার প্রকৃত বীভৎস রূপটা।

বন্যার কথায় মনে পড়ল শৈলজানন্দের বান-ভাসি উপন্যাসটির কথা।

বহুস্যের অবগুণ্ঠন আলোয় সুন্দর নারী-চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। অতি ঘরকুনো না পায় ঘর-এর সুষমা, মুগ্ধতার-এর সুরুচি, ভংগার-এর সুজাতা—প্রতিটি চরিত্র সুস্পষ্ট হয়েও কোথায় যেন রহস্যে আবৃত। বিশেষ করে বান-ভাসির বাসন্তী। কিন্তু নারীচরিত্রের চেয়ে পুরুষচরিত্রের প্রতি শৈলজানন্দের সহানুভূতি যেন অনেক আন্তরিক। পায়ে ঘুঙুর, গায়ে আলখেল্লা, মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে যখন অবিনাশ গায়:

শোন সবে সাবধানে হয়ে এক মন,
সন তেরশ তিরিশ সালে
দামোদরের বান,
দুপহর রাত্রিকালে...

তখন সে-ছবি মনের নিভৃতে গিয়ে তোলপাড় শুরু করে। কিন্তু লেখকের জীবনের সেই হারিয়ে যাওয়ার ঐকান্তিক বাসনা যেন তাঁর গল্পে উপন্যাসেও সঞ্চারিত হয়ে আছে। হারিয়ে যাওয়া, পথ খোঁজা। অবিনাশ আর বাসন্তীকেও তাই পথ খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চলতে হয়, বৃন্দাবনের দিকে, কৃষ্ণদাসের সন্ধানে।

*

বারবার তিনি হারিয়ে যেতে চেয়েছেন, হারিয়ে গিয়েছেন—কিন্তু সে শুধু নিজের কাছেই। পথ হারানো শিশুর মত ভয় আর কান্না নয়, বন্ধনমুক্ত বলিষ্ঠ এক কৃষ্ণসারের মত অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি মুক্তির আনন্দে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মানে শুধু নিজের কাছে হারিয়ে যাওয়া, পৃথিবীর কাছে কেউ কোনদিন হারিয়ে যায় না। শৈলজানন্দও সাহিত্যের পৃথিবী থেকে কোনদিন হারিয়ে যাবেন না। বৃন্দাবনের বাঁশীর সুর অরণ্যপথে হারিয়ে গেলেও একদিন সেই পথই হয়েছিল ধর্ম-জীবনের রাজপথ। শালবনের বাঁশীর সুরও একদিন যে-পথে বেজেছে সেই পথই আজ সাহিত্যের জনপথ।

বিনী —বস্ত্রশিল্পে একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম
BINNY—a great name in textiles
BY 504 (A)
* তুলোর আঁশের সমতা পরীক্ষা
কাপড় টেকসই হয় সুতো শক্ত হ'লে। আবার তুলোর আঁশ এক নমুনার হ'লে তবেই সুতো শক্ত হয়। তাই বিশেষভাবে বাছাই করা তুলোর সুতোয় বিনীর কাপড় তৈরী হয়, আর সেইজন্যেই বিনীর কাপড় এত টেকে।
প্রতি বছর প্রায় ৯ কোটি গজ বিনীর কাপড় তৈরী হয়। বিনীর নানা ধরনের কাপড়ের মধ্যে আছে :
শার্টিং—খাকি ড্রিল—সাদা ও রঙীন ড্রিল—তোয়ালে—আন্টিশ্রীঙ্ক স্যুটিং—তসর—ইউনিয়ন ফেব্রিক—সিল্কের শাড়ী—র‍্যাগ ইত্যাদি
দি বাকিংহাম এণ্ড কার্ণাটিক কোম্পানী লিমিটেড
দি বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস : বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ
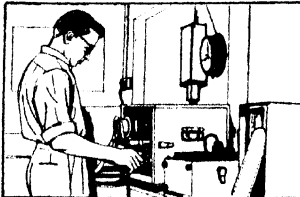
আতরের শিশি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সাল মনে নেই, স্থান বর্মা আর চীনের এক সীমান্ত শহর। নাম টাউনজী। পরীক্ষা শেষ করে বেড়াতে এসেছি। হাতে অফুরন্ত সময়। কাটতে আর চায় না। দিন কয়েকের মধ্যেই দ্রষ্টব্য যা কিছু, দেখা শেষ। ইন লে লেক, ক্র্যাগ হিল, কাছের, দূরের ছোট বড় পাহাড়, অবজারভেটরি। তারপর স্ট্রবেরীর বনে সারাটা দুপুর কাটানো কিংবা বসে বসে সামন্তরাজ শবোয়াদের অতীত ঐশ্বর্যের খতিয়ান।

অন্ধকার নামলেই আর জ্ঞান থাকে না। এই বন আর পাহাড়ের দেশে অন্ধকারটা একটু তাড়াতাড়িই নামে। কেলেমাজিদির ঝোপে ঝোপে জোনাকি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পিছনে পড়ে থাকে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাই। লক্ষ্য চৌধুরী মেডিকেল হল।

বড় রাস্তার ওপর ছোট খাটো দোকান। যতগুলো আলমারি, ওষুধ সেই অনুপাতে অনেক কম। ডাক্তার চৌধুরী এ নিয়ে আক্ষেপও করেন। এমন দেশে এসে দোকান পাতলুম মশাই, যে রোগ বালাইয়ের নাম নেই। কারুর একটু মাথা পর্যন্ত ধরে না। দশ বছর আছি, দু মাইলের মধ্যে কাউকে কাশতে শুনিনি।

সন্ধ্যা হলেই সেখানে বেশ একটু ছোট খাট ভিড়। রোগী কেউই নয় সবাই আসে কাগজের লোভে। বাংলা কাগজ। বিকেলের বাসে কাগজ দিয়ে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাগাভাগি হয়ে যায়। এক একজনের হাতে এক একটা পাতা। আবার অনেক সময়ে একটা পাতার ওপরও একাধিক লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

কাগজ পড়ার লোভ আমার ষোল আনা, কিন্তু ঠেলাঠেলিতে দারুণ বিতৃষ্ণা। সেই-জন্যই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামলে তবে এখানে এসে দাঁড়াই। উদ্দেশ্য ততক্ষণ বুড়োদের খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়ে যাবে।

সেদিন কিন্তু অবস্থা চরমে। বোধ হয় কংগ্রেসের কোন জোর খবর ছিল। নেতারা মাথা পেতে দিয়েছেন পুলিসের লাঠির সামনে কিন্তু মাথা নিচু করেননি। কিংবা হয়তো ঝুলি থেকে ইংরেজ নতুন কোন রঙে-চঙে খেলনা বের করে দেখাচ্ছে ভারতবাসীদের, যাতে কিছুক্ষণের জন্যও তারা হৈ-চৈটা বন্ধ রাখে। হাত পেতে দাঁড়ায় শাসককে ঘিরে। প্রত্যেকটি চেয়ার ভর্তি। বুড়োরা কাগজ আঁকড়ে বসে আছেন। রাতের মধ্যে ছাড়বেন, এমন আশা কম। দু একবার কাগজের দিকে উঁকি দিতে গিয়ে কয়েকজনের রোষকষায়িত দৃষ্টির মুখোমুখি পড়লাম।

শ্রীমনোজ বসু

সরে গিয়ে কোণে রাখা বেঞ্চটার ওপর বসলাম। কাচভাঙা আলমারির ফাঁক দিয়ে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কি এমন জরুরী খবর কাগজের পাতায় পাতায় জানতে না পারলে সুনিদ্রা হওয়ার ভরসা কম।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলমারির দিকে চোখ ফেরালাম। এ পাশে গোটা চারেক ওষুধের শিশি। নানা রঙের। ও পাশে গোটা দুয়েক বই পাশাপাশি রাখা। পাল্লা খোলার দরকার হল না, ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোটা বইটা বের করে নিলাম। মেটিরিয়া মেডিকা। তার নিচে কাশীরামের মহাভারত। মাঝখানে মলাট ছেঁড়া বিবর্ণ একটা পত্রিকা।

তখন বাংলা বইয়ের ব্যাপারে আমি সর্বভুক। বাছ বিচার নেই, জাত বিচারও নয়। টেনে পত্রিকাটা বের করলাম। কয়েক পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটি গল্প। কার্ট্টবুক ও চিত্রাঙ্গদা। কার্ট্টবুক শেষ করেছি অনেক বছর আগে, চিত্রাঙ্গদা ধরবার বয়স, কাজেই গল্পের নামেতেই মজে গেলাম। তারপর আধ ঘণ্টা আর জ্ঞান নেই। দ্রুত নিশ্বাসে একটা লাইন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছি আর-লাইনে। পাতা ওল্টাবার দেরীটুকুও যেন অসহ্য। একেবারে শেষ লাইনে এসে যখন থামলাম তখন আমি বেঞ্চ-চেয়ার-আলমারী ঘেরা ছোট প্রকোষ্ঠে আর নেই। খবরের কাগজ নিয়ে ভাগাভাগি করে পড়ার মন্তরও উধাও। রূপ আর রস, বর্ণ আর গন্ধের আর-এক জগতে তখন গিয়ে পৌঁছেছি। পশু মাস্টারের বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে আমারও বুকে। তাই বিড় বিড় করে বার বার উচ্চারণ করলাম,

One night when the wind was high a small bird flew into my room.

পশু মাস্টারের স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ।

বুড়োদের কাগজ পড়া তখনও শেষ হয়নি। না হোক, খবরের কাগজের ওপর আর আমার একটুও লোভ নেই। সেই জরাজীর্ণ পত্রিকাটি যেন কৌস্তুভ মণি এইভাবে বুকে আঁকড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ডাক্তার চৌধুরী সামনের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ তাঁর চেয়ারটিও বেদখল। কাছে গিয়ে মৃদু গলায় বললাম, এই পত্রিকাটা নিয়ে যাচ্ছি। কাল সকালে ফেরত দেব।

পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি প্রথমে আমাকে দেখলেন, তারপর পত্রিকাটি। আমার হাত থেকে পত্রিকাটি টেনে নিয়ে দু একপাতা উল্টিয়ে দেখে বললেন, কি কাগজ এটা? অ, প্রবাসী, ঠিক আছ নিয়ে যাও, এটা আর তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

পত্রিকাটি হাতে নিয়ে তীরবেগে ছুটলাম। কী জানি ডাক্তার চৌধুরী যদি হঠাৎ মত পরিবর্তন করেন।

বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে আবার পড়লম গল্পটা। এবার দ্রুতশ্বাসে নয়, বিলম্বিত লয়ে। ভাল লাগা জায়গাগুলো থেমে থেমে দু তিনবার করে পড়লাম। বিশেষ করে সেখানটায়—স্টেশনের মরচে-ধরা ওজনের কলটির ওপর পশুপতি, আর ঠিক তার পিছনে কাচের চুড়ির রুণঝুন। বুঝতেও পারল না পশুপতি মাস্টার সদ্যকেনা সামর্থ্যেরও অতিরিক্ত দামের বইটা মেয়েটির হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও অলক্ষ্যে মরচেধরা কলটিতে তার ওজন লেখা হয়ে গেল। স্থূল দেহের ওজন নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনের বিচিত্র সত্তার পরিমাপ। আরো ভাল লাগল সেই জায়গাটি যেখানে বর্ষামুখিত দুর্যোগের রাতে আচমকা পশুপতি মাস্টারের স্বল্প-পরিসর ঘরে হংস মিথুনের প্রবেশ, তাদের কলকাকলি। যার স্মৃতি-সৌরভ অধ্যয়ন-সর্বস্ব মাস্টারকেও উন্মনা করে তুলল ক্ষণেকের জন্য। ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতার ওপরই শুধু নয়, পশুপতি মাস্টারের শুকনো পাঁজরের ওপর রোমান্সের চড়া রংয়ের স্পর্শ।

পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই, ঘুম ভেঙে গেল আতরের গুরু গন্ধে। চমকে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। লেখকের নাম দেখলাম, মনোজ ছিল, কখন বুঝি হাল্কা হাওয়ায় মেঝেয় পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

বাতি জ্বালানোই ছিল। হ্যারিকেনের শিখাটা উসকিয়ে দিলাম। না, ঠিক আছে অগুরুর শিশি। তবে, তবে চারদিকে এ কিসের গন্ধ? তন্ন তন্ন করে বিছানার চারপাশ খুঁজলাম। কোথাও কিছু নেই। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এ আতর আমার নয়, লীলা তোরংগ থেকে শাড়ী-জামা বের করার সময় অসাবধানে আছড়ে ফেলেছে আতরের শিশি। আমার সারা ঘরে তারই সুবাস।

আশ্চর্য লাগল। গল্পের আতর পাঠকের ঘরে, পাঠকের মনে ছড়িয়ে দিতে পারেন এমন অনায়াস-কৃতিত্ব কার? পত্রিকাটা বালিশের তলায় ছিল। উঠে বাতির কাছে বসলাম। লেখকের নাম দেখলাম মনোজ বসু।

আর-এক ছুটির বন্ধে কলকাতায় এসেছি। ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে আরো লেখা পড়েছি। নরবাঁধ, বনমর্মর। বনমর্মরে আবার নতুন করে পড়েছি ফার্স্ট বুক আর চিত্রাংগদা। প্রত্যেকটি গল্পেরই সৌন্দর্য-প্রোজ্জ্বল পরিবেশ, ব্যঞ্জনাবহ ভাষা, মধুর সংলাপ।

থাকার মেয়াদ একমাস। অজানা শহর, মানুষগুলো আরো অচেনা। জনতার চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। যাতায়াত করি ভয়ে ভয়ে। উপগলির গোলোক ধাঁধায় পা বাড়াই না। খোলা ছাদ ডবলডেকারে যাই আর আসি।

অগণিত জনস্রোতের দিকে চাইতে চাইতে ভাবি এর মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছেন মনোজ বসু। কিংবা বলা যায় না ঘোরাফেরা করছি একই বাসে। সহযাত্রীর হাল্কা রসিকতায় এক সঙ্গেই হয়তো হেসে উঠেছি দুজনে।

লুকিয়ে লুকিয়ে তখন আর-একটা কাজও আরম্ভ করেছি। মেটে রঙের ফুলস্ক্যাপ কাগজে অজস্র কবিতা আর বেশ কয়েকটা গল্প। লুকিয়ে, কারণ এদিক থেকে বাড়ির কোন বারণ ছিল না, বরং অবারিত উৎসাহই ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ ছিল নিজের মনে। কুমারীর সন্তানের মতন নিজের মনের উত্তাপ দিয়ে নিভৃতে লালন করছি এগুলোকে। নিজেরই রক্ত মাংস মেধা দিয়ে তৈরী, অথচ বাইরের লোককে দেখাবার উপায় নেই।

বয়সটা খারাপ, তাই প্রায় প্রত্যেক কবিতারই উপজীব্য অদেখা মানসী। আমার সম্পূর্ণভাবে ধরা দেবার আগে যিনি গোকুলে বাড়ছেন। শ্রাবণ মেঘের মতন যাঁর কেশপাশ, দীর্ঘপক্ষ্ম চোখে বিলোল কটাক্ষ। গল্পগুলোও উগ্রধরনের রোমান্টিক। নায়কের কাছে পৃথিবীর কোন বাধাই দুর্বার নয় কারণ তার হাতে নায়িকার হাত। বেশ কয়েকটি গল্পে ফার্স্টবুক আর চিত্রাঙ্গদার আমেজ। ঠিক তেমনিভাবে রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে প্রথম সূর্যের ঝিলিক, রুক্ষ সাহারার বুকে মরূদ্যানের ইশারা।
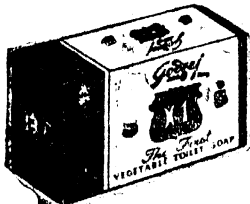
সবই তৈরী, শুধু একবার ফার্স্টবুক আর চিত্রাঙ্গদার লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ার অপেক্ষা।

মুরুব্বি পাকড়ালাম খুড়তুতো ভাইকে। বয়সে আমার চেয়ে ছোট হলে হবে কি কলকাতার অলিগলি তার নখদর্পণে। পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে একটা হাতে-লেখা পত্রিকাও সম্পাদনা করতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত তাকেই ধরলাম।

এই, কাগজ তো বের করেছিস, সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

ভাই প্রশ্নটাকে খুব আমল দিল না। পোশ কাটানোর ভঙ্গীতে বলল, আলাপ করে লাভ নেই। বড্ড ঘোরায় আজ নয় কাল নয় করে, লেখা দেয় না। একটা আশীর্বাণী দেবে তাও দুমাস একশোর বায়নাক্কা।

শোন, শোন, তাকে ফেরালাম, মনোজ বসুকে চিনিস? বনমর্মর, নরবাঁধ যাঁর লেখা?

ভাই ফিরে দাঁড়াল। মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। আমার নির্বুদ্ধিতার ওপর অসীম করুণা, এই রকম একটা ভাব।

চিনি না মানে? তিনিই তো আমাদের বাংলা পড়ান।

বাংলা পড়ান মনোজ বসু? সাউথ সুবার্বানে?

আমার মাথায় হাত চাপড়াতে বাকি। পৈতৃক বাড়ি কেনার বসু লেনে। মাঝখানে ছ ফিট সড়ক। এ পাঁচিল থেকে ও পাঁচিলে পা রাখা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। আমাদের উঠানের আম গাছের সঙ্গে স্কুলের প্রাঙ্গণের বটগাছের অবাধ মিতালি। ছেলেদের ড্রিল আরম্ভ হলে মাঝে মাঝে ছাদের ওপর বসে দেখেছি। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোলাহলে কান পাতা দুষ্কর। সব ছুটেছে ক্লাসের দিকে। শুধু ছাত্রেরাই নয়, চেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার ঝালরের মতন শিক্ষকরাও আছেন। হাতে ছাতা, দ্রুত গতি, আধ-ভোলা মানুষের দল। দশটার সময় প্রায়ই দেখেছি মাস্টারদের আনাগোনা, কে জানত তাদের মধ্যে মনোজ বসুও ছিলেন! অজানা এক স্টেশনে অচেনা এক মেয়ের হাতে চিত্রাংগদা যিনি তুলে দিয়েছিলেন।

পরের দিন থেকে একটা কাজ বাড়ল। রোজ সকালে ছাদের ওপর গিয়ে বসি। আম পাতার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে।

শুধু চরিত্র নয়, তাঁর রচনায় সমগ্র আরণ্য-ভূমি, জীর্ণ সমাধি স্তূপে, খাল বিল পরিখা, নাবাল জমি, পদ্ম কুমু কহ্লার সবই এক একটি চরিত্র। দিনের মানুষ আর রাতের মানুষে যেমন আকাশ-জমিন প্রভেদ, তেমনি রৌদ্রদগ্ধ বন্ধুনী রাতের অন্ধকারে রহস্য-ময়ী রূপে পরিগ্রহ করে। শতাব্দীর স্বপ্নের অবসান হয়, যুগযুগান্তের মানব মানবী অনন্ত সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠে বুভুক্ষু হৃদয় নিয়ে। রাতের অন্ধকারে ফেলে-আসা জীবনের পুনরভিনয় শুরু হয়।

আরো পরের কথা। বিদেশের বাস উঠিয়ে এদেশের উপকূলে এসে পৌঁছলাম। সারা বিশ্বে তখন ঘরভাঙার খেলা চলেছে।

নতুন চাকরির সূত্রে গোটা ভারতে ছড়ানো ছিল। সেই সুতোয় জড়াতে জড়াতে একদিন কলকাতায় এসে বসলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চাই শুধু নয় হাতে কলমেও সাহিত্য করছি। ইতস্তত কবিতা আর কিছু কিছু গল্প। দু একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। মনোজ বসুর আরো অনেক বই পড়েছি। বকুল, নবীনযাত্রা, শত্রুপক্ষের মেয়ে, পৃথিবী কাদের। নতুন নাটকও হাতে এসেছে। নতুন প্রভাত, প্লাবন, রাখিবন্ধন। শুধু বিষয়বস্তুই নয়, লেখার ধরনও অনেক পাল্টেছে। মানুষের অনেক কাছাকাছি আসার চেষ্টা করেছেন। লেখক নয়, কথক। রসিয়ে, রসিয়ে, রং ফলিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়কে হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা। সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সঙ্গে মিশেছে আদর্শবাদ। মধুর শিল্পকর্মের পাশাপাশি মহৎ শিল্পধর্ম।

তখনও কিন্তু মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়নি।

প্রথম দেখা অনেক পরে।

অফিসে কাজ করছি, সাগরময় ঘোষের টেলিফোন এল।

বিকেলে অফিসের পরে একবার মনোজ বসুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন? মনোজ বসুর সঙ্গে? বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

দেখা হলেই জানতে পারবেন।

কোন ঠিকানায় দেখা করতে হবে?

বেঙ্গল পাবলিশার্স। চোদ্দ, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট।

ব্যস, সেদিন সব কাজ খতম। টেবিলে ফাইলের ওপর ফাইল জমল। চিঠিপত্রের রাশ। দু একজন বাইরের লোক এল দেখা করতে। সবাইকে দু হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সব কাজ ঠেলে রাখলাম এক পাশে।

ছুটি হবার মিনিট দশেক আগেই উঠে পড়লাম। খুঁজে খুঁজে বের করলাম চোদ্দ নম্বর। স্বল্প পরিসর কামরা, বুঝি পশুপতি মাস্টারের আস্তানার চেয়েও ছোট। সামনে দুটি দুয়েক কর্মচারী বই গুছিয়ে তাকের ওপর রাখছে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেই ভিতর দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

পাশাপাশি দুটি চেয়ার। একটিতে বন্ধগলা কোট, শীর্ণ চেহারার একটি ভদ্রলোক। কোলের ওপর বইয়ের গোছা। আর একটি চেয়ার খালি।

দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলেন, কাকে চাই?

বললাম, মনোজ বসুকে।

আমি মনোজ বসু কি দরকার বলুন?

স্তূপাকার বইয়ের আড়াল থেকে একটি ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। পরনে সাদা পাঞ্জাবি, বুকের গোটা দুয়েক বোতাম খোলা। মসৃণ প্রশস্ত ললাট, মুখে অনাবিল হাসি।

পরিচয় দিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসালেন। মিনিট দশেকের মধ্যে আপনির কাঁটাতার সরিয়ে তুমির অন্তরঙ্গ প্রাঙ্গণে নামলেন। সেই সময়ে 'দেশ'এ আমার একটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছিল। পটভূমি বর্মাদেশ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন। কিছুটা আপসোসও। ভারতবর্ষ আর সিংহল ছাড়া আর বাইরে কোথাও যাননি। এখন অবশ্য তাঁর এ ক্ষোভ মিটেছে। দর্শনযোগ্য দেশ প্রায় সব কটাই ঘুরে এসেছেন।

আমি লেখার সঙ্গে লোকটাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। লেখার মতনই সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী, কথাবার্তায় তেমনি প্রচ্ছন্ন কৌতুক, বলার গুণে সামান্যও অনায়াসে অসামান্য হয়ে ওঠে। দেশকে ভাল বাসেন, শুধু দেশের বঞ্চিত, মূঢ় মানুষগুলোকেই নয়, তার অবহেলিত প্রাকৃতিক সম্পদ, বাদাভূমি, নোনাজল। তার অন্ধসংস্কারঘেরা হাজার অলৌকিক কাহিনী।

কথা বলতে বলতেই থেমে গেলেন। হেসে বললেন, এই দেখ কথা তোমার সঙ্গে বলছি, বলছি নিজের সঙ্গে। পুরোনো আমিটাকে ঝালিয়ে বাজিয়ে দেখছি। কি খাবে বল? চা না কফি?

আমি কিছু বলবার আগেই কফি এল।

কাপটা টেনে নেবার আগে আর একবার লোকটির দিকে চেয়ে দেখলাম। খেয়াল নেই। কথা বন্ধ ক'রে শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে রয়েছেন। সে দৃষ্টি রাজপথ আর চলমান জনতার দিকে নিবদ্ধ মনে হলেও আমি বুঝতে পারলাম মনোজ বসুর দৃষ্টি ফেরো-কংক্রিটের কঠিন আবরণ ভেদ করে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। সবুজ কিংখাবে মোড়া হাঙরমুখো ঝালরদার শিবিকার পাশে রায়রায়ান, রাজারামের পরিত্যক্ত বিধ্বস্ত গড়, জলজঙ্গলের মায়াবী পরিবেশ, অংটি চাটুজ্জের ভাই, সর্বস্বহারা নটবরের বৌ সৌদামিনী, অন্ধ গহর, তরঙ্গিনী, সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে উদাস দৃষ্টির সামনে।

কাপে ঠোঁট ঠেকাতে গিয়েই থেমে গেলাম।

সম্বিত ফিরে পেলেন মনোজ বসু। বললেন, কি হ'ল কফি খাও না বুঝি? তা হ'লে থাক, চা আনতে বলি?

ঘাড় নেড়ে কফিতে চুমুক দিলাম।

সেদিন কি হয়েছিল লজ্জায় বলতে পারিনি। আজ আপনাদের বলছি। কফিতে ঠোঁট ছোঁয়াতে গিয়েই চমকে উঠেছিলাম। কফিতে আতরের গন্ধ।

ময়ূরাক্ষী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"শেষ গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষী। স্রোত তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। একদিকে ধূ ধূ করছে বালুচর। কতো পাখির পায়ের দাগ তার উপর বিচিত্র আলপনা কেটে গেছে। চিহ্ন রয়েছে কত মানুষের পায়ের দাগের। কেউ জল নিতে এসেছে, কেউ গেছে। গত রাত্রের চক্রবাকী ফেলে গেছে একটি পালক। হাওয়ায় সেটি ইতস্তত উড়ছে। কর্মব্যস্ত মানুষের চোখে তার মূল্য নেই। দুটি পাখির নিগূঢ় বিরহ-মিলন-কথার নীরব সাক্ষী কারও চোখে পড়ে না।"

বছর বারো আগেকার কথা। বাংলা দেশ থেকে বহু দূরে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছি। শুধু দেশ থেকে নয়, সাহিত্য থেকেও। বিচিত্র কর্মজীবনের অবসরে ভিতরের তাগিদে মাঝে মাঝে লিখি, পড়ি কম। হঠাৎ ডাক পড়ল আরও দূরে যাবার। অবশ্য সাময়িকভাবে।

বন্দর ছেড়ে উধাও সমুদ্রে পাড়ি দিতে জাহাজের তখনো কিছু বাকী, আমি এজেন্ট অফিসের শেষ কাজকর্ম সেরে ক্যাপ্টেনের ঘরে কাগজপত্র নামিয়ে রেখে নিজের কেবিনে এসে সবে বসেছি, দুজন বন্ধু এসে উপস্থিত। দুজনেই অবাঙ্গালী। একজন বললে, Here are some Bengali books for you.

একটা বড়ো কাগজে-মোড়া প্যাকেট। সেদিকে একবার মাত্র দৃকপাত করে বলে উঠলাম—রাখো ওখানে।

তেমন ঔৎসুক্য ছিল না। সে সময় কিছুদিনের জন্য আমার মনের অবস্থা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ঐরকমই হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমি বাংলার কে? বাঙলা দেশ আমাকে চায়নি, বোধ হয় চায় না। চিরতরে বাংলা ছেড়ে এসেছি, আর বোধ হয় কখনো ফিরব না।

বন্ধুরা গল্পগুজব করে চলে গেল। কেন যেন বইয়ের মোড়কটা খোলবারও উৎসাহ বোধ করলাম না। বাইরে এলাম। মালবাহী জাহাজ। কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। পাইলট এসেছে। 'বন্দরের কাজ হল শেষ।'

ক্রমে, জাহাজ ছাড়ল। একসময় দূরের বাতিঘরের আলোকবিন্দুটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। কৃষ্ণপক্ষের রাত। শান্ত সমুদ্র। মিডসিপের উচ্চতম ক্ষুদ্র ডেকটিতে আমি আর রেডিও অফিসার দেশাই বসেছিলাম। সে জরথুস্ট্রের ধর্মমত সম্বন্ধে বহু বাক্যব্যয় করে গেল, আমি হাঁ, হাঁ করে সেরে দিচ্ছিলাম। অবশেষে একসময় সে নেমে গেল। আমি বললাম, তুমি যাও। আমি একটু থাকি—একা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে একটু হেসে বলে গেল, Don't be a poet. It is dangerous to be a poet here—in a ship.

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। কথাটার তাৎপর্য সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝি। কিন্তু যাক সেকথা। চুপচাপ একা-একা বসে নক্ষত্রমালায় সাজানো আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। মনে মনে খুঁজছিলাম একটি নারাঙ্গী নক্ষত্র বা অরেঞ্জ স্টারকে। তারিখ আর তিথি দেখে রেখেছিলাম, মনে হয়েছিল, তার দেখা পাবো। ইংরেজীতে বলে, অক্টুরাস। বাংলায় বোধ হয়,—স্বাতী।

একা-একা বসে বসে রাত্রের আকাশে বিশেষ কোনো তারা খুঁজে বেড়ানো, এ ছিল একদা আমার মনে মনে খেলা করার বিষয়। কিন্তু তা-ও সেদিন ভালো লাগেনি বেশীক্ষণ। কী-এক অদ্ভুত না-জানা বিষাদময় অনুভূতিতে ভরে ছিল সারাটা মন।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। খুললাম সেই
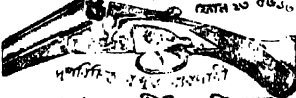
ট্রিলজীর প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড অনেক পরে পড়েছিলাম—'গৃহ-কপোতী' ও 'সোমলতা'। ভূমিকায় আছে, 'জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল রসময় বাউলের আখড়ায়, যেখানে বন্ধন নেই, আছে শুধু অনন্ত মুক্তি।...অনন্ত মুক্তির লঘুতম হাওয়া গৃহকপোতীর ডানায় যেন সাড়া জাগায় না।'

এ হচ্ছে 'গৃহকপোতী'র প্রসঙ্গ। এ-প্রসঙ্গ আমার মনকে কী জানি কেন তেমন টানতে পারেনি, পেরেছিল তৃতীয় খণ্ড, 'সোমলতা'। ভূমিকায় আছে—'বিনোদিনী যেন এই পৃথিবী, কলঙ্কে ও মহিমায় তার আর তুলনা নেই।'

লেখক এই 'মহিমা'কে সুন্দর প্রকাশ করতে পেরেছেন সোমলতায়। যেদিন 'সোমলতা' প্রথম পড়ি, সেদিন বদলে গেছে আমার পারিপার্শ্বিক। আমার চারিদিকে তখন জাহাজের হৈ-হৈ করা লোকগুলি নেই, রয়েছে একটু বেশী উচ্ছ্বাসপ্রবণ—রঙ্গমঞ্চের লোকগুলি। যাদের অধিকাংশের কাছেই ভালো গল্পের বইয়ের অর্থ এক-কথায়—'চরিত্র' আর 'পরিস্থিতি'। 'পরিস্থিতি-প্রেমিক এক অভিনেতা-বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম "সোমলতা"। "ময়ূ-রাক্ষী-গৃহকপোতী"র বিনোদিনীকে আবার দেখলাম পিতৃগৃহে। 'তার মন তখন অনেক দূরে আর একখানি ঘরকন্নার কাজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার নিজের ঘরকন্নার কাজে। বড় ঘরখানিতে এবারে কে রাঙা-মাটির গোলা দিচ্ছে, কে জানে। অযত্নে উঠানের কোণে-কোণে হয়তো আগাছার জঙ্গল হয়েছে। ঘরে-দোরে, তুলসীতলায়, গোলার নীচে হয়তো আর মেড়ুলি দেওয়াই হয় না। জলের অভাবে তুলসী গাছটি হয়ত এতদিনে শুকিয়ে মরেই গেছে।'

এক নিরাসক্ত বৈরাগী মনের আত্মপ্রকাশই সরোজকুমারের শিল্পী-মানস। কৃষক ও বাউলদের জীবন নিয়ে 'ট্রিলজী' লেখা হলেও, জীবনই সব কথা নয়। জীবনের উপলব্ধিই বড়ো কথা।

ওয়ালটেয়ারে তখন বাসা বেঁধেছি। পত্রালাপের মধ্য দিয়ে পরিচিতির শুরু। "বর্তমান" পত্রিকা বার করছি। আপনাকে যে কতো খাটাবো তার ঠিক নেই। —ইতি সরোজকুমার রায়চৌধুরী।"

শুনেছি উনি 'আত্মশক্তি' অমুক-তমুক নানান্ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সে-খবর আমার জানার কথা নয়। আমি যখন ওঁকে জানলাম, তখন উনি 'বর্তমান' পত্রিকার সম্পাদক। 'বর্তমান'-এ ওঁর তখন বেরুচ্ছে ধারাবাহিক 'কৃশানু' আর আমার 'এ জন্মের ইতিহাস।'

ছুটিতে এসেছি ওয়ালটেয়ার থেকে কলকাতায়। ওঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হতে চলেছি ওঁর মদন মিত্র লেনের বাসায়। ততদিনে পত্রেই 'আপনি'র পর্যায় থেকে উনি 'তুমি'তে এসেছেন। প্রাথমিক সম্ভাষণের পরই বললেন,—'আমিও ওয়াল-টেয়ারে থাকি।'

অর্থাৎ ওয়ালটেয়ারে আমি যেমন সপরিবারে থেকেও 'লেখক' হিসাবে একা, উনিও সেই কথাটি বোঝাতে চাইলেন, 'কলকাতায় সহস্র বান্ধব-মধ্যে থেকেও আমি একা।'

এক অদ্ভুত বিষণ্ণতার সুর লক্ষ্য করে-ছিলাম সেই প্রথম দিনকার সাক্ষাৎকারে। পরে, আরও আলাপ হয়েছে, কলকাতায় স্থায়ীভাবে ফিরে আসার পরও বহুবার গেছি। বুঝেছি, যাকে বিষণ্ণতা মনে হয়েছিল, আসলে সেটিই ওঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। বিষণ্ণতা ঠিক নয়, এক ধরনের নিরাসক্তি। হাসির কথাও বলেছেন, বেদনার কথাও বলেছেন, কিন্তু সবের মধ্যেই একটি সুর পেয়েছি। সে সুর নিস্পৃহতার সুর। সব কাজের মধ্যেই আছেন, অথচ থেকেও যেন নেই।

যতবার কাছে গেছি, ততবারই 'ময়ূরাক্ষী' লেখকের মনকে দেখে এসেছি। ইনি "শৃঙ্খল" লিখেছেন, লিখেছেন "কালো ঘোড়া", লিখেছেন "শতাব্দীর অভিশাপ", কিন্তু, স্রষ্টার মন তাঁর যে সৃষ্টিতে মুক্তির শ্রেষ্ঠতম আস্বাদ লাভ করেছে, সে "ময়ূরাক্ষী"।

একটা দিনের জন্যও কখনো আলোচনা হয়নি ওঁর সঙ্গে 'ময়ূরাক্ষী' নিয়ে বরং ওঁর নাটক 'হালদার সাহেব' নিয়ে আলোচনা করেছি, একবার "হালদার সাহেব" অভিনয় করবার প্রয়াসও করে-ছিলাম। লক্ষ্য ক'রেছিলাম "নাটক" ও "নাটমঞ্চ" নিয়ে ওঁর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার গভীরতা ও বিস্তার।

ওঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস "তিমির বলয়" আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু অনেক-কিছু না-জানানোর মতো একথাও ওঁকে জানানো হয়নি। বরং বলা উচিত, জানতে উনি চানওনি। এতবার গেছি এতবার দেখা হয়েছে, কখনো বলেননি,—আমার অমুক বইটি পড়েছ? কেমন লেগেছে?

না। তা নয়। উল্টে প্রশ্ন করেছেন,—নতুন কী লিখছ?

আজ 'বর্তমান' নেই,—ওঁর কাছে যাওয়া হয় না,—যে-যার চক্রে ঘুরপাক খেয়ে মরছি, —তবু 'ব্যক্তি'টিকে ভুলতে পারি না,—মাঝে মাঝে মনে হয়। মনে হয়, ঐ নিরাসক্তিই জীবনের বড়ো কথা,—বড়ো বর্ম, বড়ো কর্ম, বড়ো ধর্ম। যতদিন তা' না হচ্ছে, ততদিন,—সেই জাহাজের রেডিও অফিসার দেশাইয়ের কথাই নির্মম সত্য হয়ে দেখা দেবে,—It is dange'ous to be a poet here in the ship.

Ship ত বটেই। আমরা সর্বত্রই কিছু সংগী জুটিয়ে একটা জাহাজের আবেষ্টনী তৈরী করে কালে সমুদ্রে পাড়ি দেবার চেষ্টা করছি। কেউ তীরে যাবে, কেউ ডুববে, কারুর মাস্তুলে ভাঙবে।

এছাড়া আমাদের জীবিকার জগৎ ত আছেই! কারুর চাকরী, কারুর রঙ্গমঞ্চ বা সিনেমা, কারুর সাংবাদিকতা, কারুর চিত্রনাট্য,—সব ক্ষেত্রই আবেষ্টনী-ঘেরা এক একটি জাহাজ বিশেষ।

"হালদার সাহেব" নাটকের একটু উদ্ধৃতি ঃ—

"—স্বর্গটা কীসের তৈরী?

—স্বপ্ন দিয়ে তৈরী।

—আর দেবতারা?

—তাঁরাও স্বপ্ন। বাস্তবতার অসুর যুগে যুগে তাঁদের স্বর্গভূমি আক্রমণ করেছে। বিজ্ঞান বারে বারে তাঁদের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল কি হয়েছে? আমরা দেখেছি, পরবর্তী অসুর পূর্ববর্তীদের অতিক্রম করে গেছে। এক যুগের বিজ্ঞান আগের যুগের বিজ্ঞানকে উপহাস করেছে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্রোতরেখা মাঝে মাঝে অন্ধকারে গেছে হারিয়ে। কিন্তু স্বপ্নের স্বর্গ আজও অম্লান, আজও যেমন দূরে তেমনি দূরেই রয়েছে।

—বিজ্ঞানের জোরেই এই স্বর্গও মানুষ একদিন জয় করবে।

—মানব সভ্যতার জীবনে তত বড় দুর্দিন আমি কল্পনাও করি না।...তোদের শতাব্দী সেই স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এই পৃথিবীর ছোট ছোট দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। সেখানে নারী মাংসের দুর্গন্ধ, শকুনি-গৃধিনীর কলরব, আর টাঁকে টাকা না থাকার অভিযোগ। তবু স্বর্গ থাকবে এবং এই পৃথিবীর শ্মশানঘাট থেকে মানুষ সেই অদৃশ্যপ্রায় স্বর্গলোকের জন্যই দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।"

বলতে বাধা নেই, আজ বাংলা সাহিত্যের নানান্ প্রয়াসের মধ্যে একটি বিশেষ দিকে তাকিয়ে বাস্তবিকই 'অদৃশ্য-প্রায় স্বর্গলোক'-এর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। কয়েক বছর আগে বাস্তব জীবনের যথাযথ প্রতিলিপিকে তুলে ধরাই আধুনিকতার দ্যোতক ছিল সাহিত্যে। কিছু কালের জন্য কলম থামিয়ে সে এক্সপেরিমেন্ট-এর ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। এ আমাদের দেশেই শুধু ঘটেনি, বিদেশেও নানান স্থানে ঘটছিল।

দেখা গেল, নিরীক্ষার ফল ভালো হলো না। বিদেশের লেখকেরাও রচনার মোড় ফেরালেন। 'Virgin soil upturned' লেখকের দেশেও রোমানফের মতো লেখকরা লিখলেন—Without Cherry Blossoms'-এর মতো গল্প ঃ

অমাদের দেশেও বিভূতিভূষণরা ছিলেন কালসমুদ্রে অবগাহনে নেমে তাঁরা ভেসে-গেলেন না, সমস্ত ঢেউ অবলীলায় কাটিয়ে উঠলেন। সরোজকুমারও এই জাতের। তাঁর রচনা পড়ে তাঁকে যদি অন্তত কিছুটাও বুঝে থাকি, তাহলে জেনেছি, জীবনের যথাযথ প্রতিফলনই যে সাহিত্য—এ-বিশ্বাসে তিনি বিশ্বাসী নন।

আজকাল দেখছি, সেই পুরানো ঢেউটা আবার কোথাও কোথাও উদ্বেল হয়ে উঠছে।

ভয় নয়। তবে সাময়িকভাবে আবহাওয়া আবার কিছুক্ষণের জন্য আবিল হয়ে উঠতে কতক্ষণ? তবে তা-ও ভাবনার কিছু নেই, আজকাল পাঠকও সচেতন হচ্ছে।

আসল কথা, জীবনটা সাহিত্যের উপকরণ মাত্র। রস-সাহিত্যের গতি জীবন-নিরপেক্ষ অবশ্যই নয়, কিন্তু লক্ষ্যটা অন্য, সেটা হলো সাহিত্য ক্ষেত্রের চিরকালের কথা,—রস।

কেরিয়ারিস্ট-লেখক হওয়া অবশ্য তত কঠিন নয়, কঠিন যথার্থ রসিক হওয়া।

সরোজকুমার রসবেত্তা। কিছুদিন আগে একবার দেখা হতে কথায় কথায় বলেছিলেন,—'দেখ, একটা কথা আমার জীবনে সত্যি, আমি কারুর দিকে তাকিয়ে লিখিনি। লিখেছি, অন্তরের তাগিদে। আত্মার তাগিদে বললেও ভুল বলা হবে না।'

লেখক-জীবনের এই উপলব্ধির কথাই বড়ো কথা। যদিও কথাটা বোঝানো শক্ত। বোঝাও শক্ত। কেন লিখি আমরা? কার জন্য লিখি?—অবশ্যই পাঠকদের জন্য। কিন্তু কেন? তাঁদের নিজস্ব জীবনই ত একটা বৃহৎ গ্রন্থ, নতুন করে কী লিখে কী জানাবো তাঁদের পৌঁছতে হবেই। একটা অবধারিত একথা যাঁরা আজ বলেন, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পূর্ব মুহূর্তে তাঁরা কখনই তা বলে যেতে পারবেন না। অন্য উপলব্ধির স্তরে তাঁদের পৌঁছতে হবেই। একটা অবধারিত এক জাহাজ ডুবি থেকে বেঁচে উঠে একথাই আমার মনে হয়েছিল,—জীবনের পথে এমন অনেক সত্য আছে, যা পুরাতন, কিন্তু নতুন অনুভূতির মধ্যে তাকে পেয়ে নতুন করে আবার তাকে প্রকাশ করে যেতে হয়। প্রকাশ না করে উপায়ও নেই লেখকের পক্ষে। লেখা ছেড়ে দিলেও, লেখা তাকে ছাড়ে না। কী এক দুঃসহ অন্তর্বেদনা ভিতরে গুমরে গুমরে মরে,—তাকে প্রকাশ করব না এমন সাধ্য কী আমার? অতএব সংসারের ক্ষেত্রেও আমাদের ভিন্নতর কোনো বিলাস নেই, ভিন্নতর কোনো আনন্দের ক্ষেত্র নেই, ভিন্নতর কোনো সঙ্গী সঙ্গিনী নেই, আছে মাত্র রচনা—রচনা—আর রচনা! কবির তা কাব্যে, নাট্যকারের তা নাট্যে, ঔপন্যাসিকের তা উপন্যাসে, প্রাবন্ধিকের তা প্রবন্ধে, গল্প লেখকের তা গল্পে।

আপন আত্মোপলব্ধি ও ধ্যান-ধারণার কথা একটু বলতে হলো এই কারণে যে, এই-ই সেই আলোকরেখা, যা দিয়ে আমি ময়ূরাক্ষীর স্রষ্টাকে দেখবার প্রয়াস করেছি।

রচনাকে আমরা দেখি, রচয়িতাকে দেখি কতটুকু? কোন মূল্য দিয়ে কে যে কতখানি দিয়ে যাচ্ছে, সেকথা ভাবিও বা আমরা কতটুকু?

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

সাহিত্যের ট্র্যাজেডিই ত এই! আমি সমস্ত জীবন মন্থন ক'রে যা' দিলাম সেই সোনার ধানই নেবে মানুষ, সেই ফসলকেই ঠাঁই দেবে, আমাকে ঠাঁই দেবে না মনে। সৃষ্টিকে মনে রাখবে হয়ত,—কিন্তু স্রষ্টাকে মনে রাখবে কতটুকু?

—আর, বাহ্যিক জগতে? প্রতিটি দিন তার মূল্য দিতে হয়। মনীষী বলেছেন, —কারুর ভাব নষ্ট করো না। কিন্তু আমাদের ভাব নষ্ট করতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সংসার উন্মুখ। আত্মাবমাননা আর আত্ম-নিগ্রহের মধ্য দিয়ে দিনগুলি কাটে।
It is dangerous to be a poet here—in the ship.'

বেদে

সমরেশ বসু

কবির নাম কি?

নীহারিকা। নীহারিকা দেবী। প্রথম কবিতাই পত্রপাঠ মনোনীত করেছেন সম্পাদক। আর যে-সে পত্রিকা নয়, প্রবাসী। বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ-ত্রিশ দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। যাকে ঘিরে শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকদের সমাবেশ।

কবির নামে ডাকে প্রায় গগন ফাটে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও কবিতার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। তার ওপরে জুটে গেল কিছু গুণ-মুগ্ধ। তারা শুধু চিঠি পাঠিয়েই নিরস্ত থাকতে রাজী নয়। কবিকে দর্শন করে একবার জীবন সার্থক করতে চায় তারা।

নীহারিকা দেবী সভয়ে কপাট বন্ধ করেছেন। এ কি দুর্বিপাক! প্রায় ছ' ফুট দীর্ঘ, ধুতি পাঞ্জাবী-পরা কালো পুরুষটি নীহারিকা দেবী নামের আড়ালে বসে ঘামছেন। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে, স্বনামেই আত্মপ্রকাশ করতে হল।

নীহারিকা নয়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

উপায় কি! সম্পাদকের দপ্তরে লেখা পাঠিয়ে পাঠিয়ে যদি কেবল নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়, আর চোখের সামনে নিজের লেখার চেয়ে অধম লেখার নিয়মিত প্রকাশ দেখতে হয়, তখন কলেজের বন্ধুর পরামর্শে জলজ্যান্ত পুরুষটাকে মেয়ে সাজতে হয় বৈ কি!

সে-ই প্রথম আবির্ভাব।

কিন্তু অস্পষ্ট। আসন্ন প্রকাশ নয় সেটা। বিপ্লবটা কোথায় ঘটেছে, তখনো টের পাওয়া যায়নি। ক্যাডারদের পরস্পরের পরিচয় তখনো হয়নি। বুকে তাদের বারুদ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঠাসা, চোখে দীপ্ত শিখা। নিজেদের ব্যক্তিগত তাগিদে তারা একত্র হন না। যুগের দাবি তাঁদের হাতে হাত মিলিয়ে দেয়।

তারপরেই কপাট ভাঙা কল্লোল সংকুল জলোচ্ছ্বাসের বান ডাকল সহসা, পটভূমিটা পরিষ্কার দেখা গেল। কল্লোল। কল্লোলেরই পবিত্র অহংকারের অবদান, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

কল্লোলের অভিধানগত মানে, মহাতরঙ্গ। সেই মহাতরঙ্গ তখন উপস্থিত। বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসবেত্তার মতে, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সেই প্রথম যাত্রারম্ভ। শুধু যাত্রারম্ভই নয়, সাহিত্য সৃষ্টির সে এক মহালগ্ন।'

মিথ্যে নয়। মোড় ঘুরে গিয়েছে। আর একক প্রতিষ্ঠার দিন নেই। সাহিত্যাকাশে আর একচ্ছত্র অধিকার নেই কারুর। সেজন্যে আর একটি নাম নয়, একাধিকের আবির্ভাব। একাধিক, কিন্তু এক নয়। সকলেরই স্বতন্ত্র প্রকাশ।

তাই পূর্বসূরীদের কথা লিখতে গিয়ে দৃষ্টি দিশেহারা হয়ে পড়ে। একজনকে স্মরণ করতে গিয়ে, হাটে এসে দাঁড়াতে হয়। কল্লোলে কোথাও নির্জনতা নেই। একূল-কিনারা নেই মহাতরঙ্গের।

তাই উত্তরসূরীদের শুধু নয়, বাঙালী পাঠক মাত্রেই মনে রাখতে হবে, বাংলার চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

সেই ইতিহাস রচয়িতাদের অন্যতম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। যাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে'। 'বেদে' প্রকাশ মাত্র নিন্দুকদের ঢাকে পড়ল জবর কাঠি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন লেখককে, 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি।'

দেকামেরনের লেখক বোকাচিয়োকে লেখা, পেত্রার্কের মত সোজাসুজি লেখেননি,—"অ্যাণ্ড ইট ইজ রিটন্ ফর দি ভালগার, নট ইজ ট্রুস, ইন প্রোজ।'

এই 'ফর দি ভালগারেরা' নিশ্চয় ইতর

জনসাধারণ। ভালগার পিপ্‌ল্‌। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। নিকটের অন্ধকার পেরিয়ে যাঁর চোখে দূরের আলোকচ্ছটা ভেসে ওঠে। বাস্তবকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। আর প্রাক্‌-ঊষা স্তব্ধ অন্ধকারেও বাসা থেকে পাখির ডাক-কাকলীর মত দূর থেকেই শুনতে পেয়েছিলেন কল্লোলের কলধ্বনি। তাই নব-যৌবনের উদ্বোধন গাইলেন,

> বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার
> সৃষ্টি তাহার খেলা।
> দস্যুর মত ভেঙে চুরে দেয়
> চিরাভ্যাসের মেলা।

যদিও সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'কল্লোল আর কালিকলমের মোড়ক খুলতে আমি ভয় পাই', তবু অন্তরের আসল কথাকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি,

> সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
> নতুন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
> কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
> নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে।......

কিন্তু অচিন্ত্যবাবু 'বেদে' লিখলেন কেন? যে-উপন্যাসের শুরু হয়েছে 'ন' পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভাল লাগল।' অভিভাবকদের চোখ রক্তবর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়। সেই প্রথম সবাই চমকে উঠে দেখল, এক উপন্যাসে ছয় নায়িকা। নায়ক এক। কিন্তু নায়িকারা কেউ-উ বহু-বিবাহের কুলিনী কুল-কাটায় বিদ্ধ নয়। নায়কের বিবাহিতা স্ত্রী নয়। নায়িকা, নায়িকা। নোঙর ছেঁড়া নৌকোর মত নায়কের, ঘাট নয়, অঘাটের কূলে তারা। তারা কেউ অনাথ আশ্রমের ঝি, কেউ বড়-লোকের অভিজাত মেয়ে। কেউ দূরে গাঁয়ের কিষাণী, শহরের বস্তিবাসিনী পানউলী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

এ কি সৃষ্টিছাড়া কথা?

হ্যাঁ, সৃষ্টিছাড়ার তত্ত্বটা এমনি। তার যে 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন।' 'চিরাভ্যাসের মেলা'কে যে সে দস্যুর মতোই চূর্ণ করে। 'বেদে'র বিশদে যাওয়ার আগে, একবার সময়ের কাঁটায় চোখ বুলিয়ে নিলেই, তত্ত্বটা ধরা পড়ে। দেশের মাটিতে তাগিদ নেই, ঋতুর আহ্বান নেই, সাহিত্যের ফসল ফলালেই হল নাকি?

নোবেল পুরস্কার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরেছেন নতুন যৌবন নিয়ে। ঘর হয়েছে বাহির, বাহির হয়েছে ঘর। পৃথিবী কাছা-কাছি। এদিকে শরৎচন্দ্র মধ্যাকাশে। ওদিকে, অনেক আগেই, কলকাতার বন্দরে, কুলির ঘাড়ে বয়ে নেমে এসেছেন জোহান বয়ার, গোর্কী, ন্যুটহামসুন। এই নেমে আসা যে কতখানি, তা 'বেদে'রই নায়কের, বন্ধুর জবানীতে শোনা যাক। বন্ধু তার বইগুলি দেখিয়ে বলছে: 'বাংলার কোণে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—ডস্টয়ভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবারটুকু গোর্কির সঙ্গে একত্র খাই, হামসুন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্প করে যায়—জ্বরো কপালে বোয়ার তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়'—ইত্যাদি।

দূর দেশের বলিষ্ঠ ভাইয়েদের হাত এসেছে এগিয়ে। ভাবের ঘরকে তারা বড় করেছে। নিজের দেশের দিকে ফিরে তাকা-বার দিয়েছে দৃষ্টি। তাদের নবজাগ্রত চেতনার কথা বলছে, ভাগাবন্ডস আর ফ্লান্ডারেরা। সেই ভালগার পিপলেরা।

ওদিকে প্রেমেন মিত্র চিঠিতে লিখছেন, 'নিখিল দেবতার এই যে দেহ সে নিখিল দেবতাকেই এমন করে ব্যঙ্গ করে কেন?' লিখছেন, 'হ্যাঁ দুঃখও দেখেছি বটে, দেখেছি বটে কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি। দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার'......

এদিকে ভারতের জীবন দুঃখে দারিদ্র্যে লাঞ্ছনায় অপমানে পর্যুদস্ত, অন্যদিকে সর্বদুঃখবিজয়ের অপরাজেয় প্রতিজ্ঞা। অচিন্ত্যবাবুর মনে হচ্ছিল, 'নজরুল বিষের বাঁশী বাজাচ্ছে, আর সে-সুর সে-কথা সবাইর রক্তে বিদ্রোহের সঞ্চার করছে।' গোকুল-নাগ মৃত্যু-শয্যা থেকে চিঠি লিখছেন। অচিন্ত্যবাবুকে, 'মাটির মানুষ ভুখা। তৃষ্ণায় তার বুক শুকিয়ে উঠেছে, ব্যর্থ-বেদনা সে আর বুঝতে পারে না, চোখে তার জল আসে না, জ্বালা করে।'

বন্ধু সুকুমারের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে বাটি ভরে গেল। বলল, 'কোনো দুঃখ করিস না। অন্ধকার কেটে যাবে।

আলোয় ঝলমল করে উঠবে আকাশ।... এই আকাশের শেষ কই'—

অচিন্ত্যকুমারের ধ্যানমগ্ন চোখের সামনে ভেসে উঠল, 'আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না'—

'ম্যাগ্নাটি অব্ দি এজ্'

'কখনো সংগ্রাম, কখনো বা জীবনতৃষ্ণা।'

এইজন্যেই উত্তরকালের ছাত্র অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত সেদিন 'বেদে' লিখেছিলেন। যুগ-যন্ত্রণায় পিষ্ট বাংলার ভাগাবণ্ড কথা বলে উঠল। সেই ভ্যাগাবণ্ডেরই বাংলা নাম 'বেদে'।

আশ্রয় নেই, নিরাপত্তা নেই জীবনের কোথাও। বেদেটা জীবন দেখছে। বেদেটা নিষ্ঠুর, নির্মম, সংসারের যাবৎ বিষও পান করেছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, কপালে ওর তৃতীয় নয়ন। ছেঁড়া জামাটা ওর জামা নয়, খোলা জটারই প্রতীক।

ও পাপ দেখছে, বীভৎস লালসা দেখছে, বড়লোকের ভাঁড়ামি দেখছে। ও অনাথ আশ্রমে মানুষ হচ্ছে, কখনো চাষী হচ্ছে, কখনো মজুর হচ্ছে, পানওয়ালীর প্রেমের 'অংখারের' টাকায় আবার এম এ পড়ছে। ও যেখানেই যায়, সেখানেই ওর নায়িকা।

অযৌক্তিক মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে অসম্ভব? মনে হচ্ছে, লেখকের উদ্দাম অসম কল্পনায় ভর করে ছুটে চলেছে বেদেটা? মনে হতে পারে। কিন্তু উপায় কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রাণে তো আর
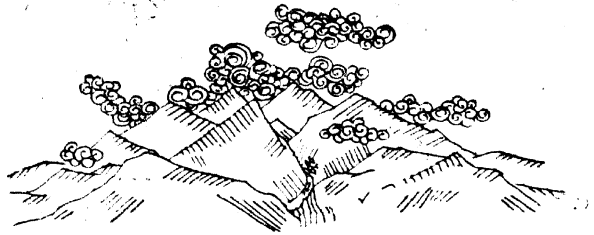
সহ্য হয় না। তাঁকে যে সব দেখতে হবে, দেখাতে হবে। বলতে হবে, সাপের ঝাঁপি, জড়িবুটির বেদে নয়; আমি নতুন বেদে। জন্মগত কিংবা পেশায় নয়, আমাকে বেদে করেছে এই শাসন, এই সমাজ। আমি তো কোথাও দেখতে পেলাম না তোমাদের এক-নিষ্ঠ প্রেমের সোনার কাঠি। সুগোল সুঠাম নিরুদ্বেগ জীবন।

কল্লোলের তরঙ্গোচ্ছ্বাস করে রীতি মেনে, মেপে-জুকে প্লাবন করেছে?

বেদে তাই এই শতকের ত্রিশ দশকের মূর্তিমান বিদ্রোহ। সনাতনীরা বারুদ হয়ে উঠলেন। অগ্রগামীদের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি।'

না-ই বা হল 'বেদে' সুসমঞ্জস উপন্যাস। মনে হতে পারে, যেন কতগুলি গল্পের সমষ্টি। হোক। সাহিত্যে বেদে উপস্থিত হয়েছে, সেটাই বড় কথা। বেদে এসেছিল, তাই অনেক নতুন কল্লমের আড় ভেঙে-ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' লেখা হয়ে-ছিল, তাই অনেক বন্ধ নির্ঝরের মুখ খুলে-ছিল।

কিন্তু আগুন নিয়ে খেলার অতিরিক্ত সমারোহ দেখে, ভয়ও পেয়েছিলেন রবীন্দ্র-নাথ। কল্লোলের কাঁচা রক্তে আগুন। শক্তির বেগকে ঠিক পথে চালিত করতে না পারলে, নিজের আগুনে নিজেকেই যে পুড়ে মরতে হবে। তাই মিথুনপ্রবৃত্তি সম্পর্কে সাবধান-বাণীও উচ্চারিত হল, 'কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক এক্ষেত্রেও।'

ধরে নিতে অসুবিধে হয় না, ও আগুন 'নারী'। কিন্তু ওটা যুগেরই বৈশিষ্ট্য। নারীকে দেখা গেল চিকের বাইরে। তাকে দেখা গেল ডালহৌসী স্কোয়ারের ফুটপাতের কোণে, পুরুষের লালসাসিক্ত চোখের সামনে। তাকে দেখা গেল বারোবাসরের লাইনে।

সর্বনাশের কি কল্যাণের, সে-কথা থাক, নতুন মূর্তিতে, নতুন ভঙ্গিতে আবির্ভাব ঘটেছে নারীর। তার নিয়ত সান্নিধ্যকে আর অস্বীকার করার উপায় ছিল না। এই নতুন যুগের। 'বর্তমান শতাব্দীর হাতে মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের এও যে এক নতুন অভিজ্ঞান।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সার ওর সামগ্রিকতা বোধহয় সেখানেই নয়। আরো কথা ছিল। যে-কথা আজকেও বারে বারে উচ্চারিত হচ্ছে। সে কথা হল, স্থির হও। ঠিক হয়ে, ঠিক জিনিসটি দ্যাখো। কী লিখেছি সেটা বড় কথা নয়, কেন লিখেছি, সেইটিই বড় কথা। যা দেখেছি, তাই দেখাব না। যা বুঝেছি, তাই বলব।

আজকের লেখকদের কাছেও কথাটা পুরোনো নয়, বরং নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে। তাই ধার্মিক ফাদার ফালো নিজের দর্শনের মাপকাঠিতে রম্যাঁ রলাঁকে কী নজরে দেখছেন সেটা বড় কথা নয়, সাহিত্যের সুক্তিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য বাঙালী সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করছেন, 'কী লিখছেন, সেটা দেখেছি, কিন্তু কেন লিখছেন, সেটা বলুন।'

লেখককে তবে শিল্পী হতে হয়। শিল্পীকে হতে হয় দার্শনিক।

সুতরাং আধুনিকতার যাত্রারম্ভই শুধু নয়, সঠিক পথে যাত্রা করতে হবে। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত ধ্যানস্থ হলেন।

আমার মনে হয়, সেই বেদে-ই যেন ধ্যানস্থ হল। জয় নয়, পরাজয়, অসহায় জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেটি, দেহে যার স্থায়ী হাঁপানি রোগ, বুকে কাব্যের আগুন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। জীবন রহস্য সন্ধানে চোখে তার সুদূর দৃষ্টি।

মুহূর্তে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ কষায় চিকুর হানল, 'দুইবার রাজা'। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত রুগ্ন ছেলে পনের টাকার জন্য বড়লোকের অরক্ষণীয়া মেয়েকে বিয়ে করে একদিন রাজা। আর একদিন মোটর চাপা পড়ে, শব হয়ে লোকের কাঁধে চেপে, রাজা।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীকে এমন নির্মম আঘাত বড় একটা কেউ দিতে পারেনি। তার রুগ্ন-নিদ্রাকে, তার পচা মোহকে, এমন নিষ্ঠুরভাবে, এত ভালোবেসে দেখানো দুর্লভ বাংলা সাহিত্যে।

কল্লোলের কলধ্বনি নীরব, জোয়ারের জল নেমে গিয়েছে ভাটায়। পলিমাটির ওপর নয়া ফসল নিয়ে দেখা দিয়েছেন অ চি ন্ত্য কু মা র। সাহিত্য-ইতিহাসবেত্তা

ঠিকই বিশেষণ দিয়েছেন অচিন্ত্যবাবুকে, শিল্পি হিসেবে যেমন দূরযানী, তেমনি বিচিত্রসম্ভব।'

জীবনরহস্য সন্ধান চলল। কিন্তু দরজা যতই খোলা যায়, শুধুই রূপ। শুধুই তথ্য, তত্ত্ব কোথায়? শিল্পী যে দার্শনিক। তার যে কিছু বলবার আছে! আধুনিকতার এই বড় লক্ষণের প্রতিষ্ঠা চাই। রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব। হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

বেদের তৃতীয় নয়ন চকিত হল। জীবনের তাগিদে, সেই বেদেই যেন ছদ্মবেশ পরল। দেহে উঠল সরকারী তকমা। মুন্সেফ থেকে হাকিমের গদিতে গিয়ে বসল সে। ভালোই হল। বিচরণ ক্ষেত্র হল সুদূর। পরিবেশ হল বিচিত্র। বহু মানুষ আর বহু দেশ নিয়েই যার চলাফেরা।

হাকিম শোনেন আর্জি। লেখেন রায়। শোনেন, বাংলার দরিদ্র রায়ত বলছে, 'বাবু ও আমার বিবির ছুরৎ দেখছে।'

রায়তের গোলায় ধান থাকতে নেই। ঘরে রূপসী বউ-রাখবারও উপায় নেই বুকে করে। কেড়ে নিয়ে যায়।

হাকিম তার কলমে রায় লিখেছেন। আর এক কলম তুলে নিয়েছে বেদে। হাকিমের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। বেদের বুক ফেটেছে, মুখও ফুটেছে কলমের ডগায়।

অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ বেদের কলম। চোখে তার ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, বুকে ভালোবাসার উত্তাপ, মনে প্রসন্নতা, বুদ্ধিতে শ্লেষের ধার।

কল্লোল স্তব্ধ হয়েছে, অচিন্ত্যকুমার সরব। শিল্পী জীবনের এই পরীক্ষায় কখনো বিচ্যুত হন নি। শুধু তাই নয়, বোধহয় সবচেয়ে অকৃপণ। তাঁর দানের অজস্র ধারায় আজও সকলের অথৈ অবগাহন।

ঘুরতে হয়েছে আজ এই জেলায়, কাল অমুক মহকুমায়। সময় কোথায়। পরিচ্ছেদের পরিচ্ছেদ, পর্বের পর পর্ব উপন্যাস লেখার?

না-ই বা লেখা হল সার্থক উপন্যাস। রাশি রাশি গল্প দিয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে, যা বাঙালী পাঠক হাত ভরে তুলে নিয়েছে ধুলি মুঠি সোনার মতো।

বিবাহের চেয়ে বড়, প্রাচীর ও প্রান্তর, মগের মুলুক কিংবা একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীর চেয়ে অচিন্ত্যবাবুর গল্পের ধার ও ভার অনেক বেশী।

আশ্চর্য সুন্দর, ঝকঝকে গল্প। তির্যক-তীক্ষ্ণ-নিষ্ঠুর, গভীর-উদার-প্রসন্ন। ভাব-কাব্য-ব্যঞ্জনা। উপন্যাসের ঠাঁই নেই এখানে। আছে কবিতা। আর কবিতার

মতোই গল্প। উপন্যাসের মেজাজ ছিল 'পাঁথকে'। উত্তর কল্লোল বিচিত্রায়, কল্লোলেরই, তার চেয়ে বলা ভাল বেদেরই পলিমাটিতে উপন্যাসের দেখা পাওয়া গিয়েছিল!

কিন্তু এখানে ছিল 'দুইবার রাজা' 'রুদ্রের আবির্ভাব'। ছিল 'মা ফলেষু'র হতভাগ্যটার কান্না। ছিল 'ডিস্ক'-এর বুকে একটি অতলান্ত ব্যথার সুর, 'ডবল ডেকারের' রহস্য-কৌতুক, আর 'ছুরি'র ধার, হৃৎপিণ্ডে যার স্থায়ী দাগ থেকে যায়! ছুরি গৌরীয়া, সেই হিন্দুস্থানী মেয়েটি, যার নিজের ব্যক্তিত্ব ও রূপের ধার ছুরির চেয়ে অনেক বেশী। তবু সে ছুরি রাখে কাছে, তার দৌর্বল্যের সাক্ষী। শুধু যে বাঙালী সাহেব যুবকটি তার প্রেম চেয়েছিল, সে প্রত্যাখ্যানের অপমান নিয়ে যখন ফিরে যায়, তখন গৌরীয়ার ঠোঁটে ও চোখে একটু হাসি দেখা যায়। প্রেমে আছে ব্যথা ও সাহস, স্টীলের ছুরিতে শুধুই ভয় ও জ্বালা।

এরকম অনেক সুন্দর গল্প, যার উল্লেখ করার মত স্থান নেই। তারপরেই বাঁশবাজির ভয়াবহ জীবন থেকে, 'হাঁড়ি-মুচী-ডোম'—বর্জিত ঘুরে, খুবই সামান্য কিন্তু অসামান্য মহার্ঘ 'কাঠ-খড়-কেরোসিনের' সন্ধানে বেরিয়েছেন লেখক।

যেন সেই বেদেই আরো অভিজ্ঞ চোখে, ব্যালেন্স মন নিয়ে সব দেখছে। দেখছে নীচু তলার অন্ধকারে। আর তারই সঙ্গে তার আশ্চর্য উপমা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উপমার রাজা বাংলা সাহিত্যে। আজ পর্যন্ত প্রায় সত্তর পঁচাত্তর খানি বই হয়েছে তাঁর চুয়ান্ন পঞ্চান্ন বছর বয়সে। তাতে হাজারের ওপর উপমা আছে। উপমা সাজিয়েই একটি বই হয়। উপমা তাঁর অশেষ আহরণ। কিন্তু আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের অসাম্য চোখে পড়ে। রাজার ধন, কিন্তু সে খোলামকুচি নয়। প্রয়োজনের বেশী পেলে দাম থাকে কই?

তারপরে আসল কথায় ফেরা যাক, জীবন রহস্যের সন্ধানে বেরিয়েছিল বেদে। তথ্যের থেকে তত্ত্বের যাত্রায়: 'কী' থেকে কেন তে। শিল্পীর নবজন্ম দার্শনিকতায়।

কিন্তু তথ্যের কি বিচিত্র রূপ! নিটোল-উজ্জ্বল-পুঙ্খানুপুঙ্খ। যত রূপ, সবই ধরা পড়েছে অচিন্ত্যবাবুর কাহিনী ও গল্পে। গল্পে উপন্যাসে আশ্চর্য রূপকার তিনি। কিন্তু তত্ত্ব? শিল্পীর দার্শনিকতা কোথায়? তাও হয়েছে। রূপকার দার্শনিক হয়েছেন চরিত্র-চিত্র-সাহিত্যে। কাব্যের আধ্যাত্মিকতায় জন্মান্তর। তত্ত্বের, 'কেন' এবং 'কোথা'র সন্ধান পাওয়া গেল 'পরমপুরুষে' 'পরমা প্রকৃতি'তে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এইটিই দার্শনিক রূপ।

না, এ রূপান্তর প্রিন্স নিকোলাইয়ের রেজারেকশন নয়। রাসকলনিকভের ভগবানকে ডাকা নয়। কারণ বেদের তো কোনো পাপ ছিল না। তার হাতে তো হত্যার রক্ত লেগে ছিল না। যুগ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বেদে যে যুগোত্তরণ চেয়েছিল। নতুন অভ্যুদয় যে ছিল তার স্বপ্ন!

সেই অভ্যুদয় যে এই দার্শনিকতা, তা বলা যাবে না। কারণ সামনে নিরবধি কাল। অচিন্ত্যবাবু এখনো অক্লান্ত। 'রূপসী রাত্রি' এসেছে, এখনো নতুন প্রসন্ন সকালের প্রতীক্ষা পাঠক ও উত্তরসূরীদের। তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সেদিন যখন সাক্ষাৎ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে এক প্রকাশালয়ে। সময় ঘোর দুপুর। ওঁর তখন এজলাসে থাকবার কথা। বাইরে কেন? জিজ্ঞেস করলাম। জবাব দিলেন, 'রিটায়ার করেছি এজলাস থেকে। আবার বেরিয়ে পড়েছি পথে।

কলকাতায় যেন আবার কল্লোল যুগকে দেখতে পাচ্ছি।

আমারো মন ভরে উঠল। নতুন কল্লোলের নতুন ধ্বনি শোনবার জন্য উত্তর-সূরীরা রইল সশ্রদ্ধ প্রতীক্ষায়।

জীয়ন কাঠির সন্ধানী

রঞ্জন

সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার কোষ্ঠীবিচারের মতো নিষ্ফলা অকাজ অল্পই আছে। অন্নদাশংকরের লেখা বাঁচবে কি বাঁচবে না, সে-সম্বন্ধে তাঁর নিজের রায় যেমন গ্রাহ্য নয়, তেমনি অগ্রহণীয় কোনো তথাকথিত নিরপেক্ষ সমালোচকের মতামত। লেখকের কাজ লেখা, আর সমালোচকের কাজ সাধ্যানুযায়ী সমসাময়িক মূল্যায়ন। আমার আলোচ্য লেখকের বিরূপতা বোধ হয় ইতিমধ্যেই অর্জন করেছি। অনুমান করি, নিতান্ত প্রান্তীয় ভাষায় সাহিত্যাভ্যাস করলেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ নিরবধি কালে আর বিপুলা পৃথ্বীতে।

পাশ্চাত্ত্য অভিলাষ ও প্রাচ্য অভিমানের বিচিত্র এক সমন্বয় শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। একাধিক অর্থে তিনি বাঙলা সাহিত্যে একক; তবু নিজে তিনি এক নন, একাধিক। এই বহুত্ব অস্বীকার করতে পারিনে, কেননা, এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে তাঁর লেখা সমগ্র গ্রন্থাবলী (একমাত্র ব্যতিক্রম "অসমাপিকা") এবং এ থেকে সাধ জাগুক অন্নদাশংকর অতি সহজেই অবিস্মরণীয়। এর মধ্যে অন্তত দুইকে তিনি আজ অস্বীকার করবেন; কিন্তু তাঁর জানা থাকার কথা, তাঁর বহু অনুরাগী হয়তো ওই দুইকেই আজো আঁকড়ে আছেন। লেখক নিজে এঁদের উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও অনালোকপ্রাপ্ত বলে হেলা করলেও তাঁর রায় চূড়ান্ত না হতে পারে।

দ্বিতীয় বাঙালী লেখকের কথা জানিনে যিনি এমন পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বেঁধেছেন দূর আকাশের তারার সঙ্গে, যিনি বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছাড়া বিচারিতই হবেন না, যাঁর এমন কিছুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই যা তাঁকে অমরত্ব দেবে না। অভিলাষের এ-উত্তুঙ্গতা রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো বিস্মিত করতো, বোধ হয় গ্যেটে ও টলস্টয়কেও। অপরিমিত অভিলাষ মাত্রই নিন্দনীয় বা হাস্যকর নয়, বিশেষ করে অভিলাষীর অন্তরে যদি থাকে যাকে বলা যায় ডেডিকেশন্। অভিলাষের চরিতার্থতার জন্য এই আত্মনিবেদনই পর্যাপ্ত সম্বল কিনা সেটা অন্য প্রশ্ন।

অন্নদাশংকরের সাহিত্যপ্রচেষ্টার দ্বিতীয় যে-দিকটি আমাকে আকৃষ্ট করে তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। বেশীর ভাগ লেখকের ব্যক্তিত্ব তাঁদের প্রথম গ্রন্থে প্রকট, তার সঙ্গে পরে যুক্ত হয় এক রাশি বই, কিন্তু সবই যেন একটি রাগের কাঠামোর মধ্যে আলাপ ও বিস্তার। অন্যান্য লেখকের মৃদুতম নিন্দা নিহিত নেই আমার মন্তব্যে। আবার পরিবর্তনশীলতাও নয় মানসিক সজীবতার চূড়ান্ত প্রমাণ,

শ্রীঅন্নদাশংকর রায়

চারিত্রিক দৌর্বল্যের নিদর্শনও হতে পারে তা। বিশেষ মহত্তম লেখকদের কয়েকজনের সমগ্র সাহিত্যকীর্তি একটিমাত্র সুরে বাঁধা। অন্নদাশংকরের বেলায় বিবর্তন মাত্র অংশত বয়সের দ্বারা নির্দিষ্ট। "আগুন নিয়ে খেলা", "পুতুল নিয়ে খেলা", "তারুণ্য" ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে পরবর্তী কালের "নতুন করে বাঁচা" বা "কলঙ্কবতী" বা "কৃষ্ণ ও শ্রীমতী" ইত্যাদি বইয়ের মধ্যেকার ব্যবধানটা শুধু বয়স দিয়ে পরিমাপ করবার নয়। শুধু স্টাইল দিয়েও নয়। আরও অনেক মৌল এ-পরিবর্তন।

বাইরের বদলগুলির বিশদ ব্যাখ্যান অনাবশ্যক। সবাই জানেন, অন্নদাশংকর নিজে সবাইকে জানিয়েছেন যে, একদা যিনি ছিলেন সাহেব আজ তিনি বাবু, একদা যিনি একটি অনুজ্জ্বল লাইন লিখতেন না আজ তিনি উজ্জ্বলাতঙ্কের রোগী, একদা যিনি পুতুল ও আগুন নিয়ে খেলেছেন আজ তিনি প্রতিমা ও আলোর পূজারী, একদা যিনি তারুণ্যের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন আজ তিনি জীয়নকাঠির সন্ধানে রত, একদা যিনি বাঁচাকেই আদর্শ জ্ঞান করতেন আজ তিনি আদর্শ জীবনপথের সন্ধানী, এবং একদা যিনি যৌনজিজ্ঞাসাবিষয়ক নির্ভীক প্রবন্ধ রচেছিলেন আজ তাঁর ধ্যান মৌন-জিজ্ঞাসা। কথার কারবারী আর মৌন-জিজ্ঞাসুর মধ্যে অন্তর্বিরোধ নেই, অন্নদাশংকর আজ এমন উক্তি করলে আমি মৌন থাকব এবং আমার মৌন সর্বাংশে সম্মতির লক্ষণ বলে গৃহীত হবে না বলে আশা করব।

সজাগ মনের স্বভাবই সমাজ ও প্রকৃতির নিহিত দ্বন্দ্ব নিয়ে দ্বিধা। "সত্যাসত্য" একটি সমাসবদ্ধ শব্দ, কিন্তু শব্দ জোড়া দেওয়া যত সোজা জীবনে জোড়া লাগানো তেমনি দুরূহ। অন্নদাশংকর আজ হয়তো মনে করেন যে, তিনি তাঁর বিরোধগুলির সমাধান করেছেন। জীবনে কৌতূহল হারাননি কিন্তু আসক্তি বর্জন করেছেন, মুক্তি খোঁজেননি কিন্তু বিশ্বাসের সূত্র পেয়েছেন, বিদেশী আচার ছেড়েছেন কিন্তু স্বদেশী সংস্কারের পাঁকে পা দেননি। তাঁর এই সব সমন্বয়ে যদি তিনি মানসিক শান্তি পেয়ে থাকেন, ভালো কথা। পাঠকের বিচার্য শুধু তাঁর সাহিত্যের উপর তাঁর নবলব্ধ জীবনদর্শনের শিল্পগত প্রভাব। বিচারের রায় পুরোপুরি লেখকের মনোমত না হলে পাঠক নাচার। মীমাংসা তখন মুলতুবি রাখতে হবে অনাগত কালের
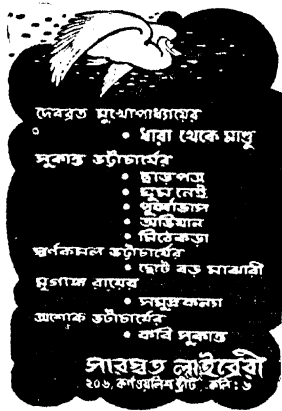
বিচারকের জন্য। অনাগত কালও অংশত বিচারক।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন যে, তিনি প্রথম "পথে প্রবাসে" পড়ে "সত্যসত্যই চমকে উঠেছিলুম।" এই চমক নামক গুণটি সাহিত্যে নিশ্চয়ই চরম নয়, কিন্তু—বোধ হয় স্বীয় দুর্বলতারই পরোক্ষ সমর্থনে—একে আমি পুরোপুরি অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করিনে। কবুল করতে লজ্জা নেই, অন্নদাশংকরের স্টাইলই আমাকে প্রথম আকৃষ্ট করে। এ-স্টাইল উজ্জ্বল, কণ্ট-কল্পিত নয় এবং সাবলীল। পরে সহসা এলো সহজিয়া বাই। জনগণের বোধগম্য করে লিখতে হবে। মুষ্টিমেয়ের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি অযথা বিলাস। সত্যের পরিবেশনে আভরণ আপদ মাত্র, অলংকার অসমীচীন। হতে পারে অন্নদাশংকরের উচ্চতর সত্যের জন্য নূতনতর রচনাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। তবু যাঁরা তাঁর অদাবর্জিত স্টাইলের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেন তাঁরা সবাই অগভীরতার অনুরাগী না হতে পারেন। গভীরের উপাসনা সব শিল্পীর পক্ষে আবশ্যক নয়, কারো কারো পক্ষে স্পষ্টত বিপজ্জনক। স্মরণীয় কথামালার সেই কুকুর, যে মুখের মাংস ফেলে দিয়েছিল ছায়ার দ্বিতীয় টুকরোর লোভে। অন্নদাশংকরের মহত্ত্বের উপর দাবির একটি বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতেই হবেঃ তিনি তাঁর সঞ্চিত খ্যাতি সম্বন্ধে সাবধানী নন আদৌ। পরিণত বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্যূতক্রীড়ায় নিয়োজিত। সব হারিয়ে সব পাবার সাধনা সফল হলে তাঁকে অভিনন্দন করব, না হলেও তাঁর সাহস অস্বীকার করব না।

সিরিল কনলির একটা কথা আছে যে, প্রত্যেক মহৎ সাহিত্যসৃষ্টিই হচ্ছে the end-product of an obsession. অন্নদাশংকরের কথা ভেবে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য-চর্চার এন্ড-প্রডাক্ট হয়েছে একটি বিরাট অবসেশন। এই অবসেশনের ফল মহত্তর সৃষ্টি হতে পারে, এ-সম্ভাবনার সঙ্গে মিশে আছে আমার অনেক আশা। তবু আমি তো জুয়াড়ী নই জুলিয়াসের মতো। আমি হিসেবী। আমার অনিশ্চয়তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁর বর্তমান আমি পুরোপুরি সাহিত্যিক বলে মানতে পারি না। আজো তাঁর উক্তিঃ "আমি লিখব জনগণের জন্য নয়, বিদগ্ধমণ্ডলীর জন্য নয়, আলটিমেট রীডার বা অন্তিম পাঠকের জন্য" কিন্তু তাঁর বর্তমান আদর্শ তার সামগ্রিকতায় নিশ্চয়ই সাহিত্যাতীত। কপট বিনয়ের আশ্রয় না নিয়ে অন্নদাশংকর সরাসরি বলেছেন—টলস্টয়, গোটে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত কাজ তাঁর উপর বর্তেছে এবং এ-কর্তব্যের অপরিমেয় বিশালতা সত্ত্বেও এর সবগুলিতে হাত না দিয়ে তাঁর নিস্তার নেই। একেই বলে অবসেশন, এবং এর সাহিত্যোর্ধ্ব প্রকৃতি নিয়ে বাগ্‌বিস্তার অনাবশ্যক।

অন্নদাশংকরকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে হবে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। তবু তাঁকে সাহিত্যবহির্ভূত সমস্যা ও সংকটের দ্বারা বিচলিত হতে দেখলে আমি বিচলিত না হয়ে পারিনে। "সত্যাসত্য" গ্রন্থাবলীর শেষের দিকে এবং তারপর থেকে অন্নদাশংকর যে-সমস্ত সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে হৃদয় কাঁদিয়েছেন—মাথা ঘামিয়েছি আমিও, অন্নদাশংকরের ইনভলভ্‌মেণ্ট তার চেয়ে অনেক বেশী—সেগুলি কোনো না কোনো সময়ে ও আকারে সুধী ও বাদলকেও ব্যাকুল করেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের সন্ধানের সাথী হয়েছি মনে মনে। কিন্তু উপন্যাসের

চরিত্র আর তার লেখক তো এক হতে পারেন না। হওয়া বোধ হয় উচিতও নয়। জীবনে শেক্সপীয়র হ্যামলেট বা ওথেলো হলে কি "হ্যামলেট" আর "ওথেলো" লিখতে পারতেন? সন্দেহ করি, একটা জায়গায় এসে অন্নদাশঙ্কর তাঁর আর তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যবধান বজায় রাখতে সমর্থ হননি। এ-আইডেণ্টিফিকেশন সর্বাংশে শুভ হয়ে থাকলে তার প্রমাণ এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। মনে রাখতে হবে, বাদল কিছু লিখে উঠতে পারেনি, সুধীও না।
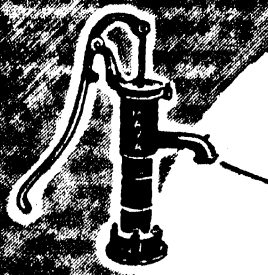
এতক্ষণ যে অন্নদাশঙ্করের অদ্যাবধি সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা না করে তাঁর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি নিয়ে শঙ্কিত চিন্তা সসম্ভ্রমে লিপিবদ্ধ করেছি, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব না। বলব, এ-ভাবনা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও আস্থারই পরিমাপ। এমন সম্ভাবনাও বর্তমান বৈকি যে, অন্নদাশঙ্কর বদলেছেন আর আমি সে সঙ্গে বদলাতে পারিনি। (আগেই বলেছি, বদল মাত্রই উন্নতি না হতে পারে। এখন যোগ করি, অপরিবর্তনের অভিযোগে তাঁর পাঠকদের মধ্যে একমাত্র আমিই সোপর্দনীয় না হতে পারি।) প্রায় তিরিশ বছর আগেকার "পথে প্রবাসে" এবং সেদিনকার "জাপানে" পাশাপাশি রেখেছি এ-প্রবন্ধ রচনা করার কয়েকদিন আগে থেকে। এতক্ষণ যে-মতের ইঙ্গিত দিয়েছি নানাভাবে তার পূর্ণ প্রত্যাহারের পর্যাপ্ত কারণ খুঁজেও পাইনি। হতে পারে একদিন আমি অন্নদাশঙ্করকে "দিলীপদাকে" কবিতাটির একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রেরণ করব—পঙ্ক্তিক বলে হেসেছি কত!—কিন্তু সে আজ নয়। আমি তো আজকের কথা লিখতে বসেছি।

এই-আজ একদিন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আমার কাছে, অন্নদাশঙ্করের কল্যাণে। জন্ম নিয়েছি গতকালের দেশে। সেখানে বসে পরিচয় পেলাম আজকের মহাদেশের, আজকের মানুষের—পরিচয় করিয়ে দিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর ভাষা, আমি যে-ভাষায় লিখতে পারলে খুশী হতাম। তাঁর দৃষ্টি, যা আমার হোতো আমার চোখ আরো সজাগ হলে। তাঁর চিন্তাধারা, যা আমার হোতো আমি তাঁর মতো বুদ্ধি ও অনুভূতি পেলে। লোকটা হাসতেও জানে—"আগুন নিয়ে খেলা", "পুতুল নিয়ে খেলা", "প্রকৃতির পরিহাস।" তারপর এলো "সত্যাসত্য"—আর আমার দিগন্ত নিমেষে প্রসারিত হোলো অবিশ্বাস্যভাবে। য়ুরোপ সুদূর ও বিচিত্র একটা মহাদেশ রইল না, তাকে চেনা গেল আমার অংশ বলে। আমি তার অংশ হলাম অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে। সেদিন য়ুরোপকে নিকট মনে হয়েছিল,
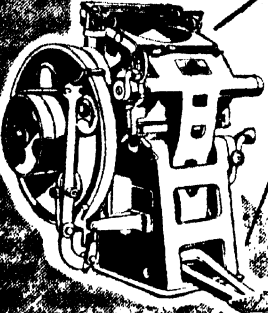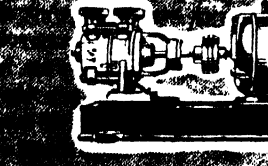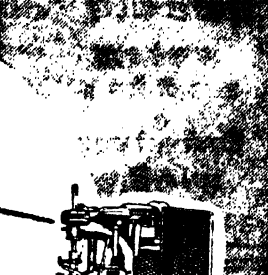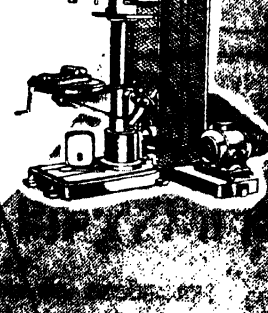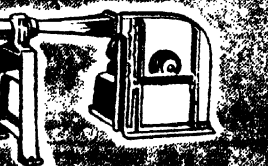
নিকট মনে হয়েছিল তাঁকে যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দূরত্ব অস্বীকার করলে অনৃতভাষণ হবে।

অসমাপ্ত "রত্ন ও শ্রীমতী" শেষ পর্যন্ত যাই হোক, "সত্যাসত্য" বাঙলা সাহিত্যে একটি মহৎ প্রয়াস বলে পরিগণিত হবে বহুদিন। "এ লেখা থাকবে।" এ-গ্রন্থমালায় দুটি মহাদেশ, দুটি বিপরীত ধারণা যে-বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় নানা রঙে চিত্রিত হয়েছে অন্তত বাঙলা সাহিত্যে তার তুলনা আছে বলে জানিনে। মার্জিত, সংবেদী একটি মন অতি পরিচ্ছন্ন ভাষায় বহুসংখ্যক বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্র এতে পরিবেশন করেছেন নানা অবস্থার মধ্যে। বেশীর ভাগ চরিত্র জীবন্ত, বেশ কয়েকজন চিন্তা করতে সমর্থ আধুনিক মনের পরিভাষায়, অন্তত কয়েকজন কাঁদতে জানে। দে সরকারের সঙ্গে বাঙলা উপন্যাসে এর আগে দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ওয়াই গুপ্তর সঙ্গে "চতুরঙ্গ"-র জ্যাঠামশাই, গোরা-র সঙ্গে বাদলের, এ-রকম দুচারটি পরিমিত সাদৃশ্য খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়; কিন্তু সমগ্রভাবে "সত্যাসত্য" একটি বিরাট প্রয়াস এবং এর সাফল্য আদৌ অকিঞ্চিৎকর নয়। খাঁটি বাঙালী উপন্যাসে চিন্তার খোরাক সাধারণত সামান্য থাকে। "সত্যাসত্য" আন্তর্জাতিক উপন্যাস, শুধু কয়েকটি বিদেশী চরিত্র আছে বলে নয়, এর প্রেরণাই আন্তর্জাতিক ও আধুনিক।

তারপর কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব আলোচনা করব না দ্বিবিধ কারণে। এক, সে-আলোচনা অপ্রীতিকর হবে। দুই, সে-আলোচনা অসাহিত্যিক হবে। রাজনীতিক গান্ধীকে তাঁর শত্রু-মিত্র কেউই পুরোপুরি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেননি। কিন্তু গুরু ও দার্শনিক গান্ধীকে কেউ কেউ সে-ভাবে গ্রহণ করেছেন। এ-গ্রহণের আন্তরিকতা সন্দেহ করিনে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পাঁজির গ্রহণের ফল দিয়েছে। সাময়িক অন্ধকার হয়েছে। এ-প্রসঙ্গ আর নয় আপাতত।

অন্নদাশঙ্কর "সত্যাসত্য" শেষ করে অনেকদিন পরে কিছুতে হাত দিতে সাহস করেননি। চাকরির ব্যস্ততা তার পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। প্রধান পঙ্গুতা আভ্যন্তর। নানা সামাজিক ও জাগতিক সংকট বিক্ষেপ হয়ে এসেছে, কিন্তু তিনি বিক্ষিপ্ত হয়েছেন আপন মানসিক অনিশ্চয়তার জন্য। কোসলার সম্প্রতি বলেছেন, There is only one way to write and that is to sit down and write. অন্নদাশঙ্কর নিজেকে বসতে পর্যন্ত দেননি। কিছুদিন লেখাকে পর্যন্ত মনে হয়েছে গৌণ বিলাস বলে। শিল্পের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে তথাকথিত জীবন-শিল্প। বংশীধর হতে চেয়েছিল হলধর বা আর-কিছু। বাঁশি বেসুরো বেজেছে বা নীরব থেকেছে। পরধর্মো ভয়াবহ, লেখক সে-কথা মনে রাখেননি। আমারই সামনে রয়েছে প্যামফ্লেটের স্তূপ, নানা রঙের ম্যানিফেস্টো। লেখকের পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতির জন্য এগুলি দরকার হয়ে থাকতে পারে। সাহিত্য-বিচারে এদের গুরুত্বের সামান্যতা লেখক নিজে স্বীকার করেছেন। মনে রাখতে হবে, অন্নদাশঙ্কর স্পেনের গৃহযুদ্ধের মতো কোনো আদর্শগত সমরে হাতে-কলমে যোগ দেননি। তিনি শুধু নানা থিয়োরির জালে নিজেকে জড়িয়েছেন, হাত কামড়েছেন, কলম তোলা রয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর আমাদের অশিক্ষিতপটুদের দলে নন। অকস্মাৎ তিনি পটুয়াদের প্রেমে পড়লেন। এখানে দ্বিতীয় এক রায়ের কথা তুলব, যামিনী রায়। তিনিও একদিন পাশ্চাত্ত্য অঙ্কনপদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন অনেক পরিশ্রম করে। পরে একদিন মুখ ফিরিয়ে নিলেন সেই বাঁধা সড়ক থেকে এবং গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথে রঙ দেখলেন। অপূর্ব, জীবন্ত শিল্পসৃষ্টি হোলো। হয়তো অন্নদাশঙ্কর সম্বন্ধেও আমার আশঙ্কা অংশত অমূলক বা অতিকৃত। সফিস্টিকেশন ছেড়ে সারল্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু সে-কাজ কী পরিমাণ দুরূহ তার স্বীকৃতি আছে "উড়কি ধানের মুড়কি"তে।

তবু আশঙ্কার পরিপূর্ণ নিরসন হয় না। ফোক আর্ট অত্যন্ত সীমিত বলে মনে করি এবং যামিনী রায়ের সাম্প্রতিক বন্ধ্যাত্বায় আমার ধারণার সমর্থন আছে। কিছুদূর গিয়ে গ্রামের পথ থেমে যায়। এ যেন মেলডি, একতারা। হার্মনি আর অর্কেস্ট্রার বৈভব এতে দুর্লভ। একতারা আমার কাছে কিছুক্ষণ পরে একঘেয়ে লাগে। অন্নদাশঙ্কর আমার উপর রাগ করতে চান করুন। আমি শহুরে এবং আমার বর্তমান নাগরিক রুচির গঠনে অতীত এক অন্নদাশঙ্করের কিছু "অবদান" ছিল যা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে বর্তমান নিবন্ধ শেষ করব। শেষ কথা লিখতে বসিনি। শেষ কথা বলে কিছু থাকলেও তা আমার অজানা। আর অজানা লেখক অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী পদক্ষেপ। বেশীর ভাগ লেখক সম্বন্ধে তো বলতে হয় পরবর্তী পঁচিশটি পদক্ষেপ পুরোপুরি জানা, বড্ডো বেশী জানা!

সোনার হরিণ

সন্তোষকুমার ঘোষ

লিখলাম, কাটলাম, কাগজে হিজিবিজি আঁকলাম, কপালে হাত রেখে বসেও রইলাম খানিকক্ষণ, কিন্তু গোড়া-পত্তনের পক্ষে যে-কথাটি সবচেয়ে মানানসই হত, সেটি কিছুতে কলমের মুখে এল না।

অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে কিছু বলব বলে বসেছিলেম। এখন না বলে চোরে থাকার উপায় নেই। প্রতিজ্ঞা যখন, তখনই ভাবা উচিত ছিল।

কাউকে নিয়েই কোন কিছু লেখা আমার পক্ষে মুশকিল—যদি না গল্পাকারে লিখতে পারি। অর্থাৎ রপ্ত করেছি বানিয়ে বলাটাই, কিন্তু এখানে সে অভ্যাস কাজে লাগান কি ঠিক হবে? সত্যের অপলাপের ভয় আছে না! কিন্তু অপলাপ কোন সাংবাদিক? সবাই যাকে সত্য বলে, তার নাগাল যদি না পাই, তবে একটা সত্য আবিষ্কার বা সৃষ্টি করতে পারি। আর, সত্য বই মিথ্যা বলিব না হলপ করে কাঠগড়ায় ত দাঁড়াইনি।

হলপ করেন জীবনীকার। "যেমনটি দেখেছি হুবহু তেমনটি লিখব, কেন ও বাদ আমাদের সাজে না। সঠিক একটি রচনা-নিখুঁত প্রতিকৃতি প্রস্তুত করবার জন্য যোগাযোগের সমালোচকেরা আছেন। আমি আমার মনের মত করে একটি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আঁকি না কেন? তিনি অন্তত আমার মানহরণ করবেন। পুরানো আলোচনার কাছে যারা কোন তথ্যনিষ্ঠ লেখকের জন্য খোলা থাকে। তিনি কী করবেন জানি। প্রথমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনাবলীর পাতা নতুন করে ওল্টাবেন। তাঁর জন্ম সাল তারিখ ইত্যাদি সংগ্রহ করবেন; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আরও সব প্রয়োজনীয় তথ্য—তিনি প্রথম লিখতে শুরু করেন কবে, কেন ইত্যাদি। হাতে পেনসিল, পকেটে নোটবই, তিনি হয়ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ইন্টারভিউ নিতে ছুটবেন।

আমি ও পথে হাঁটব না। শুধু এই কারণে যে, জানি, ওটা কোন ফল নেই। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র ধরা দেবেন না, কেননা, তাঁরও বিশ্বাস, কবিকে পাবে না তার জীবনচরিতে। যাঁর লেখকসত্তা স্বর্ণমৃগ, তাঁকে ধরবার পণ অকারণ, ছোটাই সার হবে।

আপ্যায়নে অবশ্য ত্রুটি হবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শোনা যাবে তিন সাহেব নিয়ে তিন বিবিকে জব্দ করবার সৌভাগ্য কী কী গ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশে আসে, কত ট্রিকের পুঁজি নিয়ে স্ল্যাম ডাকা বিধেয়, অণুতম পরমাণুকে দীর্ণ করে আমরা পৃথিবীকে মরুভূমি করে তুলছি এই ধারণা ঠিক কি না; তুলনীয় তাপপ্রবাহে ব্যাবিলনে খৃষ্টপূর্ব কোনো শতকে ঘটেছিল; অধুনালুপ্ত কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর হাড়ে হাড়ে কত ভেলকি ছিল, সে বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ কিছু বলেই (বাক্যাংশের ফাঁকগুলি আপনাকেই পূরণ করতে হবে) তিনি হয়ত উপদেশ দেবেন, আপসেট ঘোড়া উইনে ধরাই পৌরুষের সার। একটি কাল্পনিক নমুনো দিলে আশা করি মানহানির দায়ে পড়ব না।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

একেবারে মাঝখান থেকে শুরু করাই ভাল। ধরুন আলোচনাটা আরম্ভ হয়েছিল হিমালয় পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক সংগঠন নিয়ে। এবং আরম্ভ হতে না হতেই উঠে পড়ল দীঘার সমুদ্র-সৈকতে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ। প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন : বুঝলে এই যে মেদিনীপুরের 'সি কোস্ট' এর একটা ব্যাপার আছে, নব্বুই বছর পর পর ওখানে একটা বিরাট সাইক্লোন হয়, তছনছ করে দেয় সব, ১৯৪২ সালে একটা হয়েছে, ১৮৫২ সালের রেকর্ডও আমি দেখেছি, আমার ধারণা তারও নব্বুই বছর আগে... আচ্ছা, এটা কি করেছ কি অ্যান্টেনার চরিত্র? অ্যান্টেনারের শিং দেয়া ও ধরনের হয় না, তারপর বুঝলে, লাইট হাউসে চড়বার বেশ একটা থ্রিল আছে, একবার রাজপুরীর পর্বতে ...হ্যাঁ, তারপর কাগজ চলছে কেমন?"

স্পষ্টই বোঝা যায় কোথায় যেন তাঁর অস্থিরতা। একটি মুখ পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েই ফিরে ফিরে যাচ্ছে। যা বলছেন তাঁর মন নেই তার কিছুতেই। সেই মন তখন অরণ্যের জটিলতায় হয়ত পথ ভুলেছে; জঙ্গলের ছায়া দেখছে বাঘের নীপশ চোখে।

সময় লেগেছিল। তাঁর রচনায় যে বহিরঙ্গ আতিশয্য নেই, শৈলীতে দুষ্ট মুদ্রা নেই; বর্ণনা সংযত, এ-কথা তখনই কি, প্রেমেন্দ্রর 'পুতুল ও প্রতিমা' পড়তে পড়তেই অনুভব করেছিলাম? বোধহয় না। তখন দিশাহারা হয়েছি 'সাগর-সঙ্গমে', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' পড়ে আড়ষ্ট হয়েছি, 'হয়ত'-র নিষ্ঠুর রহস্য চকিত করেছে। মানুষের মমতা, প্রীতি, ভালবাসা; ক্রূরতা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা; উল্লাস আর হতাশার পাশাপাশি চিত্র দেখে বিস্মিত-আচ্ছন্ন-মোহিত হয়েছি। আমার জীবন-বোধ, শিল্পবোধ তখনই চিরদিনের মত তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আশ্চর্য, যে শিল্পী আমার মনের শান্তির নীড় ভেঙে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা। তাঁর নিপুণ ছুরির প্রতি আমার লোভও; কেননা, সেই ছুরি শাণিত অথচ সুন্দর। মসৃণ এবং উজ্জ্বল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র যে কবি সেটা টের পেতে তাঁর কাব্যগ্রন্থ পড়বার প্রয়োজন নেই। তাঁর যে কোন গল্পের কয়েক ছত্র পাঠই যথেষ্ট। একটি কাব্যময়তা তাঁর সমস্ত রচনায় নির্মোক হয়ে রয়েছে। অন্তরালে আছে বলে তাঁর নির্মমতাও মমতার মত কোমল-করুণ হয়ে দেখা দেয়। শিল্পস্রষ্টা হিসাবে তাঁর হাতে শুধু 'ভেলভেট গ্লাভস'ই দেখেছি 'মেলড ফিস্ট' কখনও নয়।

আরও একটা জিনিষ লক্ষণীয়—তাঁর রচনায় নয়, ঘটনার অনিশ্চয়তা। সবই কেমন যেন থেকে থেকে সূক্ষ্ম পর্দার মত কাঁপে, প্রত্যক্ষকেও ঈষৎ অস্পষ্ট আর সুন্দর করে তোলে। তাঁর বাক্য যোজনায় এত যে 'যেন' 'বুঝি' আর 'হয়ত'র ছড়াছড়ি—সে কি এই কারণে?

*

এই লেখাটি যখন লিখছি, তখন আমার হাতের কাছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোন গ্রন্থ নেই—ইচ্ছে করেই রাখিনি। তাঁর মারফত যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, পরখ করে দেখতে চাই না, তাদের কজনকে মনে করে রাখতে পেরেছি—সেই সব বেনামী বন্দরের নাবিক, নিশীথনগরীর পথচারী আর অফুরন্ত-দুর্লিধুসের অজস্র চরিত্র?

প্রায় কাউকেই ভুলিনি। মনে পড়ছে সেই লোকটিকে যার সব ব্লাফ আর মিথ্যে, কিন্তু মেয়েটি নয়; সেই মেয়েটি যে প্রণয়ীর চেয়ে তার স্বামী ঢের মহৎ জেনেও তাকে ভাল-বাসা দিতে পারেনি, আর সেই দুঃখে কাঁদছে। স্ত্রীকে যন্ত্রণা দেওয়াই যার নিষ্ঠুর খেলা, সেই ভদ্রলোকটিকেই বা ভুলব কী করে—সে তার স্ত্রীকে একা সিনেমায় ফেলে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছিল না? যে-ভাইটি মহানগরীতে এসে তার দিদিকে খুঁজে পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু স্তম্ভিত হয়েছিল তার জীবনের স্বরূপ দেখে; অনেক দিন

একসঙ্গে ঘর করার পর সামান্য কারণে ছাড়াছাড়ির সময়ে যে বিহারী বা ভোজপুরী মেয়েটি অনায়াসে, নির্বিকার গলায় বলেছিল, "যা তু থানেমে যা"—তাকেও ভোলা সহজ না। পুরনো চিঠি খুলে গোপন কথা নববধূ আবিষ্কার করেছে; সে না-জানি কী মনে করেছে এই ভাবনায় তার স্বামীর একটি দিন নষ্ট হয়েছিল, আবার সে কিছুই মনে করেনি জেনে তার স্বামী অনুভব করল নষ্ট হয়েছে তার সমস্ত জীবনটাই। এই মানুষটিও এই মুহূর্তে আমার মনে বিস্মৃতি থেকে জেগে উঠে বসল। সেখানে চেয়ার পেতে একটু আগেই বসেছেন ভস্মশেষ ভালবাসার ডাক্তারবাবু, আর তার পাশেই আছেন সিংধকল্প একটি পুরুষ, যিনি মাথা নীচু করে ভাবছেন, জীবনে যা-কিছু চেয়েছিলেন, সবই ত পেয়েছেন, তবু তাঁর চিত্ত অসুখী কেন। ডেকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে তাঁর পাশে আরও অনেককে এনে বসাতে পারতাম, কিন্তু স্টোভ ফেটে পড়ল, প্রতীক্ষার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যার চিরযৌবন ঝরে পড়েছে, বহিনসম রুপো নদীপের সেই ডাইনি বুড়ি হঠাৎ হেসে উঠল, আর 'সব ঝুটা হায়' বলে ভূগোলেই যার বুঝি অস্তিত্ব নেই সেই সর্বনাশা তেলেনাপোতা গ্রাম চাইল সব স্মৃতি ঢেকে দিতে।

দুঃস্বপ্ন কত আর বাড়াব।

*

এত বকলাম, এখনও কিন্তু বক্তব্যে উঠতে পারিনি, কোন্ গুণে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশিষ্ট লেখক, বাংলা কথাসাহিত্যের কোন্ ধারার তিনি প্রবর্তন করলেন, তাঁর আর্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি কী?

প্রশ্নটা কঠিন হল, এবং কারো করে উত্তরে বলতে পারতাম, যে-কথা বহু মনের ভিতর অগোচরে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাকেই তাঁর কথায় কথায় চুরি করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্যটা তাতে স্পষ্ট হত না।

অন্যভাবে বলি। রিয়্যালিটি বস্তুত দুই। এক, বাইরে যা ঘটে, তাকে আমরা চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি দিয়ে গ্রহণ করি। মৃত্তিকার কঠিন স্তরের উপরে যা ঘটছে সেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অভিজ্ঞতা শিল্পসৃষ্টির মালমশলা হয়। কুশলী লেখকেরা তাকে কাজে লাগান। আবার অলক্ষ্য এক জগৎ আছে, যার অস্তিত্ব আমাদের মনে। সেখানে যা ঘটে, বাইরে তুলে এনে ধরলে তা-ও সত্যবৎ রূপ পায়। কিন্তু এই রিয়েলিটি বস্তুগত নয়, একান্তই আর্টের। এই জগতে আলোর রঙ পাখির রবে বাজে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ চিল মুছে ফেলে।

এই জগতে মানুষ সুখেই হাসে না, হাসে দুঃখেও। আবার সুখের মুহূর্তে

দীর্ঘশ্বাসও ফেলে। সুখের হাসির আর দুঃখের কান্না সহজ সত্য, তাকে রূপে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ নয়। কিন্তু দুঃখের হাসি আর সুখের দীর্ঘশ্বাসকে সত্য করে তুলতে পারে আর্ট। পাওয়াকে হারান আর হারানকে পাওয়া ইত্যাদি বহু আপাত-অসম্ভবকেও সে সম্ভব করে তোলে। বস্তু-জগতে মণির দাম অনেক, কিন্তু মণিকেও যে-ক্ষণে মণি বলে না-মানার ইচ্ছা জাগে, সেই মহৎ ক্ষণটিকে তুলে ধরতে শুধু শিল্পীই পারে।

আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই। অন্ধ চোখে দেখে না, তার এই দুঃখ বাস্তব। এবং এ নিয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনী রচনা সম্ভব। হয়েছেও। কিন্তু 'নয়ন মুদিলে অন্ধ' যা দেখে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বাস্তব সত্যও না, কিন্তু শিল্পের সত্য।

এই শিল্পসত্যের অজস্র নমুনা ছড়ানো প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে। অনেক চাওয়া সেখানে ভুল করে চাওয়া, অনেক চকচকে সাফল্যের সোনাই—তিনি আঁচলের গেরো খুলে দেখিয়েছেন—আসলে সামান্য কাচ। মৃদুভাষ অথচ নির্মোহ দৃষ্টির অধিকারী বলেই তিনি অনন্য।

বলতে পারতাম, নিঃসঙ্গও। কিন্তু নিঃসঙ্গ ত তিনি নন। তাঁর অনুজ কয়েকজন লেখক অন্তত এই শিল্পদৃষ্টির উত্তরাধিকার পেয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গী আজ তাঁরাই।

তাও হয়ত-বা অনুভব বা বোধের ক্ষেত্রেই। প্রকাশের ক্ষেত্রে এই মিতবাক, পরিচ্ছন্ন, পূর্বসূরীর নিপুণতার শরিক হওয়া সহজ নয়। তুলির টানে টানে যিনি একই সঙ্গে খানিক আলোর জ্বালা আর খানিক বেদনার ছায়া মিশিয়ে রহস্য-পরিবেশ সৃষ্টি করেন, তাঁর রঙের পাত্রটির খোঁজ সকলে কি পায়!

*

পরিশিষ্ট : লেখাটা শেষ করবার আগে একটা ছোট খবর দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। সে-খবর প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও জানা নেই। খবরটা এই: তিনিই আমাকে কবি হতে দেননি। প্রথম যৌবনে ভাবাবেশে লাইন মিলিয়ে পদ্য লেখা ধরেছিলুম। মৌতাতটা জমেছিল, দু একটা পদ্য ইতস্তত ছাপাও হয়েছিল। তাতে উচ্ছ্বাস, হা হুতাশ ছাড়া বিশেষ কিছু থাকত না। ঠিক এই সময়েই হাতে একটি কাব্যগ্রন্থ পড়ল—নাম 'প্রথমা'। কবিতাগুলি পড়লুম। একবার নয় বারবার, একদিন দেখি প্রায় সব কটি কবিতাই কবে যেন মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। (স্বীকার করতে লজ্জা নেই, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া আর মাত্র একজন কবিরই অজস্র কবিতা আমি অনায়াসে মুখস্থ বলতে পারি—তিনি রবীন্দ্রনাথ)। 'প্রথমা'র কবিতাগুলি পাঠের প্রথম ঘোর যেদিন কাটল সেদিন খাতা কলম নিয়ে আবার ছড়া বাঁধতে বসলুম। অবাক হয়ে দেখি কলম সরে না। যা লিখতে যাই তাই মনে হয় কাঁচা, অযোগ্য, অকিঞ্চিৎকর। কবিতা লেখা আমার জীবনে আর হয়ে ওঠেনি। তবু বলব আমার ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি সকলি ফাঁকি। গল্প লেখায় হাত মকসো করা যখন শুরু হল—প্রেরণা, আদর্শ, প্রভাব সব প্রেমেন্দ্র মিত্র। সে প্রভাব কি আজও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি!

প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে কবি হতে দেননি; কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে গল্পলেখক করেছেন।

ছোট ঘর : পৃথিবী : জীবন

প্রফুল্ল রায়

অতীতের ঝাঁপিতে হাত দিলে প্রথমেই যা উঠে আসে তা একটি ছোট ঘরের স্মৃতি। এতদিন পর পিছনের জীবনের অনেক কিছুই যখন হারিয়ে ফেলেছি, অনেক কিছুই যখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, তখনও সেই ছোট ঘরটিকে অবিকল মনে করতে পারি। কেন পারি? এর উত্তর খুঁজতে গেলে মনে হয়, সেই ছোট ঘরটি আমার একটা বিশেষ ধারণার প্রতীক। কিন্তু এ সব অনেক পরের কথা। আগের কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

তখন আমি লেখক হই নি, এমন কি পাঠকও না। তখন আমি হাই স্কুলের উঁচু দিকের কোন এক ক্লাসে পড়ি। আমাকে নীরেট ভালো ছেলে তৈরি করার জন্য আমার অভিভাবকদের বাবস্থায় কোন খুঁত ছিল না।

মফস্বল শহরের যে বাড়িটিতে আমরা থাকতাম, তার সামনে লাল সুরকির পথ, পিছনে ছোট একটি নদী, যার নাম রূপসী। বাড়িটি ছিল দোতলা। দোতলার ছাদে ছোট একটি ঘরে সারা দিন (স্কুলের সময়টুকু ছাড়া) পড়ার বই নিয়ে আমাকে আটক থাকতে হত। সেই ছোট ঘরটির চারপাশে ছোট বড় অসংখ্য নিষেধের পাহারা বসানো ছিল। সেই নিশ্ছিদ্র, নিঃসংগ ঘরে কোন খারাপ ছেলে কি বাজে বই ঢোকাবার উপায় ছিল না। বাইরের পৃথিবী থেকে খানিকটা দূষিত আবহাওয়া সেই ঘরখানার মধ্যে ঢুকে যে আমাকে খারাপ করে তুলবে, এমন কোন ফাঁকই অভিভাবকরা রাখেন নি।

আমার অভিভাবকদের মনোভাব ছিল অদ্ভুত। তাঁদের চোখে বাইরের ছেলে মাত্রেই খারাপ, ক্লাসের পড়ার বই ছাড়া অন্য সব বই বাজে। ব্যবহারিক জীবনে যা অপ্রয়োজনীয়, এমন সব কিছুর উপর তাঁরা 'খারাপ'—এই শীলমোহরটি মেরে দিতেন। তাঁদের সংগে সাহিত্যের সম্পর্ক মধুর ছিল না। নাটক-নভেল জাতীয় গল্পের বইগুলো হাজার মাইল দূর থেকে আমাদের বাড়িটাকে দণ্ডবৎ জানিয়ে মানে মানে সরে পড়ত।

এক এক সময় আমার কান্না পেত। ছাদের সেই ছোট ঘরখানাকে জেলখানা মনে হত। পড়া বন্ধ রেখে মাঝে মাঝে জানালার সামনে এসে দাঁড়াতাম। ছোট ঘরের ছোট জানালা দিয়ে বিরাট আকাশ দেখতে দেখতে মন উদাস হয়ে যেত। আমার অপরিণত মনে একটা অস্ফুট ইচ্ছা উঁকি দিত। ভাবতাম, কোন এক দিকে বেরিয়ে পড়ি। ভাবতাম, ছোট ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে কবে আমি বিরাট আকাশের, বিপুল পৃথিবীর উন্মুক্তির স্বাদ পাব?

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

হঠাতই বিরাটের স্বাদ পেয়ে গেলাম।

এতগুলি অভিভাবকের এতজোড়া সতর্ক চোখ এড়িয়ে, এতগুলি নিষেধের বেড়া টপকে কার মারফত কেমন করে বইটা আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল, আজ আর মনে নেই। বইটার নামও ভুলে গিয়েছি। কিন্তু লেখকের নাম আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে—প্রবোধকুমার সান্যাল।

প্রথম উপন্যাস পড়ার স্বাদ প্রথম প্রেমের মতই রমণীয়। কিছুটা বা উত্তেজক। মনে আছে, পাঠ্য বই-এর ভাঁজে ফেলে এক নিঃশ্বাসে বইটা শেষ করেছিলাম। উপন্যাসটির আখ্যান অংশ এখন আর মনে নেই। অনেক কিছুই ঝাপসা। কিন্তু প্রধান পুরুষ চরিত্র অর্থাৎ নায়ককে আজও আমি ভুলতে পারি নি। সে ছিল নিয়ত অস্থির, ভ্রাম্যমান। জীবনের অদম্য বেগ তাকে অবিরত তাড়িয়ে নিয়ে চলে। কোথাও তার স্থিতি নেই। যতদূরে তার চোখ যায় মন যায়, সে শুধু ছুটে বেড়ায়। ছোট গণ্ডীর মধ্যে জীবনকে সে পোষ মানায় না। ছোট মাপের ঘর, ছোট মাপের সমাজ, ছোট মাপের মন, ছোট ছোট সব পিঞ্জরা ভেঙে পৃথিবীর সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে কিসের আনন্দে সে যেন ছুটে বেড়ায়।

উপন্যাসটা পড়ার পর কয়েকটা দিন বিচিত্র এক নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলাম।

ছোট ঘরের মধ্যে সারাদিন আটক থেকে আমার মনের মধ্যে একটি সংগোপন ইচ্ছা জন্ম নিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল, অভিভাবকদের শাসন-বেষ্টন চার পাশের ছোটবড় অসংখ্য নিষেধ আর মানব না। যেমন করে

পারি, সেই ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে বিপুল [illegible] মধ্যে সে আমাকে সঙ্গ দিল, আশ্বাস দিল। পৃথিবীর স্বাদ নেব। প্রবোধ কুমারের [illegible] তার সঙ্গে আমার সখ্য হল। উপন্যাসের নায়ক আমার ইচ্ছার মূর্তি ধরে [illegible] প্রবোধকুমার, সান্যাল তাঁর প্রথম সামনে এসে দাঁড়াল। আমি যা হতে চাই [illegible] উপন্যাসের মফস্বল শহরের এক কিশোর অবিকল সে তা-ই। ছোট ঘরের একাকীত্বের [illegible] পাঠক [illegible] জয় করে নিলেন।

ছোট মফস্বল শহর ছেড়ে একদিন কলকাতায় এলাম। তখন আমি বড় হয়েছি, কলেজে পড়ি এবং মধ্য কলকাতার এক হরিজন মেসবাড়িতে একটা ছোট কুঠরি ভাড়া নিয়ে সহপাঠী এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকি।

এখানে অভিভাবকদের তাড়না নেই। ক্লাসের পড়ার বইগুলি সযত্নে বাক্সের ভিতরে পুরে যা কিছু 'অপাঠ্য' হাতে আসে, গোগ্রাসে গিলি। এইভাবেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় হল। বলতে দ্বিধা নেই, এই সময় প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাই আমি সব চেয়ে বেশি পড়েছি। 'কলরব', 'নিশিপদ্ম', 'প্রিয় বান্ধবী' থেকে শুরু করে তাঁর সদ্যো-প্রকাশিত বইটি পর্যন্ত পড়ে ফেলি। শুধু কি প্রকাশিত বই, যে সব রচনা 'সোনার বাঙলা', 'মজলিস', 'শঙ্খ' 'কালি-কলম' এবং 'কল্লোল' পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল, খুঁজে খুঁজে সেগুলো বার করলাম। এই সব রচনার মধ্যে 'খাঁচার জীবন একটানা', 'বুদ্ধদেব', 'মাটির ঢেলা' গল্প হিসেবে এবং 'উর্মিকর মেলা' স্কেচ হিসেবে আমার খুব ভাল লেগেছিল।

প্রবোধকুমার সান্যাল তখন আমার প্রিয় লেখক, আমি তাঁর অনুরাগী পাঠক।

তখন আমার প্রথম যৌবন। প্রথম যৌবনের সঙ্গে স্বভাবতই প্রচুর আবেগ মিশে থাকে। সেই আবেগে ভান নেই, ভণিতা নেই; তা নিখুঁত। সেই বয়সে, যখন আবেগে ভরপুর ছিলাম, তখন মনে হত, আমি প্রবোধকুমারের উপন্যাসের নায়ক হব। এ কথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগত।

প্রবোধকুমারের রচনা পড়তে পড়তে মনে মনে তাঁর একটা চেহারা কল্পনা করতুম। কিন্তু চেহারাটা কিছুতেই পছন্দ হত না। সেই কারণেই তাঁকে দেখে, আমার কল্পিত চেহারার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে নেবার সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার অসহ্য এক ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসত।

আমার সহপাঠী বন্ধুটি তখন পুরো-দস্তুর কবি। দিনরাত বুকের নীচে বালিশ গুঁজে পদাবলী লিখত। সব সময় তার মুখে সাদিনক সিগারেট অলঙ্কৃত থাকত। কোনক্রমে সিগারেট স্থানচ্যুত হলেই বন্ধুটি কবিতা লিখতে লিখতে মাথে রাজা-উজীর মারত। প্রতি দিন নিয়ম করে দুপুরের ডাকে তিনজন সম্পাদকের দপ্তরে তিনটি কবিতা সে পাঠাত। দু'একদিনের মধ্যেই যথারীতি অক্ষত অবস্থায় সেগুলি ফিরে আসত। কবিতা ফিরে এলেই অদ্ভুত এক দার্শনিকতা তার উপর ভর করে বসত। কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে সে চেঁচিয়ে উঠত, সম্পাদক ব্যাটারা কিস্‌সু বোঝে না। তুমি দেখে নিও, সময়

একদিন আমার দাম দেবে। আমার ট্র্যাজেডি, পঞ্চাশ বছর আগে বাঙলা সাহিত্যে এসেছি।' বলেই দ্বিগুণ উদ্যমে কবিতা লিখতে বসে যেত।

বন্ধুটির মুখেই শুনেছিলাম, বাঙলা সাহিত্যের ছোট-বড়-মাঝারি, হেন লেখক নেই যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই, যে তাকে খাতির করে চলে না।

একদিন তার কাছে আর্জি পেশ করলাম, 'ভাই প্রবোধ সান্যালকে দেখাও।'

বর দেওয়ার ভঙ্গিতে ডান হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে বন্ধুটি বলল, 'এ আর এমন কি! আজ বিকেলেই প্রবোধ সান্যালকে দেখিয়ে আনব।'

সন্ধ্যের খানিকটা আগে বন্ধুটি আমাকে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে এক প্রকাশকের দোকানের সামনে এনে দাঁড় করাল। এখানে নাকি রোজ সাহিত্যের আড্ডা বসে। দিক-পাল লেখকরা এখানকার আড্ডাধারী। আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বন্ধুটি দোকানের কাউন্টারে গিয়ে একটি লোককে ফিস ফিস করে কি যেন বলে এল। তারপর ফিরে এসে আমাকে বলল, 'দোকানের ভেতর হাতলওয়ালা চেয়ারে যিনি বসে আছেন, তিনিই প্রবোধ সান্যাল। তুমি দেখতে থাক; আমি সিগারেট কিনে আনি।'

বন্ধুটি সিগারেট কিনতে সেই যে গেল, আর ফিরল না। অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করে দোকানের কাউন্টারে এসে উঁকি দিলাম। একটি লোক বই বিক্রি করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রবোধকুমার সান্যাল কে?'

লোকটি ভুরু চোখের ইশারায় সে জন দিকে দেখিয়ে দিল।

বই টইয়ের ছোট্ট স্তূপের মধ্য দিয়ে দোকানের ভিতরে মৃদু [illegible] করে ঢুকলাম। দেখলাম, হেলানো চেয়ারে একজন প্রিয়-দর্শন পুরুষ বসে আছেন। চওড়া কবজি, চিতানো বুক, টকটকে ফর্সা রঙ, আশ্চর্য স্বপ্নালু দুটি চোখ, যৌবনসুলভ কঠিন চোয়াল, বসবার ভঙ্গিটি ঋজু। এই প্রথম প্রবোধকুমার সান্যালকে দেখলাম। তখন তাঁর বয়স হয়েছে। সামনের দিকে বিরল চুলের ফাঁকে একটি টাক দেখা দিয়েছে; হয়ত সামনে গেলে তাঁর মুখে সরু সরু অনেক রেখাও খুঁজে পেতাম। কিন্তু তখন, সেই বয়সে আমার চোখে বিচারের চেয়ে বেশি ছিল মোহ। অপলক চোখে একজন কান্তি-মান সুপুরুষ সাহিত্যিককে দেখছিলাম।

খুব সম্ভব প্রবোধকুমার সেদিন জমিয়ে গল্প করছিলেন। গল্পের বিষয় কি ছিল, দূর থেকে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তাঁর গলার স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বরটি বড় ভাল লাগছিল।

কাউন্টারে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হল না। সন্ধ্যের আগে লাগল। আমিও এক সময় মেসের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। প্রথম দিন প্রিয় লেখকটিকে দেখেই এলাম। আলাপ করতে পারলাম না। কোন সুবাদেই বা আলাপ করব?

মেসে ফিরে এসে একটা কথাই ভাব-ছিলাম। কেন জানি আমরা মনে হচ্ছিল, প্রবোধকুমারের চেহারায় দস্যুতার সঙ্গে আবেগ, কাঠিন্যের সঙ্গে স্বপ্নময়তা মিশে আছে।

একদিন সকালে উঠে দেখলাম, আমি লেখক হয়ে গিয়েছি। কেমন করে লেখক হলাম, সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে লেখক হবার সূত্রেই একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের বাড়িতে এক-দিন প্রবোধকুমার সান্যালের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা হতে খুব বেশী সময় লাগল না।

এই প্রিয়ভাষী প্রিয়দর্শী সাহিত্যিক এক-দিন তাঁর প্রথম উপন্যাস দিয়ে আমাকে জয়

করেছিলেন। এবার তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করলেন।

এতদিন অবুঝ আনন্দে প্রবোধকুমারের রচনা পড়েছি। লেখক হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্ন জেগে উঠল। প্রবোধকুমারের রচনা কেন পড়ি? কেন ভাল লাগে?

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, আমি প্রবোধ-সাহিত্য বিচার করতে বসিনি। সে দায়িত্ব অন্যের। একজন অনুজ লেখক হিসেবে, একজন অনুরাগী পাঠক হিসেবে একজন অগ্রজ লেখকের কাছ থেকে কতটুকু পেয়েছি, কতটুকু ঋণ গ্রহণ করেছি, এখানে সে কথাই বলতে চেষ্টা করব।

কথায় কথায় একদিন প্রবোধকুমার বলেছিলেন, 'ভাই, চৌবাচ্চার পার থেকে একদিন সমুদ্র দেখতে বেরিয়েছিলাম। সমুদ্র দেখেও সাধ মিটল না। এবার মহাসমুদ্র দেখতে যাব।'

আমার মনে হয়, এই কথাগুলির মধ্যেই তাঁর রচনার মূল সুরটি রয়েছে। লেখক হিসেবে তিনি ঈষৎের নন, বিরাটের। তাই খণ্ড থেকে পূর্ণতায়, ক্ষুদ্র থেকে বিপুলে, বিপুল থেকে বিপুলতমের দিকে তাঁর অক্লান্ত অগ্রগমন। 'তুচ্ছ' গ্রন্থে আমার এ কথার সমর্থন আছে। প্রবোধকুমার লিখেছেন, 'ঘরের থেকে বাহির, সে বাহির অনেক বড়। বিধি-নিষেধের বাহিরে যে-জীবন—সে-জীবনের আস্বাদ আমার দরকার ছিল। স্নেহ-মোহ-বন্ধনের অতীত যে মহাজীবনের ডাক তার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেত.........'

মনে হয়, বক্তব্যটি আরো একটু স্পষ্ট করা দরকার। এই স্পষ্ট করার সূত্রেই আমি 'কল্লোল'-যুগে ফিরে যাব।

'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে প্রচলিত সাহিত্য-ধারার বিরুদ্ধে একদিন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এ সময় রুচিবদলের জন্য সাহিত্যের বিষয়বদল হয়েছে। রীতি, আঙ্গিক এবং কলাবিধি নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা চলেছে। সাহিত্যের কান্তি, পুষ্টি এবং ঋদ্ধির জন্য এ বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিল।

প্রবোধকুমারের মতে 'কল্লোল' শুধুমাত্র বিদ্রোহ; সর্বাত্মক বিপ্লব নয়। যে বিপ্লব সাহিত্যকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে পৌঁছে দেয়, তেমন কোন সুস্পষ্ট বিপ্লব এ যুগে দেখা যায় নি।

তবু 'কল্লোলীয়' বিদ্রোহের সুফল আমরা আহরণ করেছি। 'কল্লোলে'র লেখকরা যখন সাহিত্যের আসরে নামেন তখন রবীন্দ্রনাথ খ্যাতি এবং দীপ্তি মধ্যগগনে। সাহিত্যের এমন কোন দিক ছিল না, যা তাঁর প্রভাবে আলোকিত হয় নি।

'কল্লোলে'র বিদ্রোহ মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব মুক্তির জন্য বিদ্রোহ। বলতে দ্বিধা নেই, 'কল্লোলে'র লেখকরা অধিকাংশই ছিলেন খণ্ড প্রতিভাধর। কারো একজনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল না। তাই 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ ছিল গোষ্ঠীর বিদ্রোহ।

আগেই বলেছি, 'কল্লোলে'র বিদ্রোহে আমরা সুফল পেয়েছি। সেই সুফলটি কী?

এককালে সাহিত্যে শ্রেণী-বিশেষের চিত্র-চরিত্র দেখা যেত। যারা উচ্চবর্ণ, যারা ভূমিপতি সমাজপতি, সাহিত্যে তাদের অপার মহিমা কীর্তন করত। কালক্রমে লেখক সর্বশ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে সচেতন হলেন। সাহিত্যের দৃষ্টি লোকায়ত হল। সেই সুযোগে বিত্তবান কুলীনের আসরে বিত্তহীন অন্ত্যজরা হানা দিল। ইতর অন্ত্যজনরা উচ্চ কুলশীলদের সঙ্গে সমান মর্যাদা পেল। সাহিত্যের পটভূমি বিস্তৃত হল। সাহিত্যের জীবন ব্যাপক হল। 'কল্লোলে'র লেখকরা সেই যে সিংদরজা খুলে দিয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বিপুলা পৃথিবীর বিচিত্র সব মানুষ আদিবাসী, যূথমানব, বিশেষ গোষ্ঠী, নাবিক, বেদুইন, আজব-জীবিকা-জীবী, ভিনদেশী, ভিনপ্রদেশী—সবাই সাহিত্যের আসরে ঢুকে পড়ল।

'কল্লোল' বাঙলা সাহিত্যে বিরাট উন্মুক্তির স্বাদ এনেছে। এটাই কল্লোলীয় বিদ্রোহের সুফল।

'কল্লোলে'র বিদ্রোহ ছিল গোষ্ঠীর

বিদ্রোহ। প্রবোধকুমার এই গোষ্ঠীরই একজন। এবার দেখা যাক, 'কল্লোলে'র বিদ্রোহে তাঁর ভূমিকা কী? এবং সেই ভূমিকার স্বরূপটাই বা কী?

তাঁর সমকালীন লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচনে নিবিষ্ট, শৈলজানন্দ সবেমাত্র কয়লাকুঠির অজ্ঞাত জীবন-কথা শুনিয়েছেন, তারাশঙ্কর জীবনের গভীরতার সন্ধানে মগ্ন, মানিক বন্দোপাধ্যায় জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণে নির্মম, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্ন নির্লিপ্তিতে বিভোর। এই সময় প্রবোধকুমার সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে তাঁর জীবন এবং সাহিত্যের জন্য পরম প্রেয় এবং শ্রেয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আসামের সীমান্তভূমি থেকে কেদারবদরী, রাজপুতনার মরুভূ থেকে দুরারোহ হিমালয়—এমন একটা জায়গা নেই, যেখানে তাঁর পায়ের ছাপ পড়েনি। ভারতবর্ষের দুর্গম পথে পথে, পাহাড়ে-পর্বতে-অরণ্যে তিনি জীবন-মৃত্যুর অপার মহিমা খুঁজেছেন। যে জীবন তীব্র, খরধার, বিচিত্রস্বাদ সে তাঁকে হিমালয়ের পাদপীঠ থেকে, সমুদ্রতীর থেকে, নির্জন অরণ্য থেকে বার বার ডাক দিয়েছে। বার বার তিনি ঘরছাড়া হয়েছেন।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগে' প্রবোধকুমারকে মানস সরোবরের যাযাবর হাঁসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রবোধকুমারের যাযাবরত্ব তাঁর রচনাকে দিয়েছে বেগ, ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য এবং বিপুলতা। 'কল্লোলে'র বিদ্রোহকে তিনি দিয়েছেন ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে বিরাট পৃথিবী দেখার প্রেরণা। এ বিদ্রোহে এ-ই তাঁর ভূমিকা।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মানুষের কোন পরিচয় আঁকতে আপনি ভালবাসেন? সামাজিক না রাজনৈতিক না আধ্যাত্মিক?'

এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে প্রবোধকুমার হঠাৎই জবাব দিয়েছিলেন, 'মানুষের Socio-Spiritual পরিচয়টাই আমার আঁকতে ভাল লাগে।'

হঠাৎই বলে ফেলেছিলেন কথাটা। কিন্তু আমার মনে হয় এর চেয়ে বড় সত্য প্রবোধকুমারের রচিত চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আর হয় না।

মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি প্রশ্ন আছে, যাদের বুদ্ধি বিমূঢ়, যুক্তি অগ্রাহ্য, যারা অনুভূতিবেদ্য আধ্যাত্মিকতা ছাড়া তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, প্রবোধকুমার এই প্রশ্নগুলিকে তাঁর সাহিত্যে চিহ্নিত করতে ভালবাসেন।

আমার এক সমালোচক বন্ধু বলেছিলেন, 'প্রবোধকুমার শুধু রোমাণ্টিক। এত বেশি মাত্রায় রোমাণ্টিক যে তাঁর চরিত্রগুলো অনেক সময় অবাস্তব মনে হয়। মনে হয়, তারা ভাবমান, শ্যাওলাধর্মী, মাটির সঙ্গে তাদের যোগ নেই।'

প্রবোধকুমার শুদ্ধ রোমাণ্টিক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কিন্তু রোমাণ্টিক ছাড়া কোন কালে বিদ্রোহ সম্ভব? প্রবোধ-এর চরিত্রগুলি আবেগ এবং রোমাণ্টিসিজমের প্রাবল্যের জন্য অনেক সময় বাস্তবতার মাত্রা মানে না। কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রবোধকুমারের চরিত্রগুলি শুধুমাত্র রোমাণ্টিসিজম-সর্বস্ব নয়।

যা ঘটে তা-ই সব সময় বিশুদ্ধ সত্য নয়। যা ঘটা উচিত এবং যা ঘটার সম্ভাবনা আছে, তার উপর সাহিত্যের সত্য অনেক সময় নির্ভরশীল। মনে হয়, সম্ভাব্যতার উপর প্রবোধকুমারের চরিত্রগুলি দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে সেই মহাজন-কথা পুনরাবৃত্তি করা যায়, 'Probability is the only test'.

প্রবোধকুমারের রচনা সম্বন্ধে ভাবতে বসলে মফস্বল শহরের সেই ছোট ঘরটির কথা মনে পড়ে। আগেই বলেছি, সেই ছোট ঘরটি আমার বিশেষ একটা ধারণার প্রতীক। এবার দেখা যাক, ধারণাটি কী?

আমার মনে হয়, সেই ছোট ঘরটি মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতীক। তার চারপাশে সমাজের নিষেধ, ধর্মের নিষেধ, নীতির নিষেধ।

প্রবোধকুমারের রচনা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, সেই ছোট ঘরের দেওয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। আমি বিশাল পৃথিবীর, বিপুলতর জীবনের ডাক শুনেছি। প্রবোধকুমারের কাছ থেকে অনুজ লেখক হিসাবে আমরা অনেকেই ব্যাপ্তি, বেগ এবং বৈচিত্র্যের পাঠ গ্রহণ করেছি; এ কথা অকপটে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

কে না জানে, লেখক ততদিনই বাঁচেন যতদিন তিনি তাঁর অনুগামী লেখকদের উপর প্রভাব রাখতে পারেন। আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরেও প্রবোধকুমার দীর্ঘজীবী হবেন।

অসভ্য লেখক, ছোকরা সাইন্স টিচার বলছেন, এরাই আসল লেখক...।

আমাকে খানিক পরেই সেই তর্ক-গরম ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তাড়িয়ে দেবার সময় অবশ্য বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হল, আর মাস দেড় পরে ফাইন্যাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা......অংকে চল্লিশ পাওয়া ছেলের অশ্লীল 'নবেল' পড়ার সময় এটা নয়।

এই ঘটনা আজও প্রায় স্পষ্ট আমার মনে আছে। ......পরে, বছর দুই আড়াই বাদে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল যা এ-প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল।

তখন কলেজের ছাত্র। অ-বাবু ছিলেন আমাদের ইংরিজীর অধ্যাপক। একবার ক্লাসে তিনি একটি রচনা লিখতে বললেন : নিজের প্রিয় বাঙালী ঔপন্যাসিক এবং তাঁর একটি বইয়ের আলোচনা। আমি জানতাম, ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে **শরৎচন্দ্র** লিখবে, দু চারজন **রবীন্দ্রনাথ** লিখতে পারে। সবাইকে টেক্কা এমন কি অ-বাবুকেও চমকে দেবার লোভে আমি লিখলাম বুদ্ধদেব বসু। দিন কয়েক আগেই পড়েছি 'বাড়ি বদল'; বাড়ি বদল আর বুদ্ধদেব এই নিয়ে পাতা তিন লিখে ফেলে ক্লাসের বাইরে এসে একটা সিগারেটই খেয়ে ফেললাম।

দিন তিন চার পর ইংরিজীর ক্লাসে অ-বাবু নাম ডেকে ডেকে খাতা ফেরত দিতে লাগলেন। একে একে প্রায় সব খাতাই দেওয়া হয়ে গেল, আমারটাই ফেরত পাই না। প্রতিবারই ভাবি, এবার ডাক পড়বে, প্রতিবারই অন্য নাম অন্য ছেলে...। এ-যেন সেই রেজাল্ট-আউটের শিট দেখা। বলতে কি, শেষের দিকে আমার হঠাৎ কেন জানি কেমন একটা ভীত উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। বুক কাঁপছিল।

একেবারে শেষ খাতাটাও আমার নয়। ফিজিক্স গ্যালারীর সিঁড়ি ভেঙে নেমে অ-বাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পা কাঁপছে।

'স্যার আমার খাতাটা—'

'তোমারটা দিই নি?'

'না, স্যার।'

'তা হলে আমার ঘরে টেবিলে পড়ে আছে। যাবার সময় দেখে যেয়ো।' আমার দিকে চেয়ে এবার কেমন করে একটু হাসলেন—দাড়ির আড়ালে হাসিটা আরও ঘোলাটে লাগল। 'বুদ্ধদেবের ক'টা বই পড়েছ?'

এমন আচমকা এবং নাটকীয় ভাবে প্রশ্নটা শুনলাম যে, ঘাবড়েই গেলাম। বুঝতে পারছিলাম না কি ধরনের উত্তর নিরাপদ হবে। শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'অনেকগুলো পড়েছি স্যার।'

'অ-নেক গুলো......! বাঙালী মডার্ন লেখকদের লেখা তুমি বুঝি খুব পড়?'

'পড়ি, ভালো লাগে।'

'তাই মনে হল। ফ্যাসনেবল বয়......। কিন্তু বুদ্ধদেবের 'বাড়ি বদল' বাজে বই।'

অ-বাবুর কথায় সেদিন আহত হয়েছিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম আমায় আঘাত দেবার জন্যে তিনি কিছু বলেননি। অত্যন্ত গুণী স্নেহশীল এই অধ্যাপক মানুষটি পরে আমাকে আধুনিক লেখকদের লেখা পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন।

যে দুটি ঘটনার উল্লেখ করলাম তার কিছু তাৎপর্য আছে, একেবারে অকারণ নয়। এই সামান্য দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে, আমরা যখন বুদ্ধদেবদের লেখা পড়ছি, অর্থাৎ আধুনিক বাঙালী লেখকদের লেখার ভক্ত হয়ে উঠছি, তখন দু-ধরনের সাহিত্য-অভিভাবক ছিলেন। একদল (সংখ্যায় এঁরাই ভারী) ভয়ংকর গোঁড়া, মারাত্মক রকমের প্রাচীনপন্থী; অন্য-দলটি গোঁড়া নন, তবে আধুনিক লেখকদের বহু লেখায় তাঁরা স্বস্তি পেতেন না। স্বভাবতই যারা বিরূপ তাঁরা আধুনিকদের অস্পৃশ্য করে রাখতে চাইতেন, মধ্যপন্থীদের মনোভাব ছিল অনেকটা সংযত। বুদ্ধদেব প্রমুখ লেখকদের অনেকের লেখার ক্ষমতা আছে এটা অন্তত তাঁরা স্বীকার করতেন। ঠারে ঠোরে বলতেন, এদের ক্ষমতার চেয়ে 'প্যাকেট' বেশি। উপর কি চটকি আর। ফ্যাসানেবল রাইটার্স।

এই দুদলের বাইরে ছিল অনুরাগীর দল। সংখ্যায় পরিমিত কিন্তু অনুরাগে উন্মত্ত। আমরা ছিলাম সেই উন্মত্ত অনুরাগীর দলে।

২

একদা যাকে ভাল লাগে, ভালবাসি—মন প্রাণ সমর্পণ করে দি—পরে, অনেক পরে—আর যে কেন তাকে তেমন করে ভাল লাগে না মাঝে মাঝে তাই ভাবি। সাহিত্যের বেলায় শুধু নয়, জীবনের বেলাতেও এই একদার ভাল অন্যদিনে হতাশ করে, বেদনা দেয়।

বুদ্ধদেবের লেখা দশ বারো বছর আগেও যে ব্যাকুলতা ও আগ্রহ নিয়ে পড়েছি আজ আর পড়তে পারি না। কেন?

আমার বার বার মনে হয়েছে, বুদ্ধদেবের রচনা পড়ার এবং তার রস অনুভব করার একটি বিশেষ ঋতু আছে। সে ঋতু যৌবন, নতুন যৌবন, নতুন মন, আবেগময় হৃদয়; অসীম বাসনা যখন। তাই নয় কি?

তুলনা অধিকাংশ সময়ে যুক্তির দুর্বলতা, তবু এ কথা কি বলা চলে না যে, বুদ্ধদেবের লেখা পড়লে মনে হয়, শান্ত নির্জন এক ঘরে বসে একটি পীড়িত বিক্ষুব্ধ আবেগময় হৃদয় এ-সংসারের অপরিপূর্ণতার কথা বার বার স্বগতোক্তির মতন বলছেন......বলে বলে ক্লান্ত হচ্ছেন, নীরব হচ্ছেন......আবার নতুন করে বলছেন আরও বেদনার সঙ্গে।

বুদ্ধদেবের শিল্পকর্মের মধ্যে একটি নির্জনতার পরিমণ্ডল, আত্মগত আবেশ, মন্থর শ্বসনক্রিয়া ও বহির্জগৎবিমুখতার স্বাদ পাওয়া যায় বলেই হয়ত অমন ছবিটি আমার মনে আসে।

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব তাঁর সমসাময়িক যুগের লেখকদের সঙ্গে এখানে অন্তত পৃথক, স্বতন্ত্র। তাঁদের যুগে সাহিত্যে

অ্যাডভেঞ্চার কিছু কম হয়নি। সাহিত্যের সিধে রাজসড়ক ছেড়ে অনেকে অনেক দিকে ছুটেছেন, রুক্ষ নির্মম 'রিয়ালিটি'র নামে অনেক মাল মশলা এনে ছড়িয়েছেন—তার কিছু বা সার্থকও হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেব? পাদমেকং ন গচ্ছামি। ঘরে বসেই লিখব, ছুটে বেড়িয়ে ডায়েরী খাতায় নোট কুড়িয়ে, চাষী-মজুর-মেথর হীন দীনের জীবনের খণ্ড খণ্ড চমৎকারী ছবি এঁকে তোমায় ভোলাবো না। না পাঠককে, না সাহিত্য সরস্বতীকে। যুগের ফ্যাসান, গণপতির ভয়ংকর সব দাবী, সমালোচকদের মুঠো মুঠো প্রশংসার ফাগ......না এত লোভেও স্বধর্ম ভ্রষ্ট হবেন না এই তাঁর সংকল্প। পাত পেড়ে ভোজ দেবার ডাক নিয়ে সাহিত্য তিনি করেন নি। তাঁর নিষ্ঠা এবং সাহিত্যপ্রেম যে বিশুদ্ধ বাঙালী পাঠক অন্ততে তার প্রমাণ পেয়েছে।

অনেকের মুখে শুনেছি, (কারণ আমার সঙ্গে ওঁর কখনও সামান্যতম সাক্ষাত পরিচয় হয়নি) বুদ্ধদেবের অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য স্বল্প, জীবনের বৈচিত্র্য ও রহস্যময়তার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ নয়—ফলে গল্প-উপন্যাসে তাঁর সফলতা আংশিক।

অভিজ্ঞতা শব্দটির ধরা বাঁধা কোনো অর্থ কি আছে! যতদূর জানি বিশ্ব-পর্যটক হলেই মহৎ সাহিত্যিক হওয়া যায় না, আবার মহৎ সাহিত্যিক হবার প্রাথমিক শর্ত এই নয় যে, সাত সাগরের জল খেতে হবে। সাহিত্যে এর একাধিক নজির আছে।

আসলে আমরা কতক 'পোটেনশিয়াল' অভিজ্ঞতার ওপরই বেশী নির্ভর করি; বাকিটা পাই বাইরে থেকে। ঘর-বাহির মিলিয়ে-মিশিয়ে শিল্পীকে এর পর যা করতে হয়, গুণীজনে তাকেই বলেছেন, 'অ্যান্ড হি ইমাজিনড...'।

আমরা যাকে সচরাচর কল্পনা বলি এই 'ইমাজিনেশান' কিন্তু ঠিক তা নয়। হয়ত এর প্রতিশব্দ হবে ধ্যানদৃষ্টি—যে-কল্পনার শক্তি প্রায় ঐশ্বরিক, সুসংগত, অপরূপ, মহান।

বুদ্ধদেবের কল্পনা মহৎ নয়, কিন্তু সুন্দর, সূর্যের মতন তার বিশ্বব্যাপী উদ্ভাস ক্ষমতা নেই; কিন্তু নক্ষত্রের মতন সে দীপ্ত। তোমায় আমায় কোনো কোনো মুহূর্তে স্বপ্নের মতন হাতছানি দেয়। এই মাধুর্যে যেন বা প্রলেপ, বিরহ, বেদনাই বা কাজল দিতে পারেন!

৩

সাহিত্য নামক রাজ্যটির রাজপাটে অনেক সময় নকল রাজারা বসে থাকেন। এঁদের কাছে মাথা নোয়াবার জন্যে কত যে লোকজন! তবে ভরসা এই, প্রচারে তিনি আজ সম্রাট, বিচারে তিনি ফাঁসির সাজা পান দু'দিন পরেই! সাহিত্যশিল্পের ইতিহাসে এর নজির কম নেই।

বুদ্ধদেব আমার প্রিয় হলেও, তাঁর কপালে দুধের ফোঁটা উপচে করে দিয়ে একথা আমি বলব না, ইনি সম্রাট। তিনি না সম্রাট, না গণতন্ত্র নির্বাচিত নায়ক। বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের রাজবংশের তালিকায় শেষ পর্যন্ত তাঁর চার অক্ষরের ছোট নামটি কোথায় থাকবে আমার এখন সে বিষয়েও আতংক হয়।

সম্রাট না হলেও বুদ্ধদেবের নিজের একটি ভূমি ছিল। সেই ভূমিকে তিনি নিজের ভূমণ্ডলে পরিণত করেছিলেন। সম্ভবত, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সাহিত্যে নিজের—একেবারে নিজের পছন্দ মতন একটি জগত সৃষ্টি করে নিতে আর কেউ পারেননি। বুদ্ধদেবকে ঠিক এই কারণেই এত স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

বুদ্ধদেবের শিল্প-জগতের পরিধি পারাপারহীন নয়। বরং আমরা সেই ছোট পৃথিবীকে বেড় দিয়ে ধরতে পারি। মুশকিল এই যে, এ-পৃথিবীর অসংখ্য ছড়ানো ছিটোনো খণ্ড বিখণ্ড সৌন্দর্য আমাদের খুঁজে নিতে হয়, তিলে তিলে সম্পূর্ণ তিলোত্তমাকে পাই না।

ছোট গল্প খণ্ডরূপ বলেই বুদ্ধদেবের গল্পে এই সৌন্দর্য ধরা যায়, অনুভব করা যায়, এমন কি মাঝে মাঝে মনের ফ্রেমে

ছিলেন। এছাড়া তাঁর গতি ছিল না। বাইরের পৃথিবী যার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারল না, তার পক্ষে মনের পৃথিবীই সব। আর মনের পৃথিবী এমন জিনিস, যেখানে পাখা মেলা ও অবাধ বিচরণ সহজ, কিন্তু কঠিন, ভীষণ কঠিন—যদি মনকে ঢিলের পাথায় না বেঁধে এক্স-রের আলোর তরঙ্গে ফেলে রাখতে হয়।

বুদ্ধদেব উপন্যাসের নবরীতি গ্রহণ করেছিলেন। করেননি নব্য-ন্যায়। ন্যায় গ্রহণ করলে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র বদলে যেত। কাব্য-সুষমার প্রাচুর্য ছাড়াও বড় জিনিস থাকত, আরও বড় কাব্য—মহৎ কাব্য—যাকে বলি জীবন-মন্থনের কাব্য। এই জীবন, এই আধুনিক জীবনে যে কত মত্ততা, অস্থিরতা, জটিলতা—এই জীবনের কী দুঃসহ বেদনা-যন্ত্রণা—কতটা পীড়ন—এর নিষ্ঠুরতা, ইতরতা, কদর্যতার কূপে আমরা গলায় গলায় ডুবেছি বলে দিবাবার কী ভীষণ হাহাকার—বুদ্ধদেব তা জানাতে পারতেন। পরিতাপ এই, তিনি অঙ্গে আধুনিক হলেন আত্মায় নয়।

অবশ্য বুদ্ধদেবকে আজ আর দোষ দিয়ে লাভ নেই। তেমন উপন্যাস কেউই-বা সে-যুগে, এমন কি অদ্যাবধি লিখেছেন! মানিক হয়ত পারতেন। তাঁকেও আমরা বহু আগে হারিয়েছি।

এত অনুতাপ জানবার পরও কথা কিছু থাকে। বুদ্ধদেব বিশুদ্ধ উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন—(অর্থাৎ সেই ধরনের উপন্যাস, যাতে কাহিনীর ভারে মেদিনী লজ্জায় দ্বিধা নয়, ঘড়ির কাঁটা ক'ঘর ঘুরে গেল ঘটনার তোড়ে তা জানতেই পারলাম না, বুঝতেই পারলাম না, পাতার পর পাতা যে দৌড় দৌড়েছি, তাতে এতটুকু কষ্ট হল)।

বাংলা দেশের পাঠক নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হলে বুদ্ধদেবকে অন্তত এটুকু সম্মান দেবেন, আজ থেকে বিশ-বাইশ বছর আগে যখন বাংলা দেশের উপন্যাসের চরিত্র পরিবর্তনের তেমন কোনো চেষ্টা নেই, তখনই বুদ্ধদেব এই মহৎ অভিলাষ নিয়ে সাহিত্যে নেমেছিলেন এবং সহস্র নিন্দা কুড়িয়েও এই দুঃসাধ্য সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

হয়ত কেউ কেউ হেনরি জেমসের মতন বলবেন, ওসব কথা থাক, শিল্পীকে তার [illegible] নিজস্ব ক্ষেত্র নিতে দাও, তার আইডিয়া, his donnée। তারপর দেখ সে এই সব নিয়ে কী গড়ল, কেমন গড়ল। ……আমিও তাতে একমত।

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে বৈচিত্র্য নেই। তাঁর বেশির ভাগ রচনাই একটিমাত্র কাহিনীর বিভিন্ন রূপ—বিভিন্ন কোণ থেকে দেখা একাধিক মেজাজ। একমাত্র ব্যতিক্রম বুঝি 'কালো হাওয়া'। বুদ্ধদেবের লেখার চরিত্রের সঙ্গে যেন এই উপন্যাসটি মানায় না। অথচ প্রথম লিখর 'অসূর্যম্পশ্যা'র পর 'কালো হাওয়া'কেই আমার তাঁর মধ্যযুগের উজ্জ্বল কীর্তি বলে মনে হয়। 'কালো হাওয়া'য় বুদ্ধদেব যেমন তীক্ষ্ণ শ্লেষময় জীবন-সচেতন, তেমনই তিনি বেদনাময়, দুঃখময়। কালো হাওয়া সযত্নে রাখার মতন বই, সানন্দে ফিরে ফিরে পড়ার মতন উপন্যাস। প্রসঙ্গত বলি, আমার মনে হয়, জীবন তাঁর কাছে যেন শান্ত স্তব্ধ একটি পুকুর; ঘটনা একটি ঢিলের প্রতীক শুধু। বুদ্ধদেবের একমাত্র কৌতূহল, ঢিল পড়ার ঘটনাটি (event) ঘটার পর শান্ত নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলে কম্পনজাত যে প্রাথমিক জলবৃত্ত এবং সেই বৃত্তের আঘাতে সৃষ্ট একাধিক ক্রমবর্ধমান ক্রমবিলীয়মান যে বৃত্তমণ্ডল তার প্রতিটি স্পন্দনকে শিল্পরূপে রূপায়িত করা। শিল্পী হিসেবে তাঁর এই তীব্র অনুভূতিপ্রবণতা, সূক্ষ্ম কারুকর্মে গভীর অভিনিবেশ বাংলা সাহিত্যে সে-যুগে দুর্লভ ছিল।

দেহ ও আত্মা বুদ্ধদেবের সাহিত্য-কর্মের অন্যতম মূল উপাদান বলে অনেকে মনে করেন। বুদ্ধদেব প্রেমে বিশ্বাসী। প্রেম সম্পর্কে তাঁর কল্পনালোকে যে ধারণা আছে, বিশ শতকের [illegible] সে প্রেম [illegible]। বুদ্ধদেব এমন এক প্রেমে বিশ্বাসী, যার [illegible] কৃত্রিমতা নেই। বলা যায় এই প্রেম [illegible] এক অবিশ্বাস্য শক্তির মতো মানুষকে [illegible] রূপান্তরিত করতে পারে। বুদ্ধদেবের চেতনার গভীরে এই আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর ক্রিয়াশীল বলে [illegible] প্রেমের [illegible] ও ক্ষুব্ধ দেখি। বুদ্ধদেবের [illegible] প্রেমিক নায়ক-নায়িকা [illegible] যেন [illegible] কোথায় এক [illegible] এই [illegible] প্রায়ই [illegible] হয়।

মানুষের অস্তিত্বে দ্বিবিধ: দেহ আর মন। দেহগত অস্তিত্বের প্রতি বুদ্ধদেব বিমুখ নন, কিন্তু সুপ্রসন্ন যে, এমন কথাও বলা চলে না। দেহের সমস্যা এলে বুদ্ধদেবের অতিরিক্ত অস্বস্তি এবং বিব্রত ভাব নিবিষ্ট পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। এবং বুদ্ধদেবের নায়ক তখনই যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে স্বগতোক্তি করে, —"যেমন করে একটি কবিতাকে ভালোবাসি, তেমনি করে……তেমনি করে ভালোবাসতে চাই তোমাকে। ……তুমি কি তোমার দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারো?" অলডাস্ হাক্সলী দেহ-মনের যে সমস্যায় পীড়িত, মনে হয় বুদ্ধদেবেরও সেই একই সমস্যা। অর্থাৎ প্রেম এক বিড়ম্বনা—।

একটি নাম আর কয়েকটি বই

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোড়ার দিকের ছোট একটি উপন্যাসের নাম 'জীবনের জটিলতা'। যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৬-৩৭ সনে বইখানি পড়েছিলাম। কাহিনীটি এখন আর ভালো করে মনে পড়ে না। একটি বিবাহিতা নারীর প্রতি আর একটি অবিবাহিত যুবকের আকর্ষণ আসক্তি সেই বইয়ের বিষয়বস্তু। বইটি মানিকবাবুর সাহিত্যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি নয়। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন আর সাহিত্যে নামটির বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে। আজও, তাঁর শেষ পর্যায়ের সৃষ্টিতে সরলী-করণের চেষ্টা সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জটিল জীবন আর সাহিত্যের প্রতিশব্দ হয়ে রয়েছে।

অবশ্য বইয়ের নাম হিসাবে 'জীবনের জটিলতা' আমার পছন্দ হয়নি। বড় সরল নাম। জটিলকে যদি সোজা ভাষায় শুধু জটিলই বললাম তাহলে তো সমস্ত জটাজুট চোখের সামনে তুলেই ধরা হল। তখন নামটি পড়ে আমার তাই-ই মনে হয়েছিল।

সেই বয়সে বুঝিনি জীবনের সমস্ত জটিলতা সরলতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলেই তা জটিল। তা সারল্যের নাম নেয়, রূপ নেয়, অন্যকে ভোলায়, নিজেকেও বিভ্রান্ত করে। যখন ভাবি গিঁট খুলে গেল তখনই হয়তো গিঁট পড়তে থাকে। জটিলতা জীবনের আকারে নয় প্রকারের মধ্যে, ধরা দেওয়ায় নয় ধরা না দেওয়ার মধ্যে। কি পরের কাছে, কি নিজের কাছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে কি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমার কখনো মনে হয়নি, তিনি একটি জটিল প্রকৃতির মানুষ। দীর্ঘ, ঋজু এবং বলিষ্ঠ গড়নের এই মানুষটিকে কখনো বা খুব দূর থেকে, কখনো বা আরো কাছে থেকে দেখে সাধারণ পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে ভেবেছি, ইনিই সেই প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, শৈলজশিলা আর বিষাক্ত প্রেম গল্পের লেখক, পদ্মানদীর মাঝি আর পুতুলনাচের ইতিকথার অন্তর্গত পুতুলের জটিল চরিত্রসূত্র ও'রই হাতে। যেন সরীসৃপের লেখককে দেখতেও সরীসৃপ হতে হবে বাঁকা জীবনের রূপশিল্পীও হবেন অষ্টাবক্র।

শুধু দেখতে নয়, শুনতেও মানে কথা-বার্তায় আলাপ আলোচনায় তাঁর কোন ঘোর-প্যাঁচের পরিচয় পাইনি। লেখার সময় যে যৌগিক বাক্য তিনি ব্যবহার করতেন, যে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরনের শ্লেষ আর ব্যঙ্গ সেই সব বাক্যবাণ উচ্চারিত হত, মুখের আলাপে তা ধরা পড়ত না। বরং তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা, কথা ছিল যাকে পূর্ববঙ্গের গ্রামভাষায় বলা হয় 'চাঁছাছোলা'। ধারালো দায়ে সমস্ত কঞ্চি ছেঁটে গিঁটগুলি চেঁছে যে বাঁশকে সম্পূর্ণ মসৃণ করা হয়েছে সেই বাঁশের সঙ্গে বাক্যের তুলনা। সে বাক্য সরল হতে পারে কিন্তু সহজ নয়।

ধর্মতলায় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অফিসে মানিকবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম মুখো-মুখি পরিচয়। তার কিছুদিন বাদে আমার প্রথম উপন্যাসের একখানি কপিতে আমি মানিকবাবুর নাম লিখে সশ্রদ্ধভাবে তাঁর হাতে দিয়ে বলি, 'আপনি যদি পরিচয়ে একটু—'

তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! আমি অবশ্যই করে দেব।'

তারপর দু মাস চার মাস ছ' মাস গেল, বছর ঘুরে এল। সমালোচনা আর বেরোয় না। দেখা হলেই একথা সেকথার পর আমি পরম সংকোচে মৃদু তাগিদ দিই, 'মানিক-বাবু, বইটা পড়েছেন?'

মানিকবাবু বলেন, 'না, এখনো পড়িনি। এই পড়ব।'

লেখক হিসাবে আমার তখন বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা অল্প, আর সেইজন্যেই নিজের বইয়ের সমালোচনা দেখবার আগ্রহ অপরিসীম। বইখানা পড়তে মানিকবাবুর এক বছরের জায়গায় না হয় দু' বছর লাগুক তাতে কিছু এসে যায় না, কিন্তু তাঁর পড়ার সঙ্গে যে সমালোচনা বেরোবার সম্পর্ক আছে। আমার তাগিদ আরো ঘনতর হয়।

তারপর মানিকবাবু একদিন বললেন, 'হ্যাঁ, পড়েছি।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'তাহলে আপনিই বোধ হয় সমালোচনা লিখবেন।'

মানিকবাবু বললেন, 'না আমি লিখব না।'

'কেন?'

মানিকবাবু বললেন, 'মিছিমিছি শত্রু বাড়িয়ে লাভ কি?'

আমি যে দারুণ আঘাত পেলাম একথা না বললেও চলে। ভাবলাম বইটা খারাপ লাগলেও আর একটু মধুর করে কি তিনি বলতে পারতেন না। প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধেয় লেখকের কাছে একটুখানি আশ্বাস আর খানিকটা সস্নেহ প্রশ্রয় কি একজন তরুণ লেখক দাবি করতে পারে না।

তবু আমি সহজে ছাড়লাম না। বইখানি সম্বন্ধে আরো দু একটি কথা জিজ্ঞাসা করে আমি শেষ পর্যন্ত এই ধারণা নিয়ে ফিরে এলাম যে মানিকবাবু হয় তো বইটা একেবারেই পড়েননি আর তিনি যদি না পড়েই খারাপ বলে থাকেন তাই বরং আমার পক্ষে ভালো।

ঠিক সেই দিনই নয় তার অনেকদিন বাদে আমার মনে হয়েছিল ওই একটি কথার মধ্যে মানিকবাবুর চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় রয়ে গেছে। সে পরিচয় তাঁর নির্মম ব্যবহার, প্রচণ্ড রকমের নিষ্ঠুর হবার ক্ষমতা।

এই সামান্য অপ্রীতিকর প্রসংগটুকু এখানে উল্লেখ করলাম এইজন্যে তারপর আমাদের মধ্যে এ ধরনের কোন দুর্ঘটনা আর ঘটেনি। এমন কিছু হয়নি যাতে প্রীতি আর প্রসন্নতায় ঘাটতি পড়ে। তারপর যতবার তাঁর সংগে দেখা হয়েছে আমরা একজন, আর একজনের কুশল জিজ্ঞাসা করেছি, লেখার খবর নিয়েছি। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'লেখাটেখা কি রকম হচ্ছে?'

এখানে বলে রাখি, মানিকবাবুর হাসি আমাকে বিস্মিত করত, মুগ্ধও করত। শব্দে আমি রূপে ফোটাতে পারি না, তাঁর সেই হাসির বর্ণনা করতেও পারব না।

কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর হাসবার ভংগির মধ্যে একটি সরল বিব্রত বালকের ধরণটুকু যেন দেখতে পেতাম। তিনি অবশ্য তাঁর বাল্যকৈশোরকে তখন বহুদূরে ফেলে এসেছেন। অনেক পোড় খেতে খেতে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। তবু মাঝে মাঝে সেই পোড়ামাটির মুখে প্রসন্ন এক মৃৎশিল্পীর হাসি ফুটে উঠতে দেখতাম।

তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এত সামান্য আর এত অগভীর ছিল যে সেই সম্বন্ধে একটি রেখাচিত্রও আঁকা চলে না। তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়নি, কিন্তু পরিচিত হবার আকর্ষণ আমি অনুভব করতাম। তাঁর প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য আর শেষ পর্যায়ের জীবন আমাকে দুর্নিবার ভাবে টেনেছে। সবাই জানেন তাঁর জীবন ধরাবাঁধা মসৃণ জীবন ছিল না। আর যে যাই বলুক, অমসৃণ সংকীর্ণ কাঁধুরে পথ তিনি নিজের জন্যে নিজেই তৈরি করেছিলেন। তাঁর সবরকম ক্লেশ কষ্টভোগের জন্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী তিনিই।

কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও, জানা সত্ত্বেও তাঁর ওপর আমার সহানুভূতি নিঃশেষ হয় না, বরং আরো গভীর হয়। Dangers and evils of life সম্বন্ধে যে লেখক নিঃসন্দেহে সচেতন তিনিই এ ধরনের জীবনের দিকে একই সঙ্গে ভয়, বিস্ময় আর অনুরাগের চোখে না তাকিয়ে পারেন না। শিল্পীমাত্রেই জানেন অসংযম কী, আসক্তি কী দুঃসহ। একই সঙ্গে তা কত মধুর আর কত মারাত্মক। শিল্পীমাত্রেই জানেন তিনি সাপ নিয়ে খেলা করেন আর সব সাপের বিষদাঁত ভাঙা থাকে না। সে দাঁত যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তা তিনি অনেক সময় জানেন, আবার কোনো কোনো সময় জানেনও না। তিনি যখন অন্যমনস্ক, তখনই সেই মৃত্যু তাঁর হাতের পাশে, সেই বিষ তাঁর হাতে লাগে, কিন্তু তাঁর জীবনী শক্তি একেবারে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। তখন তাঁর আর কেউ থাকে না, কিছু থাকে না।

শিল্পের সাধনা থেকে বিচ্যুত হবার অজস্র পথ, আর অসংখ্য পদ্ধতি খোলা রয়েছে। কখনো সুরা, কখনো নারী, কখনো যশ, কখনো অর্থ, কখনো বা সাধারণ পরিবার প্রীতি, কখনো বা অসাধারণ আদর্শবাদ। আবার উল্টো দিকে আছে সমাজের অবহেলা, অনাদর-ঔদাসীন্য, লাঞ্ছনা, এমন কি অনশনের ভয়। যে কোন ধাক্কা যে কোন মুহূর্তে অতলে গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। কোন্‌ কাজে কী যে বিষ, কী অমৃত, কখন বিষ, কখন অমৃত তা বলা কঠিন।

এই কাঠিন্যকে যাঁরা স্বীকার করেন না, শিল্প আর জীবনকে যাঁরা সরল সমান্তরাল রেখা বলে জানেন তাঁরা নমস্য। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা হিসাব জানি না, কিম্বা জানলেও বার বার ভুল করি, জমার চেয়ে বেশি খরচ করে দেউলিয়া হয়ে যাই—তারা মানিকবাবুর সাহিত্যের মধ্যে নিজেদের স্বরূপ দেখি, মানিকবাবুর জীবনের মধ্যে আতংক আর আশংকাকে দেখতে পাই। দুদিকে সুদীর্ঘ গভীর গহ্বর। মাঝখানে সংকীর্ণ পথের পিচ্ছিলতা। স্খলনের আশংকা প্রতি পদে, পতনের আশংকা যে কোন মুহূর্তে। মজা এই, নৈতিক কি রাজনৈতিক পতন যত সহজে টের পাওয়া যায়, শিল্পের পতন তত সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সে পতন নিজের অগোচরে, সশব্দে নয়, প্রায়ই নিঃশব্দে আসে। তারপর হঠাৎ জনতার হাততালির শব্দ। সে হাততালি পরিহাসের। শুনতে শুনতে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথও একদিন এই ধাক্কাই খেয়েছিল।

মানিকবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমাকে একজন প্রবীণ সমালোচক বলেছিলেন, 'সেদিন মানিক এসেছিল। বলল, বাঁচতে আর ইচ্ছা করে না।'

আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলাম 'বাঁচতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' শিল্পীর মনে এ সাধের বিপরীত সাধ কেন? ভুবন সুন্দর নয় বলে? তাকে যথেষ্ট সুন্দর করতে পারিনি বলে? জীবন সুন্দর নয় বলে? শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে সুন্দর করতে পারিনি বলে?

জীবনের এক সমর্থক, সমুচ্চ আদর্শে দীক্ষিত হয়েও মানিকবাবুর মনে কেন এই অবসাদ আর নৈরাশ্য এসেছিল তা বলা সহজ নয়। হয়তো নীতিজ্ঞ আর গণিতজ্ঞের কাছে সহজ। যারা তা নয়, তাদের কাছে কঠিন। মরতে চাই আর মরতে চাই না, পরস্পর বিরোধী এই দুই আকাঙ্ক্ষা পরস্পরবিরোধী এই দুই যোদ্ধা সত্তাকে শিল্পীমাত্রেই নিজের মধ্যে অনুভব করেন এবং দুধ কলা দিয়ে সেই সাপকে পোষণ করেন।

সমালোচক আমাকে বলেছিলেন, 'সে মোমবাতির দু দিকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দেখছে বাতি কত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে, কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে লেখার সাথে সমন্বয় করা কি সহজ? যদিও জানি

শিল্পের সাধনায় জীবনকে ধূপের মত পোড়াতে হয়, মোমের মত জ্বালাতে নেই, কিন্তু সে কথা কি সব সময় মানা যায়, না মনে থাকে?

হতে পারে সেই সমালোচকের ধারণা ভুল এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যাও অসত্য। একজনকে আর একজন আমরা কতটুকুই বা জানি। যতটুকু দেখি, শুনি এবং নিজের অনুভবের মধ্যে টের পাই তাই দিয়ে আমরা অনুমান করি, কল্পনা করি, বানাই। এই সৃষ্টি প্রকরণ কি লেখক, কি অলেখক সকলের বেলাতেই সমান সত্য।

একই মানুষ তাঁর সারাজীবনে নানা-জনের কাছে একই নামে কিন্তু নানারূপে নানা মূর্তিতে পরিচিত। সে মূর্তিও আবার মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়, ভাঙে গড়ে। তবু আমাদের এ ধারণা কিছুতেই যেতে চায় না, সব মিলিয়ে মানুষের জীবনধারা একটি নদীর ধারার মত। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত সে এক নয়। প্রতিদিনের জলস্রোতও নতুন, তবু তাকে দুই নামে ডাকি না, দুই বলে ভাবি না, দুই চোখে দেখি না। হতে পারে দৃষ্টি-বিভ্রম কি মতিভ্রম। তবু এই ঐক্য আর অখণ্ডতায় বিশ্বাস নিয়ে আমরা দিনে যে যার কাজ করি, রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাই। জেগে উঠে ফের দেখব সেই কটি পরিচিত মুখ, সেই একটি পরিচিত পৃথিবী।

আর এই পৃথিবীর সব মানুষকে না হোক স্বজন বন্ধুকে আমরা বড় ভালবাসি। শিল্পীবন্ধুকে, লেখকবন্ধুকে ভালোবাসি আর এক রকম করে, হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আত্মীয় না হয়েও তিনি পরম আত্মীয়। তিনি অন্ন দেন না, অর্থ দেন না, জীবনে পথের সন্ধান দেন অন্তত সবাই নয়, সবাইকে নয়, কিন্তু এক অপূর্ব পাথেয় দেন, জীবনে এক নতুন স্বাদ আনেন, কয়েকটি মুহূর্তকে অবিস্মরণীয় করে রাখেন। আর সেই জন্যেই আমরা তাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করি। হয়তো অনেক প্রত্যাশাই তাঁর কাছে পূর্ণ হয় না, আমার রুচি আর রসবোধের সায় না পেয়ে তারা অন্তত আমার কাছে বিস্বাদে ব্যর্থ হয়ে যায়। তবু যা পেয়েছিলাম সে কথা যদি না ভুলি তাতে আমারই লাভ, ভুলে গেলে আমারই ক্ষতি। কৃতজ্ঞতা নিজেরই সম্পদ। যে বন্ধুর কাছে একদিন প্রীতি পেয়ে-ছিলাম, আজ কিছু না পেলেও সেদিনের কথা যেন মনে রাখি, যে লেখকের কাছে একদিন রস পেয়েছিলাম, আজ তা না পেলেও সেই আনন্দধারাকে যেন ধরে রাখি। যদি রাখতে পারি তাতে আমারই লাভ। স্মৃতি, কৃতজ্ঞতার স্মৃতি, জীবনে যার কাছে যা কিছু পেয়েছি তার স্বীকৃতিতে আমরা কিছুই হারাই না, বরং নতুন অর্থে নতুন গৌরবে সেই হারানো ধনকে বার বার ফিরে পাই।

মৃত্যু বিশেষ করে অকালমৃত্যু সবই কেড়ে নেয়। অনেক প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রাখে। নিজের, আত্মীয়স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের—সকলেরই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও সেই অপূর্ণ আশা তাঁর অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে এক অসহায় ক্ষোভের আকার নিয়ে রয়ে গেছে। ছেচল্লিশ বছর বয়স এক জীবনের পক্ষে বেশি নয়, একজন শিল্পীর জীবনের পক্ষে অনেক কম। হয়তো পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতায়, অনুশীলনে, মানিকবাবুর দ্বিতীয় পর্যায়ের লেখাগুলি আরও রসোত্তীর্ণ হত। শুধু বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসীদেরই নয়, অবিশ্বাসীদেরও হৃদয় জয় করত। হয়তো পঞ্চাশের এপারে এসে প্রগাঢ় প্রৌঢ়তা তাঁর সব অস্থির জ্বালাকে শুধু বাইরে ছড়িয়ে দিত না, আরও

অন্তর্মুখী করে তুলত। আবার হয় তো এ সব কিছুই হত না। পুড়ে যাওয়া আতসবাজির অঙ্গার শলাকাটাই শুধু দীর্ঘস্থায়ী হত। কিছুই বলা যায় না।

তবু প্রত্যাশা থেকেই যায়।

মৃত্যু সব কেড়ে নেয়, কিন্তু স্মৃতি সব ফিরিয়ে আনে না। শুধু বেছে বেছে যেটুকু ভালো, যেটুকু মধুর, যেটুকু সুন্দর সেইটুকুই আনে। আর তাই দিয়ে সম্ভাবনার ডালিকে পূর্ণ করে তোলে।

কিছুদিন আগে মানিকবাবুর বরানগরের বাসায় গিয়েছিলাম। তাঁর এ বাসায় আমি তিন বছর আগে আর একদিন মাত্র এসেছি। সেদিন তিনি ছিলেন। চেয়ারে বসে লিখতে লিখতে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর বুড়ো বাবা ছিলেন পর্দার আড়ালে। আজ সেই বাপও নেই, ছেলেও নেই। শুধু মানিকবাবুর স্ত্রী আছেন আর চারটি ছেলেমেয়ে। তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা হল।

দেখলাম ভাঙা আলমারিটায় বইয়ের সংখ্যা আগের চেয়ে আরো অনেক কমেছে। যৎসামান্য আসবাবপত্রে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্টতর। দেয়ালে মানিকবাবুর একখানি ফোটো টাঙানো আছে, নিচে সরু টুলখানির ওপর তাঁর কিছু বই। আমি সেই বইগুলি উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে বললাম, 'এখানে কি সব আছে?'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'না।'

শুধু বাড়িতেই নয়, বাজারে দোকানেও অনেক বই নেই। তিনি চেষ্টা করেও খোঁজ পাননি। আমার কাছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও সন্ধান দিতে পারলাম না।

দুটি পাবলিশারের ঘর থেকে যৎসামান্য রয়ালটি আসে। তাতেই সংসার চলে। মানে চালিয়ে নিতে হয়। অনেক বই-ই এখন ছাপা নেই। যা আছে তাদের বিক্রিও নেই।

জনসাধারণ কি তাঁর লেখা নেয়নি? প্রোলেটারিয়েটের লেখক মানিকবাবু কি জনপ্রিয় হতে পারেননি? তাঁর সমসাময়িক অনেকেরই তুলনায় পাবেন নি।

এই নিয়ে একজন নিষ্কাম সহৃদয় প্রবীণ লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনিও বললেন, 'লেখকরা যথেষ্ট না হলেও কিছু কিছু তার জন্যে করেছেন, দেশের সরকারও করেছেন। কিন্তু সাধারণে যদি না নেয়—।'

সাধারণে যদি না নেয় তাহলে তারা না' হাত ভরে দেয়ও না তা জানি। তবু শিল্পে সাহিত্যে সাধারণের রায়কে সব সময় সবচেয়ে উঁচু আদালতের চূড়ান্ত এবং নির্ভুল বিচার বলে মেনে নিতে পারি না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হয়তো আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। জানি না তারপরেও তিনি অনেকের সায় পাবেন

কি না। নাকি এখনও কয়েকজনের হয়েই থাকবেন। লেখকরা দুই জাতের। কেউ অনেকের জন্য লিখতে পারেন, কেউ বা দু' একজনের জন্যে। দুটোই অসাহিত্য হতে পারে, আবার দুইয়েরই জাত সাহিত্য হওয়া সম্ভব।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। রোদ বেশ চড়েছে। আমি উঠতে যাচ্ছি, মানিকবাবুর স্ত্রী বললেন, 'বসুন আর একটু।'

তারপর তিনি নিজেই উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। বুঝতে পারলাম আতিথেয়তার আয়োজন হচ্ছে। বড় ছেলে আর বড় মেয়েটি কি দরকারি কাজে আগেই বেরিয়েছে।

আমি বসে বসে ছোট ছেলে আর ছোট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। তারা একেবারে ছোট নয়। একজন এখন কিশোর, আর একজন কৈশোর পার হয়েছে। দুজনের মুখেই মানিকবাবুর মুখের আদল। কথার ফাঁকে ফাঁকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

আলাপ চলতে লাগল। কার কি নাম, কে কোন ক্লাসে পড়ে, কে কি ভালোবাসে, কেউ কিছু লেখে কি না।

মেয়েটি বলল, 'না।'

ছেলেটিও বলল, 'না।'

মনে মনে ভাবলাম, লেখকের ছেলে কদাচিৎ লেখক হয়। এটা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

কিন্তু না লিখলেও ছেলেটি পড়ে, অন্যের বইয়ের চেয়ে বেশি পড়ে বাবার বই।

আমি হঠাৎ মানিকবাবুর বইগুলির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'তুমি তোমার বাবার কোন বই পড়েছ?'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল, 'আমরা বড় হয়ে পড়ব।'

ছেলেটি বলল, 'মা বলেন এখন 'কিন্তু', বাকিবে। আমরা বড় হলে বাবার সব বই পড়ব।'

বড় হয়েই পড়া উচিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই পরিণত বয়সের, পরিণত মনের পাঠকদের জন্যে।

আমি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আমার পাশে মানিকবাবুর দুটি ছেলেমেয়ে, সামনে টেবিলের ওপর টাল দেওয়া তাঁরই কতকগুলি বই।

ওদের বাবা ওদের জন্যে আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি, বিত্ত নয়, বিভব নয়, কিছুই নয়।

কজনেই বা তা পারেন?

শুধু রেখে গেছেন একটি নাম আর কয়েকটি বই।

কজনেই বা তা পারেন?

বড় বিস্ময় লাগে

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যে কোনদিন বিকেলবেলায় আপনি যদি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের বিশেষ একটি বইয়ের দোকানে উঁকি মারেন ত দেখতে পাবেন সেই পুরনো ভাঙা ঘরটির প্রায়ান্ধকার গহ্বরে একটি ছোটখাটো মানুষ চেয়ারে বসে সজোরে পা নাচাচ্ছেন!

নিতান্তই সাধারণ দৃশ্য হয়ত, তবু আপনি চমকে উঠবেন লোকটির দিকে চেয়ে। তাঁর মুখের দিকে তাকালেই মনে হবে—মানুষটি ঠিক আর পাঁচজনের মত নন—ভাল হক, মন্দ হক—সকলের থেকে স্বতন্ত্র, পৃথক।

প্রথমেই চমকে উঠবেন আপনি ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। বেশ বড় বড় চোখ কিন্তু ভাসা ভাসা ভাবালু নয়। সে চোখ থেকে যেন সর্বদা একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে, বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারিদিকে। সে চোখে চোখ রেখে দাঁড়ানো শক্ত। সে দীপ্তি দেখলে আপনাদের মনেই জাগবে একটা সম্ভ্রম মাত্র কারণ, কোন একটি উত্তর দেবার চেষ্টায় এতটুকু বিচ্যুতির আভাস ইঙ্গিতেই ও কৌতুক-লোলা নাচতে থাকে। সে কৌতুকের আলো দেখতে দেখতে তাঁর মনীষা-প্রদীপ্ত গম্ভীর মুখেও নতুন এক ধরনের দীপ্তি এনে দেয়—নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে তা সমস্ত মুখে—উপচে চোখের ওপর থেকে ঝরে পড়তে থাকে উজ্জ্বল কৌতুক ও প্রশ্রয়।

শুধু চোখ নয়, তাঁর দীপ্তিপ্রশস্ত ললাটেও এক প্রকারের মনীষা ও বুদ্ধির প্রাখর্য লক্ষ্য করবেন আপনি। সুডৌল তীক্ষ্ণ নাসিকা এবং ঈষৎ বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র পর্যন্ত সেই মনীষা ও গাম্ভীর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু তার ঠিক নিচেই মুখ এবং চিবুক দেখে মনে হবে, এ যেন অন্য লোকের ভারি সুকুমার, ভারি মিষ্টি!

এই বিচিত্র মানুষটিই হলেন বর্তমান কালের অন্যতম বিস্ময়কর লেখক—প্রমথনাথ বিশী বা প্র-না-বি।

বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। লোকটির সব কিছুই অদ্ভুত। পদবী থেকে শুরু করে স্বভাব ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সর্বত্রই এই বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। সুস্থ সবল নিরোগ মানুষ—কিন্তু ওঁর বিশ্বাস বিশ্বের তাবৎ রোগ ওঁর জন্য ওত পেতে বসে আছে, এতটুকু সুযোগ পেলেই চেপে ধরবে তারা। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী কিন্তু একেবারেই আত্মনির্ভরশীল নন। যে কোন একটি বিশ্বস্ত বন্ধুর ওপর ভর না দিয়ে জীবনের কোন ক্ষেত্রে এক পা চলতে পারেন না। রাস্তা পার হতে গেলে সাধারণ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মানুষের তিনগুণ বেশী সময় লাগে। সে সময় ওঁর আচরণ দেখে মনে হয় সমস্ত গাড়ি ঘোড়া-ট্রামের একমাত্র লক্ষ্য হল ওঁকে চাপা দেওয়া। অত্যন্ত মিতাহারী কিন্তু খিদে পেলে আর স্থির থাকতে পারেন না।

স্বভাবত মিষ্টভাষী কৌতুকপ্রিয়, নির্বিবাদী লোক—কিন্তু কোন কারণে অপমানিত, অবহেলিত বা প্রবঞ্চিত বোধ করলে পাথরের মত কঠিন এবং হুতাশনের মত দীপ্ত হয়ে ওঠেন। সে সময় সে রোষবহ্নির সামনে দাঁড়ান অতি বড় দুঃসাহসীর পক্ষেও দুঃসাহসের কাজ। অত্যন্ত অস্থির ছটফটে মানুষ কিন্তু ঘোরাঘুরিটা পছন্দ করেন না আদৌ, হাঁটাটা একেবারেই রুচিকর নয়। যখন নিশ্চিন্ত মনে আড্ডায় জমেন বা তথা-কথিত পরচর্চার রসে মশগুল হয়ে যান—তখন একথা কিছুতেই মনে হয় না যে, আমাদের কালের সমস্ত পরিচিত লেখকদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে বেশী পরিশ্রমী। অথচ কর্মক্ষেত্রে সে কথাটা প্রত্যহই প্রমাণিত হচ্ছে!

ওঁর সঙ্গে পরিচয় আমার বেশীদিনের নয়, বোধহয় এগারো বারো বছর মাত্র হবে। ঠিক কবে বা কীভাবে পরিচয়টা হয়েছিল তা আজ আর মনে নেই, অল্পদিনের কথা হলেও প্রাত্যহিক মেলামেশা, আড্ডার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় বহু কথা বহু স্মৃতির সাগরে সেই বিশেষ দিনটির ইতিহাস কোথায় তলিয়ে মিলিয়ে গেছে—আজ আর তার পাত্তা পাওয়া সহজ নয়। তবে যতদূর মনে হয় ওঁর ছাত্র এবং আমার সাহিত্যিক-বন্ধু শ্রীমান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতাতেই প্রথম পরিচয়ের সুযোগটা ঘটেছিল।

পরিচয় সেদিনকার হলেও—কৌতূহলটা বহুদিনের। লেখক সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু ওঁর হিসেবটা কোন দিনই আর পাঁচজনের মাপে হয় না।

কৌতূহলের বেলাও তাই। কৌতূহলের অন্ত ছিল না ওঁর সম্বন্ধে—কৌতূহল ওঁর পদবীতে, কৌতূহল ওঁর লেখার ধরনে, কৌতূহল দুই নামের খেলায়। শুনতুম প্রমথনাথ বিশী আর প্র-ন-বি দুই-ই এক ব্যক্তি, প্রথম নামটারই সংক্ষিপ্ত রূপ দ্বিতীয়টা—কিন্তু দুটো নামের সার্থকতা বুঝতুম না। আবার যখন দেখতুম প্রমথনাথ বিশী বই উৎসর্গ করছেন প্র-না-বি'কে তখন আরও ধাঁধা লাগত মনে মনে।

পরিচয়ের পরেই কী সে কৌতূহলের নিরসন হয়েছে? বোধহয় না। যতই দেখছি—ততই ওঁর স্বভাবের ও শক্তির নিত্য নব বৈচিত্র্য চোখে পড়ছে।

বিচিত্র ওঁর জীবনও। জন্মাবধি বহু ঘাটের জল খেয়েছেন—বহু কাজ করতে হয়েছে, জীবনসংগ্রামের বহু ক্ষেত্রে পদচিহ্ন রেখে এসেছেন। তবে সে পদচিহ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ীর পদচিহ্ন—যেখানে গেছেন যা করেছেন সর্বত্রই তাঁর অসাধারণ মনীষা ও প্রখর বুদ্ধির কিছু না কিছু ছাপ থেকে গেছে।

১৯০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে?) উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার জোয়াড়ী গ্রামে ওঁর জন্ম হয়। জন্মদিনটা উনি কাউকে বলেন না সুতরাং সেটা চেপে যাওয়াই ভাল। বাল্যেই ওঁর সৌভাগ্যক্রমে ওঁর বাবা ওঁকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করে দেন। তখন শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া এখনকার থেকে কিছু পৃথক ছিল। তখন ওখানে [illegible] তাদের চারপাশে [illegible] রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য [illegible]। প্রমথবাবু সে সুযোগের [illegible] আদায় করেছিলেন। [illegible] মনীষা [illegible] [illegible] আহরণ করে [illegible] যে [illegible] [illegible] পারত তাঁর [illegible] করেন।

প্রমথবাবু ১৯২১ [illegible] শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পাস করে সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। [illegible] [illegible] ম্যাট্রিক ক্লাসেও পড়াতে শুরু করেন।

এই শিক্ষকতা [illegible] প্রাইভেট [illegible] রাজশাহী কলেজে এসে ভর্তি হলেন [illegible] এবং ১৯২৯ সালে ওখান থেকেই বি এ পরীক্ষা দিলেন। এই বছরটি ওঁর জীবনে স্মরণীয় বছর। কারণ এ বছরই ওঁর বিবাহ হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁকে একেবারে জীবন-যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়—কঠোর সংগ্রামের মধ্যে!

বিশীরা নাটোর অঞ্চলের নামকরা জমিদার বংশ। ভাগ হয়ে হয়েও ওঁদের হিস্যায় জমিজমা কিছু কম ছিল না। কিন্তু ওঁর বাবা নলিনী বিশী মশায় বিষম খেয়ালী মানুষ ছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত স্বদেশীওলা—স্বাধীনতা আন্দোলনই তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল, বহুবার তিনি জেলও খেটেছেন, এমনকি এই সেদিন অর্থাৎ ১৯৪২-এর আন্দোলনে, সত্তর বছর বয়সেও। ফলে বিষয়আশয় কিছুই দেখার অবসর হত

না তাঁর। অবশেষে যখন এক সময় তরী বানচাল হবার উপক্রম হল তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র-সন্তান হিসাবে প্রমথবাবুকেই তার হাল ধরতে হল। বয়সে তরুণ, স্বভাবে কবি (তায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত) সদ্য-বিবাহিত—বিষয় সম্পত্তির জটিল ও দুরূহ তত্ত্ব বোঝবার কথা নয় একেবারেই; কিন্তু আগেই বলেছি হার মানবার মানুষও নন উনি—হাল যখন ধরলেন তখন আর সহজে ছাড়লেন না। প্রায় এক বৎসর ধরে সমানে মামলা মোকদ্দমা চালাতে হয়েছে, ঘরে বাইরে অসংখ্য বিদ্বিষ্ট লোকের আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছে; কিন্তু তাতে উনি একটুকুও দমেন নি—সকলের সব অস্ত্রই ওঁর প্রখর বুদ্ধির বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।

কত কি করতে হয়েছে এ সময় তাঁকে—তার ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই।

এক মুসলমান জমিদারের সঙ্গে তখন ওঁদের মামলা চলছে। সে পক্ষ প্রবল, তাঁদের নথির জোরও বেশী। মোকদ্দমা উঠলে এঁদের পরাজয় অনিবার্য। সুতরাং সে মামলা কোনদিনই ওঠে না। প্রমথবাবু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন, প্রতি মামলার তারিখে তাঁকে পাঁচটি করে টাকা দিয়ে আসেন—তার ফলে হাকিমের টেবিলে ওঠবার সময় ওঁদের মামলার কাগজটি সুকৌশলে নিচে চলে যায়—আর ততদূরে পৌঁছবার আগেই আদালতের সময় যায় ফুরিয়ে—ফলে আবার একটা দিন পড়ে।

এইভাবে বছরখানেক যাবার পর এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে আর কোনমতেই এ পক্ষে সময় নেওয়া চলে না। ও পক্ষের উকিল বড়ই গোলমাল শুরু করেছে। এখন একমাত্র উপায় চাকাটা ঘুরিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ ওপক্ষ থেকে সময় নেওয়ানো। সঙ্গে সঙ্গে প্রমথবাবু উপায় ভেবে নিলেন। সে উপায়ও ওঁরই বুদ্ধির উপযুক্ত। উনি নাটোরের এক মশলার দোকান থেকে আশি তোলা কর্পূর বিক্রীর একটা ফর্দ জোগাড় করে নিয়ে এলেন। তারপর সেই জমিদারের উকীলের কাছে গিয়ে যথোচিত করুণ-গম্ভীর মুখ-ভাবের সঙ্গে জানালেন যে আগের দিন নাটোরে জমিদার সাহেবের এন্তেকাল হয়েছে। বিশ্বাস করার কথা নয়—প্রথমটা উকিল তা করেনও নি। কিন্তু আশি তোলা কর্পূরের অকাট্য যুক্তিতে শেষ অবধি অবিশ্বাসও করতে পারলেন না। মৃতদেহ জীবাণুশূন্য করার কাজ ছাড়া এক সের কর্পূরে মানুষের আর কী কাজে লাগতে পারে?

এখন জমিদারই যদি যান ত মামলা থাকে কি করে? নতুন মালিক ঠিক না হওয়া পর্যন্ত মামলা চলতে পারে না। দ্বিধায় দুলে উকীলবাবুই এবার মামলার সময় চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ পক্ষ থেকে বলা হল—এতদিন ধরে ভোগাবার পর আবার দিন কিসের? আসলে ওঁদের মামলা করার মত কিছু নেই, শুধু শুধু এঁদের বিরক্ত করার জন্যেই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। হাকিমও তাই বুঝলেন, মামলা খারিজ হয়ে গেল।......

এইভাবে বছর দেড়েক ধরে নিয়ত বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যুদ্ধ করার পর ফুটো নৌকো কথঞ্চিৎ মেরামত হলে প্রমথবাবু আবার নিজের দিকে মন দিলেন। এম এ দেবার কথা ১৯৩১ সালে; কিন্তু এইসব কারণেই দেওয়া হয়নি, শেষ পর্যন্ত ১৯৩২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এম এ পরীক্ষা দেন এবং (প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকরা বিষ নজরে দেখেন এই অপবাদ অমূলক প্রমাণিত করে) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে পাস করেন। এরপর ১৯৩৩ সালে ৭৫, দরমাহায় রিসার্চ স্কলার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত হন। তারপর আসেন রিপণ কলেজে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ওখানে অধ্যাপনা করেন। এর ভেতরই ১৯৪৪ সালে যুগান্তরে

'পার্ট-টাইম' সহযোগী সম্পাদকেরও একটা কাজ পান; কিন্তু কোন বিচিত্র কারণে ও'কে বিশেষ কিছু লিখতে হয়নি কোনদিনই—যাকে বলে বসে বসে মাইনে নেওয়া—তাই নিতেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বা সৌভাগ্যক্রমে সেখানে বেশীদিন টিকতে পারেননি। রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি নিয়ে যুগান্তরে এক বিরূপ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে প্রমথবাবু তার প্রতিবাদ না করে থাকতে পারলেন না। এই থেকেই খিটিমিটি শুরু হল, শেষে ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুলাই (স্মরণীয় তারিখ—কারণ ঐ তারিখে চার্চিলও বিলেতে পদত্যাগ করেন!) উনি যুগান্তরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

মনান্তরের কারণটা কানে যেতেই আনন্দবাজারের তদানীন্তন কর্ণধার সুরেশবাবু ও'কে ডেকে পাঠালেন এবং আনন্দবাজারে যোগ দেবার অনুরোধ জানালেন। তখন পুরোপুরিভাবে ওখানে আসার কথা হয়ত দুজনের কেউই ভাবেন নি; কিন্তু মাস কয়েক পরে ১৯৪৬-এর ১লা জানুয়ারী উনি পাকাপাকিভাবেই আনন্দবাজারে এলেন, রিপন কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে। এর পর একটানা চার বছর এখানে কাজ করার
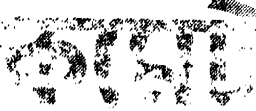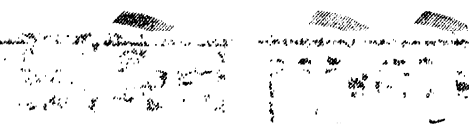
পর ১৯৫০-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা বিভাগের লেকচারাররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। অধ্যাপনায় ও'র সহজাত অনুরাগ জানতেন বলে সুরেশবাবু বাধা দিলেন না বটে; কিন্তু আনন্দবাজারের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও দিলেন না। শ্রী-না-বি কমলাকান্তরূপে যোগসূত্র বজায় রাখলেন। সে যোগাযোগ আজও অব্যাহত আছে, আজও উনি আনন্দবাজারের সঙ্গে একাধিক গ্রন্থিতে বাঁধা।

কিন্তু তাহলেও অধ্যাপনাই ও'র আসল কাজ—মনের মত কাজ। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া কাটানো কঠিন ও'র পক্ষে। মধ্যে অনেক বেশী বেতনে অপর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সর্বোচ্চ পদও পেয়েছিলেন; কিন্তু প্রধানত সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অতিমাত্রায় সীমিত বলেই সে কাজ নেন নি, বহু টাকা লোকসান দিয়েও পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই টিঁকে আছেন। অবশ্য সামান্য একটু পদোন্নতি সেখানেও হয়েছে বৈকি! এখন আর উনি সাধারণ 'লেকচারার' নন, অন্যতম 'রীডার'!

এই হল সংক্ষেপে ও'র জীবন কথা; কিন্তু একে কোনমতেই ও'র সামগ্রিক পরিচয় বলা চলে না। ও'র শক্তি ও কর্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। একাধারে অধ্যাপক, সাংবাদিক (এই কর্মক্ষেত্রেও ও'র বিপুল খ্যাতি ছিল—আজও সে খ্যাতি ম্লান হয়নি), সমালোচক, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, কলামিস্ট (Columnist), ঔপন্যাসিক, বিদ্রূপশিল্পী (স্যাটায়ারিস্ট) এবং সুবক্তা, এই মানুষটির সম্পূর্ণ পরিচয় কোন একটি প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবও নয়। শেষোক্ত শক্তিটি অর্থকরী নয় বটে; কিন্তু তাই বলে সামান্যও নয়। যাঁরা ও'র সঙ্গে কোন সভাতে গিয়েছেন তাঁরাই জানেন দীর্ঘকাল ধরে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখার কী দুর্লভ ক্ষমতা ধরেন ভদ্রলোক!

এইসব প্রত্যক্ষ দিক ছাড়াও ও'র জীবনে আর একটা বড় দিক আছে—সেটা রাজনীতির দিক। যাকে রাজনীতি করা বলে তা উনি কোনদিনই করেন নি বটে—তবে তার বাইরেও থাকতে পারেন নি। সোজা-সুজি রাজনীতিতে যোগ দিলে সেদিকেও উনি বিস্তর সুবিধা আদায় করতে পারতেন, হয়ত দেশের শাসন ব্যবস্থারও কেন্দ্রে বসতে পারতেন—কিন্তু সে জীবন ও'র কাম্য নয়। অথচ দেশ ও জাতি সম্বন্ধে ও'র উদ্বেগেরও অবধি নেই। মাঝে মাঝেই বলে, 'আপনারা দেশের কথা কিছু চিন্তা করছেন না।' সেটা ঠাট্টার মতই শোনায় কিন্তু ঠাট্টা নয় আদৌ। দেশ ও জাতি সম্বন্ধে ও'র তীব্র বিদ্রূপাত্মক রচনা পড়লে মনে হয় কোনরকম জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধের ওপরই এতটুকু আস্থা নেই ও'র—যা কিছু তথাকথিত মহৎ বা শ্রেষ্ঠ তা সমস্তই যে কত অন্তঃসারশূন্য সেইটে দেখানোই যেন ও'র একমাত্র কাজ বলে মনে হয়; কিন্তু আসলে এই সমস্ত বিদ্রূপ বিলাপেরই নামান্তর, এসব কৌতুকের পিছনে একটি সুগভীর ব্যথাই বর্তমান। সর্ববিষয়েই ও'র বক্রোক্তি, জীবনের সব-দিকেই বাঁকা চাহনি—যা তাঁকে একদা 'বাংলার বার্নার্ড শ'এই আখ্যা দান করেছিল, তা সস্তায় হাততালি বা 'নোটোরাইটি' পাবার সহজ কৌশল নয়—তা একপ্রকারের হতাশাই। দেশের সামান্য বিপদের আশঙ্কায় উনি যেভাবে বিচলিত হন—তা যাঁরা ও'কে দেখেন নি, শুধু লেখা পড়েছেন—তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রমথবাবু মনে প্রাণে ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করেন। সেই জন্যই উনি নেহেরুর বিশেষ ভক্ত। আর কতকটা সেই জন্যই কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে ওর অকপট—un-compromising বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষ ও'র কাছে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের মতই—যতদিন দেহে এতটুকু শক্তি থাকবে উনি বোধহয় 'কায়েন মনসা বাচা' অনিবার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ওদের রাজনীতি আর জীবননীতির সঙ্গে।

জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উনি অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী নন। যদিচ ক্ষেত্র-বিশেষে তার প্রয়োজনীয়তা আছে এটা স্বীকার করেন। 'some what honest' হওয়াই যথেষ্ট, মুখে একথা বললেও নিজের দেনাপাওনা সম্বন্ধে অত্যন্ত হুঁশিয়ার, যাকে বলে নীতিবাগীশ, স্ক্রুপুলাস—তাই। অন্যায় বা অবিচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপ্রিয় হয়েছেন ওপর-ওয়ালাদের—তবু নীরবে ঐ ধরনের কোন অসাধুতা সহ্য করতে রাজী হননি তিনি কোনদিনই।

প্রমথবাবু অত্যন্ত আত্মীয় ও বন্ধু-বৎসল লোক। ও'র ছোট-ভাইবোনেরা সমস্ত ব্যাপারেই চিরদিন বড়দার ওপর নির্ভর করে এসেছেন, উনিও কখনও সে বিশ্বাসের অমর্যাদা করেন নি। বড়দা ও বৌদি বিপদে আপদে চিরকাল তাদের স্নেহচ্ছায়ায় ঢেকে রেখেছেন এবং চিরদিনই রাখবেন—তা তাঁরা জানেন। আর সকল আত্মীয়ের অধিক ও'র বন্ধু দেবেশবাবু, সম্বন্ধে ও'র মনোভাব যাঁরা জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন—বন্ধুর প্রতি এই ভালবাসা মানুষের ইতিহাসে কত দুর্লভ। রাজশাহী কলেজে দুজনের পরিচয় হয়, না জানি কী মহালগ্নে সে পরিচয় নিবিড় সখ্যে পরিণত হতে দেরী হয়নি, আর আজও তা তেমনি অটুট আছে। দেবেশবাবু ও'র চেয়ে বয়সে ছোট, কলেজেও দুই ক্লাস নিচে পড়তেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও অন্তরঙ্গতম হয়ে উঠেছিলেন তিনি—আজও তাই আছেন। দীর্ঘকাল ভাড়াবাড়িতে একত্রে কাটিয়েছেন, এখন জমি কিনেছেন দুজনে পাশাপাশি। সম্ভবত আমরণ দুজনে এমনি কাছাকাছি, এমনি অন্তরঙ্গ, পরস্পরের প্রতি এমনি নির্ভরশীল থাকবেন তাঁরা।

মোটামুটি প্রমথবাবু এ-ই। আরও হয়ত ঢের বলা যেত—বহু কথাই বলতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সে স্থান এটা নয়।

কৌতুকটা ও'র স্বভাবের মধ্যে শুধু নয় বোধকরি দৈহিক গঠনের মধ্যেই আছে। কৌতুক না করে থাকতে পারেন না উনি। গল্প বা উপন্যাস রচনায় কোথাও কোথাও অনাবশ্যক বা ক্ষতিকর রূপে এই রসের অবতারণা করেছেন—এ অভিযোগ মধ্যে মধ্যে করেছি ও'র কাছে। উনি উত্তর দিয়েছেন, 'দেখুন আমার মধ্যে কোথায় একটা mischeivous imp আছে, সে মজা করার বা তামাশা করার এতটুকু সুযোগ পেলে সব কিছুই ভুলে যায়। সেজন্য অনেক ভাল ভাল লেখা আমার নষ্ট হয়ে গেছে তা আমিও জানি, কিন্তু তবু সে impটাকে আমি দমন করতে পারি না!'

ও'র স্বভাবের এই imptটা জীবনের ক্ষেত্রেও প্রবল। mischeif করার সুযোগ পেলে উনি আর স্থির থাকতে পারেন না। অবশ্য নির্দোষ কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়—তবু সে কৌতুক মধ্যে মধ্যে লোককে বিব্রত করে তোলে বৈকি! এই কৌতুকপ্রিয়তারই একটা প্রকাশ হল তাঁর বাহ্য আত্মধিক্কার। নিজেকে ridicule করতে তিনি অদ্বিতীয়! সে সূত্রেই তিনি বলেন, "যাই বলুন পরচর্চার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই—আসুন কোন অনুপস্থিত বন্ধুকে নিয়ে পড়া যাক!"

কিন্তু সে পরচর্চা তামাশার স্তরেই থাকে—অনিষ্টতে নামতে দেখিনি কোনদিন। অন্তত অকারণে- নয়ই।

এই কৌতুকপ্রিয়তার জন্যই ও'র সাহচর্য সকলের ঈপ্সিত, উনি সঙ্গে থাকলে কখনও সময় কাটাবার জন্য চিন্তা করতে হয় না। মুখে মুখে গান ছড়া কবিতা—গল্প রচনা করতে অদ্বিতীয়! এই ত সেদিনও ঘাটশিলায় গিয়ে সকালবেলা দাড়ি কামাবার প্রস্তাব হতেই মুখে মুখে এক গান রচিত হয়ে গেল—

'কেন রে কামাব দাড়ি!
ঘুঘুরা ডাকিছে গাছে
ছাগলছানারা নাচে
আমারই কি এত তাড়াতাড়ি?'

অর্থাৎ দাড়ি কামানো হবে না। কেন কামাব? এখানে কি দাড়ী কামাতে এসেছি?

কিন্তু যেই বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ এল ডাঃ বোসের বাড়ি থেকে—তিনিই সর্বপ্রথম গানটির পরিবর্তন করলেন—

'কেন না কামাব দাড়ি।
ঘুঘুরা ডাকিছে গাছে
ছাগলছানারা নাচে
কারই বা ধারি এক কড়ি!
মোরা যাব যে বোসের বাড়ি!"

এবং মহাসমারোহে দাড়ি কামাতে বসলেন।

এ পর্যন্ত এক নজর দেখা গেল মানুষটাকে—এবার, প্র-না-বি প্রদক্ষিণ শেষ করার আগে, একবার তাঁর সাহিত্যকীর্তিতেও চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

অবশ্য ঐ চোখ-বুলোন পর্যন্তই—তার বেশী দেখা সম্ভব নয়। না, আপনি দোকানে দোকানে 'পুস্তক তালিকা' সংগ্রহ করে কিছু সুবিধা করতে পারবেন না। কারণ আগেই বলেছি, আমাদের কালের লেখকদের মধ্যে প্রমথবাবুর মত পরিশ্রমী খুব অল্পই আছেন। চাষ ভাল হলে ফসলও ভাল হয়—এ স্বতঃসিদ্ধ কথা। ও'র মস্তিষ্কের ভূমি উর্বরা, তাতে কলমের চাষও অক্লান্ত, সুতরাং ফসল আশাতীত রকমেরই ফলেছে—যাকে বলে 'বাম্‌পার হারভেস্ট'। এই মুহূর্তে যদি সত্যিই কষ্ট করে তালিকা সংগ্রহ করেন ত অন্তত পঁচাত্তর খানি সাবালক অর্থাৎ চলতি বইয়ের নাম পাবেন—সব কটা জড়িয়ে। তার মধ্যে চটি নাটক ও কবিতার বইও যেমন আছে, তেমনি ভারী ভারী প্রবন্ধের বই ও চার-পাঁচশ পৃষ্ঠার উপন্যাসেরও অভাব নেই। আর এ ছাড়া দৈনিক ও সাময়িক পত্রের পাতায় যা রয়ে গেছে বেনামে—কিছু বা স্ব-নামেও—তাতেও কোন-না পঁচিশ খানি মাঝারি সাইজের বই হতে পারত।

প্রমথবাবু কবে থেকে লিখছেন, তা বোধকরি উনিও জানেন না। ভূমি উর্বরা, বীজও সহজাত—তাতে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া অনুকূল—বাল্যেই সাহিত্যবৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়েছে। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই নাটক কবিতা যে কত রচনা করেছেন, তার হিসাব ও'রও বোধ হয় নেই।

তখনকার ঐ নাটকগুলি অধিকাংশই যাত্রার পালা ধরনে লেখা। সেকালের অকৃত্রিম যাত্রার পালা। তার মধ্যে 'বীরভূমেশের পরাজয়', 'ঘোষযাত্রা' এবং 'কর্ণমর্দন' (বধ?) পালার কথা এখনও অনেকের মনে আছে। 'ঘোষযাত্রা' পালাটি ছাপাও হয়েছিল, খোঁজ করলে আজও এক আধ কপি হয়ত আবিষ্কৃত হতে পারে। এসব নাটক—অন্তত এই তিনখানি—ওখানে সগৌরবে অভিনীত হয়েছিল, আর তা নিয়ে সে সময় বেশ একটু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সে চাঞ্চল্যের সবটাই কিশোর নাট্যকারের আশ্চর্য প্রতিভা সম্বন্ধে মুগ্ধ বিস্ময়—এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। প্র-না-বির স্বভাবসিদ্ধ বক্রোক্তি ও পরিহাস সেই কিশোর রচনাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সেগুলি কোন কোন স্থানে (যথাস্থানে?) কাঁটা নয়, শেলের মতই বিঁধেছিল হয়ত।

ক্রমশ শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ও'র কবিতাও ছাপা হতে শুরু হল। বলা বাহুল্য, সেসব কবিতায় তরুণ বয়সের স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসেরই আধিক্য থাকত। তাতে কবিতা যা-ই হোক, আশ্রমবাসী-বাসিনীদের মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তখন চতুর কবি 'প্রাচীন আসমীয়া হইতে' অনুবাদ কবিতা ধরলেন। আধুনিক কালের লেখনীতে যা উদ্বেগের কারণ হয়, প্রাচীন কালের ছাপ থাকলে তা-ই ক্লাসিকে দাঁড়ায়। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, শুচিবায়ুগ্রস্তদেরও উদ্বেগের কারণ রইল না। তবে শুনেছি, 'ভানু সিংহের পদাবলী'র কবি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদগুলির মূল সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে তখনই খুব হেসেছিলেন। অবশ্যই সস্নেহে প্রশ্রয়ের হাসি।

ও'র কবিতা প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—'দেওয়ালি' নামে—সে ১৯২৩ সালের কথা। অবশ্যই নিজের খরচে তরুণ কবির কাব্য সংকলন গাঁটের পয়সা খরচ করে ছাপবেন — তখনকার দিনে এমন নির্বোধ প্রকাশক কেউ ছিল না। এর পর ১৯২৫ সালে 'দেশের শত্রু' নামে এক উপন্যাস এবং ১৯২৭ সালে রসন্ত খেলা নাম দিয়ে আর একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এর পর নিজে খরচা করে ওকে কোন বই ছাপতে হয়নি। অবশ্য দীর্ঘকাল কোন বই আর বেরোয়ওনি।

বস্, এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেও ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস একে বলা চলে কিনা তা বিজ্ঞ সমালোচকরা বিচার করবেন—তবে সে সময়ের সামাজিক ইতিহাস যে এতে অনেকটা বিবৃত হয়েছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া কী আঙ্গিকে, কী সরস ডায়ালগে, কী ঘটনা সংস্থানে এবং কী চরিত্র চিত্রণে এ উপন্যাস নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের আসরে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে।

কিন্তু কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক সাহিত্য রচনার সাধারণ এই কটি ক্ষেত্র ছাড়াও প্রমথবাবুর সাহিত্যিক কীর্তি অর্জনের আর একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র আছে, সে হচ্ছে সমালোচনার ক্ষেত্র। বরং কেউ কেউ বলেন, এইটিই ওঁর আসল ক্ষেত্র, এইখানেই উনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, অপরাজেয়। বিশেষ করে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে একটি বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর জনপ্রিয়তাও। এই আপাতবিপরীত সাফল্যের প্রধান হেতু—তাঁর অপূর্ব ভাষা, এবং সহজ সরল অনাড়ম্বর-ভঙ্গী। অন্যান্য সমালোচকদের মত তিনি বক্তব্যকে দুরূহ, কোটেশান সবন্ধ বা অস্পষ্ট করে তোলেন না। তাঁর চিন্তাও স্বচ্ছ—রচনাশৈলীও তাই। তাছাড়া তিনি নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেছেন—কবিকে তাঁর পরিবেশ, মানসিক আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। হয়ত একথা বলাও খুব ধৃষ্টতা হবে না, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নতুন আলোকপাতও করেছেন। তাঁর 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ' দুই খণ্ড, 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ' দুই খণ্ড, 'রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর', 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' এবং 'রবীন্দ্র বিচিত্রা' বাংলার সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রে তাই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং থাকবেও। তাঁর এইদিকে আর একটি কীর্তি—বাংলার ক্লাসিক রচনার সংকলন-খণ্ড সম্পাদন করা। ভূদেব, বিদ্যাসাগর, রমেশ দত্ত, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, মাইকেল এঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। আরও কয়েকটি হবে। এইসব গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে লিখিত তাঁর প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যে ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় সংযোজন।

তাঁর কাব্য সংকলনের সংখ্যাও কম নয়। তার মধ্যে 'প্রাচীন আসামী হইতে', 'প্রাচীন পারসিক হইতে 'শকুন্তলা', 'উত্তর মেঘ' 'মেঘেন্দ্রবিমুক্ত' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একেবারে সাম্প্রতিক কবিতার বই বোধ হয় তাঁর 'কিংশুক বীথি' প্রকাশিত হয়েছে বা শিগ্‌গিরই হবে। এছাড়া তিনি বাংলার প্রবীণ ও নবীন কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি সংকলনও সম্পাদনা করেছেন—'কাব্যবিতান' নাম দিয়ে। 'বাংলা গদ্যের পদাংক' নামে আর একটি গদ্য রচনা সংগ্রহও ছাপা হচ্ছে।

বই বহু লিখেছেন প্রমথবাবু, তা আগেই বলেছি। সে তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবও নয়। এখনও লিখে চলেছেন সমানভাবে। অক্লান্ত, অনলস লেখনী তাঁর যেন দিন দিন নব নব শক্তি লাভ করছে।

খুচরো-খাচরা অসংখ্য লেখা ছাড়াও আপাততঃ উল্লেখযোগ্য নিজস্ব দুটি সুবৃহৎ রচনায় হাত দিয়েছেন। একটি উপন্যাস—সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা বিরাট ও বৃহৎ উপন্যাস, সম্ভবত আকার ও আয়তনে কেরী সাহেবের মুন্সীকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ এর আখ্যান ভাগ প্রধানত দিল্লি ও লক্ষ্ণৌয়ের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই কল্পিত। সুতরাং আকার যে কী পরিমাণ হবে, তা মোটামুটি আমরা একটা অনুমান করতে পারি।

আর একটি বিরাট গ্রন্থ লেখা চলছে—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই। এই বইতে কবিকে সামগ্রিকভাবে দেখবারই চেষ্টা করবেন তিনি—দেখবার ও দেখাবার। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী আসন্ন, তাঁর সহস্র আত্মীয়াধিক গুরুদেবের স্মৃতিপূজার সেই জাতীয় উৎসবে সম্ভবত সেই হবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মাল্য, হৃদয় ও মস্তিষ্কের সর্বশক্তি নিয়োজিত চরম ও পরম অর্ঘ্য।

প্রেম ঃ পরিধি ঃ প্রত্যয়

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গল্পের নাম শক থেরাপি। আর লেখকের নাম সুবোধ ঘোষ। অদ্ভুত দুটো কথা। আর লেখকও একেবারে নতুন। চেনা লেখকের সব লেখা একে একে শেষ করলাম। তারপর শক থেরাপি।

আশ্বিনের শেষ। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। জোলো হাওয়ার ঝাপটায় টেবিলের চাদর উড়ে গিয়ে পড়ল ছোট একটা কাচের পুতুলের ওপর। ঝন্ করে একটা শব্দ। জানলার পর্দা ছটফট করছে। দরজায় খিল দেয়া নেই বলে একবার খুলছে আর একবার যেন আছড়ে পড়ছে। উঠে গিয়ে খিলটা ঠিক করে দেয়ার মতো মনের অবস্থা আমার নয়।

আমার চোখের সামনে তখন আশ্চর্য এক জগৎ। ইংরেজ পরিবারের মেকী দম্ভ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বোসিলের বেদনাময় অনুভূতির প্রবল একটা ঘোর আমিও যেন অনুভব করতে পারছি। একেবারে নতুন পরিবেশ। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আমি যেন ছাপার অক্ষরে কিছু পড়লাম না। আমার চোখের সামনে শক থেরাপির সমস্ত চরিত্রগুলি এসে ঘটনাটা ঘটিয়ে গেল। প্রধান সাক্ষীর মতো আমি সবই দেখলাম। তারপর আবার গল্পের প্রথম পাতা খুলে লেখকের নামের পাঁচটি ছোট ছোট অক্ষরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে-বছর বিপুলায়তন পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকার বহু বড় বড় নামের ভিড় এড়িয়ে ওই ছোট নামটিই বৃহৎ একটা রূপ নিয়ে আমার মনে যেন গাঁথা হয়ে গেল।

কলেজ-জীবনের প্রথম প্রথম। লুকিয়ে-চুরিয়ে সাহিত্য করি। ইতস্তত কয়েকটি লেখাও তখন প্রকাশিত হয়েছে। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও একটু যেন থিতিয়ে গেছেন। প্রেমেন-শৈলজা ছায়াচিত্র নিয়ে ব্যস্ত। মানিক-তারাশঙ্করের খ্যাতি প্রবল হয়েছে। রাতারাতি পাঠকরাও যেন সমাজ-সচেতন হয়ে পড়েছে। নানাদিকে একই কথা শুনছি, প্রগ্রেসিভ লেখা লিখুন মশাই। নিছক প্রেমের গল্প লিখে কি হবে?

কথাটার মানে বুঝলেও লেখার ধরন কেমন হবে বোঝা কঠিন হত। ইচ্ছে মতো লিখতে পারব না সেকথা মনে করেই একটা বেদনা অনুভব করতাম। যৌবনের প্রথমেই রোমান্সকে অস্বীকার করবার মতো মনের সায় কিছুতেই পেতাম না। খোলা চোখে যা দেখি তা লেখা নিষেধ। মনেপ্রাণে যা অনুভব করি তা বলা বারণ। তাই জোর করে সব কিছু দেখার অক্ষম চেষ্টায় হিমসিম খাই। অভিজ্ঞতা আর নাগালের বাইরে

শ্রীসুবোধ ঘোষ

যে-সব চরিত্র তাদের ফোটাতে গিয়ে একটা ভান শুধু প্রধান হয়ে ওঠে। চলতি হাওয়ার ভয়ে কোন কিছুই গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। চার পাশে একটা ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া ভাব। আমি যেন সব কিছুর মধ্যে থেকেও নেই। উঠতি বয়সে নিজের সঙ্গে নিজে বোঝা-পড়া করতে পারি না। বিবশ এক পৃথিবী। মনের সঙ্গে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। সাহিত্যচর্চা যেন শুরু না হতেই সারা হয়ে গেল।

সেই সময় শক থেরাপি। প্রেমের এক অনন্যসাধারণ রূপ। ব্যাপক চেতনার স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। দম্ভ আর আভিজাত্যের বেড়া ডিঙিয়ে প্রেম বোসিলকে নিয়ে এল অমিল থেকে অদ্ভুত এক মিলে। মানুষের সর্বপ্রধান বৃত্তিকে লেখক সমাজ-চেতনার দোহাই দিয়ে অস্বীকার করবার কোন চেষ্টাই করলেন না, কিন্তু ভাবের ঘরে আশ্রয় খুঁজে মুক্তির চেষ্টাও নেই। প্রেমের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ এক প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে পাঠককে উত্তীর্ণ করে আধুনিক স্বার্থপর সমাজের ওপর এ গল্প যেন লেখকের এক বিপুল শব্দাবচ্ছেদ।

শুনলাম এটি সুবোধ ঘোষের তৃতীয় গল্প। এর আগে অযান্ত্রিক আর ফসিল নামে তিনি আরও দুটো ছোট গল্প লিখেছেন। পরে লিখলেন সুন্দরম।

প্রথম গল্পেই অসামান্য শক্তির পরিচয় দেয়ার উদাহরণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হয়তো নতুন নয়, কিন্তু মাত্র কয়েকটি ছোট গল্প লিখে সকলকে ডিঙিয়ে একেবারে সামনে এগিয়ে আসা বোধহয় একমাত্র সুবোধ ঘোষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

যে-লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য পাঠকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেতে পারেন, কি তাঁর মূলধন এবং অনুশীলনের কোন রীতি অবলম্বন করে এতদিন ধরে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন তা ভেবে আমাদের মতো তরুণ লেখক-পাঠকের মনে তখন গবেষণার একটা প্রচ্ছন্ন সুর বেজে উঠল।

একদিকে তারাশঙ্করের গ্রামীণ সভ্যতার দরদী প্রতিচ্ছবি আর একদিকে মানিকের নানা শ্রেণীর মানুষের চুলচেরা বিশ্লেষণ।

তারও আগে প্রেমেন-শৈলজার সাহিত্যে শহর, কলকারখানা আর খনি-জীবনের কাটা ছেঁড়া ছবি আমরা পেয়েছি। তবে তখনকার সাহিত্যের সুর অনুসারে তাঁদের মানব চরিত্রে বুদ্ধি বিজ্ঞানের চেয়ে হৃদয়টাই যেন প্রধান হয়ে উঠেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস, যন্ত্রের আক্রমণে সব হারিয়ে যাবার অস্পষ্ট ইঙ্গিত ভেসে উঠেছে মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের মধ্যে।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রধান শক্তি—সর্বগ্রাসী সমস্যা যন্ত্রযুগ যেন সর্বপ্রথম রূপে মিল সুবোধ ঘোষের কলমের এক একটি আশ্চর্য আঁচড়ে। যন্ত্রের প্রসার হচ্ছে—হবেই। পৃথিবী বাড়ছে ভিতরে—বাইরেও। নাকি-কান্না কেঁদে লাভ নেই। যন্ত্রকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলে পিছিয়ে পড়তে হবে—লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। তাই আধুনিক কালকে সমবেদনা আর শ্রদ্ধা জানিয়ে সন্ধি করে নিতে হবে যন্ত্রের সঙ্গে। যন্ত্র আর মানুষের এই সন্ধির স্বাক্ষর সাহিত্য হয়ে উঠেছে বলেই সুবোধ ঘোষের কৃষ্টিকে কালের মুকুর আখ্যা দিতে পরবর্তী কালের পাঠকের সামান্য দ্বিধা হবে বলে মনে হয় না।

যাঁর লেখা যখন আমার ভাল লেগেছে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার, তাঁকে চোখে দেখবার অদ্ভুত একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসত। আরও কম বয়সে আমার এক অকাল-মৃত কবি বন্ধু ফাল্গুনী রায়ের সঙ্গে অনেক লেখকের বাড়ি বাড়ি আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। কাউকে দেখেছি দূরে থেকে, কারুর সঙ্গে সটান ভেতরে গিয়ে কথা বলেছি। কেউ কেউ সস্ত্র করে বসিয়েছেন, কেউ কেউ বিকট গাম্ভীর্যে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন।

সুবোধ ঘোষকে দেখবার ইচ্ছা হলেও, একটা ভয়-ভয় ভাব, অদ্ভুত এক সংকোচ তাঁর কাছ থেকে আমাকে যেন দূরে সরিয়ে রেখেছিল। মনে হত এ লেখকের নাগাল যেন সহজে পাওয়া যাবে না। তাঁর সামনে দাঁড়াবার মতো প্রস্তুতি যেন আমার নেই। তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার কথা মনে হলেই নিবিড় একটা দৈন্য অনুভব করতাম। এর মধ্যে ফসিল আর পরশুরামের কুঠার বেরিয়ে গেছে আর তিলাঞ্জলি প্রকাশিত হচ্ছে দেশ পত্রিকায়।

বন্ধুমহলে সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে নানা কথা শুনতে পাই। গম্ভীর প্রকৃতির বিরাট এক মানুষ। গায়ে অসীম শক্তি। জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই নাকি তাঁর নেশা। বুনো বাঘের সঙ্গে শুধু হাতে যুদ্ধ করেন। কেউ বলে, তিনি কোন এক জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করেন। ডাঙায় থাকেন খুব কম। কেউ বলে, তিনি এডেন বন্দরে ব্যবসা করেন। এমনি আরও অনেক গল্প।

এত সব কল্পনার মধ্যে কতটুকু সত্যি আর কতটুকু মিথ্যা সেকথা আজও হয়তো স্পষ্ট করে বলতে পারব না, কিন্তু এমন ঘটনার প্রধান কারণ হল লেখকের বিপুল পরিধি। শুধু বাংলা দেশের মানুষের কথা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষের ভিড়ে পাঠক মিলিয়ে দিতে পেরেছে নিজেকে। ভৌগোলিক সীমা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে আমরা দেখি নেটিভ স্টেটের আসল রূপ, কয়লার খনিতে নেমে গিয়ে মানুষের নির্মম কান্না শুনি, ঘন অরণ্যের জীর্ণ মন্দির পুরানো ভারতের ক্লাসিক রূপ ফুটিয়ে তোলে আমাদের চোখের সামনে। আর কারাগারের শৃংখল ঝনঝনা ছাপিয়েও একটা চাপা কান্না আমাদের কানে গুমরে-গুমরে বেজে ওঠে।

সুবোধ ঘোষের সাহিত্যে সমগ্র ভারত যেন একসূত্রে বাঁধা হয়ে যায়। নতুন চরিত্র। নতুন পরিবেশ। কিন্তু শুধু সাংবাদিকের তথ্য পরিবেশন নয়, পাঠক অনভিজ্ঞ হলেও, বঞ্চনা-বেদনা আর গূঢ়তার মিলে এই সব চরিত্রগুলির মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্যের স্বাদ পায়।

কিন্তু শুধু সমস্যা নয়, শুধু বেদনা আর বঞ্চনা নয়—প্রেমের একটা ব্যাপক রূপ কখন যেন সব সমস্যার সমাধান করে দেয়। তাই এই লেখকের ক্ষেত্রে 'মর্বিড' কথাটির প্রয়োগ এক মুহূর্তের জন্যেও কোন পাঠক বোধহয় কখনই করতে পারবে না। কখনও কখনও সমস্যা দিয়ে শুরু হলেও সেটা প্রধান হয়ে ওঠে না, বলিষ্ঠ কাহিনী ঘন কৌতূহল রসের মধ্যে দিয়ে পাঠককে সচেতন করে তোলে নিবিড় মানসলোকে সূক্ষ্ম একটা তন্ত্রীতে আঘাত করে। তাই দৈন্য-দুঃখ যন্ত্রণার কাঁটাপথ পার হয়ে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে আসি এক বিস্তৃত সীমানার মাঝখানে। সুবোধ ঘোষ পৃথিবীকে গুটিয়ে কাছে টেনবার চেষ্টা করেন না, তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দেন—বাড়িয়ে দেন এক আশ্চর্য বিপুলতায়। যেন কোন শেষ নেই তাঁর মানসভ্রমণের।

তাঁর প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর, আধুনিক সাহিত্যের রূপ কেমন হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হল। আর সাহসও যেন একটু বাড়ল। এই সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে যেন আমার নিজেরই উপকার হত। ভাবলাম, সুবিধামতো একদিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে গিয়ে সুবোধবাবুর ঠিকানাটা যোগাড় করা যাবে। তিনি দেশ আর আনন্দবাজার পত্রিকাতেই বেশি লেখেন—তাই তাঁর ঠিকানা পাবার সেটাই হল সবচেয়ে ভাল জায়গা।

ঠিক সেই কারণে না হলেও, নিজেরই একটা দরকারে খুব শিগগিরই একদিন যেতে হল আনন্দবাজার পত্রিকায়। কড়া দুপুর।

ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে। কিন্তু তখন কষ্ট সহ্য করবার বয়েস। রোদের তেজ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে। ওই বিভাগেই সুবোধবাবুর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল কিছুদিন আগে। গল্পটির নাম দণ্ডমুণ্ড। আমার গল্পটিতে দণ্ডমুণ্ডের স্পষ্ট প্রভাব ছিল। তাই স্থির বিশ্বাস ছিল এ গল্প প্রকাশিত হবেই।

রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক মন্মথবাবুকে গল্পটির কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি পাশের এক ভদ্রলোকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আপনি ও'র কাছ থেকে খবর নিন—

বেশ অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ইনি আবার কে? যা হোক আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম তাঁর টেবিলের দিকে। আমার গল্পটির কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বসতে বলে একটা মোটা ফাইল ঘাঁটতে লাগলেন।

ভদ্রলোক কে আমি জানি না। হয়তো আমার নিজের গল্পটির কথা ভেবেই আমি আগ্রহের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম একদৃষ্টিতে। অত্যন্ত গম্ভীর। কিন্তু একেবারেই রুক্ষ নন। বেদনার একটা উজ্জ্বল আভায় জ্বল জ্বল করছে মুখ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

আমার গল্পটি ফেরৎ দিয়ে তিনি হেসে বললেন, এই যে—

ভিজে ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, মনোনীত হয়নি?

মাথা নামিয়ে কি লিখতে লিখতে ভদ্রলোক মৃদুস্বরে বললেন, গল্পটির অনেক ত্রুটি আছে। আপনি অন্য আর একটা গল্প দিয়ে যাবেন।

মুখে বললাম, আচ্ছা। কিন্তু তখনকার মনের অবস্থা এখন আর বর্ণনা না করাই ভাল। ভদ্রলোকের চেহারাটাই হঠাৎ যেন আমার কাছে একেবারে অন্যরকম মনে হল। আমি আবার মন্মথবাবুর কাছে এসে সেই ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করলাম।

ছোট্ট একটি উত্তর, সুবোধ ঘোষ।

চমকে উঠে বললাম, মানে যিনি লেখেন—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাধা দিয়ে মন্মথবাবু হেসে বললেন, উনিই ফসিলের সুবোধ ঘোষ—

আমার চোখ হঠাৎ যেন ঝাপসা হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজেকে মনে হচ্ছে দীন অসহায়। কে জানে সুবোধবাবু আমার নামটা মনে রেখেছেন কি-না। যদি মনে রেখে থাকেন, তাহলে তাঁর সামনে কোনদিনও দাঁড়ানো চলবে না। এমন অক্ষমতার কথা মনে করেই আমি এতদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। মুখ নামিয়ে কোন রকমে সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পালিয়ে গেলাম। যে লেখকের লেখা পড়ে আমার ঝিমিয়ে যাওয়া মন সজীব হয়ে উঠেছে, তাঁর সঙ্গে আজ আমি একটি কথাও বলতে পারলাম না—সেটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ।

কিন্তু আমার লজ্জা মুছে যেতে বেশি দেরি হল না। ভাবলাম এমন ঘটনা তো আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে প্রায় ঘটে, কাজেই সকলের চেহারা মনে রাখা সুবোধবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। লেখার খোঁজ করতে গিয়েছিলাম প্রথম দিন, এবার না-হয় একদিন আলাপ করতেই যাব। তাঁর বয়স তো আর এমন কিছু বেশি নয় যে মন খুলে আলোচনা করতে খুব একটা সঙ্কোচ হবে। যদি সুযোগ পাই, তাহলে তাঁকে একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব। অর্থাৎ তাঁর রচনা আমাকে কি পরিমাণ বিচলিত করেছে সে-কথাটা পাকে-প্রকারে তাঁকে শুধু জানিয়ে দিতে চাই।

কিন্তু সুবোধবাবুর সামনে দাঁড়াতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। তিনি মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে বসতে বললেন। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, লেখা এনেছেন?

আমার তখন গলা শুকিয়ে উঠেছে। কোন রকমে মাথা নেড়ে বললাম, না। মানে—এই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এসেছি।

বেশ—বেশ। বলুন?

একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে—

সুবোধবাবু হেসে বললেন, নিশ্চয়ই যাব।

এক সন্ধ্যেবেলা—আজও স্পষ্ট মনে পড়ে—ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হল। বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ। গলিতে জল জমে গেছে। মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ পায়ের শব্দ। সুবোধবাবু বাড়ি খুঁজে খুঁজে জল কাদা ভেঙে যথাসময়ে ঠিক এসে হাজির হলেন। সহজ একটা আন্তরিকতা। সেই গম্ভীর মানুষটি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও যিনি বলেন না, বোধহয় হঠাৎ আসা বর্ষণে তিনি একে একে অনেক কথাই বলে গেলেন। ধনবিজ্ঞানের প্রভাবে নানা ধাপের মানুষের ওঠা-নামা তাঁকে কিভাবে ভাবায়, কল-কারখানার ঘর্ঘরে আধুনিক সভ্যতার রূপ কেমন হয়ে উঠছে আর মুদ্রাস্ফীতির ঢেউ কাকে কিভাবে আঘাত করছে—এমনি আরও অনেক সমস্যার কথা।

তাঁর সব কথা সেদিন ভালভাবে বুঝতে না পারলেও আমার অজ্ঞতার কথা ইচ্ছে করেই গোপন রেখেছিলাম। কিন্তু তাঁর সব আলোচনা ছাড়িয়ে একটি কথা আমার বুঝতে দেরি হয়নি সে কোন বিশেষ চরিত্রের কথা ভাববার আগে তিনি কোন সমস্যা কিংবা আইডিয়ার কথা ভেবে নেন। তারপর তাকে রূপ দেন চরিত্রের মধ্যে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শুরু থেকেই দেখা যায় তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে একটা বিশেষ ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে চরিত্রের অপূর্ব বিন্যাসে। তাই তিনি সাধারণকে অসাধারণ করে তুলতে পেরেছেন।

প্রচলিত সাহিত্য-রীতিকে চূর্ণ করবার জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে যার আবির্ভাব তাঁর সমাজ-সচেতন মনে প্রথম প্রথম রাজনীতির দুর্বার প্রভাব যে পড়বেই সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু বিচক্ষণ পাঠকের পক্ষে তখন বোঝা কঠিন হত না যে রাজনৈতিক প্রভাব, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর বয়সের ঝাঁজের চেয়ে সুবোধ ঘোষের রচনায় নিবিড় মর্মবোধ, সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনাশৈলী আর শব্দসম্ভারের বিপুল সমারোহ অনেক বেশি প্রধান হয়ে আছে। ঐতিহ্যে অগাধ বিশ্বাস আর আধুনিক যুগের ওপর অসীম শ্রদ্ধা—তিনি যে একদিন অতীত আর বর্তমানের সমন্বয় ঘটাবেন—হয়তো অনেক সমালোচকের সে বিশ্বাসও ছিল।

কিন্তু তার অনেক আগেই আমি দেশ ছাড়লাম। অনেক বছরের লম্বা ছেদ। সুবোধবাবুর ক্রম-পরিণতির খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। বহুদিন পর ফিরে এসে পড়লাম একে একে তাঁর অনেক বই। গঙ্গোত্রী, জতুগৃহ, থির্‌বিজুরী, ত্রিযামা, সুজাতা, ভারত প্রেমকথা আর পলাশের নেশা। শতকিয়া আর রূপসাগর তখন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দু-এক অধ্যায় পড়ি আবার কখনও কখনও বাদ পড়ে যায়।

অনেকের কাছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাংঘাতিক রকম অস্বাভাবিক মনে হলেও আমি একেবারে অবাক হলাম না। বস্তুত তাঁর মতো লেখকের পক্ষে এই পরিণতিই যেন স্বাভাবিক। বাইরের চেয়ে অভ্যন্তর, সমস্যার চেয়ে সমন্বয়, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে মানসিক তৃপ্তি-অতৃপ্তি আজ সুবোধ ঘোষের সাহিত্যে প্রধান হয়ে

উঠেছে। ছোট ছোট ঘাত-প্রতিঘাত এড়িয়ে, প্রতিদিনের আবর্জনা পেরিয়ে জীবনের একটা সুন্দর সার্থক রূপ তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধি-বিজ্ঞান সেখানে হার মানে, রাজনীতি সেখানে পৌঁছয় না, সেখানে বোধহয় একমাত্র সাহিত্যিকেরই অবাধ প্রবেশাধিকার। এবং ঐতিহ্যের দিকে যার ঝোঁক প্রবল, তিনি সবচেয়ে আগে রূপময় জীবনের অনুসন্ধানে আধুনিক যুগের মানুষের মনের গভীরে দৃষ্টি দেবেন সেকথা হয়তো অনেকের পক্ষেই বোঝা কঠিন হবে না।

আমার অগ্রজ এবং সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই বিষয়বস্তু নির্বাচনকে মুখ্য বলে গণ্য করেন না। তাঁদের মত—ক্ষমতা থাকলে যা কিছু নিয়ে লেখা যাক না কেন, তাই নাকি সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করা যায়। ক্ষমতা বলতে তাঁরা হয়তো বোঝেন, ভাষার নিপুণ প্রয়োগ, বিশ্লেষণের নতুন এক টেকনিক আর ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ।

কয়েকটি নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে অনায়াসেই প্রমাণ করে দেয়া যায় যে, ভাষার ও টেকনিকের পীড়াদায়ক দৈন্য নিয়ে বর্তমান কালের অনেক সাহিত্যিক একমাত্র সমাজবোধ সম্বল করে শুধুমাত্র মাস্টার টেকনিসিয়ানদের ভালভাবেই পরাজিত করে সামনে এগিয়ে আসতে পেরেছেন। সাহিত্যের ব্যাপ্তি পরিধি যতই বাড়িয়ে চলুক, যে-লেখক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে একেবারে নীরব, তিনি পাঠককে চমকে দিলেও তার মনে চিরন্তন রেখাপাত করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

যে লেখক ক্লাসিকপন্থী ও যাঁর রচনা এপিক ধর্মী, বলা বাহুল্য, তিনি মূলত রোমান্টিক। এবং সমাজবোধের চেয়ে ভাব-প্রবণতাকে মিঠেকড়া রসে জারিয়ে দেয়া তাঁর স্বভাব ধর্ম। কিন্তু এই উক্তির একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় সুবোধ ঘোষ। ভাষা টেকনিক আর সমাজবোধের অলৌকিক গ্রন্থন তাঁর ক্ষেত্রে যেন এক হয়ে গেছে। চোখ কান বন্ধ করে রেখে তাঁর প্রেমিক-প্রেমিকাকে দীন মেকী সমাজের ওপর ভাবের রঙীন তুলি বুলিয়ে তিনি কোন গজদন্ত মিনারে নিয়ে যাননি। তাঁর আজকের বিষয়বস্তু একেবারে ভিন্ন হলেও প্রকাশভঙ্গি হয়তো এক। ঝলমলে আবরণের আড়ালে আর আধুনিক সভ্যতার বিপুল ভানের পিছনে মানুষের সে দৈন্য আর কান্না, যন্ত্রণা আর ক্ষোভ—প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের আগুন মনের গোপন নিঃসঙ্গ লোকে গুমরে গুমরে জ্বলছে, মহাজীবনের ব্যাপক প্রেমের সঙ্গে তার চিরন্তন সন্ধি হয়তো আজ সুবোধ ঘোষের শিল্পিমানসের সার্থক প্রতীতি।

এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই

গত এক বছরে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য যেসব সাহিত্য-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হল। প্রতি বছর বাংলা ভাষায় নতুন যেসব বই প্রকাশিত হয়, তার থেকে অনুমোদনযোগ্য বইগুলি নির্বাচিত করে দেবার কাজটি যে অত্যন্তই দুরূহ তা আশা করি সকলেই উপলব্ধি করবেন। অনবধানবশত কোন কোন উল্লেখ্য বইয়ের নাম বাদ পড়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তার জন্য আগে থাকতেই আমরা ত্রুটিস্বীকার করে রাখছি।

বাংলা দেশে সাহিত্য-পাঠকের অভাব নেই, প্রকাশিত গ্রন্থও সংখ্যায় অনেক। সুতরাং বৈশিষ্ট্য গুণ এবং গুরুত্ব অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরি করে পাঠক-সাধারণের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতি বছরই, সুতরাং, এই বিশেষ সংখ্যাটিতে এক বছরের উল্লেখযোগ্য বইয়ের একটি তালিকা প্রকাশিত হবে। পাঠক-সাধারণ এবং সাধারণ-পাঠাগারগুলির যদি তাতে কিছুমাত্র উপকার হয়, আমরা সুখী হব।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উল্লেখযোগ্য বাংলা বইয়ের নির্ভরযোগ্য তালিকা না পাওয়ায় এবার আর তা দেওয়া সম্ভব হল না।

সম্পাদক, দেশ।

কবিতা

অমিল থেকে মিলে	১·৫০	মণীন্দ্র রায়	...	এম সি সরকার
আলেখ্য	২·৫০	বিষ্ণু দে	...	এম সি সরকার
আলোকিত সমন্বয়	২·০০	আলোক সরকার	...	মিত্রালয়
জাতক	১·০০	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	ইণ্ডিয়ানা
ব্যঙ্গ কবিতা	৬·০০	বনফুল		বেঙ্গল পাবলিশার্স

যে আঁধার আলোর অধিক	২·৫০	বুদ্ধদেব বসু ...	এম সি সরকার
রক্তগোলাপ	২·৫০	বিমলচন্দ্র ঘোষ ...	
শেষ সওগাত	৪·০০	নজরুল ইসলাম ...	আই এ পি
শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪·০০	সুনির্মল বসু ...	মিত্র ও ঘোষ
সন্ধ্যামণি	৫·৫০	কালিদাস রায় ...	এ মুখার্জি
সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা	৪·০০	কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদিত) ...	গ্রন্থগৃহ
স্বনির্বাচিত কবিতা	৪·০০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	আই এ পি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়	৬·০০	দীপ্তি ত্রিপাঠী ...	নাভানা
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য	৫·০০	ত্রিপুরাশংকর সেন ...	পপুলার লাইব্রেরী
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য	১০·০০	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	বুকল্যাণ্ড
কবিতার ধর্ম ও আধুনিক বাংলা কবিতার ঋতুবদল	৪·০০	অরুণ ভট্টাচার্য ...	জিজ্ঞাসা
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫·০০	মনজুরা খাতুন ...	ভারতী লাইব্রেরী
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র		যোগেশচন্দ্র বাগল ...	শ্রীগুরু
চলচ্চিন্তা	২·৫০	রাজশেখর বসু ...	মিত্র ও ঘোষ
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি	৩·০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ...	পাইওনিয়র
ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৫·০০	মোহিত পুরকায়স্থ ...	ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়
বঙ্গ প্রসঙ্গ	৫·০০	সুশীল রায় (সম্পাদিত) ...	পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন

বর্বর যুগের পর	২·৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	কথামালা
বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র	৫·০০	অহীন্দ্র চৌধুরী	...	বুকল্যান্ড
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য়)	৫·০০	গোপাল হালদার	...	এ মুখার্জি
রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব	৫·৫০	বিমলকান্তি সমদ্দার	...	গুরুদাস
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য	৭·০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	বিদ্যোদয়
সাহিত্যে ছোটগল্প	৮·০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	ডি এম
সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা	৫·০০	শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়

জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়	১·৫০	কুমুদরঞ্জন রায়	...	এস রায় য়্যান্ড কোং
কবি সুকান্ত	২·৫০	অশোক ভট্টাচার্য	...	সারস্বত লাইব্রেরী
কেশবচন্দ্র সেন	১·০০	যোগেশচন্দ্র বাগল	...	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
ক্রীড়াজগতে দিকপাল বাঙালী	৩·৫০	অজয় বসু	...	দেবদত্ত অ্যান্ড কোং
দরদী শরৎচন্দ্র	৪·৫০	মণীন্দ্র চক্রবর্তী	...	বসুধারা
ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী	২·০০	আবদুল আজীজ আল আমান	...	জাগরণ প্রকাশনী
নজরুলকে যেমন দেখেছি	২·৫০	বেগম শামসুন নাহার	...	ভারতী লাইব্রেরী
নজরুল প্রসঙ্গে	৪·০০	মুজাফফর আহমেদ	...	বিংশ শতাব্দী
বাবার কথা	৩·০০	উমা দেবী	...	মিত্রালয়
বাঘা যতীন	২·৭৫	শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়	...	আই এ পি
বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র	৬·০০	দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)	...	বিদ্যোদয়
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম)	৫·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	এম সি সরকার

ভারতের সাধক (৪র্থ খণ্ড)	৬·৫০	শংকরনাথ রায়	... প্রাচী
রামমোহন	৪·০০	মণি বাগচী	... জিজ্ঞাসা
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে	২·৭৫	অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	... আই এ পি

স্মৃতিকথা

খড়ির লিখন	২·৫০	সুকন্যা	... নিউ এজ
ছেলেবেলার দিনগুলি	৩·০০	পুণ্যলতা চক্রবর্তী	... নিউ স্ক্রিপ্ট
তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ (৩য়)	৬·৫০	প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	... ডি এম
যা বলো তাই বলো	৩·০০	শংকর	... নিউ এজ
রবি-তীর্থে	৫·০০	অসিতকুমার হালদার	... পাইওনিয়র বুক কোং

ভ্রমণ ও অভিযান

অকারণের পথ	৪·৫০	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	... মিত্র ও ঘোষ
আজকের পশ্চিম	৪·৫০	ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	... এশিয়া
জাপানে	৬·৫০	অন্নদাশংকর রায়	... এম সি সরকার
নতুন ইয়োরোপ : নতুন মানুষ	৫·০০	মনোজ বসু	... বেঙ্গল পাবলিশার্স
নেপোলিয়নের দেশে	২·০০	দিলীপ মালাকার	... বেঙ্গল পাবলিশার্স
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে	৫·৫০	গোপালদাস মজুমদার (সম্পাদিত)	... গোপালদাস পাবলিশার্স
হিমতীর্থে	৩·৫০	সুকুমার রায়	... বেঙ্গল পাবলিশার্স

রম্যরচনা

উপল-উপকূলে	২·২৫	নিমাইসাধন বসু	... এ কে ঘোষ
একটি সুরের কান্না	২·৫০	ভারতপুত্রম্	... সাহিত্য

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ	৩·৫০	বাণী রায়	...	মুখার্জি বুক হাউস
ব্যান ও বন্যা	৩·০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ভেলকি থেকে ভেষজ	৬·০০	আনন্দকিশোর মুন্সী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
যুদ্ধের ইয়োরোপ	৪·০০	বিক্রমাদিত্য	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সতুবদ্যির গল্প	২·৫০	সতুবদ্যি	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স

সংগীত

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা	২·০০	কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান	২·৫০	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	...	ডি এম

অনুবাদ

ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা	৫·৭৫	শান্তা বসু	...	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
চিড়িয়াখানার খোকাখুকু (ভেরা চ্যাপলিনা)	৩·০০	প্রতিভা দাশগুপ্তা	...	পপুলার

দ্কুনকে ধান (শিবশংকর পিল্লাই)	৩·০০		ত্রিবেণী প্রকাশন
বাল্মীকি রামায়ণ	১২·০০	শিশিরকুমার নিয়োগী ...	এ মুখার্জি
মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ (এ এন কাবানভ)	৭·০০	সমর রায়চৌধুরী ...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
মাটির মানুষ (কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী)	২·৫০	সুখলতা রাও ...	ত্রিবেণী প্রকাশন
সাগরে মিলায় ডন (শলোখফ)	৬·০০	রথীন্দ্র সরকার ...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
সাহিত্য শিল্প প্রসঙ্গে (মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিন)	৩·০০		ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

ধর্ম ও দর্শন

দর্শন প্রসঙ্গ	৭·০০	ইন্দুভূষণ মজুমদার ...	আশুতোষ বুক স্টল
দর্শনের ভূমিকা	৬·০০	নীরদবরণ চক্রবর্তী ...	এ মুখার্জি
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন	৫·০০	রবি রায় ...	সিগনেট
স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন (বিনোবা)	১·৭৫	বীরেন্দ্র গুহ ...	সর্বোদয়
হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা	৪·৫০	স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি ...	সত্যাশ্রম

অভিধান

পৌরাণিক অভিধান	৭·০০	সুধীরচন্দ্র সরকার ...	এম সি সরকার

ইতিহাস

ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা	৪·০০	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ...	পপুলার লাইব্রেরী
সম্রাট বাহাদুর শার বিচার	৩·০০	অপূর্বমণি দত্ত ...	মিত্র ও ঘোষ

রচনাবলী

প্রভাত গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)	১০.০০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	শ্রীভবন
বনফুল-রচনা--সংগ্রহ	৭.৫০	বনফুল	...	মিত্র ও ঘোষ
মাইকেল-রচনাসম্ভার	১০.০০	প্রমথনাথ বিশী (সম্পাদিত)	...	মিত্র ও ঘোষ
রচনা-সংগ্রহ (১ম খণ্ড)	১০.০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স

নানা নিবন্ধ

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে	২.০০	অম্লান দত্ত	...	মিত্রালয়
গ্রন্থাগার পরিচালনা	২.৫০	রাজকুমার চক্রবর্তী	...	শ্রীগুরু
জেল ডায়েরী	৩.০০	সতীন সেন	...	মিত্রালয়
টি বি সম্বন্ধে	৪.০০	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়
নারীর উক্তি	২.৫০	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	...	বিশ্বভারতী
পরমাণু শক্তি	৪.০০	অমলেন্দু দাশগুপ্ত	...	গোপালদাস পাবলিশার্স
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান		শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বৈদিক ও বৌদ্ধশিক্ষা		নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স

নাটক

অপরাজিত	১.৭৫	রমেন লাহিড়ী	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
আকাশবিহঙ্গী	২.০০	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	...	সেনগুপ্ত বুক স্টল
উটরোগ	২.০০	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	ডি এম
কন্যকা	২.৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
কালরাত্রি	২.০০	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	...	বিংশ শতাব্দী

গৃহদাহ (শরৎচন্দ্র)	২·০০	অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল	...	গুরুদাস
চোর	২·০০	ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	গোপালদাস পাবলিশার্স
ছায়ানট	২·৫০	উৎপল দত্ত	...	পপুলার লাইব্রেরী
তিন সর্গ	১·৬২/২·০০	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
ত্রিনয়ন	১·০০	সুনীল দত্ত	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
থানা থেকে আসছি	২·০০	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	...	প্রকাশনী
নব একাঙ্ক	৩·৫০	মন্মথ রায়	...	গুরুদাস
বহ্নিপতঙ্গ	২·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
বারো ঘণ্টা	১·২৫	কিরণ মৈত্র	...	রাইটার্স কর্ণার
রাজলক্ষ্মী (শরৎচন্দ্র)	২·০০	দেবনারায়ণ গুপ্ত	...	গুরুদাস
সকাল-সন্ধ্যার নাটক	৩·৫০	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	...	মিত্রালয়

গল্পগ্রন্থ

অপরূপা	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	ত্রিবেণী প্রকাশন
আনন্দনট	৩·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
উত্তরণ	২·৫০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	গুরুদাস
এক অঙ্গে এত রূপ	৩·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	নাভানা
এলার্জি		প্রমথনাথ বিশী	...	বিশ্ববানী
কাঠের ঘোড়া	২·৫০	কুমারেশ ঘোষ	...	শতাব্দী
গল্পপঞ্চাশৎ	৮·০০	আশাপূর্ণা দেবী	...	মিত্র ও ঘোষ
চন্দ্রমল্লিকা	২·৫০	ভবানী মুখোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার
চৈত্রদিন	৪·০০	ননী ভৌমিক	...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
ছিলেন বাবুর দেশে	২·৫০/৩·০০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	...	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
জলপায়রা	৪·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	ত্রিবেণী প্রকাশন
দিবারাত্রি	৩·০০	বিমল কর	...	শ্রীগুরু
দ্বন্দ্বমধুর	৩·৫০	মুজতবা আলী ও রঞ্জন	...	ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রজাপতির রঙ	২·৫০	প্রবোধবন্ধু অধিকারী	...	নিউ স্ক্রিপ্ট
বরনারী	২·৫০	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	...	বিংশ শতাব্দী
বিয়ের প্রুফ বউ	২·৭৫	শিবরাম চক্রবর্তী	...	কথামালা
বিষপাথর	২·৫০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
মনোমুকুর		সমরেশ বসু	...	ক্লাসিক প্রেস
মহুয়া মিলন		ধীরাজ ভট্টাচার্য	...	কারেন্ট বুক শপ
মায়াকুরঙ্গী	৩·৫০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
মেঘলা দুপুর	২·২৫	প্রতিভা বসু	...	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
মৃগশিরা	৩·৫০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	..	শ্রীগুরু
রূপের দায়	৩·৫০	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	এম সি সরকার
সেই চিরকাল	৩·৫০	দেবেশ দাশ	...	মিত্র ও ঘোষ

উপন্যাস

অনমিতা	৪·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	মিত্র ও ঘোষ
অন্য দিগন্ত	৫·০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
আনোখীলাল পাথোটিয়া	২·৫০	বিক্রমাদিত্য	...	আই এ পি
আমার ফাঁসি হল	৩·৫০	মনোজ বসু	...	ত্রিবেণী প্রকাশন
উত্তরায়ণ	৪·০০	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্র ও ঘোষ
একটি স্বাক্ষর	৩·০০	রামপদ মুখোপাধ্যায়	...	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
কঙ্কপথ	২·৭৫	সুনীল সরকার	...	এশিয়া
কাজল গাঁয়ের কাহিনী	৪·৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	...	গুরুদাস
কেরী সাহেবের মুন্সী	৮·৫০	প্রমথনাথ বিশী	...	মিত্র ও ঘোষ
চায়না টাউন	৪·৫০	বারীন্দ্রনাথ দাশ	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
চারপ্রহর	২·০০	মাহমুদ আহ্‌মদ	...	সাধারণ পাবলিশার্স
জলতরঙ্গ	৪·০০	বনফুল	...	আই এ পি
ঝাঁপতাল	২·৭৫	লীলা মজুমদার	...	আই এ পি
তুমি সন্ধ্যার মেঘ	৫·৫০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যা	...	নিউ এজ
ত্রিধারা	৮·০০	সমরেশ বসু	...	[illegible] পাবলিশার্স

তৃতীয় ভুবন	৪.৫০	দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়
দাঁড়ের ময়না	৩.৫০	পূর্ণেন্দু পত্রী	...	সাহিত্য
নক্ষত্রের রাত	৩.৫০	মতি নন্দী	...	আই এ পি
নীলদিগন্ত	৩.০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	গোপালদাস পাবলিশার্স
নীলরাত্রি	৩.৫০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	আই এ পি
পার্ক	৪.৫০	সরিৎশেখর মজুমদার	...	প্রাচী
ফানুসের আয়ু	৫.৫০	বিমল কর	...	কথামালা
বেগম	৩.০০	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
বল্মীক	৪.০০	নারায়ণ সান্যাল	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মৎস্যগন্ধা	৫.০০	অচ্যুত গোস্বামী	...	ডি এম
মহারানী	৩.৫০	বনফুল	...	ডি এম
মন কেমন করে	৩.৫০	বিমল মিত্র	...	নিউ এজ
মন নিয়ে খেলা	৫.০০	ধীরাজ ভট্টাচার্য	...	এম সি সরকার
মনে মনে	২.০০	সত্যব্রত মৈত্র	...	মুখার্জি বুক হাউস
মেঘ পাহাড়ের গান	২.০০	অনিলকুমার ভট্টাচার্য	...	ডি এম
মেঘ ডম্বর	৩.০০	প্রশান্ত চৌধুরী	...	বলাকা
মেঘের পরে মেঘ	৩.৭৫	প্রতিভা বসু	...	নাভানা
মৌসুমী	৩.০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	আই এ পি
মধুরে মধুর	৫.৫০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	এ মুখার্জি
মধুমিতা	৪.৫০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	বিদ্যোদয়
রূপসী রাত্রি	৫.০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	আনন্দ পাবলিশার্স
রোয়াক	৩.৫০	দীপক চৌধুরী	...	এম সি সরকার
শতকিয়া	৮.০০	সুবোধ ঘোষ	...	আনন্দ পাবলিশার্স

শেষ পর্যন্ত	৩·০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	..	শিশির পাবলিশার্স
সিন্ধুপারে	৭·০০	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	...	নিওলিট
সিন্ধুপারের পাখি	৯·০০	প্রফুল্ল রায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
স্মৃতি	৩·০০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	...	শ্রীগুরু
বেলোয়ারী	৬·৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	মিত্র ও ঘোষ

ছোটদের সাহিত্য

অথ ভারত কথকতা	২·২৫	শ্রীকথক ঠাকুর	...	বিদ্যোদয়
আলি ভুলির দেশে	২·০০	সুখলতা রাও	...	
আদিকালের বদ্যিবুড়ো		জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	...	ক্লাসিক প্রেস
আধুনিক ম্যাজিক	২·০০	এ সি সরকার	...	মিত্রালয়
এ দেশ আমার (২য়)		দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
খুশির হাওয়া	১·৫০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
খেয়াল খুশি অসম্ভব	৩·০০	অমিয় চক্রবর্তী (সম্পাদিত)	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
চামড়ার কাজ		ননীগোপাল চক্রবর্তী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (বনফুলের)	২·০০	বনফুল	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (হেমেন্দ্রকুমার)	২·০০	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (মানিক বন্দ্যো)	২·০০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
ছোটদের শ্রীকান্ত	২·৫০			এম সি সরকার
ছোটদের রঙমহল	৩·৫০	সুনীল দত্ত সম্পাদিত	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষৎ
ঝড়ের যাত্রী	১·৬০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
জ্ঞান থেকে অজ্ঞান	১·৬০	বুদ্ধদেব বসু	...	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
নিশুতিপুর	১·৬০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
পদ্মগোলাপ	২·০০	মনোজিৎ বসু	...	মিত্রালয়
পারুল পারুল পারুলটি		অমিতাভ সেন	...	অক্ষর
বনের ডাক	৫·০০	স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ	...	অরুণ দে
বাংলার ডাকাত (২য়)	২·৫০	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	বৃন্দাবন ধর
মায়ের বাঁশি	৪·৫০	বিমল ঘোষ (মৌমাছি)	...	মিত্র ও ঘোষ
মামা ভাগ্নে	০·৭৫	শিবরাম চক্রবর্তী	...	এম সি সরকার
মামাবাড়ি	১·৫০	অরবিন্দ গুহ	...	অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির
রঙিন রূপকথা	১·৬০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
সদাশিবের তিনকাণ্ড	১·৭৫	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	নিউ এজ
সাত রাজ্যি	১·৮০	সুকুমার দে সরকার	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
রংবেরং	৩·৫০	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
রূপকথার ঝাঁপি	২·২৫	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	আই এ পি

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বরিশাল জেলার এক সুদূর পল্লী-গ্রাম উজিরপুরে আমাদের বাড়ি ছিল। ১৮৯৬ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক স্বর্গত কবি সতীশচন্দ্র রায়ের বাড়িও সেখানে ছিল। কলেজের বয়স্ক ছাত্রেরা গ্রীষ্মের বা পূজার ছুটিতে যখন গ্রামে আসিতেন, তখন আমাদের মত ইস্কুলের ছোট ছেলেদের লইয়া তাঁহারা বাংলা ও ইংরাজী আবৃত্তি ও অভিনয়ের আয়োজন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সুদূর পল্লীগ্রামে তাঁর বই তখনো পৌঁছায় নাই বলিলেই হয়। সেই সময় একবার গ্রামে আবৃত্তি হইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনৃত্য কবিতা "বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে বাজিছে বিশ্ব বাজনা, উঠিছে চিত্ত করিয়া নৃত্য বিস্মৃত হয়ে আপনা"—গান হইল 'সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার, তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।' আমার বয়স তখন নয় দশ বৎসর হইবে। আবৃত্তি ও গানের অনেক কথাই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দের দোলা ও শব্দের মাধুর্য মনকে মুগ্ধ করিত। কবি সতীশচন্দ্র মাঝে মাঝে আবৃত্তিতে যোগ দিতেন, তাঁর আবৃত্তি কি ইংরাজী কি বাংলা আমাদের কাছে এক অপরূপ ব্যাপার মনে হইত।

তখনকার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার (বর্তমান ইস্কুল ফাইনাল) দুই বছর আগে গিয়া (ইং ১৯০২) বরিশাল শহরের ইস্কুলে ভর্তি হইলাম। সেখানে মাঝে মাঝে সভা-সমিতিতে রবীন্দ্র কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইত। মনে আছে এক সভায় বক্তার প্রবন্ধ পাঠের পর অশ্বিনীকুমার দত্ত (বরিশালের বিখ্যাত নেতা ও শিক্ষাবিদ) বলিলেন 'রবিবাবু যদি অন্য কবিতা কম লিখে "কথার" মত কবিতা বেশি করে লিখতেন তো দেশের উপকার হোতো।' কিছুদিন পরে শুনিলাম সতীশবাবু শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়াছেন। তিনি তখন কলিকাতায় জেনেরাল আসেম্ব্লি ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) বি-এ ক্লাসে পড়িতেন।

ইংরাজি ১৯০৩ সালের পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়া এক সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁর বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ছিল। বিজয়া দশমীর পর গিয়াছিলাম বলিয়া দেশের প্রথামত কিছু মিষ্টিমুখ করিতে হইল। তার পরে বেলা পড়িয়া আসিলে তিনি আমাদের নিয়া ছাদে গেলেন। আমাদের অনুরোধে তিনি তাঁর টৌনি সংস্করণ (প্রথম সংস্করণ) রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হইতে বুঝাইয়া বুঝাইয়া কয়েকটি কবিতা শুনাইলেন। তার মধ্যে একটি 'গানভঙ্গ'—'গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা' ইত্যাদি। বলিলেন, কবিতার ঘটনাটি কবি স্বপ্নে পেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যেন তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধ গায়ক বরজলালকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আর একটি শুনাইয়াছিলেন—"পুরী হইতে সমুদ্র দর্শনে" 'হে আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার'। কোনো কোনো কবিতার পাশে সতীশবাবুর লিখিত মন্তব্য ছিল। মনে আছে এই কবিতাটির পাশে লেখা ছিল 'more sublime than Byron's Sea-Vision'

অর্থাৎ কবি বাইরনের সমুদ্র দর্শনের চেয়ে গম্ভীর। 'কথার' কবিতা শুনিতে চাহিলে তিনি মন থেকেই 'পণরক্ষা' 'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ' কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। এই আলোচনার মধ্যে এক সময়ে তিনি বলিলেন—"রবিবাবুর কবিতার সহজ ভাষার জন্য আগে মনে করতাম মানেটা খুব সোজা—এখন যত বয়স হচ্ছে দেখি মানেটা তত সোজা নয়, গভীর।" এই ছুটিতেই একদিন সতীশবাবু আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নিমন্ত্রণটা সঠিক কিনা সন্দেহ হওয়ায় আমি সেদিন যাই নাই। গেলে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশের হয়তো আর একটু সাহায্য হইত আর সতীশবাবুর মত ভাবুকের সঙ্গ আর একদিনের জন্য সঙ্গলাভ
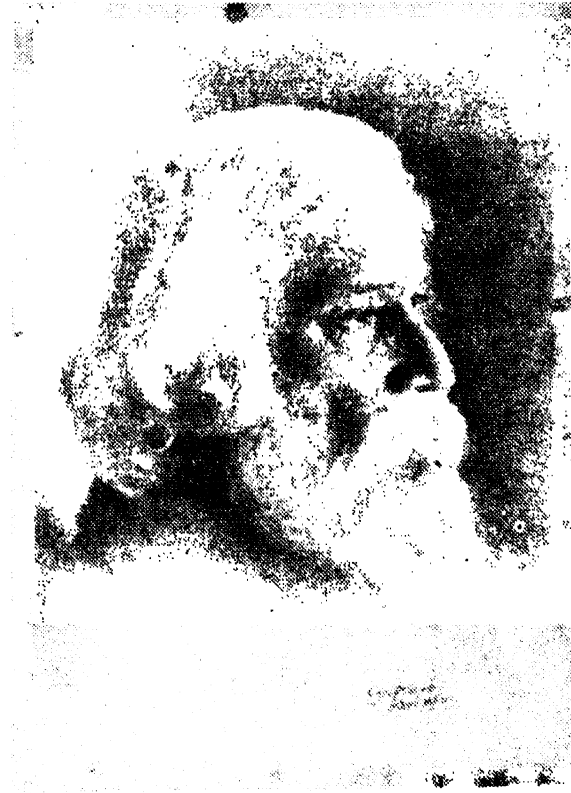
করিয়া জীবন ধন্য হইত। কিন্তু আমি কি জানিতাম এ জন্মে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হইবে না? ইহার পরের মাঘ মাসেই মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে বসন্তরোগে মারা যান (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। সতীশবাবুকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন দু-একটি লেখার মধ্যে তার কিছু কিছু পরিচয় আছে। আশ্রমে আলোচনার মধ্যে একবার তিনি বলিয়াছিলেন—"ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যের যে প্রাচীন আদর্শ শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি ভাবে-ভোলা বালক সতীশের মধ্যে তা মূর্তিমান হয়েছিল। সতীশের সঙ্গে আলাপ করে আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। আশ্রমে সে আমার ছাত্র হয়ে এসেছিল—বেঁচে থাকলে সে একদিন আমার শিক্ষক হোতো।"

চায়ের পেয়ালায় ঝড়

১৯০৩—৪ সালে যখন বরিশাল জিলা ইস্কুলে পড়িতাম, তখন একটি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে ইস্কুলের জুবিলি উৎসব হয়। সেই উপলক্ষে নানারকম খেলাধুলো, আবৃত্তি ও অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ধর্মপ্রচার'—"ওই শোনো ভাই বিশু পথে শুনি জয় যিশু" নাটিকাটিও ছিল। নিমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে কয়েকটি খৃষ্টানও উপস্থিত ছিলেন। এই নাটকে খৃষ্টান তাপসের নম্রতা ও ধৈর্যের তুলনায় নব্য-হিন্দুর আস্ফালন ও কাপুরুষতাকে যে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন খৃষ্টান প্রচারককেই ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাঁহারা গিয়া তাঁহাদের বড় পাদ্রীসাহেবকে এই কথা জানাইলেন। সাহেব আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়কে এক কড়া চিঠি লিখিয়া ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। হেডমাস্টার মহাশয় যখন চিঠিটা পান, তখন তিনি খেলার মাঠে ছেলেদের প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করিতেছিলেন। এদিকে সাহেব তাঁর চাপরাশি পাঠাইয়া জবাবের জন্য তাগিদ দিলেন। অবসর হইলে হেডমাস্টার মহাশয় পাদ্রীসাহেবের ভুল দূর করার জন্য যে চিঠি দেন তার শেষের বাক্যটি কতকটা এইরূপ ছিল—

'The play depicts the humility and patience of a pious Christian pracher which, however in strange contrast with the haughtiness and tone displayed in your letter.'

অর্থাৎ নাটকটিতে একজন সাধু খৃষ্টান প্রচারকের নম্রতা ও ধৈর্য চিত্রণ করা হইয়াছে যা আপনার চিঠিতে প্রকাশিত উদ্ধত ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বলা বাহুল্য, পাদ্রীসাহেব এই অপ্রিয় সত্য শুনিয়া মোটেই খুশি হন নাই। তিনি ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হেডমাস্টারের নামে নালিশ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হেডমাস্টারের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। হেডমাস্টার কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন কিনা মনে নাই, তবে তার বেশি যা দিয়াছিলেন তা জানি। তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তখনকার বেঙ্গলী কাগজে টেম্পেস্ট ইন এ টী পট—চায়ের পেয়ালায় ঝড় এই শিরোনামা দিয়া এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমাদের এই স্বাধীনচেতা হেডমাস্টার মহাশয়ের নাম ছিল প্রসন্নকুমার বসু। সম্ভবত ঢাকা জেলায় তাঁর বাড়ি ছিল। পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দেন (ইং ১৯০৭)।

কবি-দর্শন

১৯০৪ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা (তখনকার ইস্কুল ফাইনাল) পাশ করিয়া জুলাই মাসে কলিকাতার কলেজে যোগ দিই। বরিশালে থাকিতে যেসব গণ্যমান্য লোকদের নাম শুনিয়াছিলাম তাঁদের দেখিবার ও শুনিবার জন্য প্রায় কোনো সভাই বাদ দিতাম না। তখনকার কালে কলিকাতায় ছাত্রদের খেলা ও সিনেমা এই দুটি প্রধান

আকর্ষণ ছিল না। থিয়েটার কিছু কিছু ছিল আর ছিল সভা। আমার যিনি অভিভাবক ছিলেন সভার প্রতি আমার এই আকর্ষণ তাঁর ভাল ঠেকে নাই। সেই জন্য সভায় যাবার দিন তিনি নানারকম বাধা সৃষ্টি করিতেন। কলিকাতায় আসার পর প্রথমে যে দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনার সুযোগ হয়, সেদিন 'স্বদেশী সমাজ' সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বক্তৃতা হইবার কথা। কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া যথাসময়ে বিডন পার্কের নিকটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়া দেখি অনেক লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া—পুলিস কাউকে ভিতরে ঢুকিতে দিতেছে না; কারণ স্থান সমস্তই ভর্তি হইয়া গেছে। শুনিলাম কিছু পূর্বেই কয়েকজন ছাত্রকে পুলিস চাবুক মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। নিরাশ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ইহার কয়েকদিন পরেই কাগজে দেখিলাম হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) কার্জন থিয়েটারে আবার "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ পড়া হইবে। সেবার আমার হিতৈষী অভিভাবক এমন ফন্দী করিলেন যে, আমাকে একেবারে কলিকাতার বাহিরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আমি সন্ধ্যার পরেই কলিকাতা পৌঁছিলাম, কিন্তু কার্জন থিয়েটারের কাছে যখন আসিলাম, তখন বাতি নিবাইয়া সভা ভঙ্গ হইয়া গেছে—বালকের কবি-দর্শনে এবারেও বাধা পড়িল।

তার পরে দীর্ঘ দিন গেল। ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে একদিন কাগজে দেখিলাম খ্রীষ্টের লোকদের এক পারিতোষিক বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হইবেন আর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বক্তৃতা করিবেন। এবারে সময়ের অনেক আগে সভায় গেলাম, রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম ও তাঁর মৌখিক বক্তৃতা শুনিলাম। এই সময়ে তিনি প্রায়ই লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। বক্তৃতার কথায় বা ধরনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথোচিত চমৎকারিতা কিছু পাইলাম না। কেবল মনে আছে এই বক্তৃতায় তিনি একজন জাপানী দেশপ্রেমিক যোশিদা তোরোজিরোর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি শুধু হাতে সমস্ত দেশ ঘুরিয়া দেশের পরিচয় লাভ করেন। দেশকে ভালবাসিতে ও দেশের কাজ করিতে হইলে দেশের জ্ঞান থাকা চাই। ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ হইতে কবি 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধ ক্লাসিক থিয়েটারে পাঠ করেন। সেই বক্তৃতায় বুঝিলাম রবীন্দ্রনাথ কী বক্তা! বক্তৃতার সময় মনে হইল কোনো স্বপ্নলোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। বক্তৃতার পর শ্রোতারা গানের জন্য দরবার জানাইল। স্টেজের উপরে একটি হারমোনিয়াম আনা হইল। দুই একবার বাজাইয়া কবির তাহা পছন্দ হইল না। তিনি শুধু গলায় গাহিলেন—"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না"। গানটি এত সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, বন্ধুরা কেউ কেউ বলিলেন যে, ওটি তখনি বাঁধা হইয়াছে। পরে জানিলাম এ ধারণাটি ভুল।

স্বদেশী আন্দোলন

ইহার পর ইংরাজি ১৯০৫ সালের বর্ষাকালে বাংলাদেশে স্বদেশীর বান ডাকিল। কবি বক্তৃতা করিয়া গান বাঁধিয়া সেই বানকে ফসলের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কখনো তাঁকে দেখিলাম টাউন হলের বক্তৃতায়, কখনো জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন) উদ্বোধনে, কখনো ডন সোসাইটির ছাত্রমহলে, স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্বে পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার কালের অনেক খ্যাতনামা লোক ছাত্রদের এই সভায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। বিদ্যাসাগর কলেজে এই সমিতির আফিস ছিল, আর উহারই একটি ঘরে স্বদেশী মিলের কাপড়ের দোকান ছিল। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় কুমার সরকার, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি এই সমিতির সভ্য ছিলেন। ছাত্রদের কবিরচিত স্বদেশী গান শিখাইবার জন্য একজন গায়ক (সম্ভবত স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তী) সমিতিতে যাতায়াত করিতেন।

আশ্রম দর্শন

১৯০৭ সালের দোলপূর্ণিমার সময় কোন বয়স্ক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র লইয়া আমি প্রথমে শান্তিনিকেতনে যাই। কবির শিক্ষা-সমস্যা প্রভৃতি প্রবন্ধ হইতে ইতিপূর্বেই তাঁর আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আশ্রমের বাস্তব রূপটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। সে সময়ে কবি আশ্রমের 'দেহলী' নামক বাড়িতে থাকিতেন। সন্ধ্যার পরে আমি সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কবি তখন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন। এই সময়ে তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন। সম্ভবত ঐ সম্পর্কেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। কবির এক দূর-সম্পর্কীয় পিসিমা ও ছোট ছেলে সমীন্দ্রনাথ তখন ঐ বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকিতেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। ভৃত্য ছিল উমাচরণ।

রাত্রে আহারের পরে শুনিলাম আমাদের স্বগ্রামবাসী কবি সতীশচন্দ্রের ভাই ভূপেশবাবু ওখানে থাকেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত, সৌরভপূর্ণ আম্রকুঞ্জের ভিতর দিয়া অতিথিশালায় রাত্রিবাসের জন্য লইয়া গেলেন। পরদিন সকালে আবার কবির সঙ্গে দেখা হইল এবং স্থির হইল ইতিহাসের অগ্রসর ছাত্ররূপে আমি আশ্রমে যোগ দিব।

আশ্রমের কার্যপ্রণালী

কয়েকদিন পরেই আমি আশ্রমের কাজে যোগ দিলাম। ছাত্রসংখ্যা তখন বোধ হয় ত্রিশ চল্লিশ। অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, সত্যেশ্বর নাগ, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ আইচ, ভূপেশচন্দ্র রায়,

গাছের তলায় শিশুদের ক্লাস

কবির জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ছেলেরা সকলে প্রাককুটিরেই থাকিত। অধ্যাপকেরা অধিকাংশই ছেলেদের সঙ্গে থাকতেন। তখনকার কার্যপ্রণালী এইরূপ ছিল। শেষ রাত্রে বিছানা হইতে উঠিয়া শৌচাদির জন্য মাঠে যাওয়া, লাইনে দাঁড়াইয়া শুধু হাতে ডাম্বেলের ব্যায়াম, নিজেদের ঘর ঝাঁট দেওয়া, স্নান, কাপড় কাচা, বিছানা রৌদ্রে দেওয়া, একান্তে ও সমবেত উপাসনা, জলখাবার, ক্লাসে পাঠ। দুপুরে আহার, নিজ নিজ বাসন মাজা, বিশ্রাম। অপরাহ্নে আবার ক্লাস, জলখাবার, খেলা, সন্ধ্যায় উপাসনা, গল্প, গান, নাট্য, সভা প্রভৃতি, আহার, ছেলেদের নিজেদের বিচারসভা, রাত ৯টার সময় নিদ্রা, ছাত্রদের পরিচালন পদ্ধতি এইরূপ ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহের জন্য ছাত্রেরা ভোটের দ্বারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে নায়ক বা ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করিত। সেই প্রত্যেক কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে ঘণ্টা বাজাইত। লাইন করিয়া যথাস্থানে নিয়া যাইত। অধ্যাপকদের মধ্যে পালাক্রমে প্রতি মাসে একজন করিয়া অধিনায়ক হইতেন। অধিনায়কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নায়ক কাজ করিতেন,—কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে অধিনায়ক তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। বুধবার ছুটির দিনে ছেলেরা অধ্যাপকদের সঙ্গে বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইত। কোপাই ও অজয় নদী, পারুল বন, চীপ সাহেবের কুঠী প্রভৃতি বেড়াইবার স্থান ছিল। সেখানে গিয়া গ্রাম থেকে মুড়ি ও লবাং (পাটালি গুড়) কিনিয়া খাওয়া আমোদের একটা অঙ্গ ছিল। কোন কোন চতুর ছেলে গ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া আরো কিছু ভাল খাবার সংগ্রহ করিয়া অন্য ছেলেদের ঈর্ষার পাত্র হইত। ছেলেদের মধ্যে বোধ হয় অর্ধেকের উপর ছিল পূর্ববঙ্গের। কাজেই আশ্রমের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে ভাষার বিশেষ মিল ছিল না। এক এক সময়ে মনে হইত পূর্ববঙ্গেরই কোন বোর্ডিং ইস্কুলে আছি।

পূর্ণবাবু

আশ্রমের কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ণবাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি একাধারে ভাণ্ডার ও রন্ধনশালার পরিদর্শক, ওভারশিয়ার, অতিথি ও রোগীর সেবক ইত্যাদি ছিলেন। এতগুলি কাজ তাঁর হাতে থাকায় এবং তিনি একটু স্থূলকায় হওয়ায় কোনো কাজটিই ভাল করিয়া হইত না। সেজন্য তাঁকে মাঝে মাঝে অনুযোগ শুনিতে হইত। কিন্তু তিনি কিছুই গায়ে মাখিতেন না। ছেলেদের ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি তাদের অনেক আবদার সহ্য করিতেন। তাঁর নাকটি টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত দেখিতেছিল বলিয়া তাঁর চেহারার মধ্যে কিছু কৌতুক ছিল, আর মাঝে মাঝে রঙ্গরস করিতে করিতে তিনি উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিতেন। শুনিয়াছি কবি এক সময়ে বলিয়াছিলেন—
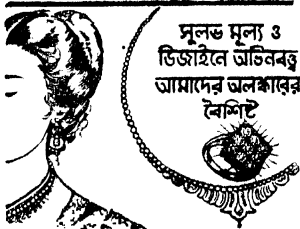
"এই লোকটি আমার মানসলোকে প্রবেশ করেছে—দেখ্‌বে এর পরে আমি যদি কোন গল্প লিখি তাতে এর চিত্র থাকবে।' কিন্তু আমি যতদূর জানি কবির কোনো গল্পে পূর্ণবাবুর ছায়া পড়ে নাই।

গ্রাম সংগঠন

১৯০৭ সালে আমি আশ্রমে যোগ দিবার পরেই ওখানে গ্রাম সংগঠনের পত্তন হয়। কবি তখন এই সংগঠনের কথা ভাবিতেছিলেন ও দেশকে বলিতেছিলেন, কিন্তু কোথাও বিশেষ সাড়া পান নাই (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ দ্রষ্টব্য)। তাই তিনি আশ্রমের নিকটস্থ ভুবনডাঙা গ্রামে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য আমাদের উৎসাহ দিলেন। আমরাও কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের কাজের এই চারটি বিভাগ হইল। আশ্রমে ও ভুবনডাঙার মধ্যে একটু সচ্ছল অবস্থার লোকের ঘরে মুষ্টিভিক্ষার হাঁড়ি রাখা হইল। ছেলেদের ও অধ্যাপকদের পুরোনো কাপড় লইয়া দরিদ্রের জন্য বস্ত্র-ভাণ্ডার হইল। অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। গ্রামের ছেলেদের শিক্ষা দিবার ভার আমার উপরে পড়িল। অজিতবাবু, বঙ্কিমবাবু, ভূপেশবাবু, সন্তোষবরবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের উপর স্বাস্থ্য বিভাগের ভার পড়িল। প্রতিদিন বিকালে জলখাবারের পর কয়েকটি ছেলেকে লইয়া আমি ভুবনডাঙায় গ্রামের ছেলেদের পড়াইতে যাইতাম। আশ্রমের এক একটি ছেলে গ্রামের এক একটি ছাত্রের ভার লইত। সে তাকে বাংলা লেখা, পড়া ও অঙ্ক শিখাইত। নিয়মিত পাঠের পরে কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা হইত। তাতে গ্রামের ছেলেরা আনন্দ পাইত। আশ্রমের মত গ্রামেও গাছের তলাতেই আমাদের ইস্কুল বসিত। স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে মাঝে মাঝে গ্রামের রাস্তা পরিষ্কার করা হইত। এই গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়ির পাশে একটা করিয়া খনা ছিল। তাতে নানারকম আবর্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ হইত। সেগুলি বুজাইয়া ফেলিবার বা পরিষ্কার করার জন্য আমরা উপদেশ দিতাম। বর্ষাকালে উহাতে জল জমিলে মাঝে মাঝে কেরোসিন তেল দিয়া মশকধ্বংসের চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ফল বেশি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

অভয় ব্রত

এই সময়ে গুরুদেবের অনুপ্রাণনায় কয়েকটি ছাত্র অভয় ব্রত গ্রহণ করে। অধ্যাপক ভূপেশচন্দ্র রায় তাদের পরিচালক ছিলেন। আশ্রমের সাধারণ ছাত্রদের জীবনেও তখন কিছু কঠোরতা ছিল, যেমন তাদের নিজেদের ঘর ঝাঁট ও বাসন মাজতে হইত। নিজেদের বিছানা করিতে, তুলিতে ও প্রতিদিন রোদ্রে দিতে হইত। কাপড় নিজেদেরই কাচিতে ও সাবান দিতে হইত। খালি পায়ে কাঁকরের রাস্তায় তো চলিতেই হইত। অভয়ব্রতীদের জীবনযাত্রা আরো কঠোর ছিল। শীতকালে মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া, আর একটা গায়ে দিয়া তারা রাত কাটাইত। দুপুরে রোদ্রে বা বৃষ্টির সময় বা গভীর রাত্রে তারা একা একাই খোলা মাঠে ঘুরিয়া আসিত। বলা বাহুল্য যে, তখন আশ্রমে বিজলী আলো ছিল না। প্রতিদিন রাত্রে ঘুমাইতে যাইবার আগে তারা লাইনে দাঁড়াইয়া অভয় মন্ত্র আবৃত্তি করিত। সংস্কৃত মন্ত্রটি মনে নাই, কিন্তু তার ভাব কতকটা এই যে, ঊর্ধ্ব-অধঃ সামনে পশ্চাতে কোথাও আমাদের ভয় নাই। কিছুদিন পরে এই ব্রতটি বন্ধ হইয়া যায়—কেন তা মনে নাই।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

যতদূর মনে পড়ে কবি তখন (১৯০৭ সাল) নিয়মিত কোনো ক্লাস লইতেন না। ইহার একটি কারণ হয়তো এই ছিল যে, তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতা ও জমিদারী শিলাইদহে যাতায়াত করিতে হইত। তবে মাঝে মাঝে ক্লাসে গিয়া পড়াশুনা দেখিতেন, নূতন কোন শিক্ষক আসিলে তাঁর উপস্থিতিতে প্রায় দশ পনর দিন নিজে পড়াইয়া ওখানকার শিক্ষাপ্রণালীটি বুঝাইয়া দিতেন। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একজন নূতন শিক্ষক প্রাক্‌কুটিরের উত্তরের বারান্দায় বসিয়া ভূগোল পড়াইতেছেন। কবি আস্তে আস্তে পিছন দিক হইতে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ শুনিতে লাগিলেন। ছাত্র বা অধ্যাপক কেউ টের পাইলেন না। আমি পাশের ঘরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে তিনি ক্লাসের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং নীহারিকাপুঞ্জ হইতে কী করিয়া পৃথিবী ক্রমে ক্রমে বর্তমান আকার পাইয়াছে, তাহা গল্পচ্ছলে বর্ণনা করিয়া গেলেন। ছেলেরা তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। সংসারে তিনি কবি, দার্শনিক, ধর্মোপদেষ্টা, কর্মী, চিত্রকর প্রভৃতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁকে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি কিরূপ পাকা শিক্ষক ছিলেন। একবার তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, "শরীরের খাদ্য সম্বন্ধে শিশুর লোভ থাকে। আমার মনে হয় মানসিক খাদ্য অর্থাৎ জ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরকম লোভ হওয়া উচিত। সবই যথার্থ শিক্ষকের উপর নির্ভর করে।" তিনি বলিতেন শিক্ষকের দুটি প্রধান গুণ

থাকা উচিত—সিমপ্যাথী ও ইমাজিনেসান, সহৃদয়তা ও কল্পনা।

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই নানা বই ও সাময়িক পত্র আনাইয়া নিজে পড়িতেন ও অধ্যাপকদের পড়িতে উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর স্বদেশ-বিদেশ শত্রু-মিত্র ভেদ ছিল না। এক সময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে তাঁর মনান্তর হয়। তখন দ্বিজেনবাবুর ইংরাজী প্রথম শিক্ষার একখানি বই বাহির হয়। বইখানি তিনি কলিকাতা হইতে ইংরাজীর অধ্যাপক অজিত বাবুকে পাঠাইয়া পত্র দেন তিনি যেন উহা বেশ করিয়া পড়িয়া গ্রহণীয় জিনিস আশ্রমের অধ্যাপনায় প্রয়োগ করেন—দ্বিজেন্দ্রবাবুর প্রতি বিরূপতার জন্য বইখানির প্রতি অবিচার না করেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালী

গুরুদেবের শিক্ষাপ্রণালীর কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী সহজ শিক্ষা সংস্কৃত প্রবেশ বইএ তার কিছু কিছু নিদর্শন আছে। দুই ভাগ ইংরাজি শিক্ষা শেষ করিবার পরেই Grim's Fairy Tales বা ঐ ধরনের কোনো ইংরাজী বই নিয়া বাক্য রচনা (Sentence Making) করানো হইত। প্রথমে কেবল একটি প্রধান বাক্য (Principal Sentence) লওয়া হইত—তাতে খালি কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম থাকিত। সেটির বাংলা তর্জমা করিয়া গুরুদেব ছেলেদের দিয়াই মুখে মুখে উহার ইংরাজী করাইয়া লইতেন। তারপর উহাতে ক্রমে বিশেষণ, বিশেষণ claus, ক্রিয়ার বিশেষণ প্রভৃতি যোগ করিয়া একেবারে বইএর আদিবাক্যের সমান করিয়া লইতেন। তার উপর ছেলেদের প্রশ্ন করিয়া করিয়া ইতিবাচক, নেতিবাচক, কর্মবাচক প্রভৃতি নানা রকম বাক্য ছেলেদের দিয়াই তৈরি করাইতেন। ইহার পর আদি বাক্যটি ছেলেদের দিয়া লিখাইতেন। তাহারা পরদিন ঐ বাক্যটি ভাল খাতায় লিখিয়া লইয়া আসিত। এই ভাবে প্রত্যেকের নিজ নিজ বই তৈরি হইত। এভাবে পড়ানোতে পাঠ বেশি অগ্রসর হইত না কিন্তু ছেলেরা যেটুকু শিখিত তা পাকা হইত। পরে দেখা গেল শুধু এভাবে পড়াইলে ছেলেদের নিজেদের বই পড়ার অভ্যাস হয় না, তাই পরে প্রত্যেক ক্লাসে দ্রুত পঠনের (Rapid Reading) জন্য একখানি করিয়া ইংরাজী গল্পের বই পড়ানো হইত।

বাংলা রচনাও প্রথম দিকে এইভাবে মুখে মুখে বলাইয়া ছেলেদের অভ্যাস করাইতেন। তারপর নোট লিখিতে বসিতেন। ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি রচনার সময় মুখে মুখে শিখাইতেন। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো বই ছিল না। বাংলাতেও দ্রুত পঠনের প্রতি তিনি খুব জোর দিতেন। এমন কি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য দ্রুত পঠনকে তিনি উৎকৃষ্ট প্রণালী মনে করিতেন। নীচের ক্লাসে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক ছিল না। ইতিহাস মুখে মুখে গল্পের আকারে শেখানো হইত। প্রথমে ভারত ইতিহাসের প্রধান প্রধান পুরুষদের জীবনী ও চরিত্রের আলোচনা করা হইত—যথা বুদ্ধদেব, অশোক, হর্ষবর্ধন, আকবর, নানক, শিবাজী প্রভৃতি। যে সব গল্প বলা হইত সেগুলি ছেলেরা নিজেদের খাতায় লিখিত ও তাহাই তাহাদের বই হইত। ইতিহাসের যে সব ঘটনা অভিনয়ের উপযুক্ত তা অবলম্বন করিয়া ছেলেরা অভিনয় করিত। ইহাতে ইতিহাস তাহাদের কাছে অনেকটা জীবন্ত হইত।

প্রধানত ভ্রমণকাহিনী দিয়া ছোটদের ভূগোল পড়া শুরু হইত, ক্রমে বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বৃত্তান্ত মুখে মুখে বলা হইত, পরে সেগুলি ছেলেরা নিজেদের খাতায় লিখিয়া লইয়া বই তৈরি করিত। ছোটদের বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য যন্ত্রপাতি ও ইংরাজী ভাল ভাল বই ছিল, ঐগুলি অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মুখে মুখে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

পরে উহাও ছেলেরা নিজেরা লিখিয়া লইত। তখনকার প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে প্রধানত মুখস্থ বিদ্যার উপরেই জোর দেওয়া হইত। পাঠ্য পুস্তকগুলি কোনো-রকমে মুখস্থ করানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, ইহাতে অধিতব্য বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, সরসতারও কোনো স্থান ছিল না, অপরের তৈরি জিনিস কোনোরকমে গলাধঃকরণ করানোই ছিল শিক্ষার কাজ, সেই যুগে গুরুদেব এই নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন আর অনেকটা সফলকামও হইয়াছিলেন।

এই প্রণালীর মধ্যে গুরুদেবের আরো একটি তত্ত্ব নিহিত ছিল। তিনি বলিতেন, 'লিখিত' কথার চেয়ে 'মুখের' কথার প্রভাব অনেক বেশি। শিক্ষকের মুখের কথা ছাত্রের মনকে যেমন গভীরভাবে নাড়া দেয় বইএর লিখিত কথা তেমন দেয় না।

ছেলেরা রাত্রে আলোর কাছে বসিয়া লেখাপড়া করে ইহা গুরুদেব পছন্দ করিতেন না। বিশেষ জরুরি কাজ না থাকিলে তিনি নিজেও—রাত্রে লেখাপড়ার কাজ করিতেন না। সেইজন্য ছেলেদের লইয়া শিক্ষক মহাশয়েরা ইংরাজি বা বাঙলা বই অবলম্বন করিয়া গল্প 'লিখিত' কথার বই অবলম্বন করিয়া গল্প বলিতেন। কোনো কোনো দিন গান বা নাটকের মহড়া হইত। এক একদিন ছেলে-দের হেঁয়ালি-নাট্য (charade) হইত। এই নাটকের মধ্যে কোনো একটি কথা বারবার প্রচ্ছন্নভাবে প্রয়োগ করা হইত। শ্রোতাদের তাহা বাহির করিতে হইত। হাস্যকৌতুকে গুরুদেবের রচিত এইরূপ কয়েকটি নাট্য আছে।

ছেলেদের উপযোগী গল্পের বইএর মধ্যে তিনি রবিনসন ক্রুসোকে (Robinson Crusoe) খুব উচ্চ স্থান দিতেন। সম্ভবত তাঁহার উৎসাহেই পরলোকগত চারু বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় ইহার একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় ইহা এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা এই গল্পের একটি অতি চটি সংস্করণ। কবি বলিতেন ছেলেদের জন্যে লেখা বইএর মধ্যে কল্পনার প্রচুর খোরাক থাকা দরকার।

শিক্ষকের শিক্ষা

ছাত্রদের শিক্ষার মত শিক্ষকদের শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা ও ব্যবস্থা করিতেন। তাঁর মতে জ্ঞানানুরাগী না হইলে কেউ যথার্থ শিক্ষক হইতে পারেন না। এইজন্য তিনি আশ্রমে একটি ভাবের পরিবেশ (ideas) সৃষ্টি ও রক্ষা করার চেষ্টা করিতেন। আশ্রমে তাঁর গান, নাটক প্রবন্ধ প্রভৃতির আলোচনা তো হইতই। তা ছাড়া কোনো কাগজে কোনো ভাল প্রবন্ধ বা কোনো ভাল বই বাহির হইলে তাহা লইয়া অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। এইরূপে একসময়ে এডমন্ড হোমসের 'Creed of Budha' বইখানি প্রায় আগা-গোড়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা খুব প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অধ্যাপকদেরও নিজেদের আলোচনা সভা ছিল। তাহাতে যে সব প্রবন্ধ পড়া হইত তার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তখনকার প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

এই আলোচনা আরো ব্যাপক করিবার জন্য কবি প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে অনেক বিখ্যাত ইংরাজি মাসিক পত্রিকা আনাইতেন। ইহার মধ্যে ষ্ট্রান্ড ম্যাগাজিন, হারপার্স ম্যাগাজিন, উইণ্ডসোর ম্যাগাজিন, চেম্বার্স জার্নাল, কনটেম্পোরারি রিভিউ, আটলান্টিক মান্থলি, লিটারেরি ডাইজেস্ট ইত্যাদি থাকিত। ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নানা বিষয়ক প্রবন্ধের সার সংকলন করিবার ভার বিভিন্ন শিক্ষকদের দিতেন। শিক্ষকেরা সংকলন করিয়া গুরুদেবকে দিতেন। তিনি উহা দরকার মত সংশোধন করিয়া প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইতেন। প্রবন্ধের শেষে প্রত্যেক শিক্ষকের আদ্যাক্ষর থাকিত —যথা অ-অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৩১৬ সালের প্রবাসীতে সংকলন ও সমালোচনা পরিচ্ছেদে ইহার নিদর্শন আছে। গুরু-দেবের মতে এইরূপে সংকলনের অভ্যাস বাংলা রচনা আয়ত্ত করার এক উৎকৃষ্ট উপায়। তাঁর সম্পাদিত সাধনা পত্রিকায় ইহার নিদর্শন ছিল। ইংরাজী Review of Reviews পত্রিকার মত এইরূপে এক-খানি বাংলা কাগজ বাহির করার পরি-কল্পনাও তাঁহার ছিল।

বিদ্যালয়ের খ্যাতি

এই সময়ে বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি কিছু কিছু আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাহার একটি কারণ এই যে, এ ধরনের বোর্ডিং ইস্কুল তখন বাংলা-দেশে বেশি ছিল না। তা ছাড়া এখানকার ছেলেদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও অপ্রত্যাশিতভাবে সুখবর পাওয়া যাইতে লাগিল। একবার শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় রেলের কোনো গাড়িতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই গাড়িতে ঘটনাক্রমে বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছেলে ছিল, ছেলেরা দুই একটি বৃদ্ধ ও মহিলাকে গাড়িতে সাহায্য করায় ও তাদের সাধারণ আচার ব্যবহারে কৃষ্ণবাবুর দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিতে পারেন তারা শান্তি-নিকেতনের ছাত্র। এর পরে গুরুদেবের সঙ্গে কলিকাতায় দেখা হইলে কৃষ্ণবাবু এই ঘটনাটি বলেন এবং ইহাও বলেন, "আপনার

বিদ্যালয়ের ছেলেদের মুখে এমন একটি ছাপ আছে যা দেখে বোঝা যায় তারা সেখানকার ছেলে।" সত্যনিষ্ঠ কৃষ্ণবাবুর কাছ থেকে এই প্রশংসাবাক্য শুনিয়া গুরুদেব অত্যন্ত খুশী হইয়া আমাদের এ কথা বলেন। আর একবার আমি একটি ছেলেকে লইয়া ট্রেনে বা স্টীমারে ভ্রমণ করিতেছিলাম, ছেলেটি তার বয়সের তুলনায় কিছু নীচে পড়িত. গাড়িতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হইয়াছিল। এক সময়ে ভদ্রলোকটি আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "আপনাদের বিদ্যালয়ে তো বেশ সৎশিক্ষা হয়, বয়সের তুলনায় নীচের ক্লাসে পড়লেও ছেলেটি নিজের বয়স কিছুমাত্র কমিয়ে বল্লে না। অন্য ছেলে হলে অনায়াসে দু বছর কমিয়ে বলতে পারতো। চেহারা দেখে ধরারও যো নেই।"

এইসব কারণে ছেলেদের সংখ্যা বাড়িয়া বোধ হয় একশর কাছাকাছি গেল। ইহার পূর্বে নিয়ম ছিল বারো বছরের অধিক বয়স্ক ছেলেদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইবে না, এই সময়ে এই নিয়মেরও বোধহয় কিছু শৈথিল্য হইয়াছিল। হঠাৎ এইরূপ বয়স্ক নূতন ছাত্র সমাগমে শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। নূতন ছেলেদের আশ্রমের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাবও দেখা যাইতে লাগিল। তখন একদিন সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপককে ডাকিয়া গুরুদেব বলিলেন, "আমাদের শরীরে রক্তসঞ্চালনের জন্য যে শিরা উপশিরা আছে তার কেন্দ্রে আছে হৃৎপিণ্ড। সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে এসে বার বার শোধিত হয়ে আবার শিরা উপশিরায় ধাবিত হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যারা পুরাতন তারা হৃৎপিণ্ডের মতো আশ্রমের আদর্শকে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখবে এবং বহন করবে এই আমি আশা করি।" এই সময়ে বোধহয় তিনি কিছুদিন প্রত্যহ বিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ হইবার আগে কিছু বলিতেন। এইজন্য তিনি daily strength for daily needs নামে একখানি ইংরাজী ভক্তবাণী সংগ্রহ ব্যবহার করিতেন।

দেখা-সাক্ষাৎ...

দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি প্রচারের সঙ্গে নানা লোক নানা উদ্দেশ্য লইয়া সময়ে অসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। কাজেই তাঁর স্বাস্থ্য. ও সময়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা এ বিষয়ে কিছু কড়াকড়ি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সময়ে (১৯০৭-১০) এরূপ কিছু ছিল না। একদিন মনে আছে শান্তিনিকেতন অতিথিশালার দোতলায় কবির সঙ্গে কিছু কথা সারিয়া দুপ্রহরের সময় নীচে নাবিয়াছি। কবি তখন স্নানের ঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তখন এক নবাগত অতিথি ধরিলেন কবির সঙ্গে দেখা করিবেন। এই সময়ে দেখা হইলে তিনি বিকালের ট্রেনে যাইতে পারেন নচেৎ রাত্রির ট্রেনে অসুবিধার পড়িতে হইবে। আমি বলিলাম, "কবি এখনি স্নান করতে যাচ্ছেন। আপনারা দুজনেই খেয়েদেয়ে সুস্থ হন তার পরে দেখা হবে।" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা অগত্যা তাই হবে—তবে আপনি একবার আমার কথাটা বলে রাখুন।" নেহাৎ চক্ষু-লজ্জায় পড়িয়া আমি উপরে উঠিয়া দেখিলাম তিনি স্নানের ঘরে যাইতেছেন। আমি সমস্ত কথা তাঁকে জানাইয়া বলিলাম, "খাওয়া দাওয়ার পর আমি তাঁকে নিয়ে আসবো।" তিনি বলিলেন, "কেন ভদ্রলোককে শুধু শুধু কষ্ট দেবে—তাঁকে এখনি নিয়ে এসো—কাজটা সেরে ফেলেই স্নান করতে যাবো।" আমি অবাক হইয়া ভদ্রলোককে উপরে পৌঁছাইয়া দিলাম।

ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার

এই সময়ে আশ্রমে ছেলেদের কয়েকটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাগজের লেখকেরা মাঝে মাঝে তাদের কবিতা ও প্রবন্ধ লইয়া সংশোধনের জন্য গুরুদেবের কাছে ধাওয়া করিত। তিনিও ধৈর্যের সহিত সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন, কখনো তাঁদের নিরুৎসাহিত করিয়া ফিরাইয়া দিতেন না। এই উপলক্ষে একদিন তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন "ছেলেদের কখনো তোমরা তাচ্ছিল্য কোরো না। ওরা যদি অর্বাচীনের মত কথা বলে তাহলে ধীরভাবে আলোচনা করে ভুল বুঝিয়ে দেবে। কথায় কথায় আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে 'ছেলেমানুষ তোরা—এসব কি বুঝবি' বলে ধমকাবে না। তাতে ওদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করে, মনুষ্যত্বে ঘা দেওয়া হয়। আমার পিতা কখনো আমাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতেন না।" ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা সম্বন্ধে বলতেন "এদের সঙ্গে মিশবে বটে কিন্তু একটু দূরত্বও রক্ষা করবে—নিজেকে একেবারে cheap (হাল্কা) করে দিয়ো না।

ওদের সংগে মেশার সময় এমন কিছু দেবার চেষ্টা করবে যা ওদের মনকে নাড়া দেয়।"

গীতাঞ্জলি

১৩১৫-১৬ সাল হইতে গীতাঞ্জলির গান শুরু হইল। এই বিষয়ে অজিতবাবুর কাছে কবি একবার বলিয়াছিলেন, "দ্যাখো, আমি তো তোমাদের মত ক্লাস পড়িয়ে বা অন্য কাজ করে আশ্রমের সেবা করতে পারি না। আমার মনে হয় আমি যে গান বাঁধি, তাই আমার আশ্রমের সেবা।" তখন জানিতাম না ভবিষ্যতে এই গীতাঞ্জলিই একদিন শান্তিনিকেতনের প্রথম বড় এনডাউমেণ্ট নোবেল পুরস্কারেরও কারণ হইবে।

বিবাহ-উৎসব

১৩১৬ সালের মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হয়। এই উপলক্ষে আশ্রমে খাওয়াদাওয়া, খেলা ও নানারকম আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় একটি লটারী অনুষ্ঠান মনে পড়িতেছে। পুরাতন অতিথিশালার গাড়িবারান্দার উপরে ছাতে, অধ্যাপক, বর ও বধূকে লইয়া গুরুদেব বসিয়াছেন। সামনে চুষিকাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি নানা-রকম খেলার জিনিস সাজানো। একটি ঝুড়ির মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের নাম ভিন্ন ভিন্ন টুকরা কাগজে লিখিয়া মুড়িয়া রাখা হইয়াছে। এক একটি ছেলেকে দাঁড় করাইয়া বধূ এক একটি মোড়ক তুলিতে লাগিলেন। কে কী পাইল গুরুদেব মোড়ক খুলিয়া তা বলিয়া দিতেছিলেন। ক্রমে অধ্যাপকেরাও এক একজন উঠিতে লাগিলেন। যখন গুরুগম্ভীর কোন অধ্যাপকের ভাগে মার্বেল বা চুষিকাঠির মত কোন জিনিস উঠিতেছিল, তখন হাসির রোল পড়িয়া গেল।

আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজী ১৯১৫ সালের মার্চ-এপ্রেল মাসে একদিন সকালে অধ্যাপক নেপাল-চন্দ্র রায়ের সংগে নানা বিষয়ে আলোচনার সময় গুরুদেব বলেন—"অনেক আদর্শবাদীর (আইডিয়ালিস্ট) জীবনে দেখা যায় তিনি যে আদর্শ প্রচার করেন, নিজের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই আদর্শকেই চিরস্থায়ী করতে চান। আমার সে রকম লোভ নেই। আমার পরে যদি মহাত্মাজী বা শ্রীঅরবিন্দ শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়ে তাঁদের আদর্শ এখানে প্রচার করেন, তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই। আমি কেবল এইটুকু চাই যে, যিনিই এখানে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকুন, তিনি যেন সত্য সত্যই আদর্শবাদী হন।"

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের এক অতি নিকট-আত্মীয় আশ্রমে বাস করিতেন, ছেলেদের সংগে তিনি খুব মিশিতেন। ইহার ফলে তাদের মধ্যে কিছু কিছু উচ্ছৃংখলতা দেখা দিল। ব্যাপারটা ক্রমে এত গুরুতর আকার ধারণ করিল যে কোন কোন অধ্যাপক ইহা অধ্যাপক সমিতিতে উপস্থিত করিলেন। ঠিক হইল যে, গুরুদেব ও তাঁর আত্মীয়ের উপস্থিতিতেই বিষয়টি আলোচিত হইবে। আলোচনার দিন অধ্যাপকেরা এক একটি অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিলেন, আর অভিযুক্ত

ব্যক্তি উত্তেজিতভাবে তাঁর বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই পক্ষই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তখন গুরুদেব দুই পক্ষকেই শান্ত ও সংযতভাবে আশ্রমের কল্যাণের দিকে চাহিয়া আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে তাঁর আত্মীয়টি বলিলেন—"আপনি তো আমাকে শান্ত-সংযত হতে বলছেন, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যদি এইরকম অভিযোগ হয় তো আপনি শান্ত থাকতে পারেন?" গুরুদেব বললেন—"না আমি পারি না, কিন্তু আমি চেষ্টা করি। এই মুহূর্তেই আমি নিরপেক্ষভাবে ও আশ্রমের কল্যাণের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বিষয়টি বিবেচনার চেষ্টা করছি।" এই কথাগুলি জ্বলন্ত আগুনে জল-ঢালার মত কাজ করিল। ইহার পরে আত্মীয়টিকে আশ্রম ত্যাগ করিতে হয়। এই ঘটনাটি অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের কাছে শুনিয়াছি।

আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর আগমন

ইংরাজী ১৯১৫ সালে মহাত্মাজী সর্বপ্রথম আশ্রমে আসেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছাত্র ও অধ্যাপক সকলে মিলিয়া বোলপুর স্টেশনে যান। যে গাড়িতে তাঁর আসিবার কথা, সেটি স্টেশনে থামিলে প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম কোন শ্রেণীর কামরাতেই তাঁকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় সকলে হতাশ হইলেন। তখন দেখা গেল একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তিনি ইতিপূর্বেই নামিয়া পড়িয়াছেন।

আশ্রমে আসিবার পর একদিন তিনি সি এফ এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে আশ্রম পরিদর্শন করিতে বাহির হন। তখনকার রান্নাঘর ও তার আশপাশ খুব পরিষ্কার ছিল না। আধময়লা-কাপড়পরা কয়েকটি লোককে সেখানে চলাফেরা করিতে দেখিয়া মহাত্মাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"ইহারা কে?" সাহেব তাঁকে বুঝাইয়া দেন তাহারা ব্রাহ্মণ পাচক। মহাত্মাজী মন্তব্য করেন রান্নাঘরের কর্মচারীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। তারপর অন্যান্য স্থান দেখিয়া তিনি তখনকার হাসপাতাল দেখিতে যান। সেখানেও পরিচ্ছন্নতার অভাব লক্ষিত হয়। তখনকার হাসপাতালের অনতিদূরেই মেথরের কুটীর ছিল। সেটি দেখিয়া মহাত্মাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন—"ওটি কিসের কুটির?" বিভিন্ন জায়গায় অপরিচ্ছন্নতার দৃষ্টান্তে সাহেব একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন—তাই আমতা আমতা করিয়া উত্তর দেন—"ওটা মেথরের বাড়ি—ও আর আপনার দেখার দরকার নেই।" কিন্তু মহাত্মাজী নাছোড়বান্দা। তখন সেখানে যাইতেই হইল। সেখানে গিয়া দেখা গেল কুটিরটির চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কুটিরের ভিতর, বারান্দা ও উঠান পরিষ্কার করিয়া লেপা—কোথাও কোন ময়লার চিহ্ন নাই। সাহেবদের দেখিয়া মেথর তাড়াতাড়ি বসিবার আসন আগাইয়া দিল। মহাত্মাজী সেখানে বসিয়া মেথরের সঙ্গে দু-চারটি কথা বলিলেন। ফিরিবার সময় এণ্ড্রুজ সাহেবকে বলিলেন, "আশ্রমে ব্রাহ্মণের দেখা এই মেথরের মধ্যে পেলাম।" এ ঘটনাটি এণ্ড্রুজ সাহেবের কাছে শুনিয়াছি।

প্রশ্নোত্তর

এক সময়ে আশ্রমের একটি ছাত্র কোন ইংরাজী পত্রিকা হইতে একটি প্রশ্নের তালিকা সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহার উত্তর লিখিয়া দিতে অনুরোধ করে। সব প্রশ্নোত্তর মনে নাই। দু-চারটি যা মনে আছে তা এই—

প্রশ্ন—হু ইজ ইওর হিরো?
(তোমার আদর্শ লোক কে?)
উত্তর—রাজা রামমোহন রায়।
প্রঃ—হোয়াট ইজ ইওর গ্রেটেস্ট মেরিট?
(তোমার সবচেয়ে বড় গুণ কি?)
উঃ—ইন কন্‌সিস্‌টেন্সি!
প্রঃ—হোয়াট ইজ ইওর গ্রেটেস্ট ফল্ট?
(সবচেয়ে বড় দোষ কি?)
উঃ—ইনকন্‌সিস্‌টেন্সি!
উঃ—ইনকন্‌সিসটেন্সি!
প্রঃ—হোয়াট ইজ দি গ্রেটেস্ট ভারচু অব এ ম্যান?
(পুরুষের সবচেয়ে বড় গুণ কি?)
উঃ—লাভ অব ট্রুথ
(সত্যের প্রতি প্রেম।)
প্রঃ—হোয়াট ইজ দি গ্রেটেস্ট ভারচু অব এ উওম্যান?
(স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় গুণ কি?)
উঃ—লাভ অব ক্রিচার।
(প্রাণীর প্রতি প্রেম।)

গুরুদেব বলিতেন, মেয়েরা সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রাণকে ধারণ ও পালন করেন বলিয়া প্রাণীর প্রতি প্রেম তাদের মজ্জাগত।

উইলি পিয়ার্সন

সি এফ এণ্ড্রুজের সঙ্গে উইলি পিয়ার্সনও আশ্রমের কাজে যোগ দেন, তিনি সর্বদা বাঙালী পোশাক পরিতেন, আশ্রম থেকে তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি লইতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন উহা তাঁর মাহিনা—এলাউন্স নয়।

তিনি বেশ রসিক ছিলেন। একবার গুরুদেব একজন প্রাক্তন ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া পিয়ার্সনকে বলেন, "ডু ইউ নো হী ইজ এ রাইজিং ব্যারিস্টার? (জান ইনি একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার)।

পিয়ার্সন তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"ইয়েস এ রাইজিং ব্যারিস্টার অব দি সেটিং রেজিম।

(হাঁ, অস্তমান ব্রিটিশ আমলের উদীয়মান ব্যারিস্টার!) আর একবার কয়েকটি অবাঙালী অতিথি আশ্রমে বেড়াইতে আসেন। তখন আশ্রমে বিজলী আলো

হয় নাই। সাধারণত গুরুদেব একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া রাত্রে ঘোরাফেরা করিতেন। এইরূপে একটি লণ্ঠন লইয়া তিনি অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বলিতে চলিতেছিলেন। এমন সময় একজন হঠাৎ তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি তাঁকে বলেন--"আমি কারো 'গুরু' নই--আমি সাধনার পথে পথিক মাত্র।"

পিয়ার্সন তৎক্ষণাৎ পিছন থেকে বলেন, "বাট দি ট্রাভলার উইথ দি লাইট!"

(কিন্তু আলো-হাতে পথিক!)

উদারচেতা পিয়ারসন ভারতের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ব্যবহারের কড়া সমালোচনা করিতেন ও ভারতবাসীর স্বরাজপ্রাপ্তির সমর্থক ছিলেন। এক সময়ে এই রকম একখানি বই তিনি প্রকাশ করেন। একবার বিদেশে ভ্রমণকালে এইরূপ প্রচার-কার্যও তিনি কিছু করেন। সেই জন্য জাপান থেকে ভারতে আসার সময়ে তখনকার ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁকে ভারত হইতে বহিষ্কার করেন।

একবার শান্তিনিকেতনে কোন বন্ধুর নিমন্ত্রণে তিনি কয়েকজনের সঙ্গে চা-পান করিতেছিলেন। কথায় কথায় এক ভদ্রলোক ইংরেজদের সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করিতেছিলেন। পিয়ার্সনের সামনে তাঁর স্বজাতি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য অভদ্র হইতেছে বলিয়া একজন উল্লেখ করেন। তখন প্রথম ভদ্রলোকটি এই বলিয়া সাফাই করেন যে, পিয়ার্সন আগে মানুষ, তারপরে ইংরেজ--কাজেই ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। এতক্ষণ পিয়ার্সন চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এইবার রাগের স্বরে বলিয়া উঠিলেন--"না, আমি আগে ইংরেজ, তারপরে মানুষ।"

সরকারের কুদৃষ্টিতে আশ্রম

আশ্রমের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গ হইতে অনেক ছাত্র এখানে পড়িতে আসিত। ইংরাজি ১৯১১-১২ সালে কোন এক সময়ে তখনকার পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার এক গোপন ইস্তাহার প্রচার করেন যে, সরকারী কর্মচারীদের সন্তানদের পক্ষে এই বিদ্যালয় সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অনেক সরকারী কর্মচারীর সন্তান ও আত্মীয় ছিল। এই ইস্তাহারের ফলে অনেক ছাত্র আশ্রম হইতে চলিয়া গেল। নূতন ছাত্র আসাতেও বাধা পড়িল। আশ্রমের প্রধান আয়ও তখন ছাত্র-বেতন। কাজেই এই ইস্তাহার এক সংকট সৃষ্টি করিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তখনকার রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা করিতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা নরমপন্থী ছিলেন (মডারেট) সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে তাঁদের যাতায়াত ছিল। এইরূপ দু-একজন নেতার কাছে গিয়া তিনি বলিলেন,--"আপনারা তো জানেন, আমার বিদ্যালয়ে শিক্ষা ছাড়া রাজনীতির কোন চর্চা হয় না। রাজপুরুষদের বলে এই সংকট থেকে একে রক্ষা করুন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে তাঁরা কিছুই করেন না। এই সময়ে কলিকাতা অক্সফোর্ড মিশনের একজন ইংরেজ পাদ্রী তাঁর হস্টেলের একদল ছেলে লইয়া আশ্রমের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলিতে যান। বিদ্যালয়টি দেখিয়া শুনিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হন। কথায় কথায় তিনি এই সংকটের কথা জানিতে পারেন। তখনকার বড়লাটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি তাঁকে এই সংকটের বিহিত করিতে বলেন। কিছুদিন পরে সেই পাদ্রীসাহেব গুরুদেবকে জানান, আশ্রম থেকে দুটি অধ্যাপককে বিদায় করিলে সরকার ইস্তাহারটি বাতিল করিতে পারেন। ইঁহাদের একজন সংগীতজ্ঞ শ্রীশান্তিদেব ঘোষের পিতা কালীমোহনবাবু। আশ্রমে যোগ দিবার আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি কিছুকাল পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচারক ছিলেন। এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিসের রিপোর্ট ছিল। আর একজন হীরালাল সেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হীরালালবাবু একখানি দেশাত্মবোধক কবিতার বই লেখেন। তার মধ্যে রাজদ্রোহসূচক কিছু কিছু গরম কথা ছিল। এইজন্য খুলনার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ হয়। হীরালালবাবু রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বপক্ষে সাক্ষী মানেন। ফলে তাঁকে ঐ কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। বইটির কোন কোন অংশ দেখাইয়া হাকিম কবিকে জিজ্ঞাসা করেন সেগুলি রাজদ্রোহসূচক কিনা? কবি বলিলেন--'হাঁ'। বিচারে হীরালালবাবুর ছমাস কি এক বছর জেল হয়।

জেল থেকে বাহির হইয়া হীরালালবাবু কবির কাছে আশ্রয় চান। তিনি তাঁকে আশ্রমের কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল। ছেলেদের খেলাধুলো ও ব্যায়ামের সাহায্য হইবে ভাবিয়া কবি তাঁকে আশ্রমে আনেন। এখানে আসিবার পর তাঁকে ছাত্র পরিচালনার ভার দেওয়া হয়।

পাদ্রী সাহেবের চিঠির উত্তরে কবি তাঁকে জানান, হীরালালবাবুকে সরাইতে তাঁর আপত্তি নাই; কিন্তু কালীমোহনবাবু সাধকভাবে (পিল্গ্রিম) আশ্রমে যোগ দিয়াছেন, তাঁকে সরাইতে তিনি অক্ষম। ইহার পর হীরালালবাবুকে কবি কলিকাতায় একটি চাকরি যোগাড় করিয়া দেন; কিন্তু কালীমোহনবাবু আশ্রমেই থাকিয়া যান। এইভাবে এই ব্যাপারের যবনিকা-পতন হয়। এই ঘটনাটি আগাগোড়া গুরুদেবের কাছে শুনিয়াছি।

কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের কলিকাতার বাড়িতে যখন বিচিত্রা ক্লাবের অধিবেশন হইত, তখন শরৎবাবু মাঝে মাঝে সেখানে আসিতেন। বাঙলা লিখিবার ভাষা কী রকম হওয়া উচিত একদিন এই আলোচনার সময়ে গুরুদেব শরৎবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এ বিষয়ে আপনারা একটা কিছু ঠিক করিয়া দেন। শরৎবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন--"সে তো আমি অনেকদিন আগে ঠিক করে নিয়েছি।" গুরুদেব অবাক হইয়া বলেন--"কই এ বিষয়ে আপনার কোন প্রবন্ধ দেখেছি বলে তো মনে হয় না।"

তখন শরৎবাবু বলেন--"গোরার ভাষাই বাঙলা আদর্শ ভাষা হওয়া উচিত। আমি অনেকবার গোরা পড়েছি আর ঐ রকম ভাষাই আমার লেখায় ব্যবহার করে থাকি। আমরা তো গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে--" এই জন্যই বোধ হয় শরৎবাবুর 'দত্তা' উপন্যাসে গোরার এত স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়।

আর একবার রাজনৈতিক নেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের আমলে যখন ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, তখন একদিন শরৎবাবু বড়বাজারের ভিতর দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। সেই সময়ে ইংরেজের গোরা সৈন্য ওখানকার নিরীহ লোকদের উপরে গুলী চালাইবার উপক্রম করে। তাহা দেখিয়া শরৎবাবু গুলী না করিবার জন্য সাহেবকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি তা শোনেন না। এই প্রত্যক্ষ ঘটনা কিছুদিন পরেই শরৎবাবু গুরুদেবের কাছে বর্ণনা করেন। চুপ করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন--"আপনি এ ঘটনার কথা কোন কাগজে দিয়েছিলেন বা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন?" তিনি বলিলেন "না--আমার কথা কে শুনবে? শুধু অরণ্যে রোদন হবে।" গুরুদেব বললেন--"এইটে আমাদের ভুল, সত্য কথা সাহসের সঙ্গে বলতে হবে--ফলাফল যাই হোক না কেন। নইলে আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি হয়"। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর বিখ্যাত চিঠি এই মনোভাবের পরিচায়ক।

বিধুশেখর ও বিশ্বভারতী

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসের এক বর্ষণক্লান্ত রাত্রিতে আমি শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করি। গভীর রাত্রে যে-গৃহে প্রথম আশ্রয় পাই—তা বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহ। সম্পূর্ণ অপরিচিত আশ্রমবাসিগণের মধ্যে যাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তিনি শাস্ত্রী মহাশয়। কিশোর বালক তখন কল্পনাও করতে পারেনি—সেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তার জীবন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বাঁধা পড়বে। সেই দিন হতে দীর্ঘকাল তাঁর গৃহে বাস করি। তাঁর শয়নগৃহে তাঁরই শয্যার পাশাপাশি শয্যায় রাত্রিযাপন করি।

অতঃপর ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিই। কিন্তু তখনও প্রতিদিন বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। বহুবার তাঁর গৃহে গেছি। রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়—পরমাত্মীয়। আমার পূজ্যপাদ মাতুল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। শান্তিনিকেতনে এসে অবধি তাঁরা দুজনে একত্রে এক গৃহে বাস করতেন। একই কুটীরে সন্ধ্যাহ্নিক করতেন এবং একই পাকশালায় স্বহস্তে রন্ধন করে পাশাপাশি বসে আহার করতেন। তিনি আমার অভিভাবক মাতুল মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সেই সূত্রেই প্রথম আলাপ।

শাস্ত্রী মহাশয় এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট আমি প্রথম সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করি। আচার্য বিধুশেখর, আচার্য ক্ষিতিমোহন, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এই সব বিখ্যাত বিদ্বানগণ শিশুদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। অন্যের কথা কী, স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শিশুদের ক্লাস নিতেন—ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা। ইংরেজির ক্লাসই তিনি বেশি নিতেন। ব্যাকরণ না পড়িয়ে ইংরেজি শেখানো যায় কিনা—তখন তাই তিনি পরীক্ষা করছেন। আমরা বালক-বালিকারা তাঁর সেই সরস শিক্ষাধারার রস গ্রহণ করছি।

শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শান্তি-নিকেতনে আসেন। তিনি কাশীর পণ্ডিত, সংস্কৃত তাঁর মাতৃভাষার ন্যায়। বেদবেদান্ত, দর্শন, সাহিত্য সমস্তই অধ্যয়ন করেছেন। কিন্তু তখনও বৌদ্ধশাস্ত্র পড়েননি।

বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শান্তিনিকেতনে এসে। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এবং বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে তিনি বুদ্ধচরিত পড়াতে লাগলেন। তাঁদেরই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি পালি-ভাষা শিখলেন। নিজে পড়েন এবং ছাত্রদের পড়ান। এইভাবে পড়তে ও পড়াতে পড়াতে তাঁর 'পালিপ্রকাশ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হল। ভাষা শিক্ষার এই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি তাঁর পরবর্তী জীবনেও অনুসৃত হয়েছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অসীম জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা গুরুদেবকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর জন্য তিনি নানা ভাষার নূতন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করতে লাগলেন। তখন শান্তিনিকেতনের অত্যন্ত দারিদ্র্য—সুতরাং এ বড় সহজ ছিল না। কিন্তু ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ এই নব্য-চার্বাক নীতি অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানামৃত পান এবং বিতরণের জন্য ঋণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এইভাবে ভবিষ্যৎ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় গড়ে উঠতে লাগল।

১৯১৯-২১ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর কার্য আরম্ভ হল। শাস্ত্রীমহাশয় এইবার তাঁর সাধনার পীঠস্থানটি পেয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা বিশ্বভারতীর পরিপালনের ভার পড়ল তাঁরই উপর। পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে না হতেই মধুকরগণ উপস্থিত হয়। বিশ্বভারতীর বিকাশ হতে না হতেই পৃথিবীর নানা স্থান হতে সুধী-গণের সমাগম হতে লাগল। ফ্রান্স থেকে এলেন সিলভ্যাঁ লেভি, বেনোয়া (Professor Dr. Sylvain Levi, F Benoit), জার্মানী থেকে উইনটারনিট্জ (Dr. M Winternitz), ইতালী থেকে ফরমিকি, টুচি (Dr. C Formichi, Dr. G Tucci), নরওয়ে থেকে স্টেন কনো (Dr. Sten Kenow), চেকোশ্লোভাকিয়া হতে লেসনি (Dr. V S Lesny), অস্ট্রিয়া থেকে ক্রামরিশ (Stella Kramrisch), হল্যাণ্ড থেকে বাকে (A A Bake), আমেরিকা থেকে প্র্যাট (Dr. J B Pratt), রাশিয়া থেকে বোগডানব (Dr

বিধুশেখর ও রামানন্দ

danov), গ্রেটব্রিটেন থেকে কলিন্স (Dr. M Collins), জেমস্ কাজিন্স্ (Dr. James Cousins), হাঙ্গারী থেকে গের-মানুস (Dr. J Germanus), চীন থেকে লিন ও চিয়াঙ্ (Dr. Lin Wo Chiang), তান য়ুন-শান (Prof. Tan Yun-Shan), পারস্য থেকে দাদুদ (Pouri Daud), তিব্বত থেকে সেনম রুগ স্রুব এবং সিংহল থেকে এলেন রাজগুরু ধর্মাধার মহাস্থবির। অধ্যাপকের ন্যায় পৃথিবীর নানা স্থান হতে বিদ্যার্থীরও সমাগম হল। সুদূর নরওয়ে হতে একজন ষোল বছরের তরুণ ছাত্র এল। ভারতীয় ছাত্রদের সংগে একই ছাত্রাবাসে সেই তরুণ ছাত্রটি স্বেচ্ছায় তার স্থান নিল। ভারতীয় ছাত্রের সংগে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে সে তার ছাত্র-জীবন যাপন করতে লাগল। সেকালে সে বড় সহজ ছিল না।

বিশ্ববিখ্যাত সুধিগণের অনেকেই ছিলেন অতিথি অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর)। তাঁদের কেউ বা এক বছর কেউ বা দু বছর থেকে গেলেন। কেউ বা একাধিকবার যাতায়াত করলেন।
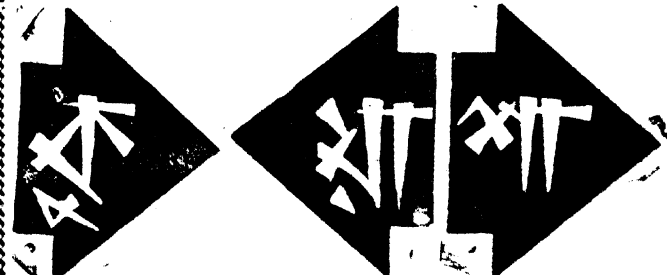
ভারতীয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহু বিখ্যাত অধ্যাপক সাময়িকভাবে বিশ্বভারতীতে এসে ভাষণ দান বা অধ্যাপনা করে যেতেন। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, আই জে এস তারাপুর-ওয়ালা, সরোজকুমার দাস, কালিদাস নাগ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেবেন্দ্রমোহন বোস, শিশিরকুমার মৈত্র, ফণীভূষণ অধিকারী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতি সুধিবৃন্দ এইভাবে বিশ্ব-ভারতীর সংগে যোগযুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় বিশ্বভারতীর প্রারম্ভ হতে দীর্ঘকাল কর্ম-সচিবের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে বিশ্বভারতীর পরিচর্যা করতেন। শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বিদেশের মধ্যে স্থায়ী অধ্যাপক ছিলেন পিয়ার্সন, এণ্ড্রুজ, কলিনস, বোগডানব, বেনোয়া, গেরমানুস, ক্যামিশ, মহাস্থবির, তান য়ুন-শান। টুচিও স্থায়ী অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর সংগে রবীন্দ্রনাথের মতান্তর হওয়ায় মুসোলিনীর আদেশে তাঁকে শান্তি-নিকেতন হতে বিদায় নিতে হয়।

ঐসব অতিথি-অধ্যাপক এবং স্থায়ী অধ্যাপকগণের মধ্যমণি ছিলেন অধ্যক্ষ বিধু-শেখর শাস্ত্রী মহাশয়। এঁদের নিয়ে তিনি এক আদর্শ পরিবার গঠন করেছিলেন—যে-পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের অসীম প্রীতি ও শ্রদ্ধা। জাতিধর্মনির্বিশেষে সে-পরিবারের সকলের সংগে সকলের প্রাণের যোগ। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা—যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং (বিশ্ব যেখানে একটি নীড় গড়েছে) সার্থক হয়েছিল। নালন্দা ও বিক্রমশীলা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল বিশ্বভারতীতে। শীলভদ্র ও দীপংকর আবির্ভূত হয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী-রূপে। যেমন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, তেমনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে, তেমনি প্রাচীন পারসিক শাস্ত্র আবেস্তাতে তাঁর গভীর জ্ঞান। যেমন ভাবে তিনি পালি শিক্ষা করেছিলেন, তেমনি-ভাবেই তিনি আবেস্তার ভাষা শিক্ষা করে-

ছিলেন। পালিরই ন্যায় নিজে শিক্ষা করেই অন্যকে শিক্ষা দিতেন। তিব্বতী ভাষাতে তাঁর 'হাতে খড়ি' হয় অধ্যাপক লেভির কাছে। তারপর নিজের চেষ্টায় সে-ভাষা অধিকার করে, বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতে থাকেন।

সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত, প্রাচীন পারসিক (Zend), বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, উর্দু, ফার্সি, আরবী, চীনে, জাপানী, তিব্বতী, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান ইতালিয়ান, রাশিয়ান, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা চলেছে বিশ্বভারতীতে। উদ্দেশ্য ভাষার সাহায্যে গবেষণা। বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গবেষণায় দীক্ষা নিয়েছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী, ছাত্রদের সেই গবেষণা পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। নানা পুঁথিপত্র হতে কেমন করে গ্রন্থ সম্পাদন করতে হয়, সে-শিক্ষাও হাতে-কলমে দিয়ে গেছেন উইণ্টারনিট্‌জ[১]।

প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডক্টর কলিনস শাস্ত্রী মহাশয়ের পরম প্রিয়পাত্র কেননা ভাষাতত্ত্বই শাস্ত্রী মহাশয়ের সর্বাধিক প্রীতি। আত্মভোলা বোগডানব ইউরোপের প্রায় সব ভাষাই জানেন। দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র ২।৩ ঘণ্টা তাঁর নিদ্রা। সেই জিতনিদ্র পুরুষ দিবারাত্র অধ্যয়নরত। বিদ্যার্থীদের জ্ঞানপিপাসা তাঁর কাছে গেলে পরিতৃপ্ত হয়। বিচিত্র বিদ্যাকুসুমের মালিকার দ্বারা বিশ্বভারতীর উপাসনা চলেছে, সেই উপাসনার পৌরোহিত্য করছেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানগণের তিনি একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট তাঁরা বিদ্যার্থীর ন্যায় বিনীতভাবে উপস্থিত হন, শ্রদ্ধাভরে তাঁর নির্দেশ শোনেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তা পালন করেন।

বিশ্বভারতীতে গুরুদেব, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, কলিনস, মরিস (H P Morris), স্ট্যানলি জোনস (Dr G S Jones), গুরুদয়াল মল্লিক, জাহাঙ্গীর ভকিল অধ্যাপনা করেন ইংরেজি। মরিস ও পল রিসার্ড (P Richard) পড়ান ফরাসী। বেনোয়া পড়ান ফরাসী ও জার্মান। টুচি পড়ান ইতালিয়ান, চীনে, তিব্বতী। বোগডানব পড়ান পারসীয়ান, ইসলাম ধর্মশাস্ত্র, ইউরোপীয় প্রাচীন ও অন্য নানা ভাষা। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী পড়ান বাংলা, সংস্কৃত, প্রাচীন হিন্দী, ব্রজভাষা প্রভৃতি। গেরমানুস ও জিয়াউদ্দিন পড়ান উর্দু, ফার্সি, আরবি। নেপালচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ বসু পড়ান ইতিহাস। রজনীকান্ত দাস পড়ান রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি। সরোজ দাস ও প্রেমসুন্দর বসু পড়ান পাশ্চাত্য তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র। মহাস্থবির পড়ান বৌদ্ধ ত্রিপিটক, শীতলপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, চম্পৎ রায় জৈন, মুনি জিনবিজয় ও পণ্ডিত সুখলাল পড়ান জৈন শাস্ত্র। কলিনস ও তারাপুরওয়ালা পড়ান আবেস্তা। বিধুশেখর শাস্ত্রী পড়ান বেদ, আবেস্তা, বৌদ্ধ দর্শন, ন্যায়, প্রাকৃত, সংস্কৃত, তিব্বতী, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি। সমস্ত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা। গবেষণা না করলে অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থী কেউ বিদ্যাভবনে স্থান পেতেন না। বিশ্বভারতীর অন্য বিভাগে তাদের স্থান নিতে হত। তাদের জন্য ছিল পাঠভবন, শিক্ষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীত ভবন। কেবলমাত্র ভাষা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য, এইসব ভবনের ছাত্রগণ সাময়িকভাবে বিদ্যা ভবনের সংস্পর্শে আসত।

বিদ্বানগণ তাঁদের বিদ্যামন্দিরের চতুর্দিকে অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী করে জ্ঞানের আরাধনা করবেন, চারি পার্শ্বের জগতের সংগে তাঁদের কোনো যোগ থাকবে না— একথা কল্পনা করতেও রবীন্দ্রনাথের অন্তর কম্পিত হত। বিশ্বভারতীর বিদ্যানিকেতনের জ্ঞানের আলোক যাতে চার পাশের অন্ধকার গ্রামগুলিকে আলোকিত করতে পারে, জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধ গ্রামবাসিগণের পথনির্দেশ করতে পারে— তারই জন্য বিশ্বভারতীর, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীত ভবনের সংগে সংগেই তিনি শ্রীনিকেতন স্থাপন করেছিলেন। গ্রামবাসিগণ জ্ঞানলাভ করে যাতে স্বাবলম্বী হয়, জীবিকার্জনে সমর্থ হয়, তার জন্য সাধারণ পুঁথিগত বিদ্যার সংগে অর্থকরী বিদ্যার, নানা কারুশিল্পের শিক্ষাদান চলতে লাগল। গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন কালীমোহন ঘোষ এবং গৌরগোপাল ঘোষ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের দুটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আত্মনিয়োগ করলেন। এই কার্যেই ঐ কর্মী যুগল তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করেন। তরুণ ইংরেজ কর্মী এলমহার্স্ট (Leonard K Elmhirst) ঈশ্বর প্রেরিতের ন্যায় বিশ্বভারতীতে এসে শ্রীনিকেতনের পরিচালনার ভার এবং আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। মৃতপ্রায় গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল, নিরাশ জীবনে আশার সঞ্চার হল। ম্লান মূক মুখে ভাষা ফুটল।

বিশ্বভারতীর সে এক গৌরবের যুগ। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে ততোধিক রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন কেবলমাত্র ভারতবর্ষ হতেই সংগৃহীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের রত্নরাজি জগতের সাত সমুদ্র হতে সঞ্চিত হয়েছিল। তাঁদের আলোক জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, নন্দলাল, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, কলিনস, বোগডানব, দিনেন্দ্রনাথ, সুখলালজী, মুনিজিনবিজয়, রত্নাকর, রজনীকান্ত (দাস), হরিচরণ, ভীমরাও, এলমহার্স্ট ও জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি রত্নগুলি নিজ নিজ বিশেষত্বে সমুজ্জ্বল, যে কেহ এঁদের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই জানেন কী অসামান্য প্রতিভা এবং অপূর্ব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এঁরা।

'ওস্তাদের ঘুঁষোবোধরাও ওস্তাদ হয়' এই প্রবাদ প্রমাণিত হয়েছে আমাদের মত অতি সাধারণ শিষ্যের জীবনে।

শাস্ত্রী মহাশয় কি কেবল তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের জন্যই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের দীপশিখা ছিল সতত সমুজ্জ্বল। যা অন্যায়, অবিচার মনে করতেন, তার বিরুদ্ধে তিনি কোষমুক্ত তীক্ষ্ণ অসির ন্যায় উথিত হতেন। বজ্রের ন্যায় কঠোর অথচ কুসুমের মত কোমল ছিল তাঁর হৃদয়। সেই শীর্ণ শুষ্কদেহ তপস্বীর অন্তরে প্রীতির অন্ত ছিল না। সামান্য ভৃত্যশ্রেণী হতে গুরুদেব পর্যন্ত সকলে সতত তাঁর মধুর হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছেন।

পালিত কন্যা শকুন্তলার সংগে কণ্ব মুনির বিচ্ছেদের দৃশ্য কালিদাসের কাব্যে অমর হয়ে আছে। বিশ্বভারতীর সংগে বিধুশেখরের বিচ্ছেদের দিনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরও স্মৃতিপটে সে-দৃশ্য অক্ষয় হয়ে আছে।

১ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের পুঁথির উপর ভিত্তি করে পুনার ভাণ্ডারকর গবেষণা-মন্দির হতে যে-মহাভারত সম্পাদন করা হয়, তার আদিপর্বের কিছু অংশ স্বয়ং উইণ্টারনিট্‌জ অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী ও বিদ্যার্থীদের সহযোগে সম্পাদন করেছিলেন। ভাণ্ডারকর গবেষণা-মন্দিরের এন বি উৎগীকর কয়েক মাস বিশ্বভারতীতে ছিলেন। তিনি তখন উইণ্টারনিট্‌জের সংগে মহাভারত সম্পাদনার সম্পূর্ণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
দেশ সাহিত্য সংখ্যা মূল্য ৮০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

BAR ASSOCIATION
তর্ক ক'রে তো কোন লাভ নেই—দামের তুলনায় ব্রুক বণ্ড-এর প্যাকেট থেকে অনেক বেশী কাপ ভাল চা পাওয়া যায়।
আর এও ঠিক যে সীল-করা প্যাকেট ব'লে ব্রুক বণ্ড চায়ে ভেজালের কোন সম্ভাবনা নেই।
আসল কথা হ'ল অন্য যে কোন চায়ের চাইতে ব্রুক বণ্ড চা-ই বেশী লোকে খায়।
ব্রুক বণ্ড চা
খেয়ে
আপনিও সব সময়
তৃপ্তি পাবেন
Brooke Bond
Darjeeling
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
BB 272 DR

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY

!! ৭০১৪

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 16th May, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৯ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্র উৎসবের ফলশ্রুতি

রবীন্দ্র জন্মোৎসব সপ্তাহকাল ধরিয়া উদ্‌যাপিত হইতেছে, আরও কিছুকাল ধরিয়া চলিবে। জন্মোৎসবের সমারোহ দেখিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা আন্তরিক। আর উত্তরোত্তর উৎসবের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, আমাদের কাছে তাঁহার গুরুত্ব ক্রমশ বাড়িতেছে। ইহা সুখবর, কেননা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বা তাঁহার প্রভাবকে গৌণ করিয়া রাখিয়া আমরা শ্রেয় লাভ করিতে পারিব না। এই ব্যাপারটাকে আমরা নিছক একটা ফ্যাশান বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস এই উৎসব পালনের মধ্যে একটা জাতীয় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্যই বিষয়টি লইয়া বারংবার আলোচনা করিয়াছি, আজও পুনরায় আলোচনায় উদ্যত হইয়াছি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষ পুষ্টিকর আহার্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিতেছে কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরিতেছে না। তখন বুঝিতে হয় যে, দেহে কোন একটা রোগ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের চেয়ে পুষ্টিকর, হৃদ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ বস্তু অল্পই আছে। এই দেশে এই সাহিত্যের সৃষ্টি, এই দেশের ঘরে ঘরে ইহার প্রসার, স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধার অকুণ্ঠ প্রকাশ, রবীন্দ্র জন্মোৎসব। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু তবু মনে প্রশ্ন জাগে জাতিদেহ কি পূর্ণশক্তি আদায় করিয়া লইতে পারিতেছে এই সাহিত্য হইতে? অর্থাৎ যে সমাজে এই মহৎ সাহিত্যের উদ্ভব সে সমাজ কি ইহার যোগ্য বাহন হইয়া উঠিবার গৌরব লাভ করিয়াছে? এই সমাজ ও এই মহৎ সাহিত্য পাশাপাশি দেখিলে মনে কেমন যেন অসঙ্গতি অনুভূত হইতে থাকে। আমাদের অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে হইবে রবীন্দ্রনাথকে আমরা জাতীয় গৌরবের অভিজ্ঞানরূপে ব্যবহার করিতেছি কি না। বাঙালী সমাজ যদি রবীন্দ্রনাথকে আত্মগৌরবের নিদর্শন হিসাবে মাত্র ব্যবহার করে, ভারতবাসী যদি রবীন্দ্রনাথকে আত্মগৌরবের নিদর্শন হিসাবে মাত্র ব্যবহার করে, সরকার যদি রবীন্দ্রনাথের নামকে রাজনৈতিক মূলধনরূপে মাত্র ব্যবহার করে, রবীন্দ্রনাথের "জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে আধারে রক্ষিত হইয়াছে" সেই বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের স্মৃতিকে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে রস আদায়ের জন্য মাত্র ব্যবহার করে তবে বুঝিতে হইবে সত্যই আশঙ্কার কারণ আছে। কোন মহাপুরুষকে এইভাবে ব্যবহার করিলে তাঁহার শিক্ষা জাতীয় জীবনে ফলপ্রদ হয় না। ইহাকে একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহার সহিত মহাপুরুষদের শিক্ষা গ্রহণ ও বর্জনের কাহিনী জড়িত। বর্তমান ক্ষেত্রেও এই নিয়মের অন্যথা হইবার কারণ নাই। রবীন্দ্র সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের জীবনে ফলবতী হইয়া উঠিতেছে কি না সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, রবীন্দ্র জন্মোৎসব জাতীয় উন্নতির দিকে আমাদের প্রেরণা জোগাইতেছে কি না লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সতর্ক দৃষ্টি আত্মোন্নতির প্রধান সোপান।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের যেখানে ঐশ্বর্য সেখানে বিশ্বকে আহ্বান করিতে হইবে। জ্ঞানে বিদ্যায় কাব্যে সাহিত্যে দর্শনে জীবননীতির পূর্ণতায় ভারতের ঐশ্বর্য। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিশ্বের লোক আসিয়া ভারতের সেই সম্পূর্ণ মূর্তি দেখিয়া যাক। এই উক্তির মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূলতত্ত্ব নিহিত বলা যাইতে পারে। জীবনের পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, জীবনের পূর্ণতার দিকে তিনি দেশবাসীর চোখ ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নেতি-নেতির প্রতি, negetive-এর প্রতি তাঁহার ধিক্কারের অন্ত ছিল না, যাহা কিছু positive তাহাই সত্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। চাঁদের বিচারের প্রশস্ত ক্ষেত্র পূর্ণিমার চাঁদ, কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চন্দ্র নয়। Positiveকে স্বীকার করিতে, negetiveকে অস্বীকার করিতে আত্মবিশ্বাসের আবশ্যক। আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাইবার কী না চেষ্টা তিনি করিয়াছেন! কিন্তু কী তাহার ফলশ্রুতি? জীবনের পূর্ণতাকে আমরা কতখানি স্বীকার করিয়াছি? আত্মবিশ্বাসের দ্বারা আমরা কতখানি বলীয়ান? "সুস্থ সমালোচনা"র নামে গ্লানি ও ক্ষয়-ক্ষতি লইয়া মাতামাতি করিতে এমন অস্বাভাবিক আনন্দ দেখা যায় যে, বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ঐ "সুস্থ সমালোচনা" অসুস্থতার নামান্তর। আর স্বাধীন হইবার পরে যেন আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে। সরকারের উপর নির্ভরতাও যে পরনির্ভরতা এ কথা কে বুঝাইবে? আবার আত্মবিশ্বাস যত কমিতেছে "সুস্থ সমালোচনা"র বহর তত বাড়িতেছে। এইভাবে "সুস্থ সমালোচনা" ও আত্মবিশ্বাসের অভাব উভয়ে মিলিয়া যে বিষচক্র রচনা করিতেছে তাহাতে আর যাই হোক জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ততর হইতেছে না নিশ্চয়ই। আমাদের জাতিদেহে খুব সম্ভব ইহাই মূল ব্যাধি—আর খুব সম্ভব এই মূল ব্যাধির জন্যই যথোচিত পুষ্টি আদায় করিয়া লইতে পারিতেছি না রবীন্দ্র সাহিত্য হইতে। জাতি-স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইয়া বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

প্রসঙ্গত

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই অনুজ্ঞা আমরা মুখস্থ করি, আউড়েও থাকি বটে, কিন্তু এ-কথাটায় আমাদের বড় বিশ্বাস নেই। আমাদের আস্থা বরং সেই বিদেশী প্রবচনে, যাতে আছে "অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে" নাকি জ্যাক নামক ব্যক্তিটিকে একটি গবেট বানায়। আমরা কাজের চেয়ে খেলা ভালবাসি, খেলার চেয়ে ছুটি। অর্থাৎ 'ছুটোছুটি' কথাটারও 'ছুটো' উপসর্গটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে শুধু ছুটি নিয়েই থাকতে চাই। ছুটি—কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ। নিষ্কর্মযোগের মত নিষ্ঠাভরে অভ্যাস করার আর কী আছে!

দেয়ালপঞ্জীর লাল তারিখগুলোর দিকে তাকাই, আর ভাবি, আহা, কবে যে সব লাল হবে। সর্দার রণজিত সিং যে-অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সে-অর্থে না; কম্যুনিস্টরা যে-অর্থে কামনা করেন, সে-অর্থেও না: কেবল আমাদের মজ্জাগত আয়েশী অর্থে।

লাল তারিখগুলোর দিকে আমরা সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে থাকি, রবিবারে পৌঁছে মনে মনে গুন গুন করে গেয়ে উঠি—'যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ, আসিতে তোমার দ্বারে।' সোম, মঙ্গল, বুধ এরা যে বড় তাড়াতাড়ি আসে, এই খেদ ত একা রবীন্দ্রনাথের কবিতার শিশুটিরই নয়, তার অগ্রজ, পিতা আর পিতৃব্যেরও। উইক-ডে'গুলি পাওনাদারদের মতই অবাঞ্ছিত।

বারো মাসে তেরো পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদি ত আছেই, আছে সপ্তাহে একদিন ছুটি—অনেকের আবার দেড় দিন বা দু-দিন এ-ছাড়া আর্নড, ক্যাজুয়াল, মেডিকেল ইত্যাদি ধরলে বছরের কাজের দিন কয়টি গজভুক্ত কপিত্থের মত থাকে। ফৌজদারি আদালতের আমলারা ঈর্ষা করে দেওয়ানি আদালতের আমলাদের; ইস্কুলের শিক্ষকেরা কলেজের অধ্যাপকদের। যদিও ছুটির বহরের তফাত আসলে উনিশ আর বিশের।

লাল পিঁপড়ের সারির মত ছুটির দিনের মিছিল ত আছেই, এর উপরে যদি আবার নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর না থাকে, সেদিন কবিই মানা করে বলে দেন 'ওরে তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।' সেদিন রেনি-ডে। আবার মেঘের কোলে যদি রোদ হাসে, তা-হলেও রক্ষা নেই, বাদল যখন টুটেছে তখন অবশ্যই আমাদের ছুটি। সেদিন কী-করি তা ভেবে পাইনে, পথ হারিয়ে কোন্ মাঠে যাব না বনে ঘুরব সেটা ঠিক করতে গিয়ে হিমসিম খাই। কেয়াপাতার নৌকো গড়ে সেদিন ফুলে সাজাব, ভাসিয়ে দেব তালদীঘিতে, তাও দেখব, রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব বেণু বাজিয়ে, অর্থাৎ নিজের নির্দিষ্ট কাজটি ছাড়া আর সব-কিছু করব।

এই যে হেলাফেলা সারাবেলার দর্শন, মাঝে মাঝে বেরসিক কেউ-কেউ বেসুরো কিছু কথা তুলে তার চর্চায় বাদ সাধেন। প্রধানমন্ত্রী বলে ওঠেন, এত ছুটি ভাল নয়; বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে, তিনি আরও কাজ চান। লোটস-ইটার্সদের পাল্লায় পড়লে তিনি নাজেহাল হতেন। তারা মুখের উপরই সাফ বলে দিত, "উই উইল নট ওয়ান্ডার মোর।" অর্থাৎ পাদমেকং ন গচ্ছামি, অর্থাৎ নড়ব না ভাই, নড়ব না।

ছুটি নিয়ে রাজ্যসভার সাম্প্রতিক আলোচনাও আমাদের কথঞ্চিৎ অস্বস্তি ঘটিয়েছে। বেসরকারী প্রস্তাবটির সমর্থকেরা বে-রসের কারবারী। বড়ই নিষ্ঠুর মোরা ভাবি তারে মনে, যিনি বলেন, ছুটি কমাও, কাজ বাড়াও। তিনি সম্ভবত শাস্ত্রেও অবিশ্বাসী। তাঁর কি পড়া নেই মনুসংহিতার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি; চতুর্থ অধ্যায় খুললে দেখবেন, শ্লোকের পর শ্লোক শুধু অনধ্যায়ের বিধান। ধুলো উড়লে নাকি অনধ্যায়। অর্থাৎ ধরুন, ক্লাসে পড়ান হচ্ছে, হঠাৎ পাশের পথ দিয়ে গরুর গাড়ি গেল, ধুলো উড়ল। তবে সেদিনকার মত পাঠের পাট তুলে দিতেই হয়, অন্যথা মানবিক সংহিতাকারের অমর্যাদা।

শাস্ত্রেরই বা দোহাই পাড়া কেন। অখণ্ড মণ্ডলাকার এই পৃথিবীর দিকেই চেয়ে দেখা যাক না। সেখানেও ত তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। কাজ আর ছুটির অনুপাতও তাই হওয়া উচিত। ছুটির মহাসমুদ্রে মাঝে মাঝে এক-এক টুকরো কাজের চড়া।

আসলে বিদেশী নজিরের দিকে তাকাতে গিয়েই আমাদের বিপত্তি ঘটছে। ভয়াবহ পরধর্মের দিকেই ঢলে পড়ছি, পবিত্র দেশীয় ঐতিহ্যের কথা আদৌ ভাবছি না। কারা যেন শুনেছেন, ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক কর্মীরা বছরে মোটে ছয়দিন ছুটি পান সেই রেওয়াজটা তাঁরা এদেশেও চালু করতে চাইছেন। সত্য বটে ইস্ট আফ্রিকায় ছুটি আট দিন এবং ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক-কর্মীরা বছরে গড়পড়তা তেইশ দিন ছুটি পান। এ ছাড়া, বাৎসরিক সবে-বরাত পাওনা ছুটি ত আছেই। সরকারী অফিসে ছুটি তিরিশ দিন। অবশ্য আমরা ধর্মঘট কিংবা জাতীয় নেতাদের মৃত্যুদিবসে কর্মবিরতি ইত্যাদি হিসাব বাদ দিয়েই বলছি। আগেই বলেছি আর্টের ক্ষেত্রে কবিরা যেমন নিরঙ্কুশ, ছুটির ব্যাপারেও আমাদের আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি তেমনি। অনন্তশয়ন থেকে মাঝে মাঝে উঠে বসে একটুখানি কাজ।

অথচ আমরা দেশের অর্থনৈতিক স্বর্গের সিঁড়ি বানাবোই, এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছি। পৌনে দুটি পাঁচশালা যোজনার যজ্ঞে কোটি কোটি টাকার ঘৃতাহুতি দিয়েছি। যথেষ্ট সুফল যদি না পেয়ে থাকি সে কি এই কারণে যে, আমরা যত টাকাই ঢেলেছি কাজ তত করিনি বা করতে চাইনি। মূল্য ধরে দিলে শুনেছি পুরোহিতেরা দশবিধ সংস্কারের উপনয়ন থেকে শ্রাদ্ধাদি—প্রায় সব কটি নিজেরাই করে দেন। মূল্য ধরে দিয়ে শাস্ত্রিক বা পারত্রিক কাজ সুচারুরূপে সমাধা হতে পারে বটে কিন্তু ঐহিক উন্নতির জন্য আমাদের বিশ্বাস অর্থ ছাড়া আরও কিছু চাই; সেটা কায়িক শ্রম।

* * *

কাজে ও কথায় আমাদের অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে পড়ে—বৃক্ষাদির অপমৃত্যু। আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে এর পিছনে চিরাচরিত উপেক্ষাই সক্রিয়। রূঢ় শোনাবে তবু বলি এই উপেক্ষা প্রায় আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আমরা গোমাতার পূজা করি কিন্তু তার পুষ্টির দিকে নজর দিইনে, এমন অস্থি-চর্মসার গোধন পৃথিবীর কুত্রাপি মিলবে না। আমরা বৃক্ষকেও দেবজ্ঞানে পূজা করি, তেল সিঁদুর মাখাই ঘটা করে বাবার থানে' গড় করি কিন্তু নির্মমভাবে তার ডালপালা ছাঁটতে দ্বিধা করিনে। প্রকৃতিকে আমরা ভালবাসি বটে কিন্তু সেটা অনেকটা মুর্গীপোষার মত। আজ কলকাতায় দুঃসহ গরমের মাত্রা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। খুঁজলে হয়ত দেখব এর কারণ আমাদের সেই 'অরিজিনাল সিন'—একদা নগরপত্তনের কালে এবং ক্রমিক সম্প্রসারণের সময়ও আমরা গোটা অঞ্চলটাকেই প্রায় তরুলতাহীন করেছি।

আলোচনা

ফ্লবেয়ার প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত মন্মথভট্ট

মহাশয়,—'দেশ'-এ (২১ মে, '৬৬) আপনি লিখেছেন, 'কিন্তু ১৯১০ সাল পর্যন্ত কোনো ফ্লবেয়ার-ভক্ত জানতেন না যে,......ইত্যাদি' পৃ, ৮৮৬, আমার কাছে একখানা পুস্তক আছে, নাম, Chroniques, e'tudes correspondence dé Guy de Maupasant; Receuillis, preface et annotion par RENÉ DOMESNIL. Librarrie Grund, 1938. এই পুস্তকে মপাসাঁর একটি প্রবন্ধ আছে, সেটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নোটে লেখা আছে, cette e'tude servit de preface aux letters de Flaubert a George Sand (Padus Charpentier, 1884). Elle fut ' reprodirite plustord dens differentes editions de Flaubert.

এই প্রবন্ধে শুধু যে LE dictionnaire des Idees recues, এবং তার সঙ্গে Le Catalogue des openions chic এবং অন্যান্য Imbeciles আছে তাই নয়, প্রায় আট পাতা জুড়ে মপাসাঁ তার থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তাঁর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও ১৮৮৪ সালে মপাসাঁ প্রকাশ করেছেন (ibid. pp 174 ff). তবে কেন ১৯১০ সালে এটা আবিষ্কারের দাবি করলেন কী করে?

আপনার লেখা পড়তে ভালো লাগে বলে এটি উল্লেখ করলুম। অপরাধ নেবেন না।

নমস্কারান্তে

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখকের উত্তর

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের মত বিদ্বান এবং সুরসিক ব্যক্তি আমার লেখাগুলি পড়ছেন এবং পড়তে তাঁর ভাল লাগছে, এ খবরে, বলা বাহুল্য, আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং উৎসাহিত বোধ করছি। সৎ পাঠকের উপস্থিতি লেখার মানকে নীচে নামতে দেয় না।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি যেটুকু জানি নিবেদন করি।

ফ্লোবেয়ার যে চলতি ধারনার একটি প্রামাণিক অভিধান বা বিশ্বকোষ লেখার জন্যে উপাদান সংগ্রহ করছেন, একথা শুধু মোপাসাঁ নন, ফ্লোবেয়ারের বান্ধববান্ধবী, শিষ্য-অনুচরদের মধ্যে আরো অনেকেই জানতেন। তিনি ন' বছর বয়েস থেকে এই সংগ্রহ শুরু করেন, মরার আগে পর্যন্ত সে-সংগ্রহ শেষ হয়নি। ১৮৫০ সাল থেকে তাঁর লেখা নানা চিঠিপত্রে LeDictionnaire des Ide'es Recues-র পরিকল্পনার উল্লেখ দেখা যায়। আমি আমার প্রবন্ধে যে তিনটি চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম তার প্রথমটি দামাস্কাস থেকে ১৮৫০ সালে বন্ধু লুই বুইয়েকে লেখা (G. Flaubert, Correspondence I, 337); দ্বিতীয়টি ১৮৫২ সালে প্রণয়িনী লুইজ কোলে-কে লেখা (ঐ, II. 157); তৃতীয়টি ১৮৭৯ সালে রাউল দুভালকে লেখা (**Letters inedites a' Raoul Duval, Albin Michel, 1950**)। তিনি তাঁর বন্ধু জুলে দুপ্লাঁ-কে দিয়ে সমকালীন লেখকদের রচনা থেকে বাছাই-করা নির্বোধ-উক্তির একটা

সংকলন-ও তৈরী করিয়ে ছিলেন। তাঁর নিজের সংগৃহীত উপাদানের কিছু কিছু নমুনা তিনি কপি করে নির্বাচিত বন্ধু এবং ভক্তদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এই অভিধান বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা তাঁর মৃত্যুর পরেও মোটেই অজানা ছিল না।

কিন্তু যেটা অনাবিষ্কৃত ছিল সেটা হোল অভিধানটির পুরো পাণ্ডুলিপি। মোপাসাঁ এর খানিকটা অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তার প্রবন্ধে তিনি সেই পরিচিত অংশ থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ফেরাার সাহেব-ও তাঁর সংস্করণে মোপাসাঁর প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন। আমার আলোচনাতে আমি ফেরাারের কথাই অনুসরণ করে বলেছিলাম ঃ "মোপাসাঁ লিখেছেন, এই ধরনের নির্বোধ উক্তি আবিষ্কারে ফ্লোবেয়ারের বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল।" কিন্তু মোপাসাঁ অভিধানের পুরো পাণ্ডুলিপি দেখেননি; সেটি আবিষ্কার করেন ফেরাার সাহেব।

ফ্লোবেয়ারের ভাগ্নী কারোলিন (বিবাহিত নাম, মাদাম ফ্রাঙ্কলিন গ্রু) তাঁর মামার নানা প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কাগজপত্র সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। ১৯১০ সালে এই সব কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে ফেরাার সাহেব চল্লিশটি ফোলিওতে সাজানো অভিধানের খসড়া পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। পরে তিনিই এটি টীকাটিপ্পনী সমেত সম্পাদনা করে প্রথম প্রকাশ্যে বার করেন। ১৯৫১ সালে ধবিএ সাহেব আরো কিছু নতুন মালমশলা আবিষ্কার করেন। রুয়াঁ-র গ্রন্থাগারে তিনি দুটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান ঃ প্রথমটি হলো একখণ্ডে বাঁধানো পাঁচিশটি ফোলিওতে সাঁটা, বহুবর্ণ কাগজের টুকরো; দ্বিতীয়টি হলো উনিশটি ফোলিওসম্বলিত একটি নোটবুক, আরো কিছু শব্দ। পুরানো মালমশলার সঙ্গে নতুন উপাদান মিলিয়ে তিনি ফ্লোবেয়ারের অভিধানের প্রামাণ্য সংস্করণ বার করেন।

অর্থাৎ মোপাসাঁ ফ্লোবেয়ারের পরিকল্পনার কথা জানতেন, তার কিছু অংশ কপির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রথমত ফেরাারের এবং পরে আংশিকভাবে ধবিএ সাহেবের। আমি ফ্লোবেয়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই; এসব তথ্যাদি স্টার্ক সাহেবের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

পরিশেষে মুক্তচন্দ্র আর্কী সাহেবকে চিঠিটির জন্যে আবার তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

—সম্পাদক

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

সবিনয় নিবেদন,—সরকার পরিকল্পিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে রঞ্জনের কয়েকগুলি বিষয়ে আপত্তির বিরোধ গত ১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৮র 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীদেবকীনন্দন মণ্ডল যে আলোচনা করেছেন, আমার মতে কিয়দংশে তা পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে বাঙালীমাত্রেরই যে পূর্ণমাত্রায় আগ্রহশীল হওয়া আবশ্যক, একথা নিশ্চয়ই কোন সংস্কৃতিবান বাঙালীকে আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। কবিগুরুর জন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই স্মৃতি-পূজার একটি সময়োচিত আয়োজনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে সচেষ্ট হয়েছেন, সেটা নিঃসন্দেহে খুবই আনন্দের বিষয়।

কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি সম্মান জানানোর প্রয়োজনকে অস্বীকার না করলেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সরকারের পরিকল্পিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই তার প্রকৃষ্ট উপায় হবে কিনা। আমার মনে হয় রঞ্জনের আশংকাও এই শেষোক্ত বিষয় কেন্দ্র করেই।

এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে "রবীন্দ্রনাথের সংগীত, নৃত্য ও নাট্য প্রতিভার একটা সার্থক রূপ" দেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। "আয়োজনের আতিশয্য এবং আড়ম্বরের" কথা বাদ দিলেও প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে রবীন্দ্র-কীর্তির প্রকৃত মূল্যায়ন কি শুধু এর মাধ্যমেই সম্ভব? শ্রী মণ্ডলের উক্তি উদ্ধৃত করেই এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, "বরঞ্চ তাঁর রচনা, বাণী বা উদ্ভাবনী চিন্তাগুলির (creative ideas) সার্থক রূপায়নেই তাঁর স্মৃতির প্রকৃত সম্মান করা হয়।" কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দিকটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং সেইজন্যই সরকারের এই পরিকল্পনার মধ্যে একটা বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে, যেটা কোনহয় শ্রী মণ্ডলের চোখে পড়েনি। আমার মতে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও নাট্যের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে যাতে রবীন্দ্র-রচনার উপর মৌলিক গবেষণা ও কবির বিরাট প্রতিভার বিভিন্ন দিকে নূতন আলোকপাত করা হয় সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

কিন্তু শ্রী মণ্ডল এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, কারণ তাঁর মতে এর মধ্য দিয়ে "রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্যনাট্যের চর্চার সুযোগ সুবিধা সাধারণের কাছে আরও ব্যাপকতর হবে।" কিন্তু সেটার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি তার সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর গবেষণায় বাঙালীর চিন্তাশক্তিকে নিয়োজিত করার প্রয়োজনও যে কোন অংশে কম নয়, সেটা ভুললে চলবে না। এই শেষের প্রয়োজনটি অস্বীকার করার বা পূর্ণ-স্বীকৃতি না দেওয়ার মধ্যে কেবল নিজেদের মননশক্তির দৈন্য ও পরমুখাপেক্ষিতারই পরিচয় দেওয়া হবে এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শনে যথেষ্ট গুরুত্ব বা সিরিয়াসনেস এর যে অভাব ঘটবে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

অবশ্য এ মনে করার কোন কারণ নেই যে, আমি কাব্যচর্চাতে রবীন্দ্রশিল্পকলার অনুশীলনের ঘোর পরিপন্থী। আমার বক্তব্য শুধু যে প্রতিভার সম্মান জানাবার এইটেই একমাত্র পথ নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যাপকতার কথা স্মরণ করেই আমি এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

তা ছাড়া আড়ম্বরের প্রাচুর্য ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতাই যাতে আয়োজনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে সেদিকেও সচেতন হওয়া কর্তব্য। সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা যে অনেক বেশী তারও দৃষ্টান্ত বোধহয় আমাদের দেশে বিরল নয়। সেদিক থেকে রঞ্জনের আশংকা আমার নিকট অমূলক মনে হয়নি। আমাদের সামর্থ্যের দিক থেকে বিবেচনা করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিরাট পরিকল্পনা হাতে না নিয়ে অন্যভাবে দেশের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভা চর্চার সুযোগকে বিস্তৃততর করা যায় কিনা তা আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আমার মনে হয় যে, সরকারী অর্থসাহায্যে যদি রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান রচনার সুলভ সংস্করণ জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা সম্ভব হয়, তবে নিশ্চয়ই তার দ্বারা অনেকেই উপকৃত হবেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা চর্চার দিক থেকে এর যে বিশেষ প্রয়োজন—সে কথা অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর প্রতিদ্বন্দ্বী কি পরিপূরক হবে জানি না, তবে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, কবির নিজের হাতে গড়া বিশ্বভারতীর মত বিরাট প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে (এবং যা সরকারের সাহায্যে বিশেষভাবে পুষ্ট), সেখানে ঐ ধরনের আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এখনই সেরকম কোন প্রয়োজন বোধ-হয় নেই। আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে হবে বলে আমরা বিরাট অনুষ্ঠানে মেতে উঠে আড়ম্বরটাকেই যেন শুধু প্রাধান্য না দিই। কবির কল্পনার সার্থক রূপায়নের জন্য সুপরিকল্পিত পথে অগ্রসর হওয়াই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর।

(২)

সমীপেষু,—রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে রঞ্জন সংগত কারণেই আশংকিত হয়েছেন এ কথা বলতে পারি। তাই শ্রীদেবকীনন্দন মণ্ডলের মতামত ('দেশ' ১৮ই বৈশাখ) প্রকাশিত হতে দেখে বিস্মিত বোধ করছি। তিনি রঞ্জনের যুক্তির 'নৈয়ায়িক ফ্যালাসি' নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন মাত্র। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে রঞ্জনের আশংকা আদৌ অমূলক বলে আমিও মানতে পারছি না।

দেখা যাচ্ছে প্রস্তাবিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কেবল নৃত্যনাট্য ও সংগীত চর্চার একটি কেন্দ্রে পরিণত হবে। শ্রী মণ্ডল বলেছেন, "নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যের দরুণ রবীন্দ্রসংগীত নৃত্যনাট্যের চর্চার সুযোগ সাধারণের কাছে আরও ব্যাপকতর হবে।" এই শিল্পকলাগুলির আপামর জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রচারসাধনের কোনো সমস্যা সত্যই অনুভূত হচ্ছে কিনা, কিংবা এই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলাগুলির সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি ঘটবে কিনা এ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি শুধু নৃত্যনাট্যের ইস্কুলের একটি বৃহত্তর সংস্করণ বসালেই কি রবীন্দ্রপ্রতিভার যথাযথ অনুশীলন সম্ভব হবে?

আমার ধারণা নৃত্যগীতের অতিরিক্ত চিত্ত-বিনোদনী উপকরণ রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের সহায়ক নয়। শ্রী মণ্ডল স্বীকার করেছেন, "তাঁর রচনা বা উদ্ভাবনী চিন্তাগুলির সার্থক রূপায়নেই তাঁর স্মৃতির প্রকৃত সম্মান করা হয়।" কিন্তু এই রূপায়ণ নৃত্যগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা নিশ্চয়ই শ্রেয় নয়। বরং আরও ভাল হতো যদি রবীন্দ্রপ্রতিভার মনন ও চিন্তনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হোত। রবীন্দ্রনাথের মানসলোক এবং ভাবজীবন সম্বন্ধে অনুশীলন, গবেষণা বা অধ্যয়নের মধ্যে প্রস্তাবটিকে সীমাবদ্ধ রাখলে তা চিরস্থায়ী কীর্তিসাধনার অনুরূপ একটি স্থাপনা হোত। সেইসঙ্গে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চার সহায়ক প্রয়োজনীয় পাঠাগার, গবেষণাগার, চিত্রশালা ইত্যাদি স্থাপনে উদ্যোগী হওয়াও দরকার। কিন্তু যেখানে শুধু নৃত্যগীতের প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা সেখানে রবীন্দ্রনাথের এক দিকের জনপ্রিয়তাটি বর্ধিত হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা দেশের সংস্কৃতি ও সাধনার ক্ষেত্রে এক নিদারুণ অবক্ষয়ের যুগ সূচনা করবে। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে শ্রী মণ্ডল বলেছেন সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। কিন্তু কে জানে শান্তিনিকেতন অবশেষে মফঃস্বলের রুচি, প্রসাধনকলা ও নৃত্যশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হবে। তাই আশংকা হয় প্রস্তাবিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন পরিমাপে স্থান নেবে।

মাননীয় বিধানচন্দ্র রায়ের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে রঞ্জনের অনাস্থার কারণ বুঝি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতি কি রূপ নিতে পারে তার দু একটি নজীর ইতিপূর্বেই আমরা পেয়েছি। আপাততঃ কলকাতায় একটি ফুটবল স্টেডিয়াম গঠনে ডাক্তার রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা সরকারী সাহায্যে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করলে তাঁর একটি স্মরণীয় কীর্তি স্থাপিত হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ তাঁর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে। ইতি—শ্রীদীপকরঞ্জন মাইতি, হাওড়া।

[২৭]

নিশিবাবু বললেন, 'চিনি ভাই, চিনি। তোমার চিত্তবাবুকে চিনি। আর নয়নবিবি পাখিবিবিদের সকলকেই চিনি। কলকাতায় বাবু আর বিবিদের কাউকে চিনতেই বাকী নেই।'

সামনে কাগজপত্র ছড়ানো, চোখে চশমা-আঁটা নিশিবাবু ঘরে বসে নথিপত্র দেখছিলেন।

মুখ তুলে সৌরর কথা শুনছিলেন, কদাচিৎ মন্তব্য করছিলেন দুই একটা কথার ওপরে, আবার কাগজপত্রের মধ্যেই ডুব দিচ্ছিলেন।

সৌর নিশিবাবুর চেহারার প্রতিক্রিয়ার বিবরণ দিচ্ছিল। দিচ্ছিল, থামছিল, চেয়ে চেয়ে দেখছিল। মাঝে মাঝে, ওঁর মুখ যখন বন্ধ নেই তখনও, মনে মনে ভাবছিল: মিছেই আমি বক বক করে মরছি, উনি একটা কথাও হয়ত শুনছেন না।

অথচ বেলা যায়। নয়ন আর পাখি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কামিনী মাসির একটা গতি ত করা চাই।

চিত্তবাবুর বাড়িতে যা যা ঘটেছিল, সব বলে দম নেবার জন্যে সৌর চুপ করল।

চশমাটা ঠেলে একেবারে নাকের ডগায় এনে নিশিবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছ ভাই।' চশমার ওপর দিয়ে নিশিবাবু তার দিকে চেয়ে আছেন। বলছেন, ঠিক বলেছ। সৌর বুঝতে পারছিল না, তার কোন কথাটা ঠিক। আর বেঠিক কথাও কি সে কিছু বলেছে?

'ঠিক বলেছ,' নিশিবাবু বললেন, 'চিত্তটা ওই রকমই। বাইরে ফাটানি আর চেকনাই, ভিতরটা ফাঁপা। ওকে জানি ত অনেক দিন থেকেই। স্মিথ জনসন এণ্ড স্মিথ শেয়ার ডীলার কোম্পানীর বাড়িতে ওকে কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল কে। আর আমার [illegible] কিনা ও চাল দেখাতে আসে! আরে, ওর মত বাক্সে কাপ্তান আমার ঢের ঢের দেখা আছে।'

নিশিবাবু একটু সময় চুপ করলেন, কিন্তু তখনও ওঁর চোখ সৌরর ওপরই ছিল। চোখ দুটি বলছিল, 'দম নিই, ফের বলতে শুরু করব।'

শুরু নিশিবাবু করলেনও। মিনিট দশেক ধরে একটানা বক্তৃতা দিয়ে চিত্তবাবু কবে তার সংগে কী কী চালাকি করতে গিয়েছিল, তার একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি দিলেন। অবশেষে বললেন, 'মিথ্যুক, জালিয়াত, জোচ্চোর।'

সৌর বুঝল, গল্পের শেষে যেমন নীতি-বাক্য থাকে, এই বিশেষণ তিনটিও তাই, নিশিবাবুর বক্তৃতার সার কথা।

সে ভাবছিল, আবার নয়ন-পাখিদের প্রসঙ্গ তুলে নিশিবাবুকে মনে করিয়ে দিতে হবে, কামিনী মাসির শব বাসি হয়ে চলল।

নিশিবাবু আবার দরকারি কাগজপত্রে নিমগ্ন-মন হয়ে পড়েছিলেন। দেওয়ালের প্রকাণ্ড বড় ক্লকটা টক টক করে বাজছিল। আর কিছুই করবার নেই বলে হতাশ সৌর অগত্যা ওই ঘড়িটার কথাই ভাবতে বসল। কী আশ্চর্য দেখ। সময় চলে যাচ্ছে, সময় বাজছে। আবার ভাবল, সময় ত বাজে না, সময়ের সঙ্গীত অনাহত, কানে শোনাও যায় না। এই ঘড়িটা তবে কী। অনেক ভেবে-চিন্তে সৌর ঠিক করল ঘড়িটা আসলে তবলার মতন, সময়ের অশ্রুত সংগীতে নিয়মিত তাকে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সৌরর অবশ্য মিনিট তিনেকের বেশি লাগেনি। সে আবার চোখ ফিরিয়ে চাইল নিশিবাবুর দিকে। নিশিবাবু তখনও কাগজপত্র দেখছেন। শেষ-বেলার মেঘ-ভাঙা রোদের

খানিকটা পড়েছে তাঁর মুখের একাংশে আর চুলে. মুখটাকে কেমন বুড়ো-বুড়ো আর চুলগুলির কাঁচা-পাকা প্রকৃতিটাকে একেবারে প্রকট করে দিয়েছে। মুখের সর্বত্র ত রোদ পড়েনি, পড়েছিল নিশিবাবুর চোয়ালের উঁচু হাড়টাতে, সেটাকে কঠিন ছোট্ট একটা গুলির মত লাগছিল। তার নীচেই একটা গর্ত, সেখানে চামড়া কোঁচকানো। সেখানে আলো নেই, তাই অন্ধকার। নিশিবাবুর কানের লতিতে একটা পাকা চুলও সৌরর নজরে পড়ল।

এইবার, সৌর স্পষ্ট অনুভব করল, সে ভুল ঠিকানায় এসেছে। এই নিশবাবুকেও ত সে চেনে না, আগে কোন দিন দেখেনি। নথিপত্রের উপরে ঝুঁকে-পড়া মাথাটা কেমন রোগা, শুকনো, আর লম্বাটে দেখাচ্ছে। এঁর মধ্যে সেই ভদ্রলোক কই, তিনি গদগদ গলায় নয়ন আর পাখিকে নাটক পড়ে শোনান?

সে-সব, নাটকের কিছু-কিছু কথা সৌরও জানা ছিল: প্রণয়, অভিমান, হা-হুতাশ, ঈর্ষা, আত্মদান ইত্যাদি যার বিষয়বস্তু, সেই পাণ্ডুলিপিগুলি কি এরই রচনা?

টেলিফোন বেজে উঠল, হাত বাড়িয়ে নিশিবাবু তুলে নিলেন রিসিভার। কথা বলতে শুরু করলেন, মৃদু-গম্ভীর স্বরে, আর মাঝে মাঝে কেমন যেন সন্দিগ্ধ চোখে সৌরর দিকে চাইছিলেন। সৌর কিন্তু কিছু বুঝছিল না, যদিও এটুকু ধরে নিতে তার অসুবিধে হয়নি যে, কথাটা গোপন এবং বৈষয়িক। এর চেয়ে বেশী কিছু সেও জানে না। জানবার কৌতূহলও নেই, তবু নিশিবাবুর এই অস্বস্তি কেন।

প্রৌঢ়, পরম পাকা একখানি মুখ সৌরর চোখে ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত চেহারার মত আরও যেন কিম্ভূত হয়ে উঠছিল।

টেলিফোন রেখে দিয়ে নিশিবাবু বললেন, "হাঁ, তারপর কী যেন বলছিলে?"

নিশিবাবুর মুখে বিরক্তির কয়েকটি রেখা, কণ্ঠস্বরেও কিছু যেন অধীরতা কিছু অসন্তোষ। একজন সাক্ষীর সম্মুখে গোপনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে হল বলে তিনি নিজের ওপরেই যেন খানিকটা চটে গিয়েছেন।

তাই কাগজগুলোর পোকাপাশী ফিতেতে গিঁট দিতে দিতে অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'কী যেন বলছিলে—'

সৌর বলল, "কামিনী মাসি—" বিস্মিত হয়ে সৌর লক্ষ করল, সে নিজেও কখন কামিনীকে মাসি বলতে শুরু করেছে।

নিশিবাবু বললেন, 'সী ওয়াজ এ বিচ্। মরেছে? বাঁচা গেছে।'

হতভম্ব সৌর হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না।

নিশিবাবুই বলে গেলেন, 'শয়তানী। সারা জীবন লোককে ঠকিয়েছে। সবাইকে। আমাকে—হাঁ, আমাকেও।'

ক্ষীণ গলায় সৌর তবু বলতে গেল, 'সৎকারের কোন বন্দোবস্ত হয়নি, ঘরেই পড়ে থাকবে?'

'থাকুক। গলুক। পচুক।' নিশিবাবু বললেন থেমে থেমে, প্রতিহিংসার উল্লাসে।

সৌর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হয়ত, সে ভুল শুনেছে। কিন্তু নিশিবাবুর দৃষ্টির নির্মমতা ত ভুল হবার নয়। সৌর ভাবল, এরা এমনই। আসলে মায়া-দয়া-প্রীতি বলে কোন কিছু কারও প্রতিই এদের নেই। যে-চিত্তবাবুর সঙ্গে নিশিবাবুকে সে নয়নদের ঘরে গলাগলি করতে দেখেছে, তাকে নিশিবাবু কী চোখে দেখেন, তার পরিচয় সে ত খানিক আগেই পেয়েছে। চিত্তবাবুর সঙ্গে দেখা হলে

তিনিও, হয়ত ঠিক একই উক্তি করতেন নিশিবাবুর প্রসঙ্গ উঠলে।

আর যে-কামিনীর ঘরে গড়াগড়ি দিয়েছেন নিশিবাবু, তার সম্পর্কে কুৎসিত কটূক্তি সৌর ও স্বকর্ণেই শুনল।

এই জগতের মানুষেরা একে অপরের সঙ্গে মেশে, শুধু নেশার বিলাসে স্ফূর্তির প্রয়োজনে, কিন্তু মেশে না, কেউ কাউকে বিশ্বাসও করে না।

সৌর উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল, "আপনি তাহলে উঠবেন না? ব্যবস্থা করবেন না?"

"আমি?" মাথার উপরে দু-হাত তুলে নিশিবাবু বললেন, "আমি কোথায় যাব, কী করেই বা যাব, আমার সময় কই। এক্ষুনি বেরুতে হবে এক মক্কেলের বাড়িতে, একটা প্রপার্টি ভাগের ব্যাপার আছে।"

নিশিবাবু বলে গেলেন দ্রুত, কিন্তু ঠাণ্ডা সুনিশ্চিত সুরে। তাঁর মধ্যে অভিনয়-পটু নাট্যকারের চিহ্নমাত্র সৌর খুঁজে পেল না। সে যেন কালো আচকান-পরা এক ঝানো-ঝানু উকিলকে দেখছিল।

সৌর শুধু বলল, নয়ন আর পাখি খুব অসুবিধেয় পড়বে।

নিশিবাবু বললেন, "ওদের নোটিস দেওয়া হয়নি বলে না?" তারপর আস্তে সৌরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "আরে ছোঃ, তোমাদের বয়সে আমরাও নাইট-এটাক করেছি, শিডনীর দেখিয়েছি — এখন এই বয়সে, সব কথা বুঝি — ভালো লাগে না নয়ন আর পাখি।"

পাইপ ধরালেন নিশিবাবু, নিমন্ত্রণ দীর্ঘ, মধ্যে মক্কেল নিয়ে কাটে, তুই মাঝে মাঝে নাটক লিখি, ওখানে গিয়ে ওদের পড়ে শোনাই। খানিকটা রিলাক্সেশন। কোমরের কষি ঢিলে করে নিয়ে একটু হাঁপ ছাড়া, আর কি। একা-একা পেসেন্স খেলা বা ক্রসওয়ার্ড সলভ করার মধ্যে একটা মজা আছে না? এ-ও অনেকটা সেই রকম।

সৌর বলল, কিন্তু আমি জানতাম, ওদের আপনি স্নেহ করেন।"

ঠোঁট দুটি ছুঁচালো করে তার ভিতর দিয়ে হাওয়া বের করে নিয়ে নিশিবাবু তাচ্ছিল্য সূচনা করলেন। বললেন, "স্নেহ? করতাম এক কালে, তখনও ওরা এমন ব্যবসা শেখেনি। কামিনী ওদেরও নষ্ট করেছে, ওদের লোভ বাড়িয়েছে; আমার কাছ থেকে মাসোহারা পেত, এই শর্তে যে ও বাড়িতে ঢোকার এক্তিয়ার একা আমারই থাকবে। কিন্তু সে-কথার খেলাপ করল না করল কেন? এরাই বা কেন তার সহায় হল?"

সৌর মৃদু গলায় বলতে গেল ওরা ছেলেমানুষ, কিন্তু নিশিবাবু তাকে এক রকম ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "লেট দেম স্টু ইন দেয়ার ওন জুস্।"

উচ্চারণের ভঙ্গিতে তাঁর কথাটা প্রাণদণ্ডের রায়ের মত শোনাল।

সৌর বেরিয়ে আসছিল, নিশিবাবু ওর হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "ইয়ং ম্যান, তুমি বরং একবার সৎকার সমিতির অফিসে যাও। সেবা ওদের ব্রত— এ-সব কাজ ওরা করে থাকে বলে শুনেছি।"

সেই টাকা সৌর নেয়নি, সে হেঁটে হেঁটেই ফিরে আসছিল, এখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, কিংবা ঝিরঝিরে বৃষ্টিই বিকেলটাকে সন্ধ্যা করে নিয়েছে। রাস্তাসের ফাঁকটায় মাঝে মাঝে এক একটা লাইট পোস্ট কানা হয়ে ছায়া শরীর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখনও কি ওরা, সৌর কাদা বাঁচিয়ে কাপড় সামলে চলছিল আর ভাবছিল, এখনও কি ওরা ওর অপেক্ষায় বসে আছে? কোনো একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে। সৌর প্রার্থনা করতে থাকল, তাই যেন হয়, হে ভগবান, কামিনীর জীবন তো তুমি নিয়েছ, এবার ওর দেহটার একটা গতি করে দাও।

ওদের উঠানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা পচা ভাপসা গন্ধ নাকে এল; মাসকাবারি ফুলগুলো কতদিন ধরে পচছে কে জানে। খোকা খোকা আঙুরগুলোর গায়ে কালো কালো তিলের মত ছিটে লেগেছে। সৌরর গা বমি-বমি করছিল। মিষ্টি ইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পেটের ভিতরটাই যেন ঠেলে বাইরে আসতে চাইল।

তাড়াতাড়ি পা চালাতে হল সৌরকে। ওদিকে একটা ফুলের দোকান ছিল সামনেই, ভিজে ভিজে কেয়ার গন্ধ ভুরভুর করছে। রজনীগন্ধার শীর্ণ ডাঁটাগুলো কেরোসিনের টিনে খাড়া করানো আছে।

কী জানি কেন, সৌরর ঠিক তখনই নয়ন আর পাখির কথা মনে পড়ে গেল।

বুক ভরে শ্বাস টেনে সৌর এগুতে শুরু করেছিল, কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে তাকে আবার থমকে দাঁড়াতে হল। বৃষ্টিটা আবার বড়-বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু হয়েছে।

আর তখনই সৌরর চোখে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটা পড়ল।

একটা বাঁশে কী একটা যেন পুঁটলির মত জড়িয়ে নয়ন আর পাখি পথ চলছিল। বৃষ্টিতে ওদের জামা-কাপড় ভিজে যাচ্ছিল, তবু ওরা থামছিল না, এক হাত দিয়ে কাঁধে রাখা বাঁশের কোণ শক্ত করে চেপে ধরেছিল। অন্য হাতে যতটা নির্লজ্জ হতে পারে, ততটাই হয়ে পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়েছিল। রাস্তার দু-পাশের লোক দেখছিল আর হাসছিল।

কী আছে ওই পুঁটলিতে? বুঝতে অবশ্য সৌরর দেরী হল না—কামিনী মাসির মৃতদেহ। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে নয়ন আর পাখি শেষ অবধি এই বুদ্ধি বের করেছে।

বাড়ি পণ্য-রমণীর শব বয়ে নিয়ে চলেছে কমবয়সী দুটি মেয়ে—তারাও বৈবর্ণ। এ-দৃশ্য সৌর এর আগে বা পরেও কোনদিন দেখেনি।

একটি ভিজে মেঘের সন্ধ্যা করুণার গানে গানে কাঁদছিল। সৌর পুরুষ, অতএব কাঁদছিল না, কিন্তু বিষণ্ণ আকাশ ওর সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

ওরা এইরকমই হয়, সে ভাবছিল মনে মনে। যতদিন বাঁচে, যতদিন আছে, ততদিনই ওদের ঘরে নানা লোকের আনা-গোনা। যেই নেই, সেদিন আর কেউই নেই।

কামিনী মাসির মড়া নয়, নয়ন আর পাখির ভবিষ্যৎ জীবনটাই যেন বোঝার মত ওদের কাঁধে চেপেছিল। এই বোঝা নামাতেও যদি পারে, তখনও কি সোজা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে?

যারা ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তা চলছিল, কিংবা বৃষ্টির জন্য যারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারা সবাই সকৌতুকে মজা দেখছিল, জোরে জোরেই হাসছিল। বিড়ির দোকানী এক-নজর দেখে নিয়েই ফের বিড়ি-বাঁধায় মন দিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই সে বিশ্রী

একটা হিন্দী গান এক-কলি গেয়েই চুপ করেছে, আর তখন তার সাকরেদ কারিকর ছোকরা দুটির একজন হাঁটুতে চাপড় দিয়ে আর একজন করতালি দিয়ে তাল দিয়েছে—হয়ত গানের সঙ্গে, হয়ত নয়ন-পাখির চলার ছন্দে। একজন ত পাটাতন থেকে নেমে ফুটপাতে পড়ে দৌড় দিল—শব্দ করে থুথুও ফেলল।

বাকী লোকগুলো, যাদের সভ্য-শহুরে সংস্কার এতক্ষণ তাদের ধরে রেখেছিল, তারা সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠল হো-হো করে। একটা কুকুর খানিকটা এগিয়ে পাখির গোড়ালিতে নাক ঠেকিয়ে ফিরে এসে ফের কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল।

সৌর একবার ভাবল, 'আমি যাই ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই।' কিন্তু লোকগুলির চোখের দিকে চেয়ে সাহস হল না, বৃষ্টির চেয়েও তীক্ষ্ণ ধারায় ওদের টিটকারি পিঠে বিঁধবে এই ভয়ে সৌর দাঁড়িয়েই রইল।

যতক্ষণ রইল, ততক্ষণই সৌর মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। বলল, আমি ভদ্র, আমি সভ্য, আমি শহুরে, আমি কাপুরুষ।

এই চারটি বিশেষণই যে মূলে এক, তাতে তার সন্দেহমাত্র ছিল না, তার গ্রামীণ মনের প্রবণতার বিনিময়ে সে যা অর্জন করেছে। 'এই শহুরে সংস্কার, সংকোচ আর ভয়' সৌর অনেক পরে লিখেছিল দিনলিপিতে 'আমাকে নাগরিক করেছে, কিন্তু মানুষ হতে দেয়নি, অন্তত আমি যা হতে চেয়েছিলাম, তা হতে পারিনি। ওই পাখি আর নয়নকে আমি ত আর ঘৃণা করতাম না, বরং তখন ওদের বিপদে আমার দুঃখ হয়েছে, তবু ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি।'

নয়ন আর পাখির মুখ-চোখ, জামা সব ভিজে গিয়েছিল। হয়ত বৃষ্টিতে, হয়ত পথশ্রমের ঘামে। হয়ত ওদের চোখেও জল ছিল।

সৌর কিন্তু সেদিন ওদের পিছু নিয়েছিল। ওরা যেই চোখের আড়াল হল, তখনই যেন বৃষ্টিটা ধরে এল, আর সৌরও অমনিই এদিক-ওদিক চেয়ে, আস্তে আস্তে পা বাড়াল।

খানিকটা চলার পরই ওদের আবার দেখা গেল। দুটি ত মেয়ে, কত তাড়াতাড়ি আর যাবে।

সৌর ওদের কাছে গেল না, একটু দূরত্ব রেখে চলতে থাকল।

ওরা মাঝে মাঝে কাঁধ বদলে নিচ্ছিল, নয়ন মাঝে মাঝে বলতে চেষ্টা করছিল, 'বল হরি, হরিবোল—' কিন্তু খুব ক্ষীণ আর ক্লান্ত আর লজ্জিত একটুখানি চাপা গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ ফুটছিল না। পথের পাশের মুড়ি বাতাসার দোকান থেকে কয়েক মুঠো খই কে যেন ওদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

একটু পরে ওরা অন্য একটা রাস্তায় বাঁক নিল। এ-রাস্তায় লোকজন কম, দোকান নেই, শুধু বসতি অঞ্চল, তাই বৃষ্টির সন্ধ্যায় দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে কেমন যেন বোবা আর কানা হয়ে গিয়েছে।

এইখানে নয়ন আর পাখি থামল। সন্তর্পণেই নামিয়ে রাখল ওদের কাঁধের পুঁটুলি। রাস্তায় বসে পড়ে আঁচল খুলে প্রথমে ঘাম মুছল, পরে আঁচল ঘুরিয়েই হাওয়া খেতে শুরু করল।

সৌরর তখন আর লুকোবার উপায় ছিল না। ওরা ওকে দেখতে পেল। হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ওরা কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সৌর বলল, 'চিত্রবাবুকে পেলাম না। নিশিবাবু এল না।'

নয়ন হাঁপাচ্ছিল। বলল, 'জানি, পাবে না। জানি, আসবে না।'

ওরা আর কোন প্রশ্ন করল না। নয়ন বলল, 'বাপ্‌স, কাঁধ ধরে গেছে। একটু জিরিয়ে নি।'

পাখি বলল, 'ঘণ্টাখানেক নেচেও কোনদিন পা এমন টনটন করেনি।'

নয়ন বলল, 'দে একটা বিড়ি দে।'

"এখানে খাবি? এই সদরে—রাস্তায়?"

"দে—দে, দম ফুরিয়ে গেছে, নইলে বাঁচব না।" সৌরর দিকে চেয়ে বলল, "দেশলাই আছে?"

সৌর বাক্য ব্যয় না করে বাক্সটা পকেট থেকে বের করে ওদের হাতে তুলে দিল। ধরিয়ে দিতেও হল ওকেই। কেন না, নয়নের হাতে ভিজে কাঠির একটাও জ্বলছিল না। নিবে যাচ্ছিল।

ফেরবার সময় কোন-কোন ঘড়িতে পৌনে দশটা, কোনটাতে দশ বেজে পাঁচ কিংবা দশ, কোনওটাতে সওয়া দশটা বাজছিল। সময়টা যে দশটারই কাছাকাছি, তাতে সন্দেহ ছিল না।

মৃদু গলায় সৌর বলল নয়নকে, 'যাক, চুকল তা-হলে। কিন্তু তোমরাই বা এই কাণ্ডটা কেন করলে বল ত! আর খানিকটা অপেক্ষা করলেই ত পারতে। আমি যে-ভাবে পারি, কিছু লোকজন জোগাড় করে আনতামই।'

নয়ন বলল, না, ভাই, আমরা ভয় পেয়ে-ছিলাম।'

সৌর হেসে বলল, 'মড়া নিয়ে এক বাড়িতে থাকার ভয়?'

নয়ন বলল 'তা বলতে পার বটে। তবে আরও কারণ ছিল।'

'কী কারণ?'

নয়ন চট করে জবাব দিল না। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, 'দেখ, সারা জীবনই ত মাসি পাপ করেছিল, যমের কাছে তার জবাবদিহি দিতে দিতেই অস্থির হবে। আবার ওর মড়া যদি বাসি হত, তবে ওর নরকেও জায়গা হত না যে!' বলে নয়ন অল্প একটু হাসল, 'পাপ করুক আর যাই করুক, তার বিচার ভগবানের কাছে। আর ও একা ত করেনি, ওকে দিয়েও অনেকে করিয়েছে। দায় তাদেরও। আমাদের সে-সব ভেবে কাজ কী। আমাদের কাছেও মাসি ঢের দোষ করেছে সত্যি—অনেক যন্ত্রণাও দিয়েছে, কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক করেছেও। তারই একটু শোধ দিলুম আর কী, ওকে নরক থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলুম।'

নয়নের গলা ধরে এসেছিল। নয়ন থামল।

আর পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে সৌর ভাবছিল, বৃষ্টি থেমে গিয়ে হাওয়া স্নিগ্ধ হয়েছে, আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে। এই মেঘ-ভাঙা জোৎস্নায় আজ রাতে একটা নতুন জিনিস দেখলাম। নয়নকে। সে-নয়নকে আমি কখনও দেখিনি। কেউ দেখেনি। এক ভিখারিকে একদিন দেখে-ছিলাম বটে—তার এক অন্ধ ভিখারীর হাতে দুটো পয়সা তুলে দিচ্ছে। সমাজের চোখে যে-নারীদের পাপের সীমা নেই, সেই নারীই আজ আর-এক নারীর পাপের বোঝা একটু হালকা করে দিল—তারই [illegible] [illegible]।

সৌর ভাবছিল [illegible] [illegible] [illegible] গিয়েছে, নয়ন এখন [illegible] করছে।

ফিসফিস করে সৌর বলল নয়নকে, 'তুমি —তোমরা এখন কোথায় যাবে?'

'কেন, আমাদের বাড়ি।'

আর সঙ্গে সঙ্গে সৌর প্রচণ্ড একটা ঘা খেল। ফিরে যাবে না? নয়ন আর পাখি আর তাদের পুরোনো জীবনে ফিরবে না? সে কি তাই ভেবে রেখেছিল?

[illegible] বলল, 'ফিরবে?'

নয়ন সবিস্ময়ে বলল, 'ওমা, ফিরব না? তবে যাব কোথায়! পা হাত-পা, সব ছিঁড়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জ্বরও এসেছে। পাখি, তোর ঘরে দু নম্বরের সেই বোতলটা লুকোনো আছে না?'

কথাগুলো নয়ন বলল কেমন টেনে টেনে, কপট ভয়ার ভঙ্গিতে; পাখি—যে এতক্ষণ চুপ করে ছিল—সে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর, সৌর, সর্বাঙ্গে কাঁটা, সর্বাঙ্গ কঠিন, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে বলল, 'নির্লজ্জ, বেহায়া, বদমাস।'

নয়ন সে-কথা শুনতে পায়নি। পাখির গায়ে আলগোছে চড় মেরে সে তখন বলছিল, "মর ছুঁড়ি—হেসেই যে মলি! চল, চল, পা চালিয়ে চল!"

(ক্রমশ)

র

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

ছয়
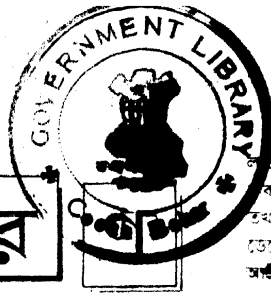
সুভাষ কেম্ব্রিজে আসবে—তার সঙ্গে একসঙ্গে ফের পড়াশুনো খেলাধুলো করব, মন গান গেয়ে উঠল। আর তর সইল না, কলকাতা থেকেই সোজা রওনা হলাম এক ছোট বি আই এস এন জাহাজে, বিদঘুটে নাম—থংগোয়া। লণ্ডনে পৌঁছলাম ২রা জুলাই। সেখানে দিন সাতেক কাটিয়ে কেম্ব্রিজে গমন এবং সেখানে কিছুর চেষ্টার পরে ফিটস্‌উইলিয়ম হলে সুভাষের ও আমার সীট প্রাপ্তি। সুভাষকে তার করলাম। সে পাল্টা তার করল: এলাম বলে।

আনন্দে মনের যেন পাখা উঠল। মহা উৎসাহে একটা গোটা কবিতাই বেরিয়ে গেল কলমের মুখে, তার শুধু দুটি লাইন মনে আছে:

স্নেহের পরশ তব যে পেয়েছে বন্ধু, একবারও
জেনেছে সে সীমাহারে আলোকবন্দনা
অন্তিমে।

কিন্তু উচ্ছ্বাসের অন্তরীক্ষ ছেড়ে এখন ঘটনার বাস্তব মঞ্চে নামি।

সুভাষ যখন ইংলণ্ডে এসে পৌঁছল তখনো কেম্ব্রিজের কলেজ খোলেনি। তাই কয়দিন আমরা লণ্ডনে কাটাই একত্রে। আমি চাইতাম ওকে থিয়েটার, সিনেমা, হিপোড্রোম প্রভৃতি প্রদর্শনীতে নিয়ে যেতে। কিন্তু ও কি আমোদপ্রমোদ করার পাত্র? যাবে কেবল এখানে ওখানে ঐতিহাসিক স্থান দেখতে কিংবা বৃটিশ মুজিয়মে। হ্যাম্পস্টেড হীথে ও একদিন মাত্র বেড়াতে গিয়েই বন্ধ করে দিল বেড়ানো—সেখানে নানা বেঞ্চেই প্রণয়ী প্রণয়িণীরা • অবাধে প্রকাশ্যেই গলাগলি করে বসে।

বিবেকী বলতে যা বোঝায় সুভাষ ছিল তাই। সেইজন্যেই ও লণ্ডনে বেশি দিন থাকতে চায়নি—দুচার দিন বাদেই বলল: "চলো কেম্ব্রিজে গুছিয়ে বসা যাক, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী?"

কিন্তু কেম্ব্রিজে স্থিতিশীল হতে না হতে ওর সেই একই অবস্থা: সেখানেও না যাবে কোনো হট্টগোলে না কোনো আমোদপ্রমোদে। কেউ ধরলেই বলবে: "আমরা বিদেশে এসেছি দেশের কাজের জন্যে প্রস্তুত হতে, বিদ্যা জ্ঞান সঞ্চয় করতে—মিথ্যে হাসি গল্প তামাশায় সময় নষ্ট করতে নয়।"

* * *

কলেজ খুলতেই সুভাষ আই সি এস-এর এক রাশ বই নিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে "মেণ্টাল অ্যাণ্ড মরাল সায়েন্স" ক্লাসে যাওয়া—একটি লেকচারও না বাদ দিয়ে। তারপর সে কী বিষম পড়া! শুধু পড়া আর পড়া!......

পরীক্ষা দিল মাত্র ন-মাস পড়ে। ওখানে আরো অনেক মেধাবী ভারতীয় ছাত্র আই সি এস পরীক্ষা দিয়েছিল দু তিন বছরের প্রস্তুতির পরে। ও তাদের প্রায় সবাইকেই হারিয়ে পরীক্ষায় দাঁড়াল চতুর্থ। তার উপরে ইংরেজীতে প্রথম।

চার দিকে ধন্য ধন্য সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু যথাকালে বোমা ফাটল: সুভাষ লণ্ডনে লিখে দিল যে আই সি এস চাকরিতে ও ঢুকবে না। লিটল সাহেব তখন ভারতীয় আণ্ডার সেক্রেটারি: ওকে ডেকে পাঠিয়ে বোঝালেন অনেক করে যে আই সি এস হয়েও দেশের সেবা এ নবযুগে আরো পরিপাটি সুষমার সঙ্গে করতে পারবে। কিন্তু সুভাষের যাকে বলে ভদ্রলোকের এক কথা: "You cannot serve God and Mammon, sir!" সুভাষ হেসে বলেছিল আমাকে, বেশ মনে আছে: "একথা শুনে সাহেবের গোরা মুখ হয়ে উঠল টকটকে লাল, বোধহয় তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, এ ধরনের সাফ জবাব কোনো ভারতীয় দিতে পারে কোনো সাহেবকে। কিন্তু তিনি রাগ দমন করে বললেন: 'হঠকারী হয়ো না ইয়ং ম্যান! বিপদে পড়বে।' আমি মৃদু হেসে বললাম: 'বিপদ তো? তার জন্যে প্রস্তুত আছি স্যার।'"

ইংলণ্ডে সব ভারতীয়দের মধ্যেই রটে গেল সুভাষের মহাকীর্তি: লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, গ্লাসগো, বার্মিংহাম—কোথায় নয়!—আই সি এস-এর মতন রাজপদ—মাত্র আট মাসে পাস করেই ইস্তফা দেওয়া! সবাই জয়ধ্বনি করে ঘোষণা করল সমানে: "জয়তু দেশভক্ত!"

কিন্তু ভারতীয় ছাত্ররা সুভাষের এ-কীর্তিতে উচ্চ পুলকিত হয়ে তাতে ওর
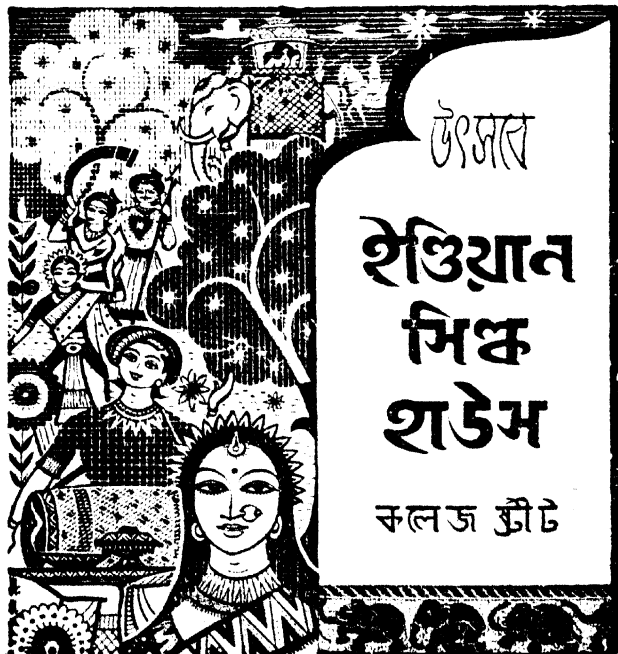
পিতৃদেব উঠলেন বিচলিত হয়ে। তিনি ওকে দীর্ঘ পত্র লিখলেন, তার মর্ম এই যে, ওটেন সাহেবকে মারার পর থেকেই ও পুলিসের নজরবন্দী হয়ে আছে, তার উপর যদি আই সি এস-এ ইস্তফা দেয় তবে বম্বেতে জাহাজ থেকে নামতে না নামতে ওকে হাতে বালা প'রে হরিণবাড়ি রওনা হতে হবে, বাপের বাড়ি হয়ে দাঁড়াবে অতীতের স্মৃতি। তাই—তিনি লিখলেন—সুভাষ অন্তত দেশে ফেরার আগে যেন চাকরি না ছাড়ে। উত্তরে সুভাষ তাঁকে লিখল যে, আই সি এস চাকরিতে ঢুকতে হ'লে সব আগে দাসখত লিখে দিতে হয় বৃটিশরাজকে প্রভু ব'লে অঙ্গীকার ক'রে। একটা আদর্শ নিয়ে যে দেশের কাজে নামতে যাচ্ছে সে শুরুতেই মিথ্যা শপথ করে কোন মুখে? এইরকম আরো অনেক কথাই লিখল। উত্তর দিলেন ওর এক দাদা, তার মর্ম এই যে, সুভাষের পিতৃদেব অসুস্থ, সে দেশে ফিরেই ফের জেলে গেলে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে। সুভাষ শুষ্কমুখে একদিন আমার বাসায় এসে এ চিঠিটি দেখালো।

আমি (একটু চুপ ক'রে থেকে): তাহলে কী করবে এখন?

সুভাষ (আশ্চর্য হয়ে): কী করব? মানে?

আমি (ইতস্তত ক'রে): মানে...এখনো সময় আছে...তোমার......ইয়ে......ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার—

সুভাষ (উদ্দীপ্ত): মানে, চাকরিতে ঢুকব? দিলীপ! এমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করতে পারলে?

আমি: কিন্তু তোমার পিতৃদেব যে অসুস্থ—

সুভাষের চোখ চিকচিক্ ক'রে উঠল, কিন্তু সামলে নিয়ে বললঃ "জানি ভাই। কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রিয় পরিজনের কথা ভেবে পদে পদে আদর্শ ঠিক করতে হ'লে সে-আদর্শ যে কেমনতর হবে একবার ভেবে দেখেছ কি? না, আমি সে কথা ভাবছি না।

আমি: তবে?

সুভাষ: ভাবছি...আমি এখন ফিরে যাব কেমন ক'রে? এর উপরে বাবার কাছে আর এখন জাহাজের ভাড়া চাইতে পারি না।

আমি (উদ্দীপ্ত হয়ে): সুভাষ, তুমি কি ভুলে গেলে যে, আমি এখনো বেঁচে আছি? আর আমার মাথার উপরে এমন কেউ নেই যিনি আমার স্বাধীন ইচ্ছার পথ আগলে দাঁড়াতে পারেন। আমি পূর্ণ সাবালক—স্বাবলম্বী।

সুভাষ আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার নিল। সে যে কী তৃপ্তিতে আমার মন নীল নিটোল হয়ে উঠল...সুভাষের একটুও কাজে আসতে পারা—এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

কয়েক সপ্তাহ বাদে ও একদিন সকালে আমার কাছে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল যে, ইণ্ডিয়া অফিসের কর্তারা খবর পেয়েছেন কে ওকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। আমি কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সুভাষ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল পাছে আমিও পুলিসের কুনজরে পড়ে যাই ব'লে। আমাকে ও বরাবরই এ-জাতীয় উপদ্রব থেকে বাঁচাতে চাইত—আরো এই জন্যে যে, রাজনীতির মহিমাকে আমি কোনোদিনই সুনজরে দেখতাম না, ওকে প্রায়ই বলতাম, কিনা রাজনৈতিক আখড়ায় অবতরণ ক'রে মিথ্যার সঙ্গে পদে পদে আপস ক'রে চলা ওর উগ্র বিবেকী স্বভাবের পক্ষে হবে পরধর্ম—কাজেই ভয়াবহ। ও বলতঃ "কিন্তু রাজনীতির আখড়াতেই তো দেশভক্তির আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভাই! নইলে সে-আখড়া যে হয়ে উঠবে কুকুরের লীলাভূমি।"

একথা আমাকে মানতেই হ'ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির আখড়ায় যে মহত্তম মানুষকেও পদে পদে মিথ্যাবাদী হ'তে হয়েছে এ-সত্যকেও সুভাষ অস্বীকার করতে পারত না। কাজেই শেষ পর্যন্ত এ-তর্কের কোনো নিষ্পত্তিই আমাদের মধ্যে হয়নি—শুধু পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে-টুকু সত্য আছে তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করা ছাড়া। কিন্তু এ-অতল সমস্যার তল পাওয়ার বিড়ম্বনা ছেড়ে ফিরে আসি ফের হারানো খেই ধরতে।

আজকের দিনে সুভাষের আই সি এস ত্যাগের মতো আন্দোলন পড়লে বড় জোর মনে হয়ঃ "চিত্তাকর্ষক বটে!" কিন্তু সে-যুগে এ আন্দোলন এমনই ক্ষেপে উঠেছিল যে, সুভাষ বাইরনী ঢঙে বেশ বড় গলা ক'রেই বলতে পারতঃ "I awoke one morning and found myself famous!"

ফেমস বলে ফেমস! লণ্ডনে কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্ররা একজোট হয়ে ওকে অভিনন্দন পাঠালো ঢাক বাজিয়ে। একজন মনকবি-যশঃপ্রার্থী আরো এক টান চালালেন—বুঝি উঠে টেনিসনের বিখ্যাত

Cannon to the right of them,
Cannon to the left of them,
Cannon in front of them,
Volleyed and thundered—

[illegible] এর অনুকরণে লিখলেন (সে সময়ে এ-কবিতাটি পড়তে না পড়তে কিন্তু আমাদের চোখে দেশপ্রেমাশ্রু বইছিল একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না):

Bullets all round him hiss,
But fall his feet to kiss,
This occasion we never can miss,
To thee, O hero, we bow!
On, on the tyrants to fight!
Behold: Gone, gone is the night!
Trample on them in delight!
Hark: calls the new sunglow!

এ-কবিতাটি পেয়েই সুভাষ "ননসেন্স" বলে ছিঁড়ে ফেলে আর কি—আমি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার ডায়ারির মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখি হারিয়ে গেছে—নৈলে সবটাই উদ্ধৃত করতে পারতাম। শুনে সুভাষ হেসে বলেছিলঃ "আপদ গেছে!" কারণ তাকে হিরো হয়ে ভুগতে হয়েছিল কম নয়। যেমন, একদা আর এক সেণ্টিমেণ্টাল ছেলে আরো উচিয়ে উঠে আমাকে এসে বললঃ "আপনি ওর বিশেষ বন্ধু, ওঁকে বলতে হবে যে, আমরা ওঁকে নিয়ে শোভাযাত্রা করব বাকিংহাম প্যালেসের সামনে।"

একথা সুভাষকে বলতেই সে রেগে লাফিয়ে: "যত সব বাজে হুজুগ! এ আনন্দে

কি রা ত

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কোথায় যাবে—যাও না!
নগরছাড়া তেপান্তরে
ঊর্মিমুখর নীল সাগরে—
অথবা দূর পাহাড় পারে
—হদিশ খুঁজে পাও না?

ক্লান্তি, ক্লান্তি, ক্লান্তি।
কোথায় গেলে একটু মেলে
বুকজুড়ানো শান্তি!

হা-হা-করা দুঃসহ তাপ
বোঝা-বওয়া এই অভিশাপ
বিষম জ্বালা—ছটফটানির ক্লান্তি।

হায়, হায় রে অবোধ ভ্রান্তি!
এই ঘর, এই ছোট্ট উঠান—
পায়রা-চড়ুই নোটন-নোটন,
দুঃখ-সুখের ছই-পাটাতন
—জীর্ণ ছুঁতে চাও না?

যেথায় খুশী, যাওনা!
আছেই আছে বুকের নীচে
হুল-ফোটানো দারুণ বিছে,
ধ্যান ভাঙাবে যখন-তখন
অন্তবিহীন পাওনা।
যতই প্রলেপ দাও না।

আ র্তি

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময়-সৈকতে বসে যে-নিঃসংগ পাখি
তোমাকে শোনাবে বলে গান বুনে চলে অবিরাম;
অশ্রুর অক্ষর দিয়ে লিখে রাখে যে তোমার নাম,
কোনোদিন তাকে তুমি চিনে নেবে নাকি!

তামসী রাত্রির বুকে একাকী যে-পাখি
করে দীপ্ত সূর্যের সাধনা;
তোমার আকাশ হোক হিরণ্ময়—এই যার একান্ত কামনা;
কোনোদিন তাকে তুমি চিনে নেবে নাকি!

কাঁটার যন্ত্রণা সয়ে যে-বিষণ্ণ পাখি
ফোটায় অজস্র ফুল, মনে আনে রঙের প্লাবন,
বসন্তের জাদুমন্ত্র করে উচ্চারণ;
কোনোদিন তাকে তুমি চিনে নেবে নাকি!

ধূপের মতন পুড়ে যে-বিমর্ষ পাখি
তোমার আকাশে মৃদু সৌরভ ছড়ায়
ভালোবেসে হৃদয় ভরায়;
কোনোদিন তাকে তুমি চিনে নেবে নাকি!

ব্যথার সাগরে ডুবে সংগীহীন যে-স্বর্ণপক্ষ পাখি
মুক্তো ভরে নিয়ে আসে মনের সম্ভার,
তোমাকে পরাবে বলে গাঁথে বসে সাতনরী হার;
কোনোদিন তাকে তুমি চিনে নেবে নাকি!

স ব চে য়ে আ শ্চ র্য

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

সব চেয়ে আশ্চর্য এই জীবনকে বেশি ভালবাসা
এ-প্রেম একান্ত অন্ধ এ জানেনা মৃত্যুদূত তার
প্রতিটি পায়ের দাগে পা ফেলে চলেছে, তার আশা
তখনো মরেনা যেন, যখন সে ক্ষুব্ধ হাহাকার
ছড়ায় আকাশে কাঁধে তুলে নিয়ে তারই শবাধার
যার জন্য উদয়াস্তে এত কাঁদা এত তার হাসা
এত চেষ্টা প্রাণপণ, খড় খুঁটে সাজানো সংসার।

তৃষ্ণা যে মেটেনা—শুধু রুদ্ধ ক্ষোভ বুকের পাঁজরে
জ্বলে দিনরাত্রি যার জ্বালায় এ অস্থির সাগর
তীরের বালুকে ভাঙে, মাথা খোঁড়ে গাঢ় অন্ধকারে
ফেনায় হাজার মণি দোলায়, এ-ক্ষিপ্ত অজগর
ক্রমশ সমস্ত টানে, তবুও যে আকাঙ্ক্ষা দুর্মর
সে চায় এ-স্মৃতি ভুলতে, আলো জেলে দেখতে বারে বারে
সেই সর্বনাশা মুখ, সেই দুটি চোখ ভয়ংকর॥

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

ছয়

সবুজপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল যে, ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, কেননা, অধিকাংশ লেখা রবিবাবুর আর প্রমথবাবুর। বীরবল নাম ছাড়া প্রমথ চৌধুরী যে আর-একটি ছদ্মনাম (ভূপেন্দ্র মৈত্র) গ্রহণ করে লিখছেন, এ-সত্যও সাহিত্যিক মহলে জানা-জানি হয়ে যাওয়ায় সবুজ-দলের সংখ্যা যে কম, এ-ধারণা পরিপুষ্ট হচ্ছিল। যে-গুরুর শিষ্য-সংখ্যা সামান্য, সে-গুরুর গুরুত্ব কোথায়? যাতে এই প্রকার নব-সাংখ্য-দর্শন বঙ্গসাহিত্য মানসে স্থিতিশীল না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সবুজপত্র এক সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করল স্বাধীনতার ভাব নিয়ে, যেন সবুজ-দল [illegible] হতে চলেছে। সেই সংখ্যারই সম্বন্ধে প্রমথবাবু তাঁর ১৩।২।১৭ তারিখের চিঠিতে আমায় লিখলেন: "এবারকার সবুজপত্রে নূতনত্বের ভিতর তাতে আমার কিংবা রবিবাবুর একটি লেখাও নেই, সব তোমাদের।" ফলে শিষ্যদের মাথায় গুরুভার অর্পিত হল। আমরা বেশি করে লিখতে আরম্ভ করলুম।

কিন্তু কি লিখি? "মুদ্রাদোষ" কথাটা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, সে-সম্বন্ধে কিছু লিখলে হয় না? মুদ্রাদোষের অনেক অর্থ, এবং বহু অনর্থও তাতে [illegible], সুতরাং প্রসঙ্গটা [illegible] বড় জোর। মুদ্রা শব্দের অর্থ যদি অর্থ হয়, তবে দোষ-গুণ বিচার করার অধিকার সকলেরই আছে, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে। এবং যেহেতু সে-বিচারে নানা মুনির নানা মত, সেহেতু তা নিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা যায়, যতক্ষণ কলম চলে। রাজা রাধাকান্ত দেবের "শব্দকল্পদ্রুমে" পাই:—

"মুদ্রা—স্ত্রী। প্রত্যয়কারিণী। নামের মোহর ইতি ভাষা। ইতি হেমচন্দ্রঃ। অঙ্গুলি মুদ্রা। ছাপের আংটি ইতি ভাষা। ইতি শব্দরত্নাবলী ॥ [illegible] ॥ [illegible] টাকা ইতি ভাষা। ইতি মেদিনী। [illegible] ছাপার অক্ষর ইতি ভাষা।"

সুতরাং ছাপার অক্ষর অর্থে মুদ্রা শব্দ প্রচলিত এবং মুদ্রাদোষ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পূর্বেই বলেছি, সবুজপত্রের প্রুফ-সংশোধন-কার্যে [illegible] আব-হাওয়া অনুকূল ছিল। ফলে ছাপার ভুল বড় একটা হত না। বাল্যাবস্থায় আমার বাড়ির পণ্ডিত মহাশয়ের (রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন) মুখে শোনা একটি গল্প বলি: 'ছোট একটা ব্যাকরণ ছাপাচ্ছিলুম। পাণ্ডুলিপিতে উদাহরণ ছিল, "রামকল্যাণী ভবতঃ"। কম্পোজিটারকে ডেকে বললুম, দু-দুবার প্রুফ দেখে দিয়েছি, তবুও 'ভবতঃ' স্থানে 'ভরতঃ' করলে? কম্পোজিটারের স্পষ্ট উত্তর এল, পণ্ডিত-মশাই, আপনার মাথা খারাপ হয়ে থাকতে পারে, আমার ত হয়নি; রাম-লক্ষ্মণ রয়েছে, আর ভরত থাকবে না?'—

কত মজার মজার ছাপার ভুল খবরের কাগজে বেরোয়, মনে পড়ছে, এ-প্রসঙ্গ একদিন আলোচনা করেছিলুম [illegible] খাবার টেবিলে বসে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, শিল্পী [illegible] কুমার চৌধুরী, দিলীপকুমার রায় আর [illegible] অধ্যাপক [illegible] (Lesny), যিনি [illegible] সংস্কৃত পড়াতেন। [illegible] যদি [illegible] বছর ধরে ঐ প্রকার মুদ্রাদোষের কাটিং জমিয়ে রাখি, তাহলে একটা [illegible] প্রবন্ধের খোরাক জোগাতে পারে [illegible]। [illegible] করা হয়নি, কেবল দু-চারটে উদাহরণ স্মৃতিপথে [illegible] রয়েছে।

সম্পাদকের কাজ সুসম্পন্ন করতে গেলে সে-কালের প্রত্যেক অংশীদারকে ভাষা-জ্ঞানী হতে হবে। সম্ভবতঃ এই কারণে স্টেটসম্যানের ভাষা সুন্দর এবং মুদ্রাদোষ সামান্য। ঐ সংবাদপত্র আমার নিত্য পাঠের মধ্যে থাকায় ওতে যে-সব ছাপার ভুল নজরে পড়েছিল, সেগুলোকে কিছু কিছু মনের কোণে জমিয়ে রেখেছি। দুটো দৃষ্টান্ত দিই: একবার সংবাদ পড়লুম যে, বরোদার মহারাজা ও মহারানী দুটি পার্টি দিয়েছেন, তন্মধ্যে "The Maharani's party was attended by evil officers only"! বুঝলুম, 'civil'কে evil দাঁড় করিয়েছেন কোন printers devil, এবং সেই ভূত এখানে অ-ভূতপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছে।

স্টেটসম্যানে আর-একটি রস-ঘন ছাপার ভুল হয়, যখন লর্ড রেডিং ভারতের রাজ-প্রতিনিধির পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। রেডিংকে তখন নানা সভা-সমিতি থেকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল। তদুপলক্ষে স্টেটসম্যানে একটি ছবি বেরোয়, যাতে রেডিং সাহেবকে কলকাতার ময়দানে ঘাসের ওপরে বসে থাকতে দেখা যায়। ছবির নীচে ছাপার অক্ষরে যে-বর্ণনা বেরিয়েছিল, তার শেষ কথা বিশেষ স্মরণীয়: "His Excellency is seen sitting on the maiden"!
ময়দানের ইংরেজী বানান m-a-i-d-a-nকে যিনি m-a-i-d-e-nএ পরিণত করেছিলেন, তিনি কোন্ অপ-দেবতার প্রসাদ পেয়েছিলেন, তা আমার জানা নেই। তবে তাঁকে অপূর্ব শৃঙ্গার রসের সৃষ্টিকর্তারূপে গণ্য করা যায়।

ইংরেজী আর-একটি সংবাদপত্র বেরুত, যার নাম ছিল "হিন্দু পেট্রিয়ট"। রাধানাথ সিকদার সম্বন্ধে একদিন খবর ছাপা হল:
We understand Babu Radhanath Sikdar has taken poison.
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর এক বইয়ে এ-উক্তির সত্যতাকে সন্দেহ না করে লিখেছেন: এই সময়ে রাধানাথ সিকদার বিষপান করেন, কেননা, আমরা অমুক তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে পাই......। এখানে যে pension কথাটি poison রূপ ধারণ করেছে মুদ্রাদোষবশাৎ, এ-ধারণার উদয় আমার মনেও হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমার একজন আত্মীয় শ্রীঅরবিন্দ মিত্র, যাকে আমরা পাগল বলে ভাবতুম। বাগল মহাশয়ের পুস্তকটি আমায় সমালোচনা করতে দিয়েছিলেন [illegible] অমল হোম Calcutta Municipal Gazette-এর জন্য। সে-সমালোচনায় আমার উক্ত মন্তব্য যথাযথ মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও বাগল মহাশয়ের বেশ কিছু সময় লেগেছিল ঐ ছাপার ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে নিতে।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। যতদূর স্মরণ আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে পাইকপাড়া রাজ-বাড়িতে এক সম্মেলন হয়, সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম ছাপা হল আনন্দবাজার পত্রিকায়। সে-তালিকায় আমার নামও ছিল, তাই সগর্বে সেটি দেখালুম আমার ভাগ্নী উমা মিত্রকে (এখন গীতশ্রী উমা দে)। উমা হেসে বললে: এ কি! আপনাকে ত পাগল বলেছে। এই দেখুন—"যোগেশচন্দ্র পাগল হারীতকৃষ্ণ দেব।"

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, যোগেশ-চন্দ্র বাগল হচ্ছেন একজন সাহিত্যিক, তাঁর পদবী ভুল করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু উমা তা মেনে নিলে না। বললে: উঁহু! যোগেশচন্দ্র হচ্ছে তাঁর নাম (যেমন নির্মল-চন্দ্র), আর আপনি হচ্ছেন পাগল!

দুই নামের মধ্যে কোনো 'কমা' না থাকায় এ-সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করতে পারলুম না। উমার বাবা (শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, এখন বেঙ্গল কার্ডবোর্ডের কর্তা) আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আনন্দবাজারের অফিসে। সেখানে প্রফুল্ল সরকারের কাছে আমার করুণ কাহিনী বর্ণনা করায় তাঁর মন ভিজল বটে, কিন্তু তিনি জানালেন যে, বাগল পদবী ইতিপূর্বেও পাগল হয়ে বেরিয়েছে, যোগেশবাবু নিজে পদবীটি ত্যাগ না করলে তিনি নিরুপায়।

এখন যে "দেশ" পত্রিকা ছাপা হচ্ছে, তার মধ্যেও মুদ্রাদোষ যে নেই, একথা বলা চলে না। আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধেই তার ধারা বহমান। আমি লিখেছিলুম, "মাধ্যন্দিন সবন", মুদ্রাকর সেটাকে করলেন "মাধ্যন্দিন সেবন" (গত ৪ঠা বৈশাখের 'দেশ' দ্রষ্টব্য)। বৈদিক যুগের একপ্রকার যজ্ঞকে "সবন" বলা হত। বর্তমান যুগে অবশ্য প্রায় সকলেই সবনে উদাসীন এবং "সেবন" অর্থাৎ উপভোগে রত। সুতরাং এ-ছাপার ভুলকে হয়ত মুদ্রাদোষ আখ্যা দেওয়া অনুচিত, বরঞ্চ ওটাকে যুগধর্মের জ্ঞাপক-চিহ্ন বলা যায়।

কিন্তু আর-একটি নিঃসংশয় মুদ্রাদোষ ঐ পাতায় দেখা যায়, যার প্রতি আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। দুটি বৈদিক দেবতা, মিত্র ও বরুণ, প্রায়ই যুগ্মভাবে স্তুতিলাভ করেছেন ঋগ্বেদে, এবং দেবতা-দ্বন্দ্বের আশঙ্কা না রেখেই আমি তাঁদের যুগ্ম উল্লেখ করেছিলুম পাণ্ডুলিপিতে। সেই 'মিত্র-বরুণ' শব্দটি 'মিত্র-করুণ' রূপ ধারণ করায় যে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে, সে-রসকে বৃষ্টির দেবতা বরুণের দান হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব, কেননা, অশ্রু-জল কখনো জল-দেবতার অনুগ্রহপ্রসূত হয় না, এবং সূর্যকে 'মিত্র'রূপে না পেলে আমি আজ মর্মাহত। তবে ছাপাখানার বিরুদ্ধে এতটা কড়া নালিশ করায় হয়ত আমারই ভুল হচ্ছে। যে-ডালে বসে আছি, সেই-ডাল কাটা নিরাপদ নয়।

সবুজপত্রের জন্যে যে মুদ্রাদোষ প্রবন্ধটা ফেঁদেছিলুম, সেটা সম্পূর্ণ করতে না পারায় তা ছাপার অক্ষরে বেরোয় নি। ভালোই হয়েছে। মতলব ছিল, তার মধ্যে কিঞ্চিৎ গুরু-নিন্দা করি। প্রমথবাবু কথায় কথায় বলতেন, "বুয়েসুন্"। এ-শব্দ যে 'বুঝেছেন' শব্দের মৌখিক আকার, সে-সত্য সকলেরই জানা ছিল। উনি যখন-তখন 'বুয়েসুন্' বলাতে আমরা মনে-মনে হাসতুম। এরকম মুদ্রাদোষ অনেকেরই আছে। সে-কালে সত্যেন বোসের মুখে 'ইয়ে' শব্দটি বার-বার শুনেছি, কিন্তু শুনে কখনো ভুল বুঝিনি। "ইয়ের কাছ থেকে ইয়েটা নিয়ে এসে ইয়ের কাছে দিও"—বৈজ্ঞানিকের মুখে এরকমের কথা শুনলেও আমরা আজ্ঞেরা-বাদের দোহাই দিতুম না। সে যাই হক, প্রমথবাবুর ২০।২।৫৭ তারিখের চিঠিতে যে সতর্কবাণী ছিল, সে-বাণীকে অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নয়। উনি লিখেছিলেন: "মুদ্রাদোষের মাত্রা বেশি হলে সহৃদয় পাঠকের মনোরঞ্জক হবে না।" সুতরাং এখানেই দাঁড়ি টানা শ্রেয়।

ঐ চিঠিতে আর দুটি নতুন কথা পাওয়া যায়—ওঁর ওখানে রাত্তিরে আহার করার নিমন্ত্রণ, আর সেখানেই দিনেন্দ্রনাথের গান শোনার দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ। দিনেন্দ্রনাথ সাধারণের কাছে দিনু ঠাকুর নামে পরিচিত। দিনু ঠাকুরের পিতা দ্বীপু ঠাকুরকে বাবার কাছে আসতে দেখেছি, কিন্তু দিনু ঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সবুজ-সভায়। দুজনেই ছিলেন দিল্-খোলা মানুষ। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ধরে তুলে নিতেন দিনেন্দ্রনাথ। তবে তাঁকে কেবল রেকর্ড-কীপার বলা যেতে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাঁর অবদান অনেক কিন্তু ঠিক কত, তা বলতে পারি না। কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রের সহযোগিতায় যে সঙ্গীত সৃষ্ট হয়, তার মধ্যে যন্ত্রশিল্পীর প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। [illegible] ... সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

দিনুদাদার আর-একটি গুণের কথা বলি। তিনি ছিলেন হাস্য-রসিক। মনে আছে, [illegible]

প্রমথবাবুর চেহারায় এমন একটা জলুস ছিল যে, কল্পনা করতে পারতুম না, তাঁর দেহে কোনো ব্যাধি আছে। তাঁর ৮।৩।৫৭ তারিখের পত্রে আমার ভুল ভাঙল। সে-দিন দোল-পূর্ণিমা এবং আট দিন বাতে ভুগে তিনি উপবাসী হতে বাধ্য হয়েছেন, এ সংবাদ পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছিলুম। অবশ্য তাঁর শরীর সুস্থ থাকলেও তিনি দোললীলার উৎসবে যোগদান করতেন না, নিশ্চয়। তিনি সর্বদাই নিজের মনকে দোল দিতেন। আমাদের মনকেও রাঙা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যেত তাঁর ভাবার পিচকারি। অবশ্য দোললীলাক্রমে বসন্তোৎসবের দিনে উনি বাতরোগাক্রান্ত, বিধির একি বিড়ম্বনা! শুধু একটা আশার কথা ঐ পত্রের শেষাংশে ছিল: "আসছে রবিবারে এখানে এসো, তাহলে চাই কি রবিবাবুরও সাক্ষাৎ পেতে পারো।" যিনি ঋতুরাজের গুণগান করতেন, বসন্তোৎসবকে যিনি কাব্য-সাহিত্যে নূতন স্থান দিয়ে গেলেন, তাঁর সশরীরে উপস্থিতিতে তাঁর বহু স্নেহপাত্র কি পরিমাণে আনন্দিত হয়েছিলেন, তা জানি না, কারণ আমি রবি-বাসরে উপস্থিত হতে পারিনি, কেবল পত্রের দ্বারাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলুম।

(১৯)

১ ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
২০।২।৫৭

কল্যাণীয়েষু,

[illegible] তোমার লেখা [illegible] হয়েছে। [illegible] বেশি বাড় করো না, কেননা, মুদ্রাদোষের মাত্রা বেশি হলে সহৃদয় পাঠকের মনোরঞ্জক হয় না।

আসছে শনিবার রাত্তিরে আমার এখানে এসে যদি আহার করো তো খুসী হই। [illegible] থেকে দিনেন্দ্রনাথ এসেছেন এবং তাঁর গলা ঠিক আছে এবং তোমার তাঁর গান শোনা যাবে। যদি এসো ও তাঁর সময় না কুলোয় উপস্থিত হয়ে সঙ্গে নিয়ে আসব। [illegible] আমিই করে [illegible] আসতে বলেছি। লেখাটা অবশ্য সঙ্গে এনো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

(২০)

১ ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
৮।৩।৫৭

কল্যাণীয়েষু,

আজ দোল। এদিন সকলের পক্ষে উৎসবের হলেও আমার পক্ষে উপবাসের। কেননা, আমি আজ আট দিন হতে অসহ্যে ভুগছি। জ্বরজ্বালা নয়—বাত—সুতরাং ব্যথাটা মাথায় না চড়ে পিঠের উপরে চেপে বসে আছে। সে যাই হক, আশা করছি দু-একদিনের মধ্যেই এই অসভ্য ব্যাধিটাকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলব।

যদি পারো আসছে রবিবারে এখানে এস, তাহলে চাই কি রবিবাবুরও সাক্ষাৎ পেতে পারো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

(ক্রমশ)

যাওয়া কাঁচি সিগারেটটা বের করল, দুই মুড়োয় দুবার ফু ফু করল, দেশলাইয়ের জন্য পকেট হাতড়াল পেলো না, কি যেন ভাবল একবার।

তারপর সুধাময়কে ডাক দিল, ও ভদ্দর-লোক, আসেন দেখি ইদিক, ম্যাচ আছে?

সধাময়ের কাছে দেশলাই ছিল না, সিগারেট জ্বালান কল ছিল। এগিয়ে তাই জেবলে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

ড্রাইভার তো অবাক।

বলল, বা বা বা, খাসা, ইডাতো ভারি জবর কল রে মশাই? পালেন কনে?

সুধাময় বলল, কলকাতায় কিনেছি।

সিগারেটে জোরে একটা টান মেরে নাক মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ড্রাইভার বলল, আহা, সিগারটের টেস্টোই বদলায়ে গেছে।

পিছন থেকে আবার গলা শোনা গেল, এই যে ময়নাপাখির বুলি ফুটিয়েই দেখাতিছ, তা এই গভ্ভো যন্তন্না আর কতক্ষণ ভোগ করব, ও মটোরওয়ালা।

ড্রাইভার এবার রাজকীয় ভংগীতে ঘাড় ফেরাল। ভালভাবে যেন প্যাসেঞ্জারদের একবার ওজন করে নিল।

গম্ভীরভাবে বলল, এ আপনাগের বাতো ঘুড়ার গাড়ি না, মটোর। সিডা ভুলে যাবেন না। এসব যন্তরের কারবার, টাইম হলি তারপরে ছাড়বে।

পিছন থেকে কে যেন ভেংচিয়ে উঠল, এঃ, মোটেই চুল নেই তার আবার চৈতন্যের বাহার! গাড়ি চলে কই যে, তার টাইম দেখাতিছ।

ড্রাইভার এবার চটে গেল। বলল, ইডা কুণ্ডু কোম্পানীর গাড়ি সিডা মনে রাখবেন। কুণ্ডু কোম্পানীর গাড়ি চলে না এ অপবাদ তার শত্তুরিউ দিতি পারবে না।

—আহা হা, চলার কি ছিরিরে, অদ্দেক পথ ঠেলতি ঠেলতিই নিয়ে আলাম।

ড্রাইভার বলল, ইডা মোষ না, মটোর, তাই শুনি? হাবড়ে পড়লি রাজার মটোরও ঠেলতি হয়।

তারপর সুধাময়কেই যেন সাক্ষী মানল ড্রাইভার।

—ও ভদ্দরলোক, আপনিই কন তো, কলকাতার লোক কি করে? গাড়ি কাদায় পড়লি ঠেলে না?

সুধাময় হাসি চেপে বলল, কাদায় পড়লে হাতি ঠেলতে হয়, আর এ তো মটোর।

ড্রাইভার বলল, শোনেন, একজন বিশিষ্ট ভদ্দরলোকের কথাটা মন দিয়ে শোনেন একবার। কুণ্ডুবাবু যে বলেন, মানষির উপগার করতি নেই, কথাটা ঠিক। এইসব মটোর গাড়িরউ যে-টুকু কৃতজ্ঞতা বোধ আছে, মানষির তাউ নেই। গাড়ি যে গাড়ি, জল পেট্রোল খাওয়ালি সে-ও সে কথা ভোলে না, তার প্রতিদান দেয়, আর দ্যাখেন মানষির ব্যাভার, নিজির স্বচক্ষি দেখেন, এতখানি পথ যে-গাড়ি চড়ে আলেন এখন তারই বদনাম গাচ্ছেন সব। সে গাড়ি নাকি চলে না। আরে চলে না তো তোগের আনল কিডা এতদুর টানে?

ড্রাইভার খুব চটেছে। সুধাময়ের মনে হল, এই অবস্থায় ছাত থেকে তার বাক্স বিছানা নামাবার কথাটা খুব মোলায়েম করে বলে ফেলবে কিনা।

এমন সময় ড্রাইভার আবার মুখ খুলল।

—বোঝলেন, কুণ্ডুবাবু যে বলেন, মানষে একের নম্বরের স্বাথপর, কথাটা ঠিক। নিজির সুবিধেডা পায়ে গেলিই হল, নিজি বাড়ি পৌঁছয়ে গেলিই হল, তারপর যা হয় হোক, থাক শালা তুই পড়ে। কি কন

সুধাময়কে আবার সাক্ষী মানল ড্রাইভার। এবং সুধাময়কে সায়ও দিতে হল।

—এই হল প্রকিত ভদ্দরলোকের ব্যাভার। দ্যাখেন, আপনারা সবাই নিজির নিজির স্বচক্ষিই দ্যাখেন।

এমন ট্যাটনের পাল্লায় আগে কখনও পড়েনি সুধাময়। বাড়ি যাবার জন্য মনটা ছটফট করছে। কৌতূহল ফেটে পড়ছে বুড়ির ছেলেটা দেখবার জন্য। বুড়ির আবার ছেলেও হল, সেই বুড়ির, সাত চড়ে যার মুখ দিয়ে রা বেরত না। বিয়ের আগে দিনরাত যে কাঁদত। সুধাময়ের যে ছিল খেলার সাথী। সুধার থেকে ছয় বছরের ছোট বুড়ি। দুজনে খুব ভাব। দু বছর আগেও সুধাময় বুড়িকে দেখেছে। এখন মা হয়ে কেমন চেহারা হয়েছে? কণ্ডাক্টার ব্যাটা এলে যে বাঁচে সুধাময়।

ড্রাইভার আবার ডাকল। সুধাময়কে বলল, ভদ্দরলোক কি গাছে ফলে মশাই? ব্যাভার দেখে টের পাওয়া যায়। শুকনো খটখটে রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, জলে পড়েনি কেউ, তার মধ্যিই সব বসে আছেন, তারই ঠ্যালা এই, বচনের চোটে তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না। সত্যি সত্যিই যদি জলে পড়ত গাড়ি তালি বোধ হয় বাবুরা আমার গলাডাই টিপে ধরতেন।

পিছনের সীটগুলোয় যারা বসেছিলেন, ড্রাইভার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। আরেকটা চ্যাপটানো সিগারেট বের করল পকেট থেকে। টিপে টুপে মেরামত করে নিয়ে দুদিকেই বেশ করে ফু দিয়ে নিল। তারপর সুধা-ময়কে চোখ মেরে বলল, ও ভদ্দরলোক, আপনার ওই খাচাকলটা জ্বালান দেখি আরেকবার, সিগারেটটা ধরায়ে নিই।

সিগারেটটা ধরিয়ে জোরে জোরে টান মেরে নাক মুখ দিয়ে ড্রাইভার ধোঁয়া ছাড়ল গলগল করে। ডান হাতের দু আংগুলে সিগারেট ধরা ছিল। মাঝে মাঝে তুড়ি মেরে ছাই ঝেড়ে নিচ্ছিল।

বলল, জলে কি পড়ে না গাড়ি? পড়ে। কলকব্জার মন তো। বোঝলেন না? এই আমার মতন পাকা লোকের হাতেও গাড়ি গিয়ে খানার জলে পড়িছে। এই সুহাগিনী, ইনিই পড়িছেন। তাও বরযাত্রির বুঝাই করে। পরহাটির মজুমদাররা বিয়ে করতি শৈলকুপোয় যাবেন। ভরা বর্ষা। ওনারা আবার কুণ্ডুবাবুগের উকিল। শখ হল মটোরে করে বিয়ে করতি যাবেন। কুণ্ডু-বাবুরি ধরলেন, মটোর চাই। কুণ্ডুবাবু আমারে কলেন, জগবন্ধু, আর কারুর উপর আমার বিশ্বাস নেই। গাড়ি আমার আরউ আছে, ড্রাইভারেরও অভাব নেই। কিন্তু শৈলকুপোর যা রাস্তা, বিশেষ করে এই ভরা বর্ষায়, সুহাগিনী ছাড়া কারুর সাধ্যি নেই এক পা নড়ে। তুমি ছাড়া এসব রাস্তায় কেউ তো গাড়ি চালাতিই পারবে না। তা গেলাম। ফিরবার সুমায় সুহাগিনী খানায় গিয়ে পড়ল। বুঝে দেখেন। তিন ঘণ্টা আমরা এক গলা জলে বসেছিলাম। কিন্তু কেউ টুঁ শব্দ অবিদ করিছে, কেউ বলুক তো। বোঝলেন না, ভদ্দরলোকের চিহারাই অন্যরকম। বোঝলেন এই সুহাগিনী—

—তোর সুহাগিনীর নিকুচি করি।

গাড়ির দরজা ধড়াম করে খুলে পিছন থেকে জনা চারেক প্যাসেঞ্জার হৈ হৈ করে ড্রাইভারের কাছে এগিয়ে এল।

—শালা গাড়ি চালাবার নাম নেই, বসে বসে আমাগের কুষ্টি কাটতিছ।

—এই গাড়ি আজ তুমার পেটের মধ্যি ঢুকোয়ে ছাড়ব।

—কানা ছাওয়ালের নাম পদ্মলোচন। ঘাটের মড়া গাড়ি, তার নাম আবার সুহাগিনী। তোর সুহাগিনীর মুখি মারি লাথি।

সুধাময় হকচকিয়ে গেল। দেখল, এক বুড়ো ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর স্পন্দনহীন শীতল বনেটে মারলেন

ধাই ধাই করে দুই লাথি। একটা ছোকরা এগিয়ে এসে প'ক প'ক করে হর্নটা বাজিয়ে দিল। দু তিনজনে মিলে গাড়ির বাঁডতে পাগলের মত দুম দাম থাপ্পড় মারতে লাগল। ড্রাইভারও প্যাসেঞ্জারদের এই আকস্মিক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে সম্বিৎ ফিরে পেল। কী, তার গাড়িকে অপমান! স্টার্ট দেওয়া হ্যাণ্ডেলটা নিয়ে সে পর মুহূর্তেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। মাথার উপর হ্যাণ্ডেলটা চরকির মত বনবন করে ঘুরোতে ঘুরোতে এগিয়ে গেল কিছুদূরে। প্যাসেঞ্জাররা থেকে সবাই একটু তফাতে হটে গেল। ড্রাইভার প্রচণ্ড রাগে কখনও লাফাচ্ছে, কখনও দাঁত কিড়মিড় করছে।

ড্রাইভারের সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখে সবাই একটু ঘাবড়েও গেল।

—কিডা আমার সুহাগিনীর মুখি লাথি মারল, মরদের বাচ্চা হলি মারুক দেখি আমার সামনে। ঠ্যাংখান এখনই খুলে নিচ্ছি। এতক্ষণ কিডা গালাগাল দিচ্ছিল আমার সুহাগিনীরি. কৈ আগোয়ে আস বাপের বিটা হওতো মুখখানারে একটু পালিশ করে দিই।

ড্রাইভার এক একটা কথা শেষ করে আর মাটিতে ধাই ধাই হ্যাণ্ডেলের বাড়ি মারে। অপর পক্ষ একেবারে চুপ মেরে গেছে। এমন সময় কানে পৈতে গাঁজে কণ্ডাক্টার এসে হাজির। সে তো এবং দৌড়ে আবহাওয়া দেখে তাজ্জব বনে গেল।

জিজ্ঞাসা করল, কী সাপারটা কি?

কণ্ডাক্টারকে দেখে ড্রাইভার হুংকার ছাড়ল, এই শালা পণ্ডা, বিচ্ছিরি কাণ্ড। কাজের খায়ে দায়ে কাজ নেই, না দেখা না শোনা, যারে পালাম গাড়ীতি তুলি বসালাম। দে, সব পয়সা ফিরেয়ে দে। কুণ্ডুবাবুরি বলে এ লাইনি সাভিস বন্ধ করে দিতি হবে।

—ব্যান, হল কি?

—হবে আবার কি তুমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। ঐ যে প্যাসেঞ্জার তুলিছ, ওনারা সুহাগিনীর মুখি লাথি মারিয়েন, এই গাড়ি নাকি ঘাটের মড়া। দে, পয়সা ফেরৎ দে।

পণ্ডা কণ্ডাক্টার ঘুঘু লোক। ব্যাপারটা আন্দাজ করল।

বলল, দাঁড়াও দাদা, দাঁড়াও। এ হল কলকব্জার ব্যাপার। মাথা গরম করলিউ কাজ হবে না, তড়বড় তড়বড় করলিউ না। বুঝে নিই একটু। গাড়িটা থামতিই পেটটায় মোচড় দিল। তাই একটু বাগানে ছুটেছিলাম আর তার মধ্যিই এত কাণ্ড। যান যান, ও ভদ্দরলোকরা, জায়গা নিয়ে বসে পড়েন গে যান। গাড়ির মর্ম আপনারা কি বোঝবেন। এ বেডফোর্ড গাড়ি, উনিশ শ' পাঁচের মডেল। এত ভাল গাড়ি আজকাল পাবেন কনে? বয়েস হয়েছে তো, একটু মিজাজে চলে। আমাগের জগোদার মতন আর কি। এমনিতে মাটির মানুষ, রাগলি পরে মুচিগের কুকুর বলে তফাৎ থাকে। গাড়িটাউ তাই মিজাজ যেদিন ভাল থাকে অক্লেশে চলে, বিগড়োলো তো ব্যস্। সেই গাড়ীর কি যা তা বলে চটাতি আছে? আসেন আসেন, এখন একটু তোয়াজ করে ঠেলে ঠেলে স্টার্টটা করে দেন সবাই। জগোদা তুমি উঠে বস তুমার সিংহাসনে। তুমি হলে রাজা। ছোট কথায় কান দিলি কি তুমার চলে?

দেখতে না দেখতে সব গণ্ডগোল মিটিয়ে দিল কণ্ডাক্টার। সুধাময়ের তোরঙ্গ আর বিছানার বাণ্ডিলটা নামিয়ে দিল। তারপর প্যাসেঞ্জারদের জড়ো করে ছেই'ও, মারো জোয়ান হেই'ও আউর থোড়া হেই'ও বলে সোহাগিনীকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

সুধাময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। লালচে মোটরখানা বড় বড় কড়ুইগাছের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। এখনও লোকগুলো ঠেলছে। এই স্টার্ট হল। শব্দ করে কেঁপে উঠল সোহাগিনী। গাড়িখানা আর দাঁড়াল না বেশ জোরেই এগিয়ে গেল কিছুদূরে। প্যাসেঞ্জাররা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে, এখনও সবাই উঠতে পারেনি। সুধাময় জানে, গাড়ি দাঁড়াবে না, দাঁড়ালেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে আবার। তাই চলতি অবস্থাতেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হবে গাড়িতে। এইভাবেই সুধাময় এখানে এসেছে।

গাড়ি পর্যন্ত এই প্রথম মোটর বাসে এল সুধাময়। দু বছর আগে সে যখন কলকাতায় যায়, তখনও এই লাইনে বাস আসেনি। এবার ফিরলায় এসেই বাস পেল। বাসটা ঝড়ঝড়ে পুরোনো, একথা সত্যি, বার বার ঠেলতে হয়েছে তাও সত্যি তবুও তো ঘণ্টা দেড়েক এসে পৌঁছেছে, গরুর গাড়িতে লেগেছে চার ঘণ্টা লাগত। ঘোড়ার গাড়িতে কমপক্ষেও দু ঘণ্টা।

কাঁপতে কাঁপতে কালো ছিটকাতে ছিটকাতে চোখের আড়ালে চলে গেল সোহাগিনী। এখন আর তাকে খারাপ লাগল না সুধাময়ের। সোহাগিনী আর যাই হোক সভ্যতার কিংকরী তো বটে। হোক না সেকেণ্ড হ্যাণ্ড।

আমরাও কি এক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড সভ্যতার মধ্যে বাস করছি না এখন? হঠাৎ এ প্রশ্নটা সুধাময়ের মগজে ঠেলে উঠল। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সভ্যতা! কথাটা সে ভেবে দেখেনি তো।

ভাববার আগেই সুধাময় দেখল নরা। ছোট একটা লাঠি নিয়ে লাফাতে লাফাতে কোথায় যেন যাচ্ছিল, সুধাময়কে দেখেই এক ছুটে কাছে এসে পড়ল।

—দাদাবাবু, তুমি কি মটোরে আলে?

সুধাময় হেসে বলল, হ্যাঁ। তুই তো দিব্যি বড় হয়ে গিয়েছিস রে।

নরা খুব খুশী হল। বলল, তুমিউ কিন্তুক খুব বাবু হয়ে গেছ।

সুধাময় হা হা করে হেসে উঠল।

—বলিস্ কি রে?

—ঠিক বলতিছি, পেত্যয় না হয়, আয়নায় দেখে নিও। খুব সুন্দর হইছ তুমি।

সুধাময়ের খুব ভাল লাগল কথাটা। আদর করে নরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। বলল, চল বাড়ি যাই। এই বাক্সটা নিতি পারবি তুই?

নরা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

(ক্রমশ)

প্রাকৃত কবিতা

বিষ্ণু দে

মাসী, তোর কথা বেঁধে রাখ্ তোর খোঁপায়,
আমার ও কালো কম্বলই ভালো,
যতবার ধোবে রংছুট নয়, পাকা।

মাসী তুই বৃথা বকিস্, আমের ঝাঁকা,
মাথায় তুলে নে ঘরে জামবাটী ভ'রে
আমচুর খাস্, থাকুক আমার কালো।

কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম,
আমার রাতের কারার আকাশে জ্বেলেছে একটি তারা,
আমাকেই বলে তার দুচোখের একটি সন্ধ্যাতারা।

নির্ভয় বীর, বিরাট আঁধারে সে আমার অমাবস্যা
ছদ্মবেশের চাঁদ,
আমাকে কি তুই করবি কথার বিজলিতে দিশাহারা?

কোনো আশা নেই, মাসী তুই ঘরে গিয়ে
হাটের লোককে শোনাস্ জ্ঞানের কথা,
সে কানে মানাবে এসব কথার ছাঁদ।

ছড়াস্ নে তোর মুক্তোর মালা, হবে না রে অন্যথা,
সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
তাকেই করব বিয়ে।

আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে
অনেক মিছিলে সঞ্চিত সংগীতে,
আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে।

উঠানের গাছ কেটে কাঁচ কলাপাতে
ক্ষেতের ধানের ভাতে
ঘরে সরতোলা ঘি দেন একজটাকে,

দীঘির পাড়ের নালিতা শাকের ব্যঞ্জন,
খাসের বাঁধের মৌরলা মাছ, পাটালির দুধে ক্ষীর
ওরে মাসী আমি দেব সুখে নিজহাতে,

দেখব অবাক চোখে,
খাবেন পুণ্যজন।
আমার কথায় এখন যে দেখি মাসী তুই অস্থির॥

ক ক

দিলীপ রায়

(তুমি) যে কাহিনী ব'লে চলে যাও
শুনবে কি ওরা? নাগরিক
দ্রুত লহরিতে যদি ধাও
মন স্বপ্নের আবাসিক;

(যদি) তোমাতে নিখিল হয় লীন,
তারকাতে তুমি মিশে যাও,
যদি গাছের কোটরে থাক তুমি, কাঁচ
ঘাসে হাসি হাসো অতি ক্ষীণ,

সাগরের ঢেউ দেখে তুমি হায়
হারাও নিজের বৈভব;
নগরীতে মিছিলের গানে তুমি
মিলেছ, দিয়েছ জেনো সব।

যে তুমি হারাও তন্দ্রার মতো
বিলাও নিজেকে অনুভব
শাসনের দ্বার সরিয়ে হৃদয়
বিকিরণ করে সৌরভ

চিনবে না কেউ তোমাকে, তোমার
জীবন দীর্ঘ কারাগার॥

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মম্মটভট্ট

তরুণের বিদ্রোহ : জ্যাক্ কেরুয়াক্*

শিশুদের কে না-ভালবাসে? তাদের নিষ্পাপ মন, আধো-আধো বুলি, অফুরন্ত আবদার, নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, তুলতুলে শরীর, একটুতেই কখনো হাসার, কখনো কাঁদার আশ্চর্য সামর্থ্য—এতে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ দুর্লভ। তাই শিশুদের নিয়ে ছড়া, ছবি, গান, গল্পের আর শেষ নেই। ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টকে যে-জন ভক্তি করতে নারাজ সে-ও ম্যাডোনার কোলে যীশুকে দেখে খুশী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের নাগরলীলা যার রুচিতে বাধে সে বলগোপাল ননীচোরার ফাঁদ সেও এড়াতে পারে না।

ঠিক কথা। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পরও যদি কেউ আমাদের কাছে বাৎসল্যের প্রশ্রয় দাবী করতে থাকে, তাহলে আমরা উল্লসিত না-হয়ে বরং উদ্বিগ্ন বোধ করি। পাঁচ বছরের বুড়োর ব্যবহারে দ্বিতীয় শৈশবের লক্ষণ হয়ত অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু কোনো যুবক অথবা প্রৌঢ় যদি শিশুর মত আচরণ করে চলে তাহলে নিরুপায় হয়ে আমরা চিকিৎসককে স্মরণ করি। দেহের বয়সের মত মনের বয়সেরও এক ধরনের দাবি। মানুষের শুধু বয়েস বাড়বে না, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহমনও পরিণত হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। শিশুকে যা মানায়, শিশুর পিতাকে তা নিশ্চয়ই মানায় না। শিশুরা স্বভাবতই স্বার্থপর; তাদের কাছে সমস্ত বিশ্বজগৎ তাদের সুখ-সুবিধার জন্য ফরমাস দিয়ে বানানো, বাপমা, আত্মীয়-স্বজনের কাজ হল তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজেদের নিরন্তর নিয়োগ রাখা। শিশুদের একথার কোনো দায়িত্ব বোধের বালাই নেই; অন্যদিকে তারা একান্তভাবেই বয়স্কদের ওপরে নির্ভরশীল। তবু যে জন্য শিশুদের ওপরে কেউ সত্যিকারের নারাজ হয় না, তার কারণ, ঐ খুদে ভোগসর্বস্ব প্রাণীদের খিদমদগারি করে আমরা অর্থাৎ বয়স্ক জনেরা নিবিড় তৃপ্তি বোধ করে থাকি। কিন্তু শিশু যতই বড় হয়ে ওঠে, ততই তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিখতে হয় যে, দুনিয়াটা তার ভাললাগা আর মন্দলাগার দ্বারা চালিত হচ্ছে না, তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এবং নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্যও আর পাঁচটা মানুষের সুবিধে অসুবিধের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বয়স বাড়া সত্ত্বেও এটুকু যে-জন শিখতে গররাজী, একটা বয়েস পেরোবার পর তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া শক্ত।

সম্প্রতি কিছু পাশ্চাত্য নব্য লেখকদের রচনা পড়তে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি মনে এসেছে। এঁদের লেখা থেকে মনে হয়, স্তন্যপানের অভ্যাস এখনো এঁরা পুরোপুরি ছাড়াতে পারেননি, অথচ বয়স্কদের মুখের ওপরে তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে এঁরা এঁদের যৌবনের প্রমাণ দিতে উদ্যোগী। তাতে কিছু ক্ষতি হত না, যদি বয়স্করা [illegible] এঁদের [illegible] চেষ্টা করতেন। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রে [illegible] ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। তাঁরা নিজেদের [illegible] প্রমাণ করবার আগ্রহে এইসব [illegible] দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

[illegible] জ্যাক্ কেরুয়াক্ [illegible] উপন্যাস [illegible]

এমন প্রশংসা শোনার পর কৌতূহলী হয়ে বইটি সংগ্রহ করে পড়া গেল। [illegible] না; ফুর্তি করা ছাড়া তাদের জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই; এবং যেহেতু তাদের না-আছে এতটুকু সংযম, না কল্পনার সামর্থ্য, তাই ফুর্তি বলতে তারা শুধু বোঝে মদ, মেয়েলোক, আকণ্ঠ খাওয়া এবং গাড়ি হাঁকিয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটে বেড়ানো। তাদের বিদ্রোহ কোনো বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। কিভাবে বাঁচব, এই প্রশ্নের ঐকান্তিক আলোচনা করে কেরুয়াক্ যে মহৎ সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর নায়ক ডীন মোরিয়ার্টির উক্তির মধ্যে তার নির্দেশ আছে। ঘুরতে ঘুরতে কানিয়ানে-এ পৌঁছে ডীন আর তার ইয়াররা উলঙ্গ হয়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে তাদের গাড়িতে বসেছে আর ডীন ভাষণ দিচ্ছেঃ

Yass, Yass. If I lived around here I'd go be an idjit in the sage brush .... I'd look for pretty Cowgirls — hee-hee-hee-hee! Damn! Bam!

শুধু ডীন নয়, এ-বইয়ের অধিকাংশ চরিত্রদের ভাষার দৌড় হল ঐ হি-হি-হি, হৌ-হৌ, হুম্‌ম-হুম্‌ম পর্যন্ত। শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস — অর্থাৎ মানব-সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোরকম পরিচয়ের বালাই এদের নেই। এরা যেহেতু বিদ্রোহী, তাই এসব বাড়তি বোঝার ভার এরা ছেড়ে ফেলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—এসব বাজে জিনিস নিয়েও এরা মাথা ঘামায় না। এরা প্রেম বলতে বোঝে রমণ—তার জন্য প্রীতি, অনুরাগ, ঈর্ষা, কল্পনা, অভিমান, অনুশীলন, এসব একেবারেই অবান্তর। এদের কাছে যৌবনের অর্থ আদালে ঘাড় ভেঙে মেশা করা এবং মাতাল হয়ে দল বেঁধে গুণ্ডামি করা আর জিনিসপত্র ভাঙা, একটির পর একটি মেয়ের সঙ্গে মাতাল হয়ে শয্যাশায়িত আর মাঝে মাঝে অকারণে হি-হি-হি করে হাসা এবং হৌ-হৌ (whiow) করে ফুকরে ওঠা। অর্থাৎ পৃথিবীর সব দোষই ঘাড়কামানো [illegible] বলে বসে যে সংকীর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখে, এরা হচ্ছে তারই প্রতিভূ।

এখন কেরুয়াক্ যদি এই টেডি-বয়দের নিয়ে কৌতুক করতে পারতেন, অথবা তাদের নিরর্থ জীবনের যন্ত্রণা আমাদের মনে সঞ্চারিত করতে পারতেন, তাহলে পাঠক হিসেবে আমাদের অভিযোগ করার কিছু থাকত না। লেখক নিজে যদি ধীমান হন, তবে তাঁর চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনার সম্পদে স্থূলতম চরিত্রের অবতারণাও গভীরভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। গোর্কির "না দুনিয়া" বা "লোয়র ডেপথ্‌স্" নাটকটির কথা স্মরণ করলে আমার এ প্রস্তাব অসমীচীন ঠেকবে না। ইতিপূর্বে জাঁ-জেনের লেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম; সে-লেখাও আমার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে উদাহরণ। কিন্তু কেরুয়াকের

---

* Jack Kerouac, **On the Road**, Viking.

লেখার মধ্যে সেই মনস্কতার স্বাক্ষর নেই। তাঁর উপন্যাস পড়ে কোনো সময়েই সন্দেহ হয় না যে, ঔপন্যাসিক স্বয়ং তাঁর কল্পিত নায়কনায়িকার চাইতে বেশী পরিণত মনের অধিকারী। সালভাটোর্ প্যারাডাইস নামে যে কল্পিত চরিত্রটির চোখ দিয়ে এই উপন্যাসের ঘটনাবলী দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে কেরুয়াকের মনের গঠনের বিশেষ পার্থক্য নেই। সালভাটোর-এর মত কেরুয়াকেরও আদর্শ পুরুষ হচ্ছে ডীন মোরিয়ার্টি; পকেটে মদের বোতল, বগলে মেয়েমানুষ এবং প্রচণ্ডগতিতে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়ানো, এই হচ্ছে এদের কল্পিত বিদ্রোহী জীবন। এদের গুরু হচ্ছেন ওল্ড্ বুল লী। খরচাপাতির জন্যে তাঁকে ভাবতে হয় না; তিরিশের দশকে তিনি নাকি ইয়োরোপে ঘুরে বিস্তর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন; আফিং, কোকেন, চণ্ডুর নেশায় তিনি হাতে কলমে ওস্তাদ। কোকেনের ফোঁড় নিয়ে নিয়ে এই "বুড়ো ষাঁড়ের" হাত-পা ক্ষতবিক্ষত; কিন্তু তাতে দিবাস্বপ্নে নিজেকে বর্বর যুগের স্বৈরাচারী সর্দার কল্পনা করায় বাধা কি? লী-র আদর্শ মনিষী হচ্ছেন স্পেঙ্গ্লার। অভিভূত ভক্তবৃন্দকে লী শিখিয়েছেন যে দুনিয়ার মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁরা নেতা তাঁদের জন্যে কোনো নীতিনিয়ম নেই, তাঁরা যা খুশী করতে পারেন, খুন ডাকাতি লাম্পট্য মাতলামী সবই তাঁদের শোভা পায়। আর বাকী মানুষদের কর্তব্য হল এই নেতাদের কথা নির্বিচারে মানা, তাঁদের প্রয়োজনে নিজেদের বলি দেওয়া। স্বভাবতই লী-র দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি নিজে প্রথম শ্রেণীর মানুষ; তাঁর ভক্তদের আশা, তারাও ঐ শ্রেণীতে উন্নীত হবে। যাঁরা চিন্তাশীল এবং উদারতন্ত্রী, যাঁরা বিশেষ সুবিধা এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করে সমাজব্যবস্থায় সাধারণ অধিকার এবং সাম্যের প্রতিষ্ঠা চান, যাঁরা স্বৈরাচারের পরিবর্তে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁদের প্রতি লী এবং তাঁর শিষ্যদের ঘৃণা এবং আক্রোশের অন্ত নেই। কেরুয়াকের উপন্যাস পড়ে সন্দেহ থাকে না যে, লেখক নিজেও লী-র মতাবলম্বী। সমকালীন সভ্যতার বিকল্প হিসেবে তিনি শুধু বন্য বর্বরতার আদর্শ কল্পনা করতে সক্ষম। তাঁর কাহিনীতে দ্রুতগতির বর্ণনা আছে, কিন্তু বিকাশের ইঙ্গিত পর্যন্ত অবর্তমান। তাঁর কুশীলব যূথবদ্ধ জীব, তাদের একজনের মধ্যেও ব্যক্তিসত্তার কোনো চিহ্ন নেই। তাঁর ভাষা অমার্জিত এবং ব্যঞ্জনাহীন। তাঁর কল্পিত স্ত্রীপুরুষদের উচ্ছ্বসিত সারল্যের আড়ালে যে-মন ক্রিয়াশীল তার সঙ্গে নাটশীদের আত্মীয়তা আবিষ্কার করতে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

কাছাকাছি; তিনি নাকি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি যদি সত্যিই মার্কিনের বিদ্রোহী তরুণদের মুখপাত্র হন, তাহলে সে দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কোনো কোনো মার্কিন সমালোচকের মতে কেরুয়াকী বিদ্রোহ ম্যাকার্থি যুগের প্রতিক্রিয়া। ম্যাকার্থির আমলে সর্বব্যাপী সন্দেহ আর আতঙ্কের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দায়িত্বশীল স্বাধীন চিন্তার ঐতিহ্য প্রায় লোপ পেয়েছিল। আজ সেই চাপ সরে গেলেও চিন্তাশীলদের মনে আত্মপ্রত্যয় এবং দায়িত্ববোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেনি। উদারতন্ত্রী আবহাওয়ার অভাবে তরুণদের বিক্ষোভ নির্বোধ এবং নির্লক্ষ্য শক্তিপুঞ্জের আকার নিয়েছে।

আমার নিজের কিন্তু সন্দেহ আছে যে, কেরুয়াকী বিদ্রোহ এবং তার জনপ্রিয়তা শুধু ম্যাকার্থি যুগের প্রতিক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। আমার বরং মনে হয়েছে, কেরুয়াকী মনোভাবের সঙ্গে মার্কিনী সমাজ-সংস্কৃতির একটি মূল লক্ষণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় মার্কিনী সমাজ অনেক বেশী গতিশীল; হয়ত অধিবাসীর অনুপাতে জমির প্রাচুর্য এই গতিশীলতার প্রধান কারণ। কারণ যাই হোক, এই গতিশীলতার একটা ফল হল ওদেশের মানুষদের জীবনযাত্রার মানের অসামান্য উন্নতি; কিন্তু অন্যধারে এর ফলে মার্কিনী সাধারণ মানুষের মনের বিকাশ অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। যে-ধৈর্য, অপেক্ষা এবং একাগ্রতার ফলে মনের মধ্যে একটি ভাব ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে, মার্কিনের মানুষ সাধারণত তাতে অনভ্যস্ত। কোনো কিছু গড়ে উঠতে না উঠতেই তারা সেটিকে ফেলে দিয়ে নতুন কিছুর সন্ধানে ছুটেছে। এই মনোভাব তাদের চিন্তায় চাঞ্চল্য এনেছে বটে, কিন্তু গভীরতার সঞ্চার করেনি; তাদের ভোগের উপাদানসম্ভার বাড়িয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের অনুভূতিতে অনুশীলনের সূক্ষ্মতা আনেনি; প্রতিটি ব্যক্তিকে বহুমানুষের সঙ্গে যুক্ত করেছে, কিন্তু একটি মানুষকেও ভালবাসতে শেখায়নি। কিছুকাল আগে মার্কিন দেশে মাস ছয়েক বাস করার সুযোগ ঘটেছিল। তখন ওদেশী তরুণদের সঙ্গে মিশে বারবার উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এরা দলবাঁধতে জানে, যে-কোন সদ্যপরিচিত লোককে নিয়েও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পদে এরা নিতান্ত দরিদ্র। এদের প্রাণশক্তি একান্তভাবেই বহির্মুখী; এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবহারিক স্তরেই অবসিত। ফলে, এদের মনে বিকাশ এবং পরিবর্তনের মধ্যে চাইতে প্রকৃতির প্রভাব বেশী প্রবল; এরা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, এবং সেই নিঃসঙ্গতার বোধকে এড়াবার জন্যে এরা দল বেঁধে ছাড়া চলতে পারে না; আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে এরা ক্রমাগতই অস্বাভাবিক কিছু করে নিজের এবং পরের কাছে আপনার পৌরুষ প্রকাশে উদ্যোগী। আর এই মনোভাব শুধু তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের মধ্যেও এটি ব্যাপকভাবে বর্তমান।

কেরুয়াকের উপন্যাসে মার্কিনী সভ্যতার এই গলদ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। বইয়ের চল্লিশ পাতা না-পেরোতেই দেখি সালভাটোর নিজের শহর প্যাটারসন ছেড়ে ফুর্তির খোঁজে এসে হাজির হয়েছে তিন হাজার মাইল দূর ডানবারে। সেখান থেকে স্যানফ্রান্সিসকো, তারপর লস এঞ্জেল্‌স্, তারপর আবার ফেরা। অথচ আমেরিকার বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সালভাটোর, ডীন কিংবা তাঁদের সঙ্গীদের মনে কোনো দাগ ফেলেনি। যারা সত্তর-আশি মাইল বেগে গাড়ি চালানোকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে রসিয়ে দেখার চোখ তারা কোথায় পাবে? ডীন মোরিয়ার্টির নায়কত্বের প্রমাণ সে এক সঙ্গে মেরিলু আর ক্যামিল নামে দুটো মেয়ের মন মজাচ্ছে। প্রেম, প্রকৃতি শিল্প, জিজ্ঞাসা একেবারে হটিয়ে দিয়ে এই তরুণেরা ফুর্তির উপকরণ হিসেবে সম্বল করেছে মদ, মোটর, মেয়েমানুষ আর দল বেঁধে হৈচৈ।

এতবড় সর্বগ্রাসী ব্যর্থতা যে-কোনো মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু অনায়াসে হতে পারত। কিন্তু তার জন্যে, এটা যে ব্যর্থতা, ঔপন্যাসিকের মনে সে-বোধটুকু থাকা দরকার। কেরুয়াক সে-বোধে একেবারেই বঞ্চিত। টমাস উল্ফ্-এর সে-বোধ কিছুটা ছিল; স্টাইনবেক, ফক্‌নার, এককালে ডস্ প্যাসস, সম্প্রতি নরম্যান মেইলার-এর লেখাতেও এ বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরাও বিদ্রোহী, কিন্তু এঁদের বিদ্রোহে কমবেশী মননের স্বাক্ষর বর্তমান। কেরুয়াক এদিক থেকে একেবারেই মুক্ত পুরুষ। তাঁর বিদ্রোহে না-আছে বেদনা, না-আছে কৌতুক। তাঁর বিদ্রোহীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হতে গররাজী। চিরকাল শিশুর মত সুখসর্বস্ব, দায়িত্বহীন, পরনির্ভর এবং নির্বোধ হয়ে থাকাই তাদের কাম্য। এবং এই কামনার ঔচিত্য বিষয়ে তাদের স্রষ্টার মনেও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

Nothing in this lousy world is fault, don't you see the? I don't want it to be and it can't be and it won't be....

অতঃপর হি-হি-হি আর হো-হো-এর মধ্যেই যে তরুণদের এই বিদ্রোহের পরি-

উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

১১

বেলা দ্বিপ্রহর। বিরাটনগরের শাসন-কর্তৃত্ব অর্পিত হইল কেশব প্রসাদের উপর; বিরাটনগর জুট মিলে অস্থায়ী শাসনদপ্তর স্থাপিত হইল। বিপর্যস্ত নাগরিক জীবনে শৃংখলা পুনঃস্থাপিত করা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের উপর আদেশ হইল যে, আগামীকাল নগর প্রমুখদের সভা আহ্বান করিতে হইবে, অবশ্য সামরিক পরিস্থিতির কোন বিশেষ অবনতি না ঘটিলে নাগরিক জীবনে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবেই। ক্রমে এক-একজন করিয়া সাধারণ নগরবাসী দপ্তরে আনাগোনা শুরু করিল। বিকালে মুক্তিসৈনিকের প্রহরায় কয়েকজন বন্দী রাণাসৈনিক হাজির হইল। ক্ষণকাল পরে জুট মিল হইতে দখলীকৃত একটি জীপ করিয়া উভয়পক্ষের তিনজন আহত সৈনিককে লইয়া আসিল একজন মুক্তি-যোদ্ধা। যাহাতে বিশেষ পার্থক্যের না হওয়ায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বেগ পাইতে হইল না। ক্ষণে ক্ষণে উত্তরদিকের প্রাসাদের নিকট হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল মেশিনগান বুলেটের দ্রুত আওয়াজ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, নিদ্রা বিদায় লইয়াছে। বাহিরে জমাটবাঁধা অন্ধকার ক্ষণে ক্ষণে বিদীর্ণ হইতেছে বুলেটের সুতীক্ষ্ণ আওয়াজে। বিরাটনগরের বিনিদ্র মানুষ মুহূর্ত গুণিতেছে ঊষার প্রত্যাশায়। সংগ্রামের কোন বিরাম নাই। অন্ধকারে অন্তরালে মুক্তিফৌজ পরিখা খনন করিয়া যায়। রাত্রি দীর্ঘ, কোনদিন কি ইহার অবসান ঘটিবে না? বীরগঞ্জের অবস্থা ক্রমাবনতির পথে। মুক্তিফৌজের অমানুষিক চেষ্টা সত্ত্বেও রাণাসেনার অগ্রগতি রোধ হইল না। রাণাসাহীর লুণ্ঠিত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত মোহন সামসেরের একান্ত প্রয়োজন ছিল বীরগঞ্জ পুনরায় দখল করা। সেই চেষ্টার কোন ত্রুটি তিনি রাখিলেন না। কাঠমাণ্ডু হইতে বারে বারে সুসজ্জিত ফৌজ প্রেরিত হইল বীরগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাকে বিফল করিবার জন্য। কিন্তু বীরগঞ্জের সংকটময় পরিস্থিতি অন্যান্য এলাকার সংগ্রামে কোনরূপ প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিল না। অদম্য অবাধ গতিতে মুক্তিফৌজের অগ্রগতি অপ্রতিহত রহিল। শুধু বীরগঞ্জ এবং বিরাটনগর নহে, নেপালের সর্বত্র মুক্তিফৌজের দ্বারা প্রজ্বলিত বিপ্লবের অগ্নিশিখা বিস্তৃত হইল বিভিন্ন অঞ্চলে। রাণাসাহীর প্রতিরোধ প্রচেষ্টা মুক্তিফৌজ খর্ব করিয়া দিল। যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল রাজধানীর দুয়ারে। কাঠমাণ্ডু হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অবরুদ্ধ মুক্তিফৌজের দুরন্ত অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্যর্থ হইল সেই প্রচেষ্টা। অবশেষে তিন হাজার অধিবাসী নেপালী কংগ্রেসের পতাকা লইয়া সদলে জমায়েত হইল মুক্তি-সাধকদের। অনেক রাণাসৈনিক আত্ম-সমর্পণ করিল, অন্যেরা কাঠমাণ্ডুর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে রণে ভঙ্গ দিল। পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ভৈরবাতেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিল। মুক্তি-ফৌজের পতাকা উত্তোলিত হইল ভৈরবার শাসনকর্তার আবাসে। রাণাফৌজের দুর্বল প্রতিরোধের কঠিন বাঁধ মুক্তিযোদ্ধার আক্রমণে ভাঙিয়া পড়িল মাঝপথে। নেপালী কংগ্রেসের বিশ্বস্ত সৈনিক দুর্দিনের সাথী ঠাকুর কে আই সিং তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কেহই সেইদিন চিন্তা করে নাই যে, ভবিষ্যতে এই মানুষটি অল্পকালের জন্য মুক্ত নেপালের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইবেন।

নভেম্বর মাসের কুড়ি তারিখ মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মসীলিপ্ত দিন। মুক্তিফৌজের সংকল্পের সমস্ত বাঁধ টুটিয়া রাণাসৈনিক কলুষিত করিল শহীদের রক্তে রঞ্জিত বীরগঞ্জের মাটি। পরিত্যক্ত বীরগঞ্জের জনশূন্য রাস্তাঘাট, রাণাফৌজ দখল করিল। নিহত মুক্তিযোদ্ধার অশরীরী আত্মার হাহাকারে নগরের নীরবতা ক্ষণে ক্ষণে টুটিয়া যাইল। পুনরায় দাসত্বের পতাকা উত্তোলিত হইল শাসনকর্তার বাস-ভবনে। বীরগঞ্জের পতন মুক্তিযুদ্ধে একটা বিপর্যয় আনিয়া দিল সত্য, কিন্তু ইহাতে রাণাসাহীর বিশেষ সুবিধা হইল না। পরিত্যক্ত নগরীতে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধার নির্ভীক গেরিলা সংগ্রাম অপ্রতিহত-গতিতে রাণাশক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানিতে লাগিল। দেশের অন্যান্য স্থানেও মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি হইল যে, অবশম্ভাবী বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মোহন সমসেরের নেপালের সমস্যা সমাধানের ভিন্ন-পথ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইলেন। বিচক্ষণ লোকের নিকট ইহা পরিস্ফুট হইল যে, কেবলমাত্র পাশব শক্তির আধিক্য নেপালের জাগ্রত জনতার মুক্তি আকাঙ্ক্ষার দুরন্ত বাসনাকে দমিত করিতে পারিবে না। যুগ যুগ সঞ্চিত লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের মর্মবেদনা, প্রতিকারহীন হাহাকারের পুঞ্জীভূত পাপের

নেপালের পথে পথে জনসাধারণের বিক্ষোভ

মুক্তিফৌজের গেরিলা যুদ্ধ

নিমজ্জিত থাকিতে আজিকার নেপালবাসী অসম্মত। অপমানের প্রতিশোধ চায় সে, অ্যাচারের প্রতিকার করিতে সে আজ দৃঢ়-সংকল্প। নূতন জীবনের জয়গানে উদ্বুদ্ধ হইয়া শতজীবনের কুসংস্কার, অশিক্ষা ও দারিদ্র্যপীড়িত এই নেপালবাসী মনের শৃঙ্খল ভাঙিয়াছে, হাতের বন্ধন সে ছিন্ন করিবেই। মোহন সামসের বুঝিলেন মুক্তি সংগ্রামের লেলিহান অগ্নিশিখা সাত সমুদ্রের সমস্ত জলরাশিও নির্বাপিত করিতে পারিবে না। মুক্তির চরম মূল্য দিতেও সে প্রস্তুত। কেমন করিয়া ভাঙিবেন তিনি বন্ধনমুক্তির এই দৃঢ়তর কঠিন সংকল্পকে। সংগ্রামের শুরুতে ইহা নিশ্চয়ই অচিন্তনীয় ছিল। তখন আশা ছিল রাণা-ফৌজ অচিরে মুক্তি যোদ্ধার জন্য নেপালের পথে প্রান্তরে সমাধি রচনা করিয়া দিবে। সেই আশা আজ উন্মত্ত দুরাশা। অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁহার নিজের শিবির ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বিদেশী শক্তির নিকট হইতে সাহায্যের আশা আজ বাতুলের দিবাস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। অলক্ষ্যে অদৃশ্য বিধাতা হাসিলেন, ইতিহাস-চক্রের গতি পরিবর্তিত হইল। দিল্লীর রাজ-পথের ধূলায় মোহন সামসেরের দম্ভস্ফীত দর্পিত শির অবনত হইল। নেপালের সমস্যার সমাধানের জন্য নভেম্বরের সাতাশ তারিখে মোহন সামসেরের দূত, জেনারেল কেশর এবং বিজয় সামসের জংগ, দিল্লী উপস্থিত হইলেন।

অব্যাহত গতিতে সংগ্রাম চলিতে থাকিল বিরাটনগরে। উভয়পক্ষের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধির পথে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসানের কোন চিহ্ন কোথাও নাই। কিন্তু বিরাট নগরের নাগরিক জীবনে সুস্থতা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। কেশব প্রসাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং মুক্তিফৌজের অসমসাহসী দৃঢ়তা বিরাট নগরের প্রাত্যহিক বেসামরিক জীবনকে সহনীয় করিয়া তুলিলেও অগণিত সমস্যা সমাধান সাপেক্ষ রহিল। মুক্তি ফৌজের মজুত গুলিবারুদ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। যেভাবেই হউক উহা পুনরায় সংগ্রহ করিতে হইবে। ক্রম বর্ধমান আহত মুক্তিযোদ্ধার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সাময়িকভাবে সামরিক হাস-পাতাল এখনই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে কলকারখানার দশহাজার কর্মহীন শ্রমিকের সমস্যা। এই ধরনের আলোচনা হইতেছিল বিরাটনগর নেপালী কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে। পূর্বাঞ্চলের সংগ্রামে প্রারম্ভিক সফলতা মিলিয়াছে, কিন্তু কর্নেল উত্তমবিক্রমের ফৌজের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল সংগ্রাম চালাইবার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই সম্পর্কে তারিণী তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিল যে, সংগ্রামে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে কার্যকরীভাবে মুক্তিসংগ্রামের উদ্দেশ্য পুনরায় তাহাদের নিকট ব্যক্ত করা প্রয়োজন। মুক্তি সংগ্রামের সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের চরমতম আত্মত্যাগের উপর। সুতরাং তাহাদের নিকট ইহা দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, মুক্তি-সংগ্রামের সফলতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি আনিবে না, ইহা অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতেও তাহাদের মুক্ত করিবে। তারিণীর যুক্তির কেহই প্রতিবাদ করিল না। স্থির হইল যে, মাতৃকাপ্রসাদ, বিশ্বেশ্বর এবং সুবর্ণসামসের পরদিন বিরাট নগর পৌঁছাইবা মাত্র তাঁহাদিগকে এই কার্য সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

পরদিন সকালে জীপ লইয়া বিহার নেপাল সীমান্ত হইতে কিছু দূরে বিহারের মধ্যে অবস্থিত সিমরাহ বিমান অবতরণ ময়দানে পৌঁছিলাম। একটি গোচারণভূমি সাময়িকভাবে অবতরণ ময়দানরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর এক ইঞ্জিনযুক্ত একটি বোনানজা বিমান হইতে মাতৃকাপ্রসাদ, বিশ্বেশ্বর ও সুবর্ণ-সামসের অবতরণ করিলেন। কিছু পরিমাণ অতি প্রয়োজনীয় সামরিক রসদও এই বিমানে আসিয়াছিল। প্রায় পঁচিশ মাইল গোরকে-কথিত রাস্তা অতিক্রম করিয়া অতি মূল্যবান রসদ এবং ততোধিক মূল্যবান যাত্রীদের লইয়া যখন কেশব প্রসাদের দফতরে পৌঁছিলাম, বিরাট নগরের মুখ্য মুক্তি সংগ্রামীরা সকলেই সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। পথে নেতৃবৃন্দ পরি-স্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই শুনিয়াছিলেন। তজ্জন্য দফতরে অধিককাল কালক্ষেপ না করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে যাইতে মনস্থ করিলেন। পশ্চিম নেপালের সংগ্রাম কেন্দ্র হইতে সরাসরি বিরাটনগর আগমনের

ট্রামে-বাসে

পাঞ্চেন লামা ভারতের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন — একটি সংবাদ। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে বলতে পারব না। ফ্রাইড রাইস ভালো হতে পারে, ল্যাংড়া আম-ফ্যানসোও ফেলনা নয়"।

* * *

চীনে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অশোক মেহতার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা কলঙ্কিত কুৎসা প্রচার করা হইতেছে তাহা শুধু শালীনতাবর্জিত নহে, ভারতে এইরূপ ভাষা ব্যবহৃতই হয় না—অন্য এক সংবাদ।—"এ চীনা সত্যিই অচেনা"—সংক্ষেপে মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

শ্রী রাজগোপালাচারী প্রমুখ ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা লোকসভার বরাবরে এই মর্মে এক দরখাস্তে বলিয়াছেন যে, জোর করিয়া হিন্দী চাপাইলে ভয়াবহ সংকট দেখা দিবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তাতে কোন সন্দেহ নেই, নেকটাইতে লেঙ্গটির ফাঁসে এখনো হাঁসফাঁস করছি"!!

* * *

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন নাকি বলিয়াছেন যে, সামান্য দুই তিনশত একর জমির জন্য কি যুদ্ধ করা যায়। কথাটা বলিয়াছেন টুকেরগ্রাম প্রসঙ্গে। শ্যামলাল বলিল—"সত্যিই তো। টুকের-গ্রাম শুধু একটি টুকরো ছাড়া তো কিছু নয়"।

* * *

আনন্দবাজার"-এর "[illegible] পৃষ্ঠা"-র সংবাদ — নিউইয়র্কে প্রচারক রেভারেন্ড জোসেফ নরিস বলিয়াছেন, নবনারী হইতেই ভবিষ্যতের যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তা হতে পারে। কিন্তু গৃহযুদ্ধে প্রাচীনারাও বড় কম যান না। খেংড়া-ঝাঁটার মারাত্মকতা-ও কম নয়"।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি চাউলের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির কথা স্বীকার করিতে নারাজ। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"হাতে ঝোলা মঙ্গলবারের দরকার কি? ঝোলা নিয়ে বাজারে বেরিয়ে পড়ুন; শুধু বাজার দর কেন, কত ধানে কত চাল পর্যন্ত টের পাবেন"!!

* * *

গ্লাসগো শহরকে ধূম-মুক্ত করিবেন বলিয়া পৌর প্রতিষ্ঠান নাকি পরি-কল্পনা করিয়াছেন। "ধূম-মুক্ত আমরা না করতে পারি, কিন্তু ধূমধামমুক্ত পরি-কল্পনায় আমাদের জুড়ি নেই"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আমেরিকার বিখ্যাত সেলসম্যান মিঃ হুইলার নাকি কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "নাই লামা সর্বাধিক বিক্রয়যোগ্য পণ্য। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু সেটা শ্যাম-বাজারে, না চীনাবাজারে তা অবশ্য তিনি বলেন নি"!!

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, লোকসভায় যৌতুক গ্রহণ ও দানের বিরুদ্ধে বিল উত্থাপন করা হইয়াছে।—"কিন্তু বিবাহ সভায় বা ছাদনাতলায় না এই নিয়ে লাখ কথার "রেস্ত" কর্ম হয়ে ওঠে"—বলে শ্যামলাল।

* * *

দিল্লির সংবাদে শুনিলাম, পুলিসের দুইটি কুকুরকে ভি. আই. পি-র সম্মান দেওয়া হইবে অর্থাৎ তারা এরো প্লেনে বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেলের কামরায় ভ্রমণ করিতে পারিবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কুকুরকে যদি ভি. আই. পি-র একাসনে বসবার সম্মান দেন তাহলে আমাদের বলবার আর কী আছে, আর [illegible] [illegible] [illegible]"!!

* * *

জিরার কারখানায় [illegible] জন্য মজুদ [illegible] সিমেন্ট [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে। "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে [illegible] পাকিস্তান আমেরিকার [illegible] [illegible] চালান দিয়া প্রতি আউন্সে [illegible] টাকা করিয়া রোজগার করিবে। শ্যামলাল [illegible] [illegible] শুনেছি, উটের [illegible] এলো বলে! বৈদেশিক মুদ্রাকে [illegible] মারে কে"!!

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী

প্রবোধচন্দ্র সেন

নানাকারণে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে জনমত আজ জাগরূক হয়ে উঠেছে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত। আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে প্রচুর পরিমাণেই। কিন্তু বিশ্বভারতীর পক্ষে সহায়ক ও সাংগঠনিক আলোচনা বা সমালোচনা খুব কমই হয়েছে।

বিশ্বভারতী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নকল হবে না, তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় থাকা চাই। শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করাই বিশ্বভারতীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে আচার্য জওহরলাল থেকে সাধারণ সমালোচক পর্যন্ত সকলেই একমত। বিশ্বভারতী-আইনে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্বভারতী ও তার বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে, আর মহাত্মা গান্ধী সে ভার অর্পণ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, একথা সর্বজনবিদিত। সুতরাং যে শিক্ষানীতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে দেশের শিক্ষানায়কদের কাছে বারংবার উপস্থাপিত করেছেন এবং যে নীতি মহাত্মা গান্ধীরও আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছে, তা যে বিশ্বভারতীর অন্যতম মূলনীতি বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সেই নীতি রক্ষার দ্বারাই যে বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হবে, তাতে সন্দেহ করা চলে না। এমন একটি নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সে নীতিটি হচ্ছে বিদ্যাবিতরণের সর্বস্তরেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতিদানের নীতি।

একথা আজ কে না জানে যে, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য দেশের কাছে বারবার আবেদন করে গেছেন। কিছুকাল পূর্বে 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে (দেশ, ১৩৫৯, ভাদ্র ২৮, আশ্বিন ৪, ১১) এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। তবু বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করবার জন্য কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

১৮৮৩ সালে এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।"

—ভারতী ১২৯০ কার্তিক

১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' নামক সুবিখ্যাত প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন—

"আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে।...... শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ মিলন কে সাধন করিতে পারে?—বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।......বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার এই শক্তিশালী অথচ তেজস্বিনী নবীনা বঙ্গভাষা অন্তঃপুরচারিণী হইয়া এমন নবীন ভাষা ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না।...... আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না।...... তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপন মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা (শিক্ষিত লোকেরা) দূরে পড়িয়া গেছেন।"

অর্থাৎ মাতৃভাষার যোগে বিদ্যালাভ করেন না বলে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যাটাও যথার্থরূপে আয়ত্ত হয় না এবং মাতৃভাষায় সে বিদ্যাকে প্রকাশ করবার সামর্থ্যও লাভ করেন না। যে বিদ্যা মাতৃভাষায় প্রকাশ লাভ করে না সে বিদ্যা তো বন্ধ্যা।

অতঃপর 'শিক্ষার বাহন' (১৯১৬) নামক প্রবন্ধটির কথা সকলেরই মনে পড়বে। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ওই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই।" এই প্রসঙ্গেই অতঃপর বলেন—

"উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।......উত্তর এই যে, বাংলা ভাষার বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর উত্তর। কঠিন বই কি, সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই।"

ওই প্রবন্ধেরই অন্যত্র আছে, "ইংরেজী আমাদের শেখা চাই-ই। কেবল ইংরেজী কেন? ফরাসী জর্মান শিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে একথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালী ইংরেজী শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, একথা কোন্ মুখে বলা যায়?......যারা বাংলা জানে, ইংরেজী জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড় অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?"

যে সময়ে এ প্রবন্ধটি লেখা হয় তখন শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাকে তার একমাত্র বাহন বলে গ্রহণ করবার লেশমাত্র সম্ভাবনাও ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতির অনুসরণ করে আপস-রফার পরামর্শ দিলেন—বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশাপাশি দুই ব্যবস্থা চলুক; এক দিকে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলুক ইংরেজীতে, অপর দিকে সে কাজ চলুক বাংলায়। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য এই—

"এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায়, তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের শাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"

বলা বাহুল্য এই আপসরফার পরামর্শও তখন গৃহীত হয়নি, আজও এই স্বাধীনতার যুগেও গৃহীত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ পরাধীনতার স্থূল রূপটাই অপসৃত হয়েছে, কিন্তু তার অদৃশ্য মায়াজালটা আমাদের হৃদয়মনকে এখনও মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। ইংরেজের শাসন গিয়েছে, ইংরেজীর শাসন যায়নি। এই শাসনের অধিকার আমাদের দেহের উপরে নয়, তার অধিকার আমাদের অন্তরে। তার সম্বন্ধে বলা যায়, "নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।" রক্ত-করবীর জালের মতো এই মোহজালও অদৃশ্য বলেই দুশ্ছেদ্য।

এইজন্য ১৯৩৩ সালে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই তাঁকে আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

"রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে।"

এই আক্ষেপ প্রকাশের পর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ লাভের পরেও বারো বৎসর পার হতে চলল, তথাপি এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ এল না, এমন কি সে স্বরাজ পাবার উৎসাহও আমাদের জাগেনি, আর শিক্ষাকে মাতৃভাষার আসনে বসালে তার মূল্যহানি ঘটবে বলে যারা মনে করে এমন মানুষের অভাবও ঘটেনি।

যা হক, রবীন্দ্রনাথ এই আক্ষেপোক্তি শেষ করেন বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হৃদয়ের আর্ত আবেদন জানিয়ে।—

"বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি, তোমার অভ্রভেদী শিখর চূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধ্বনি।"

—শিক্ষার বিকিরণ (১৯৩৩)

অতঃপর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে (১৯৩৬) তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নিজের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেন—

"বাংলা ভাষার দোহাই দিয়ে যে-শিক্ষার আলোচনা বারংবার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।.... আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলুম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধুভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাই চলেছিল।......এর ফলে শিশুকালেই বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত। সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয়নি।...... ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে-তোলা সাজিয়ে-তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না।......ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজী আমি পথে পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি।......আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজী-জানা ভদ্রসমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে।...... তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলা-ভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত,...... শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি

ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল যে-খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর যাদুমন্ত্র দিয়েছেন।"

বিশ্বভারতীর শিক্ষানীতির এক দিকের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে এই উক্তি থেকেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের প্রেরণাই ছিল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে।

"শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" প্রবন্ধটির মর্মবক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর হৃদয়ের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষায় ও একটি বাক্যে। সেটি এই—

"বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব শিশুমূর্তি দেখতে চাই।"

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে বিদ্যার আদানপ্রদান চলবে একমাত্র বাংলাভাষার যোগে, তাকেই তিনি বলেছেন 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়'। এমন একটি নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে তাঁর হৃদয় উৎসুক হয়ে ছিল। এই অনাগত নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে তিনি আশীর্বাদও উচ্চারণ করে গেছেন।—

"বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশেই সে দাঁড়াক বালক-বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যে দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।"

এই বালক-বিদ্যালয় একদা বালকবীরের বেশে বিশ্বজয় করবে এই ভরসায় তিনি বহুদিনই বসেছিলেন 'পথ চেয়ে আর কাল গুনে'। কিন্তু তার দেখা পেয়ে যেতে পারেননি। তবু ভাবী কালের ভরসায় তিনি আমাদের কাছে হৃদয়ের আকুতি জানিয়ে গেছেন।—

"অবশেষে আমার নিবেদন এই যে আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন—দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনীধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

এর পরের বৎসর (১৯৩৭) কলকাতা 'পদবী সম্মান বিতরণ'-সভাতেও তিনি তাঁর 'ছাত্রসম্ভাষণে' এই কথারই পুনরুক্তি করেন——

"পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষায় মধ্যে আত্মীয়তাবিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।......সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা।......বর্তমানকালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্য জাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে। হয়নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।......পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা।......দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।"

'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে', 'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার টলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না;' এই যাঁর অন্তরের বাণী, তিনি যে মাতৃভূমির কাছে মাতৃভাষার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েও নিরস্ত হবেন না, তা বিচিত্র নয়। তাই তিনি শেষবারের মতো বললেন,

"ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিতরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।" অবশেষে, "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তালাভে গৌরবান্বিত হবে", এই আশা নিয়েই তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই আশা আজও পূর্ণ হয়নি। কিন্তু 'তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফলবে না, তা বলে ভাবনা করা চলবে না'। তাই তিনি সুদূর অনাগত কালের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের জন্য এই বাণী রেখে গিয়েছেন।—

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটি বহুকাল পূর্বে একজন বলেছিলেন; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন ইংরেজী-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল, আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।"

—শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

বলা বাহুল্য তাঁর এই শেষ উক্তিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য বলেই অগ্রাহ্য হয়েছে। তথাপি তাঁর এই উক্তি থেকেই বল সংগ্রহ করে তাঁর বাণীর পুনরাবৃত্তি করবার সাহস পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথমেই কামনা প্রকাশ করেছিলেন, 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' দেশ ছেয়ে গিয়ে বাংলাভাষার যোগে সমস্ত শিক্ষা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক, আর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন, একটি 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের' শিশুমূর্তি দেখে যেতে চাই। তাঁর জীবিতকালে এই দুই কামনার কোনোটিই পূর্ণ হয়নি। তাঁর তিরোধানের পর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁর জন্মশতবার্ষিক উৎসবকালও আসন্ন হয়ে এল; কিন্তু তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাপূরণের কোনো লক্ষণ আজও বাংলার শিক্ষাদিগন্তে আভাসেও ফুটে ওঠেনি। তিনি বারবার চারবার বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শিক্ষাকে মাতৃভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে বেদনার্ত আবেদন জানিয়েছেন, তাও আজ পর্যন্ত ইংরেজীশিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্যই রয়ে গেল। তিনি যখন এই পৌনঃপুনিক আবেদন জানাচ্ছিলেন তখনও তাঁর বিশ্বভারতী বিধানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ গ্রহণ করেনি। তাঁর তিরোধানের দশ বৎসর পরে বিশ্বভারতী যখন বিধানসম্মত স্বীকৃতি লাভ করল, তখন আশা করেছিলাম তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানই অবশেষে বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের
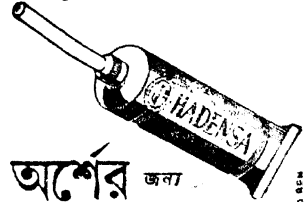
শিল্পমূর্তি পরিগ্রহ করে তার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে। তাই যখন বিশ্বভারতীতেও রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার লেশমাত্র আভাসও কোথাও দেখা গেল না, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

এখানে ক্ষোভের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে, বিশ্বভারতীর বিধানসম্মত স্বীকৃতিলাভের সময় থেকেই কর্তব্যবোধে নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে বারবার শিক্ষাসমিতির ও সংসদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে চেষ্টা ইংরেজিশিক্ষার সংস্কার-প্রাচীরে বারবারই প্রতিহত হয়েছে। এই ক্ষোভের ফল 'বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রবন্ধধারা।

আমাকে বারবারই শুনতে হয়েছে, বিশ্বভারতী তো শুধু বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্মানি রাশিয়া প্রভৃতি সব দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই তো আন্তর্জাতিক, অথচ সে-সব দেশে সেখানকার স্থানীয় ভাষাই তো সমস্ত শিক্ষার বাহন। ভারতবর্ষের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় নয়? তাই বলে কি সে-সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহন বলে গণ্য হতে পারবে না? এ সব তর্কযুক্তির কথা পুনরুত্থাপন করতে চাইনে। শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বভারতীর পরিদর্শক, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি স্বয়ং রাজেন্দ্র প্রসাদও এখানে সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়—ইংরেজীতে নয়, হিন্দিতেও নয়। আমাদের আচার্যও কি বাংলায় ভাষণ দিতে পারেন না বলে দুঃখ করেননি?* আর বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনও ইংরেজীর ন্যায় বাংলাতেও প্রকাশের কথা সংসদকে অনুমোদন করিয়ে নেননি? সব চেয়ে বড় কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্যই তো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিধানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার পূর্বেও দীর্ঘকাল (১৯২১-৫১) এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক বলেই স্বীকৃত ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথ এখানকার সভাসমিতিতে বাংলাতেই ভাষণ দিতেন এবং আচার্যরূপে নির্দেশাদিও দিতেন বাংলাতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও জানি শান্তিনিকেতনসমিতি তথা রবীন্দ্রভবন-সমিতির প্রস্তাবগ্রহণ প্রতিবেদন প্রভৃতি কার্যকলাপ বাংলাতেই নির্বাহিত হত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যার শিক্ষাপীঠ বলে স্বীকৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব-ভারতী অ-ভারতীয় ভাষার অঞ্চল গ্রহণ করল। স্বরাজ-সরকারের স্বীকৃতি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বভারতীর এই ভাবান্তর দেখে কারও যে হাসি পেল না, তা দেখেই কাঁদতে ইচ্ছে করে। অথচ এর হাস্যকরতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন বহুকাল পূর্বেই।—

"শিক্ষা-সরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়িপরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা

* আচার্যের ভাষণ বাংলায় দিতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত জওহরলাল। আর বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও সুধীরঞ্জন।

করতে আরাম পাবেন, (ইংরেজি ভাষায়) থরেওয়ালা বুটজুতোর পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।"

—শিক্ষার বিকিরণ (১৯৩৩)

রবীন্দ্রনাথের এ সব উক্তি চিরকালই আমার মনকে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে। শুধু তাই নয়, সক্রিয়তার দিকেও প্রেরণা দিয়েছে। তার একটু আভাস দিয়েছি পূর্বেই। ১৯৪২ সালে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থায় বাংলাভাষাকে যতটা সম্ভব সর্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেছিলাম। অতঃপর ১৯৪৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন শেষবার এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে সোদপুরের ঠিকানায় চারটি প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলাম। চারটি প্রশ্নই ছিল বিশ্বভারতীতে ভাষাপ্রয়োগের দিক্ নিয়ে। পত্র লেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে উত্তর পেয়েছিলাম, সেটি এখানে অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম।—

খাদী প্রতিষ্ঠান, সোদপুর,

পোস্ট মার্ক : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৫

ভাই প্রবোধচন্দ্র সেন,

আপকা পত্র মিলা। ইসী বারে মেঁ মৈঁনে রথীবাবুকো লিখা হৈ। বিশ্বভারতীকে সব নিবাসীয়োঁকো বংগলা ঔর হিন্দুস্তানী জাননা হী চাহিয়ে। অংগ্রেজীকী সবকো আবশ্যকতা নহীঁ হোনী চাহিয়ে। বিদেশী জো আবে উনকে লিয়ে প্রথম হিন্দুস্তানী সীখনেকা প্রবন্ধ করনা চাহিয়ে। বংগাল ছোড়কর জো অন্য প্রান্তসে আতে হৈঁ উনকো বংগলা সীখনেকা অনিবার্য হোনা চাহিয়ে—জৈসে বংগালীয়োঁকো হিন্দুস্তানী সীখনেকা হোনা চাহিয়ে। তব হী বিশ্বভারতী অপনে নামকে ঔর গুরুদেবকে নামকে যোগ্য বন সকতী হৈ। মেরী চলে তো বহাঁকে সব কারবারোঁকো হিন্দুস্তানী মেঁ রখু, আজ যহ সম্ভব ন হো তো বংগলা মেঁ রখু—অংগ্রেজী মেঁ হরগীজ নহীঁ।

চৌথা প্রশ্নকে বারেমেঁ মৈঁ সংপূর্ণ মাহিতী ন হোনেকে কারণ কুছ অভিপ্রায় দেনা নহীঁ চাহতা হুঁ।

—বাপুকে আশীর্বাদ

এর বাংলা অনুবাদ এই।—

ভাই প্রবোধচন্দ্র সেন,

আপনার পত্র পেয়েছি। এ বিষয়ে আমি রথীবাবুকে লিখেছি। বিশ্বভারতীর সব নিবাসীরই বাংলা ও হিন্দুস্থানী জানা চাই। ইংরেজি সকলের পক্ষে আবশ্যিক হওয়ার দরকার নেই। বিদেশী যাঁরা আসবেন তাঁরা প্রথমে হিন্দুস্থানী শিখবেন। বাংলার বাইরের অন্য প্রদেশ থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের পক্ষে বাংলা শেখা অনিবার্য হওয়া চাই, যেমন বাঙালীর পক্ষে হিন্দুস্থানী শেখা চাই। তবেই বিশ্বভারতী নিজের নাম তথা গুরুদেবের নামের যোগ্য হতে পারে। আমার মত যদি চলত তবে ওখানকার সব কাজই হিন্দুস্থানীতে চালাতাম, এখনই তা সম্ভব না হলে বাংলায় চালাতাম—ইংরেজিতে কখনোই নয়।

চতুর্থ প্রশ্নের বিষয় আমি সম্পূর্ণ অবগত নই বলে ও বিষয়ে কোনো অভিমত দিতে চাই না।

স্বাক্ষর : 'বাপুকে আশীর্বাদ'

রথীবাবুকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তা বিশ্বভারতীর শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে, ভাষা বিষয়ে নয়। আমার চতুর্থ প্রশ্ন কি ছিল তা এখন মনে নেই।

মহাত্মাজীর পত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর মতে (১) বিশ্বভারতীর শিক্ষা ও কর্ম-ব্যবস্থায় ইংরেজীর যে প্রাধান্য এখন বিদ্যমান তার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নেই, (২) অবাঙালী-বাঙালীনির্বিশেষে এখানকার সকলেরই বাংলা ও হিন্দুস্থানী জানা চাই, এবং (৩) এখানকার কাজকর্ম সমস্তই হিন্দুস্থানীতে, এখনই তা সম্ভব না হলে বাংলায়, চালানো উচিত।

এখানে শিক্ষার বাহন কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে স্পষ্টত কোনো উল্লেখ না থাকলেও একথা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায় যে, তাঁর মতে এখানে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত হয় বাংলা, না-হয় হিন্দুস্থানী; ইংরেজি যে নয় সে বিষয়ে তিনি সংশয়ের কোনো অবকাশই রাখেননি। তা ছাড়া বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় গুরুদেবের যে অভিপ্রায় নিহিত ছিল তাকেই যে এখানে প্রাধান্য দিতে হবে তারও স্পষ্ট আভাস রয়েছে ওই পত্রেই। আর শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে এখন আর কারও সন্দেহ নেই।

হিন্দুস্থানী সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাষায় তাঁর অভিমত আমাদের জানিয়ে গেছেন। এ স্থলে তাঁর সেই অভিমত স্মরণ করা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করি।—

"হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্য একভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

"রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারি তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

"এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া

যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে, এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সনদ নিয়তই অদল-বদল করছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে-নিয়ে-আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

"তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির একভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে, সেদিন য়ুরোপের বড়দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়দিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"

—বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮), ৮ম পরিচ্ছেদ

কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্র বিশ্বভারতীতে, প্রধানত বাংলাভাষারই সাধনা করতে হবে দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করে তোলবার জন্য, এই ছিল তাঁর অন্তরের অভিপ্রায়। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী যখন ভারতবর্ষের সরকারী ভাষা বলে কার্যত স্বীকৃত হবে তখন এখানেও ওই ভাষার একটা সরকারী দীপ জ্বালাতে হবে, কিন্তু তার স্থান হবে বিশ্বভারতীর দেউড়িতে, অন্দরে নয়; ঘরের মধ্যে জ্বলবে বাংলাভাষার প্রদীপ, সরকারী দীপের তেল জোগাবার খাতিরে ঘরের দীপে তেলের কমতি ঘটানো চলবে না। অর্থাৎ এখানকার শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থা চলবে বাংলাভাষারই যোগে, সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দী শেখবার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কিন্তু হিন্দীর চাপে বাংলার সংকোচন ঘটানো চলবে না।

আবার মূলপ্রসঙ্গে অর্থাৎ শিক্ষার বাহন-প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা দেখেছি ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন বলে স্বীকার করবার জন্যে দেশের কাছে বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি যে একক ছিলেন তা নয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠও বারবার ধ্বনিত হয়েছে অব্যর্থ ও কঠিন ভাষায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হৌসের মহতী সভা ইংরেজীর যূপকাষ্ঠে 'অসংখ্য বালকবলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে' চরম সদ্গতির অধিকারী হয়েছে, এমন কঠোর উক্তি করতেও বঙ্কিমচন্দ্র কুণ্ঠিত হননি। (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, পৃ ৬১৬-১৭) এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি করব না।

মধুসূদনকে বঙ্কিমচন্দ্র অভিহিত করেছিলেন 'ডাহা ইংরেজ' বলে। এই 'ডাহা ইংরেজ'কেও একদিন ১৮৬৫ জানুআরি ২৬) আক্ষেপ করে বলতে হয়েছিল—

After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue....If there be any one among us anxious to leave a name behind him, let him devote himself to his mother tongue. That is his legitimate sphere—his proper element. European scholarship is good, in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe, but when we speak to the world, let us speak in our own language ....*I should scorn the pretensions of that man to be called educated who is not the master of his own language*......

Our Bengali is very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as owing to early defective education, know little of it and learnt to despise it, are miserably wrong.

—সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ২৩, পৃ ৭৫-২৬

দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মধুসূদনও আমাদের শিক্ষার ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। এখানে শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত না হলেও মাতৃভাষার চর্চাই যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং মাতৃভাষার যোগেই বিদ্যার প্রকাশ যে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য, এ বিষয়ে মধুসূদনের মনে লেশমাত্র সন্দেহও ছিল না। তাঁর ১৮৬৫ সালের উক্তিকে যে ১৯৫৯ সালেও পুনরাবৃত্তি করতে হল এবং বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে, সেটাই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করবার অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে, যতদূর জানি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নামই সর্বাগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথের কয়েক বৎসর পূর্বেই, ১৮৮০ সালে, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'কালেজী শিক্ষা' নামে এক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, আজও তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। তাঁর উক্তি এই।—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্তত আট-দশ বৎসর লাগে। ভাষাশিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম।... ইংরাজী ভাষাশিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরাজীতে অঙ্ক কষিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজী শিখ না কেন? ইংরাজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরাজী মুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে, ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরাজী শিক্ষা অল্প হয়, অথচ পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞান হয়।"

—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭ ভাদ্র

এর টীকা বা ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। এত অল্প পরিসরে ও এমন সরল ভাষায় আমাদের শিক্ষাসমস্যাকে এমন সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহ্য রূপে আর কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা জানি না। এই উক্তি প্রকাশের পরও প্রায় আশি বৎসর গত হয়ে চলল, কিন্তু আজও আমাদের চৈতন্য হল না, এটাই বিস্ময়ের বিষয়।

ইংরেজি ভাষার আলেয়ার পেছনে এক সময়ে মধুসূদন ছুটেছিলেন সমস্ত প্রাণমন নিয়ে। কিন্তু তাঁকেও একদিন নিবৃত্ত হয়ে বলতে হয়েছিল—

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, অবোধ আমি, অবহেলা করি'
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

অবরণে বরণ করার অনুতাপে অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল, "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে।" আমরা আজও পরদেশে পরধনলোভে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেই চলেছি। কিন্তু আশার ছলনে ভুলি কি ফল লাভ করলাম, সেকথা ভাববার অবকাশ কি আমাদের কখনও হবে না?

শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। শিক্ষায় ইংরেজী ভাষার স্থান এবং পরিমাণ সম্বন্ধেও অনেক কথাই প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এবিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার সার্থকতা আছে। ভবিষ্যতে সে প্রসঙ্গ অবতারণার অভিপ্রায় রইল॥

আমরা পাঁচজন এ-আপিসে, এই রেকর্ড সেকশনে, একসঙ্গে ঢুকেছিলাম। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতাম না। আমি, রেণুকাদি, অপর্ণা এবং আরো দুজন, যারা এখন আর এ-আপিসে নেই। সুজাতা চলে গেছে অন্য আপিসে, গৌরী বিয়ে করে সংসার করছে। কি সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে হয়েছে তার, কি মিষ্টি আধো আধো বুলি।

প্রথম যেদিন চাকরীতে যোগ দিলাম, সেদিন এদের কাউকে চেনা তো দূরের কথা আপিসের এই লম্বা হলখানাও চিনতাম না। গোলকধাঁধার মত এই বিরাট বাড়িখানা শুধু দেখেছিলাম বাইরে থেকে, ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম এ-বাড়ির অন্য এক প্রান্তে, বড়সায়েবের খাসকামরায়।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের চিঠিখানা নিয়ে কেমন একটা ভয়-ভয় থর থর বুকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম এর সামনে, খোঁজ করে হদিস জেনেছিলাম রেকর্ড সেকশনের।

বাইরে থেকে চেহারাটা বিরাট মনে হলেও এর ভেতরে যে এমন একটা গোলকধাঁধা আছে টের পাই নি। সিঁড়ির পাশেই লিফ্‌ট ছিল, লিফ্‌টের সামনে লোকও দাঁড়িয়ে ছিল অনেক। কিন্তু সাহস করে তাদের পিছনে দাঁড়াতে পারি নি। কি জানি, এই লিফ্‌টে ওঠার অধিকার আমার আছে কিনা—আমার, রেকর্ড সেকশনে আশি টাকা বেতনের সাধারণ নতুন চাকরী পাওয়া একটি মেয়ে-কেরানীর। তাই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙেই ওপরে উঠেছিলাম, তেতলার বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। একে জিগেস করে, ওকে জিগেস করে একবার এ-বারান্দা একবার ও-বারান্দা করেছি। আর বার বার হাতের ছোট্ট ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকিয়েছি। শুধু অন্ধকার বারান্দার সারি এদিক থেকে ওদিক থেকে এসে পরস্পরকে কাটাকাটি করে চলে গেছে, আর তারই পাশে পাশে ঘর, ঘরের সামনে টুল-বসা চাপরাশিদের গুঞ্জন।

তাদেরই একজন বললে, রেকর্ড সেকশন? আসুন আমার সঙ্গে।

বিরাট দরজা, যেমন চওড়া তেমনি উঁচু। ঢোকবার আগে বুকটা কেমন দুরু দুরু করে উঠলো, গলা শুকিয়ে এলো।

ঢুকলাম চাপরাশির পিছনে পিছনে। ভালো করে তাকিয়ে দেখতেও কেমন অস্বস্তি। সারি সারি টেবিল, টেবিলে টেবিলে ফাইলের রাশি, দেয়ালগুলো র‍্যাক আর আলমারীতে ঠাসাঠাসি, র‍্যাকে ধুলোটে ফাইলের স্তূপ। কিন্তু বিতৃষ্ণা জাগলো না। নতুন চাকরীর মোহ আর ছোট সায়েবের সঙ্গে দেখা করার আতঙ্কে তখন মন ভরে আছে।

ছোটসায়েবের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে হবে, না বাংলায়, তা ভেবেছি দুদিন ধরে, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক করতে পারি নি। বাবা বলেছিলেন, ইংরেজী; ছোটমামা বলেছিল, বাংলা।

একটা কিছু ঠিক করার আগেই দেখলাম চাপরাশিটা সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এসে বলছে, আসুন।

এক মুখ হেসে দু'হাত তুলে নমস্কার জানালেন ছোটসায়েব, আমিও বেঁচে গেলাম।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের চিঠিখানা আমার কাছ থেকে নিয়েই তিনি উঠে এলেন, এসে আলাপ করিয়ে দিলেন হেড অব সেকশনের সঙ্গে।

আর সদানন্দবাবু চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

প্রথম দিনটা যে কি অস্বস্তিতে কেটেছিল! সদানন্দবাবু না থাকলে দ্বিতীয় দিন হয়তো আপিসে আসতে পারতাম না।

ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখের চশমার ফ্রেমটা একসময় রোলডগোল্ড ছিল কিন্তু এখন পিতল মনে হয়, চুলের অর্ধেক সাদা। পান খান মিনিটে মিনিটে। এই হলো সদানন্দবাবু।

খুব আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেন তিনি, কথা বলতে বলতে আনমনে হাতের উল্টো পিঠটা নিজের চিবুকে-গালে ঘষে নিলেন একবার, বোধহয় দাড়িটা কামানো নেই দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। এতক্ষণে ভয় কেটে গেল কিছুটা, মনে মনে কৌতুক বোধ করলাম।

সারাটা দিন কোন কাজ করতে দিলেন না সদানন্দবাবু। বললেন, এখন দিনকয়েক জিরিয়ে নিন মিস রায়, কাজ শুরু হলে আর নিশ্বাস ফেলতে পাবেন না।

আমি শুধু হাসলাম।

রেণুকাদি, অপর্ণা, সুজাতা আর গৌরীও সেদিন থেকেই কাজে লাগলো। শুধু নাম-ধাম জিগ্যেস করা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কোন আলাপই হলো না। অন্য পুরুষ-কেরানীদের নামধামটুকুও জিগ্যেস করতে পারলাম না। তা কেন, মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাতেও লজ্জা হচ্ছিল।

অথচ গৌরী ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দিব্যি আলাপ জমিয়ে ফেললো কয়েকজনের সঙ্গে। আর তারাও গৌরীর দিকেই নজর দিলো বেশী।

দোষ নেই, আমাদের পাঁচজনের মধ্যে গৌরী একটু পৃথক। চেহারাটা ভাল, মুখখানা মিষ্টি, যেমন ফিগার তেমনি স্মার্ট। আবার তেমনি সাজপোশাক।

পরের দিনও ঠিক সময়েই এলাম, দেরাজ খুলে পেপার-ওয়েট, পিনকুশন, কলম পেন্সিল বের করে সাজিয়ে রাখলাম টেবিলে। জলতেষ্টা পেয়েছিল, সবাই চাপরাশি রাধানাথকে জল দিতে বলছিল, কিন্তু তাদের মত আমি রাধানাথকে চেঁচিয়ে ডাকতে পারলাম না।

ফিসফিস করে সদানন্দবাবুকে বললাম, একটু জল দিতে বলুন না।

একটু আগেই রাধানাথ তাঁর টেবিলে এক গ্লাস জল কাগজের চাকতি ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল, সদানন্দবাবু সেটাই এগিয়ে দিলেন।

জলটা ঢকঢক করে গিলে নিয়ে বললাম, কাজ দিন।

সদানন্দবাবু হাসলেন, তারপর কয়েকটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, কাজ করতে হবে না, এগুলো উল্টে উল্টে দেখুন শুধু।

প্রৌঢ় সদানন্দবাবুর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অথচ এই সদানন্দবাবুই নাকি সেকশনে মেয়েদের চাকরী দেওয়া হবে শুনে প্রথমটা রীতিমত চটে গিয়েছিলেন।

একটু একটু করে কাজ দিতে শুরু করলেন সদানন্দবাবু, সে-সব খুবই সহজ কাজ। একটু একটু করে সকলের সঙ্গে আলাপ হতেও শুরু হলো।

আলাপ হলেও বেশী কথাবার্তা ঐ সদানন্দবাবু আর চক্কোত্তির সঙ্গেই হতো। চক্কোত্তি রসিক বৃদ্ধ, শুনেছিলাম মাস-কয়েক পরেই নাকি রিটায়ার করবেন।

হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন, সেই এলে মা-লক্ষ্মীরা, দুদিন আগে এলে না!

আমরা হাসতাম, আমি, অপর্ণা, রেণুকাদি, সুজাতা। আর গৌরী, যেমন প্রশ্ন, তার তেমনি জবাব দিতো।

অমন ফাজিল মেয়ে আমাদের সেকশনে আর একটিও ছিল না। আমাদের মেয়েদের দলটাকে সব সময়ে যেন ফুর্তিতে মাতিয়ে রাখতো সে।

টিফিনের সময় আমরা পাঁচজনে কাছের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। ইডলি, দোসা, চা-কফি খেতাম, আর হৈ-হল্লা করতাম নিজেদের মধ্যেই এক একজনকে নিয়ে। পরস্পরকে আমরা এত ভালবেসে ফেলেছিলাম যে, একদিন একসঙ্গে ঐ চায়ের দোকানে এসে জুটতে না পারলে মনে হতো সারা দিনটা বুঝি বৃথাই গেল। আবার পরস্পরের সমালোচনাও করতাম, হাসিঠাট্টা।

ছোটসায়েব যে গৌরীকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন, একটু ঘন ঘন তার ডাক পড়তো তাঁর খাস কামরায়, তা আমরা সবাই লক্ষ্য করতাম। সবই লক্ষ্য করতাম আমরা, কোন কিছুই আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতো না।

রেণুকাদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল চাকরীতে ঢোকার আগেই, স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরী করতেন দু' আপিসে। আর সেই সূত্রেই কিছু কিছু খবর এসে পৌঁছতো। রেণুকাদিই খবর এনেছিলেন ছোটসায়েব বিবাহিত, ছেলেমেয়েও তাঁর সিকি ডজন।

মাদ্রাজী চায়ের দোকানে বসেই সে-খবর জানিয়েছিলেন রেণুকাদি, গৌরীকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সতীন নিয়ে ঘর করতে চাস তো আমাদের কোন আপত্তি নেই।

গৌরী সশব্দে হেসে উঠে বলেছিল, সতীনে আপত্তি ছিল না রেণুকাদি, কিন্তু সোয়া তিনটে ছেলেমেয়েও আছে যে ছোট-সায়েবের।

অপর্ণা টিপ্পনি কাটতো, যত দোষ আমাদের গৌরীর, এদিকে সন্ধ্যা যে সদানন্দ বুড়োর সঙ্গে......

আমি চটে যেতাম। আর আমি যত চটতাম ওরা তত আমাকে নিয়ে পড়তো। আমার চটার কারণ যে না-ছিল তা নয়। অভিলাষবাবু তো প্রায়ই আমার সঙ্গে কথা-বার্তা বলতেন, গল্পগুজব করতেন। বেশ বুঝতে পারতাম আমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজছেন। আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলতাম। তা হোক, ওরা তো অভিলাষবাবুর নাম করে আমাকে ঠাট্টা করতে পারতো। তা নয়, বুড়ো সদানন্দ-বাবুকে নিয়ে।

সদানন্দবাবু লোক ভাল ছিলেন। বাড়ির খবর নিতেন। ভাইয়ের অসুখ সেরেছে কিনা। দিদির কি হয়েছে, ছেলে না মেয়ে। সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন সদানন্দবাবু, তাঁর ব্যবহারে কোনদিন কোন ত্রুটি পাই নি। কিন্তু ওরা ঠাট্টা করতো বলেই আমি এক একদিন সদানন্দবাবুর ওপর চটে যেতাম, কথাবার্তা বেশী বলতাম না, হাঁ-না দিয়ে উত্তর সারতাম। আর সদানন্দবাবুর ওপর চটতাম বলেই অভিলাষবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতাম।

অভিলাষবাবুর বয়স তখন কমই, চেহারাটাও মন্দ ছিল না। কিন্তু তার সম্পর্কে সত্যিই কোন দুর্বলতা ছিল না আমার মনে। তবু তাঁর সঙ্গে যেচে গল্প করে আসতাম। নিজের থেকেই দু'একদিন বলতাম, চলুন চা খেয়ে আসি।

রেণুকাদিদের সামনে দিয়েই আমরা দুজনে গিয়ে বসতাম চায়ের দোকানে। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতাম, আরো ধীরে ধীরে কথা বলতাম। ইচ্ছে করে এমন একটা ভাব দেখাতাম, যেন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি।

কাজ হলো কিছুদিনের মধ্যেই। ওরা সদানন্দবাবুর বদলে অভিলাষবাবুকে জড়িয়ে আমার নামে কানাঘুষো শুরু করলো। আর রেণুকাদি একদিন বললে, গেঁথে তো এনেছিস, এবার টেনে তোল।

প্রথমটা আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে একটু ভয়ও যে না পেতাম তা নয়। অভিলাষবাবুর ওপর আমার কোন দুর্বলতাই ছিল না। যেমন রেণুকাদিকে ভালো লাগতো, গৌরীকে ভালো লাগতো, তেমনি অভিলাষবাবুকেও। বন্ধু ভাবতাম, সঙ্গ ভালো লাগতো তাঁর। কারণ অভিলাষ-বাবু মানুষটি খুব হাসিখুশী, মিশুকে। এক কথায় মজার মানুষ, হাসাতে পারতেন প্রচুর, হাসতেনও।

কিন্তু এক একসময় তাঁর কথাগুলো দুমুখো মনে হতো, চোখের দৃষ্টিও। আশঙ্কা হতো, অভিলাষবাবু না ভুল বোঝেন। আমার এই অন্তরঙ্গ হবার

যখন প্রথম কলেজে ঢুকতে চেয়েছিলাম, মা আপত্তি করেছিল। দুদিন রাগারাগি করে তবে সম্মতি আদায় করেছিলাম। কিন্তু পড়াশুনো শেষ করে যখন চাকরী করতে চাইলাম, বাবাও আপত্তি তুললেন। কয়েকটা বছর উঠে পড়ে লাগলেন, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। পারলেন না। সে-সময় আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকতো, কারো সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারতাম না, হাসতে পারতাম না প্রাণ খুলে। আত্মীয়স্বজনরা এসে সমবেদনার ভঙ্গিতে আমার বিয়ের কথা জিগ্যেস করতো, আমি জ্বলে উঠতাম ভেতরে ভেতরে। সারাটা দিন সারাটা রাত্রি কিভাবে যে কাটতো, মনে হতো ঘড়ির কাঁটা যেন থেমে গেছে, ক্যালেন্ডারের পাতা নেই।

কাউকে কিছু না জানিয়েই চাকরীর জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম, ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। আর অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠিটা পেয়ে বাবাকে দেখালাম।

বাবা দেখলেন, খুশী হলেন, বললেন, বেশ তো, চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো।

মা বললে, আজকাল তো অনেকেই চাকরী করছে।

কি আশ্চর্য, চার বছর আগের সেই আপত্তি কোথায় উবে গেছে, কখন থেকে, তা আমি নিজেও টের পাই নি।

আর টের পাই নি, বছরের পর বছর চাকরি করতে করতে কখন থেকে বাড়িতে আমাকে কেউ আর 'মেয়ে' ভাবে না। আপিসের হেড-অব-সেকশন সদানন্দবাবুর মত, ছোটসায়েবের মত, বাড়িতেও আমি শুধু কেরানী। আত্মীয়স্বজনরাও বেড়াতে এসে কোনদিন বিয়ের কথা তুলতো না। তুলতো না বলেই আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমার মনের ভেতরেও একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে।

পরের দিন আপিসে এসে অপণা আর সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দুজনই যেন অসুখে ভুগছে, মুষড়ে পড়েছে, কেমন একটা বিষণ্ন চোখ। আয়নায় মুখ দেখে বুঝতে পারি নি, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নিজের মুখটাও যেন দেখতে পেলাম।

কাজে মন বসলো না। অকারণে সদানন্দবাবুর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলাম। ধমক দিলাম চাপরাশি রাখালদাকে। আর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অভিলাষবাবুর কাছ থেকে ফাইলটা চেয়ে নিতে পারলাম না।

তারপর টিফিনের সময় চমকে উঠলাম অভিলাষবাবুকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে যে কি অস্বস্তি!

—চলুন একটু চা খেয়ে আসি। অভিলাষবাবু বললেন।

আমি আরো অস্বস্তি বোধ করলাম। বোধ হয় বিদ্রোহ।

বললাম, আপনি আজ একাই যান, আমি রেণুকাদিদের সঙ্গে যাবো।

অভিলাষবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ আমার একটা জরুরী কথা ছিল।

কেমন অসহায় হয়ে পড়লাম আমি। যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি কি কিছু বলতে চান আমাকে? যা শুনতে চাই? না না, তা নয়, ও আশঙ্কা মিথ্যা, ও আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা। বাঙ্গ-বিদ্রূপে স্পষ্ট কথার চাবুক মেরে আমি নিজেই তো বোবা করে দিয়েছি অভিলাষবাবুকে। কিংবা সে কল্পনাটুকুও মিথ্যা। হয়তো আমার অহংকার। নিজেকে বড়ো বেশী বড়ো করে দেখেছি। অভিলাষবাবু এই নীরস মধ্যাহ্নের মধ্যে একটু বিশ্রাম চেয়েছেন, সঙ্গ চেয়েছেন, সঙ্গী করতে চান নি।

তাই ধীরে ধীরে বললাম, চলুন।

অন্য দিনের মতই এসে বসলাম চায়ের দোকানের খোপটায়।

দুপেয়ালা কফির অর্ডার দিলেন অভিলাষবাবু। কফি দিয়ে গেল। চামচটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কফির পাত্রে নাড়তে লাগলেন অভিলাষবাবু। অনেকটা সময় কেটে গেল। দুজনেই চুপচাপ।

তারপর এক সময় বেশ চেষ্টা করেই সোডার বোতলের ছিপি খোলার মত আকস্মিক সশব্দতায় অভিলাষবাবু প্রশ্ন করলেন, আপিসের এই চাকরী আপনার ভালো লাগে?

স্পষ্টভাবে সত্যি কথাটাই বললাম।—না।

অভিলাষবাবুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো। —এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছে হয় না আপনার?

খিল খিল করে হেসে উঠলাম। কথাটাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলাম, বললাম, হলেই বা উপায় কি?

অভিলাষবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে চামচটা ঠুন ঠুন করে কফির
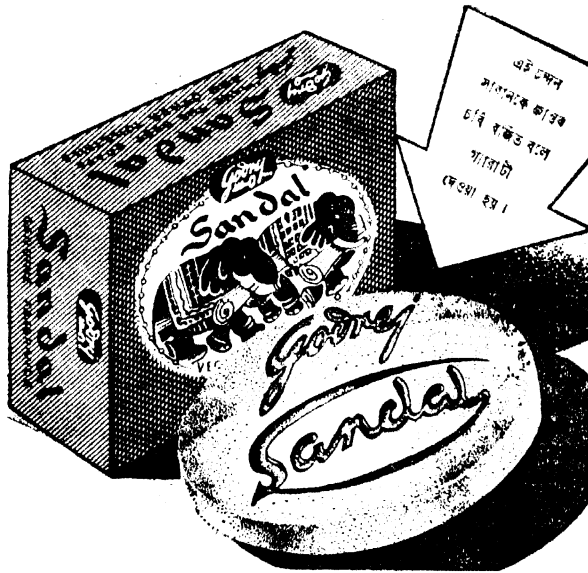
পায়ে বাজাতে বাজাতে মুখ নিচু করেই বললেন, আমি বলছিলাম কি, আপনার অমত যদি না থাকে,......

অস্বস্তিতে, লজ্জায়, অপ্রতিভতায় আমি কেন জানি না, তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়ালাম। আমি কেমন যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

অভিলাষবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজকেই উত্তর দিতে বলছি না, আজকের দিনটা ভেবে দেখুন, কাল, কাল ঠিক এই সময়ে আপনার উত্তরটা শুনবো।

কোন জবাব দিতে পারলাম না। সমস্ত শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। বুক দুরু দুরু করছে, কেমন একটা আতঙ্ক আর আনন্দের ভাব, ঠিক সেই চোদ্দ বছর বয়সে পাড়ার একটা বকাটে ছেলে যেদিন পাশ দিয়ে যাবার সময় হাতে চিঠি গুঁজে দিয়েছিল, ঠিক সেই দিনের মত কাঁপতে কাঁপতে সেকশনে ফিরে এলাম। একটিমাত্র প্রশ্নে আমার বয়সটা যেন কুড়ি বছর পিছনে চলে গেল, মনে হলো সেদিনের মতই অনভিজ্ঞ এক কিশোরীতে পরিণত হয়ে গেছি।

সেদিন আর কোন কাজে মন বসলো না। চোখ তুলে বুড়ো সদানন্দবাবুর দিকেও তাকাতে পারলাম না। প্রশ্ন নয়, কথা নয়, অভিলাষবাবু যেন এক মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছেন আমার মুখে। মুখ তুললেই যেন সকলে দেখতে পাবে।

ছুটির পর সকলকে এড়িয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। প্রথম বাসটার ভিড় ঠেলেই উঠে পড়লাম কোনদিকে না তাকিয়ে।

সমস্ত রাত্রি ঘুম এলো না। না, আনন্দ নয়, কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। কেমন একটা আতঙ্ক।

ঘর-সংসারের কথা ভেবেছি, গৌরীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করেছি। এই ধুলোটে ফাইলের পরিবেশ আর চাকরী-জীবনের তিক্ততা থেকে রেহাই চেয়েছি কতদিন।

কিন্তু সেই ঘর-সংসার বিবাহিত জীবন সামনে এসে দাঁড়াতেই কেন যে ভয় পেলাম নিজেও বুঝতে পারি না। কেমন একটা অবোধ্য আতঙ্ক। কিন্তু কি উত্তর দেবো অভিলাষবাবুকে। জীবনের একমাত্র কামনা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে এসে। হাত বাড়াবো, না হাত গুটিয়ে নেবো?

কোন উত্তরটাই যেন মনের মত হয় না। ভাবতে ভাবতে একটা রাত কেটে গেল। সকাল।

ভাবতে ভাবতেই কখন অফিসে পৌঁছে গেছি। নিজের টেবিলে এসে বসেছি, দেরাজ খুলে পেপার-ওয়েট, পিন-কুশন, কলম-পেন্সিল বের করে সাজিয়ে রেখেছি, রাধানাথকে চেঁচিয়ে ডেকেছি, বলেছি জল দিতে, তারপর ঢক ঢক করে জলটুকু খেয়ে ভ্যানিটিটুকু ঢেলে দিয়েছি শুকিয়ে যাওয়া কালির দোয়াতে।

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, কি উত্তর দেবো। ঠিক করে ফেলেছি, উত্তর নয়, কপট লজ্জা আর মৃদু হাসি হেসে সম্মতি জানাবো।

খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেছেন সদানন্দবাবু, তাঁর বাড়ির কথা, আমার বাড়ির কথা। বলেছেন, ছোটসায়েব লোক তো ভাল ছিলেন এখন মেজাজটা কড়া হয়ে গেছে। বলেছেন, আমার তো আর মাত্র দু'মাস মিস রয়। তারপর রেণুকাদি এসে বসেছেন এক সময়, চেয়ার টেনে নিয়ে অপর্ণা আর সুজাতাও।

রেণুকাদি বলেছেন, সুজাতা চললো।

—কোথায়?

অপর্ণা হেসে বলেছে, এ জি বি। ভাল চাকরী পেয়েছে।

রেণুকাদি বলেছেন, তুই এবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দিয়ে দে সন্ধ্যা। তা না হলে উন্নতি হবে না।

আমি চুপ করে শুধু শুনেছি। শুনে গেছি, সুবিমলবাবু চিৎকার করে মাণিককে বলছেন, তিনি নাকি ডবলু বি সি এস দিচ্ছেন। রায় আর হাজরার থিয়েটারের গল্প ঃ ভেবেছিলাম গৌরী দেবীকে পার্টটা করতে বলবো, আপনি একটা রোল করুন না মিস রায়?

আমি হেসেছি শুধু। কতদিন এই ছোটসায়েবের চরিত্রচর্চায় মজে গিয়েছি, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি। মেন রোলটা গৌরীকে কেন দেয়া হবে বলে তর্ক করেছি।

কিন্তু অভিলাষবাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যেন শান্তি নেই।

একসময় সময় কেটে গেছে। একে একে টিফিন বের হতে শুরু করেছে সকলে। আর আমি অভিলাষবাবুর দিকে তাকিয়েছি, অভিলাষবাবু আমার দিকে।

দুজন চুপচাপ এসে বসেছি চায়ের দোকানটায়। দুপেয়ালা কফির অর্ডার দিয়েছি আমি নিজেই। তারপর কফির পেয়ালায় চামচ নেড়েছি ঠুন ঠুন করে, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেছি, তারপর এক সময় হঠাৎ বলে উঠেছি, তা হয় না অভিলাষবাবু। তা হয় না। একথা আমি কোনদিন ভাবি নি, আমরা বন্ধু, আমরা...

আবেগে থর থর করে উঠেছি আমি। কথা শেষ করতে পারি নি।

ধীরে ধীরে কফির পেয়ালাটা আমি শেষ করেছি, আর অভিলাষবাবু পেয়ালায় একটা চুমুকও দেন নি। সেটা আমার চোখের সামনেই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে এসেছি, এসে বসেছি নিজের টেবিলে। এক মনে, হালকা মনে কাজ করেছি তন্ময় হয়ে। ভারী পাথরটা তখন সরে গেছে বুক থেকে।

ধুলোটে ফাইলগুলোকে ভেলভেটের ব্লাউজের চেয়েও নরম মনে হয়েছে। সদানন্দবাবুর গিন্নীর গল্প শুনতে আগ্রহ বোধ করেছি, সুবিমলবাবুকে বলেছি, গত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেবেন তো একবার; রায় আর হাজরাকে বলেছি, মেন রোল আমাকে দিতে হবে, রেণুকাদিকে ঠাট্টা করেছি তাঁর স্বামীর কথা বলে, অপর্ণাকে খোঁটা দিয়ে বলেছি, লজ্জাও করে না, এখনও পাত্রপক্ষের সামনে সেজে গুজে গিয়ে বসতে।

তারপর এক সময় নিজের মনকেই প্রশ্ন করেছি, ঘর-সংসারকে আমি ভয় পাই, না এই রেকর্ড সেকশনের ধুলোটে ফাইল আর ধোঁয়াটে মানুষগুলোকে ভালবাসি?

উত্তর খুঁজে পাইনি। উত্তর খুঁজে খুঁজেই বছরের পর বছর কেটে গেছে, কেটে চলেছে। কিন্তু সেদিন গৌরীর ফুটফুটে ছেলেটাকে দেখে এত ভাল লাগলো, এমন মিষ্টি মুখখানা, একুশ বছরের বাচ্চা ছেলে মাণিক যেদিন অফিসে জয়েন করলো, সেদিন যেমন ভালো লেগেছিল, ঠিক তেমনি......

চক্রদত্ত

যে সমস্ত টেলিফোন বহু লোক ব্যবহার করে, তার থেকে ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাসজনিত রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। টেলিফোনের 'মাউথপিস্', যেটি মুখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে হয়—তাতে এই সব ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস লেগে যায়, তারপর আর কেউ কথা বলতে গেলে ওখান থেকে পরের লোকটির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যাতে এই ধরনের জীবাণু মানুষকে আক্রমণ করতে না পারে,

জীবাণু ধ্বংসকারী টেলিফোন

তার এক অভিনব ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিফোনের গায়ে যেখানে ঠিক মাউথপিসটি থাকবে, সেখানে একটি চোঙার মত জিনিস লাগান থাকে। ঐ চোঙার ভেতর থেকে আলট্রাভাইলেট রশ্মি বের হয়ে মাউথপিসটির ওপর পড়ে সমস্ত জীবাণু ধ্বংস করে ফেলে।

*

বাগান যখন ফুলে ফলে ভরে ওঠে, তখন আর সবার চেয়ে বাগানের মালিকের বেশী আনন্দ হয়—কারণ তখন তার মনে পড়ে যায়, বীজ থেকে আরম্ভ করে কত কষ্ট করে তবে সে তার বাগান সাজাতে পেরেছে। বীজ থেকে চারা তৈরী করা খুব একটা শক্ত কাজ নয়—কিন্তু সেই চারা এক জায়গা থেকে সরিয়ে নড়িয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলাই কষ্টকর। সম্প্রতি বিলাতে এই চারা তৈরী করা আর খুব সহজেই বাঁচাবার জন্য এক নতুন উপায় বার করা হয়েছে। 'সুগার কিউবের মত 'সিড কিউব' তৈরী করা হয়েছে। 'সিড কিউব' আধ ইঞ্চি চৌকো দানার মত জিনিস। এটি বিভিন্ন ধরনের বস্তু মিশিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এতে 'ভারমিকুলাইট', হাড়ের গুঁড়ো, শুকনো রক্ত এবং গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু মিশিয়ে শক্ত চৌকো দানা তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় বীজ একটা অথবা দুটো এই সিড কিউবের মাঝখানে ঠিকমত বসিয়ে বাগানে এই গাছ বড় হতে দেওয়া হয়। গাছের চারা ঐ স্থানে দাঁড়িয়ে বড় হতে থাকে—আর তখন ঐ চারা সরান নড়ানর দরকার হয় না।

*

দিল্লীর ডি ডি টি'র কারখানা এই বছরে প্রায় দ্বিগুণ ডি ডি টি তৈরী করতে পারবে বলে আশা করা যায়। গত বছর এখানে ৬৫৭ টন ডি ডি টি তৈরী করা হয়েছিল। আর এই বছর এখানে ১১০০ টন ডি ডি টি তৈরী করা হবে। এই কারখানার উন্নতির জন্য ইউনাইটেড নেশনসের সাহায্য পাওয়া গেছে।

*

শীতকালে আমরা ঘরে কিম্বা টেবিলের নিচে ইলেকট্রিক হিটার রেখে দিই শীতের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য। সম্প্রতি একটি কোম্পানী এক নতুন রকম মাদুর তৈরী করেছেন সেটি টেবিলের নীচে জমির ওপর এমনভাবে পাতা থাকবে যে, ঐ মাদুরের সঙ্গে পা টা না ঠেকিয়েই দূরের থেকেই উত্তাপ অনুভূত হবে। মাদুরটি লম্বায় ২৫" ইঞ্চি ও চওড়ায় ২০" ইঞ্চি হয়। শীতের দিনে ইলেকট্রিক হিটারে ঘরের আবহাওয়া গরম হলে ও মেঝের দিকটা খুব বেশী রকম ঠাণ্ডা থেকে যায়। কিন্তু হিটারের বদলে এই মাদুর ব্যবহার করলে ঘরের মেঝে পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। যেসব কর্মচারীকে অফিসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাদের পক্ষে এই মাদুর খুব উপকার দেবে।

*

সারা পৃথিবীতে কম করেও ৬২টি হাই অলটিচিউড রিসার্চ লেবরেটরী (High altitude research laboratory) আছে। এই সমস্ত গবেষণাগারগুলি খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। এখানে কসমিক রশ্মি, রেডিও এস্ট্রোনমি, আবহাওয়া, এস্ট্রোফিজিকস্ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা হয়। এর মধ্যে কোন কোন গবেষণাগার একটি বিশেষ তথ্য নিয়ে গবেষণা করে। যেমন জাপানের 'মাউন্ট ফুজু ওয়েদার স্টেশনে' অত্যধিক ঠাণ্ডা জল থেকে এবং ভিজে তুষার-এর সঙ্গে [illegible] ছোট ছোট বরফ বিন্দু তৈরী হয় তাই নিয়ে পরীক্ষা করছে। এই গবেষণাগার প্রায় ১২000 ফিট উঁচু পর্বতের ওপর অবস্থিত। সর্বাপেক্ষা উঁচু স্থানে বলিভিয়ার কসমিক রে লেবরেটরী অবস্থিত—এটা প্রায় ১৮000 ফিট উঁচু। এর পরে 'মাউন্ট ওয়ারনগেল্স অবজারভেটরী' যেটি প্রায় ১৪,০০৬ ফিট উঁচুতে অবস্থিত। আমেরিকায় সবশুদ্ধ প্রায় সাতটি হাই অলটিচিউড রিসার্চ লেবরেটরী আছে। এই সমস্ত গবেষণাগারে অনেক ক্ষেত্রে কোন [illegible] কর্মচারী নেই। প্রয়োজনের সময় বৈজ্ঞানিকরা এখানে গিয়ে তাঁদের গবেষণা করেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণে কোডাইকেনালে প্রায় ৭000 ফিট উঁচুতে এই রকম একটি গবেষণাগার আছে। আর এখানে প্রায় ৩৭ জন লোক কাজ করে।

বাঁদিকে সিড কিউবের মধ্যে বীজ রাখা হয়েছে। ডানদিকে ছোট চারা ঐ কিউবের মধ্যে জন্মেছে

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে —

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বলেছি তো—স্বার্কা (স্বারকা) আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হবে, আমাদের ইয়ার-বন্ধুর সামিল। বাপ-ঠাকুর্দার লোহা-লক্কড়ের দোকান, আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি। পড়ে আমাদের নীচের ক্লাসে, কিন্তু মানে আড্ডা মারে আমাদের সঙ্গে। সাদা ধপ্‌ধপ্‌ করছে গায়ের রং, সুন্দর চেহারা, হাসতে হাসতে আমার পাশে এসে বসে। চুপিচুপি বলে, চিঠি এসেছে।

জিজ্ঞাসা করি হয়ত—কার চিঠি?

এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আরও চুপি চুপি বলে, বৌএর।

[illegible] বারোমাসের [illegible] বিয়ে ওদের একটা, সকলের সকালেই হয়। ওর বিয়েতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম বরযাত্রী হয়ে। [illegible] বছরের ডিবি ফ্রকপরা সুন্দরী একটি বৌ—মস্ত বড়লোকের মেয়ে।

সেই বৌ তার বাপের বাড়ি থেকে চিঠি লিখেছে।

চিঠিখানি পড়ে বেশ ভাল করে তার একটি জবাব লিখে দিতে হবে।

প্রথম-প্রথম রাজি হইনি কিছুতে। ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছি স্বার্কাকে।

কিন্তু তাড়ালেও যাবার ছেলে সে নয়।

—তাহলে দিলাম তোমার এই জামাটা ছিঁড়ে!

জামা ছেঁড়া বন্ধ করি তো মোটা একখানা বই টেনে নিয়ে বলে, এই আল-জ্যাব্রাটা নিয়ে গেলাম। কুয়োর ভেতর ফেলে দেবো।

তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয়: দে, দেখি তোর বৌএর চিঠি।

দেখবার একটা লোভও তো আছে! আমাদের বয়েসই-বা তখন কত!

চিঠি দেখে নজরুলের হাসি আর থামে না কিছুতেই।

বানান ভুলের ছড়াছড়ি আর উলটো-পালটা কথা। —তুমি ভাল আছ। আমি কেমন আছি।

স্বার্কা এবার রাগ করে। সত্যি তার রাগ করবার কথাই। বলে, হাসি থামাবে? তোমাদের হোক, দেখব কেমন পণ্ডিত বৌ হয়।

চিঠি লিখবার কাগজ একখানি স্বার্কা সঙ্গে এনেছিল। রঙিন কাগজখানি দেখতে ভারি সুন্দর। বাঁদিকের কোণে একটি পাখির ছবি। পাখির ঠোঁটে একটি খাম, আর তার নীচে সোনালী অক্ষরে ছাপা দু' লাইন কবিতা—

যাও পাখি বোলো তারে—
সে যেন ভোলে না মোরে।

নজরুল বললে, এবার লেখো তুমি। আমি চললাম।

বলেই সে আবার ফিরে দাঁড়াল হাসতে হাসতে। হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি দেখি চিঠির কাগজটা।

স্বার্কা দেবে না, নজরুলও ছাড়বে না। কেড়ে নেবেই।

শেষ পর্যন্ত কাগজটা কেড়ে নিয়ে নজরুল পড়লে—

যাও পাখি বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।

এর নীচে লিখে দাও—

আর বোলো—চিঠিখানা লিখে দেছে শৈল, ভোলে না কাউকে যেন এ দিব্যি রইল।

বলেই সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

স্বার্কা বললে, বাঁচা গেল। নাও এবার লেখো।

লেখা বললেই লেখা যায় না। নব-বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে লিখবে তার যুবক স্বামী। অথচ স্বামী কিছুই বলছে না। বলবে না জানি। কারণ এ আজ নতুন নয়। এই দুঃসাধ্য কর্ম এর আগেও আমাকে বারকতক করতে হয়েছে।

হতভাগা কাঁপ পর্যন্ত করবে না। তার হাতের লেখা নাকি তার বৌএর চেয়েও খারাপ। বৌ পড়তে পারবে না।

—তারপর? যখন ধরা পড়বি?

—পড়ি পড়ব। তুমি লেখো তো!

এই আমাদের স্বার্কা।

সেদিন এস-ডি-ও'র চিঠি নিয়ে আসান-সোল থেকে ফিরছি নজরুল আর আমি। রাণীগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই দেখি—স্বার্কা দাঁড়িয়ে আছে বেরিয়ে যাবার গেটটার পাশে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এখানে কি জন্যে এসেছিস?

সে-কথার জবাব না দিয়ে স্বার্কা বললে, তোমরা যুদ্ধে যাবে?

—তুই জানলি কেমন করে?

স্বার্কা বললে, শহরের সবাই এতক্ষণ জেনে গেছে। তোমাদের বাড়ি থেকে তিন-জন চাকর বেরিয়েছে তোমাকে খুঁজতে। বাড়ি-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। রায়-সাহেব তোমাদের দেখে এসেছেন আসানসোলে।

নজরুলের মুখের দিকে তাকালাম। সে হাসছে।

বললাম, তুমি হাসছো?

নজরুল বললে, তোমার এখনও ভয় করছে? কিন্তু এখন আর তোমাকে কেউ কিছু বলবে না—এই আমি বলে রাখলাম দেখো।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। সুমুখে শহরে ঢোকবার পথ। পথের দু'পাশে তখন আলো জ্বলেছে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে আমাদের সেই কয়লাকুঠির দেশে।

পাশাপাশি চলেছি আমরা তিন বন্ধু। ম্বার্কা কথা বলছে না। তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, কথা বলছিস না যে?

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম তার মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। আর সেই জলের ওপর রাস্তার আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে।

আলোর খুঁটিগুলো একটু দূরে দূরে। আবার আমরা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি। এই অবসরে কোঁচার খুঁট দিয়ে ম্বার্কা তার চোখ দুটো চট্ করে মুছে নিলে। তার সে অশ্রুসজল চোখ আর দেখতে পেলাম না। কিন্তু যা দেখলাম তারও মূল্য বড় কম নয়।

খানিক বাদে পথ চলতে চলতে ম্বার্কা আমার হাতটা চেপে ধরলে। বললে, কি এমন দুঃখু তোমার মনে, যার জন্যে তুমি এমনি করে চলে যাচ্ছ?

বলতে বলতে গলাটা তার ধরে এল।

বললাম, দুঃখু না থাকলে কি যেতে নেই?

কোনও জবাব পেলাম না তার কাছ থেকে।

—তুই কি ভেবেছিস আমরা আর ফিরবো না?

তারও কোনও জবাব নেই।

ভাবছিলাম আজ আর বাড়ি ফিরব না। যেখানে হোক রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই পালাব রানীগঞ্জ থেকে। নজরুলকে বললাম, চল—কালই চলে যাই কলকাতা।

নজরুল বললে, কলকাতায় থাকবে কোথায়?

থাকবার জায়গা অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া চলবে না।

বংশীর বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি, বংশী দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। বংশী বললে, চল আমিও যাব। ম্বার্কা নতুন বিয়ে করেছে, নইলে তাকেও সংগে নিতাম।

ম্বার্কা চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে। সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল বিস্তর। পানের দোকান ছেড়ে ভজুয়া পর্যন্ত এসে দাঁড়াল আমাদের দেখবার জন্যে।

ভজুয়া বললে, দুগিয়াকে সংগে নিয়ে যাও বাবু, ব্যাটা আমাদের ভারি জ্বালাচ্ছে।

সত্যিই তো। যে-লোক জ্বালাচ্ছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার এত সহজ উপায় আর কি হতে পারে? যুদ্ধে যারা যাচ্ছে, তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করছে—এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এরা যখন আর ফিরে কোনোদিনই আসবে না, তখন দুগিয়াকে কোনোরকমে এদের সংগে ঠেলে দিতে পারলেই—বাস্, জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যাবে চিরদিনের জন্যে। মরে তো ওই ব্যাটাই আগে মরবে।

দুগিয়াকে দেখেছেন আপনারা শেকার-সাহেবের বাংলোয়। অস্থিচর্মসার লম্বা লিক্লিকে একটি ছোকরা। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। সেই দুগিয়ার ব্যাটাই আগে মরবে।

নজরুল হাসতে লাগল দুগিয়ার নাম শুনে। বললে, ওকে নেবে কেন ভজহরি?

ভজহরি বললে, নিতেও পারে বাবু, ব্যাটা দেখতে অমনি, কিন্তু ওর হাড়গুলো ঠিক লোহার মত শক্ত। আপনাদের আর কি, নিয়ে যান সংগে করে, নিজের পয়সায় যাবে, না নেয় তো ফিরে আসবে।

দুগিয়ার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছি, এমন সময় যা ভয় করেছিলাম তাই হল। আমাদের বাড়ির দুজন চাকর—সীতুয়া আর নায়া এসে দাঁড়াল। বললে, চলুন। বড়বাবু ডাকছেন।

আমি একাই যাচ্ছিলাম, নায়া নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনিও আসুন বাবু, আপনাকেও নিয়ে যেতে বললেন।

গিয়ে দাঁড়ালাম রায়-সাহেবের কাছে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দুজনে—নজরুল আর আমি।

দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। মার্বেল ফ্লোরের ওপর কাশ্মিরী কার্পেট পাতা। জানলার কাছটিতে যেমন তিনি প্রত্যহ বসে বসে কাজকর্ম করেন, সেদিনও তেমনি বসেছিলেন। নজরুলের দিকে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, বোসো।

দুজনেই বসলাম কার্পেটের ওপরে।

রায়-সাহেব কথা খুব কম বলেন। সেদিন মনে হল যেন আরও বেশি গম্ভীর। তাঁর গায়ের রং ছিল খুব ফরসা। বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়িতে তখন সবেমাত্র পাক ধরেছে। আমার দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না।

আবার তিনি নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি খুব ভাল ছেলে, কিন্তু লেখাপড়া তো তোমার এইখানেই শেষ।

নজরুল জবাব দিলে না। তিনি আবার বললেন, তোমার বাড়ির অবস্থা ভাল নয় আমি শুনেছি। তার ওপর তুমিই বাড়ির বড় ছেলে। যাক গে, সে-সব ভাবনা তোমার।

এই বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,

এই যে যুদ্ধে চলে যাওয়া—এটি বেরুলো কার মাথা থেকে?

নজরুল বলতে যাচ্ছিল, তার মাথা থেকে বেরিয়েছে। আমি তাকে থামিয়ে দিলাম, বললাম, আমার।

আমি চাই নি—নজরুলের ওপর রায়-সাহেবের ধারণা খারাপ হোক। চাইনি যে তিনি ভাবুন—এ-ব্যাপারে নজরুলের উৎসাহ আমার চেয়ে বেশী।

কি তিনি ভাবলেন বুঝলাম না।

বললেন, তাহলে কবে তোমরা যাচ্ছ কলকাতায়?

নজরুল বললে, পরশু।

বলেই নজরুল তার জামার পকেট থেকে এস-ডি-ও সাহেবের লেখা খামের চিঠিখানা বের করে বললে, এই যে, দেখুন না, সাহেব লিখে দিয়েছে।

খামখানি রায়-সাহেব নিলেন হাতে করে। দেখলেন, খামের মুখ বন্ধ। মনে একটু হেসে সেখানি আবার তিনি ফিরিয়ে দিলেন নজরুলের হাতে।

বললেন, হাওড়ায় নেমে সোজা তোমরা চলে যাবে স্যুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। আমি একখানা চিঠি লিখে দেব। মেজদাদু সেখানে আছেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রিক্রুটিং অফিসে।

বেঁচে গেলাম। রায় সাহেব নিজেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

বললেন, যাও। লেখাপড়া তো চুকিয়ে দিলে। এখন তোমরা স্বাধীন। যা খুশি তাই করগে।

বুঝতে পারছি মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছে।

বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে আমরা নীচে নামছি, পেছন থেকে মনে হল যেন মামীমা ডাকছেন। বলে গেলাম, আসছি।

মেয়েদের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করছে। পাশ কাটিয়ে ভাবলাম পালিয়ে যাই নজরুলের বোর্ডিংএ। কিন্তু রাস্তায় গিয়ে নামতেই দেখি—সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গিয়া। দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এমন পান খেয়েছে যে, মুখের দু'কস্ বেয়ে রস গড়াচ্ছে। হাসতে হাসতে বললে, আমি শুনেছি।

—কি শুনেছিস?

দুর্গিয়া বললে, আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।

—তোকে নেবে না যে!

—না নেয়, আমি ফিরে আসবো।

তার পরেই চলল তার পায়ে ধরা আর কান্না। নিয়ে তাকে যেতেই হবে। আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি সে আদায় করে নিলে তবে ছাড়লে।

নজরুল চলে গেল তার বোর্ডিংয়ে, আর আমি গেলাম বাড়ির ভেতর। মামীমা ডেকেছেন—যেতেই হবে।

চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়ালাম মামীমার কাছে। আমার একখানা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, এ কি করলি বল্ দেখি?

হাতটা তাঁর থর্ থর্ করে কাঁপছে। আমিও তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাব বলেই পালাতে চেয়েছিলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে।

হঠাৎ আমার হাতটা মামীমা ছেড়ে দিলেন। মুখ তুলে চাইতেই দেখি রাঁধুনি বামনী মোক্ষদা এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে দোর আগলে।

মামীমা আমার হাতটা কেন ছেড়ে দিলেন—বুঝতে দেরি হল না।

বাংলা দেশের অনেক কবি অনেক সাহিত্যিক নারীজাতির গুণ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা বোধহয় আমাদের এই মোক্ষদাকে দেখেননি, দেখলে কলম তাঁদের নিশ্চয়ই থেমে যেত, অতখানি প্রাণ খুলে লিখতে পারতেন না।

মোক্ষদা বলতে আরম্ভ করলে, আহা বাছা রে! লড়াইএ নাম লেখাতে গেলি কোন্ দুঃখে বল্ দেখি? কোথায় কোন্ মাঠে-ঘাটে মরে পড়ে থাকবি, শেয়াল-শকুনিতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে!

মামীমা বললেন, আঃ, থামো না! ছি!

কিন্তু থামা দূরে থাক, মোক্ষদা এবার সত্যি সত্যিই চোখে কাপড় চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। —এই এতটুকু ছেলেকে এত বড়টি করে তুললে গা, আর সেই ছেলে কিনা আজ জন্মের মতন চলে যাচ্ছে সবাইকে ছেড়ে—

আমি ছাড়া সকাল-সকাল ভাত খাবার লোক বাড়িতে কেউ ছিল না। আমাকেই শুধু ইস্কুলের ভাত ওকে রান্না করে দিতে হতো। তাই আমি ছিলাম মোক্ষদার দু' চক্ষের বিষ। ইস্কুলের ভাত আর রাঁধতে হবে না—এই আনন্দেই বোধহয় সে এই মড়াকান্নার অভিনয় করে লোক জড়ো করে ফেললে।

মামীমা আর আমি দুজনেই ঘরের ভেতর আটকা পড়ে গেছি। কারণ মোক্ষদা তার বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোরের ঠিক মাঝখানটিতে।

মামীমাই প্রথমে তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার পিছু পিছু আমিও পথ করে নিলাম একটুখানি।

রানীগঞ্জে রইলাম মাত্র একদিন। এই একটি দিনের স্মৃতি আমি কখনও ভুলবো না, পৃথিবীতে থাকবার মেয়াদ আমাদের শেষ হয়ে গেছে—এই কথাটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সকলেই। বুঝবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওইটিই আমি চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম—জীবনের প্রতি এ বিতৃষ্ণা আমার কেন এসেছিল—সে কাহিনী এখানে অবান্তর।

নজরুলের জীবনের নিগূঢ়তম বেদনার কাহিনীও আমি জানি। সেই বেদনার সংগে মিশেছিল কৈশোরের দুর্দমনীয় অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি। তাই সব-কিছু হাসিমুখে পরিত্যাগ করে সেও ঝাঁপ দিয়েছিল এই মরণ-যজ্ঞে।

আমাদের দুজনের প্রীতির বন্ধন নিবিড়তর হয়েছিল বুঝি সেই কারণেই। এই সহানুভূতির জন্যই বোধকরি এক আর একের যোগফল দুই না হয়ে এক হয়েছিল।

আমার পাতান দিদি আর যতীন, নজরুলের ছিনু আর আমায় দ্বারকা—পেছনে টেনে রাখতে পারলে না আমাদের। যারা পারত, আমার মাতামহী আর নজরুলের মা—তারা রইল দূরে, নিষ্ঠুরতম ঔদাসীন্যে তাদের সংগে দেখা না করে শুধু তাদের স্মৃতির আগুনে বুকে জ্বালিয়ে নিয়ে আমরা ট্রেনে চড়ে বসলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে। দুর্গিয়া হাসতে হাসতে এসে বসল আমাদের সংগে। তার মা দাঁড়িয়ে রইল ল্যাম্প পোস্টের নীচে। দুর্গিয়ার মত এক সর্বহারা পাষাণের চোখেও অশ্রুর ধারা।

আমাদের চোখ ছিল শুকনো। পাশাপাশি বসে হাসছিলাম আমরা—নজরুল আর আমি। সে হাসিও শুকনো। জীবন-দেবতার প্রতি নিদারুণ অভিমানে যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম আমাদের বুকে, তারই উষ্ণ উত্তাপে বোধকরি উত্তাল অশ্রু-সমুদ্র শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় পৌঁছলাম পরের দিন সকালে। এর আগে নজরুল কখনও কলকাতা দেখেনি। বললাম, দ্যাখো। আর হয়ত দেখতে পাব না।

নজরুলের কেন জানি না দৃঢ় বিশ্বাস সে আবার ফিরে আসবে। বললে, না না এত তাড়াতাড়ি মরব না আমরা।

আমাদের যেতে হবে সুকিয়া স্ট্রীট। (আজকাল কৈলাস বোস স্ট্রীট) একাত্তর নম্বর বাড়িখানি উখরার জমিদারদের। রায়-সাহেবের কোনও বাড়িই তখন হয়নি কলকাতায়। উখরা এস্টেটের সংগে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই ওই এক বাড়িতেই আমাদের দু বাড়ির কাজ চলত।

কলেজ স্ট্রীটে ট্রাম বদল করে যেই আমরা ট্রাম থেকে নেমেছি, দেখি আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে। রায়সাহেবের টেলিগ্রাম এসে পৌঁচেছে আমাদের আগেই।

সেখানে গিয়ে দেখি আমার মামা, উখরোর সেজমামা ইত্যাদি অনেকেই বসে আছেন আমাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে।

উখরোর সেজমামা শৈলবিহারীলাল সিং রায়ও আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, খুব দেখালি বাবা!

আমার মামা একটি কথাও বললেন না। শুধু একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মা আর এই মামা—রায় সাহেবের দুই ছেলেমেয়ে। আমার মা অনেকদিন আগেই চলে গেছে আমাকে রেখে। আমি তখন নিতান্ত ছোট—আমার সেকথা মনে নেই, কিন্তু মামা বোধকরি ভুলতে পারেননি সেকথা।

এতক্ষণ পরে কথা বললেন তিনি। বললেন, সব নিলে তো শেষ করে! খুব বাহাদুর! কই, এস-ডি-ও'র চিঠি কার কাছে?

নজরুল তার পকেট থেকে খামের চিঠিখানি বের করে দিলে।

মামা বললেন, রাত জেগে ট্রেনে এসেছ, যাও এবার স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোওগে। বিকেলে নিয়ে যাব রিক্রুটিং আপিসে।

রাত জেগে এসেছি, সত্যিই তো, চোখ জ্বালা করছে। ভেবেছিলাম, স্নান করলেই ঘুমে চোখ ভেরে আসবে। কিন্তু কোথায় ঘুম?

দুর্গিয়া বসে বসে পা টিপছে। বারণ করলেও শোনে না। বলে আমাকে ফেলে যেন তোমরা চলে যেও না।

দুর্গিয়ার সংগে মজার মজার গল্প করেই সময়টা আমাদের কেটে গেল।

হেদোর উত্তর দিকের লাল বাড়িতে মল্লিক-সাহেবের রিক্রুটিং আপিস। মামা আর সেজবাবু আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন।

খাতায় নাম লেখান হল। দুর্গিয়াও বাদ গেল না। তার নাম উঠল 'সুইপারের' খাতায়। দুর্গিয়ার তাতে আপত্তি নেই। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'সুইপার' মানে কি?

আমি বললাম, ঝাড়ুদার।

নজরুল হাসতে হাসতে বললে, 'মেথর।'

তা হোক, তবু সে যাবে।

তার পরেই পরীক্ষার পালা।

আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল নজরুলকে আর আমাকে। দুর্গিয়ার পরীক্ষার দরকার নেই।

পরীক্ষা যৎসামান্যই। কত ফুট লম্বা, কত ওজন, বুকের ছাতির মাপ কত।

প্রথমেই নজরুল পাশ হয়ে গেল।

যিনি মাপ নিচ্ছিলেন তিনি বললেন, বসুন ওই দিকে। এক্ষুণি আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে ফোর্ট উইলিয়মে। সেখানে সাজ-পোশাক, বিছানা আর কিড্-ব্যাগ্ দেওয়া হবে। তারপর যেদিন চিঠি আসবে, সেইদিন যাত্রা করবে।

মামা এইবার আমাকে এগিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক লিখে চলেছেন খাতায়। লম্বা—ঠিক আছে। ওজন—ঠিক আছে। শেষে এসে দাঁড়ালাম, ফিতে নিয়ে যিনি বুকের মাপ নিচ্ছিলেন তাঁর কাছে। একবার মাপলেন, দুবার মাপলেন, তারপর বললেন, আধ-ইঞ্চি কম। আন্‌ফিট্।

যিনি খাতা লিখছিলেন, তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, আপনি বাড়ি চলে যান। দিন কতক খুব সাঁতার কাটুন, তারপর বুকের মাপ ঠিক হয়ে গেলে আবার এপ্লাই করবেন।

বলেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাঁকলেন, নেক্সট্!

মামা তখন আমার হাতখানা চেপে ধরেছেন। ওদিকে নজরুল উঠে দাঁড়িয়েছে।

এ কি হল?

নজরুল এগিয়ে এসে বললে, সে কি? তোমার বুকের ছাতি তো—

মামা বললেন, তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

তারপর যা হল তা আর লিখবার নয়। নজরুলের মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম মনে আছে।

তার সে শুকনো চোখেও সেদিন একটুখানি জল দেখেছিলাম। আর আমার চোখে তখন অশ্রুর ধারা নেমেছে।

মামা আমাকে সেখান থেকে জোর করে টেনে আনলেন। বললেন, খুব হয়েছে। এসো।

দূরে, অনেক দূরে, বিকচকবাগে নরম পেন্সিলের আঁকাবাঁকা রেখার মত অস্পষ্ট গ্রাম। গ্রামের মাথা ছুঁয়ে সূর্য ডুবছে। জ্বলজ্বলে পীতাভ সূর্য। পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের রক্তিম রঙ। একটা দুটো মেঘের টুকরো উড়ছে। আকাশের গা ছুঁয়ে সামান্য হেলে পড়েছে একটা অস্বাভাবিক লম্বা গাছ। তাল, সুপারি কি নারিকেল—সুধাব্রত জানেন না।

দেখছিলেন সুধাব্রত।

হাসপাতালের এই খোলামেলা প্রশস্ত বারান্দা; রেলিঙ ঘেঁষে সুধাব্রত দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ। সামনে ধূ ধূ প্রান্তর. তার মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা এক রাস্তা সরু থেকে ক্রমশ প্রশস্ত হ'তে হ'তে এগিয়ে এসেছে। হাসপাতালের সীমানা ছুঁয়ে পেছন দিয়ে রাস্তাটা কোথায় চলে গিয়েছে, সুধাব্রত জানেন না।

সুধাব্রত অপেক্ষা করছেন।

কার যেন আসবার কথা! হাঁ, সে আসবে, সুধাব্রতকে নিয়ে যাবে। এই হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স—এই সুন্দর বারান্দা; ওপরে আকাশ...সামনের ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝখানে ছোটমত একটা ধূলোর ঘূর্ণি দেখতে পেলেন সুধাব্রত। খানিক পরে সেই ঘূর্ণির ধূসরতা দমকা বাতাসে সরে গেল; বেরিয়ে এল একটা এক্কাগাড়ি। জোরে, খুব জোরে ছুটে আসছে এক্কাগাড়ি টানা ঘোড়াটা...সুধাব্রত এবার যাবেন।

সামান্য ঝুঁকে পড়লেন সুধাব্রত। ব্যথা। বুকের তলায় একটানা ব্যথার কনকনানি। কিন্তু আমি যাব, ভেবে সোজা হবার চেষ্টা করলেন সুধাব্রত। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের সমারোহ দেখলেন। কী লাল, রক্তের মতন!.....হাতে বুক চেপে নুব্জ ভঙ্গিতে অল্প কাত হলেন; দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজলেন জোর করে। কোঁচকান ভুরুটো উঠল, নামল, কাঁপল—সোজা হ'তে গিয়ে ধনুকের মত বেঁকে গেল।

...এই ধূসরতা, অল্প আলো মেশানো ছায়া ছায়া বিকেল; এই দীর্ঘ দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া পথ...আমি যাব। এক্কা-গাড়ি নিয়ে সুধাংশু আসছে। এসে পড়বে এখনি। ব্যথায় পীড়িত চোখ দুটো মেললেন সুধাব্রত। কী শীত, ঠাণ্ডা! হিম জড়িয়ে আসছে আঙুলগুলো। অদ্ভুত এক ভয়ও সেই সঙ্গে বাড়ছে। আমি কি মরব! হাঁ, মরব। ভয় মেশানো এক নিশ্চিন্ত সন্দেহ সুধাব্রতর মনে।...কিন্তু এই বারান্দা, দূরের বিশাল প্রান্তর, বিকেলের সুন্দর আকাশ...আঁকাবাঁকা পথটা এই হাসপাতালের সামনে যেখানে ছুঁয়েছে, তার পাশে ফুলের বাগান; সব আছে। সঠিক সুন্দর। কিন্তু সুধাব্রত ভাবলেন, হাসলেনও সামান্য, ছোট বাচ্চাদের মত হয়ে গিয়েছি আমি। সবে জ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছে যেন। আর খুব করুণ, হৃদয় ছিঁড়ে নেওয়া সুরে কে যেন টেনে টেনে অদ্ভুত এক কান্নার সুর বাজাচ্ছে। কী সে বাজনা, কেমন—সুধাব্রত জানেন না।

...আমি ছোট। খোকা। বাবার মতন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা একটা কুঁজো লোক, তার চুলগুলো কী সাদা! গোঁফ দাড়িও কাশ-ফুলের মত শুভ্র—সে বাঁশি বাজায়। বাঁশি বাজাতে বাজাতে সে কাঁদে, তাকায় আকাশের শূন্যতায়। তার কাঁধে ঝোলা। খুব লম্বা, কোমরের নিচ পর্যন্ত নেমে আসা সেই ঝোলার তলাটা মোটা। কি আছে ওতে সুধাব্রত জানেন না।

'ভিক্ষে নেবে?'

সে কথা বলে না।

'তুমি গরিব।'

সে তাকায়।

বাঁশি তার বাজে, বাজে—থামে না। আমার কান্না পায়।

কিন্তু ডাক্তার বলেছিল, 'অপারেশন হলেই ভাল হয়ে যাবেন। তখন ফিরে যাবেন বাড়িতে।'

ছোট ছেলেমানুষের মত কেন কান্না পাচ্ছে সুধাব্রতর! ওই তো প্রায় এসে গেল এক্কাগাড়ি। সুধাংশু আসছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে স্টীমার ঘাটে পৌঁছে যাবেন তিনি। স্টীমারের ডেকে বসে সূর্যাস্তের রঙ মুছে যাওয়ার পর ভীরু পায়ে এগিয়ে আসা সন্ধ্যা দেখবেন। আকাশ, প্রান্তর নদীর জল থেকে দিনের শেষ আলোটুকু মুছে মুছে যাবে।...কিন্তু চাঁদ উঠবে কি আজ?

সিঁড়ি দিয়ে ঝাপুর টানার মত হালকা শব্দ। সুধাংশু এল।

ব্যথা। বুকে হাত রাখলেন সুধাব্রত। বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখটা নিচু হল, কুঁচকে এল চোখের ভুরু।

দু' জোড়া পায়ের হালকা শব্দ নামল, আর সব নিস্তব্ধ।

'চলি।' সামান্য হাসলেন সুধাব্রত আ নার্সকে দেখে।

মাস্কের নিচের ঠোঁট কাঁপল। হাসল

একটু। 'খুব সাবধানে থাকবেন। এতবড় অপারেশন।'

'থাকব।'

কম বয়েস এই নার্সটির। নাম শান্তি। ওর ঢলঢলে সুন্দর মুখ, শান্ত দৃষ্টি আর মিষ্টি স্মিত হাসিটুকু পর্যন্ত চোখে লেগে রয়েছে সুধাব্রতর। ঢালু চিবুকের তলায় উজ্জ্বল কালো একটি ছোট তিল, সামান্য ওঠা পাতলা ঠোঁটের তলায় তির্যক ছায়া; শান্তির ঠোঁট কাঁপছে।...তুমি আমার অনেক করেছ, অনেক—ঃ নিজের মনেই বললেন সুধাব্রত। কিন্তু এতদিন পরে, এখন শান্তির এই সুন্দর মুখটা কার সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছে। কার সঙ্গে? নিজের মনকে প্রশ্ন করে ভাবতে লাগলেন সুধাব্রত। কিন্তু আশ্চর্য সেই মুখ মনে পড়ল না কিছুতেই।

'যাচ্ছি', শান্তির কাঁধে হাত রেখে সুধাব্রত ওকে ছুঁলেন।

'হ্যাঁ', মুখ নিচু করল শান্তি, অস্পষ্ট জড়ানো গলা শান্তির—। যেন চাপা বিষণ্ণতা এবং মুখের বেদনার রেখাগুলো আড়াল করল ও।

আমি কি শান্তিকে ভালবেসেছিলাম সত্যি! হয়তো বেসেছিলাম। শান্তিও যদি আকৃষ্ট হয়ে থাকে আমার প্রতি দোষ কিসের? কিছুই নয়। তিন মাস ধরে বিছানায় পড়ে যে যন্ত্রণা আমি পেয়েছি, শান্তি তা থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে। কিন্তু —সুধাব্রত ভাবলেন, কত ক্ষণস্থায়ী জীবনের এই ছোট ছোট ভালবাসার মুহূর্তগুলি।...আজ চলে যাচ্ছি আমি, শান্তি রইল...

'তোমার কি শীত লাগছে, সুধাংশু?'

'না। শীত লাগবে কেন? বসন্তকাল এখন।'

'বসন্তকাল!' অবাক হলেন সুধাব্রত, কিন্তু আমার হাত-পাগুলো কেমন জড়িয়ে আসছে যে!'

হাওয়া বইছে, অনুভব করলেন সুধাব্রত। বসন্তই যদি এসে থাকে, তবে শীত কেন! হয়তো আজ পর্যন্তই শীতকাল। আজ তার শেষ দিন। আজকের রাত ভোর হবে, শুরু হবে বসন্তকাল। নিজের জীবনের সঙ্গে বসন্তকালকে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন সুধাব্রত।

আলো ম্লান হয়ে আসছে। সূর্যটা ডুবেছে অর্ধেকের মত। অল্প ধূসরতা মিশেছে এই আলোয়। দিগন্তে, যেখানে আকাশ ঝুঁকে পড়েছে পৃথিবীর গা-য়ে, সেই দূরে অস্পষ্ট পথরেখার মাথা ছাপানো দীর্ঘ এক তাল কি সুপুরির গাছটা অতি গর্বে স্পর্ধায় হেলান দিয়েছে আকাশের গায়ে। ডুবন্ত সূর্যটা তার পেছনে। যেন ওই গাছটা সূর্যকে চিরে ফেলেছে দু' ভাগে।

একাগাড়িটা ভয়ানক ঝাকুনি দিচ্ছে। যেন উঁচু নিচু বন্ধুর পথে যেতে যেতে বিশ্রীভাবে নামছে উঠছে। কিন্তু এ পথটা কি এমন! এমন নয়। হাসপাতালের দোতলার বারান্দা থেকে এই মাঠ সুন্দর সমতল দেখেছিলেন সুধাব্রত। এখন কেন এমন! সুধাংশুকে জিজ্ঞেস করবেন কিনা ভাবছিলেন। তাকালেন সুধাংশুর দিকে। সুধাংশু কেমন আনমনা। তন্ময় হয়ে কি দেখছে সুধাংশু? এই সুন্দর বসন্ত,—এই মাঠ ঘাট আকাশ—প্রকৃতির শোভা? আলতো, হাল্কাভাবে বসেছিলেন সুধাব্রত, এবার শক্ত হলেন একটু। ব্যথাটা হঠাৎ বাড়ল। বুকের তলায় দলা পাকানো ব্যথাটা মোচড়াচ্ছে, কি ভেতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে —ধরতে পারছেন না। এতক্ষণের আলগা হালকা শরীরটাকে মনে মনে চাপলেন সুধাব্রত নিশ্বাস বন্ধ করে। নুব্জ হয়ে একটু বেঁকালেন ডানদিকে। কাঁধ থেকে মাথাটা ঝুলে পড়ল ডান কাঁধের ওপর।

কষ্ট হলেও চোখ মেললেন সুধাব্রত। এইটুকু তো পথ। ডাক্তার বলেছিল, 'অপারেশন হয়ে গেলেই, এই চোখে আবার সুন্দর পৃথিবীকে দেখতে পাবেন।'

কী নীল আকাশ! সুধাব্রত দেখলেন। অনেক পাখি আকাশের শূন্যতায়। ঝাঁক বেঁধে কিংবা ছুটছাট পাখিরা উড়ে যাচ্ছে কলরব করতে করতে। নীড়-ফেরা পাখিদের সুন্দর এই কাকলি সুধাব্রতর মনে অদ্ভুত এক চেতনার জন্ম দিল। অস্তপ্রায় সূর্যের কাছাকাছি থেকে রঙের ছোপ লাগা মেঘগুলো যত সরে সরে আসছে, তত রঙ বদল হচ্ছে। তুলোর মত হয়ে যাচ্ছে মেঘগুলো। সাদা সাদা ময়লা তুলো।

আর কতটুকু দেরি। এইতো, এইতো শেষ হয়ে এল পথ। আর খানিক পরে গ্রাম ছাড়িয়ে, পার হয়ে একাগাড়িটা এগিয়ে যাবে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার অনেক আগেই পৌঁছে যাবে। হয়ত সূর্যটা তখন সম্পূর্ণভাবে ডুববে। পশ্চিমের আকাশ থেকে আবীরের রঙ মুছতে মুছতে ধূসর হয়ে আসবে। তারপর সেই ধূসরতা ঘন হতে হতে কালো রঙ ধরবে। ততক্ষণে বাড়িতে উঠে যাবেন সুধাব্রত। কোন পক্ষ আজ! সুধাব্রত ভাবলেন, কোন তিথি। চাঁদ উঠবে কি আজ? সে কি আসবে, লাবণ্য?

'সুধাংশু', গলায় অস্ফুট শব্দ করে আচমকা সুধাংশুকে ধরতে গেলেন সুধাব্রত।

চমকে মুখ ঘোরাল সুধাংশু, 'ভয় পেলেন?'

সুধাব্রত কথা বললেন না। তাঁর চোখ বন্ধ, ভুরু কোঁচকানো। ঠোঁট শক্ত করে চাপা। নাক থেকে মুখের দু' পাশে একটা মাংসল ভাঁজ নেমে এসেছে। কপালের চামড়া টান টান—মসৃণ।

এত জোরে ছুটছে একাগাড়িটা, সুধাব্রতর বুকের ভেতর কেমন এক ধড়ফড়ানি, অস্বস্তি মেশানো ভয়। মনে হচ্ছিল, অনেক উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে খুব ঢালু পথে জোরে নেমে আসছে গাড়িটা। খুব জোরে, হুড়বড় করে। এখনও নামছে তেমনি; তেমনি ভয়ানক জোরে।

'গাড়িটা এত নিচে নামছে কোথা থেকে, সুধাংশু!'

'সামান্য ঢালুতে নেমেছে পথ।'

'কিন্তু সুধাংশু, হাসপাতাল থেকে আমি দেখেছি, পথটা সমতল, সুন্দর।'

'হয়তো দেখেছেন।' একটু হাসল সুধাংশু, 'ওপর থেকে সব কিছুই তাই মনে হয়।'

আস্তে বেজে ওঠা হারমোনিয়মের রীড টিপে মিহি থেকে ক্রমশ মোটা সুরে আসতে যেমন সুরের গমক ওঠে, তেমনি বুকের তলায় ব্যথাটা বাড়ছে। একটু ভয়ও সেই সঙ্গে। কিসের ভয়, কেন?...আমি কি খুব ছেলেমানুষের মত কথা বলছি? সুধাব্রত ভাবলেন, চোখ মিলিয়ে নই?

চোখ বুজলেন সুধাব্রত। দৃষ্টি দিয়েছে নিবিড় ঢালু পথ ধরে একাগাড়িটা ছুটছে। কী ছুটছে গাড়ি এই জোরে? আশ্চর্য! কিন্তু যা ভেবেছিলাম, নিশ্চয় সুরে সরে যাচ্ছে। এর শেষ কোথায়, কতদূরে? পৌঁছতেই হবে আমাকে। অবশ্যই। সারারাত ধরে পৌঁছতে চলবে। রাত শেষ হবে। ভোর হয়ে আসবে। সূর্যের মুখ দেখা যাবে পূবের আকাশে, আমার বাড়ি আসবে তখন। আমার বাড়ি।

যদিও বাড়িতে শান্তির ভালো ঠেকিল লাগছিল সুধাব্রতর কাছে কিন্তু এই চোখ-মুখে লাগা ব্যথার এক ধরনের আমেজ মিশিয়ে। আশ্চর্য এক ভাবনার জন্ম দিচ্ছিল সুধাব্রতর মনে। নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, ভীতি, ব্যথা এবং সুদীর্ঘ অসুস্থতার সবকিছু ম্লান হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল, সব যেন জলের ওপর ভাসছে। সাঁতরে বাঁচছে। বাড়িঘর, গাছ-গাছালি, আকাশ, সবুজ সুন্দর পৃথিবী সাঁতরে না জানা মানুষের ডুবে যাওয়ার মত জলের ওপর শেষবারের মত আঁকড়ে ধরছে। এই অনুভব, মানুষ পৃথিবী আকাশের অন্তিম সময় সুধাব্রতর মনে অদ্ভুত বেদনার জন্ম দিল। চোখ বুজলেন সুধাব্রত। কী শূন্য! ফাঁকা ধু ধু নির্বাক শূন্যতা। করুণ সেই বাঁশির সুর অস্পষ্টভাবে কানে আসছে। যেন দূরের কোন বাগানে একটি সুন্দর ফুলের মধুটুকু নিঃশেষে তুলে নিয়ে মৌমাছি এগিয়ে আসছে তার হালকা ডানায় গুঞ্জরণ তুলে। চোখ বন্ধ অন্ধকার...জল...নদী—সুধাব্রত সেই নদীতে নৌকো দেখতে পেলেন। সেই নৌকোয় টিমটিমে আলো।

চিমনির ফাঁকে লণ্ঠনের মৃদু আলো কাঁপছে। নৌকো আসছে। এইদিকেই।

'কতদূরে, আমরা কোথায়, কোথায় এলাম সুধাংশু?'

'আমরা এলাম।'

'এলাম?'...সুধাংশু শেষ পর্যন্ত নিয়ে এল আমাকে। কোথা থেকে, কতদূরে থেকে, কতকাল হ'ল আমরা রওনা হয়েছিলাম... দিন গেল, ফুরিয়ে এল দিনের আয়ু, বিকেল শেষ। সূর্য কি ডুবল, পশ্চিমে তাকালেন সুধাব্রত। সুধাংশু কিন্তু সত্যিই ভাল ছেলে। ও আমাকে নিয়ে এল...'

'কখন এলাম আমরা, সুধাংশু?'

'এখন। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।'

'ও।'

'গায়ের চাদরটা খুলুন।'

'কেন, সুধাংশু!' সুধাব্রত ভয় পেলেন।

'অসুবিধে হবে। যাওয়ার সময় এখন...।'

উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়লেন সুধাব্রত। উঃ! ভয়ানক দেক দিচ্ছে এই ব্যথা। বুকের তলায় হৃদয় মন পুড়ছে। নিচের ঠোঁটটা জোরে কামড়ে ধরলেন। মাথা নিচু করে ওপর বুকে চিবুক ছোঁয়ালেন.. সুধাংশু সুধাংশু, বড় ব্যথা।...চাদরটা আমার খোলস, তাও খুলে নেবে? না-ও। বড় মায়ার চাদর। এই দিয়ে আমি ঢেকেছিলাম—আড়াল করেছিলাম আমাকে।'

সামনে নদী। সুধাব্রত দেখছিলেন।

ধু ধু বালির চর—ধারে কাছে গাছ-গাছালি নেই। পৃথিবীর সবুজ শ্যামলিমা পড়ে রইল পেছনে, অনেক পেছনে। সেই সবুজের কথা, গাছপালা মাঠ শস্য হাসপাতাল সেও ছাড়িয়ে এলেন সুধাব্রত। যে করুণ মমতা তাঁর যাবার পথে বিষণ্ণতার আঁচড় কাটছিল, ছায়া ফেলছিল। এখন এই রুক্ষ অথচ নিঃসঙ্গ চরে সে মমতাটুকু অন্য এক ছায়ায় আড়াল হয়ে গেল।...আমি যাব, এই খাড়াই পাড়ের নিচে যে স্রোতস্বতী যমুনার জল পাক খেয়ে খেয়ে চলে যাচ্ছে, এই পথে আসবে আমার স্টীমার...

পশ্চিমের আকাশ থেকে শেষ রক্তিম আভাটুকু মুছে গেছে। এই ধু ধু বালির চর দূরে, দিগন্তে—যেখানে আকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সেখানে ডুবেছে সূর্য। সূর্য নেই, আলো আছে। এ আলো অন্য। ভীরু ছায়া ছায়া নরম আলো—সহৃদয় কোনো আত্মীয়ার মত। এক অদ্ভুত ধূসরতা, মলিন বিষণ্ণতার রূপ নিয়েছে এই আলো। এ আলোও মুছে যাবে। পা টিপে টিপে অন্ধকার আসবে। ওই আকাশ, নদীর জল, এই চর—এর শূন্যতা—সব ডুববে, মিলে মিশে যাবে এক হয়ে। কিন্তু চাঁদ উঠবে কি?...এই অন্ধকারে আমার ফেলে-যাওয়া পথ, নদী চর প্রান্তর—এসব কি আর দেখতে পাব?

অনেক যাত্রীর গুঞ্জরণ। কত লোক যাবে আজ স্টীমারে! এখানে ওখানে ছাড়া-ছাড়া-ভাবে কত লোক! এরা সকলেই যাবে। নদীকে অবলম্বন করে সকলের দৃষ্টি অনেক দূরে, দেখছে স্টীমার আসছে কিনা। স্টীমার আসবে, আসে তবু আমরা কেন তাকাই! শেষ ধৈর্যটুকু বড় ক্ষীণ। অসহায়। সুধাব্রত সেই বাঁশির অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পারছিলেন। কিন্তু বাঁশি তো নয়...

এক বৈরাগী। যাত্রীদের ভিড়ের এক কোণে, চুপচাপ নিরিবিলি বসে একমনে একতারা বাজাচ্ছে। ফুরফুরে কাশফুলের মত তার দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। চুল তার লাল। এক পা, দু' পা করে এগিয়ে এলেন সুধাব্রত। চোখ-বোজা বৈরাগীর পাশে একটি ঝোলা।

'তুমি যাবে?'

লোকটি শুনতে পেল কি পেল না, বোঝা গেল না।

'তুমি যাবে?'

বাজনা থামল। মুখ তুলল বৈরাগী। সে অন্ধ। মাথা ঝাঁকাল সে, যাব।

'কোথায়?'

'জানি না।'

'তোমার এই ঝোলা?'

'এইখানে রেখে যাব', বৈরাগী তার হাতটা ঝোলার ওপর রাখল, 'কাকে দেব কেউ নেই তিনকুলে।'

নেই! চমকে উঠলেন সুধাব্রত।

এই খোলা প্রান্তর, অগুনতি যাত্রী—পুরনো হালকা এক চেয়ারে সুধাব্রত বসে। আরও অনেকে। সামনে লম্বা এক টেবিল।

...বড় সরল, সুন্দর ছেলে সুধাংশু। এইখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। টিকিটও কেটে দিয়েছে। 'আপনি পারবেন তো?' জিজ্ঞেস করেছিল সুধাংশু।

'পারব।'

'না পারার কিছু নেই। ভাল হয়ে গেছেন। আচ্ছা, যাচ্ছি আমি...'

যাও। যাবেই তো। সুধাব্রত নিজের মনে বললেন, সামনে তোমার ভবিষ্যৎ...

সুধাব্রতর মনে হল তিনি কাঁদছেন। চাপা কান্নার জমাট বাষ্প বুকের সঞ্চিত। সেই বাষ্প-চাপ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। চোখে হাত দিলেন সুধাব্রত। জল নেই, অথচ কান্না। অশ্রুশূন্য শব্দশূন্য এক নীরব বিষণ্ণ কান্না।

কী আশ্চর্য এই পৃথিবী! এই হাসপাতাল ছিল, তার নিচে কত সুন্দর রঙ-বেরঙের ফুল; সবুজ সতেজ গাছের পাতা, মাটি, রাস্তা, হালকা নীল-ছাওয়া-আকাশ—আর এখন! এখন বালি, ধূসর আকাশ, মলিন বিষণ্ণ আলো, এই প্রান্তর.....

'কি খাবেন?'

চমকে তাকালেন সুধাব্রত।

'চা?'

এ এক পান্থশালা। কোনো ঘর নেই, দেওয়াল কি ওপরে ছাদ, তার জানলা—কিছু নেই। ধু ধু বালির চরে ছোট স্টেশন, তার পান্থশালা এমনি খোলা। সুধাব্রত এতক্ষণে দেখলেন, এই টেবিলে, আশেপাশে অনেকেই বসে। তারা খাচ্ছে......

'চা দেব?'

ছোট বয়েসী একটি রুগ্ন ছেলে। ময়লা বিবর্ণ ছেঁড়া তালিমারা খাটো প্যান্ট পরে; কী তিক্ততা ওর মুখে!

গলা শুকনো শুকনো লাগছে। শীতও বাড়ছে বুঝি। হাতের আঙুলগুলো কি ঠাণ্ডা!

'চা দাও,' সুধাব্রত বললেন।

সামনেই বসে আছে মেয়েটি, এতক্ষণে দেখলেন সুধাব্রত। 'তুমিও যাচ্ছ নাকি?'

ঘাড় নেড়ে সায় জানালো মেয়েটি। 'আপনিও?'

'হ্যাঁ। অপারেশন হয়ে গেল, আর কি...'

'এখন ভাল?'

'ভালই।'

সুধাব্রত মেয়েটিকে দেখছিলেন। কি সুন্দর সুশ্রী মুখ। চোখ দুটো আয়ত চঞ্চল, সামান্য সর্পিল। ভুরু জোড়া কি কুচকুচে কালো, সুন্দর আর বিন্যস্ত। হালকা দুটি ঠোঁটে কেমন এক সুন্দর রঙ, মোলায়েম। চোখের তারায় আকাশের ছায়া। পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চুল, মোটা গুচ্ছ, কালো এ কালোর উজ্জ্বলতায় অন্য এক দ্যুতি। কপালের ওপর সিঁথির প্রান্ত থেকে দু'গাছা চুল চোখের প্রান্ত ছুঁয়ে গাল বেয়ে বুকে পড়েছে। অল্প চাপা ছোট চিবুক। আর অদ্ভুত এক প্রসন্নতা তার ঠোঁটে। কিন্তু সুধাব্রত দেখছিলেন, প্রাক সন্ধ্যার এই মলিন আলোয়, এই মেয়ে, তার চোখের নিচে ছোট ছায়া। অল্প কালো। চোখের তারায় অবসন্নতা।

'দেখ,' সুধাব্রত বললেন, 'যত যাওয়ার কথা ভাবছি, কেমন লাগছে যেন।'

'ভয়?' শান্ত স্থির চোখে তাকাল মেয়েটি।

'তাই।' বললেন সুধাব্রত। বলে চুপ করলেন। ঠোঁট দুটো সামান্য বেঁকল। বেদনার চাপ স্পষ্ট হল চোখেমুখে। ডান হাত বুকে চেপে বাঁ হাত টেবিলে তুলে দিলেন। কি যেন ধরতে চাইলেন।

'একলা যাচ্ছ লাবণ্য?'

'না, বাবা আছেন।' আঙুল দিয়ে তার বাবাকে দেখাল লাবণ্য।

'জানো লাবণ্য, এই ব্যথাটা বড় কষ্ট দিচ্ছে আমাকে। ডাক্তার বলল, ভাল হয়ে যাবেন, অপারেশনের পর আর কিছু থাকবে না। কিন্তু ব্যথাটা...'

আচ্ছা লাবণ্য,
স্টীমার আসবে।
?'
ধবেন এই ব্যথা
কি মনে হচ্ছে
আমাকে, কথ... ণ্যকে শুধোবেন কিনা
ভাবলেন সুধাব্রত।

......লাবণ্যর বাবা বন্ধ। সুন্দর কথা বলেন। বললেন, 'ওঁকে তুমি ধরে উঠতে সাহায্য ক'র লাবণ্য। অসুস্থ মানুষ, মনের জোর কম।'

মলিন যেটুকু আলো ছিল এতক্ষণ, তাও মরছে। সময়ের রূপ এখন হাল্কা কালো। দৃষ্টির সামনে মিহি রেশমী শাড়ির ব্যবধান যেন। দূরের সব কিছু কেমন আড়াল আড়াল অস্পষ্ট। আকাশের ধূসর রঙ ঘন হয়েছে। পৃথিবীরও। ঘোলাটে জলের রঙ ঢাকা পড়েছে এই রঙে। এতক্ষণে সুধাব্রত দূরের, অনেক দূরের এক বিন্দু আলো দেখতে পেলেন। প্রায় আকাশের শেষপ্রান্তে জ্বলা একটি তারার। তারাটা জ্বলছে।

'শুনেছেন!'

সুধাব্রত চুপ। যেন শুনতে পান নি।

'স্টীমারের হুইস্‌ল্‌ বাজছে।'

'আঁ!' এতক্ষণে কথা বললেন সুধাব্রত।

'স্টীমার আসছে।'

'ও!'

খানিক চুপচাপ বসে রইলেন সুধাব্রত, কি যেন ভাবলেন। কান পেতে শুনলেন স্টীমারের হুইস্‌ল্‌।

'এই!' জোরে ধমকে উঠলেন সুধাব্রত, 'এই ময়লা, নোংরা গ্লাশ......'

'আজ্ঞে না, ধোয়া। ধুয়ে আনলাম।' রুগ্ন ছেলেটির মুখ ফ্যাকাশে হল।'

'চুপ!' আরও জোরে গলা চড়ল সুধাব্রতর, 'নিয়ে যা, নিয়ে যা।'

ছোট কাচের গ্লাশ টেবিলের ওপর। গলা পর্যন্ত চা। চা-য়ে ধোঁয়া উঠছে। গ্লাশের কানায় সামান্য দাগ; ফেনার কি দুধের সরটর কিংবা ননীর। সুধাব্রত ভয়ানক তেতে উঠেছেন।

'থাক,' বাধা দিল লাবণ্য। 'ওকে ধমকে কি লাভ? ওরা কি মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারছে......'

আর কিছু বললেন না সুধাব্রত। চুপ করে লাবণ্যকে দেখলেন। প্রশান্ত এক ভঙ্গিমায় লাবণ্য বসে। লাবণ্য দেখছে সুধাব্রতকে।......এই ব্যথাটা যদি না থাকত, এই অসুস্থ অবসন্নতা তাহলে লাবণ্য... আমার কি চুপ থাকত! সুধাব্রত লাবণ্যর চোখে তাকালেন। কি একটা কথা যেন মনে পড়ছে, কার কথা......সুধাব্রত স্মরণ করতে পারলেন না।

কেমন স্তব্ধতা নেমেছে এখানে। সামনে লাবণ্য চুপচাপ বসে। স্থির। ওর নিশ্বাসের শব্দটুকুও যেন শুনতে পারছেন সুধাব্রত। ধরতে পারছেন আর এক শব্দ। চাকায় জল তোলপাড় করে স্টীমার আসছে, তার শব্দ। যেন এই ক্ষীণ থেকে স্পষ্ট হয়ে আসা শব্দটুকু তাঁর বুকের তলার ব্যথা। ভয়ানক দুর্বলতা, অবসন্নতায় মাথা নুয়ে পড়তে চাইল। হাত বাড়িয়ে টেবিল ধরলেন সুধাব্রত।......এত নরম কাঠ! তবে কি লাবণ্যর হাত! বোজা চোখে সব কিছু কেমন অদ্ভুত-ভাবে বদলে যাচ্ছে, দেখতে পেলেন। কঠিন বিষণ্ণ ঘুম তাঁর চোখের পাতাকে টেনে জোড়া লাগাচ্ছে যেন।

ভয়ের এক অস্বাচ্ছন্দ্য আকস্মিক অনুভব করলেন সুধাব্রত। সূর্য ডুবল, ধূসর সন্ধ্যা আমার চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করল। এই চোখ কেড়ে নিতে চাইছে রাত্রি। রাত্রি যে অন্ধকার নিয়ে এলো তার রঙ কি...রঙ কি ...রঙ...লাবণ্য, লাবণ্য, আমি দেখতে পারছি না কিছু। কিছু না...কিছু না...। অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা। জলে ঢিল ছোঁড়া, ছড়িয়ে পড়া বৃত্তাকার অনেক মৃদু ঢেউ চোখ বোজা অন্ধকারে। বন্ধ চোখের মণি থেকে অনুজ্জ্বল বিন্দুর জন্ম...সেই বিন্দু ছোট বৃত্ত...তারপর বড়, অনেক বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকার জলে ঢিল ছুঁড়েছি আমি। আমি একলা...

...'উঃ! আঃ! ইস! যেয়ো না, আর যেয়ো না...'

'কেন, কেন তুমি যাও? পোড়ো বাড়ি। জঙ্গল। কত সাপখোপ আছে...অন্ধ পুকুর—কতবার না মানা করেছি তোমাকে!'

'উঃ! আমি মরে যাব, মরে যাব, মাগো...'

'মর। মরে যাও। এত জ্বালা তোমাকে নিয়ে সয় না আমার...'

পা-য়ে ব্যথা; পিঠে, পাঁজরে, গালে। ঠোঁট কেটে গেছে। রক্ত।

ঘরের দরজা বন্ধ। লাবণ্য কাঁদছে। আমাকে বুকে জাপটে ধরেছে লাবণ্য। আমার মাথার ওপর তার ভেজা গাল। মাথা ভিজছে আমার ঈষদুষ্ণ জলে। কে আছে তোমার? কেউ নেই, কেউ নেই; মারলে ধরলে, দুটো শক্ত কথা শোনালে ধরবার মানুষ নেই সংসারে; তবু কেন, কেন কথা শোনো না আমার...।' লাবণ্যর বুক কি দ্রুত ওঠা-নামা করছে!

লাবণ্য তার কোলের উপর, বুকের চাপে কি শক্ত করে জাপটে ধরেছে আমায়। গরম লাগছে, ভয়ানক গরম। ঘাম হচ্ছে আমার। তোমার কোলে, বুকের উষ্ণতায়, বাহুর বন্ধনে পিষ্ট হচ্ছি আমি। তোমার চোখের জলে ভিজছি। আর করব না, কথার অবাধ্য হব না তোমার। ছেড়ে দাও। এই দেখ ঠোঁট কেটে গেছে আমার। রক্ত। মা!

রক্ত দেখল লাবণ্য।

ছোট এই ঘর। থমথমে নিঃসাড়। বন্ধ জানলা বন্ধ, বিশ্রী অস্বস্তিকর গুমোট। লাবণ্যর জ্বলা চোখ শান্ত। মমতায় তাকাল লাবণ্য। ছড়িয়ে পড়া, সরে যাওয়া আঁচল কুড়িয়ে রক্ত মুছল আমার।

এই ডেক খোলা মেলা উন্মুক্ত। আরাম চেয়ারে বসে সামনে তাকিয়ে আছেন সুধাব্রত। একলাটি। কেমন এক শব্দ হচ্ছে নিচে। যেন মনে হচ্ছে আকাশে মেঘ ডাকছে। কিন্তু মেঘের ডাক নয়, স্টীমার তার চাকায় জল তোলপাড় করছে। ইঞ্জিন চলছে—এ শব্দ তার। তিন পাশ খোলা এই ডেকে হাওয়ার মাতামাতি চলছে। এত হাওয়া—তীব্র ভয়ানক যে থেকে থেকে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে যেন। সামনে তাকিয়ে সার্চলাইটের খেলা দেখছিলেন সুধাব্রত। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে আবার নদীর মধ্যে এমনি সরে সরে সার্চলাইট আসল পথ খুঁজে নিচ্ছে। নদীর মধ্যে তাকালেন সুধাব্রত। হাওয়ায় তাড়ানো জলের ঢেউ আসছে সারি সারি। স্টীমার তাকে কেটে দু' ভাগ করছে আর দু পাশের চাকায় সেই দুখণ্ড ঢেউকে ভেঙেচুরে পিষে তছনছ করছে। ঢেউ আসছে তবু। অবিরাম।

আকাশের কোণে, দূরে সেই তারাটা দেখলেন সুধাব্রত।

ভয়ংকর নিঃসঙ্গ লাগছে সুধাব্রতর। আকাশের ওই তারার মত।

সুধাব্রত ভেবেছিলেন, স্টীমারের ডেকে বসে পৃথিবী থেকে একটি দিন মুছে যাওয়ার ছবি দেখবেন তিনি। সূর্য ডুববে। পশ্চিম আকাশের রঙ মুছতে মুছতে ধূসর হয়ে আসবে। ডানায় ভর করে পাখিরা ফিরে যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে। যেতে যেতে শেষ পাখিটা, যার দল নেই, সঙ্গ নেই, সে, হয়তো ক্লান্ত ডানায় আস্তে উড়তে উড়তে পেছনে পড়ে গেছে অনেক পেছনে। তাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে। কেউ নেই তার। এই বিশাল বিরাট আকাশে ছোট একটি বিন্দুর মত সে একা। একাকী। প্রায় অবশ তার ডানা, ক্লান্ত। দিনের সেই শেষ পাখি শ্রান্তিতে কাঁপতে অবসন্নতায় অতি মৃদু গতিতে উড়তে, উড়ছে...তারপর বিকেলের এই শেষ পাখিটাও দূরে চলে যাবে। দৃষ্টির সীমানা থেকে সরে যাবে। তখন আকাশে কি আর কেউ আসবে? না।

এখনও এল না লাবণ্য। লাবণ্য যদি আসত, এই খোলামেলা ফাঁকা নির্জন ডেক—লাবণ্য বসত আমার পাশে। আমরা দুজনে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

'কে!'

'আমি!'

'এত দেরি তোমার!'

'বাড়ো মানুষ ঘুমুল, তারপর এলাম।'

বসো।'

লাবণ্য বসল।

'দেখছ লাবণ্য, তারাটা কি জ্বলজ্বল করছে।'

'হ্যাঁ।'

'আর ঢেউগুলো কেমন...'

'দেখছি।'

স্টীমারের নিচ থেকে টানা শব্দটা উঠে আসছে। ইঞ্জিন চলছে। যমুনার জল মথিত করে চাকা ঘুরছে অবিরাম অবিরত। এই শব্দ সুধাব্রতর কাছে অন্যরকম লাগছিল। অন্ধকার ছিঁড়ছে সার্চলাইট। হালকা কুয়াশাও চোখে পড়ছে। পেছনে আলো নেই। পেছনের নদী কুয়াশায় ঢাকা। সুধাব্রত ভাবলেন বাতাসে একটা সুন্দর শব্দের ছন্দ আছে। অল্প ঠান্ডা ছিল, এখন শীত। হাত খালি সুধাব্রতর। পা-ও। জড়িয়ে আসা আঙুলগুলো নাড়লেন সুধাব্রত। এবং বাঁ ও ডান পাশের রেলিঙে ঝোলান বয়াগুলো দেখলেন। 'লাবণ্য!' আস্তে ডাকলেন সুধাব্রত। অত্যন্ত চাপা অস্পষ্ট লাগল নিজের গলা। সে গলায় কেমন এক বিষণ্ণতাও যেন। আমি কি জোরে কথা বলতে পারছি না! সুধাব্রত ভাবলেন। নিচ থেকে উঠে আসা যে শব্দটা বুকের তলার বেদনার মত, সেই শব্দে ঢাকা পড়ল কি আমার কথা!

কি অদ্ভুত প্রসন্নতা লাবণ্যর মুখে। লাবণ্য সুন্দরী, লাবণ্য রূপসী। কি উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ। আমার দিকে তাকিয়ে আছে লাবণ্য, ভাল লাগার অদ্ভুত মোহের মত। কিছু প্রশ্ন, কিছু সহানুভূতি, স্নেহ আর বেদনা। এই নির্বাক মোহগ্রস্ত দৃষ্টি, এই সহজ সময় যেন প্রশ্ন আর উত্তরের ঠিক মাঝামাঝি এক মুহূর্ত। তারা পাশাপাশি বসে আছেন। কতক্ষণ? এক ঘণ্টা, দু' ঘণ্টা? না, হয়তো সারাজীবন ধরেই।

সার্চলাইটের আলোটা ম্লান হল। অন্ধকারের গাঢ়তা ভাঙছে, আকাশে সামান্য আলো জাগল। পৃথিবীর অন্ধকারের গাঢ়তা তরল হয়ে এল। তার নীলাম্বরীর আঁচলটাও কে যেন সরিয়ে নিল।

'চাঁদ উঠছে, লাবণ্য।'

'সম্ভবত।'

'সম্ভবত কেন? ওই যে আলো হয়ে এল আকাশ!'

'আসবে।'

'তুমি চাঁদ ভালবাস লাবণ্য, জ্যোৎস্না?'

'বাসি।'

অন্ধকার সরে গেছে। উজ্জ্বল আলো ফুটল। আকাশে প্রসন্ন চাঁদের মুখ। কী নীল, সুন্দর আকাশ। মেঘ উড়ছে. ছোট ছোট টুকরো টুকরো অনেক মেঘ। পুরনো তুলোর মত এই টুকরো টুকরো মেঘগুলো শিশুর মতন। যেন এতক্ষণের অন্ধকারে চাঁদের গর্ভ থেকে বেরিয়েছে ওরা। চাঁদের আলোয় পথ দেখছে এই সব অশান্ত শিশু মেঘ।

লাবণ্যকে দেখলেন সুধাব্রত। লাবণ্য শান্ত, সুন্দর মুখ চাঁদের মতই।

ডানদিকে, ইজিচেয়ারের হাতলের দিকে মুখটা সরিয়ে আনলেন সুধাব্রত। আস্তে। হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয়ে আসছে। হাতলের ওপর রাখা হাতটা বেঁকলো, ভাঁজ হল; কনুইটা সামান্য বাইরে চলে গেল হাতল ছেড়ে। যন্ত্রণায় ব্যথায় পীড়িত মুখটা হাতের ভাঁজে গুঁজলেন সুধাব্রত। নিশ্বাস চাপলেন।

'কষ্ট হচ্ছে?'

রুদ্ধ নিশ্বাস, ব্যথায় পীড়িত বিষণ্ণতা এবং অবসন্নতার মধ্যেও লাবণ্যর কথা শুনতে পেলেন সুধাব্রত। কিন্তু কিছু বললেন না। নিচ ঠোঁটের খানিকটা অংশ তার দাঁতের চাপে ছিঁড়ছে।

মাথায় আলতো স্পর্শ পেলেন সুধাব্রত। লাবণ্য। লাবণ্য সরে এসে মাথায় হাত রেখেছে। হাতটা নড়ছে লাবণ্যর।

'কেন এমন হয়?' লাবণ্যর গলা।

আমারও ওই এক কথা, বলতে চাইলেন সুধাব্রত। ডাক্তার বলেছিল, অপারেশন হলেই ভাল হব আমি। কিন্তু কই! আমার এই ব্যথাটা, যন্ত্রণা...লাবণ্য। চেষ্টা করেও গলায় স্বর ফোটাতে পারলেন না সুধাব্রত।

অনেকক্ষণ ধরেই কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছিলেন সুধাব্রত। বিশ্রী অস্বস্তিকর গন্ধ। উৎকট। এই গন্ধ সুধাব্রতের চেনা। অথচ কি, কোন মানুষ...ধরতে পারছিলেন না।
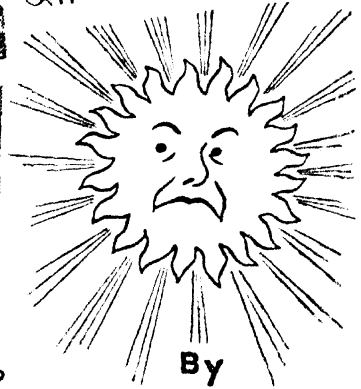
লাবণ্যর শরীরের গন্ধ স্নিগ্ধ, সুন্দর, মিষ্টি।...জন্মের দিন থেকে এই গন্ধ আমার, আমারই। সেই গন্ধ নষ্ট হ'ল। সুধাব্রত বুঝতে পারছিলেন একজন মানুষ এসেছে এখানে। এই ডেকে। লুকিয়ে আছে মানুষটি। সেই মানুষটির চেহারা এলোমেলোভাবে ভাবতে পারছিলেন সুধাব্রত। তার চোখ, সেই চোখে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসার আগুন। আর গায়ে তার কি বিশ্রী গন্ধ যে...

'আমার ভয় করছে, লাবণ্য।'

'ভয়! কেন?'

'কেন, জানি না; তবু। সেই ভয়টা এমন...'

চোখের সামনে এক ঝলক কুয়াশা দেখতে পেলেন সুধাব্রত। কেমন এক নিরাবরণ উন্মুক্ততা অনুভব করলেন। প্রাণিজগতের উলঙ্গ এক রূপ চোখের সামনে হালকাভাবে ফুটল। লাবণ্য লাবণ্যও। লাবণ্য সুন্দর। তার নিরাবরণ শরীরের প্রতিটি ভাঁজ, ছায়া, লোম, লোমকূপ, ত্বকের মসৃণতা, দেহের বন্ধুরতা—মাথার চুলের প্রান্ত থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত......লাবণ্যর ওই বুক, ওই নগ্ন বুকের উষ্ণতা আমার শিশু শরীরকে হিম মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। এই শরীরের গন্ধ আমার রক্তে মিশেছে...লাবণ্য নামের তিনটি অক্ষর অদ্ভুত তরলতায় গলে গিয়ে কি যেন হ'ল!...সব কিছু কেমন গুলিয়ে গেল সুধাব্রতর।

সেই লুকনো লোকটি বেরিয়ে এল কোণ থেকে। লাবণ্যর পাশে দাঁড়াল। ওর দেহের উৎকট গন্ধ পেলেন সুধাব্রত। কটমট করে সুধাব্রতর দিকে তাকাল লোকটি। তারপর লাবণ্যর হাত ধরল। টানল জোরে। লাবণ্যর নিরাবরণ নগ্ন শরীর কাঁদছে। লাবণ্য যাবে না, লোকটি নেবে...কী অসহায় লাবণ্য! লাবণ্যর বুকে অন্য একটি হাত, সেই হাত শিশু সুধাব্রতকে ডাকছে। লাবণ্যকে বুকে তুলে নিল লোকটি। সুন্দর স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ উৎকট গন্ধে মিলিয়ে গেল। হাত পা ছুঁড়ছে লাবণ্য। তার মাথায় সরু একটি রক্তের পথ কপাল ছুঁয়েছে।

লাবণ্য ছুটে গেল। উড়ে গেল। হালকা কাপড়ের মত ঝড়ে উড়ছে লাবণ্য। সুধাব্রত হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছেন...এত জোরে যাচ্ছে ও, সুধাব্রতর পা চলছে না। এই ধু ধু বালির চরে দৌড়ে, ছুটে পা এগোয় না, এগোয় না...তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও, মাগো।

পেছন থেকে একটা হুংকারের শব্দ আসছে। সেই লোকটা আসছে। অতিকায় বিভীষিকা। '......লাবণ্য লাবণ্য, তুমি দাঁড়াও...।'

দাঁড়িয়ে গেল লাবণ্য। খুব হাসছে সে, বলল, 'আয়, আয়—এই দাঁড়ালাম।'

লাবণ্য গাছ।

কী অন্ধকার!...লাবণ্য, আমি দেখতে পারছি না কিছু। তোমার বাকলের মধ্যে, আলো নেই, আলো নেই...কোন পথে আমি বেরুব লাবণ্য।

'কেমন সেই ভয়?' শুধালো লাবণ্য।

চোখ খুললেন সুধাব্রত। সামান্য সময় লাগল ধাতস্থ হতে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিলেন। যেন এতক্ষণ বাক্সবন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মরছিলেন, এখন শিশুর মত অন্য এক ঘুম থেকে জাগলেন।

'তোমার সেই ভয় কেমন?' লাবণ্যর মৃদু স্বর আস্তে নিশ্বাস ফেলার মত। একটু হাসল লাবণ্য, 'আমাকে বল সে কথা।'

সুধাব্রত তাকালেন। আগের কিছুই মনে নেই। বললেন, 'স্বপ্ন। আমি স্বপ্ন দেখেছি। কি সাংঘাতিক একটা জায়গা জানো, দূর দূর—অনেক দূর। ধু ধু চর। গাছ নেই, ঘাস নেই; শুধু বালি। সমস্ত প্রান্তরটা বালিময়। তারপর, জানো লাবণ্য, রাত। কী অন্ধকার! আমি পথ পাই না। পথ খুঁজে খুঁজে হয়রান। শীতও লাগছিল, ভয়ানক শীত। সেই অন্ধকারের মধ্যে অবশেষে কি একটা চোখে পড়ল আমার। আমি এগিয়ে গেলাম। মনে করলাম, ও কিছু নয়। কিন্তু একটা ফলক দেখলাম আমি। ফলকের অন্ধকার মুছল, দেখলাম, লেখা আছে কোন এক নক্ষত্রের নাম। কেউ নেই সে জগতে। আমিই শুধু, একা, একলা---কী নিঃসঙ্গতা লাবণ্য। আমার মনে হ'ল ফলকে লেখা ওই নামটা আমার...'

'খুব অদ্ভুত তো', লাবণ্য হাসল।

আবার কথা ফুরিয়ে গেল দুজনের। নির্বাক স্তব্ধ হয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে। যে কথা মুখে বলা যায় না, সেই আলাপই করছে ওরা নীরব হয়ে, চোখের ভাষায়।

'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?'

'শীত করছে।'

'শীত করছে!' সুধাব্রতর একটা হাত তুলে নিল লাবণ্য। কি ঠাণ্ডা! ইস, খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ তুমি। তোমার আঙুলগুলোও চুপসে আসছে।' নিজের চেয়ার থেকে উঠে এল লাবণ্য। 'এই কষ্ট তোমার থাকবে না।'

'হ্যাঁ, ভোর হলে।'

'তাই।'

নিচ থেকে উঠে আসা সেই গম্ভীর শব্দ সুধাব্রতর বুকের তলায় জমছে।

আকাশটা কেমন সুন্দর বদলে গেছে এইটুকু সময়ের মধ্যে। কেমন স্বচ্ছ নীল। ডানায় ভর করা একটি পাখির মত এক খণ্ড মেঘ আস্তে সরে আসছে। ছুঁই ছুঁই করেও চাঁদকে ছুঁচ্ছে না। ক্যালেণ্ডারের ছবিতে আঁকা অনেক দূরের পাহাড়ের মাথায় আটকে থাকা এক খণ্ড মেঘের মত অতি দূরে মনে হচ্ছে। চাঁদের গায়ে একটা ছবি। কিম্ভূত এক জন্তুর। ডিমের তরল কুসুম ঘন হতে হতে একটি প্রাণের জন্ম যেন।

নদীর তীর ঘেঁষে যাচ্ছে কি স্টীমার? হ্যাঁ, বাঁ-দিকে, সামান্য দূরে নদীর পাড়। ভয়ানক খাড়া। ওপরে ঘর বাড়ি কুটির—টিন খড় শনের ছাউনি...লাউয়ের মাচা, ছোট সব্জি বাগান, গাছগাছালি, নিকনো ঝকঝকে উঠোন, সুপুরিগাছের বন, একটা দুটো তাল কি নারকেল গাছ। গ্রাম গেল। মাঠ।...আবার গ্রাম আসবে, অনেক মাঠ পার হবে...

সুন্দর স্পর্শ লাবণ্যর। ওর শাড়ির আঁচলে আমার গায়ের খানিকটা ঢাকা পড়েছে। কাঁধের দিকে ঝুঁকে পড়েছে লাবণ্য। একটু উষ্ণতা যেন। লাবণ্য লাবণ্য, কথা কইতে চাইলেন সুধাব্রত। তোমার ভালবাসা, লাবণ্য......তুমি আর আমি এক, চিরদিন, চিরকাল ধরে আমরা, সৃষ্টির আদি থেকে, প্রাণী জন্মের ইতিহাসে যে দুটি বিন্দু সাকার হয়ে উঠেছিল, সে তুমি আর আমি। বিন্দু যদি এক হয়, তার মধ্যে তুমি ছিলে, আমিও। উদ্ভিদ কি জলজ প্রাণী অথবা সরীসৃপ কিংবা আদম-ঈভ—তাও আমরা; তুমি আমি দুজনে।

'তোমার এই ভয়টা কিন্তু অদ্ভুত।' লাবণ্য দূরে দাঁড়িয়ে।

'হ্যাঁ।'

'কেন এমন হয়?'

'জানি না।' সুধাব্রত দেখলেন, সেই মানুষটি লাবণ্যর পাশে দাঁড়িয়ে।

'তুমি বল আমাকে।'

'বলবে, কী বলবে?' ভয়ানক জোরে হেসে উঠল লোকটি। 'পাপ বোধ থেকে এই ভয়ের জন্ম।' ক্রুর কদর্য ভঙ্গিতে কটমটে চোখে তাকাল লোকটি।

আরও দূরে সরে গেছে নদীর তীর। এই আলোয় হালকা সবুজের ভাবটা তবু ধরতে পারছিলেন সুধাব্রত। সামনে টলমল নদীর জল। জলে ছোট ঢেউয়ের সারি। এতক্ষণের দামাল বাতাস শান্ত হয়ে এসেছে। খুব আস্তে আসছে হাওয়া; মাঠ থেকে উঠে এসে নদীর জল ছুঁয়ে এই বাতাস নরম মোলায়েম স্পর্শ বুলোচ্ছে, গালে কপালে, খোলা হাতে। সুধাব্রত সেই জলজলে পীতাভ

তারার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে আনলেন।

'খুব দুর্বল লাগছে?' কপালে হাত রাখল লাবণ্য।

'লাগছে। এই ব্যথাটা আমাকে পিষে পিষে মারছে, লাবণ্য।'

'কিন্তু তার চাইতেও বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে তোমাকে।' একটু থামল লাবণ্য। নিশ্বাস নিল। বলল, 'আমাকে সব কিছু খুলে বলবে না?'

লাবণ্য তার দু চোখে এমন করে তাকাল যে, এই প্রশ্নটা ভয়ের মনে হ'ল সুধাব্রতর কাছে। ঢোক গিলল সুধাব্রত, নিশ্বাস চাপল এবং দূরে তাকাল। কি হবে বলে। যদিও সুধাব্রত জানতেন, সব কথাই বলবেন লাবণ্যকে। 'লাবণ্য!' জোরে ডাকলেন সুধাব্রত। মনে হ'ল তার কথাগুলো যেন অদ্ভুতভাবে ভেঙে চুরে গেল। 'এই ব্যথা, যন্ত্রণা মারছে আমাকে, তিলে তিলে...' চোখে জল এল সুধাব্রতর। লাবণ্যর চোখ দুটোও ভেজা। আস্তে সুধাব্রতর কাঁধে সে হাত রাখল, বলল, 'আমি জানি, জানি, তবু তুমি বল!'

সুধাব্রত কাঁপছিলেন। দেখলেন, লাবণ্যর চোখেও সেই ভয়ের ছায়া আস্তে আস্তে নেমে আসছে। লাবণ্য শক্ত করে ধরেছে সুধাব্রতকে। 'তুমি কি জেনেছ...' হালকা নিশ্বাস ছাড়ার মত ফিসফিসিয়ে, অস্পষ্ট গলায় চাপা সুরে বলল লাবণ্য।

'জানি', সুধাব্রত বললেন, 'তুমিও...'

বুকের সঙ্গে লেগে গেল লাবণ্য। সুধাব্রত তাকে ধরলেন। শক্ত করে। লাবণ্য জড়াল। দুই বগলের নিচ দিয়ে তার দুটি হাত পিঠে গিয়ে মুঠি বাঁধল। লাবণ্যর মাথায় সুধাব্রতর গাল। সুধাব্রতর বুকে লাবণ্যর মাথা। লাবণ্য কাঁদছে। সুধাব্রতও। সামান্য ঝুঁকল ওরা। সুধাব্রতর গালে কপালে ঠোঁটে লাবণ্য তার কাঁপা, ভেজা ঠোঁট ঘষল। নাকে নাক লাগল। জামা ভিজল বুকের। সুধাব্রত চুমু খেলেন লাবণ্যকে। লাবণ সুধাব্রতকে। যেন লাবণ্য তার উষ্ণতা, তার গভীর ভালবাসা, স্নেহ দিয়ে সুধাব্রতকে হিম মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে চাইছে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল লাবণ্য, 'হয় না, হয় না, সে হয় না...' সহসা দু' হাতে মুখ ঢেকে পেছন ফিরে জোরে কেঁদে উঠল লাবণ্য।

'কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি, লাবণ্য।'

'কী, কী দেখতে পাচ্ছ তুমি?' লাবণ্য উন্মাদ। তার বিন্যস্ত চুল এলোমেলো। চোখের নিচে জলের রেখা। ঠোঁট কাঁপছে। 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ সে আগুন? পাচ্ছ?' লাবণ্যর মাথার সরু রক্তের পথ বেঁকে বেঁকে কেমন ছিন্নভিন্ন হ'ল।

চাঁদের আলোয় কেমন ম্লান, মরা বিষণ্ণতার ভাব। সামনে পেছনে হালকা কুয়াশার আস্তরণ। পাতলা ধোঁয়ার মত কুয়াশা উড়ছে। সরে সরে সরে যাচ্ছে সবুজ মাঠ, সুন্দর গ্রাম, সুপুরির বাঁধ। আকাশের অনেক তারা নিভেছে। গুটি কয় নীহারিকা ঝুলছে আকাশের গায়। জলে ঢেউ নেই। নদী শান্ত অচঞ্চল।

'লাবণ্য, আমি বাঁচব...'

'বাঁচবে', আস্তে বলল লাবণ্য। 'রাত ফুরিয়ে এল, চল ঘুমোবে।'

'চল!' সুধাব্রত আকাশ, জল, মাটি দেখলেন।

আস্তে আসছিলেন সুধাব্রত আর লাবণ্য। রেলিঙের ধার ঘেঁষে খানিক। তারপর ডাইনে। এইখানে সুধাব্রতর ঘর। ঘরের দরজা খোলা। ঘর অন্ধকার। ওরা এসে দাঁড়াল।

'লাব...' সুধাব্রত কি যেন বলতে চাইল।

'শোন...' লাবণ্য কি যেন বলতে চাইল।

যেন ওদের কথা অন্ধকারের ছাদে ঝুলল। সময় ঢাকল তাকে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজন। অল্প আলো। পাশে ছায়া দুটোর খানিকটা মিশে গেছে।

'যাও' খুব নরম স্নেহজড়ানো গলায় বলল লাবণ্য, 'লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোও গে।'

হাত বাড়ালে সুধাব্রত। কে দাঁড়িয়ে সামনে! স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। সুধাব্রতর কেমন সব গুলিয়ে গেল। না, শান্তি নয়, লাবণ্য নয়—সুধাব্রত চিনতে পারলেন এতক্ষণে, ডাকলেন, 'মা মা মা...' সুধাব্রতর আকুল গলা স্পষ্ট হ'ল না, হ'ল না...

মা চলে যাচ্ছে। সামান্য আলো, অল্প অন্ধকার এই পথে। আর কুয়াশা। মা-র পিঠের ওপর আঁচল উড়ছে। চুল উড়ছে...

চোখ ছেয়ে একটা ঘোলাটে ভাব নামল। চোখের পাতা নড়ল সুধাব্রতর। মুছে মুছে যাচ্ছে সব। দূরের সবুজ মাঠ, ঘর বাড়ি গ্রাম, নীল আকাশ, চাঁদ, নদীর জল, ঢেউ সব মুছতে মুছতে জলে ধোয়া চিঠির অক্ষরের মত কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই অস্পষ্ট ভাবও হালকা হতে হতে সামান্য নীলচে লাগল। তারপর সাদা। একখণ্ড সাদা কাগজের মধ্যে হারিয়ে গেল সবকিছু। কী সাদা! সুধাব্রতর মনে হ'ল সে আজন্ম অন্ধ। কি যেন অনর্গল বলছিলেন সুধাব্রত, সে কথা নিজেও ধরতে পারলেন না। বুঝতেও নয়। এই রাত সাদা হ'ল, কেন সাদা...কাল সকাল... সুধাব্রত আর্তনাদ করে উঠলেন হঠাৎ।

সেই নিষ্কলঙ্ক সীমাহীন সাদা ঝালরের এক কোণ থেকে হঠাৎ এক ঝলক হালকা ধোঁয়া এল। পাতলা কুয়াশার ধোঁয়া। সেই হালকা ধোঁয়া আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছিল সাদা ঝালরে। সাদা ঝালর মলিন হ'ল। ধোঁয়া গাঢ় হচ্ছে। হালকা ভাব সামান্য গাঢ়, তারপর আরও আরও...সাদা মুছে গেল ঝালর থেকে। অন্ধকার! কী আঁধিয়া! কালো সিরাপের গাঢ়তা...তার স্রোত আসছে আসছে...এলো...মা, সুধাব্রত আকুল গলায় ডাকলেন...

অপারেশন থিয়েটারের ফেস-মাস্ক পরা লোকগুলো মাথা নামাল। ছুরি রাখলেন ডাক্তার। সুধাব্রতর পা থেকে চাদরটা টেনে দিলেন মাথা পর্যন্ত ঢেকে। তারপর ফেস-মাস্ক খুলতে খুলতে সরে এলেন। দেখলেন ক্লোরোফর্ম করার যন্ত্রটাকে।

কংক্রিটের মেঝেয় ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন ডাক্তার। উদ্বেল অস্থির মন নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন লাবণ্য, সুধাব্রতর স্ত্রী। শব্দ শুনে চমকে চোখ তুললেন।

'Sorry, he is...'

আর বলতে হ'ল না। মাথা নিচু হ'ল লাবণ্যর। পায়ের তলায় যে বারান্দা, তার শক্ত কঠিন কংক্রীট পা দিয়ে আঁকড়ে রইল।

ভারতীয় লোহা ও ইস্পাতের কথা

সোনাভান চৌধুরী

ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থনীতির ইতিহাসে এ-বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের একটা বিশেষ উল্লেখ থেকে গেল। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রৌরকেল্লায় সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে "প্রথম ব্লাস্ট্ ফারনেস" বা বাত্যাবহ চুল্লীর কাজ শুরু হলো। দৈনিক এ থেকে প্রায় এক হাজার টন অপরিশোধিত লোহ উৎপাদিত হচ্ছে। রৌরকেল্লার একশ পঞ্চাশ মাইল দূরে ঠিক ষোল ঘণ্টা পরে ভিলাইয়ের কারখানার প্রথম ব্লাস্ট ফারনেসের উৎপাদনও শুরু হলো। এরপর এ কারখানা দুটোর বাকি ফারনেসগুলোর কাজও শুরু হবে অচিরেই। দুর্গাপুরের ইংগ-ভারত কারখানাও গঠনপথে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জামসেদপুর, বার্ণপুর, ভদ্রাবতী, রৌরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর মিলিয়ে বছরে দশ লক্ষ টনেরও বেশি ইস্পাত তৈরী হবে। এই লোহা হলো এ যুগের সোনা। আধুনিক সভ্যতার মেরুদণ্ড হলো ইস্পাত। কোন দেশের লোহা-ইস্পাতের সদ্ব্যবহার ক্ষমতাই সে-দেশের ব্যবহারিক উন্নতির স্থিতার মানদণ্ড।

শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে একটা কথা মনে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। শিল্পের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লোহ-শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের নবজন্ম না পুনর্জন্ম? বাইরের পৃথিবী তো প্রাচীন ভারতের দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারার কথাই শুনে এসেছে। সুখের বিষয়, এখন লোকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বৈষয়িক উন্নতির কথাও মেনে নিচ্ছে। আয়ান-লব্ধ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথি-পত্র নূতন পথের নিশানা দেখাচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্ববিষয়ক উৎস-গুলো প্রমাণ করেছে, বৈচিত্র্যময় এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এই দেশের প্রাচীন জনগণ জীবনের নৈতিক এবং বৈষয়িক মূল্যায়ন আলাদা করে করেন নি। বেঁচে থাকার জন্য এ দুটো ছিলো প্রয়োজনীয় পরিপূরক। অনেকে বলবেন, সভ্যতা যেখানে নূতন জয়যাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন আমার এই ঐতিহ্যপন্থী হওয়ার কোন হেতু নেই। কিন্তু যুক্তিগত এবং বিজ্ঞানসম্মত কারণেই অতীত-অন্বেষণের দরকার আছে। দিল্লীর বিখ্যাত ক্ষয়নিরোধক লৌহস্তম্ভ আজও কালের মৃত্যুশীতল স্পর্শকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। আজও তো তেমন ইস্পাত তৈরী হচ্ছে না। আমরা তো আমাদের পুরোনো কাগজপত্র জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দিয়েছি। অথচ ম্যাক্সমূলার সাহেবের কৃপায় জার্মানরা সে-সব যত্ন করে রেখে দিয়েছে। লৌহ-শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের অভাবনীয় উন্নতিতে সে-সব কোন কাজে আসেনি একথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না।

খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভারত-বর্ষের লৌহসরবরাহ অপর্যাপ্ত ছিল। প্রাচীন মিশরে বড় বড় গ্রানাইট পাথর কাটার যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষ থেকে চালান যেত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে এদেশ ইস্পাত নির্মাণে এত উন্নতিলাভ করেছিলো যে, বিখ্যাত দামাস্কাস ব্লেডের ইস্পাতও এদেশে প্রস্তুত হতো। পরবর্তীকালে পারসীকেরা আরো পরে আরবেরা ও ইউরোপীয়েরা এই কৌশল আয়ত্ত করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত রায়কা এবং মজুমদার বলেছেন, প্রথমে লৌহ আকরিক ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয়। ইংরেজী ভাষায় (Iron) কথাটার সাথে যেমন অ্যাংলোস্যাক্সনীয় ইর্ন (irn) ও জার্মান আইসেন (eisen) কথা দুটোর মিল রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংস্কৃত 'অয়স' কথাটার।

ইতিহাসবিদগণ আকরণগত সম্পদের-ভিত্তিতে প্রাচীন যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকেন: প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহযুগ। এ ধরনের কালবিভাগ ইউরোপীয় দেশগুলোর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একেবারেই খাটে না। প্রস্তর যুগ বলতে যে যুগ বোঝায় তার বহু পূর্বেই এদেশে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। লৌহশিল্পে ভারতবর্ষ তখনই যথেষ্ট উন্নত ছিলো। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন, লৌহযুগের পূর্বে বরং একটা তাম্রযুগ থাকার কথা উঠতে পারে। খৃঃ পূঃ ১০০০ বছর আগেও এদেশের লোকেরা তামার ব্যবহার জানত। লৌহযুগের পূর্বে ব্রোঞ্জযুগের কল্পনা করতে ধাতুবিদ্যাগত অসুবিধাও আছে। ব্রোঞ্জ নির্মাণে কম করেও দুটো ধাতু—তামা ও টিনের নিষ্কাশন কৌশল জানা দরকার। কিন্তু লৌহ নিষ্কাশনে একটি মাত্র ধাতুর কথাই ওঠে। তাছাড়া, লৌহ নিষ্কাশন অপেক্ষাকৃত সহজ। তখনকার দিনে লালচে লৌহ-আকরিক (hematite) কাঠকয়লা দিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে গরম করে লোহা তৈরী করা যতোটা সহজ ছিলো, টিন তৈরী তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। আজ বিংশ
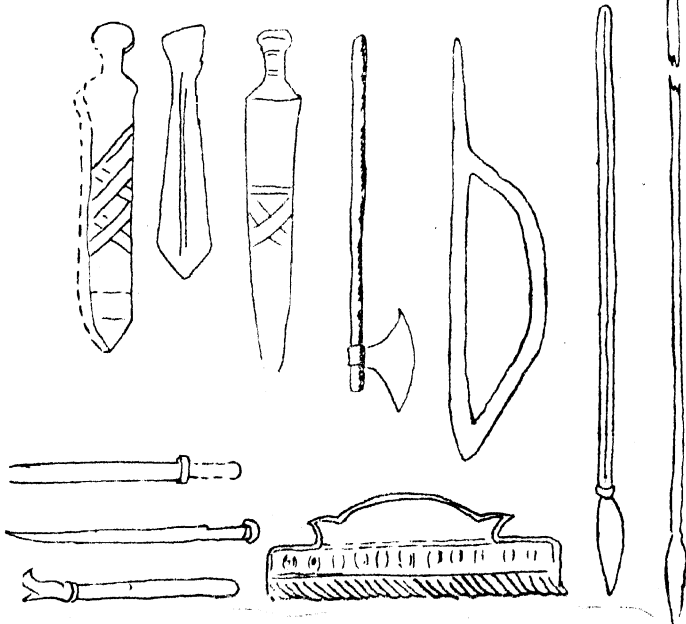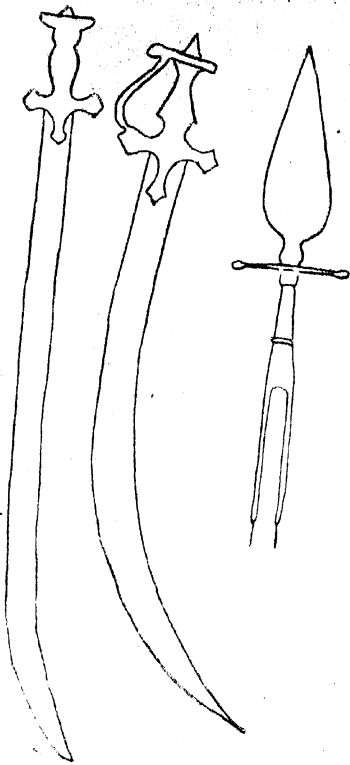
অষ্টাদশ শতকের অস্ত্রশস্ত্র (লোহার)

ভঙ্গুর (brittle) করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে সুশ্রুতের আবির্ভাব ঘটে। সুশ্রুত প্রায় শ'খানেক সূক্ষ্ম ইস্পাতের অস্ত্রের কথা লিখে গেছেন, যা দিয়ে সেকালে তলপেট বা চোখের মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার করা হতো। ভারতীয় ইস্পাতের এসব অস্ত্র দিয়ে মাথার চুলকে লম্বালম্বিভাবে দুভাগ করা যেতো।

ঐতিহাসিক যুগে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে আমরা পাই মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ (৩০২ খৃঃ পূঃ)। মেগাস্থিনিস বলেছেন, ভারতবর্ষের মাটিতে সবরকম ধাতুর আকরিকই পাওয়া যেতো। লোহা ছাড়া, তামা, সোনা, রুপা যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কাশিত হতো। একদিকে গহনা ও বাসনপত্র, অন্যদিকে সমরোপকরণের উপাদান হিসেবে এসব ব্যবহৃত হতো। ইতিহাস বলে, পরাজিত ভারতীয় নৃপতি পুরু বিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারকে ৪০ পাউণ্ড ভারতীয় ইস্পাত উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ইস্পাতের আদর ছিলো অনেক। ইউরোপের দেশগুলোতে যদি ইস্পাত সুলভ হতো, একজন দিগ্বিজয়ী রাজার জন্য ৪০ পাউণ্ড ইস্পাত তাহলে উপহারের সামগ্রী হতো না। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের নানা জায়গায় লৌহ-অস্ত্রের ব্যবহার ও তার বিধি-নিষেধের কথা আছে। অর্থশাস্ত্রেই প্রথম আকরাধ্যক্ষের (superintendent of mines) কার্য-প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এর আগে একথা আমরা পাই না। খনির অধ্যক্ষের কাজ ও তার ক্ষমতার বিস্তৃত বিবরণ চাণক্য দিয়ে গেছেন।

এর পর নাগার্জুনের আবির্ভাব ঘটে। ২০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৩০০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এদেশের রসায়ন শাস্ত্রের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। নাগার্জুন লোহা ও ইস্পাতকে ক্ষয়নিরোধক ও তাপসহনশীল করার নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বাংলা দেশ, বিহার ও উড়িষ্যার মন্দির ও মন্দিরস্থাপত্য পর্যালোচনা করে আমরা খৃঃ পূঃ ১৫০ থেকে ৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের অনেক কথা জানতে পারি। উদয়গিরি পাহাড় (১৫০ খৃঃ পূঃ), বুদ্ধগয়া (১০০ খৃঃ পূঃ) এবং অমরাবতীর (৩০০-৪০০ খৃঃ) মন্দিরগুলো এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। এসব মন্দিরের গায়ে হরেক রকম ঢাল, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতির সাক্ষাৎ মেলে। প্রথম চিত্রে উদয়গিরি, বুদ্ধগয়া, বরহুত, অমরাবতীর মন্দিরগুলোর গায়ে খোদিত অস্ত্রের নমুনা দেয়া হলো। বলা বাহুল্য, এসব অস্ত্র ছিলো লোহার তৈরী। দ্বিতীয় চিত্রে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির (৬৫০ খৃঃ) ও কোনারক (১২৩৭ খৃঃ) মন্দিরের গায়ে প্রাপ্ত নানা অস্ত্রের প্রতিচ্ছবি দেয়া হলো। লৌহশিল্পের এসব পরোক্ষ উন্নতির নিদর্শন ছাড়াও কোনারকের মন্দির থেকে আরো মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। মন্দিরের গঠনকার্যে লোহার কড়ি-বর্গার ব্যবহার এখানেই আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করি। ছাদ যাতে ধসে না পড়ে তার জন্যে বর্গার ব্যবহার উড়িষ্যার আরো কয়েকটি মন্দিরেও দেখা যায়। অধ্যাপক ফার্গুসনের মতে, দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভের নির্মাণকাল ৪০০ খৃষ্টাব্দ।
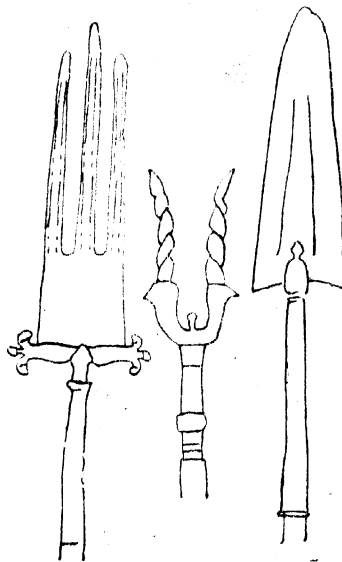
সপ্তদশ শতকের অস্ত্র

মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের, ঢাকা, পাটনা, বর্ধমান, বিষ্ণুপুরের কামানগুলো নির্মিত হয়েছিলো আরো অনেক পরে। এগুলো খুব সম্ভব লোহা পিটিয়ে তৈরী করা হতো। ঢালাই বা casting-এর সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, লোহাকে একদম গালিয়ে ফেলার উপায় তখন জানা ছিলো কিনা, তার কোন প্রমাণ নেই। মুর্শিদাবাদের "বাচ্চাওয়ালী" তোপ (১২০০—১৩০০ খৃঃ) ও "জাহানকোষা" (১৫০০—১৬০০ খৃঃ) আকারের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃঃ পূঃ ২৫০০ থেকে ১৬০০ খৃঃ পর্যন্ত আমরা ভারতীয় লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহারের নিদর্শন পাই। কিন্তু কোন্ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় এসব উৎপাদিত হতো তার সঠিক এবং ধারাবাহিক খবর আমরা পাই না। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলেছেন, তাঁর সময়ে লোহার একমাত্র আকরিক ছিলো hematite। হিন্দু রসশাস্ত্রে hematiteকে বলা হতো গৈরিক বা সুবর্ণ গৈরিক। Iron-pyritesকে বলা হতো রূপা। আইন-ই-আকবরীতে আমরা দেখি, আকবরের সময় সুবা [illegible] সুবা কাশ্মীর, [illegible], কমায়ুন ও গোয়ালিয়রে লোহা-ইস্পাতের কারখানা ছিলো। কিছুদিন আগেও উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কর্ণাটক প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন পদ্ধতিতে লোহা, ইস্পাত উৎপাদন দেখা যেতো। অশিক্ষিত আদিবাসীদের মধ্যেই এসব পদ্ধতি প্রক্রিয়া টিকে ছিলো। [illegible] কোল জাতিরা লোহার কাজের জন্য বিখ্যাত ছিলো। কিন্তু দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ বা উড়িষ্যার মন্দিরের কড়ি-বর্গা নিশ্চয়ই নিপুণ লৌহ শাস্ত্রবিদ্ ও যন্ত্রবিদদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো। উচ্চমানের পরিকল্পনা বা পদ্ধতি ছাড়া এসব সম্ভব হতো না। অথচ পরবর্তীকালে এরকম একটা অগ্রসর শিল্প গবেষণার অভাবে শ্লথ-গতি হয়ে পড়ে। বহুদিন এসব কাজ উপেক্ষিত হয়ে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো বলেই, আমরা এখন আর তার কোন চিহ্ন দেখতে পাই না।

১৮০০ খৃঃ ডাঃ বুকাননের ভারত ভ্রমণের বিবরণ প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষে সরাসরি পেটা লোহা (Wrought Iron) তৈরী হতো। কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আগে ঢালাই লোহা

প্রাচীন বাত্যাচালিত চুল্লী

(cast iron) তৈরী করে, তা থেকে অংগার (carbon)-এর ভাগ কমিয়ে পেটা লোহা উৎপন্ন করা হয়। ভারতবর্ষের মতো বোর্নিও, আফ্রিকা ও আমেরিকার নিউ-জারসিতেও প্রত্যক্ষভাবে লোহা তৈরী হতো। এর কারণ, হয়তো তখনকার দিনে ১০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের বেশী তাপ উৎপাদন সম্ভব ছিলো না। কিন্তু লোহা গলাতে সাধারণভাবে ১৪০০—১৭০০° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপ দরকার।

তখনকার দিনের "বাত্যাচালিত চুল্লী" বা Blast furnace-এর একটা ছবি দেওয়া হলো। এসব চুল্লীতে খুব খাঁটি আকরিক ব্যবহার করা হতো। জ্বালানী এবং রাসায়নিক নিষ্কাশক হিসেবে কাঠ কয়লার প্রচলন ছিলো। বাতাচলনের জন্য ব্যবহৃত হতো হস্ত-চালিত হাপর। খনিজ কয়লার চেয়ে কাঠকয়লা অনেক বিশুদ্ধ। ফলে বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যেতো। আর খাঁটি আকরিক ব্যবহার করা হতো বলে কোন গলন সহায়ক (flux) পদার্থের দরকার হতো না। মিঃ হাইনে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেও ভারতের বহু জায়গায় বাত্যাচালিত চুল্লী দেখতে পান। তিনি বলেছেন, ফার্নেসের নিচের দিকটা অর্থাৎ চুল্লী-অংশ নির্মিত হতো বিশেষ ধরনের তাপসহনশীল ইট দিয়ে। উপরের দিকটা হতো কাদা-মাটি আর বালি দিয়ে তৈরী। উপারের দিকটা দেখতে ছিলো—একটির উপর আর একটি ওল্টানো দুটো চোঙার মতো। হাপর সাধারণত ছাগলের চামড়া দিয়ে মোড়া হতো।

ভারতীয় ইস্পাত এশিয়া-মাইনর, মিশর ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে 'উজ' (wootz) নামে পরিচিত ছিলো। কথাটা সম্ভবত এসেছে কানাড়ী শব্দ 'উক্কু' থেকে। 'উক্কু'—অর্থ ইস্পাত। ইস্পাতের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হলো 'তীক্ষ্ন'। 'অর্থ-শাস্ত্রে' তীক্ষ্ন কথাটার উল্লেখ আছে। নিজামরাজ্য, মহীশূর, সালেম ও মাদ্রাজের অনেক অঞ্চলে 'উজ' প্রস্তুত হতো। 'দামাস্কাস ব্লেডের' জন্য ইস্পাত নির্মাণের আসল ঘাঁটি ছিলো এসব অঞ্চল। ইস্পাতের যন্ত্রপাতি দিয়ে পাথরের উপর নানারকম কারুকার্য খোদাই করার প্রথা অশোকের আমলের আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো।

সাধারণভাবে অংগার এবং লোহার মিশ্রণ বা alloy-কেই ইস্পাত বলা হয়। এদেশে ইস্পাত দুভাবে তৈরী হতো। ঢালাই লোহার অংগার কিছুটা কমিয়ে বা পেটা লোহায় অংগার যোগ করে ইস্পাত প্রস্তুত সহজ ছিলো। দক্ষিণ ভারতের ইস্পাত নির্মাণের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে আগে ঢালাই লোহা প্রস্তুত করা হতো। তারপর সেগুলোকে টুকরো-টুকরো করে কেটে, মাটির পাত্রে কাঠ, গাছের পাতা প্রভৃতি দিয়ে ঢেকে, কাঠকয়লার চুল্লীতে ঢাকনাবন্ধ অবস্থায় গরম করা হতো। ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা গরম করার পর যখন সব টুকরোগুলো গলে যেতো, তখন নানান আকারে ঢেলে ঠাণ্ডা করা হতো। জল ছিটিয়ে ইস্পাতকে শক্তও করা হতো। এসব পদ্ধতি-প্রক্রিয়া এখন ইতিহাসের ঘটনা হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে লোহ-ইস্পাত-শিল্পের নবজন্মের সূচনা হলো আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। জামসেদ-পুরের লোহার কারখানা বিগত পঞ্চাশ বছরের গৌরবময় অধ্যায় পার হয়ে নূতন আর এক যুগের সামনে দাঁড়িয়েছে। এর সংগে সহযোগিতা করে এসেছে বার্নপুরের ও ভদ্রাবতীর লোহা ও ইস্পাত কারখানা।
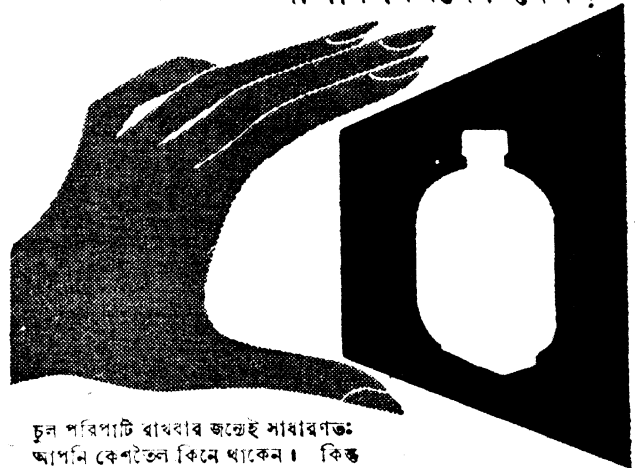
সংকলন

পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প—সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত। নতুন সাহিত্যভবন। ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০। দাম ১২.৫০।

প্রেমের গল্প, প্রেমের কবিতা নিয়ে আজকাল সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে যার উদ্দেশ্য কিছুটা সাহিত্যিক, কিছুটা ব্যবসায়িক। প্রেম কথাটির মধ্যে এমন এক যাদু আছে যে প্রেমের গল্প পড়বার জন্য উন্মুখতা বয়সের সীমানির্দেশ মানে না। অতএব এই বিরাট পাঠকচক্রের কাছে প্রেমের গল্পের আবেদন খুবই সহজবোধ্য। এবং সেই দিকে নজর রেখে প্রকাশকের ব্যবসায়-বুদ্ধি যদি সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধির সঙ্গে মিলিত হয়ে সহযোগিতা করে, তাতে নিন্দার কিছু নেই। উপরন্তু লাভ ষোল আনা। জীবন ও জীবিকার মধ্যে এমন কিছু ব্যবধান নেই। সংকলন-প্রকাশের ধারণা বা উদ্যোগ মুখ্যত বিদেশী আমদানি। কিন্তু এ কথাও সত্য, বাংলা দেশের ছোট গল্পের এবং প্রেমের গল্পের মান ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে তা নিয়ে একাধিক সংকলন প্রকাশ করা চলে। গল্প নির্বাচনের পদ্ধতি, সম্পাদকীয় রুচি, পাঠকবর্গের চাহিদা, আর সমাজজীবনের পরিবেশ,—এই রকম বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ রীতি মেনে এবং সাহিত্য-লক্ষণের কয়েকটি সূত্র একাধিক ধরে সংকলন-গ্রন্থ তৈরি করা যায়। অতএব সংকলন-গ্রন্থের বৈচিত্র্য খুবই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। সে দিক থেকে আলোচনা করলে বইখানির মূল্য আছে। শুধু 'ফেস-ভ্যালু', মার্কেট-ভ্যালু' নয়,—তার অতিরিক্ত একটি মূল্য। সেটি তৃপ্তির,—শ্রদ্ধাশীল সম্পাদনা এবং সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশের জন্য মনের ও নয়নের তৃপ্তি।

১৯০১ থেকে ১৯৫০—মোটামুটি এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে সব উল্লেখযোগ্য ছোট-বড় প্রেমের গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে বাছাই-করা চুয়াল্লটি গল্প এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। অর্ধশতাব্দী ধরে যে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা চলেছে, তার নির্বাচিত সংখ্যা আরও বেশি হল না কেন, অথবা পঞ্চাশ বছরের পঞ্চাশটি গল্প বাছাই করলে ভাল হত—এ সব প্রশ্ন ও মন্তব্য অর্থহীন। যিনি কখনো সম্পাদকের কাজ করেছেন, তিনিই জানেন এ কথা কত দুরূহ। ইংরেজি কাব্যের কত বিভিন্ন ধরনের সংকলন আছে, তা জেনেও আবার নতুন করে গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এবং সে নির্বাচন ক্রিয়াটি যে কত সমস্যা-সংকুল, কবি ডেভিস তাঁর সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় তার সরস উল্লেখ করে গেছেন। সমালোচকের তথা পাঠকদের গোষ্ঠীকে সহজে খুশি করা যায় না, এটা সত্য কথা। সেই জন্যই রুচিবান বিবেকপরায়ণ সম্পাদক প্রতি পদেই ত্রুটির আশংকায় বিব্রত বোধ করেন। বর্তমান সংকলনেও একটি সুলিখিত মুখবন্ধ আছে এবং তার পরে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা লেখা হয়েছে, যা থেকে সম্পাদনার উদ্দেশ্য এবং নির্বাচন-রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি আদ্যন্ত পড়ে মনে হল, নির্বাচিত গল্পগুলি মোটামুটি লেখকদের অযোগ্য প্রতিনিধি নয়। কয়েকটি অন্তত নিশ্চয়ই লেখকদের বিশেষ ভালো রচনা। যদি সবগুলি তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা না হয়, তাতে ক্ষতি নেই। কেন না 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প' তো রয়েছেই।

সম্পাদনা নিখুঁত নয় এবং সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবও নয়, এ কথা সম্পাদক গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং বলেছেন সংকলন-প্রসঙ্গে মতভেদ ঘটা বিচিত্র নয়। তবে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে সংশোধনের পথ প্রশস্ত করা যেতে পারে। উপভোগ আমন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে রসজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ পাঠকদের তরফ থেকে দুই একটি কথা বলা যেতে পারে। মুখবন্ধে সম্পাদক বাংলা সাহিত্যে প্রেমের গল্পের যে সামাজিক আবহাওয়া, যুগ-লক্ষণ, এবং ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা সুচিন্তিত। কিন্তু এ আলোচনা ভাসা-ভাসা, আরও একটু বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ করে তুললে ভাল হত। নিশ্চয়ই সময়ের ও কাগজের অপব্যবহার হত না। অনেক নতুন কথা হয়তো তিনি বলেননি, কিন্তু যেটুকু বলেছেন তা প্রাঞ্জল ও সম্ভাবনাময়। সাল-তারিখ দিয়ে ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিক স্ফুরণকে গণ্ডীবদ্ধ এবং চিহ্নিত করা চলে না। তাই বিমল মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু, সতীনাথ ভাদুড়ী, ননী ভৌমিক ও রমাপদ চৌধুরীর গল্পগুলি ১৯৫১ সালের পরে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থভুক্ত করায় আপত্তি উঠতে পারে না।

কিন্তু ১৯৫০'এর মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের রচনা দেওয়া চলত। 'কল্লোল যুগের' পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় শক্তিশালী প্রেমের গল্প লিখেছিলেন। 'বিচিত্রা' ও 'পরিচয়'-এর বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুখ্যত প্রবন্ধকার হলেও এমন কয়েকটি প্রেমের গল্প লিখেছিলেন যা সত্যই প্রশংসনীয়। জ্যোতির্ময় রায় ১৯৫০'এর বেশ কিছু আগে প্রেমের গল্পে এক বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় রেখে গেছেন। এঁরা কেউই 'ইনসিগনিফিকেন্ট' লেখক নন। তারপর গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুশীল রায় ও ভবানী মুখোপাধ্যায়—এঁদের প্রেমের গল্প হাত ভালো। উপরন্তু তাঁদের কয়েকটি গল্প সম্পাদকীয় নির্বাচনেও মানোত্তীর্ণ হতে পারত। হয়তো পরবর্তী সংস্করণে এ বইখানি আরও প্রতিনিধিত্বমূলক এবং লেখকদের নির্ভুল জন্ম-তারিখ ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। (১২৬।৫৯)

অপরূপা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

কথাটা মামুলী হলেও বলা যায় যে, সাহিত্যিকের সিদ্ধি প্রধানত তাঁর প্রত্যক্ষগত জীবনবোধের আন্তরিক বহিঃপ্রকাশের উপরই নির্ভর করে। মানুষ ও পরিবেশকে নিছক দ্রষ্টা হিসেবে দেখে সেগুলির প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে বাস্তবনিষ্ঠার সততা যাচাই হয় বটে; কিন্তু শিল্পের মর্যাদা এই মূল্যের নেপথ্যলীন বক্তব্য, দর্শন তথা সাহিত্যিক মানসের চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই সম্পর্কিত। এর অভাবে ঘটনার অভিনবত্ব, নাটকীয়তা, অদৃষ্টপূর্ব চরিত্রের অবতারণা এগুলো শেষ পর্যন্ত একটি চমৎকার গল্প দানা বেঁধে গিয়ে লেখককে প্রায় রূপকথা বলা ঠাকুরদা বানিয়ে ফেলে। বাংলা দেশে এই ধরনের লেখকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ব্যাপক পাঠক সমাজের দ্বারা সমাদৃত এবং সাহিত্যিক অভিধায় চিহ্নিতও বটে। এই সম্প্রদায় থেকে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ অনেক দূরেই বেশ মর্যাদার সঙ্গে অধিষ্ঠিত যেখানে বলা যেতে পারে, তারাশংকরবাবুর মত প্রতিভার প্রতিবেশিত্ব পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি কথাগুলো বেঁচিয়ে—যা শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে শক্ত কথা অনায়াসসাধ্য বলে মনে করি, অন্তত শ্রমিক শ্রেণীর মানসিকতার সাহিত্যিক উদ্ঘাটন এই দেশে যতদূর জানি তাঁরই দৌলতে—সেই বৈচিত্র্যের জন্যে তাঁকে মূল্য দিচ্ছি না; শুদ্ধ, সরল মানবিকতার বিচ্ছুরণ আর প্রকাশভঙ্গীর অনবদ্য সহজতার কারণেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় সাহিত্যজগতে প্রায় স্তব্ধলেখনী। এবং আলোচ্য গ্রন্থটি নামে প্রচ্ছদে ছাপায় নতুন মনে হলেও আসলে দুটি বড় পুরনো গল্পেরই পুনর্মুদ্রিত আকার। তবে ষোল আনা গল্পটি কাহিনীসূত্রের শিথিলতায়, পারম্পর্য শূন্যতায় অকারণ দীর্ঘায়িত এবং ফলে কিছু ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। তিন চারটি উপকাহিনীতে গল্পটি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় ভারসাম্যহীন এবং কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় কাহিনীটি সংসারবিরাগী অবিনাশ আর গৃহত্যাগী বাসন্তীর অন্তর্গত প্রেম-সম্পর্কের মাধুর্যে অভিভাসিত। চরিত্র ও ঘটনার সুসংবদ্ধ বিন্যাসে রমণীয় পাঠ্য। প্রচ্ছদ এবং ছাপা সুন্দর। ৯৭।৫৯

কবিতা

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। লেখক সমবায়, ৫৮ মনসাতলা লেন, কলিকাতা-২৩। সাড়ে তিন টাকা।

কবি দিনেশ দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নাম নিয়ে বেরোলো। যদিও রচনা সংকলনে এই 'শ্রেষ্ঠ' কথাটির ব্যবহারে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে, কারণ কথাটির মধ্যে ব্যবসায়বুদ্ধি যতখানি প্রকট শিল্পবোধ তার সিকিমাত্র নয়, তথাপি এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থ হাতে নিলেই দুটি অনুভব মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রথমত মনে হয় একটি সমগ্র কবিজীবনী অর্থাৎ কবিচরিত্র আমাদের হাতে এল। আনুষঙ্গিকভাবেই দ্বিতীয়ত মনে হয় কবির কাব্য পরিক্রমা শেষ হয়ে চলল। যাই হোক অন্তত শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলনের মধ্যে অপবাদের ছায়া বিদ্যমান, একথা সন্দেহমাত্র নেই।

এই শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের সন্ধিকাল থেকেই দিনেশ দাস বাঙালী কাব্য পাঠকের দৃষ্টি ও প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। সেই বিপ্লব-পরিবিস্ফারের যুগে দিনেশবাবু রোমান্টিক আবেগের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ছিলেন না, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চৈতন্যের স্বাক্ষরবাহী সেই যুগের কবিতাগুলি তারই প্রমাণ। সাময়িক বিষয়-নির্ভর সেই উচ্চকণ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে সাংবাদিকসুলভ সংবেদনশীলতার ঊর্ধ্বেও কিছু ছিল যাকে আমরা রোমান্টিক কবির সঙ্গীতধর্ম থেকে পৃথক করতে পারি না। পরবর্তীকালে যে সুরেলাগীতি কবির সাক্ষাৎ দিনেশ দাসের কবিতা ও অহল্যা গ্রন্থে পেয়েছি তার সম্ভাবনা শুরু থেকেই ছিল। দিনেশ দাসের কবিতার জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ এই যে, সাম্প্রতিককালের কবি হয়েও তিনি দুর্বোধ্য নন। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধের প্রথম অভিযোগটিই রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি অক্লেশে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন.

অন্তত বিষয়বস্তুর দিক থেকে, এই ত্রিকোণ কাব্যগ্রন্থটি ইতিহাস-চেতনা, রাজনৈতিক সংবেদনা ও রমাচারিতার প্রকাশক। দীর্ঘ আটাশ বছরের ধারাবাহিক কাব্যেতিহাস রয়েছে এই সংসন্নিবিষ্ট কবিতাগুচ্ছের মধ্যে যা থেকে কবিচরিত্রের চতুর্দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট হল। সমস্ত কবিতাগুলি শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোন নতুন পথ কেটে ঋজু রেখায় এগিয়ে গেল না, বরং পুনরুক্তির সাদৃশ্যবাচক বৃত্ত রচনাই করলো। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ত্রিবেণীবিন্ধ হলেও সুরের দিক থেকে সমস্ত গ্রন্থটি মাত্র শিবময়। এবং এই প্রায় একশটি কবিতার মধ্যে ছন্দ ও কাব্যাঙ্গিক বৈচিত্র্য কোন বহুধা বিস্তৃত সমৃদ্ধি দান করেনি। কবিচিত্তের সরল সাংগীতিকতা কাব্য প্রকরণের মধ্যেও মূর্ত। প্রবহমান উচ্চারণে অমিত্রাক্ষর সংযুক্ত পয়ার রচনার ধ্বনিটিই দিনেশ দাসের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। ছন্দের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্যই নেই, দু এক স্থানে শব্দের সন্ধিগত টানাপোড়েনে ছন্দ দুর্বল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কবিতা যাতে, যেখানে কবি সংযত, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছেন। উপমামূলক প্রয়োগের একাগ্র্য স্বভাবেও মেনে নিলে আমাদের একথা বলতেই হবে যে শ্রীযুক্ত দিনেশ দাসের মধ্যে একটি বিস্ময়প্রাণ কবি রয়েছে, যখন যখন এক একটি কবিতায় তিনি আমাদের শহুরে সুরের চোখের নাচান কি, মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মোহিত করে ফেলেছেন। [illegible] তিনি [illegible] প্রকাশ করেছেন [illegible]। এই সহজ [illegible] এই [illegible] তিনি শ্রেষ্ঠ কবিতায় [illegible] নতুন পথে [illegible] উপলব্ধিসঞ্জাত [illegible] এবং [illegible] উচিত। ২৬।৫৯

সাহিত্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী—বিজন রায়চৌধুরী। প্রকাশক: [illegible] চক্রবর্তী, ১২।৮, [illegible] রোড, কলিকাতা-২৯। দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েই আমাদের মত-বিরোধের অন্ত নেই। রক্তকরবী [illegible] নাটক যে অনেক বেশী করেই তার সম্ভাবনা। কবি এই কথা বলেছেন, কি কবি এই কথা বলে-ছেন, এই মীমাংসায় নিয়ে নিয়ে আমাদের বিবেচনা জটিলতার পথ ধরে চলেছে। একটা নাটকের ওপরে অনেক সময়েই আমরা অন্যতর বস্তুতত্ত্বের বোঝা চাপিয়ে চলেছি, কারণ আমরা বুঝতে চাইনি, বোঝাতেই চেয়েছি। রক্তকরবীকে নিয়ে এই বোঝানোর পালা এখনো চলেছে এবং সম্ভবতঃ আরো অনেকদিন ধরেই চলবে।

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত বিজন রায়চৌধুরীর এই আলোচনা গ্রন্থ আমাদের হাতে এল। বিস্তারিত ভাবে রক্তকরবীর বিভিন্ন দিক নিয়ে, নাটকের চরিত্র আঙ্গিক, ট্রাজেডি, শিল্পকলা, ভাবকল্পনা, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর চিন্তা যোজনা করেছেন। রক্তকরবী বিশ্লেষণে তিনি যে অনেক নতুন কথা বলতে পেরেছেন তা বলবো না, তবে তিনি অসংশয়ী মনে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সহজ করে দেখেছেন আগাগোড়া নাট্য-রসলোকে। অধ্যাপকের মত তিনি বুদ্ধিসর্বস্ব বিচারে অবতীর্ণ হননি, সহৃদয় রসিকের মতই রসাস্বাদনে ব্যাপৃত হয়েছেন। সে কারণে এই আলোচনা গ্রন্থটি আমাদের মুগ্ধ করলো। ছাপার ভুল স্থানে স্থানে পীড়াদায়ক হয়েছে। ৭৮।৫৯

ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প—ডাঃ যামিনী-কান্ত সিং। শান্তি লাইব্রেরী, ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। এক টাকা ষাট নয়া পয়সা।

বাংলার প্রাচীন এবং রসাল লোকগাথা হিসাবে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের পূর্ব-লক্ষণ আমরা এই কাহিনীগুলির মধ্যে লক্ষ্য করে থাকি। ডাঃ যামিনীকান্ত কিশোরদের জন্য এই রম্য উপাখ্যানগুলিকে সংক্ষিপ্ত গদ্য মূর্তি দিয়েছেন। সাবধানেই তাঁকে একাজে এগোতে হয়েছে। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কাব্য উদ্ধৃতি এবং চিত্র সংযোজন করা হয়েছে। ১৩১।৫৯

কাহিনী

যুদ্ধের ইয়োরোপ—বিক্রমাদিত্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

যুদ্ধের ইউরোপের এই সত্য কাহিনীটির মূল উৎস গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের 'দিস ইউরোপ'। বিক্রমাদিত্য এই ছদ্মনামের পিছনে কে আছেন আমরা জানি না তবে তিনি গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের লিখিত ও অলিখিত কাহিনীকে এক করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ বহু যুদ্ধোপন্যাস রচিত হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় একখানির মুখ্যানির বেশী লেখা হয়নি। এ থেকে আমাদের একরকম ধারণা করা উচিত হবে না যে বাংলার ছেলেরা দলে দলে যুদ্ধে যায়নি, যুদ্ধের বিচিত্র ভয়াল অভিজ্ঞতা তাদের হয়নি এবং তারা সাহসিকতার নজির রাখেনি যুদ্ধের অলিখিত ইতিহাসে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জতুগৃহ সদৃশ্য প্যারী শহরে এক ভাগ্য-বিড়ম্বিত বাঙালী যুবকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা লিখিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতই সে কাহিনী কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের ভাষা মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে সাবলীল কিন্তু কতকগুলি বিদেশী শব্দের উচ্চারণ আমাদের কানে লাগলো। যেমন প্যারী, রেস্তুরাণ্ট, লিউটেনাণ্ট ইত্যাদি। ছাপার বহু ভুলও নজরে পড়ল। ৭৯।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতু বদল—অরুণ ভট্টাচার্য।

স্বপন বুড়োর নব কথামালা—অখিল নিয়োগী।

আশাবরী—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আঁচরা—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধু পারে—নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

কোটিপতি নিরুদ্দেশ বিদ্যুৎপর্ণা রাজলতা রূপকথা—মন্মথ রায়।

চন্দ্রশেখর

অপু কাহিনীর যবনিকা

গত এক দশকের মধ্যে বিচিত্র প্রাণ-চাঞ্চল্যের ঢেউ নানা রূপে ও ছন্দে বাংলা ছবির কূলে এসে আঘাত করেছে একথা সত্য, কিন্তু এই প্রাণের জোয়ারে বিনা আড়ম্বরে সকলের অলক্ষ্যে যিনি নতুন দিগন্তের সন্ধানে তরীর নোঙর তুলেছিলেন তিনি সত্যজিৎ রায়। তাঁর নবদিগদর্শনের অপরূপ প্রকাশ "পথের পাঁচালী" যা দেশ-বিদেশের রসিকজনকে অপার বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বিভূতিভূষণের অবিস্মরণীয় অপু-কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাংলা ছবির এই নবীন পথিকৃৎ-এর পথ-পরিক্রমার অভিনব পাঁচালী "অপরাজিত"র পর এক অপূর্ব শিল্প পরিণতি লাভ করেছে তাঁর অধুনাতম ছবি "অপুর সংসার"য়ে।

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স-এর "অপুর সংসার"-এর চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণের "অপরাজিত"র শেষাংশ নিয়ে। কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর পথে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয় অপু। প্রাণে তার অপরিমেয় জীবনীশক্তির উচ্ছলতা, অন্তরে তার বড় হবার স্বপ্ন। সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে সে অমর হয়ে থাকবে অনাগত পাঠকদের মনে। অন্তরের স্বপ্ন আর বাইরের সংঘাতের দ্বৈরথ সংগ্রামে অপু যেন এক ক্লান্তিহীন যোদ্ধা। এমনি দিনে হঠাৎ তার দেখা কলেজ-দিনের পুরনো বন্ধু প্রণবের সঙ্গে। সেই দিনই অপুর জীবনদেবতা তার ছন্নছাড়া জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূত্রটি অলক্ষ্যে গেঁথে দিয়ে যান।

ভাবপ্রবণ অপু মহৎ কিছু একটা করবার ঝোঁকেই বিয়ে করতে রাজী হয় প্রণবের মামাতো বোন অপর্ণাকে। বর অপ্রকৃতিস্থ এ-দুঃসংবাদ যখন রটে গেল, তখন দুঃখিনী জননী যেন নিয়তির সকল প্রতিকূলতাকে ব্যর্থ করেই মেয়েকে আঁকড়ে রাখলেন বুকে। অপর্ণা দো-পড়া হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় সমস্ত বিয়ে বাড়ি ম্রিয়মান। অপর্ণার ব্যথা, তার মায়ের কান্না এসে আঘাত করে অপুর মনে। তাই বন্ধু প্রণবের অনুরোধ অপুর মনের সুপ্ত মানবতাবোধটিকেই জাগিয়ে তোলে। সেই রাত্রেরই শেষ লগ্নে সে অপর্ণাকে জীবনসঙ্গিনী করে নেয়।

কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অপু অপর্ণাকে হারায় অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই। দাম্পত্যজীবনের রস-মাধুর্যের কোরক নবদম্পতির জীবনে পাপড়ি মেলতে পারলো না। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অপর্ণা বিদায় নেয় সংসার থেকে।

অপর্ণার মৃত্যুর নিদারুণ আঘাতে অপু ছিটকে বেরিয়ে পড়ে পথে, প্রান্তরে, দূর দেশে। ছেলের টানও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর পর সে যখন ফেরে ছেলে কাজলের কাছে, কাজল তাকে পরম বন্ধু ভেবেই ধরা দেয় তার কাছে। ছেলেকে নিবিড় স্নেহে কাঁধে তুলে নেয় অপু। সুখের বোঝা বয়ে নিয়ে এগিয়ে যায় নতুন জীবনের সন্ধানে।

অপু-কাহিনীর এই অধ্যায়ের চিত্র-রূপায়ণে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অনন্যসাধারণ প্রয়োগ শিল্পের আশ্চর্য দীপ্তি আলিপ্ত হয়ে আছে ছবির সর্বাঙ্গে। এ-ছবিতে তিনি যে-ক্ষেত্রে প্রয়োগ-রীতির নতুনত্ব দাবী করতে পারেন সেটি হল কাহিনীর ভাববিন্যাসে সহজ সরল প্রকাশ-ভঙ্গি। তাঁর অন্যান্য ছবির মতো ধোঁয়াটে ভাবের অস্পষ্টতা এতে নেই। আখ্যানভাগের নাট্যাবেগ অকম্পিত এবং মরমী রেখায় রূপায়িত এ-ছবিতে। অপু-অপর্ণার দাম্পত্যজীবনের মৃত্তিকাশ্রয়ী মধুর অনুভূতির গাঢ় স্বাদ (মনসাপোতায় অপুর মনের কথাটি জেনে অপর্ণার চাঁপা গাছের ডাল পোঁতা, বর্ষণমুখর রাতে তার কবিতা আবৃত্তি, প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় অপর্ণার টিপ-পরা মুখের দিকে অপুর বার বার চেয়ে থাকা এবং আরও কত কি) এ-ছবিতে না থাকলেও, শহুরে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নবদম্পতির গৃহস্থালী, ছোট ছোট মিষ্টি কথায়, মান-অভিমানে, দুরন্ত জীবন-পিপাসায় এমন আবেগনিবিড় হয়ে বাংলা রজতপটে এর আগে কখনও উপস্থিত হয়নি। রূপকার হিসাবে সত্যজিৎ রায়ের এই কৃতিত্ব হয়তো অনতিক্রমনীয় হয়েই থাকবে।

এ-বাদেও ছবির অনন্য শিল্পগরিমা ও রূপরীতি, ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের সূক্ষ্ম অথচ সহজবোধ্য বিন্যাস এবং সর্বোপরি এর নিরুচ্ছ্বাস গীতিময়তা দর্শকের অনুভূতিকে পুলকিত ও বিস্মিত করে। সত্যজিৎ রায়ের আগের ছবির মতো "অপুর সংসার" ভাস্কর্যের কঠিন-সূক্ষ্ম সুষমা বা শিল্পীর তুলির টানের অস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জনায় অতীন্দ্রিয় নয়। শ্রীরায় তাঁর মননশীল পরিচালনার সঙ্গে সুতীব্র অথচ সংযত রসবোধের এমন অনাস্বাদিত সমন্বয় ঘটিয়েছেন যার ফলে ছবিটি রসিকজনের কাছে একটি অভূতপূর্ব কীর্তি হিসাবে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক-মানসের সঙ্গে পরিচালকের কল্পনার গরমিল হয়তো সত্যজিৎ রায়ের এই ছবিতেই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহৎ শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে ছোট ছোট ঘটনা ও অংশের পরিবর্জন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ছবির প্রধান চরিত্র উপস্থাপনে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনার আশ্রয় যেমনভাবে নিয়েছেন তা চিত্রস্রষ্টার দৃষ্টিসিদ্ধির পরিচায়ক হয়ে ওঠেনি। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুকে দেখানো হয়েছে শ্মশ্রুধারী বিরহী রূপে যে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর দয়িতার বিয়োগ ব্যথা বয়ে

চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের "জল জঙ্গল"-এর নায়ক-নায়িকা অসীমকুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতির কোলে জলকাদার মধ্যে যারা মানুষ তাদের নিয়ে এই ছবি

এই দুটি নতুন মুখ চিত্রপ্রিয়দের মন ভোলাবে এম পি প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি "কুহক"-এ। অগ্রদূতের পরিচালনায় ছবিখানি এখন গঠনপথে

নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা জায়গায়। অপুর শোকাবেগ নিয়ে ছবিকে যেভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে তার মধ্যে বিভূতিভূষণের অপুকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। অপর্ণার বাধাজড়িত স্মৃতি অপু কোনদিন ভুলতে পারেনি সত্য; কিন্তু তার দার্শনিক মনের গহনে সে প্রিয়জনের মৃত্যুকে জীবনচক্রের নিষ্ঠুর লেনদেনের খেলা বলে ভেবে এসেছে। মায়ের মৃত্যুর পর তার মনে প্রথমটা আসে যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ... বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস" লেখকের ভাষায়। এই সর্ব-বন্ধনমুক্তির অভীপ্সা অপুচরিত্রের মূল কথা। অন্যদিকে প্রকৃতির কে সেই যে মানুষ — প্রকৃতির জীবনস্পন্দনে সে পেয়েছে নিঃসীম জীবনের সন্ধান। দশ বছর বয়সের "অবোধ, উদগ্রীব স্বপ্নময়" শিশুটি ছিল তার চিরদিনের চাওয়ার বস্তু। বনে বনে, বনবীথির শ্যামল ছায়ায়, গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিলীন হয়ে যেতে চেয়েছে সে মহা-জীবনের সন্ধানে। মানুষের যৌবনে জীবনে, সুখে দুঃখে, আশাভঙ্গে, শোকে শান্তিতে সে খুঁজেছে বৃহত্তর জীবনকে। এই জীবন যেন প্রকৃতির চঞ্চল জীবনধারারই প্রতীক।

অনন্ত জীবনের এই উৎস ও বিকাশ সে লিপিবদ্ধ করবে তার উপন্যাসে এই ছিল তার প্রেরণা। সেইজন্য অপুর অভিযান শুরু হয় মানবাত্মার রাজপথে অজস্র মানুষের মিছিলে মিশে গিয়ে, জীবনবিচ্ছিন্ন বৈরাগ্যের পথে নয়। তাই অপু "মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন" তেমনিভাবে সে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিকে পরম আগ্রহে আঁকড়িয়ে রাখে। বিভূতিভূষণের এই জীবনবাদী অপুকে (যার মতে "জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের রস নিঃশেষিত হয়ে পড়ে") জীবনের উৎসব থেকে পালিয়ে বেড়ানো বিবাগীরূপেই শুধু দেখানো হয়নি, তার সাধের উপন্যাসটিকেও —যা তার কাছে জীবন-বেদের মহাভাষ্যের মতো—ফেলে দিতে দেখানো হয়েছে। অপু-চরিত্র কল্পনায় পরিচালকের নিজস্ব ভাষা (যার অধিকারগত প্রশ্নটুকু বাদ দিলেও) বিভূতিভূষণের অপু আখ্যানের জীবন-দর্শন ও মূল বক্তব্যকে খর্ব করেছে।

কাজলকে "অলীক, অবাস্তব" ভেবে অপুর দূরে সরিয়ে রাখাটাও ছবিতে রস-হানি ঘটিয়েছে। ভ্রাম্যমান জীবন শুরু করবার আগে অপু কাজলকে গিয়ে দেখে আসে তার মামার বাড়িতে। এর পরেও কাজলকে নিয়ে তার মনে হয়েছে "এই যে ছেলে, পৃথিবীতে সে ত যাচিয়া আসে নাই—এই নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে?" তার ওপর, যে কাজলকে পরিচালক পর্দায় উপস্থাপিত করেছেন সেও বিভূতিভূষণের কল্পনাপ্রবণ, ভীরু, প্রকৃতি-প্রিয় কাজল নয়। কাজল পাখী ভালোবাসে, পাখীর ডাক তার মনে পুলক-রোমাঞ্চ জাগায়। ছবিতে কাজলের মধ্যে দেখা যায় পাখী মারবার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি। কাজলের পাখী মারা ও পরে মরা পাখীটিকে এক অন্ধের মুখের সামনে নিয়ে ধরার ঘটনাটি শিশু-চরিত্রের স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট করেছে। কাজলের প্রকৃতির এই "স্যাডিজম" বা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি অপু-অপর্ণার ছেলের সম্বন্ধে ভাবতে অবাক লাগে। চরিত্র বিন্যাসে

এমনিতরো বন্ধুতার আভাস মেলে যখন অপু অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুরারিকে সজোরে ঘুসি মারে, আর কাজলের দাদু যখন তাকে লাঠি উঁচিয়ে মারতে যান।

অপু ও কাজলের মধুর সম্পর্কের যে উপাখ্যান মূলে কাহিনীতে রয়েছে, ছবিতে তার আভাস অল্প। কাজলের পক্ষে তার শ্মশ্রুধারী বাবাকে চিনতে না পারার ফলেই দর্শকেরা বিভূতিভূষণের এই আখ্যানের রস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কাজলের অপুকে বাবার পরিবর্তে বন্ধুভাবে মেনে নেওয়া সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব কল্পনা যা ছবিটিকে এক বিশেষ রসসম্ভার থেকে বঞ্চিত করেছে। মূল কাহিনীর রানু-দি ছবিতে অনুপস্থিত থাকার ফলেও অপু-কাজলের উপাখ্যানটি ছবিতে অপূর্ণ থেকে যায়।

ছবির অন্যান্য বৈসাদৃশ্যের মধ্যে বাড়িওয়ালার সংগে অপুর কাটা কাটা কথা তার মতো ভাবপ্রবণ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুবকের পক্ষে বেমানান। কাহিনীর কাল দেখাতে গিয়ে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য নজরে পড়ে।

বস্তুত দর্শকদের মনে ছবিটির একটি দিক বিশেষভাবে শূন্যতার সৃষ্টি করবে। অপুর সংসার সর্বজয়ার স্মৃতিমাখানো নয়। দুর্গার কথা বাদ দিলেও, সর্বজয়ার স্মৃতি অপুর [illegible] [illegible] [illegible] বিয়ের পর [illegible] অপর্ণার [illegible] কাহিনীতে যে [illegible] সৃষ্টি করে [illegible] ছবিতে [illegible] থাকলে অপু কাহিনীর শেষ ছবিটি আরও [illegible] হত এবং এতে [illegible] হতে বাধা থাকত না।

বিভূতিভূষণের [illegible] সাহিত্য সৃষ্টির মর্যাদা ছবিটিতে পরিপূর্ণ রূপ না পেলেও সত্যজিৎ রায়ের একটি নতুন সৃষ্টি হিসাবে 'অপুর সংসার'—তার রূপ ও অভিনয়ে [illegible] চলচ্চিত্রের একটি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে। বিদেশেও এ ছবি একটি অনুপম নিদর্শন হিসাবে আদৃত হবে।

ছবির শিল্পী নির্বাচন সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি উল্লেখ্য কৃতিত্ব। অপর্ণার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর যে সংযম, দরদ ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন তা অতুলনীয়। মনে হয় শর্মিলা বিভূতিভূষণের অপর্ণারই একটি পরিপূর্ণ রূপ যার ছোট ছোট অস্ফুট কথা আর নম্র নেত্রপাত ছবিতে মরমী রসের মাধুরী সৃষ্টি করে। অপুবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রোচিত ও মর্মস্পর্শী। তিনি বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে অপু-চরিত্রের মর্মমূলে পৌঁছাতে পেরেছেন অনেকাংশে। তাই তাঁর অভিনয়ে বিভূতিভূষণের অপু বার বার মূর্ত হয়ে ওঠে। একটি সাধারণ চরিত্রকে প্রাণোচ্ছল অভিনয়ের গুণে স্মরণীয় করে তুলেছেন পুলু-রূপী (প্রণব) স্বপন মুখোপাধ্যায়। কাজলের চরিত্রে আলোক চক্রবর্তী দর্শকমনে মায়ার সৃষ্টি করে। ছোট ভূমিকায় অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধীরেন ঘোষ, বেলারাণী, শেফালিকা (পুতুল), ধীরেশ মজুমদার ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

এবং অসাবধানতার ঘটনায় ভারাক্রান্ত। বিশেষত ছবিটিতে শিশুদের জন্য আমোদের উপকরণই বেশী, শিক্ষার নয়। বরঞ্চ কলকাতার পথে গোবিন্দের নতুন বন্ধুদের যে ভাব, ভঙ্গী ও পোষাকে দিনে-রাতে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত দেখা গেল, শিশুদের কাছে তা কোন সুন্দর আদর্শ স্থাপন করে না। কৈশোরের প্রাণ-প্রাচুর্যের উজ্জ্বলতা রয়েছে কাহিনীতে, কিন্তু তা মহৎ কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত নয়।

ছবিতে অভিনয়ের দিক দিয়ে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবে গোবিন্দের ভূমিকায় তিলক। চরিত্রটির মূল আবেদনটিকে এই শিশু-শিল্পী সহজগ্রাহ্য করে তুলেছে। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় গোবিন্দর শহুরে বোন নমিতার ভূমিকায় মধুছন্দার স্বচ্ছন্দ অভিনয়। অন্যান্য ভূমিকায় চন্দন, বরুণ, ভাস্কর, লোকনাথ, স্নিগ্ধা, সব্যসাচী, তাপস, সজল, সুরঞ্জন ও স্বপন উল্লেখযোগ্য। প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে পদ্মা দেবী, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, [illegible]-কুমার (দুর্গাবেশের ভূমিকায়), কমল মিত্র ও সুরুচি সেনগুপ্তার অভিনয় প্রশংসনীয়। সুররচনায় নচিকেতা ঘোষ কয়েকটি সুখ-শ্রাব্য গানের জন্য প্রশংসা পাবেন।

কলাকৌশল ও আঙ্গিকের কাজ চলনসই।

অনাত্মীয়ের বন্ধন

মানুষ বিভ্রান্ত হয় শোকে দুঃখে, নিরাশায় বিপর্যয়ে। তার এই বিভ্রান্তির মূলে থাকে হয়তো কোন এক অসতর্ক মুহূর্তের ভুল যার জের চলে জীবনভোর, নয়তো এমন কোন স্বার্থান্ধতা যা কুটিলের হাত ধরেই এগিয়ে চলে অভীষ্টসিদ্ধির পথে। জীবনপথে এমনি দিশেহারা কয়েক-জনকে নিয়েই গড়ে উঠেছে মহোদয় ফিল্মস-এর "বিভ্রান্ত"।

এ-ছবির কাহিনীতে বিভ্রান্ত অনেকেই। বিভ্রান্ত রায় বাহাদুর ত্রিদিব চৌধুরী, যিনি একদিন মুহূর্তের ভুলে নিজের একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূকে আঠারো বছর আগে এক বিজয়ার রাত্রিতে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন পথের দিকে যদি কোনদিন তারা ফিরে আসে। বিভ্রান্ত মনীষা যে আঠারো বছর পর জানতে পারে যে সে ত্রিদিব চৌধুরীর আসল নাতনী নয়। শুধু ত্রিদিব চৌধুরীর স্ত্রীকে ছেলে হারাবার ব্যথা ভোলাবার জন্যই পিতৃমাতৃহীনা এক শিশুকন্যাকে এনে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কোলে। বিভ্রান্ত প্রশান্ত, যে ত্রিদিব চৌধুরীর নাতির জন্ম-পরিচয়ে মনীষার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল অতি সহজেই। ত্রিদিব চৌধুরী যখন মনীষাকে প্রশান্তর হাতে তুলে দিতে চান, তখন প্রশান্তর বিবেক জেগে ওঠে। সে তার মুখোস খুলে ধরে। কিন্তু [illegible]

[illegible]

ছবির এই [illegible] পারে নি।

ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল (ত্রিদিব চৌধুরী) ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের (মনীষা) অভিনয় দর্শকদের প্রশংসার দাবী রাখে। নাটকীয় মুহূর্তে তাঁদের অভিব্যক্তি ছবিতে নাটকীয়তা আনে। কুহকী বসন্তের চরিত্রে অসিতবরণ বেমানান হলেও, কৃতিত্বের ছাপ তিনি রেখে দিয়েছেন তার অভিনয়ে। প্রশান্তবেশী আশীষকুমারের অভিনয় মনে রেখাপাত করে না। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে কমল মিত্র, তুলসী ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতিধারা ও পদ্মা দেবী চলনসই।

আবহসংগীত রচনায় সংগীত পরিচালক কালী [illegible] ও [illegible] কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ছবির শিল্পী [illegible]।

[illegible]র রাজা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে কুমারী বাসবী মেট্রোপলিটান পিকচার্সের "নির্বাসিত শিল্পীর [illegible]"
[illegible]

ছবির দুটি নৃত্যাংশ উপভোগ্য। এতে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছেন প্রীতিধারা।

আলোকচিত্র, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ নির্ভরযোগ্য।

চিত্রালোচনা

বাংলা ছবির কাহিনীতে বৈচিত্র্য পরিবেশন করবার যে প্রয়াস চলছে দেখা যাচ্ছে, তারই অন্যতম উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত হয়েছে চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের নবতম নিবেদন 'জল জঙ্গল।' যাদের কেন্দ্র করে মনোজ বসুর এই সুখ্যাত কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে, তারা কেউই শহরের মানুষ নয়। ছবিখানি তোলাও হয়েছে খাস সুন্দরবনে—গল্পের নামানুযায়ী একেবারে জলে-জঙ্গলে। পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ছবিখানিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবানুগ করে গড়ে তুলেছেন। মুখ্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন অসীমকুমার, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুখেন, প্রেমাংশু বসু, শিশির বটব্যাল প্রভৃতি কুশলী শিল্পীরা। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর-যোজনায় ছবির আকর্ষণ অনেকাংশে বেড়েছে। 'জল জঙ্গল' এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন বাংলা ছবি।

আরো দুখানি নতুন হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। তাদের নাম 'হীরা মোতী' ও 'সি আই ডি গার্ল।'

রূপালয়ের 'হীরা মোতী' মুন্সী প্রেমচাঁদের 'দো বয়েলো কি কথা'র চিত্ররূপ। নবাগত কৃষ্ণ চোপরার পরিচালনায় ছবিখানি গৃহীত হয়েছে। প্রধানাংশে চিত্রাবতরণ করেছেন বলরাজ সাহানী, নিরূপা রায়, শুভা খোটে, অসীমকুমার, রেবী নাজ প্রভৃতি। রোশন এতে সুর দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতন ফিল্মসের 'সি আই ডি গার্ল'-এর নায়কও বলরাজ সাহানী। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গীতা বালী, কানহাইয়ালাল, কুমুদ ত্রিপাঠী, হেলেন ও নবাগত সুবিরাজ। রবীন্দ্র দাভে ছবিটি পরিচালনা করেছেন, রোশন এ ছবিরও সঙ্গীত পরিচালক।

*

গত রবিবার অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্য লগ্নে অনেকগুলি নতুন বাংলা ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সুরু হয়েছে দুখানি ছবি—চয়নিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের "কি পাই নি" ও অন্তরাগ পিকচার্সের "সাত দিনের অতিথি।" শেষোক্ত ছবিখানি পরিচালনা করবেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুভি মেকার্স (ইণ্ডিয়া) স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাউণ্ড স্টেজে "কোন এক দিন"-এর যাত্রা সুরু করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। সুবীর হাজরার কাহিনী অবলম্বনে পরিচালনা করবেন অসিম [illegible]। মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, তুলসী ঘোষ, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

এস ডি অর প্রোডাকসনের প্রথম চিত্র "ইট"-এর মহরৎ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। পরিচালনা ও সুরসৃষ্টির ভার অর্পিত হয়েছে অভিমন্যু রায়ের ওপর।

ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে ঐদিনই রাঙা-দীপা ফিল্মসের "কালচক্র" ও বঙ্গলক্ষ্মী পিকচার্সের "যুগ স্বপ্ন"—এই দুখানি ছবির শুভারম্ভ হয়েছে। শেষের ছবিটি পরিচালনা করবেন নিরঞ্জন দে—শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে সরোজপ্রভা কর রচিত "কবি বিল্বমঙ্গল" ও অনন্ত চট্টোপাধ্যায় রচিত "রত্নাকর" চিত্রদ্বয়ের মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি দুখানি তোলা হবে বিমলা প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে। হরি ভঞ্জ দুটিরই পরিচালক।

*

রূপালয়ের হিন্দী ছবি "হীরা মোতী"-র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় শুভা খোটে

সত্যজিৎ রায় "মহাভারত"কে চিত্রায়িত করবার আগে আরো দু একখানি ছবি তুলবেন। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" নিয়ে ছবি তৈরী করবার পরিকল্পনা তাঁর অনেক দিনের। প্রথমে হয়তো তাইতেই হাত লাগাবেন তিনি। সুচিত্রা সেনকে বিমলা, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিখিলেশ ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্দীপ রূপে উপস্থাপিত করবার সংকল্প আছে তাঁর। এই সম্পর্কে শিল্পীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় ডকুমেণ্টারী ছবিটি তিনি আসছে বছরের গোড়ায় আরম্ভ করবেন। এই ছবিখানি কবির শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রচারিত হবে ফিল্মস ডিভিসনের মাধ্যমে।

থিয়েটার সেণ্টারের নাট্য সমারোহ

থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোক্তায় বহু প্রতীক্ষিত নাট্য সমারোহ মে মাসের ১৯ তারিখ থেকে সুরু হবে। এই নাট্য সমারোহের একটি বিশেষত্ব এই যে, যোগদানকারী অধিকাংশ দলই নূতন এবং প্রত্যেকটি নাটকও নূতন।

ক্যালকাটা ড্রামাটিক ক্লাব [illegible]

রঙ্গসভা প্রযোজিত 'বোবা কান্না' নাটকের একটি দৃশ্যে প্রবীরকুমার, সন্ধ্যা রায় ও দিলীপ রায়। নাটকটি সম্প্রতি চাকুরিয়াতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। "বোবাকান্না" রমাপদ চৌধুরীর "জলরঙ" গল্পের নাট্যরূপ। পীযূষ বসু এর নাট্যরূপদাতা ও পরিচালক

'দি ফোর্থ ওয়াল' নাটক দিয়ে এই সমারোহের উদ্বোধন হবে। উক্ত ক্লাবের মঞ্চসজ্জার অসুবিধার জন্যে ওই অনুষ্ঠান শ্রীশিক্ষায়তন হলে করা হবে। গত বৎসরের একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দলটিকে ২৩শে মে থিয়েটার সেণ্টার হলে পুরস্কৃত করা হবে।

জুন মাস থেকে থিয়েটার সেণ্টারের নিজস্ব মঞ্চে সমারোহ সুরু হবে। যে কয়টি দলের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে প্রতাপপুর মিলন মন্দির, রংরেরং, আনন্দভারতী, মহলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জুলাই মাসে রঘুনাথ গোস্বামীর 'পাপেট ড্যান্স' এই সমারোহের আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। মুখোস ধনঞ্জয় বৈরাগীর একটি নূতন নাটক অভিনয় করবে। পরিচালনায় থাকবেন শ্রীতরুণ রায়। এছাড়া আরও কয়েকটি দলের যোগদানের সম্ভাবনা আছে।

"দীপ জ্বেলে যাই" সম্পর্কে

মহাশয়,

"দীপ জ্বেলে যাই" ছবিটিতে কিছু অসংগতি নজরে এলো। যেমন—(১) নায়িকা রাধা (সুচিত্রা সেন) নার্স হওয়া সত্ত্বেও তাকে 'ডাক্তারের গাউন' পরানো হয়েছে ও পকেটে 'স্টেথোস্কোপ' দেওয়া হয়েছে। (২) অপর একজন নার্সকেও (নমিতা সিনহা) ডাক্তারের গাউন' হাত গুটিয়ে পরা ও 'ক্যাপ' বিহীন অবস্থায় ডিউটি করতে দেখা গেল। (৩) অনেক জায়গায় নায়িকাকে নার্সদের ক্যাপ পরা অবস্থায় দেখা গেলেও, তাঁর শাড়ি পরার কায়দা মোটেই নার্সদের মত হয়নি। (৪) মেট্রনকেও 'ক্যাপ' বিহীন অবস্থায় ডিউটি করতে দেখানো হয়েছে। (৫) এক জায়গায় দেখানো হয়েছে যে রোগী ভর্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে হাসপাতালের প্রধান ও আরও ডাক্তারদের সঙ্গে মেট্রনও অংশ গ্রহণ করছেন—যা কোনও হাসপাতালে হয় না।

আমার এক ডাক্তার বন্ধুও 'ক্যাপ'বিহীন, "ডাক্তারদের গাউন" পরা, স্টেথোস্কোপ' পকেটে নার্স দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। কারণ নার্সদের কখনই 'ক্যাপ' বিহীন অবস্থায় ডাক্তারের গাউন' অথবা স্টেথোস্কোপ' ব্যবহারের কোনও অধিকার নেই। মেট্রনও ক্যাপবিহীন অবস্থায় ডিউটি করতে পারেন না। ইতি—

মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কলিকাতা-২০

এইচ পি পিকচার্সের "উত্তর মেঘ"-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় বিধায়ক ভট্টাচার্য

বিবিধ সংবাদ

বিশ্বরূপার দ্বিতীয় নাটক "ক্ষুধা"র অভিনয় আরম্ভ হয় ১৩৬৪ সালের বৈশাখ মাসে। গত সোমবার নাটকটির ৫০০ অভিনয় রজনী মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অভিনয়ের প্রারম্ভে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ একটি স্মারক উৎসবের আয়োজন করেন। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে লেডী রাণু মুখার্জী "ক্ষুধা" নাটকের শিল্পী ও কর্মীদের স্মারক উপহার বিতরণ করেন। এর আগে মাত্র একখানি বাংলা নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের "উল্কা"—একাদিক্রমে ৫০৭ বার অভিনীত হয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘ দিনব্যাপী অভিনয়ের নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে। "ক্ষুধা" যে সে রেকর্ড ভঙ্গ করে আর একটি নতুন গৌরবের অধিকারী হবে তা অনায়াসেই বলা যায়।

• • •

গত শনিবার ১৪ই মে থেকে বিশ্বরূপা [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বরূপায় একটি একাংক নাট্য [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

• • •

[illegible]

এ বছর কয়েকটি নির্বাচিত ভাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে না। উৎসব কমিটির তরফ থেকে জানান হয়েছে, আগামী বছর থেকে আবার চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এক বছরের এই বিরতি প্রতিযোগিতাকে আরো শক্তিশালী করে তুলবে এমন আশাও প্রকাশ করা হয়েছে।

খেলার মাঠে

একলব্য

বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক শ্রী বেরী সর্বাধিকারী আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ড গিয়েছেন ইংলণ্ডে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলার সংবাদ পরিবেশনের জন্য। দেশের খেলার পাতায় এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে শ্রী সর্বাধিকারীর মতামত ও সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হবে। 'যাত্রা হল শুরু' এই শিরোনামায় তিনি দেশের জন্য যে লেখা পাঠিয়েছেন এই সংখ্যায় লেখার শেষদিকে তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

• • •

কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ময়দানের আবহাওয়া এখনো ফুটবলের উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরে ওঠেনি। বড় বড় ক্লাব, যাদের নামের মোহে দর্শক মাতেন, তারা একে একে ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন, ফুটবলও আস্তে আস্তে জমে উঠছে। ফুটবল কলকাতার প্রাণ মাতানো, মন-মাতানো খেলা। মরসুমের সূচনা থেকে ফুটবল খেলা জমে না উঠবার দুটি কারণ। প্রথম কারণ—প্রথম দিকে মহারথী ক্লাবের খেলার আয়োজন করা হয়নি। দ্বিতীয় কারণ—হকি খেলার শেষ না হতেই এবার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে। কলকাতা মাঠে হকি খেলা এবং মোহনবাগান ও মহামেডান মাঠে ফুটবল খেলা একসঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অবশ্য হকিরও ক্ষতি হয়েছে।

বেটন কাপের শেষ পর্যায়ের খেলাগুলি এবার মোটেই জমেনি। অবশ্য ভারতের কয়েকটি নামকরা হকি দলের অংশ গ্রহণ না করাও বেটন কাপের খেলা না জমার অন্য কারণ।

যাই হক, বেটন কাপের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হকি মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। এখন পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে ফুটবল মরসুম। বিকেলের দিকে কলকাতার সব পথেরই গতি এখন ময়দানের দিকে।

এবার বেটন কাপ পেয়েছে কিরকির কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং হকি দল। ফাইনালে এরা ২—১ গোলে পরাজিত করেছে শক্তিশালী ইণ্ডিয়ান আর্মি টীমকে। কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং এবং ইণ্ডিয়ান আর্মি দুটি দলই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হকি টীম। বিজয়ী দলটি কিরকির সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত। আর ইণ্ডিয়ান আর্মি [illegible] সামরিক দল। অবশ্য ইণ্ডিয়ান আর্মি দল সমগ্র সামরিক বাহিনীর খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নিয়েই গঠিত এবং বিশেষভাবেই বলবার বিষয়, কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং দলেরই ৬ জন খেলোয়াড়কে আর্মি দলে খেলতে দেখা গেছে। এই কারণে কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের বেটন কাপ লাভ বেশী কৃতিত্বপূর্ণ। কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং গতবারের বেটন কাপ রানার্স। গতবার এরা ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করেছিল মোহনবাগান ক্লাবের কাছে। কিরকির দলটি এবার চতুর্থ রাউণ্ড থেকে খেলার সুযোগ পায় এবং চতুর্থ রাউণ্ডে পাঞ্জাব স্পোর্টস ক্লাবকে, কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের বিজয়ী মোহনবাগানকে ও সেমি-ফাইনালে কাস্টমস দলকে হারাবার পর ফাইনালে পরে শক্তিশালী ইণ্ডিয়ান আর্মি দলকে হারিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার বেটন কাপ লাভ করে। গতবারের দলের ৬ জন খেলোয়াড় [illegible] তরুণ ও অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় নিয়ে কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং দলের এই জয়লাভ সত্যই কৃতিত্বপূর্ণ।

তবুও বলবার বিষয়, ইঞ্জিনীয়ারিং দলের বেটন কাপ লাভের মধ্যে ভাগ্যের কোন সহায়তা নেই। যোগ্য দল হিসাবেই তারা বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে এবং তাদের [illegible] পরিচয় পাওয়া গেছে বেশী গোল [illegible] না বলে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার রানার্স শক্তিশালী আর্মি দল ফাইনালে আশানুরূপ ভাল খেলতে পারেনি।

১৯৫৯ সালের বেটন কাপ বিজয়ী কিরকির কোর অব ইঞ্জিনিয়ারিং হকি দল

আর্মির খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা রীতিমত ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন। ফলে খেলাটিও কোন সময় প্রাণবন্ত হয়নি। শুধু ফাইন্যাল খেলা কেন, বেটন কাপের কোন খেলাতেই এবার উন্নত হকি চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। আর অল্পসংখ্যক দর্শক সমাগম এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ক্রীড়াধারার কথা বিচার করলে ১৯৫৯ সালের ফাইন্যাল খেলাকে তো বেটন কাপের সুদীর্ঘ ইতিহাসের এক নৈরাশ্যজনক ফাইন্যাল খেলা বলেই অভিহিত করা যায়।

আগেই বলেছি, বাইরের কয়েকটি খ্যাতনামা দলের অভাবে বেটন কাপের খেলা এবার ভাল জমেনি। বাইরের কয়েকটি শক্তিশালী দল সমেত মোট ৪১টি দল নিয়ে এবার বেটন কাপের খেলার তালিকা রচনা করা হয়েছিল, আশা করা গিয়েছিল, বেটনের খেলা এবার ভালই জমবে। কিন্তু খেলবার জন্য নাম পাঠিয়েও নর্দার্ন রেলওয়ে, বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব, সেণ্ট্রাল রেলওয়ে, পাঞ্জাব পুলিস ও উত্তর প্রদেশ দল শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। এতে খেলার মাধুর্য এবং প্রতিযোগিতার আভিজাত্য দুই-ই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে উপরের পাঁচটি দলের প্রতিষ্ঠার কথা সর্বজনবিদিত। যদিও বোম্বাইয়ের গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা কয়েকটি দলের কলকাতায় যথাসময়ে আসবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, তবুও কেউ কেউ যে না আসতে পারত, এমন নয়। কিন্তু আসেনি। নাম পাঠিয়ে এভাবে না আসা ক্লাবের কর্তৃপক্ষ মহলের পক্ষে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির অভাবের পরিচায়ক কিনা, কথাটি একবার ভেবে দেখা দরকার। আর দরকার ভারতীয় হকির কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সময়ের একটা সুসমঞ্জস বিলিব্যবস্থার। যাতে করে কোন দলের পক্ষে কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অসুবিধা হবে না।

নর্দার্ন রেল এবং উত্তর প্রদেশ দল গতবারও নাম পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত বেটন কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি। বেটন কাপ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার খেলা যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয় এবং ভারতের বহু নামকরা টীম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে বিরত থাকে তবে ভারতীয় হকির উন্নতির পক্ষে সেটা মোটেই আশার কথা নয়। আশা করি, হকির মাতব্বরেরা কথাটা ভেবে দেখবেন।

কলকাতার নামকরা ক্লাবগুলির মধ্যে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান ও বেটন বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব এবার মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। এবারকার অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং কোয়ার্টার ফাইন্যালে পরাজিত হয়েছে ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে। অপরাজিত লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকেও সেমি-ফাইন্যালে ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে এবং কাস্টমস দলকে সেমি-ফাইন্যালে কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অবশ্য ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভাগ্য একটু সহায়ক থাকলে এ খেলায় ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে জয়লাভও অসম্ভব ছিল না। ইস্টবেঙ্গলের রাইট আউট ভাস্করণ ইণ্ডিয়ান আর্মি দলের বিরুদ্ধে অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যে এবার আর যাঁরা দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গোলাম রসুল, ইণ্ডিয়ান আর্মির ব্যাক মূর্তি ও শান্তারাম, লেফ্‌ট ইন ম্যানুয়েল, কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের রাইট ইন গোরেল, লেফ্‌ট আউট লোকনাথন। বেটন কাপের খেলায় এবার সবচেয়ে বেশী সাতটি গোল করেছে কাস্টমস দল দ্বিতীয় রাউণ্ডে জামালপুর দলের বিরুদ্ধে। হ্যাট্রিক করেছেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ইশাক, দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের রমেশ ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বালু।

নীচে বেটন কাপের সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল:—

প্রথম রাউণ্ড

এরিয়ান (৩) বি ই কলেজ (০)
জামসেদপুর এস এ (৫) ক্যালকাটা (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান (৩) উয়াড়ী (০)
রাজস্থান (১) ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস (০)
বিহার মিলিটারী পুলিস (২) (৩) রেঞ্জার্স (২) (০)
পাঞ্জাব স্পোর্টস (ওঃ ওঃ) শিলং এস সি (স্ক্র্যাচড্)
ইস্টার্ণ রেলওয়ে (৩) ছোটনাগপুর (০)
কাস্টমস (৭) জামালপুর (০)
গ্রীয়ার (১) (১) এস ই আর এ (১) (০)
আর্মেনিয়ান্স (২) লালবাগ এস সি (১)
জামসেদপুর (১) এরিয়ান (০)
দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (৪) জ্যাকোরিয়ান্স (০)
মহঃ স্পোর্টিং (৫) মেসারার্স (১)
পোর্ট কমিশনার্স (২) স্বস্তিক ক্লাব (১)
পুলিস (৩) ঝাড়খণ্ড (১)
আদিবাসি (১) এস ই আর নয়ানপুর (০)
ইস্টবেঙ্গল (৪) বার্নপুর ইউনাইটেড (১)

তৃতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান (২) রাজস্থান (০)
পাঞ্জাব স্পোর্টস (২) বিহার মিলিটারী পুলিস (০)
কাস্টমস (২) ইস্টার্ণ রেলওয়ে (০)
আর্মেনিয়ান্স (২) গ্রীয়ার (১)
জামসেদপুর (৩) ইস্টবেঙ্গল কোচ ফ্যাক্টরী (২)
মহঃ স্পোর্টিং (১) দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (০)
পুলিস (১) (৪) পোর্ট কমিশনার্স (১) (০)
ইস্টবেঙ্গল (৩) আদিবাসি (০)

চতুর্থ রাউণ্ড

মোহনবাগান (৪) নাগপুর ইউনাইটেড (০)
কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং (১) পাঞ্জাব স্পোর্টস (০)
কাস্টমস (ওঃ ওঃ) নর্দার্ন রেলওয়ে (স্ক্র্যাচড্)
আর্মেনিয়ান্স (ওঃ ওঃ) টাটা স্পোর্টস (স্ক্র্যাচড্)
ইণ্ডিয়ান আর্মি (৪) জামসেদপুর (০)
মহঃ স্পোর্টিং (ওঃ ওঃ) সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (স্ক্র্যাচড্)
পুলিস (ওঃ ওঃ) পাঞ্জাব স্পোর্টস (স্ক্র্যাচড্)
ইস্টবেঙ্গল (ওঃ ওঃ) উত্তর প্রদেশ একাদশ (স্ক্র্যাচড্)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং (৩) মোহনবাগান (০)
কাস্টমস (১) আর্মেনিয়ান্স (০)
ইণ্ডিয়ান আর্মি (০) (৩) মহঃ স্পোর্টিং (০) (১)
ইস্টবেঙ্গল (১) পুলিস (০)

সেমি-ফাইন্যাল

কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং (২) কাস্টমস (০)
ইণ্ডিয়ান আর্মি (১) ইস্টবেঙ্গল (০)

ফাইন্যাল

কোর অব ইঞ্জিনীয়ারিং (২) ইণ্ডিয়ান আর্মি (১)

* * *

যাত্রা হ'ল শুরু—শ্রীবেরী সর্বাধিকারী

লণ্ডন: আবার যাত্রা হল শুরু। ভ্রাম্যমান আমার জীবন, কোনো যাত্রারই বৈচিত্র্য আছে বলে আজ আর আমার মনে হয় না। "লোটা-কম্বলের" যুগ হলে বোধ করি তাই সম্বল করে বেরোতাম, কিন্তু আজ আর তা সম্ভবপর নয়। সুতরাং একটি সুটকেশ ও টাইপরাইটার সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলাম, যার প্রয়োজন বর্তমানেও আমার থাকে, কর্মোপলক্ষে বিলাতে তো বটেই।

বিমান যুগের কথা যত চিন্তা করি ততই আশ্চর্য হই। শুক্রবার রাত্রে কলকাতায়, শনিবার সন্ধ্যায় প্যারীতে। প্যারীতে রাত্রি যাপন করে রবিবার দুপুরে লণ্ডন যাত্রা, এক ঘণ্টার মধ্যেই লণ্ডন এয়ারপোর্ট দেখা দিল, চিরাচরিত প্রথায় অবশ্য বৃষ্টি ও কুয়াশাও।

লণ্ডন এয়ারপোর্ট শহর থেকে প্রায় দশ বার মাইল দূরে। হোটেলে পৌঁছেই ভারতীয় দলের ম্যানেজার বরোদার মহারাজা ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅমর ঘোষকে টেলিফোন করে জানালাম যে, তাঁদের তখনই একটা ছোটখাট পার্টিতে বেরোতে হবে, তরুণ মহারাজা সাদর নিমন্ত্রণও জানালেন। কোনোদিনই পার্টির ভক্ত আমি নই, ক্লান্তির অজুহাতে তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলাম, কলম নিয়ে লিখতে বসলাম।

বেলা তিনটে, কিন্তু আকাশ দেখলে মনে হবে যেন কলকাতার শীতের সন্ধ্যা হয় হয়। হোটেলের জানালা দিয়ে এক ফালি ছাই রং-এর আকাশ চোখে পড়ে। এখন অবশ্য কালো মেঘে ভরা। টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে।

খেলার কথা বলার বিশেষ কিছু নেই, কারণ চাক্ষুষ না দেখে মতামত আমি প্রকাশ করি না। তবে উস্টারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলা "মনের মত" হয়নি বলে এখানকার বিশিষ্ট সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন। [illegible] ভারতীয় দলের ফিল্ডিং সম্বন্ধে [illegible] বলেছেন। মনে থাকতে পারে আমি এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম আমার প্রবন্ধে, অনুরোধ করেছিলাম অধিনায়ক গাইকওয়াড় ফিল্ডিং-এর ওপর যেন বিশেষ নজর দেন, নিয়মিত অনুশীলন করেন।

আজকের কাগজে [illegible] প্রমুখ অনেকেই লিখেছেন আর একটি কথা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের যাঁরা নতুন [illegible], ইঙ্গিত করেছেন যেন নতুন বলের জৌলুস (Shine) ঘষে-মুছে দিয়ে [illegible] দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে গত সংখ্যায় কলকাতায় বসেই আমি [illegible] করেছিলাম স্মরণ থাকতে পারে।

এখন ফিরে যাওয়া যাক যখন "যাত্রা হল শুরু"। শুক্রবার, পয়লা মে প্রায় রাত্রি এগারোটা, দমদম এয়ারপোর্ট। ফরাসীদের এয়ারওয়েজ, সকলেই [illegible], [illegible] জোড়ে। [illegible] বলতে আমি ছাড়া আর একজন ভারতীয় ছিলেন। আমার যাত্রার ব্যবস্থা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের বিশেষ অনুগ্রহেই বোধ হয় আমাকে Window Seat (জানলার পাশে) দেওয়া হয়েছিল এবং যে প্লেনে "ন স্থানম্ তিলধারণম্", পিসি সরকারের ইন্দ্রজালের মতন পাশের সীটও খালি দেখলাম। বারবার বিদেশ যাত্রা আমার কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল, এবারে কেন জানি না সে মনোভাব ঠিক ছিল না। কিন্তু "আঁখিপাতা দুটো জড়ায়ে" থাকা সত্ত্বেও নিদ্রাদেবীর করুণা লাভে বঞ্চিত হলাম। রাত্রি গভীর, জমি থেকে কুড়ি হাজার ফুট উপরে রাত্রির মায়া কাটিয়ে প্লেন চলেছে, বোধ করি শেষ পর্যন্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল, শুনলাম মিষ্ট কণ্ঠস্বর: "পার্দোঁ মঁসিয়ে" ইত্যাদি, চোখ খুলে দেখলাম, এয়ার হোস্টেসের হাসি-হাসি মুখ। বুঝলাম করাচী পৌঁছে গেছি, অর্থাৎ আকাশ থেকে "জমিনে" নামবার সময় হয়েছে।

করাচী থেকে তেহেরাণ, তেহেরাণ হতে ইস্তানবুল, ইস্তানবুলের পর ফ্রাঙ্কফার্ট, ফ্রাঙ্কফার্টের পরে প্যারী। যেন নিমেষেই পৌঁছে গেলাম। আমার ফরাসী ভাষায় বিদ্যার দৌড় "মের্সি বুকু", "পার্দোঁ", "বঁজুর" পর্যন্ত, কিন্তু স্টুয়ার্ড ও এয়ারহোস্টেস দুজনেই কাজ চালানোর মত ইংরাজী জানায় অসুবিধা কিছু হয়নি। Appel (আপেল নয়, যে আপেল খেলে ডাক্তার বা বৈদ্য কাছে ঘেঁষতেও পারে না, যে আপেল ডাক্তারের পয়সা বাঁচিয়ে আপনার প্রতিবেশীর [illegible] মহৌষধ, [illegible]—Appel-এর ইংরাজী প্রতিশব্দ Appeal বাংলায় সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, অবশ্য [illegible] মতে একটি [illegible] দিলেই সারা যায়। Appel-এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, যার দুজনের কার্যকুশলতা, সরল অকপট হাসি-মুখেই অনুরোধ রক্ষা করা হোতো।

কলকাতা থেকে প্যারী, মেঘের ওপর দিয়ে গেলেও সর্বত্র নীলাকাশের ছড়াছড়ি। প্যারী পৌঁছাতে কিন্তু একটু দেরী হোলো, [illegible] স্থির করলাম [illegible] করব প্যারীতেই। কলকাতা থেকেই অগ্রিম [illegible] করা হয়েছিল তার, আমার [illegible], অবশ্য একটি পয়সা বাড়তি খরচ না করেও। ফরাসীদের কার্য-তৎপরতার পরিচয় এখানে পেলাম। এয়ার-পোর্টে এক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল—হোটেল, গাড়ী ইত্যাদি—তার মধ্যে ভিসাও।

রাতে প্যারী মহানগরীর বোধ হয় জগতে তুলনা নেই। চারিদিকে আলো, আলোকসজ্জার মায়া বহুরই যেন দীপালীর বিরাট উদ্বোধন-পর্ব। আইফেল টাওয়ারের কাছেই নতুন এক কাফিখানা, শিল্পালয় তো আছেই, যে শিল্পালয়ে সারি সারি ১৫০-২০০টি [illegible] রাখা আছে। সুবেশা নারীর দল প্যারীর [illegible], কাতারে কাতারে যেন চলেছেন অভিসারে "যৌবন মদে মত্তা"। আগে দেখেছি অধিকাংশেরই চিরাচরিত প্রথামত মাথার চুল বব করতেন, হাল-ফ্যাশন হোলো "নেপোলিয়ঁ" ছাঁট। এর অর্থ প্রায় পুরুষেরই মত চুল কাটা, দেখালেন এসব ফরাসী বন্ধুবর, সবই দেখলাম, কিন্তু মন ভরল না। এঁরা যত সুন্দরী—বাংলা দেশের সুন্দর—অসুন্দর মধ্যেও যে কমনীয়তা আছে, তার আভাসও পেলাম না।

পরের দিন রবিবার, প্যারী নগরী সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত, যাত্রা আবার শুরু হবে। লণ্ডনের পথে। ফরাসী জাতি পান-ভোজনে আসক্ত, তার পরিচয় পাওয়া গেল এই এক ঘণ্টার বিমান যাত্রায়। প্লেন Vickers Viscount (ভিকার্স ভাইকাউন্ট), সার্ভিস Epicurean (এপিকিউরিয়ান), অর্থ "দৈহিক সুখভোগী"। "Epicurean Cafe" কলকাতার ভবানীপুর-বালিগঞ্জের অঞ্চলে যেন কোথাও দেখেছি, যেমন দেখেছি রাণাঘাট বা [illegible] "Grand Hotel"; কিন্তু সত্যিই Epicurean service এখানে। শ্যাম্পেনের ছড়াছড়ি, পানভোজন অতুলনীয়। প্রায় ইংলণ্ডের উপকূলে পর্যন্ত সূর্যদেবও সাথে ছিলেন। হঠাৎ কিন্তু দেখা গেল তিনি মুখ লুকোলেন, সূর্যকিরণের স্থান নিল মেঘ-বৃষ্টি-কুয়াশা। বুঝলাম ইংলণ্ডে পৌঁছেছি, ক্রিকেট খেলার সমালোচনা করবার জন্য। এয়ারহোস্টেস লাউড-স্পীকারে নির্দেশ দিলেন সীট বেল্ট আঁটবার জন্য, সিগারেট নিবিয়ে ফেলবার আজ্ঞা জারী করলেন। আরও বললেন: "আমরা কয়েক মিনিটে লণ্ডন পৌঁছাব। আমার ধারণা লণ্ডনে এখন বৃষ্টি হচ্ছে।" নূতন কথা নয়, বহুবার ইংলণ্ডে এসেছি, একবার ছাড়া প্রতিবারই বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কেন জানি না [illegible]—মনে হল কে যেন [illegible]।

হঠাৎ মনে পড়ল এয়ারহোস্টেসের নাম Micheline Ducas, ফরাসীর উচ্চারণ, ধারণা হল হয়ত শুনতে ভুল করেছি। ভদ্রতার খাতিরে বিদায় নেওয়ার সময় দু'এক কথা বলার রীতি। ধন্যবাদ জানালাম, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর নাম মিশেলিন না মিসেলিনা। তিনি বললেন, মিশেলিন, মেসেলিনা নয়। সন্দেহ হয়ে গেল, কারণ এত আদর আপ্যায়ন, এত "প্রেম-ভালবাসা", তারপর সংহার, এ মেসেলিনারই বৈশিষ্ট্য। [illegible] উল্লেখ করে তাঁকে সে-কথাই বললাম।

মিশেলিন আবার সরল হাসি হাসলেন, ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বললেন, লণ্ডনের আবহাওয়ার ওপর তাঁদের কোনই হাত নেই, সাদর আহ্বান জানালেন প্যারীতে, প্রতিশ্রুতি দিলেন সূর্যদেব নিত্যসহচর হবেন সেখানে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম, বলতে তা আর হয় না, ক্রিকেট-লেখা পেশা আমার, ইংলণ্ডের ক্রিকেট-খেলায় নিত্য-সহচর যে বৃষ্টি দেবতাই।

দেশী সংবাদ

৪ঠা মে—অদ্য লোকসভায় উদ্বাস্তু ক্ষতিপূরণ পুনর্বাসন আইন সংশোধন বিল ১১৮-৩৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। যে সকল উদ্বাস্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভাড়া দেয় না, এই বিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের বিধান করা হইয়াছে।

কলিকাতার বাড়ি ও জমির উপর সুসমঞ্জস কর ধার্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর-নির্ধারক বোর্ড স্থাপনের কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ধার্য কর সম্পর্কে আপত্তি এবং নালিশ নিষ্পত্তির জন্য স্বতন্ত্র একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইতে পারে।

৫ই মে—উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি আজ ছয় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর কংগ্রেস ও গণতন্ত্র পরিষদের মধ্যে কোয়ালিশনের প্রস্তাব এই শর্তে অনুমোদন করিয়াছেন যে, গণতন্ত্র পরিষদ কংগ্রেসের নীতি গ্রহণ করিবেন এবং কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড ইহা অনুমোদন করিবেন।

শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী আজ লোকসভায় বলেন যে, উপযুক্ত প্রস্তুতির পর একমাত্র কালক্রমেই আঞ্চলিক ভাষাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহনে পরিণত হইতে পারে। অবিলম্বে ইহা হইতে পারে না।

৬ই মে—নদীয়া জেলা হইতে কলিকাতায় প্রাপ্ত সরকারী বিবরণে জানা যায়, গত রবিবার ফাজিলনগরের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১৫০০টি পাকা বাড়ি ও কুটীর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে এবং ৫৩৭টি পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হইয়া ১১ জন নিহত এবং ৯জন গুরুতর আহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

অদ্য লোকসভায় কোম্পানি আইন সংশোধন বিল সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন, সংসদের সদস্যগণ যদি কোম্পানি কর্তৃক রাজনৈতিক দলকে অর্থসাহায্য দান বন্ধ করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি তাহার বিরোধিতা করিবেন না।

৭ই মে—মাথাই-প্রসঙ্গ সম্পর্কে মন্ত্রিসভার সচিবের রিপোর্ট এবং অর্থমন্ত্রী এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের মন্তব্য বিবেচনা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার ভূতপূর্ব বিশেষ সচিব শ্রী এম এ মাথাই সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত থাকার সময় তাঁহার সরকারী পদমর্যাদার কোনরূপ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

৮ই মে—অদ্য কলিকাতা ও হাওড়া এলাকায় এনফোর্সমেণ্ট পুলিস ও রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের অফিসাররা একযোগে বিভিন্ন অঞ্চলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চাউলের মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ অভিযান চালান।

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার সশস্ত্র খাম্পা বিদ্রোহী তিব্বত হইতে ভারতীয় এলাকা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের নিরস্ত্র করিয়াছেন।

৯ই মে—দুর্গাপুরে নির্মীয়মান তৃতীয় ইস্পাত কারখানায় পাইল বসানোর ব্যাপারে গুরুতর ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে ভারত সরকারকে সম্ভবত আরও এক কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে। ঐ ব্যাপারের জন্য নাকি এক বিদেশী কোম্পানি দায়ী।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আজ তিব্বত সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা এবং অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা—ভারতের এই দুইটি মূলনীতি পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

১০ই মে—কড়েয়া থানার এক পুলিস ফাঁড়িতে আর একটি মধুচক্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সন্দেহে সম্প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রকাশ ঐ ফাঁড়ির জনৈক মুসলমান কনস্টেবল এই নূতন মধুচক্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে।

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরী শিক্ষা লাভের দিকে ঝোঁক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সংকীর্ণ সুযোগ সুবিধার দরুণ অধিকাংশ ছাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যায়। কারণ এই রাজ্যে যে স্বল্প সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষায়তন আছে, তাহাতে ভর্তি প্রার্থীদের মোট সংখ্যার শতকরা ২৫জনের বেশী ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হয় না।

বিদেশী সংবাদ

৪ঠা মে—জলস্রোত বা বায়ুস্রোতের সহায়তায় বিদ্যুৎ বা শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি জানা আছে। কিন্তু কালস্রোত বা সময়ের ধারাও শক্তির উৎস হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক কোজিরেভ 'তাসের' নিকট ঘোষণা করিয়াছেন।

৫ই মে—বিশিষ্ট সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে লইয়া গঠিত বৃহৎ সাংবাদিক সমিতি আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা গত রবিবার বন্দী রিপোর্টারদের প্রতি রুশদের কঠোর ব্যবহারের প্রতিবাদে সোভিয়েট প্রচার বিভাগ কর্তৃক পরিবেশিত সংবাদসমূহ প্রকাশ না করার ব্যবস্থা করিতেছেন।

৬ই মে—তিব্বতকে আধা-স্বাধীন মর্যাদা দেওয়া হইবে—এরূপ সম্ভাবনার বিষয়টি অদ্যকার পিকিং পিপলস ডেলি উড়াইয়া দিয়াছে। উহার মতে এ জাতীয় ব্যবস্থা প্রতিক্রিয়াশীল চীনা ও ভারতীয় জনসাধারণ এবং চীন-ভারত মৈত্রী ও এশিয়ার শান্তিরক্ষার পক্ষে হানিকর হইবে। কেননা তিব্বত চীনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।

৭ই মে—মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর উইলিয়াম ফুলব্রাইট অদ্য পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রদান সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রতিরক্ষা দপ্তর সামরিক সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে [illegible] যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই।

[illegible] একটি [illegible] উপর [illegible] অভিযোগ [illegible] করিয়াছে [illegible] হইতে পারে।

৯ই মে—[illegible]

১০ই মে—[illegible] একটি [illegible] বৎসরের একটি [illegible] সামরিক আইন অনুযায়ী বিচারে তাহার [illegible] মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও [illegible] হয়।

যদি কোন [illegible] পরবর্তীকালে বিবাহ [illegible] তাহা [illegible] হইবে এই মর্মে [illegible] বেসরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত একটি বিল [illegible] সভায় গৃহীত হইয়াছে। [illegible] গৃহীত হইয়া আইনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ৩৩—২২৮১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

প্রেমতারা

অগণিত মানুষকে আনন্দ দিতে হেসে নেচে নানা কসরত দেখাতে হয় সার্কাসের মেয়েদের। এমনি এক মেয়ে সার্কাস-কুইন প্রেমতারা। রাত্রির 'শো' শেষ হলে যখন সে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসে তখন তার হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রণয়ের আকুতি-অভিব্যক্তি সার্কাসের সেরা খেলাকেও ছাপিয়ে ওঠে। আশ্চর্য রূপোজ্জ্বল পরিবেশে নতুন ধরনের কাহিনীসমৃদ্ধ উপভোগ্য উপন্যাস। দাম—চার টাকা

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

কাব্য-দীপালি

'কাব্য-দীপালি' প্রবীণ ও নবীন সমুদয় বিশিষ্ট কবির সুনির্বাচিত কবিতার বৃহৎ সংকলন-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কিছু পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার যে-সমৃদ্ধ ধারাটি প্রবহমাণ, তার বিচিত্র গীতিছন্দের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টভাবে রসসম্পন্ন হয়ে উঠেছে এই কাব্য-সংকলনে। বহুদিন পরে পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। দাম—সাত টাকা

রাজশেখর বসু

মহাভারত ... ১২·০০ রামায়ণ ... ৬·৫০
চলন্তিকা (অভিধান) ... ... ৬·৫০

সুধীরচন্দ্র সরকার

পৌরাণিক অভিধান ... ... ৭·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

জাপানে ... ৬·৫০ পথে প্রবাসে ... ৩·৫০
সাহিত্যে সংকট ... ... ২·০০
নতুন করে বাঁচা ... ... ১·৭৫

মৈত্রেয়ী দেবী

ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ ... ২·৫০

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পৌরাণিক উপাখ্যান ... ... ৩·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড) ৫·০০

বনফুল

ভুয়োদর্শন ... ... ৩·০০

সুবোধ ঘোষ

গঙ্গোত্রী (উপন্যাস) ৩·০০ ফসিল ২·৫০
থির বিজুরী ৩·০০ জতুগৃহ ৩·৫০

দীপক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু (উপন্যাস) ... ৬·০০
রোয়াক (উপন্যাস) ৩·৫০ শংখবিষ ৩·৫০
এই গ্রহের ক্রন্দন (উপন্যাস) ... ৬·০০

প্রতিভা বসু

মধ্যরাতের তারা (উপন্যাস) ... ৩·২৫

পরশুরাম

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ... ৩·০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ... ৩·০০
গল্পকল্প ... ২·৫০ কৃষ্ণকলি ... ২·৫০

বুদ্ধদেব বসু

যে-আঁধার আলোর অধিক (কবিতা) ... ২·৫০
কালিদাসের মেঘদূত ... ... ৩·৫০
শেষ পাণ্ডুলিপি (উপন্যাস) ... ৩·২৫

ধীরাজ ভট্টাচার্য

মন নিয়ে খেলা (উপন্যাস) ... ৫·০০

সুলেখা সরকার

রান্নার বই ... ... ৪·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রমল্লিকা ... ... ২·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এ বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
[illegible]

সমুদ্র সফেন ৪৷৷

[illegible]

সেই চিরকাল ৩৷৷

[illegible] উপন্যাস

অপরূপা ৫৷৷

কালীপদ ঘটকের
[illegible]

চন্দন-বহ্নি ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কথাচিত্র ৩৲

গল্প-পঞ্চাশৎ ৮৲

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

অকারণের পথ

বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্ত অধ্যায় সংযোজন করিল
— সাড়ে চার টাকা —

[illegible]

রচনাসংগ্রহ ৭৷৷

[illegible]

আশাপূর্ণা দেবীর

গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲

বলয়গ্রাস [illegible] [illegible] ৪৲
অগ্নিপরীক্ষা [illegible]

[illegible]

গল্পপঞ্চাশৎ ৮৷৷

মেঘমল্লার ৫৷৷৹ কুশল পাহাড়ী ৪৷৷৹ যাত্রাবদল

অবধূত বিরচিত

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲

দুই তারা ২৷৷

প্রবোধকুমার সান্যালের

বেলোয়ারী ৬৷৷

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

ঝক্‌ঝকে
—যা একমাত্র ভিমই করতে পারে!
আপনার বাসনপত্র, রান্নার প্যান ইত্যাদি ভিম দিয়ে পরিষ্কার করে দেখুন—দেখবেন এর থেকে ভাল পরিষ্কারের জিনিষ হতে পারেনা। ভিম আপনার রান্নার জিনিষপত্র থেকে নোংরা আর তেলতেলে দাগ তুলে দিয়ে ঝকঝকে করে তোলে—শুধু তাই নয় ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে বাসনপত্র সবই নিরাপদ কারণ ভিম হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কারের পাউডার। ভিম ব্যবহার করে দেখুন—আপনার কাঁচের বাসনপত্র, স্নানের ঘর, মেঝে এবং টালি কিরকম ঝকঝকে হয়ে ওঠে। ভিমের সাহায্যে বাড়ীর জিনিষপত্র ঝকঝকে রাখুন।
আপনার বাড়ীর জন্যে দরকার ভিম
VIM
VIM
for quick, spotless clean
HOW TO USE VIM

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে

চারটি ওষুধ রয়েছে

ANACIN

Registered User : GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

"নতুন

সুগন্ধযুক্ত

ভাতনী

দিয়ে স্নান আমি উপভোগ করি"

চাবী ছাপ

VATNI

ভাতনী

এ ছাড়া
ভাতনী বেবী

মধুবালা বলেন

প্রখ্যাত চিত্রতারকার দৃষ্টান্ত অনুযায়ী — সকলের সুবিধামত দামে, ফুলের মত সজীব ও ফুলের নতুন গন্ধযুক্ত, জনপ্রিয় দামে ভাতনী ব্যবহার করুন এবং পার্থক্য অনুভব করুন।

শেষ টুকরো পর্যন্ত তাজা ও সুগন্ধযুক্ত থাকে।

১০০% ভারতীয়, পরিচালনা এবং মূলধন

Godrej গোদরেজ নামটি উৎকৃষ্ট সাবানের প্রতীক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অমিত লাবণ্য
আপনারই জন্য

বোরোলীন

আপনার লাবণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রোদ আর শুষ্ক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী ম্লান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বককে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ কোরে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।
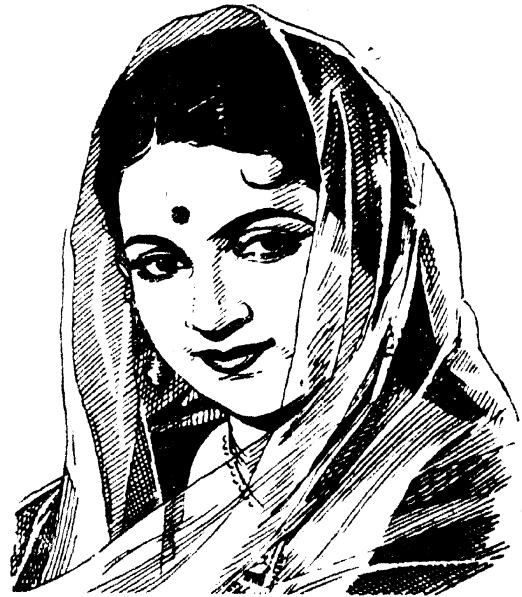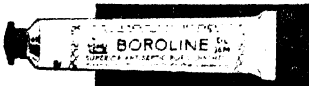
পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 23rd May, 1959.

শনিবার, [illegible] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
২৬ বর্ষ [illegible] সংখ্যা ৩০ । ৪০ নয়া পয়সা

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় জনসাধারণের কাছে যে আবেদন করিয়াছেন তাহা কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিগুরুর কীর্তি, তাঁহার কাছে আমাদের ঋণ, সেই ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের দায়িত্ব প্রভৃতি স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহারা জনসাধারণের কাছে অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছেন। শতবার্ষিক উৎসবের পরিকল্পনার একটা আভাস প্রকাশিত হইয়াছে। যদিচ তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। আশা করা যায় ক্রমে ক্রমে পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ জানিতে পারা যাইবে। বলাবাহুল্য যে, কবিগুরুর কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। যথাসাধ্য তাহা পরিশোধের চেষ্টা অবশ্য করিব। এবিষয়ে কোনও দ্বিমত হইতে পারে না। পরিকল্পনার যে আভাস প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। হয়তো আভাস বলিয়াই বুঝিতে অসুবিধা, আশা করি পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ হইলে এ বক্তব্য নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইবে এমনও অসম্ভব নয়। সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়াও অগ্রসর হইতে হইবে। আবেদনে বলা হইয়াছে:—

"বিশ্বভারতীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এই অর্থের কিছু অংশ ব্যয় হবে। কিছুদিন আগে বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীজওহরলাল নেহরু দেশবাসীর কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন। সংগৃহীত অর্থ বিশ্বভারতীর আচার্যের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী তহবিলে সঞ্চিত হয়েছে। শুধু বিশ্বভারতীকে নয়, ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে গুরুদেবের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি। এই স্মৃতিচিহ্নের রূপ কি হবে, তা বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণই স্থির করবেন।"

রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসবের আবেদন

শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ অন্য কোনও খাতে ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অতীত অভিজ্ঞতা [illegible] কাল। "বিশ্বভারতীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীরূপ দিবার" জন্য স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি করা যাইতে পারে। বিশ্বভারতীর আর্থিক দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ নামান্তরে দেশবাসীর। বিশ্বভারতীর জন্য যে ব্যয় হয় তাহাতো জনসাধারণই দেন—আবার কেন? তাহা ছাড়া এমন অসম্ভব নয় যে দাতাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন যাঁহাদের কাছে রবীন্দ্র সাহিত্যের ও রবীন্দ্রনাথের যে গুরুত্ব বিশ্বভারতীর সে মূল্য নয়। তাঁহাদের দানকে বিশ্বভারতীর জন্য ব্যয় করা উচিত হইবে না। "বিশ্বভারতীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ীরূপ দিবার" বিরোধী আমরা নই। কিন্তু এ দুই উদ্দেশ্যকে একত্র জড়াইয়া না ফেলাই ভালো। তারপরে "ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে গুরুদেবের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমরা মনে করি।" অবশ্যই আছে কিন্তু তাহাতে প্রভূত অর্থের আবশ্যক, শতবার্ষিক তহবিল হইতে অর্থ অন্য খাতে ব্যয় হইলে এ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভবপর হইবে মনে হয় না। তাহা ছাড়া সরকার যদি এখনই ঘোষণা করেন যে জনসাধারণ যে টাকা দান করিবে ঠিক তত পরিমাণ অর্থ সরকার দিবেন তবে জনসাধারণের উৎসাহ বর্ধিত হয়, সরকারের ও জনসাধারণের প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ সহজ হয়।

এই উপলক্ষে কবিগুরুর নির্বাচিত রচনার সুলভ সংস্করণ প্রকাশ আবশ্যক। [illegible] প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। প্রচলিত বাজার দরের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্ররচনাবলীর মূল্য বেশি নয়। এর চেয়ে কম দামে দিতে হইলে সরকার কর্তৃক subsidy দান বা অর্থ সাহায্য একান্ত আবশ্যক। আমাদের মনে হয় সুলভ সংস্করণ প্রকাশ শতবার্ষিক উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। তারপরে প্রত্যেক রাজ্যে স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা [illegible] হইয়াছে। যে-আকারে ইহা [illegible] হইয়াছে তাহা [illegible] সেইজন্যই জনমানসে যথোচিত উৎসাহের সঞ্চার করিবে না বলিয়া আশঙ্কা।

জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলে তাহাদের উৎসাহ ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। এই উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধির একমাত্র উপায় [illegible] উদ্দেশ্যের [illegible] প্রত্যেক রাজ্যে স্মৃতিচিহ্ন [illegible] জনসাধারণের কোনও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান।

এই উপলক্ষে রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা সাধনও আবশ্যক। এ সম্বন্ধে [illegible] নাট্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানমাত্র হইয়া আছে। ইহাতে দেশবাসীর মন সন্তুষ্ট হয় নাই। [illegible] দেওয়া এখন হইতেই আবশ্যক।

প্রসঙ্গত

এই লেখাটি পাঠকদের হাতে পৌঁছবার আগেই উড়িষ্যায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। নতুন সরকারের শরিক হবে দুটি দল—কংগ্রেস আর গণতন্ত্র পরিষদ। উড়িষ্যার শাসনের রথটি জুড়িগাড়ি হল। মন্ত্রিসভায় আসনের বখরা নিয়ে গোল নেই, আসনই মোটে তিনটি; কোন দলেরই অতিরিক্ত প্রাধান্য থাকবে না।

প্রথম দিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবের কোয়ালিশন-প্রস্তাব কোন-কোন মহলের বিরোধিতা এমন কি উপহাসেরও বিষয় হয়েছিল। অনেকেই এর মধ্যে সুবিধাবাদকেই প্রকট দেখেছেন, কেউ কেউ সন্দেহ করেছেন, মহতাব মহোদয়ের মূল উদ্দেশ্য যেন-তেন প্রকারেণ শাসনের সিংহাসনটি কায়েম করা। কেউ বলেছেন, কংগ্রেস ও গণতন্ত্র পরিষদের মধ্যে আদর্শ বা নীতিগত ঐক্য অত্যন্তই কম, মিলটা অতএব ঠিক রাজযোটক হবে না এবং এই ম্যারেজ অব্ কনভিনিয়েন্স-এর আয়ু বেশি দিন না, উভয়ের একসঙ্গে সপ্তপদী গমনই দুষ্কর হবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারি বোর্ড-এর অনুমতি সংগ্রহ করতে শ্রী মহতাবের কাঠ খড় কম পোড়াতে হয়নি। গণতন্ত্র পরিষদও তার নেতাদের রাজি করিয়েছে। অভিভাবকদের আশীর্বাদ আগেই পাওয়া গেছে, নির্দিষ্ট লগ্নে অতএব দুই হাত এক এবং চার চোখের মিলন হল।

*

যাঁরা গোড়া থেকেই কোয়ালিশনের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা সম্ভবত শ্রী মহতাবের প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন। কোয়ালিশন ভাল কি মন্দ এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বিচার করে দেখা যাক, বিকল্প কী ব্যবস্থা সম্ভব হত।

বিধানসভায় কংগ্রেসের পক্ষে নিশ্চিন্ত হবার মত সংখ্যাধিক্য কখনই ছিল না, দু-একটি উপনির্বাচনের ফলে অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছিল। মন্ত্রিসভার পতন ঘটা বিচিত্র হত না। কিন্তু যাঁরা মনে করেছেন, শ্রী মহতাব গণতন্ত্র পরিষদের হাতে হাত মিলিয়ে অন্য বিরোধী দলগুলির মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন, তাঁরা প্রকৃত অবস্থাটা বিচার করে দেখছেন না। বিরোধী কোন গোষ্ঠীরই একক বা সমবেতভাবে বিকল্প সরকার গঠন করার সাধ্য ছিল না। করলে, বর্তমান বিধান সভায় তার অবস্থাও পদ্মপত্রে নীরের মত টলমল হত, কেননা, শক্তিতে অপর পক্ষও থাকত তুলমূল্য। টাগ-অব্-ওয়ারে দুই প্রান্তে শক্তির তারতম্য না থাকলে টানাটানির ফলে দাঁড়টারই ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, না ছিঁড়ুক, অচল অবস্থার সৃষ্টি ত হয়ই। আর জনকল্যাণই যদি সরকারের লক্ষ্য হয়, এবং সেই লক্ষ্য ভেদ করার বাসনা কোন সরকারের প্রকৃতই যদি থাকে, তবে নিজের শক্তির বিষয়ে তাকে নির্ভাবনা হতেই হবে। অস্থায়ী বন্দোবস্তের ইজারাদারীর কুফল আমরা সকলেই জানি। অতএব আপনার স্বার্থে নয়, সাধারণের স্বার্থেই উড়িষ্যা সরকারের শক্তিশালী হবার প্রয়োজন ছিল।

*

শ্রী মহতাবের সম্মুখে খোলা ছিল দুটি রাস্তা। এক, রাজ্যপালের বরাবরে বিধান সভা ভেঙে দেবার সুপারিশ পেশ। দুই, কোয়ালিশন। কঞ্চির চেয়ে আঁটি দড়, সুতরাং জোট বাঁধা।

প্রথম সুপারিশটি শ্রী মহতাব করেননি। নতুন নির্বাচন হলেই যে একপক্ষ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, এমন গ্যারাণ্টি নেই, বরং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই বেশী। নির্বাচনের প্রচার এবং ভোট-গ্রহণ ইত্যাদির খরচই তবে অপব্যয় হত, স্থায়ী এবং পাকাপাকিভাবে কোন মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হত না। রাজ্যের স্বার্থ তাতে ক্ষুণ্ণ হত।

সুতরাং শ্রী মহতাব দ্বিতীয় পথই বেছে নিয়েছেন। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার একটি দলের দিকে। তার সঙ্গে নীতিগত মিল হয়ত ষোল-আনা নেই। কিন্তু একটি ব্যাপারে কোন ভুল নেই—সাধারণের সমর্থনের জোর গণতন্ত্র পরিষদেরও বিলক্ষণ আছে। হুবোজা সামন্তগোষ্ঠীর দল হক বা যাই হক, গণতন্ত্র পরিষদের ব্যালট বাক্সে যথেষ্টই ভোট পড়ে। এক্ষেত্রে যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্য যুক্ত হল। জনপ্রিয়তার সঙ্গে জনপ্রিয়তা যোগ করলে ফলও জনপ্রিয় হয়। উড়িষ্যা বহুদিন পরে একটি দৃঢ়ভিত্তি গবর্নমেণ্ট পেল।

*

শ্রী মহতাব যে তাঁর নীতি একেবারে বিসর্জন দেননি তার একটি প্রমাণ, নতুন মন্ত্রিসভাটি আকারে ক্ষুদ্র। মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিলে এর সদস্য-সংখ্যা মোট দুই—একজন কংগ্রেসী, একজন গণতন্ত্র পরিষদ। ছয়জন পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি নিয়োগের ব্যবস্থাও অবশ্য হয়েছে, দুটি দল থেকে তিনজন করে। অতিরিক্ত কয়েকটি ভোট এবং ক্ষমতার স্থায়িত্বের মোহে পড়ে শ্রী মহতাব মন্ত্রিসভাকে মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়ে স্ফীত না করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। উড়িষ্যা যে ছোট রাজ্য এবং ছোট রাজ্যের অমাত্য-সভাও যে ছোট হওয়াই সঙ্গত, তিনি এ-কথা স্মরণ রেখে করভারপীড়িত সাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

*

যাঁরা মহতাবের প্রয়াসের সমালোচনা করেছেন, তাঁদের আপত্তি তবে আসলে কোথায়? ইংলণ্ডের নজির দেখিয়ে তাঁরা বলতে পারেন, সেখানে কোয়ালিশন গঠিত হয় জাতীয় সঙ্কট—যথা যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির কালে। এক্ষেত্রে সেরকম কোন সঙ্কট ছিল না।

আরও একটা সংশয় উঠতে পারে, শক্তির বদলে শ্রী মহতাব দুর্বলতার চোরাবালিতে পা দিচ্ছেন না ত? এক দলের শাসনে নীতি একমুখী থাকে—কিন্তু দুই দলের মনোমত নীতির ভিত যদি খুঁজে না পাওয়া যায়? জুড়ি ঘোড়ার দুটি যদি একই দিকে চলতে না চায়? মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষের খবর লোকে পাবে না, কিন্তু একদিন শাসন-রথের রশ্মিই ছিঁড়ে যেতে পারে।

*

কংগ্রেস আর গণতন্ত্র পরিষদের মধ্যে মৌল মিল নেই, বার বার এ-কথা বলাও অহেতুক। স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ—এই কথা বলে যাঁরা পরিহাস করছেন, সেই বামপন্থী দলগুলিকেই বলি, এর নমুনা কি তাঁরা এই প্রথম দেখলেন? শুধু কংগ্রেসকেই জব্দ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাংলাতেই কি বিরোধী দলগুলি একজোট হয়নি? পৌরসভাতে সেই গাঁটছড়া ত শুনেছি, ছেঁড়ে-ছেঁড়ে। দিল্লীতেও কম্যুনিস্ট আর জনসঙ্ঘ এক হয়েই পৌরপ্রধানকে আসনে বসিয়েছেন। জনসঙ্ঘের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের যত গরমিল, কংগ্রেসের সঙ্গে গণতন্ত্র দলের নীতিগত গরমিল কি তার চেয়েও বেশী? যে-ধর্ম আপনি আচরণ করা যায় না, তা পরকে শেখাতে যেতে নেই।

পরিশেষে বলি, প্রয়োজন হলে কোয়ালিশন গঠনের যে নীতি আজ কংগ্রেস কর্তারা মেনে নিলেন, দুই যুগ আগে এই নীতিকে তাঁরা যদি স্বীকৃতি দিতেন—বিশেষত বাংলায় আর পাঞ্জাবে—তবে হয়ত পাকিস্তান গঠিতই হত না। কিন্তু গত নিয়ে শোচনা করে আর লাভ কী।

সন্তোষকুমার ঘোষ

। ২৮ ।

নয়ন বলল, "এস বঁধু, এস এস, আধো আঁচরে বোসো। তারপর? দু'দিন দেখিনি কেন?"
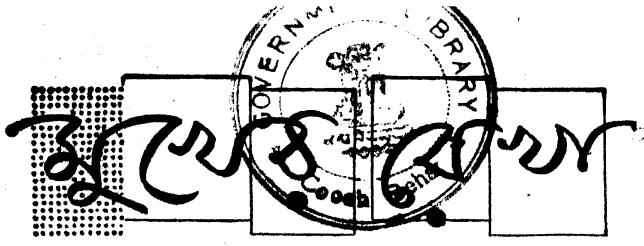
সৌর বলতে পারল না, তার ঘেন্না হয়েছিল, বলল, "এই—নানা কাজের চাপ ছিল।"

কথাটা নয়ন বিশ্বাস করল, না অবিশ্বাস করল, ঠিক বোঝা গেল না। তেরছা নজরে চেয়ে বলল, 'ও'। আর তখনই সৌর লক্ষ্য করল, নয়নের চোখ দুটো ফুলো ফুলো।

বলল, "চোখের এ-দশা কেন?"

পলকের জন্য আঁচল দিয়ে চোখ আড়াল করেই নয়ন আঁচল সরিয়ে নিল। —"কেন, কী আবার দশা দেখলে?"

"চোখ ফুলিয়েছ কেন?"

নয়ন মাথা কাত করল। এভাবে যে মাথা না হয়ে কলসী হলে জল গড়িয়ে পড়ত।—"যদি বলি, কেঁদে কেঁদে?"

"বিশ্বাস করব না।"

"তবে কি তুমি ভেবেছ, মদ খেয়ে?"

"তোমার মুখে কিছু আটকায় না।"

"তবেই দেখ, কথায় এঁটে উঠবে না। আমি কিন্তু এ-দু'দিন তোমার কথা ভেবেছি।"

"আমার কথা?"

"তোমাকে যে আমার খুব দরকার!

পাখি কাছেই ছিল, ফোড়ন কেটে বলল, "সো-ও-ত্তি। আমাকে ও কতবার যে ওপরে যেতে ফরমাস করেছে তার ঠিক নেই। আমি ওপরে গিয়েছি, কিন্তু তুমি ছাদে একবারও আসনি।"

পাখি মুখ ভার করল। নয়ন বলল, "বিশ্বাস করলে না?"

"বিশ্বাস ত করেছি" সৌর বলল, "কিন্তু কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না, এমন কি দরকার পড়ল।"

"তুমি ভাই মোটে শাস্তর মান না। মাসির তেরাত্তিরের শ্রাদ্ধ করতে হবে না?"

"শ্রাদ্ধ?"

"শ্রাদ্ধই ত। করব আমরাই।"

সৌর আবার বলল, "কামিনী মাসির শ্রাদ্ধ?"

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুখিয়ে দাঁড়াল নয়ন। "কেন হবে না, শুনি? আমাদের ইহকাল নেই বলে বুঝি পরকালও নেই?"

ঠিক এই কথাটার জবাব সৌর দিতে পারল না।

আর জ্বর ছেড়ে যাবার সময় লোকে যেমন টের পায়, দেহের তাপ জল হয়ে ঘাম হয়ে ফুটে বেরোয়, সৌরও তেমনই টের পেল, তার মনের রাগও তেমনি জল হয়ে যাচ্ছে। জল হয়ে গেল বলেই সৌর একটু পরে বলতে পারল, "আমি সেদিন তোমাদের খুব—"

সৌর বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিল, থেমে গিয়েছিল। নয়ন ওর কনুইয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, "খুব কী? থামলে কেন?"

"খুব, মানে এই বিশ্রী লেগেছিল।"

"ঘেন্না হয়েছিল, তাই বলতে চেয়েছিলে

ত?” নয়ন বলে হাসতে থাকল, আর অপ্রস্তুত সৌর কী বলবে ঠিক করতে না পেরে বলে বসল, “ঘেন্না হবে না? সেদিন —সেদিনও তুমি—”.

নয়ন বলল, “তুমি ভাই বড় অবুঝের মত কথা বল। সেদিনই ত আরও বেশী করে খাব—নইলে মনের দুঃখ ঢাকতাম কী করে। আর মনের দুঃখ-টুকুখ ছেড়ে দাও। সেদিন আমার খুব ঘুমের দরকার ছিল, নইলে গতরের বাথা যেত কি? ধরে নাও ওটা ঘুমের ওষুধ।”

তর্কে পরাস্ত সৌর শুধু ফুসছিল।

নয়ন নিজেই যেচে সন্ধি করল—“ও-সব কথা ছেড়ে দাও। তোমার সংগে জরুরী দরকার আছে। সুস্থ হয়ে বোসো, বলি। আমাকে গোটাকতক টাকা দিতে পারবে?”

“টাকা? আমি? কত টাকা?”

“এই মরেছে” ওর গালে টোকা দিয়ে নয়ন গড়িয়ে পড়ল। “দুধের বাচ্চা যেন আঁতকে উঠল। এখানে এলে টাকা লাগে, জান না!”

নয়ন হাসতে হাসতেই বলছিল, কিন্তু সৌরর মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, “আমি সেভাবে আসি না। জানলে আসতাম না।”

সৌর উঠে পড়ছিল, নয়নই জামার আস্তিন ধরে টেনে ওকে বসিয়ে রাখল। “তুমি ঠাট্টাও বোঝ না। সত্যিই আমার টাকার খুব দরকার। নইলে মাসির শ্রাদ্ধ হবে না। আমার হাতে কিছু নেই। মাসির কি গতি হবে না? এত কষ্ট করে পোড়ালুম, এর পরেও পেত্নী বা শাকচুন্নি হয়ে থাকবে?”

“হাতে কিছু নেই?”

“বিশ্বাস কর ভাই, কিছু না।

“পাবার আশাও নেই?”

নয়ন এক মুহূর্তে কী ভেবে বলল, “না। যদি না—যদি না মালাকে বিক্রী করি। ও-ঘরে আর একটা মেয়েকে ওরা আটকে রেখে গেছে, মনে আছে?”

সৌরর মনে নেই? সেই স্বপ্নটাও মনে আছে যে। বিবর্ণ মুখে বলল, “বিক্রী?”

নয়ন আস্তে আস্তে পুনরুক্তি করল, “বিক্রী। আমাদের মধ্যে এ রকম হয়। মালার জন্যে কটা দালাল দিনকতক ঘোরা-ঘুরি করছিল, খবর দিলেই আসে।”

সৌর তীব্র গলায় বলে উঠল, “ছিঃ”। বলে আর বসল না, নয়নের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে নেমে এল নীচে। পকেটে হাত দিল। মোটে সাড়ে সাত আনা আছে।

নয়নের মুখে বিস্ময়ে কথা ফুটছিল না। —“বিশ টাকা? এত টাকা পেলে কোথায় তুমি!”

সাফল্যে, গর্বে, উত্তেজনায় সৌরর সমস্ত শরীর কাঁপছিল। বলল, “বই বিক্রী করে দিয়ে এলাম। পুরনো বইয়ের দোকানে।”

“পড়ার বই?”

সৌর মাথা নীচু করে বলল, “পড়ার বই।”

তখন কী করেছিল নয়ন, এতদিন পরে ভাল মনে নেই। সে কি কৃতজ্ঞতার ঝোঁকে সৌরকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল, নাকি, সংকোচে সৌর পিছিয়ে গিয়েছিল বলে নয়ন শুধু তার একটা হাত চেপে ধরতে পেরেছিল?

ভাল মনে নেই, কিন্তু নয়নের কথাগুলো সৌর ভোলেনি।

ধরা-ধরা গলায় নয়ন বলেছিল, “তুমি যে উপকার করলে আমরা কখনও ভুলব না ভাই। আর, এ-টাকা আমরা শোধ দেব।”

সেই আশ্বাসে সৌর চমকে উঠল। একবার সে চাইল নয়নের মুখের দিকে, একবার পাখির। এই মেয়ে দুটির টাকা শোধ দেবার পথ বা উপায় ত মোটে একটাই—সেই উপায়টার কথা কল্পনা করে সৌর শিউরে উঠল।

পরবর্তী জীবনে সৌর নয়ন-পাখির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে এই কারণে যে, ওরা ওর মনটাকে সংস্কারের কৌটো থেকে বাইরে বের করে এনেছিল। দিনান্তলিপিতে ছিলঃ

“গরম কাপড় বরাবর তোরঙ্গজাত থাকলেই পোকায় কাটে, তাই মাঝে মাঝে রোদে মেলে দিতে হয়। আমাদের মনও তাই। পারিবারিক বন্ধন আর সামাজিক নিয়মের মধ্যেই যে শুধু সৎ বাস করে না তার বাইরেও উপরে-নীচে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারাও যে মানুষ, এটা নয়ন-পাখিদের জীবন-মন আর ভাবনাকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেই আমি জেনেছি। আমি জেনেছি কোন গুণই অপরিবর্তনীয় নয়, এমন কি বস্তুর ধর্ম শুধু হওয়াতে, শুধু থাকাতে। গুণের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে শুধু যে দেখে তার দৃষ্টিভঙ্গী। অনেক সময় অন্যের, অনেকের রায় আমরা নির্বিচারে নিজের বলে গ্রহণ করি; আকাশকে বলি নীল, পাতাকে সবুজ, দীঘির জলকে কালো। সবটা আমরা নিজেরাও বিচার করে দেখি না, অন্যের মুখে শোনা কথার উপরে নির্ভর করি। কে জানে, আকাশ নিজে হয়ত নীল নয়, দীঘি নয় কালো, আমাদের চোখই হয়ত ওদের নীল আর কালো করেছে। সুন্দর ক করেছেই।”

পুরোপুরি মানে হয় না বলে সৌর পরে এই লাইনগুলো কেটেও দিয়েছিল।

অতি-প্রাকৃতে সৌরর বিশ্বাস নেই, কিন্তু অতি-প্রাকৃতকে সে ভয় করে; যুক্তি আর বিচার তাকে দিয়েছে অবিশ্বাস, মনের দুর্বলতা, ভয়। ভূত তার জীবনে বহুদিন ভয় হিসেবে সত্য হয়ে ছিল।

মালার দোলনায় দোল খাওয়ার ঘটনাটার রহস্য সে কোনদিন উন্মোচন করতে পারেনি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তবে বুঝি সত্যিই অতিপ্রাকৃতের ছায়া পড়ে। আর এমন ঘটনা সত্যিই বুঝি আছে, যা প্রথম ঘটে মনে এবং স্বপ্নে; পরে জীবনে।

মালা দোলনায় বসেছিল।

একটা টকটকে শাড়ি ওর পরনে, ওকে ঘিরে, ওকে জড়িয়ে। দেখতে ভাল লাগছিল, তবু সৌরর মনে অদ্ভুত একটা তুলনা এল কেন। কেন তার মনে হল, শাড়ি নয়, ওটা চিতার আগুন। চিতার আগুন ওর অনাবরণ দেহ ঘিরে যদি জ্বলত, তবে ওকে এমনি দেখাত। মালার রুক্ষ চুল উড়ছিল। সৌরর কেন মনে হল, ওর চুল উড়ছে শ্মশানের হাওয়ায়। একি আগামীর ছায়া?

মোহিত সৌর অপলকভাবে মালার ভীষণ-সুন্দর রূপ দেখছিল।

দোলনা থেমে গিয়েছিল। মালা থেকে থেকে দুলতে চাইছিল। দোলনাটা কিন্তু নড়ছিল না। মালা ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

“দাও না একটু দোলা দিয়ে। দেবে?”

সৌর এগিয়ে গেল। কয়েক পা মাত্র, আর পারল না। যেন ভয় পেল। যেন আরও কাছে গেলে ওর গায়ে মালার আগুন-শাড়ির আঁচ লেগে যাবে, হাতে ফোস্কা পড়বে, মুখ-চোখ ঝলসে যাবে। স্থির চোখে সৌর কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

“দাও না একটু দোলা”, মালা আবার বলল।

এবার সাহস করে এগিয়ে গেল সৌর, হাত বাড়িয়ে ঠেলল দোলনাটা।

মালা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। ঠোঁটে চাপা কৌতুক, মালার চোখ বিস্ফারিত। আর মালার চোখের মণি—সৌর খুব কাছে গিয়ে প্রথম অনুভব করল—কটা, কিংবা সাদাই যেন। দোলনার দড়ি শক্ত করে ধরে আছে মালা যে-হাত দিয়ে, তার আঙুলগুলোও যেন কঠিন। বাঁকানো।

সৌর ভয় পাচ্ছিল। দোলনাটাকে আরও জোরে জোরে ঠেলে দিচ্ছিল ও, মালা এক-একবার সোঁ করে আকাশে উঠে গিয়ে আবার মাটির কাছাকাছিই ফিরে আসছিল। ওর চুলের গাঁধ সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে আরও বেশী উড়ছিল, আরও সকসক করছিল চিতার মত শাড়িটা, সেটা শাড়ি আর ছিল না, একটা রক্তাক্ত, তৃষ্ণার্ত রসনার মত হয়ে গিয়েছিল।

সৌর ভয় পেয়ে গিয়েছিল, মালা একবারও হাসল না বলে। ওর ঠোঁট একবারও নড়ল না কেন? কেন একটুও কাঁপল না চোখের

পল্লব? মালা দুলছে, দুলছে, দুলছে— যেন নেশার ঝোঁকে, যেন দোলাটার সঙ্গেই ও এক হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ একবার অনেক উপরে উঠে গেল মালা, আকাশ যত দূরে, যেন ততটাই উঁচুতে। দড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্ত ভীত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল মালা, সেই চিৎকারে সৌরর পা থেকে মাথা অবধি চমকে উঠল, সে চেয়ে দেখল, মালা পড়ে যাচ্ছে।

মালা পড়ে যাচ্ছে, মালা বলছে, "আমাকে ধর, বাঁচাও", সৌর হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু ধরতে পারল না, হয় সে জড় হয়ে পড়েছিল, নয় ত তার দিশা ছিল না, পলক পরে মাথা নীচু করে দেখল, মালা মাটিতে।

মালা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দেহে স্পন্দন নেই, উগ্র রঙের শাড়িটা কয়েকটি অগোছালো স্থির ঢেউ হয়ে ওর শরীরটাকে খানিক আঁকড়ে রেখে, খানিক অসতর্ক করে দিয়ে, মূর্ছিত হয়ে রয়েছে।

সৌর নুয়ে পড়ে মালাকে আস্তে আস্তে ঠেলছিল, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছিল, "ওঠ, ওঠ", কিন্তু মালার দিক থেকে কোন সাড়া ছিল না।

একটু আগেই মালা চিৎকার করে উঠেছিল, সেই চিৎকারের শব্দের রেশমাত্র এখন নেই, মালা নিথর-নিস্পন্দ পড়ে থাকার ভঙ্গিতে, নেই প্রাণের লেশ।

ভয় পেয়ে সৌর নিজেই এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল

পরদিন সকালে, কৌতূহলী পুলিসে আর ডাক্তারে মিলে মালার দেহটা যখন ছাদে শুইয়ে পাশ ফিরিয়ে পরীক্ষা করছিল, সৌরও তখন বাড়ির ছাদ থেকে অবাক হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, এই দৃশ্যটি তার কাছে একদিন আগের রাত্রেই এসেছিল কী করে, একটি মর্মান্তিক ঘটনার অগ্রিম স্বাদ তাকে দেবার আয়োজন করেছিল কে।

আশ্চর্য, যে-দড়িটা ধরে কাল দোলনায় দুলছিল মালা, সেটা এ-ঘরেও ছিঁড়ে পড়ে আছে, যদিও দোলনা নেই। মালা কি আজ এই দড়িটা ধরেই ঝুলেছিল কিছুক্ষণ— তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে? অত উঁচুতে উঠল কী করে মালা, ছাতের হুকটার নাগাল পেল কোন্ উপায়ে।

পা টিপে টিপে আরও এগিয়ে গেল সৌর, ও-বাড়ির যত কাছাকাছি যাওয়া চলে। মালাকে ওরা এখন টেনে এনেছে বাইরে, সকালের রোদ্দুরে বারান্দায় চিত করে শুইয়ে দিয়েছে।

আগুনে রঙের শাড়িটার আঁচল দুলছে কয়েকটা সাপের মত মালাকে ঘিরে কিলবিল করছে। মালা সরছে না, নড়ছেও না, মালার আর ভয় নেই। সাপের বিষে ওর আর কোন্ ক্ষতি হবে?

মালার গলার কাছে কালো গভীর দাগ— ওই দড়িটা ধরে মালাকে বুঝি অনেকক্ষণ ঝুলে থাকতে হয়েছিল? কখন্ ওটাকে সংগ্রহ করল মালা, কোথা থেকেই বা করল। হুকটার সঙ্গে বাঁধল কী করে। নিজেকেই যখন বাঁধনটার কাছে সঁপে দিল, তখন মালা কি ভয় পায়নি? দড়িটা যখন গলায় গেঁথে গেঁথে বসছিল, তখন কি মালা তীব্র-তীক্ষ্ণ ভীত গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল?

ওর স্বর কারও কানে কি পৌঁছয়নি? পৌঁছেছিল, হয়ত সৌরর কানেই পৌঁছেছিল। বাকী সব ছিল স্বপ্ন, কিন্তু

মালার আর্ত স্বরটা সত্য—ওই একটা মর্মভেদী চিৎকারের শব্দ হয়ত মৃত্যু আর জীবন, অপ্রাকৃত আর বাস্তবের সীমারেখা চিহ্নিত করে তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছে।

ওরা ফিস ফিস করে কানাকানি করছিল, পুলিসের লোক আর ডাক্তারে মিলে, ওদের এখানে ডেকে আনল কে, ওরা খবর পেল কী করে।

মালার মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে সৌর তখন এই সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, আর তলিয়ে তলিয়ে ভাবছিল, নয়ন বা পাখিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না।

চিত্তবাবুকে দেখা গেল একটু পরে, তিনি টলতে টলতে ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন, পাঞ্জাবির সব বোতামই খোলা, কাছা-কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, বিপর্যস্ত।

পুলিসের লোকেরা কী যেন জিজ্ঞাসা করল চিত্তবাবুকে, চিত্তবাবু জড়িত-অস্পষ্ট গলায় কী একটা জবাবও দিলেন, ওদেরই একজন কড়া গলায় চিত্তবাবুকে ধমক দিয়ে উঠল, আর একজন এগিয়ে এসে ও'র কব্জি চেপে ধরল।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চিত্তবাবু ওই ধুলোতেই বসে পড়লেন। বিড় বিড় করে তিনি কী যেন বলছিলেন। তোতলামি না প্রলাপ, কে জানে!

একটা সাদা কাপড় খুলে একজন জড়িয়ে জড়িয়ে মালাকে বাঁধল। ওর রুক্ষ চুল আর আঁচলের আগুন সব ঢাকা পড়ে গেল।

মালাকে ওরা এবার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। মালা আর আপত্তি করছে না, ভয় পাচ্ছে না, চেঁচাচ্ছে না। মালা আর আপত্তি করবে না, ভয় পাবে না, চেঁচাবে না।

আর, মালাই ত নেই, চেঁচাবে কে। ক্যাম্বিসের পর্দা দিয়ে তৈরি বিছানায় তুলে ওরা যাকে নিয়ে গেল, সে ত মালা নয়। মালা ত তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে সেই চিৎকারেরই পিছে পিছে পালিয়ে গিয়েছে। ওরা কতটুকু বা নিয়ে যেতে পারল। গলায় একটা শুকনো কালো দাগ, রাশি রাশি রুক্ষ চুল, আর মালারই ফেলে-যাওয়া খানিকটা আগুন। সে-আগুনেও তাত নেই, নিবে এসেছে।

"এই!"

চমকে সৌর মাথা তুলে তাকাল।

পাখি কখন পা টিপে টিপে উঠে এসেছে, সে কিছু ত টের পায়নি।

"এই!" পাখি ডাকল আবার, আরও কাছে এসে।

সৌর বলল, "কী?"

"মালা মরে গেছে।"

"জানি।"

"মালাকে ওরা নিয়ে গেছে।"

"তাও জানি।"

"আজ শেষ রাত্রে—চুপি চুপি উঠে—"

"তোমরা কখন টের পেলে?"

"খুব ভোরে—নিশিবাবু যখন চলে গেল।" বলতে বলতেই একটু থেমে, একটু যেন লজ্জা পেয়ে, পাখি বলল, "নিশিবাবু কাল এসেছিল।"

সৌর বলল "ও।"

"আমি জানতাম," পাখি আস্তে আস্তে বলল, "জানতাম, মালা বাঁচবে, বেঁচে যাবে।"

"বাঁচবে?" সৌর থতমত খেয়ে বলল।

"বাঁচল না?" চোখ ঘুরিয়ে পাখি বলল, "বাঁচল না?"

আর সঙ্গে সঙ্গে সৌর সায় দিয়ে বলে উঠল, "বাঁচল।"

একটু পরে সৌর আর একটা রহস্যের কিনারা করতে পারছিল না বলে, জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু পুলিসে খবর দিল কে?"

"জানি না," অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে পাখি কতকটা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "নিশিবাবুও দিয়ে থাকতে পারে।"

সৌর বলল, "ও।"

"ওরা চিত্তবাবুকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাদের—আমাদেরও ধরে নেবে। আমরা যে এখানে এভাবে আছি, এটা নাকি বেআইনি।"

"বোধ হয়।"

"আর দেখা হবে না।"

সৌর এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাখির দিকে তাকাল। পাখির গলা কি ধরা-ধরা? এই কয়েক ঘণ্টা আগেও যার ঘরে নিশিবাবু ছিল, সৌরর সঙ্গে আর দেখা হবে না বলে হঠাৎ কি তার চোখে কুয়াশা জমল, গলা ধরে এল?

"তোমার কাছে আমরা অনেক ধারি", পাখি বলে চলেছিল, "সে-ধার শোধ দেওয়া আর হবে না। কত টাকা যেন?"

সৌর বলল, "টাকার কথা থাক।"

"যদি কোনদিন পারি, টাকা নয়ন এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু আর সব ত বাকী থেকেই যাবে।"

"আর!" সৌর ধীরে ধীরে বলল, "আর ত কিছু ছিল না পাখি!"

"ছিল না?" পাখি যেন আহত হল। "তোমার কাছে যে ব্যবহার পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। আরও কত লোক আমাদের কাছে আসে ত, তোমার মত কেউ নয়। আমাদের তারা মানুষ বলে মনে করেনি। অথচ আমরা কত খারাপ দেখ, জান, প্রথমে নয়ন আর আমি মিলে তোমাকে খারাপ করে দেব, ঠিক করেছিলাম।"

"তারপর?"

"তুমি টের পেয়েছিলে, না? তারপর আর কী, খারাপ ত তুমি হওনি, আমরাই বরং—" পাখি থেমে গিয়ে মাথা নিচু করল।

সৌর বুঝতে পেরেছিল, পাখি কী বলতে চায়। কিন্তু মুখে না বলে মনে মনে জবাব দিল: "না। পাখি, তোমরাও ভাল হওনি, আমিও খারাপ হইনি। আসলে আমরা কেউই কিছু হই না, যা আছি, তাই থাকি।"

"যাই", পাখি একটু পরে বলল, "ওরা বোধ হয় আমাকে খুঁজছে।"

বলেও পাখি এক মুহূর্ত দেরী করল। আঁচলের ওধার থেকে বাড়িয়ে দিল একখানা হাত, সৌরর ডান হাত ধরল। একটু চাপ দিয়ে বলল, "আসি।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গেল না সৌরর হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুটি ঠোঁট রাখল। রাখল ঠিক বলা যায় না, সঙ্গে সঙ্গেই তুলল, কিন্তু সৌরর চোখে চোখে আর তাকাল না, হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে, এক রকম দৌড়েই নীচে ছুটে গেল।

সৌর তখন চিত্রার্পিত পুত্তলিকা। পাখি কি ধারেরই খানিকটা এইভাবে শোধ দিয়ে গেল?

(ক্রমশ)

আলোচনা

রায় সাহেবের গাড়ি

বিনীত নিবেদন,—দেশ ২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দের 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কৌতূহল নিরসনের আশায় লিখিতেছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। সে সময়ে রানীগঞ্জে মোটর গাড়ি ছিল বলিয়া মনে পড়ে না। যুদ্ধাবসানের পাঁচ ছয় বৎসর পর অবাধ প্রতিবেশিত্বের সুযোগে আমরা শৈশবে মুগ্ধচক্ষে দেখিয়াছি রায় সাহেবের চমৎকার একটি জুড়ী গাড়ি ছিল। আমাদের মাতুলালয়ের পিছনেই রায় সাহেবের গাড়ির আস্তাবল থাকায় সকালে উঠিয়া তেজী ঘোড়া দুটির পরিচর্যা দেখা আমাদের দৈনিক কাজ ছিল। সেকালে আসনসোল বা মফস্বল শহরে ট্যাক্সিও পাওয়া যাইত বলিয়া জানি না। তবে আসানসোলে রায় সাহেবের মোটর ছিল বা তিনি সদরালায় মোটরে কোর্টে আসিতেন, এমনও হইতে পারে। সবেশাপরি পুনর্বার্তা করি, ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত কৌতূহল। [illegible]—তারিণীচরণ ঘোষ, হাজারীবাগ।

লেখকের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,—সুরিয়া, হাজারীবাগ থেকে শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ আপনাকে যে পত্র লিখেছেন, তার জন্য সর্বপ্রথম তাঁকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেউ ভোলে না কেউ ভোলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ করেছি।

[illegible] সময় আমাদের ও অঞ্চলে মোটরকার [illegible] ছিল না। ট্যাক্সি তো ছিলই না। [illegible] আসানসোল [illegible] সামনে রায় সাহেবের মোটর থেকে [illegible] কেমন করে? এই কথাই তিনি জানতে চান।

শ্রীমান তারিণীচরণ সে সময় নিশ্চয়ই খুব ছেলেমানুষ ছিলেন, আমার চেয়ে বয়সে ছোট তো ছিলেনই; তাই সম্ভবত তিনি ভুলে গেছেন, জুড়ি গাড়ি থাকা সত্ত্বেও রায় সাহেবই সর্বপ্রথম মোটর গাড়ি কেনেন, আর তা কেনেন ঠিক ওই সময়েই।

রায় সাহেবের মোটরকার কেনার একটা ইতিহাস আছে। এক মাপের এক চেহারার কালো রঙের দুটি 'ওয়েলার হর্স' আর দুটি দু রকমের গাড়ি ছিল তাঁর। মাতুলালয়ের পিছনেই রায় সাহেবের গাড়ির আস্তাবল থাকায় সকালে উঠিয়া যে ঘোড়া দুটির পরিচর্যা দেখা তারিণীচরণের দৈনিক কাজ ছিল, সেই ঘোড়া দুটির মধ্যে একটি হঠাৎ যায় মরে। মনের দুঃখে রায় সাহেব ঠিক করেন—ঘোড়ার গাড়ি আর রাখবেন না—মোটর গাড়ি কিনবেন। এই কথা তিনি জানিয়ে দিলেন কলকাতার মিলটন-কোম্পানিকে। ধর্মতলা স্ট্রীটে, এখন যেখানে 'কমলালয় স্টোর্স', সেইখানে ছিল মিলটন-কোম্পানির আস্তাবল। মিলটন-কোম্পানি ঘোড়াও বিক্রি করতেন, মোটরের এজেন্সিও নিয়েছিলেন। কোম্পানি জানালেন—মোটর পেতে কিছু দেরি হবে। এদিকে তখন আমাদের কোচম্যান মহবুব ঘোড়ার শোকে অনশন আরম্ভ করেছে। রাঁধছে না, খাচ্ছে না, দিনরাত শুধু শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। সে যে কি কান্না না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মাথাটা ঠুকে ঠুকে ফুলিয়েছে, রক্ত বের করেছে আর ক্রমাগত বলছে—আমিই কাল্লুকে মেরে ফেলেছি। পায়ে তার ফোঁড়া হয়েছিল, পা তুলে

তুলে সে আমাকে বার বার দেখিয়েছিল, চোখ দিয়ে তার জল পড়েছিল, আমি দেখেও দেখিনি বাবু, আমার মরে যাওয়াই উচিত। দু দিন, তিন দিন—মহবুবকে যখন কিছুতেই খাওয়ানো গেল না, রায় সাহেব তখন মিলটন-কোম্পানিকে টেলিগ্রাম করে দিলেন—ঠিক কাল্লুর মত একটি ঘোড়া পাঠিয়ে দিতে।

তিন দিনের ভেতর ঘোড়া এসে গেল। দেখতে ঠিক কাল্লুর মত।

মহবুব উঠে বসল।

জুড়ি বশ করতে বিশেষ দেরি হল না।

রানীগঞ্জের রাস্তায় আবার চলতে লাগল রায় সাহেবের বুহাম্।

আর ঠিক সেই সময়েই মিলটন কোম্পানি পাঠিয়ে দিলে নতুন একখানি [illegible] মোটর গাড়ি—সিডন বডি, টেন হর্স পাওয়ার, গাড়ির নাম OVERLAND। সঙ্গে একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার।

মোটর রইল রায় সাহেবের নতুন বাড়ির পেছনে। ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি রইল তারিণীবাবুর মামার বাড়ির কাছে।

আসানসোলের আদালতের সামনে যা সেদিন পড়ে গেলাম, রায় সাহেব সেদিন এই ওভারল্যাণ্ড থেকে নেমেছিলেন।

খুব বেশি দূরে যেতে না হলে রায় সাহেব মোটরে চড়তেন না। ঘোড়ার গাড়িটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশি।

রায় সাহেবের মোটরের পরে দেখলাম, আমাদের [illegible] অবশ্য তখনও হয়নি। [illegible] কে পি চাটার্জিদের দু'খানা [illegible] আসা [illegible] লাগল। [illegible] একখানা [illegible]।

[illegible]

এই সম্পর্কে [illegible] করবেন। —[illegible] মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক সমীপেষু,

[illegible]

কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা যেখানে তা হচ্ছে এই যে, প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে দাবী করা হলেও তাতে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান এবং তাঁরই রচিত নাট্যনাট্য ও নাটক শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান নাটক ও নৃত্য অধ্যয়নের ও গবেষণার প্রচুর অবকাশ রয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও নিশ্চয়ই ভাবতে পারি যে, সার্বিকভাবে সঙ্গীত নাটক ও নৃত্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেই "বিশ্ববিদ্যালয়" কথাটির প্রতি অধিকতর সুবিচার করা হবে। বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাইরে সংস্কৃতির এ তিন উজ্জ্বল বিভাগে বহু সাধনার ফলে আজ যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাঙালী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করবে একথা প্রায় জোর করেই বলা চলে।

বাঙালী সংস্কৃতির অধিকতর সমৃদ্ধি সাধনই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায়, সে বিষয়ে আমরা কেউ কখনো দ্বিমত হবো কি?

ইতি—মোয়াজ্জেমুর রহমান, ঢাকা।

সব ছাড়িয়ে এক বিচিত্র মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। তুমি মাত্র সেদিন এসেছ জাহাজের লাইনে, তাও রাইটার হয়ে,—আমাদের মতো সাত-আট বছর কাটাও, তখন দেখবে, জাহাজী লোকের কাছে সংস্কার কী জিনিস!

একটু হেসে বললাম, বুঝেছি। কিন্তু তুমি পাশ-করা ইঞ্জিনীয়ার, তুমি বলো ত, এই যে এক কাঠিতে সিগারেট না-ধরানোর নিষেধ, এর পিছনে কোনো যুক্তি আছে?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুরেশ্বর, যেন কী-এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। তারপরে এক সময় হঠাৎ স্বপ্ন-দেখে-জেগে-ওঠার মতো সোজা বসে, চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করল আমার ওপর, বললে,—আমি যে উনিশ বছর বয়সে ট্রেনিং জাহাজে ভর্তি হয়ে ফায়ারম্যানের পরীক্ষা পাশ করে ফায়ারম্যান হয়ে প্রথম জাহাজে ঢুকি, তা বোধহয় জানো না?

সবিস্ময়ে বললাম,—তাই নাকি! তা ত কোনোদিন বলো নি?

মহাদেবন বললে,—ফায়ারম্যান থেকে থার্ড ইঞ্জিনীয়ার,—রিমার্কেবল্ কেরিয়ার। পরীক্ষাগুলো পাশ করতে হয়েছে ত?

—তা' ত নিশ্চয়ই! সুরেশ্বর বললে, ভদ্রলোকের ছেলে, খেতে না পেয়ে জাহাজে ঢুকেছিলাম খালাসি হয়ে। কেউ জানত না যে, স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েও ছিলাম। সারেঙ্ আর ফার্স্ট টিণ্ডেলের পা-ও টিপেছি একদিন। কিন্তু যাক্ সে-কথা। যে কথা বলতে যাচ্ছি, তাই শোনো। জাহাজের নাম করার দরকার নেই, ধরে নাও এরই মতো সে-ও একটা ইণ্ডিয়ান জাহাজ, কোস্টাল কার্গো নিয়ে ভারতের উপকূলে-উপকূলে ঘুরে বেড়ায়। এবং এ-ও ধরে নাও যে, এ জাহাজের মতো সেটিও সেদিন যাচ্ছিল কলকাতা থেকে কলম্বো। এর মতো তারও কলম্বোর কার্গোই ছিল বেশী। অর্থাৎ, কলম্বোতে তার থাকবার কথা এরই মতো বেশ কয়েকটা দিন।

কথায় বলে, 'There is no promotion without the Ocean.' আমরা দুজন বছর আড়াই ধরে দুদুটো মহাসমুদ্র পারাপার করে অবশেষে এক দেশী কোস্টাল জাহাজে 'ডেকম্যান' হয়ে ঢুকলাম। অর্থাৎ মাসিক মোট ১৩৫ টাকা থেকে ১৭১, টাকায় উঠেছিলাম।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, কিন্তু দুজন! দুজন মানে?

একটু থেমে, তারপরে সুরেশ্বর বললে,—হ্যাঁ, তার সঙ্গে প্রথম জাহাজেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে-ও বাঙালী। ঋষিকেশ তার নাম, ঋষিকেশ চন্দ্র বোধ হয়। আমরা ডাকতাম 'ঋষি' বলে। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু তখন, অর্থাৎ প্রথম-প্রথম যখন বাঙালী হিন্দুর ছেলেরা জাহাজে খালাসী হয়ে ঢুকতে লাগল, সারেঙ্ আর খালাসীর দল ভালোমনে সেটা নিতে পারেনি,—তখন অপমান আর অবহেলা নিত্য সঙ্গী ছিল আমাদের। আর অমানুষিক পরিশ্রম? তার কাহিনী না শোনাই ভালো। দরকার হলে সারেঙ বা টিণ্ডেলদের সঙ্গে বন্দরে বন্দরে নিষিদ্ধ পল্লীতেও যেতে হতো। অন্য কিছু নয়, তাদের অনুচর হিসাবে, দেহরক্ষীরূপে। ঋষি মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত, আমি ওকে সামলে রাখতাম। বলতাম, ধৈর্য, পড়াশুনো আর পরীক্ষাই আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু জাহাজ ত অধ্যয়নের বা উপাসনার ক্ষেত্র নয় ফায়ারম্যান হিসাবে। তাই, যা কিছু করতাম, তা লুকিয়ে লুকিয়ে। লোকে পাপ লুকোয়, আমরা লুকোতাম—পুণ্য। আমি অনাথ ছেলে, মামাবাড়িতে আমাকে মানুষ। ও তা নয়,—ওর মা ছিল। কিন্তু তার কথা দু-একবার উল্লেখ করা ছাড়া, আর কিছু বলেনি,—মনে হতো, মায়ের প্রসঙ্গের প্রতি ওর এক অস্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে।

ছিলাম আমরা অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। ফার্স্ট টিণ্ডেলের তা সইল না, সে ওকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সব সময় ভিন্ন-ভিন্ন ডিউটিতে রাখত। এমন কি, ওর শোবার জায়গাও সরিয়ে দিলো আমার কাছ থেকে দূরে, অন্য কেবিনে। অবশ্য, তাতেও তেমন-কিছু আসে যায় না। কিন্তু, দিনে দিনে যা দেখতে লাগলাম, তা হ'লো ওরই এক ভিন্নতর মানসিক অবস্থা। পড়াশুনায় তেমন মন নেই, ফার্স্ট টিণ্ডেলের পিছন-পিছন যায়, বন্দরে জাহাজ লাগলে তারই সঙ্গে ঘুরতে বেরোয় বেশী, চলনে-বলনে রীতিমত 'জলচর' হয়ে উঠেছে বলা যায়।

একদিন একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম,—করছিস্ কী তুই, ঋষি?

ঠোঁট উল্টে বললে, কী করছি!

বললাম, কোথায় যাস্ তুই টিণ্ডেলের পিছন-পিছন?

বাঁকা একটু হেসে বললে, তুমি কাল কোথায় গিয়েছিলে সারেঙের সঙ্গে? আমি জানি না, না?

বললাম, তা বলে তোর মতো...

বললে, তোর মতো কী? বল? [illegible] খেয়েছি একটু, [illegible] করেছি। না খেলে ও আমাকে [illegible] রাখতো? খাটিয়ে-খাটিয়ে মেরে ফেলতো না?

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ওর সামনে, মাথা নীচু করে। বলার নেই, করারও নেই কিছু। এক, পালানো জাহাজ ছেড়ে। কিন্তু কোথায়? এক জাহাজ থেকে পালিয়ে অনেক জাহাজেই যে যাওয়া যায়। সর্বত্রই ও জাহাজের মতো গণ্ডী। সেই গণ্ডীর [illegible], ক্ষমতাবান যে দুর্বলকে শাসন করছে, কোথাও বা দেহে কোথাও বা মনে। এই নিষ্ঠুর সত্য সেই বয়সেই জেনেছিলাম আমরা।

ক্রমে-ক্রমে অনেক কিছু সহনীয় হয়ে এলো আমাদের। দুজনের দেখা হয় কম কিন্তু যেটুকু দেখা হয়, তারই মধ্যে কথা হয়ে যায় আমাদের, প্রতিজ্ঞা যেন না ভুলি। পাশ করে করে বড়ো হতে হবে আমাদের। আর, কাজ শেখা? তার জন্য সারেঙদের সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লী ত ভালো কথা, ওদের পা টিপতেও রাজী আছি।

এসব বর্ণনা বিশেষ করে লাভ নেই। বাহুল্য মনে হবে।

একদিন ওকে বললাম,—এই, ফার্স্ট টিণ্ডেল ত এখন তোর হাতের মুঠোয়। ওকে বলে আমার কেবিনে আমার পাশের বাঙ্কে আবার ফিরে আয় না?

ঋষি বললে,—আমিও সেকথা ভাবছি

ক'দিন ধ'রে। বোধ হয়, রাজী হবে। দেখছিস্ না, তোকে-আমাকে বেশীক্ষণ কথা বলতে দেখলে আজকাল আর কিছু বলে না।

—কেন বল্‌তো?

ও একটু হেসে বললে,—তুই যে সায়েবের পেটোয়া।

হেসে উঠলাম। ওর হাত ধরে বললাম, —মনে থাকে যেন। ওদের ভজিয়ে-ভাজিয়ে যেমন ক'রে হোক, সব কাজ শিখে নিতে হবে। উন্নতি নিশ্চয়ই করতে হবে জীবনে।

—নিশ্চয়ই।

তারপরে সত্যিই আবার একদিন ও আমার কেবিনে ফিরে এলো। এবং, শুধু তাই নয়, জাহাজ যাবে কলকাতা থেকে কলম্বো,—নির্বাপিত ফার্নেসে প্রথম আগুন দেবার দিন একপ্রস্থ ডিউটি পড়ল আমাদের দুজনেরই এক সঙ্গে। মহা আনন্দে দুজনে ফায়ারম্যানদের সঙ্গে একেবারে হাত মিলিয়ে কাজ করতে লাগলাম সেদিন। ফায়ারম্যানরা প্রত্যেক ফার্নেসের 'ফায়ার বার্স'-এ আধ ফুট উঁচু ক'রে কয়লা সাজিয়েছে। আমরা তারপরে, মাঝখানকার ফার্নেসের দরজার কাছে কিছু বড়ো কয়লার জন্যে সাজালাম এঞ্জিনিয়ারদের বরফ-[illegible] সাজানোর মতো ক'রে। দিলাম কিছু কাঠ, তুলো আর [illegible] কটন-ওয়েস্ট। অর্থাৎ, যেমন হয় আর কী। তেমনি করে আগুন জ্বালালাম বয়লারে। [illegible] টিণ্ডেল আর সারেং দুজনকেই দেখলাম খুব খুশী আমাদের ওপর।

এর দু'দিন পরে যখন আমরা কলকাতার পাইলটকে বিদায় দিয়ে, হুগলী পয়েণ্ট আর স্যাণ্ড হেডস্ ছাড়িয়ে সমুদ্রে অনেকটা দূরে এসেছি—তখন [illegible] ওয়াচের ডিউটির নীচে আমাদের দুজনকেই ডেকে নিয়ে গেল [illegible] টিণ্ডেল।

সব-কিছু চেক-আপের পর গলদঘর্ম হয়ে যখন [illegible] নীচে দাঁড়িয়ে দুজনে একটু হাওয়া খাচ্ছি, টিণ্ডেল এলো একটা বড়ো মগে এক মগ চা নিয়ে। বললে,—খাপ বার করো।

'খাপ'—অর্থাৎ 'কাপ'। এনামেলের দুটো কাপ নিয়ে এলো ঋষি, বললে,—দাও।

টিণ্ডেল বললে,—এসো, একটু বোস।

তিনজনে চা খেতে-খেতে গল্প করছি। টিণ্ডেল কী মেজাজে ছিল কে জানে, তার জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করল। সে-সব নানান দেশের নানান মধুরতার কাহিনী। ঋষি শুনে খুব হাসছিল। ঋষি আজকাল অবশ্য খুবই হৈ-হৈ করে। হাসতে-হাসতে একে চাপড় মারে, তাকে চাপড় মারে। এখনো তাই করছিল। ব'লে উঠছিলাম—উঃ! করছিস্ কী?

—মিঞাসাহেবের গল্প শুনেছিস্?

টিণ্ডেল পান-খাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল, বললে,—ফাঁচ-ফাঁচবার সাধ করছি। ফাঁচ-ফাঁচটা বন্দরে। হ্যাঁ। কতো আর শুনবা, বলো?

বলেই হঠাৎ ঋষির একটা হাত ধরে মারল টান, বললে,—তোমার সেই হুরীর খবর কী?

সবিস্ময়ে ব'লে উঠলাম—হুরী!

ঋষি একটু লজ্জাই পেয়েছিল বোধ হয়। আমতা-আমতা ক'রে বললে,—মিঞা-সাহেবের রসিকতাও বুঝতে পারছ না? হুরী, মানে—

বাধা দিয়ে টিণ্ডেল বললে,—হুরী, মানে—জরু। সাদী করবে মেয়েটারে। কলকাতায় চিঠি পেয়েছ না?

প্রশ্ন করলাম,—কে মেয়েটা! কার চিঠি পেয়েছিস্?

মিঞা ওকে বললে, দোস্তকেও বলোনি? বলেছে, আমারে বলেছে। জাহাজ ত সেই হুরীর দেশেই যাচ্ছে।

—হুরীর দেশ মানে?

টিণ্ডেল বললে,—মোদের কাছে কলম্বো, ওর কাছে হুরীর দ্যাশ! বুঝলে না? ওর হুরী যে সেখানে!—বলেই হি-হি করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে ওরই গায়ে চিমটি কেটে বললে,—পেরানটা না পাখি হয়ে যায়!

ততক্ষণে প্রাথমিক লজ্জাটা কাটিয়ে উঠেছে ঋষি, বললে,—তোকে বলব-বলব করে বলা হয়নি, মানে—

বড়ো অদ্ভুত লাগছিল পরিবেশ। গম্ভীর মুখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর, দাঁড়ানো মাত্র ও আমার হাত দুটো ধরে আবার

বসিয়ে দিলে, বলল,—রাগ করিস নি। এবার তোকে দেখাবো। আলাপ করিয়ে দেবো। আরে, বিয়েতে তুই-ই ত হবি—সাক্ষী! দেখিস,—ভারী মিষ্টি মেয়ে।

টিণ্ডেল তখনো হাসছে, বললে,—আমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিও দোস্ত্।

ঋষি বললে,—আমার মনটাকে বুঝে দেখ্। সত্যিই পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার কাছে।

বললাম,—কিন্তু এসব আমাকে একটুও জানাস নি?

—জানাবার সময় পেলাম কই!—তাড়াতাড়ি বলে উঠল ঋষি।—সে এক আশ্চর্য কাণ্ড! মিঞাসাহেব জানে, তুই জিজ্ঞাসা কর।

টিণ্ডেল বললে,—দোস্তকে তুমিই সব বলো। বাসো। এই নাও, এক-একটা করে কাঁচি খাও। কলকাতার কাঁচি। ছ'টা আনা পয়সা দিয়ে নগদ কিনেছি।

বলতে-বলতে আমাদের দুজনের হাতে দুটো সিগারেট এগিয়ে দিলো। আমি দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে সেই কাঠিতেই আমারটা আর মিঞা সাহেবেরটা ধরিয়ে, তারপর জ্বালিয়ে দিলাম ঋষির সিগারেট। প্রথমটায় কারুরই খেয়াল হয়নি, কয়েকটা উপর্যুপরি টান দিয়ে হঠাৎ ঋষি নিজেই লক্ষ্য করল ব্যাপারটা। সিগারেট ঠোঁট থেকে বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চট্ করে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—সর্বনাশ হয়েছে!

তারপরে এগিয়ে গিয়ে পায়ের জুতো দিয়ে পিষে-পিষে নিভিয়ে ফেললে সিগারেটটা।

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে আমরাও। বললাম,—কী হলো!

কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে গেল, ঋষি বললে,—এক কাঠিতে তিনবার ধরালে, তিনের লোকটি মরে যায়। জানো না? বলে মুখটা ঘুরিয়ে স্টোক্‌হোল্ডের অপর প্রান্তে চলে গেল সে।

মুহূর্তে সব সুর যেন কেটে গেল মনে হলো। টিণ্ডেলও একটুক্ষণ উস্‌খুস্ করে তারপরে কাজের অজুহাতে চলে গেল অন্যদিকে। আমি ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম ঋষির, বললাম,—এসব সংস্কার মাথায় ঢুকিয়েছে কে?

মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে মুখটা ফেরালো আমার দিকে, বললে,—জাহাজে কে আবার কাকে কী শেখায়?

বলে প্যান্টের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে দস্তানা বার করে, সেগুলো পরে পোর্ট সাইড বয়লারের ফার্নেস-ডোরটা খুলে গনগনে আগুনের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখল, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দস্তানা পকেটে রেখে ব্লোয়ারের হু-হু হাওয়ার নীচে গিয়ে মাথা পেতে দাঁড়ালো।

কাছে গেলাম, কোমলকণ্ঠেই বললাম,—মিলোনীতি মেয়েটার নাম কী? বল, কীভাবে আলাপ হলো তোর সঙ্গে?

কোনো উত্তর না দিয়ে সরে গেল সেখান থেকে। স্টারবোর্ড বাংকারের দরজায় দাঁড়িয়ে কালো-কালো কয়লার পাহাড়ের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমি আমার ওয়াচ ফিরে দিয়ে বয়লারের প্রেশারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

কাজ শেষ করে আবার একসময় গেলাম ওর কাছে। ও তখন স্টোক্‌হোল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিলো, বললাম,—হঠাৎ হলো কি তোর, ঋষি?

ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, কী হলো বুঝতে পারো না? জাহাজ পৌঁছবে না কলম্বো।

শিউরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে,—বলছিস কী অলক্ষুণে কথা! জাহাজ বে-অফ-বেঙ্গলে। এ সমুদ্রকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটাতে পারে!

হিংস্র শ্বাপদের মতো আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগল—মরতে হলে একা মরব ভেবেছ? সবাই মরব। একসঙ্গে।

এবার একটু জোরে ধমকেই উঠলাম ওকে,—বলছিস্ কী সব পাগলের মতো!

বললে, জাহাজ না ডুবলে মরব কী করে? আর জাহাজ ডুবলে, সবাই ডুববে। বুঝতে পারলে, কী সর্বনাশ হতে চলেছে?

বললাম,—তুই আমার সঙ্গে ঘরে চল্।

বললে,—সবে এগারোটা দশ। ওয়াচ্ শেষ হতে এখনো পঞ্চাশ মিনিট।

আর কোনো কথা হয়নি ওয়াচের ঘণ্টা পর্যন্ত। একসঙ্গেই ফিরলাম কেবিনে। চারজনের সীট্। দুজন ফায়ারম্যান আর আমরা। এই দুজন ফায়ারম্যানের মিড্‌ল ওয়াচ, অর্থাৎ বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ডিউটি পড়েছে। অতএব, রাত্রিটা নিরিবিলি পাওয়া যাবে।

ও কিন্তু, হাতমুখ ধুয়ে কেবিনে এলো না। লক্ষ্য রেখেছিলাম বলেই দেখতে পেলাম, আমার দিকে বাইরে বেরিয়ে চার নম্বর পাঁচ নম্বর হ্যাচ পার হয়ে আফট-পার্টের ছাদে গিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। আশেপাশে ছিল না কুলিদের কেউ। পিছনের জলরেখার দিকে মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ঋষি। বললাম,—আমি অত না ভেবেই দেশলাইয়ের কাঠিটা এগিয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস কর, ওর মধ্যে আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

মুখ ফেরালো আমার দিকে, বললো,—উদ্দেশ্যের কথা আমি বলি নি।

কণ্ঠস্বর একটু নিচু, শান্তই বলে উঠলাম, —এতো উত্তেজনার অর্থ কী? কী ব্যবহার করছিস আমার সঙ্গে, তা বোঝার জোর নেই।

কোনো উত্তর দিলো না, আকাশের দিকে তাকিয়ে কী-যেন দেখতে লাগল। একসময় বললে, সুরেশ!

কী?

বললে, আকাশে মেঘ জমে আসছে না?

—কই! কোথায়?

—ঐ কোণের দিকে তাকিয়ে দেখ।

বললাম,—দূর! আকাশ একেবারে ঝক্‌-ঝকে। সমুদ্রও শান্ত আছে।

বললে,—কিন্তু ঝড় উঠবে। আমি বললাম। দেখ দিন, ঝড় নয় কাজ। জাহাজ কখনো ডুববে না।

বলেই ধড়ফড় করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পিছন-পিছন গেলাম আমিও।

কেবিনে এসেই ও শুয়ে পড়ল। পাশে গিয়ে বসলাম। আপত্তি করল না। বললাম, —মেয়েটির নাম বললি না?

হঠাৎ, অদ্ভুত একটা কথা বলে উঠল। বলে,—কেন? আমি মরলে, মেয়েটিকে বিয়ে করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?

যেন চাবুক খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপরে বললাম,—সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঘুমো তুই আজ।

কেটে গেল। রাত বারোটার পর আবার আমরা এলাম আমাদের কেবিনে। দুজনেই শুধু আছি, আর দুজন ডিউটিতে। দেখি, চেহারা যেন আরও খারাপ হয়ে গেছে। বললাম,—খাওয়া-দাওয়া করেছিস ত?

ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর এলো,—ব'সেছিলাম। খেতে পারলাম না। যেন বমি ঠেলে আসছিল।

ব'লে নিজের টিনের সুটকেশটা বার করে চাবি লাগিয়ে খুলে ফেললে। তার মধ্য থেকে কী যেন খুঁজে বার ক'রে, বাক্স আবার বন্ধ ক'রে, আমার কাছে এলো। বললে,—দেখ দেখি ফটোটা? পছন্দ হয়?

ওর হাত থেকে ফটোটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলাম। ছাপা শাড়ি পরা তরুণী একটি মেয়ের ফটো। হাসি-হাসি মুখখানা, —মোটামুটি সুশ্রী বলা যেতে পারে। ফটো দেখে যতটা আন্দাজ করা যায়, গায়ের রং খুব ফর্সা নয়।

ফটোটা দেখে ফেরৎ দিতে যাচ্ছি ওর হাতে। মুখ তুলে চেয়ে দেখি,—সরে গিয়ে ও ওর বিছানায় টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়েছে। উঠে, ওর বিছানায় ওর কাছে গিয়ে বসলাম। চোখ বুজে আছে। বাস্তবিকই মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখের চারিদিকে কালির দাগটা আরও গাঢ় হয়েছে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে গাল দুটো ভেঙে পড়েছে। অদ্ভুত মায়া হ'তে লাগল ওকে তখন ওভাবে দেখে। কোমল কণ্ঠে ডাকলাম,—ঋষি? এই নে তোর ছবি। চমৎকার মেয়ে। তুই ভাগ্যবান।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল, বলল,—আমার সুটকেশে আর কিছু নেই। গোটা কতক প্যাণ্ট্ আর শার্ট। দামী কিছু নেই। সারাজীবনে জমাতেও কিছু পারিনি। এই হাতঘড়িটা, তা-ও দামী নয়। দামী জিনিসই জীবনে পাইনি। আমার নিজের মা আমাকে কোনদিন ভালো চোখে দেখতে পারেনি।

বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এলো, চোখ দুটি উঠল ছলছল ক'রে। বলল,—বাবা ভালো লোক ছিল না। মদ খেতো, আর রাত্রে এসে মাকে মারত। শেষে, নিজেই লিভারের রোগে মারা গেল। কিন্তু বাবাকে মা মনে মনে ঘৃণা করত ব'লে, আমাকেও দেখতে পারত না। কাকা-জেঠাদের সংসারে সবার মন যুগিয়ে চলতো মা, আর উদয়াস্ত খাটত। কাকী-জেঠীদের সঙ্গে মিশে আমার ওপরও নির্যাতন করতো। এই ত জীবন আমার সুরেশ, কিছুই নেই, মনে-রাখার-মতো ছোটবেলার কোনো সুখের স্মৃতিও নেই। আছে ঐ ফটোটা। না চাইতেই নিজের হাতে ও আমাকে দিয়েছিল। ওর মতো মূল্যবান জিনিস আমার জীবনে আর কিছু নেই। তাই মানুষ যেমন লুকিয়ে রাখে তার সব থেকে প্রিয় জিনিসটিকে সবার চোখের আড়ালে থেকে, তেমনি এটির কথাও কাউকে কোনদিন বলিনি, কাউকে কোনদিন দেখাইনি। লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে দেখতাম, নিজেই সবার আড়ালে পাগলের মতো কথা বলতাম ছবিটার সঙ্গে। আমার জীবনের সবথেকে দামী জিনিসই আজ তোমাকে দিচ্ছি সুরেশ, এটা তুমি রেখে দাও তোমার কাছে। আমি নিয়ে করব কী? আমার দিন শেষ হয়ে গেছে।

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। ওর হাত দুটো ধ'রে বললাম,—যেমন ক'রে হোক তোকে বাঁচাবো। রাখ তোর ফটো তোর কাছে।

না-না!—ঋষি বললে,—বাঁচাতে আমাকে পারবে না। কিন্তু বলছ কী? ছবিটা তুমি নেবে না!

ওর অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম,—না-না, তা' আমি নিচ্ছি। দাঁড়াও, রেখে আসছি আমার বাক্সে।

ব'লে বাক্সে ছবিটা রেখে সোজা তখ্‌খুনি ছুটে গেলাম চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। বৃদ্ধ লোক, জার্মান। যুদ্ধের পর বহু জার্মান অফিসার ভারতীয় জাহাজে চাকরী নিয়েছিলেন, ইনিও তাঁদের মতো একজন। ওঁকে যতটা গুছিয়ে পারি, বললাম। শুনে বললেন,—ভয়ানক কথা। ওকে নেক্সট্ পোর্টে ছেড়ে দিতে হবে। বেচারা সত্যিই মারা যেতে পারে। তাছাড়া, এক কাঠিতে তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতেই বা গেল কোন্ আহাম্মক? পৃথিবীসুদ্ধ সেলাররা যেটা জানে আর মেনে চলে, তা' সে জানে না? তাকে ধরে চাবকানো উচিত!

দূরে সরে এলাম চীফের কাছ থেকে। 'উচিত'ই মাত্র নয়, সত্যিই যেন চাবুক দিয়ে আমাকে প্রহার করা হ'লো সেই মুহূর্তে। সর্বাঙ্গে যেন একটা দুর্বিসহ জ্বালা। ফোরকাসলে পিকচারকার্ডটা দেখবার অছিলা ক'রে গিয়ে ব'সে রইলাম নিভৃতে একা— কিছুক্ষণ। মনে হ'লো, তবে কি আমিই দায়ী? তবে কি এ মাত্রই সংস্কার নয়? এর মধ্যে সত্যি কিছু আছে? সত্যিই মানুষ মরে তৃতীয় কাঠিতে? সত্যিই তাহলে মরে যাবে ঋষি?

না-না, হ'তে পারে না!—নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে উঠলাম। তারপরে ছুটে এলাম বাইরে। তাকালাম চারিদিকে। নীল সমুদ্র শান্ত আর স্থির। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। আকাশের কোনো কোণে কোনো কালো মেঘ নেই। হাল্কা মেঘের সাদা [illegible] ক'রে আছে শুধু।

ছুটতে ছুটতে কেবিনে এলাম ফিরে। দেখলাম, সেই একইভাবে শুয়ে আছে ঋষি। ঘুমোচ্ছে না, চোখ দুটি খোলা,—তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে।

আস্তে ডাকলাম,—ঋষি।

যেন চমকে উঠল মুহূর্তে, বলল,—কে! ও তুমি?

—হ্যাঁ আমি। কাছে গিয়ে বললাম,—মন থেকে মুছে ফেল সব। মনে কর, কিছুই হয়নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলে শুধু।

—দুঃস্বপ্ন!—ব'লে একটু হাসল, ঠোঁটের কোণে কষ্টে টেনে আনা ম্লান একটু হাসি। বললে,—দুঃস্বপ্নই বটে!

বললাম,—চীফের কাছে শুনলাম, তোর যে অবস্থা, তোকে ওরা কলম্বোতে নামিয়ে দিয়ে যাবে। শাপে বর হবে, কী বল্?

একটু যেন আগ্রহ দেখলাম ওর মধ্যে। বললে,—ঠিক বলছিস? কলম্বোতে নামাবে আমাকে!

—হ্যাঁ রে!

পরক্ষণেই যেন সব আগ্রহের জ্যোতি ওর নিভে গেল, বললে—কিন্তু তার আগেই ত আমি শেষ হয়ে যাব। আমি জানি। আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

বললাম, মেয়েটির নাম কী রে?

বললে—কমলা।

—কমলা! সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, এযে একেবারে বাঙালী নাম!

ধীর, শান্ত আর স্তিমিত কণ্ঠে বললে, বাঙালীই সে।

—বলিস কী! কলম্বোতে বাঙালী মেয়ে?

—হ্যাঁ। টিণ্ডেল জানে, ওকে সেদিন বলেছিলাম সব! ঋষি বললে, গতবার কলম্বোতে আলাপ। তারপর চিঠি লেখা-লেখি। হ্যাঁ, ভালো কথা, চিঠিগুলোও তুমি নাও ভাই। একতাড়া চিঠি। ঐ বাক্সের কোণটাতে আছে। চাবির দরকার নেই, বাক্স খোলাই রেখেছি। কই, নিয়ে এসো?

ও যাতে বাধা না পায়, সেই বুঝে, উঠে নিয়ে এলাম চিঠিগুলো। একটা সুতোয় বাঁধা—যত্ন করে রাখা—একগোছা নীল খাম। ওর শিয়রে এনে রাখতেই, তার ওপরে সস্নেহে হাতখানা বুলোতে বুলোতে বললে, পরে, অবসর মতো পড়ে নিও। সব জানতে পারবে। এইবারেই আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল।

বললাম, আমিও বলছি, হবেই এ বিয়ে। আমিই হবো সাক্ষী।

ম্লান হাসলো। আমার জীবনটাই এমনি। কোথাও পাই না। ভেবেছিলাম কিছুই ত হয়নি ভাগ্য বোধহয় এইবার একটু আলোর পথ দেখালো। কিন্তু সে-ও মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেল। কাকে পাবো না, কিছুতেই পাবো না।

একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে বললে, সুরেশ?

—কী?

বললে, ছোট্ট একটা কাজ যে আছে। চিঠিতেই তার ঠিকানা আছে। তুমি গিয়ে দেখা করো। বড়ো ভাল মেয়ে। একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে।

বললাম, বাঙালী মেয়ে ওখানে গেল কী করে?

বললে, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। আমি টিণ্ডেলের সঙ্গে নিষিদ্ধ এক পাড়াতে গেছি। গা ছিমছিম করে গলির চেহারা দেখলে। আমাকে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড় করিয়ে ভেতরে গেল। পরে ফিরে এসে বললে, তুমি যাও। আমি রাতটা এখানে থাকব। সারেঙকে বলো ভোরবেলা এখানে এসো। এসে, আমাকে ডেকে নিয়ে যেও।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি চলে এলাম। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ভাবলাম, এখনি ফিরব কী জাহাজে? একটু ঘোরাঘুরি যাই। ঘুরতে ঘুরতে বড়ো রাস্তায় এলাম। হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক প্রান্তে চলে এসেছি। হঠাৎ একটা বইয়ের স্টলে খান দু'চার বাঙলা বই নজরে পড়ল। সে যে কি আনন্দ, তা ভাষায় বোঝাতে পারব না! এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বইগুলি উলটে-পালটে দেখছি। কতক্ষণ ধরে দেখছি, তার ঠিক নেই, হঠাৎ কানে এলো মেয়েলী এক কণ্ঠস্বর—বইগুলি দেখা হয়েছে কী?

কণ্ঠস্বরে যতটা না চমকে উঠলাম, ততোধিক চমকে উঠলাম কলম্বোতে বাঙলা ভাষার উচ্চারণ শুনে।

দেখি, আমারই মতো বইয়ের আকর্ষণে একটি মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন স্টলে।

বেশী বর্ণনা দেওয়া বাহুল্য মাত্র, মেয়েটির সঙ্গে এইভাবে আমার আলাপ। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? সেটি রিপিয়ারের জন্য জাহাজটা সেবার ওখানে ছিল প্রায় দিন দশেক। তাই না?

—তা হবে।

বললে, এই দশ দিন রোজ তার সঙ্গে দেখা করেছি। তার অফিসও সে চিনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, যখন সুবিধা হবে, তখনি আসবেন। অফিস-টাইম হলে অফিস থেকে ছুটি নেবো। কিছুই না। দুজনে খালি ঘুরে বেড়াতাম। অমন করে ঘোরার আনন্দও যে কতো হতে পারে, তা যদি আগে জানতাম! অদ্ভুত মেয়েটির জীবন। বললে, কলকাতাতেই তার শৈশব কেটেছে। নারকেলডাঙ্গায়। ছোট বেলাতেই মা মারা যায়। বাপ আর মেয়ের সংসার। বাপ সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ। ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে ভদ্রলোক কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিশতেন না, মেয়েকেও মিশতে দিতেন না। মিশতেন তিনি অবাঙালীদের সঙ্গে, তাঁর কারবারও ছিল অবাঙালীদের সঙ্গে। বলতেন, বাঙালীরা খুব যে খারাপ তা নয়, কিন্তু এতবড়ো পরশ্রীকাতর জাত আর নেই।

মেয়েকে নিজে পড়াতেন বাড়িতে। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ এক গোঁ। বাঙালীর সঙ্গে মিশতে দেবেন না, এমনকি বিয়েও দেবেন না বাঙালীর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিলেন এক সিংহলী ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে ভদ্রলোক কলকাতাতেই থাকতেন। কিন্তু, বিয়ের পর কী জানি কেন তাঁর মত বদলালো, চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বউকে সঙ্গে করে চলে এলেন একেবারে কলম্বো।

—তারপর?

ঋষি একটু থেমে থেকে তারপরে বললে, বছর দুই পরে সেই ভদ্রলোক একদিন তাড়িয়ে দিলেন বউকে। অন্য বিয়ে করলেন। নিঃসহায় মেয়ে। কেই বা সাহায্য করবে? বিয়ে ত হয়েছিল কলকাতায় হিন্দুমতে পুরুৎ ডেকে—বাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু, ধর্মে বৌদ্ধ, ভদ্রলোক সিলোনে এসে যদি সে বিয়েকে অস্বীকার করে বসেন, তুমি প্রমাণ করবে কোন্ দলিল দিয়ে?

—কেন, বাপ?

ম্লান হেসে ঋষি বললে, এ-ও অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়েকে ওভাবে বিয়ে দিয়ে দূরদেশে পাঠিয়ে বোধহয় অনুশোচনা হয়েছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকেরাও বলতো, মেয়ে বেচা কসাই। তা, টাকা তিনি নিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে, বেশ কিছু টাকা, কারবার বাড়াবার জন্য। কিন্তু, কী যে হলো, কলকাতার পাট উঠিয়ে দিয়ে কোথায় যে গেলেন, তা কেউ জানল না। একদিন খবরের কাগজের মাধ্যমে জানা গেল,

পুরীর সৈকতে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পকেটে চিঠি। তার নাম ঠিকানা। লেখা, আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়।

সোজা হয়ে উঠে বসেছি। বললাম, বলিস কী! এসব বানানো গল্প না ত?

—না। ঋষি বললে, তাকে দেখলে তুই-ও বুঝবি, মিথ্যে কিছু বানানোর মেয়ে সে নয়। আর তাছাড়া তাকে লেখা তার বাপের চিঠিগুলোও আমি দেখেছি। তীব্র অনুশোচনার সুর তাতে বেশ ধরা পড়ে।

—তারপর?

ঋষি বললে,—তারপর আর কী? কোনক্রমে দিন কাটে। সেলাই করে, ছেলে পড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত টাইপরাইটিং আর স্টেনোগ্রাফী শিখে অফিসের চাকরী। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা নেহাৎই দৈব ছাড়া আর কিছু নয়।

বললাম,—তা তাকে ত কলকাতায় নিয়ে আসতে পারতিস?

ঋষি বললে, বলেছিলাম। বলেছিলাম, বিয়ের পর তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবো, কেমন? কিন্তু সে রাজী হলো না। বললে, [illegible] প্রাণ আছে, [illegible] বাঙলাদেশ কেন, ভারতের মাটিও আমি ছাড়বো না।

একটু হেসে বললাম [illegible]

—[illegible]। ঋষি বললে, মেয়েদের সঙ্গে কখনো মিশিনি। কিন্তু এমন মেয়ে কখনো দেখি নি। [illegible], কিন্তু কখনো প্রশ্রয় দেয়নি। বলেছে, ভালোবাসতে শেখো, সহানুভূতি। [illegible] পরে ভালবাসা নয় ভালোবাসার পরে পাওয়া। আমাকে পেতে চাও [illegible] করে।

বললো, তোমার কাছে আমি আকর্ষণীয়, আমার কাছেও তুমি সমান আকর্ষণীয় হয়ে ওঠো।

একদিন বললে, একটা বদমায়েস ফর্সা লোক আমাদের ফলো করে, লক্ষ্য করেছ?

—না ত!

বললে, লক্ষ্য করে দেখো। ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে তোমাকে।

—কেন? দুষ্টুলোক?

—না, তা ঠিক নয়। বললে,—আমাকে যে বিয়ে করেছিল কলকাতায়, সে আমাকে এখানে এনে তাড়িয়ে দেবার পর ঐ লোকটাই আমার জীবনে আসে। সীলোনিজ খৃষ্টান। ভালবাসতে শুরু করল। আমারও ভালো লাগতো তখন লোকটিকে। কিন্তু, আমার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হবার পূর্বেই ও একদিন জোর করে অধিকার করলো আমাকে। ঘৃণায় সর্বশরীর রি-রি করে উঠেছিল। সেই থেকে, ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি, পরিহারও করে চলেছি।

যামাদের যুদ্ধ করতে হবে প্রাণপণ! যার যদিকে যেটুকু ক্ষমতা! যতদিন ঝড় না থামবে, ততদিন কী অফিসার কী খালাসী, কারুরই বিশ্রাম নেই মুহূর্তের জন্য। হয় জেগে থাক। আর বুদ্ধি স্থির রেখে যার-যার কাজ ক'রে যাওয়া,—আর নয়ত—জাহাজডুবি হয়ে সমুদ্রের অতল-তলে চির বিশ্রাম।

ডেক ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক পাগলের মতো, —আর আমরা ছড়িয়ে পড়লাম সমুদ্রের জঠর-প্রদেশে। ডেকের লোকেরা জাহাজ-ডুবি হলে লাইফবোটের সাহায্য নিতে পারে, কিন্তু ইঞ্জিন রুমের আমরা কলে পড়া ইঁদুরের মতো মারা পড়বো অসহায়ভাবে। মুহুর্মুহু ওপরের দিকে তাকাচ্ছিল সবাই, যে কোনো মুহূর্তে প্রবল জলস্রোত ওপর থেকে নীচে এসে পড়তে পারে দুর্ধর্ষ প্রপাতের মতো। আমরা ঘাড় ভেঙে মরতে পারি, আবার খাঁচায়-পোরা পাখির মতো ছটফট্ ক'রেও মরতে পারি। সারেঙ বললে,—দরিয়ার অবস্থা ভালো নয়। পাহাড়ের মতো সব ঢেউ উঠছে।

আমার ভয়েস-পাইপে ব্রীজ থেকে ইঞ্জিন রুমে সব সময়ই ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আসছে। ইঞ্জিনের গতি-নির্দেশক ফলকের কাঁটা-টা 'অ্যাহেড-অ্যাস্টার্ন'-এর মাঝে কাঁপতে কাঁপতে চরম গতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, জাহাজ চলছে এবার ফুল স্পীডে,—কোন্‌দিকে কে জানে!

কাজের ফাঁকে বেশ কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম,—স্টোকহোল্ডে স্টারবোর্ড-বয়লারের ওয়াচে দাঁড়িয়ে আছে ঋষিকেশ। টিণ্ডেল বোধ হয় ওর ওপর মায়াপরবশ হয়েই হাল্‌কা কাজ দিয়েছে ওকে। কিন্তু, দূরে থেকে ওকে ওভাবে দেখে বুকের ভিতরটা কী একটা আশঙ্কায় ধক্ ক'রে উঠল মুহূর্তের জন্য। বয়লারের ওয়াচে এখন খুবই সতর্ক থাকা উচিত। পূর্ণগতিতে জাহাজ চলছে, বয়লারের প্রেসারে না তারতম্য ঘটে! জাহাজের দুর্দান্ত আন্দোলনে অথবা বয়লারের 'ওয়াটার-লেবেল' খুব বেশী হয়ে, বিপদের সম্মুখীন না হতে হয়!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। অন্যমনস্ক থাকলে ওকে এখন চলবে না। ওর সামান্য অন্যমনস্কতার জন্য জাহাজের এতগুলি প্রাণ না বিপন্ন হয়ে পড়ে! চড়া গলায় ডাকলাম,—ঋষি?

চমকে কেঁপে উঠল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—কী?

—বয়লারে স্টীম-প্রেসার কত? ওয়াটার-লেভেল?

অপ্রস্তুতের মতো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বয়লারের কাছে। দেখে এসে যা বলল তাতে বুঝলাম,—সব ঠিকই আছে। বললাম—শোনো। ভাবালুতার সময় এটা নয়। জাহাজের এতগুলি লোকের মরণ-বাঁচন। ওয়াচে কোনোরকম গাফিলতি ক'রো না।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় না ওর চেহারা। চোখ দুটো ব'সে গেছে, কপালে ভাঁজ পড়েছে, গালের হাড় দুটো অস্বাভাবিক উঁচু। শরীরও বেশ রোগা হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বললে,—বৃথা চেষ্টা। বাঁচাতে পারবে না।

শোনামাত্র হিংস্র আক্রোশে ওর জামার কলারটা চেপে ধরলাম,—ফের অমন অলক্ষুণে কথা বলবে তুমি?

কিছু বলল না, প্রতিরোধও করল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাবার পর ব'লে উঠল,—এক কাজ করলে বেঁচে যাবে তোমরা। আমাকেই ফেলে দাও জলে। আগেকার ক্যাপ্টেনরা যেমন নাকি করত অলক্ষুণেদের নিয়ে। আমি অলক্ষুণে—আমি অপয়া।

বলতে বলতে দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মতো, বললে,—কিছু পাইনি জীবনে। মরুভূমি। শুধু ওর ঐ কয়েকদিনের সাহচর্য! কিন্তু, সে যে ব'সে থাকবে আমার জন্য! সে স্থির জানে, আমি এই জাহাজে যাচ্ছি তাকে বিয়ে করতে। এই জাহাজে তার বর আসছে। কী হবে তখন? তুমি দেখা ক'রো। তিন সত্যি করো যে দেখা করবে?

কোনো উত্তর না দিয়ে আমি স'রে এলাম ওর কাছ থেকে। এবং সেই যে স'রে এলাম, আর কাছে যেতে পারিনি পুরো দুটো দিন, মানে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য। কিন্তু, মনে মনে বার বার বলেছি, ঈশ্বর ব'লে যদি কেউ থাকো, ওকে বাঁচিয়ে রেখো। সংস্কার যে মিথ্যা এর প্রমাণ যেন ওকে আমি দিতে পারি!

কেটে গেল আটচল্লিশ ঘণ্টা। ক্লান্ত শরীরে মুমূর্ষুর মতো এসে বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। আমার মতো আরও অনেকে অসুস্থ হয়েছে। ওরই মধ্যে তাকিয়ে দেখি, ঋষি ওর বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু, একি কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ওর!

খালাসীদের কাছ থেকে শুনলাম, এ দু'দিনে চার-পাঁচবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ও। অবশেষে নিয়ে এসে চীফ অফিসার আর স্টুয়ার্ড ডিউটি থেকেও [illegible] দেওয়া হয়েছিল। কোনক্রমে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। মাতালের মতো টলছি। বললাম,—কেমন আছিস?

আমাকে দেখে আবার কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে, বললে,—কমলার সঙ্গে একটিবার দেখা করবে তো? বলবে, আমি তাকে ভুলিনি—একটিবারের জন্যও ভুলিনি।

—তা কাঁদছিস কেন [illegible]! করব, দেখা করব।

আমার হাতটা টেনে নিয়ে রাখল বুকের ওপর। বললে,—বাঁচলাম। জানো, মরতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু পাওয়া যে আমার ভাগ্যে নেই, তা আমি জানি।

হাত ছাড়িয়ে স'রে এলাম নিজের বিছানায়। তারপরে আর কিছু মনে নেই। কে যেন বলেছিল,—আমি এক সঙ্গে ঘুমিয়েছিলাম আটাত্তর ঘণ্টা।

উঠে,—বিছানায় তাকিয়ে দেখি,—ঋষি নেই। ঘরে কেউই নেই। পোর্টহোল্ দিয়ে

ঝক্‌ঝকে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। ঐ ফাঁক দিয়েই দেখলাম,—চক্রাকারে ঘুরছে সব সাদা-সাদা সাগর-পক্ষীর দল। ঝড় থেমে গেছে। কিন্তু, একী কোনো পোর্টে এসে লেগেছি নাকি? তবে কি, কলম্বো? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সেলুনে গিয়ে দেখলাম, আমার অনুমান ঠিক। ঋষি টেবিলের সামনে ব'সে আছে চা-টোস্ট নিয়ে। ফর্সা প্যাণ্ট আর সার্ট পরণে, মুখখানিও কামানো,—চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কণ্ঠ তখনো দুর্বলতায় ক্ষীণ, বললে,—শীগ্‌গির তৈরী হয়ে এসো। তোমাকে আমাকে দুজনকেই এবেলা ছুটি দিয়েছে সারেঙ্! কলম্বো এসেছি চার ঘণ্টা হয়ে গেল,—কলম্বো।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। তারপরে, একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে যেন উদ্বেল হয়ে উঠলাম মুহূর্তে। প্রাতঃকালীন সব কাজ সেরে, বেশ ক'রে পেট ভরে খেয়ে ভালো কাপড়-জামা প'রে বেরুলাম ওর সঙ্গে। চীফ বললে,—এজেণ্টকে চিঠি দিয়েছে কাপ্তেন। ওকে কলম্বোতে ছেড়ে যাবো আমরা। ডাক্তার এসে ওকে দেখে গেছে, বলেছে,—খুব দুর্বল। ওকে 'সিক্' ক'রে দিয়ে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর পিঠ চাপড়ে বললাম,—ভালোই হলো হতভাগা! বিয়ে ক'রে দিনকতক কাটা কাটিয়ে। কিন্তু, দেখিস্ ও সম্বন্ধে উৎসবের সব বাকী!

ও কিছু বললে না, একটু হাসল শুধু।

পর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আলাপ হলো মেয়েটির সঙ্গে। আমিও বাঙালী শুনে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। বেশ মেয়ে, কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। কিছুক্ষণ কাটিয়েই ফিরে এলাম। আমি ফেরবার ঘণ্টা দুয়েক পরে ও-ও ফিরল।

—কীরে, এলি যে?

বললে,—ও যে অফিসে গেল। কোনো সুরেশ, রেজিস্ট্রার ওর চেনা। কাল বিকেল পাঁচটায়, তোমার অফ্ থাকবে জানি, আমার সঙ্গে যাবে সাক্ষী হতে। কালই বিয়ে। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর দেরী করতে চাই না। ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারি না।

তা-ই হলো। যথারীতি অনাড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। কমলার ঘরখানা সাজানো হয়েছিল ফুল দিয়ে। গল্পে গল্পে খাওয়া-দাওয়ায় রাত হয়ে গিয়েছিল। টিণ্ডেল-সারেঙ্ আর আমি উঠে এলাম। বললাম,—আজ তোর ফুলশয্যা। চল্লাম। আমার কাল সকালে ছুটি আছে, ভোর হলেই আসব।

তারপরেই গলা নামিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম,—এসে শুনব সব।

লজ্জায়-খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা, হাসতে-হাসতে বললে,—একটা ব্যাপারের মীমাংসা করতে পারছে না কমলা। আমি ওর জীবনের তৃতীয় ব্যক্তি আমি জানি। কিন্তু ও বলছে—দ্বিতীয়।

—যাও!—ব'লে লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল কমলা।

আমরা চলে এলাম। এ কাহিনী যদি এখানেই আমি শেষ করতাম, তাহলে ভালো হ'তো বাইটার, কিন্তু, তা তো হবার নয়। যিনি সকল কাহিনী, জীবন আর মনের নিয়ামক,—তিনি এ কাহিনী আরও একটু দূরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

পরদিন সকালে যথারীতি ওদের ওখানে গিয়ে যা দেখলাম, তা যে কোনদিন দেখব, তা কল্পনাও করিনি। দেখলাম, লোকজন ভীড় ক'রে আছে বাড়িটাকে ঘিরে। দু-একটা গাড়িও।

বলতে হবে, সিংহলের রাজপুরুষেরা খুব নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। পুলিসের সামনে ডাক্তার লিখে দিতে দেরী করলেন না যে,—মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়ে।

সারাটা দিন গেল মর্গ আর শ্মশান নিয়ে। সব শেষ ক'রে এসে পরদিন যখন ওর সঙ্গে দেখা করলাম, দেখি নিশ্চল প্রতিমার মতো ব'সে আছে ও ঘরের একাকোণে।

কাছের একটা চেয়ারে আমিও গিয়ে বসলাম। কিন্তু, কথা বলতে পারিনি অনেকক্ষণ। ঝাউগাছের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের মতো। বললাম, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন মনে হচ্ছে। অবশ্য, তোমার শোকের সান্ত্বনা নেই, কিন্তু কেমন ক'রে ঘটল এটা?

যেন সমস্ত লাবণ্য ওর দেহ থেকে শোষণ ক'রে নিয়েছে কেউ,—ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কমলা বললে,—সে রাতে আপনি চলে যাবার পর ও যেন মেতে উঠল আমাকে নিয়ে। বলতে বাধা নেই, আমিও ধরা দিলাম। কিন্তু ডাক্তারসাহেব যা বললেন, তাতে বুঝলাম, সেটাই আমার ভুল হয়েছে। জাহাজে ওর যে অতো মানসিক বিপর্য্যয় গেছে, তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ও স্থিরই করেছিল, বিয়ে আমাদের হবে না। আমাকে ও পাবে না। কিন্তু সেই আমাকেই যখন আবার পেলো, তখন সেই অতর্কিত পাওয়ার আনন্দের উচ্ছ্বাসে ওর দুর্বল স্নায়ুতে ও সহ্য করতে পারল না। গল্প করতে করতে শেষরাতে এক সময় কেমন নির্জীব হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম—ঘুম পাচ্ছে? বললে,—না। বুকের ভিতরটা কেমন করছে। ব্যস্, সে-ই শেষ কথা। ডাক্তার এসেও কিছু করতে পারলেন না।

চুপ করল সুরেশ্বর দাস। আকাশ তখন ফর্‌সা হয়ে এসেছে। কেউই কোনো কথা বলতে পারছি না। আমিও না, মহাদেবও না।

অনেকক্ষণ পরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল জাহাজে, সূর্যোদয় আসন্ন। আমরা তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। মহাদেবন বললে,—মেয়েটির কী হ'লো শেষ পর্যন্ত?

—কিছুই হ'লো না।—সুরেশ্বর বললে, —তারপরেও দু'বার দেখা হয়েছে, সেই একই ভাব। সেইদিনকার সেই প্রস্তর-মূর্তির মতোই লাবণ্য-ঝরা চেহারা,—দিনের পর দিন অফিসে কাজ করে চলেছে একই-ভাবে, কথা বললে সংক্ষিপ্ত [illegible] দেয়, মিশতে চায় না কারুর সংগে। [illegible]বির সেই বিশ্বাস,—পেয়েও পাবে [illegible]।—সেই বিশ্বাসের মতো, তার জীবনেও যে কিছু-একটা হবে না, কমলা এটা স্থির বুঝে নিয়েছে এতদিনে।

সম্বন্ধ' গল্পটা যেদিন প্রমথবাবু সবুজ সভায় পাঠ করেন, ননী সেটা দরজার আড়াল থেকে শুনেছিল। আমি নিজে সেদিন অনুপস্থিত, সুতরাং এ-সন্দেহ কেবল সন্দেহের কোঠাতেই পড়ে আছে। আমার অবশ্য জিজ্ঞেসা করা উচিত ছিল, সত্যেন বোস ও ধূর্জটি মুখুয্যের কাছে, কেননা তাঁরা যে দুজনেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, এ-সংবাদ প্রমথবাবুর ২০-১২-১৬ তারিখের চিঠিতে পাই।২ কিন্তু যা করা উচিত তা না করার জন্যে যে গাফিলতি হয়েছে সেটা কবুল করে আজ বলছিঃ কসুর মাফ্ কী জিয়ে।

প্রমথ চৌধুরীর এই 'ননী নামক ভৃত্যটি' কি পরিমাণে আমাদের সবুজ-সভার খোরাক জুগিয়েছে, তার হিসেব নেবার ইচ্ছে থাকলেও দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটা নিশ্চয় যে, আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে সে ছিল প্রধান সহায়। জলযোগ প্রস্তুত ও পরিবেশন করার কাজ তার হাতে থাকায় আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত মনে আলাপ-আলোচনা চালাতে পেরেছি। প্রমথবাবু কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাবার পরেও তাকে ও'র একনিষ্ঠ সেবকরূপে সেখানে দেখেছি। পুরাতন ভৃত্য যে একটা সম্পদ বিশেষ, এ-সত্য অনেকেই জানে ও মানে। রবীন্দ্রনাথ কতটা তাঁর পুরোনো চাকরের ওপর নির্ভর করতেন তা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাই, যখন তাঁর অতিথি হয়ে কিছুদিন শান্তি-নিকেতনে বাস করি। প্রাচীন কালে ক্রীত-দাসের মূল্য নির্ধারণ করা যেত, অন্য পণ্যদ্রব্যের মত। একালে ভাল চাকরের দাম না থাকলেও মর্যাদা আছে। এমনদিন আসতে পারে, যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিষয় সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য সম্পদেরও একটা মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং যে-ভাই টেক্কা দিয়ে আসলের ভাল চাকরকে পাবে, সে অন্য ভাইকে দাম ধরে দেবে।

ননীর কেবল গুণগান করেই আমার পালা সাঙ্গ করা ঠিক হবে না। তার যে পান-দোষ ছিল, এটাও বলা উচিত। তার হাতের সাজা পান বহুবার চর্বণ করেছি, সুতরাং সে-পানে যে-দোষ তা আমার খুব জানা। বোধ হয়, পান-সাজার কাজটা পুরুষের নয়, ও-কাজ কেবল মেয়েদেরই সাজে। মনে পড়ে, সবুজ দলে ভর্তি হবার কিছু পূর্বে আমি পান-সাজা দেখতে যেতুম আমাদের পাশের বাড়িতে (যেখানে এখন জয়পুরিয়া কলেজ হয়েছে)। সেখানে আমাদের এক বৌরাণী (ইন্দুবালা) বেশ আসর জমিয়ে পান সাজতেন। সভাভঙ্গের সঙ্গেই তিনি যে পান-দান করতেন তার স্মরণে আজও আমার জিভে জল আসে। সে-পান মুখে দিলে তৎক্ষণাৎ রসনায় রস-সৃষ্টি হত অসাধারণ। তার একটা কারণ ছিল উপকরণের তরীবৎ। মশলাগুলো গুঁড়িয়ে ফাঁকি করে ছেঁকে নিয়ে সেই সঙ্গে একটুকরো পানের বোঁটা যোগ দিয়ে পান-পূরণের ব্যবস্থা। সেও একরকম সবুজ-পাতার ডাক। সবুজ পান-পাতার অন্তরে বিরহী বৃন্ত আংশিকভাবে স্থানলাভ করায় সেখানে রসের সৃজন যেন পুনর্মিলন। মশলা গুঁড়োনোর কাজে নারী-শক্তি নিযুক্ত থাকায় সবশুদ্ধ মিলিয়ে যে খিলি তৈরী হত তার তুলনা পাই নি।

বেনারসী খিলিওয়ালাদের প্রতিপত্তি শুনে কয়েকবার তাদের রচনা পরখ করে এসেছি কাশীতে গিয়ে। একটা খিলির দাম চার আনা পর্যন্ত দিয়েও খেয়ে খুসি হইনি। হরেক রকম মশলা থাকা সত্ত্বেও সে-পানে রসের অভাব। অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার পর বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা চর্বিত-চর্বণ ছাড়া আর কিছু নয়। বেনারসী পানে বিনা-রসী ভাব কেন? আমার মনে হয়, তার কারণ, ঐ পুণ্যতীর্থে তাম্বুল রচনার কাজ আজ নারীহস্তচ্যুত। শক্তির প্রেরণা না থাকায় সেখানে পান-মাহাত্ম্য স্থান-মাহাত্ম্যের সমতুল্য হয়নি।

তাম্বুল-রচনা হচ্ছে একটা আর্ট। এই আর্ট বাৎসায়নে বর্ণিত চতুঃষষ্টি-কলার অন্তর্ভুক্ত না হলেও, তাম্বুল-দান-রীতির কথা কাম-শাস্ত্রে আছে। তাম্বুল-গ্রহণ-রীতির মধ্যে রাজাদের বিশিষ্ট অভ্যাস ছিল, একথার উল্লেখ পাই রাজতরঙ্গিনীতে। কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় যখন 'কল্লট' এই নাম নিয়ে নানা দেশে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময়ে তিনি নাকি বঙ্গদেশের পৌণ্ড্র-বর্ধনে ছদ্মবেশেই আসেন। সেখানে কার্তিক ঠাকুরের মন্দিরে নাচ-গান হচ্ছে দেখে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। অভ্যাসবশত তাঁর হাত মাঝে মাঝে কাঁধের ওপর চড়ছিল। বুদ্ধিমতী নর্তকী কমলা এইরূপ হস্ত-সঞ্চালন লক্ষ্য করে তাঁকে রাজা বা রাজপুত্র বলে সন্দেহ করলেন। কারণ ঐভাবে রাজারা পান হাতে নিতেন।

পানের দোষ-গুণ-বিচারে সহায়ক একটা গল্প বলছি। বাবার মুখে শোনা। ইংরেজ-দের কৌশলে ওয়াজিদ আলী শাহ যখন অযোধ্যা-রাজ্য ত্যাগ করে কলকাতায় বসবাস করতে বাধ্য হন, তখনও ও'র দরবার বসতো এইখানেই (মুচিখোলায়)। উনি খুব গান-বাজনা ভালবাসতেন। ও'র সঙ্গীতের আসরে যেতেন আমাদের কোনো আত্মীয়। শীত-কালে একদিন—সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা—গরম কোট—আলস্টার চাপিয়ে ইনি গেছেন ও'র আসরে। ও'র গায়ে মিহি মসলিনের জামা দেখে ইনি বললেনঃ আচ্ছা, জাহাঁপনা, আপনি ফিনফিনে পিরান পরে আছেন, আপনার শীত করছে না? রাজোচিত উত্তর এলঃ আমি যে-পান খাই তাইতেই আমার শরীর গরম থাকে। গরম পোশাকের দরকার হয় না। এই নিন্-না একটা পান। খেলেই আপনাকে আলস্টার খুলে ফেলতে হবে। সদ্য সদ্য ফল পেয়ে আর একটি পান চাওয়ায় রাজভাষায় মৃদু আপত্তি উচ্চারিত হলঃ বহুৎ গরম হোগা। কিন্তু সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা রাজ-সৌজন্যের পরিপন্থী। সুতরাং দ্বিতীয়বার পান-দান অবশ্যই হল। পান-গ্রহীতার ঘর্মাক্তকলেবর নবাব সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ইনি সেলাম ঠুকে বিদায় নিলেন। বেচারী এক-দম খালি গায়ে গাড়ির কোচবাক্সে উঠে ময়দানের হাওয়া খেতে খেতে বাড়ি ফেরেন। প্রথম সেবনে পান-গুণ এবং দ্বিতীয় সেবনে পান-দোষ কার্যতঃ প্রতিপন্ন হয়ে গেল!

প্রমথবাবুর প্রসঙ্গে রাজা-রাজড়ার গল্প বলায় আমার প্রবৃত্তি এল এই জন্যে যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা সাহিত্যে গল্প-সম্রাট। তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য এখন বর্ধনশীল। তাছাড়া, তাঁর ভৃত্য ননী সবুজ সভায় যে-ভাবে পানের ডিবে নিয়ে দাঁড়াত তার মধ্যে একটা মোগলাই কায়দা ছিল। ঐ রকম কেতা-দুরস্ত খানসামার দৌলতেই খানদানী ঘরের খাতির খানিকটা এযুগেও বজায় আছে।

প্রথম জীবনে প্রমথবাবু প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। এ খবর আমি প্রথম পাই তাঁর ১০-১১-১৬ তারিখের চিঠিতেঃ১ "দেখতে পাচ্ছি তোমার শরীর তেমন টেঁক নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি ইচ্ছে করলে শরীর শক্ত করতে পারো। আমি বলছিনে ওষুধ-পথ্য খেয়ে কিম্বা ব্যায়াম করে কিন্তু মনের জোরে। এই অসুখ জিনিষটের সঙ্গে আমার বাল্যাবধি পরিচয় আছে বলে ওর সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি। তোমাকে একদিন এ বিষয় বক্তৃতা দেবো।"

মনের জোরে কি উপায়ে শরীর শক্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে কোনো বক্তৃতা ও'র মুখে শুনিনি বটে। কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা রোগমুক্ত হওয়া যায়, এ-সত্য নিজে উপলব্ধি করেছি। বোধ হয়, প্রমথবাবু যে মনের জোরের কথা লিখেছিলেন, সে-জোর কেবল ভগবৎ কৃপায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গান 'বল দাও মোরে, বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি, সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি'—যা পঞ্চাশ বছর আগে শিখেছি, তাই আজও আমার দুর্বল মনে

---

২ দেশ পত্রিকা, ১১ বৈশাখ, ১৩৬৬।

১ দেশ, ৪ বৈশাখ, ১৩৬৬। 'টেঁক' শব্দটি ছাপার ভুলে 'টেক' রূপ নিয়েছে।

স ত্তা র স মী পে

দুর্গাদাস সরকার

তুমি স্থির সত্তার সেতারী। প্রতি ঘায়
নিজেকে বাজাও অন্তরায়।

সময়-সময়
কোনো রাগ ভুল হয়।
তবু তার সুর আছে, তারে বাঁধা তোমার হৃদয়।
আর সেই হৃদয়ের রাজা সাজে সঙ,
তখনি সে সুখ পায় ভোলে যদি নিজেকে বরং।
একা হাঁটে। পথে বসে। গাছের ছায়ার গোল রেখা
তার স্পষ্ট চোখ দুটি ধরে রাখে একা।
আবার কখনো তারি কায়া
দোকানে ভাঁড়ের চায়ে মুখ রেখে তোলে যবনিকা
বহু আবছায়া-জীবনের। দেখে নগর-তালিকা ঃ
মৃত্যু, পণ্য, পথে জন্ম;
কখনো ধমনী
চিন্তার তরঙ্গে তোলে সমুদ্রের ধ্বনি।
হয়তো তখনি
ছিঁড়ে যায় সেতারের তার,
ডুবন্ত লোকের মতো নীল জল হয় অন্ধকার,
শূন্যতায় অসহায় বাড়ায় দুহাত।
মাটি তাকে ধরা দেয় তবু অকস্মাৎ। সেতারের তার
জুড়ে যায়। খুঁজে খুঁজে জীবনের অমৃত অপার
তারপর নিজেকে দুহাতে করে ক্ষয়।

তুমিই সেতারী। তার গান সুর লয়।

ই তি হা স

গোরাচাঁদ নন্দী

পঙ্গু প্রহরগুলো যখন গড়িয়ে গড়িয়ে আসবে
তোমার ছায়ায় আশ্রয় নেবার জন্যে
তখন তুমি কার কাছে হাত পাতবে?
তখন কি তুমি শেষ বারের মত
তোমার সমস্ত জীবনীশক্তি দিয়ে
রুখে দাঁড়াবে না সেই সর্বগ্রাসী নিঃসঙ্গতাকে ঠেকাতে
যা তোমার সামনের তেপান্তরকে
ধূসর কুয়াশার মত ঢেকে রয়েছে?
তারই এক কোণে তো ভাগাড়ের শকুনিদল
গোল জটলা করে ঠোঁট শানাচ্ছে
আর ক্লান্ত আঁধার রাত্রির গায়ে আরও মসীলেপন করছে।

তরুণ তরুণদল, যারা তোমার
এই শেষ কীর্তির সাক্ষী হয়ে থাকবে—
হয়তো তারা কোনোদিন ভবিষ্যের খেলাধূলাতে
খেলার শেষে চঞ্চল সঙ্গী-শিশুকে
কোলে নিয়ে দোলা দিতে দিতে
ঠাকুমার ঝুলি উজাড় করবে ঃ
হয়তো বর্ণনা করবে তুমি কেমন করে [illegible]
নির্মম নিয়তির [illegible],
অথবা [illegible]
দিশাহারা [illegible],
কিংবা কেমন প্রশান্ত ধীর সাহসে
আগামী [illegible] দিকে
পা বাড়িয়েছিলে।

নী ল প দ্ম

অরুণ বাগচী

ঠিক যেন এই কথা কোথায় শুনেছি
এই ছবি দেখেছি কোথাও
ঐ মানুষের মুখ ভারী পরিচিত
মনে হয়, হয়তো বা যুক্তিহীন মনে হওয়াটাও।

কখনো রোদ্দুরে সোনা রৌপ্যগর্ভ মেঘ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রাণ ভরে আশ্চর্য দ্যুতিতে
ঘাসে ঘাসে সিঁথিকাটা হাওয়ার আবেগ
গন্ধভেবে ফুলটাকে চায় তুলে নিতে।

ঘুরে ঘুরে কত দেখি দেশ নদী পাখি
স্থির হ্রদ ছায়া ফেলে বিশংকু পাহাড়
শান্তমন মন্ত্রজপে নিশ্বাসে একাকী ঃ
এ নয়, ও নয় না, নীলপদ্ম চাই
নীলপদ্ম কোথাও কি নাই?

নীলপদ্ম আলো করে এই মর্ত্যভূমি
নীলপদ্ম আমাদের প্রেমিক হৃদয়ে
নীলপদ্ম তুমি।

১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কবলিত হওয়ার পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। চতুর ইংরেজ শিখদিগকে বুঝাইল যে, গুরু তেগবাহাদুরের হত্যাকারী আওরংগজেবের বংশধর ২য় বাহাদুর শাহ বিদ্রোহী সিপাহীদলের অধিনায়ক। ইংরেজদিগের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিলে শিখগণ এই সুযোগে গুরুহত্যার এবং মোগল রাজধানী দিল্লীর উপর প্রতিশোধ লইতে পারিবে। এই প্রচার, শিখ সম্প্রদায়ের মজ্জাগত যুদ্ধানুরাগ—যুদ্ধের সুযোগ না থাকায় এই অনুরাগ কলহপরায়ণতায় পরিণত হইয়াছে—এবং যুদ্ধান্তে জায়গীর ও পেন্সনের প্রতিশ্রুতির ফলেই সিপাহী বিদ্রোহের সংকটের দিনে শিখগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। তাহাদের সহায়তা না পাইলে বিদ্রোহ দমনে কোম্পানীকে আরও বেগ পাইতে হইত।

(It is no exaggeration to say that but for their timely assistance the British Government would have found it very difficult to quell the Mutiny", Transformation of Sikhism by Dr. Gokul Chand Narang, p. 191)

ইহার পর হইতে শিখ সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত শিখ সম্প্রদায় বিদেশী শাসকের সুয়োরাণীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাহারা ইংরেজদিগকে আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিত এবং সর্বপ্রকারে প্রভুর মন জোগাইয়া চলিত। কিন্তু ১৯১৩ সালে ইংরেজ-শিখ সম্প্রীতির বুনিয়াদে ফাটল ধরিল। দিল্লীর রেকাবগঞ্জ গুরুদ্বারা শিখ সম্প্রদায়ের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। গুরুদ্বারা প্রাঙ্গণের একদিকের দেয়াল ভাঙিয়া এই সময় সরকারী রাস্তা বাহির করা হয়। শিখ সম্প্রদায় ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সরকার এবং শিখদিগের মধ্যে একটা আপস-রফা হয়। যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে গুরুদ্বারার ভগ্ন-প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য নূতন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্দার শার্দুল সিং কাভি-সারের নাম সর্বাগ্রে (Sardar Sardul Sing Caveshar) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। সরকার অবশেষে শিখদিগের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। নাভার রাজা রিপুদমন সিং এবং পাঞ্জাবের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকল্যাগান এই বিরোধ মিটাইতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। অল্পদিন পরেই কানাডা প্রত্যাগত কোমাগাটা মারু (Komagata Maru) জাহাজের যাত্রিগণের উপর পুলিস গুলী চালায়। পুলিসের গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন যাত্রী হতাহত হয়। ইহারা প্রায় সকলেই শিখ। কলিকাতার উপকণ্ঠে বজবজে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে জেনারেল ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র নিরুপদ্রব জনতার উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১,৬০০ লোক হতাহত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন শিখও ছিল।

এই সমস্ত কারণে শিখ সম্প্রদায়ের প্রভূত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই সময়েই তাহাদের গুরুদ্বারা আন্দোলন আরম্ভ হয়। শিখ ধর্মমন্দিরগুলি এই সময় পুরোহিত-দের কর্তৃত্বাধীন ছিল। মোহান্তেরা প্রায় সকলেই হিন্দু। ইহারা নানাপ্রকারে যাত্রীদের উপর জুলুম করিত। পুরোহিতদিগের অনেকেই চরিত্রহীন ছিলেন এবং দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তীর্থস্থানগুলিকে ইহাদের কবল-মুক্ত করিবার জন্য আন্দোলন গুরুদ্বারা আন্দোলন নামে পরিচিত। আকালি দলের নেতৃত্বে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব এবং অহিংসভাবে পরিচালিত হয়। শিখগণ এই আন্দোলনে অসাধারণ সংযম এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছে। ত্যাগ-স্বীকারও তাহারা কম করে নাই। এই আন্দোলন ব্যর্থ হইল না। ১৯২৫ সালে শিখ গুরুদ্বারা আইনের (The Gurudwara Act, 1925) বলে শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি (Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee সংক্ষেপে S. G. P. C.) পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান শিখ মন্দির-গুলির পরিচালনার ভার লাভ করিলেন। এই কমিটির সদস্যগণ সকলেই শিখ।

শিখ আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। কিন্তু সরকার শিখদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুদ্বারা

আন্দোলনের পূর্বে ভারতীয় বাহিনীর শতকরা ১৯·২ জনই ছিল শিখ। এই আন্দোলনের পর ১৯৩০ সালে ভারতীয় বাহিনীতে শিখের সংখ্যা শতকরা ১৩·৮ জনে নামিয়া আসিয়াছিল। গুরুদ্বারা আন্দোলনের সফলতা আকালি দলের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু আকালি নেতৃবৃন্দের ঔদ্ধত্য এবং অদূরদর্শিতায় এই সময় হইতেই হিন্দু-শিখ সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিল।

১৯৩১ সালে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে শিখ প্রতিনিধিগণ প্রথমত সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ উচ্চ-বাচ্য করেন নাই। কিন্তু পরে মুসলমান, হরিজন, প্রবাসী ইউরোপীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ একযোগে মহাত্মা গান্ধী এবং বৃটিশ সরকারের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে শিখ প্রতিনিধিগণও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইনে (Government of India Act, 1935) শিখ সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন এবং রক্ষাকবচের ব্যবস্থা হওয়ায় তাহাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরও সমৃদ্ধ হইল। এদিকে আকালি নেতারা শিখদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তাহারা হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং হিন্দু ও শিখ-স্বার্থ পরস্পরবিরোধী।

এই বিভেদনীতি এবং সরকারী ভেদনীতির ফল ফলিতে দেরী হইল না। ১৯৪০ সালে ভারত বিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইতেই স্বতন্ত্র শিখস্থান বা খালিস্থানের দাবি দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে।

১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের নিকট আকালিদলের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়, তাহাতে অন্যান্য দাবির সঙ্গে শিখরাষ্ট্র স্থাপনের দাবিও জানানো হয়। এই স্মারকলিপিতে বলা হয় যে, স্বতন্ত্র শিখরাষ্ট্রের দাবি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের দাবির মতই যুক্তিসঙ্গত এবং শিখ রাষ্ট্রের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান রাষ্ট্রের দাবিতেও যেন কর্ণপাত করা না হয়। ("The Sikhs have as good a claim for an Independent Sikh State as the Mussalmans".... "The claim for a Muslim Pakistan should not be conceded to the Mussalmans without at the same time conceding the claim for an independent Sovereign State to the Sikhs"—The Cabinet Mission in India).

১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাঞ্জাবের হিন্দু, শিখ এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আকালি দলের সম্পাদক জ্ঞানী কর্তার সিং একটি স্বতন্ত্র শিখরাজ্য স্থাপনের দাবী উপস্থিত করেন। ("The Sikhs should be allowed to form an independent State of their own in Northern India") (লাহোর হইতে প্রকাশিত 'ট্রিবিউন' (Tribune) পত্রিকার ১৯৪৭ সালের ২০শে জানুয়ারী সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৯৪৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মাস্টার তারা সিং বলেন, অখণ্ড ভারতবর্ষে শিখ-রাষ্ট্র স্থাপনই শিখদিগের উদ্দেশ্য ("We want a Sikh State in a united India")। কয়দিন পরে নববর্ষ (১লা বৈশাখ) উপলক্ষে অমৃতসরে সম্মিলিত শিখ সমাবেশেও অনুরূপ দাবী জানানো হয়। 'ট্রিবিউন' পত্রিকার ১৬ই এপ্রিল (১৯৪৬) সংখ্যায় এই সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুন সংখ্যায় অমৃতসরে আরও একটি শিখ সম্মেলনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই সম্মেলনে আকালি দলের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, পূর্ব পাঞ্জাবের যে সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদিগের শতকরা অন্যূন ৮৫ জন শিখ সে সমস্ত অঞ্চল লইয়া শিখরাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। ("The Sikhs have demanded and they reiterated that they should get East Punjab as a Sikh State. All areas that contain 85% Sikh population should be included in such state").

শিখরাষ্ট্র স্থাপনের স্বপক্ষে বলা হয় যে, শিখগণ হিন্দুর তাঁবেদারি করিতে প্রস্তুত নয়। আসল কারণ কিন্তু তাহা নয়। শিখ নেতৃবর্গ আসলেই ভয় করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে শিখগণ হিন্দুসমাজের সহিত মিশিয়া যাইবে এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইবে। কিন্তু যদি একবার কোন-রকমে আর শিখ সম্প্রদায়কে একটি স্বতন্ত্র শিখরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে। ("One of the reasons for the demand for a separate Sikh State by Akali leaders was now hostility between the two communities. In the Sikh State the Sikhs would not only be free of Hindus and Hindu influences, but the Sikh youth would also be persuaded—if necessary compelled to continue observing the forms and symbols of the faith"—The Sikhs by Khushwant Singh, Pp. 184-85).

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান শিখকেই লম্বা চুল এবং দাড়ি-গোঁফ রাখিতে হয়। দিল্লী হইতে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'রিয়াসৎ'-এর সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী নিজে দীর্ঘ-কেশধারী শিখ। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে এই পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় যে, ৭৫ বৎসর পর হয়ত আর একজনও দীর্ঘকেশধারী শিখ দেখা যাইবে না। সম্প্রতি প্রকাশিত একখানা বইতেও অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। ("The magnitude of the trend to abandoning forms and symbols cannot be exaggerated. ...... the dividing line between Sikhs and Hindus is the external appearance of the Sikh. If the process of abandoning the symbols and smoking—continues at the present pace—within a short period of history—fifty years at most—we may witness the remarkable phenomenon of a religious community which achieved the semblance of nationhood disappear in the quicksands of Hinduism"—The Sikhs by Khushwant Singh, p. 180).

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর অল্পদিনের মধ্যেই পাঞ্জাবের শিখ-নৃপতি শাসিত পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা ও কাপুরথালা (Patiala, Jhind, Nabha, Kapurthala) রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইল। এই সমস্ত রাজ্য এবং হিন্দু নৃপতির শাসনাধীন নালাগড় লইয়া পেপসু (PEPSU অর্থাৎ Patiala and East Punjab States Union) রাজ্য গঠিত হয়। পাতিয়ালার মহারাজা ইহার রাজপ্রমুখ এবং কাপুর-থালার মহারাজা ইহার উপরাজপ্রমুখ নিযুক্ত হইলেন।

১৮৪৯ সালে পাঞ্জাবে ইংরেজ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত উল্লিখিত রাজ্যের রাজগণ কর্তৃক না হইলেও নামে রাজক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। তাহাও এইবার গেল। শিখ
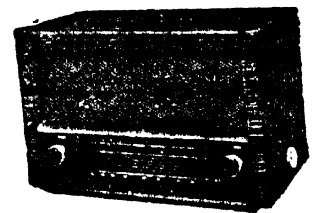
সম্প্রদায়ের মনে নূতন করিয়া ক্ষোভ এবং নৈরাশ্য দেখা দিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীরই স্বাধীনতা একথা তাহারা বুঝিতে চাহিল না। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন শিখ নেতৃবৃন্দ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। যেভাবেই হউক, শিখ সম্প্রদায়ের বেনামীতে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রথমেই দাবি করিলেন যে, পাঞ্জাবের সমস্ত পাঞ্জাবী ভাষার স্কুলে গুরুমুখী অক্ষরে লিখিত পাঞ্জাবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দুগণ এই দাবির বিরোধিতা করিল। বহু বাদ-বিতণ্ডার পর অবশেষে একটা রফা হয়। এই রফা অনুসারে পাঞ্জাবকে পাঞ্জাবী এবং হিন্দী এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত হইল। কথা থাকে যে, পাঞ্জাবী অঞ্চলে গুরুমুখীতে লিখিত পাঞ্জাবী ভাষা এবং হিন্দী অঞ্চলে দেবনাগরীতে লিখিত হিন্দীর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হইবে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নির্দেশে আর একটি শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইল। ইহাতে স্থির হইল যে, পাঞ্জাবী বা হিন্দী অঞ্চলের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যূন ৪০ জন বা যে কোন শ্রেণীর ১০ জন ছাত্রছাত্রী অন্য অঞ্চলের ভাষায় অর্থাৎ হিন্দী বা পাঞ্জাবীতে শিক্ষা লাভের দাবী করিলে তাহাদের দাবী পূর্ণ করিতে হইবে। উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচার এই সময় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহার নাম অনুসারে এই ব্যবস্থা 'সাচার ফরমুলা' (Sachar Formula) নামে পরিচিত। ইহার পূর্বে পাঞ্জাবী ভাষা বা গুরুমুখী বর্ণমালা কোনদিনই সরকারীভাবে স্বীকৃত হয় নাই। তবে কয়েক বৎসর পূর্বে শিখরাজ্য পাতিয়ালার একাংশে গুরুমুখী বর্ণমালা এবং পাঞ্জাবী ভাষাকে সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোঁড়া শিখগণ এইবার আরও সুর চড়াইল। এই সময় মাস্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে শিরোমণি আকালি দল গঠিত হয়। এই দল প্রচার করিতে লাগিল যে, মুসলমানগণ পাকিস্তান এবং হিন্দুগণ হিন্দুস্থান(!) স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে শিখ সম্প্রদায় লাভবান বা উপকৃত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের জন্য খালিস্থান (Khalistan) অর্থাৎ স্বতন্ত্র শিখরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু মাস্টার তারা সিং এবং তাঁহার অনুগামিগণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাবি পূর্ণ হইবার আশা সুদূরপরাহত। তাঁহারা তখন সুর পাল্টাইয়া বলিলেন যে, পাঞ্জাবী সুবা অর্থাৎ পাঞ্জাবীভাষী রাষ্ট্র গঠনই তাঁহাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু খালিস্থান এবং পাঞ্জাবী সুবা একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। শিরোমণি আকালি দল বলিতে লাগিল যে, পাঞ্জাব এবং পেপসুর যে সমস্ত অঞ্চলে শিখগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং উল্লিখিত রাজ্য দুইটির যে যে অঞ্চলে তাহারা মোট জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সে সমস্ত অঞ্চল লইয়া পাঞ্জাবী সুবা গঠন করিতে হইবে।

শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এই সময়েই দাবি করা হয় যে, শিখ হরিজনদিগকে হিন্দু হরিজনগণের মত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। এদিকে কিন্তু শিখধর্মে জাতিভেদের স্থান নাই। শিখ নেতৃবৃন্দ মুখে একথা স্বীকার করিলেও দলীয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের খাতিরে শিখধর্মের একটি মূল নীতিকেই কার্যতঃ অস্বীকার করিলেন। ধর্মকে রাজনীতির আসরে টানিয়া আনিলে এইভাবেই তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যুক্তি দেখানো হইল যে, শিখ হরিজনগণ শিখধর্ম গ্রহণে সম্মত হয় না এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভেই উত্তর প্রদেশের দুই লক্ষ শিখ হরিজন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে হিন্দু হরিজনগণের ন্যায় শিখ হরিজনদিগকেও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে সম্মত হইলেন। শিখধর্ম জাতিভেদ স্বীকার করে না বলিয়াই ভারতীয় সংবিধানে পূর্বে শিখ হরিজনদিগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই। দোষ বা দায়িত্ব সরকারের নহে

আকালি নেতৃবৃন্দ **এই সময়েই** বলিতে আরম্ভ করেন যে, কেন্দ্রীয় এবং পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন চাকুরিতে শিখগণের ন্যায্য দাবী উপেক্ষিত হয় এবং জনসংখ্যার অনুসারে তাহাদিগকে চাকুরি দেওয়া হয় না। কিন্তু এই অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁহারা বেশী উচ্চবাচ্য করিতে ভরসা পান নাই। শিখ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী চাকুরিই পাইয়া আসিতেছে। সৈন্য এবং পুলিস বিভাগের ত কথাই নাই।

এদিকে পাঞ্জাবী সুবা অর্থাৎ শিখস্থানের দাবী দিনের পর দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। যেখানে সেখানে পাঞ্জাবী সুবার অনুকূলে আওয়াজ তোলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। বিভিন্ন শিখ গুরুর জন্মদিনে যে সমস্ত শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহাতেও 'পাঞ্জাবী সুবা জিন্দাবাদ', 'রাজ করে খালসা' অর্থাৎ খালসার (গুরু গোবিন্দের অনুগামী শিখগণ) রাজত্ব করিবে ইত্যাদি জয়ধ্বনি এই সময় করা হইত। গুরু নানকের জন্মদিনের শোভাযাত্রায় এই সমস্ত ধ্বনি লেখক নিজের কানে শুনিয়াছেন। পাঞ্জাবের সর্বত্র এবং উত্তর প্রদেশের কোন কোন জায়গায় পাঞ্জাবী সুবার দাবির সমর্থনে সভা-সমিতি হইতে লাগিল। এই সমস্ত সভা-সমিতিতে গরম গরম বক্তৃতা করিয়া শিখগণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টাও এই সময় কম হয় নাই। নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহই বোধহয় মাস্টার তারা সিং-এর মত কথায় অসংযমের পরিচয় দেন নাই। একাধিক জনসভায় তিনি বলেন যে, শিখগণ প্রবল প্রতাপশালী মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে (কথাটা একেবারেই মিথ্যা। আফগানগণের আক্রমণেই পাঞ্জাবে মোগল শক্তি ধ্বংস হয়। শিখগণ পরে আফগানদিগকে পাঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দেয়।) সুতরাং কংগ্রেস সরকারের শিখদিগের দাবী অগ্রাহ্য করিবার মত শক্তি বা সাহস নাই। আকালিদিগের সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রায় অনবরত হিন্দু এবং নেহরু-বিরোধী ধ্বনির ফলে পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

১। 'ধোতি টোপি যমুনা পার' অর্থাৎ যাহারা ধুতি এবং টুপি পরে তাহাদিগকে (হিন্দুগণকে—শিখরা ধুতি এবং টুপি কোনটাই ব্যবহার করে না—যমুনা নদীর পরপারে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। সোজা কথায় পাঞ্জাবে হিন্দুর স্থান হইবে না।

২। 'খান্ডা খড়কু, নেহরু ভাজকু' অর্থাৎ (শিখ) অসি ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠিলে নেহরু পালাইবার পথ পাইবেন না। সোজা কথায় শিখগণ বিদ্রোহী হইলে নেহরু সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী।

এইরকম আরও অনেক আছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

সাত
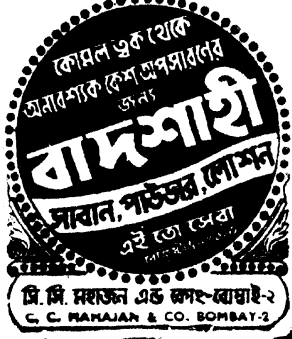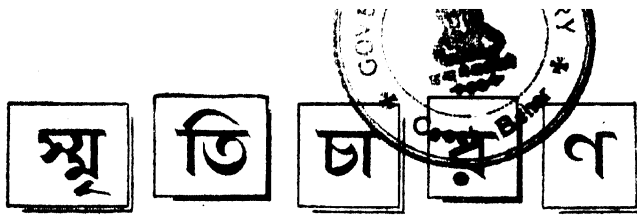
আমি এ-ধরনের যুক্তিতে অস্বস্তি বোধ করতাম আরো এইজন্যে যে, আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করতে পারিনি—শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, মীরা, দাদূ, তুলসীদাস প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধকদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল ভারতের দুঃখকে ছেড়ে নিরন্তর দুর্গতদের জন্যে অন্নসংস্থান করা। তাই সুভাষের মহাপ্রাণতাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মৃদু প্রতিবাদ না করে থাকতে পারতাম না, বলতাম: "কিন্তু তাই বলে কি তুমি বলবে যে, সব আদর্শবাদীই এক গোয়ালে মাথা মুড়োবে? না বলবে—স্বামীজীর জীবনের আদর্শ মহৎ ছিল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, পরমহংসদেবের জীবনের আদর্শ মহত্ত্বে খাটো? তিনি কি অক্লান্তভাবে বলেন নি, ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য?"

সুভাষও একথায় একটু বিব্রত হত বৈকি, কারণ পরমহংসদেব যে ভগবৎসাধনায় ঐকান্তিকতাকেই সবচেয়ে বড় আদর্শ বলে মনে করতেন একথা কেউ অস্বীকার করতে পারত না গায়ের জোরে ছাড়া। তাই এ-যুক্তিতে খানিকটা পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। না যেয়ে করে কি? তার্কিক হিসেবেও সে তো কিছু কম কুশলী ছিল না। তাই আমাকে কাবু করতে বলত: "কিন্তু এখানে গোল বাধে কোথায় বলব? তাঁর স্ববিরোধী উক্তিতেই। হ্যাঁ দিলীপ, স্ববিরোধী ছাড়া এর কী নাম দেব বলো? মনে নেই তোমার—স্বামীজী যখন তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি যখন সমাধিতে বুঁদ হয়ে থাকবেন তখন তিনি কী বলেছিলেন?—বলেছিলেন: 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি রে। আমি চাই, তুই বিরাট বটের মতন হবি, ত্রিতাপে তাপিতকে আশ্রয় দিবি তোর ছায়ায়।' বলেন নি যে, স্বামীজীকে লোকশিক্ষা দিতেই হবে?"

আমি: বলেছিলেন মানি। কিন্তু তিনি তাঁর জন শিষ্যদের কী বলতেন সেটাও ভুলো না: লোকশিক্ষা দিতে হলে সব আগে চাই ভগবানের আদেশ পাওয়া—চাপরাশ—যাকে ইংরাজীতে বলে sanction.

তর্কাতর্কি আমাদের চলত এইভাবেই—কোনো নিষ্পত্তি হত না। কিন্তু তাই বলে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে আমরা তর্কের জন্যেই তর্ক করতাম। সুভাষ আমার কাছে তার দেশসেবার আদর্শ পেশ করত দেশকে সে প্রাণাধিক ভালোবেসেছিল বলে, আর আমি তার এ-মতে সায় দিতে না পারলেও তার কথায় কান দিতাম তাকে ভালোবেসেছিলাম বলে। কাজেই আমাদের মতভেদও আমাদের অন্তরঙ্গতাকে ব্যাহত করত না, আরো গভীর করত।

কিন্তু শুধু দেশের সম্বন্ধে নয়, সুভাষ যাই বলুক না কেন, আমি শুনতাম সাগ্রহে, খানিকটা মুগ্ধভাবে, শিক্ষার্থীর মতনই বলব। এর একটা কারণ—ওর কথার পিছনে ছিল ওর সমগ্র ব্যক্তিরূপের সংহত আলো, বল, তেজ। একটা দৃষ্টান্ত দেই।

মেয়েদের সঙ্গে আদৌ ও মিশত না বিলেতে। শুধু মেয়েদের সঙ্গবর্জন নয়—যাঁরা ওকে বিলেতে দেখেছিলেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য দেবেন যে, বিলেতে যৌবনে ও কোনো ইংরাজ মেয়ের দিকে এমন কি চোখ তুলেও তাকায় নি। আমাদের ছাত্রসমাজে ওর এই ধরনের সেকেলে "ভালোছেলেমি"কে কেউ যে কখনো কটাক্ষ করত না এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু একটুও অত্যুক্তি হবে না, যদি বলি যে, ওকে যারা aloof, high-brow, Victorian Puritan প্রভৃতি বিশেষণে দেগে দিয়ে আড়ালে আবডালে ব্যঙ্গ করত, তারাও মনে মনে ওর পবিত্রতা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাকে সমীহ না করে পারত না। কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা নারী সম্পর্কে আলোচনায় খুবই নিষ্পরোয়া ঢঙে কথা কইত—যেমন সর্বত্রই সমর্থ ছেলেরা করে থাকে। কিন্তু সুভাষের সামনে কেউ কোনোদিন অশ্লীল আলোচনা করতে সাহস করেনি—এমনই ছিল ওর ব্যক্তিরূপের প্রভাব। এ সম্বন্ধে একটা কথা হঠাৎ মনে হল, লিখি না।

আমি ১৯১৮-য় গণিত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ হই, তৃতীয় হয়েছিলেন কিরণ দে বলে একটি মেধাবী ছাত্র। ইনি পরে কেম্ব্রিজে ট্রাইপসে বি-স্টার র‍্যাংলার হন—ওখানকার গাণিতিক পরীক্ষার সর্বোচ্চ উপাধি। কেম্ব্রিজে তিনি মাঝে মাঝেই আমার ঘরে আসতেন ও বলতেন, বেশ চেঁচিয়ে উঠে।

"দিলীপদা! আজ দেখে এলাম ক্যাম নদীর তীরে এক নিভৃত কুঞ্জে...বুঝতেই তো পারছেন...দুজন...উঃ কী কাণ্ডই যে করে এরা! এদের লজ্জা বলে কি কিছু নেই?"

কোনোদিন হয়ত এসে বলতেন: "কাল লণ্ডনে গিয়েছিলাম হ্যাম্পস্টেড হীথে—সেখানে আরো এক কীর্তি দেখে আমি তো থ দিলীপদা। পাশাপাশি বেঞ্চিতে দুজন দুজন করে...কী দুর্দান্ত ব্যাপার...সবার সামনে...বুঝতেই তো পারছেন...ঠিক আর মনে পড়ে যায়—চণ্ডীদাসে পড়েছিলাম—যৌবন অতি বিষম কাল। তখন বুঝতে পারিনি কেন? আজ সব জলের মতন সাফ হয়ে গেছে"...বলতেই সে কী খিল খিল করে হাসি! আমিও না হেসে থাকতে পারতাম না।

একদিন কী কথায় কথায় আমি হাসতে হাসতে সুভাষকে বলি: "জানো সুভাষ, কিরণদা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, যৌবন কেন বিষম কাল!"

সুভাষের মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল: "মানে?"

আমি বললাম—কিন্তু বাদ সাদ দিয়ে অবশ্য।

সুভাষের চোখে তীব্র বিরক্তির আভা জ্বলে উঠল, বলল: "কিরণ দের যদি এসব এতই সন্দেহকর মনে হয় তাহলে যান কেন হ্যাম্পস্টেড হীথে বা এখানকার ক্যামের তীরে যত সব নিভৃত কুঞ্জে?"

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম, সুভাষ যে কিরণ দের রসিকতাকে এভাবে নেবে আমি ভাবতে পারিনি। বললাম: "কিন্তু কিরণদার অপরাধ কি?"

সুভাষ (উদ্দীপ্ত): অপরাধটা তবে কার শুনি? ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে না "Every nation gets the Government it deserves?" মানুষ সম্বন্ধেও ঐ কথা। এসব কুকীর্তি ঘাড় ঘাড় তাদেরই চোখে পড়ে যারা খোঁজে নিভৃত কুঞ্জের আনাচে কানাচে। কিরণ দে এসব নিয়ে রিসার্চ না ক'রে যদি গণিত-রিসার্চে আর একটু মন দিতেন তবে নিজের সুনামও বাঁচত, দেশের টাকা তথা মানেরও মর্যাদা

গানও তাঁদের ভালো লাগে। তাঁরা আমাদের উভয়কেই নিমন্ত্রণ করেন। সুভাষ সোজা "না" ক'রে দেয়। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ "হাঁ" ব'লে তাঁদের মনোরম স্নেহনিলয়ে গিয়ে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাই। অতঃপর সুভাষ আই সি এস পাশ ক'রে চাকরিতে ইস্তফা দিলেই ডাক্তার ধর্মবীর আমাকে ভার করেন সুভাষকে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে ও কোনো প্রকারে তাঁদের ওখানে ধ'রে নিয়ে যেতে। সুভাষ প্রথমে যেতে রাজী হয়নি কিন্তু আমিও তো কম নাছোড়বান্দা নই, গেলাম তাকে নিয়ে অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে। সুভাষ সেখানে গিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মিসেস ধর্মবীরের সরল স্নেহে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে দিদি পাতায়। ডাক্তার ধর্মবীরকেও সুভাষ ভালোবেসে ফেলল—আরো তাঁর জ্বলন্ত স্বাদেশিকতা তথা আন্তরিক স্নেহশীলতার দরুণ। সেখানে আমাদের সপ্তাহকাল সে যে কী আনন্দেই কেটেছিল! সময়ের যেন পাখা উঠেছিল। আনন্দমেলা ভাঙবার দিনে সুভাষের কাছে উদ্ধৃত করেছিলাম পিতৃদেবের একটি কবিতার দুটি চরণ:

সুখের বছর হয় যে গত
একটি ছোট দিনের মত
দুখের বছর যুগের মত কাটে।
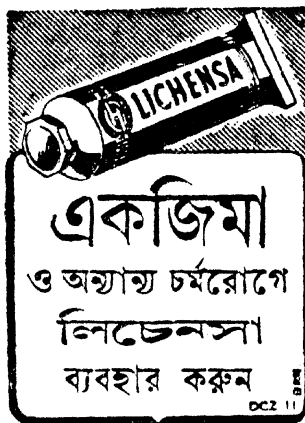
মনে আছে যেদিন আমরা ওঁদের কাছে বিদায় নিই সেদিন ধর্মবীর দম্পতির আমাদের স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দেওয়ার কথা। সুভাষ খুব গম্ভীর মুখেই "গুড বাই" বলল বটে, কিন্তু বলবার সময়ে ওর চোখের তপস্বী আলো বেশ নরম হয়েই এসেছিল। তবু ও সামলে নিল কোনোমতে, কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই হ'ল ওর ভাবান্তর। দেখি কি, আমাদের প্রত্যেকের আসনে দুটি মোড়ক। সামান্য উপহার—বাদাম ভাজা ও চকলেট। কিন্তু অমনি সুভাষের চোখে জল। ও বলল: "women will be women!" নারী সম্বন্ধে এই-ই ওর প্রথম প্রশস্তি—য়ুরোপে। তাই আমার কাছে অবিস্মরণীয়। এর পরের বার যখন আমি ওঁদের অতিথি হই তখন মিসেস ধর্মবীর আমাকে দেখান সুভাষের একটি দীর্ঘ পত্র। তাতে ও লিখেছিল যে, তাঁকে যে ও দিদি ব'লেই বরণ করে নিয়েছিল একথা যেন তিনি অবিশ্বাস না করেন। লিখেছিল: "আমি দিলীপের মতন সহজে বন্ধুত্ব পাতাতে পারি না—বিশেষ ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু আপনাকে আমার একবারও মনে হয়নি বিদেশিনী। বরং বলব আপনার স্নেহে আমি এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, হয়ত সময়ে সময়ে ইংরাজের অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি, যা আমার বলা উচিত ছিল না। সে-সব অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করবেন...." ইত্যাদি আরো অনেক কিছু লিখে শেষে লিখেছিল: "আমার আড়ষ্টতার জন্যেও আমাকে দুষবেন না কারণ it is easier for a leopard to change his spots than it is for me to come out of the shell of my reserve in a mixed company".

বলেছি ডাক্তার ধর্মবীর ছিলেন সবগুণ দেশভক্ত, কিন্তু বলা হয়নি যে, তিনি আর্যসমাজী হ'লেও মেমকে গৃহিণী পদে বরণ করেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর একটি রসিকতা আজও মনে আছে বাঁধা।

একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি মেম বিয়ে করলেন কী দুঃখে? তাতে তিনি উত্তর দেন: "ভাই, তুম লোগ তো বাঁদরকো মেম বনাতে হো আর হম—হম না কিয়া তো মেমকো বিবি বনা দিয়া?" মিসেস ধর্মবীর এ-রসিকতাটি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। "এমন নির্মল মিষ্টি হাসি আমি এদেশে বড় বেশি দেখিনি—" বলত সুভাষ প্রায়ই। আমি বলতাম: "তুমি এদেশবাসীর সঙ্গে মিশলে তবে তো দেখবে?" সুভাষ একটু চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর মুখে বলত: "যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে তখন মিশব—সমানে সমানে।"

আমি: তোমার কি মনে হয় এখন মিশতে গেলে—

সুভাষ: হাঁ—ওরা খানিকটা পিঠ চাপড়ে মিশবে। (patronise কথাটিই সে ঘাড় ঘাড় ব্যবহার করত এ সম্পর্কে)

আমি: কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি ইতিমধ্যেই এমন ইংরাজ বন্ধু পেয়েছি যিনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করেন।

সুভাষ: তোমার কথা আলাদা ভাই। তুমি যে দিতে পারো নিজেকে—গানে, গল্পে আলাপে।

আমি: আর তুমি পারো না? বাঃ।

সুভাষ: বাঃ নয় ভাই। আমি হয়ত পারব একদিন—কিন্তু এখন এদেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে আমার বাধে। তাছাড়া, সকলের স্বধর্ম এক নয়। তুমি যা পারো আমি তো তা পারি না।

আমি (হেসে): কেন এ-মিথ্যে কমপ্লিমেণ্ট সুভাষ, যখন বেশ জানো যে, তুমি যা পারো তা কোটিতে কোটিতেও পারে না!

ওর সঙ্গে ধর্মবীর-ধামে আমাদের মধ্যে এই ধরনের উক্তি প্রত্যুক্তি হ'ত প্রায়ই। সময়ে সময়ে ডাক্তার ধর্মবীর তাতে যোগ দিতেন তাঁর প্রাণখোলা হাসি নিয়ে। বলতেন, সুভাষের সঙ্গে সায় দিয়ে যে তিনিও ইংরাজদের "অভ্যাগমকী" সাধুতে বিশ্বাস করেন না, কেননা আমরা যতদিন না স্বাধীন হব ততদিন ওরা আমাদের কালচারের মধ্যে দুটিকটাক এক-আধটা মনোহারিক সারাংশ বললেও কিছুতেই মানতে পারবে না সত্যতায় আমরা ওদের সমকক্ষ। সুভাষ খুশী হয়ে আমাকে বলত বিজয়ী ভঙ্গিতে: "এবার?"

আমি কোণঠাসা হয়েই উত্তর দিতাম বলতাম: "এবার মানে? ডাক্তার ধর্মবীর এদেশে অনেকদিন আছেন, কাজেই তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদেরও মেনে নিতে হবে নাকি প্রমাণ বাক্য? না ভাই, ওতে আমি নেই। আমি হলুই উন্নাসিক হই না কেন, এই এক জায়গায় আমি আত্মপ্রত্যয় যা, পরের মুখে ঝাল খেতে আমি নারাজ—তা সে-পর ভাক্তারই হোক না—

ডাক্তার ধর্মবীর (হেসে): দেশভক্তই হোক, এই না?

এই ধরনের তর্ক থেকে হাসি, হাসি থেকে গল্প, গল্প থেকে শেষে গানে শেষ হ'ত আমাদের আনন্দ-সহবাস। মিসেস ধর্মবীর গানে ছিলেন বিশেষ পটু—তাই গানের আসর তাঁর সহযোগে আরো জমে উঠত।

ডাক্তার ধর্মবীর ছিলেন শুধু যে নিরামিষাশী তাই নয়—তার উপর না সুরাপান, না নাচানাচি, না থিয়েটার-সিনেমা। কাজেই সুভাষের সঙ্গে তাঁর খুব বনত। না বনে পারে? একজন আর্যসমাজী দেশভক্ত, অন্যজন বিবেকানন্দপন্থী দেশনায়ক ইংরাজী উপমায় 'যেন দস্তানার সঙ্গে হাতের মিতালি'।

(ক্রমশ)

গোচর বিমানঘাঁটির রাণা ফৌজ বিক্ষুব্ধ জনতাকে লাঠি চার্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিতেছে।

ইহা ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত কাঠমাণ্ডু উপত্যকার অগণিত নর-নারীর অদৃষ্টপূর্ব সমাবেশ। ইংরাজের বৈদেশিক দফতরের দূরপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ স্যার এলসার ডেনিং মোহন সামসেরের সহিত আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে কাঠমাণ্ডু আসিতেছিলেন। কিন্তু মুক্তিকামী কাঠমাণ্ডুর জনসাধারণ সন্দেহ করিল যে ইংরাজ তাহার হীন স্বার্থ সিদ্ধির মানসে মোহন সামসেরের ক্রীড়নক শিশু রাজাকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্যই দূত প্রেরণ করিয়াছে। কাঠমাণ্ডুবাসী মুক্তিসংগ্রামের পরিপন্থী কার্যকলাপ কোনমতেই সহ্য করিবে না। স্যার এলসার বিমান হইতে অবতরণ করিবামাত্র গোচর অবতরণ ঘাঁটি এক বিক্ষোভময় রূপ ধারণ করিল। রাণা ফৌজের উন্মত্ততার উগ্রতায় বহু নিরস্ত্র কাঠমাণ্ডুবাসীর জীবন বিপন্ন হইল। আহতের আর্তনাদে উল্লসিত হইল মোহন সামসেরের খুনীর দল। নবতর উদ্যমে রাণা ফৌজ কাঠমাণ্ডু উপত্যকার মানুষের বিরুদ্ধে পৈশাচিক প্রতিহিংসা গ্রহণে লিপ্ত হইল। কিন্তু ইহা দমন করিতে পারিল না কাঠমাণ্ডুবাসীর মুক্তি আকাঙ্ক্ষার অদমনীয় দৃঢ়তাকে। এই অবস্থায় ত্রিদলীয় দিল্লীর আপস আলোচনা ব্যর্থ হইল। মোহন সামসেরের দূত কাঠমাণ্ডু প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইতোমধ্যে ধানকুটার পথে রাণা ফৌজের বিরাটনগর অভিমুখে অভিযান ক্রমশঃ এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল। রাণা ফৌজের অগ্রগতি রোধ করিবার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল ধানকুটা অঞ্চলের মুক্তিসংগ্রামীদের উপর। প্রয়োজনীয় হাতিয়ার এবং তদুপযোগী রসদ তথাকার মুক্তিসংগ্রামীদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাই স্থির ছিল যে, রাণা ফৌজের অগ্রগতি রোধে অসমর্থ হইলে কাঠমাণ্ডু এবং বিরাট-নগরের সহিত সংযোগ পথের উপর অবস্থিত সেতুটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু কার্যকালে ইহার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হইল। মুক্তি ফৌজের অমার্জনীয় অসাবধানতার ফলে রাণা ফৌজ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি দখল করিয়া লইল। ধানকুটার এই বিপর্যয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়, এই সম্পর্কে নীরবতা রক্ষিত হওয়াই বোধহয় শ্রেয় ছিল। কিন্তু ইতিহাসের কঠিন দাবী মিটাইবার জন্য সত্যের—তাহা যত অপ্রিয় হউক না কেন—অপলাপ করা আদৌ উচিত হইবে না। ধানকুটা অঞ্চলের মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে কয়েকজন কম্যুনিস্ট বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। এই এলাকায় মুক্তিসংগ্রাম শুরু হইবার সময় তাঁহাদের অধিকাংশ কমিউনিস্ট নাম-সর্বস্ব কারণের জন্য ছিল। যদিও মুক্তি-সংগ্রাম সম্পর্কে দলের বিরোধী অভিমত থাকা সত্ত্বেও কেহই চিন্তা করে নাই যে নেপালের মুষ্টিমেয় কম্যুনিস্ট জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করিবে। কিন্তু নেপালের মুষ্টিমেয় কম্যুনিস্ট ঠিক তাহাই করিল। মুক্তিসংগ্রামীদের নিকট প্রাপ্ত হাতিয়ার সমেত তাহারা ধানকুটার সংগ্রাম ক্ষেত্র মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার এক জঘন্যতম নিদর্শন স্থাপন করিল। এদিকে বিরাট-নগরের কাছে মাইল পাঁচেক কোশী নদীর তীরে অবস্থিত কুশাঘাটে রাণাফৌজ আঘাত হানিল। কোশী অতিক্রম করিয়া বিরাটনগর আক্রমণ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। রাণাফৌজের নদী অতিক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বিরাটনগরের দিক হইতে মুক্তিফৌজের একটি অংশ কোশীর তীরে প্রেরিত হইল। গিরিজা এবং বিশ্বেশ্বরের সহিত বিহারের বিশিষ্ট সোস্যালিস্ট কর্মী ডাঃ কুলদীপ ঝা মুক্তিফৌজের সহিত কোশী নদীর তীরে হাজির হইলেন। প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও মুক্তিফৌজ রাণা-সৈনিকের নদী অতিক্রমণ প্রতিরোধ করিল।

দিল্লীর আলোচনা ব্যর্থ হইবার পর রাণাফৌজ নেপালের প্রতিটি কেন্দ্র হইতে মুক্তিফৌজকে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রত্যাক্রমণ শুরু করিল। স্থান বিশেষে সাময়িক সফলতা সত্ত্বেও মুক্তিফৌজের অগ্রগতি অব্যাহত রহিল। দার্জিলিং-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত ইলাম শহর মুক্তিফৌজের দখলে আসিল। এই সংগ্রামে অপূর্ব সাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিল

মুষ্টিমেয় মুক্তিযোদ্ধা। প্রায় বিনারক্তপাতে ইলাম শহরে উত্তোলিত মুক্তিফৌজের পতাকাকে অভিবাদন জানাইল আত্মসমর্পণকারী রাণা-সৈনিক। দার্জিলিং-এর সমাজবাদী আন্দোলনের যোগ্য সৈনিক ছেমজঙ্গ এবং বসন্ত ঘোষ প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজবাদী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইলামের সংগ্রাম ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। বিরাটনগরের পঞ্চাশ হইতে সত্তর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ভোজপুর, খোটাঙ্গ এবং বসন্ত ঘোষ, প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজ-প্রচুর রক্তক্ষয়ের পর। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের সফলতা সত্ত্বেও বিরাটনগরের অচল অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিল না। মুক্তিফৌজ-বেষ্টিত উত্তমবিক্রমের প্রাসাদ অত্যাশ্চর্য দৃঢ়তার সহিত মুক্তিফৌজের অগ্রগতির পথে পাষাণ প্রাচীরের ন্যায় অটল। ধীরে ধীরে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্বাসিত কয়েক শত রাণা-সৈনিক মজুত রসদ গ্রাস করিতে লাগিল, তথাপি আত্মসমর্পণের কোন আগ্রহ তাহারা জানাইল না। এই অচল অবস্থার শীঘ্রই অবসান ঘটান প্রয়োজন। অধিককাল এই অচল অবস্থা স্থায়ী হইলে মুক্তিফৌজের সংগৃহীত গুলীবারুদ নিঃশেষ হইয়া এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব যে কোন উপায়ে রাণা ফৌজের প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করিতে হইবে। বিশেশ্বর সুব্বার নিকট জানিতে চাহিলেন, এই বিষয় তাঁহার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা? সুব্বা তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অপর সাথীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি এই সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জানাইবেন। সুবর্ণ সামসের অন্য সংগ্রামক্ষেত্র পরিদর্শন উপলক্ষে বিরাটনগরে অনুপস্থিত ছিলেন। স্থির হইল যে তিনি দুই একদিনের ভিতরে বিরাটনগরে ফিরিয়া আসিলে, বিশদ আলোচনা করিয়া এই সম্পর্কে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

পুনরায় দিল্লীর দ্বারস্থ হইলেন অস্থ-সর্বস্ব মোহন সামসের। মুক্তিফৌজের দুর্বার অগ্রগতির দুরন্ত প্রবাহে রাণা-ফৌজের প্রতিরোধের সকল বাঁধ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। মোহাবিষ্টের ন্যায় মোহন সামসের দিল্লীর অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন এই ভরসায় যে, ইহার দ্বারা হয়ত সর্বাত্মক সর্বনাশের সর্বগ্রাসী বেষ্টনী হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। দিল্লী সরকার নেপালের প্রধানমন্ত্রী মোহন সামসের জঙ্গ বাহাদুরের নিকট হইতে পত্র পাইলেন। লোকসভায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করিলেন যে, মাসাধিক কালের মধ্যেই নেপালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেটা ডিসেম্বরের একুশ তারিখ।
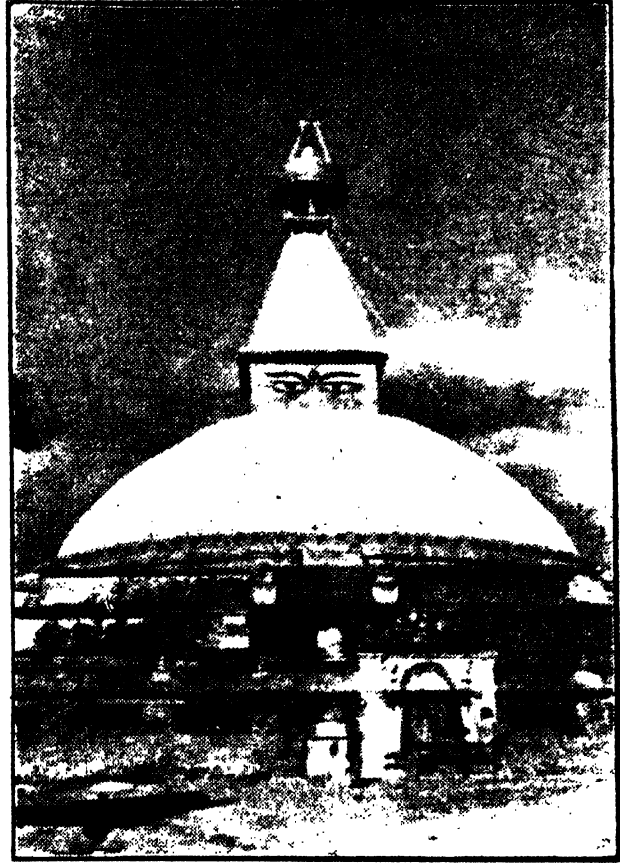
কাঠমাণ্ডু হইতে তিন মাইল দূরে বোধনাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তূপ: মহাকালের জাগ্রত চক্ষু যেন নেপালের অতীত ও বর্তমানের সাক্ষ্য

কোন বক্তির পরিকল্পনা ছিল সেটা, আজ তাহা স্মরণ করিতে অক্ষম। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ছিল দুঃসাহসী। একটি সুবৃহৎ কাটার পিলার ট্রাকটারকে ইস্পাতের চাদরে আচ্ছাদিত করিয়া উহার উপর কয়েকটি ব্রেনগান স্থাপিত হইল। কাটার-পিলার ট্রাকটার একটি ক্ষুদ্র ট্যাঙ্কে পরিণত হইল। স্থির হইল, এই সচল দুর্গটি উত্তমবিক্রমের প্রাসাদের সীমানা-প্রাচীরের এক অংশ চূর্ণ করিয়া দিবে এবং এই পথে ট্যাঙ্কের পশ্চাতে অগ্রসরমান মুক্তিফৌজ প্রাসাদে প্রবেশ করিবে। পরবর্তী কার্যের নির্দেশ দিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না।

নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারেই প্রত্যেকটি নির্দেশ মুক্তিফৌজ পালন করিল। ডিসেম্বর মাসের তেইশ তারিখে মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে আরও একটি রক্তাক্ষরে লিখিত গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হইল। মুক্তি-পাগল সৈনিক পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না মুহূর্তের জন্য। বেয়নেট খচিত রাইফেল হাতে একে একে অগণিত মুক্তি-সৈনিক সেই চলমান যন্ত্রদানবের পশ্চাতে অগ্রসর হইল। শত্রুর অপরিমিত গুলীবর্ষণ অনেককেই বাধ্য করিল ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিতে। কিন্তু সেইদিকে কেহই ভ্রূক্ষেপ করিল না। সেইদিনের মৃত্যু-যজ্ঞে সকলেই নিজেকে সমর্পণ করিতে চায়। অবশেষে প্রাসাদ-প্রাচীর চূর্ণ হইল সেই যন্ত্রদানবের আসুরিক আঘাতে। তারপর শুরু হইল এক নারকীয় অধ্যায়ের। উভয় পক্ষের বহু সৈনিকের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইল একটি বুলেট অথবা বেয়নেটের এক আঘাতের দ্বারা। কর্নেল উত্তমবিক্রম রাণা তাঁহার আহত পুত্র ও পরিবারবর্গ লইয়া মুক্তিফৌজের বন্দী হইলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র সুদর্শন সামসের রাণাসাহীর দানবীয় স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে আত্মাহুতি দিলেন। বিরাটনগরের বন্ধন-মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল।

অতি দ্রুতগতিতে শুরু হইল এইবার নেপালের রঙ্গমঞ্চের পটপরিবর্তন। বাধামুক্ত মুক্তিফৌজ বিরাটনগরের ছাব্বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত ধারান অভিমুখে যাত্রা করিল। রাণা-ফৌজের সমাবেশ হইয়াছে সেই এলাকায়, অতএব উহা চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। মুক্তিফৌজের গতি আর দুর্বার। মুক্ত বিরাটনগরের অগণিত সমস্যার সমাধান আবশ্যক। নেপালী কংগ্রেস সভাপতি মাতৃকাপ্রসাদ সহকর্মীদের সহিত পরামর্শে বসিলেন এই অভিপ্রায় লইয়া। নাগরিক জীবনের জটিলতম সমস্যা ছিল কর্মবঞ্চিত শিল্প শ্রমিকের বুভুক্ষা। মাতৃকাপ্রসাদ বলিলেন যে, বিরাটনগরে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কল-কারখানা পুনরায় চালাইতে নির্দেশ দেওয়া হউক মালিকপক্ষকে। যিনি নির্দেশ পালনে অক্ষম, তাঁহার কারখানা চালাইবার দায়িত্ব নেপালী কংগ্রেস গ্রহণ করিবে। ইহার পর দিল্লীর সহিত মোহন সমসেরের আলাপ-আলোচনায় প্রসংগ উত্থাপিত হইল।
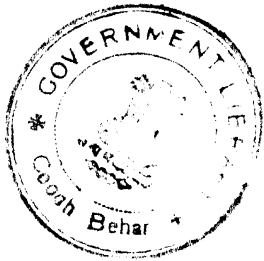
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

ফাদার দ্যতিয়েন

লেখকটি কে?

ভীষণ মাথা ধরেছিল সেদিন; পড়াশোনায় একটুও মন বসছিল না। লিখতে বসলাম 'ডায়েরির ছেঁড়া পাতা'। লেখাটার উপর চোখ বুলিয়ে অমিতাভ রসজ্ঞতা-দ্যোতক ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, "খাসা! ছাপিয়ে দিন 'দেশ' পত্রিকায়।" আমার কপাল ভাল; সম্পাদক মশাই ফেরত পাঠালেন না।

রচনাটি বেরুবামাত্রই চিঠি আসতে লাগল। সোমবার কলকাতার চিঠি, আর পর পর তিন দিন প্রয়াগ, বোম্বাই, কন্যাকুমারিকার......। কেউ বলল পরশুরাম, কেউ বলল মুজতবা—অবশ্য 'অবিশ্বাস্য'-মুজতবা নয়, কাহিনীর চাচা আলী সাহেব। উইলিয়াম কেরি, আস্তা মুলেনস্ ও আন্টনি ফিরিঙ্গির পর্যেই আমার স্থান......। আমার স্টাইল নাকি দু আনা ফরাসী দু আনা বাংলা আর পঁচাত্তর নয়া পয়সা [পৈসে] সম্পূর্ণ নিজস্ব। সারা বাংলায় নাকি প্রশ্ন জেগেছে, বঙ্গসরস্বতীর সেবক এই নতুন আগন্তুকটি কে? আমাদের আটপৌরে সাহিত্যের অন্তঃপুরে পদার্পণকারী এই সাহেবের পরিচয়ই বা কী? বলা বাহুল্য ডায়েরির রচয়িতা লেখকই নন; তাঁর চৌদ্দ পুরুষ সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, কৃষিক্ষেত্রেই উপার্জন করে স্বর্গলাভ করেছেন। ফাদার দ্যতিয়েনের একমাত্র পরিচয় এই যে, তিনি একজন খৃষ্টসন্ন্যাসী—চলিত গৌড়ীয় ভাষায় যাকে বলে ক্যাথলিক মিশনারি।

মালতী-মাধবী

খাতা থেকে চোখ তুলে দেখি, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডুবু। সে এসেছে কাশী থেকে-আসা-মাসীর কেনা নতুন জামা ফাদারকে দেখাতে। আমি বললাম, "বাটিক না কি?". ডুবু অবজ্ঞামিশ্রিত সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিল, "আপনি একদম কিছু জানেন না;" তার পর আমার খাতা দেখে "এত হিজিবিজি মাথামুণ্ডু কী সব লিখছেন?" বলে জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে, বানান করে পড়ল "দন্ত্য স দন্ত্য ন্য নয়ে য-ফলা আ-কার দন্ত্য স দীর্ঘ ই, সন্ন্যাসী......বাঃ, দুর্বাসার কথা লিখছেন না কি?"

"নিজের কথা লিখছি।"

"রাম......আপনি সন্ন্যাসী? আপনার জটা কই? কোথায় আপনার কমণ্ডলু?"

"আগে সংস্কৃত শিখে নাও, তার পর আসবে আমার সঙ্গে তর্ক করতে, দস্যি মেয়ে কোথাকার।"

"ইস, সংস্কৃত জানি না কে বলল? নরঃ নরৌ নরাঃ, ওঁ শান্তিঃ, ভিক্ষাং দেহি... এগুলো বুঝি ফরাসী ভাষা?"

হঠাৎ "ডুবু......উ" সম্বোধনে সিঁড়ি কাঁপতে লাগল।

"মা ডাকছেন......উঠি তা হলে...... আবার আসব, আপনাকে বাটিক শেখাব। মাসীকে গিয়ে বলব আমার ফ্রক আপনার খু......ব পছন্দ হয়েছে......আপনার ফুল নিয়ে যাই কিন্তু; লক্ষ্মীপুজো হবে" বলে আমার ফুলদানি হালকা করে ডুবু দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

"তুই আবার কোথায় গেছলি লক্ষ্মীছাড়া? আজও বুঝি ফাদারকে বিরক্ত করে এলি? পুজোর ফুল কই?"

ডুবু বলল, "নাও।"

সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে উঠল। ফাদার তো অন্য ধর্মের লোক। আজ কিন্তু দৈবচক্রে ডুবুদের বাড়িতে খৃষ্টান ফুল লক্ষ্মীর পায়ে পড়ল। ফাদার লক্ষ্মীঠাকুরকে মানেন না; ডুবুদের ভক্তি কিন্তু শুধু ফাদারের নয়, ভগবানেরই চোখে এক অমূল্য রত্ন।

এক তোড়া মালতী ও মাধবী এনেছিলাম তাদের চিনতে শিখব বলে। উদ্ভিদবিদ্যায় আমি বড় কাঁচা......

হবু জামাই

আমার দরজায় টোকা পড়ল। বাংলো দেশে সাহেব কিংবা বিলেত-ফেরত ছাড়া দরজায় টোকা কেউ দেয় না। ধাক্কা মেরে, শিকল নাড়ে, এমনিও ঢোকে, টোকা দেয় না। চটপট করে টেবিলের বইখাতা গুছিয়ে সাহেবের উচ্চারণে বললাম, 'কাম্ ইন।' দেখা দিল [illegible] শ্যামবর্ণ-তম এক ভদ্রলোক। দেখতে বাঙালী, শুনতে বাঙাল। নাম [illegible]। তিনি বিলেত ফেরত [illegible] ভাবী [illegible] নাকি [illegible] হবু জামাই [illegible] পত্রিকার সম্পাদক [illegible] 'নবা-লোকের' [illegible] সম্পাদক। তিনি নাকি [illegible] চালাবেন পত্রিকা ....

"এতক্ষণ বোঝেন নি, স্যার্? আপনি ত একজন উদীয়মান সাহিত্যিক; আপনার একটু লেখা চাই-ই, সচিত্র, মানে স্বচিত্রসহ, একটি লেখা....." বলতে বলতে পিনাকীবাবু আমাকে নিরীক্ষণ করে নোটবুকে পেন্সিল চালাচ্ছিলেন। আমার ছবি আঁকছেন নাকি? 'নবালোকে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার জন্য আমার সেই ছবি?......ওঁর ঘাড়ের উপর ঝুঁকে দেখলাম—শর্টহ্যাণ্ডের হায়রোগ্লিফ......। আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠল যে হবুজামাই আমার ছবি আঁকছেন, শর্টহ্যাণ্ডে আঁকছেন—উঁচুতে প্রায় ছ ফুট, ওজনে প্রায় দু মণ, দাড়ি আছে, রূপ নেই, রঙ অবশ্য ফরসা। বয়স?...... পিনাকীবাবুর পেন্সিল ইতস্তত করতে লাগল। ফাদার যেন কালাতীত একটা জীব। তাঁর বয়স একটি রীতিমত হেঁয়ালি; কেউ বলে ষাটের উপর। সাহিত্যরসিকদের কানে কানে রজব, ফাদার 'পৃথ্বী'র সমসাময়িক।

পৃথ্বীকে পিনাকীবাবু চেনেন না......

ফাদার-দা

"আপনাকে কী বলে ডাকব?......" সম্বোধন পাল্টানো শিশুর যেন একটা রোগ। পাড়ার সমস্ত প্রতিবেশী তার [illegible], প্রতিবেশীমাত্রেই হয় মাসী আর বাড়িতে যত পুতুল আছে তারাও শিশুর খুড়তুতো ভাই মাসতুতো বোন। আমি বুড়ো মানুষ ফাদারবাবু, হিন্দুস্থানী নাপিতের ফাদারবাড়ি, হয়ে উঠলাম শিশুর ফাদারদাদা। [illegible] ফাদারদা। সম্বোধনটি পাড়াময় ছড়িয়ে পড়ল। ব্রবেন কিন্তু নাছোড়বান্দা, ব্রবেনের কাছে আমি মেমসাহেব।... না, আমাকে বলতে বলবেন না ব্রবেনের কথা। ওর জন্যে মেমসাহেবের বড় কষ্ট হয়। মেয়েটি পড়ে পাড়ার ছাতে টাইফয়েডে মারা গিয়েছে, বিধবা মার একমাত্র সন্তান।

বউদির কথা

আধখোলা দরজার অন্তরালে দেখি একটি কোমল উৎসুক দৃষ্টি যার আপনার কাছে [illegible] অনেক কলম বাঁধতে হল। ফাদারের এই নবাগত ক্ষুদে বান্ধবীর নাম পারুল — না না, কম্পোজিটারবাবু, পারুল নয় পারল্, অর্থাৎ বাণী। বাণীর এক সহপাঠিনীর নাম ছিল বেবি। বেবি মেয়েটি বড় [illegible]। তার নাম ইংরিজী বলে সে মেম সেজে ক্লাসের আর সকলকে খেপাত। বাণী উপবিচার ছেলে আমার কাছে এসে বলল, "আমার নামের ফ্রেঞ্চ করে দিন না, সন্দেশ খাওয়াব আপনাকে।" সে দিন থেকে বাণী হল পারল্।

[illegible] বাণীর মুখ যেন কী রকম থমথমে। [illegible] জিজ্ঞেস করলাম, "এত মন-মরা [illegible] মাদমোয়াজেল পারল্? মিস্ বেবির সঙ্গে আবার ঝগড়া? সে বুঝি বদ নাম নিয়েছে?...ভাবনা নেই, তোর নাম হিব্রু করে দেব আমি।" না, বেবির স্পর্ধা এত দূরে যায়নি, স্কুলের খবর সব ভাল, অন্তঃপুরেই যত অশান্তি। বাণীর চোখে কান্না ভাসছিল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলল, "জানেন ফাদারদা? আমার বউদি ভাল না। বউদি আসার পর দাদাও খারাপ হয়ে গেছে। সারাদিন খালি ওদের বাচ্চার কথাই বলে। আর আমি বুঝি বাড়ির মেয়ে নই? বাবাও এখন ওদের দলে—খুকু ওঁর প্রথম নাতনী

বর্তমানে পৃথিবীর কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ইঁদুরের বুদ্ধিবৃত্তির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ইঁদুর মাঝে মাঝে যে আশ্চর্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিকদের নানা পরীক্ষার ফলে তাদের সম্বন্ধে এখন এমন অনেক কথাই জানা যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় জানা গেছে, ইঁদুর পিঁপড়ে ও মৌমাছির মতই সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী। কোন একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, ইঁদুর মাঝে মাঝে কারিগরি বুদ্ধিরও প্রমাণ দিয়ে থাকে।

ইঁদুর সাঁতার কাটতে পারে, গাছে চড়তে পারে, সুড়ঙ্গ কাটতে ত পারেই। কোন খাবারের সঙ্গে যদি সামান্যতম রঙও মেশানো থাকে—তাহলে তাও ইঁদুরের নজর এড়ায় না, আর সে খাবারের কাছ দিয়েও সে ঘেঁষবে না। ইঁদুর চোর সন্দেহ নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে সেই চৌর্যবৃত্তিতে সে মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়। লুণ্ঠিত মাল যখন ভাগ বাঁটোয়ারা করতে হয়, তখন তারা নিজেদের মধ্যে সেই বাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া করতেও পেছপা হয় না।

শোলমাছের খাবারের জন্য নিউইয়র্কের এক রেস্তরাঁর কর্মী রন্ধনশালার দেয়ালের গায়ে চার ফুট সমান উঁচু এক তাকের উপর এক জার শোলমাছ রেখে অন্য কাজে চলে যায়। হাতের সেই কাজ সেরে যখন সে আবার ফিরে এল, তখন সেই জারে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

পরের দিন আবার সেই ঘটনাই ঘটল। রেস্তরাঁর মালিক একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টি পর্যবেক্ষক আনালেন। রেস্তরাঁর কর্মী জারের আশেপাশে থেকেই তার কাজ করতে লাগল। আর পর্যবেক্ষকের চোখ রইল জারের দিকে।

হঠাৎ দেখা গেল, ইঁদুরদের এক গুপ্তচর এগিয়ে এল, জারের গা বেয়ে বেয়ে উপরে উঠল, আর ভিতরে এক নজর দেখে নিয়েই সরে পড়ল গর্তের দিকে। এর পরই শুরু হল তাদের চৌর্য অভিযান। আস্তে আস্তে গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একের পর আর ইঁদুর। সার দিয়ে সব দাঁড়িয়ে পড়ল গর্ত থেকে জার পর্যন্ত ১০ ফুট রাস্তায়। প্রথম ইঁদুরটি জার থেকে শোলমাছ নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সামনের দুটো পা দিয়ে সেই খাবার ধরে রিলে প্রথায় একে অন্যকে পৌঁছে দিতে লাগল—আর নিমেষেই সেই চোরাই মাল গর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল।

মাঝে মাঝে ইঁদুরের চতুরতাতে তাদের অবিশ্বাস্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেলেও ইঁদুর যে আমাদের শত্রু, সেকথা ভুলে গেলে চলবে না। এক বৃটেনেই সপ্তাহে প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ডের মত ক্ষতি ইঁদুর করে থাকে।

*

একই বাপমায়ের চারটি সন্তান কিন্তু চারজনই বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং পরস্পরের মধ্যে কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয় ছিল না। ওদের পিতা সার্কাসের এক ভাঁড় যাকে অনবরতই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হতো। কোথাও সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে শিশুকে কোন অনাথ আশ্রমে রেখে ওরা অন্যদেশে চলে গিয়েছে।

কয়েকমাস আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় বাপ-মা দুজনেই মারা যায় এবং তারপর যে উইল পাওয়া যায় তাই থেকেই জানা যায় যে ওদের চারটি সন্তান আছে এবং উইলে নির্দেশ দেওয়া ছিল যে ওরা যেন ইতালির কাপরি শহরে মিলিত হয়। তদনু-যায়ী কাপরিতে এসে উপস্থিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমা থেকে মরিয়া; মেক্সিকো থেকে সানফ্রান্সিসকো; ব্রাজিলের রাজধানী বুইন্স আয়ার্স থেকে ফার্নান্দো; এবং পশ্চিম জার্মানীর কলোন থেকে গ্রেশেন।

* * *

চল্লিশোর্ধে জীবনযাত্রা আরম্ভ হয় বলে পাশ্চাত্যে একটা কথা আছে এবং বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের অনেকে কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করছে। মধ্যবয়সীদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠছে দেখে জনকয়েক উৎসাহী লোক মিলে "চল্লিশোর্ধে জীবন-যাত্রা সমিতি" গঠন করে।

প্রথমে সমিতিটি উপহাসের লক্ষ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু বেশীদিন সে অবস্থা রইল না। বর্তমানে "বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ লোকের" জন্য বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র থেকে সমিতির কাছে অনুসন্ধান করা হয়।

অফিসিয়ালভাবে ছোট্ট এক অফিস থেকে গত চার বছরে এই সমিতি এ পর্যন্ত সহস্রাধিক চল্লিশোর্ধ বয়স্ক ব্যক্তিকে ভাল ভাল কাজ জুটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বেশ কিছু পার্লামেন্ট সদস্য এই চমৎকার কাজের প্রশংসা করেছেন।

কখনও কি কোন পাখিকে দেখেছেন ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে এসে মাছকে খাওয়াতে? নর্থ ক্যারোলিনার লেনোয়ার শহরের মিঃ বেকার তাই যখন প্রথম কার্ডিনাল পাখিকে মুখে করে খাবার এনে তার পুকুরের 'গোল্ড ফিস'দের খাওয়াতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি সজাগ চোখ নিয়েই ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। হঠাৎ এক দিন দেখতে পেলেন, কার্ডিনাল পাখি পুকুরের চারধারে যে বেড়া আছে, তার উপরে বসে কিচির মিচির শব্দ করছে। আর আস্তে আস্তে 'গোল্ড ফিস'গুলি পুকুরের ধারে এসে খাবারের প্রত্যাশায় মুখ হাঁ করে অপেক্ষা করছে। ত্বরিতে কার্ডিনাল পাখি নিচে নেমে এল, সকলের মুখেই কিছু খাবার গুঁজে দিয়ে আবার খাবারের সন্ধানে উড়ে চলে গেল।

কি যেন হয়েছে সুধাময়ের। খুঁত খুঁত করছে সে। সব জিনিসেই যেন খুঁত ধরতে চাইছে। কাল ঘেমে নেয়ে বাড়িতে পৌঁছতে না পৌঁছতে সবাই ভিড় করে এল তার পাশে। ঘিরে ধরল তাকে। এক সংগে একশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল সবাই। এমনিভাবেই এই বাড়ি প্রবাসী ছেলেদের অভ্যর্থনা করে। চিরকাল করে এসেছে। সুধাময়ও বাপ কাকা কিছুদিন অনুপস্থিতির পর ফিরে এলে, এমনিভাবেই আর পাঁচজনের সংগে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও।

এখন তার মনে হল এরা অনর্থক বড্ড বেশি চেঁচামেচি করে। মা এসে পাঁচজনের সামনেই আঁচল দিয়ে তার মুখখানা ফস্ করে মুছে দিল। সংগে সংগে সুধাময়ের সমস্ত স্নায়ু যেন তার প্রতিবাদ ঘোষণা করল। সুধাময় মুখে কিছু বলল না। মা তো বরাবরই এই কাজ করে। অন্যের মত ভালবাসে তাকে। সুধাময়ও মাকে খুব ভালবাসে। তবুও কাল, এই প্রথম, সুধাময়ের মনে হল, সব তাতে বাড়াবাড়ি করাই মার স্বভাব।

এদের স্নেহ ভালবাসার প্রকাশ এরা তারস্বরে করতে চায়। যেন পাঁচজনকে জানাতে চায়। এই যে দেখাম ভাবটা সুধাময় যেন আর বরদাস্ত করতে পারছে না। কলকাতায় এত আদিখ্যেতা নেই।

এবার বাড়িতে এসে সুধাময় বড় অস্বস্তিতে পড়ল। যা দেখে, যা শোনে এখানে তার মধ্যেই কলকাতা এসে মাথা ঝামেলা বাধায়। কলকাতায় তো এমনটি নেই। কলকাতায় তেমনটি হয় না তো।

কলকাতায় থেকে যা বুঝতে পারেনি, গ্রামে এসে তা বুঝল সুধাময়, কলকাতা ছাড়া তার গতি নেই। এই গ্রামের আকাশে

সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, কি রে বুড়ি, কথা বলিস নে যে? নামটা বুঝি পছন্দ হল না তোর।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না দাদা, খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ নাম, সুন্দর নামটা।

সুধাময় খুশী হল।

বলল, এসব কলকাতার নাম। তোদের বিষ্টুপদ কি ষষ্ঠীচরণ নয়। বুঝলি?

গিরিবালা প্রতিবাদ না করে হাসতে লাগল। দাদার এ ভাষায় মারপ্যাঁচ নেই। একথা গিরিবালা বোঝে।

সুধাময় বলতে লাগল, তোর ছেলে হবার খবর বড়মার চিঠিতে পাওয়া ইস্তক আমার অদ্ভুত লেগেছে। আমাদের সেই বুড়ি, সে আবার মা-ও হল! আমি তো ভেবেছিলাম, প্রায় বড়মার মতই দেখতে হয়েছিস বুঝি। কিন্তু কই, তোর তো কিছুই বদলায় নি রে।

গিরিবালা এবারও কথা বলল না, শুধু হাসতে লাগল। চাঁপা মুখ ভার করে এসে দাঁড়াল।

বলল, কারুর যদি ক্ষিদে লাগে থাকে তো সে যান মুখ চোখে জল দিয়ে রান্নাঘরে যায়। বড়মা কয়ে দিল।

সুধাময় চাঁপাকে ভেংগিয়ে বলল, আর কারো যদি লাল ফিতের দরকার থাকে তো যেন আমাকে এক ঘটি জল এনে দেয়।

অমনি চাঁপার মানভঞ্জন হয়ে গেল। সুধাময়ের হাঁটু ধরে লাফাতে লাফাতে বলতে লাগল, ও দাদা, আনিছ নাকি ফিতে? সত্যি আনিছ আমারে ছুঁয়ে কও। আমসত্ব খাবা? তেঁতুলের আচার? পিসিমা পিঠে গড়ছে, আনে দেবো?

চাঁপার কাণ্ড দেখে গিরিবালা হাসি আর চাপতে পারে না।

বলল, জল চালো দাদা, আগে সেইডেই আনে দে, তারপরে না হয় স্বগ্গোডাই ধরে দিস।

চাঁপা খর খর করে উঠল, আমার কথায় তুই ফোড়ন কাটিস্ ক্যান ক' দিনি। আমি কি তোর পাকা ধানে মই দিইছি?

চাঁপা জল আনতে গেল। হঠাৎ কি খেয়াল হল গিরিবালার, ও পাড়ার মামাবাড়িটায় একটু বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করল। কতদিন যে যায় নি! আবার কবে হুট্ করে চলে যেতে হবে। বড়মামাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে বড়। আসলে ওটা সুধাময়েরই মামাবাড়ি। গিরিবালা সুধাময়কে বলল, যদি আজ নিয়ে যায় সুধাময় তো বড় ভাল হয়।

নিয়ে যাবা, ও দাদা! তালি খাওয়া দাওয়া সারেই বেরোয়ে পড়বানে।

সুধাময় রাজী হল। ভালই হল, সে-ও তো সেই কবে গিয়েছিল মামার বাড়ি, তারও এই সংগে দেখাটা হয়ে যাবে। তাছাড়া করবার মত একটা কাজও পাবে সে। বাড়িতে এসে কিছুই তো করার থাকে না।

দুর্গাবাড়িতে ঘরামি লেগেছে। চাল ছাওয়া হচ্ছে। তার মানে পুজোর বার্তা এসে গেছে। এবার পুজো কার্তিকের মাঝামাঝি। গিরিবালা থাকবে না তখন। বিয়ের পর একবার মাত্র বাপের বাড়ির পুজো দেখেছে গিরিবালা। তার শ্বশুরবাড়ির দেশে দুর্গোৎসব নিয়ে অত মাতামাতি হয় না। সেখানকার প্রধান উৎসব দোল।

গিরিবালা ফাঁকা মণ্ডপটা দুচোখ ভরে দেখে নিল। ঠাকুরের সিঁদুর মাখান পাটটা একপাশে পড়ে আছে। ঘরের মেঝের বিস্তর ইঁদুরের গর্ত হয়েছে। গর্তগুলোর মুখে মাটি উঁচু উঁচু হয়ে আছে। তার উপর চাল থেকে খসা খড়, বাতার টুকরো, দড়ি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে। গিরিবালা ফাঁকা মণ্ডপে গড় হয়ে প্রণাম করল। এ পাশে ভাঁড়ার, তার লাগোয়া পিছনেই ঢাকীদের ঘর। এখনও একটা ঢাক মটকায় বাঁধা আছে। ঢাকীদের ঘরের পিছনে গাব আর কামরাঙা গাছ। সবুজ কামরাঙাগুলো এলোমেলো বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কামরাঙা গাছের তলা দিয়ে হাঁটলে এখনও জিভে জল ভরে আসে গিরিবালার।

চারিদিকে আমের বাগান। মণ্ডপের জমিটা সুধাময়দের, তবে দুর্গামণ্ডপটা বারোয়ারি। এ আমের বাগানও সুধাময়দের। মণ্ডপের পিছনেই গন্ধ আমের গাছ, সামনে রাস্তার ধারের গাছটার নাম চুকাড়ে। চিনিচোরা, টিকটিকে, চাপড়া, গন্ধ কুলচে, নাইতোলা আমের গাছগুলোয় যেন খুশির মাতন পড়ে গিয়েছে গিরিবালাদের দেখে। কতদিন পরে আবার ওদের কাছে সে এল। যে গাছটার দিকে গিরিবালা চায় সেটাই যেন ডালপালা দুলিয়ে গিরিবালাকে ইশারায় ডাকে। ও বুড়ি ও বুড়ি, কোথায় ছিলিরে, এতদিন? [illegible] কত বড়ো হয়ে গেছে! আসো আসো আমার ছায়ায় একটু আসে বসো।

গিরিবালার কানে যেন মানুষের স্বরেই সেই ডাক গিয়ে পৌঁছায়। সত্যিই তো, সে কোথায় ছিল এতদিন। যখন সে ছিল সেই ছোট মেয়েটি, তার দাদার হাত ধরে আম কুড়োতে আসত। তার সেই কচি কচি পায়ের দাগ বুঝি আমগাছের ঝরা পাতার বুক থেকে এখনও মুছে যায় নি। শুকনো পাতার মর্মরে এখনও বুঝি সেই ধ্বনি বেজে উঠবে কোনখান থেকে।

ঘোর লেগে গেল যেন গিরিবালার মনে। আম কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গিরিবালা যে স্পষ্ট শুনল, টিপ করে শব্দ হল চাপলে গাছের নিচে। ও যে পরিষ্কার দেখল আমটা নিয়ে কাড়াকাড়ি বেধে গেল এক আট বছরের মেয়ে আর ষোল বছরের দাদার মধ্যে। কে ওই মেয়েটা? বুড়ি না?

জীবনী

যুগ প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়—প্রবোধরঞ্জন গুহঠাকুরতা। প্রকাশক : অধ্যয়ন, ২০এ গোবিন্দ সেন লেন, কলকাতা—১২। ১·২৫।

ফরাসী, আরবী, ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রামমোহন ছিলেন অসাধারণ অধিকারী। মোগল দরবারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি ফার্সিতে এক বই লিখেছিলেন। তার ফলে পিতা-পুত্রে মতান্তর ঘটে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। ১৮১৪ থেকে রামমোহন স্থায়িভাবে কলকাতায় বাস করেন। সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র-চিন্তা, সাহিত্য ও শাস্ত্র পাঠের চিন্তা, ধর্ম-সংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন আন্দোলনের আয়োজনে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে তাঁর কীর্তি বহুশ্রুত। য়ুরোপের ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের তুলনা করা হয়। তাঁর ভদ্রতা, বিনয় ও তেজস্বিতার কথাও প্রবাদ-স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথের রামমোহন-প্রশস্তি কে না জানেন? শ্রীপ্রবোধরঞ্জন গুহঠাকুরতা এই ৭৪ পৃষ্ঠার ছোট বইখানির মধ্যে রামমোহনের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি (১৭৭৪—১৮৩৩),—রাধানগর থেকে ব্রিস্টল পর্যন্ত বিচিত্র কর্ম ও ভাব-জীবনের উল্লেখযোগ্য সব কটি অধ্যায়ের কথাই বলেছেন। বইখানি চমৎকার হয়েছে।

৫০১।৫৮

প্রবন্ধ

ভারতীয় সমাজশাস্ত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক সম্পাদিত। ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০। দুই টাকা।

মহারাষ্ট্রনিবাসী পণ্ডিত রাজোপাধ্যায় মহাশয় মহারাষ্ট্রী ভাষায় ভারতীয় সমাজশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। তাঁর আলোচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাগুলি কল্যাণজনক। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী সেই আলোচনার বঙ্গানুবাদ করেন এবং বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে সে আলোচনা সুসম্পাদিত হয়ে বাঙালী পাঠকের করাধিগম্য হলো।

কেবল বৈদিক মত স্থাপন করবার দিকেই লেখক অভিনিবিষ্ট, একথা মনে হয় না। প্রসঙ্গত বহু পাশ্চাত্ত্য মতামত তুলে দেখান হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন, 'এই গ্রন্থের দ্বারা যদি সনাতন ধর্ম বিষয়ে অনুকূল বুদ্ধির উদয় হয় এবং যদি উহার ব্যক্তিগত এবং সমাজগত আচার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি স্বল্পাংশেও জাগরিত হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থের সার্থকতা হইবে।'

সে দিক দিয়ে বইখানি সার্থক হয়েছে।

৫০৬।৫৮

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—সন্‌জীদা খাতুন। প্রকাশক : শ্রীনিতাইচন্দ্র দাস। ১৩এ, [illegible] লেন রোড, কলিকাতা। সাড়ে পাঁচ টাকা।

কবির [illegible] এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত পুস্তকটি সুখপাঠ্য ও কবি সম্পর্কে [illegible] [illegible]

১৪৯।।৫৮

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রী[illegible] [illegible]

ভূমিকায় [illegible] [illegible] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা হবার একটি নিখুঁত চিত্র এই পুস্তকে আমরা পাই। বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং মাঝে মাঝে বিদেশী মতামতও বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। [illegible] প্রাচীন লেখকদের ছবি এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ফটোচিত্র পুস্তকটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। পুস্তকটি যে পরীক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে লাগবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে, এই প্রসঙ্গে একমাত্র মনে হয় যে এত-গুলি বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক কোনো বিষয়ের প্রতি অনেকাংশে সুবিচার করতে পারেননি। আরো বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। মনে হয় স্থানে

অনেক বিষয় কেবল উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এক একটি বিভাগ নিয়েই এক একটি পুস্তক রচনা করা সম্ভব। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক আর একটু এবিষয়ে অবহিত হবেন। ৩৮৫।৫৮

নাটক

কোটিপতি-নিরুদ্দেশ, বিদ্যুৎপর্ণা, রাজনটী, রূপকথা (একত্রে চারটি নাটিকা)—মন্মথ রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা-৩। মূল্য—তিন টাকা।

আজকাল নাট্যাভিনয় নিয়ে কলরব একটু বেশী হচ্ছে, কিন্তু যা নিয়ে প্রকৃত কলরব করার কথা, সেই নাটক রচনার ক্ষেত্র বিস্মৃততর হচ্ছে কী? ইংরেজী নাটকের অনুবাদ, আর নয়ত পুরানো নাটকের পুনরাভিনয়, আর নয়ত বস্তী-জীবন বা শ্রমিক জীবন নিয়ে একঘেয়ে নাট্য কলাপ, প্রায়শই কতকগুলি অশ্রাব্য সংলাপ সংযুক্ত করে তথাকথিত "বাস্তবের" অনুসরণ। অত্যন্ত সুখের বিষয়, এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় সত্যিকার নাট্যধর্ম বজায় রাখতে পারছেন এবং এত যে ঢেউ আসছে-যাচ্ছে, তিনি তাঁর স্বকীয়তা হারান নি। তাঁর রচনার যা সম্পদ, বৈচিত্র্য, গভীর জীবনবোধ, কল্পনা ও সত্যনিষ্ঠা, এ তাঁর আজও অব্যাহত। একাঙ্কিকা ও নাটিকার ক্ষেত্রে তিনি আজও সম্রাট। তাঁর নাট্য-রচনার ধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যায়, তিনি কখনো থেমে থাকেননি, সবসময়েই এগিয়ে চলেছেন। চিন্তাধারার মধ্যে গতি আছে, বিবর্তন আছে, [illegible] সুরের অন্তর্দৃষ্টি [illegible] তিনি সিদ্ধহস্ত।

আলোচ্য চারটি নাটিকার মধ্যে 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ'—[illegible] হাস্যরসের উৎসই নয়, লেখকের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনায় মধুর। 'বিদ্যুৎপর্ণা' এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ নাটিকা বলে আমার ধারণা। 'রাজনটী' ও 'রূপকথা', এই তিনটি [illegible] ও উপলব্ধিই এই নাটিকার [illegible] যা আবেদনে মধুর, [illegible] অভিনব। [illegible] নাটকীয় [illegible] এবং [illegible] একথাই [illegible] যেন নিজের মতো মানুষের [illegible] কল্পনার ও মাধুর্যের [illegible] বন্দিনী করে রেখেছে, [illegible] চিরকালের শিল্পী [illegible] উপহার দিয়ে আনতে সক্ষম।

ঘূর্ণী—উমানাথ ভট্টাচার্য (গলস্‌ওয়ার্দির 'স্ট্রাইক' নাটকের প্রেরণায় বিরচিত)। প্রকাশক—ভবানী ভট্টাচার্য, কলকাতা, [illegible] নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬। মূল্য—২ [illegible]

[illegible] কারখানা অঞ্চলের পটভূমিকায় মালিক-শ্রমিক বিরোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আলোচ্য নাটকটি। উমানাথবাবু বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ নাটকের ভাবান্তর তাঁর ক্ষমতার পরিচিতিকে বহন করছে। তাঁর সংলাপ ও ভাষা ভালো, নাট্য-বিন্যাসেও সাবলীল। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে কিছুটা ক্লান্তি আনে। চিন্তা ও তর্কের ভারে নাটক যতটা ভারাক্রান্ত, রসের আবেদনে ততটা মধুর নয়। হয়ত নাট্যকারের তা অভিপ্রেতও নয়। চিন্তাই তিনি করাতে চান। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে এ চিন্তাকেও ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা চলে। শোষক শোষিতের চেহারা আজকের দিনে ঠিক এই কিনা, ঠিক এইভাবে আজকাল স্ট্রাইক গড়ে ওঠে কিনা, তা লক্ষ্য করার বিষয়। অন্তত আলোচ্য নাটকে তা যেভাবে এসেছে, তাতে বাস্তবানুগতার থেকে আইডিয়ার আনুগত্যই চোখে পড়ল যেন বেশী। নাট্যকার হিসাবে নীচের মহল-এর স্রষ্টার ওপরে আমাদের আশা অনেক বেশী বলেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করলাম। ৪।৫৯

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের হালচাল

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও সংকটজনক—এই মর্মে কিছুকাল পূর্বে লোকসভায় যে আলোচনা হয় এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী যে মন্তব্য করেন তার উত্তরে ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব সভাপতি এম বি বিলিমোরিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প রীতিমত সুসংগঠিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রগতি সাধনের পথ সব সময়েই খোলা আছে। উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে তাই শিল্প সংস্থাকে আরও বেশী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।

চলচ্চিত্র শিল্পের আভ্যন্তরীণ মতবিভেদ ও ঐক্যের অভাব সরকারী সমালোচনার ভিত্তি কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবিলিমোরিয়া বলেন, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত নয়। কাঁচা ফিল্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে চলচ্চিত্র শিল্পব্যবসায়ের ভেতরকার সাম্প্রতিক একতা লক্ষ্য করেই যে সরকার কাঁচা ফিল্ম সাপ্লাই কমিটি পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন—সে বিষয় তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতীয় চিত্রের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে যে উত্তেজনাময় আলোচনা শোনা যায় সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শ্রীবিলিমোরিয়া বলেন, এটা এমন একটা বিষয় যার ওপর অযথা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কাঁচা ফিল্মের অভাবে প্রযোজকদের সমস্যা অনুধাবন এবং ছবির সর্বাধিক দৈর্ঘ্য নিরূপণ (বাংলা দেশে যা করা হয়েছে) সম্বন্ধে তিনি বলেন, এ সকল বিষয়ে আঞ্চলিক কাঁচা ফিল্ম কমিটি নিজস্ব বিবেচনা খাটাতে পারেন। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব কমিটি গ্রহণ করেছেন। আঞ্চলিক কাঁচা ফিল্ম সাপ্লাই কমিটিকে শ্রীবিলিমোরিয়া চলচ্চিত্র শিল্পের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেন।

চলচ্চিত্র শিল্পীদের প্রভূত পারিশ্রমিক সামগ্রিকভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক কাঠামোকে কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করে এ-কথা স্বীকার করে তিনি সাংবাদিক

মহামায়া চিত্রমের "ভাঙন" ছবির দুটি প্রধান নারী চরিত্রে পদ্মা দেবী ও শিখা বাগ-কে দেখা যাবে

বৈঠকে বলেন, সমস্ত কিছুর মূল্যই দিনের পর দিন অসম্ভবরকম বেড়ে যাচ্ছে, তাই সকল ব্যাপারই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে।

চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সাধারণ কর্মীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সিনেমা কর্মচারীদের জন্য স্বল্পতম পারি-শ্রমিক আইন ("মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট") প্রবর্তন (বাংলা দেশে যা করা হয়েছে) সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শ্রীবিলিমোরিয়া মন্তব্য করেন, প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে আঞ্চলিক সংস্থাগুলি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেন্সরপ্রাপ্ত

ছবির পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা এমন একটি বিষয় যা পরিপূর্ণ যৌক্তিকতার ভিত্তিতেই গ্রাহ্য হতে পারে। ফেডারেশনের কাছে কোন সংস্থা এরকম পুনর্বিবেচনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এখনও পেশ করেননি।

কাঁচা ফিল্মের নতুন বণ্টন নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীবিলিমোরিয়া বলেন, আশাপ্রদভাবেই এই নীতির প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে তিনখানি নতুন হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে—বাংলা একখানিও না। হিন্দী ছবিগুলির নাম—"কাল হামারা হায়", "নয়া সংসার" ও "এক আরমান মেরা"।

"কাল হামারা হায়" কে অমরনাথ প্রোডাকসন্সের ছবি. এস কে প্রভাকর এর লেখক ও পরিচালক। বর্তমান সমাজ জীবনের নানান গলদ ছবিটিতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এই আশার ওপর ছবিটি শেষ করা হয়েছে যে যে-তরুণ দল দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা তাদের আমলে এমনিধারা অনাচার ঘটবে না। মধুবালা ও ভারত-ভূষণ শ্রেষ্ঠাংশে চিত্রাবতরণ করেছেন। অন্যান্য অংশে আছেন লীলা চিৎনীশ, জয়ন্ত, জগদেব, দীপক, হরি শিবদশানি প্রভৃতি। চিত্রগুপ্তের সুরে ছবিখানি সমৃদ্ধ।

"নয়া সংসার" নামে অনেকদিন আগে একখানি হিন্দী ছবি তোলা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মস প্রযোজিত [illegible] এই "নয়া সংসার"-এর সঙ্গে সে ছবির কোন সম্পর্ক নেই। স্ত্রীর জীবদ্দশায় একটি যুবক তার শ্যালিকার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে তার সুখের সংসারে কেমন করে ভাঙন ধরল তাই নিয়ে এর গল্প। লিখেছেন পণ্ডিত মুখরাম শর্মা। প্রদীপকুমার, জয়শ্রী ও নন্দাকে নিয়ে এর মুখ্য ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন নানাভাই ভাট। এ ছবিটিরও সুরকার চিত্রগুপ্ত।

একদা বিখ্যাত চিত্রকর্মান আজকাল পাইকারী হারে যেসব বিস্ময়-বিহীন ছবি উপহার দিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরই অন্যতম "এক আরমান মেরা"। পরিচালক [illegible] ও সুরকার এস ডি বাতিশ ছাড়া আর কারুর নামও উল্লিখিত হয় নি এর প্রচারপত্রে।

• • •

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে প্রেম পিকচার্সের "শশীবাবুর সংসার" ও রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের "ভ্রান্তি"। আর দু এক হপ্তার মধ্যেই এদের মুক্তি ঘটবে।

আর ডি বনশাল প্রযোজিত "শশীবাবুর সংসার"-এর ভূমিকালিপি এককথায় চমৎকার ঘটিত। নামকরা তারকাদের মধ্যে রয়েছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তপতী ঘোষ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি এবং সকলের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছেন ছবি বিশ্বাস। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুধীর মুখোপাধ্যায়।

অনন্ত সিং প্রযোজিত "ভ্রান্তি"-র প্রধান নায়কও ছবি বিশ্বাস। এই কুশলী শিল্পী "কাবুলীওয়ালা" ও "জলসাঘর"-এর মত "ভ্রান্তি"তেও তাঁর অসামান্য নাট্য প্রতিভার আর একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে প্রকাশ। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায় ছবিখানি তোলা হয়েছে। এই ছবির দুটি মুখ্য ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দীকে দেখা যাবে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত আর একটি নতুন ছবিও মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। ছবির নাম "নির্ধারিত শিল্পীর

অনুপস্থিতিতে"। অবধূত রচিত ঐ নামের গল্প অবলম্বনে ছবিটি তুলেছেন মেট্রোপলিটান পিকচার্স। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের বিপরীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, কেতকী দত্ত, প্রেমাংশু বসু এবং ভানুর শিশু কন্যা বাসবী। নির্মল দে ও নচিকেতা ঘোষ যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

• • •

গেল হপ্তায় নতুন ছবি মহরতের যে হিড়িক পড়েছিল, তা বাদে আরো কতকগুলি নতুন বাংলা ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। নিউ থিয়েটার্স (এক্জিবিটরস) প্রাইভেট লিমিটেড ময়ূরাক্ষী নদীকে পশ্চাৎপট করে কৃষক জীবনের একটি বাস্তবানুগ ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন। ছবির নাম "নতুন ফসল", সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্প। কালী বন্দোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরীকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচন করা হয়েছে। পরিচালনার ভার পেয়েছেন হেমচন্দ্র চন্দ্র।

কালী বন্দোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দীকে শ্রেষ্ঠাংশে নির্বাচন করে পরিচালক দিলীপ বসু মালা প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি [illegible] কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শুটিং চলছে। অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়কে দুটি পার্শ্বচরিত্রে দেখা যাবে।

সুশীল মজুমদারের পরিচালনাধীনে এন টি ২ প্রোডাকশন্সের "হাসপাতাল"-এর কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে পুরোদমে শুরু হয়েছে। এই ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে নামবেন সুচিত্রা সেন ও অশোককুমার। আগামী [illegible] মাসে অশোককুমার এখানে শুটিং করতে আসবেন। ইতিমধ্যে ছবির অন্যান্য কাজ এগিয়ে রাখা হচ্ছে। "হাসপাতাল"-এর গল্প লিখেছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন [illegible]।

সুন্দরবনের সুন্দরী

সুন্দরবন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় পটভূমিতে দর্শকদের নিয়ে গিয়ে তাদের এক অনাস্বাদিত পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে মনোজ বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী এবং কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের "জল-জঙ্গল"।

সুন্দরবনের নোনা জল আর জঙ্গলের পরিবেশে গড়ে উঠেছে জেলে ও জঙ্গুলেদের যে গেঁয়ো সমাজ তারই দুটি তরুণ-তরুণীকে নিয়ে এই ছবির প্রেমোপাখ্যান। মহিরাম সাধুর মেয়ে এলোকেশী। সৌন্দর্যের চাইতে চটক তার বেশী, ভালবাসার চাইতে মন ভোলানোতেই তার বেশী সুখ। সেখানকার জমিদার-

বাবুর ম্যানেজার দুর্লভচন্দ্রকে ভুলিয়ে সে আনন্দ পায়। তার দেওয়া জিনিস সে হাসিমুখে নেয়। একদিন এক মেলায় স্বাস্থ্যবান কুস্তীগীর কেতুচরণকে দেখে এলোকেশীর মনে জাগে চাঞ্চল্য। প্রথম দেখার পরই সে কেতুর মনে রং ধরিয়ে দেয় হাল্কা হাসি আর মিষ্টি কথায়। এই বেপরোয়া ছেলেটির দিকে দিনে দিনে অনুরাগ বাড়ে এলোকেশীর। কেতুও মজে তার প্রেমে।

কেতু মজুরের কাজ নেয় জমিদারবাবুর বিরাট আবাদী পরিকল্পনায়। সুন্দরবনের নোনা জল সরিয়ে আর জঙ্গল সাফ করে ফসল ফলিয়ে বহু লোকের অন্নসংস্থানের প্রেরণা নিয়ে জমিদারবাবু আসেন সে অঞ্চলে। তারই কুঠী ও আবাদের ম্যানেজার দুর্লভচন্দ্র। দুর্লভচন্দ্র এলোকেশীর প্রণয়প্রার্থী। আবার এদিকে কেতুও কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসে এলোকেশীর কাছে। চোখে চোখে তারা ঘুরে বেড়ায়, মান-অভিমান, মিষ্টি কথায় ও গানে তাদের দিন কাটে।

একদিন এলোকেশীর [illegible] সদরে [illegible] ধরা পড়ে। জমিদারবাড়ির [illegible] পুলিশ [illegible] এবং অনেক চোরাই [illegible] আবিষ্কার করে সেখানে। [illegible] পুলিশের [illegible]। জমিদার এলোকেশীকে আশ্রয় দিতে চান। কিন্তু এলোকেশী কেতুকে অনুরোধ করে তাকে শহরে নিয়ে যেতে। কেতু [illegible] আগেই এলোকেশীর [illegible] দুর্লভচন্দ্র। তাকে লোভ দেখায় শহরে নিয়ে যাবার ও অনেক কিছু দেবার। এলোকেশী দুর্লভচন্দ্রের সঙ্গেই পালিয়ে যায়।

বিয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটে কেতুর। দুর্লভচন্দ্রের সঙ্গেই যে এলোকেশী পালিয়েছে, সে খবরও সে পায়। দুর্লভচন্দ্র মাতলা স্টেশনে এলোকেশীকে [illegible] রাখে। তার কোলে এনে তুলে দেয় তার মা-মরা বাচ্চা ছেলেকে। আর সেখান থেকেই সে শত্রুতা করবার চেষ্টা করে জমিদারের সঙ্গে। জমিদারের জন্য কাজের লোক খুঁজতে গিয়ে কেতু একদিন দুর্লভচন্দ্রের বন্দী হয়। তার বাঁধন রাত্রিবেলায় এসে খুলে দেয় এলোকেশী। এর পরও কেতু কয়েকবার লুকিয়ে দেখা করে এলোকেশীর সঙ্গে। কিন্তু কেতুর অনুরোধ সত্ত্বেও এলোকেশী তার সঙ্গে পালাতে সাহস পায় না।

একদিন যখন দুর্লভচন্দ্রের ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তার সকল সন্দেহ এসে পড়ে এলোকেশীর ওপর। এলোকেশীকে সে মেরে ফেলবার ভয় দেখায়। এলোকেশী তাই পালায় সেখান থেকে এবং কেতুর কাছে এসে আশ্রয় নেয়।

দুর্লভচন্দ্রের হারানো ছেলেকে সে দেখতে পায় কেতুর বাড়িতে। কেতু জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে দুর্লভের ছেলেকে চুরি করে। যে রাত্রে এলোকেশী পালায় সে রাত্রেই দুর্লভচন্দ্র শত্রুতা করে জমিদারের অনেক-কষ্টে-তৈরী সবুজ ধানের ক্ষেতের বাঁধ কেটে দিয়ে নোনা জল ঢুকিয়ে দেয়। হাজার হাজার লোকের জীবনধারণের উপায় নষ্ট করল যে দুর্লভচন্দ্র, তাকে মারবার জন্য হাতে ছোরা নিয়ে ছুটল কেতু। যে মুহূর্তে সে তাকে মারতে যাবে, তখন পেছন থেকে এলোকেশী তাকে ডেকে শান্ত করে। এলোকেশীর প্রভাবে কেতুরও মন ভিজে যায়। জমিদারের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য সে একটি নৌকো দেখিয়ে দেয় দুর্লভকে। নৌকোর ওপর দুর্লভ দেখে তার হারানো ছেলেকে। এলোকেশী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দুর্লভের ছেলেকে। দুর্লভ পালায়, কেতুর কাছে সুলভ হয় এলোকেশী।

ছবির প্রধান সম্পদ এর নয়নাভিরাম দৃশ্যসম্ভার। পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় কাহিনীর পটভূমিকার একটি সুন্দর ও সহজগম্য প্রমাণরূপে নিয়েছেন সুন্দরবন অঞ্চলে বিচিত্র ধরনের বহির্দৃশ্য তুলে এনে। সারা ছবিটি এমন একটি মনোরম আঙ্গিক অলংকার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যা বাংলা ছবিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—এর ঘন জঙ্গল, জলা জমির ওপর এর অধিবাসীদের বসতি, তাদের মাছ-ধরা, জমিতে ফসল ফলানো, [illegible] পরিবেশ, নদী, [illegible] পথ-ঘাট-মাঠ এ-সব-কিছুই ছবিটিকে বর্ণাঢ্য ও রূপময় দৃশ্য-কাব্যে মণ্ডিত করেছে।

কিন্তু ছবিটি [illegible] মনকে [illegible] ভরে তোলে না। জল-জঙ্গলের [illegible] কাহিনীটিকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার নাট্য-রস কোথাও [illegible] ভাবে [illegible] কাহিনীর কিছু [illegible] করা হয়েছে ছবিতে। বস্তুতপক্ষে এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যে [illegible] তার প্রমাণ ছবির নাটকীয়তার অভাব। ছবিটির প্রধান দুটি চরিত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার আবেগ সংবেদনশীলভাবে রূপ না পাওয়ায় ছবির নায়ক দর্শকের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারে না। বন্দী দুর্লভচন্দ্রের হাত থেকে পালাবার সুযোগ পেয়েও কেতুর সঙ্গে এলোকেশীর চলে আসতে রাজী না হওয়া, আবার পরে দুর্লভচন্দ্রের নির্যাতনের ভয়ে রাত্রিবেলায় একাই পালিয়ে কেতুর কাছে চলে আসা—এ-দুটি ঘটনা এলোকেশীর চরিত্রের মর্ম-উদ্‌ঘাটনে দর্শকদের ধাঁধায় ফেলে। দুর্লভের

নাম—অরসন ওয়েলস, ডিন স্টকওয়েল এবং ব্র্যাডফোর্ড ডিলম্যান।

বিচারের ফলাফল যাতে আগে থেকেই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে ফাঁস হয়ে না যায় সেজন্য বিচারকেরা সমুদ্রবক্ষে জাহাজের ওপর বসে তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়ার ছবি যার ইংরেজী নামকরণ হল "বাটারফ্লাইজ ডু নট লিভ হিয়ার"।

অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে জুরীদের বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে বুলগেরিয়ার "স্টার্স"। হাস্যরসাত্মক ছবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে ইটালির "পোলিকারাপি, সেইন্ট ক্যালিগ্রাফ"। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে মেক্সিকোর "নাজারিন"। উৎসবের "উল্লেখযোগ্য" চিত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে একটি জাপানী ছবি যার ইংরেজী নাম "দি হোয়াইট হেরন"। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান লাভ করেছেন ফরাসী চিত্র "লে কাত্রে সাঁ কুপ"-এর পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো।

এ ছাড়াও যে তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্রান্সের "ভ্যানগার্ডের সা মোয়াসঁ রুজ"। হলিউডের "নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক" এবং পোল্যাণ্ডের "ক্রিস্মাস ওয়ার্টি"।

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত মেক্সিকোর "নাজারিন" ছবির পরিচালক লুই বুনুয়েল তাঁর পরিচালনার দক্ষতা ও প্রেরণার জন্য জুরীদের প্রশংসাভাজন হন।

চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘের "সমালোচকের পুরস্কার" লাভ করে ফরাসী চিত্র "হিরোশিমা মাঁ আমুর"। ছবিটি প্রথম আণবিক বোমার ধ্বংসলীলার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রণয়মূলক কাহিনীর চিত্ররূপ।

ক্যাথলিক সিনেমা অফিস তাদের পুরস্কার প্রদান করেন ফরাসী চিত্র "লে কাত্র সাঁ কুপ"কে।

এ-বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে মোট একত্রিশটি দেশ যোগদান করে। ভারতবর্ষ থেকে এই উৎসবে পাঠানো হয় হিন্দী ছবি "লাজবন্তী"। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে "দি ডেস্টিনি অব ম্যান", ইটালি থেকে "হেল ইন দি টাউন" এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে "মিডল অব দি নাইট" ছবিগুলি পাঠানো হয়। জাপান থেকে উৎসবে পাঠানো হয় "শিরাগাসি"।

(সি ৬৭৩২)

বিবিধ সংবাদ

কলকাতার বিখ্যাত হিন্দী নাট্য প্রতিষ্ঠান অনামিকা অনেকগুলি সুষ্ঠু হিন্দী নাটকের অভিনয় করে এখানকার নাট্যামোদীদের কাছে নাম কিনেছেন। এঁদের প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলির মধ্যে "হাম হিন্দুস্থানী", "জনতা কা শত্রু" ও "নয়া হাথ"-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একাধিক একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করে এঁরা মৌলিক নাট্য চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

নয়াদিল্লিতে সংগীত নাটক আকাদেমীর উদ্যোগে সম্প্রতি যে হিন্দী নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তাতে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে অনামিকা প্রযোজিত "নয়া হাথ"। যাঁরা অনামিকার অভিনয় দেখেছেন এবং তা দেখে আনন্দ পেয়েছেন, তাঁরা এই সংবাদে উল্লসিত হবেন।

• • •

"ভারত মহাসাগরের ওপর রামধনু" এই নামে জাপানের শিনতোহো চিত্র প্রতিষ্ঠান নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটি ছবি তোলার মনস্থ করেছেন। বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনকে উপলক্ষ করে এক ভারতীয় তরুণী ও এক জাপ সামরিক অফিসারের বন্ধুত্বের কাহিনী এর মধ্যে বিবৃত করা হবে। অর্থ সরবরাহ করেছেন একটি জাপানী সংবাদ প্রতিষ্ঠান।

• • •

পাটনার সুবিখ্যাত কৃষ্টি সংঘ আর্টস এন্ড আর্টিস্টসের শিল্পীবৃন্দ গত ১৯শে ও ২০শে মে মহাজাতি সদনে দু'টি মনোজ্ঞ নাচের আসর বসিয়েছিলেন। ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী এবং আধুনিক নৃত্যশিল্পে এঁদের শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতা দেখা গেল।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ফুটবল খেলা ধীরে ধীরে জমে উঠছে। মহারথী ক্লাবগুলি সবাই আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। তিন চারটি করে খেলাও হয়ে গেছে। কিন্তু মহারথী ক্লাবগুলির কয়েকজন মহারথী খেলোয়াড় এখনো কলকাতায় এসে পৌছাননি। যেমন মোহনবাগানের কেম্পিয়া, ইস্টবেঙ্গলের হাসান, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ওমর, মুসা। খবর পাওয়া গেছে ক্লাবের সঙ্গে এদের মান-অভিমানের পালা চলছে। কি নিয়ে, সে কথা খুলে না বললেও পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হবে না আশা করি। তবে ফয়সালা একটা তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। কলকাতার খেলার মাঠ হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণখনি। এখানকার সোনার লোভেই তো বাইরের খেলোয়াড়দের এত ভীড়। তাদেরও যেমন এখানে না এসে উপায় নেই, তেমন এখানকার ক্লাবেরও গত্যন্তর নেই তাদের সাহায্য ছাড়া। এই যখন পারস্পরিক সম্পর্ক তখন মান অভিমানের পালা বেশী-দিন চলতে পারে না। কলকাতায় এবার যেসব নতুন খেলোয়াড়ের আমদানী হবার কথা ছিল তাদের প্রায় সবাই এসে গেছেন। দুই একজন যাদের এখনো আসতে বাকী, তারাও আসবেন দুই একদিনের মধ্যে। সুতরাং জুনের প্রথম থেকে ফুটবল খেলা পুরোপুরি জমে উঠবে।

ফুটবল মরসুমের সূচনায় এখানকার ফুটবল খেলার খবরই সমস্ত সংবাদপত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলার জন্য। ভারত ও ফিলিপাইনের মধ্যে ডেভিস কাপের ফাইন্যাল খেলা নিয়ে সব কাগজেই খুব মাতামাতি করেছে। করবারই কথা। কারণ ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যালের অনুষ্ঠান ভারতে এই প্রথম। ইতিপূর্বে ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজে ভারত ও মালয়ের মধ্যে ডেভিস কাপের প্রথম রাউণ্ডের খেলা একবার অনুষ্ঠিত হলেও আজ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাই স্বাভাবিকভাবে ভারত ও ফিলিপাইনের ফাইন্যাল খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতার টেনিস রসিকরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন।

কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাউথ ক্লাবে আয়োজিত ডেভিস কাপের এই পূর্বাঞ্চলিক ফাইন্যালে ভারত ৪—১ খেলায় ফিলি-পাইনকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার মূল প্রতি-যোগিতার সেমি-ফাইন্যালে খেলার অধিকার পেয়েছে। ভারতকে এখন মূল সেমি-ফাইন্যালে খেলতে হবে ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের ফাইন্যাল খেলার বিজয়ী দেশের সঙ্গে। আমেরিকা অবশ্য এ খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না। কারণ গতবার ডেভিস কাপ জয় করে আমেরিকা বহাল তবিয়তে বসে আছে। বিশ্বব্যাপী খেলার বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ চরম খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আমেরিকার সঙ্গে। যতদূর মনে হয় ভারতকে মূল সেমি-ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেই খেলতে হবে। কারণ ইউরোপ ও

কলকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি'র কক্ষে ভারত ও ফিলিপাইনের মধ্যে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলার তালিকা রচনা করা হয়। অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশনের অস্থায়ী সম্পাদক ডাঃ এইচ কে হাণ্ডুর কন্যা শ্রীমতী শঙ্কর দাশ দু'টি কাপের মধ্য থেকে দুই দেশের খেলোয়াড়দের নামাঙ্কিত কাগজের টুকরা তুলছেন

খেলাটি বাদ দিলে এ পর্যন্ত ছয়টি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল কোন খেলাতেই হার স্বীকার করেনি। অপরদিকে ভারতীয় দল ওভ্যাল মাঠে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স টীমকে দুই দিনব্যাপী খেলায় ১০ উইকেটে আর কেম্ব্রিজে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে এক ইনিংস ও ৫৩ রানে পরাজিত করেছে। ইণ্ডিয়ান জিমখানা, উরস্টার, লিস্টার ও সারের সংগে বাকী চারটি খেলার ফলাফল থেকে গেছে অমীমাংসিত। সুতরাং ভারতের তরুণ দলটি এ পর্যন্ত ভালই খেলেছে বলতে হবে।

অবশ্য এই ভাল খেলার পেছনে অদৃষ্টের কিছুটা সহায়তা আছে, একথা স্বীকার করা উচিত। প্রথমত ছয়টি খেলার মধ্যে কেম্ব্রিজ ও লিস্টারের সংগে শেষের দুটি খেলা ছাড়া বাকী চারটি খেলাতেই আমরা 'টসে' জিতেছি এবং মাঠ খুব নরম থাকায় কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে 'টসে' জিতেও প্রথম ফিল্ডিং নিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ আবহাওয়া। ইংলণ্ডের ভিজে আবহাওয়ায় আমরা খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নই। আমাদের বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ও শুকনো মাটির মানুষ।' কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার প্রতি এখনো তেমন অভিযোগ করবার আমাদের কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু ঘটবে নিশ্চয়ই। কথায় বলে স্ত্রীলোকের মন অনিশ্চিত ও দুর্বোধ্য। কিন্তু ক্বচিৎ কদাচিৎ তাদের সত্যিকারের মনের রূপ ধরা গেলেও ইংলণ্ডের আবহাওয়ার কোন কূল কিনারাই পাওয়া যায় না। জমির রূপও দুর্বোধ্য। আগের দিন যে মাঠে হাঁস সাঁতার কেটে বেড়ায়, কেউবা ছিপ নিয়ে মাছ ধরে, পরের দিন আবার সেই মাঠেই খেলা হয়। ভারতে আমরা এটা কল্পনাও করতে পারি না। আর বৃষ্টি। সে তো যে কোন মুহূর্তেই আসতে পারে। তবে প্রথম শ্রেণীর খেলায় উইকেট ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। টেস্টে উইকেট ঢাকবার ব্যবস্থা হয়নি।

খেলার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। আগেই বলেছি ইণ্ডিয়ান জিমখানার সংগে ভারতীয় দলের প্রথম খেলাকে সফরের 'ফাউ' হিসাবে ধরা যেতে পারে। নরফোকের ডিউকের দলের সংগের খেলাটি যদিও সরকারী সফরের প্রথম খেলা ছিল, তবুও এক দিনব্যাপী ঐ খেলারও বিশেষ কিছু গুরুত্ব ছিল না। বৃষ্টি বাদ সাধায় খেলাটি হয়ও নি, তার সম্বন্ধে আলোচনারই বা কি আছে? ইণ্ডিয়ান জিমখানা দল সম্পর্কে দু' একটি কথা বলতে চাই। নামে 'ইণ্ডিয়ান' হলেও আজ ভারত ছাড়া বহু দেশের লোকই এই জিমখানার সদস্য। অবশ্য এর গোড়া পত্তন হয়েছিল ভারতীয়দেরই প্রচেষ্টায়। ভারতের রাজন্যবর্গের বদান্যতায় এই জিমখানার সুদৃশ্য প্যাভেলিয়ন ও তার সংলগ্ন মনোরম বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠটি গ্রেটার লণ্ডনের অস্টারলী পার্কে অবস্থিত। আণ্ডার গ্রাউণ্ড বা ভূগর্ভ রেলপথে লণ্ডনের কেন্দ্র স্থান থেকে অস্টারলী পৌঁছতে পৌনে দু' ঘণ্টার মত সময় লাগে। আবহাওয়ার গুণে এমনও হয় লণ্ডনে এমন বর্ষণ কিন্তু অস্টারলী পার্ক শুকনো খট খটে। শুকনো মাঠেই এবার ভারতীয় দল জিমখানার সংগে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলে 'ড্র' করেছে। অবশ্য সময়ের অভাবেই জিমখানা দল হারতে হারতে বেঁচে গেছে। প্রধানত উমরিগর, নাদকার্ণী ও কৃপাল সিংয়ের ভাল ব্যাটিংয়ের ফলে ভারতীয় দল করেছিল ২৬৮ রান। ইণ্ডিয়ান জিমখানা ১৩৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করবার পর 'ফলো অন' করে দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিল ৭ উইকেটে ১৩৫ রান। এ খেলায় উমরিগরের ৯৭ রানের কথা যেমন বলবার বিষয়, তেমন প্রথম ইনিংসে সুরেন্দ্রনাথের ২২ রানে ৪টি উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে বোরদের ৩৬ রানে ৪টি উইকেট পাবার ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

উরস্টার ক্রিকেট মাঠের কথা লিখতে বসলেই প্রথমে মনের পটে ভেসে ওঠে সুবিখ্যাত আকাশচুম্বী 'ক্যাথিড্রাল' বা গীর্জার স্মৃতি। তার মনে পড়ে মাঠের অনতিদূরে কলস্রোতস্বিনী সেভার্ন নদীর কথা। বহুদিন থেকেই ইংলণ্ড সফরকারী অভ্যাগত দলের পয়লা প্রথম শ্রেণীর খেলা এই মাঠেই হয়ে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৪৬ সালে এই মাঠেই পতৌদির নবাবের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দলের খেলা দেখেছি। ১৯৫২ সালে এই মাঠে এসেছি অধিনায়ক বিজয় হাজারের দলের সংগে। কিন্তু পুরো খেলা দেখিনি। সেবার একদিন খেলার পর বৃষ্টির ফলে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে কি বৃষ্টি! থামবার নাম গন্ধ নেই। মনে হয়েছিল বুঝি 'চেরাপুঞ্জীতে' এসে পড়েছি; কিন্তু চেরাপুঞ্জীতে কি এত ঠাণ্ডা? হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে আমরা জড়সড় হয়ে বসেছিলাম। আর দেখেছিলাম উরস্টারের ফাস্ট বোলার রেজ পার্কস মাঠে ছিপ নিয়ে মাছ ধরছেন। দেখেছিলাম অবশ্য টেলিভিশনের ছবির পর্দায়।

দেরিতে পৌঁছবার ফলে এবারও আমার উরস্টারের সংগে ভারতীয় দলের খেলা দেখা হয়নি। এ খেলার বিশদ বিবরণ আপনারা কাগজেই পড়েছেন। খেলায় ভারতের সূচনা খুব খারাপই হয়েছিল। কিন্তু প্রথম ইনিংসে চন্দ্রকান্ত বোরদের ৯০ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে উমরিগরের ৮৭ রান ভারতের মুখ রক্ষা করেছে। বোলিংয়ে সুভাষ গুপ্তে ৯২ রানে ৬টি উইকেট এবং আর দেশাই ৮৮ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও উরস্টারের জর্জ ডিউস (১২২) ও বব ব্রডবেণ্ট (১০২) সেঞ্চুরী করায় বুঝতে কষ্ট হয়নি এরা ভারতীয় বোলিংয়ের উপর বেশ আধিপত্যই বিস্তার করেছিলেন।

ওভ্যাল মাঠে দু দিনব্যাপী খেলায় ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ভারতীয় দল সফরের প্রথম জয়লাভ করেছে। ভারতের সামরিক বিভাগের বৈমানিক ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট মুদিয়ার বলের চমৎকার 'ফ্লাইটে' ক্রিকেট কনফারেন্স দল প্রথম ইনিংসে ৯৮ রানের বেশী করতে পারেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়সিমা, নাদকার্ণী এবং ঘোড়পাড়েও ভাল বল করেছেন। মুদিয়া প্রথম ইনিংসে পেয়েছেন ৪০ রানে ৬টি উইকেট। ভারত ১০ উইকেটে এ খেলায় জিতলেও ক্রিকেট কনফারেন্স দলের হল কিন্তু একাই ৪৯ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। এ হল কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ত্রাস-সৃষ্টিকারী বোলার ওয়েস হল নন। ইনি সারের এমেচার খেলোয়াড় জন হল। এখন দেখছি এর 'নামের' স্মৃতিই আমাদের খেলোয়াড়দের মনে জাগিয়ে তুলেছে এক মলিন স্মৃতি।

কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি এবার এমন কিছু শক্তিশালী ক্রিকেট টীম না হলেও কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে আমাদের এক ইনিংস ও ৫৩ রানে জয়লাভ গৌরবের কথা। আরও গৌরবের কথা এই খেলায় পলি উমরিগরের না আউট থেকে ২৫২ রান করার কৃতিত্ব। ভারতীয় দল এ খেলায় ৬ উইকেটে ৪৩৬ রান করে ডিক্লেয়ার করেছে এও জানার কথা। উমরিগর ছাড়া ঘোড়পাড়ে, কন্ট্রাক্টর নাদকার্ণীও ভাল ব্যাটিং করেছেন। পুরনো খেলোয়াড় উমরিগর বরাবরই নির্ভীক খেলেছেন। মাঝে তার খেলায় কিছুটা মন্থর গতিও প্রথম দেখা গিয়েছিল। এই সফরে তিনি যে আবার তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়াধারা ফিরে পেয়েছেন তা খুবই আশার কথা। খটে খটে করে খেলা চালাতে কেউই পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে তো নয়ই। কেম্ব্রিজে ভারতীয় দলের ব্যাটিং দেখবার পর এখানকার অনেক সমালোচকই খুশী হয়েছেন। উমরিগরের হাতে কয়েকখানা অভিনন্দন বার্তাও এসে পৌঁছেছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে ভারতীয় দল যেখানেই থাকুক আর যেখানেই খেলুক না কেন, কোন খেলোয়াড়ের নামে কোন অভিনন্দন care of Indecricket London এই ঠিকানায় এলে তা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যবস্থা ভাল হয়েছে সন্দেহ নেই।

ইংলণ্ডে উমরিগরের এটাই চতুর্থ ডাবল সেঞ্চুরী এবং ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে সর্বোচ্চ রান। ১৯৫২ সালে উমরিগর

মা সবসময় **হামাম** কেনেন

নরম, মসৃণ ফেণা…

নূতন কোমলকারক পদার্থ আছে ব'লে।

ত্বক পরিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে স্নিগ্ধও করে…

হামাম মাখতে এত চমৎকার এবং সুগন্ধি!

•

কিছুতেই যেন আর ক্ষয় হতে চায় না…

এত অল্পই খরচ হয়!

হামাম

মেখে তাজা বোধ করুন এবং তাজা গন্ধে ভরে উঠুন

THY-1

বাড়ীর সবাই **হামাম** পছন্দ করে টাটা উৎপাদিত—তাই নিশ্চয়ই ভাল

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING
OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

নিখুঁত
কেশতৈলের
সন্ধান
পেয়েছেন কি?
আপনি যদি এমন কোন কেশতৈলের সন্ধানে থেকে থাকেন – যা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবে, যাতে কোন কৃত্রিম রং থাকবে না। আর মাথায় যা স্বাভাবিক তেলের যোগান দেবে, তা হলে নিশ্চিতই আপনি খুঁজে নেবেন
কেয়ো-কার্পিন
॥ সক্রিয় ভেষজ কেশতৈল
চুলে নতুন জীবন দেয় ॥
দেজ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটি
DB/KK/1-59

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যে নূতন উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নিশিপদ্ম ৪॥০

আশাপূর্ণা দেবীর

কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

অমনোনীত গল্প

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : কলি-১২

১১ই জ্যৈষ্ঠ

নজরুল জন্মদিবসে

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনীর শ্রদ্ধার্ঘ

কাজী নজরুল প্রসঙ্গে ৩-৫০

(স্মৃতিকথা)

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

দাম : চার টাকা

বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী

২০ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫ : ফোন ৫৫-৪৪২৫

সূচীপত্র

বিষয় লেখক

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 30th May, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল কোন এক উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাতন্ত্র অবাধ পরিচালনার ভার পাইলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেই রাষ্ট্রকে অভীষ্টপথে লইয়া যাইতে পারেন। কেহ আপত্তি করিবে না, আপত্তি করিবার কথা কাহারও মনেই উঠিবে না।

কেরলের শিক্ষাসংকট সম্বন্ধে রাসেলের এই উক্তি প্রযোজ্য, কেন না, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের শাসন প্রসঙ্গেই কথাটা তিনি পাড়িয়াছিলেন। তবে প্রভেদের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে, রাসেলের মনে ছিল কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র আর এক্ষেত্রে লক্ষ্য একটি কম্যুনিস্ট রাজ্য। দুই-এ আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইলেও স্বভাবে এক।

সকলেই জানেন যে, শিক্ষা আইন প্রসঙ্গে কেরলে একটা মহাসংকট আসন্ন। আগামী ১লা জুন এই নাটকের প্রথম মঞ্চের পর্দা উঠিবে। ইহা কোন আকস্মিক বিপর্যয় নয়, সমস্তটাই নিগূঢ় চিন্তাপ্রসূত পূর্ব পরিকল্পনাজাত ব্যাপার। কম্যুনিস্ট পার্টি কেরলে শাসনভার পাইবামাত্র নিজেদের চিরন্তনভাবে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে দেয়ালে হাতুড়ি ঠুকিয়া দুর্বল স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। অবশেষে তাহারা যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছে, মনীষী রাসেল তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কম্যুনিস্টগণ বুঝিয়াছেন যে, একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিতে হইবে, ডাল-পালা কাটিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বৃক্ষটাকে সমূলে উৎপাটিত না করিতে পারিলে স্থায়িত্বের আশা নাই। বৃক্ষ হইতেছে গণতান্ত্রিক মনোভাব। গণতান্ত্রিক মনোভাব দূর না করিতে পারিলে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

কেরলে শিক্ষাসংকট

আর গণতান্ত্রিক মনোভাব দূর করিবার যথার্থতম উপায় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে, যাহাতে গণতন্ত্রের প্রতিকূল হয়, একনায়কত্বের অনুকূল হয়। ১লা জুন যে শিক্ষা আইন চালু হইবে, তাহা সেইভাবেই তৈয়ারী।

এ আইন বিধান সভার মেজরিটি (কম্যুনিস্ট পার্টি স্বতন্ত্র সদস্যের সহায়তায় দুটি মাত্র ভোটে মেজরিটি) সিদ্ধ হইলেও কেরল রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীর সমর্থন লাভ যে করে নাই, তাহার প্রমাণ এগারো হাজার স্কুলের মধ্যে সাত হাজারের অধিক স্কুল ঘোষণা করিয়াছে যে, শিক্ষা আইনের প্রতিবাদে ১লা জুন হইতে স্কুল বন্ধ থাকিবে। বাকী চার হাজার সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল। উহাদের কর্মের স্বাধীনতা থাকিলে উহারাই বা কী করিত কে জানে। এই কুখ্যাত কালা কানুন সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। আমরাও যথাসময়ে আলোচনা করিয়াছি; কাজেই এখন বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইহার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি কম্যুনিস্ট পার্টির কুক্ষিগত করা। তাহার উপায় হইতেছে যে, শিক্ষক নির্বাচনে, পাঠ্য স্থিরীকরণে ও সাহায্য দানে নিরঙ্কুশ সরকারী ক্ষমতা ও খেয়াল প্রয়োগ। ইহার ফলে শিক্ষার সংকোচ ও স্কুলের সংখ্যা হ্রাস অবশ্যম্ভাবী এবং সবচেয়ে অবশ্যম্ভাবী ও একান্ত অবাঞ্ছিত হইতেছে, শিক্ষার স্বাধীন সত্তা বলিয়া কিছু থাকিবে না, তাহা একটি সরকারী হাতিয়ারে ও সরকারী প্রচার বিভাগে পরিণত হইবে। গণতান্ত্রিক মনোভাবের কেল্লা উড়াইয়া দিবার জন্য দুর্গমূলে বারুদ স্তূপীকৃত হইয়াছে, ১লা জুন স্বহস্তে, স্বজ্ঞানে, সানন্দে সরকার অগ্নিসংযোগ করিবেন বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নাম্বুদ্রিপাদ সগর্বে ঘোষণা করিয়াছেন। অশুভ পরিণামের জন্য ধীরভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী আছে জানি না।

শিক্ষার উপরে সরকারী কর্তৃত্বের আমরা বিরোধী। একথা আগে বহুবার বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে আবার বলিব। শুধু শিক্ষাই-বা কেন — সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প সর্বত্র আমরা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, সরকারী হস্তক্ষেপে এ সকল যে কেবল ধ্বংসই পায় তাহাই নয়, মানুষের মন রূঢ় হইয়া নীরস হইয়া বিচার-বিমূঢ় হইয়া ক্রমে একনায়কত্বের ভিত্তি স্থাপন করে। তা ছাড়া সরকারী খেয়ালে শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট হইলে সরকারের পরিবর্তনে শিক্ষানীতিরও পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। এখন প্রত্যেক পাঁচ দশ বছর অন্তর যদি শিক্ষানীতি পরিবর্তিত হইতে থাকে, তবে শিক্ষা ব্যাপারটাই হাস্যকর হইয়া পড়ে। (অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টি সরকার বদলে অভ্যস্ত নয়। 'শেষাঃ স্থিরত্ব সিদ্ধান্ত' আর কি!) কাজেই গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কেরলের শিক্ষানীতির যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। গণতন্ত্রী ভারত ইতিমধ্যে যথোচিত প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। আশা করি, শেষ মুহূর্তে রাশ টানিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নাম্বুদ্রিপাদ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

প্রসঙ্গত

অতি-ব্যবহারে শব্দের অর্থ গৌরবের লোপ ঘটে, "অপূরণীয় ক্ষতি" — এই কথাটির বেলায় যেমন ঘটেছে। যত্র-তত্র আমরা এটি প্রয়োগ করে থাকি, লঘু-গুরু ভেদ থাকে না। মিঃ ডালেসের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি অবশ্যই হল, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল। মিঃ ডালেসের উদ্দেশে তাঁর শত্রু-মিত্র অনেকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। শ্রদ্ধা ডালেসের নীতির প্রতি ততটা নয়, যতটা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সত্যই অসামান্য পুরুষ ছিলেন।

মিঃ ডালেস প্রায় তিন মাস যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিলেন। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং মৃত্যু যদিও অবশ্যম্ভাবী, তবু শোকাবহ। জেনেভায় পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকের টেবিলে এবার মিঃ ডালেসের পরিচিত মূর্তি দেখা যায়নি এবং আর কোন দিনই দেখা যাবে না।

এই অপমৃতি কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, একটি যুগের অবসান ঘটল বলা যেতে পারে: নীতিরও কিনা, একমাত্র আগামী কালই সেকথা বলতে পারে। কূটনীতির ক্ষেত্রে কোন্ নীতির প্রতীক ছিলেন ডালেস? বলা বাহুল্য, কম্যুনিজম্-বিরোধিতার। তাঁর নীতি ম্যাকার্থিবাদের মত উগ্র এবং অন্ধ যদিও ছিল না, তবু বিরোধী মহলে দুটিই সমভাবে সমালোচিত হয়েছে, টুইডলডাম আর টুইডলডীকে পৃথক করে দেখা কঠিন। যাঁরা মতের দিক থেকে ডালেসের সমর্থক, তাঁদেরও অনেকে তাঁর পথ মেনে নিতে পারেননি; অভীষ্ট সিদ্ধিই তাঁর কাছে বড় ছিল বলে ডালেস "মীনস্" অর্থাৎ উপায়টা স-হিত না গর্হিত সেদিকে দৃকপাত করেন নি। এসিয়ায়, ইউরোপে, নাটো-সীয়াটো ইত্যাদি যে-সব সামরিক চক্র তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তার জন্যে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মহলে তাঁকে বিরাগভাজন হতে হয়েছে। সমকালের অন্য কোন রাজনীতিক বোধ হয় স্বপক্ষে এতটা নন্দিত এবং বিপক্ষের কাছে নিন্দিত হননি।

ডালেস-নীতির কতখানি তাঁর স্বরচিত কতখানি আমেরিকার প্রভাবশালী মহল কর্তৃক প্ররোচিত, সেটা স্নায়ুর লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি থেকে বোঝা যাবে। কিন্তু আপন আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসে ডালেসের নাম দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাঁর 'ম্যাসিভ্ রিটালিয়েসন' নীতি পৃথিবীকে যুদ্ধের প্রায় কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল ("ব্রিংকম্যানসিপ" কথাটি স্মরণীয়) এবং সন্দেহ নেই, তিনি ক্রুশ্চেভ ইত্যাদির মত "পিরুয়েৎ" (হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো) নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন না। স্পেডকে স্পেড বলতেও তাঁর সাহসের অভাব ঘটেনি; যদিও তাঁর অপ্রিয় ভাষণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায়শই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এই দিক থেকে বিচার করলে স্বতঃই সন্দেহ হবে যে, এই বিশ্রুত ডিপ্লোম্যাট আসলে হয়ত ডিপ্লোম্যাট ছিলেন না; কেন না তাঁর সংহিতায় "নত হয়ে জয় করো" এই অনুজ্ঞাটি ছিল না।

*

তাপক্লিষ্ট নাগরিকেরা বিধাতার কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সে-প্রার্থনা বিধাতা রেখেছেন। কিন্তু যা চাওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে কিছু বেশীই দিয়েছেন—বেণীর সঙ্গে মাথা। অর্থাৎ জলের সঙ্গে সর্বনাশা ঝড়। গত বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে দক্ষিণ কলকাতার দৃশ্য ছিল হতাহত সৈন্যে পরিকীর্ণ রণক্ষেত্রের মত। ছিন্ন-ভিন্ন শাখা অপ্রদীপ পথে পথে ব্যারিকেড রচনা করেছিল। ঘূর্ণিবাত্যা শত শত মানুষকে গৃহহারা করেছে — অনেককে দ্বিতীয়বার—প্রাণহানিও ঘটিয়েছে; কিন্তু তার হিংস্র মুষ্টির প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল বনস্পতি, ভূলুণ্ঠিত শিরে তারা ঝটিকার উদ্ধত জয়যাত্রার পথ আস্তৃত করেছে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর-নিষ্ঠুর খেলা থেকে কাব্যের প্রেরণা শেলীকে হয়ত প্রেরণা যোগাত; কিন্তু যে মাল্টিচ্যুড্ 'পেস্টিলেন্স-স্ট্রিকন', পিঙ্গল, কৃষ্ণ আলোহিত পত্ররাজির শোভায় তাদের মোহিত হবার উপায় নেই। আর এমনিতেই বিরলবৃক্ষ কলকাতা মুণ্ডিত মস্তকে কতকাল এই শোকাবহ ঘটনার স্মৃতি বহন করবে তার স্থিরতা নেই,—বহু সায়োজন বনমহোৎসবেও হয়ত এই অশৌচকালের ক্লান্তি হবে না।

*

উড়িষ্যার নতুন মন্ত্রিসভার বিষয়ে গত সংখ্যাতেই কিছু লেখা হয়েছিল; অতএব এবার মাঙ্গলিক উচ্চারণ করেই কাজ সারি। যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন হল, সেটি আকারে ক্ষুদ্র—মাত্রই তিনজনের সংসার। কেউ একে জমকালো করে বলেছেন, "ত্রয়ী" বা "ত্রিমূর্তি"; কেউ বা হালকা করে বলেছেন, পকেট মন্ত্রিসভা। অর্থাৎ ভারী ভারী বহু গ্রন্থের—যথা ডিক্সনারী—যেমন পকেট সংস্করণ আছে, এটিও তেমনই; এবং এত ছোট যে, ফতুয়ার পকেটেও নাকি রাখা যায়। অত মাপ-জোখেই বা দরকার কী, এটা ত নিশ্চিত যে, শ্রী মহতাব অনেক সন্ন্যাসীতে মিলে গাজন নষ্ট করতে দেননি। পার্কিনসন-সংহিতার এক বিপরীত সূত্রও তিনি উদ্ভাবন করেছেন।

কংগ্রেসকে নিয়ে কোয়ালিশন ভারতে এই সর্বপ্রথম হল। যতদূর স্মরণ করতে পারছি, ভাগের কারবারে অংশীদার হতে কংগ্রেস ইতিপূর্বে স্বীকৃত হয়নি। এবার হল। এই ভাগ কিসের ভাগ? অবশ্যই ক্ষমতার, তাতে কোন সংশয়ই নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সেবারও। উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে কংগ্রেসের প্রকৃতি পরিবর্তনও এবার স্বীকৃত হল। কংগ্রেস আর মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণের মঞ্চ মাত্র নয়, একটি পার্টি—অবশ্য প্রধানতম পার্টি—কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন এবং একটি বাদে সমস্ত রাজ্যেও। দুর্বলতার সুযোগে যদি একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতা হারিয়ে বসে, কিংবা বসবে এমন উপক্রম দেখা যায়, তবে অবশ্যই সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। কেন না রাজ্যচ্যুতি পরিণামে কেন্দ্রকেও দুর্বল করে ফেলতে পারে। অতএব কংগ্রেস যে গণতন্ত্র পরিষদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এর পিছনে রাজনৈতিক যুক্তিও আছে। যাঁরা এখনও এই মিতালীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন, তাঁদের ভীমের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি স্মরণ করতে বলি:—"কৌরব পাণ্ডব যদি মিলে এ আহবে, তাহে তব কিবা অপমান, বাড়িবে কেবল ভারতবংশের মান......" ইত্যাদি। দুটি প্রভাবশালী দল যদি এক হয়ে সেবায় ব্রতী হয়, তাতে উৎকলেরই মঙ্গল।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

আট

প্রমথ চৌধুরী তাঁর ১২।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে আমায় লিখেছিলেন :

"আমার লেখা আনন্দ থেকে বেরোয়নি, বেরিয়েছে বেদনা থেকে। ব্যথার একটা গুণ এই যে, যার তা হয় তার আত্মজ্ঞান টনটনে হয়ে ওঠে—সে যে individual তার মনে কোনও সন্দেহ থাকে না।"১

প্রত্যেক নূতন সৃজনেই বেদনা। মানুষ যখন জন্ম লাভ করে, তার জননীর তখন হয় প্রসব-বেদনা। সে যে কী কষ্ট তা প্রসূতিরা জানেন। ইদানীং আমেরিকায় না-কি এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে অনেক কষ্টের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সে যন্ত্রের নাম ডলারিমীটার (Dolorimeter)। স্টেটসম্যানের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই সংবাদ সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে যে, ঐ ডলারিমীটার-যন্ত্র অনুসারে প্রসব-বেদনা সবচেয়ে বড় বেদনা। ও-যন্ত্র না তৈরী হলেও আমরা বলতুম, ও-যন্ত্রণা মহতী। তবে নারীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা পুরুষের চতুর্গুণ, তাই অত বড় যন্ত্রণা সহ্য করে জননীরা মানব-জাতিকে চির-মরণ থেকে রক্ষা করতে পারে। সন্তান সম্যক-রূপে বিস্তার করে দেহ-ধারী প্রাণীকে।

মানুষ পুত্রের দ্বারা অমরত্ব পায়, এ-ধারণা রিহুদীদের ধর্মশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে উপাখ্যান দেখি, সেখানেও নারদ ঋষি রাজাকে উপদেশ দিচ্ছেন :

"পিতা যদি উৎপন্ন ও জীবিত পুত্রের মুখ দেখেন, তাহা হইলে সেই পুত্র আপনার ঋণ সমর্পণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে—।"..."পিতা সর্বদা পুত্রের সাহায্যে বহু দুঃখ অতিক্রম করেন; আত্মাই আত্মা হইতে [পুত্ররূপে] উৎপন্ন; সেই পুত্র [ভবসমুদ্রে] পার করিবার পক্ষে অন্নপূর্ণ উৎকৃষ্ট তরণী স্বরূপ।" "মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা এ সকলে কি হইবে?"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ উদ্ধৃত করলুম। তিনি সায়নাচার্যের ভাষা অনুযায়ী পাদটীকায় বলেছেন :

"মল, অজিন, শ্মশ্রু ও তপস্যা এই চারিটি শব্দে আশ্রম-চতুষ্টয় বুঝাইতেছে।"

অবশ্য এ-মতকে মেনে নিতে আমরা বাধ্য নই। পশু-পক্ষীদের নজীর দেখিয়ে নারদ বলছেন :

"অপুত্রকের কোন লোক নাই, ইহা সকল পশুতেও জানে, সেই জন্যই (পশুমধ্যে) পুত্র মাতা ও স্বসার সহিত সংসর্গ করে।"

অর্থাৎ মানুষকে পশুবৎ আচরণ করতে বলা হচ্ছে। এ মত যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী, সে-কথা অনস্বীকার্য।

হরিশ্চন্দ্রের এই উপাখ্যান আসলে অ-ভারতীয় উপাদানে প্রস্তুত। মেসো-

১ গত সপ্তাহের দেশ পত্রিকা দ্রষ্টব্য

পোটেমিয়াতে এর উদ্ভব। যে-প্রমাণের উপর আমার এ-সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে, তার অবতারণা করা এ-স্থলে উচিত হবে না। কেবল একটা কথা বলে রাখি। হরিশ্চন্দ্র যে দেবতার প্রসাদে পুত্রলাভ করলেন, সে-দেবতা বরুণ, আর বরুণস্য পুরী রম্যা পুরাণে 'সুষা' নামে অভিহিত। এই 'সুষা' যে Susa, এবং সেখান থেকেই শিশুনাক রাজা যে মগধে এসেছিলেন, তার প্রমাণ আমার ইংরিজী প্রবন্ধে দেওয়া আছে।২

তবু যেহেতু মানুষ এখনও তার মনুষ্যত্বকে পুরোপুরি পশুত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে নি, মনুষ্য জাতির দেহ-ধর্ম-স্বীকার অপরিহার্য। তাই বলা যায়, শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। তাই দেখি, আয়ুর্বেদকে একটা বেদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নর-দেহ-ধারী বিষ্ণু। এই বিষ্ণুকেই আমরা সর্বজীবনের প্রসবিতা সবিতা রূপে ধ্যান করি। সূর্যদেব সর্বত্রই পূজ্যদেব। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিকও এ-দেবতার কাছে নত-শির হতে বাধ্য। আর কষ্ট না করলে যে কেষ্ট পাওয়া যায় না, এ-সত্যও সকলেই জানে।

আদিকবি বাল্মীকি যখন বল্মীক-স্তূপের মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁর কত কষ্ট হয়েছিল তা আমরা জানি না। আমেরিকান ডলারমীটার ত সে সময়ে তৈরী হয়নি! তবে তাঁর শোক থেকে যে "শ্লোক" বেরিয়েছিল, তার সার্টিফায়েড কপি রামায়ণে রয়েছে :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

একজন ব্যাধ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছে, তাই দেখে বাল্মীকির মন বেদনায় কাতর হল, এবং সেই শোক থেকে উদ্ভূত এই শ্লোক।

কালিদাসের অমর-কাব্য মেঘদূত। সেখানেও বিরহী যক্ষ আপন গোপন ব্যথার কথা নিয়ে দূত হয়ে যেতে বলছেন মেঘকে :

সন্তপ্তানাংত্বমসি শরণম্।

কিন্তু মেঘ ত জড়, অচেতন। কবির কৈফিয়ৎ এই :

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

কাম-পীড়িত যারা হয়, তাদের বিচার-শক্তি লোপ পায়, চেতন-অচেতনে ভেদ তারা বোঝে না। এই পীড়া, এই বেদনা এ-স্থলে কাব্য-রসের উৎস।

শঙ্করাচার্য আর ভারতচন্দ্র, এঁদের দুজনের জীবনী যেটুকু শোনা আছে, তার থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তাঁদেরও রচনা বেদনা থেকে বেরিয়েছে। পারিবারিক অশান্তি এ দুজনকেই বহির্মুখী করেছিল। মনের অসুখ ত একটা অসুখ বটে।

ভারতচন্দ্রেও দেখি, দক্ষযজ্ঞে সতীর মৃত্যুতে শোকাকুল মহাদেব বলছেন :

অরে রে অরে দক্ষ, দে রে সতীরে!
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে,
সতী দে সতী দে সতী দে!

সমবেদনায় ছন্দ এখানে হয়েছে সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভূ। এই পংক্তিগুলো আমার ঠাকুরদাদা আবৃত্তি করে যখন আমাদের শোনাতেন, তখন তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত। ভারতচন্দ্রের আর একটি কবিতার শেষ দু-লাইন আবৃত্তি করবার সময়েও তাঁর স্বরে কাতর ভাব শোনা যেত :

এহি এহি দেহি দেহি দেহি রক্তদন্তিকে
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমম্বিকে!

এই দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতচন্দ্রের উপর শংকরাচার্যের প্রভাব উপলব্ধ হবে। স্তোত্রকার বলছেন :

ভবৎভক্তি মেকাং স্থিরাং দেহি মহ্যম্
কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোঽস্মি তস্মাৎ॥

শংকরের প্রিয় ছন্দ ভুজঙ্গপ্রয়াতে রচিত আর একটি স্তোত্রের ধ্রুবপদ হচ্ছে :

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্!

আমার মনে হয়, এই আদর্শ গ্রহণ করেই ভারতচন্দ্র লিখলেন :

সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে।

একটা ব্যক্তিগত কথা বলি। শংকরাচার্যের অনেক স্তোত্রে ভৈরবী, ছায়ানট, খাম্বাজ, ইত্যাদি রাগ-রাগিনী সংযোগ করে বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। এ-কার্যে তাঁর প্রবৃত্তি এসেছিল আমার মেজদাদার মৃত্যুর পর, যখন পিতৃদেব শোকে মুহ্যমান। তাঁর দেওয়া সুর আর শংকরাচার্যের ছন্দ আমার কানে ও প্রাণে যে-রেশ রেখে গেছে, তারই ফলে আমি পেয়েছি দেব-ভাষায় ভক্তি, এবং ঐ ভাষায় যে সামান্য অধিকার লাভ করেছি, সে জ্ঞান-যোগে নয়, ভক্তি-যোগে।

সবুজ-সভার বৈঠক বসত সচরাচর প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে। সেখানে কোনো গানের মজলিসে শংকরের শংকর-স্তোত্র সুর-সংযোগে শোনাতে সাহস করিনি কোনোদিন, পাছে রহস্য-জ্ঞানী মনে আঘাত লাগে। তবে কচিৎ কখনো বাবার বৈঠকখানাতেও সভা বসত, এবং তদুপলক্ষে ধ্যান না ভেঙে শিবের গীত গেয়েছি কি না তা স্মরণ নেই। শংকর-প্রসঙ্গে তখন একটা কথা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করিনি। বেদান্ত-বাদী-শংকর কি শিব-স্তব-কারী-শংকর ছিলেন? উপনিষদের শাংকর-ভাষ্য সম্বন্ধে তখন আমার জ্ঞান একটু ভাসা-ভাসা। অথচ, শংকরের স্তোত্র

২ Journal of the Asiatic Society of Bengal (1948) Journal of the American Oriental Society (1922).

পিতৃদত্ত সূত্রের সহযোগে বাল্যকাল থেকে আমার শ্রুতিগোচর হওয়ার ফলে যে-রোমাঞ্চ অনুভব করতুম, সে-রোমাঞ্চকে অতিক্রম করে যাবার ইচ্ছেও ছিল না। বহুকাল পরে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, বন্ধুবর শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, যিনি সে-কালে মাঝে মাঝে সবুজ-সভায় যেতেন এবং এ-কালে প্রায়ই পশ্চিম-বঙ্গের বিধানসভায় থাকেন, কথায় কথায় তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেন, স্তোত্রকার শঙ্করাচার্য আর বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য হয়ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। নিরাকার ব্রহ্ম যে সাকার হয়ে সাধকের কাছে আবির্ভূত হতে পারেন, এ-সম্ভাবনা তৎক্ষণাৎ হঠাৎ আমার মনে এসে গেল। স্তোত্রকার শঙ্করই ত বলেছেনঃ

দীপং দেব দয়ানিধে পশুপতে
হৃৎকল্পিতং গৃহ্যতাম্।

এখানে পূজার উপকরণকে 'হৃৎকল্পিত' বলায় বোঝা যায়, শঙ্কর ছিলেন মানস-পূজার পূজারী।

আর এক স্তোত্রে আছেঃ

পরাত্মানমেকংজগদ্বীজমাদ্যং
নিরীহং নিরাকারমোঙ্কার বেদ্যং
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্।

এখানে উপনিষদের ব্রহ্ম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত।

একবার মেঘদূতে ফিরে আসা যাক্। সমগ্র মেঘদূত কাব্যে মাত্র একটি ছন্দ ব্যবহার করেছেন কালিদাস। সে-ছন্দ খুব সম্ভব কালিদাসেরই আবিষ্কার। তার নাম মন্দাক্রান্তা। এই নামের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সংস্কৃত 'মন্দ' শব্দের ধাতুগত অর্থ যদি ধরা যায়, তাহলে ওর মানে হতে পারে 'জড়'। তেমনি সংস্কৃত 'আক্রান্ত' শব্দের ধাতুগত অর্থ ধরা যাক্ঃ আ+ক্রম্-ধাতু+ক্ত। ক্রম-ধাতুর অর্থ—'গমন করা।' আ-উপসর্গের যোগে যদি ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি বুঝি, তাহলে জড় মেঘের আকাশপথে দূত হয়ে গমন করার সার্থকতা উপলব্ধি করি। মেঘদূতের গোড়ার দিকেই পড়িঃ

মন্দং মন্দংনুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং।

যে-হাওয়া 'মন্দং মন্দং' অর্থাৎ ধীরে ধীরে জড় মেঘকে ঠেলে নিয়ে যাবে, সে-হাওয়াকেই 'অনুকূল পবন' বলছেন কালিদাস। সুতরাং যক্ষের প্রেয়সী—কবির প্রিয়া—মন্দ-গতিচ্ছন্দে আক্রান্তা, এইটাই কবির উদ্ভাবিত ছন্দের নিগূঢ় উদ্দেশ্য, এ-কথা বলা যায়।

এ-অনুমানকে স্বীকার করে নিলে রামায়ণের সঙ্গে মেঘদূতের একটা যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি যেমন কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে একটির প্রাণ-বধ হওয়ায় অপরটির চিরবিরহ-ব্যথা চিন্তা করে শ্লোক-নামক নূতন ছন্দ আবিষ্কার করেছিলেন, কালিদাসও তেমনি দূরে-সংস্থিত-প্রিয়ার বিরহে কাতর যক্ষের কল্পনা করে মন্দাক্রান্তা-নামক নূতন ছন্দ আবিষ্কার করলেন।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা বেদনা থেকে বেরিয়েছিল, এ-স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। ফলে তিনি কোনো নূতন ছন্দের আবিষ্কর্তা হননি বটে, কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটা বিশিষ্ট ছাঁদের প্রযোক্তা হয়েছিলেন। তথাকথিত সাধুভাষার অসাধুতা তাঁর মনে দুঃখ দিয়েছিল। তিনি প্রায়ই আমাদের দেখিয়ে দিতেন 'সাধু' ভাষায় লেখা প্রবন্ধে কতটা অন্বয়ের অভাব। তাই তিনি বাংলায় নতুন ছাঁদে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করলেন। সাধুভাষায় যে-সব প্রবন্ধ তখন লেখা হত, তাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাই ছিল নির্দোষ। কিন্তু হাল্কা হাতের গুণ সে-রচনায় প্রকাশ পেতন না।

আর একটা বেদনা প্রমথবাবুর ছিল। সেটা হচ্ছে অতীতের বিরহ। দেশে যাতে আবার ফিরে গৌরবের যুগ—এ-কামনা তাঁর অন্তরে সদাই জাগ্রত থাকত। নিজে বিলেত-ফেরত হয়েও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে দ্বিধাবোধ যে করেননি, তার প্রমাণ ও'র 'তেল-নুন-লকড়ি'তে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বেদনা থেকেই যদি প্রমথনাথের লেখা বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে-লেখায় অত হাস্যরস এল কোথা থেকে? এ-প্রশ্নের একটা মোটা জবাব দেওয়া চলে। তেতো চিরেতার জল যদি রোগীকে খাওয়াতে হয়, দুটো মিছরির টুকরো তার সঙ্গে দেওয়া ভাল। ডাক্তারী ওষুধেও ব্যবস্থা আছে, সিরাপ দিয়ে মিক্সচার তৈরী করার। কটু-তিক্ত-কষায় ট্যাবলেটকে চিনির কোট পরিয়ে সুস্বাদু করা হয়। ব্যঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ করা উচিত, যদি সে-ব্যঙ্গের কোনো সাধু উদ্দেশ্য থাকে।

(ক্রমশ)

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে —

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

যার যাবার কথা নয় সেও চলে গেল। তালপাতার সেপাই ছগিয়া চলে গেল সুইপার হয়ে।

পেছনে পড়ে রইলাম শুধু আমি।

দুঃখ যত না হল লজ্জা হল তার চেয়ে বেশি। রানীগঞ্জে আমি ফিরে যাব কোন্ মুখে?

সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় এসে নিশ্বাস টেনে টেনে বুকের ছাতিটা বার-বার ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখতে লাগলাম।

দর্জির কাছে গিয়ে একটা ফিতে দিয়ে মেপে দেখলে হয়!

উখরোর সেজ মামার মুখে হাসি দেখে মনে কেমন যেন সন্দেহ হল। এ'দের কারসাজি নয় তো?

কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। আমি তখন সন্দেহাতীতভাবে নজরবন্দী।

বারান্দায় বসে বসে রাস্তার লোক দেখছি। পাশের ঘরে তুমুল হট্টগোল চলছে। তিন জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।—তার ভাষা নিয়ে উঠেছে তর্ক। Sailaja exhempted হবে, না released হবে, disqualified হবে, না unfit হবে—ঠিক হচ্ছে না কিছুতেই।

সেই ফাঁকে ভাবলুম পালাই! তখনও যদি নজরুলকে ফোর্ট উইলিয়ামে না পাঠিয়ে দিয়ে থাকে তো চট্ করে একবার দেখা করে দুটো কথা বলে আসি। বলে আসি—একা একা তোমার যদি ভাল না লাগে তো পালিয়ে এসো ওখান থেকে। পালিয়ে যদি না আসতে পারো তো রোজ একখানা করে চিঠি লিখো। আমিও লিখব।

পা টিপে টিপে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে যেই পা দিয়েছি, পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—কোথায় যাচ্ছিস?

বললাম, রাস্তায়। একটু ঘুরে আসি।

সেজবাবু বললেন, না। বিকেলে আমাদের সঙ্গে বেরুবে। বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনব।

তাই হল শেষ পর্যন্ত। সারাদিন বন্দী হয়ে রইলাম বাড়ির ভিতর। বিকেলে ট্রামে চড়ে চললাম চৌরঙ্গীর দিকে। চারিদিকে সতর্ক প্রহরী। জানলার ধারে চুপটি করে বসে আছি। রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান। লোকজনের যাওয়া-আসা দেখছি। কলকাতায় তখন এত লোকও ছিল না, এত গাড়িও ছিল না। তবু ক্রমগত মনে হতে লাগল—এই জনারণ্যে আমি যেন আমার বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছি।

ট্রাম গিয়ে দাঁড়াল চৌরঙ্গীতে। আমাদের নামতে হবে।

সুমুখে গড়ের মাঠ। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটা শুনেছিলাম এইদিকেই কোথায় যেন আছে। সেজবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, দুর্গটা কোথায়?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সেখানে গেলেও এখন আর দেখা করতে দেবে না। কড়া মিলিটারি আইন।

এই বলে তিনি আমাকে অনেককিছু বোঝালেন। বললেনঃ এখন তোমার লেখাপড়া শেখবার বয়েস। রানীগঞ্জে ফিরে যাও, গিয়ে যাতে ভাল করে পাশ করতে পার, তার চেষ্টা করগে।

লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরে চলেছি। যাব গ্লোব থিয়েটারে। মামা একটু দূরে দূরে চলছিলেন। গ্লোবে ঢোকবার দোরের কাছটাতে দাঁড়িয়ে একটা কথা তিনি বলেছিলেন—যা আমার আজও মনে আছে। বলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে দেবে—এই কথাটা কে ঢোকালে তোদের মাথায়?

জবাব দিতে পারিনি। মাথা হেঁট করে তাঁদের পিছু পিছু ছবিঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মনে আছে—ছবিটা ছিল নাজিমোভার। আর ছিল তখনকার দিনের টাইটেল্ ভারাক্রান্ত নীরব ছবি। সব-কিছু লং-শটে তোলা।

পা-কাটা ছবি চলে-ফিরে বেড়াবে, কাটামুণ্ডু কথা বলবে—তখনকার মানুষ সেকথা ভাবতেও পারতো না। ক্লোজ্-আপ্ মিড্-শটের যুগান্তকারী আবিষ্কর্তা গ্রিফিথের আবির্ভাব তখনও হয়নি।

এক বর্ণও বুঝতে পারিনি ছবিটা। বুঝবার চেষ্টাও করিনি। আমার মন তখন পড়ে আছে ফোর্ট উইলিয়ামে। বারম্বার শুধু সৈনিকের বেশে কল্পনা করছি নজরুলকে। ভাবছি রানীগঞ্জ স্টেশনে একখানা ট্রেন গিয়ে দাঁড়াল। দুটো কামরা বাঙালী পল্টনে ঠাসা। তাদের ভেতর থেকে খাঁকি হাফ্‌প্যাণ্ট-পরা নজরুল বেরিয়ে এল। বন্ধুরা এসেছে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। হয়ত-বা সারা রানীগঞ্জ ভেঙে পড়েছে সেখানে।

কিন্ত আর-একজন কোথায়? রানীগঞ্জ ছেড়ে যে চলে গেল বুক ফুলিয়ে?

কি জবাব দেবে নজরুল?

বলবে হয়ত তার বুকের ছাতি আমার মত চওড়া নয়, তাই সে পড়ে রইল পিছনে। আমি একাই চললাম। সে আবার ফিরে আসবে রানীগঞ্জে।

আমি কিন্তু রানীগঞ্জে আর ফিরলাম না। ফিরতে পারলাম না।

কলকাতা থেকে আমাকে একা আসতে দিলে না। সঙ্গে একজন লোক এল।

যে এল তাকে আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফিরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না ফেরাতে। সে যাবেই। রানীগঞ্জে আমাকে পেঁছে দিয়ে তবে ফিরবে।

ট্রেনে চড়ে বসলাম দুজনে। লোকটি আমাকে খুব তোয়াজ্ করতে লাগল। —বিড়ি-সিগ্রেট খাও যদি তো খেতে পারো, আমি কাউকে কিছু বলব না।

কিছুই তখন আমার ভাল লাগছে না। পৃথিবীটা কেন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

রানীগঞ্জে গাড়িটা পেঁছোবে বিকেল চারটেয়। দিনের বেলা কিছুতেই আমি সেখানে যেতে পারব না। সুতরাং যে-লোকটি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব?

শেষ পর্যন্ত সম্ভব একটা করে বসলাম। রানীগঞ্জের আগের স্টেশন অণ্ডাল। গাড়িটা অণ্ডালে এসে যেই দাঁড়িয়েছে, চট্ করে আসছি বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললে, দেরি কোরো না। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।

সত্যিই দাঁড়াল না। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, আমি তখন প্ল্যাটফর্মের ওপর একটুখানি দূরে দাঁড়িয়ে।

দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক চীৎকার করতে লাগলঃ ওঠো, ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো।

চেঁচিয়ে বললাম, উঠবো না। আমি অণ্ডাল গ্রামে যাচ্ছি। আপনি বলে দেবেন।

তার মুখের চেহারা কিরকম হল দেখবার অবসর পেলাম না। গাড়িটা ধীরে ধীরে অনেক দূরে চলে গেল।

আমার টিকিটখানা রয়ে গেল তার পকেটে। কালেক্টার টিকিট চাইলে কি বলব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম। অণ্ডাল স্টেশন তখন এত বড় ছিল না। কখন যে স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি বুঝতেও পারিনি।

নিঃসঙ্গ একাকী এক তরুণ বালক—বিশ্ব মহাযুদ্ধের সৈনিক হবার বাসনা নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল তিনদিন আগে। ফিরে এল আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে। সেই বেদনার

সুস্পষ্ট চিহ্ন বোধ হয় পড়েছিল তার সর্ব অবয়বে।

—কি গো, কি ভাবতে ভাবতে চলেছ?

তাকিয়ে দেখি, অণ্ডাল গ্রামের একজন লোক। বললে, ফিরে এলে তাহ'লে?

খবরটা তাহ'লে সেখানেও পৌঁছেছে!

বললাম, হ্যা গোবিন্দ, ফিরে এলাম।

গোবিন্দ বললে, জানি তুমি ফিরে আসবে। অত বড় দাদামশাই, যেমন করে' হক্ ছাড়িয়ে আনবে তা জানি।

যে যা ভাবে ভাবুক্। কথাটার জবাব দিলাম না।

নীরবে পথ চলছিলাম। দেখি না গোবিন্দ আমার পিছু নিয়েছে। তার কৌতূহলের সীমা নেই। বললে, ইংরাজরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। না, কি বল?

কথা বলতে হ'ল। বললাম, না। হারবে কেন?

আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় গোবিন্দ। আমাকে জন্মাবধি চেনে। জাতে ময়রা। আমার কথাটা সে বিশ্বাস করলে না। বললে, লেখাপড়া জানি না, কিন্তু বুঝি সব। মানুষের টান পড়েছে বাবু, জার্মানীরা মেরে সব সাবাড় করে দিয়েছে। তা নইলে তোমাদের মতন কচি ছেলেগুলোকে ইস্কুল থেকে টেনে টেনে নিয়ে যায় কখনও?

অনেক করে তাকে বুঝিয়ে বললাম, তুমি ভুল বলছ গোবিন্দ, আমাদের টেনে নিয়ে যায়নি। আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম।

কিন্তু কাকে বোঝাব সেকথা?

পরাধীন জাতির মর্মমূলে ইংরেজ-বিদ্বেষ তখন এমনি পুঞ্জীভূত যে, গোবিন্দের মত নিতান্ত সাধারণ গ্রামের একজন অশিক্ষিত মানুষও মনে মনে কল্পনা করছে—জার্মানীর হাতে ইংরেজের লাঞ্ছনার অন্ত নেই। আমাদের কি হবে সে-সব পরের কথা, এখন ইংরেজ তো মরুক্।

সারাটা পথ গোবিন্দ আমাকে নানান তত্ত্ব-কথা শোনাতে শোনাতে চলল। ইংরেজ যে আমাদের ভাল কিছু করতে পারে, বাঙালী যে পল্টন হ'তে পারে—সে-সব কথা তার ধারণার অতীত। রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা সে রামায়ণে শুনেছে। শ্রীরামচন্দ্রের হাতে রাবণের গুষ্টিকে গুষ্টি যখন সাবাড় হয়ে গেছে যুদ্ধ করবার মত একটি লোকও যখন আর লংকায় পাওয়া গেল না, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে রাবণ তখন তার চোদ্দ-বছরের ভাইপো তরণী সেনকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল।

গোবিন্দর কাছে আমাদের যুদ্ধে যাওয়াটাও ঠিক তেমনি।

তার পরেই এল তার অভাব-অভিযোগের কথা। ভারতবর্ষ তখন ম্যানচেস্টারের কাপড় পরছে। আমেদাবাদ তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। গোবিন্দ বললে, রেলি ব্রাদার্সের একজোড়া শাড়ির দাম যখন ছ' টাকা উঠেছে,

তখনই জানি ইংরেজ আমাদের ন্যাংটো না করে' ছাড়বে না।

গোবিন্দর ধারণা, ইংরেজ যে মরছে, সে শুধু এই পাপে। আমাদের মত ধর্মপ্রাণ একটা জাতিকে বিনা অপরাধে কষ্ট দিলে ভগবান সহ্য করবে না। ইংরেজ মরবে।

ইংরেজ মরবে কিনা জানি না, তবে আমি যে মরেছি সেকথা বুঝতে দেরি হ'ল না।

পরের দিন সকালেই দেখি, কালো ঘোড়ার জুড়ি গাড়িটা অণ্ডালের বাড়ির সদরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন রায়-সাহেব।

দোতলার ঘরে বসে গল্প করছিলাম অবনীর সঙ্গে। অবনী রায় সাহেবের ছোট ভাইএর ছেলে। সম্পর্কে মামা হ'লেও জীবনে কোনোদিন তাকে মামা বলে ডাকিনি। এক বয়েস দু' জনের, একই সঙ্গে পাশাপাশি মানুষ হয়েছি, এক সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি।

অবনী বললে, ওই এলেন! তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। চল্ পালাই।

পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। প্রকাণ্ড বাড়ি। ছাতের সিঁড়িতে গিয়ে বসে রইলাম। রায় সাহেব কি বলেন শুনতে হবে।

অবনী বললে, কেন মরতে গেলি ওই-সব করতে? আমি বাবা রায়সায়েবের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যেতে পারব না এক গাড়িতে। তুই যাবি তো যা।

আমি বললাম, আমি যাব না রানীগঞ্জে।

—পড়বি না?

—না! পড়তে হয় অন্য কোথাও পড়ব।

সিঁড়ির একপাশে গায়ে গা দিয়ে বসে আছি দু'জনে। চুপি চুপি কথা বলছি ফিস্ ফিস্ করে। এমন সময় রায়-সাহেবের জুতোর আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়ির ওপর। দোতলায় উঠছেন।

হঠাৎ রায়সাহেব চীৎকার করে উঠলেন, কোথায় সে নবাব-সাহেব, কোথায় গেলেন?

বুঝলাম, দিদিমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

রায়সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি। বলছেন, শুনেছ তো নাতির কীর্তি-কাহিনী?

দিদিমা কি বললেন শুনতে পেলাম না। হয়ত-বা কিছুই বলেন নি। হয়ত-বা তিনিও ভয় পেয়ে গেছেন।

রায়সাহেব বললেন, ইস্কুলের টিচাররা বলে ছেলেটো ভাল। ভেবেছিলাম, লেখা-পড়া শেখে তো বিলেত পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর কোনও আশা নেই। কতকগুলো বখাটে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একেবারে মাটি হয়ে গেল।

অবনী বলে উঠল, ঠিক বলেছ। আমিও ঠিক সেই কথাই বলি।

অবনী আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছে। বললাম, চুপ কর্। হেসে ফেলব।

বলেই আবার কান পেতে রইলাম রায়-সাহেবের কথাগুলো শোনবার জন্যে। তিনি বললেন, কলকাতা থেকে আসছিল, সঙ্গের লোকটাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে অণ্ডালে নেমে পড়েছে। ভাবলাম বুঝি আবার পালাল। তাই সকালেই ছুটে এলাম ওকে নিয়ে যাব বলে।

বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন তিনি। আর একটি কথাও শোনা গেল না।

অবনী তখন আবার আরম্ভ করেছে আমাকে খোঁচা মারতে।—এবার কি করবি? যাব না বলছিলি যে!

বললাম, সত্যি বলছি আমি যাব না। চল্ এখান থেকে পালাই।

পা টিপে টিপে সত্যিই পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। বললাম, গাঁয়ের ভেতর কারও বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকিগে চল্। খুঁজে পাবে না তাহলে।

অবনী তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। কারণ আমাকে যেতে হলে তাকেও যেতে হবে। অথচ কিছুদিন থেকে পড়াশোনা সে একদম করছে না। একদিন ইস্কুলে যায় তো দশ-দিন যায় না। থার্ড মাস্টার একদিন বলে-ছিলেন, কানে হাত দিয়ে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাক। বাস্, সেইদিন থেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে সে অণ্ডালে বসে আছে।

সেদিন আমরা বাড়ি যখন ফিরলাম, রায়সাহেব তখন চলে গেছেন। রায়সাহেব চলে গেছেন, কিন্তু বাড়ির ভিতর একটা হৈ-চৈ কাণ্ড!

যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, সর্বনাশ হয়ে গেছে। রায়সাহেব নাকি আমার ওপর এমন রাগ রেগেছেন যে, দেখতে পেলে কেটে ফেলবেন।

সত্যি খবরটা পেলাম দিদিমার কাছে গিয়ে। বললেন, পালিয়ে না গেলেই পারতিস!

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি খুব রেগেছেন না?

—রাগবে না? একবার দেখা পর্যন্ত করলি না।

বললাম, দেখা করলে যে ধরে নিয়ে যেত!

দিদিমা বললেন, তবে কি তুই ভেবেছিস রানীগঞ্জে যাবি না? লেখাপড়া করবি না?

না না তা কেন, তুমি কি বললে তাই বল।

দিদিমা বললেন, বললাম, এখন ওর মনের অবস্থা ভাল নয়, দু'দিন পরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

বাঁচা গেল।

কিন্তু সেই দু'দিন আর পার হ'তে চায় না কিছুতেই।

রানীগঞ্জ যেতে আর মন চাইছে না। অথচ পড়া ছেড়ে দেব সেকথা ভাবতেও পারছি না।

অবনীর সঙ্গে হৈ হৈ করে দিনগুলো কাটছিল মন্দ নয়। এমন দিনে হঠাৎ একদিন দুপুরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পিওন আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। খামের ওপরে হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলাম। নজরুলের চিঠি। টিকিটের ওপর করাচির ছাপ।

চিঠিখানা পড়লেই তো ফুরিয়ে যাবে। খুললাম না। চিঠিখানা পেয়েছিলাম স্নান করবার আগে। ভাবলাম স্নান করে খেয়েদেয়ে নিশ্চিত হয়ে একা বসে বসে পড়বো।

তখন আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল রবীন্দ্র-নাথের একখানি কবিতার বই। অণ্ডালের বাড়িতেই সেখানি রেখে দিয়েছিলাম। সেই বইএর ভেতর চিঠিখানা রাখতে গেলাম।

রাখতে গিয়ে আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। স্নান করব, তারপর খাব, তারপর অবনীর কাছ থেকে চুপি চুপি সরে গিয়ে একা বসে বসে পড়ব.অনেক দেরি হয়ে যাবে।

খামের মুখখানা ছিঁড়তে গিয়ে দেখি, রানীগঞ্জের ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে সে সোজা অণ্ডালের ঠিকানা লিখেছে খামের ওপর।

নজরুল জানলে কেমন করে যে, আমি অণ্ডালে আছি?

জানা অবশ্য শক্ত কিছু নয়। সেও যদি ঠিক আমার মত ফিরে আসতো, বাণীপুরে থাকা তার পক্ষেও সম্ভব হতো না। হয় সে তার চুরুলিয়া গ্রামে গিয়ে বসে থাকত, আর নয়তো কোথাও পালাত।

খামটি খুলেই দেখি বেগুনী রঙের কালিতে লেখা এক প্রকাণ্ড চিঠি।

প্রতিদিনের প্রতিটি কথা সে রসিয়ে রসিয়ে লিখেছে। প্রথমেই লিখেছে, তোমার অভাবে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে সত্যি, কিন্তু ভালই হয়েছে তুমি আস নি। মিলিটারি আইন-কানুন ভারি কড়া। তুমি সহ্য করতে পারতে না। আমার কথা ভাবছ? এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি আমার জীবনে। এ আমার গা-সওয়া হয়ে যাবে দু'দিনেই।

ভারি সুন্দর একটা গল্পের প্লট এসেছে আমার মাথায়। কখন লিখব এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। লেখা হলেই তোমাকে জানাবো।

তারপর অনেক কথার পর লিখেছে দুগিয়ার কথা। ব্যাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে দেওয়া হয়েছে কিচেনে। ভাব করে ফেলেছে সবাইকার সঙ্গে। কিন্তু যেদিন চুরি করবে, সেইদিন বুঝবে মজা! দাঁত বের-করা হাসি সব মিলিয়ে যাবে।

শেষে লিখেছে—করাচি জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর।

আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। অতি তুচ্ছ এবং সাধারণ। অথচ তাই নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে গেল।

সপ্তাহখানেক আগে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অনিল গিয়েছিল কলকাতা। শালার ছেলের অন্নপ্রাশন। পর পর দুখানা চিঠিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছে ও-পক্ষের। অপর্ণা একেবারে জিদ ধরে বসল। যেতেই হবে। ছ'মাস হল সে এই শিল্পশহরে ফোরম্যান; নতুন কোয়ার্টারে সবে এসে উঠেছে। এবং এর মধ্যে একবারও কোথাও যাওয়া হয় নি।

অপর্ণার সেই জিদকে আয়ত্তে আনা গেল না। দিন চার পাঁচের ছুটি নিয়ে, দরজায় তালা ঝুলিয়ে অনিল সস্ত্রীক কলকাতার ট্রেনে চাপল।

দিন দুয়েক হৈ হুল্লোড়ে কেটে গেছে। তৃতীয় দিনে এ গল্পের শুরু। ছোট শালী অর্চনা ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। স্পেশাল বেঙ্গলী নিয়ে পড়ে। টীকা টিপ্পনী এবং টিটকারিতে দক্ষতা প্রচুর। সে হঠাৎ ঝড়ের বেগে ছুটে এসে বলল, "জামাইবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।"

অনিল ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, "প্রকাশ্যে না কানে কানে?"

"আপাতত প্রকাশ্যেই হোক। তারপর আপনার তর্কশক্তি যদি নিদারুণ মত হয়, তাহলে বাকিটুকু বরং কানে দিয়েই শেষ করা যাবে।"

বহর দেখে অনিল বিচলিত হল একটু। ঝটপট কিছু একটা মোক্ষম জবাব আর দিতে পারল না।

অর্চনা বলল, "আচ্ছা, ছেলে আর মেয়ে এই দুই জাতের মধ্যে হৃদয়বৃত্তিতে উঁচু কোন দল? নিরপেক্ষ হয়ে বলুন তো?"

অনিলের চোখেমুখে বিস্ময়। "কেন বলত?"

"না, আপনারা—মানে পুরুষেরা আমাদের বরাবরই দাবিয়ে রাখতে চান। এটা নীচতারই পরিচয়—"

অনিল বাঁকা পথে জবাব দিল, "কিন্তু একেবারে না দাবিয়ে উপায় কি বল? অন্তত তোমাদের দাবাগ্নি একটু আধটু দাবাতেই হবে। নচেৎ—

অর্চনার রঙ ফরশা। সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হল তার। চটে গিয়ে বলল, "আপনি অসভ্য, বড্ড স্থূল দৃষ্টি। না, আপনি ডিবেটের অযোগ্য।"

অনিল বাগে পেয়ে সহজে ছাড়তে চাইলো না। "তা স্থূলে তো বটেই। আর ডিবেট-টিবেটের সত্যি সত্যি বুঝিই বা কি? ওসব তোমারই একচেটিয়া। কিন্তু এই অধোমুখী দৃষ্টিতে সামান্য অনিচ্ছা দেখালেই তোমার দিদি ভাবে, যে আমার দাবানোর ক্ষমতাই বুঝি নেই। সুতরাং—"

অর্চনা এবারে আর বলল না। লজ্জায়, রাগে উঠে পড়ল। কিন্তু যাবার আগে একটি তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করে গেল, "দেখুন, আমারই ভুল হয়েছে। আপনার বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে আমার আর তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই, শুধু দুঃখ হচ্ছে দিদির কথা ভেবে। ও কেমন করে যে আপনাকে..."

এতক্ষণ এক আশ্চর্য সুখের অনুভূতিতে ভাসছিল অনিল। শালী কানে হাত দিতে চেয়েছিল, সেই অপমানের চতুর্গুণ শোধ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষের কথাটার খচ করে একটা কাঁটা এসে হৃদয়ের অন্তস্তলে গেঁথে গেল। তার বিদ্যা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে অর্চনা। কারণ, অনিল মাত্র ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছিল। আর অপর্ণা, তার স্ত্রী ফিফথ ইয়ারে পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে। অর্চনাও গ্রাজুয়েট হতে চলল এবার। নাঃ, তাই ভুল হয়েছে। বিদুষীকন্যাকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়াটা, এখন আর সুখকর বলে মনে হল না অনিলের।

ইজিচেয়ারে এলিয়ে বসেছিল অনিল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ ম্লান এবং নিস্তেজ হয়ে আসছে। সূর্য ডুবতে আর একটু বাকি। হঠাৎ সেই সময় একটুকরো মরা আলো জানালার গরাদ ছুঁয়ে অনিলের পায়ের কাছে এসে পড়ল। অপর্ণা ঘরে ঢুকে পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলে দিয়েছে।

"কি ভাবছ একমনে?" কাছে এল অপর্ণা।

অনিল চুপ করে থাকল উত্তর দিল না

অন্য সময় হলে, কিছু একটা সে বলত। কিন্তু এখন প্রায় অকারণেই তার আর কিছু ভাল লাগছিল না। একটি মৌমাছি খানিক আগে গুনগুন করে গেছে। হয়ত একটু হুলও ফুটিয়েছে। তারই বিষ কি!

"হল কি তোমার? সাড়া নেই মুখে!" অপর্ণা হাত রাখল অনিলের মাথার চুলে। একটু যেন উৎকণ্ঠিত।

অনিল এবার সচকিত না হয়ে পারল না। ধরা পড়ার কিছু নেই তবু কেমন অস্বস্তি হল তার। সহজ হতে চাইলো অনিল। জোর করে হাসির রেখা টানল মুখে। "না, মানে ওই চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ছিল কিনা, তাই।"

—ইশ্‌শ্‌, কত যেন ভাবা হয় একেবারে? আমার আর কিছু জানতে বাকি নেই, বুঝলে মশাই?—খুশী খুশী দেখাল অপর্ণাকে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অনিলের মনে হল, সে এতক্ষণে ভুল ভাবছিল। জট জড়াচ্ছিল মনে। আসলে তার ভাগ্য ভাল। এমন স্ত্রী! না, সে ঠকেনি। মোটেই ঠকেনি। মেয়েরা বিদুষী হলেই যে বিষবতী হবে, এমন ধারণা করা অন্যায়, অসংগত।

অপর্ণা হেসে বলল, "এই দেখ, বলি বলি করে তোমাকে কিন্তু একটা কথা আর বলাই হয়নি। আমার একটা কলম কিনতে হবে আজকেই।"

অনিল হিসেবীর মতন জিজ্ঞেস করল, "কেন, তোমার আগের পেনটা কি হল?"

"ঐ মোটা নিবে আর ভাল লেখা পড়ে না আজকাল, তা ছাড়া কালি সরে না ভাল। তাই দিয়ে দিলাম বুলুকে। বুলু বলছিল ও নাকি এই পেন-এ দিব্যি ম্যাট্রিক অবধি চালিয়ে নেবে।"

"তা বুলুকে দিলে, ভালই করলে, তবে এখন আবার কুড়ি টাকা। এগুলো বাজে খরচ—নাই বা করলে!"

অপর্ণা রাগের ভান করল এবার। "তোমার সব সময় শুধু হিসেবের খোঁচা।"

অনিল ব্যাপারটাকে আর ঘাটাতে চাইলো না। তুচ্ছ তো কয়েকটা টাকা। কত আর দাম হতে পারে একটা লেডীজ শেফার্স-এর। আঠারো না হয় বিশ। তিন ঘণ্টার ওভার-টাইমেই তা পুষিয়ে নেবে অনিল। আর সত্যিই তো, যার স্বামী ছ'শো টাকা মাইনে পায়, তার স্ত্রী যদি খেয়ালের ঝোঁকে একটা কলম কাউকে দান করে অন্য একটা নতুন কেনার বাসনা প্রকাশ করে তো তাতে হিসেবের কথা আসে না।

চিন্তাটা এখন যে-খাতে বইছিল তাতে অনিলের সামান্য গর্ব হলো। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলল, "বেশ তো, খোঁটা দিয়ে অন্যায় করেছি, তা দোকান তো বাড়িতে নয় রাস্তায়। বেরুতে হলে শাড়িটা অন্তত পাল্টানো দরকার।"

অপর্ণা উঠে গেল। আধ ঘণ্টা পার করে ফিরল। ঘন লাল রঙ-এর নাইলন শাড়ি কোমর থেকে বুকের কাছে জড়াতে জড়াতে। মাধবীলতার মত তুলে আনল স্তূপাকার রিঙ বাঁধানো খোঁপার গোড়ায়।

"নাঃ, তোমাকে সত্যিই দেখতে নাইস্। সার্টিফাই করতে আমার আর আপত্তি হচ্ছে না এখন—" অনিল বলল, রাস্তায় নেমে, রহস্য করে।

অপর্ণা কপট ক্রোধের ভর্ৎসনা ফোটাল চোখে। একজোড়া কালো টানা ভ্রূ ধনুকের ছিলার মত টংকার দিল। "আহা-হা, ফ্লাটারার আর কাকে বলে?

অনিল হাসল। "ফ্লাটারীর একটা মস্ত গুণ হল, তাতে স্ত্রীপক্ষ সর্বদাই ঘায়েল হয়ে থাকে।"

অপর্ণা ফিরে তাকাল। "তুমি কি খুব একস্‌পিরিয়েন্সড নাকি?"

অনিল চট করে উত্তর দিতে পারল না। অপর্ণার চোখের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে দেখল, অপর্ণার চোখ দুটো তারই চোখের দুটো কালো মণির মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত স্থির হয়ে রয়েছে।

অপর্ণা হয়তো সুযোগ পেয়েই একটু রসিকতা করেছে। হয়তো একথার সত্যি সত্যি কোন গভীরতা নেই। তবু তাতেই অনিলের মনে নিঃশব্দ একটি আলোড়ন উঠল। কয়েক বছর আগের প্রায়-ভুলে-যাওয়া ক'টি কথা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে মনের পরদায় ভেসে এল।

আর একটি মেয়েকে ভাল লাগত অনিলের। তার নাম অনুপমা। অনুপমা কলেজে পড়ত। থাকত পাশের বাড়িতে। সেই সূত্রে আলাপ, পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা। অনিল তাকে ভালবাসত নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাতে সুফল তেমন কিছু হয়নি। চেষ্টা করে যে মন পায়নি তার, তাও নয়। তবু অন্য কতগুলি বাধা, সামাজিক, অর্থনৈতিক; অনুপমার আশা শেষ অবধি ছাড়তে হল অনিলকে।

সেই অনুপমাকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে গিয়েছিল অনিল। ফুটপাত ধরে কিছুক্ষণ এলোমেলো হেঁটে হেঁটে অবশেষে গড়ের মাঠের সবুজ দূর্বায় ঢাকা ঘাসমাঠের উপর দুজনে গিয়ে বসল।

প্রথমে কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রূপের প্রশংসা আরম্ভ করেছিল অনিল: "তোমাকে ওয়াণ্ডারফুল লাগছে আজ। সত্যি, এই ইয়েলো সিল্কের শাড়িতে তোমাকে এত সুন্দর লাগে, যে মনে হয়—"

"থাক্ থাক্, এতেই হবে অনিলদা। খুব তোয়াজ শিখছেন আজকাল।"

অনিল সেদিনও জবাব দিতে পারেনি। আজও না। কিন্তু স্ত্রীর পাশাপাশি পথ চলতে আর পুরোনো কথা ভাবতে ইচ্ছা হল না তার। এক রকম জোর করেই মন থেকে এ সব ভাবনা সে তাড়িয়ে দিল। তবুও মনটা কেমন হয়ে গেল যেন।

হঠাৎ একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল অপর্ণা। "ভ্যারাইটি পেন হাউস"। সাইনবোর্ডটা টিউব লাইটের। এই মাত্র জ্বলে উঠেছে। দুটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ফুটপাতে নামল সেই দোকান থেকে।

অপর্ণা বলল, "এই তো একটা কলমের দোকান। ঢুকবে নাকি?"

অনিল সংক্ষেপে সারল। "চল।"

ঢুকতেই লম্বা কাউণ্টার। শো কেস্। কাউণ্টারের ওপাশ থেকে দুজন সেলস্-ম্যান প্রত্যেকের চাহিদা পূর্ণ করে চলেছে। এ পাশে তিন চারজন গভীর মনযোগে নিবের সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করে যাচ্ছে।

অপর্ণা এগিয়ে গেল। "ভাল লেডীজ পেন আছে আপনাদের?"—আর বলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এ পাশের যে-ভদ্রলোক কলম দেখিয়ে চলেছে, সে আর কেউ নয়—প্রভাতদা!

প্রভাত আগে স্কটিশে পড়ত। আর অপর্ণাও। তখন থেকেই দুজনে দুজনকে চিনত। তারপর হঠাৎ একদিন প্রভাত আবিষ্কার করেছিল, অপর্ণারা তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অনেকটা লতায় পাতায়। সুতরাং অপর্ণাদের বাড়িতে প্রভাতের যাওয়া আসা বাড়ল। আত্মীয়তাও। অপর্ণা নীচু ক্লাসে পড়ত, তাই তাকে মাঝে মাঝে পড়াটড়া দেখিয়ে দিত প্রভাত।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। অপর্ণা ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়েছে। প্রভাত বি এ-টা উতরে গিয়ে বেকার বসেছিল।

প্রভাত মুচকি হেসে অপর্ণার দিকে এগিয়ে এলো।

"আরে! কবে এসেছ কলকাতায়?"

অপর্ণা হেসে উত্তর দিল, "দিন কয়।"

"থাকবে নিশ্চয়ই কিছুদিন?"

"নাঃ, তার আর উপায় নেই। বোঝই তো, ঘরদোর ফেলে এসেছি। তা তোমাদের সব খবর কি? মাসিমা [illegible] তো?"
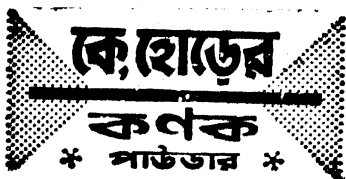
প্রভাত বলল, "মাসিমা ভালই, কিন্তু মাসিমার ছেলে ততটা নয়। এই একটানা খাটুনি আছে সারাদিন। তার ওপর আবার পার্ট টাইম, অমুক তমুক—" অপর্ণার কাছেই অনিলকে দাঁড়ান দেখে প্রভাত হঠাৎ বলল—"এই ভদ্রলোক বোধ হয়—"

"ঠিকই ধরেছ। আমার সর্বময় কর্তা। এসো আলাপ করিয়ে দেই।" একটু জোরেই হাসল অপর্ণা।

প্রভাত নমস্কারের ভঙ্গিতে আরও এগিয়ে এলো। হাসল নিঃশব্দে।

অনিল গভীর মনযোগে স্ত্রীর কথোপকথন শুনেছে। এবার হাত দুটি যুক্ত করে প্রতি নমস্কার করে বলল—"ইনি অবশ্য আমার নাম মুখে অনতে পারবেন না। আমি অনিল বোস। আপাতত বার্নপুরের কারখানায় চাকরি করে খাচ্ছি।"

প্রভাত সশব্দে হেসে উঠল এবার, "তাই বলুন। যেভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন তাতে আমি কিন্তু চিনতে পারি নি। যাক গে—আমার নাম প্রভাত সরকার।"

অপর্ণা মাঝে পড়ে বলল, "আর চিনতে পারবেই বা কেমন করে? যখন গেলে জানাচেনা হত, তখন তুমি কথা দিয়েও যাওনি প্রভাতদা। মা দুঃখ করেছিলেন কত!"

প্রভাত ত্রুটি স্বীকার করল। "সত্যি, অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কোন হাত ছিল না। হঠাৎ জ্বর হয়ে গিয়েছিল, তাই। নইলে তোমার বিয়েতে যাব না, এও কি—"

অপর্ণা বিশ্বাস করল না। "হ্যাঁ, ইচ্ছা না থাকলে কারণের অবশ্য অভাব হয় না। থাক ও সব, একটা কলম দেখাতে পারো এবার?"

প্রভাতও পুরোনো প্রসংগ এড়াবার পথ পেয়ে বলল—"নিশ্চয়ই, কি কলম নেবে বল।"

"লেডীজ শেফার্স। চকোলেট কালারের আছে?"

"বোধ হয়।" বলেই প্রভাত কাচের আলমারি থেকে খুঁজে খুঁজে একটি চকোলেট-রঙ কলম বার করে আনল।

অপর্ণা কলম কালিতে ডুবিয়ে কাগজের ওপর ঝুঁকল নিবের সুক্ষ্মতা পরীক্ষা করতে। "লিখে তো ভালই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, চলবে।"

অনিল মাঝে বলল, "ওভাবে টেস্ট না করে বরং কালিভরে তারপর লেখ। ফ্লো ঠিক থাকে কি না—"

অপর্ণা মুখ টিপে হাসল। খুঁত খুঁতনি থাকবেই অনিলের।

প্রভাত ব্যস্ত হয়ে কালি ভরে দিল। তারপর নিজেই আকাবাঁকা রেখা টানল সাদা কাগজে। অপর্ণার নামটাও লিখে ফেলল কয়েকবার। না, ফ্লো-টা ভালই।

সেই নাম লেখা কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অপর্ণা লজ্জা পেল।

অনিল এতক্ষণ প্রায় সহজভাবেই নিচ্ছিল সব কিছু। এখন কাগজটার দিকে চেয়ে, এই মুহূর্তে ব্যাপারটাকে সহজ মনে নিতে পারল না। দুজনের চোখে চোখে তাকিয়ে অনিলের সন্দেহ হল।

"কলমের দাম কত?" অনিল শুধলো।

"দামের জন্য আপনার ঘুম নেই—।" হাসল প্রভাত, "দামের দরকার হবে না। কলমটা আমি দিলাম।"

আর একবার ছোট ঘা পড়ল বুকে।

অনিল ভীষণভাবে আপত্তি জানাল। "সে হয় না। কিছুতেই না। দাম আপনাকে নিতেই হবে। তা ছাড়া এটা তো আপনার নিজের দোকান নয়। আপনি এই দোকানে চাকরি করেন মাত্র—" ঘুরিয়ে হয়ত খোঁচা দিতে চাইলো এবার অনিল। প্রভাত সে সে খোঁচা গায়ে মাখল না। উপেক্ষা করে গেল, এবং বিব্রত অপর্ণার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, "তোমার বিয়েতে কিছু একটা উপহার আমার দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়নি, আমার সেই অপরাধটা সুযোগ পেয়েও শোধরাব না—তাও কি হয়? কলমটা তোমাকে নিতেই হবে।"

অপর্ণা এরপর আপত্তি করতে পারেনি। কলমটা নিয়েছে, এবং স্বামীর সাথে রাস্তায় নেমে এসেছে।

পরের দিনই অপর্ণারা চলে এলো। শাশুড়ী বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন—"আর দুটো দিন থেকে যাও বাবা"। শালী রাগের ভান করেছে—"আহা, কি একটা ইম্পরটেন্ট লোক! যেন আজ না গেলেই কারখানাটা অচল হবে। করেন তো কয়লা পোড়ানো কাজ আর সেবার সর্দারী—দু' একদিন না গেলে কিছু এসে যাবে না।"

কিন্তু অনিল সে সব অনুরোধ উপরোধে গলেনি।

বর্ধমান স্টেশনে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটেছিল। ট্রেন থেমে আছে, একজন হকার ঠেলাগাড়িতে অনেক দেশী বিদেশী উপন্যাস ও পত্র পত্রিকা নিয়ে ফিরি করছে। অপর্ণা তাকে কাছে ডাকল, "ঐ লালমত ইংরেজী বইটা দেখি?"

চার পাঁচখানা ইংরেজী বই এগিয়ে দিল লোকটা। অপর্ণা তার মধ্যে বেছে নিল একটি। সমারসেট্ মম্-এর "ফ্লেস্ এন্ড দেয়ার ফলি"। "কত দাম?"

দাম সস্তা। দেড় টাকা।

অপর্ণা এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—দেড়টা টাকা দাও তো, একটা বই কিনলাম।

অনিল পত্রিকার মাঝখান থেকে নিবিষ্ট

চোখ দুটো অপর্ণার দিকে ফিরিয়ে এনে বলল—টাকা তো তোমার কাছেই রয়েছে। আমাকে আবার অনর্থক টানাটানি কেন?

"সে এখন সুটকেস খুলতে হবে। তুমি তোমার ব্যাগ থেকে দাও বরং—"

অনিল একটা দু' টাকার নোট বার করে স্ত্রীর হাতে দিয়েই খোঁচা দিল, "আর একটু হিসেবী হও অপর্ণা। এগুলো এক রকম বাজে খরচ। তা ছাড়া সব জায়গায় কি তোমার ফাউয়ে পাবার লোক আছে!"

কথাগুলো অপর্ণার কানে বিঁধল। ছি ছি, এ আবার কি রকম রসিকতা? কি বলতে চাইছে তার স্বামী? একটা বই কেনা কি বাজে খরচ নাকি? আর প্রভাতদাকেই বা টানতে চাইছে কেন এর মধ্যে? অপর্ণার মনের মধ্যে স্বামীর ইঙ্গিতটা গেঁথে গিয়েছে। ভাবল, বইটা এই মুহূর্তে ফেরত দিলে কেমন হয়? হয়তো সেটা মুখের মতন জবাব হবে। শিক্ষা হবে লোকটার একটু।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপর্ণা কিছুই করল না। অনর্থক ঝামেলা বাড়াতে বাসনা নেই তার। সংসারে চলতে গেলে, এমন কি দাম্পত্য জীবনেও একটু মানিয়ে নিতে হয়। সুতরাং অনিলের দেওয়া খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করে অপর্ণা বইটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

তারপর দু' তিনটে দিন এক রকম শান্তিতেই কেটেছে। অনিল এবং অপর্ণার মনের মধ্যে যেটুকু আলোড়নই উঠে থাকুক, মুখে অন্তত তারা সহজ হতে চেয়েছে, হবার চেষ্টা করেছে। সেই আগের মত ধরাবাঁধা জীবনযাপন পদ্ধতিতে দিন এবং রাত কাটিয়ে গেছে। তেমন কিছু ছন্দ পতন ঘটেনি।

সে-দিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি নিজের খাওয়া শেষ করে অপর্ণা এসে রাইটিং প্যাড খুলে বসল। অর্চনা আর বুলুকে চিঠি লেখা দরকার।

অপর্ণা লিখছিল টেবিলে হাত রেখে। অনিল তখন চোখ বুজে বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে। আজ তার ঘুম আসছিল না। এমনিতেই, মাঝে মাঝে এ রকম হয়। হঠাৎ বিনা কারণে কিছুতেই আর ঘুম আসে না

কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে অনিল যখন চোখ খুলল, অপর্ণার চকোলেট কালারের নতুন কলম তখন রাইটিং প্যাড-এর উপর দিয়ে খস খস শব্দ করে এগিয়ে চলেছে। সেই দিকে চোখ পড়তেই অনিলের কেমন যেন বিশ্রী লাগল। এতদিন কলমটাকে চোখে পড়েনি তার। কাজে কর্মে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে একটি অচেতন পদার্থকেও তার আর সহ্য হচ্ছিল না। অপর্ণার তিনটি আঙুলের মধ্যে অবাধে প্রবেশ করেছে সে। তিনটি আঙুলের সোহাগে আবদ্ধ হয়ে থাকবে বহুকাল। হয়ত অন্য একজনের কথা মনে পড়িয়ে দেবে তাকে। যে হয়তো এককালে অপর্ণাকে—

ভাবতে ভাল লাগছিল না অনিলের। এ সব ভাবাভাবির মধ্যে সে নেই।

অনিল গম্ভীর মুখে উঠে পড়ল। কি করা যায়, কি করা উচিত—ভাবল একবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু আগে আগেই আজ শার্ট-প্যান্ট পরল। জল খেল এক গ্লাস। চিরুনিটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে।

ততক্ষণে অপর্ণার চিঠি লেখা শেষ। খামের মুখ বন্ধ করে অনিলের হাতে দিয়ে বলল—"মনে করে ডাকে ফেলে দিও তো। অর্চনা আর বুলুকে লিখলাম। সেই কবে এসেছি, অথচ এখনও একটা—"

"সে তো আরও আগেই লেখা উচিত ছিল তোমার। কি যে কর সারাদিন?"

অপর্ণা হেসে ফেলল, "করব আবার কি! পড়ে পড়ে ঘুমোই।"

অনিলও একবার হাসতে চেষ্টা করল "তোমার কলমটা দেবে একটু। আমারটার কি যে হয়েছে—লেখাই পড়ছে না।"

"ঐ তো রয়েছে টেবিলে। নিয়ে যাও। দেখো আবার নষ্ট করে ফেল না যেন।"

অনিল হাসল, "ছিঃ, এ কলম নষ্ট হয় নাকি? এ কি যে সে কলম? এ হল গিয়ে—" বলেই হাসিটা ছড়িয়ে দিল। পেনটা পকেটে নিয়ে সাইকেল ঠেলে রাস্তায় নামল।

অপর্ণা কিছু বলল না। চুপ করে তাকিয়ে থাকল স্বামীর দিকে। একদৃষ্টে।

কারখানায় গিয়েও, হাজার কাজের মাঝেও—অনিল আর শান্তি পাচ্ছিল না। যতবারই পকেটে হাত দিয়েছে সে, সাতপাঁচ রকমের কাগজে সই করার জন্য কলমটা টেনে বার করেছে অপর্ণার—ততবারই এক ধরনের ঈর্ষা, অশান্তি ভোগ করেছে। সব বিস্বাদ মনে হয়েছে। সব কেমন এলোমেলো ভার ভার ঠেকেছে।

একবার ভাবল, ছুঁড়ে অ্যাসিড ট্যাঙ্কের মধ্যে ফেলে দিলে কেমন হয়? বা হাই প্রেসার ওয়াটার ড্রেনে ছাড়লেও তো চলে?

তবু ছোঁড়া হল না। ছুঁড়তে গিয়েও পারল না অনিল। কি যেন ভাবল। তারপর নিজের অফিস-টেবিলের ড্রয়ারে কলমটাকে রেখে দিল। থাক এখানেই। এই ড্রয়ার-গর্ভেই। অপর্ণাকে শুধু একটা মিথ্যা কথা বললেই চলবে। ও আর জানবে কি করে যে কলমটা অনিলের ড্রয়ারেই।

দু'ঘণ্টা ওভার টাইম শেষ করে সাড়ে ছ'টায় বাসায় ফিরল অনিল। সাইকেলটা ঠেলে ঢোকাল ঘরে। আস্তে আস্তে। খুব শব্দ হল না।

রান্নাঘরে টুং টাং আওয়াজ উঠছিল দু' একটা। খালাবাসন নড়াচড়ার শব্দ। অপর্ণা ওখানেই।

স্বামীর সাড়া পেয়ে অপর্ণা উঠে এলো একবার। "কি ব্যাপার? এত দেরি যে? আজ আবার ওভারটাইম ছিল বুঝি?"

অনিল জবাব দিল, "হ্যাঁ। ব্রেকডাউন চলছে প্ল্যান্টে।"

অপর্ণা উদ্বিগ্ন হল একটু, "সে কি, তাহলে কি আবার যাবে নাকি কারখানায়?"

"না না, আজ আর নয়। আমি আজ ঘরের ব্রেকডাউন সামলাব। তোমার রান্না বান্না সব রেডি?" অনিল সামলে নিল নিজেকে।

তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে, সব কিছু ঝঞ্ঝাট ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে, মধ্যরাতে অনিল যখন স্ত্রীর গলা জড়িয়ে আদরে সোহাগে তাকে উষ্ণ করে তুলছে, ঠিক সেই সময় মুখ খুলল। "অপু, একটা অন্যায় করে ফেলেছি, বল রাগ করবে না তুমি?"

অপর্ণার গলা থেকে একটু মাত্র অস্ফুট স্বর বেরুল, "কি অন্যায়?"

"বলছি, কিন্তু তুমি রাগ করবে না। আমি তোমাকে অনেক দামী, অনেক ভাল—"

অপর্ণা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "থাক থাক, খুলে বল।"

"তোমার কলমটা হারিয়ে গেছে। কেমন করে যে গেল, কখন যে হারাল, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। সত্যি বলছি—"

দুই হাত দিয়ে স্বামীকে ঠেলে সরাতে চাইলো অপর্ণা। সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের গলায় বলল, "মিথ্যে কথা। কলম আমার
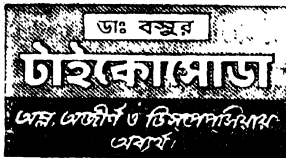
হারায়নি। কলম তুমিই নষ্ট করেছ।' আমি তখনই বুঝেছিলাম"

তারপর অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনেই উসখুস করেছে, অনিল এবং অপর্ণা। দু'জনে মুখ ঘুরিয়ে গভীর অন্ধকারে আকাশ-পাতাল কি সব ভেবেছে। এবং চোখ বুজে, কিন্তু বিনিদ্র অবস্থায় পরস্পরে একটু একটু করে মনের অমিল রচনা করেছে। আর একটা তুচ্ছ কলমকে মারাত্মক এক জীবন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয়েছে অনিলের। কিন্তু সে দমল না।

ভোর ভোর অপর্ণা উঠে চোখে জল দিল। মুখ ধুলে নিজে। কিন্তু স্বামীকে বলল না—'ওঠ'।

অনিলও সেই ডাকের অপেক্ষা করল না। গম্ভীর মুখে উঠল। বাথরুমে ঢুকল। তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে আগের দিনের খবরের কাগজ খুলে বসল।

অপর্ণা কখন নিঃশব্দে এসে রুটি মাখন ডিম চা দিয়ে গেল পাশের টিপয়-এর উপর নামিয়ে।

অনিল চুপ করেই প্রাতরাশ সারল। শার্ট প্যান্ট গায়ে চাপল। তারপর নোংরা রুমালটা পকেট থেকে আলনার উপর ফেলে দিয়ে ভাবল একবার, অপর্ণাকে বলবে কি না অন্য একটা নতুন রুমাল নামিয়ে দিতে।

অনিলের রুমাল খোঁজা আর হল না। সে বিনা রুমালেই সাইকেলে চেপে ডিউটি চলে গেল।

এদিকে ভার ভার সেই ভাবটা দুপুরেও কমল না। অনিল এলো। সামনের দরজা খোলা। দরজাটা তার জন্য যেন খুলে রাখা হয়েছে এইমাত্র। অথচ দরজায় কেউ নেই। তেল, তোয়ালে সাবান, সব বাথরুমে সাজান।

চান করে এসেও সেই এক অবস্থা। চিরুনি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল গিয়ে অনিল কিন্তু মনের মধ্যে যন্ত্রণা। অপর্ণা এখনও উঠছে না। একবার বারান্দায় উঁকি দিল অনিল। টেবিলে ভাতের থালা ঢাকা রয়েছে। রান্নাবান্না প্রায় সব বড় বড় বাটিতে পাশে রাখা আছে। প্রয়োজন হলেই তুলে নেওয়া চলবে। কিন্তু অপর্ণা অনুপস্থিত। মনটা দমে গেল অনিলের। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে চুলে চিরুনি চালাতে থাকল অনিল। কি করবে, কি করা উচিত, ভাবল। এবং বারংবার চিরুনি চালাল। আর ভাবল।

ড্রেসিং টেবিলের ঝকঝকে আয়নায় অনিলের প্রতিবিম্ব পড়েছে। হুবহু এই অনিল। এই নাক, এই মুখ, এই চোখ। এই হাত, পা, গা। অথচ সেই অনিলের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকানোর পরেই এই অনিলের মনে হল—সে আয়নায় অন্য এক অনিলকে যেন দেখেছে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। যার নাক-মুখ-চোখ এই অনিলের মত হলেও, আসলে সে বা প্রভাত স্বতন্ত্র কিছু নয়। কিংবা অপর্ণা। সবাই এক ছাঁচে ঢালা। আজ কারখানায় বসে বসে সে-কথা বুঝেছে অনিল। কলমটা ড্রয়ার থেকে বার করে প্রথমে নিব ভাঙতে গিয়েছিল, ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েছিল—অথচ পারেনি। পরে অন্যমনস্ক মনে কাগজে এটা ওটা লিখতে গিয়ে অপর্ণার নামের চেয়েও বেশিবার অনুপমার নাম লিখেছে, ইচ্ছে করে নয় কেমন নেশায়। আর নেশাটা এমন গাঢ় হল যে অনুপমার পর আরও ক'টা নাম লেখা হয়ে গেল। ছোট শালী অর্চনাও বাদ গেল না। নামের সেই তালিকার মধ্যে যখন তন্ময়—তখন হঠাৎ চমকে উঠেছিল অনিল। মনে হয়েছিল পাশে অপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে। ভয় পেয়ে ঘাড় ঘোরাতেই অপর্ণা সরে গেল। কেমন বোকার মতন একটু হেসেছিল অনিল। কারখানায় অপর্ণা কোথা থেকে আসবে?

তবু ত অপর্ণা আসবেই। হয়ত পাশে নয়, মনে, মনের তলায়। অনুপমাও কোনো কোনোদিন আসবে। উপায় কি!

সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসে আর-একটা মিথ্যে বলল অনিল, "অপর্ণা, তোমার কলমটা পাওয়া গেছে। সল্ট হাউসের কোণায় পড়েছিল। ওখানেই ব্রেকডাউনের ঝামেলায় ছোটাছুটি করেছিলাম কি না..."

২৯
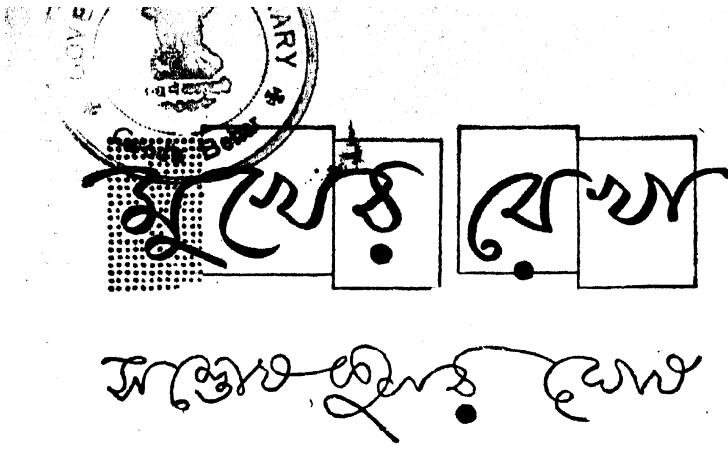
[রাত বাড়ছে, রাত ফুরচ্ছে, রাত মরছে। সৌরেশ চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। চাঞ্চল্যের কোন প্রকাশ ছিল না। অন্য কোন লোক ঘরে ঢুকলে দেখতে পেত, সৌরেশ চোখের ওপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে হেলান চেয়ারে শুয়ে আছেন, নাকটা লুকিয়েছে কনুইয়ের খাঁজে। 'বাইরে থেকে আমি এখন নিস্তরঙ্গ দীঘির মত, প্রশান্ত, যার তলাকার খবর কেউ রাখে না. সেখানে হয়ত গভীর কল্লোল, হাজার-হাজার ছোট ছোট মাছের পুচ্ছ আলোড়ন। কিন্তু রাত পুইয়ে এল, আর একটু পরে সব ফর্সা হবে, আমার কাজ শেষ হল না ত!'

কী কাজ? সৌরেশ শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে। আমি কী করছি? হয়ত নিজেকে খুঁজছি। আমার মধ্যে এই আমি-টা কী করে এল, কবে এল, আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রণালী কিছু অদ্ভুত—নিজেকে আমি দেখছি অনেক মুখের পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে। কে আমাকে কতটুকু দিল, কে কেড়ে নিল কতখানি। কিংবা একের পর এক হাত ধরে ধরে ওরা আমাকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল এখানে। অন্ধকারে সকলের মুখ আমি ভাল করে দেখতে পাইনি, সব ছোঁয়া হয়ত মনে রাখতেও পারিনি।

চোখ মেললুম, আমার ঘরের খোলা জানলার ওপারেই আকাশ, আকাশ নীচে নেমে এল। ওই আকাশ আমার অতীত, আমার সব অভিজ্ঞতা ওখানে মিটিমিটি তারা হয়ে জ্বলছে। সব তারা আমি দেখতে পাচ্ছি না, ওরা জ্বলে, নেবে, জ্বলে, আর নাগালের বাইরে বলেই অস্থির করে তোলে। আকাশ নীচে নেমে এল, ওর আঁচলটা ঝেড়ে সব তারা বুঝি ছিটিয়ে দেবে আমার গায়ে, আমি জ্বলব। আর, সেই জ্বলুনির ভিতর দিয়েই ফিরে পাব আমার অতীতকে, আমার হারানো অভিজ্ঞতার কণাগুলিকে।]

আজ পুরনো ক্ষণগুলিকে তারা বলে ভাবলেন সৌরেশ; অনেক অনেক দিন আগে আরও একবার কল্পনা এর অনুরূপ হয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। পাখি আর নয়ন সেদিন চলে যায়।

সেদিন বিকালে সৌর একটা সিনেমায় গিয়ে ঢোকে; পর্দায় হাত-পা নাড়া, মুখ-চোখের বিলোল ভঙ্গি কুৎসিত ঠেকে, গান আর কথা—সব অসহ্য ন্যাকামি আর বোকামি। বেরিয়ে এল সৌর, এখনও বাতাবি লেবুর মত রোদ ছিল; সূর্যের রঙ ছিল বাতাবির ভিতরটার মত টকটকে, আর রোদ্দুর বাইরের মত হলদেটে।

সৌর চলতে শুরু করল। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে না-চেনা একটা পথ ধরল। দু-পাশের সার-দেওয়া বাড়িগুলো তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না, খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে চলে শহরতলীও যেন হাঁপিয়ে পড়ে পিছিয়ে গেল। আস্তে আস্তে শহরের শেষ ছাপটুকুও লুপ্ত হল।

নয়ানজুলি, দু পাশে ঢালু জমি, মাঝ-খান দিয়ে পথ, খানিকটা দূরে দূরে কালভার্ট। এখানকার মাটি ভিজে, এখানকার মাটি কালো, নরম, এখানকার মাটি গন্ধ ছড়ায়। সেই গন্ধ আকাশের পাখিকে ডাকে, তারা নেমে নেমে ফসলের গুঁড়ো ঠোঁট দিয়ে কুড়োয়, চক্রাকারে ওড়ে, আবার ক্লান্ত হয়ে কখনও বাঁশঝোপের আগায় গিয়ে বসে।

সেই বাঁশ-ঝাড়গুলি এক-একটি বিদীর্ণ তুবড়ির মত—সবুজ ফুলকিগুলি চির-কালের মত স্থির হয়ে আছে।

এ পথে বাস বিরল, একটি-দুটি ট্রাক চলে। সৌর বাঁধা রাস্তা ছেড়ে নীচের কাঁচা পথে নেমে এসেছিল।

পথে লোক ছিল না। অনেক দূরে কোন গ্রামে ডুগডুগি বাজছিল, তাল নিয়মিত কিন্তু একটানা শুনলে অস্বস্তি লাগে, গা শিরশির করে। সৌরর করছিল। একটু-একটু ছায়া নামছিল, হাওয়ায় হিম-হিম ভাব—আর খানিক পরেই বুঝি অন্ধকার নামবে। ছায়া আর অন্ধকার সোদর—অথবা বুঝি একই, কিশোরী ছায়াই ধীরে ধীরে প্রগাঢ় যুবতী অন্ধকার হয়ে যায়।

সৌরর অল্প-অল্প ভয় করছিল। এই ভয়-ভয় ভাব আর হাওয়ার শীত, এরাও আসলে এক, সৌর ভাবল, বাইরের শির-শিরে শীত যা আমার শরীরে লাগে, কাঁটা দেয়, মনের ভিতরে গিয়ে তাই পলকে ভয় হয়ে যায়।

সন্ধ্যা হল, না-চেনা পথ, আমি আর চলছি কেন, সৌর ভাবছিল কিন্তু থাম-ছিলও না। যতক্ষণ চলব, ততক্ষণই বাঁচব, যেই থামব অমনই এই অন্ধকার আমাকে আত্মসাৎ করে নেবে, আমি—আমি আলাদা থাকব না, এই অন্ধকারই হয়ে যাব।

এই ভয় ছিল বলেই সৌর চলছিল, আবার এই ভয় ছিল বলেই সে ফেরার কথাও ভাবছিল। আমি চলছি কেন, কত দূরেই বা যাব, থামতে ত হবেই, ফিরতেও হবে। কী করে ফিরব। এখনও দু-একটা বাস শহরের দিকে ফিরছে বটে, ওদের রাগী-রাগী জ্বলজলে চোখ, ওদের অন্তর-যন্ত্রেও গরর্-গরর্ রাগ, ওরা আমাকে তুলে নেবে কেন, ওরা আমাকে কি তুলে নেবে? যদি

হাত তুলি? যদি দু'হাত তুলে সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তা-হলে হয়ত থামবে বা হয়ত থেঁতলে চলেই যাবে। আমি কি 'বাঁচাও' বলে চেঁচাব, চেঁচাতে কি পারব, কে শুনবে, মালাও ত 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়েছিল, কে শুনেছিল। ধোঁয়া, কুয়াশা আর কালি দিয়ে অন্ধকারের শরীর তৈরি—সেই অন্ধকারে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, আমি আর শহরে ফিরব না।

কালভার্টে পা ঝুলিয়ে সৌরকে এক সময় বসতে হল। নিজের নিশ্বাসকেও কখনও কখনও ভয় লাগে, মনে হয়, কানের কাছে কে বুঝি ফোঁস ফোঁস করছে। হাওয়ার শিষে বিষ, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সৌর হাত দুটি বুকের কাছে জড়ো, আর হাঁটু দুটি এক সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়েছিল। সামনে, নয়ানজুলির ঠিক ওপাশেই কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে, মাঠের মাঝখান দিয়ে ঠিক আলের পথ ধরে ধরে একটা লণ্ঠন দুলতে দুলতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে গেল। সৌরর মনে হল, ওই লণ্ঠন কী যেন খুঁজছিল, কাকে ইশারায় কিছু হয়ত বলছিলও, কিন্তু পিঁপড়ে মৌমাছি, পাখিদের ভাষার মত আলোর ভাষাও ত সৌরর জানা নেই, তাই দপদপে শিখাটার দিকে সে শুধু কিছুক্ষণ নিষ্পলক হয়ে চেয়ে থাকতেই পারল।

আর ওই জোনাকিগুলো! ওদের যদি ছুঁতে যাই, সৌর ভাবল, ধরতে পারব না; আমার মুঠিতে অনেক যে ফাঁক। ওই জোনাকিগুলো, যারা ঝোপের ভিতর ঢুকেই বেরিয়ে পড়ছে, আসলে কোন প্রাণী বা পতঙ্গ নয়, আমারই সুখ আর আনন্দের কয়েকটি ছোট ছোট ক্ষণ জোনাকি হয়ে জ্বলছে। আজ যেমন, ভবিষ্যতেও তেমনই আমার অভ্যস্ত জীবন আর নিয়ম থেকে যখনই বেরিয়ে আসব, এখানে বা এই রকমই অন্য কোনখানে, তখনই এই জোনাকিদের জ্বলা-নেবা দেখব, আমার সুখের উজ্জ্বল কয়েকটি মুহূর্ত-বিন্দুকে ফিরে পাব; কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়, তারা ধরা দিতে দিতেও দেবে না, চোখে নেশা ধরিয়েই মুছে যাবে।

মাঠের অন্য প্রান্তে কে যেন অন্ধকারের মধ্য থেকেই কাকে চীৎকার করে ডাকল; সেই ডাক মুহূর্তমধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে সৌরর কানে চারদিক থেকে এসে আঘাত করল। সৌর চমকে উঠল।

সেখান থেকে সৌর কখন উঠে দাঁড়াল কখন আবার বাড়ির পথ ধরল, তার খেয়াল ছিল না। শহরের প্রান্তে এসে তার সম্বিত ফিরে এল। সে একটু দিশাহারাও হয়ে পড়েছিল—কয়েক মুহূর্তের জন্য। নিমীলিত চোখের ওপর হঠাৎ আলোর ছটা লাগলে যেমন হয়ঃ প্রথমে ধাঁধা লাগে পরে দৃষ্টি [illegible] আসে। পাঁচটি পথ যেখানে এসে মিশেছে, সেখানে তখনও সারি সারি দোকান খোলা, শো-কেস থেকে বিচ্ছুরিত আলো, ব্যস্ততা-অভিমানী নানা ধরনের গাড়ি—গম্ভীর ট্রাম থেকে ছটফটে ট্যাক্সি সবাই তাদের আপন রূপ আর চরিত্র নিয়ে আছে। শুধু কি আমিই বদলে এলাম! সৌরর অস্বস্তি একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসার রূপ নিল এবং জিজ্ঞাসাই আপনা থেকে উত্তরে পরিণত হলঃ না, আমিও বদলাইনি। জলে ডুব দিলে শরীরটা ভারী ঠাণ্ডা আর স্নিগ্ধ লাগে, মনে ভ্রান্তি হয়, আমার সত্তাটাই এমন সিক্ত বুঝি। একটু পরেই গা মুছে যখন শুকনো কাপড় পরে ফেলি, তখন আমরা আবার সেই ডাঙার প্রাণী। এই ত আমি ফিরে এলাম আলোয়, ভীড়ে কলরবে কোলাহলে, শক্ত ইঁট আর কংক্রীটে গাঁথা আমার চেনা শহরে।

একটু দাঁড়াই এখানে, তা হলেই আমার চোখের ঘোর কেটে যাবে, একটু সবুজ নেশা করেছি, তাই পা টলছে, কিন্তু নেশা আর কতক্ষণ থাকে। সৌর খানিকক্ষণ মোহিত চোখে চেয়ে রইল আলোর খুঁটিগুলোর দিকে, ধীরে ধীরে সেই ব্যস্ত-চলন্ত পথ-বেণী মোড় তার চোখে একটা ফুটন্ত কড়াইয়ের রূপ নিল—সৌরকে চোখ বন্ধ করতে হল।

কিছুটা ভয়ে, কিছুটা অস্বস্তি কাটাতে সৌর একটা গলির পথ ধরল।

কিন্তু যেদিন মানুষকে ভুলে পায়, সেদিন কোন হুঁশিয়ারিতেই কাজ হয় না।

সৌর যে ভুল পথে ঘোরাঘুরি করছে, এ কি সে নিজে থেকেই টের পেয়েছিল! বোধ হয় না, হঠাৎ খিলখিল হাসির তোড় শুনেই সে চমকে গিয়ে থাকবে।

নয়ন—নয়ন এখানে কোথা থেকে এল?

গ্যাসের আলো, তাও নিবু-নিবু, কিছু পরিষ্কার দেখা যায় না, আবছায়া কয়েকটি শরীরের ঠাম শুধু চোখে পড়ে। জড়োসড়ো একটা বেরালের বাচ্ছাকে কোলের কাছে নিয়ে একটি মেয়ে পানওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করছিল।

এই, আমার মেনিকে মেরেছিস কেন খোনা-খোনা গলা, ঠিক যেন নয়নের।

"কে বলেছে, মেরিচি!"

"মেনিই বলছিল।" একটি মুখ আনত হয়ে পড়ল, বোধ হয় মেনিকে চুমু খাবে বলে।

নয়ন কিনা ভাল করে পরখ করবে বলেই সৌর দাঁড়িয়ে গেল। পান কিনল দু-পয়সার।

মেয়েটিও তাকে দেখছিল।

আর তখনই সৌরর ভুল ভাঙল। না, নয়ন নয়। সৌর পিছন ফিরে চলতে শুরু করে দিল। কয়েক পা এগতেই পায়ের গোড়ালিতে একটা ঢিল পড়ল। মেয়েটিই ছুঁড়ে থাকবে। খিলখিল হাসিও শোনা গেল। হাসছিল পানওয়ালাটাও। সে চেঁচিয়ে ডাকছিল, সৌরকে আর একটা পান খেয়ে যেতে।

পান ত নয়, ওই মেয়েটিই--যে কক্ষনো নয়ন নয়--পানওয়ালার মারফত ডাকছে। ঢিলও ছুঁড়েছে। এর পরে কী। ওই বেরালের বাচ্চাটাকেই লেলিয়ে দেবে না ত? ও যদি আসে, যদি সৌরর পায়ে জিভ ঠেকিয়ে চাটতে শুরু করে দেয়?

আরও তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে সৌর একজনের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আশ্চর্য, সে লোকটা কিন্তু তাড়া করে এল না, সৌরকে গাল দিল না পর্যন্ত।

লোকটা বসে পড়েছিল। অপাঙ্গে সৌরর দিকে চেয়ে জড়িত গলায় বলল, "কী বাপা!. পিয়াকে গাও চলি রে?"

লোকটা মাতাল।

সদর রাস্তায় এসে তবে সৌর মুখের ঘাম মোছার সময় পেয়েছিল। কী হল, সে অবাক হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিল, এ-পথে কেন এলাম। এ-পথ যে ভুল, তা ত জানতাম না। জানতাম। তবু এসেছি। এই পথই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। আর, সৌর এ-ও জানল, এইবারই শেষ নয়। এ-পথ তাকে আরও অনেকবার টানবে, আনবে। অনেক মেয়ের গলাই তার নয়নের পাখির বলে ভুল হবে, সে থামবে, ভুল টের পেয়ে পালাবে, কিন্তু আবার ফিরে এসে অনেক মুখের মধ্যে নয়ন আর পাখির মুখ খুঁজবে।

এ-পাড়ার পথে-পথে ঘোরাঘুরির শেষ সৌরর এ-জীবনে নেই।

অনেক রাত্রে ছাদে উঠে সৌর তাকিয়েছিল। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা—সে কি সারা বিকেল আর সন্ধ্যা মাইলের পর মাইল ঘুরেছে বলে? কিন্তু মাথাতেও কেন যন্ত্রণা, পৃথিবীতে এত স্থান থাকতে বেছে বেছে তার মগজেরই কোষে কোষে কেন মৌমাছিরা চাক বাঁধল। তাদের গুঞ্জনের বিরাম নেই কেন, তাদের হুলেই বা এত জ্বালা কেন।

প্রবল পিপাসা আকণ্ঠ উঠে এসেছিল। সেই পিপাসাই সৌরকে বুঝিয়ে দিল তার জ্বর এসেছে।

চোখের সামনে তখনও সকালের দৃশ্য ভাসছে। বাড়ির ও-পাশের দিকটা নিস্তব্ধ, অন্ধকার, পাখি নেই, নয়ন নেই, মালা নেই তবু থেকে থেকে ঘুঙুর বাজছিল। কলকাকলি, বেসুরো গানেরও বিরতি ছিল না। ওরা নেই, না-থেকেও আছে।

সৌর স্পষ্ট দেখছিল, মালার গলার ফাঁস খুলে ওরা ওকে তুলে দিল ঢাকা একটা গাড়িতে। নয়ন আর পাখিকেও ওরা আলাদা একটা খোলা ট্রাকে তুলে দিল। সামান্য মালপত্র যা-কিছু আগেই উঠেছিল।

আশেপাশের ছাতে লোক ধরছিল না।

নয়ন বসেছে মাথায় কাপড় তুলে—রোদ ঠেকাতে, মুখ ঢাকতেও হতে পারে। পাখি ড্যাবডেবে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। তার এতটুকু সংকোচ ছিল না।

গিন্নীরা ছেলেমেয়েদের ঠাস ঠাস করে চড় মেরে নীচে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন, তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন।

দেখছিলেন বাবুরাও। বাজারের থলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন।

চিত্তবাবুকেও সৌর দেখতে পেল। তাঁকেও ওরা তুলে দিয়েছিল। খোলা ট্রাক, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চিত্তবাবু বসে বসে ঢুলছিলেন। এদিক-ওদিক কাতও হচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। চিত্তবাবুর নেশার ঝোঁক তখনও বুঝি কাটেনি।

ট্রাক স্টার্ট দিল, একটা পুলিস পিছনেই দাঁড়িয়ে রইল, বোধ হয় ওদের পাহারা দিতে। চিত্তবাবু ঝিমুচ্ছিলেন, ও'র তন্দ্রার আবেশ ছুটে গেল। গাড়ি চলতেই টলে পড়ে জড়িয়ে ধরলেন পাহারাওয়ালার পা। তার মুখের দিকে চোখ তুলে অস্পষ্ট গলায় বলে উঠলেন, "কী হল বাবা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

ট্রাকটা চলছে। গলির মুখে বাঁক নিচ্ছে। চিত্তবাবু আর পাহারাওয়ালা অদৃশ্য হল। নয়নের ঘোমটা-তোলা মাথাও আর দেখা যায় না। পাখির অপলক চোখ দুটিও আড়ালে চলে গেছে। একেবারে। তাকে পণ রেখে যারা কড়ি খেলত, হার-জিতের মীমাংসা না করেই, সেই মেয়ে দুটি চলে গেছে। পণ্য-পুরুষটি পড়ে আছে। অন্ধকার ছাতে, একলা। তার জ্বর এসেছে।

সৌর ওখানেই প্রবল পিপাসা আর চিন্তার যন্ত্রণা নিয়ে বসে পড়েছিল।

* * *

"এ কী! এত জ্বর? গা যে পুড়ে যাচ্ছে!"

খুব মৃদু গলা, মৃদুতর স্পর্শ।

অনেক কষ্টে চোখ খুলল সৌর, কিছু দেখতে পেল না। হাত বাড়িয়ে সেই স্পর্শটুকুকে তপ্ত কপালে চেপে ধরল।

"নীচে যাওনি, কিছু খাওনি, কখন ফিরলে? ছিঃ, এত জ্বর নিয়ে এই খোলা ছাতে ঘুমোতে আছে?"

সৌর কিছু বুঝতে পারছিল না, দেখতে পাচ্ছিল না, উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। নরম দুখানি হাত ওকে ধরে ফেলল।

শুকনো বিমূঢ় গলায় সৌর বলল, "নীচে যাব। জল খাব।"

"উঠতে হবে না, আমি জল আনছি" এবার সেই স্বর। সৌরকে সাবধানে শুইয়ে দিয়ে একটি ছায়া-ছায়া দেহ-রেখা নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি-ঘরে অদৃশ্য হল। (ক্রমশ)

মাছ খাওয়ার কথা

সুরেশচন্দ্র সাহা

একবার টাংগাইল সম্মেলনীতে ভাষণরত এক সাংবাদিক বলেছিলেন—এই তো ইউরোপের কত জায়গায় কত মাছ খেলুম, কিন্তু টাংগাইলের কাজলী মাছের স্বাদ কোথাও পেলাম না। টাংগাইলের এলাসিন অঞ্চলের ধলেশ্বরীর কাজলী মাছ অতি সুস্বাদু বটে। তাই টাংগাইলের নানা গৌরব ঘোষণায় কাজলী মাছের কথাও উল্লেখ করেছেন টাংগাইল সন্তান।

আফিম-প্রসাদাৎ কমলাকান্তের দিবাদৃষ্টি খুলে যেত। কাজলী মাছের প্রসঙ্গে ইউরোপীয় মৎস্যের উল্লেখেও আমার যেন কেন নানা দেশের মাছ খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় ক্ষীণকটা একতোলা ওজনের বাঁশপাতাকৃতি কাজলী মাছের মুখরোচক পদ—আর কোথায় কড্ হ্যাডক মাছের একপো দেড়পো সাইজে টুকরো সেদ্ধ বা ভাজা। আজন্ম মসলা-পাড়া খানা দুরন্ত মুখে কি করেই বা রোচে ইউরোপীয় রান্না, তা শুনতে যত ভাল লাগুক ওদেশী মাছের নাম। কিছুদিন আগে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর গিয়েছিলেন রাশিয়ায়। আধ সের ওজনের এক টুকরো সেদ্ধ মাছ নানা খানাবস্তুর সংগে টেবিলে দেখে শুধু মৎস্য-প্রাচুর্যের জন্য খুশি হতে পারেন নি তিনি। হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল বাড়িতে হলে আধ সের মাছের ঝোল-ঝাল কতই না ভাল লাগত খেতে।

কত উপায়েই না আমরা মাছ খেয়ে থাকি—কাঁটা মাথা লেজের কত উপাদেয় পদ তৈরী হয় বাঙালীর ঘরে। ইলিশ ভাজা, রুইয়ের মুড়িঘণ্ট, আড়মাছের লেজের—যাক্ গে, আবার পদ্মার হে-পাড়ের কথা মনে পড়ে যাবে অনেকের। ইলিশের ঝোল বা পেটী পছন্দ করি, ভাবি মাথাটাও মিলবে কি না। ছেলের মাথা খাও বলে বকনি দিলে যত আঘাত লাগে মনে। একসংগে খেতে বসে নিজের পাতে মুড়ো নেই, অথচ পাশের লোককে মুড়ো দিতে দেখলে মর্মাঘাত বোধ হয় তার চাইতে কম নয়। বিলেতে কিন্তু মাথা লেজের ব্যবহার লোকে জানেই না। মাছটাকে টেবিলের উপর রেখে লেজ মাথা কাঁটা বাদ দিয়ে পেট-পিঠের মাংস লম্বালম্বিভাবে কেটে দেওয়া হয়। এর নাম ফিলেট। এই ফিলেটই ভাজা বা সেদ্ধ হয়ে মানুষের উদরে সমাধিলাভ করে। আর লেজ মাথা কাঁটা ফ্যাক্টরীতে গিয়ে গম-চূর্ণের মত যে চিজে রূপান্তরিত হয় তার নাম ফিস্‌মিল—হাঁস-মুরগী গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাদ্য এবং জমির উৎকৃষ্ট সার। জাপানীরা কিন্তু অনেকেই মাথাটাকে জলে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করে সারপদার্থযুক্ত জলটা সুপের মত খেয়ে নেয়।

একমাত্র আমাদের দেশেই বোধ হয় নদীর মাছের সবচাইতে বেশী ব্যবহার। বিলেতের কোন বাড়িতে কখনও সমুদ্রের মাছ ছাড়া নদীর মাছ রাঁধতে দেখেছি মনে পড়ে না। চিংড়ি মাছের মালাইকারী দিয়ে ভাত খেয়ে চটাস চটাস হাত না চাটলে যেন পুরোপুরি তৃপ্তিই হয় না আমাদের। একবার উত্তর সাগরের কিছু কড, হ্যাডক, হ্যালিবাট ইত্যাদি মাছ এনে ওয়াই এম সি এ-তে উপহার দিয়েছিলাম। সেদিন সে কি উল্লাস! এক গাদা টাটকা মাছ উপহার পেলে খুশী হয় না এমন লোক সব দেশেই বিরল। দশ সের রসগোল্লার বদলে দশ সের পোনা মাছ উপহার পেলে লোকে বোধ হয় বেশী খুশী হয় বাঙলা দেশে।

যা হোক, সেদিন হোস্টেলে ভোজ হল, কিছুটা মাছ গেল স্কটল্যাণ্ডে, ওয়াই এম সি এ-র সেক্রেটারীর বৌ মিসেস্ ব্রাউনের বোনের বাড়ি। হোস্টেলে খাওয়া ত হল মাছের শুধুই ভাজা—তেল-নুন-হলুদ ছাড়া। পোয়া ওজন টুকরায় এপিঠ ওপিঠে শুকনো ময়দা মেখে চর্বিতে (আপনাদের পক্ষে দুর্গন্ধ) ভাজা হয়ে পরিবেশিত হল অকৃপণ উদারতায়। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল কত গুলি হতভাগ্য জ্যান্ত কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গরম জলের গামলায়। কি নিষ্ঠুর পাকপ্রণালী! সেদ্ধ হওয়ার পর মাছগুলি নামিয়ে নিয়ে চলল খাওয়ার আয়োজন। একটা চিংড়ি চাঁপার কলি আঙ্গুলে চেপে একটু একটু ছিঁড়ে লাল রঙ-করা নখের ডগায় তুলে ভিনিগার মিশিয়ে মুখে দিতে লাগল শার্লী। ভারী মজার ভোজনপদ্ধতি! কেমন লাগছে শার্লী? ত্বরিতে উত্তর এলো—লাভ্‌লি। কোন কিছুই ভাল লাগার সর্বজনের সর্ব সময়ের ভাষা ওদের লাভ্‌লি—বাঙলা তর্জমায় যার অর্থ দাঁড়ায় চমৎকার। পার্শ্ববর্তী কে একজন শার্লীকে ঠুকলে—কে লাভ্‌লি, চিংড়ি, না সুরে-সু? শার্লীর চোখে-মুখে বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভা। মধুর হেসে বললে—বোথ্। আমার মুখের রক্ত কে কেড়ে নিলে। পাশেই ডজনখানেক তরুণ-তরুণী ছিল কি না!—

পরদিন মিসেস ব্রাউন বললেন—আজ আমার এখানে লাঞ্চ খাবে, সু-রে-সু—ওদেশে বহুজনকণ্ঠে আমার নামের সপ্রীতি উচ্চারণ। মধুর পরিহাসে খাওয়ার টেবিল জমিয়ে তুললেন আইরিশ মহিলা। ভেবেছিলাম, হয়ত কতই না আইরিশ পদ তৈরী করেছিলেন মিসেস্ ব্রাউন। হয়েওছিল—তবে মাছের নয়, সসের। মাছের সেই থোড়-বড়ি-খাড়া—সেই সেদ্ধ ভাজা আর শ্যামবাজারের মোড়ে দুআনা সাইজের আলুর চপের মত ফিশ-কেক্। কি কি

ট্রলারে ধৃত সামুদ্রিক মাছের সমারোহ

সস্ দিয়ে সেদিন মাছ খেয়েছিলাম আজ আর সেকথা মনে নেই। তবে একটা সসের কথা আজও ভুলি নি; আইরিশ স্পেশাল—তাতে ছিল দুধ, গোলমরিচের গুঁড়ো, হয়ত আরও কিছু। বুঝুন এবার, সমুদ্রের টাট্কা মাছ সেদ্ধ করে দুধ দিয়ে খাওয়া—পূর্ববঙ্গের কোন কোন সম্প্রদায়ের নুন দিয়ে দুধ খাওয়ার মত!

মাছের ডিম খাওয়াতেও ওদের ঐ সনাতন রীতি—সেদ্ধ, নয়ত চর্বিতে ভাজা। ডিমের প্রসঙ্গে আমাদের কিন্তু মনে পড়ে চিংড়ির ডিম বেসমে ফেটিয়ে বড়া ভাজা, ইলিশের ডিম ভাজা বা টক। একবার গ্রীমস্‌বী থেকে হাম্বার নদী বেয়ে ছোট্ট মোটরবোটে শুধু ছোট চিংড়ি (শ্রিম্প) ধরতে যাওয়া ধীবরকে জিজ্ঞেস করলুম—এইসব চিংড়ি তোমরা খাও কি করে? উত্তর এলো—কেন, সেদ্ধ করে। আপনারা ভাবছেন লাউ-চিংড়ির কথা, তাই না?

কলকাতাতেও বঙ্গোপসাগরের চিংড়ি, চাঁদা, ভেট্‌কী, পমফ্রেট কতজনকে এন্তার উপহার দিয়েছি। কোথাও খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়েছি, কোথাও পাই নি—হয়ত নেমন্তন্ন-না-পাওয়া বাড়িতে মাছগুলো সমুদ্রের বলে ফেলেই দেওয়া হয়েছে; শুধু দেওয়ার সময় আবার সামনে না বলতে পারত না বলে তুলে নিত। তবে এক বাড়িতে মাছ দিলে নেমন্তন্ন ছিল বাঁধা—আর নেমন্তন্ন পেলে চোখের সামনে ভেসে উঠত সরষের তেলে নুন-হলুদযোগে ভাজা মাছ, ঝোল, চচ্চড়ি আরও কত কি হাত-চেটে খাওয়ার পদ। এদেশ আর ওদেশে নেমন্তন্নে তফাৎ এই।

সেদিন ওয়াই এম সি এ-তে মাছের উপহারে উন্নাসের কারণ আছে। প্রথম কারণ মাছগুলি সদ্য সাগর থেকে আনা; দ্বিতীয়ত এর অমিত পরিমাণ। ওদেশে মোটামুটি বড় রকমের একটি মৎস্য-বন্দরে একদিনে দশ থেকে কুড়ি হাজার মণ সমুদ্রের মাছ আমদানী হলেও এর অল্প অংশ মাত্র টাটকা বিক্রী হয়। অধিকাংশ মাছ ভোর রাতে ট্রলার থেকে নামাবার পর নীলামে বিক্রীত হয়ে চলে যায় শহরের নানা কারখানায় এবং ফিশ ডক থেকে প্রসারিত রেলযোগে দেশের সুদূরতম অঞ্চলে। পাইকারী ব্যবসায়ীরা সামান্যতম অংশ টাট্‌কা অবস্থায় বাজারে ছেড়ে দেয়। বাকী মাছটার কারখানায় দীর্ঘস্থায়ী রক্ষণ ব্যবস্থা হয়—স্মোকিং, ড্রাইং, কুইক-ফ্রিজিং। কুইক ফ্রিজিংএর পর মাছের জলীয়াংশ জমে যায়, আর মাছটা হয়ে পড়ে পাথরের মত শক্ত। হয়ত দুসেরী এমনি একটা শিলায়িত মাছ দিয়ে ঘায়েল করা যাবে শত্রুকে—ভগবান করুন, এদেশের গৃহিণীদের হাতে যেন না পড়ে এই মাছ! কুইক ফ্রিজিংএর পর অবিকৃত অবস্থায় ছ'মাসের বেশী থাকতে পারে মাছ। রান্নার আগে শীতল প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে আধ ঘণ্টা জলে ডুবিয়ে রাখলে মনে হয় মাছগুলি যেন এই মাত্র ট্রলার থেকে নামিয়ে আনা হল।

রক্ষণব্যবস্থার আগে সমস্ত মাছেরই মাথা-লেজ-ডানা এবং পেটের নাড়ী-অন্ত্র কেটে বাদ দেওয়া হয়। এতে পচনক্রিয়া বন্ধকরণ সহজতর হয়। অথচ ওদেশের লোকেও মাছ নিয়ে এত এলাহি কারবারের খবর রাখে না—যেমন মুর্শিদাবাদের লোকের নবাববাড়ি দেখার সৌভাগ্য হয় না। তাই নিকটবর্তী কোন মৎস্য-শহরে থাকা বন্ধু-বান্ধবকে লেখে আসার সময় কিছু টাট্‌কা মাছ এনো তো হে।

মজার কথা, এত মাছের দেশেও লোকে মাছ খায় সপ্তাহে দু'তিন দিন। তার মধ্যে মাংস খাওয়ার নিষিদ্ধ দিনে সবাই খায় মাছ। আমরা মাছ খাই ভাত খাওয়ার উপাদান হিসেবে—ভাত মাখার জন্য চাই ঝোল, চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট। ওরা মাছ খায় খাদ্য হিসেবে; এক বেলায় একজন লোকের সমস্ত রকম খাদ্যের মোট পরিমাণ যদি ধরে নেওয়া যায় দুসের, তার আধ সের হয়ত মাছ—বাকীটা সব্জি, আলুসেদ্ধ, রুটি-মাখন, পুডিং, জল ইত্যাদি। বাড়িতে মাছের ব্যবহার দুদিন হলেও হোটেলে রেস্তোরাঁতে মাছের রোজ নানা ব্যবহার চলতে। ফিশ্ এন্ড চিপস্ অর্থাৎ পোয়াখানেক টুক্‌রো ভাজা মাছ আর টুক্‌রো টুক্‌রো ভাজা আলু স্বল্পবিত্ত ও সংক্ষিপ্ত সময় মানুষের অতি প্রিয় খাদ্য।

কলকাতায় অনেক জায়গায় বিক্রী করতে দেখা যায় ভাজা মাছ—বিকৃত মাছ লোক-ঠকানো পদ্ধতিতে রান্না করা। শীতকালে বঙ্গোপসাগরের প্রচুর মাছ আমদানী হয় কলকাতায়। শীতের আলুও সস্তা। অফিসে কারখানায় আলু আর মাছভাজা চালু হলে ধনিক ও শ্রমিক সকলেরই মেলে সস্তায় পুষ্টিকর খাবার, আর বেকার যুবকদের জোটে রোজগারের পথ।

জাপানীদের কাঁচা মাছ খেতে দেখে এক বন্ধুর কাছে গল্প করেছিলুম। বন্ধুবর কিন্তু কল্পনায় চলে গিয়েছিলেন একেবারে আদিম যুগে। তাঁর মনে হয়েছিল মাছ ধরে দুই হাতে চেপে খোসা কাঁটাসহ বোধ হয় চিবিয়ে খায় জাপানীরা। ভেট্‌কী মাছ খোসা ছাড়িয়ে পাত্‌লা টুক্‌রো করে কেটে কাঠি দিয়ে তুলে মুখে দিতে দেখেছি জাপানীদের; সঙ্গে একটু জাপানী সস্। প্রথমে দেখে গা ঘিন্ ঘিন্ করত। একদিন এক জাপানী ভোজের বৈঠকে উপস্থিত ছিলুম। নানা রকমারি ভোজ্য আয়োজনের মধ্যে আবার সেই কাঁচা মাছ—ভারত মহাসাগরে ধরা টুনা মাছের টুকরা। কি করি, অন্যের সামনে না খাওয়ার অভব্যতাও প্রকাশ করা চলে না, আবার খেলেও অন্ন-প্রাশনের অন্ন উদ্গীরণের আশঙ্কা। অবশেষে তরল জাপানী সসে ডুবিয়ে এক টুকরা মুখে ফেলে দিলাম আর কি। একি!—চিবোতে গিয়ে দেখি সসে-ভেজান কাঁচা মাছ কি মোলায়েম। কোন বিস্বাদও লাগল না, উদ্গারের ভাবও দেখা দিল না। স্বাস্থ্যে-সম্পদে-শিক্ষায় পৃথিবীর যে সব জাত উন্নত, তাদের খাদ্য আমাদের মত না হলেই যে অবরণীয়, তা ভাবা মোটেই সঙ্গত নয়। অবশ্য অভারতীয় মাত্রই আমাদের মসলা-প্রধান খাদ্য দেখে শিউরে ওঠে।

বিখ্যাত বিপ্লবী এবং চিন্তানায়ক ডাঃ ভূপেন দত্ত এদেশে এবং ওদেশে ট্রলার দিয়ে মাছ ধরার বিবরণ শুনলেন। করমর্দন করে সস্নেহে বললেন—ইয়ং ম্যান, আই কন্‌গ্র্যাচুলেট ইউ। কথা প্রসঙ্গে বললেন—বিলেতে, আমেরিকায় কত সমুদ্রের মাছ খেয়েছি। যোগাড় করে দিতে পার কিছু এদেশী সমুদ্রের মাছ, চেখে দেখতুম। স্বামীজীর সঙ্গে পরমার্থিক চিন্তাধারায় কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও অধিক মৎস্যাহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই ভায়ের কোন অমিল নেই।

জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা সামুদ্রিক মৎস্য শিকার পরিকল্পনা সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কখনও কখনও বেসরকারী ভিত্তিতে এই নতুন শিল্পায়নের সম্ভাব্যতা আলোচনা করতেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন—পমফ্রেট মাছ কলকাতার কোন বাজারে মেলে? জনৈক বিদেশী বিজ্ঞানী ছিলেন সেদিন তাঁর বাড়িতে অতিথি। নিজের কাছে প্রিয় ছিল এই মাছ, তাই অতিথি আপ্যায়নও করবেন নিজের কাছে ভাল-লাগা পমফ্রেট দিয়ে।

নবতম বৈজ্ঞানিক গবেষণার আভাষে নাকি জানা গেছে সেদিন সুদূরে নয়, যখন মানুষের আর মাছ খাওয়ার দরকার হবে না। মাছের গুণসম্পন্ন গোটাকতক ট্যাবলেট মুখে পুরে দিলেই নাকি মিটবে মাছ খাওয়ার প্রয়োজন—যেমন এখন চলে সবুজ সব্জীর বদলে ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্স। বাজী রেখে বলতে পারি বাঙালীরা সে দুর্দিন কখনই মেনে নেবে না। পৃথিবীর আর সব প্রান্তে মাছের বদলে ট্যাবলেট চললেও অন্তত বাঙালীরা তেলে-নুনে-ঝালে কাঁটা-মাথা-লেজের ঝোল-চচ্চড়ি, মুড়িঘণ্ট চিরদিন হাত চেটে খাবে।

(বাইশ)

চাঁপার জ্ঞান ফিরেছিল সঙ্গে সঙ্গেই। ফেদি ওকে এক বাটি দুধ খাওয়াল। চাঁপা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ফেদি অবাক হয়ে গিয়েছিল এদের দেখে। কতদিন দেখেনি ওদের। ফেদির বিয়ে হয়েছে তিন বছর। দু বছর সে বিধবাই হয়েছে। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় যখন এসেছিল ফেদি তখন একদিন দেখতে এসেছিল গিরিবালা। তার তখনও বিয়ে হয়নি। চাঁপা কতটুকুই বা ছিল। এই যে সুধাদা, আজ একেবারে জোয়ানমদ্দ হয়ে উঠেছে, এই সুধাদাকেও এত বড় কখনও মনে হয়নি ফেদির। আজ তো বেশ লজ্জা লজ্জাই লাগছিল।

গ্রামের মধ্যে সুন্দরী বলে খুব নাম ছিল ফেদির। সত্যিই সে খুবই সুন্দরী। অমন গড়ন পেটন, অমন গায়ের রঙ, অমন মুখ চোখ বড় একটা সহজে চোখে পড়ে না। শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের পর যখন গেল ফেদি, যেন মহারাণী এলেন এমন খাতির। কিন্তু বছর না ঘুরতেই কপাল পুড়ল তার, সিঁথের সিঁদুর, শাখা, লোহা, এয়োতির সমস্ত চিহ্ন ঘুচিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এল ফেদি। এক ফুঁয়ে কে যেন ভাগ্যের প্রদীপ নিভিয়ে দিল। জীবনটাও যদি নিভিয়ে দিতে পারা যেত।

ফেদি অবাক হয়ে গিরিবালাকে দেখতে লাগল। কি অদ্ভুত সুন্দরই না দেখতে হয়েছে এখন। অথচ বিয়ের আগে এমন আহামরি কিছু ছিল না। ছোটবেলা থেকে ফেদি ওকে দেখেছে। একসঙ্গে খেলা করেছে পুজো বাড়িতে। খেলেছে সুধাদার সঙ্গেও। তবে সে সব তো আরেক জন্মের কথা। তখন এই বুড়ি, আজ যে নতুন মাতৃত্বে লাবণ্যবতী, তার তখন এমন ঢল-ঢল রূপ ছিল না কি? ছিল তো রোগা, কাঠ কাঠ, সামনের দাঁত কটা একটু উঁচুই ছিল বরং। সেই বুড়ি এখন মা হয়ে যেন জগদ্ধাত্রীর রূপ নিয়ে এসেছে। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। এই রূপেই সার্থক। সে কথা গিরিবালাকে দেখে ফেদির আজ মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবল, তার জীবনে এ সার্থকতা কখনো আসবে না। কখনোই না। ঈর্ষা ফেদির বুকে এক ছোবল বসাল। পরক্ষণেই লজ্জা পেল সে। কী নীচ মন তার! দুঃখ পেল।

তাড়াতাড়ি ফেদি বলে উঠল, যেন কৈফিয়ত দিল, "রোজ ভাবি, তোর খুকিরে দেখতি যাব, তা ভরসা তো পাইনে। এ রাক্ষসীর চোখি বিষ, তাই পড়া মুখ যতটা পারি লুকোয়ে রাখি।"

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল ফেদি। ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। গিরিবালার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী লাগতে লাগল। যেন ফেদি বিধবা হয়েছে, সে অপরাধ তার। ফেদির ছেলেপুলে হয়নি, গিরিবালার হয়েছে, এর জন্যও যেন সে-ই দোষী। গিরিবালার মনটা খচখচ করতে লাগল। গিরিবালা মনে মনে খুব কষ্ট পেল ফেদির কথা স্মরণ করে। বোকার মত বসে থাকল। পরক্ষণেই খোকার কথা মনে পড়তে মন তার চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেক-ক্ষণ দেখেনি তাকে, এতক্ষণ আর কখনো তাকে ছেড়েও থাকেনি। এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেই হয়।

সুধাময় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দিয়ে ভাবছে। ভাবছে গদা পদার কথা। তারই মামাত ভাই। কিন্তু আচার আচরণ দেখতে নরভুক আদিম মানুষ ছাড়া আর কিছু ভবতে ইচ্ছে করে না। কেমন স্বচ্ছন্দে হানাহানি করে চলেছে। যেন এরা সব অরণ্যচর। আদিম প্রস্তর যুগের ভয়াল সব মানুষ। গ্রামে সভ্যতা নেই। এখানে দুম দুম বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে এখনও পশু শিকার চলে। ভাই ভাইয়ের মাথা লক্ষ্য করে খড়্গ তোলে অনায়াসে।

সুধাময়ের হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, সে যেন ষোল-সতের শতকের এক বিদেশী পর্যটক। সভ্যতার বার্তা বয়ে এসে পড়েছে অনাবিষ্কৃত কোন ভূখণ্ডে। না না, এ গ্রামের লোক নয় সে। সে এদেশেরই লোক নয়। তার দেশে সেই দেশ, যেখানকার মাটিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ দেব, বিবেকানন্দের স্পর্শ মিশে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভাস্বর। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিদিনের নিঃশ্বাসে নতুন প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, আধুনিকতায়, অগ্রগতিতে সে দেশ পৃথিবীর যে-কোন আলোকপ্রাপ্ত প্রান্তের সমগোত্রীয়। এখানে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। এ দেশের ভাষা সে জানে না। তার কথা কাউকে সম্ভবত বোঝাতে পারবে না। ওর ভাষা এখানে কেউ বুঝবে না।

সুধাময়ের মনে প্রবল এক অস্থিরতা দেখা দিল। যত শীঘ্র পারে, সুধাময় আপন দেশে ফিরে যাবে। সেখানে এক মুহূর্ত সে আলস্যে কাটাতে পারে না। অজস্র কাজ তার জন্য পড়ে আছে। এতক্ষণ কত কাণ্ড ঘটছে কলকাতায়। শোভাযাত্রা বের হচ্ছে। পার্কে পার্কে সভা-সমিতির আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। মডারেট, স্বরাজ্যদল আর 'নো চেঞ্জারের' মধ্যে পাঞ্জা কষাকষি শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনে কাউন্সিলের ইলেকশন। দেশবন্ধুর তেজোদৃপ্ত আওয়াজ এত দূর থেকেও যেন শুনতে পাচ্ছে সুধাময়, "আমরা কাউন্সিলে ঢুকছি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য নয়, ভিতর থেকে গুঁতো মেরে ওদের শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে দেবার জন্য।"

"চল দাদা, বাড়ি যাই।"

গিরিবালার কথায় চমক ভাঙ্গল সুধাময়ের। চেয়ে দেখল আচার্যি বাড়ির দাওয়ায় বসে বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে জেগে জেগেই কলকাতার স্বপ্ন দেখছে।

গিরিবালার কথা শুনে ফেদিও তাড়া-তাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখলেই মনে হয় এতক্ষণ কাঁদছিল ফেদি। বড় বড় গভীর চোখ দুটো এখনও টলমল করছে।
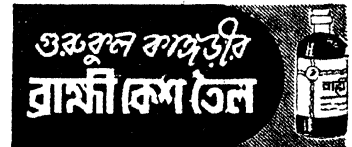
নাকের ডগাটা পাকা করমচার মত রাঙা হয়ে উঠেছে।

ফেদি বলল, "কালই যাব তোর খুকা দেখতি বুঝলি।"

গিরিবালা একটু থতমত খেয়ে বলল "আচ্ছা।"

বাড়ি ফিরেও সুধাময় স্বস্তি পেল না। ঘুরল ফিরল সুধাময়, জোর করে একবার আগের মত মেলামেশা করতে গেল বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। রান্নাঘরে গিয়ে বসল মাছভাজা খেতে, অমনি সেটা ওর নিজের কাছেই কেমন আদুরে-গোপালপনা ঠেকল। খুনসুটি করতে গেল গিরিবালার সঙ্গে, কেমন ন্যাকামি ন্যাকামি লাগল। বাবার কাছে বসতে ইচ্ছে হল না। বাবার কাছে বিশেষ ভিড়তেই চায় না সুধা। পড়া আর পরীক্ষার কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বাবার সঙ্গে বলা যায় না। বাবা সংসারের শোচনীয় দুরবস্থার কথা তুলে স্পষ্টই বলেন, সমস্ত সংসার এখন সুধার মুখ চেয়ে বসে আছে। সুধা যেন পাশটা ভাল-ভাবেই করে। কথাটার মধ্যে মিথ্যে কিছুই নেই। তবু সুধাময়ের যেন ভাল লাগে না। তাই বাবার ঘরের দিকে মাড়াল না সে। না, মা পিসিমার কাছেও নয়। দু একবার গিরিবালার ছেলেটাকে নেড়ে চেড়ে আদর করতে গেল, একটুও ভাল লাগল না। বাড়ির বের হতেও আর ইচ্ছে নেই তার। মামাবাড়ি গিয়েই যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে।

সন্ধ্যে হল, রাত হল। সন্ধ্যে আর রাতে এখানে তফাৎ বিশেষ নেই। মেজকর্তা বাড়ি ফিরতেই সুধা যেন বেঁচে গেল। এই একটা লোক বাড়ির মধ্যে এখনও আছেন, যাকে দেখলে সুধা খুশি হয়। যার সঙ্গে সে কথা বলে সুখ পায়।

কাল মেজকর্তার সঙ্গে বিশেষ কথা-বার্তার সুযোগ হয়নি। আজও সারাদিন বড় ব্যস্ত ছিলেন। এখন সুধাকে পেয়ে যেন বর্তে গেলেন। পরম আগ্রহে মেজ-কর্তা সুধাময়ের মুখে কলকাতার সব খবরাখবর শুনতে লাগলেন। কাউন্সিলের ইলেকশনের কথা, কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ, স্বরাজ্য পার্টির পত্তন, তাদের কর্মসূচী সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। সব কথার ভাল জবাব দিতে পারল না সুধাময়। অত খুঁটিয়ে, অত তলিয়ে সে কোন ব্যাপার দেখতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে সুধাময়ের মনে নানা ধারণা গড়ে ওঠে। সেই সব ধারণার প্রতি-ফলন সুধাময় সেখানে দেখে, যখন দেখে, যে কাজের মধ্যে দেখে, তার মধ্যেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মন প্রাণ ঢেলে দেয় সে, সে কাজের মধ্যে।

আড়াই বছর আগে, দেশে যখন অসহ-যোগ আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল, অফিস, কাছারী, ইস্কুল কলেজ বর্জনের হিড়িক জেগেছিল, সুধাময় তখন সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। সে তখন সরকারী কলেজের ছাত্র। দেশপ্রেম দেখাবার এতবড় সুযোগ সে কিন্তু কাজে লাগাতে পারে নি। বাদ সেধেছিলেন মেজকাকা। এই নেতিবাচক আন্দো-লনের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। সেই সময় সুধাময়কে সামলাতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। মেজকর্তা তখন বলেছিলেন, মূর্খ লোক স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারে না। বলেছিলেন, স্বাধীনতা অন্তরের জিনিস। কোন বাইরের সামগ্রী নয়। হৈ চৈ করে বড়জোর রাষ্ট্রীয় পতাকা বদল করা যায়। ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে তিরঙ্গা ঝাণ্ডা সরকারী দপ্তরের মাথায় উড়ান যায়, কিন্তু লোককে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করা যায় না।

এই সময় মেজকর্তা এক কড়া চিঠি লিখেছিলেন সুধাময়কে। লিখেছিলেন, যে-সব নেতা মনে করেন, গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে ঝাণ্ডা ঘাড়ে করে বন্দে মাতরম্ বলে ঘুরে বেড়ানোতেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা—সে সব নেতার কথায় আমার শ্রদ্ধা নেই। তাঁরা অত্যন্ত অদূরদর্শী, সংকীর্ণমনা। আমি মনে করি একজন ইঞ্জি-নীয়ারের প্রয়োজন এই রকম দশটি নেতার চেয়েও বেশি। তুমি যদি সাময়িক উত্তেজনায় তোমার কর্তব্য পালন করতে অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য পথটি ছেড়ে গড্ডলিকার সহজ স্রোতে গা ভাসাতে চাও তাহলে শেষ পর্যন্ত দেশের ক্ষতি করবেই বেশি। যে ভাবোচ্ছ্বাসকে তুমি প্রবল বলে মনে করছ, তার পিছনে সত্যিকারের কোন শক্তি নেই, তা মহাসাগরের ঢেউ নয়, ফেনা মাত্র। ও একদিন শুকিয়ে যাবে।

সুধাময় এর পর আর কলেজ অবশ্য ছাড়েনি। কিন্তু দুটি বছর চোরের মত অপরাধী হয়ে ছিল। তার সহপাঠী বন্ধুরা একে একে বুক ফুলিয়ে বন্দে মাতরম্ বলে কলেজ ছাড়ত আর তাদের অব্যক্ত ধিক্কারে সুধা যেন মরমে মরে যেত। শুধু যেদিন কলেজের সামনে পিকেটিং হত, সেদিন আর সে ক্লাশে ঢুকতে চেষ্টা করত না। পালিয়ে যেত। রাগ হত তার নিজের উপর। রাগ হত মেজকাকার উপর। যেন মেজ-কাকার এই সব ওজর কোন আদর্শের জন্য নয়, যে টাকা সুধার পিছনে ও'রা ঢালছেন সেটার নিরাপত্তা রক্ষা করাই ও'দের আসল উদ্দেশ্য। মানসিক দ্বন্দ্বে এই দুটো বছর সুধাময় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তার মত যন্ত্রণা তার অন্য কোন সহপাঠী পায়নি।

তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখল সুধাময়। সত্যিই আন্দোলন একদিন মুখ থুবড়ে পড়ল। আর উঠল না। যে সব নেতা হাত ধরে টেনে টেনে তাদের কলেজের ছাত্রদের পথে বের করেছিলেন তাঁরা আবার নিয়মিত জীবনে ফিরে গেলেন। তার সহপাঠীদের অনেকে আবার ফিরে এল কলেজে। দুটো বছর খামাখা নষ্ট হওয়ায় ইনিয়ে বিনিয়ে অনুতাপ করতে লাগল। এমন কি এও বলল, তুই বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিস সুধা।

সুধার কেমন অবাক লেগেছিল। মেজ-কাকার কথা এমন ভাবে ফলে যাবে সে কখনও ভাবে নি। কিন্তু যখন ফলল তখন মেজকাকার বিচার বুদ্ধির উপর গভীর শ্রদ্ধা বাড়ল তার। আবার মনের খুব গোপনে যেন খুব দুঃখও পেল। যেন এমন না হলেই সে খুশী হত। তার কলেজের ছোকরা ইংরেজ প্রোফেসরেরা এই ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত আর সুধাময় জ্বলে পুড়ে মরত। এদের হাত এড়াবার জন্য সে মরীয়া হয়ে উঠল।

হঠাৎ সে একদিন শুনল, দেশবন্ধুর নতুন সংগ্রাম পদ্ধতির কথা। কাউন্সিলের ইলেকশন আর বর্জন নয়, এবারে গ্রহণ। কাউন্সিলে ঢুকে ইংরেজের কেশর ধরেই নাড়া দিতে হবে। ভারত শাসন আইন অকেজো করে দিতে হবে। তবেই ইংরেজ-দের তাড়াতে পারা যাবে।

চট করে সুধাময়ের মনে হল, হ্যাঁ, এত-দিনে একটা পথ পাওয়া গেল। মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন করল দেশবন্ধুকে। এখন দেশবন্ধুই সুধাময়ের দেবতা।

কংগ্রেস দুটো দল হয়ে গেল। একদল নো-চেঞ্জার। তাঁরা অসহযোগের আদর্শ আঁকড়ে থাকলেন। দেশবন্ধু আর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন স্বরাজ্য পার্টি। নো-চেঞ্জাররা ধিক্কার দিতে লাগল দেশ-বন্ধুকে। মডারেট দল আগেই কাউন্সিলে ঢুকেছিল। মিনিস্টারী নিয়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে হাত পাকাচ্ছিল। এবার মডারেটরা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। কিন্তু হাসুক মডারেটরা, রটাক কুৎসা নো-চেঞ্জাররা, দেশবন্ধুকে ওরা এঁটে উঠতে পারবেন না। জয় তাঁর হবেই।

কিন্তু তোমার দেশবন্ধুই বা কি করবেন?

মেজকর্তার আচমকা এই প্রশ্নে সুধাময় থতমত খেয়ে গেল। মেজকর্তার প্রশ্নটা যে তির্যক, তা সে বুঝতে পারল। অথচ
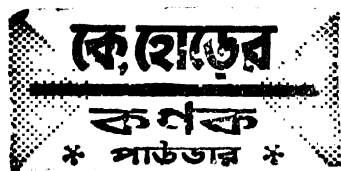
সুধাময়ের ধারণা ছিল মেজকাকা এ খবরে উল্লসিতই হবেন। কই, তাঁর মুখে চোখে বিন্দুমাত্র উৎসাহের আভাসও ত ফুটে উঠতে দেখছে না সুধা।

মেজকাকা বললেন, কি এমন মন্ত্র জানা আছে তোমার দেশবন্ধুর যাতে তিনি উন্নতির চরম স্তরে পৌঁছে দেবেন দেশের দরিদ্রতম লোকগুলোকে। এই যে সব মূক মূঢ়ের দল জগদ্দল পাথরের মত অনড় হয়ে রয়েছে, যাদের নিয়েই দেশ, কোন সঞ্জীবনী বলে তিনি এদের প্রাণ সঞ্চার করবেন। বলতে পার?

সুধাময় যথেষ্ট গরম হয়ে বলল, স্বাধীনতাই সেই সঞ্জীবনী। পরাধীনতার শৃংখল মোচন করতে পারলেই আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দেশের প্রাণ আপনি জাগ্রত হবে।

পাগল! মেজকর্তা হাসলেন। এরা সব একই কথা কপচায়। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে তফাৎ বিশেষ নেই। দেশের পায়ে শিকল, দেশের প্রাণ, দেশের দুঃখ। কে যে এই সব কথাগুলো আবিষ্কার করেছিল। যে জিনিসের কোনও অস্তিত্ব নেই, সেই ফাঁকা আওয়াজগুলোই আজ মুখে মুখে ফিরছে। তাই নিয়েই যত মাতামাতি চলেছে। এদের কি একবারও এ কথা ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে না, যে-কথা অনর্গল উচ্চারণ করে চলেছি তার মানে কি?

মেজকর্তার মনে পড়ল, তাঁদের কলেজী জীবনে দেশমাতৃকার এক ছবি ছাপা হয়েছিল। এক রূপসী রমণী তার হাতে পায়ে শিকল। কে একজন তার সামনে ফাঁসিতে লটকে আছে। বোধ হয় ক্ষুদিরাম। একটা লোক সেই ছবিটা বাঁধিয়ে সঙ্গে হাতে শীতলা ঠাকরুণের সিংহ মাড়ুর মত করে পয়সা নিয়ে বেড়াত। অশিক্ষিত সেই লোকটিকে মেজকর্তা বুজরুক বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেদের ধারণাই বা কি এমন পরিণত? এ সব বঙ্কিমবাবুর সেই বন্দে মাতরম্-এর এফেক্ট। দেশ এখন পুরোপুরি একটা পৌত্তলিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। সকলে গালভরা শোনায়, তাই আমরা সকল ভরে বলি। যদি আসলে ব্যাপারটা এত সহজ সরল নয়, অনেক জটিল, দেশোদ্ধার করা কখনোই যায় না, দেশের মানুষের উদ্ধারই করা যায় তাহলে হয়ত বা কেউ কেউ ভাবতেন, তবে বুঝি স্রেফ দুড়ি মেরেই এ সব কাজ করা যায় না। এর পিছনে যা আছে তার খোঁজ আনাই দরকার সমস্যা। দেশ-শব্দটা যত অসার, দেশবাসী শব্দটা কিন্তু ততখানিই সারবান। দেশের মধ্যে আছে পাহাড় পর্বত, নদী, মাঠ, বন। আছে পশু পক্ষী মানুষ। দেশবাসীর মধ্যে শুধু মানুষই আছে, বিচিত্র সব মানুষ। কৃষক আছে, জমিদার আছে, শ্রমিক আছে, চাকুরে আছে আবার কলকারখানার মালিক আছে। শোষিত আছে শোষক আছে। শত রকমের অত্যাচার অবিচার আছে। আছে লোভ, হিংসা বিদ্বেষ, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। এ সমস্যা জড় মৃত্তিকার নয়, সজীব মানুষের। সমস্যা আছে হাজার রকম, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, দার্শনিক। বড় জটিল ব্যাপার। সম্ভবত এত জটিলতায় দিশেহারা হয়ে যাবার ভয় আমাদের থাকে, এই সব সমস্যার চিন্তা মাথায় ঢুকলে বাক্যস্ফূর্তি না ঘটার আশঙ্কাই থাকে, তাই এই সব জটিলতার মুক্ত অতি বাস্তব এই দেশবাসী শব্দটাকে উহ্য রেখে স্বং হি সুগীর কাল্পনিক ধ্যানে নিমগ্ন থাকা পছন্দ করি।

এতে আর যাই হোক, মেজকর্তার বিশ্বাস, লোকে স্বাধীনতা কাকে বলে তার মর্ম কোনদিনই বুঝবে না। যেমন এর আগেও কখনও বোঝে নি। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে। শক হূণ গ্রীক এসেছে, পাঠান মোগল রাজত্ব করেছে। তারপর তাদের পরমায়ু ফুরলে ইংরাজ ফরাসী পর্তুগীজ ওলন্দাজ এসেছে। ইংরেজের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কি এসে যায় তাতে এদেশবাসীর? কোনদিন তারা মানুষের মূল্য পায়নি। মানুষের অধিকারে বরাবর তারা বঞ্চিত থেকেছে। স্বাধীনতার আস্বাদ পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে কখনও তারা গ্রহণ করতে পারে নি। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মাথা ব্যথাও তাদের নেই।

ইতিহাস আমাদের কিছুমাত্র যদি শিক্ষা দিয়ে থাকে তবে তা এই। কি করবেন গান্ধী, কি করবেন দেশবন্ধু? বড় জোর ইংরাজ তাড়াবেন। তারপর? আবার কোন গান্ধীরাজ বা দাশশাহীর প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু তাতেই কি স্বাধীনতার ফল ভারতের চব্বিশ কোটি মনুষ্য বৃক্ষে ফলে যাবে। মুক্তি যেখানে শূন্য সেখানে চব্বিশ কোটি শূন্য যোগ হবে মাত্র আর যোগফলও সেই শূন্যই দাঁড়াবে। অন্ততঃ মেজকর্তার ত তাই দৃঢ় বিশ্বাস।

সুধাময়ের মাথা ঝিম ঝিম করছিল। কতক কথা সে বুঝল, কতক বোঝেনি। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল, সেই সব কথা কানেও ঢোকেনি। তবে মেজকাকা যে নিজেও নেতিবাদীই, সেটা যেন আবিষ্কার করল।

তেইশ

এত রোদ্দুরে এতখানি পথ ফেদি বেশ জোরে জোরেই হেঁটে এসেছে। বিশেষ করে গোয়ালা বুড়ির বাড়ির কাছ থেকে। বুনোরা আজ এদিককার জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলছে। দুম দুম ট্যাম ট্যাম এই একঘেয়ে বাজনাটা আম কাঁঠাল বাঁশ বেত আর নানারকম আগাছা জংগলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে কেমন এক রহস্যময়, কেমন এক হিংস্র আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। মৃত্যুর পরোয়ানাই যেন দিকে দিকে ছুটে চলেছে। যেন রটনা করছে, আজ আর নিস্তার নেই। মাঝে মাঝে বনের এদিক ওদিক থেকে হৈ হৈ চিৎকার ভেসে উঠছে। কখনো কখনো বুনো আশশ্যাওড়া গাছ আর মানুষ সমান উঁচু নরম আগাছার বুকে প্রবল বিক্ষোভ জাগিয়ে কারা যেন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। ওদের দেখা যায় না। জানোয়ারও হতে পারে আবার মানুষও হতে পারে।

ফেদির ভয় ভয় করছিল। গা ছমছম করছিল। যদিও সে এতটা পথ একা আসতে সাহস করেনি, এক সেথো সঙ্গে এনেছিল। কিন্তু সে ছোকরা দুর্গাবাড়ির কাছ থেকেই ভেগে পড়েছে। হাটের মাঠে ফুটবল ম্যাচ হবে, তার আকর্ষণেই সে ফেদির হাতছাড়া হয়েছে।

গিরিবালাদের উঠনে এসে দাঁড়াতেই ভয়ডর এক নিমেষে ফেদির শরীর থেকে শুকনো মাটির মত ঝরে পড়ল। এখানে মানুষের উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া গেল। উঠনে বাঁশে বাঁশে তারে তারে মেলে দেওয়া কাপড় হাওয়ায় দুলছে। একটা বড় কড়াই উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একখানা কোদাল, একটা কুড়ুল, খান কতক চালা কাঠ। ব্যস্, এই গুলো চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফেদির ভয় ভাঙল।

পরিশ্রমে সে এখন শুধু হাঁফাচ্ছে। তার ফর্সা সুন্দর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। শাড়ির ভিতর থেকে তার বুক ঘন ঘন দুলে উঠছে। তার চিকন নাক ফুলে ফুলে উঠছে। এলোমেলো চুল মুখে কপালে উড়ে পড়ছে।

বেলা গড়িয়ে এলেও রোদের ঝাঁঝ বেশ আছে। বাড়িটা নিস্তব্ধ। প্রাণ আছে দেখা যায়, সাড়া পাওয়া যায় না। হাতের কাঁধখানা মুঠো করে ধরে ফেদি গুদোম ঘরের হাঁটু-কাড় সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল। বড় বউয়ের ঘরে উঁকি মারল। বাবা, কেমন ঘুম এদের দেখ। চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেলেও বোধ হয় ঘুম ভাঙবে না।

ফেদি গলা বাড়িয়ে সন্তর্পণে ডাকল, "ও খুড়ি!"

গলা শুকিয়ে যাওয়ায় আওয়াজটা ঠিক মত বের হল না।

আবার ডাকল, "ও খুড়ি!"

বড়বউ চোখ মেলেই দেখল ফেদি। ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। দুহাতে চুলে গিঁঠ দিতে দিতে গলা ভর্তি হাপ নিয়ে

উ: আঁ করে তাকে বসতে বললেন। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে থুথু ফেলে এলেন।

বললেন, "আসো মা, আসো। কতদিন তুমারে দেখিনি। কাল যখন বুড়িরা আসে কল্ল তুমার বাড়ি উরা গিছিল, আমি আরউ কলাম, আহা ওরে আসতি কলিনে ক্যান। সুনার মুখখানা একবার দ্যাখতাম।"

ফেদি ম্লান হেসে বলল, "সুনার মুখ আর সুনার নেই খুড়ি, একেবারে পিতলের হয়ে গেছে। এ মুখ আর দেখাতি ইচ্ছে করে না।"

ফেদির চোখ টলটল করে উঠল। বড়-বউয়ের চোখেও জল এসে গেল।

বললেন, "বালাই ষাট। বিধেতার যে দিশ্টি নেই মা, নাহলি এমন কপালেউ কি আগুন জ্বালে?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেদি বলল, "সবই আমার অদিশ্ট। কারে দুষি করব, বল?"

বড়বউ কোন কথা না বলে আঁচল দিয়ে ফেদির মুখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর এক-খানা হাতপাখা টেনে ওকে হাওয়া করতে লাগলেন।

ঘর সংসারের কথা উঠল। ফেদির বাবা মা তীর্থে বেরিয়েছেন। গয়া কাশী বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন সব। আসবার সময় প্রায় হয়ে এল ওদের। বাড়িতে আছে ফেদি আর তার বাউণ্ডুলে দাদা সন্তোষ। কাজ-কর্মে মন নেই এখন বিয়ে করার শখ চেপেছে। এই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি চলছে। শ্বশুরবাড়ি থেকেও কেউ খোঁজ নেয় না ফেদির। অপয়া অলক্ষুণে বউ, কে তার বার্তা নেবে? কোলে একটা গুঁড়ো-গাড়া থাকলেও না হয় কথা ছিল।

"মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় খুড়ি আগুনি ঝাপ দিই, না হয় জলেই ডুবি আর নয়তো একদলা বিষ খাই।"

ফেদি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। এই তো মাত্র আঠার উনিশ বছর বয়েস। কড়ে রাঁড়ির পেরমায়ুও নাকি অখণ্ড হয়। সামনের দিকে চাইতে তার ভয় হয়। ভবিষ্যৎ এক রুক্ষ, ধু-ধু মরুভূমি।

"তবে আমার কপাল তো, আগুনিউ ছোঁবে না, জলই হয়ত শুকোয়ে যাবে, বিষ হার মানবে।"

বড় বউ শিউরে উঠে ফেদির মুখে হাত চাপা দেন।

"বলাতি নেই মা, ওকথা বলাত নেই।"

বড়বউ নিজের বুকের কাছে টেনে আনেন ফেদিকে। দুটো বুকের ব্যথা কাছা-কাছি এগিয়ে আসে। সমবেদনার অদৃশ্য প্রবাহ এক গভীর ক্ষতে প্রলেপ দিতে এগিয়ে যায়। বড়বউয়ের চোখের জল ফেদির মাথায় টপটপ করে ঝরে পড়ে। ফেদির চোখের জলে বড়বউয়ের কোল ভিজে সপসপে হয়ে ওঠে।

ফেদি চোখ মুছে সামলে বসে। তার মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফুটে ওঠে। দুখানা মেঘ চিরে শরতের জ্যোৎস্না যে হাসি ফোটায়, সেই হাসি।

বলে, "দ্যাখ দিনি, কি কাজে আলাম আর কি করতি বসিছি। ও খুড়ি, বুড়িরি একবার ডাকো তো। ওর ছেলের জন্যে এই দ্যাখ একখান কাঁথা সিলোইছি। কল্কা নকশাড়া কেমন উঠিছে?"

কাঁথাখানা মেলে ধরল ফেদি। সরু ফোড়ের সুন্দর কাঁথা। বড়বউ খুব তারিফ করলেন।

"আহা হা, এ যে গায় দেবার দোলাই। অতি চমৎকার। যেমন পাড়ের কল্কা তেমন সুন্দর ভিতরের নকশা। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। ও বুড়ি, মনিরে, আয় এখেনে। ফেদি আয়েছে। দ্যাখ, কি আনেছে।"

গিরিবালা আরেকটা ঘরে শুয়ে শুয়ে ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছিল। ফেদি এসেছে সে জানে। তার মনের অপরাধ বোধটা সে নামাতে পারছিল না, তাই ও ঘরে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। ফেদি যে দৃষ্টি দিয়ে কাল দেখছিল গিরিবালাকে তাতে প্রশংসা ছিল, ঈর্ষাও ছিল। সে ভাষা কিছু কিছু পড়তে পেরেছিল গিরিবালা, কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করতে পেরেছিল। বড়মার সঙ্গে ফেদি এতক্ষণ ধরে যা বলাবলি করছিল, তাও শুনেছে গিরিবালা। ফেদির জন্য সত্যিই সে দুঃখ পেয়েছে মনে। কিন্তু গিরিবালার কি দোষ? তার স্বামী বেঁচে আছে, ফেদির নেই। তার কোলে ভগবান ছেলে দিয়েছেন, সোনারচাঁদ ছেলে (গিরি-বালা চুক চুক করে চুমু খেল, ছেলের গায়ের গন্ধটা একটু শুঁকল) দিয়েছেন ভগবান, ফেদির কোল খালি রেখেছেন, তা সে কি করবে? তার কী দোষ? গিরিবালার খুব অস্বস্তি লাগছিল।

গিরিবালা জানে, বুঝতে পেরেছে ফেদির মনে কী তীব্র পিপাসা জেগে উঠেছে। এখন খোকাকে ওর সামনে নিয়ে গেলে কিছু হবে না তো, নজর লাগবে না তো? খোকাকে বুকে চেপে ধরল গিরিবালা। পরক্ষণেই তার চোখে এক বঞ্চিতা মাতৃত্বের করুণ দুটি চোখ ভেসে উঠল। গিরিবালা ভাবল, সত্যি ফেদিদির চোখ দুটো কত সুন্দর। গিরিবালা নিজেকেই চাবুক মারল যেন। ছিঃ, সে তো বড় স্বার্থপর! ধড়মড় করে উঠে পড়ল। উলঙ্গ শিশুটিকে বুকে নিয়ে সে বড়মার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢোকার আগে সে অবশ্য খোকার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে আলতো করে একটা কামড় দিয়ে নিল। সাবধানের বিনাশ নেই।

ফেদির কোলে গেল না খোকা। কিছুতেই না। বড্ড চেনা অচেনা হয়েছে। একবার জোর করে কোলে নিল যেমন, কঠিন আয়াসে বুকে চেপে ধরল। কঠিন স্তনে মাতৃত্ব ফলেনি তার। সুধার ভাণ্ড পূর্ণ হয়নি। তাই তার বুক জুড়াল না। কেঁদে কাঁকিয়ে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে গিরিবালার ছেলে। অপ্রস্তুত ফেদি হার মেনে ক্ষুণ্ণ মনে আবার তাকে গিরিবালার কোলে ফিরিয়ে দিল। ওর কচি মুখে চুমু খাবার একটা বাসনা ফেদির হয়েছিল। কিন্তু ডাকাত ছেলেকে আর ঘাটাতে ইচ্ছে করল না। কেমন এক অবসাদ এসে গেছে তার। কিসের জন্য এতটা পথ এসেছিল, এখন আর তা বুঝতে পারছে না এবার বাড়ি ফিরতে মন চাইছে। কিন্তু এতটা পথ একা ফিরবে কি করে? বেলাও পড়ে আসছে।

ফেদি বলল, "খুড়িমা, ইদার বাড়ি যাই' একটা লোক দিতি পার একটু আগোয়ে দেবে আমারে?"

বড়বউ বললেন, "সে কি মা, এখনই যাবি?"

"হ্যাঁ খুড়ি, বাইরি বেরয়ে দ্যাখ, বেলা আর নেই।"

"ওমা তাই তো, ও ফুলির মা, পানের বাটাটা আনো দিনি, ফেদিরি একটা পান খাওয়ায়ে দিই। একটুখানি বস্ মা, একটা পান মুখি দে।"

ফেদি বলল, "বিধবার ঠোঁট কি রাঙ্গা করতি আছে? আচ্ছা, দ্যাও একটা। কিন্তু যাব কার সঙ্গে?"

বড়বউ বললেন, "দাঁড়া দেখি, ওরে ও নরা।"

কেউ সাড়া দিল না। নরা নেই। রাম-কিষ্টো নেই। ফেদির মুখ শুকিয়ে গেল। তাহলে?

বড়বউ বললেন, "ভাবিস ক্যান, ব্যবস্থা একটা করছি। ও সুধা, সুধা, বাবা একটু শোন।"

সুধা বই পড়ছিল তার ঘরে। মার ডাকে এ ঘরে এল।

বড়বউ অনুনয় করে বললেন, "মনিরে, ফেদিরি একটু আগোয়ে দিবি?"

সুধা ভণিতা না করেই বলল, "দেব। জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।"

গাছের মগডালে তখনও আলো। তলায় তলায় সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। দুর্গা-বাড়ি ছাড়াতেই সেই দুম দুম দুম ট্যাম ট্যাম ট্যাম বাজনা সজীব হয়ে উঠল। নিমেষের মধ্যে সেই ভয়টা লাফিয়ে পড়ল ফেদির ঘাড়ে। তার বুক-ধুকধুক বেড়ে গেল। সুধাময় মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এই কার্তিকের বর্বর অনুষ্ঠান কেন শেষ হবে না কোনদিন। এরা সব সেকেলেকালের দেশবাসী! হাসি পেল সুধাময়ের। এদের কথা স্মরণ রেখে যদি কাজ করতে হয়, তাহলে তাদের জীবনে কোন কাজেই আর নামা যাবে না।

"সুধাদা শুয়োর!"

ফেদি এক চিৎকার দিয়ে সুধাময়কে জড়িয়ে ধরল। চমকে উঠে সুধাময় চেয়ে দেখল একটু দূরে একটা দাঁতাল শুয়োর সর্বাঙ্গে কাদা নিয়ে অন্ধকার গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। ফেদির চিৎকার শুনে শুয়োরটাও চমকে ফিরে দাঁড়াল। সুধাময় দেখল দুচোখে আগুন জেলে শুয়োর নয়, ভয়ংকর এক মৃত্যু ছুটে আসছে।

সুধাময়ের সমস্ত স্নায়ু এই প্রচণ্ড আকস্মিকতায় শিথিল হয়ে গেল।

"সুধাদা পালাও পালাও!"

ফেদির এই আর্ত চিৎকার তার কানে ঢুকল না। ঢুকলেও ফল হত না। এক চুলও নড়তে পারত না। তার দেহ পাথর হয়ে গেছে।

ফেদি রাস্তার ধারে সরে গিয়ে প্রাণপণে সুধাময়ের একখানা হাত ধরে মারল টান। কেউই টাল সামলাতে পারল না। ঢেঁকির শাকের পাতা দিয়ে মুখ ঢাকা চোরা নয়ানজুলির মধ্যে হুড়মুড় করে দুজনেই গড়িয়ে পড়ল।

ধাতস্থ হতে বেশিক্ষণ লাগল না সুধাময়ের। দেখল মরেনি সে। শুয়োরের ধারাল দাঁতে তার দেহটা ফালাফালা হয়ে চিরে যায়নি। শুধু অন্ধকার নালায় পড়ে গেছে। তার উপরে পড়েছে ফেদি। ফেদির দেহটা বেশ ভারি লাগছে। সুধাময়ের পেট আর হাঁটুতে ব্যথা করছে। ফেদি একদম নড়ছে না। সে-ও তখন নড়তে চড়তে ভরসা পেল না। কি জানি, শুয়োরটা যদি এখনও দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। ভয়ে আবার প্রাণ উড়ে গেল সুধাময়ের। খিঁচুনি শুরু হল তার মেরুদণ্ডে। উঃ খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে আজ। ফেদি না থাকলে প্রাণই যেত। খুব সন্তর্পণে একটু নড়তেই ফেদির যৌবনোদ্দীপ্ত দেহের ছোঁয়া সুধাময় অনুভব করল। আর সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের দেহে প্রচণ্ড বেগে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। ভীম এক বিস্ফোরণের ঝাঁকুনি সে অনুভব করল। তার দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার মনে অজানা এক আক্ষেপ দেখা দিল। সুধাময়ের যৌবন এই প্রথম এক নারী-দেহের আস্বাদ পেল। তার সর্বঅঙ্গ আরো কিছু পাবার আশায় প্রস্তুত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার অঙ্গে অঙ্গে তীব্রস্বরে বেজে উঠল বাসনার মুক্ত বাঁশরী। মুহূর্তে মুহূর্তে সুধাময়কে এক মধুর মৃত্যু যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল।

ফেদি এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়েছিল সুধাময়ের শক্ত দেহের উপর। সে দেহে চাঞ্চল্য জাগবার সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ধড়মড় করে উঠে সুধাময়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বসল যে, সুধাময় ভাবড়াচ্যাকা খেয়ে গেল। ফেদি তার দিকে একবার তাকাল। সুধাময়ের মনে হল, সে যেন নীরবে তাকে তিরস্কার করলঃ ছিঃ সুধাদা তোমার এমন ব্যবহার। সুধাময়ের দেহের কাঁপুনি তখনও থামেনি। তার যেন জ্বর এসেছে উত্তেজনায়।

ফেদি খুব শীতল কণ্ঠে বলল, "ওঠ সুধাদা, লাগেনি তো?"

সুধার আর কথা বলার অবস্থা নেই। খুব ইতর ভাবছে তাকে ফেদি। খুব খারাপ ভাবছে তাকে। ইচ্ছে হল ফেদিকে এখানে ফেলে রেখেই সে পিঠটান দেয়। এ মুখ আর দেখাতে চায় না।

যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে সুধাময় জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে একা বাড়ি যেতে পারবে?"

ফেদি একবার চোখ তুলে চাইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, "না। চল একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছিয়ে দ্যাও।"

ফেদিদের বাড়ি পর্যন্ত পথটুকু নীরবে পার হয়ে গেল দুজন। বাড়ির বাইরে থেকেই ফিরে আসছিল সুধাময়, ফেদির কথায় থমকে দাঁড়াল।

ফেদি তেমনি শান্তস্বরে বলল, "সুধাদা যায়ো না, ভিতরে আসো, কথা আছে।"

এইবার সুধাময়ের মন রুখে দাঁড়াল। কি তাকে ভেবেছে ফেদি। লম্পট? বদমায়েস? কি করেছে সে? নয়ানজুলিতে তার যে চিত্তবিভ্রম জেগেছিল তার জন্য সুধাময় একটুও দায়ী নয়। বেশ, ফেদিকে খোলাখুলিই জানিয়ে দেবে সুধাময়। ফেদির দেহের সান্নিধ্যে সুধাময় ওভাবে এসে পড়েছিল বলেই তার দেহে অমন চঞ্চলতা জেগেছিল। স্বীকার করছি ব্যাপারটা শোভন হয়নি। কিন্তু ফেদি বিশ্বাস করুক ও ঘটনার উপর সুধাময়ের কোন হাত ছিল না। সে এতখানি বয়স পর্যন্ত কোন মেয়েকেই পাপচক্ষে দেখেনি।

সুধাময় ভিতরে ঢুকতেই ফেদি এসে তার হাত ধরল। একী, ফেদিও যে অমনি থরথর করে কাঁপছে। ফেদির গায়ে গা ঠেকামাত্র সুধাময় আবার সেই প্রবল জ্বরের আক্রমণে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। এবার সে একা নয়। দুজনেই একই তাপে তাপিত হচ্ছে।

ফেদি কোন কথা না বলে থরথর কম্পিত হাতে সুধাময়ের হাত ধরে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঝনাৎ করে বাইরের শিকলটা শব্দ করে উঠল। তারপর বন্ধ কপাটের গায়ে মৃদু মৃদু দুলতে লাগল শিকলটা। *

(ক্রমশ)

আশ্চর্য হবো না আর

জিয়া হায়দার

আশ্চর্য হবো না আর—সামান্য ইংগিতে, ইশারায়
যদি সে আদিম পাত্র নির্বিকারে তুলে নিতে বলে—
যেহেতু জন্মের ভিতে, রক্তে সুতীব্র অতৃপ্তি জ্বলে
অবিরাম।

নিষ্প্রাণ ঘুঁটির মতো দাবার খেলায়
সেবার কৃত্রিম রাজ্যে বর্ণহীন নিষ্কম্প শিখায়
গর্বিত ছিলাম শুধু; (সুগোপন মিথ্যার অনলে
ধূপের গন্ধের মতো অজ্ঞাত দাহনে পলে পলে
হয়েছি নিষ্পাপ খাঁটি।) প্রার্থনায় সংগীত সভায়
দুর্জ্ঞেয় নামের গান।

কোনো নারী (আশ্বিনের নদী)
নিস্তৃতির মন্ত্রে আর প্রেমে দেহের গভীরে ডাকে
সহাস্যে; (বিস্মিত চাঁদ : সেদিনের নিষিদ্ধ ফলেরা
কী বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী!) রাত্রির ত্রিপদী
(আমি তার ক্রীতদাস) অকারণে বিহ্বলতা রাখে
যদি, আশ্চর্য হবো না;—সে আমার উৎসর্গের ডেরা॥

খণ্ড সত্য

শংকর চট্টোপাধ্যায়

শিল্পীর ঈপ্সিত বাঞ্ছা কে এমন নৈবেদ্যে [illegible]াল?

যবনিকা কম্পমান, আলো পড়বে নর্তকীর মুখে
বসে থাকবে শান্ত একা, দর্পণের ধাতব মূর্ছাতে
ধরা পড়বে মিথ্যাচার, ব্যাধিগ্রস্ত ক্লান্ত বিবর্ণ।

যেহেতু বস্তুর উর্ধ্বে অতিক্রান্তির রসলোক
অতএব স্তব্ধ থাকবে তুলিটা আঙুলে, চোখ দেখবে
সাজসজ্জা, অস্থি মাংস মেদ আর বস্তুর কংকাল
অবশেষে ঘরে ফিরবে উষালগ্নে ভ্রষ্ট পায়ে পায়ে।

যকৃতে যন্ত্রণা নিয়ে নর্তকীও বিবস্ত্র ঘুমোবে
রক্তে মাংসে একাকার, লোভলাস্য, জন্ম-পরিবেশ।

চেয়েছি একটি শিশু

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

একটি শিশু! দুজনের মিলনের একটি স্মারক
চেয়েছি তোমার কাছে, অসহ্য সুখের দিন-যামে
তোমার অস্ফুটতম গুঞ্জনে কাঁপাত যবে হাড়
জ্বলজ্বলে কপালে জাগত অনুরাগ বিন্দু বিন্দু ঘামে।

চেয়েছি একটি ছেলে। বসন্তের তরুণ তমাল
বাড়ায় ব্যাকুল বাহু নীলাকাশে, তেমনি সে হক;
অপাপবিদ্ধ প্রাণ, দুটি ঠোঁটে অধীর আগ্রহ
আশ্চর্য, আয়ত নম্র যেসাসের মত যার চোখ।

বাহু তার মালা হয়ে জড়াক না গলায় আমার
আমার জীবন-স্রোত তার মাঝে লুপ্ত হয়ে যায়;
সত্তার গভীর থেকে পাহাড়ের শিখরে শিখরে
একটি কোমল গন্ধ সবখানে নিশ্বাস ছড়ায়।

যেতে যেতে আমরা তাকে চেয়ে দেখি—যে মেয়ে মা হবে,
ঠোঁট যার কাঁপা কাঁপা, দৃষ্টি যার প্রার্থনার মত।
প্রেমিক-যুগল হাঁটি, ভিড় ঠেলে অকস্মাৎ পথে,
শিশুর আশ্চর্য চোখে চেয়ে হই বিস্ময়-আহত।

তন্দ্রাহীন রাত গেছে সুখের, স্বপ্নের জাল বুনে;
বিধ্বস্ত হয়নি শয্যা বাসনার উদগ্র বাসনে।
ঘুম-পাড়ানিয়া গানে গা-জুড়ে যে জন্ম নেবে কাল
তারি উপাধান রচি আমার বক্ষের দুটি স্তনে।

সূর্য তত উষ্ণ নয় যার নীচে সে পোহাবে রোদ,
আমার কর্কশ কোলে, তাকে আমি শোয়াবো কী করে!
হৃৎপিণ্ড উত্তাল হয়, আশ্চর্য এ দেবতার দান
যত দেখি, দীন দুটি চোখে তত অশ্রু পড়ে ঝরে।

মৃত্যুকে নেই-ক ভয়; তার দুটি চোখে চোখ রেখে
ক্ষতি-বিনাষ্টির সব শঙ্কা, সব চিন্তা মুছে যায়;
মৃত্যুর পাতাল-সিঁড়ি ভাঙতে আর ভয় নেই, কোনো
উজ্জ্বল সকালে কিংবা ছায়াম্লান বিষণ্ণ সন্ধ্যায়।

অনুবাদ : প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সত্যি ঘোড়ার ডিম

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এই দুনিয়ার যতকিছু আজগুবি আর বুজরুগিকে বুঝতে হলে বলতে হয় ঘোড়ার ডিম, আর নয়তো কি! অর্থাৎ ঘোড়ার ডিম মানে অশ্বডিম্ব আর অশ্বডিম্ব মানে পয়লা নম্বর মিথ্যা। তাই ঘোড়ার ডিমের আর এক অর্থ লবডঙ্কা। কিন্তু ভ্রূণতত্ত্বের সঙ্গে যাঁদের যৎসামান্য আতাত আছে—তাঁদের কিন্তু ঘোড়ার ডিমের এমন কদর্থকে চট করে বেমালুম হজম করে ওঠা সহজ নয়। আটপৌরে মানেতে যাই বোঝাক না কেন, ঘোড়ার ডিমের একটা পোশাকি মানেও হয় এবং সেটা অলীক স্বপ্ন-কল্পনা ছড়ান মত কিছু নয়। এ অর্থে ঘোড়ার ডিম সোনার পাথরবাটির মত কোন সমস্যাই সৃষ্টি করে না। কারণ ঘোড়া যেমন সাচ্চা ঘোড়ার ডিমও তেমন সাচ্চা। অতএব ভ্রূণ-তত্ত্বের দরবারে যেমন হাঁসের ডিম সত্যি, মুরগীর ডিম সত্যি, তেমনি ঘোড়ার ডিমও সত্যি। Ex ovo omnia. শুধু কি ঘোড়ার ডিম, টিকটিকির, গিরগিটির, ভাল্লুকের ডিম হয়, হাতীর ডিম হয়, তিমির ডিম হয়, মায় মানুষেরও! তখন আর ঘোড়ার ডিম হতে দোষ কি? আর শুধু কি প্রাণী জগতে? কোন বোটানিস্টকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি তাঁর স্বধর্ম বজায় রাখতে স্বীকার করবেন যে, কোন কোন গাছেও ডিমের অনুরূপ জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

ঘোড়ার ডিম যে তাহলে সত্যি করে মিথ্যে নয়, সেই ব্যাপারটা আরও সাফ করে বলা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে প্রাণিজগতে যেখানে উভয় লিঙ্গ আছে সেখানে সন্তান জন্ম দুরকমে ঘটে। এক হলো যারা ডিম্বজ (oriparous), অর্থাৎ যারা আগে ডিম হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এবং এই ডিমের মধ্যে মাতৃ জঠরের বাইরে বসে নিজের নিজের অবয়ব গড়ে তোলে। এই পর্যায়ে পড়ে মাছ, ব্যাং, হাঁস-মুরগী, সাপ ইত্যাদিরা। এদের আগে ডিম হয় পরে বাচ্চা। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো যারা জরায়ুজ (viri-parous); অর্থাৎ যারা মাতৃ জঠর থেকে সরাসরিভাবে সন্তানের অবয়ব নিয়েই ভূমিষ্ট হয়। এদের অবয়ব প্রাপ্তির ব্যাপারটা মায়ের দেহের মধ্যেই ঘটে।

এই পর্যায়ে উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীর অনেকে পড়ে। যেমন গরু, ঘোড়া, বানর এবং মানুষ। যারা জরায়ুজ, তাদের তা বলে ডিমের অবস্থা যে একেবারে পার হতে হয় না, এমন মোটেই নয়। ডিম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে গঠনের সমস্ত ধাপগুলি জননীর তত্ত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। এরা ডিমের অবস্থা পেরিয়ে বাচ্চা হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। গঠনের সমস্ত ধাপগুলো সমাপ্ত করতে হাতীর বাচ্চাকে ৬৪১ দিন, ঘোড়াকে ৩৩০ থেকে ৩৮০ দিন ও মানুষকে ২৭০ থেকে ২৯৫ দিন মাতৃজঠরে থাকতে হয়।

আর পাঁচটা জীবের মত তাহলে ঘোটকীর দেহের ভিতরে ডিম্বাশয় থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি? ডিম্বাশয় মানে ডিম তৈরী করবার কারখানা। অনেক প্রাণীর ডিম খালি চোখে দেখা যায় না। যদিও ডিম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেহের মধ্যকার সবচেয়ে বড় কোষ। কিন্তু আবার এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের ডিমের আকার দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই যেমন উট পাখির ডিম। এক একটি উটপাখির ডিম প্রায় বারটি মুরগীর ডিমের সমান। [illegible] নামক একপ্রকার প্রস্তরীভূত পাখির ডিমের সাইজ আবার একবার উটপাখির এক ডজন ডিমের মত বড় ছিল। স্তন্যপায়ীদেরই ডিমের সাইজ খুব ছোট হয়। ঘোড়ার ডিমও সাইজে খুব

ছোট হয়—কিন্তু একেবারে হয় না বললে মারাত্মক ভুল হবে। খালি চোখে দেখা না গেলেও অণুবীক্ষণে তা ধরা পড়ে।

একজন বৈজ্ঞানিক দেখিয়েছেন ২২ বছরের কোন এক যুবতীর ডিম্বাশয়ে ২০০,০০০ ডিম্বাণু থাকতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটি মানবজীবনে চারশো ডিম, প্রতিমাসে একের পর এক করে বার হয়। শুধু ডিম্বাণু দিয়ে মানুষ গড়া সম্ভব নয়। ডিম্বাণুকে মানুষের পূর্ণ অবয়ব পেতে হলে চাই শুক্রাণুর সহযোগিতা। সুস্থ সবল মানুষের দেহে প্রতিদিন কয়েক কোটি
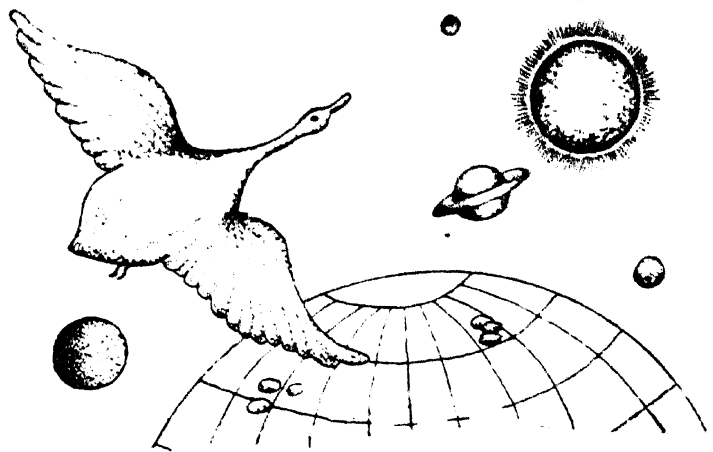
আকাশটা যেন সাদানীলে মেশান একটা পাখি, মহাশূন্যে ডিম পেড়ে চলেছে
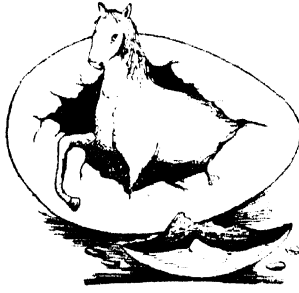
শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। সাধারণত দেখা যায় একই সঙ্গে ২০০,০০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০,০০০ শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুকে নিসিক্ত করবার জন্যে উপস্থিত থাকে। এক-জন বৈজ্ঞানিক এই মন্তব্য করেছেন যে, আট কোটির কম শুক্রাণু ডিম্বাণুর সম্মুখীন হলে নিষেক (Fertilisation) ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে না। মানুষের জীবনে ডিমের সংখ্যা এমন কম হলেও ইলিশ মাছদের জীবনে ডিমের ছড়াছড়ি পড়ে যায় বর্ষার সময়। মুরগী প্রতি বছর ২৫০—৩০০টা ডিম পেড়ে থাকে।

শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জাগ্রত অবস্থায় নিয়ে আসে। শুক্র কোষ ও ডিম্ব কোষ দুই-ই ক্ষণজীবী। তাই এই ডিমের জাগরণ পর্বটা একটা সময়নির্ভর ব্যাপার বলা চলে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব-কোষ নিষ্কাশিত হবার পর প্রায় ৪৮ ঘণ্টার ভিতর যদি তা শুক্রাণুর সংস্পর্শে না আসে তাহলে নিষেকের সম্ভাবনা কম থাকে এবং নতুন জীবন গঠনে তা অসমর্থ হয়। যদি শুভ মুহূর্তের ভিতর ডিম্বকোষের কাছে শুক্রাণুর আবির্ভাব ঘটে তা হলে সেখানে ছোটাছুটির এক ধুম পড়ে যায়। প্রত্যেক ডিমের গায়ে এক রকম আবরণ থাকে, যা তৈরী হয় হায়ালোরুনিক অ্যাসিড দিয়ে। অগণিত শুক্রকীট হায়ালোরুনিক অ্যাসিডের আবরণটি বিধ্বস্ত করে নিজেদের ভিতরকার হায়ালোরুনিডেজ নামক এনজাইম দিয়ে। হায়ালোরুনিক অ্যাসিডের আবরণ ভাঙ্গা মানে নিষেকের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। অনেকে বলেন যে শুক্রকীটের সংখ্যা হ্রাস পেলে হায়ালোরুনিডেজের পরিমাণ কম হয় এবং সেই কারণে স্বল্প পরিমাণ হায়ালো-রুনিডেজ হায়ালোরুনিক অ্যাসিড বর্মকে ভেদ করতে অসমর্থ হয়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে কখনই নিষেক ঘটে না। ফলে সেই সব পিতার নিঃসন্তান না হয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু এ জগতে কিছু কিছু প্রাণী আছে যাদের ডিম্বকোষ শুক্রকোষের উদ্দীপক সংস্পর্শে না এসেই ভ্রূণের নতুন জীবন সৃষ্টি করতে পারে। শুক্রকোষের সংস্পর্শ ছাড়া বোলতা, মৌমাছি ও পিঁপড়ের ডিম সরাসরি অবয়ব পেতে পারে। এদের অযৌন সন্তান (Virgin birth) বলা যেতে পারে।

নিষেকের আবিষ্কর্তা হার্টউইক—১৮৭৫ সালে। নিষেকের সমস্ত পর্বটা এত সূক্ষ্ম যে অনেক সময় তাকে অনুমান করাও এক-রকম অসাধ্য হয়—চুপিসাড়ে তা কেমন ঘটে চলেছে। মানুষের একটি পরিপক্ব ডিম্বাণু (ripen human egg)-এর পরিমাণ হবে .1 মিলিমিটারের কিছু বেশি, অর্থাৎ এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ। আর শুক্রকীটের সাইজ আরও কত ছোট তা অনুমান করতে পারবেন যখন শুনবেন, একটি ডিম্বকোষের মধ্যে প্রায় ১০০০০০ গুলি শুক্রকীট থাকতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে একটিমাত্র শুক্রাণু একটি ডিম্বকোষকে অভিসিক্ত করে। ডিম্বকোষ ও শুক্রাণুর সম্মেলন নতুন জীবন সৃষ্টির মহালগ্ন। দুটি জনন কোষ মিলে যে একটি জীবকোষের সৃষ্টি করে তা বার বার বিভক্ত হয়ে অগণিত জীবকোষের রূপ পায়। এই সব জীবকোষ থেকে ধীরে ধীরে নাক, কান, চোখ, মুখ, ভিতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকশিত হয়ে ওঠে। অবয়ব প্রাপ্তির সমস্ত সংবাদ ভ্রূণের ভিতরকার কোষদের মধ্যে রয়েছে।
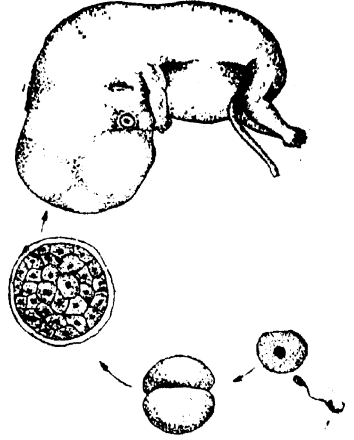
ভ্রূণের গঠন একটি জীবন্ত ভাস্কর্য—ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে অবয়ব গঠন করার নাম এপিজেনিসিস

একখানি কোষ থেকে ক্রমে বহুকোষ, বহু-কোষ থেকে বিভিন্ন রকমের দেহের অঙ্গ একটি জীবন্ত ভাস্কর্যের সামিল।

কিভাবে এই বিশেষ জীবকোষটি একটি মূর্তিমান মানুষের রূপ পরিগ্রহণ করে তার সব ইতিহাস আজও জানা যায়নি। তবে গঠনের মাধুর্য সম্বন্ধে অনেক মৌলিক কথা ইদানীং জানা যাচ্ছে। অতীতে যখন অনু-বীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি, মানুষের জ্ঞান-চেতনা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন থেকেই মানুষ নিজের অবয়বের গঠন সম্বন্ধে অশেষ কৌতূহলী হয় এবং নানা জল্পনা-কল্পনা করে। সে সব কথা আজ শুনলে গল্প বলে মনে হবে।

সেই কবে অ্যারিস্টটল তাঁর লেখায় লিখে গেছেন যে, রক্ত আর বীজ ঘনত্ব পেয়ে সন্তানে রূপায়িত হয়—তাঁর সময়ে নতুন জীব সৃষ্টির পিছনে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সঠিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট ছিল না। এখানে লক্ষণীয়, অ্যারিস্টটলের ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে ভারতবর্ষে তখনকার প্রচলিত মতবাদের অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন, গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ বিনিময় হয়েছিল। আমাদের শাস্ত্রেতে ভ্রূণের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সন্তানের অবয়ব পাওয়ার পেছনে কতক-গুলো জিনিসের প্রয়োজন থাকে। তার মধ্যে প্রথমত হলো শোণিত—মায়ের রক্ত; দ্বিতীয়ত শুক্র—পিতার বীর্য; তৃতীয়ত আত্মা, চতুর্থত মানস। এই চার জিনিসের সঙ্গে মেলে পঞ্চম অংশ—পূর্বজীবনের কর্ম। এই পাঁচ মিলিত হয়ে ভ্রূণের সৃষ্টি করে। কর্মের গুণাগুণের উপর ভ্রূণের

পরিস্ফুটন নির্ভর করে। যারা আধুনিক কালে ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাছে আত্মন, মানস, কর্ম—এইসবের যথার্থ বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ মেলে না। কিন্তু তা না মিললেও, একথা তাঁদের কাছে স্বীকৃত যে, যদিও পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের রহস্যের আবিষ্কর্তা বলা হয়, তবু তাঁদের আগে হিন্দু দার্শনিকরা নতুন জীবন সঞ্চারে পিতার শুক্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকদের ডিম্বকোষ সম্বন্ধে ধারণা তেমন সুস্পষ্ট ছিল না বলে অনেকে মনে করেন।

ইউরোপে বহুদিন ধরে ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষ নিয়ে নানান ভ্রান্ত ধারণা নানাভাবে মাথা চাড়া দিয়েছিল। বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারি এক হাস্যকর ঝগড়ার প্রচলন দেখা যায়। তখনকার দিনে একদলরা বলতেন, প্রত্যেক শুক্রকোষের মধ্যে নাকি একটি ছোটখাট মানুষ শুধু বড় হবার অপেক্ষায় বসে থাকে। তাঁদের মতে ভ্রূণের গঠন মানে এই ক্ষুদে মানুষটির অর্থাৎ ম্যানিকিনটির (Manikin) বড় হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। অপরপক্ষ জাহির করতেন (ভনবেয়ার ১৮২৭ সালে মানুষের ডিম্বাণু আবিষ্কার হওয়ার পর) ডিমের মধ্যেই ভবিষ্যতের সেই ক্ষুদে মানুষটি বসে থাকে। এই ডিমপক্ষ সমর্থকদের বলা হতো ওভিউলিস্ট (Ovulist) আর শুক্রকোষ সমর্থকদের বলা হতো এনিমালকিউলিস্ট (Animalculist)। অণুবীক্ষণের অবাধ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভ্রান্ত ধারণা ক্রমে দূর হয়। ভ্রূণের গঠনে কোন কিছুই আগে থেকে তৈরী হয়ে থাকে না। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের পর প্রতিধাপে নানারকম গঠনের ক্রিয়াকলাপ চলে, এবং তার ফলেই সম্পূর্ণ মানুষটি রূপ পায়। জীবকোষ দিয়ে প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন যেন এক একটি প্রাণময় শিল্প হয়ে ফুটে ওঠে। স্বভাবত এই প্রসঙ্গে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কথা মনে পড়ে। তিনি প্রধানত ছিলেন শিল্পী। তিনি তাঁর নোটবুকে যে সব শিশু ও ভ্রূণের ছবি এঁকে গেছেন—সেগুলো দেখলে মনে হয়, তিনি ভ্রূণতত্ত্বের একজন সার্থক পর্যবেক্ষক। তাঁর সময়ের চেয়েও তিনি এগিয়েছিলেন এবং বুঝতে পারেন ভ্রূণের গঠন ব্যাপারে কোষ বিভাজনের নৈপুণ্য আছে। ভ্রূণের এই প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনের গতিশীলতাকে বলা হয় এপিজেনিসিস (Epigenesis)। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর গঠনক্রিয়া অনুসরণ করলে তাদের গঠনের অনেক সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এইসব সাদৃশ্য তাদের উত্তরাধিকারের স্মরণ চিহ্ন। এই সাদৃশ্য তাদের বহুপ্রাচীন কালের কোন এক অতীত পূর্বপুরুষ থেকে উত্থানের পরিচায়ক। গঠনের
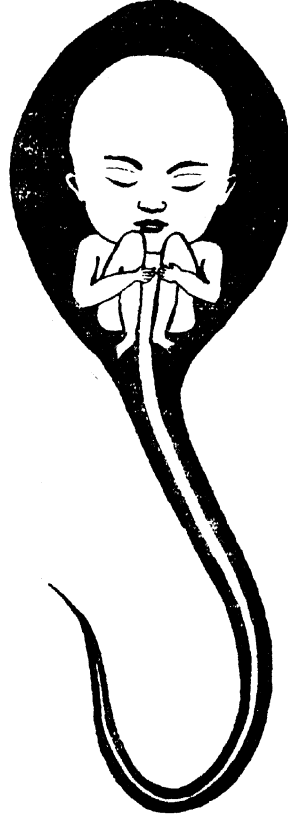
তখন ধারণা ছিল একটি খুদে মানুষ শুক্রাণুর ভিতর বড় হবার অপেক্ষায় থাকে

শুরু, পরে ক্রমে নিজ নিজ তারতম্য ভ্রূণের মধ্যে ফুটে ওঠে এবং তা সর্বশেষে মাছ, ব্যাং, সাপ, খরগোস ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক কালে ভ্রূণতত্ত্বের গবেষণায় অসামান্য সাফল্যের সূচনা পাওয়া যায়। ভ্রূণ গঠনকারী কোষদের নিয়ে এখন নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গঠনের সময় প্রত্যেকটি জীবকোষ তাদের ভিতর কি অঙ্গীকার বহন করে তা পরীক্ষামূলকভাবে বিচার সাপেক্ষ। ভ্রূণের গঠনের শুরুতে যখন নতুন জীবনটি মাত্র দু' কোষবিশিষ্ট থাকে তখন সেই দুই কোষকে কৃত্রিম উপায়ে পৃথক্ করলে (যেমন চুল দিয়ে যদি গেরো দিয়ে দেওয়া যায়।) সে দুই কোষ থেকে দুটো স্বতন্ত্র ভ্রূণ নির্গত হয়। এমনতর নানা পরীক্ষা করে ভ্রূণের কোষ কখনও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা কিংবা সম্পূর্ণ ভ্রূণ থেকে তাকে পৃথকীকরণ করে তাদের গঠনের স্বাতন্ত্র্য পরীক্ষা করা হচ্ছে

পরীক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হলেও, এখনও পর্যন্ত গঠনপর্বের শেষ কথাটি জানা যায় নি। কেন ঘোড়ার ডিমটি ঘোড়ার অবয়বে পর্যবসিত হয়, আর মুরগীরটি মুরগীতে, মানুষেরটি মানুষে? যদিও সবক্ষেত্রেই নতুন যাত্রার শুরু হল একখানি কোষ দিয়ে—তবু ক্রমশ গঠনের পদধ্বনি ভিন্ন রূপায়ণের পথে চলে যায়। এর জন্য নিজ নিজ বংশগতির দায়িত্ব আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কিভাবে তার প্রকাশ ঘটে—তা এখনও অজ্ঞাত।

সব দেখে শুনে মনে হয় যে, এ দুনিয়াটা মুসাফিরের শুধু চোলট্রি* নয়, একটা বিরাট গোছের পোলট্রিও। পৃথিবীটা ডিম্বাকার। আর নিঃসীম আকাশের দিকে চাইলে মনে হয়—আকাশটা যেন একটা সাদায়-নীলে মেশান পাখি—মহাশূন্যে সে সূর্য্যি, চাঁদ, পৃথিবীর মত নানান গ্রহের আকারে বড় বড় ডিম পেড়ে চলেছে সেই কোন অতীত কাল থেকে। শূন্যে তারা সব ভাসছে। আমরা মাতৃজঠর থেকে ডিম হতে বেরিয়ে চোখ ফুটলে আকাশে দেখছি মস্ত মস্ত সব ডিমের মেলা। এখন বুঝুন, ঘোড়ার ডিম ঘোড়ার ডিমের মত হাট্টিমাটিম গোছের ব্যাপার কিছু নয়। ঘোড়ার ডিম বিলকুল সত্যি। ডিম, তারপর তার নিষেক এবং সেখান থেকে নতুন জীবনের এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। এমনি শত শত সুযোগ দিয়ে চলেছে সৃষ্টির প্রবাহ। সেই করে ১৬৫১ সালে হার্ভে কল্পনা করেছিলেন জুপিটার সিংহাসনে বসে ডিম ভাঙছেন, আর সেই ডিম থেকে মানুষ এবং নানান জীবের সব আবির্ভাব হচ্ছে। হার্ভে এক মহামূল্যবান উক্তি করেছিলেন—Ovum esse primordium commune omnibus animalbus—The egg is the common primordium to all animals:
ডিম থেকেই তাবৎ প্রাণীর শুরু।

আজকে আমরা হয়তো জানি জুপিটার বলে কোন ভদ্রলোক নেই, যিনি সব সময় ডিম ভাঙছেন। কিন্তু ডিম সব সময়ে বর্তমান এবং এ সত্যও চিরন্তন।

---

* চোলট্রি তামিলে মুসাফিরখানা।

॥ শিখ সম্প্রদায়ের মতিগতি ॥

ওয়াকিবহাল

॥ ২ ॥

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির নিয়ম। আকালি আন্দোলনের প্রতিবাদে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা জাগিয়া উঠিল। ফলে জায়গায় জায়গায় হিন্দু শিখ সংঘর্ষ হইয়া গেল।

অন্ধ্রের রাজ্যপাল লালা ভীমসেন সাচার এই সময় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমদিকে আকালিদলের আপত্তিজনক কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী শিখনেতৃবৃন্দকে সংযত করিবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নাই। আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার মত দৃঢ়তা তাঁহার ছিল কিনা সন্দেহ। অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হইয়া চলিল। হিন্দু-শিখ সংঘর্ষের সংখ্যাও বাড়িয়াই চলিল। সমগ্র পাঞ্জাবের শান্তি ক্ষুন্ন হইবার আশংকা দেখা দিল। সাচার সরকার আর নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিলেন না। সরকার শোভাযাত্রার আওয়াজ তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন (১৯৫৫)। মাস্টার তারা সিং-এর অনুগামী আকালিগণ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিল। আদেশ অমান্যকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠানো হইতে লাগিল। শিখগণ বেপরোয়া হইয়া উঠিল। অন্যূন দশ হাজার শিখ এইসময় কারাবরণ করিয়াছিল। এই আন্দোলন অমৃতসরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই আন্দোলনের সময় ইউরোপে সফর করিতেছিলেন। দু'এক জায়গায় নাকি তাঁহাকে একটু বাঁকা কথা শুনিতে হয়। তাঁহাকে নাকি বলা হয় যে, তিনি বিদেশে পঞ্চশীল এবং সহ-অস্তিত্বের বাণী প্রচার করিতেছিলেন। আর তাঁহার নিজের দেশে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ধরিয়া ধরিয়া জেলে পোরা হইতেছে। তাঁহার 'শান্তির ললিতবাণী' কি ব্যর্থ পরিহাস মাত্র নয়? অনেকের ধারণা যে নেহরু পাঞ্জাব সরকারের নীতি অনুমোদন করেন নাই এবং তিনিই সাচারকে ধরপাকড় বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। নেহরু যেদিন দেশে ফিরিয়া আসেন, সেদিনই পাঞ্জাব সরকারের আদেশে শোভাযাত্রায় ধ্বনি তুলিবার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইল। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হইবার আর দুদিন মাত্র তখন বাকী। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই নাকি এই আজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। সরকার বিরোধিগণ কিন্তু ইহাকে সরকারের ভীরুতা এবং দুর্বলতার প্রমাণ বলিয়াই মনে করেন।

শোভাযাত্রায় ধ্বনি তুলিবার উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া শিখগণ যখন দলে দলে কারাবরণ করিতেছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। কয়েকজন আইন অমান্যকারী অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের নিকটে অবস্থিত কোন কোন বাড়িতে আত্মগোপন করে। ইহাদিগকে ধরিবার জন্য পুলিস এই সমস্ত বাড়িতে প্রবেশ করে। আকালিগণ সমস্বরে বলিতে লাগিল যে পুলিস স্বর্ণমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া তাহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে। তাহারা এ সম্বন্ধে তদন্তের দাবী করিল। মুখ্যমন্ত্রী ভীমসেন সাচার ভয় পাইলেন। অমৃতসরে আহুত এক বিরাট শিখ সমাবেশে তিনি পুলিসের আচরণের নিন্দা করিয়া প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ আকালিদলকে উৎসাহিত করিয়া শিখ সাম্প্রদায়িকতার শক্তি বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিল।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট আকালিদলের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাহাতে বলা হয় যে, পাঞ্জাবী সুবা গঠিত হইলে—১। পাঞ্জাবের ভাষা সমস্যার সমাধান হইবে; ২। হিন্দু-শিখ মনোমালিন্য দূর হইয়া সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপিত হইবে; ৩। শিখ সম্প্রদায় বহুলাংশে সন্তুষ্ট হইবে এবং পাঞ্জাবের পুনর্গঠন কার্যে তাহাদের পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যাইবে; ৪। পাঞ্জাবী ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রক্ষা করিবার অনুকূলে পরিবেশের সৃষ্টি হইবে; ৫। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার শক্তি হ্রাস পাইবে। সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের মনে যে হতাশার ভাব দেখা দিয়াছে তাহা দূর হইবে। ফলে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে পারিবে।

পাঞ্জাব হিন্দুসভার পক্ষ হইতে পাঞ্জাবী সুবা গঠনের বিরোধিতা করা হয়। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট সভা যে স্মারকলিপি পেশ করে তাহাতে বলা হয় যে, ১। প্রদেশের সংখ্যা বাড়ানো অসংগত। প্রদেশের সংখ্যা যত কম হইবে, সর্বভারতীয় ঐক্য এবং জাতীয়তা বোধও ততই গভীর এবং শক্তিশালী হইবে;

২। পাঞ্জাবী সুবার দাবী সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসূত। পাঞ্জাবী সুবার বেনামীতে শিখতন্ত্র স্থাপনই শিরোমণি আকালি দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য;

৩। পাঞ্জাবীভাষী জনগণের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র পাঞ্জাবী সুবার দাবি করিতেছে। সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের শিখগণ পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার ন্যূনাধিক ত্রিশজন অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশেরও কম—একটি অংশ মাত্র এই দাবি করিতেছে। সুতরাং পাঞ্জাবী সুবার দাবি সমগ্র পাঞ্জাবের দাবিরূপে গণ্য হইতে পারে না।

১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে অমৃতসরে হিন্দু মহাসভা, জনসংঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, রামরাজ্য পরিষদ এবং আর্য সমাজের সম্মিলিত অধিবেশন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে উল্লিখিত দলগুলি পাঞ্জাবী সুবা গঠনের বিরোধী।

৪। শিখ সম্প্রদায়ের—বিশেষত আকালিগণের—আইন শৃংখলা রক্ষা করিয়া চলিবার সুখ্যাতি নাই। তাহাদের শোভাযাত্রা এবং সভা-সমিতিতে যে সমস্ত ধ্বনি তোলা হয়, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাহাদের পরিকল্পিত পাঞ্জাবী সুবা স্থাপিত হইবার সংগে সংগে তাহারা পাঞ্জাবী-সুবার হিন্দু অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিবে (তুলনীয়—"ধোতি টোপি যমুনা পার");

৫। পাঞ্জাবী সুবা সম্বন্ধে শিখ সম্প্রদায় একমত নহে। তাহাদের অনেকেই ইহার ঘোর বিরোধী;

৬। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণের সংখ্যালঘু শিখদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহারের অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। হিন্দুগণ শিখদিগকে স্ব-সমাজের অচ্ছেদ্য অংগ বলিয়াই মনে করে;

৭। পাঞ্জাবী ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি রক্ষার অজুহাতও কেবল কথার কথা। পাঞ্জাবী হিন্দু এবং শিখ একই ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী;

৮। শিখগণ পাঞ্জাবী সুবার সমর্থনে ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের নজির দেখাইয়াছে। কিন্তু অন্ধ্রের সহিত পাঞ্জাবের তুলনা অসমীচীন। অন্ধ্র এবং মাদ্রাজ পরস্পর সংযুক্ত থাকিলেও ইহাদের ভাষা বরাবরই পৃথক। অন্ধ্র ও তেলেগুভাষী অঞ্চল; পক্ষান্তরে মাদ্রাজে তামিল ভাষা প্রচলিত। কিন্তু পাঞ্জাবের হিন্দু এবং শিখ উভয়েরই মাতৃভাষা পাঞ্জাবী। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে পাঞ্জাবে ভাষা-সমস্যা নাই। বর্ণমালার সমস্যাই পাঞ্জাবের আসল সমস্যা।

রাজ্য কমিশন পাঞ্জাবী সুবার দাবি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, যে সমস্ত অঞ্চল লইয়া পাঞ্জাবী সুবা গঠনের দাবি করা হইয়াছে, তাহাদের অধিবাসীগণও এ দাবি সমর্থন করে না এবং পাঞ্জাবী সুবা গঠনের পথে পাঞ্জাবের ভাষা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান মিলিবে না।

("The case for a Panjabi-speaking state falls firstly, because it lacks the general support of the people inhabiting the area, and secondly, because it will not eliminate any of the causes of friction from which the demand for a Punjabi-speaking state emanates. The proposed state will solve to neither the language problem nor the communal problem, and far from relieving internal tension, which exists between communal and not linguistic and regional groups, it might further excerbate the existing feelings."—Report of the States Re-organisation Commission, P. 540).

কমিশনের রিপোর্টে পাঞ্জাব, পেপসু এবং হিমাচল এই তিনটি রাজ্য লইয়া বৃহত্তর পাঞ্জাব গঠনের সুপারিশ করা হইল। আকালি বিরোধী হিন্দুদলগুলিও ইহাই চাহিতেছিল। তাহাদের পরিকল্পিত মহাপাঞ্জাব এবং রাজ্য কমিশন সমর্থিত বৃহত্তর পাঞ্জাবের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। হিমাচলকে বৃহত্তর পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে কমিশনের সদস্যগণ একমত না হইলেও* কমিশনের রিপোর্টে পাঞ্জাব, পেপসু এবং হিমাচলকে সম্মিলিত করিবার সুপারিশই করা হইয়াছিল।

পাঞ্জাবী সুবার সমর্থকগণ মাস্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে রাজ্য কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিল। অবশেষে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পাদক [illegible] চৌধুরীর মধ্যস্থতায় ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে শিরোমণি আকালি দল এবং সরকারের মধ্যে মিটমাটের জন্য আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনা চলিবার কালে প্রধানমন্ত্রী নেহরু অমৃতসর যান। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করা হয়। এই রাজকীয় সম্বর্ধনা নেহরুজীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অমৃতসরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। ঠিক এই সময়েই মাস্টার তারা সিং-এর আদেশে পাঞ্জাবী সুবার সমর্থনে অমৃতসরে এক শিখ সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বয়ং মাস্টার তারা সিং এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার নির্দেশে এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের প্ররোচনায় হাজার হাজার শিখ লাঠি কুঠার এবং তলোয়ারে সজ্জিত হইয়া শোভাযাত্রা করিয়া সভায় যোগদান করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কংগ্রেস অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলীর ধারণা হইল যে পাঞ্জাবী সুবার দাবি সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের দাবি এবং আকালি দলই শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কংগ্রেস-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবী সুবার দাবি সরাসরি অগ্রাহ্য করিবার ভরসা পাইলেন না। তাঁহারা জানিতেন না—আজও জানেন কি না সন্দেহ—কতরকমে প্রলুব্ধ করিয়া কত মিথ্যা প্রচার করিয়া এবং কি রকম অর্থবৃষ্টি করিয়া ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হাজার হাজার শিখকে অমৃতসরে হাজির করা হইয়াছিল। উদ্যোক্তাগণ সভায় যোগদানকারী সকলের জন্যই বিনা পয়সায় খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দূর হইতে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। অনেককেই আবার নূতন পাগড়ি এবং যাতায়াত খরচ দেওয়া হইয়াছিল। সভায় যোগদান না করিলে শিখধর্মস্থানগুলি হিন্দু কবলিত হইবে এবং শিখধর্ম লোপ পাইবে গ্রামে গ্রামে এই ধরনের প্রচারের কথাও শোনা গিয়াছে। সরল, নিরক্ষর জনসাধারণ প্রলোভন এবং মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়াছিল। ফলে শিখসম্মেলনের সফলতা মণ্ডিত হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মাস্টার তারা সিং-এর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাও এই 'সফলতা'-র একটি প্রধান কারণ।

স্ত্রী-চরিত্রের ন্যায় আকালি দলের মতিগতিও দুর্বোধ্য—"দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" আকালি নেতৃবৃন্দ কী চায়, কিসে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন বলা কঠিন।

* কমিশনের সভাপতি স্যার ফজল আলি হিমাচলকে পাঞ্জাবের সহিত একত্রিত না করিয়া পৃথক রাখিবার সুপারিশ করিয়া স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছিলেন। অপর দুইজন সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং ডাঃ কে. এম. পানিক্কর তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ভারত সরকার স্যার ফজল আলির সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে মাস্টার তারা সিং-এর উর্দু দৈনিক "প্রভাত"-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, পাক-ভারত সীমান্তে অবস্থিত পাকিস্থানের অন্তর্গত কর্তারপুরের (Kartarpur Ravi) আশে পাশে কিছু জায়গা শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটিকে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য তিনি পাকিস্থান সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্থানের শিখগুরুদ্বোরাগুলির দেবোত্তরের বিনিময়ে কর্তারপুরের আশে পাশে জমিও প্রার্থনা করা হইয়াছিল। মাস্টার তারা সিং বলেন যে, পাকিস্থান সরকার তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলে কর্তারপুরের উপকণ্ঠে একটি শিখ উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। প্রস্তাবিত উপনিবেশে মুসলমানদিগের বসবাসের অধিকার থাকিবে না। ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে যাতায়াতের বিধিনিষেধ এই উপনিবেশ সম্বন্ধে কঠোরতার সহিত প্রয়োগ করা হইবে না। ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধের সময়ও ভারত এবং কর্তারপুরের যাতায়াতের কোন বাধা থাকিবে না।

এই প্রবন্ধেই মাস্টার তারা সিং বলেন যে, পাকিস্থান সরকার পাঞ্জাবের অন্তর্গত সরহিন্দের নিকট মুস্লিম অঞ্চল স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিলে শিরোমণি আকালি দল পাকিস্থান সরকারের সহায়তা করিবে। মাস্টার তারা সিং-এর দক্ষিণ হস্ত—এখন তাঁহার ঘোর শত্রু—আকালি দলের সম্পাদক পাঞ্জাব সরকারের বর্তমান কৃষিমন্ত্রী জ্ঞানী কর্তার সিং এইসময় করাচী এবং লাহোরে পাকিস্থান সরকারের বিভিন্ন দফ্তরে বার বার ধর্ণা দিয়াছিলেন। পাকিস্থান সরকারকে কর্তারপুরে শিখ উপনিবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যেই তিনি করাচী এবং লাহোর অভিযান করিয়াছিলেন। পাকিস্তান সরকার রাজী না হওয়ায় এই পরিকল্পনা ফাঁসিয়া যায়।

ইহার কিছুকাল পূর্বে বা পরে জ্ঞানী কর্তার সিং-এর নেতৃত্বে কয়েকজন শিখ প্রতিনিধি লাহোর যান। আকালি দলের পক্ষ হইতেই তাঁহাদিগকে পাঠানো হইয়াছিল। লাহোর পৌরসভার তরফ হইতে এই প্রতিনিধি দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। সম্বর্ধনা সভায় প্রথমে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী জাতীয় পতাকা তোলা হইয়াছিল। অতিথিগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইবার পর তাঁহাদের অনুরোধেই নাকি ভারতীয় পতাকা সরাইয়া আকালি পতাকা তোলা হয়।

১৯৫৫ সালের কথা। ২১শে জানুয়ারী মাস্টার তারা সিং এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাচারের সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় উত্তেজিত মাস্টার তারা সিং বলেন—আমরা স্বাধীনতা চাই। শিখগণ স্বাধীনতা পায় নাই। আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ এবং প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিতেও—কাহার বিরুদ্ধে খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন—দ্বিধা করিব না।

("What we want is Azadi. The Sikhs have no Azadi. We will fight for our Azadi with full force. Even if we have to revolt, we will revolt to win our Azadi.")

১৯৫৬ সালের প্রথম ভাগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আকালি দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া যায়। সরকার রাজ্য কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া হিমাচল রাজ্যকে পুনর্গঠিত পাঞ্জাব (পূর্ব পাঞ্জাব পেপসু) হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। পুনর্গঠিত পাঞ্জাব একই রাজ্যপালের শাসনাধীন। অন্যান্য রাজ্যের মত ইহারও একটিমাত্র বিধান পরিষদ। কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে ইহাকে 'হিন্দী' এবং 'পাঞ্জাবী' এই দুইটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। হিন্দী এবং পাঞ্জাবী যথাক্রমে ইহাদের মুখ্য ভাষা। প্রথমোক্ত অঞ্চলে হিন্দু এবং দ্বিতীয় অঞ্চলে শিখগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। 'হিন্দী' এবং 'পাঞ্জাবী' অঞ্চলের জন্য দুইটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। বিধানসভার সদস্য এবং মন্ত্রিগণ সকলেই স্ব স্ব আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য। মুখ্যমন্ত্রী কোন পরিষদেরই সদস্য নহেন। পরিষদের সভাপতি পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আঞ্চলিক শাসন এবং উন্নয়ন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতাই পরিষদ দুইটিকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে আইন প্রণয়নের বা কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ইহারা বিধান পরিষদের নিকট সুপারিশ মাত্র করিতে পারে। যে সমস্ত বিষয়ের উপর আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, রাজ্য বিধানসভাকে সে সমস্ত বিষয়ে আইন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মত লইতে হয়।

মহাপাঞ্জাবের সমর্থক আকালি-বিরোধী দলগুলি এই আপসে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। হিন্দুগণ পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। অথচ তাহাদিগের দাবীতে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদিগকে একবারে
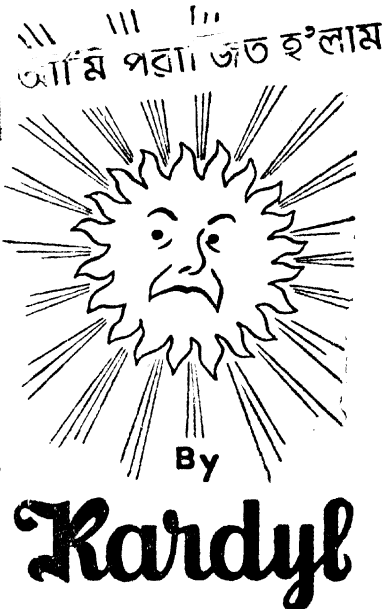
জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার শিখ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। হিন্দু এবং শিখ যে কোন দলেরই হউক না কেন, সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে শিখ সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দের প্রতি সরকারের এই কৃপা দৃষ্টি কেন? এই 'কেন'র উত্তর কে দিবে? সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের মতামত পদদলিত করিয়া সরকার গণতন্ত্রের মৌলনীতি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আকালি দলের সহিত আপসের শর্তাবলী বহুদিন কাহাকেও জানানো হয় নাই। মহাপাঞ্জাব সমর্থক দলের বিশিষ্ট নেতা বলরামদাসজী ট্যাণ্ডন সরকারী আচরণের প্রতিবাদে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। তখন আকালি দলের সহিত আপসের শর্তাবলী তাঁহাকে জানানো হয়।

মহাপাঞ্জাবের সমর্থক এবং অন্যান্য অনেকেই মনে করেন যে, পৃথক পৃথক ভাষাভিত্তিক অঞ্চল এবং ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিতে সম্মত হইয়া ভারত সরকার ভবিষ্যতে পাঞ্জাবী বা শিখ সুবা গঠনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। নেতৃস্থানীয় অনেক শিখেরও বিশ্বাস যে, এই ব্যবস্থার ফলে শিখ সম্প্রদায় পাঞ্জাবী-ভাষী সুবার প্রদেশ গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছে। পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য, একদা পাঞ্জাব বিধানসভার সদস্য বিশিষ্ট শিখ শিক্ষাব্রতীর মুখে শুনিয়াছি যে, যদি কোনদিন পাঞ্জাবী সুবা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অমৃতসরের তারা সিং নগর—এখানেই ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আকালি দলের আহ্বানে সহস্র সহস্র শিখ সমবেত হইয়াছিল—অমর হইয়া থাকিবে। তাহার নাম শিখ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। তারা সিং নগর তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করিবে।

সরকারের সহিত আপসের ফলে আকালি দল রাজনীতি বর্জন করিবার প্রতিশ্রুতি দিল। প্রায় সমস্ত আকালিই কংগ্রেসে নাম লেখাইল। মাস্টার তারা সিং কিন্তু কংগ্রেসের যোগদান করিলেন না। আকালি দল কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বীকার করিলেও অনেকেই আকালি দলের প্রতিশ্রুতিকে উদ্দেশ্যমূলক মনে করিলেন। আকালি দল কংগ্রেসকে রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিয়াছে। আপসের সময় ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পাঞ্জাবের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী হিন্দু। আকালি দলের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ফলে হিন্দুগণ শিখদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থায় নির্বাচনের ফলাফল অনুমান করা শক্ত নয়। কংগ্রেসের দোহাই দিয়া নির্বাচন সমুদ্র পার হইবার ভরসাতেই আকালি দল কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

তোষণের পথে সত্যকার সমাধান মিলে না এবং তোষণ-নীতির ফলও শুভ হয় না। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময়ই আকালি দল বলিতে আরম্ভ করিল যে, প্রার্থী মনোনয়নে কংগ্রেসের আকালি সদস্যদের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। মাস্টার তারা সিং স্পষ্টই বলিলেন যে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আচরণে তিনি অপমানিত হইয়াছেন। হিন্দু-শিখ সম্প্রীতি স্থাপনের আশাতেই নাকি তিনি আকালি দলকে কংগ্রেসে যোগদানের অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার আশা ব্যর্থ হইয়াছে এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শিখদের নিজেদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতেছেন।

("Master Tara Singh has launched his campaign by blaming Congress leaders for creating disruption in the ranks of the Sikhs, "contrary to my expectations of Hindu-Sikh unity as I had felt the Congress was the only organisation common to all."—The Statesman, Delhi, 31-1-57).

তিনি বোধ হয় চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মনোনীত সব কয়টি প্রার্থীকেই কংগ্রেস-প্রার্থীরূপে গ্রহণ করা হউক। কংগ্রেস রাজি হইল না। ক্ষুব্ধ মাস্টার তারা সিং বলিতে আরম্ভ করিলেন, আকালি দল রাজনীতি বর্জন করিতে পারে না। শিখদের দৃষ্টিতে ধর্ম এবং রাজনীতি এক। ইহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব।

মাস্টার তারা সিং যাঁহাদের নাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কিছু কংগ্রেস মনোনয়ন লাভ করেন নাই। কিন্তু মাস্টার তারা সিং তথা আকালি দলকে খুশি

করিবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্য কংগ্রেসকর্মীর দাবী উপেক্ষিত হইবার কথা শোনা গিয়াছে। ১৯৫৭ সালের নির্বাচন উপলক্ষে সাম্প্রদায়িকতা যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছে। যে সমস্ত অঞ্চলে শিখ ভোট-দাতা দলে ভারী সে সমস্ত অঞ্চলে সাধারণত শিখপ্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যে সমস্ত এলাকায় হিন্দু ভোটদাতা বেশী সে সমস্ত এলাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিখপ্রার্থীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। বহুক্ষেত্রে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষও প্রার্থী মনোনয়নে প্রার্থীর যোগ্যতা অপেক্ষা সম্প্রদায়ের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন।

নির্বাচনের পর আকালি-কংগ্রেস আপস অনুযায়ী 'হিন্দী' এবং 'পাঞ্জাবী" অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইল। হিন্দী সমর্থকগণ ততদিনে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, কাহাকেও পাঞ্জাবী শিখিতে বাধ্য করা চলিবে না। অথচ আকালি কংগ্রেস আপস অনুযায়ী হিন্দী এবং পাঞ্জাবী অঞ্চলে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে আঞ্চলিক মুখ্য ভাষা (যথাক্রমে হিন্দী এবং পাঞ্জাবী) ছাড়াও যথাক্রমে পাঞ্জাবী এবং হিন্দী অবশ্যই শিখিতে হইবে। মাস্টার তারা সিং এবং তাঁহার সমর্থকগণ বলিতে লাগিলেন যে, ভাষা সংক্রান্ত শর্ত ভঙ্গ করা হইলে আকালি-কংগ্রেস আপসের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আকালি দল রণ-হুংকার ছাড়িতে লাগিল। কিছুদিন পরেই তাহারা অভিযোগ করিতে লাগিল, পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার আকালি কংগ্রেস আপসের শর্তাবলী কার্যে পরিণত করিতেছেন না। আকালি-কংগ্রেস মৈত্রীতে ভাঁটার টান ধরিল।

১৯৫৭ সালের প্রথম দিকেই হিন্দী সমর্থকগণ পাঞ্জাবী শিখিতে বাধ্য করিবার নীতির প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই সময় জায়গায় জায়গায় শিখদের উপর ছোটখাটো উপদ্রবের কথা শোনা যায়। এই আন্দোলনের সময় শিখদিগের তরফ হইতে অমৃতসর স্বর্ণ-মন্দিরে সিগারেটের টিন ফেলিবার অভিযোগ করা হয়। অভিযোগের সত্যতা এবং অপরাধী কে বা কাহারা আজও নির্ধারিত হয় নাই। পুলিস বহুক্ষেত্রে সত্যাগ্রহী-দিগের উপর অনাবশ্যক বলপ্রয়োগ করিয়াছে। পুলিসের বিরুদ্ধে রাজধানী চণ্ডীগড়ে আর্যসমাজের উপাসনা-মন্দিরের মর্যাদাহানির অভিযোগ করা হইয়াছে। ফিরোজপুর জেলে সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপর উচ্চপদস্থ জেল কর্মচারীদিগের ইঙ্গিতে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। সত্যাগ্রহী সুমের সিং নিহত হন। অনেককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। হিন্দী আন্দোলনের সময় প্রায় ১০,০০০ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে। অবশেষে সরকার সন্তোষ-জনকভাবে ভাষা-সমস্যা সমাধানের প্রতি-শ্রুতি দেওয়ায় হিন্দী আন্দোলন স্থগিত রাখা হইয়াছে।

এদিকে আকালি-কংগ্রেস 'মধুচন্দ্রের' (হানি মুন) অবসান হইয়াছে। আকালি দলেও ভাংগন ধরিয়াছে। জ্ঞানী কর্তার সিং, জ্ঞান সিং রারেহেণ্ডয়ালা ইত্যাদি নাম-জাদা আকালি নেতা মাস্টার তারা সিংএর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৯৫৮ সালে শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির কর্মকর্তা নির্বাচনে স্বয়ং মাস্টার তারা সিং এবং তাঁহার সমর্থক আকালি দলের পরাজয় ঘটিয়াছে। মাস্টার তারা সিংকে পরাজিত করিয়া জ্ঞানী কর্তার সিংএর আশ্রিত প্রেম সিং লালপুরা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভূতপূর্ব পেপসু রাজ্যে অবস্থিত শিখ গুরুদ্বারাগুলিকে পাঞ্জাব-পেপসুর মিলনের পর শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির কর্তৃত্বাধীনে আনিবার এবং পেপসু হইতে এই কমিটিতে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্বে পাঞ্জাব বিধানসভা একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছে। মাস্টার তারা সিং বলেন যে, এই আইনে সরকারকে শিখ ধর্মস্থানগুলির উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি আবার পাঞ্জাবী সুবার জিগীর তুলিয়াছেন। ধর্ম দেশ অপেক্ষা বড় এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন। আবার আসর জমিয়া উঠিয়াছে। মাস্টার তারাসিং এবং জ্ঞানী কর্তার সিং-এর দলের মধ্যে জায়গায় জায়গায় বচসা এবং হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। কোন কোন জায়গায় মাস্টার তারা সিংকে উত্তেজিত জনতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য পুলিস পাহারায় সরাইয়া নেওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছে।

ধর্মস্থানের স্বাধীনতা রক্ষা এবং পাঞ্জাবী সুবার দাবির সমর্থনে মাস্টার তারা সিং গত ১৫ই মার্চ দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৫ই মার্চের পূর্বেই পাঞ্জাব সরকারের আদেশে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং দিল্লীর ৫০,০০০ শিখ নরনারীর বিরাট শোভাযাত্রা রাজধানীর প্রধান প্রধান রাস্তায় নিরুপদ্রব বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। দিল্লীর বহু শিখ পুরনারী বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদিগকে স্ব স্ব গৃহ হইতে আহার্য জোগাইয়াছেন। ইহা হইতে শিখ সম্প্রদায়ের উপর মাস্টার তারা-সিং-এর প্রভাব কত ব্যাপক এবং গভীর অনুমান করা যায়; কিন্তু মাস্টার তারা সিং এবং তাঁহার আকালি দল উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু এবং শিখ নেতৃবৃন্দের নীতি এবং কার্যকলাপে পাঞ্জাবের আকাশে যে দুর্যোগের ছায়া নামিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি এবং একাত্মবোধকে জাগাইয়া তোলা আবশ্যক। সংখ্যাধিক হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতি উদারতা দেখাইয়া তাহাদের আস্থা অর্জন করিতে এবং প্রয়োজন হইলে স্বার্থ-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকেও প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি এবং সুবিবেচনার উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেয়নায়"।

সমাপ্ত

দিলীপকুমার রায়

নয়

"একদা সেখানে এক অন্ধ পাদ্রি এসে হাজির—একেবারে একা। ডাক্তার ধর্মবীর তাঁকে কি একটা অসুখে চিকিৎসা করে নিরাময় করেন। ভদ্রলোক একবার একটা কলার খোসার উপর পদক্ষেপ করে পিছলে মেরুদণ্ডে বিষম আঘাত লেগে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু কী প্রফুল্ল মানুষ! আমাদের কাছে একদিন পিকুইক পেপার্স থেকে এক ভারি মজার কাহিনী আদ্যন্ত মুখস্থ আবৃত্তি করলেন নিজে হেসে ও সবাইকে হাসিয়ে। তার উপর কী আশ্চর্য স্বাবলম্বী! একাই রাস্তাঘাটে চলে-ফিরে বেড়ান। ডাক্তার ধর্মবীরের কাছে একদিন সুভাষ এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে তিনি বললেন যে, অনেকেই বিলেতে এভাবে একা চলে-ফিরে বেড়ান অন্ধতা সত্ত্বেও। পথে-ঘাটে পুলিস বা পথিকরা তাঁদের ফুটপাথে উঠিয়ে দেয়, তারপর নানা মোড়ে নানা জন এসে মোড় পার করে দেয়, পথ বলে দেয় কখনো বা হাত ধরে টেনে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়। শুনে আমি অবাক—সুভাষ তো মুগ্ধ! ভদ্রলোক বিদায় নিলে পর সুভাষ আমার দিকে চেয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল: "দেখ দিলীপ, দেখ—স্বাবলম্বী কাকে বলে একবার দেখ। এ-জাত বড় হবে না তো হবে কে? তাই তো বলি তোমাকে ঘড়ি ঘড়ি এদের কাছে আমাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে।"

ডাক্তার ধর্মবীর ইংরাজদের উপর আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না, তাই টুকলেন: "বটে সুভাষ, কিন্তু আমার মন আজো খুঁত খুঁত করে ইংরাজদের কেউ বেশি গুণগান করলে। কারণ ওরা নানা বিষয়ে বড় একথা মেনে নিয়েও বলবই বলব যে, আমাদের পক্ষে ওদের ধরনধারনের বেশি নকল করতে যাওয়ায় বিপদ আছে। এই দেখ না কেন, এই সজ্জন অন্ধটিও শুধু যে মদ খাওয়ার সমর্থন করেন তাই নয়, আমি আমার বাড়িতে কাউকেই মদ পরিবেশন করি না বলে আমাকে পিউরিটান ফ্যাডিস্ট বলে ঠাট্টা করতেও তাঁর বাধে না।"

আমি: ও'দের চোখে হয়ত মদ খাওয়া একটুও খারাপ ঠেকে না—যেহেতু ও'রা মাত্রা রেখে খেতে পারেন।

ডাক্তার ধর্মবীর (উদ্দীপ্ত): সবাই পারে নাকি? ইশ্! পথেঘাটে এখানে মাতলামি যে কত দেখেছি—সব জানা আছে হে!

আমি: ব্যতিক্রম দু-চারটে থাকবেই। সর্বত্র।

ডাক্তার: ব্যতিক্রম? তুমি জানো কত পরিবার উচ্ছন্নে গেছে কর্তার মাতলামির জন্যে? জানো, এদেশেও একটা মস্ত আন্দোলন চলছে মদের বিপক্ষে?

আমি: তা না জানতে পারি, কিন্তু এখানে ভদ্রঘরের কর্তা-কর্ত্রী ছেলেমেয়েরা কদাচ মাতাল হয় এও তো অস্বীকার করা চলে না। আমি তো আজ পর্যন্ত একটিও ভদ্রপরিবারে কাউকে মাতাল হতে দেখি নি এদেশে।

সুভাষ (বিরক্ত কণ্ঠে): তা থেকে কী প্রমাণ হয় শুনি? যে, মদ খাওয়া ভালো?

আমি (হেসে): তোমরা দলে পুরু, কাজেই আমাকে হয়ত রণে ভঙ্গ দিতে হবে শেষটায়। তবে, যদি বলি এ-শীতের দেশে মাত্রা রেখে সুরাপানে কিছু ভাগবত অশুদ্ধ হয় না, তাহলে কি সেটা খুবই কালাপাহাড়ী মতো হবে? না, এ আমার উড়ো তর্ক নয়। সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিদ্বান বন্ধু অমুকচন্দ্র মহাশয় বলছিলেন,—মাতাল হওয়া মন্দ বলে যে পরিমিত মাত্রায় মদ খাওয়া মন্দ এ একটা যুক্তিই নয়। মহাশয় আরো বললেন যে, মাত্রা রেখে মদ খেতে জানলে শুধু যে অনিষ্ট হয় না তাই নয়, অনেক সময়েই নির্দোষ ফুর্তির আমদানি করে বিরস মুহূর্তগুলিকে উৎরে যাওয়া যায়। তিনি আরো এমন চোখা চোখা যুক্তিবাণ হানলেন যে, শেষটায় আমি তর্কে হেরে গেলাম—যদিও মুখে স্বীকার করি নি একথা।

সুভাষ (উদ্দীপ্ত): তোমার মহাশয় ঠাকুরকে আমি জানি হে জানি। খোঁজ নিলে দেখতে পাবে তিনি মাঝে মাঝে বেশ একটু বেচাল হন। না, শোনো দিলীপ। এ নিছক যুক্তির কথা নয়। বলে না—**ইভন দি ডেভিল ক্যান কোট স্ক্রিপচার্স?** এ হ'ল তাই। সংসারে কিসের স্বপক্ষে না চোখা চোখা যুক্তির বুকনি সাজানো যায় বলো তো? না, আমি কিছুতেই মানব না যে, আমরা পিউরিটান। আমরা শুধু চাই—এদের ভাষায় কোদালকে কোদাল বলতে। তুমি কি দেখ নি স্বচক্ষে কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে অমুক অমুক বিরাটধ্বজ কীভাবে মদ খেয়ে কেলেঙ্কারি করেছে? না না না। মদ কোনো দিক দিয়েই ভালো নয়—স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তো নয়—আমোদের দিক দিয়েও নয়। ধ্যেৎ! এ কি একটা সভ্য আমোদ? —স্রেফ স্নায়বিক উত্তেজনা, অ্যানিম্যাল ডিলাইট—তার বেশি নয়। মদ খাওয়ার আমোদ যদি ভালো হয়, তবে গাঁজা আফিং, কোকেন কী দোষ করল, শুনি? ওসবেও কি আমোদ নেই বলতে? জুয়াখেলাতেও কি আমোদ নেই? কত লোক কি বছর জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয় জানো? বালজাকের একটি উপন্যাসের কথা তুমিই তো সেদিন বলছিলে—কীভাবে মন্টে কার্লোতে কত লোক জুয়াড়িরা মত্ত হয়ে খেলে আমোদ করতে গিয়ে, মান নেই? না দিলীপ, মানুষ সভ্য উপাধি পেতে পারে কেবল তখনই, যখন সে সভ্য আমোদ চাইবে—মাতলামি করে, গাঁজা খেয়ে, পাশব-উল্লাসে মেতে যে মজা সে তো চাষাদের আমোদ, বর্বরদের আমোদ।

সুরাপান সম্বন্ধে তর্ক উঠলেই সুভাষ কীভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত, তার একটি নমুনা দিতেই এ কথার অবতারণা। আমি সময়ে সময়ে ওর সঙ্গে তর্ক করতাম বটে, কিন্তু তবু মনে ওর কথা অন্তরে মেনে নিতে আমার কোনোদিনই বাধে নি। তাই তো আমি আপত্তি তুলি নি যখন দেশে ফেরবার আগে ও আমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। বিলেতে আমাদের সেই অবিস্মরণীয় শেষ রাত্রিটির কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না। আমাকে ও অনেকক্ষণ ধরে বলল ওর নানা স্বপ্নের কথা। শেষে বলল: "আমি জানি দিলীপ যে, আমাকে ওরা সহজে রেহাই দেবে না। এ দেশের পুলিসরা আমার কিছু করতে না পারলেও তাদের কর্তারা ওদেশের পুলিসকে লিখে দিয়েছেই দিয়েছে আমার কী ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম কয়েক বৎসর হয়ত আমাকে জেলেই কাটাতে হবে—হয়ত......" বলতে বলতে ওর গলা ধরে এল......"হয়ত আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেই পারব না, বোম্বে নামলেই আমাকে ওরা বেআইনী আইনে পুলিস-পোলাও চালান দেবে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি দিলীপ, আমি ভাঙলেও বেঁকব না।"

আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল,

বললাম: "কিন্তু ওরা তোমাকে পুলিপোলাও চালান দেবে বলছ কেন? গান্ধীজীকে তো দেয় নি?"

সুভাষ হেসে বলল: "গান্ধীজীকে ওরা জানে।...তোমাকে বলছি দিলীপ, ওরা ভয় করে না, অহিংসা সত্যাগ্রহ চরকাকে। ওরা ডরায় শুধু ঐ বোমারুদেরকে—যারা এক কথায় প্রাণ দিতে পারে—বাঘা যতীন, সূর্য সেন, কানাই দত্ত, বারীন ঘোষ, যাদুগোপাল মুখুজ্জে, সাবরকর, কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা, শ্রীঅরবিন্দ......এ'দের। আজ ওরা আমাদের যেটুকু অল্পস্বল্প রাশ ছেড়ে দিয়েছে সে এ'দেরই জন্যে। কিন্তু তোমাকে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

আমি ওর হাতে হাত দিয়ে বললাম: "অনুরোধ বোলো না সুভাষ, বলো আদেশ।"

সুভাষ আমার দু-হাত ওর দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "আমি চাই তুমি জেলের বাইরে থেকে দেশের কাজে আমাদের সহযোগ করবে।"
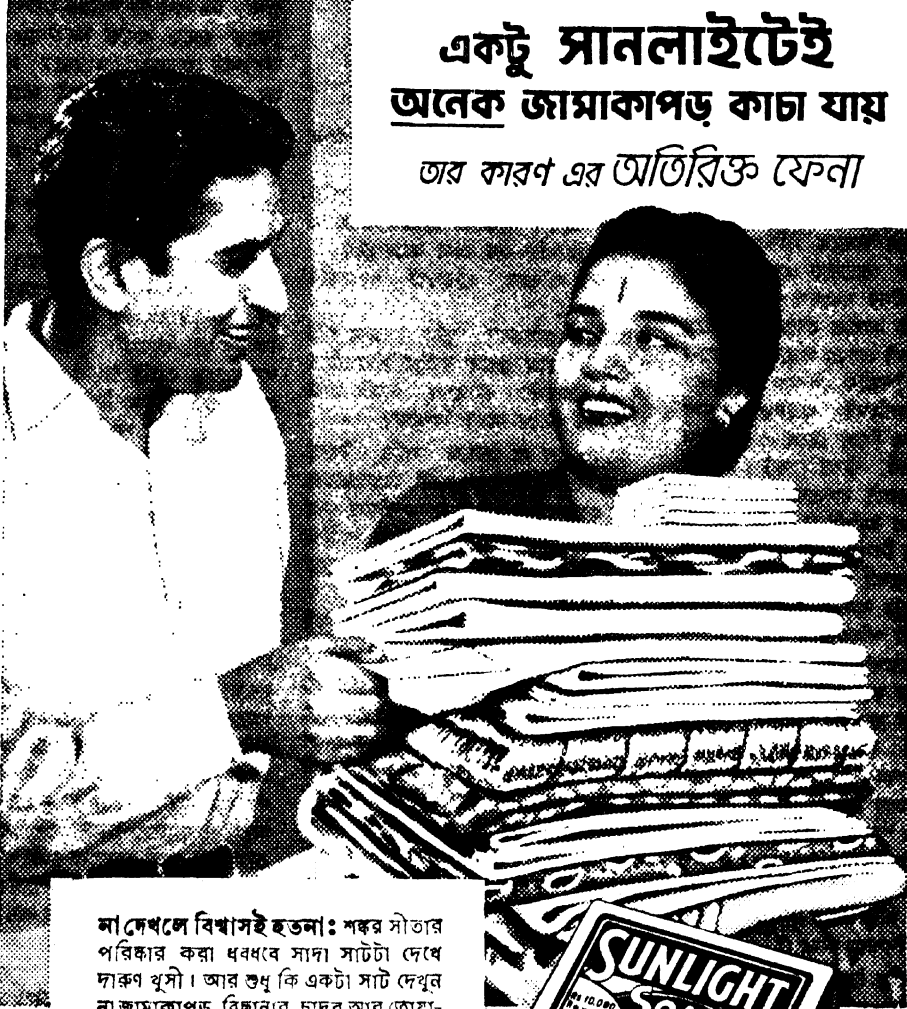
আমি স্পষ্ট হয়ে বলেছিলাম: "সুভাষ, তুমি জানো তোমাকে আমি কী চোখে দেখেছি প্রথম থেকেই। তুমি আমাকে ডাকছ, আমি কি সাড়া না দিয়ে পারি? কেবল......আমারও একটা অনুরোধ আছে—আমি তোমার মতন সবল মেরুদণ্ড নিয়ে জন্মাই নি, ভাবি অনেক কিছু; কিন্তু কাজে করতে পারি না। তাই আমার অনুরোধ, আমি দুর্বল বোধ করলে তুমি আমাকে গড়ে নিও, শক্তি দিও। তাহ'লে আমি পারবই পারব"......ইত্যাদি।

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত আরো কত কথাই যে ও বলেছিল—আহা, যদি কুঁড়েমি না করে তার একটা অনুলিপিও রাখতাম তাহলে আজ দেশবাসীর কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারতাম ওর তরুণ মনের আশ্চর্য মহত্ত্ব ও অবিশ্বাস্য ঐকান্তিকতা। কারণ ওর সে রাতের কথাগুলি ছিল আগুনের হল্‌কা, শুধু উৎপ্রেক্ষার ফুলঝুরি নয়। সবশেষে ও আমাকে দিয়ে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়:

কখনো মদ ছোঁব না।
কখনো কোনো নাইট ক্লাবে যাব না।
কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচব না।

ভগবানের কৃপায় এ-তিনটি প্রতিজ্ঞার একটিও আমি ভাঙি নি। ভাঙলে সুভাষের চোখে ছোট হতে হত।

* * *

বিলেতে সুভাষের সম্বন্ধে কত স্মৃতিই যে মনের পটে আজো উৎকীর্ণ হয়ে আছে ......দু-একটি বিচ্ছিন্ন অবস্থা ছবিতে ফের রঙ ফলালে কেমন হয়? দেখিই না।

একদিন ওর ওখানে গিয়ে দেখি ও গিবনের বিরাট 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার' পড়ছে। এ-দুর্ধর্ষ গ্রন্থটি কেম্ব্রিজ লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকায় দেখেছিলাম বটে, কিন্তু একবার একটি খণ্ড দেখেই রেখে দি "ও বাবা!" বলে। এ-হেন বিপত্তি মহাভারত সুভাষ শুধু যে পড়ছে তাই নয়—কিনে পড়ছে। শুধু কি এই?—গারিবল্ডি, ম্যাটসিনি, মেটারলিংক, লেনিন ক্রপটকিন প্রমুখ দেশভক্তদের বই। আমি ওকে বালজাক কি ডস্টয়েভস্কি কি টুর্গেনিভের নভেল দিলে ও বলত: "ওসব পরে পড়া যাবে হে, এখন কাজের বই পড়াই ভালো।"

* * *

আর একটি চিত্র। ওর ওখানে গিয়ে দেখি কয়েকটি আইরিশ ছাত্র। কেম্ব্রিজে তখন আইরিশরা মোটেই 'পপুলার' ছিল না। কিন্তু ও খুঁজে খুঁজে তাদের সঙ্গেই আলাপ করছে। তারা প্রস্থান করলে জিজ্ঞাসা করাতে ও চুপি চুপি বলল: "শিনু ফেন হে! খবর নিচ্ছি। ওদের কাছে বিপ্লবের টেকনিক কত যে শিখবার আছে ......" ইত্যাদি।

* * *

কয়েক বৎসর পরের আর একটি ছবি হঠাৎ মনে পড়ল, লিখি এখানেই।

তখন আমি বম্বেতে। হঠাৎ সুভাষের অভ্যুদয়। মহা হৈচৈ। কী? না সুভাষ বক্তৃতা দেবে। গেলাম বক্তৃতাসভায়। ওমা! কী কাণ্ড—সাড়ে পনের আনা সভাসদ পাঞ্জাবী, শিখ, মুসলমান, পেশোয়ারী, মাড়োয়ারী......ইত্যাদি। বাঙালী নেই বললেই হয়। সুভাষ ঝাড়া এক ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা দিল চোস্ত হিন্দুস্থানিতে—আধা উর্দু আধা হিন্দী। আমি তো থ! সুভাষ কী করে রাতারাতি এমন দুর্দান্ত হিন্দুস্থানি বলল? আজাদি, জিন্দাবাদ, বতন, মওত, তকদীর, মনজিল, রৌশন, মুসীবত নফরৎ......আরো সে কত গালভরা উর্দু কথা। ও রপ্ত করল কবে? ওকে পরে জিজ্ঞাসা করতে ও হেসে বলেছিল: "কেন? জেলে। তোমার গুরুদেব কি বলেন নি যে জেলই ছিল তাঁর সাধনপীঠ?"

এখানে লক্ষ্য করবার এইটুকু যে, ও শুধু যে দেশ সম্বন্ধে মনে-প্রাণে একান্ত ছিল তাই নয়, মনেপ্রাণে চেয়েছিল সে ঐকান্তিকতাকে কর্মের মধ্য দিয়ে রূপ দিতে। দেশ দেশ ক'রে গদগদ হওয়া খুব কঠিন কাজ নয়—উচ্ছ্বাসের ঠেলায় অশ্রুসিক্ত হতে পারে মানুষ সহজেই—কিন্তু কোন্ কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে আদর্শ দেশসেবক হওয়া যায় তা নিয়ে মাথা বকাবার লোক দেশব্রতীদের মধ্যেও খুব কমই মেলে। সুভাষ ছিল স্বধর্মে দেশব্রতী, তাই পথসন্ধানে যে-আলোকেই ওর কাছে বরণীয় বলে মনে হত তাকেই ও বরণ করত সর্বান্তঃকরণে, আর বরণ করার পর দিনে দিনে সে-আলোয় নিজেকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে উঠে পড়ে লাগত অক্লান্ত উৎসাহে, উদগ্র তপস্যায়। এই তেজ ও নিষ্ঠা ছিল ওর চরিত্রের কবচকুণ্ডল।

আর কী পবিত্র! ওর মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে যে-সমাহিত গাম্ভীর্যের দীপ্তি নিত্যদীপ্যমান হয়ে পাঁচজনকে টানত সে-দীপ্তির মূলে ছিল ওর আবাল্য ব্রহ্মচর্য। শুধু যে কথাবার্তায় ও শ্লীল ছিল তাই নয়, ওর প্রতি ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠত চিত্তশুদ্ধির পাবন আভা। অনেকের মুখেই শুনেছি যে ওর কাছে খানিকক্ষণ বসে থাকার পরে তাঁরা নির্মল বোধ করতেন। এ-অভিজ্ঞতা আমার একবার নয় বারবারই হয়েছে। দুর্বলতার মুহূর্তে ওর কাছে ছুটে এসে পেয়েছি ঈপ্সিত পাথেয়—মনের জোর। একটা দৃষ্টান্ত দিই। এটা নমুনা হিসেবেই গ্রাহ্য, কারণ এরকম ঘটনা মাঝে-মাঝেই ঘটত।

বলেছি, আমি রাজনীতির আখড়াকে সুনজরে দেখতাম না। কিন্তু সুভাষের জন্যে সময়ে সময়ে পরোক্ষভাবে রাজনীতির মধ্যেও নামতে হয়েছিল—আর শুধু নামা নয়—একেবারে রংচঙে রঙ্গমঞ্চে! কীভাবে বলি:

তখন আমি রামমোহন লাইব্রেরি, ওভারটুন হল, প্রভৃতি নানা হলে চারিটি কন্সার্ট দিয়ে টাকা তুলি। সুভাষ ধরল রাজবন্দীদের জন্যে কন্সার্ট দিতে হবে বড় স্কেলে—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের রঙ্গমঞ্চে।

সুভাষের আদেশ: "জো হুকুম" বলে নেমে গেলাম। আমার সম্বলের মধ্যে কয়েকটি বালক বালিকা মাত্র। কিন্তু তিন চার হাজার টাকা তুলতে হলে আরো অনেক তোড়জোড় চাই তো। অগত্যা ধরলাম গিয়ে শিশির ভাদুড়ীকে। তিনি পিতৃদেবের চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত দৃশ্য ভিক্ষুকের সঙ্গে আলাপের সীনটি করলেন, আমি সাজলাম ভিক্ষুক এক বালককে "আয়রে" সাজিয়ে। থিয়েটারে এই আমার প্রথম নামা আর এই শেষ। অন্য কারুর অনুরোধে কখনই এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করতাম না কিন্তু সুভাষ সামনে বসে, ভয় কিসের?

শুধু এইটুকু নয়, আরো আছে। "এ কি

অগণন জলবালা পাথারে" ব'লে একটি সাগর নৃত্যের গান বেঁধে ধরলাম কুমারী রেবা রায়কে। তিনি নামলেন। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা ছাড়া সে সময়ে (১৯২৩।২৪-এ) কোনো গৃহস্থ মেয়েই প্রকাশ্যে স্টেজে নামত না।

বিপুল উৎসাহ। গেট-ক্র্যাশিং জনতা। বার হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রি। জয় ডেটোনিউয়ের জয়! সুভাষের জয়!

পরদিন কাগজে আমাকে মোক্ষম গালাগালি দিল—হিন্দুসমাজের কলঙ্ক ব'লে! ভদ্রঘরের মেয়েকে টেনে নাচানো—ধিক্! সুভাষের কাছে গেলাম একটু বিমর্ষ হয়েই। কারণ প্রকাশ্যভাবে, খবরের কাগজে এত গালাগালি আর কখনো খাইনি। সুভাষ হেসে বলল: "পথিকৃৎ যারা হয়, তাদের লোকনিন্দা তো অলংকার!"

ব্যস্, প্রফুল্ল মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম: যার সুভাষ আছে তার নেই কী?

* * *

আরো কয়েকটি ছবি: সুভাষ ও আমি দু'তিনবার লন্ডনে একসঙ্গে ছিলাম শ্রীশরৎকুমার দত্তের ফ্ল্যাটে—গোলডার্স গ্রীনে। বড় মনোরম পল্লী: হ্যাম্পস্টেডের কাছেই। বিলেতের একটি অতি শান্ত, সুভদ্র পাড়া। শ্রীশরৎকুমার দত্ত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জর্মনিতে আটক পড়েন। ওখানে বুঝি কি টেকনোলজিক্যাল বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন। জর্মন ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। তাঁর দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে তো জর্মনে বোলচাল দিত ঠিক জর্মনদের মতই। কচি বাঙালী শিশু দুটি বাপের সঙ্গে "Wissen Sie was ich meine" (আমি কী বলছি বুঝেছেন?) বা "Verzeihen Sie" (ক্ষমা করবেন) জাতীয় জর্মন বুকনির ফুলঝুরি কাটছে দেখে সুভাষ কী যে খুশি! এই সময় থেকেই ও জর্মন ভাষার দিকে ঝোঁকে (আমিও ঝুঁকি)। আরো ঝুঁকি শরৎবাবুর কাছে জর্মনদের হাজারো গুণপনার কথা শুনে। তাই তো প্রৌঢ় বয়সে ও জর্মন ভাষায় অবলীলাক্রমে দুর্দান্ত বক্তৃতা দিতে শিখেছিল।

শরৎবাবুর সম্বন্ধে সুভাষের খুবই উঁচু ধারণা ছিল। তিনিও ওকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীমতী দত্তও আমাদের স্নেহ করতেন ঠিক দিদির মতন। এ-দম্পতীর মধ্যে যে কী সুন্দর বনিবনাও ছিল—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। শ্রীমতী দত্তর গুণ ছিল অগুন্তি। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা, অতিথিদের যত্ন আপ্যায়িত করা, রান্নাবাড়া, সেলাই, গৃহকর্ম—কী না করতেন তিনি? তাঁদের ফ্ল্যাটে একটি চাকরানি পর্যন্ত ছিল না, শ্রীমতী দত্ত যাকে বলে গৃহস্থালীর জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব একাই সমাপন করতেন। আমি তাঁকে বলতাম: "আপনাকে দেখে মনে পড়ে ছেলেবেলাকার একটি ছড়া: "দুখানি হাতেই কত করি কাজ পারে না যা দশভুজা!" তিনি খুব হাসতেন আমার মুখে এ-ধরনের ছড়া শুনে।

শরৎবাবু জর্মনিতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাঁচ বৎসর আটক পড়েছিলেন ও একটি জর্মন ফ্যাক্টরীর শীর্ষস্থানীয় হয়ে খুব সুনাম কিনেছিলেন। এজন্যে শ্রীমতী দত্তের গর্বের অবধি ছিল না। তার উপর শরৎবাবুর এমন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ ছিল যে, ভিড়ের মধ্যেও তিনি হারিয়ে যেতেন না—গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে থেকে নিরন্তরই নিজের বৈশিষ্ট্যের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বেরিয়ে আসবার শক্তি ছিল যেন তাঁর সহজাত। সুভাষ তাঁর নানা মন্তব্য, মতামত ও উপদেশ খুব মন দিয়েই শুনত। তাছাড়া শরৎবাবু [illegible] তাঁর গল্পালাপের [illegible] সময়ে সমান খুব হেসেছি তাঁর [illegible] শুনে। সুভাষ যখন হাসত [illegible] গম্ভীরানন মুহূর্তে এমনই রূপান্তরিত হ'ত যে মনে হ'ত ঠিক যেন একটি ছোট শিশু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমার বিলেতের বন্ধুদের মধ্যে একজনও [illegible] হাসি সুভাষের হাসির [illegible] সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত। কেম্ব্রিজে সুভাষকে যারা অতিগম্ভীর বা অধিক [illegible] দিয়ে উড়িয়েছেন হাসি [illegible], তাদের জন্যে আমার দুঃখ হ'ত [illegible]: সুভাষকে [illegible] কাছ থেকে জানবার [illegible] সৌভাগ্য হয়নি [illegible]। [illegible] যে, সুভাষ [illegible] হাসিঠাট্টায়, কি [illegible] কালক্ষেপ করতে [illegible] নারাজ [illegible]। কিন্তু উৎকৃষ্ট রসিকতায়, সরস গল্পালাপে ও হাস্যকৌতুকের স্রোতে বেপরোয়া হয়ে গা ভাসিয়ে চলতে ও কোনদিনই পেছপাও হ'ত না। ওকে কেউ অরসিক বললে ও আমাকে ঠিকই বলত: "আরে! সরস কথা বললে তবে না রসিক হবার প্রশ্ন ওঠে। যারা হাসাতে চেষ্টা করে কেবল লোক হাসায় মাত্র, তাদের রসিকতার পণ্ডশ্রমে হাসাটাই কি অরসিকতার লক্ষণ নয়?" বলেই বলত: "দেখ তো শরৎবাবুকে—তাঁর কথায় কেউ না হেসে থাকতে পারে?"

এ হেন রসিকচূড়ামণির দু-একটা রসিকতার নমুনা দিলামই বা। একটু ভূমিকা করতে হবে কিন্তু।

শরৎবাবুর মেয়ে রমা খুব বুদ্ধিমতী ও চটপটে ছিল। পরে সে এলাহাবাদে আই এস সি-তে রসায়নে ২০০র মধ্যে ২০০ পেয়ে ডাফ বৃত্তিধারিণী হয়ে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বলে: "আপনাকেও [illegible]—কারণ ক্ষিতীশ ১৯১৬ সালে রসায়নে ২০০র মধ্যে ১৯৯ পেয়ে ডাফ পেয়েছিল।

কিন্তু রমার ছোট ভাই—তাকে আমরা "খোকা" বলে ডাকতাম—আদৌ বুদ্ধিমান ছিল না। শরৎবাবু বলতেন: "খোকার আমার মাথায় সবই আছে কেবল মস্তিষ্কটি নেই।" বলেই দেখতেন সুভাষকে ও আমাকে: "একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? [illegible] এমন কোন বাপ [illegible] "আমার কুলতিলকের কী বুদ্ধি!" [illegible]

আমি হেসে বলেছিলাম: "আপনার কথা [illegible] বুদ্ধিমান [illegible] বেলা— [illegible] এ-জাতীয় [illegible] শরৎবাবু [illegible] রসিকতাটি [illegible] করেছিলেন—সুভাষের তো [illegible]

[illegible] শরৎবাবু আমাকে বলেছিলেন: "[illegible] কে দিল [illegible]" [illegible] আমাকে কী [illegible]"

আমি: কী রকম?

শরৎবাবু: আর কী রকম?—সেখানে যাই [illegible] নয়। সেখানে [illegible] অবশ্য [illegible]—এ [illegible] এ [illegible]" তারপরেই [illegible] গরম হয়ে ওঠে বলি "দূরে ঘোড়ার ডিম! আমার নিজেরই ভালো লাগছে না—তা অপরের ভালো লাগবে কোত্থেকে?" হা হা হা?

(ক্রমশ)

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মম্মটভট্ট

এ যুগের মহাকাব্য (২): স্যাঁ-জন্ প্যার্স্

নিকস কাজানৎজাকিসের "ওডিসি" প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম যে, যদিচ আধুনিক মন মহাকাব্য রচনার প্রতিকূল, তবু এ-যুগের মহাকাব্য একেবারে প্রাগৈতিহাসিক সাহিত্যরূপে পর্যবসিত হয়নি। কাজানৎজাকিস্-এর মহাকাব্যটি তারি অন্যতম প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রামাণিক উদাহরণ হিসেবে স্যাঁ-জন প্যার্সের ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত "সৈকতচিহ্ন" (Amers) মহাকাব্যটির উল্লেখ করা চলে।

বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে প্যার্স-এর দু'একটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে থাকলেও পাশ্চমী কাব্যরসিকদের বিচারে তিনি যে ফ্রান্সের মহত্তম সমকালীন কবি হিসেবে স্বীকৃত, বছর দুই আগে প্যারী শহরে কিছুকাল কাটাবার আগে পর্যন্ত একথা আমার জানা ছিল না। অথচ প্যারীতে যে-কোনো লেখকগোষ্ঠীর সংগেই আলাপ করি না কেন সর্বত্রই শুনি এক পোল ভালেরি-কে বাদ দিলে প্যার্সের সমতুল্য কবিপ্রতিভা বিংশ শতকের ফরাসী সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়ে না। এলুয়ার, সুপারভিয়েল, মিশো, আরাগঁ, রেনে শার্—এঁরা প্রত্যেকেই সুপরিচিত এবং ভালো কবিতা লিখেছেন কিন্তু মহৎ কবি আখ্যা ভালেরি ছাড়া আর একজন মাত্র আধুনিক ফরাসী কবিকেই মানায় এবং তিনি হচ্ছেন স্যাঁ-জন প্যার্স। প্যারী শহরে, যেখানে প্রায় প্রতিটি অন্যান্য লেখকের নিজস্ব গুণগ্রাহী গোষ্ঠী রয়েছে, সেখানে এ ধরনের সর্বজনীন স্বীকৃতি পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। এক কথায় বলা যায়, আধুনিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে এলিয়টের যেমন প্রতিষ্ঠা, আধুনিক ফরাসী কবিদের মধ্যে প্যার্সের প্রতিষ্ঠা তারি সংগে তুলনীয়।*

অথচ, আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যাদর্শের বিবর্তনে এলিয়ট যেমন গভীর প্রভাব ফেলেছেন, আধুনিক ফরাসী কবিদের ওপরে প্যার্সের সেজাতীয় প্রভাবের কোন স্বাক্ষর চোখে পড়ে না। হয়ত এই জন্যেই প্যার্সের খ্যাতি অনেকটা তাঁর স্বদেশে সীমাবদ্ধ। কোন দল, মত, আন্দোলন বা ধারার হিসেবের মধ্যে তাঁকে খাপ-খাওয়ানো শক্ত। তাঁর কাব্যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার অভাব নেই; কিন্তু আধুনিক কাব্য বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক অথবা সমাজতাত্ত্বিক প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর কাব্যকে ব্যবহার করা স্থূলবুদ্ধি গবেষক-সমালোচকদেরও প্রায় অসাধ্য। অথবা তাঁর কবিতা থেকে একটি সিদ্ধান্তই করা যায় যে, প্রতিভার প্রকাশ যুগধর্মের দ্বারা চিহ্নিত হলেও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

কাব্যের সাধনা যে গদ্যের সাধনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সংগীতের রূপগত বিশুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হওয়াই যে কাব্যের অভীপ্সা, অভিধাকে গৌণ করে ব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দেওয়া যে কাব্যের ধর্ম, মালার্মের সময় থেকে ইউরোপের কবি এবং কাব্য-রসিকদের মনে এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। এই আদর্শের প্রথম সচেতন প্রবক্তা বোধ হয় এডগার অ্যালান পো। বোদলেয়ারের মারফৎ এই মার্কিন কবি-সমালোচকের আদর্শ ফরাসী কবিদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। পরে মালার্মের আজীবন সাধনার ফলে পশ্চিমের কবিদের মনে এই আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এঁর প্রভাবে আধুনিক কবিরা কবিতাকে আকারে সংক্ষিপ্ত এবং তার ভাষাকে অত্যন্ত গাঢ়বদ্ধ করতে শিখেছেন; অনুভব এবং দৈনন্দিন স্থূল অভিজ্ঞতা ও আবেগকে কাব্যের জগৎ থেকে সযত্নে নির্বাসিত করেছেন; ব্যাকরণ এবং অভিধানের সংযমকে অগ্রাহ্য করে শব্দের সংগীতধর্ম এবং ব্যক্তিগত প্রতীকের আশ্রয়ে কাব্যে ব্যঞ্জনা সঞ্চারে ব্রতী হয়েছেন। তার ফলে কাব্যের যথেষ্ট লাভ হয়েছে; এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সংগে সংগে আধুনিক কবির কল্পনার ব্যাপ্তি অনেক কমে গেছে; এবং আধুনিক কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

পার্স মালার্মেপ্রবর্তিত পথ অনুসরণ করেন নি। তাঁর কল্পনায় কবি শুধু শিল্পী নন, কবি দ্রষ্টা। এদিক থেকে মালার্মের চাইতে র‍্যাঁবোর সংগে তাঁর মিল বেশী। কিন্তু র‍্যাঁবোর কল্পনা যে ক্ষেত্রে অস্তিত্বের মূলে বিশুদ্ধ শূন্যতা আবিষ্কার করে শেষ পর্যন্ত মৌনে আশ্রয় নিয়েছিল, প্যার্স সেক্ষেত্রে মৃত্যুকে সৃষ্টির অলংঘনীয় শর্ত হিসেবে উপলব্ধি করে সত্তর বছর বয়সেও অস্তিত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত। শূন্যতা বোধের যন্ত্রণার সংগে তিনি মোটেই অপরিচিত নন। Anabase এবং Exil কাব্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি লিখেছেন, নাস্তিত্ব থেকেই মহৎ কবিতার জন্ম (Un grand poème né de rien)। শূন্যতা ছাড়া সৃষ্টি অকল্পনীয়। শূন্যতার একধারে যেমন মৃত্যুর যন্ত্রণা অন্যধারে তেমনি সৃষ্টির উল্লাস। প্যার্স তাই বলেছেন, একটি বই মানে একটি গাছের মৃত্যু (Un livre, c'est la mort d'un arbre)। হেরাক্লেইটস-এর মত তিনিও জানেন, দুবার একই নদী পার হওয়া যায় না; অস্তিত্বের প্রতিটি রূপ পলক না পড়তেই ভাঙছে, বদলাচ্ছে। কিন্তু সেই জন্যেই ত নিত্য নূতন রূপের উদ্ভব সম্ভবপর, আর তাইত' মানুষ স্রষ্টা। মানুষের মন এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে রূপের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জগতের নাস্তিত্ব থেকে কল্পনার অস্তিত্বে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা মানুষকে সৃজনধর্মী জীবের স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই সূত্রে মানুষ ঈশ্বরের সমকক্ষ; অথবা মানুষের ঈশ্বর-কল্পনার মধ্যে তার স্রষ্টা-চরিত্রেরই প্রতিফলন দেখা যায়।

উক্ত উপলব্ধির ফলে প্যার্স দর্শনকে কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত করেননি। উপরন্তু বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যেও তিনি শূন্যতা থেকে রূপে উত্তীর্ণ হবার সাধনা লক্ষ্য করেছেন। উত্তীর্ণ হবার অর্থ শূন্যতাকে অস্বীকার করা নয়, তার অর্থ আদি এবং অন্তের শূন্যতার মাঝখানে সৃষ্টির সেতুবন্ধ রচনা করা। এই সেতু-বন্ধের ওপর দিয়ে মানুষ আবার শূন্যতার মধ্যেই ফিরে যাচ্ছে বটে; কিন্তু উদ্ভব এবং বিলয়ের মাঝখানে তার অস্তিত্ব তার নিজেরই সৃজিত রূপের আলোকে উদ্ভাসিত। রূপ অনিত্য বলে নিরর্থ নয়; নিত্য-শূন্যতার পটভূমি রূপকে সৃষ্টির অর্থ-সম্পদে বিচ্ছিত্তিশালী করেছে।

প্যার্সের উপলব্ধি অনুসারে প্রতিটি মানুষের চেতনায় শূন্যতাবোধ এবং রূপের আকৃতির মধ্যে নিয়ত টানাপোড়েন চলেছে। এই টানাপোড়েনের সবচাইতে অর্থময় প্রকাশ কাব্য। তাই কবি মনুষ্যজাতির সর্বোত্তম প্রতিভূ। মালার্মে কাব্যকে সাধারণ জীবন থেকে বিযুক্ত করে তাতে বিশুদ্ধতা আনতে চেয়েছিলেন; প্যার্সের কাছে মানুষের সমগ্র জীবনই কাব্যের উপাদান। মালার্মের মত কাব্যাদর্শ নিয়ে তিনি কোনো তাত্ত্বিক বিচার করেছেন বলে

* St. Leger Leger, ELOGES (Nouvelle Revue Francaise, 1910); St. John Perse, ANABASE, 1924 (trans. by T. S. Eliot), Harcount, Brace; EXIL, 1942, (Exile and other Poems, Pantheon); VENTS, 1946; AMERS, 1957 (Seamarks translated by Wallace Fowlie, Pantheon). M. Saillet, St. John Perse, Poete de Gloire, 1952.

আমার জানা নেই; কিন্তু তাঁর কাব্য পাঠ করলে বোঝা যায় যে, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব কোনো কিছুই তাঁর সর্বগ্রাসী কল্পনায় অপাংক্তেয় বলে পরিত্যক্ত হয়নি। শব্দের ব্যঞ্জনাসামর্থ্য ছাড়া কবিকল্পনা নির্জীব হয়ে পড়ে, এ বিষয়ে তিনি অবহিত। কিন্তু তাঁর ব্যঞ্জনার উপাদান শুধু পূর্বসূরী কবিকুলের কাছ থেকে সংগৃহীত নয়, প্রকৃতি এবং মানব সংস্কৃতির বিচিত্র ঐশ্বর্যকে তিনি কাব্যের মালমশলা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা থেকে ধর্মশাস্ত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্য, মায় ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্র থেকেও তিনি শব্দ, উপমা এবং প্রতীক আহরণ করেছেন। বোদলেয়ারের সূত্রে মালার্মের গুরু যদি হন এডগার অ্যালান পো, তবে প্যার্সের পূর্বসূরী হিসেবে ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যানের উল্লেখ হয়ত একেবারে অযৌক্তিক নয়। এ যুগের আরেকজন মহাকাব্য রচয়িতা এজ্‌রা পাউন্ড একদা পো এবং হুইটম্যানের বিকল্পের মধ্যে পথ বাছতে না পেরে ছটফট করেছিলেন। "ক্যান্টোস্" মহাকাব্যে তাঁর সেই দ্বিধা-বিভক্ত আনুগত্যের বিস্তর প্রমাণ আছে। পাউন্ডের তুলনায় প্যার্সের কল্পনা বৈচিত্র্যে দরিদ্র নয়: কিন্তু আরিস্টটল যাকে সার্থক কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলেছিলেন, পাউন্ডের মহাকাব্যে সেই "অর্গ্যানিক ইউনিটি"র অনুপস্থিতি অত্যন্ত পীড়াদায়ক। প্যার্সের কাব্য সেই গুণে বিশেষ সমৃদ্ধ।

সাধারণ জীবন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এবং প্রাণশক্তির অমিত প্রাচুর্যই শুধু প্যার্সের সঙ্গে হুইটম্যানের একমাত্র যোগ-সূত্র নয়: তাঁদের রচনারীতির মধ্যেও সুস্পষ্ট আত্মীয়তা লক্ষ্যনীয়। মালার্মে কাব্যে সঙ্গীতের সামীপ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন: দীর্ঘ বাক্যবন্ধে রচিত প্যার্সের কবিতা অকুণ্ঠভাবেই গদ্যাভিমুখী। সে গদ্যের গঠন বাইবেলের গদ্যের মত, ছন্দময় তরঙ্গিত। ছোট, বড়, মাঝারি, বিভিন্ন আকারের ধ্বনিতরঙ্গ, যার ওঠাপড়া, থামা গদ্যের মত অর্থের নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অথচ যার তাল রক্তে দোলা লাগায়। তাঁর কাব্যের মুক্ত ছন্দ স্মরণ করায় ইংরেজি অনুবাদে ওল্ড টেস্টামেন্টের কথা, হুইটম্যানের কবিতার কথা, কখনো বা পাউন্ডের ক্যান্টোজ্-এর কথা। তা পাঠকের মনে গুনগুনানির প্রতিধ্বনি তোলে না: তার ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা আবৃত্তির দ্বারাই পরিস্ফুট হয়।

তবে প্যার্সের কল্পনার ব্যাপ্তি স্থান-কাল-পাত্রে হুইটম্যানের চাইতে অনেক বেশী দূরবিস্তৃত। আদিম গোষ্ঠিসমাজ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পারমাণবিক সভ্যতা, গোবি মরুভূমি থেকে সমুদ্রবেষ্টিত প্রবাল দ্বীপ, সঙ্ অব্ সংগস্-এর নিটোল দেহ-সর্বস্ব প্রেম থেকে আধুনিক নায়ক-নায়িকার আর্ত আত্মপ্রত্যয়হীন আত্ম-পরিক্রমা—প্যার্সের কল্পনা প্রায় সর্বত্র সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিচরণশীল। শব্দশিল্পী হিসেবেও হুইটম্যানের চাইতে নিপুণতা তাঁর অনেক বেশী; মালার্মের পন্থা অনুসরণ না করলেও প্রতীকবাদী কবিদের কাছ থেকে তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গাঢ়বন্ধ প্রকাশরীতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শব্দচিত্রের উদ্ভাবনে তাঁর ক্ষমতা প্রায় নৈসর্গিক এবং তাঁর কাব্যদেহে শব্দচিত্রের প্রাচুর্য প্রায় কোনো সময়েই শুধুমাত্র অলংকারে

পর্যবসিত হয়নি; কল্পনার ঐক্যে তারা পরস্পরের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে এক সাবয়ব সমগ্রতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। প্যাসের্র আলোচনা প্রসঙ্গে এলিয়ট তাই লিখেছেন যে, তাঁর শব্দচিত্রের আপাতবিশৃঙ্খল প্রাচুর্যের মধ্যে কল্পনার অখণ্ড যুক্তিবন্ধ আবিষ্কার করে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। অ্যারিস্টটল উক্ত "অর্গ্যানিক ইউনিটি" অথবা এলিয়ট-উল্লিখিত 'লজিক অব্ ইম্যাজিনেশ্যন"-এর প্রতি নিষ্ঠা প্যাসের্র গদ্যাভিমুখী কাব্যকে অতিকথনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গুয়াদালুপের কাছে এক প্রবাল দ্বীপে তাঁর জন্ম; এখানে তাঁর বাবার এবং গুয়াদালুপে তাঁর মার কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল। জন্মসূত্রে তাঁর নাম আলেগ্জিস-লেজে। শৈশবকাল এই অঞ্চলে কাটিয়ে তারপর তিনি কৈশোরে শিক্ষার জন্যে ফ্রান্সে আসেন। প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার বছরে তিনি ফরাসী ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে যোগদান করেন; এই সূত্রে ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর চীন এবং গোবি মরুভূমিতে কাটে। (এই সময়কার অভিজ্ঞতা Anabase কাব্যের মুখ্য উপাদান।) ১৯২২ সালে তিনি দূরপ্রাচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওয়াশিংটনে "নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন"-এর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রিয়াঁর সহকর্মী; ১৯৩২ সালে তিনি ফরাসী সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের স্থায়ী সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর আরো অনেক দেশপ্রেমী ফরাসীর মত তিনিও ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে আসেন। এখান থেকে কানাডা হয়ে তিনি আমেরিকায় যান; সেখানে লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেসের ফরাসী বিভাগে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। এখন তিনি আমেরিকার অধিবাসী। দায়িত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সাহিত্য-সাধনার এই আশ্চর্য সমন্বয়ের দিক থেকে তিনি স্তাঁদালের সুযোগ্য অনুগামী।

প্যাসের্র প্রথম কাব্যগ্রন্থ Eloges বা "প্রশস্তি" প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে; এই গ্রন্থে তিনি সাঁ লেজে-লেজে নাম ব্যবহার করেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি এ নাম ত্যাগ করে সাঁ-জন প্যার্স এই ছদ্ম নাম গ্রহণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Anabase প্রকাশিত হয় চোদ্দ বছর পরে, ১৯২৪ সালে; স্প্যানিশ, জার্মান, ইতালিয়ান, রুশ, গ্রীক ইত্যাদি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে; ইংরেজি অনুবাদ করেছেন স্বয়ং টি এস এলিয়ট। প্রথম কাব্যগ্রন্থের উপাদান মুখ্যত তাঁর শৈশবের দ্বীপবাসী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। Anabase-এ তিনি মধ্য-এসিয়ার পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। এলিয়ট এই কাব্যের তর্জমা করতে গিয়ে যে মুখবন্ধটি লিখেছিলেন তা থেকে প্যার্সের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে কিছু সূত্রের সন্ধান মেলে। সেখানে তিনি প্যার্সের কল্পনার জটিল সুসম্বন্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই কাব্যের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়টিও বিশেষ লক্ষণীয়। কবি পরিচিতের জগৎ থেকে অপরিচিতের জগতে নিজেকে নিরন্তর নির্বাসিত করে চলেছেন; কিন্তু সে-নির্বাসনের উৎস ব্যর্থতাবোধ নয়, অপরিচিত দেশকে আবিষ্কার করে তাকে নিজের আয়ত্তাধীন করার অভীপ্সাই এই স্বেচ্ছানির্বাসনের মূলে প্রেরণা। কাজানৎজাকিসের ওডিসিয়ুসের মত প্যার্সের কবি-বিজেতাও অপরিচিত দেশ আবিষ্কার এবং জয় করার পর আবার নতুন অজ্ঞাতের সন্ধানে যাত্রী। কবি শব্দ প্রয়োগের দ্বারা শূন্যতাকে জয় করে তাকে রূপের মধ্যে আকার দিচ্ছেন; কিন্তু শূন্যের বিস্তার সীমাহীন এবং তাই তাকে জয়ের সাধনাতেও কোনো শেষ পূর্ণচ্ছেদ অকল্পনীয়। অর্থাৎ প্যার্সের বিজেতার স্বেচ্ছা-নির্বাসন একান্তভাবেই অনতিক্রম্য।

প্যার্স যে-নির্বাসনের কথা কল্পনা

মৃগতৃষ্ণা

যজ্ঞেশ্বর রায়

গলিটা কালীঘাট বাজারের উত্তর দিকে কালীঘাট রোড থেকে বেরিয়ে আদি গঙ্গার পারে ঝোপ জঙ্গল আবর্জনার মধ্যে হারিয়ে গেছে। তারই দু' পাশে কতক বসতি। অর্ধকুলীন পতিতা পল্লী।

এখানেই এসে উঠেছিল চঞ্চলা। পুলিসের তাড়া খেয়ে খেয়ে, পেশার উজান ভাটা বেয়ে বেয়ে চিৎপুর বেলগাছিয়া নারকেলডাঙ্গা হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে নতুন। বয়স তার বেশী নয়। পঁচিশ—সাতাশ। দোহারা গড়ন। দেখতে ভাল। বড় বড় চোখ। ফুলো ফুলো গাল। কোমর ভারী বলেই হয়তো চলন ধীর। এমন চেহারার মেয়েরা চঞ্চল হয় না বড়। কিন্তু পেশায় আর পরিবেশে কি না হয়। নাম মাহাত্ম্যেও কিছু হয় বোধ হয়। পেশাকে পয়মন্ত করতে সে তার নামকে সত্য করে তুলেছে। বিপরীত স্বভাবে শান দিয়ে দিয়ে সে চটুল হয়ে উঠেছে। বড় বড় চোখ দুটো ক্ষণে ক্ষণেই চাপা হাসিতে থর থর করে। ভ্রূ বেঁকে যায়। গালে টোল পড়ে। সারা শরীর দুলে ওঠে ঢেউয়ের মত।

কিন্তু এ স্বভাব যাদের পছন্দ গোবিন্দ তাদের দলে নয়। এ সব তার দু চোখের বিষ। ক'দিন ধরেই দেখছিল সে। একদিন তার পাশের দোকানদারটির কাছে সহজ গলায় বললোঃ মেয়েটা কি বেহায়া রে, বাজার করতে আসে তাতেও ওর কত ঢং আর ঢলানি দেখ না।

পাশের দোকান হরকুমার দাসের। সে বয়সে বিগত যৌবন আর স্বভাবে সংস্কারমুক্ত। হেসে বললোঃ ওরা শুধু কিনতেই আসে না, কিছু লাভ করতেও আসে।

—হুঁ, ওরকম ঢং দেখতে মানুষের বয়ে পড়েছে। নাক সিঁটকায় গোবিন্দ।

হরকুমার জবাব দেয় না। কিন্তু হাসিতে যোগ দেয়। তারপর বলেঃ কিন্তু তোর দিকে ওর যেন দিন দিন ঝোঁক বাড়ছে। প্রথম প্রথম আমার দোকানে ঢুকতো সকলের আগে। এখন সব-প্রথমেই তোর দোকানে।

—তোর যে শুধু মুদিখানা। আমার যে স্টেশনারীও আছে।

—স্টেশনারী কি এ বাজারে আর কারো নেই, তোর আগের দোকানে নেই? কিন্তু নির্মল হাজরার মত শুকনো আমসিদের মনে ধরে না ওদের। একটা শক্ত-সমর্থ সুন্দর পুরুষ মানুষও চায় বোধ হয়।

—হ্যাঁ, শকুনের লোভ!

—আরে নারে, না, ওরা প্রেমে পড়তেও জানে।

—দূঃ, বেশ্যার আবার প্রেম!

হরকুমার চোখ নাচিয়ে হেসে ওঠে।
—দোষ কিরে তাতে। তোর বউ মরে গেছে

সেদিন, আর একটা বিয়ে করবার আগে বউদিই না হয় একজনের আদর যত্নের শেকলে বাঁধা। খাচ্ছিস তো হোটেলে, শুচ্ছিস তো দোকানে। কি সুখে আছিস বল্।

একটা কর্কশ কঠোর মুখভঙ্গী করলো গোবিন্দ। মারমুখো গোবিন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে হরকুমার চুপ হয়ে গেল।

গোবিন্দ প্রতিজ্ঞা করলো 'ওই মেয়েছেলেটাকে প্রশ্রয় দেবে না সে কোন মতে, মানেই বেচবে না সে তার কাছে।

কিন্তু দু'দিন পরেই একটা লম্বা ফর্দ গোবিন্দর সামনে যখন ফেলে দিল চঞ্চলা, বললো—'এ মালগুলো দিন অমুক।' গোবিন্দ তার প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল। ফর্দটায় কমসে কম তিরিশ টাকার মাল হবে। হয়তো তারও বেশী। গোবিন্দ ফর্দ

খালিয়ে দোকানে কি আছে না আছে দেখছিল। চঞ্চলা একটু হেসে বললো—'যা আছে তাই দিন। যা নেই কাল পরশু এনে দেবেন। আমার তাড়া নেই কিছু। সব সময় সব মনে থাকে না। তাই ফর্দ বানিয়েছি। এই সেদিনও সব মনে থাকতো। সেই মন যে কোথায় হারিয়ে গেল!" কথা শেষ করে ঠোঁট টিপে যেন হাসল একটু মেয়েটা।

গোবিন্দ সেদিকে তাকিয়ে সাবধান হয়ে উঠলো। তিরিশ টাকার একটা ফর্দ পেয়েই মনের অর্গল আলগা হয়ে গিয়েছে গোবিন্দর। নিজের অজ্ঞাতেই চঞ্চলাকে সে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছে। কি দরকার তার চঞ্চলার সঙ্গে ইয়ার্কি মারবার। শুধু ইয়ার্কি নয়। এ বুঝি তার থেকেও বেশী। মনের মধ্যে প্রতিরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললো গোবিন্দ। খদ্দের রাখার জন্য যতটুকু হৃদ্যতা দেখানো দরকার, দরকার যতটা অভ্যর্থনা তার বেশী এক তিল প্রশ্রয় দেবে না সে চঞ্চলাকে। মনের বৈঠকখানা পেরিয়ে অন্দর মহলে...ওই দিকেই নজর চঞ্চলার। ভাগ্যিস তাকে সাবধান করে দিয়েছিল হরকুমার। নয়তো অজ্ঞাতসারে সে হয়তো...। শিউরে উঠলো গোবিন্দ। নাঃ, মরে গিয়ে মনটাকে বড্ড কাঁচা করে দিয়ে গেছে বউ। এমন সময় চঞ্চলার আবির্ভাব ভয়ের বই কি। খুবই ভয়ের। লক্ষ্মণ কাকার দশা হয়ে যেতে পারে তার। কাকি যখন মারা গেল কাকার তখন মতিচ্ছন্ন অবস্থা। খাওয়া না, ঘুম না, বাড়িতে থাকে না। লোকে বলতো, লক্ষ্মণ বউর শোকে পাগল হয়ে গেছে। গোবিন্দর তখনও বিয়ে হয়নি। বউ মরার শোক কি সে জানতো না। আর সকলের সঙ্গে সেও হাসতো। কিন্তু আজ হাসি আসছে না, ভয় হচ্ছে। লক্ষ্মণ কাকার মতই তার বুকটাও হু হু করছে। নিজেকেই দু মুঠো অন্নের জোগাড় চাই, ছেলেটারও ভবিষ্যৎ দেখতে হবে, নইলে সেও কি আজ মতিচ্ছন্ন না হয়ে থাকতে পারতো। সেই মতিচ্ছন্ন লক্ষ্মণ কাকাকে পেয়ে বসেছিল এমনি একটা মেয়েছেলে। কাকা তার বউর শোক ভুলতে তারই বুকের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজতে চেয়েছিল। বিনিময়ে কাকাকে কি না দিতে হয়েছেঃ সর্বস্বান্ত হয়ে শুধু বিষয়-আশয়ই নয়, বত্রিশ বছরের অমন শক্ত স্বাস্থ্যটাও। হাসপাতালে ফেলে মাগী কোথায় উধাও হলো তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না। উঃ, কি কষ্ট পেয়েই না কাকা মরলো হাসপাতালে। না, না, গোবিন্দ তা ঘটতে দেবে না নিজের জীবনে। গোবিন্দ শক্তই ছিল আরও শক্ত হলো।

—আপনি বাজার করে আসুন,

এর মধ্যে আমার সব মাপা জোকা ধাঁধাছাদা হয়ে যাবে।

—বেলা দশটাতক কেউ বাজার ফেলে রাখে নাকি! চঞ্চলা জবাব দিল, "আমার বাজার সারা। এখন আপনারটা সারুন, আমি দেখি।"

একটা অসোয়াস্তির অবস্থা। চঞ্চলা তার লোভী চোখ দিয়ে তাকে চাটবে, খুড়বে। গোবিন্দ মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু আর কিছু বলে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদেয় করে দেবার জন্যে দ্রুতহাতে ফর্দের মাল মেপে চলে।

চঞ্চলা বলে—উঃ কি তাড়াতাড়িই না আপনি কাজ করতে পারেন, আশ্চর্য, যেন মেশিন।

—আমার তো একটা খদ্দের নিয়ে থাকলে চলে না।

—কিন্তু এখন তো আর কোন খদ্দের নেই।

—এসে পড়তে কতক্ষণ। তয়ের থাকতে হয়। হাতে কাজ দেখলে খদ্দের অন্য দোকানে চলে যায়. আপনার মত দাঁড়িয়ে থেকে মাল কেনার মত সময় হাতে থাকে না সবার।

কথা বলতে বলতেই গোবিন্দ দ্রুত হাতে কাজ শেষ করে। একটু পরেই সব বেঁধে-ছেঁদে সামনে রাখে চঞ্চলার। তারপর ফর্দের ওপরে দর ফেলে যোগ দিয়ে বলে—আপনার হয়েছে গিয়ে ছাব্বিশ টাকা দশ আনা।

চঞ্চলা তিনখানা দশ টাকার নোট ফেলে দেয়। খুচরো ফেরত দিতে দিতে গোবিন্দ বলে—তিনটে মাল আপনাকে দিতে পারলাম না আজ। কাল, পরশু......

—যেদিন খুশি দেবেন। বলেছি তো তাড়া নেই কিছু আমার।

মালগুলি ব্যাগে তুলে একটা সরস দৃষ্টিতে গোবিন্দর দিকে তাকালো চঞ্চলা।

ছাব্বিশ টাকা দশ আনার মাল বেচে গোবিন্দর মন খুশী। যেমন অন্যান্য শাঁসাল খদ্দেরকে বলে তেমন করে বললো—আসবেন আবার। যখন যা দরকার হয়......

চঞ্চলা একটা তির্যক কটাক্ষ হেনে বললো—ওঃ, নিশ্চয়।

চঞ্চলা চলে গেল। হরকুমার উঁকি মেরে বললো—কি রে সেদিন না খুব সতীপনা দেখাচ্ছিলি। এখন কি হলো। খুব কিছুক্ষণ তো ফষ্টি নষ্টি করলি। মন হারানো, মন পাওয়া—যাবার সময় অসবেন আবার...... এক দিনেই এত!

হরকুমার আড়ি পেতেছিল। গোবিন্দ মনে মনে তেতে উঠলো। কিন্তু জবাব যখন দিল উত্তাপ প্রকাশ পেলো না। শান্ত কণ্ঠেই বললো—প্রথম প্রথম বলতে হয়। সে যেই হোক, খদ্দের লক্ষ্মী, তাকে তো অবজ্ঞা করতে পারিনে।

—আজ যাকে অবজ্ঞা করতে পারলি নে, দেখিস কাল যেন তাকে মন দিয়ে ফেলিস নে।

—হরকুমার তুই ভুলে যাসনে, আমি একটা ছেলের বাপ, বউ মরেছে, কিন্তু তার জিনিস রেখে গেছে আমার কাছে। কথাটা যেন নিজেকে শোনালো গোবিন্দ।

হরকুমার হেসে উঠলো—ছেলে, তবু তো বউ নেই! কত দেখলাম, ছেলে বউ সংসার ফেলে ওই গঙ্গার পারের পাঁকে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। আমিও একদিন বাপ ছিলাম রে, কিন্তু কিছুই কিছু নয়।

হরকুমার গোবিন্দর মনের কাঁচা প্রাচীরটাকে আলগা করে দিতে চায়। ওর দল ভারী করতে চায় হরকুমার। গোবিন্দ ওর গল্প না শুনে কাজের অছিলায় কেটে পড়লো।

❁

আজকাল প্রায় প্রত্যহই আসে চঞ্চলা। খদ্দেরের অতিরিক্ত প্রশ্রয় গোবিন্দ তাকে দেয় না কখনো, তবু আসে। টুকিটাকি মাল কেনে দু' চারটে কথা কয়। চলে যায়।

একদিন এসে গোবিন্দর দিকে চেয়ে আঁতকে-ওঠা কণ্ঠে সে বলে উঠলো—কি হয়েছে গো জ্বরটর নাকি? চেহারা এমন শুকনো খসখসে কেন, চোখ ছল-ছলে?

কথাটা খট্ করে কানে বাজে গোবিন্দর। কপাল কুঁচকে যায়। বলে—না তেমন কিছু নয়। সামান্য সর্দি জ্বর। তা আপনার কিছু চাই? গোবিন্দ টুলে বসে একটা ডালের বস্তার ওপরে কাত হয়েছিল। সোজা হয়ে বসলো।

—না না। কিছু না। ......একটু বার্লি জ্বাল দিয়ে এনে দেবো? নেবু, বার্লি, সর্দির মুখে খুব ভাল লাগবে।

—না। আপনি ভাববেন না। একদিন নির্জলা উপোস দিলেই ভাল হয়ে যাবো।

—উঁহু, নির্জলা উপোসে পিত্ত পড়বে।

গোবিন্দর শুষ্ককণ্ঠের নিরস উক্তি চঞ্চলাকে বারবারই বিঁধছিল। তবু সে এগিয়ে এলো—'কপালে একটু হাত দিয়ে দেখব।'

—না। রুক্ষ স্বরে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল গোবিন্দ।

চঞ্চলা সরে এল। মাথা নত করে বললো—কপালে হাত দিতে না দিলেও বেশ বুঝতে পারছি, খুব জ্বর। বার্লিটা অন্তত জ্বাল দিয়ে আনি। এমনভাবে আনবো কেউ দেখবে না।

গোবিন্দ মুখ ফিরিয়ে বললো—আপনি যান এখন। বলে সে নিজেই উঠে ভেতরে চলে গেল।

......কে যেন হাত বুলোচ্ছে চুলের মধ্যে। কার নিঃশ্বাস যেন ক্ষণে ক্ষণে লাগছে এসে মুখে।

—কে, কে?

—আমি হরকুমার, কেমন লাগছে এখন।

—কি ব্যাপার রে?

—জ্বরে অচৈতন্য হয়ে প্রলাপ বকছিলি। ডাক্তার এসেছিল। ইনজেকসন দিলো। ওষুধ পথ্য খাওয়ালাম, টের পেয়েছিস কিছু?

—মনে পড়ছে না ভাই।

—কাল রাতে চঞ্চলাও এসেছিল।

—চঞ্চলা? গোবিন্দর কপালে কয়েকটা কঠিন রেখা দেখা দিল।

—চটিস্ কেন? বেচারা আমার কাছে তোর জ্বরের কথা শুনে......

গোবিন্দ পাশ ফিরে শুলো।

হরকুমার বললো—ভয় পাসনে। কেউ জানে না। তোর ওই ভেতরের ঘরের দরজা খুলে পেছনের গলি দিয়ে......

গোবিন্দ হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো। হরকুমার ভয় পেয়ে থেমে গেল।

চারদিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল। গোবিন্দরও তাই হয়েছিল। দিন সাতেক বেশ ভুগে সুস্থ হয়ে উঠলো গোবিন্দ। আর সুস্থ হয়ে উঠেই দোকান খুলে বসলো সে। হরকুমারের কাছে সব শুনেছিল চঞ্চলা তাই আর সে নিজে আসেনি, হরকুমারের কাছ থেকেই খোঁজ খবর নিয়েছে। আজ গোবিন্দ দোকান খুলেছে দেখে সে দোকানে ঢুকলো।

—ইস্ কি চেহারা হয়েছে কদিনের জ্বরে। ভাল করে বোধ হয় এখনো সেরেও ওঠেননি। কেন দোকান খুলেছেন আজ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গোবিন্দ শুধোলো—আপনি আমাকে দেখতে এসেছিলেন?

কেমন একরকম ভয় ভয় করলো চঞ্চলার। একটু চুপ করে থেকে চাপা গলায় বললো—হাঁ।

—আর কোন দিন এরকম আসবেন না। মনে রাখবেন, খদ্দের দোকানদার ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

যা ভয় করেছিল তার থেকেও ভয়ানক আঘাত পেল চঞ্চলা। চঞ্চলার মুখের ওপরেই যেন চাবুক মারলো গোবিন্দ। চঞ্চলা মুখ ফিরিয়ে নিল। পাথর হয়ে গেল যেন ক্ষণ কালের জন্যে। তারপর উদ্গত কান্নাটাকে সবলে চেপে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

সেদিনের পরে কয়েক দিন আর আসেনি চঞ্চলা। বাজারেই আসেনি। কিন্তু একদিন আর থাকতে না পেরে ধীরে ধীরে এসে দোকানে উঠে দাঁড়ালো। খালি দোকান। গোবিন্দ কোথায় গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে চলে যাবে কিনা ভাবছে হঠাৎ ভেতর

থেকে একটা কাঁচ গলার জিজ্ঞাসা ভেসে এলো—কি চান? সংগে সংগেই একটি বছর ছ' বয়সের ফুটফুটে ছেলে বেরিয়ে এলো। —একটু দাঁড়ান, বাবা মাছ কিনতে গেছে এক্ষুনি আসবে।

বাবা! হকচকিয়ে গেল চঞ্চলা। 'গোবিন্দবাবু তোমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—অ্যাদ্দিন তুমি কোথায় ছিলে?

—পিসিমার কাছে। পিসিমার অসুখ করেছে বলে পিসেমশায় কাল আমাকে বাবার কাছে রেখে গেছেন।

—তোমার নাম কি?

—ফটিক।

—বাঃ বেশ নামটি তো তোমার।

ফটিক এলো না। সলজ্জ ভংগীতে দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। একটু পরেই চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো—ঐ যে, বাবা এসেছে।

চঞ্চলা গম্ভীর হয়ে গেল। গোবিন্দ দোকানের পেছনে মাছ রেখে এসে দাঁড়ালো —কি দেবো আপনাকে?

—সাবান একটা।

পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এল চঞ্চলা। কয়েক পা গিয়ে কিসের টানে আবার ফিরে চাইল। দেখলো বাপের পিঠের ওপরে ঝুকে ফটিক তার বাপের গালে গাল চেপে ধরেছে। বাপ আদর করছে ছেলেকে।

কেমন একটা অনুভূতিতে গা শির শির করে উঠলো চঞ্চলার।

এর পর থেকে ফটিক যেন বাজারের প্রধান আকর্ষণ চঞ্চলার। গোবিন্দ দোকানে থাকলেও চঞ্চলা ফটিককেই ডাকে।—ফটিকবাবু দু' আনার মুড়ি। ফটিক এখন দোকানদারীও করে। ঝুলোনো পাল্লায় মাপতে পারে। পয়সা গুণতে পারে। বাপ সাহায্য করে। শেখায়। ছ' বছরের ফটিক শিখেছে অনেক। লেখাপড়া নয়, দোকানদারী। গ্রামে পিশেমশায়েরও মুদীর দোকান। সেখানেই তার হাতে খড়ি। তবে বাপ যেমন আদর করে যত্ন করে শেখায় সেরকম ভাবে নয়। গাল খেয়ে, কানমলা খেয়ে, চড়টা চাপড়টা খেয়ে। অনেকদিন ঐ খেয়েই থাকতে হয়েছে, ভাত জোটেনি। অপরাধ? খদ্দেরকে হয়তো ওজনে বেশী দিয়েছে, নয়তো পয়সা কম নিয়েছে। চঞ্চলা শুনে গালে হাত দিয়ে বলেছে—ওমা এইটুকু ছেলেকে এই রকম মেরেছে, খেতে পর্যন্ত দেয় নি! কি পাষণ্ড পিসেমশায়, বাব্বা! আর কখখনো সেখানে যেয়ো না তুমি।

—যাবো নাই তো। বাবাকে আমি বলেছি।

গোবিন্দ ছেলেকে দোকানে বসিয়ে যখন খিদিরপুর ক্যানিং স্ট্রীটে মাল কিনতে যায় চঞ্চলা এসে গল্প ফাঁদে। চঞ্চলা ফটিককে ভজিয়ে ফেলেছে। ফটিক আজকাল মা ডাকে চঞ্চলাকে। তবে সবার সামনে নয়। কেউ যখন আশেপাশে থাকে না, তার বাবাও না, তখন। হঠাৎ ওর হাত দু' খানা ধরে নিকটে নিয়ে এসে চঞ্চলা বলে—ডাকতো বাবা, যত বার ডাকবে ততটা রাজভোগ দেবো। রাজভোগের লোভেও ফটিক অনেকবার ডাকতে পারে না। অনাহূতকে কত আর ডাকতে পারে। তবু যে কবার ডাকে তাতেই চঞ্চলার মুখে চোখে কি যেন হয়। কিসের আঁচে মুখ চোখ রাঙা হয়ে ওঠে। ছল ছল করে ওঠে চোখ। দুই হাতে ফটিককে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

ফটিক বুঝে ফেলেছেঃ তার বাবা এই মেয়েটিকে পছন্দ করে না। ওইটুকুন ছেলে তাই এখনই তার বাপকে না জানিয়ে চুপ করে চলে যায় চঞ্চলার কাছে। রাজভোগ খায়। কোলে বসে খায়। আদর করে খাইয়ে দেয় চঞ্চলা। তারপর মুখ ধুইয়ে একটা এলাচ বা লবংগ মুখে ফেলে দেয়। একটা চুমু খেয়ে বলে—এবার বাবার কাছে যাও, তোমাকে হয়তো খুঁজছে।

সত্যি খোঁজে গোবিন্দ। ফটিককে পেলেই গম্ভীর গলায় শুধোয়—কোথায় ছিলি। ফটিকও গম্ভীর সে বলে—কেন ওইখানে, ওই আলু পটল ঝিঙে......

—আলু পটল ঝিঙে! আমি সারা বাজার খুঁজে তোকে পেলাম না।

—ভিড় কিনা তাই তুমি দেখতে পাওনি। ফটিক চটপট মিথ্যে কথা বলে আজকাল। বাপ ধরতে পারে না। ফটিক কোথায় যায়। কখন যায়।

তবু একদিন ধরা পড়ে যায় ফটিক। খুব করে বকে দেয় ফটিককে গোবিন্দ। 'কক্ষনো যাবিনে। ও তোর কেউ নয়।'

চঞ্চলাকে কিছু বলে না। বলতে তার সম্মানে বাধে। নিজের সন্তানকে সে নিজে সামলাতে পারে না, এটা সে অপরকে বলবে কেমন করে। অথচ বলা দরকার। চঞ্চলার স্পর্ধা দিনের দিন বেড়েই যাচ্ছে। সে তাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল সরাসরি। পারেনি। এখন ছেলেকে আপন করে তাকে পেতে চায়। ভেবেছে কান টানলে মাথা আসে। সমঝে দিতে হবে।

গোবিন্দর মনের মধ্যে যখন এই রকম উষ্মা তখন একদিন। বেলা বারোটা বাজে। ফটিকের পাত্তা নেই। সমস্ত বাজার, বাজারের আশপাশ ঘুরেও যখন আর তাকে পাওয়া গেল না তখন এক উন্মত্ত ক্রোধের উত্তেজনা নিয়ে গোবিন্দ ছুটে গেল সেই পাড়ায়। এই প্রথম সে এলো। কোথায় চঞ্চলার ঘর সে জানে না। কিন্তু এখানে সকলেই ফটিককে চেনে। ফটিকের বাবাকেও। তাকে দেখে তাদের বুঝতে বাকি রইল না, এই অসময়ে গোবিন্দর এ বাড়িতে আবির্ভাব ছেলের খোঁজে। তারা তাকে চঞ্চলার ঘর দেখিয়ে দিল।

আজ বড় দেরী হয়ে গেছে চঞ্চলার। ফটিককে যেদিন খাওয়ায়, দশটা, সাড়ে দশটার মধ্যেই খাইয়ে দেয়। কিন্তু আজ ভুল করে ফেলেছে চঞ্চলা। সব গুলিয়ে দিয়েছে ফটিকই। অন্যদিন কিন্তু এমন করে না। কাছে বসে খেলা করে, বক বক করে। আজ তার কি খেয়াল হয়েছিল, চঞ্চলা রাঁধছিল আর সে তার পিঠের ওপরে পড়ে দোলা খাচ্ছিল। ফটিকের নধর কচি দেহের ঘষায় ঘষায় তার মনের মধ্যে ফেনিয় উঠছিল একটা রোমাঞ্চকর স্নেহরস। চঞ্চলার শিরায় শিরায় তা নেশার মত ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

সে নেশার মধ্যে মগ্ন থেকে সময়ের কথা ভুলে গিয়েছিল চঞ্চলা।

ফটিকের মুখে দু' চারটে গ্রাস দিয়েছে কি দেয়নি চঞ্চলা, এমন সময় গোবিন্দ ঘরের মধ্যে পা দিয়ে ফেটে পড়লো। বেশ্যার আবার ছেলে কোলে বসিয়ে আদর করে খাওয়ানো!

পাথর হয়ে বসে রইল চঞ্চলা। কিছুই বলতে পারলো না। তার নিজের ছেলেকেও এমনি করে একদিন কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল তার বুক থেকে, কিছুই বলতে পারেনি সে। দর বিগলিত ধারায় চঞ্চলার দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এই তো সেদিন মাত্র। পাঁচ বছর আগেকার কথা।
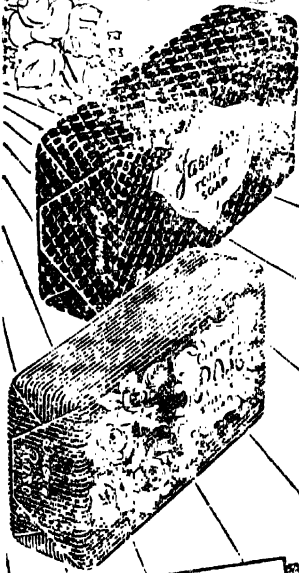
একদিন গভীর রাত্রিতে তাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। অজ পাড়াগাঁ। দরিদ্র নমঃশূদ্র বাড়ি। স্বামী অবশ্য পাঠশালার শিক্ষক কিন্তু আর সকলে ক্ষেতে খামারে কাজ করে। চাষা। দু' চার ভরি সোনা, পাঁচ দশ ভরী রূপো ছাড়া যাদের সম্পদ নেই, দু চারটে গরু হাঁস ছাড়া যাদের সম্পত্তি নেই, তাদের বাড়িতে ডাকাত। তাই ডাকাত পড়ার অর্থ বুঝতে বেশী দেরী হয়নি বাড়ির লোকদের। চঞ্চলা যখন বুঝলো তখন তার মুখে কাপড় বেঁধে তারা তাকে কাঁধে ফেলে নিয়েছে। দারোগা-পুলিসের চেষ্টায় তিন দিন পরে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার পায় চঞ্চলা। থানার লোক তাকে নিয়ে আসে বাড়ি। উঠোনে চঞ্চলার তিন বছরের ছেলে খেলা করছিল। তাকে দেখেই 'মা' বলে ছুটে এলো। 'বাবা' বলে চঞ্চলা তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। শাশুড়ী কোথায় ছিল। চিলের মত ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে গেল। ম্লেচ্ছের ছোঁয়া মেয়েমানুষের স্থান নাকি আর হয় না স্বামীর ঘরে। পুলিসের শত অনুরোধেও স্থান হলো না সেখানে। তাদের সংগে চলে এলো চঞ্চলা সদরে। মামলা-মোকদ্দমা হলো। কটা ডাকাত ধরা পড়েছিল, তাদের শাস্তিও হলো; কিন্তু তার স্থান হলো না আর সমাজের কোথাও। সমাজের এক ধারে নোংরা আস্তাকুঁড়ে আবর্জনার মত নিক্ষিপ্ত হলো সে। স্রোতের শ্যাওলার মত সেই থেকে ঘাটে ঘাটে ঘুরে মরছে চঞ্চলা।

কিন্তু শুধু চোখের জলে দিন চলে না।

চঞ্চলা শোক ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দু' দিনেই তার চেহারা পাল্টে গেছে। মাতৃত্বের নিবিড় ছায়ায় তার মধ্যে একটা নরম লাবণ্য ফুটে উঠেছিল, অনাহার আর কান্নায় দু' দিনে সে-লাবণ্য বাসি ফুলের মত মিইয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু একটা রুক্ষ উষর কর্কশতা। চরিত্রও বদলে গেল তার।

ক্রুদ্ধ গোবিন্দর রুদ্র মূর্তি দেখে চঞ্চলার কোলে ফটিক ভয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যখন এলোপাথাড়ি কয়েক ঘা মারলো গোবিন্দ প্রথম ত্রাসে চুপসে গিয়ে ফটিক হয়তো চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছিল। ভীষণ ভয়ে চোখ থেকে তার বোধ হয় দু' চার ফোঁটার বেশী জল পড়েনি।

সেই থেকে আর সে দোকান থেকে বেরোয় না। আজকাল আর সে বড় একটা কথাও বলে না। পাখির মত চব্বিশ ঘণ্টা বুল বুল করতো যে তার মুখে রা শোনা যায় না। ছাগল ছানার মত সব সময় ছুটোছুটি করে বেড়াত যে সে এক পা নড়ে না। ঘুম থেকে ওঠে, খায়, আবার ঘুমোয়। এর মধ্যে-কার সময়টা দোকানের এক কোণে চুপচাপ বসে থাকে আর বিষণ্ণ চোখ মেলে জনতার আনাগোনা দেখে। হঠাৎ কখনো সেই জনতার মধ্যে কি দেখে যেন বিষণ্ণ চোখ তার বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই চোখের দৃষ্টি যেন কিসের বাষ্পে ঘোলা হয়ে যায়। ফটিক জামার হাতায় চোখ মোছে। এ সব সময় সে উঠে চলে যায়। দোকানের পেছনে তার ছোট্ট বিছানাটাতে উপুড় হয়ে প'ড়ে আকুল হয়ে কাঁদে। খুব সাবধানে খুব নিঃশব্দে ফিস ফিস করে ডাকে—মা মা মা।

ব্যস্ত মানুষ গোবিন্দ। এ সব দিকে তার লক্ষ্য নেই। বরং আজকাল সে বেশ নিশ্চিন্তেই কাজকর্ম করতে পারে। ছোট্ট ছেলে ঘর থেকে বেরুলেই ভাবনা। কিন্তু সে ঘরে বসে থাকলেও যে ভাবাতে হবে, ব্যাকুল হয়ে ভাবতে হবে এ গোবিন্দ কোন সময়েই কল্পনা করেনি।

সামান্য সর্দি জ্বর, দু' দিনেই যা সেরে যাবে ভেবেছিল গোবিন্দ চার দিনের দিন তাকে ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে বলে গেলেন নিউমোনিয়া।

দিন যায় যেমন তেমন। রাত আর কাটতে চায় না। দু'একজন রাত জাগতে আসে বটে, কিন্তু তাদের ওপরে রোগী ফেলে গোবিন্দ ঘুমোতে পারে না। ঘুম আসেও না। সে জেগেই থাকে। ফটিকের অনুক্ষণ শুকনো মুখের দিকে চেয়ে থেকে কাটিয়ে দেয় সারারাত। যারা রাত জাগতে আসে তারা সাহস যোগায়। সান্ত্বনা দেয়। সেই তাদের [illegible]। কাল মাত্র একজন এসেছিল।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। হাওয়া বইছে জোর। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘরের মধ্যে ম্লান একটা নীল বাল্বের তলায় মৃত্যুর ছোঁয়া। শিয়রে বাপ। তার পাণ্ডুর মুখে ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা। এখন পর্যন্ত রাত জাগতে কেউ আসেনি। কখন আসবে আলো আসবে কি না কে জানে। রোগীর ফাঁকে ফাঁকে শুকনো মুখে শুধু বিড় বিড় শব্দ। মা, মাগো আমায় একটু কোলে নাও।......

গোবিন্দ ভেবে পায় না, এ ছেলেকে কেমন করে বাঁচাবে। মা মা করেই কি ছেলেটা মরবে! এতদিন পরে আজ হঠাৎ গোবিন্দর মনে হলো, চঞ্চলার কাছ থেকে ফটিককে অমনভাবে না কেড়ে নিলেও হত। নিজেকে সে কেড়ে নিয়েছিল, বেশ করেছিল, কিন্তু ছেলেকে—!

দিন দুই পরে, রাত করেই গোবিন্দ এল চঞ্চলাদের বাসায়। পথ ঠাওর করে একে ওকে শুধিয়ে শেষে চঞ্চলার ঘরে ধাক্কা দিল।

চক্রদত্ত

আম ভারতের একটি জাতীয় খাদ্য বিশেষ। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে ভারত-বাসী অমৃত-রসাস্বাদন করে চলেছে। যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন তখনকার কালেও আম খাদ্য হিসাবে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। কারো কারো মতে এ-ফল সর্বপ্রথম মালয় দেশ থেকেই এদেশে আমদানী করা হয়েছিল। অবশ্য অমৃতফল তার সুস্বাদের জন্যই এত সমাদর লাভ করেছে। এর গুণাগুণ সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত মানুষ উদাসীন ছিল। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কাঁচা এবং পাকা দুইরকম আমের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে 'সি' ভিটামিন থাকে। এমন কি, আজকাল জানা গেছে যে, আমের মধ্যে আপেলের চেয়েও বেশী পরিমাণ "সি" ভিটামিন আছে। 'সি' ভিটামিন ছাড়াও ভিটামিন 'এ' 'বি'-ও আমের মধ্যে থাকে। এছাড়া জল, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, খনিজ-বস্তু, শর্করা, ক্যালশিয়াম, লৌহ ইত্যাদি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে। সুতরাং আম শুধুমাত্র সুস্বাদের জন্য নয় সুগুণের জন্যও একটি মূল্যবান খাদ্য বিশেষ। অবশ্য কাঁচা আম ও পাকা আমের মধ্যে কিছুটা তফাত আছে:—

		কাঁচা আম:—		পাকা আম:—	
জল	...	শতকরা	৮৬	৮৬	ভাগ
প্রোটীন	...	,,	·৭	,, ·৬	,,
স্নেহ	...	,,	·১	,, ·১	,,
খনিজ	...	,,	·৪	,, ·৩	,,
শর্করা	...	,,	১০·২	,, ৮·৮	,,
ক্যালসিয়ম	...	,,	·০১	,, ·০১	,,
লোহা	...	,,	৪·৫	,, ·৩	,,
ভিটামিন 'এ'	...	,,	১৫০	,, ৩০০	ইউনিট
,, 'বি'	...		ইউনিট	৪০	ইউনিট

ভারতে খুব কম করলেও দু'লক্ষ কোটি একর জমিতে এই অমূল্য অমৃত ফলের চাষ করা হয়, কিন্তু এই বহুসমাদৃত ফলের চাষ করার জন্য গাছের কলম করার পদ্ধতি পর্তুগীজদের কাছ থেকে ভারতীয়রা শেখে এবং কলম করার দরুণই এত তাড়াতাড়ি এত অধিক পরিমাণ আমের চাষ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে করতে পারা সম্ভব হয়েছে।

*

আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায় তার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে বিজ্ঞানীরা কৃষিভূমির সার সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছেন। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণের ফলে এক এক চমকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা থেকে ১·৫ টন করে নাইট্রোজেন-অক্সাইড তৈরী হয়। সাধারণ অবস্থায় বৃষ্টির সঙ্গে মিশে মিশে শেষ-পর্যন্ত এই নাইট্রোজেন অক্সাইডের কিয়দংশ মাটিতে এসে মেশে। বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ-উৎপন্ন নাইট্রোজেন-অক্সাইডের সবটুকুই মাটিতে মেশাবার জন্য একরকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন—একটি পাতলা রবারের বেলুনের সঙ্গে একটি ধাতব তার লাগিয়ে আকাশে ছেড়ে দিচ্ছেন। আকাশে বিদ্যুত চমকানর সঙ্গে সঙ্গে তারটি বিদ্যুত থেকে নাইট্রোজেন-অক্সাইড সংগ্রহ করে এবং তারটি জমির ওপর এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে কিছুক্ষণ কাজ করার পর তারটি নষ্ট হয়ে যায়।

*

এক জায়গায় আগুন লাগলে যাতে ঐ আগুন আশেপাশে ছড়িয়ে না পড়ে সর্বপ্রথম সেই চেষ্টাই করা হয়। এর জন্য ফায়ার-ম্যানরা একটা জলের চাদর মতন তৈরী করেছেন—হোস-পাইপের মুখের কাছে একটা অর্ধগোলাকার ঝারি লাগিয়ে দেওয়া হয়, এইরকম অনেকগুলি পাইপ আগুন-লাগা জায়গাটির চারিদিকে ঘিরে সাজিয়ে রাখা হয় তাতে একটি জলের আস্তরণ তৈরী হয়ে ঐ আগুনকে ঘিরে ফেলে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না।

আগুন প্রতিরোধের ব্যবস্থা

*

বোম্বেতে "সরদেশাই ব্রাদার্স" নামে একটা কেমিক্যাল তৈরীর কারখানায় সম্প্রতি একরকম কেমিক্যাল তৈরী করেছেন যেটা কাপড় বোনার সময় ব্যবহার করলে ঐ কাপড়ের পচন প্রতিরোধকারী ক্ষমতা জন্মায় এবং কাপড়টি ধোলাই-এর দরুণ খাটো হয়ে যাবে না। দিল্লীর শ্রীরাম ইনস্টিটিউট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারেই "সরদেশাই ব্রাদার্স" কাজ করছেন।

*

আজকাল সব দেশ চেষ্টা করছে উন্নত ধরনের শস্য উৎপন্ন করবার জন্য। এর জন্য বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন ধরনের সংকর শস্য তৈরী করে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখছেন। এর মধ্যে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলেছে এক নতুন জাতের গম উৎপন্ন করবার, যার দানা বড় বড় এবং গাছগুলো খুব শক্ত এবং বেঁটে। শক্ত এবং বেঁটে ধরনের গাছ না হলে গাছগুলো গমের ভারে, জোর হাওয়া এবং বৃষ্টির সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সম্প্রতি রাশিয়াতে এই ধরনের এক নতুন গম সৃষ্টি করতে পেরেছেন। গম গাছগুলো প্রায় কুড়ি ইঞ্চির মত লম্বা—যেটা সাধারণ গম গাছের ২।৩ ভাগ লম্বা। রাশিয়ার উজবেকিস্তানে এই নতুন গমের চেয়ে আরো এক ভাল জাতের গম সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ১০০০টি গমের দানার ওজন ৮০ গ্রাম, যেটা সাধারণ ১০০০টি গমের দানার চেয়ে দ্বিগুণ বেশী ওজন।

*

এক নতুন ধরনের ইঞ্জেকশন দেবার সিরিঞ্জ তৈরী করা হয়েছে। কাচের বদলে নাইলন দিয়ে এই সিরিঞ্জ তৈরী করা হচ্ছে। এই নতুন সিরিঞ্জ খুব শক্ত, কোন কারণেই ভাঙবে না, এবং অনেকদিন কাজ দেবে। সিরিঞ্জের সবচেয়ে শক্ত জায়গা হচ্ছে সামনের দিকের সরু ছুঁচলো অংশটি। নাইলনের তৈরী সিরিঞ্জে সবচেয়ে সুবিধা হবে এই অংশটি নিয়ে, কারণ এটি কোন কারণেই ভাঙবে না—ফলে যিনি ব্যবহার করছেন এবং যার ওপর ব্যবহার করা হচ্ছে কারুরই কোন ভয় থাকবে না। এ ছাড়াও প্রয়োজনে এই নতুন সিরিঞ্জের একটা অংশ অন্য আর-একটা সিরিঞ্জে লাগান যাবে।

জার্মানীর লোয়ার স্যাক্সনীর পরিসংখ্যান সমিতি বিবাহযোগ্য বয়স ও বিবাহের তথ্যসমৃদ্ধ এক পরিসংখ্যান সম্প্রতি তৈরি করেছেন। প্রাপ্ত সব তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

১৯৩০ সালে শতকরা প্রায় ৭০ জন জার্মান কুমারী ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করত, এর চেয়ে কম বয়সে তারা বিয়ে করতে সাহসী হত না। আর আজ, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন ২১ বছর বয়সের আগেই বিয়ে করছে। তাছাড়া ১৯৩০ সালের চাইতে এখন অধিকসংখ্যক বর্ষীয়সী মহিলা বিয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। সেই সময় শতকরা মাত্র ১·৭ জন পঞ্চাশের অধিক বয়সী মহিলা বিয়ের ঝুঁকি নিতেন, আজ সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে—শতকরা ৩'৬ জন। অপরদিকে পুরুষের বিয়ের বয়সের খুব বেশি হেরফের হয়নি। যদিও ২১ বছর বয়সের কম স্বামীর সংখ্যা শতকরা ২ ভাগ বেড়েছে। বিয়ের ব্যাপারে পঞ্চাশোর্ধ পুরুষ এই বয়সের মহিলার চেয়ে কম উৎসাহী।

আগেকার [illegible] পতি বা পত্নী নির্বাচনে বয়সের [illegible] পার্থক্য বজায় রাখার মত রুচির পরিচয় পাওয়া যেত। আজকের দিনে কোন মহিলাই তার চেয়ে খুব বেশি বয়সের স্বামী পছন্দ করে না।

পক্ষান্তরে পুরুষেরাও তাদের চেয়ে খুব কম বয়সের পত্নী পছন্দ করে না। উভয়-পক্ষই কম-বেশি একই বয়সের সঙ্গী কামনা করে। এই নববিধানে বয়সের পার্থক্য ২।১ বৎসরের বেশি হয় না। বয়সের খুব বেশি অসাম্য বিয়ের প্রথমদিকে কিছুটা সুবিধাজনক হয়—আপাতদৃষ্টিতে এই কথাটাকেই খুব চালু বলে মনে হয়, পরবর্তীকালে এই বিয়ে অসুবিধারই সৃষ্টি করে। সম্ভবত এই মনোভাবের জন্য দায়ী কারণগুলির মধ্যে অংশত এই কারণও আছে যে, মেয়ে বা তার অভিভাবক কাউকেই নিরুদ্বিগ্ন জীবনে প্রতিষ্ঠিত সামর্থ্য-সম্পন্ন কোন পাত্র খুঁজতে হয় না, কারণ ঐ মেয়েরা বিয়ের প্রথমদিকে একটি সুখের সংসার গড়ে তোলার জন্য রোজগার করে স্বামীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক থাকে।

এমন ঘটনাও আজকাল সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় যে, মহিলারা তাদের চেয়ে কম বয়সের পুরুষকে বিয়ে করছে। এক পুরুষ আগে এই ঘটনাকে লজ্জাকর বলেই মনে করা হত। সম্ভবত এই প্রবণতা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আরও বেশি বোঝাপড়ার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে ১৯৫০ সাল থেকে বিবাহ

বিচ্ছেদের হার খুব কমে এসেছে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তীকালের দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ বিয়েকে কষ্টিপাথরে যাচাই করবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। বর্তমানে সে অবস্থার অবসান হয়েছে।

যুদ্ধকালীন মৃত্যুর হার, বিবাহের পরিসংখ্যান নিতে গিয়ে বিধবার সংখ্যাধিক্যেই ধরা পড়েছে। কিন্তু আগের দিনের চাইতে এখন যে খুব অল্পসংখ্যক বিধবাই অবিবাহিত রয়েছে, তা পরিসংখ্যানের হিসেবে পরিস্ফুট হয়েছে। যুদ্ধই যাদের বৈধব্য এনে দিয়েছিল—এমন সব মহিলা, বিশেষ করে যারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের স্বামী হারিয়েছে, যুদ্ধোত্তর পারিপার্শ্বিকতার ভয়াবহ চাপে পড়ে আবার বিয়ে করেছে। যুদ্ধের অভিশাপস্বরূপ বহুনিন্দিত যে অবৈধ বিবাহ সমাজের বুকে চেপে বসেছিল আজ আর তার চিহ্নমাত্র

বার্লিনের হানসা শহরে অবিবাহিতদের জন্য নির্মিত ১৭ তলা বাসভবন

নেই। এই বিবাহবিধি রাষ্ট্র বা গির্জার বিনানুমতিতেই চালু ছিল। অনেক ক্ষেত্রে বহু মহিলা পেন্সনের জন্যই আবার বিয়ে করতে চাইছে না, কেননা বিয়ে করলেই তাদের পেন্সন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা প্রায়ই নিজেদের এই প্রবোধ দিত যে, মনোমত স্বামী নির্বাচন খুব দুরূহ ব্যাপার, আর তাদের নিঃসঙ্গতা ও দুঃখকষ্ট তারা নিজেদের মত করেই ভোগ করবে।

*

কথায় বলে পালাবার পথ নেই যম আছে পিছে। কথাটা খুনী ও চোরদের বেলায় খুবই খাঁটি। যেখানেই লুকিয়ে থাক না কেন গোয়েন্দা পুলিস তোমাকে খুঁজে বের করবেই। খুনী বুঝতেই পারে না খুনের কি নিদর্শন সে সঙ্গে নিয়ে গেল। জুতার তলার সামান্য কাদা অসামান্য হয়ে কিভাবে এক খুনীকে ধরতে সাহায্য করেছিল তার এক চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গেছে।

পুলিসের জেরার উত্তরে খুনী জানাল, যে শহরে খুন হয়েছে সে শহরে সে কোনদিনই যায় নি। কিন্তু তার জুতার তলার মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেল, যে জায়গায় খুন হয়েছে সেই জায়গার এক বিশেষ ধরনের মাটি তার জুতার তলায় লেগে আছে।

আর এক ক্ষেত্রে এক খুনীর জুতার তলার মাটির বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করে তার গতি-বিধির সন্ধান পাওয়া গেছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য, বুড়ো আঙুলের সামান্য একটা আঁচড় এক খুনীকে ধরতে সাহায্য করেছে। জার্মানীর রুর অঞ্চলে এক ব্যক্তিকে খুন করে খুনী নিরাপদে পালিয়ে গেল। মাসখানেক পরে রুর অঞ্চল থেকে ১০০ মাইল দূরে কোন এক জায়গায় এক ব্যক্তিকে পুলিস জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে নিল, কেননা নিহত ব্যক্তির সঙ্গে একদিন এই লোকটির পরিচয় ছিল। সে কিন্তু নিহত ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় সরাসরি অস্বীকার করল। কিন্তু তার হাতের বুড়ো আঙুলের একটা সামান্য আঁচড়ের দাগ পুলিসের নজর এড়িয়ে গেল না। এই আঁচড় পরীক্ষা করে দেখা হল। এই পরীক্ষার ফলে জানা গেল কয়লা ও মাটির সূক্ষ্মতম কণা এর মধ্যে আছে, যা কোন খনি অঞ্চলের বিশেষ করে যে অঞ্চলে এই ব্যক্তি নিহত হয়েছে সেই অঞ্চলেরই।

*

চীনের প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সপ্তদশ শতাব্দীর এক সমাধি সৌধের খননকার্য সম্প্রতি শেষ করেছেন। ১৯৫৬ সালে তাঁরা চীনের সম্রাট ওয়ান-লির সমাধিসৌধের খনন আরম্ভ করেন। সম্রাট ওয়ান-লি ১৫৭৩-১৬১৯ খৃঃ চীনে রাজত্ব করে-

ছিলেন। এক বছর ইতস্তত খননকার্য চালাবার পর দেয়ালে খোদাই করা একটা নির্দেশ থেকে তারা সমাধি সৌধের রাস্তার একটা হদিস পান। এগিয়ে চললেন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নির্দেশ অনুসারে। কিছু-দূর এগিয়ে যাবার পর আর একটি শিলা-নির্দেশ থেকে তারা গোপন প্রবেশপথের সন্ধান পেলেন। ইঁটের তৈরি এক দেউড়ি অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা স্মৃতিসৌধের দ্বারদেশে এসে পৌঁছলেন। এই অভিযানের সদস্য একজন চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদের কথায় জানা যায়—"সমগ্র সমাধি-সৌধটি একটি বড় চৌকো ঘর। পর পর পাঁচটি খোপ আছে এতে। গোটা ছাদটি খিলান ছাদ। কোন পিলার বা বরগা এতে নেই। একটি অপূর্ব কারুকার্যখচিত পাথরের রাস্তা দেউড়ি থেকে তাঁদের নিয়ে এসেছে সমাধিসৌধের প্রবেশ দরজায়। দরজায় নয় সার সমান্তরাল মাথা মোটা পেরেক লাগান আছে—আর আছে জন্তুর মাথার আকারে তৈরি ২টি কড়া। এই দরজার যান্ত্রিক কৌশল এমনই চমৎকার যে, যদিও কয়েক টন এর ওজন হবে, তবুও মাত্র একজন লোকই অনায়াসে এটা খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। এক ঘর থেকে আর একঘরে যাবার জন্য দরজা আছে। সমাধি-সৌধের মেঝে এক বিশেষ ধরনের ইঁট দিয়ে তৈরি। এই সাম্রাজ্যে তখন এইরকম ইঁটই তৈরি হত, বিশেষ করে প্রাসাদ ও সমাধি-সৌধ তৈরি করার জন্য। এই ধরনের ইঁট ব্যবহারের ফলে মেঝের ঔজ্জ্বল্য আজও বর্তমান। সবশেষের ঘরে পাওয়া গেল উঁচু বেদীর উপর স্বর্ণমণ্ডিত ও বিচিত্র কারু-কার্যসমন্বিত পাশাপাশি অবস্থিত ৩টি শবাধার। প্রত্যেকটি শবাধারে ৪টি করে পিতলের আংটা লাগান আছে যাতে করে শবাধারগুলি অনায়াসেই সরান যেতে পারে। এই শবাধার তিনটির চারদিকে নানা রকমের প্রচুর জিনিস ছড়ান ছিল—যেমন মদের জাগ, মদের পানপাত্র, ফুলদানি, বিভিন্ন রকমের মুদ্রা, মূল্যবান পাথর, অলংকারাদি, সোনারূপো, কিংখাব ও পোর-সেলিন। প্রত্যেকটি পাত্রের নিচে অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত সোনার পীঠিকা আর সোনার তৈরি ঢাকনা তৎকালীন চীনা শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব স্বাক্ষর বহন করছে। তবে এইসব জিনিসের ভেতর অনেকগুলিই ভেঙে গেছে বা আর্দ্রতায় নষ্ট হয়ে গেছে। সম্রাজ্ঞীদের বিভিন্ন রকমের মূল্যবান পাথরখচিত কানের দুল ও কবরীবন্ধনের অজস্র সাজসরঞ্জাম প্রাপ্ত জিনিসের ভেতর উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। শবাধার তিনটির ভেতর সম্রাট ও ২ জন সম্রাজ্ঞীর কংকাল তারা পেয়েছেন —আর পেয়েছেন অবিকৃত মাথার চুল আর সম্রাটের খয়েরি রঙের গোঁফ। প্রত্যেক করোটির শোভাবর্ধন করছে বহুমূল্য প্রস্তরখচিত ও শিল্পসুষমায় মণ্ডিত অপূর্ব স্বর্ণমুকুট। প্রত্যেকটি শবাধারের সামনে আছে ধূপদানি, দুটো করে মোম-বাতি, ফুলদানি, চিরকাল জ্বলবে এমন প্রদীপ আর ড্রাগন আকৃতি একটা জারে সুগন্ধি তেল। সমাধিসৌধের দরজা যখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল সম্ভবত প্রদীপটি তখন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্রাট আশা করেছিলেন এই প্রদীপটি হয়ত চির-কাল জ্বলবে, কিন্তু বাতাসের অভাবেই এই প্রদীপের জীবনদীপ নিভে গিয়েছিল।"

সমাধিসৌধে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত জিনিসেই তৎকালীন শিল্পীদের নাম খোদিত আছে দেখা যায়। এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়েছিল। তখন সম্রাট ওয়ান-লির বয়স ২৩ বৎসর, ৬ বৎসরের পরিশ্রমে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়। বর্তমানে স্মৃতিসৌধটিকে মিউজিয়াম হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

*

নিউগিনির মোরসবি দ্বীপের এক আড়তদার কোন এক জাপানী আমদানী-কারক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্প্রতি এক চিঠি পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে ড্রাগনের রক্ত পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছে।

সেই অনুরোধলিপিতে আরও ছিল, যদি এই রপ্তানিযোগ্য মাল আপনার আড়তে থেকে থাকে, তাহলে ডাকযোগে আমাদের ২।১টি নমুনা প্যাকেট পাঠিয়ে দেবেন। প্রেরিত মালের গুণাগুণ আর আপনার সঞ্চিত মালের পরিমাণ অনুসারে আমরা এখনই আপনাকে একটা অর্ডার দেব।

আড়তের মালিক ভাবলেন, কেউ হয়ত তাঁকে ভাঁওতা দেবার জন্যই এই চিঠি লিখেছে। কিন্তু পরে তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, তাঁর এ-অনুমান ভুল। চিঠিখানা প্রকৃতই কোন এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লিখেছে।

সেই জাপানী প্রতিষ্ঠানকে তখন তিনি দুঃখের সংগে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর আড়তে ড্রাগন বা ড্রাগনের রক্ত কোনটাই বিক্রির জন্য মজুত নেই।

এমনও হতে পারে যে, ইন্দোনেশিয়ার কোমোডোতে প্রকৃতই ড্রাগনের মত জীবন্ত সরীসৃপ শ্রেণীর যে বিরাটকায় গিরগিটি পাওয়া গিয়েছে, হয়ত সেই গিরগিটি সম্বন্ধেই এই জাপানী প্রতিষ্ঠানটি কিছু জানতে চেয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা এদের ড্রাগনই বলে থাকে। ১৯১২ সালে কোমোডোতে প্রথম এদের আবিষ্কার করা হয়। সেই সময় পাঁচটি বিরাটকায় গিরগিটি মারা পড়ে, যার মধ্যে কয়েকটি নয় ফুটের চাইতেও বেশি লম্বা ছিল। যুদ্ধের আগে কোমোডো থেকে দুটি আট ফুট লম্বা গিরগিটি লণ্ডন চিড়িয়াখানার জন্য ধরা হয়েছিল। এর জন্য বিশেষ ধরনের ফাঁদের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। টোপ করা হয়েছিল মৃত শূকরছানাকে। যেই মাত্র সেই টোপ ধরে গিরগিটি টানবে, অমনই একটা চারাগাছের সংগে সংযুক্ত ফাঁদে আটকে গিরগিটিটি উঁচুতে উঠে যাবে।

বন্দী অবস্থাতে এই গিরগিটি বেশ পোষ মানে। ৩০ বছর আগে জুলজিক্যাল সোসাইটির এক আলোচনা সভাতে সমাগত সভ্যবৃন্দ আট ফুট লম্বা জীবন্ত ড্রাগন দেখে কেমন হকচকিয়ে যান ও ভীত হয়ে পড়েন। তাঁরা অবশ্য ড্রাগন দেখতেই সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন, আরকে নিষিক্ত ড্রাগনই তাঁরা দেখবেন—তার বদলে জীবন্ত ড্রাগন দেখে তাঁরা হকচকিয়ে যান। খাঁচায় আবদ্ধ কোন ড্রাগনকে অবশ্য সোসাইটির কিউরেটার তাঁদের দেখাননি—যে ড্রাগনটি তাঁদের দেখিয়েছিলেন, তার চলাফেরার ছিল অবাধ স্বাধীনতা।

*

ক্যানসারের কারণ ও নিবারণ, দুইই ডাক্তারদের অজানা। তার চেয়েও অজ্ঞাত ব্যাধি বোধহয় মানসিক অসুস্থতা। এর উৎস ও চিকিৎসা, কোনোটাই আজও বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে ধরা দেয়নি। সহস্র কারণ থাকতে পারে উন্মত্ততার, লক্ষরূপে এর বিকাশ, অযুতরূপে এর বিকার। কিন্তু আমেরিকা থেকে সেদিন যে বৈমানিকের মস্তিষ্ক বিকৃতির সংবাদ এসেছে তাতে কুজ্ঝটিকার পরিমাণ অতি অল্প। স্পষ্টই বলা আছে, অধুনা-অসুস্থ বৈমানিক গত ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা ফেলতে নিযুক্ত হয়ে-ছিলেন। এখন তাঁর ধারণা, এক লক্ষ নিরপরাধ জাপানীর মৃত্যুর দায়িত্ব তাঁর এবং এ-বিভীষিকা তিনি কিছুতেই এড়াতে পারছেন না যে জীবিত জাপানীরা তাঁর উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। বেচারীর স্থান হয়েছে পাগলা গারদে। ইতিপূর্বে তিনি একবার অভিযুক্ত হয়েছিলেন কোনো মদের দোকানে চুরির অপরাধে। লোকটির বাকি জীবনের শান্তি যারা চুরি করেছিল ১৯৪৫ সালে, তাদের কোনো শাস্তি হয়েছে বলে জানিনে।

সন্দেহের অবকাশ সামান্য, বৈমানিক একদা বীর বলে বৃত হয়েছিলেন। বীরত্বের মত্ততা দীর্ঘস্থায়ী হোলো না, নেশাবসানে বিসর্জন দিতে হোলো চিত্তের শান্তি। অবশিষ্ট রইল অবসন্ন দেহ আর বিকৃত মস্তিষ্ক। বেচারীর বিবেকের উপর বিরাজ করছে লক্ষ শব। ওজনে ভারী বৈকি এত-গুলি নিষ্প্রাণ দেহ! দেহগুলি আবার অক্ষত নয়। কোনোটার হাত আছে পা নেই। মাথা নেই, ধড় আছে। বৈমানিকের মাথা সুস্থ থাকলেই বিস্ময়ের বিষয় হত।

পুস্তক পরিচয়

সংগীত

রবীন্দ্রসংগীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা। ছয় টাকা॥

মহৎ প্রতিভার সম্পূর্ণ এবং সার্থক মূল্যায়ণের জন্য বৃহত্তর পটভূমিকায় পর্যালোচনার প্রয়োজন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে কেবলমাত্র প্রয়োগশিল্পের কতকগুলি বাঁধা ধরা রূপবন্ধ দিয়ে বিচার করেননি;—তিনি রবীন্দ্রসংগীতকে একটি সুমহৎ পটভূমিকায় পর্যবেক্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত সৃষ্টিকে তিনি দেশ, কাল, সমাজ এবং ব্যক্তির মাধ্যমে দেখেছেন অর্থাৎ যে সব বিভিন্ন সত্তা দিয়ে একটি বিরাট জীবনের পরিবেশ প্রস্তুত হয়েছে তিনি সেই পরিবেশটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পাঠকদেরও প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এই সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত পর্যবেক্ষণের ফলে রবীন্দ্রসংগীতের রসের উৎস কোথায় সেটি তিনি নিপুণভাবে সন্ধান করেছেন এবং পাঠকদেরও প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীতমানসের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর সংগীতচিন্তার পরিচয় পেয়ে আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি যেন এইখানিতে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার সমগ্ররূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে এবং এই সার্থক রূপায়ণ ও মূল্যায়ণের জন্য গ্রন্থখানি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং কবির সাংগীতিক চিন্তাধারার স্বরূপ যে কী তা তিনি উত্তমরূপে জানেন এবং এই কারণেই তিনি যে ভিত্তির ওপর তাঁর রচনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা একান্তভাবে মার্জিত। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভারতীয় সংগীতকে গ্রহণ করেছিলেন বা যেভাবে বাংলা গান বা ভারতের অপরাপর আঞ্চলিক সংগীত তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল—সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই উপলক্ষ্যে প্রচুর মনোরম অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিগত ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন। এই চিত্তাকর্ষক বিবরণগুলি গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ কেননা এই সব ঘটনা থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ আদৌ উদাসীন নন। তিনি গ্রন্থে রবীন্দ্র সংগীতের সংগঠন, ছন্দ-তাল, শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার উদ্ভব, ক্রমোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে সুনিপুণ আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। ও দিক দিয়ে প্রয়োগশিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সকল প্রশ্নের উত্তরই তাঁর গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন চিন্তাশীল নিবন্ধ রচনার মত পাণ্ডিত্যসূচক সংস্কার সর্বত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ কতকগুলি টেকনিকসম্বলিত আলোচনা যা রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য সেগুলি অযথা যোজনা করে গ্রন্থটিকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার পরিকল্পনা করেন নি। তিনি একটি মহৎ শিল্পীর প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে এই প্রাণেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এটি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে—'ভারতীয় সংগীতে গুরুদেবের স্থান', 'দেশী সংগীতের প্রভাব', 'গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও কলাবিভাগ', 'ঋতুসংগীত', 'নেপথ্যের কথা' এবং 'গীতিনাট্যের বৈচিত্র্য'—এই ছয়টি অধ্যায় নতুন যোজনা করা হয়েছে। এ ছাড়া অনেকগুলি পুরাতন অধ্যায়ের পরিবর্ধন করা হয়েছে। গ্রন্থে সর্বসমেত ত্রিশটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রসংগীত এবং শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এই তথ্য-

গুলি সাম্মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথের রসিকমনের সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছে। এইটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল। এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের গোচরে এলে তিনি লিখেছিলেন— "......আমার জীবন ছিল রসে পূর্ণ সেই কথা মনে করিয়ে দিল তোর এই লেখা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়া শেষ করলুম।" সাধারণ বা বিশেষজ্ঞ—উভয় পাঠকের কাছে এই পরিচয়টি প্রত্যক্ষ করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে [illegible] যোগ্য একটি সুমহৎ কর্তব্য সার্থকভাবে পালন করেছেন।

—রাজেশ্বর মিত্র

অর্থনীতি

ভাত কাপড়ের কথা—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন পুরকায়স্থ। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক সদ্য অক্ষর-পরিচয়-লব্ধ প্রাপ্ত বয়স্ক গ্রামবাসীদিগের পাঠ্য হিসাবে মনোনীত এবং দপ্তরের লোক-সাহিত্য শাখার নির্দেশ অনুসারে মুদ্রিত। লেখক দেশের লোকের ভাত কাপড়ের সংস্থান করিবার উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে যে অর্থনীতির পর্যালোচনা করিয়াছেন সাধারণ দেশবাসীর কাছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে বলিয়া মনে হয়। ভাত কাপড়ের অভাব সম্পর্কে জনসাধারণ বাস্তব অর্থনীতি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। অতএব আলোচ্য পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া কেহ উপকৃত হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ৫৬৮।৫৮

Economic Theory and Practice In India—by Sudhir Das Gupta. Published by Mr. Atmaram Jajodia and Printed at Naranarayan Printing Press 17-H. Cawasapi Patel Street. Fort. Bombay-1. Price Rupee one.

এই বইয়ের রচনা পড়ে অর্থনীতি অনুরাগী পাঠকমাত্রই উপকৃত হবেন। সাধারণ পাঠকের কাছে অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব তিনি একটি সহজ সরল ভঙ্গীতে পরিবেশন করতে পেরেছেন। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য, কৃষিশিল্প, রাজনীতি প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। তাঁর উপস্থাপনা সাবলীল, নৈর্ব্যক্তিক এবং নিরপেক্ষ। তাঁর কাছে বাংলা ভাষায় লেখা অর্থনীতিবিষয়ক গ্রন্থ আশা করবো। ৪৫২।৫৬

ব্যায়াম শিক্ষা

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ব্যায়াম ও আসন—শ্রীনীরদকুমার সরকার। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২। মূল্য ১·৪০ নয়া পয়সা।

ব্যায়াম শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাপ্ত বয়স্কদের হরেক রকম ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি আলোচ্য গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে। প্রত্যেক পদ্ধতির সঙ্গে চিত্র সমন্বিত হওয়ার দরুণ ব্যায়ামের প্রক্রিয়াগুলি আরও সহজবোধ্য হইয়াছে। ব্যায়াম চর্চা দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা ইদানীং দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গণ্য করার মত

মনোবৃত্তি তরুণদের ভিতরে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে। অতএব আলোচ্য পুস্তকখানা প্রত্যেক ব্যায়াম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগ্য হইয়াছে। বহু চিত্র সহযোগে আর্য-ঋষি ও সাধু সন্যাসী প্রবর্তিত বহু আসন পদ্ধতির সন্নিবেশ পুস্তকখানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহার সাহায্যে বয়স্ক লোকেরাও সহজসাধ্য আসনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্রতী হইতে পারেন। দেশের কল্যাণ কামনায় এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার ও প্রসার অত্যাবশ্যক। প্রচ্ছদপট মনোরম। ৩১৪।৫৮

সমাজ-কল্যাণ

যুব কল্যাণ—বিনয় ঘোষ। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

বর্তমান দিনের আমাদের সমাজের প্রধান একটি সমস্যাকেই আলোকিত করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। সর্বজনবোধ্য ভাষায় সরল ভঙ্গীতে লেখা এই ক্ষুদ্র সচিত্র গ্রন্থটি আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই অবক্ষয়ের যুগের কিছুটা সমাধানও দেওয়া হয়েছে। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য গ্রন্থটির সৌভাগ্যের পিছনে ইউনেস্কোর সহযোগিতা রয়েছে। ১৪৪।৫৯

কবিতা

পদচিহ্ন—কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রায়। প্রকাশক: কালিদাস দে, ৯ পরামাণিক ঘাট লেন, কলিকাতা-৩৬। এক টাকা।

এই যৌথ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি অগভীর কাঁচা হাতের রচনা। নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করলে লেখকদ্বয় ভবিষ্যতে উন্নতি করবেন আশা করা যায়।

আভাস—অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক দীপংকর বিশ্বাস, ২৩।১, হাজরাপাড়া লেন, বালী, হাওড়া। এক টাকা।

তিনশ পনের পংক্তির একটি কবিতাই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সমাজের নানা অন্যায় আবিচারের বিরুদ্ধে কবির এই কাব্য প্রতিবাদ। ৪০।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

ভেলকি থেকে ভেষজ—আনন্দকিশোর মুন্সী।
প্রণয়ী পঞ্চক—সুশীল রায়।
ফানুসের আয়ু—বিমল কর।
কারিগরের রক্তকরবী—শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
আকাশিনী ও মৃন্ময়ী—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়।
ময়নামতীর দীঘি—শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৫ম খণ্ড—শ্রীঅনিলবরণ রায়।
নীলকণ্ঠী—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
রক্তরেণু—রমেশ মজুমদার।
নারী ও প্রিয়া—ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।
অজানিতার চিঠি—স্টিফান সুইগ অনুবাদক বিধায়ক ভট্টাচার্য।
চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান—আর্মেনগার্ড ইবার্ল।
অন্ধকার সিঁড়ি—আলাউদ্দিন আল আজাদ।
শিল্পীর সাধনা—আলাউদ্দিন আল আজাদ।
অরণ্য বাসর—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।
বাংলা নাট্য—বিবর্তনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী।

ট্রামে-বাসে

[illegible] সংস্থার [illegible] শ্রী বি [illegible] লণ্ডনে তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—গবেষকগণ যদি খাদ্য সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ফেরান তবে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই খাদ্য সঙ্কটের সুরাহা হইতে পারে।—"তা হয়ত পারে: কিন্তু অভাগাদের কোন সুরাহা হয় না, তারা তাকালে সাগর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

কলিকাতায় শীঘ্রই একটি আম্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে।—"এটা হবে আম্র-ভোজন বা আম্র বিক্রয়ের বিকল্প ব্যবস্থা। কবি কি কুক্ষণেই লিখেছিলেন—ফাগুনে

তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে—শেষ পর্যন্ত ঘ্রাণেন ভোজনের ব্যবস্থাই পাকা হতে চলল"!—মন্তব্য শ্যামলালের।

* * *

আমের প্রসঙ্গের জের টানিয়া আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"ক্ষীরের সনে পাকা আমের আহা কিবা মানানোটা শুধু গান হয়েই রইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা হোক একটু দুধের বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু কপালে সইল না। শুনেছি দুধ নাকি ফেটে গেছে বা যাবার যো হয়েছে"—সহযাত্রী হরিণঘাটার অব্যবস্থার কথাই বুঝি উল্লেখ করিলেন।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম মাছের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন, তাহার সবটা নাকি খরচ করা সম্ভব হয় নাই। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"মাছ না হোক, এবার মন্ত্রী মশাই অন্তত সংবাদ পালটা তো শুনিয়ে দিতে পারবেন।"

শ্রী নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন—ভারতের শত্রু নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু নেহরুজী ঠিক জানেন তো? আমরা তো জানতাম বোবার শত্রু নেই। আমরা আর যা হই, বোবা নই!!"

* * *

মোহনবাগানের মতো ইস্ট বেংগলও ফুটবল লীগের প্রথম খেলায় জয়লাভ করিয়াছেন।—"কিন্তু খেলাটা হয়েছিল বিষ্যুৎবারের বারবেলায়। সুতরাং সাধু সাবধান"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ নাকি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন, তাহারা যেন কলিকাতার লেখকদের পুস্তকাদি পাঠ না করেন। শ্যামলাল বলিল—"গল্প শুনেছিলাম কোন এক অজ্ঞাতনামা

ছেলে নাকি অঙ্কে কাঁচা ছিল। এ দিকে আবার লেখাপড়ায়ও মন ছিল না। শেষে অভিভাবক তাকে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে দিলেন। শিক্ষক গল্পচ্ছলে ছেলেটিকে আকাশের তারা দেখিয়ে বলছিলেন—"বলতো বাবা, এদিকে কটা তারা?"। ছেলের ছোট ভাই ছিল খুব চালাক। সে সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে সতর্ক করে দিল: "দাদা, বলিসনি, শেখাচ্ছেরে"! জনাব আয়ুব নিশ্চয়ই এ গল্প শুনেছেন"।

* * *

কাসিম ভাট্টি নামক জনৈক চোরাকারবারী নাকি অভিযোগ করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের এক ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট এবং ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল ও এক ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাহাকে চোরা চালানের কার্যে উৎসাহ দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কাসিম ভাট্টির এই অভিযোগ সত্য হলে বলা যায় এ বুঝি চোরাচালানের ভাট্টিকাবা,—ভট্‌ভটে অভিযোগ, ইত্যর্থ।"

* * *

পাকিস্তানের কোন কোন সাহিত্য ছদ্মবেশধারী সাহিত্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন।—"ভাষা

সম্বন্ধে ভাসা জ্ঞানের পরামর্শ" সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ভারত সরকার কলিকাতা স্টেডিয়ামের জন্য ময়দানে পুনর একর জমি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। তবে স্থান নির্বাচন এখনও হয় নাই। —"মেয়ের বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়েছে, শুধু বর এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাপুয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে একদল গ্রামের লোক নাকি একটি পুলিসকে খুন করিয়াছে এবং পরে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"আমরা মাথা খাও পর্যন্ত জানি, কিন্তু সেটাও অনুনয় মাত্র। মস্তক চর্বনের চেষ্টাও আছে। কিন্তু গোটা মানুষটার কথা ভাবতে পারিনে। এরা দেখছি সত্যি সত্যি [illegible], তা-ও খেয়েছেন ঝানু হাড়ের পুলিস, ওয়াক, থু"!!

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

সত্যজিৎ রায়ের চিঠি

'দেশ' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

সবিনয় নিবেদন,

গত ১লা জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "অপুর সংসার" ছবিটির সমালোচনার প্রথম ও শেষাংশে সমালোচক চিত্ররূপটির ভূয়সী প্রশংসা করে ("ভাবে, রসে ও আঙ্গিকে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে"—ইত্যাদি), মধ্যাংশে মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চিত্রনাট্যের বিবিধ দুর্বলতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। চিত্রনাট্যে অসংগতি থাক বা না থাক, ছবিটি সম্পর্কে সমালোচক চন্দ্রশেখরের মতামতের যে অসংগতি এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, তা বিস্ময়কর।

সমালোচক বিভূতিভূষণ থেকে যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি "পথের পাঁচালি" বা "অপরাজিত" কোনটিই ভালভাবে পড়েননি অথবা তাঁর উদ্ধৃতি নির্বাচনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো "অপুর সংসারে"র চিত্রনাট্যকে খর্ব করা।

সমালোচক বলেছেন—"বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক মানসের সঙ্গে পরিচালকের কল্পনার গরমিল হয়ত এই ছবিতেই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" সাহিত্যিকের কল্পনা লিখিত ভাষায় ব্যক্ত; পরিচালকের কল্পনা (উপন্যাসের উপর ভিত্তি হলেও) মূলত গতিশীল ছবির মাধ্যমে পরিস্ফুট। দুই-এ যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, সমালোচক কি সেটি বোঝেন না? উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আজ অবধি এমন কোন সার্থক চলচ্চিত্র রচিত হয়নি, যেখানে পরিচালককে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

অথচ সমালোচকের মতে "প্রধান চরিত্র উপস্থাপনে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও

গ্রেস পিকচার্সের 'শশীবাবুর সংসার'-এর একটি দৃশ্যে চা-পানরত অবস্থায় বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

কল্পনার আশ্রয় যেমনভাবে নিয়েছেন, তা চিত্রস্রষ্টার দৃষ্টিসিদ্ধির পরিচায়ক হয়ে ওঠেনি।" আমার মতে ছবির অপু ও উপন্যাসের অপুর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই। বরঞ্চ সমালোচকের মানস কল্পিত অপুর যে ইঙ্গিত আমরা পাই, তার সঙ্গে বিভূতিভূষণের অপুর বিশেষ মিল নেই। বিভূতিভূষণের অপুর সম্বন্ধে দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—(১) অপুর চরিত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় এবং (২) আর পাঁচজনের চেয়ে অপু অনেক বেশি অনুভূতিসম্পন্ন—অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ দুই-ই তাকে সাধারণের চেয়ে বেশি বিচলিত করে। সমালোচকের মতেঃ "অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুকে দেখানো হয়েছে শ্মশ্রুধারী বিরহীরূপে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর দয়িতার বিয়োগ-ব্যথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান জায়গায়। অপুর শোকাবেগ নিয়ে ছবিকে যেভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে—তার মধ্যে বিভূতিভূষণের অপুকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।" অথচ অপর্ণার মৃত্যু দীর্ঘকালের জন্য অপুর সত্তাকে কীভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তার স্পষ্ট বিবরণ উপন্যাসে আছে। অপুর মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ বলেছেন—

"কি বিরাট শূন্যতা, কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে......কখনও না, কাহারও দ্বারা না......সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুল-ফল নাই, শুধু এক রুক্ষ, ধূসর, বালুকাময়, বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।" (মিত্রালয় সংস্করণ, ২৩০ পৃষ্ঠা)।

অপর্ণার মৃত্যুর এক বছর পর অপু তার কলকাতার বাসা ছাড়বার কথা ভাবছে, কেননা, "অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো—আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল" (২৩২ পৃঃ)। আবার "কলিকাতা আর ভালো লাগে না, কিছুতেই না। একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনে গড়িয়া উঠিতেছিল—কলকাতা ছাড়িলেই যেন সব দুঃখ দূর হইবে" (২৩৪ পৃঃ)। এর পরে চাঁপদানিতে শিক্ষকতা করার বর্ণনা আছে। এখানে অপর্ণার মৃত্যুর দুই বছর পরে প্রণব ও অপুর সাক্ষাৎকার হয়। বিভূতিভূষণ বলেছেন—"তাহার (প্রণবের) মনে হইল, সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য যাহার মধ্যে একদিন উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছি, সে যেন প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল প্রবৃত্তি বা সন্তোষবোধ...... অপুর প্রকৃতিতে তো কখনও ছিল না" (২৩৬ পৃঃ)।

চিত্রনাট্যের প্রথম দিকে অপুর জীবন-রসিকতা ও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য এবং তার সঙ্গে অপর্ণার মৃত্যুর পরে তার তিক্ততা, রুক্ষতা ও cynicism-এর বৈপরীত্য ও তার নাটকীয়তা, বিভূতিভূষণের বর্ণনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

সমালোচকের আরেকটি বিচিত্র মন্তব্যঃ "কাজলকে 'অলীক', অবাস্তব' ভেবে দূরে সরিয়ে রাখাটাও ছবিতে রসহানি ঘটিয়েছে।" মূল উপন্যাসটি কি সমালোচক আদৌ পড়েছেন? উপন্যাসে অপর্ণার মৃত্যুর দুই বছর পর কাজল সম্বন্ধে অপুর মনোভাব এই—"ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুণ পাঁচটি টাকা শ্বশুরবাড়িতে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাধান করিয়াছে" (২৪৫ পৃঃ)।

এই ঘটনার প্রায় এক বছর পরে অপু প্রথম কাজলের কাছে যায়—তাও মাত্র কয়েক দিনের জন্য। 'দেশ'-সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"অপু ও কাজলের মধুর সম্পর্কের যে উপাখ্যান মূল কাহিনীতে আছে, ছবিতে তার আভাস অল্প। কাজলের
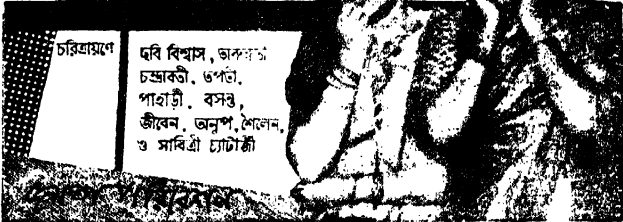
পক্ষে তার শ্মশ্রুধারী বাবাকে চিনতে না পারার ফলেই দর্শকেরা বিভূতিভূষণের এই রস থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।" বিভূতিভূষণের বর্ণনা অনুযায়ী "প্রথমে সে (কাজল) কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া ধরিল। অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল" (২৫৫ পৃঃ)।

কিন্তু উপন্যাসে এই প্রথম দেখাতেও অপুর মনে বাৎসল্য জাগেনি। অপু পুনরায় কাজলকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ পাড়ি দেয়। কাজলের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন প্রণব তাকে অসহায় অবস্থায় দেখে নিরুদ্দিষ্ট অপুর সম্বন্ধে মন্তব্য করে—"আচ্ছা পাষণ্ড ত? মা-মরা কচি বাচ্ছাটাকে বেঘোরে ফেলে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে?......দয়ামায়া নেই শরীরে?" (২৮৮ পৃঃ)।

এর তিন বছর পর অপু নাগপুর থেকে বাংলা দেশে ফেরে। প্রথমে যায় কলকাতায়—ছেলের কাছে নয়। কাজলকে দেখবার কোন তাগিদ তার মনে নেই—বরঞ্চ তার আগ্রহ লীলা সম্পর্কে (৩০০ পৃঃ)। এর বেশ কয়েক মাস পরে অপু কাজলের কাছে যায় ("কাজলের আগের চেহারা অপুর মনে ছিল না"—৩১৯ পৃঃ)। দ্বিতীয়বার কাজলকে দেখে অপুর মনোভাব বিভূতিভূষণ এইভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ "আজ এইটুকু—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল—কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়াছিল?" (৩২০ পৃঃ)।

চিত্ররূপে কাজলের পাখি মারা সম্পর্কে সমালোচক যে-মন্তব্য করেছেন, তা দ্বারা তিনি যুগপৎ সাধারণ জ্ঞানের অভাব ও মূল উপন্যাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁদের প্রাথমিক জ্ঞানও আছে, তাঁরাই জানেন যে, নিষ্ঠুরতা একটি স্বাভাবিক শৈশব-প্রবৃত্তি। বিভূতিভূষণ তাঁর একাধিক গল্পে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং তাঁর ডায়েরিতেও এর উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে পাখি মারার ঘটনাটি "অপরাজিত" উপন্যাস থেকেই নেওয়া—যদিও উপন্যাসে ঘটনার নায়ক কাজল নয়—স্বয়ং পঞ্চমবর্ষীয় অপু।

"দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে দিকি আমার হাতে। পরে সে নিজের হাতে পাখিটাকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আচ্ছা কেন মারতে গেলি তুই? অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।" (৪৫ পৃঃ)।

সমালোচক হয়ত বলবেন যে, এই ঘটনাটি অপুর চরিত্রের মাধুর্য নষ্ট করেছে। অপুর মনোবৃত্তি যে পিতৃমাতৃহীন কাজলের ক্ষেত্রে আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য, সে-কথা বোধহয় বলাই বাহুল্য, যদিও সমালোচকের মতে "কাজলের এই স্যাডিজম্ (!) বা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি অপু-অপর্ণার ছেলের সম্বন্ধে ভাবতে অবাক লাগে।"

আরেকটি কথা—বিভূতিভূষণের কাজল কেবলমাত্র "কল্পনাপ্রবণ, ভীতু, প্রকৃতিপ্রিয়" নয়—বিভূতিভূষণের বর্ণনায় "সে একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে" (৩১৩ পৃঃ)। দাদামশাই কাজলকে কড়া শাসনে রাখেন, প্রয়োজনে নির্দয় প্রহার করেন (৩১৩ পৃঃ)।

সমালোচক চিত্রনাট্যে কাজল-অপুর সম্পর্কে মাধুর্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন। চিত্রনাট্যের সমাপ্তি যে মধুর মিলনান্ত সুরে ঘটেছে, মূল উপন্যাসে কাজল-অপু সম্পর্কের সমাপ্তির সুর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। উপন্যাসের শেষে অপু
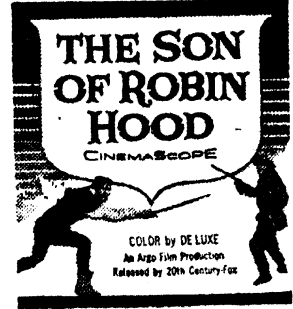
কাজলকে রানুর জিম্মায় রেখে দেশত্যাগী হয়। "'তুই এখানে থাক খোকা; আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবিনে? তোর পিসিমার কাছে থাকবি?'— কাজল বলিল, 'হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বইকি! আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা।'" (৩৭৬ পৃঃ)। অপু কাজলের এ-অনুরোধ রক্ষা করেনি।

চিত্ররূপে পিতাপুত্রের মিলনের পর আবার এই বিচ্ছেদের অবস্থাটি (রানু ও নিশ্চিন্দপুর সমেত) পর্যন্ত জের টানতে গেলে ছবির আয়তন কতখানি বৃদ্ধি পেত, তা প্রদর্শনযোগ্য দৈর্ঘ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত কিনা এবং তা শিল্পসম্মত হত কিনা, এ বিষয়ে সমালোচক কোন হদিস দিতে পারেন কি?

আরো দু-একটি বিরুদ্ধ মন্তব্য, যা সমালোচক করেছেন, সে বিষয়ে কোন প্রতিবাদ বা মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না—কারণ যে-কোন ছবি সম্বন্ধে স্বাধীন মত (ভালো বা মন্দ) ব্যক্ত করার অধিকার সমালোচকমাত্রেরই আছে। তবে একটি কথা বিশেষ করে বলা প্রয়োজন—উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ

এস পি প্রোডাকসন্সের 'অভিশাপ' চিত্রের দুটি প্রধান ভূমিকায় শোভা সেন ও বিকাশ রায়

কী হয়ে এসেছে, কী হওয়া উচিত বা কী হতে পারে, এ বিষয়ে সমালোচকের অধিকতর অনুশীলনের প্রয়োজন। উপন্যাসাবলম্বী সার্থক চলচ্চিত্রের উদাহরণের অভাব নেই। দেশজ শিল্পে যদি সমালোচকের আস্থা না থাকে, তবে যে-কোন বিদেশী ক্লাসিক ছবি থেকে তিনি অনেক কিছু শিখতে পারেন।

ইতি—
সত্যজিৎ রায়।
২৫-৫-৫৯।

আমাদের বক্তব্য

সত্যজিৎবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আমরা "পথের পাঁচালি" বা "অপরাজিত" কোনটিই ভালোভাবে পড়েছি কিনা। মূল উপন্যাস আদৌ পড়েছি কিনা—সে ইঙ্গিতও করেছেন এক জায়গায়। আগামী সংখ্যায় আমরা তাঁর সন্দেহ নিরসন করবার চেষ্টা করব। এ সপ্তাহে স্থান এবং সময় দুয়েরই অভাব।

একজন পাঠকের চিঠি

সবিনয় নিবেদন,

কদিন আগে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" দেখে এবং 'দেশে' তার সমালোচনা পড়ে বাঙালী সাহিত্য পাঠক হিসেবে (এবং চলচ্চিত্র দর্শক হিসেবেও) আমার মনে কতকগুলো প্রশ্ন জেগেছে।

শ্রীসত্যজিৎ রায় চিত্র-পরিচালক হিসেবে আজ জগৎ-প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। তাঁর "পথের পাঁচালি" পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেছে। বাঙালী তথা ভারতবাসী হিসেবে এজন্য আমরা নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করি। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। শ্রী রায় বাঙালী দর্শক মনকে কি অবহেলা করেন নি তাঁর "অপুর সংসার" মারফত?

"অপুর সংসার" ছায়াচিত্র হিসেবে হয়তো চিত্রজগতে স্মরণীয় সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হবে, ছবির অপু হয়তো স্মরণীয় চিত্র-চরিত্র হিসেবে বিশ্ববরেণ্য হবে। কিন্তু আমরা তো আমাদের সেই চেনা অপুকে পুরোপুরি পেলাম না! বিভূতিবাবুর অপুকে দেখতে গিয়ে এক আধা-চেনা অপুকে দেখে কেন আশাহত হলাম?

শ্রী রায় কিছুদিন আগে কোন এক সভায় বলেছিলেন—লেখনীর দ্বারা কোন কিছু প্রকাশ করা আর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কিছু প্রকাশ করা এক ব্যাপার নয়। দুটোর কারিগরী আলাদা। বেশ লেগেছিল চিত্র-জগতের এই গূঢ় রহস্যের কথা তাঁর মুখ থেকে শুনে। কিন্তু তাঁর সেই "দুটো

[রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের "ভ্রান্তি"-র নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নির্মলকুমার ও বাসবী নন্দী। ছবিখানি অচিরেই মুক্তিলাভ করবে

আলাদা কারিগরী" কি চেনা মানুষকে অচেনা করে দেওয়া? ইতি—

গোপীনাথ রায়,
বর্ধমান।

চিত্রালোচনা

দু'খানি বাংলা ও দু'খানি হিন্দী—মোট চারখানি নতুন ছবি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে।

গ্রেস পিকচার্সের 'শশীবাবুর সংসার' তার মধ্যে একটি। আশাপূর্ণা দেবীর যুগোপযোগী একটি আধুনিক কাহিনীকে ছবির পর্দায় রূপ দিয়েছেন সুদক্ষ পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় এ ছবির অন্যতম সম্পদ। তাঁর সহযোগিতা করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, চন্দ্রাবতী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, জীবেন বসু, অনুপকুমার, অমর মল্লিক প্রমুখ কুশলী শিল্পীরা। অনিল বাগচী ছবিতে সুরারোপ করেছেন।

এস পি প্রোডাকশন্সের 'অভিশাপ' এ হপ্তার দ্বিতীয় বাংলা ছবি। বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিখানি কিছুদিন আগে তোলা হয়। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, শোভা সেন, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতশ্রী, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুপার পিকচার্সের '৯১১নং জয়েরী' ও এন কে প্রোডাকশন্সের 'মিস্টার জন' হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে এ হপ্তার নতুন আকর্ষণ। প্রথমোক্ত ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন শেখ মুখতার, নন্দা, মামুদ, হীরালাল, ডেজি ইরানী ও মিনু মমতাজ। আসিপ ও দত্তারাম যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

জনি ওয়াকার 'মিস্টার জনে'র নায়ক। শ্যামা, ললিতা পাওয়ার, কাম্মো ও হেলেন অন্যান্য বিশিষ্ট অংশে চিত্রাবতরণ করেছেন। পরিচালনা ও সুরারোপের দায়িত্ব যথাক্রমে বহন করেছেন ইন্দর ও এন দত্ত।

* * *

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের নবতম অবদান 'ভ্রান্তি'-র মুক্তিও সমাসন্ন। ইতিপূর্বে 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবিতে এই প্রতিষ্ঠানটি বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছে। আবেগ ও অনুভূতির সমন্বয়ে বর্তমান ছবিটি নতুনতর রসের সন্ধান দেবে বলে প্রকাশ। ছবি বিশ্বাস, বাসবী নন্দী, পাহাড়ী সান্যাল, নির্মলকুমার, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে
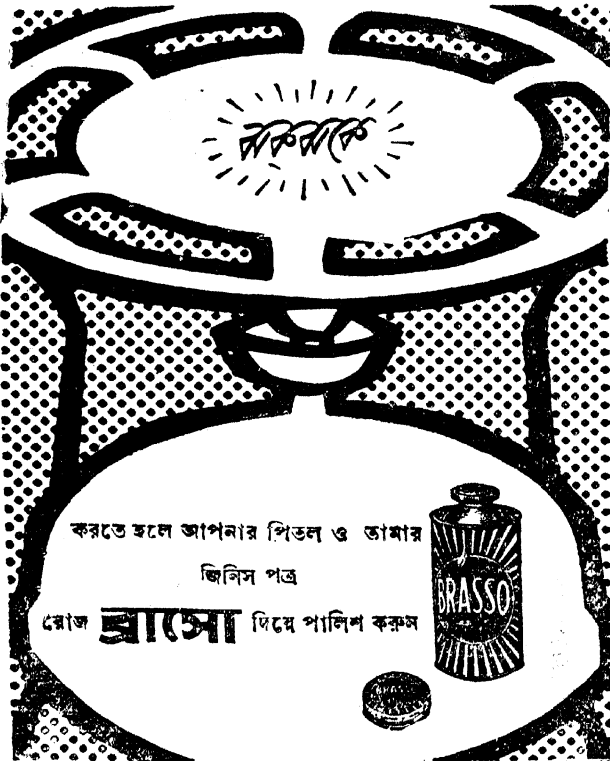
এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

বি পি ফিল্মসের 'মাহুত বন্ধুরে' আগামী আকর্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। ভূপেন হাজারিকার প্রযোজনা ও পরিচালনায় তোলা এই বাংলা ছবিখানি পুরোপুরি স্টুডিওর বাইরে তোলা। আসামের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী ছবিখানিকে নতুন শোভায় মণ্ডিত করেছে। ছবির মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন প্রিয়ম্ হাজারিকা, দিলীপ রায়, মানসী সোম, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি। স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার পুত্র অলকেশ বড়ুয়া ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকৃতীশ বড়ুয়াও এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'ঘরে-বাইরে' অবলম্বনে যে ছবি তোলবার সঙ্কল্প করেছেন, তাতে নায়িকা বিমলার ভূমিকায় তিনি সুচিত্রা সেনকে মনোনীত করেছেন—এ খবর আগেই বেরিয়েছে। এখন জানা গেল, শ্রীমতী সেনের বর্তমান পারিশ্রমিকের অনুপাতে অর্থদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় সত্যজিৎবাবু ঐ ভূমিকার জন্যে অন্য অভিনেত্রীর সন্ধান করছেন। যদি উপযুক্ত শিল্পী (নতুন বা পুরাতন) তিনি না পান, তাহলে 'ঘরে-বাইরে' চিত্রান্তরিত করবার সঙ্কল্প তিনি এখনকার মত ত্যাগ করবেন—একথা এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির কাছে শ্রী রায় বলেছেন। তার বদলে ছোট ছোট তিনটি গল্প নিয়ে সমারসেট মম-এর 'ট্রিয়োর ধাঁচে একটি চিত্রগুচ্ছ তৈরী করবার ইচ্ছা তাঁর আছে।

* *

রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে আর এস আর প্রোডাকশন্স তাঁদের প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'গানের কাহিনী' নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। চণ্ডী নাগের ওপর এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

ঐ স্টুডিওতেই ২২শে মে এ এন এস প্রোডাকশনের নতুন জীবনীচিত্র 'কবীর'-এর শুভারম্ভ করা হয়েছে। প্রণব রায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করবেন নীরেন লাহিড়ী।

মাটির ছোঁয়াচ

বিকৃত রস ও রুচি এবং উগ্র বিদেশীয়ানা ইদানীং হিন্দী পর্দায় এমন নির্লজ্জভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে ভালো হিন্দী ছবি দেখবার আনন্দ রুচিবান দর্শকদের ভাগ্যে খুব কমই জোটে। এর মধ্যে হঠাৎ যদি দেশের মাটি ও মানুষ নিয়ে সত্যিকারের কোন রসসমন্বিত ছবির সাক্ষাৎ মেলে তবে তা শুধু আনন্দই দেয় না, আশারও সঞ্চার করে বটে। রূপালয়ের 'হীরা-মোতী' রসিকজনের কাছে সেই আশা ও আনন্দের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।

মুন্সী প্রেমচাঁদের বহুপঠিত গল্প 'দো বৈলো কি কথা' থেকে ছবিটির আখ্যানবস্তু আহরণ করা হয়েছে। কৃষক-দম্পতির একমাত্র সম্পদ এক জোড়া বলিষ্ঠ বলদ—তাদের নাম হীরা ও মোতী। হীরা ও মোতীর ধনে তারা ধনী, এদের নিয়ে এরা সুখী। হীরা ও মোতী মনিবের সকল কাজ করে দেয়, তাদের ছোট্ট অভাবের সংসারে প্রাচুর্য যত না এনে দেয়, তার চেয়েও বেশী এনে দেয় ঐশ্বর্য—যা নির্ভয় ও শান্তি।

গ্রামের কর্তৃত্বাভিমানী, স্বার্থান্ধ জমিদার সহ্য করতে পারে না কৃষক-দম্পতির এই সম্পদ। বলদ দুটিকে কৃষক-দম্পতির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ও মেরে ফেলা তার পণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের এমনিভাবে পশুর স্তরে নেমে আসা, আর পশুর মূক বেদনায় মানুষেরই সদ্‌গুণ রূপ নেওয়ার মধ্যে গড়ে উঠেছে কাহিনীর নাট্যসংবেদন। প্রভুভক্ত এ-দুটি পশু কি করে জমিদারের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে এবং নিপীড়িত কৃষক-সমাজকে জমিদারের উদ্ধত শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রেরণা জোগায় যার ফলে অত্যাচারী শেষ পর্যন্ত মাথা নত করে তা নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিণতি।

ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ভারতীয় গ্রামজীবনের একটি মনোময় রূপ সহজ ও সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছবির পরিবেশ, কাহিনী ও পাত্র-পাত্রীরা একান্তভাবে ভারতীয়। মাটি, মানুষ ও গৃহপালিত পশু—এই ত্রয়ীর মধ্যে এক বন্ধন—যা কৃষিপ্রধান ভারতের প্রাণ—এমন আবেগনিবিড় হয়ে পর্দায় উপস্থাপিত হয়েছে যা দর্শকদের সহজেই আবিষ্ট করে রাখে। দুটি মূক পশুকে নিয়ে ছবিতে যে নাট্যরস বিস্তার করা হয়েছে এবং স্নেহপ্রাণ মনিবের সঙ্গে এদের সম্বন্ধের মধ্যে এমন নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করা হয়েছে যার জন্যে নবীন পরিচালক কৃষণ চোপরা সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবেন। গ্রাম্যপরিবেশে কৃষি সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা নিরাশার রূপটি সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে ছবির সুগ্রথিত চিত্রনাট্যে। মুন্সী প্রেমচাঁদের অপরূপ কাহিনীর রূপ ও রস অবিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে ছবিতে। বর্জনীয় অংশ ছবির কোথাও নেই তা নয়, তবে সেগুলি ছবির সামগ্রিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করে না।

কৃষক-দম্পতির ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ, বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন বলরাজ সাহনী ও নিরূপা রায়। অন্য একটি কৃষকের ভূমিকায় অসীমকুমারের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী। একটি গ্রাম্য তরুণীর বেশে শুভা খোটে মনে রেখাপাত করেন। জমিদারবেশী কৈলাস, রসিদ খাঁ, কুমারী নাজ প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। নামভূমিকায় দুইটি বলদকে, অদ্ভুতভাবে কাজে লাগিয়েছেন পরিচালক।

আবহসংগীতে রোশন নির্ভরযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবিতে গান ও নাচের আধিক্য রসহানি না ঘটালেও অনাবশ্যক বলে মনে হয়। আলোকচিত্র ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ উঁচুদরের।

খেলার মাঠে

একলব্য
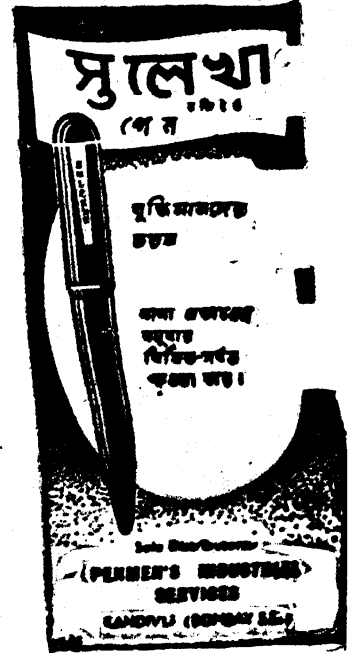
সপরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিমণ্ডলী দার্জিলিং শৈল বিহারে যাবার আগেই ভারতের ফুটবল-মন্ত্রিসভা শিলংয়ের শৈলাবাস থেকে ফিরে এসেছেন। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভার আসর বসেছিল শিলংয়ে। সব রাজ্যের প্রতিনিধি, অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবলের মাতব্বরেরা এখানে সমবেত হয়েছিলেন। দু'দিনের অধিবেশনে কর্মকর্তা নির্বাচন ছাড়া আরও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ফুটবল ফেডারেশন তার আয় বাড়াবার উপায় করেছেন, ভারতীয় রেল টীমকে ১৯৬০ সাল থেকে সার্ভিস টীমের অনুরূপ মর্যাদা দিয়েছেন, আরও দুটি নতুন প্রতিযোগিতা 'নিজাম গোল্ড কাপ' ও 'কেরালা ট্রফির' খেলাকে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আই এফ এ শীল্ড, ডি সি এম কাপ, জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ, কেরালা ট্রফি ও নিজাম গোল্ড কাপের খেলার সময় নির্দেশ করে দিয়েছেন, জাতীয় প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক বিভাগের পুনর্বিন্যাস হয়েছে, বিভিন্ন উপসমিতি গঠিত হয়েছে, আরও হয়েছে কত কি! কিন্তু যে দু'তিনটি প্রস্তাব এবারকার সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সে সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

একটি প্রস্তাব ছিল ফেডারেশনের কোন কর্মকর্তা অন্য কোন ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। অপর প্রস্তাব ছিল আই এফ এ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের নাম পরিবর্তন করে প্রাদেশিক দল হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ ফুটবল এসোসিয়েশন বা অনুরূপ কোন নাম গ্রহণ করতে হবে। সমভাবে পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের নামও বোম্বাই ফুটবল এসোসিয়েশন নামে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের বিভিন্ন উপসমিতিতে স্থান দিয়ে ফেডারেশনের ক্ষমতাশালী কর্মকর্তারা প্রস্তাবগুলি ধামাচাপা দিয়েছেন আর ফেডারেশনের গদি-আঁটা চেয়ারের দখল নিজেরাই ভাগাযোগ করে নিয়েছেন। ফেডারেশনের কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই 'খোড়-বড়ি-খাড়া' আর 'খাড়া-বড়ি-খোড়েরই' পুনরাগমন ঘটেছে। কোন সংস্থার কাজকর্মের উন্নতি এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই মাঝে মাঝে সংস্থার কর্মকর্তা পরিবর্তনের প্রয়োজন। এটা সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। কিন্তু ফুটবলের, শুধু ফুটবলের কেন, আমাদের দেশের খেলাধুলোর মাতব্বরেরা এ তথ্য স্বীকার করতে নারাজ। তারা চান বহাল তবিয়তে আজীবন গদি এটে বসে থাকতে। এতে কি খেলাধুলোর কোন উন্নতি সম্ভব?

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সৃষ্টির আগে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হলেও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন এখন একটি প্রাদেশিক সংস্থা। সুতরাং এসোসিয়েশনের নামের আগে ইণ্ডিয়ান কথাটি থাকলে বিদেশীর চোখে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাই ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অযৌক্তিক নয়। সমভাবে পশ্চিম ভারতের গণ্ডি অনেকখানি। পশ্চিম ভারত বললে শুধু বোম্বাইকেই বুঝায় না। তাই বোম্বাই ফুটবল এসোসিয়েশনের নাম পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিবর্তে বোম্বাই ফুটবল এসোসিয়েশন হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ফেডারেশনের কোন কর্মকর্তা অন্য কোন ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে পারবেন না বলে যে প্রস্তাব ছিল তার মধ্যেও যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। একজন লোক যেমন একই সঙ্গে দুই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসলেও তার মধ্যে কপটতা থাকা স্বাভাবিক। তেমন একজন কর্মকর্তা একই সঙ্গে দুটি ক্রীড়া-সংস্থার সেবা করতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের একাধিক ক্রীড়া-পরিচালক একাধিক সংস্থার কর্মকর্তা। বিভিন্ন পদাধিকারবলে বিভিন্ন সংস্থার সুখী পরিবার। এদের কবল থেকে যতদিন ভারতের ক্রীড়া-সংস্থাগুলি মুক্ত না হবে ততদিন ভারতে খেলারও উন্নতি হবে না।

* * *

কলকাতার ফুটবল লীগের খেলায় এখনো কোন গোলযোগ দেখা যায়নি। বৃষ্টির ফলে দু'দিন মাঝপথে অবশ্য খেলা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সত্যই এখনো কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ময়দানের ফুটবল আবহাওয়াকে কলুষিত করেনি।

এর মাঝে একদিন প্রথম ডিভিসন লীগের তিনটি খেলাই গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। সেদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মরশুমের প্রথম এবং মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় পয়েন্ট নষ্ট করে। 'খেলাঘরের' টেবিলে বসে কি হেডিং করবো ভেবে যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি তখন বার্তা সম্পাদক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটু মুচকি হেসে বলে গেলেন—'লিখে দিন খেলায় কোন 'গোল'-যোগ নেই।' অর্থাৎ কোন গোল হয়নি। বার্তা সম্পাদক যত হাল্কা ভাবেই বলুন না কেন, কথাটা কিন্তু মনে ধরলো। কিন্তু কলমে এল না। কারণ গোলযোগই তো কলকাতার ফুটবলের নিত্য সহচর। এবার এখন পর্যন্ত যখন গোলযোগ দেখা দেয়নি তখন এই হেডিং করে শেষে গোলযোগ টেনে আনবো? কখনও না।

পাশেই ইংরাজী দৈনিকের বিজ্ঞ ক্রীড়া-সাংবাদিক হেডিং করছিলেন—'ইস্টবেঙ্গল ড্রপ ফার্স্ট পয়েন্ট।' তাঁকে সবিনয়ে বললাম—খেলার যে হাল তাতে ইস্টবেঙ্গল ফার্স্ট পয়েন্ট একদিন ড্রপ করতই, কিন্তু একদিনে তিনটি খেলায় গোল না হবার ঘটনা আর নাও ঘটতে পারে। তিনি মত পরিবর্তন করলেন। লিখলেন 'অল থ্রি সিনিয়র ম্যাচেস গোললেস।' পরের হেডিংয়ে লিখলেন—'ফার্স্ট চেক ফর ইস্টবেঙ্গল।' তার পরের হেডিংয়ে—'মোহনবাগান ড্রপ অ্যানাদার পয়েণ্ট। আমি হেডিং করলাম 'প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের গোলশূন্য দিন।' দ্বিতীয় হেডিং হল—'ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ও মোহনবাগানের দ্বিতীয় পয়েন্ট নষ্ট।'

মোহনবাগান ও রাজস্থান ক্লাবের লীগের খেলায় রাজস্থান ব্যাক এস গুপ্ত গোলের মুখ থেকে একটি বল হেড করছেন

ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন পরিচালিত দক্ষিণ কলিকাতা স্কুল হকি লীগে উপর্যুপরি পাঁচ বছরের চ্যাম্পিয়ন জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন হকি দল

এখন সেদিনের হেডিংয়ের কথা যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে হেডিং তেমন জুৎসই হয়নি। যদি হেডিং করতাম—"তিনটি খেলায় তিরিশ জন ফরোয়ার্ডের গোল করবার ব্যর্থতা" তাহলে বোধহয় হেডিং আরও জুৎসই হত। ফুটবল খেলার ধারার সঙ্গেও হত মানানসই। সত্যিই এবার গোল বড় দুর্মূল্য। প্রথম ডিভিসন লীগের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে এ পর্যন্ত ১৫টি ক্লাবের একশ বিশ তিরিশ জন ফরোয়ার্ড গোল করেছেন মাত্র ৬২টি। এক এক জনের ভাগে আধখানা করেও পড়ে না। এটা অবশ্য মে মাসের পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত তিন সপ্তাহের খেলার হিসাব। ফুটবল খেলা এখনো ভাল করে জমে ওঠেনি। কোন ক্লাবের খেলাতেও তেমন জলুস নেই। তবে মাঠে, বিশেষ করে মহারথী ক্লাবগুলোর খেলায় দর্শক সমাগম হচ্ছে যথেষ্ট। কিন্তু আগেই বলেছি কোন গোলযোগ নেই। এটাই সুখের কথা। খেলায় 'গোল'-যোগ থাক না থাক গোলযোগ না থাকলেই বাঁচোয়া।

ক্রিকেট খেলার খবর

বেরী সর্বাধিকারী

(বিমান ডাকযোগে)

লণ্ডন, ২৩শে মে—গত সপ্তাহে ভারতের প্রথম ছয়টি খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিয়েছি। এবার পাঠাচ্ছি পরের দুটি খেলার বিবরণ। এ দুটি খেলার প্রথমটিতে 'গ্লামোরগানের' কাছে ভারতীয় দলকে ৫১ রানে হার স্বীকার করতে হয়েছে। পরেরটিতে 'এসেক্সের' সঙ্গে ভারতীয় দল অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে।

কার্ডিফে 'গ্লামোরগানের' কাছে আমাদের পরাজয়ই এবারকার সফরের প্রথম পরাজয়। 'গ্লামোরগান' এমন কিছু শক্তিশালী কাউণ্টি টীম নয়। গতবারের কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানশিপে 'গ্লামোরগানের' স্থান ছিল ১৪টি কাউণ্টির নীচে। তারাই কিনা আমাদের প্রথম পরাজিত করলো! শুধু তাই নয়। অধিনায়ক উইলফ্রেড উলার সমেত 'গ্লামোরগানের' তিনজন ভাল খেলোয়াড় ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। উলার ছাড়া বাকী দুজন খেলোয়াড় হচ্ছেন গিলবার্ট পার্কহাউস ও বার্নার্ড হেজেস। সবারই হাতে পায়ে অল্পবিস্তর চোট ছিল। উলারের অনুপস্থিতিতে এলান ওয়াটকিন্সের উপর 'গ্লামোরগানের' অধিনায়কত্বের ভার পড়ে। সেই ওয়াটকিন্স, যিনি ১৯৫১-৫২ সালে নাইজেল হাওয়ার্ডের ভারত সফরকারী ইংলেণ্ড দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ছিলেন। ভারতে খেলার সময়ই আমরা তাঁর মাথায় বেশ বড় রকমের 'টাক' দেখেছিলাম। ওয়াটকিন্সের টাকের আকার এখন আরও বড় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভারতে ওয়াটকিন্সের টেস্ট খেলার স্মৃতি ভেসে উঠছে। দিল্লীতে প্রথম টেস্টেই ইনি ৫০ ও নট আউট থেকে ১৩৮ রান করে আমাদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তারপর বোম্বাইতে করেছিলেন ৮০ রান, কলকাতায় ৬৮ ও ২, কানপুরে ৬৬ এবং মাদ্রাজে ৯ ও ৪৮। ওয়াটকিন্স ছাড়া ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের আর একজন মাত্র সেঞ্চুরী করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন টম গ্রেভনি। যাই হক, মুস্তিয়ার অফ-ব্রেক বলে ওয়াটকিন্স শূন্য রানে এল-বি-ডবলিউ আউট হয়ে গেলেও এবং 'গ্লামোরগানের' আর কোন খেলোয়াড় বেশী রান না করতে পারলেও ২৬ বছরের অখ্যাতনামা খেলোয়াড় জেমস প্রেসডী গ্লামোরগানের পক্ষে একাই ১১০ রান করে দলের জয়লাভের প্রথম 'ভিত্তি' রচনা করেন। বোরদের প্রশংসনীয় বলে এক দিক থেকে গ্লামোরগানের উইকেট যখন পড়তে আরম্ভ করে, অন্যদিকে তখন প্রেসডী দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন। এ-খেলায় বোরদে 'হ্যাটট্রিক' পাবার উপক্রম করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। এক ওভারে তিনটি উইকেট নিয়ে শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৭ রানে ৪টি উইকেট নিয়েছেন। জেমস প্রেসডীর ব্যাটিং আমাদের বেশ আনন্দ দিয়েছে। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রেসডীর প্রথম শ্রেণীর খেলায় এটাই প্রথম সেঞ্চুরী। প্রেসডীর ১১০ রান নিয়ে 'গ্লামোরগান' প্রথম ইনিংসে ১৮২ রানের বেশী করতে পারে নি।

'গ্লামোরগানের' ব্যাটিংয়ের কথা বলছিলাম না? ব্যাটিংয়ের চেয়ে এদের বোলিং আরও শক্তিহীন। দলে নামকরা কোন বোলার নেই। যে দুজন অফ্‌স্পিনার আছেন—ওয়াকার ও ম্যাককেনম—এঁরা নিতান্ত সাধারণের পর্যায় পড়েন। কিন্তু এঁরা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এক রকম 'কচুকাটা' করলেন কিভাবে? উত্তর খুব সোজা।

ব্যাটিংয়ে প্রয়োজন তিনটি জিনিস—চোখ, হাত আর পা। 'শেকড় গেড়ে' ক্রীজের ভেতর পা রেখে স্পিন বোলিং খেলা যায় না। উইকেট কিছুটা স্পিন বোলিংয়ের সহায়ক ছিল ঠিকই। কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা 'নড়ে চড়ে' না খেলে 'স্ট্যাচুর' মত দাঁড়িয়ে স্পিন বোলিং খেলতে গিয়েছিলেন। ফলে 'দণ্ডও' পেয়েছেন হাতেনাতে। ১১২ রানে আমাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেছে।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭০ রানে এগিয়ে থেকে 'গ্লামোরগান' দ্বিতীয় ইনিংসে বেশ পিটিয়েই রান তোলে। জয়লাভের জন্য যেমন পেটানো প্রয়োজন। পিটোতে গিয়ে কিন্তু প্রথম দিকের তিনটি উইকেট ৪০ রানের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু তাতে কি? হারজিত নাহি লাজ। নির্ভীকভাবে খেলাই আসল খেলা। ওয়াটকিন্স এ ইনিংসে ভালই খেলেন। ২২৩ রানে গ্লামোরগানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। জয়লাভের জন্য ভারতীয় দলের প্রয়োজন থাকে ২৯৩ রানের। এর মধ্যে পঙ্কজ রায়ের উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দল সংগ্রহ করে ৪৫ রান। সুতরাং জয়ের জন্য আর ২৪৯ রানের দরকার থাকে।

ইলফোর্ডে এসেক্স ও ভারতীয় দলের খেলার সময় মঞ্জরেকার নাইটের বল 'হুক' করবার সময় মুখে আঘাত পান। এই আঘাত মঞ্জরেকারের টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণের অন্তরায় হয়েছে

খুট খুট করে খেলায় লাভ হয় না, ক্ষতিই হয়। এ-কথার তাৎপর্য বোধ করি অধিনায়ক গাইকোয়াড় ও বোরদে ভাল করেই বুঝেছিলেন। তাই প্রমাণও করলেন দ্বিতীয় ইনিংসে মারের খেলা খেলে। কিন্তু একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বুঝতে। তাদের দুজনের জুটিতে ১২৯ রান হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় দলকে হার-স্বীকার করতে হল। ভাগ্যবিপর্যয়ই বলব। কারণ গাইকোয়াড় শেষ পর্যন্ত রান আউট হয়েছেন একটি রান করতে গিয়ে, যে রান করবার ঝুঁকি নেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। গাইকোয়াড় উইকেটে টিকে থাকলে ভারতীয় দল এ-খেলায় জিততে পারত কিনা, সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু জেতার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে এভাবে অধিনায়কের পতন দলের উপর কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ফলে ১৯৩ রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটে গাইকোয়াড় রান আউট হবার পর ভারতীয় দল বাকী ছয়টি উইকেটে মাত্র ৪৯ রান যোগ করেছে। আবার সেই ভীত সন্ত্রস্ত ব্যাটিং। তবু মন্দের ভাল অধিনায়ক গাইকোয়াড় এ-খেলায় জেতবার প্রচেষ্টা করে হেরে গেছেন। আমাদের ব্যাটসম্যানরা এখনো যদি মেরে খেলা শুরু করেন, তবে ভয়ের বিশেষ কিছু নেই। অবশ্য মারবার বল। বাজে বলে খোঁচা দিয়ে উইকেট না হারান, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

আজ কদিন ধরে ইংলন্ডে বৃষ্টি হচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি। আমাদের দেশের 'বাদল ঝর ঝর মাদল বাজে'-এর মত। শুনলাম সুর সাধক আলী আকবর খাঁ সাহেব লন্ডনে এসেছেন। তাঁর 'সরোদে' মেঘমল্লার ঝংকারের সংগে সংগেই এই মেঘ বাদল কিনা কে জানে! বলতে হয় 'শ্যামল সুন্দর' ইংলন্ডবাসীর ডাকে সাড়া দিয়েছে। আকাশ সব সময়ই মেঘ-মেদুর। প্রায় সারাক্ষণই টিপ টিপ বৃষ্টি, মাঝে মাঝে পসলা। আইসক্রীমের আর চাহিদা নেই। তবু ঠান্ডার জন্যও অনেকের মুখেই আইস-ক্রীম। যেমন আমাদের দারুণ গ্রীষ্মেও অনেকে 'চা'য়ের ভক্ত। 'বিষে বিষ-ক্ষয়' করবার প্রচেষ্টা আর কি।

লন্ডনের অনতিদূরে ইলফোর্ডে ভারত ও এসেক্স দলের খেলায় বৃষ্টি যথেষ্টই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। কখনো বৃষ্টি কখনো রৌদ্র। খেলা শুরু হয়, হতে না হতে আবার বৃষ্টি, আবার খেলা বন্ধ। এ অবস্থার মধ্যে খেলেও ভারত যে শেষ পর্যন্ত ড্র করেছে সেটা আনন্দেরই কথা। এসেক্সের বিরুদ্ধে অধিনায়ক গাইকোয়াড় খেলেননি। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার পড়েছিল সহ অধিনায়ক পঙ্কজ রায়ের উপর। পঙ্কজ এ ম্যাচে ভালই খেলেছেন। প্রথম ইনিংসে ৩৫ আর দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট থেকে ৪৩ রান করেছেন।

ইংলন্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির অন্যতম সদস্য ডগলাস ইনসোল হচ্ছেন 'এসেক্স' দলের অধিনায়ক। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান খেলোয়াড়। তারপর টেস্ট খেলোয়াড় ট্রেভর বেলীর খ্যাতি তো সর্বজনবিদিত। প্রয়োজনমত শেকড় এঁটে উইকেটে টিকে থাকতে পারেন, আবার মারের হাতও চমৎকার, বলও করেন ভাল। ভিজে উইকেটেও 'এসেক্স' টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করে এবং প্রথম দিনই সংগ্রহ করে ৭ উইকেটে ২৫৭ রান। বেলী অবশ্য ২ রান করেই গুপ্তের 'গুগলী'তে ক্যাচ তুলে আউট হয়ে যান। কিন্তু একুশ বছরের ছেলে ব্যারী নাইট আট নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে ব্যাট করতে এসে ভারতীয় বোলারদের 'নাজেহাল' করে ছাড়েন। মাত্র ৮৮ মিনিটে ৮২ রান করেও তিনি নট আউট থাকেন এবং ইংলন্ডের এই মরশুমে তিনি সর্বপ্রথম দ্রুততম সেঞ্চুরী করবেন বলে সকলের ধারণা হয়। কিন্তু পরের দিন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৮৯ রানের মাথায় আউট হবার ফলে নাইট সে সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। যা'ই হক ৯ উইকেটে ২৮৫ রান করে ইনসোল দ্বিতীয় দিনের সূচনায় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ভারতীয় দল ৯৮ রাণ তুলতেই ৬টি উইকেট বিসর্জন দেয়। ফলে তারা ফলো অনের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে কিনা এ বিষয়ে রীতিমত আশংকাই সৃষ্টি হয়। অবশ্য মঞ্জরেকার কৃপাল সিং ও তামানের প্রয়োজনানুরূপ ব্যাটিংয়ে ভারতীয় দল ফলো-অনের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। খেলাও শেষ পর্যন্ত শেষ হয় অমীমাংসিত-ভাবে। কৃপাল সিং এ খেলায় যেমন ব্যাটিং

করেছেন, সফরের আর কোন খেলায় তেমন ব্যাটিং করতে পারেননি। তার ৫২ রানের সত্যই প্রশংসা করা উচিত। মঞ্জরেকার এই খেলাতেই নাইটের একটি বল হুক করার সময় মুখে আঘাত পেয়েছেন। তার ফলে মঞ্জরেকারের গণ্ডেয় একখানি অস্থিতে চুলের মত ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষার পর এ তথ্য আবিষ্কারের পর মঞ্জরেকারের প্রথম টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ সম্পর্কেও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। মঞ্জরেকার অবশ্য হাসপাতালে নেই। তিনি যদি নটিংহামের প্রথম টেস্টে না খেলতে পারেন তবে ভয়েরই কথা। হায়দরাবাদের তরুণ খেলোয়াড় আব্বাস বেগ, যিনি এখন অক্সফোর্ডে পড়ছেন এবং ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন তাকে ভারতীয় দলের পক্ষে টেস্ট খেলাবার অবশ্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু মঞ্জরেকার খেলতে না পারলে যে ক্ষতি হবে তা অপূরণীয়।

ইলফোর্ডে ভারতীয় দলকে এসেক্সের সংগে খেলতে হয়েছে প্রকৃত ইংলন্ডের আবহাওয়ায় এবং সত্যিকারের ইংলিশ উইকেটে। দ্বিতীয় দিন মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন ও মুহুর্মুহু বর্ষণের মধ্যে ভারতীয় দলের যখন 'ফলো অনের' সম্ভাবনা ছিল তখন সকল খেলোয়াড়েরই মুখ ছিল গুরুগম্ভীর। বসিহারি প্রকৃতি দেবীর। তৃতীয় দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। আগের দিনের এত গর্জন, এত বর্ষণ সত্ত্বেও মাঠ চমৎকার। মাঠের চারিদিকে রোদ্দুর খেলা। আশ্চর্য, কিন্তু এটাই ইংলন্ডের বিশেষত্ব। অনিশ্চিত কেটে গেছে—আমাদের খেলোয়াড়দের চোখে মুখে হাসি ফুটেছে।

সুভাষ গুপ্তে সম্বন্ধে একটা কথা বলছি। কয়েকদিন আগে 'এম্পায়ার নিউজে' ইংলন্ডের প্রাক্তন ওপেনিং ব্যাটসম্যান সিরিল ওয়াশব্রুক লিখেছিলেন—"ভারতীয় দলের বোলিংয়ের মহাস্ত্র হলেন সুভাষ গুপ্তে"। ওয়াশব্রুক আরও বলেছেন—তাঁর সারা জীবনে গুপ্তের মতন এমন উচ্চাংগের লেগ ব্রেক বোলারের বিরুদ্ধে তিনি কখনো খেলেন নি। ইংলন্ডের ক্রিকেট সমালোচক এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়রাও স্বীকার করেন গুপ্তে আজও পৃথিবীর সেরা লেগব্রেক বোলার। আমি কিন্তু বলি গুপ্তে আজও হয়তো সেরা কিন্তু আগে তাঁর বোলিংয়ে যে জলুস ছিল তা আর নেই। এর প্রমাণ প্রকৃত ইংলিশ উইকেটেও তিনি এসেক্সের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেননি।

এ লেখা পাঠকদের হাতে পৌঁছাতে লর্ডস মাঠে ভারতীয় দলের এম সি সি দলের সংগে খেলা শেষ হয়ে যাবে। তারপর ভারতীয় দল খেলবে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও সামারসেটের সংগে। এক-দিন বিশ্রামের পর জুনের ৪ তারিখ থেকে ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে প্রথম টেস্ট। ইংলন্ডের গ্রীষ্ম-কালীন আবহাওয়া অর্থাৎ 'ঝড় বৃষ্টি বাদল' শুরু হয়েছে। এই আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের খেলোয়াড়েরা যদি এম সি সি, অক্স-ফোর্ড ও সামারসেটের সংগে ভাল খেলে কিছুটা মনোবল সঞ্চয় করতে পারে তবে টেস্টেও মন্দ খেলবে না।

আমাদের খেলোয়াড়রা আজ পর্যন্তও কিন্তু ইংলন্ডের দর্শকদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। অবশ্য একথা ঠিক ইংলন্ডে ক্রিকেট নিয়ে আর আগের মত 'মাতা-মাতি' নেই। ভারতীয় দলের খেলায় অল্প দর্শক উপস্থিত থাকছেন সে কথা আগেই বলেছি। ওভাল মাঠে সারের সংগে খেলার তিনদিনে ৯ হাজারের বেশী দর্শক মাঠে দেখা যায় নি। এর মধ্যে ভারতীয়, বাঙালী এবং তথাকথিত 'কালা আদমী'দের সংখ্যা কম নয়। ভারতীয় মহিলাও ছিলেন যথেষ্ট। সংসারের কাজকর্ম ছেড়ে ওভালে মৌরসী-পাট্টা করে বসেছিলেন। ভারতীয় দলের খেলায় দর্শকের কথা না হয় নাই তুললাম। কিন্তু চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়ায় সেদিন 'লর্ডসে' লন্ডনেরই দুটি নামকরা টীম সারে ও মিডলসেক্সের খেলায় এক হাজারের বেশী দর্শক দেখিনি। অবশ্য সভা হবে। সভারও যে বেশী এসেছিলেন সে কথা স্বীকার করতে পারছি না। মোটের উপর ইংলন্ডে এবার ক্রিকেটের আকর্ষণ যেন বেশ কমে গেছে।

আর ভারতীয় দলের খুট খুট ব্যাটিংয়ের খবর তো এখানকার ক্রীড়ারসিকদের আলো-চনারই বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানকার অনেক পুরনো বন্ধু ঠাট্টাও করছেন যথেষ্ট। 'নিউজ ক্রনিকলের' ক্রফোর্ড হোয়াইট, 'ডেলী হেরাল্ডের' চার্লস ব্রে, সারে দলের একেক বেডসার সেদিন আমায় বলছিলেন—"তোমা-দের ছেলেদের হোল কি হে, মারে না কেন?" আমি দমবার পাত্র নই। মুখে হাসি টেনে জবাব দিলাম—"ওরা তোমাদের ছেলেদের অস্ট্রেলিয়ায় খেলা দেখে শিখেছে।" বন্ধুরা রাগ করলেন না। শুধু একটু মুচকি হাসি হাসলেন।

ভারতীয় দল সম্পর্কে এখানকার কিছু কিছু লোকের একটা ভুল ধারণাও রয়েছে। একটা মজার ঘটনা বলি। সেদিন এক পুরনো বন্ধু 'কেরল' ও 'ওয়্যারলেসের' মিঃ ক্রিক লং নিয়ে গেলেন 'সিভিল সার্ভিসেস' ক্লাবে। মেম্বারদের সংগে লং পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি জিম, ইনি বার্নিস, ইনি ক্রিক, স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ইনি গ্লাডিস, ইনি প্যাম (প্যামেলার সংক্ষিপ্ত) ইনি কেটি ইত্যাদি। কোন নাম পুরো বললেন না। তাড়াতাড়ি পরিচিত হচ্ছি কি না। মিসেস গ্লাডিস করমর্দন করলেন, ভুরু তুললেন, চোখ নাচালেন, তারপর সোল্লাসে বললেন।

How wonderful! I know you will beat us. The West Indians are such wonderful cricketers.

—বুঝুন ব্যাপারখানা। এঁরা জানেনা এবার কোন দল ইংলন্ডে সফর করছে। এঁরা অবশ্য ক্রিকেটের খুব ভক্ত নন। কিন্তু একথাও ঠিক ভারতীয় দলের এবারকার সফর ইংলন্ডে তেমন 'সোরগোল' তোলে নি। ডাকের সময় হয়ে এল। সুতরাং এখানেই শেষ করছি।

দেশী সংবাদ

১৮ই মে—মুখ্যমন্ত্রী সহ মাত্র তিনজন মন্ত্রী লইয়া উড়িষ্যায় কংগ্রেস গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। যে তিনজনকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে, তাঁহারা হইতেছেন ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, মুখ্যমন্ত্রী, শ্রী আর এন সিংদেও (গণতন্ত্র পরিষদ) ও শ্রীরাধানাথ রথ (কংগ্রেস)।

করোগেট টিন ও গৃহনির্মাণ অথবা মেরামতের জন্য অতি প্রয়োজনীয় লোহার রড ইত্যাদি, যাহার জন্য বহুদিন এমন কি বহু বৎসর ধরিয়া সরকারের নিকট দরবার করিয়াও সহজে পাওয়া যায় না, এইরূপ লৌহ দ্রব্যাদি বণ্টন ও পরিদর্শন ব্যবস্থায় চরম দুর্নীতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৯শে মে—রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পতাকা দণ্ডে যে জাতীয় পতাকাটি উড্ডীন আছে, অদ্য উহাতে কতকগুলি বড় বড় ছিদ্র দৃষ্ট হয়। ছিদ্রের সংখ্যাধিক্য জাতীয় পতাকার প্রতি পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহা ইঁদুরে খাইয়াছে কি পোকায় কাটিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

আজ কেরল সরকার রাজ্যের বে-সরকারী বিদ্যালয় পরিচালকগণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, শিক্ষা আইনকে কার্যকরী করিতে না দিবার জন্য তাঁহারা বিদ্যালয় বন্ধ রাখার যে হুমকি দিয়াছেন, তাহা যদি সত্য সত্যই কার্যে পরিণত করেন, তবে গভর্নমেণ্টও এ অবস্থায় যাহা করণীয় তাহা করিতে বাধ্য হইবেন।

২০শে মে—দুর্গাপুরে ডি ভি সি-র নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি ইঞ্জিনীয়ারদের ভুলের জন্য যথাসময়ে চালু করা সম্ভব হইবে না বলিয়া নির্ভরযোগ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারদের ভুলের ফলে নির্মিত কয়েকটি অংশ ভাঙিয়া নূতন করিয়া তৈয়ার করিতে হইবে। এজন্য অতিরিক্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হইবে।

রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরে দলাদলির সুযোগে এক শ্রেণীর অফিসার ও কর্মচারীর সরকারী চাকুরি-বিধি লঙ্ঘন করিয়া দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগে আরও প্রকাশ, ইহাদের সহিত কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার কতিপয় নেতা ও কর্মীরও যোগসাজশ রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'হরিণঘাটার দুগ্ধ পরিকল্পনা' বিভাগীয় এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর দূরদৃষ্টির অভাবে এবং ঔদাসীন্যে অব্যবস্থা এমন চরমে উঠিয়াছে যে, হরিণঘাটার দুগ্ধ উপনিবেশের ৬৩০টি মহিষের মধ্যে ৩৮৯টি মহিষ এবং ৮৮৫টি গরুর মধ্যে ৫৭৮টি গরু উপনিবেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৫ জন লাইসেন্সধারীর মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৫ জন উপনিবেশের মায়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

২১শে মে—অদ্য সন্ধ্যার দিকে কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কর ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে দুইটি শিশু সহ আটজন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হয় বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ব্যারাকপুর, হুগলী, বনগাঁ, বজবজ প্রভৃতি এলাকায় গৃহ ও বৃক্ষাদি পতনের ফলে আরও প্রায় ১০০ লোক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২২শে মে—মুসৌরীতে দলাই লামা ২৫০০-তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে তিব্বতের অধিবাসীরা যে 'বাধা'র সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা যাহাতে চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণের মত সাময়িক হয় এবং স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম যাহাতে আরও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্য সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধদের নিকট আজ আবেদন জানান।

২৩শে মে—কলিকাতায় একটি সুসংগঠিত দল কিভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়াছে, তাহার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগ দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া এই জালিয়াতিতে লিপ্ত সন্দেহে ১০ জন কোটিপতি ব্যবসায়ী সহ ৭৮ জনকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিয়াছে।

দুর্গাপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কয়েক হাজার ডি ভি সি কর্মীর মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। একদিকে বহু উদ্বৃত্ত কর্মী ছাঁটাই করা হইতেছে; অন্য দিকে বাহির হইতে 'আপন লোক' নিয়োগ করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

২৪শে মে—অদ্য বিডন স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলনে সমবায় ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কিত প্রস্তাব আলোচনাকালে সম্মেলন মণ্ডপের এক কোণে কিছুসংখ্যক লোক গোলমাল শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উহা গোলযোগকারী দল এবং কংগ্রেস সেবাদল কর্মীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও লাঠালাঠিতে পরিণত হয়। তবে ঐ সংঘর্ষের ফলে কোন পর্যায়েই সম্মেলনের কাজ তেমন ব্যাহত হয় নাই।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই মে—শ্রীফিলিপ গুণবর্ধনের নেতৃত্বে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট মার্কসবাদী বিপ্লবকারী লঙ্কা সম সমাজ দল আজ রাত্রে সিংহলের কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় ব্লু বুকে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান "ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিশ্বনীতির" একটা সীমা থাকা উচিত এবং বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি যেরূপ, তাহাতে জাপানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত প্রতিরক্ষা মৈত্রী ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ থাকা চলে না।

১৯শে মে—কায়রো হইতে প্রেরিত প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীইউজেন ব্ল্যাক আজ কায়রোতে বলেন যে, সিন্ধু নদের জল বিভাগ সম্পর্কে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কর্মচারিগণ দুই মাসের মধ্যেই লণ্ডনে মিলিত হইবেন।

২০শে মে—নেপালী কংগ্রেস নেতা শ্রী বি পি কৈরালার নেতৃত্বে নেপালী মন্ত্রিসভা আগামী সোমবার শপথ গ্রহণ করিবেন। আটজন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। মন্ত্রিসভায় একজন মহিলা সহ ১১জন উপমন্ত্রী থাকিবেন।

২১শে মে—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ গতকল্য এই মর্মে এক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন যে, দেশ হইতে সাময়িকভাবে অনুপস্থিতি অথবা অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে যদি কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার হইয়া অন্য একজন অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেণ্টের কাজ চালাইয়া দিবেন। তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে প্রেসিডেণ্টের কাজ চালাইবেন।

২২শে মে—পাকিস্তানের ইতিহাসে নামজাদা চোরাই চালানদার বলিয়া বর্ণিত কাসিম ভাট্টি আজ সামরিক আদালতে বলে যে, পাকিস্তানের একজন ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট, একজন ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেল এবং একজন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাহাকে চোরাই চালানদারের কার্যে উৎসাহ দান, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্য দান করিয়াছেন।

২৩শে মে—ছেলেমেয়েদের একটি বইয়ে একটি কালো খরগোশের সঙ্গে একটি সাদা খরগোশের বিয়ের গল্প থাকায় বইটি আলাবামা রাজ্যের পাবলিক লাইব্রেরীসমূহ হইতে সরাইয়া ফেলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধরনের পুস্তকে কালো ও সাদা মানুষের সংহতি সাধনে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ আসায় উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কাসেম অদ্য অপরাহ্ণে বাগদাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দলের কার্যকলাপ বন্ধ করার যে সিদ্ধান্ত ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি সমর্থন করেন।

২৫শে মে—ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রসচিব শ্রী জন ফস্টার ডালেস অদ্য ৭১ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, দুই পুত্র ও এক ভগিনী শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার রোগযন্ত্রণা এমন তীব্র হইয়া ওঠে যে, তাঁহাকে ঘুমের ঔষধ সেবন করাইয়া রাখিতে হয়। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি মারা যান।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সব ঘরেই দরকার

LIPTON (INDIA) LIMITED *(Incorporated in England)*

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গহন (কবিতা)—শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	...	৪৮০
চিহ্নহীন (কবিতা)—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	...	৪৮০
স্মৃতিচারণ—শ্রীদিলীপকুমার রায়	... ...	৪৮১
বিজ্ঞান-বৈচিত্র্য—চক্রদত্ত	... ...	৪৮৪
নেপাল—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়	... ...	৪৮৫
লণ্ডনে রোগশয্যা থেকে—ডক্টর শশধর সিংহ	...	৪৮৯
অলিখিত—শ্রীশচীন কর	... ...	৪৯১
জল পড়ে পাতা নড়ে—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	...	৪৯৪
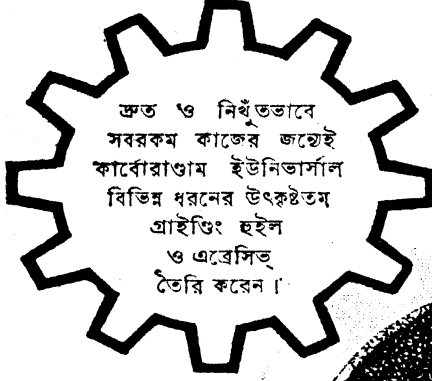
সবরকম কাজের জন্যেই
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল
গ্রাইণ্ডিং হুইল
পাওয়া যায়
দ্রুত ও নিখুঁতভাবে
সবরকম কাজের জন্যেই
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল
বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্টতম
গ্রাইণ্ডিং হুইল
ও এব্রেসিভ্
তৈরি করেন।
A PRODUCT BY
বণ্ডেড্
এব্রেসিভ্
গ্রাইণ্ডিং হুইল,
সেগ্‌মেণ্ট, রাবিং ব্রিক, স্টিক,
শার্পেনিং স্টোন (শানপাথর)
ভাল্‌ভ গ্রাইণ্ডিং কম্পাউণ্ড,
প্রভৃতি।
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : ৫২।৫৩, জাহাংগীর স্ট্রীট,
টেলিফোন : ২৯৪১ (৪ লাইন)
কারখানা : তিরুভত্তিয়ুর,
মাদ্রাজ।
বিক্রয়-প্রতিনিধি :
মেসার্স উইলিয়াম্ জ্যাক্স্ অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা-১, বোম্বাই-১, মাদ্রাজ-১, নয়া দিল্লী, বাঙ্গালোর-১, কানপুর।
শুধু বৈশিষ্ট্যের জন্ম :
মেসার্স এইচ, এস্, কর অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২৪, রাম্পার্ট রো, বোম্বাই।
BOMAS CUZ-46 BEN
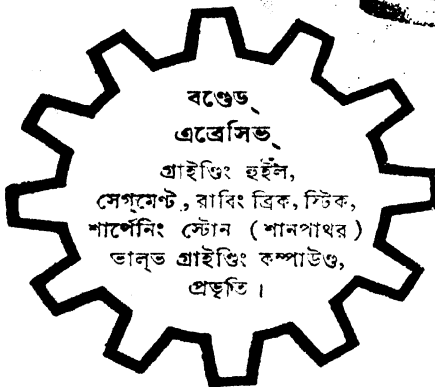
সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 6th June, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

তিব্বতে অনুষ্ঠিত চীনা শাসক-গোষ্ঠীর অত্যাচারে ভারতবাসীর চিত্ত যেমন বিচলিত হইয়াছে তেমন অনেককাল ঘটে নাই। ভারতবাসী চিরকাল পরশাসন ও সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী। যখন সে নিজে পরাধীন ছিল তখনও সে জাপান কর্তৃক নিগৃহীত চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ কালে সাধারণতন্ত্রের প্রতি দরদের অভাব ছিল না। আবার ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রান্ত হইলে আবিসিনিয়ার সঙ্গেই ছিল তাহার সহানুভূতির যোগ। তারপরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে সর্বত্র নিগৃহীত দেশের প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছে, বিশেষ আফ্রিকা ও এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ লাঞ্ছিত দেশগুলির নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছে স্বাধনী ভারতবর্ষ। নিজের বেদনার দ্বারা অপরের বেদনা বুঝিবার ক্ষমতা তাহার। কিন্তু তিব্বতে অনুষ্ঠিত অত্যাচারে তাহার একেবারে নাড়ীতে টান পড়িয়াছে, কারণ ভারতের বহির্ভূত দেশগুলির মধ্যে বোধ করি তিব্বতের সঙ্গেই তাহার ঘনিষ্ঠতম যোগ, সে যোগ দীর্ঘকালের ও নানা সূত্রের। তাই আজ রাজনৈতিক মতবাদের সীমানা লংঘন করিয়া ভারতীয় জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এমন যে সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ তিব্বতের গণবিপ্লব রাজনৈতিক ব্যাপার মাত্র নয়, তিব্বত সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের ভাষায় তাহা মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। ভারতবাসী যে অধিকারকে পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকার করে, তিব্বতের বেলায় তাহা লংঘন করিতে পারে না।

সম্প্রতি কলিকাতা শহরে যে তিব্বত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহাতে

তিব্বত ও ভারতীয় জনমত

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ন্যায় নেতা ও মনীষিগণ তিব্বত সমস্যার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিষয়ে, অপরটি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভ্রম বিষয়ে। "সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, তিব্বতের সমস্যা সমাধানকল্পে আফ্রিকা ও এশিয়ার নিরপেক্ষ দেশগুলি হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিশন গঠিত হোক—আর এই কমিটি বিষয়টি সম্যক আলোচনা করিয়া একটি রিপোর্ট দান করুন। খুব সম্ভব শ্রীজহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস সরকার এই কমিশনে যোগদান করিবেন না, কেননা গোড়া হইতেই শ্রীজহরলাল নেহরু তিব্বত সম্পর্কে একপ্রকার উদাসীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। বলিলে অন্যায় হইবে না কম্যুনিস্টগণের মতো কংগ্রেসদলও এ বিষয়ে ভারতীয় জনমতের প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কংগ্রেস সরকারের দায়িত্বই সবচেয়ে অধিক। কংগ্রেস সরকারের মুখপাত্র হিসাবে নেহরুজী সাময়িক সুবিধা লাভের আশায় তিব্বতকে চীনের হাতে তুলিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু সেই কল্পিত সুবিধা হইয়াছে কী? চীন মাঝে মাঝে মুখে 'হিন্দি চীনী ভাই ভাই' ধ্বনি করা ছাড়া ভারতের জন্য আর কি করিয়াছে জানি না। তিব্বত সম্বন্ধে নেহরুজী যে তথ্যমূলক বিবৃতি দিয়াছেন তাহা চীনকে এমন রুষ্ট করিয়াছে যে, চৈনিক পক্ষ নেহরুজীকে যৎপরোনাস্তি কটুকাটব্য করিয়াছে। তারপরে ভারতের ত্রিশ হাজার বর্গমাইল ভূমি নিজের এলাকা বলিয়া চীন মানচিত্রে দেখাইয়াছে, প্রতিবাদ সত্ত্বেও জানাইয়া দিয়াছে এখন প্রতিকার করা সম্ভব নয়। এই তো 'হিন্দি চীনী ভাই ভাই'এর প্রতিদান। মূলে নেহরুজী যে ভুল করিয়াছেন তাহার এগুলি ফল। এসব উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আবার ভুল করিতে চলিয়াছেন—ইহাতে চীনের মন গলিবে না। চীনের পররাজ্যলিপ্সা ভবিষ্যতে কী ভয়াবহ আকার গ্রহণ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যে আভাষ দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট।

"ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, চীন কর্তৃক তিব্বতের উপর আধিপত্য স্থাপনের কথা তিনি যতই চিন্তা করিতেছেন ততই শঙ্কাবোধ করিতেছেন। তাঁহারা যখন এশিয়ার কয়েকটি দেশ মিলিয়া পাশ্চাত্য দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা প্রতিরোধের কল্পনা করিতেছেন তখন এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ চীন এই-ভাবে একটি দুর্বল জাতির স্বাধিকার হরণ করিতে সচেষ্ট। ইহা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। নেপালেও একদিন কোন পুরাকালে চীনের আধিপত্য ছিল এই অজুহাতে নেপালের উপরও হয়ত একদিন চীনা আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা হইবে। নেপালের পর ভূটানেও যদি আধিপত্য স্থাপিত হয় তবে আর কতদূর? ভারতও যে কোন সময় বিপদগ্রস্ত হইতে পারে। সেজন্য ভারতকে সজাগ থাকিতে হইবে।"

ভারতবাসী অবশ্যই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শ্রীজহরলাল নেহরু তথা কংগ্রেস সরকার সজাগ আছেন না [illegible] ঘুমাইতেছেন তাহা লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

প্রসঙ্গত

মহাবীর হনুমানের কয়েকটি কীর্তি প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে একটি অগ্নিকাণ্ড-সংঘটন, অপরটি উল্লম্ফন। হনুমান অনায়াসে যোজন যোজন পার হয়ে লংকায় উপনীত হয়েছিলেন। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে যিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি নর নন, বানর, এ-কথার স্মরণে মানবজাতির বিশেষ গৌরব নেই। ত্রেতাযুগের কাহিনীকে তবু কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে, কিন্তু কলিকালে যা ঘটছে তা প্রায় চাক্ষুষ। চোখে যদি বা দেখতে না পাই, বেতারের সরব প্রচারের প্রসাদে কানে শুনি, খবরের কাগজে শিরোনামাগুলি ত ডানা মেলে দিয়ে আছেই। অতএব, "এবল্" এবং "বেকার" নাম্নী দুটি বানরী মহাকাশ থেকে ফিরে এসে রাতা-রাতি বিখ্যাত হয়ে ত পড়েছেই, বানরকুল ত বটেই, নরকুলকেও তারা ধন্য করেছে। পাখি ঠোঁটে করে বড়জোর আনতে পারে সমুদ্রপারের স্বাদ, কিন্তু এই বানরী দুটি যেখানে গিয়েছিল সেখানে ইতিপূর্বে কোন মর্ত্যবাসী পোঁছতে পারেনি। হ্যামলেট হলে বলতেন, সেই "আন্-ডিসকাভার্ড কাণ্ট্রি ফ্রম হুজ বোর্ন নো ট্র্যাভেলার রিটার্নস্"।

নিজ-মর্তসীমা চূর্ণ করতে মানুষের বরাবর আগ্রহ। তার চাঞ্চল্য অধুনা এত তীব্র এবং সুদূরের পিপাসা এত বলবতী যে, সে বিশ্বরহস্যের মর্মমূলে পোঁছতে চায়। সে-কাল হলে বানর দুটি পারমার্থিক উপলব্ধি নিয়ে ফিরত। তাদের ভাষা দুর্বোধ্য; তবু যদি তার থেকে কিছুমাত্র অর্থোদ্ধার করা যেত তাহলে বোধহয় তার মর্ম এই রকম দাঁড়াতঃ "আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি, যিনি তমসার পারে আদিত্য-বর্ণ।" কিন্তু, এ ত দর্শনের যুগ নয়, কালটা বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের। বানরী-দুটি তাই ফিরে এসে মহাকাশের বিকীরণতত্ত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান বিতরণ করেছে। তাদের মহাকাশে যাত্রা যে মহাযাত্রায় পরিণত হয়নি, আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাশ্চর্য কৃতিত্ব এই, এবং লাইকা কুক্কুরীর উপরে মার্কিন বানরী-দুটি অন্তত এই একটি বিষয়ে টেক্কা দিয়েছে। 'পরমাশ্চর্য' বিশেষণটি সুপ্রযুক্ত হল কিনা জানিনে, কেননা রামগরুড়ের ছানাদের যেমন হাসতে, আমাদের এ-কালের মানুষের তেমনই বিস্মিত হতে মানা। একটুখানি অবাক লেগেছিল যেদিন প্রথম স্পুটনিক মহাকাশের কিনারা খুঁজতে ছুটে বেরিয়েছিল। আবার ঈষৎ বিস্মিত হলাম এবার যখন উৎক্ষিপ্ত দুটি প্রাণ নিরাপদে মাটিতে ফিরে এল। চরম বিস্ময় এখনও বাকি —সেদিন হয়ত শুনব চন্দ্রলোকে মানুষের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে।

এই সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্ষোভও মিশ্রিত। বিমানযোগে মানুষ কালো মেঘ ফুঁড়ে গেছে, কিন্তু একেবারে উড়ে যাবার গৌরব প্রথম পেল মানবেতর প্রাণী। তবে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনাও আছে। মানুষের সহায়তা না থাকলে কি "এবল্" এবং "বেকার"-এর পক্ষে এই কীর্তি অর্জন সম্ভব হত? বীর হনুমানেরও সহায় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র; তিনি অবতার হলেও নরোত্তম, অর্থাৎ মানুষ।

*

ম্যালথসের মুখে ছাই দিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ হিসেব দেখছি, সংখ্যাটা ২৪০ কোটি। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি চাঁদা দিয়েছে চারটি দেশ—মহাচীন (৬৪ কোটি), আমাদের মহাভারত (৪০ কোটি), সোভিয়েট ইউনিয়ন (২০ কোটি) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৭ কোটি)। কেবল ভয় নয়, এই হিসাবে কিঞ্চিৎ আহ্লাদেরও খোরাক আছে। শক্তিতে নয়, শিক্ষায়, সম্পদে, সামর্থ্যে কোনটাতেই না, শুধু লোকসংখ্যায় আমরা 'বিগ ফোর'-এর অন্যতম। প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৮৫টি সন্তান ভূমিষ্ট হয়, মাষষ্ঠীর কাছে অতএব যমেরও জারিজুরি চলে না। অবিবাহিতের তুলনায় বিবাহিতেরাই দীর্ঘায়ু এই তথ্য প্রকাশ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ দপ্তর কাদের সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন জানি না, অন্তত বিবাহিত নরনারী-মাত্রেই যে পুলকিত হবেন না এটা ঠিক। সব কিছুরই অত্যন্ত গর্হিত, দাম্পত্য জীবনেও। কপোত-কপোতীর সংখ্যা এ-সংসারে আর কটি!

সুখের কথা থাক, এবারে ভাবনার কথায় আসি। ভারতের জনসংখ্যা বেশি একথা আমরা ত জানি, আর পরিকল্পনা-নবীশেরা জানেন হাড়ে হাড়ে। নূন আনতে তাঁদের পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে—দুকোটি বেকারের জন্য যদি প্ল্যান করলেন, তবে দেখা যায় প্ল্যানের আমলেই আরও দুকোটি বেকার কাজ চাই বলে হাত বাড়িয়েছে। বাকি-বকেয়া চুকিয়ে দিতে দিতেই আমাদের প্ল্যানের কর্ণধারেরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন, দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনার গোড়াতে এদেশে কর্মহীনের সংখ্যা ছিল সরকারী মতে ৫৫ লক্ষ, তাদের অনেকেই চাকরি পেয়েছে তবু তৃতীয় পরিকল্পনার গোড়াতে "অয়ম্ আরম্ভঃ শুভায় ভবতু" বলতে আমাদের অনেকেরই একটু আটকাবে, কেমননা ঐদিন বেকারের সংখ্যা বেড়ে হবে ৭০ লক্ষ। আগামী প্ল্যানে যেদিন "স্বাহা" বলে পূর্ণাহুতি দেব সেদিন দেখব ইতিমধ্যে আরও ১৪০ লক্ষ কর্ম চাই বলে এক দরজা থেকে অন্য দরজায় ফিরছে। গ্র্যান্ড টোটাল তাহলে দাঁড়াল ২১০ লক্ষ। এর মধ্যে একটি সরকারী সংস্থা হিসাব করে দেখেছেন, বড়জোর ১২০ লক্ষ লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। শেষ অবধি ৯০ লক্ষ বেকার থেকেই যাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্ল্যানের শুরুতে যত ছিল তার চেয়ে ২০ লক্ষ বেশি। খরচের পরিমাণ বাড়ছে, বেকারের সংখ্যাও। বেকার নব্বই লক্ষ না হয়ে এক কোটি বা দেড় কোটিও হতে পারে; কারণ সরকার বলছেন বটে ১২ কোটি নতুন কাজের সংস্থান তাঁরা করবেন, তবু সাধ আর সাধ্য সব সময়ে ত মেলে না। পাশ্চাত্য দেশের পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে এই হিসাবও অবাস্তব মনে হবে। কেননা, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ওসব দেশের তুলনায় আমাদের নিতান্তই কম। অগ্রসর দেশে সুস্থদেহ নরনারীমাত্রেই কাজ করে বা খোঁজে, আমাদের দেশে পরিবার পিছু একজন। অন্যান্য দেশে কর্মহীনতা মানে অনাহার নয়, কেননা 'আন্-এমপ্লয়মেণ্ট ইনসিওরেন্স' ইত্যাদি আছে এবং বেকারের সংখ্যা বাড়লেও জাতীয় সম্পদ উৎপাদনের হার সমানই থাকে। ন্যাশনাল ওয়েলথ বাড়াবার দিকে যদি আমাদের সরকারের ঝোঁক থাকত, তবে বেকার-সমস্যায় আতঙ্কিত হবার কারণ ঘটত না। সরকার এখন ভাবছেন শহরের বেকারদের গ্রামে পাঠালে মুশকিল-আসান হয়। অদর্শনে বিস্মৃতি বলে একটা কথা আমরা জানি; গ্রামে যারা যাবে, তাদের ভুলে যাওয়া শহরের সরকারের পক্ষে এতই কি সহজ হবে?

আলোচনা

পরিপূর্ণ সাহিত্য

সবিনয় নিবেদন,

"দেশ" পত্রিকার "সাহিত্য সংখ্যায়" শ্রীরাজশেখর বসু লিখিত "পরিপূর্ণ সাহিত্য" প্রবন্ধটি আগ্রহ সহকারে পড়িলাম। লেখকের বক্তব্য সম্পর্কে মোটামুটি আমি একমত। বর্তমানে বাঙলা ভাষায় কি জাতীয় রচনার আধিক্য লেখক সেই সম্বন্ধে কতকগুলি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ঐ পরিসংখ্যানগুলির ভিত্তিতে তিনি বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান রূপ বা প্রকৃতি বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরিসংখ্যানগুলি লেখকের কোনও ছাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। উল্লিখিত কয়েকটি পরিসংখ্যানের (বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন হইতে সংগৃহীত) ভিত্তিতে সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের বিচার করা ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। যদিও কার্যক্ষেত্রে উহা কতকাংশে সত্য। রাজশেখরবাবু খ্যাতনামা সাহিত্যিক—শুধু তাই নয় তিনি একজন বিজ্ঞানী বলিয়াও পরিচিত। সাহিত্যিক রাজশেখরবাবুর কাছে নিরস পরিসংখ্যানের গুরুত্ব না থাকিতে পারে—কিন্তু বিজ্ঞানী রাজশেখরবাবুর কাছেও কি তাই? —না তা আশা করা যায়? উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলির "উদাহরণ স্বরূপ" সংগৃহীত—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Random Survey, সুতরাং Random Survey-র ফলাফল ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার সময় "Random Survey-র ফলাফল" বলিয়া উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন—অন্যথায় ভিত্তি অবৈজ্ঞানিক হওয়ার ফলে বিচারে গুরুতর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "দেশ" পত্রিকারই ১৩৬৫ সালের সাহিত্য সংখ্যায় দেখা যায় যে, বাঙলা ভাষায় (নানান বিষয়ে) উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত নূতন পুস্তকের (মোটামুটি হিসাব) সংখ্যা প্রায় ২০৪ খানি। উক্ত তালিকার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের মোট সংখ্যা ৫৮—অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের (পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে) শতকরা ২৯ ভাগ গল্প ও উপন্যাস। চলতি বৎসরের (১৩৬৬) সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য নতুন বাঙলা পুস্তকের সংখ্যা প্রায় ২০৫—উহার মধ্যে গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা ৬৭—অর্থাৎ শতকরা ৩৩·৫ ভাগ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পরিসংখ্যানের হিসাব করিবার পদ্ধতির রকমফেরে—পরিসংখ্যান পরিবর্তন করিতে সমর্থ। সুতরাং **Sample Statistics**-এর ভিত্তিতে ব্যাপক ও সাধারণভাবে বিচার করিবার সময় কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইতি—

কানাইলাল বসু

লোহা ও ইস্পাতের কথা

বিনীত নিবেদন,

দেশে ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সোনাভান চৌধুরীর "ভারতীয় লোহা ও ইস্পাতের কথা" প্রবন্ধে আছে, "তখনকার দিনের বাত্যাচালিত চুল্লী'তে "খাঁটি আকরিক ব্যবহার করা হ'তো বলে কোন বিগলন সহায়ক (Flux) পদার্থের দরকার হ'তো না।"

কিন্তু খাঁটি আকরিক কি করে পাওয়া সম্ভব? যতগুলি আকরিক লোহার (Iron Ore) নাম আমরা জানি, তা নিম্নরূপ। বন্ধনীর মধ্যে বিশুদ্ধ লোহার পরিমাণ শতকরা হিসাবে দেওয়া গেল।

Clay iron ore (38 to 46); **Black**

band (about 40) Iron Pyrites (about 47); **Magnetic iron ore** 55 to 72) **Red Hoematite or, Specular iron ore (about 70) Brown Hoematite or, Limonite** (about 60) **Spathic iron ore or, Siderite (about 48).**

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই কমবেশী নোঙরা (**Impurities**) আছে। প্রয়োজনীয় Roasting এবং Smelting-এর পরেও প্রচুর নোঙরা আকরিকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়।

অভিধানের মতে Flux-এর অর্থ "বিগলন সহায়ক"। কিন্তু ধাতুবিদ্যামতে (**Metallurgically**)—**Flux** is a substance mixed with ores in order that it will react chemically with the gangue (i.e. impurities) present in the ores and to form slag. ....

আর একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি অন্যত্র লিখেছেন "এই সব অস্ত্র দিয়ে হাতীর শুঁড়ের মতো কঠিন জিনিস কেটে নানা রকমের জিনিসপত্র তৈরী হতো।"

"হাতীর শুঁড়ে"র পরিবর্তে কি "হাতীর দাঁতের"...পড়তে হবে? ইতি—

সন্তোষকুমার সিকদার,
জলপাইগুড়ি।

স্মৃতিচারণ

"দেশ" সম্পাদক সমীপে,

সবিনয় নিবেদন, শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর স্মৃতিচারণে (দেশ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬) সুভাষচন্দ্রের আই সি এস পরীক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন: "ও তাদের প্রায় সবাইকেই হারিয়ে পরীক্ষায় দাঁড়াল চতুর্থ। তার উপর ইংরাজীতে প্রথম।"
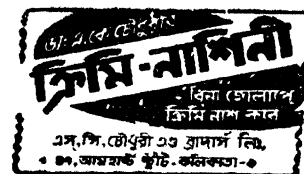
এ তথ্য নির্ভুল। কিন্তু ইংরেজীতে অর্থাৎ ইংরেজী প্রবন্ধ রচনায় সুভাষচন্দ্র একাই প্রথম হননি, একথা নিবেদন করা উচিত মনে করি। ইংরেজী প্রবন্ধ রচনায় ৫০০ মার্কস-এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র পান ৩৬০। সেবারে যিনি আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হন পি রামলিংগম—তিনিও প্রবন্ধ রচনায় ৩৬০ মার্কস পান। কী প্রবন্ধ তাঁরা লিখেছিলেন জানিনে তবে নিচের চারটির মধ্যে কোন একটি।

1. Discuss the economic position of Europe at the present time and suggest any means of improving that position.

2. "It is ludicrously untrue that progress is a universal law of nature"—Discuss the proposition.

3. How far is Labour justified in employing strikes for political ends?

4. Is it desirable to have a National Theatre?

আবশ্যিক ইংরেজী রচনা (প্রবন্ধ) বাদে সুভাষচন্দ্রের ঐচ্ছিক ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য ছিল না যা রামলিংগমের ছিল।

সর্বসাকুল্যে ৬০০০ মার্কসের মধ্যে রামলিংগম পান ২৭১৬ ও সুভাষচন্দ্র ২২৮৪। সুভাষচন্দ্রের মার্কস লিস্ট নিচে দেওয়া গেল।

			সেকশন ২
(৫০০)	(৮০০)	(৬০০)	(৪০০)
৩৬০	২৬৬	১০৫	১৭৩

সাধারণ আধুনিক ইতিহাস	যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যা	নৈতিক ও আধিবিদ্যক দর্শন
(৫০০)	(৬০০)	(৬০০)
১২৫	৩৪৪	৩০৪

অর্থবিদ্যা ও অর্থনৈতিক ইতিহাস	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	ইংরেজী আইন
(৬০০)	(৫০০)	(৫০০)
২২৯	২৪৮	১৩০

১৯২০-তে লন্ডনে গৃহীত আই সি এস পরীক্ষার্থীর প্রথম ৯ জনের মধ্যে ৬ জন (২, ৪ ৫ ৭ সংখ্যক বাদে) সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন।

(1) P. Ramalingam; (2) A. F. Bateman; (3) A. N. Shah; (4) S. C. Bose; (5) M. D. Bhat; (6) D. V. Rege; (7) A. G. Ranasinha; (8) Chandra; (9) S. M. Dhar.

(Pamphlets of the London Competitive Examination for Indian Civil Service 1920. Containing Regulations Question Papers Table of Results etc., London. His Majesty's Stationery Office, 1920: দ্রষ্টব্য।)

নমস্কারান্তে।

পরিমল দত্ত,
দিল্লী।

মুদ্রাদোষ

সবিনয় নিবেদন,

গত পয়লা জ্যৈষ্ঠের দেশ পত্রিকায় শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের "সবুজপাতার ডাক" প্রবন্ধে অনেক রকম মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। মুদ্রার যে অর্থ 'ছাপার অক্ষর' তার ভুলের বর্ণনাগুলোই সবচেয়ে উপভোগ্য। এখানে আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা হয়। আমাদের বাল্যকালে একবার এলাহাবাদে পয়লা বৈশাখের একটি উৎসবে হ্যান্ডবিল ছাপা হয়। তাতে লেখা ছিল—"আজ সন্ধ্যায় ছয়টার সময় নৃত্যগীত ও হত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" নৃত্যগীত এর পরই হত্যাদির ব্যবস্থা থাকায় প্রথমে লোকে একটু হকচকিয়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভুল বুঝতে পারায় হাসি পায়। "ইত্যাদি" যে মুদ্রা দোষে "হত্যাদি" হয়েছে তা আর বুঝতে বিলম্ব হয়নি।

হারীতবাবুর লেখাটি পড়ার পর থেকেই মুদ্রাদোষ ধরার একটা নেশা এসে গেছে। বোধকরি তারই ঝোঁকে ৮ই জ্যৈষ্ঠের দেশ পত্রিকায় তাঁরই প্রবন্ধে কয়েকটি মুদ্রাদোষ চোখে পড়ে। ৩৩৩ পাতার প্রথম কলামে ওপর থেকে দশম লাইনে ছাপা হয়েছে—"মানসিক স্বল্পের সৃষ্টি হয়েছিল।" "স্বল্পের" কথাটি যে "স্বপ্নের" হবে এবিষয় বোধহয় কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু পরের কলামের মুদ্রাদোষটি একটু সঙ্গীন হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। পরবর্তীকালে পত্রের অনুলিপির এক জায়গায় ছাপানো হয়েছে—

"আমি পারত পক্ষে কাজ কামাই করিনে, সেও আমার একটা রোগ—ছাপতে দিয়েছি। কাগজ বোধহয় কাল বিশেষ, একটা পুরোনো প্রবন্ধ মেজে ঘসে বেরুবে।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষা বলে প্রথমটা ভাবলাম হয়তো কোনো অর্থ থাকতেও পারে। কিন্তু অনেক বার পড়ার পর মনে হলো কথাটা হবে:—

"আমি পারতপক্ষে কাজ কামাই করিনে, সেও আমার একটা রোগ বিশেষ। একটা পুরোনো প্রবন্ধ মেজে ঘসে ছাপতে দিয়েছি। কাগজে বোধহয় কাল বেরুবে।"

আমার অনুমান ঠিক না-ও হতে পারে। লেখকের মত জানতে ইচ্ছা করি।

আমি নিয়মিত "দেশ" পড়ি ও আনন্দ পাই। হারীতবাবুর প্রবন্ধ থেকে খুঁচিয়ে মুদ্রাদোষ বার করায় আশাকরি কেউ অপরাধ নেবেন না। ইতি—

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত,
লখনউ।

সন্তোষকুমার ঘোষ

[৩০]
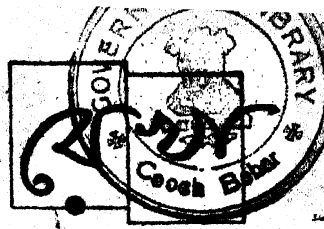
দিনান্তলিপি' থেকেঃ পরবর্তিকালে এই ঘটনার উল্লেখ করে সতী কৌতুক বোধ করত। বলার কথা যখন ফুরিয়ে যেত, কিংবা খুঁজে পাওয়া যেত না, তখনই সতী আমরা প্রথম যেদিন কথা বলি, সেদিনকার রাত্রির কথা তুলত। জিজ্ঞাসা করত, সত্যি কথা বল ত, আমাকে ছুঁয়ে বল, সেদিন কী ভেবেছিলে তুমি? আমি বলতাম, কিছু ভাবিনি। আমি ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সতী বলত, মিছে কথা, আমি যখন জলের গ্লাস নিয়ে ফিরে এলাম, তখনও তুমি জেগেছিলে। তোমার চোখের পাতা বন্ধ ছিল, কিন্তু পায়ের বুড়ো আঙুল নড়ছিল।

কী করে জানলে?

ঝুঁকে পড়ে আমি দেখেছিলাম যে।

আর কী?

আর আমি তোমার পাশে জলের গ্লাস নামিয়ে চলে আসছিলুম।

তখন কী হল? আমি জানতাম, তবু জিজ্ঞাসা করতাম, সতীর মুখে শুনতে ভাল লাগত। অনেক দূরের কি যেন খুঁজিয়ে বাজিয়ে দেখত না। সতীর গলা মিহি ছিল, সতীর গলার ভঙ্গি সুন্দর ছিল।

তখন আমার আঁচলে টান পড়ল। ফিরে চাইলাম, দেখি, তুমি টানছ।

আর?

জানি না। আচ্ছা, কী করে টেনেছিলে বল ত। তখন পর্যন্ত তুমি ত আমার মুখখানাও ভাল করে দেখতে পাওনি।

দেখতে পাই নি না পেলাম, তোমার ছোঁয়া ত পেয়েছিলাম।

প্রথম দর্শনে প্রেমের কথা শুনেছি, তোমার প্রেম কি প্রথম ছোঁয়াতেই?

হয়ত তাই।

তোমার মনে তখন কী হচ্ছিল?

বলা মুশকিল। সেকালের উপন্যাসের এক-একটা পরিচ্ছেদের শিরোনামা থাকত না! বোধ হয় তারই একটা ভাবছিলাম, যেমন ধর, "করুণাময়ী তুমি কে?"

সতী বলত, আমি বসে পড়েছিলাম। আমার শাড়ির প্রান্ত তখনও তোমার মুঠোয়, সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'ছিঃ!' আস্তে আস্তে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম। বললাম, ঘুমোও। তুমি বললে, ঘুম আসছে না যে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুব কী কষ্ট হচ্ছে? কষ্ট?—তুমি বলেছ, না, তবে খুব খালি-খালি লাগছে। আমি কারণ জানতে চাইনি, আমি জানতাম, কেন।

ও। আর কী হ'ল?

সতী আর জবাব দিত না, আমার বুকে মুখ লুকোত। অনেক পরে, বুকে মুখ রেখেই, চোখ তুলে বলত, অসভ্য। তোমরা সব পার। আচ্ছা, চেনা নেই, নাম জান না, এমন একটি মেয়েকে কী করে কাছে টেনে নিয়েছিলে বল ত?

আমি আশ্রয় খুঁজছিলাম।

আশ্রয়?

হ্যাঁ। ঝড়ে দাঁড় ভেঙে গিয়েছিল, পাল

ছেঁড়া আমি নৌকো ভেড়াতে পারি এমন পাড় খুঁজছিলাম।

আমিই সেই পাড়?

তুমিই সেই।

কী করে চিনলে?

ছোঁয়া দিয়ে।

সতী বলত, ও। (এই 'ও' অব্যয়টা ওর মুদ্রাদোষ, আমি জেনেছিলাম। চুপ করে থাকত। আমিই আবার বলতাম, 'আমার অবস্থাটা কেমন ছিল জান সতী? সেই পথিকের মত, যাকে দস্যুরা তাড়া করেছে সর্বস্ব কেড়ে নেবে বলে, সে ছুটেছে, রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে প্রথম যাকে পেল, তার কাছেই তার শেষ সম্বল গচ্ছিত রাখল। আমার সব খোয়া যেতে বসেছিল, স্বপ্ন, বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা—সব। যেটুকু তখনও বেঁচেছিল, তোমার কাছে জমা দিলুম।'

তোমার আশা আর ভালবাসা?

তাই।

ভাল করে জানবার আগেই এত বিশ্বাস?

জানা হয়ে গিয়েছিল। আর, বেশী পরখ করবার তখন সময় কই?]

সৌরেশ আজ ভাবলেন, আশ্চর্য, আমি আবার ভালবাসতে পারলাম। আছাড় খেয়ে পড়েও পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়ালাম। ধুলো-বালি ফেললাম ঝেড়ে। আমি আবার ছুটব।

সেদিন রাত্রে সতী কখন চলে গিয়েছিল জানি না। আমি আর কী করেছি, জানি না। কিছু মনে নেই। শুধু একটা বিকার-ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করে ছিল।

সকালের রোদ ছাদে এসে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙেছিল। তবু, যতক্ষণ পারি, চোখ বুঁজে ছিলাম। চোখ মেললাম কেন। বোধ হয় সকালবেলার চড়ুই পাখির ডাকে। ওরা আমাকে দেখছিল, কিচ-কিচ করছিল। আমি হাত তুললুম, ওরা উড়ল। যেন এই ইশারার অপেক্ষায় ছিল।

চোখ মেলে আমি কী দেখলাম? গোটা-কয়েক বাসি ফুলের পাপড়ি। কুড়িয়ে কী পেলাম? চুলের একটা কাঁটা। কাঁটাটা নাড়তে গিয়ে আমার হাতে ফুটল, আমি ব্যথা পেলাম। আর তখনই আমার মনে গ্লানি এল। অপরাধবোধ তুষারের ঢলের মত নেমে এসে আমাকে ঢেকে দিল। দু হাত দিয়ে চোখ কচলে মুখ রগড়ে রগড়ে আমি হাত দুটি রোদ্দুরে মেলে ধরলাম। হাতের তেলোয় কাজলের অনেকখানি কালি। ছি!

ছি—আমি ভাবলাম—ছি। অচেনা একটি মেয়ের আমি ছোঁয়া নিয়েছি, অচেনা একটি মেয়েকে ছোঁয়া দিয়েছি।

তখনই তাকে দেখলাম।

সে স্নান সেরে ছাতে এসেছিল। ওর খোলা মেলা ভিজে চুলে অপর্যাপ্ত মুক্তি। ও তারে কাপড় শুকতে দিচ্ছিল। আমি রাত্রে ভাল করে দেখতে পাইনি, তবু ওকে চিনলাম। এই সেই। আমার লজ্জা হল, আমি আবার চোখ বুঁজে ফেললাম।

আমি পায়ের শব্দ শুনেছিলাম। ও এদিকটাতে তারের নাগাল না পেয়ে ওদিকে চলে যাচ্ছে। ও হাঁটছিল। ওর পায়ের চাপ আমি টের পাচ্ছিলাম আমার গোড়ালিতে, হাঁটুতে, কোমরে, বুকে, গলায়। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমার শরীরের ওপর দিয়ে ও হাঁটছে কেন। আমাকে কেন থেঁতলে দিতে চায়। আবার চোখ খুললাম আমি, ওকে দেখতে পেলাম না, কী জানি, কতদূরে সরে গেছে, কিন্তু ওর পায়ের শব্দ শুনছিলাম। সেই মৃদু-নরম পা ফেলার ছন্দ আমাকে ঘিরে ফেলছিল। ওকে চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই ওর পায়ের শব্দই ওর অস্তিত্ব হয়ে উঠেছিল, আমাকে গ্রাস করছিল।

রোদের তাত বাড়ছিল। আমার স্নিগ্ধ চোখের পাতায় ছুঁচ বিঁধছিল। কাপড় মেলে দেওয়া ত শেষ হয়ে গেছে, তবু ও নীচে নামছে না কেন।

এবার চুরি করে চাইলাম। ও আলসেয় কনুই রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। ও-ও চুরি করে চাইছিল। আমি হাসলাম। ও-ও হাসল। ওকে ইশারায় ডাকলাম, এল না। আমি হাত বাড়িয়ে ওকে চুলের কাঁটাটা দেখালাম। ও হাত বাড়িয়ে সেটা নিল, ঘাড় নিচু করে খোঁপায় পরল।

বাসি ফুলটা ফিরিয়ে দেওয়া তখনও বাকি ছিল। কিন্তু সেটা খুঁজে পেলাম না।

আমি কালো, রোগা কিন্তু সুশ্রী মেয়েটিকে দেখছিলাম। কাল এত কথা বলেছে, আজ কিছু বলবে না নাকি। কাল স্পর্শ দিয়েছে, আজ বোঝা-যায়-কি-না-যায় এমন হাসি দিয়েই বিদায় নেবে?

আমি থরথর কাঁপছিলাম, পাগল হয়ে উঠছিলাম, পাশ দিয়ে মুখ ঢেকে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।

সারা সকাল তার চিন্তা, সৌরেশ আরও ভাবলেন, আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল বলেই ত আমি আমার অনুভূতিকে চিনতে পারলাম। ভালবাসা। এর নামই ভালবাসা। নইলে পথে চলতে চলতেও সেই কালো-রোগা মেয়েটিকে আমি দেখতে পাব কেন, তাদের দোতলায় যখন বসে আছি, তখনও তার পায়ের শব্দ শুনব কেন। সে যেন আমার রক্তের নদী হেঁটে পার হয়ে যাচ্ছে, আমি ছলাত ছলাত শব্দ শুনছি।

আমাকে যে ডাক দেবে, তাকে বারবার ডেকে ফিরেছি। সেদিন জানলাম। ডাকতে হয় না, সে নিজেই আসে। যাদের মধ্যে তাকে খুঁজেছি তাদের মধ্যে সে ছিল না, কিন্তু এই কালো মেয়েটির মধ্যেই সকলেই আছে।

সারা দিন এই ভাবনায় সুখে ছিল, স্বস্তি ছিল, শান্তি ছিল। সৌর ভেবেছিল এই ভাবনা নিয়েই তার বেশ কাটবে। তার ভালবাসাকে সে সম্মান করতে পেরেছে, আর কিছু চাই না।

একটু অনুশোচনাও ছিল কালকের রাতের অসংযমটুকুর জন্য। যে ভালবাসার প্রতীক্ষা করেছি, তা যখন এল, তখন তার মর্যাদা রাখতে পারলাম না। তাকে ছুঁয়ে, ছিঁড়তে চেয়ে অমর্যাদা করলাম। এ-ভুল আর হবে না।

বিকালের দিকে আবার সেই জ্বরটা যেন ফিরে এল। সেই ছাদ সৌরকে কেবলই টানল। অন্ধকার নেমে নেমে শুধু প্রত্যক্ষ জগৎ নয়, ওর মনের ভিতরটাকেও যেন কালো করে দিল।

"আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি" সৌর যন্ত্রণায় অধীর হয়ে আর্তনাদ করল, "আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

পড়ার টেবিলের সামনে সৌর বসে ছিল। টেবিলটা কে যেন গুছিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজপত্রগুলো টেবিলেই ছড়ানো থাকে, সেগুলো যে কোথায় অন্তর্হিত হল কে জানে! তার মধ্যে টুকরো ছেঁড়া অনেকগুলো কবিতার লাইন ছিল যে!

একটা বই টেনে নিল সৌর তার পাতার ভাঁজে পাওয়া গেল সেই চুলের কাঁটাটা। অবাক হয়ে সৌর ভাবল, এটা ত আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আবার এখানে এল কি করে? সে-ই কি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। এই টেবিলটা তবে গুছিয়ে দিয়েছে সে-ই, এই কাঁটাটা তার চুলের। কাঁটাটিকে মুখের কাছে নিয়ে এল সৌর, নিশ্বাস নিল, যেন ঘ্রাণ পেল সেই মেয়েটির। পকেটে চিনেবাদাম ছিল, ছাড়িয়ে নিয়ে চিবতে চিবতে মনে হল, তার স্বাদ পাচ্ছি। তার চেয়েও অদ্ভুত এই যে, সৌর থেকে থেকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, এই যে সে বসে আছে, কে যেন তাকে অপলক চোখে দেখছে। সে যখন ঘুমোবে তখনও দেখবে। অনেক রাতে পা টিপে টিপে সৌর ছাতে এল। এখানে সে থাকবে, যদি নাও থাকে আসবে।

সারাদিন সৌর ভেবেছে, ভাবনাটুকু নিয়েই সে বেশ থাকতে পারবে, কেননা ভাবনা হল ভালবাসার মন। সেদিন সেই মুহূর্তে ছাতে একা অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সৌর অনুভব করল, ভালবাসার শরীরও আছে—স্পর্শে, ঘ্রাণে, শ্রুতিতে, স্বাদে, দর্শনে।

পিছনে ছায়া পড়ল, সৌর ফিরে তাকিয়ে বলল, "এস, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।" সে পাশে এসে দাঁড়াল, মমতামধুর স্বরে বলল, "না, তুমি ভাবছিলে নয়ন আর পাখির কথা।" (ক্রমশ)

চিত্র প্রদর্শনী

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনগেন্দ্রনাথ হেমনাথের একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে এ সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন বেলা চারটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ৭ই জুন অবধি খোলা থাকবে।

ইনি সব সুদ্ধ ৫০টি ছবি প্রদর্শন করেছেন। শান্তিনিকেতনী রচনার নীতি এঁর বেশীর ভাগ ছবিতেই স্পষ্ট; তাহলেও মনে হয়, দীর্ঘকাল ধরে একরকমভাবে কাজ করতে করতে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করছেন শিল্পী, তাই তাঁর ইদানীংকার কাজের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। 'এ ব্রাইড লুক্স ফরোয়ার্ড', 'কাস্টমস', 'এ লেডী', 'মিউজিসিয়ান' প্রভৃতি ছবিতে ইনি নিজের অভিমত পথে অগ্রসর হয়েছেন। মন যা চেয়েছে তাই এঁকেছেন। এগুলি বলিষ্ঠ রচনা এবং আদিম শক্তির স্পর্শে বিশিষ্ট। কাব্য বা সাহিত্যে অত্যুক্তি থাকলে আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু শিল্পে অত্যুক্তি থাকলেই অনেকের কাছে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। শিল্পে অত্যুক্তি জিনিসটা অবশ্যই সংগত। যে কোনও শিল্পেই অত্যুক্তি জিনিসটা কোনো-না-কোনো আকারে থাকবেই। কিন্তু যে শিল্পীর দর্শকের প্রতি সহানুভূতি আছে তিনি এই অত্যুক্তি যাতে অত্যাচারে না পরিণত হয় সেদিকে নজর রেখে চিত্র রচনা করে থাকেন। সেই কারণেই তাঁদের রচনায় ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা পরিচয় ঘটে সব সময়। এবং সেইসব ছবিই দর্শকের কাছে রসোত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কল্পনাশূন্য একটা মানসিক অবস্থায় হুবহু প্রকৃতিকে নকল করলেও তাকে আর্ট বলে প্রচার করা যায় না, আবার বাস্তব রূপকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবল কল্পনার ওপর ভিত্তি করেও রসোত্তীর্ণ শিল্প হবার যো নেই। অত্যুক্তিমূলক চিত্রকলায় বাড়াবাড়িটা গড়িয়ে আজকাল দেখতে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ অবাস্তব সব কর্ম আসর জাঁকিয়ে বসছে। কিন্তু আমার মনে হয়, একমাত্র সুরশিল্পীই বাস্তব জগতের অতীত রূপ সব ধ্বনির সাহায্যে নির্মাণ করতে পারেন, মূর্তিমধ্যে হয়ে তা মনে গিয়ে পৌঁছয় শ্রোতার। কিন্তু ছবির বেলায় হাজার চেষ্টা করলেও তা হয় না। বস্তুনিরপেক্ষ রচনা অনেক দেখেছি, কিন্তু সেইসব রচনার রচয়িতা তৃপ্ত হলেও অন্য দর্শকের দর্শন ইন্দ্রিয় বাস্তবিকই তৃপ্ত হয় বলে তো মনে হয় না।

শিল্পী নগেন্দ্রনাথ হেমনাথ অংকিত চিত্র 'কক ফাইট'

তাই শিল্পী হেমনাথের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁর ভাব যেন বস্তুনিরপেক্ষ রূপ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সঙ্গে অর্থহীন কলহ বাধিয়ে না বসে। 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড', 'কুসিং দি লাইট', 'কক ফাইট', 'পেল ব্লু ক্লাউড' প্রভৃতি রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর শরীরস্থানেজ্ঞান কিছুটা বৈলক্ষণপূর্ণ। তৈল মাধ্যমের রচনাগুলিকে আরও 'ঘষা মাজা' করবার দরকার। প্রত্যেক শিল্পীরই আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা। শিল্পীর অন্য দোষ গুণ যাই থাকুক, এই জিনিসটি যদি থাকে এবং লোকে কি বলবে না বলবে সেই ভয়ে আত্মগোপন না করে যদি তিনি রচনা করে চলেন তাহলে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক আনন্দ ও সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। শ্রীহেমনাথের আত্মনিষ্ঠা অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতে আমরা তাঁর বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ চিত্রমেলা দেখতে পাবো বলেই বিশ্বাস করি।

•

গত সপ্তাহে ৫১বি, মহানির্বাণ রোডে কল্যাণ বসু পরিচালিত শিশু অংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি এবং উত্তরাপণ চারু ও কারু শিল্প কলালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রচনার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতার রসিক সমাজ প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন।

ঐ প্রদর্শনীতে বড়দের রচনা অপেক্ষা শিশুদের রচনাগুলিই ছিল বেশী উপভোগ্য। রেখায় বৈলক্ষণ্য বর্ণের অপচয় থাকলেও শিশুদের মনের স্পর্শে তাদের রচনা বিশিষ্ট হয়ে দেখা দেয় দর্শকের চোখে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দেবযানী চক্রবর্তী (৫), শ্রীমতী চক্রবর্তী (৫), স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩), টুলটুল চক্রবর্তী (১০), শান্তা লাহিড়ী (১২), শ্রীমতী চক্রবর্তী (৮), ইন্দ্রানী সেন (১১) এবং সুব্রত কুমার বসুর রচনাগুলি। সুব্রতকুমার বসুর রচনাটি এ বছরের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

বড়দের রচনার মধ্যে কল্যাণ বসুর জল রঙে আঁকা টাটার কারখানার দৃশ্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর শিল্পরসিকের দৃষ্টি আছে এবং জল রঙের ওপর বেশ দখলও আছে। এঁর একক প্রদর্শনী দেখবার ইচ্ছা রইল।

ঃ তাই নাকি! —এতো সুন্দরী'

ডান ভ্রূটা নামিয়ে আর বাঁ ভ্রূটা বার কতক নাচিয়ে রাজা সাহেব বললেন: ঠিক বলছ তো, না, আগের বারের মতো! ডানা-টানা আছে তো—!

তার চোখে চাপা কৌতুক ছিল। সেটা সুধন্য বুঝতে পারলেও নিঃসন্দেহ হতে পারেনি সে বিষয়ে।

ওপরের পাটির পোকায় খাওয়া ছাতা ধরা তরমুজের বিচিগুলো নিঃশব্দে বের করে সাহেবের চোখে অপলক চেয়ে রইল সুধন্য। কি বলবে? কি বললে মনঃপূত হবে কথার, বুঝতে পারল না। কি বললে হুম বলে হুংকার ছাড়বেন' আর জ্যা-ছেঁড়া ধনুকের মতো কংকালসার দেহটা নিয়ে ছিটকে বাইরে পড়তে হবে—বুঝতে পারছিল না সুধন্য আর কি বললেই বা প্রসন্ন হবেন সাহেব, তাও নয়।

পোষা কুকুরকে অনুগ্রহের মাংস ছুঁড়ে দিলেন একটুকরো। গলায় গর গর আওয়াজ তুলে সেটা সামনের দু'পা'র তলায় চেপে ধরল কুকুরটা। আর ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডান দিকে বাঁ দিকে মাথা কাত ক'রে হাম হাম করে কামড়াতে লাগল মাংসখণ্ডটা। লালা ঝরতে লাগল। আগেই ভেজা দু'কষ বোঝাই হল মাংসের আঁষটে আঘে—

কুকুরটার নাম সুধন্য।

কুকুরটা কৃতার্থ নিশ্চয় হল, প্রসন্ন হয়েছেন প্রভু।

মাংসখণ্ডটা একটুকরো হাসি।

রাজা সাহেব মুখ বাঁকিয়ে হাসলেন। হেসে রইলেন খানিকক্ষণ।

ঃ তা এবার কতো নেবে দালালী? এর আগের বার তো দুইয়ে দুইয়ে এ নাম করে সে হিসেবে গোটা সাতাশ টাকা মেরেছিলে! ...দ্যাখো, টাকা আজকাল আর অতো সস্তা নেই!

দালালী কথাটা সাহেবের মুখ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মা কালীর মতো জিভটা কেটে রেখেছিল মোসাহেব সুধন্য দাস। সেই অবস্থায়ই আরো খানিকক্ষণ রইল। ইচ্ছে করেই। আর মনে মনে ভেবে চলল—সেটা আর জানিনে! ঘটিও ডুবছে না আজকাল তালপুকুরে। নামেই রাজাসাহেব।

রাজাসাহেব বললেন- জিভটা ভেতরে টেনে নাও হে সুধন্য।...কি, হ'ল কি! জিভ কাটলে কেন?

সুধন্য বলল: আজ্ঞে আমি আপনার চিরচরণের দাস। কেনা গোলাম। ঠকিয়ে মেরে নেবো স্যার, আপনার টাকা?......দরকার হয় চেয়ে নেবো। হাত পাততে একটুও লজ্জা নেই আপনার কাছে। আপনি হলেন তিন-পুরুষের রাজা—

এই প্রসংগ আরো বাড়াতে পারতেন রাজা-সাহেব। বাড়ালেন না। একটা ছুঁচোর সংগে অকারণ অনেক কথা খরচ করেছেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন রাজাসাহেব, কি মনে ক'রে কে জানে? প্রাচীন আমলের ধুলো পড়া আভিজাত্যে অট্টহাসির মতো প্রতিধ্বনি হতে লাগল সে হাসি। দেয়ালে দেয়ালে রবি বর্মার তুলির অর্ধ উলংগ মেম-মানুষগুলো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রাজা-সাহেবের দিকে। ক্ষণেকের জন্য। তারপর ফিরে গেল কাচের পিছনে। নিশ্চল হয়ে গেল আবার। শুধু খোপের পায়রাগুলো বাইরের দিকে উড়ে গিয়ে ডানা ফরফর করতে লাগল অনেকক্ষণ।

হাসি থামেনি ভালো ক'রে। রাজাসাহেব বললেন: আর একবার বলো তো, শুনি! বেশ লাগে তোমার মুখে শুনতে! গায়ের রং কেমন? চোখ কেমন? মুখখানা কেমন দেখতে? এর আগের বার তো বলেছিলে, ব্লাউজ খুলে ফেললে, ডানার কাটা দাগ দেখা যাবে।......এইবার সেই রকম কিছু—'

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তর্জনীর আর অংগুষ্ঠের মধ্যে ঘোরাতে লাগলেন সবে ধরানো সিগারেট। ধোঁয়া উঠে উড়ে যেতে লাগল। কার চিতাগ্নি কে জানে!

ঃ হ্যাঁ হে দেখেছিলাম। ঠিকই দেখেছিলাম। কাটা ডানার নয়, সম্ভবত পোড়ার দাগ।

শিক টিক্ক প্ড়িয়ে ছে'কা দিয়েছে যেন কেউ। হয়তো মেয়েটার বজ্জাতির শাস্তি।......যাক, যা বলছিলাম। একটু বলো, শুনি—গায়ের রং?

ব'লে খেই ধরিয়ে দিলেন রাজাসাহেব।

সুধন্য বললেঃ আজ্ঞে রংএর কথা বললেন যদি, কি বলব আপনাকে স্যার! আপনি তো না-পেত্যয় হয়ে বসেই আছেন। চাঁপা ফুল তার কাছে কয়লা। আর চোখ? স্রেফ পদ্ম-দীঘি। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, গামছা প'রে স্রেফ নেমে যাই। হ্যাঁ যা বলব, সত্যি বলব। ও সব মন রাখা কথা পাবেন না। চুল? ঐটেই তেমন নেই। সব মেয়ের কি সব থাকে। বলি, উর্বশীর ছিল? মহাভারত খুলে পড়ুন—সুদ্ধ যৌবন ছিল। নামেই অপ্সরী!
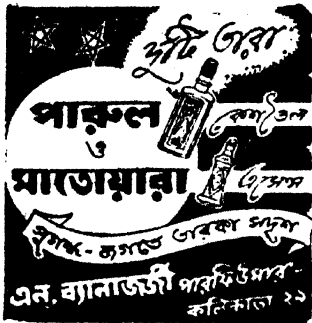
রাজাসাহেব বললেনঃ তবু, কতোটা, কি রকম, বলো-একটু শুনে রাখি—

সুধন্য বললেঃ ঐটে, ঐ চুলটা বড়ো ছোট। বাঁকা বাঁকা। কাল ফণা যেন। সিমেণ্টের ওপর সাপ চলতে গেলে দেখেছেন তো কিলবিল করে ওঠে—পিছলে কেমন ঢেউয়ের মত হয়ে যায় শরীরটা। অমনি বাঁকা। আর লম্বায় এই এতোটা—

বলে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধন্য। ডান হাতটা গলা ধাক্কার আকারে বানিয়ে ফেললে। সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতিটা নিজের ডান পায়ের হাঁটুর পিছনে রাখল।

রাজাসাহেব হাঁকলেনঃ হরিপদ—

কোন আড়াল থেকে হরিপদ এসে উদয় হল। হাত কচলাতে কচলাতে। অত্যন্ত নিরাসক্ত নিচু গলায় রাজাসাহেব বললেনঃ হাণ্টার—

কে'চোর মত কু'চকে গেল সুধন্য। শরীরে মনে কাঁপতে লাগল বেতসপত্রের মতো। মনটা কাঁপলেও শরীরটাকে কাঁপার হাত থেকে বাঁচাতে প্রাণপণ করতে লাগল সুধন্য। তার অন্যায়টা কি, তার তন্ন তন্ন অন্বেষণ ভয়ের তলায় চাপা পড়ে গেল। কল্পনার পিঠে হাণ্টার পড়ছে তখন সপ সপ সপাং।

ভয়ে বিবর্ণ নীল ঠোঁট কে'পে কে'পে যাচ্ছে। গলার আওয়াজ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে তরঙ্গের মতোঃ স্যার, আমি আজ আসি তা হ'লে।

হরিপদ হাণ্টার আনতে গিয়েছিল। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

কেউ উত্তর দিল না।

চারদিককার প্রমাণ সাইজের আরশি আর রবি বর্মার ছবি ঝু'কে পড়া কাচে রাশি রাশি প্রতিফলন হল মাত্র। ফরাশের ওপর তাকিয়া ঠেস দেওয়া আধশোওয়া রাজাসাহেব ডান করতল বাঁ পায়ের তলায় বুলোতে লাগলেন। শোয়ার ভঙ্গীতে বাম পদতলটা আকাশমুখী হয়ে আছে, অ্যাশট্রেতে আধপোড়া আধখানা সিগারেট কটু গন্ধ ছড়াতে লাগল। ধোঁর তলার জল ছিল না। মুখটা রগড়ে রগড়ে নিভিয়েও দেন নি সেটাকে।

সসম্ভ্রমে হাণ্টার নিয়ে এল হরিপদ। এনে হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজাসাহেব সুধন্যর দিকে তাকালেনঃ আজ নয়, তোমার ডেসক্রপশন যদি বর্ণে বর্ণে না মেলে তবে এই দাওয়াই। পুরো-পুরিই মিলবে না, মেলা সম্ভব নয়। দুজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এক হয় না। সাইপ্টি পারসেণ্ট মেলা চাই।......হরিপদ, পার্স—

পাশের কামরা থেকে পেট ফোলা চামড়ার ব্যাগ এনে দিল হরিপদ।

রাজাসাহেব বললেনঃ দশটা টাকা চটিটার ওপর রাখ—

হুকুম বরদার তালিম করল হুকুম।

রাজাসাহেব বললেনঃ মুখে করে তুলে নাও সুধন্য।......সাত দিন সময়। যাও—

দাঁড় করানো কোয়ার্টার টাইমিংএ বেলা এগারোটা বাজল।

আভিজাত্যের পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে, বাড়িটার গা থেকে। হেথা হোথা বের করে রেখেছে ই'টের দাঁত। দারিদ্র্য দাঁত বের ক'রে হাসছে। সে-ই আগামী, আর পলেস্তারা অতীত—বাড়িটার চেহারায় সেকথা সুস্পষ্ট।

কলকাতার উপকণ্ঠ। শহরের ব্যারাম বাদ দিয়ে আধা শহরের পুরো আরাম পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, শহরে খরচ খরচা অনেক বেশী। আধা শহরে লৌকিকতার খরচ কিছু কম। শেয়াল রাজা হয়ে থাকা যায়।

বংশানুক্রমিক রাজা। বাপ পিতামো'র ধুতি পাঞ্জাবি শেরওয়ানী পায়জামা ছেড়ে এখন ট্রাউজার। তাই রাজাসাহেব,—রাজা-বাহাদুর নয়। রাজা দীপঙ্কর রায় চৌধুরী।

প্রায় সবই গেছে। জমিদারী সবটাই লাটে উঠেছে প্রায়। আছে শহরে শহরতলীতে ভাড়া দেওয়ার অনেক বাড়ি, বস্তী, একখানা সিনেমার আদ্ধেক।

দশ ফুট উ'চু পাঁচিল ঘেরা মধুচক্র। বড় রাস্তাটা প্রধান দেউড়ির সোজাসুজি এসে দেয়ালের পাশ ঘে'ষে বাঁয় বে'কে গেছে। তবুও একদা বাগান বাড়ি অধুনা বসত-বাড়ির অন্তরাত্মার কান্না বাইরে শোনা যায় না। পাশের রাস্তা থেকে শোনা যায় না কোনো ধর্ষিতার দীর্ঘশ্বাস। রাস্তা থেকে অনেক দূরে বিলডিং। মেন গেটের পর পুতুল-দুধারী রাস্তা। পরীদের গা থেকে সিমেণ্টের মাংস খসে খসে পড়ে গেছে। নগ্নতার লজ্জা আগেও তাদের ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু দারিদ্র্যের ছে'ড়া কাপড়ের লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে! জমিদার বাড়ির উপার্জনের মতো নকল ফোয়ারার উৎস কবে শুকিয়ে গিয়েছে। তাদের গায়ে শাওলার শ্লানি। আগেকার দিনের কেয়ারি করা ফুলবাগান নেই আর। কংকাল পড়ে আছে তার। অ্যাজেলিয়া, ক্যামেলিয়ার বাগান তো কবেই উধাও।

কয়েক বিঘার ওপর পাঁচিল ঘেরা বাগান-বাড়ি। বসত বাড়ি এখন।

কেন্দ্রস্থলে দোতলা মেন বিলডিং। সামনেরখানা 'হলঘর' বিরাট। ওপরেও নিচেও। হলঘরের মাঝখান থেকে করিডর দালানটার উত্তর প্রান্ত অবধি চলে গেছে। দুধারে ঘর। ছোট বড় মাঝারি। প্রয়োজনের মতো করে কিছু ইঁট পাটকেল চাপিয়ে প্রসাধন করে নেয়া হয়েছে। দোতলার উত্তরে নতুন বাড়ি তোলা হয়েছে। খান চারেক ঘর নিয়ে একতলা। রান্নাবাড়ি।

মেন বিলডিংয়ের পশ্চিমে পাকা নাট-মন্দির, পুবে ঝিল।

মন্দিরে রাধাবল্লভ জীউর আরতির ঘণ্টার
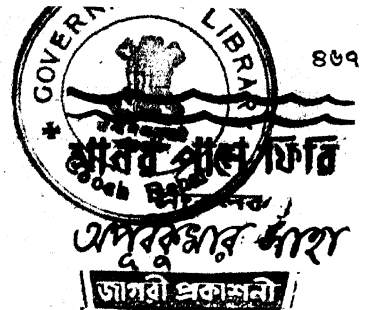
টুং টাং শেষ হলেই যেন বিল্ডিংয়েরে কোন না কোন ঘরে আর এক রকমের টুং টাং আরম্ভ হ'ত। নানা রকমের মাধুর্য ঝরে পড়ত তাতে। কঙ্কণের সঙ্গে রেশমী চুড়ির সেতার, কিঙ্কিণীর সঙ্গে সারেঙ্গীর, ডিকেণ্টারের সঙ্গে পেগগ্লাসের। কখনও আধুনিকারা কটেজ পিয়ানোটায় টুংটাং তুলে বলতেন এটা সেভেন্থ সিম্ফনি। ঝিলের পূবে টেনিস লন। তার পাশে ছোট্ট একখানি পিলার-আশ্রিত দোতলার ঘর। গোটা চারেক গোল স্তম্ভ মাথায় করে রেখেছে দোতলার ঘরখানাকে। পাশে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। ও পাশে ছোট অথচ সম্ভ্রান্ত গেস্ট-হাউস।

বাগানবাড়ির একোণে ওকোণে চাকর-বাকর সহিস কোচোয়ান, ড্রাইভার মালীর ঘর।

মেন বিল্ডিং থেকে অনেকটা এলে তবে মেন গেট। তার পর পাবলিক রোড।

পরীদের পায়ের তলা দিয়ে আসতে আসতে পিছন ফিরে বারে বারে চাইছিল সুধন্যা। এই বুঝি চাবুকের বাড়ি পড়ল। এই বুঝি তাড়া করে এল অ্যালসেশিয়ান নেকড়ে।

গেট পার না হওয়া পর্যন্ত ভয় গেল না সুধন্যার।

রাস্তায় পা দিয়ে শেষ বারের মতো তাকাল সুধন্যা। বাঁ দিকের সেটুড়ির ওপর মারবেল প্লাক—মধুচক্র। ডান দিকে ইংরিজীতে লেখা রাজা ডি রায় চাউডুরী অব রক্তপুর।

ভাবল মনে মনে সুধন্যা। জুতোর ওপর নোট রাখলে ওতো মা লক্ষ্মীকেই জুতো মারা হল। এ নইলে এই অবস্থা আজ। ভেতর খাঁকরা—পাঁকে খাওয়া করবেন। ভেতরের কোন খোলাও নেই আজ, বাইরে তাই হাণ্টার।

কোনও জায়গায় ধার জুটল না আজ। কোথেকে জুটবে? ঋণ নিয়ে নিয়ে আকণ্ঠ। কোনও দোরে ঢুকতেই পেল না—দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল সব। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল দোর।

শেষ আশ্রয় এই রাজ্যহীন রাজা। বাগানবাড়ির বনবাসে নির্বাসিত।

বিশেষ কোন মেয়ের কথা না ভেবেই বর্ণনা দিচ্ছিল সে। রূপসী মেয়ের সৌন্দর্যের বর্ণনা ছেলেবেলার ঠাকুমার ঝুলির মধ্যে থেকে তুলে নিচ্ছিল। তুলে নিচ্ছিল স্মৃতি থেকে। তার পরিণতি যে হাণ্টারে পৌঁছবে ভাবতেই পারে নি সুধন্যা।

হেমন্তের বেলা সাড়ে এগারোটার রোদ প্রখর হয়ে উঠছে ক্রমে। দাঁত বের করছে সাদা আর ধারালো। বিঁধিয়ে দিচ্ছে গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে। গরম-জামার তলায় গা চিড়বিড় করে উঠছে।

টাকাটা মুখে করে তুলতে হ'ল জুতোর ওপর থেকে। বেশ! দেখা যাবে। রাজা সাহেবের দম্ভের দাম বেশী, না আমার সহ্যগুণ বেশী টেঁকসই। 'রাজা সাহেব!'—ঠোঁট উল্টোল সুধন্যা।

একটু চা শুধু জুটেছে সকাল থেকে। পেটটা জ্বালা করছে সুধন্যার। কলিকের বেদনাটা শুরু না হয়ে যায়। খালি পেটে থাকলেই পিত্তশূলে মাথা চাড়া দেয়, খোঁচাতে থাকে অসংখ্য ত্রিশূলে দিয়ে।

পোড়া পেটটার জন্যেই যা কিছু। তাও কি একটা পেট! তিন তিনটে। বাঁধা আয় উপার্জন নেই। তঞ্চকতা বা উঞ্ছবৃত্তি করে আর কতটা হয়!

মাঝে মাঝে এক-আধটা মাইফেল না দিলে চলছিল না আর।

লোকে বোধ হয় ভাবতে আরম্ভ করেছে—ভরাডুবি হয়েছে দীপংকর। কিছু নেই আর ওঁর। দু-একজন শুভার্থীর মুখোশধারী শত্রুর মুখে কথাটা শোনা। লোকে বলাবলি করে—সুমিত্রার মৃত্যুর সঙ্গে লক্ষ্মীও গেছে সংসারের।

দীপংকরের রানীসাহেবার নাম সুমিত্রা। ঈশ্বর জানেন আর দীপংকর জানে সুমিত্রার মৃত্যু-রহস্য। আমার আপনার সাধারণ ঘরের কেচ্ছা হলে লোকে আত্মহত্যা বলেই মেনে নিত। জমিদার বাড়ির ঘটনা বলে কুৎসায় দাঁড়িয়েছে—কুৎসিত হয়ে আছে সে রহস্য।

অবাধ জীবনযাত্রায় কোন বাধা নেই তা কোনখানে। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই। বা একমাত্র মা—রানী রাজেশ্বরী। মা এখনও বেঁচে। শুধু তাই নয়—সমস্ত স্টেটের
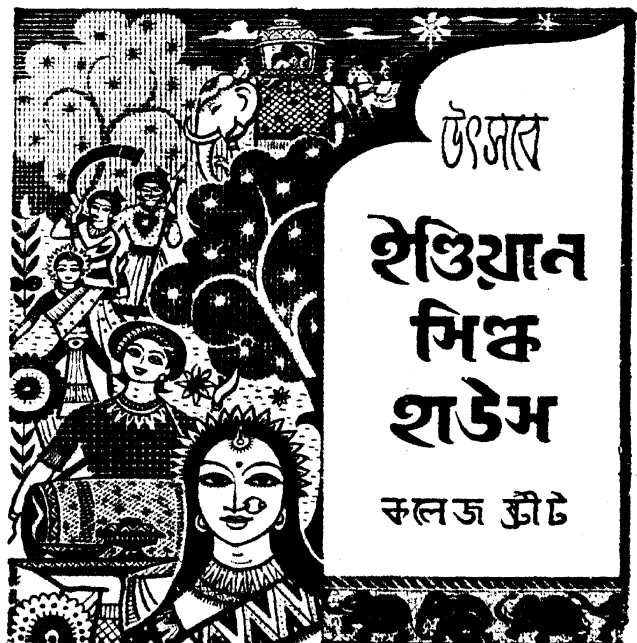
মালিকও বটেন। সুমিত্রা সাধারণ জমিদার বাড়ির মেয়ে—রূপের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছিল এ বাড়ি। সেই সুমিত্রার অসাধারণ মৃত্যুতে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ মর্মাহত বিরক্ত হয়েছেন রাজেশ্বরী। সুমিত্রাকে রাজবাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনিই।

পাছে যেটুকু আছে, সেটুকুও উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয় দীপু, সেই ভয়ে গয়া কাশী গেলেও বাসী হতে পারেন না। দৌড়তে দৌড়তে ফিরে আসেন।

মধুচক্রেই থাকেন ওপরতলায়। তিন-তলার চিলেকোঠায় ঠাকুরঘর করে নিয়েছেন নিজের। থাকেন ওপরে। চোখ থাকে নিচে। খবর রাখেন অনেক কিছুর।

দীপুকে দোষ দেন না খুব। জমিদারী থাকছে না আর। কারো থাকছে না—দীপু রুখবে কি দিয়ে!

না, নজর আছে বটে সুধনার। জিনিস চেনে। ব্যাটা পাকা জহুরী। অতো দুর্ব্যবহার না করলেও হ'ত সেদিন।

পর মুহূর্তেই মনে হল আবার—অতো দুর্ব্যবহারের হাণ্টার না হাঁকড়ালে এই জিনিস বের করত না ব্যাটা কিছুতেই। ঘা-তো জিনিস জুটিয়ে আনত—

চোখের কথা কি বলেছিল ব্যাটা। পদ্ম-দীঘি। স্রেফ পদ্মদীঘি। হাসিটা নিজের অলক্ষ্যেই ঠোঁটের কিনার ছুঁয়ে গেল দীপঙ্করের। খুব বেশী মিথ্যে বলে নি সুধনা।

রাজা সাহেবের নিজেরই কি জানা ছিল! প্রথম তো দেখেন পুরীতে। দেখে শখ হয়। সুমিত্রা সঙ্গে ছিল। ধরে বসল দীপংকর—ঐ পোশাক পরতে হবে তোমার। জলে ভিজলে পক্ষীশাবক চুপসে যায়—আর মানুষ! মানুষ নয় মানুষী—মানসীও বলা যায়—মানুষী হয় বিকশিত। ফুটে ওঠে মেয়েদের দেহ। জামা-কাপড়ে ঢাকা দেহের বেল-কুঁড়ি শত শত দল মেলে শতদল হয়ে ওঠে। সকালবেলার শিশিরে মাজা। মুক্তো-ঝরা সর্বাঙ্গ।

সহজে কি রাজী হয় সুমিত্রা। সহজে তো নয়ই, কোনমতেই রাজী হতে চায় না। তারপর জোর-জবরদস্তি। গরীবের মেয়ে, ভয় পেয়ে গেল রাজার চোখরাঙানিতে। রাজী হওয়ার প্রশ্ন নয়, রাজার হুকুমের জবরদস্তি।

সুমিত্রা বললে: বেশ, নিয়ে এসো।

দীপংকর বললে: সবচেয়ে দামী। এই দ্যাখো—নাইলন বলে একে। এক-আধবার প'রে সড়গড় ক'রে রাখো। কাল সকালে যেতে হবে আমার সঙ্গে—

সুমিত্রার বড় চোখ আরো বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে! যেতে হবে—! কোথায়? যাবার সঙ্গে চানের পোশাকের সম্পর্ক কি?

দীপংকর বললে: চানের নির্জন জায়গা বের করেছি খুঁজে। তার ওপর হাজার টাকা খরচা করে সত্যিকার জনহীন করে নেবার ব্যবস্থা করেছি। কোন চিন্তা নেই তোমার। কোন চোখ থাকবে না আর—আমার চোখ জোড়া ছাড়া। পাখির চোখ রুখতে পারব না অবশ্যই—
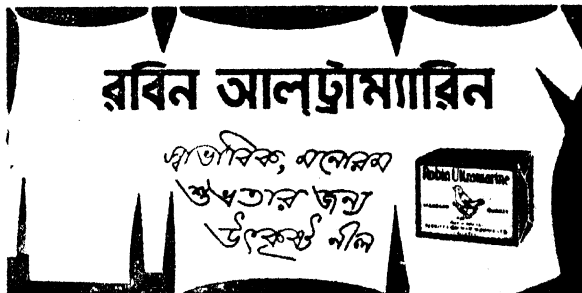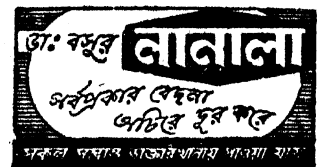
সমুদ্দুরের চান করতে হবে এই উলংগ-বাহার পোশাকে?

নইলে কি বাথরুমের চৌবাচ্চার সমুদ্র মনে করেছিলে তুমি! রোদের আলো না পড়লে কি করে বুঝব তুমি মেয়ে!

প্রতিবাদের অবকাশ না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল দীপংকর।

সুমিত্রা বলত: রাজা, তোমার আমার বিয়েটা কেমন অসমান? অন্য সব বিয়ে মানুষের সংগে মানুষের, ভালবাসার সংগে ভালবাসার। আর আমাদের বিয়ে দম্ভের সংগে ভয়ের।

সুমিত্রা কি ভয়ই না করত দীপংকরকে। অথচ, শেষ দিনটায় একটা বেয়াড়া জেদ পেয়ে বসল ওকে। নইলে তো এমন করে শেষ হতে হত না ওকে—

*　　*　　*

সময় অসময়ে সুমিত্রা এসে হাজির হয় কেন? এই মাইফেলের খারাপ জায়গায় রজতপুরের রানীর আসার দরকার?

আচ্ছা কে বেশী সুন্দরী? সুমিত্রা না এই মেয়েটা? নাম কি বলল যেন পাঞ্চালী! বেশ নাম। পাঞ্চালী মানে দ্রৌপদী। দ্রৌপদী পাঁচ ভাইয়ের এক বৌ ছিল। অশ্লীল ব্যাপার, কুৎসিত ব্যাপার। হিন্দু মাইথলজীর অনেক কিছুই কুশ্রী, অশ্লীল।

পাঞ্চালী। বেশ নাম। নতুন নাম। কোনদিন শুনিনি কিন্তু। তা পাঞ্চালী কি সাকারের নাম! মনে তো হয় না। এসব দরবারী কানাড়ার দরবারের আসরী নাম।

সত্যি, কি বড় বড় চোখ। ঠিক বলেছিল [illegible] সুন্দর। ডাগর ডাগর ডাগর ডাগর। ব্যাটা বলেছিল—রাজা সাহেব, ভদ্রঘরের মেয়ে। দেখে নেবেন, যাচাই করে নেবেন, বাজিয়ে নেবেন। মিলিয়ে নেবেন না-যদি হয় জুতো তো আপনার পায়ে আছে-ই। হান্টারও আছে পাশের ঘরে—

হতেও পারে কিন্তু। পোষ মানানো যায়। বেয়াড়া নয়। চুপ করে বসে আছে। মুখে হাসি টেনে। হাসিটা দুষ্টু হাসি নয়, মিষ্টি হাসি। লজ্জার সংকোচের মিষ্টি মাখানো। হাসিটা বজ্জাতের নয়, সজ্জাতের—

মাঝখানে পঞ্চমুখী ঝাড়। তবে মোমের পরিবর্তে ফ্লোরেসেণ্টে গড়া। মাঝখানের ডাঁটির ওপর দিক থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে চার দিকে আর চারটে টিউব। চার কোণের চারটে ঝাড়—তিনটে করে টিউবে তৈরী। প্রাচীন প্রথার রাজাকে কোট-প্যাণ্ট-টাই পরানো যেমন। যেমন রাজাসাহেব। যেমন ঝাড়ের গড়ন বজায় রেখে ফ্লোরেসেণ্টের আধুনিকতা।

নাটমন্দিরের এক দিক চেপে ছোট আকারের নাচঘর। নাটমন্দিরের বাকি দুদিক খোলা, বাড়তি লোকের বাহুল্য দাঁড় করিয়ে হলেও সংকুলান করতে। আবার নাটমন্দিরের দিককার দরজা বন্ধ করলে ঠাকুরের পবিত্র চোখ বন্ধ করে রাখা যায়। বাইজী নাচানো যায়। ওপাশে দেবদাসী, এপাশে বাইজী।

এই ঘরখানা যোগ হয়েছে দীপংকরের আমলে।

মায়ের চোখ আছে সদাজাগ্রত প্রহরায়, এই কথাটা ভুলতে পারে না দীপংকর। তাই ঘরবাড়িতে এই যোগ-বিয়োগ। ভুলতে হয়ত পারত, যদি রানী রাজেশ্বরী গোটা বিষয়-আশয়ের মালিক না হতেন। গোটা যদিও আজ আর নেই।

যে মেয়েটা নাচছে সেও দেখতে মন্দ নয়। বয়েস হয়ত কিছু বেশী, এই যা। তার নাম কি বলল—গান্ধারী। সব পোশাকী নাম। গান্ধারী কখনও নাম হয়—

কিন্তু পাঞ্চালী কখন নাচবে! ও নাচছে না কেন? বসে আছে মুখ নিচু করে! নাচের পোশাকও পরে নি। সাদামাটা ঘি রঙের জর্জেট পরে আছে—

সাঁতা বোঝা যাচ্ছে না, চন্দন-রঙা ব্লাউজটা কোনখানে শুরু। হাতার শেষ, নগ্ন বাহু আর হাতের শুরু, বোঝা যাচ্ছে না। মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। বেণীটা কত দীর্ঘ! ঠিকবলেছিল ব্যাটা সুবন্যা। জরির ফিতে জড়ানো নেই, বেণীটা আগাগোড়া দেখা যাচ্ছে—টাসল না কি বলে—তার ঝাঁকি নেই। ঠাসবুনোনি বেণীটা তেলে চিকন, মাথা ঘষে ফাঁপানো নয়। একটা তিলকে বেলুন-ফুলিয়ে তালের আকার দেখানো নয়। মাথার ওপর একটা বৃত্ত পড়েছে আলোর আভার, সিঁথির কাছে এসে ভাগ হয়ে অসম্পূর্ণ বৃত্ত। তেলে চকচকে চুল। মাথার চাঁদিতে আর বেণীর গুটিগুলোর আলো পিছলে যাচ্ছে। বেণীর গুটি গুণতে লাগলেন রাজা সাহেব—উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ—

গান্ধী নাচছিল। পঞ্চী বসেছিল পাশে। পঞ্চীর বাঁপাশে সারেঙ্গীওলা—তার বাঁপাশে তবলচী।

খুব একটা আড়ম্বর পছন্দ করেন না রাজাসাহেব। পয়সায় কুলোয় কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। বাজনা বেশী নয়। ইয়ার-বকশীও বেশী নয়।

ঘুরে ঘুরে নাচছিল গান্ধারী—সৈরা তেরী গোদমে গেন্দা বন যাউংগী। কতো তার কায়দা। ডান পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে এক পাক—উড়ে যাচ্ছে পেশোয়াজ পরিপূর্ণ বৃত্ত রচনা করে। অনাবৃত করে

দিচ্ছে শালোয়ার—নাভীমূল পর্যন্ত। পায়ের ঘুঙুর বলছে ঝম ঝম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুমুর—। গায়ে খাটো হাতা, শেরোয়ানী কোমরের কাছে দড়ির বাঁধ। উপর অঙ্গে ঢিলে ঢালা। এতো পাতলা নকল সিল্কের যে কাঁচুলির প্রতিটি রেখা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। গায়ের উড়নিখানা গায়ে সংলগ্ন না থেকে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে বেশী। উড়ছে নাচের ঘূর্ণিতালে।

ঘুঙুরে নিমন্ত্রণ তুলে, সারেঙ্গীর ক্যাঁ-কোঁ আর্তবিলাপে বিরহিনীর বিরহ গুরুভার করে নাচের ভঙ্গীতে ডানদিকে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে এলো গান্ধারী। বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরটাকে ডানদিকে ধনুকাকৃতি করে দিল। মাথার ওপর দুবাহু যতোদূর তোলা যায়, তুলে দুহাতের আঙুলে জড়াজড়ি। তাতে আমন্ত্রণের মুদ্রা। ঐ অর্ধচন্দ্রাকারে ডান-কাতে আসতে আসতে একেবারে রাজাসাহেবের কাছে।

রাজা সাহেব তখন পাঞ্চালীর চোখের সাগরে ভাসছিলেন। আশ্রয় পাচ্ছিলেন না খুঁজে। তৃণখণ্ড পর্যন্ত নেই কোথাও।

রাজনাদারদের মুখোমুখি বসেছিলেন রাজাসাহেব, হলের উল্টো দেয়ালে মুখ করে। পাশে টেনিস খেলোয়াড় দিলীপ দত্ত, ধানকোটের মোতিলাল চৌধুরী, গঞ্জামের গোবিন্দ পট্টনায়েক, আরো চুনোপুঁটি রাজা রাজকুমারের দু'একজন। উই এককোণে ইতস্তত করছে সুধন্য। তাকে থাকতে বলেছেন রাজাসাহেব। কিন্তু সে তো হাণ্টারের খোরাকির জন্য। রূপের বর্ণনা না মিললে তখন তার প্রয়োজন। নাচঘরের মধ্যে থাকবে, না বাইরে—বুঝতে পারছিল না সুধন্য। উঁকিঝুঁকি মারছিল, সামনের চার পাঁচ সার মাথার তলায় ডুব দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। ভেসে উঠে রাজাসাহেবের চোখে চোখ পড়লেই আবার পাণকৌড়ি।

ঐ 'পোজে' ঘুঙুরের ঝুম ঝুম তুলে গান্ধারী রাজাসাহেবের কাছে আসতেই দিলীপ দত্ত চেঁচিয়ে উঠলো—বাহবা, বাইজী, বাঃ—রাজাসাহেব, টাকা দাও প্যালায়।

ঐভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুঙুরে ঝম ঝম করছিল গান্ধারী—তবলার সঙ্গে তাল রাখার জন্য। চোখ আধবোজা গান্ধারীর—ভাবে নিমীলিত প্রায়।

কি কষ্ট করছিল গান্ধারী ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে।

স্বপ্ন ভঙ্গ হল রাজাসাহেবের, দিলীপ দত্তর গলার আওয়াজে।

পাঞ্চালীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে এনে ডান পাশে তাকালেন রাজাসাহেব—দিলীপ দত্তর দিকে। দিলীপ দত্তর বাঁ হাতে গ্লাস, ডান কনুইয়ে তাকিয়ায় ভর করে আছেন তিনি। চোখ সুরক্ত।

চোখ আরক্ত নয়, সুরক্ত সকলেরই। রাজাসাহেবের বাদে। রাজাসাহেব নাকি মদ ছোঁন না। অন্তত ওপরতলায় যেন এই সুনামটা চালান যায়। রাজ্যেশ্বরীর মাথার দিব্যি—তরল আগুন না ছোঁয় দীপঙ্কর। তিনি অনেক করে বুঝিয়েছেন, মদের বোতলের সরু গলাটার মধ্যে অতোবড়ো স্টেটের বারো আনা কি করে ঢুকে মদের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর স্বামী শুভঙ্করের আমলে।

স্বপ্নভঙ্গে রাজাসাহেব দিলীপকে বললেন-ঃ—য়্যাঁ! কি বলছ?—ও, হ্যাঁ—এই যে হরিপদ—

দিলীপ বলল ঃ আরে এ আসরে শ্রীহরি হরিপদদের প্রবেশ নিষেধ—টাকা তোমার পকেটেই আছে।

রাজাসাহেব ঈষৎ আরক্ত চোখে বললেন ঃ তাই নাকি—কই না তো। বলে পাঞ্জাবির বুক পকেট হাতড়াতে লাগলেন।

দিলীপ দত্ত বললেন ঃ আরে বাবা, ডান পকেটে রেখেছো। তুমি যে দেখছি বোতলের মাল না খেয়েও নেশায় বুঁদ। চোখ যা দেখছ সুর্মার সুক্ষ্ম টানে চেরা পটল, চুল যা দেখছ—গুচ্ছির ফাঁকি আছে। রং তো সবটাই ম্যাক্স ফ্যাক্টর: জামা কাপড়ের তলাতেও আজ ম্যাক্স ফ্যাক্টর মেখে এসেছে। আর বয়েস! তোমার ডবল—

রাজাসাহেব উত্তর করলেন না। ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে একমুঠো নোট তুলে প্যালায় দিলেন। এক টাকার খান চার নোট ড্যালা পাকানো। আঙুলের ফাঁকে সিকি আধুলি দু' একটা। খুঞ্চিপোশ ঢাকা পেতলের থালায় চাপা আওয়াজ উঠল ঠুন ঠান।

এইবার আর সবার দেবার পালা। রাজাসাহেব মানে গৃহকর্তা দেবার আগে আর কারো দেবার নিয়ম নেই।

দিলীপ দত্ত ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে একমুঠো রেজ্গি তুললেন। পরিমাণে হয়তো রাজাসাহেবের চেয়ে বেশীই হবে। তুলে, হাওয়ায়-উড়ে-যেতে-চাওয়া নোট গুলোকে চাপা দিলেন।

রাজাসাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বললেন ঃ কলকাতার তো! তোমার আর গাড়ি খরচা করতে হবে না। আমার গাড়ি আছে—পেঁছে দেবো—।

রাজাসাহেব এবারেও উত্তর করলেন না।

আসরের চার পাশ ঘুরে প্যালায় যা নেবার কুড়ানো হয়ে গেল গান্ধারীর। পাঞ্চালীর পাশে বসে পড়ল সে।

রাজা সাহেবের মনের ইচ্ছাটা অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছিলেন দিলীপ দত্ত—রাজাসাহেবের অপলক দৃষ্টি অনুসরণ করে।

দিলীপ দত্ত বললেন : এইবার তোমার একখানা হোক পাঞ্চালী। তুমি তো এসে অবধি বসেই আছো—

গোবিন্দ পট্টনায়েক আর আরো সবাই একবাক্যে সায় দিল : হ্যাঁ-হ্যাঁ-নিশ্চয়! রাত হয়ে যাচ্ছে—অবশ্যই রাজাসাহেব যদি হুকুম করেন—

রাজাসাহেব মনে প্রাণে তাই চাইছিলেন। সবুর সইছিল না তার। কতোক্ষণ আর ভুঁষিমালের ন্যাকামি সহ্য করা যায়। আর আসর এখন তাড়াতাড়ি ভেঙে দিলেই হয়। গোঁফের ফাঁকে হাসি দেখা দিল তার। বললেন : তাই হোক—সবার যখন ইচ্ছে—

কি যেন কানাকানি হল দুজনার। আস্তে আস্তে মন্থর পদে দুজনে উঠে পাশের ছোট্ট ঘরে চলে গেল। সেইটাই সাজঘর। গান্ধারীর পায়ে ঘুঙুর বাজতে লাগল—ঝম ঝম—

নকল সিল্কের রঙীন রুমাল ভেস্ট কোটের পকেট থেকে বের করে কপালে জমে-ওঠা ঘাম মুছতে লাগল সারেঙ্গীওয়ালা। বাঁয়ায় আর তবলায় নতুন করে ফ্রেঞ্চ চক মেখে নিল তবলচী—নতুন গানের প্রস্তুতিতে। উর্দি পরা বয় ট্রেতে বহু রকমের মদ সাজিয়ে ঘরে বেড়াল নতুন করে—এই নাচের বিরতিতে। কেউ তুলে নিল রাম—কেউ হুইস্কি। বাড়িতে ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য কেউ জিন—

সাজঘরে গিয়ে ঘুঙুর জোড়া পা থেকে খুলতে খুলতে গাঁদী শুধোল : কোনটা নাচবি? জরি চুমকির আংরাখাটা দিই? —নাকি, বেগুনী ভেলভেটের টা?

উত্তর দিল না পঞ্চী। সন্ধ্যে থেকেই গম্ভীর হয়ে আছে। আজকের রাতে গম্ভীর হয়ে থাকবার মানে বুঝতে পারছে না গাঁদী। কি হয়েছে যেন ওর! কি চাও পারে? কতোদিন পর মুজরো জুটল একটা। তাও কি সোজা পয়সার। নাচের দরুণ পঞ্চাশ। আর, রাজাসাহেবের সঙ্গে রাত কাটাবার জনো আরো পঞ্চাশ। এই থেকেই গাল ফুলে আছে কুললক্ষ্মীর। কেন, পঞ্চাশটা টাকা কি সোজা! না, তুই কুলের বউ? ঢং দেখে বাঁচে না গান্ধারী।

চোখ পাকিয়ে তাকালো গান্ধারী। এই সব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বয়ীয়সী একজন সঙ্গে যায় অভিভাবিকা হয়ে। লক্ষ্মীটিকে বিপদ আপদ থেকে বাঁচাতে যায়, চাল চলন শেখাতে যায়। যায় উপদেশ দিতে। এবং মেয়েকে বেতালের হাত থেকে বাঁচাতেও।

সন্ধ্যে থেকেই বেতালে চলেছে পঞ্চী। মুখ গোমড়া করে বসে থাকার আসর ওটা? কতোবড়ো বড়োলোক, রাজামাহারাজা। নজরে ধরে গেলে পটাপট মুজরো পেয়ে যাবি—সেটুকু বুঝছিসনে!

গান্ধারী রেগে-মেগে বলল : তোর মতলবখানা কি রে? ও কি! প্লেন জর্জেট-খানা পরে কি নাচবি তুই? নাচবি না নাকি? আগাম নেয়া হয়ে গেছে—

পরনের শাড়িখানাই একটু ঠিকঠাক করে পরে নিচ্ছিল পাঞ্চালী। এইবার ঘুঙুর জোড়াটা পরে নিল পায়। পরে দ্বিরুক্তি না করে নাচঘরের দরজার দিকে পা বাড়াল। সাবধান-পায়ে পা ফেলল পাঞ্চালী, নূপুরের কণ্ঠ টিপে ধরে। প্রগলভ না হয়ে ওঠে ওগুলো।

নাচঘরের চৌকাঠে পা দেবার আগেই বেহাগ রাগে প্রাণের সোহাগ ঢেলে দিল। গান ধরল এমন একটা যেটা গান নয়। কবিতা। সুর দিয়ে গাওয়া যায়, জানা ছিল না।

আঁটসাঁট করে পরা জর্জেট। আঁচলের প্রান্ত টেনে টেনে কোমরে জড়ানো—বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে জড়ো করে নিয়ে পিছনে ফেলে দেয়া আঁচল। জামায় কাপড়ে ভঙ্গীতে-সঙ্গীতে নটী নেই কোথাও। জন্মদিনের উপলক্ষে ঘরোয়া নাচের স্নিগ্ধ শ্যামলতা! যেন মাইফেল নয় এটা, রাজাসাহেবের জন্মদিনে ঘরের মেয়ে বা বন্ধুপত্নীর অভিনন্দন!

চৌকাঠ থেকেই নাচতে শুরু করল পাঞ্চালী। মুখে গান। পুরনো রবীন্দ্র-সংগীতকে লম্বা লম্বা টানে রাগপ্রধান গানের রূপ দেয়া—

আ—জি যে রজনী যা—য় ফিরাইব তা……য় কেমনে

বাঁয়া তবলায় ছোট ছোট টোকা মারছিল তবলচী। চৌতাল না ত্রিতাল—দাদরা না কার্ফা। কিছুই জানা নেই। গানের টান শুনে বা প্রথম কলির খানিকটা শুনে তার-পর ঠিক ক'রে চাঁটি মারবে।

চুপ করে গেল তবলার ঠেকা। বিস্ময়! এ গান তো সে শোনেনি। কী বাজাবে?

তদ্রূপ অবস্থা সারেঙ্গীওলারও। এমনি এমনি কাঁ কোঁ করছিল। ছড়ির ঘষায় তারের হৃদয়বিদারণ আর্তনাদ, থামিয়ে দিল সেও—

হাতের মুদ্রায় হৃদয় মুদ্রিত করতে

করতে ছোট ছোট পদক্ষেপে এগিয়ে এল পাঞ্চালী। নূপুর বাজল কি বাজল না। তাল রেখে চলল গানের ছন্দের। এ তাল মাতাল করে না, উত্তাল করে না শান্ত সমুদ্র হৃদয়। উত্তাল রক্তসমুদ্রকে বরং শান্ত ক'রে আনে। ঘুম ভাঙায় না, ঘুম পাড়ায়।

ছোট ছোট পদক্ষেপ। হাতের কাজই বেশী—। শরীরের তীরে তীরে অল্প অল্প ঢেউ। মৃদু শিহরণ ঝিলের জলে।

বার কয়েক টেনে টেনে প্রথম কলি গেয়ে দ্বিতীয় কলি ধরল পাঞ্চালী

কে...ন নয়নে জল ঝরিছে ঝরিছে ঝ—রিছে বিফল নয়নে—

ঘুমন্ত সারেঙ্গী খুঁজে পেল ছড়ের সঙ্গ। আর্তনাদ নয়। মিষ্টি প্রলাপ ব'কে উঠল। তবলাও।

সভাতল নিস্তব্ধ। উচ্ছলতা নেই। গান্ধারীর গানের আর নাচের মাদক অনুভব—মুহূর্তে উধাও। এ এক নতুন অনুভূতি।

তারিফ করতে ভুলে গেল দিলীপ দত্ত। হাতের গ্লাস ঠোঁটে উঠল না আর।

ভ্রূভঙ্গী করতে ভুল হয়ে গেল গোবিন্দ পট্টনায়কের।

শুধু তৃতীয় কলির অর্থ অনুসরণ ক'রে হারিয়ে যাওয়া স্বরূপ খুঁজে পেল দিলীপ দত্ত—

এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ

দিলীপ দত্ত গ্লাস রাখল কার্পেটে। মূর্তিমান ছন্দোভঙ্গের মতো পশুর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: বাহবা বাঈজী. বাহবা। ঠিক বলেছ। নাম পাঞ্চালী। এসেছ স্বয়ংবর সভায়। স্বয়ংবর নয়। পাশা খেলায় হেরে। বাহবা বাঈজী। নিজে থেকেই দিতে চাইছ বেশ ভূষণ। দুঃশাসনের পার্টটা—ও আমিই না হয়—

বলে কথাটা অপূর্ণ রেখে নিজের ডান উরুতে চাপড় মারল দুটো—

এই মিষ্টি আবহাওয়ার স্বচ্ছ তলায় দিলীপ দত্তর কুৎসিত মন্তব্য কাদা জল ঘুলিয়ে দিল। অশ্লীল রসিকতায় সায় দেওয়া দূরের কথা, দিলীপ দত্ত কারো মুখে না তাকিয়েও বুঝতে পারল, পঞ্চাশ জোড়া চোখে রক্ত ঝরছে। তারিফ তো কেউ করেই নি, চোখের অগ্নিবাণ ছুঁড়ে মারছে সবাই।

বিশেষ করে রাজাসাহেব।

আর এ কটাক্ষ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না দিলীপ দত্তর। মুহূর্তে বিপুল বিক্রম কেঁচো হয়ে গেল তার।

নর্তকী তখন ফুলের গয়না ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে—ফুলের তাগা, ফুলের বাজুবন্ধ, ফুলের কান, মাথায় জড়ানো মালা, চন্দ্রহার। আর মুখে গাইছে—

এ কুসু—ম মা—লা—হয়েছে অসহ

অনেকেই উপহার পেল। ফুলহার। পেল না শুধু যার বেশী চাহিদা। দিলীপ দত্ত।

গলার মালাটা প্রসারিত দু হাতে ধরা ছিল অনেকক্ষণ পাঞ্চালীর। পঞ্চম কলিতে চলে এসেছে তখন সে—

এ—মো—নো যা—মি—নী কাটি—ল বিরহ শয়নে

হঠাৎ তৃষিত চাতকের মুখ চেয়ে দু ফোঁটা জল ঢালল আকাশ। মালাটা এমন কায়দায় ছুঁড়লো পাঞ্চালী যে, রাজাসাহেবের মাথা গলে গলায় পড়তে পড়তে কোলে এসে পড়ল তাঁর—

বিহ্বল রাজাসাহেব কোনো সম্মানই দিতে পারলেন না মালাটার। এই উপকারটুকু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সহযোগে করে দিল দিলীপ। কোল থেকে তুলে গলায় পরিয়ে দিল রাজাসাহেবের।

মাথা নিচু করে রইলেন রাজাসাহেব। একি করল নর্তকী! ভগবানের কোনো ইঙ্গিত নেই তো এতে—

রসসঞ্চার হল নৃত্যসভার, না, রসভঙ্গ হল—বোঝা গেল না। শুধু বাসনামথিত উন্মত্ত আবহাওয়ায় এলো সুকুমার পেলবতা। মন্ত্রবলে—

পাঞ্চালী তখন প্রথম চরণে ফিরে এসেছে আবার।

আজি যে রজনী যায়
ফিরাইব তায় কেমনে—

কি হল রাজাসাহেবের, কে জানে!

বিশেষ করে চোখ তুললেন না তিনি আর—

রাগে দাঁত কড়মড় করতে লাগল গান্ধারী।

মেয়ের ঢং দেখে—

তার ছিঁড়ে গেল সারেঙ্গীর।

তাল কেটে গেল তবলার—

সভাভঙ্গ হল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

লোক চলে গেল একে একে।

সুধনা আধো-দেখা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়।

রাজাসাহেব ডাকলেন: সুধনা, পৌঁছে দাও এঁদের—

দিলীপ দত্ত গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে আস্তে আস্তে বিদায় নিল: গুডনাইট সিলভার কিং! চলি ভাই আজ—

ট্রাউজারের দু পকেটেই হাত বোঝাই করে ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে আস্তে বেরিয়ে গেল দিলীপ।

গিয়ে দাঁড়াল নগ্ন পুতুলের আবছায়ায় —দশ গজ দূরে।

গেটের দিক থেকে ফিরছিল হরিপদ। চাপা গলার ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গলাটা চিনতে পারল। দিলীপ বলল: সুধনাকে ডেকে দাও তো—

সুধনা এসে যা বলল তাতে খুব সুবিধে হল না দিলীপ দত্তর। সুধনা বলল: এখন খাওয়া-দাওয়া করবেন তেনারা। তারপর কখন যান, না-যান—

নিজের মনে দিলীপ বলল: না যান। ও—

বলে মশার কামড় খাবার অতি আগ্রহে নিজের ল্যান্ড রোভারের স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল। ভূতের মতো চুপচাপ। বাগানবাড়ির গেটের কাছে—বাইরে রাস্তায়—

নির্দেশ মতো ঝিলের ওপাশের গেস্ট হাউসে গান্ধারী আর পাঞ্চালীকে নিয়ে তুলল সুধন্য। রাজাসাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। বলা বাহুল্য, খিড়কি দুয়ার দিয়ে গেস্ট হাউসে পৌঁছবার সহজ রাস্তা আছে—

লুচি-মাংসের ব্যবস্থা ছিল নাচিয়েদের জন্য। বাজিয়েরা তো পারিশ্রমিক আর বকশিশ নিয়ে কখন চলে গেছে।

গান্ধারী পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে চলেছিল। রাগের জ্বালায় একটাও কথা বের হয়নি এতক্ষণ তার। ক্ষুধার মুখে উপাদেয় ভোজ্যে অনেক পরিমাণ জ্বালা কমে গিয়েছিল। এইবার নাটকের শেষ অঙ্কের জন্য চিন্তিত হতে লাগল গান্ধারী। যার একমাত্র নায়িকা পাঞ্চালী। সে নয়। শেষ অঙ্কের দামও কম নয় —পঞ্চাশ।

খুশি করবার জন্য খোশামোদ আর তোয়াজ করা দরকার মনে করল গান্ধারী। দিদিসুলভ দরদ মিশিয়ে বলল: হ্যাঁরে পঞ্চী, ভালো করে খাচ্ছিস নে কেন রে?

বাকি কথা কটা বের হল না মুখ দিয়ে। তখন সে হাড় চুষতে ব্যস্ত।

খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল পাঞ্চালী। কিছু মুখে দিচ্ছিল মাত্র।

সামনে দাঁড়িয়ে সুধন্য। তার জন্য খাওয়ার বরাদ্দ ছিল না। এত খাবার দেখে লোভে চকচক করছিল তার চোখ। নিজের বরাদ্দ থেকে বেশির ভাগই তুলে দিয়েছিল তাকে পাঞ্চালী—আলাদা করে আলাদা প্লেটে। তা সত্ত্বেও খাবার সাহস ছিল না তার। দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বারে বারে তাকাচ্ছিল। অনেকগুলো চিন্তা পেয়ে বসেছিল তাকে। তার মধ্যে পয়লা নম্বরটা হচ্ছে পাঞ্চালীর দয়া। দয়া করে শেষ অংকটা ভেস্তে না দেয় পাঞ্চালী। তা হলে তার বরাদ্দ টাকার অংকটাও ভেস্তে যাবে।

আর একটা চিন্তা ছিল তার। এখানে দাঁড়িয়ে কি করে খাওয়া যায়? রাজাসাহেব এসে পড়েন যদি। তার চেয়ে, রকম দেখে মনে হচ্ছে সবটা খাবে না পঞ্চী। যেটুকু রেখে দিয়েছে পঞ্চী, আর উচ্ছিষ্ট যতটুকু থাকবে পঞ্চীর পাতে, সবটা বেঁধে নিয়ে বাইরে যাবে। আড়ালে গিয়ে আরাম করে খাবে। রাজাসাহেবের এসে পড়ার ভয় থাকবে না যেখানে।

তার যা জীবন ও জীবিকা, উচ্ছিষ্ট খাওয়া ছাড়া গতি নেই আর।

হাত কচলাতে কচলাতে হাতের তেলো দুটো দস্তুরমতো গরম করে ফেলেছে সুধন্য। : পঞ্চী, ভাই, দিদি আমার খাচ্ছো না কেন? খাও? ভালো করে খাও। আর একটু মাংস দিক! ওহে অ বাবুর্চি, আর একটু মাংস দাও এখেনে—পঞ্চী, পাঞ্চালী।

বাবুর্চি—জানত, উদ্বৃত্ত মাংস-লুচি বেঁধে নিয়ে যাবে সুধন্য। তাই, পঞ্চীর পাত খালি না হতে নতুন করে কিছু দিল না সে আর।

দরজার-পথে যে আলোটা বাইরে আধো-অন্ধকারকে পাহারা দিচ্ছিল, সেই আবিষ্কার করে দিল। শালটাকে ঘোমটার মতো টেনে দিলেও বাহারী গোঁফে আলো পড়ল সবার আগে। ছদ্মবেশে এসেও চমকে দিতে পারলেন না। শুধু তিন জোড়া চোখ দরজা থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো রাজাসাহেবকে—

মৃদু হেসে ঢুকলেন রাজাসাহেব, মাথা থেকে শালের ছদ্মবেশ টেনে খুলতে খুলতে।

: পঞ্চী—পাঞ্চালী—পাঞ্চালী—পঞ্চী। বেশ নাম।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন রাজাসাহেব: সুধন্য।

কিংকর্তব্য আগেই হয়েছিল সুধন্য। হঠাৎ তাড়া খেয়ে দৌড় লাগাবার প্রস্তুতিতে সিমেন্টের বারান্দায় পিছলে গেল কুকুরের চারটে পা'র ষোলটা নখর।

খাবার টেবিলটা ধরে না ফেললে পড়ে যেতো সুধন্য। বিবর্ণ গলায় কাঁপা আওয়াজ বেরলো একটা। যেটাকে 'আজ্ঞে' বলে ভুল করা যেতে পারে। তার চোখে তখন কুণ্ডলী পাকানো হাণ্টার। যেটা অনেকটা লম্বা হতে জানে।

কেউ কিছু বলল না আর। সুধন্য আপনা থেকেই বাইরে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল: বাইরে আছি স্যর—

কি মনে করে পাশের ঘরে চলে গেল গান্ধারী। যাবার সময় নীরব চোখে বিদায় নিয়ে গেল। ডান হাত সকড়ি মাখা। এঁটো হাত কোথাও ধুয়ে নেবে এই আশাতেই বেরিয়ে গেল সে।

গেস্ট হাউসের পিছন দিককার ঘর এখানা। ও ঘরখানা পেরলেই প্রশস্ত দুখানা ঘর। একখানাতে ঢুকতে গিয়ে পিছিয়ে এলো গান্ধারী। পাশের ঘরে ঢুকল এসে। এখানা কম প্রশস্ত। মাঝখানে দরজা নেই। তাই খাবার ঘরে ফিরে এসে পাশের ঘরে ঢুকতে হল তাকে।

মুখ নিচু করে ছিল পাঞ্চালী। থালার ওপর আঁকিবুকি কাটছিল—তর্জনীর ডগায়। শুকিয়ে-আসা মাংসের ঝোলের ওপর আঁকছিল একপায়ে খাড়া বক।

বাঁ পাশে চেয়ার টেনে ঘন হয়ে বসলেন রাজাসাহেব। আস্তে ডান হাতখানা তুললেন। পাঞ্চালীর বেণী পার হয়ে ডান কাঁধে পৌঁছল সে হাত।

অনড় বসে রইল পাঞ্চালী।

নার্ভ স্ট্যাণ্ড করতে পারে না! ...তুমি হাতে করে দিলে 'না' বলতে পারলুম না।...ঘুম যে রুখতে পাচ্ছি না।...তাই বলে...তুমিও... বুঝলে...এই বুঝেছ...হ্যাঁই পনছী কাঁহে হোত উদাস...তুমি যেন ফুরুৎ করে......

আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পাশের ঘরে ফিরে এলো পাঞ্চালী। সারা মুখে চাপা হাসি। অদৃশ্য সুগন্ধির মতো লেগে—

গা ছমছম ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল গাঁদী। কি জানি অচেনা জায়গা! তা ছাড়াও ভয় ছিল তার পাঞ্চালীর জন্য। বেগোরবাই করছে সন্ধে থেকে। চলছে বেচালে। পঞ্চাশটা টাকাই বড়ো কথা নয়। মানুষের আশাকে খুন করলে তার চেয়ে চরম বেইমানি আর নেই। মানুষ খুনের চেয়ে পাপ। আশা দেওয়া-না-দেওয়া তোমার ইচ্ছে। ভেবে চিন্তে দাও। দিলে, রাখতে হবে কিন্তু! ...পঞ্চা আগাগোড়া, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ অঙ্কের নায়িকা হতে আপত্তি করেছে। আপত্তি নয়, মারতে উঠেছে। অনেক বোঝাতে বোঝাতে চুপ করে গেল শেষ পর্যন্ত। আর বিশেষ আপত্তি করল না। তাও, সুধন্য কি মন্ত্র দিয়ে গেল কানে সেই থেকেই। পাঞ্চালীর খাড়া মেরুদণ্ডের ধনুকটা, গান্ধারীর তো মনে হয়, একটুও বাঁকাতে পারেনি। না, এক ইঞ্চি নয়, এক চুল নয়। বলেই গেল সুধন্য—সরে যা গাঁদী, ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখবি সুড়সুড় করে রাজী হয়ে যাবে। কথাটি বলবে না!......হলও তাই। খুশী মনে না হলেও রাজী হল অবশেষে।

কিন্তু এ বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত সন্ধ্যে থেকে যে-কে-সেই। সেই এক গোঁ, মুজরো করতে এসেছি মুজরো করব। তার বেশী নয়। ও সব হবে না—

এই পাঁচ দুর্ভাবনায় ঘুম আসেনি ভালো গান্ধারীর। ঘরে লোক ঢুকতেই ধড়মড় করে উঠে বসল শালমুড়ি ফেলেঃ কে?—কে?—ও তুই?—চলে এলি যে? ভেবেছিস কি মনে মনে? অতোই সোজা পঞ্চাশটা টাকা? যা, যা শীগ্গির ওঘরে—নইলে খেংরা মেরে মুখ ছিঁড়ে দেবো—যা—বেরো—দূর হ' চোখের সামনে থেকে—

খুকখুক খুকখুক হেসেই চলেছে পাঞ্চালীঃ ও কম্ম ফতে করে এসেছি—

তার মানে? তার মানে? কি করে এসেছিস সর্বনাশী? কি দিয়ে? পুলিস এসে পড়বে এখখুনি। এ কি-আপদকে জোটালুম! হায় হায়—

দারুণ ভয়ে উত্তেজনায় চোখমুখ রক্তবর্ণ, হাঁফাচ্ছে গান্ধারী। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। ঘুমের লেশ পালিয়েছে। শোয়া থেকে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে গান্ধারী। বল্ বল্ কি ক'রে এসেছিস?

ঘুম পাড়িয়ে এসেছি ব্রোমাইড দিয়ে।

হুইস্কির সঙ্গে ব্রোমাইড মিশিয়ে দিয়েছিলাম। ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমোচ্ছে মরা হাতীর মতো—

হতচ্ছাড়ী, ইমান রাখিস নি?

রেখেছি।

বুঝতে পারে না গান্ধারীঃ তার মানে খুলে বল। ও-ঘর থেকে চলে আসার কথা তো নয়। সারারাত থাকার কথা। বেইমানি করেছিস তুই। ঠকিয়েছিস রাজা সাহেবকে। কথা দিয়ে কথা রাখিস নি। পঞ্চাশটা টাকা আগাম নেয়া হয়ে গেছে এ জন্যে। ইমান খুইয়েছিস তুই—

হাসি উবে গেল পাঞ্চালীর মুখ থেকেঃ ইমান খোয়াবো না বলেই চলে এসেছি।... টাকা চাইনা আমার। ফেরৎ দিয়ে আসতে পারো।

গান্ধারী বললঃ আশা দিয়ে আশা না রাখাই বেইমানি। হ্যাঁ, আমিই যাবো, আমিই যাচ্ছি রাজা সাহেবের কাছে। আমি সাধারণ মেয়েমানুষ—সাধারণ বলেই নীচ হতে পারি নেমকহারামি করতে পারি না—

গান্ধারী চলে গেল পাশের ঘরে।

পাঞ্চালী জানে, কাল ভোরের আগে ঘুম ভাঙবে না রাজাসাহেবের।

শূন্য দেয়ালের পানে শূন্য দৃষ্টির ডানা মেলে কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল পাঞ্চালী।—সুধন্য বলেছে রাজাসাহেব বিয়ে করবেন আবার। সত্যিকার সুন্দরী মেয়ে চাই।......রাজাসাহেবের চোখে সত্যিকার মুগ্ধ দৃষ্টি। রূপমুগ্ধ তিনি। ......আজ রাতে সহজভাবে ধরা দিলে রাজাসাহেবের শ্রদ্ধা থাকত না আর।......সুধন্য রাজাসাহেবকে বুঝিয়েছে সত্যিকার ভদ্রঘর। পাঞ্চালী কি ধরা দিতে পারে?......পাঞ্চালী যে শুধু গান-বাজনা বেচে খায়।...এ বাড়ির বৌয়েরা কি সুখী!

চোখ জলে ভরে এলো পাঞ্চালীর।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

প্রমথ চৌধুরী কেন 'বীরবল' নাম অবলম্বন করেছিলেন, তার ইতি-কথা তাঁর 'বীরবল' শীর্ষক প্রবন্ধে ছাপা হয়েছিল বত্রিশ বৎসর পূর্বে। ও'র বাবার কাছে বীরবল নামটি উনি প্রথম শোনেন। ও'র ভাষাতেই বলিঃ

'আমি যখন বালক, তখন আমার পিতার কর্মস্থল ছিল বেহারে। কাজেই তিনি সেকালে বছরের বেশির ভাগ সময় সেই দেশেই বাস করতেন। আর আমি বাস করতুম বাংলায়, স্কুলে পড়বার জন্য। আমার বিশ্বাস, এর কারণ বাবা মনে করতেন বেহারের আবহাওয়ায় মানুষের মাথা তাদৃশ খোলে না, যাদৃশ ফোলে তার দেহ।

এর ফলে তিনি আপিসের পূজোর ছুটিতে বাংলায় আসতেন, আর আমরা কেউ কেউ বেহারে যেতুম স্কুলের শীতের ছুটিতে।

আমার বয়েস যখন এগার বৎসর, ... একবার আমি শীতকালে মজঃফরপুরে যাই। সঙ্গে ছিলেন আমার একটি ভ্রাতা ও একটি ভগ্নী। আমিই ছিলুম সবচাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। দিনটে একরকম খেলাধূলোয় কেটে যেত। সন্ধের পর ... জন্য মন কেমন করত।

বাবা তাই ঘরের ভিতর প্রকাণ্ড একটা আঙটি জ্বালিয়ে তার চার পাশে আমাদের বসিয়ে একখানি উর্দু বই থেকে আমাদের কেচ্ছা পড়ে শোনাতেন। এর অধিকাংশ কেচ্ছাই এই বলে শুরু হত 'আকবর বীরবল সে পুছা'; আর শেষ হত বীরবলের উত্তরে।...আকবরের প্রশ্নের উত্তরে বীরবলের চোখা চোখা জবাব শুনে আমি মনে মনে তাঁর মহা ভক্ত হয়ে উঠলুম।...বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবল নাম অবলম্বন করলুম।'

প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলছেনঃ 'আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন।'

যে-ছল অবলীলাক্রমে খেলায় আসে, সে-ছলের আবির্ভাব লেখায় হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সব ভাষাতেই এমন এক একটা কথা আছে, যার দুটো মানে হয়। তাই নিয়ে রঙ্গ করার ইংরিজী নাম Pun আর সংস্কৃত নাম 'শ্লেষ'। ভারতচন্দ্রের হাতে এ-খেলা কতো সরস রূপ গ্রহণ করেছে।

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥'

প্রমথনাথের রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলার চেষ্টা এই ব্যাজ-স্তুতির সমগোত্রীয়। এর পশ্চাতে যে ছেলে মানুষী ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। সকলেই শৈশবে কৈশোরে এই কথার খেলা খেলেন—কেউ কম, কেউ বেশি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কথোপকথনে আজীবন এই খেলা খেলেছেন। তাঁর লেখায় এ-খেলার ছাপ তত পড়েনি এই জন্যে যে, রস-সৃষ্টির অন্য অনেক উপায় তাঁর কবি-মনে আবির্ভূত হয়েছিল।

ছেলেবেলায় ঠাকুরদাদার মুখে এমন অনেক গল্প শুনেছি, যার মূলে আছে ঐ কথার খেলা। তার মধ্যে দুটো গল্প আমার মুখে শুনে তারিফ করেছেন ছোট-বড় সকলেই। সুতরাং সাহস করে এই সূত্রে ছাপার অক্ষরে সে-দুটি গল্পের পুনরাবৃত্তি করছি।

অমনি সন্দেশ

একটা ময়রার দোকানে ঢুকে এক ভদ্রলোক চার পয়সার সন্দেশ খেয়ে দাম দেবার সময় প্রশ্ন করলেনঃ

—আচ্ছা, অমনি সন্দেশ আছে?

ময়রা বললেঃ

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কত চাই?

—দাও এক সেরটাক।

ময়রা তার চোরা দাঁড়িপাল্লায় চে...ওজনের এক সের সন্দেশ শাল পাতার ঠোঙায় পরিপাটি করে কাটি গুঁজে সসম্ভ্রমে খরিদ্দারের হস্তে সমর্পণ করবার পর ভদ্রলোক সন্দেশ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর দু-চার পা চলার পর ময়রাও বেরিয়ে এসে বললেঃ

—কৈ মশায়, দাম দিলেন না?

—কিসের?

—কেন, সন্দেশের?

—সে ত দোকানে বসেই দিয়ে এসেছি!

—সেটা ত দোকানে বসে যে-সন্দেশ খেলেন, তার দাম। যে-সন্দেশ এখন আপনার হাতে রয়েছে তার দাম দেন নি।

—এর আবার দাম কি?

—দাম নেই? অমনি না-কি?

—নিশ্চয়। আমি ত অমনি সন্দেশই চেয়েছিলাম।

ময়রা নিরুত্তর। এরকম ভদ্দরলোক

খদ্দেরের পাল্লায় পড়লে দাঁড়ি টানা ছাড়া উপায় কি?

এই এমনি-ই করে

এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ সকালে উঠে আহ্নিক সেরে সন্দেশ খেতেন। তাঁর চাকরের প্রতি আদেশ ছিল, রোজ সন্ধ্যের সময় চারটে করে সন্দেশ কিনে খাটের নীচে একটা রেকাবীতে খোরা চাপা দিয়ে যেন রাখা হয়। তার মধ্যে তিনটি সন্দেশ ব্রাহ্মণ নিজে খেয়ে বাকি একটি তাঁর চাকরকে দিতেন। এই ছিল তাঁর প্রাতরাশের ব্যবস্থা।

একদিন খোরা খুলে তিনি দেখলেন যে, মাত্র একটা সন্দেশ আছে। চাকরকে ডেকে বললেনঃ

—হ্যাঁরে, রোজ চারটে সন্দেশ আনিস্, আজ একটা দেখছি কেন? কেনবার পয়সা ছিল না?

—আজ্ঞে, পয়সা ত ছিল, কিনেওছিলুম চারটে।

—তাহলে তিনটে কি বেরালে খেয়ে গেল? আদুড় রেখেছিলি বুঝি?

—আজ্ঞে, আদুড় রাখবো কেন? এনেই ত খোরা চাপা দিয়েছি।

—তবে?

—হল কি জানেন? সন্দেশ চারটে কিনে রাস্তা দিয়ে আসছি, এমন সময় হঠাৎ একটা ভুঁয়ে পড়ে গেল। আপনি ব্রাহ্মণ, সেই ছত্রিশ জাতের পায়ের ধুলো লাগা সন্দেশ আপনাকে ত দিতে পারি না!

—যাক্, একটা না-হয় নষ্ট হল। তিনটে ত থাকবে?

—আজ্ঞে, যেটা পড়ে গেল, সেটা ঠিক নষ্ট হয়নি। ভুঁই থেকে কুড়িয়ে ধুলো ঝেড়ে আমি খেয়েছি।

—তা বেশ করিছিস্। কিন্তু তিনটে ত থাকবে? মাত্র একটা আছে কেন রে ব্যাটা?

—তিনটেই ছিল। কিন্তু পথে একজন দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হল। কথা কইতে কইতে বোধ হল যেন একটা সন্দেশের ওপর আমার মুখ থেকে একটু থুতু পড়েছে। আপনি ব্রাহ্মণ, সেটা ত আপনাকে দিতে পারি না, সেটা নিজেই খেয়ে ফেললুম।

—হুঁ বুঝেছি। একটা রাস্তায় পড়ে গেল, সেটা তুই খেলি। আর একটায় তোর বো-ও-ধ হলো যে থুতু পড়েছে, সেটাও তুই খেলি। তাহলেও ত দুটো থাকবে। একটা রয়েছে কেন রে, ব্যাটা?

—আজ্ঞে, একটা ত আমায় দিতেন-ই। সেটা আমি আগেই নিয়ে খেয়েছি।

ব্রাহ্মণ অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জন করে উঠলেনঃ

—ব্রাহ্মণের মুখের জিনিস কি করে খেলি, র‍্যা?

—আজ্ঞে, বলব?

—বল্, ব্যাটা বল্!

যে একক সন্দেশটি উদ্বৃত্ত ছিল রেকাবীতে, প্রভুভক্ত ভৃত্য সেটিকে তুলে নিয়ে নিজের হাঁ বড় করে গলাধঃকরণ করলে আর বললেঃ

—আজ্ঞে, এই এমনি-ই করে!

ব্রাহ্মণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সে-সময়ে শূন্য-বাদ চিন্তা করেছিলেন কিনা, সে-সংবাদ পাইনি।

প্রমথ চৌধুরীর লেখায় যে কথার খেলা দেখি, তার ভিতরে ছেলেমানুষী ভাব যেটা আছে সেটা স্বাভাবিক মানসী বৃত্তি ত বটেই। উপরন্তু, তাঁর ক্ষেত্রে আশ-পাশের অনুকূল বায়ু সে-বৃত্তিকে স্ফূর্তি দিয়েছিল। উনি যখন এগার বছর বয়সে মজঃফরপুরে বসে ও'র পিতৃদেবের কাছে আকবর-বীরবল সংবাদ শোনেন, তখন সেই বিদূষকের চোখা-চোখা জবাব ও'র মনে মহাভক্তির সঞ্চার করেছিল কেন? আমার বিশ্বাস, তার কারণ এই যে, উনি তৎপূর্বেই অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই এ-ধরনের কথার লেখায় মজা পেয়েছিলেন ভরপুরে। মজঃফরপুরের নাম-গান আমার শোনা নেই, তবে এটা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি ও-নামটি হচ্ছে মজা-ভরপুরের অপভ্রংশ।

অনেককাল আগে কি যেন একটা বইয়ে পড়েছিলুম যে, প্রাণীদের মধ্যে হাসবার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর এ-মত প্রতিষ্ঠিত কিনা, সে-বিষয়ে গবেষণা করার অধিকার আমার চাইতে প্রশান্ত মহলানবীশ বা সত্যেন বোসের ঢের বেশী। তবে মানুষ যে শিশু-কালে হাসে, এ-সত্য সকলেই মানে, এবং শিশুর সরল শুভ্র হাস্য সকলেরই মন হরণ করে। মনে পড়ল আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ('শীতলকৃষ্ণ দেব) একটি ইংরিজী কবিতা, যার শেষ লাইন হচ্ছেঃ

The laugh that leaps from children's lips!

শিশু-ভাবকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। লীলাময়ের লীলা শিশু-ভগবানে রূপায়িত। বাইবেল বলেঃ

"যিশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দাও, বারণ করিও না, কেননা তাহারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।"

এর মধ্যে যে-ছন্দ আছে সে-ছন্দের দোলায় আমার শিশু-মন দুলেছিল। আমাদের পেছন-দিকের বাড়িতে একটি খৃষ্টান মেয়ে-ইস্কুল ছিল (চার্চ অফ্ ইংল্যান্ড জেনানা মিশন)। সেখান থেকে সুরে-ছন্দে লীলায়িত ঐ যিশুর উক্তিটি প্রায়ই আমার কানে আসত।

একদিন এই মেয়ে-ইস্কুলে পড়তে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি। একটি মিশ্-কালো দিদিমণি আদেশ দিলেনঃ ঈশ্বরের স্তোত্র বল। খৃষ্টান ঈশ্বর-স্তোত্র তখন শিখিনি। শঙ্করাচার্যের শঙ্কর-স্তোত্র সুর-সংযোগে আবৃত্তি করবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল খুব, কিন্তু তার মধ্যে কোনটা ধরব ঠিক করতে না পারায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। দিদিমণি ধমক দিয়ে বললেনঃ জান না ত ইস্কুলে এসেছ কেন? আমার চমক ভাঙলো বটে, কিন্তু মাথাটাও চড়াং করে ধরে উঠল। বাড়ি ফিরে মাথায়-চোখে-মুখে জল দিয়ে মা-ঠাকুরমাকে ঘটনার বিবরণ দিলুম। তাঁরা বললেনঃ ও-ইস্কুলে তোমার যাবার দরকার নেই। আমি ঠাকুরদাদার আদুরে নাতি, বাড়িতে আমায় কেউ ধমক দিতেন না।

এ-ঘটনা কিন্তু আমার মনে ঐ যিশু কর্তৃক শিশু-প্রশস্তির প্রতি বিরাগ আনেনি। বোধ হয়, তার কারণ, আমি শৈশবে নাড়ু-গোপালের মূর্তি ভালবাসতুম। তাছাড়া, ঐ প্রশস্তির মধ্যে যে ছন্দ আছে,

এ-অনুভূতি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের কথা:

বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা। পথ ছাড়। জল খাও। হাত ধর। বাড়ী যাও।

এত ছেলেমানুষী গল্প বলছি; কেবল একটা সত্য প্রতিপন্ন করবার জন্য। শিশুরা যেমন মাঝে মাঝে আঘাত দেয় আর হাসে, প্রমথনাথের অন্তরে যে-শিশু ছিল সে-ও কলমের খোঁচা দিত আর হাসত। এ-প্রবৃত্তিকে যদি কেউ Sadism-জাতীয় বলেন, আমি আপত্তি করব না। বাঙালি জাত অনেককালের নিপীড়ন সহ্য করতে করতে খুব Masochistic হয়ে পড়েছে। এখনো বেশ কিছুদিন বকুনি খেলে তবে যদি আরোগ্য লাভ করি! প্রমথনাথের করুণা, তিনি কলমের খোঁচা দিয়েই চলে যাননি। কী সবুজ-সভায়, কী সবুজ-পত্রে তিনি মিষ্টি-মুখ না করিয়ে ছাড়তেন না। যখন তিনি লিখলেন: দেশ একটু বে-সামাল হলেই তা সুরটে পরিণত হয়, তখন সুরট-কংগ্রেসের কেলেঙ্কারীর ওপর এক-ঘা ঝাড়লেন, আর ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর টেক্‌নীক্‌ অবলম্বন করে দেশ-কে বলতে বাধ্য করলেন: আমি রাগিণী—অর্থাৎ আমি রাগিনি।

ইংরিজীতে একটা প্রবাদ আছে: A cobbler must talke of leather—অর্থাৎ যে মুচি, সে একবার চামড়ার কথা কইবেই কইবে। প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে আমার প্রধান উপজীব্য। সুতরাং তার থেকে একটা লাগ-সই কথা লেখবার জন্যে আমার হাত নিশ্‌-পিশ্‌ করছে। লিখেই ফেলি।

শিশু-নামে একজন ঋষি ছিলেন, যাঁর 'দৃষ্ট' অর্থাৎ রচিত একটি সূক্ত ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে পাই। সাহেবরা এ-সূক্তকে Secular (অর্থাৎ ধর্ম-নিরপেক্ষ) বলেন, কারণ ঋষিটি বলছেন:

কারুরহং ততো ভিষগ্‌ উপল-প্রক্ষিণী-ননা।

এর মানে করা হয়:

আমি কবি, আমার বাবা ডাক্তার, আর আমার মা যব-ভর্জনা করেন।

আমার মনে হয়, এ অর্থ সংগত নয়। ঋগ্বেদে ধর্ম-নিরপেক্ষ সূক্ত থাকার সম্ভাবনা সামান্য। শিশু যে কবি অর্থাৎ স্তোত্রকার, এ-কথা মেনে নিতে হয়। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শ্রুত হয় যে, যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌-দের মধ্যে একজন 'ব্রহ্মা' থাকতেন, যাঁর কাজ ছিল বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা, যাতে অন্যান্য ঋত্বিগ্‌-দের কাজে কোনো ত্রুটি না হয়। এই কাজ ভিষগের তুল্য, সুতরাং সব-সুদ্ধ পাওনা-গণ্ডার অর্ধেক কেবল 'ব্রহ্মা'-রই প্রাপ্য। আর, 'উপলপ্রক্ষিণী ননা' এই বোঝায় যে, শিশুর মা শিল-নোড়া দিয়ে সোম-পাতা বাটতেন। এইরূপ অর্থ করলে আমরা বুঝতে পারি, কেন এ-সূক্তটি ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে স্থান পেয়েছে। সমগ্র নবম মণ্ডলটির দেবতা হচ্ছেন পবমান সোম।

শিশু তাঁর মাতাকে 'ননা' বলছেন কেন? ও-শব্দ ঐ অর্থে মাত্র ঐ একবার ব্যবহৃত হয়েছে ঋগ্বেদে। আসলে ওটি বাইরের থেকে আনা শব্দ। ওর পুনরভ্যুদয় দেখি কুষাণ যুগে। হুবিষ্কের মুদ্রায় উনি সিংহবাহিণী মা দুর্গা-রূপে অবতীর্ণা। প্রাচীনকালে জগজ্জননী ধরিত্রী দেবীর মূর্তি পূজা পেতেন ব্যাবিলোনিয়ার উরুক (Erech) শহরে। সে-মূর্তি বহু শতাব্দী ধরে পূজা পেয়েছিলেন সুষা-পুরীতে। অসুর-বানী-পাল সে-মূর্তিকে উরুক শহরে পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। এই মূর্তিকে 'ননা' বলা হত।

তাই আমার অনুমান, শিশু এসেছিলেন সুষা থেকে। সুষাকে প্রাচীন পারস্য ভাষায় 'ক্ষুজ' বা 'ক্ষুবজ' বলা হত। এ-শব্দ সংস্কৃত "স্বজ" শব্দের জাত-ভাই। শিশু-সুষা-ক্ষুজ-ক্ষুবজ-স্বজ, এ-শব্দগুলি শিশু-বাচক। আর, এই শিশু-ঋষিতে আমি শিশু-নাক (বা শিশু-নাগ) রাজারই ঋষি-ভাব দেখি। মহাভারতে শেষ-নাগের যে-গল্প আছে, তারও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সে-গল্পে শিশু-নাগ রাজা উদ্দিষ্ট। বৈদিক ভাষায় "শেষ" আর "শিশু" সমার্থক। শেষ নাগ মহী-ধারণ করলেন। তার অর্থ হচ্ছে, শিশুনাগ গিরিব্রজে রাজা হলেন। গিরিব্রজের অপর নাম "বসুমতী", এ-কথা রামায়ণে পাই। আর, মহাভারতে দেখি, গিরিব্রজে মণি-নাগ বাস করতেন। এই মণি-নাগ ছিলেন শেষ-নাগের এক ভাই। আজও শিশুনাগের রাজধানী গিরিব্রজে (আধুনিক রাজগীর) "মণিয়ার মঠ" এ-সত্যের সাক্ষ্যস্বরূপে বর্তমান।

শিশু রাজর্ষির সম্বন্ধে একটি মহর্ষি-উক্তি আছে: উপ-মন্ত্রীরা 'হসনা' চাইতেন, অর্থাৎ "নর্ম-সচিবেরা (মোসাহেব) হাস্য পরিহাস কামনা করেন।" (রমেশ দত্তের অনুবাদ।) এখানে বিদূষকের উল্লেখ পেয়ে আমরা খুশী হই। এ-কালের উপ-মন্ত্রীদের কাউকেও লোক হাসাতে দেখিনি। হাস্যরস উদ্রেক করার সার্থকতা একালের মন্ত্রীরা কেউ কেউ বোঝেন। বৃটিশ পার্লামেন্টে অনেক সময় মন্ত্রীরা বিরোধী দলের তীব্র তর্কের অবসান আনেন হাসির কথা বলে।

দেখা গেল, প্রমথনাথের লেখা বেদনা থেকে বেরিয়ে আমাদের আনন্দ দিয়েছে হাস্যরসের সঞ্চার করে। "নাম-লক্ষ্মি"র দিক থেকে কি এটা মনে হয় না যে, শাক্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বংশে জন্মলাভ করে শিব-সমার্থক 'প্রমথনাথ' নামটি পাওয়ার ফলে উনি শিবের মতন হাসি হেসেছেন?

(ক্রমশ)

গহন

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ছায়াটাও নিত্যসংগী। কী মায়ায় পায়ে পায়ে চলে!
সূর্যকে সম্মুখে রেখে আমি এক সূর্যমুখী হলে
সে আমার পিছুটান, পিছনের ছায়াচ্ছন্ন ঠাঁই।
দিনের রশ্মিকে যেই পিঠ দিয়ে তার দিকে চাই
সে আমার আগে থাকে। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
সে সাথে চলে না আর। হারায় সে গহন বিস্তারে।

আলোটা তবে নিভিয়ে দিই। পেলব অমাবস্যা
বরণ করি। এসেছে যদি অসূর্যম্পশ্যা
এই গহন অন্ধকার, যদি কাজল মেঘলা
ঢাকল সব তারার বাতি, আলোটা জ্বলে একলা!
এ আলো যেই নিভবে, ঘন আকাশে উৎক্ষিপ্ত
এলো খোপায় মেঘলা মেয়ে স্বয়ম্বরা তৃপ্ত।

চিহ্নহীন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই, কাছে কিংবা সুদূরে সিঁড়িতে
তুমি কার বুকে এসে থামো। ভাঙ্গে দূরে
দ্বিতীয় প্রেমের আর্তি, কাচপাত্র, জলের লিপিতে
ভালোবাসা! সোনার হরিণ কার নির্দয় দুপুরে।

কোথায় লুকোবে তবে? যদি এক প্রীতির শরীর
প্রেম হয়, দুঃখ হয়—যে যুবক তখনো অধীর
ফিরিয়ে আনবে বলে নিজে ফিরে আসেনি কখনো।
উদাসীন সোনালেখা, তুমি শুধু পদচিহ্ন জানো
বালুতট, প্রস্তুত সৈকতে

সমস্ত পথের চিহ্ন মোছে যার তীব্র জলস্রোতে।

তোমাকে আমি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় কোনো নদীর নাম,
জীবন নয় পাহাড় থেকে এসে
দুঃখ পাওয়া আঘাতে—আশ্লেষে,
জীবন মানে আরো—;

সোনাল ফুল রাত্রিবেলা ঝরে;
সকাল বেলা তুমি আমার ঘরে;

তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম
জীবন নয় জীবন-সংগ্রাম॥

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়
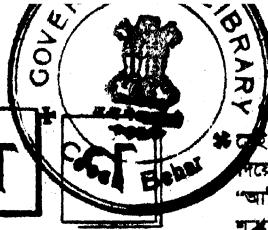
দশ

বিলেতে একটা দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়ঃ নানা ভারতীয় সুসন্তান তাদের ল্যান্ড-লেডির মেয়ে নিয়ে মশগুল। শ্রীশরৎ দত্ত প্রায়ই বলতেনঃ 'এর মূলে শুধু যে শ্বেত-চর্মের মোহ লুকিয়ে আছে তা নয়, আছে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। ভাবখানা যেন—সাক্ষাৎ মেমকে হাত করেছি। বলেছি, ভারতীয় ছাত্রদের এ ধরনের মতি-গতি দেখে সুভাষের দুঃখের সীমা ছিল না। আমার সঙ্গে এ নিয়ে প্রায়ই তর্ক বাধত, কারণ আমার মনে হ'ত—এসব ক্ষেত্রে সমাজের চেয়ে প্রেম বড়। শরৎবাবু টুকতেনঃ "কিন্তু যাকে প্রেম বলছ, সে যদি প্রেম না হয়ে মোহ হয়?" আমি বলতামঃ "কিন্তু কোন্‌টা প্রেম আর কোন্‌টা মোহ চিনবার উপায় কি? এখানে তো দুষ্মন্তের দেওয়া আংটি নেই যে, সন্ধানী অভিজ্ঞানের এক্তারে চিনে নেবে শকুন্তলাকে?" বলেই [illegible] হেসেঃ "আর সেখানেও দেখুন গোল—সাক্ষাৎ শকুন্তলাকে নিয়েও। কী? [illegible], দুষ্মন্তেরও হল মতিভ্রম। তবে?"

সুভাষঃ "তবে মানে? কী বলতে চাচ্ছ তুমি শুনি? তুমি বলতে চাও যে, যাকে তাকে শকুন্তলা বলে গলায় মালা দেওয়া হোক?"

আমি (হেসে)ঃ "সুভাষ ভাই, তুমি আর যে বিষয়েই কথা কও সশ্রদ্ধে শুনব, কিন্তু কারা শকুন্তলা দময়ন্তী, অনুসূয়া আর কারা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা এ-সঙিন মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার নিন—যাঁরা ললনা-লোকের জহুরি। তুমি আমি এখনো ডাঁশা আছি ভাই, কাজেই না পাকা পর্যন্ত বোধ হয় চুপ করে থাকাই ভালো।"

সুভাষ (উদ্দীপ্ত হয়ে)ঃ "কক্ষনো না। চোখের সামনে দেখছি এদের কীর্তি, আর চুপ করে থাকব? কী বলেন আপনি শরৎবাবু? মেম বিবাহ করা কি আপনি ভাল বলেন?"

শরৎবাবু (এড়িয়ে গিয়ে)ঃ "সার রজার ডি কভার্লির রায় মনে পড়ে সুভাষঃ much can be said on both sides.

সুভাষ (মৃদু হেসে)ঃ "আপনি ফের ঠাট্টা ধরলেন।"

শরৎবাবু (গাম্ভীর্যের ভাণ করে)ঃ মোটেই না। কারণ আমার মনে হয় মেম বিবাহ সাধারণত দূষ্য হলেও কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রণম্য হতেও পারে।"

সুভাষ (হদিস না পেয়ে)ঃ যথা?

শরৎবাবু (মুচকে হেসে)ঃ যেমন ধরো সেই লোকটির বেলায়—তাকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় কি? যে বলেছিলঃ "আমি মেম বিয়ে করেছি কেন জানিস? শুধু সাহেবদের শালা বলতে—হা হা হা!"

কিন্তু রসিকতা রেখে গম্ভীর প্রসঙ্গে আসি।

শরৎবাবুকে সুভাষ উপাধি দিয়েছিলঃ "গভীরদর্শী।" আমি তাঁর জীবন-দর্শনের কাছে একদিক দিয়ে ঋণী আছি। বলি।

আমি যখন এল এল বি ও ব্যারিস্টারী পড়ছি, তখন তিনি একদিন এক-ঢিলে দু-পাখি মেরেছিলেন। বলেছিলেনঃ "দিলীপ, সুভাষকে ভালবাসো খুব ভাল কথা, কিন্তু ভালবাসারও দায়িত্ব আছে। যাকে ভালবাসবে তার মতন হতে চেষ্টা করতে হয়। তুমি সংগীত নিয়েছ বেশ করেছ, কিন্তু এখনো দু-নৌকোয় পা কেন? আইন রেখেছ কেন? সংগীতেই জীবন নিয়োগ করো। বার্ন ইওর বোটস্‌, বার্ন ইওর বোটস্‌—যেমন সুভাষ করেছে।

কথাটা আমার বুকে তীর হয়ে বিঁধেছিল।

সুভাষ ও আমি পাশাপাশি খাটে শুতাম একই ঘরে। সুভাষ রাতে আমাকে বিমর্ষ দেখে এক আঁচড়ে এঁচে নিল ব্যাপারটা। বললঃ "শরৎবাবুর কথাকে অত সীরিয়সলি নাই নিলে দিলীপ!"

আমি আর থাকতে পারলাম না, বললামঃ "সুভাষ! আমাকে প্রতিপদেই তুমি বাঁচাতে চাও—খুব ভাল কথা। কিন্তু শরৎবাবু তো মিথ্যে বলেন নি ভাই—সীরিয়সলি না নিয়ে করি কী। ভেবেচিন্তে চলার নাম বিচক্ষণতা হতে পারে, কিন্তু আদর্শবাদী চিরদিন ঝাঁপই দেয়—'নৌকো পুড়িয়ে'।"

এর পরেই আমার লণ্ডনে দেখা হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাউথ কেনসিংটনে ১৯২০ কি ১৯২১ সালে। তিনিও আমাকে বলেন এই কথাই যে, সংগীতকে একান্ত করে বরণ না করলে আমাদের দেশে গানের প্রচারে ও সংস্কারে আমি বিশেষ কিছুই করতে পারব না।

ভেবেচিন্তে অবশেষে সুভাষকে ধরি: "তুমি কী বলো? বলতেই হবে।"

সুভাষ অগত্যা বলে: "আমি তো ভাই সংগীতের কিছুই বুঝি না। তবে একথা বলতে পারি যে, গতানুগতিক পথে যারা চলে, তারা দেশকে এগিয়ে দেয় না। তাই তোমার আদর্শে যে আমার সায় আছে, তা কি আর বলতে হবে—যখন এটুকু আমি জানি ও মানি যে, সংগীতকে জীবনের একটি মহৎ আদর্শ ব'লে বরণ করা চলে?"

পর পর শ্রীশরৎ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ তিন তিন উপদেষ্টার কাছে একই উপদেশ মিলতে আমি স্থির করলাম যে, আর দু-নৌকায় পা নয়—"নৌকা পুড়িয়ে" ঝাঁপ না দিলে আর মান থাকে না। এ-ত্রয়ীর মধ্যে শরৎবাবুর কথাটাই আমার মনে সব-চেয়ে বিঁধেছিল: যে, কাউকে ভালবাসার দায়িত্ব আছে। তবে আমার প্রকৃতি চির-দিনই কেমন যেন চলমান—কাজেই পথের প্রতি মোড়ে এসেই যেন গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করে দেয়—এবার কোন্ দিক? উত্তর না দক্ষিণ,—পূর্ব না পশ্চিম? আর যেই ভাবি সেই দেখি প্রতি দিকেরই একটি বিশেষ নিজস্ব টান আছে। কাজেই প্রতি চৌমাথায় আসতে না আসতে থমকে যাই। এই দিশ্বিদিক সংকটের লগ্নেই মহৎ বন্ধু ও বিচক্ষণ উপদেষ্টারা আঁধার পথে আলো ধরেন—ঠিক পথটি চিনিয়ে দিতে না পারলেও শেখাতে পারেন——কেমন করে দেখতে হয়, চিনতে হয়। যাঁরা আমাকে এই দিক দিয়ে চলার পথে গন্তব্যের দিশা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শরৎবাবুর ঋণ ইতিপূর্বে কোথাও স্বীকার করা হয় নি। তাই আজ প্রথম স্বীকার করে এত তৃপ্তি পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দুটি চরণ উধৃত করে এ-প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি তাঁদের সকলেরি তর্পণে—

যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে
জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের
সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা.........

রবীন্দ্রনাথ একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। সমাজে আমরা কত শত লোকেরই সংস্পর্শে আসি। প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু পাই। কিন্তু আলোর পাথেয় পাই শুধু তাদেরি কাছে, যারা নিজেদের হৃদয়ের পরশ দিয়ে আমাদের জীবনের আলো-ছায়ার লীলাকে উস্কে দিয়ে যায়। আমার জীবনে এঁদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই শ্রীশরৎকুমার দত্ত। আজো ভুলতে পারি না তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চোখের জ্যোতি, দরদী মুখের হাসি, সর্বোপরি ধূলোবালির জীবনের কেন্দ্রে থেকেও মনে রাখা:

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পারো লুকানো রতন।

× × ×

এমনি আর একজন আমাদের জীবন-পথে এসেছিলেন সুভাষকে ও আমাকে তাঁর স্নেহরসে সমৃদ্ধ করে রেখে যেতে। তাঁর নাম মিসেস মেবেল পালিত।

ও'র কথা বলেছি আমার বাল্য-স্মৃতিতে। ইনি বিখ্যাত লোকেন কাকার বিধবা স্ত্রী—মেমসাহেব।

মেম বিবাহ করার বিরুদ্ধে অনেকের গভীর প্রেজুডিস আছে। আমারও হয়ত থাকত, যদি শৈশবে মিসেস পালিতের ও যৌবনে মিসেস ধর্মবীরের স্নেহ না পেতাম। মানুষের স্নেহ তার মতামতকে নিত্যনিয়তই প্রভাবিত করে—কে না জানে? কিন্তু প্রভাবিত করা এক—রূপান্তরিত করা আর। বিলেতে আমার সময়ে সময়ে সত্যিই মনে হ'ত যে, হয়ত এই দুটি ইংরেজ মনোরমার স্নেহ-সংস্পর্শে না এলে ইংরেজ নারীর সম্বন্ধে অনেক ধারণা আজও আমার মনে কাঁটার মতন খচ খচ ক'রে বিঁধত। যথা, ধরুন: ওদের মধ্যে বিলাস-প্রবৃত্তি বেশি প্রবল বা মাতৃস্নেহ নেই বা পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকার কোন আন্তর তাগিদ দেখা যায় না......ইত্যাদি।

একথা মানি যে, ভারতীয় মা-র মধ্যে সন্তান-বাৎসল্য সচরাচর য়ুরোপীয় মা-র চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে বলা যায় না যে, অনুকূল গৃহজীবনের পরিবেশে লালিত হ'লে তাঁরা ঠিক ভারতীয় জননীর মতনই স্নেহময়ী ও সুচরিতা হয়ে উঠতে পারেন না। যদি মিসেস পালিতের ছবিটা আঁকতে পারি—ঠিক যেমনটি তাঁকে দেখেছি তেমনি রঙে রসে ভাবে অনুভাবে—তাহলে হয়ত আমার বক্তব্যটা একটু পরিষ্কার হবে।

মিসেস পালিতকে আমি দেশেই—গয়াতে 'আন্টি' বলতাম। লোকেন কাকা তাঁর

জন্যেই লণ্ডনে গোলডার্সগ্রীণে একটি দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর লোকান্তরের পরে আণ্টি এই সুন্দর আনন্দনিলয়েই নীড় বাঁধেন। উপরের তলায় তিনি থাকতেন তিন-চারটি ঘর নিয়ে, নিচের তলা দিতেন ভাড়া। যে সময়ের কথা বলছি—১৯২১ সালে—সে সময়ে দত্ত-পরিবার ছিলেন আণ্টির ভাড়াটে।

কিন্তু না, ভাড়াটে বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এ যেন দুটি পরিবার মিতালি বন্ধনে বন্ধ হয়ে মিলে-মিশে রয়ে গেছে—একই পান্থশালায় পরম আনন্দে। ও'দের রান্নাঘর আলাদা ছিল বটে, কিন্তু কখনো আণ্টি নিচের তলায় নেমে এসে খাওয়ার পূর্বে বা পরে আসর জমাতেন, কখনো বা আমরা যেতাম সদলবলে উপরে তাঁর ড্রয়িং-রুমে আড্ডা দিতে। খাওয়া-দাওয়াও হ'ত প্রায় একত্রে—ভিড়ের মধ্যেই বলব—বিশেষ সুভাষ আসার পরে। কারণ সুভাষ ইতিমধ্যে আই সি এস ছেড়ে দিয়ে এত নাম কিনেছিল যে লণ্ডনে বহু ভারতীয় তরুণ-তরুণী ওর সঙ্গে আনন্দ করতে আসত। সুভাষ সকলের সঙ্গে প্রথম প্রথম মিশতে পারত না, একথা বলেছি ইতিপূর্বে। কিন্তু দত্ত পরিবারের ও আণ্টির স্নেহ-পরিচর্যায় ওর যেন যাকে বলে আইস ওয়াজ ব্রোকেন—কিনা বাইরের বাধা কেটে গিয়ে ও হয়ে উঠল ঘরোয়া। কখনো আমাদের সঙ্গে আণ্টির ফ্ল্যাটে খাওয়াদাওয়ার পর ডিশ ধুতে তাঁর সঙ্গে—শ্রীমতী দত্তও যোগ দিতেন। কখনো নিচের তলায় ঐ একই গৃহকর্মে ধুম লেগে যেত, যাতে আণ্টি এসে যোগ দিতেন।

আণ্টি স্বভাবে ছিলেন যাকে বলে অত্যন্ত মিশুক—গ্রেগেরিয়াসঃ অর্থাৎ লোকজনের সঙ্গ না পেলে স্রেফ মিইয়ে যেতেন। তাই সময়ে সময়ে ধরতেন আমাদের ও'র আতিথ্যেও কিছুদিন করে থাকতে হবে—শ্রীমতী দত্ত একা কেন আমাদের একচেটে করে নেবেন?

সুভাষকে তিনি ভালবেসেছিলেন প্রথম দিকে আমার জন্যেই বটে, কিন্তু পরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন আমাকেঃ "আমার সত্যি মনে হয় দিলীপ যে আমার দুটি ছেলে সুভাষ ও দিলীপ। কিন্তু ওকে আমি প্রথম দিকে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি ও দারুণ ইংরেজবিদ্বেষী। কিন্তু ও যে স্বভাবে এত উদার ও মহৎ—আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি। ও এখানকার নানা দুঃসহ বক্তার মতন সংকীর্ণ নয় তো—যদিও ও আই সি এস ছেড়ে দিয়েছে শুনে প্রথমে আমি খুশি হতে পারি নি কিছুতেই। কারণ ইংরেজরা তো ভারতের শত্রু নয় দিলীপ, তারা সত্যিই চায় তোমরা স্বরাজ পাও—কিন্তু এখনো তোমরা তো শাসন করতে শেখোনি"......ইত্যাদি ইত্যাদি মামুলি যুক্তি। সুভাষ অন্য কোন মেম-সাহেবের মুখে এ ধরনের কথা শুনলে রেগে আগুন হয়ে বলতই বলত—"যত সব ফিরিঙ্গি যুক্তি", কিন্তু স্নেহ হৃদয়কে নরম করার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির কঠোরতাও আসে কোমল হয়ে। কাজেই আণ্টির স্নেহ পেতে না পেতে তার চোখে জেগে উঠেছিল এক দরদী দৃষ্টি, যার আলোয় সে তাঁকে দেখতে শিখেছিল এক নতুন দৃষ্টি দিয়ে, সমীহ করতে শিখেছিল তাঁর নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-বুভুক্ষার দিকটা তথা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য যার গুণে তিনি ভারতীয় ছাত্রদেরকে এত সহজে আপন করে নিতে পারতেন। সুভাষ কতবারই যে আমাকে বলেছেঃ "মিসেস পালিত যেন স্বধর্মে মা হয়ে জন্মেছেন, তাই ভালই হয়েছে যে, ও'র নিজের সন্তান হয় নি। নৈলে হয়ত সবাইকেই এমন অপত্য-নির্বিশেষে কাছে টানতে পারতেন না।"

কথাটা সুভাষ মিথ্যা বলে নি। কারণ মিসেস পালিত মনে মনে স্বজাতির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও নিত্যই নানা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীকে কাছে টানতেন তাঁর অপূর্ব মাতৃস্নেহের চরিতার্থতা খুঁজতেই বটে। এর একটা বড় চমৎকার দৃষ্টান্ত দেবিকারাণী। সে আজ একজন ভারত-বিখ্যাতা চিত্রতারকা, কিন্তু ১৯২১ সালে কে তাকে চিনত? তার পিতা সার্জন জেনারেল মন্মথ চৌধুরী ও মা লীলা দেবী তাকে বিলেতের এক বোর্ডিংএ ভর্তি করে দিয়েছিলেন। লীলা দেবী ছিলেন ঠাকুর-বাড়ির মেয়ে, মন্মথ চৌধুরী শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সহোদর। লীলা দেবী শিশু-সঙ্গের ভক্ত ছিলেন না—মাতৃস্নেহ বলতে আমরা যা বুঝি, তা তাঁর ছিল না আদৌ। কাজেই দেবিকার একটি মস্ত স্নেহতৃষ্ণা মিটেছিল তার এই নিঃসন্তানা "আণ্টির" স্নেহে—যিনি তাকে প্রায়ই নিজের কাছে এনে রাখতেন পরম আদরে। দেবিকার বয়স তখন দশ এগার বৎসর, কিন্তু সুবুদ্ধি ও কথাবার্তার জলুসে সে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এমন কি সুভাষ যে সুভাষ সেও দেবিকার সহজ সুন্দর ধরন-ধারনে তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল—যদিও সে দেবিকাকে আবাল্য খাস-বিলিতি শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। আমাকে মাঝে মাঝেই একান্তে বলতঃ "দেবিকার জন্যে ভারি দুঃখ হয় দিলীপ! এই বয়স থেকেই পেকে উঠবে এ দেশের মেমসাহেবি হালচালে।"

আমিঃ "কিন্তু আমার মনে হয় না ও এদেশের হালচাল রপ্ত করার ফলে সত্যি সত্যি মেমসাহেব ব'নে যাবে। ও দেখছে তো আণ্টিকে স্বচক্ষে।"

সুভাষঃ "মিসেস পালিতের স্নেহ ও পাচ্ছে, এ খুবই ভাল কথা বৈকি। কিন্তু তবু ওর নিজের মা থেকেও নেই—"

আমিঃ "কেন? লীলা মাসিমা স্বভাবে মা না হলেও দেবিকাকে স্নেহ করেন না, এমন তো নয়।"

সুভাষঃ "কী পাগলের মতন কথা বলছ দিলীপ? মা-র স্নেহ বলতে কি বোঝায়—মেয়েকে দূরে দূরে রেখে শুধু তার মেম-সাহেবি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া? শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস হল মার স্নেহসঙ্গ, পরিচর্যা। অর্থাৎ যা ও মিসেস পালিতের কাছে পাচ্ছে তাই ওর পাওয়া উচিত ছিল সব আগে লীলা দেবীর কাছে।"

লীলা দেবীকে সুভাষ কোনদিনই সুনজরে দেখতে পারে নি। যদিও ঠিক সেই জন্যেই ও আণ্টির আরো গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। বলতঃ "উনি মেম হয়েও ভারতের আত্মার বেশি কাছে দেবিকার বাপ মা-র চেয়ে।"

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

প্রায় তিন লক্ষ বছর আগেকার পেকিং-ম্যান আজকের নৃতত্ত্ববিদ মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে। চীন মহাদেশের পেকিং শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে একটি চুনাপাথরের এক গুহার অভ্যন্তর থেকে এই পেকিংম্যানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে পেকিংম্যান ও সমসাময়িক অন্যান্য অনেক কিছু সংগ্রহ করা হয়। কাটা, চাঁছা ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজের উপযোগী অনেক যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছিল। পেকিংম্যান, মানবজাতির ক্রমবিবর্তনবাদের একটি নূতন শাখার সন্ধান দেয়। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে জড়পদার্থবৎ পেকিংম্যান সহসা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং আজও পেকিংম্যানের অবস্থিতির কোনও সঠিক খবর পাওয়া যায় না। ১৯৩৭ সালের উত্তর চীনের ওপর যখন জাপানী সৈন্যের আক্রমণ চলে, তখনই এই মহামূল্য পেকিংম্যানটিকে মার্কিন প্রতিষ্ঠান "পেকিং য়ুনিয়ন মেডিকেল কলেজে" জমা দেওয়া হয় এবং সর্ত ছিল যে, যে পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে ততদিনই ঐ জিনিসটি ওখানে থাকবে। এ সম্বন্ধে গবেষকগণ ঐ প্রতিষ্ঠান থেকেই গবেষণার সুযোগ পাবেন। এই ব্যবস্থার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন প্রদেশও মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন চীনা সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় যে, যুদ্ধকাল পর্যন্ত ওটিকে আমেরিকায় নিয়ে রাখা হবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী তিনটি বাক্সে সমস্ত জিনিস প্যাক করে প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন নামক জাহাজে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজটি সাংহাইএর নিকট ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর বালুর চড়ায় আটকে যাওয়ায় শত্রুপক্ষীয় জাপানী জাহাজ বাক্সগুলি উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কোথায় নিয়ে যায় এবং এখনই বা ঐগুলি কোথায় আছে তা আজ অবধি জানা যায় নি। অনেকে বলেন যে, বাক্সগুলি সমেত জাহাজটি নদীর মধ্যে ডুবে যায়। ১৯৪২ সালে একজন বিখ্যাত জাপানী নৃতত্ত্ববিদ পেকিংম্যান সম্বন্ধে গবেষণা করার নিমিত্ত চীন মহাদেশে উপস্থিত হন এবং যে সিন্দুকে ঐ পেকিংম্যানটি রাখা ছিল, সেটির মধ্যে প্লাস্টারের ছাঁচ ছাড়া কিছুই দেখতে পান নি। তারপর থেকেই সমগ্র চীন মহাদেশ তোলপাড় করে অনুসন্ধান চলে, কিন্তু কোনও খবরই পাওয়া যায় না। যদিও আজ পর্যন্ত পেকিংম্যানের খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবে জগতের নৃতত্ত্ববিদগণ বিশেষত আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, একদিন জাপানের টোকিও শহরেই পেকিংম্যানের অবস্থিতির খবর পাওয়া যাবে।

*

দিল্লীর "আয়ুর্বেদ রিসার্চ কাউন্সিলে" প্রকাশ যে, "পুনরনাভা" ও "বিমল-জ্যোতি" নামক দুটি দেশজ উদ্ভিদের সংমিশ্রণে যে ওষুধ তাঁরা তৈরী করেছেন তা দিয়ে যাবতীয় চক্ষুরোগ নিরাময় করা সম্ভব হবে। এই দুটি উদ্ভিদকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মিশিয়ে কাজলের মত একরকম ওষুধ তৈরী করা হয়। সংমিশ্রণের পদ্ধতিটি খুব জটিল না হলেও বিশেষ আয়াসসাধ্য। সাতবার সাতরকমভাবে মিশিয়ে মিশিয়ে চোখে লাগানর মলমটি তৈরী হয়। ভারতবর্ষে পুনরনাভা যত্রতত্র পাওয়া যায়—ইংরাজীতে একে "হগ-উইড" বলা হয়। "বিমলজ্যোতি" ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ও আশেপাশের পাহাড়ে দেশে হয়। স্থানীয় লোকে এই গাছকে "মাহীনখাড়ি" বলে।

*

"কালো-শিখরের" ভারতীয় নাম "বন্দর-পাঞ্চ—১"। একদল ভারতীয় অভিযাত্রী ২০৯৫ ফুট উঁচু এই পাহাড়টি জয় করার মানসে যাত্রা করেছেন। পূর্বের ত্রিশূলে অভিযাত্রী দলের ওয়াই কে যাদব এই দলভুক্ত—এ ছাড়া বর্তমান অভিযাত্রী দলের মানচন্দ্র ও ভাটও পূর্ব দলে ছিলেন।

*

আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক 'থ্যাম' Tham থেকে মানুষের অবসাদ দূর করবার এক নতুন ওষুধ বার করেছেন। থ্যাম সাধারণত সাবান তৈরীর কাজে প্রয়োজন হয়। তাঁরা এই নতুন ওষুধটি প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা করে খুব ভাল ফল পেয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, এর সাহায্যে যাঁরা খেলাধুলো করেন, তাঁদের সহজেই অবসাদ দূর করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও ভবিষ্যতে যারা মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে যাবে তাদের জন্যও খুব প্রয়োজনীয় হবে।

*

ছোট্ট ইঁদুরটির কৃতিত্ব অসামান্য—৫,০০০ মাইল মহাশূন্যে ভ্রমণ করে এসেও ক্ষুদ্র জীবটি বেশ বহাল তবিয়তে আছে। রাশিয়া যেমন লাইকা নামক একটি কুকুরকে স্পুটনিকের মধ্যে মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে পাঠায়, আমেরিকার "স্পেস টেকনোলজিক্যাল ল্যাবরেটরী" "বেনজি" নামক একটি ক্ষুদে ইঁদুরকে তাদের মিসলে করে ৫,০০০ মাইল মহাশূন্যে ভ্রমণ করিয়ে এনেছে।

খুদে বেনজি তার ভ্রমণের সাজসরঞ্জামাদি পরীক্ষা করছে

নেপাল

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ২৭শে মে নেপালের রাজা মহেন্দ্র শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালার নেতৃত্বে নেপালের প্রথম গণ-নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করান। স্বৈরতন্ত্রী রাণাসাহীর স্বেচ্ছাচারের অবসানে নেপালে প্রথম গণ-তান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

নেপাল পর্বতদুহিতা। তাই সেই পার্বতীর কোলে যাদের জন্ম তারা পর্বতের মতই দৃঢ়, ঋজু, বলিষ্ঠ ও দুর্জয়। ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তনের ক্ষুদ্র রাজ্য, কিন্তু তবুও নেপাল বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠের জন্মদাত্রী। শ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধ আর শ্রেষ্ঠ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট তারই সৃষ্টি। তাই নেপাল ক্ষুদ্র হয়েও অসামান্য, দরিদ্র হয়েও অমেয় ঐশ্বর্যের অধিকারিণী।

নেপালের উত্তর সীমান্তে রয়েছে তিব্বত, আর অন্য তিন দিক ঘিরে রয়েছে সিকিম ও ভারতের তিনটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার আর উত্তরপ্রদেশ। রাষ্ট্রটির পূর্ব পশ্চিমে সর্বাধিক দৈর্ঘ্য হ'ল পাঁচশ' পঞ্চাশ মাইল, আর উত্তর-দক্ষিণে একশ' পঞ্চাশ মাইল। ভৌগোলিক বিচারে নেপাল দুটি সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। তার উত্তর-ভাগ হ'ল মূল হিমালয়ের পাদদেশস্থ পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে আছে গৌরীশংকর, ধবলগিরি, কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট প্রমুখ হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি। জনবিরল এই অঞ্চলের একটা বিরাট অংশই সারা বছর বরফে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আর তার দক্ষিণভাগ হ'ল মধ্য হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত নিম্ন-পার্বত্য অঞ্চল ও নদী উপত্যকা। নেপালের এই ভাগের আর এক নাম হ'ল তরাই। সরযূ, ঘর্ঘরা, কুশী প্রভৃতি নদী-গুলির স্রোতধারা এই অঞ্চলের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। সে কারণে নেপালের প্রায় সমগ্র কৃষিক্ষেত্র আর অরণ্য অঞ্চল এই তরাই এলাকাতেই অবস্থিত। আর তার অধিকাংশ লোকের বসবাসও এইখানেই। নেপালের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পাঁচাশি লক্ষ।

একদিন নেপালের প্রায় সকল মানুষই ছিল বৌদ্ধধর্মী। তার কারণ শুধু এই নয় যে, নেপাল ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি। নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে খৃষ্টপূর্ব যুগে বহু প্রচারককে একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করতে হয়েছিল। এমন কি সম্রাট অশোক স্বয়ং গিয়েছিলেন সে দেশে। তাঁর সেই আগমন উপলক্ষে পাটান নগরীতে পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপ স্থাপিত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে হর্ষবর্ধনের রাজত্ব-কালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন এ দেশ পরিভ্রমণে আসেন, তখনও নেপালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস হয়নি। সেই মহান পর্যটক তাঁর ভ্রমণ-বিবরণীতে নেপালের অধিবাসীদের বৌদ্ধধর্মী বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার কয়েক শতাব্দী পরে ভারতে মুসলিম আক্রমণের কালে আশ্রয়-প্রার্থীদের আশ্রয় দিতে গিয়ে নেপাল তার ধর্ম হারাল। সে এক আশ্চর্য ইতিহাস।

রাজা মহেন্দ্র

সুলতান আলাউদ্দিনের আক্রমণে ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে যখন চিতোরের পতন হল তখন কয়েক হাজার রাজপুত চিতোর থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় নেপালের তরাই অঞ্চলের গুর্খা নামক একটি স্থানে। পরবর্তীকালে ঐ জায়গারই নামানুসারে ভারতত্যাগী রাজপুতদের নাম হয়ে গেল গুর্খা বা গুর্খালী। আর কিছুদিনের মধ্যেই এই গুর্খাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, তাদের চাপে নেপাল তার প্রায় সব আদিম বৈশিষ্ট্যই হারিয়ে বসল। সারা নেপালের অধিবাসীই গুর্খা নামে পরিচিত হ'ল আর তাদের মন থেকে বৌদ্ধধর্মের সকল প্রভাব গেল লুপ্ত হয়ে। তারপর ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুতের হিন্দু রাজপুত হরি সিং নিজেকে সারা নেপালের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। নেপালের লেপচা, ভুটিয়া, নেওয়ার প্রমুখ আদি অধিবাসীরা আজও বৌদ্ধধর্মী। কিন্তু হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আচরণ ও বিশ্বাস আজ তাদের ওপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, নেপালের আদিম অধিবাসীদের আজ আর কোন যুক্তিতেই বৌদ্ধধর্মী বলা চলে না। সমগ্র নেপালে বর্তমানে হিন্দু মন্দিরের সংখ্যা হল ২,৭৩৩।

নেপালের জল-বাতাস কৃষির অনুকূলে। তাই ফসল সেখানে ভালই হয়। কিন্তু শিল্পজাত পণ্যের অভাব পূরণের জন্যে তার কৃষিপণ্যের একটা বিরাট অংশ বিদেশে চালান যায়। খাদ্যশস্য, পাট, কাঠ, তৈল-বীজ, আলু, ঘি, চামড়া, গবাদি পশু প্রভৃতি পণ্য বিদেশে চালান দিয়ে তাকে আমদানি করতে হয় কাপড়, জুতো, পেট্রোল, নুন, চিনি, তামাক, ওষুধ, কাগজ, সিমেন্ট ইস্পাত প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প-পণ্য। যার অর্থ হল, নেপালের মানুষকে তার ক্ষুধার অন্ন বেঁচে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে হয়। প্রাণ রাখার এই প্রাণান্তকর প্রয়াসে নেপালের জনজীবন আজ যে কতখানি দরিদ্র, তা তার রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাবের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে নেপালের রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, যার চেয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের আয়ও প্রায় তিনগুণ বেশী। শাসনখাতের ব্যয় চুকিয়ে এই সামান্য পরিমাণ টাকা দিয়ে রাষ্ট্রের কতটুকু কল্যাণ সাধন সম্ভব, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তারই জন্যে নেপালের শিক্ষিতের হার

বর্তমানে শতকরা মাত্র ছয়জন। নেপালের যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবধায়কাধীন। নেপালই বোধ হয় বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র সভ্য রাষ্ট্র যার নিজস্ব কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই।

অথচ নেপালের এমন দুর্দশার কোন কারণই ছিল না। প্রকৃতির করুণাধারায় শুধু যে তার জমিই উর্বরা তা নয়, তার সমগ্র আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এক বিরাট অরণ্য-সম্পদ। এছাড়া কয়লা, চুনা পাথর, মর্মর, লোহা, তামা, দস্তা, সীসা, গন্ধক প্রভৃতি খনিজ সম্পদও আবিষ্কৃত হয়েছে নেপালে। এমন কি এ অনুমানও ভূতত্ত্ববিদরা করেছেন যে, নেপাল স্বর্ণসম্ভবা। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, নেপালের বর্তমান দুরবস্থার জন্যে প্রকৃতির কৃপণতা দায়ী নয়। দায়ী সে দেশের প্রাক-বিপ্লব যুগের হৃদয়হীন শাসনব্যবস্থা—শতাব্দীকাল পূর্বে কয়েকটি স্বার্থলোলুপ সামন্ত পরিবারের উদ্যোগে যা কায়েম হয়েছিল নেপালে। নেপালের রাজশক্তিকেও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল তার কাছে।

অবশ্য আপন শক্তিতেই এই সামন্ত-রাণারা বলীয়ান ছিল না। তাদের প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় সহায় ছিল ভারতের তৎকালীন বৃটিশ সরকার। একশ বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল আঘাতে ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, সেই সময় রাণারা হাজার হাজার গুর্খা সৈন্য পাঠিয়েছিল ভারতে, ইংরেজের হয়ে ভারতের বিদ্রোহী সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। বিপদের দিনের এই সাহায্যেরই প্রতিদানরূপে ভারতস্থ বৃটিশ সরকার সেদিন রাণাগোষ্ঠীকে নেপালের সর্বময় কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রবল ঐ রাণাশাহী আসলে যে বৃটিশ শক্তির ওপর কতখানি নির্ভরশীল ছিল, ইংরেজের ভারতত্যাগের তিনবছর বাদেই তাদের পতনে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। বৃটিশ বণিকদের স্বার্থেই নেপালের রাণাতন্ত্র গত একশ বছরে নেপালে একটি শিল্পও গড়ে উঠতে দেয়নি।

নব-নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী বি পি কৈরালা।

রাণাতন্ত্রের অভিশাপ থেকে নেপাল মুক্তি পায় ১৯৫১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। নেপালের সংগ্রামী জনতার জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বে ঐ সময় যে অভ্যুত্থান হয় তারই প্রবল আঘাতে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে রাণাতন্ত্র, আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নেপালের সাধারণ মানুষ। নেপালের তৎকালীন রাজা ত্রিভুবন সক্রিয়ভাবে এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁকে পুরোভাগে রেখেই নেপাল শুরু করে তার নতুন রাষ্ট্রজীবন। রাজা ত্রিভুবন স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলে ঘোষণা করেন এবং নেপালের সমগ্র শাসনদায়িত্ব অর্পণ করেন নেপালী কংগ্রেসের হাতে। নেপালী কংগ্রেসের নেতা শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা হন নেপালের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। নেপালের নতুন সংবিধান রচনার জন্যে ৬১ জনকে নিয়ে গঠিত হয় সংবিধান পরিষদ। এই সংবিধান রচনার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে রাজা ত্রিভুবন যদি একটি সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে পরবর্তীকালের বহু অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে নেপাল নিষ্কৃতি পেত। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। মানসিক উত্তেজনা আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রাজার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের প্রয়োজনে বারবার এবং কোন কোন সময় দীর্ঘদিনের জন্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তিনি, আর সেই অবকাশে ভ্রাতৃবিরোধের এক মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল সারা নেপালের রাষ্ট্রজীবনে। যে নতুন আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে জেগে উঠেছিল নেপাল, মাতৃকাপ্রসাদ আর বিশ্বেশ্বরপ্রসাদের দারুণ কলহে তা একেবারেই স্তিমিত হয়ে গেল। দেশজোড়া এই হতাশার মাঝে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ তারিখে রাজা ত্রিভুবন ইহলোক ত্যাগ করলেন।

নেপালের দুর্ভাগ্যের পাত্র তখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়েছিল সকলের। কিন্তু রাজা মহেন্দ্র সিংহাসনে বসে তাঁর আচরণ আর কর্মক্ষমতা দিয়ে সকল অশুভ আশংকা দূর করে দিলেন। তিনি

বুঝিয়ে দিলেন সকলকে যে পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সংকল্প নিয়েই তিনি সিংহাসনে বসেছেন। রাজনীতিক বিরোধিতা ও আত্মকলহের ফলে নেপাল তখন শতধা-বিভক্ত, দেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে সংখ্যাতীত রাজনীতিক দল। কিন্তু তবুও রাজা মহেন্দ্র নিরাশ হলেন না। বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলকে ডেকে এনে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামো বজায় রাখতে। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়ে সে পথ ত্যাগ করলেন তিনি। তিনি বুঝলেন, সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনসমর্থনপুষ্ট কোন রাজনীতিক দল যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন নেপালে গণতন্ত্রের পরীক্ষা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই ১৯৫৭ সালের ১৪ই নভেম্বর রাজা মহেন্দ্র পিতৃপ্রবর্তিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বাতিল করে সমগ্র শাসনদায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি আবার একটি সংবিধান পরিষদ গঠন করে তার হাতে নেপালের নতুন সংবিধান রচনায় দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে আমন্ত্রণ করে আনালেন প্রখ্যাত বৃটিশ সংবিধানজ্ঞ জেনিংসকে। এই সংবিধান পরিষদ রচিত সংবিধানই গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক নেপালের নতুন সংবিধান বলে ঘোষিত হয়েছে।

এই সংবিধান ভারতের সংবিধানের মতই একটি গণতান্ত্রিক দলিল এবং মৌলিক বিষয়ে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বললেই হয়। ভারতের সংবিধানের মত নেপালের সংবিধানের মুখবন্ধেও ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কয়েকটি মৌলিক অধিকার এবং সে অধিকারগুলি সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ রাষ্ট্রীয় সভা নামক একটি পরিষদের হাতে।

নেপালের আইনসভা হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। তার নিম্নকক্ষের নাম হবে প্রতিনিধি সভা, আর তার সদস্যসংখ্যা হবে ১০৯। প্রত্যেক সদস্যই প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। প্রতিনিধিসভার সদস্য নন এমন একজন ব্যক্তিকে স্পীকার নিযুক্ত করা হবে। দলীয় আনুগত্যের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাতে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সভার কাজ পরিচালনা করতে পারেন তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। নেপালী সংবিধানে নিঃসন্দেহে এ এক নতুন পরীক্ষা। সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্থিরীকরণ সম্পর্কিত আইন ছাড়া আর সকল আইনই প্রতিনিধিসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। নেপালের মন্ত্রিসভা তাঁদের সকল কাজের

উপ প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল সুবর্ণ সমশের

জন্যে যৌথভাবে প্রতিনিধিসভার কাছে দায়ী থাকবেন। আইনসভার উচ্চ কক্ষ মহাসভার সদস্য সংখ্যা হবে ৩৬, যার মধ্যে ১৮ জন হবেন প্রতিনিধিসভার নির্বাচিত সদস্য আর ১৮ জন, রাজমনোনীত। নেপালের মন্ত্রি-সভায় মহাসভার অন্তত দুইজন সদস্যকে গ্রহণ করতেই হবে। প্রতিনিধিসভার কার্য-কাল পাঁচ বছর, কিন্তু মহাসভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

প্রতিনিধিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাজা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন, তারপর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিযুক্ত করবেন মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যদের। প্রধানমন্ত্রী ও অনধিক ১৪ জন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হবে নেপালের মন্ত্রিসভা। প্রতিনিধিসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। অবশ্য সংবিধান-বিরোধী কাজ করার অপরাধে তার আগেই রাজা রাষ্ট্রীয় সভার পরামর্শ অনুসারে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় সভা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান হলেও বিচার ছাড়াও আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রাজাকে শাসন ও আইন সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় সভার। তারপর কোন কারণে সিংহাসন শূন্য হলে তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচন বা নাবালক রাজার অভিভাবকতা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়সভার।

রাজা হলেন সমগ্র নেপালের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। মন্ত্রিসভা তাঁরই নামে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই নেপালের বর্তমান রাজা অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের চেয়ে একটু বেশি ক্ষমতা [illegible] করেন। যতদিন পর্যন্ত না নেপালে [illegible] সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারছে, ততদিন রাজার অতিরিক্ত ক্ষমতা নেপালের সকল শুভার্থীর কাছেই বাঞ্ছিত বলে মনে হবে।

নূতন সংবিধানের ভিত্তিতে সম্প্রতি নেপালে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তাতে নেপালী কংগ্রেস আশাতিরিক্তভাবে সাফল্যলাভ করেছেন। প্রতিনিধিসভার ১০৯টি আসনের মধ্যে তারা জয়ী হয়েছেন ৭৪টি আসনে। নির্বাচনে ১৪টি রাজনীতিক দলকে জাতীয় দলরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, আর প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন গড়পড়তায় নয়জন। তবুও নেপালের সাধারণ মানুষ যে এত বিচক্ষণতার সঙ্গে উপযুক্ত দলটিকে বেছে নিতে পেরেছেন, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। দরিদ্র অশিক্ষিত দেশের মানুষ গণতন্ত্রের মর্ম বোঝে না, সম্প্রতি এই জাতীয় একটি কথা এশিয়ার কয়েকটি দেশের ক্ষমতালোভী রাজনীতিক নেতারা প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এই উক্তি যে কতখানি অর্থহীন তা নেপালে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল। নেপালের প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠী রাণা ও সামন্তের দল সম্মিলিত হয়ে গঠন করেছেন চরম দক্ষিণপন্থী "গোর্খা পরিষদ" দল। প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্রেই এই দল

প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন এবং অর্থবল ও নানাভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাঁদের নেপালী কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বেশিই ছিল। কিন্তু তাঁরা জয়ী হয়েছেন মাত্র ১৯টি নির্বাচনকেন্দ্রে। এর থেকেও নেপালের সাধারণ মানুষের নির্ভীক ও নির্লোভ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাকি ১২টি রাজনীতিক দলের মধ্যে ৮টি দল একটি আসনেও জয়ী হতে পারেন নি। অন্য চারটি দলের মধ্যে ডাঃ কে আই সিং পরিচালিত সংযুক্ত গণতান্ত্রিক দল পেয়েছেন ৫টি আসন, কমিউনিস্ট দল ৪টি আসন, প্রজা পরিষদের দুইটি উপদল একত্রে ৩টি আসন। আর স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ৪টি আসনে। নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নেপাল রাজনীতির রথী মহারথীদের শোচনীয় পরাজয়। ডাঃ কে আই সিং, শ্রীডি আর রেগমী, শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য, শ্রীভদ্রকালী মিশ্র প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নেপালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। সে জায়গায় বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন নেপালী কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা শ্রীসুবর্ণ সমশের, তিনটি নির্বাচন-কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটিতেই জয়ী হয়ে। কিন্তু তবুও নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সব সময় একথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁদের এই সাফল্য আপাতদৃষ্টিতে যতটা বিপুল বলে মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু সেটা ততখানি নয়। তাঁরা প্রতিনিধিসভার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনলাভে সমর্থ হয়েছেন সমগ্র প্রদত্ত ভোটের এক-তৃতীয়াংশেরও কম পেয়ে, যেখানে নেপালী কংগ্রেসের প্রার্থীরা সমবেতভাবে পেয়েছেন ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ভোট, সেখানে অন্যান্য দলের প্রার্থীরা সমবেতভাবে পেয়েছেন ১২ লক্ষেরও বেশি ভোট। সুতরাং আজ নেপালী কংগ্রেস দেশসেবার যে সুযোগ পেয়েছেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি তাঁরা না করেন তাহলে আজকের বিচ্ছিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে তাঁদের সংখ্যালঘুর সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রি-সভা কোনমতেই বেশিদিন স্থায়ী হতে পারবে না। ইতিমধ্যেই ডাঃ কে আই সিং ঘোষণা করেছেন, নেপালী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সারা দেশের জনমতকে সংঘবদ্ধ করে তিনি বর্তমান মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করবেন। ডাঃ সিংয়ের এই চ্যালেঞ্জের জবাব নেপালী কংগ্রেস শুধু তাঁদের দেশসেবার মধ্য দিয়েই দিতে পারেন, অন্য কোনভাবে নয়।

তাই আজ রাজা মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ও শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালার পরিচালনায় নেপালের রাষ্ট্রজীবনের যে নব-অধ্যায় সূচিত হল তা সম্পূর্ণ সফল হোক, নেপালের শুভার্থীমাত্রেরই এই একান্ত কামনা।

লণ্ডনে রোগশয্যা থেকে

ডক্টর শশধর সিংহ

(১)

আমার স্বাস্থ্যের জন্য বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সব সময়েই খুব খ্যাতি ছিল। তাঁরা সবাই বলতেন বাঙালীদের মধ্যে এমন স্বাস্থ্য বড় দেখা যায় না। জীবনে অসুখ বিসুখ বড় কখনই হয়নি, আগের জীবনে বালসুলভ অসুখ বিসুখ যা হয়েছিল, তার অধিকাংশই বোলপুরে ছাত্রাবস্থায়। একবার মাত্র খুব শক্ত রকমের জ্বর হয়েছিল বলে মনে পড়ে।

শান্তিনিকেতনেই হাসপাতালের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন আমাদের হাসপাতাল ছিল 'পাহাড়ের' কাছে। হাসপাতালের বাড়িটা শুনেছি এখনও আছে, কিন্তু অন্য কাজে লাগছে। আমি ও আমার সহপাঠীরা অনেক সময় সেখানে গেছি এবং ছুটির আনন্দ উপভোগ করেছি। গল্পগুজব, বইপড়া ও খেলাধুলো নিয়ে দিনগুলি বেশ কাটত। মাঝে মাঝে আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকরা আমাদের দেখতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু ও পিয়ারসন সাহেবের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তাঁদের স্নেহ কখনও ভুলতে পারব কি?

যে সময়ের কথা বলছি তখন আমাদের স্বাস্থ্যের ভার ছিল প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ বিনোদবাবুর হাতে। বোলপুর শহর থেকে ডাঃ চক্রবর্তীও রোজ ঘোড়ার গাড়ি করে আসতেন। তিনি ছিলেন খুব ফিটফাট লোক। গায়ে ইস্ত্রিকরা শার্ট ও পরনে গিলে করা ধুতি। ভাল করে মাথার চুল আঁচড়ানো ও দাড়ি কামানোর প্রতিও তিনি উদাসীন ছিলেন না।

হাসপাতালে বিনোদবাবুর সহকারী ছিলেন যোগেনবাবু। ইনি ঢাকার লোক কিন্তু পশ্চিমেই জীবনের বেশীদিন কাটিয়েছেন। তিনি নামে কম্পাউন্ডার হলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। পরে তিনি আশ্রমের পাশে তালতোড় গ্রামে বাড়িঘর করে ডাক্তারী শুরু করেন। যোগেনবাবুর সামাজিকতা ছিল অদ্ভুত। তিনি খুব আমুদে লোক ছিলেন, সব সময়ে মুখে হাসি। তাঁর আর একটা বড় গুণ ছিল রন্ধনপটুতা। তাই অসুখের পথ্য হত ঢাকাই ধরনে রান্না মাছের ঝোল, ভাত। আমার খুব বিশ্বাস মাছের ঝোল খাবার লোভে লোকেই আমাদের অসুখ-বিসুখ খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠত। আর তিনি ভাল গল্প বলতে পারতেন বিশেষত ভূতের গল্প। মনে আছে রাত্রে ভেতরে বাইরে নিবিড় অন্ধকার, দূরে প্যাঁচা, শেয়াল প্রভৃতি নিশাচরের ডাক শোনা যাচ্ছে। গা'টা ছম ছম করে উঠছে, কিন্তু আসলে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। পাশের বিছানাগুলিতে আমার সহপাঠীরা সশব্দে ঘুমোচ্ছে। আর কাছের ঘরেই হাসপাতালের চাকরবাকর আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার যে, খানিকটা ভয়ের উদ্রেক না হলে ভূতের গল্প ঠিক জমে না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গুরুদেবের স্নেহের কথা। অনেকভাবে তার পরিচয় পেয়েছি। তিনি শুনলেন যে, আমার শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না, তাই বলে পাঠালেন যেন আমি রোজ তাঁর বাড়িতে গিয়ে খাই। গুরুদেবের স্নেহ শান্তিনিকেতনের সব ছাত্রের প্রতিই সমানভাবে ছিল। তাই আমরা তাঁকে কখনও ভয় করিনি। মনে পড়ে ছেলেবেলায় বড় হরফে তাঁকে কত চিঠি লিখেছি এবং তিনি ঐসব চিঠিরই উত্তর দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমি আমার যাযাবর জীবনে অনেক জিনিসই হারিয়েছি, আর তার সাথে সাথে এই অমূল্য চিঠিগুলোও লোপ পেয়েছে। বক্তব্য এই যে, গুরুদেব, আমি ছেলেমানুষ বলে আমাকে কখনও তাচ্ছিল্য করেন নি। নানা বিষয় তাঁর চিঠিতে আলোচনা করেছেন, কখনও ভাবেন নি আমি এই আলোচনার যোগ্য কি না। গুরুদেব মানুষকে মানুষের মর্যাদা সব সময়েই দিয়েছেন, আর মনুষ্যত্বের মর্যাদা তাঁর চোখে ছিল সবার উপরে।

পরের জীবনের লেখা একটি মাত্র চিঠি আমি সযত্নে রেখেছি এবং এর একটা নকল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র মিউজিয়মে পাঠিয়েছি। ঐ চিঠিটা ১৯৩৬ সালে সিংহল হতে লেখা। অনেকেই হয়ত জানেন যে, আমি গুরুদেবের রাশিয়ার চিঠির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলাম এবং এর শেষ অধ্যায়ের তর্জমাটা শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুকে পাঠাই। এই তর্জমাটা তিনি গুরুদেবকে সিংহলে পাঠান এবং গুরুদেব আমাকে লিখলেন, "তোর রাশিয়ার চিঠির তর্জমা পড়ে খুব খুশী হলাম।

এটাকে যেমন খুশী যেখানে খুশী প্রকাশ করতে পারিস, আরো যদি কিছু চাস তাও করতে পারিস।" এর পরে যখন ঐ তর্জমাটা মডার্ন রিভিউ-তে প্রকাশিত হল তখনকার বাঙলার সরকার ত চটেই লাল। রামানন্দবাবুকে কড়া চিঠি পাঠান হল এবং বিলাতে পার্লামেণ্টেও এর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'ল। আমার ইচ্ছা ছিল রাশিয়ার চিঠির পুরো তর্জমাটা বিলাতে প্রকাশ করি। কথাবার্তাও চলছিল, কিন্তু সবাই পিছিয়ে গেলেন। এই তর্জমাটা এখন বিশ্বভারতী পাবলিসিং হাউসের হাতে আছে এবং কয়েক মাস আগে স্নেহাস্পদ পুলিন সেন আমাকে লিখেছেন যে, এটা শীঘ্রই প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের কত সহজ সম্বন্ধ ছিল ও আমাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার কত সহজ ছিল, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এটা ১৯৩০ সালের কথা। গুরুদেব লণ্ডনে শেষবারের মত এসেছেন। এসে উঠেছেন চট্টগ্রামের রজনী মজুমদার মহাশয়ের বড় হোটেলে। কেনসিংটন এলাকায় ল্যাসেস্টার রোডে রেজিনা হোটেল অনেকের কাছেই পরিচিত। গুরুদেব রজনী মজুমদার মহাশয়কে আগের জীবনে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর স্মৃতি তিনি কখনও ভুলতে পারেন নি।

আমি একদিন গুরুদেবের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে গেছি। তিনি বললেন তাঁর সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খেয়ে যেতে। খাবার পর স্থির হ'ল গুরুদেব স্বর্গীয় আরনেস্ট রীজ-এর গোল্ডেনস্ গ্রীনের বাড়িতে বিকালে চা খেতে যাবেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। মিঃ রীজ ওয়েলস কবি, সুলেখক ও এভ্‌রিম্যান সংস্করণের সম্পাদক হিসেবে সর্বজনবিদিত। তাঁর লেখা গুরুদেবের জীবনীর সঙ্গেও হয়ত অনেকের পরিচয় আছে। তাঁর বাড়ির বাগানে গিয়ে সবাই বসলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল, তখন রীজ-পত্নী গুরুদেবকে সান্ধ্যভোজন (সাপার) খেয়ে যেতে বললেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে খেতে বসলাম। মিসেস রীজ গেলাসে করে ভারমাউথ মদ খেতে দিলেন। বলা বাহুল্য, আমি এটা খাব কিনা ইতস্তত করছি দেখে গুরুদেব নীচু গলায় বললেন, 'চোখ বুজে খেয়ে ফেল।'

গুরুদেবের স্নেহের আরেকটা পরিচয় দিচ্ছি। ১৯৩৩ সনে বাঙলার রাজকীয় পুলিসের তাড়নায় যখন দ্বিতীয়বার দেশ-ত্যাগী হলাম এবং লণ্ডনে ফিরে এলাম, তখন রোজগারের সমস্যা প্রবল হয়ে উঠল। একটা বইয়ের দোকান খুলে বসলাম। "দি বিব্রিওফাইল" বইয়ের দোকানের নাম, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সব সময়েই সজীব থাকবে, কারণ এটা তখনকার ছাত্রদের একটা মিলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং অনেকেই এর সংস্রবে এসে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন।

গুরুদেব, পণ্ডিত নেহরু, এবং অন্যান্য অনেকেই আমার কাছ থেকে বই নিতেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, গুরুদেব বই নিতেন কেবলমাত্র আমাকে সাহায্য করবার জন্যে নয়, আমি বিদেশে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করবার চেষ্টা করছি এটাই তাঁর কাছে ছিল বড় কথা। তিনি মানুষকে মানুষের দাম সব সময়ই দিতেন।

এবার সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসার পর থেকে কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছে। গুরুদেব ও গান্ধীজী আমাদের দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন কেবল ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে বলে নয়। তাঁরা চেয়েছিলেন যে, স্বাধীন ভারতের নরনারী মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তাদের আত্মমর্যাদা বাড়বে, আর দেশে মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়বে। আমরা কি এই আদর্শটা অটুট রাখতে পেরেছি? এই প্রশ্নটাই গত ক'মাস ধরে মনকে সব সময়ে পীড়া দিচ্ছে।

নিখিলবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, একথা ভাবতেও পারিনি। অথচ "ভেতরে আসতে পারি" বলে তিনি যখন সত্যি সত্যি সশরীরে এসে হাজির হলেন, তখন নিজের চোখ দুটোকেই বুঝি বিশ্বাস করতে পারিনি।

আর পারবই বা কী করে! আজ তিন মাস হলো নিখিলবাবু আমাদের মেসে এসেছেন। এই তিন মাসের মধ্যে, এক ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কাজের দু-একটা কথা ছাড়া তিনি কারু সঙ্গে তিনটে কথাও বলেছেন কিনা সন্দেহ। ভদ্রলোক মেসের চাকরবাকরদের পর্যন্ত কোন ফাই-ফরমাশ দেন না। খাবার ঘরে গিয়ে পিঁড়িতে বসেন, কিন্তু একবার হাঁক দিয়ে বলেন না—ঠাকুর, আমার খাবারটা দিয়ে যাও। তাঁকে খেতে বসতে দেখে কেউ খাবার দিয়ে গেল, ভালো, নয়ত খানিক বসে থেকেই না খেয়েই চলে যান। এই নিয়ে ঠাকুর-চাকরকে তিরস্কার তিনি কোনদিন করেননি, ম্যানেজারবাবুর কাছে কোন নালিশ জানান নি। মেসের চৌবাচ্চায় সাধারণত জলের অভাব লেগেই থাকে। তাই, কার আগে কে স্নান সেরে নেবে, এই নিয়ে মেম্বারদের মধ্যে তাড়াহুড়ো প্রায় নিত্যিকার ব্যাপার। কিন্তু নিখিলবাবু নির্বিকার। সবার স্নানের শেষে একটু তলানি যদি চৌবাচ্চায় পড়ে থাকে, তবে তাই নিয়ে কোনরকমে কাকস্নান সেরে নেন, কোনদিন তাও হয় না। অস্নাত বা কোনদিন অভুক্ত অবস্থাতেই মেস থেকে বেরিয়ে যান।

কিন্তু কোথায় যান, কেউ জানে না। কোথায় তিনি চাকরী করেন, কিংবা আদৌ করেন কিনা, সে-খবরও কেউ রাখে না। মেস-হোটেলের নিয়মই এই। সবার সঙ্গে মেলামেশা না থাকলে যেচে কেউ বড় একটা আলাপ পরিচয় করতে আসে না। নিখিল-বাবু সবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন, সুতরাং তাঁর খোঁজ-খবরেও কারু কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু তা হলেও এই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষটিকে নিয়ে হাসি-তামাশা যে না হয় এমন নয়। ইতিমধ্যেই তাঁকে মৌনীবাবা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর আগমনে কেউ কেউ —"মৌনীবাবা এসেছে রে" বলে আড়াল থেকে চীৎকার করেন। ফাজিল মেম্বারদের কেউ কেউ—"ও বৌ, কওনা কথা মুখ তুলে" বলে গানও ধরে। পরিহাসটা যে তাঁকে লক্ষ্য করেই করা হয়, তা নিখিলবাবু নিশ্চয়ই বোঝেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দু-একজন ম্যানেজারবাবুকে নিখিলবাবু সম্বন্ধে সতর্ক থাকার পরামর্শও দিয়েছেন। বলেছেন—"যে-লোক কথা কয় না, হাসে না, তার পক্ষে খুন করা অসম্ভব নয়, খুন করেই এসেছে কিনা তা-ই বা কে জানে।"

এহেন নিখিলবাবু সেদিন নিজে থেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার রুমে এসে ঢুকলেন, তখন আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কী একটা বই নিয়ে বসে-ছিলাম। রাত তখন প্রায় একটা। ঠিক সেই সময় নিখিলবাবু "ভেতরে আসতে পারি" বলে ঘরে এসে ঢুকলেন এবং বসতে বলার সৌজন্য প্রকাশের আগেই নিজে থেকে চেয়ারটা টেনে বসলেন। তারপর কোন রকম ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন—"আপনি তো শুনেছি গল্পটল্প লেখেন। আমায় একটা গল্প লিখে দিতে পারেন?"

নিখিলবাবুর মতো লোকের মুখে গল্প লিখে দেওয়ার অনুরোধটা কল্পনাতীত হলেও ফরমাসী গল্প আমায় মাঝে মাঝে লিখতে হয়। ভাবলাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কাগজের যোগাযোগ আছে। কাগজের প্রতিনিধি হিসেবে গল্প চাওয়াটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। বললাম—"তা গল্প আমি মাঝে মাঝে লিখি বটে। কিন্তু এখন তো আপনাকে গল্প দিতে পারব না। হাতে সময় আমার একদম নেই। তারপর হালে ক'দিন অফিসে খুব কাজের চাপ পড়েছে। দশটা-পাঁচটা অফিস এবং তার ওপর বিনি পয়সার ওভারটাইম করে আর গল্প লেখার টাইম থাকে না। তাছাড়া হাতে কোন তৈরি গল্প নেই, মাথায়ও নেই।"

"তা মাথার জন্য আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। গল্পের মশলা আমিই আপনাকে দেবো। আপনি শুধু আপনার ভাষায় লিখে দেবেন। গল্পটা আমার জীবনেই ঘটেছে। কিন্তু লেখাটা আমার আসে না বলেই আপনাকে অনুরোধ করছি। কিন্তু একথাও আপনাকে বলে রাখছি, আমি কোন কাগজের প্রতিনিধি নই, প্রকাশকও নই। গল্পটা একজনকে উপহার দেবো বলেই আপনাকে লিখতে বলছি। আমার জীবনের সত্যিকারের গল্প আর আপনার ভাষা। যে-কথাটা আমি তাঁকে গুছিয়ে বলতে পারিনি, সে-কথাটা আপনি গুছিয়ে বলে দেবেন"—।

অদ্ভুত আবদার। কাগজের জন্য নয়, প্রকাশনের জন্য নয়। উপহার দেবার জন্য গল্প লিখে দিতে হবে। আবার সেই গল্পও বলে দেবেন তিনি। আমি শুধু লিখে দেবো। লিখতে পারব না বলাই উচিত ছিল। কিন্ত অদ্ভত চরিত্রের এই

মানুষটির জীবনে-ঘটা গল্প শোনার লোভ সংবরণ করা গেল না। শুনতে ইচ্ছে হলো, কী সে গল্প, যা এই মানুষটিকে পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কী সে কথা গুছিয়ে বলা হলো না বলে তাঁর সমস্ত কথা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কে সে মানুষ, যাকে তার গল্পটি উপহার দেওয়ার এই কৌতূহল। বললাম—"বেশ, আপনার গল্প শোনা যাবে একদিন। দেখব কী করা যায়।"

"না, একদিন নয়। দয়া করে আজ রাতেই শুনুন। পরে হয়ত আর শোনবার সময় হবে না। আমার পেছনে পুলিস লেগেছে।"

পুলিস? বলেন কি মশাই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিস। কিন্তু আমার গল্পটা না শুনলে তো কিছুই বুঝবেন না।

পুলিসের নাম শুনে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তবে কি মেসের মেম্বারদের অনুমানই সত্যি? লোকটা কি সত্যিই খুনী? যদি তাই হয়, তা হলে খুনীর সঙ্গে আমার এই যোগাযোগের ফল যে কী দাঁড়াবে, তা বুঝি ভাবতেও আতঙ্ক হয়। অথচ উপায় নেই। কথা দিয়েছি গল্প শুনবো। তাছাড়া লোকটা সত্যি সত্যি খুনী হয়ে থাকলে এই রাতে একলা ঘরে তাকে ঘাঁটানোও যে শক্ত। রাজী অগত্যা হতেই হলো। নিখিলবাবু গল্প শুরু করলেন।

তাপসী সেন জুনিয়র টাইপিস্ট হিসেবে আমাদের অফিসে কাজে যোগ দেয়, সে আজ তিন বছরের কথা। আমি নিজেও টাইপিস্ট। দুজনে পাশাপাশি বসে কাজ করি। অফিসের হালচাল, অফিসারদের কা'র কি রকম মেজাজ-মর্জি, এসব খুঁটিনাটি তাপসী আমার থেকেই জেনে নেয়। জানেন তো, অফিসে কাজ করতে হলে এসব খবর জানা দরকার। তাপসী নতুন টাইপিস্ট। সময় মতো সব কাজ সেরে উঠতে পারত না। দু'এক মাসেই সব ঠিক হয়ে যাবে বলে তাকে উৎসাহ দিয়েছি। কাজের ফাঁকে তাপসীর দু'একটা কাজও করে দিয়েছি। কৃতজ্ঞতায় তার মুখের রেখা অপূর্ব হয়ে উঠতো। বড় ভালো লাগতো দেখতে।

অফিসের পর একসঙ্গে বেরুতাম। ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাপসীকে ট্রামে চড়িয়ে দিতাম। পরে আমি অন্য রুটের বাস ধরতাম। কিছু দিন এমনি ক'রেই গেল। এর পর অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ী না গিয়ে দু'জনেই চায়ের দোকানে চা খেতে যেতাম। কতদিন এক সঙ্গে সিনেমা দেখার সময়ও তাপসীর হতো। ঘনিষ্ঠতার শেষ ধাপে বিনা কাজে দু'জনে পাশাপাশি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও ভালো লাগত। ময়দানের এক কোণে বসে ঘন্টার পর ঘন্টাও দু'জনে কাটিয়েছি।

বুঝতেই পারছেন আমি ততদিনে তাপসীকে ভালবেসে ফেলেছি। অসম্ভব সে ভালবাসা। আমার প্রতি তাপসীর আকর্ষণ বুঝতেও বেগ পেতে হলো না। ভালোবাসার এই গভীর স্তরে ধাপে ধাপে কী ক'রে এলাম সেটা আপনি আপনার ভাষায় বর্ণনা করুন। এই বর্ণনার ভাষা আলাদা হতে পারে কিন্তু তাপসীকে ভালোবেসেছি শুধু এই কথাটি বজায় রেখে আপনি আপনার কথায় গল্প রচনা করুন। তাতে কিছু এলে যাবে না। গল্পটা মিথ্যে হলেও ভালোবাসাটা তাতে যেন মিথ্যে না হয়। তবে হ্যাঁ, তাপসীর অনেক দিনের অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আর তার উত্তর আমাদের দু'জনের ভাষাতে রাখলেই বোধহয় ভালো হয়।

তাপসী প্রশ্ন করল—"এরকম বাউন্ডুলে হয়ে আর কত দিন ঘুরবে?"

উত্তরে বললাম—"যদ্দিন না তুমি নিজে এসে ঘর-সংসার বুঝে-সুঝে গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবে।"

লজ্জায় আরক্ত হয়ে তাপসী মাথা নীচু করে বলল—"তুমি ভারি দুষ্টু।"

এই সামান্য ক'টি কথা "তুমি ভারি দুষ্টু" এ আর কী ভাষায় এত সহজ ক'রে প্রকাশ করা যায় তা আপনি লেখক, আপনিই বলতে পারেন। কিন্তু আমি বলি তাপসীর এই দুষ্টুমির মিষ্টি অভিযোগটা তার নিজের ভাষাতেই রাখবেন।

যাক্। দুষ্টুমি শুরু হলো সেদিন থেকেই। তাপসীর সঙ্গে আমার এই মেলা-মেশা নিয়ে অফিসে প্রথমে কানাকানি পরে জানা-জানিতে পরিণত হলো। এমনকি কথাটা অফিসের কর্তাদের কানেও উঠল। বন্ধুরা আমাদের দু'জনকে নিয়ে নানা রকম হাস্য-পরিহাস শুরু করলেন। তাদের পরিহাস গায় মাখিনি। বরং তাপসী আমাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ক'রে গ্রহণ করেছে এটাকে পরম গৌরবের বস্তু বলেই মনে করেছি। দুঃখ হতো শুধু তাপসীর জন্য। সহকর্মীদের নির্লজ্জ উপহাসে সে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়তো। হাজার হোক মেয়ে-ছেলে তো!

কথাটা যখন কর্তাদের কানে উঠেছে, এবং হয়ত বেশ অতিরঞ্জিত হয়েই উঠেছে, তখন সহজে যে আমার রেহাই নেই তা বেশ ভালো ক'রেই বুঝলাম। কিন্তু শাস্তি যে এত কঠোর হবে তা ভাবিনি। শাস্তি দিলেন অফিসের মেজোকর্তা। অত্যন্ত কড়া মেজাজের অফিসার। কারু এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি বরদাস্ত করেন না। ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি। তাঁর ভয়ে সবাই তটস্থ। সেই মেজোকর্তাই আমায় শাস্তি দিলেন। কিন্তু সেটা চার্জশিট দিয়ে নয়, বরখাস্ত ক'রেও নয়। তিনি তাপসী সেনকে তাঁর খাস কামরায় বসে কাজ করবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কাজের ফাঁকে পাশের ফাঁকা সীটটার দিকে তাকিয়ে বুকটা কী রকম মোচড় দিয়ে ওঠে। চার্জশিট বুঝি এর চেয়ে অনেক লঘু দণ্ড!

অভ্যেস মতো পথে এসে দাঁড়াই। কিন্তু তাপসীর দেখা নেই। স্বাভাবিক নিয়মে তার ছুটির সময় পাঁচটা। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে সেটা সাড়ে পাঁচটায় দাঁড়ালো এবং আরো কিছু দিন পর পাঁচটা বেলা সাতটা সাড়ে সাতটায় গিয়ে গড়ালো। প্রথম প্রথম তাপসী অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বলত—"বাব্বাঃ এরকম খাটলেই হয়েছে আর কি। চল, চল, শিগ্গির চল, এককাপ চা খাই গে।"

কিন্তু চায়ের প্রয়োজনও তার ফুরিয়ে গেল। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে বলে "চা মেজোকর্তার ওখানেই খেয়েছি।" কিন্তু সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ মেজোকর্তার কী এমন কাজ জিজ্ঞেস করতে তাপসী একদিন বলল "আহা, ও কথা বলোনা, ঢের কাজ তাঁর। খেটে-খেটে হয়রান হ'য়ে গেল, বেচারা।" মেজোকর্তা "বেচারা", বলে তাপসী। সেই তাপসী।

আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন হয়নি। এখন পথে ঘাটে ঘুরতে আর তাপসীর ভালো লাগেনা, অসম্ভব ভীড়। পথ চলা যায় না। ময়দানে সন্ধ্যা থেকে লোক গিসগিস করতে থাকে। একটুও ভালো লাগেনা সেখানে গিয়ে দু'দণ্ড বসতে। চোখটা হালে একটু খারাপ হয়েছে, সিনেমা দেখতে ডাক্তার বারণ করেছেন। মনে মনে বলি চোখ বুঝি সত্যি খারাপ হয়েছে তাপসীর। সব কিছুই তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। দু' দিনেই।

নিখিলবাবু একটু থামলেন। পরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"এই অবস্থায় আমার কী করবার আছে বলতে পারেন? আপনি তো লেখক। আপনিই বলুন না আমার কী কর্তব্য।"—নিখিলবাবু জবাবের আশায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম—আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আপনি আপনার কথাটাই বলুন।

নিখিলবাবু হাসলেন। ম্লান হাসি। বললেন—বুঝেছি। আপনি নিজে কিছু বলতে চান না। তা ছাড়া আপনি কতটাই বা বলতে পারেন। আপনার গল্পে তাপসী হবে আপনার কল্পনার মানুষ। আমার নিজের হাতে-গড়া রক্তমাংসের তাপসীর প্রতি আমার ভালোবাসার পরিমাপ আপনি কল্পনা দিয়ে কতটাই বা বুঝতে পারবেন আর আমার কর্তব্য সম্বন্ধেই বা আপনি কতটা বলতে পারবেন। তাছাড়া আমি আপনার পরামর্শ নিতেও আসিনি। আমি গল্পটা বলতে এসেছি মাত্র।

নিখিলবাবু থামলেন। বেশ খানিকটা সময় কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে

বসে রইলেন। আমার মনে সেই পুরনো প্রশ্নটাই আবার জাগল—কী সে কথা যা তাঁর সমস্ত কথা বন্ধ করে দিয়েছে। নিখিলবাবু অনর্গল কথা বলতে পারেন এবং বলেনও ভালো। অথচ মেসে এই মানুষটার মুখে একটা রা নেই। দিনের পর দিন তাঁর এই বাক্‌সংযম সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়।

"আপনি কী ভাবছেন জানিনে"—নিখিলবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন। বললেন—"আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমার নিজের মনে কিন্তু এতটুকু দ্বিধাও ছিল না। কর্তব্য নির্ধারণের পর আর আমি এতটুকু কালবিলম্বও করিনি। আমি তাপসী সেনকে খুন করেছি।"

বিস্ময়ে, আতঙ্কে হতবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু নিখিলবাবুর মুখের রেখায় কোথাও এতটুকু চঞ্চলতা পর্যন্ত নেই। সহজ স্বাভাবিক স্বরে তিনি তাঁর কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন—হ্যাঁ, আমি তাপসী সেনকে খুন করেছি। লম্বা ছুটিতে ছিল তাপসী। মেজোকর্তা জানেনও না সে কোথায় গেছে। হয়ত তিনি তাপসীর ফিরে আসার দিন গুণছেন। কিন্তু তাপসী আর ফিরে আসবে না। তাপসীর মৃত্যু সংবাদ আপনার গল্পের মারফতেই মেজোকর্তার কাছে পৌঁছুবে।

নিখিলবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বিকট সে হাসি। একটা পৈশাচিক জিঘাংসায় তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন—"আমি আর আপনার সময় নষ্ট করব না। আপনি লিখতে আরম্ভ করুন। স্পষ্ট করে লিখুন নিখিল রায় তাপসী সেনকে খুন করেছে। দেশের আইন নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা করবে না। কিন্তু মানুষের মনের আইনের বিচারে আমি বেকসুর খালাস এ কথা লিখতে পারবেন কি?

নিখিলবাবু ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন রাতে তিনি মেসে ছিলেন না এবং এই ঘটনার পর এক মাস পর্যন্ত তিনি মেসে আসেননি। বলা বাহুল্য গল্প আমি লিখিনি। তাঁর খুনের কাহিনীও সুস্পষ্ট কারণেই কাউকে বলিনি। লোকটা একটা মানুষ খুন করে ফেরারী হয়ে উঠেছে সে আমাদেরই মেসে। স্বীকার উক্তি করে গেল সে আমারই কাছে। ঘুণাক্ষরেও কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে খুনীর পরিণাম তো ভয়াবহ হবেই. নাগরিক কর্তব্যের অবহেলার জন্য পুলিস আমাকেও সহজে ক্ষমা করবে না।

এক মাস পরের কথা। হঠাৎ কোথা হতে নিখিলবাবু আবার একদিন মেসে এসে হাজির হলেন। গল্পের কথা তিনি ভোলেন নি। তেমনি গভীর রাতে আমার ঘরে এসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন—"গল্পটা লেখা হলো?"

তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে সত্যি দুঃখ হলো। এক মাসের মধ্যে কাউকে এমন বুড়িয়ে যেতে দেখিনি। ভরা নদীর মাঝখানে একখানা হালহীন জীর্ণ তরী মাত্র সম্বল নিয়ে আসন্ন ঝড়ের দিকে যে-শঙ্কা নিয়ে মানুষ তাকায়, তাঁর দুই চোখে সেই শঙ্কার ছায়া। গল্প আমি লিখিনি। কিন্তু কেন জানিনে কথাটা তাঁকে সরাসরি বলতে পারিনি। হয়ত বা ভয়ও হলো সত্যি কথাটা বলতে। তাই আমতা আমতা ক'রে বললাম—দেখুন, নানা কারণে গল্পটা ......আমার মুখের কথা টেনে নিয়ে নিখিলবাবু বললেন—"লেখা হয়নি? তা ভালোই হলো। গল্পের শেষটা একটু অন্য রকম ক'রে লিখতে হবে। আমি সেদিন যা-বলেছিলাম তাতে একটু ভুল ছিল।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিখিলবাবুর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—"আমি তাপসীকে খুন করিনি।"

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। নিখিলবাবু নিজের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন—"কিন্তু তাকে খুন আমি করতে গিয়েছিলাম একথা লিখলে এতটুকু ভুল হবে না। চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি বহুদিন আগেই। আনু বাড়ী যায়, না কী একটা কথা আপনারা বলেন। কিন্তু এই আনু বাড়ী যাওয়া যে কী তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না। আমি তা জেনেছি। দেখেছি দিনের পর দিন। খুন চেপে যায়। রক্ত টগবগ করতে থাকে।

তক্কে তক্কে ছিলাম। সুযোগও একদিন পেয়েছিলাম। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তাঘাট জলে ভেসে গেছে। ট্রাম বহুক্ষণ থেকেই বন্ধ। দু'একখানা বাস মাত্র চলছে। সন্ধ্যাও নেমেছে অনেকক্ষণ। রাস্তায় অফিস ফেরতাদের অসম্ভব ভীড়। তাপসী বোধহয় বাস ধরতেই যাচ্ছিল। আমায় দেখতে পায়নি। ভাবলাম এই সুযোগ। যে-কোন একটা চলন্ত গাড়ীর তলায় তাপসীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো। তাপসী চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মরবে আমার চোখের সামনে। বৃষ্টি, অন্ধকার আর ভীড়ের সুযোগে সত্যিই তাকে খুন করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ যখন ওর হাতটা আমার হাতে ঠেকে গেল তখন যেন আমি কী রকম হয়ে গেলাম। হাতটা অসাড় হয়ে গেল। তাপসীর হাতে বুঝি কী আছে। খুন করা হলো না। তাপসী দিব্যি বাসে চড়ে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

নিখিলবাবু বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর অকস্মাৎ বলে উঠলেন—তাপসী কিন্তু একদিন ফিরে এলো। ফিরে এলো তার একটিমাত্র কাতর অনুনয় নিয়ে, বললে তার অনাগত সন্তানের সম্ভ্রম আর পরিচয়ের দায়িত্ব যেন আমি নিই। আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়া তাপসীর দেহটা একটা বোবা কান্নার দমকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তাপসী মরেছে। কিন্তু তার কান্না মরেনি। আমি তাপসীকে বিয়ে করেছি। আপনি লিখুন, লিখে যান। আমার যে আবার লেখা আসে না। ঐতো মুশকিল।"

নিখিলবাবু বিভ্রান্তের মতো টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
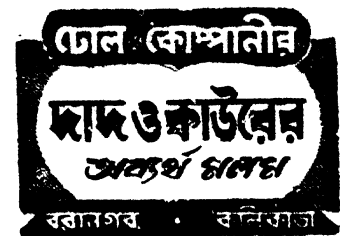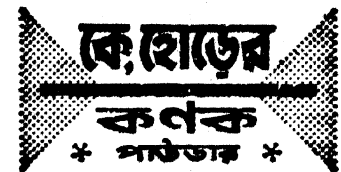
চব্বিশ

এ কা হল? এত প্রচণ্ড তৃষ্ণা তার মনে ছিল? এত দাবদাহ তার দেহে? কই ফেদি ত এর আগে এমনভাবে টের পায়নি। স্বামীর মৃত্যুর পর ওর দেহ আর মনের ক্ষুধা তৃষ্ণার তেজকে নানা প্রক্রিয়ায় মন্দীভূত করে ফেলেছিল ফেদি। কোন কোন মা নিরুপায় হয়ে যেমন তার দামাল সন্তানকে মাদকের নেশায় নির্জীব করে ফেলে রাখে, তেমনি ফেদিও তার কামনা বাসনাকে তার দেহের আশ্রয়ে পঙ্গু করে ফেলে রেখেছিল। দুটো বছর পার হবার পর ফেদি বুঝি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল, বুঝি ভেবেছিল সব চুকে-বুকে গেছে, বুঝি নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে এক বর্ণহীন, গন্ধহীন স্বাদহীন দীর্ঘ জীবন যাপনের কঠোর সাধনার জন্য।

কিন্তু এ কী? আকস্মিক এক ঘটনার দুর্বার আঘাতে ফেদির এতদিনের সাধনায় অর্জিত সংযম, বিধবার তপঃক্লিষ্ট শুচিতা, সব ফুৎকারে উড়ে গেল! পরপুরুষের অনধিকার প্রবেশ ঘটল তার দেহের সীমানায়! আর কিনা ফেদিরই আমন্ত্রণে? ছিঃ!

সে কি তবে কাল পাগল হয়ে গিয়েছিল?
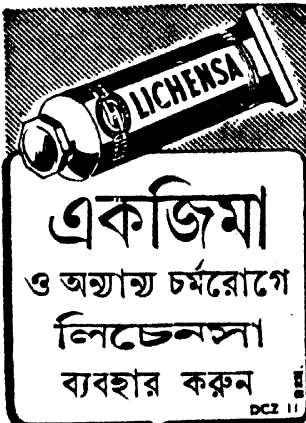
অন্যদিন খুব ভোরে ওঠে ফেদি। রোদ ওঠবার আগেই তার সংসারের কাজ অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে যায়। আজ ফেদিদের অপরিষ্কার উঠনে রোদ এসে গড়াগড়ি খেতে লাগল, তবুও ফেদি ঘরের দরজা খুলল না। বাসি বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে রইল। নড়াচড়াও করল না। কোন কিছুই করতে ইচ্ছে যায় না আর। আহা, এখন ঠিক এই মুহূর্তে যদি তার মৃত্যু হত। ভগবান, ভগবান, মনে মনে পরিত্রাহি ডাকতে লাগল ফেদি। বলতে লাগল, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পুজো করে থাকি, তবে মৃত্যু দাও, আমায় মৃত্যু দাও দয়াময়।

দয়াময়কে স্মরণ করামাত্র সুধাময়কে মনে পড়ে গেল ফেদির। ফেদির চিন্তার ভূমি থেকে ভগবানকে কনুইয়ের গুঁতোয় ঠেলে দিল সুধাময়, ফেদির সমগ্র সত্তার দখল নিল নিজে।

ফেদির ভাবনার গতি ঝড়ের বেগ ধারণ করল। দ্রুত, অতি দ্রুত ধেয়ে চলল সুধাময়ের দিকে। চিন্তার এই গতিতে ভর করে ফেদির দেহটাই যেন ছুটে চলল সুধাময়ের দেহে প্রচণ্ডবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সুধাদা কাল এই বিছানায় শুয়েছিল। কথাটা মনে পড়ল ফেদির। বিদ্যুৎবেগে কি এক অপূর্ব সুখাস্বাদ ছড়িয়ে পড়ল তার দেহের কোণে কোণে। সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ের স্পর্শ প্রাণময় হয়ে উঠল। ফেদির মনে হতে লাগল, তার সর্বদেহে সুধাময়ের অনভ্যস্ত হাতের ছোঁয়া। দারুণ উত্তেজনায় ফেদির দেহে থরথর কম্পন শুরু হল। বুক ধুকপুক ধুকপুক করতে লাগল। চোখের অতল থেকে এক নতুন সূর্যের যেন উদয় হতে লাগল। শরীরে প্রবল তাপ। নাক, কান, মুখে যেন উত্তাপের হল্কা লাগছে। কামনার প্রবল তৃষ্ণায় ফেদি ছটফট ছটফট করতে লাগল। উপুড় হয়ে বালিশটা বুকে জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে। নিজেকে যেন ছোবল দিতে লাগল বারবার। আর পারে না ফেদি, এক্ষুনি যেন গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। যেন মরে যাবে। মর্ মর্, তুই মর্ হতভাগী! তোর মনে এত পাপ, তোর দেহে এত তাপ, না মরলে তুই জুড়োবিনে। ছিঃ ফেদি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মরবে সে, মরবেই। এই কলঙ্কিত দেহের ভার বয়ে, নিজের কাছে ধিকৃত, জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়ে সে বাঁচতে চায় না। ভগবান, তোমার কাছে এই মিনতি, শুধু এইটুকু করো, মরণকালে সুধাদা যেন শিয়রে এসে একবার দাঁড়ায়, এই হতভাগীর জন্য যেন দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে। তাহলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ নিয়ে ফেদি মরতে পারে। কিন্তু আসবে কি সুধাদা সে সময়?

হঠাৎ ফেদির হৃদ্‌পিণ্ড ধকাস ধকাস করে কেঁপে কেঁপে উঠল, সুধাদা আজই আসবে যে! এই দুপুরে। না না অপরাহ্নে। যখন তার দাদা বাড়ি থাকবে না। যখন খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে তার পড়শিরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে। সেই সময় সুধাদা চুপি চুপি আসবে। ফেদি যেন দেখতে পাচ্ছে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে সচকিত সুধাময় ফেদির বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। সুধাময়ের মুখে-চোখে সেই নিষ্পাপ সুকুমার ঔজ্জ্বল্য আর নেই। সেই অনাবিল আনন্দের ধারা সুধাময়ের সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারায় আর উপচে পড়ছে না। সেই স্বর্গীয় দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে সুধাময়। আর সে কোনদিন মাথা উঁচু করে ফেদিদের উঠনে পা দিতে পারবে না। কখনো আর সুধাময় তাদের বারান্দায় বসে তেমন অনায়াসে বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে ভাবালু দৃষ্টি মেলে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে পারবে না। সুধাময়ের এই মূর্তিটা খুব ভাল লেগেছিল ফেদির। এই ত পরশু দিনের কথা। অথচ সেই সুধাময় একটি দিনের মধ্যে কি হয়ে গেল? চোরের মত তাকে এখন আসতে হবে। পাপের গোয়েন্দা-ছায়া সব সময় অনুসরণ করতে থাকবে তাকে। যে সুধাময় সুস্থ সবল সদানন্দের প্রতীক ছিল, ফেদির মত অসতীর বিষ নিঃশ্বাসে সে এখন মোহগ্রস্ত, অপ্রকৃতিস্থ এক পেশাদার কামুকে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামে যার নমুনা নিতান্ত কম নেই।

সুধাময়ের এই অধঃপতনের জন্য কে দায়ী? আমি। ফেদি স্বীকার করল, হ্যাঁ আমি। সুধাময় কাল রাত্রে তাড়াতাড়ি যখন পালাতে চেয়েছিল, কে তার হাত ধরে আটকে রেখেছিল? কে তাকে আধ-আধ ভাবে বলেছিল, কাল এসো, কাল দুপুরে এসো? আমি বলেছি, আমি আমি আমি।

কিন্তু পরিণাম ভেবেছিলে কি? এর পরিণতি কি হতে পারে, ভেবেছিলে? না। না ভাবিনি। ভাববার অবকাশ কোথায় ছিল কাল? এক ফেদি দুই হয়ে গেল। তারপর যাত্রাদলের সুনীতি কুনীতির মত তর্ক করতে বসল।

এখন তবে বুঝতে পারল ফেদি, কাল যে অত তাড়া অনুভব করেছিল গিরি-

বালার ছেলেকে দেখতে যাবার জন্য, সে তাহলে গিরিবালার ছেলের জন্য নয়। না না, সংগে সংগে প্রতিবাদ করল ফেদি, ঈশ্বর জানেন, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার। গিরিবালার ছেলেকেই দেখতে চেয়েছিল, তাকেই দেখতে গিয়েছিল সে। কোন কুমতলব ছিল না। তবে, তবে এ কান্ড কী করে ঘটল? জানি না, জানি না, জানি না। বালিশে মুখ ঘষতে লাগল ফেদি।

দুম দুম ট্যাম ট্যাম বাজনাটা ফেদির কানে বেজে উঠল। আহত সেই ভয়ংকর শুয়োরটার চেহারা ভেসে উঠল তার চোখে। বুনোদের হাত থেকে যেমন রেহাই পায়নি সেই দাঁতালটা, বন থেকে বনে তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে, যেমন নিষ্ঠুর উল্লাসে শিকারীরা তাকে শেষ করেছে, ঠিক ফেদিকেও তেমনিভাবে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে? তাড়িয়ে তাড়িয়ে তাকে এই পরিণতিতে এনে ফেলেছে। এই ঘটনায় তার সচেতন হাত কোথায়?

ফেদির হ্যাঁচকা টানে সুধাময় নয়ানজুলিতে গড়িয়ে পড়ল। ফেদিও টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ল সুধাময়ের উপরে। প্রচন্ড ভয়ে ফেদি তখন আধমরা। তার কি তখন অন্য খেয়াল থাকতে পারে? কতক্ষণ এমনভাবে ছিল সে জানে না। হঠাৎ এক সময়, সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেও সে তার স্বামীর পরিচিত উষ্ণতার বিদ্যুৎ স্পর্শ পেল। চমকে সে তৎক্ষণাৎ সুধাময়ের দেহ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল। একটা নতুন আতঙ্ক আর পুরান উত্তেজনা তাকে মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল ফেদি। কিন্তু বিধবার সংযমের রাশ পেরিয়ে সে মুহূর্তের মধ্যেই সেই ফাজিল চিত্তোত্তনাকে বশে এনে ফেলেছিল। সুধাময়ের মুখে বিমূঢ়তা এবং অপরাধবোধের যে মিশ্র ছাপ সে সময় ফুটে উঠেছিল, তা ফেদির দৃষ্টি এড়ায়নি। সুধাময়ের শিশুর মত বিমূঢ়তায় বরং কিছুটা মজাই পেয়েছিল সে। সুধাময় এতই বিব্রত বোধ করছিল, যে ফেদিকে ওখানে ফেলে রেখেই যেন পালিয়ে যাবে। সুধাময় সে কথাটা বলে ফেলতেই চোখে অন্ধকার দেখল ফেদি। সর্বনাশ! সে তাহলে যাবে কি করে একা? তা ছাড়া কি এমন হয়েছে যে সুধাদা এত কিন্তু কিন্তু করছে। তাই সে যথাসম্ভব সহজভাবেই সুধাময়কে বাড়ি পর্যন্ত পেঁাছে দিতে বলেছিল।

তারপর সারা পথ তারা দুজনে চুপ করে হাঁটতে লাগল। সুধাদা কথা বলছে না কেন? এত অপরাধী ভাবছে কেন নিজেকে? এই সম্পর্কে ভাবতে গিয়েই যে সত্য অকস্মাৎ আবিষ্কার করে বসল ফেদি, তাইতেই সর্বনাশ ঘটে গেল। সুধাময়ের দেহটা তাকে বুকে ধরে যে তার স্বামীর দেহের ভাষায় তাকে ডাক দিয়েছিল, সুধাময়ের অপরাধ বোধের কারণ কি এই? তবে কি ফেদির দেহে এখনও এমন গুণ আছে যা পুরুষকে টানতে পারে? বিধবা হওয়ার পরেও সে তাহলে ফুরিয়ে যায়নি? এ সব কথা মনে পড়ার সংগে সংগে কামনায় তীব্র কামড়ে ফেদি অস্থির হয়ে পড়ল। তার সর্বদা ভয় হতে লাগল, এই বুঝি সুধাময়ের অবুঝ পৌরুষ পিছন থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সত্যি, এখন যদি সুধাদা তাকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে কি হবে? কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না, কেউ না। কি হবে তাহলে? যত এই কথা মনে পড়তে লাগল ফেদির শরীর তত বেশি কাঁপতে লাগল। পথ আর চলতে পারে না। যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে মাটিতে। তবুও যা হোক, নির্বিঘ্নেই বাড়ি পেঁাছল। কিন্তু বাড়ি পেঁাছতে না পেঁাছতে তীব্র পিপাসায় ফেদির যৌবনকে জর্জরিত করে ফেলেছে। সে যেন দিনের পর দিন জল না খেয়ে এক দুস্তর মরু পার হয়ে এসেছে। সামনেই দেখেছে এক জলাশয়। সামনেই সুধাময়। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তাই ফেদি কাল সন্ধ্যায় সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, পরিণাম পরিণতি, কিছুই সে ভাবেনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার স্বামীকেই কাছে পেয়েছিল। যেটুকু ঘাটতি ছিল, সে তার কল্পনা দিয়ে পূরণ করেছে। তাই সেই সুখকেই তখন অন্তিম সুখ বলে মনে হয়েছিল তার। এখন দেখল, বুঝল, সে সুখ সুখ নয়, কালসাপের দংশন। এখন যা দীর্ঘস্থায়ী তা হচ্ছে যন্ত্রণা, উত্তরোত্তর সুতীব্র পিপাসা। তাই হয়ত ফেদি অজান্তেই সুধাময়কে আবার আমন্ত্রণ করে থাকবে।

কিন্তু কাজটা উচিত হয়নি। এখন বুঝতে পেরেছে ফেদি। সুধাদাকে বারণ করে দেবে আসতে। সুধাদা চিরকাল সুধাদাই থাক। তার নাগর যেন না হয়। ফেদি নিজেকে নষ্ট করেছে, তা করুক। কিন্তু সুধাময়কে নষ্ট করবে না।

কিন্তু কি করে বারণ করবে? চিঠি পাঠাবে? ছিঃ ছিঃ। তাতে শুধু মনের কেলেঙ্কারী কালির অক্ষরে জগতে প্রকাশ হবে। তবে কি আজ আবার যাবে ওদের বাড়ি? কিন্তু কি উপলক্ষে? ফেদি সভয়ে দেখল, পৃথিবীটাকে সে কত জটিল করে
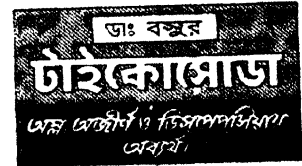
ফেলেছে। ফেদি দেখল, সে এরই মধ্যে কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে। তবে কি সুধাময়কে বারণ করা যাবে না? সে আসবে? তাকে নিবারণ করা যাবে না? আবার......

না না না, আর না, আর না। যা হবার হয়ে গেছে। ভগবান, ভগবান, এবার রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ফেদি বালিশে মুখ গুঁজে অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল।

ঘুম হয়নি, ঘুমতে পারেনি সুধাময়। ঘুমনো কি যায়!

উত্তেজনার প্রবল আবর্তে পড়ে সারারাত হাবুডুবু খেয়েছে সুধাময়। ফেদির অস্তিত্ব অশরীরী অবয়ব ধরে বারে বারে এসেছে, নিরন্তর তাকে স্পর্শ করেছে। সুধাময়ের রোমে রোমে পুলকের শিহরণ জেগেছে। সুধাময় জেগে উঠেছে। আবার হয়ত কখনও ঘুমিয়েছে। ঘুমনোমাত্র ফেদির কমনীয় দেহের সুঘ্রাণ হয়ত সুধাময়ের নাকে ঢুকেছে। অমনি সুধাময়ের ঠুনকো ঘুম টুটে গেছে। ফেদির অজস্র চুল যেন অন্ধকার হয়ে সুধাময়কে ঢেকে রেখেছে। তার প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, হাত বাড়ালেই যেন এই নরম অন্ধকার সে মুঠো করে ধরতে পারবে। আর মুঠিভর অন্ধকারের গোছা সুধাময় আলতো করে তার নাকের কাছে টেনে আনলেই তার ভিতর থেকে ফেদির চুলের সেই মাতাল গন্ধ বুঝি পাওয়া যাবে। বুঝি সেই চাপ চাপ অন্ধকারের নিচেতেই ফেদির অপরূপ মুখখানা ভেসে উঠবে, হেসে উঠবে। বুঝি তার নরম ওষ্ঠের দুটি পেলব পাপড়ির গুরু চাপ পড়বে সুধাময়ের ঠোঁটে। সুধাময় চমকে উঠল। ফেদির গরম নিঃশ্বাস কে ফেলল তার গালে? কে?

সুধাময়ের রক্তে যেন প্রচণ্ড বেগে বান নামল। প্রতিটি রক্তকণিকা দুরন্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে অনির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে ছুটে চলল। কোথায় কে জানে? উন্মাদ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ছোঁয়া লাগায় তার দেহের কোষে কোষে বাধাবন্ধহীন উচ্ছৃংখল উল্লাস অবিশ্রান্ত নৃত্যে মেতে উঠল। এই বুঝি সুধাময় ফেটে পড়ে, ভেঙে পড়ে। এই বুঝি তার সত্তা রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায়। এ কী নিদারুণ, এ কী দুঃসহ, এ কী পরম আনন্দময় এক অভিজ্ঞতা! সুধাময় একে আর ধরে রাখতে পারছে না। ছেড়ে দিতেও মন চায় না।

এক সময় এই প্রবল জোয়ারও স্তিমিত হয়ে এল। অবসাদে ক্লান্ত হল সুধাময়। আর সে চাঞ্চল্য নেই। আর সে বিক্ষোভ নেই। মহা আলোড়নের পর তার বিধ্বস্ত অস্তিত্বে যেন শান্তি ঘোষিত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়ল সুধাময়।

দু মিনিটও পার হয়েছে কিনা সন্দেহ, কে যেন ধাক্কা দিল সুধাময়ের বন্ধ দরজায়। ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে গেল তার। এত মৃদু তার দুয়ারে নাড়া দিল কে? ফেদি? চুপিসাড়ে ফেদি এসেছে নাকি? দাঁড়িয়ে আছে বাইরে? কালকের মত থরথর করে কাঁপছে? যে মুহূর্তে দরজা খুলবে সুধাময় সেই মুহূর্তেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ফেদি? আদরে আদরে অস্থির করে দেবে সুধাময়কে গত সন্ধ্যার মত? আবার সুধাময় প্রবল তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার মহাতেজে তার দেহে, তার মনে তোলপাড় শুরু হল। মাতাল হল রক্ত, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল। প্রবল চাঞ্চল্যে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণা করল। আবার অস্থির হয়ে উঠল সুধাময়। কাঁপতে লাগল থরথর করে। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। অসহায় হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। উন্মুখ আগ্রহে

প্রতীক্ষা করতে লাগল ফেদির। যেন ঐ বন্ধ কপাট ভেদ করেই ফেদি এসে উপস্থিত হবে সুধাময়ের শয্যায়।

কিন্তু ফেদি এল না। দরজায় আর ধাক্কাও দিল না। এর আগেও সম্ভবত দেয়নি। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই দেয়নি। সুধাময় ভাবল, সে তবে পাগল হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, পাগলই। নইলে সে কি করে ভাবল, ভাবতে পারল, ফেদি এত রাত্রে ও পাড়া থেকে বন জংগল ডিঙিয়ে তার দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। সেই ফেদি, ভয়ে যে দিনের আলোতেও একা যেতে পারে না। সুধাময়ই ত তাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। আর এগতে গিয়েই ত... ... ...

তা ছাড়া ও পাড়াতে নাই-ই যদি থাকত সে, যদি সে সুধাময়ের পাশের ঘরেই থাকত, তা হলেই কি আসতে পারত? যদি ধরা পড়ত?

এতক্ষণ পরে সুধাময়ের জ্ঞান হল, যে সুখস্বপ্নে সে ভাসছিল, সেটি অতি গর্হিত। আর সংগে সংগেই সে বিবেকের এক চাবুক খেল। এ কী করেছে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে! এ ত অন্যায়, এ ত অপরাধ, এ ত পাপ! যদি ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে! সর্বনাশ! চোখে অন্ধকার দেখল সুধাময়। ভয়ে ঘেমে উঠল। এখন উপায়? গলা শুকিয়ে গেল তার। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কী উপায় এখন? কী করবে সুধাময়? পালিয়ে যাবে কলকাতায়? পালালেই কি নিস্তার আছে? সুধাময় দেখল, এমন নিদারুণ এক জালে সে জড়িয়ে পড়েছে, যা থেকে কাটবার সাধ্য তার নেই।

নেই, একদম নেই। সুধাময় জানে, পাপ কখনও চাপা থাকে না। মা দিদিমার মুখে কতবার সে কথাটা শুনেছে, নাটক নভেল পড়েছে, যাত্রা থিয়েটারে দেখেছে। না, পাপ কখনও চাপা থাকে না। সুধাময় দেখল, এ প্রত্যয়টা তার মনেও দৃঢ়ভাবে গাঁথা। পাপ কখনও চাপা থাকে না। আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল সুধাময়। তার পাপও চাপা থাকবে না। একদিন ফাঁস হয়ে যাবে। হয়ত এর মধ্যেই জেনে গেছে লোকে। ভর সন্ধ্যায় সে ফেদির সাথে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। ফেদি তাকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল। কারো নজরে কি আর তা পড়ে নি? নিশ্চয়ই পড়েছে। সুধাময় ধরা পড়ে গেছে। ফিস্-ফিস্ করে কথাটা কান থেকে কানে ছড়াতে আরম্ভ করেছে। ঘরে ঘরে কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। এসব মুখরোচক জিনিসের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পেলে গ্রামের লোক ছেড়ে দেয় না। সকাল হতে না হতেই দ্রুতবেগে কথাটা ছুটবে বিভিন্ন পথে। হাটতলায় পৌঁছে যাবে, তারপর মাতব্বররা, সমাজের রক্ষকরা ছুটে যাবে ফেদির বাড়িতে, আসবে এখানে। হৈ চৈ হবে। নালিশ, সালিশ, বিচার। কেলেংকারীর বাকি থাকবে না কিছু। কি অবস্থা হবে তার? কি অবস্থা হবে এই পরিবারের, বাবার, মার, পিসিমার, মেজকাকার? কি তাকে ভাববে বুড়ি? মা হয়ত এই শোকে মরেই যাবে। সুধাময়ের জীবনের সব আলো নিভে আসতে লাগল। তার মনে হল, সে যেন তাড়া খাওয়া এক শিকার। সেই বুনো শুয়োরটাই যেন। বন থেকে বনে পালাচ্ছে সে আর গ্রামের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে ঝোপঝাড় পিটে তাকে ধরবার জন্য তাড়া করেছে। তাদের হিংস্র চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সুধাময়। এ সেই আদিম মানুষের শিকারী চিৎকার। সুধাময়ের কানে উদ্দাম বাজনা বেজে উঠল। দুম দুম দুম ট্যাম ট্যাম ট্যাম। এর পরিণতি কিসে—সুধাময় বুঝতে পারল। মৃত্যুতে। পাপের বেতন মৃত্যু, এই অমোঘ নির্দেশটা সুধাময় কলকাতায় দেখেছে কোন একটা গীর্জার দেওয়ালে। আজ সেটাকে তারই কপালে ঝুলতে দেখল। মৃত্যুই তবে একমাত্র পথ? কিন্তু কেমন মৃত্যু। কলংকের কালি মেখে সে মরবে, তার পরিবারে চিরদিনের জন্য এই অক্ষয় কলঙ্ক চিহ্নিত করে দিয়ে যাবে? সুধাময়ের দম আটকে আসতে লাগল। জল তেষ্টা পেয়েছে, তার বুক ফেটে যেতে লাগল।

আর কি কোন পথ নেই? ভাবতে লাগল সুধাময়।

কেন, সে যদি বিয়ে করে ফেদিকে?

উত্তেজনায় বিছানার উপর লাফিয়ে উঠল সুধাময়। যদি সে বিয়ে করে ফেদিকে! বালিশটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল। যদি কেন, সে বিয়েই করবে। সব দায়িত্ব মাথা পেতে নেবে। সে না পুরুষ, সে না আধুনিকতার প্রতিনিধি। ফেদি বিধবা, সে বামুনের মেয়ে। সুধাময় জানে, তার এই কাজে গ্রামে কি প্রবল আলোড়ন উঠবে। বাবা মা পাড়া প্রতিবেশী সবাই বাধা দেবে প্রাণপণে। তা দিক, সুধাময় গ্রাহ্য করে না। এতেও দারুণ কেলেংকারী হবে। তা হোক, পরোয়া করবে না সুধাময়। এ কাজে কেমন যেন এক বীরত্ব আছে। সে ফেদিকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে। সেখানে সংসার পাতবে দুজনে। আবার আলো দেখল সুধাময়। মনোমত এক পথ দেখতে পেল। অবৈধ নারী সংসর্গের পাপ সে মুক্ত করবে বিবাহের বৈধতার বন্ধন দিয়ে। দৈব দুর্ঘটনায় যে দুটি দেহ পাপের পংকে এসে মিশেছিল, বিয়ে করে, সংসার পেতে সে দুটি মনে তারা প্রেমের পদ্ম ফুটিয়ে তুলবে। এর জন্য যে বিপদই আসুক, সুধাময় মাথা পেতে নেবে। যদি ত্যাজ্যপুত্র হতে হয়, যদি এ পরিবার ছাড়তে হয় জন্মের মত, তাও স্বীকার করে নেবে সুধাময়।

সংকল্পটা নেবার পর সুধাময় দেখল তার মনের গ্লানি কেটে আসছে। নিশানা-হীন সমুদ্রে সারারাত তরী বেয়ে সুধাময় যেন ভোরবেলা কোন নতুন দেশের তটরেখা দেখতে পেয়েছে। ধীরে ধীরে তার মনে উল্লাসের সঞ্চার হতে লাগল। সুধাময় তখন আরো এক ধাপ আগে পা বাড়াল।

কেউ জানুক আর নাই জানুক, ফেদিকে সে বিয়ে করবেই। আর তার ভয়-ডর নেই। অমনি সুধাময়ের কানে ফেদির কাতর আহ্বান বেজে উঠল। গত সন্ধ্যায় তার বুকে মুখ রেখে অস্ফুটস্বরে বলেছিল, কাল আসো সুধাদা, দুপুরের পর আসো। অমনি আবার সুধাময়ের দেহে জোয়ার আসতে লাগল। প্রবল জ্বরের জোয়ার। ফেদির কাছে যাবার জন্য দুর্বার ইচ্ছা জেগে উঠল।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল সুধাময়।

গ্রামে সুধাময় আর ফেদিকে নিয়ে কম কেলেঙ্কারী হল না। সুধাময় যেমন যেমন ভেবেছিল, ঠিক তেমন তেমন ঘটে গেল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। পিসিমা সুধাময়ের পায়ের উপর মাথা কুটলেন। মা অন্নজল পরিত্যাগ করলেন। বাবা শক্ত পাথর হয়ে গেলেন। সুধাময় শুধু মেজকাকার সমর্থন পেল। না পেলেও ক্ষতি ছিল না। মাতার অশ্রুজলে বিচলিত হলে আর সমাজ সংস্কার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের মায়ের মত মা কজন লোকে পায়। সুধাময়ের একটু-খানি আফসোস রইল এই যে, বিদ্যাসাগরকে সে এ জিনিসটা দেখাতে পারল না। বোঝাতে পারল না যে, বাঙালী এখনও তাঁকে ভুলে যায়নি। ফেদি বড্ড ভীতু। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কলকাতায় আনতে সুধাময়কে বেশ বেগ পেতে হল। সুধাময়ের বন্ধুরা হৈ হৈ করে উঠল। কাজের মত কাজ করছে সুধা। কয়েকটা ফক্কড় অবশ্য ফোড়ন কাটতেও ছাড়ল না: ঐ রকম বিধবা আমাদেরও জোগাড় করে দে সুধা। অমন বিধবা পেলে আমরাও বিদ্যাসাগরের শিষ্য হয়ে যাই। সুধাময় গম্ভীরভাবে বলল, ফেদি যে সুন্দরী এটা নিতান্তই একসিডেণ্ট। বিয়েটা বড় নয় সুধাময়ের জীবনে, প্রিন্সিপলটাই বড়। বন্ধুরা সবাই হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল। তারাই চাঁদা তুলে বিয়ের এমন আয়োজন করে ফেলল যে, সুধাময় রীতি-মত অবাক হয়ে গেল। আরো বিস্ময় বুঝি বাকি ছিল। দেশবন্ধু সেটা পূরণ করলেন। স্বয়ং হাজির হলেন তার বিয়েতে। আশীর্বাদ করলেন। উপহার দিলেন খদ্দরের জাতীয় পতাকা। পরদিন খবরের কাগজে বিয়ের খবরটা ছাপা হয়ে গেল। উদারচেতা যুবক কর্তৃক বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান।

চট করে ঘুম ভেঙে গেল সুধাময়ের। দেখল প্রচুর বেলা হয়েছে। চোখ তখনও জ্বালা করছে তার। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। ঘন ঘন হাই তুলল। এত বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

সকাল যদি বা গেল দুপুর আর যায় না। সুধাময় অস্থির হয়ে উঠল। এ বাড়িতে এখনও খাওয়া দাওয়াই হয়নি কারও। লক্ষ্য করল, কত দেরিতে খাওয়া দাওয়া হয় তাদের বাড়িতে। সময়টা যে কত মূল্যবান বস্তু তা কলকাতার লোকের মত বোঝে না এরা, এই সব পাড়াগেঁয়ে লোকেরা। তাই শুধু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেই দিন কাবার করে দেয়।

কিছুক্ষণ ছটফটিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে সুধাময় নিজের ঘরে গিয়ে বসল। একখানা বই নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগল। একবর্ণও পড়তে পারল না। বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দরজা ভেজিয়ে দিল। তারপর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে শুয়ে শুয়ে টানতে লাগল।

হঠাৎ দুম করে উঠে পড়ল সুধাময়।

রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাঁক মারল, মা, তোমাদের রান্না হল?

বড়বউ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

বললেন, ক্যান রে মনি, খিদে পায়েছে?

অসহিষ্ণু সুধাময় জবাব দিল, খিদের আর দোষ কি? কলকাতায় কোনকালে আমাদের খাওয়া হয়ে যায়। এতক্ষণ ত আমাদের টিফিন খাওয়ারও সময় হয়ে এল। রান্না হয়ে থাকে বল, চানটা করে নিই।

বড়বউ অপ্রস্তুত হলেন। আহা, বাছার বড্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু মাছ আনতে আজ এত দেরি করে ফেললেন বড়কর্তা যে, এখনও পর্যন্ত মাছটাই রান্না হয়নি। মুড়িঘণ্টটা নামল কেবল। মাছটাও পাওয়া গিয়েছে ভালই। মেস বোর্ডিংয়ে কি খায় সুধা কে জানে? কেই বা আছে যত্ন করে খাওয়াবে? তাই পাঁচ রকম রাঁধতে বসেছেন বড়বউ। এর মধ্যেই সুধা তাড়া লাগাতে আরম্ভ করেছে।

বড়বউ তাড়াতাড়ি বললেন, ব'স না এখেনে। দুখোন মাছ ভাজে দিই খা।

এবার সুধাময় চটে গেল রীতিমত।

বলল, ওসব হাবিজাবি খাওয়ার সময় আমার নেই। ভাত যদি হয়ে থাকে ত দাও। না হলে চিঁড়ে মুড়ি যা থাকে আনো। নিয়মের খাওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। অনিয়ম এখন সহ্য হবে না। পাংচুয়ালিটির মর্ম তোমরা জীবনেও কখনও বুঝবে না। যাক গে, আমি এখনই চান করে আসছি।

সুধাময় চলে গেল। বড়বউয়ের মনটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। সুধাই যদি না খেল তবে এ ছিষ্টির রান্না কার জন্যে। সমস্ত শ্রম বরবাদ হয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ও ফুলির মা, রান্না এখন থো। সুধার আমার খিদে পায়েছে খুব। থাকতি না পারে চ্যান করতি গেল। আসে পড়ল বলে। তাড়াতাড়ি খান-কয়েক মাছ ভাজে দ্যাও। আর ও বেলার জন্যি সব তুলে রাখ।

আসলে খাওয়ার জন্য অত মাথাব্যথা পড়েনি সুধাময়ের। তার তাড়া অন্য কারণে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। দরজায় খিল এঁটে দিল। হ্যাঁ, এইবার সে নির্বিঘ্নে ভাবতে পারবে। যতক্ষণ তার খুশি। কেউ আসবে না তার চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাতে।

ফেদির কাছে যাবার আগে সে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে নিতে চায়। সুধাময়ের সংকল্প ঠিকই আছে। সে ফেদিকে বিয়ে করবে। এতে আর নড়চড় নেই। এখন ফেদির মত হলে হয়। সেটা খুব সহজে পাবে বলে সুধাময়ের মনে হচ্ছে না। কলকাতার মেয়ে ত নয়, পাড়াগাঁয়ের কুসংস্কারেই ফেদি হয়ত আচ্ছন্ন। হয়ত সে সুধাময়ের প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি তুলবে। তখন, সুধাময় মনে মনে স্থির করল, অকাট্য সব যুক্তি দিয়ে ফেদির অবৈজ্ঞানিক মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বীজ বপন করে দেবে। ফেদি তখন বুঝবে কি অসার সংস্কার সে আঁকড়ে ধরে আছে। তখন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করবে ফেদিকে। ফেদি তখন আনন্দের সংগে স্বেচ্ছায় এ বিয়েতে মত দেবে। শুধু বউই নয়, ফেদি হবে তার মন্ত্রশিষ্যাও। এই চিন্তায় বড় সুখ পেল সুধাময়। তার মনে পড়ল, অনেকটা এই রকম ব্যাপার যেন কোন একখানা ইংরাজী ছবিতে ঘটতে দেখেছিল। আদি খৃষ্টানদের উপর রোমকদের নিদারুণ নির্যাতনের কাহিনী নিয়েই ছবিখানা তোলা। এক সুন্দরী ক্রীতদাসীর মনে খৃষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে নবদীক্ষিত এক খৃষ্টান যুবককে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল সেই ছবিতে। কিন্তু প্রভুর কৃপায় সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সেই যুবতীকে দীক্ষিত করেছিল। তারপর দুজনের মিলনের মধ্য দিয়ে ছবিটির সমাপ্তি ঘটেছিল। সুধাময় দেখল, সেই যুবকের সংগে তার কেমন মিল হয়ে যাচ্ছে। ফেদিকেও যে সে তার আদর্শে দীক্ষা দিতে পারবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই তার। আদর্শ যে জীবনের থেকেও বড়, একথা ফেদিকে সে বোঝাতে পারবে বলেই তার দৃঢ় বিশ্বাস।

ফেদির সংগে সে চিরকাল সুখে কাটাতে পারবে, অথচ কোন কলঙ্কিত পথে চোরের মত তাকে হাঁটতে হবে না, এই সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুধাময়ের কাছে।

ফেদির মনটাই শুধু বদলে দেবে না সুধাময়, সে ঠিক করল বিয়ের পর তার নামটাও বদলে দেবে। ফেদি নামটা যে সুচারু নয়, বিশেষ করে যে মেয়েকে কল-কাতায় থাকতে হবে, যে হবে সুধাময়ের বউ, সেটা এখন খেয়াল হল সুধাময়ের।

শুয়ে শুয়ে গা এলিয়ে আসছিল সুধা-ময়ের। তারপর প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত তার মনোমত হওয়ায় মানসিক উদ্বেগও কমে আসছিল। বড় বড় গোটাকতক হাই তোলবার

সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি এসে ঘুমের অতলে নিয়ে ফেলল সুধাময়কে।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেলা শেষ হতে আর অল্পই বাকি। সুধাময়ের শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। একটা বড় হাই তুলে সে পরম নিশ্চিন্তে হাত পা ছড়িয়ে আবার গা এলিয়ে দিল বিছানায়।

তারপর তার শিথিল মনে যেন বিদ্যুৎ-স্ফুলিংগ জ্বলে উঠল। তার না ফেদির কাছে যাবার কথা! সর্বনাশ! বেলা যে আর নেই। সুধাময়ের বুকটা শিনশিন করে উঠল। এক লাফে নেমে পড়ল খাট থেকে। খাবলা খাবলা জল মুখে চোখে ছিটিয়ে দিল। জামাটা গায়ে চাপিয়ে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়ল। উর্ধশ্বাসে হাঁটতে লাগল ফেদির বাড়ির দিকে। বুক দুরদুর করছে অজানা এক আশঙ্কায়। যদি না থাকে ফেদি? সুধাময় যেন হাটের মাঝে মনিব্যাগ ভুলে ফেলে এসেছিল, মনে পড়তেই সেটা আনতে ছুটছে। কেন সে ঘুমিয়ে পড়ল এমন করে? এতক্ষণ ধরে কেন ঘুমল? নিজেকে চাবুক মারতে ইচ্ছে করছে সুধাময়ের।

বেলা থাকতে থাকতেই সুধাময় ফেদির বাড়িতে পৌঁছল। তাকে দেখতে পেয়েই ফেদির বাবা হুঁকোয় টান মেরে বেদম কাসতে লাগলেন।

কাসিটা কোনমতে সামলে বললেন, আরে কিডা, সুধাময় না? আরে বাপ্পর এত বড্ডা হয়ে গেছ? আমি ভাবি কিডা না কিডা? আসো আসো। বস। কবে আলে? থাকবা কদিন?

ফেদির বাবা কখন এলেন? সুধাময়ের চোখ থেকে দপ করে সব আলো নিভে গেল। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিল সে, সেটাও সংগে সংগে সরে গেল। ঠিক এই ব্যাপারটার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সে। সুধাময়ের মনে হল, তার ভবিষ্যতটা যেন চুরমার হয়ে ভেংগে পড়ল। কি কষ্টে যে সামলে নিল সুধাময়, সেই জানে। বোকার মত খানিক হাসতে চেষ্টা করল। আন্দাজে আন্দাজে প্রণাম করল ফেদির বাবাকে। তারপর ধপ করে বসে পড়ল মাটিতেই।

সাড়া পেয়ে ফেদির মা ভিতর থেকে থপথপ করে বেরিয়ে এলেন। বাতে একেবারে কোলাব্যাঙের মত ফুলে গিয়েছেন ফেদির মা।

বললেন, ও মা সুধা? তাই বল। আমি বলি সুধাময় আবার কিডা?

আবার বোকার মত খানিক হাসতে হল সুধাময়কে। প্রণাম করতে হল ফেদির মার গোদা পায়ে। এককালে ফেদির মতই সুন্দরী ছিলেন তিনি। তাকে দেখে আজ কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে

ফেদির মা ডাক দিলেন, ও ফেদি, দ্যাখ আসে, সুধা আয়েছে। আমরাও বাবা আজ দুপুরে আসে, পৌঁছলাম। তীথ করতি গিছিলাম। তা তীথই বল আর যাই বল, বাড়ি আসে যেন হাঁফ ছাড়ে বাঁচল্যাম। ফেদি ক'ল কাল তুমাগের বাড়ি গিছিল। বুড়ির ছাওয়াল নাকি বড় সুন্দর দেখতি হয়েছে? যাব একদিন দেখতি। তা বাড়ি যাবে কবে?

সুধাময় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ফেদি আছে, কাছাকাছিই আছে। কিন্তু কাছে আর নেই। কাছে আর আসবেই না আজ। আসছেও না। সবাই মিলে সুধাময়কে কেমন বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। কি যেন একটা জিজ্ঞাসা করলেন ফেদির মা।

ভাল করে না বুঝেই সুধাময় জবাব দিল, বেশ ত, কালই যাবেন একবার।

ফেদি খুব নরম সুরে ডাকল, মা শোন!

ফেদির স্বর সুধাময়ের দেহে যেন ঝংকার তুলল। রোমাঞ্চ হল তার দেহে।

ফেদির মা বললেন, বস বাবা, এট্টু পিস্‌সাদ খায়ে যাও। ও ফেদি সন্ধ্যে লাগল। পিদিম দে মা। তারপর সুধারে এট্টু পিস্‌সাদ দে। বেরো না, সুধারে আবার লজ্জা কি?

ফেদি তাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে? তাই বেরচ্ছে না? সুধাময়ের খুব মজা লাগল। ফেদি ত আচ্ছা অভিনয় করতে পারে?

ফেদির বাবা হুঁকো টানতে টানতে আর কাসতে কাসতে দীর্ঘ এক ভ্রমণ-কাহিনী ফেঁদে বসলেন। পথের কষ্ট, পাণ্ডাদের অত্যাচার, আরও নানা ব্যাপার। সব কানেও ঢুকল না।

বুঝলে বাবা খাওয়ার সুখ যদি বল ত তা হল কাশীতি। আঃ, যেমন মাছ মাংস, তেমন দুধ ঘি আর তেমনই তরি-তরকারী। কাশীর কাছে কেউ না। বোম ভুলানাথের জায়গা ত। পৃথিবীর বাইরি।

এইটুকু শুধু শুনেছিল সুধাময়। তারপর যে-মুহূর্তে ফেদি সন্ধ্যেবাতি দিতে বেরল, তার মন তার চোখ ফেদির সংগে সংগে ঘুরতে লাগল। কাল সে যেন ভাল করে দেখেই নি ফেদিকে। তুলসী তলায় জলের ছিটে দিচ্ছে ফেদি, গলায় আঁচল দিয়ে তাদের দিকে পিছন ফিরে গড় হয়ে প্রণাম করছে, প্রদীপ দেখাচ্ছে আর এক এক সময় ফেদির দেহের এক একটা অংশের উপর দৃষ্টি পড়ছে সুধাময়ের। সে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। প্রতিটি অংশ ওর কত সুগঠিত, কি অসাধারণ সুন্দর! ফেদির হাঁটা চলায়, পৈঁঠে বেয়ে এক একটা ঘরের বারান্দায় ওঠানামায় কত রকম ছন্দ যে ফুটে উঠছে ওর দেহে তার যেন কোন সীমাসংখ্যা নেই। একবারও কি আজ নিরিবিলিতে দেখা হবে না? একটা কথাও কি বলবে না ফেদি? একটিবারের জন্যও...

সুধাময়কে প্রসাদ খেতে দিল ফেদি। জল দিল। কিন্তু একবারও তার চোখে চোখে চাইল না। সে যে সুধাময়কে চেনে, কোনদিন দেখেছে, ফেদির চালচলনে, মুখ-চোখের ভাবে তা একদম প্রকাশ পেল না। খেতে দেবার সময়েই বোধ হয় নিকটতম সান্নিধ্যে এসেছিল তারা। কিন্তু এই সান্নিধ্যে তো কোন আহ্বান জাগল না? সুধাময় উত্তরোত্তর বোকা বনে যেতে লাগল, উত্তরোত্তর হতাশ হতে লাগল।

তারপর আবার অনেকক্ষণ দেখা পাওয়া গেল না ফেদির। এ পৃথিবীতে ফেদি বলে যেন কেউ নেই, কখনও ছিল না, এমন মনে হতে লাগল সুধাময়ের। তারপর অকস্মাৎ ফেদির আবির্ভাব হল। হাতে তার ছোট একটা পোঁটলা।

ফেদি বলল, এই প্রথম আজ কথা বলল সুধাময়ের সংগে, "বাড়ি যাও সুধাদা। এই পিস্‌সাদ ন্যাও। মা দিল। খুড়ির বল। চল তুমারে আলোটা ধরে দিই।"

এ কেমন কথার ঢং ফেদির? এ কেমন কাঠ কাঠ ব্যবহার? সুধাময় হাত পেতে পোঁটলাটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ফেদির বাবা বললেন, সুধাময় সুমায় টুমায় পালি আরেকদিন আসো, কেমন?

সুধাময় ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চলল। দরজার মুখে আসতেই ফেদি ফস করে একখানা চিঠি সুধাময়ের হাতে গুঁজে দিয়েই ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিঠিখানা মুঠো করে ধরতেই চনচন করে রক্তের বেগ বেড়ে গেল সুধাময়ের। থরথর সেই কাঁপুনি আবার ফিরে এল তার শরীরে। চিঠি নয়, যেন ফেদিকেই মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সুধাময়।

এত ছুটে বাড়ি এল সুধাময়, ঢুকে গেল নিভৃতে তার ঘরে, সে কি এই জন্য? তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পড়বার জন্য? কাঁপা-কাঁপা হাতে দলা পাকান চিঠিখানা খুলে পড়েছিল সুধাময়, দু লাইনের চিঠি। পড়া শেষ করে ফ্যাকাশে মুখে সেই থরথর করেই কাঁপতে লাগল আবার। এই দুই কাঁপুনির মধ্যে কি আকাশ পাতালই না ব্যবধান। একটা পুলকের শিহর, অন্যটা অসহ্য যন্ত্রণা। ফেদি লিখেছে, 'আসতে লজ্জা হল না। আমার সর্বনাশ করার জন্য এত উৎসাহ কেন'? দুটি মাত্র ছত্র। যেন দুটি শেল। অব্যর্থ লক্ষ্যে তার মর্মে

গিয়ে বিঁধল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সুধাময় মৃতপ্রায় হয়ে উঠল।

চিঠির যা ভাষা তাতে একথা স্পষ্ট যে, ফেদি সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। 'আসতে লজ্জা হল না।' যেন সুধাময় বিনা আহ্বানে সেখানে গিয়েছে। 'আমার সর্বনাশ করার জন্য এত উৎসাহ কেন?' মিথ্যাবাদী। সুধাময় যেন গর্জন করে উঠল। চিঠিখানাকে উঁচু করে ধরে সে বিড়বিড় করে বলল, একথা বলতে কি একটুও বাধল না। লজ্জা হল না তোমার। আমি কি তোমার হাত ধরে টেনেছিলাম? ঘরে নিয়ে খিল দিয়েছিলাম? আজ আমার ঘাড়ে সব অপরাধ, সব পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তুমি সতী সাজছ। আমার সম্পর্কে এই তোমার ধারণা! এত খারাপ। অথচ তোমাকে আমি কী ভেবেছিলাম। কত উঁচুতে তুলেছিলাম। আমি কোন পাপ মন নিয়ে আজ তোমার কাছে যাইনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। ঈশ্বর জানেন, একটা আদর্শ নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। মুহূর্তের দুর্বলতায় যে পাপ করে ফেলেছি, চিরতরে তার থেকে মুক্ত হবার পথ দেখাতে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি, তুমি কী! তুমি নীচ, তোমার মন অতি ছোট, কোন মহৎ ধারণা তোমার অন্তরে নেই, তাই তুমি আমাকে এমন যাচ্ছেতাই কথা বলতে পারলে। কিন্তু তমি যা ভাবছ, আমি তা নই, তা নই। তোমার সর্বনাশ করতে আমি যাইনি। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। চিঠির একটা কোনা ধরে প্রাণপণে ঝাঁকাতে লাগল সুধাময়। রাগে জ্বলতে লাগল। তারপর বুকে এক তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। ছিছি, ফেদি এমন ছোট। এত নীচ, এমন পাজী। আর সেই ফেদিকে নিয়ে সে এক সুখের প্রাসাদ গড়তে শুরু করেছিল। কী বোকা সুধাময়। যদি একা পেত ফেদিকে, তাহলেও না হয় সুধাময় তাকে বোঝাতে পারত, সত্যিই কোন বদ মতলব তার ছিল না। কিন্তু তা ত হবে না। সে আর একা কখনই ফেদির দেখা পাবে না। প্রয়োজনই বা কি? কে ফেদি? একটা অতি বাজে মেয়ে। সুধাময়কে নিয়ে অনায়াসে যেমন কাণ্ড সে করেছে, তার ঠিক কি? সোমত্থ বিধবা, তায় আবার এত রূপ। গ্রামে এই ধরনের লোকেরও অভাব নেই। তারা এতদিন ওকে আস্ত রেখেছে! হুঃ! চিঠিখানা কচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সুধাময়। পারলে হয়ত ফেদিকেও ছিঁড়ত।

সর্বনাশ হয়েছে তার। ফেদির স্পর্শে সুধাময়ের দেহেই পাপ ঢুকে গেছে। কি করবে সে? কিসে সে পরিত্রাণ পাবে? যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সুধাময়।

সারারাত ধরে সে এমন ছটফট করল। ভোর হতে না হতেই ঠিক করল আজই সে কলকাতায় ফিরে যাবে। আর এখানে থাকবে না। এক মুহূর্তও না।

কিছুতেই থাকল না সুধাময়। বলল, বিশেষ জরুরী কাজ, না গেলেই নয়। গোটা পরিবারকে হতভম্ব বানিয়ে, মার চোখে জল ঝরিয়ে বাড়ির গরুর গাড়ি করে সে দশটার মধ্যেই রওনা দিল। এ গ্রামের বাতাসে বাতাসে অসভ্য উদ্দামতা, অবিশ্বাস আর প্রবঞ্চনা। এখানে থাকলে আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না। সে পাগল হয়ে যাবে আর না হয়। বাইরে ফাঁকা রাস্তায় এসে কিছুটা হাঁফ ছাড়ল। সামনে তার সোজা শড়ক। আকাশ অনেক উঁচুতে। দম ফেলবার অবকাশ পেল সুধাময়। বিকাল নাগাত ঝিনেদা পৌঁছে যাবে। তারপর প্রথম রাত্রে চুয়াডাংগা। কাল এমন সময় সে কলকাতার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু ফেদি? ফেদির কথা আবার মনে পড়ল কেন? না না, তার কথা আর ভাববে না সে। কখনও না, কখনও না।

বিকালে ফেদি মাকে সঙ্গে নিয়ে সুধাময়দের বাড়িতে এসে দেখে সকলেরই মুখ ভার ভার। সে আর থাকতে পারেনি। কাল বাবা মা হঠাৎ এসে পড়ায় তার মাথা প্রায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সুধাময় এসে পড়লে কি মনে করবে তাঁরা, যেন ধরা পড়ে যাবে ফেদি, সেই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সারাদিন প্রার্থনা করেছিল সুধাময় যেন না আসে। বিকেল প্রায় পেরিয়ে গেলেও যখন সুধাময় এল না, তখন সে একটু হাঁফ ছাড়ল। আর তার একটু পরেই উদভ্রান্তের মত সুধাময় এসে হাজির। ফেদির মাথায় আকাশ ভেংগে পড়ল। সুধাময়ের উপর বেজায় রেগে গেল। কি এই লোকটা! আবার আজ এসেছে? লালসা ত কম নয় ওর। ঘৃণা হয়েছিল নিজের উপর, ঘৃণা করেছিল সুধাময়কে। তাই জ্ঞানগম্যি হারিয়ে অমন কড়া একটা চিঠি দিয়েছিল। তারপর সারা রাত ধরে বড় কষ্ট পেয়েছে নিজের মনে। সত্যিই সুধাদার কি দোষ? দোষী তো সে নিজেই। ভাল কথায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তার। কাল অবশ্য সময় ছিল না। তাই সারা দুপুর ধরে ফেদি গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখেছে। নিজের দোষ অকপটে স্বীকার করেছে। সুধাদা যেন তাকে ক্ষমা করেন। আর যেন দুজনের দেখা না হয়।

ফেদির মাকে দেখে চোখ ছলছল করে উঠল বড় বউয়ের। থপ করে বসে পড়ল ফেদির মা। আসতে তার বড় কষ্ট হয়েছে।

বললেন, কি লো বউ কেমন আছিস? মুখখানা ভার ভার ঠেকছে ক্যান?

বড়বউ বললেন, আসো দিদি বস। দুঃখির কথা আর কি ক'ব। সুধা বাড়ি আলো দু বছর পর। তেরাত্তিরও থাকল না। আজ সকালে কলকাতায় চলে গেল। আজকাল কলকাতার বাবু হয়েছে, বাড়ির ভাত আর মুখি রোচে না। এত ন্যাগাতা করলাম আর দুটো দিন থাকার জন্যি। তা আমরা তার কিডা? দাসী বাঁদী বইত নই।'

বড়বউ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। ফেদি চমকে উঠল। সুধাদা চলে গেছে? তবে কি তার কারণেই গেল? সেই চিঠিখানা পেয়ে? ফেদির হৃদপিণ্ডটা শক্ত মুঠিতে কে যেন চেপে ধরল। দম বন্ধ করে কে যেন মেরে ফেলেছে তাকে। সুধাদা নেই? আর একবার তার দেখা পেল না? তার মনের কথাটা না শুনেই চলে গেল সুধাদা?

ফেদির মা বললেন, সেকি, কাল যে দেখা হল সুধার সংগে। কতক্ষণ গল্প করল বসে বসে। কই কিছুই তখন কল না।

বড়বউ চোখ মুছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমাদেরউ কিছু কয়েছে নাকি কাল? সকালে ঘুমির থে উঠেই কল চললাম। চললাম বললি ত আর অপিক্ষে নেই। সংগে সংগেই পিরায় যায়। কোনমতে দুডো ভাত রাঁধে মুখি তুলে দিলাম। এতদিন পরে আলো, এটটু খাওয়াব দাওয়াব, তা কপাল!

ফেদি আর সেখানে বসল না। বসতে পারছিল না। চোখ জ্বালা করছে। বুকের খাঁজে লুকোন চিঠিটা বুক যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সে চট করে সুধাময়ের ঘরে চলে গেল। দরজাটা কোনমতে ভেজিয়ে দিয়ে পরিত্যক্ত বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। মনে মনে প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, যেন ফেদির মনের আওয়াজ সুধাময়ের কানে গিয়ে পৌঁছবেঃ ও আমি অন্যায় বলিছি সুধাদা, ও আমার মনের কথা নয়। ও কথা সত্যি নয়, সত্যি নয়।

(ক্রমশঃ)

যুগ পাল্টে গেলেও রীতি পাল্টায় নি। আজও নারী বীর্যশুল্কা। তারই কয়েকটি কাহিনী সম্প্রতি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

এক ধনী মহাজনের কুরঙ্গনয়না কন্যার বেপরোয়া প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এক যুবক ডাক্তার। কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল ধনীর দুলালীর বিলাসিতার কড়ি যোগাতেই তার বহু বছর কেটে যাবে।

খোঁজ নিয়ে সে জানতে পেরেছিল, ধনী মহাজনটি একজন পাকা জুয়াড়ী। সে তাঁর কাছে একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল। যদি সে বিষধর সাপের সঙ্গে একঘরে রাত কাটিয়ে জীবিত বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে তাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে। আর দিতে হবে যৌতুক হিসাবে একটা মোটা টাকার অংক।

মহাজন একটা ব্যবসার চুক্তি হিসাবে এটাকে মেনে নিলেন। মৃত্যুঘর তৈরি হল। এমন সব বিষধর সাপের সেখানে আমদানি হল যার একটা দংশনই যে কোন লোকের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু যুবক ডাক্তার বেপরোয়া। মৃত্যুঘরে সে ঢুকে পড়ল। পরদিন সকালে ঘর খুলতেই হাসিমুখে বিজয়ী বীরের মত সে বেরিয়ে এল। মহাজন তাঁর চুক্তি রেখেছিলেন। কিন্তু অনেক পরে হলেও তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাঁর জামাতা বিলাতী ইস্পাতের তৈরী পাতলা পাতের এক পোশাক পরে সেই মৃত্যুঘরে ঢুকেছিল।

পৃথিবীর অনেক জায়গায় বিয়ের জন্য এই ধরনের পরীক্ষা চলে আসছে। অসীম সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষার আহ্বান আসে যুবকদের কাছে মাঝে মাঝে। আফ্রিকার ট্রান্সভালের এক বৃদ্ধ সম্পন্ন কৃষি-ব্যবসায়ী তাঁর সুন্দরী একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থীদের জন্য ভয়াবহ এক পণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ড্যান এস্টারহাইজ রাজি হয়ে গেল। সিংহীর দুধ সে দুইয়ে আনবে। যে করেই হোক, এস্টেলা ফোনসেনের যোগ্য পাণিপ্রার্থী সে হবে।

ড্যান শক্তিমান হলেও চারদিকে তার খুব সুনাম ছিল শান্ত এবং নির্বিরোধী হিসাবে।

এক সপ্তাহ ধরে নানারকম পরিকল্পনার ছক এঁকে গেল ড্যান। সে সিংহীর চালচলন ও অভ্যাস সম্বন্ধে যতই ওয়াকিবহাল হয়ে উঠল ততই সে তার বিপদের স্পষ্ট রূপ দেখতে পেল। ক্রুদ্ধা সিংহীর থাবার এক আঘাতেই তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।
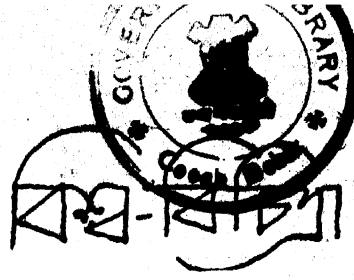
এক সপ্তাহ পরে ড্যান তার প্রস্তুতির কথা বন্ধুকে জানাল। বন্ধু তাকে বনের রাস্তা দেখিয়ে দেবার জন্য কিছু লোক ও একটা বন্দুক দিয়ে সাহায্য করল। দুপুরের কিছু পরেই লোকজন নিয়ে ড্যান সিংহের এলাকায় এসে পৌঁছল। পথপ্রদর্শকরা তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। এ পথ, ও পথ করে তারা শেষ পর্যন্ত একটা জলার ধারে এসে পৌঁছল। ড্যান জলার ধারে ফাঁদ পেতে ধুকপুক বুকে লোকজন নিয়ে দূরে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বনের ভেতর এখন অন্ধকার। গাছের উঁচু ডালে আলোর সামান্য আভাস। দূরে এক সিংহীকে দেখা গেল—জলার দিকে এগিয়ে আসছে। নির্বাক দৃষ্টিতে ড্যান তাকিয়ে আছে সিংহীর দিকে। সিংহী এগিয়ে আসছে। জলে মুখ দেবার আগেই সিংহী ফাঁদে আটকা পড়ে গেল। এবার দ্রুতপায়ে দড়ির ফাঁস হাতে নিয়ে ড্যান এগিয়ে গেল। ফাঁসের পর ফাঁস দ্রুতহাতে ছুঁড়ে মারতে লাগল সিংহীর দিকে। ফাঁসের কঠিন বাঁধনে আটকা পড়ে গেল সিংহী। একেবারে স্থির—নড়বার সাধ্যও তখন নেই। গর্জন বন্ধ হয়ে গেছে।

এরপর মাত্র কয়েক মিনিটের কাজ। সিকি পাইট দুধ দুইয়ে নিয়ে ড্যান লোকজন নিয়ে নির্বিঘ্নে সরে পড়ল।

প্যারিস থেকেই সব চাইতে মজার খবর এসেছে। সেই ওসমান-আয়েষা-জগৎসিংহের কাহিনী। এবার অসি নয়, মদের গ্লাস। শেষ পর্যন্ত যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে আয়েষা তারই।

পাঁচ পাইট মদ সাবাড়ের পর একজন দেখতে পেল তার প্রতিদ্বন্দ্বী কখন ঘর ছেড়ে চলে গেছে। পরের দিন জানা গেল আসল ব্যাপার। বেশি মদ খাবার ফলে যুবকটির মানসিক অবসাদ এসে গিয়েছিল। সে কোনরকমে টলতে টলতে বিদেশী সৈন্য সংগ্রহের অফিসে এসে পাঁচ বছরের জন্য সৈন্যবাহিনীতে তার নাম লিখিয়ে দিয়েছে। অপর যুবকটিও হঠাৎ আবিষ্কার করল, যে নারীকে নিয়ে তারা মাতামাতি করছে, সে আদৌ মাতামাতির যোগ্য নয়। সেও সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাল।

*

ইউরোপ ভ্রমণকারীগণ যে জায়গায় যান সেখানকার মদের—খুব সামান্য হলেও—স্বাদ নিয়ে থাকেন। এতো গেল ভ্রমণকারীদের কথা। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরাই স্থানীয় মদের সব চেয়ে বড় সমজদার। এমন একটি মদ-পাগলের সংবাদ সম্প্রতি

মহীশূরের সুলতান টিপুর ইংরেজবিদ্বেষ কত তীব্র ছিল তা টিপুর নির্দেশে তৈরি ইংরেজকে আক্রমণোদ্যত এই বাঘ দেখেই বোঝা যায়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর পরাজয়ের পর তদানীন্তন ইংরেজ সরকার শ্রীরংগপত্তম থেকে এটাকে লণ্ডন নিয়ে আসেন। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়মে আছে। এর যান্ত্রিক কৌশল এমনই ছিল যে, এর থেকে ইংরেজের আর্ত চিৎকার ও বাঘের গর্জন যুগপৎ শোনা যেত। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য গর্জন বন্ধ ছিল। বর্তমানে মেরামত করা হয়েছে

পাওয়া গেছে বুগোশ্লাভিয়া থেকে। যুগোশ্লাভিয়ার নিস শহরের ড্রাগোলজাব নামে এক ভদ্রলোক সমস্ত জীবন ধরেই মদের খুব সমজদার ছিলেন। বার্ধক্যে তিনি তাঁর তিন ছেলেকে ডেকে বললেন, "মৃত্যুর পরেও আমি এ অঞ্চলে মদের সমজদার হিসেবেই পরিচিত থাকতে চাই।" সেই অনুসারে তিনি তাঁর উইলে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, প্রতি মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর কবরের ওপর এক পিপে করে মদ ঢালতে হবে। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এই উৎসব আজ ৯ বছর ধরে চলে আসছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১০০ গ্যালন মদ তাঁর কবরের ওপর ঢালা হয়েছে।

*

টেক্সাসের অধিবাসীরা ১২৩ বছর পরে ১৯ পাউন্ডের এক জাতীয় ঋণ পরিশোধ করে ঋণশোধের এক নজীর রেখেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে এই ঋণশোধের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রতি বছর মেক্সিকো থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার দিনটিকেই তারা তাদের স্বাধীনতাদিবসরূপে পালন করে। ইতিহাসবেত্তা কয়েকজন নাগরিক হঠাৎ এই বকেয়া ঋণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত করেন।

এই ১৯ পাউন্ডের উত্তমর্ণ ছিলেন ১৮৩৬ সালের এক কামারশালার মালিক মিঃ নোয়া টি বায়ার্স। টেক্সাসের ওয়াশিংটন-অন-দি-ব্রাজোস শহরে এই কামারশালার একটি ঘরে মেক্সিকোর ৫৯ জন নাগরিক ১৮৩৬ সালে টেক্সাস রিপাবলিকের গোড়াপত্তন করেন। তারপরই শুরু হয় মেক্সিকো থেকে আলাদা হয়ে যাবার আন্দোলন। তারপরই সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হল, মেক্সিকো থেকে তারা আলাদা হয়ে গেলেন। ৯ মাস পরে ২৮তম দেশ হিসেবে টেক্সাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করল।

১৯৫৯ সালের টেক্সাসের স্বাধীনতা দিবস কমিটির ডিরেক্টর মিঃ টম হোয়াইটহেড মেক্সিকোর সেই ৫৯ জন নাগরিকের পক্ষ থেকে বকেয়া ঋণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কেননা ১৮৩৬ সালে তাঁরা এই ঘরভাড়ার ঋণ শোধ করতে পারেন নি। মিঃ টম হোয়াইটহেড এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নোয়া বায়ার্সের উত্তরাধিকারী মিস বায়ার্সের হাতে ১৯ পাউন্ডের এক চেক তুলে দিয়ে দীর্ঘ ১২৩ বছরের জাতীয় ঋণ পরিশোধ করেছেন।

*

কিছুদিন আগে ডিউক অব এডিনবার্গ যখন বোর্ণিও বেড়াতে এসেছিলেন, তখন তাঁকে পাখির বাসার সুপ খেতে দেয়া হয়েছিল। একথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠবার কোন কারণ নেই। পাখির বাসার সুপ খুব সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে পরিচিত। চীন এবং আরও অনেক দেশের অধিবাসী তো এ খাবার বলতে পাগল।

খাদ্য তালিকায় পাখির বাসার সুপের উল্লেখ দেখলেই মনে করবেন না, গাছের ছোট ছোট ডালপালা, পাখির পালক, আরও সাতপাঁচ নানা জিনিসের সেদ্ধ করা জল। এই সুখাদ্য পাখির বাসা উত্তর বোর্ণিওর বড় বড় চুণা পাহাড়ের গুহার মধ্যে পাওয়া যায়। এই বাসা একরকমের পাখির লালা-গ্রন্থির ক্ষরণজাত আঠালো জিনিস দিয়ে তৈরি। লালা দিয়ে তৈরি এই বাসাগুলো ঠিক সুতোয় বোনা বাসার মত দেখতে। দূরে থেকে মনে হয় যেন ময়দায় তৈরি স্তবক। গুহার ধার বা ছাদ থেকে এই বাসা সংগ্রহের অধিকার কেবলমাত্র বোর্ণিওর কয়েকটি পরিবারেরই আছে। তারা বংশানুক্রমে এই অধিকার ভোগ করে আসছে।

নড়বড়ে মইয়ের উপরে উঠে গুহার ছাদে এক হাত ঠেকিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা আর অন্য হাতে কাঁটাওয়ালা বর্শা দিয়ে বাসাগুলি ভেঙে আনা এক দুরূহ ব্যাপার। নিচে যারা থাকে তারা কাঁটাওয়ালা বর্শা থেকে বাসাগুলো খুলে নেয়। এইভাবে সংগৃহীত বাসা পরে বাক্সবন্দী করে নিলামে বিক্রি করা হয়।

যুদ্ধের আগে এ পাখির বাসার দাম ছিল দশ শিলিং করে আউন্স। কিন্তু সে তুলনায় দাম আজ অনেক চড়া। সুপ রান্না করার আগে বাসাগুলোকে বেশ করে গুঁড়িয়ে নিতে হয়। চীনাদের বিশ্বাস এই সুপের একটা অদ্ভুত ভেষজ গুণ আছে।

শ্যামের আশেপাশের দ্বীপ এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের সুখাদ্য পাখির বাসা অনেক পাওয়া যায়। পাখিরা সাধারণত পাহাড়ের এমন সব খাঁজে খাঁজে বাসা করে যে, মানুষ সেখানে সহজে উঠতে পারে না। কিন্তু তবু তাদের রেহাই নেই। মানুষ সেখান থেকে তাদের বাসা ভেঙে আনবেই।

*

কথায় বলে, খোদাই দেনেওয়ালা। খোদা যখন দেন তখন অপ্রত্যাশিতভাবেই দেন। এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ এসে গেল কুইন্সল্যান্ডের এক দরিদ্র মেকানিক ইভান্সের ভাগ্যে। গত বছর ১৯২৭ সালের মডেলের এক ভাঙ্গা গাড়ি কিনল ইভান্স মাত্র ৩০ পাউন্ডে। গাড়ির হুড খুলতে গিয়েই সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। হুডের ভাঁজে লুকান আছে ১৭০০০ হাজার পাউন্ডের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার কারেন্সি নোট। এ টাকা কার? ইভান্স সজ্জন ব্যক্তি। সে টাকাটার কথা জানিয়ে দিল। গাড়ির পূর্বতন মালিকের সম্পত্তির অছি টাকাটার দাবিদার দাঁড়িয়ে গেল। ফলে শুরু হল মামলা। শেষপর্যন্ত বিচারপতি ইভান্সকেই টাকাটার মালিক সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছেন।

শার্ঙ্গদেব

চর্যাপদ, ক্রমশ

এমন অনেক বস্তু আছে যা সংগীতের অন্তর্ভুক্ত অথচ সাহিত্যের ইতিহাসেও তাদের সম্বন্ধে আলোচনা কম হয়নি। উদাহরণস্বরূপ চর্যাপদের কথা বলা যেতে পারে। বলতে গেলে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস শুরুই হ'ল এই চর্যাগান থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন চর্যাপদগুলি সম্পাদিত করে প্রকাশ করলেন তখন বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চর্যা সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান চলেছে। তথাপি বহু গবেষণা সত্ত্বেও চর্যা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি সন্দেহ রয়ে গেছে। অতএব এ সম্বন্ধে যত বিস্তারিত অনুসন্ধান হয় ততই ভাল। চর্যা আসলে গান। সুতরাং আলোচনা উপলক্ষে সংগীতশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া উচিত বলেই মনে করি, কেননা এখান থেকেও কিছু সূত্র মিলতে পারে যাতে চর্যার একটি স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত সংগীতরত্নাকর নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় চর্যার বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায় যে চর্যাগানের পদ্যাংশ পজ্‌ঝটিকা বা তদনুরূপ ছন্দে প্রস্তুত হত। এসব গানে আমাদের বাংলা গানের মত দুলাইনের শেষ অক্ষরে মিল থাকত। এতে সাধারণত যে তালের প্রয়োগ হত তার নাম—দ্বিতীয়। এসব গানে সব ক্ষেত্রেই ছন্দের তেমন বাঁধাবাঁধি ছিল না। তবে, সাধারণভাবে এগুলি ছিল ছন্দোবদ্ধ পদ। গানের সব পদগুলিই আবৃত্তি করে গাওয়া হত অথবা কেবলমাত্র যে পদটি ধ্রুব বলে নির্দিষ্ট ছিল সেটিরই সম্মিলিতভাবে আবৃত্তি করা হত। চর্যাগান আসলে সাধন সংগীত—এইকারণে একে বলা হয়েছে "অধ্যাত্মগোচর"। এটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধন-সংগীত কি না সে সম্বন্ধে কিছু সংগীতশাস্ত্রে বলা হয়নি। এর সংগে সংগত হিসাবে মণ্ড-ডক্কা নামক একটি চর্মপদের কথাও বলা হয়েছে। সংগীত-রত্নাকরের দুটি টীকাতেও এই সংগীতের প্রয়োগ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা আছে। টীকার লক্ষণ দেখলে কিন্তু সন্দেহ হয় টীকাকারদ্বয় চর্যা আদৌ স্বকর্ণে শুনে-ছিলেন কি না। তবে শোনেননি এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। অন্তত চর্যার একটি ট্রাডিশন তাঁদের যুগেও ছিল—এমন ধারণা অসংগত নয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, চর্যাগান এর বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানেই চর্যা গাওয়া হত। সংগীতরত্নাকর প্রণেতা ছিলেন বর্তমান গুজরাটের অধিবাসী এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে। সে যুগে তিনি যে সুদূর গুজরাট থেকে চর্যাপদের অনুসন্ধানে বাংলায় এসেছিলেন এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। অতএব এই ধারণাই সংগত যে চর্যাগান কেবল বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ চর্যাগান কোন বিশেষ ভাষাভাষীর নিজস্ব

জিনিস নয়। চর্যাগান যদি সম্পূর্ণ, আঞ্চলিক হত তাহলে রত্নাকরে তেমন কোন উল্লেখ থাকত কেননা যে সব সংগীত কোন বিশেষ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল রত্নাকর সেই অঞ্চলগুলির বিশেষ উল্লেখ করেছেন।

চর্যাপদ সেকালকার কোন একটি বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে গঠিত যে সব গীতের পরিচয় পাওয়া যেত চর্যা ছিল তাদের অন্যতম। এই কারণে এই গীতকে প্রকীর্ণক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কীর্তনের মত আবৃত্তি করে গাওয়া হলেও চর্যাকে কীর্তনের আদিরূপ বলে ধারণা করলে অত্যন্ত ভুল হবে। এমনভাবে আবৃত্তি করে গাওয়া সে যুগে বহু গীতেই প্রচলিত ছিল। চর্যার চেয়ে কীর্তনে বিদগ্ধজনের বিশেষ হাত ছিল কেননা কীর্তনকে সে যুগের ষড়ংগ প্রবন্ধের আদর্শে গঠন করা সম্ভব হয়েছে। চর্যার ধারা ছিল স্বতন্ত্র এবং এই গীতের তেমন একটি উজ্বল সম্ভাবনাও ছিল না।

চর্যাপদে বিভিন্ন রাগের উল্লেখ দেখে এই শ্রেণীর গীতকে উঁচুদরের সংগীত মনে করলে সে অনুমানও অসংগত হবে। মঙ্গলকাব্যেও নানান রাগের উল্লেখ ছিল কিন্তু এই গীতগুলি উচ্চ শ্রেণীর সংগীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে, পদের ওপর রাগের উল্লেখ বাংলার একটি বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এতে এটা অনুমান হয় যে বাংলার কোন কোন অংশে চর্যার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কালক্রমে এই গীতরূপটি কেমনভাবে অপরাপর গীতের সংগে মিশে গেছে সেটি বর্তমানে বলা কঠিন।

বর্তমান বাংলায় লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত অনেক গান প্রচলিত আছে, যার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না অথচ কোন কোনটির সংগে হয়ত এক একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর সংগীতের যোগ রয়েছে। ঝুমুর এই শ্রেণীর একটি গীত বলে মনে হয়। ঝুমুর বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীত। যদিও ঝুমুর এক প্রকার লোকসংগীত তথাপি এর প্রভাব বাংলার সংগীতে কম নয়। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর "পদাবলী পরিচয়" গ্রন্থে জানিয়েছেন—"কীর্তনের আর একটি অংগ 'ঝুমুর'। 'ঝুমুর' বা ঝুমরী একটি সুর। পদাবলীতে পাই—'ঝুমরী গাইছে শ্যাম বাঁশী বাজাইয়া'। ভক্তিরত্নাকরে ঝুমরীর উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন ঝুমুর গান থেকে কবিগানের উদ্ভব হয়েছে। শ্রীভবতোষ দত্ত তাঁর "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী" গ্রন্থে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—"প্রাচীন কালিয়-দমন যাত্রার কৃষ্ণলীলা প্রসংগে ঘটিত সংগীতগুলির নাম ছিল ঝুমুর। বালকেরা ঐকতানে ঝুমুর গান করত; এই ঝুমুর গান থেকেই শ্রোতারা বুঝতে পারত কোন পালার যাত্রা হবে।"

ঝুমুরের এতখানি প্রভাবের প্রধান কারণ ঝুমুরের চিত্তাকর্ষক সুর, গঠন এবং ছন্দ। এছাড়া ঝুমুর প্রেমের গান—এটিও একটি মস্ত আকর্ষণ। শ্রীরামেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বিষ্ণুপুর" নামক গ্রন্থে বিশ্বম্ভর রচিত একটি ঝুমুর গানের স্বরলিপি দিয়েছেন। গানটি উদ্ধৃত করছিঃ—

ওকে যায় গো যায় বাজায় বাঁশী মন কেমন করে
ও তার বাঁশী শুনে কভু যেতে নাহি মন সরে।
আহা কি রূপ তাহার
বর্ণিবে সাধ্য কার
তাই প্রাণ সঁপেছে কত-শত সুন্দরী চিরতরে॥

যে তালে এই গানটি গাওয়া হত সেটি আমাদের আড়খেমটা জাতীয় তাল। উনবিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত এই আড়-খেমটা চালের গানেও ঝুমুরের বিশেষ প্রভাব ছিল বলে মনে হয়।

ঝুমুর গান যে কত প্রাচীন তা বলা শক্ত। ঝোম্বাড়া নামক একটি বৃহৎ গীতরূপের পরিচয় সংগীত রত্নাকরে পাওয়া যায়। এটি সেকালকার সবচেয়ে বড় দেশী সংগীত শুদ্ধ সুরের অন্তর্গত ছিল। অনুমান হয় যে এই "ঝোম্বাড়া"ই বর্তমান ঝুমুরের আদিরূপ। অবশ্য এমন কোন বিশেষ সূত্র নেই যা দিয়ে আমরা পূর্ববর্তী ঝোম্বাড়ার সংগে ক্রমবিবর্তন অনুসারে বর্তমান ঝুমুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি তথাপি ঝোম্বাড়ার সংগে ঝুমুরের নামগত এবং লক্ষণগত কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে এটা অস্বীকার করা যায় না। সংগীত দামোদর এবং পঞ্চমসার সংহিতায় "ঝুমরী" নামক গীতকে সালগ বা মিশ্রসূড়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। এই উল্লেখ থেকে মনে হয় পূর্বযুগের ঝোম্বড়া পরবর্তীকালে ঝুমরীতে পরিণত হয়েছিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও এই গ্রন্থদ্বয় থেকে ঝুমরীর উল্লেখটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

রত্নাকর ঝোম্বড়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শুদ্ধ ঝোম্বড়ায় পূর্বে যুগের উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ—এই চারটি কলিই যুক্ত ছিল। এই গান সেকালকার বিখ্যাত দশটি তালের যে কোন একটিতে গাওয়া হত। এই দশটি তাল হচ্ছে—নিঃসারুক, কুড়ুক্ক, ত্রিপুট, প্রতিমণ্ঠ, দ্বিতীয়, গারুগী, রাস, যতি, লম্ভন, অড্ড এবং একতালী। এর অনেকগুলি প্রাচীন বাংলাতেও প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই গীতগোষ্ঠীতে প্রযুক্ত কোন তালই অধুনা প্রচলিত ঝোমরা তালে রূপান্তরিত হয়েছে। ঝোম্বড়া গানের মোট প্রকারভেদ হচ্ছে ৩৫১০। এ থেকেই বোঝা যায় এর প্রচলন কত ব্যাপক এবং বহুল ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চিত্র এবং বিচিত্র নামক দুটি গীতরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দুটি এই ঝোম্বড়ারই অন্তর্গত ছিল। অনেকের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর শ্রেণীর গীত। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হচ্ছে এই যে ঝোম্বড়া গানে বিবিধ অলংকারের প্রয়োগ হত—তার মধ্যে উপমা, রূপক এবং শ্লেষের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ঝুমুর গানেও এই অলংকারগুলির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া—বীর, বিলাস, বীভৎস, অদ্ভুত, ভয়ানক, হাস্য, শৃংগার, রৌদ্র এবং শান্ত রসেও এই গান নানাভাবে বিনিযুক্ত হত। এই ঝোম্বড়া গান আবার গদ্য, পদ্য, গদ্য-পদ্য তিনটিকে অবলম্বন করেই রচিত হত। এই সব লক্ষণ থেকে অনুমান হয় সেকালের ঝোম্বড়া গীত নানা অভিনয়াত্মক গীতে বা বিষয়ে প্রযুক্ত হত। এই ধারাটিই পরবর্তী ঝুমুরে বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

আমরা কেতাবি প্রমাণ অনুসারে এইটুকু পাচ্ছি যে, শুদ্ধসূড় পর্যায়ের ঝোম্বড়া ক্রমে ঝুমরী নামে মিশ্র বা সালগ সূড় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিশেষে সম্ভবত এরই একটি চটুল ধারা বর্তমান ঝুমুরে পরিণত হয়েছে। এই লঘু ধারাটি বর্তমানে ভদ্র সমাজে প্রচলিত না থাকলেও একদা এর বহু মার্জিত রূপও প্রচলিত ছিল এবং সেগুলিই পুরাতন বাংলা গানকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

অনুবাদ

মাটির মানুষ—কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। অনুবাদ : সুখলতা রাও। ত্রিবেণী প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যে বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদের সংখ্যা স্বল্প নয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতবর্ষেরই অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় অল্পই। বলা বাহুল্য, ভাষার পার্থক্যই এই অপরিচয়ের একমাত্র হেতু। সাহিত্য আকাদামী তাই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির ভারতীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ প্রকাশের যে আয়োজন করেছেন তার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের পাঠকদের মত বাঙালী পাঠকমাত্রেরও অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির লেখক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্য-জগতের একজন কৃতিমান কবি ও ঔপন্যাসিক; বস্তুবাদী জীবনমুখী শিল্পী তিনি। তাঁরই বিখ্যাত উপন্যাস 'মাটির মানুষ'-এ পল্লীজীবনের যে ছবি আঁকা হয়েছে, সেখানে যৌথপরিবারের সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মানুষের মহত্বের সদ্‌গুণগুলি আজও রয়েছে অক্ষুণ্ণ, অম্লান। দেশকালের সীমা পেরিয়ে বইখানি পাঠকমাত্রেরই মনে সাড়া জাগাবে।

সুখলতা রাও-এর অনুবাদ মূল বইয়ের রস সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ৯৯।৫৯

দু কুনকে ধান—শিবশংকর পিল্লাই। অনুবাদ : মলিনা রায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা—১২। তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মালয়ালম ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'রণ্টিটঙ্গষী'-র বাংলা অনুবাদ। কটনাড অঞ্চলের কৃষিভূমির ভূমিহীন চাষীদের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এর বিষয়বস্তু। এই ধরনের চাষীরা মজুরি হিসাবে পায় রোজ দু' কুনকে ধান। তা থেকেই বইটির নামকরণ।

লেখক শ্রী পিল্লাই এই ধরনের মজুরদের জীবন খুব কাছে থেকে যে দেখেছেন, তার ছাপ বইখানির সর্বত্র। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনের ব্যর্থতা আর সাফল্য, অতীতের প্রতি নিষ্ঠা আর মোহ, সমাজবিবর্তনের ফলে তাদের আশাভংগ ও দুঃখদুর্দশা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামময় জীবন—সবকিছুই লেখকের উদার বুদ্ধি ও সংবেদনশীল মনের ছোঁয়ায় সার্থক সাহিত্যকর্মে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বইখানি পাঠকমাত্রকেই তৃপ্তি দেবে।

ইন্দু দুগারের আঁকা প্রচ্ছদপটটি রেখার বলিষ্ঠতায় ও ভাবদ্যোতনায় অনুবাদগ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ৯৮।৫৯

প্রেম মৃত্যুহীন—আরভিং স্টোন। অনুবাদ : গীতা দেবী। পার্ল পাবলিকেশনস, বোম্বাই—১। (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রতি খণ্ড—এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি আরভিং স্টোন-এর বিখ্যাত উপন্যাস, 'লভ্ ইজ্ ইটারন্যাল'-এর সার্থক বাংলা অনুবাদ। সমসাময়িক আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পটভূমিকায় রচিত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ও তাঁর স্ত্রী মেরী লিংকনের এই রসঘন প্রেমোপাখ্যান দেশকালের সীমা পেরিয়ে সকল পাঠকের মনেই সাড়া জাগাবে। অনুবাদের ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বইখানি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সর্বশেষে, বইখানি এত স্বল্পমূল্যে

পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রকাশককে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়।

৬৮-৬৯।৫৯

কবিতা

দ্বিতীয় সন্ধি—দুর্গাদাস সরকার। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু এই দ্বিতীয় গ্রন্থই যে পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে তাতে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে।

দ্বিতীয় সন্ধির কবিতাগুলি প্রধানত রোমান্টিক। কিন্তু এই রোমান্স বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। বস্তুজগৎকে স্বীকার করে নিয়েই কবির এই ভাবকল্পনা। আর সেই কারণেই কবিতাগুলি মনকে দোলা দেয় বেশী। কবির অভিব্যক্তির মধ্যে কোথাও আড়ম্বরের আতিশয্য যেমন নেই, তেমনি নেই ভাবকল্পনার জটিল দুর্বোধ্যতা। সহজ সরল ভঙ্গীতে অথচ বলিষ্ঠ লেখনীর টানে রূপ পাওয়া এই কবিতাগুলি পাঠক-মাত্রকেই তৃপ্ত করবে।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের আঁকা প্রচ্ছদপটটি প্রশংসার্হ।

৬১৮।৫৮

শ্রীমতী মিস্তু সেন—বীরেন রায়। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা—১২। দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের 'রঙ্গ ব্যঙ্গ কবিতা'র সংকলন। কিন্তু এই রঙ্গ ও ব্যঙ্গের রূপায়ণে যে অনবদ্য শব্দ চয়ন ও ছন্দের প্রয়োগ কবি করেছেন, তাতে একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের খাপছাড়া বা সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল জাতীয় গ্রন্থের উত্তরসাধনায় তিনি একজন সার্থক উত্তরসূরী। বইখানি শুধু যে ছোট-দেরই আনন্দ জোগাবে তা-ই নয়, বড়-দেরও তৃপ্তি দেবে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

৬৭।৫৯

উজল সবুজ—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা—৩৭। দুই টাকা।

কবিতার বই। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-বস্তু ও মতবাদের ভিত্তিতে রচিত হলেও, কবিতাগুলোর মূল সুর হল আধুনিক যুগে মানব-মনে যে বেদনা, বিক্ষোভ, সংশয় ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এবং সেই সঙ্গেই রূপ ও প্রকৃতির চিরন্তনী সত্তায় গভীর আস্থা। এক গভীর প্রত্যয় বইখানির প্রতিটি কবিতায় তার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু বক্তব্যের এই বলিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গী সর্বত্রই সমান নয়, কোথাও কোথাও তা দুর্বল। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে অভি-ব্যক্তি ও আঙ্গিকের এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সার্থক কবি হিসাবে বাংলা কাব্যসাহিত্যের জগতে তাঁর স্থান করে নিতে পারবেন।

৪২৫।৫৮

উপন্যাস

আদিগন্ত—সরদার জয়েনউদ্দীন। গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী, ঢাকা। তিন টাকা বারো আনা।

মাটির মানুষ নরোত্তম বৈরাগী গান গায় সব ভুলে। গান গায় তার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে কুমারী সরলা। আর গান গায় মনের আনন্দে কবিরাজ মেহের। জাত-বিচারের বেড়া ডিঙিয়ে সুরের বাঁধনেই বাঁধা পড়ে দুটি সরল তরুণ প্রাণ।

কিন্তু বাধা আসে। রূপ আর রূপেয়ার লোভে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে ভণ্ডামীর খোলসে লুকিয়ে থাকা গ্রাম্য প্রেসিডেন্ট পীর সাহেব আর দারোগা লস্কর সাহেব। তাদের চক্রান্তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় দুটি কোমল প্রাণ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুটি গোটা পরিবার।

তবু নির্যাতনেরও একটা সীমা আছে, সীমা আছে অত্যাচার-অবিচারের। আছে তার শেষ। তাই শেষ পর্যন্ত পীরসাহেব

আর লস্কর সাহেবের খোলসও খ্লে পড়ে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় ন্যায় বিচারের। জয়ী হয় চিরজয়ী প্রাণ, জয়ী হয় তার ভালবাসা।

এমনি একটি কাহিনীকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসখানি। লেখকের লেখায় মুন্‌শীয়ানা আছে। তাঁর প্রত্যয় যেমন গভীর ও বলিষ্ঠ, তাঁর পাত্র-পাত্রীরাও তেমনি স্বীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। বইখানি লেখকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিতে ভরা।

১০৪।৫৯

বন্ধহীন—কনক মুখোপাধ্যায়। গণ-সাহিত্য ভবন, ১৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—১৭। দুই টাকা।

ভাঁড়ার ঘরের অন্ধকার কোণে জিনিসপত্র চারিপাশে ছড়িয়ে বসে আছেন পট্টবস্ত্র পরিহিতা, ঈষৎ স্থূলকায়া গৃহকর্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। কিছুক্ষণ আগে গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে দেখা হয়েছিল বিনোদ-দার—তার ছোটবেলাকার বিনুদার সাথে। কিন্তু সে চিনতে পারেনি তাকে। আর এই না চিনতে পারাটাই হিরণ্ময়ী দেবীর মনকে নাড়া দিয়েছে সজোরে। ভাঁড়ার গুছোন তাই পড়েই রয়েছে, তার মন হাতড়িয়ে ফিরছে সুদূর অতীত। এই অতীতকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাস।

ফ্ল্যাশব্যাক-টেকনিকে লেখা এই উপন্যাস-খানি সুখপাঠ্য এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

৫৯৬।৫৮

গোধূলিতে বাঁধে নীড়—রঞ্জন সাহা। মডার্ন পাবলিশিং কোম্পানি, ৫।১এ নূর মহম্মদ লেন, কলিকাতা—৯। তিন টাকা।

নাগরাজপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার হিমাদ্রিপ্রসাদের চক্রান্তে নিহত হল সেই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের নেতা রঞ্জন। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ কল্পে এগিয়ে এল অঞ্জন, কিন্তু জমিদারের কুটিল চক্রান্তে, সরকারী শক্তির বিরূপতায় আর প্রতিক্রিয়া-শীলদের প্ররোচনায় ব্যর্থ হয়ে গেল কৃষক আন্দোলন। এরই পটভূমিকায় লেখক এঁকেছেন নায়ক অঞ্জন আর নায়িকা বারুণীর অশ্রুসজল প্রেমোপাখ্যান।

লেখকের লেখায় দরদ থাকলেও, ঘটনা-বিন্যাসের অতিনাটকীয়তা রসসৃষ্টির সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়েছে। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ। আমরা আশা করবো, ভবিষ্যতে তিনি সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম হবেন।

৮০।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

কষ্টি কবিতা ও একলব্য—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিয়ের প্রুফ বউ—শিবরাম চক্রবর্তী।

ভাল লাগার নেশা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

উদয় বাণী—অঞ্জনবরণ বিশ্বাস।

কান্নার রং—মহুয়া।

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ—মণি বাগচি।

আশীর্বাদ—নির্মলেন্দু ঘোষ।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার — তুলসীদাস লাহিড়ী।

কবি দীপিকা—(মেদিনীপুর জেলার কবি পরিচয়)

ট্রামে-বাসে

"ইয়ং গ্রুপ" নামক কংগ্রেস দলটি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা সুফলের জন্যই প্রতীক্ষা করব। কিন্তু ইতিমধ্যে "কাঁচকলা গ্রুপ" (হয়ত তাঁরাও আছেন) 'আদায়-কাঁচকলায়' না করলেই বাঁচি"!!

* * *

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম, প্যারিসে নাকি নৈঃশব্দ্য অভিযান শুরু হইয়াছে। ইহার অর্থ—এক সপ্তাহকাল যতদূর সাধ্য নিঃশব্দে গাড়ি চালাইতে

হইবে, রেডিওর মুখরতা নীরব করিতে হইবে এবং পারিবারিক কলহ মৃদুস্বরে চালাইতে হইবে।—"সবই বুঝলাম এবং সব ক'টা নির্দেশ পালন করাই হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু শেষের নির্দেশটা অর্থাৎ পারিবারিক কলহ? লাগ্‌ধুমোধুমো লেগে গেলে আইনের বাবার সাধ্যি কী থামায়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

খড়দহ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কোন এক কুমারী নাকি বরের জন্য সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন।

বরপক্ষ তার শাসানিতে প্রথম ভীত হন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহেরই জয় হইল, বরপক্ষ বিবাহে রাজী হইলেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"দেখে শুনে মনে হয়, সত্যাগ্রহটা আগেকার দিনের উমার তপস্যার মেড ইজি সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্যাগ্রহ তো হলো, অতঃপর বিবাহ ব্যাপারে বরেরা যদি হঠাৎ লড়কে লেঙ্গে নীতি অনুসরণ করে তাহলে কী হবে তাই ভাবছি"!

* * *

"স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন"—একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"পরীক্ষার পদ্ধতি তো পরিবর্তন হলো। কিন্তু পরীক্ষার পর চা-এর দোকানে বসে খাতা দেখা, পরীক্ষার খাতা দিয়ে ঠোঙা তৈরি করা প্রভৃতি পদ্ধতির পরিবর্তন হবে তো"?

* * *

"ভুটানের মধ্য দিয়া একদল চীনার ভারতে প্রবেশ"—একটি সংবাদ শিরোনামা।—"অনেক অচিনারা কোন পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছেন তার খবর কাজনেই বা রাখেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ খ্রুশ্চেভের জামাতা "ইজভেস্তিয়া" কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"জামাতা জীবন ঘোষণা করেছেন, তাঁর নীতি হবে 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন'"!!

* * *

কলকাতা পার্ক সার্কাসে নাকি সংখ্যালঘুদের জন্য একটি "আত্মরক্ষা" সমিতি স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে।—"চাচা আপন বাঁচা নীতি মন্দ নয়, কিন্তু এটা কি আপনা বাঁচা, না পার্ক সার্কাসের নতুন সার্কাস"—বলে শ্যামলাল।

* * *

আসামকে পাকিস্তানভুক্ত করার স্বপ্ন—একটি সংবাদ। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সংবাদে ভুল রয়েছে, এটা স্বপ্ন নয়, দেয়ালা"!!

* * *

বিহার সরকারের কৃষি দপ্তর ইঁদুর ধ্বংস করিবার জন্য ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন।—"অতঃপর বেড়ালের বাজার তেজি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সুবিধে কিছু হবে কি? সাম্প্রতিক সংবাদে শুনিলাম, কোথায় ইঁদুরেরা মিলে একটি বেড়াল মেরে ফেলেছে। ইঁদুর আর সে ইঁদুর নেই তো।"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

এক সভায় পুলিস মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জুতো চুরি গিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"কিন্তু চোর মিছামিছি পরিশ্রম

করলেন, তিনি বোধ হয় জানেন না, মন্ত্রীর জুতো সবার পায়ে ফিট্ করে না। তবে হ্যাঁ, জুতো জোড়া যদি স্মারক চিহ্নরূপে রাখতে চান তবে সে আলাদা কথা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলা দেখিয়া বিলাতের কোন এক কাগজ নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, এঁদের খেলা দেখিয়া মনে হয়, এঁরা যেন হামাগুড়ি দিয়া চলে।

"স্বীকার করতে লজ্জা নেই ক্রিকেটে ভারত শিশু। সুতরাং হামাগুড়িটা বুঝি। কিন্তু খুব বেশিদিনের কথা নয়, অস্ট্রেলিয়ায় অনেক পাকাদেরও যে নেংচাতে দেখেছি"—বলিলেন জনৈক ক্রিকেট রসিক সহযাত্রী।

চন্দ্রশেখর

অপু চরিত্রের বিচার

সত্যজিৎ রায় গত ১লা জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অপুর সংসার' ছবিটির সমালোচনার কয়েকটি বক্তব্য খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন গত সপ্তাহে প্রকাশিত তাঁর সুদীর্ঘ চিঠিতে। 'অপুর সংসার' ছবির যে-সকল বৈসাদৃশ্যের কথা সমালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল তার মাত্র কয়েকটি খণ্ডন করতে গিয়ে সত্যজিৎবাবু যে সত্যসন্ধানী দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছেন তা বলতে পারি না।

শ্রীরায়ের প্রথম অভিযোগ, ছবিটি সম্পর্কে সমালোচকের মতামতে 'অসঙ্গতি' প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর বক্তব্য তিনি সমর্থন করেছেন আমাদের একটি বাক্যের অসম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করে (সুবিধামতো ছবির বিজ্ঞাপনে যেমন সময় সময় সমালোচনার অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দেখা যায়)। যেখানে ছিল "বিভূতিভূষণের অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টির মর্মরস ছবিতে পরিপূর্ণ রূপ না পেলেও সত্যজিৎ রায়ের একটি নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে 'অপুর সংসার'—ভাবে, রসে ও অভিনয়ে—বাংলার চলচ্চিত্রের একটি অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে", সেক্ষেত্রে তিনি বাক্যের শেষ প্রশংসার অংশটুকু উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন যে সমালোচক প্রথম ও শেষাংশে ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করে মধ্যাংশে মূল উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ছবিটির বিবিধ দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন। সমালোচনার প্রথম দিকে ছবির গুণের আলোচনা ছিল এবং ভূমিকায় এক 'অপূর্ব শিল্প পরিণতির' কথা বলা হয়েছিল ছবিটি সম্বন্ধে—কিন্তু সেটি যে বিভূতিভূষণের উপন্যাসের সার্থক ও ভাবানুগ চিত্ররূপ তেমন কথা তো আমরা বলিনি। সুতরাং 'অসঙ্গতি' কোথায়?

'দেশ'-এর সমালোচনায় বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক মানস ও পরিচালকের কল্পনার গরমিল সম্বন্ধে যে উক্তি করা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "সাহিত্যিকের কল্পনা লিখিত ভাষায় ব্যক্ত; পরিচালকের কল্পনা (উপন্যাসের উপর ভিত্তি হলেও) মূলত গতিশীল ছবির মাধ্যমে পরিস্ফুট। দুই-এ যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, সমালোচক কি সেটি বোঝেন না?" 'অপুর সংসার' দেখে সেটি সত্যিই আমরা বুঝেছি। তবে আমাদের এ-ধারণা ছিল না 'গতিশীল ছবির মাধ্যমে' সাহিত্যিকসৃষ্ট জীবন্ত চরিত্র নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে, সাহিত্যসৃষ্টির মূল রস 'গতিশীল ছবির মাধ্যমে' শুকিয়ে মরে।

এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আজ অবধি এমন কোন সার্থক চলচ্চিত্র রচিত হয়নি, যেখানে পরিচালককে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।" সত্যজিৎবাবু লক্ষ্য করে দেখেননি, সমালোচনায় ছিল "মহৎ শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে ছোট ছোট ঘটনা ও অংশের পরিবর্জন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনার আশ্রয় যেমনভাবে নিয়েছেন তা চিত্রস্রষ্টার দৃষ্টিসিদ্ধির পরিচায়ক হয়ে ওঠেনি।" দেখা যাচ্ছে, সমালোচনাটি পড়বার সময়েও সত্যজিৎবাবু দৃষ্টিসিদ্ধির পরিচয় দিতে পারেননি।

এর পর, ছবির অপু এবং উপন্যাসের অপুর মধ্যে যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই—প্রভেদ শুধু 'সমালোচকের মানস কল্পিত

অপুর' সঙ্গে—সে-কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণের লেখা থেকে তাঁর বক্তব্যানুগ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক মানস অনুসরণে পরিচালকের ব্যর্থতার কথা এবং জীবনবাদী অপু, অপু আখ্যানের জীবন-দর্শন ও মূল রসের বিকৃতি সম্পর্কে সমালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে ছবিতে অপুর উপন্যাস ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে। সমালোচনার সে প্রধান বক্তব্যটি সুবিধাবাদী উকিলের মত সত্যজিৎবাবু সরাসরি এড়িয়ে গেছেন। সে যাই হোক, অপর্ণার মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণের ভাষায় অপুর মনের অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি আক্রমণ করেছেন আমাদের এই বক্তব্যকে—"অপুর শোকাবেগ নিয়ে ছবিকে যেভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে তার মধ্যে বিভূতিভূষণের অপুকে খুঁজে পাওয়া কঠিন।" অপর্ণার মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণ অপুর মনের 'বিরাট শূন্যতা' ও তার অপূরণীয় 'ক্ষতি'র কথা যা লিখেছেন, সেই অনুভূতি অপুর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু বন্ধু অনিলের মৃত্যুতে যার মনে হয় "কেমন এক ধরনের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে" ('অপরাজিত', পি সি সরকার এন্ড কোং সংস্করণ, ২০০ পৃ), বাবা হরিহরের মৃত্যুতে যার মনের অবস্থা—"রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্নমাত্র—অপু তাহাকে চেনে না" ('পথের পাঁচালী' রঞ্জন প্রকাশালয়, ৩৮০ পৃ), দিদি দুর্গা মারা যাবার পর যে অপুর মনে জাগে এক "বিচিত্র অনুভূতি—তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না" ('পথের পাঁচালী', ৩২২ পৃ), মা সর্বজয়ার মরণে যার মনে 'উল্লাসের স্পর্শ' ('অপরাজিত', ২৩২ পৃ)—সেই বিচিত্ররূপী অপুকে তার মনের একটি সাময়িক শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছেন সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' ছবির শেষাংশে। বিভূতিভূষণের অপু-চরিত্রের এই যে আপাতবিরোধী বৈচিত্র্যময় রূপ তা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে—আকাশে অথবা পাতালে—(চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁরই চিঠির বক্তব্য অনুসরণে বলতে গেলে) তিনি অপুর জীবনে এনেছেন একটি দীর্ঘায়িত শোকোচ্ছ্বাস বিমূঢ় অধ্যায়। অপু-চরিত্রে এই যে একঘেয়েমি তাতে কি বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে? অথচ তাঁর চিঠিতে তিনি বিভূতিভূষণের অপু সম্বন্ধে মনে রাখতে বলেছেন, "অপুর চরিত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখা যায়।"

ছবিতে অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুকে শোক-বিভ্রান্ত অবস্থায় আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হতে দেখানো হয়েছে। এটা কি বিভূতিভূষণের সেই অপুকে হত্যা করা নয়—অপর্ণার মৃত্যুর পর দেশভ্রমণের সময় যার মনে হয়েছিল 'যে-জীবন যে-জগতকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দ-ভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যার গতি কল্প থেকে কল্পান্তরে; দুঃখকে তা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে

ছায়াচিত্র পরিষদের "রাজা সাজা"-র নায়িকা চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন বিকাশ রায়

'অপুর সংসার'-এর অপুর মতো বিভূতিভূষণের অপু অপর্ণার মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকেই ক্রমাগত বিমূঢ় অবস্থায় দিন কাটায়নি। অপর্ণার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরদিন তার ঘরে পিণ্টুর মাকে ঘরের মেঝেতে স্টোভ মুছতে দেখে অপু বলে, "বৌ ঠাকরুণ, তা আপনি আবার কষ্ট করে কেন মিথ্যে—আমিই বরং ওটা"—(৩৪৬ পৃ) অন্য জায়গায় আছে, "অপর্ণার মৃত্যুর পর হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল।" (৩৪৮ পৃ) এর পর চাঁপদানিতে তার শিক্ষকতা করে কিছুকাল কাটে। পরে চিরকালের বাঁধনছেঁড়া অপু মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতোই উড়ে বেরিয়ে পড়ে দূরদেশে। ছবিতে দেখানো হয়েছে শ্মশ্রুধারী, ক্লিষ্ট, অবসন্ন অপু যেন বুকে শোকের জগদ্দল পাথর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্জন বনে প্রান্তরে। অথচ পরে প্রণবের কাছে লেখা চিঠিতে অপুর তখনকার মনের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়—"সে দেখেছিলাম নাগপুরে ভাই—সে কি অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বৈকালটিতে যখন কোন শালবনের করিয়াছে অনন্ত জীবনে উৎসধারা" (অপরাজিত, ৪৩১ পৃ)।

এই "শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী"র উৎস-সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল অপর্ণার মৃত্যুর পর। সে ভাবল, "একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে— যেখানে-সেখানে—যেদিকে দু চোখ যায়—এতদিনে সত্যই মুক্তি। আর কোন জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষ্যে জড়ায় কিনা পায়ে!" (অপরাজিত, ৩৮৮ পৃ) তাই রওনা হবার আগের দিন "পুলকিত মনে বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফর্সা কাপড় পরিল। পুরাতন সৌখীনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠার দরুণ দরজীর দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবী তৈয়েরী করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল।" (৩৯৩ পৃ) এই পাড়ি দেবার আগে অপর্ণার বাপের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তার মনে জাগে, "আশ্চর্য! এরই মধ্যেই অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে! অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের, অনেক দূরের।" (৩৯১ পৃ)

অথচ 'অপুর সংসার'-এ দেখা গেল যে অপর্ণার মৃত্যুতে শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে অপু লম্বা পাড়ি দিল দূর দেশে। সত্যজিৎবাবুর উদ্ধৃতি অনুযায়ী বিভূতিভূষণ যেমন অপর্ণার মৃত্যুর পর 'বিরাট শূন্যতা' দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন সহজভাবে সব দুঃখকে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা।

জি শংকর এণ্ড কালিগসের নির্মীয়মান ছবি "চেনামুখ"-এর একটি রহস্যময় দৃশ্যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়

ছায়ায় পাথরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড় জীবন শত শত জন্ম-মৃত্যুর দূরপারে অক্ষুণ্ণ, তার অস্তিত্বকে মন যেন চিনে নিতো।" (৫৯৯ পৃ) 'অপুর সংসার'-এ নাগপুরের বনাঞ্চলে অপুকে যেরকম শোকার্ত ও জীবনবিমুখ দেখানো হয়েছে (যে তার জীবনের পরম সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ফেলে দেয়) সেটা কি বিভূতিভূষণের অপুর অপমৃত্যু নয়?

অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর মনে কাজলকে নিয়ে যে সাময়িক ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং যেটা বিভূতিভূষণের ভাষা দিয়ে সত্যজিৎবাবু উল্লেখ করেছেন, তা যদি লেখক না দেখাতেন, তবে মনে হোত নব-পরিণীতা স্ত্রীর মৃত্যুতে অপুর মতো সংবেদনশীল মনের শোকের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু এই যে প্রতিক্রিয়া—ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে ছেলেকেই দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধহয়"—তা অপু চরিত্রের প্রতি সমবেদনা জাগায়, অশ্রদ্ধা আনে না। বিভূতিভূষণ তাঁর বইয়ে এমন দেখাননি যে প্রণব কাজলের প্রতি অপরিসীম দরদে অপুকে তার ভার নেবার জন্য অনুরোধ করছে, আর অপু নির্দয় রূঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছে। বরঞ্চ বিভূতিভূষণের অপু লম্বা পাড়ি দেবার আগে ছেলেকে না দেখে যেতে পারেনি। অপুর মনের স্বাভাবিক ক্ষণিকের প্রতিক্রিয়াকে পরে তিনি বাৎসল্যের রসে ভরিয়ে দিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের রচনায় যা কোমল, যা মধুর তা সত্যজিৎবাবু অনেক জায়গায়ই বর্জন করেছেন। ছবিতে অপুর কাজলকে না দেখেই দেশান্তরে যাওয়া এবং দীর্ঘকাল কাজলকে অপুর কাছে 'অলীক, অবান্তর' করে দূরে সরিয়ে রাখার ফলে মূল কাহিনীর অপু-কাজলের উপাখ্যানের রস 'অপুর সংসার'-এ পাওয়া যায় না। এখানেই সত্যজিৎবাবুর নিজস্ব কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টিসাধিকের অভাব। সত্যজিৎবাবু এই চিঠিতে বলেছেন, বিভূতিভূষণের কাহিনীতেও কাজল "প্রথমে কিছুতেই অপুর কাছে আসিতে না" ইত্যাদি। শিশু কাজলের পক্ষে জীবনে প্রথম বাবাকে দেখে প্রথমে কিছুতেই তার কাছে না আসা কি এতই অস্বাভাবিক? কাজল তখন তিন বছরের ছেলে এবং সেদিনই সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে তার ভাব হয়। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর ছবিতে কাজল তার শ্মশ্রুধারী বাবাকে আসলে বাবা বলে গ্রহণ করেনি। সে তাকে বন্ধু জেনে তার কাঁধে চড়ে ('ডাক হরকরা' ছবির শেষ দৃশ্যের সঙ্গে যার বিশেষ মিল) কলকাতার পথে যাত্রা করে।

আমাদের সমালোচনায় কাজলের পাখি মারা সম্পর্কে যা মন্তব্য করা হয়েছিল তার উল্লেখ করে সত্যজিৎবাবু বলেছেন, "নিষ্ঠুরতা একটি স্বাভাবিক শৈশব প্রবৃত্তি"। শৈশবের এই কুপ্রবৃত্তিই বা তিনি বেছে নিলেন কেন যা ছবির রসকে এমন তিক্ত করে তোলে? ছবিতে যা দেখানো হয়েছে তা রসোত্তীর্ণ হলো কিনা সেটাই সমালোচকের বিচার্য। প্রসংগক্রমে সত্যজিৎবাবু পঞ্চমবর্ষীয় অপুর পাখি মারার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই নজির আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে 'কথামালা'র সেই নেকড়ে বাঘ ও মেষ-শাবকের গল্পটি। নির্দোষ মেষ-শাবককে মারবার

একটা কারণ উদ্ভাবন করতে গিয়ে বাঘ তাকে বলেছিলঃ 'তুই আমার জল ঘোলা করে না থাকিস তো তোর বাপ করেছে—' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বাঘের দুটি অভিযোগই অসত্য। আর সত্যজিৎবাবুর উদ্ধৃতিতে আছে আংশিক সত্য এবং আংশিক সত্য যে অনেক সময়ে অসত্যের চেয়েও ভয়াবহ তা বোধহয় তাঁর অজানা নয়।

'অপরাজিত'তে আছে, "বাড়ির পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নীচে পড়িয়া গেল"...... ('অপরাজিত' ৬৫ পৃঃ)। এর পর অপু-দুর্গার পাখিটির সৎকার করা, "হরিবোল হরি, হরিঠাকুর ওর গতি করবেন" বলে প্রার্থনা করা এবং "নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া চিতার জায়গাটা" ধুয়ে দেওয়া—যেখানে বিভূতিভূষণ বলছেন "কে জানে তাহারা কোন মুক্ত বিহঙ্গ-আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল"—আর ছবির কাজলের পক্ষে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গুলতি দিয়ে পাখি মারা ও মৃত পাখিটি এক বৃদ্ধার চোখের সামনে নিয়ে নাচানোর মধ্যে কি একই রসের বিস্তার? পঞ্চমবর্ষীয় অপুর পাখি মারার ঘটনা যেমন মাধুর্যরসে অপরূপ, 'অপুর সংসার'-এর কাজলের পাখি মারার ঘটনা তেমনি নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির বিন্যাসে অসহনীয়। তাই হরিহর-সর্বজয়ার [illegible] অপু-দুর্গাকে বিভূতিভূষণ বর্ণিত পাখি মারার ঘটনায় চিনে নিতে অসুবিধে হয় না, কাজলের পাখি মারার ঘটনায় অপু-অপর্ণার ছেলেকে চিনে নিতে বেগ পেতে হয়।

সত্যজিৎবাবু তাঁর চিঠিতে বলেছেন, বিভূতিভূষণের বর্ণনায় কাজল, "একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে।" সত্যজিৎবাবুর কাজল যদি সত্যিই তাই হোত তবে তো কোন ক্ষোভ থাকত না। কিন্তু একদণ্ড চুপ করে না থাকা কি শুধু গুলতি দিয়ে পাখি মারা আর দাদামশাই ও বাবার দিকে ঢিল ছোঁড়া? আর "সর্বদা বকিতেছে" এমন রূপ তো সত্যজিৎবাবুর কাজলে মোটেই নেই।

সত্যজিৎবাবু তাঁর চিঠিতে আরও বলেছেন, "চিত্রনাট্যের সমাপ্তি যে মধুর মিলনান্ত সুরে ঘটেছে, মূল উপন্যাসে কাজল-অপু সম্পর্কের সমাপ্তির সুর সম্পূর্ণ বিপরীত।" বিভূতিভূষণের পাঠকমাত্রই তা জানেন এবং এক্ষেত্রে লেখকের সমাপ্তি গ্রহণ করলেই যে ছবিখানি আরও
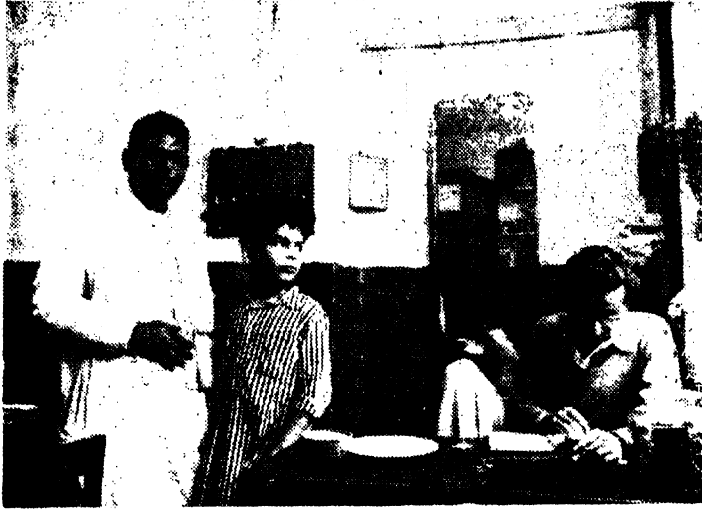
এল বি ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশান্যালের "বাড়ি থেকে পালিয়ে"-র একটি দৃশ্যে মাণ শ্রীমানী, পরম ভট্টারক ও বেচু সিংহ

মহৎ ও সার্থক চিত্ররূপ হয়ে উঠতে পারত সে-বিষয়ে বিভূতিভূষণের অপু কাহিনীর মূল দর্শন যারা অনুধাবন করেছেন তারা দ্বিমত হবেন না।

বিভূতিভূষণের মূলকাহিনীর সমাপ্তি দেখাতে গেলে ছবির আয়তন প্রদর্শনযোগ্য দৈর্ঘ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত কিনা এবং তা শিল্পসম্মত হত কিনা সত্যজিৎবাবু সে সম্বন্ধে হদিস চেয়েছেন। পাঁচখানি ছবি করার পরই তিনি সমালোচকের কাছে হদিস চাইছেন? এত শীঘ্র কল্পনাশক্তিতে তাঁর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ত উচিত নয়! তবে ছবি আয়তনে বড় হলেই তা প্রদর্শনযোগ্য দৈর্ঘ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং শিল্পসম্মত হয় না, এটা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ধারণার কথা। প্রদর্শনযোগ্য দৈর্ঘ্যের মাত্রা তাঁর মতে কত ফুট তা জানতে ইচ্ছে করে। তবে এটা তাঁর জানা উচিত যে, বড় দৈর্ঘ্যের ছবিও রসোত্তীর্ণ ও শিল্পসম্মত হয় এবং চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এর নজির আছে।

সবশেষে তিনি চলচ্চিত্র ও উপন্যাসের পারস্পারিক সম্বন্ধ সম্পর্কে আমাদের অনুশীলন করতে বলেছেন এবং "দেশজ শিল্পে যদি আমাদের আস্থা না থাকে তবে বিদেশী ক্লাসিক ছবি" থেকে শিখে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য, উপন্যাসাবলম্বী সার্থক ছবির উদাহরণ "দেশজ শিল্পেই" আছে, বিদেশী ক্লাসিক ছবির দিকে এ ব্যাপারে না তাকালেও চলতে পারে।

ছবির সমালোচনা সম্পর্কে সত্যজিৎ-বাবুর মতামতের প্রতি আমাদের আস্থা ঠোক্কর খেয়েছে তাঁর একটি সাম্প্রতিক অভিমত জেনে। "অপুর সংসার" সম্বন্ধে যে স্তুতিমূলক সমালোচনাকে তিনি এছবি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা বলে অভি-হিত করেছেন, তা পড়বার পর "দেশ"-এর "অপুর সংসার"-এর সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর কি অভিমত তা নিয়ে আমাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তবে তিনি একটি চিঠি দিয়েছেন, তাই এই উত্তর।

চিত্রালোচনা

এ-সপ্তাহে দুখানি হিন্দী ছবি মুক্তি-লাভ করছে। বাংলা একখানিও না। হিন্দী ছবি দুটির নাম—'ময় নশে মে হুঁ' ও 'বেদর্দ্ জমানা ক্যা জানে'।

বর্মা পিকচার্সের 'ময় নশে মে হুঁ'-এর পরিচালক নরেশ সাইগল। এক পথভ্রষ্ট যুবকের জীবনে বিবেক ও বাসনার নাট্য-সংঘাতময় দ্বন্দ্বকে ঘিরে রচিত হয়েছে ছবির কাহিনী। রাজকাপুর ও মালা সিনহা ছবির শ্রেষ্ঠাংশে অবতরণ করেছেন। অন্যান্য অংশে আছেন নাজির হুসেন, হেলেন প্রভৃতি। শঙ্কর-জয়কিষণের সুরারোপে ছবিখানি সমৃদ্ধ।

'বেদর্দ্ জমানা ক্যা জানে' একটি মর্ম-স্পর্শী সামাজিক কাহিনীর চিত্ররূপ। ছবিটির মুখ্য দুটি চরিত্রে আছেন অশোক-কুমার ও নিরুপা রায়। বিশিষ্ট পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করেছেন জবীন, প্রাণ, হেলেন ও সুদেশ কুমার। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন বাবুভাই মিস্ত্রি। সংগীত পরি-চালনায় আছেন কল্যাণজী বিরজী।

মরমী পারিবারিক চিত্র

আশাপূর্ণা দেবীর লেখা একটি মনোরম পারিবারিক গল্পের সর্বজনগ্রাহ্য রসমধুর চিত্ররূপ গ্রেস পিকচার্সের প্রথম নিবেদন "শশীবাবুর সংসার"।

মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অতি-চেনা একটি সংসার যেন রূপ নিয়েছে এ-কাহিনীতে। কর্মজীবন থেকে অবসর-প্রাপ্ত গৃহস্বামী একদিন মনে করেন সংসারে তাঁর দাম বুঝি ফুরিয়ে গেছে। জীবন-সায়াহ্নে শশীবাবুও ভাবেন সে-কথা —যে সংসার পরম যত্নে ও নিবিড় আনন্দে তিনি গড়ে তুলেছেন, আজ সে সংসারে যেন

তিনি অবাঞ্ছিত। সে সংসারেই আবার প্রাচীনের সংস্কার আর নবীনের দুরন্ত জীবন-পিপাসার সংঘর্ষ ঘনিয়ে আনে ঝড়ের সংকেত। শশীবাবুর শঙ্কিত মন দেখে তাঁর ঘরের ভিত যেন কেঁপে উঠছে—বুকের পাঁজরে যে ঘর তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, যে ঘর শুধু ইট আর ইস্পাতের কঠিন বাঁধুনিতেই তৈরী নয়। শশীবাবুর অন্তরের ব্যথা ও নৈরাশ্যের আসল রূপটি ধরা দেয় না পুত্র-কন্যাদের কাছে—এমনকি স্ত্রী মন্দাকিনীর কাছেও। শুধু পুত্রবধূ সুমিত্রার মধ্যে প্রগতির তাগিদের সঙ্গে ছিল সংহতির প্রেরণা। তাই সে-ই এগিয়ে এসে ছন্দোবন্ধ করে দিল পুত্র-কন্যাদের অন্তরের দাবী, আর শশীবাবুর পক্ষে স্বচ্ছন্দ করে দিল নবীনদের নির্বিঘ্ন যাত্রা ও বিশুদ্ধ বিচারের জন্য প্রসন্নমনে অন্তরের প্রার্থনা জানাতে।

আখ্যানভাগে একদিকে স্থান পেয়েছে শশীবাবুর পুত্র-কন্যা সতীশ ও রেখার মধুর প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ও নির্মল হাস্য-কৌতুকের অজস্র উপকরণ, অন্যদিকে রয়েছে নতুন যুগের জোয়ারে বাঙালী মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের প্রাচীনের শাসন ও নবীনের উপেক্ষা এবং অশান্তি ও আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাওয়ার করুণ বাস্তবের অনুসরণ। কাহিনীর এই মূল রস নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সুগ্রথিত চিত্রনাট্যে ও সংলাপে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। তদুপরি সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার পরিমিতি জ্ঞান ও রসবোধ ছবিখানি যে বেগ ও আবেগ এবং সর্বজনীন আবেদনমণ্ডিত করেছে তাতে এটি সহজেই জন-অভিনন্দন লাভ করবে। সামগ্রিকভাবে ছবিটি মহৎসৃষ্টির পর্যায়ে না পড়লেও নিঃসন্দেহে একটি মরমী চিত্রসৃষ্টি।

সম্মিলিত অভিনয় সৌকর্য ছবির একটি বিশেষ সম্পদ। নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস তাঁর অসামান্য অভিনয়-প্রতিভার অন্যতম স্বাক্ষর রেখেছেন ছবিখানিতে। চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্তর-ব্যথা, কাঠিন্যের আড়ালে অপার স্নেহ—সবকিছুই তিনি নিপুণ অভিনয়ের ভিতর দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। শশীবাবুর গৃহিণীর চরিত্রে চন্দ্রাদেবীর স্বচ্ছন্দ ও সংবেদনশীল অভিনয় আবার নতুন করে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ দেয়। কন্যা রেখার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রাণোচ্ছল। পুত্রদ্বয় পরেশ ও সতীশের চরিত্রে যথাক্রমে জীবেন বসু ও অনুপকুমার প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। শশীবাবুর শ্যালকরূপী পাহাড়ী সান্যালকে ভালো লাগবে দর্শকদের। রেখার প্রণয়ীরূপে বসন্ত চৌধুরী অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। পুত্রবধূ সুমিত্রাবেশিনী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-প্রতিভার ছাপ রেখেছেন ছবিতে। অন্যান্য ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তপতী ঘোষ, শৈলেন মুখার্জী, অমর মল্লিক ও পশুপতি কুণ্ডু।

সঙ্গীত পরিচালনায় অনিল বাগচী কয়েকটি সুখশ্রাব্য গানের জন্য ধন্যবাদার্হ হবেন। চিত্রগ্রহণে দেওজীভাই তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বহির্দৃশ্যাবলী এবং বিশেষত মোটর ও ট্রেনের পাশাপাশি সবেগে চলার দৃশ্যটি সুগৃহীত।

শব্দগ্রহণ, সম্পাদনা ও অন্যান্য কলা-কৌশলের দিক বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

অভিশাপের নিরসন

দুই নারী ও এক পুরুষের জীবনের করুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এস পি প্রোডাকশন্সের 'অভিশাপ'।

কাহিনীর নায়ক তরুণ অধ্যাপক অনিলের প্রণয়ে ব্যর্থতা, দাম্পত্যজীবনে অশান্তি, বিপথগমন ও পরে সহধর্মিণীর সঙ্গে মিলন আখ্যানভাগের মূল সূত্র। তার প্রণয়িণী শিখা জানতে পারে যে সে অনিমার বোন নয়, এবং অনিলের সঙ্গে অনিমার বিয়ের পরেই সে বাড়ি ছেড়ে যায় আত্মহত্যা করতে। এমন সময় বীরেন নামক এক দুর্বৃত্তের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ও তাকে 'দাদা' ডেকে তার আশ্রয়ে দিন কাটাতে থাকে। সেখানেই সে অনিলের দেখা পায় এবং পরে বিবেকের অনুশাসনে অনিলকে ফিরিয়ে এনে দিয়ে যায় তার স্ত্রী অনিমার কাছে। অনিমার জীবনের অভিশাপ দূর হয়। এই চরম মুহূর্তে শিখা জানতে পারে যে সে-ই বীরেনের হারিয়ে যাওয়া সহোদর বোন।

পরিচালক বিনয় ব্যানার্জি কাহিনীর দুর্বলতাকে অতিক্রম করে উঠতে পারেননি তার বিন্যাসে। ফলে ছবিটি কম জায়গাতেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। ছবির চিত্রনাট্যও সামগ্রিকভাবে শিথিল।

ছবির আকর্ষণের দিক প্রখ্যাত শিল্পীদের অভিনয়। শিখার চরিত্রে মঞ্জু দে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। অনিলরূপী বিকাশ রায়ও চরিত্রটির মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। অনিমার চরিত্রটির প্রতি শোভা সেন দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য চরিত্রে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ ব্যানার্জি ও গীতশ্রীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত পরিচালনায় শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ আশানুরূপ। কলাকৌশল ও আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক সাধারণ স্তরের।

খেলার মাঠে

একলব্য

গত সপ্তাহে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে আরও কতকগুলি বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধের মীমাংসা হয়নি, উৎকট বর্ণবিদ্বেষের নীতি গ্রহণ করায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিক থেকে বহিষ্কারের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়নি, কুয়োমিণ্টাং চীন ও প্রজাতন্ত্র চীনের বিরোধও জীইয়ে রাখা হয়েছে।

কুয়োমিণ্টাং চীনকে অলিম্পিকে প্রতি-নিধিত্ব করবার সুযোগ দানের প্রতিবাদে প্রজাতন্ত্র চীন গতবার অলিম্পিকের সংগে সংস্রব ত্যাগ করেছে। একই কারণে মেল-বোর্ন অলিম্পিকেও তারা অংশ গ্রহণ করেনি। ৬৪ কোটি নরনারী অধ্যুষিত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ যদি অলিম্পিক থেকে দূরে সরে থাকে তবে সেই অলিম্পিককে কি বিশ্বের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে অভিহিত করতে মনের কোণে একটু খুঁত থাকে না? অলিম্পিক কমিটির পক্ষেও এটা গৌরবের কথা নয়। রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে এ সম্বন্ধে কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধেরও মীমাংসা হওয়া দরকার। আলবেনিয়া, নিকারাগুয়া (ডাচ গিনি), ইকোয়েডর, মরোক্কো, রোডেশিয়া, সান মেরিনো, সুদান প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট দেশকে অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ দিয়ে অলিম্পিক কমিটি ভালই করেছেন। ন্যায়নিষ্ঠার সংগে প্রতিযোগিতা করে সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ় করা যে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য সেই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সকল দেশের অংশ গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি সবচেয়ে ভাল কাজ করেছেন ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক খেলাধূলার স্থান হিসাবে টোকিও শহরকে নির্বাচিত করে। টোকিওতে এশিয়ান গেমের পরিচালনায় জাপানের খেলাধূলার কর্তৃপক্ষ যে সুনাম অর্জন করেছেন অলিম্পিক ক্রীড়া পরি-চালনার ব্যাপারে তারা সে সুনাম বজায় রাখবেন এ সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আজ পর্যন্ত এশিয়ার ক্রীড়া-ভূমিতে অলিম্পিকের আসর বসেনি। সুতরাং ১৯৬৪ সালের অলিম্পিক খেলা-ধূলা সমগ্র এশিয়াবাসীর পক্ষেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

• • •

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সাম্প্রতিক সাধারণ সভায় ভারতীয় রেল-ওয়েকে সার্ভিস টীমের অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় ফুটবলে সার্ভিস টীম যেমন একটি রাজ্য টীমের মর্যাদার অধিকারী, ১৯৬০ সাল থেকে রেল টীমও হবে এমন রাজ্য দলের মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু এতে একটি অসুবিধাও দেখা দেবে। কথাটা ফুটবল ফেডারেশনের মাতব্বরেরা ভেবে দেখেছেন কিনা জানি না। রেল দল মানে ভারতীয় রেল দল। বাংলা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ যেখানে রেলের যত খেলোয়াড় আছেন তার মধ্য থেকে বাছাই করেই ভারতীয় রেল দল গঠিত হবে। এখন কথা হচ্ছে, ইস্টার্ন রেল বা বি এন রেল দলের যে সমস্ত খেলোয়াড় আই এফ এ-র অন্তর্ভুক্ত জাতীয় ফুটবলে তাঁরা আই এফ এ অর্থাৎ বাংলার পক্ষে খেলবেন না ভারতীয় রেল টীমের পক্ষে খেলবেন? সমভাবে বোম্বাই বা অন্য যায়গার খেলোয়াড়দের নিয়েও একই সমস্যা দেখা দেবে। রাজ্য এসোসিয়েশন যদি জাতীয় ফুটবলের সময় রেল খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেন এবং এঁদের খেলার পক্ষে কোন বাধা না থাকে সে পৃথক কথা। কিন্তু বাধা থাকলে বা রাজ্য এসোসিয়েশন তাঁদের ছেড়ে না দিলে ভারতীয় রেল টীম গঠিত হবে কিভাবে? শুধু নামকোয়াস্তে একটি দল গঠন করলে কোনই লাভ হবে না। ভারতীয় রেল দল গঠন করতে হলে তাকে শক্তিশালী করেই গঠন করতে হবে। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান কি? নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন পরিষ্কার করে কথাটা বলবেন কি?

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলও অনেকদিন ধরে পৃথক মর্যাদার দাবী করে আসছে। এদের পৃথক মর্যাদা দিলেও একই সমস্যা দেখা দেবে। আশা করি, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন কথাটা ভেবে দেখবেন।

• • •

শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুব-শক্তির এক বিরাট উৎসব গত ১৬ই মে থেকে ২৫শে মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামে। সমস্ত রকমের সংকীর্ণতা, বাধা অতিক্রম করে আনন্দোজ্জ্বল যুবশক্তি অদম্য উৎসাহে এই নটি দিন যৌবনের এক বিরাট তরংগের সূচনা করে।

জুলাই আগস্ট মাসে ভিয়েনাতে যে সপ্তম বিশ্ব যুব উৎসব হতে চলেছে তারই প্রস্তুতিতে দেশে দেশে আজ যৌবনের উৎসব। তরুণের জয়যাত্রা, জীবনের জয়গান।

পশ্চিমবংগেও এ উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য কোন আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। জীবনের যতদিকে যুবশক্তির প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রত্যেকটি দিক এ উৎসবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগে ইস্টার্ন রেল ও ইস্টবেংগল ক্লাবের খেলায় রেল-গোলরক্ষক পি বর্মণ একটি বিপজ্জনক বল ধরছেন। ইস্টবেংগল ক্লাব খেলায় ৩—১ গোলে জয়লাভ করে

তাই এবারকার যুব উৎসবের ব্যাপকতা এত বেশী, অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। সেজন্যই এবারকার উৎসব শুধু মাত্র কলকাতার রণজি স্টেডিয়ামেরই সীমাবদ্ধ ছিল না, উৎসব হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পল্লীতে। প্রায় তিন সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান এবারকার উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছে, আর ত্রিশ সহস্রাধিক প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মিলিত হয়েছে।

এবারকার যুব উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য যুব জীবনের বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলার সাথে সাথে কয়েকটি গঠনমূলক কাজের ও সমাজসেবার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ। বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণ, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, কলেরা মহামারীর বিরুদ্ধে যুবশক্তির ব্যাপক অভিযানের কর্মসূচী এর মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে।

শুধু মাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয়, এ উৎসবে খেলাধুলার জন্য এবারকার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।

এবারে খেলাধুলোকে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রদর্শনী খেলাধুলা, এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা। প্রদর্শনী খেলাধুলার মধ্যে মেয়েদের বাস্কেটবল, সম্মিলিত লাঠিখেলা এবং সমবেত শরীরচর্চার অনুষ্ঠান সমবেত দর্শকের নিকট বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল, ভলিবল, হাডুডু, দৌড়, সাঁতার, গঙ্গা পারাপার, কুস্তি, ভারোত্তোলন, দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। শুধু খেলাধুলায় এবার প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। গ্রামীণ যুবকদের জন্যও মাটিকাটা, ধনুর্বিদ্যা, অসিচালনা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল।

এবারকার খেলাধুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নির্দিষ্ট মানের ক্রীড়া। এর ফলে প্রতিযোগীর সংখ্যা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ যুব উৎসবের ব্যাপকতা পশ্চিমবাংলার সকল ধরনের তরুণ তরুণীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যই এ আয়োজন।

যুব উৎসবের ক্রীড়ামোদী তরুণ তরুণীরা শুধুমাত্র বিভিন্ন খেলাধুলাতেই অংশ গ্রহণ করেছে তাই নয়, কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের দাবিতে সহি সংগ্রহ করেছে প্রায় এক লক্ষ। দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করেন। উৎসবশ্রী সন্তোষ দাশ ও সত্য পাল সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায়ও বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন।

এ উৎসবের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কয়েকজন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার বিতরণই
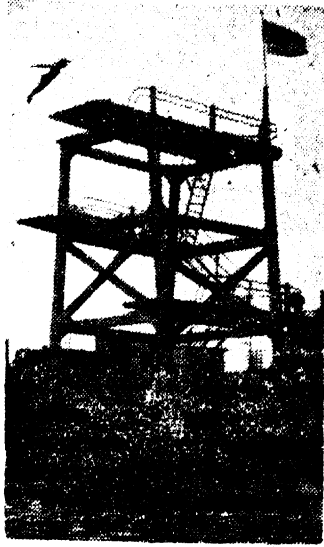
যুব উৎসব উপলক্ষে আজাদ হিন্দ বাগ পুষ্করিণীতে ডাইভিংয়ের একটি ভঙ্গি

নয়, কেবলমাত্র নিছক গান, বাজনা, নাটক, আবৃত্তি ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনই নয়, শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ এ উৎসবের আয়োজন। সকলরকম যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির স্বপক্ষে যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ হবার শপথ গ্রহণ করেছে। শপথ গ্রহণ করেছে বিশ্বশান্তির জন্য যে সংগ্রাম, সে সংগ্রামের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার, শপথ গ্রহণ করেছে সকল রকম বাধা ও সংকীর্ণতার অচলায়তনকে অতিক্রম করে শান্তির পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে।

ক্রিকেট খেলার খবর

বেরী সর্বাধিকারী

লণ্ডন, ৩১শে মে ইংলণ্ড ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলার আগে টেস্ট খেলার 'স্টেজ রিহার্সেলে' ভারতীয় দলকে ১৪৭ রানে এম সি সি-র কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। পরের খেলাটিতে অবশ্য ভারতীয় দল 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়েছে এক ইনিংস ও ৫৩ রানে। কিন্তু শক্তিহীন অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে ভারতের ক্রিকেট মর্যাদার কিছু পুনরুদ্ধার হয়নি। লর্ডসে এম সি সি-র সঙ্গে ভারতের খেলাটিই ছিল শক্তি পরীক্ষার প্রথম 'কষ্টিপাথর'। সেই পাথরে ভারতীয় ক্রিকেটের আসল রূপ আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকখানিই 'খাদ' বেরিয়েছে। খাঁটি সোনার অংশ খুবই কম। এপ্রিলের ৪ তারিখে নটিংহামের 'ট্রেণ্ট ব্রিজ' সমরক্ষেত্রে দুই দলের আসল টেস্ট যুদ্ধের আগে 'লর্ডসে' এম সি সি-র সঙ্গে এই 'নকল যুদ্ধে' হারের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী।

লণ্ডনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম এখানকার সমালোচকরা ভারতের এ পরাজয়কে কিভাবে গ্রহণ করেছেন। দেখছিলাম, সব কাগজেরই এক সুর। ভারতীয় দলের শক্তি সম্বন্ধে এদের ধারণা উঁচু তো নয়ই, বরং 'খাদের'ও নীচে।

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ডেনিস রোবথাম লিখেছেন—টেস্ট খেলার এক সপ্তাহ আগে এম সি সি-র কাছে ভারতের এই পরাজয় খুবই নৈরাশ্যের। কি ব্যাটিং, কি ফিল্ডিং সব বিষয়েই ভারতীয় দল পর্যুদস্ত হয়েছে।'

'ডেলি স্কেচে' ডেভিড উইলিয়ামস বলেছেন—'ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স ভারতকে টেস্ট খেলার যে অধিকার দিয়েছে এই কি তার নিদর্শন? ভারতের ব্যাটস্‌-ম্যানরা যে ফুটো করা বেলুনের মত চুপসে পড়ছে।'

এরিক স্টেঞ্জার 'ইয়র্কশায়ার পোস্টে' লিখেছেন—'এ যে দেখছি দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ক্রিকেট দল। উমরিগর, মঞ্জরেকার ও বোরদে ছাড়া আর কারো উপরই নির্ভর করা চলে না।'

'টাইমস' পত্রিকার খেলার বিবরণীতে বলা হয়েছে—ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা যেভাবে ফিল্ডিং করেছেন এখানকার অতি হীনশক্তির কোন দল এমন ফিল্ডিং করলে কটূক্তিবাণে জর্জরিত হত। ব্যাটিং-এর কথা না বললেও চলে—ব্যাটিং অত্যন্ত মন্থর। তৎপরতার বড়ই অভাব। তৎপরতা এবং চটুলতা বাড়াবার জন্য এদের পাগলা ষাঁড় ভর্তি মাঠে অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

'ডেলী এক্সপ্রেসে' অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান

খেলোয়াড় কিথ মিলার বলেছেন—'ভ্রমণ ব্যর্থ করো না, অক্সফোর্ড থেকে তরুণ খেলোয়াড় আব্বাস আলী বেগকে এবং ল্যাংকাশায়ার লীগ থেকে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ খেলোয়াড় মানকড়কে ধরে আনো।'

'ডেলী টেলিগ্রাফে'র সুর কিছুটা নরম। 'ডেলী টেলিগ্রাফে' ই ডব্লিউ সোয়াণ্টন লিখেছেন—'ভারতীয়রা যদি নিজেরা হতাশ হয়ে না থাকে তবে এখনো নৈরাশ্য প্রকাশের সময় আসেনি। তবে এই দলকে ক্রীড়াধারার রদবদলের জন্য বেশ কিছুটা সময় ও মাথা খাটাতে হবে।'

বিভিন্ন কাগজের মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, এদেশে ভারতের ক্রিকেট মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। হবেই বা না কেন? কেন লোকে বিদ্রূপ করবে না? কেনই বা ক্রিকেট সমালোচকরা আমাদের দলকে ভীরুর দল বলে আখ্যা দেবে না? অধিনায়ক গাইকোয়াড় সুন্দর আবহাওয়া এবং চমৎকার 'পীচ' থাকা সত্ত্বেও টসে জয়ী হয়ে এম সি সি-কে প্রথম ব্যাট করতে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন। যে মাঠে প্রচুর রান সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল সেই মাঠে প্রতিপক্ষকে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ দিলে যে পরিণতি ঘটে, ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ক্রিকেটের চুলচেরা হিসাবের একটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি।

এম সি সি বেশ পিটিয়ে খেলেই রান করেছে। এম সি সি-র ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান আর্থার মিল্টন ও কেন টেলর যখন মাত্র ৮৫ মিনিটে ১০০ রান করেছিলেন, তখনই গাইকোয়াড় বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাটস্‌ম্যানের 'স্বর্গ' উইকেটে ওদের ব্যাটিং করতে দিয়ে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। তারপর প্রথম দিনের খেলা শেষ হবার এক ঘণ্টা বাকী থাকতে ৪ উইকেটে ৩৭৪ রান তুলে যখন অধিনায়ক ডগলাস ইনসোল এম সি সি'র 'দান' ছেড়ে দিলেন তখন গাইকোয়াড়ের চক্ষু 'চড়কগাছ'। বিকেলের এক ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য ভারতীয় দলের কোন উইকেট পড়লো না। পংকজ রায় এবং জয়সিমা ১৩ রান করে নট আউট রইলেন।

পরের দিন মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে অধিনায়ক গাইকোয়াড় সমেত পংকজ রায় ও জয়সিমা ৩১ রানের মধ্যে আউট হয়ে গেলেন। চতুর্থ উইকেটে উম্‌রিগর ও বোরদের প্রশংসনীয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং অবস্থার পরিবর্তন করলো। বোরদে ও উম্‌রিগর একত্রে করলেন চতুর্থ উইকেটে ১৬৯ রান—এই সফরের যা সবচেয়ে ভাল পার্টনারশিপ। কিন্তু আবার ব্যাটিং বিপর্যয়। দুই ফাস্ট বোলার টাইসন ও মস-এর আক্রমণে আমাদের ব্যাটস্‌ম্যানরা ভেঙে পড়লো। মাত্র ২১ রানের মধ্যে পড়ে গেল আমাদের শেষ ৬টি উইকেট। কি শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়!

'ফলো অন' করাবার সুযোগ পেলেও ডগলাস ইনসোল কিন্তু ভারতীয় দলকে 'ফলো অন' করালেন না। বোধ করি, ইনসোল তাঁর পরিশ্রান্ত ফাস্ট বোলারদের আর পরিশ্রান্ত করতে চাননি। তাছাড়া, ম্যাচ যখন হাতের মধ্যে তখন আবার ব্যাট করলেই বা ক্ষতি কি। আমাদের খেলোয়াড়দের দৌড় তিনি বুঝে নিয়েছিলেন। তাই প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৬৩ রানে এগিয়ে থেকেও এম সি সি দিনের শেষে আবার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামলো। একটি উইকেট হারিয়ে এইদিনই করলো ১৯ রান। তৃতীয় দিন আর কোন উইকেট না খুইয়ে ১২০ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলো।

এবার ভারতের পালা। জয়ের জন্য ২৮৪ রানের প্রয়োজন। সময় হাতে ২৮০ মিনিট। ২৮০ মিনিটে ২৮৪ রাণ কববার সুযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কিন্তু ইনসোলের 'স্পোর্টিং ডিক্লারেশন' ভারতের পক্ষে ভয়েরই কথা। তার প্রমাণও পাওয়া গেল যখন একে একে ভারতের এক একটি দেউটি নিভতে আরম্ভ করলো। ৬১ রানের মধ্যে পড়ে গেল ৬টি উইকেট। প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন দপ্ করে একবার জ্বলে ওঠে তেমন সপ্তম উইকেটে নাদকার্ণী ও ঘোড়পাড়ের ব্যাট কিছু সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর 'বোধনযজ্ঞ' শেষ হল 'অফ স্পিনার'-রে ইলিংওয়ার্থের মারাত্মক বোলিংয়ে। চা পানের অল্প পরেই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। ইলিংওয়ার্থ দখল করলেন ৩৪ রানে ৫টি উইকেট। চায়ের বিরতির আগেই হয়তো ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ইংলণ্ডের রানীর সংগে খেলোয়াড়দের পরিচয়ের জন্য কিছুটা সময় কেটে যায়। ফলে পরাজয়েও একটু বিলম্ব ঘটে।

এখানকার ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের সমালোচনার সব বিষয়ের সংগে আমি একমত না হলেও তাঁদের বিরুদ্ধ সমালোচনার যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি। সমভাবেই স্বীকার করি, খেলার জন্য আমাদের খেলোয়াড়দের মনোবল যতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েছে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিরুদ্ধ সমালোচনায়।

কিথ মিলারের 'কথার', উপদেশের জবাবে ভারতীয় দলের ম্যানেজার বরোদার মহারাজা বলেছেন—'অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের এখনো আমাদের প্রয়োজন হয়নি। তরুণ খেলোয়াড় দলে প্রবীণের আগমনে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হবে। ইংলণ্ডের ক্রীড়াসমালোচকদের বিরুদ্ধ সমালোচনা আমাদের খেলোয়াড়দের বিব্রত করেনি। ভুল ত্রুটি কিছু আছে সত্য, কিন্তু আমাদের সমস্ত খেলোয়াড়ই ভুল শোধরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দলগত সংহতিও অটুট রয়েছে।'

বরোদার মহারাজার এ উক্তি খুবই সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয়। সত্যিই আমাদের খেলোয়াড়দের দলগত সংহতি এখনো অটুট আছে।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের মধ্যে বেশ একটু রেষারেষি আছে। খেলার ব্যাপারে কে কার উপর 'টেক্কা' মারে তা দেখবার আগ্রহ এখানে কম নয়। যেমন আমাদের মোহনবাগান ও ইস্টবেংগলের মধ্যে আছে রেষারেষি। ভারতীয় দল কেম্ব্রিজকে হারিয়েছিল এক ইনিংস ও ৫৩ রানে। ঠিক একই ফলাফলে অক্সফোর্ডকেও ভারতীয় দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং কেউই কারো উপর টেক্কা মারতে পারেনি। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডকে একইভাবে আমাদের খেলোয়াড়দের হাতে 'নাকাল' হয়ে ঠিক একই ফলাফলে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

আমাদের খেলোয়াড়দের রানের দিক দিয়েও কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের খেলার খানিকটা মিল আছে। পলি উম্‌রিগর কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে করেছিলেন নট আউট থেকে ২৫২ রান আর অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে নট আউট থেকে বিজয় মঞ্জরেকার করেছেন ২০৪ রান। কেম্ব্রিজের খেলায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান নরী কণ্ট্রাক্টর যেমন ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করেছিলেন, অক্সফোর্ডের খেলায় তেমন গোড়াপত্তন করেছিলেন, ওপেনিং ব্যাটসম্যান পংকজ রায়। তবে পংকজের রান সংখ্যা অনেক বেশী—১৫৫। এ সফরে পংকজের এটাই প্রথম সেঞ্চুরী। এক ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স দলের বিরুদ্ধে ৭০ রান ছাড়া সহ অধিনায়ক পংকজ রায় আর কোন ভাল রান করতে পারেননি।

অক্সফোর্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে পাকিস্তানের তরুণ ব্যাটসম্যান জে বার্কি ছাড়া আর কেউই ভাল রান করতে পারেননি। বার্কি দ্বিতীয় ইনিংসে করেছেন ১১০ রান, অবশ্য সেঞ্চুরীর তিনবার 'চান্স' দিয়ে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্বাস আলি বেগ, যিনি এখন অক্সফোর্ডে পড়ছেন এবং এর আগে ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেছেন, তিনি দুই ইনিংসেই গুপ্তের বলে আউট হয়ে যান। আব্বাস বেগ প্রথম ইনিংসে ১০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২ রান করেন। গুপ্তে এ খেলায় বোলিংয়ে তার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬টি উইকেট নিয়েছেন।

অন্ধকারের পর যেমন আলোর হাসি ভাল লাগে, তেমন এম সি সি'র কাছে পরাজয়ের পর অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে এক ইনিংস ও

৫৩ রানে ভারতীয় দলের জয়লাভ আমাদের ভাল লেগেছে। টেস্টের আগে সামারসেটের বিরুদ্ধেও আমরা ভাল খেলব বলে আশা রাখি।

পিটার মে টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের অধিনায়ক হবে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে যে জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলী মে-কে অধিনায়ক নির্বাচিত করে সেই জল্পনা কল্পনার অবসান করেছেন। শুধু একটি টেস্টের জন্যই মে অধিনায়ক হননি। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলার জন্যই তাকে অধিনায়ক করা হয়েছে। ইংরেজ রক্ষণশীল জাতি। সহজে এদের মত বদলায় না। মে-কে অধিনায়ক নির্বাচিত করে এই কথারই তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন। অধিনায়ক হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় মে-র ব্যর্থতার পর কত লেখালেখি, কত সমালোচনা এদেশে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশে গোলাম আমেদের অধিনায়কত্ব নিয়েও এমনিধারা সমালোচনা হয়েছিল। আমরা মত বদলিয়েছি, গোলাম আমেদও সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এখানে মে-ও সরে যাননি। নির্বাচকমণ্ডলীও মত পরিবর্তন করেননি।

ভারতের বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে মে এক নতুন রেকর্ড করতে যাচ্ছেন। নটিংহামের প্রথম টেস্টে মে হবেন ৩২টি টেস্ট খেলার অধিনায়ক, আর তাঁর টেস্ট খেলার মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০। ফলে ইংলণ্ডের জনপ্রিয় নামী খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক উলীর ৫২টি টেস্ট খেলার যে রেকর্ড আছে পিটার মে তা ভেঙে দেবেন।

প্রথম টেস্ট খেলার জন্য ইংলণ্ডের পক্ষে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের নাম— [illegible] মে—অধিনায়ক (সারে), গডফ্রে ইভান্স—উইকেট কিপার (কেণ্ট), কেন ব্যারিংটন (সারে), কলিন কাউড্রে (কেণ্ট), টম গ্রীনহাউ (ল্যাঙ্কাশায়ার), মার্টিন হর্টন (উরস্টার), আর্থার মিল্টন (গ্লস্টার), এলান মস (মিডলসেক্স), স্ট্যাথাম (ল্যাঙ্কাশায়ার), কেন টেলর (ইয়র্কশায়ার), ফ্রেড ট্রুম্যান (ইয়র্কশায়ার), ও পুলার—দ্বাদশ খেলোয়াড় (ল্যাঙ্কাশায়ার)।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ভারতের মত ইংলণ্ডও তারুণ্যের প্রতি ঢলে পড়েছে। লক, লেকার, টাইসন, বেলী, গ্রেভনির মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েছেন। ব্যারিংটন, গ্রীনহাউ, হর্টন, টেলর ও মস দলভুক্ত হয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে জয়লাভই ইংলণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। এদের চোখ ভবিষ্যতের দিকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের জন্য শক্তিশালী করে দল গড়াই ইংলণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। এর পর ইংলণ্ড দলের হয়তো আরও পরিবর্তন দেখা যাবে। এবং সম্ভবত হ্যাসেল, ডেক্সটার, পুলার এবং ইলিংওয়ার্থও টেস্টে খেলবেন। শক্তিহীন ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড চায় তাদের তরুণ খেলোয়াড়দের শক্তির যাচাই করতে।

ক্রিকেট ছেড়ে এবার অন্য কথায় কিছু আলোচনা করি। বিখ্যাত ডার্বি ঘোড়দৌড়ের দিন আসন্নপ্রায়। 'ঘোড়ার রাজা' এবং টাকার অনেক রাজার রাজা পরলোকগত আগা খাঁর সুযোগ্য পুত্র আলি খাঁর নাম এখনকার কাগজের পাতায় পাতায়। আগা খাঁর আমলে তাঁর ঘোড়া পাঁচবার ডার্বি জিতেছে। ঘোড়াগুলির নাম—ব্লেনহিম, বেরাম, মাহমুদ, মাই লাভ ও টিউলিয়ার। আলি খাঁ এ বছর 'ওয়ান থাউজ্যাণ্ড গিনি' ও 'টু থাউজ্যাণ্ড গিনি' জিতেছেন। তাঁর দুটি বিখ্যাত ঘোড়ার নাম 'টাবাউন' ও 'পেটিট এটোয়েল'। এ দুটি ঘোড়ার ডার্বি জেতার খুবই সম্ভাবনা। সবাই বলছে হবেই বা না কেন? আলি খাঁ সব কিছুই বিশেষ দেখেশুনে বাছাই করেন। কি ঘোড়া, কি ট্রেনার, কি জকি, কি জীবনের সঙ্গী। এ ছাড়া বড় বড় প্রাসাদ তো আছেই। ট্রেনার হিসেবে রেখেছেন ফ্রান্সের এলেক হেডকে, জকি হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার জর্জ মুরকে। তার প্রাক্তন ও বর্তমান অর্ধাঙ্গিনীদের মধ্যে রয়েছেন হলিউডের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা রিটা হেওয়ার্থ, জিন টিয়ার্নি ও বেতিনা। বেনাবনে মুক্তো ছড়াবার লোক আলি খাঁ নন। ইনি বাপকা বেটা। নজর সব সময়ই উঁচুর দিকে।

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতেও বেশী দেরী নেই। এর জন্য টেনিস মহলে 'সাজ' 'সাজ' রব পড়ে গেছে। সম্প্রতি ছোট্ট একটি বিষয়ের সমস্যা সমাধান করতে উইম্বলডন টেনিসের পরিচালক অল ইংলণ্ড ক্লাবের সেক্রেটারী কর্নেল ডানকান মেকলেকে অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটতে হয়েছে। বিষয়টি তুচ্ছ : সন্তান-সম্ভবা কোন নারীকে উইম্বলডনে খেলিতে দেওয়া সঙ্গত কিনা? চিলির বিখ্যাত খেলোয়াড় লুই আয়োলার স্ত্রী মেরিয়া ভালই টেনিস খেলেন। এ বছরের প্রতিযোগিতায় মেরিয়া খেলতে খুবই উৎসুক। কিন্তু তিনি সন্তান-সম্ভবা। স্বামীর মত আছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেরও অমত নেই। আইন কি বলে? কর্নেল মেকলে সাহেব আইনের পুঁথিপত্র ঘেঁটে রায় দিয়েছেন—না, আপত্তি নেই। ভাল খেলতে পারলেই হল। কার ছেলে হবে আর কার হবে না এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। তবে খেলার সময় ছেলে না হলেই রক্ষে।

সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৫শে মে—কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত এক লিপিতে বলা হইয়াছে যে, অন্ততঃ ১৯৭৬ সালের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে পরবর্তী তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৪৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ান অঞ্চলে পদ্মার ভাঙনে উদ্বাস্তু অধিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার হইতে কিছুকাল আগে বহু অর্থ মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু কোন কোন সরকারী কর্মচারীর যোগসাজসে জনৈক কংগ্রেসী এম এল এর বণ্টন কারসাজিতে ঐ অর্থের মোটা একটা অংশ ঐ সদস্য মহোদয়ের পাকিস্তান নিবাসী আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিতরণ করার এক গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোপন তদন্ত আরম্ভ করেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৬শে মে—করিমগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ২রা এপ্রিল যে নবম গুলীবর্ষণ বিরতি চুক্তি কার্যকর করা হইয়াছিল, পাকিস্তান তাহা পুনরায় ভংগ করিয়াছে। গৌহাটির অসমীয়া সাপ্তাহিক "আসাম বাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার নাকি আসাম সরকারকে জানাইয়া দিয়াছে যে, পাকিস্তান টুকেরগ্রাম ছাড়িবে না।

অদ্য পৌরসভার মুলতুবী অধিবেশনে এক প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণকালে কংগ্রেস দল সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার পরও কংগ্রেসী মেয়র শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি সভার কার্য চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়ায় পৌরসভার ইতিহাসে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

২৭শে মে—কলিকাতার খোলা বাজারে চাউলের অভাবজনিত কেলেংকারী যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক মহলে ইহাকে খাদ্যনীতির চরম ব্যর্থতার নামান্তর বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে।

ভারত সরকার চিনি সম্পর্কিত নীতি পর্যালোচনা করার পর চিনিকলে উৎপন্ন সমস্ত চিনি সরাসরি বণ্টন করার জন্য নিজেদের হাতে রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদিন বৎসরের উৎপন্ন মোট চিনির শতকরা ২৫ ভাগ সরকারের হাতে ছিল।

২৮শে মে—শিলং-এ এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পাক প্রতিরক্ষা দপ্তর সম্প্রতি পাকিস্তানের একটি গোপন মানচিত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং এই মানচিত্রে সমগ্র আসাম রাজ্যকে বৃহত্তর পূর্ব পাকিস্তানের একটি অংশরূপে দেখান হইয়াছে।

কলিকাতার চোহান ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হরবংশ সিংহ চোহান ও তাঁহার কর্মচারী জয়রাজ বারি গুজদার এবং ওরিয়েণ্টাল ফায়ার অ্যাণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেডকে তিন লক্ষ টাকা সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

২৯শে মে—আজ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহার এবং কংগ্রেসী মেয়র শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জির মধ্যে তুমুল বিতণ্ডামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফলে সভাকক্ষে কিছুক্ষণ প্রবল উত্তেজনা ও হৈ-হল্লা চলে। শ্রী নাহার মেয়র শ্রী ব্যানার্জির সভা পরিচালনায় নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কটাক্ষপূর্ণ এক উক্তি করিয়া বসিলে উপরোক্ত বিশদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৩০শে মে—বার্তাজীবী বেতন কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ই প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্ররূপে গণ্য হইয়াছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি অস্তিত্ববিহীন সুগার মিলের নামে সরকার ও কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন লক্ষ টাকা ও সরকারী কন্ট্রোলের করগেটেড টিন, গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য লৌহদ্রব্য, সিমেণ্ট ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া কালোবাজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩১শে মে—১৯৫৭ সালের জুন মাসে শ্রীমুন্দ্রার বাবসায় প্রতিষ্ঠানে জীবন বীমা কর্পোরেশনের ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা লগ্নীর ব্যাপারে শ্রী এইচ এম প্যাটেল আই সি এস-এর নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার ও কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া বসু তদন্ত বোর্ড রায় দিয়াছেন। জীবন বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী জি আর কামাথের কার্যকলাপ নিন্দনীয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে মে—কুখ্যাত ডোরাই চালানদার বলিয়া কথিত কাশিম ভাট্টি আজ করাচীতে সামরিক আদালতে বলে যে, প্রাক্তন পুলিস ইন্সপেক্টর জেনারেল মালিক হক নাওয়াজ টিওয়ানা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নূনের নিকট হইতে ডোরাই চালান চালাইয়া যাইবার জন্য যে নির্দেশ আনিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে জানান হয়।

২৬শে মে—ওয়াকিব মহলের সংবাদে প্রকাশ, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের লেবানন বা মরোক্কোর মারফত ইরাকী প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল আবদুল করিম কাসেমের নিকট গোপনে 'শান্তি প্রস্তাব' প্রেরণ করিয়াছেন। কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, ইরাক-আরব সাধারণতন্ত্র বিরোধ ও আরব আরব্যরাষ্ট্রসমূহের অন্যান্য অনৈক্যের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

রাশিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞান আকাদামীর ব্যবহারিক শারীরতত্ত্ব গবেষণাগারের অধ্যক্ষ প্রফেসর নেগোভস্কী বিভিন্ন জীবের উপর পরীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক হইতে মৃত্যু ঘটিবার পাঁচ ছয় মিনিট পরে নহে, আরও বহু সময় পরেও নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার সম্ভবপর।

২৭শে মে—অদ্য সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ দরবারে রাজা মহেন্দ্র শ্রী বি পি কৈরালার নেতৃত্বে নেপালের প্রথম নির্বাচিত মন্ত্রিসভাকে শপথ গ্রহণ করান। প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে সহস্র সহস্র নেপালী নরনারী সমবেত হইয়াছিল।

আজ হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আগামীকাল প্রাতে বার্লিন ও জার্মানী সম্পর্কে জেনেভার আলোচনার ব্যাপারে বৃহৎ চারিটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিবেন।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভ বলেন, "শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করিব এবং জেনেভা সম্মেলনে আমাদের অংশীদারদের সহিত বুঝাপড়া করিবার জন্যও আমরা চেষ্টা করিব।"

২৮শে মে—দেশ বিভাগকালীন ঋণ বাবদ ভারত পাকিস্তানের নিকট ৩০০ কোটি টাকা পায় বলিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রে যে খবর বাহির হইয়াছে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী মহম্মদ শোয়াইব তাহার প্রতিবাদ করিয়া করাচীর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন—বরং পাকিস্তানই বিভিন্ন খাতে ভারতের নিকট ১৮০ কোটি টাকা পায়।

২৯শে মে—নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালা অদ্য কাটমাণ্ডুতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পাকিস্তানের সহিত নেপালের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানী হাই কমিশনারের নেপালে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীকৈরালা বলেন, তিনি ভ্রমণকারী হিসাবে নেপালে আসিতেছেন।

আমেরিকা নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম বলম্বীপ পার্শ্বে প্রিয়াংগান রিজেন্সিতে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন এক পার্বত্য খাদে পতিত হওয়ায় শত শত লোক হতাহত হইয়াছে।

৩০শে মে—জনৈক মার্কিন মুখপাত্র বলেন, সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআঁদ্রে গ্রমিকো আজ বলিয়াছেন যে, বার্লিন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের পরিকল্পনা আলোচনার ভিত্তি হিসাবেও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩১শে মে—রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত বিবরণে প্রকাশ, পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্যা হইতেছে ২৮০ কোটি—তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী চারিটি দেশে রহিয়াছে—প্রজাতন্ত্রী চীন ৬৪ কোটি, ভারতবর্ষ ৪০ কোটি,

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

প্রস্তুতকারক
দি ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯
CMC-13 BEN

রবিনসন্স 'পেটেন্ট' বার্লি
খেয়ে
দুজনেই ভালো আছেন
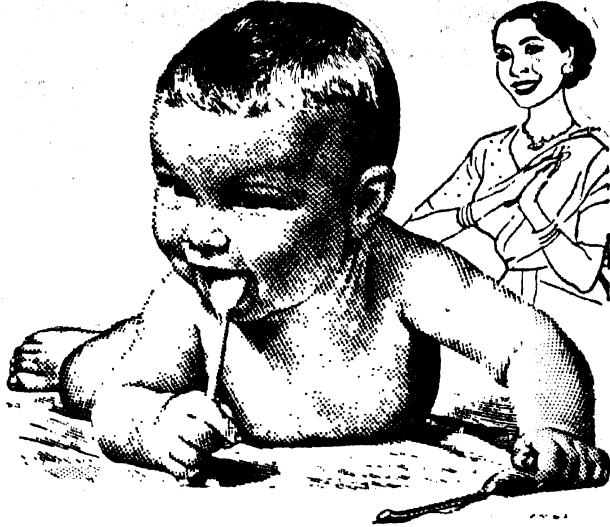
বাচ্চাদের যখন মায়ের দুধ দেওয়া চলে না, তখন সবসময়ই ডাক্তাররা গরুর দুধের সঙ্গে রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি খাওয়াতে বলেন। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি মেশানো থাকলে গরুর দুধ ওদের পেটে চাপ বাঁধতে পারে না বরং সহজে হজম হয়। তার মানে, বাচ্চারা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর তাদের শরীর ভালোভাবে গড়ে ওঠে। আপনার ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দেখুন, ওদের স্বাস্থ্য কত সুন্দর হয়!

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড (ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

RPT 1372

সূচীপত্র

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 13th June, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৩ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

"স্বতন্ত্র দল"

শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন, নাম দিয়াছেন "স্বতন্ত্র দল"। কিছুকাল হইতেই, বিশেষ কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ভূমি সংক্রান্ত নীতি গৃহীত হইবার পর হইতেই তিনি সরকার বিরোধী একটি দল হওয়া উচিত, মন্তব্য করিতেছিলেন। এখন সেই সব মন্তব্য দানা বাঁধিয়া অনেকটা স্থায়ীরূপ লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় পঞ্চাশজন রাজনীতিক রাজাজির সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন। পরকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, তবে কর্মনীতি প্রকাশিত হইয়াছে বলা চলে না। কর্মনীতি স্থির করিতে আরও কিছু সময় লাগিবার কথা, কিন্তু মূলনীতি বা Ideology-র কিছু আভাস ইতিমধ্যেই রাজাজি ব্যক্ত করিয়াছেন।

কিছুদিন হইতে রাজাজি কংগ্রেস সরকারের কর্মনীতিতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কংগ্রেস সরকার "ব্রেকহীন" গাড়ির ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার সম্মুখে মানুষের জীবনযাত্রা অকারণে বা অন্যায়ভাবে পদদলিত হইতেছে, জোরালো বিরোধী দল না থাকায় সরকারের গতিরোধ করা যাইতেছে না। সরকারের যথেচ্ছা গতিরোধ করিবার আশাতেই "স্বতন্ত্র দলের" পরিকল্পনা। কংগ্রেসের দুটি নীতির সহিত "স্বতন্ত্র দলের" বিরোধ। ভূমি সংক্রান্ত নীতি এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত নীতি। রাজাজির মতে এ দুয়েরই শেষ পরিণাম একনায়কতন্ত্র। তিনি বলেন যে যদিচ প্রধানমন্ত্রী একনায়কতন্ত্র বিরোধী, আর একনায়কত্ব যাহাতে না আসিয়া পড়ে সে বিষয়ে সচেতন, তৎসত্ত্বেও প্রবল ঘটনাস্রোত সমগ্র দেশকে সেইদিকেই ঠেলিয়া লইয়া যাইবে, তাঁহার আশঙ্কা, সমগ্র দেশ ইতিমধ্যেই সেইদিকে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই এখনই কংগ্রেস সরকারের গতি সংযত করা আবশ্যক। আর তাহার উপায় হইতেছে একটি প্রবল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন। "স্বতন্ত্র দল" সেই দল। গোড়াতে তিনি দলটির নামকরণ করিয়াছিলেন "Conservative party" বা রক্ষণশীল দল। পরে সে নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেন পরিত্যক্ত হইল সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে যুগ পড়িয়াছে তাহাতে কেহই নিজেকে 'রক্ষণশীল' বলিতে রাজি নয় এমন কি নিতান্ত ধর্মীয় বা রাজকীয় রাজনৈতিক দলগুলিও ইশারায় নিজেদের "Progressive" বলিয়া পরিচয় দেয়। কাজেই গোড়াতেই "রক্ষণশীল" বলিয়া আসর পাতিলে আসর তেমন জমিবে না আশংকাতে নামের বদল হইয়াছে। ভালোই হইয়াছে কেন না, গোলাপফুল যে নামেই অভিহিত হোক গোলাপফুল থাকিলেও রাজনীতি সম্বন্ধে এ সত্য প্রযোজ্য নয়, এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে নামটাই সব, "কলৌ নামৈব কেবলম।" রাজাজি বলিয়াছেন যে ভোট পাইবার আশাতে সমস্ত দল বেমক্কা প্রতিশ্রুতি দেয়, একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অধিকতর বেমক্কা প্রতিশ্রুতি দেয়, আর অবশেষে সেই প্রতিশ্রুতির তাগিদে [illegible] দেশটাকে অনিশ্চয়ের পথে ঠেলিয়া লইয়া যায়। এই সর্বনাশা প্রথার অবিলম্বে অবসানের আশাতেই রাজাজির উদ্যম।

এ উদ্যম কতখানি সফল হইবে এখনি বলা যায় না। রাজ্যে রাজ্যে জনমত সচেতন ও জনমত সংগ্রহ আবশ্যক, তারপরে আছে সাধারণ নির্বাচন। সাধারণ নির্বাচনের পরে বুঝিতে পারা যাইবে রাজাজির উদ্যম কতটা সাফল্যলাভ করিল।

আমরা আশা করিব যে রাজাজির উদ্যম সাফল্যলাভ করুক, কেন না, ভারতীয় গণরাষ্ট্রে একটি প্রবল সর্বভারতীয় গণতন্ত্রসম্মত বিরোধী রাজনৈতিক দল অত্যাবশ্যক। এখন পর্যন্ত ভারতীয় গণতন্ত্র এক চাকায় চলিতেছে, অন্য চাকাগুলি যাহা আছে তাহা না থাকারই সামিল। রাজাজির পরিকল্পিত "স্বতন্ত্র দল" যদি দ্বিতীয় চাকায় পরিণত হইতে পারে তবে এই বুঝিয়া নিশ্চিত হইব যে এতদিনে ভারতে গণতন্ত্র স্থায়ী আশ্রয় লাভ করিল। সে চেষ্টা ইতিপূর্বেও কোন কোন রাজনীতিক করিয়াছেন, আশা করা যায় এবারে রাজাজির মত বিচক্ষণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির চেষ্টায় সে প্রয়াস ফলবতী হইবে।

নিরর্থক বলা যায় না. উত্তম ঐতিহাসিক রচনার আপেক্ষিক সত্যতাও স্বীকার্য। কেবল মনে রাখিতে হবে, কোনো ইতিহাসই বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া হতে পারে না, উভয়ের সত্য এবং স্বাদের প্রকৃতি এবং স্তর ভিন্ন। ইতিহাস লেখক পুরাতন স্থানে ঘুরে "atmosphere" আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। তাতে তাঁর "ঐতিহাসিক কল্পনা-শক্তির" তেজবৃদ্ধি হতে পারে, লেখা সরসতর হতে পারে, কিন্তু সেকালের বাস্তব তাতে বেশি ধরা পড়বে এমন কোনো কথা নেই। পুরাতন স্থানে ঘুরে "atmosphere" আয়ত্ত করলে লেখকের সুবিধা হতে পারে কিন্তু স্বপ্নে সেকালের বাস্তবের বাদ পেলে লেখাই ঘুচে যেতে পারে, কারণ 'ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তি" যে তথ্যের কাঠামোর উপর কাজ করবে সেটাকেই সম্ভবত তখন অলীক অথবা obstraction বলে বোধ হবে।

বইপত্তর, খবরের কাগজ প্রভৃতি ,থেকে বিদেশে কাজ চালানো গোছের ধারণা করা যায় এবং সেগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে অর্থসঙ্গতি বজায় রেখে প্রকাশ করলে হয়ত বিসদৃশ ঠেকে না. কাগজের কথার সঙ্গে কাগজের কথার মিল নষ্ট না হলেই হল। কিন্তু মুশকিল হয় চোখে দেখার সঙ্গে মিল রক্ষা করতে হলে। দেশে লোকে কাগজও পড়ে, চোখেও দেখে, দুয়ের মধ্যে কতখানি মিল এবং কতখানি অমিল তার একটা ধারণা হয়ে গেছে, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তুলনায় পুঁথিপত্রে এবং খবরের কাগজের obstractionগুলির স্থান এবং প্রভাব কম। কিন্তু বিদেশ সম্বন্ধে আমরা obstractionsএর উপরই মুখ্যত নির্ভর করে থাকি, এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংশোধনী শক্তির ক্রিয়া থেকে আমরা বঞ্চিত। এক কাগজের কথা অন্য কাগজের কথার সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে কিন্তু সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সেইজন্য পুঁথি-পত্রের নজিরের উপর নির্ভর করে বিদেশ সম্বন্ধে ভাবতে এবং লিখতে যারা অভ্যস্ত তাদের পক্ষে চোখে দেখার ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় লাগে। অল্প সময়ের দেখার বিপদটা বোধ হয় আরো একটু বেশি।

৮।৬।৫৯

আলোচনা

"বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী"

সবিনয় নিবেদন,

"দেশ"-এ (১ জ্যৈষ্ঠ, '৬৬, ২৬ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা) "বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী" শিরোনামার প্রবন্ধটি পাঠ করে লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রবন্ধটি তাঁর মননশীলতা আর ধীশক্তির নতুন পরিচয় বহন করে এনেছে। তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে আমরা আরো তথ্যযুক্ত, যুক্তিপূর্ণ রচনা আশা করব। তিনি আমাদের নিরাশ করবেন না—আশা করি।

এখন আলোচনায় আসা যাক।...গুরু-কবির আক্ষেপের একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, শাস্ত্রী মশায়ের অভিমতের কালও প্রায় শতপূর্তির মুখে, তবুও আমাদের চৈতন্য হল না—"আত্মবিস্মৃত জাতি" সন্দেহ নেই। গুরুদেবের আন্তরিক চেষ্টা দেশবিদেশে তা স্বীকৃত হবার পরেও আজও একটা প্রকৃত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ আমাদের হল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল বিশ্বভারতী একটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী শিক্ষায়তন-এ পরিণত হবে সেখানে নাকি শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে(?) বা তত্ত্বাবধানে(?) থাকা সত্ত্বেও এর কোন প্রতিকার হল না—এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক সন্দেহ নেই। মহাত্মা গান্ধী—যাকে গুরুদেব বিশ্বভারতী গঠনের ভার দিয়েছিলেন তাঁর তিরোধানের পর—তিনিও অকপট ভাষায় শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে হিন্দুস্থানী ভাষাকেও বিশ্বভারতীর একটা অন্যতম প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কবি-গুরুর মনে হিন্দুস্থানী ভাষার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশয় ছিল—তাঁর নানারকম প্রবন্ধের মধ্যেই এর পরিচয় আর ইঙ্গিত রয়েছে। (যার একটা উল্লেখ শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে করেছেন। উদাহরণ বাড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই)। গুরুদেবের মতে বিশ্বভারতীর একমাত্র মাধ্যম ভাষা হবে বাঙলা—"মোদের গরব মোদের আশা"। তাঁর ইচ্ছে ছিল পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাও আমরা শিখব—কিন্তু তা ইংরেজীর মাধ্যমে নয়—মাতৃভাষার মাধ্যমেই। পৃথিবীর সব দেশেই (উন্নত) এই প্রথায় বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

আরও একটা কথা—বিশ্বভারতীর বর্তমান আচার্য শ্রীনেহরু বাঙলায় ভাষণ দিতে না পারার জন্যে দুঃখিত হন বা নাই হন তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু তাঁর আন্তরিক চেষ্টা হওয়া উচিত গুরুদেবের অন্তিম ইচ্ছাকে মূর্ত করে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করা। আমরা তাঁর কাছে এটুকু আশা নিশ্চয়ই করবার অধিকার রাখি। নমস্কারান্তে ইতি—

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলিকাতা।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

সবিনয় নিবেদন,—রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি রবীন্দ্র অনুরাগী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এই চিঠি লিখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ অভিপ্রায় ছিল এই অশিক্ষাগ্রস্ত দেশে 'শিক্ষিত মন' গড়ে তোলা। অথচ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য দেশব্যাপী যে আয়োজন হচ্ছে তাতে এই হতভাগ্য দেশের 'অতি বিরাট মূর্খতার কালিমা দূরে করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ার কোনও শ্রদ্ধেয় প্রস্তাব স্থান পেয়েছে কিনা এখনও জানা যায়নি।

শিক্ষার অনাবৃষ্টির জন্য দেশের চিত্ত-ক্ষেত্রের মরুময়তা যে তাঁকে পীড়িত করত সেকথা বলা বাহুল্য। তিনি দেশবাসীকে একাধিকবার জানিয়ে গেছেন যে, পরভাষার অবাঞ্ছিত প্রতিবন্ধের জন্য বিশল্যকরণীর সন্ধান না পেয়ে আধুনিক শিক্ষার সমগ্র গলাধঃকরণ পর্যন্ত আমাদের বহন করতে হচ্ছে অহেতুক ক্লান্তির সংগে, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে যেটুকু খাদ্য আমরা পাই, সেটুকুও আমরা পরিপাক করতে পারছি না স্বাভাবিক জারক রসের অভাবে। দেশের চিৎপ্রকর্ষের সাধনা এইভাবে ব্যাহত হতে দেখে নিদারুণ ক্ষোভে তিনি বারংবার বিচলিত হয়েছিলেন।

কোনও প্রাতিভাসিক কারণের বশবর্তী না হয়ে আমরা যদি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হয়ে থাকি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত অভিপ্রায় বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই দুটি প্রস্তাব অবহিত হয়ে বিবেচনা করবার জন্য আবেদন জানান যেতে পারে। রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে বাংলা দেশের, সমক্ষে—(১) যথার্থ নিষ্ঠার সংগে অবিলম্বে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা করা, এবং (২) মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

এই প্রসংগে এই আশা পোষণ করা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, উক্ত দুটি প্রস্তাবের সফলতাই হবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি জাতির শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ। নমস্কারান্তে—ইতি,
দিলীপকুমার দাস, বর্ধমান।

স্প্রিংগিং টাইগার

মহাশয়,

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠের দেশ-এ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সরকার নেতাজীর প্রতি ইংরাজ-দের শ্রদ্ধা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, "The Springing Tiger" বইটির সমালোচকদের মন্তব্যই বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ তার।

বিখ্যাত 'অবজারভার' পত্রিকার সমালোচক বলেন,

"Yet in the end, his (Netaji's) fiery energy accomplished little. The I.N.A. proved as incompetent and unreliable as the spies and saboteurs left behind him."

এপ্রিল তিন তারিখে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে' সমালোচক মন্তব্য করেন,

"It is the Boses and not the Gandhis whom we have to fear. The Nationalist with the bomb has too many precedents.

'We have to give our blood and to take the blood of our enemies.' wrote Bose in his order of the Day of January 1, 1945, 'therefore let your slogan—your battle cry.... be blood, blood, and blood.'

Some one might be doing us all a good turn if he sent a copy of Mr. Toye's book to Sir Roy Welensky."

ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইংরাজদের মনোভাবের একটি দৃষ্টান্ত বোধ হয় এখানে

উনিশশো সাতান্ন সালে, সুয়েজ ঘটনার কিছুদিন পর লণ্ডনের কোন একটি স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর একটি রচনা দেখার সৌভাগ্য (বা দুর্ভাগ্য) হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের যে কোন একটি রাষ্ট্রের সম্বন্ধে রচনায় অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক ছাত্রী ভারত সম্বন্ধে মন্তব্য করে,

"অনার্য এবং নরখাদক অধ্যুষিত এই অঞ্চলে প্রথম সভ্যতার আলো দেখান মহামতি ক্লাইভ। হীনবুদ্ধি এই অনার্যরা আজও বৃক্ষশীর্ষে বাস করে। তবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান হয়। ইত্যাদি।"

স্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন,

"Very high standard of writing. Isn't it ?"

ছাত্রীর পিতার মন্তব্য,

"I do believe, one day, she will be a great journalist of this country."

'ডেলী মেল', 'ডেলী এক্সপ্রেস' বা 'নিউজ ক্রনিকলে'র ভারতস্থ সংবাদদাতাদের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বিদ্রূপ করেছিলেন কিনা বুঝতে পারিনি সেদিন।

ইতি—
শরৎপ্রসাদ রায়
লণ্ডন।

ড্রাগনের রক্ত

মাননীয় মহাশয়,

গত ৩০শে মে তারিখের সংখ্যায় "বিশ্ব-বিচিত্রা" শীর্ষক প্রবন্ধে "ড্রাগনের রক্তের" চাহিদা সম্বন্ধে খবরটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। যে জাপানী প্রতিষ্ঠানটি এই দ্রব্যটির অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহা নিছক উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। কারণ, দ্রব্যটি অভিধানগত অর্থ হিসাবে ড্রাগন নামক জন্তুর রক্ত নহে।

ড্রাগনের রক্ত বা DRAGON'S BLOOD, একপ্রকার পাম্ জাতীয় (CALAMUS DRACO) বৃক্ষ হইতে নিষ্কাশিত Resin জাতীয় পদার্থ। একপ্রকার রোটাং (ROTANG) জাতীয় পাম্ বৃক্ষ ভারতবর্ষে জন্মায়, যাহা হইতে বেশী পরিমাণে Resin জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই সকল জাতীয় গাছের ফল পাকিলে তাহার গায়ে একপ্রকার আঠা জাতীয় পদার্থ জন্মায়। এই ফলগুলি সিদ্ধ করিয়া ঘন লাল্চে বাদামী রংয়ের পাউডার তৈয়ার হয়। ইহাই ড্র্যাগনস্ ব্লাড নামে পরিচিত। ইউরোপ, আমেরিকা, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশসমূহে ইহা পেটের অসুখের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে বার্নিশ, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতেও মুদ্রণ-শিল্পে ইহার যথেষ্ট পরিমাণে চাহিদা আছে। লাইন ব্লক তৈয়ার করিতে ড্রাগনস্ ব্লাড-এর প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে ইহার পরিবর্তে বিটুমেন ব্যবহার করা যায়।

ইতি—
বৈদ্যনাথ ঘোষাল,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় ভুবন

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

গাছের ওপাশে গাছ বনবাদাড় নিবিড় জঙ্গল :
আদিম রক্তের তৃষ্ণা ; দ্রিমিদ্রিমি মাদলের ঘায়ে
ছিঁড়ে যায়, খুলে যায় প্রত্যেক গভীর অন্তস্তল,
নৃত্যের দুরূহ ভঙ্গি ফুটে ওঠে কার পায়ে পায়ে ;

আর সব শূন্য, দ্যাখো শূন্য ঐ দূর ঘরবাড়ি—
পোষাপাখি ঠোঁট নাড়ে একভাবে, থাকে অন্তরীণ,
সুন্দর দেয়ালঘড়ি সময় জানায়, আর ওর দূরবীন,
দ্যাখায় বাহির-দৃশ্য উজ্জ্বল অস্তিত্ব সারি সারি ;

ভেতরে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে দ্বিতীয় ভুবন—
দুবাহু মেলে সে ডাকে দুই ডানা ছড়ায় আকাশে,
গাছের ওপাশে গাছ, ছায়া পড়ে, মেঘ ক'রে আসে—
তোমার বুকের মধ্যে আদিম মানুষ এক বাঁচে সারাক্ষণ ॥

অজ্ঞাত হাওয়ার মধ্যে

শিবশম্ভু পাল

অপরিচয়ের নিশীথ কখনো ফুরোতে দেব না।

কান্নাহাসির সম্প্রীতি বুকে নিয়ে
তুমি কি বলছ হে বিজন বহুকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ
দ্বিধার পাহাড় ছাড়িয়ে কোথায় আমাকে ডাকলে
দু'হাত বাড়িয়ে
সবই রয়ে গেল বোধের ওপারে, হে নিশীথিনি।

প্রহরের পর প্রহর কেটেছে, নায়িকা আমার
সমর্পণের নমিত রেখায় সুন্দরতর
অন্তবিহীন দিন কেটে গেছে, নায়িকা আমার
বাঁধ-ভেঙে-দেয়া হৃদয়ের কাছে আগুনের স্বর।
এই সুনিবিড় যুগ্মতা, মন সবই তো জেনেছি ;
অগ্নিমুখর দেহের মধ্যে চিন্ময়তার
দীপ্ত শ্লোকের চতুরালি দেখে বিজ্ঞ ভেবেছি
তবুও প্লাবনে নাচের ঘূর্ণি ; নায়িকার সারা দেহ
ভেসেও অটুট ধ্রুবমণ্ডলে উজ্জ্বল স্থির আগেরি মতন।

বন্ধু আমার, হে বিজন বহুকাঙ্ক্ষিত ক্ষণ
জানার পরিধি ভেঙেচুরে দিয়ে কোথায় এনেছ
এই হাসি, এই চোখের পাতার কম্পিত আভা
কখনো দেখিনি।

অরণ্যভূমি তোলপাড় করে অজ্ঞাত হাওয়া। আমি চিরকাল
বিস্মিত থেকে যাব ॥

ঘুম ভেঙে গেল নির্ঋতির। চকিতে চোখ মেলে চাইল সে। সে যেন আতঙ্ক-গ্রস্ত। নয়নে ত্রাস, সর্বাঙ্গে স্বেদ, মুখে আর্তচিহ্ন। সম্বিৎহারা লাফিয়ে উঠল নির্ঋতি। অসহ্য, অসহ্য! হোমধূপের সৌরভ অসহ্য, অসহ্য গম্ভীর বেদধ্বনি। মাতালের মত ছুটে বেরিয়ে এল সে, কম্পিত অঙ্গ—স্খলিত চরণ। কিন্তু অবরুদ্ধ যেন আশ্রমের নির্গমন দ্বার। উত্তেজিত হয়ে সে এসে উপস্থিত হল ঋষি উদ্দালকের সম্মুখে, বলল ত্রস্তকণ্ঠে, 'আমি থাকব না, থাকব না এ আশ্রমে। আমাকে দূরে নিয়ে চল, ঋষি! এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা অসম্ভব আমার পক্ষে—'

বিস্মিত, ভীত উদ্দালক। এ কি বলছে নির্ঋতি! কিন্তু কোন কথা উচ্চারণ করার পূর্বেই ঝড়ের বেগে নির্ঋতি তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল, চোখে মিনতি—কণ্ঠে ভয়ার্তি, 'আমায় পথ দেখিয়ে দাও, আমায় বাইরে নিয়ে চল।'

'কিন্তু, কেন?'—প্রশ্ন করলেন উদ্দালক।

'এখানে নয়, এখানে নয়—তুমি আমায় দূরে নিয়ে চল, আমি সব কথাই বলব তোমায়'—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে নির্ঋতি। অস্থির সে, উন্মাদ। দ্রুত আকর্ষণ করতে থাকে ঋষিকে। উদ্দালক বাধ্য হন তাকে নিয়ে আশ্রমের বাইরে আসতে। যতবার বলে ঋষি, বল, 'কেন এলে'—ততবার বলে নির্ঋতি, 'চল দূরে, আরও দূরে।'

বিদ্যুৎবেগে ছুটেছে নির্ঋতি ঋষিকে সঙ্গে নিয়ে, ছুটেছে ঠিক ভূতগ্রস্ত আতঙ্কিতের মত। সারাদিন ঘুরেছে, থামবার মত স্থান পায়নি কোথাও। কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে চরণ—ভ্রূক্ষেপ নেই, উচ্চাবচ ভূমিতে হয়েছে পদস্খলন—বোধ নেই, ঊর্ধ্বে মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রখর দীপ্তি—আতপ্ত পদতল, তবু জ্ঞান নেই। সঘন নিশ্বাস, পরিশ্রান্ত দেহ। তথাপি চলেছে বিরতিবিহীন পথপরিক্রমা। অবশেষে অপরাহ্ণে সে এসে দাঁড়িয়েছে দিগন্তাবস্তৃত এক পরিত্যক্ত প্রান্তরে নির্জন অশ্বত্থতলে। এইখানে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে নির্ঋতি। আশ্রম নয়, আশ্রম থেকে দূরে—বহুদূরে এই জনশূন্য প্রান্তরই তার যোগ্য বাসভূমি।

'কেন চলে এলে'—শুধালেন ঋষি। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তাঁর।

বুকভরে উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাস টেনে অনর্গল বলে চলে নির্ঋতি, 'যেখানে বেদ-ধ্বনি ছন্দিত হয়, সেখানে আমি বাস করতে পারি না। যেখানে হয় যজ্ঞ, দেবপূজা—তা-ও আমার বাসযোগ্য নয়। সংযম, শান্তি, সত্য আমার চোখের বিষ। যজ্ঞহীন, দান-হীন, অতিথি-সংকারহীন স্থান আমার আবাসভূমি। আমি অলক্ষ্মী, আমার উল্লাস শূন্যতায়, শ্রীহীনতায়, ধূমল ধূসরতায়। আমি নির্ঋতি বিশ্বের অসত্য—মিথ্যাচারে কুটিলতায় ব্যভিচারে আমার স্থিতি। আমি নির্ঋতি,—হিংসায়, ছলনায়, ষড়যন্ত্রে আমার আনন্দ। আমি নির্ভয়ে বিচরণ করি সেইখানে, যেখানে স্বার্থচিন্তায় মানুষ উন্মাদ, কামনায় ক্রিমি কীটবৎ।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন ঋষি উদ্দালক। সৃষ্টির একি অনিয়ম নির্ঋতি! ধর্ম-কর্মের বিরোধী, আচার-নিয়মের অরি, পাপ-সহচরী সে। একে নিয়ে কি করবেন, কোথায় যাবেন তিনি! বিধাতার কি অভি-প্রায়? ধর্মাদি ত্রিবর্গ সাধনের সহায়িনী ভার্যা, পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী। যে পত্নী সেই ধর্মাচরণের প্রতিবন্ধক, ধার্মিকের গৃহে কোথায় তার স্থান?

বিচলিত হলেন মুনি উদ্দালক, যেন ভূকম্পনে ঈষৎ চঞ্চল স্থির ভূধর। মূক মৌন দেখে নির্ঋতিও অস্থির হল, পূর্ণ কি হবে না তার মনস্কাম? ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল সে, 'আমাকে কি তাহলে তুমি গ্রহণ করবে না, ঋষি?'

—'না, না—তা নয়। মিথ্যা হবে না বিধাতার অভিপ্রায়।'—বললেন স্থিরবুদ্ধি উদ্দালক, 'তুমি অপেক্ষা কর নির্ঋতি। তোমার বাসযোগ্য ভূমি কোথায়, আমি শুনে আসি বিধাতার নির্দেশ।'

গমনোদ্যত উদ্দালককে বাধা দিয়ে কাতর-ভাবে বলল ক্লান্ত নির্ঋতি, 'তুমি তো সত্যি ফিরে আসবে আবার!'

—'মিথ্যা হয় না ঋষি-বাক্য। সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার আচরণ, সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার বাণী। তুমি অপেক্ষা কর, আমি শুধু জেনে আসি বিধাতার নির্দেশ—ধার্মিকের নিবাসে কোথায় নির্ঋতির স্থান?'

ধীর চরণে চলে গেলেন ঋষি। আদিত্য-পথে যেমন যাত্রা করে রাজহংস, তেমনি আকাশপথে অন্তর্হিত হলেন যোগ-সিদ্ধ উদ্দালক। নির্ঋতির কর্ণে জেগে রইল একটি অনুরণন, 'আমি আসব, আসব, আসব!'

সেই থেকে প্রতীক্ষা করছে নির্ঝর্তি, প্রতীক্ষা করছে জনহীন পরিত্যক্ত প্রান্তরে শুষ্কশাখ অশ্বত্থতলায়। চরণ-শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত নয়ন। তবুও চক্ষু তার মুদ্রিত হয়নি ক্ষণেকের তরে। আরক্ত লোচনে শ্রান্তিহীন প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি,—কোথায় ঋষি? অপরাহ্নের বিদায়ী সূর্যের শেষ রশ্মিপাতে আরক্ত হয়েছে দিগন্ত; আরক্ত হয়েছে সূর্যবিরহে; প্রতীক্ষাব্যাকুল নির্ঝর্তির রক্তে জেগেছে চঞ্চল শিহরণ। ধীরে মিলিয়ে গেছে সোনালী কিরণ, মিলিয়ে যায়নি নির্ঝর্তির আশার দীপ। তারপর নেমেছে সন্ধ্যা, তিমিরাঞ্চলে আচ্ছাদিত দিগ্বলয়—তখন কেঁপে উঠেছে নির্ঝর্তির অন্তর, ঋষি কি আসবেন না!

ঘোর রাক্ষসী মুহূর্তে নির্ঝর্তি ভয় পেয়ে গেল! সমীরণে যেন প্রেত-পিশাচের হাহাশ্বাস তার শুষ্ক বদন শুষ্কতর হয়ে উঠল। যৌবন-দর্পিতা, মদ-বিহ্বলা, আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণীর অন্তরে সভয় কম্পন, প্রস্ফুরিত সংলোষ্ঠীর খসে ওষ্ঠ! পরাজয়—আজ তার চরম পরাজয়। ক্রোধ নয়, গভীর নৈরাশ্যে যেন ভেঙে পড়ে নির্ঝর্তি। বড় সহায়হীন, বড় একা সে। পাপমতি সে, নির্বাসিতা। এ নির্বাসন থেকে পরিমুক্তি নেই, চেষ্টা করলেও মুক্তি পাবে না। বিধাতা ধরে ফেলেছেন তার ছলনা, কুহকিনীর মিথ্যা কৌশল। ওই প্রগাঢ় অন্ধকার বিধাতার উদ্যত বজ্র, এই নিঃসীম নীরবতা প্রলয়ের পূর্বাভাস!

কে যেন কণ্ঠ চেপে ধরেছে নির্ঝর্তির! একটা ক্রন্দন অন্তর বিদীর্ণ করে উত্থিত হয়, কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায় কণ্ঠেই। সভয়ে নিমীলিত হয়ে আসে অক্ষিপুট। প্রাণপণ চেষ্টায় সে চোখ মেলে রাখে। একটা অতি ক্ষীণ আশা, মিথ্যা কি হয় ঋষিবাক্য! সত্যো

প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ধর্ম, সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের বাক্য—ঘনতমিস্রার দিগ্‌দর্শন তাঁদের শব্দজ্যোতি।

নিরাশ হলেও নিঋ্ঋতি প্রতীক্ষা করে। উত্তরঙ্গ সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির শেষ আশা, কোথায় ঋষি, কোথায় সত্যবাদী ঋষি উদ্দালক!

সহসা সেই গাঢ় তমসায় পরিত্যক্ত প্রান্তরে একটা শব্দ ওঠে—কার যেন গোপন পদ-সঞ্চার। ঋষি কি এলেন তাহলে? ভর্তা কি এলেন ভীতা ভার্যাকে আশ্রয় দিতে?
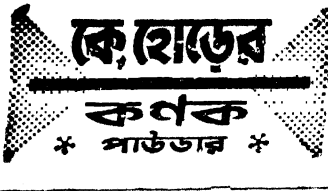
কম্পকণ্ঠে প্রশ্ন করে নিঋ্ঋতি, 'তুমি কি এলে ঋষি!'

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু শোনা যায় কার যেন উত্তর, 'আমি এসেছি।'

এসেছেন, তিনিই এসেছেন! আনন্দে উল্লসিত হয় নিঋ্ঋতি। কী গভীর আশ্বাস। নিঋ্ঋতির যেন নবজন্ম হয়েছে আজ। নৈরাশ্যের তীর্থনীরে স্নান করে পাপমতি নিঋ্ঋতি আজ শুভ্র পবিত্র। আজ সত্যিই সে প্রেমার্থিনী। আজ আর সংশয় নেই, দ্বিধা নেই। লোভকে, লালসাকে, মিথ্যার ব্যভিচারকে সে নিঃশেষে বিসর্জন দেবে; নিবিড়ভাবে গ্রহণ করবে সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রেমালিঙ্গন। সে আর কিছু চায় না। দূরীভূত প্রতিশোধ-স্পৃহা। আজ একান্ত-ভাবে সে কামনা করে সত্যের স্পর্শ।

নিঋ্ঋতি ভাবতে চেষ্টা করে, এও কি ভ্রম? এও কি ছলনা?—হয়তো ভ্রম নয়, ছলনা নয়। লোপ পেয়ে গেছে তার বিচার-বুদ্ধি। বিমূঢ়া নিঋ্ঋতি।

সহসা কে তাকে আলিঙ্গন করল, উষ্ণ—জ্বালাময় আশ্লেষ। রোমাঞ্চিত নিঋ্ঋতি, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, চোখের পাতায় কী নিদারুণ ক্লান্তি। আবেশে মুদ্রিত হয়ে আসে নয়ন। নিঋ্ঋতি ভাবে, সত্যের স্পর্শ বুঝি এমনই উত্তপ্ত, এমনি প্রচণ্ড, এমনি জ্বালা-সঞ্চারী। কথা বলতে পারে না সে। অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে; নিঃশেষে নিজেকে সে সমর্পণ করে কামনার নিবিড় বাহুপাশে।

আকাশে কি ঝড় উঠেছে? উন্মাদ প্রলয় যেন আজ নির্বাধ। সমুদ্রে মন্থনের ঘোর গর্জনে যেন বধির শ্রুতিমণ্ডল। সর্বাঙ্গে রক্তকণার উত্তাল নৃত্য। আজ নিঋ্ঋতির রভস-রজনী। আজ নিঋ্ঋতির উল্লাস। নির্মম ঋষিকে সে জয় করেছে, ধর্মধীরের বীর্যকে সে গ্রহণ করেছে নিজের মধ্যে। আজ তার জয়, ঋষির পরাজয়—নিঋ্ঋতির বিজয়, সত্যের পরাভব। নির্জন প্রান্তরে অন্ধকারে দণ্ডায়মান এই শুষ্কশাখ, নিষ্পত্র অশ্বত্থবৃক্ষ অলক্ষ্মী নিঋ্ঋতির জয়গৌরবের সাক্ষী।

রজনী প্রভাত হল, শান্ত হল যেন প্রলয়ের মদমত্ততা। তমঃপ্রচ্ছাদিত দিগ্বলয় প্রথম আলোর শুভ্রকিরীট মাথায় পরে ঘোষণা করল জ্যোতির্ময় সত্যের আগমন বার্তা। ঊষার গোধূলিতে চোখ মেলে তাকাল রমণক্লান্ত, তৃপ্ত নিঋ্ঋতি কিন্তু মুহূর্তেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বসল সে। একি! কার আলিঙ্গন-পাশে ধরা দিয়েছে নিঋ্ঋতি! এতো স্বর্ণকান্তি কান্ত ঋষিসত্তম উদ্দালক নয়। এ যে তারই মত ভীমদর্শন, কৃষ্ণকান্ত — আসঙ্গলোভী, লালসাকুটিল, কদর্য! আতঙ্কে আর্তকণ্ঠে পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে নিঋ্ঋতি, 'কে তুমি! কে তুমি!'

উত্তর আসে,—'আমি অনৃত।'

অনৃত! অধর্ম-নন্দন, নিঋ্ঋতির সহোদর অনৃত! হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিঋ্ঋতি। একি সর্বনাশ হল তার। সত্যকে আঘাত করতে গিয়ে, ধর্মকে জয় করতে গিয়ে, অসত্যের লূতাতন্তুতে নিজেই আবদ্ধ হয়েছে সে। ভীম ভল্লাহতা বরাহীর মত মূর্ছিতা হল নিঋ্ঋতি।

বিমূঢ়, হতবাক্ জঘন্য আসঙ্গলোভী অনৃত! সভয়ে পালিয়ে গেল লম্পট। দূরে শোনা গেল, ঋষি উদ্দালকের আশ্বাসভরা গম্ভীর মধুর কণ্ঠ—'কোথায় নিঋ্ঋতি! এই যে এসেছি আমি!'

তখন সংজ্ঞাহারা নিঋ্ঋতি।

অনৃত ও নিঋ্ঋতি—অসত্য আর মিথ্যা। অধর্ম ও হিংসার পুত্র ও কন্যা তারা—বিশ্বের ব্যভিচার ও অলক্ষ্মী। তাদের অসত্য সঙ্গম, অবৈধ সঙ্গমের বিষময় ফল সর্বান্তক মৃত্যু! অধর্ম ও হিংসার পৌত্র, অধর্ম ও হিংসার দৌহিত্র, ভ্রাতা ও ভগ্নীর ব্যভিচারী কামনার কালকূট মহাভয় মৃত্যু! বিশ্বব্যাপী তার সদম্ভ নিষ্ঠুর আস্ফালন। জননী তার ঋত-রিপু, নিকৃতি-নিপুণ নিঋ্ঋতি।*

* পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১৬১ অধ্যায়

পঁচিশ
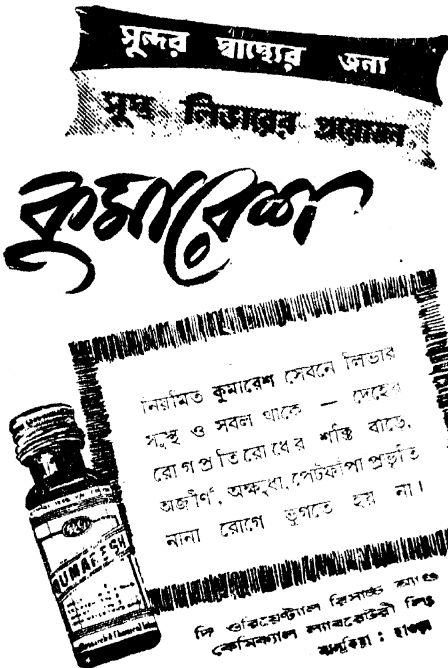
অবশেষে ভূষণ এল।

ঘোড়ায় নয়, চকচকে একখানা সাইকেলে চড়ে। ওখানা ভূষণ সদ্য সদ্য কিনেছে। হারকিউলিস বাইক, উইটকম্বের ঘোড়া-মুখো সীট আর ডানলপের টায়ার টিউব। ভূষণের মতে বাইক সম্পর্কে শেষ কথা এই। বি এস এ কি র‍্যালে কি হাম্বার, ওগুলোও ভাল, কিন্তু ওসব শৌখীন লোকেদের জন্য। তার মত পাড়াগেঁয়ে ডাক্তারের উপযুক্ত সাইকেল এই হারকিউলিস। কাঁচা রাস্তা, মাঠের আল, বেশির ভাগ সময় এইসব পথেই ত তার যাতায়াত। হারকিউলিসের শক্তিই বলে এ পথে সাইকেল ঠেলাচ্ছে।

বেশ স্পীডেই চালিয়ে আসছিল সাইকেল। বাঁকের মুখে আসতেই শ্বশুরের সঙ্গে দেখা। একেবারে চোখাচোখি। ভূষণ তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে নেমে পড়ল সাইকেল থেকে। শ্বশুর আর জামাই, দুজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল।

ভূষণ কিঞ্চিৎ মুশকিলে পড়ল। তার সামনে শ্বশুর হাতে সাইকেল। প্রণাম করে কিভাবে? নাঃ, সাইকেলের সঙ্গে অটোমেটিক একটা স্ট্যান্ডও থাকা দরকার। চাবি টিপে দিলাম অমনি দাঁড়িয়ে রইল সাইকেল। ইতস্তত তখন প্রণাম কর কি অসুবিধে লাগলে জিরিয়ে নাও একটু। কাছাকাছি একটা শক্ত গাছও নেই যে ভূষণ সাইকেলটাকে ঠেস দিয়ে রাখবে। কি আর করে, রাস্তার উপরেই শুইয়ে দিল সাইকেলখানা। প্যাডেলে চাপ লাগায় পিছনের চাকাটা পনপন করে ঘুরতে লাগল একটানা শব্দ তুলে। গোল বেলটা ক্রিলিলিং ক্রিলিলিং শব্দে বেজে উঠল।

•

মেজকর্তার পায়ের ধুলো নিল ভূষণ।

মেজকর্তা বললেন, খবর সব ভাল ত? বাড়ির সব ভাল আছেন? বেয়ান ঠাকরুণ?

ভূষণ বশংবদের মত ঘাড় নেড়ে সব কথার জবাব দিয়ে গেল। প্যাডেলের কোণা আর ফুটপিনে কাদা লেগে গিয়েছে। শ্বশুরের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি থাকা সত্ত্বেও ভূষণের মনটা ঐ কারণে খুঁত খুঁত করতে লাগল।

মেজকর্তা বেরুচ্ছিলেন। বেলা দশটা সাড়ে দশটা। কিন্তু আজ আর বেরুন হল না। জামাইকে নিয়ে ফিরলেন।

চাঁপার সঙ্গে গিরিবালার একটু খিটি-মিটিই বেঁধে গেল। ওটার কোন জায়গায় হল না আজ পর্যন্ত। বিরক্ত হল গিরিবালা।

সে তার তোরঙ্গ গোছাতে বসেছিল। দিন ধরে গিরিবালা তার ভাল ভাল জামা কাপড় তোরঙ্গ থেকে বের করে রোদে দিয়ে শুকিয়ে রেখেছে। তোলা তার হয়ে উঠছিল না। আজ জোর করেই বাক্সটা নিয়ে বসল। ভাল ভাল শাড়ী জামা তার নিতান্ত মন্দ নেই। সব উপহার পাওয়া। এ দুখানা তার মার শাড়ী। একখানা মুর্শিদাবাদী, অন্যখানা বেনারসী। মা বোধ হয় বিয়ের সময়েই পেয়েছিল। কিন্তু পরেনি। অন্তত গিরিবালা তার

মাকে কখনও এসব পরতে দেখেনি। পাট করে তোলা ছিল। বেনারসী খানার রং একটু জবলে গিয়েছে, মুর্শিদাবাদীখানা পোকায় কেটেছে। কলকাতার ভাসুরের দেওয়া জামদানী, যশোরের ভাসুরের দেওয়া কটকি, কাকিমার দেওয়া ভাগলপুরি, শ্বাশুড়ির দেওয়া ফরাসডাঙগাই, সব এই বাক্সেই পড়ে থাকে। কখনও পরে না গিরিবালা। এসব তার যক্ষের ধন। মাঝে মাঝে, তাও হয়ত বছরে দুই তিনবার বের করে, নেড়েচেড়ে দেখে, রোদে দেয় আবার ঝেড়ে ঝুড়ে তুলে রাখে। বড় জোর নাকের ডগায় ধরে একটু একটু শোঁকে। ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধের সঙ্গে শাড়ির গন্ধ মিশে যে এক অদ্ভুত গন্ধ বের হয় তার ঘ্রাণ বড় ভাল লাগে গিরিবালার।

বাক্স খোলার সময় সে কাউকে কাছে থাকতে দিতে চায় না। কারোর সামনে সে পারতপক্ষে বাক্স খুলতে চায়ও না। একবার শ্বশুরবাড়িতে বাক্স খুলেই তার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে। এক ভাসুর-ঝি তার অমন ভাল টাঙগাইল খানা দেখতে নিয়ে আর ফেরৎ দেয়নি। কিছু বলতে সে ভরসা পায়নি। তবে মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছিল।

এসব জিনিষ সে পরে না, পরতে পায় না। কোথায় পরবে? শোবার ঘর থেকে রান্না-ঘরে ত আর পোশাকী কাপড় পরে যাওয়া যায় না। বিয়ের পর সে কোথাও ত যায়নি। এমন কি পাড়া বেড়াতে কবার গিয়েছে তাও এক আঙগুলে গুনে বলে দিতে পারে। বাপের বাড়ি, এইবার নিয়ে এই তিন বছরে চারবার এল।

কাজেই ভাল ভাল জিনিষ পরার সুযোগ কই তার। তা না পরুক সে, তার জিনিষ তার, কাছেই থাকুক! যেভাবে খুশি। অন্যেরা তাতে হাত দেবে কেন? তাই চাঁপার উপর চটে গিয়েছিল। চাঁপা অবশ্য শাড়িটাড়িতে হাত দেয়নি। তার লোভ গিরিবালার গন্ধদ্রব্যগুলোর দিকে। ওগুলো ত আরও দুষ্প্রাপ্য। সেই বিয়ের সময় এক সেট কে যেন উপহার দিয়েছিল। ফুলশয্যার দিন ভাসুর-ঝিরা তাকে একটু একটু মাখিয়ে নিজেরা খাবলা খাবলা মেখেছিল। ঐ সব গায়ে মেখে প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি, একটু বাধ বাধ লাগলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু গিরিবালার কেমন একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল। আরও কয়েকবার মাখবার সাধ ছিল। কিন্তু আর একদিনও সে সুযোগ গিরিবালা পায়নি। অনেক-গুলো জিনিসও লোপাট হয়ে গেল। মুখে মাখা সেই হিমানী, তার কৌটোটা আর পাওয়া গেল না, সেই গন্ধ গন্ধ পাউডার, সেটাও গায়েব হয়ে গেল। তার উপহারের বাক্সটার প্রায় সব খোপগুলোই এখন খালি। এককোণে ছয়কোণা কাঁচের ছিপিওয়ালা একটা 'এসেন্সের' শিশি পড়ে আছে তার খোপে। এককোঁটা 'এসেন্সে'ও তার মধ্যে নেই। ভাল করে ছিপি না আটায় খানিকটা বাক্সে পড়েছে আর খানিকটা উপে গেছে। কিন্তু তার মিষ্টি গন্ধটা এখনও আছে। বাক্সের ডালাটা খুললে এখনও নাকে লাগে। আর, সেই বাক্সের মধ্যে গিরিবালা একটা অগুরুর শিশি কোনমতে ঢুকিয়ে রেখেছে। সেই শিশির প্রতিই চাঁপার লোভ। বড্ড হ্যাংলা হচ্ছে মেয়েটা। সে একমনে বাক্স গুছোচ্ছে আর সেই ফাঁকে অগুরুর শিশিতে হাত বাড়িয়েছে চাঁপা। ভাগ্যি সে তাড়া তাড়ি ধরে ফেলেছিল, নইলে নির্ঘাৎ নিয়ে পালাত।

গিরিবালা ধমকে উঠল, এসব জিনিস তোর কি দরকার, অ্যাঁ। নোলা একেবারে সক্‌সক্‌ করতিছে।

আচমকা ধরা পড়ে চাঁপা প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপর অনুনয় বিনয় আরম্ভ করল। তারপর হাতে পায়ে পড়তে লাগল। দেখল দিদি এ ব্যাপারে বড় সেয়ানা!

তুই এমন চামার ক্যান রে? একটু দেখতি চাচ্ছিলাম, আমি কি খায়ে ফ্যালাতাম।

গিরিবালার মাথায় আগুন চড়ে গেল।

যত বড় মুখ না, তত বড় কথা। লাথি পায়ে তুমার বড্ড বাড় বাড়িছে, না। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

চাঁপার চুল ধরে আচ্ছা করে নেড়ে দিল গিরিবালা।

চাঁপা থরথর করে উঠল, তুই আমার গায়ে হাত তুললি! তোর ঐ হাতে পোক না পড়ে ত কি বলিছি। কুড়িকুষ্টি হবে তোর। হবে, হবে, হবে। এই তিন সত্যি করলাম।

গিরিবালা বলল, দ্যাখ চাঁপা, ইবার সত্যি সত্যি মার খাবি কিন্তু। বড়-মারে বলে দেব?

চাঁপা বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলল, তুই করবি আমার কলা।

গিরিবালা বিয়ে হয়ে যাবার পর যা করেনি, তাই করল। রাগ সামলাতে না পেরে ঠাস করে চাঁপার গালে এক চড় মেরে বসল। আর দুদিন পরে ত বিয়ে হবে, সভ্যতা শিখল না মেয়েটা। চড় খেয়ে চাঁপা অবাক হয়ে গেল। দিদি যে সত্যি সত্যিই মারবে ও ভাবেনি।

তৎক্ষণাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সত্যিই দিদি ওকে মারল, মারতে পারল! এই আড়ি আড়ি। জন্মের মত আড়ি। জীবনেও আর কথা বলব না দিদির সঙ্গে।

বাইরে থেকে মেজকর্তা ডাকলেন, চাঁপা! মেজকাকা এসেছেন। ঠিক হয়েছে। এইবার দেখাচ্ছি দাঁড়াও। বড় হয়ে ভেবেছ, কি না কি হয়েছ? এবার টের পাওয়াচ্ছি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে চাঁপা বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল।

দিদিরে, জামাইবাবু!

বলেই ছুটে দিল ভিতরের দিকে। গিরিবালা চমকে উঠল। কে? ভূষণ! সে হকচকিয়ে গেল। কি করবে, বুঝতে পারল না। ঢকাশ করে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিল। যেন এইভাবেই সে তার সমস্ত অস্থিরতাকে ঢেকে রাখবে। গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ঘোমটা টেনে সে রান্নাঘরে ছুট দিল। যেন ওখানে পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই।

চাঁপা ততক্ষণে ভয়ানক চেঁচামেচি করতে লেগেছে।

ও বড় মা, ও পিসিমা, ও কাকীমা, জামাইবাবু আয়েছেন।

ভিতরবাড়ির শব্দ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। চট চট করে ঘোমটা উঠতে লাগল সকলের মাথায়। নিঃশব্দে উল্লাসের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মনে মনে। জামাই, জামাই এসে গেছে। বাব্বাঃ, কতদিন পরে এল ভূষণ!

খবরটা ছড়িয়ে যেতে দেরি হল না। এ-পাড়া ও-পাড়ার পুরানো মহলের পুরুষেরা আগেই এসে গিয়েছে। বারবাড়িতে বিস্তর তামাক পুড়ছে। জটলা হয়েছে। সরকার মশাই, পুরুত মশাই, সান্যাল কবিরাজ, বুড়ো [illegible] এসেছেন সবাই। ভূষণের কুশল, বাড়ির খবর আগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করেছেন, ভূষণের কাজকর্মের খবর নিয়েছেন। ভূষণ কোটচাঁদপুরে আছে শুনে সেখানে এঁদের যেসব পরিচিত লোক আছে, তাদের তত্ত্ব-তল্লাস এঁরা নিয়েছেন। নানারকম স্মৃতি-কথা শুনিয়েছেন ভূষণকে। সমালোচনাও হয়েছে কোটচাঁদপুরের লোকেদের।

ভূষণ মন দিয়ে সব শুনেছে। অতি বিনীতভাবে দু-এক কথার জবাবও দিয়েছে। সে দেখল, এরা যে কোট-চাঁদপুরের কথা বলছেন, তার সঙ্গে আসল কোটচাঁদপুরের কোন মিল নেই। অবশ্য ভূষণ সেকথা প্রকাশ করল না। বরং এঁদের খুশি করার জন্য দু-একবার এঁদের কথাতেই সায় দিয়ে গেল।

ভূষণ এসেছে বলেই তাকে ঘিরেই যে এই সভা, সে যে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে সম্পর্কে ভূষণ সচেতন হল। নড়ে চড়ে বসল। সময়োচিত গাম্ভীর্য আনবার জন্য ভূষণ নানাভাবে তার মনটাকে নাড়াচাড়া

বুড়ি আর তুমি থুব যুবো, না। ভাগ এখেন থে।
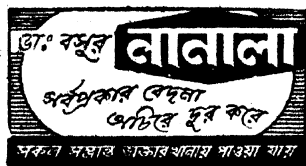
বড়বউ ধমক দিল, তোর এখেনে কি? যা।

গোয়ালদিদি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে গিরিবালা ঘোমটা টেনে এক কোণায় জবুথবু হয়ে বসে আছে।

ডাক দিল, ও-মা, ও নাতনি, ওখেনে শুবোচুনি ঠাকরুণের মত বসে আছিস ক্যান। আমি আরউ ভাবছি, নাত-জামাইয়ের সঙ্গে বসে গপ্প কর বুঝি। এদিক আয়।

গোয়ালদিদিটা কি বল দিনি। গলা ত ঝিনেদা-মাগরোয় পেঁছুচ্ছে। গিরিবালা যেন মাটিতে মিশে যাবে। ওঘরে বসে রয়েছে না ভূষণ!

ওলো আয় আয়, ভাতার আমাগেরউ ছিল এককালে। সুহাগের ভাত আমরাউ খাইছি। নে, ছাওয়ালডারে কোলে নিয়ে এটুউ বস। দেখি তোরে। যাওয়ার বাঁশী ত বাজেই উঠিছে।

গোয়ালদিদির বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

তা নাতজামাই কাল কি? সন্তুষ্ট হয়েছে ত। আরে মর ছুঁড়ি। সুজা হয়ে বস না। লজ্জায় একেবারে পাতালে প্রবেশ হচ্ছে।

গিরিবালা কি কষ্টে যে সে বেলাটা কাটাল, সেই জানে। সন্ধ্যার মুখে সব বিদায় নিল। খাওয়া-দাওয়া সারতে রাতও কম হল না।

ছেলেটাকে খাইয়ে শুইয়ে রেখে এসেছে বিছানায়। রাত্রে আর উঠবে না। ভূষণও এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে তার জায়গায়। গিরিবালার শুধু বাকী। সাত মাস পরে স্বামীর সঙ্গে সে শোবে।

সারাদিন নানা কাজে আড়াল করে রেখেছিল নিজেকে। দুরন্ত অভিমানকে যেন পুঁজে পুঁজে রেখেছিল। একবারও দেখা হয়নি ভূষণের সঙ্গে। না, এখনও সে দেখা করবে না। সুযোগ পেয়ে অভিমান গিরিবালার মনকে দখল করে বসল। না, সে যাবে না, যাবে না, কিছুতেই ভূষণের ঘরে যাবে না। কেন যাবে? এতদিনের মধ্যে একবারও কি তার খোঁজ নিয়েছে ভূষণ? একদিনের তরেও কি এসে দেখে গেছে খোকন সোনাকে?

দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল গিরিবালা। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল তার। একটা এলোমেলো বাতাস উঠেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া জ্যোৎস্নার আলো নেমে এসেছে। গিরিবালা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, বাইরে দাঁড়িয়েই সে রাতটা কাটিয়ে দেবে। ভিতরে যাবে না। তার প্রতিজ্ঞা শেষ হতে না হতেই ঘরের একেবারে ছানচেতে দুটো শেয়াল খ্যাক খ্যাক করে লুটো-পুটি শুরু করে দিল। ভয় পেয়ে গিরিবালা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। তার প্রতিজ্ঞাটাও একটু বদলে নিল। সে তার খোকার পাশে শোবে। ভূষণের সঙ্গে একটি কথাও বলবে না।

ভূষণ দেখল গিরিবালা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। দরজায় ঠেস দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার-পর ওপাশ ঘুরে বিছানায় উঠে খোকার আড়ালে শুয়ে পড়ল। তার দিকে চাইল না, তার সঙ্গে কথাও বলল না। স্পষ্টতই বুঝতে পারল ভূষণ গিরিবালা রাগ করেছে। হয়ত এর আগে সে আসেনি, আসতে পারেনি, তাই রাগ করেছে।

কিন্তু ভূষণ আসবে কি করে? সে যে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিল। মশার স্বভাব চরিত্র পর্যবেক্ষণ করছিল। একটা গবেষণা করার ইচ্ছে জেগেছিল। মশা-ই যে ম্যালেরিয়ার কারণ, তা সবাই জানে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে দেশ-গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মশা না মারলে ম্যালেরিয়া যাবে না, সে বিষয়ে ভূষণ আর সকলের সঙ্গে একমত। তার অমত অন্যখানে। ভূষণ জানে, তার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণী-মাত্রেরই [illegible] সৃষ্টিতে এক একটি ভূমিকা আছে। সম্ভবত মশারও আছে। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য সে ভূমিকাটি যে কি, ভূষণ তা জানে না। হঠাৎ একদিন সেটা সে আবিষ্কার করে ফেলল। কলেরার সিজিনে দেশের লোক কলেরার ইনজেকশন নিতে চায় না। জোর করে দিতে গেলেও পালায়। আর হাজারে হাজারে মরে। ভূষণের মনে হয়েছিল, মশার মারফতে কলেরার ইনজেকশন দেওয়াতে পারলে এই সমস্যার সমাধান করা যেমন যায়, মশারও তেমন একটা গতি হয়। এই বিষয়টি নিয়ে গত ছ মাস ধরে সে গবেষণা চালিয়েছে। মূল আবিষ্কার সম্পর্কে কাজ করতে হলে কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার, এতদিনে মোটামুটি তার একটা খসড়া করে ফেলেছে। যথা, (১) মশা-গুলোর রোগ বহন করার ক্ষমতা হরণ করা, (২) কলেরার প্রতিষেধক বহন যাতে করতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং (৩) একটা মশা কতটুকু ওষুধ বহন করতে পারে, সেটা নিরূপণ করা।

কাজটি নিতান্ত সহজ নয়, অথচ দারুণ একটা কাজ। বিশ্বমানবের কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত। এমন একটা কাজ ফেলে রেখে ভূষণ নিজের ছেলে-বউয়ের তত্ত্ব নিতে আসবে, এমন সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করে ঈশ্বর তাকে গড়েননি।

কিন্তু এসব কথা গিরিবালাকে বোঝাতে যাওয়া খুব সমীচীন বোধ করল না ভূষণ। বিশেষ করে এখন, যখন গিরিবালার ভাব গতিক বিশেষ সুবিধার ঠেকছে না।

ভূষণ পাশ ফিরে চেয়ে দেখল, খোলা জানালা বেয়ে তাদের বিছানায় জ্যোৎস্না নেমে এসেছে। ছেলের পাশে শোয়া গিরিবালাকে সেই জ্যোৎস্নার আলোয় অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে। ভূষণের বেশ ভাল লাগছে। গবেষণা নয়, সাধারণ দু-চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। গিরিবালার পাশে যাবার ইচ্ছেটাও যে ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠছে। কিন্তু অবাধে আজ আর সেখানে যাবার উপায় নেই। মাঝখানে এক বাধা। অপরিচিত এক শিশু। তার ছেলে। ছেলের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই প্রথম সচেতন হল ভূষণ। একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল। ভূষণের মনে হল তার আর তার স্ত্রীর মাঝখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে ছেলেটা। ছেলেটার বে-আক্কেলে ব্যবহারে কিছুটা ক্ষুব্ধই হল সে।

গিরিবালা মটকা মেরে পড়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল ভূষণ কখন ডাকে। মুখে মুখে যতই রাগ দেখাক গিরিবালা, সত্যিই কি তার উপর রাগ করে থাকতে পারে? গিরিবালা জানে, এখনই যদি ফিস ফিস করে ডাকে ভূষণ, কি কিছু না বলে হাতখানা ধরে টানে, সব রাগ, সব অভিমান নিমেষে দূর হয়ে যাবে তার। আজ কি হল সকালে; চাঁপা যখন খবর দিল ভূষণ এসেছে। অভিমানে তার চোখে জল এসে পড়েছিল, এতদিন খোঁজখবর নেয়নি বলে রাগও হয়েছিল ভূষণের উপর, কিন্তু একেবারে গোপনে তার মনটা লাউয়ের ডগায় ঘাসের ফুল হয়ে সুখের বাতাসে মৃদু মৃদু দুলেছিল।

কি আশ্চর্য, একই বিছানায় আমি আর গিরিবালা, কিন্তু আগের সেই নৈকট্য আর নেই। ভূষণ ভাবছিল, কাছাকাছি শুয়ে আছি বটে, কিন্তু সান্নিধ্য নেই। গিরিবালার গায়ে ভূষণের গা ঠেকছে না। তার চুলের ঝোপে বন্দী হচ্ছে না ভূষণের মুখ। তার দেহের তটে আগের মত আর আছড়ে পড়ছে না গিরিবালা ঢেউ হয়ে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন হল কিসের জন্য? এই শিশু, এই শিশু, এই শিশুটির জন্য। এতদিন গিরিবালা আর ভূষণের মধ্যে কেউ ছিল না। আজ থেকে সর্বদা এক তৃতীয় অস্তিত্ব থাকবে। ব্যাপারটা ভূষণের খুব মনঃপূত হল না। ছেলেটার দিকে আড়চোখে একবার চাইল।
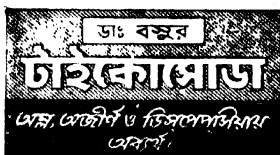
কি রকম কি রকম যেন! নেংটি ইঁদুরের মত! হাত-পা অবয়ব, চোখ মুখ নাক কান সব ছোট্ট ছোট্ট। মানুষের যা যা থাকে, সবই আছে ওর, তবুও কেমন বেঢপ বেমানান লাগে। কলকাতায় মেজদার টেবিলে ভূষণ শ্বেতপাথরের তৈরী তাজ-মহলের মডেল দেখেছে। এখন সে কথা মনে পড়ল। এ-ও যেন সেই রকম একটা মডেলই। মডেল ভূষণ। হাঃ-হাঃ। মনে মনে হাসল ভূষণ। শিশুরে প্রতি প্রচ্ছন্ন বীতরাগ কমে এল চট করে।

তবে কি ভূষণ রাগ করেছে গিরিবালার উপর? এমন ত হয় না কখনও। এতক্ষণ চুপ করে থাকবার পাত্র সে নয়। নিশ্চয়ই রাগ করেছে। ঐ যে নড়ল ভূষণ। গিরিবালা উন্মুখ হয়ে রইল। এবার ডাকবে তাকে। কাছে টানবে। আদর করবে। কিন্তু কই? তবে কি ভূষণ রাগই করেছে। ছেলে দেখে কি খুশি হয়নি সে? গিরিবালার মুখ কালো হয়ে গেল।

আজ ব্যাটাকে মডেল বলে মনে হচ্ছে। ভূষণেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে একদিন ভূষণের মতই বড় হয়ে উঠবে। তখন ভূষণ আরও এগিয়ে যাবে, অনেক অনেক দূর। ছেলে আর বাবাতে শুরু হবে দৌড়বাজী। একদিন খোকা হয়ত তার বাবার বয়েসটা ধরে ফেলবে, কিন্তু বাবাকে ধরা তার অসাধ্য।

আজ ভূষণের কাছে গিরিবালার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে গিরিবালা। কোন আকর্ষণ নেই তার। গিরিবালার চোখ ফেটে জল এসে গেল। বেশ, বেশ ত, তাই যদি হয়, সম্পর্ক তুলে দিক ভূষণ। সে আর যাবে না ভূষণের কাছে। কেন যাবে? কেন?

কিভাবে শুয়ে আছে দেখ। গিরিবালা এমনভাবে ছেলে শুইয়েছে, তাকে ডিঙিয়ে হাত না বাড়ালে গিরিবালার নাগাল পাবার যো নেই। ব্যাপার কি? গিরিবালা কি ছেলের আড়ালে লুকোতে চায়, নাকি ছেলেটাই দখলিস্বত্ব নিয়ে নিয়েছে।

আমার স্বত্বই বা আমি ছাড়ব কেন? এই ভেবে গিরিবালার দিকে হাত বাড়াতেই হঠাৎ কেঁদে উঠল ছেলেটা। চমকে উঠল ভূষণ। চাপ পড়ল নাকি? অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা টেনে নিল। কাঁদতেই লাগল ছেলেটা। গিরিবালা সাড়া দেয় না। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিছানায়। ব্যস্ত হয়ে ঝাঁকাতে লাগল গিরিবালাকে।

এই এই, দ্যাখ না, এত কাঁদছে কেন আঁ।

গিরিবালা টের পেল ভূষণের স্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে। কেমন জব্দ? মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। ছেলের কান্নায় এখন আর ভয় পায় না সে।

এই, এই, ওঠো না, চাপ-টাপ পড়ল নাকি?

গিরিবালা এবার উঠল। কোলে নিয়ে বসল ছেলেকে। কান্না থামল না।

কি হল ওর বল ত।

ভূষণের এই দুশ্চিন্তায় গিরিবালার রাগ অভিমান ভেসে গেল কোথায়! ছেলেকে উপেক্ষা করছে না ভূষণ। তার জন্য ভাবছে। উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। যে সংশয়, যে ভয়, যে উৎকণ্ঠায় এতদিন একা-একা পীড়িত হয়েছে সে, এখন ভূষণও তার ভাগ নিতে এগিয়ে এসেছে। অপূর্ব সুখে গিরিবালার

অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না-না, কিছু হয়নি। ছোট ছোট ছেলেরা অমন করেই থাকে।

গিরিবালার বুড়োটে কথার ধরনে চিন্তা দূর হল ভূষণের, সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল।

ভয় পায় কি না? স্বপন টপন দ্যাখে ত, তাই ভয় পায়, ভয় পায়ে কাঁদে ওঠে। কোলে নিলি কি আস্তে আস্তে থাবাতি থাকলি আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

গিরিবালার কথার ধরন দেখে ভূষণের মনে হল মেট্রন যেমন করে নতুন নার্সকে লেকচার দেয়, তেমনিভাবে গিরিবালাও যেন তাকে বাৎসল্য শেখাচ্ছে।

ভূষণও উঠল। গিরিবালার কাছ ঘেঁষে বসল। তার পিঠের উপর আলতো করে মুখটা বারকয়েক ঘষল। খোঁপার নীচটায় গভীরভাবে একটা চুমু খেল। শিরশির করে উঠল গিরিবালার সর্বদেহ। আবেশে চোখ বুজে এল, গ্রন্থিগুলো শিথিল হতে লাগল।

আধো আধো স্বরে গিরিবালা বলতে লাগল, এই, অমন করে না, অমন করে না, আমি তাহলি খুকোরি ঘুম পাড়াতি পারব না।

ভূষণ কথা শুনল না। গিরিবালার পিঠে নিজের গালটা জোর করে চেপে ধরল। বসে রইল সেইভাবে। গিরিবালা সম্মোহিত হয়ে গেছে। আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বলতে চেষ্টা করল, আমি, আমি আর পারতিছি নে। শরীর অবশ হয়ে আয়েছে। ছাড়ে দ্যাও, লক্ষ্মীটি, ইবার শুয়ে পড়।

ছেলেটা গিরিবালার কোল থেকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে কেঁদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার আবেশের রেশটা কেটে গেল।

ধমক দিল গিরিবালা, হল ত, ইবার তুমি ছেলে সামলাও।

সে তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। দুষ্টু হাসি ঠোঁটে মেখে আড়চোখে গিরিবালা একবার ভূষণের দিকে চাইল। দেখে ভূষণও বোকার মত মিটি মিটি হাসছে। জ্যোৎস্নার আলোর জোর বেড়েছে। গড়িয়ে পড়েছে ভূষণের চুলে ঠোঁটে গালে। ওর বাকী শরীরটা অন্ধকারে ঢাকা। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ভূষণকে।

কিন্তু ছেলের কান্না আর থামে না। ভূষণের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে মিনতি করল গিরিবালা।

ওদিক ফিরে শোও দিনি।

তেমনি ফিসফিসিয়ে ভূষণ জিজ্ঞাসা করল, কেন?

গিরিবালা বলল, খুকো যে দুধ খাবে।

খাক না, আমি দেখি।

চলাং করে গিরিবালার বুকের রক্ত লাফিয়ে উঠল। মুখ চোখ গরম হল। ভারি অসভ্য ত। দেখে ভূষণ হাসছে। তার দাঁতের পাটিতে জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়ছে।

না-না! তুমি ওদিকে ফের। কাঁদছে না?

ভূষণ ওর কানের কাছে মুখ এনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তাহলে তুমি খোকার বিছানাটা ওপাশে সরিয়ে দাও।

গিরিবালার বুক ধুকপুক ধুকপুক করে উঠল। চনমন চনমন করে উঠল মন।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলতে লাগল, না, না, না। তুমি কি আমার খোঁজখবর নাও?

ঝরঝর করে গিরিবালার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

খানিক পরে দেখা গেল, খোকার বিছানা সরে গিয়েছে গিরিবালার ওপাশে। সে ভূষণের আলিঙ্গনে বাধা পড়ে পরম তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্নার ফিনিক-মারা আলো দুজনের বুক পর্যন্ত এসে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ছাব্বিশ

ঐটুকু শিশু, সে-ও আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। কাঁদতে কাঁদতে বেসামাল হয়ে পড়ছে। কোলে কোলে ফিরছে, তবুও তার কান্না থামে না। বড়বউ, শুভদা, গোয়াল-দিদি, এমন কি, ছোটবউও ওকে ক্ষান্ত করতে পারছেন না। গিরিবালার চোখ দিয়েও অবিশ্রান্ত ধারে জল ঝরছে। কয়েকবার চোখ মুছে সে-ও ছেলেকে কোলে নিল। কিন্তু সুবিধে করতে পারল না।

তার সর্বাঙ্গে গহনা। মাথায় চাঁদ, হাতে বালা, গলায় হার। সর্বাঙ্গেই মহা বিড়ম্বনা। এই সব কারণেই বড় অস্বস্তি লাগছে তার। কিন্তু কেউ তা বুঝল না।

কে বুঝবে? কেউই ত প্রকৃতিস্থ নেই। বড় কর্তা স্বভাব শান্ত মানুষ। কিন্তু তাঁকেও আজ বিচলিত দেখা যাচ্ছে। কেবল তামাক খাচ্ছেন আর মধ্যে মধ্যে উঠে রামকিষ্টোর কাছে যাচ্ছেন।

রামকিষ্টো বারবাড়ির উঠানে গরুর গাড়ির ছই আঁটছে।

বড়কর্তা এক একবার তার কাছে যাচ্ছেন আর বলছেন, ও রামকিষ্টো, খুব কষে বাঁধতিছ ত, দেখো পথের মধ্যি আবার যেন খুলে টুলে না পড়ে।

রামকিষ্টো বলছে, বড়বাবু, ভাবেন ক্যান, খুব মজবুত করে বাঁধতিছি। এ কাজ কি নতুন করতিছি?

বড়কর্তা বলছেন, হ্যাঁ, আর দ্যাখ, খুব সাবধানে নিয়ে যাবা কিন্তু। বেশি ঝাঁকি টাকি না লাগে সেদিক খুব লক্ষ্য রাখবা, বুঝলে?

রামকিষ্টো একটু হেসে জবাব দিচ্ছে, আমার হাতে গাড়ি, কিচ্ছু চিন্তে করবেন না বড়বাবু, বড়দিরি আরেমে পোঁছয়ে দিয়ে আসব।

বড়কর্তা বলছেন, তা ত বটেই, তোমার জন্যিই ত নিশ্চিন্ত আছি। আর কারুর জন্যি ত ভাবতিছিনে, ঐ কচি শিশুটো যাবে ত তাই।

না না, বড়বাবু, কোন চিন্তে নেই। আমি মোষ দুটো নিয়ে যাব ত।

মোষ? মোষ নিবা নাকি? না না, ওগের মতিগতি বুঝা ভার। তুমি বরং বলদ দুটোই নিয়ে যাও। বুঝিছ?

রামকিষ্টো বড়বাবুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বড়কর্তা বললেন, বলদ দুটোই ন্যাও বরং।

রামকিষ্টো কথা বাড়াল না। সায় দিয়ে গেল। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। বলদ জুতলি বড়দির বাড়ি পোঁছতি পোঁছতি রাত হয়ে যাবে।

বলল, তাহলি তাই নেব। বলদই নেব।

বড়কর্তা নিশ্চিন্ত মনে আবার গিয়ে

তামাক খেতে লাগলেন। হঠাৎ কি মনে পড়ল, উঠে ঘরে গেলেন। পাঁজিকাটা খুলে ফেললেন আবার। দশটা পঞ্চান্ন মিনিট গতে যাত্রা নাস্তি। অশ্লেষা। বড় চেন-ঘড়িটার ঢাকনা খুলে সময় দেখলেন, এখন সোয়া আটটা। সর্বনাশ, আর যে সময় নেই! খড়ম খটখট করতে করতে ভিতরে গেলেন।

ও মাজদি, যাত্রোরায় বসায়ে দ্যাও। সময় যে আর নেই বললিই হয়।

শুভদা গোটা ছয়েক বিভিন্ন আকারের মাটির হাঁড়িতে নানা জিনিস ভরছিলেন। এটায় ক্ষীরের ছাঁচ, এটায় আমসত্ব, এটায় নোনা তেঁতুল, এটায় কুলের আচার, এটায় বড়ি, এখন আমচুরগুলো ভরতে পারলেই হয়।

এমন সময় বড়কর্তার গলা শোনা গেল।

ও মাজদি, তাড়াতাড়ি করো।

শুভদা বললেন, এই যে হয়ে আসো। ও বড় বউ, রান্না হয়েছে?

বড় বউ সাড়া দিলেন, হয়ে আসো। আমি বড়ির চ্যানড়া করায়ে দিই।

বড় বউ গিরিবালার চুলের গোছায় তেল দিতে বসেছেন। সামনে চাঁপা বসে আছে। তিনজনের চোখ দিয়েই জল পড়ছে। ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে।

বড় বউ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছেন, খুব সাবধানে ছেলেরা রাখবা মা, একটুও যেন অযত্ন না হয়, অনিয়ম না হয়। গরম ঠান্ডা বাঁচায়ে চলবা। যা তা খায়ে না। তুমার শরীর ভাল না থাকলি ওর শরীরও খারাপ হবে। বদি দ্যাখ, বেশি কাঁদতিছে, নাইটে হেঁক দিবা। সর্দিকাশি হলি নারকলাইর তেল গরম করে হাত পার তালো আর কণ্ঠায় মালিশ করে দিবা। ভাল করে তেল মাখায়ে রোজ চান করাবা, বুঝিছ।

গিরিবালা ফোঁৎ ফোঁৎ ফোঁপাচ্ছিল আর ঘাড় নেড়ে নেড়ে বড়মার কথায় সায় দিচ্ছিল। অবিশ্রান্ত কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ রাঙা হয়েছে, আর জল মুছতে মুছতে নাকের ডগা, মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না গিরিবালা। কেবলই বুকের ভিতর হু হু করা এক ঘূর্ণি উঠছে আর চোখ দিয়ে অবিরল ধারা ঝরছে। দুরন্ত এক ধারা।

ছোটবউ অবশেষে আটকেছে শান্ত করেছেন তাকে। তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে সওদাগর। কাল আর এই কোল ভরাবে না। যে সূর্যে এত আলো, এত হাসি আছে কাল আর সে সূর্য উঠবে না। যে বাতাস বইবে কাল তাতে এত * দিত লাগবে না। আর একটু পরেই যেন জীবনের সব উজ্জ্বলতা নিভে যাবে। সব সাধ স্তিমিত হয়ে পড়বে। কোন কাজই থাকবে না আর হাতে।

ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছেন ছোটবউ। ঐ অমিয় মুখে কত সুধা! একটা চুমু খেলেন। ঐ ছোট ছোট হাতে কত আকর্ষণ! আরেকটা চুমু খেলেন ছোটবউ তারপর আরেকটা। আরেকটা আরেকটা আরেকটা।

আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে? পারবে তুমি? একবারও মনে পড়বে না? একবারও না? কখনো না? আমি না থাকলেও তোমার অসুবিধা হবে না।

তোমার মা ত আছে। আরেক বন্দর আছে তোমার। এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে পাড়ি মারবে সংতডিঙায় জয়ের নিশান তুলে। ডিঙা ভিড়াবে আরেক আশ্রয়ে। কিন্তু আমি? আমি কি নিয়ে থাকব? আমার আর কে আছে? কেউ না, কেউ না, কেউ না। হু হু করে উঠল ছোটবউয়ের অন্তরখানা। যেন সেই শূন্য বন্দরের কূলে সাগরের আকুতি আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

মেজকর্তা গেলেন কোথায়? সেই যে বেরিয়েছেন সকালে, এখনও পাত্তা নেই। এদিকে যে যাত্রা বয়ে যায়। আর অপেক্ষা করা যায় না। ভূষণ আর গিরিবালাকে পাশাপাশি যাত্রা ঘটের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। গিরিবালার ফোঁপানী বিষম বেড়ে গেল।

বড়বউ, শুভদা, গোয়ালাদিদি আঁচলে চোখ মুছে বারবার করে তাকে সাবধান করতে লাগলেন, ওরে, ও মনি, চুবোও চুবোও, যাওয়ার সময় কাঁদে না, কাঁদতি নেই। ওরে ও পাগল, ওতে অমংগল হয়।

একে একে সবাইকে প্রণাম করে উঠে পড়ল ভূষণ। সে এই অবস্থা দেখে যেন চোর বনে গেছে। তার বউকেই ত নিয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির অবস্থা দেখে মনে হল তার, আদালতের পরোয়ানা নিয়ে অনাথার সম্পত্তি ক্রোক করে নিচ্ছে। মনে মনে অপ্রস্তুত হল ভূষণ। এ বাড়ি ছাড়তে পারলে এখন বাঁচে। গিরিবালাও সবাইকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তার গুরুজনরা বাঁ হাতের কড়ে আংগুল কামড়ে কামড়ে সেটা প্রায় ফুলিয়ে দিল।

এমন সময় মেজকর্তা বড় একটা রুই মাছ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন এসে। কোনখানে মাছ নেই। সেই আঠারোখাদার বিল থেকে ধরিয়ে আনতে হল।

কিন্তু একী, সবাই বিস্মিত হয়ে মেজকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর দাড়ি কোথায় গেল? পরিষ্কার চাঁছাছোলা গাল। তাঁর চেহারাই বদলে গেছে। মুহূর্তে বাড়িসুদ্ধ সবার ফোঁপানি অব্দি বন্ধ হয়ে গেল।

ম্লান হেসে অপ্রস্তুত মেজকর্তা কৈফিয়ৎ দিলেন, বড্ড জঞ্জাল হয়েছিল, কেটেই ফেললাম।

বাড়ির সকলে গাড়ির সংগে হাঁটতে হাঁটতে গোয়ালবাড়ি পর্যন্ত এলেন। গিরিবালা মিনতি করল, ও বড়মা, ও পিসিমা, আমারে খুব তাড়াতাড়ি আবার আনো। লোক পাঠায়ো ও বড়মা, মাথার দিব্যি।

আনব মনি, আনব বৈ কি, উতলা হয়ে না। ও মুখ কি বেশিদিন না দেখে থাকা যায়। সাবধানে থাকবা। ছাওয়ালরি খুব যত্নে রাখবা। এর বেশি আর কথা বের হয় না। গলায় সব কথা আটকে যায়।

গোয়ালবাড়ির কাছে এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাড়ির সংগে সংগে এগিয়ে চললেন মেজকর্তা। নাতি তব বুকে। আজ আসতে বিশেষ আপত্তি করেনি। এই প্রথম তাঁর কাছে ধরা দিল। আঃ কি গভীর আনন্দ। কি শান্তি।

নাতিকে বুকে ধরে গাড়ির সংগে অনেক দূর এলেন মেজকর্তা। গিরিবালা বারবার বলল, বাবা আর না, আর আসবেন না।

কিভাবে গিরিবালা। একে কোলে করে যে পৃথিবীর শেষ সীমান্ত পর্যন্ত এমন-ভাবে হাঁটা যায়। কোন ক্লান্তি আসে না অন্তত মেজকর্তার তাই ত মনে হচ্ছে।

তবু তাকে থামতেই হল। জোড়াপুকুরের কাছে এসে মেয়ের কোলে তুলে দিলেন নাতিকে। তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ ওদের দেখা যায়। ঐ যে জামাইয়ের সাইকেল চিকচিক করতে করতে মিলিয়ে গেল। পথের বাঁক আড়াল হয়ে গেল গরুর গাড়িটা। আর কি? আর কেন? এবার ফিরুন মেজকর্তা। রোদ এর মধ্যেই প্রায় মাথায় উঠেছে। চারিদিক চেয়ে দেখলেন, কোথাও একটা লোক নেই। খাঁ খাঁ করছে নিঃসীম এক শূন্যতা। অভ্যাস বশে দাড়িতে হাত দিলেন, হাত গিয়ে থুতনিতে ঠেকল।

সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছে তার। সব খালি করে দিয়ে গেছে। মুখটাও, বুকটাও।

(ক্রমশ)

বিশ্ব-বিচিত্রা

মৃত্যুর পরে সম্পত্তি নিয়ে কোন গোলযোগ বা মামলা মোকদ্দমা না বাধে, সেইজন্যই সাধারণত উইল করা হয়ে থাকে। এই উইলেও অনেক সময় নানা খামখেয়ালীর নজীর থাকে। সেই রকম কয়েকটি নজীরই তুলে দেয়া হল।

কোন এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর উইলে টাকা পয়সার কোন উল্লেখ নেই দেখে তাকে যারা জানত সবাই বিস্মিত হল। এমন কি তার উকিলও অবাক হয়ে গেল। ব্যবসায়ীর উইলে মাত্র ৭১ জোড়া ব্যবহৃত ট্রাউজার ছাড়া অন্য কোন জিনিসের উল্লেখ নেই।

উইলে লেখা আছে, "আমার নির্দেশ, আমার মৃত্যুর পরেই এই শহরের স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীদের কাছে আমার ট্রাউজারগুলি নিলামে বিক্রি করবে।" ব্যস্, এই পর্যন্ত। ভদ্রলোক আর কিছুই রেখে যাননি।

নিলামের সময়ই সব রহস্যের কিনারা হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ্যবান ক্রেতা প্রতি জোড়া ট্রাউজারের পকেটের ভেতর অতি সন্তর্পণে পিন দিয়ে গাঁথা ৫০০ পাউণ্ডের নোট পেল।

অনেক উইলের সঙ্গে হয় কোন কৌতুককর বা কোন করুণ কাহিনী জড়িয়ে আছে। অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত এমন সব উইলের বহু নজীর বিভিন্ন দেশের আইনজীবিগণ দেখাতে পারেন।

এক আমেরিকান ভদ্রলোক যখন তার কাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন তখন তিনি আদৌ বিস্মিত হননি। কিন্তু তাঁর বিস্মিত হবার পালা এল তখন যখন তিনি জানতে পারলেন, শুধু নীল নদের বদ্বীপে তুলার চাষের উত্তরাধিকারীই নয়, তাঁর কাকা তাঁকে মিশরীয় সুন্দরীদের এক হারেমেরও উত্তরাধিকারী করে গেছেন। আমেরিকান ভদ্রলোক খুব বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে এই উইল প্রত্যাখ্যান করলেন।

উইল কোন জিনিসের উপর কি দিয়ে লেখা হবে আইনে তার কোন নির্দেশ দেয়া নেই। কোন এক ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে তাঁর উইল প্রকাশ করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না জন্য উল্কি দিয়ে তাঁর পিঠে উইল লিখে রেখেছিলেন।

আর এক ভদ্রলোক সমুদ্রতীরে এক বাংলোর দরজায় তাঁর উইল লিখে রেখেছিলেন। ৬০ বছর আগে এই বাংলোতেই

উক্ত ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী মধুযামিনী যাপন করেছিলেন।

নার্সের পোশাকের আস্তিনের ওপর রক্ত দিয়ে হাতে লেখা এক উইল আদালতে প্রোবেটের জন্য দাখিল করা হয়েছিল। গয়াণ্ডালক্যানাল দ্বীপের এক হাসপাতালে কোন এক আহত নাবিক এই উইল লিখেছিলেন। উইলে মাত্র ৩টি শব্দ ছিল। "সবই মাকে দিলাম।" উইলের সমর্থনে ঐ হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সের বিবৃতি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। তারাই এই উইলের সাক্ষী ছিলেন। হাকিম উইলটিকে এক নজর দেখে নিয়েই বৈধ বলে ঘোষণা করলেন।

শাবলের নিচে হিজিবিজি আঁচড় কেটে লেখা একটি উইলও আদালতে প্রোবেটের জন্য পেশ করা হয়েছিল।

জর্জ হ্যাজেনটাইন নামে সংসার-বিরাগী এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর পেটিকোটের প্রান্তভাগে উইল লিখেছিলেন। ভদ্রলোক যখন যুবক তখনই তার স্ত্রীর নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয়। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে যে ১ লক্ষ পাউন্ড তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তার বিলি ব্যবস্থা তিনি এই উইলেই করেছিলেন।

ফরাসী দেশের আদালত লিপস্টিক দিয়ে লেখা একটি উইলকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। আদালত বলেন—ব্যবহারিক অর্থে লিপস্টিককে লেখনী হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই রায়ের নজীরে অপর একটি উইলও বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই উইল কোন এক মহিলা চোখ রঙ করার কজ্জল পেনসিল দিয়ে লিখেছিলেন।

গ্রামোফোন রেকর্ডে গৃহীত উইলের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কেউ কেউ রুমালের ওপর বা সার্টের ছেঁড়া অংশের ওপরও পেনসিল দিয়ে উইল লিখে রেখে গিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে এক বৃটিশ বৈমানিক ডিমের খোলার ওপর উইল লিখেছিলেন। "মেরীকে—আমার যা কিছু আছে সব।" ডিমের খোলার ওপর লেখা উইলের যথারীতি প্রোবেট নেওয়া হয়েছিল এবং বৈমানিকের স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।

এক খামখেয়ালী ভদ্রলোক তার খাটের ছটি পায়ার মধ্যে তার উইল লিখে রেখেছিলেন। এ পর্যন্ত যে সব উইল সম্পর্কে জানা গেছে তাদের মধ্যে বৃহত্তমটি লিখতে ৪টি বড় বইয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। এই উইলটি ১৯২৫ সালের নবেম্বর মাসে 'সমারসেট হাউসে' গচ্ছিত রাখা হয়। এই উইলে খুব কম করেও ৯৫১৯৪০টি শব্দ আছে। তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে যে, ক্ষুদ্রতম উইলটিও এই সামারসেট হাউসেই

এফ্রোডেশিয়াস তুর্কীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন ক্যারিয়ার প্রসিদ্ধ এক নগরী ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে এই নগরী দর্শনে, বিজ্ঞানে ও ভাস্কর্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। কালের বিবর্তনে এই নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ১৯৩৭ সালে গ্রামবাসীরা একটা পুরোন খালের সংস্কার করতে গিয়ে এই অমূল্য সম্পদের হদিস পায়। তুর্কী সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে এর খননকার্য শুরু হয়। ভাস্কর্যের অসংখ্য নিদর্শন ভগ্ন বা অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। উপরের দার্শনিকের এই ভাস্কর্যটি খ্রীস্টীয় ২য় শতকের মধ্যভাগে তৈরি বলে অনুমান করা হয়

গচ্ছিত আছে। ছোট্ট একটি ফটোফ্রেমে মেয়ের ফটোর পিছনে লেখা সামান্য ৩টি কথা—'সবই তোমার জন্য'। এই ফটোটির নিচে মেয়েটির একটি নাম স্বাক্ষর ছিল 'মারিয়েন'। এই উইলের নিচে স্যান্ডারল্যান্ডের সৈন্যবাহিনীর এক অফিসারের স্বাক্ষর ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। অবশ্য এই উইলের কোন সাক্ষী ছিল না। এই মেয়ের পরিচয় দিয়ে আদালতে এফিডেভিট করা হলে প্রোবেটের জন্য এই উইল গৃহীত হয়।

নানা খামখেয়ালীর খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের উইলে। ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের এক পাউন্ডের নোট দিয়ে তার ২টি মেয়েকে ওজন করতে যত নোট লাগবে তত নোট এক ভদ্রলোক তার ২টি মেয়ের প্রত্যেকের জন্য উইলে বরাদ্দ করে যান। পাউন্ড মূল্যের নোট দিয়ে যখন ওজন করা হল তখন প্রথমা পেল ৫১·২০০ পাউন্ড, আর দ্বিতীয়া ৫৭·৩৪৫ পাউন্ড।

কয়েক বছর আগে এক ফরাসী ভদ্রলোক, বোধ হয় কৌতুকের নেশাতেই—এমন একটি মহিলার নামে ১২০০ পাউন্ডের উইল করে গেলেন যিনি ২০ বছর আগে দু'দুবার তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

'প্রত্যাখ্যানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' ভদ্রলোক উইলে লিখেছেন, 'আমি যে বিবাহিত জীবনের দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ না করে স্বাধীনভাবে চিরকুমার থেকে আমার জীবন যাপন করতে পেরেছি সে জন্য আপনার প্রত্যাখ্যানকে অশেষ ধন্যবাদ।'

*

'তোমরা হিটলার সম্বন্ধে কি জান?' টিভি ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের টেলিভিসন রিপোর্টার পশ্চিম জার্মানীর কয়েকটি হাইস্কুলের ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি ১২টি স্কুলের কয়েকশত ছাত্রকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি উত্তরই নাজীবাদ সম্বন্ধে বিস্ময়কর অজ্ঞতায় ভরা। প্রকৃতপক্ষে প্রতি ১০ জনের ভিতর ৯ জন ছাত্র হয় হিটলার সম্বন্ধে কিছুই জানে না বা মনে করে যে, হিটলার মন্দের চেয়ে ভালই বেশি করেছেন।

জবাবগুলো প্রায় সবই এক ধরনের। জবাবগুলো পর পর সাজালে এই রকম দাঁড়ায়।

হিটলার জার্মানীর পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। তিনি জার্মানীর ৭০ লক্ষ বেকারের জন্য কাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি আমাদের যুবকদের নাবিক হওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু করাটা তাঁর পক্ষে অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু হারাটা আরও অন্যায় হয়েছে।

'কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাজীর নাম করতে পার।' জবাব এল, টিটো, ক্রুশ্চেব, হিণ্ডেনবুর্গ।

শিক্ষকরা কিন্তু ছাত্রদের এই অজ্ঞতার নিন্দা করলেন, কিন্তু তাঁরা এও বললেন যে, পাঠ্য পুস্তকের যে বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপান হয়েছে তাতে ১৯১৮ সালের পরের ইতিহাস পড়ার সময়ই তারা পায় না।

কিন্তু সংবাদপত্রগুলির অভিমত ভিন্নরূপ। 'ডাইওয়েল্ট' বলেন—আমাদের স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই কোন গলদ ঢুকে পড়েছে। 'ফ্রাঙ্কফুর্টার' আলজেমিন' বলেন—আমাদের অতীত সম্বন্ধে ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার মত সাহস অধিকাংশ শিক্ষকেরই নেই। অন্য একটা সংবাদপত্রের অভিমত—আমরা কি এমন একটা ভবিষ্যৎ বংশধর তৈরি করতে পারি, যারা হিটলারের গোঁফ ছাড়া আর সব সম্বন্ধেই অজ্ঞ থাকবে?

সুরলোক থেকে নরলোকে

জ্যোতির্ময় দত্ত

রুয়োর জন্ম হয় মাটির তলার এক ভ্যাপসা ঘরে। মানুষের অধিকাংশ সন্তান ভাগ্যবান, তাঁরা মাতার উষ্ণ অন্ধকার থেকে বহির্গত হয়ে সূর্যের উষ্ণতর সংসারে প্রবেশ করেন। রুয়ো প্রথম চোখ মেলে দেখলেন মানুষের গড়া এক হিম অন্ধকার: সেই গ্রীষ্মে, ভের্সাই সরকারের বোমাবর্ষণের ভয়ে প্যারিবাসী নাগরিকগণ অনেক নিম্নতর, কিন্তু বুদ্ধিমান, প্রাণীর ন্যায় বিবরবাসী হয়েছিলেন। রুয়োর জন্মের ঠিক সাতদিন আগে ভের্সাই সরকারের বিজয়ী সেনাদল নগরীতে প্রবেশ করলেন; বোমাবর্ষণ থামলো বটে, সন্ত্রাসের বৃদ্ধি হলো। সাতদিনে ছত্রিশ হাজার নাগরিক ধৃত হলেন, আঠারো হাজারের মৃত্যু হলো। ফরাসী বিপ্লবের সময় প্যারীর গর্ভে যে তেজঃশিশুর সূত্রপাত হয়, জুলাই এবং ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যে-ভ্রূণের বৃদ্ধির লক্ষণ এবং যার জন্মের পূর্বমুহূর্তে লক্ষণ দর্শনে ইউরোপের রাজন্যবর্গ শিহরিত ও বিস্মিত, প্রৌঢ় শিশুকে সূতিকাগৃহে নৃশংসভাবে প্রৌঢ় শিশুকে সূতিকাগৃহে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো।

রুয়োর ছবি দেখে আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে না প্রকৃত স্মৃতিশক্তি নিয়েই জন্মায়; আদি স্মৃতিগুলি কেউ ভুলে যায় না, মনের পিছনে সেগুলি পড়ে থাকে; যার কাছে আগে সে ধুলো ঝেড়ে তাকে বের করে আনে। রুয়ো বহুকাল পর্যন্ত তাঁর ঐ শৈশব সম্পদগুলির অস্তিত্ব ভুলে ছিলেন—ততদিন ঐ ঐশ্বর্য সংকার্যে ব্যয় করবার ক্ষমতা তাঁর হয়নি—কিন্তু কোন সৎ অভিভাবকের মতো স্মৃতি নাবালকের জমিদারি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। যখন রুয়োর ছবির গড়ন বদলালো তখন স্পষ্ট দেখা গেল সেই পবিত্র চোখে দেখা আদি অন্ধকার এবং সেই অবরুদ্ধ নগরীর ভূগর্ভস্থ নরক আবার ফিরে এসেছে। রুয়োর ছবি দেখার পর সেই সব পুরোনো প্রশ্ন, যা আমরা মালার্মে ও মাতিসের কৃপায় প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম, আবার জরুরী মনে হয়। শিল্পে কতটুকু বানানো আর কতটুকু স্মৃতি? কোন অংশ মনগড়া আর কোনটা শিল্পী শুধু মনে রেখেছেন? বিশ শতকের দুর্দান্ত আধুনিকেরা এসব প্রশ্নকে আমলই দেবেন না। তাঁরা বলবেন কবিতায় বা ছবিতে সবটুকুই নতুন; শিল্পী ছবিতে পুরোনো কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে চান না, তিনি কাপড়ের পর্দায় রঙ মাখান। মানুষ মাত্রেই আয়ুষ্মান ও দেহধারী, সেহেতু স্মৃতির হাত থেকে তার অব্যাহতি নেই। কিন্তু জীবন ও শিল্প স্বতন্ত্র দুটি লোক। বায়ু থেকে জলে যে সাঁতারু প্রবেশ করেন, তাঁকে মাটির উপযোগী ভারি পোশাকের কিছুটা উপরে ছেড়ে আসতে হয়। শুধু যদি স্তরান্তরে এতটা পরিহার করতে হয়, লোকান্তরে যেতে হলে আরো বেশী কিছু ত্যাগ তো করতেই হবে! সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তি ছাড়া শিল্পী সম্পূর্ণ নির্গুণ; সেহেতু ছবিতে কতটুকু বানানো—এমন প্রশ্ন অবান্তর।

কিন্তু একেবারে অবান্তর হয়তো নয়। মের্লাভিচ কিংবা মঁদ্রিয়ানের ঐসব অলৌকিক গড়নের আড়ালে হয়তো আমাদের এই ভূলোকের ব্যথা ও সংশয় খেলা করে না—হয়তো বা সব সত্ত্বেও করে—কিন্তু রুয়ো স্পষ্টতই তাঁর ছবিকে শুধুমাত্র বর্ণের বিন্যাস মনে করতেন না। মানুষের যে সমস্ত চিরন্তন ভাবনা আছে—ঈশ্বর এবং আত্মা, মৃত্যু, প্রেম এবং জন্ম—যে সমস্ত ভাবনা এতো পুরোনো যে তা আমা-

রুয়ো কর্তৃক অঙ্কিত রঙীন এচিং

দের শিরায় জড়িয়ে গেছে, সেগুলিকে তিনি, ভাবনা নয়, মূর্তির আকারে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেকে এই সমস্ত ভাবনার সাহায্যে নিজের বিশিষ্ট সত্তা অনুভব করেন। ঈশ্বর কারো কাছে শুধু নাম, কারো কাছে দার্শনিক প্রশ্নমাত্র, কোন কোন মানুষের হৃদয়ে এক উষ্ণ উপস্থিতি। যিনি যেভাবে জগতকে অনুভব করেছেন তিনি সেইভাবে এই ভাবনাগুলির জবাব দেবেন। ঈশ্বর—এই তিন অক্ষরের শব্দটি বিশ্বাসী [illegible] প্রত্যেকের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তার [illegible]; এই প্রাচীন ধারণাটি আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার গড়ন নির্ণয় করে।

রুয়ো জগৎকে এতো তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন যে আমাদের এই বিশাল ধুলোয়-গড়া আস্তানাটিকে শুধু ধুলো এবং মানুষের এই উত্তপ্ত শরীরকে শুধুমাত্র খাদ্য ও পানীয় আত্মসাৎ করার একটি সুগঠিত যন্ত্র বলে মনে করতে পারেন নি। দুঃখকে তাঁর মনে হয়েছিল প্রয়োজনীয়, এমন কি উপকারী, সেহেতু মৃত্যুকে তাঁর অর্থহীন মনে হয় নি। আনন্দবোধের ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরিমেয়, পুলকে শুধু তাঁর গাত্র শিহরিত হতো না, রোমাঞ্চিত হতো তাঁর সত্তা, সেহেতু তাঁর সংশয় হয়নি জীবনে আশার কারণ আছে। মানুষকে তিনি রণক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছিলেন হিংস্রতায় উন্মাদ। মাংসভোজী পশুরাও হিংস্র: কিন্তু মানুষ কখনো কখনো অকারণে আঘাত করে, রক্তের প্লাবনেও অত্যাচারীর বুভুক্ষু মন আরো চায়. মানুষ অপরকে বিক্ষত করে, মাংস নয়, আর্তনাদে তৃপ্ত হবার জন্য। এমন নিষ্ঠুরতার কি কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা আছে, কোনো সহজ বিশেষণ কি এর পক্ষে যথেষ্ট? নীল বা গাভী শব্দটি যতটুকু দরকার তা বোঝায়. এই নিষ্ঠুরতার উত্তেজনা কি "মন্দ" নামক নিভু নিভু পাংশু শব্দটি প্রকাশ করতে পারে? রুয়োর মানুষ তীব্র যন্ত্রণায় ও আনন্দে গড়া। শুধুমাত্র "শয়তানে"র ধারণটি তাদের দানবিক ও হিংস্র মনের গোপন, অন্ধকার সত্তাগুণের বোধ আমাদের দিতে পারে। আর প্রেমে মানুষেরা কোমল, অপরের শরীরে সস্নেহে ছাড়া হাত দেয় না শিশুর চাইতে তারা পরনির্ভর, জলের মতো তাদের হৃদয় তখন আর্দ্র. নিজের স্বতন্ত্র সত্তা মুছে ফেলে অপরের মধ্যে গলে যেতে চায়—তখন তাদের ঈশ্বর বিনা চলবে কী করে?

রুয়ো মানুষের যে ছবি এঁকেছেন, তা ঠিক স্বাভাবিক নয়; চোখ, মুখ, নাকের প্রকৃত গড়নটা তিনি ধরবার চেষ্টা করেন নি। ফ্লোবেয়ারের নায়িকা যেমন ঈশ্বর বিনা জীবনধারণ করতে পারে, কিন্তু কোন কারামাজভ তা পারে না, তেমনি একজন মাতিসের ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন না হতে পারে, রুয়োর হয়। একালে কোনো ছবির সম্পর্কে যে কথা বলতে আমরা প্রায় শিহরিত হই, রুয়োর বেলায় তা মানতেই হয়—তাঁর ছবি এতো গাঢ় যে, মনে হয় ত্বকের আড়ালেও আরো কিছু আছে, চর্মচক্ষু যেটুকু দেখে তা যেন আরো কিছু দিয়ে আরো গভীরে দেখবার সংকেত। রুয়োর ছবিতে এই অতিরিক্ত বস্তুটি হলো বায়ুর চেয়েও সূক্ষ্ম, দেহের জমজ অথচ দেহেই যার অধিষ্ঠান, শরীর থেকে যা সরে গেলে শরীরের ওজন কমে না, অথচ চরিত্র

বদলে যায়—অর্থাৎ সেই মানুষের আত্মা যার অস্তিত্ব আমরা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে ভয় পাই।

ছবিতে তাঁর আত্মাকে প্রকাশ করবার অধিকার একালের শিল্পী হারিয়ে ফেলেছিলেন। যা অদৃশ্য তাকে আমরা ছবি থেকে বিতাড়িত করেছি; কিন্তু রঙের প্রলেপ যেমন রঙ ছাড়াও আরো কিছু হয়ে ওঠে, মানুষের চৈতন্য যেমন বস্তুর বিন্যাসের মধ্যে যা-বস্তু-নয় সেই সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে পারে, রুয়োও তেমনি ছবি নামক বস্তুটিকে তাঁর তীব্রতম অনুভূতির দ্বারা সংক্রমিত করলেন। এতো তীব্র তাঁর যন্ত্রণা, এতো গভীর বিষাদ, এতো মধুর পুলক যে এই অনুভূতিগুলিকে আর স্বাভাবিক অথবা ভ্রান্ত বলা চলে না। প্রেম অথবা ক্রোধ, করুণা অথবা ঘৃণা তাঁর ছবিতে এমন সূক্ষ্ম ও সচেতন আকার পেয়েছে যে, আমরা মানতে বাধ্য হই অন্যান্য জীবের অনুভূতি থেকে এগুলি স্বতন্ত্র, এরকমভাবে মানুষের চৈতন্যই শুধু বুদ্ধি ও বোধ, স্মৃতি ও নতুন ঘটনার অভিঘাতকে সংযুক্ত করতে পারে।

এই যৌগিক প্রক্রিয়াটি শুধু মানুষের (এবং সব মানুষের) মনে ঘটে। কিন্তু কোন কোন মানুষ আরো পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা ক্রমাগত নতুন সংযোগে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জানা ছিল আর যা সদ্য ঘটলো তা সংযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু কখনো কখনো অভিজ্ঞতা শুধু বাড়ে না, বদলেও যায়। শিল্প পুরোনো ও অভিনব বস্তুর পাঁচ-মিশেলি যোজক নয়; শিল্পে বিচিত্র বস্তু এক নতুন রূপের মধ্যে মিশে যায়, সেই রসায়নের কৌশল হলো শিল্পের প্রাণ। যেমন মানুষ শুধুমাত্র হাত ও পা, শিরা ও স্নায়ু, অথবা মেরুদণ্ড ও অস্থিসন্ধি নয়; এমন কি এইসব অঙ্গ এবং বৃক্ক-ফুসফুস-যকৃতাদি যাবতীয় প্রাণযন্ত্রের সমষ্টিও নয়; যেমন সব কিছু সংযুক্ত হলেও কী এক সূক্ষ্মবস্তুর অভাবে মৃত মানুষকে শুধুমাত্র মাংসের কবর বলে মনে হয়, তেমনি সৃষ্টির প্রাণদাত্রী নিশ্বাসের অভাবে অধিকাংশ ছবি শাদা কাপড়ে রঙিন বস্তুর বিন্যাস বলে বোধ হতে পারে।

আধুনিক শিল্পী শিল্পের প্রাণবস্তুর সন্ধান করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে শুধু এই পরমতার নিশ্বাসটুকু খাঁটি। এবং যেহেতু সৃষ্টির অলৌকিক সংযোগ শুধু সৃষ্টিকালে ঘটে, সেহেতু ছবিতে যে অভিজ্ঞতা মূর্ত হয় তা সৃষ্টির অভিজ্ঞতা, যে-স্মৃতি বিধৃত থাকে তা সৃষ্টিক্ষণের স্মৃতি। কিন্তু প্রাণহীন মানুষ যেমন শুধু মানুষের শব, দেহহীন প্রাণও তেমন শুধু গত মানুষের স্মৃতি। দেহের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে মর্তলোকও লুপ্ত হবে। একালের শিল্পীর বৈরাগ্য নিষ্ঠুর; তাঁর ছবি এতই পরিশুদ্ধ যে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর ব্যক্তিত্বও বুঝি শোধন প্রক্রিয়ার ফলে বাদ পড়ে গেছে। যা-কিছু বিশেষ, স্থানীয় ও কালনির্দিষ্ট তা অন্তর্হিত হয়েছে, রয়ে গেছে শুধু যা পরম ও আদি; অর্থাৎ মানুষ নয়, দেবতার উপভোগ্য এই শিল্প। এমন কি দেবতাও নয়। পুরাণে যিনি সর্বভূতের আত্মা, তিনি ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ-পরিশূন্য, তাঁর পরম ও অব্যয় শান্তস্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। দেবতারা সৃষ্টির লীলায় অংশ গ্রহণ করেন; এমন কি বিশ্ব-সৃষ্টিকারী ঈশ্বর জগতের সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত এবং সেহেতু ন্যায় ও করুণা, প্রেম ও পুণ্য আদি নরগণের পরিচিত গুণাবলী তাঁর উপরও আরোপিত হয়। আধুনিক ছবি চতুর্গুণশূন্য। ঈশ্বরের পৃথিবী বন্ধুর; মঁদ্রিয়ানের ছবিতে কোনো রেখা বাঁকা নয়, কোনো রঙ অন্য রঙে মিশে যায় না, সেই পরম সারল্যের মধ্যে এই আমাদের মতো দুর্বল কোনো মানব-হৃদয়ের লেশ নেই।

রুয়ো একমাত্র আধুনিক যিনি মানবাত্মার গভীরতম বেদনা নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন। ভান গগ্‌র ছবিরও উপাচার তাঁর যন্ত্রণা, কিন্তু সে-যন্ত্রণা হার্দিক এবং তাঁর উত্তেজনা সম্পর্কে দর্শক যদিও সহজেই নিঃসংশয় হন, সে-যন্ত্রণা যে প্রকৃতিস্থের, অথবা অতো উত্তেজনার যে যথেষ্ট কারণ আছে, এমন হয়তো প্রত্যেকের মনে হয় না। রুয়ো যে-যন্ত্রণায় দগ্ধ শীর্ণ তার কারণ ব্যক্তিগত জীবনে কোনো বিফলতা নয়; রুয়োর ছবিতে যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হয়তো যন্ত্রণাও নয়, তার আসল নাম হয়তো বিষাদ কিংবা দুঃখ। স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করেও তিনি ভুলতে পারেন নি অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, নিষ্ঠুর ও সন্তপ্ত, হিংসাপরায়ণ ও প্রেমিক একই ঈশ্বরের গড়া মানুষ, হয়তো তারা একটি মানুষ। প্রত্যেকের আত্মার ক্লেশ যেন তাঁরই বুকের ভার। সেই জন্যই হয়তো যখন তিনি রাজা ও বিচারক, আইনজীবী ও যুদ্ধব্যবসায়ীর ছবি আঁকেন, তখন মনে হয় যেন তাঁর ক্রোধ তাঁকেও ভস্ম করছে। আর যখন তিনি সেইসব আর্ত নরনারীগণের ছবি এঁকেছেন—মনে যাদের দর্প নেই, শরীর যাদের দারিদ্র্যের আঘাতে ভগ্ন—তখন তিনি এমন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রয়োগ করেন, ঐ নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর মিশে যাওয়া এমন চিহ্নহীন যে মনে হয় ঐসব সন্তপ্ত মানুষেরা আসলে একাত্মা, সকলের মুখের তলায় সেই একই মুখের গড়ন—তাঁর নিজের,—লুক্কায়িত; এত ভিন্ন পোশাক, পেশা, আসবাব ও অনুষঙ্গের এত বৈচিত্র্য, কিন্তু আসলে সবার যেন সেই এক নাম—জর্জ রুয়ো। অর্থাৎ রুয়োর সার্বজনীন আবেদনের যদি প্রথম কারণ এই

হয় যে, তাঁর দুঃখ নির্বিশেষে,—কোনো বিরল বা ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাসঞ্জাত নয় বলে যেমন ঐ দুঃখের সম্ভাবনা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত,—তেমন এও সত্য যে, প্রতি মানুষের ব্যথাকে তিনি এমন ব্যক্তিগত, এমন আপনার করে নিয়েছিলেন ব'লেই তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের এত নিকট বলে মনে হয়।

আধুনিককালে অধিকাংশ শিল্পীই ব্যক্তিগত হতে ভরসা পান নি, কেউ কেউ তা হতে চানও নি। সেজানের কাছে একটি আপেলের নিস্তব্ধ ও নির্ভেজাল অস্তিত্ব মানুষের মুখের চাইতে অধিক আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। ঈশ্বর একটি ফুৎকারে মাটির কৌটোয় প্রাণ ভ'রে তাকে মানুষ আখ্যা দিয়েছিলেন; মাতিস তুলির স্পর্শে সেই প্রাণ কেড়ে নিয়ে তাকে আবার রঙিন পুতুলে পরিণত করলেন। আর কান্দিন্স্কী যে বর্ণলোক রচনা করলেন তার অধিবাসী বিমূর্ত আকারেরা অস্থির এক রঙীন প্রাণগর্ভ আকাশে বিদ্যুতের মতো ক্ষণ-জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে কোন দৃশ্যাতীত বর্ণে; এমন তুমুল ও উন্মত্ত তাদের জীবন, এমন তীব্র

তাদের প্রাণ যে মুহূর্তে নিজেদের গ্রাস করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ঐ অকল্পনীয় আণবিক আলোড়নের তুলনায় মানুষ আর শ্যাওলা আর শামুকে প্রায় একই শ্রেণীর জীব—তথা প্রায় সমান শ্লথ, দুর্বল, ম্লান। কান্দিন্স্কী মানুষকে নিশ্চল দর্শকে পরিণত করেছেন। মানুষের কৃতিত্ব এইটুকু যে সে হলো সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন; বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে সৃষ্টির আদি ও চিরন্তন বীজের আলোড়ন সে কিছুক্ষণের জন্য দেখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু জগতের কেন্দ্র থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। সে ব্রহ্মাণ্ড সবচেয়ে প্রাণবন্ত নয়; সেহেতু তার স্ফূর্তি ও বিরক্তির সংবাদ কান্দিন্স্কীকে আর আকৃষ্ট করে না।

কিন্তু রুয়োকে করে। তাঁর মনে হয়েছিল প্রাণের লক্ষণ গতি নয়, চৈতন্য। আঘাত করতে না-পারুক, আঘাত যে সহ্য করতে পারে এবং আঘাতে যার চেতনা পুষ্ট হয় সে-ই মানুষ। প্রাণ নয়, দুঃখ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সেহেতু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁকে আকৃষ্ট করে নি, মানুষ তাঁর শিল্পের বিষয়। অন্যান্য অনেক শিল্পীর মতোই তিনিও একদা প্রেরণার সন্ধানে প্রকৃতির দ্বারস্থ হন। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীরা যে প্রকৃতিকে মনে করেছেন নব নব গড়নের অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেই প্রকৃতি যুবক রুয়োর চোখ পেরিয়ে মনে গিয়ে পৌঁছালো না। অপাপবিদ্ধ, মূক প্রাণীরা, অসন্তুপ্ত বৃক্ষগণ, অনুদ্বেলিত নদী— এদের মধ্যে রুয়ো এমন কোন গভীর আলোড়ন অনুভব করলেন না যা তাঁর অস্থায় অস্থিত জীবনের শিল্প মুক্তি পেতে পারে।

এমন সময় ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন। দেবতার করুণা কঠোর। গোটে মণ্টিস হারিয়ে ষয়ং কবি হয়েছিলেন, দান্তেকে যেতে হলো নির্বাসনে, এস প্রেমিককে হারাতে হলো দেশ, ভাষা, ধর্ম, আত্মীয় ও বন্ধুজন। কীটস অসুখ হাইনেকে কুরে কুরে খেলো; বোদলেয়ার মাকে হারিয়ে কবিতাকে পেলেন। রুয়োর প্রতি দেবতা অধিক স্নেহশীল, তাঁর বজ্রবিদারণ আঙুলে মোলায়েম স্পর্শ জানিয়ে দিলে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। রোগ তাঁর দেহকে অধিকার করলো দীর্ঘ দু'বছর ধরে। প্রিয় প্যারী নগরী ছেড়ে তিনি চলে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তখন রুয়ো যোগ্য হয়েছেন, যদিও শরীরের অর্ধেকটা রোগের জীবাণুরা ভক্ষণ করে ফেলেছে।

প্যারীতে রুয়োর ছবি এক আশ্চর্য অবয়ব গ্রহণ করলো। সার্কাসের সঙ ও রাস্তার বেশ্যা এ যুগের পটের নায়ক। প্রমোদ-ব্যবসায়ের বিশাল মহাদেশ বহুকাল অপরিচিত ছিল; তার অতিরঞ্জিত সংবাদ শিল্পীকে দীর্ঘদিন আকৃষ্ট করেছে। দেগাস সেই মহাদেশ জয় করলেন। দেগাস নিষ্ঠুর, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ। তাঁর ছবিতে নর্তকী-গণ অভ্যাসের পুতুল, তাদের অঙ্গচালনা যন্ত্রের মতো কঠিন ছন্দে বাঁধা, কিন্তু তবু তারা রঙ্গমঞ্চের মায়ালোকে সুন্দর হয়ে ওঠে। রূপকথার রাজপুত্র যেমন নিষ্প্রাণ, তার চরিত্রে যেমন জটিলতা নেই, তার কার্যাবলী যেমন পুরোনো গতে বাঁধা, দেগাসের মোহিনী পুত্তলিকারাও তেমন অপরের খেয়ালে চালিত। কিন্তু রুয়োর ছবিতে সেই ভাঁড় অথবা বেশ্যা পুতুল আর থাকলো না, ভিন্ন জাতের প্রাণীও নয়, তারা হয়ে উঠলো আমরাই, হয়তো আমাদের চাইতে শ্রেয় মানুষ। তাদের দুঃখ উদ্রেক করে সমবেদনা নয়, শ্রদ্ধা। রুয়োর ছবিতে প্রমোদ-ব্যবসায়ীর অঙ্গলীলা আত্মার অস্বস্তিতে পরিণত হলো। প্রাচীন ঢঙ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তিনি ছবিতে গাঢ় বর্ণ লেপন করলেন। আর ছবি থেকে বর্জন করলেন নাটকের আভাস, কাহিনীর অংশ।

পিকাসোর ভাঁড়কে আমরা দুঃখী বলে চিনি, কারণ তাদের চেহারা শীর্ণ, চোখে বিরক্তি প্রচ্ছন্ন। রুয়োর ছবিতে তাদের চোখ এক অন্ধকার গর্তে, অথবা ভাবহীন চিহ্নে পরিণত হলো। এবং দুঃখকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি শীর্ণতাকে অবলম্বন করলেন না। নিতান্ত বিষণ্ণ ভাঁড়ের দেহও নধর এবং সন্তুপ্ত বেশ্যাও মেদবহুল হতে পারে। বিকে অপোলোর ভাঙা, প্রাচীন নারীর মধ্যে শিল্পের পরম অজর রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রুয়ো ঝকঝকে শরীরের আড়ালে জীর্ণ আত্মাকে সনাক্ত করলেন। তিনি প্রমোদ-ব্যবসায়ীদের চৈতন্যকে এমন এক সূক্ষ্ম কৌশলে প্রকাশ করলেন যা বর্ণনা করা যায় না অথচ এক পলকেই অনুভব করা যায়।

মাতিস, দেরাঁ, মারকে ও অন্যান্যদের সঙ্গে রুয়োও তাঁর ছবি সাঁল দতন-এ প্রদর্শিত করলেন। আশ্চর্য এই যে, বিশ শতকের সবচেয়ে বিপ্লবী ছবিগুলির বিরুদ্ধে কোন সমালোচকের রোষ বর্ষিত হলো না। যে-নিভৃত প্রক্রিয়ার ফলে রুয়োর শিল্প বিবর্তিত হচ্ছিলো, তা সম্পূর্ণভাবে ঐ ছবিগুলির মধ্যে মিশে গিয়েছিলো। হয়তো সংস্কৃতির স্বর-বারিকগণ তরুণ মাতিসের রঙের অস্থির প্রবাহের তুলনায় ঐ ছবিগুলিকে নির্জীব মনে করেছিলেন। তাছাড়া, তাঁর ছবিতে এমন এক সততা আছে, যা তাঁকে চীৎকার করে মনোযোগ আকর্ষণ করতে বাধা দেয়। তিনি যেমন অসংখ্য ঢঙে ছবি এঁকে প্রত্যেক বসন্তে আলোড়ন তোলেন নি, তেমন ছবিতে অর্থহীন তাণ্ডব তুলে এক বসন্তের পাখিও হতে চান নি। পিকাসোর কতো না ভঙ্গি, তাঁর বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই; রবীন্দ্রনাথ অথবা ঈশ্বরের মতো

তিন হাজার গড়নের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির মধ্যে যেমন কোন উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না, বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন শুধু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে, কিন্তু আপনাতে অর্থহীন, তেমনি পিকাসোর এবং রবীন্দ্রনাথের অশেষ নিঃসরণ যেন শুধুমাত্র তাঁদের অফুরন্ত ক্ষমতার প্রকাশ, তাঁদের শক্তি এমন অসীম যে, অপব্যয় ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বা পিকাসো যেন সহস্র মানুষ; রুয়ো নিতান্তই একজন। রুয়ো কখনোই তাঁর শরীর, তাঁর অভিজ্ঞতা অতিক্রম করেননি; যেটুকু তাঁর নিজের ও সম্পূর্ণ খাঁটি, সেটুকু তিনি অতি যত্নে লালন করেছেন। তাই তাঁর বিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত—তাঁর শিল্প বদলেছে এই কারণে যে, তাঁর বয়স বেড়েছে; খেয়াল নামক যে-দুর্বার শক্তি ক্ষমতাশালীকে চালিত করে, চমকে দেবার যে-প্রলোভন এমন কি মহৎ পুরুষও সংবরণ করতে পারেন না, প্রকরণের যে শীতল মায়া আত্মার জ্বালা জুড়োতে বারে বারে আমন্ত্রণ জানায়, তা রুয়োর নিষ্ঠা ভাঙতে পারে নি।

রুয়ো কিছুই আঁকেন নি 'যা তাঁর নিজের নয়'। বহু বছর ধরে এক একটি ছবি তিনি গড়েছেন; "বৃদ্ধ রাজা" ছবি আঁকতে তাঁর দীর্ঘ দুই দশক অতিবাহিত হয়েছিলো। "সার্কাস" নামে একটি ছবিও সমান কালক্ষয়। "পুরোনো সহরতলি" আঁকতে তাঁর পনেরো বছর লাগে। পিকাসো মাছের মতো বহুপ্রসবী: তুলি ধরলেই তিনি আঁকতে পারেন। এ-রকম নয় যে পিকাসো বা রবীন্দ্রনাথ, সব সৃষ্টিতেই—শুধু অভিনব নয়—খাঁটি হতে পেরেছেন। আসলে দু-হাজারের পর দু-হাজার একেরটা সহজেই আসে—ওটা অভ্যাস। রুয়ো ঐ অভ্যাসকে সংযত করেছেন কারণ তাঁর বিবেক ছিলো সততায় নির্মম; যেটুকু তাঁর আত্মাকে সম্পূর্ণ দোহন করে, তাঁকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে, ব্যথা দিয়ে জন্মেছে সেটুকুই তাঁর, বাকিটা তিনি নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছেন।

১৯১৪ সালে যুদ্ধবিষয়ক ছবিগুলির প্রথম খসড়া করলেন রুয়ো। তাঁর এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু নামত যুদ্ধ—তৎসত্ত্বে তাঁকে যুদ্ধের দৃশ্যনীয় ইতিহাস রচনা করতে বলেন। কিন্তু রুয়োচিহ্নিত যুদ্ধের ফল প্রধানত কামান-বন্দুক দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এখানে মারণাস্ত্র যারা শক্তিমান তারা আসলে জড় পদার্থ, কোন কুটিল মন ঐসব পাথরের ধড় অধিকার করে তাদের সচল করেছে। কিন্তু চলনে তারা অদ্ভুত—আদৌ মানুষের মতো নয়। আর কামান প্রস্তুত করবার পক্ষে যেটুক কূটবুদ্ধি লাগে সেটুকু হয়তো তাদের আছে, কিন্তু মানুষ হবার মতো সূক্ষ্ম চৈতন্য তাদের নেই। আর যাঁদের চৈতন্য আছে তাঁরা এই যুদ্ধ নামক ঘটনার দ্বারা এমন আক্রান্ত হয়েছেন যে, তাঁদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দুঃখভোগে নিয়োজিত; অন্য কিছু করবার সময় তাঁদের নেই। সুতরাং শত্রুক্ষয় তাঁরা কখনো করতে পারবেন না; পরাজয়ের মুহূর্তেই তাঁরা সার্থক হবেন। অথবা যুদ্ধের উপকূল থেকে অপসারণরত অবস্থায় তাঁদের ধীর মূর্তি আমাদের চোখে পড়ে। যেহেতু এই ছবিগুলি পুরাণ ইতিহাস নয়, সেহেতু কালনির্ণয়ের প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না; নয়তো লক্ষ্য করতাম এগুলি প্রধানত প্রথম মহাযুদ্ধের ছবি নয়; এ সেই অবরোধের ছবি [illegible] স্মৃতিটুকু পর্যন্ত শিল্পীর মনে ছিল না, অথচ যার প্রভাব, কোন সূতিকাগৃহে লোকান্তরগতা মাতার মতো, সন্তানের প্রতি কাজে প্রতিফলিত হয়। এ-যুদ্ধে এক পক্ষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়; এগুলি আসলে এক বিশ্বব্যাপী ছবি—সাহায্য এসে পৌঁছবে অন্য এক লোক থেকে অবরোধের প্রাচীর আমাদেরই অহং বোধ, ক্ষুধা আমাদের প্রেমের অভাব, আর, ঐ কামান, বন্দুক মানুষের জান্তব বুদ্ধি।

মিসেরে বা 'করুণা করো' নামধারী চিত্র-পর্যায় রুয়ো শেষ করেন ১৯২২ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে—প্রথম মহাযুদ্ধের দশ বছর পরে। এই দীর্ঘ ব্যবধান রুয়োর পক্ষে প্রয়োজন ছিল। সমকালীন ঘটনার উত্তেজনা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকৃষ্ট করে; সংবাদপত্রে যে-সংকর ভাষায় লেখা হয় তাতে এমন কি ইস্তাহারও লেখা হলে আমাদের অসহ্য মনে হবে। অথচ মহাপুরুষ ও প্রকৃতির নির্বোধ সন্তান কৃষক ছাড়া, কেউই পৃথিবীর টাটকা খবর সংগ্রহ না করে পারেন না—আবার করবার সময় নিজেদের একটু কলঙ্কিত বোধ করেন। যুদ্ধের বিশুদ্ধ চৈতন্য রক্ত-মাংসের উত্তেজনা এমনিতেই প্রশমিত হয়েছিলো কালক্ষেপের ফলে উত্তেজনার [illegible] হয়ে গেছে। গোইয়াও যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন; উত্তেজনা ও ইতিহাস দুই সেখানে প্রবল। [illegible] মনের উপর যুদ্ধের প্রথম অভিঘাত [illegible] তেমনি দেশ

কালের বোঝাও তাঁর লাঘব হয় নি।

আর, পিকাসোর ছবিতে রূপক বড়ো স্পষ্ট; তাঁর বাণী এতো সহজে পৌঁছয় যে তা আমাদের তরল ব'লে সন্দেহ হ'তে পারে। গার্ণিকার সংবাদকে পিকাসো তাড়িৎ গতিতে রূপকে পরিণত করেছিলেন। ইস্পানি সরকারকে তিনি কথা দিয়েছিলেন প্যারী প্রদর্শনীর জন্য একটি ছবি আঁকবেন, কিন্তু ছবির বিষয় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রুয়োর ছবির বিষয় অনেকদিন ধরে ঠিক করা ছিল, গড়নটা ধীরে ধীরে কেটে বার করেছেন; পিকাসো গড়নটা মকসো করছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে, গার্ণিকায় বোমা পড়াতে যা একটু দেরি হলো। পিকাসোর চাতুর্য বেশি, রুয়োর সততা; পিকাসোর ছিল ভাগ্য, রুয়োর পুরস্কার; পিকাসো দেবতার প্রিয়, প্রবীণ রুয়োকে দেবতাও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে মিসেরেরের নরকে ধীরে ধীরে আলো প্রবেশ করছিল। রুমের ছবি বয়ঃপ্রাপ্তির পর কখনো আঁকেন নি; এখন আঁকলেন। ১৯২৮ সালে তিনি অদ্ভুত এক নিসর্গ-চিত্র রচনা করলেন—শহর [illegible] দূরে দেখা যাচ্ছে, সামনে [illegible] স্নিগ্ধ গভীর অস্তিত্বও অনুমান করা যায়, [illegible] মানুষ ও [illegible] [illegible] তাই, এক শতকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে না। তিনি এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বহুর পরে তিনি আবিষ্কার করলেন [illegible] আলো বড় না হ'লে [illegible] নয়; আলো হালকা ক্ষীরের মতো [illegible] উঁচু [illegible] [illegible] তবে, [illegible] জমে থাকে। আর হাওয়াও কখনো কখনো ভারি হয়; [illegible] উপর [illegible] সব পড়ে। তখন তাঁর বয়স ষাট, মৃত্যু আর ছ-বছর দূরে। একশো বছর আগে যেসব বর্ণ ইম্প্রেশনিস্টরা আবিষ্কার করেছিলেন, তা এখন প্রথম ব্যবহার করলেন। [illegible] কমলা, [illegible] তরুণ সবুজ, [illegible] নীল, [illegible] ছবিতে প্রবেশ করল। কিন্তু ইম্প্রেশনিস্টরা কুয়াশার মতো এইসব রঙকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রুয়োর ছবিতে রঙ পুরু, এবং গাঢ়, অথচ মনে হয় কোন গভীর গর্ত থেকে ধোঁয়ার মতো তা নির্গত হচ্ছে এবং [illegible] ছবিতে শুধু [illegible] চিহ্নের মতো তাদের আঁকা [illegible] মনে হয় সবই [illegible] [illegible] মতো গভীর, মত্যান্তরে যেন এক [illegible] আন্দোলন

নিরন্তর চলছে। ক্লে কিংবা মিরোর ছবিতেও মানুষ কয়েকটি রেখায় আঁকা চিহ্ন, কিন্তু তারা শুধু চিহ্ন।। ঐ উজ্জ্বল ত্বকের খোসা ছাড়ালে প্রাণের শাঁস বেরিয়ে আসবে না। রুয়ো রঙের পুঁটলিতে আবার প্রাণ ভরে দিলেন; ছবিকে দিলেন দৃশ্যোত্তর সত্য আবিষ্কারের অধিকার, মানুষকে ফিরিয়ে দিলেন তার ঈশ্বর। উনিশ শতকের শিল্পী আত্মাকে পরিহার করে শুধু জড় বস্তুর ছবি এঁকেছিলেন; বিশ শতকে শিল্পী মাংসকে পরিহার করে শুধু নিরাকার চেতনার পরম ও বিদেহী গড়ন খুঁজেছেন। উনিশ শতকের শিল্পী নাস্তিক; বিশ শতকের শিল্পী নিজেই ঈশ্বর। রুয়ো প্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে বিভেদের ব্যবধান ঘোচালেন। ভবিষ্যতের শিল্পীকে তিনি বর্ণ-ব্যবহারের নতুন কৌশল শেখালেন, গড়ে দিয়ে গেলেন ছবির [illegible] [illegible] বাঁকা, ধনুকাকৃতি গড়ন, [illegible] [illegible] মধ্যে কোয়ার মতো, [illegible] করে নিতে পারে; প্রমাণ করলেন [illegible] বড়ো নাই হোক না কেন, ক্যানভাসে

প্রাচীর-চিত্রের দানবীয় প্রকাণ্ডতার জায়গা নেই। কিন্তু কান্দিন্স্কীর বর্ণ ও দ্যুতিময়; মাতিসের বিন্যাস কৌশল হয়তো আরো অভিনব; ভবিষ্যতের শিল্পী পিকাসোর আঁকা কোনো কোনো ছবি দেখে অনুমান করতে পারবেন কেন বৃহৎ আকার সর্বদা মহৎ ভাবের উদ্রেক করে না। রুয়োর বিশেষ দান তাঁর প্রকরণ নয়; যদি অন্য কোন শিল্পীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে হয়, তবে এল গ্রেকোর সঙ্গে—হয়তো—এবং ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে—তিনি ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও—নিশ্চয়ই করা চলে। কিন্তু পুরাণে তাঁর সমগোত্রীয়, অগণন না হোক, বিরল নয়। যুধিষ্ঠির যেমন স্বর্গের অধিকারী হয়েও নরকের অধিবাসী হতে চেয়েছিলেন, রুয়োও তেমনি সুরলোক থেকে অবতরণ করলেন নরলোকে। এবং যে-পরম দুঃখী দেব-মানবের ছবি তিনি বারে-বারে এঁকেছেন, তাঁর মতো রুয়োও অপরের ক্রুশ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। "করুণা" গ্রন্থে তিনি যীশুর উদ্দেশ্যে লেখেন:

"তাঁর ব্যথায় ক্ষত শুদ্ধ হয়।" একই কারণে রুয়োও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কান্ ফেস্টিভ্যাল-এর চিঠি

কার্লটন হোটেল
কান্
১৪-৫-৫৯

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। প্রায় দু' বছর হল দেশের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই। বাংলা সিনেমার সঙ্গে যা পরিচয় তা দেশ পত্রিকারই মারফৎ। মনে হয়, একদল গুণবান্ আগ্রহীর চেষ্টায় বাংলা সিনেমা কেন, ভারতীয় সিনেমারই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মোড় ঘুরে যাবে। যাই হক, সিনেমা সম্বন্ধে বাংলা পাঠক পাঠিকাও মোটেই উদাসীন নন। কান্-এ দ্বাদশ সিনেমা-মহোৎসবে আমার উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছে। তাই মনে হল, এখানকার খবর দেশের পাঠক পাঠিকার জন্য আপনার কাছে লিখলে হয়ত তা কাজে লাগতে পারে। দেশী ছবি যখন কান্, ভেনিস্, এডিনবরা বা কার্লোভীভারীতে যায়, তখন বাইরে যাই ঘটুক, দেশে কেবল তার বিজয়ের রটনাই হয়। তাই বিশেষ করে আপনাকে এখানকার ভিতরের খবর দেবার প্রয়োজন মনে হল।

দক্ষিণ ফ্রান্সে ভূমধ্যসাগর তীরে ছোট্ট এই শহর কান্। কয়েক মাইলের মধ্যেই নীস্, মণ্টিকার্লো ইত্যাদি শহর। এছাড়া পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অসংখ্য গ্রাম তো আছেই। শুনেছি, ভূমধ্যসাগরের জল খুব নীল, কিন্তু না দেখা পর্যন্ত ঠিক ধারণা করতে পারিনি যে, এতটা নীল। সবুজ পাহাড়ের ঢালু গা গিয়ে নেমেছে সমুদ্রের বালুতীরে। এই সবুজ আর বালুর সংগম ধরে পিচঢালা পথ চলে গেছে সর্পিল গতিতে সাঁ রাফায়েল, কান্, আন্তীব, নীস্, মণ্টিকার্লো। তারপর পাহাড়ের গায়ে যত উঁচুতে চোখ যায় কেবল সুন্দর বাগানে সাজান বাড়ির মেলা। এত সবুজ, এত নীল আর এত রোদ—প্যারিসের বারোমাস, প্যাচ্‌প্যাচ্ কাদা ও কালো-অন্ধকার আকাশের পর যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

সমুদ্রের তীর ধরে যে এই পথ, তার এক ধারে সারি সারি বড় বড় হোটেল, দোকান এবং Palais du Fastival, অন্য ধারে কেবল বালুতীর। সেখানে নরনারী মেয়েপুরুষ বাদামী হবার চেষ্টায় রোদে শুয়ে, নয়ত "সার্ফ" আর "ইয়ট" নিয়ে ব্যস্ত। বছরে এই সময়টা এখানে যে কেবল ভাল ফিল্ম আর তারকাদের চাক্ষুষ দেখার জন্য ভীড় হয় তাই নয়, সমুদ্র-স্নান, সমুদ্রে নানাবিধ খেলা এবং "কাসীনো"তে জুয়া খেলাও বিশেষ আকর্ষণ। এই রাস্তার ধারে সমুদ্রের তীর ধরে একটার পর একটা পতাকা সাজান হয়েছে। গুনে দেখিনি, তবে মনে হল, অসংখ্য অগণিত পতাকা। আকাশের, জলের, ফুলফল ও বিকিনীর রং সব ছাপিয়ে রোদে ঝলমল্ করছে পতাকা-গুলো।

এবারে এই ফেস্টিভ্যাল-এ যোগদান করেছে: জার্মানী, আর্জেণ্টীন, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, কানাডা, চীন, ডেনমার্ক, স্পেন, আমেরিকা, গ্রেট-বৃটেন, হাঙ্গেরী, ভারত, ইতালী, জাপান, মেক্সিকো, নরওয়ে, পাকিস্তান, পোল্যাণ্ড, পোর্তুগাল, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, টুনিসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং ফ্রান্স তো আছেই। এবারে ফ্রান্সের প্রত্যেকটি ছবিই উল্লেখযোগ্য এবং Palmed'or অর্থাৎ "দি গোল্ডেন পাম্" ফরাসী ছবি প্রথম পুরস্কার পাবে বলেই মনে হয়। এছাড়া কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবির নাম দেব।

ফ্রান্স—"ক্যাথ্ সাঁ কু", পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, বয়স মোটে ২৭ বছর এবং এই এঁর প্রথম ফিল্ম।

„ —"হিরোশিমা মোন্ আমুর"—আলাঁয়ে রেনে। এর আগে ইনি মাত্র একটি ডকুমেণ্টারী করেছেন।

„ —"ওরফেও নেগ্রু"—মার্সেল কেমু, এঁর আগে মাত্র একটি ফিল্ম আছে।

ইতালী—"উফিসিয়ালে দী স্ক্রিত্তুরা"—মারিও সোলদাতী।

„ —"নেল্লা চিত্তা ল' এনফার্নো"—রেনাতো কাস্তেল্লানী।

ভেনেজুয়েলা—"আরায়া"—মার্গো বেনা-সেরাফ্। (এটি মহিলার প্রথম ফিল্ম)

মেক্সিকো—"নাজারিন্"

আমেরিকা—"মিড্ল অব দি নাইট"—ডেলবার্ট মান।

„ —"কম্পালশন"—রিচার্ড ফ্লিশার।

গ্রেটবৃটেন—"রুম অন দি টপ"—জ্যাক্ ক্লেটন।

জাপান—"[illegible]" [illegible]।

—[illegible] কিনুগাসা এবং [illegible]।

এরপর পুরস্কারটির পালা। এটাও ফ্রান্সেরই পাবার সম্ভাবনা। কারণ মনে [illegible] মত দুটি ছবিই ফরাসী।

ফরাসী—"[illegible]"—[illegible]।

„ —"[illegible]"—[illegible]।

„ —"[illegible]"—[illegible] এবং [illegible]।

চেকোশ্লোভাকিয়া—"Motyli tady Nezji" (এখানে প্রজাপতি নেই)। মীরো বের্না।

ফিল্ম সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ফেস্টি-ভ্যাল-এর নিয়মাবলী এবং জুরী সম্বন্ধে লিখছি। এদের ব্যক্তিগত আধিপত্য ফিল্মের ভালমন্দ ছাপিয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে এমন দলাদলি এবং কূটনীতি আছে যে বিচার বেশীরভাগই পক্ষপাতদুষ্ট হয়। সেজন্য একটু আধটু এসম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ফেস্টিভ্যাল-এর বেশ কয়েক মাস আগেই তোড়জোড় আরম্ভ হয়। নিয়ম হল, প্রত্যেক দেশ দুটি ছবি দেখাতে পারবে। একটি

নির্বাচন করেছে ফিলিপাইন উপদূলকের। তবে শেষ পর্যন্ত জাপানের আড়ালে এদের হয়ত পুরস্কার দিতে হবে অন্যকে। চেকোশ্লোভাকিয়ার "এখানে প্রজাপতি নেই" ছবিটিও এই পর্যায়ে পড়ে। বড় ছবির মধ্যে ইতালীর দুটি ছবিই একেবারে সাধারণ স্তরের। ভেনেজুয়েলার 'আয়ারা' এক মহিলার তোলা বলে তার পুরস্কারের সম্ভাবনা আছে। দুটি মার্কিন ছবি একেবারে চিরকালের মার্কিন ছবির মত। ঝকঝকে কলাকৌশল, এমন কি অভিনয় পর্যন্ত। ব্রিটিশ ছবির বিশেষত্ব এই যে, নায়িকা হচ্ছেন ফরাসী অভিনেত্রী। অতএব মনে হয় এই অভিনেত্রীই পুরস্কার পাবেন। তাতে ফরাসী ও ব্রিটিশ দু' জাতেরই মুখ রক্ষা হবে! জাপানী ছবি টেকনিকে এবং

বাংলা দেই মহাবদের মত সুন্দর—এই পর্যন্ত। এই গেল প্রতিযোগিতার ছবির খবর। প্রতিযোগিতার বাইরে ছিল এই প্রথম ফ্রেঞ্চ এসোসিয়েশন অব্ ক্রিটিক্স অব্ সিনেমা অ্যান্ড টেলিভিশন এবং ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ এসোসিয়েশন অব্ অথরস্ অব্ ফিল্মস্ দ্বারা নিমন্ত্রিত ছবি 'India' (মাতৃভূমি)। প্রযোজক-পরিচালক রেবার্তো রোসেলিনী। আমি সমালোচক নই। তবে এ-ছবির প্রদর্শনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। কাজেই দর্শকদের মধ্যে কী এবং কেন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল তা দেখলাম। একটা উদাহরণ দিই। হিরাকুদ বাঁধ নিয়ে যে গল্পটি এই ছবিতে ছিল তা দেখে আমাদের দেশ সম্বন্ধে এদের অনেক ভুল ধারণা ঘুচে গেছে। প্রত্যেকেই বলছে যে, এই ছবি দেখে তাদের মনে হয়েছে যেন পিরামিড তৈরী হচ্ছে। যাদের ওরা মনে করে অর্ধনগ্ন, অর্ধপুষ্ট তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় যে পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ তৈরী হতে পারে এটা এদের যেন বোকা বানিয়ে দিয়েছে। ৩৫০০০ হাজার লোক পিঁপড়ের মত একটার পর একটা পাথর বয়ে চলেছে—এর পিছনে যে দুর্দাম শক্তির পরিচয় আছে তা এদের কাছে রীতিমত বিস্ময়ের বিষয়। [illegible] মেয়েদের কাজ করতে দেখে এরা [illegible] হয়ে পড়েছে।

কান্ ডাইরেক্টর [illegible] ভ্যালে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। [illegible]

শুনলাম ভেনিসে সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' আসার খুব সম্ভাবনা। এঁর কাছে আমাদের বাংলার "nouvelle vague" অর্থাৎ "নতুন-তরঙ্গের" কথা তুললাম। এতটা যে উৎসাহিত হলেন আশা করিনি। আমাদের দেশে যে মার্কিন ছবি ছাড়া আর কোনো বিদেশী ছবি আসে না এবং তা সত্ত্বেও সুদূর বাংলায় যে একদল অগ্রণী আছেন যাঁরা কষ্ট করে বিভিন্ন ইউরোপীয় ছবি দেখেন, সমালোচনা করেন, কেবল তাই নয়, বাংলা সিনেমার "নতুন-তরঙ্গের" মূলে যে এইসব সিনেমাই আছে তা শুনে ভদ্রলোক খুবে [illegible] হলেন। আশা হচ্ছে, ধীরে ধীরে এদেশে আমাদের দেশের যে-কটা সত্যিকারের ভাল ছবি আছে তা এরা জানতে পারবে। এখানকার nouvelle vague ও ওখানকার নতুন-তরঙ্গ [illegible] জানি হোক না? আমাদের বাংলা সিনেমায় যাঁরা উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়ে নতুন কিছুর সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তাঁদের কথা ভেবেই লিখছি। ফেস্টিভ্যাল-এর বাইরেও ছবি দেখান যেতে পারে। পুরস্কারটাই আসল কথা নয়। চ্যাপলিন [illegible] কটা অস্কার বা প্রাইজ পেয়েছেন? [illegible] সব রকম পুরস্কার এবং নিত্য নতুন [illegible] "Cinemascope" ছাপিয়ে [illegible] চিরস্মরণীয় হয়ে আছে [illegible]

সোনালী দাশগুপ্ত

তাগিদে? ওর মান নরনারীর গভীর আদান-প্রদানের প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করে প্রথম দেশবন্ধু দাশের সংস্পর্শে এসে। দেশবন্ধু ওকে রেহাই দিতেন না, নানাদিক থেকে নরনারীর গভীর সহযোগ ও সাহচর্য প্রসঙ্গের আলোচনা করতেন। • আমার যোগে দীক্ষা নেবার ঠিক আগে ও আমাকে একদিন বলে যে, জেলে ও বৈষ্ণব কবিতা ও তন্ত্র পড়ে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছে। কথাটা ও বলবামাত্র আমি হেসে উঠেছিলাম, বলেছিলাম যে, এ সম্বন্ধে পুঁথি পড়ে কিছু জানা সম্ভব নয়। এই সময়ে সুভাষ অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সংস্পর্শে আসে। (তাঁকে আমি এখন থেকে শরৎদা নামেই অভিহিত করব।) শরৎদার নানা গল্প উপন্যাসে নারীচরিত্রের নানা মতিগতি দেখে ও সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই একটু বিহ্বল মতন হয়ে পড়ত, কিন্তু শরৎদার 'পরে ওর এমনই গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ও ভুলেও তর্ক করত না। তাই "তন্ত্র ও বৈষ্ণব কবিতা পড়ে সুভাষ রাতারাতি প্রেমের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়েছে" ওর এই কথা যখন একদিন ওর সামনেই শরৎদার কাছে বলি তখন শরৎদা তাঁর অভ্যস্ত ঢঙে চোখ দুটি মিটি মিটি করে খিলখিলিয়ে হেসে বলেন: "সুভাষ, এ হ'ল হাতে-কলমের ব্যাপার ভাই, পুঁথি পড়ার কর্ম নয়।" সুভাষের মুখ সেদিন লাল হয়ে উঠেছিল এ-ঠাট্টায়। পরে শরৎদা চলে গেলে আমাকে বলে: "তুমি ভারি দুষ্টু—কেন এভাবে আমাকে অপ্রস্তুত করলে?" আমি হেসে বললাম: "যাতে তুমি এ-বিষয়ে একটু সচেতন হও—ইংরাজীতে এই ধরনের মন্তব্যকে naive বলে, জানো না কি?" ও একটু চুপ করে থেকে বলেছিল: "তোমার একথা সত্যি যে, এ বিষয়ে আমার কোনো অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাই নেই। কিন্তু তা বলে শরৎবাবুর একথা সত্য নয় যে, হাতে-কলমে না করলে কোনো কিছুর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সব জ্ঞানই প্রথমে আসে পরোক্ষভাবে—অপরোক্ষ অনুভূতি আসে সবশেষে আর তখনই মানুষ পরোক্ষ জ্ঞানকে বাড়িয়ে নিয়ে সত্যিকার অভিজ্ঞ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার সঙ্গে এ-আলোচনা আমি একটু সময় পেলে করব কোনো-দিন—কারণ আমার যে-ছবিটি তুমি মনে মনে এঁকে রেখেছ আমি ঠিক তা নই।"

দুর্ভাগ্যক্রমে এ-আলোচনার অবসর আমাদের মধ্যে হয়নি। কেনন, ১৯২৮ সালের পরে আমার পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতায় বড় বেশি আসা হত না বলে আমাদের মধ্যে বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৩৭ সালের পরে অবশ্য বহুবারই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু তখন এ-আলোচনায় না ছিল আমার উৎসাহ, না ছিল ওর অবসর। পরিণত বয়সে নরনারীর মন আদান-প্রদান সম্বন্ধে সুভাষের ভাবধারার খবর দিতে আমি অক্ষম। •

আমি সুভাষকে প্রথম থেকেই চিনেছিলাম স্বধর্মে বীর সাধক ও স্বভাবে ব্রহ্মচারী বলে। এ-জাতের মানুষ প্রায়ই একলা থাকার ফলে হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী তথা নিঃসঙ্গবৃত্তি। সহজ মানুষ (normal) বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি—অর্থাৎ বে-হাঁচে সাড়ে পনের আনা মানুষ ঢালাই-করা—তাদের সঙ্গে এ-জাতের মানুষের একটা মূলগত তফাত থাকেই থাকে।

তফাতটার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয়গম্য হলেও তার নিদানের দিশা পুরোপুরি যুক্তিগম্য নয়। তাই একের মাপকাঠিতে অপরকে মাপা চলে না। একথা সুভাষও স্বীকার করত—বিশেষ করে ওর কর্মজীবনে, তাই ও কথায় কথায় বলত যে, দেশের ডাক যে শুনেছে ঘরের ডাকে কান দিলে সে স্বধর্মভ্রষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের বলাকার শেষ কবিতাটি ওর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এইজন্যেই, প্রায়ই উদ্ধৃত করত সংযত উচ্ছ্বাসেঃ

> ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
> নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
> নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
> পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর
> আশীর্বাদ,
> শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ......

স্বামীজির Song of the Sannyasin থেকে ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত একটি চরণঃ "Have thou no home, what home can hold thee, friend?" এক কথায় ও দেশের [illegible] অনিকেত নিঃসঙ্গ [illegible] সন্ন্যাসীর মতনই [illegible] [illegible] [illegible] অনুরক্তভাবে [illegible] [illegible] [illegible] Danton এর মতো সুভাষও [illegible] একটি মন্ত্রবৎ ছিল "Audace, audace, toujours l'audace!" [illegible] Memoirs of a Revolutionist ছিল ওর একটি অত্যন্ত প্রিয় বই। প্রায়ই বলত আমাকেঃ "তিনি সত্যিই ছিলেন a giant among men [illegible] পেরেছিলেন দেশের জন্যেই [illegible] [illegible] এই পথের জন্যেই [illegible] ছিলেন?

বাইরের লোক জানত না যে ও স্বভাবে উদাসী, অসংসারী কিন্তু ও নিজে জানত। তাই ও একবার লিখেছিল একটি ছোট্ট খাতায়—[illegible] ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮ সালে—[illegible] ছিল তার আত্মার একটি রক্তাক্ষরঃ

"There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown. In this life there may be suffering, but there is joy as well; there may be hours of darkness but there are also hours of dawn. To this path I call my countrymen."

অর্থাৎ, "আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে দুঃসাহসের জীবন—গতানুগতিকের সহজ পথ ছেড়ে অজানার অচিনের দুরভিসার। এ-হেন জীবনে দুঃখ থাকতে পারে কিন্তু আনন্দও আছে; রাত্রির আঁধার আছে, কিন্তু উষার আলোও আছে। এই পথের দিকেই আমি আমার দেশবাসীদের ডাক দিতে চাই—এসো।"

আমি এ-সূত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছি এই কথাটি যে সুভাষ আবাল্য বেশ ভালো করেই জানত যে সে গড্ডলপড়তাদের একজন নয়, তাকে নিজের পথ কেটে নিজের লক্ষ্যপথে চলতেই হবে সে-অভিসারে যত দুঃখই সইতে হোক না কেন। তাই না ও আঠার বৎসর বয়সেই ওর এক বন্ধুকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "আমার জীবনে এমন একটি উদ্দেশ্য আছে যাহা বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। আমার জীবন বিধাতার সেই উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্য, সুতরাং গতানুগতিক জীবনযাত্রা আমার জন্য নহে।"

একটু আগেই বলেছি প্রতিভা আত্মসচেতন না হয়েই পারে না। তাই সুভাষ যে তার জীবনবাণী সম্বন্ধে সচেতন হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় পাই, তিনি জানতেন বিধাতা তাঁকে কোন্ শান্ত শিব সুন্দরের পথে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন, তাই না লিখেছিলেন অকুণ্ঠেইঃ

জানি আমি, মোর কাব্য
ভালোবেসেছেন মোর বিধি—"
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ
আপন-দেওয়া নিধি।......
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন
নিঃশব্দ পদচারে
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার
বাঁশিতে শুনিবারে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও—তাঁর কথা বলবার সময় এলো—ঠিক্ তেমনি জানতেন বরাবরই যে, তাঁর প্রতিভার উৎসমুখে তাঁর মধ্যে পাষাণ চাপা আছে, একবার খুললে তার সুধাধারায় কেউ পারবে না স্নিগ্ধ তৃপ্ত মুগ্ধ না হ'তে। আমাকে একথা প্রায়ই বলতেন, চিঠিতেও নানা লোককে লিখে-ছিলেন। যেমন একটা চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্যকেঃ "আমার চেয়ে ভালো নভেল কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারে না। যখন এই কথাটা মনে জানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন আমাকে গল্প বা উপ-ন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্বে নয়।"......

এ-কথাটাকে এত করে ফলিয়ে বলছি আরো এই জন্যে যে সুভাষের অনেক সমা-লোচক তাকে অহঙ্কারী ও অটোক্রাটিক বলে তার উপর অবিচার করেছেন। তাঁরা যদি বলতেন ওর আদর্শের পথে যারা হানা দিত তাদের সম্বন্ধে ও অসহিষ্ণু ছিল তাহলে মেনে নিতে পারি, কেন না এ অসহিষ্ণুতাকে দোষের বলে আমি মনে করি না। কেন করি না বলি সংক্ষেপে।

সংসারে যারা গড়পড়তা গতানুগতিক হয়ে যায় তাদের চলার পথে দুঃখ থাকলেও বাধা খুব বেশি প্রকট হয়ে ওঠে না যেমন ওঠে তাদের পথে যারা সুভাষের মতন স্বভাবে দুঃসাহসী, দুর্গমপন্থী। এ-শ্রেণীর মানুষ মহাপ্রাণ হয় বলেই পথ নেয়ঃ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। কাজেই যখন তারা দেখে যে, তাদের মন্ত্রসিদ্ধির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে তারা, যাদের সম্বন্ধে চলতি প্রবচনে বলেঃ "ভালো করতে পারি না পারি মন্দ করতে তো পারি—আমায় কী দিবি বল্—" তখন তারা সইতে পারে না এ-ঈর্ষার গ্লানি নীচতার বিদ্রোহ, মিথ্যার দাপট।

কিন্তু ঈর্ষা নীচতা মিথ্যা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে মানুষকে খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তেই হয়, কেন না সব মহৎ বিকাশই দুর্লভ বলে সংসারে মহৎ আশা মহৎ স্বপ্নের শরিক হবার লোক খুব বেশি মেলে না। আমি তাই সুভাষকে প্রায়ই বলতাম যে, ধর্মের প্রেরণায় জাতির ও সমাজের সংস্কারসাধনের ব্রত নিয়ে ভারতের শাশ্বত অমৃত বাণীর পতাকাবাহী হওয়াই তার উচিত ছিল, বলা উচিত বিবেকানন্দের পথে—হীন রাজনীতির পথে নয়। উত্তরে সুভাষ বলত ঐ একই কথাঃ 'তবে যে রাজনীতির অঙ্গন শেয়াল কুকুর শকুনির ভাগাড় হয়ে দাঁড়াবে।'

এ-প্রাচীন সমস্যার কোনো আশু সমাধান করবার দুরন্ত উৎসাহে এ-প্রসঙ্গ পাড়িনি আমি। স্মৃতিকারকের স্বধর্মও নয় এ-ধরনের সমস্যা সমাধান। আমি এ-সূত্রে শুধু এই-টুকুই বলতে চাই যে, সুভাষ বিলক্ষণ জানত যে, তার আদর্শের বিরোধীদের সঙ্গে লড়ন্ত তাকে অনেক কিছুই সইতে হবে। শরৎদাকে দেশবন্ধু একবার বলেছিলেন (সুভাষের মুখেই প্রথম শুনি একথা) যে, দেশকে স্বাধীন করতে তাঁকে ইংরেজের সঙ্গে যত না লড়তে হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি লড়তে হয়েছে তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে। সুভাষের বেলাও ঠিক তাই ঘটেছিল। ফলে জনকল্লোলের মধ্যেও সে হয়ে পড়েছিল খানিকটা একলা ও অসহায়। বারান্তরে একদিনের কথা বলব—যার স্মৃতি আমার মনে কতদিনই যে খচ খচ করে বেজেছে—বিশেষ সুভাষের সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বিদেশে বিভুঁয়ে অকালমৃত্যুর পরে।

(ক্রমশ)

সন্তোষকুমার ঘোষ

[৩১]

সোরেশ সৌরকে বললেন, 'তুমি কমবয়সী, অনভিজ্ঞ। তাই জান না, সতী তোমাকে কী দিয়েছিল। জানলেও, নাম জান না।'

'জানি। সুখ, শান্তি।' একটু ভেবে সৌর জুড়ে দিল 'আর আনন্দ।'

'আনন্দ?' সোরেশ হেসে উঠলেন, সেই হাসি শুধু সৌরই শুনতে পেল। বিদ্রূপের ভঙ্গিটা তাকে বিঁধল। আহত গলায় সে বলল, 'কেন? সুখ নয়? শান্তি নয়? আনন্দ নয়?'

সোরেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'তিনটের কোনটাকেই তুমি চেন না, তাই এক নিশ্বাসে তিনটি কথাই উচ্চারণ করলে। তিনটি ছাত্রকেই ব্র্যাকেটে এক নম্বর দিলে। যদি অভিজ্ঞতা থাকত তোমার, তা হলে টের পেতে, সুখে শান্তি নেই, শান্তিতে নেই আনন্দ। কিছু ঠেকছে?'

নির্বাক সৌর শুধু মৃদুভাবে মাথা নাড়ল।

'বেশ বল, সুখ বলতে তুমি কী বুঝেছিলে।'

'সতীকে পেয়েছিলাম, সেই সুখ।'

'শুধু সেইটুকু?'

'না' খোঁচা খেয়ে সৌরর মুখ খুলে গেল। 'না, শুধু তাই নয়। আমার জীবনের চেহারাই বদলে গিয়েছিল যে।'

ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গ, সোরেশ তখনও হাসছিলেন। —'জীবন কী?'

'বেঁচে থাকা।'

'না। প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকার যোগফল জীবন। তার পর বল।'

'বেঁচে থাকার স্বাদ বদলে গিয়েছিল।'

'শুধু স্বাদ?'

সৌর গদগদ গলায় বলল, 'আর বর্ণ আর স্পর্শ। আর গন্ধ আর মোহ। সব অনুভবকে ছেয়ে ফেলেছিল, ভরে তুলেছিল।'

'ছেলেমানুষ', সোরেশ স্বগত বললেন, 'ছেলেমানুষ'। সৌর সুখ, শান্তি আর আনন্দের মধ্যে তাই তফাত করতে জানত না। সময়ের দহে আমরা মৃণালের মত ডুবে থাকি, দহে যদি ঢেউ না থাকে, তাকেই বলি শান্তি। পাঁক থেকে আলোয় পৌঁছতে মৃণালের গায়ে কাঁটা ফোটে, সেই রোমাঞ্চকে বলি সুখ। কিন্তু আনন্দ আরও ওপরে—সে আলোয়-আকাশে ফুলের মত ফুটে থাকে।

আনন্দই কি তবে জীবনের লক্ষ্য? কিন্তু শুধু ফুটেই যে ফুরিয়ে গেল সে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছল? ফুটে ওঠা একটা ক্রিয়া, রূপ আর সৌরভ একটা অবস্থা। ফুরিয়ে যাওয়া একটা পরিণতি মাত্র। প্রথমটা সৃষ্টি, দ্বিতীয়টা স্থিতি, তৃতীয়টা লয়। তিনে মিলে একটা নিয়মের বৃত্ত, যার মধ্যে অস্তিত্ব আবর্তিত। অস্তিত্ব নিজেই যদি নিজের অর্থ না হয়, তবে তার দ্বিতীয় কোন অর্থ নেই।

অস্তিত্ব যদি অর্থহীন তবে আমরা বাঁচি কী নিয়ে। ইচ্ছা নিয়ে, আশা নিয়ে বাসনা নিয়ে। শান্তির আশা, সুখের বাসনা। শান্তি আবার জলের মত সাদা, স্বাদহীন। সে যদি একঘেয়ে হয়ে ওঠে, আমরা তখন তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে কয়েকটি সুখ আর দুঃখের কণা সৃষ্টি করি। সাদাকে ভাঙলে অনেক রঙ পাওয়া যায়, শান্তির ভাঙা-ভাঙা টুকরো সুখ আর দুঃখের কণা-গুলিরও তেমনি নানা রং—বেগনি, নীল, হরিৎ, পীত, লোহিত, নীল। সাধ মিটলে তাদের আবার জোড়া দিয়ে দিয়ে অখণ্ড শান্তি তৈরি করতে চাই।

এত কথা জানা সৌরর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সৌর শুধু নেশাই করেছিল। বিকাল হলে ছুটে-আসার নেশা। ছাদে একলা দাঁড়িয়ে থাকার নেশা।

ঠিক একা নয়। সে আসত। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, এমন-কি সৌরর নিজেরও চোখ দুটি যখন ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে, তখন। এসে সৌরর পাশে দাঁড়াত। তার আঁচল হাওয়ায় উড়ে সৌরর গায়ে লাগত। সৌর তার গন্ধ পেত। চুলের? চামড়ার? জিভের লালার, নিশ্বাসের? না। অস্তিত্বের। শুধু উপস্থিতিরই একটা গন্ধ আছে।

'তারা-দেখা শেষ হল?'

'হল।'

'চিনেছ?'

'চিনেছি।'

'বল ত কোন্‌টা ... পুষ্যা?'

'নাম জানি না।'

'তবে যে বললে চিনেছি।'

'নাম না জানলেও চেনা যায়। যেমন—'

'যেমন আমাকে, না? আমার নাম সতী।'

'সতী, তোমাকে আমি মিছে কথা বলেছি। আমি তারা গুণতে ছাদে আসি না।'

'জানি। তুমি নয়ন আর পাখিদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকতে আস। চমকে উঠলে?'

'না। তুমি আরও কত জান, তাই ভাবছিলাম। জানলে কী করে?'

'দেখে দেখে।'

'তার মানে আড়াল থেকে তুমি আমাকে লক্ষ্য করেছ? ওদের নাম জানলে কী করে?'
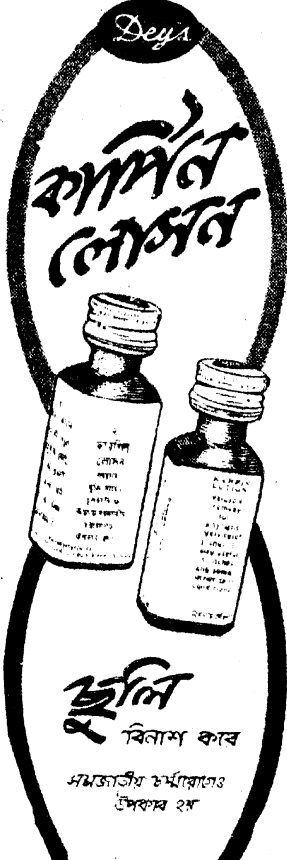
'তোমার খাতার পাতা থেকে।'
'চুরি করে পড়েছ?'
সতী উত্তর দিত না।
সৌর বলত, 'আর কেউ জানে?'
'কেউ না।'
'শুধু তুমি?'
'শুধু আমি।'
'ও।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত সৌর।
—'সতী তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'
'কৃতজ্ঞতা?'
'কৃতজ্ঞতা। আমাকে নানা পথ টানছিল, আমি স্থিতি পাচ্ছিলাম না, তুমি আমাকে ফিরিয়ে এনেছ। ঘরমুখী করেছ।'
'এবার স্থিতি পাবে।'
'পাব।' প্রগাঢ় গলায় উচ্চারণ করত সৌর, তারপর হঠাৎ যেন অস্থির হয়ে বলে উঠত, 'এই!'
'কী'
'মুখ ফেরাও না।'
'কেন?'

'একটিবার একটু!'

'কী হবে?'

'তোমাকে দেখব। তোমাকে ভাল করে দেখতে দাও না কেন।'

'এই ত দিয়েছি।'

'না, এতটুকুতে কিছু হয় না। এই রাতটা অন্ধকার, এই ছাতটা অন্ধকার, আমি শুধু আবছাভাবে তোমাকে দেখি। তুমি কালো, অন্ধকারে কালোর সঙ্গে মিশে যাও। কাছে এস।'

'এলাম।'

'মুখ তোল। চোখ খোল।'

'হয়েছে?'

'না, আর একটু। তোমার গন্ধ নিতে দাও। ছোঁয়া পেতে দাও। এই গন্ধ কার?'

'আমার।'

'এই ছোঁয়া?'

'আমার।'

'আর গন্ধ আর ছোঁয়া যার সেই তুমি?'

'তোমার।'

* * *

আবার সকালে যন্ত্রণার মধ্যে সৌরের ঘুম ভাঙল। ও-পাশের বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে, নয়ন নেই, পাখি নেই। সতীও নেই। সতী কখন গেল?

নীচে নেমেও তাকে সৌর খুঁজে পেল না।

মধ্যবিত্ত যৌথ সংসারে সকালগুলো কা-কা করে চেঁচায়, কলকেতার আশপাশ-পড়া কাঁসার বাসনে ঝনঝন করে ওঠে, বাসী মুড়ি হয়ে হাওয়ায় ছড়ায়, আর কলাই-ওঠা পেয়ালা থেকে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়। সকালের মুখে সাবানের ফেনা, চোখে পিচুটি। কাচা করা ভাঙা-ভাঙা শিথিল শাড়ীর খসখসে আদলও আছে, কিন্তু তার মধ্যে সতী কই।

দিনে তাকে দেখা যায় না। দেখা গেলেও চেনা যায় না। সেকি ওই কালো মেয়েটি, যে তোয়ালে কাঁধে নিয়ে কলঘরে গিয়ে ঢুকল? সে বেরিয়ে এসে কাপড় মেলে দিতে ছাদে গিয়ে ওঠে—সৌরও পিছুপিছু যেতে চায়, কিন্তু সাহস পায় না, যদি সে না হয়? যদি সে-ই হয়, কিন্তু ভুলে গিয়ে থাকে? যদি তার চোখে ভ্রুকুটি ফোটে? রাতে যে অনেকখানি মোহ, মধুরতা আর প্রশ্রয় নিয়ে ধরা দেয়, দিনের আলোয় সে যদি বদলে গিয়ে থাকে?

তার মনটাকে সৌর তো চেনেই না, দিনের বেলা তার শরীরটাও বুঝি কঠিন আর রাগী অথবা ভীরু আর বিব্রত হয়ে থাকে?

তার চেয়ে এই ভাল, সৌর নতুন বইয়ের পাতা নাকের কাছে এনে তার ঘ্রাণ নিক, নরম পাউরুটিতে দাঁত বসিয়ে অধরের স্বাদ ফিরিয়ে আনুক। বিকল্প আঘ্রাণে আর দংশনে সে তবু আছে, দিনের রূঢ় রোদ্দুরে দেখা শরীরের কোথাও নেই।

* * *

তারপর গভীর রাত্রির ইশারা ত আছেই। সে সাড়া দেবে, পা টিপে টিপে উঠে আসবে, ধরা দেবে।

'এই!'

'কী?'

'নিশির ডাক কাকে বলে, জান?'

'কাকে?'

'একটা ডাবের জলে মানুষের আয়ুকে পুরে রাখা যায়, জান না?'

'না-ত।'

'আমার আয়ুও তুমি নিয়েছ। এই!'

'বল।'

'দিনের বেলা তোমাকে পেতাম না বলে আফসোস ছিল। এখন নেই। কেন, জান?'

'কেন?'

'দিনেও তোমাকে পাই বলে। কী করে, জান? ছেলেমানুষি ভাবনার কথা তোমাকে বলতেও লজ্জা হচ্ছে। এতদিন নিজেকে বড় একা লাগত। এখন আর লাগে না। মনে হয়, তুমি আছ। তুমি দেখছ। সিগারেট ধরালুম, মনে হল, তুমি দেখলে। চায়ের দোকানে গেলুম, তুমি আমার পাশে গিয়ে বসলে। চলতি বাসে উঠতে গিয়েও পারলুম না। অপ্রস্তুত হয়ে এদিক-ওদিক চাই, তুমি দেখে ফেলনি ত? তাই মনে হয়, আমি একা নই, অন্তত একজন ত এই মুহূর্তে আমার কথা ভাবছে। তুমি সব সময়ে কি আমার কথা ভাব?'

'ভাবি।'

'আমারও সবক্ষণ সেই।'

'সবক্ষণ?'

'না, সবক্ষণ না। কত রাত অবধি তোমার জন্য একলা জেগে থাকি, তুমি আসতে দেরি কর। তখন কষ্ট হয়, যন্ত্রণা পাই। আবার দেখ, সেই যন্ত্রণাও ভাল লাগে। ছটফট করার মধ্যে কত সুখ, তুমি জান?'

'জানি না।' গভীর-অতল চোখ তুলে সতী বলত, 'জানি না।'

সেই ভঙ্গিটা সৌরর মনে হত—চেনা। কার, কার—কার যেন? পাখির। পাখি এইভাবে চোখ তুলে চাইত। এইভাবে কথা বলত।

'নয়নের কথা ভাবছ? পাখির?'

সৌর চমকে উঠে বলত, 'না—না। সতী, নয়ন আর পাখি হারিয়ে গেছে।'

সতী আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিত সৌরর চুলে। নুয়ে পড়ে বলত, 'তুমি, ওদের খুব ভালবেসেছিলে, না?'

'ভালবাসা?' সৌর ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, 'কী জানি।' ভালবাসা হয়ত দিইনি। হয়ত কাউকে দেওয়াও যায় না, ভালবাসা নিজের মধ্যেই থাকে। ওদের যদি ভালবাসা দিয়েই ফেলব সতী, তবে তোমাকে আবার সেই ভালবাসা দিলুম কী করে।'

'আমাকে দিয়েছ?'

'দিয়েছি।' অতি-ক্ষীণ গলায় বলত সৌর, তারপর ঘুমিয়ে পড়ত।

সৌরেশ বললেন, 'বুঝলাম—সৌর, এই আশ্রয় তোমার কত দিন ছিল?'

'মনে নেই। হয়ত দেড়মাস—দু' মাসও হতে পারে।'

'এই আশ্রয় ভাঙল কেন? সৌর, তুমি কি ভয় পেয়েছিলে?'

'ভয় কেন?'

'তবে লজ্জা? কাপুরুষতা? সৌর, এখানে আমি ছাড়া কেউ নেই, অকপটে বল, তোমাদের ভালবাসার বীজ সতীর শরীরে অঙ্কুরিত হয়েছিল, অবয়ব নিচ্ছিল, সেই দায়িত্ব নেওয়ার সাহস কি তোমার ছিল না?'

'মিথ্যে কথা।' সৌর সরোষে বলে উঠল 'মিথ্যে কথা। আমার সাহস ছিল, ইচ্ছা ছিল। আমি—আমরা বিয়ের সংকল্পও স্থির করে ফেলেছিলাম। আমি আগামীকে মেনে নিতে ত তৈরিই ছিলাম।'

'তবে?' সৌরেশ নির্মম প্রশ্ন করলেন, 'তবে তুমি পালালে কেন? কেন বারো বছরের মত নিরুদ্দেশ হয়েছিলে?'

সৌর ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, 'সব ফাঁকি, সেটা এক দিন জেনে গেলাম যে! গোটা জিনিসটাই আমার কাছে প্রহসনের মত লাগল।'

'সৌর, খুলে বল।'

* * *

পড়ার টেবিলে বসে সৌর লিখছিল। কী। কিছু না—একটি নাম শুধু, সতী—সতী—সতী। সে এই টেবিলটা গুছিয়ে দিয়ে গেছে। এই টেবিলঢাকা কাপড়টায় তার স্পর্শ রয়ে গেছে। সৌর টেবিলের মসৃণ ঢাকনায় হাত বুলিয়ে সেই স্পর্শের একটুখানি তুলে নিল।

ফুলদানিতে একগুচ্ছ তাজা ফুল। সৌর একটি ফুল তুলে নিয়ে নাকের কাছে আনল, চোখে ঠেকাল।

পিসিমা কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, সৌর জানত না। পিসিমা কথা বললেন বলেই জানল।

'বই-টইগুলো আজ ত দিব্যি গোছানো রে। কে গুছিয়ে রাখল?

অসতর্কভাবে সৌর বলে ফেলল, 'কী জানি। হয়ত সতী।'

'সতী?' পিসিমা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন।—'সতীকে তুই চিনিস?'

'না।' সাবধান হয়ে সৌর অনায়াসে মিথ্যে কথা বলল, 'না। তবে দেখেছি কয়েকবার। কালো একটি মেয়ে, কিছুদিন হল এসেছে —তোমাদের কেমন আত্মীয় হয়, না?'

'হ্যাঁ। ওই ত সতী। দূর সম্পর্কে আমার ভাসুরঝি। মাস দুই হল এসেছে। মেয়েটি ময়লা হলেও সুশ্রী।'

সৌর ভিতরে ভিতরে ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। এর পরে কী বলবেন পিসিমা তাও যেন সে আন্দাজেই বুঝে নিয়েছিল, কী জবাব দেবে, তা-ও সে তৈরি করে নিচ্ছিল মনে মনে। বিয়ে? এখনই কি পিসিমা? পরীক্ষাটা দিই আগে, পড়াশুনা শেষ করি।

কিন্তু পিসিমা তার চেয়েও মারাত্মক কথাটা যদি বলতে এসে থাকেন! সতীর শরীরের ভিতরে যা ঘটছে, যদি তাঁর চোখে সেটা ধরা পড়ে গিয়ে থাকে? সেই প্রশ্নের কী জবাব দেবে সৌর? ঠিক করতে না পারল না বলেই সৌর তার হাতের আঙুল-গুলোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল। আঙুলে আপনা থেকে কাঁপছিল। হাত তুলে নিয়ে সৌর আস্তে আস্তে আঙুলগুলো কামড়াতে থাকল। এতে যদি কাঁপুনি থামে।

'মেয়েটি ময়লা হলেও সুশ্রী' পিসিমা বলছিলেন, 'কিন্তু কী অদৃষ্ট দেখ্, ওর কপালে সুখ নেই।'

'কেন নেই পিসিমা', সৌর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'ও কি—ও কি বিধবা।'

পিসিমা বললেন, 'বিধবা কী রে, বিয়েই ত হয়নি।'

'তবে?'

পিসিমা বললেন, 'ওর দেহে অসুখ আছে।'

দেহের উল্লেখে সৌর কেঁপে উঠল। নির্জীব গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী অসুখ, পিসিমা?'

'মাথায়। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন, ছিটছিট ভাব। অনেক চিকিৎসা হয়েছে—'

'সারেনি?'

'কিছু সেরেছে। তবু এখনও গোলমাল আছে। ঘুমের ঘোরে কোথায় উঠে চলে যায়, দিশা নেই। মেয়েটা কবে যেন বেঘোরে হাত-পা ভেঙে মরবে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিসিমা বললেন, 'চিকিৎসার জন্যে ওকে এনেছে। এ-সব ব্যাপারে ভাল ডাক্তার আছে নাকি তোর খোঁজে?'

আর ত শুনছিল না সৌর, ওর নিজের মাথার মধ্যেই গ্রন্থিগুলি খুলে গিয়ে গিয়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মাথায় ছিট আছে সতীর, সে কি ঘুমের ঘোরেই মাঝ-রাতে ছাদে চলে আসে? যাকে ছুঁয়েছে সৌর, কাছে টেনে নিয়েছে, সে তবে অচৈতন্য শব ছাড়া কিছু না?

সৌর আর ভাবতে পারছিল না, মাথা ঘুরছিল। এক অদৃশ্য গহ্বরে অনর্গল জল-স্রোত পড়ছে, সেই প্রপাতের শব্দ শুনছিল। কিছুই তবে কিছু না? সৌর ভাবছিল, আর কিছুই যদি কিছু না তবে এই টেবিলটাও ত নেই, আমি তবে প্রাণপণে আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছি কাকে। এই দেওয়াল-ঘেরা ঘরটাও তবে নেই, আমি তা-হলে বসে আছি কোথায়। বসে আছি-ই বা কেন। বসে থাকব না, জিভ আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল, তাই মুখে সৌর উচ্চারণ করতে পারল না, মনে মনে বলল, 'বসে আমি থাকব না।'

• • •

সেই দিনই শেষ রাত্রে সৌর নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

সৌরেশ বললেন, "শুনলাম। কিন্তু সৌর, তুমি আসলে ভীরু, কাপুরুষ।"

"কাপুরুষ কেন?"

"নইলে ওভাবে কেউ পালিয়ে যায়?"

"পালাব না?" সৌর আহত-বিস্ময়ে বলে উঠল, "পালাব না? আমার একমাত্র ভাল-বাসা মিথ্যে হয়ে গেল"—

সৌরেশের হাসিতে সৌর বাধা পেয়ে থেমে গেল। সৌরেশ বলছিলেন, 'ভাল-বাসা? ভালবাসা তুমি কাকে বলছ সৌর।' একবারও কি তোমার মনে হয়নি, তুমি লম্পট আর কামুক?'

"কামুক?"

"কামুকই ত। দেখ ও-সব ভালবাসা-টাসা তোমার বাজে কথা, নিজেকে ওই বলে ঠকিয়েছ। সতী মেয়ে—রক্ত মাংসের পুতুলি তার উচ্ছ্বাস নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে-ছিল, তাকে তুমি রোধ করতে পারনি। নারী-মাত্রেই তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু, এ-কথা স্বীকার করতে তোমার সংকোচ ছিল, তাই প্রবৃত্তির নাম দিয়েছিলে ভালবাসা। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে সৌর, তুমি এবার যাও।"

"তুমি এবার যাও।" সৌরেশ আবার বললেন স্থির গলায়, "রাত শেষ হয়ে আসছে। আমি এবার একটু একলা থাকি, ঘুমোই।"

[আগামীবারে সমাপ্য]
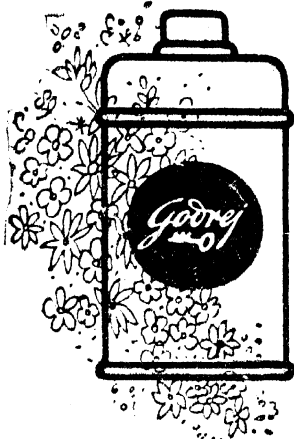
শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

দশ

নয় পেরিয়ে দশে পড়লে সেকালে বাঙালীর ঘরে মেয়েকে পাত্রস্থ করবার ভীষণ ধূম পড়ে যেত। ভাগ্যিস্ আমি বাঙালীর ঘরের পুরুষ! দশমিক নিয়মে অবশ্য তখন পয়সার হিসেব ছিল না। বরঞ্চ রাস্তায়-ঘাটে লোকের মুখে গুন্-গুন্ শোনা যেত:

দুনিয়া পুরোনো, হেথা
চল্‌বে নাকো নয়া ঢং।

এখন আমরা যে-লাইনে চল্‌ছি, সেটা ষোল-আনা "নয়া"। এর পরে যদি "দশা" আসে, আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

প্রথমে কলকাতা শহরে "লাইন দেওয়া" শুরু হয়, বছর পনের-ষোল আগে, রেশন নেবার জন্যে। একজনের কার্ড নিয়ে আর একজন যে দাঁড়াতে পারে রেশন-লাইনে, এ-ধারণা তখন আমার না-থাকায় আমি নিজেই লাইন দিলুম। গভর্নমেণ্ট রেশন-শপে, অর্থাৎ সরকারী মুদীর দোকানে।

—ময়দা নেবেন, না আটা নেবেন?

ভাবলুম, যদি বলিঃ ময়দা নেবো, হয়ত তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হবে মর-দানব, কেননা দানব-লীলার বিবরণ তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু লোক দানব-লীলা সংবরণ করেছিল। সভয়ে বললুমঃ শুনেছি অনেকের মুখে যে, আপনারা ভাল আটা দিচ্ছেন, সুতরাং আটা নেবোই। বলেই আবার ভয় হল, দোকানের মালিক যদি ভুল শোনেন যে আমি বলেছি 'আটা নোব্বই', তারপর নিরে নোব্বই-এর ধাক্কা সামলাতে পারব কি? ভাগ্যক্রমে সে-রকম ধাক্কা খাইনি, এবং সে-দিন রেশনের লাইনে কত লোক ছিল তাও গুণি নি।

এই শেষ কথাটি কলমের মুখে বেরল, তার জন্যে আমায় যেন কেউ দোষ দেবেন না। ওটি তৎসম শব্দ বলে যদি কারও কানে লাগে, আমি একটা পুরাতন গাথা শোনাব:

গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে, নাগুণশীলস্য
গুণিনি পরিতোষঃ
অলিরেতি বনাৎ কমলং নহি
ভেকস্ত্বেকবাসোঽপি।

এ-কয়টি লাইন আমার ইস্কুলে-শেখা। তখন থেকে এখন পর্যন্ত অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল অতিক্রান্ত। এখন রাস্তায় যে-লাইন দেখি, তার সম্বন্ধে বলা যায়: নান্তং ন মধ্যং, কিন্তু আদি তার আছে, যেখানে আদি-রসের উৎস, যেখানে ছায়া-চিত্র, শিল্প ও বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে সহস্র-সহস্র নর-নারীর সম্মুখে এনে ধরছে ত্রিভুবনের রূপ আর মর্ত্যের বাণী।

এ ত গেল সিনেমায় লাইন-দেওয়ার কথা। আবার একটা কথা উঠেছে, সিনেমা-লাইনে যাওয়া। এর বিশদ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। আজকাল অনেকেই ও-লাইনে যাচ্ছেন, তাতে সামাজিক বাধা সামান্য। আমারও একবার ঐ-লাইনে যাবার ডাক পড়েছিল বহুকাল আগে। তখন বাঙালিরা ফিল্ম-প্রোডাকশনে আত্মনিয়োগ করেন নি। একদিন হেদোর কাছাকাছি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাথে দেখি, কতকগুলো ছবি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যিনি দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দর-দস্তুর হচ্ছে

গতিশীল ক্রেতাদের। আমি রূপের আকর্ষণে পথভ্রষ্ট হয়ে সেখানে দাঁড়ালুম। কেনবার ইচ্ছে আমার ছিল না। শুধু দর্শনীয় রূপকে উপভোগ করতে চেয়েছিলুম খানিকক্ষণের জন্যে।

এমন সময়ে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি সুপুরুষ, এবং তাঁর ছবি-দেখার কৌতূহল আমার চাইতে কম নয়। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন:

—আপনি কি আর্টিস্ট?

—না, কেবল ছবি দেখতে ভালবাসি।

ছবি-সম্বন্ধে মন্তব্যের কিছু আদান-প্রদানের পর তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন:

—আপনি ফিল্মে নাববেন? একটা বাঙালি সিনেমা-তৈরী করার দল গড়ছি আমরা কয়েকজনে মিলে। আপনার ফিল্ম-ফেস্ আছে, তাই এই অনুরোধ।

পরিচয় নিয়ে জানলুম, ভদ্রলোকটি উত্তরপাড়া মুখুয্যেদের বাড়ির ছেলে। তাঁর আচরণ দেখে পূর্বেই আমার সন্দেহ
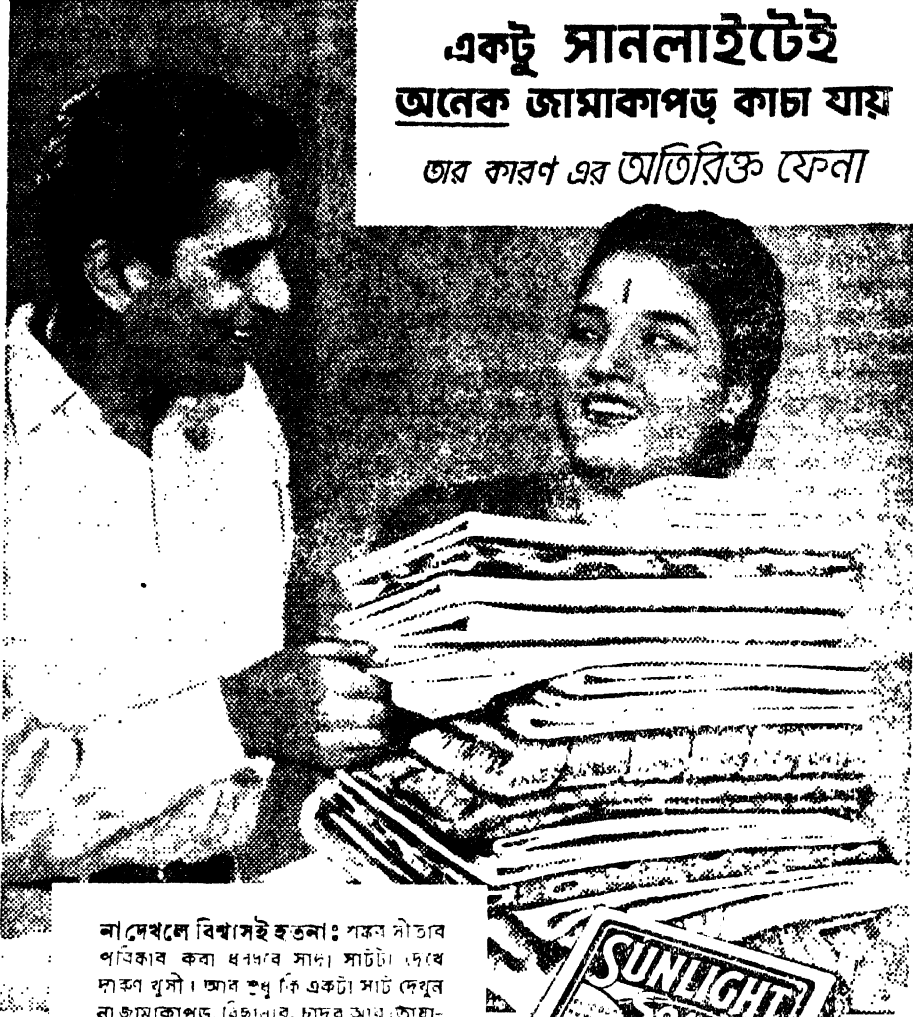
হয়েছিল যে, তিনি কোনো অভিজাত বংশের সন্তান। আমি বললুম:

—আপনি যে আমায় ফিল্ম-আর্টিস্ট হতে বলছেন এতে আমি গৌরব অনুভব করছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমাদের বংশে কেউ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে অভিনয় করেন নি। আমার পিতা বর্তমান। তিনি হয়ত মনে দুঃখ পাবেন, যদিও আমার একান্ত ইচ্ছা জানালে তিনি আপত্তি না-ও করতে পারেন।

ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছি। এ-ঘটনার পরে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।

কোনো লাইনে গেলুম না বটে, কিন্তু দেশের লাইনে এসে দেখি যে, ওলট-পালট হচ্ছে। বোধ হয় লাইনোর দোষে। একবার একটা গোটা লাইন আমার এই সবুজ পাতার ডাকের পঞ্চম কিস্তিতে পঞ্চত্ব পেয়েছে। আমি লিখেছিলুম:

"আশ্চর্যের বিষয়, শরৎ চাটুয্যে আর হেরম্ব মৈত্র (যাঁর সত্যপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত) একই দিনে পরলোকগমন করেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য, এবং সেই সত্যকে অবলম্বন করে আমি একটা গল্প লিখি "যমসভায় একদিন", যেটা ১৩৬৩ সালের "হোমশিখা" পত্রিকার পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়।"

এর তৃতীয় লাইনটি দেশে১ নেই।

প্রমথ চৌধুরী ১২।৩।১৭ তারিখে আমায় যে-চিঠি লিখেছিলেন তার একাংশে লাইন ওলট-পালট হওয়ায় যে বিভ্রাট ঘটেছে সে সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌ থেকে শ্রীসুকুমার সেন-গুপ্ত 'আলোচনা' বিভাগে চিঠি দিয়ে ভ্রম সংশোধন করেছেন বলে সে-প্রসঙ্গ এখানে আর উল্লেখ করলাম না।

১২।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন:

"......রবিবাবু কাল বিকেলে কলকাতায় আসছেন। তোমাদের সঙ্গে একদিন এখানে দেখা করিয়ে দেব। কবে? তা পরে জানাব।"

এ-চিঠি ১৩।৩।১৭ তারিখে পাই। খামের ওপর ডাকের মোহর সে-বিষয়ে অসন্দিগ্ধ সাক্ষী।

প্রমথবাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের—অর্থাৎ সবুজ-পত্রীদের—পরিচয় করিয়ে দেবেন, তাই নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছি নিশ্চয়, কিন্তু সে-ভাবনার কোনো তারবিশ রাখিনি। শুধু মনের মাঝে জেগে আছে একটা স্মৃতি-রেখা। বাবা আর অনাথ কাকাকে যখন ঐ-সংবাদ দিলাম, তাঁদের দুজনেরই মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এ-পরিচয় যে আমার হবে, সে-কথা অনাথ কাকা আমায় পূর্বেই বলেছিলেন, যখন প্রমথবাবুর প্রথম পত্র তাঁকে দেখাই। কিন্তু কবে হবে?

"কবে? তা পরে জানাব।" প্রমথবাবুর এই অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আমার মনকে আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দোদুল্যমান রেখেছিল দুদিন। এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রমথবাবুর আর একখানি চিঠি পেলুম যে, সেই শুভদিন আগতপ্রায়।

১, ব্রাইট স্ট্রীট,
বালীগঞ্জ
১৪।৩।১৭

কল্যাণীয়েষু,

রবিবাবু মহাশয় এসেছেন, এবং আমার সঙ্গে কাল তাঁর দেখা হয়েছে।

আসছে শনিবারে বিকেলে তিনি আমার এখানে আসছেন। এই সুযোগে তোমাদের সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেব। সে কথাও তাঁকে বলে রেখেছি।

তুমি সিংহকে সঙ্গে করে সেদিন বেলা সাড়ে পাঁচটা ছটার সময় আমার এখানে এসো। তিনি সামনে হপ্তাতেই কলকেতা থেকে চলে যাবেন। সুতরাং এ-সুযোগ হারিয়ো না।

মাণিক ও সত্যেন্দ্রের সঙ্গে বহুকাল আমার সাক্ষাৎ নেই। মধ্যে মাণিক আমাকে লিখেছিলেন যে সত্যেন্দ্রের অসুখ। আশা করি, এতদিনে তিনি ভালো হয়ে উঠেছেন। আমার শরীর প্রায় তদবস্থাই আছে।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

এই পত্রে উল্লিখিত "সিংহ" ছিলেন সুসঙ্গ রাজবংশের কুমার সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ। এঁর নাম পূর্বেও পাই ওঁর তিনখানি চিঠিতে, ২০।১২।১৬, ৫।১।১৭ ও ২৫।১।১৭ তারিখে২।

১৯১৩ সালে এই পুরুষ-সিংহের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, ফ্রেঞ্চ ক্লাসে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ফরাসী ও জর্মন ভাষা শিক্ষা দেবার ক্লাস শুরু হয়েছে। ঐ দুই ভাষাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় বয়সের বাছ-বিচার দেখিনি। জর্মন ক্লাসে সত্যেন বোসের সহপাঠী অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। ফ্রেঞ্চ ক্লাসে আমার সহপাঠী অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু! অবশ্য বয়োবৃদ্ধের পাশে

১ দেশ, ১৮ বৈশাখ ১৩৬৬, পৃঃ ২৩।

২ দেশ, ১১ বৈশাখ ও ১৪ বৈশাখ ১৩৬৬।

উপন্যাস

বৃত্ত—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অপরা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। নিউ স্ক্রিপ্ট, কলিকাতা—২৯। তিন টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য শুধু প্রথম শ্রেণীর কবিই নন, একজন শক্তিমান ঔপন্যাসিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান সর্বজন স্বীকৃত। আলোচ্য উপন্যাস দুখানি তাঁর পরিণত প্রতিভার দুইটি অনবদ্য সৃষ্টি।

বৃত্তের রচনাকাল ১৯৪০ সাল। আর অপরা তাঁর হাল আমলের সর্বশেষ উপন্যাস। কিন্তু দুয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যেই একটা যোগসূত্র রয়েছে। একই সমস্যার ইঙ্গিত যেন দুখানি গ্রন্থই বহন করছে। যদিও তাদের পরিসমাপ্তি ভিন্নমুখী।

বিবাহিত প্রেমে অতৃপ্তি, নতুন প্রেমের আস্বাদ-গ্রহণে ঔৎসুক্য—একেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বৃত্তের কথা-শরীর। সত্যবান—মধ্যবয়স্ক অধ্যাপক—পনের বছর আগে সমাজের অনুমোদন অস্বীকার করেই বিয়ে করেছিল সতীকে। কিন্তু বিয়ের পর যখন সতী গার্হস্থ্য কর্মেই আত্মনিয়োগ করল, তখন যে উন্মুক্ত আবেগ হতে তাদের প্রেমের সঞ্চার হয়েছিল, তাই স্তিমিত হয়ে জড়, অভ্যস্ত গতানুগতিকতায় পরিণত হল। সুরমার সাথে তাই হল তার ক্ষণিক অন্তরঙ্গতা, আর তারপরেই তার জীবনে সঞ্চারিত হল তরুণী বনানীর উচ্ছল আবেগ। কিন্তু সার্থকতার আস্বাদন পেল না কিছুতেই সত্যবান। শেষ পর্যন্ত বিবাহের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবের শুভ সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সত্যবান জয় করল সতীর প্রতি তার বিমুখতা, বিভিন্ন নারীবলয়ের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে বৃত্তান্তরে পর্যটন করে একটি কেন্দ্রে সংহত হওয়ার মধ্যে ঘটল তার বৃত্তানুবর্তনের পরিসমাপ্তি।

অপরার কথা-শরীর তৈরী হয়েছে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া অধ্যাপিকা সুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করে। সুপ্রিয়া ভালোবেসেছে তার বন্ধু কুন্তলার দাদা নিরঞ্জনকে। অথচ বিবাহের মধ্যে এই প্রেমকে বাঁধতে পারল না সুপ্রিয়া, কারণ বিবাহ—সে তো বন্ধন। "মুক্তি ছাড়া কোথায় সত্য আছে? ভালোবাসা যদি তোমাকে মুক্ত না করে তা নিয়ে তুমি কি করবে?"—এই হল সুপ্রিয়ার প্রত্যয়। সুপ্রিয়ার স্বতস্ফূর্ত লীলাচঞ্চলতা ও নিশ্চিন্ত দুঃসাহসিকতার বিচ্ছুরণ স্বভাবতই বৃত্তের বনানীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু যেখানে বনানীর বিশ্বাসের মূলে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মানসসাম্যে নিহিত নয়, সুপ্রিয়ার পরিণতি সেই গভীর মানসসাম্যের মধ্যেই ঘটানো হয়েছে।
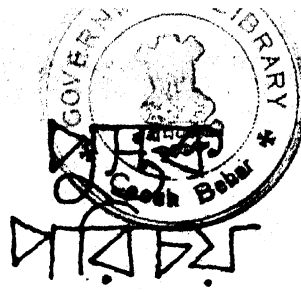
দুইটি উপন্যাসই সমস্যামূলক, চরিত্রগুলোও তাই এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট, বিকাশ লাভ করেছে। তীক্ষ্ম মননশক্তি ও নিপুণ বিশ্লেষণের ফলে চরিত্রগুলো যেমন সজীব হয়ে উঠেছে, কাহিনীও তেমনি হয়েছে এক দুর্লভ ও অনবদ্য সৃষ্টি। বৃত্তে যে আঙ্গিকের ব্যবহার লেখক করেছেন—দুই ঘণ্টার স্মৃতি পর্যালোচনার চতুর্দিকে সমস্ত জীবনাভিজ্ঞতার কাহিনীর বিন্যাস—তা দুরূহ হলেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সার্থক পরীক্ষা। দুখানি বই-ই পাঠকসমাজকে নতুনত্বের আস্বাদন দেবে।

৫৪।৫৯ ৫৫।৫৯

চন্দন-যাত্রা—সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—অভিজিৎ প্রকাশনী, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে নতুন লিখিয়ে বহু। কিন্তু সাহিত্যপদবাচ্য সৃষ্টির সংখ্যা খুবই অল্প। উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হয় কাহিনী দুর্বল কিন্তু আড়ম্বর প্রচুর, না হয় প্রকাশের অক্ষমতায় বিষয়-বস্তুর ব্যর্থতা।

এই একঘেয়েমির হাটে চন্দন-যাত্রা উপন্যাসটি সার্থক ব্যতিক্রম। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত, তবু তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে অকুণ্ঠচিত্তে সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

উপন্যাসের নায়ক প্রশান্ত আধুনিক ও সংস্কারমুক্ত। তিনি পোশাকী-আধুনিক নন, চরিত্রে ও বীর্যে আধুনিক। নায়িকা অর্পার কুমারী জীবনের ভুলকে ঘৃণার চোখে না দেখে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন অসীম মমতায়, এবং কুমারী জীবনের পুত্রকে পিতৃপরিচয় দিয়ে সার্থক আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখকের এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার্হ। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কেতকী ও প্রসাদ সার্থক। ত্রুটির মধ্যে ভবানীরঞ্জন শেষের দিকে হঠাৎ ভবানীপ্রসাদ হয়ে পড়েছেন, আর

ছাপার ভুলেই বোধ করি 'ভুল'গুলো ক্রমাগত শুদ্ধ হয়ে গেছে। পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই কাঁটাগুলো উপড়ে ফেলবেন আশা করি।
১৫৮।৫৯

মুক্তবিহঙ্গিনীর কাব্য—রবি গুহ মজুমদার। জ্যাক পাবলিশার্স, ১।১।১ হাজরা রোড, কলিকাতা—২৬। দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি হাস্যরস-প্রধান উপন্যাস। নায়িকা রিনী ভালোবাসতো তার বন্ধুর দাদা সুশান্তকে। কিন্তু চলার পথে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই তাদের পরিবারের পরিচয় হল খজুর সাথে, আর খজু ভালোবাসলো রিনীকে। এদিকে আবার রিনীর বাবা তার বিয়ে ঠিক করে বসলেন সুশান্তর বন্ধু হরিপদর সাথে। এই বিভ্রাটকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই মিলনান্তক উপন্যাসখানির কাহিনী।

বইখানির সর্বত্র এক অসংবরণীয় হাস্যোচ্ছ্বাসের সুর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতে লেখকের জীবনের প্রতি একটা সামগ্রিক ব্যাপক দৃষ্টির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে বিভিন্ন উত্তেজনাপূর্ণ অথচ হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে এক প্রকারের লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন মাত্র। তবে এরি মাঝে একমাত্র খজুর চরিত্রই লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে। কারণ, এই চরিত্রটি অংকনে তিনি যে সার্থককাম হয়েছেন সেই কথা অনস্বীকার্য। খজুর রসিকতাকে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের সাথে নিগূঢ় সম্পর্কে সম্পর্কিত করে, তার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য ও সুপরিণতির বহির্বিকাশ রূপে চিত্রিত করে তিনি বইখানিকে পাঠকের যথার্থ উপভোগ্য করে তুলেছেন।
১৩৪।৫৯

কৈশোরক—ডাঃ মতিলাল দাস। প্রকাশক—আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলি-৩৩। দাম—তিন টাকা।

'জীবনের অপরাহ্ন বেলায়' দাঁড়িয়ে কিশোর জীবনের কথারম্ভ বাংলা উপন্যাসে নতুন নয়। লেখক পুরনো চালে পুরনো কথা বলেছেন। কাহিনী সরস হতে পারত হয়তো, কিন্তু লেখক গল্প বলার চেয়ে তত্ত্বকথা শোনাতে উদ্যোগী বেশি। ফলে কেবলি রসভঙ্গ ঘটেছে। উদাহরণ দিই একটা। কিশোর নায়ক অজিত মরে[illegible] পড়েছে, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মশাই খালি হা[illegible] অবসর নিচ্ছেন। ব্যস, আর যায় কোথায়, লেখক শুরু করলেন বক্তৃতা: 'সংসারে ধ[illegible] বৈষম্য কেন? আমাদের নিকট তাহার সহজ উত্তর, পূর্বজন্মের কর্মফল। যে জন্ম দেখি নাই, তাহার স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া নিরুদ্বেগ জীবনযাপন করিতে পারা সহজ; কিন্তু সর্বত্র মানুষ ইহা মানে নাই।' এইভাবে চলল দীর্ঘ মন্তব্য এবং লেখক কিছু-না-কিছু খাঁটি কথা বলার সুযোগ কোথাও ছাড়েননি।

কথা-সাহিত্যে কথা-না-বলে কথা-বলার আর্ট লেখক বিশেষ রপ্ত করতে পারেন নি।
৫৭২।৫৮

পরগাছা—রমেশ মজুমদার। অনুপমা প্রকাশনী, ২ জগবন্ধু মোদক রোড, কলিকাতা। আড়াই টাকা।

গতানুগতিক উপন্যাস। রোমান্স, প্রেম, বিরহ, মিলন, ফ্লার্টিং, অবৈধ যৌন মিলন, তার পরিণাম ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় ও সমস্যা ভিড় করে এসেছে বইখানিতে, আর তারই ফলে কাহিনী পায়নি দানা বাঁধবার সুযোগ বা অবসর। একই কারণে চরিত্রগুলোও মনে দাগ কাটতে পারে না। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট ভালো।
৫৩৯।৫৮

শ্বেতবাহু—রাইমোহন সাহা। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। চার টাকা।

কিশোর স্বর্ণকমলকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার পদ্মা-পাড়ে ফেলে আসা একটি গ্রাম, ভেঙে যাওয়া একটি পল্লীসমাজের ছবি—যে ছবি আজ থেকে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার—এঁকেছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসখানিতে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্বর্ণকমলের কঠোর জীবন সংগ্রাম, তার জয়-পরাজয়, তার আশা আকাঙ্ক্ষা—এই বইখানির বিষয়বস্তু। বইখানি এই খণ্ডেই শেষ হয়নি, এ শুধু কৈশোর পর্ব।

লেখকের ভাষা স্বচ্ছন্দ, লেখায় দরদও রয়েছে যথেষ্ট। তবু এ-কথা অনস্বীকার্য, কাহিনীর দিক থেকে উপন্যাসখানি দানা বেঁধে উঠবার সুযোগ পায়নি বিশ্লেষণশক্তির অভাবে। ভবিষ্যৎ কালের রচনায় এ ত্রুটি লেখক কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন, আমরা এই আশাই করবো।
৫৫৫।৫৮

অন্তর্মনা—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলি-৬। দাম—দু টাকা।

দরিদ্র শিক্ষক পরিবারের কাহিনী। মা, বাবা, ছোড়দি আর অনিন্দ্য। এই বালক অনিন্দ্যের চৈতন্য গড়ে উঠছে সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে। একমাত্র ছোড়দি ছাড়া সংসারের আর কারুর সঙ্গেই যেন তার কোনো আন্তরিক যোগ নেই। দারিদ্র্যের পীড়ন ছাড়াও তার চোখে ধরা পড়েছে বাপের কাপুরুষতা, মায়ের সংকীর্ণতা। এই অবক্ষয়ের পাশাপাশি আরও কতকগুলো ছবি অনিন্দ্যের মানস-

পটে ছাপ রেখে যাচ্ছে, যাদের প্রকৃত তাৎপর্য সে বুঝতে পারছে না অথচ তাদের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করছে। সে ছবিগুলো সংগ্রামের। স্কুলে স্ট্রাইক, পথে মিছিল, ময়দানে জনসভা। মানুষ তাহলে শুধু তিলে-তিলে মরছে না, মেরুদণ্ড টান করেও দাঁড়াচ্ছে। বালক অনিন্দ্য এত বোঝে না, তবু মিছিলের পদধ্বনির তালে-তালে তার সত্তা দুলে উঠছে।

মাত্র সওয়া শ' পৃষ্ঠার উপন্যাস। আয়তনে ছোট হলেও লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়েছে আঙ্গিকে নূতনত্ব আনার প্রচেষ্টায় এবং বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়। ভাবাবেগের চেয়ে লেখক মননশীলতার আশ্রয় নিয়েছেন বেশি। ভবিষ্যতে এই দুইয়েরই সমন্বয় ঘটবে তাঁর লেখায়, এই আশা নিয়েই লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩৭০।৫৮

ছোট গল্প

পূর্বতনী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গ্রন্থপীঠ, ১৪৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কজন খ্যাতিমান লেখক রয়েছেন, যাঁদের লেখায় চিন্তবৃত্তির সাথে হৃদয়বৃত্তির দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মশাই তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর একখানি সম্প্রতিক ছোটগল্প সংকলন।

নরেনবাবুর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল তিনি সামান্যকেও ভাবকল্পনায় অসামান্যের মর্যাদা দিতে পারেন। অতি তুচ্ছ বিষয়কেও রসসমৃদ্ধ করে কাহিনী গড়ে তুলতে তাঁর সমকক্ষ খুব অল্পই রয়েছেন। আর তাঁর এই বৈশিষ্ট্যেরই ছাপ রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি গল্পে। পার্কে রোজ দেখা মেয়েটির হঠাৎ আর বেড়াতে না আসা 'যৎসামান্য' ব্যাপার হতে পারে, বিজয়দার 'সিগারেট' খাওয়া ছেড়ে দেওয়া নিম্নবিত্ত পরিবারের নিতান্তই একটা স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে, কনে দেখতে গিয়ে 'অপছন্দ' হওয়া বা সেখানে বিয়ে না হওয়া এ তো বাঙ্গালী সমাজে হামেশাই ঘটছে- অথচ এ সব ক্ষুদ্র ঘটনাকেই ভিত্তি করে যে সব কাহিনী লেখক গড়ে তুলেছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের ছোটখাট সমস্যা ও হৃদয়-সংঘাতের যে মনোজ্ঞ ও বাস্তবানুগ ছবি তিনি এঁকেছেন তা তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। সমস্ত বইটিতে যে একটি করুণ মধুর সুর ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তা পাঠকমনকেও দোলা দেবে, আমরা এ আশা রাখি।

১০১।৫৯

মন-ময়ূরীর নাচ—কন্দর্পকান্তি মুখোপাধ্যায়। আর্ট এন্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা—১২। দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের প্রথম গল্প সংগ্রহ।

বিষয়বস্তুর ও পটভূমির বৈচিত্র্যে বইখানি সমৃদ্ধ। এর নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে বাংলাদেশের শহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ নীলাদ্রি, দ্যুতিলেখা, শশবিন্দু, কুন্তলা, শীলা, সুমনার দল, তেমনি আবার রয়েছে পাহাড়ী পরিবেশে চিলড্রেনস-হোমের জুনিয়ার টিচিং স্টাফের সদস্যা এলিজাবেথ, সুদূর কোরিয়ার যুদ্ধের পটভূমিকায় মোটর ড্রাইভার কুইলামও। কিন্তু সবগুলো গল্পকেই যা একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে তা হচ্ছে একটি সংবেদনশীল মনের ছোঁয়া, অন্তর সত্যের স্বচ্ছতায় অবগাহন করে একটি সূক্ষ্ম ভাবলোকের স্পন্দনে প্রত্যেকটি কাহিনীই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। 'উৎসর্গ' প্রভৃতি গল্পে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে সত্য, কিন্তু কল্পনার গাঢ় বর্ণ-প্রলেপে তা-ও এক নিগূঢ় প্রণয়লীলার দ্যোতনারূপেই ফুটে উঠেছে, শুধুমাত্র অনুকৃতিতেই পর্যবসিত হয় নি।

৮৪।৫০

গীতিকবিতা

সুধাঞ্জলি—ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—হরিকৃষ্ণ মন্দির, গণেশ খিন্দ রোড, পুণা-৫। দাম—৩॥০।

শ্রীরায়ের কন্যাশিষ্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ভাবাবেশে ভক্তিরসাপ্লুত লিখেছেন এই হিন্দী ভজনগুলি। দু'একটি গান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের হিন্দী অনুবাদ আছে। ভূমিকা ছাড়াও কতকগুলি গানের ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিয়েছেন দিলীপকুমার। ইন্দিরা দেবীর গানগুলি মীরা-ভাবে আপ্লুত। ভক্তজনের গানগুলি ভালো লাগবে নিঃসংশয়ে, যদিও তীক্ষ্ণ মৌলিকতার স্বাক্ষর বিশেষ কোথাও নেই। শ্রীরায়ের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে মূল হিন্দী গানের চেয়ে অধিকতর উৎকর্ষের দাবি রাখে। একটা নমুনা দেওয়া গেল :

হিন্দী : লাখোঁহী রংগোমেঁ দেখেঁ প্রভুজী
তেরী ছায়া।
পর হো চাঁদ নদীমেঁ জ্যায়সে—হাথ কভী
না আয়া।
কিঁউ কহতা দিল—তু চিরসাথী, তু হায়
হৃদয়বিহারী!
প্রভুজী, দেখেঁ বাট তিহারী॥

ইংরিজী :

In myriad forms I see thy shadow
vast,
But elusive like the moonbeams in
rills glassed.
When wilt thou be mine own, Love,
first and last ?

এটা না বেছেই তুলে দেওয়া হল। খুঁজে-পেতে বাচাই করে দিলে আরও অনেক এই ধরনের সার্থক নমুনা দেওয়া যেত। যাই হোক, বইটির সুপ্রচার কামনা করি।

১৮১।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

মোদের বিশ্ব—অময় নন্দী।

গোস্বামী তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস ৩য় খণ্ড।

পারের কড়ি—(ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর পত্রাবলী) ১ম ও ২য় খণ্ড।

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ (পঞ্চাঙ্ক নাটক)—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

"শ্রীশ্রীভগবান" (ভাগবতের অনুবাদ)—শ্রীরাধারাণী দেবী।

দুই কাননের পাখি—সন্তোষকুমার ঘোষ।

ঊনবিংশ শতকের গীতি-কবিতা সংকলন—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারা—আদিত্য ওহদেদার।

অভিষেক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

নীল আকাশ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

শরৎচন্দ্র সঙ্গে—অমমল্ল মুখোপাধ্যায়।

সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

Songs of Love—Sri Kumud Bandhu.

Yogiraj Brahmachari Kuladananda—Brahmachari Gangananda.

An Agricultural Plan for India.

চন্দ্রশেখর

পাঠকের চোখে 'অপুর সংসার'

[রঙ্গজগৎ-এ 'অপুর সংসার' ছবিটির সমালোচনা, সেই সমালোচনা সম্পর্কে সত্যজিৎবাবুর বক্তব্য, আমাদের তরফে তার জবাব—এ-সব একে একে বেরিয়েছে। আলোচনা বিস্তর হয়েছে। তবু বুঝি পাঠকরা অতৃপ্ত; তাঁরা প্রতি ডাকে মোটা মোটা চিঠি পাঠাচ্ছেন (একটি চিঠি এর আগে প্রকাশ করা হয়েছে)। সবই অতি যত্নসহকারে লেখা। সত্যজিৎবাবুর ছবি দর্শক কতখানি সজাগ মন নিয়ে দেখেন, চিঠিগুলি তার প্রমাণ। আর চিত্র পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎবাবুর কাছে দেশের দাবি অনেক বলেই বুঝি 'দেশ'-এর পাঠকরা 'অপুর সংসার' সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব কিছু বক্তব্য না পাঠিয়ে পারেননি। এ-পর্যন্ত যত চিঠি আমরা পেয়েছি তাদের প্রতিনিধিমূলক কয়েকটির সারাংশ নীচে দেওয়া হল। এর পর এই প্রসঙ্গের জের আর টানা হবে না।]

রমেন্দ্রকুমার ঘোষ (মাখলা গ্রাম, হুগলী) : লেখকের আঙ্গিক এবং চিত্র-পরিচালকের আঙ্গিকে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েও বলা যায় যে, যে-ক্ষেত্রে পরিচালকের কল্পনা উপন্যাসভিত্তিক সেখানে এমন কিছুই তাঁর ধরে নেওয়া চলে না যা সেই উপন্যাসের মূল সুর অথবা বক্তব্যের বিরোধী। আর যদি পরিচালক বোঝেন, কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কল্পনা তাঁর নিজস্ব কল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে অত্যন্ত পরিমিত, তবে তাঁর উচিত ছবির উপযোগী কোন নূতন কাহিনী রচনা করে নেওয়া।

বর্তমানে আমরা যে পরাজয়, ভাঙন এবং অবক্ষয়ের টানে নীচে নেমে চলেছি, আমাদের দেহ-মনের চার পাশে যে-হতাশার পরিমণ্ডল রচিত হয়ে চলেছে, 'অপুর সংসার' ছবিতে তারই একটি রূপের প্রতিফলন লক্ষ্য করে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, ছবির সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছি। কিন্তু উপন্যাসের অপুর, লাভ-ক্ষতি-টানাটানির ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু অতিক্রম করবার যে-প্রয়াস আমাদের মনকে মহৎ আনন্দের বার্তা জানায়, যা আমাদের চিত্ত পবিত্র বেদনার রসে অভিষিক্ত করে, ছবিতে কোথায় সেই অনুভূতির আভাস?

পার্থ সেন (কলিকাতা) : 'অপুর সংসার' সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকার সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে সত্যজিৎবাবু বলেছেন, তাঁর মতে ছবির অপু ও উপন্যাসের অপুর মূলগত কোন প্রভেদ নেই। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাস থেকে আমি এখানে একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি। এক জায়গায় অপর্ণার চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ লিখেছেন : "...স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম যে সব শুনিয়াছে। সে-সব অপু বলে নাই, সে-সব বলিয়াছে প্রণব। বরং অপু নিজের অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল।...নিজে কলেজ হোস্টেলে ছিল এ-কথাও বলিয়াছে। বুদ্ধিমতী অপর্ণা স্বামীকে চিনিতে বাকী নাই, কিন্তু স্বামীর কথা যে সে সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাবটা একদিনও দেখায় নাই।" অপর্ণার এই গভীর অনুভূতির দিকটা এবং অপু-চরিত্রের এই ছেলেমানুষি ও বৈচিত্র্য কি ছবিতে ফুটেছে?

*

অভিজাত সেন (শালিখা) : সত্যজিৎবাবু বিভূতিভূষণ-কল্পিত অপু চরিত্রের সরলতাটুকু সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে ছবিটিকে সকল বিশ্ববাসীর উপযোগী করবার চেষ্টা করেছেন। এর আবেদন সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্যই মূল কাহিনীর কিছু পরিবর্তন করা দরকার হয়েছে।

*

খগেন দাস (কলিকাতা) : মূল কাহিনীর সঙ্গে চলচ্চিত্রের ঘটনাবলীর মিল থাকতেই হবে, এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রের সংগতি থাকা প্রয়োজন এ-কথা আমি বিশ্বাস করি। তাই অপর্ণার

বি পি ফিল্মসের মুক্তি প্রতীক্ষিত 'মাহুত বন্ধু রে' ছবির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকৃতীশ বড়ুয়াকে দেখা যাবে

মৃত্যু সংবাদে অপুর মারমুখী ব্যবহার আমি সহজভাবে নিতে পারিনি। অপুর শোকের তীব্রতা দেখাতে গিয়ে পরিচালক রায় বুঝি স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে দেখেননি। 'অপরাজিত' চিত্রের অপু জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু জয়ী। 'অপুর সংসার'-এ এই জীবন সংগ্রামের অনুপস্থিতি বড়ই বেদনাদায়ক। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর কাছে তার স্মৃতি আরও সুন্দর আরও মধুর হয়ে উঠতে পারত যদি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির সহজ সফল পরিণতি ঘটত। এক কথায়, ছবিটি কাব্যময় হয়েছে, বাস্তবানুগ হতে পারেনি। 'অপরাজিত'তে কাব্য ও কঠোর বাস্তবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে—'অপুর সংসার'-এ এই সমন্বয়ের অভাব।

*

কিশলয় সেনগুপ্ত (কলিকাতা) : 'অপুর সংসার'-এ কাজলের পাখি-মারা সম্পর্কে 'দেশ'-এর সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর চিঠিতে বলেছেন, 'অপুর মনোবৃত্তি যে পিতৃমাতৃহীন কাজলের ক্ষেত্রে আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য, সে-কথা বলাই বাহুল্য।' আমার মনে হয়, এ-রকম যুক্তি অঙ্ক শাস্ত্রে চলে, মানব-মনস্তত্ত্বে নয়। ছবিটিতে কয়েকটি ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে।

ওম্‌ চিত্রমের পৌরাণিক ছবি "নিমাই"-এর একটি দৃশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীর রূপসজ্জায় যথাক্রমে নবাগতা শ্যামলী মজুমদার ও অনুরাধা গুহ

যেমন, অপুর শ্বশুরবাড়ির দেশের লোকেদের কথাবার্তায় বোঝা যায় না যে, তারা খুলনার অধিবাসী। সাধারণত, কনের পাড়াপড়শী বা সখীরাই বিয়ের দিন তাকে সাজায়। ছবিতে দেখা গেল, অপর্ণার মা বিয়ের দিন মেয়েকে সাজাচ্ছেন। কেন? বিয়ের পর অপুর সঙ্গে অপর্ণা যখন কলকাতার বাসায় আসে, তখন দেখা যায় অপর্ণার মুখচোখ এমন কি চন্দনের ফোঁটারও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। বিয়ের রাতের মতই তার সাজ। নৌকা এবং ট্রেন-ভ্রমণ সত্ত্বেও বেশ কয়েক ঘণ্টা আগের ঐ রূপসজ্জা কি অম্লান থাকে?

*

সত্যব্রত চক্রবর্তী (আগরতলা) : 'পথের পাঁচালী' দেখে যে স্বর্গীয় আনন্দ পেয়েছিলাম, 'অপুর সংসার'-এ তা পেলাম না। একটি উৎকৃষ্ট ছবি যে-সব গুণে হতে পারে এতে তার কোনটিরই হয়ত অভাব নেই। তবু প্রাণের আবেদনের দিক থেকে ছবিটিকে কেমন যেন রিক্ত মনে হয়।

*

শৈলেন সেন (কলিকাতা) : 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'অপুর সংসার' ছবির সমালোচনার উত্তরে সত্যজিৎ রায়ের চিঠিতে যে-অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা আমরা আশা করিনি। সত্যজিৎবাবু কি এটুকু উপলব্ধি করেন না যে, 'অপুর সংসার'কে কেন্দ্র করে এত যে কথা সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু তাঁর ছবি বলেই?

*

সুধীররঞ্জন দত্ত (কলিকাতা) : 'অপুর সংসার'-এ কাজলের নিষ্ঠুরতা আমার ভালো লাগে নি। সত্যজিৎবাবু তাঁর চিঠিতে বলেছেন, 'নিষ্ঠুরতা একটি স্বাভাবিক শৈশব প্রবৃত্তি।' কিন্তু সেই প্রবৃত্তির অমন স্থূল প্রকাশ কি অনিবার্য ছিল? সত্যজিৎবাবুর চিঠিখানি আমাকে বেদনা দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পত্রটি তাঁর রচিত নয়। তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, তিনি যেন চিঠিখানি অন্যের লিখিত এই কথা জানিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করেন।

*

সুবোধ রায় (কলিকাতা) : সত্যজিৎ রায়ের অনন্যসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই। তবু কোন চিত্রপরিচালকের প্রতি ছবি নিখুঁত, নির্ভুল হবে এমন কোন কথা নেই। দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে, এই সত্য মেনে নেবার মতো ঔদার্যবোধ সত্যজিৎবাবুর নেই। ব্যক্তিগতভাবে 'অপুর সংসার' আমার প্রত্যাশা মেটাতে পারে নি।

সত্যজিৎবাবুর এর আগের সব কটি ছবির মতো এখানেও সেই বর্ষণমুখর আকাশ আর বৃষ্টি প্লাবিত পথঘাট। কাহিনীর পক্ষে অল্প-প্রয়োজনীয় কতকগুলি detail তুলে ধরার সেই আগ্রহ। এ-সব খুবই ভালো লেগেছিল একদিন। আজও হয়ত লাগে। তবু আজকের ভালো-লাগার মধ্যে বুঝি একটা সংশয়ও লুকিয়ে থাকে। অফিস-ঘরে অপু যখন কর্মরত, সেই দৃশ্যে বাতায়ন পথ দিয়ে দেখা যায় হাতে আঁকা সিনের পশ্চাৎপট। সত্যজিৎবাবুর ছবিতে এ-জিনিস আমরা আশা করতে অনভ্যস্ত।

*

বিভূতি চৌধুরী ও বিজন নাগ (কলিকাতা) : সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলচ্চিত্র বিচার করা সংগত নয় বলেই আমাদের মনে হয়। উপন্যাসাবলম্বী চিত্রের অবশ্যই ভাব ও রসের দিক থেকে উপন্যাসকে মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। এবং আমাদের মনে হয়, 'অপুর সংসার'-এর ক্ষেত্রে তার অন্যথা হয় নি। তবে ছবি দেখবার সময়, সাহিত্যিক চিন্তা বর্জন করতে না পারলে রসোপলব্ধিতে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়।

*

চন্দ্রনাথ ঘোষ (গড়িয়া) : আগাগোড়া ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যজিৎবাবু লিখেছেন, অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর রিক্ততা, রুক্ষতা ও cynicism বিভূতিভূষণের বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই যুক্তি বিভূতিভূষণকে উপলব্ধি না করার নিদর্শন হিসাবে মনে করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ অপর্ণার মৃত্যুতে, অনুভূতিশীল মনের অধিকারী অপু শোকগ্রস্ত ও বৈরাগী হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু cynic হয়ে ওঠে নি। কখনও না। অপুর cynic রূপ লেখক কল্পনা করেন নি—রিক্ততা ও রুক্ষতা তো অনেক দূরের কথা!

'দেশ'-সমালোচকের সাহিত্যবোধের উপর সত্যজিৎবাবুর যদি আস্থা না থাকে, তবে এ-বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা কি বলেন তাঁদের মত তিনি জানতেন। তাই তাঁকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র ৬৩২ পৃষ্ঠা দেখতে অনুরোধ করি। সেখানে অপু ও অপর্ণার প্রেম বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*

অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা) : 'অপুর সংসার'-এর কাব্যময় রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তবু এর দু-একটি ত্রুটি বেদনাদায়ক। যেমন মুরারিকে অপুর ঘুষিমারা। এ-দৃশ্য অসহনীয়। অপর্ণাকে বিয়ে করতে সম্মত হওয়ার আগে অপুর মনের ভাবনাকেও সত্যজিৎবাবু সুষ্ঠু রূপ দিতে পারেন নি। অপু এই বিয়েতে রাজী হল কি কেবল বন্ধুর অনুরোধে, অথবা বাহাদুরি নেবার চেষ্টায়? লেখক এই প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দিয়েছেন : "... ভাবিবার সময় কোথায়! পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ভদ্রলোক দুটি তার হাত ধরিয়াছেন—তাহাও সে ঠেলিয়া দিতে পারিত। কিন্তু মেয়েটিও যেন শান্ত ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আহ্বানে ছাদের উপর যেমন তাহার পানে চাহিয়াছিল—তেমনি

অপরূপ স্নিগ্ধ চাহনিতে...নির্বাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে...।" এই লাইনগুলির প্রতি পরিচালক সুবিচার করতে পারতেন।

*

অমিতাভ দাশগুপ্ত (আগরপাড়া) : সত্যজিৎবাবু তাঁর চিঠিতে বলেছেন যে উপন্যাসের অপু ও ছবির অপুর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই। বিচারে এ-যুক্তি টেঁকে না। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপুর নৈরাশ্যবোধ ও বৈরাগ্যভাবের সমর্থনে শ্রীরায় একটি উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন : কলিকাতা আর ভালো লাগে না; কিছুতেই না...ইত্যাদি। লক্ষ্য করবার বিষয়, এর অব্যবহিত পূর্বে লীলার বিবাহ-সংবাদ শুনে "জগৎটা যেন অপুর একেবারে নির্জন, সংগীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন" বলে মনে হয়েছিল। তবে অপু কি শুধুই অপর্ণাকে হারানোর দুঃখটুকু নিয়ে বেঁচেছিল বছরের পর বছর?

*

দীপকরঞ্জন মাইতি (শিবপুর) : সত্যজিৎবাবু তাঁর চিত্রনাট্যের সমর্থনে 'অপরাজিত' থেকে যে-সব উদ্ধৃতি উপস্থিত করেছেন, তাতে শুধু অপু-চরিত্রের সাময়িক অবসাদ ও দুর্বলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরিচালক রায় অপুর মানসিকতার এই খণ্ড-চিত্রকে কেমন করে চরিত্রটির সম্পূর্ণ চিত্র বলে ভাবতে পারলেন সে-কথা আমরা বুঝতে অক্ষম। সত্যি বলতে, মুরারিকে শিক্ষক হয়ে ঘুষি মারার পর থেকে ছবির শেষ পর্যন্ত অপু-চরিত্র একটি বিরাট অসংগতি নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হয়েছে।

*

মনজিৎ বৈরাগী (কলিকাতা) : 'দেশ'-এর গত কয়েক সংখ্যায় 'অপুর সংসার' নিয়ে বেশ কিছু লেখালিখি চলছে—বাইরেও আলোচনা শুনেছি অনেক রকম। এতে মনে হয়, আমাদের রুচিটাই বদলাচ্ছে।

এ-ছবি আমার সাত বছরের ছেলে দেখেছে। দেখে সে যেভাবে ছবির গল্পটি আমাকে শুনিয়েছে, তাতে বুঝেছি 'অপুর সংসার' তার কতখানি ভালো লেগেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একটি অশিক্ষিত চাকরের কথা, যে ছুটি নিয়ে 'অপুর ছবি' দেখতে গিয়েছিল। দেখে এসে সে বলেছে, 'আহা বউটা যদি না মরত, তবে অত দুঃখু হত না।' এই সঙ্গে ভাবছি ছবিটি সম্পর্কে এক শিক্ষিত বাঙালী বড়লোকের মন্তব্যটি : 'এই বোধ হয় প্রথম ছবিতে সত্যকার মানুষের প্রেম দেখলাম। আর যা দেখি, সে-সব রঙ-চঙে নকল প্রেম।'

যে-ছবি শিশুকে আনন্দ দেয়, অশিক্ষিত জনের মনে বেদনার সঞ্চার করে, শিক্ষিত বাঙালির হৃদয় স্পর্শ করে সে-ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তর্কের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। শিল্প যত উন্নত হয়, ততই শিল্পী তার মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে—সকলের কাছে।

কিছুকাল আগে ইওরোপ পরিভ্রমণের সময় আমি দেখেছি সত্যজিৎবাবুর সম্মান সেখানে কতখানি। ছবির যে-ভাষা তিনি খুঁজে পেয়েছেন তা-ই বিশ্বের দরবারে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে—সেইজন্যই তাঁর প্রতিভার এই স্বীকৃতি।

সত্যজিৎবাবুর ছবি সমালোচনা করবার সময় আমাদের এই কথা মনে রাখা দরকার।

সুখের কথা, 'দেশ'-এর সমালোচক 'অপুর সংসার'কে বিশিষ্ট চিত্র হিসাবেই আর পাঁচটি ছবির চেয়ে পৃথকভাবে বিচার করেছেন। সমালোচক বলেছেন, 'অপুর সংসার' ভাবে, রসে ও আঙ্গিকে একটি অনুপম চিত্রসৃষ্টি। শুধু তাঁর সমালোচনার বিষয়, উপন্যাসের অপুর সংগে ছবির অপুর চরিত্রগত বৈসাদৃশ্য। আমার মতে চিত্র-সমালোচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গ না এলেই ভালো হত।

তবে এ-কথা সত্য যে, সত্যজিৎবাবু স্বয়ং যে-চিঠি দিয়েছেন তাও সমর্থনযোগ্য নয়। শিল্পীকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। সমালোচকের বিরুদ্ধে যে কঠিন মন্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন, তা না করলেই আমরা খুশি হতাম। কারণ চিঠির মধ্যে তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন, যে কোন ছবি সম্বন্ধে স্বাধীন মত (ভালো বা মন্দ) ব্যক্ত করার অধিকার সমালোচকের আছে।

আমার অনুরোধ, এই প্রসঙ্গ নিয়ে যেন আর তিক্ততা বাড়ান না হয়। আমরা সকলেই চাই সত্যজিৎবাবু আরও সুন্দর ছবি করুন, বিশ্বের দরবারে তিনি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হোন। শিল্পের মধ্য দিয়ে, তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে, বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হোক।

"জগজঙ্গল" সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,—"জঙ্গজঙ্গল" নামে আমার একটি উপন্যাস আছে। "জগজঙ্গল" ছবির সংগে সে-কাহিনীর মিল নেই—সেটা আপনাদের অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়েছে। অনুরোধ সত্ত্বেও চিত্রনাট্যের এক বর্ণও আমায় দেখতে দেওয়া হয়নি। ছবি সর্বপ্রথম দেখলাম ৫ই মে তারিখে—সেন্সর হয়ে যাবার পর, মুক্তির দশ দিন আগে। চরিত্রগুলোর নাম এবং কয়েকটা খুচরো ঘটনা ছাড়া সবই আমার কাছে নতুন।

প্রশ্ন—(১) গল্পের আগা-পাস্তলা পালটে সমস্ত যদি নতুন করে বানাতে হয়, অর্থমূল্যে সে গল্পের চিত্রস্বত্ব কেনার কি প্রয়োজন? (২) চুক্তির মধ্যে থাকে, প্রয়োজন মতো গল্পের পরিবর্তন করা চলবে। পরিবর্তন কতদূর অবধি চলা উচিত? আদ্যন্ত যদি বদলাতে হয়, গল্পের নাম এবং লেখকের নামই বা কেন বদলাবে না?—মনোজ বসু, কলিকাতা।

চিত্রালোচনা

এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে মোট দু'খানি ছবি। একটি বাংলা, অপরটি হিন্দী।

বি পি. ফিল্মস-এর পতাকাতলে নির্মিত "মাহুত বন্ধু রে" এ হপ্তার একমাত্র বাংলা ছবি। স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার পুত্র অলোকেশ বড়ুয়া রচিত দুটি মধুর প্রণয়োপাখ্যানের ভিত্তিতে ছবিখানি তৈরী। আসামের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছবিটিকে সুন্দর আঙ্গিক সুষমায় মণ্ডিত করেছে। ছবির মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন প্রিয়ম হাজারিকা, দিলীপ রায়, মানসী সোম, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি। স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকৃতীশ বড়ুয়াও এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। লোক-সংগীত ও নৃত্যের সম্ভার এ-ছবির বিশেষ আকর্ষণ। ভূপেন হাজারিকা ছবিখানির পরিচালক ও প্রযোজক। তাঁরই সংগীত পরিচালনায় ছবিখানি বিশেষ সাংগীতিক আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে।

প্রকাশ পিকচার্সের "[illegible]" বর্তমান সপ্তাহের একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি। পিতামাতার সংরক্ষণে এক কিশোরের জীবন কেমন করে মহত্ত্বের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তারই এক মর্মস্পর্শী কাহিনী উদ্ঘাটিত হয়েছে ছবিতে। হরসুখ ভট্ট পরিচালিত এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করেছেন সুলোচনা, ললিতা পাওয়ার, কানাইয়ালাল, [illegible] প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্রগুপ্ত।

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এশিয়ান ফিল্মস-এর 'গলি থেকে রাজপথ'। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর স্বচ্ছ আলোকসম্পাতে এ-ছবির কাহিনী বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ছবির প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী। অন্য কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, অনুপকুমার প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দকে। হিন্দী জনপ্রিয় শিল্পী হেলেন এ-ছবির একটি চরিত্রের রূপদান করেছেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছবির পরিচালক; সংগীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাসগুপ্ত।

অশোক চিত্রের "পুষ্পধনু" অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করছে। প্রবোধকুমার সান্যালের এই বহুপঠিত উপন্যাসের চিত্ররূপ পরিচালনা করেছেন সুশীল মজুমদার। ছবির শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। পার্শ্বচরিত্রে আছেন অমর মল্লিক, বীরেন চ্যাটার্জী,

উত্তেজনা, রহস্য ও রোমাঞ্চে এ-ছবি ভরপুর। পাপ-পরিবেশেই এ-ছবির রস নিহিত।

ইন্দ্র পরিচালিত "মিস্টার জন" ছবিতেও হিন্দী ছবির আলোচ্য ফরমুলো নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হয়েছে। এ-ছবির নায়ক কৌতুকাভিনেতার জনি ওয়াকার। শ্রেষ্ঠ কৌতুকাভিনয়ের মানদণ্ড তাঁর অভিনয়ে খুঁজে পাওয়া না গেলেও তিনি দর্শকদের হাসাতে পারেন। তাই তাঁকে কেন্দ্র করেই ছবির অপরাধ, প্রণয়, নৃত্য-গীত ও যাবতীয় উত্তেজনার সৃষ্টি। ছবিতে তাঁর প্রণয়িনী শ্যামা যিনি কাহিনীকার-পরিচালকের দাবী মেটাতে গিয়ে "অর্ধেক মানবী" আর "অর্ধেক কল্পনা" হয়ে উঠেছেন। বলা বাহুল্য, ছবির নাট্যপরিণতি আদালতে, যেখানে নায়িকার সাক্ষ্যে নায়ক হত্যাপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই পায়। এন্. দত্তের সংগীত এ-ছবির বিশেষ আকর্ষণ।

অপরাধ, আইন-আদালত ও উত্তেজনার এই প্রাচুর্যের মধ্যে দর্শকদের মনে নতুন নেশা ধরিয়ে দেওয়ার আয়োজন রয়েছে "ময় নশে মে হুঁ"—ছবিতে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত এই চিত্রের নেশাতুর নায়ক রাজকাপুর। সাকীর মতো যে তার দিকে সুরার পাত্র এগিয়ে দেয় তিনি "ওয়াণ্ডার-ফুল ক্লাবের" খদ্দের-তোষিণী নর্তকী মিস্ রিতা (নিশি)। মিস্ রিতার মধুবেন "ওয়াণ্ডারফুল ক্লাবের" স্বরূপ দর্শকদের বোকা বানিয়ে দেয়। ক্লাবের যা কার্যকলাপ ও বিধি-ব্যবস্থা দেখা গেল, বাস্তবে তার সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। তদুপরি মিস্ রিতার বেশ-বাস ও অঙ্গ-ভঙ্গি (রুচি ও শালীনতার প্রশ্ন বাদ দিলেও) দর্শকমনে চিত্রনির্মাতাদের ঈপ্সিত আমেজও আনে না। অথচ তারই সঙ্গসুধা ও সুরার বিভোর হয়ে রাজকাপুর আত্মমর্যাদা, বংশমর্যাদা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ভুলে প্রায় অধঃপতনের শেষ সিঁড়িতেই গিয়ে পৌঁছল। যেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেন ধরমদাস (নাজির হুসেন) তার বুদ্ধি, সাহস ও আত্মত্যাগের বলে। ধরমদাস রাজকাপুরের পিতামহ যিনি খুনের দায়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর ছদ্মবেশে পুত্র কুন্দনলালের (মুবারক) বাড়িতেই ভৃত্যের কাজ নেন। কুন্দনলাল পিতার পরিচয় মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন নিজের জীবন থেকে। কারণ তাদের খান-দানিতে তিনিই এনেছিলেন দুরপনেয় কলঙ্ক। পরে যখন কুন্দনের পুত্র রাম অর্থাৎ রাজকাপুরও পিতামহের মতোই পরিবারের সম্মান ধূলিসাৎ করতে উদ্যত, তখন ধরমদাসই রিতাকে হত্যা করে (একদা যে হাতে দুটি নরহত্যা করে তিনি বংশে কলঙ্ক লেপন করেছিলেন) ও তারই গুলীতে নিহত হয়ে বংশকে বাঁচান অপমানের হাত থেকে। কুন্দনের বাড়িতে পালিতা শান্তার (যে রামকে ভালবাসে) সঙ্গে রামের সুস্থ শুভমিলনের ইঙ্গিত পেয়ে দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। মিস্ রিতার ভূমিকাটির রূপদান করেছেন নিশি, শান্তার চরিত্রে অবতরণ করেছেন মালা সিন্হা। নাজির হুসেন, মুবা-রক, লীলা চিটনীশ যথাক্রমে ধরমদাস, কুন্দন ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পার্শ্বচরিত্রে ধুমল ও মারুতি উল্লেখযোগ্য। শিল্পীরা সকলেই পরিচালক-কাহিনীকার নরেশ সায়গলের সর্ববিধ উদ্দেশ্য মেটাতে তৎপর হয়েছেন। ছবিটি বিশেষ একটি দর্শকশ্রেণীর কাছে আমুদে মনে হলেও—বিশেষত শংকর-জয়কিষণের হাল্কা সুরের কয়েকটি গান যেখানে রয়েছে—রুচিবান দর্শকদের কাছে কতদূর আদরণীয় হবে তা সন্দেহের বিষয়।

বাবুভাই মিস্ত্রী পরিচালিত "বেদর্দ জমানা ক্যা জানে" মূলত একটি দাম্পত্য জীবনের মেলোড্রামা। কিন্তু এতেও নাইট ক্লাব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পাপাচার অবশ্যম্ভাবী ফরমুলোর সূত্র ধরেই এসে স্থান করে নিয়েছে। নাইট ক্লাবের খল-প্রকৃতির মালিকের ফাঁদে গিয়ে পড়ে কাহিনীর নায়িকা। পরে সে যখন সুস্থ বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে তখনও এই খলনায়ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অতি কৌশলে আনে বিচ্ছেদ। ছবির নায়িকাই পরে হত্যা করে দুর্বৃত্তটিকে এবং রোমাঞ্চকর পরি-স্থিতির মধ্য দিয়ে চিত্রনাটের যবনিকাপাত হয়। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিরূপা রায় এবং নায়কের ভূমিকায় অশোককুমার। উভয়ের অভিনয়ই ছবির আকর্ষণ সন্দেহ নাই। দুষ্টপ্রকৃতির অভিনয়ে সিদ্ধহস্ত প্রাণই এ-ছবির কুচক্রী। অন্যান্য ভূমিকায় সুদেশকুমার, জবীন, নীলাম

উল্লেখযোগ্য। হাল্কা নাচ-গানের সম্ভার ছবিতে প্রচুর। সংগীত পরিচালনা করেছেন কল্যাণজী বিরজী।

এই কয়টি ছবির আলোচনায় এটা স্পষ্টই দেখা যায় যে, অপরাধের উপকরণ এবং নাইট ক্লাব বা য়ুরোপীয় ধাঁচের হোটেলে (যা পাপচক্রের কেন্দ্ররূপেই দেখানো হয়) ক্যাবারে ও রক-এন-রোল নাচ-গান এবং নানারকমের বেলেল্লাপনা অক্টোপাসের মতোই বর্তমান হিন্দী ছবিকে জড়িয়ে ধরেছে। এক বিচিত্ররূপী খলনায়ক ও বিচিত্র য়ুরোপীয়(?) পোশাকে সজ্জিতা ধূমপানরতা তার বিষকন্যারূপিনী সহচরী ভারতীয় চিত্রশিল্পে শিকড় গেড়ে বসেছে হিন্দী ছবির প্রযোজক-পরিচালকদের দৌলতে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই বিকৃতির আমদানী হয়েছে হলিউড থেকে। এক জাতীয় আশুতোষ দর্শকদের হিন্দী ছবির এই অ-ভারতীয়, বিকৃত রসসম্ভার মাতিয়ে রেখেছে বেশ কিছুকাল ধরে, অথচ হিন্দী পর্দাতেও সর্বজনসমাদৃত, ভাবে-আঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ছবি আমরা অল্প কিছুদিন আগেও দেখেছি রূপোলাহার "দু'বিঘা-জমীন"র মধ্যে। উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, শিল্পের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে হিন্দী প্রযোজকদের বিপুল মূলধনে অনায়াসে মূল্যবান ছবি তৈরী হতে পারে না বাণিজ্যিক সাফল্যও অর্জন করে। তবে কেন বিদেশের অন্ধ অনুকরণ? কেন এই বিকৃত রস ও রুচির আয়োজন?

নতুন রেকর্ড

এইচ এম ভি

এন ৮২৮২০—শ্যামল মিত্রের দু'খানি আধুনিক গান—"মন মেতেছে নীল আকাশে" ও "পরদেশী সুরে খোঁজে"। এন ৮২৮২১—"গীতালী গীতাঞ্জলি" ও "একটি ফুলের মত" আধুনিক গান দুটি পরিবেশন করেছেন বাণী ঘোষাল। এন ৮২৮২২—শিল্পী সুবীর সেনের দু'খানি আধুনিক গান—"কালো মেঘে ডম্বরু" ও "ওগো শকুন্তলা"। এন ৮২৮২৩—পূরবী দত্তের গাওয়া গান "আজ মনের মালঞ্চে" ও "হারিয়ে গেল জীবনে"। এন ৭৬০৮৩।৮৪।৮৫—রেকর্ডগুলিতে "দেড়শো খোকার কাণ্ড" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা চক্রবর্তী (বসু) প্রভৃতি শিল্পিগণ।

কলম্বিয়া

জি ই ২৪৯৪৩—শ্রীমতী গীতা দত্ত (রায়)-এর কণ্ঠের আধুনিক গান—"জানিতে চেয়েছ তুমি" ও "মাটির ভুবনে যদি"। জি জি ২৪৯৪৪—শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দু-খানি অতুলপ্রসাদী গান "তুমি মধুর অঙ্গে" ও "ওগো আমার নবীন শাখী"। জি জি ২৪৯৪৫—দু'খানি আধুনিক গান "ঘুম নামে পথের ছায়ায়" ও "হাতে কোন কাজ নেই" গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া জি জি ৩০৪১৯ রেকর্ডে "চাওয়া পাওয়া" বাণীচিত্রের গান ও জি জি ৩০৪২০ এবং জি জি ৩০৪২১০ রেকর্ডগুলিতে "জলজঙ্গল" বাণী চিত্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিও আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন নাট্যোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ। দিল্লীর তালকোটরা উদ্যানে এই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীরা মাইকেল মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" মঞ্চস্থ করেন। এ-বাদে তারা অল ইণ্ডিয়া ইয়ুথ ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ম্যাক্সিম গর্কির "মা" উপন্যাস থেকে "মে দিবস" ও গর্কির "লোয়ার ডেপথস্" অবলম্বনে "নীচের মহল" অভিনয় করেন। রাজধানীতে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের নাট্যাভিনয় নাট্যামোদী ও সংবাদপত্রের সমালোচকগণ কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত হয়।

× × ×

বিশ্বরূপা থিয়েটার নেপথ্যে আয়োজিত নাট্যসমারোহ গত ১৯শে মে উদ্বোধিত হয়েছে। এই নাট্যসমারোহ আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে। যোগদানকারী প্রত্যেকটি নাট্যসংস্থা থিয়েটারের নিজস্ব রংগমঞ্চে তাদের নাটক প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার অভিনয় করবেন। এই নাট্যসমারোহের প্রথম অনুষ্ঠান হিসাবে কলকাতা ড্রামাটিক ক্লাব তাঁদের "ফোর্থ ওয়াল" অভিনয় করেন। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আনন্দ ভারতী কর্তৃক স্যামুয়েল বেকেটের "ওয়েটিং ফর গোদোর" মঞ্চস্থ করেন। জুলাই মাসের বিশেষ আকর্ষণ রঘুনাথ গোস্বামীর "পাপেট শো"।

* * *

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি কেবলমাত্র মৌলিক নাটকের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বার্ষিক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় (পূর্ণাঙ্গ) যোগদানের জন্য শৌখীন নাট্য সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন। মুদ্রিত নিয়মাবলী সহ আবেদনপত্র বিশ্বরূপা থিয়েটারে ১৪ই জুন থেকে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৬শে জুন। এ-বছর ৮২ জন বিচারক প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত বিচারের ভার গ্রহণ করেছেন।

* * * *

সোভিয়েট তাজিকিস্তানের রাজধানী স্তালিনবাদের "লাখুতি অ্যাকাডেমিক ড্রামা থিয়েটার"-এ গত ৩রা মে রবীন্দ্রনাথের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁর "বিসর্জন" নাটকটি অভিনীত হয়। পরিচালক খোজাকুল রহমতুল্লায়েভ রবীন্দ্রনাথের নাটকটিকে অল্প কয়েকটি সংলাপ বাদ দিয়ে পরিবেশন করেন। অপর্ণার ভূমিকায় তরুণী অভিনেত্রী হাইবি নাজারোভা তাঁর অপূর্ব অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। বাংগালী মেয়েদের মতো তাঁর কোমল মুখশ্রী চরিত্রটিকে বাস্তবানুগ করে তোলে।

*

গত শনিবার শৌখীন নাট্যসংস্থা "নবমঞ্চ" লোকমান্য তিলক হলে (হাজরা রোড) রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" মঞ্চস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ নাট্য রচনার মর্মরস "নবমঞ্চে"র শিল্পীদের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রাজার চরিত্রে অনিল গুহের সংবেদনশীল অভিনয় খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। রাণীর চরিত্রটিকেও কৃষ্ণা রায় স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় তপন সেন, নির্মল গুহ, সমীরণ দত্ত, বরেন মিত্র, অনিল বসু প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সমীরণ দত্তের পরিচালনা ও দৃশ্য-পরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

জাতীয় কৃষ্টি ও শিল্পের উন্নতি বিধানকল্পে গঠিত "রূপায়ণ আর্ট সেণ্টার" আগামী ২১শে জুন রঙ্গি চিত্রগৃহে "শকুন্তলা" গীতিনাট্য পরিবেশন করবেন।

লেক পল্লী মণিমেলা অভিনীত 'হ-য-ব-র-ল'

লেক পল্লী মণিমেলার শিশুশিল্পীরা গত ২৪শে মে সকালে নিউ এম্পায়ারে সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' নাট্যাকারে পরিবেশন করে। 'হ-য-ব-র-ল'-র নায়িকা ছোট্ট একটি মেয়ে। 'বিশেষ্য'র সংজ্ঞা মুখস্থ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে যে অদ্ভুত স্বপ্নটি দেখে তা-ই নিয়েই এর কাহিনী। এ-কাহিনীর কোন অর্থ নেই, পারম্পর্য নেই। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় জিনিস এর আছে। সেটুকু হল অর্থহীনতার মজা। এই অর্থহীনতাই কাহিনীকে একটি পরমার্থ এনে দিয়েছে। আর তার মজা দিয়েই শিশু নায়িকার স্বপ্নের আজব দেশটি ঘেরা। শিশুশিল্পীরা সেদিন সুকুমার রায়ের এই বিখ্যাত, বহুপঠিত গল্পটি উপভোগ্য করে দর্শকের নিকট উপস্থিত করেছেন। পাত্র-পাত্রীর (দাঁড়কাক, রামছাগল, ব্যাং, প্যাঁচা, খরগোস, সজারু প্রভৃতি) সাজসজ্জা অপূর্ব। নেপথ্য থেকে তাদের কথাবার্তা ও গান মাইকের সাহায্যে শোনান হয়েছে। মঞ্চসজ্জা নিখুঁত

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ফুটবল মরসুম বেশ জমে উঠেছে। এরই মধ্যে মরসুমের প্রথম চ্যারিটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে। খেলাটিতে মোহনবাগান ক্লাব ১—০ গোলে মহমেডান দলকে পরাজিত করে লীগ প্রতিযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় বিজয়ী হয়েছে। অপরদিকে কলকাতা ফুটবল ক্ষেত্রের তিন প্রধানের অন্যতম মহমেডান দলকে স্বীকার করতে হয়েছে মরসুমের প্রথম পরাজয়।

কলকাতার বড় খেলার কথা আলোচনা করতে হলেই প্রথমে স্টেডিয়ামের কথা আলোচনা করতে হয়। স্টেডিয়ামবিহীন এই মহানগরীতে বড় খেলা দেখার যে কত বিড়ম্বনা তা ভুক্তভোগীমাত্রেরই ভাল করে জানা আছে। ফুটবল-পাগল দর্শকের কাছে কলকাতার বড় খেলা দেখার একখানা টিকিট পাওয়া মানে অনেক কিছু পাওয়া। যক্ষের ধনের মত সেই টিকিট বুকে ধরে মাঠে গিয়েও কি ভদ্রভাবে খেলা দেখবার উপায় আছে? পুলিসের জবরদস্তি। অশ্বারোহী বাহিনীর তাড়না। সময় সময় ইঁট-পাটকেলও বরাতে না জোটে এমন নয়। এত করে তো মাঠে ঢুকলেন। তারপরও শান্তি নেই। বসে খেলা দেখবেন? সে পথও বন্ধ।

'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বড় খেলার একজন দর্শক লিখেছেন — "জাতীয় সংগীতের সময়ই শুধু আমাদের দাঁড়াতে হয় এই কথাই এতদিন জানা ছিল। কিন্তু ফুটবল খেলার সময় যে দাঁড়াতে হয় একথা জানা ছিল না। অনেকে আবার নামাজ পড়ার মত খেলার সময় বার বার 'ওঠ-বস' করেছেন।"

স্টেডিয়াম সম্পর্কে শখের দর্শক লিখেছেন—'স্টেডিয়াম ত এখনো সাত মণ তেল পোড়ার ব্যাপার। খেলার মালিকেরা এক কাজ করুন। এবার ঘটা করে বন-মহোৎসব করুন না! মাঠের আশে-পাশে চারাগাছ লাগিয়ে দিন, তবে অন্তত এক যুগে কিছু লোক উচ্চ বৃক্ষচূড়ে আসীন হয়ে খেলা দেখবে। একটা 'বার্ডস-আই-ভিউ' ত পাবে!'

বছরখানেক আগে আই এফ এ গভর্নিং বডির এক সদস্যও গভর্নিং বডির সভায় মস্করা করে এমন এক উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—সন্তানকামী মহিলারা যেমন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বটগাছে ইঁটের টুকরো বেঁধে আসেন তেমন স্টেডিয়ামকামী ক্রীড়ামোদীরা যদি খেলা দেখতে আসবার সময় একখানি করে ইঁট হাতে করে নিয়ে আসেন তবে সহজেই স্টেডিয়াম হয়ে যেতে পারে।"

না। হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। কলকাতায় স্টেডিয়াম নিয়ে যতদিন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে আর যতদিন আমরা সরকারের মুখ চেয়ে বসে আছি ততদিনে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করলে কলকাতার ফুটবল-পাগলদের খেলা দেখার জন্য এত কষ্ট করতে হত না।

মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গত চ্যারিটি খেলার কথাই ধরা যাক। ফুটবল কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও কলকাতার দুটি জনপ্রিয় ক্লাব; সুতরাং এ খেলা দেখার জন্য লাখখানেক দর্শক আগ্রহী হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কি? বড় খেলা, এমন কি মাঝারি ধরনের খেলা দেখবার জন্যও যে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সেকথা মনে করে যাঁরা বহুদিন মাঠে যাবার বদ-অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের কথা বাদ দিচ্ছি। শত দুঃখ কষ্ট এবং দুর্ভোগের মধ্যে যাঁরা এখনো মাঠে যাবার অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি তাঁদের সংখ্যাও কি কম? এই ধরনের ফুটবল ক্রীড়ামোদীরাই মোহন-বাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের চ্যারিটি খেলার আগের দিন, সারাদিন, এমন কি বেশী রাত্রি পর্যন্তও একখানা টিকিটের আশায় দুই ক্লাব তাঁবুতে ধর্না দিয়ে বসে ছিলেন। আই এফ এ অফিসেও টিকিট প্রত্যাশীদের আনাগোনা কম হয়নি। কিন্তু কোথায় টিকিট? ক্লাব সভ্য ছাড়া তো টিকিট পাবার উপায় নেই। বড় খেলা দেখার শখ লাখখানেক লোকের। আর মাঠে বসে বা দাঁড়িয়ে খেলা দেখার মত জায়গা আছে মাত্র পনেরো ষোলো হাজারের। তবে উপায়? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মত বাকী দর্শকদের খেলা দেখে চোখ সার্থক করার বদলে বেতারে খেলার বিবরণী শুনে কান সার্থক করতে হয়েছে। আর খেলার মাঠের আশে পাশে জড় হয়ে পরের মুখে খেলার খবর শুনতে হয়েছে। মাঠে যত দর্শক ছিলেন তার চতুর্গুণ দর্শক ছিলেন মাঠের বাইরে, পথের ফুটপাতে, গড়ানো জমিতে, গাছের ডালে ডালে।

মাঠে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হতাশ দর্শক-দের কত কথাই বলতে শোনা গিয়েছে।
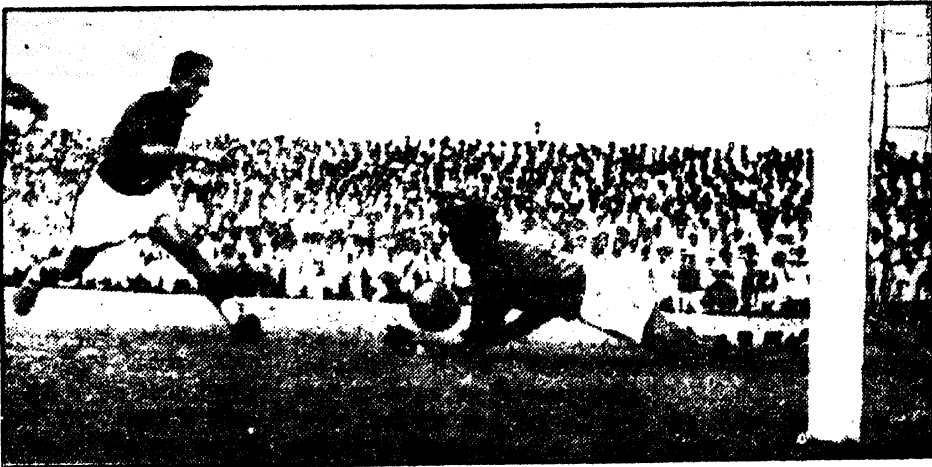
মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে ফুটবল মরসুমের প্রথম চ্যারিটি খেলায় মহমেডান গোলরক্ষক নবী মোহনবাগান সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পালের নিকট থেকে একটি বল বাঁচাচ্ছেন

নটিংহামশায়ারে ভারত ও ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলার অনুষ্ঠানক্ষেত্র 'ট্রেণ্ট ব্রিজ' মাঠ......

অভিযোগ তাদের অনেকের বিরুদ্ধে। পোড়া অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তো আছেই। সব কথা শ্রুতিসুখকর নয়। ছাপার অক্ষরে লেখার পক্ষেও অসুবিধা আছে। তবু তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছেঃ যারা এই শহরে স্টেডিয়াম গড়বার মালিক তারা যদি আরাম চেয়ারে বসে খেলা দেখার নিমন্ত্রণ পান, তাঁদের পারিষদ ও সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য যদি আই এফ এ অফিস থেকে খামভর্তি টিকিটের 'কোটা' চালান হয়ে যায়—আর যাঁরা খেলার টিকিটের মালিক, ভাগ্যকর্তা-বিধাতা, তাঁরা যদি খেয়ালখুশি মত টিকিট নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন তবে স্টেডিয়াম হবে কিভাবে?

সাধারণের অভিযোগ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেও কম নয়। এঁদের ভাবখানা—কাগজওয়ালারা কাগজে লিখে স্টেডিয়াম করে দিক আর এঁরা আরামে বসে খেলা দেখুন। এঁদের যেন কোন কর্তব্যই নেই শুধু একখানা টিকিটের জন্য যথাস্থানে ধর্না দেওয়া ছাড়া। কাগজওয়ালারা স্টেডিয়ামের জন্য সদাই আগ্রহী। গত বিশ বছর ধরে স্টেডিয়াম সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে কম লেখালেখি হয়নি। কিন্তু এই পোড়া দেশে কাগজে লেখার কি দাম আছে? একমাত্র সাধারণ ক্রীড়ামোদীর সক্রিয় আন্দোলন ছাড়া এ শহরে স্টেডিয়াম হবার কোনই আশা নেই। ক্রীড়ামোদীরা যদি নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে থাকেন তবে কাগজওয়ালারা নাচার। যতদিন তাঁরা কোন আন্দোলন আরম্ভ না করবেন ততদিন স্টেডিয়ামের স্থানও খালি থাকবে। প্রতিশ্রুতি হয়তো অনেক আসবে। হয়তো ইডেন উদ্যানের রণজি স্টেডিয়ামের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের মত ফুটবল স্টেডিয়ামেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। সাধারণ ক্রীড়া-মোদীরও দুঃখ ঘুচবে না।

* *

ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান কেন্‌ টেলর ও মিস কোটস্‌ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন ঠিক ছিল। কিন্তু টেলর সব সময় ক্রিকেট খেলা নিয়ে মেতে থাকেন এইজন্য মিস কোটস্‌ তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। বিয়ের প্রস্তাবও নাকচ হয়ে গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় 'কাল-পরিণয়' শীর্ষক যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে খেলা-ধূলার রসিকজনকে তা একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এইজন্যই সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে।

"অনেককাল আগে একটা বিদেশী গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পের নায়কটি ছিল নিপাট ভালমানুষ। ভাটিখানায় গিয়া আড্ডা মারিত না, এবং সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরিত। জীবনে তাহার শখ ছিল মাত্র একটিঃ ঘুড়ি উড়ানো। নিতান্ত নির্দোষ শখ। কিন্তু এমনই তাহার দুর্ভাগ্য যে, নায়িকার তাহাতে বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। স্বামীর শখে বারংবার সে বাধা দিয়েছে। তাহার পরিণাম অবশ্য ভাল হয় নাই। গল্পের উপসংহারে কী হইয়াছিল, বলিব না। বলিলে রসভঙ্গ হইতে পারে। উৎসাহী পাঠকের যদি জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে মম্‌-সাহেবের গল্পগুচ্ছ একবার পড়িয়া লইবেন।

বিলাতী টেস্ট-ক্রিকেটার কেন্‌ টেলারের খবর পড়িয়া মনে হইতেছে, মম্‌-সাহেবের গল্পটা তাঁহার পড়া ছিল। টেলর সম্প্রতি প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পতনের পরমুহূর্তেই আবার গায়ের ধুলো ঝাড়িয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে প্রেম সম্মুখ-পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে, তাহার বন্ধন ছিন্ন করিতে তাঁহার দেরি হয় নাই। টেলরের প্রণয়িনী মিস্‌ কোট্‌সকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, ব্যাপার কী। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "মারাত্মক কিছু নয়। সচরাচর যা হইয়া থাকে। কেন্‌ ভালবাসে ক্রিকেট; ক্রিকেট খেলিয়াই তাহার সময় কাটিয়া যায়।" টেলর নিজেও সে-কথা কবুল করিয়াছেন। ক্রিকেট এবং বিবাহ, তাঁহার জীবনে এই দুইয়ের মধ্যে যে-কোনও একটিকে বাছিয়া লইবার লগ্ন আসিয়াছিল। ক্রিকেটের ব্যাটখানিকেই তিনি বুকে তুলিয়া লইয়াছেন।

অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। প্রেম যেন ধ্রুবতারাটির মত, জনৈক প্রেমিকের এই বিহ্বল উক্তির উত্তরে এক বিখ্যাত সাংবাদিক একবার বলিয়াছিলেন, "ঠিক কথা। কিন্তু ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পথ চলিবার একটা বিপদ আছে, হোঁচট খাইয়া শেষে বিবাহের গহ্বরে গিয়া পড়িতে হয়।" অনুমান করি, টেলর সে-কথা জানিতেন। জানিতেন যে, কোমল দুইটি বাহুর নিগড়ে যদি একবার বন্দী হন, তবে আর জীবনে কখনও ক্রিকেট খেলা সম্ভব হইবে না। শুধু ক্রিকেট কেন, আরও অনেক কিছুকেই হয়ত ছাড়িতে হইতে পারে। সমস্ত শখ শিকায় তুলিয়া তখন দশটা-পাঁচটা অফিস করিতে হইবে। তা ছাড়া সকালে বাজার আছে, বিকালে অন্যান্য গৃহকর্ম। সে খুব সুবিধার ব্যাপার হইবে না। টেলর সেয়ানা মানুষ। 'ধুত্তোর' বলিয়া তিনি তাই সরিয়া পড়িয়াছেন, এবং নটিংহামের মাঠে গিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলিতেছেন।

প্রশ্ন উঠিবে, এমন হয় কেন? বিবাহ করিলেই কেন সমস্ত শখ শিকায় তুলিয়া রাখিতে হয়? কেন যে হয়, কে বলিবে। আমরা শুধু এইটুকুই বুঝি যে, যে-মানুষ বিবাহ করে, সে আর ঠিক সে-মানুষ থাকে না। জানি, কোনও বিষয়েই পাইকারীভাবে কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয়; তবু দেখিয়া-শুনিয়া সত্যই এক-এক সময়ে মনে হয় যে, বিবাহের শখ যাঁহার হইয়াছে, অন্য শখের আশা তাঁহার পরিত্যাগ করাই ভাল। বিবাহের আগের অধ্যায়টা যেন ধরিবার অধ্যায়; আর পরের অধ্যায়টা ছাড়িবার।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে একটার-পর-একটা জিনিস সকলে ধরিতে থাকে। পান, বিড়ি, সিগারেট, বন্ধু, তাস পাশা ইত্যাদি। পরবর্তী অধ্যায়ে আসে ছাড়িবার পালা। পান হইতে শুরু করিয়া পাশা অবধি, আবার সেই একটার-পর-একটা ছাড়িতে ছাড়িতে শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা যায় যে, এই পৃথিবীটাকেই ছাড়িয়া যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে।

* * *

পরিণয়পন্থীরা কিন্তু অন্য কথা বলিবেন। বলিবেন যে, ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে ত এই সেদিন বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু "অ্যাশেস্" হাত ছাড়া হইলেও ক্রিকেটকে তিনি ছাড়েন নাই। শুধু তাই নয়, হনিমুন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতের বিরুদ্ধে খেলিতে নামিয়াই তিনি একখানা সেঞ্চুরি হাঁকাইয়াছেন। পক্ষান্তরে বিবাহ না করিয়া টেলর করিয়াছেন মাত্র চব্বিশ রান। তবে?"

ক্রিকেট খেলার খবর

বেরী সর্বাধিকারী

(বেতার ও বিমানযোগে)

লণ্ডন, ৮ই জুন—নটিংহামের ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৯ রানে অতি সহজেই ভারতকে পরাজিত করেছে। এ ফলাফল অপ্রত্যাশিত নয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভারতের মন্দভাগ্যের জন্য পরাজয় একটু আগেই এসে গেছে। যদি ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের সময় বৃষ্টি না হত আর নাদকার্নী ও চাঁদু বোড়ে খেলার সময় আহত না হতেন তবে পরাজয় কিছুটা দেরিতে আসতো। পরাজয় এড়াবার মত শক্তি ভারতীয় দলের ছিল না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় দৈবদুর্বিপাক না ঘটলে ভারত ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেত। আর অধিনায়ক দাত্তাজী রাও গাইকোয়াড় যদি বোলার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল না করতেন তবে ভারতীয় দল খেলায় হার স্বীকার করলেও সে হার হত অনেক গৌরবজনক। অর্থাৎ ভুলচুক এবং দৈবদুর্বিপাকই খেলার ফলাফল ত্বরান্বিত করেছে। পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার উপর যবনিকা পড়েছে চতুর্থ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির কিছু পরে। টেস্ট খেলার আলোচনায় পরে ঘুরে আসছি। তার আগে 'ট্রেণ্ট ব্রিজ' মাঠ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি।

* * *

'ট্রেণ্ট ব্রিজ' মাঠে ভারত ও ইংলণ্ডের টেস্ট খেলা শুধু এবারকার সফরেরই প্রথম টেস্ট খেলা নয়। ইংলণ্ডে ভারতের টেস্ট খেলার ইতিহাসেরই প্রথম খেলা। কারণ এর আগে সরকারীভাবে ভারতীয় দল যে ৪ বার ইংলণ্ডে সফর করেছে তার কোন খেলাই 'ট্রেণ্ট ব্রিজে' অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৩২ সালের একটিমাত্র টেস্ট খেলা হয় 'লর্ডসে'। ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালের প্রথম টেস্টও লর্ডসে অনুষ্ঠিত হয়। শুধু ১৯৫২ সালে প্রথম টেস্টের অনুষ্ঠানক্ষেত্র ছিল লীডস মাঠ।

'ট্রেণ্ট ব্রিজ' নটিংহ্যামশায়ার কাউণ্টি ক্লাবের মনোরম ক্রীড়াভূমি। ইংলণ্ডের মোট ছয়টি টেস্ট খেলার মাঠের মধ্যে 'লর্ডসের' পরই ট্রেণ্ট ব্রিজের স্থান। ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কলস্রোতস্বিনী ট্রেণ্ট নদী। নদীর উপর আছে একটি প্রাচীন ব্রিজ বা সেতু, নর্মান যুগ থেকে যার অস্তিত্ব। অবশ্য প্রাচীন ব্রিজের সংস্কারের পর নতুন যে ব্রিজ রচনা করা হয়েছে তার বয়সও একশ বছরের উপর। নদী ব্রিজের নামানুসারে মাঠের নামকরণ হয়েছে 'ট্রেণ্ট ব্রিজ'।

ইংলণ্ডের প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড়রা মাঠে আসলে আজও ইংলণ্ডের প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় উইলিয়াম ক্লার্কের নাম স্মরণ করে থাকেন। ক্লার্কই ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠের স্রষ্টা। ১৮৩৫ সালে ট্রেণ্ট ব্রিজ 'ইনের' অধিকারিণীর সঙ্গে ক্লার্ক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তারপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে মেতে উঠেন একটি ক্রিকেট ক্লাব সৃষ্টির নেশায়। সেই থেকে নটিংহাম ক্রিকেট ক্লাবের সৃষ্টি হয়। উইলিয়াম ক্লার্ক হন ক্লাবের প্রথম সভাপতি। ১৮৩৮ সাল থেকে ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠ নটিংহামশায়ারের কাউণ্টি মাঠে পরিণত হয়। কালক্রমে এই মাঠই ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠ বহু ঐতিহাসিক ক্রিকেট-যুদ্ধের লীলাভূমি। বিশ্বের কত ধুরন্ধর খেলোয়াড় এখানে কত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন, ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কত রেকর্ড করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ডব্লিউ জি গ্রেস, রণজি, গানস, শ্রুসবারী, হবস, সাটক্লিফ, ক্লেম হিল, ভিক্টর, ট্রাম্পার প্রভৃতি অতীত যুগের ধুরন্ধর খেলোয়াড়েরা যে ব্যাটে খেলে ট্রেণ্ট ব্রিজে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ক্লাবের লংরুমে সে ব্যাট এখনো সঞ্চিত আছে। লারউড, ভোস প্রভৃতি খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের ব্যবহৃত বলও এখনো শোভা পাচ্ছে ট্রেণ্ট ব্রিজের লংরুমে। এছাড়া দেশ বিদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বহু চিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র ঝোলানো আছে ক্লাব রুমের এখানে ওখানে। ঐতিহাসিক খেলাগুলির স্কোরবোর্ডেরও অভাব নেই। এর সঙ্গে ক্রিকেট সম্পর্কীয় নানা তথ্যবহুল ঘটনারও সমাবেশ করা হয়েছে। 'নটস'-এর প্রাক্তন অধিনায়ক জর্জ পার, ইংলণ্ডের ক্রিকেট ক্ষেত্রে যিনি 'লায়ন অব নর্থ' নামে অভিহিত ছিলেন এবং যাঁর ওভার বাউণ্ডারী মারার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম,—ট্রেণ্ট ব্রিজে তাঁর মর্মর মূর্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় বিশ্বের যে কোন খেলোয়াড় শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। স্কোয়ার লেগের দিকে অনেক উঁচুতে বল তুলে জর্জ পার ওভার বাউণ্ডারী করতেন। ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠের স্কোর লেগের দিকে যেসব সুউচ্চ বৃক্ষ আছে পারের বল সেই সব বৃক্ষের ৬০।৭০ ফুট উঁচু দিয়ে মাটিতে পড়তো। একটি গাছের অনেক উঁচুতে এক যায়গায় একখানি প্লেট আটা আছে। ৯২ বছর আগে পার ঐ যায়গা দিয়ে বল মেরে ওভার বাউণ্ডারী করে-ছিলেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন খেলোয়াড়ই পারের সেই উচ্চতার রেকর্ড ভাঙতে পারেননি। সামারসেট ও ইংলণ্ডের মারমুখী ব্যাটস্‌ম্যান আর্থার ওয়েলার্ড বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান ব্যাটস্‌ম্যান কিথ মিলারও পারের রেকর্ড অতিক্রম করতে পারেননি।

ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে ৩৫ হাজার দর্শকের বসবার যায়গা আছে। আগেই বলেছি, সবদিক দিয়েই ট্রেণ্ট ব্রিজের স্থান লর্ডসের কেবল পরে।

* * *

টেস্ট খেলার আগে 'টনটনে' সামারসেট দলের সঙ্গে ভারতীয় দল বেশ ভালই খেলেছে। আমাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান পলি উমরিগর, যিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দ্বিশতাধিক রান করেছিলেন তিনি সামারসেটের বিরুদ্ধেও ডাবল সেঞ্চুরী করে দর্শকদের আনন্দ দেন। তাছাড়া অধিনায়ক গাইকোয়াড়ের ৬৯ রান। মঞ্জরেকারের ৫৩ এবং নাদকার্নীর ৩১ রানও প্রশংসনীয় হয়। আমাদের চৌকস খেলোয়াড় চাঁদু বোড়ে ব্যাটিংয়ে সুবিধা করতে না পারলেও মাত্র ৪২ রানে সামারসেটের ৫টি উইকেট দখল করেন।

৯ উইকেটে ৪৩২ রান করে ভারতীয় দল ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর সামার-সেটের সামনে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তারা খেলায় পরাজয় এড়াতে পারবে কিনা। কিন্তু ম্যাকুল, অ্যাটকিনসন ও পামার প্রভৃতি খেলোয়াড়দের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের ফলে সামারসেট পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। সময়াভাবেই ভারতীয় দল এ খেলায় জয়ী হতে পারেনি এ কথা বললে খুব ভুল বলা হয় না।

যাই হক। এখন টেস্টের কথায় আসা যাক। টেস্টে আমাদের হার অনিবার্য এ কথা আমি আগেই বলেছি। কারণ ব্যাটিংয়ে আমাদের কোনই স্থিরতা নেই।

কখন ২০ রানের মধ্যে পাঁচটি উইকেট পড়ে যাবে তা বোধ করি ভগবানেরও অজ্ঞাত। ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে খেলবার লোক টেনেটুনে আমাদের তিন-চারজন আছেন। বোলিংয়ে সবেধন নীলমণি সুভাষ গুপ্তে আর অপরদিকে রামকান্ত দেশাই ও চাঁদু বোড়ে। ফিল্ডিং দিন দিনই অবনতির দিকে। সুতরাং এ অবস্থায় ইংলণ্ড দল যতই শক্তিহীন হক না কেন—তাকে পরাজিত করার কল্পনা করা 'আকাশ-কুসুম কল্পনা' করার সামিল। সব চেয়ে বড় কথা অধিনায়ক গাইকোয়াড়ের ক্রিকেট সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ জ্ঞান। লর্ডসে টসে জিতেও যে অবস্থার মধ্যে তিনি এম সি সিকে প্রথম ব্যাটিং করতে দিয়ে ছিলেন তা নিয়ে এখানকার কাগজে বিরুদ্ধ সমালোচনার অন্ত নেই। আগেই বলেছি টেস্টেও গাইকোয়াড় কম ভুল করেননি। ভাগ্যের খেলায় ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মে চিরদিনই ভাগ্যবান। এই টেস্ট খেলা নিয়ে মে ৩৩টি টেস্টের অধিনায়কত্ব করেছেন। আর এবার নিয়ে টসে বিজয়ী হয়েছেন ২২ বার।

টসে জিতে ইংলণ্ড দল ব্যাটিং করতে আরম্ভ করল। সূচনাতেই দেখা গেল বিপর্যয়। মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের উপর আমাদের খুব আস্থা ছিল না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসনীয় বোলিংয়ের ফলে ১৭ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রথম এবং ২৯ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে গেল। মিল্টন ও কাউড্রে আউট হয়ে গেলেন। ৬০ রানের মাথায় আবার আউট হলেন কেন টেলর। ৬০ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের তিনটি উইকেট ফেলে দেওয়া ভারতীয় দলের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। কিন্তু এর পর অধিনায়ক পিটার মে ও ব্যারিংটন চতুর্থ উইকেটে একত্রে খেলে অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। চমৎকার হাতে মেরে খেলে মে করলেন ১০৬ রান, ব্যারিংটন ৫৬। ২২১ রানের মাথায় পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল। এর পর ভারতের স্পিন বোলাররা খেলায় বেশ আধিপত্য বিস্তার করলেন। গডফ্রে ইভান্স ও হর্টন এই সময় একত্রে খেলছিলেন। বেশ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল গুপ্তে ও নাদকার্নির বল খেলতে এদের বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু অধিনায়ক গাইকোয়াড় এই সময়ে নতুন বল নিয়ে এক মারাত্মক ভুল করলেন। আমাদের মিডিয়াম ফাস্ট বোলিং ইংলণ্ড ব্যাটসম্যানদের উপর মোটেই প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। ৬ উইকেট হারিয়ে দিনের শেষে ইংলণ্ড সংগ্রহ করলো ৩৫৮ রান। এর মধ্যে মাত্র ৭৫ মিনিটে গডফ্রে ইভান্সের ৭৩ রান করার কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

পরের দিন ৪২২ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর আমাদের ব্যাটসম্যানরা সতর্কতার সঙ্গে ইনিংসের সূচনা করলেন। এখানে বলা প্রয়োজন ইংলণ্ড ইনিংসের শেষ মুখে নদকার্নী তাঁর নিজের বোলিংয়ের একটি শক্ত ক্যাচ ধরতে গিয়ে হাতের আঙ্গুলে আঘাত পান, ফলে তিনি ব্যাটিং করতে পারবেন কি না সে সম্পর্কেও সন্দেহ দেখা দেয়।

৩৪ রানের মাথায় ভারতের প্রথম উইকেটে কন্ট্রাক্টর আউট হন। এর পর পঙ্কজ রায় ও উমরিগরের সহযোগিতায় ৬১ মিনিটে ৫১ রান সংগ্রহের ঘটনা ভারতীয় সমর্থকদের মনে আশার সঞ্চার করে। কিন্তু ২১ রান করে উমরিগর আউট হয়ে যান। পঙ্কজ রায়ও আউট হন ৫৪ রান করে। দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য শেষের এক ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকে। খেলা বন্ধের সময় আমাদের স্কোর বোর্ডে ওঠে ৩ উইকেটে ১১৬ রান।

ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলিং ভীতি সব সময়ই আমাদের খেলোয়াড়দের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তৃতীয় দিন এই ভীতিই 'কাল' হয়ে দাঁড়াল। ভারতীয় দলের ভাগ্যাকাশেও দুর্যোগ দেখা দিল সূচনায় বোরদের আহত হবার ঘটনায়। বোরদে ১৫ রানের মাথায় ট্রুম্যানের বলে হাতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মাঠ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। মঞ্জরেকার বেশীক্ষন টিকতে পারেন না। ভারতীয় দলের শেষ দিকের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র অধিনায়ক গাইকোয়াড় অসীম দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৩৩ রান করেন। ভারতের শেষ ৫টি উইকেটে মাত্র ১৬ রান যোগ হয়। ২০৬ রানে শেষ হয় ভারতের প্রথম ইনিংস।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ২১৬ রানের ক্ষয়ক্ষতি। দুইজন খেলোয়াড় আহত। তার উপর আবার বৃষ্টিপাত। এই অবস্থায় ফলো অন করলে যে হাল হয় ভারতেরও তাই হল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রানের মধ্যে পড়ে গেল ৬টি উইকেট। একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন ১৫৭ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। ভারত পরাজিত হল এক ইনিংস ও ৫৯ রানে। প্রথম ইনিংসের মত দ্বিতীয় ইনিংসেও পঙ্কজ রায়ের ৪৯ রান উল্লেখ-যোগ্য। মঞ্জরেকারের ৪০ রান প্রশংসনীয় হয়।

নীচে খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড এবং দুই দলে যাঁরা খেলেছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হলঃ—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৪২২ (পিটার মে ১০৬, গডফ্রে ইভান্স ৭৩, এম হর্টন ৫৮, কে সি ব্যারিংটন ৫৬, জে বি স্ট্যাথাম ২৯, কেন টেলর ২৪; সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৪ উইকেট, নাদকার্নী ৪৮ রানে ২ উইকেট, সুরেন্দ্রনাথ ৫৯ রানে রানে ২ উইকেট)

ভারত—প্রথম ইনিংস—২০৬ (পি রায় ৫৪, ডি কে গাইকোয়াড় ৩৩; ট্রুম্যান ৪৫ রানে ৪ উইকেট, এলান মস ৩৩ রানে ২ উইকেট, জে বি স্ট্যাথাম ৪৬ রানে ২ উইকেট)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৭ (পি রায় ৪৯, বিজয় মঞ্জরেকার ৪৪, ডি কে গাইকোয়াড় ৩১, পলি উমরিগর ২০; জে বি স্ট্যাথাম ৩১ রানে ৫ উইকেট, ট্রুম্যান ৪৪ রানে ২ উইকেট)

[ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫৯ রানে বিজয়ী]

উভয় দলে খেলেনঃ—

ইংলণ্ড—পিটার মে (অধিনায়ক), গডফ্রে ইভান্স (উইকেট কিপার), আর্থার মিল্টন, কেন টেলর, কলিন কাউড্রে, কেন ব্যারিংটন, মরিস হর্টন, ফ্রেড ট্রুম্যান, জে বি স্ট্যাথাম, টি গ্রীন হাউ ও এলান মস।

ভারত—ডি কে গাইকোয়াড় (অধিনায়ক), পি জি যোশী (উইকেট কিপার), নরী কন্ট্রাক্টর, পলি উমরিগর, বিজয় মঞ্জরেকার, বোরদে, পঙ্কজ রায়, আর জি নাদকার্ণী, এস পি গুপ্তে, সুরেন্দ্রনাথ ও আর বি দেশাই।

দেশী সংবাদ

১লা জুন—আজ ভারত ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপ্যাল অফিসার রামকৃষ্ণ ডালমিয়া কোম্পানীর প্রায় ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের ষড়যন্ত্র করার ও ঐ পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করার দুইটি অভিযোগের প্রত্যেকটিতে দুই বৎসর করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। দণ্ড দুইটি একযোগে চলিবে।

দিল্লি কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী মেয়র হিসাবে তাঁহার কার্যে ইস্তফা দিয়া পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। ডেপুটি মেয়রের নিকট লিখিত সংক্ষিপ্ত পদত্যাগপত্রে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনরূপ কারণ প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

২রা জুন—চাউলের খোলা বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতে সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। অদ্য কলিকাতায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সে কথা স্বীকার করেন। শ্রী সেন একথাও স্বীকার করেন, বর্তমানে এই রাজ্যে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৯॥ লক্ষ টন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কেরলের কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে কেবল কংগ্রেসের সম্পূর্ণ অহিংসভাবে ও মর্যাদার সহিত সংগ্রাম করার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন।

৩রা জুন—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্ধমান জেলার আসানসোলের জন্য একজন নূতন জেলা ও সেসন জজ নিয়োগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত পুলিস-সুপার নিয়োগের কথাও চলিতেছে। উক্ত তিনজনের কর্মস্থল আসানসোলেই হইবে।

৪ঠা জুন—অদ্য কলিকাতায় 'মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' এক বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করেন, "জনস্বার্থ বিরোধী সরকারী খাদ্যনীতির" প্রতিবাদে শীঘ্রই রাজ্যব্যাপী "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু করা হইবে। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৫ই জুন 'সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস' এবং ১৭ই জুন সারা পশ্চিমবঙ্গে 'হরতাল' পালন করা হইবে।

গোপনসূত্রে সংবাদ অবগত হইতে পারেন এমন এক নির্ভরযোগ্য মহল আজ বলেন যে, এতদিনে তিব্বতের অভ্যন্তরে সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের মতে যে সব প্রতিরোধকারী বিপক্ষজনক, গণ-কমিটিসমূহের দ্বারা এখন তাহাদের প্রকাশ্য বিচার হইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারীতে ফি-রীতি টাকা জমা দিয়াও সহস্রাধিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির ডিপ্লোমা পাওয়ার আশায় মাসের পর মাস হয়রানি হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সময়মত ডিপ্লোমা না পাওয়ায় অনেকেরই চাকুরি ও অনুরূপ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

৫ই জুন—সরকারী চাউলের গুদাম হইতে সহস্রাধিক মণ চাউল কালোবাজারে পাচার করিবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে ৭ জন অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং সম্ভবত ইতোমধ্যে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে।

গতকল্য শেষ রাত্রিতে মধ্য বোম্বাইয়ের জনসমাকীর্ণ এক ব্যবসায় অঞ্চলে রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্যের এক গুদামে আগুন লাগার ফলে বিস্ফোরণ ঘটায় ১২ জন নিহত ও ৭ জন আহত হইয়াছে।

৬ই জুন—একান্তভাবে শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করায় এবং কথায় ও কাজে সর্বোপায়ে হিংসাত্মক মনোভাব বর্জন করার জন্য শ্রীনেহরু অদ্য কেরলের অধিবাসীদের নিকট আবেদন জানান।

অদ্য মেসার্স জেসপ অ্যাণ্ড কোং-এর দমদমস্থিত কারখানায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রমিকদের হর্ষধ্বনির মধ্যে উক্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ভারতে নির্মিত প্রথম ইলেকট্রিক মালটিপল ইউনিট কোচ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের হাতে অর্পণ করা হয়।

৭ই জুন—অদ্য দার্জিলিং-এ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন, কলিকাতায় পুরা রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাবনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত পৌরকর্মচারী-দের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ এখন পর্যন্ত কার্যকরী না হওয়ায় এই রাজ্যের ৮১টি পৌরসভার প্রায় ১৫০০০ পৌরকর্মচারী উহার প্রতিবাদে আগামী ২০শে জুন (শনিবার) মধ্যরাত্র হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ ধর্মঘট পালন করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

১লা জুন—বৃটিশ মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ "হোভারক্রাফট" বা "সমুদ্রগামী উড়ন্ত পিরীচ" প্রথম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অর্ধেক জাহাজ ও অর্ধেক বিমান পিরীচের আকৃতি-বিশিষ্ট এই যান সমুদ্রের উপর দিয়া জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া ছুটিয়া চলিবে—আবার মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া উড়িয়া চলিবে বিমানের ন্যায়।

লাহোরের সংবাদে জানা গেল, সরকারী কর্মচারী অযোগ্যতা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী শীঘ্রই পাকিস্তানের অন্তত ছয়জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে বিচারার্থ অভিযুক্ত করা হইবে। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট কয়েক সপ্তাহ পূর্বে উপরোক্ত অর্ডিন্যান্স জারী করেন।

২রা জুন—মার্কিন স্থলবাহিনী ইনফ্রারেড বা "অবলোহিত রশ্মি নেত্রের" দ্বারা অন্ধকারেও বহু মাইল দূরে অবস্থিত গরম চায়ের কাপ বা লক্ষ্য বস্তুর দিকে ধাবমান ক্ষেপণাস্ত্র দেখিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। স্থল বাহিনীর জনৈক বিজ্ঞানী বলেন, ইস্পাত কারখানাই হউক, বিমান বা রকেটই হউক—যাহা হইতে তাপ নির্গত হয়, এমন সব বস্তুই আমরা বহু দূর হইতে দেখিতে পাইব।

৩রা জুন—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, জেনেভা বৈঠকে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই যাহাতে পরবর্তীকালে একটি শীর্ষ বৈঠক আহ্বানের প্রয়োজন হইতে পারে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, খার্তুমে আপৎ-কালীন অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার কম্যুনিস্ট চক্রান্ত উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার অবসান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৪ঠা জুন—লাওসের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো আজ জেনেভায় বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীসেলউইন লয়েডের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৫ই জুন—আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশন সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, তিব্বতে সুপরিকল্পিত উপায়ে মৌলিক মানবিক অধিকার দমন করা হইয়াছে। এই কমিশন একটি বেসরকারী সংস্থা হইলেও রাষ্ট্রপুঞ্জ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদকে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিবার অধিকার উহার রহিয়াছে।

৬ই জুন—ব্রহ্ম সরকার যদি অদূর ভবিষ্যতে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপের তীব্রতা দমন করিতে পারেন তাহা হইলে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বেই ব্রহ্মদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে।

৭ই জুন—বিশ্বের অন্যতম দুরারোহ পর্বত-শৃঙ্গ এভারেস্টের সন্নিকটস্থ আমা দাব্লাম (২২০০০) ফুট উচ্চ শৃঙ্গে আরোহনকালে গত ২১শে মে বৃটিশ অভিযাত্রী দলের দুইজন সদস্যের জীবনান্ত ঘটিয়াছে। এই অভিযাত্রী দলের সদস্য সংখ্যা ছয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

SISTA'S-KMS 216

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 20th June, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৪ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোগপর্ব

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোগ-পর্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একথা সকলেই জানেন। এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হইবে রবীন্দ্র-রচনার সুষ্ঠু অনুবাদ ভারতীয় ও বিদেশীয় ভাষা-সমূহে। ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, কারণ ভাষা আলাদা হইলেও সংস্কৃতির ভিত্তি এখানে এক ও অভিন্ন। কিন্তু বিদেশী ভাষাতে রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন কাজ, ভাষা ও সংস্কৃতি দুই-ই দুস্তরভাবে বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদের উপরে আমরা তেমন জোর দিতেছি না, কেননা, অনুবাদ যতই নিপুণ হোক না কেন, কবিতার ভাষান্তর প্রায় অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইহা জানিতেন। তিনি সরাসরি অনুবাদ করেন নাই। বাংলা রচনাকে অবলম্বন করিয়া নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে না। সেরূপ নূতন সৃষ্টি একমাত্র লেখকের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। অপরের তাহা করিবার অধিকার নাই। অনুবাদ কিরূপ দাঁড়াইবে জানি না, কাজেই রবীন্দ্র-কাব্যের অনুবাদের উপরে আমাদের তেমন ভরসা নাই। বাকি রহিল গদ্য ও নাটক ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ অর্থাৎ রবীন্দ্র-প্রতিভার সুষ্ঠু পরিচয় দান অসম্ভব নয়। কিন্ত এক্ষেত্রেও কিছু প্রাথমিক বাধা আছে। সেই বাধা হইতেছে যথাযথ নির্বাচন। অনুবাদ-যোগ্য রচনাগুলি যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত না হয়, তবে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হইবে। নির্বাচনের সময়ে দুটি দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রচনা যেন রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন করে, আর সে রচনা যেন পাশ্চাত্ত্য জগতের গ্রহণোপযোগী হয়। এমন অনেক রচনা আছে, যাহাতে রবীন্দ্র-প্রতিভা তেমন স্ফূর্তি লাভ করে নাই, আবার এমন রচনাও আছে, যাহার পাশ্চাত্ত্য জগতের হৃদয়গ্রাহী হইবার সম্ভাবনা অল্প। এই দুটি বিষয় মনে রাখিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। তার-পরে অনুবাদকের কঠিন পরীক্ষা। মূলের রীতি অনুবাদে রক্ষিত না হইলে সব রচনাই এক রকম অর্থাৎ নিতান্ত একঘেয়ে লাগিবে। কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ—যে ভাষার আধারে রক্ষিত হইবে, লক্ষ্মীর পরীক্ষার আধার তাহা হইতে স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। মূলে দুই ভিন্ন আধারে রক্ষিত। এরূপ হয় নাই বলিয়াই পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহিত্য-রসিকদের কাছে রবীন্দ্র-পরিচয় আজ ম্লান হইয়া আসিয়াছে। তাহারা ধারণা করিয়া লইয়াছে, মূলে বুঝি সব এক ছাঁচে ঢালাই করা।

কয়েকদিন আগে নয়াদিল্লির একটি সংবাদে দেখিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, বিশেষভাবে তাঁহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধাদি অনুবাদের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির সদস্যগণের নামও প্রকাশিত হইয়াছে। দুটিই আমাদের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধাদি অংশত মাত্র অনূদিত হওয়া উচিত বলিয়া আমাদের ধারণা—সমগ্রভাবে অনুবাদ উচিত হইবে না। কমিটির অনেকেরই যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রমাণাভাব।

এবারে আর দুটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। ছাব্বিশ খণ্ডে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও প্রচুর উপাদান আছে, যাহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। এগুলি শতবার্ষিকীর পূর্বে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদকগণ সুযোগ্য ব্যক্তি, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সংগ্রহনিপুণতা, যে-কোনও সম্পাদক-মণ্ডলীর ঈর্ষা ও অনুকরণের স্থল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের হাত-পা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী লালফিতায় বাঁধা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। আশঙ্কা হইতেছে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এ-কাজটির চেয়ে অফিস কেতা-দুরস্ত করাকে অধিক গুরুতর মনে করেন। বিশ্বভারতী অফিসের জন্য সাধারণের কোন শিরঃপীড়া নাই, কিন্তু যথেষ্ট শিরঃপীড়া আছে রচনাবলীর নূতন খণ্ড বা রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনাবলী পাইবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে ও রবীন্দ্র-সদনে। কিন্তু এ দুটিই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহেলিত বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্র-সদনে রবীন্দ্র-জীবনের সুপ্রচুর উপাদান সঞ্চিত। নিত্য নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু সেগুলি রক্ষার ও প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়। কর্মী-বেতন বাদে রবীন্দ্র-সদনের মাসিক বাজেট আড়াইশত টাকা। বামহস্তের এই মুষ্টি-ভিক্ষায় কর্তৃপক্ষ লজ্জা পান কিনা জানি না, শুনিয়া অবধি আমরা হেঁট-মস্তকে আছি। এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-সদনে সঞ্চিত উপাদানের কোন ক্যাটালগ কেন প্রস্তুত হয় নাই, এবারে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশ্ব-ভারতী অফিসের জলুস বাড়ুক, কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় জানিয়া রাখুন, অফিসের গৌরবে বিশ্বভারতীর গৌরব নয়। বিশ্বভারতীর গৌরব গ্রন্থালয় ও রবীন্দ্র-সদন; কারণ সেখানেই রবীন্দ্রনাথ দিব্যরূপে প্রকাশিত। এ দুটির দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিলে অবশ্য প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হইবে।

বিরোধী কোন একটি দল যথেষ্ট শক্তিমান নয় বলে এদেশে কংগ্রেসকেই কখনও কখনও আপন-সমালোচনার ভার নিতে হয়. ভারতীয় গণতন্ত্রের এ-ও একটা বিশিষ্ট এবং সুস্থ লক্ষণ। একই অভিনেতা একই দৃশ্যে দুটি চরিত্র অভিনয় করছেন, কোন-কোন ছায়াচিত্রে এ-ব্যাপার দেখা যায়; কংগ্রেসেরও এদেশে অংশত দ্বিবিধ ভূমিকা, শাসকের এবং সমালোচকের। শাসনকার্যে এবং বিবিধ দায় ও দায়িত্ব নির্বাহে রাজ-কর্মচারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করবার অধিকার সংসদে বা বিধান সভায় কংগ্রেসী সদস্যদের আছে এবং এই অধিকার অনেকে প্রায়শই ব্যবহার করে থাকেন। হুইপের এই উদারতা পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রেও সর্বত্র সম্ভব নয়, এবং এই উদারতা কংগ্রেসের আপন শক্তি-সচেতনতারই সাক্ষ্য।

*

আপসোসের সঙ্গে বলব, বিরোধী দলগুলি সর্বত্র কংগ্রেসের এই অভিনব সংসাহসের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখাননি। কোন সর্বভারতীয় বা জাতীয় সমস্যাতেও তাঁরা কংগ্রেসের পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে ইতস্তত করেছেন, বরং কংগ্রেসকে যে-কোন সুযোগে খেলো করে দেবার দিকেই তাঁদের ঝোঁক দেখা যায় বেশী। অর্থাৎ জাতীয় সমস্যাও রাজনৈতিক চাল, পাল্টা চালের বিষয়বস্তু হয়েছে। যেন তেন প্রকারেণ কংগ্রেসকে হেয় বা ক্ষমতাচ্যুত করাই এঁদের লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যসিদ্ধি করতেই এঁরা জোট বাঁধেন, আপনাদের মধ্যে আদর্শগত মিল কতটুকু, বা আদৌ আছে কিনা, সে বিচারও করে দেখেন না। ফলে কিছু ভোট হয়ত বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায়, কিন্তু, সাধারণের প্রকৃত আস্থা নয়। সামান্য চাপেই জোটের বাঁধন শিথিল হয়, অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। নীতি এবং ইজম-এর দোহাই যাঁদের মুখে সর্বক্ষণ তাঁরা ভাবের ঘরে এতটা চুরি করেন কী করে। আর নাকের চেয়ে দূরে তাঁদের দৃষ্টিই বা চলে না কেন। অপরিণামদর্শী জোট-বাঁধার এই অভ্যাসকে সুবিধাবাদও বলব না, কেন না সুবিধাবাদের মূলেও বুদ্ধি থাকে। আদর্শের ভিত্তিনিরপেক্ষ দল-সম্মিলন পরোক্ষভাবে সম্মিলিত দলগুলির প্রেস্টিজ-হানি ঘটায়, কংগ্রেসকেই শক্তি ধার দেয়। কংগ্রেসের শত খুন তখন মাপ হয়ে যায়। কেননা, সাধারণ লোকে মনে মনে বোঝে কংগ্রেসকে রেকাব-চ্যুত করাই এদের আসল লক্ষ্য, সওয়ার হতে এরা চায় না, হবার যোগ্যতা যে আছে এমন পরীক্ষাও দেয়নি, আর ক্ষমতা পেলে ভাগাভাগি নিয়ে এরা কলহে যে প্রবৃত্ত হবে না, এমন স্থিরতাও নেই। অতএব বিরোধী দল যে ভোট বা আসন সংগ্রহ করে, তা বাটখারার কাজ করে; পাল্লার অপর দিকটাকে সহসা শূন্যে উঠে যেতে দেয় না।

রাজাজী-স্থাপিত দলটি অবশ্য এ-জাতীয় নয়। কংগ্রেসের পন্থা ও লক্ষ্যের মধ্যে যেগুলি এঁদের মতে ত্রুটিবহুল, এঁরা তাই দেখিয়ে দেবেন। প্রথম দিকে প্রস্তাব ছিল দলটির নাম হবে "রক্ষণশীল"। কিন্তু এই শব্দটির সঙ্গে বিলাতী যে ভাবানুষঙ্গ আছে তা বিশেষ প্রীতিপ্রদ নয়। সে-কথা স্মরণ করেই কি রাজাজী অবশেষে তাঁর নতুন দলের জন্য মাত্র "স্বাতন্ত্র্য" দাবি করেছেন?

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রর বড় গল্প 'তিন দিন তিন রাত্রি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

অবশ্য নামের চাবি দিয়ে যে কোন দলের প্রকৃতি-নিরূপণ করা চলে, তা-ও নয়। যেমন মানুষের বেলায়, তেমনই রাজনৈতিক দলগুলির বেলায়, নাম প্রায়ই অর্থহীন, এবং কানা ছেলেরাও কখনও কখনও পদ্মলোচন নামের অধিকারী। মার্কিন "রিপাবলিকান"-রা কি "ডেমোক্রাট"-ও নয়? অথবা "ডেমোক্রাটরাই" কি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সপক্ষে?

যাই হক, দলের নামকরণের ব্যাপারে রাজাজী কোন প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে ভালই করেছেন। তাঁর লক্ষ্য শুধু স্বাতন্ত্র্য; ক্ষমতা-লাভ নয়, জনমত গঠন এবং কংগ্রেসকে মনোহারী না হলেও হিত-বচন শোনানো (অবশ্য রাজাজীর মতে যা হিত, তাই)। এঁরা প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। সংসদে এলডার্স—অর্থাৎ প্রবীণ রাজ্যসভা সদস্যেরা যে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন, বাইরের রাজনীতি-ক্ষেত্রেও রাজাজীরা, যদি তাই করতে পারেন, তবেই এঁদের ভূমিকা সার্থক হবে। এ-কথা আশা করা অন্যায় হবে না যে অন্তত আপৎকালে "বৃদ্ধস্য বচনং" গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

*

ভারতে গণতন্ত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে কেরলের প্রশ্নও অবশ্য জড়িত। এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যিনি প্রামাণ্য অভিমত দিতে পারতেন, তিনি স্পষ্ট করে কিছু না বলে, বা নিত্য-নতুন কথা বলে আরও কি ভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। পণ্ডিতজীর অসুবিধা কোথায়, অবশ্য স্পষ্ট বোধ করতে পারছি। কেরলে বিরোধী একটি দলকে সরকার গঠন করতে দিয়ে তিনি গণতন্ত্র নিয়ে একটা বড় রকমের পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দুষ্ট লোকে একে বলবে স্টান্ট, বলবে পণ্ডিতজীর আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে জাহির করা—দেখ, আমাদের গণতন্ত্রের ভিত কত মজবুত। চ্যা রি টি র মত সহ-অবস্থিতিও আমরা "য়্যাট হোম"-ই শুরু করেছি। কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে বিশেষত চীন ও রাশিয়ায়, এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিতজী এ-কথা বোধহয় ভেবে দেখেননি, তাঁর সম্মান না-হয় বাড়ল, কিন্তু কেরল যা ভারতেরই অচ্ছেদ্য অংশ, তার গতি কী হবে। আপনার প্রেস্টিজ বৃদ্ধির প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে 'বোড়ে' হিসাবে ব্যবহার করার নৈতিক অধিকার তাঁর আছে কিনা, প্রধানমন্ত্রী তা-ও বিচার করে দেখেননি। যেমন তিনি বিচার করে দেখেননি, দেশবিভাগে সম্মতি দেবার সময়ে, সীমান্তের ওপারে যে কোটি কোটি লোক রইল, তাদের গতি কী হবে। তাড়াতাড়ি শাসন ব্যবস্থা করতলগত করবার গরজে লক্ষ লক্ষ লোক নিজভূমে পরবাসী হয়েছে। যাদের গলা কাটা পড়ল, কিংবা ধনমান সব খুইয়ে যারা উদ্বাস্তু হল, তাদের কথা ত তুলছি-ই না। কিন্তু সমস্যার সুরাহা কি এতটুকুও হয়েছে? অন্য প্রমাণের আবশ্যক নেই—এই সেকুলার ভারতেই যত মুসলমান এখনও আছে, সংখ্যায় তারা চার কোটি—সমগ্র পশ্চিম, পাকিস্তানের জনসংখ্যা তিন কোটির বেশী হবে না।

আসলে মানুষকে রক্ত মাংসের জীব বলে জ্ঞান করেন না বলেই আমাদের নেতৃবৃন্দ বারবার নৈতিক ভুল করেন। কেরলেও একটা অলীক শখ মেটাতে গিয়েও তাঁরা তাই করেছেন। কিন্তু যে দলের ঘোষণা ও আচরণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক নীতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, এমন একটি দলের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করার ভ্রান্তি আজ প্রকট।

বৈদেশিকী
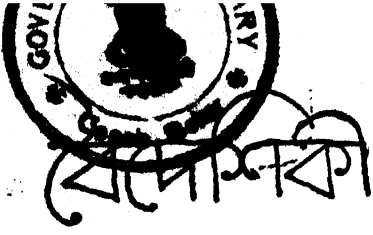
জেনেভায় টুরিস্টদের শহর-দেখানো মোটরবাস থেকে নামছিলাম—ইউনাইটেড নেশনসের বাড়ির সামনে। সঙ্গী সকলেই শ্বেতাঙ্গ অথবা শ্বেতাঙ্গিনী। সুতরাং হঠাৎ পাশ থেকে পরিষ্কার হিন্দীতে যখন প্রশ্ন শুনলাম, 'আপনি হিন্দুস্থান থেকে আসছেন?' তখন একটু চমকে গেলাম। প্রশ্নকর্ত্রী একটি শ্বেতাঙ্গিনী। বয়স ২৮।২৯ হবে অনুমান করলাম। পরে জানলাম যে তিনি ডাক্তার, মধ্যভারতে ধার-এ খৃষ্টান মিশনারী হাসপাতালে পাঁচ বছর কাজ করে আসছেন। ছুটিতে কানাডায় যাচ্ছেন, আবার ভারতবর্ষে আসবেন।

ভদ্রমহিলা আমার ধুতি দেখে বুঝেছিলেন যে, আমি কোন দেশের লোক, প্রথমে এইটাই নিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখেছি যে বাইরের লোক যারা কখনো ভারতে আসেনি তারা ধুতি দেখলেই তার পরিধানকারীকে ভারতবাসী বলে বুঝে ফেলবে, একথা বলা যায় না। তার প্রমাণ পেলাম কয়েকদিন পরেই। রোম থেকে মাইল কুড়ি দূরে সমুদ্রতীরবর্তী অস্তিয়ায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর মণি মৌলিক। সমুদ্রতীরের রেস্তোরাঁয় আমরা কফি খেতে বসেছিলাম। চলে আসার সময়ে আশেপাশের চাহনি ও গুঞ্জনধ্বনি থেকে বুঝলাম বলাবলিটা আমার পোশাক নিয়ে চলছে। ডক্টর মৌলিক ইতালিয়ান লিখতে, পড়তে, বলতে, কইতে দক্ষ। তিনি জানালেন যে, আমার পোশাক দেখে যারা বলাবলি করছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থির করেছে আমি আরব!

যাই হোক, হঠাৎ ডাঃ মিস হাস্টনের (নামটা অবশ্য পরে আলাপ করে জেনেছি) মুখে হিন্দী কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। মুহূর্তের জন্য মনে একটা দ্বন্দ্ব অনুভব করলাম। উত্তর কী ভাষায় দেব? বিদেশিনী মিস হাস্টনের এক কথায় বুঝে গিয়েছি যে তাঁর হিন্দীর চেয়ে আমার হিন্দী ঢের খারাপ হবে। বিদেশিনীর কাছে 'টুটাফুটা' হিন্দী বলব? লজ্জা বোধ হলো। তবে কী ইংরেজীতেই উত্তর দেব? কিন্তু সে যে আরো লজ্জা। তাছাড়া, সত্যিই কি আমার মুখে 'টুটাফুটা' হিন্দীর চেয়ে ইংরেজী বেশি ভাল অথবা 'এডুকেটেড' শোনাবে? ইংরেজী ব্যাকরণ বাঁচিয়ে গোটা

করা উচিত। তিনি স্টেট্‌স্‌ম্যানে মাঝে মাঝে চিঠি ছাড়েন, নাম-সই করেন "পি কে সেনগুপ্ত।" তাঁর সঙ্গে একদিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সেণ্টিনারীতে, বন্ধুবর হিরণকুমার সান্যালের সৌজন্যে।

সুন্দর পাখী দেখা যেত ভারতবর্ষ ও মিশর, এই দুই দেশে। একথা লিখে গেছেন এক পশ্চিমা পণ্ডিত, নাম প্লীনি। সে অবশ্য আজ থেকে উনিশ-শো বছর আগেকার কথা, যখন রোমক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন বেস্পেশিয়নের তনয় টাইটস্‌, আর উত্তর ভারতের অধীশ্বর ছিলেন (আমার মতে) কুষাণবংশীয় বিম-কদফিসের পুত্র হুবিষ্ক-মহাসেন।

তৎপূর্বেও আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন (খৃঃ পূঃ ৩২৬।৩২৫), তিনি এখানে ময়ূরের রূপ দেখে এত মোহিত হন যে, ময়ূর-হত্যাকারীর কঠোর দণ্ডবিধান করেছিলেন। এ সংবাদের জন্যে আমরা আর একজন পশ্চিমা পণ্ডিত ঈলিয়ানের নিকট ঋণী। তাছাড়া, ঐ সময়ে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) সৌভূতি নামক একজন ভারতীয় নৃপতির মুদ্রায় আমরা একটি সুন্দর মোরগের প্রতিকৃতি পাই। মুদ্রাটির শিল্প-শৈলী যাবনিক (Ionian) অর্থাৎ গ্রীক্‌। গ্রীক্‌-মুদ্রাঙ্কনে প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী আমরা সঙ্গত অনুমান করতে পারি যে, ঐ মোরগ ছিল কোন পূজ্য দেবতার প্রতীক এবং শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ এখানে মূর্ত হয়ে রয়েছে।

পাখীর কথা বেশি করে বলছি তার কারণ, মিশরের আদিম বর্ণমালায় মূল ২৪টি চিত্রায়িত (hieroglyphic) অক্ষরের যে তিনটি পাখীর ছবি দেখি সে-তিনটি হচ্ছে—অ, উ, ম। এই বর্ণত্রয়ের যোগে 'ওঁ' বা প্রণব উৎপন্ন হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতির কামনা ও পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনার ফলে ঐ তিন বর্ণ ক্রমলাভ করে। "ঐ স্বর্গলোকও ওঁ-স্বরূপ; ঐ যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিও ওঁ-স্বরূপ।" (রামেন্দ্রসুন্দরের অনুবাদ)।

মিশরীয় বর্ণমালা উদ্ভাবিত হয়েছিল খৃষ্ট-জন্মের অন্তত চার হাজার বৎসর পূর্বে। সে-বর্ণমালায় কেবল অ-উ-ম কেন পক্ষীরূপে কল্পিত? মিশরীয় সংস্কৃতিতে আদিত্য পূজা নানাভাবে প্রচলিত ছিল। ঐ সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পক্ষী-ভক্তির স্থানও অনন্যসাধারণ। প্লীনি যখন লিখছিলেন, তখনও পর্যন্ত মিশরে চিত্রায়িত অক্ষরে শিলালিপি (hieroglyphic inscrip-tions) লেখা চলছিল। বহুসংখ্যক ঐ-প্রকার মিশরীয় শিলালিপি পাওয়া গেছে, এবং তদ্‌-ব্যবহৃত-শব্দের একখানা বড় অভিধানও মুদ্রিত হয়েছে। সে-অভিধান যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর সাজানোর গুণে আমি লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই যে, ঐ চার-হাজার বছর ধরে মিশরীয়রা পক্ষী-চিত্রের মাধ্যমে প্রধানত সত্য-শৌচাদি-দিব্যগুণ-বাচক মনোভাব প্রকাশ করছিলেন। এই স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন মিশরের চিন্তাধারায় দেব-ভক্তি ও পক্ষী-ভক্তি সমভাবে প্রতিবিম্বিত।

পাখীরা যখন আকাশে ওড়ে, তখন তাদের দেখে আদিত্য-পূজকদের এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পক্ষী-জাতি স্বর্গ-দ্বারের কাছে নিত্যই আনাগোনা করে, চাই-কি স্বর্গের সন্ধানও জানে। সুন্দর পাখী সেকালে ভারতে ও মিশরে সব-চেয়ে বেশি দেখা যেত (এখন অস্ট্রেলিয়াতেও দেখা যায়)। তাই বোধ হয় এ-দুই দেশে সত্যের সঙ্গে সুন্দরের—শিবের সঙ্গে সুন্দরের—মনোগত যোগাযোগ প্রাচীন কাল থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত। পাখী যে স্বর্গদ্বার থেকে

মর্ত্য-বুকে নেমে আসে, সে নিশ্চয়ই সবুজ পাতার ডাকে।

আমরা সবাই সৌন্দর্যের উপাসক। তবে দেশ-ভেদে কাল-ভেদে সৌন্দর্যের মাপকাঠি বদলায়। চীনাদের নাক খাঁদা। সুতরাং টিকোলো-নাক-ওয়ালা মানুষকে সুন্দর বলে মেনে নিলে তাদের পক্ষে স্বজাতির প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হয়। তারা খাঁদা নাককে তারিফ করতে বাধ্য।

ঐ খাঁদা নাকের কারণ কি, সে-সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি বলে রাখি। চীন দেশে প্রাচীন অভ্যাস, তাদের মেয়েদের বাচ্চাকে পিঠে বেঁধে বেড়ানো। যেমন দার্জিলিঙে দেখেছি লেপচা-ভুটিয়ারা বেড়ায়। ফলে চীনা শিশুদের নাক বাড়তে পেত না। মায়ের পিঠে ঘষে ঘষে সেটা খাঁদা হয়ে যেত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে তাদের শিশু-নাক খর্বাকার ধারণ করেছে।

হয়তো এই নাকের সঙ্গে ব্যালান্স রাখবার জন্যে ওদের মেয়েরা অনেকে শিশুকাল থেকে লোহা দিয়ে ঠ্যাং বাঁধাত, যাতে পা ছোট থাকে অথচ পদ-মর্যাদা বাড়ে। এ-প্রথার প্রচলন এই সেদিন পর্যন্ত দেখা গেছে। বড় বড়-লোকের মেয়েরা সম্ভবত সোনা দিয়ে ঠ্যাং বাঁধাতেন, কারণ (একটা ইংরিজী বচনের সংস্কৃত অনুবাদ করে বলছি):

[illegible]
লৌহো মহীয়ান্ [illegible]

আমাদের [illegible] খেলার একটা বুলি হচ্ছে:

[illegible]

এই খেলায় [illegible] উ উ বলে ছোটার যে-রীতি আছে সে-রীতি হবে চীনা। ও-ভাষার [illegible] অর্থ [illegible] যে ভারতীয় নয়, বরং চীনা, এ সন্দেহ ঘনীভূত হয় যখন আমরা স্মরণ করি যে, সোনা পায়ে ঠেকানো এ-দেশে বারণ, এবং ঠ্যাং-বাঁধানোর রীতিটি বিশেষ করে চীনা। চীনদেশে সেকেলে বড়-লোকদের বাড়িতে মেয়েরা এই ধরনের কোনো খেলা খেলেন কি-না, তা খোঁজ নেওয়া উচিত।

মেয়েদের পা ছোট হওয়া যে শুভলক্ষণ, এ-ধারণা আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাবে [illegible] পাওয়া যায়। কিন্তু ও-জাতীয় শাস্ত্রে [illegible] প্রভাব এত যে ধারণাটা কতদূর ভারতীয় তা বলা কঠিন।

ইউরোপীয় মহিলারাও ছোট-পা পছন্দ করেন। একটা ঘটনা বলি। আমার একজন বাঙালী বন্ধুর (নিরঞ্জন চক্রবর্তী) মেম বউ শাড়ী পরে আমাদের এখানে প্রথম যখন আসেন, তখন জুতো খুলেই তাঁর মোজা-হীন পা ঝপ্ করে চাপা দিলেন, যেমন হিন্দু মহিলারা সাধারণত করে থাকেন। ছোট একটি মেয়ে তার 'মেম-কাকিমা'কে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতে চাইলে তিনি বাধ্য হলেন পায়ের চাপা খুলতে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমায় বললেন:

—আমাদের পা ছোট দেখাবার জন্যে আমরা এত টাইট্ জুতো পরি যে পা-দুটো কড়ায় ভর্তি হয়ে যায়। তাই লজ্জা করছে আমার কড়া-ওয়ালা পা দুটোকে বের করতে।

এ-প্রসঙ্গে রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের অভিজ্ঞতার একটি কাহিনী শোনাতে লোভ হচ্ছে। উনি সাদা ফুল-মোজা পরতেন। পায়ের সাইজ দশ ইঞ্চি। স্টক ফুরিয়ে যেতে উনি একবার যান হোয়াইটওয়ে লেড্ল-র দোকানে (যেখানে এখন ইউসিস ইত্যাদি হয়েছে—মেট্রো সিনেমার দক্ষিণে)। পুরুষদের ও মহিলাদের আলাদা আলাদা হোসিয়ারি সেকশন আছে, সেটা খেয়াল করেন নি, অর্থাৎ হুঁশিয়ার ছিলেন না। উনি প্রথমেই পুরুষদের সেকশনে প্রবেশ করলেন। নিজের পায়ে যে ফুল-মোজা পরে ছিলেন সেইটা দেখিয়ে ওখানকার ইংরেজ দোকানীর কাছে ঐরকম মোজা চাওয়ায় সে-লোকটা বললে: ও, ইউ ওয়ান্ট লেডিজ' সক্স? জাস্ট গো ওভার দেয়ার (অর্থাৎ ও! আপনি মেয়েদের মোজা চান? ঐ যে, ঐখানে যান)। তার নির্দেশ অনুসারে উনি দ্বিরুক্তি না করে লেডীজ্ সেকশনে চলে গিয়ে নিজের পায়ের মাপ-মাফিক (অর্থাৎ দশ ইঞ্চি) মোজা কিনে সেই পথ ধরেই ফিরলেন, যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলেন। ইচ্ছে, ঐ ইংরেজ দোকানীর সঙ্গে দেখা হয়। চোখা-চোখি হতেই সে মুচকে হেসে ওঁকে প্রশ্ন করলে:—হ্যাভ ইউ ফাউন্ড ইওর লেডীজ' সক্স? (অর্থাৎ, আপনি কি আপনার মহিলা-মোজা পেয়েছেন?)

উনি উত্তরে বললেন:

—ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ; আই অলসো ফাউন্ড

দ্যাট সাম অব ইওর লেডীজ হ্যাভ ফিট টেন ইঞ্চেস লং? (অর্থাৎ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। তাছাড়া আমি জান্‌তে পারলুম যে, তোমাদের কোন কোন মহিলার দশ ইঞ্চি মাপের পা আছে)। সায়েবের লাল মুখ লজ্জায় আরও লাল হয়ে গেল। অমৃতলাল ওর চোট্‌-খাওয়া মনের উপর কিঞ্চিৎ কথামৃত ছড়িয়ে দিলেনঃ —ডোন্ট বি এমব্যারাস্‌ড। আই অ্যাম এ কমেডী-রাইটার। মাই বিজনেস ইজ টু কাট জোক্‌স (অর্থাৎ, লজ্জা করো না। আমি প্রহসন-লেখক। ... কাজই হচ্ছে, ঠাট্টা করা)।

প্রাচীনকালে চীনারা যদি পা ছোট করাটা সৌন্দর্যের সহায়ক মনে করে থাকে, তাদের দোষ দেওয়া যায় না। প্রাচীন অনুকরণ-মূলক শিল্পের ইতিহাসে প্রধানত তিনটি প্রণালী দেখা যায়—বড়কে ছোট করা, ছোটকে বড় করা এবং তৎসম রাখা। বোধ হয়, বড় জিনিসকে ছোটর মধ্যে ধরে রাখাটাই হচ্ছে ছোট ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য। গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর, এইসবের চেহারা আঁকতে গেলে ওছাড়া আর উপায় কি? চীনারা এইসব আঁকে এত ভাল যে, অন্য কোন জাতের শিল্পীরা ওদের সমকক্ষ নয়। লরেন্স বিনিয়ন দুঃখু করে লিখেছেন, চীনাদের সবচেয়ে ভাল পেণ্টিং ইউরোপীয়দের চোখে অ-দৃষ্ট হয়ে আছে, কেননা চীনা শিল্পীরা ইউরোপীয় তারিফের তোয়াক্কা রাখে না। সত্যই অদৃষ্ট!

আমরা খাঁদা নাকের চেয়ে টিকোলো নাক পছন্দ করি, যদিচ বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে খাঁদা নাকই দেখা যায় বেশি। পছন্দ করার একটা কারণ এ হতে পারে যে, অনেককাল ধরে আমাদের শাসন করছিলেন যাঁরা, তাঁদের নাক বেশ উঁচু। রাজার জাত অবশ্য উন্নাসিক হবারই কথা!

মনে পড়ে, সবুজ-সভায় একবার নাক মাপার পালা জমেছিল খুব। তখন কুমুদ-শংকর রায় (কিরণশংকরের ভাই) ডাক্তার হয়ে সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। তিনি সভার সামনে যন্ত্র দিয়ে সবার নাক-মুখ মাপ্‌লেন। কে 'আর্য', কে 'অনার্য', এ নাকি ঠিক করা যায় নাকী প্রমাণে! ঐ বিজ্ঞানের নাম অ্যানথ্রোপোমেট্রি। আমি, প্রমথবাবু, সুধীন্দ্র, আরও অনেকে এ পরীক্ষায় পাশ করে 'আর্য' উপাধি পেলুম। আমাদের মধ্যে কে কে ফেল হলেন, এ প্রশ্নের জবাব পাই নি কুমুদশংকরের কাছে। ভালই হল। ডাক্তার জবাব দিলে সব আশাই নির্বাণলাভ করত।

রঙের দিক থেকেও আমরা গৌরবর্ণের উপাসক। উজ্জ্বল বর্ণের একটা আবেদন আছে। ছেলেবেলায় সকলেরই লাল রং ভাল লাগে। লালের সঙ্গে সাদা মেশালে যে দুধে-আলতা রং হয়, তাও আমরা ভালবাসি—পরিণত বয়সে, বিশেষত যদি পরিণীতা পত্নীর গায়ের রং ঐ জাতীয় হয়। পীতবর্ণেরও একটা বিশেষ আবেদন আছে। সেই জন্যে অনেকে দুধে-আলতা রঙের চাইতে কাঁচা-সোনা রং পছন্দ করেন বেশি। এই গৌর-বর্ণ-প্রীতির ফলে যুগের পর যুগ গৌর-বর্ণ-জাতিরা মুষ্টিমেয় সংখ্যায় এসেও আমাদের জয় করতে পেরেছে। তাদের ফর্সা রং সহজেই আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করে।

সুধীন্দ্র সিংহকে যখন সবুজ-সভায় নিয়ে যাই, তখন তাঁর বয়েস উনিশ-কুড়ি। কালিদাসের 'নবং বয়ঃ কান্তমিদংবপুশ্চ,' তখন তাঁর প্রতি সুপ্রযোজ্য। কেননা তাঁর রং ফর্সা, নাক টিকোলো, মুখশ্রী চমৎকার, দেহ বলিষ্ঠ ও সুঠাম। উপরন্তু তিনি ছিলেন প্রমথ চৌধুরীর স্বজাতীয়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর বিজ্ঞানে অনুরাগ, শিল্প-শাস্ত্রের মর্মজ্ঞতা, বঙ্গভাষায় শক্তি ও আসক্তি এবং সর্বোপরি তাঁর সহজাত শিষ্টাচার, আমার জনক-জননীরও স্নেহ আকর্ষণ করেছিল। এই সুসংগীকে সবুজ দলে ভর্তি করায় প্রমথবাবু খুবই খুশী হন। তাছাড়া, সবুজ-পত্রে প্রকাশিত আমার "বিয়ের সম্বন্ধ" গল্পটিতেও সুধীন্দ্রের ফিনিশিং টাচ ছিল শেষাংশে, যেখানে পাত্রের বিলেত-যাত্রা ব্যাহত হল, যখন সংবাদপত্রে খবর বেরলঃ

HUN OUTRAGE
P & O LINER SUNK!

'পি এ্যান্ড ও' মানে যে পেনিনসুলার অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল, এ-জ্ঞান অবশ্য তখন আমার হয়েছে। কিন্তু এক সময়ে ভাবতুম, পি অ্যান্ড ও মানে পিয়ানো। এ-ধারণা আমার শোনবার দোষে হয় নি, হয়েছিল আমার পিসতুতো ভাই শচীন ঘোষের বলবার গুণে, কেননা তিনি পি অ্যান্ড ও-কে পিয়ানোর মতন উচ্চারণ করতেন। এই শচীন দাদার কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, দার্জিলিঙে প্রমথ চৌধুরীর ভাই অমিয় চৌধুরীর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে।[১] শচীন দাদার উচ্চারণে একটু ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হবার ভাব ছিল—সুনীতিবাবু যে-ভাবকে consonantal elision বলবেন। ফলে তিনি যখন আমার বাবাকে ডাকতেন, তখন 'বড়মামা' বলার ইচ্ছে থাকতেও তাঁর উচ্চারণে সে-শব্দটি 'বড়মা'-রূপ ধারণ করত। এই ব্যঞ্জন-লোপের কলকাত্তাই অপকর্ষ প্রায়ই শোনা যায়। যখন কেউ 'মিনিট পনের' বলতে গিয়ে বলেনঃ 'মিইট্‌ পোঁ-ও-ও।' সে-অপকর্ষ যদিচ শচীনদাদার মুখে শুনি নি, তবু একদিন যা শুনেছি তা ছাপার অক্ষরে বলবার চেষ্টা করিঃ

শচীন দাদা একদিন আমার কাছে তিনটে টাকা রেখে বললেনঃ

—দেখ, এই তিনটে টাকা তোমার কাছে রাখছি।

এর মধ্যে দু'টাকা দিও বড়মা-কে, আর এক টাকা দিও বড়মাকে।

উনি আমার বড় পিসিমাকে 'বড়মা' বলতেন। কিন্তু শ্রুতির মাধ্যমে 'বড়মামা' আর 'বড়মা', এ-দুই শব্দের পার্থক্য বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হওয়ায় আমি উত্তর করলুমঃ

—এই তিন টাকার মধ্যে দু-টাকা তাহলে বাবাকে দোবো, আর বাকি এক টাকা বড়-পিসিমাকে।

—না, না, উল্টো বুঝেছ। দু'টাকা দেবে......

আমি বাধা দিয়ে বললুমঃ

—থাক্‌, আর বোঝাবার দরকার নেই।

যা বুঝেছিলুম, তা উল্টে নিলেই বোঝা হবে সোজা।

সুতরাং শচীন দাদার মুখে পি অ্যান্ড ও-কে পিয়ানোর মতন শুনতে আমার ভালই লেগেছিল এবং সুধীন্দ্র যখন আমার "বিয়ের সম্বন্ধে"র শেষে পি অ্যান্ড ও নামটি জুড়ে দেয়, তখন এইটাই আমার কাম্য হয় যে, ভবিষ্যতে উক্ত-নাম-সংযুক্ত লাইনার সাগর-ময় ঘোষণা করুক দেশ থেকে দেশের বাণী, সুমধুর সুরে। ক্রমশ

---

[১] দেশ; ২৮ চৈত্র, ১৩৬৫।

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে—

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
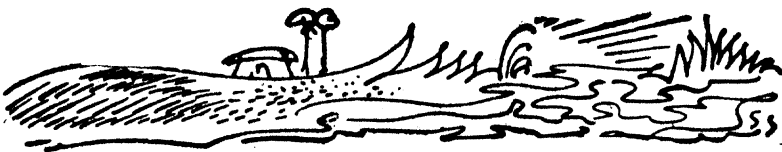
নজরুলের প্রথম চিঠির জবাব দিলাম। জবাবটি লিখতে আমার চারদিন লেগেছিল। চারদিন না বলে চার রাত্রি বলাই উচিত। কারণ দিনের বেলা নজরুলকে চিঠি লিখতে আমার ভাল লাগত না। নিশুতি রাত্রে সারা গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়ত, অণ্ডালের বাড়ির দোতলায় শিয়রের কাছে বড় জানালাটা খুলে দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতাম।

এবার সবই আমার নিজের কথা। সে-সব কথা নাই-বা শুনলেন! পরে যদি কোনোদিন শুনতে চান তো শোনাব সে ছন্নছাড়া জীবনের এক রহস্যময় ইতিকথা। এখন যতটুকু না বললে নয়, ততটুকু বলি।

রাণীগঞ্জ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে। লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম কি না সেই কথাই জানতে চান রায়-সাহেব—আমার দাদা-মশাই।

সুতরাং এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

নজরুলের চিঠির জবাব আসবে অণ্ডালে। অণ্ডাল ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। পড়াশোনার কি হবে—সেও এক দারুণ দুশ্চিন্তা। মূর্খ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

শেষে একদিন দিদিমার কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিলাম। বললাম, কয়েকটা দিনের জন্যে আমি গা-ঢাকা দেব। কিছু ভেবো না তুমি।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবি?

বললাম, যেখানেই যাই তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। আমি নিজেই জানি না কোথায় যাব।

মিথ্যা কথা বললাম। কোথায় যাব আমি জানি। আর এও জানি, যেখানে যাচ্ছি সেখানের নাম শুনলে দিদিমা দুঃখিত হবেন। তাঁর দুঃখিত হবার কারণটা অবশ্য অবহেলা করবার মত নয়। তবু নিরুপায় হয়ে আমি স্থির করলাম—সেইখানেই যাব।

যাব রূপসীপুর গ্রামে। বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তে সাঁওতাল-পরগণার গায়ে-গায়ে লাগা ছোট্ট একখানি গ্রাম। রেল-স্টেশন থেকে অনেক দূরে—ঢেউ-খেলানো মাঠের ওপর দিয়ে, পায়ে-হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথ ধরে, ছোট ছোট শুকনো নদী আর শাল-মহুয়ার জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। ছেলেবেলায় দু'একবার গেছি সেখানে। স্বপ্নের মত মনে আছে তার স্মৃতি। মনে হয় যেন গরুর গাড়িতে চড়ে দূর অতীতের কোন্ এক বসন্ত-সন্ধ্যায় অতিক্রম করেছিলাম ওই সুদীর্ঘ পথ। জোড়া তাল-গাছের মাথায় দেখেছিলাম একফালি চাঁদ। বনের গায়ে নেমেছিল কুয়াশার মত ঝাপসা জ্যোৎস্না, আর কেমন যেন একটা নেশা-ধরিয়ে-দেওয়া গন্ধ পেয়েছিলাম মহুয়া-ফুলের। দূরের কোন্ সাঁওতালপল্লী থেকে আসছিল মাদলের আওয়াজ আর শেয়াল ডাকছিল পথের ধারে।

শেয়ালের ডাক শুনে ভয়ে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম আমার বাবাকে। তিনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

রূপসীপুরে আমার পৈতৃক বাসস্থান।

অথচ আমার দিদিমা এই রূপসীপুরের নাম শুনলে চটে যান।

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু আমাকে বলতে হবে। না বললে আপনারা খেই হারিয়ে ফেলবেন।

আমার মা যখন মারা যান তখন আমি নিতান্ত শিশু। মাতৃহীন সেই শিশুকে আমার মাতামহী পুত্রাধিক স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন। তাই রূপসীপুরের নাম শুনলেই তাঁর ভয় হয়—ওর বাবা পাছে (ছেলেটাকে) নিয়ে চলে যায়, ছেলেটাও বা পাছে তার বাপের দিকে ঢলে পড়ে।

অবনীকে চুপি চুপি বলেছিলাম, আমার নামে চিঠিপত্র এলে রূপসীপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিস্।

—তোকে চিঠি কে লিখবে? নজরুল?

বললাম, হাঁ। কিন্তু দিদিমাকে এখন বলিস না যেন আমি কোথায় যাচ্ছি।

অবনীর ইচ্ছা নয়—আমি কোথাও যাই। বললে, ওখানে কি জন্যে যাবি মরতে? যাস্ না।

কিন্তু কিছুতেই যখন সে আমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারলে না, তখন একসময় চুপি চুপি গিয়ে দিদিমাকে দিলে বলে। যা বারণ করেছিলাম তাই করলে।

দিদিমা ডেকে বললেন, লেখাপড়া তোর কিছু হবে না তা আমি জানি। বাপ্ যার সাপ ধরে ধরে ঘুরে বেড়ায়, তার ছেলে কখনও মানুষ হয় না। আবার শুনলাম নাকি সেইখানেই তুই যেতে চাচ্ছিস।
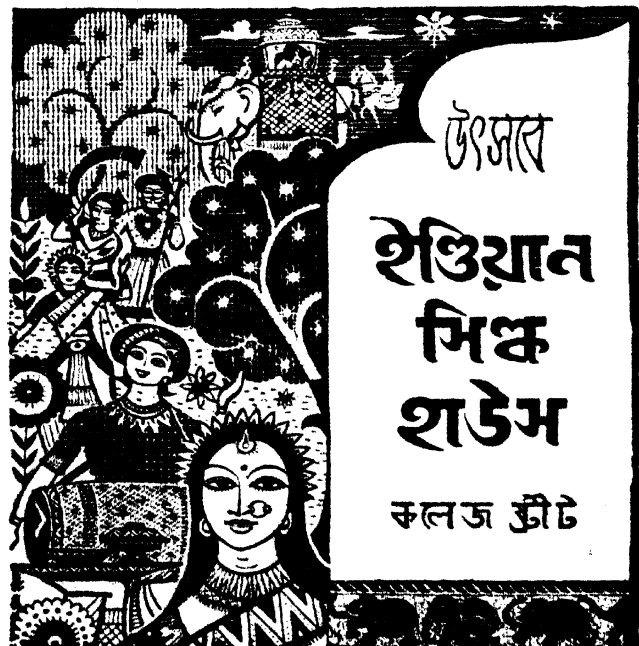
খুব ভাল। আমাদের বড় দাদা ছিল ডাক্তার, মেজদাদা আদালতের পেস্কার, আর বাকি সব আমরা এক-একটি ওস্তাদ। হরিদাস খুব সুন্দর তবলা বাজায়, আর আনন্দময় বাজায় বেহালা।

ঠুক্ ঠুক্ করে কাজ করেন আর বলে চলেন তাঁদের বংশের ইতিহাস।

সে ইতিহাস অবশ্য আমারও।

আমারও রক্তের মধ্যে তার সন্ধান যে পাই না তা নয়। তবে এখানে এসে যেন আরও বেশি করে অনুভব করছি।

বাড়ির দোতলায় মাত্র দুখানি ঘর। বাকিটা সব খোলা ছাত। মনে হয় যেন বাড়িটা তৈরি হতে হতে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ছাদের ওপর খাড়া কয়েকটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ছাত পড়েনি।

সবটা আমার বাবার দখলে।

পাকা ইঁটের সেই দেয়ালগুলোর ওপর কাঠ আর খড় দিয়ে ছাদন করিয়ে নিয়ে সে এক অদ্ভুত রকমের ঘর তৈরি করে নিয়েছেন তিনি।

লম্বা লম্বা সেই ঘরগুলো হয়েছে তাঁর বিচিত্র কর্মশালা।

ভবতোষ দত্ত

মাদ্রাজ থেকে তিনেভেলি এক্সপ্রেস ছাড়ল সন্ধ্যা সাতটার সময়। পাশের কম্পার্টমেন্টগুলিতে আমাদের সঙ্গীদের একবার ঘুরে দেখে আসা গেল। আমাদের ঘরে সরকারী কলেজের আমরা তিন অধ্যাপক।—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ এবং আমি। একটি বার্থ খালি যাচ্ছিল। গাড়ি ছাড়বার সময় এক পার্শী ভদ্রলোক এসে উঠলেন—তিনি নেবে যাবেন তিনেভেলিতে। পাশের ঘরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিমলকান্তি মজুমদার এবং শ্রীশচীন মাইতি। বিমলাবাবুর সঙ্গে তাঁর ছেলে শ্রীমান্‌ সৌগত। অধ্যাপক সুশোভন সরকার চলেছেন সপরিবারে আর একটি কম্পার্টমেন্টে।

যাচ্ছিলাম ইতিহাস সম্মেলনে যোগ দিতে ত্রিবান্দ্রমে। সকালে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ পৌঁছেছি। মাদ্রাজে পৌঁছবার কিছুক্ষণ পর খবর পাওয়া গেল ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসের মিটার গেজের ইঞ্জিনের ক্ষমতায় নাকি কুলোবে না এতগুলি অধ্যাপককে একসঙ্গে বহন করার। বাধ্য হয়ে আমাদের দুটি দলে ভেঙে পড়তে হল। একদল চলে গেলেন ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসেই আর একদলকে আর একটু ঘুরে তিনেভেলি জেলা পরিক্রমা করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দুটি ট্রেন সামান্য আগে-পিছে ছাড়লেও আমাদের ট্রেন যখন ত্রিবান্দ্রম পৌঁছবে আগামী রাত্রিতে তখন এক্সপ্রেসের যাত্রীরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকবেন। বন্ধুবর দিলীপ বিশ্বাস বললেন, এই সুযোগে তিনেভেলি জেলাটা তো দেখা হবে। সেখানে জীবনে কোনো কারণেই যাওয়া হত কি না সন্দেহ। সান্ত্বনা হিসাবে কথাটার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

এই গভীর আশ্বাস নিয়ে ত্রিশ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। বিছানা ইত্যাদি পেতে ফেলা গেল। অধ্যাপক সরকার স্বভাবসিদ্ধ অবিচলিতভাবে ধূম পান করতে লাগলেন। বিমলবাবু এবং বিমলাপ্রসাদবাবু দুজনেরই মুখে উদ্বেগের রেখা দেখা দিল। উদ্বেগের জন্য

ত্রিবান্দ্রম বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হাউস

দোষ দেওয়া যায় না। দুই রাত্রি মাদ্রাজ মেলে কাটিয়ে এখন স্বভাবতই গন্তব্যস্থলে যাওয়ার তাড়া। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দুজনের খাদ্যের নানা রকম বিধিনিষেধ। ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসটা তবু রেল রাজপথ দিয়ে যায়। তাতে খানিকটা ভরসা ছিল। দক্ষিণ ভারতের খাদ্য গ্রহণের অনভ্যাসের দুঃখটা এখনও চরমে ওঠে নি। ওঁরা আশংকা করেছেন তিনেভেলির অজ্ঞাত প্রদেশে শেষ কলাটি পূর্ণ হবে।

এদিকে রাত্রিতে সম্বর-ভাত খেয়ে ঘুমটি মন্দ হল না। একটা অজ্ঞাত দেশের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। দেশটা কি রকম চোখে এখনও দেখতে পাই নি। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। ছোট ট্রেন। সুতরাং দোলাচলটা কিছু প্রবর। জানালা খুলে একবার দেখলাম ট্রেনের চাকা চেঙ্গেলপেট হ্রদের জল ছুঁয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভাঙা চাঁদ। তার ক্ষীণ আলো মুমূর্ষুর চেতনার মতো একটা বিষণ্ণ পরিবেশ ঘনিয়ে তুলেছে।

সকালে মাদুরা স্টেশনে হৈ হৈ কাণ্ড। বিমলাপ্রসাদ বাবুরা জিনিসপত্র নিয়ে নেবে পড়েছেন। বললেন, কিছুক্ষণ পর ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস আসবে, তাতে উঠে পড়বেন; তাতে সময়টাকে সংকুচিত করা যাবে। বললেন, যাবেন তো চলুন। এখান থেকেই আমাদের যাত্রাপথ আলাদা হয়ে গেল। ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস সোজা চলে যাবে পশ্চিম সমুদ্রতটের দিকে আর আমাদের গাড়ি আরও নামবে দক্ষিণে। আমরা দক্ষিণের পথই ধরব স্থির করলাম। ভ্রমণ করতেই যখন বেরিয়েছি তখন তাড়া কিসের।

দিনের বেলা দেশটা চোখ ভরে দেখে নেওয়া গেল। স্টেশনের নামগুলো পড়া সব সময় সম্ভব হল না। দু' একটা মাত্র যা আমাদের সহজগম্য হয়েছে, তার মধ্যে একটি আসমুদ্রম্‌। ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এ জায়গাটির কথা বিশেষভাবে মনে আছে, এত সুন্দর জায়গা সহজে চোখে পড়ে না। প্লাটফরমে নামতেই চোখ আটকে গেল পাহাড়ের গায়ে। দুদিক থেকে দুটি বড়ো পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। যে বিন্ধ্য একদা সূর্যের পথ রোধ করেছিল, এরা যেন তারই প্রমত্ত অনুচর। পাহাড়ের ঘন অরণ্য দুপুরের সূর্যে নীল আভা ছড়াচ্ছে। সমস্ত উপত্যকাটা আলোয় আকীর্ণ। পাহাড়ের নীচে নদী বা ঝরনার ক্ষীণ স্রোত যেন রক্তকরবীর রাজার হাতে প্রাণের অদম্য রেখাটি। মিটার গেজের ছোট গাড়িটাকে পাহাড়ের নীচে নেহাতই করুণার বস্তু বলে মনে হতে লাগল। স্টেশনটি বড়ো নয়, লোকজনও খুব বেশি নেই।

তিনেভেলি থেকে ট্রেন অগ্রসর হল পশ্চিমঘাট পর্বতের দিকে। তিনেভেলিতে পৌঁছেছিলাম বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময়। মোটামুটি সমতলভূমির উপর দিয়ে ট্রেন এসেছে। এ দেশে দেখছি এখনও ধান

ত্রিবেন্দ্রাম টাউন হল

গাছ সবুজ হয়ে মাঠ ছেয়ে আছে। পূর্ব দেশে ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে, নবান্ন উৎসব সমাপ্ত। এখানে এখনও বৃষ্টি হয়—মাঠে মাঠে জল জমে থাকে। তাল আর নারকেল গাছ এক একটা গ্রামের সীমান্ত রচনা করেছে। ট্রেন থেকে মাঝে মাঝে মন্দির চোখে পড়ে। নারকেল-তরু বেষ্টিত গোপুরমের আভাস ভিন্নতর সংস্কৃতির আভাস জাগিয়ে তোলে। আমাদের বাংলা দেশের স্থাপত্যে এই মহত্ত্বের অভাব আছে। এই বিশাল এবং প্রসারিত শিল্পকলার অনুরূপ বাংলা দেশে নেই। স্বভাবতই আকাশস্পর্শী মন্দির গোপুরম দেখলে ভিন্ন লোকালয় এবং সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছি বলে অনুভব করি।

বিকেলের দিকে ভগবতীপুরম নামে একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। এখান থেকে ট্রেন প্রবেশ করবে পশ্চিম ঘাট পর্বত-শ্রেণীর মধ্যে। ত্রিবাংকুর প্রদেশ এই পর্বতের পশ্চিমে আরব সমুদ্রের তীরে। সমস্ত পাহাড়টাকে ভেদ করে ট্রেন ওপারে পৌঁছয়। এই পর্বত অতিক্রমণ আমাদের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। টানেলের ভেতরের হঠাৎ অন্ধকারের অভিজ্ঞতা হয়তো নতুন নয়; কিন্তু পাঁচটা টানেলের গহ্বরে প্রবেশ করে পশ্চিমঘাটের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেশান্তরে যাত্রা করছি এই অনুভবটি রোমাঞ্চকর, যেন এক পৃথিবী থেকে অপর এক পৃথিবীতে উত্তরণ; মাঝখানে এক তিমিরাচ্ছন্ন ঘন বিস্মৃতি। প্রথম টানেলটাই সব চেয়ে দীর্ঘ, প্রায় আড়াই মিনিট সময় নিল। তারপর আরও চারটি সুড়ঙ্গ পেরিয়ে মালাবার উপকূলে পৌঁছলাম। এই পর্বতের মধ্যে দিয়ে অরণ্য আর শিলা-স্তূপের আড়াল দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে সরীসৃপের মতো ট্রেন উঠে যাচ্ছে—যাঁরা দার্জিলিঙ গিয়েছেন, তাঁদের কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন নয়। এখানেও দুটি ইঞ্জিনের দরকার হয় ট্রেনকে পাহাড়ের উপর ঠেলে তুলতে। অজগরগতিতে পাহাড়ের গায়ে এঁকে বেঁকে সাদার্ন রেলওয়ের গাড়ি চলে যায়; পাহাড়ের শিখরলগ্ন মেঘের সঙ্গে মিশে যায় ইঞ্জিনের ধোঁয়া। দু হাজার আড়াই হাজার ফুট নীচে সবুজ উপত্যকা, সাপের উড়ে-পড়া খোলসের মতো রূপালী নদীর ধারা, সরু বনপথ আর তার সঙ্গে বাঁধানো সরকারী রাস্তাও চলেছে পাল্লা দিয়ে। হিমালয়ের মহানদী অরণ্যের মতো অরণ্য দুর্ভেদ্য গভীর নয়, কিন্তু তেমনি বিশালকায় বনস্পতি তরু গুল্মে পাহাড় ঢেকে আছে। কখনও বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকে, কখনও ছায়াবীথি রচনা করে। এ সব পাহাড়ে নাকি কফি এবং কিছু কিছু রবারের চাষ হয়ে থাকে।

পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে ট্রেন এগিয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল। উপত্যকায় পাহাড়ের দীর্ঘ ছায়া অকালে সন্ধ্যা ঘনিয়ে তুলল। দু' একটা দীপ জ্বলল পাহাড়ের গায়ে গায়ে।

সম্মেলনের একদিন আগে আমরা পৌঁছেছি ত্রিবান্দ্রমে। ডেলিগেটদের জন্য য়ুনিভার্সিটি ছাত্রাবাসটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। গভীর রাত্রিতে দেড়টার সময় আমরা যখন ছাত্রাবাসের গেটে ঢুকলাম, রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা বিরাট বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনে হল কোনো একটা দুর্গের মধ্যে ঢুকছি। দিনের আলোয় দেখে বুঝলাম ছাত্রাবাসটি কত বড়ো। এতে দুশ পঁচাত্তরটি ঘর আছে এবং প্রতি ঘরেই দুজনের থাকার ব্যবস্থা। বাড়িটা শুধু যে আয়তনেই বড়ো, তা নয়, এর স্থাপত্যকলাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মধ্যযুগীয় য়ুরোপের দুর্গের মতো বাড়িটা, অমসৃণ পাথরে তৈরী। ত্রিবান্দ্রমের বিশিষ্ট বাড়িগুলি খৃষ্টীয় স্থাপত্যকলার অনুকরণে নির্মিত।

প্রথম দিনে কোন কাজ ছিল না। শহরের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয়ের চেষ্টা করা গেল। কিন্তু বেরিয়ে মালাবারের আবহাওয়া আমাদের তাজ্জব করলে। একটু হাঁটতেই ক্লান্ত আর খানিকটা হাঁটতেই স্বিন্ন। ডিসেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখ। কলকাতায় আমরা আলাপ করে এসেছি, 'এবার দেখছি শীত পড়লই না—কী গরম মশাই'। কিন্তু এখানকার তাপ সেখানে অকল্পনীয়। জুন মাসের মতো প্রচণ্ড গ্রীষ্মে রাত্রিতে এপাশ-ওপাশ করেছি। সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে সারাদিনের ঘাম দূর করতে হয়। সেই সঙ্গে মশার আলাপ। কলকাতা থেকে আসবার সময় আমরা সকলেই কিছু গরম কাপড়-চোপড় এনেছিলাম। সে সব বস্তুর ভাঁজ আর ভাঙ্গাই হল না।

ত্রিবান্দ্রম শহরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট প্রশস্ত। বাড়িঘরগুলি সুন্দর। আমাদের অঞ্চলটায় বিশ্ববিদ্যালয়, সেক্রেটারিয়েট, পাবলিক লাইব্রেরী, টাউন হল, পশুশালা, মুজিয়ম, চিত্রশালা, রাজভবন। হস্টেলের সামনেই স্টেডিয়ম—চন্দ্রশেখর নায়ার স্টেডিয়ম। এর পূর্বদিকে উঁচু আলোকস্তম্ভ, সাধারণতন্ত্র দিবসের স্মরণে রাষ্ট্রপতি স্থাপন করেছিলেন।

মালাবারের সভ্যতা ও সংস্কৃতি খুব পুরনো। মেগাস্থিনিস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মালাবারের চের এবং নায়ারের উল্লেখ করেছেন। অশোকানুশাসনে 'কেরলপুত্র'

কথাটির উল্লেখ আছে। বহু প্রাচীনকালে এখান থেকে হাতীর দাঁত, শাল কাঠ, মরিচ, মর্সলিন থেকে বানর এবং ময়ূরের রপ্তানিও হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে মনে হয় রাজা সলোমনকে এদেশ থেকেই নানা দ্রব্য উপহার দেওয়া হয়েছিল। সে-ও প্রায় ১০০০ খৃীষ্টপূর্বাব্দের কথা।

এ সব ইতিহাসের উল্লেখ। লোকগাথায় কিম্বদন্তীতে এর ইতিহাস প্রাচীনতর। গোকর্ণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত এই দেশটির প্রাচীন নাম পরশুরাম ক্ষেত্র। পরশুরাম এই দেশটিকে সমুদ্র-গর্ভ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তিনিই সিন্ধুতীর থেকে একদল ব্রাহ্মণ এ দেশে নিয়ে আসেন। সমস্ত দেশে বহুসংখ্যক মন্দির তৈরী করে সেই ব্রাহ্মণদের হাতেই সব ভার দিয়ে দেন। বর্তমান নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের এরাই পূর্ব-পুরুষ। অবশ্য তারও আগে এ দেশে নিজস্ব এক সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। তারা ছিল নাগজাতি। এখনও সর্পপূজা এ দেশের সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেশ প্রবল। কেরলের হিন্দুদের মধ্যে নানা বর্ণ আছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের কথা ছেড়ে দিলে নায়াররা এ দেশের প্রভাবশালী সম্প্রদায়। এরা যোদ্ধজাতি। মালাবারের নায়াররাই ছিল সামন্ত শ্রেণী। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে এখনও এরা অগ্রগণ্য।

সকলেই জানেন ত্রিবাঙ্কুরে খৃীষ্টানের সংখ্যা খুব বেশি। খৃীষ্টানেরাও অনেক-গুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—রোমো সিরিয়ান, রোমো ক্যাথলিক, সিরিয়ান, জ্যাকোবাইট সিরিয়ান, প্রোটেস্টাণ্ট। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা—সর্বত্রই তাদের প্রতি-পত্তি। কেরলের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খৃীষ্টানদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে—এ খবর এখন সকলেই শিক্ষাবিলের প্রসঙ্গে জানেন। ৫২ খৃীষ্টাব্দে সেণ্ট টমাস মালিক্কানকারায় অবতরণ করেছিলেন। সে জায়গাটা অবশ্য কেরলের মধ্যে নয়। কিন্তু খৃীষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পর্তুগীজরা আসবার আগে সিরিয়ান খৃীষ্টান নামে পরিচিত টমাসের অনুগামীরাই ছিল প্রধান। পোপ-নিয়ন্ত্রিত খৃীষ্টধর্ম প্রচার করবার উৎসাহে পর্তুগীজরা সিরিয়ানদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছিল বলে শোনা যায়। সিরিয়ানরা নিজেদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ প্রাচীন ধর্ম বলে মনে করে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজনৈতিক ইতিহাস কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রাচীনতম শাসক ছিলেন তামিল চের। চোল এবং পাণ্ড্যদের আক্রমণে এবং মূলত নিজেদের দুর্বলতার ফলে চেররা হীনবল হয়ে পড়লে ক্রমে নায়ার এবং নম্বুদ্রিরাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'সংকেতম' এবং 'সভা'র সাহায্যে তারা নিজেদের মধ্যে শাসন পরিচালনা করত। এক সময় এল, যখন এরা হয়ে উঠল অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। তখন প্রজারা মিলিত হয়ে কেরলের বাইরে থেকে পেরুমলদের আহ্বান করে নিয়ে আসে। শর্ত ছিল এই যে, বারো বৎসরের বেশি একজন পেরুমল রাজত্ব করতে পারবে না। কয়েক শতাব্দী এইভাবে পেরুমলদের রাজত্ব চলে এসেছে। পেরুমল যুগের পর কেরল আবার কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে কালিকাটের জামোরিন প্রবল হয়ে উঠে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে প্রভাব বিস্তার করল। জামোরিন-দের সময়েই ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষের উপকূলে অবতরণ করেন। আত্তিংগোলের রানীর পুত্র মার্তণ্ড বর্মার সময়ে ইংরেজরা কিছু কিছু ভূমিস্বত্ব পেতে থাকে। মার্তণ্ড বর্মা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনিই সমগ্র রাজ্য পদ্মনাভকে উৎসর্গ করেন। ত্রিবান্দ্রমে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির এখনও বিখ্যাত আর এই রাজাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদও আমরা দেখেছি কন্যাকুমারীর পথে, তার নাম পদ্মনাভপুরম্।

ত্রিবান্দ্রমের প্রধান দ্রষ্টব্যগুলির মধ্যে পদ্মনাভস্বামীর মন্দির অন্যতম। ত্রিবান্দ্রমের চালে বাজারের কাছে এই মন্দির। বহুদূরে থেকে গোপুরমটি চোখে পড়ে। এর মূর্তিটি হচ্ছে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর। এত বড়ো মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। তিনটে দরজা দিয়ে মূর্তির তিনটি অংশ দূরে থেকে দেখে মনে মনে সমগ্র রূপটা কল্পনা করে নিলাম। কাছে যাবার উপায় নেই সান্ধ্য শৃঙ্গারের দর্শনার্থীদের ভিড়ে। মন্দির-প্রাঙ্গণে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি। অসংখ্য মূর্তি চারদিকে ছড়িয়ে আছে। স্তম্ভগাত্রে প্রদীপ হাতে নিয়ে পাষাণ পূজারিনীরা দাঁড়িয়ে আছে। তারি মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চমকে উঠলাম। দর্শনার্থীরা পূজাগৃহে সমবেত হয়েছে। এদিকে কেউ আসে নি। বলভিপ্রান্তে কপোত মৃদু গুঞ্জন করে ঘুমিয়ে পড়েছে, দু'-একজন পূজারী অন্ধকার আবছায়ে ক্ষীণ দীপালোকে দীর্ঘ ছায়া ফেলে চলে গেল। আমি সেখানে হাজার বছরের রুদ্ধ

কুমারীকা ঃ দূরে বিবেকানন্দ শিলা

বাতাবরণ সরিয়ে কোন্ দূর অতীতের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

এ সবই বর্মা রাজাদের কীর্তি। আমরা নতুন যুগের মানুষ। অতীতের যাদুঘরে আমরা প্রবেশ করেছি। ঊর্ধ্বাঙ্গের আবরণ ফেলে দিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে নগ্নপদে যখন প্রবেশ করলাম, দেখলাম বর্তমান মুছে গিয়ে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠল—সেখানে ঘণ্টা বাজছে, প্রদীপ জ্বলছে, পূজারী নীরবে হেঁটে চলেছে, চন্দনের গন্ধে ধূপের সুরভিতে গভীর স্তোত্রছন্দে সে আবহাওয়া পূর্ণ।

বর্মা রাজাদের শেষ কীর্তিও দেখলাম: চিত্রালয়ম্ এখানকার স্থায়ী আর্ট গ্যালারী। রাজা রবি বর্মার মূল ছবি অনেকগুলি রয়েছে সেখানে। অবনীন্দ্রনাথের কিছু আগে রাজা রবি বর্মা য়ুরোপীয় রীতিতে ছবি আঁকতেন। অনেকগুলি ছবি আমরা কৈশোরে রামায়ন-মহাভারতে দেখেছি। তখন অবশ্য বুঝি নি ছবিতে মেয়েদের কাপড় ওভাবে পরা কেন। চিত্ররসিকেরা বলবেন, রবি বর্মা যত ভাল পোর্ট্রেট আঁকতে পারতেন মৌলিক সৃষ্টিতে তত উৎকৃষ্ট নন।

রবি বর্মা (১৮৪৮—১৯০৬) ছবি আঁকা শিখেছিলেন তাঁর কাকা রাজা রাজবর্মার কাছে। রাজবর্মার ছবিও এখানে আছে। উজ্জ্বল রং, সুস্পষ্ট রেখা, ফটোগ্রাফিক রচনা—রবিবর্মার ছবির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরীতির কোন যোগ নেই। গ্যালারীতে প্রায় সর্বভারতীয় ছবির নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। বাঙালী শিল্পীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। চিত্রালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ তাম্পী। ব্যবস্থা ও পরিচালনা সরকারী তত্ত্বাবধানে। মোগল, বৌদ্ধ, তিব্বতী, রাজপুত, চৈনিক, জাপানী প্রভৃতি বহু বিচিত্র ছবি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। চিত্রালয়ের একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য এবং দ্রষ্টব্য শাখা রোরিক সংগ্রহ। নিকোলাস রোরিক এবং তাঁর পিতা স্বেতোশ্লাভ রোরিকের অনেকগুলি ছবি এখানে আছে। নিকোলাসের হিমালয় বিষয়ের ছবিগুলি পরিবেশের গভীরতায়, বর্ণের উজ্জ্বলতায় দুঃসাহসিক কল্পনার পরিচয় দেয়। হিমালয়ান লেক, টেরা স্লাভোনিকা, হিমালয়ান রিভার, কুলু ম্যান প্রভৃতি উজ্জ্বল ছবিগুলি সহজেই দৃষ্টিতে পড়ে। পিতার ছবিগুলিও সমান শক্তিশালী যদিও পুত্রের ছবির মতো তাতে অত ডিটেল নেই। পিতা-পুত্র দুজনের ছবিতেই এক ধরনের প্রচণ্ডতা আছে যা আমাদের ভারতীয় চিত্ররীতির মধ্যে অতটা পাই না।

ত্রিবান্দ্রমে পশুশালা আছে, ম্যুজিয়ম আছে। মৎস্যশালা আছে, কিন্তু বিশেষ করে দেখবার মতো আর কিছু নেই। দুঃখের বিষয় এখানকার লোকশিল্পে বৈশিষ্ট্য কিছু দেখলাম না।

পঁচিশে ডিসেম্বর ইতিহাস সম্মেলন আরম্ভ হল। অধিবেশন বসল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে। বাড়িটা নতুন তৈরী হচ্ছে। এর স্থাপত্যরীতিতে বিশেষত্ব আছে। হিন্দু এবং খৃষ্টীয় রীতিতে মিশিয়ে এই বাড়িটি তৈরী হচ্ছে। সিঁড়ির কাছে 'সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে' আর ওদিকে উঁচু ক্লক-টাওয়ার অনেক দূর পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রবি বর্মার দেশের ইঞ্জিনীয়ার এ রীতির অনুসরণকে চুন-বালি মজুরির অপব্যয় বলে মনে করে না।

মূল সভাপতি ডক্টর কালীকিংকর দত্ত। উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল ডাঃ রামকৃষ্ণ রাও। প্রধান মন্ত্রী শংকরণ নম্বুদ্রিপাদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন। রাজ্যপাল ইতিহাসের আদর্শ নিয়ে লিখিত ভাষণ পড়লেন। প্রধান মন্ত্রী ইতিহাস-সাধনায় সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। প্রধান মন্ত্রী কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে আটকে যান। তা হলেও তাঁর বলার ভঙ্গি সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করল। কেরলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সকলেরই শ্রদ্ধেয়। এই জন্যই এসেম্বলীতে বাদ-বিতর্কে তাঁর বক্তৃতা সকলেই মনোযোগের সঙ্গে শুনে থাকেন।

ইতিহাস সম্মেলনের চারটি শাখা সম্মেলন, প্রাচীন ভারতবর্ষ, মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষ, আধুনিক ভারতবর্ষ এবং আঞ্চলিক ইতিহাস। এগুলিতে সভাপতিত্ব করেছেন যথাক্রমে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত সন্দসী সরস্বতী, ভূপালের হামিদিয়া কলেজের ডঃ কে এস লাল, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সজনলাল এবং কেরলের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক যোসেফ মুণ্ডাসেরী। বিভিন্ন শাখায় পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১২৫। এই সব বিভিন্ন সম্মেলনের বিশদ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সম্মেলন পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ এই তিন দিন চলল। এর সঙ্গে আরও দু' একটি বিষয়ের উল্লেখ দরকার। একদিন রাজ্যপাল এবং একদিন মুখ্যমন্ত্রী ডেলিগেটদের চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। রাজ্যপালের নিমন্ত্রণের দিন বেশ বৃষ্টি হল। লনে আয়োজন করা হয়েছিল; তাতে কিছু বিশৃঙ্খলা হল বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রাওয়ের অমায়িক ব্যবহারে সকলেই খুশী হলেন। কসক্লাটি প্রাসাদে মুখ্য মন্ত্রীর চায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রাসাদটি ছিল রাজাদের, সরকারে হস্তান্তরিত হয়েছে। একটা টিলার উপর এই প্রাসাদ। এর বারান্দা থেকে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যেতে দেখলাম। পার্টি চলল প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে সকলেই উৎসুক হল ভারতবর্ষের একমাত্র কম্যুনিস্ট প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে। সকলেই নানারকম পরামর্শের মধু তাঁর কানে ঢালতে লাগলেন। অসীম ধৈর্য সহকারে মৃদু স্নিগ্ধ হাসিতে সকলকে বাধিত করে তিনি সব শুনতে লাগলেন। কখনও দু' একটা উত্তর দিলেন, কখনও নীরবে স্মিত হাসি হাসলেন।

সন্ধ্যার পর একদিন ছিল কথাকলির অনুষ্ঠান। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে এত ক্লান্ত যে, চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসত। শেষ পর্যন্ত দেখে আসতে পারি নি। তিনটে পালা পর পর হল। ভীম-মহাবীর সংবাদ এবং পুতনামোক্ষম পর্যন্ত দেখে চলে এসেছি। নাচটা তো ভালোই লেগেছিল, কিন্তু হলের মধ্যে মাইকের সাহায্যে ঢোল এবং কণ্ঠসংগীতটা নেহাতই কর্ণপীড়াদায়ক হয়ে উঠল।

এর মধ্যে একদিন গিয়েছিলাম পাবলিক লাইব্রেরীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত পুঁথিশালায়। পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক একটা কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস দেখালেন। গত শতাব্দীতে কোনো ইংরেজ পণ্ডিত কী খেয়ালে অষ্টাদশ পুরাণ ইংরেজী অক্ষরে হাতে লিখে মোটা মোটা কয়েক খণ্ডে বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন। মাদুরা মন্দিরের সংগ্রহশালা থেকে এগুলি এখানে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ের অনুবাদ মালয়ালমে হয়েছে কিনা জানতে চাইলে একটা বই-ই তাঁরা দেখালেন—স্নেহাথিন্দিয়া শিক্ষা অর্থাৎ প্রেমের শাসন, নৌকাডুবির অনুবাদ। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের অনুবাদও ওখানকার স্কুলে পাঠ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আধুনিক মালয়ালম সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশি, এমন কি ওদের সাহিত্যের একটা যুগকে রবীন্দ্র-যুগ নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীযুক্ত শংকরণ কুরুপ এই যুগের একজন বড়ো কবি—রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত। সাহিত্য একাদেমীর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের আরও অনুবাদ হচ্ছে।

ত্রিবান্দ্রমের একটা বিশেষ গৌরব বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা। চল্লিশ হাজার পুঁথি এখানে সংগৃহীত হয়েছে। বিবরণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিবান্দ্রম ওরিয়েণ্টাল সিরিজের সম্পাদিত গ্রন্থ সুসম্পাদনার গুণে বিশেষ নির্ভরযোগ্য। পুঁথিশালার ডিরেক্টর পি এন কুমজন পিল্লাইর ভারতবর্ষের পণ্ডিত মহলে বিশেষ স্থান আছে। পুঁথিশালা সংলগ্ন আমাদের আর একটি ঈর্ষাযোগ্য বিভাগ আছে, মালয়ালম অভিধান সংকলন বিভাগ। পুঁথিশালার আর একজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল; তিনি কিউরেটর ডক্টর কে রাঘবন পিল্লাই। আগে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজে কিছুদিন পড়িয়ে এসেছেন।

ত্রিবান্দ্রমের শেষের দিনটি এসে গেল। কন্যাকুমারী যাওয়ার কথা সেদিন।

ভোরবেলা হস্টেলের কম্পাউণ্ডে তিনটি স্টেট বাস এসে দাঁড়াল। বেরোলাম প্রায় আটটার সময়। পথে আমরা নেমেছিলাম তিন জায়গায়, পদ্মনাভপুরে, নাগরকোল এবং শুচীন্দ্রমে। ত্রিবান্দ্রম থেকে কন্যাকুমারী প্রায় পঞ্চাশ মাইল। রাস্তা আগাগোড়া পীচের। বাস চলল মসৃণ দ্রুত গতিতে। শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে এসে পড়তে ঘন নারকেল আর তাল গাছের অরণ্য চোখে পড়ল। সমুদ্র-পর্বত-নারকেল বন—এই তিনটি বিশেষত্ব নিয়ে কেরলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ্যাতি। মনে রাখা দরকার, কন্যাকুমারী কেরল রাজ্যের মধ্যে পড়ে না, পড়ে মাদ্রাজে।

পদ্মনাভপুরে পৌঁছলাম বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময়। বর্মা রাজাদের প্রাচীন প্রাসাদ ছিল এটা। প্রাসাদ উচ্চতায় বেশি নয়, কিন্তু খুব বিস্তৃত। একটা দুর্গের মতো। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়—বাড়িটা কাঠের। এ দিকে কাঠের বাড়ি আর কোথাও দেখি নি। ব্যাপারটা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, যদিও এর সদুত্তর কারো ঠিক মনে পড়ল না। প্রাসাদের মধ্যে নানা রকম অলি গলি, গুপ্তদ্বার

পুকুর, কুয়ো, মন্দির, দরবারঘর। একটা দিকে ম্যুজিয়ম করা হয়েছে।

সেখান থেকে আমরা আবার ফিরে এলাম নাগরকোলে। সেখানে একটি হোটেলে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

নাগরকোল থেকে রওনা হয়ে, কন্যাকুমারীর পথে আবার যাত্রা শুরু। পথে কন্যাকুমারীর প্রায় আট মাইল আগে পড়ল শুচীন্দ্রম্। ত্রিমূর্তির মন্দির। পৌরাণিক আখ্যান হচ্ছে, অত্রি মুনির পত্নী অনসূয়াকে পরীক্ষা করবার জন্য এসেছিলেন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিন দেবতা। অপরিসীম সতীত্বের শক্তিতে তিন ব্রাহ্মণ তিনটি শিশুতে পরিণত হন এবং অনসূয়া তাদের স্তন্য পান করিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেন।

শুচীন্দ্রমের আর একটি মাহাত্ম্য আছে। অভিশপ্ত ইন্দ্র নাকি এখানেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবকে পূজা করে শুচি হয়েছিলেন। দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে আর্য ধর্ম কত গভীরে প্রবেশ করেছিল—এই সব তীর্থ-মাহাত্ম্য শুনলেই বুঝতে পারা যায়। ত্রিবান্দ্রমের পদ্মনাভস্বামী আর্য দেবতা, শুচীন্দ্রমের বিগ্রহও আর্য পুরাণেরই। কিন্তু মন্দিরের স্থাপত্যকলা খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয়। এখানে একটি বিস্ময়কর বস্তু দেখলাম। বারান্দায় সাতটি স্তম্ভ পুরোহিত ঘা দিয়ে দেখালেন সুরে বাঁধা। স্থাপত্য এবং সংগীতের এমন অদ্ভুত মিশ্রণ দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। মাদুরার মন্দিরে এই বিশেষত্বটি আছে।

বালুকা-পথ গড়িয়ে গিয়ে ডুবে গেল মহাসাগরের জলে। বাস সমুদ্রতটে গিয়ে দাঁড়াল। ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত। সোজা দক্ষিণের দিকে তাকালে ভারত মহাসাগর। বাঁ দিকে বঙ্গোপসাগর, ডান দিকে আরব সমুদ্র। আরব সাগরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ত্রিবান্দ্রমে। বাঁ দিকে জলের মধ্যে মাথা তুলে একটা টিলার মতো পাথর। স্বামী বিবেকানন্দ এখানেই ধ্যানে বসেছিলেন। ভারতবর্ষের রূপ এখানে বসেই তিনি কল্পনা করেন আর এখান থেকেই স্বপ্ন দেখেন আমেরিকা যাওয়ার। পাথরটার নাম বিবেকানন্দ-শিলা। আমরা দেখলাম, তীরের থেকে ওই পাথরে যেতে হলে নৌকা, নেহাৎ সাঁতার দিয়ে যেতে হয়। স্বামীজী রোজ সেখানে কি সাঁতার দিয়েই যেতেন।

তীরের কাছাকাছি জলের মধ্যে কিছু-দূর পর্যন্ত পাথর ছড়ানো। পাথরের গায়ে জল প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়, ফেনিল হয়, আবর্ত সৃষ্টি করে। জায়গাটা বিপজ্জনক। তবে স্নানের জন্য খানিকটা পরিধি নির্দেশ করে দেওয়া আছে। সঙ্গে স্নানের কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়েছিলাম। দেরি না করে নেমে পড়া গেল। সেখানকার সমুদ্র-তলের বালির নাকি বিশেষত্ব আছে। ডুবেই এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলাম—বালি আর কাঁকরের মাঝামাঝি এক বস্তু। লাল্চে, হল্দেটে, সবুজে মেশানো সেই বালি।

সমুদ্রতল শিলাসংকুল। পুরী ত্রিবান্দ্রমের বা মাদ্রাজের মতো শুধুই বালুকাময় নয়। পশ্চিম ঘাট পর্বতেরই নিম্নতম সোপান একে বলা যেতে পারে। আসবার সময় বাস থেকেই দিগন্তে প্রান্তরে পাহাড়ের টুকরো টুকরো স্খলিত অবশেষ চোখে পড়ছিল। এক্ষণে বুঝি পাথরগুলি সংহত হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি—ভেঙে ছড়িয়ে আছে। জলে নামলাম সন্তর্পণে। অনেকেই নামলেন না। তাঁদের কেউ কেউ পাথরে পা ফেলে ফেলে একটা উঁচু পাথরে গিয়ে উঠলেন। দিগন্তের হাওয়ায় তাঁরা ফুস ফুস ভরে নিলেন। আগামী ইতিহাস সম্মেলনের ভাবী সভাপতি ডক্টর আলতেকর এবং তাঁর পত্নী পাথরের উপর বসে আছেন দেখলাম। তাঁর পায়ের তলা জলে নেমে কলরব করছিল। পরম প্রশান্তিভরে সেই দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

কন্যাকুমারীতে আছে মন্দির আর গান্ধী-স্মৃতিসৌধ। গান্ধী সৌধটি তৈরী আধুনিক রীতিতে। বড়ো বেসুরো লাগল। এখানকার সমুদ্র, পাহাড়, বালুবেলা, কন্যাকুমারী মন্দির আর উপরে তাঁর তীক্ষ্ণ নীলিমা, প্রখর সূর্যালোকের সঙ্গে সৌধটি মেলে নি।

কন্যাকুমারী মন্দিরটিও দেখে আসা গেল। মন্দিরটি পুরনো নয়, বিগ্রহটিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যদিও কন্যা-কুমারীর মাহাত্ম্য পৌরাণিক। কন্যাকুমারী বা দেবীকুমারী দুর্গারই কুমারী রূপ। বাণাসুরকে বধ করবার জন্য এই মূর্তি ধারণের প্রয়োজন হয়েছিল। মূর্তিটি সুন্দর, শ্বেত পাথরের তৈরী।

বিকেল গড়িয়ে এল। দুপুরে কিছু সামুদ্রিক দ্রব্যাদি কেনাকাটা করে অপেক্ষা করছিলাম অপরাহ্ন বেলার। টুরিস্টরা এখানে রাত কাটিয়ে যায় সমুদ্রগর্ভ থেকে চন্দ্রোদয় দেখবার জন্য। আমাদের সে সুবিধা ছিল না। আমরা বসে রইলাম সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য। ক্যামেরা-বহরা অন্তত একটি ফিল্ম রেখে দিয়েছিলেন সূর্যাস্তকে ধরে রাখতে। দিনটা উজ্জ্বল সূর্যালোকিত, আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না। সুতরাং গান্ধী-স্মৃতি সৌধে, সমুদ্রতীরে, মন্দির প্রাচীরে, স্নানের ঘাটে সকলেই যে যেমন পারল স্থান সংগ্রহ করে নিল। কিন্তু সব প্রত্যাশা ব্যর্থ করে সূর্য যখন দিগন্তের কাছে পৌঁছল, তখন কোথা থেকে মেঘের দল এসে জুটল। এরাও যেন প্রতীক্ষাতেই ছিল। অবশ্য মেঘ একেবারে ঢেকে দিতে পারল না, সেটাই লাভ।

দক্ষিণের সমুদ্রের উপর অন্ধকার নেমে এল। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারের সঙ্গে আলোর করুণ সংগ্রামের শেষ রক্তচিহ্ন। ছুটে এল একটা মত্ত হাওয়া তীরের দিকে। জল আকাশ—সব এক হয়ে গেল। হঠাৎ নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হতে লাগল। স্বজন-বর্জিত কোন মহা-সমুদ্রের তীরে নিঃসঙ্গ আমি দাঁড়িয়ে আছি। অন্তরে এবং বাইরে একটা মহাশূন্যতা।

এমন সময় কানে এল বাসের হর্ণ। ডাকছে ফিরে যাওয়ার জন্য।

এবার উত্তরায়ণ।

অ ন্য দে শে

শিশিরকুমার দাশ

তুমি এখন অন্য দেশে, তোমার ঘরে এখন কটি আলো
জানি না তাই, ভেবেছি মনে, সেখানে আজ নীল
আকাশে মেঘ, আবার মেঘ, মেঘের রং কালো॥

জানালাগুলি এখন খোলা, বাইরে বহু দূর
ফসলহীন মাঠ ঘুমায়, ছায়াশীতল ঝিল
কাঁপে হাওয়ায়, বাতাসে জলে বাতাস-জল সুর॥

আকাশে ওঠে মেঘের ঝড়, জানালা দুটি খুলে
দাঁড়িয়ে আছ, পূবের দিকে, নদীর দিকে চেয়ে
নদীর হাওয়া লেগেছে এসে তোমার কালো চুলে॥

ঘরের আলো নিভেছে আর বাইরে মাঠ ফাঁকা
দৃষ্টিহীন সুদূর পথ, যেন পাহাড় মেয়ে
কপালে তার বিদ্যুতের উল্কি এক আঁকা॥

অন্ধকার শূন্যতায় এসেছে হেঁটে কারা
তুমি এখন অন্য দেশে, তোমার ঘরে এখন কটি আলো
জানি না তাই ভেবেছি মনে, সেখানে আজ তারা

ওঠেনি, শুধু চতুর্দশী তিথির শেষ কলা
কখন নিভেছে গিয়েছে হায়, অন্ধকার কালো
ছড়িয়ে যায়, হয় না শেষ কথাটি শুধু বলা॥

লো ভ এ বং নি র্জ ন তা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অন্ধকারে ঝলসে ওঠে হীরের ছুরির মত লোভ
রূপসী স্মৃতির মূর্তি অদৃশ্যে ডেকেছে স্নিগ্ধ স্বরে
হে অভিজ্ঞ দুঃখ, এসো, শান্ত করো বুকের বিক্ষোভ
মুগ্ধা ডাকিনীর গান ভেসে আসে সমুদ্রের থেকে
এই ভাঙা ছোট ঘরে।

হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ, তবু লোভ,—তবু লোভ দুঃসাহসী
ইঁদুরের মতো
টুকরে খায় দুই চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, রক্তে লাগে লবণ বাতাস
পৃথিবীর সব যুবকের স্বপ্ন মনে হয়, নিশ্চিত বুকের অন্তর্গত-
অন্ধকারে ফুটে ওঠা হলুদ রঙের দীর্ঘশ্বাস।

সারা রাত খণ্ড, লঘু বাতাসেরা খেলা করে আমার শিয়রে
বিস্মৃতি চাইনা আমি ঘৃণা করি সময়ের সামরিক সাজ
যদিও অনেক দিন নির্বাসিত আছি আমি অন্তর গহ্বরে
জানি, যাকে আয়ু বলি, তার অন্য এক রূপ বিপক্ষের
দক্ষ তীরন্দাজ।

রমণীরা গূঢ় হাসে, কৃত্রিম ঝর্ণার শব্দে তাদের মত্ততা
পাখির নখের মত তীক্ষ্ম চোখে তারা সব সুখ বিঁধে রাখে
আমি লোভে ছিন্ন ভিন্ন—তবু যেন দৃষ্টির অতীত নির্জনতা
নিশি বিহঙ্গের মতো দূর থেকে ডাক দেয় আমার আত্মাকে।

প র মা

তারাপদ রায়

হোক না কাঁটার বেড়া, তবু ফুল ফুটলো চারদিকে
উজ্জ্বল সীমানা দিয়ে; লাল টালি ছাওয়া ঘরে ঘরে
কয়েকটি মানুষ এলো—সন্নিহিত স্তব্ধ দিনটিকে
আনন্দ সদৃশ ভেবে, পরিত্যক্ত অদূর শহরে
ঘনিষ্ঠ অস্তিত্বটুকু কেমন সহজ সাবলীল
ভোলা যায়। অনন্তর ক্রমাগত পিঙ্গল শ্রাবণে
কুসুমিত বৃষ্টি আসে, মধু বহে মলয় অনিল,
মরাল নিন্দিত মেঘ ছায়াময় শারদ-কাননে।

তাহ'লে যৌবন, জন্ম, সফলতা—সব অর্থ এই।
হে বনতোষিণি পুষ্প, তরুলতা, প্রিয় বিহঙ্গমা,
এ-ঘরে ও-ঘরে আমরা পাঁচজন আছি—প্রত্যেকেই
সমান সন্তাপী, দুঃখী। জীবনের কাছে, হে পরমা
প্রার্থনীয় নেই আর কোনো সুখ; শুধু তুমি থাকো,
প্রতিবেশী, থাকো ফুল-পাখিলতা, বসন্ত-বৈশাখ-ও॥

সারাদিন ভোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—
পণ্ড্‌স
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC

বিশ্ব-বিচিত্রা

আলাস্কার বেথেল শহরের অধিকাংশ সিনেমা দর্শককে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতে হয় না। তাদের প্রবেশ দক্ষিণা পয়সা নয়, মাছ। এই সিনেমা হলের যারা দর্শক, তারা প্রায় সবাই এস্কিমো। তারা পয়সার পরিবর্তে স্যামন বা হোয়াইট ফিশ টিকিটঘরে জমা দিয়ে বিনিময়ে টিকিট নিয়ে যায়। এই মাছ স্লেজটানা কুকুরের প্রধান খাদ্য। সিনেমা-কর্তৃপক্ষ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসী ও তার টাকা

পরে এই মাছ স্লেজটানা কুকুরের মালিকদের কাছে বিক্রী করে দেয়।

আফ্রিকার উগান্ডা শহরে আজও ২ গজ কাপড়ের বিনিময়ে একটা মুর্গি কিনতে পাওয়া যায়। নিউগিনি থেকে লণ্ডনে ফিরে এসে এক মিশনারী তার বন্ধু-বান্ধবকে কিছু কুকুরের দাঁত সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেন। এই অদ্ভুত অনুরোধে তাঁরা বিস্মিত হন। মিশনারী ভদ্রলোক কুকুরের অনেক দাঁত সংগ্রহ করে নিউগিনি ফিরে গেলেন। এই সম্পদ দিয়েই তিনি সেখানে এক হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন।

পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় আজো চা, লবণ ও তামাক মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মেলেনেশিয়াতে আজো শূয়োরই চলতি মুদ্রা হিসাবে চালু আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ইয়াপে এক সময় অর্থ হিসেবে যা ব্যবহৃত হত, তা পকেটে করে চলাফেরা করা যেত না। দ্বীপবাসীরা অর্থ হিসেবে যা ব্যবহার করত

তা নিরেট পাথরের গোল চাকা। আজো নবদ্বীপে যেসব 'পাথুরে টাকা' দেখা যায়, তার একটির ছবি এখানে দেওয়া হল।

*

'হুইস্কি'-রসিকরা আবার সেই পুরনো প্রশ্নকে নতুন করে চালু করেছেন। কে এই হুইস্কির আবিষ্কারক? সম্ভবত কেউই জানে না কে এর আবিষ্কর্তা। হুইস্কি-প্রিয় আইরিশরা দাবি করেন হুইস্কি তাঁরাই প্রথম তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ২৫০০ বছরেরও বেশি আগে চীনদেশে যে চাল থেকে হুইস্কি তৈরি হত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে যবমণ্ড থেকে, ভারতবর্ষে চাল থেকে এবং আমেরিকায় 'রাই' থেকে হুইস্কি তৈরি হয়।

'জল যেমন আমাদের জীবন, হুইস্কিও তেমন'—বলেছিলেন এক আইরিশ ভদ্রলোক। ভদ্রলোক তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে বেশ কয়েক বছর আগের তার এক অরণ্য অভিযানের গল্প বলছিলেন। 'গুলিবারুদ, খাবার এবং হুইস্কি ফুরিয়ে গেল। আমরা সকলে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লাম।'

'সেখানে কি জল পাওয়া যেত না?'—এক বেরসিক শ্রোতা আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন।

'হ্যাঁ, প্রচুর পরিমাণে ছিল।' আইরিশ ভদ্রলোক উত্তর করলেন। 'কিন্তু বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে চিন্তা করবার মত সময় আমাদের ছিল না।'

ডিজেল ইঞ্জিন হুইস্কি দিয়ে চালান যায় কিনা তার একটা পরীক্ষা ক্যালিফোর্নিয়ায় হয়েছিল। এটা ১৯৩৫ সালের কথা। এই সংবাদ যখন আমেরিকার হুইস্কি রসিকদের কানে এল, তখন তাঁরা খুব মর্মাহত হলেন। এমন একটা অপব্যয় তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

কয়েক বছর আগে গুডফ্রাইডের দিন একটা দুর্ঘটনার ফলে মোরোশায়ারের একটা মদচোলাই কারখানা থেকে ৮০০ গ্যালন হুইস্কি পাশের একটা ছোট নদীর মধ্যে পড়ে যায়। সাধারণত বাজারে যে ধরনের হুইস্কি কিনতে পাওয়া যায়, এগুলি তার চাইতে ৩ গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। সেই সময়টা ছিল গরু-ভেড়াদের জল খাওয়ার সময়। তখন যে সমস্ত গরু-ভেড়া জল খেতে নেমেছিল—তাদের জলতেষ্টা যেন আর মেটে না। শেষ পর্যন্ত তারা খালের ওপর কোন রকমে যখন উঠে এল তখন তাদের আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। প্রায় সবাই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। এটা বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, এই কড়া হুইস্কি-মেশান নদীর জল খেয়েই তাদের এই অবস্থা হয়েছে।

১৫ বছরের বেশি পুরনো হলেই হুইস্কি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। ৮ থেকে ১০ বছরের পুরনো হুইস্কিই সবচেয়ে ভাল। আমেরিকার কোন এক পুরনো জেলখানা ১৯৩৫ সালে যখন ভেঙে ফেলা হয়, তখন সেই জেলখানার কোণের একটা থামের ভেতর ১০০ বছরের পুরনো এক বোতল হুইস্কি পাওয়া গিয়েছিল। সেই হুইস্কি এত মিষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে কেউই শেষ পর্যন্ত খেতে পারল না।

*

১৬ বছরের জেল খেটে সম্প্রতি আমেরিকার জেল থেকে এক খুনী আসামী ছাড়া পেয়েছে। এই খুনীর সঙ্গে জেলখানায় তার ১৮ বছর বয়সের ছেলেরও দেখা হয়েছিল। সিঁধেল চুরির অপরাধে তার জেল হয়েছিল। এই বছরের প্রথম দিকে ওকলাহোমা কারাগারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত এক খুনী বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণ দিয়েছে। তার 'মা'ও খুনী ছিল। তার বাবা ও কাকাও সিঁধেল চোর হিসাবে খ্যাতিমান ছিল।

কেন একই পরিবারের সমস্ত লোক এই-রকম অপরাধ প্রবণ হয়? তবে কি এটা বংশানুক্রমিক? না এর জন্য পারিপার্শ্বিকতাই দায়ী? অথবা দুটোই।

বিখ্যাত মনীষী হ্যাভলক এলিস বলেন, উভয় কারণই এই অপরাধপ্রবণতার মূলে আছে। তিনি তার যুক্তির সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করেন। তিনি এমন একজন ইতালীয়ানের উল্লেখ করেন যার পিতামহ হিংসার বশে একজনকে খুন করেছিল; পিতা শুধুমাত্র বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা পরখ করার জন্যই এক মহিলাকে খুন করেছিল। আর সে নিজে তার বাবা ও ভাইকে খুন করেছিল। এই ইতালীয়ানের শুধু যে রক্তের দোষই ছিল তা নয়, তার পারিপার্শ্বিকতাও তাকে খুনী হতে সাহায্য করেছিল। সে খুনীদের মধ্যেই মানুষ হয়েছে—খুন ছাড়া আর সে কিছু ভাবতে শেখেনি।

আরও একটি অদ্ভুত কাহিনী জানা গেছে এক চোরাকারবারী সম্বন্ধে। আমেরিকার এই চোরাকারবারী রক্তের কারবারে নিযুক্ত ছিল। ভদ্রলোকের কোন ছেলে না থাকায় তার পাঁচ মেয়ে যাতে পিতার ব্যবসা নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে সচেষ্ট ছিল। ভদ্রলোক এক একটি মেয়েকে পাত্রস্থ করতে লাগলেন, আর জামাতাজীবনরা একে একে এই পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ দিতে লাগল। ৩০ বছর ধরে তারা এই চোরাকারবার চালিয়ে এসেছিল।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

মুকুন্দদাস

এক শ্রেণীর বনস্পতি আছে, যারা ঝড়ের সংকেত পেলে আশ্চর্য অধীর হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যেও এমন এক শ্রেণীর পুরুষ আছে, যারা এক একটা প্রেরণায় আশ্চর্যভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। চেতনার সেই রূপটা তাদের নিজস্ব। মুকুন্দদাস ছিলেন এই ধরনের বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, এবং সেই ব্যক্তিত্ব আশ্চর্য উত্তেজনায় প্রখর হয়ে উঠত রঙ্গমঞ্চে জাতীয়তামূলক অভিনয়ের প্রেরণায়। মুকুন্দদাস অভিনেতা ছিলেন, নাট্যকার ছিলেন, সুগায়ক ছিলেন এবং সুবক্তা ছিলেন; কিন্তু তাঁর পক্ষে এর কোনটিই যথার্থভাবে প্রযোজ্য ছিল না। কেননা সাধারণভাবে তিনি এর কোনটিই ছিলেন না। বাস্তবিক— সাহিত্যিক, নট, গায়ক বা রাজনীতিক বলতে যা বোঝায় মুকুন্দদাস তার কোনটাই নন। অপরপক্ষে যদিচ যাত্রাই তাঁর পেশা ছিল, তথাপি পেশাদার যাত্রাওয়ালা বললে তাঁকে অসামান্য রকমের ছোট করা হয়। আসলে তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক এবং মানবধর্মের প্রচারক। তাঁর সব কাজে তিনি মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে একনিষ্ঠ মানবতান্ত্রিক বলেই স্বীকার করতে হয়। বাঙালীর সমাজ, বাঙালীর চরিত্র সম্পর্কে তিনি যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, সে তার মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করবারই উদ্দেশ্য এবং সেই সমালোচনার মাধ্যম ছিল যাত্রা যা সর্বসাধারণের মধ্যে অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে পারত। মুকুন্দদাস তাঁর অভিনয়ে একজন উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। সেটা তাঁর নির্দিষ্ট পার্ট হলেও সেটা ছিল নামে মাত্র। সেই ভূমিকাটুকুকে অবলম্বন করে নানা প্রসঙ্গে তিনি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা এবং গান করে যেতেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতাকে আহ্বান করে তিনি তাদের নানা ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, উন্নতির জন্য আবেদন করতেন, তাদের জাতীয়তাবোধ এবং সমাজচেতনা উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করতেন। তারপরে আবার ফিরে আসতেন তাঁর ভূমিকায়। তাঁর অভিনয়গুলিতে প্রত্যেকটি চরিত্র ছিল সমাজের এক একটি বিশেষ রূপের প্রতীক। আমাদের সমাজের প্রায় প্রতিটি "ভিলেন"কেই তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন। এই নৈপুণ্য এবং যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য শ্রোতাদের ওপর তাঁর প্রভাব যে কী বিরাট ছিল, তা না প্রত্যক্ষ করলে ধারণা করা যায় না।

সেটা বোধ হয় ১৯৩০ সাল। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া গরম। আমরা এক দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। যে শহরে থাকতাম তার তিন দিকে পাহাড়,—একদিক খোলা; আর সেই খোলা রাস্তায় রেল ইস্টিশন অন্তত ছ'মাইল দূরে। অতএব বাইরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ অল্পই ছিল। তবু, ব্রিটিশশাসিত অঞ্চলের দীর্ঘশ্বাসের একটু ক্ষীণ বাষ্পও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আমাদের দেশীয় রাজ্যের ঠান্ডা আবহাওয়াকে সামান্য উত্তপ্ত করেছিল বৈকি। ওইরকম ঈষদুষ্ণ পরিস্থিতিতে একদিন শুনলাম শহরে মুকুন্দ দাসের যাত্রা হবে। আমরা তখন ইস্কুলের ছাত্র—বাইরের খবর খুব বেশি রাখি না। সুতরাং কে মুকুন্দদাস আর কি রকম তাঁর যাত্রা, সে সম্বন্ধেও আমাদের কোন ধারণা ছিল না। যেসব যাত্রা আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, তাকে কোনদিক থেকেই উন্নত বলা যায় না। পর্বের দিনে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে সেই সব বিকৃত অভিনয় দেখাটা আমাদের অপরাপর কর্তব্যের মধ্যে একটা ছিল। যাত্রা সম্বন্ধে সেই সাধারণ মনোভাব নিয়েই মুকুন্দদাসের যাত্রা দেখতে গেলুম।

সেদিনকার যাত্রা ছিল তাঁর লেখা—পল্লীসেবা। মুকুন্দদাস আসরে নাবলেন—পরণে গৈরিক আলখাল্লা, কোমরে দড়ুবন্ধ গৈরিক উত্তরীয়, বুকে অসংখ্য মেডেল, মাথায় পাগড়ী ঠিক বিবেকানন্দের পোষাক। শান্ত, সৌম্য, সুন্দর মুখ, বলিষ্ঠ দেহ। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। সুপুষ্ট গোঁফ প্রায় সবই পাকা। গান গাইতে গাইতেই তিনি ঢুকলেন—

আয় মা তারিণী করালবদনী
ডাকিনী যোগিনী সব নিয়ে আয়।
শ্মশানবাসিনী শ্মশানরঙ্গিণী
ভারত শ্মশানে নাচবি গো আয়।

গম্ভীর বলিষ্ঠ গলায় আসর গম গম করে উঠল। প্রথম দৃষ্টিতেই মন শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে এল। প্রচারকের উপযুক্ত এমন ব্যক্তিত্ব ইতিপূর্বে আর দেখি নি, পরেও আর দেখলাম না। মুকুন্দদাস তার পরের দৃশ্যে গাইলেন—

তোরা সবাই কোদাল ধর—
দেশ থেকে তাড়াতে হবে ম্যালেরিয়া জ্বর
মাথা গুঁজে ভাবলে বসে হবে না দেশের কল্যাণ
কোমর বেঁধে হতে হবে সবায় আগুয়ান
ভয় কিরে ভাই একজন আছেন মাথার উপর।

সে কি আশ্চর্য আহ্বান। কণ্ঠ আবেগে কাঁপছে—সমস্ত দেহ থেকে যেন একটা অগ্রগতির প্রেরণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। শ্রোতাদের

দিকে চেয়ে মনে হল এক মুহূর্তে তারা যেন সব তুচ্ছ করে দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে পারে। আরো অনেক গান গাইলেন, তার মধ্যে আছে বজ্রকণ্ঠে উদ্দীপ্ত সঙ্গীত—

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলে পরেই জাত যাবে জাত
ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি
ভাবলি এতে জাতের জান
তাই তো বেকুব করলি তোরা
এক জাতিকে একশ খান
এখন দেখিস ভারত জোড়া
পড়ে আছিস বাসি মড়া।
জাত নেই আজ আছে শুধু
জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥
জানিস না কি ধর্ম সে যে
বর্মসম সহনশীল
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে
ছোঁয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।
যে জাত ধর্ম ঠুনকো এত
আজ নয় কাল ভাঙবে সে তো
যাক না সে জাত জাহান্নমে
রইবে মানুষ নেই পরোয়া।
বলতে পারিস বিশ্বপিতা
ভগবানের কোন্ সে জাত
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া
অশুচি হন জগন্নাথ
জগন্নাথের জাত যদি নাই
তোদের কিসের জাতের বড়াই
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে
মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।
ভগবানের ফৌজদারি কোর্ট
নাই সেখানে জাত বিচার
পৈতে টিকি টুপি টোপর
সব সেথা ভাই একাকার
জাত যে শিকায় তোলা রবে
কর্ম নিয়েই বিচার হবে
বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে
নরক কিম্বা স্বর্গে থোয়া॥

ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই যাত্রা শেষ হয়ে গেল। একটা আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে সবাই ঘরে ফিরল। এমন কণ্ঠ, এমন গান আর এমন উৎসাহ—এ তিনের এমন সংযোগ সত্যিই দুর্লভ। পরের দিন ঐ ছোট্ট শহরে অভয় আশ্রম থেকে বারো-চোদ্দটা চরকা বিক্রী হয়ে গেল। সে ওই মুকুন্দ দাসের প্রভাব।

মাসখানেক ধরে এখানে ওখানে মুকুন্দ-দাসের যাত্রা হল। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে শুধু আমরা নয় স্টেটের গণ্যমান্য কর্মচারীরাও উপস্থিত থাকতেন। "কর্ম-ক্ষেত্র" নামক একটি অভিনয়ে এক ম্যানেজারের ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাটিকে উপলক্ষ্য করে তিনি স্টেটের কর্মচারীদের কয়েকটি মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। এই সমালোচনায় মহারাজের ক্রুদ্ধ প্রাইভেট সেক্রেটারীর আসর থেকে উঠে যাওয়াটা এখনো আমার চোখে ভাসছে।

মুকুন্দদাসের উদাত্ত কণ্ঠে উত্তেজনার পরিমাণ কম ছিল না, কেননা তিনি ছিলেন একজন প্রচারক; কিন্তু সেই কণ্ঠ আবেগেও বিগলিত হত, কাতরতায় আকুল হত—আবার খুশিতে, রসিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে আছে একটি গান, যাতে তাঁর কণ্ঠে নানারকম উচ্ছ্বাস ফুটে উঠত। এ গানটিও তাঁর "পল্লীসেবা"র অন্তর্ভুক্ত।

সাধে কি আর হচ্ছ রাজি
তোমায় রাজি করেছে
সেদিনই জানি ধরবে চরকা
যেদিন গিন্নী ধরেছে।
মায়ের রান্না যেমন তেমন
বোনের রান্না ছাই
গিন্নী যেদিন রাঁধেন সেদিন
অমৃতের মতন খাই॥
এই যে দেশের কথা রাজেন
সেই দেশেরই তো তুমি
তোমার দোষ নয় দেশের হাওয়া
ঐ জায়গায়ই গোল বেধেছে॥
তাই মুকুন্দের কান্নাকাটি আজ
সকল গিন্নীর পায়ে ধরা
তোমরা যদি ধরতে চরকা মা
পঁচিশ জনও শতকরা
তবে বাবুরা পেতেন পথটা
উঠে যেত এই দেশটা
আমিও বলতাম বুক ফুলিয়ে
বাংলার সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে॥

কর্মক্ষেত্র অভিনয়ে 'এডিটার'দের নিয়ে তীব্র শ্লেষাত্মক গান বেঁধেছিলেন—

এডিটার খোঁজ রাখে কজনার
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে
নাম ছাপে সে দুচার জনার।
নামটি যার টাইটেল যুক্ত
লেখনীটি সেথায় মুক্ত
তা বই লেখার উপযুক্ত আছে কি বা তাঁহার।
রামা আজ দিল্লী যাবেন
শ্যামা যাবেন কাছাড়
স্টারে নাচবেন কুসুমকুমারী
আ মরি খবরের বাহার
এ দেশের এডিটার যত
বুঝেনে তাঁদের দায়িত্ব কত
লেখায় তারা ঢালত আগুন
আসন নিত নেতার।
দেশের সেবক উঠত মেতে
জয় দিয়ে বিধাতার।
তারা ফেলত ছিঁড়ে বাঁধন ছাদন
মুক্ত তারা হত আবার।

প্রতিটি শ্লেষ ফুটিয়ে তোলবার আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল তাঁর কণ্ঠে।

মুকুন্দদাস হুজুগের প্রশ্রয় দেন নি। তিনি ছিলেন গঠনমূলক কর্মী। তাঁর প্রতিটি অভিনয়ে তিনি গড়বার পরিকল্পনা করেছেন, ভাঙবার নয়। সমাজের প্রায় প্রতিটি বিসদৃশ দিক তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং কিভাবে সেগুলির সংস্কার সাধন করা যায়, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার পরিচয় তাঁর অভিনয়ে পাওয়া যায়। বহু রাজনীতিক নেতার বক্তৃতা শুনেছি—তাঁদের একটা কথাও মনে নেই; কেননা সে সব বক্তৃতায় তরল উত্তেজনা টগবগ করে ফুটে উঠত এবং তা বাষ্পের আকারেই মিলিয়ে যেত; কিন্তু মুকুন্দদাসকে আজও ভুলতে পারি নি—কেননা যে লোক আত্ম-সমালোচনার প্রেরণা দেয়, তাকে ভোলা যায় না। তাঁর গানকেও ভুলতে পারি নি; কেননা সঞ্জীবনীর মন্ত্র তাঁর কণ্ঠে ছিল এবং তা দিয়ে তিনি প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

মুকুন্দদাস জন্মেছিলেন বিক্রমপুরের বানারি গ্রামে—১২৮৫ সালে। তাঁর আসল নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে; কিন্তু তিনি সাধারণ্যে মুকুন্দদাস নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বরিশালের বরেণ্য নেতা অশ্বিনী দত্তের বিশেষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে তিনি যাত্রাগানে ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করবার ব্রত গ্রহণ করেন। ফুলার সাহেবকে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। "মাতৃপূজা" নাকি তাঁর প্রথম প্রকাশ্য অভিনয়। তাঁর অভিনয়ে রাজদ্রোহের ইঙ্গিত পেয়ে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। আড়াই বৎসর তাঁকে জেলখানায় ঘানি টানতে হয়েছিল। কারাবাসকালে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। জেল থেকে বেরিয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে আবার তিনি অভিনয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আট দশটি অভিনয় রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে কর্মক্ষেত্র, পল্লীসেবা, সমাজ এবং ব্রহ্মচারিণী বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ছাড়া মাতৃপূজা, পথ, সাথী—এই তিনটি অভিনয়েরও সমাদর হয়েছিল। তাঁর সবগুলি রচনা যথাযথভাবে একত্রে পাওয়া এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে। কোন কোন ছাপা বইতে মুকুন্দদাসের লেখার অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে দেখেছি। ১৩৪১ সালে বৈশাখ মাসে তিনি অভিনয় উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন। আসরে অভিনয়ের মাঝখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ চিরনীরব হয়ে যায়। বরিশালে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তার নাম আনন্দময়ীর আশ্রম।

এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে আজ আমরা ভুলে গেছি বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীতের কোন রেকর্ড নেই। তাঁর কয়েকটি গান সম্ভবত কোন কোন শিল্পী রেকর্ড করেছেন। তাঁর জীবনের বিস্তারিত ইতিবৃত্তও পাওয়া যায় না। যদিও জীবিতকালে তিনি কম গৌরব অর্জন করেন নি। এযুগে তাঁর পরিচয়ের ক্ষীণ স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নেই।

সন্তোষকুমার ঘোষ
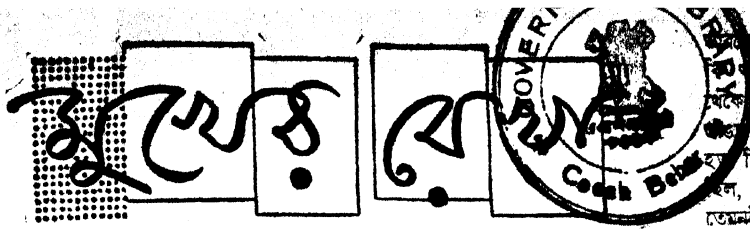
৩২

সৌরেশ সৌরকে ফিরে যেতে বললেন। অনেক দূর তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, এবার যাও। অনেক কথাই তোমাকে এতক্ষণ ধরে বলেছি, কথা বলেছ তুমিও, এখন আমি একটু একলা থাকি। আমাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দাও।

ছোট্ট টুলু কখ'ন ঘুমিয়ে পড়েছে, সৌর তোমার চোখে ঘুম নেই কেন। আমি এখন যে-কথা বলব, নিজের সঙ্গেই বলব। সৌর, তোমার বয়স হয়নি, তুমি সে-কথা বুঝবে না। সাক্ষী রেখে তা বলাও যায় না 'আমি আমাকে নিয়ে থাকব, কথাটা হয়ত আত্মরতির মত শোনাক—শোনাক না।'

আবার এ-ও বলতে পারি, আমি এই রাতটাকে নিয়ে কিছু সময় কাটাব। এতক্ষণ ওকে দূরে রেখেছি, বসে বসে ও বুঝি ক্লান্ত হয়ে গেল, এবার এই রাতকে কাছে ডেকে নিই। নইলে সময় হয়ে এসেছে, হতাশ হয়ে এই রাত হয়ত আমাকে ছেড়ে যাবে। আমি তখন কী নিয়ে থাকব। আমি কি থাকব!

ওই শোন, অস্থির হয়ে টিকটিকিটা ডেকে উঠল। এতক্ষণ ও অপেক্ষা করছিল। সামনের মাঠ-পাড়ে নীলাভ গাছের সারি একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। টকটক-করা ঘড়িটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। আমার কাছে ওদেরও ত কিছু দাবি আছে।

সৌর, তুমি যাও।

নিরুদ্দেশ হয়ে যে গিয়েছিল, সে সৌর। দশ-বারো বছর পরে ফিরে এল যে, সে সৌরেশ। তাকে সহসা কেউ চিনতে পারেনি। তার মাথায় টুপি—চুল নয়, চুলের বিরলতা ঢেকে রেখেছিল। তার চোয়ালের চামড়া আরও খড়খড়ে, রঙ আরও তামাটে। নাকটা আর বেশী উঁচু নীচু হয়নি বটে, কিন্তু নাকের ঠিক পাশেই একটা কাটা দাগ জুটেছিল। কয়েকটা মিলিয়ে-আসা বসন্তের চিহ্ন কতগুলো বছর কেটে গেছে তাই বলছিল। গালের হাড়ে একটু ঔদ্ধত্য ফুটেছিল, আর চিবুকের ছাঁদ, ঠোঁটের ভঙ্গি মিলিয়ে ঈষৎ-কঠিন - মানসের ইশারা দিচ্ছিল।

কেউ চিনতে পারেনি।

ব্যাগ নামিয়ে রেখে সৌরেশ টুপি খুললেন, পা ছুঁয়ে যখন প্রণাম করলেন, পিসিমা তখনও তাকিয়ে ছিলেন।

"চিনতে পারছ না?" সৌরেশের স্বরও মেঘ-মেঘ, ঠিক আগের মত নেই।

কিন্তু পিসিমা হেই সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "ওমা, টুলু, তুই!" অমনিই অনেকগুলো বছর যেন নিমেষে অন্তর্হিত হল, সৌরেশ লজ্জিত হয়ে তাকালেন নিজের দিকে, টুলুকে কি তবে অমনই ভিতরে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি, আমি কি ছেলেধরা?

আরও অনেকে ভিড় করে এসেছিল, দেখছিল, ফিসফিস করে কথা বলছিল, তাদের কাউকে সৌরেশ চিনলেন না। এরা কেউ কি সেদিন ছিল, অন্য কারও মধ্যে ছিল, অন্য কেউ হয়ে ছিল? মনে পড়ে না ত। কার কোলে একটা বাচ্চা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল, সৌরেশ হাত বাড়াতেই একটি ছেলে পিছিয়ে গেল। এরা কেউ সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীতেই হয়ত আসেনি। আর ওই যে কিশোরী মেয়েটি, সৌরেশের চোখে চোখ পড়াতেই যে লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরাল, সেদিন ও কতটুকু ছিল?

ব্যাগ খুলে সৌরেশ বিস্কুট বের করলেন, আর মিষ্টির হাঁড়ি ত বাইরেই ছিল।

সৌরেশ থেমে উঠেছিলেন। ওরা কী দেখছে, ব্যাগটাকে, না আমাকে, না মিষ্টির এই ভাঁড়টাকে। কোনটাকে নিয়ে ওদের কৌতূহল বেশী? মিষ্টি ত কেউ ছুঁলে না—এ-সব পশ্চিমা মিষ্টি ওরা কেউ খায়নি, তাই সন্দিগ্ধ, সৌরেশ ভাবলেন, তাই ওরা নখ দিয়ে দানাগুলো শুধু খুঁটে খুঁটে দেখছে, মুখে তুলছে না।

ব্যাগের ভিতরে কী আছে তাই দেখাতেই সৌরেশ যেন সেটাকে খুলে পায়জামা, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি বের করলেন।

না, ওরা তা-ও দেখছে না ত, সৌরেশ ভাবলেন, তবে ওদের একাগ্র লক্ষ্যের বস্তু কী আমি? আমি কেন? না, অতীত থেকে উঠে এসেছি। জাল ফেলে বড় মাছ তুললেও ওরা এইরকমই বিস্মিত হয়ে ঘিরে ধরত, কেননা, মাছটা জলের তলায় ছিল, তাকে আগে দেখা যায়নি। আমিও তেমনই—অতীতের জল থেকে উঠে এসে বর্তমানের ঘাটে দাঁড়ালাম। যে-অতীত ওরা চোখে দেখেনি, শুধু তার দু' একটা ঘটনার কথা শুনেছে, ওদের কাছে আমি সেই

অতীতের প্রতীক। কেন? সে-সময়ের আরও ত কতজন রয়েছে, কিন্তু তারা ওদেরই চোখের সামনে একটু-একটু করে বদলে গেছে বলে তারা সেকালের অংশ হতে পারেনি, এই শিশুদের কাছে আমিই প্রথম অতীতটাকে টেনে এনে হাজির করলাম। আসলে ছিলুম না বলেই এত পুরনো লাগছে, নইলে সময়ের মাপে কত আর—দশ-বারো বছরের বেশী ত না! ওদের নিজেদের বয়সই ত ওই।

আবার মজা এই, সৌরেশ বিচার করে দেখলেন, ওদের কাছে আমি যেমন সাবেক কালটুকু নিয়ে এলাম, আমার চোখ দিয়ে যদি দেখি, তবে কিন্তু এই ফিরে-আসা রূপ পাবে। আমি আমার বর্তমান থেকে আমার অতীতে ফিরে এসেছি। এই বাড়ি, এর চুন-বালি, কাঠের হাতল-দেওয়া সিঁড়ি, নোনা গন্ধ আর উই-খাওয়া কড়িকাঠ, দেওয়ালের সিঁদুরের ছোপ-ছোপ দাগ—এ-সবই আমার চেনা, এই সবই ত আমার সেকাল।

সৌরেশ খেতে বসেছিলেন, পিসিমা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

"খুব রোগা হয়ে গেছিস।"

"তুমিও ত বুড়ো হয়ে পড়েছ।"

"তাই। কম দিন ত হল না। পনের বছর, না?"

"না। এগার।"

মুখে গ্রাস তুলছিলেন সৌরেশ, ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছিলেন। স্নান করে এসে শরীর স্নিগ্ধ, চুলগুলোও তেমন কটা নয়, অনেক রুক্ষতা যেন ঝরে পড়েছে।

"হ্যাঁ, এগারোই ত। সেই যে সেবার—" পিসিমা মনে মনে অন্য কয়েকটা ঘটনাকে পাশে রেখে হিসাব মিলিয়ে নিলেন—কোন জন্ম, বিবাহ বা মৃত্যু—সেবারই ত তুই গেলি।"

একে একে এ-পরিবারের আরও অনেকের গল্প করলেন পিসিমা। কে পাশ করে ভাল চাকরি করছে, কার বিয়ে হয়েছে অনেক টাকা পণ নিয়ে কিন্তু বউ পছন্দ হয়নি; কার বউ সুন্দরী কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব। পাড়ার ধিঙ্গি হয়ে-ওঠা মেয়েদের কথাও বাদ দিলেন না।

সৌরেশ শুনছিলেন, সব হয়ত শুনছিলেন না। অথবা একটা খবরের জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন।

"এখন এখানেই থাকবি?"

"এখানে—মানে কলকাতায়। বাসা খুঁজে নিয়ে চলে যাব। বদলি হয়ে এসেছি। তুমি জান, পিসিমা, আমি আজকাল চাকরি করি।"

"ভাল চাকরি?"

"চলে যায়।"

"তুই ত লিখিসও। তোর কত লেখা বেরোয়!"

"তুমি পড়?"

"পড়ি কই আর, ওরা বলাবলি করে, শুনি। আমার চশমাটা বদলে দিবি টুকু, তোর সব লেখা তা-হলে পড়তে পারি।"

সৌরেশ বললেন, "দেব।"

এমন অস্বাভাবিকভাবে খুশি হয়ে পিসিমা বলে উঠলেন 'দিবি?'—যে সৌরেশের খটকা লাগল। চশমা বদলে দে। তোর লেখা পড়ব। প্রার্থনা আর প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয়টা কি ঘুচবে?

অনেক পরে অনেক সংকোচ জয় করে সৌরেশ বলতে পেরেছিলেন, "পিসিমা সতী কোথায়?"

"কোথায় আবার, এখানেই। হতভাগী

কোন্‌খানে যাবে। আছে বুঝি কোন একটা ঘরে। ও লুকিয়েই থাকে।”

সৌরেশের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। আছে, সতী এই বাড়িতেই কোথাও আছে, ছোট এই খবরটুকু সৌরেশকে গ্রাস করে ফেলছিল। তাই লজ্জা দ্বিধা জয় করে সৌরেশ বলে ফেললেন, “পিসিমা, সতীর সঙ্গে আমি দেখা করব।”

*

“এস।”

দরজা বন্ধ করে দিতেই ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, সতীকে প্রথমে দেখা যায়নি।

“এস”—এই ডাকটুকুকে লক্ষ্য করে সৌরেশ এগিয়ে গেলেন।

জানালার শিক ধরে যে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই সতী। রুক্ষ চুল, কৃশ, বিশীর্ণ—কিন্তু সৌরেশ ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ঠাহর করতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

“এস”, সতী বলল আবার। “ভয় নেই, আমি আর পাগল নেই, সেরে গেছি।”

“কী খুঁজছ? তোমার চিঠি? না সে নেই। আসেনি।”

“আসেনি?” প্রতিধ্বনি করতে গিয়েও সৌরেশের গলা কাঁপল।

“না। আমাকে পাগল বলত। আমাকে ওরা দিত কই?” সতীর গলা ধর-ধর, সেটা ঢাকতেই সে যেন চাপা গলায় হেসে উঠতে গেল।—“তাই বল, এলে ও কারো নজরে পড়ত কিনা। মা পাগল, বাপ ফেরার।”

সৌরেশ জানালা অবধি এগিয়ে এসেছিলেন। মুখের একাংশে আলো পড়েছিল। সৌরেশ হাত বাড়িয়ে সতীর কপাল থেকে রুক্ষ দু-একগাছি চুল পিছনে ঠেলে দিচ্ছিলেন। সতী সরেনি। সতী বাধাও দিচ্ছিল। ‘আজও তোমাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না’ সৌরেশ বলছিলেন অভিযোগের সুরে। ‘আমি পাচ্ছি’, সতী বলল মৃদু গলায়, “তোমার কপালের রগ বেরিয়েছে, তোমার কণ্ঠার হাড় উঁচু, তুমি অনেক বদলে গিয়েছ।”

“আমার চেহারা?”

সতী বললে, “তুমি।”

অথচ সৌরেশ এ-কথা শুনেও বললেন, “তুমি তা-ই আছ।”

পিসিমা অবাক হয়েছিলেন। সতীকে বিয়ে করবি বলিস কী তুই। ওর অনেক বয়স জানিস?

“জানি। অনেক বয়স আমারও।”

“ওর আর কী আছে?”

“যা আছে, আমার কাছে তাই ঢের।”

“ওর মাথায় ছিট ছিল জানিস? রোগটা যদি আবার দেখা দেয়?”

“দিক। ও আবার সারবে।”

“আর”—পিসিমা এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, “ওর জীবনের সব ঘটনা জানিস?”

“জানি। পিসিমা, আমার কিছুতে আপত্তি নেই।”

*

[‘দিনান্তলিপি’ থেকে: প্রথম প্রথম নেহাত মন্দও লাগেনি। দেখলাম, সব ভাঙাই জোড়া লাগে, দাগ হয়ত একটু থাকে, তাকে দেখাও যায় না। সেই আমি, যার নিরুদ্দেশ জীবনের প্রথম কয়েক বছর পথে পথে কেটেছে, ঠিকাদারের আড়কাঠি হয়ে যে গভীর বনে কাটিয়েছিল দশ মাস, পাথরের কোয়্যারিতে ঝুপড়িতে রোদে শীতে বর্ষায় মাসের পর মাস কাটাতে যার বাধেনি। সে আবার ঘর বাঁধল, আশ্চর্য। হয়ত বাঁধতে হবে, তার বিধিলিপি এই ছিল। সতী যে আমারই প্রতীক্ষা করে ছিল।

মন্দ লাগেনি সতীকে—চেলিতে, চন্দনে, ফুলের সাজে, অলংকারে, আর মালায়। ও যে অকস্মাৎ পরম রূপবতী হয়ে উঠেছিল বলতে পারব না, তবে ওকে নববধূর বেশে যেমন দেখিয়েছিল, তাকে এক কথায় বলতে পারি: [illegible]। যেমন দেখানো উচিত।

এই বছর এলাম। বারান্দায় এই [illegible] দিয়েছে সতী, [illegible] ওর হাতে দিয়ে সাজিয়েছে।

আমি মজাই পেয়েছিলাম, আমার ভালই লাগছিল। সতী নিজেই সব করত, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম। কোথায় কোন্‌ নীলামে কী মেলে, সব খবর রাখত সতী, টুকিটাকি আসবাব কিনে আনত। জিজ্ঞাসা করত, ‘ভাল হয়নি?’ আমি বলতাম, ‘খুব ভাল।’

আমি তখন হয়ত এই বারান্দায় চাল ছড়িয়ে পায়রাদের খেতে দিচ্ছি। খারাপ কিসে এই নিস্তরঙ্গ জীবন—সকালে ওঠা থেকে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা, অনেকগুলি নিয়ম আর সংযম?

ছোট্ট একটি ঘোমটা থাকত সতীর কপালে। পরিমিত, সংবৃত। সুন্দর একটি সিন্দুরের ফোঁটা ও যত্ন করে পরত। আমার ভাল লাগত। আমি দেখতাম। ছাতে অন্ধকারে যার অভিসার ছিল, এ যদিও ঠিক সে নয়, তবু তার এই রূপই বা মন্দ কী।

আমার দেশের মত লাগছিল। অকৈশোর অস্বাভাবিক জীবনের আতিশয্য দেখে যার চোখ ঝলসেছে, সে [illegible] প্রদীপের আলোয় চোখ জুড়িয়ে নিক।

সকালে [illegible] বাচ্চাটাকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যাই, ফিরে দাড়ি কামাই, স্নান সারি, অফিসে দৌড়ই। তার পর বারান্দা

আছে, ইজি চেয়ার আছে। সন্ধ্যার পর বেরনো বড় হয় না। দেখেছি, সতী ওতে বড় খুঁত খুঁত করে।

সতী আমাকে ঘর চিনিয়েছে। এই ঘরের ইঁট-চুন-সুরকির দেয়াল গড়েছে কোন মিস্ত্রী, কিন্তু এই দেয়ালের ভিতরে অদৃশ্য আর একটা দেয়াল আছে, সেই দেয়াল সতীর রচনা। ঘাসে ঘাসে ফড়িং ওড়ে, অনেকে ছুটে ছুটে তাদের ধরে। কাচের বয়মে রাখে। সতীও আমাকে ধরে, এই ঘরে পুরেছে।

সতী একবারই ছুটেছিল, আমাকে ধরতে। একবারই সে নির্লজ্জ হয়েছিল। আমার বাইরের ঝোঁককে ভিতরে ঘুরিয়ে সে শান্ত হয়ে গেছে। সতী শান্ত, সুন্দর, নম্র, ভীরু। সতী এখন বধূ, অনায়াসেই লজ্জিত। সতী গর্বিতও। সতী মা হবে। একবার হতে গিয়েও পারেনি, তাই আবার হতে চেয়েছে। হতে চলেছে। সতীর ইচ্ছাকে আমি বাধা দিইনি। সতীকে আমি বাধা দিতে চাই না।]

এই পর্যন্ত লিখে, সুখে, ঔদাস্যে সৌরেশ হয়ত হাই তুলেছিলেন।

[উপসংহার]

না, পুরনো কান্না নয়, নতুন কান্না।

সৌরেশ চমকে উঠলেন, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে একটি ভয়, একটি অনিচ্ছা, একটি অসহায়তা ভূমিষ্ঠ হল।

এই ভয় একদিন সাহসে পরিণত হবে, অনিচ্ছার রূপান্তর ঘটবে তীব্র জীবন-তৃষ্ণায়, অসহায়তা পরিণত হবে একটা প্রতিবাদে আর একটা জ্বালায়।

তারপর আবার সাহস মিলিয়ে যাবে, প্রতিবাদ থামবে, আর জ্বালা জুড়িয়ে জীবন হবে নিস্তরঙ্গ দীঘি।

সৌরেশ যা হয়েছেন।

সৌরেশ, যা হয়েছেন, এই শিশুও তাই হবে, করকোষ্ঠী বিচার না করেই সৌরেশ বলে দিতে পারেন—এখনই। নবজাতকের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

আমরা মৃত্যু থেকে উঠে আসি বলেই জন্মের মুহূর্তে অস্বস্তি বোধ করি। জলের মাছ ডাঙায় পড়লে যেমন করে। তারপর জীবনটা সহজ আর স্বাভাবিক যখন হয়ে ওঠে, তখন মৃত্যুর মধ্যে ফিরে যেতে ভয় পাই। আলোয় থেকে আলোই অভ্যস্ত হয়, অন্ধকারে থেকে থেকে অন্ধকার।

আমাকে এই ভয় জয় করতে হবে,—সৌরেশ উচ্চারণ করলেন স্পষ্টস্বরে, যেন অনুপস্থিত, অন্তত অদৃশ্য, কোন শ্রোতাকে শোনালেন।

সতী চুপ করেছে। তার কান্না করুণ গানের মত এক সুরে বাজছিল, এখন থেমেছে। এতক্ষণ যেন অনেক দূরে, অন্ধকারে, কয়েকটি তারে সে অনিশ্চিত হাতে ছড় টানছিল, ফরমাস পুরল, সে থামল।

সে ঘুমিয়ে পড়ল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সৌরেশ বারান্দা পার হয়ে গেলেন। তাঁর ভয় করছিল; এ-ভয় স্নায়ুজ।

বন্ধ দরজায় সৌরেশ টোকা দিলেন। দরজা খুলল। ফাঁক পেয়েই বন্দী খানিকটা আলো ঠিকরে পড়ল বাইরে। নতুন কান্নাটা এখন আরও স্পষ্ট। ভিতরটা আবছায়া দেখা যায়। সতীর বুক অবধি চাদরে ঢাকা, চোখ দুটি নিমীলিত, ছোট বুকের ছোট ছোট ঢেউ। ঠোঁটের কোণে কষ-কষ রক্তের দাগ। মুখ পান্ডুর।

পিসিমা এসে দরজা আড়াল করে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখেই হয়ত ভয় পেয়ে আলোর রেখাগুলো পিছিয়ে ফের ঘরে ঢুকল।

"খবর কী?" সৌরেশ জিজ্ঞাসা করলেন ফিসফিস করে। পিসিমা বললেন, "খবর ভাল। ছেলে।"

সৌরেশ তবু বোবা হয়ে, কালা হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন।

"দেখতে তোর মতই হবে" পিসিমা আস্তে আস্তে বললেন। ওর কাঁধে হাত রাখলেন।—"বংশের ধারাটা রইল।"

আর ওই কথাটায় সৌরেশ চমকে উঠলেন। মাথা হেঁট করে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। কনকনে হাওয়া লাগল মুখে-চোখে। সৌরেশের মনে হল, দম বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটবে।

ঘটুক না, ক্ষতি কী। বংশের ধারা ত থাকবে। বৃত্ত সম্পূর্ণ। মৃত্যু ত সতীরও

ঘটেছে। এইমাত্র ও-ঘরে তার শান্ত-শয়ান শব দেখে এলাম। এর পর যে-সত্তা উঠবে, চলাফেরা করবে, সে অন্য একজন। জননী, ধাত্রী।

এই সন্তান সৌরেশ চাননি। সত্তা চেয়েছিল।

তিতির পাখির মত যে স্মৃতির ঝাঁক উড়ে এসে এতক্ষণ তাঁকে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল, সৌরেশ তাদের বিদায় দিলেন। তোমরা যাও। আমি একটু একা হব। আমার নিজের সংগে একটা বোঝাপড়া বাকী আছে।

যেখানে সৌরেশ এসে থেমেছেন, ওই শিশু সেখান থেকে চলবে। ওই শিশু কে? এইমাত্র যে হল। যে দেখতে তাঁর মত, পিসিমা বলেছেন।

"ও আমার মত" সৌরেশ অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন কিন্তু আমি কার মত?

আর সেই মুহূর্তে সৌরেশ নিজের প্রতি, জীবনের প্রতি তীব্র একটা ধিক্কার বোধ করলেন।

আমি কার মত? এই প্রশ্নের উত্তর জানতেই ত আজ সারা রাত এখানে কাটিয়ে দিলেন। উত্তর পাননি।

যে ধ্রুবতারা আকাশে জ্বলছিল, সৌরেশ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কার মত? আমার পিতৃ-পিতামহের মত? তবে আমি হলাম কেন। মুহূর্ত একই যদি হবে, তবে আমার অর্থ কী?'

ধ্রুবতারা উত্তর দিল না, এখন সময়কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সৌরেশ বললেন, বুঝেছি। বিন্দুমাত্র অর্থ নেই। আমরা একই জায়গায় থাকি। তুমিই শুধু বদলাও। এক-একবার এক-একজনকে চাও। কিংবা আলাদা-আলাদা মুখোস পরিয়ে একই মানুষকে অনেক মানুষ করে তোল।'

বৃথাই আজ উজান স্রোত ঠেলে ঠেলে ক্লান্ত হয়েছেন সৌরেশ। মিছিমিছি ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন টুলুকে। মনো-বিজ্ঞানী ডাক্তারের মত সৌরকে জেরায় জেরায় বিব্রত করেছেন ওদের দুজনের কেউ ত সৌরেশ নয়। যদিও সৌরেশ ওদেরই পরিণতি। "ওদের পরিণতি আমি, কিন্তু আমার পরিণতি কী?" সৌরেশ এখন আর কাকে পাবেন, তাই জিজ্ঞাসা করলেন নিজেকে, সেই প্রশ্ন বিষাক্ত একটা পিঁপড়ের মত সৌরেশকে দংশন করল। বিবর্ণ, পাংশু সৌরেশ কাঁপা কাঁপা হাতে দিনান্তলিপির শেষ অংশ লিখতে বসলেন।

['তিনবার লিখেছি আমি ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত। ক্লান্তি এই শেষ রাতে আমার সত্তার সওয়ার হয়েছে; সত্তা ওকে ফেলে দিতে চায়, ক্লান্তি পড়ে না। আমার পরিণতি কী, একটু আগে জিজ্ঞাসা করেছি নিজেকে, কিন্তু এখন জানি, এই ক্লান্তির পরিণতি মৃত্যু-ইচ্ছা। সে আমার সত্তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এক গহ্বরে ফেলে দিতে চাইছে।

'এ-লেখা এর পরে যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এই বিচিত্র ইচ্ছাটির কথা জেনে অবাক হবেন। হঠাৎ আসেনি। এই ইচ্ছা মনের গোকুলে গোপনে বেড়েছে।

যুক্তি দিয়ে একে বোঝান যাবে না। প্রায়-প্রৌঢ় যে-পুরুষ অনেক লড়াই করে বেঁচে এল, সে এখন জানে-প্রাণে মরতে চায় কেন। আপাত-দৃষ্টিতে তার এই মুহূর্ত ত শান্তির—জীবনের ভুল-ভ্রান্তি সব চুকে গেছে। তার এই মুহূর্ত পরিপূর্ণ, বৈষয়িক অর্থে নির্ভাবনা; পুন্নাম নরকের ভয়মুক্ত; প্রসবে শ্রান্ত কিন্তু নির্ভার, সুখ-সুপ্ত পত্নী—তার এবারকার মাতৃত্বে লোক-লজ্জা নেই। তবে?

'এই তবে-র জবাব আমি ত জানি না। ঘুম পায় কেন, এই প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে? পায় বলেই পায়। কিংবা অবসাদে। অবসাদে যেমন ঘুম পায়, আমাকেও তেমনই মৃত্যুতে পেয়েছে।

"অবসাদ সাপের বিষের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে আমার রগে-রগে, আমার রক্তের কণায় কণায় ঢলে পড়ব।"]

এইটুকু লিখে সৌরেশ আর এগোননি, বড় বড় হরফে একটি উদ্ধৃতিমাত্র দিয়ে-ছিলেন—"নাউ মোর দ্যান এভার সীমস্
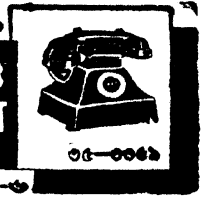
ইট রিচ্ টু ডাই"। কাগজের বাকী অংশ সাদা ছিল।

সৌরেশ লুকোন একটা শিশি বের করেছিলেন দেরাজ থেকে; লেবেলটা পড়ে নিয়ে শক্ত মুঠোয় ধরে সেই শিশিটাকেই উদ্দেশ করে বলছিলেন, "আত্মহত্যা কি আমার রক্তে? আমার মা-বাবা দুজনেই আত্মহত্যা করেছিলেন মনে পড়ছে। তাঁদের মরবার কারণ ছিল একটা কিছু নিশ্চয়ই। এখন মনে পড়ছে না। হয়ত কোন কারণই ছিল না। আসলে মরবার কারণ থাকে বলে ত লোকে মরে না, বাঁচবার কারণ থাকে না বলেই মরে। আমার বাঁচবার কারণ নেই। আমি তাই মরব।'

হাতের শিশিটা থর থর করে কেঁপে উঠল, ঈষৎ পানের ফলে কণ্ঠস্বর যেমন জড়িত হয়, সেই রকম কণ্ঠে সৌরেশ বলে গেলেন, 'আশার পূরণেও নৈরাশ্য আসে। যুধিষ্ঠিরের যেমন এসেছিল। কুরুক্ষেত্রে জয়ের পর বাঁচার আর কোন হেতু তিনি খুঁজে পাননি বলেই মহাপ্রস্থানের পথ ধরেছিলেন। তাঁর আর কিছু করার ছিল না। তিনি সব পেয়েছিলেন। আমি কিছু পাইনি। আমারও কিছু করার নেই। এইখানে আমাদের মিল।

হাওয়ার ঝাপটা লেগে সৌরেশের শরীর কেঁপে গেল।—'আমি কী হতে চেয়েছিলাম? জানি না। কী হতে পেরেছি? জানি। কিছুই হতে পারিনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সৌরেশ বললেন, 'হায় রে।'

'হায় রে' সৌরেশ আবার বললেন, "আমি কয়েকটি সংস্কার আর অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। যে অভ্যাস সকালে উঠে দাড়ি কামায় (ব্রাশ ঘষে ঘষে পুঞ্জে পুঞ্জে ফেনা তৈরি করা ছাড়া যে কাজের সবটাই বিরক্তিকর), বাজারে যায়, অফিস করে, বাড়ি ফেরে। আবার সকাল, আবার বাজার। আবার অফিস, আবার বাড়ি। বাজার, অফিস। বাড়ি। তাও কি আগের মত তাড়াতাড়ি চলাফেরা করতে পারি! গর্দানে মাংস বেড়েছে, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাইতে পারি না। আর ভুঁড়ি! প্রথম যখন পেটে চর্বি জমে, ভুঁড়ি হয়, তখন এটাকে কী ঘৃণাই না করেছি। এখন গা-সহা হয়েছে। এখন ঐ ভুঁড়িটাও আমি। আমি না হলেও আমার একাংশ। এর পর আমার প্রভু হবে। এখনও তবু নড়াচড়া করতে দিচ্ছে। কিছুকাল পরে তাও দেবে না। পাকস্থলী ছাড়া দেহের কোন যন্ত্রের কোন দাবি থাকবে না। এখানে দাঁড়িয়ে সেদিনটিকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তবে কেন বাঁচব?"

কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, "ভালবাসার জন্যে", সৌরেশ চটে গিয়ে ঠক করে শিশিটা রেখে দিয়ে টেবিলে চটাস করে একটা চাপড় মারলেন। যেন "ভালবাসা" কথাটাকে মশার মত করে মারবেন। বললেন, "ফুঃ! ভালবাসা বলে কোন বস্তু আছে নাকি। সবই প্রবৃত্তি। সতী শুনলে আঘাত পাবে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা অন্য যে-কোন মেয়ের সঙ্গে হতে পারত। যে-কোন। এনিথিং ইন্ এ স্কার্ট। ছিঃ। না, সাত বছর বয়সে শিশুর যেমন দাঁত নড়ে, ভালবাসায় বিশ্বাস আমার তেমনই কবে নড়ে গিয়েছে, মনেও নেই।"

সৌরেশ বলতে শুরু করেছিলেন জোরে জোরে, কিন্তু আপনা থেকেই তাঁর গলা গাঢ় হয়ে এল—"ভালবাসায় বিশ্বাস খুইয়েছি

হলেও ত আমি মরতে চাই। ভালবাসা আমি দেখিনি, পাইনি। তবু যতদিন বয়স ছিল ততদিন ভেবেছি, ভালবাসা এখানে নেই কিন্তু অন্য কোনোখানে আছে। আমি পাইনি, ওরা পেয়েছে। আমিও একদিন পাব। এখন ত জানি কোন দিনই পাব না। আর পাবই বা কবে। বয়স নেই, সময় নেই।

"থাকলেও পেতাম না। ভালবাসাই যে নেই। যাকে ভালবাসা বলি, তা কয়েকটি গ্রন্থির ক্রিয়া, কয়েকটি স্নায়ু-পেশীর প্রতিক্রিয়া। আর কিছু নেই। কুকুর যেমন অন্য কুকুরের গন্ধ পেলে ডেকে ওঠে, সাড়া দেয়, আমাদের রক্ত মাংসও তেমনই কুকুর-স্বভাব, অন্য রক্ত মাংস কাছাকাছি পেলেই ডেকে ওঠে, সাড়া দেয়।"

দীর্ঘ স্বগতোক্তি করে সৌরেশ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, অতএব টেবিলে কনুই রেখে করতলে মুখ ঢেকে রইলেন কিছুক্ষণ। অবশেষে পিঁপড়েও শুনতে পায়, এমন গলায় বললেন, "আমি এ-সবই জেনেছি। জেনেছি বলেই ত মরতে চাই। এ-জগতে আমার শেখার আর কিছু নেই। যে ক্লাসের পড়া শেষ হয়ে গেল, সে-ক্লাসে কি কেউ সাধ করে পড়ে থাকে?"

যে-জড়তা এসেছিল তাকে ঝেড়ে ফেলবেন বলেই উঠে দাঁড়ালেন সৌরেশ, জানালার সামনে বুকের ওপর দুই হাত জড়ো করে দাঁড়ালেন। একে একে অনেক মুখ মনে পড়ে গেল, অনেক নাম, যাদের কাছে জীবনের মানে শিখে নিয়েছেন। টুকরো টুকরো শিক্ষার যোগফল আজ মৃত্যুর সাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মোহিতদা আর লতিকাদি; আর মায়া। লতা বউদি, শচীপতি, বিজন, নয়ন, পাখি আর মালা। আর সতী। নিজের মধ্যে সকলের ছাপই দেখতে পেলেন। কেউ বেপরোয়া ইচ্ছা, কেউ কামনা, কেউ অক্ষমতা, কেউ বিদ্রোহী রহস্যের প্রতীক। কেউ ভীরু, কেউ ক্রুর সমাজের বন্দী। কেউ করুণার কাঙাল, কেউ এতটুকু বাসার।

বাসনা, ভীরুতা, সাহস, লোভ, লাম্পট্য আর মোহহীনতা, নিস্পৃহতা, কাঠিন্য আর আশা, ওদের কাছ থেকে তিল-তিল নিয়েই ত সৌরেশের মন গড়ে উঠেছে!
সংগে সংগে বিতৃষ্ণায় দেহ শক্ত হল সৌরেশের। তাঁর মনও তবে তিলোত্তম, তাঁর নিজের নয়?

কোনটা তাঁর? সেটা পরখ করতেই যেন সৌরেশ আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দেহ? এই চেহারা? এ-ও তাঁর নয়। মুখের ছাঁদে আর রঙে, নাকের গড়নে আর ধরনে তাঁর মা আর বাবার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে; কে জানে, হয়ত আরও কত বিস্মৃত-সুদূর পিতৃপুরুষের। সব পরের কাছ থেকে পাওয়া আর নেওয়া। না, এই চেহারা—যে-মুখ তিনি সাবান দিয়ে ঘষেন, যে-চুল ব্রাশ করেন পরিপাটি করে, একটি একটি করে যে পিঠের ঘামাচি মারেন—তাঁর নয়।

"কিছুই আমার নয়" শিশিটার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে সৌরেশ বললেন, "না মন, না চেহারা। সব যেন চাঁদা আর চ্যারিটি। ওরা অনেকে মিলে যা তৈরি করে দিল, আমি বিনা বাক্যে তাই নিজের বলে গ্রহণ করেছি। এতক্ষণ জ্বলছিলাম, বলছিলাম সত্যিকার কিছুই পাইনি। বিশেষ কিছু হতে ত চাইনি! সাধু না, সন্ত না, কৃতী না, যশস্বী না। সামান্য যা সাধ ছিল, তাও পূর্ণ হয়নি; আমি "আমি"-ও হতে পারিনি।"

দ্রুত ব্যস্ত হাতে সৌরেশ শিশিটার ছিপি খুলতে থাকলেন

*

তবু পরদিন সকালে সৌরেশের ভূলুণ্ঠিত দেহ আবিষ্কৃত হয়নি। দিনের প্রথম কোমল রোদ সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে তাঁকে আস্তে আস্তে ঠেলছিল। উঠতে বলছিল। বিস্মিত ব্যথিত চড়ুই পাখিরা চেয়েছিল। তারাও উঠতে বলছিল। জানালার বাইরের নিম-ফুলের হঠাৎ-গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সৌরেশকে চোখ মেলতে বলছিল।

ঘুম ভেঙে সৌরেশ সবিস্ময়ে হাতের মুঠোর শিশিটার দিকে চেয়ে রইলেন। ছিপিটা দেখছি শেষ পর্যন্ত খোলা হয়নি। আমি তবে মরিনি।

"আমি মরিনি", সহসা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন সৌরেশ, আবার অবাক হয়ে ভাবলেন, "কিন্তু আমার মরবার ইচ্ছেটা মরল কখন। আমি 'আমি'-ও হতে পারিনি, এ-কথা জেনেও যদি মরে না গিয়ে থাকি, সে কি এই কারণে যে, আমি এ-ও বুঝেছিলাম; 'আমি' বলেই কিছু যখন নেই, তখন মারব কাকে। আত্মা যদি না থাকে তবে কাকে হত্যা করব। অকিঞ্চিৎকর এই শরীরটাকে? মজুরি পোষাবে না।"

ফুর ফুর করে হাওয়া এল ঘরে, টুকরো টুকরো অনেক কাগজ উড়তে থাকল। হঠাৎ পরিবেশটাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হিমে ভেজা চকচকে পাতায় পাতায় আলো নাচছে। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ। আর চাঞ্চল্য। ওদিকের ঘর থেকেও সাড়া আসছে। বারান্দায় কারা হাঁটছে। বাইরের রাস্তায় চলার উল্লাসেই একটা গাড়ি হর্ন দিল। ফিরিওয়ালা চিৎকার করে সওদা হাঁকছে। ব্রণ খুঁটতে গিয়ে কেটে গেল; সৌরেশের নখে এক ফোঁটা টকটকে রক্ত। জীবন টকটকে। এক ফোঁটা ঘাম বুকের রোমকূপ থেকে উঠে আস্তে আস্তে গেঞ্জির তলা দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। একটা নিঃশব্দ ছারপোকা হাঁটছে যেন। ঘাম ওপরের ঠোঁটে গোঁফের কিনারেও। নোনতা। জীবনের স্বাদ নোনতা। একবার ও ঘরে যাই? ওদের দেখে আসি—সতী কেমন করে বাচ্চাটাকে বুকের কাছে নিয়ে ঘুমুচ্ছে। মমতার স্তূপ। নতুন বাচ্চা। সৌরেশের মত। ও-ও কিছু হবে না। কিন্তু হয়েছে। কিছু হয় না, কিন্তু হতেই থাকে। সংসারের নিয়ম।

সন্দেহ নেই এই সংসার বড় ছোট, অপরিসর, কৃপণ। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় বাঁচা শক্ত। কিন্তু মায়া টুটিয়ে, মরাই কি সহজ! শেষ পর্যন্ত তাই আমরা আপস করি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেঁচেই চলি।

'বেঁচেই চলি," সৌরেশ অতি ধীরে উচ্চারণ করলেন, "মরে থাকি।"

সৌরেশ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনের রাস্তাটা ছোট সর্পিল গলি। খানিক গিয়ে থেমেছে। কিন্তু ওখানে যদি যাই, দেখব থামেনি, বাঁক নিয়েছে, আবার খানিক দূর অবধি গিয়েছে। আবার বাঁক। বাঁকের পর বাঁক।

"যদি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই" সৌরেশ আপন মনে বললেন, "তবে শেষ পাব না, চলতেই থাকব। দিগন্তের পারে দিগন্ত দেখব। কিন্তু থামা হবে না, কেন না কোথাও পৌঁছব না। আমরা কোথাও পৌঁছই না," সৌরেশ নিজেকে বোঝালেন, "পৌঁছনো নেই বলেই চলা আছে। চলারও অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ খোঁজা আছে।"

হাতের মুঠিতে তখনও শিশিটা ধরা ছিল। সৌরেশ সেটাকে সামনের বাগানে ছুঁড়ে দিলেন।

(সমাপ্ত)

ভারতবর্ষের জম্মু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে আপেলের চাষ হয়। আপেল চাষের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক "সঞ্জোস" নামক একরকম পোকা। এই পোকা সমগ্র বাগানের আপেলের ক্ষতিসাধন করতে পারে। সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরের "ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল" "সঞ্জোস" ধ্বংস করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ছোট্ট একরকম মৌমাছি জাতীয় পোকা এনেছেন। এই পোকাগুলি পরভোজী বিশেষ এবং এগুলি "সঞ্জোসের" ওপর ব্যবহার করতে পারলে "সঞ্জোস" ধ্বংস করা সম্ভব হবে। সুতরাং ঐ ছোট ছোট পোকাগুলিকে সঞ্জোসের ওপর নির্ভরশীল পরভোজী করা হবে। সাধারণত "সঞ্জোস" আপেল গাছের সমস্ত রস শুষে নেয় এবং এদের নষ্ট করার জন্য বর্তমানে ডিজেল তেল পিচকারি দিয়ে আপেল গাছের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে "সঞ্জোস" নষ্ট হয় বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে গাছগুলিও এই তেলে নষ্ট হয়ে যায়। আশা করা যাচ্ছে যে, যে পরভোজী পোকার সাহায্যে "সঞ্জোস" ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে গাছগুলির ক্ষতি না করে সঞ্জোস ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

*

ডাঃ বারর্চ বলেন যে, শিশুদের যদি খুব বেশী পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়ে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যবান এবং বড় করা যায় তাহলে তাদের যতদিন সাধারণ অবস্থায় বাঁচা উচিত তার চেয়ে কমদিন বাঁচবে। অবশ্য ডাঃ বারর্চ তাঁর এই নতুন তথ্য মানুষের পক্ষে কতখানি ঠিক তা বলতে পারেন না। তিনি প্রাণীদের ওপর এই নিয়ে পরীক্ষা করে ফেলেছেন। তিনি প্রাণীদের ছোট ছোট
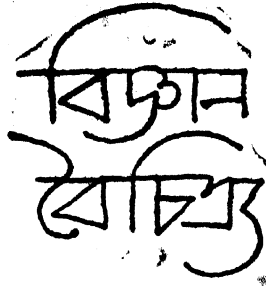
চক্রদত্ত

বাচ্চাদের কম খাইয়ে পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছতে দেরী করে দিয়ে বাঁচবার সময় বাড়িয়ে দিতে পেরেছেন। ইঁদুর সাধারণ অবস্থায় দু-বছর বাঁচে, কিন্তু ডাঃ বারর্চের পদ্ধতিতে ঐ ইঁদুর প্রায় আরো ২৭০ দিন বেশী বাঁচছে। শুয়রের বেলাও ঐ রকম ফল পাওয়া গেছে। তবে পূর্ণবয়স্ক প্রাণীদের কম খাওয়ালে তাদের বাঁচবার সময় বাড়ে না।

*

আমেরিকার "আর্মি ব্যালিস্টিক মিসিল এজেন্সির" ডাইরেক্টর ডাঃ ভন ব্রন বলেন যে, পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে একেবারে পৌঁছান যাবে না, তিন দফায় পৌঁছাতে হবে। মঙ্গল গ্রহের যাত্রিগণ যাত্রা করার আগে একটি যান মহাশূন্যে প্রথমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেটি পৃথিবীর কক্ষে পৌঁছে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকবে এবং এইভাবে ২৬০ দিন ঘোরার মত ক্ষমতা থাকবে ঐ যানটির। এদিকে মঙ্গল গ্রহের যাত্রিগণ একটি রকেটে করে পৃথিবী থেকে রওনা হয়ে ঐ যানটিতে পৌঁছানর পর আবার নতুন একটি যানে করে যাত্রা করবেন। দ্বিতীয় যানটিকে বৈজ্ঞানিকেরা "স্পেশ স্টেশন" আখ্যা দিয়েছেন এবং তৃতীয় যানটি পাখাওয়ালা গ্লাইডার বিশেষ। মঙ্গল গ্রহে পৌঁছে নামবার জন্যই ঐ ডানা দুটির প্রয়োজন। ঐ যানটি বায়ুভরে আস্তে শূন্যে ভেসে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহে পৌঁছবে। ফিরতি পথে ঐ নাবিকগুলি তাদের সঙ্গের যাবতীয় ভারি সরঞ্জামগুলি ঐ স্থানে নামিয়ে দিয়ে নিজেদের বোঝা হাল্কা করে নেবে, তাছাড়া, ওদের নিজেদের খাদ্য এবং অক্সিজেনের আধারও কিছুটা হাল্কা হয়ে যাবে। ফলে সহজেই "স্পেশ স্টেশনে" ফিরে এসে ঐ স্থান থেকে আবার রকেটে করে পৃথিবী থেকে ফিরে আসতে পারবে।

*

আজকে যদি আমাদের নতুন করে ইঞ্চির পরিমাপ শিখতে হয় তাহলে খুব অবাক হয়ে যাব কারণ কতখানিতে এক ইঞ্চি হয় এ আমরা শিশুকাল থেকেই জানি বলেই মনে করি। বস্তুত এই ইঞ্চির পরিমাপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। আমেরিকা, কানাডা এবং বৃটেনের ইঞ্চির পরিমাপে তফাৎ আছে। যদিও মাত্র এক ইঞ্চির কয়েক লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র তফাৎ তবু আজকাল এত নতুন নতুন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে যে ঐ সামান্য তফাৎটুকুর জন্য সর্বদেশসম্মত একটি নির্ধারিত যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য এই তিনটি দেশেই ইঞ্চির পরিমাপ হিসাবে একটি নির্দিষ্ট মাপ ঠিক করার কথা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে, নতুন ইঞ্চির পরিমাপ হবে—২.৫৪ সেন্টিমিটার।

*

টোকিওতে সম্প্রতি যে সিম্পোসিয়াম হয়ে গেছে তাতে মুবাইয়ামা নামে একটি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ল্যাবরেটরি এসিস্ট্যান্ট কসমিক-রে সম্বন্ধে এক নতুন আবিষ্কারের কথা বলেছেন। এতদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীতে কোথা থেকে কসমিক-রে আসে সেই প্রহেলিকাই ভেদ করতে পারেন নি। মুবাইয়ামা অঙ্কশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে তার পরিলক্ষণ ও পরিসংখ্যান কার্যের দ্বারা জানতে পেরেছেন যে, কসমিক-রে এমন কি গামা-রে ওয়েস্ট অরিওনিস নামক তারা থেকে পৃথিবীতে আসে। এই বছরের শেষে অথবা সামনের বছরের প্রথমে ওয়েস্ট অরিওনিস্ যখন সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল দেখাবে সেই সময় পৃথিবী থেকে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যন্ত্রপাতি সমেত ওয়েস্ট ওরিওনিসে পাঠিয়ে দিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বছরের অন্য অন্য দিনগুলোর মতই আজো তেমনি কাজ পড়ে আছে পদ্মর। সেই ভোর রাত্তিরে পুকুরঘাটে রেখে আসা এঁটো বাসনগুলো পড়ে রয়েছে। গরুগুলোকে সুপুরি বাগানে বেঁধে রাখা হয়েছে সেই কখন! এখনো দু' মুঠো খড় দেওয়া হয় নি। বাছুর দুটো তেমনই ডাকছে, ছেড়ে দেবার ফুরসত পায় নি। খড়-গোবর আলাদা করা হয় নি গোয়ালের।

বুড়ি মা সেই থেকে আগুনের মালসা সামনে রেখে তামাক টানছে তো টানছেই। এদিকে উঠোনে ঝাঁট পড়ে নি। কি জ্বালা! হাঁস পায়রাগুলো এখনো ছাড়া পায় নি। একরকম ছুটতে ছুটতে গিয়ে পদ্ম হাঁসের ঘরটা খুলে দিল—হাঁসজোড়া বেরিয়ে যেতেই, খোয়াড়ের ভেতর হাত চালিয়ে দিল। ওমা শুধু একটি ডিম! আর? পদ্ম গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "তোমার সোহাগীটা আজো ফাঁকি দিলে গো। এই নিয়ে তিন দিন।" ওদিক থেকে সাড়া পাবার আশায় কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে আবার চেঁচিয়ে উঠল—"হাতে পায়ে ঝিম ধরেছে জানি, কানেও কালা হল নাকি?"

পদ্মর মা জ্ঞানদাবুড়ি হুঁকোটাকে আরো কায়দা করে ধরে নড়ে চড়ে বসল। পদ্ম দরজার কাছে এগিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। বুড়ির হুঁকোটানার ধরন দেখে বললে—"মরণ! তিনকাল পেরিয়েও হুঁকোটানার কায়দা দেখ। চোখ বের করে টানছে।"

দেখবার মত লোক কেউই সেখানে ছিল না। ভেতরের উঠোনের মাদী কুত্তিটা ছাইগাদায় একবার নড়ে চড়ে চোখ মেলে আবার চোখ বুজল। হাঁস দুটো ছেড়ে দেবার পর থেকেই প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরছে তো ঘুরছেই। তবে হ্যাঁ, দেখেছে মেনী বেড়ালটা। বসেছিল বুড়ির মুখোমুখী, সমুখের পা দু'খানায় চাপ দিয়ে। ধোঁয়া গিলছিল হয়তো!

পদ্ম জোরে একটা চাপড় বসিয়ে দিলে বেড়ালটার পিঠে। —"পোড়ার মুখী! কথা গিলছে হা করে। মর! মর! মুখে ঝাঁটা, ভর সকালে।"

জ্ঞানদা বুড়ি আর চুপ করে থাকতে পারলে না। হুঁকো নামিয়ে খেঁকিয়ে উঠল—ভোর থেকে তোর হল কি লা? মুখে যে মন্তর ঝরছে।"

—ঝরবে না?

—কেন, হয়েছেটা কি? কী এমন রাজ কাজ পড়েছে বেগম বাঁদীর?

—মুখ সামলে কথা কয়ো মা। দু'বেলা আণ্ডে পুণ্ডে গেলায় কারো কমতি নেই। কাজ একলা করব কেন? কি দায় আমার শুনি?

জ্ঞানদা চেঁচাতে চেঁচাতে হুঁকো হাতেই উঠে দাঁড়াল—ও লা রাজার ঝি, দায় আমারও বা কিসের শুনি? সাত সকালে দায় দেখাচ্ছিস পোড়ারমুখী।

—বছরের দিনে তুমি গাল দিও না বলছি।

—দেবো না?

মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। উঠোনে এক ঝাঁক গলা শোনা গেল। —কই গো পদ্মর মা, ও পদ্ম? বাড়িতে কেউ নেই নাকি? ও পদ্মর মা...ও পদ্ম...

পদ্মর ইচ্ছে হলো বলে—যত সব কালা নিয়ে হলো জ্বালা। অমন পাড়া কাঁপানো বুড়ির কথাও কানে যায় নি, কেমন কান তোমাদের? পদ্ম পড়িমড়ি পুকুর ঘাটে ছুটল। ঘটি ধুয়ে বাছুর ছেড়ে দিতে হবে। কচি বাচ্চা দুটোকে এখনো ছেড়ে দেয়া হয় নি। গলা নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে একেবারে।

বছরের প্রথম দিনে মেলা বসে ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের। পদ্মদের ভিটের লাগোয়া সুপুরির বাগানের পাশের বিঘেকয় জমির পরেই মেলা। এ উপলক্ষ্যে কুটুম আসে। সারা বছর যারা খবরটি নেয় না, যাদের সাথে পদ্মদের রক্তের সম্পর্ক খুঁজলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ; সেই লতাপাতার কুটুমদেরও আসার কমতি নেই।

একদিনের মেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রান্নাঘরেই ফুরোয় পদ্মর। ঘরের

পাশের মেলাটি একটু ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখবে সে ফুরসতও নেই।

ফুলবিউর দিন। ফুল তুলে, আম নিমের পাতা দিয়ে মালা গেঁথে দরজায় দরজায় টাঙিয়ে দিয়েছে। ঘর রান্নাঘর লেপে পুছে পরিষ্কার করেছে। বাক্স প্যাটরার গায়ে সিঁদুর চন্দনের ফোঁটা দিয়েছে। কলার খোল কেটে গরুগুলোর মাথার মুকুট তৈরী করেছে. সাজিয়েছে ফুল দিয়ে। গিলে-হলুদ বেটে রেখেছে। তা ফাঁকি একটু দিয়েছে বৈ কি! দিয়েছে, যখন ছাগল আর ছাগলছানাটাকে বাঁধতে গিয়েছিল কলাবাগানে. তখন ছাগল ছানাটাকে নিয়ে আদর করেছে; বুকে নিয়ে চুমু খেয়েছে. গালে ঠোনা মেরেছে। তাছাড়া পা দুটো এক করে দাঁড়িয়েছে কোথায়?

বাছুর ছেড়ে দিয়ে দুধের ঘটিটা শিকেয় টাঙিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাসন মাজতে বসল পদ্ম। তারপরে জল তুলল তিন কলসী। পায়রার খোপগুলোর দরজা খুলে দিল। এক আঁটি খড় ছড়িয়ে দিল গরু-গুলোর সামনে। একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে কোমরে আঁচল এঁটে লেগে গেল উঠোন ঝাঁট দিতে।

ওদিকের দাওয়ায় কলকলানির অন্ত নেই। পদ্মর কানে যায় না কিছুই। এক্ষুনি তরকারী কুটতে হবে. উনুনে আগুন দিয়ে চড়িয়ে দিতে হবে ডালের কড়াই। এক কাঁড়ি হলুদ লঙ্কা বাটার পরেও দম ফেলবার ফাঁক পাবে না সে। স্নান করবে, কাপড় ধোবে। তারপর রান্না বান্না সারা হলে একঝাঁক কুটুমকে খাওয়ানো।

পদ্ম তাড়াতাড়ি উঠোন ঝাঁট দিয়ে শিল নোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লঙ্কা, হলুদ. আর মসলাগুলোকে জলে ভিজিয়ে উবু হয়ে বসল।

ইতিমধ্যেই মেলার লোকজনের শব্দ কানে এসেছে পদ্মর। সে শুনেছে ভলাণ্টিয়ারদের কাঁচ গলার হাঁক ডাক, নাগর দোলার ক্যাঁচ কোঁচ্।

পদ্ম একবার মুখ তুলে তাকাল।

অতিথিদের তিন তিনটি বাচ্চা উঠোনময় ছুটোছুটি করছে। ওদিকের বারান্দায় ঝিমুচ্ছে থুথুড়ে দুটো বুড়ি। একটা বউ বসে আছে ঘট সামনে রেখে। আর কে একজনী অনর্গল বকে চলেছে। জ্ঞানদা বুড়ি হ্যাঁ হুঁ করে সায় দিচ্ছে তার কথায়।

পদ্ম ভিজে লঙ্কাগুলোকে শীলের উপর ফেলে জোরে জোরে বাটতে লাগল।

হোক এবার বেলা, গড়াক সূর্যি পশ্চিমে; খিদেয় চোঁ চোঁ করুক অতিথিদের পেট। বয়ে গেছে পদ্মর।

নতুন গলার আওয়াজ পেতেই পদ্ম আবার মুখ বাড়াল। ইচ্ছে হল চুল ছেঁড়ে পদ্ম।

কোথা থেকে এতগুলো লোকের মুখে ভাত জোগাবে? অথচ বলার উপায় নেই। ...মানুষগুলোর কি জ্ঞান-গম্যিও নেই? পদ্মর ভীষণ কান্না পেল। কান্না পেল আগামী দিনগুলোতে তাকে ধান ভানতে, মুড়ি ভাজতে কত পরিশ্রম করতে হবে সে কথা ভেবে। অথচ এ লোকগুলো না এলেও মন খারাপ হতো সবচাইতে বেশী পদ্মর। তার মনে হতো কেমন যেন ফাঁকা বছরের এই দিনটা। সারাটা দিন তার বিশ্রীই কাটতো, পাশাপাশি অন্যান্য বাড়িগুলোতে লোক গমগম করত বলে, হাসি-গল্পের শব্দে সরগরম হয়ে থাকত বলে। সেটাও তার সহ্য হত না।

পদ্ম উনুনে কয়েকটা কাঠ গ‍ুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গরুগুলোকে স্নান করাতে হবে ঘিলে হলুদ বাটা গায়ে মাখিয়ে; গলায় ফুলের মালা, মাথায় মুকুট পরিয়ে। তারপর স্নান করবে নিজে। খইয়ের ছাতু উঠোনে ছড়িয়ে কাঁচা আম কাটবে।

পদ্ম হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। বাড়িতে যদি একটি ছেলেও থাকত! গরুকে স্নান করানো, আমের শত্তুর কাটা এসব ত ছোট ছেলেরাই করে। লতাপাতা জমিয়ে বাড়িতে ভোর রাত্তিরে আর সন্ধ্যায় সুর করে করে আগুন জ্বালানোর কাজটাও তো ছোট ছেলেদের। কিন্তু পদ্মদের বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটিও না। না পদ্মর, না পদ্মর মার। পড়শীদের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের বাড়িতে না জ্বালিয়ে পরের বাড়ি আসবে কেন? যদি আসত, পদ্ম তাহলে ছাতুর নাড়ু, তিলের সন্দেশ, নারকেলের পুর, মুড়ি, মলা সব দিত কোচড় ভরিয়ে।

মাদী কুত্তিটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেই পদ্ম কাজে ফিরে এল। টাঙানো বাঁশ থেকে কাপড় আর ঘিলে হলুদের বাটি নিয়ে যেতে যেতে মাকে ডেকে বললে—আগুনটা দেখো। আমি নাইতে যাচ্ছি।

মেলার শব্দ এখন বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। আওয়াজ উঠেছে জোর। সুপুরি বাগানের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষের চলাফেরা। পদ্মর ইচ্ছে হল একবার মেলা ঘুরে আসে। নোংরা কাপড়টার দিকে নজর পড়তেই তার মনের ইচ্ছে হঠাৎ থেমে গেল। অথচ অন্যান্য দিন সে একটুও সংকোচ বোধ করত না এতে। আজ কিন্তু তার কেমন যেন মনে হল। মনে হতেই পা আটকে গেল তার।

অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে রইল খাঁচকাটা ঘাটের তালগাছটার উপর পা রেখে। তারপরে কাপড়টা মাটিতে রেখে মাথা তুলবার সময় আচমকা নজরে পড়ল ছাগল আর ছাগল ছানাটা। ওমা! এতক্ষণ বাঁধা রয়েছে! পোড়ামুখী একটু ডাকছেও না তো। অন্য অন্যদিন তো এতক্ষণে কানে তালা লাগিয়ে দিত। তাড়াতাড়ি দড়ি খুলে দিয়ে হাতে কয়েকটা তালি দিতে দিতে মাঠের দিকে তাড়িয়ে দিলে। ছাগলটা হেলে দুলে এগোতে লাগল। সেদিকে দেখতে দেখতেই মনে হল, আজ ছেড়ে দিয়ে ভালো করল না সে। চারিদিকে লোকজন। যদি......? ইচ্ছে করলে ছাড়া ছাগল ফিরিয়ে আনতে পারতো পদ্ম। কিন্তু কেন যে গা করলে না। মনে মনে ভাবলে—কোথায় আর যাবে? ওই তো মাঠ।

বেলা ঢলল খেতে খাওয়াতে। ক্লান্তিতে তখন ঝিম ঝিম করছে গা। ইচ্ছে হল একবার শুয়ে পড়ে মাদুর পেতে। পারলো না। মেলায় যাবার ইচ্ছেটা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে পদ্ম ভাঙ্গা সুটকেসের ভেতর থেকে সেমিজ বের করলে, থান কাপড়। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরে পলকে একবার এদিক ওদিক চেয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। ইচ্ছে হলো আরো কিছুক্ষণ দেখে। কেমন যেন লজ্জা হল। অতিথিরা এখনো বারান্দায় বসে আছে। অবশ্য বুড়ি বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক।

পদ্ম ঘরের ভেতর পায়চারি করল বার কয়। অতিথিরা উঠে পড়ল। একটু পরে পদ্মও।

উত্তরের সুপুরি বাগিচা, তারপরেই পায়ে চলতি পথ খালের ধার দিয়ে। পদ্ম আঁচলের কোণায় বাঁধা কয়েকখানা পয়সা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে এগিয়ে চলল সেই পথের দিকে। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। বুড়ি ঘুমুচ্ছে বেঘোরে। ঘুমুক। নইলে এতক্ষণে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলত। সোমত্থ বয়সের মেয়েকে কিছুতেই মেলায় যেতে দিত না। মাথা কুটত, গাল পাড়ত। বলতো—গা ঘষতে যাচ্ছিস বুঝি লা!

এর আগের আগের বছরেও একা একা মেলায় যেতে পারে নি পদ্ম। কিন্তু আজ স্বয়ং বিধাতা এলেও পদ্মকে রুখতে পারতো না। সে যেতই।

পায়ের নীচের কড়কড়ে বালিগুলো বেশ লাগছিল পদ্মর। একবার নীচেরদিকে তাকিয়ে মুখ তুলল সে। লোক যাচ্ছে, আসছে। এদিকে রূপখালে জলের চিহ্নও নেই। তলার বালিগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে রোদে। একসোতা খাল। এমনিতেই জল কম, হাঁটু ডোবে কি ডোবে না। এখন আবার উপরে বাঁধ দিয়েছে চৈতফসলের জন্যে। তাই এদিকটা একদম শুকনো। বাঁধ কাটাতে আরো অনেক দেরি। কম করে মাসখানেক। পদ্ম হাঁটতে লাগল।

রূপখালের পাড়েই ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের মেলা। খালধারের গাছগাছালি তেমন ঘন নয়। বড় গাছ খুব কম। ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের থান আছে যেখানে, সেখানে বড় বটগাছ আছে একটি। ডালাপালা ছড়িয়েছে
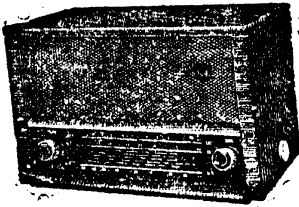
পদ্ম দেখছে ভলাণ্টিয়ারদের ছুটোছুটি। শুনল তাদের হাঁক ডাকের বহর। ছেলে হারিয়েছে যেন কার, কে যেন জল চাইছে। কারা পাঁঠা ছেড়ে দিয়েছে, বাইরের লোকে ধরেছে বলে সে কি ঝগড়া। পদ্ম পায়ে পায়ে ভিড় বাঁচিয়ে এগোতে লাগল। হাড়িকাঠের জায়গাটা এখন পরিষ্কার করা হচ্ছে। একটু পরেই বলি শুরু হবে। অনেকগুলো পাঁঠা সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। উঃ এত বলি হবে? কাঁসা, ঢোল, সানাই বাজবে একটু পরে, তারপরে তালে তালে লাফিয়ে লাফিয়ে অসুরের মত দেখতে ঝাঁকড়া চুলো লোকটা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে একটির পর একটি কাটবে। রক্তারক্তি হয়ে যাবে আশে পাশে। পদ্ম জানে, সে তখন কিছুতেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। কিছুতেই না। তার মাথা ঘুরবে, চোখে অন্ধকার দেখবে, হৃৎপিণ্ড বার বার ভয়ে দুলে উঠে বার বার থমকে থেমে যাবে। না, তখন সে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। তার চেয়ে এখনই ভেতরে ঢুকে একবার ঘুরে আসবে সে।

পদ্ম ঘেরার ভেতর ঢুকল।

প্রথম থেকেই তার নজর ছিল বিধবা ব্রতীটার দিকে। বয়স পদ্মর চাইতে কিছু বেশীই হবে। পদ্ম পায়ে পায়ে তার পাশে এগিয়ে গেল। ব্রতীটার পাশে একটি পুরুষ মানুষ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। বিধবা মেয়েছেলেটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে বিকট। পদ্ম শুনতে চেষ্টা করল কি বলছে।

একটু পরেই ঠাকুরের সাথে পরিচয় শুরু হলো।

পুরুষ মানুষটা ঝুঁকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে—কি বলছ মা? ওষুধ দেবে বলেছে? দিতে বলো।

মেয়েছেলেটা মাঝে মাঝে গলা নামিয়ে কি যেন বলছে, শুনতে না পেরে বেটাছেলেটা কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করছে—পরিষ্কার করে বলো।

সুর করে মেয়েছেলেটা বলছে—রাগ করেছে, রাগ করেছে।

—কেন?

—কেন কি গো! দাও নি বলে।

—কি?

—ভোগ। ঠাকুরের ভোগ।

—দেব বল।

—কবে দেবে?

—কালই দেব।

এবার মেয়েটা আরো জোরে জোরে মাথা কুটতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এলোপাথারি চষে চলেছে। আর, মুখে মা মা। একটু পরে বলল—ওষুধ দেবে।

—দিতে বল।

—ওষুধ দে মা, ওষুধ দে—ডাইনে বাঁয়ে চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করতে লাগল। এক সময়ে লাফাতে লাফাতে, কখনো বা হামাগুড়ি দিতে দিতে ভিড় ঠেলে বাইরে, যেদিকে থাল সেদিকে চলতে লাগল। ইচ্ছে হল পদ্মর একবার জিজ্ঞেস করে পুরুষটাকে, এর কি অসুখ। জিজ্ঞেস করতে পারল না। ঠাকুরের সাথে পরিচয় হচ্ছে দেখে আরো আরো কৌতূহলী মেয়ে-পুরুষ ভিড় করল একে ঘিরেই। পদ্ম সেই ভিড়ে মিশে এগোতে লাগল।

থালধারটা একেবারে খাড়াই। ঢালু যেটুকু হয়েছে, তা হয়েছে ভলাণ্টিয়ারদের ওঠানামায়। মেয়েছেলেটা সেদিকে নামতে গিয়েই ফ্যাসাদ ঘটাল। গড়িয়ে পড়তে গিয়ে বেসামাল হয়ে গেল। হাঁটুর কাপড় এলো কোমরে। কী অপ্রস্তুত অবস্থা! পদ্ম লজ্জায় চোখ বুজল। চোখ বুজলেও কানে শুনল—কাপড়টাকে ঠিক করে দেবার জন্যে মেয়েছেলেদের ধমক।

এবার একেবারে খালের তলায়। বালিতে আঁচড় কাটছে দুহাতে। যেন পারলে গড়াগড়ি দেয়। কতকগুলো বয়েসী মেয়ে-ছেলে সঙ্গের বেটাছেলেটাকে বলছে—ধরো, ওকে ধরো। নইলে—

বেটাছেলেটা কি করবে ভেবে না পেয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে। এবং ধরেই রইলো। ওদিকে বলির বাজনা শুরু হয়ে গেছে। পর্দায় পর্দায় কাঁসা ঢোলের শব্দ চড়ছে। এখুনিই বলি শুরু হবে।

পদ্ম কয়েক পা এগিয়ে এল।

মেয়েছেলেটা পুরুষ মানুষটার হাতের বন্ধনের মধ্যে আঁকু পাঁকু করতে লাগল ছাড়া পাবার জন্যে। বেটাছেলেটার সে কী অবস্থা! বার বার টাল সামলাতে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। মেয়েছেলেটা সুদ্ধ। মেয়েছেলেটা এক সময়ে হাতের ভেতর থেকে গলে বেরিয়ে আবার লাফাতে লাগল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পুরুষ মানুষটা আবার পেটের কাছে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করালে। আবার গলে পড়ল। এমনি আরো বারকয়।

এবং এসব দেখেই পদ্মর মনে কেমন যেন খট্‌কা লাগল। সে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার বয়সী বিধবাটার দিকে। আর তখনই তার নজরে পড়ল, সেই বিধবা ব্রতী হঠাৎ একটি চোখ খুলে মুখ দেখে নিল পুরুষটির। সে তাকানো পদ্মর মনে হলো একেবারে স্বাভাবিক। প্রথমে কেমন যেন লাগল। তারপরেই পদ্ম আচমকা নাড়া খেয়ে কেঁপে উঠল। চোখ রাখল পুরুষ মানুষটির চোখে। কী ভীষণ বিতৃষ্ণা। ঘেন্নায় লজ্জায় কেমন যেন হয়ে গেছে।

বলি শুরু হয়েছে ওদিকে। কাটা ধড়-গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে খালে।

পাশাপাশি এক একটি ছাগল এগিয়ে দিচ্ছে লোকগুলো। শব্দ নেই, হাঁক ডাক নেই। ছাগলগুলো যেন কেমন হয়ে গেছে। মন্ত্র-মুগ্ধ হয়তো। অথবা যন্ত্রণায় বোবা।

পদ্মর শরীরটা সির সির করে উঠল। দুঃখ হল লোকটার জন্যে। এবং মনে পড়ল পাঁচ বছর আগের একটি রাত্রির কথা। মেঝেতে রাগ করে শুয়েছিল বলে, তার স্বামী তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তুলতে গিয়েছিল, এবং সে কেমন ভান করে হাতের ভেতর দিয়ে গলে পড়তে গিয়ে সারা শরীরে একটি সিরসিরানি অনুভব করেছিল, সেকথা। মনে হতেই পদ্মর মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। বিধবা ব্রতীটার দিকে ঘোমাজড়ানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে পায়ে পায়ে উঠে এল খালপাড়ে।

একবার পেছন ফিরে তাকাল। মেয়েটা জোরে জোরে মাথা কুটছে, পুরুষ মানুষটা স্থির দাঁড়িয়ে। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা পদ্মর খুব ভালো লাগল। এবং তাই সে বেশ কিছুক্ষণ- নিষ্পলক তাকিয়ে রইল সেদিকে।

আচমকা একটা জোরালো ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল পদ্ম, একটি লোক হাত-বাড়িয়ে বুক জাপটে ধরে ফেলল। লজ্জায় প্রথমে মুখ তুলতে পারে নি। পরে চোখ তুলতেই দেখল সেই কালো গুঁফো লোকটা কুতকুতে চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

পদ্ম ছুটে পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না। ভীষণ ভিড়। ভীষণ ভয় পেল ও। লোকটা কি সেই থেকে তার পিছু নিয়েছে? সে কী চায় পদ্মর কাছে, কী? মনে হলো তার মাথা ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। মনে হলো সে টলে পড়বে। একবার ইচ্ছে হল পেছন ফিরে দেখে লোকটা পিছু নিচ্ছে কিনা? পারলে না। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিল। এর ধাক্কা ওর ধাক্কা খেতে খেতে পদ্ম একটা ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়াল। জোরে জোরে নিশ্বাস নিলে বার কয়। মুখ তুলে দেখতে চেষ্টা করলে সে লোকটাকে। না, লোকটা নেই। পদ্মর চোখ পড়ল আকাশের দিকে। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। বলির বাজনা থেমে গেছে। মানুষ মেলা থেকে ফিরে চলেছে বাড়ির দিকে। দোকানদাররা বাতি জ্বালাচ্ছে।

অন্ধকার ঘন হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

পদ্ম ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পায়ে পায়ে। চলতে চলতে মনে হল, এতক্ষণ মেলায় থাকা কিছুতেই ঠিক হয় নি তার। বুড়ি হয়ত বাড়ি মাথায় করেছে এতক্ষণে। দ্রুত পা চালাল পদ্ম। গরু, ছাগল, হাঁস, পায়রা সব এখনো বাইরে। খড় দিতে হবে, ফেন দিতে হবে, সাঁঝবাতি দিতে হবে। কত কাজ পড়ে রয়েছে বাড়িতে, অথচ সে এখনো বাড়ির বাইরে।

বাড়িতে ঢোকার আগেই বুড়ির ক্যান্‌-ক্যানে গলা কানে এল। বিশ্রী বিশ্রী গালাগাল দিচ্ছে বুড়ি। পদ্ম বোবা হয়ে রইল। আর শ্যামল ছাগল আর ছাগলছানাটা এখনো ফেরে নি। পদ্ম চুপি চুপি ভেতর উঠোনে গেল। হাঁসগুলো খোয়াড়ে ঢুকেছে। দুয়ার দিয়েছে বুড়িই। বেরিয়ে এল গোয়ালে। গরুগুলো বাঁধা হয়েছে। ফেন খড়ও দিয়েছে। এত সব কাজ বুড়ি করেছে—একথা ভাবতেই পদ্ম আরও বিরক্ত হয়ে উঠল। উঃ এ কাজগুলো করতে করতে কত গালই না দিয়েছে। গাল দিক; তাতে গায়ের মাংস খসবে না, পদ্ম জানে। কিন্তু ছাগল আর ছাগলছানাটা? পদ্ম নিজেকেই গাল দিলে ছাগল ছেড়ে দেয়ার জন্যে। যা সে ভেবেছিল তাই হয়েছে। এখন কোথায় খুঁজবে সে?

পদ্ম ভিটে ছাড়িয়ে মাঠে নামল।

অন্ধকারে মুখ খুঁজে পড়ে আছে দক্ষিণের মাঠ। পুবদিকের পুকুর পাড়ের ধারটায় অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে। মানুষ জন দু'চার দশটা পাড় থেকে কোনা-কুনি বড় সড়কের দিকে যাচ্ছে। পদ্ম এদিক ওদিকে ভালো করে তাকালো। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বারুই পাড়া। সেখানে দু'চারটে আলো জ্বলছে গাছ-গাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে। পদ্ম সারা মাঠটা থৈ থৈ করে খুঁজল। পশ্চিমের খালধারেও খুঁজল। মেলার লোকজন খালধার ধরে বাড়ি ফিরছে। কথাবার্তা বলছে জোরে জোরে। পদ্ম আরো এগিয়ে আরো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল। না, কোথাও নেই। তবে কি খালের পশ্চিম পাড়ে গেছে? পদ্ম পায়ে পায়ে খাল পেরোল। খালপাড়েই ঘন বাঁশবন। বাঁশ-বনের পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলার রাস্তা। একটু এগোলেই বিঘা দশ বারো জমি জুড়ে শণবন। শণবনের দক্ষিণে আখের ক্ষেত অনেকদূর ছড়ানো।

কয়েকজন লোক, দু'চারটি মেয়েমানুষ, বাচ্চা কাচ্চা পদ্মকে পাশ কাটিয়ে মাঠে নামল। লোকগুলো বার কয় তার দিকে তাকালও। অন্ধকারে কেউ কাউকে ঠাওর করতে না পারলেও ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি পদ্মর নজর এড়ালো না। পদ্মর কেমন যেন লাগল। তার মনে হল, সব পুরুষগুলোই বুঝি মেলার সেই লোকটার মতো। মেলার সেই লোকটাকে মনে পড়তেই পদ্ম একবার পেছন ফিরে তাকাল। লোকটা পিছু নেয় নি ত? যদি নেয়, তাহলে? তাহলে পদ্ম চিৎকার করে উঠবে, সে ছুটবে। ততক্ষণে নিশ্চয়ই আশপাশের লোকজন ছুটে আসবে। তখন? পদ্ম ভালো করে পেছনে তাকিয়ে দেখল, না কেউ নেই। নেই কি, বাঁশবনের ওখানটায় লুকিয়ে থাকে, যদি? পদ্ম কয়েক পা পেছিয়ে দেখল। না, কেউ নেই। পদ্মর বুকের ভেতর থেকে ভারী একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

অন্ধকার ঘন হয়েছে আরো; গাঢ়। মাঠের উত্তরের উত্তরপাড়ায় ঘোষেদের বাড়িতে আরতির বাজনা সবে বন্ধ হয়েছে। দূরে পিদীম জ্বলছে কাদের দাওয়ায় কে জানে; আবছা দেখা যাচ্ছে। হয়ত মনার মার ঘরে। নয়তো বিলু পিসীদের বাড়িতে। পদ্ম কয়েক পা এগিয়ে ছাগলের ডাকের অনু-করণে ডাকতে লাগল—মিইঁইঁ......। এমনি বার কয় ডাকল। কোনখান থেকেই কোনো প্রত্যুত্তর এলো না। পদ্ম দ্রুত এগিয়ে গেল আরো কদ্দূর। একবার থমকে দাঁড়াল।

কি যেন পাশের ঝোপের দিকে খর খর করে হেঁটে গেল। কী? সাপ, না শেয়াল? শণবনের ওদিকটায় একদল শেয়াল ডেকে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে ডাকল। দূরের আখের ক্ষেতে শব্দ উঠল হাওয়ায়। পদ্ম আরো এগিয়ে গিয়ে ডাকল মিঁই-ই মিঁই......ই।

হিজল গাছতলায় ঘন অন্ধকার। কেয়া ঝোপ জুড়েও। সেখানে জোনাকিগুলো জ্বলছে আর নিভছে। উঁচু মাদারগাছের ডালে কি যেন নড়ে চড়ে উঠল। পদ্ম এদিক ওদিক তাকাল। খাল ধারটাকে গাছের ভিড়ে কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দৈত্যের মত সব কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচিয়ে। পদ্ম এবার আরো জোরে ডাকল মিঁই—ই......

দূরে একদল সাদা কাপড়ের লোক কোনাকুনি মাঠ পার হচ্ছে। পদ্মর ইচ্ছে হল ডেকে জিজ্ঞেস করে কোনো ছাগল দেখেছে কিনা? হেঁকে জিজ্ঞেসও করল। ওরা কিন্তু কোন জবাব না দিয়েই চলে গেল। শুনতে পায় নি হয়তো পদ্ম। মাঠের মাঝ দিয়ে আরো এগিয়ে গেল।

ফাটা ফুটি জমি। নাড়াগুলো ফুটছে পায়ে। কোথাও কোথাও এক চাষ দেয়া জমি। পদ্ম পায়ে পায়ে আখের ক্ষেত ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেল। এমনি কতক্ষণ চলেছে খেয়াল নেই। একদল বাদুড় উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। মাঠের মাঝখানে ঝাঁক ছেঁড়া একটা শেয়াল ডেকে উঠল। দূরের একদল শেয়াল গলা মেলাল। পদ্মর গা কেমন ভার ভার হয়ে এল। আর ঠিক তক্ষুণিই তার মনে পড়ল বিঘে কয় জমি পড়েই জোট পুকুর। জোট পুকুরের পাড়ে বড্ড ভয়। মনে পড়ল তার ডোমিনীর মার চিতার কথা, রাখহরির বাপের গলায় দড়ি দেয়া গাছটার কথা, এবং পদ্মর চোখের সামনে ভেসে উঠল মেলার সেই কালো লোকটার কুতকুতে চোখজোড়া। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। চারিদিকে থৈ থৈ অন্ধকার। দূরে কাছে কোথাও কেউ নেই। ইচ্ছে হল সে চিৎকার করে কাউকে ডাকে। কাকে ডাকবে? বুড়ি মাকে? বুড়ি এখন কোথায়? পদ্মর সারা শরীর সির সির করে উঠল। মনে হল সে আর দাঁড়াতে পারছে না।

ছুটছে পদ্ম। ফাটাফুটি মাঠের উপর দিয়ে, চষা ক্ষেতের উপর দিয়ে। কোন্ দিকে, কোথায় ছুটছে সে ভুলে গেছে। তার মনে হল পেছন থেকে কে যেন তাড়া করে নিয়ে চলেছে তাকে। ডোমিনীর মা? না, রাখহরির বাপ? না, সেই লোকটা? উঁচু আলে হোঁচট খেয়ে পদ্ম চষা জমির উপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হুমড়ি খেয়ে পড়তেই পদ্মর মনে হল, সামনেই দাঁড়িয়ে তার ছাগল আর ছাগলছানাটা। সে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না। উঠবার চেষ্টা করল, উঠলও। কিন্তু কোথায় তার ছাগল আর ছাগলছানা। কৈ, কিছু নেই তো। তাহলে?

পদ্মর সারা শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। সামনে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো, কান আলগা করল। সে কিছুই দেখল না অন্ধকার ছাড়া; কিছুই শুনল না মাথার ঝিম ঝিম ছাড়া। মনে হল, এক রাশ অন্ধকার তার চোখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাথা ঘুরছে। তারপরে আর কিছুই মনে নেই পদ্মর।

কত রাত হয়েছে পদ্ম জানে না। যখন সে চোখ মেলেছে তখনো তেমনি অন্ধকার। মনে হল, হাওয়া দিচ্ছে। মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে রাশি রাশি অন্ধকার ঝাপটা মেরেছে তার চোখে। চোখ বুজে আবার চোখ খুলতেই নজরে পড়েছে এক ঝাঁক জোনাকি। আরো মুখ তুলতে চোখে পড়েছে বিরাট আকাশ, আর, এক আকাশ তারা। শুনেছে কানে, ঝিঁঝির একটানা শব্দ।

পদ্ম ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। চারিদিক নিঝুম। কোথাও কেউ নেই। দূরের পিদীমের আলোও না। কাঁসার শব্দও নয়। পদ্ম টলতে টলতে মাঠ ছাড়াল শণবন, বাঁশবন ছাড়িয়ে খাল পেরোল।

ওপাড়ে উঠেই প্রথম পদ্ম মনে করতে চেষ্টা করলো—কেন সে মাঠে গিয়েছিল? কী জন্যে?

পদ্মর প্রথমে মনে পড়ল মেলার কথা, সেই লোকটার কথা, বিধবা ব্রতীটার কথা। তারপরে মনে পড়ল সেই বউটাকে যে ছেলেকে মাই দিচ্ছিল। আরো মনে পড়ল তার কচি ছেলে আর তার গা ঘেঁষে চলা বউটাকে। সবশেষে পদ্মর মনে পড়ল তার স্বামীর কথা। তারপর?

পদ্মর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। ভীষণ ভাবে ঘুরে উঠল। তবে সে মাঠে গিয়েছিল কেন? খাল পেরিয়ে, শণবন, বাঁশবন ছাড়িয়ে উত্তর পাড়ার মাঠে, কেন গিয়েছিল? কেউ কি নিয়ে গিয়েছিল তাকে? না কী নিশায় পেয়েছিল? না কি বিবাগী হয়ে চলে গিয়েছিল সে?

উঠোনে পা দিতে না দিতেই বুড়ির কান্না, কান্না জড়ানো গলার বিশ্রী শব্দ আর একঘর লোকের আওয়াজ শুনতে পেল। পদ্ম দেখল ভেতর উঠোনে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে, কথা কাটাকাটি হচ্ছে। সে ভালো করে শুনতে চেষ্টা করল। হাঁ, তার কথাই হচ্ছে। পদ্মর কেমন যেন মনে হল হঠাৎ সে কী পালিয়ে গিয়েছিল? না তো! ইচ্ছে হল চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। পারল না।

পদ্মর মনে হল, আবার তার সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। অবশ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একরাশ অন্ধকার কাপড় চাপা দিচ্ছে তাকে। পদ্ম তবু মনে করতে চেষ্টা করল। আপ্রাণ চেষ্টা করল, কেন সে মাঠে গিয়েছিল, কেন? কি জন্যে? কেউ কি ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে?

কিছুতেই মনে করতে পারল না পদ্ম। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল উঠোনেই। এবং আচমকা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তৎক্ষণে ভেতর বাড়ির লোকগুলো ঘিরে ফেলেছে তাকে। জিজ্ঞেস করছে নানান প্রশ্ন। বুড়ি হঠাৎ জোর গলায় গালাগাল দিতে শুরু করেছে।

পদ্ম মুখ তুলতে চেয়েও মুখ তুলতে পারল না। কেন সে মাঠে গিয়েছিল, কি জন্যে?

সেই লোকটার জন্যে? তার স্বামীর জন্যে? নাকি অন্য কোন কিছুর জন্যে? কিছুতেই মনে পড়ল না।

জমায়েতের লোকগুলো পদ্মর মুখের উপর, দেহের উপর হ্যারিকেনের আলো ফেলে ফেলে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা খুঁজছে।

পদ্ম মুখ তুলতেই তাদের সাথে চোখাচোখি হল। ওরা চোখ সরিয়ে নিল না। পদ্ম নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ওদের মুখের দিকে, চোখের দিকে। আর, বার বার ভাবতে চেষ্টা করছে—এত জোরালো চোখে ওরা তার সারা শরীরে কী খুঁজছে? কী—? এরা তো কই এমন চোখে আগে পদ্মর শরীরে কিছু খোঁজে নি। তবে আজই বা কেন?

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

বারো

বলেছি, ১৯৩৭ সালে আমি পণ্ডিচেরির যোগাশ্রম থেকে বাংলা দেশে ফিরে আসি দু' তিন মাসের জন্যে। কলকাতায় আত্মীয়-স্বজনের স্নেহনীড়ে ফিরে যেন এক নতুন গভীর আনন্দের স্বাদ মিলল আবার। বিশেষ ক'রে সুভাষ ও শরৎদার দাক্ষিণ্যে। সুভাষ মাঝে মাঝেই আমার এখানে হাজির হ'ত কখনো শরৎদাকে সঙ্গে ক'রে, কখনো একা। ওকে প্রায়ই কর্মক্লান্ত দেখে আমি গানবাজনার আসরে ওকে ডাক দিতাম শরৎদার সঙ্গে। দুজনে একত্রে এলে আসর খুব জমে উঠত —গানে গল্পে হাস্যে। একদিন বারাকপুরে আমার বোন মায়ার ওখানে সুভাষকে আমরা অভিনন্দন দেই। সে-সভায় আমি ও আমার কন্যোপমা ছাত্রী রমা বসু গান করেছিলাম ও অমলা নন্দী (এখন অমলা শঙ্কর) নেচেছিলেন। আনন্দমেলা ভাঙলে আমি দাদামহাশয়ের মোটরে না ফিরে সুভাষের মোটরেই কলকাতা ফিরি, কারণ সুভাষ আমায় বলল—কথা আছে।

কিন্তু মোটর দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়েছে অথচ সুভাষ সমানেই নিশ্চুপ।

আমি (অবশেষে): কী হয়েছে সুভাষ? এত অন্যমনস্ক?

সুভাষ (চমকে আমার দিকে তাকিয়ে): বলব একটা কথা?

আমি: কী?

সুভাষ (আমার বাহুমূলে হাত রেখে): দিলীপ তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই, রাখবে?

আমি: কী?

সুভাষ: আশ্রমের অজ্ঞাতবাসে ফিরে যেয়ো না এখন। তোমাকে আমার বড় দরকার।

আমি (সবিস্ময়ে): সুভাষ! তুমি কী বলছ? আমাকে তোমার দরকার? আমাকে! তুমি হ'লে দেশের একজন মস্ত নেতা—কত তোমার সহায় সম্বল। আর আমি তো একজন অকেজো স্বপনী মাত্র—তুমিই তো বলো, ঘাঁ ডুঘড়ি ঠাট্টা ক'রে। তাছাড়া কলকাতায় থাকলেও কবারই বা তোমার সঙ্গে দেখা হয় বলো?

সুভাষ (আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে): বেশি দেখা নাই বা হ'ল। তুমি জানো না আমাকে কিসের মধ্যে থাকতে হয় —কপট, চক্রী ও ধাপ্পাবাজরাই আমাকে ঘিরে থাকে বেশির ভাগ। তুমি কলকাতায় থাকলে আর কিছু না হোক মনে আমার এই ভরসাটুকু থাকবে যে আমার কাছাকাছি একজন মানুষ অন্তত আছে, যার কাছে গিয়ে আমি মনের সব কথাই বলতে পারি খুলে।

ওর এই একটা কথা আমার মনকে যে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল ব'লে বোঝাতে পারব না কিছুতেই। তাই শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, মানুষ যতই বীর ও স্বাবলম্বী হোক না কেন, মহৎ হ'তে হ'লেই তাকে নিঃসঙ্গতার গভীর দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে হবেই। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর ছন্দোময়ী ভাষায়:

> Whoever is too great must lonely live
> Adored, he walks in mighty solitude
> Vain is his labour to create his kins,
> His only comrade is the Strength within

অর্থাৎ—

> মহত্ত্বে মহিমময় যেই হোক—বিনিঃসঙ্গ রবে,
> সর্বপূজ্য হয়ে তবু রবে মহাবিজনবিলাসী;
> আপনার সমধর্মী গড়িতে যে বৃথা চায় ভবে
> শুধু এক সাথী তার—অন্তঃশক্তি গহনবিবাসী।

এ-চতুষ্পদীটি সুভাষের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

সুভাষের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলবার আছে: তার নানা গুণের, নানা শক্তির, কর্মপ্রতিভার, চরিত্রের অচল-প্রতিষ্ঠতার—আরো কত কী। কিন্তু এ-স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্য নয় তার জীবনী লেখা আমি চেয়েছি তার মহত্ত্বকে আমি যে চোখে দেখেছি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি ফোটাতে —তর্পণের সহজ আনন্দেই বলব।

শেষে শুধু একটি কথা জানাতে চাই। কথাটি নিতান্ত ব্যক্তিগত হ'লেও স্মৃতি-চারণে ব্যক্তিগত কথার অবতারণা অন্তত অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাই বলি নিঃসংকোচেই।

কথাটা—বা প্রশ্নটা এই যে, সুভাষের কাছ থেকে আমি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় যে-দানটি পেয়েছি তার কী নাম দেওয়া যায়? যে-কোনো মহাজনের চরিত্রের নানা দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহীতা ভিন্ন ভিন্ন রসদ পায়, কে না জানে? আমি ওর কাছে পেয়েছি অনেক সম্পদ, প্রাণশক্তি, স্বপ্ন-বৈভব —যার কিছু হদিশ দেবার চেষ্টা করেছি এ স্মৃতিচারণে। কিন্তু আমার কাছে ওর সব চেয়ে বড় দান—ওর পবিত্র চরিত্রের একান্ত সন্ন্যাসী প্রভা যাকে আমি দিব্য প্রভাই নাম দিতে চাই। সুভাষকে আমি কিছুতেই শুধু মহৎ কর্মী বা দেশ-ভক্ত উপাধি দিতে পারি না। সে মহৎ কর্মী, মহৎ বন্ধু, মহৎ দেশভক্ত, মহৎ স্বপনী—সবই সত্য। কিন্তু আমার চোখে তার মহত্তম রূপ হ'ল তার অন্তরাত্মার অধ্যাত্ম জ্যোতি। তাই আমি কিছুতেই মোহিতলাল মজুমদারের মতাবলম্বীদের কথায় সায় দিতে পারি না যে, দেশের নেতাজী এই উপাধিই তার সর্বোচ্চ উপাধি। কারণ আমি আশৈশব বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, মানুষের সব চেয়ে বড় আদর্শ ধর্মব্রতী হওয়া এবং কোনোদিনই বিশ্বাস করতে পারি নি যে, রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে পুণ্য-তম ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

সুভাষ আমার কাছে বরেণ্য এজন্যে নয় যে, সে স্বভাবে ছিল বীর ও কর্মিষ্ঠ, এজন্যেও নয় যে সে আমাদের দেশবাসীর চোখে ত্যাগের মহৎ প্রেরণার প্রতীক হয়ে ফুটে উঠেছিল, এমন কি এজন্যেও নয় যে তার সৈন্য গঠনের ফলে ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ

চারিয়ে যাওয়ার দরুণই ইংরাজ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে ভারতকে স্বাধীনতা না দিলেই নয়। একথা বলছি এই জন্যে যে, অনেকে মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা শুধু মহাত্মা গান্ধীরই দান। আমি বলতে চাই সুভাষের বিদ্রোহ ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে না উঠলে শুধু মহাত্মা গান্ধীর নিরীহ সত্যাগ্রহে ভয় পেয়ে, ইংরাজ বলত না তখনই (পিতৃদেবের ভাষায় অনুষ্টুপ ছন্দে):

উঠিবে উঠিবে এরা ঠেকানো বড় দুষ্কর।
বুঝি বা এখন শ্রেয়ঃ মানে মানে পলায়ন।

তাই সুভাষকে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিসাধকদের অন্যতম ব'লে তাকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েও বলব: এইই তার ব্যক্তিরূপের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়। অর্থাৎ সে দেশের মুক্তি সেনানীদের মধ্যে একজন পুরোধা হ'লেও তার সব চেয়ে বড় দান এ-রাজনৈতিক আখড়ায় নয়। সুভাষকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বরেণ্যতম মনে করি এই জন্যে যে, রাজনীতির আখড়ায় এযুগে ভারতের যত মহাজন অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে এক অরবিন্দ ছাড়া সুভাষের অধ্যাত্ম সত্তাই ভারতের আত্মার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ—ভারতের অধ্যাত্ম সত্তার অন্তরের রূপ তার শিবনেত্র যেভাবে ফুটে উঠেছিল রাজনৈতিকদের মধ্যে আর কারুর নেত্রেই ভারতের সে রূপটি ফুটে ওঠে নি।

এইখানেই তার ব্যক্তিরূপ উত্তীর্ণ হয়েছিল ভারতের আত্মিক দৃষ্টির পরম শিখরলোকে; তাই সে বলেছিল তার যৌবনেই (আশ্বিন ১৩৩৩, তরুণের স্বপ্ন): "ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎসভায় শোনাতে হবে।...তাই ভারতের মনীষিগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন।......ভারতের এই মিশনে যার বিশ্বাস আছে সেই ভারত-বাসীই শুধু বেঁচে আছে।......দেশান্তরে কারাবাসে যখন মাসের পর মাস কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত: "কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ঠ না হ'য়ে আরো শক্তিমান্ হ'য়ে উঠছি।" নিজের অন্তরে উত্তর পেতাম: "ভারতের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, সেই ভবিষ্যৎ-ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির এই ইতিহাস আমরা রচনা করছি এবং করব।" এ-বিশ্বাস তার শেষ জীবনে আরো ভাস্বর ও গভীর হ'য়ে উঠেছিল বিদেশে দুঃখবরণের ভূমিকায়। তাই সে তার শেষ জীবনে টোকিয়োতে ঘোষণা করেছিল যে, ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে এক নব ধর্মবীর জাতির গঠনই তার জীবনসাধনার পরম লক্ষ্য। আর ঐ-স্বপ্ন তার তৃতীয় নয়নে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল এই জন্যেই যে মৃন্ময়ী ভারতমাতার মধ্যে চির চিন্ময়ীকে দেখবার ধ্যানদৃষ্টি ছিল তার সহজাত। তাই আমরণ ছিল সে শক্তিসাধক—কৈশোরেও গঙ্গাজলে নেমে আবৃত্তি করত স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother

> Who dares misery, loves and
> hugs the form of Death,
> Dances in Destruction's dance,
> to him the Mother comes.

নির্ভয়ে যে বীর" যন্ত্রণায়
প্রেমে করে মৃত্যু আলিঙ্গন,
নাচে মহাকাল-নৃত্য সাথে
তারে করে জননী বরণ।

সুভাষ যখন ১৯৪১এ নিয়তির করাল ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে কাবুল হয়ে যখন একান্ত নিঃসহায় হ'য়েও অকুতোভয়ে "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার"* অতিক্রম করতে উদ্যত হয়ে দেশমাতার মুক্তিসাধনার ব্রত বরণ ক'রে, যখন দেশে চারিদিকে নিরাশা ও জগতে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল গর্জনে বিশ্বময় উদ্‌-ভ্রান্ত, তখনও যে সে অভীঃ-মন্ত্রে সিদ্ধি-লাভ করেছিল সে মহাকালীরই কৃপায়, যাঁর সে নিত্য উপাসক ছিল বরাবরই। (শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আমাকে বলেন ১৯৫০ সালে যে, সুভাষ মান্দালয়েও রোজ কালীর ধ্যান করত)

সুভাষের মহাপ্রয়াণের পরে কলকাতায় আমার দেখা হয় তার সহযাত্রী হবিবুর রহমানের সঙ্গে। তিনি আমাকে বলে-ছিলেন যে, সুভাষ তার শেষ নিশ্বাসের সময় উচ্চারণ করেছিল শুধু একটি কথা: "মা!"

একথা আমি অবিশ্বাস করি নি। কারণ, বলেছি, সুভাষকে আমি দেশভক্ত ও মহৎ ব'লে বরাবরই গভীর শ্রদ্ধা করে এলেও চিরদিন মনে মনে প্রণাম করে এসেছি কেবল সেই বরেণ্য বীরোত্তমকে যে মহা-কালীর কৃপায়ই অভীঃ-মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে জীবন সাধনায় তিলে তিলে সে-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করার রক্তস্বাক্ষর রেখে গেছে তার অন্তিম মুহূর্তের পরম শরণাগতির সাক্ষ্য। তার এই রূপটির কথা মনে ক'রেই আমি তার তর্পণে মহাজাতি-সদনে গেয়েছিলাম:

"মন্ত্র সাধন শরীর পাতন"—জপি' যে-প্রাণোজ্জ্বল
চাহিল দেশের মুক্তিব্রত যাপিতে অমিতবল,
সুখের দুলাল যে-দুরভিসারী
হ'ল দুঃখের, ত্যাগের পূজারী,
"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য"—গাহিয়া অচঞ্চল:
সে-তোমারে করি প্রণাম হে মহামহিম, অমিতবল!

দেখেছি আমরা কান্তি যাহার—বিকচ ইন্দীবর,
শুনেছি যাহার যৌবনবাণী—বৈরাগ-সুন্দর,
অমিতাভ তেজে বরি' যে পাবক
লভিল উপাধি—'দেশের নায়ক',
মথি' মরণসিন্ধু ছানিল অমরণ-শতদল:
সে-তোমারে করি প্রণাম হে অপরাজেয় অমিতবল!

ক্রমশ

* কাজির এই গানটি আমরা প্রায়ই গাইতাম চ্যারিটি কন্সার্টে—আরো এইজন্যে যে, গানটি ছিল সুভাষের একটি অতি প্রিয় গান।

সাতাশ

ইদানীং সে অনুভব করছে, কে যেন তাকে বলছে, অনেকদিন চার পায়ে হেঁটেছ, আর না, এবারে ওঠ। মানুষ চিরকাল চার পায়ে হাঁটে না। তার পা মাত্র দুটোই। এবার দুপায়ে ভর দিতে শেখো।

কিন্তু তা কি সম্ভব? তাকে মাঝে মাঝে বেশ ভাবিত হতে দেখা যায়।

মনের আনন্দে সে বাড়িটা চষে বেড়াচ্ছিল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে। তার ধারণা, হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলা হয়ত অনেক নিরাপদ। আপদবিপদ সহজে সে ডেকে আনতে চায় না। বাঁধা পথে চলা অনেক ভাল।

চৌকাঠের কাছে এসে সে থমকে গেল। এই জায়গাটা তাকে বড্ড জ্বালায়। গোটা ঘরে আর কোনও বাধা নেই, কোথাও প্রতিরোধ নেই। তরতর করে সে ঘুরে বেড়ায়। চৌকাঠ পর্যন্ত অনায়াসে আসে। এখান থেকে বাইরে নজর পড়ে তার। কত আলো, কত জায়গা, কত রকম জিনিস সেখানে। লাল, কালো হলদে, সবুজ, নীল, বেগুনি, গোলাপী, সাদা। কত রকম রঙ! কোনটা চিকচিক করে, কোনটা চকচক করে। কোনটা নড়ে, কোনটা দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কোনটা শব্দ করে, কোনটা নিঃশব্দ। কারোর প্রতি পক্ষপাত নেই তার। সবার দিকে হাত বাড়ায়। সব চাই তার। সবই তার। কিছুই ফ্যালনা নয়।

ঐ যে কি একটা থপ্ করে পড়ল তার সামনে। চট করে তার চোখ দুটো ঘুরে গেল। ঐ যে ফড়ুক করে কি একটা উড়ে এল। বসল দূরে। চট করে সে ঘুরে গেল। ঐ যে কেঁউ কেঁউ করে কি যেন একটা ঘুরপাক খেয়ে চলে, খটখট করে ছুটে গেল কি, কোথায় ঠং করে একটা আওয়াজ হল। চটচট করে তার চোখ ঘুরে যাচ্ছে। দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে সে। সে অকারণে চঞ্চল। খুব মজা লাগছে তার। শরীরটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অমিত উৎসাহে দোলাচ্ছে। হাঁটুতে ভর দিয়ে শরীরটাকে তুলছে। হাত দুটো বাড়িয়ে আহবান জানাচ্ছে। কাছে এস, কাছে এস। আয় আয় আয়।

হঠাৎ তার পিছনে কেমন কেমন দেখতে কি একটা এসে গেল। মিহি স্বরে ডেকে উঠল, মিঁউ। সে-ও তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেল। দারুণ বিস্ময়ে, কৌতূহলে স্ফটিকের মত চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। আরে, এটা ত সেই, তার বন্ধুটা। তার কাঁছে যে প্রায়ই আসে। ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়। মিউমিউ ডাকে। ঘড় ঘড় করে। তড়াক তড়াক লাফ মারে। ওটাকে দেখে সে বেজায় খুশি হল। ডাকল, দাদ্দা, দাদ্দা।

ওই যে ওটা চলতে আরম্ভ করেছে। দাদ্দা। সেও পিছু পিছু চলল। দাদ্দা! দাঁড়াও। যেন ধমক দিল। তার ধমকে কান দিল না সেটা। ঢুকে পড়ল চৌকির নীচে। সে-ও চলল। দাদ্দা। অত জোরে না, আস্তে চল। সে যেন এবার মিনতি করল। তার মিনতিও ব্যর্থ হল। একটু ক্ষুণ্ণ হল সে। তবু সে চলল তার পিছু পিছু। যাঃ, কোথায় গেল! চৌকির নীচে অজস্র জিনিস। এক লাফে তার আড়ালে ওটা লুকিয়ে পড়েছে। বিস্মিত হয়ে এধার ওধার চাইল। দাদ্দা? কোথায় তুমি? কেউ সাড়া দিল না। দাদ্ দাদ দা? এই এই, কোথায়? না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। মনটা খারাপ হল তার। বিরস মুখে বসে থাকল চুপ করে।

আরে ওটা কি? ওই যে ওই কোনে চিকচিক করছে। ওই যে, ওই যে, ওই যে। তার চোট দুটো আবার চকচক করে উঠল। গুটিগুটি সেদিকে এগিয়ে গেল। খপ করে তুলে নিল হাতে। বেশ-শক্ত জিনিসটা মুখে পুরে কামড় দিতে লাগল। মাড়িটা শুলুতে লাগল তার। কামড় দিলেই আরাম লাগছে। চুকচুক করে চুষতে লাগল, চুষতে চুষতে মাঝে মাঝে মাড়ির জোরে চাপ দিতে লাগল। বেশ লাগছে। বেশ লাগছে। এই নতুন কাজে উৎসাহের জোয়ার এল মনে। এতেই মেতে গেল।

হুড়মুড় করে ওদিকে কি পড়তেই সে সচকিত হয়ে উঠল। সে দেখল, তার বন্ধু সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। হাসি পেল তার। সে আবার বন্ধুকে অনুসরণ করল।

সে দেখল, তার বন্ধু এক লাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে গেল। কিন্তু সে পারল না। কি যে শত্রুতা আছে ঐ চৌকাঠটার সঙ্গে, কেন যে সে বারে বারে ওকেই আটকে দেয়, ও তা বুঝতে পারে না। মাঝে মাঝে বেজায় রেগে যায়! হাঁটু গেড়ে বসে প্রবল আক্রোশে দুহাতে ঝাঁকাতে থাকে চৌকাঠটাকে। পারলে যেন উপড়েই ফেলত।

আপাতত এই বাধাটায় সে মোক্ষম ঠেকা ঠেকে পড়েছে। কদিন ধরেই সমানে সে চেষ্টা করছে ওটা পার হতে। চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। ভাবনায় পড়েছে। এটা পেরতে না পারলে তার মুক্তি নেই। এটা অতিক্রম না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

বাধা সে কম পার হয়নি। এই ত সেদিনও, সে একেবারে নড়তে পারত না। অসহায় হয়ে বন্দী ছিল বিছানার কারাগারে। তখন শুধু হাত পা নেড়ে নেড়েই চলার সাধ মিটিয়েছে। পাশ ফিরতেও পারত না একদিন, উপুড় হতেও পারেনি। তারপর ধীরে ধীরে তার রক্তে একদিন পিতৃপুরুষের চাঞ্চল্য জেগে উঠল। সে অনুভব করতে লাগল এক তীব্র, এক অশান্ত পিপাসা তার মনে জেগে উঠছে। তাকে অস্থির করে তুলছে। বাধা ভাঙো। কে যেন তাকে তাগিদ দেয়। বলে, এ তোমার জায়গা নয়। তোমার জন্য এতটুকু স্থান নয়। তোমার ভুবন এখানে নয়। সে অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। ওঠো, ওঠো, ওঠো। চল, চল।

কিন্তু কি করে উঠবে সে? কি করে চলবে? তার শক্তি কোথায়? অসম্ভব, তারপক্ষে অন্যের সাহায্য ছাড়া পাশ ফেরা অসম্ভব, উপুড় হওয়া অসম্ভব। পারবে না সে। সে যে কিছুই পারে না। আবার তাগিদ আসে। তাগিদের পর তাগিদ। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। তোমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউই হার মানেনি। বিদ্রোহ করেছে, সংগ্রাম করেছে। একে একে সব বন্ধন ছিন্ন করেছে। সেই বিদ্রোহের উত্তরাধিকার না তোমার! জন্মসূত্রে তুমি না সৈনিক! বিজয়ী।

ভাল করে মনেও পড়ে না তার, কবে কেমন করে, তার রক্তে বিরামহীন সংগ্রামের প্রবল আহ্বান সে শুনল। টেরও পেল না, তার অজ্ঞাতসারেই কবে সে অসম্ভবকে সম্ভব করবার দুর্দম সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সে বুঝতেও পারল না, তার পরাক্রমে পঞ্চভৌতিক শক্তিকে সে তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে এরই মধ্যে বাধ্য করেছে। ঠেলতে ঠেলতে সে একদিন কাত হল, উপুড় হল। ক্রমাগত চেষ্টায় সে একদিন মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানকে মিথ্যে করে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল। হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘরময় ঘুরতে লাগল। সীমানাটাকে টেনে টেনে সে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে তুলল।

মাতৃজঠরের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে বিছানায় এসে সে একদিন বন্দী হয়েছিল। এখন বিছানার সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে ঘরের চৌহদ্দিতে বন্দী হয়েছে। এ এক অদ্ভুত খেলা সে খেলছে। বন্দিত্বের দিগন্ত পার হয়ে মুক্তি পাচ্ছে। মুক্তি পেয়ে দেখছে সে নতুন কারায় বন্দী হচ্ছে। এইভাবেই ত সে এতটা পথ এগোল। আর এত পথ এগিয়ে এসে শেষে কিনা ঠেকে গেল এই চৌকাঠে?

বিরক্ত হল সে। বাইরে ওই যে ওরা হাঁটছে ফিরছে, মা গিয়ে লুকিয়ে থাকছে কোথায়, কিছুতেই সে নাগাল পাচ্ছে না কারও। ওরা সব সে চৌকাঠের ওপারে। ওদের নাগাল এ জীবনে বুঝি সে ধরতে পারবে না। লুকনো সেই জায়গাটায় গিয়ে মাকে বুঝি আর খুঁজে বের করতে পারবে না! যদি সে এই চৌকাঠটা ডিঙোতে পারত! অন্তত একবার, একবারও যদি পারত!

না, এ অসম্ভব। এ বাধা সে আর পার হতে পারবে না। কখনই না। হতাশা এল তার। শ্রান্ত হয়ে পড়ল। কোন কিছুই ভাল লাগছে না। খুঁত খুঁত করে কাঁদতে লাগল। খানিকক্ষণ কাঁদল।

হঠাৎ তার হাত-পা নিশপিশ করে উঠল। চনমন করে উঠল রক্ত। পুরুষ পুরুষ ধরে যে অতৃপ্তি জন্ম নিয়েছে মানুষের মনে, যে আকাংখা পাগল করেছে তাকে, সেই অতৃপ্তি, সেই আকাংখা, সেই তাগিদ প্রবলবেগে গুঁতো মারতে লাগল। অস্থির হয়ে উঠল সে। পাগল হয়ে গেল যেন। চৌকাঠটা দুহাতে ধরে পায়ে ভর দিয়ে একটুখানি তুলে ধরল নিজেকে। ও বাবা, বড্ড টাল। সামলান দায়। থপ করে বসে পড়ল। খানিক পরে আবার উঠল। আবারও পড়ল। দূর, এ কী পারা যায় নাকি? না, সে পারবে না। সে হার মানছে।

কে হার মানে? আবার তার ভিতরে এক বর্বর তৃষ্ণা জেগে উঠল। তাকে হার মানতে দিল না। আমি যাবই, আমি যাবই, যাবই। যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। এই প্রতিজ্ঞার কাছে আর সব তুচ্ছ হয়ে গেল। এবার বারবার চেষ্টা করল উঠতে। থপথপ করে পড়লও বারবার। এমনি পড়তে পড়তে উঠতে উঠতে টাল ভাঙল। চৌকাঠ ধরে এক সময় আকাবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েও পড়ল। হ্যাঁ পেরেছে। যে পৃথিবী প্রবল বেগে ঘোরে, যে পৃথিবী কাউকে করুণা করে না, তার উপর টেক্কা মারার কৌশল করায়ত্ত হয়েছে তার। এবার সাহস বাড়ল। টাল সামলাতে শিখে ফেলল। বেশ কয়েকবার সে দাঁড়াল। কি ফুর্তি, কি ফুর্তি! প্রচণ্ড উল্লাসে নাচতে লাগল সে। কি মজা, কি মজা! খুব নাচছে। উৎসাহ ফেটে পড়ছে তার নধর দেহে। এখন সে ধরে ধরে দাঁড়াতেই চায়। বারে বারে তাই দাঁড়াচ্ছে।

বারান্দায় তার বন্ধুটা এসে বসেছে। যেই ঝোঁক দিয়ে দেখতে গেল অমনি উল্টে পড়ল বারান্দায়। কি হল! সে ঠিক বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার মনে হল সোঁ করে যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। তাই থপ করে মাটিতে পড়ার পর কয়েক মুহূর্ত সে কান্নাকাটি কিছুই করল না। যেন একটু সামলে নিল। পরমুহূর্তেই কান্নার চোটে বাড়ি মাথায় করে তুলল।

হেঁসেলে হিমসিম খাচ্ছিল গিরিবালা। পিতলের বড় ডেকচিটায় ভাত চড়িয়েছেন বড়-জা। পুকুরের পানা তুলতে লোক লেগেছে। ঘরামিরা চাল ছাইছে। জন দশেক লোক খাবে। এই এক ডেকচিতে সকলের ভাত চড়েছে। চাল ফুটে উঠল। ভারী ঢাকনাটা ঢক ঢক করে যেন মাথা কুটতে শুরু করল।

বড় ভাশুর দু খালুই পুঁটি মাছ এনেছেন। গিরিবালা এতক্ষণ ধরে হেঁসেল ঘরের এক পাশে বসে সেগুলো কুটছিল। এ কী এক হাতের কাজ! কিন্তু গিরিবালা জানে, এ সব ছোট কাজে কেউ হাত লাগাবে না। বড়-জা সেই ঘরেরই অন্য ধারে পা ছড়িয়ে বসে, দুই মেয়ে নিয়ে জমিয়ে গল্প করছেন আর কাজ করছেন। কাজ ত ভারী! যারা পুকুর সাফ করছিল, তারা এক ডাঁই কলমি শাক তুলে দিয়েছে। তিন-জনে মিলে তাই বাছতে লেগেছেন। গিরি-বালা একবার চেয়ে দেখল, এখনও অর্ধেকও হয় নি।

বড় জা বড়মেয়েকে বললেন, ও চম্পি, ভাতটা একবার দ্যাখ ত?

চম্পি অসন্তুষ্ট হল।

গোমড়া মুখে বলল, ক্যান, চম্পি দ্যাখবে ক্যান, বাড়ীতি কি আর মানিষ্যি নেই?

ঝাঁ করে গিরিবালার কান লাল হয়ে গেল। কোন লক্ষ্য যে এ বান ছোঁড়া, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না তার।

বড়-জা বললেন, লোক থাকবে না ক্যান, লোকের মধ্যে ত দেখতিছি এক বাঁদী, এই আমি। আর ত সবার হাতেই জুড়া।

গিরিবালা বুঝল, সবার মানে গিরি-বালার কথা বলা হল। ওর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। এই বাড়িতে এসে অবধি সে বড় ভয়ে ভয়ে থাকে। কি জানি কেন, গিরিবালার মনে হয়, এখানকার কেউ তাকে ভাল নজরে দেখে না। বিশেষ করে মেয়ে মহল। মুখে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু ওদের আড়া-আড়া ছাড়া-ছাড়া ভাব দেখে গিরিবালা বুঝতে পেরেছে, ওকে খুব প্রসন্ন মনে কেউ যেন গ্রহণ করে নি।

গিরিবালা প্রাণপণে পরিশ্রম করে। যে যা বলে করে দেয়। কারোর কোন কথার থাকে না। সকলের মন জুগিয়ে চলবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের সুবিধে অসুবিধে দেখে। কিন্তু তাকে কেউ দেখে না। এইটেই ওর কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। ব্যথাও পায়।

সকাল থেকে উঠেই তার খাটুনি শুরু হয়। একে বাড়িটা বড়, তার উপর ছাড়া ছাড়া, এ পোঁতায় একখানা ঘর, ও পোঁতায় আরেকখানা ঘর, ছটোছুটি করতে করতেই প্রাণান্ত হয় তার। তায় এরা বড় অগোছাল। কি রকম যেন! অযত্নে অবহেলায় কত জিনিস যে নষ্ট হয়, সে দিকে কারোর কি

লাক্ষা আছে? কোন কাজ কেউ গুছিয়ে করে না। অথচ বাড়িতে বড় বড় দুটো মেয়ে, চম্পি আর যূথী। বিয়ের বয়েস দুজনেরই হয়েছে। চম্পির বিয়ের চেষ্টাও চলছে। কিন্তু ওরা ওদের আড্ডা আর মেজাজ নিয়েই আছে।

চম্পি কলমির বড় বড় ডগাগুলো পুট পুট করে ভাঙতে লাগল। যূথী কোন সাড়াশব্দই দিল না। ডেকচির ঢাকনাটা বার কয়েক ঢকাস ঢকাস করে বড় বড় গুঁতো মারল।

বড়-জা বললেন, তাহলি পুড়ুক ভাত, পুড়ে যাক। গভ্ভের সন্তান, সেই কথা শোনে না, কারে আর কি কব?

চম্পি খর খর করে বলে উঠল, বাড়ির মেয়েরা কি চিরটাকাল হাড়ি ঠ্যালবে না কি? যদ্দিন লোকজন ছিল না, খাটতি ত কসুর কিছু করিনি। একটা কাজ হাতে নিয়ে দিন কাবার করার কায়দা আমরা শিক্ষে করিনি।

চম্পির কথা শুনে গিরিবালার চোখ ফেটে জল এসে গেল। এত কাজ করার পরও কেমন সব কথা শুনতে হয় দ্যাখ। গিরিবালা মাছ কোটা বন্ধ রেখে উঠে গেল। হাতটা বেশ করে ধুয়ে এসে ডেকচির ঢাকনাটা এক পাশে সরিয়ে দিতেই এক বলক ফ্যান উথলে উঠল, গরম বাষ্প বুজবুজ করে বেরিয়ে গেল। খুন্তি করে গোটা কতক ভাত তুলে এনে টিপে দেখল, হয়ে গেছে। ডেকচির ভিতর ভাতগুলো আস্তে করে ঘুটে খুন্তিটা ঠক ঠক করে ডেকচির কানায় ঠুকল তারপর একটা থালার উপর খুন্তিটা রেখে ঢাকনাটা আবার চাপা দিল। এবার ভাত নামাতে হবে। ডালের বোগনোর পাশে ন্যাতা পড়েছিল। গিরিবালা সে দুটো তুলে এনে ভাতের ডেকচি নামাতে গেল।

ডেকচিটা কি ভারী! এতটা ভারী তা আগে বুঝতে পারেনি গিরিবালা। প্রথমবার ত তুলতেই পারল না। অপ্রস্তুত হল।

বলল, ও বড়দি, এ যে দেখছি বেশ ভার।

ভেবেছিল একথা শুনে কেউ হয়ত সাহায্য করতে আসবে। কিন্তু যে রকম মন দিয়ে কলমির শাক বাছতে আরম্ভ করেছে ওরা, তাতে মনে হয়, ওর সঙ্গে ওদের বাঁচন মরণ জড়িয়ে আছে।

বড়-জা একটা হাই তুলে বললেন, হাঁ, খুব সাবধানে নামাস।

গিরিবালা বড়-জার জবাব শুনেই বুঝল, কারোর আর হাত লাগাবার কোন ইচ্ছেই নেই। এইবার গিরিবালা ভাবনায় পড়ল। এত ভারী ডেগ যদি না নামাতে পারে তবে বড় বে-ইজ্জৎ হয়ে যেতে হবে। ওরা হাসাহাসি করবে। চিরকাল খোঁটা দেবে। পাড়ায় পাড়ায় কথাটা রটে যেতে বিলম্ব হবে না। না, গিরিবালা কথা বলবার সুযোগ দেবে না কাউকে। তার কেমন জেদ চেপে গেল। দাঁতে দাঁত চিপে সে সর্বশক্তি দিয়ে ডেকচিটা তুলে ধরল। তুলতেই বুঝল, গোয়ার্তুমিটা করে খুব ভুল করেছে।

ডেকচির ভারে তার শরীরটা নুইয়ে পড়ল। সবশুদ্ধ উনুনের উপর উল্টে পড়ে বুঝি। গরম ডেকচির ভাপ তার গায়ে লাগছে। উনুনটা লক লক জিভ বের করে গিরিবালাকে গ্রাস করার জন্য যেন এগিয়ে আসছে। অদৃশ্য হাতে জোরে টান মারছে। গিরিবালা প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিরোধ করতে লাগল। তার পিঠ, পেট, কোমর টন টন করছে প্রবল চাপে। মনে পড়ে মরার প্রবল আতঙ্ক। কপালের ঘাম টস টস করে পড়ছে, চোখে এসে ঢুকছে। শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাতের পেশী সব যেন পট-পট করে ছিঁড়ে যাবে। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখল। আর সেই গাঢ় অন্ধকারে উজ্জ্বল অজস্র সব বিন্দু ছুটোছুটি করতে লাগল। আর প্রতিরোধ করতে পারছে না গিরিবালা। ডেকচি সমেত সে নিজেও পড়তে শুরু করেছে। আর রক্ষা নেই। এবার হাঁড়িসুদ্ধ উনুনে পড়বে গিরিবালা। সিদ্ধ হয়ে সে মরবে। খোকার কি হবে? ভূষণ কোথায়?

ধপ করে গিরিবালা নামিয়ে ফেলল ডেকচিটা। উনুনে নয়, একেবারে ওর পায়ের উপর। একটুখানি ফ্যান চলকে পড়ল পায়ে। উঃ করে উঠল যন্ত্রণায়। পায়ের আঙুলে ছেঁচে গিয়েছে। গরম ফ্যান পড়ে পা জ্বালা করছে। ফোস্কা পড়ে উঠল। মাথাটা যেন টলছে। মুখ চিপে ব্যথা সামলাল। চোখ বুজে টাল সামলাল।

বড় জা নির্বিকারভাবে বলে উঠলেন, ও কি, পা-র উপর ফেললি। সাবধানে নামাতি কলাম না। কি ফোস্কা পড়ল না কি? আর পারিনে বাপু। যাও একটু আলু ছেঁচে লাগায়ে দ্যাও।

এমন সময় পরিত্রাহি চীৎকার করে কেঁদে উঠল গিরিবালার খোকা। যেন মাকে ওই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে ইশারা করে ডাকল।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দেখে, খোকা চৌকাঠের বাইরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ডুয়ার একেবারে কিনারে চলে এসেছে! আর একটু হলেই উঠনে গড়িয়ে পড়ত। সর্বনাশ! দরজা ডিঙোতে শিখেছে! আর বাঁচান যাবে না ছেলেকে। কে সর্বদা চোখে চোখে রাখবে। নিজের যন্ত্রণা আর খোকার ভাবনায় জেরবার হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। খাটের উপর খোকাকে নিয়ে শুয়ে পড়ল। ফোস্কার ব্যাথায় কাতর হয়ে পড়তে লাগল সে।

গিরিবালা ভাতের ডেকচিটা উপুড় না দিয়েই চলে গেল দেখে বড় জা একটু অসন্তুষ্টই হলেন। চম্পিকে একটা ধমকও দিলেন।

ভাত যে এতক্ষণে গলে পিণ্ডি হয়ে গেল, ও চম্পি! কার ছিরাদ্দে দেওয়া হবে?

ধমক খেয়ে চম্পি অপমানিত বোধ করল।

কার ছিরাদ্দে আর দেব, সে মুখে মুখে জবাব করল। যাই নিজির পিণ্ডি নিজিই সাজাই গে। এ বাড়ির হয়েছে বেশ, এক এক কাজ সারতি জনা সাতেক করে লোক চাই।

দুম দুম পা ফেলে সে ডেকচিটার কাছে এগিয়ে গেল। ফ্যান গালতে নেবার জন্য সেটা সরাতে গেল। কিন্তু নড়াতে পারল না। ও বাবা, এ যে দেখছি জগদ্দল পাথর! ছোট কাকী নামাল কি করে? অবাক হয়ে গেল চম্পি। এই ডেকচি কাকীমার উপরে পড়েছে? কি সর্বনাশ, সে পায়ের ত আর নেই তাহলে। চম্পি ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কোনমতে গড়িয়ে টুড়িয়ে ফ্যান ঝরাবার জায়গাতে হাড়িটা নিয়ে গেল চম্পি। ডেকচিটাকে ঢাকনা সমেত কাত করে বসিয়ে রেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

বাঁ পায়ের আঙুল কটায় আর ডান পায়ের গোড়ালির উপরে ফোস্কা পড়েছে। সেখান থেকে তীব্র যন্ত্রণা উঠে সমস্ত শরীর যেন ছিঁড়ে ফেলছে। বিছানায় শুয়ে খোকাকে মাই খাওয়াচ্ছিল গিরিবালা।

আর নিঃশব্দে কাঁদছিল। ওর মনে হচ্ছিল বুঝি জ্বর এসে গেছে।

চম্পি ঘরে ঢুকেই বলল, দেখি কাকীমা তুমার পা দেখি।

গিরিবালা ধড়মড় করে উঠে বসল। এ আবার কি খেলা! মনে মনে সে শঙ্কিত হল। খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটায় খোকা কেঁদে উঠল।

শোও শোও, শুয়ে পড়। যা করছিলে, কর। আমি পা দুখানা দেখি।

গিরিবালার পায়ের অবস্থা দেখে চম্পি শিউরে উঠল। ই-শ্!

গিরিবালা মনে মনে চটে গেল। আবার আদিখ্যেতা হচ্ছে।

চম্পি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। বড় অপরাধী বলে মনে হতে লাগল নিজেকে। সেই ত দায়ী। তার বোঝা উচিত ছিল, অত বড় আর অত ভারী ডেকচি নামান কারোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন সে তখন এগিয়ে যায় নি। যদি আজ মারাত্মক কান্ড কিছু ঘটে যেত! খুব ফাঁড়া কেটেছে আজ বাড়ির লোকের। আর মাকেও বলিহারী যাই, ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে নারকেল তেল আর চুন ফেটাতে ফেটাতে চম্পি মায়ের উপর চটে উঠল। ঐ যজ্ঞি রাঁধার হাঁড়ি আজ নামাবার দরকার ছিল কি? না হয় তিন চড়া ভাত হত!

চম্পি তেলে-চুনে মিশিয়ে নিয়ে গিরিবালার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বলল, যাই বল কাকীমা, তুমি লোক সজ্জা নও। একবার আসো বলে ডাকতি কি হইছিল। যদি আথার উপর গিয়ে পড়তে, পুলিসি যে আমাদের হাতে দড়ি দিত। দ্যাও, লাগায়ে দিই ওষুধটা।

গিরিবালা বিব্রত হয়ে না না করে উঠল।

চম্পি ধমক দিল, থাম।

তারপর জোর করে ব্যথার জায়গায় প্রলেপ লাগিয়ে দিতে লাগল। পাছে আরও ব্যথা লাগে তাই কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে রইল। সে অবাক হয়ে চম্পিকে দেখল খানিকক্ষণ। কই, ওর মুখে ত বিরাগের ছাপ নেই। চোখে মুখে ত আন্তরিকতাই ফুটে বেরোচ্ছে। তবে, এর সম্পর্কে তার খারাপ ধারণা হয়েছিল কেন?

চম্পি বলল, দ্যাখ কি? আমার হৃদয় পাষাণ কি না?

অপ্রস্তুত হয়ে গিরিবালা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলল, ছি ছি, তুমারে পাষাণ ভাবব ক্যান। কোনদিন তা ভাবিনি।

গিরিবালাকে সেদিন আর কাজকর্ম করতে দিল না চম্পি। প্রায় জোর করেই শুইয়ে রাখল বিছানায়। চম্পিকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিল গিরিবালা। তার পায়ে ব্যথা হয়েছে। পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে। এর উপর কাজকর্ম করতে হলে সে ঠিক মরে যেত। চম্পির মনটা ভালই। সে এতদিন বুঝতে পারে নি।

শ্বশুরবাড়ির প্রায় কাউকেই গিরিবালা বুঝতে পারে না। কেন যে এটাকে বিভুঁই বলে মনে হয়, কে জানে। এখানেও যে-আকাশ, যে-মাটি, তার বাপের বাড়িতেও তো সেই আকাশ, সেই মাটিই। সেই একই রোদ বৃষ্টি ঝড়। তবু বাপের বাড়ির আকাশে কেমন প্রকান্ড প্রশ্রয়, সে-মাটিতে যেমন স্নেহক্ষরা আশ্রয়, এখানকার আকাশ বাতাস মাটিতে সেই আস্বাদটা পায় না গিরিবালা।

বাপের বাড়ির রোদে কেমন তেজ! আরাম দেয়। এখানকার রোদ তাকে পোড়ায়। এখানকার বৃষ্টি তাকে কেবল হেনস্থাই করে, ঝড় তাকে শাসায়। সে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। এটা যেন তার বিরুদ্ধ পুরী। আর আশ্চর্য শ্বশুরবাড়ির বিভিন্ন লোকের মুখে মনে যেন এই ভাবটাই লেখা আছে বলে গিরিবালার মনে হয়। সে হাঁফিয়ে ওঠে। মন কেমন করে তার।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকে গিরিবালা। বাড়িতে লোক ত কম নয়। শাশুড়ি, বড়-জা, ভাশুর-পো, দুই ভাশুর-ঝি, ভূষণ, সে, খোকন, দুজন বাইরের-কাজ করার লোক। হ্যাঁ, আরও একজন আছেন, বক্সী-মশাই। ইনি যে এ বাড়ির কে তা জানে না গিরিবালা। চুপচাপ থাকেন। দুবেলা দুটো খান আর হুঁকো টানেন। বয়েস কত তাও বোঝা যায় না। রোগা, হাড়-বার-করা শরীরটা। এত লোকের কাজ গিরিবালাকে সামলাতে হয়। দিনরাত কোথা দিয়ে বেরিয়ে যায়, সে বুঝতেও পারে না।

খোকাকে যত্ন করতে বলেছিল বড় মা। কিন্তু কখন করবে? প্রথম প্রথম দিনকতক খুব যত্ন নিয়েছিল গিরিবালা। কিন্তু সেটা নাকি আদিখ্যেতা। সে এই কথাই শুনতে পেল। চাপা কানাকানিও তার কানে গেলঃ ছেলে যেন এক গিরিবালারই হয়েছে, ত্রিসংসারে আর কারও ছেলে যেন মানুষ হয় নি।

গিরিবালা না হয় জানে না, বোঝে না, কি করে কি করতে হয়। তাই হিমসিম খায়। সামলাতে পারে না। কিন্তু তার শাশুড়ি ত জানেন, বড়জা ত জানেন? তাঁরা কেন কিছু বলেন না? তাঁরা কেন এ ভারটা নেন না? গিরিবালার না হয় ছেলেপুলে হয়নি এর আগে, ওদের ত হয়েছে।

কিন্তু এটা তার বাপের বাড়ি নয়, এখানে বড়মা, পিসিমা, কাকীমা নেই। সহানুভূতি, সমবেদনা নেই। সহযোগিতা নেই। আছে শুধু নিষ্করুণ সমালোচনা, পদে পদে খুঁত ধরার বিকারগ্রস্ত উৎসাহ। শ্বশুরবাড়িটাকে গিরিবালার মনে হয় ফলহীন, ফুলহীন শুধু চোরকাঁটা বিছানো এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র।

তাই গিরিবালা নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে রাখে। এমন কি প্রকাশ্যে তার খোকনের উপরও দৃষ্টি দেয় না। সময়মত খাওয়াতে পারে না। খিদেতে চিৎকার করতে থাকে তার ছেলে। কেঁদে কেঁদে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলে। কিন্তু সে অবুঝটা ত বুঝতে পারে না, তার মা বন্দী, এখন বন্দী হয়ে আছে সংসারের কাজে। হেঁসেলে কি অন্য কোথাও। হাতের কাজে সে তখন মন বসাতে পারে না। মনে মনে সান্ত্বনা দিতে থাকে, চুপ কর, চুপ কর, বাবা আমার, এই যে হয়ে আলো, হয়ে আলো। কাজ সারবার জন্য সে তাড়াহুড়ো করতে যায় আর গোলমাল করে ফেলে। দেরি হতে থাকে তার। বিরক্ত হয়ে ওঠে গিরিবালা। মুন্ডপাত করতে থাকে মনে মনে। বড়-জা ভাশুর-ঝি, শাশুড়ি, ভূষণ, কাউকেই সে রেয়াত করে না। নিজেকেও না। এমন কি কখনও কখনও খোকনকেও ছাড়ে না।

তার একমাত্র সুহৃৎ এখন রাত। রাত গভীর হলে গিরিবালা বেঁচে যায়। খোকনের উপর অজস্রধারে সে তখন স্নেহ ঢালতে থাকে। ইস্ কি ঘামাচিই না বেরিয়েছে দ্যাখ ওর সারাটা গায়ে। এ কি, বুকে আবার বিষফোঁড়া কখন বেরল? চুলে কেমন জট পাকিয়েছে দেখেছ, মাগো, সারা গায়ে ধুলো-মাটি কিলবিল কিলবিল করছে। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় পরম যত্নে। চুলগুলো আঁচড়ে দিতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু এ ঘরে চিরুনি নেই। এত রাত্রে চিরুনিটা আনতে বড় আলস্য লাগে তার। তার চোখেও ঘুম এসে গিয়েছে। যাক, কাল আঁচড়ালেই চলবে। ঘুমন্ত ছেলের মুখে গোটাকতক চুমু খেয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় তাকে। ছেলেটা দিন দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। সে-ও ঘুমিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গিরিবালা বড়মা, পিসিমা আর কাকীমার ধমকানি শোনে। তাতে তার রাগ হয় না। সে বরং খুশিই হয়। একেবারে নির্বান্ধব সে নয়। আছে আছে, এই পৃথিবীতেই এমন জায়গা আছে, যেখানে তার সান্ত্বনার আশ্রয় মিলবে। পরম সুখে খোকাকে কোলে টেনে নেয় গিরিবালা।

বুঝি তার ঘুমই এসেছিল। কপালে কার শীতল স্পর্শ পেয়ে সে চমকে উঠল।
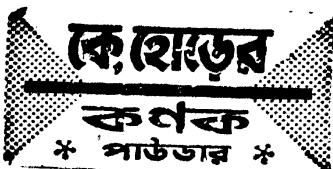
বড়মা? চোখ মেলে সে অবাক হল। বড়-জা। তার পিছনে শাশুড়ি। ধড়মড় করে উঠে বসল গিরিবালা।

বড়-জা বললেন, ওলো, তোর যে জ্বর হয়েছে। শুয়ে থাক্‌, শুয়ে থাক্‌।

এ ত বড়-জা নয়, বড়মা। শরীর জুড়িয়ে গেল তার। চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

শোও শোও, পালোয়ানের বিটি!

শাশুড়ি বললেন। এ কোন শাশুড়ি!

ভয় নেই মা, সামান্য গা গরম হয়েছে। তড়াশের জ্বর। চম্পির মুখে শুনে আমি ত থরথরায়ে মরি। কি কাণ্ড করিছিলে মা, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে তাই রক্ষে। একটু এদিক-ওদিক হলিই সব্বনাশের মাথায় বাড়ি। কাঁচা পুয়াতি তুমি অমন গোঁয়ারতুমি কি করে? ছি ছি।

গিরিবালাকে কোনদিন বকেন নি এঁরা, আজ বকছেন। কিন্তু কই, গিরিবালার মনে ত তার জন্য কোন কষ্ট হচ্ছে না। সে এতে সুখ পাচ্ছে কেন? তবে কি এ বাড়িতেও স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে? তার জন্য দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠবার মত হৃদয়ও আছে? এ কী আশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলল গিরিবালা? কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিল তার।

চম্পি এল এক বাটি দুধ নিয়ে।

কাকীমা খাও।

কিন্তু গিরিবালার খিদে আর নেই। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। সে যে অমৃত পেয়েছে আজ। সারা জীবনই এখন না খেয়ে কাটাতে পারে।

দুধের বাটি দেখে তার ছেলে উঠে বসল। কচি কচি হাত বাড়িয়ে, দুলে দুলে বলল, দাদ্দা।

চম্পি হেসে বলল, ওরে রে হ্যাংলা। এ তুমার দুধ না। মা খাবে।

চম্পির কথা শুনে ফোকলা মুখে সে হাসতে লাগল।

দাদ্‌ দাদ্‌ দা।

হাত দুটো উপরে তুলে ঘোরাতে লাগল।

বড়-জা, শাশুড়ি, চম্পি হাসতে লাগল। গিরিবালাও হেসে ফেলল।

শাশুড়ি বললেন, বুঝিছি দাদু, বুঝিছি। খিদে পায়েছে। চল চান করে খাবা।

চান করিয়ে, চুল আঁচড়ে, কাজল-টাজল পরিয়ে চম্পি যখন খোকাকে নিয়ে গেল গিরিবালার কোলে, সে তখন তাকে প্রায় চিনতেই পারে না।

চম্পি অনুযোগ করল, কি নোংরা করেই যে এরে রাখ কাকিমা? দ্যাখ দিন, কেমন রাজপুত্তুরের মত দ্যাখাচ্ছে এখন। যাই বল বাপু, তুমি বড় ঢিলেঢালা।

তা হয়ত সে একটু আছে। অস্বীকার করছে না গিরিবালা। একেবারে নতুন ত। বাপের বাড়িতে কি এত কাজ করতে হয়েছে নাকি কখনও!

ন্যাও, আজ বাড়া ভাত খাওয়ার কপাল তুমার, পাটে বসে বসে তাই খাও।

চম্পি হাসল। গিরিবালাও হেসে ফেলল। ঠাট্টা করছে চম্পি। তা করুক। এটা ঠাট্টাই। এতে ঝাঁজ নেই, হুল নেই। শরীরে বেঁধে না, কাতুকাতু দেয়।

বেশ মেয়ে চম্পি। বেশ মেয়ে।

ভূষণের বড়দা বিলাস মেজাজ গরম করেই বাড়ি ফিরলেন। এই দুপুর পর্যন্ত টো টো করে প্রজার বাড়িতে ঘুরেছেন, এক পয়সা আদায় হয় নি। রোদ লেগে বড় কষ্ট হয়েছে তার। তার উপর খিদে পেয়েছে। এখন একটু জিরোবেন, তারপর চান করে পুজোয় বসবেন। এক ঘণ্টার আগে পুজো সারা হবে না তাঁর। তারপর খেতে বসবেন। তিনটের আগে আজ আর খাওয়া হবে না।

বাড়িতে পা দিয়েই দুর্ঘটনার কথা শুনলেন। আর শুনেই মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে লাগলেন।

বলি ওগো, কনে গেলে, বউমা আস্ত আছে ত?

শোন কথা! দামিনীর পিত্তি জ্বলে গেল। নিজের জ্বালায় মরছেন তিনি, সংসারের কাজ তার ঘাড়ে, নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই, আর সন্দ এখন আড়াই পহর বেলায় বাড়ি ঢুকে চিন্তা দেখাচ্ছেন। তিনি জবাব দিলেন না।

বলি কেউ কথা কয় না ক্যান, চিতেয় উঠিছে নাকি?

না এতক্ষণ ওঠেনি, মড়ারা সব শুকোচ্ছিল, এতক্ষণে ডোম আসেগ, ইবার ওঠবে।

দামিনীর কথা শুনে বিলাস লাফাতে লাগলেন উঠনে।

ওই মুখখান আছে, তাই করে খাচ্ছ। বুড়ো মাগী বসে বসে খাবে, আর কচি মেয়েটারে দিয়ে আধমুনি হাঁড়ি ঠ্যালাবে। ক্যান, গতরখানা ত সাতটা কুমিরিউ শেষ করতি পারে না, উডা নাড়াতি হইছিল কি?

দামিনী এবার রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বলল, দ্যাখ, চাষার মত চেঁচায়ে না।

বিলাস একেবারে গাড়ু নিয়ে ছুটে গেলেন।

কি বললি? আজ তোর ঐ মুখ থাঁতা করে দেব।

চাঁপা আর যূথী হাউমাউ করে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। দামিনী রান্না ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। ভূষণের মা ভীতু মানুষ। এক কোণায় বসে ইষ্টনাম জপ করতে থাকলেন চম্পি যূথীকে যাচ্ছেতাই করে বকলেন বিলাস।

হাতিগুলো বসে বসে শুধু গেলবে। হাতিগের পার করাতি করাতি ফতুর হয়ে গেলাম, তবু পাল শেষ আর হয় না। হাড় যে জুড়বে কবে।

বাবার কথায় চম্পির বুকে যেন শেল বাজল। তার দোষটা কি? সে কী কাকিমার পায়ে হাঁড়িটা চেপে ধরেছে না গরম ফ্যান তার গায়ে ঢেলে দিয়েছে। হাঁড়িটা যে এত ভারি, সে তা জানবে কি করে? কাকিমা বলতেও ত পারত। একটা ডাক দিলেই সে গিয়ে হাত দিত-হাঁড়িতে। এমন ত নয়, সে কাজকর্ম করে না।

এ সবই কাকিমার শয়তানি। ওর ওই আহ্লাদী আহ্লাদী ভাবখান দেখে ওকে যত সাধাসিধে মনে হয়, উনি তা আদৌ নন। ইচ্ছে করেই ও আজ এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। সবাইকে বকা খাওয়াবার জন্য। আসলে ওর তেমন লেগেছে কিনা, সে সম্পর্কেই চম্পির এখন সন্দেহ হচ্ছে। ঢং করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

রাগে কস্‌ কস্‌ করতে করতে গিরিবালার ঘরে গিয়ে উঠল চম্পি।

যতটা পারে বিষ ঢেলে দিল কথায়, তুমারে একা একা ওই হাঁড়ি নামাতি কইছিল কিডা? খুব যে কাজ দ্যাখায়ে আলে? এখন ত বিছানায় আসে উঠিছ। কভা দাসী বাঁদী সঙ্গে পাঠায়েছে তুমার বাবা। ইবার তাদের দিয়ে কাজ করাও। আমরা পারব না।

গিরিবালার বুকে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ লাথি মেরেই যেন চলে গেল চম্পি। সে ছটফট করতে লাগল অপমানে আর লজ্জায়। জিভে কী তীক্ষ্ণ ধার চম্পির? শুধু শুধু তাকে অপমান করে গেল। বট্‌ঠাকুরের চীৎকার শুনে মরমে মরে গিয়েছিল গিরিবালা। এখন চাঁপির বাক্যির চোটে সে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পেল।

এ বাড়িতে গিরিবালা থাকতে পারবে না। আসুক ভূষণ। সব সে বলবে। প্রতিকার চাইবে। ভূষণ যদি কিছু না করে, করবে না বলেই বিশ্বাস, তখন বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলবে তাকে। না যদি পাঠায় ত বাবাকে আসতে লিখে দেবে। কালই চিঠি লিখবে বাবাকে।

(ক্রমশ)

মডেল ৭৩০

* নতুন 'ম্যাগ্নি-ব্যাণ্ড' টিউনিং !

* ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাণ্ডস্প্রেড !
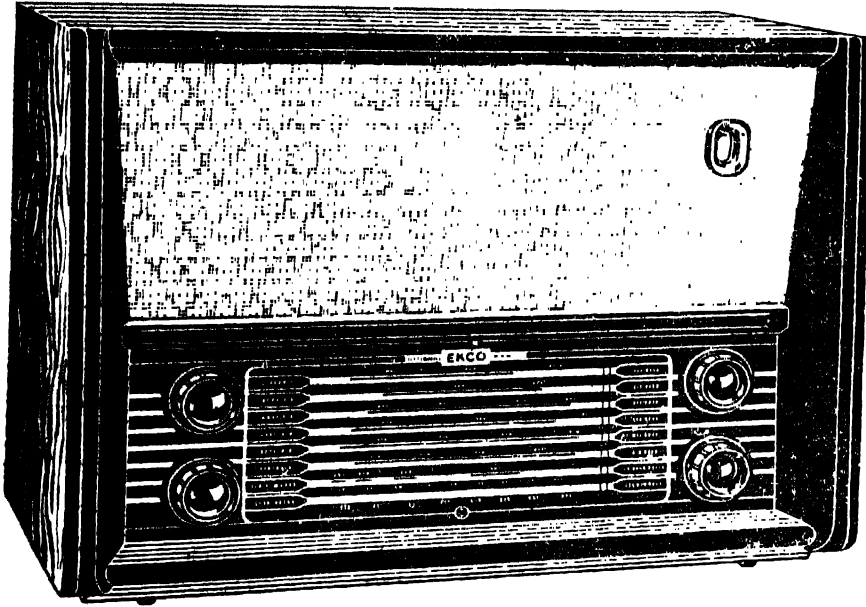
মডেল এ-৭৩০ : ৬ ভালভ, ৮-ব্যাণ্ড, এসি। মডেল ইউ-৭৩০ : এসি/ডিসি। ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের ক্যাবিনেট।

দাম ৪৯৫৲ টাকা নীট

স্থানীয় কর স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—

ছোটখাটো স্টেশন ধরতেও আপনাকে আর সময় নষ্ট করতে হবেনা—ন্যাশনাল-একোর নতুন মডেল ৭৩০ 'ম্যাগ্নি-ব্যাণ্ড' টিউনিং সংযুক্ত ! ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে আছে গুরুত্বপূর্ণ বহু স্টেশন, আর বিশেষ ব্যাণ্ডস্প্রেড ব্যবস্থার ফলে সহজেই সুপষ্টভাবে সেসব স্টেশন ধরা যায় !

আজই আপনার কাছাকাছি অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো বিক্রেতার দোকানে গিয়ে নতুন মডেল ৭৩০ দেখে আসুন !

এগুলি মনসুনাইজড

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেজার রোড, পাটনা। ১।১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬।৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর। যোগধিয়ান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী। রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ।

GRA

GRA 9117

উপন্যাস

জনপদবধূ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৪·৫০।

তরুণ লেখকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম তাঁর লেখার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলের সীমানা বাড়ালেন। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কাহিনীর পুনর্বাসন হল। এবং বলতে গেলে ছোট গল্পে ও উপন্যাসে প্রথম নোনা-জলের স্বাদ নতুন করে পেলাম শচীনবাবুর লেখার মধ্য দিয়ে. অন্তত সেজন্যেও তিনি বাঙালী পাঠকদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি যদিও সামুদ্রিক নরনারীর জীবনকথা নয় তবু এর মধ্যেও পটভূমির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবো। বাঙলা দেশেতের কোন সুদূর অঞ্চলের জনজীবনের কথা আছে এর মধ্যে এবং সেখানে একটি বাঙালী চরিত্র আশ্চর্যভাবে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে প্রাচীনকাল এবং নবীন কালের বন্ধন ঘটেছে দক্ষিণ ভারতের সেই জনপদের বিচিত্র চিত্রকলায়। ইতিহাসের বর্ণক্ষেপে শচীনবাবু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের নিয়ে গল্পের কথাবস্তু তারা সাধারণ নরনারী নয়, তাদের জীবন তাদের জীবিকা মানুষের ইতিহাসের একটি আদিম অধ্যায় হলেও, প্রতিটি প্রলেপে ও রঙের অবগাঢ়তায় তারা চিত্তাকর্ষক। দেহজীবাতার মধ্যেও কোথায় যেন একটি পরিশুদ্ধ অনুশীলনের তার বাঁধা, নৃত্যকলা এবং সংগীতের মধ্যে যেমন আমরা একই সঙ্গে লৌকিক অলৌকিকের মেলবন্ধন লক্ষ্য করি এই নব-রক্ষার মধ্যে তারই প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। তাই তাদের নাম বারাঙ্গনা নয়, পতিতা নয়; তারা সুদূরকালের স্মৃতিবহ জনপদবধূ মাত্র। এই বধূ কথাটার মধ্যেই নারীজীবনের বহু সঞ্চিত বেদনার আভাস রয়েছে। এক রাত্রির বরণ এবং বিবাহ, রজনীর শুভ্র অবসানে যে বৈধব্যের রঙ নিয়ে আসে তার উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত প্রেমের চৈতন্যে উপনীত হয়েছে। ভামতী এমন একটি চরিত্র। তার নারীত্বের বিকাশ এবং দ্বন্দ্ব, তার অশ্রু এবং উল্লাস স্নিগ্ধ যূথীগন্ধের মত আলোচ্য কাহিনীকে সুরভিত করেছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে চেট্টিবাবু, নটরাজন, ঘনশ্যামদাসজী, সরস্বতী আম্মা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'জনপদবধূ'র ভাষা কবিত্বময় এবং উচ্ছ্বাসপূর্ণ। ১৯।৫৯

নক্ষত্রের রাত—মতি নন্দী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলিকাতা-৭। ৩.৫০ নঃ পঃ।

তরুণ লেখক মতি নন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও স্বল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি মাত্র গল্প লিখেই পাঠক মহলে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর গল্পগুলি যখন ইতস্তত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই তিনি আমাদের দৃষ্টি এবং অনুরাগ আকর্ষণ করছিলেন। 'নক্ষত্রের রাত' একাধারে তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ এবং প্রথম উপন্যাস। সুতরাং সেকারণেও আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং আশাও ছিল বইটি সম্পর্কে। কিন্তু হতাশ হয়েছি শেষ পর্যন্ত। উপন্যাসের মধ্যে জীবনের যে বিশাল পরিধি, যে প্রখর চেতনা, যে গভীর অনুভব, যে চলমান জিজ্ঞাসা, যে দ্বন্দ্ব ও সর্বোপরি যে জীবন-ভাষা থাকে তার কিছুই ফুটে ওঠেনি তাঁর এই স্তিমিত অনড়, নখদর্পণের মত সংকীর্ণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকটি টুকরো ছবির মধ্যে; কয়েকটি ভগ্নদশাগ্রস্ত চরিত্রের মধ্যে। নায়ক-নায়িকাহীন, গল্পশূন্য কয়েকটি বিবর্ণ দিনযাপনের ইতিহাস চিত্র-ধর্মী চিন্তায় অনুচিন্তায় ফুটিয়ে তুলবারই যে সাহসী পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত নন্দী নেমে-ছিলেন তাতে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। একটি মেয়ের জীবনে বিবাহ এবং একটি যুবকের জীবনে চাকরি, নতুন না হলেও নিশ্চয়ই সমস্যা, বলতে গেলে জীবন সমস্যাই, কিন্তু তারা উপন্যাসের মধ্যে সমস্যা, জীবন সমস্যা হয়ে ওঠে তখনই যখন তারা চলমান জীবনের অনেক বিচিত্রমুখী বোধের সংগেও জড়িয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আত্মবিন্দুতেই থেমে দাঁড়িয়ে থাকে না। পর্যবেক্ষণই উপন্যাস লেখকের প্রধান কথা এবং শেষ কথা নয়, উপলব্ধির মধ্যেই প্রকৃত ঔপন্যাসিকতা। বর্তমান লেখক দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়েছেন, অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারে তীক্ষ্নদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু সমস্ত কিছুকে স্বাভাবিক সমন্বয়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই দ্বৈধ চিন্তার প্রবাহ এনেছেন এবং বলতে গেলে এই অন্তঃশীলা চেতনা, এই স্বগত সংলাপের সহঅবস্থান দিয়েই প্রতিটি চরিত্রের 'থার্ড ডাইমেনশন' দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মনের ছবি, মানুষের দৈর্ঘ্য প্রস্থের অতীত আর-একটি যে দিক আছে, সেটি অত সহজে ফুটে ওঠেনি। মাধবী, দিনেশ, চিনু এরা যদিও পৃথক পৃথক স্তরের মানুষ তবু এদের স্বগত চিন্তাকে পৃথক করে চেনা যায় না। কবিতা নাটক বা ছোট গল্পের চেয়ে যদিও উপন্যাসে কৌশলী কথাকারের অনেক বেশী বিভিন্ন
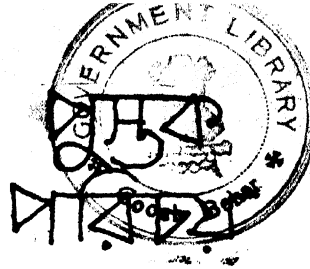
প্রসঙ্গে বলবার সুযোগ থাকে, তথাপি সেই বক্তৃতাটা ধরা পড়ে গেলে ক্ষমা নেই। কাহিনীর সঙ্গে লেখকের বক্তব্যগুলোকে মিলিয়ে দিতে হয় অক্ষরে অক্ষরে, চরিত্রে চরিত্রে। শ্রীযুক্ত নন্দী অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন এবং অস্থিরতার সঙ্গে বলেও ফেলেছেন কিন্তু মেলাতে পারেন নি, তাঁর নিজের গলা ধরা পড়ে গেছে। এবং যেখানেই উপমার মধ্য দিয়ে সেই অতিগদ্য বক্তব্যগুলোকে চালানো হয়েছে সেখানেই হাস্যকর হয়েছে। কয়েকটি ছোট গল্পকেই ভেঙে ফাঁপিয়ে এই গ্রন্থে নতুন আকার দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মনে হল। তাতে দুদিকেরই ক্ষতি হয়েছে। কোন চরিত্রেরই বিকাশ ঘটেনি। ভাষা কাহিনীর মতই মন্থর। দু-এক জায়গায় উপমা বাহুল্য ও দুরান্বয়কটু লাগে। যেমন—'ওর থুতনি পায়রার মাথার মত। ওর ঘাড়ের বাঁকান ছাঁদটা কচি শশার মত। ওর গোড়ালি বাছুরের নাকের মত।'......(১৪২ পৃ)

যদিও উপন্যাসের পরিসমাপ্তি দুর্বল হাতের বলে মনে হয়েছে তবু কয়েকটি দৃশ্য ও আবহে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণযোগ্য। আগাগোড়া উপন্যাসে শিল্প কৃতিত্বের দিক থেকে তার ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি। আমরা এই তরুণ লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী।

৫১।৫৯

কবিতা

অচিরা—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থে কবির পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। কবিতাগুলি ন-দশ বছরের মধ্যে লিখিত এবং সেই দশটি বছর কবির প্রথম যৌবন ও যৌবন-উপকণ্ঠকালের মধ্যে বিধৃত। দেশপ্রেম ও মানবতার জয়গানই ধ্বনিত হয়েছে কবিতাগুলির মধ্যে। আঙ্গিক রচনায় কিংবা শব্দ ও ছন্দের প্রয়াসে কবি সম্প্রতিকালের অভিমুখী নন। অন্তরের সহজ প্রত্যয়ে ও স্বচ্ছ প্রকাশে কবিতাগুলি আন্তরিক। কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কতটা প্রকাশ পেয়েছেন নিঃসন্দেহে বলার আগে নির্ভয়ে স্বীকার করতে পারি একটি সুরুচী, সত্যনিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় মানব-চরিত্র 'অচিরা'র মধ্যে ধরা দিয়েছে। প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

১৭০।৫৯

কান্নার রং—মহুয়া। পরিবেশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই সাম্প্রতিক কবিতার আসরে সুনিশ্চিত প্রবেশপত্র লাভ করবেন। এই বিচিত্র-রসোজ্জ্বল কবিতাসংকলনটি পড়ে আমরা এর কবি সম্পর্কে আমাদের উচ্চাশা ঘোষণা করছি।

কবির নাম মহুয়া, গ্রন্থের নাম কান্নার রং। বস্তুত কবিচিত্ত ও কবিতায়, ছদ্মনাম সত্ত্বেও, সেই মাদকতা ও বেদনা সঞ্চারিত হয়ে আছে। বরং বলবো, ছদ্মনামটিই কবির কবিত্বশক্তির একটি পরিচিতি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে। মাদকতা ও বেদনা—দুয়ের সমন্বয় আছে বলে কোনোটিই মাত্রাতিশায়ী না হয়ে একটি সুষ্ঠু শিল্প-রূপে সমন্বিত হয়েছেঃ

> প্রণাম আমার প্রাণের মহাদেশ
> জলের সিংহাসন
>
> পায়ের প্রবন্ধে
> ধুলোয় ধূসর
> ব্যথার বসন্তে
> তোমার পায়ের স্পর্শ অনিমেষ।
> (প্রণাম)

তাঁর কবিতায় কবিতায় ঐ 'ব্যথার বসন্তের' একটি কবিত্বে উত্তীর্ণ পরিচয় আছে। রোমাণ্টিক কবির সৌন্দর্য ও যুদ্ধধরিমা এই কবিকে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে, সন্দেহ নেই। আঙ্গিকনৈপুণ্যেও এর কবি উল্লেখযোগ্য। শব্দের ব্যবহারে তিনি সাবলীল। তাছাড়া স্কেচ আঁকবার শক্তিতেও তিনি বিশেষ শক্তিমান। একটি স্মরণযোগ্য ছবিঃ

> সকালবেলার প্রাতরাশ
> কাচের কাপে ডিম
> সুস্থ গৃহী রোদ,
> পাখি পাখি সুখ। (প্রাত্যহিক)

যিনি এইরকম ছবি বা দৃশ্য স্বচ্ছন্দে আঁকতে পারেন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা প্রচুর। মহুয়াকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই।

(১৯৮।৫৯)

নাটক

শেষ সংলাপ — গিরিশংকর। দক্ষিণ গোবিন্দপুর, চব্বিশ পরগণা থেকে পার্বতী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ মশাইর লেখা ভূমিকা থেকে জানা যায় শ্রীগিরিশংকর শুধু মাত্র নাট্যকারই নন, তিনি একজন অভিনেতা, নিপুণ পরিচালক এবং নাট্য-আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী। বস্তুত নাটকের সর্বাঙ্গীণ ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের ছাপই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থখানির বিভিন্ন একাঙ্কিকাগুলোতে।

এই একাঙ্কিকাগুলো প্রধানত বাস্তবধর্মী। কান্না-হাসির দোল-দোলানো জীবনের একনিষ্ঠ ছবিই প্রধানত নাট্যকার বেছে নিয়েছেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে। আর সেই ছবি তিনি পাঠক ও দর্শকের কাছে উপস্থিত করেছেন অপরিসীম সহানুভূতির সাথে। স্থানে স্থানে আবার এই জীবনের নোংরামি-ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তীব্র কশাঘাত হেনেছে সত্য, কিন্তু সেটাকেই তিনি মুখ্য করে তোলেন নি কোথাও। সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

নাটকগুলোতে আঙ্গিক নিয়ে যে পরীক্ষা তিনি করেছেন, তাও বিশেষ প্রশংসার্হ।

১০১।৫৯

সকাল-সন্ধ্যার নাটক—সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। সাড়ে তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের প্রথম একাঙ্কিকা সংকলন। এতে মোট সাতটি নাটক রয়েছে। তার মধ্যে "যে নিজের কথা ভেবেছিল" রচিত হয়েছে নীল গ্র্যান্ট-এর দি ম্যান হু থট অফ হিমসেল্ফ-এর ছায়ানুসরণে এবং "মূলধন" রবার্ট কেম্পএর অ্যাসেট অবলম্বনে; "অন্ত্যজ" নাটকটি স্ট্রিণ্ডবার্জএর প্যারিয়া নাটকটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। এছাড়া অপর চারটি নাটক "মহাকবি অশ্বঘোষ", "আশংসা", "সকাল বেলায় এক ঘণ্টা" এবং "সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা" মৌলিক।

সবগুলি নাটকই বাস্তবধর্মী এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাছাড়া, মহাকবি অশ্বঘোষ, যে নিজের কথা ভেবেছিল, আশংসা প্রভৃতি নাটকে লেখক যে নাট্যশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তাও কৃতিত্বের দাবী রাখে। এই প্রসঙ্গে লেখকের মুন্সীয়ানা প্রশংসনীয়।

বস্তুতঃ সকাল-সন্ধ্যার নাটক আমাদের সাম্প্রতিক নাট্যসাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

৯৫।৫৯

সাত ভাই চম্পা—সমর চট্টোপাধ্যায়। শিশুরঙমহল প্রকাশনী বিভাগ, ২ তিলক রোড, কলিকাতা—২৭। দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ছোটদের জন্য লেখা একটি নাটিকা। ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার সাত ভাই চম্পা আর পারুল বোনের কাহিনী এর বিষয়বস্তু। কিন্তু সেই চিরপুরাতন কাহিনীকেই ছন্দে আর গানে অনবদ্য করে তুলেছেন লেখক, যার আকর্ষণ শুধু ছোটরা তো নয়ই, বড়োরাও অস্বীকার করতে পারবে না—নাটক হিসাবে সুষ্ঠু অভিনীত হ'লে তো নয়ই, এমন কি পড়তে বসেও নয়।

গানগুলোর স্বরলিপি গ্রন্থশেষে দিয়ে দেওয়ায় বইখানির অভিনয় অনেক সহজসাধ্য হয়েছে।

বইখানি মুদ্রণ পারিপাট্যে এবং চিত্রসজ্জায় উজ্জ্বল। ছোটরা বইখানি হাতে পেলে খুশী হবে নিঃসন্দেহে। ১০২।৫৯

ভ্রমণস্মৃতি

চেনা-অচেনায়—সলিমুল হক খান মিলকী। গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা। তিন টাকা আট আনা।

মানুষ নিয়েই দেশ। আর সে দেশ দূরের হলেও মানুষগুলি কাছের। কোন প্রভেদ নেই য়ুরোপের মানুষের সঙ্গে পাকিস্তানের মানুষের। গায়ের রং তাদের আলাদা হতে পারে, কিন্তু মাটির কাছাকাছি যে মানুষ, সে মানুষ মনের কাছাকাছিও অবশ্যই। প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা—যে সব প্রবৃত্তি পাকিস্তানের মানুষদের রয়েছে, তা আছে য়ুরোপের মানুষেরও। মিলকী সাহেব বাইরে থেকে য়ুরোপকে না দেখে, য়ুরোপের সেই মানুষেরই খোঁজ করেছেন। আর সেই খোঁজের ফলই তিনি উপহার দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে।

য়ুরোপের দেশে দেশে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং শিল্পিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থক প্রয়োগে বইখানি পাঠকমাত্রেরই ভালো লাগবে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। ১০৫।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

Indian Culture in Bali and Indonesia—Gopi Nath Kapoor.

মানস ৩য় খণ্ড।

বিশ্ব রাজনীতিতে গণতন্ত্র—লেস্টার বি পিয়ারসন; অনুবাদক—মিণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়।

উত্তর মৌসুম—অগ্নি মিত্র।

প্রাক্তন—বরেন বসু।

ট্রামে-বাসে

বিশুখুড়ো জামাইষষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—"সরকার যদি স্টেডিয়ামে আমের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাটা ষষ্ঠীর দিনে করতেন, তাহলে আর কিছু না হোক, জামাতাজীবনদের অন্তত দুটি দুষ্টি আম খাওয়ানো যেতো। কিন্তু আইবুড়ো মন্ত্রিসভায় তা কি আর হবার উপায় আছে"।

• • •

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উড়িষ্যা হইতে কিছু খুদ আনাইয়াছেন। "বিদুরের খুদ যখন স্বয়ং ভগবান গ্রহণ করেছেন, তখন আমাদের কোন আপত্তি করা চলে না; অবশ্য করলেই বা শুনছে কে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

১৩২৯ সালে ফরিদপুর জেলায় জলকষ্টের প্রসঙ্গে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন—মঙ্গলময়ের করুণা ভিন্ন নিরুপায় গ্রামবাসীর আর ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় নাই। —"১৩৬৬ সালে খোদ কোলকাতা শহরেও জলকষ্ট নিবারণের জন্য আমরা মঙ্গলময়ের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

খবরের সংবাদে শুনিলাম কোন ভদ্রলোকের স্ত্রী স্বামীর কাছে তিনটি টাকা চাহিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল সিনেমা দেখার। মাসের শেষ বলিয়া ভদ্রলোক টাকা দেন নাই বা দিতে পারেন

নাই। অতঃপর ভদ্রমহিলা ও তাঁর সঙ্গিনীদের হাতে স্বামী বেচারার লাঞ্ছনার একশেষ হয়। শেষ পর্যন্ত টাকা তাঁকে দিতেই হইল। —"দারা শব্দটা কেন পুংলিঙ্গ এবং কেনই বা বহুবচন তার খানিকটা অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

প্রেসিডেন্ট টিটো স্বামীদিগকে রান্না-বান্না ও অন্যান্য ঘরগেরস্থালীর কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়াছেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন——"সংবাদ সম্বন্ধে আমরা কোন মন্তব্য করব না। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, আমাদের দেশে সেন্সার ব্যবস্থায় গলদ রয়েছে। যদি সত্যি সত্যি এখানে স্বামীদের.........কিন্তু একথা ভাবতেও যে গায় জ্বর এসে যায়!!"

• • •

প্রসঙ্গত রাশ্যার একটি সংবাদ মনে পড়িল। সংবাদদাতা বলিতেছেন—এদেশে মেয়েরা ছেলেদের মনোরঞ্জনের আগ্রহ

দেখায়। শ্যামলাল বলিল—"আর আমাদের দেশে একেবারেই উল্টো। আমরা "বাজার হুন্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিছি পায়," অধিকন্তু ট্রামে-বাসের সীট ছেড়ে দিয়ে এক পায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। কিন্তু ফলং লবডঙ্কা!"

• • •

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন—কমিউনিস্টগণ নিজেদের এদেশের লোক মনে করে কিনা এখনও তাহা জানা যায় নাই। সংবাদটি পরিবেশন করিতে গিয়া এডিটর শিরোনামা দিয়াছেন—"কমিউনিস্টরা কি ভারতীয়?"—বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাঁর প্রশ্নটা রাজনৈতিক, না নৃতাত্ত্বিক তা কিন্তু বোঝা গেল না।"।

• • •

এক সংবাদে জানা গেল, নজন বন্দী বর্মাবাসীর মুক্তিমূল্য হিসাবে পাকিস্তানী মুজাহিদরা নাকি স্কচের রেড দাবি করিয়াছেন।—"কী আর দাবি করবেন, নাকের বদলে নরুণের দাবী ওদের চিরকালের"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

শ্রী রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন,—কমিউনিস্টগণ ও কংগ্রেসসেবিগণ একই ধর্মাবলম্বী।—"কথাটা তিনি নিশ্চয়ই

চোখে রঙীন চশমা পরেই বলেছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

রেলকর্তৃপক্ষ কোন কোন অঞ্চলে "স্ট্রীট ডেলিভারী"র ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন—"অনেকেই তো আমাদের রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, রেলকর্তৃপক্ষই বা ছাড়বেন কেন!!"

• • •

রেলকামরার চোরের সংবাদ পড়িলাম। সুন্দর তার চেহারা। প্রথম শ্রেণীর কামরায় কামরায় সে ভাব জমায়। তার পর যাত্রীরা ঘুমাইয়া পড়িলে মালপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। বার চারেক সাজাও তার হইয়াছে। সম্প্রতি সে আবার হাওড়া রেল-পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে। লোকটার নাম নাকি রঘুনাথ ওরফে হাঁদাই। —"আমরা শেষের নামেই ডাকব। চুরির মতো বড় বিদ্যে শিখেও লোকটা বারবার ধরা পড়ছে। হাঁদা ছাড়া কী আর ডাকা যায়! ও সত্যি হাঁদা-ই"।

• • •

বিশুখুড়ো হঠাৎ খেলার প্রসঙ্গ পাড়িলেন। বলিলেন—"শুনেছিলাম বর্তমানে নাকি সামন্ত যুগ আর নেই। কিন্তু এটা বোধ হয় শুধু কাগজপত্রের কথা। সামন্ত যুগের দাপট শেষ হয়ে গেলে কি আর রাজস্থান ইস্টবেঙ্গলকে ৩—১ গোলে হারাতে পারে!!!"

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

একটি প্রশ্ন

ছবি যাঁরা তোলেন এবং ছবি যাঁরা দেখেন তাঁদের মধ্যে সেতু রচনার মহৎ দায়িত্ব রয়েছে চিত্র সাংবাদিকদের ওপর। তাই চিত্র-শিল্পের কল্যাণ যেমন সাংবাদিকের কাম্য, চিত্রামোদীদের ন্যায্য দাবী মেটানও তাঁর কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্যেই চিত্র সাংবাদিককে দু'পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। ফলে গড়ে ওঠে পরস্পরের সংগে একটা সম্প্রীতির সম্পর্ক।

ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্বহীন আচরণের ফলে এই সম্পর্কে ভাঙন ধরে চিত্রশিল্পের কল্যাণকামী কেউ তা চাইবেন না। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এমনিধারা অবাঞ্ছনীয় একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে সম্প্রতি আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন চিত্র সাংবাদিকদের।

ব্যাপারটি ঘটেছে কোন একটি নির্মীয়মান ছবির শুটিং দেখা নিয়ে। ছবির প্রযোজক-পরিবেশক একদল চিত্র-সাংবাদিককে শুটিং দেখবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন স্টুডিওতে ছবির সেটে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল শুটিং-দেখারূপ পরম সৌভাগ্যের তাঁরা অধিকারী নন। কারণ ছবির নায়ক-নায়িকা এই সব অবাঞ্ছিত অভ্যাগতের সামনে নাকি অভিনয় করতে নারাজ। নিমন্ত্রণকারীরা গত্যন্তর না দেখে চা-খাওয়ার অজুহাতে সাংবাদিকদের সেট থেকে সরিয়ে আনলেন এবং তারপর তাঁদের চটপট বিদায় করলেন আরম্ভ বর্ষণের আশংকায়। তিনঘণ্টা স্টুডিওতে অপেক্ষা করেও নিমন্ত্রিত সাংবাদিক দল শুটিং দেখতে পেলেন না।

ঘটনার বিবরণ দু'হপ্তা আগে একটি দৈনিক কাগজের মঞ্চ ও চিত্র বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে বিভাগীয় সম্পাদকের মন্তব্য সমেত। এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মহল থেকে উক্ত বিবরণের কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত না হওয়ায় ধরে নিতে বাধা নেই যে সহযোগীর অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। যাঁদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে তাঁদের নিন্দা করবার উপযুক্ত ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। এই ঘটনার সঙ্গে যে জনপ্রিয় অভিনেতা ও নবাগতা অভিনেত্রীটি জড়িত হয়ে পড়েছেন তাঁদের জন্যেও দুঃখ অনুভব করছি।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'শুভ বিবাহ' ছবিতে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন

আমরা ইচ্ছা করেই সংশ্লিষ্ট সকলকার নাম অনুচ্চারিত রাখলুম যাতে কারুর কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু এই ধরনের ঘটনায় তাঁরা যদি চিত্র সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হন তাহলে তার জন্যে দায়ী হবে কে?

বি-বি-সি টেলিভিশনে ভারতীয় ছবি

গত সপ্তাহে (১২ই জুন) লণ্ডনবাসীরা বি-বি-সি টেলিভিশনে সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসারে"র অংশ বিশেষ দেখবার সুযোগ পান। বিদেশী দর্শকের কাছে ভারতীয় ছবির পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত টেলিভিশনে বি-বি-সি'র এই প'য়তাল্লিশ মিনিটব্যাপী কর্মসূচীতে আরও যে সমস্ত ছবির অংশ বিশেষ দেখানো হয় সেগুলির মধ্যে ছিল "নয়া দৌড়", "দো বিঘা জমিন", "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত", "মাদার ইণ্ডিয়া" ও "পিয়াসা"।

বি-বি-সি-এর ভাষ্যকার লিণ্ডসে এণ্ডারসন ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, প্রতি বছর ভারতে স্বদেশী দর্শকদের জন্য ২৫০ থেকে ৩৫০টি ছবি তৈরী হয়। হৃদয়াবেগ, সঙ্গীত নৃত্য ও দৃশ্যসম্ভারই ভারতীয় ছবির বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও বিমল রায়ের কথা উল্লেখ করে এণ্ডারসন মন্তব্য করেন, এ'রা দু'জন গতানুগতিক ছবি তৈরীর পথ পরিত্যাগ করে উন্নততর, বাস্তবধর্মী ও কাব্যরসমণ্ডিত ছায়াচিত্র দ্বারা বিদেশে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। ভারতীয় ছবির প্রগতির উপর সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু ভারতীয় ছবির ঐতিহ্য সত্যজিৎ রায়ের সৃজনী প্রতিভাকে সহজভাবে নিতে পারবে কিনা তার উত্তর এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে—এই বলে লিণ্ডসে এণ্ডারসন তাঁর আলোচনা শেষ করেন।

ইতালীতে ভারতীয় ছবির কদর

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদেশে ভারতীয় ছবির প্রদর্শনীর পরিধি ক্রমশই যে বিস্তৃতি লাভ করছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল বোম্বাইতে সম্প্রতি রোমের ইউনিতালিয়া ফিল্ম-এর প্রধান কর্মকর্তা লিদিও রোজানি'র একটি বিবৃতিতে। ইতালীয় চলচ্চিত্রে প্রতিনিধিদলের এই নেতা বলেন, বছর দুই আগে সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" ছবিখানি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বোচ্চ পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর ইতালীর চিত্র পরিবেশক মহলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভারতীয় ছবি প্রদর্শন ব্যাপারে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত ইতালীয় চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে আটজনের একটি প্রতিনিধি দল ভারত ভ্রমণে আসেন এবং দিল্লি ও বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন। প্রতি-

নিধিদলের নেতা লিদিও রোজানি একথাও ঘোষণা করেন, সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" এবং ভি শান্তারামের "দো আঁখে বারাহ্ হাত" ইতালীতে শীঘ্রই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মুক্তিলাভ করবে। তিনি আরও বলেন, ছবিগুলি সম্প্রতি ইতালীয় ভাষায় ভাষান্তরিত (ডাব্‌ড্) হচ্ছে।

প্রতিনিধি দলের নেতা একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ভারতে অনুষ্ঠিত এই ইতালীয় চলচ্চিত্র উৎসব ভারতে ইতালীয় চিত্রের জনপ্রিয়তা বর্ধনের প্রয়াসমাত্র। ইতালীয় ছবি সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের উৎসাহের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রতি বছরই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে।

ইতালীয় চিত্রের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীয় ছবিতে বাস্তব অনুশীলনের ঝোঁক অতিমাত্রায় দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষ এখন ভুলতে আরম্ভ করেছে। ইতালীর ছবি ক্রমশঃই রসাশ্রয়ী হয়ে উঠছে। হাস্যরসের প্রাধান্য বর্তমান ইতালীয় ছবিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

হলিউড কর্তৃক ইতালীয় ছবি প্রভাবান্বিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কলাকৌশলের দিক দিয়ে অনেকটা প্রভাবান্বিত হলেও ভাবের দিক দিয়ে নয়।

চিত্রালোচনা

নতুন ছবির আসরে এবার এক সঙ্গে তিনখানি হিন্দী ছবির আবির্ভাব ঘটেছে—বাংলা একখানিও নয়। ছবিগুলির নাম—"দো ওস্তাদ", "জাগীর" ও "বাজীগর"।

"দো ওস্তাদ"-এর এক ওস্তাদ হলেন রাজকাপুর, অপর ওস্তাদ ছবির প্রযোজক স্বয়ং শেখ মুখতার। নায়িকার ভূমিকায় মধুবালা দুজনকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ হয়েছেন। সুলোচনা, মাস্টার ডাব্বু ও ডেজি ইরাণীও এ ছবির অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন। পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে তারা হরিশ এবং ও পি নায়ার।

এক কার্নিভালের পটভূমিকায় তোলা এম এম মুভীজের "জাগীর"। মীনাকুমারী, প্রেমনাথ, উল্লাস, হীরালাল, মেহমুদ, কুলদীপ, মীনু মমতাজ প্রভৃতিকে নিয়ে এর প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। জগমোহন মট্টু ছবিখানির পরিচালক এবং মদনমোহন এর সুরকার।
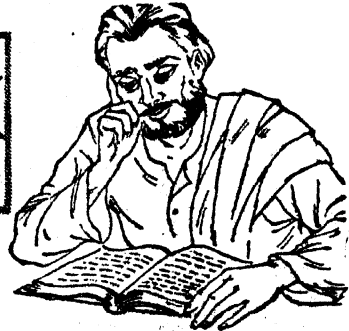
মুকুল পিকচার্সের "বাজীগর" দুঃসাহসিকতার-ভরা এক এডভেঞ্চার কাহিনী, নিরুপা রায় ও জয়রাজ এর প্রধান দুটি চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন তিওয়ারী, হেলেন, রোমী, নাজী এবং টাইগার নামক একটি কুকুর ও মুস্তাক নামধারী একটি ঘোড়া। নানাভাই ভাটের পরিচালনায় এবং চিত্রগুপ্তের সুরারোপে ছবিখানি চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

*

প্রায় বিশ বছর আগে সুশীল মজুমদার পরিচালিত "রিক্তা" বাংলা ছবির জগতে আলোড়ন এনেছিল কাহিনী ও অভিনয়ের মানবীয় আবেদনের গুণে। এর গল্প লিখেছিলেন প্রখ্যাত নট-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী এবং মূলে ছবিতে সুরযোজনা করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুরকার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। এই একদা-প্রসিদ্ধ ছবিখানি আধুনিক রুচির উপযোগী করে দর্শক সমাজে উপস্থিত করতে ব্রতী হয়েছেন বীণা চট্টোপাধ্যায়। সেই উদ্দেশ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায় ও সুমিত্রা দেবগুপ্তের কণ্ঠ সহযোগে কয়েকখানি গান এতে নতুন করে সংযোজিত হয়েছে। পুনঃসম্পাদনার কৃতিত্ব অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্য।

*

সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার রচিত ও পরিচালিত "যাত্রী" ছবিটি সম্পূর্ণ নতুন আবেদনের সম্ভার নিয়ে মুক্তির দিন গুনছে। সারা ভারত জুড়ে যেমন এর পশ্চাৎপট বিস্তৃত, তেমনি এর সুরসৃষ্টিতেও সর্ব-ভারতীয় সংগীতের এক অভিনব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। সম্প্রতি সুধীন দাশগুপ্তের পরিচালনায় এর আবহ সংগীত গৃহীত হয়েছে।

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে সুশীল মজুমদার পরিচালিত "অগ্নি-সম্ভবা" জীবনদ্বন্দ্বে নিষ্পেষিত নিম্ন মধ্যবিত্তকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। পরের দুয়ারে হাত না পেতে যে কোন স্বাধীন উপজীবিকা নিয়ে বেঁচে থাকার মূল্য যে অনেক তাই দেখান হয়েছে এই ছবিতে। এক খেটে-খাওয়া মানুষের ভূমিকায় কালী বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁর অভিনয় প্রতিভার চরম উৎকর্ষ প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁর ভগিনীবেশিনী মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও এক মানবহিতৈষী বিজ্ঞানীরূপে ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। কালোবরণ এতে সুর সংযোজনা করেছেন।

*

সন্ধ্যা পিকচার্স ও সন্ধ্যা ফিলম্‌স এই দুই নামে দুটি নতুন প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি চিত্র প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন।

সন্ধ্যা পিকচার্সের প্রথম ছবির নাম "পোয় মারে দই"। গত ৫ই জুন নিউ থিয়েটার্সের দু'নম্বর স্টুডিওতে এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহরৎ দৃশ্যে ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন তরুণকুমার ও নমিতা সিংহ। জগমোহন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন সুনীলবরণ। বিনু চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল বসু এর যুগ্ম প্রযোজক।

দশহরার দিন (১৬ই জুন) সন্ধ্যা ফিলমসের প্রথম নিবেদন "কিন্তু কেন?"-র

শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। সুনীল ভঞ্জ এর কাহিনীকার। প্রযোজনার দায়িত্ব বহন করবেন মদনমোহন ও নিতাই দাস।

*

* ইন্কা পিকচার্সের "নৃত্যের তালে তালে" আগামী ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। গোপীকৃষ্ণ, রাগিণী ও সুকুমারী—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই তিনটি সেরা নৃত্যশিল্পীর একত্র সমাবেশ বাংলা ছবির জগতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা, এবং পরিচালক সুধীরবন্ধু তাই ঘটিয়েছেন এই ছবিতে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল এবং অসিতবরণকে এর তিনটি মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ এতে সুরযোজনা করেছেন।

রীতেন এণ্ড কোম্পানী প্রযোজিত 'হেডমাস্টার'-এর নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

মাতঙ্গ-মাহুত মিতালী

বাংলা ছবির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভ ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বি, পি ফিল্মস-এর প্রথম নিবেদন "মাহুত বন্ধুরে"। ছবির প্রযোজক ও পরিচালক ভূপেন হাজারিকার অসমিয়া ছবি "এরা বাটর সুর" রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে ইতিপূর্বে। বাংলা রজতপটে রূপকার হিসাবে তাঁর এই প্রথম পদক্ষেপ এক নতুন নিরীক্ষার নিদর্শন হিসাবে অভিনন্দনযোগ্য হয়ে থাকবে।

এ-ছবির অভিনব পটভূমি উত্তর বাংলা ও আসামের সীমান্তবর্তী বনাঞ্চল, এবং সেখানকার অধিবাসী মাহুত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এর আখ্যানভাগ। হিমালয়ের পাদদেশে চম্পা নদীর তীরে ঘন অরণ্যের কোলে গড়ে উঠেছে তাদের আরণ্যক সমাজ। বনে বনে মত্ত মাতঙ্গকে ধাওয়া করে বেড়ায় তারা, ঘরে এসে মন ভরে তোলে মনের মানুষের কাছে। অমিত বলশালী হাতির কাছে তারা পায় শক্তির অপূর্ব সংযমের শিক্ষা, আর হাতিকে ওরা দেয় তাদের বুদ্ধির ছোঁয়াচ ও অন্তরের স্নেহের উষ্ণতা। হাতি তাদের কাছে নতি স্বীকার করে। হিংস্রতার পরিবেশে গড়ে ওঠে মাতঙ্গ ও মানুষের মিতালী।

শ্বাপদসঙ্কুল এই অরণ্যেই মাহুতদের জীবিকা, জীবনধারণ ও জীবনাবসান অনেক রোমাঞ্চ, উত্তেজনা ও আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে এক বিচিত্র জীবনধারায় বয়ে চলেছে। কখনও হাসি, কখনও কান্না। বছরের যে সময়টাতে জমি চাষ আর কাঠ কাটার কাজ থাকে না, পুরুষেরা দল বেঁধে

চলে যায় দূর বনে হাতি ধরতে। একটি হাতি ধরা পড়লে এক একজনের পরিবারের দুঃখ ঘোচে। মেয়েরা নদীতে মাছ ধরে, নদী থেকে জল তুলে আনে—কখনও বা জলে কলসী ভাসিয়ে আপনমনে ভাবে মাহুত বন্ধুর কথা। কেউ হয়তো হাতি ধরতে গিয়ে আর ফেরে না। যে হাতি একদিন তাদের কাছে ধরা দেয়, পরিবারের একজন হয়ে ওঠে, ক্ষিপ্ত হলে সেই হাতিই তাদের পিষে মারে। তাই অজানা আশঙ্কায় মাহুত-প্রেয়সীর মন কেঁদে ওঠে, সে গায়—"গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে"।

অলোকেশ বড়ুয়ার কাহিনী এই বিচিত্র মাহুত সম্প্রদায়ের দুটি তরুণ ও তরুণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। রূপনাথ যখন তার প্রণয়িনীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছে, সেই সময়ে বনে হাতি ধরতে গিয়ে মত্ত হাতির পায়ের তলায় সে প্রাণ হারায়। সঙ্গীরা রূপনাথের মৃতদেহ হাতির পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসে। তার প্রেয়সীর করুণ আর্তনাদে সমস্ত বনভূমি কেঁদে ওঠে।

কান্তেশ ভালোবাসে দেউসিকে। কিন্তু দেউসি'র চঞ্চল মনের নাগাল সে পায় না। এই সরল অনাড়ম্বর বন্যসমাজে শহর থেকে এসেছে একজন কাঠের ব্যবসায়ী—বন থেকে কাঠ কেটে চালান দেওয়া তার কাজ, আর বুঝি বনফুল ছিনিয়ে নেওয়া। অন্তত কান্তেশ তাই ভাবে যখন দেউসিকে হাত করবার জন্য শহুরে বাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দেউসি বাবুকে নিয়ে শুধু কৌতূহল অনুভব করে, তার কাছে গল্প শোনে; কান্তেশ তাকে ভুল বোঝে। অভিমানে দেউসি কান্তেশের ভুল বোঝার মধ্যে লাগিয়ে দেয় ঈর্ষার জ্বালা। তার জন্যে ছোট-খাটো অভিনয়ও করতে হয় তাকে। দেউসিকে ভুল বোঝে তার অভিভাবক। তাকে সে কঠোর শাস্তি দেয়। অভিমানে দেউসি একদিন বেরিয়ে পড়ে একা শহরের দিকে। পথে দেখা হয় রাত্রির অন্ধকারে শহুরে বাবুর সঙ্গে। দেউসি তার আশ্রয়েই থাকে সে রাত, আর রাত্রির বিভীষিকার মতোই তার কাছে প্রকাশ পায় শহুরে মানুষের নির্লজ্জ ঘৃণ্য স্বরূপ। দেউসি ছুটে পালায়। এদিকে দেউসির বাল্যসাথী—যে ছিল রূপনাথের প্রেয়সী—হাতে মশাল নিয়ে খুঁজতে বেরোয় তাকে। বেরিয়ে পড়ে কান্তেশও। সে ভুল বুঝেছে দেউসিকে। তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন। রাত্রির শেষ যামে উভয়ের দেখা হয়। দেউসির চোখের জলে শেষ পর্যন্ত কান্তেশের চোখের আগুন নিভে আসে। ওদের জীবনে বিচ্ছেদের কালরাত্রির অবসান ঘটে।

পরিচালক ভূপেন হাজারিকা মাহুত সম্প্রদায়ের প্রাণোচ্ছল জীবনধারা, ও কাহিনীর আরণ্যক পটভূমি আশ্চর্যভাবে পর্দায় উপস্থিত করেছেন। মাহুত জীবনের মধ্যে রয়েছে যে স্বাভাবিক নাটকীয়তা যা গহন বনে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা আর ঘরের অঙ্গনে নাচ-গান-পাঁচালির মধ্য দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়, পরিচালক তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও শিল্পীমন দিয়ে মাহুত সমাজের সেই নাটকীয়তাকে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন পর্দার বুকে। পটভূমির বর্ণাঢ্য ও রূপাঢ্য পরিবেশ মূর্ত হয়ে উঠেছে অতিকায় অসংখ্য হাতির সারি সারি দল বেঁধে চলা, জলে নামা, বৃক্ষদল মথিত করে আহার্যের সন্ধানে চারিদিক ঘুরে বেড়ানো, পোষ-মানা হাতির পিঠে চড়ে দলে দলে মাহুতদের দড়ির ফাঁস দিয়ে ছোট হাতি ধরা, অন্যদিকে সমাজ জীবনে পাহাড়ী নদীতে মেয়েদের দল বেঁধে মাছ ধরা, বিভিন্ন ঋতুতে তাদের বিভিন্ন ধরনের গান ও নাচে মেতে ওঠা, মাহুত বন্ধুরা বন থেকে ফিরে এলে সামাজিক প্রথায় তাদের অভ্যর্থনা জানানো, আবার হয়তো বন থেকে কোন উন্মত্ত মাতঙ্গের আবির্ভাবে সমস্ত পাহাড়ী অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের বিহ্বলতা নেমে

নির্মীয়মাণ এম-পি চিত্র 'কুহক'-এর একটি বেদনার্ত দৃশ্যে গঙ্গাপদ বসু, মাস্টার দীপক ও ভূমিশয্যায় তরুণকুমার

আসা—এই সব কিছু এবং আরও অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে। পরিচালক অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন এই কারণে যে মাহুত-জীবনধারার প্রামাণ্যরূপে পরিবেশনে তিনি তথ্য ও রসের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

মাহুত সমাজ ও এর পরিবেশের প্রামাণ্য-রূপ যেখানে স্বাভাবিকভাবে নাট্যরস সমন্বিত হয়ে উঠেছে, কল্পিত প্রণয়কাহিনীর রস সেখানে আলাদাভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি ছবিতে। চিত্রনাট্যে ছবির তথ্যরূপ ও পরিবেশের ওপর জোর বেশী থাকায় ছবির দুটি প্রণয়োপাখ্যান স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তবে প্রামাণ্যের রস প্রণয়-রসের অভাব অনেকাংশে মিটিয়ে দেয়। তাই এই ছবি দর্শকমনে প্রভাব বিস্তার করে গোড়া থেকেই।

ছবির আখ্যানবস্তু সামগ্রিকভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে না উঠলেও পরিচালক শ্রীহাজারিকা ছবিতে কয়েকটি স্মরণীয় নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। মাহুত বন্ধুরা যখন বন থেকে রূপনাথের মৃতদেহ নিয়ে আসে তখন অনবদ্য পরিমিতি জ্ঞানের ভেতর দিয়ে রূপনাথের প্রেয়সীর নিদারুণ বেদনা তিনি সুন্দরভাবে দর্শক-মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন।

অভিনয়ের দিক দিয়ে ছবিতে যিনি সর্বাগ্রে প্রশংসার অধিকারী তিনি কান্তেশবেশী দিলীপ রায়। মাহুত চরিত্রের একটি বিশ্বাসযোগ্য রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রণয়ী রূপেও তাঁর অভিনয় সংবেদনশীল। কান্তেশের প্রণয়িনীর চরিত্রে তৃষ্ণা'র (প্রিয়ম হাজারিকা) অভিনয় মনে রেখাপাত করে। যদিও বিশেষ নাট্য মুহূর্তে তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য চোখকে পীড়া দেয়। রূপনাথ ও তার প্রেয়সীর চরিত্রে অরূপ বড়ুয়া ও মানসী সোমের অভিনয় প্রশংসনীয়। মানসী সোমের শোকোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি স্মরণীয়। কাঠের ব্যবসায়ীরূপে প্রভাত মুখোপাধ্যায় চরিত্রের 'রমণীমোহন' রূপটি ফুটিয়ে তুলতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর মুখের অযথা ইংরেজী সংলাপ অপ্রয়োজনীয় ও অসঙ্গতি-পূর্ণ মনে হয়েছে। অন্য দুটি চরিত্রে বিষ্ণু রাভা ও প্রকৃতীশ বড়ুয়ার অভিনয় মনোগ্রাহী।

ছবির অন্যতম সম্পদ এর লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের সম্ভার। মনোমুগ্ধকর লোকসঙ্গীত ছবিতে গেয়েছেন প্রধানত ভূপেন হাজারিকা, প্রতিমা বড়ুয়া, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। "গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে" গানটি ছবির পরিবেশকে অপূর্ব ভাবরসে মণ্ডিত করে তুলেছে। গৌরীপুরী, বিহু, বাগরুম্বা প্রভৃতি লোকনৃত্য ছবিতে প্রাণ-সঞ্চার করেছে। নৃত্যাংশে রেখা ভৌমিকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

ছবির শিল্প-সৌষ্ঠবে পরিচালক শ্রীহাজারিকার পরই যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। তিনি আলোকচিত্র শিল্পী অজয় মিত্র। তাঁর ক্যামেরায় আরণ্য-পটভূমির নয়নাভিরাম রূপ যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি সমস্ত পরিবেশে তিনি এনে দিয়েছেন দৃশ্যকাব্যের সুষমা। ছবির অঙ্গাবরণ ও অঙ্গাভরণের মধ্যে বিরল শিল্পগরিমার ছাপ সুস্পষ্ট। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ সাধারণ

ন্তরের। শব্দগ্রহণের কাজ—সঙ্গীতে ও সংলাপে—আরও সুষ্ঠু হতে পারত।

"বিশ্বরূপা" প্রতিষ্ঠা দিবস

গত রবিবার (১৪ই জুন) বিশ্বরূপা নাট্যালয়ের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব একটি মনোজ্ঞ অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। "ক্ষুধা" নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য যে সমস্ত দর্শক সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন ও বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অভ্যাগতের শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিশিষ্ট নাট্যরূপকার ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। তিনি বলেন, জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে পালা বদলের লগ্ন আসে—আসে পরিবর্তনের জোয়ার। এই জোয়ার লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান রঙ্গমঞ্চের দরজায় এসেও আঘাত করে। সুখের বিষয়, বিশ্বরূপা বাইরের এই জোয়ারের সামনে তার দরজা বন্ধ করে রাখেনি। তাই নতুন জোয়ারের দাবি মিটিয়ে বিশ্বরূপা এগিয়ে চলেছে জন-অভিনন্দনের পথে। পরিশেষে বিশ্বরূপার প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি যে প্রচুর আনন্দ লাভ করেছেন সে কথা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে অহীন্দ্র চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে বর্তমান নাট্য-আন্দোলনে বিশ্বরূপা ইতিমধ্যেই একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যুগে যুগে বাংলা নাটকের পরিবর্তন ও বিকাশের কথা উল্লেখ করে বলেন, চিরন্তন ও সার্বজনীন রসের যে নাটক তার আবেদন সার্বকালীন। আর এই সার্বজনীন ও সার্বকালীন নাটকের মধ্য দিয়েই রঙ্গমঞ্চ জনসংস্কৃতির তীর্থ হয়ে বিরাজ করে। সবশেষে তিনি বিশ্বরূপার অপ্রতিহত জয়যাত্রার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে বিশ্বরূপার অন্যতম কর্ণধার রাসবিহারী সরকার নাট্যালয়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত জ্ঞানী-গুণী ও অগণিত নাট্যরসিকদের তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বরূপার এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ইণ্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট-এর সভাপতি এবং এই প্রতিষ্ঠানের জাপান ও ডেনমার্ক-শাখার সভাপতিদ্বয়ও তাঁদের শুভেচ্ছামূলক বাণী প্রেরণ করেন।

• • •

১৯৫৮ সালে মোট ১১৬টি হিন্দী ছবি নির্মিত হয়। সংখ্যানুক্রমে আঞ্চলিক ভাষায় তোলা ছবির তালিকাটি দাঁড়ায় এই রকম : তামিল—৬১, বাংলা—৪৫, তেলেগু—৩৬, মারাঠী—১৬, কানাড়ী—১১, মালয়লী—৪, সিন্ধী—৩, অসমিয়া—২ ও পাঞ্জাবী—১। ১৯৫৮ সালে মোট ছবি তোলা হয় ২৯৫ খানি।

একলব্য

সেদিন ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও ইস্টার্ন রেলদলের ফুটবল লীগের খেলার সময় দর্শকরা মাঠে যে উচ্ছৃংখল আচরণ করেছেন তার নিন্দা করবার ভাষা নেই। খেলোয়াড় ও রেফারীর উদ্দেশ্যে মাঠের মধ্যে শুধু ইট-পাটকেল এবং জুতাই নিক্ষিপ্ত হয়নি, সোডার বোতলও নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং কোন দলের সমর্থকই কম উচ্ছৃংখল আচরণ করেননি।

নিছক আনন্দ লাভের জন্য খেলা দেখতে গিয়ে দর্শক-সমর্থকরা কেন যে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন তার কারণ বুঝি না। জীবন-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত মানুষ অফিস আদালতের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর খেলার মাঠে যায় একটু আনন্দের জন্য। সেখানে গিয়েও যদি 'যুদ্ধ' করতে হয় তবে জীবনের শান্তি কোথায়? তাছাড়া সমাজের উপরও এর একটা প্রতিক্রিয়া আছে। চঞ্চলমতি ছাত্ররাও খেলা দেখতে মাঠে যায়। তারা গিয়ে যদি এই উচ্ছৃংখল আচরণ প্রত্যক্ষ করে আসে তবে তাদের মধ্যেও এই আচরণ সংক্রামিত হতে বাধ্য।

রেফারীর সিদ্ধান্তের বা খেলোয়াড়ের আচরণের প্রতিবাদ করতে হলে তার অন্য উপায় আছে। অন্ততঃ পৈত্রিক গলার উপর এখনো ট্যাক্স বসেনি। চীৎকার করেও প্রতিবাদ জানানো যায়। কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে হলে মাঠের মধ্যে ইট, পাটকেল, জুতো, সোডার বোতল নিক্ষেপ করতে হবে খেলোয়াড়কে ঘায়েল করতে হবে এটা বিকারগ্রস্থ প্রতিক্রিয়া। দর্শক সমর্থকরা বোঝেন না তারা নিজের প্রিয় ক্লাবকে সমর্থন করতে গিয়ে সেই ক্লাবের কতখানি সুনাম নষ্ট করেন। সমস্ত ক্লাবের সমর্থকদের উদ্দেশ্যেই আমার এই মন্তব্য ও বিশেষ করে জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব সমর্থকদের উদ্দেশ্যে। কারণ মোহনবাগান ক্লাবের যে প্রতিষ্ঠা আছে অন্য কোন ক্লাবেরই তা নেই। মোহনবাগান ক্লাবের পেছনে ইতিহাস আছে, বহুজনের বহুদিনের সাধনা আছে। তার ফলেই মোহনবাগান প্রায় 'জনগণের' ক্লাবে পরিণত হয়েছে। সেই ক্লাবের এতটুকু সুনাম যাতে নষ্ট না হয় সমর্থকদের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এবং সেদিকে লক্ষ্য রাখলেই তাঁরা হবেন ক্লাবের সমর্থক, ক্লাব-দরদী।

• • • •

রাজস্থান স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে মাউণ্ট আবুতে খেলাধুলার এক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী এখানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হবার আগেই ভারত সরকার দেশে খেলাধুলার উন্নতির জন্য দু' কোটি টাকা খরচ করবেন। এই টাকার শতকরা ষাট ভাগই ব্যয় হবে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের খেলাধুলার উন্নতির জন্য। কয়েক বছরের মধ্যে প্রত্যেক স্কুলই তার নিজস্ব খেলার মাঠের অধিকারী হবে। রাজ্যে রাজ্যে খেলার জিমন্যাসিয়াম ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। ডাঃ শ্রীমালী আরও বলেছেন—দেশে আগামী দিনের গুণসম্পন্ন খেলোয়াড়ের অভাব নেই। অভাব শুধু তাদের প্রকৃত গুনসম্পন্ন খেলোয়াড়রূপে তৈরী করার বাস্তব পরিকল্পনার।

ডাঃ শ্রীমালীর মত নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ পি সুব্বারায়নও সেদিন এক বেতার-ভাষণে খেলাধুলা সম্পর্কে ভারতের এক রঙীন ছবির আভাষ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভবিষ্যতে খেলাধুলায় ভারত বিশ্ব সভায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

ভারতের প্রাক্তন হকি অধিনায়ক কে ডি সিং যিনি ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে 'বাবু' নামে পরিচিত তিনি কিন্তু ভারত যে বিষয়ে এখনো বিশ্ব প্রধান সেই হকি খেলা সম্পর্কে কোন রঙীন ছবি আঁকতে নারাজ। পূর্ব আফ্রিকা সফরের জন্য নির্বাচিত ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও শিক্ষাদানের জন্য 'বাবু' এখন পুনায় রয়েছেন। রোম অলিম্পিকের হকি খেলায় ভারতের সাফল্য সম্পর্কে জ্ঞানসমৃদ্ধ হকি খেলোয়াড় 'বাবু' যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'বাবু' বলেছেন—রোম অলিম্পিকে ভারতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের আখ্যা নিজ আয়ত্বে রাখার সম্ভাবনা আধা-আধি। প্রথমত রোমের মাঠ ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনুকূল হবে না। এখানকার মাঠ ভারতের মাঠের তুলনায় অনেক নরম। দ্বিতীয়ত ভারতে হকি খেলার সাধারণ 'মানের' অবনতি ঘটেছে। তৃতীয়ত পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড ও পাকিস্তান হকি খেলায় প্রভূত উন্নতি করেছে। পাকিস্তানের কাছেই আমরা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নের আখ্যা হারিয়েছি। পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড ও পাকিস্তান হবে ভারতের অনায়াস সাফল্যের পথে প্রবল অন্তরায়।

বাবু আরও বলেছেন—যথোপযুক্ত পরিকল্পনা এবং খেলোয়াড়দের নিয়মিত শিক্ষাদানের অভাবেই ভারতে হকি খেলার 'মানের' অধোগতি ঘটেছে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে তরুণ বয়স থেকেই খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিতে হবে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের গড়ে তুলতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় ক্রীড়াধারায়। আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকেও খেলোয়াড়দের মুক্ত রাখা প্রয়োজন। হকি, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খোলা মাঠের খেলার জন্য প্রতি স্কুল কলেজেই মাঠের ব্যবস্থা করে ছাত্রদের উৎসাহ দিতে হবে। তা হলেই এত বড় দেশ থেকে আবিষ্কার হবে ভুরি ভুরি খেলোয়াড়। তার মধ্য থেকে বিশ্বজয়ী একটি দল গড়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

ডাঃ শ্রীমালী, ডাঃ সুব্বারায়ন ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হকি খেলোয়াড় বাবুর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অভিন্ন। এর আগে দেশের আরও বহু নেতা, ক্রীড়া পরিচালক এবং ক্রীড়ামোদী একই ধরনের কথা বলেছেন এবং প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন খেলাধুলায় ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু কথাটা শুনতে শুনতে পচা ও পুরোনো হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যৎ কি কোনদিন বর্তমানে পরিণত হবে না? আজ এই প্রশ্নই সবার মনে দেখা দিয়েছে।

• • •

অলিম্পিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া অনুষ্ঠান। ৪ বছরের ব্যবধানে এক একটি অলিম্পিকের আসর বসে আর সারা বিশ্ব মেতে ওঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য। যদিও ক্রিকেট, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলা অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও বাকী খেলাধুলা ও অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের জন্য এক একটি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যত খেলোয়াড় সাঁতারু, মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লবীর ও অ্যাথলীটের সমাগম হয় তা আর কোন ক্রীড়ানুষ্ঠানে হয়ে থাকে? শুধু কি খেলোয়াড় অ্যাথলীট? প্রতি অলিম্পিকে দর্শক সমাগমও হয় অভূতপূর্ব। যে শহরে অলিম্পিকের এই মহাক্রীড়ার আসর বসে সে শহরে বাইরের দর্শক ও খেলোয়াড়ের আগমনে স্থানাভাব ঘটে—খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে অসুবিধাজনক। তাই আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও খেলোয়াড় অ্যাথলীট কমাবার চিন্তা করছেন। অ্যাথলেটিক স্পোর্টসই অলিম্পিকের প্রধান অঙ্গ। অলিম্পিক অ্যাথলীটের সংখ্যা কমাবার জন্য আন্ত-

ইস্ট বেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগ খেলায় ইস্ট বেংগল গোলরক্ষক আর গুহ মহমেডান দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ওমরের মাথার উপরে একটি বিপজ্জনক বল ধরছেন। খেলাটিতে ইস্ট বেংগল ক্লাব ২—১ গোলে বিজয়ী হয়

র্জাতিক অলিম্পিক কমিটি প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের একটা 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বা মান ঠিক করে দিয়েছেন। যেমন উঁচু লাফে ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি যাঁরা অতিক্রম করতে অসমর্থ হবেন অলিম্পিকে তাঁরা যোগ দিতে পারবেন না। ২৫১ ফুট দূরে বর্শা না ছুড়তে পারলে বর্শা ছুড়িয়েও থাকবেন অলিম্পিকের বাইরে, দৌড়বিদ যদি ১০·৪ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করতে না পারেন তবে তারও অলিম্পিক যোগদানের অধিকার নেই। এমনিভাবে অন্যান্য বিষয়েরও একটা নির্দিষ্ট মান ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে মান নির্ণয়ের রেওয়াজ অবশ্য কিছুদিন থেকেই প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এবারকার 'মান' উঠেছে অনেক উঁচুতে। এতে বহু দেশের বহু নাম করা অ্যাথলীটকেই অলিম্পিকের বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু এটা একদিক থেকে অলিম্পিকের আদর্শ বিরোধী।

আধুনিক অলিম্পিকের প্রবর্তক মহামতি ব্যরন দ্য কুবার্তিন অলিম্পিকের যে 'আদর্শ' প্রচার করে গেছেন তা হচ্ছে—"অলিম্পিক খেলাধুলায় জয়লাভ নয়, অংশ গ্রহণই বড় কথা,—জীবনের বড় কথা বিজয় নয়, সংগ্রাম—প্রতিপক্ষকে পরাজিত করাই লক্ষ্য নয়, সততার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই লক্ষ্য।"। এ ছাড়া মিলন, মৈত্রী এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করাও অলিম্পিকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এখন বিশ্বের যোগদানেচ্ছু প্রতিযোগী, এমন কি যাদের মান বেশ উঁচুতে তাঁরাও যদি অলিম্পিকের বাইরে থাকে, তবে প্রধান উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু এর উপায়ই বা কি। অলিম্পিক উপলক্ষে জনস্রোত যদি বাঁধ না মানে তবে 'মান' দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ক্রিকেট খেলার খবর

বেরী সর্বাধিকারী

(বিমানযোগে)

লণ্ডন, ১৪ই জুন—কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। যত ভাবছি ততই আপসোস হচ্ছে। কি অবস্থা ছিল আর কি হল! আমাদের অধিনায়ক দত্তাজীরাও গাইকোয়াড়ের একটিমাত্র ভুলে অনেক কিছুই বদলে গেল।

নটিংহামের প্রথম টেস্ট খেলার 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' শেষ করে লণ্ডনে ফেরবার পর গত সপ্তাহেই 'দেশের' জন্য একটি বিবরণী পাঠিয়েছিলাম। মন ভাল ছিল না। কি লিখেছিলাম ঠিক মনে পড়ছে না। এ ক'দিন টেস্টের কথাই বার বার ঘুরেফিরে মনে পড়ছে। এখনো চোখের সামনে ভেসে আসছে একটি ছবি। ১৭ রানের মাথায় প্রথম উইকেট, ২৯ রানে দ্বিতীয়, ৬০ রানের সময় তৃতীয় উইকেটের পতন। ক্রিকেটের 'জন্মস্থান' ইংলণ্ডের রমণীয় ক্রীড়াভূমি ট্রেণ্টব্রিজে ইংলণ্ডের কি সঙ্কটময় অবস্থা। কাদের কাছে। না, অভিজ্ঞতাহীন বেশীরভাগ 'ছেলেমানুষ' নিয়ে গড়া ভারতীয় দলের কাছে। তারপর ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে'র নির্ভুল খেলার দাপটে 'স্কোর-বোর্ডের' অবস্থার পরিবর্তন হল। ইংলণ্ডের ক্রীড়া-সাংবাদিকদের মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু আবার হাসি মিলিয়ে গেল যখন ২২১ রানের মাথায় পিটার মে প'ড়ে গেলেন নিজে ১০৬ রান করে। ইংলণ্ডের কাছে এক 'মহা-পতন'।

প্রেস-বক্সে সাংবাদিকদের অবসর নেই। প্রায় একশ জন সাংবাদিক তাঁদের ত্রিশ-চাল্লিশ জন সহকারীদের সংগে কর্মব্যস্ত। দেশবিদেশের খবরের কাগজের জন্য এঁরা প্রথম টেস্ট খেলার বিবরণী পাঠাচ্ছেন। মহারথীদের মধ্যে আছেন স্যার লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন, কিথ মিলার, এলেক্স ব্যানিস্টার প্রভৃতি। সকলেরই মুখ গম্ভীর। ফিস ফিস করে কথাবার্তা চলছে। তাঁরা ভাবতে পারছেন না—এ স্বপ্ন, না বাস্তব-? অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংলণ্ড যেমন 'গো-হারা' হেরেছে, ভারতের এই 'বাচ্ছা' ছেলেদের

কাছেও তেমনভাবে হারবে নাকি ইংলণ্ড? ইংলণ্ডের সাংবাদিকদের মুখ পাংশু। এর একটা কারণও ছিল। ইংলণ্ড স্পিন বলকে ভীষণ ভয় করে, যেমন ভয় করে ভারত ফাস্ট বলকে। হর্টন, ইভান্স, ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম, গ্রীনহাউ, মস, কেউই তেমন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান নন। হর্টন ও ইভান্স তখন গুপ্তে ও বোরদের বলে 'খাবি' খাচ্ছেন। ইভান্সের স্বভাব 'লাগে তুক না লাগে তাক'। অবশ্য আনাড়ী তিনি মোটেই নন। কিন্তু 'গুগলী' বল তাঁর ত্রাসের কারণ।

এই সময়েই আমাদের অধিনায়ক করলেন মারাত্মক ভুল। ইভান্সের সব চিন্তার অবসান করে তিনি গ্রহণ করলেন নতুন বল। ডাকলেন আমাদের তথাকথিত মিডিয়াম ফাস্ট বোলারদের। ইভান্স নতুন বলে রানের বান ডাকলেন। সে কী-মার! ইভান্স খেলছেন যেন এক আনাড়ী দলের সঙ্গে। ৭৫ মিনিটে তাঁর ব্যাট থেকেই এলো ৭৩ রান। আজও যেন আমি চোখের সামনে সেই ছবি দেখছি। ভারতীয় অধি-নায়কের 'বোকামীতে' ইংরেজ সাংবাদিকরা মুখটিপে হাসছেন। আর আমাদের মুখে কারা যেন কালি লেপে দিয়েছে।

অনেক ভেবে দেখেছি গাইকোয়াড় এমন ভুল কেন করলেন। ভেবে কোন কিনারা পাইনি। বড় খেলায় অধিনায়কত্ব করবার অভিজ্ঞতা গাইকোয়াড়ের নেই জানি, কিন্তু তিনি তো ইংলণ্ডে নবাগত নন। ১৯৫২ সালেই তিনি ইংলণ্ড সফর করে গেছেন। এঁদের খেলার 'হালচাল', মাঠের অবস্থা সব কিছুই তো তাঁর জানা আছে। তারপর তাঁর অধিনায়কত্বেই তো গতবার বরোদা দল রণজি ট্রফি জিতেছে। সাধারণ খেলোয়াড়ের যে জ্ঞান থাকা উচিত, গাইকোয়াড় সেই জ্ঞানশূন্য হলেন কি ভাবে? সকালের উইকেটে 'প্রাণ' ছিল। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বল বেশ সুইং করছিল। তাই সুরেন্দ্রনাথ ও দেশাই-এর বল ইংলণ্ডের ধুরন্ধর ব্যাটসম্যানদের খুবই বেগ দিয়েছে। কিন্তু বিকেলে এর কিছুই ছিল না। থাকলেও ঐ অবস্থায় 'স্পিন'ই যে আমাদের একমাত্র অস্ত্র—এমন কি মহাস্ত্র, একথা অধিনায়কের বোঝা খুবই উচিত ছিল। না, কোন কারণই খুঁজে পাই না, এই মারাত্মক ভুল গাইকোয়াড় কেন করলেন! অবশ্য একটা 'মেয়েলী' কারণ খুঁজে না পেয়েছি, এমন নয়। সেদিন ছিল বিষ্যুৎবারের বার-বেলা। বারবেলার দোষ কে খণ্ডাবে?

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ক্যাচ ফেললেও স্পিন বোলারদের দিয়ে বল করালে ২৬০—২৭০ রানের মধ্যে ইংলণ্ড দল পড়ে যেত। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি—ইংলণ্ড এবার সত্যিই দুর্বল দল; কিন্তু এত দুর্বল আমার আগে ধারণা ছিল না।

প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড ৪২২ রান তোলার পর ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের ইতিকথা খুবই সংক্ষিপ্ত। পর্জন্য দেবের 'অভিশাপ' আর দৈবদুর্বিপাক ঘটনাকে আরও সংক্ষিপ্ত করে তোলে। অবশ্য ভারত ফলো-অন বাঁচাতে পারেনি—তার কারণ 'ভীতসন্ত্রস্ত' ব্যাটিং। 'কাঁপুনি' বন্ধ করে আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি একটু বেপরোয়া হয়ে পিটিয়ে খেলতেন, তবে ৩০০—৩৫০ রান করা আমাদের পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বিধি বাম। হর্টন ও গ্রীনহাউয়ের মত নিকৃষ্ট ধরনের স্পিন বোলারদের মেরে খেলতেও আমাদের ব্যাটসম্যানরা ভয় পেয়েছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকেছে পলি উমরিগরের ভীতসন্ত্রস্ত ব্যাটিং। ফিল্ডিংয়ের কথা না-ই বললাম। ওটা সম্বন্ধে আমাদের খেলোয়াড়দের ভাব 'বিধবার একাদশী' করার মত। আমাদের ক্রিকেট খেলোয়াড়দেরও ধারণা ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করলে কোন লাভ হয় না, না করলে কাগজওয়ালারা মন্দ কথা লেখে, তাই ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করতে হয়। অর্থাৎ প্র্যাকটিসে মন নেই। মন থাকলে এত নিম্নশ্রেণীর ফিল্ডিং হতে পারে না।

এ তো গেল খেলার কথা। এর উপর আমাদের দলের ম্যানেজার বরোদার মহামান্য মহারাজাকে নিয়েও এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিকেট সম্বন্ধে যার 'অ আ ক খ' জ্ঞান নেই, তিনি যদি বিজ্ঞের মত বেমানান বাণী কাগজে দেন, তবে তা পড়তে কেমন লাগে বলুন তো?

টেস্ট খেলার মধ্যেই মহারাজা সাহেব 'ডেলী এক্সপ্রেসে' এক হস্যাকর বাণী পাঠিয়েছেন। তারপর 'গোদের উপর বিষ-ফোড়ার' মত টেস্ট খেলার পরাজয়ের পর আমরা মাইনর কাউণ্টির কাছে পরাজিত হয়েছি। তখনও মহারাজা আর এক দফা বাণী দিয়েছেন। ইংরেজ চালাক জাত। মহারাজার কাছ থেকে বাণী নিয়ে তারা কি আমাদের আরও হাস্যাস্পদ করতে চাইছে?

টেস্ট খেলায় অধিনায়ক গাইকোয়াড়ের মারাত্মক ভুলে যেমন আমাদের শোচনীয়-ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তেমন টেস্টের পরের খেলাটিতে আমাদের ৬ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে সহঃ-অধিনায়ক পংকজ রায়ের ভুলের মাশুলে। মাইনর কাউণ্টির বিরুদ্ধে শেষ দিনের খেলায় পংকজ রায়ই ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। কারণ গাইকোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষ দিনের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে প্রথম দিন তিনি সেঞ্চুরী করে ভারতীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোন সময় একলা আসে না। সময় খারাপ হলে লোকে 'শুকনো মাটিতে'ও আছাড় খায়। ভারতীয় দলও খেয়েছে। মাইনর কাউণ্টির কাছে এভাবে হার স্বীকার করা শুকনো মাটিতে আছাড় খাওয়া ছাড়া কি?

অবশ্য পংকজ রায়ের ইনিংস ডিক্লারে-শনকে 'স্পোর্টিং ডিক্লারেশন' বলে নিশ্চয়ই অভিনন্দিত করবো। সঙ্গে সঙ্গে বলবো আয়নায় তিনি নিজের ছবি দেখে পরকে বিচার করেছেন। ভারতীয় দলের ২৪৭ রানের প্রত্যুত্তরে যখন মাইনর কাউণ্টি দল ২২৮ রান করেছিল এবং জ্যাক আইকিন করেছিলেন ১১৮ রান, তখনই এঁদের মারবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুটা উঁচু ধারণা করা উচিত ছিল। তাই জেতবার জন্য ৩৩৪ রান করতে মাইনর কাউণ্টিকে ৩০০ মিনিট সময় দেওয়া খবই ভুল হয়েছে। ৩০০ মিনিটে ৩৩৪ রান করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু মাইনর কাউণ্টির খেলোয়াড়রা আরও কম সময়ে এই রান করে 'চোখে আঙুল' দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মনের বল আর বাহুর শক্তি থাকলে কি না হয়। এদের কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এঁরা ৩৩৪ রান করেছেন মাত্র ২৪০ মিনিটে। সত্যই প্রশংসনীয় ব্যাটিং। মাইনর কাউণ্টির এই জয়ের গৌরব অবশ্য প্রধানত একজন খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে। ইনি হচ্ছেন ২২ বছরের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফিলিপ শার্প। শার্প একাই করেছেন ২০২ রান।

টেস্টে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের পর এখানকার বহু কাগজেই রব উঠেছে ভারতীয় দলকে টেস্ট খেলার জন্য পাঁচদিন সুযোগ দেওয়া উচিত কি না? শুধু ভারত কেন? এঁরা পাকিস্থান এবং নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার দিনও হ্রস্ব করবার প্রস্তাব করেছেন। এ প্রস্তাবের মধ্যে যৌক্তিকতা নেই, একথা বলি না; কিন্ত কথা হচ্ছে ইংলণ্ড যখন তিনদিনে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে বা অস্ট্রেলিয়া তিন দিনে বা সাড়ে তিন দিনে হারে ইংলণ্ডের কাছে, তখন এ প্রস্তাব ওঠে না কেন?

দেশী সংবাদ

৮ই জুন—কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ এই বৎসর কলেরা প্রতিরোধের জন্য যেসব ইনজেকশন অ্যাম্পুল ব্যবহার করিতেছেন তাহার অনেকগুলি নাকি রোগ প্রতিরোধে অক্ষম বলিয়া দায়িত্বশীল মহলের অভিমতে প্রকাশ পাইয়াছে।

৯ই জুন—পশ্চিমবঙ্গের জটিল খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়, খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সেন ও কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী শ্রী বি বি ঘোষের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকের দিন ধার্য হইয়াছে।

আজ এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন চাকুরির শিক্ষানবিশীর নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইতেছে। যেহেতু কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকাল অস্থায়ী হিসাবে রাখা চলিবে না।

১০ই জুন—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ তাঁহার মাসিক সাংবাদিক বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, কেরলের কম্যুনিস্ট সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য সংবিধানবিরোধী পন্থা গ্রহণের তিনি বিরোধী। কেরল বা অন্যত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পিকেটিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্ট প্রতিবাদ জানান।

হাড়োয়া, সন্দেশখালি, মথুরাপুর, জয়নগর ক্যানিং ২৪ পরগণার বিভিন্ন থানায় চরম খাদ্যাভাব। দোকানে, ভাঁড়ারে চাউল নাই। থাকিলেও জনসাধারণের ক্রয়ের ক্ষমতা নাই। দর বত্রিশ টাকা। তাই দলে দলে লোক ছুটিতেছে শহরের দিকে, কলিকাতার দিকে।

১১ই জুন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের অন্যতম 'জেনারেল অফিসার' শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসকে পুলিস বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একটি ১৪।১৫ বছরের কিশোরীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অভিযোগে দুর্নীতি দমন ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের পুলিস টালিগঞ্জ পুলিসের সহায়তায় শ্রী দাসকে গ্রেপ্তার করে।

কলিকাতা কর্পোরেশনে একটি চাঞ্চল্যকর চুরির সংবাদ জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, কে বা কাহারা কেন্দ্রীয় পৌরসভা ভবনের ছাদ হইতে সুকৌশলে প্রায় ৩০টি বৃহদাকার মূল্যবান সীসার পাত চুরি করিয়াছে। এই পাতগুলির ওজন ৮।১০ মণ হইবে।

১২ই জুন—কেরলের কম্যুনিস্ট শাসনের সমাপ্তি ঘটাইবার জন্য সমস্ত বিরোধী দল যে আহ্বান জানাইয়াছিল তাহাতে সাড়া দিয়া আজ প্রথম হরতাল পালন করা হইলে কেরলের সর্বত্র সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হরতাল ও স্কুল বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে ৭৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামের তৈল খনি অঞ্চল হইতে বিহারের অন্তর্গত বারৌণী পর্যন্ত যে তৈলের পাইপ লাইন নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে, আংশিকভাবে তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে এক কোটি ৩০ লক্ষ স্টার্লিং (১৭॥ কোটি টাকা) ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ই জুন—আজ রাত্রে এর্নাকুলাম জেলার আনকামালিতে প্রায় দুই হাজার লোকের এক জনতার উপর পুলিস গুলী চালায় বলিয়া এখানে প্রাথমিকভাবে সংবাদ আসিয়াছে। গুলী বর্ষণে কেহ হতাহত হইয়াছে কিনা এখনও জানা যায় নাই।

কেরালার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে কেরল পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। শ্রীনেহরুর নিকট হইতে এখনও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

বন রাওয়াত (অর্থাৎ রাজপুত) নামে অজ্ঞাত পরিচয় এক উপজাতীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আলমোড়া জেলার অ্যাসকোট অরণ্যে ইহারা বাস করে।

১৪ই জুন—ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরম্ভ হইলে কেরালা রাজ্যে রেলওয়ে, পোস্ট অফিস প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সংস্থা আছে তাহার প্রহরায় সম্ভবত সৈন্য মোতায়েন করা হইবে। মাদ্রাজ এলাকার অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল কোছার এই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ-এর সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল দূরে হাবড়ার অশোকনগর কলোনীর এক বাড়িতে একই পরিবারের তিনজনকে শনিবার শেষ রাত্রে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কোন এক রহস্যাবৃত কারণে ঐ তিনজন আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

বিদেশী সংবাদ

৮ই জুন—লণ্ডন হইতে নাফেনের সংবাদে জানা গেল, পৃথিবীর প্রাচীনতম পালতোলা জাহাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। "ট্রিনকোমালী" নামে ১৪ শত টনের কাষ্ঠ-নির্মিত এই যুদ্ধ জাহাজটি ১৮১৭ সালে বোম্বাইতে ভাসান হয়। ১৪২ বৎসরের পুরান এই জাহাজটিকে রক্ষা করার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৫৯ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল ৫ই জুন প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরীক্ষায় শতকরা ৪৮·১ জন পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হইয়াছে।

৯ই জুন—রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্রের সহায়তায় ডাক বিলির প্রথম চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। মার্কিন নৌবাহিনীর বেতার নিয়ন্ত্রিত রকেট রেগুলাস তিন হাজার চিঠিপত্র বহন করিয়া অদ্য মহাসমুদ্রের একখানা সাবমেরিন হইতে যাত্রা করে এবং ২২ মিনিট পর জ্যাকসনভিল (ফ্লোরিডা) অবতরণ করে।

১০ই জুন—আজ এই সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এক বৎসরের মধ্যে বার্লিন হইতে পাশ্চাত্ত্য সৈন্যদল সরাইয়া লইতে হইবে—আকস্মিকভাবে এই দাবি করিয়া রাশিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনকে একটি সংকটের মুখে লইয়া আসিয়াছে।

বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহে অদ্য এই সংবাদটি ফলাও করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে যে, ফ্রান্স হইতে যে ২৫০ খানা মার্কিন জঙ্গী বোমারু বিমান সরাইয়া আনা হইবে সেগুলি বৃটিশ ঘাটিতে রাখার জন্য তোড়জোড় শুরু হইয়াছে। ফ্রান্স জানাইয়া দিয়াছে যে, ফরাসী এলেকায় যদি আমেরিকার আণবিক অস্ত্র মজুত রাখিতে হয়, তবে সে সকল অস্ত্রের উপর ফ্রান্সকেও সমান কর্তৃত্ব দিতে হইবে।

১১ই জুন—তিনদিনের জন্য নেপাল পরি-দর্শনের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ কাঠমাণ্ডুতে উপনীত হইলে লক্ষাধিক লোকের একটি বিরাট জনতা তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১১২ জন গেজেটেড সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

১২ই জুন—কাঠমাণ্ডু মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রদত্ত এক মানপত্রের উত্তরে শ্রীনেহরু এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে আজ বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে এই কথা বলেন যে, "আদর্শ হিসাবে পঞ্চশীল" আজ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

১৩ই জুন—আজ মধ্যাহ্ন ভোজের সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালার মধ্যে এক ঘণ্টাকাল বৈঠক হয়। প্রকাশ এই সময় তিব্বত, আন্তর্জাতিক বিষয় এবং উভয় দেশের মধ্যে বৈষয়িক সহ-যোগিতা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

১৪ই জুন—তিন দিন নেপাল পরিদর্শনের পর অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, তিব্বত সমস্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ভারত ও নেপালের মধ্যে বহুলাংশে মতৈক্য রহিয়াছে। তিনি বলেন, তিব্বত সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে লইয়া যাই-বার কোন অভিপ্রায় ভারতের নাই।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

নতুন ক'রে
শেখাতে হবেনা—ব্রুক বণ্ড
চা'য়ে দামের তুলনায় অনেক
বেশী কাপ ভাল চা
পাওয়া যায়।
আমার কাছে ব্রুক বণ্ডই
সব চাইতে ওপরে, কেমনা
প্রতি সপ্তাহে ২,৮৯,০০,০০০
প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা
তৈরী হয়।
আর এসব কারণের
জন্যেই তো অন্য চায়ের
চাইতে ব্রুক বণ্ড চা-ই বেশী
লোকে খায়।
আপনিও
ব্রুক বণ্ড চা
খেয়ে
সব সময় তৃপ্তি পাবেন
Brooke Bond
Darjeeling
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
BB 274D

স্মরণীয়
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি
৭ই বৈশাখের বই
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
অভিষেক (উপন্যাস) ৫৮০
২৫শে বৈশাখের বই
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলায়
রবীন্দ্রনাথ ৩॥০
৭ই জ্যৈষ্ঠের বই
বনফুলের
নূতন বাঁকে (কবিতাগ্রন্থ) ২·৫০

সূচীপত্র

FOUNDATION
POND'S
Vanishing
Cream

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 27th June, 1959

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৫ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

'ভারতকোষ' বিচার

প্রত্যেকবার 'আর্থিক বৎসর' শেষ হইবার উপক্রম করিলে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। তাঁহারা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া আবিষ্কার করেন যে বরাদ্দ টাকা খরচ হয় নাই, কাজেই প্রমাণ হইতে চলিল যে কাজ হয় নাই। তখন তাঁহারা "প্রভাতে উঠিয়া যাহাকে দেখিব তাহাকেই কন্যাদান করিব" পণ করিয়া বসেন এবং পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যাঁহাকে প্রথমে সম্মুখে পান তাঁহাকেই টাকা দিয়া ফেলিয়া সেরেস্তা দোরস্ত হইল বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। সংসারে টাকার গৌরবেই কাজের গৌরব।

এই মনোভাবের সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'ভারত কোষ' নামে মহাগ্রন্থ সঙ্কলন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি। প্রকাশ যে ইতিমধ্যেই উনচল্লিশ হাজার টাকার অধিক সাহিত্য পরিষদ পাইয়াছেন।

আর সাহিত্য পরিষদও অপ্রত্যাশিত তৎপরতা দেখাইয়া কমিটির চেয়ারম্যান আহ্বায়ক ও সদস্য প্রভৃতি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও সাহিত্য পরিষদের এই শুভ সহযোগিতা সত্ত্বেও সাধারণের সংশয় দূরীভূত হইল না। সেই সংশয়কে প্রথমে কয়েকটি প্রশ্নাকারে উপস্থাপিত করিতেছি। টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার দিতেছেন ঠিক, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বিভাগ? সাহিত্য অ্যাকাদামি না শিক্ষা বিভাগ? এই ভার সাহিত্য পরিষদের উপরে দিবার আগে কেন্দ্রীয় সরকার কি নিশ্চিত হইয়াছেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদই যোগ্যতম প্রতিষ্ঠান? অন্য যে-সব বৃহৎ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে কেন্দ্রীয় সরকার কি তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন? সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এই জাতীয় কোনও গ্রন্থের নাম কি কেন্দ্রীয় সরকার জানেন? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোন গুণে তাঁহারা বশীভূত হইলেন? এ সমস্ত প্রশ্ন একান্ত প্রাসঙ্গিক। আমরা এমন ইঙ্গিত করিতেছি না যে বন্ধুপ্রীতিবশে বা অবাঞ্ছিত সমালোচনার দায় এড়াইবার আশায় তাঁহারা এমন কাজ করিয়াছেন। কেন না, এতবড় দায় ঘাড়ে পড়িলে কাহারও খুশী হইবার কথা নয়। আমাদের আপত্তিও সেখানেই। এত গুরু দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাই। নামে এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইলেও কার্যত ইহা বাংলা দেশের ও বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব অর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের কাজ ছোট করিয়া না দেখিয়াও আমরা বলিতে বাধ্য যে ইদানীং কালের মধ্যে পুরাতন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ ব্যতীত আর কিছু ইঁহারা করেন নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে উৎসাহ এই প্রতিষ্ঠানে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এখন তাহা নিঃশেষ প্রায়। এ-সব কথা নয়াদিল্লীর জানিবার কথা নয়, দূর হইতে সমস্তই নিশ্চল দেখায়, তবু কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী মন্ত্রীদের তো জানা উচিত। তাঁহাদের উচিত ছিল বাঙালীর যথার্থ প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে ভারার্পণ। কিম্বা কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের উপরে ভারার্পণ না করিয়া মনীষী বাঙালী পণ্ডিতগণের কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপরে ভারার্পণ। এই কমিটির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষদ, বিশ্বভারতী বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতির সদস্য থাকিতে পারিতেন। কিন্তু এ হেন ধীরতা ও বিচার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণের কাছে আশা করা লোকে এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছে। দিল্লীর হাওয়া গায়ে লাগিলেই লোকে "নবাব হইয়া ওঠে। তবু যে বলি তাহার কারণ টাকাটা আমাদের, মন্ত্রীদের নয়।

আরও এক কথা, সাহিত্য পরিষদ এই উদ্দেশ্যে যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার সদস্যগণের নাম সাধারণকে আশ্বস্ত করিবে না। কমিটির চেয়ারম্যান পণ্ডিত ব্যক্তি, আরও দু একজনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। অন্যাদের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ-হেন কোষগ্রন্থ প্রনয়ণের ক্ষমতা যে তাঁহাদের আছে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এমন যে হইয়াছে তাহার একমাত্র হেতু যে-প্রতিষ্ঠানের উপর ভার পড়িয়াছে তাহার ভিত্তি যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। সাহিত্য পরিষদ হয়তো তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সদস্যগণের উপরেই ভার দিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের 'শ্রেষ্ঠ' বাংলা দেশের 'শ্রেষ্ঠ' নয়। কাজটি কেন্দ্রীয় সরকারের— কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের দেখা উচিত ছিল যাহাতে বাংলা দেশের 'শ্রেষ্ঠগণ' এই কাজে যোগদান করিতে পারেন। সে পথ খোলা থাকিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। এখন আর সে পথ উন্মুক্ত আছে কিনা জানি না তবে "ভারত কোষের' ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। এদেশে 'যেন তেন প্রকারেণ বর্বরস্য ধনক্ষয়' হওয়াই রীতি। আশা করি এ ব্যাপার তাহার নূতন দৃষ্টান্ত হইবে না।

প্রসঙ্গত

ভেবেছিলুম, ডালেসের দেহাবসানের পর রাজনৈতিক অভিধান থেকে 'ব্রিঙ্ক-ম্যানশিপ' শব্দটি লোপ পাবে। রাজনীতি না হক, খাদ্য নীতি নিয়ে পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকার যে খেল দেখালেন, তাকেও ব্রিঙ্কম্যানশিপ বলা চলে। রাজ্যকে তাঁরা একেবারে সঙ্কটের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার পরেই অতল গহ্বর, সেই গহ্বরে দুর্ভিক্ষ মুখ-ব্যাদান করে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সার্কাসি কসরতে সরকারের অসীম নৈপুণ্য, তাঁরা কিনারায় গিয়ে গোড়ালিতে ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। রদ করেছেন ধান ও চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ। দুর্ভিক্ষের দশা ট্যান্টালাসের মত; মুখের গ্রাস ফসকে গেছে।

*

যাকে ঘটা করে সরকার এই পৌনে ছয় মাস পরে বিসর্জন দিলেন, সেই বস্তুটি আসলে কী? সূতিকায় মৃত একটি শিশু। জাত হবার অল্প পরেই সে বিনষ্ট হয়েছিল, কিন্তু শোকাতুরা জননীর মত সরকার সে-কথা বিশ্বাস করতে চাননি, পরম মমতায় নিয়ন্ত্রণ-প্রয়াসের শব বুকে আঁকড়ে রেখে-ছিলেন। এতদিন শুধু নীরবে অশ্রুপাত চলছিল। কু-লোকে অবশ্য বলবে, সূতিকায় ঈষৎ যত্ন নিলে শিশুর মৃত্যুই ঘটত না, আবশ্যক হত না অশ্রু-মোচনের। কিন্তু গত নিয়ে শোচনা করে কী হবে।

আমরা, ইতরজনেরা এইমাত্র দেখলুম যে, মাতৃক্রোড় থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া শিশুটিকে ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্মশান-বন্ধুরা 'বল হরি' বলে বয়ে নিয়ে গেল। এবার ঘটা করে তার অন্ত্যেষ্টি হবে।

*

তা হক। আমরা এই শ্রাদ্ধ-বাসরে ক্ষণায়ু শিশুটির কাহিনী খানিক আলোচনা করি। জল্পনাকল্পনা (অর্থাৎ কনসেপসন) এবং প্রতীক্ষা-পর্ব হিসাব থেকে বাদ দিই। ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে শিশুটির জন্ম। কী অমঙ্গল-লগ্নে জানি না, সঙ্গে সঙ্গেই সে নীল হয়ে গেল। জন্মান্তরের অভিশাপ সে বহন করে এনে থাকবে, কেননা, নানা দুর্লক্ষণ অচিরেই প্রকটিত হল। শহরে নির্দিষ্ট দরে চালের অভাব, মফঃস্বলে কোন দরেই কিছু নেই। সম্পন্ন গৃহস্থ ও মজুতদারদের কথা স্বতন্ত্র: মাটি খুঁড়ে সোনার তাল লুকিয়ে রাখার রীতি একদা এই দেশেই ছিল: সেই ট্র্যাডিসন সম্ভবত একেবারে লোপ পায়নি; বিশেষ করে সদাশয় শাসকেরা যদি চক্ষু মুদিত করে থাকেন, তবে ত কথাই নেই। সরকার অবশ্য শুধু চোখই বুঁজে ছিলেন এবং হাত দুটিকে নিরস্ত রেখেছিলেন; মুখে তাঁদের কথার কামাই ছিল না, খই ফুটছিল। থেকে থেকেই হুকুম অমান্যকারীদের কঠোর সাজা হবে বলে সরকার হুমকিও দিয়েছেন। কিন্তু 'খোকা, যাসনে, করিস নে' মিহি-গলার এই মিনতি কি দামাল ছেলেরা শোনে।

সেই সঙ্কটে, স্বীকার করতেই হয়, খাদ্যমন্ত্রীর ভূমিকাই সবচেয়ে করুণ হয়েছিল। তাঁর ভাষা বোঝার আশায় অনেকেই জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। খাদ্য-মন্ত্রী যখন বলেছেন, 'কই, অন্নাভাব কোথায়, এমন খবর পাইনি ত!' লোকে তখন ভেবেছেন, মন্ত্রী অবশ্যই বধির হবেন। আবার বিব্রত মন্ত্রী মহোদয় কখনও-বা বলেছেন, দোষ সাধারণেরই; চড়া দাম দিয়ে তারা চাল কেনে কেন। সে-কথায় বিমূঢ় লোকে অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছে, আপৎকালে লোকের মাথার ঠিক থাকে না; কথারও না। চাল যে প্রসাধন দ্রব্যাদির মত চালিয়াতি বা শখের বস্তু নয়, যে-কোন মূল্যে ওটা যে সংগ্রহ করতেই হয়, খাদ্যমন্ত্রীর তা কি অজানা ছিল? সর্বজনীন অনশনের ফলে সব মুশকিলের আসান আপনা থেকেই হবে—এই বিপজ্জনক চিন্তা নিশ্চয়ই বিদ্যুচ্চমকের মত তাঁর মনে খেলে যায়নি?

*

মে-মাসের শুরু থেকে সরকারী নীতির ব্যর্থতার দুর্গন্ধ এমনভাবেই ছড়িয়ে পড়ল যে, কোন স্তোক-বাক্য দিয়েই তাকে চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। গ্রামাঞ্চলের বুভুক্ষুরা দলে-দলে শহরে এসেছে। সুন্দরবনে দুর্ভিক্ষের ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই সুযোগে কিছু বিরোধী শক্তি জোট বেঁধে আপন স্বার্থ-সিদ্ধিরও ছল খুঁজেছেন। প্রয়োজন হলে মুখের গ্রাসের সমস্যা নিয়ে ফুটবল খেলতেও এঁরা পিছ-পা নন।

অবশেষে ২২শে জুন তারিখে সরকার নিয়ন্ত্রণাদেশ রদ করলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী খাদ্য মূল্যকে উদ্দেশ করে নাটকীয় ঘোষণা করেছেন, 'যাও বীর, মুক্ত তুমি।' বন্দী বি-শৃংখল হল; এর পরিণাম বিশৃংখলাও কিনা, কিছুকাল না গেলে বোঝা যাবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী কিঞ্চিৎ বীর-রসেরও অবতারণা করে-ছিলেন। "ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে" এ-কথা অকপটে স্বীকার করেই তিনি সগর্বে বলেছেন, "কিন্তু ভুল কে না করে? এবং করবার পর সে-কথা কবুল করার এবং ভুল-সংশোধনের সৎসাহস ক'জনের থাকে?" মহাত্মাজী একদা আপন ভুলকে 'হিমালয়তুল্য' বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী সে-কথাও উল্লেখ করেছেন।

*

প্রকাশ্য মঞ্চে নাটকীয় ঘোষণার পূর্বেই কিন্তু নেপথ্যে, পার্লামেন্টারি পার্টির সাজঘরে, একদফা মহলা হয়ে গেছে। কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, খাদ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন। অমনই একজন রাষ্ট্র-মন্ত্রী "মীয়া কাল্পা"—আমিই দোষী—কবুল করে আপন শির ডালি দেবেন বলে বাড়িয়ে দিলেন। মঞ্চস্থ নাটক থেকে এই অংশটুকু অনাবশ্যক বলে বর্জিত হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়ের মাথাই যথাস্থানে আছে।

পদত্যাগের দাবিদারেরা সম্ভবত ভেবে রেখেছিলেন, খাদ্যমন্ত্রী গদী ছাড়লে কাজের কাজ না হক, একটা 'গুডউইল স্টাণ্ট' হবে। ঐতিহাসিক নজিরও যে নেই, তা নয়। কয়েকটি রেল দুর্ঘটনার পর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইস্তফা দেন। রেল-দুর্ঘটনায় রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পরোক্ষ, খাদ্যসঙ্কটে খাদ্যমন্ত্রীর দায় প্রত্যক্ষ।

খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য গদী ছাড়েন নি, শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ ছেড়েই রক্ষা পেয়েছেন। সে-ই মল খসিয়েছেন তবে লোক হাসিয়ে নয়—অসংখ্যকে কাঁদিয়ে।

*

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর মতভেদের ব্যাপারটার বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া হবে বলে মনে করিনে। বিষয়টি দাম্পত্য কলহের মত লঘু আদৌ নয়। আর এ ত স্পষ্ট, উভয়ের নীতি ও দৃষ্টি-ভঙ্গিগত মিল মোটেই রাজযোটক হয়নি। রাষ্ট্রপতি অন্তত এটুকু দেখিয়ে দিলেন যে, শালগ্রাম শিলার মত টাটে বসে থাকাতে তাঁর রুচি নেই। তৃতীয় জর্জকে তাঁর মা নাকি কেবলই বলতেন, "জর্জ বী এ কিং—রাজার ন্যায় আচরণ কর।" প্রেসিডেণ্টও অবশেষে প্রেসিডেণ্টের ন্যায় আচরণ করবেন বলে স্থির করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী এ 'হক' তাঁর আছে। এই মতানৈক্যের পরিণতির ওপর ভারতের গণতন্ত্রের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটবে কিনা, তা-ই নির্ভর করছে।

জেনেভায় "বৃহৎ চতুঃশক্তির" (সাবেকী লোকদের কানে কথাটা বোধহয় কোনো আয়ুর্বেদীয় ঔষধের নাম বলে ঠেকে) পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন প্রায় ছ' সপ্তাহ ধরে চলে (?) তিন সপ্তাহের জন্য বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৩ই জুলাই আবার বৈঠক বসবে। এই একচল্লিশ দিনের পরিশ্রমে কী হল তা সাধারণ লোকের নিকট দুর্বোধ্য, তারা শুধু এইটুকু বুঝেছে যে কোনো বিষয়েই দুইপক্ষ একমত হন নি, কোনো প্রশ্নেরই মীমাংসা হয় নি। কিন্তু মতের ঐক্য বা মীমাংসার নিকটবর্তী না হয়েও যাঁরা দিনের পর দিন বৈঠক করতে পারেন এবং না দমে কেবলমাত্র দম নেবার জন্য তিন সপ্তাহ বিশ্রামের পর আবার বৈঠক চালাতে কৃতসংকল্প তাঁদের কাছে মীমাংসাই সম্মেলনের লক্ষ্য না হতেও পারে। নিয়ত সম্মেলনই সম্মেলনের লক্ষ্য। সেইজন্য পররাষ্ট্রসচিবদের সম্মেলনে কোনো বিষয়ের মীমাংসা না হলেও "শীর্ষ" সম্মেলন সংঘটিত হবার সম্ভাবনার কথা প্রচারিত হচ্ছে। মোট কথা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু বুঝাই মুশকিল। এমন কি যে-গুলোকে সমস্যা বলা হচ্ছে সেইগুলোই আসল সমস্যা কিনা অথবা সেগুলোর মীমাংসার দাবি যেভাবে উপস্থিত করা হচ্ছে তাতেও কোনো পক্ষেই আন্তরিকতা আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং "কর্তারা যা করেন"—সাধারণের পক্ষে এই ভাবের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া পথ নেই।

বিলাতী "পপুলার" খবরের কাগজ যেগুলি বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত চলে—সেগুলিতে সংবাদ বিন্যাসের রকম দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগে। 'উন্নত' দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন মনের খোরাক এই। আমাদের ভাষায় 'গুরুত্বপূর্ণ' সংবাদের প্রতি এমন তাচ্ছিল্য! তার জায়গায় প্রাত্যহিক জীবনের যত 'তুচ্ছ' ঘটনা, চোর-বদমায়েসের কাহিনী, যৌন কেলেংকারীর রসসিক্ত ব্যাপারের ফলানো চিত্র! এই প্রসংগে মনে পড়ছে—জেনেভা কনফারেন্স যেদিন আরম্ভ হয় তার পরের পরের দিনই বোধহয় বার্লিন থেকে লণ্ডনে যাচ্ছিলাম। প্লেনে একখানা ইংরেজী কাগজ চাইতে সেদিনের 'ডেইলি হেরাল্ড' হাতে এলো। জেনেভায় পররাষ্ট্র-সচিবদের কনফারেন্স সবে আরম্ভ হয়েছে, আমি ভাবছিলাম কাগজে এই সংক্রান্ত খবর বেশ বড়ো করেই থাকবে। কিন্তু কাগজ হাতে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কোথায় কনফারেন্সের খবর! শেষ-পর্যন্ত খুঁজে পেলাম বটে, প্রথম পাতাতেই আছে, নিচের দিকে এক-কলমে ইঞ্চি ছয়েক জায়গা পেয়েছে। কিন্তু যে-খবরকে প্রথম পৃষ্ঠার দু'কলম জুড়ে হেডলাইন দিয়ে কাগজের সেদিনকার প্রধান খবরের সম্মান দেওয়া হচ্ছে সেটা একটি এগারো বছরের স্কুলের ছেলের নিখোঁজ হবার খবর, একজন স্কুলের মাস্টার তাকে নিয়ে কোথাও গেছে—এই হচ্ছে অনুমিত ঘটনা। তাকে ফলিয়ে ফালিয়ে বিরাট আকার দেওয়া হয়েছে, মাস্টারের তিন-কলমী ফোটো। ছেলেটির ফোটোও ঐ দিনের 'ডেইলী হেরাল্ডে' ছিল কিনা ঠিক মনে করতে পারছি না, কিন্তু ঐ দিনের অন্য বিলাতী কাগজে ছিল। মোট কথা, বিলাতে ঐ দিনের 'ন্যাশনাল' 'পপুলার' কাগজগুলিতে ঐটেই ছিল সর্বপ্রধান খবর। খুবই বিলক্ষণ লেগেছিল।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, হয়ত বা বিলাতী 'পপুলার' কাজগুলির সংবাদ পরিবেশনের ধরণটা প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের কাছে যতটা অযৌক্তিক বলে মনে হয় ততটা অযৌক্তিক নয়। জেনেভা কনফারেন্সের সংবাদই ধরা যাক। দিনের পর দিন আমাদের দেশের কাগজে বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশের সব দৈনিক কাগজকেই 'সিরিয়াস' বলা যায় —জেনেভা কনফারেন্স সম্বন্ধে যে গাদা গাদা শব্দ ছাপা হয়েছে তাতে সাধারণ পাঠকগণের মোট জ্ঞানলাভ কতটুকু হয়েছে? জেনেভা কনফারেন্সের খবর বড়ো বড়ো করে ছেপে পাঠকদের মনে কনফারেন্সের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে-ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিল তার কি কোনো সার্থকতা ছিল? সেখানে কনফারেন্সের খবরের চেয়ে কোনো স্থানীয় 'হিউম্যান স্টোরি' বড়ো করে ছেপে

বিলাতের 'পপুলার' কাগজগুলি সত্যই কি তাঁদের 'নিউজ সেন্সের' অভাবের পরিচয় দিয়েছে? যে-ব্যাপার জনসাধারণ বুঝবে না অথবা যে-ব্যাপারের আসল তত্ত্ব জনসাধারণকে বুঝাবার ইচ্ছা কোনো পক্ষেরই কর্তাদের নেই সেই ব্যাপার নিয়ে শব্দের জাল বিস্তারের প্রশ্রয় দান সত্যই অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য?

অবশ্য যে-ধরনের সংবাদকে বিলাতী 'পপুলার' কাগজে রং চং ফলিয়ে ছাপানো হয় সেটা ভালো কিনা, সে প্রশ্ন আলাদা। এখানে একথাও কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, বিলাতের যে-সব 'পপুলার' কাগজ আমাদের মতে 'সিরিয়াস' সংবাদের তুলনায় স্থানীয় সামান্য ঘটনার সংবাদকে প্রাধান্য দেয় তারাও কিন্তু 'সিরিয়াস' খবর সংগ্রহের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করে। দেখা যাবে যে-সব 'পপুলার' কাগজে জেনেভা কনফারেন্সের খবরের জন্য সামান্যই জায়গা দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই একান্ত নিজস্ব সংবাদ-দাতা জেনেভায় রয়েছে এবং তার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় হচ্ছে। অবশ্য বিলাতেও কয়েকটি বিখ্যাত 'সিরিয়াস' কাগজ আছে —আমাদের দেশের কাগজগুলি অনেকাংশে তাদেরই আদর্শে গঠিত। তাদের সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা 'পপুলার' কাগজগুলির চেয়ে বেশি কিন্তু তাদের চেয়ে 'পপুলার' কাগজগুলির পাঠকসংখ্যা বহুগুণ বেশি।

সুতরাং বিলাতী গণতন্ত্রের মানসিক ছবি 'পপুলার' কাগজগুলিতেই বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে ধরা যায়। তাহলে ধরতে হয় যে, জনসাধারণের বেশির ভাগ 'সিরিয়াস' রাজনৈতিক সংবাদ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্বন্ধে উদাসীন অথবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিপরিচালনার যে-ব্যবস্থা জগতে চলছে তাতে জনসাধারণের পক্ষে তার মর্মোপলব্ধির সুযোগ নেই বা তাদের সেই সুযোগ দেবার আগ্রহ কোনো দেশের কর্তৃপক্ষেরই নেই। সকল দেশের কর্তারাই চান যে জনমত তাঁদের নির্ধারিত নীতির পশ্চাদনুসরণ করুক, পারতপক্ষে প্রবুদ্ধ জনমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে কেউ চান না। অথচ মুশকিল এই যে, যে-ব্যাপারের ভিতরটা তাদের দেখবার বা বুঝবার উপায় নেই তার উপর যুদ্ধ, শান্তি, জীবন, মরণ হয়ত নির্ভর করছে। কূটনীতি গোপনে পরিচালিত হোক, যুদ্ধবিগ্রহ লাগা না লাগা রাজরাজড়ার খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করুক, সাধারণ মানুষের কোনো কিছুতে হাত ছিল না—আগের কালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল। একালে দুই পক্ষের মধ্যে গালাগালিটা খুবই প্রকাশ্যে এবং প্রায় অবিরত হয় বটে কিন্তু সেইটা ছাড়া বাকী সবটা এখনো জনসাধারণের দৃষ্টি এবং জানার বাইরে ঘটে। ২২।৬।৫৯

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

বারো

সবুজ সভায় সুসংগ রাজবংশের গৌরব সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহের শুভাগমন-প্রসংগে আমি পূর্বেই বলেছি যে, প্রমথ চৌধুরী এই সুসংগীকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। খুশী হবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। ঐ রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব, কেন প্রমথবাবু প্রথম-প্রথম সুধীন্দ্রকে কেবল "সিংহ" বলে উল্লেখ করেছেন।

সুসংগ-রাজবংশের সিংহ পদবীটি যে বীরত্বের পরিচায়ক, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ও-বংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ, অথচ ক্ষত্রিয়োচিত "সিংহ" পদবী গ্রহণ করলেন কেন?

"ভারত-গৌরব" নামক গ্রন্থের প্রণেতা সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় লিখেছেন: 'বাঙ্গালাদেশে ভাদুড়ী-বংশ ও সুসঙ্গের রাজবংশ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সিংহ উপাধি নাই।'

উক্ত গ্রন্থে সুসংগ রাজবংশের যে ইতিহাস দেওয়া আছে, তদনুসারে ও বংশের 'আদি-পুরুষ' ছিলেন রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রভূমে এসে বারেন্দ্র-শ্রেণীভুক্ত হয়ে যান। তিনি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজাদের শ্রীশ্রীহরগৌরী বিগ্রহের এক পুরোহিত। তাঁর পুত্র সোমেশ্বর পাঠক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সস্ত্রীক আসামে গিয়ে শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীকে দর্শন করার পর সুসংগ-দুর্গাপুরে এসে বসতি করেন ও সেখানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করেন। সোমেশ্বরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ব্রহ্মচারীবৎ জীবন-যাপন এবং সর্বোপরি তৎপ্রতিষ্ঠিত কালী-ঠাকুরের পূজা-প্রাপ্তির পর স্থানীয় অনেক লোকের কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ

সম্বন্ধে খ্যাতি, তাঁকে গুরুর সম্মান এনে দিলে। সোমেশ্বর-পুত্র শ্রীপাদ পিতৃ-শিষ্যদের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী স্থান অধিকার করেন।

বসু মহাশয় লিখেছেনঃ "তৎকালে গারো, কুকি, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাংগলা দেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত। শ্রীপাদ পাঠকের দ্বারা উহা নিবারণ করিবার জন্য বাংগলার নবাব তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

সুরেন্দ্রমোহন বসু-প্রদত্ত বংশক্রম অনুসারে শ্রীপাদ-পুত্র স্বর্ণশিখর; তদ্বংশীয় বিনায়কের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ বুদ্ধিমন্ত দিল্লীশ্বরের অধীনে সৈনিক বিভাগে পদ-প্রাপ্তির পর "খাঁ" উপাধি লাভ করেন এবং সুসংগ-পরগণার জায়গীরদার হন। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পুত্র জগদানন্দ খাঁ। তাঁর দুই পুত্র, জানকীনাথ ও যদুনাথ সিংহ।

জানকীনাথ সিংহ "তাহিরপুর রাজ-বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। নাটোর রাজবংশের সহিতও বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়াছিল। নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পুত্র কুমার কালিকা-প্রসাদের সুসংগ রাজবাটীতে বিবাহ হয়।"

রঘুনাথ সিংহ ছিলেন জানকীনাথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র। তাঁহার সময়ে গারো পর্বতের অসভ্য জাতিগণ অতি অশান্ত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া দিল্লীর সম্রাট জাহাংগীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন......অতঃপর সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়া ১২৫ অশ্বারোহী ও ২৫০ সিপাহী প্রদানপূর্বক গারোদিগকে শাসন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন।"

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, "সিংহ" পদবীটি ও-বংশে প্রথমে জানকীনাথই গ্রহণ করেন। আমার মনে হয়, সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের অনুকরণেই সম্ভবত এ-পদবী কল্পিত। মানসিংহ ঐ সময়ে বঙ্গদেশের সুবাদার ছিলেন। তাঁর বীরত্বের কাহিনী সর্বজনবিদিত।

মানসিংহ মোগল সম্রাট্ আকবরের ও জাহাংগীরের সংগে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁকে অন্যান্য রাজপুত রাণারা ঘৃণা করতেন। সুসংগের "সিংহ"-রা দিল্লীশ্বরের অনুগত ছিলেন বটে, কিন্তু মানসিংহের মতন মুসলমান কুটুম্বিতা করেন নি। ফলে হিন্দুদের মধ্যে তাঁদের মান ও সিংহ দুই-ই বজায় আছে। ও'রা জাতিতে ব্রাহ্মণ, যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন—"সিংহ"-পদবী গ্রহণ করা সত্ত্বেও। সেইজন্যে দেখি, ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাপক "শর্মা"-পদবী যোগ করে' ও'রা নিজেদের নাম সই করেন।

সুধীন্দ্রকে যখন প্রমথ চৌধুরীর ওখানে নিয়ে যাই, তখন তিনিও নাম সই করতেন—সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ-শর্মা। আমাদের ফ্রেঞ্চ-ক্লাসের শিক্ষক লাফ্রুশেয়র সুধীন্দ্রকে 'সার্মা' অর্থাৎ 'শর্মা' বলে ডাকতেন। এক্ষেত্রেও জহুরী জহর চিনেছিলেন, একথা বলা যায়, কারণ শিক্ষকটি জাতিতে ফরাসী হলেও গুণ-কর্ম-বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, এবং যেহেতু সুধীন্দ্রের বীরত্ব-ব্যঞ্জক "সিংহ"-পদবীর কোনো সার্থক প্রমাণ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি, তিনি হয়তো ছাত্রের ব্রাহ্মণত্বটুকু বুঝেই ফরাসী রীতিতে 'শর্মা'-পদবীর উচ্চারণ দ্বারা সুধীন্দ্রকে আহ্বান করতেন।

"সিংহ-শর্মা" ইংরিজীতে লিখলে বড্ড বড় দেখায় (SINHA SARMA), তাই কখনো কখনো তোরংগ বা সুট্-কেসে সুধীন্দ্র শুধু SINHA লেখাতেন। এতে লেখাবার খরচও কিছু বাঁচত। একবার উনি সস্ত্রীক রেলগাড়িতে চড়ে যাচ্ছেন, ও'দের কম্পার্টমেন্টে একটি ইংরেজ সহযাত্রী প্রশ্ন করেছিলেনঃ

"Are you related to Lord Sinha?"

এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন সুধীন্দ্র, তা আমার মনে নেই। তবে ভুয়ো খাতির যে টানেন নি, এটা সুনিশ্চিত।

আর একবার "ভারত-গৌরব"-গ্রন্থটির পাতা উল্‌টে গেলে একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র পাওয়া যাবে, যে-সূত্রে গ্রথিত আছেন তিনটি অভিজাত-কুল—সুসংগ রাজবংশ, নাটোর রাজবংশ আর হরিপুরের চৌধুরী-বংশ। বসু মহাশয় লিখছেনঃ

"আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর নিকটে সান্তোল-নামে একটি রাজ্য ছিল। তাহার বাৎসরিক দুই কোটি টাকা আদায় ছিল। তন্মধ্যে ৫২,৫৩,০০০, টাকা মুসলমান সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। সান্তোল-পতি রাজা রামকৃষ্ণ রায় দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া ১৭২০ খৃঃ স্বর্গারোহণ করেন। হরিপুর-নিবাসী কলিকাতা হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী সান্তোল রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ১৭২১ খৃঃ রানী শর্বাণী গতাসু হইলে উত্তরাধিকারীহীন সান্তোল-রাজ্য রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় নাটোরাধিপতি রামজীবন রায়ের রাজ্যভুক্ত

হয়। তৎপরে ক্রমে বহু পরগণা তাঁহার হস্তগত হইলে মহারাজ রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার লাভ করেন। তিনি সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৭২৪ খৃঃ মহারাজ রামজীবনের একমাত্র পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ রায় সহসা কালগ্রাসে পতিত হয়।"

আমরা দেখেছি, কালিকাপ্রসাদ রায়ের বিবাহ হয়েছিল সুসংগ-রাজবাটীতে। এই নাটোর-সুসংগ বিবাহ-বন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে আসেন হরিপুরের দেওয়ান রামদেব চৌধুরী—প্রমথ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ—যাঁর সহায়তায় নাটোর-রাজ রামজীবন বিশেষ সমৃদ্ধ হন। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, সুধীন্দ্র সিংহের পূর্বপুরুষ ও প্রমথ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ, এ-দুজনের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল ১৭২০ খৃঃ এমনি সময়ে।

এর দুশো বছর পরে আবার হরিপুরের চৌধুরী-বংশের এক বিশিষ্ট সন্তানের সংগে সুসংগ-রাজবংশের এক শিষ্ট সন্তানের নতুন করে পরিচিতি করাবার হেতু হলাম, শুধু "সবুজ পত্রে" আহ্বানে।

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সংগে প্রমথ চৌধুরীর খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে-ঘনিষ্ঠতা কতদূর পুরুষানুক্রমিক তা আমার জানা নেই। তবে এটা অনেকেই জানেন যে, উভয়েই কৃতবিদ্য ও রসিক ছিলেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের সাহচর্য কামনা করতেন।

একটা মজার গল্প বলি। প্রমথবাবুরে কাছে শোনা। ওঁরা দুজনেই নাচ-গান-বাজনার আসরে যেতে ভালবাসতেন। অনেক সময়ে নাটোর-মহারাজের গাড়িতে দুজনেই বাড়ি ফিরতেন। জগদিন্দ্রনাথ আগে নেবে যেতেন নিজের বাড়িতে, আর গাড়ির ভেতরে একটু মুখ ঢুকিয়ে বলতেনঃ

—আচ্ছা, প্রমথ, তাহলে তোমায় এবার বাড়ি পেঁৗছে দিক্।

এই রাজকীয় ভদ্রতা-টুকু প্রত্যেকবারেই দেখাতেন জগদিন্দ্রনাথ।

একবার নাটোর-রাজ নিভৃতে প্রমথ চৌধুরীকে বলেছিলেনঃ

—দেখ, যেদিন তুমি সংগে থাকো, বাড়ি ফিরতে যত রাত্তিরই হোক্ না কেন, মহারাণী আমার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চান না। এদানী কখনো কখনো সংগী হিসেবে তোমায় না পেয়েও আসর-টাসরে যাচ্ছি। ফিরতে রাত্তির হলে আমি করি কি জানো? বাড়ির দরজায় নেবে এসে খালি গাড়ির দরজায় মুখ ঢুকিয়েই বলি, একটু উঁচু গলায়ঃ আচ্ছা, প্রমথ, তাহলে তোমায় এবার বাড়ি পেঁৗছে দিক্!—যাতে মহারাণী এটা শুনতে পান। রাত করে বাড়ি ফেরার জন্যে আমার আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। প্রমথবাবুর অকলংক চরিত্রের এটা মস্ত বড় সার্টিফিকেট, এ-কথা অনস্বীকার্য।

আমি সুধীন্দ্র সিংহের অতিথি হয়ে তিন-চার বার সুসংগে গিয়েছি। তখনও রাজ-পরিবারের হাল-চালের মধ্যে পূর্ব-

গৌরবের চিহ্ন বর্তমান। বাসন-কোসনের পেছনে রাজত্ব স্বত্ব-জ্ঞাপক 'স্বা'-অক্ষরটি মাঝে মাঝে চোখে পড়তো। প্রজাদের মামলার শুনানী হত রাজাদের বাড়িতে। সেখানে হাকিম হতেন রাজারা বা রাজ-পুত্রেরা। কর্মচারীদের বসবার আসন রাজা বা রাজ-অতিথির চেয়ে একটু নীচু। প্রজারা অবশ্য ভূম্যাসন গ্রহণ করতো। মুসলমান প্রজারা সেলামের উত্তরে সেলাম পেত, রাজন্য-বর্গের কাছে। কিন্তু হিন্দু প্রজারা প্রণামের উত্তরে লাভ করতো শুধু রাজাস্যের মৃদু হাস্য। এইসব ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণদের কুশল-পরিপৃচ্ছার মধ্যে যে শালীনতা দেখেছি তা ভোলবার নয়।

আবার, ডিমোক্রাসির ভাবও আগতপ্রায়, এ-অবস্থাও দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বড়-বাড়ির মধ্যম মহারাজকে ছেঁড়া-গেঞ্জি-গায়ে রাস্তায় বেড়াতে দেখেছি। তাতে তাঁর সম্মান কিছু কমে নি, বরং বেড়েছে—এই কথাই শুনেতুম। ঔরংগজীবের টুপি-সেলাই করার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আর মহম্মদের ঘর-ঝাঁট দেওয়ার কথা। সুধীন্দ্র প্রথমে বাজার-যাওয়ার রেওয়াজ চালু করেন। অবশ্য, সংগে দুজন চাকর: একজনের কাজ ছাতা-ধরা, আর একজনের কাজ জিনিস কেনা।

সুসংগ-রাজবাড়িতে দুটি হাতের লেখা বই দেখেছি, যার স্মৃতি কিছু লেগে আছে আমার মনে। একটিতে বাদ্যযন্ত্রের সচিত্র বর্ণনা লিপিবদ্ধ। অপরটিতে নানারকমের রান্নার প্রণালী। একটা ডিশের নাম "চিরস্থায়ী কোর্মা"! চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবশ্য তখন ছিল, জমিদারীর রাজস্ব সম্বন্ধে। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, মানুষের কর্মফল থেকেই যায়, অর্থাৎ চিরস্থায়ী। কিন্তু কোর্মা-ফল কি করে সমপর্যায়ভুক্ত হবে? সুধীন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন, ওঁর ঠাকুরদাদা (মহারাজ কমলকৃষ্ণ সিংহ) একজন কাশ্মীরী রসুইকরকে এনে ঐ কোর্মার পাক-প্রণালী লিখে নেন। শুনেছি, কাশ্মীরী মেয়েরা এত ভাল রান্না জানেন যে, সাত-পাকের কাজ এক পাকেই সেরে ফেলেন। একটা ছাপা বইও সুসংগ-রাজ-পুস্তকাগারে দেখলুম, যেটার নাম পাক-দর্পণ, নলরাজের লেখা। এ নলরাজ যে দময়ন্তীর সম্পর্ক-বিহীন, সে-কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তবে কাশ্মীরী রান্নার কিছু আভাস যেন তাতে ছিল।

আর একটা হস্ত-লিখিত পুস্তকে দেওয়া আছে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংগে পত্রালাপে কাকে কি-ভাবে সম্বোধন করতে হয়। বইটির নাম 'আল্-কাপ্-নামা'। সবচেয়ে মজা লাগল যখন দেখলুম যে, বড়লাটকে যেভাবে সম্বোধন করার বিধি রয়েছে, ঠিক্ সেইভাবেই য়্যাডভোকেট-জেনারেল অফ্ বেংগলকে (Advocate General of Bengal) সম্বোধন করার ব্যবস্থা! এ যেন মুড়ি-মিছরির একদর! কিন্তু সুধীন্দ্র বুঝিয়ে দিলেন, সেকালে ইংরেজ Advocate General-এর কাছে সেলাম-বাজীর সার্থকতা এত বেশি ছিল যে, Viceroy-এর সমীপে কোনো আবেদনাদি পেশ করতে গেলে Advocate General-এর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না, এবং Viceroy-এর উপযুক্ত সম্বোধন-রীতি অবলম্বন না করলে য়্যাডভোকেট-জেনারেল রেগে যাবার সম্ভাবনা।

গারোদের কাউকে বড় একটা রোগা দেখা যায় না। না দেখা যাওয়াই উচিত, কারণ 'গারো' হচ্ছে 'রোগা'-র ঠিক বিপরীত। বাংলা রামায়ণে শোনা গেছে, নারদ ঋষি না-কি দস্যু রত্নাকরকে 'রাম'-নাম উচ্চারণ করাবার জন্যে বার-বার 'মরা-মরা-মরা' বলতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ঐভাবেই কোনো হাল-আমলের নারদ কি 'রোগা-রোগা-রোগা' বারম্বার উচ্চারণ করার বিধি দেন নি? শিলালিপির মধ্যে এ-বিধির সন্ধান না মেলায়, বিধি-লিপি খণ্ডন করা নিষ্প্রয়োজন।

"সিংহ"-বংশীয় কুমারদের সংগে একজন গারো নেতার বাড়িতে গিয়েছিলুম। খুব মোটা খড়ের ছাউনি-দেওয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। সে-ছাউনিকে ভেদ করে বৃষ্টির জল আসতে পারে না, যদিও গারোদের দেশে প্রায়ই গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা। ঘর-গুলো তক্-তকে ঝক-ঝকে। শুনলুম, ওদের সমাজে নেতা-গিরি করতে গেলে হাতের মুঠোর মধ্যে ন্যাতা ধরতে হয়। পূর্ববংগে 'নেতা'-শব্দের উচ্চারণ 'ন্যাতা' হওয়ায় কোনো দোষ নেই। প্রমথ চৌধুরী একবার আমায় বলেছিলেনঃ

—আমি ত হরিপুরের জাত-বাঙাল। কৃষ্ণনগরে আর কলকেতায় বাস করে স্থানীয় উচ্চারণকে দখল করতে বেশ কিছুদিন লেগেছিল। সবই প্রায় ঠিক্ ঠিক্ উচ্চারণ এসে গেল। কিন্তু 'কেবল' আর 'লেখা' এই দুটি শব্দের পূর্ববংগীয় উচ্চারণ যে 'ক্যাবল' আর 'ল্যাখা', সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলুম অনেক কষ্টে আর সব শেষে।

ঐতিহাসিকরা গারোদের অসভ্য জাতি বলে আসছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। চল্লিশ বৎসর আগে দেখেছি ও শুনেছি যে, ওরা আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ পেয়ে সানলাইট সাবান আর গেঞ্জি-ফ্রক পরতে শিখছে। তখনও পর্যন্ত ওদের মেয়েরা বেশির ভাগ সময়ে খালি গায়ে বেড়াত। অথচ ওদের সততা ও সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরিচ্ছদের ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন যে, শীতাতপ-নিবারণের জন্যেই বস্ত্র প্রয়োজন। লজ্জা-নিবারণ করাটাও যে খুব দরকার, এ-অনুভূতির উদয় হতে বিলম্ব হয় নি বটে। কিন্তু দেখা যায়, নারীর সতীত্ব সেই সমাজেই সুরক্ষিত, যে-সমাজে আবরণের ঘটা কম। লজ্জা-নিবারক পরিচ্ছদের ক্রম-বিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অপরাধের চেয়ে আভরণ করার ধুমে বেশি। এর ভূষায় উলঙ্গ একটা যৌন আবেদন আত্মগোপন করে থাকে।

সুধীন্দ্র সিংহের সংগে সুসংগে যে-সব গারো মেয়েদের দেখেছি, তাদের মধ্যে খুব কম মেয়েদের উর্ধ্বাংগ অনাবৃত, এবং সে-আবরণ বিলিতী 'সভ্যতা' থেকে পাওয়া। শুনলুম, এ-শ্রেণীর গারো-রা খৃষ্টান। সেখানে ইংরেজ মিশনারীরা নারী-জাতিকে সভ্যতা শেখাচ্ছেন! পরম্পরাগত কীর্তন গানের মধ্যে 'যিশু' নামটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেঞ্জি-পরা গারোর দলকে নাচাচ্ছেন! এ-উপায়ে ধর্ম-প্রচার বাড়ুক আর না বাড়ুক, মিশনারীদের আর বিলিতী ব্যবসায়ীদের রোজগার যে বাড়ে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সভ্যতার এই বিপ্লবী আলোক গারো-সমাজের যেখানে পড়েনি, সেখানে তখন নিয়ম ছিল, প্রত্যেক মেয়ে কাপড় বুনতে না শিখলে বিবাহের উপযুক্ত হবে না। এ-কাপড় ওসারে দেড় হাত, দৈর্ঘ্যে তিন-চার হাত—কেবল অধমাংগ আবরণ করার উপযোগী। ঘোর নীল আর রগ্-রগে লাল, এই দুটি রঙের সুতো দিয়েই অধিকাংশ 'সাড়ি' বোনা। এ-সব সুতো আর রং সম্পূর্ণ স্বদেশী।

আমার বিবেচনায় এই গারো কাপড় দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। দু-কুড়ি বছর আগে পাওয়া গারো কাপড় আজও আমার নিত্য সহচর। যে-পালঙ্কে শুই, যে-চেয়ারে বসি, যে-টেবিলে লিখি, সর্বত্র সেই স্মৃতি-চিহ্ন বিরাজমান।

(ক্রমশ)

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

সঙ্গে মালপত্র বেশি আনেনি অসীম। ছোট একটি স্যুটকেশ আর মাঝারি ধরনের হোলড্অলটি। এর জন্যে কুলী ভাড়া করতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দু' তিনটি কুলী যখন তার ভার বহনের জন্যে মাথা এগিয়ে দিল, অসীম যেন বেঁচে গেল এবং একটির হাতে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যে কোন রকমের কায়িক পরিশ্রমে অসীম কাতর, অপটু, এবং সেই-জন্যেই তাতে তার শৈথিল্যেরও সীমা নেই। কিন্তু আশ্চর্য, এমন জায়গায় এমন চাকরিটি জুটেছে যেখানে হাত পা না চালালে, জোর গলায় ধমক দিয়ে ছুটোতে না পারলে টিকে থাকাই মুশকিল। সেখানে কাজ আর বাক্যটাই সব, মনটা কিছু নয়।

কুলীটি আগের বেগে গেল। সে কি পিছনে রয়েছে না আগে আগে চলেছে। নাকি মালপত্র নিয়ে সরে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই কুলীকে সামনে দেখতে পেয়ে অসীম নিজের মনে হাসল। তার কাছে টি-কেস আর দেখা না। সব সময় কেবল হারাই হারাই ভাব। হারাবার আছে কি। কী এমন সম্পদের মালিক সে যে চোর ডাকাতে লুটে নেবে। কিন্তু মানুষের মন তা বোঝে না। সে প্রাণপণে নিজের পুরোন স্যুটকেশ আর হোলডঅল পাহারা দেয়।

পিছনের ভিড় ঠেলছে কিন্তু সামনের ভিড় পথ ছেড়ে দিচ্ছে না। তবু আস্তে আস্তে মহাজনের বদলে জনগণের পায়ে পায়ে অসীম শেষ পর্যন্ত গেটের কাছে এসে পৌঁছল। টিকেটটা চেকারকে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হল, খুশীও হল।

'তুমি! তুমি এতদূর আসবে ভাবতেই পারিনি।'

মানসী বলল, 'কেন, না পারার কি হয়েছে। আমি কি হাওড়া স্টেশন চিনি না?'

অসীম একথার কোন জবাব না দিয়ে এগোতে যাবে হঠাৎ মনে হল, কে যেন তার পায়ে লেজ বুলোচ্ছে। অস্বস্তির একশেষ। লাফ দিয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল অসীম। কী ব্যাপার।

তাকে ভয় পেতে দেখে সতের আঠার বছরের একটি ছেলে মাথা তুলে তার সামনে দাঁড়াল।

'অসীমদা আমি।'

এবার চিনতে পেরেছে অসীম। মানসীর ভাই নন্দু। এতক্ষণ ওর দিদির দিকেই চোখ ছিল তাই ভালো করে দেখতে পায়নি।

'তুমি! এত লোকের মধ্যে অমন করে কেউ প্রণাম করে! বিশেষ করে তোমরা যারা আজকালকার ছেলে।'

মানসী হেসে বলল, 'আর বল না। নন্দু এবার আই এস সি দিয়েছে তো। ভয়ংকর আস্তিক হয়ে গেছে। পুণ্যের ফলে যদি পরীক্ষার ফলটা ভালো হয়। দেব দ্বিজ যাকে দেখে তাকেই টিপ টিপ করে প্রণাম করে।'

অসীম বলল, 'কিন্তু মানসী, আমি তো দেবও নই, দ্বিজও নই। একেবারে শূদ্র। সবদিক থেকেই।'

মানসী বলল, 'হয়েছে হয়েছে। বিনয়ের অবতার, চল এবার। নন্দু তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধর। এরপর আর পাবিনে।'

দিদির আদেশে দু' লাফে নন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাইরে এসে কুলীকে বিদায় করল অসীম। তারপর মানসীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'হাওড়া স্টেশন যদি চেনাই ওকে সঙ্গে আনলে কেন। একা আসতে বুঝি ভরসা পেলে না।'

মানসী তার সরু ভ্রূ দু'টি কুঁচকে কোপের ভঙ্গি করে বলল, 'ভারি ইয়ে তো তুমি। অত বড় একটা প্রণাম করেও নন্দু তোমার মন গলাতে পারল না। কেন এনেছি, ওই দেখ।'

সামনের দিকে আঙুল বাড়াল মানসী।

ট্যাক্সির জন্যে তখন ছুটোছুটি, প্রতি-যোগিতা শুরু হয়েছে। যে ক'খানি রথ আছে রথীরা তার পাঁচ গুণ। তাই বাগ-যুদ্ধ, জনদুয়েকের মধ্যে বাহুযুদ্ধও শুরু হয়ে গেল।

'মশাই, ও ট্যাক্সি আমি ডেকেছি, আপনি কেন উঠে বসলেন।'

'রেখে দিন মশাই, আমি ডেকেছি। ট্যাক্সির গায়ে আপনার নাম লেখা আছে নাকি।'

'নির্লজ্জ বেহায়া।'

'মুখ সামলে কথা বলবেন।'

শান্তিভঙ্গের আশংকায় পুলিস এগিয়ে এল।

মানসী অসীমকে বলল, 'পারতে তুমি ওইভাবে ট্যাক্সি জোগাড় করতে?'

অসীম মানসীর দিকে তাকাল, 'পুরুষের যোগ্য অনেক গুণই যে আমার নেই তা মিনিটে মিনিটে মনে করিয়ে দিচ্ছ কেন। ট্যাক্সিতে কাজ নেই, আমি বাসেই চলে যেতে পারব।'

মানসী হেসে বলল, 'অমনিই রাগ হয়ে গেল। তুমি দেখছি নন্দুর চেয়েও—।'

না, হার মানলাম। তুমি শুধু পুরুষ নও, মহাপুরুষ। হল তো?'

একটু পরে ফের ঠোঁট টিপে বলল, 'দেখেছ বাস ট্রামগুলির অবস্থা! এই অফিস টাইমে তুমি তাতেও উঠতে পারতে না।'

অসীম মরীয়া হয়ে বলল, 'পায়ে হেঁটে যেতে তো পারতাম। পা দু'খান তো আছে।'

মানসী বলল, 'তাই বা কি করে বলি। দু'টি পা শুধু নন্দুদের মত অবোধ ছেলেদের প্রণাম কুড়োবার জন্যে। আর সব ব্যাপারে অচল।'

তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'সেবাদাসীরা পায়ে তেল না মাখলে পুরুষের পা কি চলে?'

এতক্ষণে নন্দু এসে হাজির হয়েছে। হেঁটে নয়, ট্যাক্সিতে উঠে। গাড়ির ভিতর থেকেই বলল, 'মেজদি, নামতে আর পারছি না। কেউ একজন উঠে এসে [illegible] বসলেই হয়। তোমরা শিগ্গির চলে এসো।'

অসীম এবার সত্যিই তারিফ বোধ করল। শুধু মানসীই সপ্রতিভ নয়, তার [illegible] এবং অনুগত অমন দু' একটি ভাই ও থাকা দরকার।

স্যুটকেশ আর হোলডঅলটা তুলে নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

নন্দুর বুদ্ধি আছে। সে গোড়া থেকেই ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছে। পিছনের সীটে মানসী অসীম পাশাপাশিই বসল, কিন্তু একেবারে কাছাকাছি নয়। নন্দু যদি পিছন ফিরে তাকায়। কিন্তু সেই আশঙ্কায় ব্যবধানের মাত্রাটা মানসী অতখানি না বাড়িয়ে দিলেও পারত।

'সর্দারজী, বেলগাছিয়া যানা হোগা।'

মানসীর গলা শুনে অসীম তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'না না না, বেলগাছিয়া নয়, আমি ভবানীপুরে যাব। পরেশের ওখানে উঠব। আমি আগেই সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

মানসী হেসে বলল, 'তুমি কি করে ভাবলে তোমাকে ভবানীপুরে নিয়ে যাবার জন্যে আমরা হাওড়া স্টেশনে এসেছি, ট্যাক্সি ভাড়া করেছি?'

নন্দু মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তাই তো [illegible] অসীমদা, আপনি [illegible] আমাদের ওখানে উঠবেন, [illegible] হয় মারবেন। আমরা কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।'

অসীম আর [illegible] মধ্যে গেল না। জোর করে [illegible] প্রতিরোধ করবার উৎসাহ [illegible]। ইচ্ছারও অভাব আছে। [illegible] কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে [illegible] বাধা না হলে সংস্কার করে না।

শুধু মানসীর [illegible] অসীম অবাক হল। [illegible] দাদা আছেন, মা আছেন, ভাইবোনেরা [illegible] আছে। সবাই [illegible] মানসী তাকে নিয়ে [illegible] কোন [illegible]? তার বাবা তেমন [illegible] নন, সেকালে মেয়েদের ব্যাপারে খুব উদারও নন। একথা অসীম জানে।

একটু বাদে অসীম বলল, 'কিন্তু তোমাদের ওখানে গেলে অসুবিধে তো হবে।'

মানসী বলল, 'তা তো হবেই। আমাদের বাড়ি ঘর নেই, ভাড়াটে বাসায় জায়গা খুব কম, তোমার থাকতে কষ্ট হবে। পরেশবাবুর মত আমরা বড়লোক নই, তোমাকে
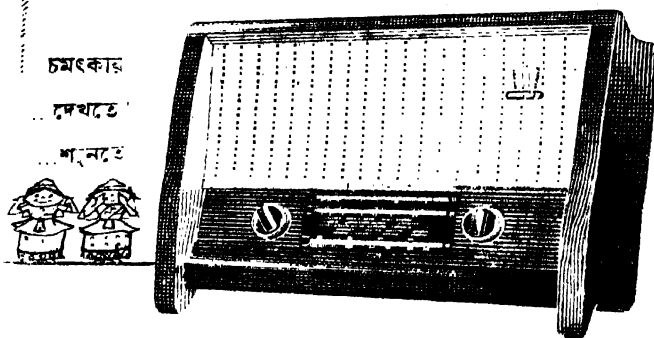
হাতি ঘোড়া বেঁধে খাওয়াতে পারব না; তোমার খেতেও কষ্ট হবে। কিন্তু একটা দিন একটু কষ্ট না হয় করলেই।'

অসীম এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'আসল কথাটা তুমি বুঝেও বুঝতে চাইছ না। আমি তোমাদের ওখানে থাকলে তোমার বাবা মা কিছু মনে করবেন না?'

মানসী হেসে বলল, 'চোরের মন বোঁচকার দিকে। মনে করবার আবার কি আছে? আমাদের বাড়িতে আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব কেউ কি কখনো এসে থাকে না? তুমি কি নতুন যাচ্ছ? তাছাড়া, তুমি আমার বন্ধু অনেক পরে, তার ঢের আগে আমার দাদার বন্ধু।'

অসীম বলল, 'কিন্তু সেই দাদার সঙ্গে তো তোমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।'

মানসীর মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। তারপর সেই ছায়াকে আরও উজ্জ্বল হাসির আভায় ঢেকে দিয়ে বলল, 'তা নাই বা থাকল। মা মরলে বাপ হয় তালুই আর বিয়ে করলে দাদা বেয়াই হয়ে যায়। কিন্তু এখন তো শুধু দাদার সম্পর্কেই তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নয়। বাড়ির সকলের সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক, তুমি পরিবারের বন্ধু।'

পরিবারের বন্ধু। তবু বিশেষ একজনের সঙ্গে একটু বিশেষ ধরনের সম্পর্কে বন্ধুত্বে আরো মাধুর্যের স্পর্শ লেগেছে। পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে যেমন বিপুলা পৃথিবী আরো মধুর হয়ে ধরা দেয় তেমনি। কিন্তু তেমনভাবে মানসী কি ধরা দিয়েছে? কাছে এসেছে? তা যদি না এসে থাকে তাহলে অসীমকে একদিনের জন্যে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন? তাতে কী লাভ হবে।

মানসী তাকে চিন্তিত দেখে বলল, 'তুমি ভেব না। আমি যখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কারো সাধ্য নেই তোমাকে কিছু বলে।'

অসীম ভাবল, বলবার আর কি আছে। একজন আর একজনের সম্বন্ধে যা ভাবে তার কতটুকুই বা মুখ ফুটে বলতে পারে। যদি পারত তাহলে প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীটা ফেটে ফেটে চৌচির হত। কিন্তু মানসী কি নিজের সাহস আর শৌর্য দেখাবার জন্যেই অসীমকে এমন করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? পরিবারে মানসীর উপার্জন সবচেয়ে বেশি, প্রভুত্বও বেশি, তাই সে যদি তার কোন পুরুষ বন্ধুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আপ্যায়ন করে কারো কিছু বলবার জো নেই, নিজের সেই প্রতিপত্তির প্রমাণই কি দিতে চায় মানসী? কার কাছে? অসীমের কাছে না নিজের পরিবারের কাছে?

কিন্তু আশ্চর্য, মানসী বলল, 'তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। বাবা মার মত নিয়েই আমি তোমাকে এগিয়ে নিতে এসেছি। তুমি গেলে ওঁরা খুব খুশী হবেন। জানো, দাদার দুর্ব্যবহারে ওরা ভারি দুঃখ পেয়েছেন। তবু দাদার পুরোন বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ কখনো খোঁজখবর নিতে আসেন বাবা খুব খুশী হন।

এতক্ষণের কুটচিন্তার জন্যে অসীম ভারি লজ্জিত হল। ছি ছি ছি, সারাটা পথ কী সব সে ভাবতে ভাবতে আসছে। সে যে একটি পরিচিত পরিবারে যাচ্ছে যে পরিবারের ছেলে তার কলেজের সহপাঠী ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অন্তত এক সময় ছিল সেকথা সে ভুলে গেল কি করে। হঠাৎ একটি অন্ধকার ঘরের চারদিকের দরজা জানলা যেন খুলে গেছে। রোদে ভরে গেছে ঘর, সারা শহর, সমগ্র পৃথিবী। আর সেই পৃথিবীর এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে তাদের ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

নন্দ মুখ বাড়িয়ে বলল, 'দেখেছেন অসীমদা, আমাদের এই নর্থ ক্যালকাটাও সাউথের সমান হতে চলেছে। চেহারা একেবারে পালটে গেছে। এরপর বালীগঞ্জ আর বাগবাজারে কোন তফাৎ থাকবে না। সব এক হয়ে যাবে।'

উত্তর কলকাতার সেই ভাবিষ্যৎ ঔজ্জ্বল্যে নন্দর মুখ এখনই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে অসীম হাসল। মানসীর ভাইরাই দেখতে ভালো, বোনেরা নয়। ভাইদের তুলনায় বোনরা কালো, নাক চোখ বড় নয়, চেপ্টা ধরনের মুখের গড়নে সহজেই খুঁত ধরা পড়ে। একটু বিশেষ চোখে না দেখলে বেশ অসুন্দরীই মনে হয়। মানসীও ওই দলে। তবু অসীমের কাছে তার চেহারার খুঁতটা বড় নয়, সেকথা মনেও পড়ে না, চোখেও পড়ে না, আর কালো রঙও কামনায় রাঙা হয়।

ব্রীজ পেরিয়ে আরো খানিকটা এগোলে তিনতলা ফ্লাট বাড়ি। বড় রাস্তার উপরেই। ট্রাম বাস দুই-ই চলছে, জনাকীর্ণ আর যানাকীর্ণ রাজপথ। এমন হাটের মধ্যেও মানুষ থাকে। মফঃস্বল থেকে এসে সারা কলকাতা শহরটাকেই বড়বাজার বলে মনে হয়।

ট্যাক্সি থামল, কিন্তু দলের কলরব থামতে চায় না। 'ও মেজদি, মীরাদি, মঞ্জুদি অসীমদাকে নিয়ে এসেছি। কিছুতেই আসবেন না, আমরা জোর করে ধরে এনেছি।'

ঘরের বাসিন্দারা একে একে—বলা যায় একসঙ্গে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। একতলার ফ্ল্যাট। ঘর আর বাইরের ব্যবধান সামান্যই।

মামসীর বাবা মনোমোহন মুখুজ্যেই আগে এসে অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো, অসীম এসো।'

অসীম নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'ভালো আছেন মেসোমশাই?'

মনোমোহন বললেন, 'আর বাবা আমাদের আবার ভালো আর মন্দ। টিকে আছি এই পর্যন্ত।'

অসীম লক্ষ্য করল সত্যিই ভদ্রলোক একটু রোগা হয়ে গেছেন। দু'টি গাল তোবড়ানো। দাঁতগুলির বেশির ভাগই নেই। বাঁধিয়েও নেননি। মাথার আধখানা জুড়ে টাক। নাকের নিচে পুরু গোঁফে তা বোধ হয় পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সে গোঁফের খানিকটা সাদা, খানিকটা কটা, খানিকটা কালো। একেবারে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা। বেঁটে খাটো চেহারায় অত বড় গোঁফ মানায় না। আজকাল বেশি বয়সীদের মধ্যেও গোঁফ দাড়ি রাখার চল উঠে গেছে। পুলিস অফিসারেরা পর্যন্ত গোঁফ পোষেন না। কিন্তু এই নিরীহ গৃহস্থ ভদ্রলোক কেন এতবড় গোঁফ রেখেছেন কে জানে। পৌরুষের প্রকৃষ্ট প্রতীক বলে? অসীম নিজের মনে হাসল।

তাঁর পিছনে মাসীমাকেও দেখা গেল। রোগা, ছিপছিপে, কিন্তু মেসোমশাইর চেয়ে মাথায় লম্বা। অসীম জানে, এজন্যে মাসীমার নিজেরই লজ্জার সীমা নেই। যখন বিয়ে হয়, মাথায় ছোটই ছিলেন, তারপর দেখতে দেখতে অসম্ভব রকম বেড়ে গেছেন। বছর বছর মা হয়েছেন আর লম্বা হয়েছেন। আগে এর জন্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই লজ্জা ছিল, এখন চোখে সয়ে গেছে।

সুহাসিনী আধময়লা আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে একটু হেসে বললেন, 'এসো বাবা, এর আগে তুমি বোধ হয় আমাদের এ বাসায় আর আসোনি।'

অসীম বলল, 'না মাসীমা। আমি সেই বেলেঘাটার বাসায়—'

সুহাসিনী বললেন, 'সে বাসা অনেক ভালো ছিল। এখানে জায়গা কম কিন্তু ভাড়া বেশি।'

অসীমকে আর একবার মাথা নিচু করতে হল। বিয়েবাড়ির প্রণাম কম জুটল না। মাসীর রূপসী মেয়েরা একের পর এক পায়ের কাছে এসে ধন্যবাদ্য ধারণ করল। প্রত্যেকের পিঠে লম্বমান বেণী। দেখতে

যেমনই হোক চুল আছে সকলের মাথায়। মানসীরও। অসীম যে তাকে মাঝে মাঝে বলে অরণ্যকুন্তলা, মিথ্যা বলে না।

একজন শুধু খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মানসীর মেজদি মাধুরী। বয়সে সে অসীমের ছোট, কিন্তু গুরুত্বে গাম্ভীর্যে যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তার সঙ্গে প্রণাম নমস্কার কিছুরই বিনিময় চলে না, কিছুরই নয়। হাল্কা ঠাট্টা তামাশা বন্ধ হবে বলে। বি এ বি টি পাশ করে স্কুলে কাজ করছে, এখনো হেডমিস্ট্রেস হতে পারেনি, এমন কি সহকারিণীও নয়। কিন্তু চাল-চলনে ভারি রাশভারি। গায়ের রঙ কালো, মুখের ডৌলও সুশ্রী নয়, তবু কোথায় যেন একটু লাবণ্য লুকিয়ে আছে। আর বিষন্নতা। তা অবশ্য লুকিয়ে নেই। মুখের দিকে চাইলেই চোখে পড়ে।

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

'ভালো। কিন্তু তোমাকে তো খুব ভালো দেখাচ্ছে না অসীমদা।' মাধুরী একটু হাসল, 'শুনেছি নাকি দারোগা হয়েছ। কিন্তু এই কি দারোগার মত চেহারা?'

অসীম হেসে বলল, 'চেহারাটা অবশ্য জমাদারেরও যোগ্য নয়। উপায় কি বল।'

সুহাসিনী এগিয়ে এসে বললেন, 'থাক থাক, চেহারার খোঁটা আর দিসনে। তোরাই বা একজন কোন অপ্সরী। পুরুষের গুণেই তার রূপ।'

মানসী বলল, 'মেয়েদের বেলায় এর উল্টো। তার রূপটাই হল গুণ। তাই না মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'খানিকটা তো সত্যিই। তা তোদের কারোরই নেই।'

ছোট একটি নিঃশ্বাস চাপলেন সুহাসিনী। একবার তাকালেন স্বামীর দিকে। মেয়েদের রূপের দীনতার জন্য মায়ের চেয়ে বাপ-ই বেশি দায়ী চোখের দৃষ্টিতে সেই কথাই যেন বলে দিলেন।

প্রচ্ছন্ন খোঁচাটা মনোমোহনের সহ্য হল না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন।

'কে বলে নেই? কে বলে রূপ নেই আমার মেয়েদের? আমার চোখে ওরা সবাই সুন্দরী। তোমরা রূপের এক ডেফিনেশন পেয়েছ। দুধে আলতায় রঙ, পটল-চেরা চোখ, বাঁশির মত নাক। ওসব ছাড়া বুঝি রূপ হয় না?'

এই নিয়ে অসীমের সামনেই পাছে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়ে যায় তাই মানসী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'হয় বাবা হয়। আমরা সবাই রূপবতী। এবার এসো, অসীমদা কোন ঘরে থাকবেন সেইসব বন্দোবস্ত করো এসে।'

সেজদির কথার ভঙ্গি শুনে মীরা মঞ্জু মুখে আঁচল দিল।

হঠাৎ মঞ্জু পাশের ঘরখানা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দিয়েছি। সেজদি, অসীমদার জিনিসপত্র সব তোমার ঘরে তুলে দিলাম।'

এক মুহূর্তে সবাই কেমন যেন চুপ করে রইল। যে মাধুরী প্রায় হাসতে জানেই না, তার ঠোঁট দুটিও কি একটু চিক চিক করে উঠল? এই নীরবতা সবচেয়ে অসহ্য হল মানসীর নিজের। সে ছোট ভাইকে ধমকে

উঠল, 'তোমার ঘরে তুলে দিয়েছি। ঘরে কি আমি একা থাকি, দেয়ালে আমার নেম-প্লেট লাগানো আছে যে, আমার ঘর বলছিস? ও ঘরে তো আমরা বোনেরা সবাই শুই, মাঝে মাঝে তুইও আসিস। ঘরখানা কি করে শুধু আমার হল?'

নন্দুর পক্ষ নিয়ে মাধুরী এগিয়ে এল, শান্ত ধীর গলায় বলল, 'যদি বলেই থাকে তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। বেচারাকে কেন মিছামিছি ধমকাচ্ছিস।

ছুটোছুটি টানাটানি তো সারাদিন ওই করে। নন্দু জামাটা খুলে ফেল এবার। ঘামে তো একেবারে নেয়ে উঠেছিস।'

ধমক খেয়ে নন্দু যেমন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, আদর পেয়ে তেমনি খুব খুশী হয়ে উঠল। হেসে বলল, 'অসীমদা, অনেকগুলি দিদি থাকলে এই এক সুবিধে। এক দিদি ধমকায় তো আর এক দিদি আদর করে, এক দিদি কান মলে তো আর এক দিদি পিঠে হাত বোলায়। কাউকে না কাউকে সব সময় পক্ষে পাই।

মনোমোহন মন্তব্য করলেন, 'ছেলেটা বড় পেকে গেছে অসীম। চল ঘরের মধ্যে চল। ঘরে পাখা আছে।'

উত্তরে দক্ষিণে মুখোমুখি দুখানা ঘর। মাঝখানে প্যাসেজ। তাকে বারান্দা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। সদর দরজা বন্ধ করলে রাত্রে সেই বারান্দাই আবার একখানা শোয়ার ঘর হয়ে ওঠে। এছাড়া, বাথরুম আছে, কিচেন আছে। গোঁফের নিচে দুটো ঠোঁট কুঁচকে মনোমোহন বললেন, 'ভাড়াটা একটু বেশি। পুরো একশ। কিন্তু এর কমে কোথায় বা কী পাচ্ছি। মাথা গুঁজতে তো হবে। এক অর্থবলই নেই, কিন্তু ষষ্ঠীর আশীর্বাদে জনবল বেশ আছে। সাত মেয়ে, দুই ছেলে। মায়ের পীড়াপীড়িতে বড়টির মানে মমতার বিয়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্যে দিয়েছিলাম, নইলে বাকি কজনের মত সেও আজ সাদা সিঁথি নিয়েই থাকত। তারপর আর-ও কম্ম হয়নি। বড়ছেলে নিজেই দেখে শুনে পছন্দ করে বিয়ে করল। আগে থেকেই জানা শোনা হয়েছিল। তোমরা যাকে লভ ম্যারেজ বল, ঠিক তাই। তার ফল একেবারে হাতে হাতে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে বউ নিয়ে ছেলে পগার পার। তার আর টিকিটিও দেখতে পাইনে।'

অসীমকে নিজের খাটে বসিয়ে পারিবারিক বৃত্তান্ত বলছিলেন মনোমোহন, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলেন না—সুহাসিনী এসে বাধা দিলেন। হাসিমুখে নয়, রাগ করে বেশ কড়া এক ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যা যা বলছ অসীম তার কোন্ কথাটা না জানে? ও কি আমাদের সংসারে এই নতুন এল? বুড়ো হলে যা হয় তাই হয়েছে তোমার। তোতাপাখির মত এক কথা বার বার বলবে, আর মানুষের কান ঝালাপালা করবে।'

তারপর অসীমের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'অমন ভালোমানুষ হয়ে থাকলে চলবে না বাবা, উনি তোমাকে আস্ত একখানা মহাভারত শুনিয়ে ছাড়বেন। সেই সঙ্গে গীতা চণ্ডী আর উপনিষদের কোটেশন। নাও ওঠো, জামা টামা খুলে চানটা সেরে নাও। ঈস্, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তুমি নেয়ে এসো, আমার রান্না তৈরি। মীরা মায়া, অসীমদাকে তেল গামছা টামছা এনে দে।' বলতে বলতে সুহাসিনী নিজেই ওসব আনতে গেলেন। মেয়েদের ফরমায়েস করলেও খাটেন নিজে। ওদের কারো ওপর তাঁর তেমন ভরসা নেই।

অসীম বলল, 'সত্যি, এসে বোধ হয় আপনাদের খুব বিব্রত করলাম।'

মনোমোহন বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না। তুমি সেজন্যে ভেব না অসীম। আমাদের জায়গা টায়গা কম, তোমার থাকতে কষ্ট হবে। কিন্তু একেকখানা ঘরে একেকজন মানুষ হাত পা ছড়িয়ে থাকবে তাই যদি তোমাদের সুখের ডেফিনেশন হয় আমার তাতে সায় নেই। সুখ আসলে খাওয়ার মধ্যে নেই, শোয়ার মধ্যে নেই, সুখ কোথায় জানো? নিজের মনে। মনের সন্তোষে। কিন্তু সন্তোষ অমৃত অতি ঊর্ধ্বে অবস্থিত লভিতে না পারে কভু উদ্বাহু বামন। ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছিলাম। আমিও বামন, বেঁটে। আমি জানি, যতই লাফালাফি করি, বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে যতই প্রাণপণ হাত বাড়াই, সুখের নাগাল আমি পাব না। কিন্তু কবি ভুল বলেছেন, সন্তোষরূপ অমৃত ফল উঁচু ডালে ঝুলছে না, তা হৃদয়ের গভীরে ঠিক জায়গাটিতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখান থেকে কুড়িয়ে নিতে পারলেই হল। আমার মেয়েরা গজ্ গজ্ করে দুখানা ঘরে এতগুলি লোক। আমি বলি, আরে তোদের তো তবু দুখানা ঘর জুটেছে। একখানা ঘরও নেই এমন লোক এদেশে হাজার হাজার। যখন নিজের দুঃখে বুক ফেটে যাবে তখন আর একজনের দুঃখের দিকে তাকিয়ো। যদিও তা খুব কঠিন। দুঃখী মানুষই সবচেয়ে স্বার্থপর হয়। কিন্তু যদি একবার সেই স্বার্থকে ভোলা যায় তাহলে বড় আনন্দ।'

মাধুরী এসে অসীমকে উদ্ধার করল, 'চল এবার, বাথরুম খালি হয়েছে।'

কিন্তু মানসী কোথায়। অসীম নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করল। ভাইকে ধমক দিয়ে সেই যে গা ঢাকা দিয়েছে আর তার দেখা নেই। অথচ এই মানসীই সেদিন চিঠিতে লিখেছিল, 'মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছা হয়, অন্তত একটি দিন একই বাড়িতে একই ছাদের নিচে আমরা থাকি। তোমার জন্যে নিজের হাতে রাঁধি, কাছে বসে খাওয়াই, নিজের হাতে যত্ন করি।'

এই কি তার সর্বকিছু নিজের হাতে করবার নমুনা? অসীম নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করল। তারপর মাধুরীর আর একবার তাগিদে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

(ক্রমশ)

বিশ্ব-বিচিত্রা

দর্পণ হাতে সিংহবাহিনী দেবীর এই মূর্তিটি হাসানলু পাত্রের গায়ে খোদিত আছে

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কতই না বালুকণা বায়ুতাড়িত হয়ে জমা হতে হতে বিরাট এক টিলাতে পরিণত হয়েছিল। কে জানত উত্তর-পশ্চিম ইরানের শুষ্ক সমতলভূমির এই বালুকণার টিলার নিচে চাপা পড়ে গেছে দীর্ঘ ২৮০০ বছর আগের দেবদেবীর অপূর্ব মূর্তিখচিত একটি স্বর্ণপাত্র আর তার সংগে প্রাচীন এক সভ্যতা। ইরানিয়ান এবং আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় মাত্র গত বছরই এই বিরাট টিলা খুঁড়ে এই অপূর্ব স্বর্ণপাত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভূগর্ভ থেকে যত জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে তার ভেতর এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে এটি অন্যতম বলে বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেছেন। সোনা স্বর্ণপাত্রের চারিদিকের গায়ে খোদিত সিংহবাহিনী দেবী আর রথারূঢ় দেবতার মূর্তি যে জাতি একদিন উপাসনা করত তাদের কীর্তি আজ এ জগতের কাছে সম্পূর্ণই অপরিচিত।

খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে এদের রাজ্য আক্রান্ত হওয়ার পর এই জাতি এবং তাদের সভ্যতা লুপ্ত হয়ে গেছে। এদের সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল সেকথা আজ আর কেউই বলতে পারে না, কারণ এদের শিল্পকলা যা দেখে এদের সংস্কৃতি ধরা যেতে পারত, তা অন্য কোন প্রাচীন জাতির সংগেই মিলছে না। যারা এই স্বর্ণপাত্র তৈরি এবং তার পবিত্রতা রক্ষা করেছিল তাদের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসতে স্বর্ণপাত্রের চারদিকের বহু দেবদেবীর মূর্তি অনেকখানি সাহায্য করেছে। অন্যান্য সমসাময়িক শিল্পকলার সংগে এদের শিল্পরীতি তুলনা করে হারিয়ে-যাওয়া এই জাতির মহত্ত্ব এবং পরিচয়ের কিছু কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। যে জাতি এই স্বর্ণপাত্র তৈরি করেছিল তাদের পরিচয়ের প্রধান সূত্র নিহিত আছে ইরানের সেই অঞ্চলে যে অঞ্চল খনন করে এই স্বর্ণপাত্র পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলটি হাসানলু গ্রামের কাছে এক উপজাতি নেতার এলাকা। ৭০ ফুট উঁচু এক বালুকার টিলার নিচে সভ্যতার এই নিদর্শন লুকিয়ে ছিল। ইরানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এম টি মোস্তাফাবি দুই বছর আগে এই টিলা খুঁজে বের করেন। তার সুপারিশ অনুসারে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের বৈজ্ঞানিকগণ ৩১ বছর বয়স্ক ডঃ রবার্ট ডাইসন (জুনিয়র)-এর নেতৃত্বে ইরানিয়ান বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতায় এই টিলা খননের কাজ শুরু করেন।

তারা এর ভেতর পেয়েছেন একটি সুরক্ষিত নগরীর প্রধান তোরণ, ৪টি খুব বড় বড় প্রতিরোধ বুরুজ, দুর্গের জল ধরে রাখার জলাধার, গভীর ভিতের আনুমানিক ২০ ফিট উঁচু পাথরের ও ইটের প্রাচীর। দুর্গপ্রাচীরের পিছনে দোতলা এক বাড়ীর ধ্বংসাবশেষও তারা পেয়েছেন। সম্ভবত এটিই প্রাসাদ ছিল। সমান দূরত্বে অবস্থিত
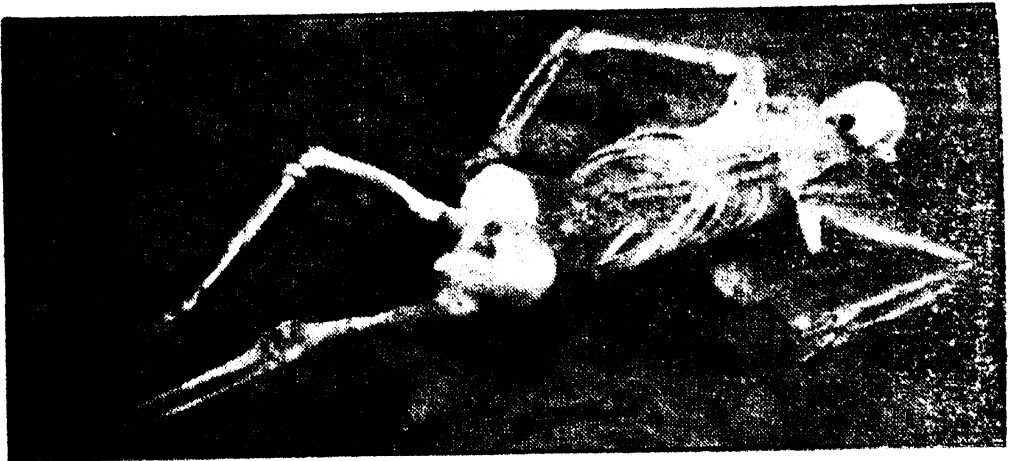
পবিত্র স্বর্ণপাত্র রক্ষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিল, এই কংকালটি তাদের মধ্যে একজনের। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এটিকে পাওয়া গেছে। কংকালের পাশে তরবারিটি দেখা যাচ্ছে

স্তম্ভের চারিদিকে এই প্রাসাদ নির্মিত ছিল। এই গৃহের অভ্যন্তরে ব্রোঞ্জের বাসনপত্র, লোহার এবং ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি, মাটির তৈরি দেয়ালের হুক পর্যন্ত পাওয়া গেছে। কিভাবে এই পবিত্র স্বর্ণপাত্র রক্ষা করা হয়েছিল তার এক চমৎকার কাহিনী এখানে দেওয়া হ'ল।

খৃষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে প্রাচীরঘেরা এই নগরী অবরোধ করা হয় এবং পরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তিনজন প্রতিরোধকারী সৈনিক নগরীর কুলদেবতাকে রক্ষা করার জন্য গদা ও তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে প্রাসাদের ছাদে উঠে গিয়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত [illegible] করেছিল। এক সময় সৈনিক ৩টিকে নিয়ে প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। প্রাসাদের জ্বলন্ত ভগ্নস্তূপের নিচে তারা চাপা পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তাদের অভীষ্ট পূরণ করেছিল। কারণ, তারা, তাদের কুলদেবতা আর পরিত্যক্ত নগরীর ভগ্নস্তূপে বায়ুতাড়িত বালুকাকণার নিচে আস্তে আস্তে চাপা পড়ে গেল। গত গ্রীষ্মে পুরোপুরি যখন এটা আবিষ্কৃত হল তখন দেখা গেল, তরবারির পাশে সৈন্যের কংকাল পড়ে আছে। একটি কংকালের হাত তখনও পবিত্র পাত্রটিকে আঁকড়ে ধরে আছে।

এই ধরনের একটি প্রাচীন নগরীর খোঁজে বৈজ্ঞানিকগণ এই সময়কার প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৯ম শতাব্দীতে এই দুর্গনগরী ছিল। ঐ নগরীর নাগরিকদের সংস্কৃতির কিছুটা অনুমান করার জন্য তারা সমসাময়িক প্রাচ্য শিল্পরীতির সঙ্গে ঐ নগরীতে প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁরা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, বাইবেলে যাদের মিন্নি বলে উল্লেখ করা আছে, সেই ম্যান্নেইয়ানদের পশ্চিম প্রান্তীয় দুর্গ ছিল এই নগরী।

এই ম্যান্নেইয়ান সাম্রাজ্যের তৎকালে দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। উত্তর জ্যাগ্রস পর্বতের পার্বত্য জাতি উরার্টিয়ানস এবং ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী বরাবর যে শস্যশ্যামলা অ্যাসিরীয় নিম্নভূমি ছিল, সেই মারমুখী অ্যাসিরীয়ান জাতির থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ম্যান্নে নগরীকে একটি বাফার রাজ্য হিসাবে রক্ষা করা হত। এই ম্যান্নেইয়ান সাম্রাজ্যের প্রতি এই দুই জাতিরই একটা প্রবল লোভ ছিল। কেননা, ম্যান্নেইয়ান সাম্রাজ্য উর্মিয়া হ্রদের তীরে এমন একটা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল যেখান থেকে জ্যাগ্রস পর্বতের সমস্ত প্রধান প্রধান গিরিপথগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যেত। ম্যান্নেইয়ান সাম্রাজ্যের সমসাময়িক কালে উরার্টিয়ানরা নিও-হিট্টিটেসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, আর অ্যাসিরীয় সৈন্যবাহিনী দক্ষিণে ধনবান ব্যাবিলিয়নদের পরাজিত করে তাদের সাম্রাজ্য নিকট প্রাচ্যের পশ্চিমদিকে প্রসারিত করেছিল। অ্যাসিরীয়দের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি থেকে জানা যায় যে, ম্যান্নেইয়ানরা অ্যাসিরীয় শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৯ম শতাব্দীর কোন এক সময়ে হয় অ্যাসিরীয়রা বা উরার্টিয়ানরা এই হাসানলু দুর্গ অবরোধ করেছিল এবং পুড়িয়েও দিয়েছিল।

ম্যান্নেইয়ানদের কোন হস্তলিখিত পুঁথিপত্র বা কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। কাজেই তাদের কুলদেবতা এই স্বর্ণপাত্রই তাদের ধর্মবিশ্বাসের একমাত্র প্রমাণ। এই পাত্র থেকে বোঝা যায়, তাদের পূর্বপুরুষ এবং প্রতিবেশীদের দেবতা থেকেই তাদের নিজস্ব দেবতা তারা কল্পনা করে নিয়েছিল।

গৌরকিশোর ঘোষ

আঠাশ

বেলা অনেক হয়েছে। চৈত্রের রোদ দাউ দাউ করছে। ভূষণ ডাক্তারখানা বন্ধ করি করি করেও করতে পারছিল না। চর ছোলেমানপুরের মনিরুদ্দিন সেখের টাকা দিয়ে যাবার কথা আছে। প্রায় তিরিশ টাকা পাবে ভূষণ। ক-টাকা দেবে কে জানে?

ভূষণ তার হিসেবের খাতাখানা খুলে দেখতে লাগল। কোটচাঁদপুর থেকে ডাক্তারখানা তুলে এনেছে ঝিনেদায়। বউ ছেলে বাড়িতে রেখে ওর কোটচাঁদপুরে পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। ওখানে ওদের নিয়ে যেতে পারলেও কথা ছিল। অবশ্য ঠিকেদার জোসেফ মণ্ডল আর রামপতি কুণ্ডু ওকে সেই পরামর্শই দিয়েছিল। ভাগ্যিস একখানা বাসা দেখে দেবে, সে-কথাও বলেছিল। জোসেফ তার ঠিকেদারির কাজে ও অংশীদার করতে চেয়েছিল ভূষণকে। পরামর্শটা ভালই লেগেছিল ভূষণের।

আর তার জন্য যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হত, তা ত নয়। রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকেই সে ঠিকেদারির তদারক করতে পারত অনায়াসে। কোটচাঁদপুরে এখনও ভালভাবে তার প্র্যাকটিস জমেনি। আর জমবার সময় যখন হল, ভূষণ তখন এমন একটা কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, যে প্র্যাকটিস ত দূরের কথা, তার নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত সে পায়নি। মশার গবেষণায় পাঁচ ছটি মাস তার যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, সে টেরও পায়নি। এত পরিশ্রমের পর, সে বুঝল কোটচাঁদপুরে মশা যেমন প্রচুর, তা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ তেমনি কম। না আছে সাজ সরঞ্জাম না বইপত্তর। তার উপর লোকগুলোর মনোভাবও তেমন অনুকূল নয়। কতকগুলো ফক্কড় লোক তার পিছনে লেগে গেল। একদিন ডিসপেন্সারিতে এসে দেখল, কে বা কারা ওর দরজার পাল্লায় চকখড়ি দিয়ে বড় বড় করে 'এম ডি' অর্থাৎ 'মশার ডাক্তার' লিখে রেখে দিয়েছে।

মনে মনে দুঃখ পেলেও, এসব আমলেই আনেনি ভূষণ। বড় বড় কাজ যারা করে এসব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাদের সইতেই হয়। সে-জন্য সে কাতর হল না, কাতর হল অন্য কারণে। তার ইনকাম কমে গেল যে। ওখানে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়ল। সেই সময় আবার শ্বশুর বাড়ি থেকে বউ ছেলেকে নিয়ে ভূষণ বাড়িতে রেখে এল। তখন সবাই পরামর্শ দিল কোটচাঁপুর ছেড়ে ঝিনেদায় এসে বসতে। কোটচাঁদপুরে বউ আর কাচ্চা ছেলেকে নিয়ে যাওয়া সে সমীচীন বোধ করল না। বড়দারও মত নেই তাতে। দাদাকে সে খুব মান্য করে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভূষণকে অমন সুযোগটা ছেড়ে আসতে হল।

সুযোগ বৈ কি? তালিমারা প্যান্ট আর হাতা-কাটা কোট পরে জোসেফ এসে যখন বোঝাত, ঠিকেদারি এমন একটা জীবিকা যাতে লোকে সহজেই লাল হয়ে উঠতে পারে, কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই জোসেফ এ-কথা বলছে, তখন ভূষণের মুখ চোখ চকচক করে উঠত। ঠিকেদারিতে ঢুকে পড়তে পারলে ভূষণ ভালই করত। লাল হয়ে উঠলে সে কি আর পয়সা নিয়ে রোগী দেখত? কক্ষণো না। একেবারে বিনা পয়সায় চিকিৎসা শুরু করে দিত।

এখনও অবশ্য সে বিনা পয়সাতেই রোগী দেখে। খাতাটায় চোখ বুলিয়ে দেখল, অধিকাংশ রোগীর কাছেই তার টাকা বাকি। বাকির পরিমাণও কম নয়। শ' দুয়েক টাকা ত হবেই।

ঝিনেদায় এসে মাস তিনেক বসতে না বসতেই এত টাকা বাকি পড়ে গেল। ভূষণ জানে, ও টাকা আর আদায় হবে না। ওরা দিতে পারবে না টাকা। না, অসৎ নয় এরা, কেউ অসৎ নয়। কিন্তু ভূষণ ত জানে
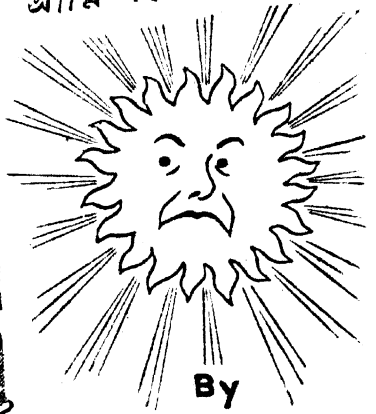
ওদের অবস্থা! কি অপরিসীম দুর্দশা ওদের!-বেশির ভাগই না খেয়ে থাকে। টাকা দেবে কোত্থেকে? তার মধ্যেও ক্ষমতা হলেই ওরা টাকা শোধ করতে আসে। পরিমাণ হয়ত সামান্য। যার কাছে দশটাকা সে হয়ত আট আনা নিয়ে আসে। ভয়ে ভয়ে সেই আট গণ্ডা পয়সা ভূষণের দিকে বাড়িয়ে এইসব জীর্ণশীর্ণ মুখগুলো যখন করুণভাবে চায়, তখন ভূষণ যেন সেই পয়সা নেবার জন্য হাত আর পাততে পারে না। এদের মত মানুষ সত্যিই হয় না। ফসল হলে এরা ফসল দেয়। কিছু না পারলে জন খেটেও টাকা শোধ করতে চায়।

ভূষণ ওদের চেনে, ওদের বোঝে। ওরাও খুব ভালবাসে ডাক্তারবাবুকে। তাই ওই অঞ্চলের নিঃস্ব চাষীদের মধ্যে ভূষণের পসার দ্রুত বেড়ে চলেছে। তারই সংগে তাল রেখে ভূষণের আলমারি খালি হয়ে পড়ছে।

ভূষণ যখন নতুন ডাক্তারখানা খোলে, তখন থাককাটা দুটো বড় বড় আলমারি বানিয়েছিল। থাকে থাকে অজস্র শিশি সাজান থাকত। প্রত্যেকটিতে তখন আসল ওষুধ ছিল। সব ওষুধের মাদার টিংচার। 'সিক্স এক্স' থেকে শুরু করে 'থাউজেণ্ড ডাইলিউশনের' সব রকম ওষুধ। মহাত্মা হ্যানিম্যানের আপন দেশ জার্মানী থেকে আমদানী করা। হয় 'পাউডার অব মিল্ক' আর নাহয় নানারকম মিষ্টি 'গ্র্যানিউলস্' 'গ্লোবিউলস্'-এর সংগে মিশিয়ে পুরিয়া করে ওষুধ দিত ভূষণ। পারতপক্ষে জলের সংগে সে ওষুধ দিতে চাইত না। দিলে যে ক্ষতি হয়ত তা নয়, ওটা ভূষণের আভিজাত্যে বাধত।

ভূষণের এখন বড় দুঃখ, তার আসল ওষুধ এসে ঠেকেছে মাত্র ছোট্ট দুটো হোমিওপ্যাথির বাক্সে। আলমারির শিশিগুলোতে এখন শুধু জল ভর্তি। ভদ্রলোক রোগী এলে আগে যেমন ভূষণ বুক ফুলিয়ে আলমারির ডালা খুলে ফেলত, মনোমত শিশিটা তাক থেকে বের করে এনে রোগীর সামনেই ওষুধ বানিয়ে দিত; এখন আর তা পারে না। এখন শিশিটা বের করে নিয়ে সে ছোট্ট একটু পর্দাঘেরা জায়গায় চলে যায়। সেখানে সেই আড়ালে দাঁড়িয়ে, শিশিটা একপাশে রেখে দেয়। তারপর সেই ছোট্ট বাক্স খুলে আসল শিশি বের করে ওষুধ বানায়। এই প্রবঞ্চনা তার ভাল লাগে না। কিন্তু সে যে বড় ডাক্তার, তার ওষুধে যে অফুরন্ত, সে-কথা বোঝাবার আর ত দ্বিতীয় কোন রাস্তাও নেই। সব থেকে বড় আফশোষ ভূষণের এই, জার্মানী থেকে সরাসরি সে আর আজকাল ওষুধ আনাতে পারে না। কিছুদিন আগে পর্যন্তও আনাতে পেরেছে। খাস জার্মানীর বড় ফার্মের খাতায় তার নাম উঠেছে। সেখান থেকে কত ক্যাটালগ আসত, ব্লটিং পেপার, প্রিন্টিং কার্ড, মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর ক্যালেণ্ডার! গর্বে ভূষণের বুক ফুলে উঠত। প্যাকেটের মোড়ক, চিঠির খাম, টিকিট সমেত টেবিলের উপর এমনভাবে রেখে দিত যেন সহজেই লোকের নজরে পড়ে।

আজ ভূষণ শুধু একজন গেঁয়ো ডাক্তার। জীবনে কিছু করতে না পেরে কিছু লোক যেমন বাড়ি বসে মহেশ ভট্‌চার্যির বই পড়ে 'এম-বি (হোমিও)' হয়ে ওঠে, ভূষণ যেন তাদের গোত্রেরই একজন হয়ে উঠেছে। সে যে একদিন মেডিকেল স্কুলে অ্যালোপ্যাথি পড়তেই ঢুকেছিল, তিন বচ্ছর পড়েছিল, ক্লাসের সেরা ছেলে ছিল, অ্যালোপ্যাথি পড়া ছেড়ে না দিলে যে সে আজ মেরিটের সংগে এল এম এফ হয়ে বেরুত, এ-কথা ত কেউ জানে না।

না, জানেন। তাঁর শিক্ষক, তাঁর গুরু প্রতাপ মজুমদার জানেন। প্রতাপ মজুমদারের মত অত বড় একজন ডাক্তার অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস্ ছেড়ে হোমিওপ্যাথিতে মন দিলেন। চৌষট্টি টাকা ভিজিট ছিল তাঁর। সোজা কথা। সেই লোক গড়পারে কলেজ খুললেন হোমিওপ্যাথির। ভূষণ এসে তাঁর কলেজে যোগ দিল। প্রতাপবাবুর সেই খুশিতে ফেটে পড়া মুখ এখনও যেন দেখতে পায় ভূষণ। গোল্ড মেডেল নিয়ে সে পাশ করেছিল। বিদেশে যাবার বৃত্তিও জোগাড় করে দিয়েছিলেন স্যার। আশা করেছিলেন ভূষণ একদিন কলকাতার নামকরা ডাক্তার হবে। এখনও ভূষণের হাতের পোঁতা একটা গাছ তাঁর কলেজের গেটের পাশে রয়েছে।

তার উপর ভূপতিরও খুব আশা ছিল। ভূপতি, তার সেজদা। ভূষণ এরকম একটা লোক খুব কমই দেখেছে। যে সময়ে দেশের লোক বিলাত যাচ্ছে শুধু আই সি এস আর ব্যারিস্টার হয়ে আসতে, সে-সময় তার সেজদা জাপানে গেলেন। যন্ত্রবিদ্যা শিখতে। পয়সা কড়ি ছিল না তাঁদের। তবুও সেজদা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন।

তা বিলাতে না গিয়ে জাপানে কেন? সেজদার দূরদৃষ্টি ছিল, দেশপ্রেমও ছিল। সেজদা বলতেন, ইংরেজ আমাদের দেশটা দখলই করেছে তার শিল্পসম্ভার বিক্রীর একচেটিয়া বাজার করে রাখবে বলে। এখান থেকে সস্তায় কাঁচা মাল কিনবে আর নিজের দেশের কলকারখানায় তাই দিয়ে মাল তৈরী করবে। আবার সেইসব মাল প্রচুর লাভ রেখে আমাদের কাছেই এনে বিক্রী করবে, করছেও। আমাদের গোটা জাতকে চাকর বানিয়ে রাখবে ওরা। রাখছেও। কোটি কোটি টাকা লুটছে ওরা। লুটবেও। অন্য কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, এদেশে একটু সূঁচও তৈরী হতে দেবে না ইংরেজরা। চিরকাল ওদের হাত-তোলা হয়ে থাকতে হবে আমাদের। আমরা তা যদি বন্ধ করতে চাই ত শিল্প প্রতিষ্ঠার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এ বিষয়ে জাপান আমাদের গুরু। জাপান ইওরোপের কাছ থেকে কি কৌশলে তার বিদ্যা আয়ত্ত করল, কি কৌশলে ইওরোপকে হঠাল, সেই গুরুমারা বিদ্যেটা শিখবার জন্যই সেজদার আগ্রহ ছিল। শিখেও এসেছেন। সেলুলয়েড শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশে।

এখন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উপর নজর পড়েছে তাঁর। এবার ফ্যাক্টরি গড়তে মন দিয়েছেন।

সেই সেজদার খুব ইচ্ছে ছিল, ভূষণ আমেরিকায় যায়। সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসে। টাকাপয়সা জোগাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। পাসপোর্ট হয়ে গিয়েছিল তার। জাহাজের টিকিট, পোষাক টোষাক কেনাও হয়ে গিয়েছিল। ভূষণ নিজেই সে-সব ভেস্তে দিয়েছে। শেষ মুহূর্তে পালিয়ে গিয়েছিল। একেবারে নিরুদ্দেশ। সবাই জানে, ভূষণ মায়ের জন্যই যায় নি, যেতে পারেনি আমেরিকায়। আসল কথা কেউ জানে না। যে জানে সে ভূষণ, আর একজন হয়ত জানে। কিন্তু তার কথা এখন থাক্।

আমেরিকায় না গিয়ে তার যে খুব ক্ষতি হয়েছে, ভূষণ তা মনে করে না। বিদেশী ডিগ্রীতে তার সম্মান বাড়ত। কলকাতায় বসলে তার পসারও। কিন্তু কলকাতায় ডাক্তারি করতে ত সে চায়নি। সে গ্রামেই বসতে চেয়েছে। বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এখানে বসলে বেনাবনে মুক্তো ছড়ানই হত। কিম্বা এ-ও ত হতে পারত, তখন আর ভূষণের গ্রামে এসে বসতে মনই চাইত না। সবাই যদি কলকাতায় যাবে তবে গ্রামে থাকবে কে?

গ্রামের লোকের হাতে পয়সা নেই, ভূষণ তা জানে। এ-ও জানে, এদের চিকিৎসার কত দরকার। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ছাড়ার একটা প্রধান কারণও তাই। পয়সা কোথায় যে, দামী দামী সব ওষুধ কিনবে এরা? রোগী দেখলেই ত অসুখ সারবে না। প্রথম থেকেই ভূষণের কিন্তু এই চিন্তা ছিল। এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতির কথা সে ভাবছিল যা নিতান্ত গরীবও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারবে। এই হোমিওপ্যাথিই সে চিকিৎসা। হ্যানিম্যান, মহাত্মা হ্যানিম্যান এ-যুগের সেই অশ্বিনীকুমার।

একটা দমকা বাতাস এল। ভূষণের টেবিল থেকে ফরফর করে কতকগুলো হ্যান্ডবিল উড়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। ভূষণ তাড়াতাড়ি করে সেগুলো গুছিয়ে তুলতে লাগল। ভূষণেরই বিজ্ঞাপন। হাটে হাটে সে যেগুলো ছড়িয়ে দেয়। এগুলো বের করে রেখেছিল মনিরুদ্দীর হাতে দেবে বলে। আর্তকল্যাণ চিকিৎসালয়। এটা বড় বড় হরফে লেখা। ভূষণ বিজ্ঞাপনখানায় চোখ বুলিয়ে নিল। ডাঃ ভূষণচন্দ্র বসু, এম-বি (হোমিও)। (এটার হরফও বেশ বড় বড়।) বেশ লাগে ছাপার হরফে নিজের নামটা পড়তে। গোল্ড মেডেল-প্রাপ্ত। গোল্ড মেডেল কি, তার অনেক রোগীই বুঝতে পারে না। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ফার্স্ট হয়েছিলাম কি না, সে গর্বের সঙ্গে জবাব দেয়। 'ফার্স্ট' কি তা-ও হয়ত জানে না ওরা, হাঁ করে থাকে। কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের ভূতপূর্ব হাউস ফিজিসিয়ান। এই কথাটা বেশ গালভরা। ভূষণের প্রেস্টিজ বাড়িয়ে দেয়। সাত বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক। না, আর সাত নয় ত, আট, এই নতুন সালে তাঁর অভিজ্ঞতা যে আট বছরে পড়ল। ভূষণ তৎক্ষণাৎ ভুলটা সংশোধন করতে বসে গেল। প্রত্যেকটা বিজ্ঞাপনে কালি দিয়ে সাত কেটে আট বসাতে লাগল। এগুলো ফুরলে আবার নতুন করে ছাপাতে দিতে হবে হ্যান্ডবিল।

কিন্তু, কিন্তু সাইনবোর্ডের কি হবে? ওখানেও যে সাত বৎসর লেখা আছে। আবার নতুন করে লিখিয়ে নেবে নাকি? অনর্থক টাকা খরচ হবে আবার। তাহলে উপায়? বছর বছরই ত তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়বে। কিন্তু সাইনবোর্ডে ত অত সহজে আপ-টু-ডেট বসান যাবে না বছরগুলো। তাহলে? একটা মিথ্যে ধারণা লোকের মনে ঢুকিয়ে দেবে ঐ সাইনবোর্ডটা আর নয়ত বছর বছর টাকা খরচ করাবে? আর কি কোন পথ নেই? এমন কোন ব্যবস্থা করা যায় না, যাতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে? মাথায় চিন্তা ঢুকে গেল ভূষণের।

কিন্তু মনিরুদ্দীর হল কি? এতক্ষণেও এল না! আসবে ত, না কি? আর ত দেরিও করতে পারে না সে। বাড়ি যেতে যেতে খুব বেলা হয়ে যাবে। না খেয়ে বসে থাকবে গিরিবালা।

টাকা দুটোর আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়েই

দিল ভূষণ। ডাক্তারখানা বন্ধ করে সাইকেলে উঠতে যাবার আগে সাইনবোর্ডখানায় একবার নজর পড়ল। সাত বৎসরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক! তাকে যেন জব্দ করার ফন্দী এ'টেছে ওটা। নাঃ, এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

খেয়াঘাটে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল ভূষণ। খাঁ-খাঁ রোদে একটানা তিন মাইল পথ সাইকেল চালিয়ে এসে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। কলকল করে ঘাম গেঞ্জির নিচে দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। বল্লভ পাটনির ঘরের কাছে, আমবাগানের ছায়ায় এসে সে দাঁড়াল।

বল্লভকে এখন আর নৌকো বাইতে হয় না। নবগংগা মজে এসেছে। এখন এপার-ওপার এক বাঁশের সাঁকো তৈরী হয়েছে। আড়াআড়ি বাঁশ পু'তে পু'তে তার উপর দিয়ে একখানা করে বাঁশ লম্বালম্বি ফেলে দেওয়া হয়। ওই ল্যাগবেগে বাঁশের উপর দিয়ে সবাই পারাপার করে। আর একখানা করে বাঁশ বাঁধা হয় একটু উপরে, যাতে হাত দিয়ে সেটা ধরে টাল সামলাতে পারা যায়। বাঁশগুলো শক্ত করে বাঁধাও থাকে না সব সময়। কোন কোন বাঁশ পা পড়া মাত্র বোঁ করে ঘুরে যায়।

আষাঢ় মাসের জল এলে বল্লভকে নদীতে নৌকো নামাতে হয়। কার্তিক মাস পর্যন্ত নৌকো এক রকম করে খেয়া মারতে পারে। অঘ্রাণ মাসেই সব থেকে মুশকিল। এদিকে কাদা, ওদিকে কাদা, মাঝখানের খানিকদূর জল। বল্লভ কণ্টেসৃণ্টে সেটুকুতেই খেয়া মারে। পৌষ মাসে সাঁকোটা বাঁধতেই হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত সেইটেই ভরসা। জোয়ান পুরুষদের বিশেষ অসুবিধে হয় না। সাঁকো তারা অনায়াসেই পার হয়। মুশকিলে পড়ে মেয়েরা, বুড়োরা। প্রতি বছর ভূষণদের ওদিককার ঐ কয়েকখানা গ্রামে এই অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়, দলাদলি হয়। কিন্তু সাঁকোর আর সুরাহা হয় না।

বল্লভ পাটনি বুড়ো হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই সে ভূষণকে দেখে আসছে। ঘরের দরজায় বসে বসে কড়া তামাক টানছিল। ভূষণকে দেখে হাসল। ভূষণও।

বল্লভ বলল, শুনিছ ত ও ভূষণবাবু, কাল হন্যেকুড়োয় প্রেসিডেন্টের বাড়ি মিটিং হয়ে গেছে।

ভূষণ বলল, কিসের মিটিং বল্লভ খুড়ো।

বল্লভ গুড়ুক গুড়ুক হু'কোয় টান মেরে বলল, রাবণের স্বগ্‌গে উঠার সিঁড়ি বাঁধার গো।

ভূষণ বলল, তা যা বলেছ। আমাদের পুল বাঁধা, ঐ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরীর মতই। ও হবেও না।

বল্লভ বলল, ভাল দেখিছ! কাজের বেলা সব অষ্টরম্ভা, গলাবাজিতি দড়। তুমাগের ঐ নকুল বক্সী আবার আমার নামে প্রেসিডেনের কাছে নালিশ করিছে। আমি নাকি কিছু করিনি। করিনে। আরে আমি করব কী? নদীতি জল যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তুমাগের পার করে দিই। একদিনের তরেও কসুর করিছি, বলুক দিনি কেউ? সাঁকো কি আমার বাঁধার কথা! তুমাগের কষ্ট হয়, তাই উজ্জুগ-আয়োজন করে দিই। আমি রাজার চাকর। কাছারীর মাইনে খাই। তোগের প্রেসিডেনের আমি ধার ধারি?

বল্লভ চটে গেল। পাকা পাকা মোটা ভুরু উঁচিয়ে যেন নকুল বক্সীকে শাসাল।

বলল, তুমার প্রেসিডেনেরই ত সাঁকো বাঁধার কথা। বাঁধে না কান রে বাপু? নালিশ, বক্সীর কিটের বড় নালিশির গলা হয়েছে!

ভূষণ বলল, আরে ওর কথা ছেড়ে দাও।

বল্লভ বলল, দুঃখু হয় না, শুনিলি? মানুষির মত মানুষ ত দেখি এক ঐ ভূপতিবাবুরি। দেশে যদি থাকত দেখতে, এতদিন এখেনে পাকা পুল বানায়ে ছাড়ত।

ভূষণ সায় দিয়ে গেল। কথাটা ঠিক। গ্রামের যাকিছু উন্নতি হয়েছে, সব সেজদার জন্যে। জাপান থেকে ফিরে ক'দিনই বা গ্রামে ছিলেন। তার মধ্যেই ছেলেদের জুটিয়ে নিয়ে বন-জংগল কেটে, খানা-ডোবা বুজিয়ে, গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কাজ ছাড়া সেজদা এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না। প্রাইমারি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে, ইস্কুলের পাকা বাড়ি গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন সেজদা।

আর গ্রামের লোক তার বদলে তাঁকে কি পুরস্কার দিয়েছিল? একঘরে করে রেখেছিল তাঁদের। নকুল বক্সীর কাকা বিনে বক্সী ছিল সে ঘোঁটের পাণ্ডা। তা একঘরে করে করল টা কি? নলডাংগার রাজা নিজের ছেলের পৈতেতে নেমন্তন্ন করলেন সেজদাকে। এক পংক্তিতে খেতে বসলেন তাঁকে নিয়ে। বিনে বক্সী কি কম জ্বালিয়েছে তাঁদের! ওর মেয়ে পারুল, না পারুলের কথা আর ভাববে না ভূষণ। সে এখন পরস্ত্রী। সম্ভবত সুখেই আছে। সুখেই থাক সবাই। এ-সংসারের কারো সম্পর্কেই মন্দ ভাবে না ভূষণ। ভাবতে সে পারেও না। তার ধারণা যা ঘটে, ভালর জন্যই ঘটে।

ভূষণ বলল, চলি গো বল্লভ খুড়ো। বেলা হয়েছে।

বল্লভ বলল, হ্যাঁ শোন, মাজায় সেই ফিকির ব্যথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠিছে। সোজা হতি পারতিছি নে। কি করি কও দিনি?

ভূষণ বলল, সেই যে তার্পিণ তেল এনে দিয়েছিলাম, আছে না ফুরিয়ে গিয়েছে?

বল্লভ বলল আছে বোধ হয়।

তাহলে আজ রাতে তাই বেশ করে মালিশ করে দ্যাখ। যদি না কমে কাল একটা ওষুধ দেব।

বলেই ভূষণ ঢালু বেয়ে সাইকেলখানা সাবধানে নামিয়ে নিল। সাঁকোর কাছে এসে কাঁধে তুলল সাইকেল। তারপর সন্তর্পণে বাঁশের উপর পা দিতেই বাঁশ-খানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল।

পায়ের নিচে আর জল দেখা যায় না। শুধু কচুরিপানা আর দাম-কলমী। নদীটা যেন একটা কঠিন সবুজে জমাট বেঁধে রয়েছে। ঐ দূরে, যেখানে খানিকটা জল চিকচিক করছে, সেখানে বংকু জেলে বাঁশ পু'তে জাল ফেলে রেখেছে। বাঁশের মাথায় মাথায় বক আর মাছরাঙা বসে আছে। আর এপাশে পেতেছে গোটাকতক সাগড়া। চাঁছা বাঁশ দিয়ে তৈরী তিনকোণা সাগড়া-গুলোর যে-কটা নদীর পাড়ে পড়ে আছে, সেগুলোকে দূর থেকে দেখলে বড় বড় সিংগাড়া বলেই মনে হয়। ওগুলোর ভিতর বাবলার ডাল ভরে জলে ফেলে দেয় বংকু। বাবলার ডাল খেতে ওর ভিতর মাছ

ঢোকে। সকালে গিয়ে সে-সব টেনে সে ডাঙায় তোলে।

ঝিঁঝিঁ দাম, কলমি আর কচুরিপানার উপর তেজাল রোদ পড়ায় অসহ্য এক ভাপসা গরম ছুটেছে। আর জল, কাদা আর দামের এক মিশ্র গন্ধ নাকে এসে ঢুকছে ভূষণের। চিলগুলো উড়ছে আর মাঝে মাঝে কাতর স্বরে ডেকে উঠছে। মড়িপড়া গরুগুলো একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে শ্রান্ত চোয়ালে পটাস পটাস ঘাস ছিঁড়ছে। একটা জলঢোঁড়া অতিকষ্টে দামের জঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল। হা-ম্বা, বাছুর ডেকে উঠল। সদ্য-বিয়ানো একটা ছাগী তিনটে বাচ্চা নিয়ে ঘাস খুঁটতে খুঁটতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সাঁকোটা পার হতে ভূষণ যেন নেয়ে উঠল। সাইকেলটা এরই মধ্যে তেতে উঠেছে। পারে নেমে সাইকেলটা কাঁধ থেকে নামাল ভূষণ। কাঁধটা একটু ডলে নিল। রুমাল বার করে মুখের ঘাম বেশ করে মুছল। তারপর সাইকেলে উঠে চলতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

খেয়াঘাট থেকে একটা মাঠ পেরিয়ে গ্রামে ঢুকতেই, মুখেই যে দোতালা কোঠা বাড়িটা পড়ে, সেটা ভূষণদেরই জ্ঞাতি পাগলা [illegible]সের বাড়ি। বাড়ির কর্তা বহুদিন যাবৎ পা[illegible]ল। রাস্তার ধারে, দোতালার ঘরে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। গ্রামে কাউকে ঢুকতে দেখলেই তিনি চীৎকার করেন, কে-ও, খাজনা দিয়েছ? ছোটবেলা থেকেই সে এটা শুনে আসছে। প্রথমে ভয় পেত, আরেকটু বড় হলে সে মজা পেত, এখন বড় কষ্ট হয় তাঁর।

ভূষণের সাইকেলের আওয়াজ পেতেই তিনি জানলার দিকে ফিরে ঝুঁকে পড়লেন। মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করলেন, কে-ও! খাজনা দিয়েছ?

ভূষণ কোন দিকে না চেয়ে এগিয়ে গেল। এই বাড়িখানার পরেই কৈবর্তপাড়া। চূণ তৈরী করে কৈবর্তরা। কলি চূণের ভাঁটি-গুলোর পাশে পাশে বিস্তর ঝিনুক শামুক ডাঁই করা হয়েছে। এখানটা একটু সাবধানে পার না হলে সাইকেলের টায়ার ফাটবার আশঙ্কা। যে পরিমাণ ভাঙা শামুক ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে! ভাঙা শামুকের খোলায় রেস্তায় ধার। তারপরেই বক্ক জেলের বাড়ি। তারপর রাস্তার দুপাশে বাঁশঝাড় আর শ্যাওড়াঝাড়ের বন। সেটা পেরুলেই একতলা ইস্কুল বাড়ি। দুদিকে দুটো রাস্তা বেরিয়ে গেল। বাঁয়ের রাস্তা ধরে এগুলেই হরিসভা, আম, কাঁঠালের বন। তারপরেই মাটির পাঁচিল দিয়ে চতুর্দিকে ঘেরা ভূষণদের বাড়ি।

ভূষণ সাইকেল থেকে সদরে নামল। রাঙ্গী গাইটা বাছুরকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। এগিয়ে এসে ভূষণের দিকে গলা বাড়িয়ে দিল। বড্ড আদুরে গাই। ভূষণ সস্নেহে হেসে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর হুড়কো খুলে ভিতরে ঢুকল।

বক্সী মশাই ভূষণকে দেখেই এগিয়ে এলেন। রোগা দড়ি-পাকানো চেহারা। হাঁফানির রোগী। বয়েস হয়েছে বেশ। কত, বলা মুশকিল।

বক্সী মশাই ফিসফিস করে বললেন, ভূষণ, বাড়িতে ত আজ কুরুক্ষেত্তর। খুব ধুম হয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা ঘরে দরজা আঁটে পড়ে আছেন। রাঁধছেন কিনা কবে কেডা? পেটে দড়ি বাঁধে পড়ে থাক।

ভূষণ অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি?

বক্সী মশাই বললেন, আরে, এ-বাড়ি গোলামাল বাধাতি আবার ব্যাপার লাগে নাকি? ছোট বউমা ভাত নামাতি যায়ে বুঝি পা পুড়োয়ে ফেলিছেন। বড়বাবু বাড়ি আসে তাই শুনে অ্যাইসা আড়ারাম তাড়ারাম করতি লাগলেন যে, বড়বউ ঘরে গিয়ে দরজা দেলেন। মেয়েগুলোও রাগ করে শুয়ে পড়িছে। দ্যাখ দিনি কি গেরো, বাড়িতি দুই খালুই মাছ আলো, কনে আরউ ভাবলাম আত্মারাম আজ সধবা হবে, তা না হরি মটর চিবোয়ে আছি। তা না-হয় আমরা চিবোলাম, কিন্তু জনেগের কি হবে? একটু পরেই ত তারা খাই-খাই করে আসে পড়বে নে।

ভূষণের যদিও প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, তবু সে মেজাজটা খারাপ করল না। বক্সী মশাইয়ের রসিকতা সে উপভোগই করল। ভূষণের পরিষ্কার একটা হিসেব আছে। সে কোন ব্যাপারে নালিশ বড় একটা জানায় না। সত্যিই ত, আঁতে ঘা লাগলে, মেয়েদের রাগ হতেই পারে। রাগ হলে ঘরের দরজা দেওয়াটাও মেয়েদের প্রকৃতির বাইরে নয়। এখন দুটো রাস্তা ভূষণের সামনে, (১) উপোস দেওয়া আর (২)

য়া-বান্নার ব্যবস্থা করা। উপোস দিতে ভূষণ পিছপাও নয়। হাসিমুখেই সে না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে কখন? যখন ঘরে খাবার কিছু থাকে না, তখন? এখন ঘরে যখন খাবার রয়েছে, তখন সে খামাকা কেন শরীরকে কষ্ট দেবে? কেউ যদি রান্না না-ই করে, সেই না-হয় আজকের মত কাজটা চালিয়ে দেবে।

ভূষণ ভিতরে এসে ক্রিলিলিং করে বেলটা বাজাল, কোন ঘর থেকেই কেউ সাড়া দিল না। তাঁর নিজের ঘরের ডোয়ার ছায়ায় সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে ভিতরে উঠে গেল।

গিরিবালা ঘুমচ্ছে। তার মুখে খানিকটা যন্ত্রণার ছাপ লেগে আছে। দু চোখের কোনা বয়ে কখন যেন জলের ধারা নেমেছিল, এখন জল নেই, মরা সোতার মত দেখাচ্ছে। কোলের মধ্যে ছেলেটাও ঘুমিয়ে রয়েছে। ভূষণ একবার উঁকি মেরে গিরিবালার পা-টা দেখে নিল। পোড়েনি, ফোস্কা পড়েছে পায়ে। ও কিছু না। এক ডোজ আর্নিকা থার্টি খাইয়ে দিলেই ব্যথার ভাবটা কমে যাবে। ভূষণ নিশ্চিন্ত হল। এখন বরং গিরিবালা ঘুমোক খানিকটা। ভূষণ জামা-কাপড় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রথমেই দেখতে হবে দাদা এখন কোথায়? ভূষণ ভাবল। মার ঘরে গেল। মা একেই ভীতু মানুষ, তারপর আজকের এই হাঁকডাক। নিজের রান্নাবান্না সব সেরে চুপ করে বসে আছেন। ভূষণকে দেখে বুকে বল পেলেন।

ফিসফিস করে বললেন, ও ভূষণ, সব্বনাশ হয়েছে আজ। বউমার পা পুড়িছে তার উপর বিলেস আজ বড় বউমারে তাই নিয়ে পিরায় মারে আর কি? তাতে পুড়ে আলি, ক্ষিদেয় ত তোর মুখ শুকয়ে গেছে। খাবি? আমার ভাতগুলোই খায়ে নে।

ভূষণ বলল, তাহলে আপনি খাবেন কি?

বুড়ির দু চোখ ভেসে গেল জলে।

বললেন, আমার আবার খাওয়া। বাড়ির কেউ দাঁতে একটা কুটো কাটল না, আর আমি বুড়ো মাগী দাঁড় জুবড়োয়ে খাই। তা কি হয়?

ভূষণ বলল, আমি ব্যবস্থা করছি, আপনি ভাববেন না। বড়দা কই?

বুড়ি ঠাকুর ঘরটা দেখিয়ে দিলেন। ভূষণ উঠে [illegible]য়ে উঁকি মেরে দেখে এল, বিলাস ধ্যানে বসেছেন। বোধ করি চিত্তশুদ্ধিই করছেন।

বিলাসের রাগটা কিছু বেশি। থপ্ করে জ্বলে ওঠেন। বাক্তবাগীশ লোক। কিন্তু মনটা বড় ভাল। কারো মনঃকষ্টের কারণ হয়েছেন তিনি, এটা যে-মুহূর্তে বুঝতে পারেন, অমনি প্রায়শ্চিত্ত করার একটা ঝোঁক প্রবল হয়ে ওঠে। ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চিত্তশুদ্ধি করেন। রাধা-গোবিন্দের শ্রীচরণে আছাড় খেয়ে পড়ে কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা চাইতে থাকেন। আজকের দিনটা অনশন চলবে তাঁর।

বউবউয়ের রাগ পড়ে গিয়েছে। তিনি উঠলেন। তাঁর আবার ক্ষিদেটা কিছু বেশি। ক্ষিদে যত বাড়ে, ততই তাঁর রাগ-অভিমান কমে আসে। ঠাকুরপো এসে গিয়েছে। আহা, বেচারার ক্ষিদে পেয়েছে খুব! সেই সকালে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। মেয়ে-গুলোও ত কিছু খায়নি।

বউবউ ডাকলেন, চম্পি, ও চম্পি। যূথি, ও যূথি।

যূথি উঠে এল। চম্পি সাড়া দিল না।

বড়বউ বললেন, হে'সেলে চল, মাছগুলো বাছে দে। চম্পি গেল কনে?

যূথি গোমড়ামুখে বলল, ঘুমোচ্ছে।

বড়বউ বললেন, অবেলায় ঘুমোলি কি চলে? উঠোয়ে দে। কাকা বাড়ি আসে গেছে। দ্যাখদিনি তোর বাবা গেলেন কনে?

যূথি বলল, বাবা ত সেই কখনের থে ঠাকুর ঘরে ঢুকিছেন।

অ্যাঁ, ক'স কি?

বড়বউ তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। এই রে, পিরাশ্চিত্তির করতি বসল না কি?

বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ, কি করতিছে, দেখে আয়।

বড়গিন্নীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বিলাসের চিত্তশুদ্ধিকে দামিনীর বড় ভয়। স্বামী যদি সারাদিন না খেয়ে চিত্তশুদ্ধি করতে থাকে ত সতী-সাধ্বী স্ত্রীর অবস্থা কি দাঁড়ায়। সেটা ভেবেই বড়বউয়ের চোখে অন্ধকার নেমে এল। তাঁকেও যে এখন শুকিয়ে থাকতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা আছে ত! দামিনী পারতপক্ষে বিলাসের চিত্তশুদ্ধির কারণ হতে চায় না। গোলমাল এড়িয়ে থাকার চেষ্টাই করে। তবুও কখনও কখনও বেধে যায়। এই আজ যেমন হল। কি সাজা বল দিনি?

বড়গিন্নী রান্নাঘরে এসে দেখেন, ভূষণ ওর মধ্যেই একটা গোছগাছ করে ফেলেছে। ভাতের হাঁড়ি সরিয়ে রেখেছে। নেভা উনুনে কাঠ ধরিয়েছে আবার। আধ-সাঁতলান ডাল চাপিয়ে দিয়েছে। ঝাড়ুন দিয়ে কলমির জঙ্গল সাফ করছিল, এমন সময় বড়গিন্নী ঘরে ঢুকলেন।

বড়গিন্নী একটানে ঝাড়ুনটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন। ধমকে দিলেন ভূষণকে।

অশৈলে রাখ। যাও এখেনের থে। আর কাজ দেখাতি হবে না। ও চম্পি, ওলো যূথি দেখসে আয়, তোগের কাকার কান্ড।

এতক্ষণে চম্পি উঠে এল। ঘরে ঢুকে একনজর চেয়েই হেসে ফেলল।

মরি মরি, ঝাড়ুন হাতে কি রূপেই তুমার খুলিছে ছোটকাকা। কাকীমা দেখলি ভিরমি খায়ে পড়বে নে।

ভূষণ ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, আহা, বেচারাদের জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে। একটা দিন রাগ করে শুয়ে থাকবে। শত্তুরেরা তা-ও দেবে না।

বড়গিন্নী বলল, রঙ্গের কথা না ভাই। মেয়ে হয়ে জন্মাইছি বলে গন্ডারের চামড়া ত আর গায় দিইনি। মান-অপমান সকলেরই সমান।

ভূষণ হেসে ফেলল।

তাই ত আমিও বলছি। তবে এটা দেখা গেল, রাগ পুষে রাখার ভাল সাজ-সরঞ্জাম এ-বাড়িতে নেই। তোমার ওই রোগা শরীরে আর কতটুকু রাগ ধরবে। হ্যাঁ, গতর হবে কুল বক্সীর বউয়ের মত। বসতে তিন কাঠা জায়গা লাগবে, যাতায়াত করতে খান দুয়েক ঘোড়ার গাড়ি লাগবে। নাকে একটা একপোয়া ওজনের নথ থাকবে। ওই রকম একজন কেউ যদি রাগে ত সেই হল আসল রাগ। বাড়ির লোক থরহরি কম্পমান, গ্রামের লোক তটস্থ। তাই সকলের সদা-সর্বদা চেষ্টা থাকে, লোকটা যেন না রাগে। তোমাদের হল—

বড়গিন্নী হাসতে হাসতে বললেন, এখন যাও দিনি, আর জ্বালায়ো না। ওই কুল-বক্সীর বউর সঙ্গে পার ত তুমার দাদারে বিয়ে দিয়ে দ্যাও। কুলবক্সীর বউর রাগ আর উনার পিরাশ্চিত্তির, একেবারে রাজযোটক হবে নে।

ভূষণ হাসতে লাগল।

বলল, জনেদের ভাত দেবার জোগাড় কর। ওদের চানটান সারা। আর সেই সঙ্গে বক্সী মশাইকেও দিয়ে দাও।

বড়গিন্নী বললেন, তুমিও বসে পড়।

চম্পি বলল, ছোটকাকীমার পা-টা কি দেখিছ?

ভূষণ বলল, হ্যাঁ, ও তেমন কিছু না। ফোস্কা একটু বেশি পড়েছে, এই যা।

চম্পি বলল, পাগলামিটা একবার দ্যাখ দিনি। ওই হাঁড়ি কি একা নামান যায়? আমরা বসে আছি এখেনে। যূথির কথাডা খসালিই ত উঠে গিয়ে ধরতি পারি।

ভূষণ বলল, ভাবিসনে, এখানে, এই উনুনের উপরে একটা ছোট্ট কপিকল খাটিয়ে দেব। আর ওই ডেকচির গায়ে আংটা লাগান থাকবে। ভাত হয়ে গেলেই আংটার গায়ে একটা শিকল পরিয়ে কপিকলে আটকে দিবি তোরা। তারপর টেনে টেনে নামিয়ে ফেলবি ভাত। অতি সহজেই ভাত নামান যাবে। ওই ডেগ ত তুচ্ছ, ওর ডবল ডেগও তোর মত লোক অনায়াসে নামাতে পারবে। একাই পারবে। এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে না চললেই দুর্ঘটনা অনিবার্য। দাঁড়া, কাল-পরশুর মধ্যেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আইডিয়াটা হঠাৎ মাথায় এসে গেল ভূষণের। এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা ভেবে তার শরীরে রোমাঞ্চ হল।

বড়গিন্নী এক ধমক দিলেন, আরে রাখ! রান্নাঘরে উনি কপিকল টাঙাবেন! যত অশৈলের কথা। আমাগের জন্য ভাবে ত আর ঘুম হচ্ছে না কারো। বলি, আজ এক মাস ধরে যে বলছি, কাপড় নেই, কাপড় নেই, তা সে বুঝি কানে যাচ্ছে না। ছিঁড়া ধুলি-ধুলি কাপড় পরে সোমথ মেয়েরা চোখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে বেলায় ত মন্দগের এত ভাবনা হয় না। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি নামাতে উনি কপিকল আনবেন। বলি, মেয়েগুলোন কি কপিকল পরে বেরোবে?

বড়গিন্নীর ধমক খেয়ে ভূষণ একটু বিব্রত হল। কারণ বড়বউদির অভিযোগটা সত্যি। অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সব অসুবিধেজনক প্রশ্নের সামনে পড়ে গেলে ভূষণ খুব অস্বস্তি বোধ করে। কাপড় কিনতে টাকা লাগে। রোগীরা না দিলে টাকা সে পাবে কোথায়? আর রোগীদের টাকা দেবার অবস্থা আছে নাকি? এসব কথা বাড়ির মেয়েরা বোঝে না। ওরা বেজায় স্বার্থপর। দুনিয়া রসাতলে যাক, আমার কাপড়টা হয়ে গেলেই হল, এই ওদের মনোভাব। কোন ভাল জিনিস ওরা বোঝে না। বুঝবে না ত। বড় স্বার্থপর যে!

এই যে কপিকলের ব্যাপারটা, এটার কথাই ধরা যাক। বড় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বড়গিন্নী করছেন, অমন ফুস করে উড়িয়ে দেবার জিনিস এটা নয়। আমাদের দেশের কোটি কোটি নারী এর সুবিধে ভোগ করবে। হাত দিয়ে গরম হাঁড়ি-কড়াই নামাতে গিয়ে যে কত দুর্ঘটনা হয়, কত মেয়ের হাত-পা পোড়ে, পুড়ে মরে, যন্ত্রণা পায়, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে? সামান্য একটা যন্ত্র ফিট করে দিলেই কিন্তু এসব এড়ানো যায়। নিরন্তর আগুনের তাতে থাকতে থাকতে কত রকম ব্যাধি হয় মেয়েদের, সে-সবও কমে যেতে পারে।

প্রথমে নিজের বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখে যদি সুফল পেত ভূষণ, তাহলে চাই কি, এটা পেটেন্ট করে সে ব্যবসাও ফাঁদতে পারত। "ডাঃ ভূষণচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত রান্নাঘরের কপিকল" অথবা ইংরাজীতে "ডাঃ বোসেস কুকিং পুলি।" এই কল ব্যবহার করিলে মাতৃজাতি রান্না-ঘরের মারাত্মক দুর্ঘটনা এবং অনাধিক পরিশ্রম হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিবেন। খবরের কাগজে হয়ত ছবি দিয়ে তার আবিষ্কারের কথা ছাপাও হত। ডাঃ বোসেস কুকিং পুলি। ইংরাজী নামটাই ভূষণের বেশি পছন্দ হচ্ছে। কুকিং পুলি। হাঁ, রান্নাঘরের কপিকল থেকে কুকিং পুলি শুনতে অনেক ভাল। মেড ইন যশোর। যশোরের তৈরী। সেকন্দার চিরুণী যেমন ভারত বিখ্যাত হয়েছে। যেশোর বেঙগল, নামটা সেজদার কল্যাণে যেমন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি তার কুকিং পুলিও একদিন বিখ্যাত হয়ে যেতে পারে। পারে বৈকি? মানুষের অসাধ্য কি আছে?

ভূষণ হিসেব কষতে বসল। অবশ্য মুখে মুখে। এটা একেবারেই থাউকো হিসেব। পরে সে বিস্তারিত হিসেব কষবে। কিন্তু এতেই, এই থাউকো হিসেবেই সে দেখিয়ে দিতে পারে, তার সামান্য, একটা আবিষ্কার থেকে কত টাকা রোজগার হতে পারে। ধরা যাক, বাংলা দেশে এখন চার কোটি লোক আছে। গড়ে দশজন লোক নিয়ে যদি এক-একটা পরিবার ধরা যায়, তাহলে পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় চল্লিশ লক্ষ। তার মানে চল্লিশ লক্ষটা রান্নাঘর। গুড্। এবার এর থেকে থ্রি-ফোর্থই বাদ দাও। চার ভাগের এক ভাগের হিসেবই ধর। তাহলেও দশ লক্ষ রান্নাঘরে দশ লক্ষ কুকিং পুলি অনায়াসেই বিক্রী হতে পারবে। ভেরি গুড্। ভূষণ খুবই উৎসাহিত বোধ করছে। এখন প্রতি কুকিং পুলিতে যদি সে মাত্র চার আনা লাভ করে, ওনলি ফোর আনাস, তাহলে কি দাঁড়ায়, আড়াই লক্ষ টাকা। আচ্ছা তার থেকে আরও না হয় দেড় লক্ষ টাকা বাদ দাও। তাহলেও থাকে নেট একটি লাখ টাকা। এর আর মার নেই। এক লাখ টাকার কোন ধারনাই নেই বড় গিন্নীর। খালি কাপড় কাপড় করছে। আরে কত কাপড় চাই, তখন ফরমাস কর? যেন বড় গিন্নীকেই বলল ভূষণ।

চম্পির খ্যারখেরে আওয়াজে ভূষণের চিন্তা ছিন্ন হল।

ও ছোটকাকা, বার্লি আনিছ?

ভূষণের উৎসাহটার জোয়ারে কিঞ্চিৎ মন্দা পড়ল। মুখের চকচকে ভাবটাও মলিন মলিন হয়ে উঠল। ভূষণ রবিনসনের বার্লি কিনবে বলেই ত এতক্ষণ মণিরুদ্দীর আশায় বসে-ছিল। কিন্তু সে যে এল না।

বলল, আজকের দিনটা চালিয়ে নে না। কাল এনে দেব।

চম্পি বলল, চালাব কি আমার মুড়ো দিয়ে। খুকোর পেটটা খারাপ, দুধ এক ফোঁটাও ধরাচ্ছে না। তুমারে বলে বলে ত হয়রাণ হয়ে গেলাম। এখন ও বিচারা খাবে কি?

ভূষণ ভাবতে লাগল, এরা নিজেদের সংসারটাকে সমস্ত জগৎ থেকে আলাদা করে দেখে। তাই অভাব অভিযোগ এদের চোখে এত বড় বলে মনে হয়। আমাদের উচিত জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সংসারটাকে দেখা। তাহলেই এ জ্ঞানটা অন্তত হবে, বার্লির অভাবে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে না।

মানুষে কি খায় আর কি পরে, তা দিয়ে মানুষকে বোঝা যায় না। মানুষের পরিচয় তার চিন্তায়, তার কর্মে। রবিনসনের বার্লি সে আনতে পারেনি বলে এরা তার উপরে চটেছে। আরে ওটা ত মাত্র একটা পরিবারের, একটা, একটা সাময়িক সমস্যা। ভূষণ মনে মনে মন্তব্য করল। কিন্তু সে যে-সমস্যার সমাধানের কথা ভাবছে, তার মধ্যে বৃহত্তর মানবের কল্যাণ নিহিত আছে।

তাই বাজে চিন্তায় মন না দিয়ে, ভূষণ ঘরে উঠে গেল কুকিং পুলির নকশা আঁকতে। (ক্রমশঃ)

দর্পক

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

দর্পক সদর্পে উপস্থিত হল রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদে। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ, বিশ্বামিত্রকে তপোভ্রষ্ট করতে হবে। অমিততেজা বিশ্বামিত্র,—দর্পিত, উগ্র, ক্রোধান্বিত। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, নূতন স্বর্গ, নূতন ইন্দ্র সৃষ্টি করবেন। স্থিরাসনে অত্যুগ্র তপস্যায় তিনি আসীন ঃ নিশ্চল দেহ, নিমীলিত নয়ন, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস। ধৃতব্রত তাপসের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উগ্রতপস্যার উগ্র দীপ্তি। ভয়ার্ত হিংস্র জীবকুল, সভয়ে আত্মগোপন করেছে নিভৃত অরণ্যে।

শঙ্কিত হয়েছেন বজ্রী ইন্দ্র। স্বর্গ-রাজ্যের একাধিকার বুঝি বিপন্ন হয়। বিশ্বামিত্রকে পদভ্রষ্ট করার আয়োজনে ত্রুটি করেন নি তিনি। পাঠিয়েছেন ভূত-প্রেত-পিশাচ, ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে প্ররোচক ক্রোধ, লোভ। ব্যর্থ হয়েছে তারা, ব্যর্থ হয়েছে ইন্দ্রমায়া। নিরুপায় হয়ে দেবরাজ কামদেবের শরণাপন্ন হয়েছেন। মিনতি করে বলেছেন তাকে, "অপরাজেয় তোমার বিক্রম, ত্রিজগতের দর্প মুহূর্তে চূর্ণ করতে পারো তুমি। কন্দর্প, তুমি আমার সহায় হও।"

বজ্রধারী যে ইন্দ্রের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় ত্রিভুবন, তাঁর করুণ মুখচ্ছবি দেখে হেসে উঠেছে কন্দর্প। গর্বে পূর্ণ হয়েছে অন্তর। সার্থক তার কন্দর্প বা দর্পক নাম। ত্রিভুবনের দর্পহারী সে, সে মন্মথ—ত্রিলোকের হৃদয়-প্রমাথী, সে কামদেব—বিশ্বকামনার উৎস। অব্যর্থ তার লক্ষ্য, অমোঘ কন্দর্প-বন্ধ। বিশ্বামিত্র কোন্ ছার, স্বয়ং বিধাতাকেও সে বিভ্রান্ত করতে পারে।

আপন মনে হেসে ওঠে দর্পক। পুষ্কর তীর্থের রমনীয় প্রস্থে ধ্যানে বসেছেন বিশ্বামিত্র। আদিত্যতুল্য তেজ, সমুদ্রের মত গাম্ভীর্য—মন বুঝি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছে ব্রহ্ম-তন্ময়তায়। ধীরে এগিয়ে এল দর্পক, যেন বিশ্ববিজয়ী বীর। বরণ্যে ধৃতি তার কাছে নগণ্য। অলক্ষ্যে সে লক্ষ্য করল ঋষিকে, লক্ষ্য করল চতুষ্পার্শস্থ অরণ্যভূমি। ইন্দ্রের নির্দেশে আশ্রমপদে এসে উপনীত হয়েছে স্বরপ্সরী মেনকা। অপরূপ রূপ—অনিন্দিত কান্তি। বিভ্রম উৎপাদনেও কুশলী সে। কিন্তু সসংকোচে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, যেন প্রাণহীন এক রূপপিণ্ড। মেনকার সাধ্য কি, ঋষিকে সে পদভ্রষ্ট করে। ঝটিকা যত প্রচণ্ডই হোক, অচল হিমাচলকে বিচলিত করে—কার সাধ্য!

নর হোক, নারী হোক—স্থায়ী রতিভাব সকল হৃদয়েই বর্তমান। কিন্তু উদ্বোধনের কারণ না ঘটলে, রতি কখনও স্বয়ংক্রিয় হয়

না। কাষ্ঠ আহিতাগ্নি; কিন্তু কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ না হলে সে অগ্নি প্রকাশিত হয় না। তিমির গর্ভে নিষ্প্রভ সূর্যকান্তমণি। সৌরকর স্পর্শেই তার দীপ্তির প্রকাশ। বিশ্বলোকে দর্পক মদন সেই রতি-ভাবের উদ্বোধক। মদন আছে, তাই পুরুষের প্রকৃতি-সম্ভোগেচ্ছা; মদন আছে, তাই নারীর প্রতি নরের সানুরাগ আকর্ষণ ও সংসর্গ। প্রজাপতি হয়ে মদন পুংকেশরের পরাগ মাখিয়ে দেয় গর্ভকেশরে। তাই সুন্দর হয়ে ফোটে সৃষ্টির ফুল।

মদন যদি না থাকত,—ভাবল মদন,—ব্যর্থ হত প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির কামনা। অকাম হত নর, অকাম হত নারী—ব্যর্থ হয়ে যেত নারীর হাব-ভাব, বিলাস-কটাক্ষ। ওইতো বিশ্বামিত্র, ওই তো বিশ্বমোহিনী মেনকা। ধ্যানমগ্ন ঋষি, ক্রীড়া-চঞ্চলা নারী। কত তার কৌশল! নূপুরে শিঞ্জন, কঙ্কনে ঝঙকার, কিন্তু মৌন তাপস; মেনকার বস্ত্রাঞ্চল অসম্বৃত, শিথিল মেখলা-বন্ধন—কিন্তু নির্বিকার ঋষি। এত চেষ্টা করেও

মোহিনী তো পারে নি মৌনীর মৌন ভংগ করাতে!

বিদ্রূপ হাস্যে মুখর হয় দর্পক। নীরস তরু কি মঞ্জরিত হয় কখনও? রতির উদ্বোধক সে রতিপতি, কামের উদ্দীপক সে কামদেব। মদনহীন সৃষ্টি অনুর্বর মরু-ভূমি। আত্মদর্পে উল্লসিত হয়ে সে অগ্রসর হ'ল অলক্ষ্যে। অলক্ষ্যচারীই সে—তাকে কেউ দেখতে পায় না। চক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত শায়কের মত গোপন তার সঞ্চরণ, অনিরুদ্ধ তার গতি।

তখন প্রভাতকাল। এদিকে তপোমগ্ন মৌনী তাপস, ওদিকে স্বাধ্যায়ঘোষমুখর ঋষির আশ্রম; এদিকে নিবিড় নীরবতা, ওদিকে মধুর ঝঙ্কার। দূরে থেকে ভেসে আসছে পদক্রমে উচ্চারিত মধুর গীত-ধ্বনি। হয়তো ঋষি বিশ্বামিত্রেরই শিষ্য তারা। গুরুর অন্তরে ব্রহ্ম-ধ্যানের একতানতা যেন মধুর সুরে ঝঙ্কৃত হচ্ছে শিষ্যদের কণ্ঠে :

অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

—নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্তুতি। তিনি আকারহীন—অপাণিপাদ, তবু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন; তিনি অচক্ষু, অকর্ণ—তবু তিনি দর্শন করেন, শ্রবণ করেন। বিস্ময়ের বিস্ময় তিনি, তাঁকে কেউ জানে না—কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন।

কি মধুর সংগীত, কি সুমিষ্ট কণ্ঠ, কি উদার ব্রহ্মসাধন ভাব! কিন্তু মুহূর্তে ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠে দর্পক। একি ব্রহ্মের স্তুতি, না তারই প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ! সে-ও দেহহীন, অপাণিপাদ। তাকে কেউ দেখে না, কিন্তু সে সব দেখে—সব শোনে। তাকে লক্ষ্য করেই কি—! ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ওঠে অন্তরে। দর্পান্ধের ক্রোধ, অতি ভয়ংকর তার মূর্তি। উল্লাস-হাসি পলকে হয় বক্রকুটিল, আত্মসম্বিৎ হারিয়ে যায়।

সে দেখবে, দেখাবে—অপাণিপাদ হলেও কী প্রচণ্ড তার বিক্রম। সে অচক্ষু হয়েও বিশ্বচক্ষু, সে অকর্ণ—কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিও তার কর্ণগোচর হয়। তার অব্যর্থ সন্ধানে বিভ্রান্ত হয় স্বর্গের দেবতা, মর্ত্যের মানুষ, পাতালের অসুর সংঘ। চতুর্দশ ভুবনে নির্বাধ তার পরাক্রম। হ্যাঁ, সে অলক্ষ্যচারী,—অদৃশ্য হয়েই সে আক্রমণ করে বিশ্বলোক—অদৃশ্য থেকেই সে পদভ্রষ্ট করবে তপ্যমান বিশ্বামিত্রকে।

ভীরু বামোরু মেনকা। হতে পারে সে ভুবন-মোহিনী রূপসী। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অতিবলা শক্তির নিকট সে অ-বলা। মর্ত্যে দ্বিতীয় বিধাতা বিশ্বামিত্র। হুতাশনের মত চিরদীপ্ত তাঁর ক্রোধ, সে ক্রোধাগ্নির আহুতি হয়েছে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শত সন্তান। তাইতো ভয়ে সংকুচিত মেনকা। উভয়-সঙ্কট তার। একদিকে আহিতাগ্নি ঋষি, অন্যদিকে বজ্রধারী ইন্দ্র—মধ্যে ভীতা, কম্পিতা অপ্সরী মেনকা।

কিন্তু নির্ভয় দর্পক। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় বিধাতা, জ্যোতিশ্চক্রের বহির্ভাগে সপ্তর্ষি মণ্ডল তাঁর নবসৃষ্টি। তাতে দর্পকের ভয় নেই। স্বয়ং বিধাতার দর্প যে চূর্ণ করতে পেরেছে, দ্বিতীয় বিধাতাকে তার ভয় কোথায়? অমিত দ্যুতি ভাস্করের তেজে যেমন নীহার বিগলিত হয়, তেমনই সে বিগলিত করবে উগ্র তপস্বীকে। ত্রিভুবনে নিরংকুশ তার ক্ষমতা, সে অজেয়।

অজেয়? একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন তীক্ষ্ন খড়্গের মত উদ্যত হয় যেন দর্পকের সম্মুখে। হৃদয়ে একি সভয় কম্পন! কোন্ দূরদিনের একটা স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত জেগে ওঠে তার মনে। ওকি! কিসের বহ্নিশিখা ওই! কল্পান্তের কালানল, কার যেন প্রদীপ্ত ক্রোধ! সুতীব্র গতি, অত্যুগ্র জ্বালা—বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে তারই দিকে। একি প্রচণ্ড দাহ! কোথায় তার দেহ? আগ্নেয় নিঃস্রাবে নিশ্চিহ্ন তার অবয়ব!

শিউরে ওঠে দর্পক। অচক্ষু দৃষ্টি মেলে তাকায় নিজের দিকে। সত্যিই সে দেহহীন, অনংগ। দারুণ বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হয় তার অন্তর। সে কি রাহুর মত কদর্য, কবন্ধের মত কুৎসিত?

আবার ভেসে আসে ঋষিকণ্ঠের সংগীত :

'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।'

দর্পকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, মধুর সংগীত মনে হয় বিষতিক্ত। অসহ্য শ্লেষোক্তি। অসংযত স্বাভাবিক সংযম, বক্র কুটিল হয়ে ওঠে স্মিত হাস্য-রেখা। দেহহীন, সে দেহহীন। সে অনংগ,—অপাণি-পাদ, অচক্ষু, অকর্ণ। দেহহীন একটা সত্তার পিণ্ড—কেবল অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শকাতর। সে কিম্ভূতকিমাকার কিং পুরুষ। নিজের প্রতি ঘৃণায়, ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে ওঠে সে। সংগে সংগে মনের অতলে জাগে পুঞ্জিত প্রশ্ন। কেন এই অভিশাপ? দেহ কি ছিল না তার? দেহ ছিল, অনিন্দ্যসুন্দর দেহ,—রূপ ছিল, ভুবনমোহন রূপ। কেন তবে সে অঙ্গহীন? আনমনা হয়ে যায় মন, আচ্ছন্ন হয়ে যায় মেনকা-বিশ্বামিত্রের কথা। দূর দিনের একটি প্রতিবিম্ব পড়ে মনের মুকুরে। স্তব্ধ হয়ে থাকে দর্পক।

তখন কল্পান্তকাল। চতুর্দিকে অনন্ত শূন্যতা। ব্রাহ্মী নিশার গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন শূন্যতল। নিম্নে সীমাহীন অতলান্ত কারণ-সলিল। প্রচণ্ড বাত্যায় বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা। সেই গর্জনমুখর নিঃসীম কারজলে অধিশয়ান বিরাট

পুরুষ। তাঁর বিরাট দেহে তিরোহিত সমগ্র সৃষ্টি।

বিরাট পুরুষের নাভিকমলে প্রসূত বিধাতা ব্রাহ্মীনিশার অবসানে নয়ন মেলে তাকালেন। ধীরে তাঁর অন্তরে জাগল সৃষ্টির ইচ্ছা। তাঁর অভিধ্যানে ক্রমে প্রকাশিত হল রাত্রিদিবা, সন্ধ্যা, জোৎস্না—প্রকাশিত হল মুখ্যসর্গ স্থাবর-জঙ্গম,—তির্যকস্রোতা পশু, ঊর্ধ্বস্রোতা দেবতাবৃন্দ, অর্বাকস্রোতা মানুষ। কল্পকালে তিরোহিত ঋষি ও মানসপ্রজা, পিতৃগণ ও সিদ্ধচারণগণ ক্রমে আত্মপ্রকাশ করলেন। সুন্দর সৃষ্টি, সুন্দর তার শৃঙ্খলা।

তবুও পরিতৃপ্ত হল না পদ্মযোনি ব্রহ্মার হৃদয়। প্রজাপতি তিনি,—প্রজা তো সৃষ্টি হয়নি তেমন! রাজা আছে প্রজা নেই, আবাস আছে আবাসিক নেই। আছে মানসপ্রজা ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ,—মিথুন সৃষ্টিও হয়েছে অনেক কিন্তু হয় নি আশানুরূপ প্রজাসৃষ্টি।

করুণাঘন কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠল কমলযোনির মানস-কমল। দেখতে দেখতে সৃষ্টি হল আরম্ভ। পুষ্পসম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হল ঋতুরাজ বসন্ত—প্রস্ফুটিত হল রক্তাশোক, দিব্যপাটল, শুভ্র হাসি ছড়িয়ে ফুটে উঠল নবমল্লিকা। বকুলগন্ধে আমোদিত সমীরণ; কান্তিরসের ধারায় অভিস্নাত প্রকৃতি।

সেই মুহূর্তে বিধাতার সকাম সঙ্কল্পে আবির্ভূত হল কমনীয় অথচ তেজস্বী, পূর্ণ যৌবন মনোহর এক মনসিজ পুরুষ অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। সুপুষ্ট, সুঠাম, সুবলিত দেহ—উন্নত গ্রীবা, সুচারু নাসিকা, সুবিশাল নীলনয়ন। সে নয়নে আশ্চর্য দৃঢ়তা। কটি, উরু, জঙ্ঘা—নিটোল, নিখুঁত। বক্ষাভ তার অঙ্গবর্ণ, আরক্ত করদ্বয় ও পদতল যেন সদ্য প্রস্ফুটিত শিশিরধৌত রক্তকমল। হৃদয়-মোহন সে কান্তি দৃষ্টির বিভ্রান্তি।

রূপসজ্জাও তার রূপের অনুরূপ। চাঁচর-কেশে মীনকেতন মুকুট, অঙ্গে বসন্ত পুষ্পের পুষ্পাভরণ। রক্তাশোকের অঙ্গদ, কুরুবকের চূড়া, চম্পক কুসুমের কণ্ঠহার—চরণমঞ্জীর তার মঞ্জুল পুষ্পমঞ্জরী। দেহ-ভরা বকুল গন্ধ। হস্তে তার পুষ্পধনু। পৃষ্ঠে পুষ্পময় তূণীরে অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলোৎপলে নির্মিত পঞ্চ পুষ্প-শায়ক। মদমত্ত গজেন্দ্রের মত পদবিক্ষেপ করে, কমল নয়নে বিভ্রম বিস্তার করে, অঙ্গের বকুল গন্ধে দিঙমণ্ডল সুরভিত করে, দর্পিতের মত সে এসে দাঁড়াল প্রজাপতি বিধাতার সম্মুখে। আশ্চর্য তার প্রভাব। সৃষ্টি সভায় উপস্থিত ছিল যাঁরা—স্বর্গের দেবতা, অন্তরীক্ষের সিদ্ধ-চারণ, মর্ত্যের মানুষ, পাতালের অসুর—মুহূর্তে উন্মথিত হল তাঁদের চিত্তপ্রদেশ। কে এই মনোভব পুরুষ—ভেবে বিস্মিত হলেন দেবসঙ্ঘ, দেখে বিস্মিত হল সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, গন্ধর্ব। অসুরের সুরার নেশা ছুটে গেল, স্বরঙ্গসরী নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেই সুবেশধারী সুন্দর পুরুষের প্রতি। শুধু তাই নয়, সহস্র মিথুন মন্ত্রমুগ্ধের মত সানুরাগে পরস্পরের প্রতি সন্নিহিত হল। সকলেরই হৃদয় সম্মোহিত, নয়নে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

বিলাসিত চরণে দর্পিতের মত বিধাতার কাছে এগিয়ে এল সে, তাকাল সুবিশাল নয়ন মেলে। কণ্ঠে মধুর ঝঙ্কার তুলে বলল: 'জানি না কি আমার নাম—আশ্রয়ই বা কোথায়? আমার নাম ও ধাম নির্দেশ করুন।'
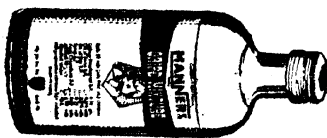
বিধাতা তন্ময় দৃষ্টিতে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন নিজের মনোভাব সৃষ্টির প্রতি, সবিস্ময়ে ভাবছিলেন, 'অহো রূপম্ অহো রূপম্।' প্রশ্ন শুনে সম্বিৎ ফিরে এল তাঁর। নিমেষে হর্ষোদ্ভাসিত হল তাঁর বদন মণ্ডল। সিসৃক্ষু তিনি। কিন্তু ভূরি সৃজনেও পূর্ণ হয় নি তাঁর সৃষ্টি। মিথুন সৃষ্টি হয়েছে, প্রজা সৃষ্টি হয় নি। নারী ও পুরুষের পরস্পর সংসর্গে যে সৃষ্টি সম্ভব, পদ্মসম্ভব বিধাতার ঋতধ্যানে তার প্রকাশ ঘটে নি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন মানসজাত নূতন সৃষ্টির প্রতি, দেখলেন তার অপূর্ব সম্মোহন রূপ, দেখলেন তার মনোমথনকর প্রভাব, দেখলেন চতুর্দশ ভুবনের সানুরাগ চাঞ্চল্য। এই নবসৃষ্টিই নিখিল নরনারীর হৃদয়ে জাগাবে সহর্ষ সৃষ্টি কামনা, কোটি কোটি সৃষ্টির বীজ ছড়িয়ে দেবে মিথুন-সমাজে। তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। সদ্যোজাত সন্তানের নাম নির্দেশ করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন উপস্থিত—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষির প্রতি।

মনস্তত্ত্ববিদ ত্রিকালদর্শী ঋষি। ধ্যানবলে তাঁরা জানলেন বিধাতার অভিপ্রায়। একে একে তাঁরা নামকরণ করলেন অনাগতযৌবন জাতকের। হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন ঋষিপ্রবর মরীচি,—ত্রিভুবনের চিত্ত মথিত করে উৎপন্ন হয়েছ তুমি, মনোমথনকর তোমার প্রভাব। তোমার নাম হোক মন্মথ।'

ষোড়শ প্রজাপতির অন্যতম প্রজাপতি অত্রি সহর্ষে বললেন,—ত্রিলোকের মত্ততা সম্পাদনেও তুমি অদ্বিতীয়—তাই, মদন নামেও অভিহিত হবে তুমি।'

সহাস্যে বললেন প্রজাপতি অঙ্গিরা, 'মুকুট চূড়ায় তোমার মকর প্রতীক, করে কুসুমধনু, আয়ুধ পঞ্চবাণ। তুমি মকরচূড়, কুসুমগন্ধা এবং পঞ্চশর নামে ভুবনবিখ্যাত হবে।'

এতক্ষণ নীরব ছিলেন মহর্ষি ভৃগু। তিনি বললেন, সর্বোপরি তুমি খ্যাতিলাভ করবে কামদেব নামে। তুমি অসাধারণ কামরূপী, কামবীর্যে তোমার একাধিকার, মিথুন-সমাজে সৃষ্টির কামনায় তোমার জন্ম, তুমি মূর্তিমান কাম। পঞ্চশর স্ত্রীপুরুষের মনে কামসঞ্চার করে তুমি সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হবে। কিন্তু অধর্মতনুজ কদর্য কাম থেকে তুমি হবে স্বতন্ত্র। কামে ও কামদেবে নিশ্চয় প্রভেদ থাকবে।

বহু নামে অভিহিত অভিনন্দিত হল মনোভব মদন। প্রজাপতি দক্ষ হৃষ্টচিত্তে তার হাতে সম্প্রদান করলেন স্বীয় মানসকন্যা রতিকে। সর্বাঙ্গ সুন্দরী, অসিতেক্ষণা রতি। এমন পত্নীলাভ করে নিজেকে সে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করল। মনোভব মদনের কিন্তু বিন্দুমাত্র বিকার লক্ষিত হল না ঋষিদের বাচনে কিংবা রতিলাভে। আননে সদর্প এক গাম্ভীর্য, অধরে কেবল স্মিত এক হাসি—যেন বজ্রসূচক বিদ্যুৎ। বিধাতার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বলল,— 'এবার নির্দেশ করে দিন আমার আশ্রয়স্থল।'

'তোমার আশ্রয়স্থল?'—মুহূর্ত দ্বিধা না করে ঘোষণা করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা,— 'চতুর্দশ ভুবনেই তোমার অবাধ অধিকার বিস্তৃত হবে, হে মন্মথ! পাতালে, মর্ত্যে, স্বর্গে তোমার গতি হবে অনিরুদ্ধ। ইচ্ছা করলে তপোলোকেও আশ্রয় নিতে পারবে তুমি, মুনি-মানসেও তোমার সঞ্চরণে বাধা থাকবে না। এমন কি সত্যলোকেও—

কি ভেবে একটু থামলেন বিধাতা পুরুষ। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর প্রতি তাকিয়ে আছে সিদ্ধ-চারণ, তাকিয়ে আছে তপোঋদ্ধ ঋষিবৃন্দ। বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও সোৎকণ্ঠ দৃষ্টি, শুষ্ক তাঁদের কণ্ঠৌষ্ঠ। ব্রহ্মা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বলে চললেন তিনি,— 'এমন কি সত্যলোকেও—বিষ্ণুলোক কিংবা মহেশ্বরলোকেও ক্ষুণ্ণ হবে না তোমার গতি। এই যে সৃষ্টিকর্তা আমি, যাঁর হৃদয়ে সৃষ্টির তপস্যা, বাক্যে যাঁর অস্খলিত সত্য,—সেই আমাকেও সম্মোহিত করবার ক্ষমতা তোমার থাকবে।'

নীরব হলেন কমলযোনি প্রজাপতি। বিধাতার বাক্যে মদন উল্লসিত হল, শাস্ত্রিক দর্পে আত্ম-অহংকারও হল ভয়ঙ্কর। আলোহিত আননে মদোদ্ধত উল্লাসের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল কি না, বোঝা গেল না—কেবল একটা সদাপ টঙ্কার জাগল তার পুষ্পধনুতে। সে টঙ্কারে ভুবন মোহিত হল, মিথুন সমাজ হল বিহ্বল। কোমলাঙ্গী নারী কম্পিত কলেবরে বিবশার মত আলিঙ্গন করল পুরুষকে। নিবিড় কামনার সে আলিঙ্গনে পুরুষ অবশ হল,— দূরে গেল তার পৌরুষ। মুনিমানসও চঞ্চল হয়ে উঠল, সর্বাঙ্গে শিহরণ। অবশ আবেশ সঞ্চারিত হল বিশ্বলোকে।

এই মদ-বিহ্বলতায় শুধু স্থির রইলেন কমলযোনি ব্রহ্মা, জিষ্ণু বিষ্ণু আর যোগীশ্বর মহেশ্বর। বিশুদ্ধ, স্থিতধী তাঁরা। মোহাতীত অকম্প তাঁদের মানস, নিশ্চল দৃঢ়তা।

ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হল মদন। ভয়ঙ্কর তার দর্প। ব্রহ্মার বরে সে অজেয়

অব্যর্থ তার শক্তি। ত্রিভুবন মোহিত, তাপিত, স্তম্ভিত তার ধনুর টঙ্কারে। কিন্তু অবিচলিত কেন এই ত্রিমূর্তি? অক্তের কি সৃষ্টিকর্তা? মিথ্যা কি সত্য-মূর্তি বিধাতার বাক্য?—তার সকাম আক্রোশ গিয়ে পড়ল পদ্মসম্ভব ব্রহ্মার উপর।

দর্পভরে সে তূণ থেকে তুলে নিল পুষ্পময় পঞ্চশর। অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা আর নীলোৎপলে নির্মিত পঞ্চশায়ক—সম্মোহনে উন্মাদনে, শোষণে, তাপনে, স্তম্ভনে যারা দ্বিতীয় রহিত। শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই—সত্য কিনা কমলযোনি ব্রহ্মার বাক্য, মদন স্মিতহাস্যে ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল সেই কুসুমশর। পলকে প্রমাদ সৃষ্টি হল ব্রহ্মার মনে। প্রথম সম্মোহিত হলেন তিনি। মুগ্ধ হৃদয়, মুগ্ধ দৃষ্টি, অবশ সর্বাঙ্গ। পর মুহূর্তেই অনুভব করলেন অস্থির উন্মাদনা। বিঘূর্ণিত মস্তক, মনে মাদকতা, দেহে বিদ্যুৎ শিহরণ। শোষণবাণে লোক পিতামহের বক্ষ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত বিশুষ্ক হয়ে গেল; রসনা, ওষ্ঠাধর হল শুষ্ক মরুর মত পিপাসিত। সঙ্গে সঙ্গে তাপন নামক তীরের প্রভাবে দেহে সৃষ্টি হল অসহ্য জ্বালা। সুতীব্র উত্তাপ—যেন কোটি সূর্যের দাহন। স্তম্ভন শায়কে স্তম্ভিত হলেন পদ্মসম্ভব—বিভ্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি, লুপ্ত সত্যের তপোবল।

সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন চিরস্থির-কান্তি সর্বশুক্লা সরস্বতী। তিনি ব্রহ্মার অঙ্গজ সন্তান। হতচেতন, কামমোহিত ব্রহ্মা মুহূর্তে কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিস্মৃত হলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত কামার্ত হয়ে কন্যা বাণীর প্রতি ধাবিত হলেন তিনি: চোখে উদগ্র লালসা, বক্ষে উত্তেজনা, দেহে স্বেদকম্পন। সরস্বতী সভয়ে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করলেন। বুভুক্ষু রাহুর মত ছুটে চললেন ব্রহ্মা।

কামপীড়িত প্রজাপতির ভ্রান্তি দেখে উচ্চ ব্যঙ্গ হাস্য করে উঠলেন বিষ্ণু-মহেশ্বর। নিয়মের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় দেখে মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্র করজোড়ে নিবেদন করলেন সবিনয় বচন, 'শান্ত হোন, শান্ত হোন পিতা! বশাত্মা বিকারহীন পুরুষ আপনি, আপনি কন্যাগমনে উদ্যত। একাজ ধর্ম-বিরুদ্ধ। আপনার মত সত্যসন্ধী পুরুষের পক্ষে কাম-নিগ্রহে এরূপ কাতর হওয়া অশোভন, বিশেষত এ কামনা অসামাজিক, সৃষ্টি শৃঙ্খলার ব্যভিচারী।'

আত্মপুত্রদের বিনয়নম্র কুশল বচনে সম্বিৎ ফিরে পেলেন প্রজাপতি। লজ্জায় আনত হ'ল তাঁর মস্তক। ছিঃ ছিঃ কি করছেন তিনি! কামমোহিত হয়ে স্বীয় কন্যার প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মার লজ্জা দেখে কৌতুক বোধ করলেন মহেশ্বর। উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করে উঠলেন তিনি। বিধাতা পুরুষের লজ্জা এবার পরিণত হল ক্রোধে। ললাট-ফলক হল ভ্রূকুটি-কুটিল, কণ্ঠে ধ্বনিত হল বজ্রনাদ। মদনকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি,—'দর্পিত কাম, সনাতন সৃষ্টি পত্তনের জন্য আমার সংকল্প থেকে উৎপন্ন হয়েছ তুমি। প্রীতিমুগ্ধ হয়ে আমি সর্বলোকে তোমার আশ্রয় নির্দেশ করেছি, তোমাতে সঞ্চার করেছি অমোঘ শক্তি। কিন্তু আত্মদর্পে স্ফীত হয়ে তুমি কামশর নিক্ষেপ করেছ আমার প্রতি। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে।'

শঙ্কিত দেবসঙ্ঘ, কম্পিত সমগ্র সমাজ। আতঙ্কে শিউরে উঠল রতির হৃদয়। না জানি কি অঘটন ঘটে আজ! কিন্তু নির্ভীক মদন। স্থির কঠিন দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে রইল বিধাতার প্রতি। বজ্রস্বরে প্রচারিত হল বিধাতার অভিশাপ,—'চন্দ্রে কলঙ্কের মত, তোমার ভুবন-মোহন সৌন্দর্যে কলঙ্ক-চিহ্নরূপে জেগে থাকবে কদর্য কামনার কুটিলতা। প্রেমের অধিদেবতারূপেই সৃষ্টি করেছিলাম তোমাকে, অধর্মজ কাম থেকে তুমি ছিলে স্বতন্ত্র। আজ থেকে অধর্ম-প্রভব কামের কলঙ্কও তোমাকে বহন করতে হবে। গুরুতল্প গমনাদি ব্যভিচারী কামনার প্রেরকরূপে সমাজে নিন্দিত, ধিক্কৃত হবে তুমি। দণ্ডধরের দণ্ড ভীষণ শাস্তিরূপে আপতিত হবে কাম বিকারগ্রস্ত প্রেমে।'

একটু থামলেন বিধাতা পুরুষ, আননে নয়নে রোষের অরুণিমা। নিস্তব্ধ সমগ্র সৃষ্টি, আতঙ্কে যেন চক্ষু মুদ্রিত করেছে চতুর্দশ ভুবনের জীব। ঝটিকার সূচনা হয়েছে, এবার হবে বজ্রপাত। ভয়ার্দিত সৃষ্টিতে তারই শঙ্কাকুল প্রতীক্ষা। কিন্তু অবিচলিত দর্পিত মদন। নিরাতঙ্ক তার হৃদয়, চোখে সুকঠিন দীপ্তি, উদ্ধত অপূর্ব দেহভঙ্গী।

বজ্র পতিত হ'ল। সরোষে বললেন ব্রহ্মা, 'হে দর্পান্ধ মন্মথ, যে দর্পে আত্মহারা তুমি, যে দর্প লুপ্ত করেছে তোমার লঘু-গুরু বিচারবুদ্ধি সে দর্প চূর্ণ হবে তোমার। ত্রৈলোক্য-মোহন তোমার রূপ—অঙ্গ-কান্তির গৌরবে তুমি আত্মহারা। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, কপর্দীর রুদ্ররোষে সেই রূপ, সেই অঙ্গ ভস্মীভূত হবে। চারুঙ্গ তুমি, তুমি হবে অঙ্গহীন, অনঙ্গ।'

ব্রহ্মার অভিশাপে বেদনাতুর হ'ল সৃষ্টি। মনোভাবের জন্মক্ষণে জেগেছিল যে আনন্দ-বিহ্বলতা, তা পূর্ণ হল অশ্রু-উচ্ছ্বাসে। শোকে ভেঙে পড়ল মদনপ্রিয়া রতি। তার দুনয়নে নামল বাদলের অশ্রান্ত ধারা, কণ্ঠে রণিত হল করুণ উতরোল। রতি-বিলাপের মূর্ছনায় মূর্ছিত হল জীবকুল।

সতী অরুন্ধতীর নয়ন ছলছল, ম্লান সাধ্বী অনসূয়ার বদন-কমল। দর্পিত মদন মর্মাহত হল, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হল না তার দর্প। বিধাতাকে লক্ষ্য করে অকম্পিত কণ্ঠেই বলল সে,—'আমাকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয়নি বিধাতার। রুষ্ট হয়েছেন লোক-পিতামহ—অবশ্য কারো তুষ্টি বা রুষ্টি নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমি নিরপরাধ।'

মদনের স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হলেন প্রজাপতি ঋষিবৃন্দ, স্তব্ধ হয়ে রইলেন উর্ধ্বস্রোতা দেবতা-সমাজ। ব্যর্থ কামনায় বিক্ষুব্ধ ব্রহ্মা উচ্চৈস্বরে গর্জন করে উঠলেন,—'কি! নিরপরাধ!'

'নিরপরাধ বই কি?'—শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল দর্পিত কুসুমধন্বা,—'আপনার বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার জন্যই আমি আপনার প্রতি শরাঘাত করেছি; প্রমাণ পেয়েছি, সত্য বিধাতার বাক্য, তিনি সত্যের বজ্রমূর্তি। কিন্তু আমার এ কার্য আপনার ক্রোধোদ্রেক করবে—এ ছিল আমার ধারণার অতীত। পরীক্ষা দ্বারাই গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র বা শিক্ষার ফলাফল নির্ণয় করা হয়। পুত্রের সাফল্যে পিতা আশীর্বাদ করেন না, অভিশাপ দেন—এ অভিজ্ঞতা হল এই প্রথম।'

নীরব হল মন্মথ, নীরব নিখিল ভুবন। বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে গেছে কলমুখর সৃষ্টি। চমৎকৃত হলেন বিধাতা পুরুষ, 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্'—এ বিধান তো বিধিরই! তুষ্ট হলেন তিনি মানসপুত্র মদনের দৃঢ়তা দেখে। কিন্তু প্রদত্ত অভিশাপ জ্যা-মুক্ত তীরের মত, একবার নিক্ষিপ্ত হলে প্রত্যাহৃত হয় না। আন্দোলিত হল চিত্তপ্রদেশ। বিধাতার কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তা দেখে আবার হাসা করে উঠলেন মহাদেব। সে বিদ্রূপহাস্য মদনের শরাঘাতের মতই জ্বালাকর। একদিকে দর্পিত পুত্রের দৃঢ়তা, অন্যদিকে কপর্দীর হাস্য-কটাক্ষ। অশেষ দম্ভ মহেশ্বরের! স্নেহের আশীর্বাদছলে মদনকে উদ্দেশ্য করেই বললেন বাক-চতুর ব্রহ্মা, কিন্তু লক্ষ্য হলেন বিদ্রূপকারী মহেশ্বর: 'তোমার দৃঢ়তা দেখে তুষ্ট হয়েছি আমি। প্রশংসনীয় তোমার দর্প। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার আর এক নাম হবে দর্পক। নিখিল সৃষ্টিতে সকলের দর্পনাশেই তুমি সমর্থ হবে। এমন কি, যোগসর্পে দর্পিত যে কপর্দী, তাঁরও দর্প চূর্ণ করতে সমর্থ হবে তুমি। ব্যর্থ হবে না আমার আশীর্বাণী। যোগীশ্বর মহেশ্বরের দর্প চূর্ণ করে জগতে তুমি কন্দর্প নামে বিখ্যাত হবে।'

বিমর্ষ হলেন মহেশ্বর, তাঁর ললাটস্থ অর্ধচন্দ্র হল দীপ্তি-ম্লান। পরিতৃপ্ত হলেন প্রজাপতি, প্রশংস দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন, গ্রীবভঙ্গাভিরাম দর্পোদ্ধত দর্পকের প্রতি। এমন ত্রৈলোক্যোন্মাদক অঙ্গ, তাঁর অভিশাপে অঙ্গহীন হবে ভেবে, করুণার্দ্র হল তাঁর অন্তর। শান্তকণ্ঠে তিনি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করলেন: 'রুদ্ররোষে অঙ্গহীন হলেও ক্ষোভের কারণ নেই তোমার। হে কন্দর্প! শম্ভু তোমার দেহ হরণ করলেও বল হরণ করতে পারবেন না। ত্রিভুবনে তুমি হবে অবার্যবীর্য, অপ্রতিহত হবে তোমার বজ্রসার পুষ্পশরের লক্ষ্য। প্রজাসৃষ্টির কামনা ব্যর্থ হবে না আমার। অপাণি হয়েও তুমি প্রহর্তা হবে, অপদ হয়েও সর্বত্র অব্যাহত থাকবে তোমার গতি। অলক্ষ্যচারী হয়ে তুমি তোমার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করবে ত্রিভুবনে। সৃষ্টির প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী হবে তোমার অব্যর্থ পঞ্চশরের অধীন।'

অদূরে দাঁড়িয়েছিল অধর্মপুত্র কাম। সহসা বিধাতার দৃষ্টি পড়ল তার প্রতি। কদাকার দেহ, লালসা-কুটিল জঘন্য দৃষ্টি, বিকৃত বক্রগতি। ব্যভিচারী কামনার প্রেরক সে। শিউরে উঠলেন বিধাতা! ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি এই কদর্য কুটিল কাম-কলঙ্কে অভিশপ্ত করেছেন মনোভব মন্মথকে? ভুবনমোহন যার রূপ, প্রেমের যে অধিদেবতা, সনাতন সৃষ্টির যে প্রবর্তক, সেই নিষ্কলঙ্ক অহীনদ্যুতিকে মসীলিপ্ত করেছেন তিনি। কাম আর প্রেমকে তিনি করেছেন একাকার!

অনুশোচনায় কাতর হলেন বিধাতা পুরুষ। মনসিজ মদনের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। শান্তস্বরে তিনি বললেন, 'তুমি দুঃখিত হয়ো না দর্পক! কামনায় ভ্রান্তচিত্ত আমি, রোষাবিষ্ট হয়ে কাম-কলঙ্কের ভার বহনের অভিশাপ দিয়েছি তোমাকে। কামের কদর্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেও, আমি বলছি, কাম ও প্রেমে স্বাতন্ত্র্য থাকবে। গুরুতল্প গমনরূপ ব্যভিচারী-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই কাম, কিন্তু তুমি হবে প্রেমের অধিদেবতা। নিঃস্বার্থ, সহর্ষ প্রেম। কামগন্ধহীন, অতীন্দ্রিয় প্রেমের সেই সুধাপাত্র অদৃশ্য হস্তে তুমি নিখিল বিশ্বের নরনারীর অধরে তুলে ধরবে, তোমার অলক্ষ্য পদসঞ্চারে বেজে উঠবে শব্দ, সত্যময় সৃষ্টির সুর। কাব্যে ও শিল্পে থাকবে তোমারই অগ্রাধিকার। নন্দনতত্ত্বে তুমিই হবে মূর্তিমান শৃঙ্গার, আদিরসের অধিদেবতা। হে অতনু, তনুহীন হয়েও অখিল ভুবনে তুমিই জাগাবে নব নব রোমাঞ্চ: কল্প-কলায় ছন্দিত হবে তোমার জয়গাথা। লোকে তোমাকে নমস্কার করবে এই বাক্যে,—

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান
যো জনে জনে।
নমোঽস্তু-অবার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

নীরব হলেন লোক-পিতামহ। নীরবে সভাভঙ্গ হল। দর্পিত বঙ্কিমভঙ্গীতে ভুবনমোহন রূপের বিভা বিস্তার করে, রতিকে সঙ্গে নিয়ে, নীরবে বিধিনির্দিষ্ট কার্যে অগ্রসর হল দর্পক মদন। অভিশাপে বা আশীর্বাদে সমান তার মনোভাব।

বিধাতার অভিশাপ ব্যর্থ হয় নি। রুদ্র-রোষে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মদন। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করেছিলেন পতিব্রতা সতী। সতীশোকে উন্মত্ত ভৈরব মৃতাপত্নীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন ত্রিভুবন। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর অঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল একান্নটি পীঠস্থান। তারপর আত্মভোলা যোগীশ্বর হিমালয়ের সানু-দেশে কল্পান্তব্যাপী ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। তখন তারকাসুরের প্রতাপে উপদ্রুত স্বর্গলোক। তারক-নিধনে প্রয়োজন হয়েছিল 'কুমারসম্ভব'। সতী জন্ম নিয়ে-ছিলেন হিমরাজগৃহে কন্যা পার্বতীরূপে। তাঁর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে যে কুমার সম্ভব হবে, তিনিই হবেন তারক-নিহন্তা। নিরুপায় ইন্দ্র বিধাতার নির্দেশে মদনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। যোগীশ্বর মহেশ্বর। তাঁর তপোভঙ্গ করতে হবে, তাঁকে আকৃষ্ট করতে হবে পার্বতী গৌরীর প্রতি। এই কঠিন কর্মেই ব্রতী হয়েছিল দর্পক মন্মথ। যোগীশ্বর মহাদেব যখন নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মত ছিলেন ধ্যান-নিলীন, আর

পুষ্পাভরণে সজ্জিতা গৌরাঙ্গী গৌরী যখন নতজানু হয়ে প্রণাম করছিলেন সেই যোগী-বরকে, তাঁর বক্ষোলগ্ন চীনাংশুক হয়েছিল ঈষৎ শিথিল, সেই মুহূর্তে হিমালয় প্রস্থে অকালবসন্তের উদয় হয়েছিল, মদনের ক্রিয়া চলেছিল অলক্ষ্যে। জিতেন্দ্রিয় মহাদেব নয়ন মেলে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও বিন্দু-মাত্র বিকারগ্রস্ত হয়নি তাঁর অন্তর। সহসা মদন-কৌশলে পার্বতীর কেশস্থিত কর্ণিকার ভূমিতলে স্খলিত হল, মহাদেবের দৃষ্টি ক্ষণ-মাত্র নিবদ্ধ হল পার্বতীর প্রতি, আর সেই মুহূর্তে কন্দর্প সুযোগ বুঝে কুসুম-চাপে যোজনা করল পুষ্পশর। হিমনন্দিনী উমার চারু অঙ্গলতিকা অকস্মাৎ রোমাঞ্চিত হল, লজ্জায় তিনি অবনত করলেন লজ্জারুণ বদন। যতাত্মা মহাদেব ঈষৎ চঞ্চল হলেন, যেন চন্দ্রোদয়ে ঈষৎ চঞ্চল হল সাগরের অম্বুরাশি। হিমরাজ-কন্যার অনিন্দ্য অঙ্গ-লাবণ্য যেন চকিতে চমক সৃষ্টি করল বিরূপাক্ষের নয়নে। বিরক্ত হয়ে তিনি আকস্মিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ নির্ণয় কর-বার জন্য চতুর্দিকে বিস্তার করলেন তাঁর রোষ-রক্ত নয়ন, দেখলেন, অদূরে অলক্ষ্যে রয়েছে 'চক্রীকৃতচারুচাপ' শরনিক্ষেপোদ্যত মদন-কৌশলে পার্বতীর কেশস্থিত কর্ণিকা হলেন রুদ্র। ললাটস্থ নেত্রে ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল ভীষণ বহ্নিশিখা। সন্ত্রস্ত মদন—'ক্রোধ সংবরণ করুন'—বলার পূর্বেই নয়ননিমেষে রুদ্রের নয়নাগ্নিতে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে গেল দর্পক মন্মথ, শুধু পড়ে রইল একটি নিষ্প্রাণ ভস্মের স্তূপ।

সেই দগ্ধ ভস্মস্তূপ আবার প্রসন্নাক্ষ বিরূপাক্ষের অনুগ্রহে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু সে প্রাণময় একটা সত্তামাত্র, অনু-ভূতিপ্রবণ কিন্তু দেহহীন—ক্রিয়াশীল, কিন্তু অপাণিপাদ। অনঙ্গ নামের কলঙ্ক ঘোচেনি অতনুর।

স্মৃতির ছায়াছবি মুছে যায়। বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদে উদাস দৃষ্টি মেলে খানিক স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অনঙ্গ। ঋষিকণ্ঠে তখন নীরব হয়ে গেছে 'অপাণিপাদো' মন্ত্রের কলি। কিন্তু এখনও যেন ঘণ্টাধ্বনির শেষ অনুরণনের মত তার রেশ ছড়িয়ে আছে তপোবনে; এখনও যেন ঘোষণা করছে অনঙ্গ নামের কলঙ্ক। সহস্র বৃশ্চিকদংশন অনুভব করে দর্পক।

মুহূর্তে প্রদীপ্ত হয় সেই দর্প, দেখা দেয় স্মিত হাস্যরেখা। হ্যাঁ, 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' স্বয়ং অনঙ্গ। তার প্রমাণ এবার দেবে সে। দৃঢ় সংকল্পে প্রস্তুত হল অব্যর্থবীর্য দর্পক। অলক্ষ্যে থেকে তপোমগ্ন বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করে চাপে শর যোজনা করল সে। দুঃসার তার পুষ্প-শর, অতিশয় কোমল—অতীব কঠিন।

মিত্রের ইচ্ছা বুঝতে পেরেই ক্রিয়াশীল হল মদন-সখা ঋতুরাজ। সহসা আরক্ত হয়ে উঠল পুষ্করতীর্থের অরণ্যভূমি। মধ্য বসন্তের রক্তিমা ছড়িয়ে পড়ল স্থলে—অশোক-পাটলের বক্ষে; ছড়িয়ে পড়ল জলে—অরবিন্দ-দলে, যেন বনলক্ষ্মীর অঙ্গধৌত অলক্তরাগ। মুহূর্তে সমীরিত হল বনভূমি, নিষ্পন্দ অরণ্যে জাগল বিহঙ্গের সঙ্গীত-স্পন্দন। অদ্ভুত প্রাণ-চেতনায় পূর্ণ হয়ে উঠল অচেতন পদার্থ।

ধ্যানমগ্ন কৌশিকের অন্তর হল চঞ্চল। ব্রহ্মধ্যানের একতানতা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর একটি সুগভীর সুরঝঙ্কারে। তাঁর নিমীলিত নয়ন ধীরে উন্মীলিত হল, যেন প্রথম প্রভাতে পাঁপড়ি মেলে বিকশিত হল একটি নীলপদ্ম। বিমোহিত অন্তর, বিমোহিত নয়ন। বনভূমিতে আজ প্রাণের একি চঞ্চল লীলা! পুষ্পিতা লতিকা আবেশে জড়িয়ে ধরেছে মহীরুহের কণ্ঠ-দেশ—প্রিয়তমা যেন কণ্ঠলগ্ন হয়েছে প্রেমিকের; বিনম্রশাখ তরু আনত হয়ে যেন চুম্বন করছে দয়িত ধরণীর রোমাঞ্চিত অঙ্গ; চূত-মঞ্জরীতে প্রণয়ের পূর্বরাগ। ভ্রমরপংক্তি, পক্ষিকুল, মৃগ-কদম্ব, চক্রবাক-মিথুন আজ বিলাস-চঞ্চল। পুষ্পে পুষ্পে মধুপের মধুর গুঞ্জন, শাখায় শাখায়-পক্ষিকুলের সুমিষ্ট কাকলি, মৃগ কণ্ডূয়ন করছে মৃগের গাত্র। গুঞ্জনে, কূজনে, কোল-কলোচ্ছ্বাসে মুখরিত ঋষির তপোভূমি।

শুধু এই দেখেই ক্ষান্ত হলেন না ঋষি। সম্মুখে দেখলেন বিশ্ববিমোহিনী কামিনী। অপরূপ রূপ, চারু অঙ্গে [illegible] তরঙ্গ, নয়নে মোহময় আকর্ষণ। শিথিল তার কটিমেখলা, অর্ধমুক্তবক্ষোবসন সাভিলাষ হাস্য-লাস্য। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সানুরাগ দৃষ্টি মুহূর্তে নিবদ্ধ হল মোহিনীর চারু অঙ্গে।

সেই মুহূর্তে অনঙ্গ নিক্ষেপ করল তার উন্মাদন শর। বিদ্যুত-তরঙ্গ খেলে গেল ঋষির শোণিত কণায়। স্থিতধী চঞ্চল হলেন মদন-চাঞ্চল্যে। মদমত্তের মত সিদ্ধাসন ত্যাগ করে কম্পিত পদে তিনি অগ্রসর হলেন মোহিনী মেনকার প্রতি। কাম-মোহিত বিহ্বল বিশ্বামিত্র। তাঁর নয়নে রুদ্রের রোষারুণ নয়, অনুরাগের স্নিগ্ধ দীপ্তি।

বিজয়ী দর্পক। অন্তরে তার বিজয়ের দৃপ্ত উল্লাস, বাইরে প্রকাশিত দর্পিত স্মিত এক বক্রকুটিল হাসি। গর্জমুখর ঊর্মিমুখে শুভ্রফেনার মত ক্ষণদীপ্ত সে হাসি যেন দর্পভরে ঘোষণা করল, 'কোথায় বিশ্বা-মিত্র, দর্পিত রাজর্ষি? বিলুপ্ত ধৈ[illegible] দ্বিতীয় বিধাতা, যেন চন্দ্রোদয়ে চ[illegible] প্রশান্ত সাগর! কোথায় বিশ্বা[illegible]র অর্বাচীন শিষ্যবৃন্দ? তারা [illegible]ক, অপাণিপাদ দর্পকের দর্পদীপ্তি। অ[illegible] সে, কিন্তু অপরাজেয় তার বিক্রম। [illegible]শরীর রুদ্ররোষ তার অঙ্গ দগ্ধ করেছে, দগ্ধ করতে পারেনি তার শক্তি। বিধাতার আশীর্বাদে চির-অম্লান তার দর্প।'

বিজয়গৌরবে অলক্ষ্য পদবিক্ষেপ করে অগ্রসর হল অনঙ্গ-দর্পক। তখন মেনকার বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হয়েছেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, যেন রাহুগ্রাসে গ্রস্ত হয়েছেন দীপ্ত দীধিতি, যেন উত্তরঙ্গ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে ধরা দিয়েছে বেলা-ভূমির বলয়বেষ্টনে।

দর্পকের এই দর্প আজও বিশ্বভুবনে এমনি অপরিম্লান। নিখিল নরনারীর অন্তরে অব্যর্থ তার শরসন্ধান। সত্য হয়ে আছে যেমন বিধাতার আশীর্বাদ, তেমনি সত্য হয়ে আছে তাঁর অভিশাপ। প্রেমে ও নন্দনত্বে দর্পকের অগ্রাধিকার বিস্তৃত হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যভিচারী কামনার কলঙ্ক আজও তাকে বহন করতে হয়। সনাতন সৃষ্টিতে তির্যক কাম-কন্দর্প ধিক্কৃত হয়, নিন্দিত হয়, তবু লজ্জিত বা নিষ্ক্রিয় হয় না দর্পিত দর্পক। ত্রিভুবনে অপরাজেয় তার হৃদয়-প্রমাথী বিক্রম।*

* (১) কালিকা পুরাণ ১, ২, ৩
(২) রামায়ণ বালকাণ্ড ৬৩ সর্গ

জনসেবায় সাহিত্য

প্রতিমা সেনগুপ্ত

মানুষের জীবনে তিনটি চাহিদা আছে। একটি তার দেহের চাহিদা, একটি মনের ও অপরটি আত্মার চাহিদা। দেহের প্রয়োজন মেটে খাদ্যে, মনের প্রয়োজন মেটে আনন্দে আর আত্মার চাহিদা মেটায় জ্ঞান। এই তিন রকম প্রয়োজন মিটিয়ে জনসাধারণের সেবা করা চলে। প্রথমটি মানুষের স্থূল প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের দিক থেকে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, অপর দুটি প্রয়োজন সূক্ষ্ম প্রয়োজন, এ কেবল মানুষেরই আছে। মানুষের এই সূক্ষ্ম প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই সাহিত্যের সৃষ্টি। মানুষ যে কাপড় কেনে, তার পেছনে রয়েছে প্রয়োজনের তাগিদ, সে নৌকা প্রস্তুত করে, তার মূলে প্রেরণাও প্রয়োজন। এ ধরনের শিল্পকলাকে বলা হয় কারুকলা। কিন্তু পেটের খিদে মেটানোই এর উদ্দেশ্য, অন্তরের ক্ষুধা মেটানোর শক্তি এদের নেই। কিন্তু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য এগুলি দৈনন্দিন প্রয়োজনের উপরে থেকে মানুষের অন্তরের নির্মল আনন্দের সঞ্চার করে। অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয় থেকেই সাহিত্যের জন্ম। Oscar Wilde বলেন, "The only beautiful things are things that do not concern us." সৌন্দর্য প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে চলে না, এইরূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত সৌন্দর্যের সঙ্গেই মানুষের অন্তরের যোগ, আনন্দের যোগ অনুভব করে।

কিন্তু সত্যই কি সাহিত্যের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই, কেবল অপ্রয়োজনের আনন্দেই সাহিত্যের সৃষ্টি? আমরা যদি সাহিত্যের সংজ্ঞাকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব সাহিত্য একদিকে যেমন জনসাধারণের মনে আনন্দ দান করে, তেমনি অপর দিকে তার জ্ঞানের খোরাক জোগায়। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নানান দিকে জ্ঞান লাভ করে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী হয় প্রসারিত ও উদার। এইভাবে তার আত্মার উন্নতি সাধিত হয়।

যুগে যুগে সাহিত্যিকেরা তাদের সৃষ্টি দ্বারা জনসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যুগ-প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। মধ্যযুগে, অর্থাৎ ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসাধারণের মনে ধর্মের পিপাসাই ছিল প্রবল। সেজন্য বৈষ্ণব-সাহিত্য, চৈতন্য-চরিত সাহিত্য, মংগলকাব্য প্রভৃতি সাহিত্য দ্বারা সে যুগের নরনারী মনের খোরাক পেয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি খুলেছিল, উদার ধর্মপথের সন্ধান পেয়ে তাদের আত্মার কল্যাণও সাধিত হয়েছিল। এইভাবে মধ্যযুগে মানুষের আত্মার উন্নতি সাধন করে সাহিত্যিকেরা জনসেবা করে গেছেন।

এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত হল। তখন সাহিত্যে দেবতার পরিবর্তে মানুষের স্থান হল। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে নতুন এক আদর্শের প্রবর্তন করলেন। এই মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন। শ্রীমধুসূদন তাঁর রাবণ, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের এক নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ নতুন করে চিনল নিজেকে। শিখল রাজসিংহ, প্রতাপের স্বজাতি-প্রীতি, চন্দ্রশেখরের নিষ্ঠা, ইন্দিরা, রাধারাণীর প্রেম,

প্রফুল্লের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সদানন্দ, ভবানন্দের দেশপ্রেম। এভাবে তৎকালীন সাহিত্যে মানুষের সামনে বিভিন্ন আদর্শ তুলে ধরে জনসাধারণের মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধনের ভার নিয়ে জনসেবা করে গেছেন তৎকালীন সাহিত্যিকেরা। এজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যকে আদর্শবাদী সাহিত্য বলা যায়, অর্থাৎ তখন সাহিত্যে মানুষের জীবনের বিভিন্ন আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে। তাই এ সাহিত্যে মানুষ জ্ঞানের খোরাকই পেয়েছে।

এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাহিত্যের আসরে এলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এঁরা সাহিত্যে জীবনের আদর্শকে অবহেলা করলেন না, পরন্তু জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত, কেবল সেকথা না বলে কিভাবে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে, তাও দেখালেন। এর মধ্যে ভাল, মন্দ, উচিত, অনুচিত, দুই-ই স্থান পেয়েছে। কিন্তু কেবল বাস্তব জীবনকে তার নিজস্ব রূপে প্রকাশ না করে, লেখক তাকে "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" এক শিল্পরূপে প্রকাশ করলেন। একথা অনস্বীকার্য যে দর্শন আর মনের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপরেই সাহিত্যের সার্থকতা নির্ভর করে।

সার্থক সাহিত্য মানুষের মনে আনন্দ দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে মানুষ যে শুধু নিজেকে চিনেছে, তা নয়। এর থেকে সে এক অনাস্বাদিত আনন্দ পেয়েছে। যা কেবল অবসর বিনোদনেই কাজে লাগে না, এই আনন্দ তাকে দৈনন্দিন জীবনেও প্রেরণা দান করে। এইভাবে সাহিত্য দ্বারা আনন্দ দান করে, মানুষের মনের খোরাক জুগিয়ে জনসেবা করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মনের খোরাকের প্রয়োজনীয়তা কি! এর উত্তরে বলতে পারি যে, মানুষ তাকেই বলি যার মনে হুঁশ আছে, অর্থাৎ মনের চেতনা না থাকলে মনকে সঞ্জীবিত, উৎফুল্ল রেখে সংসারে চলতে না পারলে সে মানুষ আদিম মানুষ থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। দেহের খাদ্য পশুও জোগায়, কিন্তু মানুষের মনের খাদ্য জুগিয়ে তার মনকে সঞ্জীবিত করবার ভার নিয়েছে সাহিত্য। আর সাহিত্যের এই দায়িত্বই সবাপেক্ষা গুরুতর ও প্রয়োজনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা সব কালের সাহিত্যকেই বিচার করতে পারি। সাহিত্য দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ। যে সাহিত্য মানুষের মনে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে যেতে পারবে, সে সাহিত্যই জনসেবার দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম, এ সাহিত্যও অমর—শাশ্বত মর্যাদায় এ সাহিত্য মহীয়ান্। চেনা দৃষ্টি, অভ্যাসের একঘেয়েমি বা সাধারণের উদাসীনতা থেকে জগৎকে উদ্ধার করে আনন্দলোকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল কবি বা সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য। চিত্রকর যেমন পট ও তুলির সাহায্যে চেনা দৃশ্যকেই এক নতুন রূপে দেন, সাহিত্যিক তেমনি বাক্যের সাহায্যে মনের জড়ত্ব ঘোচান। সাহিত্য যখন নির্মল আনন্দ দান করে মানুষের মনের গ্লানি কাটিয়ে দিতে পারে, তখন সাংসারিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে মানুষ তার মনের প্রশান্তি ফিরে পায় এবং এই বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত চিত্তেই সেই পরম পুরুষের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যে সাংসারিক আবিলতা মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, সাহিত্য তাকে মুক্ত করে উজ্জ্বল দীপ্তি দান করে। তখন পরমানন্দময়কে মানুষ চিনতে পারে। তিনিও ভক্তের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাই যখন দেখেন ক্ষেত্র হয়েছে প্রস্তুত তখনই তিনি মানুষের মনের নির্মল অভিগমনে এসে বলতে পারেন, "অহমস্মি ভোঃ"—আমি এসেছি, আমাকে ডেকে নাও তোমার মনের অভিগমনে। সেজন্য সাহিত্য যেমন নির্মল আনন্দ দান করে মানুষের মনের খোরাক জুগিয়ে মনকে আনন্দিত করে, তেমনি অপর দিকে তার আত্মার দৃষ্টিও প্রসারিত করে। সেজন্য জনসেবার দিক থেকে সাহিত্যের দায়িত্ব গুরুতর।

উপসংহারে আর একটা কথা বলি যে, জনসাধারণের চিত্তোন্নতি দ্বারা জনসেবাই যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয়, তবে এ সাহিত্যের ভাষা হবে এ রকম, যা সর্বসাধারণের বোধগম্য। যে ভাব যত সহজ সরলভাবে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে ততই সে তার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে। শুধু ভাষাই নয়, বিষয়বস্তু সাধারণের অত্যন্ত কাছের হওয়া চাই। তবেই সকলে তাকে আপন করে নিতে পারবে। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট বলে স্বীকৃত হলেও একথা আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস জনচিত্ত জয় করেছে

দিলীপকুমার রায়

তেরো

শ্রী **প্রমথনাথ** চৌধুরী ওরফে বীরবল এ-যুগের মানুষের কাছে অর্ধ-বিস্মৃত, কিন্তু ত্রিশ-চাল্লিশ বৎসর আগে তিনি আমাদের তরুণদের মনে তাঁর "সবুজপত্রে"র মর্মরে যে বিচিত্র হিল্লোল জাগাতেন, আমরা আজও ভুলতে পারি নি—আমরা মানে যাঁরা সে-যুগে তাঁর সাহিত্যিক পার্ষদ, সভাসদ তথা বধুরূপে তাঁর নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলাম। কীভাবে ও কেমন করে—বলি।

যতদূর মনে পড়ে, আই এস সি পাশ করার পরেই আমি প্রথম তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে বালিগঞ্জে তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যচক্রে যোগ দিই। বেশ মনে আছে, প্রথম যেদিন তাঁর [illegible]খানে গিয়ে নানা খ্যাতনামা সাহিত্যিকের [illegible] আলাপ শুরু করি সেদিন মন উৎফুল্ল [illegible] উঠেছিল "বড় হয়েছি" ব'লে নয়, [illegible]ণীর হবু সেবকদের দলে ভর্তি হয়ে[illegible] ব'লে।

"স[illegible]জপত্রে"র যুগকে বাঙলা সাহিত্যের একটি [illegible]রণীয় যুগ বললে বেশি বলা হবে না—যার [illegible]থান বঙ্গদর্শন, সাধনা ও ভারতীর পরেই। [illegible]মথবাবু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক না হওয়া সত্ত্বেও এ-যুগের সাহিত্য-শিল্পীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন শুধু তাঁর সাহিত্যিক রস-পরিবেষণের শক্তির দৌলতে নয়—তাঁর তীক্ষ্মবুদ্ধি, আভিজাত্য, রসজ্ঞতা ও স্নেহশীলতার জোরেও বটে। তাঁর সাহিত্য-রসচক্রে নিমন্ত্রণ পেলে সে-যুগে কি নবীন কি প্রবীণ উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকই হৃষ্ট হয়ে উঠতেন। এর দুটি কারণ ছিলঃ এক, তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ছিলেন; দুই তিনি তাঁর অনুরাগিবৃন্দকে কাছে টেনে তাদের আত্মপ্রকাশের প্রেরণাকে উস্কে দিতে পারতেন—যাকে বলে ড্রয়িং আউ[illegible] তাই শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসোমনাথ মৈত্র, শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব প্রমুখ নানা সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক তাঁর কাব্যকুঞ্জে মধুকরের মতনই এসে আনন্দ-গুঞ্জন জুড়ে দিতেন। সে-আসরে যাঁরাই যেতেন পুলকিত হয়ে ফিরতেন আরো তাঁর গৃহলক্ষ্মী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর আতিথ্যে—যিনি চা-যোগের সঙ্গে প্রায়ই পিয়ানো বাজিয়ে গান গেয়ে সবাইকে উল্লসিত করে তুলতেন। ফলে আমরা তাঁর ওখানে গিয়ে আসর জমিয়ে দেখতে দেখতে তাঁর অনুরাগীদের দলে সাগ্রহে নাম লেখাতাম এবং দুদিন যেতে না যেতে "অনুরাগীর" চেয়েও ঘনিষ্ঠ পদবী অর্জন করতাম, যার সাহেবী নাম—"ফ্যান"।

এ আসরে গিয়ে আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবনের পাথেয় পেয়েছিলাম নানাভাবেই। সেসব কথা ফেনিয়ে বলার দরকার দেখি না, কেবল দুজন সাহিত্যিকের নাম করতেই হবে, যাঁরা আমাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেনঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। এঁরা উত্তরকালে বাঙলা সাহিত্যে স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সবুজচক্রে যিনি আমার কিশোর চিত্ত একদিনেই জয় করে নিয়েছিলেন, তাঁর কথাই আজ বলব সব আগে।

তাঁর নাম আজ সবাই জানেন; কেননা আজ তিনি বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে **একজনঃ** ডাক্তার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এফ আর এস, পদার্থ-বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক। কিন্তু সে সময়ে তিনি তরুণ অধ্যাপক মাত্র।

যেদিন আমি এ অপরূপ মানুষটির দেখা পাই সেদিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় থাকবেই থাকবে। সে সময়ে এক সুভাষ ছাড়া আর কোন বন্ধুই আমার চিত্তকে সত্যেনের মতন অধিকার করতে পারে নি। যদিও বন্ধু হিসেবে আমার কাছে সুভাষ হয়ে উঠেছিল হিরো-ই বলব, তবু সত্যেনের কাছেও আমি জীবনে কম পাথেয় পাইনি—বিশেষ করে চিন্তা, সংস্কৃতি ও স্বাধীন চিন্তার দিক দিয়ে।

শুনেছি, সত্যেনের আবিষ্কৃত পরমাণুর নাম হয়েছে 'বোসন' এবং নানা বৈজ্ঞানিক তাঁদের গবেষণায় নাকি সত্যেনের আবিষ্কারের জের টেনে চলেছেন। মনে আছে কেম্ব্রিজে একদিন মেঘনাদ সাহা ওর এই বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস্ প্রসঙ্গে আমার কাছে কথায় কথায় দুঃখ করেনঃ "সত্যেন ইচ্ছে করলেই এফ আর এস পেতে পারত এই আবিষ্কারটিকে নিয়ে আর একটু তদন্ত করলে।" আর একজন মনীষী বলেছিলেন ঃ "সত্যেন একটুও তদ্বির করে না যে নামটামের জন্যে—অত এলাভোলা হলে কি চলে এ জগতে?" আইনস্টাইন স্বয়ং সত্যেনের থীসিস-এর অনুবাদ করে-

ছিলেন, তার পাদটীকায় ছিল যে, এই আবিষ্কারের জন্যে বিজ্ঞানে সে চিরস্মরণীয় থাকবে—না এই ধরনের কি একটা কথা।
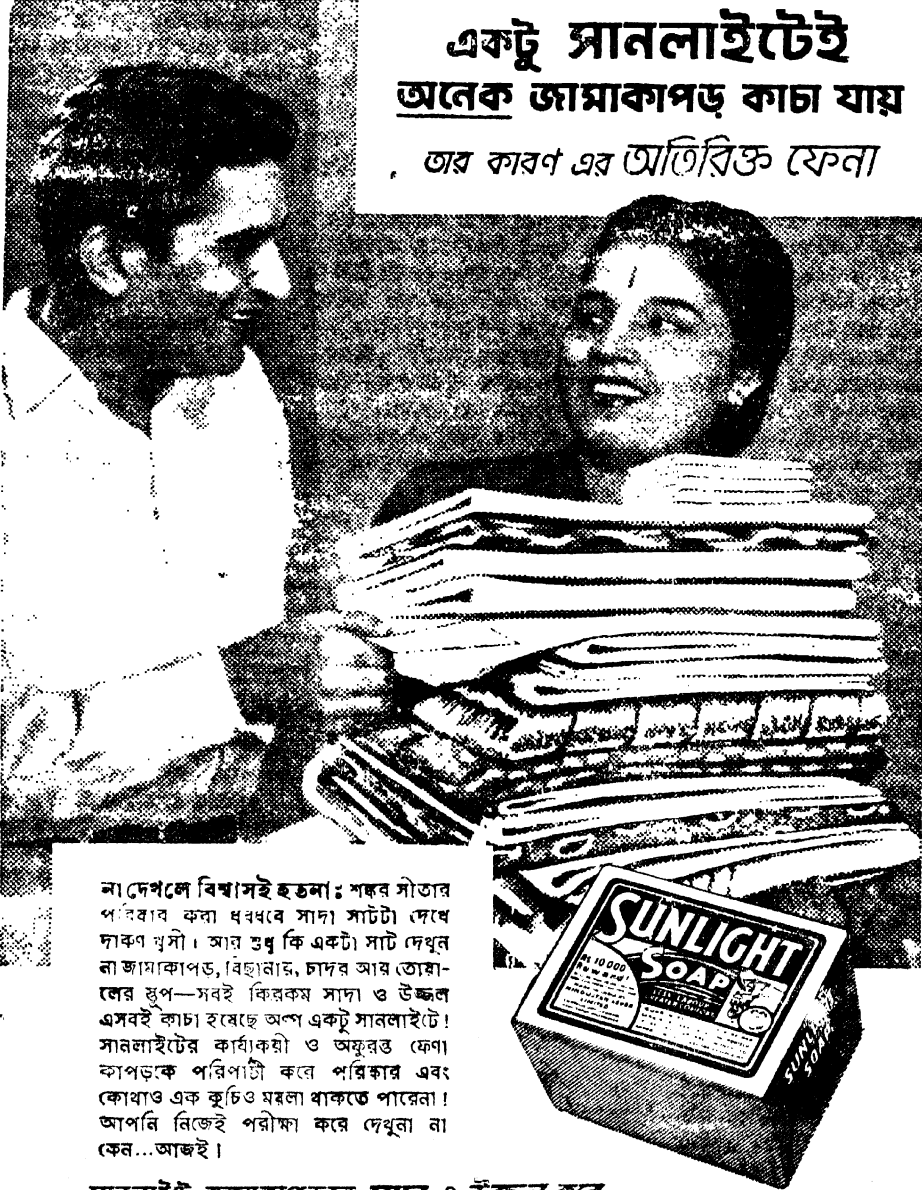
'বোসন' পেতে শোওয়া চলে না গায়ে দেওয়া যায় আমার কোন ধারণা ছিল না। কেবল এইটুকু বলার জন্যে কথাটার অবতারণা যে কিছুই না বুঝেও আনাড়ী যে সেও বন্ধুর গৌরবের শরিক হতে পারে : আমার বন্ধু সোজা লোক নয়—স্বয়ং আইনস্টাইন যার...... ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু ১৯১৫ সালে যখন সত্যেনের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, তখন বোস-আইনস্টাইন থীসিস লেখে নি। না-ই লিখল—সে সত্যেন তো! ছাত্রমহলে সে যুগে তার যে কী নামডাক ছিল, সে কী বলব? শুনেছিলাম এম এস সি-তে নাকি সে রেকর্ড নম্বর পেয়েছিল—শতকরা নব্বইয়েরও বেশি। ভাবতেও আমার বুক দশ হাত হয়ে উঠত—এ হেন মনীষী কি না আমার গান শোনে সোৎসাহে, আমাকে ভালবাসে আন্তরিক,

আমার সংগ চায় সাগ্রহে! কিন্তু না—বলি যথা-পর্যায়েই।

আমি তখনো গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা কোন কিছুই লিখিটিখিনি, শুধু গান গেয়েই বাজি মাৎ করে চলি। আর সে কি সোজা গান? সভা-সমিতি ড্রয়িং-রুম, বিবাহ-আসরে পরিণয় সংগীত ("সুখে থেকো আর সুখী কোরো সবে" বর্গীয় গান) উপনয়ন সংগীত, অন্নপ্রাশন সংগীত, কনফারেন্সে সংগীত কী নয়—কেবল শ্রাদ্ধ-সংগীত বাদ। উত্তরকালে শ্রাদ্ধেও গান গেয়েছি; কিন্তু সে-যুগে খেয়াল, ঠুংরি, গজল, প্রেম-সংগীত, স্বদেশী সংগীত ও ভজনই ছিল আমার উপজীব্য। গান শিখছি তখন রকমারি কালোয়াতের কাছে—সুবিধে পেলেই ছুটি ওস্তাদ বাইজির খোঁজে—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে না হোক, সারা ভারতে চক্র দিয়ে। তখন আমি দুর্দম্য তরুণ, ঠেকায় কে? কোথায় না গেছি গান শুনতে ও শিখতে? কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, পাটনা, ভাগলপুর, ইন্দোর, জয়পুর, আজমীঢ়, উদয়পুর, রাম-পুর, মোরাদাবাদ, মাদ্রাজ, বাংগালোর, মহীশূর, বেরিলি, দিল্লী আগ্রা, মথুরা...... ইত্যাদি। কবে কোথায় গেছি বলতে পারব না—তবে এটুকু বলতে পারি যে, সত্যেনের সংগে যখন দেখা হয় তখন আমি ঠিক ডাঁশা সংগীতপন্থী নই, বেশ পাকা ওস্তাদিপন্থী। তাই মনে আছে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য কুঞ্জে [illegible] তিনি আমাকে সত্যেনের সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন এই বলে যে, "সত্যেন শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, [illegible] পাকিতমত সমঝদার।" [illegible] তখন যদি [illegible] উঠে ধরেছিলাম মালকোষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুম-দারের কাছে শেখা—বন বন মুরলিয়া বাজে রী। ঐ একটিই হিন্দি মালকোষ তখন জানতাম, কাজেই বলতে পারি সত্যনিষ্ঠ হয়েই যে ঐ গানটিই গেয়েছিলাম এক টেবিল হারমোনিয়ম বাজিয়ে।

অন্যত্র বলেছি—আমি শিশুকাল থেকে সহজেই তানবাজি করে নাম কিনেছিলাম। কলেজে ঢুকবার আগে ওস্তাদি গানে তালিম নিয়ে সে-তানবাজি হয়ে ওঠে চরকি-বাজির কাছাকাছি—আমি চাইতাম বিশেষ করে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে হিন্দু-স্থানি সুরের ঐশ্বর্য জাহির করতে। ফলে গীতজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ ছিল না যে, আমার কণ্ঠস্বর শুনলে তাঁদের মনে হত রবীন্দ্র-নাথের—

> গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা—
> ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি;
> কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর—
> সাতটি যেন পোষা পাখি।

শুধু তাই নয়, আমি সত্যিই সদর্পে চাইতাম:

> আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল—
> আপনি কাটি দেয় তাহা,
> সভার লোক শুনে অবাক মানে—
> সকলে বলে বাহা বাহা।

নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা কার না থাকে? তাই আমার যদি গীতকুশলী হওয়ার জন্যে অহংকার এসে থাকে তবে সহৃদয় প্রবীণেরা বর্ণনায় সদয় হেসে ক্ষমা করবেন—আরো এই কথাটি সমঝে যে সে সময়ে "নবীন যুবা"দের মধ্যে আদৌ ওস্তাদি সংগীতের চল ছিল না। আমার পরের যুগে আমি চমকে উঠেছিলাম ভীষ্মদেবের তান-প্রতিভায়। কিন্তু সে-যুগে সুভদ্র সমাজে ভীষ্মদেবের মতন কোন অসামান্য ওস্তাদি-পন্থী কিশোর অভ্যুদিত হন নি। তখন দিলীপ রায় ওস্তাদি জাঁকজমকের রাজ্যে বাঙলাদেশে প্রায় একমেবাদ্বিতীয়ম্—অন্তত উচ্চশিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজে। কাজেই এ হেন আমি সত্যেনকে চমকে দেবার জন্যে যে সদর্পে জাহির করতে চাইব:

> শাণিত তরবারি গলাটি যেন—
> নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
> কখন কোথায় যায় না পাই দিশা—
> বিজলী হেন ঝিকমিকে।

এ শুধু আমার অহম্-এর আত্মস্তুতি নয়—বড় বড় সংগীত-রসিকরাও পরে আমাকে তারিফ করে করে আমার মস্তকটি যথাবিধি ভক্ষণ করেছিলেন। ফলে আমি প্রমথবাবুর সাহিত্যকুঞ্জে সেদিন দারুণ দাপাদাপি করলাম "সাতটি সুর" নিয়ে নয় মালকোষের পাঁচটি পর্দা নিয়ে। সে সময়ে আমার গলা খুবই হাল্কা ছিল—যেদিকে চাইতাম বাঁক নিত একটুও চিড় না খেয়ে! গান শেষ হতেই স্পষ্ট মনে আছে—সত্যেন বলল: "কাছে আসুন, আপনার সংগে ভাব করি।"

মন আমার গর্বে প্রায় "জয় বীর উন্নত তব শির" বলত নিশ্চয়ই—কেবল কাজী তখনো বিদ্রোহী কবিতাটি লেখেন নি বলেই পারে নি। সত্যেন বোস শেষে আলাপ করতে ডাকছে—যে সত্যেন মেধাবী ছাত্র-মহলে উজ্জ্বলতম কোহিনুর! এ-যুগের অনেকে হয়ত কল্পনাই করতে পারবেন না, সে-যুগে আমরা সত্যেনের নাম শুনলেও সম্ভ্রমে ভাবোচ্ছ্বাসে কী রকম রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। তার উপরে আমি চিরদিনই স্বভাবে "হিরো-ওয়র্শিপর"। দেখতে দেখতে সত্যেন হয়ে উঠল মেধাবী ছাত্র-চূড়ামণিদেরও চূড়ামণি—দি ব্রাইটেস্ট অব দি ব্রাইট যাকে বলে। সুভাষকে বাদ দিলে—কারণ সুভাষ আমার কাছে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবী—সত্যেনের মতন এমন অপরূপ মানুষ আর আমার চোখে পড়ে নি; একটি উর্দু ভাষায়:
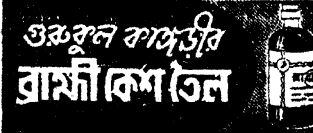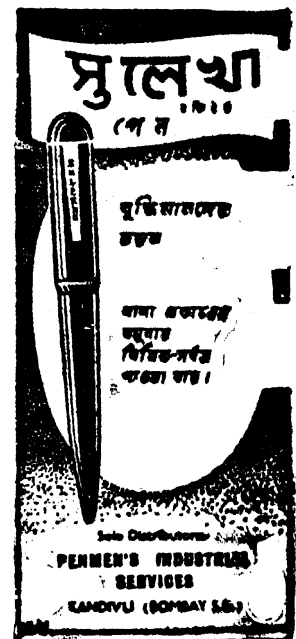
য়ু তো ক্যা নজর নহীঁ আতা
কোঈ তুমসা নজর নহীঁ আতা
ভুবনে কী আছে—নয়ন দেখতে যা না পায়।
শুধু তোমার মতন কারেও দেখল না হেথায়!

সত্যিই সে সময়ে আমার আশ্চর্য লাগত ভাবতে যে, সত্যেন কেমন করে আমার বন্ধু হ'ল! সুভাষের সঙ্গে বন্ধুত্ব বোঝা যায়—তার সঙ্গে পড়ি এক ক্লাসে, দেখা হয় প্রায় রোজই—বলতে গেলে সে ও আমি সে সময়ে পাশাপাশি চলেছি একই রঙিন কল্পনার উধাও তরণীতে—তার উপর সুভাষ ছিল সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের উজ্জ্বলতম রত্ন, তার উপর থাকত কাছেই। সত্যেন থাকতও অনেক দূরে—তার উপর ছাত্রও নয়—তরুণ অধ্যাপক—যোগসূত্র কোথায়? কিন্তু নিয়তি মিলন ঘটান অনেক সময়েই বিনি-সুতোর মালার বন্ধুবরণে—কাজেই বাইরের দিক দিয়ে তার ও আমার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সে আমাকে দুদিনেই এমন আপন করে নিয়েছিল যে, আজো ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়! কারণ আমি যতই বুদ্ধির অহংকার করি না কেন, সত্যেন যে বুদ্ধিতে আমার চেয়ে অনেক বড় এটুকু স্বীকার করতে আমার বাধত না। বাধবার কথাও নয়, যেহেতু তার বুদ্ধির বল্লম নিয়ে সে কাউকেই খোঁচা দিত না। মুখে তার এমন একটা শান্ত কমনীয়তা মাখা থাকত যে, সে সুভাষের মতন সুপুরুষ না হলেও তাকে দেখলে কেউই আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। সবজুচক্রে সে বেশি কথা বলত না বটে, কিন্তু সবাই খুশি হত যখনি সে স্নিগ্ধ হেসে এর ওর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত, সবাই মন দিয়ে শুনত যখন যে কোন প্রসঙ্গে সে কোন মন্তব্য করত। সবচেয়ে সহজিয়া ছিল সে আলাপ করার আখড়ায়। বেশ মনে আছে—আমাকে ডেকেই সে দেখতে দেখতে আপনি ছেড়ে তুমি বলা শুরু করল। বিদায় নেবার সময়ে বলল: "২ নম্বর ঈশ্বর মিল লেন—কেমন? আসবে তো?"

"আসব না? বা!"

এর পরে দুদিন যেতে না যেতে সত্যেন আমাকে তুই বলা শুরু করে দিল—আর এমনই সহজে যে আমার মনে হ'ত তার সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। আমাদের বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে কেবল ধূর্জটি সত্যেনের এই ভঙ্গিটি খানিকটা মকশ করে নিয়েছিল—এই দেখতে দেখতে সদ্য-পরিচিতকে তুই-তোকারি করা। বলা বাহুল্য এ পারে কেবল সেই যে আপনি পারে—তালিম নিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার এ-ওস্তাদি অর্জন করা যায় না। ধূর্জটিও পারত সেও ভাব করতে ওস্তাদ ছিল বলে।

আরো একটা দৃষ্টান্ত দেই সত্যেনের এই আশ্চর্য সহজিয়া ছন্দের। মেলামেশায় আমিও বড় একটা কেওকেটা ছিলাম না, শুধু এদেশেই নয়, ওদেশেও যেখানেই গিয়েছি বন্ধুত্ব পাতিয়ে এসেছি—আর এমন স্বভাবের মানুষের সঙ্গে যার জীবনাদর্শের সঙ্গে আমার জীবনাদর্শের সম্বন্ধ প্রায় অহিনকুলেরই বলব। কিন্তু তবুও সত্যের খাতিরে বলতে আমি বাধ্য যে সত্যেনের কাছে নানাভাবেই শিক্ষা পেয়েছি মেলামেশার অন্তরঙ্গ মন্ত্রে, তার টেকনিক থেকেও বেশ কিছু শিখেছি—কী ভাবে অপরকে আপন করে নিতে হয়। সে প্রসঙ্গে বলার একটা কথা মনে আছে—তার ভাষায়ই বলতে চেষ্টা করি।

"আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার অনেক ত্রুটি আছে রে ভাই। কিন্তু বলতো স্কুল কলেজের সবচেয়ে বড় দান কী?"

আমি: তুমিই বলো না।

সত্যেন: রকমারি সহকর্মীদের সংস্পর্শে আসা। অন্ততঃ আমার ছাত্র-জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ বই পত্র অধ্যাপকদের লেকচার নয়—সতীর্থদের সঙ্গে নিত্যনতুন প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিয়েই আমি পথচলার সবচেয়ে বেশী পাথেয় পেয়েছি। যারা শুধু পড়াশুনোয় ভালো ছেলে তারা তথ্যের বা জ্ঞানের কোঠায় হয়ত সবই পেতে পারে কিন্তু পায় না বহুর অমূল্য সংস্পর্শের মন-জাগানিয়া দান। আমাদের তরুণ মন সত্যি জেগে ওঠার জন্যে এই সখ্যের অপেক্ষা রাখে বিশেষ করে কৈশোরে ও যৌবনে।

কথাটা কিছু নতুন নয়—হয়ত অনেকে বলতে পারেন: "এ এমন কি বাণী যা টুকে রাখবার মত?" কিন্তু সত্যেনের গভীর তৃপ্তিদায়ক বন্ধুত্ব ও অনাড়ম্বর অন্তরঙ্গতার মধুর স্বাদ যে-মানুষ পেয়েছে সে সেই মধুস্বাদের রসভাষ্যে একথার নিহিতার্থটুকু খুঁজে পাবেই পাবে, বুঝতে

পারবেই পারবে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে সে অনেক কিছু আহরণ করত বলেই পারত অনেক কিছু দান করতে। কিন্তু এ-দান ও গ্রহণ কেবল তাকেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ করে যার স্বভাব নিতে ও দিতে পারে সহজিয়া ছন্দে। একটা উদাহরণ দিই আমার বক্তব্যটিকে ফলাও করে তুলতেঃ প্রকৃতিকে কে না ভালোবাসে? নদী পাহাড় লতা পাতা মেঘ জ্যোৎস্না, গ্রহ, তারা আকাশ কার চোখকে না মুগ্ধ করে? কিন্তু ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়ের প্রতি তন্তু নিসর্গশোভা থেকে যে অফুরন্ত রস টেনে নিত—যার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেনঃ

> এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
> যে-প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
> সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে
> সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
> লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
> বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে...
> সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
> আমার নাড়িতে আজি করিছে নর্তন।

স-ভাবে প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করতে পারে শতটি কোটির মধ্যে কয়জন? একই অনু-[illegible]র নানাভাবে নানা লোকের কাছে আসে, কিন্তু যার কাছে কোনো বিচিত্র অনুভব ধরা [illegible]দেয় তার গভীরতম স্বাদ নিয়ে তাকে কি [illegible] চলে না সে-ভাবের বিশেষজ্ঞ, দরদী [illegible]? সত্যেনের মনে মানুষের সোহাগ [illegible] এমন এক অপরূপ রঙে রঙিন ও রসে রস[illegible] হয়ে জানান দিত যে আমি আমার [illegible] ও যৌবনে বরাবরই তাকে মনে [illegible] প্রণাম করে বলেছিঃ "এ তুমিই পারো [illegible] আমি পারি না।" এর একটা কারণ [illegible] আমার মন এক্ষেত্রে নিবদ্ধ-প্রেম ছিল বরাবরই। মানুষ আমার কাছে প্রিয় হলেও আরাধ্য বা উপাস্য হয় নি কোনোদিনই। আমি বরাবরই নানাদেশের মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছি, তার স্নেহ-প্রীতির ডাকে অকপটেই ধরা দিয়েছি একটিবারও বিদেশীকে তার বৈদেশিকতার জন্যে সন্দেহের চোখে না দেখে—কিন্তু অনুক্ষণই কে যেন আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেঃ "সাবধান! এতে শেষরক্ষা হবে না। মানুষকে যদি সত্যি আপন করতে চাও তবে সব আগে ভগবানকে আপন করে পেতে হবে। কেন না তাঁকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে না পারলে মানুষকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে আর যেই পারুক না কেন, তুমি পারবে না—কেন না তোমার স্বধর্ম বিশ্বমানবপূজা নয়—ভগবদ্‌ভক্তিই বটে।"

ঝোঁকের মাথায় একটু অবান্তরের অবতারণা করে ফেললাম হয়ত। কিন্তু সহৃদয় পাঠকরা পুরোপুরি সহৃদয় হলে হয়ত এহেন অনাধুনিক কথা শুনে বিরূপ হবেন না এই সেকেলে মানুষটির প্রতি, যে এখনো বিশ্বাস করে যে মানবপ্রেমকে মানুষের মধ্যে দিয়ে আংশিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে সব আগে তাঁকে জানতে হবে যাঁর নাম "বিশ্ব-কর্মা দেব" যিনি "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" আমার "দি কুম্ভ" বইটিতে আমি উদ্ধৃত করেছি—সক্রেটিসকে এক জন বলেছিলেনঃ তুমি মানুষকে বুঝতে চাইছ? কিন্তু ভগবানকে না জেনে কে কবে মানুষকে বুঝেছে, জেনেছে, চিনেছে?" একথা আমার কাছে কোনদিনই অনাদরণীয় জনশ্রুতি মনে হয় নিঃ বরং আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে মানুষের গভীরতম সত্য হল তার আত্মিক সত্য যার অন্য নাম পারমার্থিক সত্য। তাই যখনই জীবকে মিলতে দেখেছি সৌভ্রাত্র্যযজ্ঞে তখনই আমার মন বলেছে এ-যজ্ঞে শিবকেই প্রধান পুরোহিত না করলে সে হয়ে দাঁড়াবে দক্ষযজ্ঞ।

কিন্তু আমার কৈশোর ও যৌবনের চঞ্চলতার লগ্নে আমি একথাকে স্বীকার করলেও ঠিক অঙ্গীকার করে নিতে পারিনি সর্বান্তঃকরণে। কারণ সে-সময়ে অন্তর গহনে প্রায় সব ভাগবত সত্যকেই খানিকটা দুরধিগম্য মনে হত বলে ভগবানকে আমার মন বরণ করে নিলেও প্রাণ মানুষের সংস্পর্শে দুলে উঠে ভুলে যেত যে জীব যতদিন শিবকে পেয়ে দিব্যদৃষ্টি অর্জন না করে ততদিন জীবের মধ্যে সে কিছুতেই শিবকে দেখতে পায় না, আর এ-দিব্য-দর্শন বিনা সর্বজীবে প্রেম আসা অসম্ভব।

কিন্তু সত্যেনের মধ্যে এ ধরনের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না বলে ও স্নেহের প্রীতির আনন্দমেলায় নিজেকে উজাড় করেই বিলিয়ে দিতে পারত। সত্যি, কী সহজেই না ও আত্মীয়তা করত শুধু অনাত্মীয়দের সঙ্গেই নয় অনাত্মীয়ার সঙ্গেও বটে। এর একটা দৃষ্টান্ত দেই—আমার মেজ-মামিমার সঙ্গে সত্যেনের স্নেহ সম্বন্ধ। সত্যেন থিয়েটার রোডে আসতে না আসতেই তাঁকে "মামিমা!—কই? চা কই? —কোথায় আপনি? আহা, কাজ থাক, এদিকে আসুন—গল্প করি—" এই ধরনের সম্ভাষণে তাঁর চিত্ত জয় করে

নিল। তিনি আমাকে বলতেন, ঃ "তোর বন্ধু সুভাষ চমৎকার ছেলে বটে, কিন্তু সত্যেন একেবারে অপরূপ।"

আমি (তটস্থ)। সুভাষও অপরূপ, মামিমা!

মামিমা ঃ তুই সময় সময় কেমন যেন—ইয়ে—হয়ে দাঁড়াস। সুভাষ যে অসাধারণ কে না মানবে? কিন্তু সত্যেন যেভাবে পরকে আপন করে নিতে পারে—

আমিঃ সুভাষও পারে। তার কত বন্ধু—

মামিমা ঃ যাঃ তোর সঙ্গে কথা কইব না। তুই তো বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিস না আমি কী বলতে চাইছি। এই যে সত্যেন থিয়েটার রোডে আসতে না আসতে আমাদের সবাইকে মামা মামিমা মাসিমা ডেকে আপন করে নিল, সুভাষ পেরেছে।

মামিমা সত্যিই সত্যেন বলতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার যত বন্ধু থিয়েটার রোডে আসতেন—আর আমার বন্ধু ছিল কি একটা? তাদের মধ্যে মামিমা সব-চেয়ে স্নেহ করতেন সত্যেনকে, তার পরেই [illegible]কে। সুভাষকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন বেশি—স্নেহ করতে যেন তেমন সাহস পাননি। উত্তরকালে সুভাষ যখন নেতাজী হয়ে দাঁড়ায় তখন মামিমা বলতেন বটে ঃ "খোকার বন্ধু কত ছিল মণ্টুবাবু! গান্ধীজীর চেয়েও বড়! আহা তবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক রে।" কিন্তু এ হল শ্রদ্ধা, স্নেহ নয়। সত্যেনকে তিনি স্নেহ করতেন অকুণ্ঠে—কেন, সত্যেন সুভাষের মতন চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিল না, আড়াল এড়িয়ে কোনো কানুন না মেনে স্নেহের রাজ্যে প্রীতির এলাকায় ও যেন উড়ে এসে জুড়ে বসত—veni, vidi, vici ঢঙে।

সত্যেনের সূত্রে মেজমামিমার কথা এসে গেল ভালোই হল কারণ আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, স্মৃতিচারণে এই মাতৃকল্পা স্নেহময়ীর তর্পণ আমাকে করতেই হবে। থিয়েটার রোডে আমাকে অনেক আত্মীয়াই স্নেহ করলেও এমন প্রাণ ঢেলে কেউ আমাকে ভালোবাসেনি, আমার হাজারো ঝক্কি বৎসরের পর বৎসর আর কেউ এমন সাগ্রহ স্নেহে বইতে পারত না। বলতে কি, আমার থিয়েটার রোডের জীবনে আমাকে ধারণ করেছিলেন সব আগে দুজন ঃ মেজমামা ও মেজমামিমা। মেজমামার কথা ইতিপূর্বে বলেছি। এবার বলি মেজমামিমার কথা—খানিকটা প্যারেন্থেসিসের ঢঙে—তারপরে ফের সত্যেনের প্রসঙ্গে ফিরে এসে খেই ধরব।

(ক্রমশঃ)

---

* আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি সব জিতে নিলাম।

লণ্ডনে রোগশয্যা থেকে

ডক্টর শশধর সিংহ

॥ ২ ॥

মৃত্যুর মুখোমুখি হ'লে মানুষের চিন্তা-শক্তি ও অনুভূতি অনেক সময় প্রখর হয়ে ওঠে। তাই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কথা ভাববার সুযোগ পেয়েছি এবং জীবনের অনেক প্রশ্নের জবাব পাবার প্রয়াস করতে পেরেছি। এইভাবে যেসব বিষয় এ যাবৎ ঝাপসা ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে যাই হক, এই লেখায় এ সবের অবতারণা করব না, করা উচিতও হবে না।

আজকের আলোচ্য বিষয় হ'ল লণ্ডনের "The National Hospital for Nervous diseases." এই স্নায়বিক ব্যাধির চিকিৎসার বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র হ'ল আমার বর্তমান প্রবন্ধের "hero" বা নায়ক। একে "hero" বলছি দুই কারণে। প্রথমতঃ আজ যা কিছু লিখছি, তা সবই এই হাসপাতালটাকে উপলক্ষ্য করে লেখা। দ্বিতীয়তঃ আমি এই হাসপাতালটাকে বর্তমান সভ্যতার প্রতীক বলে মনে করি। আজ মানুষ জীবন-সংগ্রামের চাপে পড়ে চারিদিক থেকে বিধ্বস্ত হচ্ছে এবং অনেকে এই চাপ অসহ্য হয়েছে বলে ভেঙে পড়ছে। স্নায়বিক পীড়াকে বর্তমান সভ্যতার অভিশাপ বললে অত্যুক্তি হবে না।

কেবল আমার বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য মন ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারা কোন সমস্যাকেই চরম বলে স্বীকার করে নি। তাই য়ুরোপে ও অন্যত্র বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছেন এসব রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে এবং এর প্রতিকার আবিষ্কার করতে। তাই দেখি লণ্ডনের এই হাসপাতালে কতরকম গবেষণা চলছে এবং এর ফল কাজে লাগছে।

জাতি, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে শত শত নরনারী এখানে চিকিৎসার জন্য আসছে, আর এদের অনেকেই সুস্থ হয়ে বা সুস্থ হবার আশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এই হ'ল য়ুরোপের মানবিকতার একটা বিশেষ দিক। মানুষের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য য়ুরোপের চিন্তাশক্তি ও প্রয়াস চারিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। "হিউম্যান ডিগনিটি", "হিউম্যান রাইটস্", "হিউম্যান ওয়েলফেয়ার"—এই কথাগুলি হ'ল য়ুরোপের মর্মের কথা, কথার কথা নয়।

"সবার উপরে মানুষ সত্য।" এই প্রবচনটি য়ুরোপীয় সভ্যতার গোড়ার কথা। সম্প্রতি অধ্যাপক টয়নবী তাঁর এক পুস্তকে গ্রীক-সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, গ্রীকরা তাদের চিন্তাজগতে মানুষকে ভগবানের চাইতেও বড় স্থান দিয়েছিল বলেই গ্রীক-সভ্যতার পতন হয়েছে। আমার মতে এই পতনের অন্য কারণও থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা বাদ দিলে গ্রীক তথা য়ুরোপীয় সভ্যতার বাকী থাকবে কি? য়ুরোপীয় সাহিত্য, শিল্প-কলা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি সবই ত গড়ে উঠেছে মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। য়ুরোপ সব সময়েই প্রয়াস করেছে সমাজ থেকে অবিচার অনাচার দূর করতে, সমাজের কল্যাণের জন্য নানাদিকে সক্রিয় হতে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে কুৎসিতকে দূর করে তার জায়গায় সুন্দরের আসন স্থাপন করতে। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের বশে আনতে। এই করে য়ুরোপীয় সভ্যতা এগিয়ে চলেছে এবং তার অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারছে না। ক্রমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ন্যাশনাল হাসপাতালে আসা অবধি ডাক্তার, নার্স, রোগী প্রভৃতি কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং এঁদের সৌজন্য ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি।

এই হাসপাতালটাকে সম্মিলিত রাষ্ট্র-সঙ্ঘের একটা খুদে সংস্করণ বললে ভুল হবে না। এখানে নার্সের কাজ করবার জন্য সব দেশের মেয়েপুরুষ এসেছে। কেবল য়ুরোপ নয়, এশিয়া, আফ্রিকা, সব মহাদেশের মেয়েপুরুষদের সঙ্গে এখানে আলাপ হয়েছে। কোন হৈ-চৈ নেই, সবাই নীরবে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে এবং সবাই নিজেদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন বিরোধ নেই বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

এখানে যখন প্রথম আসি, তখন অবস্থা

খুব সংকটাপন্ন ছিল বলে অনেক মেয়ে-পুরুষের উপর আমাকে শুশ্রূষা করবার ভার পড়েছিল। এরা দিন-রাত আমার জন্য খেটেছে। এদের সবার সম্বন্ধে লেখার সুযোগ হবে না, তাই কয়েকজনের কথা বলছি।

একদিন ভোরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছি; কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে পড়ল একটি যুগোশ্লাভ নার্সের নাম। তাকে নাম ধরে ডাকলাম। কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে যেন বেঁচে যাই। দেখি অন্ধকারের ভিতর থেকে মেয়েটি ছুটে এল। বলল, "ডাঃ সিনহা, তুমি আমার নাম মনে রেখেছ, ঘুম হয়নি বুঝি? একটু চা খাবে?"

তারপর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছে, সে আমাকে কতভাবে সাহায্য করেছে। যুগোশ্লাভিয়া ও ভারতবর্ষের মৈত্রীর সম্বন্ধ আমাদের একটা যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াল। য়ুরোপীয় নানা ভাষার সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় থাকাতে এবং য়ুরোপের নানা দেশের সম্বন্ধে পরোক্ষ বা অ-পরোক্ষ জ্ঞান থাকাতে বিভিন্ন দেশের পুরুষ-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ হয়েছে।

আমাদের ওয়ার্ড-এর স্টাফ নার্স ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বান্টু মেয়ে। এই নার্সটি খুবই উচ্চশিক্ষিতা ও কর্মকুশলা এবং লণ্ডনের নার্সিং কলেজ থেকে সবরকম পরীক্ষায় পাশ করেছে। যখনই সময় পেতাম চিরলাঞ্ছিত আফ্রিকা সম্বন্ধে আলাপ করতাম এবং তার কথাবার্তা থেকে বর্তমানে আফ্রিকার নরনারীরা কি ভাবছে, তার ইঙ্গিত পেতাম।

কয়েকদিন হল এই মেয়েটি আমার স্ত্রীর সঙ্গে চা খেতে এসেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তার কাজ হবে না, তাই সে আফ্রিকার অন্যত্র একটা ভাল কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছে।

একদিন কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, তোমাদের দেশে ত অনেক জন্তু জানোয়ার আছে। এদের সম্বন্ধে তোমাদের কোন বিশেষ গল্প আছে কি? বলতে পারো? আমার ইচ্ছা ছিল এইসব গল্পের ভেতর দিয়ে চিরন্তন আফ্রিকার প্রাণের স্পন্দন পেতে, যেমন আমরা পাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের গল্পের ভেতর দিয়ে।"

দেখলাম সে কিছু বলতে পারল না। আমার খুবই বিশ্বাস আফ্রিকায়ও এরকম অনেক গল্প আছে। আরও সুস্থ হয়ে উঠলে এ বিষয়ে পড়াশুনো করবার ইচ্ছা রইল।

আরেকটা মজার কথা মনে পড়ছে। একদিন ভোর বেলায়—তখনও খুব অন্ধকার—দেখলাম একটি অল্পবয়সী মেয়ে এল আমার হাত মুখ ধোয়াতে। মুখ দেখে মনে হল বুদ্ধিমতী ও ভাল ঘরের মেয়ে। জিজ্ঞাসা করলাম, "ওগো, তুমি য়ুরোপের কোন্ দেশ থেকে এসেছ?"

ও বলল, "পর্তুগাল থেকে"। বলেই চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলল, "তুমি নিশ্চয় আমার দেশকে ভালবাসনা"।

আমি বল্লাম, "কেন?"

তখনই সে গোয়ার কথা তুলল। এত ভোরে একটি অপরিচিত কচি মেয়ের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করছি ভেবে হাসি পেল।

আমি বল্লাম, "আচ্ছা, গোয়ার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। গোয়া ত তোমারও নয় আমারও নয়।"

এর পর আর গোয়ার কথা উত্থাপ করে নি। পরে যখনই এসেছে আমাকে নানা ভাবে সেবা করেছে। শুনলাম তার বাড়ি অপরটো শহরে। বাড়িতে মা আছে। ভ রেজিলে গেছে। তার ছটি ছেলেমেয়ে। [illegible] বড় বোনটি স্বামীর সঙ্গে পর্তুগীজ [illegible] আফ্রিকায় আছে। তারও দুটি ছেলে মেয়ে।

যখনই কাজে আসত এই মেয়েটি [illegible] কাজ করত। আর সময় পেলে বাড়ি র নীচে বসে পড়াশুনো করত।

একদিন তাকে বললাম, "তুমি [illegible] এদেশে ইংরেজী শিখতে এসেছিলে। [illegible] ত বেশ শিখেছ। তোমার মা অপেক্ষা করে আছে। এখন বাড়ি ফিরে যাও। [illegible] অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে বেশীদিন বাইরে থাকা ভাল নয়, আর এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী বেশীদিন সইবে না।"

সে স্বীকার করলে। আশাকরি এতদিনে সে দেশে ফিরে গেছে।

অনেক সুশিক্ষিত পুরুষ নার্সদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। একদিন একটি ইংরেজ যুবক চলন্ত চেয়ারে করে আমাকে স্নানের ঘরে নিয়ে গেল। তার কথাবার্তা শুনে মনে হল সে বেশ ভাল ঘরের ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এখানে কি কর?"

সে বললে, "আমার বাবা কেম্ব্রিজে ইতিহাসের টিউটর, আমি অক্সফোর্ডে ক্লাসিকস্ পড়তে চাই। অর্থাভাব তাই এখানে কাজ করে কিছু রোজগার করে নিচ্ছি।"

এখানে আরেকটি ইংরেজ যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। সে অভিনেতা হতে চায়। তারও একই অবস্থা। মাঝে একবার একটা ছোট পার্টও করেছে বার্নার্ড শ'র নাটকে। পরে একটি বুদ্ধিমান ইতালীয় যুবকের সঙ্গেও আলাপ হল। তার সঙ্গে তার দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা

করতাম। বর্তমান ইটালীর একটা প্রধান সমস্যা হ'ল দেশের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য। দেশের নেতারা এটা কত শীঘ্র দূরে করা যায় তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। দক্ষিণবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষা সব বিষয়েই পিছিয়ে আছে। ইতি-মধ্যে উত্তর দক্ষিণ ইটালীর রেষারেষি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই যুবকটির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়েছি। শুনলাম, ইতালীর সংবাদপত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা হয়। এটাও লক্ষ্য করেছি যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য য়ুরোপের সব জাতির মধ্যেই সমানভাবে বর্তমান।

য়ুরোপের বৈচিত্র্য দেখবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আগে কখনও হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের মৌলিক ঐক্য সম্বন্ধেও গভীর-ভাবে সচেতন হয়েছি। স্বভাবতঃই এশিয়ার সঙ্গে এর তুলনা মনে জেগেছে। আজকে এ বিষয়ের আলোচনা করব না। পরে করা যাবে।

"আরে বিনয় না! তোমার অমন সুন্দর মুখ
নকল দাড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছ, ব্যাপার কি?"
"আরে, চুপ চুপ! নতুন স্যুটটা পরেছি কিন্তু এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর চিনতে পারলে আর রক্ষে নেই—নির্ঘাত চাকরী যাবে।"
"কেন, তুমি বিনীজ কাপড়ের নাম শোননি নাকি? মিলে তৈরীর সময়ই এই কাপড়ের "কোয়ালিটি কন্ট্রোল" (উৎকর্ষের সমতা রক্ষা) করা হয়।"
"কোয়ালিটি কন্ট্রোল"? সে আবার কি? কেনই বা করে?
"আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুতো ও কাপড়ের প্রসেসিং এত তাড়াতাড়ি করা হয় যে অনেক সময় খালি চোখে ধরা পড়ে না এমন সব খুঁত থেকে যায় কাপড়ে। বিনীজ মিলে একটি বিশেষ ল্যাবরেটরী আছে—সেখানে তৈরীর ধাপে ধাপে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় যাতে কোন দোষত্রুটি কাপড়ে থেকে না যায়। এর জন্যই বিনীজ কাপড় অনেক দিন অবধি নতুনের মত থাকে।"
"তোমার কথা শুনে ভাই ভরসা পাচ্ছি; তবে আর দেরী নয়, চল কাছাকাছি কোন বিনীর দোকানে যাওয়া যাক।"
বিনীজ্—বস্ত্রশিল্পে একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম
"এই প্রোজেক্টরটিতে যে কোন জিনিস ৫০০ গুণ বড় দেখায় —তুলোর প্রতিটি দোষত্রুটি এতে ধরা পড়ে।
তুলোর আঁশের উপর কাপড়ের উৎকর্ষ অনেকটা নির্ভর করে। বিশেষভাবে বাছাই করা তুলোর সুতো দিয়েই বিনীজ কাপড় তৈরী করা হয়। তাই বিনীজ কাপড় অনেক বেশী টেকসই।
বিনীজ প্রতি বছর প্রায় ৯ কোটি গজ কাপড় তৈরী করে। এদের তৈরী নানা রকম কাপড়ের মধ্যে রয়েছে:
শার্টিং — খাকি ড্রিল — সাদা ও রঙীন ড্রিল — তোয়ালে — স্যানিটাইজড স্যুটিং — ভয়েল — ইউনিয়ন ফেব্রিক — সিল্কের শাড়ি — রাগ ইত্যাদি
দি বাকিংহাম এণ্ড কর্নাটিক কোম্পানী লিমিটেড
দি বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্: বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ
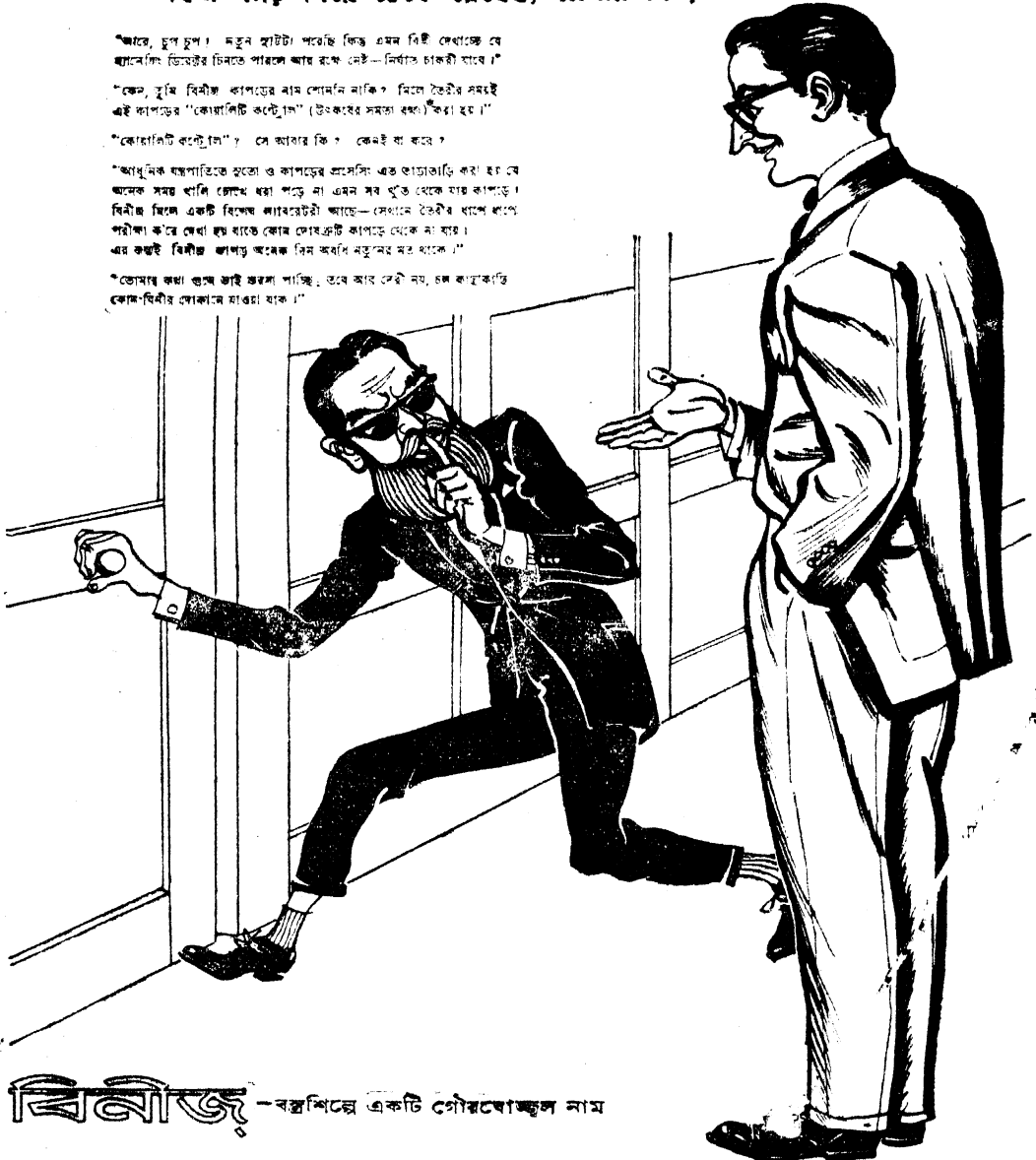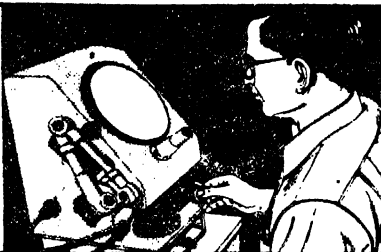
বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয়কে দেখতে হলে যেমন সমতল-ভূমি থেকে উঠে আসতে হয়, তেমনি বঙ্কিমের সমুন্নত জীবনভূমি থেকে দৃষ্টি-পাত না করলে রবীন্দ্র-প্রতিভার দিব্যদ্যুতি আমরা দেখতে পাই না। আকাশের যে প্রচুর বারিকণা ধূসর প্রান্তরের ধুলো শ্যামল আচ্ছাদনে ভরে দেয়, সে বারিকণার কথা তৃণভূমি হয়তো ভুলে যায়, কিন্তু বনস্পতি তার আকাশ বন্দনায় নিত্য সে ঋণ স্মরণ করে। কবিগুরুর বঙ্কিম-বন্দনাই আমাদের সচেতন করে দেয় তাঁকে বোঝার জন্যেও বঙ্কিমকে বোঝার প্রয়োজন আছে। দুই প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা তখনই শুরু, যখন একের আলোয় অপরকে দেখা সহজ হয়, একের গতি অপরের কাছে আমাদের পৌঁছে দেয়, যখন একের উত্তরণে অপরের সম্বন্ধে চিন্তার জড়তা দূর হয়। এ উত্তরণ লাভ করে যাঁরা দুই জনের তুলনামূলক বিচারে জ্ঞান-মানসের কি [illegible] নিয়ে আসেন তাঁরা কোন প্রতিভাকেই অস্বচ্ছ দেখেন না।

বাস্তব আকাশ রবীন্দ্রনাথ অম্বর, কিন্তু ও বঙ্কিম নন। বহুদিনের পুঞ্জীভূত মেঘের দুর্যোগ সরে গিয়ে রাত্রির আকাশে অনেক তারা দেখা দিয়েছে। সূর্যোদয়ের দিকেই যাদের পথনির্দেশ। রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোক আমরা তাই ঠিক বুঝব, যদি বঙ্কিম-প্রতিভার রশ্মি-রেখাকে অনুসরণ করি।

উত্তরসূরী তিনিই যিনি পূর্ব-প্রতিভার ধ্যানকে অস্বীকৃতি দিয়ে বিপর্যস্ত করে দেন না, বরং মননের স্বাস্থ্যে তাকেই আত্মস্থ করে নেন, ধ্যানের গভীরতাকে অনুসরণ করে প্রয়োগের ক্ষেত্র দেন বাড়িয়ে—একাকে বিচিত্রের দিকে নিয়ে যান, যা মুষ্টিমেয়ের অধিকারে তাকে সর্বসাধারণের করে তোলেন।

রবীন্দ্রদর্শনের মূলতত্ত্বটি হলো সীমার মধ্যে অসীম, রূপের মধ্যে অরূপ, জীবনের মধ্যে জীবনাতীতের লীলাতত্ত্ব। পূর্ণতাকে কবিগুরু স্বীকার করেছেন। বলেছেন: আমাদের জীবন পূর্ণতার দিকেই এগিয়ে চলেছে। আমরা নানা ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সার্থকতারই ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি। জীবনাতীতের আভাস আমাদের জীবনের বিচিত্র লীলায় বার বার ধরা পড়েছে। [illegible] সাধনার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন অভি-ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। এ অভিব্যক্তি দৈহিক নয়, আত্মিক।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মিক অভিব্যক্তিবাদ, অনুশীলনতত্ত্বেরই রূপপরিণতি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অনাদিকাল যাহা প্রতীয়মান, অসীমে তাহাই প্রমাণিত হইতে থাকিবে।' বলেন, পুরাণে দেবতার কল্পনা ছিল, কিন্তু দেবতা ছিল না; সত্যের অর্জন করতে করতে তপস্যার মধ্যে দিয়ে মানুষই দেবতা হয়ে উঠবে।

অনুশীলন-তত্ত্বে বঙ্কিমও একথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন, "আমার বিশ্বাস যে এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক।"
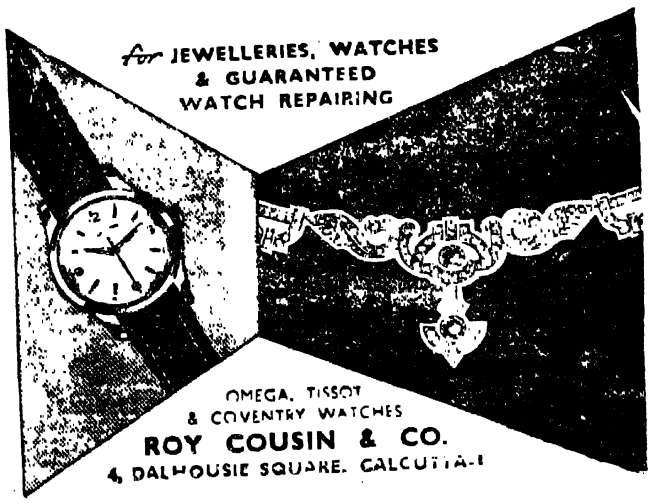
চিন্তার ক্ষেত্রে দুজনের একটা মিল আমরা এই দেখি যে, দুজনেই পূর্ণতার আদর্শের কথা বলেছেন এবং আমাদের জীবনকে সেই পূর্ণতার অভিমুখী করে দিয়েছেন। উভয়ের ধ্যানেই এই পরিপূর্ণতা মানবিক। প্রভেদ হল এই, বঙ্কিমের ধ্যানে এই পূর্ণতা মানব শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে নির্দিষ্ট, রবীন্দ্র-ধ্যানে তা মানবিক ভূমায় অনির্দিষ্ট, অসীম।

কনফর্মিজম-এর সঙ্গে হিউম্যানিজম-এর যে একটা বিরোধ আছে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হিসাবে বঙ্কিমই তার প্রথম দৃষ্টান্ত সমন্বয়ের নির্দেশ দেন। পাশ্চাত্ত্যের হিউম্যানিজমকে বঙ্কিম অস্বীকার করেন নি, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি একটি ধর্মচেতনার মধ্যে দিয়ে দেখেছেন—পরিপূর্ণতার ভূমিকায় দেখেছেন। এই দৃষ্টিকে অনুসরণ করেই উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ আরও গভীর কথা বলেছেন। বঙ্কিমের ধর্মচেতনা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতারই একটা যুগোপযোগী অনুবাদ। মানুষই বঙ্কিমের লক্ষ্য—কিন্তু সে পরিপূর্ণ মানুষ। সেই পরিপূর্ণ মানবের রূপটি আবিষ্কার করে বঙ্কিম আমাদের নবজাগরণের বস্তু-পরতন্ত্রের সঙ্গে একটা আদর্শবাদ, হিউ-ম্যানিজম-এর কল্যাণকামিতার সঙ্গে স্পিরি-চুয়ালিজম-এর ধ্যানধর্মের মহিমা যোগ করে দিলেন। যুক্তি দিয়েই বঙ্কিম প্রমাণ করলেন যে, পরিপূর্ণতার আদর্শ, মানবিক। বললেন, আমাদের চিত্তবৃত্তির অনুশীলনেই আমরা জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি। পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারি। এই অগ্রগামিতায় আমরা একটা সামাজিক শালীনতা লাভ করি। পরিপূর্ণতার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা তাকেই বঙ্কিম বললেন ভক্তি। ভক্তির চর্চা তাই জীবনেরই সাধনা। জীবনকে অস্বীকার করে কোন ধ্যান ও ধারণার কথা বঙ্কিম বলতে চান নি।

উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জীবনের এই স্বীকৃতি যেমন আরও গভীর বেদনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সাধনার স্বরূপও বিচিত্র মূর্তিতে ধরা পড়েছে। বঙ্কিম বললেন, পরিপূর্ণ মানব—পারফেক্ট হিউম্যানবীইং-এর কথা; রবীন্দ্রনাথ বললেন, মানবিক পরিপূর্ণতা—হিউ-

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে শুনিলাম, নয়া পয়সাকে অ্যালুমিনিয়ামের কর্তৃত্ব স্বীকার প্রচেষ্টা চালাইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"অতঃপর নয়া পয়সাকে খোলামকুচির

কদর দিলেই আমরা টাকাকে মাটি বলে তুরীয় অবস্থা লাভ করতে পারি"।

• • •

কেরলে জনতার উপর পুলিসের গুলী বর্ষণে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। "হওয়ার কথাই। তাঁরা জানতেন, কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। স্বর্গগমনের সোনার সিঁড়িটাও কেরলেরই কোথাও গড়ে উঠছিল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

আমাদের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজ করিতে উদ্যোগী হইবার আবেদন জানাইয়াছেন। অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত হইবে অথচ দেশের সকলের পক্ষে সহজলভ্য করিতে হইবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা আগেও অনেকবার বলেছি, আবার বলি। সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি পাঁচ পয়সা বা বড় জোর সোয়া পাঁচ আনার সিন্নি-মানত—তথা পদ্ধতি"।

• • •

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষের পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সুপরামর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু মৎস্য চাষে রাজনৈতিক ভিত্তির উচ্ছেদ না হ'লে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়া হয়ত সম্ভব নয়"।

•
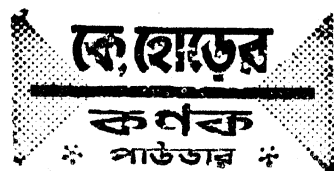
আচার্য ভাবে শেখ আবদুল্লার সংগে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল একটি বহু পুরাতন বাউল গানের একটি কলি সুর দিয়া শুনাইল—"ভাবের ভাবের ভাব যাবেরে জানা, সরল হলে"।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁহার কাছে যে-সমস্ত রোগী আসেন তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবন লাভের জন্য কী ধরনের খাদ্য প্রয়োজন তাহা বলিয়া দেন।—"কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, প্রাণ রাখিতে যাদের প্রাণান্ত তাঁরা কি সত্যিই দীর্ঘজীবন কামনা করেন"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

কল্যাণীতে কো-অপারেটিভ টয় সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে নানা ধরনের পুতুল তৈয়ার করা হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এখানে যদি ছোটদের

কল্যাণীতে প্রস্তুত

সংগে বড়দেরও মন-ভোলানো খেলনা তৈরি হয় তাহলে কারখানার উদ্দেশ্য সার্থক হবে! তাঁদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে না রাখলেই আর নয়"!!

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন ধর্মযাজক ডাঃ বিলি গ্রাহাম একটি পুরাতন বাইবেল হাতে করিয়া মস্কোতে উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রাহাম মনে করেন, রুশেরা খুবই ধর্মভাবাপন্ন।—"কিন্তু আমরা জানি, এক বক ছাড়া সেখানে নাকি কেউ ধর্মে বিশ্বাসী নয়। ডাঃ গ্রাহাম হয়ত গণনায় ভুল করেছেন"—বলে শ্যামলাল।

• • • •

প্রায় লক্ষাধিক ইঁদুরের আকস্মিক আবির্ভাবে নিউইয়র্কের উত্তরাঞ্চলের গৃহিণীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমাদের দেশের গৃহস্বামীরা, লক্ষাধিক না হলেও, পর্বতের বহু মূষিক প্রসবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন"!!

• • •

ব্যারাকপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কয়েক প্রকার মৎস্য দেখিতেছেন—ইহারই একটি ছবি সংবাদপত্রে
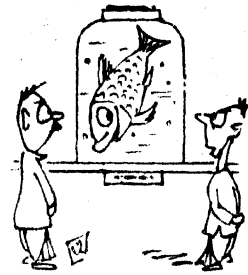
প্রকাশিত হইয়াছে।—"মন্ত্রী মহাশয়, সময় পেলে একবার বাজারে এসে মাছ দেখে নিতে পারতেন। মেছোহাটার দৈত্যরাই থাকবে, মাছ আর থাকবে না। গভর্ণমেন্টের দু'একটা হয়ত গবেষণাগারের দেওয়ালে থাকতে পারে। তাই মন্ত্রীর সঙ্গে মাছের রূপ দেখার সুযোগ হয়ত আর মিলবে না"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

• • •

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মন্তব্য করিয়াছেন—শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল নহে।—"নিওন বা গ্যাস লাইট দিয়ে কিছু করা যায় না কি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে সভ্যগণ মন্তব্য করিয়াছেন—সরকারী খাদ্যনীতিই দুরবস্থার কারণ। বিশুখুড়ো বললেন—"বহু পুরাতন তথ্য, নব আবিষ্কার"!!

• • •

আটত্রিশদিনব্যাপী সম্মেলনের অচল অবস্থা দূর করার চেষ্টায় বৃহৎ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বিশুখুড়ো কবিতার ছোঁয়া লাগাইয়া দিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী তাই কবিতাতেই মন্তব্য করিলেন—"গোপন কথাটি রবে না গোপনে"।

উপন্যাস

রূপসী রাত্রি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা—৯। দাম পাঁচ টাকা।

প্রেমকে উপজীব্য করে যুগে যুগে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে; আজও হয়। বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে এ-যুগ পর্যন্ত বহু গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য প্রেম। অতএব স্বভাবতই এর আবেদন স্থান ও কালে সীমাবদ্ধ নয়। এক কথায় চিরন্তন। কিন্তু তাই বলে সব প্রেমকেন্দ্রিক উপন্যাসই যে সার্থক এমন কথা বলব না। প্রেমেরও জীবনায়ন দরকার। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে দুঃখের দহনে পুড়ে, ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জর হয়ে এবং হতাশা ব্যর্থতার জ্বালা সয়ে যে-প্রেম বিশুদ্ধ জীবনায়নের জন্ম দেয়—প্রেম সার্থক সেখানেই। বলতে দ্বিধা নেই সেই সার্থকতায় শুচিস্নাত উপন্যাস অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'রূপসী রাত্রি'।

শিল্পী হিসাবে অচিন্ত্যকুমার বাঙলা সাহিত্যে এক অপার বিস্ময়। নিজের প্রতি তিনি যতটা সৎ, সাহিত্যেও তার বিন্দুমাত্র কম নন। বরং অনেক বেশি তিনি ভাবেন, সরব থাকেন, সচেতন হবার চেষ্টা করেন। কল্লোল যুগের সেই মূর্তিমান বিদ্রোহী, 'বেদে' দিয়ে যাঁর শুরু—সেই অচিন্ত্যকুমার বিচিত্রগামিতায় সম্ভবত অদ্বিতীয় এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে এখনও তিনি অক্লান্ত। 'বেদে'র উত্তরকালে লিখেছেন—'হাড়ি-মুচি-ডোম'। আবার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক অচিন্ত্যকেও আমরা চিনেছি: বিস্মিত হয়েছি তার অভিলাষের উত্তুঙ্গতায়। বস্তুত অচিন্ত্যকুমার জনজীবনের কথাও যেমন জানেন, তেমনি মহাজীবনেরও। এক দৃপ্ত বাকভঙ্গি, সুষ্ঠু, শ্রুতিমধুর ও রমণীয় শব্দপ্রয়োগ, ভাব ও মননের অপূর্ব কারুকাজ আর মোহিনী বিন্যাসের তিনি স্রষ্টা। এই বিশেষ ভঙ্গিটি তাঁর নিজস্ব। তাঁর রচনা আবেগে যেমন প্রচন্ড, চিত্রকল্পে তেমনি সমৃদ্ধ এবং দূরদৃষ্টি ও আবিষ্কারের মহিমায় ততটাই প্রোজ্জ্বল।

রূপসী রাত্রির পটভূমি দুটি। কিছুটা মফঃস্বল, খানিক শহর। তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে, দাঙ্গার এক বীভৎস রূপ দেখা দিয়েছে। এই সময়ের নানা ঘটনা অনেক মানুষ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের কথা এমন সংযত ও সুষ্ঠুভাবে অচিন্ত্য বলতে পেরেছেন যে, তাকে এক বিশেষ আবিষ্কার-রূপেই আখ্যায়িত করা উচিত। গভীর সঞ্চারী এই দৃষ্টি নিয়েই কয়েকটি সত্যিকারের মানুষ দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। যেমন—সোহিনী নীলুদা, গীতালি, শৈলবালা এবং হাসিনা পর্যন্ত। এরা মানুষ। নিত্যকার জীবনের সমস্যা জ্বালা প্রেম এবং বিচ্ছেদের মধ্যেও এরা এক একটি বিশেষ বক্তব্যের অবয়ব। মূলত সামাজিক সত্তার মূল্য যদিও দেন অচিন্ত্যকুমার—কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপকে তুলে ধরার দিকেই তার আগ্রহ ও প্রবণতা। এই আগ্রহই তাঁকে সাহিত্যে সম্মান দিয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও দেবে। অচিন্ত্যর সাহিত্যিক সত্তার একটা অপূর্বতা এই যে, সমাজের অবক্ষয়ের মধ্যে মানুষের বিশ্বাস তাকে সমস্ত প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি, হতাশা ব্যর্থতার ঊর্ধ্বে এক অম্লান অকম্প প্রত্যয়ে পেীছে দেয়।

এ উপন্যাসের সুপ্রভাত আর সোহিনীর কাহিনী যেমন প্রেমে ভাস্বর, তেমনি ভাস্বর পরমা ও নলিনেশের প্রেম। নানা রূপে আবির্ভূত যে প্রেম, সেই প্রেম গীতালির জীবনে এক চরম ট্রাজেডি আনল। কেউ পেল, কেউ জ্বলল দহনে। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে দেখা হ'ল সকলের। দাঙ্গার এই ভয়াবহতার মধ্যেও।

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়, অচিন্ত্য চিরাচরিত পথে পা বাড়ান নি। তাঁর লক্ষ্য আরও ঊর্ধ্বে, এক বিশেষ

মূল্যবান বক্তব্যে। গীতালি তার নিষ্ঠুর কলংকময় অতীতকে ভুলতে চেয়েও পারছে না। নলিনেশ কলংকের বোঝা মাথায় নিয়েও পরমার জন্য অস্থির মনোবেদনা অনুভব করে এবং সোহিনীর জীবনে নীলুদার ভূমিকা ম্লান হয় না ক্ষণিকের জন্যেও। এরা সকলেই প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষমান এবং একই প্রশ্নে বিভোর। জীবন-জিজ্ঞাসার কতগুলো নির্ভুল জবাব এখানে দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার এবং বিশেষ এক লক্ষ্যে উপনীত হতেও পেরেছেন। এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এক পরিশুদ্ধতায় উপস্থিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের এই সাম্প্রতিক উপন্যাস নিঃসন্দেহে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

(১৪২।৫৯)

দুরি বৌদি—অবধূত। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

সেই সন্ত্রাসবাদ ও আত্মভুক গৃহযুদ্ধের বাংলা দেশ আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি। ফাঁসির মঞ্চে যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন, সেই বিপ্লবীদলের আন্দোলন এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু মূল গল্প একটি নর ও নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত, ঘৃণা ও ভালবাসা নিহিত প্রেমের গল্প। দুরি বৌদি সেই গল্পের অন্যতম নায়িকা এবং বর্তমানে গল্পের কথক। [illegible] এবং দুরি নামক দুটি বালক বালিকা, [illegible] কিশোর-কিশোরী একদা পরস্পরে [illegible] প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পরবর্তীকালে [illegible] তাদের একজন সরকারী কর্মে উচ্চপদস্থ হল, অপর জন দেশবরেণ্য বিপ্লবীনেত্রী হয়ে উঠল, কিন্তু সেই বাল্য-প্রণয় জীবনের শেষ দিন শেষ প্রহর পর্যন্ত অবিকৃত থেকে গেলো, অর্থাৎ অপরিণতই থেকে গেলো। বাংলা দেশের ওপর দিয়ে কত ঘূর্ণি, কত ঘোলা জল বয়ে গেল, কত মৃত্যু, কত হাহাকার, কত চমকপ্রদ ঘটনায় দেশ পরিপূর্ণ হয়ে গেল কিন্তু দুরির একটিও বদলাল না তার প্রেমের ক্ষেত্রে। অথচ দুরি বৌদিকে যে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন নারীমূর্তি দেওয়া হয়েছে, যে রোমহর্ষক ক্রিয়াকলাপের পুরো-ভাগে [illegible]পিত করা হয়েছে, ভারতবর্ষ এবং তার বাইরেও সে যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং স্টীমারের ডেক থেকে ঝাঁপ দেওয়া থেকে শুরু করে ক্রমাগত ছদ্মবেশ ধারণ ও বোমা পিস্তল চালনায় পটীয়সী করে তোলা হয়েছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাংলা দেশে বুঝিবা দ্বিতীয় দেবীচৌধুরাণীর আবির্ভাব হল। কিন্তু দেবীচৌধুরাণীর সৃষ্টিকর্তা যে আসেন নি তা পরমুহূর্তে দুরিবৌদির ব্যক্তিগত জীবন ও ভাবনাচিন্তায় পরিস্ফুট হয়েছে। এত কাঁচা চরিত্রের একটি

অতি সাধারণ মেয়ে যে তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ভাবতে হাস্যকর লাগে। রীতিমত গোয়েন্দা কাহিনীর মতই ঘটনার পরে ঘটনার চমক খেলিয়ে, সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা লঙ্ঘন করে লেখক তাঁর কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু ডিটেকটিভ লেখকেরও একটা দায়িত্ব থাকে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার জন্য একটা মোটামুটি সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে হয়, প্রতিটি খাপছাড়া ঘটনা দুর্ঘটনাকে মিলিয়ে দিতে হয়। বর্তমান লেখকের সেদিক থেকে সাতখুন মাপ। পরম উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায়, কণ্টপাঠ্য ভঙ্গিতে তিনি কাহিনী লিখেছেন—আমাদের বলবার কিছু নেই; কিন্তু তিনি বিপ্লবী বাংলাকে কল্পনার রঙে বিবর্ণ করে অসম্মান করেছেন বলে মনে করি। ৯৩।৫৯

নারী ও প্রিয়া—ইলারাণী মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—বেংগল পাবলিশার্স, ২০৮, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৬৲।

বেশ বড় উপন্যাস। লেখিকা খুব ধৈর্য-সহকারে লিখেছেন এবং ঘটনার পর ঘটনা এমনভাবে জুড়ে গেছেন যে, এত বড় উপন্যাস পড়তে ক্লান্তি আসে না। ভাষাও খুব খেলো নয়। তবে কাহিনী সেই অতি-পুরাতন ছকে ঢালা। দরিদ্র বিভাস সততা ও কর্মনিষ্ঠার জোরে শেষ পর্যন্ত রাজস্ব ও রাজকন্যা কৃষ্ণাকে অনেক ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে লাভ করল। অবশ্য, ভিলেন জ্যোতির্ময় ও [illegible] ঘোষ আছে। এখানে যেসব চরিত্র ভাল, [illegible] ভয়ংকর রকমের ভাল। আর যারা [illegible]প, তাদের নরকেও ঠাঁই নেই। যাই হো[illegible] যারা নিছক গল্প পড়ে সময় কাটাতে চান, তাঁদের নিঃসংশয়ে ভাল লাগবে বইখানি। (১৮৪।৫৯)

রবীন্দ্র-সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী কাব্য পরিচয়—জীবনবল্লভ চৌধুরী। প্রকাশক: ডক্টর নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ১৫।২ একডালিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ। দু টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর জীবনের ধারা-বাহিক চলচ্চিত্র। বিভিন্ন যুগের অধ্যায়ে এসে তাঁর কবিতা বারবার মোড় ফিরেছে। 'সোনারতরী' তাঁর রোমান্টিক ক[illegible] থেকে জাগতিক সুখ দুঃখের দরজায় অব-তরণের ইতিহাস। সোনারতরী একদিক থেকে তাঁর খরস্রোতে ভাসা জীবন, অন্যদিকে ভরা ফসলের যুগ। মর্ত্যপ্রীতির মধ্য দিয়ে আত্মউপলব্ধি সোনারতরীর স্বর্ণযুগেই প্রথম সম্ভব হয়েছে। সেদিক থেকে কবির জীবন এবং কাব্য-ব্যাখ্যার মধ্যে কোন দুর্গম ব্যবধান নেই, রহস্যোন্মচনী গুরুতর ব্যাস-বাক্য যোজনারও অবকাশ নেই। শ্রীযুক্ত জীবনবল্লভ চৌধুরী আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের একটি জটিল ব্যাখ্যা করেছেন। জটিল এই কারণে যে, সোনারতরীর কবিতাবলী প্রসংগে তিনি বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে চর্চা-পদ, সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ প্রভৃতি প্রায় কিছুই বাকি রাখেন নি তুলনা দিতে। এবং সে তুলনাকার্যটিও এক কথায় অতুলনীয় হয়েছে। প্রসংগচ্যুত হয়ে সংগৃহীত তথ্য থেকে তথ্যান্তরে যেভাবে তাঁর আলোচনা স্খলিত হতে থেকেছে তাতে করে তাঁর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন আমাদের কাছে নিষ্ফল উপহারে দাঁড়িয়েছে। উচ্ছ্বাসময় ভাষায় অগণিত ছাপার ভুলে বইটি শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। ১৪৪।৫৯

কৌতুক-নাটক

উটরোগ—উপেন্দ্রনাথ গংগোপাধ্যায়। ডি এম লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে কৌতুক-নাটকের অভাব না থাকলেও, তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেদিক থেকে আলোচ্য নাটকখানি আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগে একখানি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন।

এক কৌতুককর চিকিৎসার অভিনয় কি ভাবে স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বমূলক পরিণতিতে রূপান্তরিত হল তারই এক উপভোগ্য চিত্র আলোচ্য গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক শংকর মিশ্র এবং দত্তভানু প্রমুখ অন্যান্য প্রখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ রাজার অসুখ সারাতে ব্যর্থ হলে দেবরাজ উপাধ্যায় কী করে সেই রোগ সারিয়ে দিয়ে ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করলেন তারই রসঘন কাহিনী অবিমিশ্র আনন্দের মধ্যে নাটকের যবনিকাপাতে সমাপ্ত হয়েছে। লেখক অসম্ভবের এক কৌতুককর ও অসংকোচ সমাবেশের মধ্য দিয়েও এক সার্থক কাহিনী রচনা করেছেন। দেবরাজের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে সত্যের সূক্ষ্মরেখা একেবারে অদৃশ্য হয় নি; আর তাই এই অসম্ভাব্য কাহিনীকে সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে ধরে রেখেছে।

বইখানি মঞ্চস্থ হলে দর্শকবৃন্দ যে তা দেখে আনন্দ পাবেন সে কথা অসংকোচে বলা যেতে পারে। শুধু তাই নয়। বই-খানি পড়লে পাঠকবৃন্দও তৃপ্তি পাবেন একথাও দ্বিধাহীনভাবেই বলা চলে। ২৯।৫৯

বিবিধ

Housing Condition in Calcutta

অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। প্রকাশক—বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

ভারতের শহরবাসিদের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯৫৪ সালে প্ল্যানিং কমিশন কয়েকটি গবেষণা সমিতি গঠন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগ গত চার বছর ধরে কলিকাতার নাগরিক জীবনের নানাদিক সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী এই উদ্যোগের সংগে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। তথ্য-সংগ্রহের দিক থেকে বইখানি বিশেষ মূল্যবান এবং দেশব্রতী নাগরিকমাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর তথ্যসমূহে কলিকাতার নাগরিকজীবনের যে ভয়াবহরূপ খুলে ধরেছে, তার আশু প্রতিকার না হলে এই মহানগরী মহাশ্মশানে পরিণত হবে অতি দ্রুতগতিতে। অর্থাভাবের মামুলি অজুহাত তুলে প্রতিকারকে বিলম্বিত করা চলবে না। অধ্যাপক চক্রবর্তী আমাদের মনোযোগ এই-দিকে তীক্ষ্ণভাবে আকর্ষণ করে এক মহৎ জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এজন্যে তাঁকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

প্রকাশক বইটির দাম করেছেন পাঁচ টাকা। এটা নিতান্ত অ-ন্যায্য। এরকম বইয়ের দাম বেশির ভাগ লোকের নাগালের মধ্যে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৩।৫৯

পত্রিকা

উন্মেষ—ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি কান্তি গুপ্ত এবং সম্পাদক রমেন আচার্যের সম্পাদনায় আলোচ্য সংখ্যা 'রবীন্দ্র সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিধুশেখর শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত রচনা, প্রফুল্ল রায়চৌধুরী, নগেন দত্ত প্রমুখের মনোজ্ঞ প্রবন্ধ; আনন্দ বাগচী, কালিদাস রায় প্রভৃতির কবিতা এবং কামনা ঘোষ প্রভৃতির গল্প সম্ভারে এই বিশেষ সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ। আমরা উন্মেষের সর্বাংগীণ সাফল্য কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

ভজন পরিচয়—সংগীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

চণ্ডীদাস প্রসংগ—শ্রীসত্যকিংকর সাহানা

বিবিধ প্রবন্ধ———ঐ

বিচিত্র প্রবন্ধ———ঐ

মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব—ঐ

শকুন্তলা রহস্য—ঐ

হিন্দু ধর্ম———ঐ

বাংলা সাহিত্যে শ্রীসত্যকিংকর সাহানা—শ্রীমণি বাগচী কর্তৃক সম্পাদিত।

আগুন দিনের কথামালা ১ম পর্ব—চুণী লাল গংগোপাধ্যায়।

সপ্তপর্ণী—শ্রীশশাংকভূষণ রায়।

সাগর পানে ফিরি—সংকলক অপূর্ব কুমার সাহা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিষ্ণু দে

খবরের কাগজের কাজ।
খাদ্যাভাব, পূর্ববংগত্যাগী ভিড়,
বাংলায় সমস্যা উগ্র, তাই চেয়েছে রিপোর্ট।
ঘুরি তিক্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউনি-বস্তিতে
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়া দেশে
যেখানে একালে, মনে হয়, চিরকাল বার্ষিক আকাল।
মাথায় প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির
কোথাও বা হাঁটু ধুলো,
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই,
শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয়।

বোঝাই, দেখতে ভদ্র এইমাত্র, কিন্তু শুধু রিপোর্টার,
কখনও নিই নি ভোট, দেশ স্বাধীন মুক্তিতে
ভাঙিনি, কয়েক কোটি মানুষের দুর্ভাগ্য কপালে
হানি নি রাজ্যের লোভ ক্ষমতার কেরামতে সুখে।
শুধুমাত্র রিপোর্টার, ভদ্রলোক এইমাত্র,
আসলে এদেরই মতো অসহায়, পরাধীন, রৌদ্রে পোড়া
হয়তো পেটটা ভরে, অথচ হৃদয় ইতিহাসে অসহায় বলি,
একেবারে নিঃসম্বল, তিক্ত, পোড়া, খাঁটি,
ছেড়ে দিই স্থানীয় বাবুর জীপ মুরুব্বির নতুন মোটার,
মফস্বলী বাস ধরি, ভাবিঃ যেখানে যেমন রীতি, হাঁটি।

হাঁটি, এই গ্রাম থেকে যাই ওই গ্রামে
নির্জলা অভাব সারাটা জেলায়, সর্বত্রই এক উপবাসী জ্বালা।
এদিকে গরম প্রায় পশ্চিমামরুর। আজও যদি ভাবি,
জ্বালা তার গায়ে লাগে। আমাদের আষাঢ়েও বৃষ্টি কই নামে
আমাদের উঠে গেছে বৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি বৈকালীর পালা।

মনে পড়ে একদিন, সে গ্রামে উন্মনে
আগুন নিবন্ত, আগুন আকাশে তোলা আগুন মাটিতে ঢালা।
যেতে হবে পুবগ্রামে, সদরালা নই নই নায়েব নবাব,
সুতরাং সকালেই যাত্রারম্ভ। সে কী মাঠ! মাইল মাইল
অনেক শতাব্দী ধরে হাজার হাজার খুনে
পৃথিবীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মেরে গেছে যেন,
আম-জাম-কাঁঠাল পিপুল কিছু নেই, দীঘি কুয়া
খালবিল মজানদী কিছু নেই।
শুধু নীরক্ত শ্বেতাংগ রৌদ্র।

তৃষ্ণার আবেগে চোখ ফাটে। সে সময়ে, আজও মনে পড়ে,
বাঁয়ে কাঁটা ডাঙার আড়ালে হঠাৎ মন্দির এক দেখা যায়
ছোট, ভাঙা, জনহীন। সে দিকেই চলি।
জলের আশায় ক্ষুধা আর পিপাসায় ছায়ার আশায়
না [illegible] উঁকি দিই।

ম[illegible]ড়ে আজও মনে পড়ে সেই সর্বংসহ অন্ধকার,
আশ্চর্য কোমল ছায়া মায়ের চোখের স্নিগ্ধ অন্ধকার,
চোখ দেহ হৃদয় জুড়ানো আহা কালোর আরাম।
চোখের জীবন ফেরে, দেখি নগ্ন যুগল বিগ্রহ
বেশভূষাহীন, শুধু কষ্টি পাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম,
নেই পূজার গৌরব, অথচ কোথায় গন্ধ
আরতির শৃংগারের পাথরে স্তম্ভিত কোথায় সৌরভ?
বেদীর পিছনে দেখি বেঁচে আছে কালো পাথরের ধাপে
হিম অন্ধকারে একা কয়েকটা কাঠ-চাঁপা
মৃত্যুহীন গোরোচনা বাহারের গন্ধের প্রতাপে।
আর বাঁদিকের কোণে দেখি সজল মাটির একটি কলসী মুখচাপা॥

পরলোকে তুলসী লাহিড়ী

গত সোমবার (২২শে জুন) সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা, নাট্যকার ও চিত্রপরিচালক তুলসী লাহিড়ী দীর্ঘ রোগভোগের পর বাষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর রাসবিহারী এভিনিউস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী, চার পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান।

১৮৯৭ সালে রংপুর জেলায় বিখ্যাত নলডাঙার জমিদার বংশে তাঁর জন্ম হয়।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ছিলেন উকিল। পিতার পদাংক অনুসরণ করে তিনি বি-এ বি-এল পাশ করে রংপুর কাছারিতে ওকালতি শুরু করেন। তখন

স্বর্গত তুলসী লাহিড়ী।

থেকেই তাঁর মধ্যে নাট্যকলার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। রংপুরে "পরপারে" নাটকের ভবানীপ্রসাদ-এর ভূমিকায় তিনি প্রথম পাদপ্রদীপের আলোকে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে ১৯২৮ সালে যখন তিনি আলীপুর কোর্টে ওকালতি করতে কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর রচিত দুটি গানের রেকর্ড করেন জমিরুদ্দিন খাঁ। তাঁর সংগীত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে এইচ-এম-ভি ও মেগাফোন কোম্পানী তাঁকে সংগীত-পরিচালকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। ফলে আইনের পেশা পরিত্যাগ করে তিনি শিল্প জগতের সংগে জড়িত হন।

চিত্রজগতে তাঁর প্রথম প্রবেশ নির্বাক যুগে হীরেন বসুর "চুপ" ছবিতে। "যমুনা পুলিনে" ছবির সংগীত পরিচালক [illegible] তিনি এরপর যশ অর্জন করেন। কাহিনীকার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে তিনি প্রথম নিবেদন করেন "মণিকাঞ্চন" (১ম খণ্ড) ছবিখানি। তারপর শ্রীলাহিড়ীর পরিচালনায় "মণিকাঞ্চন" (২য় খণ্ড), "একটি কথা", "মায়া কাজল", "বিজয়িনী" ও "চোরাবালি" মুক্তিলাভ করে। "মণিকাঞ্চন", "একটি কথা", "মায়া কাজল", "সাবিত্রী", "বেজায় রগড়", "রিক্তা", "ঠিকাদার", "মহাসম্পদ", "বিজয়িনী", "চোরাবালি", "কেরানীর জীবন", "সর্বহারা" ও "পথিক" প্রভৃতির রচয়িতা হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

পঞ্চাশখানিরও বেশী ছবিতে তিনি অভিনেতা হিসাবে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে "কেরানীর জীবন", "সোনার সংসার", "অভিনয়", "রিক্তা", "জীবনসঙ্গিনী", "বিজয়িনী", "এই তো জীবন", "দিগভ্রান্ত", "রাত্রির তপস্যা", "বামুনের মেয়ে", "সাহেব বিবি গোলাম", "ভালোবাসা", "পথিক", "মামলার ফল", "ডেইলি প্যাসেঞ্জার", "লীলাকংক" এবং "জলসাঘর" প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শেষ অভিনীত ছবি মুক্তিপ্রতীক্ষিত "ক্ষণিকের অতিথি"।

পেশাদারী মঞ্চের সংগে তাঁর প্রথম যোগাযোগ শুরু হয় আর্ট থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত "পোষ্যপুত্র" নাটকের সুরকার হিসাবে। "চিরকুমার সভা"য় অক্ষয়ের ভূমিকায় শিল্পী হিসাবে তিনি প্রথম পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় করেন। নাট্যকার হিসাবে তিনি "দুঃখীর ইমান" ও "ছেঁড়া তার" নাটক দুটিতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মঞ্চে তাঁর শেষ অভিনয় হয় বিশ্বরূপায় "অচলায়তন"-এর উদ্যোগে অভিনীত "লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার"-য়ে। স্বরচিত এই নাটকে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তিনি রোগ-জীর্ণ দেহে অংশ গ্রহণ করে রংগমঞ্চের প্রতি তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে বাস্তবধর্মী নাট্যরচনায় নতুন [illegible]রূপে তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। তাঁর রচিত "দুঃখীর ইমান", "পথিক" ও "ছেঁড়া তার" বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে নাট্যসাহিত্য রচনায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার গোড়াপত্তনে সহায়তা করে। এদিক দিয়ে বাংলা নাট্য-সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ব্যক্তিগত জীবনে এই মহৎ শিল্পী ও নাট্যকার ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তিনি ছিলেন সুরসিক যাঁর সান্নিধ্যে বন্ধুবর্গ কিছুক্ষণের জন্যও প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখকষ্ট ভুলে যেতেন। বন্ধুবৎসল, উদার, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বোপরি একনিষ্ঠ এই শিল্প-সাধকের [illegible] পরবর্তীকালের শিল্পীদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার চাইতে শিল্পের সেবাই ছিল তাঁর কাছে বড়, তাই তাঁর গুণমুগ্ধের সংখ্যার সীমা নেই।

তুলসী লাহিড়ীর তিরোধান যেন রংগ-জগতের একটি বিশেষ যুগ ও সাধনার অবসান—যে যুগে আদর্শবাদী একনিষ্ঠতাই শিল্পীজীবনের আসল পরিচয়। তাঁর জীবনাবসানে শিল্পজগতের যে ক্ষতি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। আমরা তাঁর

লোকান্তরিত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে [illegible] সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

চিত্রালোচনা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে অশোক চিত্রের বাংলা ছবি "পুষ্পধনু" এই সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে। প্রবোধকুমার সান্যালের লেখা মূল কাহিনীকে চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক সুশীল মজুমদার। প্রধান স্ত্রীচরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। তাঁর সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরকুমার, তপতী ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক প্রভৃতির নাম। টিনা বারবারা নামের একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অভিনেত্রীকে এই ছবির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে। রাজেন সরকার সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন।

* * *

এ সপ্তাহে মাত্র একখানি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে—পুষ্পাঞ্জলি পিকচার্সের "রাতকে রাহী"। মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন শাম্মী কাপুর, জীবন, আনোয়ার, অচলা সচদেব, নাজীর হোসেন প্রভৃতি। নাসীম ও বিপিন বাবুল যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

* * *

মুক্তি-প্রতীক্ষিত বাংলা ছবির তালিকায় রয়েছে [illegible]কুমারী চিত্রমন্দিরের "ভ্রান্তি", এশিয়ান [illegible]সের "গলি থেকে রাজপথ", এম বি ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনালের "বাড়ি থেকে পালিয়ে", ইন্ডো-বর্মা ফিল্ম করপোরেশনের "[illegible]" প্রভৃতি।

বিমল রায়ের নতুন হিন্দী ছবি "সুজাতা"-ও আগামী আকর্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। সুবোধ ঘোষ লিখিত গল্পের এই চিত্ররূপ ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নূতন ও সুনীল দত্ত এই ছবিতে প্রথম একত্রে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছেন। এঁরাই ছবির নায়ক-নায়িকা। তাঁদের সঙ্গে আছেন শশীকলা, ললিতা পাওয়ার প্রভৃতি। [illegible] দেব বর্মণের সুর ছবিখানির [illegible] বাড়িয়েছে।

এইচ এন সি প্রোডাকসন্স বর্তমানে বিধায়ক ভট্টাচার্যের মঞ্চ-সফল নাটক "ক্ষুধা"-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। নিজস্ব ইউনিটের পরিচালনাধীনে ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার ও বসন্ত চৌধুরী স্টেজে যে তিন বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করে সকলকার অবিমিশ্র প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন ছবিতেও তাঁদের সেইসব ভূমিকাতেই দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নরেশ মিত্র, সুনন্দা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বিয়ের দিন সকালে কনে নিখোঁজ—এই থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব, তাকেই কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার প্রথম ছবি "শুভ বিবাহ"-এর নাটকীয় কাহিনী। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম পরিচালনায় ছবিখানি দ্রুত সমাপ্তির পথে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, তৃপ্তি ও শম্ভু মিত্র। ছবিখানি নিউ থিয়েটার্সের দু নম্বর স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে।

অগ্রগামীর নতুন ছবি "হেড মাস্টার"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস আবার নতুন করে সকলকে চমক দেবেন। রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষাল—এই দুটি নবাগত শিল্পীর সঙ্গে চিত্রপ্রিয়দের পরিচয় ঘটবে এই ছবিতে। শোভা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রগুলিতে রূপ

দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মূল কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তুলেছেন রীতেন এণ্ড কোম্পানী।

* * *

গত ২০শে জুন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে নবোদয় ফিল্মসের দ্বিতীয় চিত্র "দুটো থেকে চারটে"-র শুভ মহরং সুসম্পন্ন হয়। বিধান সভার ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীশঙ্কর-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শুভ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং মৎস্যমন্ত্রী শ্রীহেম-চন্দ্র নস্কর প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

কাঁচা ফিল্মের অপচয়

যে তিনখানি হিন্দী ছবি গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে সেগুলি অন্তত একটি ব্যাপারে সমগোত্রীয় পূর্বতন অনেক ছবির উপরই টেক্কা মেরেছে। ক্রাইম ও সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বেলেল্লাপনা সম্ভোগের সঙ্গে সঙ্গে এ-জাতীয় ছবির পৃষ্ঠপোষকরা যাতে তাদের প্রিয় শিল্পীর সান্নিধ্যলাভও করতে পারে তার এক অভিনব অপপ্রয়াস ছবিগুলিতে বিদ্যমান। ছবি তিনটির একটিতে রাজ-কাপুর চোর ও পকেটমার দলের ওস্তাদ, অন্যটিতে মীনাকুমারী এক কার্নিভালের মনোহারিনী নর্তকী (যার বিভিন্ন পোশাক ও ভঙ্গিমার কথা আলোচ্য ছবির বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়েছে), অপরটিতে হিন্দী পর্দার দেবী নিরূপা রায় "স্টান্টের" রাণী যিনি পুরুষের বেশে অশ্বারোহণ, অব্যর্থ গুলীচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ও এমন কি বিমান-চালনায়ও পারদর্শিনী। হিন্দী ছবির এই তিন জনপ্রিয় শিল্পী যে ছবিগুলিতে তাঁদের দর্শক মনোরঞ্জন-মেধার পরিচয় দিয়েছেন সেগুলির নাম হল—"দো ওস্তাদ" (শেখ মুখতার প্রোডাকশন্স), "জাগীর" (এল এম মুভীজ) ও "বাজীগর" (মুকুল পিকচার্স)।

"দো ওস্তাদ" ছবির এক ওস্তাদ চোর ও পকেটমার রাজকাপুর, অপর ওস্তাদ ডাকাত ও খুনী শেখ মুখতার। এই দুই অপরাধ-চূড়ামণি সহোদর ভাই। পিতৃ-মাতৃহীন দুই ভাই কৈশোরে এক [illegible]পটের পাল্লায় পড়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শেখ মুখতার পাপের পথে পা বাড়ায় সমাজের অন্যায়-অবিচার ও তার প্রতি ভগবানের নির্দয়তার (যা তার অভি-যোগ) প্রতিবাদকল্পে। রাজকাপুর পাপ-পরিবেশে গিয়ে পড়ে [illegible]নকটা অবস্থার বিপাকে পড়ে, আর বা[illegible]টা তার আশৈশব চৌর্য-প্রবৃত্তির তাড়নায়। দুই ওস্তাদের কাণ্ডকারখানা কিছুক্ষণ চলবার পর কাহিনীতে একটি [illegible]টকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করবার প্রয়াস [illegible]ন কাহিনীকার। শেখ মুখতারের সতী-সাধ্বী স্ত্রী জানে না স্বামীর আসল পরিচয়। স্বামীর মেকী সাধুতার মুখোস যখন খসে পড়ে তখন [illegible]ভবা সতী রমণী যায় আত্মহত্যা [illegible] রাজকাপুর তাকে উদ্ধার করে নিজের বোনের মতো তাকে আশ্রয় দেয় এবং এই বোনের প্রভাবেই সে পাপের পথ ছেড়ে দেয়। এর আগে শেখ মুখতার পুলিসের কাছে ধরা পড়ে রাজকাপুরেরই চেষ্টায়। জেলখানায় সে খবর পায় যে, তার স্ত্রী ও পুত্র রাজকাপুরের কাছে আছে। উদভ্রান্ত হয়ে সে জেলখানা ভেঙে পালায় এবং এর পর চিত্রনাট্য তাকে কেন্দ্র করে অনেক রোমাঞ্চ রসেরই বিস্তার ঘটে। শেষ পর্যন্ত সে জানতে পারে, রাজকাপুরই তার

অশোক চিত্রের "প্রস্পধন্ন"র একটি নৃত্যদৃশ্যে নৃত্যরতা নায়িকার বেশে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

হারিয়ে-যাওয়া ভাই। এদিকে জেল-ভাঙগা ও একটি হত্যার অপরাধে তার শাস্তি হয়। জেল হয় তার অল্পকালের জন্য—কারণ আদালতে তার আবেগপূর্ণ জবানবন্দীর ফলে (যার মূলে কথা—অপরাধ তার নয়, নির্দয় সমাজের) শাস্তির মেয়াদ যায় কমে। সৎ জীবন যাপন করার সংকল্প নিয়ে ভাই, স্ত্রী ও পুত্রের সামনেই সে কয়েদখানায় প্রবেশ করে।

দুই ওস্তাদের মাঝখানে আরেকটি বিচিত্র নারী মধু মধুবালা। বাস্তবে অথবা যে কোন দেশের সাহিত্যে এ-জাতীয় নারী-চরিত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার দূর সম্পর্কের কাকা—যিনি তার একমাত্র অভিভাবক—মধুর পিতৃ-সম্পত্তি গ্রাস করতে উদ্যত। এর আগে মধুর সঙ্গে রাজকাপুরের পরিচয় ঘটে। কাহিনীর রাজকাপুরকে অর্থাৎ রাজনকে সে ছদ্মবেশী সত্যিকারের রাজকাপুর অর্থাৎ ছায়াছবির শিল্পী-প্রযোজক রাজকাপুর ভেবে তার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাকে "জাগতে রহো"র গ্র্যান্ড প্রিক্স এবং "শ্রী ৪২০" প্রভৃতি ছবির কথা জিজ্ঞেস করে। পরে তার ভুল ভাঙলেও অনুরাগ ভাঙেনি। অন্যদিকে মধুর টাকার কথা জেনে তার উপর শেখ মুখতারের নজর পড়ে এবং বহু যাতনার পর সে ডাকাতের হাত থেকে উদ্ধার পায়। ছবিতে মধুর সঙ্গে রাজকাপুরের প্রণয়, ভুল বোঝাবুঝি ও পরে মিলন যেমন একদিকে স্থান পেয়েছে, অন্যদিকে পরিচালক মধু অর্থাৎ মধুবালাকে বিচিত্র ও রুচিবিগর্হিত সাজে সাজিয়ে প্রচুর নাচিয়েছেন, যে কারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে মঞ্চের নর্তকীর ভূমিকাও নিতে হয়।

এই জগাখিচুড়ি জাতীয় কাহিনীর অনেক শাখা ও প্রশাখা। তবে এর মূল লক্ষ্য দুর্বোধ্য বা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। দুই ওস্তাদের পাপাচার, নায়িকার নির্লজ্জ মাত্রাহীন নাচ-গান ও অসুস্থ দর্শকদের তাজা করে তোলার মতো নানা উপকরণ দিয়ে আমোদের আয়োজনই ছবির লক্ষ্য। এই আমোদ বিতরণে প্রভূত সহায়তা করেছেন সংগীত পরিচালক ও পি নায়ার, যিনি কুমার জালালাবাদীর উদ্ভট কথায় রচিত গানে এই জাতীয় বিকৃত রসের ছবির ভাবানুগ হাল্কা সুর খুব কৌশলে প্রয়োগ করেছেন।

প্রধান তিনটি চরিত্র রূপায়ণে রাজকাপুর, শেখ মুখতার ও মধুবালা পরিচালক তারা হরিশের দাবী ভালোই মিটিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন সুলোচনা, কমল মোহন, উমা দত্ত ও সতীশ ভাস। শেখ মুখতারের পুত্রের ভূমিকায় ডেইজি ইরাণীর অভিনয় বিরক্তিদায়ক।

কলাকৌশল ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবের কাজ প্রশংসনীয়।

"জাগীর"-এর পটভূমি একটি কার্নিভাল —"মায়া কার্নিভাল"। আসলে সেটি একটি পাপ-চক্র। কুলদীপ কাউর তার পাটরাণী, ছবিতে যার নাম মায়া। মায়া এমনই নারী যে অর্থের প্রলোভনে নিজের বাবাকেও খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতে দ্বিধা বোধ করে নি। মায়ার বাবাকে কার্নিভাল তৈরী করতে অর্থসাহায্য করে উল্হাস্—সে তখন ডাকাত। ডাকাত সে ছিল না—সে ছিল একজন সহৃদয় জাগীরদার। তার ছেলে যখন মৃত্যুমুখে তখন প্রতিবেশী ডাক্তার পূর্ব শত্রুতাবশত সময় মতো তার ছেলেকে দেখতে না আসায় ছেলেটি মারা যায়। জাগীরদার প্রতিশোধ নেয় ডাক্তারের একমাত্র পুত্রকে চুরি করে। তাকে সে সাধু থাকতে দেয় না—তাকে তৈরী করে তোলে ডাকাত। উদ্দেশ্য—সেই সমাজপতিদের মাথায় মৃত্যুশেল হানা, যারা গরীবকে 'ইনসান' বলে স্বীকার করে না।

উল্হাসের পালিত ডাকাত পুত্র প্রেম-নাথ। পিতাপুত্র ডাকাতি করতে যায় প্রেমনাথের আসল পিতা সেই ডাক্তারের বাড়িতে। সেখানে প্রেমনাথের কাতর আর্তনাদ শুনে উল্হাসের মনে জাগে বিষাদ। সে প্রেমনাথকে উপদেশ দেয় তার নিজের হাতছাড়া জাগীর কিনে সমাজে সম্মানী ও সৎলোক হতে। এমন সময় প্রেমনাথ "মায়া কার্নিভালে"র মায়ার ফাঁদে অর্থাৎ কুলদীপ কাউরের কুচক্রে গিয়ে পড়ে। কুলদীপ এই সাহসী যুবককে দিয়ে নিজের পাপাচার সার্থক করতে চায়। কিন্তু সেই কার্নিভালেরই নর্তকী মীনাকুমারী চায় প্রেমনাথকে পাপকুণ্ডলী থেকে উদ্ধার করতে। পরে যখন কুলদীপ প্রেমনাথের হাতে পিস্তল দিয়ে তাকে পাঠায় তারই পিতাকে হত্যা করতে, তখন প্রেমনাথ কুল-দীপের উপর প্রতিশোধ নিতে মরীয়া হয়ে ওঠে। বহু উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার পর কুলদীপ শেষ পর্যন্ত খুন হয় উল্হাসেরই হাতে। বহুদিনের ফেরারী আসামী উল্হাস্ আদালতে তার পূর্ব অপরাধ—ডাক্তারের ছেলে চুরি—স্বীকার করে এবং সেখানে উপস্থিত ডাক্তারকে জানিয়ে দেয় তার হারানো ছেলের পরিচয়। প্রেমনাথকে জড়িয়ে ধরে তার দুঃখিনী মা। হত্যা ও ডাকাতির অপরাধে উল্হাসের চরম দণ্ড হয়। মীনাকুমারী ও প্রেমনাথের প্রেমের শুভ পরিণতির কথা আন্দাজ করে দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

পাপ-উপকরণে নতুন পরিবেশ (নাইট ক্লাবের পরিবর্তে কার্নিভাল) ও আঙ্গিকে (পার্বত্য অঞ্চলবিহারী ডাকাত ও তার দস্যু মোহন জাগীরে ডাকাতি) পরিবেশন করার এক কিম্ভূতকিমাকার চেষ্টা জগমোহন মট্টু পরিচালিত এই ছবিতে বিদ্যমান। কাহিনীতে গরীবের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে বড় বড় বচন ও মেলোড্রামার অবতারণাও হয়েছে। সব কিছু মিলে যা দাঁড়িয়েছে তা থেকে রস আহরণ করতে হলে দর্শকের রুচি ও যুক্তি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নেই।

ছবির প্রধান কয়টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উল্হাস, প্রেমনাথ, মীনাকুমারী ও কুলদীপ কাউর। উল্হাস, প্রেমনাথ ও কুলদীপ কাউর চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। মীনাকুমারীকে কার্নিভালের নর্তকীর ভূমিকায় দেখতে বিসদৃশ লাগে। অস্বাভাবিক চরিত্রে তাঁর অভিনয়ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে নি।

মদনমোহনের সংগীত পরিচালনা ছবির

আকর্ষণ বিশেষ বাড়াতে পারে নি। আঙ্গিক পারিপাট্য ও কলাকৌশলের কাজ মোটামুটি একপ্রকার।

গত সপ্তাহের তৃতীয় চিত্র "বাজীগর"। বিষয়বস্তুর মূলে ধারা দর্শকদের পক্ষে আগে থেকেই অনুমান করে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। ছবির খলনায়ক গুপ্তধনের লালসায় উন্মত্ত হয়ে বন্দী করে রাখে কোন এক কল্পিত রাজ্যের এক পুরনো কর্মচারীকে, যে এর সন্ধান জানে। এই বন্দী কর্মচারীকে উদ্ধার করবার জন্যে যে ছদ্মবেশী অশ্বারোহীর আবির্ভাব ঘটে সে তারই মেয়ে। কর্মচারীর এই "শতপত্র সম কন্যা"র অবলম্বন তার ঘোড়া ও একটি কুকুর এবং তার অসীম সাহস, অব্যর্থ গুলীচালনার ক্ষমতা ও বহুবিধ পুরুষোচিত বীরত্ব। এ সমস্ত-কিছুর সহায়তায় সে তার পিতাকে উদ্ধার করে এবং খলনায়কের কবল থেকে রক্ষা করে রাজ্যের শিশু রাজকুমারকে।

একটি ঘোড়া ও কুকুরকে দিয়ে দর্শকদের

অসিতবরণ বর্তমানে বিশ্বরূপার "ক্ষুধা" নাটকে নায়ক রমেনের ভূমিকায় নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন। ফলে "ক্ষুধা" ৫০০ রাত্রি অভিনীত হবার পরও নতুন করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

চমক দেবার মতো দৃশ্য ছবিতে অনেক আছে। আমোদের দিক দিয়ে ছবির প্রধান আকর্ষণ এ-দুটি পশু যারা ছবির পাশব প্রকৃতির খলনায়কের কীর্তিকলাপ দেখার যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব করে। ছবির অন্যতম আকর্ষণ সর্বশক্তিময়ী নিরুপা রায় যিনি জাহাজের মাস্তুল বেয়ে উঠে যেমন দুর্বৃত্তকে মল্লযোদ্ধার মতো ঘুষি মারেন, তেমনি চলন্ত জীপের উপর দিয়ে সবেগে বিমান চালিয়ে নিয়ে গিয়ে দুষ্কৃতদের হীন প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেন। নারীচরিত্রের পুরুষোচিত বীরত্ব পরিবেশনের তাগিদে এবং "স্টান্টের" প্রয়োজনে সংগতি ও যুক্তির বালাই পরিচালক নানাভাই ভাট মেনে নিতে পারেন নি অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

ছবির মূল চরিত্রে নিরুপা রায় আধুনিক "চিত্রাঙ্গদা" হয়ে উঠতে পারেন নি, তবে পরিচালকের চাহিদা মতো পুরুষালী দেখিয়ে প্রেক্ষাগৃহ জমিয়ে রেখেছেন। খলচরিত্রে তিওয়ারীর অভিনয় স্বাভাবিক। ছবির নায়করূপী জয়রাজ বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রোমি, শাম্মি, সুন্দর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছবির দুটি আশ্চর্য পশু মুশতাক (ঘোড়া) ও টাইগার (কুকুর) ছবিতে শিল্পীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছে বলা যেতে পারে।

সংগীত পরিচালনায় চিত্রগুপ্তের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কলাকৌশলের কাজ উঁচুদরের।

ছবি তিনটি নিয়ে আলোচনা করবার পরও একটি বিশেষ বক্তব্য থেকে যায়। বিদেশী ছবির আমোদ-উপকরণের বিকৃত অনুকরণ, পাপ-উপাদানের ছড়াছড়ি ও

নিম্নপ্রবৃত্তি উত্তেজক নাচ-গান ও রূপসজ্জা সম্বলিত এক ধরনের হিন্দী ছবির সংখ্যা ইদানীং এত বেশী বেড়ে চলেছে যে, এতে সহজেই আতঙ্কিত হয়ে পড়তে হয়। এ সকল ছবির প্রতি দর্শকদের সক্রিয় অসহযোগিতা যদি না-ই বা আসে, তবুও অন্য কোন সংশ্লিষ্ট মহলের হাতে কি এর কোন প্রতিকার নেই?

নাট্যাভিনয়

পরলোকগত নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে আগামী ২৯শে জুন, সোমবার, সন্ধ্যা ৬-৩০টায় বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির উদ্যোগে বহুরূপী কর্তৃক তুলসী-বাবুর "ছেঁড়াতার" অভিনীত হবে। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায় প্রমুখ বহুরূপীর জনপ্রিয় শিল্পিগণ এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

• • •

হাওড়া যুব-সভার উদ্যোগে আগামী ৯ই আগস্ট থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় হাওড়া টাউন হলে তিনদিনব্যাপী কিশোর সাংস্কৃতিক সম্মেলন শুরু হবে। নাটকাভিনয়, নৃত্যনাট্য, একক সঙ্গীত ও নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে যুবসভার কার্যালয়ে (২২ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া) ১৫ই জুলাই পর্যন্ত।

• • •

'আনন্দভারতী'র শিল্পিদল থিয়েটার সেণ্টারের নাট্যসমারোহে গত ৫, ৬ ও ৭ই জুন যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের প্রতীকধর্মী নাটক 'ওয়েটিং ফর গোডো' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির রূপান্তর করেছেন অশোক সেন। কৃত্তিম মজুমদারের পরিচালনাধীনে নাট্যাভিনয়টি সুসজ্জিত অভিনয় সৌকর্যে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

গীতবিতানের 'বর্ষামঙ্গল'

গীতবিতানের পরবর্তী নিবেদন রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' গীতিনাট্য আগামী ১৯শে জুলাই, রবিবার সকাল ১০-৩০, ২১শে জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬-৩০ ও ২২শে জুলাই সন্ধ্যা ৬-৩০টায় নিউ এম্পায়ারে পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বর্ষার গান নাচের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্র-রচনার ভিত্তিতে গীতবিতানের পূর্ববর্তী নিবেদন, 'মায়ার খেলা', 'রক্তকরবী', 'বসন্ত', 'শ্যামা', 'মৃগয়া' ও 'শাপমোচন' রসিক জনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের আগামী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গীতবিতানের কর্তৃপক্ষ একটি আধুনিক ধরনের ভবন ও প্রেক্ষাগৃহ এই মহামানবের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে গীতবিতানের দুই লক্ষ টাকার একটি অর্থ-ভাণ্ডারের প্রয়োজন। বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের অর্জিত লভ্যাংশ এই অর্থভাণ্ডারে দান করা হবে।

একলব্য

ভারতের কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণণের লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ গত সপ্তাহের খেলাধূলার খবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় খবর। আজ পর্যন্ত ভারতের কোন খেলোয়াড় লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেন নি শুধু এইজন্যই এ খবর বড় খবর নয়। বড় খবর এইজন্য, কৃষ্ণণ সেমি-ফাইন্যালে বর্তমানে এমেচার টেনিসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে অভিহিত এলেক্স ওলমেডোকে পরাজিত করবার পর ফাইন্যালে পরাজিত করেছেন গতবারের উইম্বলডন রানার্স নীল ফ্রেজারকে। উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভের মুখে রমানাথন কৃষ্ণণের এই কৃতিত্ব সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর অধিবাসী এবং বর্তমানে আমেরিকার খেলোয়াড় ওলমেডোকে নিয়ে টেনিস জগতে হৈ-চৈ আরম্ভ হয়েছে। ওলমেডোর কৃতিত্বেই আমেরিকা গতবার অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করেছে। তাই বিশ্বের টেনিস পণ্ডিতরা ওলমেডোকে দিয়েছেন এমেচার টেনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের 'সিডিং'য়ে অর্থাৎ সম্ভাবিত বিজয়ীদের বাছাই তালিকায় ওলমেডোর স্থান সবার উপরে। ওলমেডোর পরেই স্থান পেয়েছেন গতবারের রানার্স অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় নীল ফ্রেজার। সেই ওলমেডো ও ফ্রেজারকে হারিয়ে লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ কৃষ্ণণের পক্ষে যে সে কৃতিত্বের কথা নয়।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের 'সিডিং'য়ে কৃষ্ণণ কোন স্থান পাননি। বিশ্বের টেনিস বিশেষজ্ঞদের অনুক্রম অস্ট্রেলিয়ার ভ্রান-সম্মধ কোচ হ্যারী হপম্যান কয়েকদিন আগে যখন উইম্বলডন সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন তখন সম্ভাবিত বিজয়ীদের মধ্যে তিনি কৃষ্ণণের নামও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণণ 'সিডিং'য়ে কোন স্থান পাননি। তাই লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপের পর হ্যারী হপম্যান বলেছেন, ইংলণ্ডের টেনিস বিশেষজ্ঞদের মুখের উপর জবাব দিয়েছেন ভারত চ্যাম্পিয়ন রমানাথন কৃষ্ণণ। শুধু হপম্যান কেন, ইংলণ্ডের সমস্ত কাগজই কৃষ্ণণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ কেউ বলেছেন, 'কুইন্স ক্লাবে লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপে কৃষ্ণণ যেমন খেলেছেন তাতে কোন প্রশংসাই তাঁর পক্ষে বেশী নয়। অপূর্ব টেনিস প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কৃষ্ণণ।'

কৃষ্ণণ সম্বন্ধে লণ্ডনের কয়েকটি পত্রিকার মন্তব্য প্রকাশ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'ইভনিং নিউজে' স্টিভ রবার্টসন লিখেছেন—'কৃষ্ণণ, তুমি অপূর্ব টেনিস খেলেছো। ওলমেডো ও নীল ফ্রেজারকে হারিয়ে তুমি দেখিয়ে দিয়েছো, 'সিডিং'য়ের বাইরে থেকেও তুমি উইম্বলডন জয় করতে পার। কু-লোকে কু-কথা বলে থাকে। অনেকে বলেছে, ওলমেডো দ্বিতীয় সেট ছেড়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে বলেছে, নীল ফ্রেজারও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি একথা স্বীকার করি না। অবশ্য এক এক সময় মনে হয়েছে, ফ্রেজার ঠিক মন দিয়ে খেলছেন না। কিন্তু কৃষ্ণণের সঙ্গে সুবিধে করতে পারেননি বলেই খেলায় তাঁর মন লাগেনি। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণণের খেলার কাছে তাঁর খেলা ম্লান হয়ে গেছে।'

'এম্পায়ার নিউজে' বলা হয়েছে—"লণ্ডনে এসে এবার কৃষ্ণণ মাত্র একবার পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ক্রীড়াধারা টেনিসের উন্নত ছলাকলায় ভরা। টেনিসের সুনিপুণ শিল্পী তিনি।"

'সাণ্ডে পিক্টোরিয়ালে' জ্যাক পিয়াট লিখেছেন—"কৃষ্ণন নীল ফ্রেজারের ব্যাক-হ্যাণ্ডের দুর্বলতার উপর আক্রমণ করে জয়ী হয়েছেন। ওলমেডোরও ঐদিকে দুর্বলতা সুস্পষ্ট। সুতরাং উইম্বলডনে কৃষ্ণণের বিস্ময় সৃষ্টি করার যথেষ্টই কারণ আছে। তিনিই হবেন এবারকার উইম্বলডনের এক প্রধান আকর্ষণ।"

ইংলণ্ডের প্রাক্তন ডেভিস কাপ খেলোয়াড় টনি মোট্রাম 'অবজারভারে' মন্তব্য করেছেন—"কুইন্স ক্লাবে কৃষ্ণণের বিস্ময়কর সাফল্যে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে এবার বাছাই তালিকার বাইরের খেলোয়াড়ও উইম্বলডনে সাফল্য লাভ করতে পারে। বলের গতিরোধ এবং গতিবেগ বিপরীতমুখী করার সুনিপুণ কৌশলে কৃষ্ণণ অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।"

রয়টারের প্রতিনিধি লিখেছেন ১৯৫২ সালে ফ্রাঙ্ক সেজম্যান লণ্ডন ও উইম্বলডন বিজয়ী হবার পর আর কেউ একযোগে এ সম্মান লাভ করতে পারেন নি। এবার এই সম্মান লাভ করে কৃষ্ণণের এমেচার টেনিসের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের মর্যাদা পাবার সম্ভাবনা আছে।"

ফ্রাঙ্ক রস্ট্রন 'ডেলী এক্সপ্রেসে' মন্তব্য করেছেন—"দু'বছর আগে উইম্বলডনে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জারোস্লাভ দ্রবনীকে হারাবার সময় কৃষ্ণণ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন এবার তার চেয়েও বেশী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কৃষ্ণণের ক্রীড়া-মান এখন এমেচার টেনিসের চরম শিখরে।"

'ডেলী স্কেচে' লরি পিগনন বলেছেন—"ওলমেডোকে উইম্বলডনের 'সিডিং'য়ে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া ঠিক হয়নি। যে ওলমেডোর সার্ভিস ফেরাতে পারবে তার পক্ষেই ওলমেডোকে পরাজিত করা সম্ভব। কৃষ্ণণ এবিষয়ে দক্ষ বলেই মনে হয়।"

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কৃষ্ণণের আর প্রশংসাবাণীর অভাব নেই। এককথায়

ইংলণ্ডে কৃষ্ণণের প্রশংসায় 'বান' ডেকে গিয়েছে। ইংলণ্ডে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ব্যর্থতায় ইংলণ্ডস্থ ভারতীয়রা যখন হতাশায় ম্রিয়মান, তখন কৃষ্ণণের এই প্রশংসা তাদের দুঃখভারাক্রান্ত মনে অনেকখানি আনন্দ দিয়েছে।

* *

ফুটবল লীগের আরও একটি চ্যারিটি খেলা হয়ে গেছে এবং এ খেলাতেও দেখা গেছে কলকাতার ফুটবল-পাগল দর্শকদের উৎকট উৎসাহ উদ্দীপনা। খেলার আগের দিন সকাল থেকেই অত্যুৎসাহী দর্শকরা মাঠে লাইনের 'কিউ' বেঁধেছে। টিকিটের জন্য শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ছোটাছুটি করেছে। ক্লাব মহলে উঠেছে টিকিটের হাহাকার। হবেই বা না কেন? খেলা তো আর যে সে খেলা নয়। মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের। কলকাতার দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী—এবং পরস্পরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। পোড়া-লালা ও পিত্তি-সবুজের সঙ্গে লাল-হলুদের লড়াই। দুই দলের রঙের নেশায় দর্শকরাও মাতাল।

খেলায় লাল-হলুদের পরাজয় ঘটেছে। শুধু পরাজয়ই ঘটেনি লাল ও হলুদের ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি ফ্যাকাশেও হয়ে গেছে। অন্যদিকে পোড়া-লাল ও পিত্তি-সবুজ হয়েছে আরও চকচকে। সত্যিই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সঙ্গে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। বিশেষ করে প্রথমার্ধে। মাখমের ভেতর দিয়ে যত সহজে ছুরি চালানো যায় মোহনবাগানও তত সহজে আক্রমণের উপর আক্রমণ চালিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণব্যূহের মধ্য দিয়ে। তাই বলে মোহনবাগানের খেলা খুব ভাল হয়েছে এ কথা আমি স্বীকার করি না। একটি দল প্রথমার্ধে একেবারেই খেলতে পারেনি। তার সুযোগে মোহনবাগান খেলেছে বীর দাপটে। কিন্তু গোল? প্রথমার্ধে যে তিনটি সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি থেকেও মোহনবাগান গোল করতে পারে নি। প্রথমার্ধের গোলটি হয়েছে ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষকেরই ভুলের ফলে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় অবশ্য ইস্টবেঙ্গল কিছু বেশীই আক্রমণ চালায় এবং কয়েকবার গোল করবার সহজ সুযোগও সৃষ্টি করে। মোহনবাগান গোল-রক্ষক এইভাবে দুইটি অব্যর্থ গোলও রক্ষা করেন। উপরন্তু কিছুটা আক্রমণধারার বিরুদ্ধেই মোহনবাগান আর একটি গোল করে জয়লাভের পথ নিশ্চিত করে রাখে। কিন্তু ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে খেলাটি উচ্চাঙ্গের হয়েছে এ কথা স্বীকার করা যায় না।

এই খেলায় আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে দুই দলের দুটি সট। সট দুটি যেন এখনো আমার চোখের উপর ভাসছে। কোন সটেই গোল হয় নি। মোহনবাগানের লেফ্ট ইন চুণী গোস্বামীর বিদ্যুৎগতি উঁচু শট ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক এক হাতে ঘুষি মেরে ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন শট তেমনই প্রতিরক্ষা। আর ইস্টবেঙ্গলের রাইট ইন নারায়ণের তীব্র উড়ন্ত শট ক্রসবারে লেগে ফিরে এসেছে। এইখানেই পাওয়া গেছে ইস্টবেঙ্গলের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। নারায়ণের শটটি গোলে ঢুকলে তখন খেলার সমতা থাকতো ১—১ গোলে এবং শেষ পর্যন্ত খেলার ফলাফল কি হত বলা শক্ত। যাই হক খেলার ধারা অনুযায়ী মোহনবাগান যোগ্য দল হিসাবেই বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে এবং লীগ জয়ের অভিযানে এগিয়ে গেছে অনেক

রমানাথন কৃষ্ণণ

ক্রিকেট খেলার খবর

বেরী সর্বাধিকারী

(বিমান ডাকে)

লণ্ডন, ২১শে জুন—দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আবার সেই পচা, পুরনো কথা লিখতে হচ্ছে। কি করব, না লিখে উপায় নেই। লেখাই আমার পেশা, কিছুটা নেশাও। ক্রীড়া-সমালোচক আমি। আজ চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে সফর করছি। উন্নতির কথা দূরে থাক, দিন দিনই দেখছি আমাদের খেলার অবনতি ঘটছে। আজ তার চরম অবস্থা। তাই মাঝে মাঝে ভাবি 'কী ফল লভিনু হায়'! এবার ইংলণ্ডে আসার খুব বেশী ইচ্ছে ছিল না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়রা যেমন খেলে-ছিলেন, তাতেই মন দমে গিয়েছিল। তবু নেশা ও পেশার টানে শেষ পর্যন্ত সাগর পাড়ি দিতে হল। অবশ্য এখানে এসে একেবারেই যে নিরাশ হয়েছি, একথা বলি না। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রশ্মিও কিছুটা না দেখেছি, এমন নয়। কিন্তু সে আলো ক্ষণিকের। 'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে'-এর মতন।

লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতীয় দল নর্দাম্পটনশায়ার কাউণ্টিকে হারালো এক ইনিংস ও ৯ রানে। নট আউট থেকে পলি উমরিগর একাই করলেন ২০২ রান। মঞ্জরেকার, পঙ্কজ রায় এবং ঘোড়-পাড়েও ভাল ব্যাট করলেন। গুপ্তের বোলিংয়েও আগের জৌলুস দেখা গেল। এখানে বলা প্রয়োজন, এবারকার ইংলণ্ড সফরে কাউণ্টি টীমের বিরুদ্ধে এটাই আমাদের প্রথম সাফল্য এবং আমাদের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান পলি উমরিগরের তৃতীয় দ্বিশতাধিক রান। এই খেলায় উমরিগরের সফরের সহস্র রানও পূরে যায়। এর আগে আমরা ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স টীমকে ১০ উইকেটে, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে এক ইনিংস ও ৫৩ রানে এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে একই ফলাফলে পরাজিত করলেও কোন কাউণ্টি টীমকে হারাতে পারিনি। উমরিগর নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরী করার আগে কেম্ব্রিজ ও সামারসেটের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন। কিন্তু করলে কি হবে? বলে খেলায় ভাল খেলে টেস্টে যদি ব্যর্থতার পরিচয় দেন, তাতে উমরিগরের মত খেলোয়াড়ের গৌরব বাড়ে না। তবু আশা ছিল, লর্ডস টেস্টে উমরিগর ভাল খেলবেন। কিন্তু হায় হতোস্মি! লর্ডস টেস্টে উমরিগরের প্রথম ইনিংসের 'এক' আর দ্বিতীয় ইনিংসের 'শূন্য' রান যেমন বেদনাদায়ক; তেমন নির্ভরযোগ্য স্পিন ও গুগলী-বোলার সুভাষ গুপ্তে, যাঁর উপর অনেকখানি আশা করেছিলাম, তাঁর ব্যর্থতা দুঃখের কারণ। তই বলছিলাম, একটুখানি আলোর পরই আবার অন্ধকার। লর্ডস টেস্টের আগে যাঁরা ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করলেন, টেস্টে তাঁরাই দিলেন ব্যর্থতার পরিচয়।

লর্ডস টেস্টে আমরা ইংলণ্ডের কাছে হেরেছি ৮ উইকেটে। ট্রেন্ট ব্রিজের প্রথম টেস্টে হেরেছিলাম এক ইনিংস ও ৫৯ রানে। প্রথম টেস্ট খেলাটি শেষ হয়েছিল সাড়ে তিন দিনে আর এবার দ্বিতীয় টেস্টের

উপর যবনিকা পড়েছে পুরো তিন দিনেরও কম সময়ে। টেস্ট খেলার আলোচনায় পরে ঘুরে আসছি। তার আগে ক্রিকেটের 'পীঠভূমি' লর্ডস মাঠ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

'লর্ডস' মাঠ সম্বন্ধে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন, ইংলণ্ডের ধনী সম্প্রদায়ই এই মাঠ সৃষ্টি করেছিলেন এবং ধনীদেরই এটা ক্রিকেটের মিলনক্ষেত্র। কিন্তু আসলে লর্ডস মাঠের সৃষ্টিকারক টমাস লর্ড নামীয় এক ভদ্রলোক। তিনিই মাঠটিকে লীজ নিয়ে ক্রিকেট খেলার উপযোগ করে তোলেন। এখানে শুধু বলব লর্ডস মাঠ অর্থে টমাস লর্ড সৃষ্ট ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক ক্রিকেট মাঠ আভিজাত্যে ভরা—পৃথিবীর যে-কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে লর্ডস মাঠে খেলার প্রলোভনও দুর্নিবার। বলা বাহুল্য, মাঠের ঐতিহ্য ও আভিজাত্য সবার উপরে। কিন্তু মাঠটি বড় সেকেলে ধরনের। লোকও এমন কিছু বেশী ধরে না। টেনেটুনে তিরিশ-বত্রিশ হাজার দর্শক বসতে পারে এখানে। বসবার জায়গাও এমন কিছু আরামের নয়। আমাদের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম এর চেয়ে অনেক আরামপ্রদ। অবশ্য মাঠে ঢোকার জন্য সবারই পয়সা দিতে হয়। ব্যবস্থা এমন যে, স্ট্যাণ্ডের পেছন দিয়ে সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করা যায়। তারপর যে যেমন সীট বসতে চায়—তেমন দক্ষিণা দিয়ে টিকিট কেনে।

কিন্তু লর্ডস মাঠের কি যেন একটা মোহ আছে। মাঠের সর্বত্রই আছে ক্রিকেটের গন্ধ। যেমন আমাদের ইডেন গার্ডেনে। আমি ইংরেজ-ভক্ত নই। সারা বিশ্বের বহু ক্রিকেট মাঠ দেখেছি। কিন্তু এত অসুবিধা এবং এমন পুরনো ব্যবস্থা সত্ত্বেও লর্ডসের ত্রুটি আজও চোখে পড়েনি। কেন জানি না। বোধ হয়, লর্ডসের ঐতিহ্য ও আভিজাত্যের জন্য। একথা ভাষা দিয়ে বুঝান যায় না। হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়।

লর্ডস মাঠে আজও সেই প্রাচীন স্কোর-বোর্ড। তবে একটু অদলবদল করা হয়েছে। ফিল্ডসম্যানদের নামের পাশে আলো দিয়ে তাঁদের চিনিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। পুরনো প্রেস বক্স বাতিল হয়েছে। সাংবাদিকদের জন্য তৈরী হয়েছে এক নতুন বাড়ি। সেখানে তাঁদের জন্য আছে স্নানাগার, খাবার জায়গা ও পানশালা। মনে পড়ে অনেকদিন আগে লর্ডস মাঠে সাংবাদিকদের অসুবিধার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না, আজ ভাল লাগছে না—লর্ডসের এই নতুন আবহাওয়া। পুরনো ব্যবস্থার সংগে এই নতুন আবহাওয়া খাপছাড়া মনে হচ্ছে। শুধু মনে হচ্ছে, আগের ব্যবস্থাই ভাল ছিল।

এখন খেলার কথা। খেলা সম্বন্ধে কি-বা বলি? সব কথাই তো আপনাদের জানা হয়ে গেছে। 'ব্রঙ্কাইটিসের' জন্য অসুস্থ গাইকোয়াড়ের বদলে লর্ডস টেস্টে পংকজ রায়ের অধিনায়কত্ব, প্রথম ইনিংসে ন্যাটা ব্যাটসম্যান নরী কণ্ট্রাক্টরের প্রশংসনীয় ৮১ আর দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকারের দৃঢ়তাপূর্ণ ৬১ রান, রমেশ দেশাই ও সুরেন্দ্রনাথের মারাত্মক বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের 'খাবি' খাবার মত অবস্থা—সবই তো পচা পুরনো কথা। তাই খেলার বিবরণ না বলে হৃদয় দিয়ে যেটা অনুভব করেছি, সেই কথাটিই বলছি।

সত্যিই আমি এবার একটু আনন্দ পেয়েছি আমাদের এই দুর্বল দলের কিছুটা মনোবল দেখে। নতুন অধিনায়ক পংকজ রায়ও অধিনায়কত্বে দাত্তাজীরাও গাইকোয়াড়ের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও আমি মনে করি, ভারতের প্রথম ইনিংসের ১৬৮ রানের প্রত্যুত্তরে যখন ইংলণ্ডের ৭টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র ১০০ রানে, তখন দেশাই ও সুরেন্দ্রনাথের বদলে গুপ্তের উপর বোলিংয়ের ভার ন্যস্ত করা উচিত হয়নি। তবুও আমি বলব, পংকজ রায়ের উপায়ই বা কি ছিল? কারণ দেশাই ও সুরেন্দ্রনাথ এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিধি বাম। গুপ্তের বোলিং কার্যকরী হল না। পেস-বোলার সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশ দেশাই বোলিংয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা লর্ডস মাঠের দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। কিন্তু লেগ স্পিন বোলার গুপ্তে? প্রথম ইনিংসে তিনি ইংলণ্ডের শেষের দিকের দুজন ব্যাটসম্যানকে কোন-ক্রমে আউট করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বল কোন সময়েই ভাল হয়নি। এর ফলে ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মে ও কলিন কাউড্রে বেশ পিটিয়ে রান তুলে নিয়েছেন। কাউড্রে গুপ্তের বলকে 'কানাকড়ি'ও সম্মান দেননি। এমনকি, শেষ দিকে একবার ওভার বাউণ্ডারীও মেরেছেন।

ইংলণ্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান মিল্টন ও চেন টেলরের দুটি টেস্টে ব্যর্থতার ফলে তাঁরা হয়তো তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ড দল থেকে বাদ পড়বেন।

আমাদের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ট্রুম্যান ও স্ট্যাথামের ফাস্ট বোলিংয়ের যথাযথ উত্তর দিয়েছেন একমাত্র মঞ্জরেকার। বিপর্যয়ের মুখে মঞ্জরেকার এই দুজনের ফাস্ট বল যেভাবে হিট করে খেলেছেন, তা কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু সেই কল্পনাতীত ঘটনাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন মঞ্জরেকার। এ ছাড়া এ টেস্টে ঘোড়পাড়ে এবং কৃপাল সিংও দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ফাস্ট বোলিং খেলতে হয়। আড়াই দিনে টেস্ট খেলা শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু আগের মত ইংলণ্ডের সমালোচকদের 'নাকনাড়া' বন্ধ করে দিয়েছেন আমাদের খেলোয়াড়রা খেলার মত খেলা খেলে। দর্শকরা উপলব্ধি করেছে, নরী কণ্ট্রাক্টরের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং, মঞ্জরেকারের অপূর্ব নৈপুণ্য, কৃপাল সিং ও ঘোড়পাড়ের কয়েকটি কভার ড্রাইভ—আর অবাক হয়ে গেছে সুরেন্দ্রনাথের মারাত্মক বলে পিটার মে'র মত ব্যাটসম্যানকে ক্লিন বোল্ড হতে দেখে। বোরদে ও অধিনায়ক গাইকোয়াড় দলে থাকলে ভারতীয় দল হয়তো আরও ভাল খেলত।

ইংলণ্ডে আসবার পর ভারতীয় দলের বিশ্রামের অবকাশ নেই। রবিবার ছাড়া প্রতিদিনই খেলা। বিশ্রাম শুধু প্রতি টেস্টের আগের দিন। তিন দিনে দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হওয়ায় তবু একটু বিশ্রাম মিলেছে। এর পর ল্যাংকাশায়ার ও ডার্বিশায়ারের সংগে দুটি ম্যাচ খেলে জুলাইয়ের দুই তারিখ থেকে ভারতীয় দল তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে লীডস মাঠে।

নীচে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোর-বোর্ড এবং দুই দলে যাঁরা খেলেছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল :—

ভারত—প্রথম ইনিংস ১৬৮ (নরী কণ্ট্রাক্টর ৮১, জে এস ঘোড়পাড়ে ৪১, পি রায় ১৫; গ্রীনহাফ ৩৫ রানে ৫ উইকেট, হটন ২৭ রানে ২ উইকেট, স্ট্যাথাম ২৭ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ২২৬ (কেন ব্যারিংটন ৮০, ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৩৮, কলিন কাউড্রে ৩৪, এলান মস ২৬; দেশাই ৮৯ রানে ৫ উইকেট, সুরেন্দ্রনাথ ৪৬ রানে ৩ উইকেট, সুভাষ গুপ্তে ৬২ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৫ (বিজয় মঞ্জরেকার ৬১, এ জি কৃপাল সিং ৪১, জে এম ঘোড়পাড়ে ২২; ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৪৫ রানে ৩ উইকেট, এলান মস ৩০ রানে ২ উইকেট, গ্রীনহাফ ৩১ রানে ২ উইকেট, ফ্রেড ট্রুম্যান ৫৫ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইঃ) ১০৮ (কলিন কাউড্রে নট আউট ৬৩, পিটার মে নট আউট ৩৩)।

উভয় দলে খেলেছেন—

ভারত—পি রায় (অধিনায়ক), নরী কণ্ট্রাক্টর, পলি উমরিগর, বিজয় মঞ্জরেকার, জে এম ঘোড়পাড়ে, এ জি কৃপাল সিং, এম এল জয়সিমা, পি জি যোশী (উইকেট কিপার), সুভাষ গুপ্তে, সুরেন্দ্রনাথ ও আর বি দেশাই।

ইংলণ্ড—পিটার মে (অধিনায়ক), কেন ব্যারিংটন, কলিন কাউড্রে, গডফ্রে ইভান্স (উইকেট কিপার), টম গ্রীনহাফ, মার্টিন হটন, আর্থার মিল্টন, এলান মস, ব্রায়ান স্ট্যাথাম, কেন টেলর ও ফ্রেডি ট্রুম্যান।

দেশী সংবাদ

১৫ই জুন—বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, চেরাপুঞ্জী থানার অধীন কাকোরকোচা গ্রামের নিকটে বলাই নদী হইতে পাথরের নুড়ি সংগ্রহের জন্য গত ২রা জুন প্রায় দুই শত নৌকায় বহু পাকিস্তানী ভারতে অনুপ্রবেশ করে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর পাকিস্তানী মনোভাবাপন্ন লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেকদিন যাবত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াইয়া আসিতেছেন। ইহাদের মধ্যে উগ্র মতাবলম্বীরা অতি সম্প্রতি এই অঞ্চলে 'মুসলিম রাজ্য স্থাপনের' জিগীর তুলিয়া সমর্থকদের মনে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি উস্কাইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৬ই জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নৈনিতালে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যেসব কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের গৃহীত সমবায় প্রথায় চাষাবাদের বিরোধী তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে পারেন। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করিতে আমরা উপযুক্ত লোকই চাই, সংখ্যাধিক্যের কোন প্রয়োজন নাই।

কোম্পানী আইনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী ডি এল মজুমদার অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, গত দুই বৎসর যাবত নূতন নূতন জয়েন্ট স্টক কোম্পানী রেজিস্ট্রারী করার ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের স্থান যেমন সর্বাগ্রে, তেমনই এই রাজ্যে কোম্পানী বন্ধ হইয়া যাওয়ার সংখ্যাও সর্বাধিক।

১৭ই জুন—প্রকাশ যে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাপারে "সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ করার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে নির্দেশ দিয়াছেন। ওই নির্দেশের ফলে রাজ্যের কংগ্রেস মহলে বিভেদ দেখা দিয়াছে এবং একদল কংগ্রেসকর্মী হাইকমাণ্ডের নির্দেশ অমান্য করিতে চলিয়াছে।

কেরলে কম্যুনিস্ট সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য রাজ্যের বিরোধী দলগুলির আন্দোলনের পঞ্চম দিবসে ত্রিবান্দ্রম শহর এলাকার মধ্যে মশাল শোভাযাত্রা সরকারী আদেশবলে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। পনের দিন এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিবে। কেরালার সাতটি জেলার সংবাদ হইতে জানা যায় যে, সরকারী অফিস ও বিদ্যালয়ের সম্মুখে পিকেটিং করিবার জন্য ছয় শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৮ই জুন—অদ্য ইম্ফল হইতে বিলম্বে প্রাপ্ত এক তারবার্তায় জানা গিয়াছে, ইম্ফল ও নানবুল নদীর বন্যায় মণিপুর রাজ্যের প্রায় দশ হাজার গৃহ জলমগ্ন হইয়াছে এবং এই সপ্তাহের গোড়ার দিকে মাও-ইম্ফল রোডের তিন মাইলেরও বেশী জলমগ্ন হওয়ায় সমস্ত যান চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজে সাপ্তাহিক 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কেরল সত্যাগ্রহ' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীরাজা গোপালাচারী বলেন, কেরলে কংগ্রেস কর্মীরা যাহা করিতেছেন, তাহাতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। যখন আইন অনুযায়ী প্রতিবিধান সম্ভব তখন সত্যাগ্রহ করার কথা মহাত্মা গান্ধীও চিন্তা করিতেন না।

১৯শে জুন—কেরালার বর্তমান সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেন—এখন যদি তাহারা আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তবে তাহা দলের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল হইবে।

আজ সকালে বাটরা থানা এলেকায় নরসিংহ দত্ত রোডস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন নামের পাঁচখানি গাঁড়া দুধের রেশনকার্ড অবৈধভাবে অপর এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ায় এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২০শে জুন—দালাই লামা আজ মুসৌরীতে বলেন যে, বর্তমান তিব্বত এবং চীনের ১৯৫০ সালের পূর্ব পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ-স্বাধীনতাভোগী আমদো ও খাম প্রদেশ দুইটি লইয়া এক বৃহত্তর তিব্বত গঠন করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫০ সালের পূর্বে তিব্বতীগণ যে অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করিয়াছে তিনি যখন উহা পাইবেন, কেবলমাত্র তখনই তিনি লাসায় ফিরিয়া যাইবেন।

২১শে জুন—আজ জব্বলপুরে গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরিতে সরকারী উদ্যোগে প্রস্তুত ভারতের প্রথম সামরিক যান বহু সংখ্যক কর্মীর বিপুল হর্ষধ্বনির ও ভেরী নিনাদের মধ্যে নির্মাণশালা হইতে নির্গত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তিন টনের এই যানটির নামকরণ করিয়াছেন—"শক্তিমান"।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই জুন—গত ১২ই জুন লাহোরে একটি নিম্ন সামরিক আদালত বে-আইনীভাবে ভারতের বস্ত্র ও টাকা পয়সা পাকিস্তানে চালান দিবার অভিযোগে চারজন ভারতীয় নাগরিককে বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আজ রাত্রিতে এডেনের নির্ভরযোগ্য মহল হইতে বলা হয় যে, ইয়েমেনী সৈন্যগণ ইয়েমেনের তাইজ এবং হোদিদা নামক দুইটি বৃহত্তম শহর দখল করিয়াছে এবং ঐ দেশের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

১৬ই জুন—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরকারীভাবে ছয় দিনব্যাপী সিংহল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আজ বিমানযোগে সদলে কলম্বোতে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক বিমান বন্দরে তাঁহাকে স্বাগত করে।

১৭ই জুন—গতকল্য রাত্রিতে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ বার্লিন সমস্যার অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান সম্পর্কে তাহাদের সর্বশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করে, এবং রাশিয়া যদি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে শীঘ্রই চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণের সম্মেলনের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

১৮ই জুন—জনৈক কানাডিয়ান চাষীর স্ত্রী অদ্য তাঁহার ২৭তম সন্তান প্রসব করিয়াছেন। নবজাতক ও জননী উভয়েই সুস্থ আছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট শ্রীইউজেন ব্ল্যাক গতকল্য ওয়াশিংটনে বলেন যে, সিন্ধু নদ অববাহিকার জল বণ্টনের ব্যবস্থা করিবার জন্য যে অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা নীতিগতভাবে অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে।

১৯শে জুন—ছয় জন মার্কিন নাগরিক ক্লিভল্যাণ্ডে মার্কিন ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ভারতের সহিত ব্যবসায় এবং ভারতে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ না গ্রহণ করে তাহা হইলে, অন্যান্য দেশ ঐ সুযোগ গ্রহণ করিবে।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ আজ এই মর্মে এক অভিমত প্রকাশ করেন যে, জার্মানী সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নূতন প্রস্তাবগুলির কোন কোন অংশ "সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।"

২০শে জুন—কংগ্রেসের নিকট সাক্ষ্যদানকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান দপ্তরের অধ্যক্ষ জেনারেল টমাস হোয়াইট বলেন যে, পাকিস্তানকে উহার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুরোধ করিয়াছে। তবে তিনি একথাও বলেন যে, "পাকিস্তানীদের চেয়ে ভাল যোদ্ধা জাতি বেশি নাই।" তাহারা আমাদের মিত্র, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহাদের উপর আমরাও নির্ভর করিতে পারিব।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ন্যূনতম ২০ কোটি ডলার ঋণ দিবে। কংগ্রেসের বৈদেশিক কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যসমূহের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে উক্ত তথ্য জানা গিয়াছে।

২১শে জুন—পূর্ব পাকিস্তানের ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা ও সুরমা এই চারিটি নদীতে জলস্ফীতির ফলে এই প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পৌঁছিয়াছে। এই বন্যার ফলে বগুড়া, রংপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ বিপন্ন হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

= বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ =
রাজশেখর বসুর
চলচ্চিন্তা ২॥
প্রমথনাথ বিশীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি
কেরী সাহেবের মুন্সী (৪র্থ মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৮॥
প্রবোধকুমার সান্যালের
বেলোয়ারী (২য় মুদ্রণ) ৬॥
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সার্থক উপন্যাস
বহ্নিবন্যা ৮॥
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
সমুদ্র সফেন
—সাড়ে চার টাকা—
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭
(সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নয়ান বৌ ৩য় মুদ্রণ ৫
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮
কথাচিত্র ৩
আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮
ডাঃ সুশীলকুমার দে'র
নানা নিবন্ধ ৫॥
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
আরাকান ২য় মুদ্রণ ৫॥
ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের
নিরীক্ষা ৪
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্প-পঞ্চাশৎ ৮॥
নূতন উপন্যাস
তরঙ্গের পর (যন্ত্রস্থ)
রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
জীবন-জাহ্নবী ৬॥০
কালীপদ ঘটকের
অরণ্য-কুহেলী ৪॥০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
ভারত-সংস্কৃতি ৫॥০
ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫
মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সদ্য প্রকাশিত হইল

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম গ্রন্থ

কবি ও অ-কবি

—তিন টাকা চার আনা—

আশাপূর্ণা দেবীর
সর্বাধুনিক উপন্যাস

নেপথ্যনায়িকা

—পাঁচ টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত

রক্তকমল

—তিন টাকা—

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

এই যে
রবিনসন্স
'পেটেন্ট' বার্লি*
এসে গেছে!

দেখবেন, খোকাবাবু সবটুকু খেয়ে নেবে। রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি গোরুর দুধের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে শিশুর কোমল পাকস্থলীতে দুধ চাপ বাঁধতে পারে না, কাজেই শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ হয়। তাছাড়া, রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়, ওরা খেয়ে তৃপ্তি পায় আর এতে ওদের শরীরও গড়ে ওঠে।

এই বার্লিতে অনধিক ০.০২৮% আয়রন বি-পি ও ১.৫% ক্রিটা প্রিপঃ-এর সংমিশ্রণ আছে।

* ক্যালসিয়াম ও লৌহ সংযোগে সুরক্ষিত

ন্যায্য মূল্যে চাউল বিক্রয়

সম্প্রতি বহু আলোচনার পর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধান্য ও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছেন। আশা করি, আমাদের অগণিত গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়িগণ স্মরণ রাখিবেন যে, চাউল ব্যবসায়ে আমাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা-প্রসূত ভবিষ্যদৃষ্টি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বিগত ৬৯ বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান কাঁকর ও দুর্গন্ধবিহীন, ক্রেতাগণের রুচিমত ঢেঁকি-ছাঁটা, কল-ছাঁটা সিদ্ধ, আতপ ও সুগন্ধি চাউল ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। ইহাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

যে সমস্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল আমাদের নিকট পাওয়া যাইত, উহা আপাততঃ স্বল্প পরিমাণে আমদানী হইতেছে। বৃষ্টি না হইলে শীঘ্রই আমরা চাহিদামত সরবরাহ করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

"পোলাও"-এর জন্য বিশ্ববিখ্যাত সুগন্ধি বাসমতি ও রোগীর পথ্যের বহু পুরাতন দাদখানি চাউল পাওয়া যাইতেছে। পূর্বের ন্যায় কম-বেশী যে কোন পরিমাণ চাউল অর্ডার দিলে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। শনিবার বৈকালে এবং রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

সর্বসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করি—
বিনীত—**শ্রীঊষাকান্ত দাস**, প্রধান পরিচালক

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

ভারতের সর্ববিধ চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান

৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলি-১৪

॥ টেলিফোন : ২৪-৪৩৮১, ৮২ ॥ টেলিগ্রাম : রাইসকিংস ॥

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturdayy 4th July, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৬ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

সংস্কৃতি কোন্ পথে?

যখনই সুযোগ পাইয়াছি আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সংস্কৃতি অর্থাৎ সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতির উপরে সরকারের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত, বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারে সংস্কৃতির উৎকর্ষ ঘটিবার পরিবর্তে তাহার অপকর্ষ ঘটে, প্রমাণ প্রয়োগে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, যে-সব দেশে এহেন অবাঞ্ছিত অবস্থা ঘটিয়াছে সেখানে জীবন্ত সংস্কৃতি লোপ পাইয়াছে, সে-সব দেশে সংস্কৃতি সরকারের আর দশটা দপ্তরের মতো একটা দপ্তরে পর্যবসিত হইয়াছে—কোথায় কোন্ দেশে এভাবে সংস্কৃতির উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি যে কিছুতেই কিছু হইবার নয়। প্রমাণ প্রয়োগ, তথ্য তত্ত্ব এসব নিতান্তই তুচ্ছ, একবার একটা খেয়াল সরকারের মাথায় চাপিলে তাহা চূড়ান্ত পরিণাম পর্যন্ত না গিয়া থামিবার নয়। সম্প্রতি সরকারের সাংস্কৃতিক খেয়ালের নিদর্শনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে অস্থানে সরকারের দাক্ষিণ্যের অন্ত থাকে না।

নয়াদিল্লীর ২৫শে জুনের খবরে প্রকাশ যে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের সমস্ত রাজ্যে রঙ্গমঞ্চ স্থা[illegible]র উদ্যোগ চলিতেছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীর আর বিশেষভাবে নয়াদিল্লীতে, কলিকাতায় ও বোম্বাই শহরে ব্যয়বহুল আধুনিক স্থাপত্য-কলানুসারী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইবে। এইসব রঙ্গমঞ্চে শৌখীন নাটকীয় দল সামান্য কিছু দক্ষিণা দিয়া এবং পেশাদার নাটুকে দল যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া অভিনয় করিতে পারিবে। আবার অবসর সময়ে এইসব রঙ্গমঞ্চ

"could be rented out to voluntary organisations for civic, social and cultural functions."

তারপরে সংবাদটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ও রাজ্য সরকারের কাহার আর্থিক দায়িত্ব কতখানি ইত্যাদি বিষয়ের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। সে-সব বিবরণ আমাদের বক্তব্যের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মন্ত্রী।

অন্য প্রসঙ্গ তুলিবার আগে আমরা উক্ত মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিব, তিনি পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস হইতে এমন একটিমাত্র নজীর উদ্ধার করুন যেখানে ব্যয়বহুল রঙ্গমঞ্চ গড়িবার ফলে দেশের নাটকের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে বা নাটক রচনায় নূতন প্রেরণাদান করিয়াছে। অনেকেরই রসনাগ্রে 'মস্কো থিয়েটার' কথাটা উচ্চারিত হইবে। 'মস্কো থিয়েটারের' অভিনয় কৃতিত্বের সত্যযুগ গিয়াছে অধুনা কুখ্যাত জারগণের আমলে, আর তাছাড়া 'মস্কো থিয়েটার' রুশ নাটক রচনায় কোনও নূতন প্রেরণা জোগায় নাই।

ভারত সরকার কি মনে করেন যে, কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারি করিয়া দিলেই শেকস্‌পীয়র ও গ্যারিক জন্মিতে থাকিবে? ভারত সরকার কি মনে করেন যে অট্টালিকার অভাবেই নাটক রচনায় নূতন প্রেরণা আসিতেছে না? ভারত সরকারের সংশিলষ্ট বিভাগের বাঙালী মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন না যে যখন বাংলা দেশে নাটক রচনার ও অভিনয়-কলার বৃহৎ প্রেরণা আসিয়াছিল তখন ব্যয়বহুল রঙ্গমঞ্চের অভাব অভাব বলিয়া গণ্য হয় নাই। যে-কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এইসব রঙ্গমঞ্চ গঠনের উদ্যোগ চলিতেছে সেই মহাকবির নাটকের রচনার, অভিনয়ের জন্য বৃহৎ হর্ম্য অপরিহার্য ছিল না—ইহা কাহার অজানা আছে? তবে এই পণ্ডশ্রম কেন? ইহা কি জগৎকে দেখাইবার চেষ্টা যে আমাদের সরকারও সভ্য দেশের সরকার, আমরাও সংস্কৃতির জন্য শিরঃপীড়া অনুভব করিয়া থাকি? ইহা কি এক-নায়কতন্ত্রী দেশের মৃদু অনুকরণে নিজেদেরও ছোটখাটো এক-নায়কতন্ত্রী কল্পনার নির্দোষ আনন্দানুভব? নানা জটিল কার্যকারণের ফলে বর্তমান যুগ নাট্য-সাহিত্যের অনুকূল নয়। হাজার রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া দিলেও আর অচিরকালের মধ্যে সাহিত্যের প্রেরণা আসিবে না। যুগ-প্রেরণা সচেতন হইয়া ব্যবস্থাপনা করিতে হয়—তাহাকেই বলি রাজনীতিজ্ঞতা।

আমাদের ধারণা সরকারী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক দলবাজি ও ব্যবসায়গত চালবাজির কেন্দ্র হইয়া রঙ্গমঞ্চগুলি নূতন একটি শিরঃপীড়ার সৃষ্টি করিবে। আর শেষ পর্যন্ত "Civic social and Cultural functions"—এর নিত্যনৈমিত্তিক আশ্রয়স্থল হইয়া এগুলি রাজনৈতিক দলাদলির আড্ডা হইয়া উঠিবে। এযুগে Culture যে রাজনীতির বেনামদার সে খবর এতদিনে মন্ত্রীদের কানেও নিশ্চয় প্রবেশ করিয়াছে। যে-ব্যবস্থার ফলে সংস্কৃতির অনিবার্য সঙ্কট, যে-ব্যবস্থার ফলে দলীয় রাজনীতির সরকারী আশ্রয় সমর্থন লাভ, যে-ব্যবস্থায় অমঙ্গল বই মঙ্গল দেখি না, তাহাতে হাত দিবার আগে সরকারকে আর একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

প্রসঙ্গত

কাল যখন নিরবধি, তখন সকল ক্ষতির পূরণ অবশ্যম্ভাবী, তবু এক-একটা মৃত্যু সুগভীর শূন্যতা রেখে যায়। অন্তত খণ্ডকালের সীমার মধ্যে। শিশিরকুমারের অভাবের অনুভব কেবল নাট্যলোকে নয়, নাট্যামোদী মহলেই নয়, বাংলার ঘরে-ঘরে স্তরে-স্তরে সঞ্চারিত হবে। কেননা নাট্যাচার্যের সমস্ত পরিচয়ের উপরে বিশিষ্ট একটি পরিচয়ঃ তিনি বাঙালী।

প্রথমেই এই কথাটির উল্লেখের কারণ এই যে, বাইরে গর্ব করবার মত শেষ যে-ক'জন বাঙালী অবশিষ্ট ছিলেন, শিশিরকুমার তার অন্যতম। একে একে সব দেউটিই নিবছে।

বাংলার রঙ্গমঞ্চে নতুন ধারার প্রবর্তক শিশিরকুমার, আধুনিক পর্যায়ের যে-কোন আলোচনায় একথা সর্বস্বীকৃত। তবু একটুখানি কথা বাকি থেকে যায়। এক্ষেত্রে সেটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলায় উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল—ইংরাজের সঙ্গে প্রথম সম্পর্কস্থাপনে তার সূত্রপাত আবার ইতিহাসের বিচিত্র নিয়মে ইংরাজ-শাসনের অবসান তারই পরোক্ষ ফল। উনিশ-শতকীয় রেনেসাঁ তার স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে আমাদের সাহিত্যে, মননশীলতার মুক্ত ঐতিহ্যে—এবং নাট্য-আন্দোলনে। আজও কলকাতা শহরে যে তিন-চারটি স্থায়ী পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, তা ওই গত শতকের উজ্জীবনের প্রসাদে।

তবু, মানতেই হয়, এই নাট্য-আন্দোলনের ধারাটি কালক্রমে সংস্কৃতির মূল প্রবাহ থেকে সরে গিয়েছিল। পরমহংসদেবের আশীর্বাদ, মহাকবি ও নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অক্লান্ত সাহচর্য ও পরিচালনা এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ নাটক—কিছুই রঙ্গমঞ্চকে সাংস্কৃতিক আভিজাত্য-খোয়ানোর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। এই প্রধান শিল্পরূপ এমনই ব্রাত্য হয়ে পড়েছিল যে, জনশ্রুতি, সেকালের কোন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অমুক থিয়েটার কোন্ দিকে, সেকথা জেনেও বলেননি। আর মঞ্চলোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অভিনেতাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা না তোলাই ভাল। তখন থিয়েটার করাই শুধু নয়, দেখাতেও বহু রক্ষণশীল পরিবারে আপত্তি ছিল।

*

আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে সেই শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজের প্রকৃত চিত্রটি কল্পনা করা সহজ হবে না। ধীমান কোন শিক্ষাব্রতী পাদপ্রদীপের আলোর সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পারেন একথা সেদিন অচিন্তনীয় ছিল। কিন্তু সকল সংস্কার ছিন্ন করে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে উন্নত-সহাস্য মুখে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার—পণ্ডিত, সুরসিক, নিপুণ বক্তা এবং ঐশী-শক্তিধর অভিনেতা। প্রেক্ষাগৃহে সেদিন ঘন ঘন করতালি অবশ্যই পড়েছিল, কিন্তু তার আগেও দর্শকজনের মধ্যে সবিস্ময় কানাকানি হয়ে থাকবে। অধ্যাপক থেকে অভিনেতা? দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।

*

শিশিরকুমারের সবচেয়ে বড় কোন কীর্তি যদি থাকে, তবে তা এই। বিমুখ ভদ্র-শিক্ষিত বাঙালী মানসকে তিনি পুনরায় রঙ্গমঞ্চের অনুকূল করেছিলেন। ছুৎমার্গকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেছেন। নাট্যলোককে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

নাট্য-আন্দোলনকে, অভিনয়-শৈলীকে তিনি যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, আপন রুচি দিয়ে সাজিয়েছিলেন, সেটা উপরি দেনা, তাঁর কাছে দেশবাসীর। অভিনয়-কৌশল তাঁর নিজস্ব এবং অভিনব : এবং তিনি যে এর শুধু প্রয়োগ জানতেন তাই নয়, অন্যকে শেখাতেও পারতেন। এ-কালের বহু কুশলী অভিনেতার তিনিই শিক্ষাগুরু।

তাঁকে তাঁর প্রতিভার দীপ্ত-মধ্যাহ্নে মঞ্চে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা ধন্য। যাঁরা শুধু পরবর্তী কালেই তাঁকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখেছেন তাঁরাও কম পাননি। বাকী সকলের এবং আগামী কালের জন্য শিশিরকুমার রইলেন শুধু স্মৃতিতে এবং বহু প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার লিখিত স্বীকৃতিতে : কেননা নিতান্ত পরিতাপের কথা, যন্ত্রযুগের এই গৌরবকালেও শিশিরকুমারের দুর্লভ অভিনয়-কলার স্থায়ী সাক্ষ্য আমরা বিশেষভাবে ধরে রাখিনি। অল্প কয়েকটি রেকর্ড, কয়েকহাজার ফুট সেলুলয়েড—ভাবী কালের জন্য এইটুকু মাত্র রইল। আর হয়ত কিছু আখ্যায়িকা—তাঁর সুদর্শন দেহ-সৌষ্ঠব, অপূর্ব বাচনভঙ্গি, মজলিশী গল্প। এ-গল্প যে একবার শুনেছে সে ভুলবে না। কখনও কথায় কখনও আবৃত্তিতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতাদের মন ধরে রাখার আর্ট শিশিরকুমার জানতেন।

*

তবু, শিশিরকুমারের ব্যর্থতাও ছিল। কোন্ মহৎ প্রতিভারই বা না থাকে। যে ব্যক্তিত্বদীপ্ত প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর আবির্ভাবের ক্ষণের সমস্ত প্রতিশ্রুতি যদি পূরণ না হয়ে থাকে, এই তিরোভাবের দিনে তা নিয়ে ক্ষোভ করব না। অভিযোগও না। একটি বিষণ্ণ শোকের মহৎ প্রশান্তি আমাদের আবৃত করুক।

হয়ত আংশিক ব্যর্থতার বীজ ছিল শিশিরকুমারের চরিত্রেই। নাট্যধারায় তিনি পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু নাটকের ধারার আশানুরূপ উন্নতি ঘটাতে পারেননি। এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও দেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে, স্বীকার করেছে, বরণ করেছে, কিন্তু প্রবল অভিমানে তিনি সেই সমাদরকে চিনতে পারেননি। অভিমান অতএব তাঁর দেশবাসীরও—প্রতিভাকে তারা চিনেছিল, ইনস্টিটিউসনের সম্মানও তারা ব্যক্তিকে দিয়েছে, তবু দাতা-গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্কের অস্বাচ্ছন্দ্য শিশিরকুমারের জীবন-কালে দূর হল না। জাতীয় সরকারের প্রতিও বিরূপতা নিয়েই তিনি বিদায় নিলেন।

*

প্রেক্ষাগৃহে একটির পর একটি দীপ নিবে যাওয়ার মত বাংলার রঙ্গলোক থেকে একে একে অনেকেই বিদায় নিলেন। অতি অল্পকালের ব্যবধানে গেলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী। শিশিরকুমার সকলের মুকুটমণি। তিনিও অপসৃত হলেন। অনেক আশা, কল্পনা, খেদ, অভিমান, অরূপায়িত কল্পনা এই মহাপ্রস্থানের সঙ্গে জড়িত হয়ে রইল। দীর্ঘ বিয়োগান্ত নাটকের মহানায়কের 'শেষ রজনীর' ভাবনা কেউ লিখে রাখেনি। একটি বিষাদের সম্মোহনে দর্শক-মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

তিনি কী দিয়েছেন, কী দেননি, কী পেয়েছিলেন, কী পাননি, এই শ্রদ্ধা-বাসরে তার হিসাব অনুচিত, অশোভন, অপ্রাসঙ্গিক। যদি আমাদের নাট্যশালার, আমাদের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কোন প্রামাণিক ইতিহাস কোন দিন লেখা হয়, তবে সে-কথার সবিস্তার আলোচনা অবশ্যই হবে।

যিনি "স্ট্রাটস্ অ্যান্ড ফ্রেট্স হিজ আওয়ার আপ্-অন্ দা স্টেজ, অ্যান্ড দেন ইউ হার্ড নো মোর"—শিশিরকুমার যদি সেই সামান্য অভিনেতা মাত্র হতেন, তবে নগদ-বিদায়ী হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেহপট সনে অন্তত এই নট সকলই হারাননি—এই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রণাম যুক্ত করে এবারের মত বিদায় নেব।

বৈদেশিকী

চাকরি বলতে ইউনাইটেড নেশনস অথবা তৎপ্রসূত বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার চাকরি। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত গরীব দেশের চাকরদের চোখে। যেমন মাইনে, তেমনি অন্যান্য সুখ সুবিধা, ট্যাক্সের উপদ্রব নেই, উপরের দিকে হলেই "ডিপ্লোম্যাটিক প্রিভিলেজ" অর্থাৎ শুল্ক রহিত মূল্যে মদ্যাদি সংগ্রহের সুবিধা ইত্যাদির কথা লোকের মনে পড়ে। আর কাজের রকমেরও এখন অন্ত নেই। ভাগ্যে থাকলে সামরিক এবং অসামরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, লেখক, কথক, শিল্পী, উকিল, অধ্যাপক—সকলরেই ঠাঁই হতে পারে। আর মাইনে তো বেশি হতেই হবে। তা না হলে আমেরিকানরা চাকরি করতে আসবে কেন? যে-মাইনেতে চলনসই আমেরিকান প্রার্থী আকৃষ্ট হতে পারে উঁচু পদগুলির মাইনের মান সেই অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ চাঁদা দেয় বেশি আমেরিকা, এবং যে দেশ যে-রকম চাঁদা দেয় সেই অনুপাতে সেই দেশের লোকের চাকরির উপর দাবি থাকে। বলা বাহুল্য, এই সব সংস্থার উপরের দিকের চাকরি পাওয়া স্ব স্ব দেশের গভর্নমেণ্টের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে।

এইসব আন্তর্জাতিক সংস্থার চাকরির বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন আছে যেগুলি তলিয়ে দেখা উচিত। অমুক আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমাদের অমুক অমুক লোক বড়ো চাকরি করছেন ভেবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

প্রথমত মনে রাখা দরকার যে ঐ সব বড়ো বড়ো মাইনের ব্যয় ভারতবর্ষই দিচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস্, ইউনেস্কো এফ-এ-ও অথবা ঐগুলির অন্তর্ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে যাঁরা বড়ো চাকরি করছেন তাঁদের মাইনে আসছে কিন্তু চাঁদাদাতা দেশগুলির কাছ থেকে এবং যেহেতু যারা যেমন চাঁদা দেয় চাকরির ভাগও মোটের উপর তাদের তেমনি হয়ে থাকে, সেইজন্য আসলে যে-যার দেশের টাকাই মাইনে পাচ্ছে। সুতরাং বড়ো বড়ো মাইনেগুলো ইউনাইটেড নেশনস্ অথবা অমুক আন্তর্জাতিক সংস্থা দিচ্ছে, তাতে 'আমাদের কী—এ রকম মনে করা

ভুল। আসলে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ চাকরেদের যে-মাইনে তার চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমরাই লোক রাখছি।

কেন? কাজের মূল্যের সঙ্গে যদি মাইনের কোনো সম্পর্ক থাকে তাহলে ধরতে হয় আন্তর্জাতিক সংস্থায় মোটা মাহিনার কাজে যাদের পাঠানো হচ্ছে তাঁরা যোগ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহলে যেসব দেশ অনগ্রসর, যাদের যোগ্য লোকের সেবার প্রয়োজন অত্যধিক তারা দেশের সবচেয়ে যোগ্য লোককে দেশে কাজে নিযুক্ত না করে আন্তর্জাতিক চাকরিতে পাঠাচ্ছে কেন, যে চাকরির দ্বারা স্বদেশের সাক্ষাৎ উপকার সাধন অল্পই হতে পারে? বিশেষ করে শিল্পী, বৈজ্ঞানিক এবং প্রকৃত সংগঠকের সেবার প্রয়োজন যেখানে এত বেশি সেখান থেকে এই সব শ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তি অন্যত্র যাবেন কেন?

কেউ কেউ বলেন যে, বড়ো বড়ো মাইনেতে আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাঁরা গিয়েছেন বা যান তাঁদের আসলে প্রথম শ্রেণীর লোক বলে সরকার মনে করেন না, প্রথম শ্রেণীর লোকদের গভর্নমেণ্ট ছেড়ে দেন না এবং প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বাইরে চাকরি করতে উৎসুকও নন। দেশের স্বক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছেন এবং তা বজায় রাখার ভরসা রাখেন তাঁরা আন্তর্জাতিক সংস্থার কয়েক বছরের কণ্ট্রাক্টের কাজ নিতে উৎসাহী হন না, কারণ তাতে তাঁদের "ক্যারিয়ারে" ছেদ পড়বে। অবশ্য দুকূল রাখার চেষ্টা করে কেউ কেউ সফলও হতে পারেন, যেখানে প্রভাবশালী দল বা মুরুব্বীর জোর আছে। আবার আন্তর্জাতিক চাকরেদের কারো কারো মুখে শোনা যায় যে, দেশের চাকরিতে কোণঠাসা হয়ে ছিলেন বলেই তাঁরা বাইরে আসার সুযোগ বাধ্য হয়ে খুঁজেছেন।

কিন্তু যেদিক থেকেই দেখা যাক, ব্যাপারটা উদ্বেগজনক। যাঁরা আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ নিচ্ছেন তাঁরা যদি সত্যই প্রথম শ্রেণীর লোক হন তবে তাঁদের শক্তি দেশের সাক্ষাৎ সেবায় কেন নিয়োজিত হল না? আর তা যদি না হয়, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে যাঁরা কাজ পাচ্ছেন তাঁরা যদি তেমন যোগ্য লোক না হন, তবে দেশের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের চেয়ে দ্বিগুণ, তিন গুণ চতুর্গুণ মইনে তাঁরা পাবেন কেন, যে মাইনে আসলে এই দেশের প্রদত্ত চাঁদা থেকেই দেওয়া হয়?

আন্তর্জাতিক মহলে ভারতবর্ষের "প্রেস্টিজ" রক্ষার কৈফিয়ৎ দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। এই "প্রেস্টিজের" ধারণা একেবারে ভ্রমাত্মক। ইউনাইটেড নেশনস্‌এর সদস্য হিসাবে বহু রকম আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হওয়ার অধিকার প্রত্যেক দেশেরই আছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে এটা এক রকম ফাঁদ বলা যায়। নিজের দেশে কাজের অন্ত নেই, কাজ করার লোক নেই—এই রকম সব দেশও নানা আন্তর্জাতিক সংস্থায় নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে "প্রেস্টিজ" রক্ষা করার চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পশ্চিমা দেশগুলির পক্ষে প্রতিনিধি পাঠানো সহজ, কারণ লোকের অভাব নেই। তাহলেও দেশের কাজে ক্ষতি হতে পারে এমনভাবে প্রথম শ্রেণীর লোক বেশি সময়ের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তারা পাঠায় না। প্রথম যখন ইউনাইটেড নেশনস্‌, ইউনেস্কো প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উৎসাহ বশে এবং আদর্শের টানে দু'একজন প্রথম শ্রেণীর লোক এইসব সংস্থার কাজে নিজেদের সময় উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন তাও তাঁদেরও স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের সৃষ্টিমূলক কাজের দিন প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরে। কিন্তু যেসব দেশে আধুনিক জ্ঞানের চর্চা অল্পদিন মাত্র আরম্ভ হয়েছে তাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি পাঠানো নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারতবর্ষের পক্ষে সবক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য না হতে পারে, তবে অনেক দেশের পক্ষে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরের মধ্যে যেসব দেশে স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যগিরি লাভজনক নয়, বরঞ্চ ক্ষতিকর। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তারা অর্থ ও শক্তি অযথা ব্যয় করে।

যাদের শক্তির সঞ্চয় অল্প তাদের পক্ষে এরূপ করা একান্ত অনুচিত। তাতে কেবল তাদেরই ক্ষতি নয়। দুর্বল প্রতিনিধিদের আধিক্য হেতু সংস্থাগুলির মানও ক্রমশ নামছে। প্রধানত উন্নত দেশগুলি থেকেও প্রথম শ্রেণীর লোক নিজেদের দেশে তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিশেষ কালক্ষেপ করতে আসেন না, যাঁরা আসেন তাঁদের অভাবে তাঁদের দেশের কাজের কোনো ক্ষতি হয় না। আর "অনুন্নত" দেশের প্রতিনিধি যাঁরা আসেন তাঁরা দেশে থেকে তবু কিছু কাজ করতে পারতেন, আন্তর্জাতিক সংস্থায় তাঁরা কোনো কাজেই আসেন না। ফলে হয়েছে এই যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং অনগ্রসর জাতিগুলির শক্তি বর্ধনের পরিবর্তে শক্তি হরণের যন্ত্র হয়েছে বলে বোধ হয়। চীন যে ইউনাইটেড নেশনস্‌এ এখনো ঢুকতে পারেনি সেটা তার পক্ষে বোধ হয় ভালোই হয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস্‌এ ঢুকলে যে শক্তি নানা আন্তর্জাতিক সংস্থায় ব্যয় করতে হত সেটা সর্বাংশে স্বদেশের কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বিষয়ে সর্বদিক দিয়ে আমাদের লাভ-ক্ষতির একটা হিসাব হওয়া উচিত।

২৮।৬।৫৯
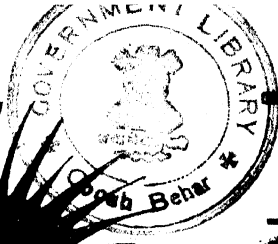
শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

তেরো

আমরা দেখেছি, হরিপুর-চৌধুরী-বংশের প্রমথ চৌধুরী আর সুসঙ্গ রাজবংশের সুধীন্দ্র সিংহ, এ-দুজনের সবুজ-সভায় মিলন হয় ১৯১৬ সালে, এবং এর দুশো বছর আগে হরিপুর-সুসঙ্গ নাটোর, এই তিনটি অভিজাত কুলের মধ্যে আন্তরিক সম্প্রীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরেই উনি আমায় নিয়ে যান ওঁর শিকারী সেজদাদা কুমুদ চৌধুরীর বাড়িতে। ওঁর বাসভবন কমলালয়ের পাশেই সে বাড়ি। বাড়িটির ফার্নিচার চমৎকার। দেওয়ালের মাপের বশে তৈরী। চীনা ছুতোর দিয়ে বানানো কি-না, তা জিজ্ঞেস করাতে উত্তর পাই—"না। ওগুলো দেশী মিস্ত্রির হাতের কাজ।" সায়েবী ফ্যাশানের হলেও ওতে স্বদেশীয়ানার ছাপ আছে, এই অনুভূতি আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়েছিল প্রমথবাবুর "তেল-নুন-লকড়ি" শীর্ষক প্রবন্ধ, যাতে উনি বলেছেন, বিলিতী ধরনের কৌচ-কেদারা ছিঁড়ে গেলে মনে হয় যেন জন্তুর নাড়ী-ভুঁড়ী বেরিয়ে পড়েছে।

কুমুদ চৌধুরীর ওখানে সিঁড়িতে ওঠবার আগেই চোখে পড়ল, একটা প্রকাণ্ড বাঘ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ দেখলে সত্যি মনে হয় বটে, কিন্তু তার 'নট্-নড়ন-চড়ন্ নট্-কিচ্ছু' ভাব দেখে আশ্বস্ত হলুম যে ওটা বাঘের দেহাবশেষ, ওর নাড়ী-ভুঁড়ী বের করে নিয়ে খড়-টড় দিয়ে পেট ভরিয়ে, কাঁচের চোখ পরিয়ে সুন্দর-ভীষণ রূপ দাঁড় করানো হয়েছে। সেটাকে বাঘের মামী (Mummy) বলা যায়, তবে এ-নাম কি মাসীর পছন্দ হবে?

এইভাবে চিন্তা করছি, এমন সময়ে প্রমথবাবু যেন বললেনঃ

—সেজদাদা অনেক বাঘ শিকার করেছেন। যেটা এখানে দেখছ, সেটা ঐ শিকারের স্বীকার।

আরও অনেক বাঘের চামড়া বাক্স খুলে দেখলুম। তখনই ওখানকার সংগ্রহের মধ্যে শ' খানেক বাঘের চামড়া জমেছে। মনে হল, বাঘের হালুম-হুলুম শুনে আমরা গেলুম-খেলুম বলতে শিখেছি।

কুমুদ চৌধুরীর (এবং তাঁর বন্ধু জ্ঞানদাবাবুর) মতন সুসংগের সিংহ-রা বাঘ শিকার করতে ভালবাসতেন। গারো পাহাড়ে খুব বড় বড় বাঘ থাকে কি না। সুধীন্দ্রের অতিথি হয়ে প্রথমবার যখন সুসংগে যাই, তখন রাজবাড়িতে যে-ঘরে আমি চোর না হয়েও রাত্রিবাস করতুম, সে-ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল একটা দশ ফিট্ দু ইঞ্চি রয়েল বেংগল টাইগারের চামড়া। সে-বাঘটাকে শিকার করেছিলেন সুধীন্দ্রের দাদা। একদিন রাত্তিরে স্বপন দেখলুম, যেন ঐ বাঘটাই জ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার তক্তাপোষের চারদিকে। জাগ্রত অবস্থায় বাঘের মাসীদের ঐভাবে ক্রীড়াচ্ছলে বিচরণ করতে দেখেছি অনেকবার। সুসংগে স্বপনযোগে মাতৃস্বসার অনুকরণে ব্যাঘ্রের খট্টাংগ-প্রদক্ষিণ দেখে আমার চিত্ত শংকাকুল হয় নি। এই প্রকার স্বপন-দর্শনের ফলেই কি সংস্কৃত কাব্যে শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দ জন্মলাভ করেছিল? সেকালে নিশ্চয়ই বাঘকে আফিম খাইয়ে আমাদের দেশে সার্কাসে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। তবে ভারতের এক রাজা রোমক সম্রাট অগস্টসের কাছে একটি বাঘকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন, এ-সংবাদ তৎকালীন প্রতীচ্য ঐতিহাসিকরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই রাজাটির নাম পশ্চিমা ইতিহাসে 'পোরস্' বা 'পান্‌ডিয়ন'। আমি তাঁকে গোতমীপুত্র শাতকর্ণির (বিক্রমাদিত্য) পুত্র পুলুমায়ী বলে মনে করি।১

সুসংগের কুমারদের সংগে হাতী চড়ে গারো পাহাড়ে গেলুম। তখন সুধীন্দ্র-দের অর্থাৎ মধ্যম তরফের—পিল্-খানায় যেটি সব-চেয়ে বড় হাতী ছিল, সেটি ও'র দিদি শ্রীমতী সুনীতি দেবীর শ্বশুরবাড়ি (কালীপুর) থেকে অভ্যাগত টাস্কার। ঐ হাতীকে আমার বাহন করা হল, কারণ আমিও যে তারই মতন রাজ-অতিথি! সগর্বে গজ-পৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে আমরা অগ্রসর হলুম পাহাড়ের দিকে। পথে যে-সব ধানক্ষেত ছিল, তাদের ধারে ধারে আমাদের গতি। একটা বাচ্চা হাতী, যার জন্মস্থান সুসংগ-রাজবাটি, খুব হেল্‌তে-দুল্‌তে চলছিল আমাদের সংগে। দেখলুম, শুঁড় দিয়ে সে ক্রমাগত ধানের আঁটি তুলছে, খাচ্ছে আর জমাচ্ছে। বোধ হয়, হিতোপদেশের সেই শ্লোকটা তার শোনা ছিল, যাতে বলা আছেঃ

কর্তব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্যং কর্তব্যো নাতি-
সঞ্চয়ঃ।

এর প্রথমার্ধের অর্থ সুবোধ্য। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ আমিও বাচ্চা-বেলায় ভুল বুঝেছিলুম যে, 'নাতিসঞ্চয়ঃ' মানে নাতি-পুতিদের সঞ্চয়। সুতরাং ঐ হাতীর বাচ্চা যে ভুল বুঝবে, সে আর বিচিত্র কি?

পাহাড়ে ওঠবার সংগে সংগেই হাতী-গুলো শুঁড় তুলে গভীর জংগলের বড় বড় গাছ মড়্ মড়্ করে ভাঙতে ভাঙতে পথ করে নিয়ে চলল। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ আজও আমার কানে লেগে রয়েছে—যেন স্বদেশে ফিরে এসে তারা হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। বলা বাহুল্য, পাহাড় থেকেই হাতীদের ধরা হয়েছিল। একটা সীমা-নির্দেশক চিহ্ন দেখিয়ে দিয়ে সুধীন্দ্র আমায় বললেনঃ এইবার আমরা বাংলাদেশ ছেড়ে আসামে এসেছি।

তথাপি আসামী আমরা হই নি। আক্রমণকারী ব্যাঘ্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে রাজকুমাররা অনেক বন্দুক-কার্তুজ সংগে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যেক বন্দুকের জন্য লাইসেন্স নেওয়া ছিল। এ-দুটো কথা ও'রা আমায় আগেই বলেছিলেন। আততায়ীকে বধ করায় কোনো পাপ নেই, মহাভারতেও পড়া যায়। সুতরাং হাতীর পিঠে হাতিয়ার নিয়ে সে দিনকার যাত্রা যে শুভ-যাত্রা তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না আমার মনে।

১ Zeitschrift fur Indologicund Iranistik 1922.
আমার এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয় বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি পত্রিকায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে আমি বললুমঃ—আচ্ছা, এইবার তবে বাড়ি ফেরা যাক্। এর পর আলো পড়ে গেলে তো কিছুই দেখা যাবে না।

সুধীন্দ্রের আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হলঃ—ভয় নেই, অনেক টর্চ সঙ্গে এনেছি।

আমিঃ আর দেখ্‌বই বা কি? ঘনবন-তল তো?

উত্তর এলঃ তা কেন? এই সময়েই বাঘ বেরোয়।

বাঘ-শিকার দেখবে না? ব্যাঘ্রাক্রান্ত হলে তবে সিংহ-বিক্রম ধর্মসংগত, এ-মতবাদকে রাজকুমাররা হেসে উড়িয়ে দিলেন। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করা চলে না। এই শাস্ত্রীয় উক্তির পশ্চাতে যে যুক্তি আছে তা খণ্ডন করার সামর্থ্য আমার না থাকায়, সোজাসুজি বললুমঃ—আমার ভয় হচ্ছে, বাড়ি চলো। পরে আর একদিন না হয় বাঘ শিকার কোরো।

ও'রা বোধ হয় ভাবলেন, বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন ভীত হয়েছিলেন, আর আমি ব্যাঘ্র-দর্শনের পূর্বেই ভীত হয়েছি। আমি ভাবলুম যে, 'রাজকন্যেষু' বিশ্বাস করাটা আমার উচিত হয় নি।

কিন্তু 'ভৃত্যকুলেষু' কি বিশ্বাস করা যায়? সুধীন্দ্রের মুখেই শুনেছি, ও'দের একটা চাকর বাঘ দেখলেই সরে পড়ত। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ

—হ্যাঁরে, তুই বাঘ দেখলেই পালিয়ে যাস্ কেন? ভয় হয় বুঝি?

চাকরটি মাথা চুলকে সবিনয়ে উত্তর করলেঃ—আজ্ঞে এ'র ভয় ঠিক হয় না—লজ্জা হয়।

আমারও যে ভয় হয়েছিল, তার জন্যে আমার লজ্জা হয় নি কারণ 'কালী-পূজো উপলক্ষ্যে সুসংগ রাজবাড়িতে বাজী-পোড়ানোর সময়ে দেখেছি যে, হাতীগুলো হাউয়ি ছাড়লেই ভীষণ ভয় পায়। তাদের ভীতিবিহ্বল বৃংহিত আমি স্বয়ং কর্ণগোচর করেছি।

এ-ঘটনার কয়েক বছর পরে সুধীন্দ্র সিংহকে একটা বাঘ আক্রমণ করেছিল। সে-বাঘটাকে আগে উনি বন্দুকের গুলীতে মারবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। চোট্ খেয়ে বাঘটা তখন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইল। শিকারী সিংহেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, বাঘটা ভয়ে পালিয়ে গেছে। হঠাৎ ব্যাঘ্রের পুনরাবির্ভাব! অন্য সিংহকে আক্রমণ না করে সে তার পরিচিত শত্রু সুধীন্দ্র সিংহের পায়ে এক থাবা মারলে। সুধীন্দ্র তখন গজপৃষ্ঠে। পাদুকা ভেদ করে বাঘ-নখ ও'র পায়ে বিঁধে গেল। রাজবাড়িতে হুলস্থুল! রব উঠল, মণি-বাহাদুরকে (সুধীন্দ্রের অপর নাম) বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। হাহাকার!! খানিক পরে মণিবাহাদুর হাতী চড়েই বাড়ি ফিরলেন, আর সকলকে বল্‌লেনঃ আমায় বাঘ ধরে নিয়ে যায় নি, কেবল পায়ে ধরেছিল!!!

সব চাইতে বড় বাঘেরা বোধ হয় সুন্দর বনের আদিবাসী। সে-বাঘকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার নাম দেওয়া হয়েছিল, সম্ভবত তার রাজ-পদ প্রতিপন্ন করবার জন্যে। শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তুদের মধ্যে যে-বাঘকে প্রধান বলা হয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে, সেও রয়েল বেঙ্গল জাতীয় হবার সম্ভাবনা, কেননা ঐ ব্রাহ্মণে বৈদিক আর্য-দের পূর্ব ভারতে স্থিতিশীল হবার সূচনা লক্ষিত হয়।

বৈয়াকরণরা নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির ব্যবহার বোঝাবার জন্যে একটি শিষ্ট-প্রয়োগ উদ্ধৃত করেনঃ

'রাজা যশসে ব্যাঘ্রং হন্তি।' তাঁরা নিমিত্তার্থে কর্মযোগে সপ্তমীর ব্যবহার বোঝান, আর একটি উদাহরণ দিয়েঃ

'চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তেষু হন্তি কুঞ্জরম্।

কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ॥'

এই দুইটি উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যাঘ্র-হত্যার দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য উল্লিখিত—কেবল যশের জন্য বাঘ মারেন রাজা, আর চামড়ার জন্যে যিনি বাঘ মারেন তিনি রাজা না-ও হতে পারেন, কারণ তাঁর অভিপ্রেত হচ্ছে চর্ম, যশ নয়। যেমন দাঁতের জন্যে হাতী

মারা, কেশের জন্যে চমরী, মৃগনাভির জন্য কস্তুরী মৃগ।

চমরী-গাই বিশেষ করে তিব্বতে ও হিমালয়ে পাওয়া যায়। আর মৃগ-নাভি-ওয়ালা হরিণদের নিবাস হচ্ছে তিব্বত, নেপাল, ভুটান, নাগা-পাহাড়। এই সব অঞ্চলে বাঘও পাওয়া যায়, হাতীও পাওয়া যায়।

সুধীন্দ্র সিংহের মুখে শুনেছি, রয়েল বেংগল টাইগার, বাইসন আর রাইনো (গণ্ডার) আসাম পাহাড়ের জংগল আশ্রয় করে আছে খুব বেশী। 'বাইসন' শব্দটি সংস্কৃত 'মহিষ' শব্দের ভিন্নরূপ মাত্র। ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, জর্মন, ইত্যাদি 'আর্য' ভাষাতে ঐ একই নাম মেলে।

আশ্চর্যের বিষয়, মহেন্-জো-দড়োতে যে সুপ্রাচীন শীল-মোহরে আঁকা পশুপতি-মূর্তি পাওয়া গেছে, সে-মূর্তির দুদিকে চারটে জন্তুর ছবি দেখা যায় এবং সে-চারটে হচ্ছে—মহিষ, গণ্ডার, হাতী আর বাঘ। এই জন্তু চতুষ্টয়ের প্রাচীনতম সংস্কৃত নাম—মহিষ, খড়্গী, ইভ আর শার্দূল। এই চার নামের আদ্য অক্ষর হল, ম-খ-ই-শ, একত্র করলে হয় 'মখেশ' অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর। অনেকদিন আগে কাশীতে এক বক্তৃতায় বলেছিলুম যে, এই শীলমোহরে দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যান রূপায়িত। মহাভারতে সে-যজ্ঞের বর্ণনা যা আছে, তা থেকে এটা পাওয়া যায় যে, শিব বলছেন পার্বতীকেঃ আমি মখেশ, দক্ষযজ্ঞে যে দেবতাকেই হবিঃসমর্পণ করা হক না কেন, আমি তার ফলভোক্তা—এই ভাবের কথা। শীলমোহরের শিব যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁর গায়ে বাঘ-ছাল, হাতে গণ্ডারের চামড়ার গয়না, মাথায় দুদিকে মহিষ-শৃংগ,—আর সম্ভবত তাঁর পর্যঙ্কটি হস্তিদন্ত নির্মিত। কনখলের কাছে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল, এ-কিংবদন্তীকে মেনে নিলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আসাম ও তৎসন্নিহিত পার্বত্য প্রদেশে নিহত পশুদের স্মরণে পশুপতি ধ্যানমগ্ন হয়ে পার্বতীকে আশ্বাস দিচ্ছেন। তিনি ঊর্ধ্ব-লিংগ, কেননা তিনি পুনর্জন্মদাতা। অবশ্য জান্তব বিধানে।

হয়তো এ-দাবী একদিন সকলে মেনে নেবে যে, বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি খুঁড়ে মহেন-জো-দড়োতে যে সভ্যতাকে লোকচক্ষুর গোচর করেছিলেন, সে-সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল এই বাঙলাদেশে বা আসামে। মহেন-জো-দড়োয় পাওয়া শীলমোহর জাতীয় দ্রব্য কিছু কিছু বক্সারেও আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ ধরনের জিনিস শিমলা পাহাড়ের নীচে রূপার নামক স্থানেও দেখা গেছে। একটা সংযোগ-সূত্র মেলে আমাদের ঢেঁকিতে। যে-রকমের ঢেঁকি বাঙলাদেশে আর কাশ্মীরে ব্যবহার করা হয়, সেই রকমেরই ঢেঁকি মহেনজো-দড়ো-হারাপ্পা অঞ্চলে মাটির তলায় মিলেছে।

যদি কেউ বলেন, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, এ প্রবাদ-বাক্য ভূস্বর্গ কাশ্মীরে প্রযোজ্য, আমরা কি হাসি-মুখে স্বীকার করে নেবো না? আর 'নারদের বাহন ঢেঁকি' এ লোক-প্রসিদ্ধির মধ্যে হয়ত এই সত্য অন্তর্নিহিত যে, বৈদিক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল যেখানে, তার পাশেই ছিল একটা অন্য সংস্কৃতির অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেষ্টনী যেটা বঙ্গদেশ থেকে কাশ্মীর হয়ে সিন্ধু নদের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই অন্য সংস্কৃতির দেবতা ছিলেন শিব-দুর্গা এবং মিশরে যেমন গগনবিহারী পক্ষীরা ছিল [illegible], এখানেও তেমনি ধরণী-বিহারী জন্তুদের সংগে বিশেষ সম্পর্ক ছিল ধরিত্রী দেবী মা-দুর্গার। 'নারদ' রাজ্যগতের সংবাদ এনে দেবার জন্যে সেকালের ভবঘুরে সংবাদদাতার কাজ করে বেড়াতেন। এ-অনুমান মহাভারতের সভা-পর্ব থেকেই করা যায়। পূর্বেও বলেছি ১ রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে যে উপাখ্যান ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, সেটি [illegible] উপাদানে [illegible]। মহাভারতে নারদ সংবাদ দিচ্ছেন, রাজাদের মধ্যে কেবল হরিশ্চন্দ্র আছেন ইন্দ্রের সভায়, কিন্তু অন্য সব ভারতীয় রাজার অবস্থান যমের সভায়।

আসামে আসামের পর্বতগুলো সুসঙ্গ-রাজকুমারদের [illegible] শিকারের সঙ্গে মহেশ-পশুপতির সম্বন্ধ রয়েছে। পার্বতী যে পার্বত্য-কন্যা একথা সকলেই জানে। আর, [illegible] হাতীই যে শিব হন, একথাও লোকের মুখে মুখে ফেরে। হিংস্র জন্তুদের বধ করলে [illegible] রক্ষা করা যায় [illegible] আর মানবসমাজ হিংস্র জানোয়ারদের থেকে রক্ষা পায়। এই দেশেই বাঙালী বাঘ-হাতীর [illegible]। [illegible] বাঙালীদের শৌর্য-বীর্যের পরিচয়।

কলকাতার সেই বাসগুলোর গায়ে বেঙ্গল টাইগারের নাম আঁকা আছে। কে যে এই জাতীয় সেই ট্রেডমার্কটির কথা কবে প্রথম দিয়েছিলেন তা জানি না। তিনি যেই হন না কেন, তাঁর কাছে আমরা ঋণী, কেননা রয়েল বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে বাঙালী-দের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই প্রচণ্ড সত্যটি এবং সাহসটুকুর মর্ম মর্মে অনুভব করেছিলেন চিরস্মরণীয় তেজস্বী বঙ্গসন্তান স্যার আশুতোষ মুখো-পাধ্যায়কে ইংরেজরা যাকে বলতেন বাংলাদেশের নরশার্দূল। তাই তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হয় 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরেঃ

BENGAL TIGER DEAD!

আমাদেরই জানা না, সেই নরশার্দূল প্রথম সেদিনটিকে সাদরে আমন্ত্রণ করে-ছিলেন না কলেজে এম-এ ও বি-এ পড়াবার জন্যে। বাংলা ভাষাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করতে ব্রতী ছিলেন সে-সময়ে, আশুবাবু তাঁদের সকলকেই আহ্বান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথও এ-ডাকে সাড়া দেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পরেও তিনি এখানকার ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হলেন। রবি-বাবু আর প্রমথবাবুকে আশুবাবু যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, আমার বিশ্বাস, তার পশ্চাতে ছিল সবুজ পাতার ডাক।

(ক্রমশ)

১ দেশ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬
৫ আষাঢ় ১৩৬৬

'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'গাছের ডাল? পাতা?'

'ডাল পাতা ফুল কুঁড়ি ফল, সব,—সবাই ফিসফিস করে আমার সঙ্গে কথা বলে।'

'আমার সঙ্গে বলবে?'

'হ্যাঁ, বলবে না আবার!' নাতির হাত ধরে সারদা তাকে কাছে টেনে নেন। তারপর ওর ছোট মাথাটা বাদাম গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে সারদা অল্প শব্দ করে হাসলেন: 'এইবেলা কানটা চেপে ধর, কথা শুনবি।'

মতি তাই করে। প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির দিকের মোটা বাকলে ঢাকা কাণ্ডের ওপর কান চেপে ধরে মতি স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীষ্মের দুরন্ত এলোমেলো হাওয়া বইছে। সবুজ সতেজ বাদাম পাতার সরসর শব্দ তুলে হাওয়া অন্যদিকে ছুটছে। মতির মাথার চুল নড়ছে, সারদার মাথায় টাক, চুল নেই, পাকা গোঁফটা হাওয়ায় একটু একটু কাঁপছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কাঁপছে সারদার ঠোঁট জোড়া। অবশ্য এটা হাওয়ার জন্য না, শব্দ না করে হাসিটা মুখের ভিতর, গলার কাছে ধরে রাখছে বলে দাদুর ঠোঁট নড়ছে, দশ বছরের মতি টের পায়। এটা দাদুর দুষ্টুমি। দাদুর বয়সের আর কোনো বুড়ো বা বুড়ি এমন দুষ্টুমি করে কিনা মতি মাঝে মাঝে চিন্তা করে।

'কি হল, শুনলি কিছু?'

'নাঃ!' মতি মুখ বেজার করে মাথা নাড়ল ও সঙ্গে সঙ্গে কানটা গাছ থেকে আলগা করে আনল। 'কিছুই শুনছি না।'

'ওয়াক্ থুঃ!' সারদা মুখ ঘুরিয়ে মাটির ঢিবির পাশের কচু জঙ্গলের ওপর থুথু ফেলেন। এবার আর হাসেন না। গোঁফের আড়ালে পুরু ঠোঁট জোড়া স্থির হয়ে আছে। অস্থির হাওয়ায় বাদাম গাছটা বেশি নড়ছে বলে হলদিবনা পাখিটা ডাল ছেড়ে অন্যদিকে উড়ে গেল। যেন হলদিবনার উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে সারদা একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়েন। তারপর চোখ নামিয়ে নাতির মুখ দেখেন।

'কান নষ্ট হয়ে গেছে তোর,—শহরে থেকে থেকে এটি হয়েছে দাদু।'

'তাই কি?' দাদুর চোখের ধূসর বাদামী রঙের মণি দুটো দেখতে দেখতে কী যেন ভাবে ও, তারপর দুধ-শাদা দাঁতের সারি বার করে মতি হাসে, মাথা নাড়ে। 'কেন, আমাদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় তো একটা পেয়ারা গাছ আছে,—রাস্তার ওপর কত বড় গোলমোহর ফুলের গাছ,—কৈ, সে দুটো গাছ তো কথা বলে না?'

'বীডন স্ট্রীটের গাছ!' গলার বিশ্রী শব্দ করে সারদা কথা বললেন, 'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির ঘড়ঘড় ভেঁপু, রেডিওর চিৎকার শুনে সেসব গাছের কিছু আছে নাকি। সব বোবা হয়ে গেছে, কথা বলবে কি, কোনোরকমে প্রাণটা টিঁকিয়ে রেখে ধুক্‌পুক্ করছে।' সারদা আর এক দলা থুথু ফেলেন। 'তোদের বীডন স্ট্রীটের পেয়ারা গোলমোহর গাছের পরমায়ু কদিন?'

মতি চুপ।

'এখানে গাছের কাছে গাছ ছাড়া আর আর ঐ নাথ্, এক একটা গাছকে যেমন কিছুই নেই। গুঁড়ির কাছে কত ঘাস মাটি

আদর করে জড়িয়ে ধরেছে অপরাজিতা লতা, ঝুমকা লতা।'

মতি হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকের গাছ, ঘন লতাঝোপ দেখে। সারদা আঙুল দিয়ে গাছের ডাল পাতা দেখান।

'আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে ডালে রঙবেরঙের পাখিরা এসে উড়ে বসে, গান গায়, পাতার বোঁটায় ঠোঁট ঘষে, ফলে ঠোকর মারে, তাই না?'

দাদুর চোখের ধূসর বাদামী মণি দুটো উত্তেজনায় ঝিকিয়ে ওঠে। নাতি ঘাড় কাত করে অস্ফুট গলায় বলে, 'তাই।'

গোঁফের আড়ালে সারদার কালচে পুরু ঠোঁট দুটো হঠাৎ আবার বেঁকে যায়।

'আর তোদের বীডন স্ট্রীটের গাছের গুঁড়ির কাছে কি? পাথরের খোয়া, গরম পীচ, গাছকে জড়িয়ে থাকে ইলেকট্রিক তার, গাছের মাথা ডিঙিয়ে ওঠে চারতলা, দুতলা দালান, কেমন?'

নাতি এবারও ঘাড় কাত করে অস্ফুট স্বরে দাদুর কথায় সায় দেয়। দিয়ে চুপ করে পায়ের নখ দিয়ে মাটির ঘাস খোঁটে।

'কাজেই শহরের গাছেরা কথা বলে না, পোড়া পেট্রলের ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে তাদের জিভ খসে পড়েছে, গাড়ির ঘড়ঘড় আর রেডিওর চেঁচামেচি শুনে শুনে তাদের কান ভোঁতা হয়ে গেছে।' কথা শেষ করে সারদা কচুজঙ্গলের গায়ে থুথু ছিটান।

'গাছের কান আছে দাদু?'

'আছে বৈকি। জিভ আছে, কান আছে। নাক আছে, চোখ আছে।' দাদু গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়েন। 'আমাদের মতো ওরাও সব কিছু দেখতে পায়।'

কালো চকচকে চোখ জোড়া বড় করে মতি এদিক ওদিক দেখে। সারদা হাঁটেন। মতি হাঁটে। কচুজঙ্গল পিছনে রেখে দুজন ঢালু জমিতে নামে। রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছে। হাঁটু সমান জল দাঁড়িয়েছে সেখানে। দুজন জলের ধারে গিয়েছে কি না গিয়েছে, জলে পা ডোবালো কি না ডোবালো যেন দু'তিনশ ব্যাং লাফিয়ে ছিটকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলে ঝাঁপ দিল। প্রথমটায় হঠাৎ ভয় পেলেও পরে মতি যেন খুব মজার জিনিস দেখল, দু' হাতে তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

'তোর প্যাণ্টের পকেটে এক আধ ডজন ঢুকিয়ে নে না।' গম্ভীর থেকে দাদু প্রস্তাব দেন। 'কেমন হলদে তেলতেলে চেহারা ওদের!'

'দোৎ, কী হবে ব্যাং দিয়ে?' মতি নাক সিঁটকায়।

'খাবি ভেজে চচ্চড়ি করে?'

'ওয়াক্ থুঃ।' মতি থুথু ছিটায়। 'চীনারা ব্যাং খায়। আমরা খাব কেন?'

'হুঁ, তোমরা বরফ চাপা পচা পচা মাছ খাবে। পচা বাসি মাছ খেয়েই তোর এমন হাড়গিলে চেহারা হয়েছে, বুকের সব কটা হাড় গোনা যায়।'

কথাটা সত্য। মতির শরীর খারাপ হয়ে গেছে। তাই না দাদুর চিঠি পেয়ে সামারের ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এল। পাঁচ সাত দিনেই শরীরটা ভাল বোধ করছে সে। পুকুরের টাটকা মাছ আর খাঁটি দুধ খেতে পারছে এখানে।

মাঠের জল পার হয়ে দুজন তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যায়। একটা না, সাত আটটা জাম গাছ। ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটা অন্ধকার করে রেখেছে। আর থোকা থোকা কালো জাম ঝুলছে মাথার ওপর। যেন শ্রাবণ আকাশের অগুনতি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গাছের মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে। মতি হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। এক সঙ্গে এত পাকা জাম সে কোনোদিন দেখেনি। সব অবশ্য পাকেনি। কাঁচা কচি সবুজ রঙের,—আধপাকা লাল রঙের জামই বা গাছে কম কি। লাল সবুজ কালো। যেন এক একটা গাছের ডালের মাথায় লাল সবুজ কালো পাথরের মালা ঝুলিয়ে রেখেছে কে?

'হাঁ করে দেখছিস কি?' দাদু ধমক লাগায়।

'দেখছি, ভারি সুন্দর লাগছে।'

'হুঁ!' সারদা হঠাৎ কি ভেবে হাসেন। 'সুন্দর লাগছে বলে গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ফলগুলো তোর মুখের ভিতরে লাফিয়ে এসে ঢুকবে, কেমন?'

'না, তা ঢুকবে কেন।' মতি মাথা নাড়ে।

'সুন্দর সুন্দর করেই তো তোরা মরলি।' সারদা কাঁধের গামছাটা কোমরে বেঁধে নেন। মতির মতো তাঁর পরনেও হাফপ্যাণ্ট। খালি গা, খালি পা। বুড়ো হলে হবে কি, হাতের পায়ের মাংসের গোছার এখনও শক্ত পাথুরে চেহারা! দাদু গাঁয়ে থাকে বলেই শরীর এত ভাল। মতি ভাবে। অথচ তুলনায় মতির বাবা, হ্যাঁ এই সারদা রায়ের ছেলে সুকুমারবাবুর শরীর কেমন নরম ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। বাবার চেহারাটা মতির এখন মনে পড়ল। এখন বেলা এগারোটা। তার বাবা অফিসে চলে গেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা প্রকাণ্ড লাল বাড়িতে তার বাবার অফিস। একদিন তাদের চাকরের সঙ্গে গিয়ে মতি বাবার অফিস দেখে এসেছে। মতি চিন্তা করল, যদি তার বাবা গাঁয়ে চলে আসেন দাদুর মতো তাঁরও শরীরটা ভাল হবে, ভাল থাকবে। এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে বাবাকে তাই পরামর্শ দেবে কিনা মতি তা-ও চিন্তা করল। কিন্তু তার বাবা আসতে চাইলেও মা আসবে না। মতি জানে। এখানে তার আসা নিয়ে মা ভীষণ আপত্তি তুলেছিল। সাপ ব্যাং জঙ্গল জল কাদা ছাড়া কিছু নেই এখানে। গাঁয়ে কোনো ভদ্দরলোক বাস করতে পারে নাকি। তাছাড়া, কেবল চাষাভূষো নিয়ে কারবার। হয়তো ওদের ছেলেপুলেরাই মতির সঙ্গী হবে। একটা ভাল কথা শুনবে না, লেখা-পড়ার চর্চা থাকবে না, দিনরাত মাঠে জঙ্গলে ঘুরে পাখির ছানা চুরি আর গরু ছাগল ঠেঙানো শিখে আসবে মতি। অবশ্য মা আপত্তি করলেও দাদুর চিঠি পেয়ে বাবা তাকে একজন লোক দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। এখানে এসে মতির ভাল লাগছে। চাষাভূষো সাপ ব্যাং জঙ্গল কাদা ছাড়াও এখানে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলি সত্যিই ভাল, সত্যিই সুন্দর। মতির ইচ্ছা, কেবল সামারের ছুটি না, সব সময়ের জন্য

এখানে থেকে যায়। তার বাবা মাও এখানে চলে আসুক।

এই আশ্বিনে উনষাট্টি পেরিয়ে ষাটে পা দিচ্ছেন সারদা। গাছের উঁচু ডালে চড়ে তিনি তাঁর দশ বছরের শহুরে নাতিকে অবাক করে দিতে পেরেছেন কিনা চিন্তা করার আগে হাত বাড়িয়ে কালো জামের ছড়া ছিঁড়ে কোমরের গামছায় পোরেন। চার পাঁচটা জাম মুখে ফেলেন। দশ বারোটা জাম ছড়া থেকে আলগা হয়ে ছিটকে নিচে পড়ে। মতি মহানন্দে সেগুলি কুড়াতে লেগে যায়। পুষ্ট পাকা জামের মধুর টক টক রসে-স্বাদে সারদার মুখগহ্বর যখন ভরে ওঠে তখন তাঁর চোখের মণি দুটো একটি ছোট ছেলের চোখের মণির মতো চকচকে হয়ে ওঠে, ঘোলাটে বাদামী রং মিলিয়ে গিয়ে পাকা জামের বীচির মতো লাল টুকটুকে হয়ে ওঠে।

'দেখতে সুন্দর। সুন্দর সুন্দর করে তোরা মরবি।' গাছের মগ ডালে উঠতে চেষ্টা করেন সারদা। 'যা দেখতে ভাল তা খেতেও ভাল। কিন্তু খাওয়া জিনিসটা তোরা ভুলে গেছিস।' মগডালে চড়ে সারদা মনে মনে নাতির সঙ্গে কথা বলেন। 'তোদের বীডন স্ট্রীটের বাসায় সুন্দর সুন্দর সোফাসেটি পর্দা, ফুলের টব আছে। রেডিও আছে, নিয়োন আলো আছে, ড্রেসিং টেবিল কাচের বাসন প্লাস্টিকের খেলনা পুতুলে ঘর বোঝাই। তোর মা একবেলার শাড়ি ওবেলা পরে না; সকালের সুন্দর শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে বিকেলে তার চেয়েও কোনটা সুন্দর, কোনটা বেশি মানাবে ভেবে দিশাহারা হয়। তোর বাবার সুন্দর টাই স্যুট জুতো গাড়ি কেতাদুরস্ত আর্দালি পিওন নিয়ে দিন কাটে। না, তোরা উপোস থাকিস বলব না। কাচ ঘেরা বন্ধ অফিস কামরার পাখার তলায় বসে সুকুমার পাঁউরুটি, টিনের মাখন, শিয়ালদার ঠাণ্ডাঘরে জিইয়ে রাখা দুটো আলু সিদ্ধ, মরিচগুঁড়ো, বাসি ডিম আর কিছু শুকনো আনাজ সিদ্ধ ও গুঁড়ো দুধ জমিয়ে তৈরী একটা বড় বরফী দিয়ে লাঞ্চ খায়। ব্যালান্সড ডায়েট? অস্বীকার করবে কে। রীতিমতো শহরের নামী ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সুকুমার অফিসে বসে খবর কাগজের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট মিনারেল্‌স সহযোগে তার দুপুরের সুষম আহার সম্পন্ন করে। ঘরে সুকুমারের স্ত্রী ভেজাল তেল আর গুঁড়ো হলুদ লঙ্কায় রান্না করা মাছের ঝোল ও চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে চিন্তা করছে, শহরের কোন সিনেমা ঘরে ভাল ছবি এল, ম্যাটিনী শো দেখে আসা যাক। 'সিনেমা!' কথাটা মনে হতে সারদা মুখ বিকৃত করলেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ডবল সাইজের পাকা জাম মুখে পুরলেন। 'ফানুসের পরমায়ু নিয়ে তোরা শহরে বসে আছিস। কেবল বাইরের রং চং আর ঠাট-ঠমক। এদিকে ভেজাল খাদ্য আর বন্ধ বাতাস যে তোদের আয়ুর বারোটা—'

নীচে থেকে মতি চেঁচাতে থাকে:

'দাদু, অত উঁচোয় উঠছ কেন,—ডাল ভেঙে—?'

সারদা হাসেন। উঁচু ডালের ওপর বসে নাতির দিকে তাকান।

'ভাঙবার আগে ডাল জানান দেবে, মটমট শব্দ হবে, তোদের বীডন স্ট্রীটের গাড়ি ঘোড়া জানান না দিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে।'

মতি নীরব হয়ে যায়। এ গাছের শালিক বুলবুলির দল দাদুর তাড়া খেয়ে অন্য গাছে উড়ে গিয়ে জটলা করে, পাকা জামে ঠোকর লাগায়। কিন্তু বুড়ো দাদুই বা কম যায় কি! মতি চিন্তা করে। এই তো সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চারটে পাকা আম দিয়ে এতবড় বাটির এক বাটি ক্ষীর মুড়ি খেয়ে এসেছে। এখন আবার গাছে উঠে প্রাণভরে পাকা জাম খাচ্ছে। শ দেড়শ এর মধ্যে খাওয়া হয়েছে ঠিক। মতি বেশি খেতে পারে না। 'পেট চিমসে মেরে গেছে, শহুরে ছেলে, কী আর খাবি, কতটা খাবি!' সকালে দাদু তাকে ঠাট্টা করছিল। কেননা এত ভাল দুধ মেরে তার ঠাকুমা কাল রাত্তিরে ক্ষীর তৈরী করেছে, সেই ক্ষীর মতি কতটা খেতে পারল! ক্ষীরের গন্ধটা এখনও তার হাতে লেগে আছে। দুধের গন্ধ, ঘিয়ের গন্ধ, ক্ষীরের গন্ধ কী মতি এখানে এসে জানতে পারছে। 'খেতে খেতে খাওয়া বাড়বে।' দাদুর ঠাট্টা শুনে মতির ঠাকুমা বলছিল, 'খাওয়াটা অভ্যাসের কাছে.— কলকাতায় থাকতে তুমি কি আর বেশি

খেতে পারতে,—এখন তো তোমার খাওয়া দেখে আমিই মাঝে মাঝে অবাক হই।' দাদু হাসছিল। 'অবাক হচ্ছ কি ভয় পাচ্ছ খাঁটি কথাটা বলে ফেল।' যেন দাদুর খোঁচা খেয়ে ঠাকুমা লজ্জা পেয়ে চুপ করে ছিল, কিন্তু দাদু চুপ ছিল না। 'হুঁ, ভুঁড়িটা বেজায় বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভয় পাবারই কথা,—আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে খাওয়াটা ঠিক রাখতে হবে বৈকি। নাকি ধরো ফিতেটা যদি ফটাস্ করে ছিঁড়ে যায়, থ্রম্বসিস কি ঐরকম কিছুতে হুড়ুড় করে মরে যাই তো তোমার সাহস বাড়বে?' শুনে ঠাকুমা রেগে গিয়ে বলছিল, 'আহা, কথার কী ছিরি! কেন তোমার কি মরবার বয়স হয়েছে নাকি যে, এসব যা তা বলছ?' আর কথা না বলে দাদু আম-ক্ষীর খাওয়ায় মনোযোগ দিয়েছে এবং ঠাকুমা আরো কিছুটা ক্ষীর দাদুর বাটিতে ঢেলে দিয়েছে। এক সংগে দাদুর চোখ ও ঠাকুমার চোখ দেখে তখন মতি বুঝে ফেলেছে, খেতে পেয়ে বুড়ো যেমন খুশি, তেমনি খাইয়ে বুড়ি মহাখুশি।

'আয়ুর ফিতে'। কথাটা মনে পড়তে মতি তার বাবার কথা চিন্তা করল। না, তার বাবা মোটে খেতে পারে না। এই এতটুকুন ভাত, দু'খানা রুটি কি এইটুকুন [illegible] খাওয়ার পর দু'হাত তুলে বাবা মাকে আর কিছু দিতে নিষেধ করে। যেন আর একটা রুটি কি এক মুঠো ভাত বেশি খেলে বাবার পেট ফেটে যাবে। এটা তো ভাল লক্ষণ না, মতি এখন দাদুকে দেখে, দাদুর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছে। তার বাবা হয়তো হুট করে একদিন—

'নে ধর।'

মতি চমকে ওঠে। দাদু গাছ থেকে [illegible] এনেছে। এই এত জাম [illegible] গামছায় বাঁধা। [illegible] ভুঁড়িটা [illegible] যেন [illegible] উঠেছে।

'আমি আর খেতে পারছি নে দাদু।'

মতি ঘাড় নাড়ে।

[illegible] খেয়ে তোর পেট [illegible] একটা খা, দুটো একটা খা।' [illegible] এক থোকা জাম নাতির হাতে তুলে দেন। মতি আর আপত্তি করে না, দুটো একটা জাম মুখে ফেলে দাদুর সংগে হাঁটে।

'হুঁ, আমার জাম বাগান দেখলি, আম বাগান দেখলি—এইবেলা তোকে কামরাঙা আর পেয়ারা বাগানটা দেখাব।'

মতি খুশি হয়ে পা চালায়। দাদুর আম বাগান দেখা হয়ে গেছে। আর জাম বাগান দেখল।

'সব গাছ তুমি লাগিয়েছ দাদু?'

সারদা [illegible] হেসে ফেলেন। জামের রসে [illegible] রং ধরেছে। 'জাম গাছ আগেই ছিল, এইগুলি জাম গাছ এক জায়গায় [illegible] এদের [illegible] দিনকাল।'

'আম [illegible] গাছ তোমার হাতের লাগিয়েছ বুঝি?'

'হুঁ,' সারদা আকাশের দিকে তাকান। 'আমি একটাও আমগাছ পাইনি। [illegible] আমের কলম [illegible] লাগাতে হয়েছিল। তাই না আজ এত বড় বা[illegible]ন হয়েছে।'

'বেশ ভাল ভাল আম হয় তোমার বাগানে।'

'হিমসাগর আর মোহনফুলি ছাড়া কোনো আমের কলম লাগানো হয়নি, দাদু,—আমার বেলায় আমি বেজায় খুঁতখুঁতে। [illegible] আম আমার দুচোখের বিষ।' সারদা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে নাতির দিকে ঘাড় ফেরান। যেন ছেলেটা কি ভাবছে। [illegible] মুখখানা লাল টুকটুকে হয়ে গেছে। দাদুর
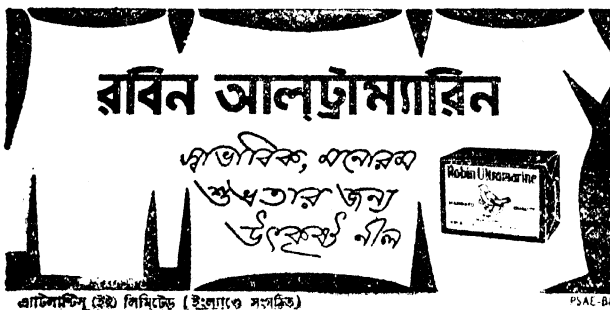
সংগে চোখাচোখি হতে মতি ফিক্ করে হাসল।

'হাসছিস যে।' সারদা ভুরু কুঁচকান। ভুরুতে একটা দুটো সাদা চুল এখনও রয়ে গেছে, বাকি চুল উঠে যাওয়ার দরুণ কপালটা আগের চেয়ে চওড়া হয়েছে মনে হয়। কপালের দু' তিনটা গভীর রেখার খাঁজে খাঁজে ঘাম জমে রোদে চিকচিক করে। 'গত বছর পাঁচ শ টাকার সিংগাপুরী কলা আর আনারসের চারা লাগিয়েছি।'

'কলাবাগান দেখেছি,—আনারসের বাগান দেখা হয়নি।' মতি ঢোক গিলল।

'একে একে সবই দেখা হবে, এখানে এসে গেছিস যখন আনারস, পেয়ারা, কামরাংগা, জামরুল সবেদা সব কিছুর বাগান দেখতে পাবি।'

মতির চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল।

'সবেদা খেতে আমি খুব ভালবাসি।'

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি হাঁটে। একটা বড় দীঘির পাড় ঘুরে দুজন আবার ঝাঁপি ঝাঁপি ডাল পাতা ছড়ানো বিশাল ছায়ার জগতে এসে দাঁড়াল। মতি গুনে গুনে দেখল এক এক সারিতে চারটে করে গাছ, তিন সারিতে একুনে বারোটা জামরুল গাছ। এক একটা গাছে পাতার চেয়েও যেন ফল ফলেছে বেশি। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে নধর পুষ্ট দুধ রং অসংখ্য জামরুল ঝুলে আছে। আমগাছের চেয়ে এখানে পাখির সংখ্যা বেশি। এখানে তারা বেশি চঞ্চল, বেশি কলমুখর। মতি বুঝতে পারল, টিয়া বুলবুলি শালিক কাক কালো জামের চেয়ে সুন্দর জামরুল পছন্দ করে বেশি। আর কাঠবিড়াল। লেজ ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওরা এডাল থেকে ওডালে ছুটে বেড়াচ্ছে।

'কেমন দেখছিস নাতি?'

'ভারি সুন্দর,—মনে হয় গাছে গাছে তারা ফুটে আছে, রাতের আকাশে যেমন তারা ফোটে।'

'কাব্য!' সারদা মুখ বিকৃত করলেন, থুথু ফেললেন। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝুলে পড়া একটা ডাল থেকে এক ছড়া জামরুল ছিঁড়ে নাতির হাতে তুলে দেন। 'খেয়ে দ্যাখ, কেমন মিষ্টি রসালো ফল আমার গাছের।'

'খুব মিষ্টি।' মতি একটা ফলে কামড় বসায়। অবশ্য নাতির কথা শুনতে সারদা চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। হাত বাড়িয়ে আর এক ছড়া জামরুল পেড়ে টপাটপ্ মুখে ফেলেন, কচমচ করে চিবোন। ছোট ছেলের মতো জামরুলের রস ঠোঁটের কষ বেয়ে থুতনির আগায় এসে ঝুলতে থাকে সারদার। দেখে মতি মজা পায়। তার ষাট বছরের বুড়ো দাদু যে সত্যি একটি ছেলেমানুষ ছাড়া আর কিছু না, মতি
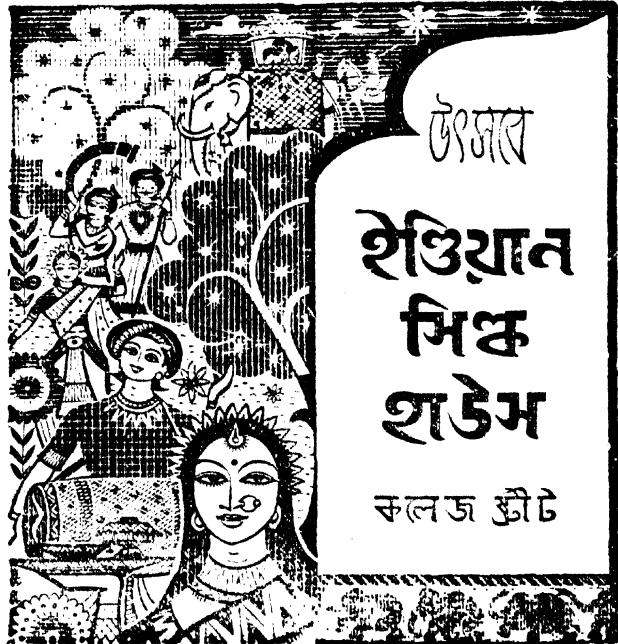
এখানে এসে বুঝতে পারছে, দেখছে। একটা জামরুল সে খেয়ে শেষ করতে পারছে না। দাদু পাঁচটা সাবাড় করে দিচ্ছে। আয়ুর ফিতে লম্বা করছে দাদু। ভেবে মতি নিজের মনে হাসল।

'এইবেলা বুঝি আনারস ক্ষেত দেখতে যাব আমরা?'

'উঁহু।' সারদা মাথা নেড়ে বল্লেন, 'আনারস ক্ষেতে যাবি কি, এখনো পাতার রং যায়নি, আর দু এক পশলা বৃষ্টি হলে তবে তো আনারস পাকতে আরম্ভ করবে। এখন সব কাঁচা রয়ে গেছে।'

কেবল ফলের বাগান দেখা না, দেখার সঙ্গে খাওয়ার একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে সারদা নাতিকে বার বার বোঝাতে চাইছেন। বুঝতে পেরে মতি আর আনারসের কথা তুলল না। কিন্তু কথা না বললেও ছেলেটা আবার কি ভেবে ভেবে মিটি মিটি হাসে।'

'হাসছিস যে বড়ো?'

'আমার ইচ্ছা করে তোমার একটা নাম দিই দাদু।'

'কি নাম?' সারদা খুশিই হন। পিটপিট করে নাতির চকচকে চোখ দুটো দেখেন। 'বল্, বলে ফেল্।'

'ফলের রাজা।' মতি ফিক্ করে হাসল।

'হু, তার চেয়ে বল্ গাছের রাজা, বাগানের রাজা।' সারদা হাতের শেষ জামরুলটা কচকচ করে চিবোল। 'ফল পিছে, গাছ আগে, বুঝলি।' কি ভেবে সারদা নিজের মনে হাসেন। তারপর 'গেলবার আমার একটাও আম খাওয়া হয়নি জানিস?'

মতি ফ্যালফ্যাল করে দাদুর মুখ দেখে।

'গেলবার ঝড়ে সব আমের বোল গুটি নষ্ট হয়ে যায়। এত্তবড় আমবাগানে একটা আম বড় হতে পারেনি, পাকেনি।'

'তারপর?'

'তার পর আর কি, পাকা আম খাইনি তো খাইনি, তাই বলে কি আমি বাগানের গাছগুলির ওপর রাগ করেছিলাম, না গাছের যত্ন করিনি! বরং গত বছর আমি আমার নিস্ফলা আম বাগানেই বেশি সময় কাটিয়েছি, ওদিকে জামের বাগানে জাম পেকে ঝরে ঝরে নিচে পড়েছে, ঘাসের ওপর হাঁটু উঁচু কালো জাজিম তৈরী হয়েছে পাকা জামের, কিন্তু আমি একবার ওদিক মাড়াইনি। হু, জমারুল পেকে পেকে সব কটা গাছ সাদা হয়ে গেছে, কাঠবিড়াল আর রাজ্যের পাখি পেট ভরে জামরুল খেয়েছে, আমি একবার এখানে চুপি দিতে আসিনি।'

'তবে তো তুমি ফলের চেয়ে গাছকেই বেশি ভালবাস।' মতি আমতা আমতা করে বলল।

'তবে?' সারদা নাক দিয়ে শব্দ বার করলেন। 'আমি আর কটা ফল মুখে দিই, না কি একলা আমি খাব বলে এত এত গাছ লাগিয়েছি, বাগান করেছি। আমার গাছের ফল পাখিরা বেশি খায়, বাদুড় আর কাঠবিড়ালগুলি বেশি খায়, খাচ্ছে।'

'তাই দেখছি।' সারদার দশ বছরের শহুরে নাতি জামরুলের ডালে ডালে লেজমোটা কাঠবিড়ালগুলির ছুটোছুটি দেখতে দেখতে খুশি হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বিডন স্ট্রীটের বাসায় সে তার গুলতিটা ফেলে এসেছে। ওখানে কি আর কাঠবিড়াল আছে। কেবল ইলেকট্রিক তার, ট্রাম টেলিফোনের তার। তারের গায়ে গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মতি কাঠবিড়াল আর পাখি মারার সাধ মিটিয়েছে। তারের ঝনঝন্ শব্দটা এখনও তার কানে বাজছে। শহরের কথা মনে হতে সে দাদুর দিকে তাকায়।

'কিছু বলছিস্?'

মতি অল্প অল্প হাসে।

'তোমার একটা বড় গাড়ি ছিল, হলুদে রঙের গাড়ি?'

'হ্যাঁ', সারদা থুতনি নাড়েন। 'কার কাছে শুনলি?'

'মা বলছিল একদিন, গাড়িটা বেচে দিয়েছ?'

'বেচে দেব না তো সঙ্গে করে ওটা গাঁয়ে নিয়ে আসতাম নাকি।' সারদা থামেন, চারদিকে তাকান। 'ভাল রাস্তাঘাট নেই, এখানে আমি গাড়ি দিয়ে করতাম কি!'

তাও বটে। দাদুর মতো নাতিও ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখে। মাঠ জঙ্গল ডোবা খানা আর এবড়ো থেবড়ো মেঠো পথে দাদু কী করে গাড়ি চালাতো!

'বেচে দিয়ে ভাল করিনি?' সারদা নাতির চোখ দেখেন। মতি ঘাড় কাত করে। সারদা হাসেন। 'না কি মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে আমি আম বাগানে জাম বাগানে এসে আম জাম খেতাম?'

'ধোৎ!' ছবিটা মতিরও মনঃপূত হয় না। 'তাছাড়া, ঘাসের ওপর দেদার পাকা জাম জামরুল ছড়িয়ে থাকে। গাড়ি ছুটিয়ে এলে চাকার তলায় সব থেঁতলে যেত।'

সারদা শব্দ করে হাসেন।

'যা বলেছিস দাদু, তাছাড়া, একবার এখানে গাড়ির হর্ন শুনলে আমার গাছের সব পাখি কাঠবিড়াল ভয়ে ছুটে পালাতো। কেমন না?'

মতি ঘাড় কাত করল। কি একটু ভাবল। চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক দেখল। তারপর:

'আমার তো মনে হয় গাড়ির শব্দ শুনে ফড়িং প্রজাপতিগুলিও ভয়ে পালিয়ে যেত।'

'তাই, গাড়ি বাজে জিনিস। সাধে কি আর বেচে দিলাম।' সারদা নাতির ওপর সন্তুষ্ট হন।

'তবে কিনা—'

'আবার তবে কিনা কি!' সারদা রুখে ওঠেন। 'আর কি বলার আছে শুনি?'

ঘাড় গুঁজে মতি পায়ের নখ দিয়ে ঘাস খোঁটে। 'পায়ে যদি ধুলো না লাগল, নরম ঘাস না মাড়ালাম তো বেঁচে আছি বলে আমার মনে হয় না।' কথা শেষ করে সারদা গোড়ালী দুটো জোরে জোরে ঘাসের ওপর ঘষেন। তাই, মতি চিন্তা করল, দাদু সারাদিন খালি পায়ে থাকে, গাছের রাজা জুতো পরে না।

কিন্তু যে কথাটা তার জিভের ডগায় এসেছিল বলতে না পেরে মতি অস্বস্তি

বোধ করে। দাদু হাঁটে, মতি হাঁটে। জামরুল বাগানের ঠাণ্ডা ছায়া মাথার ওপর থেকে সরে যায়। দুজন রৌদ্ররুক্ষ আকাশের নিচে চলে এল।

'বেজায় রোদ।' মতি আস্তে বলল।

'এটা জ্যৈষ্ঠ মাস।' চড়া গলায় দাদু বলল, 'শ্রেষ্ঠ ঋতুর শ্রেষ্ঠ মাস, রোদ তো চড়বেই; না হলে আম জাম কাঁঠাল কলা পাকবে কেন।'

'তাও বটে।' মতি বিড়বিড় করে দাদুর কথায় সায় দেয়, হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। তার কপালটা ঘামছিল বেশি।

'এক কাজ কর্ না।' সারদা নাতির দিকে ঘাড় ফেরান।

'কি?' মতি ঘাড় ফেরায়।

সারদা হাঁটা বন্ধ করে থমকে দাঁড়ান। মতি বুড়োর চোখ দেখে। বুড়োর চোখের বাদামী মণি দুটো রোদের তাপে লাল হতে শুরু করেছে কি।

'রোদটা তোর মাথায় বেশি লাগছে, কেমন?' সারদা অল্প হাসেন।

'হুঁ।'

'তা তো লাগছেই', সারদা আবার এক দলা থুথু ছিটান। মাঠের গরম বালি থুথুটাকে চোখের নিমেষে শুষে নিচ্ছে, যেন মতি তাই দেখতে আরম্ভ করেছিল। সারদা আঙুল দিয়ে মতির পরনের হাফপ্যাণ্ট দেখান। 'ওটা খুলে ফেল্,—খুলে মাথায় জড়িয়ে নে, মাথাটা ঠাণ্ডা থাকবে।'

'ধোৎ' মতি ফিক্ করে হাসল, 'তুমি যেন কী দাদু, মাঠের ওপর দিয়ে আমি ল্যাংটা হয়ে হাঁটব নাকি।'

'আমি গরু, আমি ছাগল, আমি গাছের কাঠবিড়াল, জংগলের শেয়াল।' সারদা ভেংচি কেটে বড় একদলা থুথু ফেলেন। 'তোকে এখানে দেখছে কে, কতবড় একটা মানুষ হয়ে গেছিস শুনি? লজ্জা করে!' একটু থেমে সারদা বললেন, 'এ তোমার বিডন স্ট্রীটের ছাদ দেয়াল ডিঙিয়ে আসা মরা হাজা রোদ্দুর না, এ হল গিয়ে মাঠ ফাটানো দীঘি শুকানো তেজী খাড়া রোদ; অভ্যাস নেই যখন তোমার মাথাটিও ফেটে চৌচির হতে পারে, তাই বলছিলাম—দাদু ওটা মাথায় জড়িয়ে নিতে।'

যেন দাদুকে খুশি করতে মতি পরনের প্যাণ্ট খুলে মাথায় জড়ায়। প্রথমটায় কেমন বাধো বাধো ঠেকে তার, কানটা গালটা লাল লাল হয়, তারপর অবশ্য মতি স্বাভাবিক হয়ে যায়; দাদুর সংগে লম্বা পা ফেলে হাঁটে। সত্যি তো, কে আছে কে দেখছে তাকে এই রোদ্দুরে; কাক শালিকটা পর্যন্ত ধারে কাছে নেই। 'বুঝলি,' সারদা হাসেন, নাতির কাঁধে হাত রাখেন; নাতি তাঁর বাধ্য হয়েছে দেখে খুশি গলায় বলেন, 'আমি কিছু গ্রাহ্য করিনে। আম বাগানে কি জাম

বাগানে থাকলে, যখন দেখি বেশি ঘাম দিচ্ছে শরীরে, গরম কমছে না, গায়ে কিছু থাকলে খুলে ফেলে স্রেফ লেংটা হয়ে ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ি।'

'খুব আরাম লাগে!'

'আলবৎ লাগতে হবে, হি হি।' ছোট ছেলের মতো শোনায় সারদার হাসি। 'নরম ঘাস তোমার শরীরকে আদর করছে, গাছের মিষ্টি ছায়া তোমার শরীর ঢেকে রাখছে, আরাম না লেগে পারে দাদু।'

'জামা কাপড় কিছু না।' যেন দাদুকে আর একটু খুশি করতে মতি বলল, 'আগে মানুষ যখন জঙ্গলে ছিল, বনে ছিল তখন তো শুনেছি ওরা জামা কাপড় চিনতই না।'

'তবে আর কি, জানিস তো সব।' সারদা আকাশের দিকে চোখ তোলেন। 'আগে মানুষ সুখে ছিল, এখন পোশাক-আশাক তার যন্ত্রণা বাড়িয়েছে।'

দাদুর মেজাজ ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে মতি কথাটা বলে ফেলল: 'মা বলে, এতবড় ইঞ্জিনিয়ার ছিল তোর দাদু, এখন একটা চাষাভুষো হয়ে গাঁয়ে আছে।'

'বলুক না, বলতে দে।—চাষা বলছে শুনলে আমি রাগ করিনে?'

'মা দুঃখ করছিল এলগিন রোডের এতবড় বাড়ি তুমি বেচে দিলে।'

'তোর মা তো দুঃখ করবেনই, তোর মা ইট কাঠ লোহা বালির স্বপ্ন দেখেন। আমার স্বপ্ন মাটি, আমার স্বপ্ন গাছ।'

'ঘাস ছায়া পাখি কাঠবিড়াল।' মতি যোগ করল।

'কাজেই শহরের বাড়ির বদলে এখানে আমি কী পেয়েছি তোর বাবা মা জানবে না।' যেন বিরক্ত হয়ে সারদা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইলেন। "শহরের পুরানো পচা আকাশের নিচে থেকে ওদের ইমারতের স্বপ্ন দেখতে দে, কল ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালি গিলে গিলে আয়ুর ফিতা গুটিয়ে নিতে দে।' সারদা ভেংচি কাটার মতো চেহারা করে নাতির মুখ দেখেন।

'ওরা তোমার আগে মরে যাবে দাদু?' মতি প্রশ্ন না করে পারল না। 'আমার বাবা মা?'

'সব, কলকাতা শহরটাই যে মরতে বসেছে।' দাদু নাকে হাসল। যেন মতি কি ভাবল, ভেবে প্রশ্ন করল, 'বাড়িগুলো? বাড়িগুলোর কী হবে, এত বড় বড় দালান?'

'ভেঙে পড়বে, ভেঙে মাটির সঙ্গে একদিন মিশে যাবে।'

'তারপর?'

'তারপর সেখানে ঘাস গজাবে গাছ হবে ফুল ফুটবে ফল হবে।'

'খুব চমৎকার হয় তা হলে, না দাদু? কলকাতার এখানে সেখানে পাখি ডাকছে প্রজাপতি উড়ছে।'

'তাই তো হতে হবে, তা না হলে পৃথিবীর নিত্যনতুন চেহারা থাকবে না যে।'

কথা শুনতে শুনতে দাদুর সঙ্গে মতি একটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছল। এর আগে সে এদিকে আর একদিনও আসে নি। ভারি সুন্দর গোলমতন একটা প্রকাণ্ড পুকুর। আয়নার মতো ঝকঝক করছে জল। পুকুরের একদিকে সাপলা আর একদিকে পদ্ম বন। থালার মতো সবুজ গোল পদ্ম-পাতাগুলো জলের ওপর চুপচাপ শুয়ে আছে। শাপলা পাতাগুলো গোল না, অনেকটা পানের মতো দেখতে।' টুকটুকে লাল দুটো সাপলা ফুল ফুটেছে। কাল আরো দু-চারটা ফুল ফুটবে, পরশু এক ডজন ফুটতে পারে, তার পরদিন আরো অনেক বেশি ফুল ফুটবে। সবুজ ডাঁটার আগায় আগায় অসংখ্য কুঁড়ি কলি তৈরী হয়ে আছে। কলিগুলোর গা ছুঁয়ে এক ঝাঁক ফড়িং উড়ছে। 'পদ্মের কলি দেখছি না দাদু!' মতি বলছিল। দাদু হেসে উত্তর করল, 'এখন কি, বর্ষা পড়ুক—বর্ষার জলে কলি কুঁড়ি গজাবে আর শরৎ কালে সব ফুটবে।' অবাক হয়ে মতি পদ্মবন দেখল আর চিন্তা করল কবে শরৎ কাল আসবে আর রাশি রাশি পদ্ম ফুটবে। 'তুই কেবল জলের ওপরের ফুলের কথা ভাবছিস, আমার এই পুকুরের জলে কত বড় বড় মাছ আছে জানিস, তোর চেয়েও বড় এক একটা রুই কাতল এই পুকুরে আছে।'

ফুলের কথা ভুলে গিয়ে মতি জলের নিচের মাছের কথা চিন্তা করতে লাগল। বড় মাছ মানে অনেকদিনের পুরনো মাছ।

'পুরনো মাছ খেতে ভাল দাদু?'

হুট্ করে নাতির মুখে খাওয়ার কথা শুনে সারদা খুশি হল। 'ভাল না মানে?' সারদার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। 'টাটকা হলে সব মাছই খেতে ভাল, নতুন পুরোনো বুঝি নে।'

দাদু যে মাছের খুব ভক্ত মতি এখানে এসে জেনে গেছে।

তাও কি তাদের কলকাতার বাসার মতন একটুকরো দেড়টুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া!

গাদা গাদা মাছ চাই সারদার। দুবেলা। বাটি ভরে ভরে ঠাকুমা দাদুর পাতের সামনে মাছভাজা, মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ি সাজিয়ে দেয়।

তাই বুঝি সারদা কাল দুপুরে খেতে বসে নাতিকে বলছিলেন। মাছ খাওয়ার জন্যে তিনটে দীঘি পুকুর কাটিয়েছেন তিনি। 'হুঁ, এমনভাবে মাছ খেতে হয় যেন কেবল হাতে-মুখে না, গা দিয়েও আঁশটে গন্ধ বেরোয়—তবে না মাছ খাওয়া।'

আর মতির তখন মনে পড়েছে, তার মাকে বাবাকে। হাতে একটু আঁশটে গন্ধ থাকবে বলে খেয়ে উঠে ভাল করে বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া। মা সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে হাতে পাউডার মাখেন।

'বুঝলি, সর্দি-কাশির ধাত থাকলে তোদের কলকাতার ডাক্তাররা রুগীকে কডলিভার, ইমালসন, এ-ওষুধ সে-ওষুধ খেতে পরামর্শ দেয়। আমি খাই গরম-গরম টাটকা মাছের তেল ভাজা। সর্দি-কাশি ধারেও ঘেঁষতে পারে না।'

সুতরাং এখন মাছের কথা উঠতে দাদুর চোখ চকচকে হবে, জিভে জল গড়াবে স্বাভাবিক। জলের দিকে তাকিয়ে সারদা হাই তোলেন। 'বড্ড খিদে পেয়েছে রে নাতি, পেট চোঁ চোঁ করছে।'

মতি অবাক হবার ভাণ করল। হাসল।

'সকালে অনেক আম ক্ষীর খেয়েছ দাদু, তারপর এত এত জাম-জামরুল। এর মধ্যে তোমার—'

'আমারটা পেট না, পিপে, কিছুতে কি আর ভরতে চায়—তোর খিদে পায়নি?' সারদা ঘাড় ফেরাল।

মতি মাথা নাড়ল।

'একটুও না।'

'তোরটাও পেট না, হোমিওপ্যাথির শিশি।'

দাদুর কথা শুনে মতি শব্দ করে হাসল। সারদা এখন আর থুথু ফেলেন না, একটা বড় ঢোক গিললেন।

'সূর্যি এখন মাথার ওপর দেখাছস তো।' বলতে বলতে আকাশের দিকে তিনি চোখ রাখেন। 'আজ আমার উত্তরের পুকুরে জেলেরা জাল ফেলেছে। এতক্ষণে বাড়িতে মাছ পৌঁছে গেছে জানা কথা। হ্যাঁ, চেতল মাছ, বলে দিয়েছি। আমার তো মনে হয়, তোর ঠাকুমা এখন চেতলের পেটিগুলো দিয়ে কালিয়া রাঁধতে বসে গেছে।'

'তা হবে।' মতি খুক্ করে হেসে ফেলল। 'তাই তোমার পেট চোঁ চোঁ করছে।'

'তা হবে মানে?' সারদা রুখে ওঠেন। 'নির্ঘাৎ কালিয়া পাক করছে বুড়ি, আমি এখান থেকে গন্ধ পাচ্ছি।'

বুড়ো না, একটি শিশু। তেমনি লোভী, চঞ্চল। তা হতেই হবে, মতি চিন্তা করল। 'এই বয়সে আয়ুর ফিতে লম্বা করতে হলে এদিকের অনেকগুলি বছর কমিয়ে দিয়ে বাদুড়কে গাছের মগডালে উঠে জাম-জামরুল খেতে হবে, মাছের কালিয়ার নামে বেসামাল হয়ে পড়তে হবে।'

'তুমি তা হলে এখন বাড়ি ফিরছ দাদু?' নাতি শুধোয়।

'আলবৎ, ভাত খাব মনে পড়লে আমার অন্য কোথাও যেতে আর কিছু করতে ইচ্ছা করে নাকি?'

'কিন্তু আনারসের বাগানটা দেখা হল না যে।' যেন দুষ্টুমি করে মতি বলল, 'ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে আর একটু বেড়াব, তোমার পেয়ারা বাগানটাও দেখব—'

'পেয়ারা এখন পাথরের গুটি হয়ে আছে, আষাঢ় মাস আসুক, দু-চারটা জলের ঝাপটা লাগুক, তবে তো পেয়ারা ডাঁসবে পাকবে, এখন বাদুড়েও পেয়ারা ছোঁয় না।'

কাজেই মতি নিবৃত্ত হয়।

জাম-জামরুলে বাঁধা গামছাটা সারদা কোমর থেকে খুলে আলগা করে নেন। 'নে ধর—তোর ঠাকুমার জন্যে ক'টা তো নিয়ে যেতে হবে, আমি নিজের হাতে তুলে না দিলে একটা ফল বুড়ি মুখে দেবে নাকি?'

হাত বাড়িয়ে মতি ফলের পুঁটলিটা নেয়।

'ইচ্ছা হলে তুইও দুটো একটা খা না, অনেক আছে, হ্যাঁ, এই ছায়ায় বসে বসে খা।' সারদা কোমরের বেল্ট খুলতে ব্যস্ত।

তা অবশ্য ইচ্ছা হলে মতি একটা দুটো ফল মুখে দেবে। পুকুর পাড়ের ছায়াটাও চমৎকার। মাথার ওপর প্রকাণ্ড হরিতকী গাছ। পুকুরের চার পাড় ঘিরে ঘন বেত জঙ্গল। কিন্তু তার দাদু একী করছে!

'দাদু তুমি কি—' মতির কথা আটকে গেল।

'হ্যাঁ, একটানে সারদা বেল্ট খুলে ফেলেন, 'এখানেই একটা ডুব দিয়ে যাই বাড়ি গিয়ে আর চানটান হবে কি, গিয়েই খেতে বসে যাব, মাছের কালিয়া আর ভাত।' সারদা হাসলেন।

মতি অবাক হল কি, ভয় পেল কি! বুকের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা অনুভব করল সে। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পরনের প্যান্ট ঘাসের ওপর রেখে দাদু পুকুরে নেমে গেল। না, যদি ওটা তাদের

মাণিকতলার মোড় কি শেয়ালদা হত; অনেক মানুষ, অনেক দোকান, গাড়ি ঘোড়া পুলিস ফেরিওয়ালা থাকত তো মতি মনে করতে পারত লোকটার মাথা খারাপ। একবার টালিগঞ্জ মাসির বাড়ি যেতে মতি ট্রাম থেকে এমন বুড়ো বয়সের একটা পাগলকে দেখেছিল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেখে রাস্তার লোক হি-হি করে হাসছে।

কিন্তু এখন? এখানে?

মতি ঘাড় ফেরাল, একটা ঢোক গিলল, ভয়ে ভয়ে ঘাসের ওপর রাখা সারদার ছাড়া হাফ্‌প্যান্টটা দেখল, তারপর যেন একটু সাহস বাড়ল, চোখ তুলে সে পুকুরের জল দেখল। দাদু সাঁতার কাটছে। মতির সঙ্গে চোখাচোখি হতে সারদা হেসে ফেলে জলের নিচে মাথা ডুবিয়ে দেন। আর দেখা যায় না মানুষটাকে। এক দুই তিন......যেন মনে মনে মতি গুণছে, দাদু কতক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারে। দূরে জলের ধাক্কায় পদ্ম পাতাগুলি কাঁপছে, কলি কুঁড়ি নিয়ে শাপলার ডাঁটাগুলি নড়ছে। বুঝল মতি, দাদু ডুব সাঁতার কেটে দূরে চলেছে। আর ঠিক তখন তার মাথার ওপর হাওয়া লেগে হরিতকী গাছের পাতার সর সর শব্দ হল, বেত জঙ্গলের কোন্ দিকে একটা ডাহুক ডাকে, কোথা থেকে একটা সাদা মেঘ উড়ে এসে আকাশের কিনারে ঝুলছে—একটা মাছরাঙা ক্রিক্ শব্দ করে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা রুপোর পাত ঠোঁটে করে আকাশে উড়ে যায়।

মতির খুব ভাল লাগে। হাত বাড়িয়ে ঝুলি থেকে একটা কালো জাম তুলে সে মুখে পুরল। হুঁ, ঠাকুমার জন্যে দাদু জাম নিয়ে যাচ্ছে। বাবার কথা মনে পড়ল তার। মার কথা। কোনোদিন জাম-জামরুল না, আম-আনারস না—অফিস থেকে বাবা যখন বাড়ি ফেরে, তার হাতে থাকে মার পাউডারের ডিবি, স্নো, ক্রিম। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল মতি, তারপর উঠে দাঁড়াল।

মতির এখন খেয়াল হল, সে নিজেও নেংটা। সেই যে দাদুর কথায় প্যাণ্ট খুলে রোদ বাঁচাতে মাথায় দিয়েছিল, আর সেটা পরা হয়নি। কিন্তু তা হলেও মতির এখন একটুও ইচ্ছা করছিল না, ওটা পরে। কলেজ স্ট্রীট থেকে তার বাবা এটা কিনে দিয়েছিল। তা দিক। তার মনে হল, এটার আর দরকার নেই, বাজে জিনিস। ভীষণ ইচ্ছা করছিল তার এমনি এ অবস্থায় দাদুর মতো সে পুকুরের জলে নেমে যায়। ডুব সাঁতার কেটে শাপলা আর পদ্ম বনের কাছে চলে যায়। কিন্তু ইচ্ছা হলে কী হবে, সে সাঁতার জানে না।

তা হলেও সে মন খারাপ করল না। কি একটা পাখি হরিতকীর ডালে এসে উড়ে বসে ভীষণ কিচিরমিচির শুরু করেছে। দাদুর মাথা একবার জলের ওপর ভেসে ওঠে। আবার ডুব দেয়। মতির মনে হয়, ডুব মেরে মেরে দাদু জলের নিচে পুরোনো মাছগুলিকে দেখছে। মাছের ভক্ত, কে জানে একটা মাছ না হাত দিয়ে ধরে ফেলে ডাঙায় তুলে আনে।

ভেবে মতি নুয়ে হাত বাড়িয়ে ঠাকুমার জামের পুঁটলি থেকে আর একটা জাম তুলতে যাবে, চমকে উঠল।

হাসির শব্দ। তার পিছনে কে হাসছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরায়। একটা মেয়ে। বেত ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে। হাতে একছড়া বেতফল। বেতফল খাচ্ছে আর মতির দিকে তাকিয়ে আছে। চকচক করছে চোখ দুটো। ছিপছিপে লম্বা গড়ন। এখানে এসে মতি কালো বাসক গাছ চিনেছে। রোগা লম্বা মেয়েটাকে দেখে তার সরু লিকলিকে বাসক ডাঁটের কথা মনে পড়ল। তেমনি কালো মিশমিশে গায়ের রং। হাসির ঠমকে নড়ছে, বাতাস লেগে বাসক ডাঁটা যেমন নড়ে, কাঁপে।

কিন্তু তার দিকে মেয়েটা এমন করে তাকাচ্ছে দেখে মতির দুকান লাল হয়ে উঠল, গরম হয়ে উঠল। চালাক ছেলে, শহরের ছেলে। মেয়েটার এভাবে তাকানোর অর্থ বুঝতে মতির এক সেকেন্ড দেরি হয় না—খপ্ করে সে ঘাসের ওপর থেকে হাফ্-প্যান্টটা কুড়িয়ে নিয়ে পরে ফেলল। এই এক সেকেন্ডেই সে বেজায় ঘামছে।

'কি চাই তোর, কি দেখছিস?' প্যান্ট পরে মতি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধমক লাগায়।

'কিস্সু না, এট্টা বেতফল খাচ্ছি।'

'একটা তো না, একছড়া।' মতি রাগে গসগস করে। কটমট করে মেয়েটাকে দেখে। গায়ের রং যেমন ময়লা তেমনি ময়লা কুটকুটে পরনের শাড়িটা। তার ওপর ছেঁড়া। কিন্তু দাঁতগুলি খুব ফর্সা। বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাঁতগুলি দেখে মতির তবু কিছুটা ভাল লাগল। ভাল লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়ে তার বুকের ভিতর ঢিব করে উঠল। আড়চোখে সে ঘাসের ওপর ছেড়ে-রাখা বড় হাফ-প্যান্টটা দেখল। দাদু এখন কী অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, সে জানে। ঐ বুঝি দাদুর স্নান সারা হয়েছে; পাড়ের দিকে আসছে না?

'এই কোথায় যাচ্ছিস তুই!' মতি আগের চেয়েও জোরে ধমকে ওঠে, 'কোথায় চললি?'

'এট্টু জল খাব।' ওর সঙ্গে একটা চটের বস্তা। মতি এতক্ষণ এটা লক্ষ্য করেনি। বেত ঝোপের ধার থেকে বস্তাটা টানতে টানতে হরিতকীর গাছের নিচে নিয়ে এল মেয়েটা, তারপর বুঝি জল খেতে পুকুরের দিকে পা বাড়ায়।

'না এখন জল খেতে হবে না।' মতি রুখে দাঁড়ায়, 'তোর এই বস্তার মধ্যে কী?'

'শুকনো পাতা।'

'অ, তুই পাতা কুড়ুনি।' মতি নুয়ে বস্তার ভিতরটা দেখে। শুকনো পাতার সঙ্গে দুটো আনারস। বেশ তাজা। যেন এইমাত্র বাগান থেকে তোলা আনা হয়েছে। মতি সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'কোথায় পেলি আনারস?'

প্রথমটায় একটু থতমত খায় মেয়েটা, তারপর হাসে, আঙুল দিয়ে পুকুর দেখায়।

'রাজাবাবুর ক্ষেতের, দুটি কেটে আনলুম নুন দিয়ে খেতে।'

তার মানে দাদুর বাগানের; পুকুরের দিকে আঙুলে দেখিয়ে দাদুকে রাজাবাবু বলছে ও, মতি বুঝল।

'তোর পিঠের ছাল তুলে ফেলবে রাজাবাবু। তুই কাঁচা আনারস কেটে আনলি।'

'কিছুটি বলবে না মুইকে, মুই কত ফলপাকুড় খাই রাজাবাবুর গাছের, বাগানের কিছুটি বলে না।' বকের পাখার মতো শাদা ধবধবে দাঁত বের করে মেয়েটা হাসে, ঘাড় নাড়ে, ভুরু বেঁকায়; তারপরঃ 'যাই, রাজাবাবুর দীঘির মিঠা জল এখন পেটটি পুরে খাই।' বলে কোমরে ক্ষীপ্র মোচড় তুলে ঘাসের ওপর দিয়ে তরতর করে ও পুকুরের ধারে চলে গেল, জলের কাছে।

মতি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এইমাত্র যে দুশ্চিন্তাটা তার মনে এসেছিল সেটা
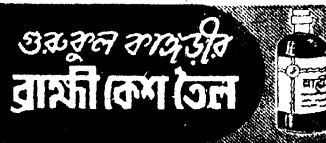
আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মেয়েটা ঠিক জলের কিনারে চলে গেল তো। দাদু সাঁতার জল ছেড়ে কোমর জলে এসে দাঁড়ালো না! ইস্ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল মতি। মুখটা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। তবে কি দাদু, এত বড় মেয়েটার সামনে জল থেকে ডাঙায় উঠবে। দাদু! যেন চিৎকার করে ডেকে বুড়োকে সাবধান করে দিতে চাইছিল সে,—গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না; ভয় বিস্ময় ঘৃণা আশংকা বিতৃষ্ণা বিষণ্ণতার ছোট বড় নানা রকম তরংগ তার বুকের মধ্যে খেলা করে গেল। এই একটু সময়ের মধ্যে। উন্মাদ না, শিশু না,—মতি মনে মনে বলল, আমার দাদু, এক কালের বড় ইঞ্জিনীয়ার, এলগিন রোডের বাসিন্দা সারদা রায় একটা জন্তু, একটা দানো, একটা ভয়ংকর কুৎসিত জীবে পরিণত হয়েছে।

হাসছে? মেয়েটা দাদুকে দেখে হাসছে? কিন্তু দাদু যে এখনো কোমর জলে দাঁড়িয়ে। নাভিটা পর্যন্ত দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের মত দৃষ্টিটাকে পুকুরের দিকে ধরে রেখে মতি একটা শুকনো ঢোক গিলল। হাওয়ার দোলায় মাথার ওপর হরিতকী গাছের মাথায় নতুন করে সরসর শব্দ জাগল। দূরের বেত ঝোপের ভিতর ডাহুকটা ডাকছে। আকাশের কিনারে সাদা মেঘের দলটা, আরো সাদা হয়ে তুলোর মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এসব কিছুই দেখতে শুনতে ভাল লাগছিল না মতির। শুধু চোখ তার মন তার সবটুকু চেতনা এখন জলের ধারে জলের ওপর।

ও কি! দাদু হাসছে মেয়েটাকে দেখে? ঘাড় নাড়ছে? পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে মেয়েটা ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়ল যে! সাদা ধূসর লোমে ঢাকা দাদুর ভুঁড়িটা জলের ওপর জাগছে না? নাভিটা দেখা গেল না? মতির শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, নিশ্বাস ফেলছে না, ঢোক গিলতে পারছে না সে। অবশ্য তখনই মতি একটা হাল্কা নিশ্বাস ফেলল, বড় করে ঢোক গিলতে পারল। দাদু আবার গলা জলে সরে গেছে, সাঁতার জলে। দাদু সাঁতার কাটছে। মেয়েটা হাত তুলে শাপলা বন দেখাচ্ছে। সবুজ ডাঁটা সমেত বড় শাপলা ফুলটা সারদা ছিঁড়ে আনেন। ফুল নিয়ে ডুব দেন। তারপর ভেসে ওঠেন পুকুরের এধারে। ? আর মতির বুকের ভিতর দুরুদুরু করে। কিন্তু না,—সারদা এবার ঘাটের ওপরের সিঁড়িতে পা রেখে আগের মতো কোমর জলে কি বুক জলেও দাঁড়ান না। গলা কাছে জল। জলের সংগে সারদার থুতনি। সেখান থেকেই তিনি ডাঁটা সমেত লাল শাপলা ফুল ডাঙার দিকে ছুঁড়ে দেন। হাত বাড়িয়ে মেয়েটা তা লুফে নেয়। তারপর ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে ফুলটা খোঁপায় গোঁজে। গলাজলে দাঁড়িয়ে দাদু হাসে, মেয়েটাও হাসে। খোঁপায় ফুল গোঁজা হয়ে যেতে মেয়েটা আঁজলা আঁজলা জল খেল ঘাড় নুইয়ে। চুলের লাল ফুলটা হাওয়ায় কাঁপছিল। জল খাওয়া সেরে ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর এক ছুটে উঠে আসে তীরের সবুজ ঘাস আর হরিতকী গাছের গুঁড়ির কাছে। শুকনো পাতার বস্তাটা টেনে কাঁধে তোলে, তারপর কোমরের একটা ক্ষিপ্র মোচড় তুলে ওধারের বেতঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ে। যেন বেতজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওর বেরোবার পথ।

হাঁ করে একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে মতি নিশ্চিন্ত হয়, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল, আপদ গেল। বিড়বিড় করে উঠল সে; আর তৎক্ষণাৎ দাদুকে দেখতে পুকুরের দিকে চোখ ফেরাল। 'দাদু তোমার স্নান হয়ে গেছে?' খুশি গলায় মতি ডাকল। ডাকতে পারল।

'হ্যাঁ রে দাদু, হয়েছে, হয়ে গেল।' সারদা জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠেন। ডাহুকটা ভীষণ জোরে ডাকছে। পেঁজা তুলোর মতো সাদা পাতলা মেঘগুলো এখন গায়ে গায়ে লেগে একটা বিশাল শ্বেত পদ্মের চেহারা ধরতে আরম্ভ করল না। আশ্চর্য এক মেঘের ফুল। খুশি হয়ে মতি দাদুকে দেখছিল। টপটপ জল ঝরছে কান থেকে নাকের ডগা থেকে থুতনি থেকে হাতের আঙুলগুলি থেকে। দাদুর উলংগ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল, একটা পুরোনো গাছ। অনেক দিন জলের নিচে থাকার পর, এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে, মতি ভাবল। দাদুর গায়ের শাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। হরিতকী গাছের সরসর শব্দটা মতি কান পেতে শুনল।

সারদা তাঁর হাফ প্যাণ্ট পরেন, কষে বেল্ট আঁটেন।

ঠাকুমার জামের পুঁটুলিটা মতি হাতে তুলে নেয়।

'একটু দেরি করে ফেললাম, কেমন রে নাতি।'

মতি হাসে, কথা বলে না, দাদুর সংগে হাঁটে।

'আমার এই পুকুরের জল চমৎকার ঠান্ডা, একবার নামলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।'

'হুঁ।' মতি প্রথমটায় অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করে, তারপর কি ভেবে বলল, 'আমার তো মনে হয় ঠাকুমা অনেকক্ষণ কালিয়া রাঁধা শেষ করে বসে আছে'।

সারদা কথা বলেন না, হাঁটেন। মতি চুপ থেকে হাঁটে। দাদু কি কিছু ভাবছে? মতি ভাবে। দাদুর আগে আগে, মাথার সামনে, কপালের সামনে একটা লাল ফড়িং উড়ে উড়ে চলে।

'আচ্ছা দাদু?'

'কি?'

মতি একটা ঢোক গিলল।

'কি বলছিস?' সারদা থুথু ফেলেন না, আড়চোখে নাতিকে দেখেন, নাতি তাঁর হাত ধরে হাঁটে।

'তোমার বাগান থেকে দুটো আনারস কেটে এনেছে মেয়েটা, শুকনো পাতার বস্তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।'

'হুঁ,' মৃদু গলায় হাসেন সারদা। 'কাঁচা আনারস নুন লংকা মেখে খাবে আর কি।' সারদা কপালের সামনে উড়ন্ত লাল ফড়িংটাকে লক্ষ্য করেন। 'তা আনুক না, কত আর খাবে, হাজারের ওপর আনারস হয়েছে এবার আমার ক্ষেতে।'

মতি একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

এবার নাতির কাঁধের ওপর হাত রেখে সারদা হাঁটেন।

'বাদুড় কাঠবিড়াল শালিক বুলবুলিতে কি কম ফল নষ্ট করে আমার! করুক। আমি একটুও রাগ করি না। আমার অনেক আছে বলেই তো ওরা যাচ্ছে।'

মতি নিরুত্তর। অনেক হেঁটে তার পা দুটো ধরে গেছে। কিন্তু হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করে যেন সে কেমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার কাঁধের ওপর দাদুর হাত। দাদুর গায়ের গন্ধ চামড়ার গন্ধ তার নাকে লাগছে। মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না। কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কিনা। বুঝতে না পেরে সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগল। আর হাঁটতে লাগল।

কাঁচের মানুষ

দিনেশ দাস

ভিজে চড়ুইয়ের মত সে কখন উড়ে এল কাফের দোকানে ঃ
হঠাৎ অবাক হ'য়ে বললাম, 'পত্রলেখা তুমি যে এখানে?'
আমার সামনে এসে বসল সে একফালি হাসি টেনে বিষন্ন মধুরে,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি সে এখন ঘরের চড়ুই নয়, বনের ময়ূরে।
চিকন গলাটি তুলে বলল এবার,
'কফিঘর শুধু বুঝি কবির একার?'
পাহাড়ী ঝির্‌ঝিরে জল কবে হ'ল শরতের নদী
আমার কথার আলো স্থির হ'য়ে পড়ে তার ভিতর অবধি।
'তোমারই আসার কথা ছিল, মনে নেই?'
আমার কথার সুর কেমন বেসুরে লাগে আমার কানেই ঃ
কেউ কিছু যেন দেবে বলেছিল, দেয়নি আমায়।
যা হ'ক কথার সুতো টেনে বললাম, 'উজ্জ্বল কোথায়?'
'উজ্জ্বল? অনেক দিন চলে গেছে, শুনেছি কেম্ব্রিজে
কোথায় মনের কার মণিকোঠা আলো করে সেই জানে নিজে।
অথচ আমায় সে তো বলেছিল, "তুমি যদি পাখি হও,
আমি হব ফাঁদ পেতে বনের শিকারী ঃ
তুমি যদি তারা হও, আমিও তো মেঘ হতে পারি।"
অনেকটা আপন মনে বলল সে চাপা সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে
তারপরে মনের পুষ্পকরথে কোথায় সে চলে গেল সাগর ডিঙিয়ে
আকাশের ছায়াপথে আরও কোন্ দূরের ছায়ায় ঃ
বললাম, 'পত্রলেখা কোথা যাও? তুমি তো এখানে, না কি
অপর কোথাও?'
তবুও লাগল ভাল। জীবনের নির্জন সেতুর পরে একা
দেখা-দেখা মুখখানি আবার নতুন করে দেখা!
মনে হ'ল, প্রেম সেই মিশরের পৌরাণিক পাখি
নিজের চিতায় উঠে কখন যে পুড়ে মরে আপনি একাকী,
আবার কখন সে যে জেগে উঠে' ভোরের আলোকে
ডানা মেলে উড়ে উড়ে যেতে যায় নতুন পালকে।

একটু বরফ-হাসি হাসল রূপসী
বলল সে, 'উজ্জ্বলতা' নেইকো কোথাও
আমিও তো আলোর উপোসী,
সে-আলো কোথায় পাব, কার অন্তরে
কোথায় সে স্বচ্ছ আলো আলোর ভিতরে!
এরা কেউ হীরে নয়, কাঁচের মানুষ সব
এদের যা-কিছু আলো ধার-করা চুরি-করা সব,
একটু নড়লেই দেখি কোথায় মিলিয়ে যায় আলোর উৎসব'।
ম্লান হেসে বললাম, 'তুমি কেন সূর্য হও নাকো,
আমাদের পাণ্ডুর আকাশে
সৌর জগৎ এক গ'ড়ে তোলো রক্তজবা-কুসুমসঙ্কাশে।'

এবার করুণ হল তার কথাগুলো ঃ 'কোথা পাব সূর্যপ্রাণ
আমি নই এতটুকু তারার সমান
আমার কি এত আলো, এতই জৌলুস
হীরক-উজ্জ্বল হবে কাঁচের মানুষ?
জীবনের চক্‌চকে কাঁচের গেলাসে
মৃত্যুর কলঙ্ক 'শুধু ছুঁয়ে চারিপাশে।'
গাঢ় এক স্বপ্নের মতন তার কথাগুলি শুনে
বললাম ধীরে ধীরে, 'কী হবে কথার জাল বুনে?'
'কথাই তো পাথেয় আমার,
আমার তো রোমাঞ্চিত হাঁক নেই সিংহের হায়নার।'
তারপর মুখর স্তব্ধতা ঃ
মনে হয়, কত কথা
এগোয় পেছোয় ভাঙে ঢেউয়ের মতই,
শুধু ঢেউ ঢেউ তোলে
স্মৃতির সমুদ্র ক্রুর অতলে অথই।

কখন বেয়ারা এসে নিয়ে গেছে কাপ ডিস
বিল-বখশিস ঃ
পত্রলেখা দাঁড়াল এবার,
একবার চোখের আঙুলে দিয়ে বুলিয়ে নিলাম তার
ঢেউতোলা শরীরের মানচিত্র এখানে-ওখানে,
কেবল আপন মনে ব'ললাম, 'পত্রলেখা, তুমি কোনখানে?'

রাজপথে আমরা দু'জন
সন্ধ্যার অন্ধকারে দিনের হয়েছে শুরু দ্বিতীয় যৌবন ঃ
ব্যস্ততায় দ্রুততায় বাতাস মুখর ঃ
তবু যেন মনে হয় বারে বারে,
মৃতপথ পৃথিবী নিথর
কাঁচের মানুষ দুটি মমির মতই হাঁটি শুধুই নিঃসাড়ে।

কখন আগুন-লাল চোখ দুটি মেলে
ট্রাম এল তার,
সে-মেয়ে বিদায় নিল
লোহার লাইনে তুলে করুণ অস্পষ্ট এক সুরের বিস্তার।

অন্ধকার রাত
একাকী মাড়িয়ে চলি মৃত ফুটপাথ ঃ
হঠাৎ কখন দেখি,
ঝড়ে ভাঙা মরাগাছে সরু সরু সবুজ পাতার রেখা ঃ
অবাক বিস্ময়ে বলি, 'তুমি তো এখানে পত্রলেখা!'
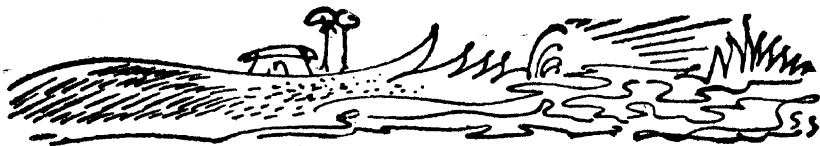
কোন অপরাধের শাস্তি যে আইনের দণ্ড-বিধিমতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বিচারকারী হাকিমের ইচ্ছানুযায়ীও শাস্তি হতে পারে।

আমেরিকার এক শহরে টহলদারী পুলিস পথ চলতে চলতে আচমকা শুনতে পেল ২ জন যুবক এই বলে গর্ব অনুভব করছে যে, থানার সামনে পুলিসের ২টি মোটর-গাড়ির চাকার বাতাস তারা বের করে দিয়েছে। টহলদার পুলিস এই কথা শুনেই তাদের গ্রেপ্তার করল। পুলিসের গাড়ির চাকার বাতাস এরা বের করে দিয়েছে—আদালতে এই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হল। আর সে অভিযোগ প্রমাণিতও হল।

হাকিম এই অপরাধের যোগ্য সাজাই তাদের দিলেন। কিন্তু আইন এই অপরাধের জন্য যে শাস্তি বিধান করেছে সে দিক দিয়েও তিনি গেলেন না। তাকে তিনি বললেন—কাল তোমরা প্রত্যেকে ৪টি করে মোটরের চাকা ফু দিয়ে ফোলাবে।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনের এই সব শাস্তি আইনের মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। অর্থদণ্ড বা অন্য কোন রকম দণ্ড দিলে হয়ত আইনের মর্যাদা এভাবে বাড়ত না।

পথচারীদের জীবন বিপন্ন করে বেপরোয়া গাড়ি চালানর অভিযোগে নিউইয়র্কের এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হল। হাকিম তার রায় দিতে গিয়ে উঠে বললেন—আমি আপনাকে জরিমানা করব না। এর পরিবর্তে পরবর্তী রবিবার আপনাকে জনাকীর্ণ চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে বেপরোয়া গাড়ি চালানর কুফল সম্বন্ধে সারাদিন বক্তৃতা করতে হবে। এই শাস্তিই আমি আপনার যোগ্য শাস্তি বলে মনে করি।

কিছুদিন আগে বার্লিনের এক আদালত এক মামলায় অভূতপূর্ব এক দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন। এক যুবক অসূয়ার বশে তার বান্ধবীর মুখে ক্ষুর দিয়ে এমনভাবে আঘাত করেছিল, যার ফলে তার মুখের বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। বিচারকারী হাকিম তাঁর রায়ে বললেন—এ মেয়েটিকে তোমায় বিয়ে করতে হবে—না করলে ১ বছরের জেল। যুবকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছিল।

*

হামবুর্গে সম্প্রতি ডাক টিকিটের একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী 'ইণ্টারপোস্টা ১৯৫৯' হয়ে গেছে। এই উপলক্ষে পৃথিবীর চারদিক থেকে ডাক টিকিটপ্রিয়রা এসে হামবুর্গে ভিড় জমিয়েছিলেন।

নিউইয়র্কের 'জার্মান ফিলাটেলিক সোসাইটি' তো একটা বিশেষ বিমানই ভাড়া করেছিলেন উদ্বোধন উৎসবে তাদের সভ্যদের যোগদানের জন্য। বিদেশের অন্যান্য ডাক টিকিট সংগ্রাহকরা নিজের নিজের সুবিধামত যানবাহনে এসেছিলেন। হামবুর্গের এই প্রদর্শনী আন্তর্জাতিক ডাক টিকিট সংগ্রাহকদের মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল।

ইউরোপে এপর্যন্ত যত আন্তর্জাতিক ডাক টিকিট প্রদর্শনী হয়েছে, এটি তার মধ্যে সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বমূলক। এত রং, ডৌল ও আকারের ডাক টিকিট প্রদর্শনীতে এসেছিল যে, তার জন্য ২০০০০০ লক্ষ স্কোয়ার ফিট জায়গার দরকার হয়েছিল। মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ থেকেও প্রদর্শিত ডাক টিকিটগুলির দাম অনেক বেশী। কতকগুলি ডাক টিকিট বিশেষ করে এই প্রদর্শনীর উজ্জ্বল মণি নিউইয়র্কের লিচটেনস্টিয়েন সংগ্রহের ২ পেন্স দামের ব্লু মরিশাস অমূল্য। অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান ডাক টিকিটগুলির মধ্যে বৃটিশ রাজ পরিবারের

হামবুর্গের আন্তর্জাতিক ডাকটিকিট প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জার্মান ডাক টিকিটের অনুকরণে মুদ্রিত দুইটি জার্মান ডাকটিকিট (দক্ষিণে ও বামে)। আর মধ্যের ডাকটিকিট এ প্রদর্শনীর মধ্যমণি—বৃ, মরিশাস

সংগ্রহ হেলিগোলান্ড স্ট্যাম্পগ্যাল অন্যতম।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সর্বসমেত ৮০০ ডাক টিকিট সংগ্রাহক হামবুর্গের এই প্রদর্শনীতে তাদের বাছা বাছা ডাক টিকিট পাঠিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁদের ডাক টিকিট পাঠিয়ে এই প্রদর্শনীকে অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ আর নিউইয়র্কের ধর্ম-যাজক স্পেলম্যান। ধর্ম-যাজক স্পেলম্যানের সংগ্রহ বিশেষভাবে ধর্ম সম্পর্কিত ডাক টিকিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সংগ্রহকে অন্যান্য মূল্যবান সংগ্রহের সঙ্গে এক ঘরে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। প্রদর্শিত মোট ডাক টিকিটের দুই তৃতীয়াংশ বিদেশ থেকে এসেছিল। ২৪টি ডাক কর্তৃপক্ষ ডাক টিকিটের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কয়েক প্রস্থ ডাক টিকিটও পাঠিয়েছিলেন।

প্রদর্শিত ডাক টিকিটের দামের কথা মনে রেখে সিঁধেল চুরি এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষতির থেকে এগুলিকে রক্ষা করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাঁচের তৈরি বিশেষ ধরনের এক আবরণের মধ্যে রেখে এগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল। আর রাত্রে এগুলোকে নিরাপদে সিন্দুকে রাখার ব্যবস্থাও ছিল।

*

আইনের কাছে কি মানবতা বলে কোন জিনিস নেই? আইন কি নির্মম আর নিষ্ঠুর? আইনের এক নিষ্ঠুরতার কাহিনী জানা গেছে বৃটিশ আদালতের এক সাম্প্রতিক বিচার থেকে।

ইফাতিয়া ক্রিসটোস নামে সাইপ্রাসের এক গ্রীক মহিলা সম্প্রতি আইনের নিষ্ঠুরতার কবলে পড়েছেন। ৩৯ বছর বয়স্কা এই মহিলা ২০ বছর আগে বৃটেনে এসেছিলেন। ১৯৫৩ সালে যক্ষ্মা রোগে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর 'ন্যাশনাল অ্যাসিস্টেন্স বোর্ড' থেকে তিনি অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছিলেন, কিন্তু এই অর্থ সাহায্য এত সামান্য ছিল যে, এ দিয়ে তাঁর পক্ষে ৪টি সন্তানকে, তার মধ্যে আবার ৩টি যক্ষ্মা রোগী, লালন-পালন করা অসাধ্য ছিল। রুগ্ন সন্তানদের জন্য ডিম আর দুধের পয়সা জোগাতে তিনি প্রতি রাত্রে জামার ওপরে ফুল নক্সা সেলাই করে আরও কিছু অর্থোপার্জন করতেন। তিনি তাঁর এই ২৷৩ পাউন্ড সাপ্তাহিক উপার্জনের কথা ন্যাশনাল অ্যাসিস্টেন্স বোর্ডকে না জানিয়ে তাদের প্রতারণা করেছেন এই অপরাধে আদালত ২ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

বৃটেনের কাগজগুলো অবশ্য এই কারাদণ্ড নিয়ে বেশ হৈচৈ করেছে। কাগজগুলো একথা বলতেও কসুর করেনি যে, আইন প্রয়োগের মূলে যদি অপ্রচুর মানবতা থাকে, তবে তা বিচারের চাইতে অবিচারই করে বেশি।

*

উত্তর লুজানের মেয়র মিঃ ব্যাসিলো ম্যানুয়েল শহরের ইঁদুরের উৎপাতে ভয়ানক বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। কোন ব্যবস্থাই ফলবতী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ইঁদুর নিধনে তিনি নাগারিকসাধারণের বারংবার সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সেদিক থেকেও কোন সাহায্য এল না। এদিকে ইঁদুরের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। অনন্যোপায় হয়ে ইঁদুর মারবার জন্য তিনি এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, দশটি ইঁদুরের লেজের পরিবর্তে শহরের সর্বোত্তম সিনেমা গৃহের একটি টিকিট পাওয়া যাবে। সিনেমা-প্রিয় নাগারিকগণ সচকিত হলেন।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিনেমা গৃহের টিকিটঘরের সামনে প্রতি প্রদর্শনীর সময়ে ইঁদুরের লেজ সংগ্রাহকদের এত ভিড় জমে গেল যে, তাদের সকলের আসনের ব্যবস্থা করা সিনেমা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হল না। তার ফলে প্রতি রাত্রে শুধু ইঁদুরের লেজ সংগ্রাহকদের জন্যই একটি করে বিশেষ শোর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ইঁদুরের উৎপাত কমানর জন্য অভিনব পন্থা সন্দেহ নেই।

*

চাকুরির ক্ষেত্রে সবাই যে মনোমত চাকুরি পান এমন নয়, যদিও যে কাজে যার সাজে—এইটাই আজকের দিনের শ্লোগান।

মিঃ ল্যাণ্ট উড নামে এমন একজন ভদ্রলোকের কথা জানা গেছে যিনি আসলে মাদকদ্রব্য বিরোধী। অথচ তিনি আজীবন চাকরি করে এলেন ইউ এস এর টেনেসীর একটি হুইস্কির ভাটিখানায়, যেখানে তাঁর কাজ ছিল হুইস্কি বোতলে ভর্তি করার আগে তার স্বাদ গ্রহণ করা। তিনি চাকুরি জীবনে কয়েক কোটি গ্যালন হুইস্কির স্বাদ গ্রহণ করেছেন অথচ তিনি মাদকদ্রব্য বিরোধী। মিঃ ল্যাণ্ট উড সম্প্রতি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'এক ফোঁটা মদও কখনও আমার গলার নিচে যায়নি। আমি মুখভরে হুইস্কি নিয়ে কুলকুচা করতাম, তারপর সবটাই ফেলে দিতাম। হুইস্কির স্বাদ গ্রহণের গোপনীয়তা লুকিয়ে আছে দাঁতে। ভাল হুইস্কির স্বাদ গ্রহণ করতে হলে আপনার ভাল দাঁতের প্রয়োজন।' তিনি দাবি করেন, 'মুখে যাঁর নকল দাঁত তিনি কখনও হুইস্কির স্বাদ বুঝতে পারবেন না।'

গানের আসর

শাঙ্গর্দেব

বিষ্ণুপুর

সংস্কৃতির একটি ধারাকে পুরুষানুক্রমে সুষ্ঠুভাবে প্রচলিত রাখা কম গৌরবের পরিচায়ক নয়। খুব কম ক্ষেত্রেই এই সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের সংগীত সাধকগণ তাঁদের সাধনা এবং সংগীত বিদ্যাকে এযাবৎকাল সার্থকরূপে সঞ্জীবিত রেখে বিশেষ গৌরবের পরিচয় প্রদান করেছেন। শুধু সংগীত চর্চাই নয়, বিষ্ণুপুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংগীত চিন্তা। নিজেদের মধ্যে বা স্ববংশে সংগৃহীত গানগুলিকে রক্ষা করার রীতি ভেদাভেদ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত থাকলেও তার মধ্যে চিন্তার পরিচয় কিছু নেই, কিন্তু গানকে যখন নিজের পুঁজি হিসাবে না দেখে একটি শিল্প বিদ্যা হিসাবে দেখা হয় এবং তার প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়, তখন বোঝা যায় যে সেই প্রচেষ্টার মধ্যে একটি চিন্তা বর্তমান। এই চিন্তা হচ্ছে সংগীতের প্রকৃত মূল্যায়নের চিন্তা এবং তার বিকাশের চিন্তা। বিষ্ণুপুরের সংগীতসাধকগণ বরাবর এই চেষ্টাই করে এসেছেন। তাঁদের শিক্ষা বিতরণের মধ্যে গোপনতা কিংবা অপর কোন বাধা ছিল না। আমাদের দেশে যখন সংগীত বিদ্যালয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে তেমন চিন্তা ছিল না বিষ্ণুপুরে তখন সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে যখন স্বরলিপির প্রচার সম্বন্ধে উৎসাহের বিশেষ স্বল্পতা ছিল, তখন বিষ্ণুপুরের কোন কোন সংগীতাচার্য বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে বহুসংখ্যক স্বরলিপি প্রস্তুত করে গেছেন। এ দুটিই বিষ্ণুপুরের সংগীত চিন্তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বিষ্ণুপুর ধ্রুবপদের ঐতিহ্য বহন করে এসেছেন। সমগ্র বাংলায় আর এমনভাবে কোন জনপদ ধ্রুপদ সংগীতের প্রচলন রক্ষা করেছেন বলে জানিনে। বাঙালীরা সাধারণতই সংগীত বিষয়ে একটু চটুল ভঙ্গির পক্ষপাতী, এই কারণে টপ্পার প্রভাব বাংলার ওপর সমধিক বর্তমান। এক সময় আমার ধারণা ছিল এইটাই সজীবতার লক্ষণ এবং বাঙালীরা এই লঘুতার প্রতি আসক্তিকে সমর্থনও জানিয়েছে, কিন্তু নানা কারণে ধারণা পাল্টেছে। ভারতীয় সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার গঠন-পারিপাট্য। সেই সুদৃঢ় সংগঠন পরিকল্পনার নিদর্শন একমাত্র ধ্রুপদ সংগীতেই বর্তমান। বাঙালীরা ধ্রুপদের এই সৌষ্ঠবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে সংগত কাজ করেন নি। বাঙালী সুরকারদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ধ্রুবপদের বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং সংগঠনের দিক দিয়ে এই কারণে রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে অপর কোন সংগীতের তুলনা হয় না। বিষ্ণুপুরের সংগীতসাধকদের মধ্যে এই চিন্তা নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংগীত-মঞ্জরী'র মূল্যবান সংগীত সংগ্রহ সে যুগে প্রকাশিত হত না। বস্তুত "সংগীতমঞ্জরী" এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "সংগীত-চন্দ্রিকা" এই দুটি গ্রন্থ বাংলাকে যে কতখানি গৌরবান্বিত করেছে, তা বলে বোঝাবার নয়। এই দুইটি গ্রন্থে প্রকাশিত ধ্রুপদগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে ধ্রুপদের বিবিধ বৈচিত্র্য এবং মনোহারিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। অথচ সে আয়াস আজকালকার শিক্ষার্থী বা সংগীতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা খেয়ালের যুগ। খেয়ালের সৌন্দর্য কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু ধ্রুবপদের মধ্যে যে বস্তু এবং যে রস বিদ্যমান, তা খেয়ালে পাওয়া যাবে না। সুতরাং যাঁরা কেবলমাত্র খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী নিয়ে আছেন, তাঁরা ধ্রুবপদের অস্তিত্বকে অবহেলা করলে আমাদের সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেই অনবহিত থেকে যাবেন। এটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। বিষ্ণুপুর তাঁদের বিবিধ প্রচেষ্টায় এইটাই বারবার বোঝাতে চেয়েছেন এবং সেই কারণেই বিষ্ণুপুর আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। দণ্ডমাত্রিকই হোক বা আকার-মাত্রিকই হোক বিষ্ণুপুরের স্বরলিপিকারগণের দক্ষতার একটুকু বিচ্যুতি কোথাও দেখিনি। প্রতিটি স্পর্শ স্বর পর্যন্ত তাঁরা পরিশ্রম সহকারে যথাযথভাবে দেখিয়ে গেছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "গীতলিপি"তে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের যে স্বরলিপি করেছেন, তাতেও এই নৈপুণ্য বিশেষভাবে বর্তমান। অতএব বিষ্ণুপুরে যে কেবলমাত্র গানের সংগ্রহ বজায় রাখা হয়েছে তাই নয়, সেই সংগ্রহ যাতে সাধারণের গোচরে আসে, তার জন্য স্বরলিপি পদ্ধতিকেও জনপ্রিয় করবার কম চেষ্টা করা হয়নি। এছাড়া তাল সম্বন্ধে আজকাল যেরকম বেপরোয়া রীতিনীতি অবলম্বিত হচ্ছে, বিষ্ণুপুর এখনো সে দিকে ঝোঁকেন নি। এখনো বিষ্ণুপুরের বাজিয়েরা আড়া ঠেকা, মধ্যমানে চমৎকার সংগত করেন, যা অনেকেরই জানা নেই; এখনো তাঁরা খাঁটি একতালা, তেতালা ঝাঁপতাল, যৎ-এর ঠেকা বাজান, যা বাংলা দেশে চিরকাল ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে।

এই প্রসংগে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। কিছুকাল ধরে পশ্চিম থেকে বাংলায় তালের একটি ঢং প্রচলিত হয়েছে যার নাম বিলম্বিত একতাল। বড় খেয়াল যাঁরা গান করেন, তাঁদের কাছে এই তালটি খুব প্রিয় কেননা ছন্দের প্রতি লক্ষ্য না রেখেও সমে এসে মিলিয়ে দেবার যথেষ্ট সুযোগ এতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে এক আসরে একজন কৃতী সংগীতবিশারদের সংগে বিষ্ণুপুরের বিবিধ বাদ্যে পারদর্শী আমার এক তরুণ বন্ধু সংগত করতে বসেছিলেন। উক্ত সংগীত বিশারদ তাঁকে প্রথমেই বললেন "আটচল্লিশ মাত্রার একতালা বাজান"। আমার বন্ধু বারো মাত্রার একতালার সংগে পরিচিত ছিলেন, অতএব তাঁকে মৌনী থাকতে হল। তখন সংগীত বিশারদ মহাশয় তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "এটা জানেন না, ধিন দিয়ে চার মাত্রা অন্তর আবার ধিন বাজাবেন, এইভাবে চার মাত্রা অন্তর অন্তর বোল বাজিয়ে যান, তাহলেই তো হোলো আর দেখুন, শেষের তেরেকেটে একটু আমার কানে লাগিয়ে বাজাবেন।" বন্ধুবর আমাকে বলেছিলেন যে, এমনভাবেই যদি গাওয়া যায়, যাতে ছন্দই না বোঝা যায়, তাহলে আলাপের ঢঙে গাইলেই বা ক্ষতি কি? ক্ষতি যে কী তা সত্যি আমরাও বুঝি না, কেননা বিলম্বিত খেয়াল যখন আজকালকার গাইয়েরা গান তখন বলে না দিলে তার তাল বোঝা স্বয়ং সংগীতের অধিষ্ঠাতা মহাদেবেরও পক্ষেও অসাধ্য।

যাক বিষ্ণুপুর প্রসংগে ফিরি। বিষ্ণুপুরের সংগীত সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্ত নেই, তবে এটা ঠিক যে, মুসলমান আমলের মাঝামাঝি থেকেই সংগীতে বিষ্ণুপুরের খ্যাতি বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে। অনেকের মতে মল্লরাজ পৃথ্বিমল্লই প্রথম বিষ্ণুপুরে সংগীতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। সেটা চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। এই সময় থেকেই দিল্লী থেকে মুসলমান ওস্তাদগণের কেউ কেউ বিষ্ণুপুরে আসেন বা তাঁদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। বাহাদুর খাঁ এবং পীরবক্স—এই দুজন ওস্তাদের সংগে বিষ্ণুপুরের সংগীত সাধনার ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে জড়িত। বাহাদুর খাঁকে বেশ মোটা মাইনে দিয়ে দিল্লী থেকে বিষ্ণুপুরে এনেছিলেন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। সেটা দুই শতাব্দী পূর্বেকার কথা। বাহাদুর খাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী। ইনি কালক্রমে বিষ্ণুপুরের প্রধান গায়করূপে স্বীকৃত হন। এঁর পর রামশংকর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ বলে পরিগণিত হন। প্রকৃত পক্ষে রামশংকরের প্রচেষ্টায় শিষ্যপরম্পরা বিষ্ণুপুরের খ্যাতি নানাদিকে প্রসার লাভ করে। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁরই শিষ্য ছিলেন এবং যদু ভট্টও তাঁর কাছে কিছুকাল সংগীত শিক্ষা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এঁর আর একজন কৃতী শিষ্য ছিলেন অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। অনন্তলালের সুযোগ্য পুত্রেরা এবং শিষ্যগণ বাংলার বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও অনন্তলালের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

গত শতাব্দীতে কলকাতায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রভাব বড় কম ছিল না। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সহায়তায় সংগীত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধারে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী নিজেও কয়েকটি বই লিখেছিলেন। আজকের দিনে গবেষণা অনেক অগ্রসর হওয়ায় সেইসব গ্রন্থের অনেক মত হয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না, তথাপি ক্ষেত্রমোহনের প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাংলার সংগীত জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। অপরিচিত লোকের মধ্যেও প্রতিভার পরিচয় পেলে তিনি তাকে শিক্ষা দিতে উৎসাহ প্রকাশ করতেন। রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মত জনপ্রিয়তা খুব অল্প গায়কই অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। বিষ্ণুপুরের সংগীত বিদ্যালয়ের উন্নতির মূলে রয়েছে অনন্তলালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বস্তুত তাঁর চেষ্টাতেই আজ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের সংগীতধারাটি গৌরবের সংগে প্রবাহিত রয়েছে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলেছি। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র স্বনামধন্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর পরিচয় নতুন করে প্রদান করবার বোধ করি কোন আবশ্যকতা নেই।

ইতিপূর্বে পীরবক্সের উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি ছিলেন নিপুণ মৃদংগ বাদক এবং মৃদংগ বাদ্য শিক্ষা প্রদানের জন্যই ইনি বিষ্ণুপুরে আসেন।

এ গেল বিষ্ণুপুরের খুব খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞদের কথা। এছাড়া বহু প্রতিভাবান শিল্পী সংগীতের নানা বিভাগে গত পাঁচশো বৎসর ধরে বিষ্ণুপুরের গৌরব রক্ষা করে এসেছেন। এঁদের সকলকার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরের সংগীত সাধনার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতী পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গ্রন্থটি বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় আঠারো বৎসর পূর্বে। এই গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক এবং সাধারণ ইতিহাসসহ বহু সংগীতজ্ঞের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আশা করা যায়, এতদিনে বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য গবেষকদের গোচরে এসেছে এবং পুনরায় বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশে আমাদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ হলে বাংলার সাংগীতিক ইতিবৃত্তেরও অনেক উপাদান পাওয়া সম্ভব হবে।

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মম্মটভট্ট

গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি

এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিকদের মনে গণতন্ত্রের আদর্শ সম্ভবত প্রথম রূপে পরিগ্রহ করেছিল। পেরিক্লেসের আথেন্সে সে-আদর্শকে প্রথম রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু গ্রীসে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগেই পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের ফলে গ্রীক সভ্যতার পতন ঘটে। তার পর দু হাজার বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের মাঝে মাঝে উল্লেখ ঘটলেও তারই ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংগঠনের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চোখে পড়ে না। হিন্দুরা ব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধির কথা বললেও তাদের সমাজ অলঙ্ঘ্য বর্ণভেদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টিয়ানিটির আদিতে প্রস্তাব ছিল সাম্যের প্রতিষ্ঠা; কিন্তু মধ্যযুগে একধারে পোপ, কার্ডিনাল প্রমুখ ধর্মযাজক সম্প্রদায় এবং অন্য ধারে সম্রাট, রাজা এবং ভূস্বামীবর্গ এই ধর্মকে সাম্য এবং স্বাধীনতাবিমুখ ভূমিদাস ব্যবস্থার প্রধান সমর্থকে পর্যবসিত করে। ইসলামের বিপ্লবী প্রেরণাও একইভাবে বিকৃত হয়। একধারে সাম্রাজ্য স্থাপন এবং অন্য ধারে সর্বসাধারণের ওপরে মুষ্টিমেয়ের একচ্ছত্র ক্ষমতাধিকারের উপায় হিসেবে তার প্রয়োগ ঘটে।

গ্রীক সভ্যতার পতনের প্রায় দু' হাজার বছর পরে সতের শতকের ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আর একটা ব্যাপক এবং বলিষ্ঠ উদ্যোগ দেখা গেল। এ-প্রচেষ্টা ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে সাময়িকভাবে বিপথগামী হলেও শেষ পর্যন্ত এরই ফলে ইংল্যাণ্ডে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং প্রজাদের মৌল-অধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন হয়। কিন্তু আঠারো শতকেও ইংরেজী গণতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সমাজের বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সামাজিক, রাষ্ট্রিক অথবা আর্থিক জীবনে দরিদ্রসাধারণের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না। আঠারো শতকের শেষাশেষি ইংরেজের শাসন থেকে আমেরিকা স্বাধীন হবার পর সে-দেশেই প্রথম গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপূর্ণ স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতৃত্বও ছিল মুখ্যত বিত্তবান সম্প্রদায়ের হাতে। ফরাসী বিপ্লবেই প্রথম জনসাধারণ সমাজের রূপান্তরে ব্যাপকভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এ বিপ্লবের স্বীকৃত আদর্শ ছিল সাম্য এবং সর্বজনীন মৌল অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং এরই ফলে ফরাসী দেশে শুধু রাজতন্ত্র নয়, চার্চ এবং ভূস্বামীদের স্বৈরাচারী ব্যবস্থারও উচ্ছেদ ঘটে।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা গেল জনসাধারণ বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নিলেও বিপ্লবোত্তর সমাজ সংগঠনের যোগ্যতা তারা অর্জন করেনি। তাদের দুর্বলতার সুযোগে সেদেশে নাপোলিয়ান ডিক্টেটরশিপের প্রতিষ্ঠা ঘটে; এবং তার পর যতই দশকের পর দশক কাটতে থাকে, ততই সে-দেশে গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বলতর হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে সতের এবং আঠারো শতকের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সমর্থনে এবং উনিশ শতকে যন্ত্রবিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাবে প্রতিবেশী দেশ ইংল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশই শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত হতে থাকে। শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে ওঠে; তাদের ক্রয়ক্ষমতা এবং বিত্তবানদের সঙ্গে দর-কষাকষির সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়; ক্রমে জনসাধারণের সংগঠিত আন্দোলনের চাপে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্বাচনের সর্বজনীন অধিকার স্বীকৃত হয়; সাধারণ মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করে; শ্রমিকদের সংগঠন, সচেতনতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্যতম প্রকাশ হিসেবে লেবার পার্টির উদ্ভব ঘটে। বিত্তবানেরাও ক্রমে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন ছাড়া গণতন্ত্র শূন্যগর্ভ। উনিশ শতকের গোড়াতে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে র‍্যাডিক্যাল সমাজ-সংস্কারকদের তুমুল আন্দোলন করতে হয়েছিল, বিশ শতকের পশ্চিমী সমাজে তা সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করে। শুধু শ্রমিকরা নয়, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিলেতে মেয়েরাও ভোটের অধিকার পায়।

উনিশ শতক ধরে ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটলেও রাষ্ট্রিক-সামাজিক-আর্থিক জীবনে জনসাধারণের ব্যাপক প্রতিপত্তি বর্তমান শতাব্দীরই বিশেষ লক্ষণ।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই প্রতিপত্তি প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম ফল। পশ্চিম ইয়োরোপে বিশের দশক থেকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিশের দশক থেকে রাষ্ট্রে এবং সমাজে জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার প্রভাব ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠেছে। এই বিপ্লব শুধু পশ্চিম ইয়োরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নেই; এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং পূর্ব ইয়োরোপেও এর লক্ষণ আজ সুপরিস্ফুট।

প্রথম মহাযুদ্ধের এই গণ-অভ্যুত্থানের প্রকাশ বহুমুখী এবং এর ভবিষ্যৎ বিবর্তন অনিশ্চিত। এশিয়া-আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে এর যেমন যোগ আছে, তেমনি এরই সমর্থন ছাড়া কম্যুনিজম্ এবং ফ্যাসিজম্-এর প্রতিষ্ঠা বোধ হয় অকল্পনীয়। রুজভেল্ট এবং ম্যাকার্থি সম্ভবত এরই দুই বিপরীত মুখ। যাই হোক, বর্তমানে আমরা এ-সব দিক নিয়ে আলোচনা করব না। সামাজিক-আর্থিক-রাষ্ট্রিক জীবনে সাধারণ মানুষের প্রভাব বাড়ার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, বর্তমানে সেটিই আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয়।

এখন গণতান্ত্রিক আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা স্বভাবতই প্রত্যাশা করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটলে সমাজের সাংস্কৃতিক মানও উঁচু হবে। কারণ সেক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় বিত্তবান এবং ক্ষমতাবান সম্প্রদায়ের খামখেয়ালের ওপরে শিল্পী-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণীজনদের জীবিকা এবং মানমর্যাদা নির্ভর করবে না; তাঁদের চিন্তা, কল্পনা অথবা প্রকাশের প্রেরণা সংখ্যালঘিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকদের তোষণের প্রয়োজনে আর খর্বিত বা বিকৃত হবে না; সাধারণ মানুষদের কাছে সমর্থন লাভ করার ফলে তাঁরা স্বাধীনভাবে জ্ঞান এবং রূপের সাধনা করার পূর্ণ সুযোগ পাবেন। কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁদের রাজা কিম্বা জমিদার অথবা চার্চ অথবা ব্যবসায়ীর কাছে সাহায্য চাইতে হবে না; জনসাধারণ নিজেদের গরজেই তাঁদের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দেবে। ভালো বইয়ের তখন লাখ লাখ কপির সংস্করণ হবে; ভাল গানের তখন অসংখ্য সমঝদার শ্রোতা জুটবে। এঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, অবস্থার উন্নতি ঘটলে সর্বসাধারণ বৈদগ্ধ অর্জন করবে। এই বিশ্বাসে এঙ্গেলস্ দাবি করতে পেরেছিলেন যে, শ্রমিক শ্রেণী ক্ল্যাসিক্যাল দর্শনের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা ঘটল এবং ঘটছে, তা থেকে গণতন্ত্রীদের পক্ষেও এই প্রত্যয় টিকিয়ে রাখা আজ আর সহজ ঠেকছে না। পশ্চিমের প্রায় সব দেশেই এখন সাধারণ মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে লেখাপড়া শিখছে; সেখানে ঘরে ঘরে রেডিও, পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, লণ্ডনের একজন বাস-কণ্ডাক্টরেরও মাসিক আয় পাঁচ/ছশো টাকা। কিন্তু অক্ষরপরিচয় এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে ক্লাসিকস-এর পাঠক যে-হারে বেড়েছে, তার চাইতে অনেক উঁচু হারে বেড়েছে ক্রাইম-কমিকস-এর খরিদ্দার। অধিকাংশ শিক্ষক এবং সমাজতাত্ত্বিকের মতে গত তিরিশ চল্লিশ বছরে পশ্চিমে সংস্কৃতির মান উঁচুতে না উঠে ক্রমেই নীচের দিকে নেমে চলেছে। থিয়েটার, সিনেমা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, সব ক্ষেত্রেই নাকি অনুশীলনহীন জনরুচির চাপে যা-কিছু উৎকৃষ্ট তা লোপ পেতে বসেছে, আর যা নিতান্ত স্থূল, বাণিজ্যিক এবং অমার্জিত তারই একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশেও গত বিশ বছরের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং সাংস্কৃতিক মানের দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করার পর উপরোক্ত অভিযোগকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদারতন্ত্রী আলেগ্জিস দ্য তক্ভিল এখন থেকে প্রায় সোয়া শ বছর আগে এবম্বিধ আশঙ্কার আভাস দিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ এবং ত্রিশের দশকে ওর্তেগা গাসেত, উইণ্ডাম ল্যুইস, এফ আর লীভিস প্রমুখ মনীষীরাও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বৃদ্ধির ফলে তার মান যে নেমে যেতে বাধ্য, এ বিষয়ে তাঁদের সমসাময়িক বিদগ্ধ সম্প্রদায়কে সতর্ক করার প্রয়াস পান। কিন্তু সে সময়ে রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ফলে অধিকাংশ তরুণ বুদ্ধিজীবীর মন সমাজতন্ত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট; যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শিক্ষাজাত বৈদগ্ধ্য জনসাধারণ থেকে তাঁদের পৃথক করেছে, তার জন্যে তাঁরা আন্তরিকভাবে লজ্জিত এবং

পীড়িত; বুর্জোয়াগণতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিকগণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে অনেকেই তৎকালে একান্ত উৎসুক। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পৃষ্ঠপোষণ বিষয়ে সতর্কবাণী তাঁদের কাছে উন্নাসিক প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রকাশ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক গণতন্ত্রীর মনে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠেছে। রুশ, চীন প্রমুখ কম্যুনিস্ট দেশে শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকদের আর্থিক অবস্থার যেমন অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটেছে, তেমনি তাঁদের স্বাধীনতাও যে প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্য ধারে ইংল্যান্ড-আমেরিকার মত দেশে সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সেখানে অত্যন্ত অপকৃষ্ট রচনার প্রচারও নৈসর্গিকভাবে বেড়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুটি চার-পাঁচ সংবাদপত্র বাদ দিলে অধিকাংশ জনপ্রিয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিকের পাতা মুখরোচক কেচ্ছাকাহিনী, মোটা রসিকতা, খুনেখারাপির বিশদ বিবরণ আর নির্বোধ অশ্লীলতায় ভরা থাকে। সেখানে যেকটি মননশীল মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাদের অধিকাংশের খরচা আসে কোনো কোনো ফাউণ্ডেশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে; তাদের গ্রাহকসংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। ইংল্যাণ্ডের দশাও এর চাইতে খুব আশাপ্রদ নয়। যে-দেশের শ্রমিকেরা সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সংগঠিত, সেখানে লেবার পার্টি এবং ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের একটি দৈনিক মুখপত্র চালাতে অপারগ। অল্প দিন আগে প্রকাশিত ফ্রান্সিস উইলিয়ামস-এর একটি প্রামাণিক গ্রন্থের হিসাব অনুসারে ইংরেজদের মত সংবাদপত্র অনুরাগী পাঠক পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। ব্রিটেনে মাথা-পিছু খবরের কাগজ বিক্রির পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ, ফ্রান্সের তিন গুণ। ব্রিটেনে প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জন অন্তত একখানা দৈনিকপত্র এবং অনেকে দুখানা দৈনিকপত্রের নিয়মিত খরিদ্দার। কিন্তু এই বর্ধিষ্ণু পাঠক সম্প্রদায় থেকে কোন্ জাতীয় কাগজ সবচাইতে লাভবান হয়েছে? টাইমস অথবা ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান নয়। এদের পুষ্ট-পোষণা পেয়েছে প্রধানত ডেলি মিররের মত স্বীকৃতভাবে স্থূলে এবং লঘুরুচি পত্রিকা—১৯৩৪ সালে আট লক্ষ গ্রাহক থেকে আজ যে কাগজ চল্লিশ লক্ষ পাঠক অর্জন করেছে।১

ডেলি মিরর-এর এই সাফল্যের কারণ কি? বিলেতী সংবাদপত্র সম্বন্ধে আরেকটি সাম্প্রতিক গ্রন্থে ম্যাথুজ নামে একজন মার্কিন সাংবাদিক এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।২ তাঁর মতে এই সাফল্যের কারণ ডেলি মিরর জাতীয় জনপ্রিয় পত্রিকারা সচেতনভাবে সাধারণ পাঠকের নির্বোধ প্রত্যাশা মেটাতে উদ্যোগী। ম্যাথুজের ভাষায় এই সব পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে :

...... the great flatterer of the common man: it assures him everyday how good he is, how right his prejudices are, how sound his hand and heart, and how little anything matters that is outside his experience or understanding........

এ সব পত্রিকায় তাই এমন কিছু থাকে না যা পাঠকের মনে প্রসারতা আনে, তাকে ভাবতে বাধ্য করে, তাকে অপ্রীতিকর সত্য স্বীকার করতে শেখায়, মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাকে কৌতূহলী করে তোলে। এবং যেহেতু অধিকাংশ অক্ষর-পরিচয়সম্পন্ন নাগরিকের জ্ঞানচর্চার দৌড় সংবাদপত্র পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাদের মনে মানব-সংস্কৃতির যে রূপটি গড়ে উঠছে সেটিকে শ্রদ্ধার্হ বলা চলে না। ম্যাথুজ তাঁর গ্রন্থের শেষে একই তারিখের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান এবং ডেলি মিররের বিষয়সূচীর বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মিররে যে মালমশলা থাকে এবং তা যেভাবে পরিবেশন করা হয়, তার ফলে সমাজের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী; তা থেকে পাঠক জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করে তা গ্রাম্য, অতি সরলীকৃত, অসত্য এবং সেন্টিমেন্টাল। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে সে হিসেবে কিছুটা সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়বোধ দেখা যায়; কিন্তু প্রতিযোগিতার চাপে সেখানেও ক্রমশ লঘুরচনার প্রলোভন প্রবল হয়ে উঠছে।

ডেলি মিরর অকস্মাৎ জনপ্রিয় হয়নি; তিরিশের দশক থেকে এই পত্রিকার পরিচালকরা সচেতনভাবে তাকে জনপ্রিয় করার সাধনা করছেন। মিররের সম্পাদক হিউ কাডলিপ্‌-এর ভাষায় তিরিশের দশকে এই পত্রিকা সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের মূল ধারার বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিল। জনসাধারণ যখন ক্রমশই সমাজের প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে, তখন কতিপয় বিদগ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষনার ওপরে নির্ভর করে দৈনিক পত্রিকা চালানোর চেষ্টা ঘোর নির্বুদ্ধিতা। সুতরাং জনসাধারণ যা চায়, ধীরে ধীরে পত্রিকায় তাই পরিবেশন করার

১ Francis Williams, **Dangerous Estate : The Anatomy of Newspapers.** Longmans, Green. 24 sh.

২ T. S. Mathews, **The Sugar Pill. An Essay on Newspapers.** Victor Gollancz. 18 sh.

ব্যবস্থা হলো। কাড্‌লিপের ভাষায়, মিররের সাফল্যের মূল কারণ হলো জনসাধারণ যা ভাবে, যা পছন্দ করে, যা চায়, মিররের সম্পাদক, লেখক এবং রিপোর্টাররা কোনো চিন্তা না করেই তা বুঝতে পারে এবং সে চাহিদা মেটাতে পারে। ("Who instinctively know what is right, who can asses the temper of public opinion without moving from their desks.........") অর্থাৎ জনশিক্ষা নয়, জনতোষণ মিররের নীতি। সুতরাং মিরর খাঁটি গণতান্ত্রিক পত্রিকা; সংখ্যাগরিষ্ঠের যা সংস্কার, এই পত্রিকার মতে তাই আজকার মত সত্য। পত্রিকা তখনি শুধু কোনো পরিবর্তনের কথা বলতে পারে যখন পত্রিকা সিদ্ধান্ত করার আগেই জনমত পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকেছে। সাফল্যকামী পত্রিকার পক্ষে স্বাধীন চিন্তা মারাত্মক বিলাস; পত্রিকার পাঠককে জনরুচির দ্বারা পরিচালিত করতে পারাই সম্পাদকের প্রকৃত কর্তব্য।

অথচ ফ্রান্সিস উইলিয়ামসের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে সংবাদপত্রের এ অবস্থা ছিল না। উইলিয়ামস নিউ স্টেটসম্যানের নিয়মিত লেখক; সংবাদপত্রের সমকালীন অবনতি তাঁকে কিছুটা পীড়িত করলেও তিনি এই রূপান্তরকে এক রকম অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েছেন। স্পেণ্ডার, মর্লি, স্টেড প্রমুখ এডওয়ার্ডিয়ান যুগের বার্তাজীবীরা জনরুচির চাইতে সত্যকথন এবং স্বাধীন চিন্তাকে বেশী মূল্য দিতেন। উইলিয়ামস্‌-এর মতে যখন সংবাদপত্রের পাঠকদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের তুলনায় অক্ষরপরিচয়-সম্পন্ন জনসাধারণ অনেক বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন এই সব সাংবাদিকরা জনশিক্ষার এই সুযোগ গ্রহণ না করে উন্নাসিকতায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সত্যিই কি তাঁদের অন্য কোনো উপায় ছিল? ১৮৭০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ফলে উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় বিলেতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতসংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে; কিন্তু সেই স্বল্পশিক্ষিতদের অধিকাংশেরই বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি অথবা রুচির মান বেশী উঁচুতে ওঠার সুযোগ পায়না। তারাই যখন সংখ্যার জোরে প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংবাদপত্রের প্রধান খরিদ্দার হয়ে উঠল, তখন কোনো বিদগ্ধ এবং বিবেকবান সাংবাদিকের পক্ষে তাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এই পাঠকরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোচনার চাইতে চিত্রতারকাদের কেচ্ছা বিষয়ে অনেক বেশী কৌতূহলী; চিন্তাশীল সম্পাদকীয় পড়ার চাইতে স্নানরতা সুন্দরীর ছবি দেখে কিম্বা বলাৎকারের বিবরণ পড়ে তারা অনেক বেশী আরাম পায়। সুতরাং এদের চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন নর্থক্লিফ, সাউথউড, বাভারব্রুক, গাই বার্থোলোমিউ, কাডলিপ, জেকবসন, কনর প্রমুখ চতুর গণতোষক সংবাদসেবীর দল। অর্থাৎ গণশক্তির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ সংবাদপত্রের মান ক্রমেই নেমে এল। গণসংস্কৃতির ধারক এবং বাহকরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো ডেলি মেল, ডেলি মিরর, ডেলি এক্সপ্রেস।

সংস্কৃতির এই সমকালীন অবক্ষয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই, এবং তার চিহ্ন শুধু ব্রিটেনেই দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত পশ্চিম ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সর্বত্র সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানের অবনতি আজ প্রত্যক্ষ। এই অবক্ষয় যে কত সর্বগ্রাসী, দুজন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকের যুক্তসম্পাদনায় কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত "গণসংস্কৃতি" নামে বিরাট সংকলন গ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় মেলে। * এই গ্রন্থের উনপঞ্চাশটি প্রবন্ধে বিভিন্ন লেখক সাধারণভাবে গণসংস্কৃতির ইতিহাস ও চরিত্র এবং বিশেষভাবে কথাসাহিত্য, পত্রপত্রিকা, বেতার,

* Bernard Rosenberg and David Manning White, **Mass Culture: The Popular Arts in America.** The Free Press, Glencoe, Illinois. $6.50.

চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণরুচির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন গণসংস্কৃতির সম্ভাব্য সুফলের কথা উল্লেখ করলেও (যথা র‍্যাব্যাসিয়েরি এবং ডেভিড হোয়াইট), সাধারণভাবে অধিকাংশ আলোচকের সিদ্ধান্ত হলো যে, গণসংস্কৃতির প্রসারের ফলে প্রকৃত সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এই লেখকদের অনেকেই এক সময়ে মার্ক্সবাদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন (যথা ফ্রাঙ্কফুর্টের ইনস্টিট্যুট ফার সোৎশিয়াল ফরশুং-এর পরিচালক ম্যাক্স হর্কহাইমার এবং তাঁর সহযোগী অধ্যাপক ভিসেনগ্রুন্ড-আডোর্নো; ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিও লোয়েনথাল; "পলিটিকস্" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ডোয়াইট ম্যাকডোন্যাল্ড এবং "ডিসেণ্ট" পত্রিকার সম্পাদক বার্নার্ড রোসেনবার্গ ইত্যাদি)। এঁদের একদা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে এবং সংগঠনশক্তি বাড়লে সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সেই বিশ্বাসকে অপ্রমাণিত করার ফলে এঁদের লেখায় আশাভঙ্গের বেদনা এবং জ্বালা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন নয়। গুণ এবং যুক্তি-বিস্তারের দিক থেকে এঁদের রচনার মধ্যে অনেক তারতম্য থাকলেও এঁদের সাধারণ সিদ্ধান্তে খুব বেশী অমিল নেই। এঁদের সংগৃহীত তথ্য এবং সে তথ্যের বিশ্লেষণ অনুসারে, যন্ত্রশিল্পের পর থেকে জনসাধারণের আর্থিক সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও তারই সঙ্গে তুলনীয় মানসিক বিকাশ ঘটেনি। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে সংস্কৃতির উপাদানও আর ব্যক্তিমনের অনন্যসৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যন্ত্রজাত অন্যান্য উৎপন্নের মত কারখানায় একই ছাঁচে তৈরী হয়ে পাইকারীভাবে বাজারে বিক্রির মালে পর্যবসিত হয়েছে। এবং যেহেতু বাজারের মাল খরিদ্দারের চাহিদা অনুযায়ী কারখানায় তৈরী করানো হয়ে থাকে, আর যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের ফলে যেহেতু শ্রমিকরাই বাজারের সংখ্যাগরিষ্ঠ খরিদ্দার, সে কারণে আধুনিক যুগে সাংস্কৃতিক উৎপাদন মুখ্যত এদের রুচির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনের লেখক, শিল্পী, গাইয়ে, সম্পাদক, প্রকাশক, রেডিও কিম্বা টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষ, চলচ্চিত্রের প্রযোজক এবং পরিচালক নিজের রুচি বা শিল্পবোধের ওপরে নির্ভর করতে অপারগ; প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে জনসাধারণের চাহিদার হিসেব করে তাঁদের প্রতি পদে চলতে হয়। সব সংস্কৃতিতেই অল্প কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি সংস্কৃতির স্রষ্টা; বাকী লোক ভোক্তা। গণসংস্কৃতিতে সেই ভোক্তাদের মন নিতান্ত অপরিণত হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের ক্ষমতা অসীম। তাদের মন জয় করতে পারলে যে কোনো লেখক, প্রকাশক অথবা প্রযোজক রাতারাতি বিত্ত এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। অন্যধারে গণ-চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে নিজের বিবেক অথবা প্রেরণা অনুযায়ী কিছু সৃষ্টি করে তাকে সমাজের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা বর্তমান কালে ব্যর্থ হতে একরকম বাধ্য। অধ্যাপক ভান ডেন হাগ-এর ভাষায় গণ-চাহিদার যুগে শিল্পী সম্প্রদায় স্বভাবতই "more market-oriented than taste-oriented. They create for anonymous consumers rather than for the sake of creation."

যে দু'চারজন বিবেকবান শিল্পী এবং মনীষী স্বপ্রতিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করছেন তাঁদের পথে প্রলোভন অসংখ্য, তাঁদের ওপরে চাপের শেষ নেই। সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তাঁদের রচনা ক্রমেই বিরস এবং দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। "The artist who by refusing to work for the mass market becomes marginal, cannot create what he might have created had there been no mass market." অপরপক্ষে অ্যালান ডুট্‌শার-এর মতে আজকের দিনে খুব কম প্রকাশকই নাকি মননশীল সাহিত্য প্রকাশের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত; সাধারণ পাঠকরা চায় কোনো উচ্ছ্বাসময় হাল্কা কাহিনী অথবা সেক্স, ক্রাইম এবং ভাঁড়ামি পাওয়া করা উপন্যাস। সুতরাং ". . . the great majority of good literature that might be published never gets into print in the first place—is still born."

সংসাহিত্যের পাঠক কমে অপকৃষ্ট রচনার খরিদ্দার যে কি ভয়াবহ হারে বাড়ছে তার একটি উদাহরণ হল, এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নাকি প্রতি মাসে ছয় থেকে সাত কোটি কমিকস্‌ বিক্রি হয় এবং তার বড় অংশ হোল ক্রাইম-কমিকস্‌। (এ বিষয়ে এই সংকলনে কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু আরো বিস্তারিত বিবরণ মিলবে ডক্টর ফ্রেডারিক ওয়েরথ্যাম-এর **The Curse of Comic Books** গ্রন্থে।) নিকৃষ্ট গণরুচির চাপে শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সিনেমা রেডিও এবং টেলিভিশানে শিল্পবিবেক, মনস্বিতা এবং সূক্ষ্ম কল্পনা আজ প্রায় একরকম ট্যাবু। গণসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একধারে যেমন বৈদগ্ধ্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, অন্যধারে তেমনি লোকসংস্কৃতির (folk culture) বিকাশ সুনিশ্চিত। অধ্যাপক হায়াকাওয়া অতীত দিনের সুন্দর এবং বলিষ্ঠ নিগ্রো লিরিক গানের সঙ্গে বর্তমান মার্কিন দেশের জনপ্রিয় টিন্-প্যান্-অ্যালি-র নির্বোধ ন্যাকা গানের তুলনার ভিতর দিয়ে শেষোক্ত বিপদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অর্থাৎ গণসংস্কৃতির প্রসারের ফলে শিল্পী মনীষীদের ত সর্বনাশ বটেই, জনসাধারণেরও মানসিক বিকাশের সম্ভাবনা দ্রুত কমে আসছে। এরি চরম পরিণতির কথা ভেবে বার্নার্ড রোজেনবার্গ তাই লিখেছেন, গণসংস্কৃতি

threatens to cretinize our taste and to brutalise our senses.

এবং তার ফলে সমাজে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাহায্য করে।

এখন পণ্ডিতদের এসব কথা কতখানি সত্যি? তবে কি ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে যে প্রকৃত সংস্কৃতি মাত্রই অধিকারীদের সংস্কৃতি (elite culture)? সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য আসলে কি জনসাধারণই দায়ী? গণতন্ত্র এবং সংস্কৃতির মিলন কি সুফলপ্রসূ হয়নি বা হতে পারে না? বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

সুধাংশু ঘোষাল

দুনিয়ায় তত্ত্বের অভাব নেই। শরীরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব—এ ধরনের তথ্যবহুল তত্ত্বের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। এছাড়া বিয়ের তত্ত্ব, শীতের তত্ত্ব, পুজোর তত্ত্ব, এসব তো আছে।' কিন্তু কান-তত্ত্বের নামটা আমরা অনেকেই শুনিনি। কথায় বলে দাঁত থাকতে নাকি মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। তেমনি এ পোড়া কান দিয়ে ধর্মতত্ত্ব হতে আরম্ভ করে কত শত সহস্র তত্ত্ব গলে গেলেও কানতত্ত্ব গলে যাবার সুযোগ সুবিধা হয়তো বা আজও হয় নি। কানের কথা শুনুন চাই না শুনুন কান নীরবে তার কাজ করে যাচ্ছে, যাবেও। কানের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটা চলে ভাবুন দেখি। ছেলেবয়সে কতবার যে কান ধরে নীলডাউন হতে হয় বা বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে হয় তার ঠিকঠিকানা নেই। শেষপর্যন্ত কানের নরম মাংসটার ওপর নাপিতের হুল ফোটানোর অভিজ্ঞতাটা যজ্ঞোপবীতধারীদের পক্ষে মনে রাখা খুবই স্বাভাবিক। সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যেও কান ফোঁড়া অপরিহার্য। এহেন কান থেকেও কত লোক কান কাটা, কেউ বা কানে খাটো। তবুও কানের দুনিয়া বড়ই মজাদার। লোককে জেলে অথবা জেলে ফেলবার আগে কখনো সখনো কান পাতার না হয় কান খাড়া করার দরকার হয়। আবার জাহাজের ডেকে বা [illegible] লোকে কানের ওপর মাকু ঝরে পড়ে শত অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে। তখন এই কানের কাছে মিঠি সুরে কত শপথ আর ঘড়া ঘড়া অনুরোধ। কান কত লোকের জীবনে এনেছে জোয়ার। কত বসন্ত, কত মধুরাত। আবার এক কানের কথা ভুল করে অপর কানে গিয়ে করেছে কত কানাকানির সূত্রপাত। কানের রাজ্যে এমন আছে ভূরি ভূরি রোমান্স। আসুন আজ বিভিন্ন প্রাণীর কানের দুনিয়া ঘুরে সেখান হতে রহস্যঘন রোমান্স নিয়ে রোমন্থন করতে করতে সরে পড়া যাক।

দুনিয়ায় ছোটো ছোটো প্রাণীদের দেহে কান বলে কোনো জিনিস নেই। যেমন ধরুন, অ্যামিবার কথা। অ্যামিবা একটি ছোটো এককোষী প্রাণী। সমুদ্র মন্থন করার মতো এর ছোটো এককোষী দেহটি তোলপাড় করে খুঁজে বেড়ালেও এর দেহে কানের টিকিটা পর্যন্ত দেখতে পাবেন না। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কান নেই বললেই চলে। তবে পতঙ্গেরা অমেরুদণ্ডী হলেও তাদের দেহে কানের অস্তিত্ব আছে। এদের কানের ব্যাপারটা বেশ মজার। "কান টানলে মাথা আসে" কথাটার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। কারণ কানের অবস্থান সাধারণত মাথায়। পতঙ্গের বেলায় এটা একেবারে উল্টো। এদের কান মাথা ছাড়া শরীরের অন্য যে কোনো অংশে থাকতে পারে। পঙ্গপাল ও কয়েকজাতীয় ফড়িং-এর কানের পর্দা বৃত্তাকার ও শরীরের পিছনের দিকে উদরে অবস্থিত। ঝিঁঝি পোকার কানের
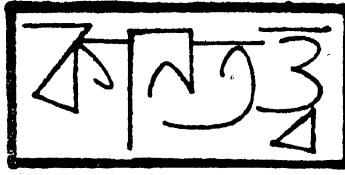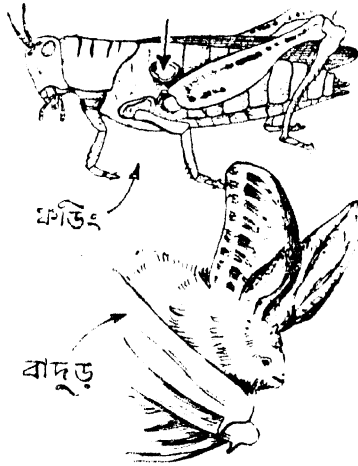
ফড়িং-এর কানের পর্দা উদরে। বাদুড় তার "কান দিয়ে দেখতে পায়" বললে মোটেই ভুল বলা হবে না।

পর্দা হচ্ছে ঠিক পিছনের পায়ে হাঁটুর কাছে। দূর হতে শব্দতরঙ্গ এসে পর্দায় আঘাত করে ও পর্দাটি কাঁপতে থাকে। এই অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে মগজে গিয়ে পৌঁছায় যার ফলে শব্দটি এরা শুনতে পায়। আমরা কান ছাড়া শরীরের অন্য কোনো অংশ দিয়ে শব্দ শুনতে পাই না। তবে পতঙ্গেরা যে কান ভিন্ন অন্য অংশ দিয়ে শব্দ শুনতে পাবে না এমন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই। একটি পুরুষ ও স্ত্রী মশা ধরে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে পুরুষ-মশার মাথায় শুঁয়ো স্ত্রী-মশার মাথার শুঁয়ো হতে অনেক বড়ো ও স্ফীত। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী-মশাটির মৃদু গুঞ্জনধ্বনি পুরুষটি জানতে পারে এই শুঁয়োর দৌলতে। কয়েক জাতীয় পতঙ্গ আছে যারা তাদের দেহের পাতলা আবরণীর সাহায্যে শব্দের উপস্থিতি জানতে পারে।

এবারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কানের খবরটা নেওয়া যাক। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছের স্থান সকলের নীচে। মাছের মাথায় কান বা কানের ফুটো দেখা না গেলেও এরা কিন্তু কানকাটা বা কানহীন নয়। মাছেদের ঘাড়ের কাছের মাংসটা সরিয়ে ফেলে, যদি খুলির পাশের হাড়টা একটু একটু করে ভাঙতে থাকেন তবে এদের কান দেখতে পাবেন। আপনার আমার যেমন কানের পাতা ও ছিদ্র আছে এদের তেমন কিছুই নেই। কাজেই শরীরের মধ্যে লুকোনো এই কানটির সঙ্গে বাহিরের দুনিয়ার কোনো যোগাযোগ না থাকায় এরা কানের সাহায্যে কথাবার্তা শুনতে পায় না। তবুও এই কান দিয়ে মাছেরা কোন্ দিকে ঘুরছে বা কাত হচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারে। মাছেদের বেলায় আমরা যে কানটি দেখি সেটি হচ্ছে অন্তঃকর্ণ। এদের বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণ নেই। প্রাণিতত্ত্ববিদদের মতে প্রথম যে কানের সৃষ্টি হয়েছিলো (যেমন মাছের কান) সেটি অন্তঃকর্ণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এই কানকে শব্দ শোনার যন্ত্র বলে ভারসাম্য বজায় রাখার যন্ত্র বলাই যুক্তিসংগত। জীবজগতের বিবর্তনের ফলে এই ভারসাম্য বজায় রাখার যন্ত্রটা কথাবার্তা শোনার ধর্মলাভ করেছে বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের উৎপত্তি হবার ফলে। সুতরাং আমরা যে কান দিয়ে শুধু শব্দ শুনতে পাই তা নয়, আমরা কোনদিকে ঘুরছি সেটিও বুঝতে পারি এই কানের সাহায্যে।

মেরুদণ্ডীপ্রাণীদের মধ্যে মাছের পরই হচ্ছে উভচর প্রাণীর স্থান। ব্যাঙ একটি উভচর প্রাণী। এদের প্রতি চোখের পিছনে একটি বৃত্তাকার স্থান আছে—এটাকে কানের পর্দা বলে। পাঠকপাঠিকারা সকলেই জানেন যে শব্দ হাওয়ার কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঢাক বাজালে যেমন ঢাকের পর্দার কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়, তেমন শব্দতরঙ্গ এসে কানের পর্দা কাঁপালে আমরা শব্দ উপলব্ধি করতে পারি। ব্যাঙের কানের পর্দার সঙ্গে অন্তঃকর্ণের সংযোগ-রক্ষা করেছে একখণ্ড অস্থিবিশেষ। টেলি-ফোনে কথা বললে যেমন তারের মাধ্যমে কথা যায় তেমন ব্যাঙের কান হতে শব্দ-তরঙ্গ ছোটো হাড়টির মধ্য দিয়ে অন্তঃ-কর্ণে গিয়ে পৌঁছায়। অন্তঃকর্ণ হতে শব্দবাহী স্নায়ু মগজে পৌঁছেছে। কাজেই শব্দতরঙ্গ শেষপর্যন্ত মগজে গিয়ে পৌঁছায়। কানের পর্দা হতে অন্তঃকর্ণ পর্যন্ত স্থানটিকে মধ্য কর্ণ বলে। সরীসৃপ-দের মধ্যে সাপেদের কানে পাতা নেই। তবে

কুমীর ও টিকটিকি জাতীয় কয়েকটি সরীসৃপের কানের ফুটোর ঠিক উপরে কানের পাতার মতো ছোটো মাংসখণ্ড থাকে।

পাখিদের বেলায় কানের ফুটো দেখা গেলেও কানের পাতা বড়ো একটা দেখা যায় না। যারা পাড়াগাঁয়ে থাকেন তারা অনেকেই পেঁচা দেখেছেন। যারা দেখেন নি তাদের মধ্যে অনেকে বন্ধুবান্ধব বা মার মুখ হতে বিশেষ্য বা বিশেষণরূপে পেঁচা শব্দটা শুনে থাকবেন। পেঁচার সঙ্গে আপনার আমার আর কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও অন্ততঃ কানের দিক হতে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এদের যে কেবল কানে পাতা আছে তা নয়, এরা কানের পাতাটা ইচ্ছেমত নাড়াচাড়াও করতে পারে। কানের পাশে ফুল গুঁজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করার চেষ্টা না করলেও এদের কানের পাতার উপরটা বেশ সুন্দরভাবে পালক দিয়ে ঢাকা। বিশ্রী পেঁচা সুশ্রী হবার চেষ্টা করছে আরকি!

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাধারণত কানের পাতা থাকে। তবে যে স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকে তাদের বহিঃকর্ণটি সেই অবস্থায় খাপ খাইয়ে চলার উপযোগী। এই প্রসঙ্গে জলচর স্তন্যপায়ীদের ব্যাপারটা বেশ উল্লেখযোগ্য। কানে বিরাট বিরাট পাতা থাকলে জলে চলাফেরা করতে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীর হয় কানের পাতা খুব ছোটো, না হয় কানের পাতা একেবারেই নেই। যেমন বিশালকায় তিমির বহিঃকর্ণে কানের পাতা নেই। তবে তিমির (তিমি মাছ নয়, এক জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী) পূর্বপুরুষদের যে কানে পাতা ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। বিবর্তনবাদীরা বলেন যে, তিমির পূর্বপুরুষেরা আগে ডাঙায় ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু কোনো কারণে স্থলে জীবনযাপন করায় অসুবিধা হবার জন্যে তারা জলে ফিরে গেলো। এরা যত জলে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হতে লাগলো কানের পাতা তত ছোট হতে লাগলো এবং পরিশেষে তিমির ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলো। সীল জলে বাস করলেও মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যেমন চোখের পাতা বুজে ফেলতে পারি তেমন সীল (ও আরও কয়েকটি প্রাণী) জলের নীচে কানের ছিদ্রপথ বুজে ফেলতে পারে। ফলে এদের কানে জল ঢুকতে পারে না। জলচর প্রাণীর মতো স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা গর্তে বাস করে, তাদের কানের পাতা নেই বললেই চলে। এক ধরনের ছুঁচো আছে যাদের কানের পাতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এজন্যে এদের শাপে বর। কানের পাতা নেই, কাজেই গর্তের দেয়ালে কান ঘষে যাবার ভয় নেই।

যে প্রাণীরা রাতে ঘুরে বেড়ায় বা চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাদের কানের পাতা বেশ বড় এবং কান অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশ তীক্ষ্ণ হয়। বাদুড় চোখে খুব ভালো দেখতে না পেলেও অন্ধকারে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারে এই কানের দৌলতে। এক কথায় বাদুড় কান দিয়ে দেখতে পায়। কথাটা কানে একটু খট্‌কা ঠেকলেও ভুল নয়। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে স্প্যালাঞ্জানি (Spallanzani) সাহেব বাদুড় নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করেন। তিনি একটি বাদুড়ের সন্ধান পান যে অন্ধ হয়ে যাবার পর দিব্যি খোসমেজাজে অন্ধকার রাতে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, কোথাও ধাক্কা খায়নি। ঘটনাটা তাঁর কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয়েছিলো। বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা এর এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা জানি যে, শব্দ হাওয়ার কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে সব কম্পন আমাদের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। আমরা যে সকল শব্দ শুনতে পাই তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। প্রতি সেকেন্ডে ২০ হতে ১৬,০০০ কম্পন হলে আমরা শুনতে পাই। খুব অল্পবয়স্ক শিশুরা ১৬.০০০ অপেক্ষা বেশী কম্পনবিশিষ্ট শব্দ শুনতে পায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে বাদুড়েরা যখন উড়ে বেড়ায় তখন তারা এক অদ্ভুত শব্দ করে যার স্পন্দন প্রতি সেকেন্ডে ৫০,০০০ বা আরও বেশী। আমরা ১৬.০০০-এর বেশী স্পন্দন বিশিষ্ট শব্দ শুনতে পাই না বলে বাদুড়ের শব্দ শোনা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, বাদুড়েরা না হয় শব্দ করে, কিন্তু তার সঙ্গে গাছের ডালে ধাক্কা না লাগার কি সম্বন্ধ আছে। ব্যাপারটা এই যে, আমরা যখন কথা বলি, তখন অনেক সময় আমাদের কথা দূরে পাহাড়ের গায়ে বা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। শব্দের গতি জানা থাকলে শব্দটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা হতে দেয়ালের দূরত্ব বের করা মোটেই কঠিন নয়। বাদুড়েরা যে শব্দ করে সেটি এভাবে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বাদুড়ের কানের পাতা বড় হবার ফলে প্রতিধ্বনি অতি সহজে এই কানে ধরা পড়ে। পরীক্ষামূলকভাবে বাদুড়ের কান তুলো, আটা ও আঠা দিয়ে বন্ধ করে দেখা গেছে যে, এই অবস্থায় উড়ে বেড়াতে বাদুড়কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কিছুদিন আগে একদল বিজ্ঞানী বাদুড়ের দেহে শব্দধ্বনি শোনার উপযোগী বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কল্পনা করতেন। কিন্তু বর্তমান প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে বাদুড়ের নিজের শব্দ (যা আমরা শুনতে পাই না) কতক্ষণে ও কিভাবে বাদুড়ের কানে এসে লাগছে তার সাহায্যে বাদুর দেয়াল, ঘর ও বাধাবিঘ্নের অস্তিত্ব টের পায়। সুতরাং কানের কৃপায় বাদুড় বা অন্ধকারের বাহাদুর সহজে দেয়ালে ধাক্কা খায় না বা ধাক্কা খেয়ে অক্কালাভ করে না।

হরিণ, খরগোস, কাঙ্গারু, এ ধরনের যত জন্তু-জানোয়ার জোরে চলাফেরা বা ছুটোছুটি করে তাদের কানের পাতা আকারে যথেষ্ট বড় হয়। কানের পাতা বড় হলে চারিদিক হতে ভেসে আসা শব্দতরঙ্গ খুব
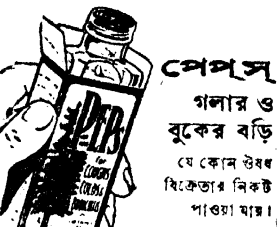
সহজেই কানে ধরা দেয়। কাজেই শত্রুর হাত হতে আত্মরক্ষায় বৃহদাকার কানের পাতার প্রয়োজন অপরিহার্য। কোনো লোকের কানের পাতা বড় হলে আমরা বলি "হাতীর মতো কান", আবার হাতীর কানকে বলি কুলোর মতো। সত্যি কথা বলতে দুনিয়ায় যত কানদার প্রাণী আছে হাতীর কান তাদের সকলের চেয়ে বড়। হাতীর ছোটো চোখ থাকায় শত্রুর উপস্থিতি জানতে এদের যতটা অসুবিধা হয়, এদের বড় কানের পাতা ততটা অসুবিধার কিছুটা দূর করেছে। প্রায় সব বুনো পশুরা নিজের ইচ্ছেমত কান খাড়া বা নাড়াচাড়া করতে পারে। খরগোশেরা যখন দৌড়ায় তখন সামনে কোনো সরু সুড়ঙ্গপথ দেখলে কান দুটো এমনভাবে নুইয়ে দেয় যে, কানের পাতা চোখ দুটোকে আংশিক ঢেকে রাখে। এর ফলে খরগোশের যে শুধু কান দুটো সুড়ঙ্গের দেয়ালে ঘসে যাবার হাত হতে রক্ষা পায় তা নয়, এদের চোখ দুটিও কিছুটা রক্ষা পায়।

কানের পাতা দূরাগত শব্দতরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করে কানের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। কতকগুলি পশু এজন্যে যেদিক হতে শব্দ আসে সেদিকে কান বাঁকিয়ে রাখে। এই পশুগুলি কান নাড়াতে পারে কয়েকটি পেশীর দৌলতে। অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তনের ফলে এই পেশীগুলি খুব ছোট হয়ে গিয়েছে এবং পেশীগুলি তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে বলে মানুষ গরু, ভেড়ার মত কানের পাতা নাড়াতে পারে না। আমাদের কান নাড়াবার ক্ষমতা নেই বলে দূর হতে ভেসে আসা শব্দ শোনার জন্যে আমরা ঘাড় বাঁকাই, অথবা কানের পাশে করতলকে বাঁকাভাবে রাখি। কখনো সখনো দেখা যায় যে, কয়েকজন লোক তাদের কানের পাতাকে সামান্য নাড়াতে পারেন। অবশ্য এদের সংখ্যা খুব কম। এটা হয়ত বা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুব কম। যদি এই লোকদের সংখ্যা কিছুটা বেশী হত এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কানটি বেশ ভালো ভাবে নাড়াতে বা বাঁকাতে পারত, তবে নিশ্চয়ই ট্রামে, বাসে বাজারে, মিটিং-এ ও পার্লিয়ামেন্টের সিটিং-এ গরমে পাখার হাওয়া খাওয়ার পরিবর্তে ইতস্তত কর্ণ-সঞ্চালনে মৃদুমন্দ বায়ু সেবনের আনন্দ উপভোগ করা যেতো। অবশ্য যে সহৃদয় ব্যক্তি এভাবে বায়ু বিতরণ করতেন তিনি নিজে কতটা হাওয়া পেতেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বিবর্তনবাদীরা যেখানে যা পেয়েছেন তা দিয়ে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ বোঝার চেষ্টা করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো স্থানে কতকটা ইঁদুরের মতো দেখতে
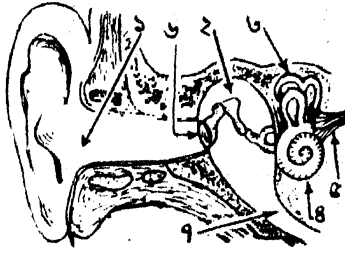
মানুষের কানের বিভিন্ন অংশ: ১, বহিঃকর্ণ; ২, মধ্যকর্ণ; ৩, অর্ধবৃত্তাকার নল ও ৪ কর্ণকম্বুকে একসঙ্গে অন্তঃকর্ণ বলে; ৫, শব্দবাহী স্নায়ু; ৬, কানের পর্দা; ৭, বায়ুবাহী নল।

এক জাতীয় প্রাণী বাস করে। প্রাণীটির নাম 'টুপাইয়া' (Tupaia) এরা গাছের ডালে ঘুরে বেড়ায়। এদের কানের সঙ্গে মানুষ, গরিলা ইত্যাদি প্রাণীর কানের বেশ সাদৃশ্য আছে। জীবতত্ত্ববিদদের মতে আজ হতে প্রায় দশ কোটি বছর আগে এই প্রাণীটির উৎপত্তি হয়েছিলো। বিবর্তনের দিক হতে এরা মানুষ, গরিলা ইত্যাদি দ্বিপদ প্রাণীগুলোর সঙ্গে দূরসম্বন্ধযুক্ত। মানুষের কানের পাতার প্রান্তে উপরের দিকে সামান্য উঁচু মাংস দেখা যায়—এটাকে "ডারউইনের বিন্দু" বলে। পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ পুরুষের কানে এই বিন্দুটি খুব স্পষ্ট। পক্ষান্তরে খুব কম স্ত্রীলোকের কানে এই বিন্দুটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। আবার বানর ও গরিলার কানে ডারউইনের বিন্দু খুবই স্পষ্ট। বানর, গরিলা, মানুষ ইত্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে একই সাধারণ উৎস হতে হয়েছে কানের পাতার এই ক্ষুদ্র মাংসবিশেষ দেখে এ সম্বন্ধে ধারনা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

নাকের ছিদ্রপথে যেমন ছোটো ছোটো লোম থাকে, তেমন আমাদের কানের ছিদ্রপথেও অসংখ্য সূক্ষ্ম ছোটো ছোটো লোম থাকে। এইজন্যে ছিদ্র দিয়ে ধুলোবালি ও অন্য কোনো পদার্থ সহজে কানের মধ্যে যেতে পারে না। এছাড়া আমাদের কানের ছিদ্রপথে এক ধরনের গ্রন্থি আছে, যা হতে সবসময়ে এক বিষাক্ত আঠালো রস বের হয়। এজন্যে পোকামাকড় সহজে কানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। তবে যারা ভুল করে বা ইচ্ছে করে কানের গর্তের মধ্যে পা দেয় তারা এই বিষাক্ত রসে মারা যায় ও পরে কানের খোলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এতক্ষণ আমরা প্রধানত বহিঃকর্ণের অবস্থা দেখছিলাম। এবারে আসুন মধ্যকর্ণটা একটু দেখা যাক। মাছের কান আলোচনা কালে আমরা অন্তঃকর্ণ সম্বন্ধে মোটামুটি জেনেছি। যেসব প্রাণীর কানে পর্দা আছে তাদের কানের পর্দা হতে অন্তঃকর্ণ পর্যন্ত স্থানকে মধ্যকর্ণ বলে। এক বা একাধিক অস্থি দ্বারা কানের পর্দার সঙ্গে মধ্যকর্ণ সংযুক্ত থাকে। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে মধ্যকর্ণে তিনটি হাড় আছে। আমরা কথাবার্তা বললে প্রথমত শব্দ তরঙ্গ এসে আমাদের কানের পর্দায় ধাক্কা মারে ও পর্দাটি কাঁপতে থাকে। পর্দাটি হতে শব্দানুভূতি তিনটি হাড়ের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখান হতে মস্তিষ্কগামী স্নায়ুর সাহায্যে অনুভূতি সরাসরি মগজে চলে যায়। কানের মধ্যকর্ণটা একটা হাওয়াভরা ঘরের মতো। এখান হতে একটি বায়ুনালী গলায় গিয়ে মিশেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে গলার ভিতরের গহ্বরের সঙ্গে মধ্যকর্ণের সংযোগ আছে। এই কারণে আমরা যখন কাসি, খুব জোরে কথা বলি বা সর্দি টানি তখন কানের মধ্যে এক অস্বস্তিকর অনুভূতি বোধকরি।
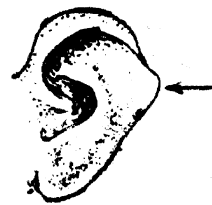
"টুপাইয়া", বানর ও মানুষের কানের সাদৃশ্য বিবর্তনের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষ ও বানরের কানের পাতায় "ডারউইনের বিন্দু" তীর দিয়ে দেখানো হয়েছে।
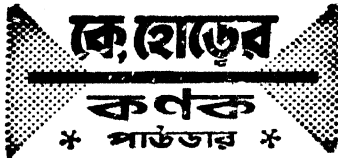
আমাদের অন্তঃকর্ণের ব্যাপারটা খুব জটিল। এটিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি অংশ তিনটি বিভিন্নতলে অবস্থিত তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নল দিয়ে গঠিত। এটির সাহায্যে আমরা কোন দিকে ঘুরছি বা কাত ফিরছি জানতে পারি। অপর অংশটি শামুকের খোলার মত প্যাকানো, এটির নাম কর্ণকম্বু। বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই পাকসংখ্যা বিভিন্ন। ঘোড়ার কর্ণকম্বুতে পাকসংখ্যা হচ্ছে ২, মানুষের ২¾, গরুর ৩½, শূকরের ৪। শব্দনিরূপণে এই অংশটি প্রধানত কাজ করে থাকে। এই কর্ণকম্বুটির কার্য-ক্ষমতা ক্রমশ কমে যেতে থাকলে আমাদের শ্রবণ শক্তি কমে যেতে থাকে। কর্ণকম্বুটি সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে গেলে কানে আর মোটেই শোনা যায় না। অবশ্য অন্তঃকর্ণ খারাপ হয়ে বধিরতা দেখা দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যকর্ণের গোলমাল হতেই বধিরতা দেখা দেয়। আমরা জানি যে মধ্যকর্ণের সংগে গলার সংযোগ আছে। যদি কোন ব্যাক্‌টিরিয়া গলা হতে বায়ুবাহী নলের মাধ্যমে মধ্যকর্ণের প্রকোষ্ঠের মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসে তবে তারা মধ্যকর্ণের হাড় তিনটিকে অথবা কানের পর্দাকে নষ্ট করে কানের মাথা খেয়ে বসে। বারংবার ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণের ফলে কালা হয়ে যাওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। অন্তঃকর্ণ হতে যে স্নায়ুর সাহায্যে অনুভূতি মগজে গিয়ে পেঁছায় সেটি কদাচিৎ আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও কানের রোগ দেখা দেয়। এছাড়া আরও বহু কারণে কান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কানকে ব্যাক্‌টিরিয়া সংক্রমণের হাত হতে বাঁচাবার জন্যে শিশুদের উপর অ্যাণ্টিবডি সংক্রান্ত পরীক্ষা করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। অন্তঃকর্ণ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে যারা খুব ক্ষীণ শব্দ শুনতে পান তারা কানের সঙ্গে এক বিশেষ যন্ত্রযোগ করে ক্ষীণ শব্দানুভূতিকে পরি-বর্ধিত করে শুনতে পারেন। বর্তমানে বিদেশে এই যন্ত্রের প্রচার বেড়ে গেছে। চোখে কম দেখলে চশমা পরা আজ আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয় না, দুদিন পরে কানে কম শোনায় এই যন্ত্রটির ব্যবহার মোটেই অদ্ভুত ঠেকবে না।

তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়ালে যত সব মুখরোচক খবর পাবেন কানের দুনিয়ার খবর তাদের একটি। অবশ্য কানের খবর যতটা জমকালো, কানকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো তার চেয়ে কম চমকদার নয়। এই কানের কাছে গুরুজন-দের তিক্তমধুর ভর্ৎসনা হতে আরম্ভ করে প্যানপ্যানানি সুরে বা কোকিলকণ্ঠে যত সব আবেদন আর আত্মনিবেদন। এক কথায় "গয়াগংগা-গোদাবরী" অথবা শ্রীক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র সব এই কানে। কান আছে বলে দুনিয়ায় আছে কানাকানি। এ কানাকানি যারা করুক না কেন, সেটা যে অন্য লোকের হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায় না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। সুতরাং এক পক্ষের কানাকানি অপরপক্ষের জানাজানির পূর্বাভাষ। শুধু তাই নয় হৃদয় যাচাই করতে হলে কষ্টি-পাথরে না ঘসে, অথবা স্যাকরার মত সোনায় সোহাগা না মিশিয়ে সোহাগভরা কণ্ঠে বললেই হবে "কানে কানে শুধু একবার বলো তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার।" রাধার মানভঞ্জন হতে আরম্ভ করে প্রহসন, প্রশাসন ও যত রাজ্যের সব অসাধ্য সাধনের ক্ষেত্রে মুশকিল আসান করতে হলে চুপচাপ কানের কাছে চলে আসুন। এখন গলাবাজি না করে ফিস্‌ফিস্‌ করে দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজি মাত। সত্যি কথা বলতে কি কানের রাজ্যটা একটা সমুদ্র—রোমান্সের গাঢ় ও গূঢ় রসে টইটম্বুর। এখানে জয়মা বলে তরী ভাসিয়ে পুকুরচুরি, হৃদয়চুরি করা অথবা ভুল করে খিচুরি পাকানো থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত ডুব দিয়ে মুক্তো তোলাও সম্ভব। তাই বলি কানের রাজ্য চিরদিন গোপালের দধিভাণ্ডের মত রসঘন রহস্যঘন রোমান্সে ভরা।

দিলীপকুমার রায়

চৌদ্দ

মেজমামিমা বড় মামিমার মতনই গরিবের ঘরের মেয়ে। নাম অমিয়া, ডাক নাম মন্দা। অনেকগুলি ভাইয়ের মধ্যে এক বোন। ফুটফুটে মেয়ে, কাজে খুব আদুরে ছিলেন বিধবা মার। তবু গরিব তো, ধনীগৃহের গৃহিণী হওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু হ'ল কি, আমার এক মাসিমার মৃগী রোগ ছিল। ঘটকালি ক'রে স্থির হ'ল মেজমামিমার ভাই বিয়ে করবেন আমার মাসিমাকে, মেজমামা বিয়ে করবেন দরিদ্রকন্যাকে। মেজমামা আশ্চর্য মানুষ, একেলে হয়েও সেকেলে। মেয়ে না দেখেই বিয়ে করতে রাজি! দাদামহাশয় বললেনঃ "দেখে আয় মেয়ে। আমাদের পছন্দ হ'লেও, বিয়ে যে করবে তারও তো পছন্দ হওয়া চাই।" কিন্তু মেজমামার 'ভদ্রলোকের এক কথা'ঃ "আপনি নিজে দেখে পছন্দ করেছেন বাবা, তারপরে আমার পছন্দের প্রশ্নই আসে না।" পরে তিনি মেজজামিমাকে চটুল সুরে বলেছিলেন, বাসরঘরে (মেজমামিমার কাছেই শোনা—তিনি সব কথা আমাকে গলগল ক'রে না ব'লে থাকতে পারতেন না)ঃ "তোমাকে না দেখেই বিয়ে করব ধনুর্ভঙ্গ পণ তো নিলাম—কিন্তু তার পরে জানো না তো আমার অবস্থা! তোমার বড়দাদাটি যেদিন আমার বোনকে দেখতে এলেন, তাঁকে দেখেই আমার চক্ষুস্থির ঃ এ আলকাৎরা দেবের বোন কয়লা দেবী না হয়ে যায় না—হা হতোস্মি! করেছি কী জাঁক ক'রে বীরত্ব করতে গিয়ে!"

ব'লে মেজমামিমার সে কি হাসি! আহা, অমন উচ্ছল হাসি থিয়েটার রোডে আর কাউকে হাসতে শুনিনি। কখনো কখনো সকালবেলা উঠেই তাঁর কলহাস্য শুনতাম পাশের ঘর থেকে। আমি শুতাম তাঁর পাশের ঘরে, আর মনে হ'ত ঝর্নার কথা। সত্যি বলছি, এ অত্যুক্তি নয়। অমন মিষ্টি হাসি আমি জীবনে বেশি শুনিনি মেয়েদের মধ্যে—সাহেবী উপমা সিলভার লাফটার মনে পড়ে যেত।

শুধু তাই নয়। ফুটফুটে মেয়ে বৈ কি—অক্ষরে অক্ষরে। তের চোদ্দ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় মেজমামার সঙ্গে। আমি তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হই। কী সুন্দর মেয়ে! আর শুধু প্রচ্ছদটুকুই সুন্দর নয়, অন্তরের স্নেহ দয়া পবিত্রতা তাঁর মুখকে আরো যেন কমনীয় ক'রে তুলেছিল। কারুর দুঃখ কষ্টের কথা শুনলেই তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠত, বিশেষ ক'রে দুর্ভাগা সর্বহারাদের দুঃখ কষ্ট দেখলে তিনি সইতে পারতেন না। গোপনে কত দুঃস্থকেই যে সাহায্য করতেন জানতাম কেবল আমি। কারণ আমাকে তিনি কোনো কথাই না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। মাতৃস্থানীয়া মামিমা তথা খেলার সাথী তথা বান্ধবী—এরকম অঘটন হিন্দু পরিবারে বেশি ঘটে ব'লে মনে হয় না, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সত্যিই ঘটেছিল। তাঁর স্নেহকোমল পবিত্র হৃদয়টির সম্বন্ধে কত কথাই লেখবার আছে, কিন্তু আজ কেবল একটি ঘটনার কথাই বলব।

দাদাঠাকুর শরৎ পণ্ডিতের কথা বাংলা দেশে অনেকেই জানেন। এমন তেজস্বী রসিক কোনো দেশেই বেশি জন্মায় না। বিশেষ ক'রে দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরিবেশে। তাঁর আশ্চর্য জীবনের সম্বন্ধে যাঁরা নানা রসাল খবর পেতে চান তাঁরা আমার প্রাক্তন বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের "দাদাঠাকুর" বইটি পড়তে পারেন। এ-মানুষটি মুখে মুখে চমৎকার সরস ছড়া কাটতে পারতেন। সভায় মজলিশে দাদাঠাকুর থাকলে রসের হিল্লোল বইত অশ্রান্তধারে। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আমার এক চ্যারিটি কন্সার্টে তিনি একবার তাঁর বিখ্যাত কলকাতার ভুল গানটি গেয়ে আসর জমিয়েছিলেন। গানটির তিনটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিঃ

মরি হায়রে, কলকাতা কেমন ভুলে ভরা।
ভাবি কলুটোলায় কলু আছে
আছে তাদের ঘানি ঃ
দেখি, কলুর বদল বাঁদা সেথা
করে তেল আমদানি।
আমি মুর্গিহাটায় টুক ক'রে যাই
কিনতে ভাই রামপাখি ঃ
দেখি, সারি সারি স্টেশনারি,
আসল জিনিষ ফাঁকি।
আমি ভেবেছিলাম রাধাবাজার
শ্যামবাজারের বাঁয়ে ঃ
দেখি, শ্যাম গিয়েছেন বহুৎ দূরে
রাধার মানের দায়ে।
আমি দেখি থিয়েটার রোডে
নেই থিয়েটার তো হায়।
তবে থিয়েটারের সাধ মিটালো
দিলীপকুমার রায়।

এ-গানটি গাইবার সময়ে স্টেজেরই একজন তাঁকে বললেনঃ "সবই হ'ল কেবল থিয়েটার রোডটি বাদ দিলেন কেন?" দাদাঠাকুর এক সেকেন্ড চুপ ক'রে থেকে ধরলেন সেই বিরাট সভায়ঃ

শুনে শ্রোতাদের সে কী হাসি। মেজমামিমা তো মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় দমবন্ধ হবার জো!

গান শেষ হ'লে তিনি গিয়ে দাদাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে আমাকে ফিস ফিস ক'রে বললেনঃ "ওঁকে আমাদের ওখানে একদিন নিয়ে আয় না।" আমি দাদাঠাকুরকে বলতেই সদাশিব মানুষটি এক গাল হেসে বললেন মামিমাকেঃ "কাঙালকে কি শাকের ক্ষেত দেখায় মা?"

এলেন পরদিন। মামিমা তাঁকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়ালেন। শেষে চিনিপাতা দই পরিবেষণ ক'রে বললেনঃ "দইটুকু ভাত দিয়ে মেখে খাবেন দাদাঠাকুর, ফেলবেন না।" বলতেই দাদাঠাকুর হেসে জবাব দিলেনঃ "খাব বৈ কি মা, দইভাত আমার দৈবাৎ জোটে।"

মেজমামিমার চোখে জল চিকচিক ক'রে উঠল। কোনোমতে অশ্রুগোপন ক'রে দাদা

অস্বীকার করার আর উপায়ই রইল না যে, আমি রূপের লোভে মেয়েটিকে দেখতে উদ্যত হয়েছি। অথচ মুশকিল—বলও পাচ্ছি না—কী করি? ভাবতে ভাবতে আমার মন যেন কালো হয়ে এল, আমি উঠে ঠাকুরের ছবির সামনে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম: "ঠাকুর, আমি বড় দুর্বল বোধ করছি......ওদিকে কথা দিয়েছি ......" ইত্যাদি।

ডাকতে ডাকতে চোখে জল। অমনি—কী আশ্চর্য: মনে বল এসে গেল! একেলে বুদ্ধিমান যুক্তিবাদীরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞ হেসে বলবেন: "প্রার্থনায় অঘটন? ও আকাশ-কুসুম—হয় না!" কিন্তু তাঁদের অজ্ঞ হাসির বিজ্ঞ রায়ে আমি হাসি আরো উঁচু পর্দায়। মনে পড়ে টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা: More things are wrought by prayer than the world dreams of."
একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি আমি যে জানি, তাই তো না মেনে পারি না, আর মানতে হয়েছে চোখের জলে—কেন, কীভাবে হয়ত কোনোদিন লিখব—অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করাতে নয় যে, ভগবান্ ডাকলে সাড়া দেন, বিশ্বাসীদের জন্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কিঞ্চিৎ দস্তাবেজ রেখে যেতে। কিন্তু সে অন্য কথা, যা বলছিলাম।

ডাকতে ডাকতে মনে বল এল বটে, কিন্তু কুণ্ঠার রেশ একটু রয়েই গেল যে, মামিমাকে কথা দিয়ে সত্যরক্ষা না করলে মিথ্যাচার হবে নাকি? অমনি কে যেন কানে কানে বলল: "না—কারণ বড় সত্যের জন্যে ছোট সত্যকে ছাড়ার নাম মিথ্যাচার নয় বরং সেই হ'ল খাঁটি সত্যবরণ। সঙ্গে সঙ্গে সব দ্বিধা অন্তর্দ্বন্দ্ব উবে গেল মুহূর্তে—সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত—এক গভীর কৃতজ্ঞতায় মন নীল নিটোল হয়ে উঠল: ঠাকুর ডাকলে সাড়া দেন না কে বলে? আমি তৎক্ষণাৎ উঠে একটি কাগজে লিখলাম: "মামিমা কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি! মুখে তোমাকে বলতে পারলাম না কেননা অন্তরে এখনও দুর্বল বোধ করছি, তুমি ফের চোখের জলে উপরোধ করলে হয়ত টাল সামলাতে পারব না......" এই ধরনের কয়েকটি ছত্র লিখে দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম: "মাজিকো দেনা।" দরোয়ান একটু আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে চাইতেই চম্পট। ক্যামাক স্ট্রীটের মোড় অবধি হন হন ক'রে হেঁটে এক ট্যাক্সি নিয়ে বললাম: "চলো—বিডন স্ট্রীট।"

বিডন স্ট্রীট পেরিয়েই ঈশ্বর মিলের লেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে হাজির সোজা সত্যেনের ঘরে।

ঠিক দুপুরে আমাকে হন্ত দন্ত হয়ে আসতে দেখে সত্যেন তো অবাক্: "কী রে? এমন অসময়ে?" আমি তো বলার জন্যে আকুলি বিকুলি করছি—সত্যেনের কাছে আত্মকাহিনী খুঁটিয়ে বলার আনন্দময় অভিজ্ঞতা সে কি ভুলবার? কন্‌ফেশনের মধ্যে দিয়ে চিত্তগ্লানি কীভাবে কাটে আমি প্রথম শিখি যে এই দরদীটিরই মাধ্যমে। অথ ব'লে চললাম—যা যা ঘটেছিল।

সত্যেন শুনে হেসেই অস্থির: "যঃ পলায়তি স জীবতি! হাঃ হাঃ হাঃ।"

এ-বিবৃতির মধ্যে কল্পনার রঙের ছোপ একটু আধটু নিশ্চয়ই লেগেছে—কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি ইচ্ছে ক'রে কিছু বানিয়ে লিখেছি। আমি আজো পিছন দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাই সেদিনকার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—সংকটে প'ড়ে প্রার্থনা করতে না করতে সংকটমোচন! সত্যেনের এ-ব্যাপারটি মনে আছে কিনা কেমন ক'রে বলব—হয়ত নেই—এক্ষেত্রে তার গায়ে তো আর আঁচ লাগেনি—তাই সে ভুলে গিয়ে থাকতেও পারে। কিন্তু যার প্রাণ নিয়ে টানাটানি সে ভুলবে কেমন ক'রে?

এরকম ঘটনা আরো হ'ত। একবার সুভাষের ওখানে গিয়েছিলাম ঠিক এই-রকমই আর একটি সংকটে—যেকথা ইতি-পূর্বে বলেছি। মামিমা মাসিমারা চক্রান্ত ক'রে মাঝে মাঝে বিবাহযোগ্যা কিশোরীকে নিমন্ত্রণ করতেন থিয়েটার রোডে, আর আমি দিতাম চম্পট।

শেষে মামিমাও হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন: "আমার একমাত্র ভরসা এখন কি জানিস?"

আমি (হেসে): মধুসূদন?

মামিমা: না। প্রমথবাবু।

আমি (সবিস্ময়ে): প্রমথ চৌধুরী?

মামিমা আমার চেয়েও বিস্মিত হলেন, বললেন "তুই কি বলতে চাস যে, তুই জানিস না?"

আমি: কী?

মামিমা: যে প্রমথবাবু ঠাকুরবাড়ির প্রজাপতি—ঘটক গো ঘটক, না আরো খুলে বলতে হবে? তাঁর ওখানে তোকে ও আরো সব চিরকুমারকে এত ঘন ঘন নেমন্তন্ন করেন কেন শুনি?

আমি সত্যিই আকাশ থেকে পড়লাম—বিশ্বাস না ক'রে মামিমাকে ধমকে বললাম: "মামিমা! তোমাদের মেয়েদের অনেক কিছুই ভালো কেবল এই সন্দেহ বাতিকটা বাদ।"

উত্তরে মামিমা আমাকে যা বললেন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—সব বলার দরকার নেই, কেবল তার মর্মটুকু এই যে, প্রমথ-বাবুর সাহিত্যকুঞ্জে ঠাকুরবাড়ির অনেক কুমারীরই বিয়ের ফুল ফুটেছে গত কয় বৎসরে। মামিমার সঙ্গে তর্ক বাধাব কি? এক এক ক'রে তিনি তিন চারটি ফ্যাক্ট অপ্রতিপাদ্য "ডেটা" দিয়ে তিনি আমাকে নাজেহাল ক'রে ছাড়লেন। হার মেনে শেষটায় হেসে বললাম: "মামিমা! এই তোমাকে আমি কিনা ভেবেছিলাম—সরলা বালা? তোমার পেটে পেটে এত?

মামিমা (পিঠ পিঠ): আর তুমিও কিছু কম যাও না বাবা! ডুবে ডুবে জল খাও। যেন দেখ নি প্রমথবাবুর রসচক্রে দিনের পর দিন যেসব সরলা বালা উঁকি ঝুঁকি মারেন তাঁর আর যারই গন্ধে আসুন না কেন, সত্যিতোর গন্ধে মধু খেতে এসে গান গেয়ে শুরু করেন না।

আমি মামিমার বক্রোক্তিটি অবশ্য একটু রং চং দিয়ে বললাম, কিন্তু মামিমা ঠাট্টা ক'রে যা বলেছিলেন ও হাতে হাতে উদাহরণ দিয়ে আমাকে নির্বাক করেছিলেন তার মোদ্দা কথাটা ছিল যে, একথা হলপ ক'রে বলতে পারি।

মামিমার বাণী কিন্তু হয়েছিল লক্ষ্য-ভেদী। ফলে আমি অতঃপর প্রমথবাবুর ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিলাম—খানিকটা বাধ্য হয়েই বলব, কেননা একের পর এক তিন তিনটি সম্বন্ধ এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। দিদিমা সেকেলে গিন্নী পুরোদস্তুর হিন্দু, বললেন: "ওদের দিকে ঘেঁষিস নি মণ্টু। ওরা হ'ল পিরিলি—আমরা হিন্দু—দা কুমড়ো বুঝলি। তাছাড়া, তুই পিরিলি বিয়ে করবি কী দুঃখে? তোর ভাবনা কি? ঐ তো রয়েছে অমুক রাজমিস্ত্রীর মেয়ে ডানাকাটা পরী, কিংবা আমার শ্রীরামপুরের সইয়ের মেয়ের মতন ফর্সা মেয়ে, কিংবা অমুক এঞ্জিনীয়ারের ফিটফাট মেয়ে—লাখ টাকা যৌতুক দেবে রে—আর সে মেয়ে ঘরকন্না করতেও জানে, ঘোড়ায় চড়তেও জানে......।"

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

পাক্ প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ একটি ফর্মান জারী করিয়াছেন, অতঃপর বার্ষিক পাঁচ টাকা জমা দিয়া ভিক্ষুকদিগকে লাইসেন্স নিতে হইবে।

বিশু খুড়ো বলিলেন, "রাজনৈতিক ভিক্ষুকরা এই ফর্মান-এর আওতায় পড়বেন কি না, তা অবশ্য পরিষ্কার করে বলা হয়নি।

• • •

আয়ুব শাহী অন্য একটি ফর্মানের কথা মনে পড়িল। ইহাতে বলা হইয়াছে, পাকিস্তান হইতে কেহ ভারতে আসিবার সময় যত টাকা সঙ্গে লইয়া আসিবেন, ফিরিয়া যাইবার সময়ও ঠিক তত টাকাই সঙ্গে লইয়া ফিরিতে হইবে। আমাদের শ্যামলাল বলিল, "ভাইছাব বোধ হয় ভারতের গোপালদাদার দধিভাণ্ডের গল্প পড়েছেন বা শুনেছেন!"

• • •

সেন্টডিয়াম প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপসংহারে বলা হইয়াছে—"মানুষের দুর্ভোগ সহ্য করিবার সীমা আছে।" আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন, "তা হয়ত আছে; কিন্তু একথা মানুষের বেলাতেই খাটে, বাঙ্গালীর বেলায় নয়। বাঙ্গালীর ধৈর্য্য অসীম!!"

• • •

দিল্লীর এক সংবাদে শুনিলাম কারখানা পাহারা দেওয়ার জন্য অতঃপর কুকুর নিযুক্ত করা হইবে। "কুকুর আর বেকার থাকবে না। মহাশূন্যে পাঠাতে কুকুর, আসামী ধরার কাজে কুকুর, কারখানা পাহারায় কুকুর। সারমেয় যুগ বললে ভুল হয় না! তা ভালোই হলো, কুকুরদের একটা মস্ত বড় গুণ, তারা বহ্বাশী স্বল্প সন্তুষ্ট। সুতরাং দাবী জানাবার মিছিলের সম্ভাবনা আর থাকবে না"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

আমাদেরই কাগজ "আনন্দবাজারের" একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—"অরণ্যের বীর"। প্রবন্ধে বলা হইয়াছে -সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকদের অযথা বীর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক বলিতেছেন—তার চেয়ে বরাহ বীর, সে মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। আমাদের খুড়ো বলিলেন—"অকুতোভয় হয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকাই সব সময় বীরত্বের নিদর্শন নয়। যঃ পলায়তি নীতিও আছে। আমরা বরং শেয়ালের সম্মান দেব। শেয়াল বলে—ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। সুতরাং অরণ্যের বীর হলো শেয়াল। তাছাড়া "শেয়ালী পাতা"ও একটি মস্ত বড় গুণ। এযুগে মানুষেরও তা শিক্ষনীয়।"

• • •

একটি জোর খবরে জানা গেল ছোহরাবর্দি ছাহেব অতঃপর সিনেমার প্রযোজক হইবেন। শ্যামলাল বলিল, "ভাই

ছাব যদি হিরোর পাট নিজে নেন, তা হলে প্রডাকসন খরচাও কম হবে। পর্দায় না হলেও বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর অভিনয় কৌশল অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।"

• • •

অন্য এক খবরে একটি ছিনতাই দলে নারী সঙ্গিনীর কথা পড়িলাম। সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, আজব শহর কলিকাতায় মেয়ে-পকেটমার ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু ছিনতাই দলে নারী এই প্রথম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সংবাদদাতা হয়ত অবিবাহিত। কিংবা হলেও তেমন পাল্লায় পড়েননি। ছিনতাই-র কাজে নারী মোটেই নূতন সংবাদ নয়!"

• • • •

কলিকাতায় শুনিলাম হৃৎস্পন্দন ফিরাইয়া আনিবার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে। আবিষ্কারক দাবী জানাইয়াছেন ইহা কলিকাতায় নূতন।—"কিন্তু শুধু স্পন্দন কেন, গোটা হৃদয়টি দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে আনার কৌশল আমরা বহু আগেই আয়ত্ত করেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

মার্কিন-ধর্মযাজক ডাঃ গ্রেহাম রাশিয়া আর বিলাতের পার্কের একটি তুলনামূলক বিবৃতি দিয়াছেন। বলিয়াছেন—মস্কোর একটি পার্কে দেখিয়াছি

তরুণ-তরুণীরা জড়ো হইয়াছে, হাত ধরাধরি করিয়াছে, কিন্তু তাদের আচরণ সংযত ও শোভন। আর লণ্ডনের পার্কগুলি যেন শয়নকক্ষে পরিণত হইয়াছে।—"এই সঙ্গে মার্কিন-এর পার্ক সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানালে তুলনাটা জুৎসই হতো"—বলেন এক সহযাত্রী।

• • •

ইউরোপের তিনটি দেশে তিনটি রূপকথা সোসাইটির শতবার্ষিকী উৎসব হইয়া গেল। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"কিন্তু যে যা-ই বলুন, আমাদের মতো রূপকথাকে রূপ দিতে কেউ পারেন নি। আমাদের রূপকথার সাড়ে সাত চোর হালের রূপায়নে সাড়ে সাতান্নতে দাঁড়াইয়াছে"!!

• • •

খাদ্যমূল্য বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাতে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট খাদ্যশস্য সরবরাহ করার সুবিধা হইবে:—"আমি শুধু দরিদ্র জনসাধারণের কথাই ভাবিতেছি"। বিশুখুড়ো বলেলিন—"দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় শরীর ও মন ভাঙিয়া পড়ে। সুতরাং এবংবিধ কার্য হইতে বিরত থাকিয়া সদা প্রফুল্ল থাকাই সমীচীন"!!

না, ধন্যবাদ
আমি একমাত্র
আমুল
মাখন চাই
লোভনীয় আস্বাদন ও অত্যন্ত টাট্‌কা বলে আমুল মাখন বয়স নির্বিশেষে সকলেরই প্রিয়। বিশুদ্ধ টাটকা সুস্বাদু ক্রীম থেকে সারা বছর ধরে একই ভাবে তৈরী করার জন্য আমুল মাখনের গুণাগুণ পরিবর্তনহীন। আমুল মাখন পুষ্টিকর, শক্তিবর্দ্ধক, স্বাস্থ্যপ্রদ। বিদেশী ডেয়ারী-বিশেষজ্ঞরা আমুল মাখনকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাখন বলে যে পরিগণিত করেছে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।
৩॥ আউন্স, ৭ আউন্স এবং ১ পাউণ্ডের প্যাকেটে পাওয়া যায়, এছাড়া আপনার সুবিধার জন্য ৬ আউন্স এবং ১ পাউণ্ডের টিনেও পাবেন।
STORES
FOR BETTER BUTTER
Amul
PASTEURISED
BUTTER
নামোল্লেখ করে আমুল মাখন চাইবেন
কৈরা ডিষ্ট্রীক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসারস্ ইউনিয়ন লিমিটেড, আনন্দ (পশ্চিম রেলওয়ে)
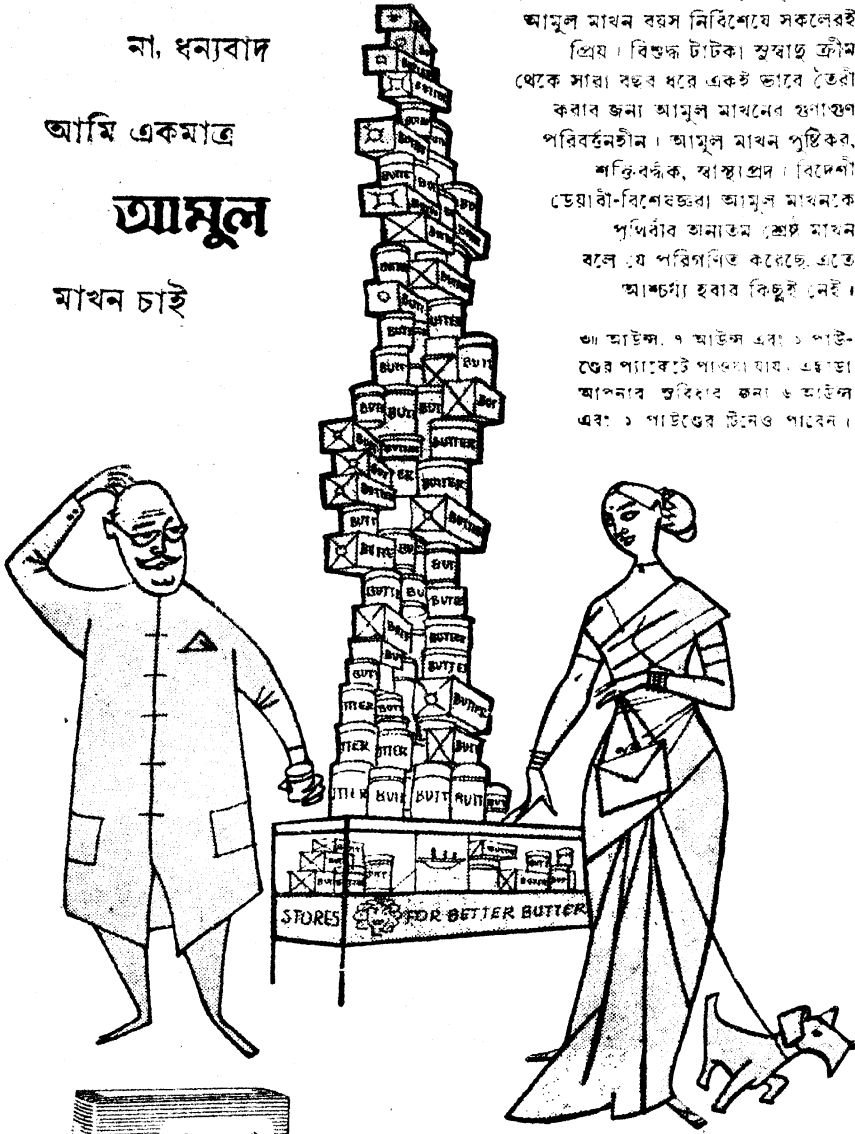
তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

॥ ২ ॥

বাথরুম খুবই ছোট। চৌবাচ্চা দেখলেও মনে হয় না যে, জন-দশেক লোকের নাইবার মত জল ওতে ধরে। কিন্তু এ অঞ্চলে নাকি জলের অভাব নেই। চৌবাচ্চা খালি হবার সঙ্গে সঙ্গে ভরে ওঠে। কিংবা খালি হবার অবকাশ পায় না। না পেলেই ভাল। মেদিনীপুরের পাণ্ডববর্জিত যে জায়গাটায় অসীম এবার বদলী হয়েছে, সে অঞ্চল নদীনালা থেকেও বঞ্চিত। জলের ভারি কষ্ট। সারা গাঁয়ে একটিমাত্র পুকুর। যে জলটুকু থাকে তা নিয়ে মেয়েপুরুষে গরু-মোষের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি লেগে যায়। পাথুরে জায়গা বলে টিউবওয়েল বসাবার জো নেই, কেউ কোনদিন বসাবার চেষ্টা করেছিল কিনা অসীম জানে না। কিন্তু এক ঘটি জলের জন্যে মানুষের সেই মরণ-পণ যুদ্ধ সে প্রায় রোজ প্রত্যক্ষ করে। জলের আর এক নাম যে জীবন তা এইসব অঞ্চলে না এলে বোঝা যায় না। ধানের তৃষ্ণা, জমির তৃষ্ণা, গোরুর তৃষ্ণা কোন তৃষ্ণার চেয়েই যে এক ঘটি জলের তৃষ্ণার নিবৃত্তি জীবনধারণের তুলনা হয় না, তা অসীম এখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখেছে। দেখেছে আর মনে মনে ভেবেছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে এমন মরুভূমিও আছে। অবশ্য চেয়ে দেখা ছাড়া সে কিছুই করতে পারে না। সরকার তাকে জলকষ্টের দিকে চোখ রাখতে তো আর পাঠান নি, পাঠিয়েছেন যাতে ধান-চাল নিয়ে চোরাকারবার না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে, পাঠিয়েছেন কালোবাজারে টর্চের আলো ফেলতে। সে যথাসাধ্য তাই করে, দুর্নীতি দমন করে।

তার জন্যে প্রায় আধ-চৌবাচ্চা জলই ধরা আছে দেখে খুশি হল অসীম। তাছাড়া আরো এক বালতি জল কে যেন রেখে দিয়েছে। মানসী কি? না মানসী নিজের হাতে কিছু করতে চায় না। নিজের হাতে শুধু চিঠি লিখে মনের ইচ্ছাটা জানায়। কিন্তু তার যা করবার কথা তা করে তার ভাই-বোনেরা। মানসী বোধ হয় যতটুকু দিয়েছে তার চেয়ে বেশি ধরা দিতে চায় না। তা যদি নাই চায় এখানে তাকে ডাকতে বলেছিল কে। সে যদি লুকিয়েই থাকবে তাহলে স্টেশনে গিয়ে কেন অত বাহাদুরী করেছিল।

যেমন ছোট চৌবাচ্চা তেমনি ছোট মগ। এতে ওদের গা ভেজে কি করে। দু-এক মগ করে জল ঢালতে লাগল অসীম। তার নিজের থানাতেও জলের বালতি আর মগ এর চেয়ে বড়। সেখানেও তোলা জলে স্নান করবার সৌভাগ্য আছে সাব-ইন্সপেক্টরের। চাকর আছে, সে অনুপস্থিত থাকলে আছে দারোয়ান কনস্টেবলের দল। সবচেয়ে যে অভাজন অসীম তার নিচেও মানুষজন আছে। এইটুকুই সুখ। সুখ নয় সান্ত্বনা। তুমি যতই ছোট হও না কেন তোমার চেয়েও ক্ষুদ্রতর বঞ্চিততর মানব-সন্তান পৃথিবীতে আছে। শুধু নিচের দিকে একবার তাকাতে পারলেই হল, তোমার সব দুঃখ-শোকের সান্ত্বনা মিলবে, সব হীনমন্যতার অবসান হবে। তুমি দেখবে প্রাণিজগতে পোকামাকড় আর কীটপতঙ্গের অভাব নেই। তুমি তাদের চেয়ে দু-এক ধাপ উঁচুতে আছ। মানসীর বাবা মনো-মোহনের কথা মনে পড়ল অসীমের। যাদের দেখলে মাত্র দুখানা ঘর, হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ তাদের সান্ত্বনা দেয়, আত্ম-প্রত্যয় বাড়ায়, দয়া আর সহানুভূতি জাগিয়ে হৃদয়কে উদার করে। ধনীদের হৃদয়বৃত্তির চর্চার জন্যেই তো গরীবদের রাখতে হয়েছে। অসীম হাসল।

'ভাল করে সাবান মেখে চান করো। ওখানে সব আছে।' উৎকর্ণ হল অসীম। ভিতরের জল ঢালার শব্দ ছাপিয়ে আর একটি কলধ্বনি ভেসে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই কি মানসীর গলা? না-ও হতে পারে। ওর দিদি আর ছোটবোনদের গলার স্বরও ওইরকমই। হতে পারে মাধুরীই কথাটা বলেছে।

অসীম আন্দাজেই জবাব দিল, 'সব যে আছে তা জানি।'

বাইরে থেকে পালটা জবাব এল, 'কই আর জানো। বলে না দিলে তোমার কি কিছু আর চোখে পড়ে?'

'কেন আমি কি এমনই তালকানা।'

একথার আর কোন জবাব এল না, শুধু চলে যাওয়ার শব্দটুকু শোনা গেল। হয়তো আর কেউ এসে পড়েছে।

সাবান-মাখা ভিজে তোয়ালে গায়ে মুখে ঘষতে ঘষতে নতুন তোয়ালে সবুজ সাবান-দানি, গন্ধতেলের শিশি তাকের ওপর কে যে গুছিয়ে রেখে গেছে, তা অনুমান করতে দেরি হয়নি অসীমের। মাইনেকরা চাকরের হাতে যে এমন শ্রী ফোটে না, তা তো সে রোজই দেখে। তবু যেন ওটুকুর দরকার

ছিল। হাতের যন্ত্র ছাড়িয়ে বাড়তি ওই গলার যন্ত্রটুকুর। শুধু প্রাপ্যটুকু পেলেই কি মন খুশি হয়? প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু না পেলে মনে হয় কিছুই পেলাম না। এই উপরি পাওনার লোভ যেদিন যাবে, সেদিন হয়তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই থাকবে না, সেদিন জল ছাড়াই জীবন বাঁচবে; কিন্তু সে জীবন মানে নিশ্চয়ই এ জীবন নয়। এই মুহূর্তে অসীমের কাছে সেই নিস্পৃহ নিরাসক্তির অর্থ মৃত্যু।

'অসীমদা, হল আপনার? কত আর নাইবেন? ক্ষিদে পায়নি?'

নন্দুর গলা।

অসীম হেসে স্বীকার করে বলল, 'পেয়েছে—আসছি। আর এক মিনিট।'

'ছিঃ ও কি অসভ্যতা নন্দু। অত যদি গরজ থাকে দোতলার পিসুদের বাথরুম থেকে তুই নেয়ে আয় না। অমনিতে তো মাথা কুটলেও তোকে জলের কাছে নেয়া যায় না; কিন্তু আর কেউ যদি বাথরুমে ঢুকল তুই দু-মিনিট বাদে বাদেই তাড়া দিবি। আচ্ছা ছেলে হয়েছিস একজন।'

অসীম শুনতে পেল মাধুরী ছোট ভাইকে ধমকাচ্ছে।

কাপড় ছেড়ে অসীম এবার বাইরে এল। একবার ভাবল ভিজে কাপড়খানা নিজেই ধুয়ে আনবে কিনা। এদের তো চাকরবাকর নেই। তাছাড়া মানসীরা ব্রাহ্মণকন্যা, আর সে বৈদ্য। কথাটা মনে হতে অসীমের হাসি পেল। এই ভেদবুদ্ধি আর তাদের মধ্যে নেই। জাতে এক ধাপ নিচু হলেও মানসী অসীমকে জলচল করে নিয়েছে। জল অর্থে এখানে শুধু জীবন নয়, জীবন-রস। যে তা নিতে পারে অসীমের কাপড়-খানা ধুয়ে দিলে নিশ্চয়ই তার জাত যাবে না।

অসীম বেরিয়ে আসবার পরেও মাধুরী আর নন্দুর বিতর্ক থামল না। মেজদির ধমকের জবাবে নন্দু বলতে লাগল, 'কেন, তাতে কী দোষ হয়েছে? অসীমদা তো অতিথিও নয় কুটুম্বও নয়, আপন জন। নিজেদের। ও'র সঙ্গেও কি ভদ্রতা করতে হবে নাকি? কি বলুন অসীমদা?'

অসীম হেসে বলল, 'ঠিক বলেছ।'

মাধুরী বলল, 'তোকে ভদ্রতাও করতে হবে না, তর্কও চালাতে হবে না। চট করে নেয়ে আয়। নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।'

নন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'অমন দুঃখটুকুকের কথা এখন আর বলো না মেজদি। আমার পরীক্ষার রেজালটা বেরিয়ে যাক তারপরে যত অভিশাপ দিতে হয় দিয়ো।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আচ্ছা Super-stitious ছেলে তো। তুই না সায়ান্স পড়ছিস? এমন অবৈজ্ঞানিক মন কেন তোর?'

নন্দু বলল, 'কে যে কত বড় বৈজ্ঞানিক আমার জানা আছে। বিপদে পড়লে মনে মনে সবাই মা কালীর কাছে নাকে খত আর জোড়া পাঁঠা মানত। আমারও এই বিপদের কটা দিন কেটে থাক—।'

ঘরে এসে গেঞ্জির ওপর ফের পাঞ্জাবিটা পরতে যাচ্ছিল অসীম। মনোমোহন বাধা দিলেন, 'এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে আবার জামা গায়ে দিচ্ছ কেন অসীম। খুলে ফেল খুলে ফেল। দেখ না আমি কেমন খালি গায়ে আছি। তুমিও ঘরের ছেলের মত। লজ্জা কি তোমার। আসল লজ্জাটা কিসের জন্যে হওয়া উচিত জানো? জামা-জুতো না পরতে পারার জন্যে নয়, স্বাস্থ্য ভাল রাখতে না পারাটাই মানুষের আসল লজ্জা। কিন্তু তোমাদের নাগরিক সভ্যতা তো স্বাস্থ্য রক্ষা করতে শেখায় না। শেখায় ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের আড়ালে কি করে রোগ-ব্যাধি অস্বাস্থ্যকে চাপা দিতে হয়। কি করে ঈর্ষা-দ্বেষ আর মনের হাজার রকমের কু-অভিসন্ধিকে মিঠে বুলি আর মিষ্টি হাসির পোশাক পরিয়ে—'

সুহাসিনী আবার এসে এক কড়া ধমক লাগালেন, 'আচ্ছা জ্বালা হয়েছে তোমাকে নিয়ে। ছেলেটা আসতে না আসতে তার কান ঝালাপালা করে দিলে। যাও, তেল মেখে দু-মগ জল ঢেলে মাথাটা ঠাণ্ডা করে এসো।'

তারপর অসীমের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'একেবারে স্কুলের ছেলের মতন করেছে দেখছি। আর যা একজন মাস্টার-মশাই আছেন আমাদের বাড়িতে। সবাই তাঁর ছাত্র-ছাত্রী। শুধু কি তাই? পাড়া-পড়শী অতিথ-কুটুম্ব যাকে সামনে পাবেন, তাকে ধরে রেখে লেকচার ঝাড়বেন।'

মনোমোহন কি একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, সুহাসিনী বলছেন, 'আবার কথা বলছ তুমি? যাও, নাইতে যাও। তুমি না হয় পৃথিবী উদ্ধার করতে এসেছ, কোন ক্ষিদে-তেষ্টা নেই, কিন্তু আর মানুষের সেসব আছে। ছেলেটা সেই কাল রাত্রে খেয়ে বেরিয়েছে, আর আজ বেলা দুপুর। গাড়ির ভিড়ে রাত্রে নিশ্চয়ই ঘুমুতে পারে নি। তোমার যদি কোনরকম কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে।'

মনোমোহন আর দ্বিরুক্তি না করে বাথ-রুমের দিকে এগোলেন। স্ত্রীকে আর ঘাটাতে সাহস পেলেন না।

অসীম হেসে বলল, 'আপনি বুঝি মেসো-মশাইকে খুব বকেন?'

সুহাসিনীও হাসলেন। 'মাঝে মাঝে ধমক দিতে হয় বাবা। দিনরাত যা বক বক করেন। মাথাটা আঁচড়ে নাও। ও মঞ্জু, তোর অসীমদাকে আয়না-চিরুনি দিয়ে যা। না হয় ও-ঘরে গেলেও তো পারো। ওঘরে বড় আয়না আছে। ড্রেসিং টেবিল। মানসী কোত্থেকে যেন সস্তায় কিনে এনেছে। তা দেখে তোমার মেসোমশাইর কি রাগ। কত-গুলি টাকা বিলাসিতার জন্যে নষ্ট হ'ল। শোন কথা। তোমার না হয় মাথাভরা টাক, তোমার কাছে একখানা চিরুনিও বিলাসিতা। কিন্তু আমার মেয়েদের তো তা নয়। চুল বাঁধবার জন্যে তাদের তো ওসব দরকার। গরীবের ঘরে ওদের কতটুকু সাধ-আহ্লাদই বা মেটে।'

অসীমকে ওঘরে যেতে হল না, মঞ্জুই আয়না-চিরুনি নিয়ে এঘরে এল। আয়না ছোট হলেও চিরুনিখানা বেশ বড়। বেশ চেনা যায় মেয়েদের মাথার চিরুনি। বড় একগাছা চুল ঘন দাঁতগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এ চুল মানসীরও হতে পারে।
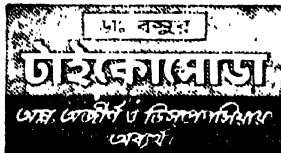
চিরুনির দিকে সুহাসিনীরও চোখ পড়ল। তিনি মেয়েকে বললেন, 'তোদের এ কোন দেওয়ার ছিরি রে মঞ্জু। চুলটুল সুদ্ধ চিরুনিটা দিয়ে দিলি? দাও অসীম, আমি পরিষ্কার করে দিই।'

অন্তত এক্ষেত্রে বেশি পরিচ্ছন্নতা অসীমের অভীপ্সিত নয়। সে বলল, 'থাক না মাসীমা।' কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারল না। পাছে তিনি কিছু মনে করেন। পাছে ভাবেন ওই একগাছি চুলের সঙ্গে অসীম নিজের ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে ফেলেছে।

সুহাসিনী অসীমের হাত থেকে চিরুনিখানা প্রায় কেড়ে নিয়ে আঁচল দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে দিলেন। অসীম মনে মনে ভাবল মেয়েদের আঁচল কখনো ঢাকে, কখনো মোছে। আঁচলকে এ ধরনের কাজে লাগাতে মানসীকেও দেখেছে অসীম।

তার হাতে চিরুনি ফিরিয়ে দিয়ে সুহাসিনী উঠে গেলেন। বললেন, 'যাই তোমাদের খাবার জায়গা করে দিই গিয়ে। উনি যদি বেশি দেরি করেন পরে খাবেন। তোমরা আগে বসে যাও।'

মঞ্জু সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবশ্য এখনো আঁচলের অধিকারিণী হয়নি। তবে করে দিলেই হয়। বয়স বছর পনের ষোল হবে, গড়নও বাড়ন্ত। তবু ফ্রক ছাড়েনি। আজকাল নাকি ফ্রকপরা মেয়েকে কলেজের ফার্স্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারে দেখা যায়। কেন ফ্রকের ওপর এত মায়া? বয়সটা কম দেখাবে বলে, নাকি নিয়মিত শাড়ির জোগান দেওয়া সহজ নয় বলে? হয়তো শেষ কারণটাই এদের বেলায় সত্য।

অসীম মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন্ ক্লাসে পড় মঞ্জু? স্কুলে আছ না কলেজে চলে গেছ? আজকাল চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করা শক্ত।'

মঞ্জু হেসে বলল, 'আমি স্কুলেই আছি। ক্লাস টেন। মায়াদি আই-এ দিয়েছে। ও আমার চেয়ে তিন বছরের বড়।'

অসীম বলল, 'তাই নাকি? বেশ বেশ। আচ্ছা তোমাদের প্রত্যেকের নামই বুঝি ম দিয়ে? পঞ্চ ম কার?'

ব'লে অসীম নিজেই অপ্রতিভ হল। কথাটার মানে যদি মঞ্জুর জানা থাকে, তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

মঞ্জু বলল, 'পঞ্চ কেন হবে? আমরা সাত বোন। পঞ্চ বাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র। আমরা সাত সমুদ্র?'

অসীম হেসে বলল, 'বেশ বেশ। কিসের সমুদ্র মঞ্জু? দুধের না মধুর?'

মঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী জানি।'

মানসী এসে ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপ শুনছিল, এবার আত্মপ্রকাশ করে বলল, 'দুধেরও নয়, মধুরও নয়। বলতে পার আলকাতরার সমুদ্র। যা সব গায়ের রঙ আমাদের।'

অসীম তার দিকে চেয়ে বলল, 'মোটেই না। শ্যামবর্ণা আর আলকাতরা-বর্ণা এক নয়। আর তুমি কিনা আমাকে বল বিনয়ের অবতার।'

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'চল, মা ডাকছেন। ও-ঘরে জায়গা করা হয়েছে।'

এ ঘরখানা আগের ঘরের চেয়ে যে আকারে বড় তা নয়, তবে জিনিসপত্র অনেক কম। দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি ড্রেসিং টেবিল, একখানা চেয়ার। ঠেলে একেবারে তলায় সরিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে একটি সস্তা দামের বইয়ের র‍্যাক। উল্টো-দিকের দেয়ালে কয়েকটা বাক্স-সুটকেস ঠেস দেওয়া রয়েছে।

মেঝেয় মুখোমুখি দুটি সারিতে কয়েকখানি আসন পাতা হয়েছে। কাঁচের গ্লাসে টল টল করছে জল। মনোমোহন এরই মধ্যে স্নানটান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছেন। কালো রঙের ওপর শাদা পৈতেটা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তিনি সবচেয়ে বড় আসনখানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো বাবা বোসো।'

মাধুরী মানসী আর তাদের মা বাদে সবাই পংক্তিভোজনে জায়গা পেয়েছে। প্রবীণ বলে

মনোমোহনকে একটু আলাদা করে সরিয়ে দিয়েছেন সুহাসিনী। অসীমের একপাশে নন্দু, আর এক পাশে মঞ্জু, তাদের পাশে মায়া আর মিনু।

সুহাসিনী নিজেই প্রধান পরিবেশিকা। মাধুরী আর মানসী তাঁর জোগান দিচ্ছিল।

মাধুরী এক ফাঁকে বলল, 'তুইও বসে গেলি পারতি মানু। ঘরে জায়গাও রয়েছে। তাছাড়া যা দেবার মা আর আমিই তো দিতে পারতাম।'

মানসীর মুখখানা কি একটু আরক্ত হল? মাধুরীর কথার মধ্যে কি কোন বক্রতা আছে, কি একটু প্রচ্ছন্ন পরিহাস? ভাতের থালা থেকে মুখ তুলে আড়চোখে দুজনের দিকেই তাকাল অসীম। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। মানসীর সঙ্গে হোটেলে রেস্টুরেন্টের টেবিলে মুখোমুখি বসে খেয়েছে অসীম। কিন্তু এই পারিবারিক ভোজের আসরে সেভাবে খেতে বসতে মানসীর বোধ হয় লজ্জা করছে। এতই যদি সংকোচ অসীমকে এখানে ডাকবার কি দরকার ছিল। এর চেয়ে দক্ষিণ কলকাতার বন্ধুর বাসায় উঠলেই সে বোধ হয় ভাল করত। দেখাসাক্ষাৎ মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা বেশি হত। অন্যান্যবার যেমন হয়েছে। এখানে কাছাকাছি থাকলেও গুরুজন আর লঘুজনের চোখ এড়িয়ে মানসী কাছারই বা তার সঙ্গে কথা বলতে পারছে—ধরা-ছোঁয়া দূরে থাক কাছে এসে নিশ্চিন্তে দাঁড়াতেই কি পারতে দু-এক মিনিটের জন্যে? এখানে বোকার মত মানসী তাকে কেনই বা ডাকল আর তারও এক ডিগ্রী বেশি বোকা সেজে অসীমই বা তাতে রাজী হয়ে গেল কেন।

সুহাসিনী বললেন, 'আমি তো বলছিলাম মাধু-মানু তোমরা দুজনেই বসে যাও। আমি একাই তোমাদের সবাইকে দিতে পারব। তা কেউ রাজী হল না। এ বলে তুই বোস, ও বলে তুই বোস।'

নন্দু বলে উঠল, 'ঠিক শঙ্খসাপের মত। জানেন অসীমদা, শঙ্খসাপের দুটি করে মুখ। একটি লেজের দিকে, আর একটি মাথার দিকে। এ মাথা বলে তুই খা ও মুখ বলে তুই খা। মেজদি সেজদি তোমার দুই শাঁখিনী মা।'

সুহাসিনী মৃদু হেসে ছেলেকে সস্নেহে ধমক দিলেন, 'ছি ছি ছি নন্দু, দিদিদের ওসব কথা বলে নাকি? দিদিরা না গুরুজন?'

মানসী বলল, 'আর তোর না পরীক্ষার ফল এখনো বেরোন বাকি?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অসীমও হাসল।

একটু বাদে সুহাসিনী বললেন, 'কই বাবা, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। মুড়ি-ঘণ্টটা তো পড়েই রইল। ঝাল বেশি হয়েছে নাকি অসীম?'

অসীম বলল, 'ঝাল ঠিকই আছে মাসীমা। একটুও বেশি হয়নি। কিন্তু এত রান্না করেছেন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা খাব ভেবে পাচ্ছিনে। চমৎকার হয়েছে রান্না।'

মাধুরী বলল, 'সরষে বাটা দিয়ে ইলিস মাছটা মানু রেঁধেছে অসীমদা।'

মানসী ছোট মেয়ের মত প্রতিবাদ করে উঠল, 'এই দিদি নিজে রেঁধে আমার নাম দিচ্ছ, মোটেই ভাল হবে না কিন্তু। আমি ভাল রাঁধতে পারিনে কিনা তাই আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।'

মাধুরী বলল, 'ঠাট্টা করব কেন, তুইও তো কাছে কাছেই ছিলি, রান্নার সময় জোগান দিয়েছিস, তেল-নুন-ঝালের পরিমাণ বলেছিস—।'

অসীম হেসে বলল, 'ঠিক সেই জন্যেই ইলিশ মাছ পাতুরিতে তোমাদের দুজনের হাতেরই গন্ধ পাচ্ছিলাম।'

নন্দু বলল, 'আমিও পাচ্ছি অসীমদা। নাকের দুটো বাঁসি থাকায় খুব সুবিধে হয়েছে। দুখানা হাতের আলাদা আলাদা গন্ধ বেশ ধরা পড়ে।'

আর একবার হাসির রোল উঠল।

মাধুরী হাসি চেপে বলল, 'ভারি ফাজিল হয়েছিস তো নন্দু। বড্ড বাড় বেড়েছে তোর।'

একটু দূরে বসে নিজের মনেই খেয়ে যাচ্ছিলেন মনোমোহন। তাঁকে শ্রদ্ধা করে প্রবীণ পূজনীয় গুরুজন ভেবে সবাই দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাঁর সঙ্গে কেউ কথাও বলছে না, তাঁর কথা কেউ শুনতেও চাইছে না। এই মুখর ভোজের আসরে বিনাবাক্যে খেয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে এক বিষম শাস্তি। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিলেন, এবার পেয়ে গেলেন

'তোমাদের ওখানে মাছটাছ কি রকম সস্তা অসীম?'

অসীম বলল, 'সস্তা কি বলছেন মেসো-মশাই? মাছ মেলেই না সেখানে।'

মনোমোহন অবাক হয়ে বললেন, 'বল কি, মেলেই না! তাহলে খাও কি?'

অসীম বলল, 'ডিম, মাংস। মুরগী-টুরগী পাওয়া যায়।'

হঠাৎ চোখে পড়ল মানসীর তর্জনী তার দুই ঠোঁটে উঠেছে।

অসীম তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'পাওয়া যায় তবে সেসব জমাদার-টমাদাররাই খায়। আমার ভাগ্যে বেশিরভাগই ডিম-সেদ্ধ আর ভাত। কি বড়জোর ডিমের ঝোলটা কোনরকমে করে নিই।'

মনোমোহন বললেন, 'করে নাও মানে? নিজেই রাঁধো নাকি?'

অসীম বলতে লাগল। মাঝে মাঝে তাও রাঁধতে হয় অসীমকে। প্রথম প্রথম সহকর্মীদের সঙ্গে জয়েন্ট মেসিংএর ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সেই যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরাতে দেরি হয় নি। একেকজনের একেকরকমের রুচি। প্রবৃত্তিও একরকম নয়। অনেকেরই অভিযোগ খরচ বেশি পড়ে। তাই শেষ পর্যন্ত যার যার তার তার হয়েছে। অসীমও আলাদা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আদিবাসী একটি চাকর আছে। ঠাকুরও সেই। লোকটি ভাল। কিন্তু মাঝে মাঝে তার মাথা আর মতিগতির ঠিক থাকে না। বাঙালীবাবুর মাছ-মাংস রেঁধে দিলে তার জাত যায়। তাই বোধ হয় ফাঁকে ফাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে আসে। টাকায় সব পাপ ঢাকে। সে যখন থাকে না কি তার বদলে আর কাউকে যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, অসীম নিজেই রাঁধতে বসে যায়। কিন্তু হাতের কৃতিত্বের সঙ্গে জিভের রুচির মিল হয় না।

সুহাসিনী বললেন, 'কি করে পারবে তুমি। ওসব কি তোমাদের কাজ।'

মাধুরী বলল, 'দারোগাগিরি করবার সুখ তো মন্দ হয় নি অসীমদা। শেষ পর্যন্ত হাত পুড়িয়েও খেতে হচ্ছে।'

মনোমোহন বললেন, 'অত কষ্ট করবার দরকার কি। চেষ্টা করে বদলী-টদলী হয়ে চলে এসো। তাছাড়া যেখানে মাছ নেই, সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, মাছ ছাড়া তেমনি বাঙাল বাঁচে না। তুমি চলে এসো।'

সুহাসিনী সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই করো বাপু! এদিকে চলে এসো। বাপ নেই, মা নেই, এক বোন ছিল বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, অত কষ্ট তোমার কিসের জন্যে? ও চাকরি ছাড়া চাকরি আর নেই নাকি ভুভারতে? তুমি চলে এসো। হয়

অন্য চাকরি নাও, কি চেষ্টা-চরিত্র করে কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় বদলী হয়ে এসো। আর ওখানে যদি থাকতেই হয় একটা বিয়েটিয়ে কর, শান্তিতে বসে যার হাতের দুটি রান্না খেতে পারবে তেমন এক-জনকে ঘরে আনো।'

অসীম মাছের টক দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'সেইজন্যেই এসেছি মাসীমা।'

সুহাসিনী হেসে বললেন, 'তাই নাকি বাবা? বেশ বেশ। সুমতি হয়েছে বুঝি এতদিনে?'

রাশভারি মাধুরীর গলা পর্যন্ত এবার তরল হয়ে উঠল, 'ও মা তাই নাকি? এতক্ষণ এমন সুখবরটা চেপে রেখেছিলে কেন অসীমদা? বিয়ে করতে এসেছ? তাই বল। কোথায় সম্বন্ধ ঠিক হল?'

মাধুরী যত উজ্জ্বল মানসী তত গম্ভীর আর ম্লান।

অসীম এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে আত্ম-চিন্তা করতে করতে সে মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছে। এক প্রশ্নের জবাব দিতে আর এক প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। যেমন দিয়েছে পরীক্ষার খাতায় আর নানা জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউতে। তাই জীবনে ভালো রেজাল্ট হল না, ভালো চাকরি মিলল না।

কিন্তু এক্ষেত্রে ভুল শোধরাবার সুযোগ পেল অসীম। হেসে বলল, 'সম্বন্ধ টম্বন্ধের কথা কি বলছ তোমরা!'

মাধুরী বলল, 'কিসের সম্বন্ধ আবার। বিয়ের।'

অসীম বলল, 'তোমরা ভুল শুনেছ। আমি চাকরির কথা বলছিলাম। চাকরির তদ্বিরের জন্যে এসেছি। আমাদের মত মানুষের কি আর বিয়ে করা সাজে?'

অসীম লক্ষ্য করল, এতক্ষণে মানসীর মুখের রঙ, কিন্তু তার দিকে তাকাতে না তাকাতে সে অন্য ঘরে চলে গেল।

মানসীর মনের ভাবটা অসীম ভালো করে বুঝতে না পারলেও তার শেষের কথাটা যে ঘরের আর কেউ বিশ্বাস করেনি তা অসীমের বুঝতে বাকি রইল না।

অসাবধানে মনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে ভেবে অসীম নিজের মনেই হাসল। তার কথাটাও মিথ্যা নয়, আবার মাধুরীদের আন্দাজটাও মিথ্যা নয়। চাকরির তদ্বিরে যেমন সে এসেছে তেমনি এসেছে মানসীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। সেটা ঠিক বিয়ে না হলেও উপক্রমণিকা। নাকি একটি দীর্ঘকালের সম্পর্কের উপসংহার?

'অসীমকে আর একটা আম দাও। উৎকৃষ্ট হিমসাগর এনেছি অসীম, আর একটা খাও। ওই তো ছোট ছোট আম, আমি তো ইচ্ছে করলে গোটা পাঁচেক এক সঙ্গে খেতে পারি।'

মনোমোহন আবার বক্তার ভূমিকা নিলেন।

টকের পরে দই। দইয়ের সঙ্গে আম। সুহাসিনী আরো দুটি আম অসীমের পাতে দিলেন।

অসীম মহা বিব্রত হয়ে বলল, 'এ কি করলেন মাসীমা, আমি কিন্তু আর একটাও খেতে পারব না।'

মনোমোহন সমানে উৎসাহ দিতে লাগলেন, 'খেলেই পারবে। খেয়ে দেখ অসীম খুব মিষ্টি আম, উৎকৃষ্ট আম। সাধে কি বলে অমৃত?'

সুহাসিনী এবার স্বামীর দিকে এগিয়ে গেলেন, হেসে বললেন, 'তোমাকে দেব নাকি আর একটা? কেবল ওপাতে দাও, ওপাতে দাও করছ!'

মনোমোহন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তা থাকে যদি একটা দিতে পার। কিন্তু আর কারো ভাগেরটা যেন দিয়ো না।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।'

একটু বাদে খাওয়া শেষ করে প্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়ালেন মনোমোহন। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে গেলে তিনি অসীমের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তোমার কল্যাণে খাওয়াটা আজ মন্দ হল না বাবা। ভেব না চর্বা চোষ্য লেহ্য পেয় এমন রাজভোগ আমরা রোজ খাই। তুমি এসেছ তাই হল। নিজের বাড়িতেই নিজে নেমন্তন্ন খেলাম। কিন্তু তুমি না এলে এসব আজ হত না।'

ভোজনপ্রিয় বৃদ্ধের এই পরিতৃপ্ত মুখের দিকে অসীম মুগ্ধ চোখে তাকাল। একটু আগে মানসীকে নিয়ে এক সঙ্গে একান্তে বসে না খেতে পারার জন্যে তার যে দুঃখ হয়েছিল, সেই দুঃখের জন্যে এখন লজ্জা হল। মনে হল, এই পারিবারিক ভোজে এসে না মিলতে পারলে এমন দৃশ্য তার চোখে পড়ত না, এমন একটি দুপুরের মাধুর্য অনাস্বাদিত থাকত। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

বড় বড় শহরে শুধুমাত্র মানুষের কোলাহলই শোনা যায় না, বড় বড় কল-কারখানার আওয়াজ এবং গাড়ি ঘোড়ার ঘড়ঘড়ানি সব মিশিয়েই শহরের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে ওঠে। বিশেষত যারা ঐসব কারখানার কাজ করে তাদের পক্ষে অবিরত একঘেয়ে আওয়াজ শুনতে শুনতে কাজ করা রীতিমত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। ফলে কাজ-কর্মে ও বিতৃষ্ণা এসে যায়। কয়েকটি বাক্সের সাহায্যে আজকাল এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, বাক্সগুলি নিতান্ত সাধারণ বাক্স নয়। বাক্সগুলোকে "হাশ বক্স" বলা হয়। বাক্সগুলোর তিন দিক কাঠের ফ্রেমে ঢাকা, একদিক খোলা থাকে। তাছাড়া, দুই ইঞ্চি পুরু এমন এক ধরনের বস্তু দিয়ে বাক্সর দ্বিতীয় ফ্রেমটি তৈরী হয়, যাতে সবরকম আওয়াজ চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়ে ঐ বাক্সগুলির মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকে। বাক্সগুলি সুন্দর করে মেহগনি বা ওক কাঠ দিয়ে তৈরী করা হয় আর এগুলো এত সুন্দর করে ঘরের ছাদের সঙ্গে সাজান থাকে যে, ঘরের সৌন্দর্য কোনও মতেই ব্যাহত হয় না। বিশেষ করে বাক্সগুলোর মধ্যে ফ্লুরেসেণ্ট আলো দেওয়ায় আরও ভালো দেখতে হয়।

•

যে কোনও কাজই একভাবে করতে থাকলে ঝিমুনি ধরে যায়। মোটর ড্রাইভার-দের পক্ষে এরকম ঝিমুনি আসা খুবই বিপজ্জনক। অথচ একভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে স্টিয়ারিং ধরে বসে বসে ঘুমের

চালকের বিপদসংকেতকারী যন্ত্র

ঝোঁক আসা খুবই স্বাভাবিক। ড্রাইভার-এলার্ম নামে যে যন্ত্রটি আজকাল বার হয়েছে তা দিয়ে এই বিপদ এড়ান যায়। ছোট্ট বোতামের মত একটি পারদের যন্ত্র কানে লাগান থাকলে গাড়ির চালক যখন গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমের ঝোঁকে ঢুলে পড়বে তখন যন্ত্রটি স্বতঃই কানের কাছে একটা ঝাঁ ঝাঁ আওয়াজ করতে থাকবে, ফলে ঘুমের ঝোঁকটা কেটে যাবে।

*

বিজ্ঞান যে সর্বতোভাবে উন্নত হয়ে উঠেছে আজকের দিনে একথা অনস্বীকার্য। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিজ্ঞানের এই উন্নতিতে মানবজাতির পরম কল্যাণ সাধিত হচ্ছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। ডাঃ ওয়েমাউথ নামে একজন বৃটিশ মহিলা বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ক্যানসার রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু উন্নতি বিধান করেছেন। চল্লিশটি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিলিয়ে একরকম সাংশ্লেষিক রক্ত তৈরী করেছেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, ঐ রক্তের মধ্যে মানুষের দেহের কোষ রেখে দিলে কোষগুলি খুব দ্রুত বেড়ে যায়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে ক্যানসার রোগ-চিকিৎসার গবেষকগণ নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন বলে মনে করেন। সাংশ্লেষিক রক্তের মধ্যের কোষ-গুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে চেষ্টা করছেন যে, কী করেই বা কোষের বৃদ্ধি ঘটে আর কী করেই বা বৃদ্ধি বন্ধ করা যায়। এইটি জানার পর আপাতত ক্যানসার রোগের যেসব ওষুধ বার হয়েছে সেগুলির কার্যকরী ক্ষমতা বা অক্ষমতা বুঝতে পারবেন। সুতরাং এর পর ওষুধ-গুলির উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে।

*

"ন্যাটো মিলিটারী" বিশেষজ্ঞগণ যে নতুন রাডারটি তৈরী করেছেন তার সাহায্যে দশ মাইল দূরের মানুষকে চিনতে পারেন এবং পঁচিশ মাইল দূরের ঘোড়াও চেনা যায়। এই রাডারটি এত নিখুঁত হয়েছে যে, যে কোনও একটি ছোট চেহারাও দূরের থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে। এমন কি, দুটো চেহারা পাশাপাশি থাকলেও এই রাডারের মধ্যে একাকার হয়ে যাবে না, দুটিকে আলাদা আলাদাভাবে বেশ স্পষ্ট দেখা যাবে। যদিও বর্তমানে এই রাডারটির আবিষ্কার কথা গোপন রাখা হয়েছে তবু, আশা করা যায় যে, য়ুরোপীয়ান এয়ার লাইনে যেসব উড়োজাহাজ চলাচল করে সেগুলো এই রাডার আবিষ্কারের ফলে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করতে পারবে।

*

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো পাল-তোলা জাহাজ বলতে গেলে ১৪২ বছর আগে তৈরী "ট্রিংকোমালী"র নামই করা যায়। ১৮১৭ সালে জাহাজটি সর্ব-প্রথম বোম্বাই বন্দর থেকে জলে ভাসান হয়। পরে এই জাহাজটি "ফুড্রোইয়াণ্ট" নামে অভিহিত হয়। পোর্ট মাউথে জাহাজটি এখনও রাজকীয় নৌঘাটির একটি কোনায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে দেওয়া হয়েছে। বৃটেনের জাতীয় অর্ণবীয় যাদুঘরের অধ্যক্ষ বলেন যে, জাহাজটিকে যদি সত্যই জলে ভাসিয়ে রাখতে হয় তাহলে সংস্কারাদির জন্য অন্তত পাঁচ হাজার পাউণ্ড অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ চাঁদা তুলে সংগ্রহ করা দরকার। তৎকালীন বিখ্যাত নৌ-নির্মাতা মামসেদি ওয়াদিয়া ১৪ শত টন ওজনের সেগুন কাঠের এই যুদ্ধ-জাহাজটি নির্মাণ করেন। আজও ঐ জাহাজে মিঃ ওয়াদিয়ার ছবি টাঙগানো আছে।

আলোচনা

গানের আসর

সবিনয় নিবেদন

২২শে জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় 'গানের আসরে' শার্ঙ্গদেব ঝুমুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন ঝুমুর বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত লোকসংগীত। তিনি এই সংগীতটি পুরুলিয়া জেলার (পুরাতন মানভূম) লোকসংগীত বলে কোনপ্রকার উল্লেখ করেন নি।

যতদূর জানি, ঝুমুরই পুরুলিয়ার একমাত্র বহু প্রচলিত লোকগীতি। ঝুমুরের বর্ণনা প্রসংগে শার্ঙ্গদেব যা লিখেছেন, তা' পুরুলিয়ায় প্রচলিত ঝুমুর সংগীতের সংগে মেলে। তাছাড়া টুসুগান ও ভাদুগানও ঝুমুর ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুলিয়ার ঝুমুর প্রধানত রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক গান।

'বাঁকা লম্পট শঠ কপট কানাই'

কিংবা 'ও কে যায় সখা যমুনারি তীরে

পরি নীল শাড়ী কক্ষেতে গাগরী

চাহি ফিরি ফিরি ধায়' ইত্যাদি গানের কথাগুলি কৃষ্ণ-রাধার বর্ণনামূলক।

এ ছাড়া আর এক জাতীয় গানকে পুরুলিয়া অঞ্চলে ঝুমুর বলে। এগুলি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে রচিত নয়, কিন্তু ঝুমুরের সুরেই গাওয়া হয়। এই গানের কথা এই প্রকার

ঝিঙা ফুল লিলেক জাতিকুল গো

পরিত হ'ল শূলে

বসিলে উঠিতে নারি হাতে ধরে তুল' ইত্যাদি

অন্য দেবতাকে উদ্দেশ্য করেও 'ঝুমুর' রচিত হয়েছে। শিবকে উল্লিখিত এ গানটির প্রচলন পুরুলিয়া অঞ্চলে অধিক।

'কানে গুঁজা ধুতুরারি ফু গো

আর না রহিল জাতি কুল।

ঝুমুর পুরুলিয়ার গ্রাম্য অশিক্ষিতদের গান। তারাই এ গানের রচয়িতা। পুরুলিয়ার ঝুমুর পুঁথিপত্রে যত না লিপিবদ্ধ হয়েছে—তারচেয়ে বহু গুণ বদ্ধ হয়ে আছে এখানকার মানুষের মনে মনে। ইতি—

শ্রীমহাবীর নন্দী, পাটনা।

ভারতীয় লোহা ও ইস্পাতের কথা

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "ভারতীয় লোহা ও ইস্পাতের কথা" প্রবন্ধের আলোচনা করেছেন শ্রীসন্তোষকুমার সিকদার 'দেশে'র ৩২ সংখ্যায়। তিনি বলতে চেয়েছেন, লোহার খাঁটি আকরিক পাওয়া সম্ভব কি করে? তিনি আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ,তাতে অবশ্য সবচেয়ে সেরা আকরিকে লোহার পরিমাণ শতকরা ৭২ ভাগের বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ থেকে হাজারখানেক বছর আগেও এদেশের আকরিকে লোহার পরিমাণ ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত পাওয়া যেত। আপেক্ষিকতার বিচারে এসবগুলোকে খাঁটি আকরিক বলা যায়। পরবর্তিকালে ব্যবহারের ফলে এসব নিঃশেষিত হয়েছে। বিদেশী পণ্ডিত হাইনে সাহেবের Tracts on India গ্রন্থে এসবের উল্লেখ আছে। এ তো গেল ঈতিহাসবিদ্‌দের কথা। ধাতুতত্ত্ববিদের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ প্রশ্নের উত্তর আছে। Meteoric লোহার নিদর্শন তো বহু জায়গায় পাওয়া যায়। বাতাসের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকার ফলে এই বিশুদ্ধ লোহার "আয়রন-অক্‌সাইডে" (Iron oxide) রূপান্তরিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং খাঁটি লোহার আকরিক একেবারে অস্বাভাবিক বস্তু নয়। এখানে "আকরিক" এবং "উৎস" কথা দুটো বিস্তৃত অর্থে সমার্থক, তা বলাই বাহুল্য।
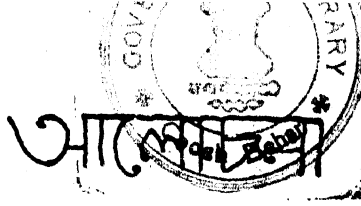
আভিধানিক মতে Flux-এর অর্থ 'বিগলন-সহায়ক'। আমি আভিধানিক মতটাই জ্ঞাতসারে গ্রহণ করেছি। আমার রচনাটিকে বিজ্ঞানাশ্রয়ী সাহিত্য প্রবন্ধ বলতে পারেন। ধাতুবিদ্যাগত জটিলতায় অনুপ্রবেশ করলে, না হবে বিজ্ঞান, না হবে সাহিত্য। তাছাড়া, Flux কথাটার আক্ষরিক বা পরম অর্থ "বিগলন-সহায়ক" হলেই ভাল হয়। কারণ, Flux ও Gangue মিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া slag হয়। slag-এর Melting point Flux বা Gangue-এর চেয়ে কম। সুতরাং "অপরিহার্য" রাসায়নিক মিলনের কথা বাদ দিলে বিগলনে সহায়তাই Flux-এর প্রধান কাজ। ইংরেজী শব্দগুলোর প্রতিশব্দ ব্যবহার করলাম না। কারণ, তার থেকে, আবার অহেতুক আর একটি আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

"হাতীর শুঁড়ের পরিবর্তে হাতীর দাঁতের পড়তে হবে।" ভুলটা লেখকের অনিচ্ছাকৃত বা অনামনস্কতাহেতু। এ ত্রুটি সংশোধনের জন্য সন্তোষবাবু নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ। ইতি—

সোনাভান চৌধুরী।

পুস্তক পরিচয়

ছোট গল্প

দুই কাননের পাখি—সন্তোষকুমার ঘোষ। কারেন্ট বুক শপ, ৫৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ২-৫০।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। গল্পের শিল্পরীতির উপর অনায়াস অধিকার যাঁদের আছে, তিনি তাঁদের অন্যতম। 'দুই কাননের পাখি'র দশটি গল্পের মধ্যে এমন একটি রীতিগত ঐক্য আছে যা লেখক-ব্যক্তির আদর্শ এবং গল্পের আদর্শ—দুটিকেই সমানভাবে রূপ দিয়েছে। গল্পের সংখ্যা দশ হলেও বইটি আকারে ছোট; গল্পগুলিও আক্ষরিক অর্থেই ছোট। কিন্তু এক একটি দামী পাথরের মতো নিটোল রঙিন এবং উজ্জ্বল। এর অভিনবত্ব এখানেই যে, এগুলি ছবি আর গল্পের মাঝামাঝি একটা জায়গায় যেন থমকে রয়েছে। মানুষের মনের এক একটা দিক ফুটে উঠছে যা দেখে মনে হয় নিত্য এবং স্থির অথচ কাহিনীধারায় তারা সচল এবং আবর্তিত। উপসংহারে নিয়মিত লেখক পাঠকের মনে চমক বা বিস্ময় দিয়ে এসেছেন। তাতে দেখতে পাওয়া যায় লেখকের মানুষের দিকে তাকানোর তির্যক ভঙ্গিকে। জীবনের প্রতি লেখকের মমতা নিবিড়, তাই তাকে দেখতে গিয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর তারই ফলে নানা রকম ট্র্যাজেডির ছবি আভাস চোখে পড়ছে। 'কিছুটা উইপন্থী হলেও আশ্চর্য জীবনভাবনার গল্পগুলি প্রাণবন্ত। 'সুচিত্রাকে' 'ফেলা' 'প্রেম অসতীর কথা'—তিনটি গল্পই পাঠকের অনেক ক্ষণকে একবার না একবার ভারাক্রান্ত করবেই। অন্য গল্পগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ঈষৎ ব্যঙ্গের স্পর্শ তাদের করেছে শাণিত। সব মিলে লেখকের প্রবণতা হচ্ছে আমাদের এই সাদামাটা মধ্যবিত্ত চরিত্রের কতকগুলি প্যারাডক্স দেখানো যা সার্থক ছোটগল্পের সার্থক বিষয়বস্তু। ২১০।৫৯

চতুষ্টয়—হিমাংশুবালা ভাদুড়ী। প্রকাশক সুধাংশুমোহন বসু। ১৬।২, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা। মূল্য ২-৭৫ নঃ পঃ।

আত্মার আশ্রয়, পত্রলেখা, অশরীরিনী এই তিনটি গল্প এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। প্রথম গল্পটি মিনতি আর প্রণতি দুই বান্ধবীকে নিয়ে। তাদের বিবাহিত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা বেদনার জাল বোনা হয়েছে এই কাহিনীর মধ্যে। পরে 'আলোক নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করে দুই সখির অশান্ত আত্মার শান্তি লাভ হল।

দ্বিতীয় গল্পটির বিষয়বস্তুও প্রায় প্রথমটির মত। কেবল দ্বিতীয়টি পত্র এবং ডায়েরীর মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। শেষ গল্প অশরীরিনী একটু ভিন্ন ধরনের। অতি প্রাকৃত একটি কাহিনীর রূপদান করা হয়েছে এই গল্পে। দেওঘরের রমাভিলা নামক একটি গৃহ ও তৎসংলগ্ন বাগান-বাড়িকে কেন্দ্র করে এই ভৌতিক কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে।

তিনটি গল্পের মধ্যে শেষেরটিই কলা-কুশলতার দিক থেকে কিছুটা রসোত্তীর্ণ। বাকী গল্পগুলির বিন্যাসে লেখিকার বিশেষ কোন দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। একই ভাব ও ভাষার পুনরাবৃত্তি অনেকক্ষেত্রে বিশেষ পীড়াদায়ক হয়েছে। গল্প গ্রন্থটির 'চতুষ্টয়' নামকরণের কোন সার্থকতা আছে কি? ১১৫।৫৯

ভজহরির সংসার—জ্যোতির্ময় ঘোষ। গ্রন্থম্, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় ঘোষ 'ভাস্কর' এই ছদ্মনামে কিছুকাল থেকে হাসির গল্প লিখে আসছেন। ভজহরি সরখেল নামে জনৈক চরিত্রের বিচিত্র বিবরণ তিনি যে গল্পগুলিতে বিবৃত করেছেন সেগুলিই **ভজহরির সংসার** নাম দিয়ে গ্রন্থমূর্তি পেয়েছে। শিথিলবন্ধ উপন্যাসের মতই সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি একটি চরিত্রসূত্রে বয়ে গিয়েছে। যখন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছিল তখন হয়ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় প্রায় প্রতি গল্পেই ভজহরির পূর্ব বিবরণ বিরক্তিকর লেগেছে। সরল অনাবিল হাসির উপাখ্যান হিসাবে এই কুড়িটি গল্প উপভোগ্য হয়েছে। ৫৮২।৫৮

উপন্যাস

সিন্ধুপারে—নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। নিউ-লিট পাবলিশার্স, ১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম সাত টাকা।

বিষয়ের দিক থেকে না হলেও পটভূমির বৈচিত্র্য সম্বল করে কিছু বাঙলা উপন্যাস লেখা হয়েছে, যা পাঠকসাধারণের স্বাদ বদলের পক্ষে অনুকূল। হাল্কা রোমাণ্টিক প্রেমোপাখ্যানের অবতারণায় কয়েকটি দেশী-বিদেশী টাইপ চরিত্রের মজাদার কীর্তি-কলাপে এবং আঞ্চলিকতা (লোকেল) বজায় রাখার জন্য কিছু দেশীয় রীতিনীতির উল্লেখে এই ধরনের উপন্যাসগুলো মুখর এবং স্ফীতকায়। 'সিন্ধুপারে' এই জাতীয় রচনার তালিকায় নবতম সংযোজন। গ্রন্থখানি প'ড়ে শেষ করার পর মনে হল বিলেতের জীবন নিয়ে লেখার যে উদ্দেশ্য লেখকের ছিল তা পালন করা হয় নি। মিসেস

ব্লেক, ভিভিয়ান, এমিলি জনসন, মংকটন, মার্লিন, ডরোথি, বারবারা এরাই যদি বিলিতী জীবন-প্রণালীর প্রতিভূ হয়, তবে অবশ্য অন্য কথা। এরা কেউ-বা প্রথম দর্শনেই প্রেমাসক্ত, কেউ-বা ব্যর্থপ্রেমিক—গ্লানী করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে ফেলতে সচেষ্ট, কেউ-বা ব্যাডমিণ্টন খেলে এবং কেউ-বা স্মার্ট। আসলে সমগ্র সমাজের প্রতিভাস কখনই গোটাকয়েক চরিত্রের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের মধ্যে ধরা পড়ে না; বিশেষত এই চরিত্রগুলির রূপায়ণ যান খাঁড়তে আর অবাস্তব নাটকীয়তায় রঞ্জিত হয়। গল্পের বাঙালী নায়ককে দেখা মাত্রই পর পর তিনটি বিলেত-ললনা মুগ্ধ হয়ে, ফ্যুসে কি সুক্ষ্ম যে অর্থেই হোক, প্রেমে পড়ে গেল; ল্যাণ্ডলেডী মিসেস ব্রেক চন্দ্রনাথের প্রতি আচমকা আসক্ত হয়ে পড়লো;—ঘটনাগুলোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের কোনরকম ইঙ্গিত না থাকায় লেখকের কল্পনা তথা পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বল্পতার প্রকট হয়ে উঠেছে। এছাড়া উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও শিথিল ভাষা প্রয়োগের দরুণ এই দীর্ঘ উপন্যাসটি ক্লান্তিকর ঠেকে। 'মনের মেঘলা', 'সেই কথাটাই এবার বলি' জাতীয় শব্দিকালি, টিপ্পনী ও বাগ্‌ভঙ্গীর বার বার ব্যবহার লেখককে কোন যে সাহায্য করে কি, জানি না। তবে গল্পের আকর্ষণে গ্রন্থটি পড়ে শেষ করাতেই হয়। থামের সৌন্দর্যের প্রচ্ছদ এবং পরিষ্কার ছাপা গ্রন্থসৌষ্ঠবকে সুন্দর করেছে।

(১৭৯।৫৯)

চিত্রাঙ্গদার রাজা—শরৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বিশাল বাংলা পরিষদ প্রকাশনী, ১-সি, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিঃ—১৪। দাম—দুটাকা।

একটি খিদবন্দী নিয়ে লেখা উপন্যাস। হংস্র শ্বাপদের মতো সমাজের একদল লোক নারীমাংস নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে মুনাফার লোভে,—লেখক তাদের মুখোশ খুলে দেখেছেন। নারীদের অধঃপতন ঘটছে বটে অভাবের তাড়নায়, তবু কুমুদিনীর মত অসহায়ারা অভাবের হাতে বিনা-প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করছে না, মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

লেখকের বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রশংসনীয়। কিন্তু দক্ষতার অভাবে উপন্যাসটি রসোত্তীর্ণ হয়নি। ভবিষ্যতে তিনি উন্নততর সৃষ্টি আমাদের হাতে তুলে দিতে পারবেন আশা করি।

(১৭৭।৫৯)

কত আশা—মানিক মুখোপাধ্যায়। ১৫বি সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। দু' টাকা।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রামে নেমে এলে সবাইর সাথে হরিশও চলে এল শহরে। কিন্তু শহর তাকে দিল না শান্তি। তাই আবার সে ফিরে এল নন্দনপুর গ্রামে। সেখানেই হারাণির সাথে হ'ল তার পরিচয়, আর তারই পরিণতিতে বিবাহ। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই হারাণি গেল মারা। হরিশের কত আশা কত স্বপ্ন এমনি করেই গেল ব্যর্থ হয়ে।

লেখকের হাত কাঁচা। তাছাড়া ঘটনা-স্রোতের অতি দ্রুত প্রবাহের ফলে কোথাও মনে দাগ কাটে না।

৫০৯।৫৮

নাটক

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার—তুলসীদাস লাহিড়ী। প্রকাশক—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ—৯। দাম—দুটাকা।

তুলসী লাহিড়ী মহাশয় নাট্যজগতে সুপরিচিত। নব-নাট্য আন্দোলনের তিনি একজন প্রতিভাবান নেতা। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে উৎপীড়িত বাঙালীর নালিশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন নাট্যজগতে। তাঁর সে নালিশ আজও বার বার বিভিন্ন-গ্রামে ধ্বনিত হচ্ছে।

'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' নাটকে লাহিড়ী মহাশয় দেখিয়েছেন, কেমন করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে মজুর হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়। এই রূপান্তর তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকেও বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। কঠোর জীবন-সংগ্রাম পরিবারের পরস্পরের প্রতি স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও মমতার বাঁধনগুলো টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিয়ে তাদের দিচ্ছে অমানুষ ক'রে। এই লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের ছবির পাশে আরও একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার—সেটা নতুন জাতের মানুষের, নতুন যুগের। সেই অনাগত দুর্যোগমুক্ত যুগের আগমনী শুনিয়ে নাট্যকার যবনিকা ফেলেছেন।

প্রবীণ অভিনেতা হিসেবে নাট্যকার দর্শকের মন কেড়ে নেওয়ার সব কৌশল-গুলো সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। তবে, তাঁর প্রতি নাটকেই কতকটা অতি-নাটকীয়তার প্রবণতা আছে। যেমন, ছোটকা পুলিসের গুলীতে মারা গেল, তার দাদা বিশু হ'ল ফাঁসির আসামী, তাদের বাপ ইন্দ্রনাথ দিল গলায় দড়ি। এই এতগুলো মৃত্যু ঘটিয়ে তবে নাটকটি শেষ হ'ল। যাই হোক, তবুও এই নাটকের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

মাত্র ৭৮ পৃষ্ঠা বইয়ের দাম দু'টাকা!

(২০১।৫৯)

জীবন-কথা

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ:—মণি বাগচি। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ: ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা: দাম—দু'টাকা।

স্বামীজীর আমেরিকা প্রবাসের ঘটনা-বহুল বিবরণ দিয়েছেন লেখক। বিবেকানন্দের জীবনীর এই অধ্যায়ের তথ্য মূলত তিনি সংগ্রহ করেছেন শ্রীমতী বার্কের লেখা স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকাঃ নিউ ডিসকভারিস বই থেকে। স্বামিজীর জীবনী সম্পর্কে কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রেরই বইখানি ভাল লাগবে।

একটা অনুযোগ না জানিয়ে পারা গেল না। লেখকের একটু চড়া রংয়ে বর্ণনা দেওয়ার অভ্যাস আছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরিমিত-বোধ রূঢ়ভাবে আহত হয়। উপরন্তু, আধুনিক যুগে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মহাপুরুষদের জীবনী রচিত হওয়া প্রয়োজন—কেবল স্তুতিবাদ গ্রথিত করলে সার্থক জীবনী হয় না। এই পরামর্শটি লেখকের বিবেচনার জন্যে পেশ করলুম।

(১৯৯।৫৯)

যেমন তাঁকে দেখি—শ্রীনাথ, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস: সৎসঙ্গ, দেওঘর।

গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে। মহাপুরুষ বাণীতে রয়েছে, 'যার যেই ভাব তার সেই লাভ'। শিষ্য শ্রীনাথ গুরু অনুকূলচন্দ্রকে যেভাবে দেখেছেন,

তাঁর রচনায় তেমনি আলেখ্য আঁকবার চেষ্টা করেছেন। এতে ভাব অনুযায়ী ভক্ত শিষ্যের লাভ হয়ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের মনে এ ধরনের গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাসা আছে।

বিশেষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পূর্ণ কোন সাধক তাঁর সত্যলব্ধ জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে বিতরণ করেন। সংসার-সীমায় আবদ্ধ স্বার্থমগ্ন মানুষ কখনো কখনো সেই সত্যের আলোকে শ্রেয়পথের সন্ধান লাভ করে। কিন্তু যদি সেই সাধক মহাপুরুষকে তাঁর শিষ্যকুলের প্রচার-যন্ত্রের ক্রীড়নক হতে হয়, তাহলে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে। এ গ্রন্থখানির কোন কোন স্থলে শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রকে অলৌকিক মানবরূপে প্রতিপন্ন করবার কোন চেষ্টাই শিষ্য শ্রীনাথ বাদ দেননি। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসে ঠাকুরের ধ্যানস্থ হওয়া; বর্ষায় সর্বগ্রাসী প্রমত্ত পদ্মার মাঝে পড়েও ঠাকুরের কৃপায় ভক্ত কৃষ্ণলালের হাঁটুজল উপলব্ধি করে অবলীলায় পেরিয়ে আসা---এ সকল অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলি বর্ণনা করে গুরু মাহাত্ম্য প্রচার করার মধ্যে যে-মনোভাব আছে, তা আজকের দিনের পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে না।

সর্বোপরি গ্রন্থখানি হাতে পেলেই মনে হবে যেন দ্বিতীয় একখানি 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের সাক্ষাৎ পেলাম। অচিন্ত্য-কুমারের বিশেষ বাকভঙ্গীটি লেখক বার বার অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন। সামান্য উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। 'মা আমার পংকজালয়া কমলা। এ মৃন্ময়ী মা নয়, লোককান্তকান্তা বরদা। চিন্ময়ী শুভদা।

নরনারায়ণসঙ্গিণী নারায়ণী। মা আমার স্নেহস্নিগ্ধতার বৈদূর্যবিকাশ। মাতৃ-মমতার মাতা।'

সাধু প্রসঙ্গ উত্তম, কিন্তু অন্ধ উপস্থাপনা বেদনাদায়ক।

Jogiraj Brahmachari Kuladananda ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ প্রণীত। শ্রীশ্রীসৎগুরু সাধন সঙ্ঘ কর্তৃক ৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, ৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে আধুনিক ভারতের সর্বজনপূজ্য ধর্মাচার্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় অন্যতম মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দজীর লোকোত্তর জীবনের কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আলোচিত হইয়াছে। রচয়িতা তাঁহারই শিষ্য গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী নিজেও একজন সাধক পুরুষ এবং ধর্মাচার্য। শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ন্যায় মহামানবের জীবন সাধারণের মত নয়; সুতরাং সেই মাপে তাঁহাকে মাপা চলে না। বস্তুত এমন মহাপুরুষের জীবনে অলৌকিকত্ব কিছু থাকিবেই। এই সব অলৌকিকত্বকে যোগ বিভূতি বলা হয়; কিন্তু যোগিগণ কতকগুলি প্রক্রিয়ার সাহায্যে যাদুবিদ্যার মত বিস্ময়কর ব্যাপার সাধন করা যায়। ইঁহাদের জীবনের যোগৈশ্বর্য তেমন বস্তু নয়। ফলত সাধনার দ্বারা সিদ্ধাবস্থায় ইঁহারা সমারূঢ়।

বিশ্বাত্মা দেবতার সহিত একাত্মতা লাভ করাতে ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া সেই দেবতার শক্তি, তাঁহার মাধুর্য বীর্য প্রকটিত হইয়া থাকে। যোগ ইঁহাদের পক্ষে কতকগুলি কসরত নয়। ইঁহাদের যোগ বিভূতিতে ভগবানের কৃপার বিরাট প্রভাবই অভিব্যক্ত হয়। ব্যষ্টি মনের সহিত সমষ্টি মনের সমন্বয়ের রহস্য উন্মুক্ত হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন। একদল বৈজ্ঞানিক অনন্তের সঙ্গে মনন সূত্রে মানুষের এমন সঞ্জীবনী শক্তি স্বীকার করেন, কিন্তু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই ইহাকে ভেল্কিবাজী বলিয়া উড়াইয়া দিতে তৎপর। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের বিচার যাহাই হোক, তদ্দ্বারা সত্য মিথ্যায় পরিণত হইবে না। মহৎ জীবন হইতে বিশ্বাত্মা দেবতার শক্তি উৎসারিত করিয়া যুগে যুগে মানবধর্মকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে এবং এখনও রাখিবে। ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজীর অবদান উল্লেখযোগ্য। যুক্তিবাদের নামে আমাদের সমাজে বর্তমানে স্বার্থ কেন্দ্রিক নীতিহীনতা এবং ধর্মহীনতাজনিত যে দুর্গতি দেখা দিয়াছে তাহার দূরীকরণে পুস্তকখানি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। পুস্তকখানি ইংরেজীতে লিখিত হওয়াতে বাংলার বাহিরে ইহার প্রচার সুগম হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতি সমুন্নতির পক্ষে ইহারও প্রয়োজন আছে। ছাপা বাঁধাই কাগজ সুন্দর, প্রচ্ছদপট মনোরম।

২০৬।৫৯

ভগবান বিজয়কৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত। শ্রীশ্রীসংগুরু সাধন সংঘ কর্তৃক ৬০, সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩্।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবনী অবলম্বনে এই পঞ্চাংক নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। রচয়িতা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি দার্শনিক। নাট্যকার হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি আছে। গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব হইতে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রীগৌরনিতাইয়ের পূজা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পটভূমিকায় আলোচ্য নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। পাকা হাতের লেখা। নাটকখানিতে নাট্যরসের পরিবেশনে এবং তাহার প্রয়োগে তাহার বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় মিলে। মহাপুরুষ দিব্যজীবনী চিত্রণে সর্বত্র গ্রন্থকারের সংযত সৌষ্ঠবের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের আধুনিক নাট্য-সাহিত্যে ইহা দুর্লভ বস্তু। ২০৮।৫৯

গান্ধী মতবাদ

গান্ধীজী কি চান—নির্মলকুমার বসু (সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি) সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা, মূল্য ৭৫ নঃ পঃ।

মহাত্মাজীর মতবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে জিজ্ঞাসা ও চিন্তার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থে গান্ধী-দর্শন বিশেষজ্ঞ নির্মলকুমার বসু মহাশয় অত্যন্ত সহজ ও মনোজ্ঞ ভংগীতে আলোচনা করেছেন। 'গড়ার কাজ ও তাহা রক্ষা করার কাজ', 'গঠন কর্মের মূল উদ্দেশ্য', 'গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তর্ক', 'সত্যাগ্রহের মূল কথা', 'সত্যাগ্রহ সাধনা', 'গান্ধীজী কি চান' এই কয়েকটি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। আলোচনাকালে লেখক দিন-জীবনের সহজবোধ্য উপমাগুলি স্থানে স্থানে প্রয়োগ করেছেন। কখনো বা স্বাধীনতা আন্দোলনের দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরেছেন। এর ফলে গ্রন্থখানি নিরস তথ্যের সমাবেশ মাত্র না হয়ে পরিচ্ছন্ন মুক্ত চিন্তার ধারক হয়েছে।

জাতীয় জীবনে সংগঠন কর্মের গুরুত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে আলোচনা করা হয়েছে তা প্রতিটি দেশকর্মীর প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। সত্যাগ্রহ সাধনার একটি দৃষ্টান্ত লেখক এই গ্রন্থে দিয়েছেন। লবন আইন আন্দোলনকালে এই ঘটনাটি ঘটে। লেখক প্রদত্ত এই ঘটনাটি যে কোন পাঠককে অভিভূত করবে সন্দেহ নেই। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ যথাস্থানে প্রয়োগ করে লেখক গ্রন্থখানিকে বিশেষ আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ করে তুলেছেন। ১২১।৫৯

ধর্ম ও আদর্শ

স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন—বিনোবা, (সর্বোদয়-প্রকাশন সমিতি) সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১·৭৫ নঃ পঃ।

সাধক বিনোবাজী সুদীর্ঘ বৎসর নিদিধ্যাসনের ফলে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে নিহিত দর্শন সম্যক উপলব্ধি করেন। গীতোক্ত এই স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটির গূঢ় অর্থ তিনি সাধক সম্প্রদায়ের নিকট এই পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ গীতার আদর্শ পুরুষ-বিশেষ। এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধকদের যে পথের অনুগামী হতে হবে, সে পথের গভীর নির্দেশ এই গ্রন্থে নানাভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ সর্বসাধারণের সহজবোধ্য নয়। তবে এই পথসন্ধানী সাধক সম্প্রদায় পুস্তকখানি পাঠ করলে যে আলোকের সন্ধান লাভ করবেন এ ইঙ্গিত বিনোবাজী এঁর রচনার মধ্যে রেখে গেছেন।

১২২।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

সাপের কথা—অবনীভূষণ ঘোষ।

প্রভাত গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্ক্সীয় দর্শন—রবি রায়।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ব্যায়াম ও আসন—শ্রীনীরদকুমার সরকার।

যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে যোগ নিবারণ শ্রীনীরদকুমার সরকার।

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

ধানদূর্বা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

দাঁড়ের ময়না—পূর্ণেন্দু পত্রী।

একটি সুরের কান্না—ভারতপুত্রম্।

রূপসজ্জা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।

রকমারী (কৌতুক নাটিকা)—সুদর্শন।

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শ্রীভূদেব চৌধুরী।

মধুসূদনের কবি মানস—শিশিরকুমার দাস।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস—আর বি নাই ও জে ই মোরপারগো অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ সরকার।

দীক্ষিতের নিত্য কর্ম ও উপাসনা—শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী।

ঝরাপাতা—গৌর দাস।

সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ—অনিল রায়।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণিকা—১৩৬৬।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

বিদায়, শিশিরকুমার

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের ইন্দ্রপাত হয়েছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ি আর ইহলোকে নেই।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত সোমবার (ইংরেজী মতে ৩০শে জুন) রাত্রি দেড়টার সময়ে নাট্যাচার্য ৭০ বছর বয়সে তাঁর বরাহনগরের বাসভবনে দেহরক্ষা করেছেন।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইষ্টগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নশ্বর দেহ যে কাশীপুর শ্মশানে ভস্মীভূত হয়েছিল--যেখানে শ্রীম এবং গিরিশচন্দ্রের চিতাশয্যাও একদা রচিত হয়েছিল--সেই স্মৃতিপূত পুণ্যতীর্থে শিশিরকুমারের মরদেহও অগ্নিসমর্পিত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল। জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যাচার্য চিরদিনের মত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আবার ঘণ্টা বাজবে, মঞ্চের আলো জ্বলবে, যবনিকা উঠবে, অভিনয় শুরু হবে। শুধু শিশিরকুমার থাকবেন না। এই অনুপস্থিতির শূন্যতা যে কত গভীর যাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছেন এবং মর্মরসে অভিসিঞ্চিত করে তার স্মৃতি বহন করছেন, তাঁরাই তা উপলব্ধি করবেন।

শিশিরকুমার ইদানীং থিয়েটার করা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন বলা চলে। অপটু দেহ নিয়ে কালেভদ্রে তিনি পাদপ্রদীপের আলোকে এসে দাঁড়াতেন--খানিকটা শখের বশে, খানিকটা জীবিকার্জনের তাগিদে। (কী লজ্জা!) তবু তিনি ছিলেন--আমাদের সেইটেই বড় আশ্বাস।

খরচ করি আর না করি, ব্যাংকে টাকা জমা থাকলে যে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি, আমরা এতদিন সেই উপভোগ করছিলুম শিশিরকুমার সম্পর্কে। অভাব অনটন যাই ঘটুক না কেন, আমাদের পুঁজি তো জমা আছে ব্যাংকে—তারই জোরে আমাদের যা-কিছু বড়াই। সেই ব্যাংক আজ আমাদের ভাগ্যে ফেল হয়েছে। তাই আজ দেউলিয়ার নিঃস্বতা অনুভব করছি অন্তরে অন্তরে।

শিশিরকুমার বাংলার কে ও কী ছিলেন তা নিয়ে পরে আলোচনা করব। তাঁর

শিশিরকুমার

অভিনয়ের মধ্যে যে আনন্দলোকের আভাষ পেতুম আমরা, মৃত্যুর পরপারে তিনি যেন সেই আনন্দের মধ্যেই চিরবিলীন থাকেন—এই কামনা জানাই আজ আমাদের নিরানন্দের মুহূর্তে।

সিনেমা ও সমাজ

শিল্পসৌকর্যে ও মৌলিক সৃজনধর্মিতায় ভারতীয় ছায়াছবি আজ পৃথিবীর প্রশস্তি পেয়েছে, একথা যেমন আমরা সগৌরবে বলে থাকি, সেই সঙ্গে একথাও না মেনে উপায় নেই যে এক শ্রেণীর ভারতীয় ছবি আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের অহেতুক অনুকরণপ্রিয়তায়, বিশেষ করে ক্রাইম ও যৌন আবেদনের অনাবশ্যক আতিশয্যে।

ভারতবাসী দরিদ্র হলেও অসামাজিক আচরণ সাধারণের ধ্যান-ধারণার বাইরে। অথচ এইসব ছবিতে অসামাজিক আচার-ব্যবহারেরই বাহুল্য। ফিল্মের নায়ক-নায়িকারা যে-পোশাকে নিজেদের লোকের চোখে তুলে ধরেন, তা শুধু অ-ভারতীয় নয়, অশালীনও। আচার-ব্যবহারে তাঁরা যে চটুলতা প্রকাশ করেন তাতে বোঝবার উপায় থাকে না যে, তাঁরা কোন সমাজের মানুষ। কুলবধূ ও বারবণিতার মধ্যে ভেদরেখা ছবির পর্দায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে উঠেছে। ক্রাইমের ব্যাপারেও ঠিক তাই। সৎলোক হঠাৎ নৈতিক অবনতির নীচের ধাপে নেমে দাঁড়াচ্ছে। পিস্তল-রিভলবার মুড়ি-মিছরির মত লোকের হাতে হাতে ফিরছে। নাইট ক্লাব সারা ভারতবর্ষে ক'টি আছে জানি না। এইসব ছবি দেখে মনে হয় যেন শহরের সর্বত্র তা ছড়িয়ে রয়েছে এবং সেখানে সুর ও সুরার সঙ্গে সমানে আধিপত্য করছে কুচক্রীদের গুন্ডাশ্রেণীর লোকেরা।

এই বর্ণনা কোন একটি বিশেষ ছবি নয়, সাধারণভাবে বোম্বাইয়ের অধিকাংশ হিন্দী ছবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

এ রকমটা কেন হবে? এ প্রশ্ন শুধু আমরা করছি না, সমাজের কল্যাণকামী মাত্রেই এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান চাইছেন।

এই ধরনের আপত্তিকর চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে
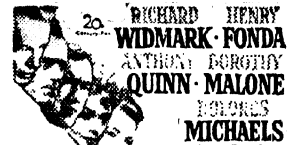
আন্দোলন গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সীর নেতৃত্বে বোম্বাইতে সম্প্রতি একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে চল্লিশজন প্রতিনিধি এই সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। সংস্থার উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী মুন্সী বলেছেন, যে-চলচ্চিত্র জাতির গঠনে সাহায্য করবে, অবস্থাবৈগুণ্যে তাই তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। যৌন-আবেদন, মদ্যপান আর লোভ—এই তিনটি জিনিসকে ফলাও করে দেখাবার উদ্দেশ্যেই যেন ছবি তৈরি হচ্ছে। ফলে আমাদের পারিবারিক জীবন বিষময় হয়ে উঠছে, তরুণ মনে ধ্বংসের বীজ বপন করা হচ্ছে।

এর জন্যে শ্রীমতী মুন্সী চিত্রনির্মাতা ও গভর্নমেণ্ট দুপক্ষকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, ছবি সেন্সর করার নিয়মকানুন গুলি অবশ্যই ভাল, কিন্তু প্রগতিবাদী হবার মিথ্যা মোহে সেগুলি ঠিকমত প্রয়োগ করা হচ্ছে না। শ্রীমতী মুন্সী তাই আওয়াজ তুলেছেন, দেশের নৈতিক স্বাস্থ্যের খাতিরে এই ধরনের ছবিকে কর্তৃপক্ষের কিছুতেই ছাড়পত্র দেওয়া উচিত নয়।

কয়েকদিন আগে কলকাতাতেও ফিল্ম-নির্মাতাদের একটি সভায় অনুব্রত আন্দোলনের হোতা আচার্য তুলসী এই বলে অনুযোগ করেছেন যে, ভারতের ফিল্ম-শিল্প স্বাধীনতা লাভের পর দেশ ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে নি। তিনি বলেন, সিনেমা জনশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কুমতলবীদের চক্রান্তে তাকে বিপথে চালিত করা হচ্ছে।

এন এস জি প্রোডাকসন্সের মুক্তিপ্রতীক্ষিত "খেলাঘর"-এর নায়িকা মালা সিংহ

এই সভায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি অজিত বসু, পরিচালক দেবকীকুমার বসু এবং প্রযোজকদের তরফে মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়া, ইন্দ্রকুমার কারনানি, অসিত চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চিত্রজগতের নৈতিক উন্নতির জন্যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব এই সভায় সর্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এসব থেকে সহজেই বোঝা যায় দেশের একটি চিন্তাশীল অংশ ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে কতখানি বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। সুখের বিষয় এইটুকু যে, বাঙলা ছবির বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কেউ ব্যাপকভাবে দুর্নীতি প্রচারের অভিযোগ তোলেন নি। বরং দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, ভারতীয় ছবির মান যদি কেউ বাড়িয়ে থাকে তো এই বাঙলাদেশের সিনেমা শিল্প। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও বাঙলা ছবিই ভারতের সম্মান বাড়িয়েছে—একথা অস্বীকার করবার দুঃসাহস কারুরই হবে না।

চিত্রালোচনা

তিনখানি নতুন ছবি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের "ভ্রান্তি", মায়া আর্ট পিকচার্সের "মধু" এবং বম্বে মুভিটোনের "গৃহলক্ষ্মী"। প্রথমখানি বাঙলা, বাকী দুটি ছবি হিন্দী।

"ভ্রান্তি"র কাহিনী গড়ে উঠেছে এক

মধুচক্রের নির্মীয়মান ছবি 'পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট'-এর নায়িকাবেশিনী রুমা গাঙ্গুলী প্রেমের যে স্বপ্ন দেখছেন এই দৃশ্যে তাকেই রূপ দিয়েছেন কার্টুন-শিল্পী দেবু মুখোপাধ্যায়

ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ববিদ ও তাঁর তরুণী মেয়েকে কেন্দ্র করে। মুখ্য ভূমিকাগুলিতে রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, বাসবী নন্দী ও নির্মলকুমার। অন্যান্য চরিত্রে আছেন ভানু বন্দোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ, ছায়া দেবী প্রভৃতি। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায় ছবিটি গৃহীত হয়েছে। সুকু সেন ও শ্যামল মিত্র যথাক্রমে এর লেখক ও সুরকার।

"মধু" প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পের চিত্ররূপ। ছবিটি শুরু করেন স্বর্গত পরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায়। তাঁর অকালমৃত্যুর পর ছবিটি শেষ হয়েছে এস ব্যানার্জীর পরিচালনায়। মীনাকুমারী, করণ দেওয়ান, কুমকুম ও জগদীশ শেঠীকে নিয়ে এর মূল ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। ছবিতে সুরযোজনা করেছেন রোশন।

ভারতীয় নারীর প্রেম ও আত্মত্যাগের একটি মহৎ কাহিনী রূপ পেয়েছে "গৃহলক্ষ্মী"-তে। পান্ডারী বাই এর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শাহু মোদক, ললিতা পাওয়ার, রূপলক্ষ্মী ও কুমারী নজর অন্যান্য ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন। রমণ বি দেশাই একাধারে এর প্রযোজক ও পরিচালক। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন অবিনাশ ব্যাস।

* * *

এম এম মুভীজের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "এ জহর সে জহর নয়" লেখক-পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। জনপ্রিয় শিল্পী জহর রায়কে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বৈত ভূমিকায় দর্শকদের কাছে উপস্থিত করবার একটি চিত্তাকর্ষক প্রচেষ্টা রয়েছে এ-ছবির নতুন ধরনের গল্পে। ছবির অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন—রবীন মজুমদার পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, তপতী ঘোষ, কমল মিত্র ও নীতিশ মুখোপাধ্যায়। সুরারোপের দায়িত্ব পালন করছেন ভি বালসারা।

• • •

এস্কার্স প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন "ধূলি মাটির গান" তরুণেশ দত্তের পরিচালনায় নির্মীয়মান। সমরেশ বসুর এক মনোরম কাহিনীকে ভিত্তি করে এ-ছবির উপাখ্যান। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে অংশ গ্রহণ করেছেন কালী ব্যানার্জী, রুমা গাঙ্গুলী, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, শিশুশিল্পী বাবুয়া এবং আরও অনেকে।

ন্যাশনাল পিকচার্সের "সোনার হরিণ"-এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। রাসবিহারী লালের একটি রোমাঞ্চমূলক কাহিনীর এই চিত্ররূপে পরিচালনা করছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। জনপ্রিয় সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটিকে বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক আবেদনে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অবতরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবি বিশ্বাস, কালী ব্যানার্জী, বিপিন গুপ্ত, তরুণকুমার নমিতা সিংহ, ভানু বন্দ্যোঃ (এন টি), মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ছবিতে হেমন্ত-কুমার, সন্ধ্যা মুখার্জী ও গীতা দত্ত কণ্ঠ-দান করেছেন।

গত ৩০শে জুন গৌরাঙ্গ চিত্রম-এর প্রথম নিবেদন "পরাশর" চিত্রের শুভ মহরৎ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। ছবিখানি পরিচালনা করবেন গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠী। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দিলীপ মুখার্জী।

ভারতী কলা মন্দিরের প্রথম হিন্দী পৌরাণিক চিত্র "দেবর্ষি নারদ"-এর শুভ মহরৎ গত ২১শে জুন এন টি স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়। কলকাতা এবং বোম্বের শিল্পীরা এ-ছবিতে অংশ গ্রহণ করবেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জীবন, বীণাচাঁদ, রাণী, তপতী ঘোষ, রিতা, রাজকুমার, নগেশ ও অশোক। ছবিখানি পরিচালনা করবেন কলাকার সুরেন্দ্র।

ভানুর চোখে জল। মেট্রোপলিট্যান পিকচার্সের "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে"-র একটি দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভি বালসারা।

পুষ্পশরের লক্ষ্যভ্রান্তি

নরনারীর অন্তরে অলক্ষ্যচারী পঞ্চশরের শরসন্ধানকে উপজীব্য করে প্রবোধকুমার সান্যাল রচনা করেছেন তাঁর রঙীন কল্পনার প্রেমভিত্তিক উপন্যাস "পুষ্পধনু"। অশোকে চিত্রে "পুষ্পধনু" এই উপন্যাসেরই চিত্ররূপ।

কাহিনীর নায়িকা ঈশানী রায়। নৃত্যপটিয়সী হিসাবে তার যশ দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের বহু জায়গায় নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তার প্রতিষ্ঠিত 'গীতালী সংঘ' প্রচুর খ্যাতি ও অর্থের অধিকারী।

যশ ও প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও রূপসী নর্তকী ঈশানী তার মনের রিক্ততা যেন আরও গভীরভাবে অনুভব করল শান্তনুর সান্নিধ্যে এসে। শান্তনু ভবঘুরে—আপন আত্মীয়েরা তাকে ত্যাগ করেছে। ঈশানী তার মধ্যে পেল অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদের সন্ধান। ঈশানী চায় এই যুবকটির অন্তর সম্পদের ভাগ যা দিয়ে সে ভরে তুলবে তার জীবনের শূন্যতা। মনের দিক দিয়ে নিঃস্ব এই নারীর করুণ অতীতের কথা জানতে পারে শান্তনু। ঈশানীর মিশনারী মহিলা বন্ধু সিলভিয়ার ছেলে ভিক্টর আসলে যে তারই ছেলে সে কথাও জানতে পারে শান্তনু। শান্তনু শোনে ঈশানীর কাছে তার জীবনে ভিক্টরের আগমনের কাহিনী।

ঈশানী তখন সুদূর গ্রামে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ছিন্নমূল হয়ে পড়ছিল অসহায় গ্রামবাসী। এরই কিছুদিন আগে সে গ্রামে সরকারী কাজে আসে একটি যুবক সামরিক কর্মচারী। ঈশানীর দিকে সে আকৃষ্ট হয়। ঈশানীর অভিভাবকেরা এই সুপাত্রকে হাতছাড়া করতে নারাজ। বিয়ে হয় ওদের গোপনে। বর পরে ঈশানীকে নিয়ে যাবে স্বগৃহে এবং প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেবে তাদের পরিণয়ের—এই ছিল কথা; কিন্তু বিয়ের পরই বর হয় নিখোঁজ। দাঙ্গায় ঈশানীর অভিভাবকেরা প্রাণ হারায়, ঈশানী ছিটকে এসে পড়ে শহরে। সেখানেই জন্মায় তার ছেলে। দীর্ঘ দশ বছর কেটে যায়। স্বাধীনভাবে নিজকে গড়ে তোলে ঈশানী—যশ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ধরা দেয় তার কাছে। কিন্তু ধরে রাখতে পারে না সে নিজের কাছে তার ছেলে ভিক্টরকে লোকলজ্জার ভয়ে; সিলভিয়ার কাছেই সে বড় হয়।

শান্তনুর ভালবাসা বন্ধনভীরু। ঈশানীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান সে খুঁজে পায় ভাগ্যাহত নারীর মাতৃত্বের অধিকারে। এমনি দিনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ঈশানীর নিখোঁজ স্বামীর। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। ভিক্টর তার ছেলে জেনেও সে তাকে গ্রহণ করতে নারাজ; কারণ অতীতের জের টেনে নতুন বিবাহিত জীবনে সে অসুখী হতে রাজী নয়। শান্তনু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী করায় ঈশানী ও ভিক্টরকে তার স্ত্রী ও ছেলে বলে আইনসংগত স্বীকৃতিদানে। ঈশানী ভিক্টরকে নিয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে পা বাড়ায়।

নর-নারীর প্রেম-সম্বন্ধের একটি নতুন সংজ্ঞার আভাস মেলে প্রবোধকুমার সান্যাল রচিত প্রায় সব প্রণয়োপাখ্যানে। স্ত্রী-পুরুষের অন্তর-বিনিময়ের একটা বন্ধন-অসহিষ্ণু সহজিয়া রূপ তিনি যেন ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক প্রেম সম্পর্কে। আলোচ্য কাহিনীতেও ঈশানী ও শান্তনুকে প্রেমের এমনি একটি সহজিয়া ছন্দে তিনি বাঁধতে চেয়েছেন; কিন্তু ছন্দপতন ঘটেছে তাঁর মুখ্য চরিত্র দুটি প্রেমের সহজ বক্তব্যে বাঙ্ময় ও জীবনায়নে স্থিতনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে নি বলে।

ছবিতেও নায়ক-নায়িকার মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগের আভাস আছে, কিন্তু তার রূপ নেই; অন্তর-পরিচয় আছে, পরিণতি নেই। তাই এতে পাত্র-পাত্রী থাকলেও চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না, ব্যক্তি থাকলেও ব্যক্তিস্বরূপের সাক্ষাৎ মেলে না। কাহিনীতে অন্যদিকে ঈশানীর সঙ্গে মিঃ দত্ত চৌধুরীর গোপন পরিণয় ও ঈশানীর পক্ষে ভিক্টরকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় না দিয়ে দশ বছর দূরে সরিয়ে রাখা যেমন কষ্টকল্পনার পরিচায়ক, তেমনি অস্বাভাবিক মিঃ দত্ত চৌধুরীর পক্ষে ভিক্টরকে গ্রহণ না করা—এমন কি দত্তক পুত্ররূপেও নয়।

ঈশানী ও মিঃ দত্ত চৌধুরীর জীবনের এই পরম সত্যকে প্রথম থেকেই গোপন রাখার চেষ্টা থেকে যে জটিলতার উদ্ভব তা ছবিতে নাট্যরস বিস্তারে সহায়তা করে না বিশ্বাস-যোগ্যতার অভাবে। অপরদিকে শান্তনুর চরিত্রটিও একান্ত কৃত্রিম হয়ে পড়েছে ভাব-প্রত্যয়ের অভাবে। জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে তার জীবন-দর্শন দুর্বোধগম্য: তার চরিত্রেও রয়েছে পরস্পরাবিরোধী ভাবের সমাবেশ, যা তার চরিত্রের বৈচিত্র্য নয়, দুর্বোধ্যতা। তদুপরি ঈশানী ও শান্তনুর চরিত্র-কল্পনা বার বার শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বলেই চরিত্র দুটি আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাহিনীর এই সব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ছবিটি মোটামুটিভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কাহিনীর বিন্যাসে ত্রুটি অবশ্যই আছে; চিত্রনাট্যের পরিণতিতে মূলকাহিনী অনুসরণে যে সামান্য পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সাধন করা হয়েছে, তা-ও যুক্তি-গ্রাহ্য নয়। তবুও প্রমোদ উপকরণের সুনিপুণ সমাবেশে ছবিটি দর্শক মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে। কাহিনীর ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং এগুলির সহজ, স্বচ্ছন্দ চিত্রায়ন ছবির বিশেষ আকর্ষণ। দর্শক চিত্তবিনোদনে সুশীল মজুমদার তাঁর স্বাভাবিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এই ছবিতে।

নায়িকার চরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তাঁর সাবলীল অভিনয়ে ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। তবে তাঁর নৃত্যাংশ মোটেই উপভোগ্য হয় নি। গীতাঞ্জলী সংঘের কুচক্রী ম্যানেজারের চরিত্রে অমর মল্লিক তাঁর অভিনয়-দক্ষতার নতুন করে প্রমাণ দিলেন এই ছবিতে। ভৃত্য নস্করের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিতে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন প্রচুর। সিলভিয়ার চরিত্রে টিনা বারবারার অভিনয় প্রশংসনীয়। ঈশানীর পিতার চরিত্রে পুরনো দিনের অভিনেতা ভানু ব্যানার্জী এবং অন্যান্য ভূমিকায় তপতী ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সমীরকুমার, জয়শ্রী সেন, বেচু সিংহ, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী ও প্রীতি মজুমদারের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শান্তনুর চরিত্রটি তাঁর স্বাভাবিক দোষ-গুণের সংগে রূপায়িত করেছেন উত্তমকুমার।

সংগীত পরিচালনায় রাজেন সরকার তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। ছবির আবহ-সংগীত মনোরম। "আমার এ রিক্ত ডালি" রবীন্দ্রসংগীতটি সুগীত ও সুপ্রযুক্ত।

নৃত্য-পরিচালনায় অনাদিপ্রসাদ, আলোক-চিত্রগ্রহণে বিশু চক্রবর্তী, সম্পাদনায় গোবর্ধন অধিকারী ও শব্দধারণে সত্যেন চ্যাটার্জীর কাজ মোটামুটিভাবে প্রশংসনীয়।

শিল্পীর তিরোধান

অনেক কিছু দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে যাঁরা একদিন বিদায় নেন, তাঁদের স্মৃতি বুঝি তীব্র হয়ে বুকে বাজে। পৃথিবী থেকে এমনি নিঃশব্দে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন বাঙলা ছায়াছবির একজন নির্জনতম শিল্পী। তাঁর নাম প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। গত ২২শে জুন পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর কলকাতার বাস-ভবনে পরলোকগমন করেন।

সরকার ও অভিনেতা হিসাবে বাঙলা রজতপটের সংগে তাঁর যোগাযোগ শুরু
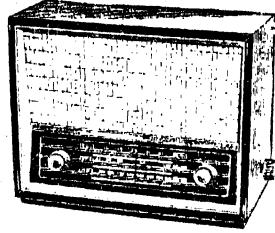
হয় চতুর্থ দশকের শেষের দিকে। নিউ থিয়েটার্সে তিমিরবরণের সহকারীরূপে কিছুকাল সংগীত-পরিচালনার কাজ করবার পর তিনি ছবি বিশ্বাস পরিচালিত "যার যেথা ঘর" ছবির সংগীত পরিচালক হিসাবে যশ অর্জন করেন। "ঘরোয়া" ছবির সহ-সংগীত পরিচালকরূপেও তিনি কাজ করেছিলেন। এর পর "কিসি সে না কহনা", "তামাসা" এবং আরও দুখানি হিন্দী ছবির সুরকার হিসাবে তিনি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। অতীতের অনেক ছবি বাদ দিলেও, সাম্প্রতিককালে "অভয়ের বিয়ে", "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত", "জলসাঘর", "মরুতীর্থ হিংলাজ" প্রভৃতি ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে তিনি অবতরণ করেন। বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের "স্বর্গ-মর্তে"র কাহিনীকাররূপেও তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেন।

বাঙলা চলচ্চিত্রপটে এ সমস্ত এবং অনুল্লিখিত আরও অনেক কিছু তাঁর বাইরের অবদান। বাঙলা ছায়াছবির রূপকার, শিল্পী ও প্রযোজকদের কাছে গত বিশ বৎসর যাবৎ তিনি ছিলেন অতি আপনজন যাঁর সংবুদ্ধি, উৎসাহ ও সকল বিষয়ে অসংকোচ সহযোগিতা প্রত্যেককে তাঁর অভীষ্ট পথে জুগিয়েছে অপরিসীম প্রেরণা। চিত্রপটের নেপথ্যে তাই তিনি ছিলেন চিত্রজগতের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর সহক্রিয়া প্রকৃতি ছোট-বড় সকলকে আপন-ভাবে কাছে টেনে নিত। অন্তরঙ্গতার আনন্দমেলায় বন্ধুদের কাছে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। শিল্পীর স্বভাবজাত অনা-সক্তিতে তিনি বার বার চলে গিয়েছেন লোকখ্যাতির প্রলোভন থেকে অনেক দূরে। কিন্তু বন্ধুদের অন্তরের অনেক কাছে সরে এসেছেন তেমনিভাবে বার বার নিবিড় স্নেহের আকর্ষণে। তাই শিল্পী হিসাবে তাঁর তিরোধানে অপূরণীয় ক্ষতি না হলেও চলচ্চিত্র শিল্পকে যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে সেবা করে আসছেন, তাঁদের কাছে তাঁর অভাব কোনদিন পূর্ণ হবার নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি "মণ্টুদা" নামে খ্যাত ছিলেন। সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র "মণ্টুদা"র স্মৃতি অন্তরঙ্গদের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

চলচ্চিত্র উৎসবের সমাদর যে দিকে দিকে বেড়েই চলেছে, তার অন্যতম প্রমাণ মস্কোর আগামী বিশ্ব-চলচ্চিত্র উৎসব। সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বপ্রথম এই ধরনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩রা আগস্ট থেকে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত। পৃথিবীর সমস্ত দেশকে এই উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রত্যেক দেশ থেকে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি ও দুটি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি (তথ্যমূলক ছবি, কার্টুন ছবি, পুতুল (পাপেট) ছবি অথবা শিশুচিত্র) এই উৎসবে পাঠানো যেতে পারে। উৎসবের পূর্ববর্তী আঠারো মাসের মধ্যে যে ছবিগুলি তৈরী হয়েছে এবং যেগুলি পূর্বে অন্য কোন উৎসবে প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হয়নি, এমন ছবিই এই উৎসবে প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণ করা হবে।

সব ছবিই সেগুলির মূল ভাষায় অথবা রাশিয়ান "সাব টাইটেল" সহযোগে এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে। বিভিন্ন দেশের চিত্র-পরিচালক, চিত্রকাহিনীকার ও চিত্র-সমালোচকদের নিয়ে গঠিত ১৫ জন সভ্যা-যুক্ত এক বিচারকমণ্ডলী পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির গুণাগুণ বিচার করবেন। ৯ জন সভ্যযুক্ত বিচারকমণ্ডলী স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির শ্রেষ্ঠতা বিচার করবেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিকে "গ্র্যাণ্ড গোল্ডেন প্রাইজ" দেওয়া হবে। বিশেষ শিল্প-সৌষ্ঠবের জন্য পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবিকে তিনটি স্বর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে। বিভিন্ন ধরনের শ্রেষ্ঠ স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ চিত্রকাহিনী, স্ত্রীভূমিকা এবং পুরুষ ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়, শ্রেষ্ঠ সংগীত, শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশ ও শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রের জন্য রৌপ্য-পুরস্কার দেওয়া হবে। "গ্র্যাণ্ড গোল্ডেন প্রাইজ" প্রাপ্ত ছবির একটি প্রিন্ট বরাবরের জন্য সোভিয়েট ফিল্ম ফাণ্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে।

মস্কোর এই প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো হচ্ছে সত্যজিৎ

রায়ের "জলসাঘর" এবং স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি হিসাবে পাঠানো হচ্ছে দুটি প্রামাণ্য চিত্র—ফিল্মস ডিভিশনের তোলা "আচার্য জগদীশ" এবং মধ্যপ্রদেশের উপর একটি ছবি।

চিঠিপত্র

বিদেশে ভারতীয় ছবি

মহাশয়, "দেশ" পত্রিকার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীমতী সোনালী দাশগুপ্তার "কান্ ফেস্টিভাল" সম্বন্ধীয় লেখাটি পড়লাম। বিদেশে প্রেরিত ভারতীয় ছবির ব্যর্থতা প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা তাঁর নিজস্ব মত ত বটেই—চিন্তাশীল প্রতিটি ভারতীয়েরই মনের কথা। বাংলা, মারাঠী, তামিল, হিন্দী ইত্যাদি যে ছবিই আমরা বিদেশে পাঠাই না কেন; দেখতে হবে ভাল ছবির ন্যূনতম মানচিহ্নটি তা যেন অতিক্রম করে।

হিন্দীভাষী ভারতীয় যে ভাবেই কথাটা নিন্ না কেন, এ বিষয়ে তিনি আমার সাথে একমত হতে বাধ্য যে, সরকার পক্ষ বিদেশে ছবি পাঠানর ব্যাপারে অহিন্দী ছবির বেলায় কতকটা পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় দিয়ে থাকেন। "লাজবন্তী"র মতো সাদামাটা হিন্দী ছবিই যে ভারতীয় চিত্রের মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়াবে, তা আমি মানতে রাজী নই। বহু ভাল ছবিই দেশে রয়ে গেছে যা শ্রীমতী দাশগুপ্তার ভাষায় 'ফিল্মস ডিভিশনের বুড়ি ছুঁয়ে শেষ পর্যন্ত কোনদিনই ওদেশে পেঁছয় না"।

আর একটি কথা। য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে আজও আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি ধারণা রয়ে গেছে। তাই ছবির মধ্যেকার কোন বিশেষ ঘটনা বা আচরণ ততটা বা মোটেই বিসদৃশ না লাগলেও ওখানকার দর্শকদের মনে অন্য প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করি। বছর দুই পূর্বে প্রাগে "দেবদাস" (হিন্দী) দেখে আমার এক চেক্ বন্ধু দেবদাসকে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও লম্পট বলে অভিহিত করেন। পার্বতীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে তিনি জানতে চান, নারীর অধিকার বলতে কি আমাদের দেশে কিছুই নেই, তারা কি পুরুষের হাতের ক্রীড়নক মাত্র? আমার মনে হয়, এ-সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির কারণ অনুপযুক্ত "ডাবিং" অথবা "সাব-টাইটলিং"। কাজেই বিদেশে ভারতীয় ছবি দেখাবার সময় উপযুক্ত ভাবানুগ ভাষায় প্রতিটি দৃশ্যের অকৃত্রিম অর্থটুকু যাতে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইতি—

শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়,
শিলং।

"দো ওস্তাদ" প্রসঙ্গে

মহাশয়, "দো ওস্তাদ" দেখলাম। দেশে যখন কাঁচা ফিল্ম-এর এত অনটন ঠিক সেই সময় "দো ওস্তাদ"-এর মতো ছবি তোলা হচ্ছে। এতে কাঁচা ফিল্ম-এর অপচয় হচ্ছে না কি? যে দেশে "পথের পাঁচালী", "লৌহ কপাট", "কাবুলিওয়ালা", "দো বিঘা জমিন", "অপুর সংসার"-এর মতো ছবি তৈরী হয়, সেই দেশে "দো ওস্তাদ"-এর মতো ছবি কি করে হয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারি না।

ভারতের নাগরিক হিসাবে সেন্সর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবো, তাঁরা যেন দেশের কল্যাণের দিকে চেয়ে এইরকমের ছবিকে প্রদর্শনীর ছাড়পত্র না দেন। ইতি—

শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়,
বালী (নপট্টী)।

"মাহুত বন্ধুরে" সম্পর্কে

মহাশয়, "মাহুত বন্ধুরে" চিত্রের সংলাপের দুর্বলতার জন্য এটি রসঘন হয়ে উঠতে পারেনি। প্রাকৃতিক শোভা সুন্দর, সন্দেহ নেই। তবে একই জায়গা বার বার দেখানোতে একঘেয়েমির দোষে দুষ্ট হয়েছে। দিলীপ রায়ের অভিনয়ে তাঁর মধ্যবিত্ত সত্তা প্রকট হয়েছে, মাহুতে সত্তা ভালোভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। বিষ্ণুরাভা এবং প্রকৃতীশ বড়ুয়ার অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। ভূপেন হাজারিকার সংগীত পরিচালনাও আশানুরূপ হয়নি। একমাত্র "গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে" গানটিই মনে ছাপ রাখে। শ্রী হাজারিকা ছবিটিকে অসমিয়া লোকসংগীত দিয়ে আরও মনোরম করতে পারতেন। অধিকাংশ গান-ই দুয়েক কলি করে গাওয়া হয়েছে। ফলে মনে একটা অখণ্ড ভাব জাগবার আগেই গানের রেশ মন থেকে মুছে যায়। তাই সংগীতের দিক দিয়েও আশাহত হয়েছি।

শ্রী হাজারিকা আমাদের একটি নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—এজন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। ইতি—

সঞ্জয়কুমার সেন,
কলিকাতা—৪০।

নাট্যাভিনয়

গীতবীথি শিল্পীগোষ্ঠী গতবারের ন্যায় এবারেও নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে আগামী ১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নাটকটি অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ নাটকটি জাঁকজমকপূর্ণ বিচিত্র বেশভূষা, তাস দ্বীপের অধিবাসীদের বিচিত্র চালচলন, সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে গতবারের ন্যায় এবারেও সুবিনয় রায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হবে।

* * *

গত ২৩শে জুন কলকাতা টেলিফোন ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ উমানাথ ভট্টাচার্যের "শেষ সংবাদ" বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় সৌকর্য দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে।

রুশ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন"

সোভিয়েত তাজিকিস্তানের রাজধানী স্তালিনাবাদের "লাখুতি অ্যাকাডেমিক ড্রামা থিয়েটার"-এ রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটক সম্প্রতি মঞ্চস্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এই নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অপর্ণা চরিত্রে রুশ অভিনেত্রী হাইরি নাজারোভা অপূর্ব অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন

পরিচালক খোজাকুল রহমতুল্লায়েফ মূল "বিসর্জন" নাটকটিকে একটু সংক্ষিপ্ত করেছেন, কিন্তু কোথাও অদল-বদল করেন নি কিংবা ঘটনাপর্যায় অন্যভাবে সাজান নি। এ সম্পর্কে তিনি "তাস" প্রতিনিধিকে বলেন : "বিসর্জন" নাটকটির নাটকীয় আবেদন ও নাট্যগঠন রূপ এতোই সুপরিণত যে তাকে মঞ্চোপযোগী করবার জন্যে অদল-বদলের কোন দরকারই পড়ে না। মঞ্চোপযোগী নিখুঁত নাটকগুলির মধ্যে "বিসর্জন" অন্যতম।"

বিশিষ্ট তাজিক সুরকারদ্বয় ফজল সালিয়েফ ও মিহাইল বভেতোফ এই নাটকের উপযোগী আবহসংগীত রচনা করেন বাংলার লোকসংগীতের সুরের ভিত্তিতে। ইঁহারা উভয়েই ভারতীয় সংগীতের রাগধর্মের সহিত সুপরিচিত। "বিসর্জন"-এর আবহসংগীতে এঁরা বাঁশের বাঁশী, এসরাজ, ঢোলক ইত্যাদি কয়েকটি ভারতীয় যন্ত্র ব্যবহার করেন।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্র যাঁরা রূপায়িত করেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অপর্ণার ভূমিকায় তরুণী অভিনেত্রী হাইরি নাজারোভা। নাজারোভার মুখশ্রী বাঙালী মেয়েদের মতোই। শান্ত ও মধুর, কিন্তু নির্ভীক—অপর্ণার চরিত্রকে যথাযথরূপে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে নাজারোভার আয়ত চক্ষু, ঘন কালো দীর্ঘ কেশ এবং লাল পাড়ের সাদা শাড়ি জড়ানো সুঠাম দেহ। অপূর্ব অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি অপর্ণার প্রত্যেকটি আবেগ-অনুভূতিকে দর্শকের মনে গভীরভাবে সঞ্চারিত করে দেন।

রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সংযত চরিত্রটিকে রূপায়িত করেন "লাখুতি আকাডেমিক ড্রামা থিয়েটার"-এর প্রবীণ অভিনেতা গাজিল নিয়াজফ, এবং রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন মহম্মদ খালিলফ। তরুণ জয়সিংহের ভূমিকায় রূপ দেন উদীয়মান তাজিক নাট্যকার শামসি কিয়ামফ। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বটি তিনি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন।

"লাখুতি ড্রামা থিয়েটার" কর্তৃক মঞ্চস্থ এই "বিসর্জন" নাটকটি সর্বদিক দিয়ে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। উদ্বোধন-রজনীর পর প্রতিদিনই প্রেক্ষাগৃহে দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

এশিয়ান মিউজিক সার্কল

লণ্ডনের এশিয়ান মিউজিক সার্কল তাদের কার্যাবলীর ব্যাপক প্রসারের প্রতি সম্প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছে বলে জানা গেছে। [illegible]র বহুবিধ পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম [illegible] লণ্ডনে একটি স্থায়ী রঙ্গালয় ক্রয় করা। এই রঙ্গালয় মিউজিক সার্কল-এর প্রধান কর্মকেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হবে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে এবং ফ্রান্স, জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও কয়েকটি আমেরিকান শহরে শাখা স্থাপন মিউজিক সার্কল-এর বহুবিধ প্রসার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সার্কল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক আয়ান দেব অংগাদি বলেন, আমরা এমন একটি রঙ্গালয় চাই যাতে সাতশো আসন ও বারোটি ঘরের ব্যবস্থা থাকবে। এই ঘরগুলির মধ্যে কয়েকটি অফিসের কাজ ও লাইব্রেরীর জন্য ব্যবহৃত হবে, সংগীত ও নৃত্যের শিক্ষাদানের জন্য দুটি ঘর ব্যবহার করা হবে।

বর্তমানে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, টুইকেনহাম, রিচমণ্ড, বার্মিংহাম ও লীডস-এ সার্কল-এর শাখা রয়েছে। এশিয়ান মিউজিক সার্কল ইউনেস্কো থেকে প্রাচ্যের সংগীত ও নৃত্যপ্রচারের একটি যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ছয় বৎসর পূর্বে এই মিউজিক সার্কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইতিমধ্যেই এই সংস্থা বৃটেনে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে। পরিশেষে শ্রীঅংগাদি মন্তব্য করেন, সার্কল এর প্রতি তিনজন সভ্যের মধ্যে দুজন বৃটিশ এবং প্রকাশ্য সংগীত অনুষ্ঠানের শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অধিকাংশই বৃটেনের সংগীতরসিক।

খেলার মাঠে

একলব্য

বিজ্ঞান বিশ্বকে দিন দিন সমৃদ্ধ করছে। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তিতে বিশ্ব হচ্ছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। খেলা-ধূলোর ক্ষেত্রেও এর শেষ নেই। আবিষ্কারের মোহ যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন সে নতুন বা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার না করে থাকতে পারে না। যেখানে যে অভাব আছে সেখানকার অভাব পূরণ করবার জন্যই তখন তার ঝোঁক চাপে।

কিছুদিন আগে সোভিয়েট রাশিয়ায় খেলার মাঠ থেকে জল নিষ্কাশনের এক অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্র সম্বন্ধে এক বিদেশী সাংবাদিক লিখেছেন—মাঠে গিয়ে ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। খেলা আরম্ভ হতে তখনো আধ ঘণ্টা বাকী। খেলোয়াড়রা নিশ্চিন্ত মনে প্যাভেলিয়নে বসে সাজগোজ করছেন। ভাবলাম এত বৃষ্টিতে খেলা হবে কি করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মাঠ জলে ভরে গেল। চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। অবশ্য খুব বেশী জল নয়। জায়গায় জায়গায় জমা জল। তবু মাঠ খেলার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কিন্তু খেলোয়াড়দের হাবভাব দেখে মনে হল তারা খেলতে বদ্ধপরিকর। স্টেডিয়ামেও লোক-ভর্তি। একটু পরে দেখি মাঠের এক কোণ থেকে একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র বিকট শব্দ করতে করতে মাঠে ঢুকলো। রোলারের মত যন্ত্রটি মাঠের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাঠের জলও সরে যাচ্ছে। কিছু পরে খেলা আরম্ভ হল। খেলা শেষ হবার পর যন্ত্রটি দেখতে গেলাম। দেখি রোলারই বটে। তবে স্পঞ্জে মোড়া রোলার। এমনভাবে তৈরী যে মাঠের জল চুষে নিয়ে পেছনের ট্যাঙ্কে জমা করে দেয়। মাঝে মাঝে জল ফেলে দিয়ে আবার রোলার চালাতে হয়।" সত্যই অদ্ভুত যন্ত্র। মস্কোতে খেলাধূলার সরঞ্জাম তৈরীর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে যন্ত্রটি তৈরী করা হয়েছে।

জলবৃষ্টির জন্য ক্রিকেট মাঠের সমস্যাও কম নয়। কিন্তু ইংলণ্ডে সম্প্রতি প্লাস্টিক ক্রিকেট পিচের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। রিল্যাক্স এণ্ড কোম্পানী এই প্লাস্টিক পিচের আবিষ্কারকারক। আবিষ্কারক প্রতিষ্ঠানের মতে এই নকল পিচ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার পক্ষে উপযোগী। খরচ কম। রোদ বৃষ্টি ঝড়েও দশ বছরকাল স্থায়ী। মিডলসেক্স কাউণ্টি ক্লাবের ক্রিকেট স্কুলে ভারতীয় খেলোয়াড় সি বোরদে এই পিচ দেখে বলেছেন প্র্যাক্টিসের পক্ষে এ পিচ খুবই ভাল। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে দেশে দেশে প্লাস্টিক পিচে ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে।

• • •

সুইডেনের মুষ্টিযোদ্ধা ইনগেমার জোহানসনের কাছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হেভি ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ফ্লয়েড প্যাটারসনের পরাজয় গত ২৩ বছরের মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা। ২৩ বছর আগে ম্যাক্স স্মেলিংয়ের কাছে বিশ্বজয়ী মুষ্টিক জো লুইয়ের পরাজয়ের পর এমন অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

ইনগেমার জোহানসন অখ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা। অবশ্য অখ্যাতনামা বললে ভুল হবে। কারণ তিনি ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্লয়েড প্যাটারসনের কাছে শিশু বলা চলে। কিন্তু এই 'শিশুই' প্যাটারসনকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করেছেন। ফ্লয়েড প্যাটারসন জীবনের ৩৬টি লড়াইয়ের মধ্যে এর আগে পরাজয় স্বীকার করেননি। অবশ্য ১৯৫৪ সালে একবার মাত্র জাকি ম্যাক্সিমের কাছে প্যাটারসনকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সে হারও ছিল বিতর্কমূলক। যাই হক বিশ্বজয়ী প্যাটারসন যে জোহানসনের কাছে পরাজিত হবেন এ কথা কেউ কল্পনাই করতে পারেননি। কিন্তু নিউ-ইয়র্ক ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামের ত্রিশ হাজার দর্শক বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখেছেন প্যাটারসন জোহানসনের বজ্রমুষ্টির আঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে অর্ধ চেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। প্রথমে তিনি মুষ্টিযুদ্ধের সীমানার চারিদিকে টলতে টলতে ঘুরতে থাকেন। তারপরেই ক্যানভাসের উপর পড়ে যান। তাঁর নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। দৃশ্য দেখে প্যাটারসনের স্ত্রীও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তাঁর বোনের চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। জোহানসনের হাতে হয়তো প্যাটারসনকে আরও নাজেহাল হতে হত। কিন্তু প্যাটারসনের অসহায় অবস্থা দেখে রেফারী ১৫ রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ের উপর তৃতীয় রাউণ্ডেই যবনিকা টানেন। মাত্র ৮ মিনিটের মধ্যে এই তিন রাউণ্ডব্যাপী লড়াইয়ে প্যাটারসন অন্ততঃ ৭ বার ভূতলশায়ী হন। ধীর, স্থির, বিবেচক মুষ্টিযোদ্ধা জোহানসন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাটারসনের অসহায় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। মহা-মুষ্টিকের এমন মহাপতন মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইনগেমার জোহানসন

ইনগেমার জোহানসন ডানহাতের মধ্যে প্যাটারসনের মৃত্যুবাণ লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্র্যাক্টিসের সময় তাকে ডান হাত কোনদিনই ঘুষি চালাতে দেখা যায়নি। বাঁ হাতেই তিনি অনুশীলন করতেন। অনেকেরই

লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের এক প্রীতি-ভোজে আপ্যায়িত করেন। শ্রীমতী পণ্ডিতের কেনসিংটন প্যালেস বাসভবনের লনে ভারতীয় দলের গৃহীত ছবি

ধারণা ছিল জোহানসনের বাঁ হাতই বেশী শক্তিশালী। কিন্তু তার গোপন যন্ত্র যে ডান হাতের মধ্যে লুকানো ছিল এ কথা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। কার্যক্ষেত্রে সেই অস্ত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে এ এক মস্ত স্ট্র্যাটেজি।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করায় জোহানসন প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা পাবার অধিকারী হয়েছেন। তাঁর জয়ের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে স্টকহোমে সুইডিসবাসিরা রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য করেছেন। গোথেনবার্গে আতসবাজি পুড়িয়ে বিজয় উৎসব পালন করা হয়েছে।

দুই মুষ্টিকের মধ্যে আবারও মুষ্টিযুদ্ধের কথাবার্তা চলছে। সারা বিশ্বের মুষ্টিকেরাই আগ্রহভরে দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে এই ফিরতি লড়াইয়ের ফলাফলের দিকে।

ইংলণ্ডের চিঠি

বেরী সর্বাধিকারী

(বিমান ডাকে)

লণ্ডন, ২৮শে জুন—এবার ইংলণ্ডে এসে খেলার যে তিনটি বড় আসরে উপস্থিত হয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি উইম্বলডনে। ট্রেন্ট ব্রিজে একেবারেই নিরাশ হয়েছি। লর্ডসে তবু কিছুটা আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছি উইম্বলডনে অলমেডো ও কৃষ্ণনের খেলা দেখে। কৃষ্ণন তৃতীয় রাউণ্ডে অলমেডোর কাছে পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু তার খেলা দেখে ভারতীয় হিসাবে রীতিমত গর্বই বোধ করেছি। কৃষ্ণন ও অলমেডোর খেলার বিবরণ আপনারা নিশ্চয়ই দৈনিকে পড়েছেন। এ খেলাকে কেন্দ্র করে সারা-ইংলণ্ডে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তাও আপনাদের অজানা নেই। কিন্তু আপনারা সে আলোড়নের কথা জেনেছেন কাগজে খবর পড়ে। আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি, চোখে দেখেছি কি সে আলোড়ন। আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়কে নিয়ে বিদেশে এত হৈ-চৈ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হবেই বা না কেন? লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপে কৃষ্ণন সেমি ফাইন্যালে হারালেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে প্রখ্যাত এলেক্স অলমেডোকে। ফাইন্যালে পরাজিত করলেন গতবারের উইম্বলডন রানার্স অস্ট্রেলিয়ার কুশলী খেলোয়াড় নীল ফেজারকে। কাগজে কাগজে কৃষ্ণনের টেনিস খেলার তেজোদৃপ্ত ছবি। তার প্রশংসায় সমস্ত কাগজ পঞ্চমুখ। তারপরই উইম্বলডনের তৃতীয় রাউণ্ডে কৃষ্ণন ও অলমেডোর সাক্ষাৎকার। টেনিস রসিকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা চরমে উঠেছিল। দর্শকে কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল উইম্বলডনের সেণ্টার কোর্ট। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন তাদের পয়সা খরচ সার্থক হয়েছে। অলমেডো ও কৃষ্ণনের খেলা দেখে তাঁরা তৃপ্ত পেয়েছেন। প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন অ্যালথিয়া গিবসন, যিনি এখন টেনিস র‍্যাকেট ছেড়ে লেখনী ধরেছেন তিনি তো পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন কৃষ্ণন ও অলমেডোর খেলাই বোধকরি এ বছরের উইম্বলডন প্রতিযোগিতার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা। ফ্রেণ্ড পেরীর মত বিজ্ঞ সমালোচকও একই মন্তব্য করেছেন।

অলমেডোর কাছে কৃষ্ণনকে অবশ্য ৬-৪, ৩-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে হার স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু স্কোরের তালিকা দুই মহারথী খেলোয়াড়ের ক্রীড়াধারায় সত্যিকারের পরিচায়ক নয়। খেলা হয়েছে প্রায় সমানে সমানে। বরং মারের নৈপুণ্যে কৃষ্ণন বাহাদুরী দেখিয়েছেন বেশী। কিন্তু অলমেডোর 'গোলার' মত সার্ভিসই তাকে বেশী পয়েণ্ট এনে দিয়েছে। সার্ভিসে একটু দুর্বল না হলে এ খেলায় হয়তো সপ্তাহ আগের লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপের পুনরাবৃত্তি ঘটতো। অনেক সাংবাদিক বন্ধু—অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড়ও কৃষ্ণন ও অলমেডোর খেলা দেখতে উইম্বলডনে গিয়েছিলেন। তাঁরা অনেকেই আমাকে বললেন সত্যিই কৃষ্ণনকে নিয়ে তোমরা গর্ব করতে পার। আনন্দে বুক ফুলে উঠলো।

উইম্বলডনের কথা এখন থাক। আবার ক্রিকেট নিয়েই আলোচনা করি। তৃতীয় টেস্টের জন্য ইংলণ্ডের টীমকে একরকম 'ঢেলে সাজা' হয়েছে। আগেই বলেছি

ভারতকে পরাজিত করাই ইংলণ্ডের আসল উদ্দেশ্য নয়। অস্ট্রেলিয়ার কাছে এবার গো-হারা হারবার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইংলণ্ডের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ভারতকে হারিয়ে সে ক্ষতির কিছু পুনরুদ্ধার হবে না। তাই ইংলণ্ডের নির্বাচকদের চোখ এখন ভবিষ্যতের দিকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ক্রিকেট যুদ্ধে ইংলণ্ড হালে কতটুকু পানি পাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই ভারতীয় দলের কষ্টি-পাথরে ইংলণ্ড নিজেকে যাচাই করতে চায়। ভারতের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে যারা খেলেছিলেন তাদের মধ্য থেকে ৬ জনকে তৃতীয় টেস্টে বাদ দেওয়া হয়েছে। পুরনো খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন মাত্র ৫ জন। অধিনায়ক পিটার মে, কলিন কাউড্রে, কেন ব্যারিংটন, অ্যালান মস ও ফ্রেডি ট্রুম্যান। ব্রায়ান স্ট্যাথাম নিশ্চয়ই দলে পড়তেন। কিন্তু তার অসুস্থতার জন্যই তাকে দলে নেওয়া হয়নি। আর দল থেকে বাদ পড়েছেন গডফ্রে ইভান্স, আর্থার মিল্টন, কেন টেলর, মার্টিন হর্টন ও টম গ্রীনহাফ। নতুন যারা দলে এসেছেন তাদের নাম রয় সোয়েটম্যান, গিলবার্ট পার্কহাউস, জিওফ পুলার, ব্রায়ান ক্লোজ, জন মার্টিমোর ও হ্যারোল্ড রোডস। পুলার ও রোডস টেস্ট টীমে আনকোরা নতুন। এরা আগে কোন টেস্ট খেলেননি। পরম নির্ভরযোগ্য উইকেট কিপার গডফ্রে ইভান্স কেন যে দল থেকে বাদ পড়লেন তার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তবে আন্দাজ করতে পারছি ইভান্স তো কষ্টিপাথরে যাচাই করা খাঁটিসোনা। তার সহকারী হিসাবে আর একজনেরও দরকার। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরের অন্যতম উইকেট কিপার রয় সোয়েটম্যানকে আবার ডাকা হয়েছে। ইভান্সের বয়স ৩৮ বছর। এ পর্যন্ত তিনি ৯১টি টেস্ট খেলেছেন। ১০০টি টেস্ট খেলার কৃতিত্ব ইভান্স নিশ্চয়ই লাভ করবেন। কারণ ইংলণ্ড দলের পক্ষে তিনি এখন অপরিহার্য। ওপেনিং ব্যাটসম্যানের সমস্যা ইংলণ্ডের এক বড় সমস্যা। দুর্বল ভারতের বিরুদ্ধেও কেন টেলর ও আর্থার মিল্টন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এদের ইংলণ্ড টীমে আর স্থান পাওয়া কষ্ট। গ্লামোরগানের খেলোয়াড় গিলবার্ট পার্কহাউসকে আবার ইংলণ্ডের ইনিংস আরম্ভ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। সম্ভবত পার্কহাউসের জুড়ি হবেন ল্যাঙ্কাশায়ারের ন্যাটা ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার। পুলার এ বছর ভালই ব্যাট করছেন। তবে ইনিংস আরম্ভ করবার অভিজ্ঞতা নেই। পুলার সাধারণত তিন নম্বর বা চার নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে ব্যাট করেন। ইংলণ্ড টীমে আর একজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান আছেন। ইনি হচ্ছেন ব্রায়ান ক্লোজ। ক্লোজ স্পিন বোলারও বটে। স্পিন বোলার টম গ্রীনহাফের বোলিংয়ের ত্রুটি শুধরে নেবার জন্য তিনি ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। তার স্থান পূরণ করা হয়েছে অফব্রেক বোলার জন মার্টিমোরকে দিয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকেছে ডার্বি-শায়ারের ফাস্ট মিডিয়াম বোলার হ্যারোল্ড রোডসের অন্তর্ভুক্তিতে। রোডস এমন কিছু আহামরি বোলার নন। এই মরসুমে মাত্র ২৯টি উইকেট পেয়েছেন। তবে যত দুর্বল করেই ইংলণ্ড দল গঠন করা হক—ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির ধারণা ভারতকে পরাজিত করতে এরাই যথেষ্ট। আর একটি খেলা ড্র হলেও ক্ষতি কি? প্রথম দুটি টেস্টের জয়ের গৌরব তো তাদের পকেটে।

এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পড়বে তখন লীডস মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের তৃতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকে এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। সুভাষ গুপ্তের গ্ল্যাণ্ডস্ফীতি, জয়সিমার পায়ের ব্যথা, কণ্ট্রাক্টরের পাঁজরের অস্থিতে সরু চির, বোরদের ভাঙ্গা আঙুল। অধিনায়ক গাইকোয়াড় এবং নাদকার্ণী সুস্থ হলেও পুরোপুরি সুস্থ নন। তাই দল গঠনে আমাদের কিছুটা অসুবিধা হবে নিশ্চয়ই। যাই হক, 'তাতে পাঁজি মঙ্গলবার' দেখাই যাক তৃতীয় টেস্টে কারা খেলেন।

এখানকার বহু কাগজ ভারতীয় খেলোয়াড়-দের উপদেশ দিয়েছেন—'তোমরা ভীরুতা ত্যাগ করে খেলার মত খেল।' আমরাও এ সম্বন্ধে বহু লিখেছি। কিন্তু কথাগুলো আমাদের ম্যানেজারের মনঃপূত হয়নি। তাঁর নাকি গোসা হয়েছে। সাংবাদিক বন্ধু বেলী বিখ্যাত 'স্টার' পত্রিকায় পরিষ্কার করে বলেছেন—"আমাদের উপদেশ ভারতীয় দলের বিরক্তির কারণ হয়েছে।"

কিন্তু এতে বিরক্তির কি আছে? খেলতে পারবো না আবার সে কথা বললে রাগ হবে? সাবাস্ ম্যানেজার! আমি বরাবরই বলেছি আমাদের দল দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযুক্ত ম্যানেজার ও অধিনায়কের হাতে পড়লে এই দলই অনেক ভাল খেলতো। দলের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও তো তেমন গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। দলের দুইজন হর্তাকর্তা দুই বরোদাবাসী। অধি-নায়ক গাইকোয়াড় আর দলের ম্যানেজার ফতেসিং। অধিনায়ক গাইকোয়াড় মুখ খোলেন না আর ফতে সিং মুখ খোলেন ইংলণ্ডের ক্রিকেটের স্তুতিগান করতে।

সত্যই গাইকোয়াড়ের দাঁত চড়ুও 'রা' বেরোয় না। অনেক কসরৎ করবার পর হয়তো মুখ দিয়ে বেরোবে—'ইয়েস নো ভেরিগুড'। নিতান্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ধর্মকর্মে অটল বিশ্বাস। পূজা-অর্চনাও করেন শুনেছি। তা করুন। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেদের লোকের সঙ্গেও তো দু একটা কথা বলা দরকার। যেমন কোন্ বোলারের বেলায় কি রকম ফিল্ডিং সাজানো উচিত—কাউড্রেকে কিভাবে তাড়াতাড়ি আউট করা যায়, কিভাবেই বা আমরা খেলবো ইত্যাদি। যাকে বলে খেলার স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে আলোচনা। কিন্তু কৈ কোন আলোচনার কথাই তো কানে আসে না। এসব জিনিস অমরনাথ ও পাতৌদির নবাবকে করতে দেখেছি। হাজারেও সব সময় খেলোয়াড়-দের পরামর্শ নিয়েছেন। অধিনায়ক ও ম্যানেজারের এ বস্তুতে হয় বিশ্বাস নেই, না হয় জানেনই না। তা না হয় বুঝলুম কিন্তু টেস্টের আগে একটু প্র্যাক্টিসও করতে নেই? লর্ডস টেস্টের আগে দেখেছি ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, পরিষ্কার চমৎকার আবহাওয়া। কিন্তু যে দল পরের দিন টেস্ট খেলবে তারা প্র্যাক্টিসও করতে এল না।

ফতেসিং কথা বলেন অনর্গল। কিন্তু ভারতীয় দলের কাজে আসে না। বরং হীনমন্যতারই পরিচয় থাকে। বিনয় ভাল কিন্তু অতি বিনয় ভাল না। ফতে সিং বলেন—"আমরা তোমাদের কাছে শিখতে এসেছি। আমরা খেলতে পারি না। হারায় লজ্জা কি আছে? একটু আধটু যেটুকু খেলি তাতেই আমরা সন্তুষ্ট।" অমায়িকতার চূড়ান্ত। ইংলণ্ডের ক্রিকেট সভায় না বলে এ ধরনের কথা বৃন্দাবনেই মানায় ভাল। এম সি সি'র ভোজ সভায় ফতে সিং যেভাবে ইংলণ্ডের স্তুতিগান করেছেন তাতে অনেক ইংরেজেরও লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেছে।

ম্যানচেস্টারে ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে আমাদের খেলার কথা একটু বলে আজকের লেখা শেষ করব। বৃষ্টিদেবতাই এ খেলায় আমাদের মুখ রক্ষা করেছে। সময় পেলে ল্যাঙ্কাশায়ার যে আমাদের হারিয়ে দিতে পারত এ কথা বলাই বাহুল্য। ৫ উইকেটে ৪০০ রান তুলে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউণ্টি তাদের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করল আর আমাদের পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৩৭ রানের মধ্যে। কল্পনা করুণ ব্যাটিং ও বোলিংয়ের কি শোচনীয় ব্যর্থতা। জলবৃষ্টি অপরিষ্কার আলো আর মারাত্মক বোলার স্ট্যাথামের অসুস্থতাই আমাদের মুখ রক্ষা করেছে। অবশ্য বিপর্যয়ের মুখে কৃপাল সিং, নাদকার্ণী ও জয়সিমা যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়েছেন একথা স্বীকার করতেই হবে।

দেশী সংবাদ

২২শে জুন—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য সায়াহ্নে তাঁহার বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, "ভারত সরকারের সহিত পরামর্শের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু ধান চাউলের ব্যাপারে লেভি ধার্য ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ সাময়িকভাবে রদ করিয়াছেন। বিগত ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ আদেশ বলবৎ হইয়াছিল।

অদ্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে সর্বশ্রেণীর ধান ও চাউলের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারের নূতন নীতিটি অনুমোদন করাইয়া লইতে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কিছুটা বেগ পাইতে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কংগ্রেসের বাঁকুড়ালো গোষ্ঠীর পক্ষভুক্ত সদস্যগণ দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ইহাকে নাকি "মজুতদার ও চোরাকারবারীদের নিকট সরকারের নতি স্বীকার বলিয়া মন্তব্য করেন।

২৩শে জুন—কেরালা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট এবং অন্যান্য বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সহিত দ্বিতীয় দফা আলাপ-আলোচনা করেন। আলাপ-আলোচনাকালে শ্রীনেহরু এইরূপ কোন আভাষ দেন নাই যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে বোঝাপড়া করার জন্য তিনি কেরালায় আসিয়াছেন।

২৪শে জুন—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পর্ষদ হইতে জানান হয় যে, এবার বিভিন্ন স্কুল হইতে ৪০,০৯৯ জন এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ৬৬১০৩ জন পরীক্ষা দিয়াছিল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এবার শতকরা ৪৮.৬৭ জন এবং শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩.৬৩ জন পাস করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি লইয়া এবং ধান চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার লইয়া রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তর যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী বি বি ঘোষ তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক বড় নোট দিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

১৯৫৭ সালের ১লা জুন পর্যন্ত [illegible] আদায় ১ কোটি ৬ লক্ষ [illegible] টাকা [illegible] আদায় হয় নাই। ইহার মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে পাওনা ৬৭ লক্ষ টাকার [illegible] আছে। সর্বাপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গিয়াছে।

২৭শে জুন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রতিপালিত হয়। [illegible] [illegible] লইয়া [illegible] মূল্য [illegible]

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এই ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানান।

কেরালা হইতে নয়াদিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর অদ্য সন্ধ্যায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু মন্ত্রিসভায় কেরালা পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকাশ যে শ্রীনেহরু মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিকট বলিয়াছেন যে, কেরালার জনগণ ব্যাপকভাবে কম্যুনিস্ট সরকারের বিরোধিতা করিতেছেন।

২৬শে জুন—উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবে সর্টিং না হওয়ায় হাওড়া আর এম এস-এ প্রায় ২০ হাজার চিঠি গত ছয় মাস ধরিয়া বিলি হয় নাই। ঐগুলি মেঝের উপর স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহা ছাড়া চিঠিপত্র বোঝাই দেড়শত হইতে দুই শতটি ডাকের থলির মুখ খোলা হয় নাই।

কেরালায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং স্কুল বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে পুলিস গত ১২ই জুন হইতে এ পর্যন্ত ১৩৬০০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সরকার বিরোধী দলগুলি এই দিন হইতে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং রাজ্যব্যাপী হরতাল হয়। ইহাদের মধ্যে ৪১৮০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

২৭শে জুন—কেরালার বর্তমান সমস্যা সমাধানকল্পে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ অদ্য তাহা অগ্রাহ্য করেন। কর্মপরিষদ বলেন যে, মন্ত্রিসভার পদত্যাগের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। কলিকাতা পুলিসের হিসাব মতে উহার পর নিখোঁজের সংখ্যা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২৮শে জুন—কেরালায় কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কেরালা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন, অদ্য নয়াদিল্লীতে কেরালার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেই পরিকল্পনা কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

এই স্থানে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড়ের ফলে একটি শিশু সহ মোট ৭ জন লোক নিহত হইয়াছে। ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৮ মাইল হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

২২শে জুন—কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষের পরিচালনাধীনে পৃথিবীর কঠিন আবরণের ভিতর দিয়া কয়েক মাইল দীর্ঘ গর্ত খুঁড়িয়া উহার অনাবিষ্কৃত অভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা শীঘ্রই আরম্ভ হইতেছে।

মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম দুইটি যুবক সাঁতার কাটিয়া মরুসাগর (ডেড সী) অতিক্রম করিল। এখানকার জল এত বেশী লোনা যে সাঁতার কাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। জলের শতকরা ২৫ ভাগই লবণ।

২৩শে জুন—সম্প্রতি পাকিস্তানে সরকারী ফরমান জারী হইয়াছে যে, পাকিস্তান হইতে কেহ ভারতে আসিলে তিনি ৫০টি পাকিস্তানী মুদ্রা সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতে পারিবেন বটে, কিন্তু সঙ্গীয় টাকা এবং গহনাপত্র আবার আসিবার সময় পাকিস্তানে নিয়া আসিতে হইবে। ভারতে একটি পাকিস্তানী পয়সাও খরচ করা চলিবে না।

২৫শে জুন—দশ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার বানরাকৃতি মানুষের একটি মাথার খুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক অধ্যাপক রেমণ্ড ডার্ট গত রবিবারে জোহান্সবার্গে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, গত ১৪ বৎসর ধরিয়া উত্তর ট্রান্সভালে বানরাকৃতি মানুষের শিলীভূত দেহ মাটিস্তূপ হইতে বাহির করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ নিখুঁত মাথার খুলি এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

২৬শে জুন—অদ্য করাচী হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পাকিস্তান সরকার করাচীর মর্যাদা হ্রাস করিয়া উহাকে চীফ কমিশনার শাসিত অঞ্চল হইতে কমিশনার শাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সরকার করাচী হইতে কেন্দ্রীয় রাজধানী রাওয়ালপিন্ডিতে স্থানান্তরিত করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই ব্যবস্থা তাহারই প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

২৭শে জুন—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের ১১ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার কারণে বরখাস্ত করা হইয়াছে অথবা অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। এই ১১ জন কর্মচারীই পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত (অবিভক্ত ভারতের আই-সি-এস)। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরের সেক্রেটারীর কাজ করিতেন।

২৮শে জুন—মধ্যচীনের কৃষকগণ মাটি খুঁড়িয়া ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বের একটি হাতীর জীবাশ্ম বাহির করিয়াছে। ইহা ২৩ ফুট লম্বা ও ১৬ ফুট উঁচু। বৃটিশ মিউজিয়ামে একটি হাতির যে ফসিল রক্ষিত আছে তাহা এই জীবাশ্ম অপেক্ষা দুই ফুট ছোট বলিয়া নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি সংবাদ দিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

"ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র - রমেশচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে...... বিরল।...বর্তমান গ্রন্থে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন।......তার মধ্যে একদিকে যেমন বাংলা দেশের একটি দুর্লভ রূপ ধরা পড়েছে, অপরদিকে গদ্য-সাহিত্যের নীহারিকা যুগের সৃজন যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে কেরী সাহেব এবং তাঁর মুন্সী এমন দুটি দৈব-যোজিত সন্নিহিত চরিত্র, যাদের নাম সাহিত্যসেবকের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

—দেশ

"এ উপন্যাসের মনোহারিত্ব-বর্ণনা সীমাবদ্ধ বাক্য এবং স্থানে চলে না। পড়ে গভীর আনন্দ পেয়েছি, বিস্মিত হয়েছি, হৃদয় মন এক সঙ্গে তৃপ্ত হয়েছে, কল্পনা শক্তির পরিধিতে অভিভূত হয়েছি। কেরী সাহেবের মুন্সী একটা বিরাট সৌধ—বহু কক্ষ বহু স্তম্ভ। একটা কালের মর্মকথা সঞ্চিত হয়ে রইল এর মধ্যে। অতীত জীবন্ত হয়ে উঠল যেন। কত নরনারী কত ঘটনা। প্রমথনাথের সার্থকতম সৃষ্টি।"

—যুগান্তর

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের

অপূর্ব স্বীকৃতি

প্রমথনাথ বিশীর

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি

কেরী সাহেবের মুন্সী

মাত্র সাত মাসে তিনটি মুদ্রণ নিঃশেষিত

প্রাচীন কলিকাতার পটভূমিকায়

লেখা সুমহৎ উপন্যাস

—— সাড়ে আট টাকা ——

"সহজ, সরল বাক্-ভঙ্গি, চমকপ্রদ উপমা এবং বিস্তীর্ণ কল্পনা একত্র মিলে এ বইখানা লেখকের বিচিত্র প্রতিভার চরম স্বাক্ষর বহন করেছে। এতবড় উপন্যাস, পড়তে কোথায়ও ক্লান্তি আসে না। রামরাম বসুর নামে উপন্যাস, এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রসমূহের কেন্দ্রে রামরাম বসু। কিন্তু সমস্তকে ছাপিয়ে উঠেছে রেশমী।......তার বিদায়-কালীন রূপ, সেই প্রলয়বহ্নি, সে এক অবিস্মরণীয় ছবি।......কেরী সাহেবের মুন্সী বাংলা-সাহিত্যের এক সফল সৃষ্টি।" —পরিমল গোস্বামী (আকাশবাণী)

"চমৎকার রচনা, একাধারে ইতিহাস, চরিত্রকথা, সমাজ-চিত্র আর গল্প। বাঙলায় বোধ হয় এরকম লেখা অদ্বিতীয়।... প্রসংগক্রমে আপনি নানারকম সেকেলে ছড়া আর কিংবদন্তী সন্নিবিষ্ট করেছেন, তাতে ঘটনাবলীর বিবৃতি বাস্তবতুল্য হয়েছে।" —রাজশেখর বসু

"ধারে ভারে সারে উপন্যাসখানি অনন্যসাধারণ। রচনাশৈলীর জন্য এর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে। এরূপ নানা ঢঙের অলংকার, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বক্রোক্তিতে ভরা রচনাশৈলী আমাদের দেশের উপন্যাসে কই তো চোখে পড়ে না।' —কালিদাস রায়

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সূচীপত্র

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 11th July, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৭ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৬ আষাঢ়, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

পাশ-ফেল

ইংরাজীতে একটা উক্তি আছে যে, সকলেই আবহাওয়ার দোষ দেখায়, কিন্তু প্রতিবিধানের চেষ্টা করে না। এই মনোভাবের একটা উদাহরণ দেতেছি। প্রত্যেক বৎসর স্কুল ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট প্রভৃতি পরীক্ষার ফল বাহির হইলে পাশ-ফেলের তুলনামূলক হার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়, কিছুদিন বাদ্‌বিতণ্ডা চলে, তারপরে 'যথাপূর্বং তথাপরং'—সমস্ত শান্ত হইয়া যায়, আবার পরবৎসরের আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। বর্তমান বৎসরেও পূর্ববর্তী অন্যান্য বৎসরের নজিরে আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, কয়েক দিনের মধ্যেই যাবতীয় উদ্বেগ ও শুভেচ্ছা চাপা পড়িয়া গিয়া সমস্ত ব্যবস্থা আগের মতো চলিতে থাকিবে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকের ধারণা হইয়াছে প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আলোচনা নয়, ওটা একটা মুদ্রাদোষ, বড়জোর অপরের স্কন্ধে দায়িত্ব চাপানোই অভিপ্রায়। এবারকার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয় নাই, ফেলের সংখ্যা বেশি হইয়াছে, গতবারের চেয়ে কিছু বেশিই হইয়াছে—এবং অভ্যস্ত সুরে আলোচনারও সূত্রপাত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে আলাপ-আলোচনা ও মতামতের কিছু কিছু নমুনা তুলিয়া দিতেছি। কিন্তু তৎপূর্বে মনে রাখা আবশ্যক, এবার প্রশ্নপত্র 'কঠিন', এমন অভিযোগ ওঠে নাই কিম্বা কোন পরীক্ষায় (স্কুল ফাইন্যাল) দক্ষযজ্ঞ-নাশ কাণ্ডও ঘটে নাই।

এক শ্রেণী শিক্ষাবিদের অভিমত

শিক্ষার মানের অধোগমনের ফলেই পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ হয় নাই। তাঁহারা মনে করেন, শিক্ষার মানের উন্নয়ন ছাড়া ইহার প্রতিকার সম্ভব নয়।

অপর এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদের অভিমত

ইঁহারা মনে করেন যে পরীক্ষকগণ, বিশেষভাবে প্রধান পরীক্ষকগণ আর-একটু "সহানুভূতিপরায়ণ" হইলে এবারে পাশের সংখ্যা গতবারের মতো হইতে পারিত। (এবারে পাশের সংখ্যা ৪৭·৬৭% গতবারে ছিল ৫০%)।

ইঁহারা আরও বলেন, অচিরকালের মধ্যে শিক্ষার মানের উন্নতির আশা নাই, যেহেতু অধিকাংশ শিক্ষক শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন, তাঁহারা অনেকেই দলীয় ইঙ্গিতে চালিত, আর শৃঙ্খলা রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন।

তৃতীয় এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদের অভিমত

এই শ্রেণীতে আছেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ইনি বিধান পরিষদের সদস্য, কাজেই একজন মাথালো শিক্ষা-সমাজপতি।

ইঁহার মতে নূতন পাঠক্রম (Syllabus), পাঠ্যবিষয়ের গুরুভার, কোন কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের 'অস্বাভাবিকতা' বাড়তি ফেলের সংখ্যার জন্য দায়ী। ইনি আরও কয়েকটি কারণ আছে বলিয়া মনে করেন—ক্লাসে ছাত্র-সংখ্যার আধিক্য, শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত চাপ, ছাত্রদের বাড়ির আবহাওয়া ইত্যাদি।

এখন এই তিন শ্রেণীর শিক্ষাবিদের মতামত একত্র করিলে পাশ-ফেলের কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু তবু কিছু অকথিত বা অর্ধকথিত থাকিয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস, এহেন অবস্থা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কারণগুলি দায়ী, কিন্তু সর্বোপরি দায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির প্রবেশ। আমাদের দরিদ্র দেশে দারিদ্র্য নূতন নয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অবস্থা আগে এমন সংকটজনক হইয়া উঠে নাই। এখন যে উঠিয়াছে, তাহার কারণ শিক্ষা-জগতের দেহে কলি প্রবেশ করিয়াছে। রাজনীতির মুখ রক্ষা করাই এখন শিক্ষা-সমাজপতিদের প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, নতুবা শিক্ষা-সঙ্কোচ বা শিক্ষার মানের অবনতির আশঙ্কায় যাঁহারা বুক চাপড়ান, মনীন্দ্র কলেজের সম্পূর্ণ অন্যায় ধর্মঘট সম্বন্ধে তাঁহারা এমন উদাসীনতা অবলম্বন করিতেন না। দৃষ্টান্তটা কলেজের লইতে হইল, কিন্তু স্কুলে ধর্মঘট হইলেও ঠিক এইরূপই ঘটিত। সত্য কথা বলিতে কি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শিক্ষক প্রতিনিধিগণ এখন স্কুলে আড়কাঠির কাজ করিয়া থাকেন, যেনতেনপ্রকারেণ নিজ নিজ দল ভারী করাই প্রধান ও অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মূল দোষ হইতে আর সমস্ত দোষের উদ্ভব। এমন অবস্থায় আদৌ যে কিছু লেখাপড়া হইতেছে, ইহাই তো বিস্ময়। শিক্ষাক্ষেত্র হইতে রাজনীতির মূল উৎপাটিত না হইলে এ অবস্থার প্রতিকার কখনোই হইবে না। কি তাহার উপায়? বিধান সভা প্রভৃতিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথা রদ করা উচিত কিনা, ভাবিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাই প্রাথমিক চিকিৎসা। বিস্তারিত চিকিৎসার কথা তারপরে ভাবিতে হইবে।

প্রসঙ্গত

আষাঢ় মাস যায় যায়, এবার বর্ষার ভাব-ভঙ্গি বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না। এই মাসেরই প্রথম দিবসে যখন রোল-কল হয়, তখন সে একবার বলেছিল বটে, "প্রেজেণ্ট স্যার"। —কিন্তু সে-হাজিরা নেহাত বুড়ি-ছোঁওয়া ব্যাপার, আসলে তখন থেকেই তার পালাই-পালাই মন। পালিয়েছিলও, দিনকতকের জন্য একেবারে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। আকাশে শুধু ছেঁড়া রুমালের মত শাদা টুকরো মেঘের চিহ্ন ছিল। শুধু ছাত্র নয়, সেকালের কেরানীবাবুরাও শুনেছি এইভাবে চেয়ারে রুমাল বেঁধে হাওয়া হয়ে যেতেন। ফেরারী বর্ষা ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও তার চিত্তস্থৈর্যের কোন লক্ষণ দেখছিনে। শর্ত পূরনে তার অনিচ্ছা যেন ষোল-আনা। জল ঢালে, থামে, আবার ঢেলে দেয়। এই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার মধ্যে রথযাত্রা এল, গেল, মেলা অন্যান্যবারের চেয়ে কিছু কম জমল না। অলিতে গলিতে শিশুদের ফোলা-ফোলা গাল, শুধু ভেঁপু আর ভেঁপু। আর রথে যাদের বামন-দর্শনের পুণ্য হল না, আমরা, সেই প্রবীণেরা কী করব। পুনর্জন্ম ত নির্ঘাত ঘটবে। একমাত্র সান্ত্বনা, আবার শিশু হয়ে মনের খুশিতে ভেঁপু ত বাজাতে পারব।

*

পড়ে চক্ষু বিস্ফারিত হয়, এমন শিরোনামা সংবাদপত্রে অধুনা দেখেছি বলে মনে পড়ে না, অতএব টুকরো-টুকরো অনাবশ্যক কথা সাজিয়েই এবারকার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য নিবেদন করব। কলকাতা শহরের পূর্বাঞ্চলে গত সোমবারে রাত্রে যে একটি হেলিকপ্টারের দর্পচূর্ণ হয়েছিল, অকিঞ্চিৎকর বলে সে-কথাও এড়িয়ে যাব—যদিও এই শহরে এমন ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম। কিন্তু চাল? রথের রশ্মিমুক্ত হয়ে তার মূল্যও যে তেপান্তরের মাঠ আর তিন-পুণির ঘাট পেরিয়ে গেল, অশ্বমেধের এই ঘোড়াকে সামলায় কে। মন্ত্রিসভা? নিয়ন্ত্রণ রদ অর্থাৎ কেঁচে গণ্ডূষ করা ছাড়া সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ তাঁরা খুঁজে পান নি। না, আরও একটু আছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নামান্তরিত কৃষি-বিভাগের ভার গ্রহণ করছেন—কিন্তু এই ফলের ত পরিচয় পাওয়া যাবে আগামী সালে। কৃষি-পণ্যের ফলন ত বাড়ুক। প্রসঙ্গত বলি, এই নিয়ে পাঁচটি দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর খাস হল।

*

[illegible] লীগে মোহনবাগান দলের অগ্রগতিও অপ্রতিহত। বর্ষার আকাশেই স্টেডিয়ামের আশা আবার রামধনুর বর্ণচ্ছটা নিয়ে দেখা দিয়েছে। পনেরো একর জমি, ময়দানের ঢালা মাঠ, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিও মিলেছে, এখন শুধু হাতে-কলমে কাজ শুরু বাকী। কিন্তু কে জানে, চায়ের পেয়ালা আর ঠোঁটের মধ্যে ফসকানি বিস্তর!

*

এরই মধ্যে একদিন ঘটা করে ছাত্র-হরতাল হয়ে গেল। উত্তর-কলকাতার একটি কলেজকে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ দীর্ঘকাল ধরে চলছে তার অবসান কিসে হবে, সে-কথা জানেন বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের কর্তৃপক্ষ। সাধারণ বুদ্ধিতে এর একমাত্র পরিণাম আশঙ্কা করি শিক্ষায়তনটির ধ্বংস। ছাত্রেরা যাঁরা বিশেষ একটি অধ্যাপকের পুনর্নিয়োগের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন তাঁদের একটা পরামর্শ দিতে চাই। তাঁদের লক্ষ্য এবং দাবি এত সামান্য কেন? সমগ্র অধ্যাপকমণ্ডলীকে ছাত্ররাই নির্বাচন করবেন, এই ডেমোক্র্যাসির যুগে এমন একটা হুজুগ তুললেই হয়, সায় দেবার জন্য পলিটিক্যাল দাদারা ত রয়েছেনই। অভিভাবকদের মনোভাব কী জানিনে, যদি সাহসে কুলোয় তাঁরা মৃদুকণ্ঠে ছাত্রদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন: এই যে ফি বছরে রাশি রাশি ছেলে পরীক্ষায় ফেল করে, আত্মহত্যার হার বাড়ে, কোন বছর পুরো কোর্স সমাপ্ত হয় না, কই, এর বিরুদ্ধে ত কোনদিন 'জোর আওয়াজ' ওঠে না?

*

২৫শে জুনের হরতাল সম্পর্কে অনেক কথাই লেখা হয়েছে, কিন্তু কোন সম্পাদকীয় টিপ্পনী বা মন্তব্যে এ দেশের নির্বাচনের কানুনের পরিবর্তনের পরামর্শ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নির্বাচন আইন বলে, নাবালকদের ভোটাধিকার নেই। কেন? বয়স না হলে নাকি বুদ্ধি পাকে না। অপ্রাপ্ত বয়স্করা রাজকার্য বা রাষ্ট্রনীতি কী বুঝবে? এই যুক্তির উপরেই ষ্যাডাল্ট ফ্রানচাইজ নামক তথ্য প্রতিষ্ঠিত।

কিন্ত হরতালের দিন বোঝা গিয়েছে, এই আইনে শিশুদের প্রতি কী ঘোর অবিচারই না ঘটেছে। পুরো একটা দিন এই বিরাট শহরের শাসন-ব্যবস্থা যাদের হাতে ছিল, ব্যালট বাক্সে বিচার করে কাগজ ফেলার বুদ্ধি তাদের নেই, এ-কথা অবিশ্বাস্য। অতএব এদেশ "ইলেকটোরাল ল" সংশোধন করে বিশ্বকে পথ দেখাক। রাষ্ট্র যখন ডেমক্রাটিক অর্থাৎ বহু-নায়ক হতে পেরেছে, তখন শিশুনায়ক হতেই বা তার আপত্তি হবে কেন।

*

সোভিয়েট রকেট দুটি কুকুর ও খরগোশ জাতীয় একটি প্রাণীকে নিয়ে মহাশূন্য চক্রমণ করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এ-সংবাদও প্রাসঙ্গিক কিনা জানি না। ইতিপূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অবশ্য মহাশূন্যে যুগল বানরী প্রেরণ করেছিল, ফিরিয়েও এনেছিল। কিন্তু একটি বানরী বাঁচেনি। সোভিয়েট কীর্তি তবে কী প্রমাণ করল? বানরের চেয়ে কুকুর শ্রেষ্ঠ, না আমেরিকার চেয়ে রাশিয়া? বলা কঠিন। তবে ভরসার কথা, রেষারেষিটা এখন মাটি ছেড়ে শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে।

*

ভ্যাটিকানের চিত্রশালার সংগ্রহভুক্ত একটি ছবি জাল, এ-নিয়ে রসজ্ঞেরা কেন বিচলিত হয়েছেন, বোঝা মুশকিল। এতকাল যার মধ্যে অপার সৌন্দর্যের বিস্ময় আস্বাদন করেছেন, তার প্রণেতার নামটুকুই যদি শুধু বদলে গিয়ে থাকে, তাতে রূপসৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায় না। সন্দেহ হয়, ছবি নয়, আসলে বোদ্ধাদের রসবোধই বুঝি জাল।

কোন্ কীর্তি কার, নিয়ে হিসাব আর তর্ক কেবল একালে, এই কপিরাইটের, রিপ্রোডাকশনের আর ছাপাখানার যুগে। সেকালে অন্য নিয়ম ছিল। স্রষ্টার একমাত্র বাসনা ছিল, তাঁর নাম নয়, রচনা যেন অমর হয়। এই অমৃতের সাধ নিয়ে কত অজ্ঞাত কবি তাঁর ভণিতায় জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাসের নাম মিশিয়ে দিয়েছেন, কত অসংখ্য ধারা মহাভারতসাগরে বিলীন হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। 'ভানু সিংহের' কবি একটুখানি ফাঁকি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু রস সৃষ্টিতে নয়, শুধু পণ্ডিতম্মন্যদের নিয়ে তিনি একটু মজা করতে চেয়েছিলেন। নিজের রচনা অপরের নামে প্রচার দূরে থাক, অপরের রচনা আত্মসাৎ করাও অধুনা বিরল নয়। এটা 'লিটারারি পাইরেসির' যুগ। একালে আপন নাম-বিলোপের মহত্ত্ব স্বীকৃত হবে না।

[এই সংখ্যাটি ছাপতে যাবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল যে মুখ্যমন্ত্রী নন, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ খাদ্য উৎপাদন বিভাগের ভার গ্রহণ করছেন। উত্তর কলকাতার একটি কলেজে যে-গোলযোগ চলছিল, তার মীমাংসাও আসন্ন।]

সম্প্রতি পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক 'মুখপাত্র' সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য বলেছেন যে, ভারত সরকার তিব্বত সরকারকে কখনো আলাদা স্বীকৃতি দেন নি, সুতরাং দলাই লামার পক্ষে তিব্বত সরকার হিসাবে আচরণ করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। হঠাৎ এইরকম বিবৃতিদানের কি প্রয়োজন ছিল বুঝা গেল না। গত ২০শে জুন মুসুরীতে দলাই লামা একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিব্বত সম্বন্ধে নানা কথা বলেন। তাতে যদি তিনি এমন কোনো কথা বলে থাকেন যার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিল তাহলে ভারত সরকার তার জন্য দশ দিন অপেক্ষা করতেন না। সুতরাং মনে হয় দলাই লামার কোনো কথা প্রতিবাদযোগ্য বলে যে ভারত সরকারের কাছে লেগেছে তা নয়, পরে অন্য কোনোদিকের চাপে পড়ে পররাষ্ট্রদপ্তর এই বিবৃতি দিয়েছেন।

দলাই লামার কোনো কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ না হলেও, পররাষ্ট্র দপ্তরের বিবৃতির সঙ্গে আইনের দিক থেকে বর্তমান অবস্থার আক্ষরিক মিল থাকলেও এবং এই বিবৃতির দ্বারা দলাই লামার অবস্থা যা আছে, তার চেয়ে আরো খারাপ না হলেও—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যাদের খাতিরে এই বিবৃতি দেওয়া হল তারা দলাই লামা এবং তিব্বতের স্বাধীনতার সমর্থকদের নিরুৎসাহ করতে চায়। ভারত সরকার তাদের সন্তুষ্ট করতে এত ব্যস্ত হলেন কেন? কিসের এতো ভয়? যারা 'মুক্তি সাধনের' নামে একটা জাতির কেবল স্বাধীনতা নষ্ট করে নি, তার জাতীয় অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলোপ করে দিতে উদ্যত হয়েছে, বন্ধুসুলভ প্রতিবাদের উত্তরে যারা ভারত এবং ভারত সরকারকে গালমন্দের একশেষ করেছে তাদের এমন আগ বাড়িয়ে আশ্বস্ত করার জন্য ভারত সরকারের এই গরজের কারণ কি?

দলাই লামা ভারত সরকারের নিকট তিব্বতের সরকার হিসাবে স্বীকৃতির জন্যে আবেদন করেছেন বলে তো শুনা যায় নি অথবা তিব্বতের সরকার হিসাবে তিনি আচরণ করার দাবিও করেন নি। ২০শে জুন তারিখের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অবশ্য বলেছিলেন "আমার মন্ত্রিগণসহ আমি যেখানেই থাকি তিব্বতবাসীরা আমাদেরই তিব্বত সরকার বলে মনে করে।" তিব্বতবাসীদের মনোভাব সম্বন্ধে এই বাক্য অসত্যও নয়, দূষণীয়ও নয়। কিন্তু এই বাক্য দ্বারা এটা বুঝায় না যে দলাই লামা এখানে থেকে তিব্বতের সরকার হিসাবে আচরণ করছেন, বা করতে চান বা ভারত সরকারের নিকট তিনি তদনুরূপ কোনো স্বীকৃতি দাবি করছেন।

তিব্বতের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দলাই লামা নিশ্চয়ই চেষ্টা করে যাবেন

কিন্তু তার জন্য নামকাওয়াস্তে তিব্বতের সরকার হিসাবে স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। সাধারণত প্রবাসে থেকে প্রতিরোধ ('রেজিস্ট্যান্স') আন্দোলন চালাবার যে পদ্ধতি আছে এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। দলাই লামা অস্ত্রশক্তি প্রয়োগের দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের কথা চিন্তাই করেন না। তিনি জানেন যে, তিব্বতে এখনো তিব্বতীরা চীনাদের বাধা দিচ্ছে—৫০ হাজার গেরিলা যোদ্ধা পাহাড় জঙ্গলের ভিতর সুযোগ মতো চীনাদের সঙ্গে লড়ছে। দলাই লামা অবিলম্বে এই যুদ্ধের বিরতি চান, রক্তপাত অবিলম্বে বন্ধ হোক, এই কামনা তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি এখনো তিব্বত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। ভারতবাসীদের এবং ভারত সরকারের সহানুভূতি তার কাম্য এবং তা তিনি পেয়েছেন। তিব্বতের সরকার হিসাবে তার স্বীকৃতিলাভ কাজে লাগত যদি মামুলি রকমের প্রতিরোধ আন্দোলন চালানোই তাঁর উদ্দেশ্য হত।

তিব্বতের স্বাধীনতা বিরোধীদের মনে বোধহয় ভয় হয়েছে যে, দলাই লামার নেতৃত্বে ঐরকম একটা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। ভারতে এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি করার প্রয়াসকে এরা মামুলি প্রতিরোধ আন্দোলনের অঙ্গ বলে

মনে করছে। বলা বাহুল্য এরূপ মনে করা ভুল। ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস যারা করছেন আশা করি তারা জানেন যে, সম্পূর্ণ অহিংস এবং নৈতিক উপায় ছাড়া এক্ষেত্রে কিছু করা যাবে না। ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের কোটি কোটি নরনারীর মত চীনা গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যাবেন এটা কি সম্ভব? অন্তত সম্ভব কিনা তাও একবার পরখ করে দেখা উচিত। এই জনমত সংগঠনের জন্য দলাই লামার সরকারী ব্যক্তিত্বের দিকটার উপর বেশি জোর দেওয়ার প্রয়োজন তো নেই বরং সেদিকটার উপর জোর না দিলেই নৈতিক শক্তির জাগরণ অধিকতর সহজ হবে।

কিন্তু তাই বলে ভারত সরকারের এত 'তুতুপুতু' ভাবের কারণ কী আছে! চীনের সংগে তিব্বত সম্পর্কিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে তিব্বত সরকারকে পৃথকভাবে স্বীকার করার কথা স্বভাবতই ওঠে নি। কিন্তু তিব্বতের উপর চীনের চক্রবর্তি-রাজাধিকার (সুজারেইটি) স্বীকারও কিন্তু ভারত সরকার তিব্বতের পৃথক জাতীয় সত্তা এবং স্বাধিকারের দাবি অক্ষুন্ন থাকবে এই জ্ঞানের ভিত্তির উপরেই করেছিলেন। সেই ভিত্তি চীন সরকার যখন নষ্ট করে দিয়েছেন তখন তিব্বতের উপর চীনের চক্রবর্তি-রাজাধিকারের স্বীকৃতির বাঁধনে ভারতবর্ষকে ধরে রাখার কোনো নৈতিক যুক্তি থাকে না। অর্থাৎ আজ চীনা সরকারের কর্তৃত্ব-অস্বীকারকারী কোনো তিব্বতী সংস্থাকে তিব্বতের সরকার হিসাবে স্বীকৃতিদানের পক্ষে ভারত সরকারের দিক থেকে কোনো নৈতিক বাধা নেই।

অবশ্য নৈতিক বাধা না থাকলেই যে রাজনৈতিক স্বীকৃতিদান করা যায় তা নয়। আবার ন্যায়ানুগ অধিকার নেই এমন কর্তাকেও কাজের খাতিরে অথবা 'প্রাকটিকাল' কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হয়—যাকে 'ডিফাক্টো' স্বীকৃতি বলে। চীন সরকার তিব্বতে যে নীতি অনুসরণ করেছেন তাতে ভারত সরকার বর্তমানে তিব্বতের উপর চীনা কর্তৃত্ব বে-আইনী এবং নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু তথাপি কাজের খাতিরে তিব্বতে চীনা শাসনকে স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু এই স্বীকৃতির উপর চীনা সরকারের আজ আর কোনো নৈতিক দাবি নেই। আমাদের সরকার যদি 'কাজের' তোয়াক্কা না করতেন তবে তিব্বতের উপর বর্তমান চীনা শাসন স্বীকারযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করতে তাঁদের পক্ষে কোনো বাধা নেই।

যে-নামেই অভিহিত হোক তিব্বতের স্বাধীনতা বা স্বাধিকারে ভারত বিশ্বাস করে। তিব্বতবাসীরা যদি মনে করে যে সেই স্বাধিকার রক্ষা চীনা চক্রবর্তি-রাজাধিকারের আওতায় সম্ভব নয় তাহলে তিব্বতীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কংগ্রেস এক সময়ে অমুক তারিখের মধ্যে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' পেলে সন্তুষ্ট হবে বলেছিল, তারপর বৃটিশ গভর্নমেন্ট যখন তা দিল না তখন পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষিত হল। সুতরাং তিব্বত যদি পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে সেটা অন্যায় কেন হবে এবং ভারতবর্ষের পক্ষে সে দাবির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনই বা অনুচিত কেন হবে? বর্তমান বাস্তব অবস্থায় তিব্বত সরকারকে পৃথকভাবে স্বীকার করার কথা আপাতত না উঠতে পারে কিন্তু কোনোদিনই উঠবে না সেকথা বলা যায় না। নৈতিক দৃষ্টিতে তিব্বতে আজ বিধিসম্মত শাসন নেই।

৫।৭।৫৯

ধনঞ্জয় বৈরাগী

নাট্যাচার্যের কথা লিখতে বসে কতদিনের কথা মনে পড়ছে। কত টুকরো কথা, কত টুকরো ঘটনা। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ছাত্রজীবনে। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে অভিনয় করছি, শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। ১৯৪৫ সালের কথা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বসে শিশিরকুমারও সেদিন অভিনয় দেখেছিলেন। অভিনয়-শেষে প্রণাম করতে যখন তাঁর ধরে গেলাম, ভুরু কুঁচকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞেস

কয়েকটা কথা ভুলতে পারছি না।

সামান্য কথা। শুনেছিলাম এক ফুলের দোকানে।

"শিশিরবাবুর কাছে যাচ্ছেন, সাদা ফুলের মালা নিয়ে যান। সকাল থেকে কত লোক যাচ্ছে। বড় বড় লোক, কত সব গাড়ি।"

কথা শুনে চোখের জল সামলাতে পারিনি।

মনে পড়ে গেল দু' বছর অগেকার কথা। নাট্যাচার্যের ব্যারাকপুরের বাড়িতে দোতালার ঘরে বসে আছি। ও'র শরীর ভাল নেই, পিঠে ব্যথা তবু কষ্ট করে চেয়ারে বসে আছেন। অবসন্ন ক্লান্ত মন। দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে গাঢ় গলায় হঠাৎ বললেন, "জীবনের সন্ধ্যা নেমে আসছে। এই বোধ হয় আমার শেষ বছর। এই বয়েসে স্যার হেনরী আরভিং মারা গিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র মারা গিয়েছিলেন। এবার আমার পালা। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না, ছানি পড়েছে, শরীর প্রায়ই Non-co-operation করছে, তার উপর মন, সে কথা ছেড়েই দিলাম।"

কি যেন একটু ভাবলেন, নিজের মনেই মৃদুস্বরে বললেন, "শিল্পীর কথা কেউ মনে রাখে না। আমি বেঁচে আছি কি না, কোথায় আছি, সে খবরও কেউ রাখে না। কিন্তু যেদিন মারা যাব দেখবে এই রাস্তায় কী ভিড়। ফুলের মালা নিয়ে সবাই আসবে। গিরিশচন্দ্রের একটা মূর্তি আছে দেখেছো? ওর সঙ্গে অবশ্য গিরিশচন্দ্রের চেহারার কোন মিল নেই। ঐ ধরনের একটা আমার মূর্তি ওরা গড়াবে। ওদের হিসেব মত কোন একজন গণ্যমান্য লোককে ওরা ডেকে আনবে, বলাই বাহুল্য যিনি থিয়েটারের কিছুই বোঝেন না। তিনি এসে আমার মূর্তির গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রমাণ করবেন শিশির-কুমার একজন অভিনেতা ছিলেন।"

কথাগুলো বলে শিশিরকুমার হাসলেন। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিনি। চোখে জল এসেছিল।

করলেন, প্রফেশন্যাল থিয়েটারে নামার ইচ্ছে আছে নাকি?

আমায় কোন উত্তর দিতে হয় নি। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়. তিনি বললেন, ও সবে মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।

"তাই নাকি? তবে তো অনেক দেরি। লেখাপড়া কর। পেটে কিছু না থাকলে অভিনয় করা যায় না। কার কাছে অভিনয় শেখো?"

সেকথারও কোন উত্তর চট করে দিতে পারি নি। কারণ কার কাছেই বা শিখেছি? তবে যাঁর অভিনয় আমার মনকে নাড়া দিত, সুযোগ পেলেই যাঁর অভিনয় দেখতে যেতাম, সংকোচ কাটিয়ে তাঁর কথাই বললাম. আপনার অভিনয় দেখে, শেখবার চেষ্টা করি।

কথা শুনে শিশিরকুমার হাসলেন, শান্ত উজ্জ্বল হাসি।

কে যেন মুখে কথা জুগিয়ে দিলে। সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে নির্ভয়ে বললাম, একলব্যের মত।

আচার্য সেদিন আশীর্বাদ করেছিলেন।

তারপর প্রায় দশ বছর বাদে আবার ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল। তখন শ্রীরঙ্গম বন্ধ হয়ে গেছে। শিশিরকুমার ব্যারাকপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। একদিন রেডিও স্টেশনে, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন, "আমরা একটা নতুন ধরনের ক্লাব করেছি, যার নাম দর্শক। যারা নাটক দেখতে ভালবাসে তারাই হবে দর্শকের সভ্য। ভাল ভাল নাটক যাতে দর্শকরা দেখতে পায়, আমরা তারই আয়োজন করতে চাই। শিশিরবাবু আমাদের জন্যে নাটক মঞ্চস্থ করতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর পছন্দমত কোন মঞ্চ আমরা পাচ্ছি না।"

বললাম, আমাদের থিয়েটার সেণ্টারের যে ছাদে মঞ্চ আছে সেটা একবার ওঁকে দেখালে হয় না?

প্রেমেনবাবু হাসলেন, ঐটুকু স্টেজে অভিনয় করতে কি আর রাজী হবেন? তবু আমি নির্মলকে বলে দেখব।

কদিন বাদে দর্শকের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত শিশিরকুমারকে নিয়ে এলেন থিয়েটার সেণ্টারে। আমরা তাঁকে সব জায়গা দেখালাম। তিনি হেসে বললেন, সবই আছে, কিন্তু বড় ছোট। আমি কি নাটক করতে চাইছি জান? দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'। আমি মনে করি This is one of the best plays in Bengali literature.
এর মুখ্য উদ্দেশ্য শুধু মদ খাওয়াকে গালাগাল দেওয়া নয়, বাঙালীর মধ্যে যে নকল সাহেব হওয়ার আদিখ্যেতা তাকেই স্যাটায়ার করা।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ওঁর সঙ্গে আলোচনা হল। নবনাট্য আন্দোলনের কথা মন দিয়ে শুনলেন। যাবার সময় কথা দিয়ে গেলেন, "ঠিক আছে, এখানেই আমি অভিনয় করব।"

২৪শে ও ২৫শে আগস্ট, দুরাত্রি 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয়েছিল। দর্শক এসেছিল অনেক। স্থানাভাবে বহুজনকেই ফিরে যেতে হয়েছিল। সেই বৃদ্ধ বয়সেও কি অসাধারণ অভিনয়! অনেক নবীন দর্শক এসেছিলেন, যাঁরা শিশিরকুমারকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে দেখেন নি। তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "ওঁর অভিনয় আরও দেখার যেন আমরা সুযোগ পাই।"

এর পর থেকে বহুবার তাঁর বাড়িতে গেছি। অভিনয়, নাটক, মঞ্চ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমার ডায়রীর পাতায় অনেক টুকরো আলোচনা লেখা রয়েছে, তারই মধ্যে থেকে কিছু এখানে তুলে দিচ্ছি।

একদিন বলছেন, "আমার কাছে সবাই

নাটক পড়াতে আসে। নতুন নাট্যকার। আমি তাদের বলি, কেন আস? আমার তো কোন থিয়েটার নেই। দু'একটা ভাল ভাল লেখাও চোখে পড়ে, উৎসাহ দিলে হয়ত কখনও ভাল নাটক লিখতেও পারে, কিন্তু আমি কি করব?"

সেই অসহায় কণ্ঠস্বর আজো কানে বাজছে।

ভারী গলায় বললেন, "আমার থিয়েটার কেন চলল না জান? আমি ভাল নাটক দিতে চেয়েছিলাম। 'পরিচয়' দেখেছো? 'দুঃখীর ইমান' দেখেছো? তার মধ্যে দিয়ে অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম। লোকে নিলে না। কিন্তু টিকিট বিক্রির উপর নজর রেখে আমি তো নাটক নামাতে চাই না।"

নাট্য বিদ্যালয় শুরু করার কথা যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি, উনি বলেছেন, "তুমি কি নিশ্চয় করে বলতে পারো অভিনেতা তৈরী করা যায়? ওদের দেশে অনেক স্কুল আছে বটে; কিন্তু এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন নিষ্ঠা দেখতে পাই না। ক'জন সত্যিকারের অভিনয় শিখতে চায়? দুটো সস্তার হাততালি পেলেই তারা খুশী। এরা মনে করে স্টেজে একবার দাঁড়াতে পারলেই হলো। কেউ একটা বইও পড়ে না। আমার তো এই বয়সেও বই ছাড়া এক মিনিট চলে না। যদিও চোখে ভাল দেখতে পাই না।"

কতদিন আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, "নিজে হাতে করে যাদের শিখিয়েছি— বিশ্বনাথ, শৈলেন, প্রভা, কঙ্কা সব একে একে সরে গেল। আমি একলা পড়ে গেলাম। শেষের দিকে যাদের শেখালাম, তাদের সব বেশী পয়সা দিয়ে অন্য থিয়েটার ডেকে নিয়ে গেল। একটা পার্টে নাম করলেই এরা মনে করে অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়ে গেছি। কিন্তু তা তো হয় না।"

এ প্রসঙ্গে তিনি যাদের নাম উল্লেখ করলেন, সত্যিই তাঁরা শ্রীরঙ্গমে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেও অন্য মঞ্চে যোগদান করে একটিও স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি।

শেষের দিকে জাতীয় নাট্যশালা স্বপ্নই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল। সব সময়ই সে বিষয়ে আলোচনা করতেন। একদিনের কথা মনে পড়ছে। বাইরে খুব বৃষ্টি। 'জীবন-রঙ্গ' নাটক থেকে কতগুলো জায়গা পড়ে শোনাচ্ছেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, হঠাৎ পড়া থামিয়ে বললেন, "কি হবে পড়ে। ইচ্ছে করছে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে অভিনয় করে দেখাই। আমার জীবনটা এখন কি রকম জানো? মাছকে ডাঙায় রাখলে যেমন হয়।" একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমাদের জানা এমন কোন লোক নেই যে, এই জাতীয় নাট্যশালার জন্যে কিছু টাকা দিতে পারে, একটু বুদ্ধিমান লোক"—কথাটা বলে নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন, "আমারই বলা ভুল হয়েছে—টাকা আর বুদ্ধি, এ দুটো বোধ হয় এক সঙ্গে থাকে না।"

জীবনের কতখানি তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই উক্তি!

শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ৩১শে চৈত্র। রঙমহলে এক মুঠো আকাশ নাটকটি শুরু হবার আগের দিন। ওঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। শরীর দুর্বল, তবু নীচে নেমে এলেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, "সময় এসেছে! মঞ্চকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দাও। লোক এখন নাটক দেখতে চায়, ভাল নাটক দিলে তারা দেখবে। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি।"

নাট্যাচার্যকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

আজ তিনি নেই। কিন্তু তাঁর অসমাপ্ত কাজ পড়ে রয়েছে। প্রার্থনা করি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য যেন হয় তাঁর সেই কামনাকে পূরন করা। আমরা যেন তাঁর জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্নকে রূপ দিতে পারি। আমরা যেন আচার্যদেবের আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত শিল্পী হয়ে উঠতে পারি। সস্তা হাততালি পাবার লোভে যেন নিজেদের নীচু না করি। টিকিটঘরের টাকা আনা পয়সার দিকে না তাকিয়ে যেন সত্যিকারের উঁচু মানের নাটকের প্রযোজনা করতে পারি। যাতে দেশের এবং দশের মঙ্গল হবে। তবেই সার্থক হবে আমাদের মত একলব্যদের গুরুদক্ষিণা দেওয়া।

ক্যানাডার ১১০০০ হাজার এস্কিমো অধিবাসী উত্তর মেরু অঞ্চলের আনুমানিক ১,২৫৪০০০ বর্গ মাইল এলাকায় ছড়িয়ে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা যে ভাষায় কথা বলে এসেছে তা বিভিন্ন ভাষা থেকে গৃহীত এক পাঁচমিশেলী ভাষা। তাদের শব্দভাণ্ডার খুবই সীমিত। বলতে গেলে দশ হাজার থেকে পনের হাজারের বেশি শব্দ তাদের ভাষায় নেই। এত শব্দ মাত্র পণ্ডিতদেরই জানা আছে। দৈনন্দিন ব্যবহারে তাদের যে শব্দসম্ভার প্রয়োজন হয় তার সংখ্যা খুবই সামান্য। তাদের কতকগুলি ক্রিয়াপদের প্রায় ১০০টি করে রূপান্তর আছে এবং বিভিন্ন রূপান্তর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু এস্কিমোরা যে ভাষায় কথা

মেরী পেনেগংশু—এস্কিমোদের সাময়িকপত্র ইনাক্টিটাটের প্রথম সংখ্যা যার লেখায়, রেখায় ও ফটোতে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বলে তার কোন মুদ্রিত রূপ ছিল না। ২ সপ্তাহ আগে অটোয়ার নর্দার্ন অ্যাফেয়ার্স এণ্ড ন্যাশনাল রিসোর্সেস প্রতিষ্ঠানের এক দুরূহ প্রচেষ্টার ফলে এস্কিমোদের জন্য একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। অটোয়া থেকে 'ইনাক্টিটাট' নামে সাময়িকপত্রটি এমনি এস্কিমো ভাবাপন্ন করে প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'নর্দার্ন রিসোর্সেস'-এর কর্মচারীরাও এর বিষয়বস্তুর পুরোপুরি অনুবাদ করতে পারেননি। ৪০ পাতার এই সাময়িক পত্রিকাটির সমস্ত লেখকই এস্কিমো, ছবি যা গেছে তাও এস্কিমোদের আঁকা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ মিশনারীগণ এই ভাষার মোটামুটি একটা রূপ পেতে এস্কিমোদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লিপিচরিত্রের যে সাংকেতিক লিপি উদ্ভাবন করেছিলেন, সেই রূপ অনুসরণ করেই এ পত্রিকা মুদ্রিত হয়েছে। ইনাক্টিটাট পত্রিকার ভূমিকায় লেখা আছে—এ পত্রিকার সমস্ত লেখকই এস্কিমো এবং এর পাঠকও তারাই। এ পত্রিকার পাঠকদের লেখার জন্য দুটো করে সাদা পাতা দেওয়া থাকবে কেননা তারা যে অঞ্চলে বাস করে সেখানে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ত বটেই দুর্মূল্যও। সামান্য কাগজও যার কাছে আছে সে তা মূল্যবান সম্পত্তির মত বুকে দিয়ে রক্ষা করে।

এই সাময়িক পত্রিকা নর্দার্ন অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার এবং এই পত্রিকার সম্পাদক মিঃ রবার্ট জি এইচ উইলিয়ামসন-এর মানসকন্যা। ২০ বছর বয়স্কা সর্বগুণসম্পন্না এস্কিমো কন্যা মেরী পেনেগংশুর একক প্রচেষ্টায় এই সাময়িক পত্রিকাটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ক্যানাডার উত্তর প্রান্তীয় দ্বীপ এলসমেরের বাসিন্দা এক নামকরা শিকারীর কন্যা সে। অন্টারিওর হ্যামিলটনে মাত্র পঞ্চম মান থেকে অষ্টম মান পর্যন্ত তিন বছর স্কুলে পড়ার সুযোগ সে পেয়েছিল। মেরী যেমন নিপুণ শিল্পী তেমনি লেখিকাও। সে নিজে নিজে খুব ভাল ফটো তুলতে ও টাইপ করতে শিখেছে। এই সাময়িক পত্রিকার অলঙ্করণে যে রেখাচিত্রগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা সবই তার আঁকা। অধিকাংশ ফটো ও কয়েকটি প্রবন্ধও তারই লেখা। এই পত্রিকার আর একজন লেখক হচ্ছেন ৩০ বছর বয়সের এক শিকারী আকলাভিকের বাসিন্দা আব্রাহাম ওকপিক।

এস্কিমোদের ভাষায় পত্রিকার কোন প্রতিশব্দ যেমন নেই তেমন নেই মানুষের কোন প্রতিশব্দ। একটি শব্দ অবশ্য আছে 'ইনাক' যার অর্থ হল শিকারী। বিদ্যুৎ, গাড়ি বা চাকা এ-সব শব্দেরও কোন প্রতিশব্দ এস্কিমোদের শব্দভাণ্ডারে নেই।

পত্রিকা সম্পাদনের চাইতে পত্রিকা বিলি করাই এক দুরূহ সমস্যা। বিভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় কাগজ পাঠাতে এক মাসেরও বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয়। ক্যানাডার পশ্চিম-উত্তর প্রান্তীয় এস্কিমোদের জন্য রোমান হরফে এই পত্রিকা ছাপান হবে, কেননা ঐ অঞ্চলে এই বর্ণমালাই বিশেষ প্রচলিত।

পত্রিকার বসন্তকালের সংখ্যা বরফ

ᑕᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᒪᒃ ᐊᑎᓕᑦ
"ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ" ᐃᓄᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂ
ᐊᒃᓚᑕᐅᓯᒫᔪᑦ, ᐃᓄᓂᑦᓗ
ᐊᒃᓚᑕᐅᖃᓂᐊᑐᑦ ᐃᓄᓂᑦ
ᐊᑐᐊᑕᐅᖃᓂᐊᒪᑕ

এস্কিমোদের ভাষার লিখিত রূপ

গলতে শুরু করার আগেই এস্কিমোদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। গ্রীষ্ম সংখ্যা বরফ গলে যাওয়ার পরে আর শীত সংখ্যা উত্তর মেরুতে আঁধার নেমে আসার আগেই পৌঁছে দিতে হবে।

হয়তো একদিন এই পত্রিকা এস্কিমোদের ব্যবসায় প্রসারে সাহায্য যেমন করবে, তেমন পুস্তক প্রকাশেও উৎসাহ দেবে। কিন্তু আজ এ শুধু স্বপ্ন।

*

এটা কি খুব আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় না যখন ভাবা যায় যে, একটা লোক সারা জীবনে ছয় মাস ধরে একাদিক্রমে দাড়ি কামিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও আমাদের চারদিকে কত শ্মশ্রুধারী লোকই না আমরা দেখতে পাই। সারা জীবনে একটি লোক ২ বর্গ মাইল জায়গা থেকে এই অযাচিত শ্মশ্রু কামিয়ে ফেলে। আর শ্মশ্রুর সংখ্যাও একেবারে কম নয়, ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ।

কে কখন এই নিষ্ফল প্রচেষ্টা প্রথমে শুরু করেছিল। কেউ জানে না। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে, পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরবাসীরা দাড়ি কামাত।

আধুনিক নিরাপদ ক্ষুর দিয়ে দাড়ি কামান এখনও কম কষ্টকর নয়। আর ভেবে দেখুন আফ্রিকাবাসীদের অবস্থা যখন তারা লোহা আগুনে পুড়িয়ে লাল করে নিয়ে মুখের খুব কাছে এনে তাদের দাড়ি পুড়িয়ে দিত। অথবা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা ভাবুন যখন তারা দুটো ধারালো চকমকি পাথরের মাঝে ফেলে তাদের দাড়ি ছেঁটে ফেলত।

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমি মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হই। সেই সময় শিশিরকুমারকে সেখানে ইংরাজীর অধ্যাপক-রূপে পাই। তিনি আমাদের পড়াতেন Xenophone. তারপর বি এ-তে ইংরেজীতে অনার্স ক্লাসে তাঁর কাছে পড়েছি Duckit and Wragg's 'Letters'. তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর। পোশাকের পারিপাট্য ছিল। তিনি প্যাণ্ট, কোট পরে আসতেন। প্রত্যহ নূতন নেকটাই বদলে আসতেন। মাথায় একটা কাল গোল টুপি থাকত। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৪।২৫ বৎসর। সেই বয়সেই তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়েছিলেন।

অধ্যাপনা করবার সময়েই তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। যতদূর শুনেছিলাম, তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। কয়েকদিন তিনি কলেজে এলেন না। তারপর থেকে তাঁর বেশের পারিপাট্য একটু কম বলে মনে হতে লাগল।

এই কলেজে পড়বার সময়েই ইউনি-ভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁর 'চাণক্য' অভিনয় দেখি। দেখলাম শিশিরকুমারের কি অপূর্ব চরিত্র বিশ্লেষণ! 'চন্দ্রগুপ্ত' একখানি ঐতিহাসিক নাটক। বহু শতাব্দীর যবনিকা ঠেলে যেন সেই দরিদ্র অথচ অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত 'চাণক্য' আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কি অদ্ভুত প্রতিভা! স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অভিনয় দেখে বলেছিলেন, "আমি কল্পনায় যে চিত্র এঁকেছি, শিশিরকুমারের অভিনয় তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে।"

শিশিরকুমারের স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি আর অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তিনি ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের বিশেষ পীড়াপীড়িতে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে একটা দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে অভিনয়েও আমার উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি অবতীর্ণ হবার পর ২।১ মিনিটের মধ্যেই তাঁর অভিনয় শেষ হয়ে গেল। তিনি যখন মঞ্চ থেকে চলে যাচ্ছেন তখন এইটুকু সামান্য ভূমিকায় অভিনয় দেখেও দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে যেভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সে কথা এখনও আমার মনে আছে।

তারপর যে বৎসর বিদ্যাসাগর হোস্টেল খোলা হয় সেই বৎসর আমি এই হোস্টেলে ছিলাম। তখন কলেজের ছাত্রদের 'কালা-পাহাড়' অভিনয় করবার বাসনা হয়। শিশিরকুমার তখন গড়পারে থাকতেন। হোস্টেলের সামনেই 'সঙ্গীত সমাজে' অভিনয় করা স্থির হয়। আমরা সপ্তাহে ২।৩ দিন তাঁকে আমাদের এই অভিনয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিয়ে আসতাম। তিনি যে অভিনয়-চাতুর্য ও অভিনয়-কলা দেখিয়ে দিতেন ছাত্রদের পক্ষে তা অনুকরণ করা সম্ভব হলে অভিনয়ের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠত।

বিদ্যাসাগর হোস্টেলে সরস্বতী পূজার রাত্রে আমরা অধ্যাপকগণকে এবং রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি কয়েকজন জ্ঞানী-গুণীকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সেই সভায় শিশিরকুমার 'হ্যামলেট' ও রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট কবিতা অভিনয় করে শোনান। তাতে উপস্থিত অধ্যাপকমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন — "শিশিরকুমার বিলাতে জন্মালে, নিশ্চয়ই স্যার উপাধি পেতেন।"

তারপর আমরা কলেজ ছেড়ে চলে গেলাম। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। ১০ই তারিখে শিশিরকুমার 'আলমগীর' নাটকের অভিনয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন। আমাদের কলেজে তাঁর বেতন ছিল ১৫০, টাকা। ম্যাডান থিয়েটারে তাঁর বেতন হ'ল ৭৫০, টাকা।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে তাঁর 'আলমগীর' নাটকের ৩৫তম বার্ষিক অভিনয় অনুষ্ঠানে শিশির-কুমার তাঁর ভাষণে বলেন, "আজ আমার অভিনয় জীবনের ৩৪ বৎসর পূর্ণ হয়ে ৩৫ বৎসরে পা দিলাম। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর 'আলমগীর' নাটকের অভিনয়ে প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়েছিলাম। তাই প্রতি বৎসর এই দিনটি স্মরণ করি এবং ভেবে দেখি কতদূর এগিয়ে যেতে পারি। যা করব বলে মঞ্চে যোগদান করে-ছিলাম, আজও তা আমার আয়ত্তে আসে নি। তবে মঞ্চে যোগদান করে ভুল করি নি। জীবিকা অর্জনের অন্য উপায়ও ছিল, তাই মঞ্চে যোগদান কেবল জীবিকা-নির্বাহের জন্য নয়। আমি নাট্যকলায়

একজন সেবক। একজন সেবক কতটুকু করতে পারে, সকলের সমবেত চেষ্টায় গড়ে ওঠে জাতীয় নাট্যশালা। পরিবর্তনের স্রোতে সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। আমি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি। তবে যতদিন বাঁচব, রঙ্গমঞ্চেই থাকব। অবশ্য যদি কণ্ঠস্বর ও দেহ অটুট থাকে ও মস্তিষ্ক বিকৃত না হয়।"

ম্যাডানরা ছিল ব্যবসাদার। তাদের প্রয়োজন অর্থের। সুতরাং তাঁরা সংগ্রহ করলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার ও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদকে। একজন অধ্যাপক হলেও শৌখিন নাট্যজগতের অদ্বিতীয় কর্ণধার আর একজন তখনকার দিনের অদ্বিতীয় নাট্যকার। ম্যাডানরা শিশির কুমারকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে এনে বাংলা নাট্যকলার ক্ষেত্রে নবযুগের বীজ বপন করল। সেদিন যাঁরা আলমগীরের ভূমিকা দেখেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে বাংলা দেশে স্বকীয় শক্তির প্রভাবে তিনি গিরিশোত্তর যুগের সকলের প্রতিভাকে ম্লান করে দিলেন। আলমগীরের স্বপ্ন-দর্শন দৃশ্যে অন্তত ৪৫ মিনিট ধরে রঙ্গ-মঞ্চ অধিকার করেছিলেন—দুজন শিল্পী আলমগীর ও উদিপুরী বেগম। সমস্তক্ষণ দর্শক শ্বাসরোধ করে মাত্র শিশিরকুমারের ভাষণের ইন্দ্রজালেই একেবারে অভিভূত হয়েছিল। এ শক্তি বাংলা রঙ্গমঞ্চে আর কেউ দেখাতে পারেন নি।

কিন্তু এই ম্যাডানদের রঙ্গালয়ে পুরাতন নটনটীদের নিয়ে অভিনয় করতে শিশির-কুমার অনুভব করেছিলেন সুযোগ ও স্বাধীনতার অভাব। এই পরাধীন অবস্থায় কাজ করে শিশিরকুমার সুখী হতে পারেন নি। তিনি বুঝেছিলেন এখানে কলাবিদের আত্মতৃপ্তি নেই সুতরাং এখানে ললিতকলার উন্নতি অসম্ভব। অর্থলোভ পরিত্যাগ করে তিনি ম্যাডানদের সংস্রব ত্যাগ করলেন। কিন্তু এখান থেকে শিশির-কুমার 'চাণক্য' ও রঘুবীরের ভূমিকায় নূতন পরিকল্পনায় নিজের অতুলনীয় প্রতিভার সাহায্যে মৃত নাটক দুটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন।

তারপর ১৯২৪ সালের ৬ই আগস্ট শিশিরকুমার 'সীতা' নাটক নিয়ে দেখা দিলেন। কেবল নটরূপে নয় নাট্যাচার্য এবং নাট্য-পরিচালকরূপে তাঁর অসামান্য প্রতিভা সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হয়ে উঠল এই নাটকে। সে নাটকের অভিনয় দেখে অভি-ভূত হয়েছি—চমৎকৃত হয়েছি। আমি গিরীশচন্দ্র, দানীবাবু, অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখেছি। কিন্তু 'সীতা' অভিনয়ের প্রয়োগনৈপুণ্য ছিল অপরূপ শিশিরকুমার রামের ভূমিকায় দর্শকের চিত্তে বিষাদের একটা স্থায়ী ছাপ এঁকে দিলেন। যখন নির্বাসিতা সীতার পুত্র লবের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে ছুটে এসে রাম অবশ-ভাবে ভরতকে জড়িয়ে ধরলেন তখন অতি বড় পাষাণেরও বুক ফেটে গিয়েছিল। সারা অভিনয়ের মধ্যে একটা প্রাচীনত্বের ছায়া আদ্যোপান্ত ফুটে উঠল। বিলাতী কনসার্টের বদলে শিশিরকুমার দিলেন প্রাণমাতানো দেশী রোসনচৌকি। দুয়ারের পাশে কলাগাছ, শঙ্খধ্বনি, ধূপধুনো, পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দিয়ে অভিনয়কে কালোপযোগী করে তুললেন। অভিনয়ের সময়ে শিশিরকুমারের হাতপায়ের চেষ্টা নাটকের ভাবানুযায়ী চোখ-মুখের ভঙ্গি অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনের সময় শিশিরকুমারের মূক অভিনয় এমনই অপূর্ব হয়েছিল যে বাঙ্গালী দর্শক তার পূর্বে আর কখনও এ দৃশ্য দেখেনি। কেবল অভিনয় দৃশ্য-সৌন্দর্য ও প্রয়োগকৌশল নয়, নৃত্যগীত বাদ্যও এই সীতা অভিনয়ে বাংলা রঙ্গ-মঞ্চে এক নবযুগের সৃষ্টি করল। এই নাটকের দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার ভার নিয়েছিলেন সুদক্ষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়। সংগীতের ভার নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। সংগীত রচনার ভার নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, নৃত্য পরিকল্পনার ভার নিয়েছিলেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাসঙ্গিক সংগীতের ভার নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। বাল্মীকির যুগের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আহূত হয়েছিলেন স্বর্গীয় রাখালদাস ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অভিনয়ের শেষ দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। শিশিরকুমার সর্বপ্রথম মঞ্চের ওপর দেখালেন এক সুনিয়ন্ত্রিত বৃহৎ জনতা। প্রাসাদ অঙ্গনে উচ্চ স্থানে বসে আছেন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, নীচেয় আছেন জন-সাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত আছেন অন্তঃপুরিকারা। কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলছে, কিন্তু সকলেই অভিনয় করছে। কেউ ভাবে, কেউ ভাষায়।

সীতা অভিনয়ের বিখ্যাত দুখানি গান "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" ও "ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে" দর্শক চিত্তে এমন বিষাদঘন অবস্থার সৃষ্টি করে-ছিল যে, দর্শকও অশ্রুসজল নয়নে এই গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নিজের কণ্ঠযোগ করেছিল।

এই 'সীতা' অভিনয় দেখে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, "আমি আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম যে, শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম। আজ আমি রামের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় অপূর্ব হইয়াছে। মোটের উপর আমার অভিনয় এত ভালো লাগিয়াছিল যে, আমার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অভুক্ত অবস্থায় শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ফিরিতে পারি নাই।"

মনোমোহন থিয়েটার যখন সন্ধ্যার পর আরম্ভ না হয়ে বেলা তটার সময় আরম্ভ হ'ল তখন বুঝলাম শিশিরকুমার আমাদের যে এলিজাবেথান যুগের নাটকের ইতিহাস পড়িয়েছেন তারই অনুসরণে তিনি এদেশেও সেই রীতির অনুকরণ করছেন। আমাদের দেশে তখন অভিনয় আরম্ভ হত সন্ধ্যার পর এবং শেষ হত ভোর রাত্রে। তাতে অসুবিধা ছিল অনেক। কারণ শেষরাত্রি পর্যন্ত অভিনয় দেখে সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র রজনী যাপন করে তার পরদিন কাজে যোগ দেওয়া ছিল অসম্ভব। শিশির-কুমার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে অভিনয় রীতির এই প্রথম পরিবর্তন করলেন।

শিশিরকুমার যখন মহলার আসরে তার শিষ্য, সহকর্মী ও অন্তরঙ্গগণকে তাঁদের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ে অংশ বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দিতেন, একাই একাধিক পরস্পরাবিরোধী পুরুষ ও নারীর ভূমিকা অভিনয় করতে শিক্ষা দিতেন, তখন মনে হত কোন্ শিশিরকুমার বড়—অভিনেতা শিশিরকুমার না অভিনয়-শিক্ষাদাতা শিশিরকুমার? নাট্যরসস্রষ্টা শিশিরকুমার যে কত নূতন নাট্যরসিকদের অভিনয় শিক্ষা দিয়ে কুশলী অভিনেতায় পরিণত করেছেন তার সংখ্যা নেই। তা সত্ত্বেও এমন শিষ্য তাঁর আজও জন্মায়নি যিনি তাঁর সম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছেন।

মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের কিছুদিন পরে 'নাট্যমন্দিরে' শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বৈচিত্র্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে এই নাট্য মন্দিরের প্রথম স্মরণীয় অভিনয় হল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী'। এখানি হল আধুনিক যুগের উপযোগী নাটক। তার সৌন্দর্যের বাহুল্য নেই। অতি সূক্ষ্ম তার ভাবের ঘাত প্রতিঘাত। আর অপূর্ব মনোবিজ্ঞানের স্বচ্ছ। শিশির কুমার জীবানন্দের ভূমিকায় দেখা দিলেন। এই ভূমিকাটি তাঁর অভিনয় প্রতিভার এক অপরূপ সৃষ্টি। অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাত ও আলো-ছায়া এত সূক্ষ্মরূপে এই নাটকে ফুটে উঠেছে যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একটা ভূমিকাকে জীবন্ত করে তুলবার তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। ষোড়শীর জীবানন্দের মত একটা মাতাল দুশ্চরিত্রের অংশকে dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরকুমারের পক্ষেই সম্ভব। শিশিরকুমারের জীবানন্দ ভূমিকা এক নূতন সৃষ্টি। এই নাটকে অভিনয়ে তিনি জীবানন্দের স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেও অতিক্রম করেছিলেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন 'পুদভকিন' ও 'চেরাকাশভ'। শিশিরকুমারের অপূর্ব অভিনয়ে ও প্রয়োগকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে অভিনয়ের মধ্যেই তাঁরা সাগ্রহে ছুটে গিয়েছিলেন সাজঘরে নাট্যাচার্যকে অভিনন্দন জানাতে। নাট্যাচার্যকে উদ্দেশ করে তাঁরা বলেছিলেন—"মস্কো আর্ট থিয়েটারের সুবিখ্যাত অভিনেতা 'স্টানিভস্কী'র সমতুল্য আপনি। অভিনয়ে আপনার কথায় আমরা অভিভূত হয়েছি—অভিনয় প্রতিভায় আপনি আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছেন। আপনি একজন বিরাট অভিনেতা।"

শিশিরকুমার প্রায় একশত নাটকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত প্রত্যেক ভূমিকাই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর শেষ অভিনয়ে এই সেদিনও মহাজাতি-সদনেও তিনি তাঁর প্রিয় ভূমিকায় দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ পরিচয়। আশ্চর্য যে ৭০ বৎসরের বার্ধক্যের জরার ভারে একটুও নুয়ে পড়েননি। নাট্যসাংবাদিকরা বললেন, "নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের বয়স সত্তর, তাঁর ললাটে বলিরেখার চিহ্ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু তবুও নাট্যমঞ্চে তিনি যেন তরুণ—আজও তিনি প্রবল পরাক্রমে রঙ্গমঞ্চে আসীন।"

শিশিরকুমার বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁর সৃজনী প্রতিভার সজীব স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা দেশের জীবন ও মননশীলতাকে বিচিত্র-ভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি ছিলেন একটা যুগ। শিশিরকুমারের নাম সমুজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভের মত চিরদিন বাংলার নাট্যজগতে দীপ্ত ও জ্যোতি বিকীরণ করবে। তাই কবি বলেছেন—

"বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক
করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব
প্রত্যক্ষ স্বরূপ
চিত্তে তব ধ্যানের মহিমা।"

অমিতাভ চৌধুরী

এ ধরনের আপ্যায়নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

শিশিরকুমার তাঁর ঘরে ঢুকতেই বললেন—"এই পোশাক পরে আমার সামনে আর আসবে না।"

আমি নিজের দিকে আপাদমস্তক চোখ বুলাই। ভাবি, কি এমন অশালীন পোশাক পরে ফেলেছি, যা নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়া যায় না!

অপ্রস্তুতির ধাক্কা সামলাবার আগেই সোফায় হেলান দেওয়া মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়াতে নাড়াতে শিশিরকুমার আবার বললেন, "বুঝতে পার নি তো? পারবেও না। ছাই রঙের ঐটে কি পরেছ উজবুকের মত?"

আমি যেন কাঠগড়ার আসামী। আমতা আমতা করে বলি—"কেন, জহরকোট!"

"তাই জন্যেই তো বলছিলুম। ঐ পোশাক পরে আমার সামনে এসো না। জানো না বোধ হয়, তোমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালকে আমি পছন্দ করিনে। ওঁর নামে যে পোশাক, তাও আমার দু'চক্ষের বিষ।"

হকচকানো ভাবটা কাটিয়ে ইতিমধ্যে আমি কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চার করেছি। বললাম—"জওহরলালের প্রতি আপনি এত বীতরাগ কেন?"

"হবো না!"—প্রায় লাফিয়ে উঠে উত্তেজনার সুরে বললেন—"জওহরলালই তো দেশ বিভাগের জন্যে দায়ী। ইচ্ছে করলে তিনি দেশ বিভাগ বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি। দেশকে যাঁরা দুভাগ করেছে, তাদের প্রতি বীতরাগ হবো না? বল কি হে ছোকরা? যাক, তোমাকে আর কি বলব, ছেলেমানুষ। তা' এখানে কি ব্যাপারে? কাকে চাই?"

"আজ্ঞে আপনার কাছেই এসেছি। আনন্দবাজার থেকে একটু আগেই আপনাকে টেলিফোন করেছিলাম।"

"বুঝেছি, বুঝেছি, বস।"

আমি এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি। ঘরের চারদিকে চোখ মেলবার ফুরসতও পেলাম।

সিঁথি মোড়ের কাছাকাছি বি টি রোডের গায়ে লাল রঙের ছোট বাড়ি। দোতালায় সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর। তেল-চিটচিটে বিছানা। ওপাশে তক্তপোশের উপর ইতস্তত ছড়ানো একগাদা ইংরেজী-বাঙলা বই, পত্র-পত্রিকা। চারদিকে তাকের পর তাক। অজস্র বই তাকগুলি থেকে উপচে পড়ছে। 'তাক লাগানো' ঘরের দেওয়ালে শিশিরকুমারের কম বয়সের একটা ছবি, অন্য দেওয়ালের ছবি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

স্তূপীকৃত বইয়ের মাঝখানে সেই ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে উদাস নয়নে তাকিয়ে আছেন গৌরবময় নাট্যসাম্রাজ্যের বাদশাহ আলমগীর। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিভাধর নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী। গায়ে ফুল-হাতা গরম গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি, হাতে চুরুট। সত্তর বছর বয়সের ভারে দেহ অর্ধনমিত। চোখে চশমা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ম্লান টেবিল ল্যাম্পের আলো ছাপিয়ে বহু কাহিনীর, বহু ঘটনার সাক্ষী চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্মান।

তারিখটা মনে আছে। জানুয়ারীর একত্রিশে। ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার শিশিরকুমারকে দিয়েছেন 'পদ্মভূষণ' উপাধি। খবর পেলাম, তিনি ঐ খেতাব ছেড়ে দিয়েছেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার বাসনায় এক সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর কাছে আমি এসেছি। গত পয়লা ফেব্রুয়ারী 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' তাঁর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তারই কিয়দংশের পুনরাবৃত্তি এখানে করছি।

চেয়ে দেখি, ভুরুটা কুঁচকে শিশিরকুমার একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সূচীপতন নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে হঠাৎ বললেন—"পড়াশোনা কিছু করেছ? বাঙলা নাটক, নাট্যশালা সম্বন্ধে কিছু জান? না জানা থাকলে কি আলাপ করবে আমার সঙ্গে?'

আমার সবিনয় নিবেদনে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট

হয়ে বললেন—"পড়বে, পড়বে আরও ভাল করে বাঙলা নাটক পড়বে। অনেক কিছু জানার আছে। বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসও ভাল করে পড়বে। সকলের পড়া দরকার। স্বাধীনতাপূর্বে যুগে বাঙলা দেশকে প্রেরণা দিয়েছে কে? এই নাট্যশালা। উদ্বুদ্ধ করেছে কে? এই নাট্যশালা। নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্নও দেখেছে বাঙলার নাট্যশালা। সেই নাট্যশালার আজ কোন কদর নেই। ভালো নাট্যশালাও নেই আজকাল।"

অনর্গল কথা বলতে বলতে শিশিরকুমার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ফাঁক বুঝে আমি জানতে চাইলাম 'পদ্মভূষণ' উপাধির সম্মান তিনি কেন প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন।

সিগারেটের এক কৌটোয় চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বললেন—"ঐসব জিনিস আমি কোনদিনই পছন্দ করি নি। থিয়েটার ভালবাসি, নাট্যশালা ভালবাসি; বরাবর তাই নিয়ে আছি। আমাকে হঠাৎ সম্মান দেখানোর ঘটা কেন? কালই ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, 'তোমাদের এই সম্মান আমি চাইনে, সরকারী খেতাবে দরকার নেই আমার।'"—শিশিরকুমারের কণ্ঠে কিছুটা অভিমান, কিছুটা উষ্মা।

আমি বললাম—"আপনার নট জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে"—

"থাক আর বলতে হবে না!"—আমার কথা শেষ হবার আগেই ডান ভুরুটো কপালের উপর ছড়িয়ে দিয়ে উত্তেজনার সঙ্গে বললেন—

"স্বীকৃতি? কিসের স্বীকৃতি? আজ তিন বছর নাট্যশালা ছেড়ে এমনি বসে আছি। কই, কেউ তো কোনদিন এসে বললেন না, 'এসো তোমাকে একটা নাট্যশালা খুলে দিই, তোমার ইচ্ছেমত অভিনয় করে যাও।' আমার প্রতি দরদ থাকলে নাট্যশালার প্রতিও দরদ থাকতো। ঐ পদবী দেবার বদলে খুশী হতাম, এই কলকাতার বুকে ভাল একটা নাট্যশালা খোলার কথা সরকার যদি ঘোষণা করতেন! তাছাড়া ঐসব খেতাব, পদবী জিনিসগুলোই ভুয়ো। কোন দাম নেই। শুধু কতকগুলি খয়ের খাঁ সৃষ্টি করার মতলব। বৃটিশ আমলে যেমন ছিল রায়সাহেব, রায়বাহাদুর। আমি খয়ের খাঁর দলে নাম লেখাতে চাইনে।"

উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন, গলা কাঁপতে থাকে। আমার মনে হয় এই ঘরটা যেন এক রঙ্গমঞ্চ, আর আমি যেন তাঁরই অভিনীত কোন এক নাটকে পাশে দাঁড়িয়ে মূকাভিনয় করে চলেছি। অভিনেতা শিশিরকুমার বাকভঙ্গীতে, হাতের মুদ্রায়, মুখের মাংসপেশীর দ্রুত সঞ্চালনে, ভুরু ওঠানামায় কখনও যেন মাইকেল, কখনও আওরংজেব, কখনও জীবানন্দ, কখনও বা রামচন্দ্র। একটার পর একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে যায়। আমি নির্বাক, নিশ্চুপ।

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে ফাঁকা দাঁতে ছোট ছেলের মত একগাল হেসে বললেন—"আসল কথা কি জান, এই দেশ নাটকের কদরই বুঝল না। না সরকার, না জনসাধারণ, কেউ না। তোমরা ছেলেমানুষ। তোমরা জান না, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে এই নাট্যশালার দান কত। গিরিশবাবু, অর্ধেন্দুবাবু ওঁরা সব নমস্য ব্যক্তি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—'এ নেশন ইজ নোন বাই ইট্‌স স্টেজ।' খাঁটি কথা। ডিউক অব ওয়েলিংটনকে কে মনে রাখবে? রাখে তো রাখবে সেক্সপীয়রকে, বার্নার্ড শ'কে।"

একটু থেমে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করেন—"অনেক কথা বলার আছে। মুখ ফুটে বলা যায় না। লেখাও যায় না। এই ধর না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু তার দাম দিতে হল দেশ দুভাগ করে। দ্বিখণ্ডিত এই দেশে স্বাধীনতার মূল্য কি? সাধে কি রাগ করি জওহরলালের উপর। কত আশা করে দেশবাসী দেশের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সুভাষ বসু থাকলে এমন কাণ্ড ঘটত না। সুভাষ ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। চেয়ে দেখ, আমার ঘরে আছে শুধু সুভাষচন্দ্রের ছবি। কি মনঃকষ্ট নিয়ে তাকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। এসব কথা মনে করলেই বহু অপ্রিয় কথা টেনে আনতে হয়। কাজ নেই অপ্রিয় কথায়, তার চেয়ে এসো অন্য কথা বলি। কবিতা পড়ো? ইংরেজি কবিতা? ব্রাউনিংয়ের 'লস্ট লীডার' পড়েছ? দাঁড়াও তোমাকে কবিতাটা পড়ে শোনাই।"

শিশিরকুমার এদিক-ওদিক বইটা খুঁজতে থাকেন। পান না। বাড়ির একজনকে ডাকেন বইটা খুঁজে দিতে।

"চা খাবে? খাও না? কি আশ্চর্য! লেখার কাজ কর কি করে? তাহলে আরও একটু বস। তোমাকে পুরোনো কথা কিছু বলি। আজকাল কেউ বিশেষ আসে না। অন্তরঙ্গ দুই একজন ছাড়া। জানো, আমি যখন প্রথম ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয় শুরু করি, তখন পুরো দু-বছর আমার নাম কোন খবরের কাগজে বেরোয় নি। একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া। রঘুবীর, আলমগীর, অন্য একটি নাটক—কি যেন নাম ভুলে যাচ্ছি—করা সত্ত্বেও না। তারপর 'সীতা' নাটক করলুম। এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ। দুজনেই খুব প্রশংসা করলেন। 'সীতা' নাটক নিয়ে 'ফরওয়ার্ড' কাগজে লিখলেন বিপিন পাল মশাই। পর পর তিনটি প্রবন্ধ।

আমি আবার 'পদ্মভূষণ' খেতাব

প্রত্যাখ্যানের প্রসংগে ফিরে যাই। বলি—"আপনি পদ্মভূষণের' খবর কখন পেলেন?"

"কাগজ পড়ে। ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে অবাক। দেখি, আমি নাকি পদ্মভূষণ না কি যেন হয়ে গেছি। সরকারী ভদ্রতার ডেফিনেশন আমার জানা নেই, তবে এই ব্যাপারে আগে আমার অনুমতিটা অন্তত নেওয়া উচিত ছিল। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম পেলাম দুদিন পর। টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল 'শ্রীরঙ্গমের' পুরনো ঠিকানায়। আমি যে তিন বছর আগে 'শ্রীরঙ্গম' ছেড়েছি, এ সংবাদ ভারত সরকারের জানা না থাকলেও বাঙলা সরকারের নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

রাত বেড়ে যাওয়ায় বিদায় চাইলাম। বললেন, 'এসো।' নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিলাম। হঠাৎ ডেকে বললেন—

'দাঁড়াও। একটা কাহিনী তোমাকে শোনাই। তিন বছর আগের কথা। বাড়ি-ভাড়ার দায়ে 'শ্রীরঙ্গম' ছাড়তে চলেছি। তখন একজনকে ডেকে বলেছিলাম—'ঠিক আছে, টাকার অভাবে 'শ্রীরঙ্গম' না হয় ছেড়ে দিলাম, তাতে দুঃখের কি আছে। বাঙলা দেশ ভাল নাট্যশালার কদর বোঝে। দেখো, এক বছর দেড় বছরের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আজ তিন বছর পর তোমাকে বলছি—আমি সেদিন ভুল ভেবেছিলাম, আমি সেদিন ভুল বলে-ছিলাম।"

দরজার গোড়ায় আমি স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি। ক্ষণ নীরবতা ভেঙে শিশির-কুমার বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—'আচ্ছা, এসো।'

তারপর আরও দুদিন শিশিরকুমারের বাড়ি গিয়েছিলাম। 'আনন্দবাজারে' তাঁর সংগে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে তিনি খুশীই হয়েছিলেন। টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এসো আর একদিন।'

পরের হপ্তায় আবার যেদিন তাঁর বাড়ি যাই, আমার সংগে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত (মৌলানা খাফী খান)।

সেদিনেরও একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতীয় নাট্যশালা।' নাট্যশালাটি কোথায় হবে, কিরকম হবে তার একটা খসড়াও তৈরি হয়ে গেছে। নির্মলবাবু এই ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। শিশিরকুমার জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের জন্যে নির্মলবাবুর মারফৎ।

'আনন্দবাজারের' জন্যে ঐ ধরনের একটা প্রবন্ধ আমি চাইলাম। বললেন—"বাঙলা লেখার সময় নেই, চোখটা বড় 'ট্রাবল' দিচ্ছে। অপারেশান করাব শীগগির। বরং তুমি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে বাঙলায় একটা খাড়া কর। আমি ছাপার আগে সংশোধন করে দেব।"

তারপর চলল পুরোনো দিনের থিয়েটার নিয়ে নানা ধরনের আলাপ। অধিকাংশ ঘটনাই শিশিরকুমারের অভিনয় জীবন নিয়ে। ঘরে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, শিশিরকুমারের প্রত্যেকটি অভিনয়ের কথা যাঁর নখদর্পণে। কোন একটা ব্যক্তিগত কাহিনী বলতে বলতে শিশিরকুমারের যখন পুরো ঘটনা মনে পড়ছিল না, তখন ঐ ভদ্রলোকই কিম্বৃত অংশ মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

শিশিরকুমার হঠাৎ আমাকে বলেন,

হয়ে বললেন—"পড়বে, পড়বে আরও ভাল করে বাঙলা নাটক পড়বে। অনেক কিছু জানার আছে। বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসও ভাল করে পড়বে। সকলের পড়া দরকার। স্বাধীনতাপূর্ব যুগে বাঙলা দেশকে প্রেরণা দিয়েছে কে? এই নাট্যশালা। উদ্বুদ্ধ করেছে কে? এই নাট্যশালা। নানা চরিত্রের ভেতর দিয়ে ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্নও দেখেছে বাঙলার নাট্যশালা। সেই নাট্যশালার আজ কোন কদর নেই। ভালো নাট্যশালাও নেই আজকাল।"

অনর্গল কথা বলতে বলতে শিশিরকুমার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ফাঁক বুঝে আমি জানতে চাইলাম 'পদ্মভূষণ' উপাধির সম্মান তিনি কেন প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন।

সিগারেটের এক কৌটোয় চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি বললেন—"ঐসব জিনিস আমি কোনদিনই পছন্দ করি নি। থিয়েটার ভালবাসি, নাট্যশালা ভালবাসি; বরাবর তাই নিয়ে আছি। আমাকে হঠাৎ সম্মান দেখানোর ঘটা কেন? কালই ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, 'তোমাদের এই সম্মান আমি চাইনে, সরকারী খেতাবে দরকার নেই আমার।'"—শিশিরকুমারের কণ্ঠে কিছুটা অভিমান, কিছুটা উষ্মা।

আমি বললাম—"আপনার নট জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে"—

"থাক আর বলতে হবে না।"—আমার কথা শেষ হবার আগেই ডান ভুরুটা কপালের উপর ছড়িয়ে দিয়ে উত্তেজনার সংগে বললেন—

"স্বীকৃতি? কিসের স্বীকৃতি? আজ তিন বছর নাট্যশালা ছেড়ে এমনি বসে আছি। কই, কেউ তো কোনদিন এসে বললেন না, 'এসো তোমাকে একটা নাট্যশালা খুলে দিই, তোমার ইচ্ছেমত অভিনয় করে যাও।' আমার প্রতি দরদ থাকলে নাট্যশালার প্রতিও দরদ থাকতো। ঐ পদবী দেবার বদলে খুশী হতাম, এই কলকাতার বুকে ভাল একটা নাট্যশালা খোলার কথা সরকার যদি ঘোষণা করতেন! তাছাড়া ঐসব খেতাব, পদবী জিনিসগুলোই ভুয়ো। কোন দাম নেই। শুধু কতকগুলি খয়ের খাঁ সৃষ্টি করার মতলব। বৃটিশ আমলে যেমন ছিল রায়সাহেব, রায়বাহাদুর। আমি খয়ের খাঁর দলে নাম লেখাতে চাইনে।"

উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন, গলা কাঁপতে থাকে। আমার মনে হয় এই ঘরটা যেন এক রঙ্গমঞ্চ, আর আমি যেন তাঁরই অভিনীত কোন এক নাটকে পাশে দাঁড়িয়ে মূকাভিনয় করে চলেছি। অভিনেতা শিশিরকুমার বাকভঙ্গীতে, হাতের মুদ্রায়, মুখের মাংসপেশীর দ্রুত সঞ্চালনে, ভুরু ওঠানামায় কখনও যেন মাইকেল, কখনও আওরংজেব, কখনও জীবানন্দ, কখনও বা রামচন্দ্র। একটার পর একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে যায়। আমি নির্বাক, নিশ্চুপ।

হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে ফাঁকা দাঁতে ছোট ছেলের মত একগাল হেসে বললেন—"আসল কথা কি জান, এই দেশ নাটকের কদরই বুঝল না। না সরকার, না জনসাধারণ, কেউ না। তোমরা ছেলেমানুষ। তোমরা জান না, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে এই নাট্যশালার দান কত। গিরিশবাবু, অর্ধেন্দুবাবু, ওঁরা সব নমস্য ব্যক্তি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—'এ নেশন ইজ নোন বাই ইট্‌স স্টেজ।' খাঁটি কথা। ডিউক অব ওয়েলিংটনকে কে মনে রাখবে? রাখে তো রাখবে সেক্সপীয়রকে, বার্নার্ড শ'কে।"

একটু থেমে নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করেন—"অনেক কথা বলার আছে। মুখ ফুটে বলা যায় না। লেখাও যায় না। এই ধর না, দেশ স্বাধীন হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু তার দাম দিতে হল দেশ দুভাগ করে। দ্বিখণ্ডিত এই দেশে স্বাধীনতার মূল্য কি? সাধে কি রাগ করি জওহরলালের উপর। কত আশা করে দেশবাসী দেশের ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। সুভাষ বসু থাকলে এমন কাণ্ড ঘটত না। সুভাষ ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। চেয়ে দেখ, আমার ঘরে আছে শুধু সুভাষচন্দ্রের ছবি। কি মনঃকষ্ট নিয়ে তাকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। এসব কথা মনে করলেই বহু অপ্রিয় কথা টেনে আনতে হয়। কাজ নেই অপ্রিয় কথায়, তার চেয়ে এসো অন্য কথা বলি। কবিতা পড়ো? ইংরেজি কবিতা? ব্রাউনিংয়ের 'লস্ট লীডার' পড়েছ? দাঁড়াও তোমাকে কবিতাটা পড়ে শোনাই।"

শিশিরকুমার এদিক-ওদিক বইটা খুঁজতে থাকেন। পান না। বাড়ির একজনকে ডাকেন বইটা খুঁজে দিতে।

"চা খাবে? খাও না? কি আশ্চর্য! লেখার কাজ কর কি করে? তাহলে আরও একটু বস। তোমাকে পুরোনো কথা কিছু বলি। আজকাল কেউ বিশেষ আসে না। অন্তরঙ্গ দুই একজন ছাড়া। জানো, আমি যখন প্রথম ম্যাডান থিয়েটারে অভিনয় শুরু করি, তখন পুরো দু-বছর আমার নাম কোন খবরের কাগজে বেরোয় নি। একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া। রঘুবীর, আলমগীর, অন্য একটি নাটক—কি যেন নাম ভুলে যাচ্ছি—করা সত্ত্বেও না। তারপর 'সীতা' নাটক করলুম। এগিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ। দুজনেই খুব প্রশংসা করলেন। 'সীতা' নাটক নিয়ে 'ফরওয়ার্ড' কাগজে লিখলেন বিপিন পাল মশাই। পর পর তিনটি প্রবন্ধ।

আমি আবার 'পদ্মভূষণ' খেতাব

প্রত্যাখ্যানের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বলি—"আপনি পদ্মভূষণের' খবর কখন পেলেন?"

"কাগজ পড়ে। ভোরবেলা খবরের কাগজ খুলে অবাক। দেখি, আমি নাকি পদ্মভূষণ না কি যেন হয়ে গেছি। সরকারী ভদ্রতার ডেফিনেশন আমার জানা নেই, তবে এই ব্যাপারে আগে আমার অনুমতিটা অন্তত নেওয়া উচিত ছিল। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম পেলাম দুদিন পর। টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল 'শ্রীরঙ্গমের' পুরনো ঠিকানায়। আমি যে তিন বছর আগে 'শ্রীরঙ্গম' ছেড়েছি, এ সংবাদ ভারত সরকারের জানা না থাকলেও বাঙলা সরকারের নিশ্চয়ই জানা ছিল।"

রাত বেড়ে যাওয়ায় বিদায় চাইলাম। বললেন, 'এসো।' নমস্কার জানিয়ে চলে আসছিলাম। হঠাৎ ডেকে বললেন—

'দাঁড়াও। একটা কাহিনী তোমাকে শোনাই। তিন বছর আগের কথা। বাড়ি-ভাড়ার দায়ে 'শ্রীরঙ্গম' ছাড়তে চলেছি। তখন একজনকে ডেকে বলেছিলাম—'ঠিক আছে, টাকার অভাবে 'শ্রীরঙ্গম' না হয় ছেড়ে দিলাম, তাতে দুঃখের কি আছে। বাঙলা দেশ ভাল নাট্যশালার কদর বোঝে। দেখো, এক বছর দেড় বছরের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। আজ তিন বছর পর তোমাকে বলছি—আমি সেদিন ভুল ভেবেছিলাম, আমি সেদিন ভুল বলেছিলাম।"

দরজার গোড়ায় আমি স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনি। ক্ষণ নীরবতা ভেঙে শিশির-কুমার বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন—'আচ্ছা, এসো।'

তারপর আরও দুদিন শিশিরকুমারের বাড়ি গিয়েছিলাম। 'আনন্দবাজারে' তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে তিনি খুশীই হয়েছিলেন। টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এসো আর একদিন।'

পরের হপ্তায় আবার যেদিন তাঁর বাড়ি যাই, আমার সঙ্গে ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত (মৌলানা খাফী খান)।

সেদিনেরও একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল 'জাতীয় নাট্যশালা।' নাট্যশালাটি কোথায় হবে, কিরকম হবে তার একটা খসড়াও তৈরি হয়ে গেছে। নির্মলবাবু এই ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। শিশিরকুমার জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের জন্যে নির্মলবাবুর মারফৎ।

'আনন্দবাজারের' জন্যে ঐ ধরনের একটা প্রবন্ধ আমি চাইলাম। বললেন—"বাঙলা লেখার সময় নেই, চোখটা বড় 'ট্রাবল' দিচ্ছে। অপারেশান করাব শীগগির। বরং তুমি ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে বাঙলায় একটা খাড়া কর। আমি ছাপার আগে সংশোধন করে দেব।"

তারপর চলল পুরোনো দিনের থিয়েটার নিয়ে নানা ধরনের আলাপ। অধিকাংশ ঘটনাই শিশিরকুমারের অভিনয় জীবন নিয়ে। ঘরে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন. শিশিরকুমারের প্রত্যেকটি অভিনয়ের কথা যাঁর নখদর্পণে। কোন একটা ব্যক্তিগত কাহিনী বলতে বলতে শিশিরকুমারের যখন পুরো ঘটনা মনে পড়ছিল না, তখন ঐ ভদ্রলোকই বিস্মৃত অংশ মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

শিশিরকুমার হঠাৎ আমাকে বলেন,

তোমাকে বলে রাখছি অমিতাভ, জাতীয় নাট্যশালা আমি দেখে যাবই।"

"হঠাৎ এত আশাবাদী হয়ে উঠলেন কি দেখে?"—আমি প্রশ্ন করি।
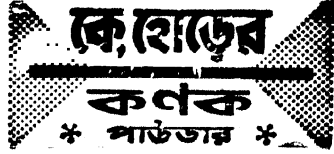
"কোষ্ঠী দেখে। এক জ্যোতিষী সেদিন এসেছিল আমার কাছে। বলে গেছে, দু'বছরের মধ্যে আমার আশা পূর্ণ হবে। জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমার অন্য কোন আশা, অন্য কোন সাধ তো নেই।"

আমি জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী মুলতুবী রেখে বলি, আপনি ডাঃ রায়কে এই ব্যাপারে বললেই তো পারেন।

"বিধানবাবুর কথা বলছ? উনি আমার থিয়েটারের একজন বড় সমঝদার ছিলেন। প্রায় সব নাটকেই তাঁকে টিকিট কাটতে দেখেছি। কিন্তু তাঁকে বলে কোন লাভ হবে না। কয়েক বছর আগে আমাকে একটা সরকারী পদ দিতেও চেয়েছিলেন। বিধানবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন যাওয়া-আসাও করি। কিন্তু মতে মিলল না। সরকারী পদ নিয়ে বিপদে পড়ি আর কি! ঐসব কাজের অনেক ফ্যাসাদ—সরকারের উদ্যোগে কোন নাটক নামালেই থাকবে ওদের হস্তক্ষেপ। আমার কোন হাত থাকবে না, ওদের ফরমাস মত কাজ করতে হবে, নাটক প্রযোজনা করতে হবে। ওসব আমার পোষায় না। সরকার এমন একটি নাট্যশালা করুন, যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রযোজকের; কিন্তু বিধানবাবুর কথায় ভরসা পেলুম না। 'না' বলে সোজা চলে এলুম। আর ওদিকে পা বাড়াইনি।"

"তারপর ভেবেছিলাম,"—শিশিরকুমার বলেন,—"জনসাধারণের সহযোগিতায় অভিনয়ের পালা চালাব। তাও হল না। অনেকেই অভিনয়ের দাবী নিয়ে আসেন। কিন্তু কারও কাছে টাকা নেই। ভাল নাটক নামাতে হলে টাকার দরকার। নূতন নাটক করার বড় ইচ্ছে। ক'দিন রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'র রিহার্সেলও দিয়েছিলাম। কিন্তু টাকার অভাবে স্টেজে নামান গেল না। এখন দিব্যি বেকার বসে আছি। ঘরে বসে চুরুট টানি, আর জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখি।"

আমি ও নির্মলবাবু যখন বিদায় নিলাম, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। যাবার আগে বললেন, 'মাঝে মাঝে এসো, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগে।'

শিশিরকুমারের টেলিফোন পেয়ে আর একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম দুপুর-বেলা। সেদিনই শেষ দেখা।

আমি দোতালায় উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি তিনি ফিটফাট সেজে নীচে নেমে এলেন। বললেন, "তোমাকে এ সময় ডেকে বড় অন্যায় করে ফেলেছি। এখন তো বেশীক্ষণ কথা বলতে পারব না। আমাকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে চোখ পরীক্ষায় যেতে হবে। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যেবেলা বরং এসো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

রাস্তায় নেমে আবার বললেন, "এখন কোথায় যাবে?"

"আপিসে।"

"তাহলে এসো, তোমাকে পৌঁছে দিই, ট্যাক্সিতে। আমি তো ঐদিকেই যাব।"

আমি বললাম—"আপনি যান, আমি আপিসের গাড়ি নিয়েই এসেছি।"

কি জানি কি ভেবে হঠাৎ তিনি বললেন—"তাহলে তো মিছিমিছি ট্যাক্সি ডাকলুম। আগে জানলে তোমার গাড়িতেই তো বেশ যাওয়া যেতো। কয়েকটা টাকা বাঁচত।"

বললাম—ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে চলে আসুন না এই গাড়িতে।

"না থাক, আমি চলি। সন্ধ্যেবেলা এসো।"—শিশিরকুমারের ট্যাক্সি সামনে এগিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি আমার যাওয়া হয়নি। আর কোনদিনই যাওয়া হল না। ঊনত্রিশে জুন রাত্রি দেড়টায় হৃদরোগে তিনি মারা গেলেন। একেবারে হঠাৎ। তাঁর বহু ঈপ্সিত 'জাতীয় নাট্যশালা' দেখে যাবার সাধ অপূর্ণই রইলো।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

মুখোমুখি দুখানা ঘরের মাঝখানে যে ফাজিল জায়গাটুকু আছে এখন তা ড্রয়িং রুম। দেয়াল ঘেঁষে একখানা টেবিল, তার ওপর স্কুল আর কলেজের বইখাতা স্তূপীকৃত। দুদিকে দুখানি হাতল ছাড়া চেয়ার। মনোমোহন অসীমকে হাত না ধরেও সেখানে টেনে আনলেন। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'বোসো, রেস্ট নাও।'

কি আশ্চর্য কাণ্ড। পানের ডিবেটায় করে সুহাসিনী নিজে নিয়ে এসেছেন পান। মেয়েদের কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হত। নিজের হাতে পান দিতে মাসীর যদি অতই সংকোচ কোন বোনকে দিয়ে পাঠালেই হত। পান সিগারেটও যদি মা-মাসীর হাত থেকে আসে তার সমস্ত মাদকতা ধুয়ে যায়।

অসীম সুহাসিনীর দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি আবার পান নিয়ে এলেন কেন মাসীমা। পান তো আমি খাইনে।'

সুহাসিনী একটু হেসে বললেন, 'আহা খাও না, মাঝে মাঝে খাওয়া ভালো।'

মনোমোহন বললেন, 'খাও, তোমরা এবার খাওয়া দাওয়া সেরে এসো, আমরা ততক্ষণ একটু রেস্ট নিই।'

সুহাসিনী বললেন, 'তোমার সামনে বসে রেস্ট? তবেই হয়েছে। মানুষের কানে তালা লাগবার আগে তোমার বকুনি কি থামবে না কি? বেচারা সারারাত গাড়ির ভিড়ে জাগতে জাগতে এসেছে। এবার ওকে একটু ঘুমুতে দাও।'

মনোমোহন এবার বেশ খানিকটা চটে উঠলেন, 'দিচ্ছি গো দিচ্ছি। ওর ওপর তোমার চেয়ে আমার দরদ কম নয়। ও তোমারও ছেলের বন্ধু আমারও ছেলের বন্ধু। কিন্তু মানুষ নেই, জন নেই, দিন নেই রাত নেই তুমি সব সময় আমাকে গরু তাড়াবার মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন বলতো। ছেলেটাকে তো বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছ, এবার আমাকেও তাই করতে চাও নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনী ঘুরে দাঁড়ালেন। অসীম অবাক হয়ে দেখল, তাঁর সেই শান্ত সৌম্যমূর্তি পলক ফেলতে না ফেলতে একেবারে রণচণ্ডীর রূপ ধরেছে।

সুহাসিনী চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওই কথা তুমি বললে? ঘরের তলায় বসে এই ভরদুপুর বেলায় আমার নামে অত বড় একটা মিথ্যে কথা বলতে পারলে তুমি? একটুও জিবে আটকাল না? আমার নামে এমন বদনাম দেওয়ার আগে তোমার পাঁচটা প্রাণে একটা কথা বলল না? নিজে টাকার খোটা দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে পর করে দিয়ে ঘরের বার করে দিলে এখন আমার ওপর যত দোষ চাপাবার চেষ্টা?'

অসীম মহা অপ্রস্তুত। এমন সুন্দর সুস্থ একটি পরিবারে মুহূর্তের মধ্যে যে এ ধরনের কুরুক্ষেত্র বেঁধে যেতে পারে তা ধারণাতীত। ছেলে মেয়ের বন্ধু হিসাবে অসীমের সঙ্গে এ'দের যত ঘনিষ্ঠতা থাকুক তার সামনে এমন মারমূর্তি হয়ে দাম্পত্য কলহ না করাটাই এ'দের পক্ষে সংগত ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের স্বাদ এরই মধ্যে কটু হতে শুরু করেছে। অসীমের মনে আবার অনুশোচনা এল এখানে না এলেই ভালো হত। অনেক কষ্টে তিনদিনের ছুটি জুটেছে। সেই দুর্লভ অবসরটুকু কাটাবার জন্যে স্থান নির্বাচনে অসীম সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়নি।

গোলমাল শুনে মাধুরী আর মানসী ছুটে এল। মানসী বলল, 'আবার কি হল তোমাদের। ভাত বাড়া হয়েছে। চল মা, খাবে চল।'

সুহাসিনী বললেন, 'তোমরা খাও গিয়ে বাছা। আমার ক্ষিদে তেষ্টা সব মিটে গেছে। আমি খাব না।'

মাধুরী ধমক দিল, 'কি পাগলামি হচ্ছে? এসো, শিগগির এসো। ভাত তরকারি সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

সুহাসিনী গভীর অভিমানে বললেন, 'হোক। আমার সবই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন দেহের জ্বালাটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাঁচি। সবাই বাঁচে তাহলে।'

মাধুরী বলল, 'লক্ষ্মী মা, চল। অমন রাগ করে নাকি।'

যেন মা আসলে সুহাসিনী নন, মাধুরী নিজেই। অবুঝ একগুঁয়ে মেয়েকে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুহাসিনী অত সহজে ভুললেন না। আগের মতই গোঁ ধরে বললেন, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না। তোমরা খাও গিয়ে আমি খাব না।'

মনোমোহন কখন উঠে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন আর রাস্তার চলমান যাত্রী বোঝাই ট্রাম বাসগুলিকে ছুটে যেতে দেখছেন। এই নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা ছাড়া সংসারে তাঁর আর যেন কোন ভূমিকা নেই।

মানসী আড়চোখে অসীমের দিকে তাকাল। মানে তুমি সাহায্য কর, তুমি উদ্ধার কর। আমাদের মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে।

তাতো যাচ্ছেই। অসীম কি এখানে এক প্রৌঢ় দম্পতির ঝগড়া বিবাদ মান অভিমান দেখবার জন্যে ছুটি নিয়ে এসে বসেছে।

তার কি পৃথিবীতে আর কোন কাজ নেই?

কিন্তু বাইরের মানুষ হয়ে এ'দের এই পারিবারিক ব্যাপারে কী করতে পারে, কীই বা বলতে পারে অসীম। তার মুখ থেকে ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বেরোয় না, যথাশ্বাস যথোচিত কাজের জন্যে সে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। তার উপস্থিত বুদ্ধি নেই, বরং সব সময়ে তার বুদ্ধি অনুপস্থিত। তবু মানসীর চোখের ইশারাই বোধ হয় পলকের মধ্যে সেই পলাতক বুদ্ধিকে ডেকে আনল, মূককে বাচাল করল আর পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করতে সাহস দিল।

অসীম বলল, 'মাসীমা, আপনি তাহলে ওইভাবে রাগ করে না খেয়ে থাকুন। আমি চলে যাই।'

সুহাসিনী বললেন, 'সে কি তুমি এই ভরদুপুরে বেলায় কোথায় যাবে? বিশ্রাম টিশ্রাম না করে?'

অসীম বলল, 'আপনি যদি অমন করেন আমার কি আর বিশ্রাম করা আসে মাসীমা?'

নিজের গলা শুনে অসীম নিজের মনেই হাসল। তার কণ্ঠের কৃত্রিমতা কি ওরাও টের পেয়েছে? মা না পেলেও মেয়ের নিশ্চয়ই বুঝতে বাকি নেই।

সুহাসিনীকে এবার একটু লজ্জিত দেখা গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি স্নিগ্ধ কৌতুকের সুরে হেসে বললেন, 'ও আমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি দেখে বলছ? কিছু মনে কোরো না বাবা। আগে আগে লজ্জা করতাম। এখন আর ছেলেমেয়েদের সামনে আমাদের কোন লজ্জা নেই। কতক্ষণ আর লজ্জা করে মানুষ পারে বলতো বাপু। তোমার মেসোমশাইর সঙ্গে আমার অমন ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। এখন আর একেবারেই বনে না।' সুহাসিনী মিষ্টি করে একটু হাসলেন। তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, 'মাধু, মানু, চল খাবি চল। আহা, তোদের বড় কষ্ট হল। চল।'

মেয়েদের নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন সুহাসিনী।

মনে মনে অসীম তাঁর অভিনয় দক্ষতাকে নমস্কার জানাল। মেয়েদের যে জাত অভিনেত্রী বলা হয়, তা এইজন্যেই। ও'র কলাকৌশলের কাছে নিজেকে অসীমের শিশু মনে হল। ভিতরের বাইরের হাজার রকমের দীনতা হীনতাকে ঢাকবার জন্যে এ'দের বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, দরজায় জানলায় দামি রঙীন পর্দা নেই যে সব আড়াল করবেন, শুধু দুটি কথা, একটু-খানি হাসি আর গলার স্বরটুকু বদলাবার কৌশল—এই সম্বল নিয়ে খোলা হাটের মাঝ-খানে এ'রা সব মর্যাদা আর গোপনতা রক্ষা করেন। যাদুকরীর কাঠি ছুঁইয়ে দিনকে রাত করেন, রাতকে দিন।

ভিতরের ঘর থেকে মঞ্জু এসে বলল, 'অসীমদা, যান আপনি এবার শুয়ে পড়ুন গিয়ে। বিছানা পাতা আছে।' ভেজানো দরজা ঠেলে মঞ্জু আগে আগে ঘরের ভিতর ঢুকল, তারপর হেসে বলল, 'আসুন।'

পুরোন একখানা ডবল বেডের খাট। অসীম অনুমান করল বাড়ির কর্তাগিন্নীর ফুলশয্যার দিনে বোধ হয় এখানা পাতা হয়েছে। খাটের তলায় আশে পাশে দেয়ালের তাকগুলিতে ঘরের সব জায়গায় গৃহস্বামীর জিনিসপত্র ঠাসা। আর সব মিশিয়ে কেমন একটা গন্ধ। সর্বনাশ। এই সিন্দুকের মধ্যে কতক্ষণ তাকে কাটাতে হবে। অসীম এই গরমে যে একেবারে আলু সেদ্ধ হয়ে যাবে।

অসীম বলল, 'আমাকে বরং বাইরেই বিছানা করে দাও মঞ্জু?'

মঞ্জু বলল, 'কেন, ঘরই তো ভালো অসীমদা। আপনি গরমের ভয় করছেন। ফ্যান খুলে দিচ্ছি। মোটেই গরম হবে না। একটু বাদে দেখবেন বেশ ঠাণ্ডা।'

অসীম বলল, 'কিন্তু ছারপোকা?'

মঞ্জু হেসে বলল, 'আপনার সেই ভয়?' না; ছারপোকা নেই। বাবার বিছানায় একটি ছারপোকা থাকলে কি আর রক্ষা আছে? আমরা সপ্তাহে দুবার করে ও'র বিছানা ধুয়ে দিই, রোদে দিই। তাছাড়া চাদর, বালিশের ঢাকনি সব ধোপা বাড়ি থেকে এসেছে। মেজদি বড় বাক্সটা খুলে সব বের করে দিয়েছে। আপনি ভাববেন না যে—।'

অসীম লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না না, আমি সে সব কিছু ভাবিনি। তোমার বাবা মা বুঝি এই খাটে—?'

মঞ্জু বলল, 'না। মা আজকাল আর—। মা, আমি মায়াদি সব নিচে বিছানা পেতে—।' আপনি এবার ঘুমোন অসীমদা আমি যাই। কথা বললে আপনার ঘুম আসবে না।'

অসীম বিছানায় উঠে শুয়ে পড়তে পড়তে হেসে বলল, 'তুমি কথা বললে আমার আর ঘুমোতেই ইচ্ছা করবে না।'

মুখ নিচু করে গলা নামিয়ে মৃদু হেসে হেসে মঞ্জু বলল, 'ঈস্, সে আর আমার কথা নয়।'

বলেই ঘর থেকে দে ছুট।

অসীম বালিশ থেকে মাথা তুলে দোরের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'ও মঞ্জু, শোন শোন। শুনে যাও।' কিন্তু মঞ্জুর কোন সাড়া মিলল না, দেখাও মিলল না।

অসীম হেসে আবার শুয়ে পড়ল।

সবই ঠিক আছে। বিয়ের আগে জামাই আদর, শ্যালিকা সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-তামাশা রসিকতা। শুধু বিয়ের নামেই দেখা নেই। বিয়ে যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। মনোমোহনবাবু তাঁর মত নিম্নবর্ণ আর কাঞ্চন কৌলীন্যে নিম্নশ্রেণীর পাত্রের হাতে স্বেচ্ছায় স্বহস্তে কন্যা দান করবেন না এটা প্রায় নিশ্চিত। অসীমকে যদি নিতে হয় কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু অতখানি বাহু-বল কি তার আছে? কিংবা ঝামেলাঝক্কি পোহাবার মত মনোবল? সেও তো তিরিশ পেরিয়েছে।

তাছাড়া মানসীকে শুধু তার বাপমার হাত থেকে কেড়ে নিলেই তো হবে না, তার নিজের মনের হাজার রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নানা ধরনের কর্তব্যবোধ, মর্যাদাবোধের হাত থেকেও কেড়ে নিতে হবে। সেই কাড়াটাই বড় কাড়া। বড় কঠিন। মানসীর মনকে আজও ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি। বিয়ের বিপক্ষে, অন্তত সমূহ বিয়ের বিপক্ষে তার একেক সময় একেক ধরনের যুক্তি। কোনটাই ধোপে টেঁকে না। মানসীর মনে প্রেম যদি দুর্বার হত, তাহলে এসব বিচার বিবেচনা আসতই না। একথার জবাবে মানসী একবার বলেছিল, 'কী করব বল, তুমিও আর আঠের কি বিশ বছরের তরুণ নও, আমিও ষোড়শী—সপ্তদশী নই। ঝাঁপিয়ে পড়বার বয়স কি সাহস এখন আর আমরা কেউ রাখি না।'

কিন্তু অসীমের যে সাহস আছে সেই কথাই আজ সে জানাতে এসেছে। বলতে এসেছে, 'এখন বয়স থাকা সত্ত্বেও বয়স নেই ভাব করছ। বয়স যখন সত্যিই চলে যাবে সেদিন আর কেঁদে কূলে পাবে না। অশ্রু-বন্যায় শুধু ভেসে বেড়াতে হবে। আর যদিও তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট তবু প্রকৃতির নিয়মে তোমার যৌবনই আগে যাবে। যৌবনই তো রূপ। যৌবনই তো জীবন। জীবনের রাজা। সেই রাজাকে ইচ্ছা করে নির্বাসনে দিয়ো না। জীবনে পরম লগ্ন কোরো না হেলা হে গরবিনী।'

'মঞ্জুকে ডাকছিলে কেন অসীম? তোমার কি কিছু চাই? জল টল কিছু দরকার?'

মানসী নয়, মাধুরী নয়, তাদের বাবা ফের এসে হাজির হয়েছেন।

অসীম শঙ্কিত হল, বিরক্তও হল। নাঃ, এই বুড়ো ভদ্রলোক তাকে একেবারে অতিষ্ঠ না করে ছাড়বেন না। যত তাড়াতাড়ি পারে এখান থেকে বিদায় নিতে পারলেই তার কান দুটো রক্ষা পাবে।

অসীম বলল, 'না মেসোমশাই কিছু চাই

না। এমনিই ডাকছিলাম ওকে। আসুন।

মনোমোহন পরম আপ্যায়িতভাবে হাসলেন, 'এলে তো তোমার আবার বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে অসীম।'

অসীমকে বলতে হল, 'না না, ব্যাঘাত কিসের। বসুন আপনি।'

এই মুহূর্তে গৃহী তাঁর নিজের ঘরে অতিথি।

মনোমোহন খাটের পাশে আলগোছে বসে বললেন, 'এলাম তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে 'I am grateful to you. Ashim very grateful।'

অসীম অবাক হয়ে বলল, 'কৃতজ্ঞতা আবার কিসের মেসোমশাই?'

মনোমোহন গলা নামিয়ে বললেন, 'তুমি আজ সামনে না থাকলে তোমার মাসীমা সারাদিন সারা রাত না খেয়ে থাকত। যেমন রাগ তেমনি জেদ। না খেয়ে সারাদিন কষ্ট পেত, আর সেই কষ্টে আমার সঙ্গে সারাদিন ঝগড়া করত। জানো অসীম, এক কষ্ট থেকে আর এক কষ্টের জন্ম, এক দুঃখ থেকে আর এক দুঃখের। মানুষ দুঃখ দেয় বলেই দুঃখ পায়, আবার দুঃখ পায় বলেই দুঃখ দেয়। রক্তবীজের গল্প শুনেছ অসীম? এক ফোঁটা রক্ত মা ধরণীর বুকে পড়ে আর হাজার হাজার লাখ লাখ অসুরের জন্ম হয়। দুঃখ তেমনি। সে হল আর এক অশ্রুবীজ। এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে আর নতুন নতুন দুঃখের জন্ম হতে থাকে।

অসীম চমকে উঠল। তার গহন মনের কোন এক অদৃশ্য তন্ত্রীতে যেন ঝঙ্কার লেগেছে। মনোমোহনের কথাগুলি সেই সুরেরই স্বরলিপি। এই মুহূর্তে মানুষটির খর্বাকার চেহারা, বিসদৃশ গোঁফ বের করবার অসম্ভব ক্ষমতা সব যেন অসীমের চোখের সামনে থেকে লোপ পেয়েছে। যা বিলুপ্ত হয় না তার নাম দুঃখ। তার স্বাদই কি সমুদ্রের স্বাদ। তলহীন কূলহীন আদিহীন অন্তহীন সেই অসীম সমুদ্র। তার বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ।

অসীম বলল, 'আপনার কিসের এত দুঃখ মেসোমশাই।'

মনোমোহন বললেন, 'কিসের দুঃখ? জানো অসীম, খেতে বসে বারবার সেই হতভাগা হারামজাদাটার কথা আমার মনে পড়ছিল। সেও ইলিশ মাছ আর আম খেতে ভালোবাসে। আমি যে চুপচাপ খাচ্ছিলাম তা শুধু ওই জন্যে। কথা বলতে পারছিলাম না। বললেই তার কথা মুখে এসে পড়ে। অথচ আমি নিজেই বাড়ি ভরে সার্কুলার জারি করেছি, খবরদার সেই কুলাঙ্গারের নাম তোমরা কেউ মুখে আনবে না। সেই আইন ভাঙি কি করে? Law maker should not be lawbreaker, কুলাঙ্গার। কুলাঙ্গার ছাড়া কি। এতগুলি আইবুড়ো সোমত্ত বোন ঘাড়ে। তাদের কথা একবারও ভেবে দেখল না। নিজে বিয়ে থা করে দিব্যি মনের সুখে আছে। বলতো অসীম, এই কি মানুষের কাজ?'

অসীম শেখানো পাখির মত বলল, 'সত্যি, এটা শংকরের উচিত হয়নি।'

মনোমোহন বলতে লাগলেন, 'স্বার্থপর, পরম স্বার্থপর। শুধু নিজের বউ আর বাচ্চা ছেলে। পূর্ব গোলার্ধ আর পশ্চিম গোলার্ধ। তার পৃথিবী এই দুই ভাগে বিভক্ত। বাপ মা, ভাই বোন সব এখন ভেসে গেছে। অথচ এক সময় ওদের সে কী ভালোইনা বাসত। আজ সেই ভালোবাসার ধারা আর একদিক দিয়ে বইছে। আজ এপারে চর, ওপারে গঙ্গা। আজ সে বলে কি জানো? ওদের জন্যে আমি দায়ী নই, আপনি দায়ী। সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দারিদ্র্যের জন্যে আপনি দায়ী। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছ অসীম? কিন্তু ভাষাটা ভদ্রলোকের হলে কি হবে, ভিতরের ভাবটা যে ইতরের মত। তোমাদের আজকালকার ছেলেরা এমন কথাও বাপকে মুখের ওপর বলে দিতে পারে। মোটেই জিভে আটকায় না। নিজের ছেলের মুখে ও কথা শুনে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল বাবা। মনে মনে বললাম ধরণী দ্বিধা হও। ওরে হতভাগা, আমি কি কেবল তোর ভাইবোনগুলির জন্যেই দায়ী, তোর জন্যেও দায়ী নই! যে মুখ দিয়ে তুই আজ ওকথা বললি সে মুখে খাবার জোগাল কে, ভাষা জোগাল কে?'

সুহাসিনীদের খাওয়া হয়ে গেছে। তিনি ঘরের বাইরে থেকে স্বামীকে আবার তাড়া লাগালেন, 'আশ্চর্য, ছেলেটাকে কি তুমি একটুও ঘুমুতে দেবে না? ও ঘরে তোমার বিছানা পেতে রেখে এসেছি। যাও শোও গিয়ে। বই আছে, কাগজপত্র আছে। আজ তো কাগজটাও ভালো করে দেখনি, যাও দেখ গিয়ে।'

এবার সুহাসিনীর গলা কোমল আর স্নিগ্ধ দেখা গেল মনোমোহন এবার আর প্রতিবাদ করলেন না। ঘর থেকে চলে যাওয়ার আগে বরং একটু লজ্জিত ভঙ্গিতেই বললেন, 'সত্যি, তোমাকে খুব

ডিস্টার্ব করে গেলাম, কিছু মনে কোরো না।'

অসীম কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না না না।'

মনোমোহন বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানসী ঘরে ঢুকল। আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। খাটের ধারে অবশ্য বসল না, কিন্তু ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। অসীম লক্ষ্য করল, দোরটা খোলাই রেখে এসেছে। বন্ধ করে এলে অবশ্য আরো অনেক খুশী হত অসীম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করল তা সম্ভব নয়। এক বাড়ি লোকের মুখের ওপর মানসী দরজা বন্ধ করতে পারে না, বরং খোলা রেখে মৌন অনুনয়ে বলতে পারে 'তোমরা দয়া করে কিছুক্ষণের জন্যে এদিকে কেউ এসো না। আমরা অভদ্রতা করছিনে, তোমরাও অবিবেচক হয়ো না।' এইটুকু যে এসেছে —এই তো মাত্র ও ঘর থেকে এ ঘরে—তবু এও কম সাহসের কথা নয়। তাদের সম্পর্কের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। অসীম মানসীর দাদার পুরোন বন্ধু প্রকাশে এই পরিচয়ের জোরটুকু শুধু আছে। যদিও সেই বন্ধু আর এ বাড়িতে নেই, তার সঙ্গে এই পরিবারের সম্পর্ক শিথিল, শুধু শিথিল কেন একেবারে ছিঁড়েই গেছে, শংকরের সঙ্গে অসীমের নিজেরও আর তেমন কোন যোগাযোগ নেই, বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে মুছে মুছে আবার সেই প্রথম দিকের সাধারণ পরিচয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তবু শংকরের বন্ধু এই পরিচয়ই অসীম মুখ ফুটে জোর গলায় বলতে পারে, মানসীর বন্ধু এ কথাটা কিছুতেই বলবার জো নেই, বলবার রেওয়াজ নেই সমাজে।

মানসী আজ পান খেয়েছে। ফিকে হলদে রঙের শাড়িটি চমৎকার মানিয়েছে ওকে। গায়ে কোন গয়না নেই। রজনীগন্ধার ডাঁটার মত পুষ্ট স্বাস্থ্যই ওর সৌন্দর্য। এই মুহূর্তে মানসীকে ভারি সজীব আর সুন্দর দেখাচ্ছে। যেখানে জীবন সেখানেই সৌন্দর্য সেখানেই রূপ। রূপ নেই শুধু মৃতের আর জীবন্মৃতের।

মানসী বলল, 'কী ভাবছ, কী দেখছ। আবার আর একজন ঘুমের ডিস্টার্ব করতে এল এই তো? আমি এক মিনিট তোমাকে ডিস্টার্ব করে যাব।'

অসীম হাসল, 'মাত্র এক মিনিট? তুমি সারা জীবন ডিস্টার্ব করবার অনুমতি করে নেবে?'

মানসী সন্তর্পণে একবার দোরের দিকে তাকাল। দেখে নিল কেউ কোথাও আছে কি না। তারপর মৃদু হেসে মধুর গলায় বলল, 'খুব যে গরজ দেখছি। তাই যদি হয় তখন আর অনুমতি নিতে আসব না। বিনা অনুমতিতেই রাধা মূর্তিমতী হয়ে থাকব। মঞ্জুকে অত ডাকাডাকি করছিলে কেন?'

অসীম বলল, 'তার সেজদিকে ডেকে দেওয়ার জন্যে।'

মানসীর খুশী আর লজ্জা অসীম দু' চোখ ভরে দেখে নিল। 'যত সব মন ভোলানো কথা। ডেকে দেওয়ার জন্যে না আরো কিছু। তুমি তো ওর সঙ্গেই দিব্যি গল্প করছিলে।'

কৃত্রিম অনুযোগ আর ঈর্ষার ভঙ্গি মানসী চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলল।

অসীম লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ। ও তো এখনো ফ্রক ছাড়েনি। আজই বুঝি শুধু শখ করে শাড়ি পরেছে। ও সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।'

মানসী সকৌতুকে বলল, 'অত চটছ কেন। আগাগোড়া ইতিহাসটা একবার মনে করে দেখ না। প্রথমে তুমি এলে দাদার বন্ধু হয়ে। কি গুরুগম্ভীর রাশভারি মুখ। কাছে যেতে ভয় হয়। তারপর আস্তে আস্তে ভয় ভাঙতে লাগল। প্রথমেই আমার নয়, আমার বড়দির আর মেজদির। তখন তুমি ওদের সঙ্গেই গল্প করতে ভালোবাসতে। কিন্তু বড়দির বিয়ে হয়ে গেল আর মেজদি রইল উদাসিনী হয়ে। থার্ড চানস আমার। কিন্তু সে চানস চলে যেতে কতক্ষণ। ফোর্থ ফিফথদের হাতে—।'

অসীম বিরক্ত হয়ে বলল, 'মানসী তুমি কি এইসব ঠাট্টা তামাশা করবার জন্যেই আজ আমাকে ডেকে এনেছ?'

মানসী বলল, 'ঠিক তাই। তামাশাটা অর্ধসত্য। সত্যে আর মিথ্যে মধুর। নির্ভেজাল সত্যের চেয়ে সুলভও।'

'মানু।'

দুজনেই চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকাল। মাধুরী। ঘর আর দোরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ন যযৌ ন তস্থৌ।

মানসী বলল, 'কি মেজদি।'

'তোর একটা ফোন এসেছে।'

মানসী এবার হেসে বলল, 'তা আসুক। তাই বলে তুই অমন কাঠের মূর্তি হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। ঘরে আয়।'

মাধুরী যেখানে ছিল সেখানে থেকেই বলল, 'তুই ফোনটা ধর গিয়ে।'

মানসী হেসে বলল, 'ফোন যখন এসেছে নিশ্চয়ই ধরব। তুই আয় এদিকে। অসীমদার সঙ্গে ততক্ষণ বসে একটু গল্প কর।'

মাধুরী এবার হেসে তরল গলায় বলল, 'তোর দাক্ষিণ্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

মানসী কথাটা না শুনবার ভান করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল, অসীম তাকে ডেকে বলল, 'তোমরা ফোনও নিয়েছ নাকি? কই দেখলাম না তো?'

মানসী যেতে যেতে আর একবার মুখ ফিরাল। তারপর হেসে বলল, 'আমাদের মনের মত ফোনটাও অদৃশ্য। কী করে দেখবে?'

মাধুরী ততক্ষণ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। বোনের শক্ত হেঁয়ালিটা সেই ব্যাখ্যা করে ভেঙে দিল, 'আমাদের ফোন নয়। দোতলার ফ্লাটে একজন এডভোকেট ভদ্রলোক থাকেন। খুবই ভদ্র। ফোনটোন এলে ডেকে দেন। দরকার হলে করতেও দেন। কিন্তু অসুবিধে এই কিছুতেই চার্জ নেবেন না।'

অসীম বলল, 'এত ভদ্রতা তো ভালো নয়। বড় সন্দেহজনক।'

মাধুরী অসীমের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'দারোগা হয়েছ কিনা। সন্দেহই তো তোমাদের মূলধন।'

অসীম হেসে বলল, 'তা ঠিক। বোসো মাধুরী।'

মাধুরী আর দাঁড়িয়ে রইল না। খাটের ধার ঘেঁষে বসল।

অসীমও শুয়ে নেই। অনেকক্ষণ আগেই উঠে বসেছে।

'তারপর মাধুরী, তোমার খবরটবর বল।'

মাধুরী একটু হাসল, 'আলাপের অবতরণিকা হচ্ছে বুঝি? যখন আমাদের কোন কথা জিগেস্য করবার থাকে না, তখনই খবর জিগ্যেস করি। কিসের খবর তুমি চাও?'

অসীম এবার চোখ তুলে মাধুরীর দিকে তাকাল। সুন্দর মুখ নয়। প্রায় উত্তীর্ণ-যৌবনা সাতাশ আঠাশের এক কুমারীর মুখ। সকালে যে মুখে বিষাদের আভাস দেখেছিল অসীম, এই পড়ন্ত দুপুরে এখন চাপা শ্লেষ আর ব্যঙ্গের আভা। সন্দেহ নেই দশ বছর আগের সেন্টিমেন্টাল সেই মেয়েটি এখন সিনিক হয়ে গেছে। ওর দুটি চোখ সেই রূপান্তরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাঁচ বছর ধরে পুলিসের কাজ করে চোখ চিনবার ক্ষমতা হয়েছে অসীমের। শুধু চোর ডাকাতের চোখই নয়, যদের ওপর দিয়ে চুরি ডাকাতি হয়ে গেছে তাদেরও। অসীমের মনে হল মাধুরীর মুখে সেই স্বাভাবিক লাবণ্য যেন নেই, তার বদলে রূঢ় রুক্ষ কাঠিন্যের এক প্রলেপ পড়েছে। অনেকদিন ধরে স্কুলে কাজ করছে মাধুরী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাস নিয়েছে ছাত্রী তাড়না করেছে সমানে। এ কি সেই ক্লান্তিকর জীবিকার ছাপ? না কি সঙ্গহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের? এখানে না আসাই ভালো ছিল অসীমের, এখানে না এলেই ভালো হত।

'মাধুরী।'

মাধুরী অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাড়া দিল, 'অমন করে কথা বলছ কেন অসীমদা?

তোমাদের পুলিস ক্লাবে ঘন ঘন থিয়েটার টিয়েটার হয় বুঝি?'

অসীম আহত হল। মমতায় সহানুভূতিতে অসীমের গলা কি খুব বেশি আর্দ্র হয়ে গিয়েছিল যে মাধুরী অমন শাণিত ব্যঙ্গে তার শোধ নিল। মুহূর্তের জন্যে কি ভুলে গিয়েছিল অসীম যে যুগটা মমতার নয়, নির্মমতার?

অসীম বলল, 'ঠিক ধরেছ। আমাদের ওখানে থিয়েটার টিয়েটার প্রায়ই হয়।'

মাধুরী বলল, 'হলেই ভালো। আজ দেখবে আমিও এক থিয়েটারে নামব।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

মাধুরী একটু হাসল, 'এখানেই। এই এখন যেমন দেখছ সন্ন্যাসিনী সেজে রয়েছি, সবাই তাই বলে আমাকে ঠাট্টা করে। সন্ধ্যাবেলায় দেখবে এই সন্ন্যাসিনীই কেমন সেজেগুজে উর্বশী হয়েছে।'

অসীম ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'তাই নাকি? পালার নামটা কি?'

মাধুরী বলল, 'নাম আগে শোনাব না, দেখলেই চিনতে পারবে।'

'কিসের চেনাচিনির কথা হচ্ছে দিদি?' মানসী হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকল।

মাধুরী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এই বলছিলাম, আমার বোনটিকে এখনো চেনেনি। কে ফোন করছিল তোকে?'

মানসী বলল, 'বিজনদা।'

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'সে আবার কোন জন?'

মানসী হেসে বলল, 'তুমি চিনবে না।'

মাধুরীও হাসল, 'আমাদের মানুর অমন দাদা কি দুজন একজন যে তোমাকে চিনিয়ে দেবে?'

অসীম গম্ভীর হবার ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝতে পেরেছি, জনসঙ্ঘ।'

তার কথা শুনে দুই বোনই হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে মানসী বলল, 'সত্যিই দারুণ ক্ষমতা তোমার।'

অসীম বলল, 'ক্ষমতা আবার কিসের দেখলে?'

মানসী বলল, 'মেজদি আজকাল কাতুকুতু না দিলে হাসে না। তুমি তাকে শুধু এলিটারেশনেই হাসিয়েছ।'

মাধুরী বলল, 'বাজে বকিসনে। বিজনদা কী বললেন?

'মায়া আর নন্দুর মার্কস জানতে পেরেছেন?'

মানসী বলল, 'এখনো পারেননি। তবে দু একদিনের মধ্যেই জানাতে পারবেন বললেন।'

অসীম এতক্ষণে বুঝতে পারল। হেসে বলল, 'ও নন্দুর সেই পরীক্ষার ব্যাপার বুঝি?'

মানসী বলল, আর বোলো না। রেজাল্ট রেজাল্ট করে ও একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে। শুধু আমাদের ওপর ভরসা করে বসে আছে ভেব না। গোপনে গোপনে কতজনকে যে রোল নাম্বার দিয়েছে তার ঠিক নেই। খেয়েদেয়ে ফের বোধ হয় বেরিয়েছে সেই চেষ্টায়।'

মাধুরী বলল, 'বড্ড বাড়াবাড়ি। পরীক্ষা তো আমরাও এক সময় দিয়েছি। কিন্তু ওর মত অমন ছটফট কেউ করিনি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। হঠাৎ মাধুরীকে ফের যেন একটু 'বিমর্ষ' আর অন্যমনস্ক দেখাতে লাগল।

মানসী তা লক্ষ্য করে বলল, 'জানো অসীমদা, আমি তো আগেই আজকের জন্যে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিলাম, কিন্তু মেজদিও গোপনে গোপনে তোমার জন্যে স্কুল কামাই করে ফেলল।'

তার এই চটুলতার ফল উল্টো হল। হঠাৎ একেবারে তীরের মত উঠে দাঁড়াল মাধুরী, বোনের চোখে চোখ রেখে তীব্র ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'ইয়ার্কির একটা সীমা আছে মানু। কিন্তু তুই সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। তুই কি জানিসনে কেন আমাকে ফরনাথিং স্কুল কামাই করতে হয়েছে? কেন অকারণে আমার ওপর এমন জোরজবরদস্তি চলছে—তুই কি জানিসনে কিছু?'

মাধুরী আর দাঁড়াল না। তীরের মত যেমন উঠে দাঁড়িয়েছিল, তীরের মতই তেমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অসীম অবাক হয়ে মানসীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ব্যাপার কি বলতো।'

মানসী গম্ভীর মুখে বলল, 'পরে এসে বলব। আগে ওকে ঠাণ্ডা করে আসি।'

বলতে বলতে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় টেনে দিয়ে গেল দরজা। অসীম নিজের মনেই হাসল। এতক্ষণে বুঝি ওর দোর বন্ধ করবার কথা মনে পড়েছে।

অসীম নিজে নিজেই হাসল, 'এবার শূন্য রঙ্গমঞ্চে আমার মৃত সৈনিকের পার্ট। অন্তত ঘুমন্ত সৈনিকের। কিন্তু ঘুম কি আর আসবে?'

আসুক না আসুক অসীম এবার হাত পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপরে চক্রাকারে সশব্দে ফ্যান ঘুরতে লাগল। খানিক ক্লান্তিতে খানিক আরামে অসীম এবার চোখ বুজল।

(ক্রমশ)

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

চোদ্দ

প্রসঙ্গত সুসঙ্গের সুধীন্দ্র সিংহের সম্বন্ধে যা-যা এ-পর্যন্ত বলেছি তা ছাড়া আরও অনেক কথা বলবার সুযোগ হবে এর পরে, কারণ প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হবার পর উনি আমায় যে-সব চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে সুধীন্দ্রের। ঘনিষ্ঠতটা কতো গভীর হয়েছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সুধীনকে লেখা প্রমথবাবুর চিঠিতে। সে-রকম কয়েকখানি চিঠি আমার হাতে আছে আমার স্বর্গগত বন্ধুটির সৌজন্যে।

প্রমথ চৌধুরীর পত্র প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পূর্বপ্রকাশিত ১২।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে উনি নিজের অসুখের কথা বলেছেন। আর ১৪।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে বলেছেন, "সত্যেন্দ্রের অসুখ" এ-সংবাদ তিনি মানিকের কাছে পেয়েছেন।

কিন্তু অসুখের ভিতর যে সুখ আছে, এই প্যারাডক্সের অবতারণা করে তার পরের দিন আর একটি চিঠি লেখেন।

(২৩)

১ ব্রাইট স্ট্রীট, বালীগঞ্জ
১৪।৩।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে চিঠি লেখা দেখছি, আমার একটা নিত্যকর্মের মধ্যে হয়ে উঠল। তুমি চিঠিতে এমন এক একটা কথা তোলো, যার জবাব দেবার জন্য আমার হাত নিস্‌পিস্ করে।

অমার শরীরটে আর যিনিই গড়ুন আমি নিজে গড়িনি। ও যখন পরের হাতে গড়া তখন তা একটি master piece নয় বলে আমার দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই। আমার হাতে যেটুকু আছে, সেটুকু করতে অমি অবহেলা করিনি, অর্থাৎ ও বস্তুকে আমি মেজে ঘষে রাখতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। আর কিছু না হোক মালিসের সাহায্যে আমার ইটাকে যথেষ্ট পালিস্ করেছি। আসল থা আমার শরীর অসুস্থ হলেও আমার তি সুস্থ। তাছাড়া অসুখের ভিতর সুখ আছে তার প্রমাণ ঐ সুখের ভেই কোনও রোগ না থাকলেও খিন লোকে চিররোগী হয়ে ওঠে। রেজিতে যাকে বলে valetudinarian যে যথেষ্ট পয়সা না থাকলে হওয়া য় না তা ত সকলেই জানে। সে যাই হাক অসুখের সুখ আমি ঢের ভোগ করেছি—এখন ও বস্তুতে অমার অরুচি ধরে গেছে।

সেদিন তোমাকে মাথামুণ্ডু কি যে লিখেছি তা আমার ঠিক মনে নেই। এইটুকু শুধু মনে আছে যে আমার কলম সেদিন একটু দ্রুতগতিতে চলছিল, সুতরাং হাতফস্কে মনের কথা বেরিয়ে যাবার আটক ছিল না। যদি কোনও বেফাঁস কথা বলে থাকি তাহলে তুমি যেন আর তা ফাঁস করে দিও না। সমালোচকেরা টের পেলে আমার সাহিত্যরাজ্যে তিষ্ঠনো ভার হবে।

তুমি আমার আপিসে আজ যদি না এসো ত কাল (শুক্রবার) যেন এসো না। কাল খুব সম্ভবতঃ আমি আপিস্ যাবোনা। অন্যত্র যাবার কথা আছে।

শনিবারে ত আসছ? সেইদিনই লেখাটা নিয়ে এসো।

শুনছি "ভারতী" এবার "সবুজ-পত্রের" উপর একটা চাপান দিয়েছে, কারণ তাতে সব নতুন লেখকের লেখা বেরিয়েছে। যদি আবশ্যক হয় ত তোমাদের একজনকে "উতোর" গাইতে হবে। "ভারতী" এখনও দেখিনি। সুতরাং জবাব দেওয়া দরকার কিনা জানিনে।

ইতি
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

এ-পত্র সম্বন্ধে আমার মন্তব্য এমনভাবে পেশ করব না, যেমন মামলাতে আরজীর জবাব দেওয়া হয়, কেন-না সুধীনের কাছেই পরামর্শ পেয়েছিলুম যে ও-ভাবে পত্র লেখায় রসভঙ্গ হয়। সে-পরামর্শ পত্রিকাতেও প্রযোজ্য। রসের অভাবেই সবুজ পাতা শুকিয়ে যায়।

প্রমথবাবু তাঁর ১২।৩।১৭ তারিখে লেখা চিঠির জের টেনে দুদিন পরে স্বীকার করেছেন যে, পূর্ব-পত্রে ওঁর 'মনের কথা বেরিয়ে যাবার আটক ছিল না।' এখানে 'বেফাঁস কথা' যে বন্ধনহীন স্বীকৃতি মাত্র, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই উত্তর-পত্রে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং পূর্ব-মীমাংসা আর উত্তর-মীমাংসার সম্পূর্ণ সঙ্গতি বর্তমান। আজ আমি সেটা "ফাঁস" করে দেওয়ায় কোনো পাপ করছি বলে মনে হয় না, কারণ প্রমথ চৌধুরী এখন সাহিত্য-রাজ্যে এত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ওঁর উচ্চ সিংহাসন টলাতে পারবে এমন শক্তি বাংলা দেশের কোনো সমালোচকের নেই।

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসাম্রাজ্য যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তকে জ্যেষ্ঠাংশ ভাগী বলা যায়। জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকার আলোচনা করতে করতে অতুলবাবু আমায় একবার বলেছিলেন : ইংরিজী টেক্‌-নিকাল শব্দের প্রতিশব্দ আবিষ্কৃত হবে ক্রমে ক্রমে, যেমন-যেমন লেখকরা স্বকীয় রচনার চাহিদা অনুযায়ী আবিষ্ক্রিয়া-কার্যে আত্মনিয়োগ করবেন।

এইভাবে অনেক প্রতিশব্দ আবিষ্কৃত হচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের বাংলা রচনায়। এ আবিষ্কারের উৎসসন্ধানে আমাদের সুদূর ভ্রমণ নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য-ব্রতীর একান্ত-চিত্তই এ-ক্ষেত্রে মহাদেবের জটা। এ-কথা এখানে বলছি এই জন্যে যে, প্রমথ চৌধুরী অত্রোদ্ধৃত পত্রে দুটি ইংরিজী শব্দ ব্যবহার করেছেন—master piece ও valetudinarian—এবং শেষোক্ত শব্দের ভাব যে বাংলায় 'চিররোগী' শব্দের অনুরূপ এটাও জানিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী নিজেও আমায় বলেছিলেন এই ধরণের কথা। উনি তখন কোলকাতা ছেড়ে বোলপুরে বাস করছেন। ওঁর ফরাসী-প্রীতির ফলে কী কতকগুলো ফ্রেঞ্চে-লেখা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমার ইংরিজীতে লেখা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের উল্লেখ পেয়ে উনি খুশি হন। আমায় প্রশ্ন করলেন : বাংলাতে লেখো না কেন?

উত্তরে বললুম : টেক্‌নিকাল টার্মসের অভাবে।

প্রমথবাবু উপদেশ দিলেন : যেখানে ঐসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ঠিক করতে পারবে না, সেখানে ইংরিজী শব্দ তৎসম রেখে কিংবা বাংলা হরফে রূপান্তরিত করে লিখতে পারো। আর আমরাও তো আছি। যদি তোমার লেখা ছাপাবার আগে দেখাও, তাহলে হয়তো মগজ থেকে প্রতিশব্দ বেরিয়ে যেতেও পারে।—এ-কথার মধ্যে একটা মিষ্টি সুর ছিল যার জন্মস্থান ওঁর স্নেহাসিক্ত হৃদয়। কিন্তু সে-সুর শুনেও তখন শুনিনি, কেন-না তাঁর জীবদ্দশায় কোনো ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বাংলায় লিখিনি।

ভুল হল। একেবারে লিখিনি তা বলা

যায় না। মাজ্দ্ সাহিত্য সম্মেলনে (কোন্ বছর তা ঠিক মনে নেই) একবার আমি যোগদান করি। সে-সম্মেলনের chairman of the Reception Committee ছিলেন বন্ধুবর সুবোধ মুখুজ্যে, যিনি প্যারিসে সাহিত্য বিভাগের প্রথম ডক্টর হয়েছিলেন সংস্কৃত "রস" সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখে। সুবোধবাবুর দেশ ছিল মাজদুতে। ও'র প্রাক্তন সহপাঠী অধ্যাপক ডক্টর রমেশ মজুমদার, ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ডক্টর প্রবোধ বাগচী আর আমি সুবোধবাবুর বাড়িতে অতিথি হই। সম্মেলনের পূর্বদিন রাত্রে কথায় কথায় প্রবোধ আমায় বললেন ঃ আচ্ছা, কাল আপনিও একটা প্রবন্ধ পড়ুন না।

উত্তরে জানালুম ঃ আমি তো কোন প্রবন্ধ লিখে আনিনি।

—তাতে কি, এখনই একটা লিখে ফেলুন।

—কিন্তু বাংলায় তো ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা অভ্যোস রাখি নি। উপযুক্ত টেক্-নিকাল টার্মসের বাংলায় বড় অভাব।

—সেজন্যে ভাববেন না; আপনি মোদ্দা কথাটা বলুন, আমিই লিখে দিচ্ছি।

দুপুর রাত্তির পর্যন্ত দুজনে মিলে "ভারতে পারস্য অভিযান" শীর্ষক একটা প্রবন্ধের খসড়া তৈরী করে পরদিন সম্মেলনে তা পাঠ করলুম। এবং সেই খসড়া প্রবন্ধটি সে-দিনই "মানসী ও মর্মবাণী"র একজন প্রতিনিধি আমার কাছে চাইলেন। আমি আপত্তি জানালুম ঃ সে কী করে হয়।

তিনি বলেন ঃ ঐটাই দিন।

আমি উপরোধে ঢেঁকি গিললুম। "মানসী ও মর্মবাণী"তে ছাপা হয়ে সেটা যে-আকারে বেরুল, তার মধ্যে সম্পাদকীয় মুন্সিয়ানা কি পরিমাণে ছিল তা আমার জ্ঞানের বহির্ভূত হয়েই আছে।

প্রবোধ বাগচী অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বাংলায় লিখেছিলেন। তিনি আমার লেখক হওয়ায় সিদ্ধি-দাতা গণেশের আশীর্বাদ আমি পেয়ে থাকব। প্রসংগত একটা রসাল গল্প বলে নিই। স্টেশন থেকে সুবোধবাবুর বাড়িতে যখন যাচ্ছি আমারা ৪।৫ জনে, আমি প্রবোধকে বললুম ঃ আপনি আমার হাতের ছাতাটা একবার ধরবেন? আমি প্রস্তাব করে আসছি।—ফিরে আসবার পর প্রবোধ বললেন ঃ আমার হাতের বই দুখানা একবার ধরবেন? আমি অনুমোদন করে আসছি! ওখানে যে বাথ-রুমের অসুবিধে ছিল সেটা অবশ্য পরে জানলুম শ্রীমতী রাধারানী দেবীর কাছে, তাঁর হবু স্বামী বন্ধুবর কবি নরেন্দ্র দেবের সম্মুখে।

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার

উপযুক্ত টেক্‌নিকাল শব্দের অপ্রাচুর্য আমায় অনেকদিন কাবু করে রেখেছিল। এখন মনে হচ্ছে আমার এই অকারণ আতংক থেকে মুক্তি পেতে পারতুম, যদি প্রমথবাবুর পরামর্শ নিতুম। রবীন্দ্রনাথের কাছেও এর জন্যে আমি ভর্ৎসনা পেয়েছি। উনি একদিন আমায় বলেছিলেন : তোমার কোনো লেখা আমি পড়ব না, যদি বাংলায় না লেখো।

তখন ভেবেছিলুম, রবিবাবু কবি মানুষ, আমার লেখা হিস্টরি না-হয় নাই পড়লেন কিন্তু ও'র একটি ইংরিজী প্রবন্ধ বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল "A Vision of Indian History" যে-প্রবন্ধের মূল বক্তব্য আমার খুব ভাল লেগেছিল, যদিচ লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেছিলেন একজন ইংরেজ সমালোচক।

প্রমথবাবুর ১৪।৩।১৭ তারিখের চিঠিতে আর একটি মন্তব্য রয়েছে। সে-বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। অসুখের ভিতর যে সুখ, তা বোধ হয় এই যে, যার অসুখ করে, তার পার্শ্ববর্তী অপর সকলেই তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং ফলে রোগীর মন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়। সেও একরকমের সুখ, কারণ দুঃখের উপশম জিনিসটা সুখ-দুঃখের ডেবিট-ক্রেডিট হিসেব-নিকেশে সুখের কোঠায় পড়া উচিত। তবে একটা দোষ হয়ে যায়। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, এ প্রবাদ-বাক্যটি যে মনোভাব থেকে বেরিয়েছে, সে-মনোভাবে দুঃখ-লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। সোয়াস্তি পেতে গেলেই অসুখ চাই। পরের মুখে ঝাল না খেয়ে, নিজের অনুভূতি আশ্রয় করে বলতে পারি যে, এ-ভাবের উদয় হয়ে থাকে। ছেলেবেলা থেকে অনেক রকম অসুখে ভুগেছি, এবং তার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল কল্পিত রোগ—যাকে ইংরিজীতে বলে 'হাইপোকনড্রিয়া'- যদিচ প্রমথবাবুর মতন এত নয় যে, 'ঠিক দিলে একটা হাসপাতালের বার্ষিক রিপোর্ট হয়ে দাঁড়ায়।' তা ছাড়া আমি জানি যে, অতিশয়োক্তিকে অলংকার বলে মেনে নিলেও সে অলংকার আমার হাতে শোভা পাবে না।

আমাদের দেশে রীতি ছিল—এখনও যে নেই তা বলা যায় না—কারও সঙ্গে দেখা হলে "কেমন আছেন" এ প্রশ্নের পিঠ-পিঠ "আপনাকে একটু কাহিল-কাহিল দেখছি" বা ঐরকম একটা কিছু মন্তব্য করা। তাই রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর "অমৃত-মদিরা" পুস্তকে 'নগরের বিবাহ' শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন :

এ ও'রে কাহিল বলে,
শুনে দোঁহে যান গলে,

ঐশ্বর্যের চিহ্ন যেন শরীর দুর্বল।[১]

এ-রীতির সহচরী হচ্ছে আর একটি নিষেধ-মূলক রীতি—কোনো মানুষকে তার সামনে বা আড়ালে স্বাস্থ্যবান বলা অনুচিত, অন্তত মঙ্গলবারে ও শনিবারে। বললেই "খোঁড়া" হল। কিন্তু এ-প্রথা থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, আমাদের জাতীয় মনই খোঁড়া হয়ে আছে? ইংরেজদের প্রথা ঠিক উলটো। কারও শরীর অসুস্থ দেখলেও বলা উচিত নয়, "আপনার শরীরটা খারাপ দেখছি।" কোনো ইংরেজকে যদি বলি, "আপনার শরীরটা বেশ ভাল দেখছি", তিনি বরং খুশী হন। আমার মনে হয়, এই ইংরেজী রীতিটিকে আমরা যদি নিজস্ব করে নিই, তা হলে ভাল হবে। আমার গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত একজন এ-রীতিকে নিজস্ব করে নিয়েছিলেন বলে জানি। তিনি স্বর্গত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর কাছে পড়েছিলুম। তাঁর এলিয়ট-রোডের বাসাতে প্রায়ই যেতুম আর ভালবাসাও পেতুম। একথা প্রমথ চৌধুরী জানতেন। সুতরাং যখন রবিবাবু আর প্রমথবাবুর উদ্যোগে "বিচিত্রা" নাম নিয়ে সংস্কৃতিসেবীর দল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি-র মতন নিবন্ধ ছাপানো হবে, তখন ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে লেখার ভার কিছু আমার ওপর চাপানো হল, আর—বোঝার ওপর শাকের আঁটি মনোমোহন ঘোষকে দিয়ে লেখাবার ভারও পেলুম। ঘোষ সাহেবের তখন শরীর অসুস্থ। রাস্তায় দেখা হতে আমি বললুম : হাউ ডু ইউ ডু? ইউ ডোন্ট লুক ওয়েল। তৎক্ষণাৎ উনি একটু হেসে বললেন : দ্যাটস্ নট্ এ ভেরি য়্যাপোজিট রিমার্ক টু মেক্। —আমি ত লজ্জায় অধোবদন!

প্রমথবাবুর চিঠির শেষ কথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারছি না। তবে ভারতীর 'চাপান' কোন ভারতী-নাম্নী মহিলার চা-পান যে নয়, এইটাই শুধু বলা যায় জোর গলায়। অগত্যা ঐ সময়ের "ভারতী" পত্রিকায় যে "মাসকাবারি" ছাপা হয়েছিল, তার অনুলিপি এখানে যোগ করে দিচ্ছি। এ-অনুলিপি করেছেন আমার এক ছাত্র (শ্রীমান রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য), "চৈতন্য লাইব্রেরি"র সৌজন্যে।

ভারতী

ফাল্গুন, ১৩২৩

মাসকাবারি

সেই মান্ধাতার আমলে "বঙ্গদর্শনে" যে সুর বেজেছিল, আজ এতদিন পরেও দেখি আমাদের মাসিক সাহিত্যে প্রায় সেই এক সুরই ধ্বনিত হচ্ছে। সেই দীর্ঘকালের মধ্যে "সাধনা" ও "সবুজপত্রের" মত বিচিত্র মৌলিকতা এবং উন্নত সাহিত্যরসপূর্ণ মাসিকপত্র খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। ষোলোর মধ্যে পনেরখানি মাসিকপত্রেই দেখতে পাই, সেই বস্তাপচা পুরাতনের জাবরকাটা চলেছে ত চলেইছে। "বঙ্গ-দর্শনে" যেমন উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, ধর্ম-বিষয়ক, দর্শন-বিজ্ঞানমূলক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ এবং ছোট কবিতা প্রতি-বারে নিয়ম করে বেরুত—এখনো প্রায় প্রত্যেক কাগজ তারই বোঝা ঘাড়ে করে গরুর গাড়ির মতন টিমিয়ে টিমিয়ে চলেছে। তখন কাগজ বেশী ছিল না, অল্পের মধ্যে অনেকখানি আশ মেটাবার দরকার ছিল, কিন্তু এখন মাসিকপত্রের প্রসার এবং পসার যেমন বেড়েছে তাতে এক একটি বিশেষ উপলক্ষ্য নিয়ে এক একখানি কাগজ বেরুতে পারে। একথা বলতেই হবে যে, আমাদের মাসিকপত্রগুলি পুরাতনের মোহ ছেড়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি। আমাদের সাহিত্যের হাটে কী বরাবরই এমন সাড়ে বত্রিশ-ভাজা বিক্রী হবে—এ তাম্রবগ্রাহিতা কি কখনো থামবে না? কেবল বঙ্গদর্শনের আদর্শ নিয়ে চিরকালটা বসে থাকলেই ত চলবে না। যে দেশ থেকে আমরা প্রথম মাসিকপত্রের আমদানি করে-ছিলুম,—এখনো আবার সেই দেশের আদর্শই নিতে হবে। বিলাতে শুধু ত "স্ট্রাণ্ড" বা "পিরসনের" মত কাগজ চলে না—মানুষের জ্ঞান জগতের যত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে, ইংরেজি ভাষাতেও প্রায় ততগুলি বিভিন্ন বিষয়মূলক মাসিক-পত্র নিয়মিতরূপে চলছে। আমাদিগকেও এখন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে হবে। বাঙলা ভাষায়ও দু-চারখানি বিশেষ বিষয় নিয়ে মাসিকপত্র আছে বটে; কিন্তু সেগুলি এতটা নিম্নশ্রেণীর ও প্রাথমিক যে ধর্তব্যের যোগ্যই নয়।

সাহিত্যে আর যে-সব অপূর্ণতা তা বরঞ্চ কতকটা সইতে পারা যায়; কিন্তু যেখানে মৌলিকতা ও গভীরতার অভাব সাহিত্য যে সেখানে শুধু অসহনীয় হয়ে ওঠে তা নয়; সে ভবিষ্যতের আশা-ভরসাকেও নির্মূল করে। ক্রমশ

১ কবিতাটি আমার ছোট দিদির বিবাহ উপলক্ষে রচিত।

বারুণী

বিশ্বব্যাপী অপরিসীম প্রভাব তার। দর্পিণী বিজয়িনী—নাম বারুণী। আলোহিত অঙ্গবর্ণ, প্রত্যঙ্গে সুবলিত সুষমার রক্তিম দীপ্তি। পূর্ণা স্রোতস্বিনীর মত পূর্ণযৌবনা, উদ্দাম—যেন উচ্ছল তারল্যে দৃপ্ত ঔদ্ধত্য। তার প্রতিটি পদক্ষেপে সেই স্পর্ধার স্বাক্ষর। যৌবনমদে সে মদবিহ্বলা, চঞ্চলা, স্খলিতচরণা। সুন্দরী সে চারুসর্বাঙ্গী, রুদ্রী সে ভয়ংকরী।

পিতা তার বরুণরাজ। অমেয় শক্তিধর পাশী বরুণ। উরুচক্ষু ব্যোমদেবতা তিনি। অন্তরীক্ষপতি মিত্র দেবতার পরম মিত্র, সৃষ্টিলোকে একসঙ্গে উচ্চারিত 'মিত্রাবরুণ' নাম। সপ্ত-সমুদ্রেরও অধীশ্বর বরুণ। ঊর্ধ্বলোকে ও অধোলোকে সমান বিস্তৃত তাঁর বিক্রম।

বীর্যবান পিতা বরুণের ঔরসে বারুণীর জন্ম—পিতার মতই সে প্রতাপশালিনী। ব্যোমচারী অসংখ্য প্রজা তার প্রস্তোতা, সাগরাশ্রয়ী সংখ্যাহীন প্রাণী তার বন্দী। উদ্ধত রত্নাকর মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত তার ইঙ্গিতে মস্তক আনত করে। মহাসমুদ্রের সহস্র ঊর্মিশীর্ষে মদমত্ত পদবিক্ষেপ করে সদর্পে বিচরণ করে বরুণ-নন্দিনী বারুণী—যেন সসাগরা বরু-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী। নিয়ত অবিন্যস্ত তার মেঘনিভ কেশকলাপ—প্রলয়কালীন মেঘের মতই মুহূর্তে ফুলে ওঠে; মুহূর্তে দোল খায়, আবার মুহূর্তে পিঙ্গল আনন আচ্ছন্ন করে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের সৃষ্টি করে। সেই ঘন-নীল কেশপাশে চপলাসদৃশ তার আনন, রক্তাক্ত লোচনের সুতীব্র শাসন।

পিতামাতার দ্বিতীয় আত্মা সন্তান। পিতার প্রকৃতি যেমন সন্তানে আত্মপ্রকাশ করে; তেমনি আত্মপ্রকাশ করে মাতার স্বভাব। বারুণীর মাতা শুক্লা। স্বামীর মতই সে বীর্যবতী, অভিমানে স্ফীতা. মোহকর তার রূপ, মোহিনী তার শক্তি। তিল তিল বিষপানে যেমন বর্ধিত হয় বিষকন্যা, জননী শুক্লার স্নেহদর্পে তেমনি লালিতা হল বারুণী। মাতার স্নেহের দুলালী, তার আদরের নাম হল সুরা। স্বামী পাশী বরুণ, সুরসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মর্যাদা, তিনিও শ্রেষ্ঠ সুর। কন্যা তাঁর সুর-সম্ভব—সুরাই তার যোগ্য নাম। জননীর সাধ,—তাঁর নন্দিনী হবে সুর-ভোগ্যা।

বারুণীর মনেও অহংকারের শেষ নেই

সে রূপবতী, অঙ্গে তার লোহিত রক্ত-দীপ্তি; নয়নে মদির কটাক্ষ। তার রূপ-বহ্নিতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয় জীবকুল। রাহু তার রূপমুগ্ধ, কেতু তার ইঙ্গিতের দাস। তার একটিমাত্র অপাঙ্গ দৃষ্টিতে গজেন্দ্র ঐরাবত মদস্রাব করে, স্বর্গতুরগ উচ্চৈঃশ্রবা হয় অস্থির। অতুলনীয় রূপ, অপ্রমেয় ঐশ্বর্য, অপরিমিত মোহিনী শক্তি—বিশ্বে কোন্ নারী তার সমকক্ষ? তার ধারণা,—ত্রিলোককে সে হেলায় পদানত করতে পারে।

দর্পিণীর এই দর্প আহত হল সেই প্রথম, সেদিন সুরাসুর অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হলেন সাগরমন্থনে। মন্দর-পর্বত দণ্ড, বাসুকি নাগরজ্জু। সেই রজ্জুর পুচ্ছাংশ ধরেছেন দেবতা, শীর্ষাংশ ধরেছে অসুর-দানব। পরিচালক স্বয়ং প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু। ভীষণ শব্দে সন্ত্রস্ত বিশ্বলোক, আকর্ষণে ও ঘর্ষণে টলমল বরুণ-রাজ্য। প্রমথিত বরুণালয় থেকে একে একে উত্থিত হচ্ছে তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিল-গিল রাঘব—কত রত্ন, কত ওষধি। ক্রমে উত্থিত হলেন বিষ্ণুবল্লভা লক্ষ্মী, ইন্দ্রাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, মেঘবাহন ঐরাবত, অমূল্য রত্ন কৌস্তুভ, কামদুঘা সুরভী। বিষ্ণু সেই মন্থনজাত দ্রব্য বণ্টন করে দিলেন দেবতা ও দানবদের মধ্যে। উৎকৃষ্ট যত দ্রব্য, সবই হল দেব-ভোগ্য। ক্ষুব্ধ আক্রোশে পূর্ণ হল অসুর-দানবের অন্তর, তবু প্রতিবাদ করল না তারা। যে দুর্লভ অমৃতের জন্য সমুদ্র-মন্থন, তা যদি হস্তগত হয়, তাহলে তুচ্ছ লক্ষ্মী, তুচ্ছ উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত। দ্বিগুণ উৎসাহে মন্থন-রজ্জু আকর্ষণ করল তারা।

এদিকে শ্রমক্লান্ত হলেন দেবতা। নিস্তেজ হলেন বজ্রী ইন্দ্র; সূর্যের দীপ্তি ম্লান হয়ে এল; চোখে অন্ধকার দেখলেন দেববৈদ্য দস্র ও নাসত্য। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণলেন। তিনি বিষ্ণুকে দেবদেহে বলাধান করতে নির্দেশ দিলেন। রসাধার সোম। বিলোড়িত সাগরজল থেকে ইতিপূর্বেই তার উদ্ভব হয়েছিল। শ্বেতশুভ্র কান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তি, অঙ্গে শুদ্ধ সাত্ত্বিক রসের উচ্ছল তরঙ্গ। বিষ্ণু এই সোম বণ্টন করে দিলেন দেবতা-সমাজে। সোমরস পান করে সাত্ত্বিক শক্তিতে বললাভ করলেন দেবতা।

দানব-শক্তিও এদিকে স্তিমিতপ্রায়। পর্বতের মত তাদের বিশাল দেহ থেকে ঝর্ণাধারার মত স্বেদ নির্গত হচ্ছে, ঘনশ্বাসে অগ্নির উচ্ছ্বাস। তবুও সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে শ্রান্ত দানব আবার প্রাণপণে আকর্ষণ করল মন্থনরজ্জু। প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হল মন্থন-দণ্ড মন্দর; পরিশ্রান্ত বাসুকি-নাগের মুখ হল আরক্ত। উত্তপ্ত দৃষ্টি, ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

সহসা প্রমথিত বরুণালয় থেকে উত্থিত হল প্রমথিনী বারুণী। আলোহিত অঙ্গ-কান্তি, মদিরাক্ষরা নয়ন, ঘন-নীল কুটিল কুন্তল। পরিধানে রক্তাম্বর, কণ্ঠে পদ্মরাগ রত্নহার, কটিতটে রত্নময় মেখলা। সর্ব-শৃঙ্গার বেশাঢ্য মূর্তি। রূপের ছটায় বিভ্রম সৃষ্টি করে চঞ্চলা তটিনীর মত এগিয়ে এল নটিনী। ঢল ঢল কান্তি, টল-মল স্খলিত গতি। মদবিহ্বল দেহ, মোহমদির বিলোল কটাক্ষ—যেন চঞ্চল লোহিতসাগরে স্বচঞ্চল ঊর্মিদোলা। আশ্চর্য উদ্‌ভ্রান্তিকর সে রূপ। স্কন্ধ-স্খলিত দুকূলে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়েছে—অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিদ্যুৎশিখা; কটি-তটস্থ শ্লথবন্ধ মেখলায় উঠছে মৃদু গুঞ্জন —যেন লাস্যময়ী রতির সংকেতালাপ।

স্তম্ভিত দেবতা ও দানব, স্তিমিত যেন কর্মশক্তি। মন্থন রজ্জু হস্তে ধারণ করে প্রথমে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা—যেন মন্ত্রবলে ক্ষণেক স্থির হয়ে রইল অশান্ত সাগরতরঙ্গ। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিতর্ক উঠল বিমুগ্ধ দেবতা ও বিমূঢ় দানব-সমাজে।

দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন, 'কে ইনি? ইনি কি দ্বিতীয় কমলা? সর্বাঙ্গ সুলক্ষণা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেহ, ইনি কি সর্ব-কল্যাণের আকর সর্বমঙ্গলা ষোড়শী?'

কামমোহিত দানবপ্রধান ভাবল, 'মদিরে-ক্ষণা, লাস্যময়ী কে এই সমুদ্রোদ্ভবা? অঙ্গে কাঞ্চন-দীপ্তি, অসম্বৃত কটিমেখলায় মদনের স্মরালাপ। ইনি কি স্বয়ং রতি, না মূর্তিমতী উদ্দীপন-শক্তি?'

বিচার-বিমূঢ় যখন সুরাসুর, তখন মদ-বিহ্বলা বারুণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল মদস্খলিত বচন—যেন মধুবৃষ্টি করল কিন্নর-কণ্ঠের অস্ফুট গান : 'বরুণকন্যা আমি বারুণী। আমি বলদায়িনী শক্তি। মাতা আমার শুক্রা। শুক্রা-তেজের বহ্নি-দীপ্তি আমার দেহে। আমার স্পর্শে অসীম উদ্দীপনা।

নির্বাক দেবতা, স্তব্ধ দানবসমাজ। দেহময় বিহ্বল শিহরণ; নয়নে তৃষাতুর

দৃষ্টি। বারুণী দেখল, তার রূপের বিভ্রমে সম্মোহিত সুরাসুরে। রূপগর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে, অধরকোণে ফুটে উঠল সদর্প এক স্মিত হাস্যরেখা। বিশ্বমোহিনী সে,—কে তার রূপে মোহিত না হয়? কিন্তু সুরা সে, সুরভোগ্যা। সুর সমাজেই সে হবে বরণীয়া। কি সুন্দর দেবতার রূপ—যেন স্বপ্নলোকের একখানি মোহময় স্বপ্ন। তারা মন্থন-ক্লান্ত, তবু দেহে অপূর্ব দীপ্তি! সুন্দরকে জয় করেই তো সুন্দরের সার্থকতা। লোকে বলবে সুর-বিজয়িনী সুরা।

সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে, কিন্নরী-লীলায় বারুণী উপস্থিত হল দেবতাদের সম্মুখে। নূপুরে শিঞ্জন, কাঞ্চিতে ক্বণন তুলে—কটাক্ষে মদিরা বেশ মাখিয়ে গদ গদ ভাষে বলল রূপ-গর্বিতা, 'বল দেবশ্রেষ্ঠ কোন্ দেবতা গ্রহণ করবে আমায়? সুরপ্রধান বরুণের ঔরসে সূর্যমণ্ডলে দেবগোত্রে আমার জন্ম। আমার আর এক নাম সুরা। লক্ষ্মীর চেয়েও আমি রূপবতী, শক্তি-সঞ্চারে সোম অপেক্ষাও অধিক যোগ্যতা আমার। আমি স্বয়ং বলদায়িনী শক্তি।'

বারুণী-বাক্যে চঞ্চল হলেন ইন্দ্র, সচঞ্চল বিশ্বদেব, মরুদ্গণ, দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের অন্তরে অশান্ত উন্মাদনা। স্বয়মাগত সুদুর্লভ সামগ্রী, মধুর চেয়েও মধুমত্তর, বুঝি অমৃতের চেয়েও স্বাদু, সোমপায়ী দেববৃন্দের নিকট তুচ্ছ মনে হল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্দীপক সোমরসের আস্বাদন। কোথায় শুভ্রকান্তি স্নিগ্ধ সোম, আর কোথায় এই অরুণ-দীপ্ত সুরা। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু। মন্থন-জাত দ্রব্যের বণ্টনকারী তিনি। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কোন দ্রব্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবার অধিকার নেই তাঁদের। তাই পিপাসু দৃষ্টি মেলে তাঁরা একবার তাকালেন মনোমোহিনী বারুণীর প্রতি, আরবার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন বিষ্ণুর দিকে। কেবল আদেশের অপেক্ষা।

মায়াধীশ বিষ্ণু। তিনি বুঝলেন বারুণীর মায়া। গভীর অন্তর্দৃষ্টি মেলে তিনি দেখে নিলেন তার স্বরূপ। পুষ্পদ্রব তরল কান্তির নির্যাস তার লাবণ্য—অঙ্গে তারল্য-তরঙ্গ। অতি উপভোগ্য এই কান্তিরস। বলসঞ্চারেও তার অদ্ভুত ক্ষমতা। কিন্তু সর্বনাশা এই লোহিতাঙ্গী কল্পান্তের রঞ্জিত সন্ধ্যাভ্র—নয়নমোহন, কিন্তু প্রলয়সূচক। সংজ্ঞানাশ করে সেবকের সর্বনাশ করে সে। সোমপায়ী দেবতাদের সাবধান করে তাই সংকেতে জানিয়ে দিলেন তিনি, 'বৈরি-মিত্র বিষকন্যা এই বারুণী বৈরিপক্ষেরই বলাধান করুক, তোমরা ওকে প্রত্যাখ্যান কর।'

বিষ্ণুর ইঙ্গিতে দেবতাগণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন—নির্বাপিত যেন উৎসাহ-দীপ। দেবতাদের নিরুৎসাহ মুহূর্তে বারুণীকে চঞ্চল করে তুলল। ব্যর্থ তার রূপ? নয়ন-পাতে সে দেখে নিল অঙ্গসজ্জা, তারপর অপাঙ্গে দেবঅঙ্গে বিলোল কটাক্ষ বিস্তার করে; নয়নাভিরাম গ্রীবাভঙ্গি করে আবার বলল দর্পিতা অনঙ্গমোহিনী, 'সূর্যমণ্ডলে সমুদ্ভূতা আমি সুরা, সুরগম্যা। সুর-লক্ষ্মীর মতই আমার ঐশ্বর্য, সনাতনী শক্তির মতই আমার শক্তি। বিশ্বকামনার মূল কমল আমি। বল, কোন্ দেবতা গ্রহণ করবে আমায়?'

আবার বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল দেবতা-দের অঙ্গে। উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন তাঁরা। কিন্তু অপ্রমত্ত রইলেন জিষ্ণু-বিষ্ণু।

তিনি বাক্‌চতুর। সুর ও সুরা উভয়কেই লক্ষ্য করে বললেন তিনি, 'সোমপায়ী দেবতা সোমরস পান করেই শক্তি সঞ্চয় করে, বারুণীতে তারা নিস্পৃহ।'

'আমি শুধু বারুণী নই, আমি সুর-সম্ভব সুরা—সুরভোগ্যা।'

'সুরসম্ভবা হলেও রাজসিক তোমার প্রকৃতি, তামসিক তোমার আচরণ। দেবতার ভোগ্যা তুমি নও।'

আঘাতে আরক্ত হল বারুণী। আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণীর ইচ্ছায় এই প্রথম বাধা। পুঞ্জিত হল মদোদ্ধত অভিমান। পরুষ-দীপ্ত কণ্ঠে বলল সে, 'তাহলে কার ভোগ্যা সুরা?'

অসুরদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে শান্তকণ্ঠে স্মিতহাস্যে বললেন, অন্তর্যামী বিষ্ণু, 'ওগো সুরা, ভুবনমোহন তোমার রূপ—প্রচণ্ড তোমার বলদায়িনী শক্তি। তোমার শক্তি অসুরদেহে বলাধান করুক। ক্লান্ত দৈত্য-দানবও তোমার রূপমুগ্ধ, তাদেরও ভোগ্যা হও তুমি।'

অপমানে আহত ফণিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়াল বারুণী। মুহূর্তের জন্য আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হল তার। তার সংকল্প প্রতিহত হতে পারে, এ কল্পনাও কোনদিন করেনি মদোদ্ধতা। গর্জন করে উঠল দর্পিতার অহঙ্কার, 'এত স্পর্ধা!' বরুণ-কন্যা আমি বারুণী। পিতা আমার উরুচক্ষু ব্যোম-দেবতা। সুরসম্ভবা, সুরগম্যা সুরা আমি। আমাকে প্রত্যাখ্যান!'

প্রলয়কালের দুর্নিমিত্ত সূচিত হল তার চোখে-মুখে। আলোহিত আননে পিঙ্গল মেঘদ্যুতি, রক্তাক্ত স্তব্ধ লোচনে মদঘূর্ণিত বিদ্যুৎ-কটাক্ষ, প্রমুক্ত কেশপাশে সহস্র শকুনের মত্ততা। কল্পান্তের ভূকম্পন দেখা দিল অঙ্গে, স্খলিত চরণে মুহুর্মুহু স্খলন। দেবতা কি এতই শক্তিশালী? সে কি নিতান্তই শক্তিহীনা? দৃঢ়সঙ্কল্পে মন স্থির করে অগ্রসর হল প্রলয়-ঝটিকা। যেমন করেই হ'ক, এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে সে। সে জানে দেবতার চিরশত্রু দানব, অনাদি-কাল থেকে সুরবিরোধী অসুর। তাদের প্ররোচিত করে সে চূর্ণ করবে দেবতার অহঙ্কার। মদদর্পিতা দর্পভরে দ্রুত উপস্থিত হল দানব-সঙ্ঘে।

ক্লান্ত বাসুকির বিষাক্ত ফণা-মুখে দাঁড়িয়ে আছে দর্পিত দানবদল, দাঁড়িয়ে আছে শক্তিপ্রমত্ত অসুর—যেন উদ্যত বজ্র-মুখে উদ্ধত মস্তক তুলে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান মদ। সহস্র বজ্রে যারা ভ্রুক্ষেপহীন, তারা সম্মোহিত বারুণীর রূপে। এই মুগ্ধতাকে কোটিগুণে বর্ধিত করে; আলোল কটাক্ষে শিহরণ জাগিয়ে বলল মোহিনী বরুণ-নন্দিনী, 'অসুর, দানব, তোমরা শোন। অমিত শক্তিধর পাশী বরুণের কন্যা আমি বারুণী। জননী শুক্রার বহ্নি-দীপ্তি আমার সর্বাঙ্গে। আমি শক্তি-সঞ্চারিণী সুরা। স্বেচ্ছায় বরণ করছি তোমাদের, আমাকে গ্রহণ কর তোমরা।'

ব্যাকুল হৃদয়ে এই বাক্যেরই প্রতীক্ষা করছিল অসুর ও দানব। এতক্ষণ অশান্ত ক্রোধভরে তারা প্রত্যক্ষ করছিল বিষ্ণুর আচরণ। চিরকালের চক্রী চক্রধারী বিষ্ণু। সমুদ্র-মন্থনে যত উত্তম দ্রব্য উত্থিত হয়েছে—বিষ্ণুর নির্দেশে সবই অধিকার করেছে দেবতা। সদ্য-সমুত্থিতা এই মোহিনী রূপসী—এ থেকেও যদি বঞ্চিত হয় তারা, তাহলে বিপর্যয় ঘটবে এই ক্ষীরোদসাগরের কূলে প্রলয় সৃষ্টি হবে প্রমদার তরে। আশ্চর্য-সুন্দর এই বামোরু নিতম্বিনী। এ'র রক্তিম আননে সদ্য-প্রস্ফুটিত অরবিন্দের দীপ্তি, মদবিহ্বল নয়নে ইন্দীবরের নীলিমা, স্খলিত চরণতলে স্থল-পঙ্কজের শোভা। এর হাস্যে সৌন্দর্যের লহরী, লাস্যে মদনোৎসব।

কাম-মোহিত দানবরাজ মন্মথমুগ্ধের মত নতজানু হল বারুণীর চরণতলে, কামার্ত অসুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত করজোড়ে দাঁড়াল বারুণীর সম্মুখে। উল্লাসে জয়-ধ্বনি করে উঠল দৈত্যসঙ্ঘ। অসুরপুরীতে হল সুরার অভিষেক।

সেই থেকে বারুণী অসুর, দানব ও দৈত্যকুলের ভোগ্যা। সে একবীরা নয়, বহুবীরা। বারুণী-সম্ভোগে অমিত শক্তিধর দৈত্য-দানব। তারা মদোদ্ধত, অভিমানে স্ফীত, অহঙ্কারে উন্মত্ত। বারুণীর বহ্নিজ্বালা তাদের সর্বাঙ্গে, তাই সতত উত্তপ্ত, চঞ্চল, মোহান্ধ। তাদের উন্মত্ততায় পর্যাকুল দেবসঙ্ঘ। বারুণীর হিংস্র প্রতিশোধ-স্পৃহার মূর্ত প্রতীক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অসুর, মদান্ধ দানব। সুরাসুর সংগ্রামের ইন্ধন ও অরণি—দুই-ই সুরা বারুণী।

কিন্তু এতেও তৃপ্ত হয়নি দর্পিণী বরুণকন্যা। অসুরভোগ্যা হলেও সে সুর প্রত্যাখ্যাতা—এ অপমান শেলের মত তার অন্তর বিদ্ধ করে। মদমত্তার মস্তিষ্কে সতীব্র জ্বালা। স্বর্গের দেবতাকে সে পদভ্রষ্ট করতে চায়, পারে না—স্বর্গের ত্রিসীমানায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। সে ধিক্কৃত হয়, ব্যর্থ হয় তার চেষ্টা—তবু অন্তরে অনির্বাণ জেগে থাকে সুর-সম্ভোগের কামনা।

বহুদিন পর উপস্থিত হল এক সুযোগ। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছিল দৈত্যগুরু

শুক্রাচার্যের নিকট। সুরার প্ররোচনায় সুরাসক্ত দানব নিহত করল সেই সুন্দর ব্রাহ্মণসন্তানকে। রক্তজবার মত কচের দেহরক্ত, উগ্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল বারুণী, পৈশাচিক উল্লাসে। ওই রক্তই না তারও দেহে! তবু সে সুরলোক-ভ্রষ্টা। পিশাচীর মন্ত্রণায় স্থির হল, কচের অস্থিচূর্ণ দিয়ে গুরুর তর্পণ করবে দানব। কচের চূর্ণাস্থিরূপ আহার্য পরিবেশনের ভার গ্রহণ করবে স্বয়ং বারুণী। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, দেব অংশে তাঁর জন্ম। তপোবলে তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যার অধিকারী। সুরার কামনা,—সুরাংশে জাত এই ঋষিকে মোহিত করে সে পূর্ণ করবে সুর-সম্ভোগের অতৃপ্ত বাসনা।

নিমন্ত্রিত হয়ে দৈত্যপুরীতে পদার্পণ করলেন দৈত্যাচার্য ভার্গব। উৎসব-প্রমত্ত দানবপুরী। চতুর্দিকে মোহময়ী সুরার প্রভাব: মদমত্ত হাসি, মদোন্মত্ত গর্জন, স্খলিত বচনের হুঙ্কার—যেন দানবগৃহে আজ তাল-বেতালের তাণ্ডব। আলোক-সজ্জায় সজ্জিত প্রমোদ-ভবন, সহস্র দীপের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল মণি-মাণিক্যখচিত কক্ষ। বিস্মিত আমন্ত্রিত শুক্রাচার্য। শিল্পী ময়দানবের অদ্ভুত এ কীর্তি বিশ্ব-কর্মার কারুশিল্পকে লজ্জা দেয়। শিষ্য-গর্বে গর্বিত দৈত্যগুরু—নয়নে তাঁর কল্পনার স্বপ্ন। ইন্দ্রপুরীর কি এত ঐশ্বর্য? নন্দনকাননে কোথায় এত আনন্দ?

মোহিনীর বেশে বারুণী এসে উপস্থিত হল প্রমোদকক্ষে, প্রণতা হল গুরুর চরণে। স্পর্শে চমকে উঠলেন মহর্ষি শুক্রাচার্য। কল্পলোক থেকে তাঁর দৃষ্টি নেমে এল নীচে, স্থিরবদ্ধ হল কামিনীর কমনীয় অঙ্গে। কি অপরূপ রূপ। আলোহিত অঙ্গকান্তি, রূপের তরঙ্গে উচ্ছলিত অঙ্গ। পরিধানে রক্তাম্বর, বিস্রস্ত ঘন-নীল কুটিল কুন্তল—যেন ইন্দ্রকান্তমণিতে ঠিকরে পড়েছে মরকতদ্যুতি। কটাক্ষে মোহময় মদিরাবেশ, অধরে রহস্যময় হাসি। সদ্য-প্রস্ফুটিত যেন বিশ্বকামনার রক্তকমল।

মুগ্ধ হয়ে যান শুক্রাচার্য উশনা। ইন্দ্র-জালনিপুণা ভানুমতী বারুণীকে চেনেন তিনি। অসীম তার শক্তি, অশেষ তার দর্প। তবুও কি দীপ্তি ওই ফুল্ল আননে, কি অনমনীয় দৃঢ়তা ওই তরল কটাক্ষে। মরালের মত উন্নত গ্রীবাভঙ্গি, মদমত্তা করিণীর মত দৃপ্ত পদক্ষেপ। কবি তিনি; 'কবীনাম্ উশনা কবিঃ'—তিনি সুন্দরের উপাসক। সুন্দর কি কেবল নারীর নমনীয়তা? সুন্দর কি কেবল কোমলাঙ্গের কমনীয় মাধুরী? এই যে রুদ্র কাঠিন্য, এই যে সপ্রভ ভীমকান্তি—এ কি সুন্দর নয়?—সুন্দর, সুন্দর। কবির শিল্পদৃষ্টি খুলে যায়, বিশ্বমাধুরীর সৌন্দর্য ছাড়িয়ে তাঁর নয়নে জাগে করালীর রুদ্ররূপ। ঢল ঢল আসবমত্তা সে কান্তি, মনোমোহিনী সে রূপের তুলনা কোথায়?

স্থূল সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়, ভয়ঙ্করের ভয়াল মূর্তি সকল মনেই ত্রাসের সঞ্চার করে। কিন্তু অন্ধকারে সৌন্দর্য দেখেন কে? উদ্যতফণা বিষধর সর্পে পরম-পদের চিহ্ন কার আবিষ্কার? সে আবিষ্কার শিল্পীর। কবি সেই শিল্পী। তাঁর অন্তরে রুদ্রের শিবময় দক্ষিণমুখের অনুধ্যান। বারুণীকে যেন নূতন করে আবিষ্কার করলেন কবিপুত্র উশনা। রূপ-রাগে অনুরাগের রক্তিম ছটা, ক্রমে তাঁর আকর্ষণ। মুগ্ধ কবি চকিতে স্পর্শ করলেন বারুণীর অঙ্গ।

স্পর্শমাত্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হল, মস্তিষ্কে ভীষণ উত্তেজনা, সর্বদেহময় প্রদাহ। উগ্র-তেজা ঋষি অন্তরে অনুভব করলেন বিচিত্র মদন-বিহ্বলতা—যেন চন্দ্রস্পর্শে উচ্ছ্বসিত হল সাগরাম্বু। লুপ্তধৈর্য মহর্ষি ভার্গব মোহাবিষ্টের মত আবদ্ধ হলেন বারুণীর বাহুবেষ্টনে, অশান্ত সমুদ্র ধরা দিল রক্তোপল বেলা-বলয়ে।

অর্ধমূর্ছিত চেতনা, মদিরা-বিহ্বল আঁখিতে তন্দ্রার ঘোর। স্বপ্ন দেখছেন যেন কবিপুত্র উশনাঃ সুরাসঙ্গে দেহময় পুলক-শিহরণ, জাগ্রত দীপ্ত কুণ্ডলিনী, কোটি সূর্যের মত সমুজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ। কি আশ্চর্য দীপ্তি! যেন সমুল্লসিত বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎবেগে সেই কুণ্ডলিনী-সহায়ে তিনি ঊর্ধ্বে উঠছেন, নিমেষে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নিম্নস্থ ভূলোক। ওই বরুণালয়, ওই অগ্নিময় কামভবন, এই অনাহত নাদলোক। পলকে নিরালম্ব শূন্যলোকে উপস্থিত হলেন তিনি। নিঃসীম নীলা-শব্দতরঙ্গ যেন বিপুল কম্পনে আত্মহারা। ওই যে জ্যোতিশ্চক্রের সীমা ছাড়িয়ে তপোলোক—কি অতল প্রশান্তি! লুপ্ত বুদ্ধি, লুপ্ত অহঙ্কার, লুপ্ত প্রাকৃত প্রকৃতি, শুদ্ধ একটি চেতনার উল্লাস। এই যে পরম শিবধাম—অমোঘ প্রশান্তি, প্রশান্ত বসন্তোল্লাস। গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত পুষ্প, পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জরিত মধুপ ঝঙ্কার। দিব্য গন্ধে আমোদিত দিঙ্মণ্ডল। সহস্র গন্ধর্ব, কিন্নর দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। পুলক-বিস্ময়ে দেখলেন ঋষি, সহস্রার কমলের কর্ণিকাবিন্দুতে মনোময় স্বর্ণপর্যঙ্কে শিব-সমালিঙ্গিতা উল্লাসময়ী পরানাদ। কি মধুর কেলি-কাকলি! অচারিত যেন মধুর উৎস।—সহস্র কমলে ক্ষরিত কোটি লাক্ষা-রসের সমারুণ সামরসধারা। সেই ধারায় অভিস্নাত দেহ। রোমাঞ্চিত অঙ্গ, পরমানন্দে আচ্ছন্ন চৈতন্য। আবেশে নয়ন মুদ্রিত হল দৈত্যগুরুর।

সেই স্বপ্ন-বিহ্বলতার সুযোগে মোহিনী বারুণী শুক্রাচার্যের মুখে তুলে দিল কচের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত আহার্য। সুরাসংগে অপূর্ব স্বাদু সে ভোজ্যদ্রব্য।

কিন্তু ভার্গবের এ মোহমুগ্ধতা মুহূর্তের মাত্র। সত্যদ্রষ্টা ঋষি উশন,—শম, দম, তপস্যাই তাঁর আচরণীয়। বারুণীতে বিহ্বল হওয়া সংশিতব্রত ভার্গবের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ধ্যানবলে সেই-ক্ষণেই বুঝতে পারলেন তিনি, মুহূর্তের বিভ্রান্তিতে ভয়ংকর অঘটন ঘটে গেছে। মোহমুগ্ধ হয়ে তিনি পানীয়ের সংগে পান করেছেন প্রিয়শিষ্য কচের অস্থিচূর্ণ, ব্রহ্ম পাতকের ভাগী হয়েছেন তিনি।

এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে কে? ক্ষুব্ধ দৃষ্টি মেলে তাকালেন ভার্গব। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিকৃতি-নিপুণা, প্রমাথিনী বারুণী। রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রূপসী—তীব্র তার আকর্ষণ; জ্বালাময় তার স্পর্শ, উন্মাদক তার আলিংগন। সে আলিংগনে রক্তকণায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নৃত্য করে, তার চুম্বনে ওষ্ঠাধর, রসনা, কণ্ঠ, বক্ষ জ্বলে যায় সংগে সংগে জাগে দুর্দম দম্ভ। কাম-তরংগও উদ্বেল হয় সেই মুহূর্তে—

কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিচারহীন সে কাম-বেগ। সুতীব্র আবেগের পরিণাম প্রচণ্ড আত্মবিস্মরণ। উল্লাস না উদ্‌ভ্রান্তি, আনন্দ না বেদনা, আরাম না অস্বস্তি—এ বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরে উদ্বেগ, মস্তিষ্কে উল্লোল—শতধা খণ্ডিত চিন্তার সূত্র। সূত্রহীন সংলাপ প্রলাপে পরিণত হয়, স্খলিত বচনে কখনও প্রমত্ত হুংকার, কখনও গদগদভাষ। স্মৃতি ও বিস্মৃতির সে এক মোহকর অবস্থা। সুরা-সম্ভোগে সম্বিৎহারা সত্তা, চুম্বনে বিলুপ্ত চৈতন্য। মহাভয়ংকরী এই লোহিতবর্ণা বারুণী, সংজ্ঞানাশে নিপুণ তার নিকৃতি।

উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন উগ্রতেজা ভার্গব। বারুণীর প্রকৃতি-পর্যালোচনায় ভ্রূকুটি-কুটিল হল তাঁর আনন। দর্পিণী বরুণ-নন্দিনীকে লক্ষ্য করে তিনি উচ্চারণ করলেন অভিশাপ বাণী: 'সুরা হয়েও আত্মদর্পে তুমি হয়েছ সুরপরিত্যক্তা। তাতেও দর্প চূর্ণ হয়নি তোমার। অসুর দানবের ভোগ্যা হয়েও সম্ভোগ-কামনায় তুমি অস্থির। তোমার কদর্য লালসা বিস্তার করেছ দেবধর্মী ঋষিব্রাহ্মণের ওপর। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আজ থেকে যে-কোন ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্যা হবে তুমি। মহাত্মা ব্রাহ্মণ ঘৃণায় তোমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে। হে দর্পিতা, অশেষ দর্প চূর্ণ হবে তোমার। ধূর্জটির বীর কাপালিকের হস্তে নিঃশেষে খর্ব হবে তোমার দর্প।'

নীরব হলেন ভূরিতেজা ভার্গব যেন নীরব হল কম্পমানের বজ্রনির্ঘোষ। স্পর্ধিতা বারুণী মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হল। সুরা সে সুরলোকভ্রষ্টা, ঋষি-শাপে মর্তালোকেও কি ক্ষুণ্ণ হবে তার অধিকার? দীপালোকে সমুজ্জ্বল কক্ষ যেন নিষ্প্রভ মনে হল তার চক্ষে, কে যেন সবলে তাকে আকর্ষণ করছে তমিস্রাঘন এক নিরয়-লোকে। শিউরে উঠল দর্পিতা বারুণী, কিন্তু ভেঙে পড়ল না। প্রাংশু শাল বজ্রে বিদীর্ণ হয়, তবু নমিত হয় না। বরুণ-নন্দিনী সে বারুণী, জননী শুক্রার বহ্নি-দীপ্তি তার দেহে ও মনে। তার দর্প খর্ব করে কার সাধ্য?

বিস্মিত হয়ে যান মহাতেজা শুক্রাচার্য। যাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত বজ্রী ইন্দ্র, তাঁরই হুতাশন-সম ক্রোধের মুখে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে দর্পিণী। এ কি অনমনীয় দর্প। এ কি কঠিন তেজ! তাঁর বাগ্‌বজ্র যেন তাঁকেই প্রত্যাখ্যাত করে। শান্ত ভার্গবের নয়ন-সম্মুখে জাগে ভৈরবীর রুদ্র-সুন্দর মূর্তি। এই দর্পিণীর আকৃতির সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে তাঁর। কবির কল্পনায় কোমল আলোচন, সমবেদনায় সিক্ত অন্তর। তিনি ভাবেন, 'বারুণী তো কেবল মদান্ধতাই সৃষ্টি করে না, কান্তি ও পুষ্টিও বর্ধন করে। বিষের সূচিকাভরণের মত বহু বিষবীজ বিনষ্ট করে সে। দুঃখের আঁধার ঘরে স্ফূর্তির দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে বারুণী; কত ক্লান্তি, কত শোকের কালিমা মুহূর্তে মুছিয়ে দেয় ক্লান্তিহরা, শোকহরা সুরা। সুরা নিজে সুরলোকভ্রষ্টা, কিন্তু এ মর-লোকে অমরলোকের সুধা সুরাই বর্ষণ করে। নিজেই অনুভব করেছেন কবি উশনা, সুরাসঙ্গে দীপ্ত কুণ্ডলিনীর কী সে সুখকর জাগরণ!

নরম হয়ে আসে ঋষির অন্তর। ঋষি বজ্র-কঠিন, কিন্তু কুসুম-কোমলতাও তো তাঁদেরই। করুণাঘন কবি গভীর অনু-কম্পায় সুরাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'সুরা, তোমার মদান্ধতায় ক্রুদ্ধ হয়েই আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি, কিন্তু তুষ্ট হয়েছি তোমার দৃঢ়তা দেখে অশেষ তোমার রূপ-দর্প, প্রবল তোমার ভোগবাসনা। প্রজাপতির সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষায় তোমারও প্রয়োজন আছে। তোমার ভোগ-কামনা ক্ষুণ্ণ হবে না। দানব ও অসুর-রাজ্যে তুমি বহুভোগ্যা, মর্তালোকেও অক্ষুণ্ণ থাকবে তোমার অধিকার। ধূর্জটির ব্রাহ্মণের ওপর তোমার অধিকার থাকবে না বটে, কিন্তু দানবধর্মী মানুষ হবে তোমার ইঙ্গিতের দাস। ইহলোকে যারা কামাসক্ত, মৃগয়াসক্ত ও অক্ষক্রীড়ামত্ত—তাদের হৃদয়ে অবাধে বিচরণ করতে পারবে তুমি। অহংকারী যারা, দাম্ভিক যারা, অজিতেন্দ্রিয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যারা—তাদের গৃহে তুমি হবে একেশ্বরী। কোটিযোজন প্রমাণ এই মর্তালোক তোমার সদর্প আক্রমণে অস্থির হবে। মদাতঙ্ক সৃষ্টিতে তুমি হবে অদ্বিতীয়া। কিন্তু...'

বলতে বলতে উদাস হয়ে যান ঋষি। প্রমোদকক্ষে শান্ত হয়ে গেছে মদমত্ত উল্লাস, নীরব হয়েছে স্খলিত বচনের হুংকার। উজ্জ্বল দীপাবলী মনে হচ্ছে যেন বড় স্নিগ্ধ। ত্রিযামার শেষ যামের সমীরণ শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে অশান্ত, দর্পোদ্ধত দেহে। করুণায় যেন রুদ্ধ হয়ে আসে ঋষির কণ্ঠ, তবু তিনি বলেন, 'কিন্তু, এ দর্প কি ভাল, ভাল কি উগ্র ভোগ-কামনা? সুরা, তুমি সুরনন্দিনী, সূর্য-মণ্ডলে তোমার জন্ম, দেহে তোমার সৌর-দীপ্তি, নয়নে সূর্য-প্রভা—কিন্তু তুমি সুর-পরিত্যক্তা। ইতরভোগে অশুচি তোমার দেহ, তামসিকতায় অপবিত্র তুমি।'

ক্ষণেকের জন্য নীরব হন কবি উশনা, নয়নে স্নিগ্ধ কোমলতা, বদনে জ্যোতির্ময় প্রভা। কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দর্পিতা বারুণী। তেমনি উদ্ধত ভঙ্গি, তেমনি বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গ—যেন রাত্রিশেষের দীপ্ত শুক্র-তারকা—তমোময় নিশান্তের প্রদীপ্ত ঔদ্ধত্য। নয়নে কি তার পূর্বাশার স্বপ্ন?

করুণায় বিগলিত কণ্ঠে বলেন সত্যের বাঙ্‌মূর্তি কবি, 'আমার আশীর্বাদে শাপ-মুক্ত হতে পারবে তুমি। যে বীর্যবান বীর সাধকের হস্তে দর্প খর্ব হবে তোমার, তাঁর বাঙ্‌মন্ত্রেই হবে শাপ-মুক্তি। অশুচি লৌকিকী সুরা তুমি, মন্ত্র-সংস্কারে হবে শুচিস্মিতা। সেদিন তুমি অমিত সাত্ত্বিক শক্তির অধিকারী হবে। তোমার স্পর্শে সাধক হবেন সুর, সার্থক হবে তোমার সুরা নাম।'

শুক্রাচার্য আর অপেক্ষা করলেন না। ব্রাহ্মমুহূর্তের শুভ্র জ্যোতিরেখা দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগ্‌বলয়ে। সুরাসঙ্গে ব্রহ্মপাতকের ভাগী হয়েছেন তিনি। তাঁকে শুদ্ধ হতে হবে, মুক্ত করতে হবে বৃহস্পতি-পুত্র প্রিয়শিষ্য কচকে। দ্রুত দানবভবন থেকে বেরিয়ে এলেন ভার্গব। রাত্রির শেষ যামের ঘোষণা শোনা যাচ্ছে বন্দীর কণ্ঠে।

তেমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্পর্ধিতা বরুণ-নন্দিনী। এ কি তার পরাজয়, না বিজয়ের পুরস্কার? স্তিমিতপ্রায় আলোকে চক্‌চক্‌ করে উঠল তার রক্তাক্ত স্তব্ধ লোচন। সুরা সে, সুরলোক-দ্রষ্টা—ঋষিশাপে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরও অস্পৃশ্যা সে। গর্জন করে উঠল অমিত দর্প, 'চায় না সে স্বর্গ-লোক, চায় না সে ভীরু ব্রাহ্মণের স্পর্শ। পিতা তার অমিতপ্রভ বরুণ, মাতা তার শুক্রা। পিতার শক্তিদর্প তার রক্তকণায়, মাতার বহ্নি-দীপ্তি তার দেহে। ত্রিভুবনে কে রোধ করবে তার গতি? প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মত জ্বলে উঠল তার আরক্ত আনন, ঘূর্ণিত হল তার রক্তাক্ত বিহ্বল নয়ন। তারপর স্খলিত চরণে প্রমত্তা করিণীর ন্যায় অগ্রসর হল মদোন্মত্তা দর্পিতা, কামোন্মত্তা ক্রুদ্ধা কামিনী।

সেই থেকে বিশ্বলোকে শুরু হল বারুণীর প্রচণ্ড আক্রমণঃ সুর-সম্ভোগের ব্যর্থ কামনায় সুরা হল রুদ্র-ভয়ঙ্করী। স্বর্গে সে প্রবেশাধিকার পায় না, কিন্তু তারই প্ররোচনায় প্রমত্ত অসুর স্বর্গলোক আক্রমণ করে, মদোন্মত্ত দানবের হিংস্রতায় শিহরে ওঠে সুরলোক। ভূগর্ভস্থ কালাগ্নি তারই ক্রুদ্ধ হৃদয়ের জ্বালা-করাল শিখা, সে শিখা সুর-সীমন্তিনীর মহাভয়। অসুর-দানবের পুরে পুরে দর্পিতা বারুণীর দৃপ্ত পদক্ষেপ। তাদের রক্তচক্ষুতে বারুণীর রক্তলোচনের রোষ-কটাক্ষ, তাদের ভীম ভ্রূকুটিতে তারই কুটিল ভ্রূকুটি, তাদের হুঙ্কার গর্জনে বারুণীরই ক্রোধান্ধ হুঙ্কার।

মর্ত্যলোকে বারুণীর স্বাধিকার-প্রমত্ততা আরও ভয়ঙ্কর। দানবধর্মী মানুষ তার করতলগত। তাদের বিকট দাপটে ত্রস্তা মেদিনী। দুর্বলের ওপর শক্তের অত্যাচারে, শোষিত মানুষের প্রতি শোষকের মর্মান্তিক অবিচারে বারুণীর উৎকট উল্লাস। কামাসক্ত দ্যূতাসক্ত, মৃগয়াসক্ত নরনারী বারুণীর কটাক্ষের দাস। অজিতেন্দ্রিয় মানুষকে ব্যভিচারী কামনায় উন্মত্ত করে তোলে বারুণী, পৃথিবীব্যাপী শক্তির দ্যূতক্রীড়ায় প্ররোচনা দেয় বারুণী, মানুষ হয়ে যারা মৃগয়াসক্ত ব্যাধের মত মানুষকে আক্রমণ করে, তাদেরও প্ররোচিকা বারুণী। সে বিরোধিনী, বিশ্বের বুকে বিরাট অক্ষমা। হিংসায় ও হত্যায় সে বিজয়ের অট্টহাসি

হাসে, গৃহে গৃহে জ্বালায় ধ্বংসের অগ্নি-শিখা। অতি ভীষণ লেলিহ তার রসনা, পুরন্ধ্রী নারীর অশ্রু তার পানীয়। সতী নারীর সীমন্ত-সিন্দুর, তার রক্তাম্বরের মঞ্জিষ্ঠা রাগ।

হিংসায় ও কুটিল কামনায় বুদ্ধিভ্রষ্টা বরুণ-নন্দিনী যেন উদ্ধত অন্ধ দম্ভ। ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যা সে,—শুক্রাচার্যের অভিশাপ। অহংকারে হাসে উন্মত্তা, দুর্বল ব্রাহ্মণ,—সে নাকি বারুণীর প্রতিস্পর্ধী! মত্ত বনাহস্তীর শুণ্ডতুণ্ডে যার মদক্ষরণ, কালান্তর মেঘে যে রক্তাক্ত বিদ্যুৎশিখা, ফেনিল ঊর্মিমুখে যার দর্পোল্লাস—তার প্রতিস্পর্ধী ভীরু ব্রাহ্মণ! সে চায় না, তাই মুক্তি পায় আতপান্নভোজী, শিখাধারী ব্রাহ্মণ। 'লৌকিকী সুরা সে'—বলেছেন দৈত্যাচার্য ভার্গব, অসুর-দানবের ভোগে সে নাকি অশুচি, তাকে নাকি মন্ত্রপূত করবে বীর কাপালিক—তার হাতেই নাকি দর্প চূর্ণ হবে বারুণীর!' প্রমত্ত হাসিতে ফেটে পড়ে বারুণী, একটা সশ্লেষ বক্রোক্তি উচ্চারিত হয় মুখে। 'ভণ্ড কাপালিক! রক্ত গৈরিকের অন্তরালে তার ব্যভিচারী কুটিল কামনা। সুরাসম্ভোগের লালসায় তারা সাধু, কামিনী-ভোগের কামনায় তারা কাপালিক। বারুণীর একটিমাত্র চুম্বনে চলিতচিত্ত হয় যারা—তারা বীর! তারাই জয় করবে বারুণীকে!' সশ্লেষ হাস্যে মুখর হয় বারুণী, দম্ভে আত্মহারা হয় দর্পিতা। সে অপরাজিতা, ত্রিভুবনে তার ভোগের পাত্র, 'লৌকিকী সুরা'—মর্ত্যলোকে সে একেশ্বরী।

কিন্তু এত ভোগেও তৃপ্তি কোথায়? প্রমুক্ত স্রোতস্বতীর মত উদ্দাম ভোগকামনা। এত বিজয়, তবু অতৃপ্ত বিজয়-নেশা—যেন মরুৎ-সংযুক্ত চণ্ড বহ্নিশিখা, চির অগ্নিমান্দ্য তার উদরে। স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। অস্থির, উন্মাদ বারুণী—অস্থির মস্তিষ্ক, অস্থির স্খলিত পদক্ষেপ। নিদ্রা নেই—বিনিদ্র, চঞ্চল তার আরক্ত, মদঘূর্ণিত নয়ন। দেহময় সুতীব্র প্রদাহ, অন্তরে বিষের জ্বালা! গভীর নিশীথে পণ্যাঙ্গনা ভবনে সে অতন্দ্র জেগে থাকে, অন্ধকারে চক্রীরূপে সে চক্রান্ত করে। রক্তাক্ত লোচনে আরক্ত দৃষ্টি, বিপর্যস্ত বুদ্ধি। সে কি উন্মাদ হয়ে গেল?—উন্মত্ততা নয়, মদাতঙ্ক—অতিমদের ভীষণ প্রতিক্রিয়া। সর্বদেহময় প্রদাহ, রসনায় মরুর তৃষ্ণা, কণ্ঠে অনন্ত শুষ্কতা। দুরন্ত মদাত্যয়, ঘোর বিকার। সে কখনও ক্রোধে গর্জন করে, কখনও অট্টহাসি হাসে, কখনও নীরব হয়ে থাকে। বেপমানবপু, অসংযত চিন্তার সূত্র। উত্তপ্ত কল্পনায় বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মালাঃ কে সে? বরুণ-নন্দিনী?—না, সে সুরা। কোথায় রূপকুমার অশ্বিনীকুমার? এ যে প্রভাবিক্ষু বিক্ষু! কে ও? সুন্দর ব্রাহ্মণ সন্তান,—কচ? শিশুর দেহে এত রক্ত! হৃদয়ে উল্লাস, নিষ্পলক বারুণীর দৃষ্টি। ওই যে মহর্ষি শুক্রাচার্য। কি বলছেন? এত দর্প ভাল নয়? দুর্বার কামনার বেগ?

কঠিন হয়ে ওঠে বারুণী। সৃষ্টির মূল-কমল কামনা, মহনীয় দর্প শ্রী। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে, অস্তগমনোদ্যত স্বর্ণভানু,—কি প্রচণ্ড তার তেজ! বাসনার সহস্র কিরণ, সহস্রমুখে বিশ্ব-রস আহরণ করে—অম্লান তার দীপ্ত গরিমা। ওই সূর্যমণ্ডলে বারুণীর জন্ম, তারও দেহে সৌরমণ্ডলের দর্প-দীপ্তি। আত্মদর্পে উল্লসিত হয় দর্পিণী।

সহসা সূর্য অস্তমিত হল, যেন অস্তমিত হল একটা জ্বলন্ত শক্তি-দর্প। নিজের অজ্ঞাতসারেই কেঁপে উঠল বারুণীর অন্তর। কি বললেন মার্তণ্ডদেব?—'এত দর্প ভাল নয়, অতি দর্প চূর্ণ হয়।' মহর্ষি ভার্গবের কণ্ঠস্বর যেন অন্তঃকর্ণে গর্জন করে ওঠে। মস্তিষ্কে আগুন জ্বলে বারুণীর, সংযত কল্পনা যেন প্রবঞ্চনা করে তাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। অস্পষ্ট গোধূলি। সম্মুখে অমারজনী। সহসা বারুণী যেন শুনতে পেল একটা দূরাগত পদধ্বনি। কে যেন আসছেন, মুখে বলছেন, 'শিতোঽহম্ সুরোঽহম্ ন চান্যোঽস্মি!' কি গম্ভীর কণ্ঠনাদ! বিস্মিত হয়ে যায় বারুণী,—অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন—পর্বতের মত বিরাট, বিভীষণ এক জটাধারীঃ বলিষ্ঠ দেহ, লৌহভীম বাহু, বিশাল বক্ষ। পরিধানে তাঁর রক্তাম্বর, ললাটে রক্তপুণ্ড্র, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে কপালপাত্র।

ভয় পাচ্ছে কি ভয়ংকরী বারুণী? উগ্রতেজা শুক্রাচার্যকে যে পরাভূত করেছে, তার আবার ভয়? মদস্খলিত চরণ স্থির করতে চেষ্টা করে বারুণী, মদবিহ্বল কণ্ঠকে যথাসম্ভব সংযত করতে যত্ন করে সে। তারপর প্রশ্ন করে, 'কে?'

'শিবোঽহম্ ন চৈবান্যোঽস্মি'—আমি বামাচারী কাপালিক।'—গম্ভীর কণ্ঠে বলেন কপর্দী।

অন্ধকার নেমে আসছে বারুণীর রক্ত-লোচনে। দিনের অমন রক্তপিণ্ডটাকে তমসার আবরণে আবৃত করে দিল কে? 'বামাচারী কাপালিক'—সোচ্চার হল কি উগ্রতেজা ভার্গবের কণ্ঠ? কি ঘোর বজ্র-নাদ। কর্ণ যেন বধির হয়ে আসে বারুণীর। জলদ-গম্ভীর স্বরে বলেন রক্তগৈরিকধারী, 'আদ্যাশক্তি চামুণ্ডা আমার উপাস্যাদেবী। আজ অমাবস্যার নিশীথে শবসাধনায় তুষ্ট করব তাঁকে। তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

'আমাকে?'—কণ্ঠ যেন শুষ্ক হয়ে আসছে বারুণীর। বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক, ঘূর্ণিত রক্তলোচন। আতঙ্কে অর্ধস্খলিত কণ্ঠে সে বলে, 'আমাকে কেন? না, না—আমি বারুণী, দেবভোগে অধিকার নেই আমার।

'কে বলে অধিকার নেই?'—উচ্চহাস্যে চতুর্দিক উচ্চকিত করে বজ্রস্বরে বলেন কাপালিকঃ 'তুমি শুধু বারুণী নও, তুমি সুরা।

দেবানামমৃতং ব্রহ্ম তদেব লৌকিকী সুরা।
সুরত্বং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীর্তিতা॥'

কি বলছেন বীর সাধক?—সে সুরা। ব্রহ্মলোকে যেমন অমৃত, মর্ত্যলোকে তেমনি সুরা। তাকে ভোগ করে সাধক সুরত্ব লাভ করেন। বারুণী যেন আর ভাবতে পারে না কিছু। চেতনা যেন প্রতারণা করছে তাকে। শক্তিও যেন লুপ্তপ্রায়। তবুও প্রাণপণে শেষ নিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে মোহিনীঃ 'আমি সুরা হলেও, লৌকিকী সুরা। শুক্রশাপে পতিতা আমি, দানব-মানবের ভোগে অশুচি,—সাধকের অস্পৃশ্যা।'

'অশুচিকে আমি শুচিশুদ্ধ করব'—প্রাণখোলা হাসির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে বলেন বীর সাধকঃ 'আমার ধর্মে কেউ অশুচি নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মায়ের কোলে শুচি-অশুচি স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদ নেই, এস—'

বীরবাহু প্রসারিত করেন বীর কাপালিক। বারুণী আত্মগোপন করতে চেষ্টা করে। পদতলে কম্পিতা ধরণী, স্থির হয়ে চলতে পারে না সে। স্খলিত পদ, স্খলিত গতি। সাধক মুহূর্তে দৃঢ়হস্তে ধারণ করেন তাকে। কি বলিষ্ঠ বাহু! বারুণীর শক্তি নেই বাধা দেয়, সাধ্য নেই চীৎকার করে। যাদুমন্ত্রে নির্জিত সর্পিণীর শক্তি, দর্পিণীর দর্প। অমানিশার অন্ধকার তার চোখে।

কথা বলেন না কাপালিক। বারুণীর দেহটাকে একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নকের মত গ্রহণ

করে কপালপাত্রে স্থাপন করেন। এতটুকু হয়ে গেছে সেই শক্তিমত্ত দেহ। অমেয় শক্তির অধীশ্বর বরুণের নন্দিনী বারুণী, অভিমানে স্ফীতা শুক্রের কন্যা বারুণী, স্পর্ধিত দানবাসুরের রাজরাজেশ্বরী বারুণী—আজ খর্ব তার দর্প। কপালপাত্রে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ লোহিতসাগর—সম্মুখে উদ্যত রক্তপুঞ্জরূপে করাল খঙ্গ। আতঙ্কে অর্ধমূর্ছিত চেতনা, প্রাণপণ শক্তিতে বারুণী অবশিষ্ট চেতনাটুকুকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

বীর কাপালিক বারুণীকে নিয়ে আসেন, অন্ধকারঘন নির্জন শ্মশানে। মহাশ্মশান, অমা-অন্ধকারে মহাভয়ঙ্কর। অদূরে ক্রব্যাদ অগ্নির শিখা, বিকট শিবাধ্বনি। নির্ভয় কাপালিক দৃঢ় হয়ে বসেন, পূর্ব-নির্দিষ্ট এক শবাসনে। সুন্দরাঙ্গ শব, এখনও নিমীলিত হয়নি তার চক্ষু,—হয়তো সদা বজ্রবিদ্ধ হয়েছে সে। নির্ভীক কাপালিক, বজ্রসার তাঁর হৃদয়, বজ্রদৃঢ় দেহ। মুখে একাক্ষরী শব্দমাত্র। ভাল বুঝতে পারে না বারুণী। অতি অস্পষ্ট মন্ত্র, অস্পষ্ট হুঙ্কার-মূর্ছনা আরও অস্পষ্ট হয়ে অর্ধচেতন বারুণীর কর্ণে ধ্বনিত হয়। বারুণী-পূর্ণ কপালপাত্র হস্তে ধারণ করে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন বীর কাপালিক:

ওঁ সূর্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ি দেবি! শুক্রশাপাৎ
প্রমুচ্যতাম্ ॥

একি হল বারুণীর! মুহূর্তে অদ্ভুত পরিবর্তন। অপহৃত শুক্র-শাপ। শুদ্ধ সে, শুচিশুভ্র। আলোহিত অঙ্গবর্ণ কলধৌত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল, রক্ত-আননে সূর্য-মণ্ডলের জ্যোতির্ময় দীপ্তি। সে যেন নির্মোকমুক্ত একটি রক্তপ্রবাল। সর্বাঙ্গে আনন্দ শিহরণ। কোথায় কামনা? নিস্তরঙ্গ কামনা-সাগর। কোথায় তার মোহিনী মায়া?—নিজেই সে মোহিতা। মূর্ছিত-চেতনা যেন শুদ্ধ চৈতন্যের শুভ্র দীপ্তি—স্বল্পস্পন্দিত, বিপুল পুলকে পুলকিত। সে বারুণী নয়, সে সুরা: লৌকিক সুরা নয়, রসসার কুলামৃত। শুদ্ধশুচি এই সুরাকে আপন দেহের কুণ্ডলিনী মুখে অর্পণ করলেন বীর সাধক। সার্ধত্রিবলয়া-কৃতি সুপ্তা কুণ্ডলিনী নিমেষে সুপ্তিভঙ্গে জাগ্রত হলেন। সূক্ষ্ম কেশাগ্রের কোটি ভাগের এক ভাগের মত সূক্ষ্ম অথচ আশ্চর্য কান্তিমতী। যেন সমুল্লসিত কোটি বিদ্যুৎ! যে শেষ দর্পটুকু ছিল বারুণীর তাও নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। কোথায় বারুণীর রূপ-গর্ব? কোটি অরুণ-কান্তির মুখে নিষ্প্রভ সুরার দেহ-দীপ্তি। কোথায় তার শক্তির দর্প? সূক্ষ্ম ভুজগীর অমিত শক্তির মুখে সুরা যেন আত্মগোপন করার পথ খুঁজে পায় না। বজ্র কুণ্ডলিনী দণ্ডের মত ঋজু, বিদ্যুতের মত সুতীব্র বেগে ঊর্ধ্বে উত্থিত হচ্ছেন আধারশক্তি। সুরা সে বেগ সহ্য করতে পারছে না। প্রলয় ঝঞ্ঝার মুখে যে সুস্থির, চপলাসদৃশ এই শক্তির মুখে সে অস্থির। কোথায় ঊর্মি-শীর্ষে বিচরণশীলা স্পর্ধিতা? শক্তিবেগে যেন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে সে। শেষ চৈতন্যও বুঝি লুপ্ত হয়ে যায়। এ পরাজয়, চরম পরাজয়—তবু মনে হয়, এ আনন্দ, বিপুল আনন্দ। কোটি লাক্ষারসের মত দীপ্তারুণ পরমানন্দধারায় নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় দর্পিতা মদোদ্ধতা। কোথায় বারুণী? কোথায় সেই সুরা!

কিন্তু লৌকিকী সুরার এই শুদ্ধি সাময়িক—এর ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। বিশ্ব-লোকে বিস্তৃত দর্পিতা বারুণীর কামান্ধ শক্তি-দর্প। তার আক্রমণে অস্থির মনুষ্য লোক। দেবধর্মী মানুষকে বুদ্ধিভ্রংশ করার উৎকট লালসায় সে সুযোগ অনুসন্ধান করে। নিদারুণ বিভীষিকার মত ভুবনে ভুবনে বিচরণ করে—রক্তাম্বরা, রক্তবর্ণা, রক্তান্তস্তব্ধ লোচনা, মদস্খলিত চরণা বারুণী।*
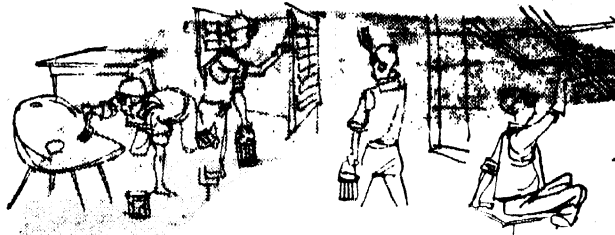
১। পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিগর্ভ, ৪র্থ অধ্যায়
২। মহাভারত—আদিপর্ব, ৭৬ অধ্যায়
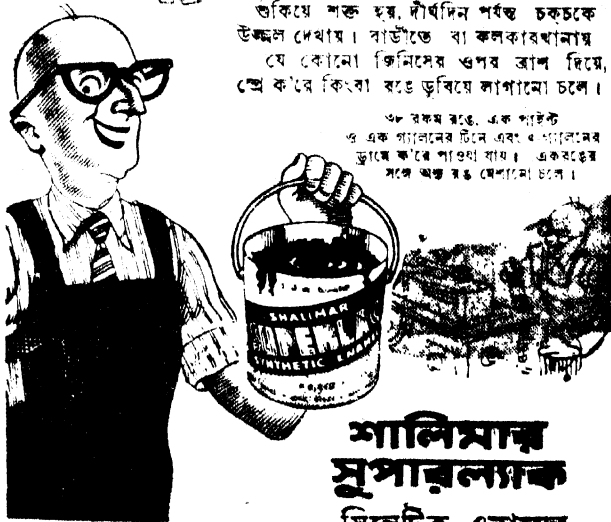
দিলীপকুমার রায়

পনেরো

সত্যেনের মধ্যে অনেক গুণেই শুধু আমার নয়—আরো অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এদের মধ্যে একটি হ'ল তার অসামান্য ধৈর্য তথা ঔৎসুক্য। বন্ধুদের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো খুঁটিনাটি ও সমস্যার কথা শুনতে সে কখনো বিরক্ত হ'ত না। তাই অনেকেই দেখতাম তার কাছে এসে ধরনা দিত সমাধান চেয়ে। এদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন প্রধান প্রশ্নটা—প্রায় নচিকেতার কাছাকাছিঃ যখনই কোন প্রশ্ন কি সমস্যা হাজির দিত সটান তার কাছে এসে দরবার করতাম। মনে আছে ব্যবহারিক রসায়নের আবর্তে মন অতিষ্ঠ হ'তে না হ'তে তার কাছে এসে অশ্রান্ত কাঁদুনি গাওয়া আর তার যথাসাধ্য অভয় দেওয়া—যখন আমি ভয় পেতাম, আমার গতি কী হবে বলে। এমন বন্ধুগত-প্রাণ মানুষ পিতৃদেবের পরে আর আমি দেখি নি। যাকেই একবার বন্ধু বলবে তারই খোঁজ নেবে যথাসাধ্য। আমার এক ধনী জমিদার বন্ধু পাকিস্তানের ফেরে প'ড়ে যখন বৃদ্ধবয়সে দেউলে হয়ে দিল্লীতে চাকরি নেন, সত্যেন খুঁজে খুঁজে তাঁর দীন ডেরায় গিয়ে হাজির। তখন দিল্লীতে সে রাজ্যসভার সভ্য মস্ত লোক। কিন্তু তার কাছে ধনী-গরিব, বড়-ছোট ছিল না—বন্ধু হলেই হ'ল। এমনি কত বন্ধু বা ছাত্রকেই যে সে পড়াশুনোয় সাহায্য করত, অংক কষাতো, কখনো বা তার বাড়ি ব'য়ে গিয়ে—যেমন শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ। আমাকেও অংক সাহায্য করত, যখনই আমি চাইতাম। সময়ে সময়ে সত্যিই আমার খুব গর্ব হ'ত যে, এ হেন মনীষী বন্ধু আমার সুখ-দুঃখের কথা এত মন দিয়ে শোনে—তার অন্য কত জরুরি কাজ রেখে! শুধু তত্ত্ব স্নেহৌৎসুক্যও নয়—স্নেহস্পর্শের দাম দেবে কে? আজও ভুলতে পারি না পথ চলতে এক হাত দিয়ে আমার বা অন্য বন্ধুদের গলা জড়িয়ে গজেন্দ্রগতি। মনে পড়ে কত জায়গায় যাওয়া গল্পালাপ করতে—কখনো শিবপুরে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ওখানে, কখনো বা শরৎদার ওখানে কখনো থেকে থেকে কলকাতার বাইরে লম্বা পাড়ি দেওয়া নিছক ভ্রাম্যমান হ'তে—সর্বোপরি, একত্রে নানা ওস্তাদের গান শুনতে বাড়ি খোঁজা। গানের সে একজন খাঁটি সমজদার ছিল—জানা গান শুনবামাত্র এক আঁচড়েই ভাল ব'লে চিনে নিতে পারত। গানের রসিক হ'তে যেয়ে সে এস্রাজ বাজাতে শিখেছিল। শুধু এখানেই আমি বিজ্ঞভাবে তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়ে মনে মনে যা একটু গর্ববোধ করতে পারতাম। কিন্তু কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই—আর সব ক্ষেত্রেই তার নির্দেশ, সমালোচনা, তারিফ থেকে আমি অপর্যাপ্ত লাভ করতাম। তার সাহিত্যিক মতামতে আমার এমনই শ্রদ্ধা ছিল যে তাকে ফরাসী নাটক-নভেল পড়তে দেখে আমি গ্রান্ড হোটেলের এক ফরাসী মহিলার কাছে দারুণ গ্রীষ্মেও মোজা প'রে ফরাসী ভাষা শিখতে লেগে গেলাম। দেখে সত্যেন খুব হাসত, কিন্তু সে-যুগে (১৯১৬-১৭ সালে) কি মেমসাহেবের কাছে মোজা পায়ে না দিয়ে কেউ ফরাসী ভাষায় তালিম নেবার কথা ভাবতে পারত?

ফরাসী ভাষা শেখার প্রসঙ্গে প্রমথবাবুর কথার ফের একটু অবতারণা না করলেই নয়। কারণ সে-যুগে তাঁর ফরাসী ভাষাপ্রীতির ছোঁয়া আরও অনেক তরুণ মনেই লেগেছিল যার মধ্যে সম্ভবত সত্যেন ছিল একজন—আমি তো বটেই।

প্রথম কথাটা এই যে প্রমথবাবু আমাদের মতন কিশোর ও তরুণ অনেকের কাছেই হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন খানিকটা কন্টিনেন্টাল কালচারের প্রতীক। কিন্তু আমাদের দেশ তো—একদল লোক উঠে প'ড়ে লেগে গেল প্রতিপন্ন করতে যে, সুকুমার বৈদগ্ধের ঝিকিমিকি-লোকে তিনি চিক চিক করলেও সোনা নন। অর্থাৎ ফরাসী ভাষা তিনি ভালো জানতেন না—বলল তারা মুচকি হেসে।

একথা সত্য কিনা কী ক'রে বলব, কারণ আমি সে সময়ে ফরাসীর প্রথম পাঠও নিই নি। কিন্তু এটুকু বলতে পারি সত্যের অপলাপ না ক'রে যে, ফরাসী ভাষা তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। নইলে তাঁর ফরাসী প্রীতির ছোঁয়াচ আমাদের অনেকেরই উৎসুক মন রাতারাতি রঙিন হ'য়ে উঠতে পারত না কখনই।

কিন্তু প্রমথবাবুর গুণ-মূল্য নির্ণয়ে এহো বাহ্য। মানে, তিনি আমাদের ফরাসী কালচারে মন্ত্রদীক্ষা দিন বা না দিন, বাংলা ভাষার প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ প্রগতি সম্বন্ধে অনেক দামী দিশাই দিয়েছিলেন। তাঁর রচনায় মধ্যে কোনো আশ্চর্য প্রতিভার নবপ্রভা ঝিলিক দিয়ে না উঠলেও তাঁর ভাষার প্রসাদগুণে আমাদের তরুণ মন উৎফুল্ল না হ'য়ে পারত না। সত্যেনও তাঁর ভাষার মুনশিয়ানার সুখ্যাতি করত, সায় দিতেন বিখ্যাত ভাবুক শ্রীঅতুল গুপ্ত। এর পরেও প্রমথবাবুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়

পোষণ করি কেমন ক'রে—বিশেষ যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুর সবুজপত্রে মৌখিক ক্রিয়াপদের" আবহে তাঁর অপরূপ "ঘরে বাইরে" সৃষ্টি ক'রে মৌখিক ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মন থেকে সব সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন প্রমথবাবুকে পূর্ণ সমর্থন ক'রে? আজও মনে পড়ে সবুজপত্রকে তাঁর সার্টিফিকেট দেওয়া প্রতিভার পরম নৈশ্চিত্যের সুরেঃ

"সবুজপত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল।......এর পূর্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে ছিল খিড়কির অন্দরমহলে।...... একবার যেমনি একে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণ-শক্তির জোরেই সমস্ত বাধা আজ ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল নিয়ে কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।"

এ-যুগে এ-ধরনের কথায় বোধহয় কেউই আপত্তি করবেন না, কেন না মৌখিক হসন্ত মধ্য ক্রিয়াপদ ও ঘরোয়া ইডিয়ম এখন বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের কাছেও সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু সে-যুগে এই গোড়াকার কথাটা স্বীকার করতেও প্রমথবাবুকে বেগ পেতে হয়নি। তাই এখন প্রমথবাবুর কথ্য ভাষার ওকালতি আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধের মতন মনে হ'লেও তাঁর তর্পণে এ-প্রশস্তি তাঁকে আমাদের দিতেই হবে যে সেযুগে অগ্রাহ্যকে অকাট্য দাঁড় করাতে তাঁকে অনেক লড়তে, অনেক নিন্দা সইতে হয়েছিল —অনেকেই তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল যখন তিনি তাঁর জোরালো ভঙ্গিতে লিখেছিলেনঃ "আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরেই নির্ভর করি তাহ'লে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে এবং আমাদের ঘরের লোকেদের সঙ্গে মনোভাবের আদানপ্রদানটাও সহজ হ'য়ে আসবে।"

একথার উল্লেখ করলাম শুধু প্রমথ-বাবুকে তাঁর প্রাপ্য প্রশস্তির অর্ঘ দিয়ে তাঁর সৎসাহসের জয়গান করতেই নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে তাঁকে আমার প্রণাম জানাতে যে তাঁর নির্দেশে বাংলা ভাষার যে ভঙ্গি আমি যৌবনেই অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছিলাম, উত্তরকালে কখনও সেজন্যে অনুতাপ করতে হয়নি। স্মৃতি-চারণে কোনও সাহিত্যিক থিওরি বা ভাষা-রীতির সমর্থন করতে গিয়ে বেশি তর্ক ফাঁদতে গেলে স্মৃতিচারণের স্বধর্ম লঙ্ঘন করা হবে, তাই এ বিষয়ে ইতি করি শুধু এইটুকু ব'লে যে, সে-যুগে প্রমথবাবু যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক না হয়েও তরুণ-মহলে গভীর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন তার কারণ তিনি ভাষার বর্তমান যুগধর্মের স্বভাবধারার ভবিষ্যৎ-গতি ঠিকই ধরেছিলেন তার ঐকান্তিক সাধনালব্ধ কোনো গভীর ইনটুইশনের আলোয়ই বলব, নৈলে রবীন্দ্রনাথ-যে-রবীন্দ্রনাথ তিনিও চল্লিশ বৎসরের অভ্যস্ত ভাষার ইডিয়ম ছেড়ে রাতারাতি মৌখিক ভাষার দিকে মোড় নিতেন না বয়াবরের জন্যে। এর পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার যে-দীপ্তি দিনে দিনে একটানা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতরই হ'য়ে উঠেছিল তার জন্যে প্রমথবাবুর সাহিত্যনিষ্ঠা ও সৎ-সাহসের কাছে কিছুটা ঋণ স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে চলতি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন অনেক আগেই বটে, কিন্তু তবু একথা না মেনেই উপায় নেই যে, তিনি খানিকটা প্রমথবাবুর যুক্তিতে সায় দিয়েছিলেন ব'লেই সেই যে সবুজপত্রে সাধু ভাষাকে পিছনে ফেলে কথ্য ক্রিয়াপদের পথে চলা শুরু করলেন—আর একটিবারও ফিরে চান নি তাঁর শেষদিন পর্যন্ত।

এ-সম্বন্ধে সত্যেনের সঙ্গে আমার কোনও দিন খোলাখুলি আলোচনা হয়নি। আমরা সবাই ধ'রে নিয়েছিলাম যে এবিষয়ে সে প্রমথবাবুরই তরফে। কিন্তু তার মধ্যে একটা অনাসক্ত নির্বিরোধী ভাব আমাদের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করত, কারণ আমরা দেখতাম সে পারতপক্ষে কাউকে আঘাত করতে চাইত না। প্রমথবাবুর সঙ্গে সে যে কখনই তর্ক করত না তা নয়, ধূর্জটির সঙ্গে সেও মাঝে তাঁর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ করত বৈকি, কিন্তু উদ্ধতভাবে কদাচ নয়। কারণ তাঁকে সে যে শুধু সমীহ করত তাই নয়—সত্যিই ভালবেসেছিল। শুধু সে বলি কেন?—আমরাও ভালবেসেছিলাম বৈকি। নৈলে আমরা তাঁর সবুজচক্রে অত ঘন ঘন যাবই বা কেন? প্রথম দিকে আমরা অনেকে তাঁকে প্রতিভাধর মনে ক'রে ভুল করেছিলাম বটে—বিশেষ ক'রে তাঁর "চারইয়ারি কথা" প'ড়ে —কিন্তু তারপরে আমরা তাঁর কাছে যেতাম তাঁর প্রতিভার আকর্ষণে নয়—তাঁর ব্যক্তি-রূপের টানেই বটে।

কিন্তু তবু মেজমামিমার সাবধান-বাণীর পরে আমাকে একটু সাবধান হ'তে হয়েছিল বৈকি। আমি আর তেমন প্রতি সপ্তাহে আসি না দেখে প্রমথবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন তেমনই সাদরে, কিন্তু আমার না-যাওয়ার আরও একটা অছিলা তখনই জুগিয়ে দিলেনঃ আমি জো'কে খেয়াল শেখা শুরু করলাম শ্রীবামাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাছে, টপ্পা রামকথক মহাশয়ের কাছে, ঠুংরি গৌরীশংকর মিশ্র, জমিরুদ্দিন, দৌলতরাম, সোনি ও হাফেজ খ্যালির কাছে। এর পরে লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন

বাই, কাশীর মোতিবাই ও এলাহাবাদের জানকী বাইয়ের কাছেও তালিম নিয়েছিলাম। —যদিও কবে ও কোন্ পর্যায়ে বলতে হ'লে ভাবতে হবে। মরুকগে, সত্যেনের কথায় ফিরে আসি।

প্রমথবাবুর ওখানে হাজিরি দেওয়া কমানোর ফলে কিন্তু সত্যেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একতিলও কমে নি। কারণ মেজমামিমার কল্যাণে আমি প্রায়ই নানা বন্ধুবান্ধবকে থিয়েটার রোডের বাড়িতে ডাকতাম আমার সংগীতচক্রে তথা গল্পগুজবের আসরে। এদের মধ্যে সুভাষের পরে সত্যেনই ছিল আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার পরে ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় ও নীরেন রায়। কিন্তু এখন সত্যেনের কথাই বলি।

সত্যেনের কাছে ভক্তি ধর্ম ধ্যান ধারণার কোনো প্রেরণা পাই নি অবশ্য, কিন্তু তার সত্যনিষ্ঠা আমার এত মন টানত যে সে যে ধর্মার্থী বা আস্তিক নয়, একথা আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারতাম না। সে মাঝেমাঝেই আমাকে স্নিগ্ধ ব্যঙ্গের সুরে হেসে বলত বটেঃ "আমার মতন নাস্তিকের দিকে তুই ঝুঁকলি কী ক'রে বলতো!" কিন্তু আমি এটুকু বুঝতাম যে সত্যেন সহজে ধরা দেয় না, তাই টুকতাম ঃ "তুমি কখনোই নাস্তিক নও। সত্যি নাস্তিক হ'লে তোমার আমার মধ্যে একটা ব্যবধান আসতই আসত।" একথা আজও আমি বিশ্বাস করি আরো এইজন্যে যে মুখে নিজেকে নাস্তিক বললেও সত্যেন তার চিঠিপত্রে বরাবরই ভাগবত সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাই প্রকাশ করত—সে-কথা একটু পরেই প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু চিঠিপত্রে অন্য সুর ধরলে হবে কি, কথাবার্তায় সে সহজে ধর্মের আলোচনায় বেশি কিছু বলতে চাইত না। আমার মনে হয়, তার প্রধান আপত্তি ছিল ধর্মের নামে ভড়ং—বা আপ্তবাক্যের নজিরে ভাবের আধ্যাত্মিকতা জাহির করায়। এসম্পর্কে একদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। কবি যতীন্দ্রমোহন বাকচি সেদিন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে আমার একটি শ্যামাসংগীত শুনে বলেন যে, এই মাতৃভাবের উপাসনায় ভারত অতুলনীয়। শুনবামাত্র সত্যেন হঠাৎ রুখে উঠে তর্ক জুড়ে দিল ও যতীন্দ্রবাবুকে চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে এমন কোণঠাসা করল যে তিনি রীতিমত রেগে উঠলেন। যুক্তিগুলি আমার মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে যে, সত্যেনের প্রতিপাদ্য ছিল—আমরা পরম ধার্মিক, আর য়ুরোপীয়রা বস্তুতান্ত্রিক—এ-ধরনের শস্তা বুকনি কেটে যারা সহজেই আত্মপ্রসন্ন হয়ে ওঠে তাদের আধ্যাত্মিক প্রগতির চেয়ে নৈতিক দুর্গতিই বেশি হ'য়ে থাকে। সত্যেন স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের কোনো তুলনামূলক সমালোচনা উঠলেই সদাপটে তর্ক জুড়ে দিত—কিন্তু তর্কের জন্যেই নয়, বুঝতে চেয়ে যে তুলনাটি সত্য হিসেবে গ্রহণীয় কি না। ওর মোদ্দা কথাটা ছিল সর্বগ্রাহ্যই বটে ঃ অর্থাৎ, পোপের ভাষায়—

To observations that ourselves we make we grow more partial for the observer's sake

অর্থাৎ

যা-ই কেন না বলি আমি জয়ধ্বনি তারি
বক্তারি খাতিরে করি—না ক'রে কি পারি?

ওর মন ছিল সত্যাশ্রয়ী, তাই ও জানত এই "আমি" ঠাকুরের বকমারি ফিচেল ফন্দি, জাল জুয়াচুরি—যার ফেরে প'ড়ে আমরা আত্মপ্রসাদকে অহরহ বাহবা দিতে উজিয়ে উঠি। জাতীয়তার জয়গান হ'ল এই ফন্দিবাজ আমির আর এক ফিকির যাতে ক'রে জাতির নাম দিয়ে আমি খোরাক পায়। সত্যেন মাঝে মাঝেই বলত ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরেঃ "একটা বুলি সত্য হয় কখন জানিস তো?—যখন অনেকে কোরাসে সে-বুলি কপচায় বারবার ও তারস্বরে।" জাতীয়তার গুণগানে আত্মপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠার বিপদ সম্বন্ধে ও অবোধদের মতন অন্ধ ছিল না বলেই পদে পদে সতর্ক হ'তে চাইত আত্মপ্রসাদের নষ্টামি সম্বন্ধে। ওর এই গভীর ও অটল সত্যনিষ্ঠা আমাকে বরাবরই শুধু যে উল্লসিত করেছে তাই নয়, সত্যনিষ্ঠার সমর্থনে ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চক্ষের নিমেষে পাকা যুক্তির অটল স্তম্ভ খাড়া করতে পারত ব'লে সে-সত্যনিষ্ঠা আমার চোখে হ'য়ে দাঁড়াত আরো মূল্যবান্ ও নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু তা ব'লে আমি কখনো একটি মস্ত ভুল করিনি—যা ওর কোনো কোনো বন্ধুকে করতে দেখেছি। সেটি হ'ল এই যে, ওর ব্যক্তিরূপের প্রধান বনেদ তথা চরম চূড়া ওর অনন্যসাধারণ বুদ্ধি। আমাকে সত্যেন নিজেই একদিন এ-সম্বন্ধে চমৎকার নির্দেশ দেয়। আমি ওকে বলি আমার কোনো এক গভীর সংকটলগ্নে কাতর প্রার্থনার ফলে হাবার মুখে জয়লাভ করা। ব'লে সরবে বলিঃ "হয়ত একথা শুনে তুমি হাসবে; কারণ, বুদ্ধি দিয়ে আমি আমার এ-উপলব্ধিকে প্রমাণ করতে পারি না।" ও হেসে সস্নেহে আমার দুই কাঁধে দুই হাত রেখে বলল: "তাই, বুদ্ধির দৌড় কার কত জানে বুদ্ধিমানেই। আমি জানি কেবল একটি কথা ঃ মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ তথা পাথেয় তার বুদ্ধি নয়—আন্তরিকতা, সততা।"

অতঃপর ধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে ও যখনই নিজেকে "নাস্তিক" বলত (আশ্চর্য—আমার পিতৃদেবও বলতেন!) তখনই আমি ওকে টুকতাম যে, আন্তরিকতাকে জীবনের সব
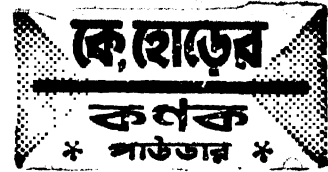
চেয়ে বড় দিশারি ব'লে যে-মানুষ জেনেছে, সে আর যাই হোক না কেন, শূন্যবাদী নাস্তিক হ'তে পারে না। ও এ-ধরনের প্রশস্তি শুনে যেন একটু খুশিই হ'ত ব'লে আমার মনে হ'ত, তবে এ আমার কল্পনাও হ'তে পারে। এবার ও যে নাস্তিক হ'তেই পারে না তার প্রমাণ প্রয়োগ করবার সময় এল : ওর নানা পত্র। কিন্তু তার আগে একটা কথা মনে পড়ছে, বললামই বা।

ঢাকায় একদিনের কথা মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে। বুদ্ধির প্রসঙ্গই উঠেছিল। আমি তুললাম রাসেলের কথা—যাঁকে আজো আমি গভীর শ্রদ্ধা করি তাঁর সত্যনিষ্ঠা, আশ্চর্য বুদ্ধি ও আন্তরিকতার জন্যে। ও বলল : "কী অত রাসেল রাসেল করিস—তিনি কিছু বুদ্ধ নন।" সেদিন চমকে উঠেছিলাম এই কথা শুনে, কারণ এর আগে কোনো-দিনও ওর মুখে কোনো মহাসাধকের গুণ-গান শুনি নি। তাই আমি ওর মুখের দিকে একটু আশ্চর্য হ'য়ে তাকাতেই ও বলল হেসে : "ঐ একটি লোককে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।" বাস্—আর কোনো কথা নয়। ও ধর্ম সম্বন্ধে যেন মুখ ফসকেই একথা ব'লে ফেলেছে এই ভঙ্গি ক'রে এ-প্রসঙ্গ চাপা দিল—কেন জানি না। যাক। বলি যা জানি।

বলেছি, ওর চরিত্রের অনেক গুণই আমাকে মুগ্ধ করত। ওদের মধ্যে একটি গুণের কথা আমি আজও সময়ে সময়ে অবাক হ'য়ে ভাবি : কখনো ভুলেও ও নিজের গুণগান করত না বা কোনো অছিলায়ই নিজের কীর্তিকলাপের কোনো খবর পর্যন্ত দিত না। আমি বলছি না ও মানস অহংকারকে জয় করেছিল মহাসাধকদের মত। পরমহংসদেব প্রায়ই বলতেন : "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" অর্থাৎ যার আমি-বোধ (অহংতা) নিরাকৃত হয়েছে তারই উপাধি জীবন্মুক্ত। সে-অবস্থা লাভ হয় শুধু ভগবানের পূর্ণ শরণাগতিতে—আর কিছুতেই নয়। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে আমাকে লিখেছিলেন : "যতদিন আমাদের নিজেদের অহংকার লুপ্ত হয় নি, ততদিন অপরকে অহংকারী ব'লে নিন্দা করা সাজে না।" সত্যেন একথা বুঝত তাই কাউকেই অহংকারী অপবাদ দিয়ে খর্ব করতে চাইত না। আমাকে একটি পত্রে একবার লিখেছিল (২৮-৩-১৯৫৫) : "আমরা কেউই শুকদেবের মত নিত্যশুদ্ধ নই ভাই, কাজেই সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণ ছুড়তে আমার ইচ্ছা হয় না।"

কিন্তু মনের গহনে নিজের গুণ মনীষা প্রতিভার জন্যে সচেতনতা যে-শ্রেণীর অহংকার, লোকের কাছে স্থূলে বা সূক্ষ্ম-ভাবে আত্মশ্লাঘা করাকে তো ঠিক সে-শ্রেণীর অহংকার বলা যায় না। তাছাড়া এ-ধরনের জাহিরিপনা অশোভন ব'লেই বেশি প্রকট হ'লে মানুষ অস্বস্তি বোধ করে, মেলামেশার ছন্দের সরল ধারা ঘোরালো হ'য়ে ওঠে। সত্যেন এ-ধরনের অসার জাহিরিপনার ছায়াও মাড়াত না—তার স্বভাবের এমন একটা সহজ শালীনতা ছিল যে, ভুলেও কখনো কোনো ছলেই সে নিজের ধামা বাজাত না, কেউ কোনোদিনও ওর কাছে এলে টের পেত না ওর কী অগাধ পড়াশুনো, কত জ্ঞান, কী গভীর পর্য-বেক্ষণশক্তি! আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু শ্রীশিবনারায়ণ সেন আমাকে একদিন বলে-ছিলেন, কি এক সংস্কৃত বইয়ের বিপুল পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি একদিন সত্যেনের কাছে যেতেই সে পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে ও দু-তিন দিনেই আদ্যন্ত প'ড়ে ফেরত দেয়। গভীর মনো-নিবেশের শক্তি ও অফুরন্ত কৌতূহল। এই দুটি গুণ ছিল ওর প্রায় সহজাত—কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত। এক বিখ্যাত লাটিন ভাবুক বলেছেন :

"Homo sum: humani nil a me alienum puto *"

একথা সত্যেনের মুখেও মানাত, কারণ কৌতূহলের ওর অন্ত ছিল না। একদিন ওর ওখানে গিয়ে দেখি চীনা হরফ নিয়ে পড়েছে, আঁকছে আর মুছছে। তিব্বতী ভাষাও বোধহয় ও শিখতে চেয়েছিল। সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে সংস্কৃত, ঐতিহাসিক-দের সঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, গীতজ্ঞদের সঙ্গে সংগীত, কবিদের সঙ্গে কাব্য কোনো আলোচনাতেই ও পেছপাও হ'ত না। আরো আশ্চর্য এই যে, এসব আলোচনাতে ও শুধু ঔৎসুক্য প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত না, এমন সব মন্তব্য করত যে বিশেষজ্ঞরাও খুশি না হ'য়ে পারতেন না। অন্তত সংগীত ও সাহিত্য নিয়ে আমি এবং ওর আরো নানা বন্ধু ওর সঙ্গে বহুবারই আলোচনা ক'রে বিশেষ লাভবান হয়েছি একথা হলপ ক'রে বলতে পারি।

ওর মন ছিল আশ্চর্য খোলা, জানবার বুঝবার ঔৎসুক্যও ছিল ওর অফুরন্ত। যা কিছু অনুধাবন ক'রে জানা যায় ও জানতে চাইত। বেকন একটি বিখ্যাত চিঠিতে একবার লিখেছিলেন :

"I have taken all knowledge to be my province"

অর্থাৎ যেখানেই জানবার কিছু আছে পড়ে আমার এলাকার মধ্যে। এ চিঠি সত্যেনও লিখতে পারত ওর উপলব্ধির স্বাক্ষরে।

কেবল ধর্ম নিয়ে ও বেশি আলোচনা করত না। হয়ত এইজন্যে যে ওর মনে একটি অবচ্ছা ভয় বা দ্বিধা ছিল যে ধর্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে গেলে ওর চেপে-রাখা ধর্মপ্রবণতা ওকে দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেবে ঝোঁকের মাথায়। ও চাইত চিরদিন স্থিতধী থাকতে—বহু বৎসরের সংযমসাধনায় ধীমান্ হ'তে ও খানিকটা পেরেছিল বৈকি! কিন্তু ধর্ম-সাধনার মধ্যে অনেক কিছু না বুঝে মেনে নিতে হয়—ধর্মের এই দাবি ও কোনো দিনই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি ব'লে আমার মনে হয়। কেন মনে হয় বলছি—অন্তত আমি যেভাবে ওকে বুঝেছি। যদি ওকে ঠিক বুঝতে না পেরে থাকি তাহ'লে ও নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে; কেননা ও প্রায়ই বলত একটি কথা : "আমরা নিজেদেরকেই না কতটুকু বুঝি?"

(ক্রমশ)

* আমি মানুষ কাজেই মানুষ সম্পর্কীয় কোনো কিছুর প্রতিই আমি উদাসীন হ'তে পারি না—Terence.

চিত্র প্রদর্শনী

লণ্ডনে উইনস্টন চার্চিলের চিত্রকলা প্রদর্শনী

সম্প্রতি রয়েল একাডেমীর ডিপ্লোমা গ্যালারীতে সার উইনস্টন চার্চিলের যে চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যে কোন একজন নিরপেক্ষ কলা সমালোচকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে চার্চিলের ব্যক্তিত্ব এড়িয়ে তাঁর শিল্পপ্রতিভার প্রকৃত বিচার করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, চার্চিলের নাম যদি কারও জানা না-ও থাকত, তাহলেও তাঁরা এই ছবিগুলির সমাদর না করে পারতেন না। ছবিগুলি একজন শৌখিন শিল্পীর আঁকা বটে, কিন্তু প্রতিটি ছবি নিঃসন্দেহে শিল্পীর স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

সাধারণ মানুষ শিল্পের রস বিচারের চেয়ে শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেই বেশী করে আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। তাই তারা দলে দলে রয়েল একাডেমীতে অনুষ্ঠিত চার্চিলের চিত্রপ্রদর্শনীতে এসে ভিড় করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই রয়েল একাডেমীতেই একদিন অনুষ্ঠিত হয়েছে অগস্টাস জন ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্র-প্রদর্শনী।

তারা এখানে এসে দেখতে চায় তাদের প্রিয় রাষ্ট্রনীতিক, রাজনৈতিক বক্তা, ঐতিহাসিক এবং যুদ্ধকালীন নেতা তাঁর নিজের অবসর যাপনের জন্য রাজমিস্ত্রীর কাজ ছাড়াও আর কি কাজ করেছেন। খুব সম্ভব তারা হতাশ হয় নি। সার উইনস্টন "ডেভিড উইন্টার" এই ছদ্মনামে রয়েল একাডেমীর নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন প্রদর্শনীতে চিত্র-প্রদর্শনের পর অনারারী একাডেমিশিয়ান একস্ট্রা-অর্ডিনারী আখ্যা লাভ করেন।

চিত্রাংকনের শখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। জেনারেল, বিশপ, অভিনেতা এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে অনেকেই রবিবারে এবং অন্যান্য ছুটির দিনে রঙ আর তুলি নিয়ে বসেছেন ছবি আঁকতে—এই ছবি এঁকে তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন প্রচুর, যদিও তাঁদের এই ছবি অনেক সময় শিল্প-রসজ্ঞদের কাছে মূল্যহীন হয়েছে।

সার উইনস্টন এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন, সেই জন্য তিনি ফরাসী এবং ইংরাজ পেশাদার চিত্রকরদের কাছ থেকে সকল সময় উপদেশ গ্রহণ করেছেন এবং অগস্টাস জন থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের সকলের কাছ থেকে নানাভাবে চিত্রাংকন সংক্রান্ত জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় জেনে নিয়েছেন।

তিনি তাঁর নিজের আনন্দের জন্য ছবি আঁকেন, যত বেশী এই দিকে তিনি পরিশ্রম করতে পারেন তত বেশী তাঁর আনন্দ; অবশ্য তিনি জানেন শিল্প-সাধনায় একটা জীবন কিছুই নয় এবং কোন মহৎ শিল্পীই তাঁর সাধনায় পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। তবু তিনি আত্মস্থ হতে চেয়েছেন, কারণ তিনি জানেন শিল্পোপলব্ধির জন্য আত্মস্থ হবার প্রয়োজন তাঁর আছে। ১৯১৫ সালে এডমিরালটি ত্যাগ করে আসার পর তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন। এই সময় তিনি মন্ত্রিসভার একজন সদস্য; ছবি আঁকতেন তাঁর অবসর সময়ে। লেডী লেভারি তাঁকে এই শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন এবং রঙ আর তুলির ব্যবহারে সাহসী হতে উপদেশ দেন।

তাঁর বক্তৃতার ভাষা যেমন আলঙ্কারিক তাঁর তুলির ব্যবহার তেমন আলংকারিক নয়। ১৯১৯ সনে ফ্ল্যান্ডার্সে আঁকা বাস্তবধর্মী চিত্র প্লাগ স্ট্রীট এবং ঐ বৎসরে আঁকা প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্র সানসেট এ্যাট ফগ এই দুটি চিত্র দিয়ে তাঁর শিল্পীজীবন শুরু হয়। ডিপ্লোমা গ্যালারীর এই প্রদর্শনী সম্পর্কে একটা উল্লেখ্য কথা হল এই যে, ৪০ বৎসর ধরে আঁকা ৬০টি ছবি এখানে প্রদর্শিত হয় এবং সমস্ত ছবিই সমালোচনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসে; একজন শৌখিন শিল্পীর পক্ষে তা নিশ্চয় গর্বের বিষয়।

'মেরাকেশ' ঃ সার উইনস্টন চার্চিল অংকিত একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য
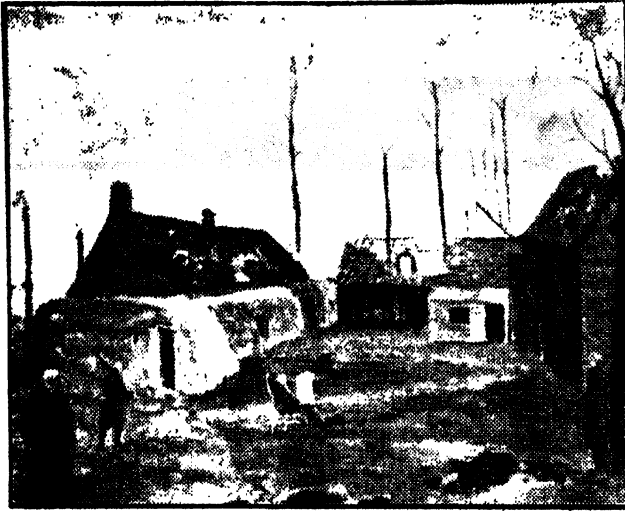
সার উইনস্টন চার্চিল অঙ্কিত চিত্র প্লাগ স্ট্রীট

সার উইনস্টন শৌখিন শিল্পীদের প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি প্রদর্শন করতে কখনও সম্মত হন নি, যদিও তাঁর কোন ছবিই বিক্রয়ের জন্য নয়। তাঁর ছবির প্রিয় বিষয়গুলি হল প্রধানত জল, সাঁকো, তুষার, সূর্যালোকিত গাছ, বাগিচা এবং ভূমধ্য-সাগরীয় দৃশ্যাবলী যা প্রত্যেক শিল্পীই কোন না কোন সময় এঁকেছেন।

কি কি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ বেশী এবং অবকাশ যাপনের সময় কি কি বিষয়ে তিনি আনন্দ পেয়েছেন বেশী তা তাঁর ছবিগুলি থেকে বোঝা যায়। ১৯২১ সালে আঁকা কায়রোর কয়েকটি সুন্দর চিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। চার্টওয়েলে তাঁর নিজের বাড়িতে আঁকা কৃষ্ণবর্ণের হাঁস এবং মাছের কয়েকটি ছবিও উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর একটি চমৎকার ছবি হল **দি লুপ রিভার**—একটি প্রবহমান নদী; ছবিটি এখন স্টেট গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। ১৯২০র দশকে সিমিজানে আঁকা গাছের ছবিগুলি এবং তার কয়েক বছর আগের আঁকা মারাকেশের ছবিগুলি সত্যই সুন্দর। ভেনিসে যে সমস্ত ছবি তিনি আঁকেন, সেগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি। সেতুর ছবি তিনি এঁকেছেন যথেষ্ট কিন্তু তিনি এ কাজেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি। ভূমধ্যসাগরে অবকাশ যাপন-কালে তিনি যে সমস্ত ছবি আঁকেন, তাও পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ হয় নি। তাঁর আঁকা ফুলের ছবি কোন কোনটি সুন্দর হয়েছে। যদিও তিনি ফল, ফুল প্রভৃতি স্টিল-লাইফ চিত্র অংকনে পুরোপুরি পটুতা দেখাতে কখনও পারেন নি। ১৯৩০ সালে আঁকা একটি যুদ্ধচিত্র উল্লেখের দাবী রাখে।

চার্চিলের সাম্প্রতিক ছবিগুলি থেকে বোঝা যায় শিল্প-প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পর্যায়ে তিনি কি পর্যন্ত সচেতন থেকে তাঁর পরিপূর্ণ শিল্পোপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করতে চেয়েছেন, শিল্প-শিক্ষার জন্য তাঁর আগ্রহ কতদূর গভীর। সত্য কথা কি মানুষটির অন্য কর্মপ্রচেষ্টার কথা ভুলে কেবল তাঁর এই শিল্পকর্মের কথা যদি বিচার করা যায়, তাহলে স্বতই এই কথা মনে হয় ১৯৫৯ সালে ৮৫ বছর বয়সে এখনও শিল্পকর্মে যে শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। তাঁর শিল্পী জীবনের ভবিষ্যৎ এখনও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ।

ফ্রেডারিক লজ (ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার কলা সমালোচনা)

ঊনত্রিশ

বাসন মাজতে মাজতে চম্পি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কলুপাড়ায় কাদের বাড়ি যেন বিয়ে। পুকুরের পশ্চিম পাড় দিয়ে সার বেঁধে সব জল সাধতে চলেছে। একটা গলা-চেরা শানাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। একটা ঢোল আর কাঁসি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

চম্পি সেদিকে চেয়ে ছিল। বগি থালা-খানা আধ মাজা হয়েছে। আর দুচারটে ঘষা দিলেই সাফ হয়ে যায়। তবু তার হাত আটকে গেল। শেষ বউটিও এক সময় পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। শানাই কাঁসি ঢোলের আওয়াজও আর শোনা যায় না। তবু চম্পি হাত তুলে বসে রইল। কাজের উৎসাহটাকে এক নিমেষে কে যেন শুষে বের করে নিয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হতে তখনও দেরি আছে। জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরম সারাদিন গ্রামখানাকে যেন ভেজেছে। এখন পুকুরের জল থেকে তার ভাপ উঠছে। এখানে তবু ত অনেক ঠাণ্ডা। ঘরের ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে।

কিন্তু এই পুকুরের ঘাটও চম্পিকে আর আরাম দিচ্ছে না। অথচ সেই আরামটুকু পাবার জন্যই না বেলা পড়লে সে তাড়াতাড়ি ঘাটে এসে বসেছিল। এনেছিল বাসনের পাঁজা। বেশ তোড়জোড় করে মাজতেও বসেছিল। এই সময় কলুপাড়ার জল-সাধার দলটা তার চোখের উপর দিয়ে বাজনা বাদ্যি বাজিয়ে গাঙের দিকে চলে গেল। আর অমনি একটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় চম্পির বুকখানা যেন খালি হয়ে গেল। তার দৃষ্টিতে অপার শূন্যতা নেমে এল।

চম্পি কিছু করছিল না, কিছু দেখছিল না, কিছু শুনছিল না।

অনেকগুলো তে-কাটা মাছ বুজ্‌বুজ্‌ করে চম্পি ঘাটের যে তাল-গুঁড়িটার উপর বসেছিল তার নিচে ঘুরছিল। সেই মোটা সোটা বেলে মাছটা, চম্পি যার নাম রেখেছে ভোম্বল, একটু একটু করে এগিয়ে এসে জলের তলে চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। অন্যদিন চম্পি তার সঙ্গে অনেক কথা বলে। গল্প করে। মুঠ মুঠ এটো-কাঁটা ছড়িয়ে তাকে যত্ন করে খাওয়ায়। ধারেকাছে যদি কেউ না থাকে তবে মৃদুস্বরে তার কাছে অনেকের নিন্দে করে।

আজ ভোম্বল যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে, সেদিকে চম্পির নজর পড়ল না। দম দেওয়া পুতুল, হাত পা নাড়ছিল যেন, হঠাৎ দম ফুরতে মাঝপথে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই গ্রামের আরেকটি মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটল। চম্পি খবরটা যেন তার মনকেই দিল। হুস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কাদের মেয়ের বিয়ে? কলুপাড়ার কাউকে সে চেনে না, তাই বুঝতে পারল না।

নিশ্চয়ই সে আমার চেয়ে ছোট। কলুরা খুব ছোট ছোট মেয়ের বিয়েই দেয়। বড়দিরও খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছে। গৌরীদান করেছিলেন বাবা। সেজদির বয়েস তের পেরতেই গ্রামে গেল গেল রব উঠেছিল নাকি! বাবা অন্নজল ত্যাগ করে পাত্তর খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ভাল একটা জমি বিক্রী করতে হয়েছিল সেজদির বিয়েতে। তাইতে মেজকাকা খুব রাগ করেছিলেন। অনেকদিন ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তি চলেছিল। সেজকাকা বা ছোট-কাকার মত নন মেজকাকা। পৈত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁর অধিকারবোধ প্রবল। ভাগের টাকার অধিকার তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়েন নি। তাই ছোটকাকার বিয়েতে পণ নিয়ে সেই টাকা মেজকাকাকে দিয়েছিলেন বাবা। আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সম্পত্তি বেচে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাইত আমার বিয়ে দেবার জন্য বাবার আর তেমন চাড় নেই।

চম্পি হতাশ হয়ে মনে মনে যেন পুকুরটাকেই শোনাল। ষোল পূর্ণ হয়েছে তার। নিটোল স্বাস্থ্যের জন্য আরও বড় দেখায়। সে কারণে খোঁটা খেতে হয় উঠতে বসতে। সে নাকি হাতি।

চম্পির বয়েস যত বাড়ছে ততই সে গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। পারলে সে পাতালে প্রবেশ করত। কত ছোট জগতে তার এখন ঘোরাফেরা! এই বাড়িটুকুর মধ্যে! রান্নাঘর আর শোবার ঘর। একমাত্র মুক্তির আস্বাদ সে পায়, এই পুকুর ঘাটে এলে।

এ আমারই মতন। নির্দিষ্ট চৌহদ্দীর বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। আমারও নেই, পুকুর, তোমারও নেই। এক অভাগী যেন আরেক অভাগীকে সমবেদনা জানাল।

চম্পি অভাগী বই কি? এই গ্রামে অবিয়েত আর কোন মেয়ে তার বয়সী নেই। বয়সী যে মেয়েরা ছিল, কবেই তাদের সিঁথেয় সিঁদুর উঠেছে। অনেকের কোলে ছেলে মেয়েও এসে গেছে। একমাত্র তারই কোন গতি হল না। তার চেয়ে ছোট অনেক মেয়ে ছিল এই গ্রামে। তাদেরও অনেকে পার হয়েছে। তাদের মা কাকীরা ঘাটে আসে। ঠেস দিয়ে, ঠেকার দিয়ে অনেক কথা শোনায়। মার কানে সে সব কথা গেলে চম্পির লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকে না।

কথা শোনার মেয়ে চম্পি নয়। সে-ও জবাব দিয়েছে মুখে মুখে, তর্ক করেছে মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। বিয়ে যে হচ্ছে না তার, এ যেন তারই দোষ। সে যেন পৃথিবীর ছেলের বাবাদের সঙ্গে আগে ভাগে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, যাতে তাকে কেউ পছন্দ না করে। কথার ভাব দেখলে গা জ্বলে যেত চম্পির।

তখন সে ঝগড়া করত, কারণ তখনও তার আশা যায় নি। সে নিয়মিত শিবপূজা করত, গোকাল করত। শিবের মত স্বামী পাবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করত। চোদ্দ থেকে সে পনেরতে পড়ল, পনের উতরে ষোলয়, সেই ষোলও বুঝি যায়!

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পি আশা

হারিয়ে ফেলেছে। এই ক' বছরে তার গোটা পাঁচেক সম্বন্ধ এসেছিল। একজনও পছন্দ করে নি। প্রতিবার সে পরিপাটি করে সাজতে বসেছে, বিনম্রভাবে এসে বসেছে কয়েকজন অপরিচিত লোকের সামনে, পরীক্ষা দিয়েছে সাধ্যমত। কিন্তু তাকে পছন্দ হয় নি কারও। সে কালো, সে দেখতে ভালো নয়, হাতির মত বড়। সে হাতি।

তারপর ক'দিন ধরে নিঃশব্দ এক লাঞ্ছনা চলেছে তার উপর। বাবা যেন কেমনভাবে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাকে; মার স্তব্ধ মুখে কি মুখর গঞ্জনা, পাড়াপ্রতিবেশীর মুখে চাপা বিদ্রুপ। কিন্তু উপেক্ষার এক কঠিন বর্ম গায়ে দিয়ে চম্পি ঘুরে বেড়িয়েছে। একটি শরও তার গায়ে বেঁধে নি। কারণ, তার আশা মরে নি। এমনি করে চারবার সে আত্মরক্ষা করেছে অমিত বিক্রমে।

কিন্তু পাঁচবারের বার আর সে পারে নি। চরম হার সে হেরেছে। তাকে সেবার যারা দেখতে এসেছিল, যূথীকে তাদের বড় পছন্দ হয়েছিল। তারা সেধে লোক পাঠিয়েছিল কয়েকবার যূথীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। এ-খবরটাও ছিল ভাল। ওদের তরফে আগ্রহ যেমন প্রবল ছিল তাতে নামমাত্র খরচেই যূথীকে পার করা যেত। কিন্তু বাবা তাতেও বাদ সাধল। সে যে যূথীর বড়। বড়কে রেখে ছোটর বিয়ে ভাল দেখায় না। তাই শেষ পর্যন্ত এ সম্বন্ধ হাতছাড়া করতে হল।

বাবা আবার তেমন চোখে তার দিকে দিনকতক চাইতে লাগলেন। মার মুখে অব্যক্ত গঞ্জনা ফুটে উঠল। পাড়াপ্রতি-বেশীর মুখে চোখে বিদ্রুপের বান ছুটল। তাতে চম্পি বিচলিত হয় নি। কিন্তু মোক্ষম মার তাকে মারল যূথী। তার চেয়ে দু' বছরের ছোট, তার আপন বোন, যূথী।

যূথীর চোখে বিষ ঝরতে লাগল। তার তীব্রতায় অস্থির হয়ে উঠল চম্পি। কি বিদ্বেষ, কি ঘৃণা যূথীর দৃষ্টিতে! প্রতি-নিয়ত যূথীর কটা চামড়া চম্পিকে যেন ছ্যাঁকা দিতে লাগল। ওর গর্বিত ভঙ্গী যেন বলতে লাগল, নিজে ত চিরকাল আইবুড়ো থাকবি, আবার আমার ভবিষ্যৎও খাবি। তোর জীবনে ধিক! তুই মর, তুই মর না।

যূথী তারপর থেকে কোনদিন আর তাকে দিদির সম্মান দেয়নি। সংসারের কাজে কর্মে তার যেটুকু ভাগ, তাও বাঁদীজ্ঞানে চম্পির উপর তুলে দিয়েছে। আগে হলে চম্পি কখনই এসব সহ্য করত না। এখন চম্পি যে আর সে চম্পি নেই। তাই অপমান সে এখন হজম করে। চুপচাপই থাকে।

যূথীর উপর লোকের এত টান কেন? কি জানে সে? জীবনে বইয়ের পাতা ওল্টায় না, সামান্য লিখতে জানে, কিন্তু কি বিশ্রী তার হস্তাক্ষর! একপদও রাঁধতে জানে না, শিল্পকাজের ধারে কাছেও কখনও ঘেঁষেনি। তবু তার দর কত চড়া! কারণ তার রংটা ফরসা।

আর চম্পি কালো। তার চামড়ার রংটুকু ময়লা বলে তার সব গুণ শূন্য হয়ে গেল। বাড়ির স্কুল থেকে সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিল। পড়াশুনা করলে সে জলপানি পেত। মেয়েদের ইস্কুল ঝিনেদায়। তাই তার লেখাপড়া হল না। মুক্তোর মত হাতের লেখা চম্পির। ক্রোচেটের কাজ শিখেছিল বক্সিদের সেজ ছেলের বউয়ের হাতে পায়ে ধরে। কতরকম রান্না জানে সে। কীর্তনে তার অপূর্ব গলা খোলে। প্রত্যেকটা জিনিস সে শেষ পর্যন্ত শিখতে চেয়েছিল। কোনটাই শেখা হয় নি। সুযোগ পায় নি। এই অজ পাড়াগাঁয়ে। কেউ সাহায্য করে নি। সামান্য উৎসাহও কারও কাছ থেকে পায় নি সে। তবুও সব দিক থেকে সে এই গ্রামে চৌকস মেয়ে। কিন্তু সে কালো। কালো কালো কালো। তাই সে কিছু না। কিছু না।

চম্পির এম্ব্রয়ডারির কাজ দেখিয়ে শ্রীনাথ কাকার মেয়ে সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল সেবার। শুধু শ্রীনাথ কাকা কেন, কায়েত পাড়ার অনেক মিঞাই চম্পির হাতের নানা কাজকে নিজের মেয়ের কাজ বলে চালিয়েছেন। তারা সব তরে গেছে। শুধু চম্পি পড়ে আছে। ভগবানের এ কেমন বিচার? নকল জিনিস আসলের চেয়ে ভাল চলে!

অথবা চম্পি যে-গুলোকে এতকাল গুণ বলে মনে করেছে, সে-গুলো কোন গুণই না। বাঙালীর ঘরের মেয়ের একমাত্র গুণ তার চামড়ার রঙ। সেখানে চম্পি মার খেয়েছে। সে কালো।

এক একটা বিয়ে হয় গ্রামে আর চম্পিকে জানিয়ে দেয় সে কালো। তার বিয়ে হবে না। সে কালো। কালো।

চম্পির কাছে নতুন দিন কোন বার্তা বয়ে আনে না। রাত অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। ছয় ঋতুর নিয়ত পরিবর্তন কোন সম্ভাবনার আগমনী গায় না। চম্পি গোকাল পুজো ছেড়ে দিয়েছে। শিব গড়িয়ে আর প্রার্থনা জানায় না। অধিকাংশ সময়েই মুখ বুজে খাটে। কখনো কখনো বিদ্রোহ করে।

শুধু যূথীর সঙ্গে তার যদি শুতে না হত।

দূরে আবার সানাইয়ের শব্দ ভেসে উঠল। ওরা জল সেধে ফিরছে। এ কী, এতক্ষণে যে একটাও বাসন মাজা হয় নি। ছিঃ।

চম্পি সম্বিৎ ফিরে তাড়াতাড়ি হাত চালাতে গেল। কে যেন ডাকল, চম্পি না, ও চম্পি। চম্পি ও ঘাটে চোখ ফেরালো। ওমা, শৈলদি যে। বাঃ, বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে ত শৈলদির। কবে এল?

চম্পি একটু হাসল সেদিকে চেয়ে।

বলল, শৈলদি যে, কবে আলে?

শৈল বলল, কাল এসেছি রে। বাবা বললেন, অনেকদিন পরে দেশে যাচ্ছি শৈল, আম কাঁঠাল খেয়ে আসি, যাবি? ওদেরও অমত হল না, চলে এলাম। বাড়ি পরিষ্কার করতেই কাল আর আজ সারাদিন কাটল। তাই একটু গা ধুতে এলাম।

চম্পি বলল, বেশ করিছ। চার, পাঁচ বচ্ছর হয়ে গেল তুমরা আর এ মুখো হও নি। পত্তর পাঠে জানলাম কলকাতায় বিয়ে হল তুমার। তুমার ভাগ্যটা খুব ভাল শৈলদি। এ গেরামের সকলের উপরে তুমি টিক্কা মারিছ। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি সুজা কথা!

সঙ্গে সঙ্গে হাত চালাল চম্পি। বাসন অনেক। সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকার ধীরে ধীরে শৈল আর চম্পির মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে লাগল। মুখ চোখ অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। শুধু গলার স্বরে দুজনের অস্তিত্ব ঘোষিত হতে লাগল।

কিছুদিন থাকবা ত শৈলদি? আম কাঁঠাল ফুরোলি যাবা?

ও বাপ, তা কি হওয়ার জো আছে রে। সঙ্গে পেয়াদা এসেছে। মাত্র সাতদিনের মেয়াদ। উনি নিজে আসতে পারলেন না ত। আপিসের কাজ। কাজ না ছাই।

খিলখিল করে হাসি বেজে উঠল। শৈলদি হাসছে। শৈলদির হাসি, শৈলদির গলার স্বর তার মত মিষ্টি না। তবু শৈলদির বিয়ে হয়, তার গায়ের রংটা ফরসা। কিন্তু এখন, এই ত অন্ধকার নেমেছে, গায়ের রং ঢাকা পড়েছে, এখন পাশাপাশি যদি দাঁড়ায় চম্পি আর শৈলদি, দুজনে যদি শুধু কথা বলে যায়, হাসে, তাহলে কি তার কাছে শৈলদি দাঁড়াতে পারে?

কাজ না ছাই। শৈল খিলখিল করে হাসল। আসলে কি জানিস? ও'র বড়
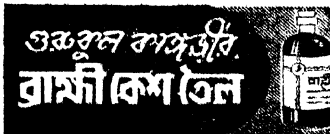
ম্যালেরিয়ার ভয়। তাই বাবাকে ঐ কথা বলে এড়িয়ে গেল।

চম্পিও হেসে উঠল। সুরে বাঁধা তরঙ্গের তারে যেন নিপুণ আঙ্গুল কে চালিয়ে দিল।

বল কি শৈলদি, জামাইবাবুর এত ম্যালেরিয়ার ভয়!

চম্পি আবার হাসল। সেই অপূর্ব সুরেলা হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে যেন পুলকময় ছড়িয়ে পড়ল। চম্পি অনেকদিন পরে হাসল। কোন সুযোগই সে আজকাল পায় না, যাতে একটু হাসতে পারে। শৈলদিকে শোনাবার জন্যই সে এই হাসি ব্যবহার করেছিল। দেখল তা ব্যর্থ হয় নি।

শৈল নিজেও অবাক হল, হাসিতে এত ঝঙ্কার ওঠে! শৈলও হাসল।

শুধু কি তাই ম্যালেরিয়ার ভয়, ভয় যে কত রকম ও'র, কি বলব? পাছে আমি হারিয়ে যাই, সেই ভয়ে লক্ষ্মণ ভাইকে সঙ্গে পাঠিয়েছে।

তারে বুঝি ম্যালেরিয়া ছোঁবে না?

চম্পি আবার হাসল। আজ সে কথায় কথায় হাসবে। সে শুনেছে, শৈলর হাসির রং এর মধ্যেই জ্বলে গেছে। শৈলদিও হাসছে ত, কিন্তু তার কাছে সে হাসি কত ম্যাটমেটে।

চম্পি বলল, নিজের পিরানের দাম আঠারো আনা, আর সব বুঝি নীলামওয়ালা ছ ছ পয়সা।

যা বলেছ ভাই।

শৈল আর চম্পি একসঙ্গে এবার হেসে উঠল।

বউদি, ও বউদি।

সুহাস ব্যস্ত হয়ে ডাক দিল। চম্পির কানে মেয়েলী হাল্কা একটা রিনরিনে সুর বেজে উঠল। শৈলদির দেওর। বাব্বা, ছেলেটার টান ত খুব বউদির উপর।

খিলখিল হাসিতে চম্পি ফেটে পড়ল। কলকাতার লোক ভাবে পাড়াগাঁয়ে বুঝি আর লোক থাকে না।

বলল, ওই ন্যাও, শৈলদি তুমার পিয়াদা আইছেন বোধ হয়। গায়ে আর ম্যালেরিয়া না লাগিয়ে উঠে পড়।

শৈল আর চম্পি এমন হাসি হাসতে লাগল যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শৈলর দেওর চুপ মেরে গেল। শৈল উঠে পড়ল।

শৈল বলল, এসো না ভাই, কাল দুপুরে। একটু কথা বলা যাবে। কে-ই বা আর আছে।

চম্পি জবাব দিল না। সে তখন উৎকর্ণ হয়ে শৈলদির দেওরের ধমকানি শুনছে।

এই সন্ধ্যেয় পুকুরের জলে নাইলে? জ্বর হল বলে তোমার। বাপের বাড়ির সব ভাল বলে কি ম্যালেরিয়াও ভাল?

ছ্যামড়াটার ত বড় পাকা পাকা কথা। মুখ টিপলি বোধ হয় এখনও দুধ বেরয়। কিন্তু কথা বলছে যেন মার্কণ্ড বুড়োর মত।

হঠাৎ চম্পির কানে এল, হাসছিল ও কে বউদি? খুব সুন্দর হাসিটা না?

শৈলর উৎফুল্ল গলাও শুনতে পেল, ও বড় গুণের মেয়ে ঠাকুর পো। ওর অনেক গুণ।

আর কিছু শুনতে পেল না চম্পি। শৈলদির একটা মন্তব্যেই তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। নিত্যদিনের অবজ্ঞা উপেক্ষা বিদ্বেষ বিদ্রূপের মাঝখানে হঠাৎ এই প্রশংসাটুকু বিধাতাই যেন শৈলদির মুখ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক, অনেক দিন পরে চম্পির মনের বন্ধ কপাটগুলো খুলে গেল। বন্ধ গুমোট কেটে গেল। খোলা হাওয়া যেন ছুটোছুটি করতে লাগল। একটা অকারণ খুশি ঠেলে ঠেলে উঠছে। মন গুন গুন করে সুর ভাজছে।

শৈল যখন চম্পিকে তাদের বাড়িতে যেতে বলেছিল, তখন চম্পি সে-কথার কোন জবাব দেয়নি। কেন না চম্পি কোথাও আর আজকাল যায় না। অথচ আগে এই যূথীর মত বয়সেও চম্পি কত ঘুরেছে পাড়ায়। কত মেয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। আসন তৈরী শিখাবার জন্য। কত মেয়েকে সে যে উলের আসন তৈরী করে দিয়েছে তার ঠিক নেই। তাকে ওরা ডেকে নিত আসন শিখবার জন্য। কিন্তু শিখত না কেউ ই। টাকা খরচ করে মাল মসলা কিনত? ভাল ভাল চট, উল, লেসের সুতো, এমব্রয়ডারির সাজ সরঞ্জাম। তোড়জোড় করে আরম্ভও করত, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কারোরই কাজে উৎসাহ ছিল না। পরিশ্রম করতে চাইত না। এক ফোঁড় দু ফোঁড় দিয়ে ফেলে রাখত। চম্পি সেই সব অসমাপ্ত কাজ বাড়িতে নিয়ে আসত। রাত জেগে জেগে শেষ করত কাজগুলো। তারপর দিয়ে আসত যার জিনিস তাকে।

আরও একটা কাজ সে করত। ভাল ভাল উল, কাপড়ের টুকরো, লেসের সুতো, কুরুশ কাঁটা সে সরিয়ে ফেলত। টুনি বলে একটা আহ্লাদে মেয়ে ছিল, এই শৈলদির খুড়তুত বোন। অকর্মার ধাড়ি। তার একটা কাঁচি সে চুরি করেছিল। টুনি তাকে সন্দেহ করেছিল ঠিকই। চম্পিকে সে মুখে কিছু বলে নি। কিন্তু সব বাড়িতে বলে এসেছিল, চম্পি চোর। তারপর থেকে সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। চম্পি যেদিন সেকথা জানতে পারল, সেদিন সে মর্মান্তিক চটে গিয়েছিল। অপমানে তার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। সে চোর! চোর? একে কি চুরি বলে? অমন সুন্দর

জিনিসটার তোর হাতে ত মর্চে ধরত। কোন কাজেই লাগাতিস নে। আমি তাকে কাজে লাগাচ্ছি। আমি চোর হলাম। কিন্তু চম্পির যুক্তিতে জোর থাকত না। তার নিজেরই মনে হত কাজটা ঠিক হয় নি। সে চুরিই করেছে। তাই সে আর কোথাও বের হত না। অনেকবার মনে হয়েছে কাঁচটা সে না হয় ফেরতই দিয়ে আসবে। টুনিকে বলবে, অন্যমনস্কভাবে নিয়ে এসেছিল। এই নাও ভাই তোমার জিনিস। নষ্ট করি নি। কিন্তু চম্পি তা পারে নি। পারা যায়ও না। টুনি খুব ঠ্যাকারে মেয়ে। আরও অনেক কেলেংকারী সে ছড়াত। তার চেয়ে এই ভাল। না দেওয়াই ভাল। যার যা ইচ্ছে সে তাই ভাবুক। চম্পি সেধে সেধে ত কারোর বাড়িতে যাচ্ছে না। যাবেও না।

সে আর যায়ও না কোথায়। সেই টুনির বিয়ে হয়েছে। চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে। তবুও সে বেরয় না। আজকাল ত বেরতে ইচ্ছেও করে না।

তাই শৈলর ডাকে সে সাড়া দেয় নি। কিন্তু শৈলর মুখে তার অবিমিশ্র প্রশস্তি শোনার পর তার মন ঘুরে গেছে। সে বড় গুণের মেয়ে। গুণের মেয়ে, তার দাম আছে। সে তুচ্ছ নয়, ফেলনা নয়, গুণের মেয়ে। সারাদিন গুনে গুনে কথাটা তার কানে বেজেছে। অজস্রবার খুশি করেছে তাকে। বাড়ির প্রত্যেককে, প্রতিটি কাজকে তার আজ অন্যমানা বলে মনে হয়েছে।

শৈলদি নিজে ত লোক ভাল, তাই সবাইকে ভাল দেখে। কাজকর্ম সব চুকিয়ে দিয়ে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে চম্পি ভাবল। বাইরে চেয়ে দেখল রোদ বড় কড়া। এই রোদে যাবে? একবার ভাবল। নাঃ, যাই একবার ঘুরেই আসি। নয়ত আবার কি ভাববে শৈলদি। কতদিন পরে এল দেশে। আর আসবে কি না, দেখা হবে কি না, কে জানে? কত মেয়ের ত বিয়ে হল, গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। তাদের সঙ্গে আর কি দেখা হচ্ছে? একদিন সেও ত চলে যাবে। তার শ্বশুরবাড়ি শৈলদির মত কলকাতায় আর হবে না ত। কোন অজ পাড়াগাঁয়ে তার জন্য অন্ন মাপা আছে কে জানে?

ঘুরে ফিরে সেই বিয়ের কথা। চম্পিকে নিশিদিন এই ভাবনা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই কি সে নিস্তার পাবে না।

একটা কাচা কাপড় পরে চম্পি তৈরী হয়ে নিল। মোটা সেমিজের নিচে তার সবচেয়ে বড় লজ্জা ঢাকা পড়েছে। তার উপর বারবার সে আঁচল টেনে দিচ্ছে। তবু চম্পির মনে হল, না, যথেষ্ট হল না। অনেকদিন বেরয় নি। দ্বিধা পায়ে পায়ে বাধা দিতে লাগল।

মা বললেন, ওরে, তোর ফুলু কাকিমারে কস্ শৈলিরে নিয়ে একদিন যেন আসে। কতদিন যে দেখিনি ওগের। ঠাকুরপোরে জিজ্ঞেস করিস ত তোর সাজে কাকার কোন খবর জানে কি না?

বক্সী বাড়ির ভাঙা দেউড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে চম্পির পা আর ওঠে না। বিরাট বড় পাকা দালান বক্সীদের। শরিকের অন্ত নেই। তাই কোন অংশ ভেঙে পড়ছে, কোন অংশ চকচক করছে। সবাই থাকেও না দেশে, অনেকে আসেও না। টুনির বাবা ঝিনেদায় বাড়ি করে উঠে গেছেন। কুলো বক্সীরা এখন ত ঝিনেদারই লোক। শৈলদির বাবা শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে কলকাতাবাসী হয়েছেন।

পুজোদালানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চকিতে চম্পির চোখে ছেলেবেলার সেই ধুমধামের ছবিটা ফুটে উঠল। শৈলদির ঠাকুর্দা তখন বেঁচে। কতবার যে যাত্রাগান, ঢপ, কীর্তন শুনতে এসেছে চম্পিরা তার ঠিক ঠিকানা নেই। একবার ত থিয়েটারও হয়েছিল। চম্পির দুর্ভাগ্য, সে তখন জ্বরে অচৈতন্য। জীবনের সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে তার।

পুজোদালান পেরিয়ে বাঁ হাতি পারুলপিসিদের মহল। ছোটকাকা তার জন্যে নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। পারুলি তুই ত কাজা খোলালি। ছড়া বেঁধেছিল গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা। চম্পির হাসি পেল।

তারপর টুনিদের অংশ। টুনির বিধবা পিসি এখন থাকে। টুনিদের পুবদিকের দালানটা শৈলদিদের। দোতলা বাড়ি। ও বাবা, কত লোক জমেছে বাইরের ঘরে। সুবল কাকা বেশ ফরসা হয়েছেন দেখি। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। বুকের আঁচলটা আবার টেনে দিল চম্পি। একসঙ্গে এতগুলো পুরুষের চোখের সামনে দারুণ অস্বস্তিতে পড়ল। কি জানি, সেমিজ পরে বাইরে বেরুলে এত অস্বস্তি হয়। সেমিজের ভিতর লজ্জার অস্তিত্ব অনুক্ষণ যেন বিঁধতে থাকে। বারে বারে মনে হয়, এই বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

সুবল কাকার গম্ভীর আওয়াজ, কাকে যেন জিজ্ঞাসা করল, বিলেসদাদার মেয়ে না?

কে যেন বলল, হ্যাঁ। বিয়ে থা দিচ্ছে না বিলেস। মেয়ে ঘরে পুষে রাখছে।

মাথাটা নিচু করে চম্পি ভিতরে ঢুকল। তার স্বভাবসিদ্ধ উপেক্ষার বর্মটি সে আজ এঁটে আসে নি, ভুলেই গিয়েছিল। তাই অতর্কিত এই আক্রমণ তার মর্মে গিয়ে বিঁধল। কেন সে মরতে এখানে এল? উচিত হয় নি। উচিত হয় নি।

ফুলু কাকিমা পালংক খাটে শুয়ে ছিলেন। ঝি তাঁকে ঝালরের পাখার বাতাস করছিল। চম্পিকে দেখে একগাল হেসে ফেললেন।

এস মা এস। থাক থাক, শোয়া মানুষকে আর প্রণাম করে না। এমনিই আশীর্বাদ করি। ভাসুর ঠাকুর, বড়দিদি, খুড়িমা সব ভাল ত?
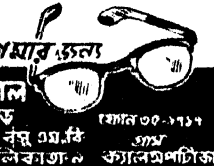
ফ্‌লু কাকিমার কথায় চম্পির মনের জ্বালা নিভে গেল। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ, কিন্তু একটুও দেমাক নেই।

চম্পি একে একে সব কথার জবাব দিল।

ফ্‌লু কাকিমা বললেন, তারপর আমাদের সন্ন্যেসী ঠাকুরের খবর কি? বিয়ে হয়েছে শুনলাম। বউ কেমন হল?

ফ্‌লু কাকিমার কথার টানে চম্পিও হেসে ফেলল খিলখিল করে।

শৈলর গলা উপর থেকে শোনা গেল, কে হাসে মা? চম্পি এসেছে না কি?

ফ্‌লু কাকিমা বললেন, হ্যাঁ এই এল। রোদে একেবারে সিদ্ধ হয়ে এসেছে। একটু ঠাণ্ডা হয়েই যাচ্ছে। ওলো চারি, হাতটা একটু জোর করে নাড়। বাছার গায়ে বাতাস লাগুক।

চারি খ্যার খ্যার করে উঠল, আমার গতর ত আর মেসিং নয় বাছা, যে ফর্‌ফর্‌ করে রাতদিন সমানতালে ঘুরবে।

হাতটা এলিয়ে গেছে। যে দেশে ইলেকটৌরি নেই, সেই দেশে কি মনিষ্যি আসে গা। রাত হলেই অন্ধকার, সাপের ঘাড়েই পা দিই, কি বিছেতেই কাটে। ভয়ে ভয়ে মরে থাকি। ম্যা গোঃ।

চারির কথা, শৈলদির বরের কথা, ওর সেই ছোকরা দেওরের কথা, সব দেখি এক সুরে বাঁধা। এরা সব কলকাতার লোক।

চুপ কর বাছা, চুপ কর। তোমাকে কালকেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেবো।

হ্যাঁ, তাই পাঠিয়ে দিও। এই জঙ্গলে আমি থাকতে পারবনি।

জঙ্গল তোমাকে গিলে খাচ্ছে। চুপ কর, এখন একটু কথা বলি। হ্যাঁ, তারপর সন্ন্যেসী ঠাকুরপোর বউ কেমন হল?

চম্পি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল কাকিমার।

আর ছেলেটাও খুব সুন্দর হয়েছে কাকিমা। অবিকল কাকার মত দেখতে। কি দস্যিপানাই না করে। একটু একটু হাঁটতে শিখেছে ত। এখন সামলান দায়।

ও মা, কতক্ষণ চম্পিকে আর আটকে রাখবে। দয়া করে এখন একবার ছেড়ে দাও।

ফ্‌লু কাকিমা বললেন, যাও মা, যাও। চম্পি চম্পি করে হাঁফিয়ে উঠেছে শৈল। সঙ্গী সাথী ত নেই এখানে। ছেলে দুটো এল না। শৈলর দেখলাম তবু টান আছে দেশের উপর। বলতেই ও রাজি হয়ে গেল। ওর এক দেওর, সে কখনও পাড়াগাঁ দেখেনি, বললে আমিও যাব। উনি ত খুব খুশি। চলে এলাম সবাই।

মা!

ফ্‌লু কাকিমা এবার চটে উঠলেন।

মেয়ের রকম দ্যাখ একবার। আমি যেন চম্পিকে খেয়ে ফেলছি। ওকি ভীমনাগের সন্দেশ যে টপাশ করে মুখে পুরে দেব। এতদিন পরে এলাম দেশে, কোথায় লোকজনের সঙ্গে দুটো কথা বলব, তা কি হবার যো আছে। হ্যাঁ, মেয়ের ঐ এক ধারা। যাও মা, যাও। নইলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে।

চম্পি খিলখিল করে আবার হেসে উঠল। শৈলদি এখনও সেই আদুরে খুকিটিই আছে।

বেশ হাল্কামনেই চম্পি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল উপরে। বাড়িটা অনেকদিন বন্ধ ছিল, ঘরের ভ্যাপসা গন্ধটা এখনও সম্পূর্ণ যায় নি।

শৈলর ঘরে ঢুকতে গিয়েও চৌকাঠের বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চম্পি। শৈলদির খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও লোকটা কে? চম্পি বিব্রত হল।

শৈল ডাকল, এসো ভাই চম্পি, ভিতরে এসো। লজ্জা কি, ও আমার দেওর।

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, কিম্বা বলতে পারেন বৌদির সেই পিয়াদা।

এ সেই কালকের রিনরিনে মেয়েলী গলা। পিয়াদা কথাটা আবার যশুরে কায়দায় বলা হল। চম্পি হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। জড়সড় হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। তারপর একপাশে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। কাল সন্ধ্যায় চম্পি সুহাসের গলা শুনে ভেবেছিল, বড়জোর সে বার তের বছরের একটা ছেলে হবে। সে যে এতবড় তা চম্পি স্বপ্নেও ভাবেনি। সামান্য সংশয় থাকলেও সে আজ আসত না। অন্তত এ ভাবে আসত না।

শাড়িটা সেলাই করা, তবে ফরসা আছে অস্বস্তি আবার হাজারগুণ বড় হয়ে দেখা এই যা। সেমিজ, সেই চিলে সেমিজের দিল। নিজের সম্পর্কেও অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল চম্পি। অপরিচিত জোয়ান পুরুষের এত কাছে আসা, এই তার প্রথম। থাকলই বা শৈলদি তার কাছে।

সুহাস উঠে বসল।

বলল, বৌদি তোমরা চৌকিতে এসে বস। আমায় চেয়ারটা ছেড়ে দাও।

জড়তাহীন কি পরিষ্কার উচ্চারণ। চম্পি ভাবল, গলাটা ওর মেয়েলী, কিন্তু এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে, এমন একটা ছেলেও কি এই গ্রামে আছে। চাইব না চাইব না করেও চম্পি লুকিয়ে একবার দেখে নিল। রং খুব ফর্সা নয়। মুখ চোখ যে আহামরি তা নয়। একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল তার। এত পরিষ্কার কামানো গাল চম্পি আর কারও দেখে নি। এই গরমেও সে একটা ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আছে। ভিতর থেকে হাতকাটা গেঞ্জির চেহারা আর সুহাসের বুকের হাতের রং উঁকি মারছে। ধুতিটা পায়ের গোড়ালি অব্দি ঢেকে রয়েছে। সুহাস কত ওজন করে কথা বলে। এক মুহূর্তে চম্পির মনে সুহাসের এই চেহারার একটা শক্ত ছাপ পড়ে গেল। চম্পি তাইতে আরও লজ্জা পেল। ঘামতে লাগল সে।

সুহাস মেঝেতে নেমে এল। এখন চম্পির থেকে তার দূরত্ব দেড় হাতও না। কেমন মৃদু মনোরম এক সৌরভ সুহাসের দেহ থেকে ভেসে এল চম্পির নাকে। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, গা খালি, বক বক করে বকা গ্রামের যে জোয়ান পুরুষদের এ যাবৎ দেখেছে চম্পি, তাদের সবাইকে সুহাসের পাশে অকিঞ্চিৎকর, অসভ্য, জংলী ভূত বলে মনে হতে লাগল তার।

বসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

তাকে আপনি আজ্ঞে করছে সুহাস। গ্রামের মেয়ে, কালো মেয়ে, বয়েস গড়ান আইবুড়ো মেয়ে চম্পিকে এতবড় সম্মান আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি। চম্পির কেবলই মনে হতে লাগল, সত্যি সত্যিই এসব ঘটছে ত? না কি দিবাস্বপ্ন দেখছে সে।

আমরা কখন থেকে আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। আমার জন্য এরা অপেক্ষা করছিল, আমার আশায় বসে আছে! চম্পি ভাবল, ঠাট্টা করছে নাকি সুহাস।

জান চম্পি, ঠাকুরপোর কেমন ধারণা হয়েছিল তুমি আসবে না।

সত্যিই তাই। আমি কিন্তু সেই রকমই ভেবেছিলুম। (সুহাসবাবুরা ভেবেছিলুম বলেন। কলকাতার লোকমাত্রেই নাকি সুন্দরবনের বাঘের মত হালুম হুলুম খেলুম বলে। চম্পি কথাটা শুনেছিল। দেখল মিথ্যে নয়।) কেন ভেবেছিলুম জানেন, বউদি জানে, আমি মনে মনে যা আশা করি তা হয় না। আমি খুব আশা করছিলুম ত আপনি আসবেন বলে। (সুহাসবাবু আমাকে আশা করছিলেন! আমাকে! সব মন রাখা কথা! কিন্তু তবুও এমন মন রেখেই বা কটা মিথ্যে কথা কজন শুনিয়েছে চম্পিকে। চম্পি কালো, চম্পি হাতি, চম্পি চোর, এমন অজস্র কঠিন সত্যই সে নিত্যদিন শুনে এসেছে। সত্য তাকে শুধু পীড়া দেয়। যন্ত্রণা দেয়। সত্যের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই তার। সে জানে কলকাতা থেকে আগত এই শিক্ষিত মার্জিত সুবেশ তরুণটি তাকে ডাঁহা মিথ্যে বলছে। আমার জন্য ও'রা আশা করে বসেছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন। কি পদের লোক আমি! একেবারে ইংলণ্ডেশ্বরী! ইংলণ্ডেশ্বরী কথাটা এখনও ভোলেনি চম্পি। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল। দয়াময়ী ইংলণ্ডেশ্বরী যে পথ দিয়া যাইতেন, সেই পথের দুই ধারে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁহার দর্শন লাভের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিত। এই ইংলণ্ডেশ্বরী কে? সেদিন চম্পি জবাব লিখেছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া। এখন সুহাসের কথায় মনে হচ্ছে সে ও বুঝি ঐ ইংলণ্ডেশ্বরীর পর্যায়েই উঠে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইহারা আমার দর্শনলাভের আশায় অপেক্ষা করিতেছে। আজগুবি আর কাকে বলে। কলকাতার লোক, বড্ড চালিয়াত হয়। হোক চালিয়াত। বলুক মিথ্যে। তবুও এ মিথ্যে শুনতে ভাল লাগে। চম্পিকে নিয়ে এক রুচিবান পুরুষের যে মিথ্যে বলবারও ইচ্ছে হয়, চম্পির পক্ষে তাই যথেষ্ট। সুহাসের প্রতি কৃতজ্ঞ হল চম্পি। তিনি ওর দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুহাস যেন নীলামওয়ালার ভাড়াটে খদ্দের। সে কিনবে না, কিন্তু ডাক বাড়িয়ে দেবে। যাকে কানাকড়ির মূল্যও কেউ কখনও দেয় নি, তার পক্ষে এটুকুও ত যথেষ্ট।)

চম্পি খুশীই হল।

শৈল বলল, সত্যি ভাই চম্পি। লেখক লোক কি না, কাল সন্ধ্যের অন্ধকারে তোমাকে ত দেখতে পায় নি, শুধু তোমার হাসি শুনেছে। তাইতেই ঠাকুরপোর আমার কবিত্বভাব জেগে উঠেছে। কাল থেকে তোমায় নিয়ে আমাদের দুজনে কেবল কথা হচ্ছে।

স্বপ্ন স্বপ্ন এ শুধু স্বপ্ন। এ মিথ্যে এ মিথ্যে, এ মিথ্যে। আচ্ছা এখন, এই মুহূর্তে, এই অসম্ভব আজগুবি স্বপ্নটা দেখতে দেখতে আমি মরে যাই না কেন? অনেক উপেক্ষা, অপমান, অবহেলা, ঘৃণা সয়ে সয়েও যে কারণে বেঁচেছিলাম এতদিন, মনের গভীরতম কোণায় যে আশাটাকে আড়াল করে পালন করেছিলাম একদিন কিছু পাব বলে, এমন কিছু, যা দিনগত দৈন্য গ্লানি উত্তীর্ণ করে আমাকে পৌঁছে দেবে নতুন এক জীবনের হাটে, নতুন দাম ধরা হবে আমার। আজ যদি তা দৈবাৎ পেলাম, যদি বাসনা পূরন এখানেই হয়ে গেল, তবে হে ভগবান, হে মদনমোহন, হে শিবশংকর হে মা ভগবতী, এতদিন শুদ্ধ-চিত্তে তোমাদের যে পুজো করেছি আজ তার ফল দাও, আমাকে তোমাদের কোলে টেনে নাও। আমার জীবন আগামীকাল যেন আর না আসে। কালো, কালো, কালো, আমি কিছু না, কিছু না, এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর সত্যের সুতীক্ষ্ম দাঁতের ফাঁকে, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর ঠেলে ফেলে দিও না।

আপনি গান জানেন, না? নিশ্চয়ই জানেন।

চম্পি এ-কথা শুনতে পেল না। তার মন প্রার্থনায় মগ্ন।

তুমি যে দৈবজ্ঞ হয়ে উঠলে ঠাকুরপো। আমাদের গ্রামে ও-ই যা কিছু জানে।

চম্পির কানে এ কথাও পেৌঁছল না। সে দেখল সুহাস আর শৈল বোবাদের মত শুধু ঠোঁট নেড়ে যাচ্ছে। ওরা অনেক দূরে সরে আছে তার কাছ থেকে। জানলার বাইরে চলে গেছে ওরা। শূন্যে ভাসছে। ওর দিকে আঙুল দেখাচ্ছে মাঝে মাঝে। হাসছে। না সুহাসের চোখে, শৈলদির চোখে বিদ্রূপ নেই, অবজ্ঞা নেই। কি যেন তাকে বলল সুহাস। আবার বলল। ওর চোখে বিস্ময়। শৈলদিও তাকে কি যেন বলছে। আবার বলল, আবার, আবার। বোবা হয়ে গেল নাকি দুজনে? না, শুধু ওরা নয়, সমস্ত জগৎ থেকেই শব্দ লুপ্ত হয়েছে। আর কেউ তাকে কুকথা শোনাতে পারবে না। পারলেও সে শুনতে পারবে না। বেশ হয়েছে। নিশ্বাসটা কখন যেন ফুরিয়ে এসেছে। যাক ফুরিয়ে। শব্দ যাক, বাতাস যাক, শৈলদি, সুহাসবাবু, যূথী, বাবা মা, এই সংসার, জগৎ, এই মুহূর্তে ফুরিয়ে যাক। চম্পিও যাক। আর কিছু চাইনে তার।

কিন্তু বড় কষ্ট! বড় কষ্ট! উঃ! বাতাস! বাতাস! এ কী হল? এ কী যন্ত্রণা বুকে! বিরাট একটা পাষাণ তার শ্বাস-নালির মুখে আটকা পড়েছে। উঠছে না সেটা, উঠছে না। থেকে থেকে সহস্র বর্শা যেন চম্পির হৃদপিণ্ডে একসঙ্গে খোঁচা মারছে। উঃ! উঃ!

চম্পি কি তবে মরছে? এই কি মৃত্যু! এত যন্ত্রণা! না, না, তবে সে মরবে না। মরতে চায় না, চায় না, চায় না। যন্ত্রণার গভীর খাদে পা ফস্কে পড়ে গেল চম্পি।

সুহাসবাবু, সুহাসবাবু, হাতটা বাড়িয়ে দিন, আপনার হাতখানা। তারস্বরে চম্পি যেন ডাকল। কিন্তু সুহাস ত শূন্যে ভাসছে। অত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারছে না। অবশেষে আসতে পেরেছে সুহাস। হাতখানা বাড়িয়েও দিল চম্পির দিকে। কিন্তু চম্পি সেটা ধরবার আগেই সুহাস উল্টে গেল। চম্পিও সাঁৎ করে তলিয়ে গেল অন্ধকারে। (ক্রমশ)

পরিচয়

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস

ভেলকি থেকে ভেষজ—আনন্দকিশোর মুন্সী। বেংগল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২. ছয় টাকা।

এই সেদিন শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যের যে ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন এত তাড়াতাড়ি তার সংশোধনের সার্থক একটি প্রয়াস হাতে পড়বে ভাবিনি। ভাষার স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলাতেও কাল্পনিক গল্প উপন্যাসের সংখ্যাই অন্য জাতের রচনার চেয়ে বেশি। সাহিত্যে কল্পনার এই প্রাধান্যে দোষের কিছু নেই. যদি সেই সঙ্গে সত্য জিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠভাবে মাত্রা বজায় রাখে। খোঁজবার দৃষ্টি ও বোঝবার ব্যাকুলতা ক্ষীণ হলে কল্পনার পাখাও যে পঙ্গু হয়, বিপদ এইখানেই।

কাল্পনিক কাহিনীও যে আমরা সাগ্রহে পড়ি. তার মূলেও আছে এক ধরনের জিজ্ঞাসা। জীবন-জিজ্ঞাসা। যথার্থ যিনি কাহিনীকার তাঁর কল্পনা সত্যের সূতো ছেড়ে-ই ওড়ানো। তাঁর কল্পনাবিহার তাই জীবন সত্যের সূত্রেই আমাদের ধরিয়ে দেয়।

সত্যের সূত্র ধরবার জন্যে কল্পনাই একমাত্র ক্ষেত্র অবশ্য নয় এবং কল্পনা যেখানে অবাঞ্ছিত সেই কঠিন সত্যের জগতের আকর্ষণও অনেক সময়ে কল্পনার চেয়ে যে বেশী তার প্রমাণ আপাতত যে বইটি নিয়ে আলোচনা করছি তাতেই পাওয়া যাবে।

বইটির নাম 'ভেলকি থেকে ভেষজ' লেখক ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী।

'ভেলকি থেকে ভেষজ'-এ যে বিচিত্র বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত তা এক হিসেবে আমাদের বর্তমান সভ্যতার বিবর্তনেরই ইতিহাস এবং সে ইতিহাস কোন উপন্যাসের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। সব সুদ্ধ জড়িয়ে এ-ইতিহাস আশ্চর্য এক রূপকথা যার প্রতি অক্ষর বর্ণে বর্ণে সত্য।

এ-রূপকথার নায়ক মানুষের সেই নির্ভীক জিজ্ঞাসা-চেতনার প্রথম উন্মেষের প্রায়ান্ধকার গুহামুখ থেকে বেরিয়ে সত্যের সূর্য-তোরণ যা পার হতে অগ্রসর। এ রূপকথার দৈত্য আমাদের অন্ধ মনের সেই আচ্ছন্ন দৃষ্টি. সত্যকে যা নিজের মূঢ়তার কুজ্ঝটিকায় আবৃত করে রাখে।

দুস্তর বাধা বিপদ বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে মানুষের জাগ্রত মনের এই জয়-যাত্রার কাহিনী লেখক সুনিপুণ হাতে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন। ব্যাধির মূল সন্ধান করে তা থেকে দেহকে নিরাময় করার অক্লান্ত সাধনার বৃত্তান্ত মানুষের ইতিহাসের এক পরম অভিযানের মহিমা পেয়েছে।
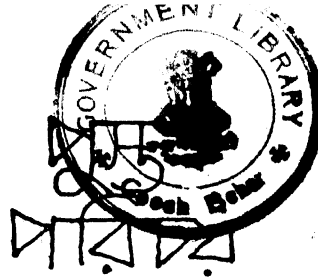
ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী ইতিপূর্বে তাঁর কলমের সহজ অস্খলিত স্বাচ্ছন্দ্যে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। আপাত শুষ্ক বিষয়ের ভেতর থেকে রসের ফল্গুস্রোত মুক্ত করে দেবার দুর্লভ শক্তি তাঁর আয়ত্ত। ভেলকি থেকে ভেষজ'এ সেই ক্ষমতার সার্থকতম প্রয়োগ আমরা দেখলাম। মানুষের রোগ যার বিষয়বস্তু. সেই বইটিই বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের একটি প্রমাণ হয়ে রইল।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

উদ্ভিদ-রহস্য

বনের ডাক—স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ। প্রকাশক—অরুণকুমার দে, ৬৫।১।১, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পাঁচ টাকা।

বিশল্যকরণী অরণ্যের ডাক এই ক্ষুধিত পাষাণ-পুরীতে ঠিকমত এসে পৌঁছতে পারে না। এখানে যে শিশুরা লোহা পাথরের খাঁচায় মানুষ হয়। তাদের পায়ের তলা থেকে মাটিকে সরানো হয়েছে বহু আগেই, এখন চলেছে আকাশ অপহরণের পালা। তাই

গাছলতাগুল্ম প্রভৃতির সবুজ হাতছানি তাদের মনকে ততটা আকর্ষণ করে কিনা কে জানে, যতটা পশুপাখির কাছ থেকে পায়, অথবা কাঁচের চৌবাচ্চার শখের মাছ থেকে। কিন্তু শহর নগরই দেশের সবটুকু নয়, শহরতলী নগরতলী আছে, গ্রাম আছে, এবং সেখানেও অগণিত সবুজ মন আছে। তাদের মনে কৃষিকাজ ও উদ্ভিদরহস্য জাগিয়ে তুলে, বৃক্ষচর্চায় আকৃষ্ট করে দিতে পারলে একই সঙ্গে তাদের দেহের এবং মনের কাজ হতে পারে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক উদ্ভিদবিজ্ঞানকে নানা গল্প ও খেলার মধ্য দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নানারকম হাতের কাজ, নানা রকম স্বল্পব্যয় পরীক্ষা নিরীক্ষার কৌশল তিনি তাঁর সরস ভঙ্গীতে বিস্তারিত করেছেন। বইটি উপভোগ্য এবং ছোটদের কাছে মূল্যবান হবে আশাকরি। ১৪৫।৫৯

যুদ্ধে বাঙ্গালী

আভি লে বাগদাদ—শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ৫৫।৪, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা—২৯ হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। তিন টাকা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙালীর যুদ্ধবিমুখতার দুর্ণাম ঘুচিয়ে তাকে সামরিক বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৎকালীন যেসব নেতা সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু অন্যতম। এঁদেরই আন্তরিক চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল বেংগল অ্যাম্বুলেন্স কোর। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন এই কোরেরই অন্যতম সদস্য।

১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে সিক্সথ্ ডিভিশনের সংগে বেংগল অ্যাম্বুলেন্স কোর ছিল আজিজিয়ায়। সেখান থেকে সিক্সথ ডিভিশন প্রয়াস পায় বাগদাদ জয়ের। কিন্তু বাগদাদ জয় তো হলোই না, বরং তাদের পশ্চাদপসরণ করে আসতে হয়। কুতে তুর্কীরা তাদের ঘেরাও করে রাখে পাঁচ মাস। এই বাগদাদ জয়ের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে ঘটনাবলীর বিবরণই বেশীরভাগ স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। লেখকের "ফ্রণ্টের" প্রত্যক্ষ বিচিত্র অভিজ্ঞতা বইখানিকে অপূর্ব রসসমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বলিষ্ঠ মনের বিচিত্র পর্যবেক্ষণশক্তি দূর বিদেশের এক অপরিচিত ছবিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। নিপুণতার সাথে।

আমরা বইখানির যোগ্য সমাদর কামনা করি।

৮৪৯।৫৯

রবীন্দ্র-সাহিত্য

কবিগুরুর রক্তকরবী—তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সূর্য ভারতী, কলিকাতা—১৪। তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। অনেকেই একে সাংকেতিক নাটক বলে অভিহিত করে এর সংকেতগুলো বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে নাটকটির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের এই প্রচেষ্টার তাগিদে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বারে বারে যে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন তা হল, 'রক্ত করবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে, তাহলে তার দায় কবির নয়।' আলোচ্য গ্রন্থের লেখকও নন্দিনীকে তত্ত্বস্বরূপ মাত্র বলে গণ্য না করে মানবী হিসাবে গ্রহণ করেই রক্তকরবী নাটকের রস-রূপ বিশ্লেষণ করেছেন, এর ভাববস্তু যে মানব-জীবনের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করছে, সাবলীল ভাষায় ও অনাড়ম্বর রচনা ভঙ্গিতে সেই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থখানি রক্তকরবীর অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থ থেকে সার্থক ব্যতিক্রম।

কিন্তু 'রক্তকরবীকে' রূপক নাটকের পর্যায়ে যদি নাও ফেলা যায়, তাকে সাধারণ নাটকও বলা চলে না। নন্দিনীকে মানবী বলে দাবী করা সত্ত্বেও নাটকটি কেন সাধারণ নাটক হয়ে উঠল না, সেই আপাত-বিরোধটুকু তপনবাবু সংশ্লেষণী পদ্ধতি অবলম্বনে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন শিল্পভঙ্গি ও নাট্যভঙ্গি শীর্ষক অধ্যায়দ্বয়ে।

এছাড়া অন্যান্য যেসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থখানিতে করা হয়েছে, সেগুলো হল রক্তকরবীর 'নাট্য কাহিনী', তার 'প্রকাশভঙ্গী' যে সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় রক্তকরবীর বিভিন্ন জীবনচিত্রগুলো আঁকা হয়েছে, সেই আধুনিক সভ্যতার সমাজ-জীবনের ইঙ্গিতবাহী 'যক্ষপুরীর' ইতি-কথা রাজার জীবনের যে দ্বন্দ্ব গ্রন্থখানির মর্মকথা সেই 'রাজার বিদ্রোহ', যে নারী-প্রেম রাজাকে এরূপ বিদ্রোহী করে তুলল, সেই 'নন্দিনী—মানবী ও রক্তকরবী' এবং যে পথিক পাগলের জীবনকথা রক্তকরবীর ভাববস্তু, যার মধ্য দিয়ে আমরা সহজ-জীবনের পূর্ণ রূপটিকে দেখতে পাই, সেই 'বিশুর' চরিত্রকথা। প্রত্যেকটি নিবন্ধই সুলিখিত এবং সুদৃঢ় যুক্তির ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

বইখানি রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেরই যেমন পড়ে ভালো লাগবে, তেমনি ছাত্রছাত্রীদেরও প্রচুর কজে লাগবে।

১৭৮।৫৯

সাধক-বাণী

শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার অমৃত বাণী—ডাঃ খগেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক সংকলিত। ১২৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫, দুই টাকা।

সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তসমাজে শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং যোগীরূপে তাঁর খ্যাতি ভারতের সাধুসন্ত মহলে

বিশেষভাবে প্রচারিত ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক দীর্ঘ দশ বৎসরকাল এই মহাপুরুষ যোগীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁর মুখনিঃসৃত 'অমৃত-বাণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মেছিলেন এবং সংসারে প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়া সত্ত্বেও দশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন। পদব্রজে নানা তীর্থক্ষেত্র পর্যটনের পর তিনি ধনিয়া পাহাড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরদাস বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর আশ্রমে থেকে কঠোর সাধনা করেন। ১৩২৮ সাল থেকে তিনি তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান ও ভক্তি সাধারণ্যে প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করেন। সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আপন শিষ্যদের কাছে মানুষের সমস্যাসংকুল জীবনের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি মানবহৃদয়ে শান্তি ও ঈশ্বরসম্বাদের প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর সেই উপদেশ ও বাণী সংকলক অপূর্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে এই গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন। ভক্তজন মাত্রই এই অমৃতবাণী পাঠে তৃপ্তি পাবেন।

৪৩০।৫৮

পত্রিকা

ছোট গল্প। সম্পাদক লালমোহন দাস ও আবীর মুনসী। ১৯।৪, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৬। প্রতি সংখ্যা ।৷৹ আনা।

"ছোট গল্প" তরুণ গল্প লেখকের একমাত্র মুখপত্র বলে ঘোষিত হয়েছে। একমাত্র কি না—সে-বিচার অনাবশ্যক তবে পত্রিকাটি যে তরুণ গল্পলেখকদের সত্যিই মিলনস্থল সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। বাংলা ছোট গল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াসে কিছু তরুণ সাহিত্যিক যে বিশেষ একটি গুরু দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন —এর জন্যে তাঁরা প্রশংসনীয়।

পত্রিকাটির মাত্র দুটি সংখ্যা আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। দুটি সংখ্যাই আশা জাগায়। তরুণদের মধ্যেও হালে যাঁরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—যেমন আনন্দ বাগচী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যশোদাজীবন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—এঁদের রচনা দেখতে পাওয়া যায়। উপরন্তু বহু প্রতিশ্রুতিবান তরুণতমদের লেখাও।

আমরা পত্রিকাটির দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

বহুরূপী—নট্যকলা সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকা। গঙ্গাপদ বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে ছবি বিশ্বাস, বনফুল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅভিনব গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের রচনাসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-দেশের নাট্য-সংস্কৃতির প্রগতিমূলক সাময়িকপত্র হিসাবে 'বহুরূপীর অবদান অনস্বীকার্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

Co-operative farming—A Critic —বলরাজ পুরী।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডাঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য।

একটি স্বাক্ষর—রামপদ মুখোপাধ্যায়।

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

অপাঠ্য—নীলকন্ঠ।

মন নিয়ে খেলা—ধীরাজ ভট্টাচার্য।

জাপানে—অন্নদাশঙ্কর রায়।

প্রেমতারা—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য।

নতুন পত্র—যুগ্ম-সম্পাদক শঙ্কর সেন ও জীবন দত্ত।

কমিউনিস্ট ট্রেড-ইউনিয়ন—সম্পাদনা পি, কে ব্যানার্জী।

কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক—সম্পাদনা পি, কে ব্যানার্জী।

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—সম্পাদনা পি, কে, ব্যানার্জী।

কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নের সাংগঠনিক রূপ ও শ্রমিক কাউন্সিল—সম্পদনা পি, কে, ব্যানার্জী।

অপরূপের নক্সা—শ্রীঅপরূপ।

পলি মাটি মন—সন্তোষ দাসগুপ্ত।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম-দিনে আমরা ট্রামে-বাসের সহযাত্রী সকলের সঙ্গে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছি। বাঙলার শিবরাত্রির সলতে শ্রীবিধানচন্দ্র অটুট স্বাস্থ্য লইয়া অনেক

অনেকদিন বাঁচিয়া থাকুন আমাদের মধ্যে, বাঙলার নিঃস্ব, বন্ধ্যা মাটির বুকে।

• • •

সঙ্গে সঙ্গে নটলোকের বিরাট শূন্যতার কথা মনে পড়িল। শিশির-কুমার আর নাই। আষাঢ়-শ্রাবণ দুটি মাস সত্যিই বাঙলার পক্ষে দুর্দিন। আমরা পণ্ডিত নই বলিয়াই মৃতের শোক আমাদিগকে অভিভূত করে। যে যবনিকার অন্তরালে শিশিরকুমার চলিয়া গেলেন সে যবনিকা আর উঠিবে না। সেই উদাত্ত কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গেল। তাঁর আত্মার শান্তিকামনা ছাড়া আর কী-ই বা করিবার আছে!

• • •

বিশুখুড়ো শিশিরকুমারের একটি গল্প শুনাইলেন—"শিশিরবাবু তখন সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। একটি ঘরোয়া চা-পার্টিতে শিশিরবাবু বলিলেন—"সীতা" প্লে। দুর্মুখের যিনি পার্ট করেন, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কী করা যায়। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন আমার এক বন্ধু। অভিনয় তিনি কোনদিন করেন নি। স্কুল-কলেজে কবিতা-টবিতা আবৃত্তি করেছেন। তাঁকেই ধরলাম। তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজী হলেন না। —ছোট পার্ট, দু-একটা কথা, কোন ভয় নেই,—অনেক বলে-কয়ে রাজী করানো গেল। যথাদিনে যথাসময়ে যবনিকা উঠল।

ট্রামে-বাসে

বন্ধু উইংসের পাশে "মহারাজ" পর্যন্ত বলেই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না। তখন শ্রীরামচন্দ্র অর্থাৎ আমি সেই থিয়েটারি সুরে বলতে লাগলাম—"ওরে, থামিস নি, থামিস নি, যা খুশী বলে যা, কেউ কিছু বুঝবে না, কিছু বুঝবে না"। দুর্মুখ আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে পড়ে বললেন—মহারাজ আমি আর পারছিনে"। আমি তখন—আপনারা যাকে বলেন শিশির ভাদুড়ীর প্যাঁচ—সেই প্যাঁচ মেরে ডান বাহু দিয়ে মুখ ঢেকে বললাম—"উঃ"। যবনিকা পড়ে গেল। বাইরে করতালিও পড়ল"!—বিশুখুড়োর গল্প শুনে এত দুঃখেও হাসলাম।

• • •

"করাচীতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি"—একটি সংবাদের শিরোনামা।—"সংবাদটা ১লা জুলাইর। ২৫শে জুন যে সমস্ত

বাঘা বাঘা পাক্ অফিসারকে আয়ুব খাঁ সাহেব গদিচ্যুত করেছেন তার সাথে এই ঝড়ের কোন সম্পর্ক নেই, একটা প্রাকৃতিক, আর একটা রাজনৈতিক"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

শ্রীবিধানচন্দ্র তাঁর জন্মদিনে বলিয়াছেন—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সমতা বিধানই কংগ্রেসের আদর্শ। শ্যামলাল বলিল—"বিধানবাবু জানেন, অসমতা নিয়তির বিধান! কংগ্রেস কী করবে, স্বয়ং ভগবানের অসাধ্য।"

• • •

শ্রীবিধানচন্দ্র তাঁর কর্মধারার কথা বলিতে গিয়া মা ফলেষু কদাচন বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের সহযাত্রীদের একজন গীতার বাণী বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মশাই যে কদিন আগেই প্রচুর ফল খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন"!!

• • •

বিশুখুড়ো বলিলেন—"ট্রামে-বাসের আলোচনার জন্য সংবাদ-এর বড়ই অভাব। সংবাদ সম্পাদকরাও মনে হয় সংবাদের তাৎপর্য ভুলে গেছেন, তা নইলে

সীমান্তে পাক পুলিসের গুলীবর্ষণ, ওপরতলার দুর্নীতি, খাদ্য ব্যাপারে সরকারী ব্যর্থতা, পাক্ গুপ্তচরের তৎপরতা, কোলকাতা স্টেডিয়াম সম্বন্ধে আলোচনা—এসব সংবাদই নয়; কুকুরের মানুষে কামড়াবার মতোই এসব"!!

• • •

জোহেন্সবার্গ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল, সেখানে দশ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার একটি বানরাকৃতি মানুষের খুলি পাওয়া গিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"মানুষের খুলিতে বানরের প্রকৃতি আবিষ্কার করতে, কিন্তু দশ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হবে না"!!

• • •

ডাঃ শ্রীমালী স্বীকার করিয়াছেন—শিক্ষকদের জন্য যতটা করা উচিত গভর্নমেন্ট ততটা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। —"শিক্ষকমশাইরা সরকারকে এ ব্যাপারে কত নম্বর দেবেন, তা তাঁরাই বলতে পারেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

"বন-মহোৎসব মরসুমে ক্যালকাটা বা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠের ধারে ধারে কিছু বৃক্ষরোপণের জন্য অনুরোধ করব। আজি হতে দশ বৎসর পরে ক্রীড়া-দর্শকদের কিছু সুবিধা হতে পারে"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহ-যাত্রী।

চন্দ্রশেখর

মনোবিজ্ঞানের জের

এক মনোবিজ্ঞানীর তাত্ত্বিক গোঁড়ামি তাঁর কন্যার সহজ সুখের পথে কিরূপ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি নিজেও কিভাবে একদিকে সন্তান-স্নেহ ও অপরদিকে ভ্রান্ত কর্তব্যবোধের কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন, তারই একটি নাটকীয়ভাবে কল্পিত উপাখ্যানের চিত্ররূপ রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের দ্বিতীয় নিবেদন "ভ্রান্তি"।

মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক ও চিকিৎসক ডাঃ হরিহরের একমাত্র কন্যা মিনতি তারই পিতার প্রিয় ছাত্র অসিতকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলে। মিনতি কোনদিনই জানতে পারেনি তার মা'র পুরনো মানসিক ব্যাধির কথা। সেই ব্যাধির লক্ষণ নতুন করে হঠাৎ যেদিন আবার দেখা দেয় তার মা'র মধ্যে, সেদিনও তার কাছে এটা অজ্ঞাতই থাকে।

অসিত ও মিনতির প্রণয়ের কথা স্ত্রীর কাছে শুনে ডাঃ হরিহর প্রবল আপত্তি জানান। স্বামীর এই ঘোর আপত্তিতে স্ত্রীর মনোবিকার আবার উগ্রভাবে দেখা দেয়। মিনতি তখন দু'দিনের জন্য গেছে মাসীর বাড়িতে বেড়াতে। মেয়ের মনে মা'র ব্যাধির প্রভাব যাতে পড়তে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে ডাঃ হরিহর উন্মাদ স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে রাখেন গোপনে শহরতলির একটি নিভৃত বাগানবাড়িতে এবং পরে সকলের কাছে ঘোষণা করেন যে, তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন পুরীতে, যেখানে তাঁকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই দুর্ঘটনার পর ডাঃ হরিহরের একান্ত চেষ্টা হল মিনতি ও অসিতের মিলনের পথ বন্ধ করা। তাঁর বিশ্বাস এই মানসিক ব্যাধি বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হয় এবং মায়ের ব্যাধি অভিশাপের মতোই একদিন মেয়ের জীবনে নেমে আসতে বাধ্য। মিনতির সন্তানও এই ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পাবে না। এই নিয়মের হয়তো ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু ডাঃ হরিহর তাতে আস্থা রাখতে রাজী নন।

এদিকে মিনতি ও অসিত তাদের স্বপ্নকে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। তারা গোপনে রেজেস্ট্রী করে পরিণয়-সূত্রেও আবদ্ধ হয়। ডাঃ হরিহর এই খবর পেয়ে কৌশলে মিনতিকে বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখেন। কিন্তু অসিত যখন তার বন্ধুর সহায়তায় মরীয়া হয়ে ওঠে মিনতিকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে, তখন ডাঃ হরিহর ব্যস্ত করেন উভয়ের মিলনে তাঁর বাধা দেওয়ার কারণ। তিনি অসিতকে নিয়ে দেখান বিকৃতমস্তিষ্ক মিনতির মার ভয়াবহ রূপ। অসিত নিজেও মনোবিজ্ঞানের ছাত্র এবং সে বিশ্বাস করে মানসিক ব্যাধির বংশানুক্রমিক সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী নয়। এর ব্যতিক্রমও আছে। তার দৃঢ়তার কাছে ডাঃ হরিহর পরাজয় স্বীকার করেন। অসিত ও মিনতির মিলনের পথে তিনি আর বাধা সৃষ্টি করেন না।

মানসিক ব্যাধির বংশানুক্রমিক সংক্রমণ নিয়ে ডাঃ হরিহরের উগ্র গোঁড়ামি, ফলে তার বুদ্ধিভ্রান্তি, সন্তানস্নেহ ও ভ্রান্ত কর্তব্যবোধে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মায়ের মৃত্যুর পর মিনতির জীবনের সাময়িক ট্রাজেডি এই কাহিনীর মূল নাট্য-উপাদান। এই উপাদানের অনুশীলন কাহিনীতে বিশ্বাসযোগ্য ও সহজগ্রাহ্য হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি। ফলে চরিত্রগুলিও হয়ে পড়েছে অনড় ও ভগ্নদশাগ্রস্ত।

মনোবিকারের বংশানুক্রমিক সংক্রমণের ব্যতিক্রমে ডাঃ হরিহরের দুরপনেয় অনাস্থাকে উপজীব্য করে গল্পে নাট্যসংঘাত বিস্তারের চেষ্টা করা হয়েছে। মানসিক রোগের অশুভ সম্ভাবনাকে—যার ব্যত্যয়ও অভিজ্ঞতালব্ধ—গোঁড়ার মতো আঁকড়ে ধরে সুস্থ স্বাভাবিক বিবাহযোগ্যা একমাত্র কন্যার ভাবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নকে নির্মমভাবে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা কোন অপার স্নেহশীল (অন্তত ছবিতে প্রথমে যা দেখানো হয়েছে) পিতার পক্ষে স্বাভাবিক কিনা, এ-প্রশ্ন দর্শকমনকে বার বার পীড়িত করে। যদি তা গোঁড়া ও নির্মম কর্তব্যপরায়ণ পিতার পক্ষে সম্ভবও হয়, তবুও মিনতি

ও আসতের ভাবষ্যৎ মিলনের সম্ভাবনাকে যে রূঢ়তা ও কঠোরতার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টায় ডাঃ হরিহরকে ব্যাপৃত দেখা যায়, তাতে তাঁর উদ্দেশ্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি দর্শকের সমবেদনা জাগা কঠিন। কন্যার প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ ডাঃ হরিহরের চরিত্রটি আপনজনের প্রতি সময় সময় মাত্রাহীন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে নির্মম হয়ে উঠেছে। এমন কি বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহারেও স্বামীর দরদ, উদ্বেগ ও মানসিক কষ্টের চাইতে শুধু চিকিৎসকের কঠোরতাই বেশী প্রকট।

ছবির মূলে নাট্যরসের এই বিবর্ণ রূপের কথা বাদ দিলেও, ছবিতে আরও এমন সব বৈসাদৃশ্য রয়ে গেছে যেগুলি সহজভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। স্বামীর বেহালা বাজনা শুনে হঠাৎ কেন স্ত্রীর পুরনো মানসিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পেল, তার কোন হদিস নেই ছবিতে। এটা যদি এমনিতেই ঘটে থাকে অর্থাৎ পূর্বের কোন জের যদি এতে না থাকে, তবে এমন ঘটনা আগেও অনেক ঘটতে পারত। সুতরাং কলেজে-পড়া মেয়ের পক্ষে দীর্ঘকালের মধ্যে কোনদিন মা'র মানসিক ব্যাধির কথা জানতে না পারাটা কষ্টকল্পিত। তা বাদে, মনোবিকারগ্রস্ত স্ত্রীর পক্ষে তার রমা নাম শুনে চীৎকার করে ওঠা এবং পরে পূর্ণিমা নামে ডাকায় শান্ত হওয়া, স্বামীর পরে পূর্ণিমা নামেই তাকে উল্লেখ করা, খাঁচার পাখী নিয়ে স্ত্রীর চিত্তবৈকল্য—এ সমস্ত অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা ছবিতে নেই। এগুলি যদি মনোবিকারেরই অনির্দেশ্য লক্ষণ হয়ে থাকে, তবুও বলতে হয় এগুলির বিন্যাসে অতীত-নিহিত কোন ক্ষুদ্র ইতিহাসের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা দর্শকমনে অহেতুক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

তবে সুখের কথা এই, চিত্রনাট্যের গতি ও পরিণতির প্রতি দর্শকের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছেন পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী। নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যান কাহিনীর শুষ্কতার মধ্যে কিছুটা স্নিগ্ধতার রেশ এনে দেয়। ছবির কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত বেশ উপভোগ্য এবং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে এর নাট্য-আবেদন সঞ্চারের প্রয়াস দর্শকসাধারণকে ছবিটির প্রতি কৌতূহলী করে তুলবে।

● মুখ্যচরিত্র ডাঃ হরিহরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় এই ছবিখানির বিশেষ সম্পদ। তাঁর অভিনয়ে বিভিন্ন ভাব-সংঘাতের অভিব্যক্তি মনকে নাড়া দেয়। তবে ছবির প্রথম দিকে স্নেহশীল পিতা ও শিক্ষকরূপী ছবি বিশ্বাসকে দর্শকদের বেশী ভাল লাগবে। ছবির শেষের দিকে তাঁর অভিনয়ে বাইরের রূঢ়তা যতটা ফুটে উঠেছে, অন্তরের কোমলতা ততটা রূপ

বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'সুজাতা'র নায়িকা নূতন

পায়নি। অসিতরূপী নির্মলকুমার তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন এ ছবিতে। মিনতির চরিত্রে বাসবী নন্দীর অভিনয় আড়ষ্টতামুক্ত না হলেও সহজগ্রাহ্য। তাঁর নৃত্যাংশ উপভোগ্য হয়নি মোটেই। নায়কের বন্ধুর ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় তাঁর খ্যাতির জন্যই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। তাঁর প্রণয়িনীর সাজে তপতী ঘোষের অভিনয় চরিত্রানুগ। ডাঃ হরিহরের পারিবারিক বন্ধু অবিনাশের চরিত্রটি পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়গুণে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। ডাঃ হরিহরের স্ত্রীর ভূমিকায় ছায়া দেবীর অভিনয়ও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুটি ছোট ভূমিকায় নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়কে নজরে পড়ে।

শ্যামল মিত্রের সংগীত পরিচালনা ছবির সম্পদ বাড়াতে না পারলেও তাঁর সুরসৃষ্টি উপেক্ষনীয় নয়। 'সংগীতের প্রকাশ' নামক গীতিনাট্যটিতে সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য আশানুরূপভাবে পাওয়া যায় নি। এটি নৃত্যাংশের দিক দিয়েও দুর্বল।

আলোকচিত্র, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ আশানুরূপ।

গড্ডলিকায় চমক

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মতো ইদানীং কালের অপকৃষ্ট হিন্দী ছবির গড্ডলিকা প্রবাহের সঙ্গে সুন্দর, উপভোগ্য ছবিও যে এসে দর্শকদের চমক দিয়ে যায়, তার নজির বিরল হলেও দুর্লভ নয়। মায়া আর্ট পিকচার্সের "মধু" এই মধুর চমক নিয়ে এসেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি মরমী উপাখ্যানের চিত্ররূপ এই "মধু"। বেশ কিছুকাল আগে এই কাহিনীর ভিত্তিতেই বাঙলায় "প্রতিশোধ" ছবিখানি তৈরী হয়েছিল। এক যুবক-যুবতীর প্রণয় ও গোপন পরিণয় সংসার-সমাজের স্বীকৃতি না পেয়ে কেমন ভাবে তিলে তিলে ব্যর্থতা ও বঞ্চনার মধ্যে সাময়িকভাবে তলিয়ে যায় এবং অসীম দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত তা কি করে পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়, / প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবেগমণ্ডিত কাহিনীর এটাই কথাবস্তু। এ-ছবির নায়িকা গ্রাম্যবালিকা মধু। সে তার জীবনের চাওয়া-পাওয়াকে পবিত্র বেদনার রসে সিঞ্চিত করে উন্মুখ হয়ে থাকে খেয়ালী নিয়তির শেষ খেলাটুকু দেখবার প্রত্যাশায়। তার প্রত্যাশা পূর্ণ হয় পরম প্রাপ্তিতে।

টাটার ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান দিয়েই
আমি আমার সব কিছু কাচি
তার কারণ
• ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবানে প্রচুর ফেনা হয় আর তাতে জামাকাপড়ের ময়লা আলগা হয়ে বেরিয়ে যায়।
• এতে খুব সহজে ও ভালোভাবে জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।
• এর ভেতরে অপ্‌টিক্যাল ব্রাইটনার থাকায় শাদা কাপড় ধব্‌ধবে আর রঙীন কাপড় ঝক্‌ঝকে দেখায়।
তাছাড়া
• ৫০১ খাঁটি গুঁড়ো সাবান যে কোন কাপড় কাচবার পক্ষেই সেরা—ফিনফিনে নাইলন, দামী সিল্ক, নরম পশম কি সুতী কাপড় সব কিছু।
বিনা আয়াসে কাচতে হ'লে
TATA'S
501
FOR ALL HOUSEHOLD WASHING
PURE SOAP POWDER
দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড
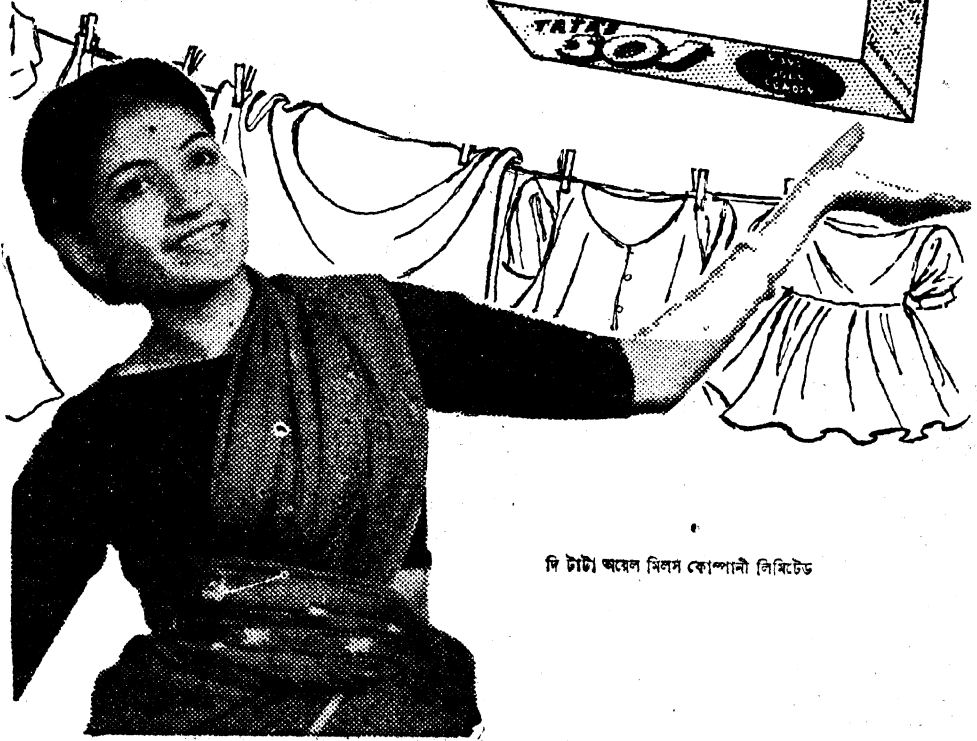
ছবিখানি পরিচালক জ্ঞান মুখোপাধ্যায় এবং পরে এস ব্যানার্জীর পরিচালনায় একখানি পরিচ্ছন্ন, আবেগধর্মী এবং সর্বজন-উপভোগ্য বিশিষ্ট চিত্রসৃষ্টির দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গোড়া থেকেই নায়ক-নায়িকার প্রণয় এবং উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এর নাট্যপথপরিক্রমা দর্শকদের উন্মুখ করে রাখে চিত্রনাট্যের পরিণতির দিকে। কাহিনীর বিন্যাসে গানের আধিক্য এবং মেলোড্রামার দিকে কিছুটা ঝোঁক থাকলেও, এর রুচিসম্মত ও সামগ্রিক রসসমন্বিত বিন্যাস দর্শকদের আবেগ-আপ্লুত করে সহজেই।

মধুরবেশিনী মীনাকুমারীর অপূর্ব অভিনয় এ-ছবির প্রধান সম্পদ। মনকে সহজেই আবিষ্ট করে রাখার মতো এমন আবেগনিবিড় অভিনয় হিন্দী পর্দায় খুব কমই নজরে পড়ে। নায়কের চরিত্রে করণ দেওয়ান প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। প্রধান পার্শ্বচরিত্রে জগদীশ শেঠী, কৃষ্ণকান্ত, কুমকুম, রাম শুকুল, প্রতিমা দেবী ও মণি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনায় রোশনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ছবির সব কটি গানই সুখশ্রাব্য। কলাকৌশল ও সর্বাঙ্গীন আঙ্গিক সৌষ্ঠবের পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

চিত্রালোচনা

বিমল রায় প্রোডাকসন্সের নতুন হিন্দী ছবি "সুজাতা" এ হপ্তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। অস্পৃশ্যতা সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা সুবোধ ঘোষের একটি বিখ্যাত গল্পের চিত্ররূপ এটি। নূতন ও সুনীল দত্ত এর মুখ্য ভূমিকা দুটি রূপায়িত করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—শশীকলা, ললিতা পাওয়ার, সুলোচনা, তরুণ বসু, অসিত সেন, অসীমকুমার প্রভৃতি। বিমল রায় স্বয়ং প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। সুরযোজনা করেছেন শচীন দেববর্মণ।

এ হপ্তার দ্বিতীয় হিন্দী ছবি বিজয় ফিল্মসের "পক্ষীরাজ"। পুরাণোক্ত মৎস্য-অবতারের কাহিনীকে প্রচুর জাঁকজমকের সঙ্গে এই ছবিতে রূপ দেওয়া হয়েছে। এস এন ত্রিপাঠী একাধারে পরিচালক, সুরকার ও অভিনেতার ত্রিবিধ কর্তব্য পালন করেছেন। ভূমিকালিপিতে যাঁরা শীর্ষ-দেশে স্থান পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন নিরুপা রায়, মনোহর দেশাই, উল্লাস, অনন্তকুমার, রত্নমালা প্রভৃতি।

এবারকার মুক্তি-তালিকায় কোন বাঙলা ছবির নাম না থাকলেও, কয়েক বছর আগে

তোলা একটি হিন্দী ছবি ("পাপোশ") ডাবিং পদ্ধতি অনুসারে বাঙলায় ভাষান্তরিত করে এ হপ্তায় দেখান হচ্ছে। কাশ্মীর এই ছবির পটভূমি, বাঙলায় তাই এর নামকরণ হয়েছে "কাশ্মীরী কমল"। ছবিটি আগাগোড়া গেভাকলারে তোলা। পরিচালনা করেছেন এজরা মীর।

• • •

কানন দেবী তাঁরই প্রযোজনায় নির্মীয়মান শ্রীমতী পিকচার্সের আগামী ছবি "ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত"তে অন্নদাদিদির ভূমিকায় অবতরণ করছেন বলে জানা গেল। শাহজীর চরিত্রটি রূপায়ণের ভার নিয়েছেন বিকাশ রায়। হরিদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ছবিখানির কয়েকটি বিশেষ বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয় ভাগলপুর অঞ্চলে এবং বর্তমানে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে এর কাজ এগিয়ে চলছে। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করছেন সজল ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়চৌধুরী। অন্য একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে অনুভা...।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সম্প্রতি এস বি ফিল্মস-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "ক্ষণিকের অতিথি" ছবিখানির সংগীত গ্রহণের কাজ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমাপ্ত হয়েছে। তপন সিংহ পরিচালিত এই ভিন্নধর্মী প্রণয়মূলক ছবিখানি বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে। ছবিটির প্রধান দুটি চরিত্র রূপায়িত করেছেন নির্মলকুমার ও রুমা গাঙ্গুলী। অন্যান্য প্রধান পার্শ্বচরিত্রে অবতরণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, রাধামোহন ভট্টাচার্য, অনিল চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, গীতা দাস, কাঞ্চনমালা ও তুলসী লাহিড়ী।

নৃত্যশিল্পী বৈজয়ন্তীমালা প্যারিস ও লণ্ডনে ভারতীয় নৃত্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়িয়ে বি-বি-সি'র হিন্দী ও তামিল প্রোগ্রামে তাঁর বক্তব্য বলছেন

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে" আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। অবধূত রচিত একটি মরমী হাসি-কান্নার কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন নির্মল দে। ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, প্রেমাংশু বসু, তুলসী চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত ও তপতী ঘোষ। শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বাসবী এই ছবিতে তাঁরই মেয়ের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছে। নচিকেতা ঘোষ এই ছবির সুরকার।

এন এস জি প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন "খেলাঘর"-এর দৃশ্য গ্রহণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। সলিল সেনগুপ্ত রচিত একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর এই চিত্ররূপায়ণে মুখ্য নারী চরিত্রে দেখা যাবে মালা সিংহকে। অজয় কর এই ছবির পরিচালক। ছবিটির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে আছেন—ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, আশীষ মুখার্জী, সবিতাব্রত দত্ত ও মানসী সোম। ছবির সুর সংযোজনায় আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

• • •

পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর পরবর্তী ছবি এস বি ফিল্মস-এর "বাইশে শ্রাবণ"-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শীঘ্রই বর্ধমানের

পল্লী-অঞ্চলে যাবেন। ছবির দুটি মূল চরিত্রে অভিনয় করবেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও নবাগতা মাধবী মুখোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গৌরাঙ্গ চিত্রমের প্রথম প্রচেষ্টা "পরাশর"-এর মহরৎ উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। ছবিটি পরিচালনা করবেন গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী।

মহাভারতী নামে চন্দ্রাবতী দেবী তাঁর নিজস্ব প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। এঁদের প্রথম ছবি হবে "অতিথি"—রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গল্পের চিত্ররূপ। মৃণাল সেনের ওপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্ষার শেষে ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

দক্ষিণ ভারতের খ্যাতিমান প্রযোজক এ ভি মায়াম্পন "শশীবাবুর সংসার"-এর সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে আশাপূর্ণা দেবীর এই গল্পটির হিন্দী, তামিল ও তেলেগু চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। সেই সঙ্গে লেখিকার "ছাড়পত্র" নামক আর একটি গল্পও তিনি কিনেছেন।

নাট্যাভিনয়

লিট্‌ল থিয়েটারের পরিচালনায় মিনার্ভার পুনরুজ্জীবন

গত ২৭শে জুন প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের পরিচালনাধীনে ঐতিহ্যপূর্ণ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের পুনরুদ্বোধন হয়েছে। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ দীর্ঘ মেয়াদে এই রঙ্গমঞ্চের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসাবে মঞ্চস্থ করছেন সেক্সপীয়রের "ওথেলো" (বাঙলা অনুবাদ) এবং উৎপল দত্তের "ছায়ানট"। প্রতি বৃহস্পতিবার "ওথেলো" অভিনীত হবে এবং শনি ও রবিবার অভিনীত হবে "ছায়ানট"।

গত ১লা জুলাই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের পক্ষ থেকে উৎপল দত্ত সাংবাদিকদের জানান যে, তারা বহুপঠিত বিদেশী নাটকের বাঙলা নাট্যরূপ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যকারদের রচিত বাঙলা নাটক ক্রমান্বয়ে মঞ্চস্থ করবেন। শ্রীদত্ত আরও বলেন, কলকাতার তিনটি স্থায়ী রঙ্গালয়ের সংগে পূর্ণ সহযোগিতায় তাঁরা তাঁদের নতুন স্থায়ী নাট্যকেন্দ্রর মারফত বাঙলার নব নাট্য আন্দোলনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন। পরিশেষে শ্রীদত্ত বলেন, তথাকথিত ব্যবসায়িক ভিত্তির পরিবর্তে সমবায় ভিত্তিতে মিনার্ভা রঙ্গশালা পরিচালিত হবে, অর্থাৎ এর সমস্ত

লভ্যাংশ শিল্পী ও কর্মচারীদের মধ্যে সমান-ভাগে বণ্টন করা হবে।

গত ৩রা জুলাই মিনার্ভার পুনরুদ্বোধন উৎসবে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের কর্তৃপক্ষ এই রঙ্গালয়ের নতুন নামকরণের কথা ঘোষণা করেন। যদি আইনগত কোন বাধা না থাকে, তবে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ এই নাট্যশালার নাম রাখবেন "শিশির নাট্য-মন্দির"। নাট্যাচার্যের প্রতি লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের এই শ্রদ্ধা নিবেদনের সার্থক পরিকল্পনাকে উপস্থিত সুধীবৃন্দ অকুণ্ঠ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

এই উদ্বোধন উৎসবে ডাঃ কালিদাস নাগ ও অহীন্দ্র চৌধুরী লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের এই নবপ্রচেষ্টাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের কথা ব্যক্ত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। কলিকাতার পৌরপতি বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবে উপস্থিত হয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপের শুভপ্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

উৎসবশেষে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীরা মাইকেল মধুসূদনের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" মঞ্চস্থ করেন।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের প্রান্তিক শাখা আগামী সোমবার (১৩ই জুলাই) সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় নয়টি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-বিজয়ী নাটক "সংক্রান্তি" মঞ্চস্থ করবেন। বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত এই সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকটির পরিচালনা করছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোকসম্পাত ও রূপ-সজ্জার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে তাপস সেন ও শক্তি সেন। সংস্থার পুরস্কারবিজয়ী সদস্যবৃন্দ সকলেই এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

* * *

বিশ্ব যুব উৎসবের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন এই মাসের শেষে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে শিশু রংমহল তাঁদের শিল্পীদের নিয়ে ওখানে গিয়ে অভিনয় করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন। "মাহুত বন্ধু রে" ও "অগ্নিসম্ভবা"—এই দুখানি বাংলা ছবিও ঐ উৎসবে প্রদর্শনের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে। শেষোক্ত ছবিখানি এখনও এদেশে মুক্তি পায় নি। নিখিল ভারত যুব সমিতির সভাপতি সুশীল মজুমদারের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল আগামী ২২শে জুলাই ভিয়েনায় রওনা হবে।

* * *

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ চিত্র প্রযোজক এ ভি মায়াপ্পন ও তাঁর স্ত্রী গত রবিবার কলকাতা থেকে বিমানযোগে বিশ্ব-সফরে যাত্রা করেছেন। জাপানে ঘুরে মায়াপ্পন দম্পতী প্রথমে যাবেন আমেরিকায়। সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে তাঁরা যাবেন লণ্ডনে, এবং সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে তাঁরা সেপ্টেম্বরের শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তন করবেন। আমেরিকায় ভারতীয় ছবি যাতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হতে পারে শ্রীমায়াপ্পন সে চেষ্টাও করবেন এই সুযোগে। শ্রীমায়াপ্পনের সঙ্গে যৌথ-ভাবে ছবি তৈরী করবার আগ্রহ ও-দেশের কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেল। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার সুযোগও তিনি পাবেন সফরকালে। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে মায়াপ্পন দম্পতীকে একটি চা-সভায় আপ্যায়িত করেন চিত্র-পরিবেশক ভি এ পি আয়ার। সেই সভায় শ্রীমায়াপ্পন উপরের তথ্যগুলি প্রকাশ করেন।

* * *

সদ্য-সমাপ্ত বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যাঁরা জুরি বা বিচারক নির্বাচিত হয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভাপতি এম ডি ভাট তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রামাণ্য ও কৃষ্টি-মূলক ছবির বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। ভিয়েনার যুব উৎসবে যে সব ফিল্ম দেখান হবে তাদের বিচার করবার জন্যে পরিচালক সত্যজিৎ রায় আহূত হয়েছেন। আগামী মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচালক বিমল রায়ও যাচ্ছেন বিচারক রূপে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর এই নবার্জিত সম্মানে দেশী ছবির অনুরাগীরা আনন্দিত হবেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

দু'টি ছেলের অকাল মৃত্যুতে কলকাতার ক্রীড়ামহলে এক শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অবশ্য মানুষ নিয়মের দাস। নিয়ম মাফিক সব জিনিসই চলছে। খেলা-ধুলোও চলছে যথারীতি। এর মধ্যে ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে আর একটি চ্যারিটি খেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু ক্রীড়ামোদীরা দু'টি ছেলের বিয়োগ ব্যথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। থেকে থেকে তাদের স্মৃতিই বার বার মনে জেগে উঠছে।

চিরদিনের মত যে দু'টি ছেলে লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল তার ছোট ছেলেটির সংগে অবশ্য ক্রীড়ামোদীদের পরিচয় ছিল না। এ হচ্ছে আই এফ এর সম্পাদক এম দত্ত রায়ের একমাত্র পুত্র মোহন দত্ত রায়। ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের ৮ বছরের সুস্থ ছেলে। হঠাৎ 'পোলিও' রোগে আক্রান্ত হল, আর চিকিৎসা শাস্ত্রের জারিজুরি ব্যর্থ করে দিয়ে দিব্যলোকে চলে গেল।

অপর যে ছেলেটির সংগে ক্রীড়ামোদীদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল, কলকাতা ময়দান ছিল যার নিত্যকার প্রিয় ক্রীড়ানিকেতন, সে হচ্ছে ইস্টার্ন রেলের উদীয়মান ফুটবল খেলোয়াড় অসীম সোম। ইস্টার্ন রেলের 'কোচ' এবং উয়াড়ী ও মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় টি সোমের দ্বিতীয় পুত্র রেল দলের রাইট হাফ তাপস সোমের কনিষ্ঠ সহোদর। অসীম খেলোয়াড় মহলে 'নাটকী' নামে পরিচিত ছিল। একুশ বছরের জোয়ান ছেলে। যেমন ছিল তার সুঠাম গঠন, তেমন ছিল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা—তেমনই সুন্দর স্বভাব। তার খেলার ক্ষেত্রে ছিল ভবিষ্যৎ শিল্পীর প্রতিশ্রুতি। সত্যিই অসীমের আবির্ভাবে বাংলার শুষ্ক ক্রীড়া-উদ্যানে রূপে বর্ণে গন্ধে আমোদ করবার মত একটি ফুল ফোটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আধ-ফোটা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার আগেই ঝরে পড়ে গেল।

'অসীম' ও 'মোহনের' অকাল মৃত্যুতে তাদের মা-বাবাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। আজ মনে পড়ে ক্রীড়াক্ষেত্রের আর এক দিকপালের একমাত্র পুত্র বিয়োগের কথা। কয়েক বছর আগে শ্রীপংকজ গুপ্তও শ্রী এম দত্ত রায়ের মত তাঁর একমাত্র শিশু পুত্র 'প্রতীপ'কে হারিয়েছেন। এম দত্ত রায় ও পঙ্কজ গুপ্ত ভারতীয় ক্রীড়া-ক্ষেত্রের দুই মহারথী। টি সোমেরও ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনাম কম নয়। একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং বিশিষ্ট 'কোচ' হিসাবে তিনি বিশেষভাবেই পরিচিত।

এশিয়ান গেমে টি সোম ছিলেন ভারতীয় দলের ফুটবল 'কোচ'। পংকজ গুপ্ত, এম দত্ত রায় এবং টি সোমের সংগে খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদীদের একটা অন্তরের যোগা-

ইস্টার্ন রেলের পরলোকগত ফুটবল খেলোয়াড় অসীম সোম। অসীমের যেমন ছিল সুঠাম গঠন, তেমন ছিল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর চেহারা

যোগ আছে। সেই সূত্রে আমাদেরও। খেলার দৌলতে খেলোয়াড়, ক্রীড়া পরিচালক ও সাংবাদিকদের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সৃষ্টি হয়েছে যে ক্রীড়া-সমাজ।—সেই সমাজে এ'রা পংকজ দা, 'বেচু' দা ও 'বাঘা' দা নামে পরিচিত। এ'দের অন্য পরিচয় নেই। এ'দের দুঃখে সবাই দুঃখী। মোট কথা এই বিরাট শহর কলকাতায় খেলোয়াড় মহল নিয়ে যে একটা ছোট্ট ক্রীড়া-সমাজের সৃষ্টি হয়েছে 'অসীম' ও 'মোহনের' অকালমৃত্যু সেই সমাজের বুকেই এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমরাও আত্মীয় বিয়োগ ব্যথার মত বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েছি।

কল্পনা করুন—পুত্রহারা এম দত্ত রায় ও টি সোম বুক চাপড়ে আর্তনাদ করছেন, তার সংগে যোগ দিয়েছেন পঙ্কজ গুপ্ত। প্রিয় বন্ধু ,জীবনের চির সুহৃদের শোকে নিজের বিস্মৃত শোক উথলে উঠেছে—তিনজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। শোকাকুল খেলোয়াড় মহলের মুখে ভাষা নেই। শুধু একটা হাহাকার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে কে স্থির থাকতে পারে?

শোকের ঘটনাও কত বিচিত্র! টি সোম গিয়েছিলেন এম দত্ত রায়ের শিশুপুত্র 'মোহনের' শবদেহ অনুগমন করে শ্মশান ঘাটে। সেখানেই তাকে সংবাদ দেওয়া হয় লিলুয়ার কর্মস্থান থেকে হাওড়া ফেরবার সময় ইলেকট্রিক ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে 'অসীম' ভীষণভাবে আহত হয়েছে। অদৃষ্টে করাঘাত করে টি সোম বন্ধুবর এম দত্ত রায়কে বলেন—দেখ বেচু, তোমার পুত্রের সৎকার করে গেলাম, আমার কপালে আবার কি আছে কে জানে? নিয়তি দেবী তখন হয়তো অলক্ষ্যে ক্রুর হাসি হেসে-ছিলে। টি সোম তখনই বি আর সিং হাসপাতালে এসে দেখেন অসীম জ্ঞানহারা। ডাক্তার কোনই ভরসা দিতে পারছেন না।

উইম্বলডন বিজয়ীর পুরস্কার সহ পেরুর খেলোয়াড় এলেক্স অলমেডো

অসীমের জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। খেলোয়াড় অসীম ৪৮ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে মরণ খেলা খেলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

অসীম খেলত ইস্টার্ন রেলের রাইট ইনে। সে পরতো ৮ নম্বরের খেলার জামা। যে জামা জীবনে তার অতি প্রিয় ছিল মরণের পর সেই ৮ নম্বরের জামা পরিয়ে তাকে পুষ্প চন্দনে সজ্জিত করা হয়। তারপর একখানি ট্রাকের উপর পুষ্প সজ্জায় শায়িত অসীমের মরদেহ নিয়ে খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদীদের এক বিরাট শোক-যাত্রা অসীমের আবাস স্থল রেল কোয়ার্টারে যখন উপস্থিত হয় তখনকার মর্মস্পর্শী দৃশ্য বর্ণনাতীত। রেল পাড়ায় অসীম ছিল সবারই প্রিয়। ঐ দৃশ্য দেখে কেউই চোখের জল রাখতে পারে না। তারপর অসীমের প্রাক্তন শিক্ষায়তন বঙ্গবাসী কলেজ, আই এফ এ অফিস, ময়দান ও রেলের সদর দপ্তর ঘুরে শোক-যাত্রা নিমতলা শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার শ্মশান যাত্রীর সম্মুখে অসীমের শেষকৃত্য সমাপ্ত করা হয়। আজকাল কোন দেশ নেতার শব অনুগমনেও এমন দর্শক সমাগম বিরল।

এর আগে অকালে বহু খেলোয়াড় মৃত্যু বরণ করেছে। মোহনবাগানের খেলোয়াড় এস ব্যানার্জি'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত 'রাজা' ব্যানার্জি, যাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রাজা শীল্ডের খেলা পরিচালিত হচ্ছে তিনিও সদ্য বিবাহের পর খেলার মাঠেই প্রাণ দিয়েছিলেন। কিন্তু অসীমের মৃত্যু সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের যেভাবে অভিভূত করেছে সাম্প্রতিককালের কোন ঘটনায় খেলোয়াড়কুল এমন অভিভূত হয়নি। একটা উঠতি তাজা ছেলে চোখের উপর দিয়ে চলে গেল! চিকিৎসকেরা কোন কিছু করবার সুযোগই পেলেন না।

অমায়িক এবং শান্ত-স্বভাব সম্পন্ন অসীমের খেলার কথা কি বলব? ক্রীড়া-মোদীদের কিছুই অজানা নেই। পিতার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে সত্যিই অসীম একজন নিপুণ খেলোয়াড় হয়ে উঠছিল। গতবার ইস্টার্ন রেলের লীগ বিজয়ের ক্ষেত্রে অসীমের দান কম নয়। একটি খেলার কথা আমার চোখের উপর এখনও ভাসছে। বোধ হয় ইস্টার্ন রেল ও জর্জ টেলিগ্রাফের ফিরতি লীগের খেলা হবে। রেল দল লীগ জয়ের প্রায় মুখে এসে পড়েছিল। কিন্তু জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে খেলায় টেলিগ্রাফ দলই প্রথম গোল করে বসলো। মাঠে তখন ভীষণ উত্তেজনা। কি হয় কি হয়! একটি পয়েন্ট নষ্ট হলেও রেলের লীগ হাতছাড়া হবার আশংকা। রেলদল অবশ্য আক্রমণ করে চলেছে। কিন্তু গোল শোধ হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাঁদিক থেকে একটি বল উঁচু হয়ে টেলিগ্রাফ গোলের মুখে আসতেই অসীম কোথা থেকে ছুটে এসে উড়ন্ত পাখীর মত বল তাক করে শূন্যে দেহ ভাসিয়ে দিল—অসীমের দর্শনীয় হেডে বল বিদ্যুৎবেগে ঢুকলো গোলের মধ্যে, সেই সঙ্গে অসীমও জালের সঙ্গে লটকে গেল। একটি চমৎকার গোল লাভের ফলে রেল সমর্থকরা হাফ ছেড়ে বাঁচল। এর পর রেলদল দ্বিগুণ উৎসাহে খেলে খেলায় বিজয়ী হল। নিজেকে বিপন্ন করে সেদিন অসীম যেভাবে গোল করেছিল সচরাচর সে দৃশ্য দেখা যায় না। তাই সে গোলের কথা আমি আজও ভুলিনি।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও মাথায় ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত অসীমের চিকিৎসার কোন সুযোগ দেয়নি, কিন্তু এম দত্ত রায়ের পুত্র মোহনের জীবন ফিরে পাবার জন্য চিকিৎসকেরা যথেষ্টই চেষ্টা করেছেন। তাকে মেডিক্যাল কলেজে 'আয়রণ লাংসের' মধ্যে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছে। স্বয়ং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

'পোলিও' অর্থাৎ শিশু-পক্ষাঘাতের নিয়মই নাকি এই। এ রোগে জীবন ফিরে পাওয়া মরাকে ফিরে পাবার সামিল। কিন্তু এও বলি ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার ব্র্যাডম্যান তনয় জন ব্র্যাডম্যান ত এই পোলিও রোগেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি এখন ব্যাট ধরে বাবার পদাংক অনুসরণ করছেন। একেই বলে ভাগ্য। ভাগ্যের উপর কারো হাত নেই। না হলে এদেশে সচরাচর যে রোগ হয় না মোহন সেই পোলিও রোগে আক্রান্ত হবে কেন? পংকজ গুপ্তের পুত্রই বা কেন দুরারোগ্য 'পারপিউরা' রোগে মারা যাবে? খেলোয়াড় অসীমই বা কেন ইলেকট্রিক ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে জীবনের খেলা সাঙ্গ করবে। সমস্ত বিধিলিপি। আগেই বলেছি এম দত্ত রায় ও টি সোমের শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। ভগবান এদের আঘাত সহ্য করার শক্তি দিন, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এ'রা শোক ভুলে যান, এই কামনা করি।

পংকজ গুপ্তের পুত্র প্রতীপের স্মৃতি রক্ষার জন্য প্লেয়ার্স এসোসিয়েশনের

উদ্যোগে খেলোয়াড়দের সেবার জন্য প্রদীপ মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইউনিট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। 'অসীম' এবং 'মোহনের' স্মৃতির জন্য কিছু করার কথা ক্রীড়ামোদীরা অবশ্যই ভেবে দেখবেন আশা করি।

• • •

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর খেলোয়াড় এলেক্স অলমেডো এবার উইম্বলডন জয় করেছেন। অলমেডো পেরুর অধিবাসী হলেও আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবেই উইম্বলডনে খেলেছেন। কারণ পড়াশুনোর জন্য অলমেডো এখন আছেন আমেরিকাতে। গতবার আমেরিকার পক্ষেই ইনি ডেভিস কাপে অংশ গ্রহণ করেন এবং অলমেডোর ক্রীড়ানৈপুণ্যেই আমেরিকা লাভ করে ডেভিস কাপ। বর্তমানে এমেচার টেনিসে অলমেডোর সমকক্ষ কোন খেলোয়াড় নেই। তাই টেনিস বিশেষজ্ঞরা উইম্বলডনের সম্ভাবিত বিজয়ীর তালিকার অলমেডোকেই শীর্ষস্থান দিয়েছিলেন। অলমেডোও তার উপর বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাসের পুরো মর্যাদা দিয়েছেন।

অবশ্য উইম্বলডনের খেলা আরম্ভের আগে লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইন্যালে ভারতীয় খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণনের কাছে অলমেডোর পরাজয় টেনিস ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এবং অনেকেই আশা করেছিলেন লণ্ডন চ্যাম্পিয়নশিপের মত খেলতে পারলে অলমেডোকে কৃষ্ণণের কাছে তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু অলমেডো যোগ্য খেলোয়াড় হিসাবেই কৃষ্ণনকে পরাজিত করেছেন। এবারকার সাত রাউণ্ডের খেলার মধ্যে এক কৃষ্ণন এবং চিলির খ্যাতনামা খেলোয়াড় লুই আয়েলা ছাড়া আর কেউই অলমেডোর কাছ থেকে কোন সেট পাননি। কৃষ্ণন ও আয়েলা একটি করে সেট নিয়েছেন।

সম্ভাবিত বিজয়ীর তালিকায় এবার দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিলেন গতবারের রানার্স অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা খেলোয়াড় নীল ফ্রেজার। কিন্তু ফ্রেজার সেমি-ফাইন্যালেও উঠতে পারেননি। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ফ্রেজারকে আমেরিকার দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় ব্যারী ম্যাকের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। অলমেডো সেমি ফাইন্যালে ম্যাককে হারিয়ে ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা রড লেভারকে পরাজিত করেন ৬—৪, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে। মাত্র ৭২ মিনিটের মধ্যে খেলার মীমাংসা হয়ে যায়। অখ্যাত রড লেভারের ফাইন্যালে খেলার ঘটনা বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ইনি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কোনদিন ডেভিস কাপের খেলাতেও অংশ গ্রহণ করেননি। সম্ভাবিত বিজয়ীর তালিকা অর্থাৎ সিডিং-য়েও লেভারের কোন
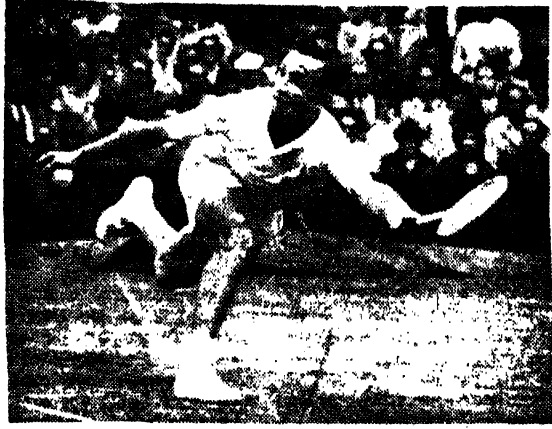
উইম্বলডন রানার্স রড লেভার

স্থান ছিল না।

উইম্বলডনে এবার দক্ষিণ আমেরিকারই জয়জয়কার। এবার মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নগণও লাভ করেছেন দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকোর টেনিস পটিয়সী মিস মেরিয়া বুনো। ফলে একুশ বছর ধরে মহিলা বিভাগে আমেরিকার একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান ঘটেছে। গত একুশ বছরের মধ্যে আমেরিকার কোন প্রতিযোগিনী ছাড়া আর কেউই উইম্বলডনে মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেন নি। মিস বুনো সেমি-ফাইন্যালে ক্যালিফোর্নিয়ার কলেজ ছাত্রী মিস স্যালী মুরকে ৬—২ ও ৬—৪ গেমে পরাজিত করে—ফাইন্যালে আমেরিকারই অনাতমা প্রতিযোগিনী ডার্লিন হার্ডকে ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে সহজেই পরাজিত করেন। ১৯৫৭ সালের ফাইন্যালে ডার্লিন হার্ড আলথিয়া গিবসনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্রেজিলের মহিলা চ্যাম্পিয়ন ১৯ বছর বয়স্কা টেনিস পটিয়সী মিস মেরিয়া বুনো সেমি ফাইন্যালে ও ফাইন্যালে যে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বহুদিন দর্শকদের স্মৃতিপটে জেগে থাকবে। সার্ভিসের নৈপুণ্যে 'ভলির' দৌরাত্ম্যে এবং পাসিং শটের কারুকার্যতায় তিনি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। উইম্বলডনে কোন মেয়ে টেনিস খেলছেন তার খেলা দেখে এ কথা মনে হয়নি। ১৯৩৯ সালে এই ধরনের খেলাই দেখিয়ে গেছেন অতীতদিনের কীর্তিমতী খেলোয়াড় এলিস মার্বেল্স।

মহিলা বিভাগে সম্ভাবিত বিজয়িনীর বাছাই তালিকায় শীর্ষস্থানের অধিকারিণী ছিলেন ব্রিটেনের ক্রিশ্চিন ট্রুম্যান। ক্রিশ্চিনের উপর ইংলণ্ডবাসীর খুবই আশা ছিল। কিন্তু ক্রিশ্চিন কোয়ার্টার ফাইন্যালেও উঠতে পারলেন না। কোয়ার্টার ফাইন্যালের আগেই তিনি পরাজয় স্বীকার করলেন ব্রেজিলের মেয়ে র‍্যামিরেজের কাছে। র‍্যামিরেজ আবার কোয়ার্টার ফাইন্যালে হারলেন আমেরিকার স্যালী মুরের কাছে।

ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে তৃতীয় রাউণ্ডে অলমেডোর কাছে কৃষ্ণনের পরাজয়ের কথা আগের সপ্তাহেই 'দেশে'র পাতায় আলোচিত হয়েছে। পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে নরেশকুমার দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হওয়ায় উইম্বলডনে খেলতে পারেননি। ভারতের দুই তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখোর্জী ও প্রেমজিৎলাল প্রথম দিকেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

প্রতি বছরই উইম্বলডন বিজয়ীর ডাক আসে পেশাদার টেনিসের প্রবর্তক জ্যাক ক্র্যামারের কাছ থেকে তার পেশাদার দলে যোগ দেবার জন্য। এবারও অলমেডোর কাছে ডাক এসেছে। খেলোয়াড়রা বিপুল অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না। আর একে একে এমেচার টেনিস থেকে এক একটি তারকা খসে পড়ে। এই করে এমেচার টেনিসের আকর্ষণ ক্রমেই কমে আসছে। বিশ্ব টেনিসের এখন যে অবস্থা তাতে এমেচার ও প্রোফেশনাল টেনিসের পার্থক্য আর বেশীদিন বজায় থাকবে বলে মনে হয় না।

• • •

লীডসের হেডিংলী মাঠে ভারত ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড দল এক ইনিংস ও ১৭৩ রাণে ভারতকে পরাজিত করে রাবার লাভ করেছে। আগের দুটি টেস্টেও ভারতকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ফলে ইংলণ্ড দল পর পর তিনটি খেলাতেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

দেশী সংবাদ

২৯শে জুন—কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড আজ নয়াদিল্লিতে ছয় ঘণ্টারও অধিক কাল কেরালা পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া একটি প্রস্তাব পাস করেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, 'রাজ্য বিধান সভায় পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই কেরালা সরকারের গণতন্ত্রসম্মত সমাধানের উপায়। শিক্ষা আইন লইয়া যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বোর্ড কেরালা সরকারকে শিক্ষা আইনের প্রয়োগ স্থগিত রাখিতে সুপারিশ করিয়াছেন।

কেরালার প্রশ্ন লইয়া অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মুলতুবী সভা বাক-যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কেরালা সরকারের সাম্প্রতিক কার্যাবলীর বিরোধী ও সমর্থকদের চীৎকার, পাল্টা চীৎকার, পরস্পরের প্রতি অশোভন কটূক্তি, পেপার-ওয়েট দ্বারা টেবিলের উপর ক্রমাগত ঠুকিবার দরুণ উত্থিত বিকট শব্দে সভাকক্ষ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

৩০শে জুন—তথ্যাভিজ্ঞ মহল হইতে এই মর্মে এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, দুর্গাপুর কোকচুল্লী কারখানায় প্রস্তুত কোক্ (জ্বালানী কয়লা) নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া ক্রেতারা উহা ক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ইহার ফলে নাকি জ্বালানী কয়লার পাহাড় জমিয়া তথায় এক সংকটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র অদ্য এক বিবৃতিতে বলেন যে, ভারত সরকার তিব্বতের কোন পৃথক সরকারের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং ভারতে দলাই লামার নেতৃত্বে তিব্বত সরকারের সক্রিয় থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না।

১লা জুলাই—আজ ত্রিবান্দ্রমে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, কেরালার বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে গত ১২ই জুন হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত কেরালায় ২৪ হাজার ৯৬১জন লোক হয় ধৃত, না হয় পুলিস কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫৮২০জন লোক দণ্ডিত হইবার পর জেলে প্রেরিত হইয়াছে।

২রা জুলাই—প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীপত্তম থাণু পিল্লাই আজ বলেন যে, কেরালা রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল হইতে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুলিস এখন পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী ব্যাপকভাবে নির্মম দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

৩রা জুলাই—পুলিস আজ মধ্যাহ্নে ত্রিবান্দ্রমের সমুদ্রকূলোপবর্তী শহরতলী ভীমপল্লীর নিকটে চেরিয়ার্থুরা নামক একটি স্থানে গুলীবর্ষণ করিলে একটি স্ত্রীলোক ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং আর এক ব্যক্তি আহত হইয়া হাসপাতালে মারা যায়। বুলেটের আঘাতে আহত আরও পাঁচ ব্যক্তি হাসপাতালে আছে। তাহাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর বলিয়া প্রকাশ।

পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত সন্দেহে মানিকতলা পুলিস হরগঞ্জ রোডের দুইটি হোটেল ও রেস্তোরা হইতে ছয়জন বিবাহিতা যুবতীকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করায় মানিকতলা অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়।

৪ঠা জুলাই—কেরলে কম্যুনিস্ট শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য তিন সপ্তাহ ধরিয়া যে আন্দোলন চলিতেছে আজ সেই আন্দোলনের 'নারী দিবস'। সংসদ সদস্যা শ্রীমতী উদয়ভানু সহ আজ বহুসংখ্যক নারী কেরল রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রেপ্তার বরণ করে।

এই বৎসর ডুয়ার্সের সর্বত্র অকালে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। অনেক নদীতে বন্যা আসিয়াছে। অনেক সেতু ভাঙিয়া যাওয়াতে বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক সংবাদ, গত দুই সপ্তাহের বর্ষণে উত্তরবঙ্গের ভয়ংকরী তিস্তা নদী গতিমুখ পরিবর্তন করিয়াছে।

প্রায় ৫০জন নাগা বিদ্রোহীর একটি দল গতকল্য রাত্রি প্রায় ১১-৫০ মিঃ-এর সময় ডিমাপুর হইতে ৪ মাইল দূরে রেলওয়ে লাইন উড়াইয়া দিয়াছে। বিদ্রোহী দল গৌহাটীর দিক হইতে আগত ৯০৩ আপ এক্সপ্রেস মালগাড়িটি আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে দুইজন আহত হইয়াছে।

৫ই জুলাই—অদ্য অপরাহ্নে বেলঘরিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচজন মেয়ে পকেটমার ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজনের কোলে দুইটি শিশু সন্তান আছে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কেরল কমিটি আজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেরালায় কম্যুনিস্ট সরকারের কাজ অচল করিবার প্রথম উপায় হিসাবে বিধানসভার প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলভুক্ত সকল সদস্য এবং সরকারী কমিটির সকল প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্য পদত্যাগ করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে জুন—পাকিস্তান টাইমস-এ প্রকাশিত পেশোয়ারের এক সংবাদে জানা যায়, গত সপ্তাহের শেষের দিকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সিতে দেশীয় রাজ্য দীরের অধিবাসী ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষের ফলে সহস্রাধিক লোক হতাহত হইয়াছে। নিহতের সংখ্যা বহু হইবে বলিয়া প্রকাশ।

৩০শে জুন—আজ সকাল হইতে নেপালের প্রথম সংবিধান চালু হওয়ায় দীর্ঘকালের রাণা শাসিত এই দেশ পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল। নূতন সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নেপালের প্রাচীন ও অসংগতিপূর্ণ আইনসমূহ পরিত্যক্ত হইল। নেপালের ৮৫ লক্ষ অধিবাসী এক নূতন যুগের শুভ স্পর্শ অনুভব করিল।

১লা জুলাই—পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী শ্রী এস সোয়েব গতকাল বিকালে জাতির নিকট যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, উহাতে দেশ বিভাগ কালীন ভারতের পাওনা পরিশোধের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। পূর্ব পূর্ব বৎসর কার্যত কোন অর্থ দেওয়া না হইলেও ভারতের পাওনা তিনশত কোটি টাকা পরিশোধের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হইত।

২রা জুলাই—৪৭ বৎসর বয়স্কা এক নিগ্রো স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে আজ বিচারপতি হেনরি জনসন ২৪ বৎসর বয়স্ক নৌ সৈন্য ফ্রেড ডেবিস নামক এক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উক্ত ফ্রেড ডেবিসের প্রাণদণ্ড হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন নিগ্রো স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের পরিণামে ইহাই প্রথম প্রাণদণ্ড হইবে।

৩রা জুলাই—পাকিস্তানের বৈষয়িক নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি গঠিত অর্থনৈতিক পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করেন। ১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এই সব পরিকল্পনা বাবদ মোট ব্যয় হইবে ২৪৪ কোটি টাকা।

৪ঠা জুলাই—৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ৫ ইঞ্চি বারিপাতের ফলে সমগ্র করাচী শহর প্লাবিত হইয়াছে। ফলে কয়েক ব্যক্তি ডুবিয়া মরিয়াছে' বহুলোক আহত হইয়াছে এবং শত শত লোক গৃহহীন হইয়াছে।

কলম্বো পোর্ট শ্রমিকদের পাঁচটি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ হইতে গতকল্য এগার দিনব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়েকের আবেদনেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ধর্মঘটের ফলে বন্দরের কাজ অচল হইয়া পড়িয়াছিল।

৫ই জুলাই—প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন অদ্য গণ-পরিষদ ভাঙিয়া দেন এবং ইন্দোনেশিয়ার ১৯৪৫ সালের বিপ্লবী সংবিধান বলবৎ করেন। এ সংবিধানে তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে ডিক্টেটরের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

গতকল্য করাচীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের বর্তমান বাজেটে দেশ বিভাগ বাবদ ভারতের প্রাপ্য ঋণের টাকা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। কারণ পাকিস্তানের যখন ভারতের নিকট বহু টাকা পাওনা তখন ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো অদ্য বলেন যে, সম্প্রতি মস্কোতে প্রকাশিত আদমসুমারী রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া দেড় কোটি হইতে দুই কোটি পুরুষকে হারাইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

= কতকগুলি জনপ্রিয় নূতন বইয়ের নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হইল =

নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অস্তি ভাগীরথী তীরে** (২য় মুদ্রণ) ৭৲

এই গ্রন্থে নীহাররঞ্জন তাঁহার সমস্ত পূর্ব গৌরবকে অতিক্রম করিয়াছেন। প্রাচীন কলিকাতার পৃষ্ঠপটে লিখিত এই সুবৃহৎ উপন্যাস তাঁহার অনন্যসাধারণ কীর্তি।

নূপুর (৩য় মুদ্রণ) তিন টাকা বারো আনা

মায়ামৃগ (নাটক) ২৷৷

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **পঞ্চতপা** (২য় মুদ্রণ)

— সাড়ে ছ টাকা —

এই কাহিনীর একাংশ মাত্র লইয়াই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মিত হইয়াছিল। ইহাই লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

নবনায়িকা ৩৷৷ **সমুদ্র সফেন** ৪৷৷

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প (দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ) ৫৲

দুই তারা ২৷৷

৷৷ তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ৷৷

অবধূতের **বহুব্রীহি** ৪৷৷

৷৷ পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ৷৷

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

আরাকান ৫৲

জাগ্রত ব্রহ্মের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস।
সুসংস্কৃত নূতন মুদ্রণ । পাঁচ টাকা

প্রমথনাথ বিশীর অত্যাশ্চর্য উপন্যাস

কেরী সাহেবের মুন্সী

চতুর্থ মুদ্রণ । সাড়ে আট টাকা

প্রবোধকুমার সান্যালের

বন্যাসঙ্গিনী

৪র্থ মুদ্রণ । তিন টাকা

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুন বই

জাপানে

জাপান হচ্ছে সৌন্দর্যের দেশ। কেবল বহিঃসৌন্দর্যের নয়, অন্তঃসৌন্দর্যেরও। 'পথে প্রবাসে'র লেখক অন্নদাশঙ্করের সৌন্দর্যের দীক্ষা হয়েছিল পূর্বেই, কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অভিষেক হ'ল জাপান ভ্রমণেই। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'জাপানে' শুধুমাত্র ভ্রমণ কাহিনী নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। বৌদ্ধ মন্দির, শিল্পোপীঠ, 'নো' নাটক, কাবুকি নাটক, পুতুলনাট্য, ব্যালে নৃত্য প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় বাংলা সাহিত্যের অসামান্য বই। দুষ্প্রাপ্য একরঙা ও বহুবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ। দাম : ৬·৫০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

প্রেমতারা

অগণিত মানুষকে আনন্দ দিতে হেসে নেচে নানা কসরত দেখাতে হয় সার্কাসের মেয়েদের। এমনি এক আশ্চর্য মেয়ে সার্কাস-কুইন প্রেমতারা। রাত্রির 'শো' শেষ হ'লে যখন সে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসে, তখন তার নারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রণয়ের আকুতি-অভিব্যক্তি সার্কাসের সেরা খেলাকেও ছাপিয়ে ওঠে। বিচিত্র রূপ ও রসের অন্তরঙ্গ পরিবেশে নতুন ধরণের কাহিনীসমৃদ্ধ উপভোগ্য উপন্যাস। দাম : ৪·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড । দাম : ৫·০০

বনফুল
ভুয়োদর্শন ... ৩·০০

সুধীরচন্দ্র সরকার
পৌরাণিক অভিধান
দাম : ৭·০০

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল
দাম : ৬·০০

দীপক চৌধুরীর অবিস্মরণীয় উপন্যাস
পাতালে এক ঋতু
প্রথম খণ্ড । দাম : ৬·০০

রাজশেখর বসু
মহাভারত
দাম : ১২·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
রূপের দায়
দাম : ৩·৫০

ধীরাজ ভট্টাচার্যের উপন্যাস
মন নিয়ে খেলা
দাম : ৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

'এনাসিন'
মাথাধরা সর্দি জ্বর ও
পেশীর বেদনায়
সত্বর আরাম দেয়, কারণ এতে
চারটি ওষুধ রয়েছে
WILL NOT UPSET THE STOMACH
DOES NOT HARM THE HEART
ANACIN
TABLETS
Registered User : GEOFFREY MANNERS & CO. PRIVATE LTD.

সূচীপত্র

স্মরণীয়
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি
৭ই আষাঢ়ের বই
জ্যোতির্ময় ঘোষ ('ভাস্কর')-এর
বিচিত্র গল্পগ্রন্থ
ফ্যাশন ৩৲
আমাদের সদ্য প্রকাশিত
বইগুলি
'বনফুল'-এর
নূতন বাঁকে (কবিতা) ২॥০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
অভিষেক (উপন্যাস) ৫৸০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩॥০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

পিয়ার্স
সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!
পিয়ার্স সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য্য সাবান—আপনার ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্য্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
সুগন্ধ পিয়ার্স সাবান আপনার সৌন্দর্য্যচর্চ্চার নিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও পিয়ার্স আদর্শ।
পিয়ার্স ট্যালকাম, এত মখমলের মত মোলায়েম, এত অপূর্ব সুগন্ধ—আপনাকে সারাদিন সতেজ, সুন্দর রাখে। সুদৃশ্য হাল্কা হলুদ-সবুজ-সোনালী টিনে পিয়ার্স ট্যালকাম কিনুন।
PEARS
TALCUM
PEARS
TRANSPARENT
SOAP

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Satuurday, 18th July, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৮ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১ শ্রাবণ, ১৩৬৬ বংগাব্দ

নেহরুর দ্বিধা

নেহরুর উক্তিসমূহের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিতেছেন, সংবাদপত্রেও অনেক সময় ইহা আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি? তাঁহাকে সদাসর্বদা অনেক বিষয়ে মতামত দিতে হয় তাহাতেই কি এমন ঘটে? কিম্বা ঘটনার তোড়ের মুখে যথাযথ চিন্তা করিবার অবকাশ পান না বলিয়াই কি এমন হইয়া থাকে? আমাদের বিশ্বাস নেহরুর দ্বিধার এগুলি গৌণ কারণ মাত্র, আসল কারণ নয়। ইদানীংকার দুটি উদাহরণ দিতেছি। ভিভিয়ান বসুর রায় এবং এদেশে সুইজারল্যাণ্ডের আর্থিক সাহায্য প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দুই ব্যাপারে তিনি এমন কিছু বলিয়া বসিয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে পরে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। ভুল হইলে দুঃখ প্রকাশ অবশ্যই মহত্ত্বের লক্ষণ। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি এমন হয় কেন?

সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোন বিষয়ে, অনেক জরুরি বিষয়ে নেহরুর মনঃস্থির করিতে কিছু বেশি সময় লাগে, আবার অনেক দ্বিধার পরে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতেও বেশি সময় লাগে না। ইহার উদাহরণস্বরূপ তিন বছর আগেকার ভাষাভিত্তিক রাজ্যসীমানা নির্ধারণ আন্দোলনকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হালফিল কেরল সমস্যাকে, তাঁহার দ্বিধা, সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহার স্বাভাবিক মন্থরতা সংকটের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হইবে জানি না; কেরলবাসিগণের আন্দোলনে বা রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে হইবে কিম্বা কম্যুনিস্টগণের চক্রান্তে কেরলের দাবানল সর্বভারতে ছড়াইয়া পড়িবে কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু যেমনই হোক, যাহাই হোক ইহার মূলে আছে নেহরুর দ্বিধা, এই দ্বিধায় ব্যাধি প্রশ্রয় পায়, শক্তি সঞ্চয় করে, অবশেষে উগ্রতরভাবে বিষক্রিয়া আরম্ভ করে। অথচ নেহরুর সততা ও আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করিবার অনুমাত্র কারণ নাই। সেই জন্যই এই দ্বিধার রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া ওঠে।

আমাদের বিশ্বাস নেহরু একই সময়ে দুই ভিন্নস্তরে চিন্তা করেন বলিয়াই, খুব সম্ভব, এমন হইয়া থাকে। তিনি একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক নির্বাচিত নেতা এবং সেই সূত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রী আবার তিনি সর্বভারতীয় নেতা (বর্তমানে একমাত্র তাঁহাকেই সর্বভারতীয় নেতা বলা যাইতে পারে)। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব লোকসভা তথা রাষ্ট্রপতির কাছে, দলীয় নেতা হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব কংগ্রেস দলের কাছে; আবার সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব দলনির্বিশেষ প্রত্যেকটি ভারতবাসীর কাছে। আরও বলা যাইতে পারে যে, সর্বভারতীয় নেতার দায়িত্ব তিনি পাইয়াছেন ইতিহাসের হাত হইতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান ও পুরোবর্তী কংগ্রেসের (তৎকালীন কংগ্রেস) হাত হইতে; আর প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পাইয়াছেন বর্তমান কংগ্রেসের নিকটে। বর্তমান কংগ্রেস দেশের বহু রাজনৈতিক দলের অন্যতম (অবশ্য গরিষ্ঠতমও বটে) দলমাত্র—কিন্তু হইলে কি হয়—পুরাতন স্মৃতির ডোর এখনো ছিন্ন হয় নাই, কংগ্রেস নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত অনেকের কাছে সর্বভারতীয় নেতা (বিশেষ নেহরুর ন্যায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাপতি)। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, অদ্যকার প্রধানমন্ত্রীপদ ও সর্বভারতীয় নেতৃপদ এক স্তরের পদ নহে। এখন নেহরুকে অনেক কারণে (ঐতিহাসিক কারণ প্রধান) একই সময়ে এই দুই ভিন্ন স্তরে চিন্তা করিতে হয়; খুব সম্ভব তিনি ইচ্ছা না করিলেও ইহার অন্যথা হইবার উপায় ছিল না, কেন না দেশের অচিরগত ইতিহাসের প্রভাব এখনো আমাদের মনের মধ্যে বেশ সক্রিয়। এখন আমাদের বিশ্বাস এই স্তরভেদজনিত চিন্তার ফল হইতেছে নেহরুর দ্বিধার যথার্থ কারণ। যে-মুহূর্তে কংগ্রেসসেবীর কথা তাঁহার মনে পড়ে সেই মুহূর্তেই আবার অন্যদলবর্তী লোকের কথা মনে পড়ে, দল ও দেশ একই সময়ে তাঁহার কাছে হাত বাড়াইয়া দেয়, সমাধান ও সান্ত্বনা যাচ্ঞা করে; দুইখানি হাত দুইখানা মুখ একই সময়ে মনে পড়িলে দ্বিধা না আসিয়া পারে না। যে-সব দেশে দল ও দেশ এক সেখানে দ্বিধার বালাই নাই। আবার ইংলণ্ডের মতো যে দেশে বহুকালের ব্যবহারে দেশ ও দলের সীমানা নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে সেখানেও দ্বিধার বালাই নাই।

কিন্তু আমাদের মতো নূতন গণতান্ত্রিক যাত্রীর পক্ষে এ একটা অপরিহার্য সমস্যা। এখনো আমাদের দল ও দেশের স্বার্থের সীমানা নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত হয় নাই; দলের স্বার্থকে কতদূর পর্যন্ত প্রবল করিয়া তুলিলে দেশের স্বার্থহানি না ঘটে, এই সময়সাধ্য শিক্ষা এখনো আমাদের আয়ত্ত হয় নাই। এ হেন ক্ষেত্রে নেহরুর মতো ব্যক্তি যিনি এককালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি ছিলেন এখন প্রধান সেনাপতি, তাঁহার উপরে একই সংগে এ দুই দায় না বর্তাইয়া পারে না। আর তাহারই অনিবার্য ফল নেহরুর চিন্তার দ্বিধা।

প্রসঙ্গত

নেই কাজ ত খই ভাজ—এটা চলতি ঠাট্টা। কিন্তু কাজ না থাকলে কেউ যদি সত্যিই খই ভাজতে বসে, তাতে কিছু দোষ দেখিনে। অদরকারী হলেও ও-কাজটাও কাজ—অলস মগজে শয়তানের কারখানা তৈরি করার চেয়ে শতগুণে সৎকর্ম। তাই বলে, হাজার কাজ ফেলে কেউ যদি খইয়ের কুলোডালা কোলে তুলে ধান বাছতে বসে, তাকে কদাচ বাহবা দেব না।

যেমন, আমাদের সরকারকে অধুনা দিচ্ছিনে। ব্রিটিশ আমলের ভারী ভারী মূর্তিগুলি তাঁরা রাতারাতি সরিয়ে ফেললেন, কিন্তু আশানুরূপ জোরে হাততালি পড়ল না। অনেকে ত ভ্রূক্ষেপই করল না। যারা করল, তাদের ভ্রূ অতঃপর কুঞ্চিত হল।

*

শত ক্ষয়ক্ষতি-শেষেও আমাদের এইটুকু লিবারেলিজম্ অবশিষ্ট আছে—এখনও মূঢ়তাকে ধিক্কার দিতে পারি। প্রশ্ন তিনটি উঠেছে : এক, এ-কাজের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা। দুই, থাকলেও তার উপযুক্ত সময় এই কিনা। তিন, বাছবিচার বাদ দিয়ে, পাইকারী হারে মূর্তি অপসারণের নীতি ঠিক কিনা।

একবাক্যে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কেন না, এ-প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে স্বাজাত্যবোধ ও অভিমান, জাতিবৈর ইত্যাদি কোথাও উঠে পড়ে কিনা! এদেশ যে একদিন ইংরেজের অধীন ছিল, আমাদের অনেকের কাছে এই স্মৃতিটাই বড় লজ্জার, তাই তার সব চিহ্নগুলিকে বিস্মরণীর ওপার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

কিন্তু মুক্তি কি ধ্বংসে বা অপসারণেই আছে? এই মূর্তিগুলি ত চাক্ষুষ চিহ্ন—কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের ভাল-মন্দ উভয় চিহ্নই রয়ে গেছে আমাদের মানসে, তার আয়ুষ্কালের ক্রান্তি সহজে ঘটবে না। যে-গণতন্ত্রের আমরা গর্ব করি, সেই গণতন্ত্র যতদিন আছে, ততদিন ত নয়। মেঘ দিয়ে রোদ শুধু ক্ষণিকের জন্যই মোছা চলে, বৈরী-ভাবের বিরূপতায় চিত্তের উদারতা চিরতরে ঢাকা পড়ে না। তা-ছাড়া, আমাদের সাহিত্যে, নাট্যে, চিত্রকলায় বিদেশী প্রভাবে একদা যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল যার জের স্বীকার করতে বাধা নেই, এখনও মেটেনি তাকে ভোলা সম্ভব হলেও সমীচীন হবে না। আউট অব সাইট, আউট অব মাইণ্ড—এ-গণনা লঘুচেতসাং। উদারচরিতেরা বসুধাকে শুধু কুটুম্ব করে না, তার শিক্ষাকেও সযত্নে রক্ষা করে। ক্লাইভ থেকে চার্চিল অবধি যে পরম্পরা, তার অবসানের পরও আমাদের মনের সুন্দরের অংগনে শেক্সপীয়র-শেলীর 'শাসন' আজও বহাল আছে, থাকুক। এই অলক্ষ্য প্রভাবই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে, ইংরেজের সঙ্গে একদিন আমাদের সংযোগ ঘটেছিল। কোন অভিমানী জাতীয় সরকারের সাধ্য নেই তাকে অস্বীকার করে।

*

বালিতে মাথা গুঁজে রিয়েলিটিকে যে ভুলতে চায়, প্রাণীবিজ্ঞানে তার নাম উটপাখি। বর্তমান যার আয়ত্তে আসেনি, ভবিষ্যৎ নিয়ে যার ভীরুতার শেষ নেই, অতীত লজ্জা তাকেই জড়োসড়ো করে রাখে। বর্তমানকে করতলগত করতে পেরেছে বলেই ব্রিটনেরা স্বল্পকালের রোমক শাসনের চিহ্নগুলি বিলুপ্ত করেনি।

এই আত্মপ্রত্যয় একদা হয়ত আমাদেরও ছিল। অধিকাংশ স্মৃতি-চিহ্নই ত একের গৌরবের, অপরের লজ্জার। তবু চিতোরের জয়স্তম্ভ আর ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ-দরওয়াজা, দুইই দীর্ঘায়ু হয়ে আছে। প্রকৃতি অবশ্য অন্ধ, নির্বিকার ও নির্বিচার—কিন্তু চক্ষুষ্মান মানুষের কাছে দূতের মত সুন্দরও অবধ্য।

অতীতে অধীনে ছিলুম কিনা, সেই গত নিয়ে শোচনায় লাভ নেই (কোন-না-কোন কালে কারও-না-কারও অধীন কেই বা ছিল না?)। আমরা অধুনা প্রকৃতই স্বাধীন কিনা, বিচার্য সেইটাই। অতীতকে অতিরিক্ত ওয়েটেজ দেওয়া অসুস্থ অস্থিরতার লক্ষণ। এই অসুস্থতায় পীড়িত বলেই সোভিয়েট শাসকেরা রুশদেশের ইতিহাস বারংবার লিখে লিখে বারংবার মুছে ফেলেন।

*

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—মূর্তিগুলি অপসারণের যৌক্তিকতা যদিও বা থাকে, তার সময় কি এই? এ-প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই সমস্বরে বলবেন—না। আমাদের কর্তৃপক্ষের প্রায়রিটির বোধ নেই। গত দশ-বারো বছরে কাজের কাজ বিশেষ এগোয়নি : শিল্পে, শিক্ষায়—প্রায় সমুদয় ব্যাপারেই আমরা আজও যথাপূর্ব অনগ্রসর। না মিটেছে অন্ন-সমস্যা, না ঘুচেছে দৈন্যদশা। সক্ষম সুস্থদেহ লোকেরা চেয়েও কাজ পায় না। সরকার সে-সবের সুরাহার আগেই জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের কাজে কোমর বেঁধে লাগলেন কেন?

বুঝি, তার কারণও আছে। প্রকৃত সমস্যাগুলির থাও মেলে না বলেই ভুয়ো সমস্যার সৃষ্টি। অন্তত সেদিকে লোকের চোখ ফেরানোর চেষ্টা। রুগ্ণকে বিবিধ প্রক্রিয়ায় অন্যমনস্ক করে, যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেবার অভিলাষ। এই অভিলাষ থেকেই নাৎসী শাসনের কালে এইভাবে একটা জাতির ক্ষোভকে ইহুদী-বিদ্বেষে পরিণত করা হয়েছিল। এদেশেও সাম্প্রদায়িকতায় এই মনোভাবই ইন্ধন যোগায়। ততখানি গুরুতর না হলেও মূর্তি-অপসারণ-লীলার পিছনে এই মনোভাবেরই ছায়া স্পষ্ট। জাতীয়তাবাদের বিকৃত সংজ্ঞা শিখেছি বলেই আমরা রাতারাতি রাস্তার নাম বদলে, হিন্দী হরফে মোটর গাড়ির নম্বর লিখেই শুদ্ধি পেতে চাই।

*

তৃতীয় প্রশ্নটার আলোচনা এবার তুলি। ঔচিত্য নিয়ে তর্ক থাক। প্রায়রিটির ফয়সালাও মুলতুবি থাকুক। এবার বিচার্য—মূর্তিগুলির সবগুলিরই কি সাজা এক, সবগুলিই কি নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হবে। সস্তা পপুলারিটির মোহগ্রস্ত সরকার, আশঙ্কা হয়, সেই নীতিই নিয়েছেন। নতুবা বেণ্টিঙ্ক আর রিপনকে তাঁরা রেহাই দিতেন নিশ্চয়।

সব কথার শেষে একটা কথা বাকী থাকে সৌন্দর্য-প্রীতি। যে-মূর্তিগুলি আমরা অপসারণ করছি, ভাস্কর্যের নমুনা হিসাবেও সেগুলি কম মূল্যবান নয়। আমরা এক্ষেত্রে তুলনীয় কিছু সৃষ্টি করতে পারিনি, প্রতিশোধের স্পৃহা কি এসেছে সেই হীনম্মন্যতা থেকে?

স্মরণীয় ভারতীয়দেরও অনুরূপ ব্রোঞ্জ বা মর্মর বা প্রস্তরের প্রতিরূপ তৈরি করব—আমাদের লক্ষ্য এইটেই হওয়া উচিত ছিল। সেগুলিকে স্মরণীয় বিদেশীদের প্রতিমূর্তির পাশে স্থান দিলে লজ্জা ছিল না। বেণ্টিঙ্কের পাশে যদি দাঁড় করিয়ে দিতে পারতুম রাজা রামমোহন রায়কে, তবে সেটা শুধু সহ-অবস্থিতির নয়, সৌহার্দ্যেরও নিদর্শন হয়ে থাকত। মনে পড়িয়ে দিত উনিশ শতকের সেই প্রত্যূষকে, ভাবের ক্ষেত্রে লেন-দেন, প্রগতিমূলক প্রয়াসের দিক থেকে যেটি একটি মহৎ ক্ষণ—প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রথম মিলনের "ফাইনেস্ট আওয়ার।"

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

পনের

ডাকযোগেই যে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, এ-কথা বলেই সবুজ-পাতার ডাক আরম্ভ করেছি। ডাক-শব্দের অর্থবোধের জন্য যোগেশ বিদ্যানিধি তাঁর "বাঙ্গলা শব্দ-কোষ"-এ লিখেছেন: 'পূর্বকালে পথে বাঘ-ভালুক ও দস্যুর ভয়ে পত্রবাহক চীৎকার করিতে করিতে পত্র লইয়া যাইত।' এখানে ইংরেজদের সুশাসনে নিয়ন্ত্রিত পোস্ট-অফিসের মাধ্যমে পত্র-প্রেরণের শব্দহীন ব্যবস্থা যখন হয়েছিল, সে-সময়ের খাসখবর কোনো নথি-লিখিত সুসমাচারে দেখিনি বটে, কিন্তু সে-ব্যবস্থার সুফল অনেকদিন পর্যন্ত ভোগ করেছি। এক-পয়সাতে পোস্টকার্ড, দু-পয়সাতে খাম, নিত্যই প্রত্যক্ষ-দর্শনের মধ্যে এসেছে। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পত্রালাপ যখন শুরু করি, তখন ঐ-দরেই খাম-পোস্টকার্ড পাওয়া যেত এবং পত্রবাহক পেয়াদা থামকা হাঁক-ডাক দিত না। ইদানীং পোস্ট-অফিসের মারফতে চিঠি লেন-দেন করা তত নির্বিবাদে সম্পন্ন হয় না, যদিও ডাকমাশুলের হার যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে তাল ফেলে চলতে গেলে সংসার অচল হতে পারে।

এই তখন আর এখন-এর পত্রগত প্রভেদ আমার সমবয়সী অনেকেই জানেন। অন্তত শহরে যাঁরা বাস করেন। পল্লীগ্রামের কথা স্বতন্ত্র। পাড়াগাঁ থেকে শহরে যে-সব লোককে আমদানি করা হত অথবা যারা ঐজন্যে নিজের গরজে আসত, তাদের পক্ষে শহুরে হাল-চাল নিজস্ব করে নিতে দেরী হওয়া স্বাভাবিক। একটা গল্প বলি। বাল্যকালে একজন নতুন লোক মুর্শিদাবাদ থেকে এসে আমাদের বাড়িতে চাকরের কাজে বহাল হয়। সে ডাক-বাক্স কাকে বলে তাও জানত না। "এই চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসো" বললে প্রথম-প্রথম সে রাস্তায় ফেলে দিত। একদিন তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলুম আর বললুম: "ঐ যে একটা থামের মতন দেখছ, রাস্তার ধারে, ওর মধ্যে চিঠিটা ফেলে দিও, বুঝেছ?" এর পর যাকে যা চিঠি লিখি, কোনো জবাব পাই না। একটু আশ্চর্য লাগল! দিনকতক বাদে দেখি, রাস্তায় খুব ভীড়। কি সমাচার? না, মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে রাস্তার থামের গায়ে যে-কল ছিল, সেটাকে আপাদ-মস্তক ব্যবচ্ছেদ করেছে এবং তার ভিতরে কতকগুলো চিঠি পেয়েছে। ভাগ্যিস জল

লেগে কালির লেখা চুপসে গেছল, নইলে আমাকেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করত। ডাক-বাক্স আর মিউনিসিপ্যাল্স জলের কল একই ধরনের থামে থাকার দরুণ আমার গেঁয়ো চাকরটি ভুল করে ডাকের পাওনা জলের কলে ফেলেছিল! তবে বলে রাখা ভাল যে, এই ঘটনা কস্মিনকালে ঘটেনি। আর, যদি কারও এ-গল্পকে সত্যি বলে ধরে নিতে প্রবৃত্তি হয়, তাতে ক্ষতি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় উপদেশ দিয়েছিলেন—"সদা সত্য কথা কহিবে।" তিনি তো বলেন নি; মিথ্যা গল্প লিখিও না।

এখন গল্প ছেড়ে স্থূলে সত্যে ফিরে আসি। এক পয়সানে স্ট্যাম্পের কথা। নিজের কথা। সুতরাং পাঁচ কাহন করায় দোষ নেই। অনেকেই তো করে। যুগধর্ম? না, এ-বিয়ের ঐ মন্তর।

প্রমথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হবার আগে, যখন পুলিস যার-তার বাড়িতে হানা দিচ্ছিল, সে-সময়ের আগুন-খাওয়া- লেখা-ওয়ালা 'যুগান্তর' আর 'সন্ধ্যা' কার কাছে জমায়েৎ আছে, তাই জেনে সেই অভিযানকারী সন্তর্পণশীল রাজদ্রোহীকে বামাল সমেত গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে, তখন

একদিন দুজন খাকিপোশাক-পরা ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে হঠাৎ হাজির। অমুক আছেন? আমার নাম তাঁদের মুখে শুনে প্রথমটা ভয় পেলুম।

তাইতো। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চলিত বাংলায় লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্যের চোখা-চোখা হেডিং এত ভাল লাগত যে, কেবল সেইজন্যেই 'সন্ধ্যা' কাগজখানি রোজ শুধু পড়তুম তা নয়, কয়েকটি সংখ্যা সযত্নে রক্ষা-ও করেছিলুম। হেডিং যথা—

"ভেড়ার গোয়ালে ধোঁয়া
ফিরিঙ্গি করে ওঁয়া ওঁয়া।"
"সিদিশানের হুড়ুম দুড়ুম
ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম।"

একটা কথা বলে নিই। ফিরিঙ্গি শব্দটা তখনকার চলিত বাংলায় দো-আঁশলা জাতকে বোঝাত, কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব সব সায়েবদের ফিরিঙ্গি বলতেন। কেন, তা বাবার কাছে জানলুম। 'ফ্রাঙ্ক' থেকে ফিরিঙ্গি হয়েছে। ফ্রান্স দেশের নামও ঐ ফ্রাঙ্ক-জাতের নাম থেকে। যেহেতু ইউরোপীয়দের মধ্যে ফরাসীরাই প্রথম এ-দেশে কায়েম হবার জন্যে আড্ডা গাড়েন, তাদের মতন দেখতে অন্য জাতের লোককেও আমরা ফিরিঙ্গি বলতুম। সায়েব হলেই ফিরিঙ্গি।

ইংরেজরাই নিজেদের 'ফিরিঙ্গি' নামটি যে স্বীকার করে নিয়েছিল, তার প্রমাণ একটা বইয়ে পাওয়া যায়—India on the Eye of the British Conquest—যে-বই বাবার সংগ্রহের মধ্যে ছিল, কিন্তু টাইটল-পেজ ছিঁড়ে যাওয়ায় গ্রন্থকারের নাম বলতে পারি না। বইটির স্টাইল চমৎকার, সুতরাং লেখক যে ইংরেজী ভাষাকে ভালবাসতেন, এটা নিশ্চিত। ইংরেজি ভাষার ভক্ত এবং ইংরেজ হয়েও তিনি নিজের জাত সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় নামকরণ নির্দ্বন্দ্বে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধবের ঢংটি আমার ঠাকুরদাদার 'গুপ্তকথা'র অনুরূপ হওয়ায় আমরা অর্থাৎ এ-পাড়ার সকলেই খুশি হয়ে 'সন্ধ্যা' কাগজ পড়তুম। ঠাকুরদাদাও পড়তেন। কিন্তু 'সন্ধ্যা' তো খবরের কাগজ মাত্র। সাহিত্যিক সমাজে চলিত বাংলার তাতে জল-চল হয়নি। পরে অবশ্য প্রমথবাবু আমায় বলেছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মবান্ধবের রচনা-রীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ব্রহ্মবান্ধবের নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েছিল যে, তিনি নাকি বৃটিশ স্পাই। আমার ইস্কুলের (সেণ্ট্রাল কলিজিয়েট) প্রিন্সিপ্যাল ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়ের মুখে শুনে আশ্বস্ত হলুম যে, এ বদ-নাম সম্পূর্ণ মিথ্যা—ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন দেবতুল্য মানুষ।

'সন্ধ্যা' চলিত বাংলায় লিখে যেমন সাধারণ লোকের মনে ফিরিঙ্গি-বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করত, 'যুগান্তর' তেমনি সংস্কৃত তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ করে উচ্চস্তরের 'বিদগ্ধ' লোকের মনে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে প্রেরণা জাগাতে ব্রতী হয়েছিল। এইভাবে দু দিক থেকে ভাষার শাণিতাস্ত্র আমাদের মনকে বিপ্লবী করে তুলেছিল। যুগান্তরে যাঁরা লিখতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দেবব্রত বসু। তাঁর এক ভাগিনেয় (অশ্বিনীবাবু) আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। তিনি মামার সুখ্যাতি প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, দেবব্রত যে শুধু অষ্টবসুর অন্যতম ভীষ্মের মতন, তা নয়; উপরন্তু তিনি লেখনী-প্রয়োগে সব্যসাচী, কেননা, তাঁর বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস থাকায় দু হাতে কলম চালাতে তিনি পটু। ফলে তাঁর হাতের লেখা চিঠি দেখলে কারও বোঝবার ক্ষমতা ছিল না, সে কোন্ হাতের লেখা। এক কথায় তিনি ছিলেন 'হস্ত-কলম'। এই গুণে থাকার জন্যে যুগান্তর অফিস থেকে হস্তলিখিত কাগজপত্র পুলিস খানাতল্লাসী করে হস্তগত করলেও তার মধ্যে কোনোটাই ঠিক দেবব্রত বোসের লেখা বলে প্রমাণ করতে পারত না। বলা বাহুল্য, তখনও বাংলা টাইপ-রাইটার তৈরী হয়নি, নতুবা সব বিপ্লবী লেখকেরই পক্ষে ঐ লেখার কল-কে পাহাড়ের আড়াল করে লুকিয়ে থাকা সোজা হত।

এই ভদ্রলোকের মুখেই শুনেছি যে, "অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দে মাতরম্' নামক ইংরেজি দৈনিক পত্রের জন্যে প্রবন্ধ লিখতেন টাইপ-রাইটার দিয়ে। ওঁর জন্যে ঐ পত্রের অফিসে একটা স্বতন্ত্র টেবিল ছিল, যার ওপর ওঁর স্বতন্ত্র টাইপ-রাইটার বসানো থাকত। উনি এসেই প্রথমে চেয়ারে বসে খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকতেন—কি লিখবেন তাই ভেবে ঠিক করতে। তারপর টাইপ-রাইটারে কাগজ চড়িয়ে ঠিক-ঠাক করে লিখে যেতেন অবিরাম—একেবারে যাকে বলে নন্-স্টপ্। কল-চালানোর মধ্যিখানে কাগজ বদলানোর সময়ে কেবল যেটুকু ফাঁক। লিখতে লিখতে তিনি হাত বন্ধ রেখে চিন্তা করছেন, এ-অবস্থায় তাঁকে কেউ দেখেনি।

টাইপ-রাইটিং ভাল জানতেন, ইংরেজি ভাল জানতেন, একাগ্রচিত্ততা তাঁর ছিল, তাই শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে বন্দে মাতরমের খোরাক জুগিয়েও 'সিদিশান'-এর চার্জ থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

মাণিকতলা বম্-কেস্ থেকে নিষ্কৃতি পাবার পরেই উনি কলকাতা ছেড়ে চন্দননগরে কীভাবে পালিয়ে যান, তার সমগ্র ইতিহাস এখনও লোকে জানে না। পলায়নের প্রথম পর্ব শ্যামপুকুরেই সমাপ্ত হয়।

রামধন মিত্রের লেনে একটি বাগানওয়ালা বাড়ির সামনের দিকে একতলা ঘরে রোজ বিকেলে বুড়োদের আড্ডা বসত। সে-আড্ডায় আমার ঠাকুরদাদা যেতেন। এখন সেখানে নতুন বাড়ি উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে সুসাহিত্যিক পবিত্র গাঙ্গুলীকে সেই আড্ডায় অনেকবার দেখেছি। আমার ঠাকুরদাদারা যে-ঘরে আড্ডা দিতেন, তার অবশ্য কোন চিহ্ন নেই। তাঁদের আড্ডা জমত বিকেলের দিকে। ঠাকুরদাদা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসতেন।

একদিন দেখি, উনি সন্ধ্যে হতে না হতেই বাড়ি ফিরেছেন। গেটে ঢুকে জামা-জুতো না বদলে, ছড়িটা হাতে রেখেই আমাদের ডেকে বললেনঃ অরবিন্দ ঘোষ আজ পালাল। —বাবা, মেজকাকা, ছোটকাকা ইত্যাদি সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শুনতে লাগলেন। আমিও শুনলুমঃ—

"তেলিপাড়ায় (রামধন মিত্রের লেন যে পাড়ায়) যেমন আমরা রোজ গল্প করি তামাক খেতে খেতে, ঠিক তেমনই আজ গল্প করছি, এমন সময়ে দেখি এক ভদ্রলোক রোগামতন, আধময়লা টুইলশার্ট গায়ে আমাদের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। তিনি বললেনঃ দেখুন আপনারা প্রবীণ লোক, আমি বিপন্ন, একটু সহায়তা করবেন? আমি জিজ্ঞেস করলুমঃ আপনি কে? —উত্তর এলঃ আমি আপনাদের পাড়ার লোক। আমার নাম অরবিন্দ ঘোষ। —বুড়োদের মধ্যে একটা অস্ফুট স্বগতোক্তি শোনা গেলঃ ও, ইনি সেই দেশপ্রেমিক অরবিন্দ, যাঁর বিরুদ্ধে পুলিস কেস চলছিল। —আগন্তুক বললেনঃ সে-কেস থেকে খালাস পেয়েছি বটে, কিন্তু আরও অনেক চার্জ আমার নামে দেবে বলে পুলিস আমায় ধরতে আসছে। আপনারা বাঁচান!

—আমরা কি করে বাঁচাব?

—আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে চাই—আর ফিরব না। আপনাদের এই বাগানের আশে পাশে পোড়ো জমি অনেক রয়েছে, ভাঙা পাঁচিলগুলোর মধ্যে ফাঁক-টাক অনেক আছে। এই আঘাটার মধ্যে দিয়ে আমায় পার করে দিন।

আমরা প্রবীণরা এই নবীন আদর্শবাদীর আবেদন গ্রাহ্য ত করবই। সুতরাং ঐভাবেই অরবিন্দকে পার করে দেওয়া গেল। বোধহয় পনের-কুড়ি মিনিট পরেই আর দুটি লোকের আবির্ভাব। তাঁরাও থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেনঃ মশায়, আপনারা তো রোজই এখানে বিকেলে বসেন। আজ একটু আগে আপনাদের সামনে রাস্তা দিয়ে একজন [illegible] লোক চলে গেল, তাকে [illegible]? —বুড়োদের মধ্যে একজন বলে ফেললেনঃ হ্যাঁ!

সর্বনাশ!! আমি ভাবলুম, এরা নিশ্চয়ই পুলিসের লোক, মুফ্‌তি হলেও হাবে-ভাবে এদের পুলিস বলে বোঝা যায়। আমি ঐ আহাম্মক বুড়োর কথা কেড়ে নিয়ে বললুমঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। যার গায়ে আধ-ময়লা একটা টুইলশার্ট?

পুলিসঃ ঠিক্। কোন্ দিকে সে গেছে, তা বলতে পারেন?

আমি বললুমঃ ঐ যে, ঐ ভূপেন বোসের বাড়ির দিকে।

আমার মিথ্যে কথাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে পুলিস সেই দিকে চলে গেল।"

ঠাকুরদাদার এই বর্ণনা যেদিন আমরা শুনলুম, তারপর দিনকার কাগজে খবর বেরোল, অরবিন্দ ঘোষ নিখোঁজ।

শ্যামপুকুরের আঘাটা পার হয়ে শ্রীঅরবিন্দ কোন্ পথে চন্দননগরে গিয়েছিলেন, তা আমার জানা ছিল না। বছর কয়েক আগে, বন্ধুবর ডক্টর কালিদাস নাগের বাড়িতে শিল্পী ধীরেন শীলকে নিয়ে একটা কাজে যাই। গিয়ে দেখি, গৈরিক-বসন-ধারী অনেক লোক তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। কালিদাস বললেন: কি হে, হারীত, এসো এসো। এই অরবিন্দ-জন্মদিন-পালনের ব্যাপারে এঁরা আমার কাছে এসেছেন। —পরিচয়ান্তে আমি কালিদাসকে জানালুম, আমার ঠাকুরদাদা পুলিসের কাছে কিরকম মিথ্যে কথা বলে শ্রীঅরবিন্দকে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন। কালিদাস অত্যন্ত আগ্রহভরে আমায় বললেন যে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল একটা আধময়লা টুইল-শার্ট গায়ে, এ-কথা স্বয়ং মতিলাল রায় বলেছেন, এবং শ্যামপুকুর থেকে পালিয়ে উনি বাগবাজারের ঘাটে নৌকা নিয়ে কলকাতা-নগরী ত্যাগ করে চলে যান।

পুলিসকে ভাঁওতা দিয়ে আমার ঠাকুরদাদা কি পাপ করেন নি? কিরকম অবস্থায় মিথ্যাভাষণে পাপ হয় না, তার বিবরণ আমাদের মহাভারতে, মনুসংহিতায় এবং প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রে যথেষ্ট পাওয়া যায়। শুধু মনুসংহিতার একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করছি:—

কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্॥

শপথ করেও মিথ্যে কথা বললে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পাতক হয় না, তার ফিরিস্তি এই শ্লোকে দেওয়া আছে। এখানে 'অভ্যুপপত্তি' শব্দের অর্থ, রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিপদে সহায় হওয়া। মনুসংহিতা-রচনার সময়ে (আমার মতে) ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ কান্ব-বংশীয়েরা সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে-বিধান কেবল ব্রাহ্মণের রক্ষা-কল্পে বিহিত, সে-বিধান কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের মতন ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? এক-একবার মনে হয়, হ্যাঁ। কেন-না অরবিন্দ তখন ব্রাহ্মণ হতে চলেছেন। অবশ্য তাঁর তৎকালীন মনোভাব বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত সামগ্রী আমাদের হাতে না-থাকায় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে এ-নগরীকে ত্যাগ করার পরে তিনি যে-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন সে-কাজ জনসাধারণের কাছে ব্রাহ্মণোচিত বলে মনে হতে পারে।

"সন্ধ্যা", "যুগান্তর", এই দুটি বাংলা কাগজের মতন "Bande Mataram" নামক ইংরিজী কাগজেরও মূলে উদ্দেশ্য ছিল, এ-দেশে ইংরেজী-জানা লোকের মনে বিপ্লবীভাব ফুটিয়ে তুলে বৃটিশশাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করা। ঐ উদ্দেশ্য-সাধনে বিফল-মনোরথ হয়েই কি শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী-শাসিত ভারতে নির্জন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন?

তখনকার স্টেটস্ম্যান-পত্রিকার লেখাগুলো পড়লে আমার মনে হত ভিজে বিড়ালের কথা, যদিও স্টাইলটা আমার লাগত ভাল। তাই বন্দেমাতরম্-পত্রিকায় একটা চিঠি ছাড়লুম এই প্রস্তাব করে যে, ঐ ভিজে-বিড়ালটিকে বয়কট্ করা হক। সে-চিঠির মর্ম দিয়ে "Bande Mataram" এ বড় হেডিং বেরোল:

BOYCOTTING THE WET-CAT

প্রমথবাবুর ভাষায় বলতে পারি যে, আমার নাম এ-সূত্রে ছাপা হয় নি, ছাপাই হয়ে গেল। তবু আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলুম এই ভেবে যে আমার মতন বালকের কথাকেও অরবিন্দ ঘোষ-প্রমুখ পত্রিকার কর্তা-ব্যক্তিরা প্রকাশের উপযুক্ত বলে গণ্য করেছেন। আরও আত্মপ্রসাদ লাভ করলুম, যখন "সন্ধ্যা"-কাগজে একটা কল্পিত অনার্স লিস্ট (Honours List) বেরোল, যা-তে বলছে যে, স্টেটস্ম্যান-কে Order of the Wet Cat দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমার বন্দেমাতরম্-এ প্রকাশিত প্রস্তাবকে রস দিয়ে পরিবেশন করেছিলেন এই অনার্স লিস্টে, যেখানে K C S I উপাধিকে 'কে-ছি-এ-ছাই' বলতে দ্বিধাবোধ হয়নি।

খানিকটা এই বাল-সুলভ আত্মপ্রসাদের প্রেরণা পাওয়ায় আমি ঐ বিপ্লবী পত্রিকা-ত্রয়ের কয়েক-সংখ্যা সঞ্চয় করে রেখেছিলুম যখন উক্ত খাকি-পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক-দ্বয় আমাদের বাড়িতে আমার নাম করে জিজ্ঞেস করলেন: "অমুক আছেন?", আর আমিও প্রথমটা ভয় পেলুম। কিন্তু ইতস্তত করে লাভ নেই বুঝে সাহস পেয়ে জবাব দিলুম সরাসরি: হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তখন

আমি একটু শৌখীন কাজে ব্যস্ত ছিলুম। বৈদ্যুতিক আলো তখন ঘরে ঘরে আসে নি। আমাদের বাড়ির যত কেরোসিনের আলো-বাতি, টেবিল-ল্যাম্প বা হারিকেন—আমি পরিষ্কার করবার ভার নিয়েছিলুম, এবং চিমনিগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে, কাপড় দিয়ে মুছে, সেলুভিট দিয়ে পালিশ করার কাজে নিজের শখে নিজেকে লাগিয়েছিলুম। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম, মায় ল্যাম্প-হারিকেন, আমার তৎকালীন পরিবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মনে সাহস হল, হারিকেন নামটির মানসিক উচ্চারণ করেঃ হারি কেন?

এবারে কিন্তু অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স—যেমন গোলোকধাম খেলায় চন্দ্রলোকে গিয়ে এক চিতে নরকে পতন! ভদ্রলোকদের মধ্যে যাঁর বয়েস বেশি তিনি সসম্ভ্রমে একটা ফাইল খুলে আমার সামনে ধরলেন।

—আপনি কি এই চিঠি লিখেছিলেন?

দেখি, পোস্ট-মাস্টার জেনারেলের এক ছত্র নোট লেখা আছে তার কোণে।

মনে পড়ে গেল, পোস্ট মাস্টার জেনারেলকে মাসখানেক আগে একটা চিঠি লিখেছিলুম, যাতে কমপ্লেণ্ট ছিল এইঃ চার আনার এক পয়সানে স্ট্যাম্প কিনতে হাটখোলা পোস্ট অফিসে একটি চাকরকে পাঠিয়েছিলুম। তার হাতে চোদ্দখানা টিকিট অটুট পেলুম, কিন্তু দুটো ছিল ছেঁড়া। সে বললে, ডাকঘরের লোক ঐরকমই তাকে দিয়েছে। ফের পাঠালুম বদলে আনতে। চাকরটি ধমক খেয়ে ফিরে এল। অনন্তর আমি সেই ছেঁড়া মাল খামে পুরে তার সংগে চিঠি লিখেছিলুম পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কাছে, সত্য কথা ব্যক্ত করে। সেই চিঠি হচ্ছে এই চিঠি।

কম বয়েসী ভদ্রলোকটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমার সেই ছেঁড়া এক পয়সানে স্ট্যাম্প সম্বন্ধে কমপ্লেণ্ট নিয়ে তদন্ত হয়ে গেছে এবং যে ঐ টিকিট আমার চাকরকে দিয়েছিল, তার দু পয়সা জরিমানা হয়েছে। সেই জরিমানা থেকে দুটো এক পয়সানে স্ট্যাম্প আমাকে দেওয়ার হুকুম তামিল করতে পোস্ট মাস্টার জেনারেল ঐ দুটি কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন। বুঝলুম যে, 'জেনারেল'-এর যথার্থ মিলিটারী মেজাজ। ক্ষতিপূরণ স্বরূপে যে স্ট্যাম্প দুটি পেলুম, তার রসিদ অবশ্য দিতে হল। কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে ছাড়িনি, ঐ রসিদের জন্যে কোনো স্ট্যাম্প চাই কি না।

বৃটিশরা সুশাসন করে না, কে বললে? এইতো সুশাসন? মনের দোটানার মধ্যে পড়ে আমি সঞ্চিত বিপ্লবী পত্রিকাগুলো পুড়িয়ে ফেললুম। এখন ভাবি, অমন মূল্যবান ঐতিহাসিক মালমশলা হব্য বাহনকে সমর্পণ করাটা ভুল হয়েছিল। (ক্রমশ)

বি স্ফো র ক

গোবিন্দ চক্রবর্তী

থেকে-থেকে যা চিকচিক করছিল
তা তীর নয়, তারাও না।
পরিচয়ের সব চিহ্ন-মোছা সে রাত্রে
তীর ছিল না এতটুকু—
ছিল না, ছিল না।

শুধু ফসফরাস-জ্বলা নদীজল,
কি-জানি—তোমার চোখের জলও কি?
আর গ্রানিটের দেয়ালের মত
দুর্ভেদ্য সেই কুয়াশা,
যা নদী আর নৌকোই নয়—
পূর্ণিমার অমন রূপসী রাত্রিকেও গ্রাস ক'রে
আশা-দুরাশার ও সম্ভাবনার
ক্ষীণতম ভবিষ্যৎটুকুও
গাঢ় সংশয়ে মসীলিপ্ত করেছিল।

কোথায় তীর-তরু-তারা!
ছাদের ঐ সঙ্কীর্ণ পরিসরেই
কত যেন মরু-ব্যবধান,
মেরু-তুহিনতা।
মন যেখানে কিছুতেই পেঁছোয় না
শিথিল দু' হাতের সেতু-বন্ধন
সেখানে সম্ভব না টেঁকে!

*

তারপর
কখন পেরিয়ে এলাম পোল
আর আচমকা চাঁদের আলোয়
কৌবনে ফেরা-র চকিত আমন্ত্রণে
বুঝলাম
মিলেছে তবে মোহানাও।

সিঁড়িতে পা দিয়েই
তবু কেন যে অমন শিউরে উঠলে,
শুধু কি আমি
সারা নিশীথ-চেতনাই যেন চিড় খেল
বিস্ফোরক সেই উত্তরে:

"কেন জানি মনে হল—
নৌকোটা দুলে উঠতেই
জলের ধার ঘেঁসে,
তুমি ছেড়ে দিলে হাত!"

*

ভরা পূর্ণিমার কোটাল তখন।
প্রমত্ত রূপনারায়ণ তখন।

ম র্গে র ছ বি

বিনায়ক ভট্টাচার্য

একটি কাঁচের ঘরে ঋজু হয়ে শুয়ে সেই মেয়ে,
সারাদেহ ভরে তার লাবণ্যের সমারোহ ঠিক
আগের মতন—সেই চারু স্তন, নাভিপদ্ম আর
উরুর বর্তুল শিল্প। চোখ মেলে শুধু নেই চেয়ে,
হয়তো ঘুমিয়ে আছে, এই ঘুম তার
হয়তো অনন্ত, এই রুদ্ধদৃষ্টি চির-অনিমিখ!

সাক্ষীদের সূক্ষ্মচোখে গবেষণা, মান্য করোনার
কারণ ব্যাখ্যায় কন 'আত্মহত্যা', কেউ অস্বীকার
করলো না, আমিও না। বেরিয়ে আসার আগে ফের
দেখি সেই স্তন, নাভি, উরু ঠিক আগের মতন,
অথচ সে মরে গেছে। বোকা হয়ে স্মরণের জের
টেনে ভাবি কোনোদিন পাইনি কি অরূপরতন!

ত্রিশ
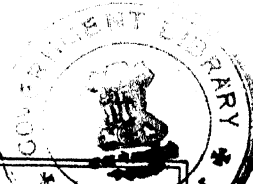
খুব উঁচুতে, খুব উঁচু আকাশের কোল ঘেঁষে, একখান সাদা মেঘ ভাসছিল। দুধের মত ধপধপে সাদা। আর তার চারপাশে ঢেউ তোলা তোলা ঝালর।

মেঘখানা নিচে নামতে লাগল। নামতে নামতে নামতে নামতে চম্পির একেবারে মাথার উপরে এসে থেমে গেল। কে যেন তার চারকোনায় দড়ি বেঁধে টান টান করে টাঙিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন একখানা মশারীর চাঁদোয়া। ওমা, মশারীই ত! পরিষ্কার ধপধপে একটা ঝালরদার মশারী। নেটের মশারী। তাদের বাড়ির ল্যাল্যাচে ল্যাল্যাচে ময়লা চিমসে গন্ধওয়ালা মশারী নয়। যার সর্বাঙ্গে নানারঙের তালিমারা, যার জায়গায় জায়গায় ঝুঁটি বাঁধা, যার চারকোনায় ছারপোকা মারার রস আর গন্ধ জমা হয়ে আছে, এ সে-মশারী নয়। টনকো নতুন এক নেটের মশারী। এর কোথাও ময়লা নেই ছিটে ফোঁটা। একটুও ভ্যাপসা গন্ধ নেই। ভাঁজকরা নেটের ফুটোগুলো যেন বিলাতী চিনির চৌকো শক্ত দানার মাপে কাটা।

এ-মশারীতে কারা শোয়? সেই তারা। ছোট বেলায় ঠাকুমার কোলে শুয়ে যাদের গল্প শুনেছে চম্পি, সেই শঙ্খমালা, মণিমালা রাজকন্যারা। সোনার পালঙ্কে, পালকের নরম বিছানায় তারা শুয়ে থাকে। শিওরে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে। কালপরী, নিদ্রাপরী পুরীর উপরে উড়াল দিয়ে যেতে যেতে রাজকন্যার রূপ দেখে থমকে যায়, বলাবলি করে, এই রাজকন্যার যোগ্য বর, উজানী নগরের সেই রূপকুমার। চল আজ মিলন ঘটাই। এই বলে তারা রাজকন্যার চোখে ঘুমের কাজল পরিয়ে পালঙ্ক সমেত তাকে নিয়ে হাজির করে। রূপকমার রাজপুত্রের দেশে। এ-মশারী সেই রাজকন্যা রাজপুত্র-দের মশারী।

চম্পি এখানে এল কি করে? সে চোখ ঘুরাতেই আরেক জোড়া ব্যগ্র চোখে তার দৃষ্টি আটকে যায়। এ চোখ চম্পির চেনা। এ মুখ চম্পির চেনা। স্বপ্নেই যেন এ মুখ সে দেখেছে। স্বপ্ন ছাড়া এমন সুন্দর একখানা মুখকে তার সান্নিধ্যে আর কে আনবে? এখনও সে স্বপ্নই দেখছে।

চম্পিকে চাইতে দেখে সুন্দর মুখখানা হাসিতে ভরে গেল। দুর্ভাবনা মাখা আয়ত দুটো চোখ নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল। মুখের হাসি চোখেও ছড়িয়ে পড়ল। তার হাতে একখানা পাখা ছিল। সে প্রাণপণে বাতাস করছিল। তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা পাখার ডাঁটের উপর নজর পড়ল চম্পির। বেশ নরম বিছানায় সে শুয়ে আছে। পালঙ্কের গদী কি এমনি নরম হয়।

সেই হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে চম্পির ঠোঁটেও এক হাসি ফুটে উঠল। চম্পি সে হাসি দেখতে পেল না। দেখছিল তাকে, ঐ হাসি যার চোখে রামধনুর তরঙ্গ ফুটিয়ে তুলল।

এই যে বৌদি, চোখ মেলেছেন।

চম্পি রিণরিণে মেয়েলি এক গলায় একরাশ উদ্বেগ ফুটে উঠতে শুনল। সঙ্গে সঙ্গে দেখল ওদুটি চোখ থেকে রামধনু রঙ নিমেষে মিলিয়ে গেল। দুটি উজ্জ্বল চোখের তারা তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রয়েছে। এ চোখ ত সে চেনে, এই মেয়েলি গলাও সে চেনে। এ ত সুহাসবাবু।

সুহাসবাবু তার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছেন কেন? সে সুহসবাবুকে এত কাছে আসতে দিয়েছে কেন? বিব্রত হল চম্পি। ছি ছি। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে সুহাস তার কপালে হাত দিয়ে শুইয়ে দিল। চম্পির সারা শরীরে উত্তাপের ঢেউ ভেঙে পড়ল। ব্যাপার কি? সে কোথায়?

উঠো না মা, এখন উঠো না। এত গরমে এতখানি পথ এসেছ ত, তাই বোধ হয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। শুয়ে থাক এখন। আমি একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিই।

ফুলু কাকিমার গলা। হ্যাঁ, ঐ যে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। এই যে শৈলদি, তার হাঁটুর কাছে। সে কি মুর্চ্ছা গিয়েছে নাকি? ছি ছি কি কাণ্ড! ফুলু কাকিমা উঠে গেলেন।

শৈল বলল, আমি আর ঠাকুরপো নিজের মনেই বকে যাচ্ছি। ও একটা কথারও জবাব দেয় না। আমি বলি হল কি? শেষে এই কাণ্ড। বাব্বা! আমি ত ভয়ে মরি।

সুহাস বলল, ভয়ে মরার একটা সুবিধে

আছে, হাতে ব্যাথা হয় না। কিন্তু বাতাস করতে করতে আমি যে মারা পড়তাম।

সুহাস হাতের অদ্ভুত মুদ্রা করে বোঝাল ও দুটোর আর কিছু নেই।

ব্যাজার মুখে বলল, আগে জানলে আমিও ভয়েই মরার চেষ্টা করতাম, হাত দুটো বাঁচত।

সুহাসের কথায় সবাই হেসে উঠলেন। চম্পি লজ্জা পেল, তবু সে-ও হাসল।

বলল, আমি এবার উঠি।

সুহাস বলল, উঠবেন উঠুন, কিন্তু দোহাই আর পড়বেন না যেন। আবার যদি পড়েন আমি কিন্তু আর পাখা ঠেলাতে পারব না।

চম্পি সলজ্জভাবে উঠে পড়ল। মুখ নিচু করে বসে বসে সে ঘামতে লাগল। সত্যিই বড় রকমের একটা কেলেংকারী সে করে ফেলেছে। কেন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ছি ছি।

শৈল সুহাসকে ধমক দিল।

ও কি, ভাই ঠাকুরপো, ওভাবে কাউকে বলে নাকি? ছি। না ভাই চম্পি, ওর কথায় কিছু মনে কর না। ঠাকুরপোটা ওই রকমই। রাতদিন সকলের পিছনে লেগে আছে।

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, তবে ত আমার গুণের কথা সবই শুনে ফেললেন। আর বাকী রইল না কিছু। বৌদির কথা শুনে এখন আমার ধারণা হচ্ছে আপনার গুণপনার যে ফিরিস্তি বৌদি দিয়েছে সেটাও বোধহয় এই রকমই সত্যি।

চম্পি সুহাসের কথা শুনে হকচকিয়ে শৈলর দিকে চাইল। ওর বিব্রত চোখমুখ যেন বলে উঠল, কি বলেছ শৈলদি? কি বলাবলি করছিলে তোমরা? চম্পির বুক ধুকপুক করতে লাগল। বিশেষ করে এখন মনে পড়তে লাগল, সে এত বয়েস পর্যন্ত যে-সব দোষ, যে-সব ত্রুটি করেছে, সেই সব অপরাধগুলোর কথা। টুনির সেই কাঁচির ব্যাপারটা কি শৈলদি জানে? ওরা কি তখন এখানে ছিল? না থাকলেই বা কি টুনি হয়ত চিঠি লিখে জানিয়েছে শৈলদিকে? এক মুহূর্তের লোভে চম্পি সেদিন যে কত গুরুতর এক অপরাধ করেছিল, আজ এখন, এই ঘরে সুহাসের সামনে বসে বুঝতে পারছে। সুহাসবাবু কি সে-কথা জেনে ফেলেছেন? কি ভাবছেন তাকে? আপনার গুণপনার যে ফিরিস্তি বৌদি দিয়েছে।...কেমন মিহি করে বলল সুহাস। কি কি ফিরিস্তি দিয়েছে। সে বাবার গলার কাঁটা হয়ে বসে আছে? বারে বারে তার সম্বন্ধ আসছে আর ভেঙে যাচ্ছে? সে কালো, তাই কেউ পছন্দ করছে না? সে অপরাধ কি আমার? সুহাসের কাছে সে আবেদন করল। আর কি বলেছে শৈলদি, কি বলতে পারে আর? সে ঝগড়াটে, যদি মুখ খোলে একবার, কেউ তার মুখের সামনে নাকি দাঁড়াতে পারে না। সত্য বটে সে অন্যায় কথা সহ্য করতে পারে না, অপমান তার খুবই বাজে। জবাবও দেয়। তা বলে সে গায়ে পড়ে ত কাউকে কিছু বলতে যায় না, বলে না। এই গ্রামের অনেরাই বরং সে ব্যাপারে পটু। মর্মান্তিক অপমান তাকে কেউ করলে সে তাকে অল্পে ছেড়ে দেয় না। আপনি, আপনি কি করেন? যদি কেউ আপনাকে অপমান করে? সুহাসকে সে জিজ্ঞাসা করল মনে মনে। এই গ্রামের লোক তাকে কি চোখে দেখে, সবটা না জানলেও সে সম্পর্কে চম্পির নিজস্ব একটা ধারণা আছে। এ তার হীনমন্যতা। আর সেটা সে মেনেই নিয়েছে। কিন্তু সুহাসও কি সেই চোখে তাকে দেখছে?

সেই সুহাস, যে কলকাতার শিক্ষিত মার্জিত ছেলে, যে তাকে আপনি বলে সম্মান দেখায় (জীবনে এই প্রথম একজন তাকে অদ্ভুত সম্মান দেখাচ্ছে যে তাকে পাখার বাতাস করছে, যে উদ্বিগ্ন চোখে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। উঠবেন উঠবেন না, আঃ এই স্বর সে জীবনে ভুলবে না। সুহাস তার কপালে হাত দিয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। স্পর্শটা চম্পির কপালে অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল। সুহাস কি এখনও ওখানে হাত দিয়ে আছে? ওর হাতটা কোমল না কর্কশ? জীবনে আর একবার সে পরপুরুষের স্পর্শ পেয়েছিল। চাকলার কাছারিতে বাসন্তী পুজোর বিসর্জনের ভিড়ে কোন এক বদমায়েস লোক তার গাল টিপে দিয়েছিল। সে তাকে দেখেনি। অনুভব করেছিল, কি কর্কশ লোকটার হাতটা! সুহাসের হাত কেমন, সে খেয়াল করে নি। কিন্তু সে-স্পর্শের যে-অনুভব তার দেহে লেগে রয়েছে সেটা আদৌ বিরক্তিকর নয়।) হ্যাঁ, যে সুহাস তার মুখের দিকে চেয়েছিল, সে তাকে খারাপ ভাবুক চম্পির মন তা চায় না। সুহাস তার জন্য অপেক্ষা করেছিল! কী বাজে কথাই না বলতে পারেন সুহাসবাবু! কিন্তু দুটি উদ্বিগ্ন চোখ মেলে তার দিকে যে চেয়েছিল সুহাস!

শৈল বলল, এই ত চম্পি আছে, তুমি ওকেই জিজ্ঞেস কর না, আমি বাজে কথা বলছি কি না? ভারি সুন্দর গলা চম্পির। কী ভাল যে গায়!

সুহাস বলল, আমাদের কি সে সৌভাগ্য হবে?

(সুহাস তার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়েছিল)!

শৈল বলল, চম্পি ভাই একখানা গান শোনাবে?

(যতক্ষণ সে অজ্ঞান হয়েছিল ততক্ষণ? আচ্ছা, কে ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়? সুহাসবাবু কি?)

সুহাস বলল, গাইতে পারবেন কি? ওঁর শরীরটা বিশেষ ভাল নয় বলেই মনে হচ্ছে।

(নিশ্চয়ই সুহাস। সুহাস ছাড়া তার এতবড় গতরখানা কে আর তুলতে পারে বিছানায়। চম্পি ত একটা হাতি। একটা ঢেঁকি।)

শৈল বলল, চম্পি ও চম্পি।

(যত্ন করে তাকে তুলেছে সুহাস। যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। যত্ন করে পাখার বাতাস করেছে।)

চম্পি, ও চম্পি, কি ভাই কথা বলছ না কেন?

(যত্ন যত্ন যত্ন। সুহাসের মত একটা লোক, তার মত নগণ্য একটা মেয়ের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে। আমি কি তার যোগ্য? এ কিন্তু সত্যি নয়। আমি বলছি, সত্যি নয়। এ এক মায়ার খেলা।)

এই, এই, কি হয়েছে আপনার?

সুহাস হঠাৎ চম্পির দুই ডানা ধরে জোরে ঝাঁকানি দিল। চম্পি সম্বিত ফিরে পেল। এ কী ব্যাপার আঁ!

সুহাস বলল, কি আবার শরীর খারাপ করছে না কি?

চম্পি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না।

শৈল বলল, তবে? খুব দুর্বল লাগছে বুঝি?

চম্পি তেমনি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সুহাস বলল, বৌদি, তুমি শিগগির দুধটা নিয়ে এস।

শৈল বলল, ঠিক বলেছ।

শৈল ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর চম্পি বুঝল, একা ঘরে সে আর সুহাস। না-না, ছি ছি, কি বিচ্ছিরি! তক্ষুণি চম্পিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু সে সাহস পেল না। সত্যিই তার তখন বেশ একটু দুর্বল দুর্বল লাগছে। উঠতে গেলে যদি কিছু হয়ে যায় আবার! তাহলে এই ফাঁকা ঘরে সুহাস আবার..... না-না, তার চেয়ে বসেই থাক চম্পি। কিন্তু তাতেও যে প্রবল অস্বস্তি লাগছে তার। কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ধুকপুক করছে বুকে। চম্পি ঘামতে লাগল। সে সুহাসের দিকে না চেয়েও বুঝল, সুহাস তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। একটু আড়াল পেলে চম্পির যেন সুবিধে হত। কিন্তু তার আর সুহাসের মধ্যে কোন আড়াল নেই। ফাঁকা মাঠে প্রখর সূর্যের আলো যেমন আপন বিক্রমে ঝরে পড়তে থাকে, চম্পির দেহের উপর তেমনিভাবে যেন সুহাসের দৃষ্টি ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ভিতরে পরার জামা চম্পির নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল। একটা ছিল

ছিড়ে গেছে। সে ত জানত না, সুহাস বলে এমন একজন কেউ এই পৃথিবীতে আছে। সে ত জানত না, তাকে এমন অরক্ষিতভাবে সেই সুহাসের প্রতিরোধহীন দৃষ্টির সামনে পড়তে হবে। আগে জানলে সে হয়ত আসতই না। যদিও আসত, তবে সতর্ক হয়েই আসত, অন্তত কাকিমার জামাটা পরে আসত। শুধু সেমিজে তার যেন লজ্জা ঢাকছে না। কাপড়ের আঁচল দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে বসেছে, তবুও না। কি বিপত্তিতেই না সে পড়েছে।

শৈলদিই বা আসছে না কেন? তার যাবারই বা দরকার ছিল কি?

সত্যি, আপনার চেহারাটায় কিন্তু শিল্পী শিল্পী ভাব আছে।

সুহাসের হঠাৎ মন্তব্যে চমক খেয়ে চম্পি তার দিকে চাইল। সুহাসের চোখে কিন্তু ঠাট্টা নেই। সেই রামধনুর মায়াও নেই। এ চোখের দিকে তবু চাওয়া যায়। সুহাসের কথা সে বুঝল না। শিল্পী কথাটার কি মানে সে ত জানে না। কখনও শোনেনি। এসব হয়ত কলকাতার কোন কথা। শিল্পী শিল্পী ভাব? কথাটা শুনে তার পিলসুজের কথা মনে পড়ল। পিলপের কথা মনে পড়ল। সেকি পিলসুজ? সে কি তবে পিলপে? চম্পি পিলসুজের সঙ্গে তার চেহারাটা কল্পনায় মিলিয়ে নিল। ধাৎ হাসি পেল তার। আর আশ্চর্য, এই দুঃসহ অস্বস্তি অনেকখানি কমে গেল।

সুহাস বলল, কি গান জানেন আপনি?

কি গান আবার? সে কি কাউকে শোনাবার মত নাকি? গ্রামের মেয়েদের মধ্যে সে আগে তার গান শোনাত। যা শুনেত, তাই গাইতে পারত। শুধু এক বোষ্টুমির কাছ থেকে গোটা কতক পদাবলী কীর্তন যত্ন করে শিখেছিল। আর মেজো-কাকার কাছে যশোরে গিয়ে একবার মাস-পাঁচেক ছিল, তখন কাকার কলের গান থেকে কিছু গান শিখে এসেছিল। তাই তখন গাইত চম্পি। তখন ত সে যূথির চেয়েও ছোট। বারকয়েক বাসর ঘরে গাইবার জন্য তার ডাক পড়েছিল। গেয়েও-ছিল। খুব প্রশংসা পেয়েছিল নয়ন, বনা আর কমলার বরের কাছ থেকেও। ওরা কেউ গানের গ-ও জানত না। তবু এই নিয়ে এককালে গর্ব করত চম্পি। ভগবান তার শাস্তি দিচ্ছেন। ওরা সব্বাই কবেই শ্বশুর ঘর করতে চলে গেছে। আর গুণবতী চম্পি থুবড়ো হয়ে এখনও পড়ে আছে গ্রামে। গান অনেকদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার। শৈলদি বুঝি সেই কথাই বলেছে সুহাসকে। হা আমার কপাল!

তবুও ত, শৈলদিই একমাত্র মনে রেখেছে সে কথা। তার কলকাতার দেওরের কাছে

বলেছে। সুহাস আন্তরিকভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর কারোর বোধ হয় মনেই নেই। চম্পি নিজেও ত ভুলে গিয়েছিল। সে কেমন এক অদ্ভুত প্রেরণা পাচ্ছে যেন। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে তার হাত ধরে কে যেন মহত্তর কোন এক জায়গায় তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। সে যেন বাক্সের কোনে বহুদিন পড়ে থাকা একটা পয়সা। একপিঠ যার ত্যালা। ঘসা। এতদিন এই পিঠটা দেখেই সবাই তার মূল্য নির্ধারণ করেছে। আজ শৈলদি এসে সেটা যেন উল্টে দিল। দেখা গেল ওপিঠটা একেবারে অক্ষত রয়েছে। ছাপটা পরিষ্কার পড়া যায়। তাই দেখে সুহাস যেন ভরসা দিচ্ছে, ও পয়সা একেবারে অচল নয়। চলতেও পারে। তাই যেন সে নেড়েচেড়ে দেখছে তাকে। চম্পির মত মেয়ের পক্ষে তাই বা কম কি?

সে সলজ্জ হেসে মৃদুস্বরে বলল, শৈলদি খুব বাড়ায়ে বলিছে।

সুহাস বলল, যাক কথা যখন ফুটেছে তখন সুর বেরুবার ভরসাও আছে।

সুহাস এবারে হেসে উঠল। শৈল দুধের বাটি নিয়ে ঢুকে পড়ল।

টেবিলের উপর সেটা রেখে বলল, কি ভাই, হাসি কেন? আমি বাদ পড়লাম বুঝি।

সুহাস হাসতে হাসতে বলল, না বৌদি, বাদ যাবে না পড়, এতক্ষণে ত তারই ব্যবস্থা হল। ওর মুখে কথা ফুটেছে।

শৈল ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে চম্পির সঙ্কোচ অনেকখানি কমে গেল। তার সহজ সত্তাটা সে ফিরে পেল। এতক্ষণ পরে তার মনটা সজীব হয়ে উঠল।

শৈল বলল, বেশ হয়েছে। চম্পি ভাই, তুমি দুধটুকু খেয়ে নাও।

চম্পি বলল, না না শৈলদি। দুধ খাব কি?

কিছুতেই সে দুধ খেল না। সে এখন যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠেছে। অসুস্থই বা কখন ছিল? কেন যে হঠাৎ অমন ভিরমি খেল, সে নিজেই জানে না।

শৈল বলল, একখানা গান তবে শোনাও ভাই। ঠাকুরপো কলকাতার লোক, আমার বাপের বাড়ি যে ফ্যালনা নয়, একটু বুঝে যাক। আমাদের ত ভগবান মেরে রেখেছেন। গলা দিয়ে হাড়িচাচার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বেরোয় না।

না না শৈলদি, সে সব কি আজকের কথা। গান টান মাথায় উঠিছে অনেকদিন।

মাথা থেকে গলার দূরত্ব খুব বেশি ত নয়। আর তাছাড়া কোন জিনিস উঠাতেই যা কষ্ট, নামাতে তেমন কষ্ট নেই। নিন চট করে নামিয়ে ফেলুন।

কোন ওজর খাটল না চম্পির। তখন গাইতেই মনস্থির করল। অকস্মাৎ তার প্রাণে প্রবল উৎসাহের জোয়ার এল। অনেকগুলি গান বিস্মৃতির তলা থেকে একসঙ্গে হুটোপাটি করে উঠে এল। একটা উত্তেজনার কম্পন ছড়িয়ে পড়ল তার দেহে। সুহাস সামনে বসে আছে। পাশে শৈলদি। শৈলদি তার দিকে চেয়ে আছে। সুহাসবাবু তার দিকে চেয়ে আছেন। সুহাসবাবুর চোখে সাগ্রহ প্রতীক্ষা। কলকাতায় কত ভাল ভাল গান হয়। কত ভাল গান শোনেন সুহাসবাবু। সে তাকে কি গান শোনাবে? তার গান শুনে মনে মনে উনি হাসবেন। বন্ধুবান্ধবের কাছে ঠাট্টা করবেন। ভয় পেয়ে গেল চম্পি। বিব্রত হয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সব গান সে ভুলে গেল। তার মাথা খালি হয়ে গেল। একটা গানের একটা কলি, একটুকু সুরও সে মনে করতে পারল না। তার সামনে পিছনে আশে পাশে আর কিছু নেই। এই ঘর নেই, শৈলদি নেই, সে নেই, কেউ নেই। শুধু দুটি উজ্জ্বল চোখের স্থির প্রতীক্ষা। ঐ দুটি চোখের ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে পারছে না। পারবে না, কখনও পারবে না। চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসে রইল। গানগুলো বিদ্যুৎবেগে ছুটোছুটি করতে লেগেছে। চম্পি প্রাণপণে হাতড়াচ্ছে অন্ধের মত। আবছা আবছা ভেসে উঠছে। আবার টুপ করে ডুব দিচ্ছে অন্তহীন বিস্মৃতির গহ্বরে। কাউকে সে ধরতে পারছে না। চম্পি হার মানল। অসম্ভব। হবে না। সে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, হতাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময় একটা সুরে গুণগুণ করে ধরা দিল তার কাছে। একটা গান মনে পড়ল তার। সে গাইল: মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলুঁ, দয়া জনু ন ছোড়বি মোয়। বিদ্যাপতির পদ। অনন্ত কষ্টে...মি শিখিয়েছিল তাকে। পুঞ্জীভূত যে আকুতি জমে ছিল, আত্মসমর্পণের যে তীব্র আশা লালিত হয়েছিল চম্পির মনে, অতি সবাড়ে, অতিশয় গোপনে, গানের পাখায় বেঁধে চম্পি আজ তাকে মুক্ত করে দিল। তার বুক থেকে একটা ভার, যেন একটা পাষাণ নেমে গেল। চম্পির মন ভরে উঠল আনন্দে। দুচোখের কোণ বেয়ে ধারা নামল।

সুহাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় যে খাদ নেই, চম্পি এক নজর তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। সেই রহস্যচপল চোখ দুটো মুগ্ধ হয়ে গভীর প্রশান্তিতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রামধনু রঙের অদ্ভুত দ্যুতি খেলে বেড়াচ্ছিল দুটি উজ্জ্বল তারায়। চম্পিকে আর কিছু বলার দরকার হয়নি, বোঝাবার দরকার হয় নি, সে আপনা থেকেই বুঝতে পেরেছিল, এর অর্থ কি? চম্পির খুব ভাল লাগছিল।

এই অনুভূতিটা সে আগে কখনও পায় নি। সুহাসের প্রশংসা—সত্যিকারের প্রশংসা পাওয়া সহজ কাজ নয়। ওরা কলকাতার লোক, কত ভাল ভাল গান শুনেছেন। তা সত্ত্বেও সুহাসের, মানে সুহাসবাবুর ভাল লেগেছে তার গান। একটা শেষ হলে আরেকটা শুনতে চেয়েছেন। সে-ও গেয়ে গেছে মনের আনন্দে। চার পাঁচটা গান গেয়ে ফেলেছিল চম্পি।

কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত। সুহাস গদগদ হয়ে বলেছিল। বলেছিল, গান অনেকেই গায়, অনেকেই শেখে, কিন্তু আপনার মত গলা কজনে পায়? এত দরদ কজনের থাকে? আপনার মত এমন সুন্দর গলার জন্যই বোধহয় এসব গান সৃষ্টি হয়েছিল। প্রশংসার ভারে নুয়ে পড়েছিল চম্পি। খুশীতে আর লজ্জায় সে মুখ তুলতে পারে নি। তবু তার আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। বলুক, বলুক সুহাস, আরও কিছু বলুক। সে যেন ঠিক রজনীগন্ধার ডাঁটা, ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে তবু ফুল ফোটাবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়ছে না।

এ একটা আশ্চর্য দিন। চম্পির জীবনে এমন দিন আর আসে নি। শুয়ে শুয়ে চম্পি ভাবতে লাগল। ঘুম আসছে না তার। রাত কত হল কে জানে? যুথী খাটের উপর শুয়ে আছে, সে মেঝেয়। সেই অপমানজনক ঘটনার পর থেকে সে আর যুথীকে পছন্দ করে গিয়েছিল তারা ত থেকে সে মনে মনে যুথীকে তীব্র ঈর্ষা করে এসেছে। যুথীর কাছে তার যেন চরমতম পরাজয় হয়েছিল। আজ, এখন তার আর তেমন কোন আক্রোশ নেই। যারা যুথীকে পছন্দ করে গিয়েছিল তারা ত অজ গ্রামেরই লোক। এখন সে-কথা মনে পড়ছে চম্পির। যুথী পারত না। সুহাসের মত মার্জিত ভদ্র শিক্ষিত লোককে মুগ্ধ করতে পেরেছে চম্পি। অনেক বড় জয় তার হয়েছে।

কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত। কী সুন্দর কথাটা। কলকাতা যে সুন্দর জায়গা। সেজকাকারা থাকেন। সেজকাকীমা ওকে ত নিয়ে যেতেও চেয়েছিলেন। সেই যখন তার জলপানি পাওয়ার খবরটা বেরিয়েছিল। তখন সে বেশ ছোট, বছর দশেক বয়েস হবে তার। মা যেতে দিল না। মাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে তখন তারও খারাপ লেগেছিল। মন কেমন করেছিল। তাছাড়া মা আবার সেজকাকীমাকে দেখতে পারত না তখন। মা বলেছিল, তোর সেজ খুড়ীর বাঁদীর দরকার পড়েছে, তাই তোকে নিতে চায়। এই কথা শুনে সে-ও তখন সেজকাকীমার উপর রেগে গিয়েছিল। কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত। ইশ্‌, কি বোকামিই না করেছে চম্পি। কেন তখন গেল না? চম্পির মনটা আজ হায় হায় করে উঠল। কলকাতা তার জীবনে যে এত বড় হয়ে উঠবে, সে-কথা চম্পি ত আজ দুপুর পর্যন্তও বুঝতে পারে নি। সুহাসকে দেখার আগে পর্যন্ত না। সুহাস যে-কলকাতার বাসিন্দা, সেই কলকাতা উপযাচক হয়ে চম্পিকে প্রবেশাধিকার দিতে চেয়েছিল। সাধা নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে চম্পি। আজ তার হা হুতাশ করা ছাড়া উপায় কি?

না হয় সে বাঁদী হয়েই থাকত। এখানেই বা সে কী? বাঁদীই ত। তবু কলকাতায় গেলে সে না-হয় কলকাতার বাঁদী হত। কিন্তু লেখাপড়াটা হত তার। গানটা শিখতে পারত, সেলাই শিখত। এমন অসহায় অবস্থা হত না। আর কিছু যদি না-ও হত, সেজকাকীমার বোনের মত চাকরী করতে পারত সে কোনও ইস্কুলে। এই গ্রামের মত খারাপ জায়গা কলকাতা নয়। পান থেকে চুন খসলে নিন্দে হয় না কারও। গ্রাম কি দেয়, কি দিতে পারে? কোন ভাল শিক্ষা? এক কণাও না। দিতে পারে শুধু নিন্দে। কলঙ্ক। এই দুটো সামগ্রীই দেবার ফলে গ্রামে। অকাতরে গ্রামের লোক তাই দুহাতে বিলোয়।

আর সেখানে কলকাতা? কলকাতা গুণের আদর করে। সেই কলকাতার ডাক শুনেও শোনেনি চম্পি। তাই এই গ্রামের দম আটকান প্রকৃতি তাকে ক্রমশ ঠেলতে ঠেলতে এক পাঁচিলের গায়ে এনে তাকে যেন ঠেসে ধরেছে। আর এগোবার পথ নেই তার। একদিন এই গ্রাম ছাড়তে হবে ভেবে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল।

কলকাতায় থাকলে আপনার অনেক আদর হত! আমার অনেক আদর হত। সুহাসবাবুর চোখে আমার দাম আরও বাড়ত। সুহাসবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হত কি করে? কেন শেফালি বুঝি তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেত না? না-হয় সেজকাকীমার বোন মনিকা মাসীর সঙ্গে আমি একদিন যেতাম। তখন আমার পেটেও ত কিছু বিদ্যে থাকত। সুহাসবাবুর সামনে এমন জবুথবু হয়ে বসে থাকতাম না নিশ্চয়ই। দুকথা গুছিয়ে বলতে পারতাম। এখন যে ওর সামনে মুখ খুলতে পারিনে, লজ্জায় প্রায় মরে যাই, সে-ত আমি কিছু জানিনে বলে।

আজ সুহাসবাবু তাকে যখন এগিয়ে দিতে চাইলেন, চম্পি অমনি শিউরে উঠেছিল। কেন? সে কি চায়নি, সুহাসবাবু তার সঙ্গে আসুক। সে এখন মনে করতে পারছে না, তখন তার মন কি চাইছিল। অমন একটা আশ্চর্য সম্ভাবনার কথা ভেবে সে মনে মনে এমনই উত্তেজিত আর সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত হয়ে উঠেছিল যে সে-সময়ের কথা তার স্পষ্ট মনে নেই। কিন্তু এখন, সুহাসবাবু নেই, তার উত্তেজনা নেই, সে একটুও বিব্রত বোধ করছে না, এখন তার মনে হচ্ছে সুহাসবাবু তাকে এগিয়ে দিতে এলে সে খুব খুশীই হত। কিন্তু এই

গ্রামে, এই হতচ্ছাড়া জায়গায় কি তা হতে পারে? সর্বনাশ! কাল থেকে তাহলে কি গ্রামে আর কান পাতা যেত। তার নিন্দায় আকাশ বাতাস ভরে উঠত না।

তাই ত সে সুহাসবাবুর প্রস্তাবে শিউরে উঠেছিল, একাই চলে এসেছে। কলকাতা হলে সুহাসবাবু নিশ্চয়ই তাকে সেজকাকার বাসায় অক্লেশে পৌঁছে দিতে পারতেন! কেউ কিছু মনে করত না।

গ্রামে আর কলকাতায় কি প্রকাণ্ড তফাৎ। সেই পার্থক্যটা চম্পি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখতে লাগল। ফুলু কাকিমা আর তার মায়েতে যে তফাৎ, শৈলদি আর টুনিতে যে তফাৎ, সুহাসবাবু আর এ গ্রামের গা-খালি, ভুঁড়িদার, পান বিড়ি ফোঁকা বিল্টুপদ, অভয় আর ছনে ঘোষে যে তফাৎ, কলকাতা আর তাদের গ্রামেরও তফাৎ ততটাই। এক লহমায় শৈলদিদের পরিচ্ছন্ন সংসারটার যে ছবি দেখে নিয়েছে চম্পি তার সঙ্গে নিজেদের সংসারটা মিলিয়ে দেখতে লাগল। শৈলদিদের পায়ের নখের যোগ্যও নয় তারা। একটা ঝকঝকে, তকতকে, সাজান ময়ূরপংখী নাও আর অনাটা শতচ্ছিদ্র হতকুচ্ছিত তালের ডোঙা। কোন তুলনাই চলে না।

কলকাতা মানে ফুলু কাকিমা, কলকাতা মানে শৈলদি আর সুহাসবাবু। কালোর মধ্যেও যে আলোর টুকরো থাকে, সে-শুধু ওদের চোখেই ধরা পড়ে।

ভাগ্যিস্ গিয়েছিল চম্পি। আজ কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিল, সে মনে করতে পারল না। না দিনটা শুরু হয়েছিল অন্য-দিনের মতই সাধারণভাবে। কোন বৈচিত্র্য ছিল না, চমক ছিল না। তার সমাপ্তিটাই অসাধারণ। খুব ভাল, মনোমত একটা ভোজ খাওয়া যেন শেষ হয়ে গেছে। চম্পি তবু পাত ছেড়ে ওঠেনি, এখন বসে বসে যেন ভাল ভাল মাছের কাঁটা চুষে চলেছে।

হঠাৎ সে শুনল, ঠাকুমা বিড়বিড় করে পরিচিত সুরে আউড়ে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শত নাম আবৃত্তি করতে লেগেছেন।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর
জয়রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালি
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি

অ্যাঁ, চমকে উঠল চম্পি। সর্বনাশ! সে কি রাত কাবার করে দিল নাকি? হ্যাঁ, ঐ যে ঠাকুমা বড় রকম একটা হাই তুলে একটু থামলেন। ঐ যে গুণগুণ করে সেই নরম শ্রুতিমধুর সুরটা একটানা স্রোতের মত আবার বইতে লাগল।

হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে
বিফল মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে

সেই জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে শুনে সমস্ত পদগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। ঠাকুমার সাড়া পেয়ে তার মনের ঘুমন্ত সুরটাও জেগে উঠল। দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে। আজকের দিনটা, না আজকের নয়, কালকের দিনটা ত তার মিছে যায় নি, রাতটাও নিদ্রায় কাটে নি। বছরের পর বছর যে মাঠে বৃষ্টি পড়ে নি, কাল বুঝি তাতে এক পশলা করুণার ধারা ঝরেছে। মনে মনে গুণগুণ করল চম্পি, কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর। কেন তার চোখে হঠাৎ হঠাৎ এমন জল আসে? হাত দুটো জোড় করে, চিত হয়ে শুয়ে শুয়েই চম্পি প্রণাম করল। কতদিন পরে সে এই অন্ধকার ভোরে ঠাকুরকে প্রণাম করবার অভ্যাসটা ফিরিয়ে আনল। তার মনে সারা-রাত যে চিন্তাগুলো এত তোলপাড় করল, তাকে জাগিয়ে রাখল, তারা এই অষ্টোত্তর-শত নামের সুরের স্রোতে কোথায় যে ভেসে গেল কে জানে?

চম্পি একসময় দেখল ঠাকুমার গুণ-গুণানির সঙ্গে সে-ও কখন সমস্বরে গলা মিলিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হৈনু
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙিয়া পড়ে
কালরূপে সংসারেতে 'পক্ষ' বাসা করে

ঠাকুমা পক্ষীকে বারবার 'পক্ষ' বলে এসেছেন, আশ্চর্য, চম্পিও 'পক্ষ'-ই বলে গেল। সে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। ঠাকুমার গুণগুণ স্রোত তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সে গা ঢেলে দিয়ে সেই দিকেই ভেসে চলেছে। চম্পির গলা পেয়ে একমুহূর্তের জন্য ঠাকুমা বুঝি থেমেছিলেন, তারপর আবার তার সুরের স্রোত ছেড়ে দিলেন। দুজনের গলা এক সুরে মিলে এক স্রোতে ভেসে চলল:

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকীর উদরে
মথুরাতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে।
বাসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে।
নন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন......

(ক্রমশ)

আপোস

অজয় দাশগুপ্ত

অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে ঢুকে শ্রীমন্ত দেখল সুচরিতা নেই, কোথায় বেরিয়েছে।

শ্রীমন্তর পা-র শব্দ শুনে দুবেলার ঠিকে-ঝি ইন্দিরা উঠে এল। বলল, 'মা বায়োস্কোপ দেখতে গেছেন।'

চুপ করে শুনল শ্রীমন্ত; কিছু বলল না। ঘরে ঢুকে জামাটা খুলে কি ভাবল একটু; তারপর বলল, 'আচ্ছা তুমি যাও।' ইন্দিরা চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়ল আবার। ডাকল শ্রীমন্ত; 'দাঁড়াও, একটু চা এনে দেবে?'

ইন্দিরা ঘুরে এল। পকেট থেকে পয়সা বার করে ওকে দিয়ে শ্রীমন্ত টেবিলের পাশে গিয়ে বসল। চুপচাপ কাটল কিছু সময়। বিকেলের রোদ নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়েছে। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেই বসে বসে ও ভাবছিল অনেক কথা। আকাশ-পাতাল বহু কথার একটা ভিড় এসে একা পেয়ে শ্রীমন্তকে ঘিরে ধরল। একটার পর একটা। সুচরিতা আজ সিনেমায় যাবে একথা আগেই বলেছিল। শ্রীমন্ত কিছু বলে নি। কিন্তু এখন এই বাড়ি ফিরে বউকে না দেখে তার কেমন যেন বিশ্রী লাগল। মনে হল ওদের দুজনের জীবনে কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। এ রকম মনে অবশ্য আজকাল প্রায় হচ্ছিল। প্রায়ই সুচরিতা এখানে-ওখানে যায়। প্রতিবারই অবশ্য আগে ভাগে জানিয়ে নেয়, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করে না।

চা নিয়ে ইন্দিরা ঘরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার দেখে বাঁ-হাতে আলোর সুইচটা টিপে কাপটা নামিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

আলো চোখে পড়তেই এলোমেলো কথার ভিড়গুলো সামনে থেকে যেন সরে দাঁড়াল। শ্রীমন্ত নিঃশব্দে চা খেতে লাগল। চা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করল সামান্য। হাত বুলোতে লাগল চুলে। যেন একটা কিছুর সমাধান সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। শ্রীমন্ত একটু আগের ছেড়ে-রাখা জামাটার দিকে এগিয়ে গেল। বুক-পকেট থেকে খাম বের করে একটা চিঠি পড়ল। তারপর চিঠিটাকে টেবিলের 'পর রেখে দিয়ে একটা বই খুলে পড়া শুরু করে দিল। পড়ায় মন বসছিল না। চোখের সামনে খোলা পাতায় অক্ষরগুলো যেন বার বার কেমন একসঙ্গে হিজিবিজি হয়ে মুছে যাচ্ছে। বই বন্ধ করল শ্রীমন্ত। টেবিলের 'পর মাথা রেখে চোখ বুজে ভাবতে লাগল কি করা যায়। দরজা খোলা রইল, আলো জ্বলতে থাকল। ওইভাবে ভাবতে ভাবতেই কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সুচরিতার ডাকে। "ওভাবে ঘুমোচ্ছ কেন পড়ে পড়ে? এ-দিকে দরজাটা ত হাট করে খোলা।"

চোখ বুজেই হাই তুলল শ্রীমন্ত। তার পর তাকাল সুচরিতার দিকে।

সুচরিতা ততক্ষণে ব্যাগ খুলেছে। একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে শ্রীমন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার জন্যে কিনে আনলাম।"

"আমার জন্য!" শ্রীমন্ত অবাক হল। প্যাকেটটা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল, "কি এটা?"

"বই।"

"বই!" মোড়কটা খুলে কৌতূহল নিয়ে শ্রীমন্ত বইখানা দেখতে লাগল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা মামুলি বই। শ্রীমন্তর সমস্ত কৌতূহল যেন নষ্ট হয়ে গেল নিমেষে। বইটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বলল, "মিছেমিছি এ-সব কিনে পয়সা নষ্ট করো কেন?"

"তুমি পড়ো বইটা।" সুচরিতা ঘুরে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর চোখটা টেবিলের 'পর পড়ে থাকা চিঠিটায় আটকে গেল। "কার চিঠি?"

"আমার। আজই এসেছে।" নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিল শ্রীমন্ত। "হেমন্ত লিখেছে, মা-র খুব অসুখ।"

"সে-কি!" চমকে উঠল সুচরিতা, "কি হয়েছে?"

"সে-সব কিছু লেখে নি।" শ্রীমন্ত চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

"তা তুমি যাবে না?"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বলল শ্রীমন্ত, "না। অফিস থেকে ছুটি পাই নি।"

তখন আর কোনো কথা হল না। এমনিতেই ওদের কথা আজকাল খুব কম। নিতান্ত দরকার ছাড়া কেউই মুখ খোলে না। কেমন একটা বিশ্রী নীরবতার শাসনকে দু'জনেই মেনে নিত, যার কোনো অর্থ ওদের কাছেই খুব একটা স্পষ্ট ছিল না।

খেতে খেতে প্রথম শুরু করল সুচরিতা, "তুমি না যাও, আমি যাব।"

হাতের গ্রাসটা মুখে পুরে তাকাল শ্রীমন্ত, "কেন? তুমি যাবে কেন?"

"বাঃ, মা-র অসুখ আমি যাব না!"

"গিয়ে লাভ কী?"

"ওখানে কোনো মেয়েছেলে নেই, একা ঠাকুরপো—, আমি না গেলে মার দেখাশোনা করবে কে শুনি?"

"তার জন্য তুমি ভাবছ কেন—" শ্রীমন্ত যেন শ্লেষ করতে চাইল, "সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"তোমার বাজে কথা ছাড়", সুচরিতার গলায় বেশ ঝাঁজ। "সব সময় এই বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগে না। তুমি আমাকে কি মনে করো?"

"কী আবার! কিছু না। তুমি যা তাই মনে করি।"

"সে তো আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি, তোমাকে তো আমার অজানা নেই" ধরা গলায় কথা ক'টা বলতে বলতে সুচরিতা উঠে পড়ল।

শ্রীমন্ত ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আবার খাওয়া শুরু করল। রাত্রে শোবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। এক মশারির নিচে শুয়ে থাকা দুটো মানুষের মধ্যে কারো চোখেই ঘুম আসছিল না। একটা ছটফটে ভাব শ্রীমন্তর মনে, আর সুচরিতা ঠাণ্ডা—যেন দেহে প্রাণ নেই।

ঠিক এরকম না হলেও প্রায় এভাবেই কাটে ওদের রাত। যদিও আজকের সঙ্গে অন্য দিনের পার্থক্য অনেক। শ্রীমন্ত আর পারল না। অনেক দিন বাদে নিজে থেকেই একটা দুরন্ত অভিমান ভেঙে কথা বলল, "ঘুমুলে না-কি!"

সুচরিতা উত্তর দিল, না।

শ্রীমন্ত চিৎ হয়ে শুয়ে মশারির চালের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তা হলে যাবে?"

"একবার ত বলেছি।"

"তা না, সত্যি করে বলো, যদি যেতে চাও...একা যেতে পারবে ত আবার?"

"না পারার কি আছে।" মনে হল সুচরিতার মনে এতক্ষণে একটা খুশির ভাব জেগেছে।

"তা হলে শোন..." শ্রীমন্ত বলতে লাগল গুছিয়ে : "তুমি কাল রাত্রের ট্রেনে চলে যাও, স্টেশন থেকে সোজা বাড়ি পৌঁছে মাকে যে-অবস্থায় দেখবে তৎক্ষণাৎ তার করে আমাকে জানাবে। তোমার টেলিগ্রাফ না পাওয়া পর্যন্ত আমি খুবই চিন্তিত থাকব।"

সুচরিতা শুধু শুনে গেল। আর কোনো কথা বলল না।

ট্রেনে যেতে যেতে ভাবছিল সুচরিতা। কে জানে মা কেমন আছে? কি অসুখ হয়েছে? শ্রীমন্তর কথাও মনে পড়ল হঠাৎ। এত বড় একটা চিন্তা বুকে নিয়ে কেন যেন খুশী হয়ে উঠল সুচরিতা। ওর মনে একটা সুখ, অন্তত এই অজুহাতে ক'দিন সে দূরে সরে থাকতে পারবে। নিজের কাছেও নিজের মনের এই বেখাপ্পা ইচ্ছেটা বিশ্রী দেখালেও সুচরিতার এই কথা ভেবে ভাল লাগল। দিন দিন বড় বেশি অসহ্য হয়ে উঠছিল নিজেদের নীরবতা। একটা শুধু অবুঝ চাহিদার কাছে বোবা হয়ে থাকা—যে-চাহিদা ছাড়া আর কিছু চায় না শ্রীমন্ত। এমন কী সুচরিতাকেও না। ভাবতে ভাবতে ঘোর লাগছিল ওর। মা-র কাছে থাকলে আর ভয় নেই; শ্রীমন্ত একা একা থাকলে বুঝবে...ওর মনের হয়ত ভুল ভাঙবে।

বউকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে শ্রীমন্ত ভাবছিল, নানা কথা। সুচরিতা পৌঁছতে পারবে ত ঠিক মতো। নিজেই বলল নিজেকে, না পারার কি আছে; একা-একাই ত কলকাতা চষে বেড়ায়। মা-র অসুখের চিঠি আসবার পর থেকেই একটা চিন্তার ভার শ্রীমন্তর মাথার পর চেপেছিল। বউকে পাঠিয়ে খানিকটা যেন হালকা বোধ করল ও। আরো একটা জিনিস মনে হল শ্রীমন্তর মনে হল বহু দিন পর আজ যেন নতুন করে মুক্তির আস্বাদ পাচ্ছে সে। সুচরিতা নেই, সুচরিতাকে ঘিরে অসহ্য গুমোটের একটা বিশ্রী আবহাওয়া নেই। আজ সে একা, এখন এই ঘরের নিভৃতে, যে-নিভৃতের প্রশান্তি কেউ ভাঙবে না। কারো উপস্থিতিতে এই শান্তি হারিয়ে যাবে না। শ্রীমন্ত নিজের মনকে নেড়েচেড়ে যেন খুশীই হল। খাটের 'পর চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে এ-সব কথা ভাবছিল। খাট ছেড়ে উঠে পড়ল সে। আলো জ্বালল। তার পর টেবিল থেকে খুলে রাখা হাতঘড়িটা নিয়ে দেখল, রাত সাড়ে ন-টা।

সুচরিতা যে-ক'দিন না আসবে ততদিন হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে শ্রীমন্ত। কে আবার হাঙ্গাম করে। খাওয়া শেষ করে বাড়ি ফিরে ঘুম পেল না ওর। ভাবল শ্রীমন্ত, কি করা যায়। ঘরের আলোয় টেবিলের 'পর একটা ফ্রেমে বাঁধানো ওদের দু'জনের একসঙ্গে তোলা ছবিটার দিকে চোখ পড়ল শ্রীমন্তর। ওর মনে হল যেন একটা চরম উপহাস ঐ ফ্রেমের আড়ালে আটকে থেকে নিঃশব্দে হাসছে। গম্ভীর হয়ে গেল শ্রীমন্তর মুখ। যে-মুখে একটু আগেও খুশী মাখান ছিল। ভাবল, কেন এ-রকম মনে হল ঐ ছবিটা দেখে? আবার তাকাল শ্রীমন্ত, কিছু না, মুখ নীচু করে সুচরিতাই হাসছে ফটোতে। একটু আগের নিজের মনের একটা কল্পনার কথা ভেবে শ্রীমন্তই হেসে ফেলল। মুখ দিয়ে ওর বেরিয়ে এল অস্ফুট কথা। যত সব...।

কালকের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। কাল অফিস থেকে ফিরে এমন সময় ক্লান্তিতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুচরিতা সিনেমা দেখে ফিরেছিল। সুচরিতার কটা কথাও যেন মনে পড়ল : তোমার জন্য নিয়ে এলাম, পড়ো বইটা।

বইটা! সত্যিই ত বইটা কোথায় গেল?

টেবিলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল শ্রীমন্ত, না নেই। তা হলে বোধ হয় সুচরিতাই নিয়ে গেছে যাবার সময়।

রাত হচ্ছিল। বাইরে ক্রমেই সাড়া-শব্দ কমে আসছিল। শ্রীমন্ত ভাবল শুয়েই পড়া যাক।

ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও। কিন্তু শুয়েই ঘুম এল না। বইটার কথাই মনে পড়তে লাগল। অথচ কোথায় যে রাখলাম...সুচরিতা নিয়ে গেলে কি বলত না? বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক?...সুচরিতা কী ঠাট্টা করবার জন্যই নিয়ে এসেছিল বইটা। না আমকে স্বামিত্বের

থিয়োরী বোঝাতে চাইছিল বইটা পড়িয়ে। কে জানে? মা-র ছবি ভেসে উঠল শ্রীমন্তর চোখে। কে জানে কেমন আছে মা। হয় ত রোগ-যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। ছুটি না দিলে আমি কী করব—আমি যাব বলেই তৈরী ছিলাম; মা-র কথা ভাবতে গিয়ে মার উপর প্রচ্ছন্ন একটা রাগও যেন ফুটে উঠল। রাগটা অবশ্য সুচরিতাকে নিয়েই। শুধু একটা তাড়াহুড়ো করে মা হঠাৎ কেন যে এভাবে শ্রীমন্তর বিয়ে দিয়ে দিল ওই সুচরিতার সঙ্গে তা কে বলবে। সুচরিতা নামে সুন্দর, আসলে অসাড় একটা মেয়ে, অন্তত শ্রীমন্তর তাই মনে হয়। কোনো উত্তাপ নেই, জ্বালা নেই। একদম ঠান্ডা। যেন কোনো বরফের দেশের মতোই ঠান্ডা ওর দেহ। মনটাও। এই ছ'মাস যে একটা পুরুষ ওর সঙ্গে বসেছে শুয়েছে তাতেও ওর কোনো বিকার নেই। অদ্ভুত এক মানসিক রোগ বুঝি। কেমন একটা শুচিতা আর পবিত্রতার দেওয়াল দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখেছে সুচরিতা। ওর কথা-বার্তায়, চাল-চলনে সর্বত্রই একটা হিম-শীতলতা। এক দিনের কথা মনে পড়ল শ্রীমন্তর। বিয়ের পর পরই।

সেদিনও এই ঘরের এই বিছানায় শুয়েছিল ওরা।

শ্রীমন্ত কবিতা করছিল উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে।

"শুনছ......"

উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে সুচরিতা জবাব দিয়েছিল, "কি?"

"এ দিকে ফের না?"

"বলো না।"

"না তাকালে বলব না।"

"তবে থাক, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"তোমার খালি ঘুম..."শ্রীমন্তর কণ্ঠে উষ্মা।

"তা কি করব জেগে জেগে?"

"বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীরা কি করে?" উল্টে শ্রীমন্তর প্রশ্ন।

"জানি না, যাও।" সুচরিতা বিছানায় আরো একটু সরে গেল।

শ্রীমন্ত ওকে ধরে কাছে আনবার চেষ্টা করল। জোর করল মুখ ঘোরানর। কিন্তু সুচরিতা শক্ত হয়ে পড়ে রইল আগের মতো।

শ্রীমন্ত শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, "কী, তুমি এ-দিকে ফিরবে না?"

"না।"

"কেন? আমি কি এমন অপরাধ করেছি?"

"অপরাধ!" সুচরিতার গলায় প্রচুর বিস্ময়ঃ "তুমি এমন এক-একটা কথা বলতে পার যার কোনো মানে হয় না।"

"তা হলে আমার কথা শুনছ না কেন?"

"শুনেছি না...কী...ভাল লাগে না।"

"আমি শুধু ফিরতে বলেছি—" তাড়াতাড়িতে শ্রীমন্ত বলেছিল।

"তার মানে...ফেরার কথা..." অন্ধকারে সুচরিতার মুখে এক টুকরো হাসি। "আমি সব বুঝি। কচি খুকি ত না।"

"একবার ফিরে দেখই না!"

"না।" সুচরিতা ওকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, "এখন ঘুমোও।"

শ্রীমন্ত একটা হতাশার শ্বাস ফেলে চুপ করে গিয়েছিল।

এখন শুয়ে শুয়ে সব কথাগুলো, সমস্ত ছবিটুকু মনে মনে ভেবে ঠিক সেই রকম এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। ভাবল ও, সুচরিতা কি আর দশটা মেয়ের মতোই, না অন্য মানুষ। আগুনের তাত নেই কেন ওর দেহে? বিয়ের পর থেকেই এ-একটা আশ্চর্য প্রশ্ন ওর কাছে। যেন একটা নতুন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে ছুঁয়ে এসে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে শ্রীমন্ত। আর দশজন বিবাহিত নারীর মতো সুচরিতার কি কোনো ক্ষুধা নেই? শ্রীমন্ত হয়ত প্রাপ্য অনেক কিছুই পাবে না তার স্ত্রীর কাছে: পাবে না, অথচ শ্রীমন্তকে নিত্যই একটা নিবন্ত নারীর অদ্ভুত এক শারীর উপস্থিতি সহ্য করতে হবে।

বিছানাটার এ-পাশ ও-পাশ গড়িয়ে নিয়ে নিজের জীবনের অদ্ভুত এই বেদনার কথা ভেবে ভেবে কিছুতেই ঘুমুতে পারল না শ্রীমন্ত। একটু আগেও ও ভেবেছিল সুচরিতা না থাকায় ক'দিন বুঝি শান্তিতে ঘুমুতে পারবে। এখন দেখছে যে, বরঞ্চ ও থাকলে ওর কাছে শুয়ে বোধ হয় সারা রাত এভাবে কথা হাতড়ে বেড়াতে হত না।

শ্রীমন্ত উঠল বিছানা ছেড়ে। আলো জ্বালল। টেবিলের উপর ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে আলো নিবিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

চোখ বুজে পড়ে থেকেও বাইরের সমস্ত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল শ্রীমন্ত। বালিশের নীচে হাতঘড়ির টিকটিক। ঘরের ভেতর হাওয়ার নড়া-চড়া। অন্ধকার ঘরে জেগে থাকার কেমন একটা অনুভূতি শ্রীমন্তর কাছে। আবার মা-র কথা ভেসে এল। মনে হল মা যেন বলছে, খোকা আমি কাছে থাকব না, বউকে কিন্তু কষ্ট দিস না। ওর মনে আঘাত-টাঘাত...ছেলেমানুষ শিখিয়ে পড়িয়ে নিবি।

না, না। তুমি কিছু ভেব না মা। প্রণাম করতে করতে উত্তর দিয়েছিল শ্রীমন্ত।

কিন্তু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে কি। বরঞ্চ সুচরিতাকে নিয়ে কলকাতা এসে শ্রীমন্ত আবিষ্কার করল, বিয়ে করে তার নিজের জীবনটাকে শ্মশানে এনে ফেলেছে। সুচরিতা শুধু এ-বাড়িতে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তির মতোই বাস করে। যার অনুভবের সঙ্গে শ্রীমন্তর অনুভবের কোনো মিল নেই—কিছু না। তাই সব সময় শ্রীমন্তর মনে হয় সুচরিতার হৃদয়ের সীমানা থেকে সে অনেক দূরে বাস করছে। একদিন স্ত্রীকে পরিহাস করে শ্রীমন্ত বলেছিল, "তুমি যেন সেই চির-তুষার আবৃত মেরু প্রদেশ—যেখানে বছরের ছ' মাস সূর্যের আলোই থাকে না।" বলার পর শ্রীমন্ত হেসেছিল, যদিও হাসিটা তেমন সরল শোনায় নি।

কিন্তু জিনিসটা হাসার নয়, জ্বালার। শ্রীমন্ত জ্বলতে থাকে। মনে হয় শ্রীমন্ত বুঝি অনিঃশেষ আগুনের ধিকিধিকি জ্বালাকে নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পুড়ে শেষ হয়ে আসছে। তারপর সেও একদিন সুচরিতার মতো নিবন্ত গ্রহ হয়ে এক কামনার বলয়ের চার পাশে ঘুরে চলবে। যাকে কোনো দিনই ছোঁয়া যাবে না।

সুচরিতার এই ভাবভঙ্গী ইচ্ছা-অনিচ্ছা এই সব দেখে দেখে শ্রীমন্ত ক্রমশই নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিল। চুপ করে নিজের জ্বালাকে গুটিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। 'ওর যা খুশী করুক', মনে মনে ভাবত শ্রীমন্ত: 'মানুষ হলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছু করা যায়—কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও একটা মাটির পুতুলকে জীবন্ত করা যায় না।' সুচরিতা এ-সব নিয়ে কী ভাবত, না ভাবত তা গ্রাহ্যও করত না শ্রীমন্ত: একটা অকেজো অব্যবহার্য দ্রব্যের মতোই সে স্ত্রীকে সংসারের এক কোণায় সরাতে চাইছিল।

এতগুলো দিনে উপোসী মনের সমস্ত জ্বালা যেন আজ রাতে অন্ধকারে পড়ে থাকা শ্রীমন্তকে একা পেয়ে আক্রমণ করে বসল। নরম বিছানায় কেবলই আহত পশুর মতো ও শুধু ছটফট করতে লাগল—তবু এক ফোঁটা ঘুম এলো না।

আবার ভাবতে লাগল শ্রীমন্ত: যা ভেবেছিল সে-ভাবেই চুপ করে থাকলে এই জীবন দুটো কি নিরুপদ্রবে কেটে যেত? না যেত না। দুজনেই যেন কোনো রকমে আলগা হয়ে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল মনে মনে। বোধ হয় এই সীমিত পরিসরে দুজনের মনের আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে একটা রূঢ় বাস্তব আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল, কোনো সহায়তা খুঁজছিল। না, তাও হল না।

মশারির চালের উপর কেমন করে শ্রীমন্তর চোখের সামনে সুচরিতার মুখটা ভেসে উঠল।

ওর চোখে যেন তীক্ষ্ণ একটা বিদ্রূপের ভঙ্গী।

যাওয়ার আগের দিন রাত্রের কথাটুকু! 'তোমার জন্য নিয়ে এলাম, পড়ে দেখ।'

যেন ঠাট্টা। বইটা কিনে উপহার দিয়ে একটা কৌতুকের মজা পেতে চেয়েছিল।

মশারির নিচে নিশ্চুপ পড়ে থাকা শ্রীমন্তর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। বিস্ফোরণ একটা ঘটতই, এ-ভাবে কিছুতেই দিন কাটত না। মনে মনে বলল শ্রীমন্ত, বই পড়ে বিবাহিত জীবনের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় না—যদিও যায় তা রক্ত-মাংসের শরীরী উপস্থিতির সঙ্গে, মাটির পুতুলের সঙ্গে না।

মনের বিক্ষোভটা যেভাবে দানা বেঁধে উঠছিল তাতে একটা অঘটন ঘটে যেতে খুব বেশি দেরি হত না, তবু কিছু ঘটল না। কারণ শ্রীমন্ত বেশ বুঝল, মা-র অসুখ আপাতত বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। আর সেই সুযোগ পেয়েই সুচরিতা যেন পালিয়ে বাঁচল। নিজেকে অন্তত সাময়িকভাবে সরিয়ে নিল আগুনের তাপ থেকে।

মা-র মুখটা অদ্ভুত ভাবে বার বার শ্রীমন্তর মনে প্রতিফলিত হতে লাগল। কত ভালবাসে মা আমাকে...তার অসুখে আমি কিনা যেতে পারছি না, এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি?

শ্রীমন্ত ভাবল, সুচরিতা গেছে। কিন্তু ওর উপর কি ভরসা? ও-মেয়ের যাওয়া না-যাওয়া দুটোই সমান। যদিও হেমন্ত আছে...তা হলেও একটা বেশী কিছু হয়ে পড়লে... সুচরিতা কি পারবে সামলাতে?

ভাবতে ভাবতে বিছানার ওপর শ্রীমন্ত উঠে বসল। একটা বিশ্রী চিন্তায় গা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এল। ও-ত শুধু একটা মুখোমুখি দুর্যোগের আড়াল হয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। জেগে জেগেই এক দুঃস্বপ্নের ছবি ফুটে উঠল শ্রীমন্তর মনে।

শুয়ে থাকা গেল না। শ্রীমন্ত মশারি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। মশারিটার স্পর্শও যেন বিশ্রী। আলো জ্বালল শ্রীমন্ত। ঢকঢক করে আবার জল খেল। তারপর এগিয়ে গেল জানলাটার কাছে। বাইরে তাকিয়ে দেখল ক'পলক। কিছু নেই। শান্ত

স্তব্ধ রাত। ঘরের ভেতর পায়চারি করল ক'বার। দুঃস্বপ্নের ভয়টা কেটে গেছে অনেকক্ষণ। বাতি নিবিয়ে ফের শুয়ে পড়ল। এতক্ষণের জাগরণে একটা অবসন্নতা ঘিরে ধরেছিল শ্রীমন্তকে। চুপ করে চোখ বুজে পড়ে রইল শ্রীমন্ত। কিছুক্ষণ কানে এল বালিশের তলার হাতঘড়ির টিকটিক। তারপর তাও না। এক সময় শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল শ্রীমন্ত।

অফিস পৌঁছেই টেলিগ্রাম পেল শ্রীমন্ত। কাটা কাটা কথা। "মা-র অবস্থা একই রকম। একবার আসা জরুরী। অপেক্ষায় রইলাম। সুচরিতা।" মাথায় হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে থেকে কিছু সময় কাটল।

যাওয়া জরুরী। তবে কি...তবে...আর ভাবতে পারছে না ও। একটা কান্নার দলা উঠে এসে ওর গলার কাছে আটকে গেল। ক্যালেণ্ডার দেখল শ্রীমন্ত। শুক্রবার। কালই যাব। চাকরি থাকে থাক, ঝুঁকি নিতেই হবে। মনে মনে কর্তব্য স্থির করে নিতে সময় লাগল না শ্রীমন্তর।

শুক্রবার সারাটা দিন কাটল ঘুরে ঘুরে। কিছু টাকাও জোগাড় করতে হল, কী জানি দরকার হতে পারে।

শনিবার কাটল। অফিস ফিরে সন্ধ্যের ট্রেনে চেপে বসল শ্রীমন্ত।

রবিবার ভোর-ভোর পৌঁছে গেল শ্রীমন্ত। দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল সুচরিতা। শুধু চোখ তুলে তাকাল শ্রীমন্ত, কোন প্রশ্ন করল না।

সুচরিতা ম্লান হাসল। বলল, "ভয় নেই। ভেতরে এস।"

ভিতরে ঢুকে দেখল শ্রীমন্ত জ্বরের ঘোরে মা অজ্ঞানের মতো। হেমন্ত নীচে শুয়ে—বোধ হয় একটু আগে ঘুমিয়েছে।

মা-র দিকে ইশারা করে সুচরিতা বলল, "কাল থেকে প্রায় সমস্ত দিনই এ-রকম। মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভুল বকছেন।"

"কি অসুখ?"

"টাইফয়েড।"

"টাইফয়েড!" শ্রীমন্ত অবাক হয়ে তাকাল। 'এ-বয়েসে?'

"ডাক্তারবাবু ত তাই বললেন।"

আর কোনো কথা হল না। শ্রীমন্ত জামা কাপড় খুলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সুচরিতাই বলল, "তুমি নয় ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে নাও। সারা রাত ট্রেনের ধকল গেছে।"

শ্রীমন্ত উত্তর দিল না কোনো।

দেখতে দেখতে সকাল হল। হেমন্ত ঘুম থেকে উঠে দাদাকে দেখে অবাক। 'কখন এলে?'

এই ত কিছুক্ষণ।

"তুমি একটু আইস ব্যাগটা ধরে বসো না ঠাকুরপো," সুচরিতা বলল মুখ তুলে। "আমি মা-র টেম্পারেচারটা নিয়ে তোমাদের জন্য একটু চা তৈরী করি।"

"চা থাক না এখন।" ঘুম আর দুশ্চিন্তা জড়ানো চোখে শ্রীমন্ত বলল।

"কি হয়েছে, কতক্ষণ আর লাগবে।"

চা খাওয়ার পর শ্রীমন্ত বেরিয়ে পড়ল। সুচরিতার দিকে না তাকিয়েই বলল, "ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি। এখন টেম্পারেচার যা দেখলাম, ভাল নয়——"

ডাক্তার ভরসা দিলেন, ভয় নেই, রুগী সেরে উঠবে। ক্রাইসিস পিরিয়ড পার হয়ে গেছে মনে হয়। তবে সারতে সময় নেবে।

রাস্তায় নেমে তবু ভরসা পেল না শ্রীমন্ত। নার্সিং এখন সবচেয়ে প্রয়োজন; কিন্তু কে করবে? হেমন্তর ছুটোছুটির কাজ। 'আমি ছুটি পেলে অবশ্য কোনো কথাই উঠত না।' সুচরিতা......বউর কথা মনে পড়ায় একটু থমকাল ও। ...বউর কথা মনে পড়ায় একটু থমকাল ও। মাথা নাড়ল, না—ওই পুতুলের ওপর বিশ্বাস করার কোনো মানে হয় না। নিজের জীবনটাকেই যে বাঁচাতে পারছে না, অন্যের সে কি করবে...আজ সকালের কথা খেয়াল হল। আজ যেন সুচরিতাকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছিল। রুগীর মাথার কাছে বসে থেকে থেকে বোধ হয় ওর দেহেও জীবনের একটা তাপ সঞ্চারিত হয়েছে। অন্তত সকালের অনুভবের রীতি দেখে তাই মনে হল।

তবে কি সুচরিতা মা-র অসুখে কাতর হয়েই এখানে এসেছে, পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে নয়।

অদ্ভুত একটা খটকা।

নিজের মনের বিচলিত ভাবটাকে একেবারে বাড়ি এসে চাপা দিল শ্রীমন্ত, না না ও কিছু নয়। সুচরিতা হয়ত তার সংশোধনের পথ খুঁজছে মা-র অসুখে ওর

মনের সহানুভূতি দিয়ে। শ্রীমন্তর মনে হল বরফ গলছে।

শ্রীমন্ত বলল, বেশ গম্ভীর হয়ে, সুচরিতাকে, "তুমি সামলাতে পারবে ত, না অন্য লোক ঠিক করব?"

স্বামীর প্রশ্নে বিস্মিত হল সুচরিতা। একটু সময় নিয়েই অবশ্য উত্তর দিল, "তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমাদের মা-র সেবা করতে আমরা পারব না, পারবে বাইরের লোক?"

"আমি ত থাকছি না?"

"হলই বা। আমি ত আছি।"

"এতখানি ঝুঁকি নেওয়া......"

"থাক থাক অনেক হয়েছে।" সুচরিতার মুখে যেন অপমানের লাল আভা। মুখ ঘুরিয়ে বলল ও, "বিশ্বাস না করতে পার ত জোর করব না—তোমার যাকে খুশী রাখ।"

সুচরিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পর আর কথা চলে না। শ্রীমন্তর তাই মনে হল।

রাতে যাবার সময় আবার দু'জনে মুখোমুখি। সুচরিতার মুখ কালো থমথম।

শ্রীমন্ত বলল, "নাও টাকাগুলো রাখ—আমি চললাম, রোজই আমায় খবর দিয়ে চিঠি লিখো। দরকার হলে তার করবে। বুঝতেই পারছ, ও-দিকে চাকরি না বজায় থাকলে..."

সুচরিতা কিছু উত্তর দিল না। হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল।

শ্রীমন্তও আর কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

কলকাতা ফিরেও শ্রীমন্তর মন পড়ে রইল মা-র কাছে। মা কি ভাল হয়ে উঠবে? বরফ গলে কি নদী হবে?

দু-রাত্রি চরম উদ্বেগ আর দুঃস্বপ্ন দেখে কাটল শ্রীমন্তর। তৃতীয় দিন অফিসে চিঠি এল সুচরিতার। 'চিন্তা করো না। মা-র সেবার কোনো ত্রুটি হচ্ছে না। কাল আবার লিখব।' সুচরিতা।

এবার থেকে রোজই একটা করে চিঠি আসতে লাগল। এক দিন সত্যি সত্যিই সুখবর এল। 'জ্বর নেই। কাল থেকেই স্বাভাবিক।' দেখতে দেখতে কেমন করে একটা মাস কাটল ঈশ্বরই জানেন। এই এক মাসে চিঠির কামাই নেই সুচরিতার। 'মা পথ্যপথ্য করেছেন। বসতে পারছেন, হাঁটতে আরো কদিন লাগবে। তুমি এখন আর মিথ্যে চিন্তা করো না।' প্রতি চিঠিতে এই সব খুঁটিনাটি খবর। শেষ চিঠি লিখল সুচরিতা, 'এখনো মা অত্যন্ত দুর্বল। একটু একটু হাঁটতে পারছেন। মনে হয় কলকাতা নিয়ে গেলেই ভাল হয়। তোমার কাছে যাবার জন্য অস্থির। তুমি লিখলে গোছগাছ করে রাখব। শনিবার এসে রবিবার নিয়ে যাবে।'

নিয়ে আসাই স্থির করে চিঠি দিল শ্রীমন্ত। মন আজ কেমন যেন খুশীতে গুনগুনিয়ে উঠল।

রবিবার শেষ রাতে বাড়ি পৌঁছেই শ্রীমন্ত দেখল সুচরিতা তখনো জেগে। "এ কি, ঘুমোও নি?"

"না।" কথাটা বলে চোখের একটা হাসিকে সুস্নিগ্ধ করে নিয়ে তাকাল সুচরিতা।

"কেন?" শ্রীমন্তর ওই চোখ দেখে বার বার একটা কথাই মনে হতে লাগল, বাংলা দেশের মাটিটা সত্যিই কেমন যেন।

"তোমার জন্য।" সুচরিতা উত্তর দিল।

শ্রীমন্তর কান যেন লোভীর মতো এই একটা কথা যে-মুহূর্তে পেল সেই মুহূর্তেই ধরে ফেলল। খানিকক্ষণ বিহ্বল থেকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল শ্রীমন্ত। হঠাৎ রুগ্ন মা-র মুখে খুশির হাসি। মা-ও জেগে উঠেছিল সাড়া পেয়ে। "মন্তু নাকি—!"

"এখন কেমন আছ?"

"খুব ভাল।" মা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, "তোর বউ ত আমার জীবন ফিরিয়ে দিল—"

শ্রীমন্ত মুখ-নিচু-করে দাঁড়িয়ে থাকা সুচরিতার দিকে তাকাল। পুতুল নয়, একটা পুতুল কেমন করে যেন মানুষ হয়েছে।

সহানুভূতি আর কৃতজ্ঞতায় মুগ্ধ চোখে শ্রীমন্ত স্ত্রীকে আর একবার দেখল।

দিন দুই পরের কথা।

অফিস থেকে ফিরে শ্রীমন্ত দেখল, সারা দিনের মধ্যেই সুচরিতা ঘরটা গুছিয়ে ফিটফাট করে রেখেছে।

কী দরকারে টেবিলের সামনে এসে বাঁ পাশের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারটা খুলল শ্রীমন্ত। এ-ড্রয়ারটা বহু দিন খোলে না ও। যত অব্যবহার্য কাগজপত্রগুলোকে ওটার মধ্যে রাখে—যদি কোনো দিন দরকার হয়।

আজ খুলেই থতমত খেয়ে গেল শ্রীমন্তর চোখ দুটো। কাগজপত্রের ওপরেই রয়েছে সুচরিতার এনে দেওয়া সেই বইটা। যেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই। অদ্ভুত ব্যাপার!

"সুচরিতা, এই সুচরিতা..."

"কি?" সুচরিতা সাড়া দিল মা-র ঘর থেকেই।

"শুতে যাও!"

"কেন?" বলতে বলতে সুচরিতা ঘরে ঢুকল।

"তুমি কি এই বইটাকে আজ ড্রয়ারে রেখেছ?"

"...।"

"তা হলে কি করে হল, বইটা একদিন পড়ব বলে কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। আর আজ..."

"তুমি ভুলে গিয়েছিলে..." সুচরিতা হাসি দিয়ে শ্রীমন্তর জটিল জিজ্ঞাসাকে উড়িয়ে বলল, "এবার পড়ে ফেল।"

হাসল শ্রীমন্ত। "উঁহু, পড়েছি...আর দরকার লাগবে না।"

"পড়েছ! তবে যে..." সুচরিতা স্বামীর সকৌতুক অথচ প্রসন্ন হাসিভরা মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। বুঝল। হেসেই বলল, "না মশাই—বিদ্বানরা আরও একটু বেশি পড়ে—অত সহজে..." কথা শেষ না করেই সুচরিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লঘুপায়ে।

শ্রীমন্ত বইটাকে নিতান্ত অবজ্ঞায় হাতে তুলে নিল। এবং তার চেয়েও অবজ্ঞায় বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধের বইটা জঞ্জালের ড্রয়ারটার মধ্যে ফেলে লঘু হাতে বন্ধ করে দিল।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

৪

'অসীমদা, আপনার চা। অসীমদা!'

অসীম চোখ মেলে দেখল মানসী নয়, মঞ্জু চায়ের কাপ হাতে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার।'

মঞ্জু হাসল, 'আপনার চা। বাব্বা, কী ঘুমটাই ঘুমিয়েছেন। কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করছি আপনার সাড়াই নেই।'

অসীম বলল, 'কতক্ষণ মানে, একবার তো মাত্র ডেকেছ।'

মঞ্জু বলল, 'আপনি শুনেছেন একবার তাই বলুন। আমি অনেকবার ডেকেছি। মা বলছিলেন ডেকে কাজ নেই ঘুমুচ্ছে ঘুমোক। সেজদি বললে তাই বলে কি চারটে পর্যন্ত ঘুমোবে?'

অসীম তাড়াতাড়ি উঠে বসল, 'সত্যি চারটে বাজে নাকি?'

মঞ্জু বলল, 'বাজে মানে মিনিট দশেক আগেই বেজে গেছে।'

অসীম বলল, 'ঈস, তাহলে তো আর দেরি করা যাবে না।'

'কেন কী হল?'

'পাঁচটার মধ্যে রাইটার্স বিল্ডিংএ যেতে হবে একবার।'

মঞ্জু হাসল, 'আজ আর তাহলে যেতে পারবেন না। হাত মুখ ধুয়ে জামা টামা পরে বেরোতে বেরোতেই আপনার পাঁচটা বেজে যাবে। চা খান।'

অসীম ভাবল আজ আর তাহলে কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অবশ্য দেখা-সাক্ষাৎ করেও যে তার কিছু লাভ হবে তা নয়। যারা তেমন করে বলতে পারে ধরা-ধরি করতে পারে তাদের হয়। কিন্তু অসীম বহু চেষ্টা করে দেখেছে নিজের কথাটা গুছিয়ে বলবার তার সাধ্য নেই। বরং কি করে আসল কথাটা ঢাকা যায় নিজের উদ্দেশ্যকে কত কৌশলে গোপন করা যায় তদবির করতে গিয়ে সেই চেষ্টাই তার বড় হয়ে ওঠে। তখনকার মত নিজেই নিজের তারিফ করে, নিজের পিঠ চাপড়ায়। কারো কাছে সে ছোট হয় নি। আর একটু হলেই হত। কিন্তু নিজের ঝাণ্ডা সে উঁচু রেখেছে। আত্মমর্যাদার পতাকা। কিন্তু ফিরে আসবার পর তার সমস্ত প্রত্যয় আর প্রসাদ বিস্বাদে ভরে ওঠে। যখন দেখতে পায় নিজের সহকর্মীদের অনেকেই তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে শুধু সে-ই কিছু করতে পারেনি তখন আর তার অনুশোচনার অন্ত থাকে না। তখন তার আত্মপ্রীতি আত্মহিংসা আত্মহননে গিয়ে পোঁছোয়। নিজের ওপর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তিরস্কারের চাবুক চালায়। কিন্তু মরা ঘোড়া তাড়নে উঠে দাঁড়ায় না, ছুটেও চলে না মুখ থুবড়ে পড়ে।

নিজের চাকরি বাকরির ব্যাপার নিয়ে অসীমের কারো কাছে যাওয়াও যা, না যাওয়াও তাই।

মঞ্জু চলে যাচ্ছিল, অসীম তাকে ডাকল, 'বাঃ তুমি চলে যাচ্ছ যে? আমি কি একা একা চা খাব নাকি? ওরা কোথায়?'

'সেজদির কথা জিজ্ঞেস করছেন তো?' মঞ্জু হাসল, 'তার এখন অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

মঞ্জু গলা নামিয়ে বলল, 'মেজদিকে সাজাতে হবে যে।'

অসীমের মনে পড়ল তখন মাধবী নিজের মুখেই উর্বশী সাজবার কথা বলেছিল। সেই সজ্জা নাকি? কিন্তু মাধবী কিসের যে ইশারা করেছিল তা ভালো করে বুঝতে পারেনি অসীম। কেন যে মানসীর সামান্য পরিহাসে তার দিদি অমন চটে উঠে ঘর

ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাও হেঁয়ালীই রয়ে গেছে। মনে পড়ল ঘুমের মধ্যে কী একটা স্বপ্নও দেখেছে অসীম। দুই বীরাঙ্গনা ধারালো তলোয়ার দিয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে মেতেছে। তাদের মাথায় যাত্রার দলের রাজ-রানীর মুকুট। পরনে সেকেলে পোশাক আর গয়না। যে যুদ্ধে মেয়েদের সহজাত পটুতা সেই বাকযুদ্ধ ছেড়ে কিসের জন্যে ওরা অসিযুদ্ধে মেতেছে তা বোঝা কঠিন। চারদিকে আলো জ্বলছে। আসর জমজমাট। সবাই দুটি বাঙালী মেয়ের এই বীরত্ব উপভোগ করছে। শুধু অসীমেরই উদ্বেগের সীমা নেই। সে আসরের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে ওদের থামতে বলছে। জোরে চেঁচাতে পারছে না পাছে আসরশুদ্ধ লোক বিরক্ত হয়ে বেরসিক ভেবে তাকে আসরের বাইরে রেখে আসে। নিঃশব্দে যুদ্ধরতাদের কাছে এগিয়ে যেতে পারছে না পাশে গায়ে তরবারির খোঁচা লাগে। ভারি অস্বস্তিকর অবস্থা। সেই দুই বীরাঙ্গনাই কি মাধবী আর মানসী? নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাদের মুখ ঠিক মনে পড়ছে না। সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ভেবে অসীম নিজের মনেই হাসল। তারপর মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের জন্যে এত সাজসজ্জা মঞ্জু? তোমার দিদিরা সিনেমায় যাবে নাকি?

মঞ্জু হাসি চেপে বলল, 'আপনি আচ্ছা বোকা। সিনেমায় যাওয়ার জন্যে আবার বড় মেয়েদের কেউ কাউকে সাজিয়ে দেয় নাকি? মেজদিকে পটলডাঙা থেকে আজ দেখতে আসবে।'

অসীম বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'ও তাই বল। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।'

মঞ্জু আস্তে আস্তে আরো অনেক কথা ভেঙে বলল। অসীম যদি কাউকে না বলে দেয় তাহলে সে সবই বলতে পারে। বাইরের লোকের কাছে এভাবে সেজেগুজে সঙ'এর মত এসে বসতে মেজদির মোটেই মত নেই। বরং ঘোর আপত্তি আছে। কিন্তু থাকলে কি হবে বাবা সে আপত্তি মানতে চান না। তিনি বলেন, 'এই যখন দেশের দস্তুর মেয়ে না দেখিয়ে বিয়ে দেব কি করে।' মা বলেন, 'কতজনকেই তো দেখালে কিন্তু কী হল।' বাবা বলেন, 'তবু চেষ্টা তো করে যেতে হবে। হাতপা কোলে করে বসে থাকলে কি কেউ সেধে এসে তোমার মেয়েকে চৌদোলায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যতদিন মেয়ে আইবুড়ো আছে তার বর খুঁজে দেওয়া বাপ মার কর্তব্য।' মা যতই তর্ক করুন ঝগড়া করুন বাবার সঙ্গে এ ব্যাপারে শেষপর্যন্ত তাঁর মতের মিল হয়ে যায়। দুজনে মিলে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করেন, চিন্তা করেন, আলাপ আলোচনা করেন. মহা ঝগড়া থাকলেও মেজদির বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ফের ভাব করে নেন।

অসীম হেসে বলল, 'ভালোই তো, তবু নিজেদের মধ্যে ভাব করবার একটা স্থায়ী উপায় তাঁরা খুঁজে নিয়েছেন।'

মঞ্জু বলল, 'তা নিয়েছেন। কিন্তু মেজদির যে প্রাণ যায়। ভদ্রলোকেরা যাঁরা দেখতে আসেন এত অসভ্য—সঙ্গে আবার মেয়েদের নিয়ে আসেন তাঁরা ভিতরে গিয়ে চুল খসিয়ে হাটিয়ে হাসিয়ে কতরকম করে দেখেন—বিশ্রী। সে দেখার ধরন দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। কোথায় মেয়েরা মেয়েদের দুঃখ বেশি করে বুঝবে তা নয় তারাই বেশি করে যাচাই বাছাই করে, তারাই বেশি করে বাজিয়ে নিতে চায়।'

মঞ্জুর ভারিক্কিপনা দেখে অসীম হেসে বলল, 'দুদিন বাদে তোমাকেও তো সবাই অমনি করে বাজিয়ে নেবে মঞ্জু। কি করে বাজতে হয়, এখন থেকে শিখে রাখো।'

মঞ্জু বলল, 'ঈস, আমাদের বেলায় আর ওসব খাটবে না। কেউ এসে যে দোকানের জিনিস দেখবার মত আমাকে দেখে যাবে তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। মেজদিও দিতে চায় না। খুব রাগ করে, ঝগড়া করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এককেবার বাবা-মার মুখের দিকে চেয়ে রাজী হয়ে যায়। মেজদির মনের দুঃখ বাবাও কি বোঝেন না? খুবই বোঝেন। তিনিও রাগ করেন, ঝগড়া করেন, চেঁচামেচি করেন। শুধু ঘরের লোকের সঙ্গে নয়, ঘরে বসে গোটা দেশের লোকের সঙ্গে, দেশের আচার-বিচারের সঙ্গে যেন মল্লযুদ্ধ করতে থাকেন। মার মেজাজ ভালো থাকলে বাবার ভাব-ভঙ্গি দেখে হাসেন। বলেন, বাতাসের সঙ্গে লড়ছ তো খালি হাতে কেন। একটা লাঠি-সোটা নাও। কিন্তু বাবাও শেষ পর্যন্ত কেন যেন সব মেনে নেন। হার মেনে বলেন, এই যখন দেশের দস্তুর—।'

ওদিকের ঘরের ভিতর থেকে মানসীর গলা শোনা গেল, 'মঞ্জু, এদিকে আয় এখন আর কত বক বক করবি।'

মঞ্জু অভিযোগের সুরে বলল, 'জানেন অসীমদা, এ-বাড়িতে বক বক সবাই করে। আবার বেশি কথা বলার জন্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ধমকায়।'

অসীম হেসে উঠল, 'তাই নাকি? চমৎকার বলছো তো মঞ্জু। তুমি দেখছি সবার সেরা, বাকপটীয়সী, তোমার কাছে কোথায় লাগে মাধবী, মানসী।'

মঞ্জু হেসে বলল, 'বাঃ রে, আপনি কি আজকালও মুখে-মুখে ছড়া কাটেন?'

আবার ভিতর থেকে ডাক এল, 'মঞ্জু!' এবার আর দিদির নয়, মায়ের গলা। মঞ্জু ছুটে পালাল।

অসীম উঠে বসল। বয়সের তুলনায় শুধু গড়নই বাড়ন্ত নয়, মনটাও পরিণত হয়েছে মঞ্জুর। অন্তত মুখে তো বেশ পাকা পাকা কথা বলে। কিন্তু ওর দোষ কি। যে পরিবেশে থাকে, যা দেখে শোনে, তাই তো শেখে। আমাদের দেশের মেয়েরা যে মায়ের পেট থেকে পড়েই পূর্ণযৌবনা, আর হামাগুড়ি দিতে শুরু করে প্রৌঢ়া হয়ে যায় না, সেই তো আশ্চর্য।

এবার তার কি করা উচিত, অসীম স্থির করতে চেষ্টা করল। এদের তো এখন দেখাদেখির পালা চলবে। ঠিক এই সময় বাইরের কোন লোকের ভিতরে না থাকাই ভালো। পাত্রপক্ষ এসে যদি জানতে চান, এ-বাড়ির সঙ্গে অসীমের সম্পর্কটা কি, কেউ সদুত্তর দিতে পারবে না। এ-সমাজে আত্মীয়তার সংজ্ঞা আছে, স্বীকৃতিও আছে, বন্ধুত্বের নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় যায় ভেবে পাচ্ছে না অসীম। এত বড় কলকাতা শহরে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। অন্তত ছিল না। কিন্তু কয়েক বছর বাইরে বাস করার ফলে কলকাতা তার কাছে অন্য দেশের এক অচেনা শহর বনে গেছে। যার সঙ্গে যত সম্পর্কের সূত্র ছিল, সব আজ ছেঁড়া ছেঁড়া। ফের গিঁট বাঁধতে চেষ্টা করে দেখেছে অসীম। কিন্তু গিঁট আঁটেনি, সব ফসকা গেরো। কলকাতার মানুষ সবাই কর্মব্যস্ত, যার কাজ নেই, তারও কাজের চেষ্টা আছে, কাজের ভাব আছে। মধু আহরণরত সবাই যেন সেই ব্যস্ত মৌমাছি। কারোরই দাঁড়াবার সময় নেই, কথা বলবার সময় নেই, অন্য কারো জন্যে একটু ভাববার সময় নেই। শুধু নিজেকে নিয়েই নিজের জগৎ। নিজের হাত-পা, নাক-চোখ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিজের বাসনা-কামনা, অর্থ-যশ, বিষয়-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র। এই নিয়ে পুরো একটি ব্রহ্মাণ্ড। অথচ আদর্শে সবাই সমাজবাদী। কিন্তু ভিতরের সামাজিক মানুষটিই শুধু বাদ পুড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে অপরিমিত জল, কিন্তু তার এক ফোঁটাও পেয় না, জন-সমুদ্রের মানুষও তেমনি তা শুধুই জনতা।

অসীম বেরোবার উদ্যোগ করছে শুনে মানসী ফের কাছে এল। বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি চলে যাচ্ছ যে।'

অসীম বলল, 'থেকেই বা কি হবে। তাছাড়া নিজেরও তো কিছু কাজকর্ম আছে।'

মানসী বলল, 'থাক, কাজের দোহাই আর তোমাকে দিতে হবে না। তুমি যে কত

কাজের লোক, তা আমার জানা আছে। কাজের জায়গা থেকে ছুটি নিয়েই তো এসেছ। আবার কাজ কিসের।'

অসীম বলল, 'যাই, বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ-খবর নিই গিয়ে।'

মানসী বলল, 'মানে মিছামিছি ঘুরে বেড়ানো। বরং এখানে থাকলেই একটু কাজ হবে। জানো মেজদিকে আজ আবার একজন দেখতে আসছে।'

অসীম বলল, 'শুনেছি।'

মানসী হেসে বলল, 'মঞ্জু বোধহয় কিছু আর বাকি রাখেনি। তাহলে তো সব শুনেইছ। তাহলে তো বাইরে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এখানে তোমার বেশি থাকা উচিত।'

অসীম একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এখানে আবার আমার কি কাজ! তোমরা মেয়ে দেখাবে, তাঁরা এসে দেখবেন, মাঝখানে তো আমার কোন ভূমিকা নেই।'

মানসী বলল, 'কেন, তুমি তাঁদের সামনে উপস্থিত থেকে আদর-আপ্যায়ন করবে। মেজদির গুণের বর্ণনা-টর্ণনা করবে। কাজ করতে চাইলে কি আর কাজের অভাব আছে সংসারে?'

অসীম বলল, 'তা অবশ্য নেই। কিন্তু যারা অকর্মণ্য, তাদের হাতের গুণে সৎকাজও অপকর্ম হয়। আমার মুখ থেকে তোমার মেজদির কোন প্রশংসা বেরোলে তা বরং bad publicity হবার আশঙ্কা আছে।'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুমি আজ-কাল ভারি অসভ্য হয়েছ। মুখে আর কিছু আটকায় না। এ বোধহয় পুলিস লাইনে ঢুকবার ফল।'

অসীম বলল, 'মানে তুমি বলতে চাও যারা অন্যকে বাঁধে, তাদের নিজের কোন বাঁধন নেই।'

মানসী বলল, 'নেই-ই ত।'

কোন অর্থে বলল, তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না।

এই অল্প জায়গা। আরো একদল বাইরের লোক আসছেন। মানসী যাই বলুক, অসীমের আর এখানে থাকা সঙ্গত নয়। মনোমোহনবাবুরা মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে হয়তো বিব্রত বোধ করবেন। সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হবে মাধবী, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যাকে দর্শন দিতে যাচ্ছে, রুচির বিরুদ্ধে সাজতে হচ্ছে প্রিয়দর্শনা। কিন্তু আগাগোড়া সব ব্যাপারই কি মাধবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে? তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সে নিজে রোজগার করে, তার একটা স্বাধীন মতামত আছে। সে যদি বেঁকে বসে, বলে, 'না, আমি বিয়ে করব না, অন্তত এই ধরনের ঘটকালির বিয়ে নয়, আমি নিজে দেখা দেব, আমাকে দেখাতে দেব না, শুভ হোক, অশুভ হোক, যা ঘটবার আমি নিজেই ঘটাব,' তাহলে কি কেউ তাকে জোর করে বিয়ে দিতে পারে? মাধবী যদি জোর করে একবার না বলতে পারে, তাহলে বিয়ের আলাপ-আলোচনাও সব বন্ধ হয়ে যায়। যেমন মানসী সব বন্ধ করে রেখেছে। সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, বিয়ে করবে না। এই নিয়ে তাকে যেন কেউ বিরক্ত করতে না আসে। তার সেই একটি 'না'তেই কাজ হয়েছে। কিন্তু মাধবীর বোধ-হয় তত মনের জোর নেই। তার মন এখনো দ্বিধা দুর্বল। যে এই দৌর্বল্য দূর করতে পারে, সব সংশয় ঘুচাতে পারে, তেমন কারো দেখা কি মাধবী জীবনে পায়নি? তেমন কারো কণ্ঠ শোনেনি, যার কথার ওপর সে নির্ভর করতে পারে? নাকি পেয়েও হারিয়েছে? যদি হারিয়ে থাকে, কার দোষে? তার, না মাধবীর নিজের?

মানসীকে বাদ দিয়ে তার দিদির খোঁজ-খবর নিতে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে অসীম নিজেই এক সময় হাসল। এই অনুসন্ধিৎসা চাকরির ক্ষেত্রে লাগাতে পারলে তার পদোন্নতি হত, অন্তত পুরস্কার, পারিতোষিক মিলত। কিন্তু চোরা-কারবারীদের মন আর আচার-আচরণ নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে গেলে তার মাথা ধরে যায়। হাত-পা অনড় হয়ে আসে। তার অমনোযোগ আর নৈষ্কর্মের সুযোগ নিয়ে যারা নিচের ধাপে ছিল, সেই এ এস আই মুকুন্দ রায় আর সদানন্দ জানা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তার বিরুদ্ধে ফিস ফিস ফুস ফুস লেগেই আছে ওদের। চোর-ডাকাতের চেয়েও বেশি ভয় অসীমের ওই দুজন সহকর্মীকে। কখন যে উঁচু চেয়ার থেকে তাকে ওরা ঠেলে ফেলে দেয়, কি টেনে নামিয়ে আনে, সেই আশঙ্কায় অসীম সদাশঙ্কিত। যে কর্মক্ষেত্র সে ভালোবাসে না, সেখানেও অপদস্থ হতে তার ইচ্ছা নেই। সেখানেও নিজের পদ আর ভুঁয়ো প্রতিষ্ঠাকে সে আঁকড়ে থাকতে চায়। কোন কোন মেয়েকে সে দেখেছে, স্বামীর ঘরে যার সুখ নেই, কিন্তু ঘরের বাইরের অচেনা পৃথিবীকে বড় ভয়। সেই ভয়ে তারা সতী, ভালোবাসায় নয়। অসীমের অবস্থাও কি তেমনি? কিন্তু কিসের এত ভয় তার? মাঝে মাঝে অসীম নিজেকে উৎসাহ দেয়, উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করে। কিসের এত ভয় তার? লীলাকে বিয়ে দেবার পর তার আর কোন পারিবারিক দায়িত্ব নেই, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে পোষণ করবার দায়ও তার নেই। তার মত মুক্ত পুরুষ আর কে আছে? সে ইচ্ছা করলে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারে। আর কোন কাজ যদি খুঁজে না-ও পায়, দু-একটা টুইশন সম্বল করে স্বাধীন-ভাবে দিন কাটাতে পারে অসীম। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সাহসটুকু অসীমের নেই। বেকার হবার চেয়ে অপছন্দ-করা এক কাজের চাকার সঙ্গে নিজেকে সে বেঁধে রাখবে সে-ও যেন ভালো। মাধবীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মাধবীও হয়তো নিরুপায় হয়ে কোনরকম একটা সংসার চায়, যে-কোন রকম একজন পুরুষের স্ত্রী হতে চায়, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ঘুচিয়ে দিতে চায় আইবুড়ো নাম। কে জানে, ভিতরে ভিতরে মাস্টারী আর বাপের সংসার নিয়ে মাধবীও হয়তো

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সে-ও এখন মুখ বদলাতে চায়। যদি তাতে জীবনে কোন নতুন স্বাদ আসে।

মাধবী মনে মনে ঘর খোঁজে, কিন্তু অসীমের সন্ধানের বস্তু দুটি। বাসের ঘর আর একটি কাজের ঘর। একটি নারীর মন, আর নিজের মনঃপূত একটি কাজ। কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা প্রধান? বলা বড় কঠিন। নিজের মন একেক সময় একেক কথা বলে। কখনো মনে হয়, 'ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা।' আর কিছু চাই না। শুধু একজনের মন পেলেই জীবন ধন্য। কখনো মনে হয়, মন-টন সব বাজে। আসলে কাজের জায়গা, সে-জায়গা যতই ছোট হোক, সেখানকার যশের মধ্যেই জীবনের সব রস ভরা রয়েছে। মনোরমা, নিজের মনোবৃত্তির অনুসারিণী একটি নারীর চেয়ে নিজের মনঃপূত একটি কাজ খুঁজে পাওয়া সংসারে কম কঠিন।

'তুমি তাহলে সত্যিই বেরোচ্ছ বাবা?'

মনোমোহনবাবু ফের এসে দাঁড়ালো দরজায়।

সত্যিই কথাটার ওপর বেশি ঝোঁক পড়ায় অসীম তাঁর মনের ইচ্ছাটা বুঝতে পারল। সে এখন কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে থাকে, মনোমোহনবাবু তাই চান। ভিন্ন জাতের নিঃসম্পর্কীয় একটি যুবক তাঁর ঘর আগলে বসে থাকুক, এটা তাঁর কাম্য নয়।

বেরোবার জন্যে অসীম তো নিজেই তৈরি হচ্ছিল, তবু এই নির্দেশটুকু দেওয়া কেন।

অসীম মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণ হল। সারা দুপুর ভরে এঁদের আদর আপ্যায়নের কথা এই মুহূর্তে তার আর মনে রইল না।

অসীম মুখে একটু হাসি টেনে বলল, 'বেরোচ্ছি, মানে এবার যাচ্ছি মেসোমশাই। আপনারা অনেক কষ্ট করলেন। নন্তু কোথায় গেল। তাকে দয়া করে একটু বলে দিন, একটা গাড়ি-টাড়ি ডেকে দেবে। একটা রিকসা-টিকসা হলেও হয়। শুধু স্যুটকেস আর বিছানাটা—।'

মনোমোহন বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে না না না। বাক্স-বিছানা নিয়ে এই সন্ধ্যা-বেলায় তুমি কোথায় যাবে? তা হয় না অসীম। তুমি অন্তত আজ রাতটা এখানে থাকবে। তারপর কাল সকালে যা-হয় করো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অনেক দরকারি কথা। এখনো কিছুই বলতে পারিনি।'

অসীম বলল, 'বেশ তো মেসোমশাই, আমি আরো দুদিন কলকাতায় আছি। এক ফাঁকে সময় করে এসে আপনার সব কথা শুনে যাব।'

নিজের অনুরোধ-উপরোধে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে মনোমোহন মেয়েদের স্মরণ নিলেন, 'ও মানসী, ও মঞ্জু, শোন এসে অসীম কি বলছে। ও এখনই চলে যেতে চায়।'

সুহাসিনী মাধবীকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাচ্ছিলেন, যাতে সে ভালো শাড়ি আর গয়না-টয়না দু-একখানা পরে, মনোমোহনের হাঁক-ডাক শুনে বাইরে এলেন। অসীম চলে যাচ্ছে শুনে বললেন, 'সে কি হয় বাবা। তুমি আজই চলে যেতে পার না। বেশ তো বাইরে তোমার দরকার থাকে, তুমি সেসব সেরে এসো। রাত এগারটা হোক, বারোটা হোক, কোন অসুবিধে নেই। আমরা অনেক রাত অবধি জেগে থাকি।'

অসীম বলল, 'আচ্ছা মাসীমা, দেখব যদি আসতে পারি।'

তার কাছ থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করবার জন্যে মানসী আবার একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিল। তারপর অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে কৈফিয়ৎ চাইবার ভঙ্গিতে বলল, 'হঠাৎ তোমার মত পাল্টাবার কারণটা কি। আমরা যথেষ্ট আদরযত্ন করতে পারিনি তাই?'

অসীম বলল, 'বরং উল্টো কারণটাই সত্যি। বড় বেশি আদরযত্ন করেছ। আমার মত বাউণ্ডুলে মানুষের এত বেশি যত্ন সহ্য হয় না।'

মানসী বলল, 'অন্য জায়গায় তোমার থাকা-টাকা হবে না। তুমি কথা দিয়েছ, এখানে থাকতে হবে তোমাকে। ভেবে-ছিলাম, যে কোন ভাবেই হোক একবার বেরোব, একটু ঘোরা-টোরা যাবে। কিন্তু মেজদিকে—। বুঝতেই তো পারছ।'

অসীম বলল, 'ছি ছি ছি, তুমি কি তাই ভেবেছ নাকি? আমি কি সেইজন্যেই—।'

মানসী বললে, 'না-না, তা ঠিক নয়। আমি জানি তুমি মোটেই অবুঝ নও। অবুঝ হলে কি আর এতদিন ধরে কেউ—।'

অসীম বলল, 'ওসব কথা থাক মানসী।'

মানসী বলল, 'তাহলে কথা দিয়ে যাও, একটু ঘুরে-টুরে ফের আসবে। আমার তো মনে হয়, রাত আটটার মধ্যে সব ঝামেলা তখন—।'

মানসী একটু হাসল।

ওই এক ফোঁটা হাসির মধ্যে যেন অনন্ত সম্ভাবনার সিন্ধু ধরা রয়েছে।

অসীম তবু বলল, 'তখন কি—।'

মানসী বলল, 'যাও আমি জানিনে কিছু। যাই মেজদি কতটা কি করল দেখে আসি গিয়ে। আচ্ছা মেয়ে একখানা। বলে আমি যেভাবে আছি, সেইভাবেই থাকব। যারা দেখবার, তারা আমাকে এভাবেই দেখে যাবে। এত খামখেয়ালী।'

'তাই নাকি? তোমার চেয়েও?'

মানসী বলল, 'বাজে কথা বোলো না। আমি মোটেই দিদির মত নই। আমি অমন একবার এগোই, দুবার পিছোই না।'

অসীম বলল, 'এগোন-পিছোন তোমারও আছে। তবে তা অন্য ধরনের।'

মানসী বলল, 'যত বাজে কথা।' তারপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'মেজদি কি বলছে জানো? তুই আমার হয়ে আজকের মত একটা প্রক্সি দিয়ে দে। মানে যাঁরা দেখতে আসছেন, মেজদির হয়ে আমিই তাঁদের দর্শন দিই।'

অসীম বলল, 'বেশ তো তাই দাও না।'

মানসী হেসে বলল, 'মুখে বলছ বটে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি দেখা দিই আর একজন হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাবে।'

একজনের হিংসা হবে, সেই সম্ভাবনায় আর একজনের আনন্দটুকু লক্ষ্য করতে করতে অসীম বাইরে এল।

মানসী পিছন থেকে ফের একবার ডেকে বলল, 'শোন, ভালো কথা, বেরোচ্ছই যখন দাদার একবার খোঁজ নিয়ে এসো না।'

'কার? শঙ্করের?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ, এই তো কাছেই বরানগরে থাকে। যাতায়াতের পথে, ইচ্ছা করলেই একবার আসতে পারে। কিন্তু ভুলেও এ-পথ মাড়ায় না। তুমি দেখ না একটু চেষ্টা-টেষ্টা করে বাপ-ছেলের মধ্যে ফের মিটমাট করিয়ে দিতে পার কিনা। যদি পার বুঝতেই তো পারছ, যদি পার আমি তাহলে রেহাই পাই।'

অসীম মানসীর দিকে চোখ তুলে তাকাল। কিন্তু সে ততক্ষণে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। এই প্রগলভা অকুণ্ঠিতা মেয়েটির এমন লজ্জা দেখে অসীম নিজের মনে হাসল। বুঝতে পেরেছে বই কি। অসীম সবই বুঝতে পেরেছে। এই পারিবারিক দায়িত্ব আর কর্তব্যের গহন অরণ্য থেকে নিজের পথটুকু বের করে আনতে চায় মানসী। সেই জন্যেই বড় বোনের বিয়ের ঘটকালিতে ওর এত গরজ। সেইজন্যেই বাপের সঙ্গে ভাইয়ের এই পুনর্মিলন ঘটাবার চেষ্টা। এই পারিবারিক বন্ধন থেকে এখন মুক্তি চায় মানসী আর-একটি নতুন বন্ধনের ভূষণ নিজের অঙ্গে পরবে বলে।

মানসীর কাছ থেকে তার দাদার ঠিকানাটা চেয়ে নিয়ে অসীম এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। বাস স্টপটার দিকে এগোতে এগোতে লক্ষ্য করল মেয়ে-পুরুষে ভরতি একখানা ট্যাক্সি মানসীদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অসীম এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর ট্যাক্সিটার দিকে আর না তাকিয়ে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মম্মটভট্ট

গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি (২)

গণতন্ত্রের জন্মভূমি আথেন্স-এ বসে প্লেটো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দার্শনিক জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আধুনিক কালে যাঁরা গণশক্তির অভ্যুত্থানকে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করেন, তাঁদের অধিকাংশ যুক্তির পূর্বাভাস উক্ত গ্রীক মনীষীর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা অনেকেই যেখানে নিজেদের যুক্তির মধ্যে নিহিত সিদ্ধান্তটিকে স্পষ্ট করে উপস্থিত করতে কিছুটা সংকোচ বোধ করেন, প্লেটো সেক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা না রেখে গণতন্ত্রের প্রকৃষ্টতর বিকল্প হিসেবে দার্শনিক-অভিজাততন্ত্রের সপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। অন্তত তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ না ঘটলে সমাজের কল্যাণ অসম্ভব।

কিন্তু আমরা যারা দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত, তাদের পক্ষে এ-সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া একটু শক্ত। আমাদের মনে এ-প্রসঙ্গে স্বভাবতই গুটিকয়েক প্রশ্ন জাগ্রত হয়। অতীত ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে, সাংস্কৃতিক মানের সমকালীন নিম্নগামীতার জন্য জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে কতটুকু দায়ী? সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করার কতটুকু সুযোগ তারা পেয়েছে? যন্ত্রবিপ্লবের পর গত একশ/দেড়শ বছরের মধ্যে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার এবং ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে বটে; কিন্তু রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে আজো কি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জনসাধারণের নামে সমস্ত শক্তি নিজেদের হাতেই কেন্দ্রীভূত করে রাখেনি? এই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই কি জনসাধারণের অনভিজ্ঞতা এবং সংগঠনশক্তির অভাবের সুযোগ নিয়ে সমাজের ভাবনা চিন্তা, রুচি এবং চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করছে না? তাছাড়া সাংস্কৃতিক সমকালীন অবক্ষয় রোধ করার জন্য বিদগ্ধ সম্প্রদায় কতটুকু চেষ্টিত? অথবা তাঁরাও কি জনসাধারণের মতই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর চাপের সামনে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করেননি?

এসব প্রশ্ন এদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে কখনো স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও পশ্চিমে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

রিচার্ড হোগার্ট নামে জনৈক তরুণ ইংরেজ লেখক বছর দুই আগে 'অক্ষর পরিচয়ের উপযোগিতা' নামে একটি বই লিখে বামপন্থী বুদ্ধিজীবি মহলে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন।* হোগার্ট নিজে শ্রমিকপরিবারের সন্তান; শ্রমিক সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য অনেকটাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া। তাঁর মতে শ্রমিক সংস্কৃতি এবং গণসংস্কৃতির মধ্যে একটা আমূল পার্থক্য বর্তমান। শ্রমিক-সংস্কৃতি একধরনের লোকসংস্কৃতি। অনেকগুলি মানুষ একই অঞ্চলে একই অবস্থায় মধ্যে দিন দিন বাস করার ফলে তাদের পারস্পরিক হার্দ্য সম্পর্ক এবং সুখদুঃখের সামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংস্কৃতির উপাদান গড়ে উঠেছে। অন্যধারে গণসংস্কৃতি আসলে কারখানায় তৈরী; বিত্তবান সম্প্রদায় জনসাধারণ সম্বন্ধে নিজেদের ধারণার ছাঁচে বাজারে বিক্রির জন্যে যেসব মাল তৈরী করছে, তার সামষ্টিক ফল এই গণসংস্কৃতি। হোগার্ট বিস্তারিত বিবরণ সহযোগে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কিভাবে যান্ত্রিক গণসংস্কৃতির চাপে স্বভাবজ শ্রমিক-সংস্কৃতি ক্রমে লোপ পেতে বসেছে। শ্রমিক-সংস্কৃতির যেগুলি বৈশিষ্ট্য—স্থানীয় জীবনের প্রতি অনুরাগ এবং বাসস্থান পরিবর্তনে অনিচ্ছা। ("the worker is more likely to change his place of work than his place of living"); গোষ্ঠিবোধ এবং পরস্পরের প্রতি সহজাত আনুগত্য ('sense of group warmth'); ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষের প্রতি আকর্ষণ ('attachment to the personal and the concrete') এবং বিমূর্ত-কল্পনা অথবা নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক বিষয়ে ভয় এবং সন্দেহ; দেহ এবং যৌনজীবনের দাবীকে নিঃসংকোচে মেনে নেওয়ার প্রবণতা—এ-সবই গণসংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে আজ লুপ্তপ্রায়। শ্রমিকদের [illegible] জীবন-যাপনের মধ্যে যে সরল, সহজ প্রাণৈশ্বর্য ছিল তা গণসংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি; উল্টে বাজারে-সংস্কৃতির বিকৃত চাকচিক্য (corrupt bnightness) শ্রমিকদের মন বিষাক্ত করে তুলেছে। গণসংস্কৃতিতে শ্রমিকরা ভোক্তা নয়, তারা ক্রেতা-মাত্র; তারা এর স্রষ্টা নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে এর বলি।

কিন্তু শ্রমিকরা বিদ্যার্জনের সুবিধা লাভ করার পরও কেন যথার্থ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় না? তার একটা কারণ, অধিকাংশ শ্রমিকই কোনোদিন প্রকৃত পক্ষে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না; শেক্সপীয়র-মিল্টন পড়ে উপভোগ করার সামর্থ্য তারা কোনো দিনই অর্জন করে না। সত্যি বটে, বিলেতে ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক; এবং সরকারী-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্যে বেতন দিতে হয় না। কিন্তু গণতান্ত্রিক
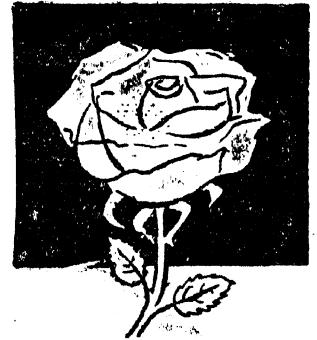
---

* Richard Hoggart, **The Uses of Literacy**; Chatto & Windus; 25sh.

ইংল্যাণ্ডেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের সুযোগ মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সে-শিক্ষা শুধু তারাই পায় যারা হয় স্কুলের পরীক্ষায় নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে বৃত্তিলাভ করেছে, অথবা যারা ভাগ্যক্রমে বিত্তবান পরিবারের সন্তান। অধিকাংশ ছাত্রই এগারো বছর বয়সে পরীক্ষা দেওয়ার পরে আরো চার-পাঁচ বছর যে অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করে তার ফলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অংশীদার হবার সামর্থ্য অর্জন করে না। ফলে তাদের একূলও যায়, ওকূলও যায়। শ্রমিকজীবনের অমার্জিত ভোগশক্তিতে তারা বঞ্চিত; উচ্চ সংস্কৃতি তাদের অনায়ত্ত। তখন গণ-সংস্কৃতিই তাদের একমাত্র সম্বল এবং সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রমিকপরিবারের যে-সব ছেলেমেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বৃত্তির জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়, হোগার্টের বিশ্লেষণ অনুসারে তাদের অবস্থা আরো করুণ। উচ্চ শিক্ষা ক্রমেই এই তরুণদের আপন পরিবার এবং সমাজ থেকে বিযুক্ত করে। লেখাপড়ার জন্যে যেটুকু নিভৃতি প্রয়োজন, শ্রমিকসংসারে তা একান্তই দুর্লভ। তাছাড়া কাব্য, দর্শন, চিত্রকলা, উচ্চস্তরের সংগীত ইত্যাদির যে রস, তার সংগে তাদের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন একেবারেই অপরিচিত। তাদের সমবয়স্ক অন্য শ্রমিক-তরুণরা যখন শিক্ষা সমাপ্ত করে উপার্জনে ব্যস্ত, তখন এই স্বল্পসংখ্যক বৃত্তিভোগী তরুণরা স্বাবলম্বী না হয়ে লেখাপড়ায় ব্যাপৃত থাকার ফলে তাদের নিজেদের সমাজে তারা ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে তারা আবিষ্কার করে যে বিত্তবান ঘরের অন্য ছাত্রদের তুলনায় সে জগতে তারা নিতান্ত বেমানান। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় নেই। তারা পারিবারিক গ্রন্থাগারের আবহাওয়ায় বড় হয়নি; তাদের চোখ এবং কান ভালো ছবি দেখে কিংবা গানবাজনা শুনে অনুশীলিত নয়; পোশাক-আশাক, খাদ্য-পানীয়, আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা সব ব্যাপারেই তাদের দারিদ্র্য এবং স্থূল রুচি পদে পদে প্রকাশ পায়। ফলে উচ্চ শিক্ষা তাদের মনে আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার না করে হীনমন্যতা বোধকেই দৃঢ়মূল করে। একধারে তারা বিত্তবান সহপাঠিদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে; অন্যধারে পদে পদে আত্মাবমাননা এবং ব্যর্থতার যন্ত্রণায় তারা অভিজাত সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। মূল গ্রন্থ পড়ে আনন্দ পাবার শক্তি তারা সংগ্রহ করতে পারে না; অথচ বুদ্ধিজীবী সমাজে কল্কে পাবার লোভে তারা প্রাণপণে মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং সরলীকৃত ব্যাখ্যা পড়ে বৈদগ্ধ্য অর্জনের ব্যর্থ প্রয়াস পায়। এদের পক্ষে তাই নতুন কোনো সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করা দূরের কথা, কোনো প্রাণবান সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হওয়াও শক্ত।

সুতরাং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী এবং জনসাধারণ (বিলেতের মত দেশে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই) সাংস্কৃতিক

অবক্ষয়ের ধারাকে রোধ করতে অসমর্থ। কিন্তু আধুনিক সমাজের যাঁরা সর্ব-স্বীকৃতভাবে বিদগ্ধ সম্প্রদায় তাঁরাই বা এ-বিষয়ে কতখানি দায়িত্ববোধ এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন? সাংস্কৃতিক মানের নিম্নগামীতা অবক্ষয়ের এক দিক; কিন্তু সংস্কৃতির পক্ষে তার চাইতেও যা সম্ভবত বেশী মারাত্মক তা হল সংস্কৃতির যাঁরা স্রষ্টা সেই মনীষীদের সততা এবং স্বাধীনতার বিলোপ সাধন। ফাসিস্ত রাষ্ট্রে শিল্পী এবং বুদ্ধিজীবীদের বিবেককে বলপ্রয়োগের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল; কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে মনীষীদের উঁচু মাইনের চাকরে পর্যবসিত করা হয়েছে। ডিক্টেটরী ব্যবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সামনে দাসত্বের বিকল্প নির্বাসন, আত্মহত্যা অথবা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে তাঁদের ত' যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বলশালী এবং সমৃদ্ধতর করার জন্য সেই স্বাধীনতাকে তাঁরা কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন?

এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ভেবলেন্‌ আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ীকুলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের নিয়োগ বহু ক্ষেত্রেই পাণ্ডিত্য অথবা শিক্ষকতার কাজে যোগ্যতার দ্বারা ঠিক হয় না; বাজারে মানুষটির চাহিদা কি রকম তারই হিসেব করে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নির্বাচন করেন। (ভেবলেন্‌ : দি হায়ার লার্নিং অ্যামেরিকা) তৎকালে এ সমালোচনার কতটা যাথার্থ্য ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু গত বছর দুজন সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক একটি গ্রন্থে বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণাদি সহযোগে দেখিয়েছেন যে, সমকালীন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে বিদ্যাবত্তা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পণ্য-দ্রব্যে পর্যবসিত।* এ'রা আমেরিকার ন'টি প্রধান প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। এ'দের সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ব্যাপারটি আমাদের মনে সব-চাইতে পীড়াদায়ক ঠেকে সেটি হল, অধিকাংশ অধ্যাপক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের নিয়মিত করতে অনিচ্ছুক ত' ননই, বরং আগ্রহশীল। জ্ঞানার্জনের চাইতে প্রতিষ্ঠার্জনে এ'রা অনেক বেশী উদ্যোগী; ছাত্রদের মানসিক বিকাশের চাইতে নিয়োগকর্তাদের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া ব্যাপারে এ'রা অধিকতর পরিশ্রমী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারে অধ্যাপকদের দর তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা, প্রত্যয়গত নিষ্ঠা অথবা অধ্যাপনার সামর্থ্য দিয়ে যাচাই হয় না; তাঁরা ক'খানা বই লিখেছেন (সংখ্যাটাই মুখ্য, গুণ গৌণ), ক'টা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে তাঁরা কতটা প্রস্তুত, কোন অ্যাকাডেমিক ক্লিকের সঙ্গে তাঁদের কেমন সম্পর্ক, এসবই হল প্রধান বিবেচ্য। অথচ এর বিরুদ্ধে অধ্যাপক-দের তরফ থেকে বড় একটা আপত্তি দেখা যায় না। তাঁরা বরং এই বাজারে নিজেদের দর ওঠাবার জন্যে নানারকম কলা-কৌশল অর্জনে ব্যাপৃত।

ক্যাপ্‌লো এবং ম্যাক্‌গীর বিশ্লেষণ থেকে অবশ্য এটা প্রমাণ হয় না যে, উক্ত অধ্যাপকবৃন্দের পাণ্ডিত্য কম। তাঁদের যেটা প্রকৃত অভাব সেটা চরিত্রবলের অভাব। কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তির যদি চরিত্রবল না থাকে, তাহলে ভয় কিংবা লোভ দেখিয়ে প্রয়োজন মত তাঁদের নীরব করিয়ে রাখা যায়, এমন কি তাঁদেরকে দিয়ে নিজেদের প্রত্যয়বিরোধী কথা বলানোও হয়ত অসম্ভব নয়। কম্যুনিস্ট এবং ফাসিস্ত রাষ্ট্রে চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে দেশের মধ্যে বাস করে নিজের বিবেক অনুযায়ী কিছু লেখা বা বলা প্রায় অসম্ভব; প্যাস্টারনাক্‌-এর ব্যাপারটা ভারি সাম্প্রতিক উদাহরণ। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মনীষীরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে অনেকটা নির্ভয়েই সংগ্রাম করতে পারেন (অবশ্য যদি তাঁদের বিবেকে ঘুণ না ধরে থাকে)। কিন্তু মার্কিন দেশে ম্যাকার্থির আমলে দেখা গেল, উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত একরকম বিনা প্রতিবাদে প্রবল অন্যায়ের দাপটকে

* Theodore Caplow and Reece J. McGee, The Academic Marketplace Basic Books. New York $4.50.

নিজেদের ভাগ্য বলে মেনে নিলেন। অথচ ম্যাকার্থির বহুবিজ্ঞাপিত ক্ষমতার ভেতরটা যে আসলে ফাঁপা ছিল, প্রথম ধাক্কাতেই তা সেটা প্রকাশ পেল। তাহলে মার্কিনের জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায় ম্যাকার্থির দাবড়ানিতে কয়েক বছর একেবারে তটস্থ হয়েছিলেন কেন?

ম্যাকার্থির পতনের পর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এই গ্লানিকর অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডোয়ার্ড শিলস্‌-এর মতে এর প্রধান কারণ মার্কিনী সমাজের "পপুলিস্ট" ঐতিহ্য।* ওদেশে সমাজকে যে-ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে তার মূল প্রেরণা হল সব মানুষকে একই ছাঁচে ঢালাই করা। এই ছাঁচে-ঢালা গড়পড়তা মার্কিনবাসী দেশ-প্রেমী, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কর্মপটু, চিন্তাবিমুখ, আগন্তুকের প্রতি সন্দেহ-পরায়ণ, মানসিক আভিজাত্যে অবিশ্বাসী। অধিকাংশের সংস্কার, অভ্যাস, মত এবং রুচিকেই এ'রা শ্রেয় মনে করে; ব্যতিক্রমের প্রতি এরা অসহনশীল। মার্কিন দেশে কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে এই গড়পড়তা মার্কিনবাসীর আস্থা অর্জন করতে হয়, তাদের খোসামোদ করা ছাড়া উপায় থাকে না। বলা বাহুল্য, এজাতীয় সমাজে বিদগ্ধজনের স্থান খুব অনিশ্চিত। এখন যতদিন পর্যন্ত মার্কিনের জ্ঞানীগুণী সম্প্রদায় ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে অধ্যাপনা জাতীয় নিরীহ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, ততদিন মার্কিনী জনসাধারণ এবং তাদের প্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতারা এ'দের ঔদাসীন্যভরে সহ্য করেছে। কিন্তু রুজভেল্টের নিউ ডিলের আমলে দেশের পরিচালনার ব্যাপারে যখন বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিকদের ডাক পড়ল, তখন পেশাদার রাজনৈতিকেরা তার মধ্যে নিজেদের সর্বনাশের সূচনা দেখলেন। রাজনীতিতে বিদগ্ধ জনের প্রবেশের অর্থ অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত গণনেতাদের একচ্ছত্র ক্ষমতায় ভাঙন ধরা। সুতরাং এ'রা উঠে-পড়ে লাগলেন যাতে জনসাধারণ প্রথমে বিদগ্ধ রাজনৈতিকদের বিরুদ্ধে এবং তারপর সাধারণভাবে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিনের "পপুলিস্ট" ঐতিহ্যের সুযোগ নিয়ে এই গণতোষক রাজনৈতিকেরা ক্রমে জনসাধারণের মনে স্বাধীনচিত্ত জ্ঞানীগুণীদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা এবং আক্রোশের মনোভাব প্রবল করে তোলে। এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব গ্রহণ করে ম্যাকার্থি এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আক্রোশের কারণ, এ'রা গড়পড়তা ছাঁচে পড়েন না, এ'রা জন-সমর্থনের মাপকাঠিতে কোনো কিছুর যাথার্থ্য বিচার করতে রাজী নন, এ'রা এমন অনেক কিছু জানেন যা চৌমাথার মোড়ে বক্তৃতা দিয়ে কিংবা খবরের কাগজের মারফং সর্বসাধারণকে জানানো যায় না। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে দেশরক্ষার জন্যে সামরিক বিভাগ থেকে নানা গোপন পরীক্ষা করানো হয়েছিল যার সন্ধান শুধু বৈজ্ঞানিকরা জানতেন এবং মার্কিন সরকার যে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত সংবাদ কংগ্রেসের গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে প্রচার করতে উৎসাহী ছিলেন না। প্রতিনিধিরা শোধ নেবার চেষ্টা করলেন একধারে গণতন্ত্রের নামে সব গোপন তথ্যকে সর্বসাধারণ্যে প্রচারের দাবী তুলে, অন্যধারে বৈজ্ঞানিকদের দেশপ্রেম এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে জনসাধারণের মনে সন্দেহ প্রবলতর করে। রাজনৈতিক আক্রমণের সামনে পণ্ডিত সম্প্রদায় অসহায়; কারণ বিলেতের মত আমেরিকাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের না আছে কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, না আছে সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি।

শিলস্ সাহেবের এই বিশ্লেষণের মধ্যে অনেকটা খাঁটি কথা আছে; কিন্তু তাঁর

* Edward Shils. The Torment of Secrecy. Heinemann. 15 sh.
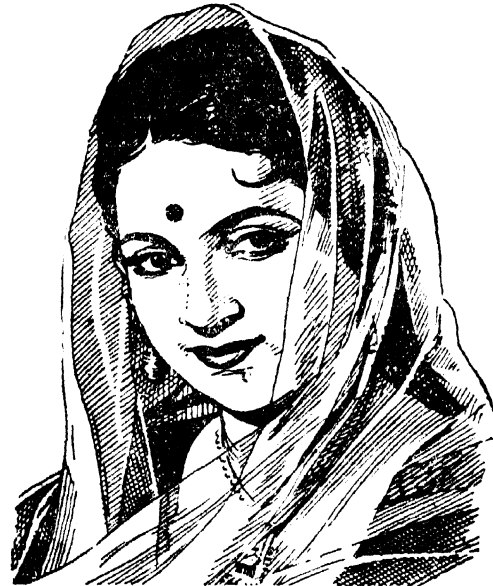
লেখা থেকে একটা মূল প্রশ্নের কোনো জবাব মেলে না। মার্কিন দেশে শিক্ষার বিকীরণের ব্যাপক বন্দোবস্ত আছে; বিলেতের মত সেখানে কোনো "ইলেভ্‌ন্‌-প্লাস"-এর বাধা নেই; বিস্তর ছেলেমেয়ে সেখানে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। বছর বছর সেখানে সাধারণ ঘরের বহু ছেলেমেয়ে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট্‌-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার সূত্রে দেশের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসে। তা সত্ত্বেও মার্কিনী অধ্যাপকবৃন্দ জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা, রুচি এবং সংস্কারের ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেন না কেন? কোনো দেশের জাতীয় চরিত্র পূর্বনির্দিষ্টও নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়। ছাত্রদের মারফৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রসারিত হয়ে মার্কিনের তথাকথিত "পপুলিস্ট" ঐতিহ্যে উদারতন্ত্রের বহুবাচনিক সহনশীলতা সঞ্চারিত করেনি কেন? শিল্‌স্‌ এর বিচার থেকে এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না।

অধ্যাপকদের এই ব্যর্থতার আংশিক ব্যাখ্যা মেলে পুর্লেকা কাপ্‌লো এবং ম্যাকৃগী-র বইটিতে। যাঁরা জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানকে মূল্যবান না মনে করে বিদ্যাকে সামাজিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সংকুচিত নন, তাঁদের পক্ষে ছাত্র সম্প্রদায় এবং তাদের অভিভাবকদের ওপরে আদর্শগত কোনো প্রভাব ফেলা যে কঠিন হবে, এটা অপ্রত্যাশিত নয়। এই ব্যর্থতার আরেকটি সূত্রের নির্দেশ পাচ্ছি মার্কিনে সমাজবিজ্ঞান চর্চার ওপরে ম্যাকার্থি যুগের প্রভাব বিশ্লেষণ করে লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত আরেকটি বইতে।* এই বইয়ের যুগ্ম গ্রন্থকার ল্যাজার্‌স্‌ফেল্‌ড্‌ এবং থীলেন্‌স্‌-এর প্রগতিপন্থী সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে খ্যাতি আছে। বিভিন্ন কলেজে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরসূত্রে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ম্যাকার্থির আমলে (এবং তার পতনের পরে এখনো) মার্কিন দেশে সমাজবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত ভয়ের মধ্যে বাস করেছেন (এবং করছেন); এই আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তাবোধ তাঁদের মধ্যেই সবচাইতে প্রবল যাঁরা উক্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অধিকতর গবেষণা এবং গ্রন্থ বা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন; এবং এই অপেক্ষাকৃত অধিকতর আতঙ্কিত এবং সৃষ্টিশীল (apprehensive and productive) পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিপ্লববাদী এবং বামপন্থী সমাজ-দর্শনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানো উচিত মনে করলেও সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় পাঠ্যতালিকা, ক্লাসের আলোচনা এবং স্নাতকোত্তর গবেষণার বিষয় থেকে ঐসব দর্শনকে হয় একেবারে বাদ দিয়েছেন, আর না হয় তাদের আলোচনাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করেছেন। বইটি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, গ্রন্থকারদ্বয় সম্পূর্ণভাবেই উক্ত অধ্যাপক সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল; তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সংকোচ এবং মানের নিম্নগামীতার জন্যে মুখ্যত রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে কোথাও এমন কোনো তথ্যের উল্লেখ নেই যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অধ্যাপকদের এই আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তাবোধের যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি ছিল। ম্যাকার্থি আন-অ্যামেরিকান কমিটি অথবা এফ-বি-আই-যে স্বাধীনচেতা অধ্যাপকদের বিশেষ ক্ষতি করতে পেরেছিল বা পারত, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় এ সন্দেহ অযৌক্তিক ঠেকে না যে, আসলে উক্ত অধ্যাপকদের মানসিক গঠনে আত্মপ্রত্যয়, সত্যনিষ্ঠা অথবা সাহসের সামর্থ্য বড় একটা ছিল না; তাঁরা চিন্তার স্বাধীনতার চাইতে চাকরী বজায় রাখাকেই বেশী মূল্য দিয়েছিলেন; অন্যায়ের প্রতিরোধ না করে নিজেদের ভীরুতার ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসে অত্যাচারীর শক্তিকে অনেক বড় করে বাড়িয়ে দেখে তাঁরা শামুকের খোলের মধ্যে স্বস্তি খুঁজেছিলেন। ল্যাজার্‌স্‌ফেল্ড এবং থীলেনস্‌-এর অবশ্য এটা বক্তব্য নয়; কিন্তু তাঁদের বইটি পড়ে গড়পড়তা মার্কিনী অধ্যাপকের এই চেহারাটাই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তাঁরা হয়ত পণ্ডিত; কিন্তু তাঁরা লোভী এবং কাপুরুষ। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এঁদের সংগৃহীত তথ্য যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য গড়পড়তা বুদ্ধিজীবির স্বার্থপর ভীরুতা কম দায়ী নয়।

অতএব আধুনিক কালে সাংস্কৃতিক মানের নিম্নগামীতার জন্যে গণতন্ত্রকে দোষী করা সমীচীন ঠেকে না। গণতন্ত্রের দুটো প্রধান লক্ষ্য আছে; প্রথমটি হল সমাজ-সংগঠনে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকার; দ্বিতীয়টি হল সমাজ-পরিচালনায় সর্বসাধারণের স্বাধীন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংস্কৃতির পরস্পর-নির্ভরতা এতই স্পষ্ট যে, তা নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না; যে-সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই সেখানে সাংস্কৃতিক স্থবিরতা অবশ্যম্ভাবী। বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সংশয় গণতন্ত্রের দ্বিতীয় লক্ষণটি নিয়ে। আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি, কোন্‌ ধরনের যুক্তি এবং তথ্যের ভিত্তিতে এঁদের অনেকে আশঙ্কা করেন যে, সর্বসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে সাংস্কৃতিক মানের অবনতি অনিবার্য। একথা হয়ত মেনে নেওয়া যায় যে, ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভোজ্যবস্তুর বৈচিত্র্য এবং সূক্ষ্মতা কমার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সম্ভাবনা এবং অনিবার্যতা এক ব্যাপার নয়। যদি সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে ভোক্তাদের মানসিক বিকাশের ব্যাপক সুবন্দোবস্ত থাকে, এবং এই বিকাশে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রধানত যাঁদের ওপরে সেই বিদগ্ধ সম্প্রদায় যদি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন, তাহলেই যাচাই করা সম্ভব যে, জনরুচির নিম্নগামীতা অবশ্যম্ভাবী কিনা।

* Paul Lazarsfeld and Wagner Thielens, Jr., The Academic Mind. Free Press. $ 7.50.

কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে জনসাধারণের শিক্ষারই কোনো ব্যবস্থা নেই; এবং যে-সব সমৃদ্ধিশালী সমাজে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানেও অধিকাংশের শিক্ষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং মানুষের বিরাট সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে অংশ গ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ যে বিশেষ সুলভ নয়, ইতিপূর্বে আমরা তা' লক্ষ্য করেছি। সর্বসাধারণকে সুশিক্ষিত করার ব্যবস্থা এবং মনস্বীতার সঙ্গে নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়—এই দুই সর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য জনসাধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধি দায়ী কিনা তা নির্ণয় করা বোধ হয় অসম্ভব। তাছাড়া, গণতন্ত্রের আদর্শ যাই হোক না কেন, পৃথিবীতে যে-সব সমাজকে এখন গণতান্ত্রিক বলে গণ্য করা হয় সেখানে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হলেও এবং তাঁদের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও সমাজ পরিচালনায় তাদের সত্যিই কতটুকু হাত আছে, সে কথাও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। সে-আলোচনা ভবিষ্যতে করা যাবে।

ডক্টর শশধর সিংহ

॥ তিন ॥

লণ্ডনের অন্যান্য হাসপাতালের মত এখানেও ওয়ার্ডের কাজ শুরু হয় ভোর ৬টায়। প্রথম হল হাতমুখ ধোয়ানো আর রোগীদের চা খাওয়ানোর পালা। ৮টায় ব্রেকফাস্ট। এ সময়টা আমার খুব ভাল লাগত। ভোরের আলো ও হাওয়া চারিদিকে ছেয়ে গেছে। ওয়ার্ডে শান্তি এসেছে। সবাই চুপচাপ বিশ্রাম করছে। আর রাত্রে যাদের ঘুম হয় নি, তারা একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। আমিও এইভাবে একদিন ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার কম্বলেমোড়া পায়ের বুড়ো আংগুলটা টেনে দিল। চোখ মেলে দেখি সুইডিস নার্সটি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে "গুড মর্নিং, হাও ডু ইউ ডু?" বলেই পালিয়ে গেল। গুড মর্নিং বলার এও যে একটা ধরন হতে পারে, তা আমার আগে জানা ছিল না। বেশ মজা লাগল।

এই নার্সটির সংগে মাত্র ২।১ দিন আগে আলাপ হয়েছে খাবার ঘরে। সে আমাদের খাবার পরিবেশন করত আর আমরা যাতে ভাল করে খাই তার উপর চোখ রাখত।

একদিন খাবার শেষে খুব ক্লান্তি বোধ হল তাই পাশের একটি নার্সকে বললাম, "আচ্ছা, তুমি আমার চেয়ারটা বিছানা পর্যন্ত একটু ঠেলে নিয়ে যেতে পার?" দুর্ভাগ্যবশত সেখানে গিয়ে দেখি যে, সেদিন পুরুষ নার্সরা সবাই খেতে গেছে। কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় দেখি হঠাৎ সেই সুইডিস নার্সটি এসে অনায়াসে আমাকে কোলে করে বিছানায় তুলে দিলে এবং কম্বল টেনে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলে।

আমি ত অবাক। এই ২২।২৩ বছরের মেয়েটির গায়ে যে এত শক্তি থাকতে পারে বিশ্বাস করতে পারি নি। অন্য নার্সটিও তথৈবচ। বললাম, "জয়তু সুইডেন, ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।" ভদ্রতার খাতিরে অন্য নার্সটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমিও সুইডেন থেকে এসেছ বুঝি?" সে উত্তর দিল, "না, আমার মা ইংরেজ, আর বাবা স্কচ।"

এই ঘটনার পর সুইডিশ মেয়েটি বেশী-দিন হাসপাতালে ছিল না। শীঘ্রই তার কাজ শেষ হয়ে এল। দেশে ফিরে গিয়ে আরও তিন বছর ট্রেনিং নিতে হবে, এর পর পুরো নার্স হবে।

ইতিমধ্যে এসে সে আমার সংগে মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলত। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা মাইব্রীট, (তাকে মিস্ বললে বাধা দিয়ে বলত, না আমার নাম মাইব্রীট) তুমি কোন্ শহর থেকে এসেছ? তুমি কি অমুক শহরকে জানো? আমার এক ভাই ওখানে পড়া-শুনো করেছে।" সে তার শহরের নাম বলল, আর বলল, "তোমার ভাই প্লয়েড টিচার্স ট্রেনিং নিতে এসেছিল বুঝি?" তার উত্তর শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। একটি সাধারণ নার্স তার স্বদেশে কোথায় কি পড়ানো হয় তার খবর রাখে। আমি বেশ বলতে পারি যে, য়ুরোপের অন্য দেশের নার্সরা নিজেদের দেশ সম্বন্ধে এত সব খবর রাখে না।

ক্রমে তার যাবার দিন ঘনিয়ে এল। একদিন ভোরবেলা আমার কাছে বিদায় নিতে এল। বলল, "ডাঃ সিন্‌হা, তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ, আর স্বদেশে ফিরে গিয়ে ভাল কাজকর্ম কর, এই প্রার্থনা করি।"

স্বভাবতই একটি বিদেশী মেয়ে আমার কাছে এইভাবে বিদায় গ্রহণ করতে এসেছে দেখে মনটা নড়ে উঠল, আর চোখের পাতা ভিজে উঠল। আমি বললাম, "তুমি দেশে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে সুইডেনকে ভারতবর্ষের অভিবাদন দিও এবং তোমার বাবা মাকে আমার নমস্কার দিও, আর বলতে ভুলোনা যে, তাঁদের মেয়েটি বড় লক্ষ্মী মেয়ে। তার সংগে আলাপ হওয়াতে খুব খুশী হয়েছি।"

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে আরও দুটি নার্স এখানে কাজ করে সুইডিশ মেয়েটির সমবয়সী। একটি ফিনল্যাণ্ড, আরেকটি ডেনমার্ক থেকে এসেছে। এদের দেখেই বুঝা যায় যে, য়ুরোপের এরা একই অঞ্চল থেকে এসেছে।

একদিন ফিনিশ মেয়েটি রাত্রের ডিউটিতে এসেছে। সে প্রায় ৬ ফুট লম্বা আর অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মেয়ে-দের মত তারও চুল সোনালি ও চোখ নীল বর্ণ। অনেকদিন তাকে দেখি নি।
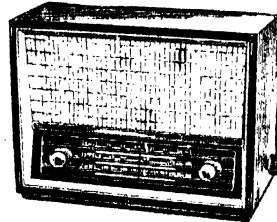
আমার বিছানার কাছে এসে বলল, "গুড ইভ্‌নিং ডক্টর, এখন কেমন আছ? তোমার উপর দিয়ে ত খুব ঝড়ঝাপটা গেছে।" উত্তরে বললাম, "ধন্যবাদ, এখন অনেকটা ভাল, তবে সুস্থ হতে সময় লাগবে।" তার নাম মনে ছিল না এবং ঠিক কোন দেশ থেকে এসেছে তাও ভুলে গিয়েছিলাম। তার নাম জানতে চাইলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার বাড়ি কোন্ শহরে?" শহরের নাম শুনেই বুঝলাম যে, সে ফিনল্যাণ্ড থেকে এসেছে। সে আরও বললে যে, তার এক বান্ধবী একটি বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করে আমাদের দেশে গেছে।

উত্তর য়ুরোপের নারী-পুরুষদের মধ্যে একটা প্রধান লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এরা কেবল আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতেও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের নরনারীদের চাইতে অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের চালচলন ভদ্র, শিক্ষা ও কৃষ্টিতে এরা অন্য সবাইকে হার মানায়। আরেকটা উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে এদের নীরব কর্ম-তৎপরতা। বেশ বুঝা যায় যে, এরা যে-সব দেশ থেকে এসেছে সেখানে বর্তমান য়ুরোপের অনেক সামাজিক সমস্যার যথা-যোগ্য সমাধান হয়েছে। এ-সব দেশে দারিদ্র্য প্রায় নাই বললেই চলে। এই হেতু সেখানে সাধারণ লোকের জীবনেও যে-পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে তা য়ুরোপে অন্যত্র কল্পনাতীত। এখানে শিক্ষা ও কৃষ্টির পথ সবার পক্ষে সুগম হয়েছে। আর সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াকে নিয়ে এক সর্বজনীন কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। কি কারণে য়ুরোপের সব দেশ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ডকে সম্মানের এমন কি ঈর্ষার চক্ষে দেখে তা বুঝা খুব কঠিন নয়।

এদের শিক্ষার আদর্শ কি রকম উঁচুদরের তার একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

হাসপাতালে একদিন রাত্রি ১০টার সময় বাতি নেবাবার সময় হ'ল। ফিনিশ মেয়েটি সবাইকে গরম পানীয় খাইয়ে-দাইয়ে ঘুমোবার জন্য প্রস্তুত করেছে। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে। এমন সময় হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের কারো কাছে টাইম্‌স আছে কি?" অনেকে ভাবলেন, মেয়েটি ভাল ইংরেজী জানে না, কটা বেজেছে জানতে চাইছে। মেয়েটি বলল, "না না, আমি সময় জানতে চাই না, টাইম্‌স পত্রিকা পড়তে চাই রাত্রে সময় কাটাবার জন্য।" আমরা ত সবাই হতভম্ব। কোন দেশের সামান্য একটি নার্স সময় কাটাবার জন্য টাইম্‌স পত্রিকা পড়তে চায়। বলা বাহুল্য এই ঘটনাটা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। এর চেয়ে শিক্ষার বড় মাপকাঠি কি হ'তে পারে?

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম য়ুরোপের নানা জাতির আকৃতি ও প্রকৃতির তফাত ও বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। এই বৈচিত্র্য নিয়েই এদের ইতিহাস ও কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, এই বৈচিত্র্য আছে বলেই য়ুরোপের প্রতিভা এমন নানামুখী রূপ গ্রহণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও ভুললে চলবে না যে, সমগ্র য়ুরোপের ভৌগোলিক পরিস্থিতি সভ্যতা, কৃষ্টি ও ধর্ম এক সূত্রে গাঁথা বলেই য়ুরোপীয় প্রতিভা মূলত এক। এই হল য়ুরোপের মৌলিক ঐক্যের উৎস।
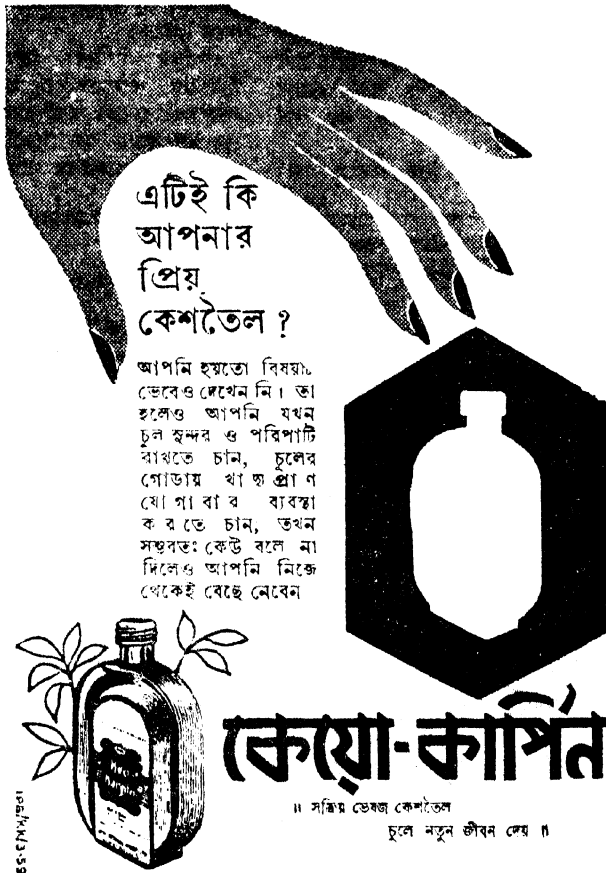
কোষগ্রন্থের কথা
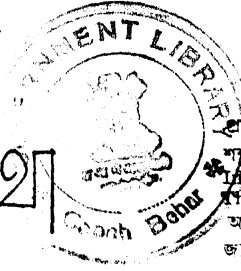
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষগ্রন্থ সংকলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আজকের নয়। অনেক বই পড়বার পরিশ্রম বাঁচিয়ে প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে কোন বিষয়ের উপর সকল তথ্যের সারমর্ম কি করে পাওয়া যেতে পারে, তার জন্য পরীক্ষা চলছে বহু শতাব্দী যাবত। কোষগ্রন্থ বলতে এখন আমরা যা বুঝি, সেই শ্রেণীর প্রাচীনতম নিদর্শন বোধ হয় ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া, এলডার (দি) প্লিনি ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এ বই সংকলন করেছিলেন। চারশ লেখকের দু-হাজার বই থেকে প্রায় কুড়ি হাজার নির্বাচিত উদ্ধৃতি সংকলন করেছিলেন প্লিনি। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে কোষগ্রন্থ সংকলনের কৃতিত্ব চীনের। দশম শতাব্দীতে সংকলিত চীনা কোষগ্রন্থ 'তাই পিং যু তান'-কে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া হয়।

ছাপাখানার প্রসারের পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল। এসব বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ করা একজন পাঠকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাছাড়া কলকারখানার যুগে সময়ের মূল্য বেড়েছে। কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত পাওয়া চাই। বই খুঁজে খুঁজে বের করবার সময় নেই। কালের এই দাবি মেটাবার জন্য আজকাল এত বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স বই বেরিয়েছে। যে-সব কোষগ্রন্থে সকলপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর পাওয়া যায় রেফারেন্স বই হিসাবে তাদের মূল্য সবচেয়ে বেশী।

একালের পাঠকের পক্ষে তিনটি রেফারেন্স বই বিশেষ প্রয়োজনীয়ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া বা কোষগ্রন্থ; অভিধান ও মানচিত্র। আজকাল বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যেকার সীমারেখা শিথিল হয়ে পড়েছে। কবি বা ঔপন্যাসিকও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। হাতের কাছে একটি কোষগ্রন্থ না থাকলে অপরিচিত তথ্যের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয় না।

তাছাড়া আজকাল বিদেশে কোষগ্রন্থ শিক্ষার জগতে একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। জনসাধারণের যে বৃহৎ অংশ স্কুলে-কলেজে পড়বার সুযোগ পায় নি একটি সত্যিকার ভালো কোষগ্রন্থ তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভের যোগ্য।

আজকাল তাই কোষগ্রন্থের আদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নবম সংস্করণ পর্যন্ত সংকলকদের মনে ধারণা ছিল কোষগ্রন্থ বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু তার পর থেকে বৃহত্তমসংখ্যক পাঠকের উপযোগী করবার দিকে সংকলকরা দৃষ্টি দিয়েছেন।

এনসাইক্লোপিডিয়া বা কোষগ্রন্থের একটি সংজ্ঞা হলঃ

"a Systematic Summary of all the information significant to mankind."

নিছক শব্দার্থ, যা অভিধানে পাওয়া যায় এবং যে শব্দের বিস্তৃততর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই অথবা সম্ভব নয়, তা কোষগ্রন্থ থেকে বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক য়ুরোপীয় কোষগ্রন্থে অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে। কারণ তখনো অভিধান ও কোষগ্রন্থের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়নি। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণে (১৭৬৮) অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হয়েছে। যেমন—

Indian—Mogul Empire; Woman—The Female of man.

আমাদের বিশ্বকোষেও নিছক শব্দার্থ অনেক জায়গা জুড়ে আছে।

"সিগনিফিক্যান্ট" কথাটি লক্ষ্যনীয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশ হিসাবে প্রয়োজনের পার্থক্য ঘটে। বাঙলা ভাষার কোষগ্রন্থে যে তথ্য থাকা আবশ্যক ব্রিটেনে তার সবগুলি প্রয়োজনীয় নয়। এই জন্য পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা অনুসারে কোষগ্রন্থের পরিকল্পনা রচনা করা দরকার।

কোষগ্রন্থের কোন পরিকল্পনাই স্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে কোনো বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, কোন বিষয়ের আকর্ষণ ক্রমশ হ্রাস পায়। কোষগ্রন্থ সংকলককে এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বিভিন্ন সংস্করণ তুলনা করে পড়লে দেখা যাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে এর রূপ বদল হয়েছে। ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণে (১৭৬৮) অ্যাটমের উপরে আছে মাত্র চারটি বাক্য; আর প্রেমের উপরে আছে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি প্রবন্ধ। বর্তমান সংস্করণে অ্যাটম পেয়েছে সাড়ে দশ পাতা; প্রেমের উপরে কোন পৃথক প্রবন্ধই নেই। ব্রিটানিকার সম্পাদক অভিযোগ পেলেন পাঠকের কাছ থেকেঃ সম্পাদক কি সংসারে প্রেমের
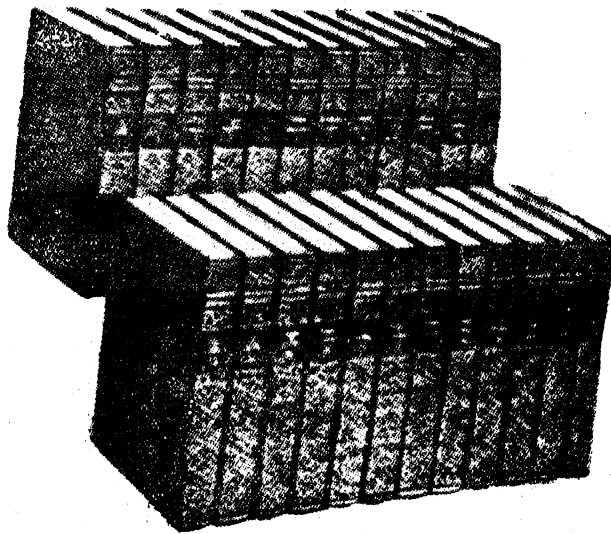
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন? সম্পাদক জবাব দিলেন, নবম সংস্করণ থেকে প্রেমের উপরে প্রবন্ধটি বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ "Love is better experienced than read about; the opposite is true of the atomic bomb."

কোষগ্রন্থ নানা শ্রেণীর হতে পারে। আমরা এখানে সেই জাতীয় কোষগ্রন্থের কথাই বিশেষ করে বলছি যেখানে ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর তথ্য পরিবেশন করে। এছাড়া বিশেষ-বিষয়ক কোষগ্রন্থের অভাব নেই। "এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস্" "এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোসাল সায়েন্সেস" ইত্যাদি রেফারেন্স বইয়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

কোষগ্রন্থ এক খণ্ডের হতে পারে; আবার পঁচিশ-ত্রিশ খণ্ডেও সম্পূর্ণ হতে পারে। এক খণ্ডের ছোট কোষগ্রন্থের চাহিদা বিদেশের বাজারে খুব বেড়েছে। সাধারণ পাঠক সর্বদা ব্যবহারের জন্য ছোট কোষগ্রন্থই পছন্দ করে। বড় কোষগ্রন্থ কেনার সামর্থ্যও কম লোকেরই আছে। এক খণ্ডের কোষগ্রন্থগুলির মধ্যে "কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া" শ্রেষ্ঠ।

কোষগ্রন্থ নানা মানের হতে পারে। "ব্রিটানিকা জুনিয়র" বা "অক্সফোর্ড জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া" কিশোর-কিশোরীদের জন্য সংকলিত। সাধারণ-শিক্ষিত পাঠকের জন্য বহু কোষগ্রন্থ আছে। ব্রিটানিকা উচ্চতম মানের কোষগ্রন্থ।

আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলে কোষগ্রন্থ মোটামুটি দুই শ্রেণীর। এক হল আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত করা; আর হল, প্রসঙ্গগুলির বিষয়ানুসারে সাজানো। এসরাজ, তবলা, বাঁশী, সেতার প্রথম শ্রেণীর কোষগ্রন্থে এ, ত, ব ও স অক্ষরের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাবে; এসরাজ ও সেতারের মধ্যে কয়েকশত পাতার ব্যবধান থাকবে। বাদ্যযন্ত্রগুলি যে পরস্পরের সহিত নানা দিক থেকে সম্পর্কান্বিত তা বোঝানো যায় না। কিন্তু যে কোষগ্রন্থে প্রসঙ্গগুলি বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত সেখানে বাদ্যযন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এরা পাশাপাশি থাকবে। এ জাতীয় বিন্যাসের সুবিধা এই যে, সম্পর্কান্বিত প্রসঙ্গগুলিসহ একটি বিষয়ের মোটামুটি ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।

অক্ষরানুসারে প্রসঙ্গ বিন্যাস করাই এখানকার প্রচলিত রীতি। এর সুবিধা এই যে, প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি দ্রুত বের করা যায়। ধারাবাহিক পাঠের জন্য কোষগ্রন্থ বা কোন রেফারেন্স বই রচিত হয় না। নতুন তেলেগু কোষগ্রন্থ বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত। অক্সফোর্ড জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়াও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই শ্রেণীর কোষগ্রন্থের পক্ষে বিস্তৃত নির্ঘণ্ট অপরিহার্য। অভিধানের মতো প্রসঙ্গগুলি যেখানে অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত, সেখানে—বিশেষ করে আকার ছোট হলে—নির্ঘণ্ট অনাবশ্যক। কিন্তু যদি বড় প্রবন্ধ থাকে তাহলে নির্ঘণ্ট প্রয়োজন। ব্রিটানিকায় এগ্রিকালচারের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে Agrarian Politics; Reclamation; Farming at Mid-20th century, World agriculture প্রভৃতি অনেক প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। ইনডেক্সে এই প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ না থাকলে পাঠকের পক্ষে তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তাই ব্রিটানিকায় বিস্তৃত ইনডেক্স আছে। ব্রিটানিকার রিলেটিভ ইনডেক্স নির্ঘণ্ট কত ভাল হতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ব্রিটানিকায় ছোট বড় প্রায় চল্লিশ হাজার পৃথক প্রবন্ধ আছে। কিন্তু ইনডেক্সে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির এই বিস্তৃত বিশ্লেষণ ব্রিটানিকার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এডওয়ার্ড বালফুর সংকলিত "দি সাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়ায়" ভারতের উপরে প্রায় দুশ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। ভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে শুধু এই প্রবন্ধটির নির্ঘণ্ট প্রাসঙ্গিক খণ্ডটির শেষে দেওয়া হয়েছে।

কোষগ্রন্থের মূল্য বিচারের সময় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি যাচাই করে দেখতে হয়। (১) নির্ভরযোগ্যতা—সম্পাদক, লেখক, প্রকাশক প্রভৃতির পরিচয় নিতে হবে। কোন পরিকল্পনা অনুসারে সংকলন করা হয়েছে, প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য কত ইত্যাদি ভালো করে দেখা দরকার; (২) পরিবেশিত তথ্য অধুনাতম এবং নির্ভুল কিনা; (৩) প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জী আছে কি না; (৪) বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি কোন্ পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়েছে; (৫) ছবি, ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদি কোন শ্রেণীর।

বিষয়মূলে ঘনিষ্ঠরূপে বিচার করবার জন্য অন্তত তিনটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পড়তে হবে। পাঠক যে বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানেন না সে বিষয়ের উপর একটি প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন যে, বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয়েছে কিনা। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে লেখাটি ভাল। আর একটি পড়তে হবে বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। কোষগ্রন্থে আমরা

নির্ভেজাল তথ্য আশা করি; লেখকের ব্যক্তিগত মতামত এখানে অবান্তর। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়কে বিচার করা যেতে পারে; কিন্তু লেখক কোনো পক্ষে অংশ গ্রহণ না করে নিরপেক্ষ থাকবেন। নিরপেক্ষতা কোষগ্রন্থের একটি প্রধান গুণ।

তৃতীয় প্রবন্ধটি বিশেষ পরিচিত বিষয়ের উপরে হবে। সুতরাং এই প্রবন্ধ পড়ে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন কোথায় কি ভুল ও ত্রুটি আছে।

উপরোক্ত বিচারপদ্ধতি থেকে ধারণা করা যেতে পারে কোষগ্রন্থ সংকলনের জন্য কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে। কোষগ্রন্থের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সম্পাদকের কৃতিত্বের উপর। পরিকল্পনা রচনার ভার এবং তা রূপায়িত করবার দায়িত্ব প্রধানত সম্পাদকের। কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য কোষগ্রন্থ সংকলন করা হচ্ছে, তা তিনি সর্বদা মনে রাখবেন এবং লেখকদের রচনা ভাষা ও ভাবের দিক থেকে যাতে তাদের উপযোগী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদক স্মেলি উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ
"Utility ought to be the principal intention of every publication." কোষগ্রন্থের এই ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্য সার্থক হতে পারে, যদি সম্পাদক পাঠকের চাহিদা অনুধাবনের জন্য সচেতন থাকেন।

কোষগ্রন্থের সম্পাদককে বিশেষজ্ঞ পন্ডিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বরং এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞের পক্ষে সকল বিষয়ের কোষগ্রন্থ সম্পাদনা কঠিন হয়ে পড়ে। যিনি বিশেষজ্ঞ তিনি "knows everything of something;" কিন্তু কোষগ্রন্থের সম্পাদককে জানতে হবে "something of everything." সকল বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা থাকবার ফলে সম্পাদক কোনো লেখা পেলেই বুঝতে পারেন তা উদ্দেশ্য-সাধক হবে কি না; কোথাও ভুল থাকলে তা-ও তাঁর পক্ষে ধরা সহজ নয়। ব্রিটানিকার বর্তমান সম্পাদক ওয়াল্টার জাস্ট-এর বিশেষজ্ঞ পন্ডিত হিসাবে খ্যাতি নেই। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্ম-দক্ষতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ব্রিটানিকাকে ক্রমাগত সাফল্যের পথে নিয়ে চলেছে।

ব্রিটানিকার দপ্তর থেকে বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিতদের রচনা ফেরত দেওয়া হয়েছে; অনেককে নতুনভাবে তাঁদের বক্তব্য লিখে আনতে বলা হয়েছে। সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে এসব সম্ভব হয় না।

কোষগ্রন্থ যাতে নির্ভরযোগ্য হয়, সেজন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রবন্ধ লেখানো হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখানো যে সব সময় নিরাপদ তা নয়। অনেক সময় তাঁরা নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করতে চান। পন্ডিত ব্যক্তিদের একদেশদর্শিতার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ডাঃ জনসন ওট (oat) শব্দের অর্থ লিখেছিলেনঃ ইংলন্ডে ঘোড়ার আর স্কটল্যান্ডে মানুষের খাদ্য। স্কটল্যান্ডের উপর আক্রোশটা তিনি এইভাবে মিটিয়ে-ছিলেন। অথচ সে যুগের কত বড় পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি!

দিদেরো সম্পাদিত আঠাশ খন্ডের ফরাসী কোষগ্রন্থে ভলতেয়ার রুশো প্রভৃতি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাদের নিরপেক্ষ বলা যায় না। ফলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রথম দুই খন্ড ফরাসী সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। ব্রিটানিকার অনেক প্রবন্ধ নিয়ে কাগজে ও সভায় সমিতিতে এককালে প্রবল বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। সম্পাদককে তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো প্রবন্ধে যেন বিতর্কমূলক আলোচনার অবকাশ না থাকে।

ব্রিটানিকার লেখকদের মধ্যে স্কট, হাক্সলি, মিল, মেকলে, সুইনবার্ন, ম্যাথু আর্নল্ড, ট্রটস্কি, বার্নার্ড শ, ফ্রয়েড মেরি কুরি, নিলস্ বোহ্র প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা আছেন। তাঁরা ভিন্ন রুচির বিশেষজ্ঞ হলেও ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির পরিচয় নেই। তার কারণ সম্পাদক প্রথমেই লেখকদের প্রবন্ধ কিভাবে লিখতে হবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশ দিয়ে দেন। একটি নির্দেশ হল প্রসঙ্গটির মোটামুটি পরিচয় যেন প্রথম বাক্যেই দেওয়া হয়। যেমন Ablution কথাটি ধরা যাক। ব্রিটানিকা প্রথম বাক্যে এর অর্থটি বলে দিয়েছেঃ "a ritual washing destined to secure that ceremonial purity

which must not be confused with the physical cleanliness obtained by the use of soap and water. মূলে অর্থটি বলে নেবার পর এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পড়ে অর্থ জানবার জন্য পাঠককে অপেক্ষা করতে হয় না। এমনি করে বিশেষজ্ঞরা সম্পাদকের নির্ধারিত ফরমূলা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করেন বলে ব্রিটানিকার মতো বিরাট গ্রন্থে সামঞ্জস্যহীনতা চোখে পড়ে না। বিশেষজ্ঞরা বিধিনিষেধ স্বীকার করেও যে লেখেন তার কারণ ব্রিটানিকায় লিখতে পারা বিশেষ সম্মানের কথা। ব্রিটানিকা প্রতি শব্দের জন্য দশ নয়া পয়সারও কম পারিশ্রমিক দেয়। ওদেশের তুলনায় এটা লোভনীয় নয়। সুতরাং অর্থের আকর্ষণটা লেখকদের পক্ষে বড় কথা নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৪শ সংস্করণ (১৯২৯) সম্পাদনার সময় ব্রিটানিকার কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে অসহযোগ আন্দোলনের উপর একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। গান্ধীজী তখন জেলে; বোম্বাই সরকার কারাজীবনের তুচ্ছ নিয়মকানুনের মর্যাদাকে বড় করে সে চিঠি লণ্ডনে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

বড় বড় কোষগ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব আজকাল সাংবাদিকদের হাতে। সম্পাদনার পদ্ধতিও অনেকটা পত্রিকা সম্পাদনার রীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। সংবাদপত্রের সহযোগিতা লাভ করে কোষগ্রন্থের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। ব্রিটানিকার নবম সংস্করণের পর আর কোনো সংস্করণ বের হবে কিনা স্থির ছিল না। দুজন ভাগ্যান্বেষী আমেরিকান প্রকাশক লণ্ডন টাইমস্-এর সহযোগিতায় নবম সংস্করণ ব্রিটানিকা সস্তা দামে বিক্রি আরম্ভ করল। টাইমসের প্রচারের ফলে এত অধিকসংখ্যক সেট বিক্রি হল যা কেউ আশা করতে পারেনি। টাইম্স্ পত্রিকার তখন আর্থিক সংকট চলছিল। বিক্রির লাভ থেকে টাইম্স্-এর সংকট দূর হল আর ব্রিটানিকার ভিত্তিও দৃঢ় হল। ব্রিটানিকার পরবর্তী কয়েকটি সংস্করণ প্রকৃতপক্ষে টাইমস্-এর তত্ত্বাবধানেই সম্পাদিত হয়েছে। ব্রিটানিকার সাফল্য দেখে অনেক প্রকাশক কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রেরণা পেয়েছে।

ব্রিটানিকার নবম সংস্করণের পর থেকে কোষগ্রন্থ সম্পাদনায় নীতি হল "democratizing the means of self-education." এই নীতি সফল করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। সেল্ফ-এডুকেশানের কথায় মনে পড়ল অনেক পাঠক সম্পাদককে জানান তিনি ব্রিটানিকা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন। সব সময় যে এ দাবি সত্য হয় না তার প্রমাণ আছে। বার্নার্ড শ' যখন বেকার ছিলেন তখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে বসে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি ছাড়া সমগ্র ব্রিটানিকা পড়েছেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সি এস ফরেস্টার দুটি বিভিন্ন সংস্করণের ব্রিটানিকা সম্পূর্ণ পড়েছেন। এই দাবি দুটি সত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আর একটি কারণে কোষগ্রন্থ সম্পাদনায় সাংবাদিকতার প্রভাব পড়েছে। পূর্বে যতদিন একটি সংস্করণ নিঃশেষ না হত ততদিন পর্যন্ত নতুন সংস্করণ সম্পাদনার কথা কেউ ভাবত না। ১৯২৯ সালে ১৪শ সংস্করণ বের হবার পর ব্রিটানিকার জন্য একটি স্থায়ী সম্পাদনা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্পাদক ও তাঁর সহযোগী ব্যতীত পঁচাত্তর জন উপদেষ্টা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই দপ্তরে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নতুন নতুন তথ্যের খবর আসে। সেই অনুসারে ব্রিটানিকার প্রবন্ধগুলির সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন হয়ে থাকে। নতুন করে লিখে নতুন সংস্করণ বের করবার জন্য অপেক্ষা করে থাকা হয় না। বার্নার্ড শ'র "সোস্যালিজম" প্রবন্ধটি বাতিল করে অন্য কাউকে দিয়ে ঐ বিষয়ের উপরে লেখানো হয় নি। শুধু বিশেষজ্ঞ দিয়ে সময়োপযোগী পরিবর্তন করানো হয়েছে। এইজন্যই ১৪শ সংস্করণের পর ত্রিশ বছরের মধ্যে ব্রিটানিকার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু পরিমার্জিত ও সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ হয়েছে অনেকবার। তাই ব্রিটানিকায় আধুনিকতম তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া গ্রাহকদের সুবিধার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে "ব্রিটানিকা বুক অব দি ইয়ার" নামক একটি বর্ষপঞ্জী বের করা হয়। এক বছরের সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতির খবর এই বর্ষপঞ্জী থেকে পাওয়া যাবে। continuous editing ও বর্ষপঞ্জী প্রকাশের এই পরিকল্পনা সকল প্রধান প্রধান কোষগ্রন্থ গ্রহণ করেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে সংকলিত কোষগ্রন্থ আমাদের দেশে নেই বলা যেতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার্জন জেনারেল এডওয়ার্ড বালফুরের সম্পাদনায় The Cyclopaedia of India and of Eastern & Southern Asia—Commercial, Industrial and scientific প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৫ সালে লণ্ডন থেকে বেরিয়েছিল তিন খণ্ডে। সম্পাদনার দিক থেকে ভারতবর্ষ-

সম্বন্ধে এটি বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ; যদিও এতে ভুল আছে, এবং য়ুরোপীয়ান পাঠকের জন্য রচিত বলে ভারতীয়দের নিকট বিশেষ সমাদৃত হয় নি। ১৯০৭ সালে কলকাতা থেকে দু'খণ্ডে বেরিয়েছিল আর একটি "সাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়া"; ১৯২৪-২৫ সালে মাদ্রাজ থেকে লক্ষ্মী-নারাশিয়া সংকলন করেছিলেন এনসাইক্লোপিডিয়া অব বেঙ্গল, বিহার এ্যাণ্ড ওরিষ্যা। তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এনসাইক্লোপিডিয়াও সংকলন করেছিলেন। কিন্তু এই কোষগ্রন্থগুলির নাম যা-ই হোক, আসলে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি।

রেভারেণ্ড কে এম বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বিদ্যাকল্পদ্রুম (১৮৪৬-১৮৫১) প্রকৃতপক্ষে কোষগ্রন্থের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। বিশ্বকোষ একালের পাঠকের দাবি মেটাতে অক্ষম। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে বিশ্বকোষই আমাদের প্রধান সহায়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান-ভারতী একটি সর্বদা ব্যবহারোপযোগী ছোট কোষগ্রন্থ রচনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। দুর্ভাগ্যক্রমে এর প্রকাশ অসম্পূর্ণ।

আমাদের বিশ্বকোষ বের হল; হিন্দী অনুবাদ হল। এই গর্ব নিয়েই আমরা এত-দিন ছিলাম। অন্যান্য ভাষায় কোষগ্রন্থ সংকলনের উদ্দীপনা লক্ষ্যনীয়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তামিল কোষগ্রন্থের কথা। ১৯৫৪ সাল থেকে এপর্যন্ত ছয় খণ্ড বেরিয়েছে। ১৯৬২ সালের মধ্যে আরো চার খণ্ড বেরিয়ে বই সম্পূর্ণ হবে। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার; ব্রিটানিকার মতো দেখতে। সম্পূর্ণ সেটের দাম ২৫০, টাকা। তেলেগু ভাষায় একটি সাত খণ্ডের ও একটি দুই খণ্ডের কোষগ্রন্থ আছে। এখন নতুন দুটি কোষগ্রন্থ ক্রমশ বের হচ্ছে। একটি হবে ছয় খণ্ডে, অন্যটি বারো খণ্ডে। বারো খণ্ডের কোষগ্রন্থটির দুখণ্ড বেরিয়েছে। এটির বিন্যাস বিষয়ানুসারে। তেইশ খণ্ডের মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ বেরিয়েছিল ১৯২০ সালে। তারপরে ছয় খণ্ড ও পাঁচ খণ্ডে আরো দুটি মারাঠী কোষগ্রন্থ বেরিয়েছে। প্রথমটি সম্পূর্ণ হয়েছে ১৯৫১ সালে। পাঁচ খণ্ডের প্রস্তাবিত কানাড়ী কোষগ্রন্থের প্রথম খণ্ড এ-বছর বেরিয়েছে। আমাদের শিশু-ভারতীর মতো কানাড়ী ভাষায় কিশোর কোষগ্রন্থ 'বালপ্রপঞ্চ' আছে। মালয়ালাম ভাষার কোষগ্রন্থ 'বিজ্ঞানম্'-এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। এটি ছয়খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। কেরল সরকার মালয়ালাম ভাষায় দশ খণ্ডে একটি কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার উদ্যোগে দশ খণ্ডে হিন্দী কোষগ্রন্থ রচনার আয়োজন আরম্ভ হয়েছে।

তালিকা সম্পূর্ণ করবার প্রয়োজন নেই। কোষগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন হয়েছি উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকেই তা উপলব্ধি করা যেতে পারে। ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের জন্য আমাদের দেশে ছোট কোষগ্রন্থের প্রয়োজন বেশী। অথচ বড় কোষগ্রন্থ না থাকলে ছোট কোষ-গ্রন্থ সংকলন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বড় কোষগ্রন্থগুলির সহায়তায় ছোট কোষগ্রন্থ সংকলন করা সহজ একখণ্ডের একটি কোষগ্রন্থে অধিকাংশ প্রসঙ্গের জন্যই এক প্যারাগ্রাফের বেশী স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে এত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখিয়ে লাভ নেই, অথচ ব্যয় বেশী পড়ে। লাভ নেই এই জন্য যে লেখক তাঁর বিশেষ জ্ঞান এত স্বল্পপরিসরে পরিবেশন করতে পারেন না। ছোট কোষগ্রন্থ সংকলনের জন্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে না পেলেও চলে। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত লেখাগুলি দেখে অনু-মোদন করে দিলেই হয়।

কোনো কোনো প্রবীণ ব্যক্তি প্রস্তাব করেছেন, বাংলা কোষগ্রন্থ থেকে শেক্সপীয়র, মিলটন প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ এসব বিষয়ে খবর পাবার মতো বইয়ের অভাব নেই। বাদ দিলে বাংলা কোষগ্রন্থের আয়তন কমবে, সুতরাং দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা করা যেতে পারবে। এ প্রস্তাব যাঁরা করেছেন তাঁরা কোষগ্রন্থের মূলে উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য এক সঙ্গে হাতের কাছে পাওয়া যায় বলেই কোষগ্রন্থের মূল্য। না হলে, প্রত্যেক বিষয়ের উপরেই তো পৃথক বই আছে। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে জানতে হলে অন্য বই যা দেখব তা তো ইংরেজী! কিন্তু বাংলা কোষগ্রন্থই বাঙালী পাঠকের জন্য। ইংরেজীর দিন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। ছাত্র ও সাধারণ পাঠক যদি ইংরেজী বই বা কোষগ্রন্থের মর্মার্থ উপলব্ধি না করতে পারে! তাছাড়া একাধিক কোষগ্রন্থ কেনার সংগতিই বা ক'জনের আছে!

ভারতীয় ভাষার কোষগ্রন্থের একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বহির্বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংবাদ সাধারণ পাঠকের নিকট সহজলভ্য করে দেওয়া। যারা ইংরেজী বই থেকে বিশ্বের পরিচয় গ্রহণ করতে পারে না তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। দেশের মধ্যে ইংরেজী জানা ও ইংরেজী না-জানা দুটি দলের সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয় জীবনে একটা মারাত্মক বিভেদ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সম্পদ আহরণ করে ইংরেজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সমাজের উঁচু স্তরে স্থান লাভ করেছে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে তা সকলের নিকট উপস্থিত করে দিতে না পারলে জাতির মধ্যে এই অন্তর্বিরোধ ঘুচবে না। এই সম্পর্কে কোষগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সুতরাং বাদ দেবার কথা উঠতে পারে না, বরং অ-ভারতীয় প্রসঙ্গ যতগুলি সম্ভব অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ব্রিটানিকার প্রবন্ধগুলি ছাপা হবার পূর্বে প্রায় ৫০০ ধাপের মধ্য দিয়ে আসে। তবু ব্রিটানিকা একেবারে নির্ভুল নয়। সুতরাং আমাদের দেশে যত সতর্ক হয়েই সম্পাদনা করা হোক না কেন, একবারের চেষ্টায় নির্ভুল ও উন্নতমানের কোষগ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় না। এখানে একটি কোষগ্রন্থ একবার প্রকাশিত হয়েই মারা যায়। এর ফলে অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে। এই জন্যই কোষগ্রন্থের ঐতিহ্য এখনো সৃষ্টি হয় নি।

যাঁরা কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা রচনা করেন তাঁদের একটি সংস্করণের কথা ভাবলেই চলবে না। বিভিন্ন ভাষার অন্তত একটি কোষগ্রন্থের ব্রিটানিকার মতো continuous editing-এর পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। তাহলে একটি কোষগ্রন্থ কেন্দ্র করে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ক্রমাগত সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা কোষ-গ্রন্থটি নির্ভুল ও পাঠকদের আস্থাভাজন হতে পারবে।

একাজের জন্য টাকা প্রয়োজন। এতদিন কোষগ্রন্থের কাজ প্রধানত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হয়েছে। তাই অসম্পূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে প্রায় সবগুলি কোষগ্রন্থই হারিয়ে গেছে। নতুন পদ্ধতিতে সম্পাদনার ব্যবস্থা না করলে এখন যেগুলি সংকলন করা হচ্ছে তাদের ভাগ্যও হবে অনুরূপ। কোষগ্রন্থ সংকলনের জন্য আর্থিক সাহায্য পেলে অবশ্যই ভালো হয়। কিন্তু আর্থিক সহায়তা অনেক সময় কোষগ্রন্থের ব্যবসায়িক ভিত্তি দুর্বল করে। অর্থাৎ, একজন প্রকাশক লাভের উদ্দেশ্যে যে নিয়মে বই প্রকাশ করে আর্থিক সাহায্য পেলে প্রায়ই তা হয় না। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রবন্ধ লিখতে পারেন, ছাপা-বাঁধাই চমৎকার হতে পারে; কিন্তু বইয়ের বাজারে নিজের গুণে স্থান করে নিতে না পারলে সব কোষ-গ্রন্থই স্বল্পায়ু হতে বাধ্য।

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

১৬

১৯২৮ সালে যখন আমি আমার সাহিত্যিক-সাঙ্গীতিক জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগ শিক্ষা নিতে পণ্ডিচেরীতে যাই ও সেখানে আট বৎসর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করি, তখন সত্যেন কথাটি কয়নি। এইজন্যেই যে বৈরাগ্য সাধনে আমার মুক্তি-খোঁজায় ওর মন সায় দেয়নি। কিন্তু তাবলে ও আমার পিছনে আমার নিন্দা করেনি—বরং আমার অন্য অনেক বিরূপ বন্ধুরা আমার কঠোর সমালোচনা করলে তাঁদের নিরস্তই করতে চাইত। বন্ধুর প্রতি লয়ালটিতে ও বিশ্বাস করত—যে-গুণটি আমাদের দেশে বিরলই বলব।

অতঃপর যখন গুরুদেবের দেহান্তের পরে বিশ্বভ্রমণ সেরে পুনায় হরিকৃষ্ণ মন্দির স্থাপনা করে এক নতুন জীবনের পত্তন করি, তখন মাঝে মাঝে ওকে বড় বড় চিঠি লিখতাম নানা আশাভঙ্গের খবর দিয়ে—আর লিখতাম এমন অনেক কথা, যা আর কোনো বন্ধুকেই লিখি নি। ওকে লিখবার তাগিদ পেতাম শুধু ওর স্নেহশীলতার 'পরে আমার আস্থা ছিল বলেই নয়- এজন্যেও বটে যে, ও বরাবরই ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝত—কাউকেই চড়াও হয়ে উপদেশ দিত না বা বিচার করতে ছুটত না। ফলে ত্রিশ বৎসর পরে আমাদের মধ্যে যেন এক নতুন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এর পরে আমি দু-একবার কলকাতা গিয়েও ওকে বলি পণ্ডিচেরী আশ্রমের নানা কাহিনী ও ধর্ম সম্বন্ধে আমার নানা নবলব্ধ অভিজ্ঞতা উপলব্ধি জল্পনা-কল্পনা। উত্তরে ও আমাকে থেকে থেকে ওর নানা মত ও মন্তব্য জানিয়ে চিঠি লিখত। সে-সব চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত সুরের মধ্য দিয়েও প্রায়ই ফুটে উঠত ওর উদার মনের নানা ভাবধারার ছবি।* তাই সে-সব চিঠির কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। (আমার অনেক প্রশ্ন বা খেদ ওর উত্তর থেকেই আন্দাজ করা যাবে।)

একটি পত্রে ও আমাকে লেখে (১০।৬।১৯৫২)ঃ

"ভাই দিলীপ, তোমার চিঠি এসেছে।...... তোমার 'শ্রীচৈতন্য' নাটকটি খুব উপভোগ করেছি।......তোমার কাছ থেকে যাই পাই, আমার খুব আদরের।"...

"তোমার সঙ্গে পরিচয় তো আমার আজকের নয়, কবে থেকে যে শুরু হয়েছে ভাবতে গেলে মনের মধ্যে আবছায়া হয়ে আসে। এতদিনের অন্তরঙ্গতার মধ্যে আর ভুল বোঝার অবকাশ কোথায় বলো? তাছাড়া সারাজীবন তুমি যে-পথে যে-সত্যের সন্ধান করে বেড়াচ্ছ, আমার কাছে তা অজানা হলেও তোমার সত্যসন্ধিৎসু মনকে তো আমি অবজ্ঞা করতে পারি না।

"মানুষের মনের সব দরজার খবর কি সকলে পায়? ......যে-পথে তোমার মনের মধ্যে সঙ্গীতের সুরসুন্দরীরা আসা-যাওয়া করেন, তা তো আমার কাছে চিরকাল গোপন রহস্যই রয়ে গেল।

"ঐকান্তিক সাধনার প্রসাদে তুমি যে সিদ্ধির পথে এগবে, এ আমি বিশ্বাস করি। এদেশের বাতাসে ও ধূলিকণায় মিশে আছে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির স্মৃতি। মরমী খবর সব সময়েই এদেশের মনকে অদ্ভুতভাবে দোলা দেয়। অবশ্য সকলে তো অধিকারী নয় ভাই, তাই অনেক ক্ষেত্রেই দোলন হয় ক্ষণস্থায়ী।

"কেবল একটা কথা মনে হয়—যা স্পষ্ট, তা আজ নির্লজ্জভাবেই প্রকট হয়েছে সারা পৃথিবীতে। এর উত্তাপে বাংলা দেশের ভাগীরথীর মত তার গোপন প্রাণশক্তির উৎস আজ অন্তর্হিত হতে বসেছে—নববিধানের তাণ্ডবে কি জীবন-দেবতার ধ্যানভঙ্গ হবে না?

"এদিকে জীবন তো শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে, নৈরাশ্যে ভরে গিয়েছে মন, অথচ হার স্বীকার করার সাহসও খুঁজে পাচ্ছি না। এমনি সময়ে হঠাৎ তোমার চিঠি অজানা রাজ্যের সুগন্ধ নিয়ে এল। তোমার অভিজ্ঞতা তাই দুর্বোধ্য ঠেকলেও হয়ত তার মধ্যেই খুঁজে পাব আশার বাণী—কে জানে?

"তুমি জন্মদিনে কলকাতায় আসবে আশা ছিল অনেকেরই। মুখে যা বলা যায়, কলমের মুখে প্রকাশ করা শক্ত হয় অনেক সময়েই। তাই দেখা হলে হয়ত মনের আদানপ্রদান হত বেশি। আশা করি, আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে কলকাতায় নামবে। তোমার চিঠির আশা করে রইলাম। ইতি—সত্যেন।"

আর-একটি চিঠি (২৬শে জুন, ১৯৫২)

"ভাই দিলীপ,

যেসব অপূর্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছ, আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা।... তোমার অন্তরের যে-খবর স্নেহবশে আমাকে পাঠিয়েছ, পেয়ে আমার মন অপূর্ব ভাবরসে ভরে উঠেছে—সুবুদ্ধির নিকট তা যাচাই করা চলে না।

"তোমার পথের শেষ কোথায় জানি না,

তবে মাঝে রাস্তার এই সব অনুভূতির রাস্তা ছাড়িয়ে হয়ত তোমাকে আরো অনেকদূরে এগিয়ে যেতে হবে। অপ্রত্যাশিত বিভূতির আকর্ষণে জড়িয়ে পড়লে হয়ত অনেকটাই বাকি থেকে যাবে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে। উপনিষদের নির্দেশ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' হয়ত এর বেলাতেই প্রযোজ্য।

"তুমি আমেরিকা যাবে শুনে আহ্লাদ হচ্ছে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হবে তোমার। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। জড়-প্রকৃতির উপর মানুষ সার্বভৌম হয়েছে, তবু সে আজো সুখী হয়নি—বরং হিংসার গরলে প্রায় সমস্ত মানব-সভ্যতাই বিনষ্ট হতে চলেছে। আমেরিকার জনমত কি—কে জানে? অর্থ যে অনেক সময়েই অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়, একথা এই পরিবেশে প্রযোজ্য বলেই মনে হচ্ছে।

"ফিরবার পথে যদি কলকাতায় আসো তো আনন্দ হবে অপূর্ব—তোমার ডায়ারির পাতা দুই বন্ধুতে উল্টে-পাল্টে পড়ব। ...ইতি—স্নেহমুগ্ধ সত্যেন।"

(এই লোক নিজেকে নাস্তিক বলে সবার কাছে দাখিল করতে চাইত!)

ওর এর পরের পত্রটির ভূমিকা হিসেবে কিছু বলতে হবে।

আমেরিকা থেকে ফিরে কলকাতা গিয়ে একদিন সকালে ইন্দিরাকে নিয়ে আমি যাই সত্যেনের বালীগঞ্জের বাসায়। গিয়ে বসতে না বসতে আমার মামাতো ভাই বিখ্যাত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার এসে হাজির। আমাকে দেখে নামমাত্র প্রণাম করে ও সত্যেনের দিকে ফিরে ওর টেবিলে হাজার দেড়েক টাকা রেখে বলল: "তোমার চীন যাবার টাকা জোগাড় করেছি সত্যেনদা, আর তোমার নিস্তার নেই—যেতেই হবে তোমাকে।"

সত্যেন (অবাক হয়ে): সেকী রে? চীন! বলিস কী?

জ্ঞানেন্দ্র: বাঃ! তুমি যে বললে সেদিন যাবে?

সত্যেন: যাব কখন বললাম? বলেছিলাম যেতে পারি।

জ্ঞানেন্দ্র: তাই সই, এখন যাও—যখন কথা দিয়েছ।

সত্যেন (একগাল হেসে): বাঃ, যেতে পারি বলার মানে কথা দেওয়া? এ কি তোর ডাক্তারি অভিধানের ভাষা নাকি?

জ্ঞানেন্দ্র (সানুনয়ে): অমত কোরো না সত্যেনদা, যাও ভাই, লক্ষ্মীটি!

সত্যেন: না ভাই, এখন যাওয়া অসম্ভব অনেক সাংসারিক কারণ আছে। তাছাড়া আমাকে ওখানে পাঠাতে চাচ্ছিস কেন বল্ দেখি?

জ্ঞানেন্দ্র: আহা, গিয়ে একবার তুমি দেখেই এস না ভাই!

সত্যেন: কী দেখে আসব শুনি?

জ্ঞানেন্দ্র: ওরা কী করছে ভিতরে ভিতরে।

সত্যেন: মাত্র এক হপ্তায় তার হদিশ পাব কী করে? না শোন্ জ্ঞেন্, আজকাল যাঁরা সাত দিনের জন্যে বিদেশে গিয়ে সেখানকার বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরে এসেই লেকচার দিতে শুরু করেন, তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ নেই আমার। ওদের ভাষা জানি না, মেজাজ জানি না, কিছুই জানি না—গিয়ে কী দেখে আসব মাথামুণ্ডু? দু-চারটে সভায় এর ওর তার সঙ্গে দেখা হবে এই তো! ওতে করে কি একটা দেশের হালচাল জানা যায়?

জ্ঞানেন্দ্র (মরীয়া হয়ে): তোমায় দেখলে ওদেরও তো কিছু লাভ হতে পারে তোমার প্রভাবে?

সত্যেন (হো-হো করে হেসে): ওরে ভাই, নিজের আত্মীয়স্বজনের নিকট বন্ধুদেরই বা কতটুকু লাভ হয়েছে আমার প্রভাবে বলতে পারিস?

জ্ঞানেন্দ্র (ক্ষুণ্ণ): তবে যাবে বললে কেন? আমি পাথেয় জোগাড় করে আনলাম—

সত্যেন (সস্নেহে তার পিঠে চাপড় মেরে): আর কাউকে পাঠা ভাই যে দেখতে না দেখতে বক্তা হয়ে ফিরবে। রাগ করিস নে, লক্ষ্মীটি। তাছাড়া বললামই তো এক্ষুনি যে আমি যাব বলিনি একবারো—বলেছিলাম: যেতে পারি। এখন দেখছি যে, যেতে পারি নে।

রিপোর্টটুকুতে বিশেষ ভুল থাকবার কথা নয়, কারণ কথাগুলি ছিল সাদামাটা তার উপর কৌতুকজনক—আর কে না জানে কৌতুককর কথা সহজে ভোলা যায় না? ইন্দিরা তো সত্যেনের কথা শুনে হেসেই খুন। সত্যেন শুধু হাসতেই নয় হাসাতেও পারত—বরাবরই।

কিন্তু সত্যেন হাসির মধ্যে দিয়ে যা বলেছিল, তার মধ্যে কান্নারও যে অনেক কিছুই ছিল, তা ইন্দিরার চোখ এড়ায় নি। তাই বাড়ি ফিরতেই বলল সোচ্ছ্বাসে: "জানো দাদা, আমি সময়ে সময়ে এর ওর তার কাছে এলে তাদের মধ্যেকার একটা স্পন্দন অনুভব করি? না—শুধু টেলিপ্যাথিই নয়,—মানে শুধু তাদের মনের চিন্তার খবর পাওয়া নয়—এ-স্পন্দন যখন পাই তাদের মধ্যে, অনেক কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাই—যেমন দেখতে পাই নিজের মধ্যে। সত্যেনদার প্রতি কথার মধ্যেই পেলাম সেই স্পন্দন, আর কিসের স্পন্দন জানো? একটা মস্ত মানুষের—Great man যাকে বলে। এক কৃষ্ণপ্রেম ও নেতাজী ছাড়া আর কোনো মানুষের সংস্পর্শে এ-স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিনি। আর দেখলুম [illegible]: দেখলাম—মনে-প্রাণে সত্যনিষ্ঠ—বিরল

আধার।" (ইন্দিরা কথাগুলি বলেছিল ইংরেজীতে)।

এখানে একটু থেমে ভাষ্য করতে হবেঃ ইন্দিরা পাণ্ডিচেরী এসে আমার কাছে কৃষ্ণমন্ত্র নিতে না নিতে ওর মধ্যে নানা শক্তির স্ফুরণ হয়, যথা টেলিপ্যাথি, দূরদর্শন, আসন্ন ঘটনার খবর পাওয়া...... ইত্যাদি। এত অস্বস্তি বোধ করত যে, আমি ওর অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দকে এক দীর্ঘ পত্র লিখি। তাতে গুরুদেবকে জানাই যে, ইন্দিরা এসব বিভূতি আদৌ চায় না, চায় শুধু ভক্তি, তাই ও চায় এসব দর্শনাদির উপদ্রব থেকে মুক্তি পেতে—গুরুদেব এ বিষয়ে ওকে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন কি?

উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন (১৪-৩-১৯৪৯)ঃ

"Dilip, such powers need not be a source of trouble, they can even be helpful to a degree; for these may well give one who has acquired mastery over her own nature the knowledge of the thoughts and feelings around her and she can then help guide and change what has to be changed in their minds so that they can become more effective for the divine work."

শ্রীঅরবিন্দের এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হয়েছিল আমাদের পুনায় আসার পরে—যখন ইন্দিরার কয়েকটি শিষ্য ও শিষ্যা লাভ হয়। তখন ও প্রায়ই দেখতে পেত কার ভিতরে কখন কোন্ শক্তির খেলা চলছে—ও সেই অনুসারে তাদের জিনিস দিত সাধনার ও কর্তব্যের—কিন্তু সে অন্য কথা।

সত্যেনের ভিতরটা ওর অন্তর্নেত্রের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল কেন আমি জানি, কিন্তু সে নিয়ে গবেষণা স্মৃতিচারণে অবান্তর হবে বলে এখানে শুধু বলতে চাই যে, আমি বহুবারই দেখেছি যে, ইন্দিরার এই সব অতীন্দ্রিয় দর্শন ও উপলব্ধি কক্ষনো ভুল হত না—বিশেষ করে কে কেমন মানুষ সে সম্বন্ধে।

এসব চিন্তা ও ইচ্ছা করলেই যে জানতে পারত তা নয়। বলত প্রায়ই খোলাখুলি যে, এসব দর্শন করা আপনা থেকেই প্রকট হত একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। একটা মাত্র উদাহরণ দেই—সত্যেনেরই সম্পর্কে। সত্যেন যখন আমাকে প্রথম লেখে যে, শান্তিনিকেতনের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হয়েছে, তখন ইন্দিরা ওর চিঠিটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে একটু চোখ বুজে থেকে বলেছিল, "সত্যেনদা শান্তিনিকেতনে না গেলেই ভালো করতেন—অনেক দুঃখ পাবেন সেখানে।" ওর কথা যে অক্ষরে-অক্ষরে ফলেছিল—সবাই জানেন। যাক, যা বলছিলাম।

সত্যেনকে আমি পুনায় ফিরে ইন্দিরার এই জাতীয় নানা অভিজ্ঞতা উপলব্ধির কিছু তথ্য (data) পাঠাই—ওর ঠিকানা বদল হয়েছে হয়ত ভেবে সে-চিঠি পাঠাই নীরেনের কাছে। উত্তরে সত্যেন আমাকে লেখে (২৮-৩-১৯৫৫)ঃ

"ভাই দিলীপ, নীরেনের কাছে যে-চিঠি লিখেছ পড়েছি। তোমার সুন্দর ফটোটিও পৌঁছেছে। পুনায় নতুন পরিবেশের মধ্যে তুমি কেমন দিন কাটাচ্ছ দেখতে ইচ্ছে করে খুব। তবে সুবিধা হয় না নানা কারণে, সংসার তো টেনে চলেছি, তার ঝঞ্ঝাট অনেক। কাজেই যা চাওয়া যায় তা সব সময় হাতের মধ্যে এসে পৌঁছয় না। তবে এবার হয়ত গ্রীষ্মের ছুটিতে একটা সুযোগ মিলতে পারে। মে-জুন মাসে তুমি কোথায় থাকবে?

"মধ্যে মধ্যে মনে হয়, এ জীবনটা এলোমেলো খোঁজাখুঁজিতেই কাটলো—নানাভাবে ঠেকে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু, তাই মনে হয়, এই জ্ঞানের উদয় অল্প বয়সে হলে হয়ত অন্যরকম হতো জীবনের গতি, ও অকিঞ্চিৎকর হলেও হয়ত শাশ্বতের ভাণ্ডারে মনোমত নিজের সঞ্চয় জমা দেওয়া যেত কিছু। তবে দেশ-কাল অতিক্রম করা বড় শক্ত, এইটেই জীবনের বহু নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা।

"তোমার বহু বৎসরের সাধনার কিছু ফল পেয়েছ জেনে ভারি আনন্দ হচ্ছে। তোমার সান্নিধ্য ও সাহায্য পাবার সুযোগ জীবনের একটা মস্ত দান বলে মনে করি। যৌবনে এক সময়ে কতদিন একত্রে কেটেছে, বন্ধুরা মিলে কতনা কুতর্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছি রহস্যের গ্রন্থিভেদের চেষ্টায়। তোমার পথে তুমি চলেছ, ত্যাগ করতে পারো তুমি আদর্শের আকর্ষণে—কাজেই ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। তবু যে-স্নেহস্নিগ্ধ বন্ধুত্বের সংস্পর্শ মিলেছিল, তাতেই এখনো মন ভিজে ও ভরে আছে।

"বিচারশক্তি খাটিয়ে বন্ধুকে কেউ বিচার করে না, কারণ জীবনের হেঁয়ালির সদুত্তর নেই। যেভাবে চলেছ, কালস্রোতে তোমার পুঁজি উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছ, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন ঐশী ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা, কে জানে? কাজেই যখন সময়ে সময়ে শুনতাম, তোমার কোনো কোনো বন্ধুর নির্দয় অবিচারের জন্য তুমি কষ্ট পাও, তখন দুঃখ পেতাম। আমরা তো কেউই গুরুদেবের মত নিত্যশুদ্ধ নই, কাজেই সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণ ছুঁড়তে আমার ইচ্ছা হয় না।

"ভালো মন্দর অতীতে যা আছে, প্রত্যেক জীবের যন্ত্রণার মধ্যে যে লীলার প্রকাশ, তার অনুভূতি তোমার এসেছে বলে আমার মনে হয়, কাজেই সাময়িকভাবে নানা লোক যে তোমাকে ভুল বুঝতে পারে, তাতে আশা করি, তোমার মনে আর কষ্টের রেখাপাত হয় না।

"ইন্দিরা দেবীকে আমার সবহুমান সম্ভাষণ জানিও, আমার প্রতি তাঁর যে মনোভাব, তার যোগ্য হয়ত আমি নই, কারণ নিজের মনের অগোচরে তো পাপ নেই—তবু জীবনে যে সত্যকেই আদর্শ করেছি সেটা ঠিকই। কাজেই চ্যুতি হলেও বলতে হয়ঃ 'অনেক সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য হয়নি'। তোমাকে অনেক বাজে কথা লিখলাম। আশা করি, কুশলে আছ। তোমার সাধনা উত্তরোত্তর জয়যুক্ত হউক, এই আন্তরিক প্রার্থনা করে এইখানেই শেষ করছি। ইতি—তোমার একান্ত স্নেহাধীন সত্যেন।"

এর পরে ওকে আমি আমার নিজের সাধনার অন্দরমহলের কথা কিছু লিখেছিলাম—তার গোড়াকার কথা ছিল এই যে,

খৃষ্টদেবের কথা যে সত্য—(যে চাইলে পাওয়া যায়—who seeketh findeth) একথা আমি পুনার মন্দিরে, বিশেষ করে ইন্দিরার মাধ্যমে অতিপ্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি—যার ফলে মনে নিটোল হয়ে উঠেছে স্থায়ী শান্তি ও ঠাকুরের অজস্র কৃপার জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা। একথা লিখে মনে একটু কুণ্ঠা হয়েছিল, যদিও আমি জানতাম—সত্যেন বিচারপ্রবণ হলেও অশ্রদ্ধাপ্রবণ নয় যে, আমার এজাহার অবিশ্বাস করে গড়পড়তা বৈজ্ঞানিকের মত সরাসরি রায় দেবে যে, এসবই মনের ভুল বা জনশ্রুতির 'পরে অন্ধ আস্থা মাত্র। আমার অকপট আত্মকাহিনী কথনের উত্তরে ও শান্তিনিকেতন থেকে যে-চিঠি লেখে, তাতে আশ্বস্ত হই, নতুন করে প্রমাণ পেয়ে যে সত্যেন স্বভাবে ঠিক বিশ্বাসী না হলেও দুরন্ত সংশয়ীও নয়। ও লেখে (২-৪-১৯৫৮)ঃ

"সৃষ্টির রহস্য তো আমরা কেউই ভেদ করতে পারি নি ভাই। তাছাড়া সাধকের সাধনার ধন কিভাবে তার কাছে পৌঁছায়—ক'জন মানুষই বা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে বলো? তোমার উপলব্ধি অনুভূতির নানা ছবি তাই একান্ত প্রিয় ঠেকছে আমার কাছে। আরও ভালো লাগছে ভাবতে যে, এখনও তুমি আমাকে তোমার মনের কথা এত খোলাখুলি জানিয়ে বড় বড় চিঠি লেখো।

"অবশ্য আমার এ-ভালো লাগার মধ্যে অনেকখানি অহমিকা মিশিয়ে আছে, কাজেই তোমাকে আমার উচ্ছ্বাস জানিয়ে আর বিব্রত করব না। তুমি হয়ত যে-পথে এগিয়ে চলেছ সেখানে সব কিছুর সত্য স্বরূপ এমনি আপনা আপনিই চোখে ভেসে ওঠে কথার অপেক্ষা না রেখে।......খুব ইচ্ছে হয় পুনায় গিয়ে তোমাদের আশ্রমে দু-চারদিন কাটিয়ে আসি.....আজ কলকাতা যাচ্ছি, নীরেনের সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা হবে ও সেও হয়ত তোমার চিঠি প'ড়ে শোনাবে। ইন্দিরা দেবীকে আমার সবহুমান শ্রদ্ধা নিবেদন করো। তোমার বন্ধু স্যার পল ডিউক্স্ যদি শান্তিনিকেতনে আসেন তো আমরা সাদরেই অভ্যর্থনা করব। ইতি। স্নেহার্থী সত্যেন।"

উৎসাহ পেয়ে আমি ওকে আর একটি চিঠিতে লিখি ইন্দিরার কয়েকটি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সম্বন্ধে বহু দর্শকের সামনেই। এর মধ্যে একটি হ'ল ওর মনে থেকে থেকে একটা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি মতন জেগে ওঠে যার ফলে ও স্পষ্ট দেখতে পায় অমুকের ভাগ্যে কী ঘটবে অদূর ভবিষ্যতে। (যথা আমাদের এক বন্ধুর অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়ে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি খুশী হ'য়ে বললেন—"সেরে উঠেছি এবার।" ইন্দিরা বেরিয়ে এসেই বলল ক্লিষ্ট কণ্ঠেঃ "দু'চারদিনের মধ্যেই ফের পড়বেন—আহা বেচারি!" কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এল বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে।) সত্যেনকে লিখেছিলাম যে ইন্দিরা ওর শান্তিনিকেতনে কাজ নেওয়ার জন্যে দুঃখিত, প্রায়ই বলেঃ "সত্যেনদা খুবই ঘা খাবেন।" উত্তরে ও লেখে শান্তিনিকেতন থেকে (১৩-৪-৫৮)।

"মেয়েদের হয়ত একটা তৃতীয় নেত্র আছে, কাজেই অনেক সময়ে তাঁরা যা যা ধরতে পারেন আমাদের মতন মানুষের সহজ বুদ্ধিতে আসে না। কেউ কেউ আমার শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হ'য়ে আসায় খুশী হন নি। যাহোক এখানে কিছু একটা গড়ে তোলবার চেষ্টাতেই আপাতত মেতে আছি। অবশ্য সবই তাঁর ইচ্ছা—এই মনোভাব অনেক ঠেকে সকলেরই সমঝাতে হচ্ছে এ-দেশে। আমার পক্ষে তার ব্যতিক্রম নেই।

"নিজেকে খুঁজে পেয়েছ, তাই শান্তিও তোমার করায়ত্ত হয়েছে। বরাবরই খুঁজেছ নানা ভাবে। অনেক কথাই মনে পড়ছে আজ। আমার অবিশ্বাসী বস্তু-তান্ত্রিকতায় তুমি যে একদা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চোখের জল ফেলেছিলে সে-কথাও আবছা আবছা মনে পড়ছে। এতদিনে যে তোমার সকল খোঁজ সফল হয়েছে তাইতেই আমার আনন্দ। বিজ্ঞানীর চোখে জগতটা চিরকালই বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে—কৌতূহলকে চিরঞ্জীবী রাখাই তার পরম কাম্য। এ-মনোভাবকে আশা করি তুমি নিছক পাষণ্ডীপনা ভাববে না।

"তোমার আমার কিম্বা বহুসহস্র সাধকের হয়ত এমন অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে যাদের প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবু বহু লক্ষ বহু কোটি জীবের মধ্যে দিয়ে যে-প্রকাশ চলেছে তার মধ্যেই সে যুক্তি ও ন্যায়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করছে। বুদ্ধির উন্মেষ ও তার প্রভাব—যা আজ চারদিকে ছড়িয়ে আছে—তার মধ্যেও তোমার কাছে সেই অন্তর্যামীর ইচ্ছা প্রকট হচ্ছে মনে হয় কি? অবশ্য যার কক্ষ মিলেছে তার আর তর্কের প্রয়োজন কি? সে সে-নিধি পেয়েছে সকলকে বিতরণ করতেই চাইবে—তার মধ্যেই তো তার সার্থকতা। অন্যসকলের পক্ষে হয়ত "কথাই গেল এ-জীবন"—জনার্দনের এ-পক্ষপাতের জন্য কেইবা তাঁর জবাবদিহি চাইবে? ইন্দিরাকে কোনো এবার সুযোগ পেলেই ছুটে যাবো—এবার মনে মনে একটা মতলব এঁটেছি—ছোট মেয়ের পরীক্ষা শেষ হ'লেই একটা সুযোগ হবে পুনা যাবার।

তোমাকে যে ক'টি পাতা ফেরত দেবার কথা এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। নীরেন এইখানে নেই।—আমার ঘরে কাগজের বোঝা বেড়েই চলেছে, তার তলায় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আমরা গরমে ত্রাহি ডাক ছাড়ছি। জানলা-দরজায় খস্‌খস্‌ টাঙিয়ে সকাল থেকে জল দিয়ে ভিজাচ্ছি। পুনা বোধহয় এই সময়ে খুব মনোরম হবে। বরষা সেখানে খুব সকালেই নামে শুনেছি।

মধ্যে মধ্যে চিঠি পেলে বেশ ভাল লাগে। নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী হ'য়ে দাঁড়ায়।

ভালবাসা জেনো। ইন্দিরাদিদিকেও ভাগ দিও। ইতি—

সত্যেন

এর পরে খবর পাই শান্তিনিকেতনে কয়েকজন লোক সত্যেনের বিরুদ্ধে দলাদলি করে ওকে অপদস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ব্যথিত হয়ে ওকে আমি লিখি যে যারা ওর মহত্ত্ব ও ঔদার্যের কদর্থ করে তাদের জন্যেই দুঃখ হয়, আর মনে পড়ে বিবেকানন্দের কথাঃ যে আমরা অত্যন্ত বেশি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়েছি বলেই ভগবানের করুণা আর আমাদের অন্তরে পৌঁছোবার পথ পায় না। লিখে শেষে ওকে অনুরোধ করি পুনায় এসে একটু জিরুতে। লিখি—বহু ভক্ত ও ভক্তিমতী ভজন শুনতে আসেন—সাড়ে পনের আনাই অবাঙালী, তাই দলাদলি কম, আনন্দ বেশি, ঠাকুরের প্রসাদে শান্তিও দিন দিন গভীর হচ্ছে।

হবি তো—ঠিক এই সময়েই ও পেল এফ আর এস উপাধি, সঙ্গে সঙ্গে হ'ল পদার্থবিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক মোটা মাইনেয়—শুধু গবেষণাই যাঁর কাজ। সানন্দে ওকে ফের লিখলাম যে, বাঙলা ভাষায় যাকে বলে শত্রুর মুখে ছাই পড়া, এ হল তাই—বিধাতার করুণায় জ্ঞানী পেলেন মণি, আর ছাই লাভ হ'ল ওর নীচ নিন্দুকদের। শেষে লিখেছিলাম এই ধরনের একটি কথাঃ "তোমার মতন কর্ম-ব্যস্ত মানুষের পক্ষে আমার মতন সুদূর প্রবাসীর কথা হয়ত মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে কত কী পেয়েছি ভাবতে আজো মন ভরে ওঠে।"

উত্তরে ও ১লা অক্টোবর ১৯৫৮ তারিখে লেখে এক দীর্ঘ চিঠি, তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করিঃ

"ভাই দিলীপ, তোমাদের স্নেহ কি ভোলা যায়? সব সময়েই তোমার কত স্মৃতিই যে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে কি বলব? আর মনে হয় যে, তুমি যে পথ ধরেছ সেই-ই তোমার পথ। ভগবানের করুণা মিলেছে তাতেই ভরপুর হয়ে ভক্ত ও ভক্তিমতীদেরকে আনন্দ পরিবেষণ করে চলো—গানে গানে মাতিয়ে দাও সবাইকে। এরি নাম তো সাধক-জীবন। তুমি স্রষ্টা ও শিল্পী—এইই তোমার আসল রূপ। তার প্রেরণা আসে যে উৎস থেকে তারই সন্ধান পেয়েছ এতদিনে, তাই ঘোরাঘুরি ও খুঁজে বেড়ানোর বিরাম হয়েছে।

"আমারও ঘোরার বিরাম হ'ল হয়ত। পাঁচ বৎসরের জন্যে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মনে একটা আত্মপ্রসাদ জেগেছে—যাক এতদিনে দেশমাতা রেহাই দিয়েছেন, নিজের কাজ নিয়েই মেতে থাকতে পারবো। তবে মুক্তি এল যখন তখন মনীষা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। আর চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ এখন! তবু তো ডাক শুনতেই হবে।

"মুখে এক মনে আর এই দেখে দেখে বিষিয়ে ছিল মন, তবে সহজেই সে-ভাব কাটিয়ে উঠেছি এখন। যে যেভাবে পারে, সেইভাবেই চ'লে মনকে ভোলাবার চেষ্টা করছে, আদর্শ ঐতিহ্য ইত্যাদি বড় বড় কথা ব'লে। তবে কথার বেসাতি তো বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে হিট্‌লারী যুগের পর, তারই ছোট ঢেউ এখানে পাড় ভাঙছে।

"মাঝে মাঝে খবর পেলে মন ভরে ওঠে। তোমার লেখা বই আসে, তোমার স্বাক্ষরও থাকে—তাই দেখেই জেগে ওঠে পুরানো দিনের কথা—

"পুরানো সে দিনের কথা—সে কি ভোলা যায়!"

ইতি—স্নেহধন্য

সত্যেন

১লা জানুয়ারী সত্যেন জন্মেছিল, ১৮৯৪ সালে। তাই ১৯৫৮র ডিসেম্বরে লিখি ওকে অভিনন্দনের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে, ও কত লোককে কত কী দিয়েছে জানি না, তবে আমি কত পেয়েছি জানি। শেষে লিখিঃ মন্দির তো হল এখন কীভাবে চলবে কে জানে? উত্তরে ও লেখেঃ

"তোমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিয়ে নতুন বর্ষ আরম্ভ হ'ল। দেখতে দেখতে বৃদ্ধত্বে পৌঁছে গেলাম— পুরানো বন্ধুরাও অনেকে চলে গেছেন পরপারে—তাই মধ্যে মধ্যে খুব নিঃসঙ্গ মন হয়। সংসারের বোঝা প্রথামত টেনেই চলেছি, নিষ্কৃতি কবে আসবে জানি না।

"২২শে জানুয়ারীতে অনেকেই হয়ত তাঁদের শুভেচ্ছা পাঠাবেন তোমার জন্ম-দিনে—এই পুরানো বন্ধুর আন্তরিক শুভ-কামনা মধ্যে পৌঁছবে।

দেনা-পাওনার কথা আলোচনা না হওয়াই ভাল—কারণ তাহ'লে আমার ঋণের অঙ্কই বড় দাঁড়াবে। তোমার নব-মন্দিরের ছবি পেয়েছি। বেশ বাড়ি হয়েছে। নিশ্চয়ই বহু ভক্ত ও ভক্তিমতী আসেন ভজন শুনে আনন্দ ও শান্তি পেতে। তোমার মধ্যে দিয়ে যাঁর ইচ্ছা ফুটে উঠছে, তিনিই তোমাকে হাত ধরে চালিয়ে নেবেন ভাই।

ইতি—স্নেহার্থী সত্যেন।"

এ চিঠিগুলি উদ্ধৃত করার দুটি উদ্দেশ্য আছেঃ একটি ব্যক্তিগত—সত্যেনের স্নেহশীল হৃদয়টির ছবি আঁকা, অন্যটি একটু গুরুগম্ভীর, তাই একটু ভূমিকা করতে হবে ব্যাখ্যার আগে।

উচ্চবিকশিত মানুষ মাত্রেরই মধ্যে একাধিক ভাবধারা বয়ে চলে—কোনটি দৃশ্যমান, কোনটি অন্তঃশীলা। সত্যেনের বহু বন্ধু—তারা সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে একজন অসামান্য ধীমান্‌ ও বৈজ্ঞানিক ব'লে। আমাদের এক প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীনীরেন রায় ২৭-৫-৫৯-এ লেনিনগ্রাদ থেকে একটি চিঠিতে ওর সম্বন্ধে যা লিখেছে, উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—আরো এই সত্যটির উপর জোর দিতে যে মানুষ যেখানে আসল জায়গায়

খাঁটি হয়ে সেখানে তার শত্রুরা নানা অকথা কুকথা বললেও তার মধ্যে যে আগুনের পরশমণি থাকে, সে অনেককেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে খানিকটা না খানিকটা বদলে দিয়েই যায়। নীরেন তীক্ষ্মধী ও স্নেহশীল মানুষ, সত্যেনের খুবই অনুরাগী বন্ধাবরই। লিখছেঃ "ছেলেবেলা থেকে তাকে আমি দেবতার মত ভক্তি করায় অভ্যস্ত। তাকে সমালোচনা করার ধৃষ্টতা আমার এখনও নেই। বরং বলতে পারি যে, বর্তমানে আমি যে জীবনদর্শনে উপনীত হয়েছি, তার মূলে আছে তারই প্রেরণা। তবে তাঁর দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, উদার জীবনাদর্শ, নিঃস্বার্থ ভালবাসা এই সবই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে বেশি, কারণ তার বিশ্বরবিশ্রুত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মর্মজ্ঞ হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার মত প্রতিভাকে কাছ থেকে দেখার।"

এ চিঠিটি হঠাৎ উদ্ধৃত করলাম শুধু ব্যক্তিগতভাবে সত্যেনের গুণগানে দোয়ার জুটিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই নয়, করলাম এই জন্যেও বটে যে, সংসারে যখন ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যাচারে আমাদের মধ্যেকার আদর্শবাদীটির স্বপ্নভঙ্গ ঘতন হয়, তখন সে একটি গভীর সত্যের পরিচয় পেয়ে খানিকটা সান্ত্বনা পায়ই পায় যে, সংসারে মহৎ মানুষ বিরল হলেও চিরজীবী আর জীবনে যা কিছু মহার্ঘ তা-ই বিরল। এই জন্যেই দেখা যায় যে, আবহমানকাল জগতে নানা নীতিপাঠ সত্ত্বেও গড়পড়তারা চায় না, যা চায় মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহৎ মানুষ। ফলে যুগে যুগে সব দেশেই গড়পড়তারা প্রায়ই ভুল বুঝে এসেছে এই মুষ্টিমেয়দেরকে। বাইবেলে এই সত্যটির কথাই বলেছেন সেণ্ট জন যে, "আলো অন্ধকারে জ্বললেও অন্ধকার তাকে বুঝতে পারে না।"

আধ্যাত্মিক জগতে এর ভাষা হল এই যে, গড়পড়তারা (পরমহংসদেবের ভাষায়) গোল-মালের মধ্যে যে-মাল আছে, তাকে ছেড়ে শুধু গোলকে নিয়েই মজে থেকে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্তই থেকে যায়, আর মালের খবর পান সেই বিরল সন্ধানীরা যাঁরা ঢেউয়ে ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে চলতে রাজি না হয়ে ডুবুরি হতে চান লক্ষ্মীর সঙ্গে অমৃত-ভাণ্ড করায়ত্ত করতে। এই ডুবুরি হবার নামই ভক্তের ভক্তিসাধনা, জ্ঞানীর জ্ঞানোৎসুক্য, আত্মসন্ধানীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা যার ডাকে যুগে যুগে সাড়া দিয়ে এসেছেন সেই পরম পুরুষ যাঁকে দেখলে জীব হয় শিব, যাঁকে জানলে আর জানবার কিছু বাকি থাকে না, যাঁকে লাভ করলে আর কোন লাভকে লাভই মনে হয় না। পক্ষান্তরে এই পরম প্রাপ্তির জন্যে যাদের কোন মাথা-ব্যথাই নেই, রূপের ওপারে অসীম অরূপ-রতনের ঘরছাড়া বাঁশির ডাকে যারা কানই দেয় না, তারা এখনো "যাহা চায় তাহা ভুল করে চায় যাহা পায় তাহা চায় না"—তাদের এখনো চোখ ফোটে নি।

সত্যেন নিজেকে সপরিহাসে "নাস্তিক" বলে ফেলে দিতে চাইলেও তাকে আমি কোনদিনই এই বহির্মুখী অন্ধদের একজন বলে মনে করতে পারিনি। কেন পারিনি তার পুরোপুরি কারণ দর্শানো সহজ নয়, তবু বলতে চেষ্টা করি—আমার নিজের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় ওকে আমি কী চোখে দেখে এসেছি। এ-দেখায় ভুল কিছু থাকবেই থাকবে—মানুষ যখন নিজেকেই পুরোপুরি চিনতে পারে না, তখন অপরকে নির্ভুল জানব, চিনব কেমন করে। তবু স্নেহ গভীর হলে একটা অন্তর্দৃষ্টি হয়, একথাও তো সমান সত্য। তাই বলি কেন ও আমাকে এত আকৃষ্ট করেছিল প্রথম থেকেই।

বলেছি আমি, ওকে ভালবেসেছিলাম প্রধানত তিনটি কারণে ওর অসামান্য স্নেহ-শক্তির জন্যে। ওর দৃঢ়মূলে সত্যনিষ্ঠার জন্যে; ওর বহুমুখী সন্ধান-বৃত্তির জন্যে। কিন্তু এ তিনটি দৃশ্যমান কারণ ছাড়া আরো একটি কারণ আছে, যার জন্যে ওকে আমি বহুবারই মনে মনে সাধুবাদ দিয়েছিঃ ওর আত্মমনস্কতা যার প্রসাদে ও সবার মধ্যে থেকেও খানিকটা যেন সর্ববিচ্ছিন্ন হয়ে চলতে পারত। এই প্রবৃত্তিটির পরম বিকাশেই মানুষ অনাসক্ত হতে পারে। তাই আমার আশা হয় যে, ও এই অনাসক্তির আলোয় ক্রমশ ওর মনের বিষাদ কাটিয়ে উঠতে পারবে। ওর মনের বিষাদের মধ্যেও কিন্তু এমন একটি অনির্দেশ্য মাধুর্য আছে, যার সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, যদিও নমুনো দেওয়া চলে। তাই এ-অধ্যায়ের ইতি করি ওর শেষ দুটি চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃত করে। এপ্রিল মাসে ও হঠাৎ পুনায় আসে আমাদের আশ্রমে একদিনের জন্য। ওর কথা শুনে এবং ওর মুখ বিষণ্ণ দেখে আমি মনে দুঃখ পেয়ে ওকে আমার সহানুভূতি জানিয়ে একটি দীর্ঘ পত্র লিখি। উত্তরে ও লেখে (৬ই মে, ১৯৫৯)।

"ভাই দিলীপ,

তোমার চিঠি পেয়েছি। ......আমার নিজের কাছে সবচেয়ে বেশি আশার কথা এই যে, খুব বেশি চিন্তিত হতে হবে না। নিজেরও মেয়াদ শেষ হ'ল, দলের নেতা হবার অভিলাষ নেই। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে সবই, এর মধ্যে ঠিক যেটুকুতে আনন্দ পাই তাই নিয়েই থাকি। বন্ধুদের দেখেই আনন্দ, তারা কি করছে তার বিচার করতে চাই না। নীরেন নিজের অভিলাষ মেটাতে চেষ্টা করছে। ভাষার টানই বোধ হয় তার বেশি ছিল মস্কো যাত্রার পিছনে। আগের দিনে তার যে উৎসাহ ছিল, তা বোধ হয় এখন কিছু নিভে এসেছে।

ইন্দিরা দেবীকে আমার সবহুমান নমস্কার জানিও। তাঁকে পুনায় দেখে বেশ আত্মসমাহিত মনে হয়েছিল। সকল বন্ধুকে নমস্কার জানাই।

ইতি—স্নেহার্থী সত্যেন।"

এর উত্তরে আমি ওকে ফের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে শেষে লিখি যে, ইন্দিরার খুব উচ্চ অবস্থা হলেও ওকে মন্দিরে দুবেলা রাঁধতে তথা বহুলোকের ভার বইতে হয়, তাই ভাবনা আসে—এত চাপ ওর দুর্বল শরীর শেষ পর্যন্ত সইতে পারবে কি না। ওর উত্তরে ও লেখে মে মাসের শেষের দিকেঃ

"দিলীপ,

আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। আমার সত্যিই কিছু আশা নেই—শুধু যে কাজ মাথায় তুলে নিয়েছি, সেটা যেন কিছু করতে পারি। বিজ্ঞানীর মনে যে উচ্চ আশা থাকে তা সে প্রকাশ করে না সহজে। তবু সে চায় যে, শেষ অবধি যেন নাম থাকে কোন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে, যেটা মানুষ সমবেত হয়ে গড়ে তুলতে চাইছে।

তুমি অনেক সাধুসঙ্গ করেছ ভাই, কাজেই তোমার কাছে গিয়ে আনন্দ হয়—তার মধ্যে ঈর্ষার লেশও নেই। পরিপূর্ণ-ভাবে সহস্রধারে তোমার মনের পাপড়ি খুলেছে দেখেই আনন্দ। আপনার জন্যে তুলে নিজের গোলাজাত করার দুর্মতি ছিল না কখনোই। মাঝে মাঝে পুরস্কারের অহমিকা মনে জেগে ওঠে, কিন্তু সে উৎসাহ নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত মনকে নিরন্তর জাগিয়ে রাখে না—এই হল গণ্ডগোল। একে কিন্তু নিরাশার কথা বলে বন্ধুর জন্যে ভেবো না। তার নিষ্ক্রমণের সিংহদ্বার আর বেশি দূরে নেই। পুনার সংসারের ঝামেলার জন্যে অন্য লোককে ধরো। ইন্দিরাকে সে যে ভাবের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়, তার সুযোগ মেলাই দরকার। তোমাদের আনন্দস্রোত ওখানে আশা করি আগের মত অবিরলই বইছে। ইতি

স্নেহার্থী সত্যেন।"

(ক্রমশ)

এ পৃথিবীর সদা-বর্ধমান শিশু জনসংখ্যার সংগে তাল রেখে কি স্কুল স্থাপন করা সম্ভব? সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ইউনেস্কোর এক পর্যবেক্ষণের ফল জানা গেছে। আজ নাকি পৃথিবীতে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ৫৫ কোটি, আর তাদের মধ্যে মাত্র ৩০ কোটি শিশু স্কুলে যায়। আর বাকি ২৫ কোটি শিশুর জন্য কোন স্কুল বা কোন পাঠ্যপুস্তক নেই।

তিন বছরের এই পর্যবেক্ষণে শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। ১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে পৃথিবীর অর্ধেক শিশু জনসংখ্যার স্কুলে পড়বার সুযোগ ছিল।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে পৃথিবীর শিশু জনসংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ বেড়েছে, আর প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৩ ভাগ।

কিন্তু এতে আত্মতৃপ্তির কোন সুযোগ নেই। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা আরও নয় কোটি বেড়ে গেছে। এই সংখ্যা জাপানের মোট জনসংখ্যার সমান আর ফ্রান্সের জনসংখ্যার দ্বিগুণ। পরবর্তী দুই বৎসরের জন্মহার যদি ঠিক এই রকমই থাকে, তবে শিশু জনসংখ্যা আরও দশ কোটি বেড়ে যাবে।

এই রকমই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দুই লক্ষ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫০ কোটিতে পৌঁছে যাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আর মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে আমাদের সদা-বর্ধমান এই মানব-পরিবারের সংগে আরও ২০০ কোটি যোগ হবে।

বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুসারে ১৯৬৩ সালে পৃথিবী ৩০০ কোটি, ১৯৭৭ সালে ৪০০ কোটি, ১৯৯০ সালে ৫০০ কোটি আর এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই ৬০০ কোটি লোকের আশ্রয়দাত্রী হবে।

*

'বিগবেনের' শতবার্ষিকী উৎসবকে স্মরণীয় করার জন্য ওয়েস্ট মিনস্টার জুয়েল টাওয়ারে একটি প্রদর্শনী ও নিউ প্যালেস প্রাঙ্গণে অন্যান্য উৎসব শুরু হয়েছে। একশ বছর আগে ১১ই জুলাই বিগবেনের প্রথম ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেছে। পরে বেতার প্রচলনের ফলে বিগবেনের

১৯৫৯ সালের ৩রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের এক ঘোষণার বলে আলাস্কা ৪৯তম রাজ্য হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়েছে। মাছ ধরাই আলাস্কার প্রধান ব্যবসায়। এই অতিকায় কাঁকড়াটি আলাস্কার উত্তর অঞ্চলের সমুদ্রে ধরা পড়েছে। এই ধরনের বিরাট কাঁকড়া আলাস্কা উপসাগর ও বেরিং সাগরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টিনজাত এই সামুদ্রিক খাদ্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রপ্তানি করা হয়। এই ধরনের কাঁকড়া ওজনে ২২ পাউন্ড পর্যন্ত হয় এবং মাঝে মাঝে এর বিস্তার ৫ ফুটে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঘণ্টাধ্বনি বি বি সি'র কল্যাণে প্রতি রাত্রে ইংলণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর বহু দূরে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু 'বিগবেন' নামটা কি করে হল, তা বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই।

১৮৫৬ সালের কোন একদিন হাউস অব কমন্সে নবনির্মিত পার্লামেন্ট ভবনের ক্লকটাওয়ারের জন্য যে ঘণ্টা ঢালাই করা হয়েছে, তার নামকরণের জন্য জোর বিতর্ক শুরু হয়।

পূর্ত বিভাগের কমিশনার ও পার্লামেন্ট সদস্য স্যার বেনজামিন হল তাঁর উদাত্ত-কণ্ঠে এই ঘণ্টার প্রয়োজনীয়তার উচ্চ প্রশংসা করে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হবার পরেই জনৈক সদস্য কৌতুকভরেই বলে ওঠেন, এই ঘণ্টার নাম 'বিগবেন' রাখা হক না কেন।

তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভা এই নামকরণই মেনে নেন এবং তদবধি এই নামই চলে আসছে।

প্রথম যে ঘণ্টাটি ঢালাই করা হয়েছিল, তার সহনশীলতার পরীক্ষা করতে গিয়ে ঘণ্টাটি ভেঙে যায়। এই ঘণ্টার জন্য যে হাতুড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা নাকি এই ঘণ্টার উপযোগী ছিল না। ১৮৫৮ সালের মে মাসে প্রায় ১৪ টন ওজনের আর-একটি ঘণ্টা ঢালাই করা হয় এবং তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়ে যায়।

এই ঘণ্টা ক্লকটাওয়ারে ঝলোন হলে দেখা গেল, ওক কাঠের যে কাঠামোর সংগে ঝলোন হয়েছে, তা এই ঘণ্টার পক্ষে দুর্বল, তখন লোহার তৈরি সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে কাঠামোটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়, যার ফলে গত মহাযুদ্ধের বোমা বৃষ্টির মধ্যেও এটি অটল ছিল।

ঘড়িটি ১৮৫৯ সালের ৩১শে মে চালু হয় আর ঘণ্টাটি বাজতে শুরু করে ঐ বছরেরই ১১ই জুলাই।

*

মানুষ কত ভাবেই না তার সহ্য শক্তির পরিচয় দিতে উৎসুক। নানা দেশে নানাভাবে এই শক্তির পরীক্ষা দিয়ে চলেছে যুবসমাজ।

আমেরিকার ১৯ বছরের এক যুবক তো ৫০ ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে টেবিল টেনিসই খেলে গেল। ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে ৫০ ঘণ্টায় সে মোট ৩০৩টি গেম খেলেছে। তার মধ্যে জিতেছে ১৬৫টি খেলায় আর হেরেছে ১৩৮টিতে।

ডোব্রিলা নামে জনৈক ব্যায়ামবিদ্ তো ১৪৪ ঘণ্টা ধরে অনবরত মুগুর ঘুরিয়েছেন। আর অধ্যাপক কার্টিয়ার তো নেচেছেন অবিরত ১৬ ঘণ্টা ধরে। কেম্ব্রিজের দুটি ছাত্র সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় পিছন দিকে হেঁটে কেম্ব্রিজ থেকে নিউ মার্কেট বেশ কিছু মাইল চলে গিয়েছিল।

র‍্যামজে নামে শেফিল্ডের এক অধিবাসী এক ঘণ্টায় ১০,৬১৭ বার স্কিপ করেছিল। শেফিল্ডের আর-একজন চার ফুট দশ ইঞ্চ ব্যাসের ৭২ পাউণ্ড ওজনের পাট চাকা হাত দিয়ে গড়াতে গড়াতে পোর্টসমাউথ থেকে নিউ ক্যাসেল আবার সেখান থেকে ফিরে এসেছিল পোর্টসমাউথে।

কয়েক বছর আগে স্নাতক ক্লাসের দুটি ছাত্র তাদের দুজনের অলিম্পিক খেলার বন্দোবস্ত করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা চার দিনের এই অনুষ্ঠানে তাদের মধ্যে ১৯ রকম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল। মুক্ত প্রাঙ্গণ প্রতিযোগিতা দিয়ে তারা তাদের অলিম্পিক শুরু করেছিল আর শেষ করেছিল বক্সিং, কুস্তী, বিলিয়ার্ড এবং দাবা খেলায়।

*

একটা খবর পাওয়া গেল, পশ্চিম জার্মানীতে ডাকটিকিটের পেছনে আঠার সংগে এমন একটা জিনিস মেশাতে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে জিভের ওপর ডাকটিকিট ঘষে ব্যবহার করা যাদের অভ্যাস তারা বেশ একটা স্বাদ পাবে। ডাকটিকিটের আঠাকে যাতে স্বাদু করা যায় তার জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। পশ্চিম জার্মানীতে সম্প্রতি এমন একটি স্মারক ডাকটিকিট বের করা হয়েছে যার পিছনের আঠার সংগে পিপারমেণ্ট মেশান আছে। অন্যান্য ডাকটিকিটের আঠাকেও স্বাদু করা হয়েছে।

তিন বছর আগে আমেরিকাতেও এই ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। ডাকটিকিটের পেছনের আঠা চেটেও এক-বেলাকার খাওয়া হয়ে যায় এমন ব্যবস্থাও তাঁরা করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন, কয়েক ধরনের ডাকটিকিটের পেছনের আঠার সংগে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন মিশান আছে।
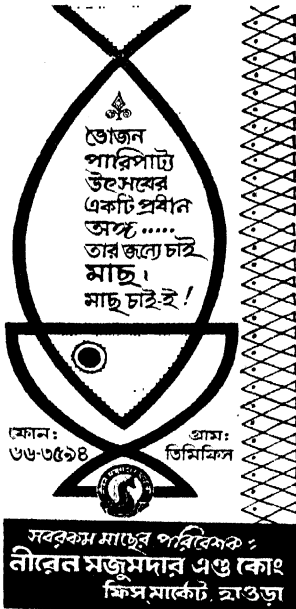
ট্রামে-বাসে

এবার বনমহোৎসবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ভবনে সাড়ম্বরে রক্তকরবীর চারা রোপন করা হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আগামীবারে হবে "মায়ার খেলা" বা "ডাকঘর"!!

• • •

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে জানাইয়াছেন যে, তিনি সারাজীবন মালিনীর কাজ করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিদায় নেওয়ার পর তিনি বাগানের কাজেই ফিরিয়া যাইতে চান। —"প্রকাশ

থাকে, রাজ্যপালের বাগান লাউ-কুমড়োর বাগান নয়, বেল-গোলাপের বাগান"—বলে শ্যামলাল।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতার চাউলের বাজারে অনিশ্চিত অবস্থা অব্যাহত। —"ভদ্রলোকের এক কথা"—সংক্ষেপে বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

ডাঃ চৌহান হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে ১৯৮০ সালে ভারতবর্ষে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। —"তার আগে নি-দারুণ দুর্ভিক্ষের কোন হিসেব তিনি দেখাতে পারেন নি"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গের রাইটার্স বিল্ডিং-এ নাকি একটি ঘর আছে, সেখানে যিনি-ই বসিয়া অফিস করিয়াছেন, তাঁরই কোন-না-কোন বিপদ ঘটিয়াছে। প্রায় ভূতুড়ে ঘর। সেখানে বসিয়া কেউ কাজ করিতে ভয় পান। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"সরকার একটি বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিলেই দেখতে পাবেন—ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়—বলবার ভাড়াটের অভাব নেই। অবশ্য সেলামী বা আগাম ভাড়া দেবার দাবি যদি না থাকে।"

• • •

কলিকাতা ডেড্ লেটার অফিস-এর নূতন নামকরণ হইয়াছে রিটার্নড লেটার অফিস। সংবাদদাতা শিরোনামা দিয়াছেন। 'মৃতের মৃত্যু'। পড়িয়া কৌতূহলী হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এইবার হৃদস্পন্দন ফিরাইয়া আনিবার যন্ত্রটি কাজে লাগিবে। কিন্তু সংবাদ পড়িয়া বল হরি না বলিয়া, ও হরি বলিলাম।

• • •

কেরল সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীনাম্বুদ্রিপদ-র সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হইবার জন্য শ্রী নেহরু পরামর্শ দিয়াছেন। নাম্বুদ্রিপদ নাকি বলিয়াছেন—সময় হইয়াছে, আভাস পাইলে আমন্ত্রণ জানাইব। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বিরোধী দল বিনা নিমন্ত্রণেই গিয়ে বলতে পারেন—আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছে বাসবদত্তা"!

• • •

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিধানচন্দ্র একটি প্রশ্নের উত্তরে নাকি বলিয়াছেন যে, অটুট স্বাস্থ্যের একটি গোপন রহস্য হইল খোলা

জানালা। —"স্বাস্থ্যলাভ না হলেও ফাউ তো আছেই—কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে আমার খোলা বাতায়নে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

ভেলোর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল, সেখানে এক সভায় পৌর-পিতারা পরস্পরের গায় কালির দোয়াত, অফিসের প্যাড, কাঠের বাক্স প্রভৃতি ছোড়াছুড়ি করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"পিতাদের জ্যেঠামি গল্প হল। গল্প লেখক অবহিত হউন। পূজা-সংখ্যা সমাসন্ন!!"

• • •

সংবাদে শুনিলাম, যুক্তপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী থেরু-মেয়েরা নাকি পুরুষদের মন্ত্রের জোরে বশ করিয়া রাখে। বাজারের কেনাকাটা সব মেয়েরাই পছন্দ মত করে, পুরুষ শুধু মোট বয়। —"মন্ত্রের জোরে
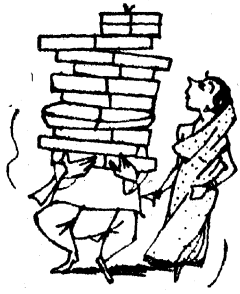
কিনা জানিনে, আমাদের এই কলকাতায় পুরুষরা শুধু মোট বয় না, পকেট থেকে টাকাও দেয়। পছন্দ করেন মা-লক্ষ্মীরা। বিশ্বাস না হয়, পূজোর বাজার আসছে, একবার ঘুরে দেখে আসবেন"—বলে শ্যামলাল।

• • •

শিকাগোর খবর—পার্কের বেঞ্চে বসিয়া যদি কোন প্রেমিক যুবক বাড়াবাড়ি করেন, তবে আইন মোতাবেক তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে। সেই জরিমানার অর্থ ব্যবহার করা হইবে পার্কের বেঞ্চ-গুলিকে ঠিক-ঠাক রাখার জন্য। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"বোধ হয় ভালো লেপ রাখার জন্য, বসবার যাতে অসুবিধে না হয়, তার জন্য"!!

• • •

রাশিয়ার আর-একটি রকেট মহাশূন্য হইতে দুইটি কুকুর ও একটি খরগোস লইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এবার খরগোসের পালা। আমেরিকা কচ্ছপ আমদানী করুন। তারপর মহাত্মা ঈশপের গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে টের পাবেন বাছাধনরা"!!

চক্রদত্ত

সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে এক-রকম নতুন ধরনের বর্ণশংকর রেশম-পোকা জন্মান হয়েছে। এই বর্ণশংকর পোকাটি চাইনীজ গোল্ডেন—৪ ও জাপানীজ গোল্ডেন—৩-এর সংমিশ্রণে জন্মান হয়েছে আর নাম দেওয়া হয়েছে জম্মু গোল্ডেন—৩। সাধারণ গুটীপোকাগুলি চারবার নির্মোচনের পর গুটী বাঁধে এবং এই চারবার নির্মোচনের দরুণ ২৭ থেকে ৩০ দিন সময় লাগে গুটী বাঁধতে। অথচ নতুন বর্ণশংকর পোকাগুলি তিনবার নির্মোচনের পর গুটী বাঁধে, ফলে কিছুটা সময় সংক্ষেপও হয়। এদের গুটী বাঁধতে তিন সপ্তাহ সময় লাগে। এছাড়া সুতো উৎপন্নেরও তারতম্য ঘটে। একটি জাপানীজ গোল্ডেন—৩ গুটী থেকে ২১০ মিটার রেশম পাওয়া যায়, চাইনীজ গোল্ডেন—৪ গুটী থেকে ৬০০ মিটার রেশম পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে একটি জম্মু গোল্ডেন—৩ গুটী থেকে ৫২০ মিটার রেশম পাওয়া যাবে। এই নতুন বর্ণশংকর গুটীর চাষ বানীহালের গ্রামে করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কারণ ঐ স্থানের জলবায়ু ঐ গুটীর চাষের বিশেষ উপযোগী। এর পরের আগস্ট মাসে এঁরা আরও একটু গরম জায়গায় এর চাষ করার চেষ্টা করবেন এবং এঁরা আশা করেন যে, ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে সমগ্র জম্মু কাশ্মীরে এই গুটীর চাষ করতে পারবেন। এই নতুন গুটীপোকার চাষে সময় সংক্ষেপ হওয়ায় পোকার খাদ্য হিসাবে তুঁত পাতা কম লাগবে এবং জনমজুরের পরিশ্রমও কম লাগবে, অথচ উৎপন্ন রেশমের হার শতকরা ২০০ ভাগ বেড়ে যাবে।

*

রাশিয়ার উজবেগীস্থানে 'ইনস্টিটিউট অব জিওলজি' গবেষণা করে মাটির নীচে তেল ও জ্বালানি বাষ্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধ ওয়াকিবহাল হওয়ার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। মাটির নীচের জলের মধ্যের আয়োডিন ও ব্রমাইডের পরিমাণ জানতে পারলেই তেল ও বাষ্পের সন্ধান জানতে পারেন। তাঁরা বলেন যে, মাটির নীচের জল তেলেও গ্যাসের সংস্পর্শে এলে তার আয়োডিনের পরিমাণ বেড়ে যায়, কিন্ত ব্রমাইডের পরিমাণ যথাযথ থাকে। এইটাই তাঁদের পরীক্ষার সূত্র। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন যে, যেসব সামুদ্রিক জীবের মধ্যে বেশী আয়োডিন থাকে, সেগুলি থেকেই তেল ও গ্যাস উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ তেল ও গ্যাসের নিকটবর্তী জলে আয়োডিনের পরিমাণ বেশী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

*

আজকের এই যন্ত্র-যুগে মানুষ প্রায় সব কাজই যন্ত্রের সাহায্যে সমাধা করার চেষ্টা করে। তবে রোগীর সেবা যন্ত্রের সাহায্যে হয় না, সেখানে মানবের স্নেহোষ্ণ স্পর্শের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাসপাতালের নার্সদের বেশীর ভাগ কাজই যন্ত্রের মত করে যেতে হয়। আলো জেলে দেওয়া, রেডিও খুলে বা বন্ধ করে দেওয়া, খবরের কাগজ এগিয়ে দেওয়া, জানলা বন্ধ করা বা খোলা ইত্যাদি কাজগুলির জন্য সেবা-নিপুণ সুশিক্ষিত নার্স না হলেও চলে—বিশেষত আজকাল প্রায় সব হাসপাতালে রোগীর সংখ্যার তুলনায় নার্সের সংখ্যা কমই মনে হয়, সেইজন্য ঐসব কাজের জন্য অন্য ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। আজকাল ঐসব কাজ রোবট মানের দ্বারা সমাধা করার ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে এই রোবট নার্স অর্থাৎ যান্ত্রিক নার্সের সাহায্যে কতকগুলি নির্ধারিত কাজ হচ্ছে। ফলে হাসপাতালের সেবা-নিপুণ নার্সদের বিশেষ কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনমত বিছানা ওঠান-নামান, জানলার পর্দা ওঠান-নামান, ঘরের বাতি জ্বালান-নিভানো, ঘরের তাপমাত্রা কম-বেশী করা, টেলিভিশনযন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করা, ডাক্তারকে ডেকে দেওয়া ইত্যাদি অতি সাধারণ কাজের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক রোগীর বিছানা সংলগ্ন একটি রোবট নার্স রাখা হবে আর রোগী তার প্রয়োজনমত নার্সের গায়ে লাগান বোতাম টিপে কাজগুলি সেরে ফেলতে পারবেন। রোবট নার্স নিয়োগ করায় রোগীরাও নিজেদের একান্ত পর-মুখাপেক্ষী না ভেবে কিছুটা আত্মনির্ভর-শীল মনে করতে পারবেন।

*

বর্তমান কর্মব্যস্ত যুগে মানুষের অনেক ক্ষেত্রেই আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে পরম তৃপ্তিমত মুহূর্ত উপভোগের অবকাশ ঘটে না। কর্মব্যস্ততার মধ্যেই অল্প দু-চারটি প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিতে হয়। এমন কি ঘরে বসে ফোনের সাহায্যেও এই সব কথা বলা সম্ভব হয় না—পথেই কথা-গুলি বলে ফেলতে পারলে ভাল হয়। একটি চুরুটের বাক্সেরমত রেডিও জাতীয় যন্ত্রটি এই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র দশ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রটি মোটরে বা ট্রেনে বহন করার পক্ষে খুব অসুবিধাজনক নয়। যন্ত্রটির সাহায্যে এক তরফ থেকে যেমন কথা বলতে পারা যায় অন্য তরফ থেকে তেমনি কথা শোনাও যায়। তিন মাইল দূর পর্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। বাড়ির সাধারণ বৈদ্যুতিক শক্তি কিম্বা মোটরগাড়ি কিম্বা মোটর-বোটের ছয় অথবা বারো ভোল্টের ব্যাটারীর সাহায্যে এই যন্ত্রটি চালান যেতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার নবপ্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থাকে সামরিক শাসনের আখ্যা দেওয়া আক্ষরিকভাবে পুরোপুরি ঠিক না হতে পারে, কিন্তু শীর্ষে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক বিভাগের কর্তৃত্বই যে প্রাধান্য লাভ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন যে-নয়জনের ক্যাবিনেটের সাহায্যে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন শাসন চালাবেন তাতে সেনা-বিভাগের প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। নিম্নবর্গের মন্ত্রীদের মধ্যেও সেনা-বিভাগের প্রতিনিধির সংখ্যা যথেষ্ট। সর্বোপরি সামরিক শাসনের যেটা সবচেয়ে সুস্পষ্ট লক্ষণ—'পার্টি পলিটিক্স্' নিষিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মনে হয় বৈধানিক দৃষ্টি-কোণ থেকে অবস্থাটা মিশর, ইরাক অথবা পাকিস্তানের রকমফের। অবশ্য ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমিকা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা এবং সম্ভবত প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ ধারাও বিভিন্ন হবে।

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, এই প্রত্যেকটি সামরিক শাসনের শীর্ষে যিনি আছেন তাঁর পদবী হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট। কেবল এই ক্ষেত্রগুলিতেই নয় পৃথিবীর যেখানে যেখানে সামরিক শাসন চলছে প্রায় সব জায়গাতেই শীর্ষে যিনি আছেন (অথবা যাঁকে রাখা হয়েছে) তাঁর পদবী হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার পদের নাম প্রেসিডেণ্ট এবং তা থেকে মার্কিন শাসনপদ্ধতির নামকরণ হয়েছে 'প্রেসিডেণ্টশিয়াল' শাসনপদ্ধতি—বৃটিশ 'ক্যাবিনেট' শাসন পদ্ধতি থেকে তার বৈশিষ্ট্য বুঝাবার জন্য। কিন্তু এই উভয় পদ্ধতি দ্বারাই পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সূচিত হয়। বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেণ্টের অংগীভূত এবং পার্লামেণ্টের সমর্থনের উপর তাঁদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আমেরিকার পার্লামেণ্টের (কংগ্রেসের) কোনও পরিষদেরই (সেনেট অথবা হাউজ্ অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ্স্-এর) সদস্য নন। তিনি প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সরাসরি গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। এমন হতে পারে (যেমন বর্তমান সময়ে হয়েছে) যে প্রেসিডেণ্ট যে-রাজনৈতিক দলের নেতা সেই দলের কংগ্রেসে সংখ্যা গরিষ্ঠতা নেই। প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের বার থেকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গবর্নমেণ্টের নীতি উদ্ভাবন এবং তাকে কার্যে পরিণত করার অধিকার এবং দায়িত্ব প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সম্মতি ছাড়া প্রেসিডেণ্টের পক্ষে অধিক দূর যাওয়া সম্ভব নয়। প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের কোনও প্রস্তাব 'ভেটো' করে বাতিল বা স্থগিত করতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ গুরুতর বিষয়েই প্রেসিডেণ্টকে অর্থাৎ গবর্নমেণ্টকে কংগ্রেসের অনুমোদিত গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্টে যা পাস হয় গবর্নমেণ্টকে তাই শিরোধার্য করতে হয় এবং মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেণ্টের নিকট সাক্ষাৎভাবে দায়ী—এই থেকে মনে হতে পারে যে, বৃটেনে পার্লামেণ্টের যে-প্রভাব তার চেয়ে আমেরিকান ব্যবস্থায় গবর্নমেণ্টের উপর কংগ্রেসের প্রভাব কম। কিন্তু আসলে তা নয়। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সর্বময় কর্তৃত্বের লক্ষণ এই ধরা হয় যে, পার্লামেণ্টে যা পাস হবে গবর্নমেণ্টকে তা মানতেই হবে এবং পার্লামেণ্টের সমর্থন হারানোর অর্থই হচ্ছে মন্ত্রিমণ্ডলীর পদচ্যুতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃটেনে পার্লামেণ্টের সমর্থনের অর্থ হচ্ছে যে যে-দলের গভর্নমেণ্ট সেই দলের জোর অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যত দিন থাকে, তত দিন গবর্নমেণ্ট যে-প্রস্তাব আনবে তাই পাস হবে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের বিতর্ক এবং আলোচনার প্রভাব গবর্নমেণ্টের উপর যতখানি হয় তার চেয়ে মার্কিন কংগ্রেসের বিতর্ক ও আলোচনার প্রভাব কম এরূপ বলা যায় না। বরঞ্চ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী মার্কিন কংগ্রেসের অংগীভূত না হয়েই কংগ্রেসী আলোচনা ও সমালোচনার প্রভাব যেন বেশি অনুভব করেন। আসলে 'ক্যাবিনেট' ও 'প্রেসিডেণ্টশিয়াল' শাসনপদ্ধতির মধ্যে যে-পার্থক্য সেটা কোনটার উপর পার্লামেণ্টের প্রভাব বেশি বা কম অথবা কোথায় পার্লামেণ্টের শক্তি বেশি বা কম তা নিয়ে নয়।

আজকাল মাঝে মাঝে কোনো ডিক্টেটর-স্থানীয় প্রেসিডেণ্টের মুখে শোনা যায় যে, তাঁর দেশের পক্ষে নাকি 'প্রেসিডেণ্টশিয়াল' পদ্ধতির গবর্নমেণ্টই বেশি উপযোগী হবে। আসলে কিন্তু এই ধরনের উক্তি কেমন

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কারণ এই রকম উক্তি যাঁরা করেন, তাঁরা মার্কিন প্রেসিডেণ্টের কংগ্রেস-নিরপেক্ষ অধিকারগুলির কথাই চিন্তা করেন, কিন্তু আসলে মার্কিন পদ্ধতিতে কংগ্রেসের শক্তি এবং প্রভাবও অতিশয় সক্রিয় এবং প্রেসিডেণ্টকে তার গণ্ডীর মধ্যেই থাকতে হয়। ডিক্টেটর প্রেসিডেণ্টেরা যখন 'প্রেসিডেণ্টশিয়াল' পদ্ধতির তারিফ করেন, তখন তাঁরা যে-অবস্থা কল্পনা করেন, তাতে হয় পার্লামেণ্ট বলে কিছুর স্থান নেই, অথবা যা আছে তা নামে মাত্র, তার কোনো প্রকৃত শক্তি নেই। অর্থাৎ এ'রা 'ক্যাবিনেট' পদ্ধতির পরিবর্তে 'প্রেসিডেণ্টশিয়াল' পদ্ধতি চান তা নয়, পার্লামেণ্টারী অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপদ্ধতির প্রতিই এ'দের বিতৃষ্ণা।

সম্প্রতি ভারতেও একটা বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে যাতে 'ক্যাবিনেট' ও 'প্রেসিডেণ্ট-শিয়াল' শাসনপদ্ধতির পার্থক্যের উল্লেখ শোনা গেছে। কিছুদিন পূর্বে সরকারের কৃষি ও শিল্পনীতির কোনো কোনো অংশ সমালোচনা করে প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রধানমন্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠি এবং তৎসহ প্রধানমন্ত্রীর উত্তর ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে বলে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মূলে কথাগুলিও কাগজে বেরোয়। এই সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর গত সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হলে জওহরলালজী সংবাদপত্রে এই রকম গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করার নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রপতির এই রকম চিঠি লেখা কিছু নতুন নয়, তাঁর মতো শ্রদ্ধেয় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য এবং পরামর্শ সরকার শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করেন, কিন্তু সরকারী নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ক্যাবিনেটের এবং ক্যাবিনেট এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী, পার্লামেণ্টের ক্ষমতাই সবার উপরে। জওহরলালজী বলেন যে, ভারতে মোটামুটি বৃটিশ ক্যাবিনেট পদ্ধতি চলছে, এখানে প্রেসিডেণ্টের পদ বৃটিশ রাজাদের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু একথা কি সম্পূর্ণ ঠিক? ভারতের কন্স্টিটিউশনে অবস্থাবিশেষে প্রেসিডেণ্টের এমন সব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া আছে যা বৃটিশরাজের পক্ষে কখনই প্রযোজ্য বলে কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া এ সব বিষয় কেবল আইনের কথার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না, নজির এবং অভিজ্ঞতার ধারার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। অনেক সময় কোন্ পদে কে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা পদের প্রতিষ্ঠা ও শক্তির সীমারেখা অঙ্কিত হয়ে যায়। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো নেতাকে যে-পদের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে সে পদের অধিকারীর দ্বারা কেবল শীলমোহরের কাজ করিয়ে নেওয়ার কোনো মানেও হয় না। জওহরলালজীর সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেণ্টের পদের ব্যাখ্যা করার দুদিনের মধ্যেই কেরালার বিরোধী দলের নেতা এবং কেরালার মুখ্যমন্ত্রী প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পান। নিয়মতান্ত্রিক বৃটিশরাজের মতো তাঁর পদ হলে প্রেসিডেণ্টের পক্ষে এই সুযোগদান কি সম্ভব বা শোভন হোত?

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

রাধা—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম সাত টাকা।

ভবিষ্যতের জন্যে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার কত দূরে পূর্ণ হচ্ছে সে-কথা জোর করে বলা সম্ভব না হলেও একথা বোধ করি বলা চলে যে, খুব সাম্প্রতিক কালে বহুতর এবং বিচিত্রতর বাংলা উপন্যাস লেখা হচ্ছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় (সাহিত্য, সিনেমা, যৌন বিজ্ঞান ইত্যাদি) প্রতি মাসে গড়ে অন্তত আট দশখানি সম্পূর্ণ (?) উপন্যাস প্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়া নানাবিধ পূজা সংখ্যা বা সংকলন গ্রন্থ আছে, সেখানে উপন্যাসের বান আপনিই ডাকে প্রতিবছরে। আবার অনেক উপন্যাস পত্র-পত্রিকা বা সংকলন গ্রন্থের ক্রোড়ে লালন-পালনের অপেক্ষা না রেখেই আপনিই পাঠক সমাজে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। তাদের সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয়। উপন্যাস পাঠে বাংলা পাঠকের এতাদৃশ সুযোগ এবং সুবিধা বোধ করি ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি।

তবু কোনরূপ বিতর্কের অবতারণা না করেই একথা বলা চলে যে, বর্তমান বাংলা উপন্যাসের এহেন প্রাদুর্ভাবে কোন স্থায়ী বা সার্থক সৃষ্টির সাক্ষাৎ অতি অল্পই মিলেছে। ফলে উপন্যাসের প্রকৃত পাঠকের রসপিপাসা অতৃপ্তই থাকছে। কিন্তু 'রাধা' তাহার বিস্ময়কর ব্যতিক্রম! বার বছর আগে উপন্যাসটি এই পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল; তখন ইহার আকার অনেক ক্ষুদ্র ছিল, বর্তমানে পুস্তকাকারে ইহার কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপন্যাসের সর্বগুণ সমন্বিতা হয়ে পাঠক-সমাজে উপস্থিত হয়েছে। বিলম্বেরও কারণ আছে। তারাশংকর সেই জাতের লেখক যাঁরা কিছুতে আপন সৃষ্টির প্রাথমিক রূপায়ণে সন্তুষ্ট নন। তাঁর সব লেখাই প্রতিটি সংস্করণে পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়। ভাল মন্দর বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঔপন্যাসিক তারাশংকরের মানসিক গঠন। লেখকের অতৃপ্তি মহৎ সৃষ্টির মন্ত্র এবং প্রেরণা আর 'রাধা' সেই প্রেরণাসম্ভূত নিঃসন্দেহে একটি মহৎ সৃষ্টি।

প্রায় আড়াই শ' বছর আগে রাঢ় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনের পটভূমিতে 'রাধার' কাহিনী রচিত। এক দিকে ইহাকে বৈষ্ণব জীবনদর্শনের মূল্যায়ন বলা চলে। বিশেষ করে তদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-বিরোধ এবং ধর্মীয় আচার-আচারণের বিভিন্নতা নিয়ে 'রাধার' কাহিনীর সূত্রপাত। কৃষ্ণা দাসী বৈষ্ণব সাধক প্রেমদাস বাবাজীর পুত্রবধূ, কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে ইলেমবাজারের ধনী ব্যবসায়ী রমণ দাস-সরকারের সাধনকুঞ্জে পরকীয়া প্রেমের সাধিকা। ন্যাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবরণে এ-সাধনায় বাধা নেই, দোষ নেই, নিন্দা নেই; কিন্তু কৃষ্ণা দাসীর ভাবনা তার ষোড়শী কন্যা, অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী মোহিনীকে নিয়ে। দাস সরকারের দুর্বিনীত, বর্বর পুত্র অক্রূরের লোভ মোহিনীর প্রতি, কিশোরী ভজনের যোগ্য পাত্রী। মনের অগোচরে পাপ নেই, শত প্রলোভনেও ধনীর লালসার ইন্ধন সে আপন আত্মজাকে দিয়ে যোগাতে চায় না। মনের বাসনা মনে রেখে কৃষ্ণদাসী দিন গোণে। সুযোগ একদিন মেলে, অজয়ের ঘাটে সহসা আবির্ভাব হয় সংসার-ত্যাগী ধনীর দুলালের। দর্শনে মা-মেয়ে বিমোহিতা হয়। কে এই উজ্জ্বলকান্তি, প্রভাত-অরুণ সদৃশ নবীন সন্ন্যাসী? সংবাদ আনলে বৈরাগী, কংসারি কৃষ্ণের মন্দির স্থাপন করেছেন মাধবানন্দ শ্যামগড়ে, রাধা বিদ্বেষী, পরকীয়া সাধনার ঘোরতর বিরোধী কামিনীবিমুখ। নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস কৃষ্ণদাসীর, নবীন সন্ন্যাসীর মন ভুলাতে সচেষ্ট হয়, হয়তো মোহিনীর মনোমত পাত্র জুটেছে এতদিনে! মাধবানন্দ অটল। কৃষ্ণ-

দাসী আপন জন্বালায়, অতৃপ্ত কামনায় জবলে মরে, মোহিনী ঘর ছেড়ে পথে বেরয়। রাধার প্রকৃত সাধনার শুরু এইখানে।

স্বকীয়া, পরকীয়া সাধনার অনেক তত্ত্বানুসন্ধান, বাদবিসম্বাদ এ উপন্যাসে আছে; রাজশক্তির উত্থান পতনের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট। সুদূরে দিল্লি থেকে রাজশক্তির রদ-বদলের সংবাদ বাংলায় এসে পেণছায়, বগীর হাঙ্গামা হয়, ফলে দেশের সামাজিক জীবনে নিদারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়। সে সকলেরও নিখুত চিত্র এ উপন্যাসে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত। তবু বলবো সমকালীন ইতিহাসের অনেক ঘটনা এ কাহিনীর অনেকখানি ব্যপ্ত হয়ে থাকলেও 'রাধা' কোন তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। স্বকীয়া, পরকীয়া এবং রাধাতত্ত্বের প্রকৃত মর্মোপলব্ধি করা 'রাধা'র উদ্দেশ্য। রাধা কি, শ্যাম কি, ভক্তি কি, প্রেম কি, বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভাব কি, সরস কাহিনী মাধ্যমে পাঠকের মনে এমন করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সদুত্তর আর কোন বাংলা উপন্যাসে আমরা পাইনি। মাধবানন্দের কর্মোদ্দীপনা, ধর্মবিশ্বাস এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা পাঠককে মুগ্ধ করে সত্য, কিন্তু মোহিনীর দুঃখসাধনায় পরিস্রুত প্রেমের মাধুরী পাঠককে আচ্ছন্ন করে। সে খুশী হয় 'রাধা-কামনায়' মাধবানন্দের অসংকোচ বাহু যখন বিস্তৃত হয়।

এ আখ্যায়িকার আরম্ভ দোলযাত্রা শুক্ল-পক্ষ প্রতিপদে, উপসংহার হেমন্ত শুক্ল রাস-পূর্ণিমার উদয় মুহূর্তে ষোল বছর পরে। পাঠ শেষে মনে হবে একটা বিরাট ঘটনা-স্রোতে পাঠকমন অকাতরে সন্তরণ করল, অবগাহনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হলো।

'রাধা' বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস ভাণ্ডারে একটি স্থায়ী সংযোজন এবং ঔপন্যাসিক তারাশংকরের অক্ষয় কীর্তির আর-একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। উপন্যাসটি সুধী পাঠকের কেবল দৃষ্টি আকর্ষণই করে নি, বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। মাত্র এক বৎসরে তিনটি সংস্করণই তার প্রমাণ। ২৬০।৫৯

পার্ক—সরিৎশেখর মজুমদার। প্রাচী পাবলিকেশনস, ২।২, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা—২৯। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গঠন-রীতির কৌশলের দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এর মানব নায়িকা ঊষানলিনী চরবালবেড় নামে এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়ে, অন্য নায়িকা কলিকাতা শহরের ওয়েলিংটন পার্ক। এদের একের বেদনা অপরের বুকেও বেদনা জাগায়, মানুষ ঊষানলিনীর দুঃখে বিরাট প্রকৃতির অংশ পার্কেরও বুক বেদনায় টনটন করে ওঠে—এই সহজ সত্যেরই স্বীকৃতি বই-খানিকে সাধারণ গোয়েন্দা কাহিনী হতে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে, শাশ্বত মানব-মহিমার ওপর ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ওয়েলিংটন পার্কের বুকে একদিন পাওয়া গেল একখানি কাটা হাত। তারই তদন্তসূত্রে ইন্সপেক্টর হারাণ গুপ্ত গ্রেপ্তার করলেন জীবানন্দকে, তার মেসবাড়ী থেকে খুঁজে পেলেন এক অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডু-লিপি। শেষ পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপি পড়েই তিনি জানতে পারলেন ঊষানলিনীর কাহিনী। কিভাবে তার উচ্ছৃংখল স্বামী সতীনাথের সঙ্গে সটারীর টাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয় বিণ্টু ঘোষালের, কিভাবে তারই প্রচণ্ড আঘাত শেষ পর্যন্ত পড়ে ঊষার ওপর, ছেচল্লিশের দাঙ্গায় কিভাবে সে ছিটকে এসে পড়ে কলিকাতায়, আশ্রয় পায় ডাঃ সুধামাধবের, তার সাথে পরিচয় হয় সুধামাধবের ভাই রতনের। সবই তিনি ঐ সূত্রেই জানতে পান এবং তারই ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত আসল অপরাধীকেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। এটুকুই বইখানির মূল কাহিনী।

এই কাহিনীর রূপায়নে যেসব চরিত্র ভিড় করে এসেছে, তাদের পরিকল্পনায় লেখক মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনী পরিকল্পনার অনন্যসাধারণত্বের মত ঊষা-নলিনী, ডাক্তার প্রভৃতি চরিত্রও পাঠককে মুগ্ধ করে। বইখানি পড়ে পাঠকমাত্রই যে তৃপ্ত হবেন, সে কথা অসংকোচে বলা যেতে পারে। ১৬১।৫৯

অরণ্য বাসর—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। ছয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের সর্বাধুনিক উপন্যাস। এক বিস্তৃত পটভূমির পরি-প্রেক্ষিতে রচিত এই গ্রন্থখানিতে তারা-শংকরের প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু তারাশংকরের রচনায় যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব সমাজ ও তার অধ্যাত্ম ভাব-মণ্ডল এক অদ্ভুত সমন্বয়ে মিলিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই সংহতির প্রকাশ

এখনও পরিপূর্ণ রূপে লাভ করে নি। তাই কথারম্ভে ডাকুর-বাদার যে চমৎকার ব্যঞ্জনা-ময় বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তার সত্য সার্থকতা বইখানার কোথাও পাওয়া যায় না। 'বড় জাগ্রত দেবতা এই ডাকুরবাদার মহা-কালের' ক্ষমতার প্রকাশ বসুমতী দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়া বা নিতান্ত অলৌকিক-ভাবে মহাকাল মূর্তি পাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে। 'ডাকুরবাদার শেষ দস্যু, এ অঞ্চলের বিভীষিকা' রামলাল সর্দারের পত্র বিশাই খুনের অপরাধে জেল খেটে বেরিয়ে প্রেমিকাকে খুঁজে বের করতে গাড়ির ক্লিনারের কাজ নেয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, বইখানি প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। ভবানীর চরিত্র আমাদের মনে কোনো দাগ না কাটলেও অনুরাধার বহুধা বিড়ম্বিত জীবনের, তার স্বামীর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষার কাহিনী আমাদের অন্তরেও দোলা দেয়। পরিণতিতে অতি নাটকীয়তার উচ্ছ্বাস থাকলেও উল্লাসী ও অশোক চরিত্র পাঠক-মাত্রেরই ভালো লাগবে। লেখকের ভবিষ্যৎ রচনা বৃহত্তর অনুভূতির গভীরতায় উৎসারিত হবে, আমরা এই আশাই করি।

১৯২।৫৯

রক্ত তিলক—স্টিফেন ক্রেন। অনুবাদকঃ সত্যব্রত বসু, গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ১.৫০ নঃ পঃ।

আমেরিকার বিভিন্ন লেখকের রচনার অনুবাদ গ্রন্থম কিছুকাল ধরে প্রকাশ করে চলেছেন। রক্ত-তিলক সেই পর্যায়ের একখানি উপন্যাস। মূল উপন্যাসের নাম ছিল রেড ব্যাজ অফ কারেজ, আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা এই উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীটি এক সময়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশ স্টিফেন ক্রেন-এর জীবৎকাল। জীবনের প্রথম ত্রিরিশও তিনি অতিক্রম করেননি, অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু এই স্বল্পপরিসর জীবনেই সাহিত্য-কীর্তিতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। অনুবাদ সাবলীল।

১২৮।৫৯

পত্রিকা

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। পঞ্চষষ্টিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীপুলিন-বিহারী সেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই মুখপত্রের সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হয়েছে শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের উপর। তাঁর সম্পাদনায় এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্পাদন-দক্ষতার ছাপ বর্তমান সংখ্যাতেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। চয়ন শিল্পে পুলিনবাবুর দক্ষতা অসামান্য। সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ 'বাঙ্গালীর নিজস্ব বাণী মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধ ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুলিনবাবু সেই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন। আচার্য যদুনাথ সম্বন্ধেও তথ্য-পূর্ণ রচনা আছে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীরাজেশ্বর মিত্র প্রমুখ লেখকবর্গের রচনার দ্বারা সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

ভ্রম সংশোধন

গত ৩৬ সংখ্যা দেশে স্মৃতিচারণের শেষ অনুচ্ছেদের মাঝামাঝি এক জায়গায় মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ রাজমন্ত্রীর স্থলে রাজমিস্ত্রি ছাপা হয়েছে। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক দেশ

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

স্বপ্নের দেশে—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য।
কলকাতার কাছেই—গজেন্দ্রকুমার মিত্র।
ধীর প্রবাহিনী ডন—মিখাইল শলোখফ অনুবাদক—অবন্তী সান্যাল।
ভুস্বর্গের অভ্যন্তরে—জ্যোৎস্নাময় চৌধুরী।
তুষার তীর্থে—শ্রীঅনিলবরণ চৌধুরী।
অঙ্গীকার—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
রূপসী—তারাপদ রাহা।
জয়তু সন্তদাস—স্বামী গণেশ্বর দাস।
সুন্দরী কাশ্মীর—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

চন্দ্রশেখর

বণ্টন ব্যবস্থায় গলদ

বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ যে সম্মান ও সাংস্কৃতিক গৌরব অর্জন করেছে, তার মূলে বাংলা ছবির অবদান অনস্বীকার্য। অথচ শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্র এই কলকাতায় চিত্র-প্রযোজকদের আজ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সংকট দৈব-দুর্ঘটনা নয়, সহ-ব্রতীদের অবজ্ঞা ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফল।

১৯৫৭ সনে কাঁচা ফিল্ম-এর উপর কণ্ট্রোল চালু হবার পর কেন্দ্রীয় কাঁচা ফিল্ম বণ্টন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোট আমদানীর শতকরা ১২½ ভাগ কলকাতা অঞ্চলের ন্যায্য প্রাপ্য বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কলকাতা বরাবরই এই নির্দিষ্ট প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বেঙ্গল মোসন পিকচার এসোসিয়েশনের প্রযোজক শাখা সম্প্রতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তাঁরা তাঁদের বিবৃতিতে একথাও বলেন যে, অচিরে নির্দিষ্ট পরিমাণে কাঁচা ফিল্ম কলকাতায় সরবরাহ করা না হলে জুলাই মাসের শেষের দিকেই এই অঞ্চলে চিত্র প্রযোজনার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

উক্ত সংস্থার তথ্যপূর্ণ বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, এই সংকটের মূলে রয়েছে বোম্বাই আঞ্চলিক কমিটির হস্তক্ষেপ। কলকাতার প্রাপ্য কাঁচা ফিল্ম মাদ্রাজে পাঠিয়ে এই কমিটি বদান্যতা দেখিয়েছেন, অথচ এখানে যখন এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুটির অনটন ঘটেছে, তখন মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া তাঁরা আর কিছু দিতে পারেন নি। এর ফলে কণ্ট্রোল চালু হবার প্রথম বছরেই কলকাতার ন্যায্য বরাদ্দে ঘাটতি পড়ে। কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করেন যে, এই ঘাটতি কয়েকটি কিস্তিতে পূরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তারপর পুরো একটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আগেকার ঘাটতি পূরন করা তো দূরের কথা, এ বছরকার প্রাপ্য বরাদ্দও ঠিকমত কলকাতায় এসে পৌঁছচ্ছে না। ফলে বর্তমান সংকটের উদ্ভব হয়েছে।

আসন্ন বিপত্তির প্রতি কেন্দ্রীয় ইম্পোর্ট কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বি এম পি এ তাই প্রস্তাব করেছেন যে, কলকাতার ন্যায্য পাওনা এখানকার আঞ্চলিক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যেন আমদানী করা হয় এবং তা বণ্টন করবার ব্যবস্থা বোম্বাইয়ের মর্জিমত না হয়ে যেন কলকাতার জয়েণ্ট চীফ কণ্ট্রোলার অফ ইম্পোর্টস-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভবিষ্যতে সংকট এড়াবার এই একমাত্র উপায় বলে কলকাতার প্রযোজক প্রতিষ্ঠান মনে করেন।

বর্তমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বি এম পি এ প্রয়োজনমত কাঁচা ফিল্ম যাতে আশু সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়, তার দাবী জানিয়েছেন।

বাংলা ছবির প্রযোজনা ক্ষেত্রে বর্তমান সংকট যে কি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের চৈতন্যোদয় হোক —এই শিল্পের কল্যাণকামী সকলেই তাই চাইবেন। এর দ্রুত প্রতিকার করতে না পারলে শুধু যে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়, তার ফলে সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের শিল্পমান যে কতদূর নেমে যাবে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। উপরন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রধান তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে একটির কর্ম প্রচেষ্টায় ছেদ পড়লে যে অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা ভারতের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভ হবে না। সরকারী ও বেসরকারী সকল সংশ্লিষ্ট মহলই সময় থাকতে এবিষয়ে অবহিত হবেন আমাদের এইটুকু কামনা।

এশিয়ান ফিল্মসের "গলি থেকে রাজপথ" -এর নায়ক উত্তমকুমার। ছবিখানি এই সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে

চিত্রালোচনা

'গলি থেকে রাজপথ' নামটির মধ্যে জীবনের আঁকাবাঁকা পথের ইঙ্গিত আছে। এই নামে এশিয়ান ফিল্মসের যে বাংলা ছবিটি এই সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে, তাও দুটি তরুণের নানা উত্থান-পতনেরই ইতিবৃত্ত। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায় তোলা এই ছবির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, ছায়া দেবী ও নবাগতা দুর্গা দে। একটি নৃত্যাংশে বোম্বাইয়ের হেলেনকেও দেখা যাবে। সুধীন দাশগুপ্ত এতে সুর যোজনা করেছেন।

* * *

'তালাক' ছবির নির্মাতা অনুপম চিত্রের আর একটি নতুন সৃষ্টি 'সন্তান'। এই হিন্দী ছবিটিও এ সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ। 'তালাক'এ অভিনয় করে যে তিনজন শিল্পী কামিনী কদম, রাজেন্দ্রকুমার ও শিশু অভিনেতা অশ্বিনীকুমার—প্রভৃত প্রশংসা পেয়েছিলেন, এছবির মুখ্যাংশেও তাঁরাই আছেন। অন্যান্য ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন নাজীর হোসেন, লীলা মিশ্র, নিরঞ্জন, তিওয়ারী, মনোরমা ও ডেভিড। পণ্ডিত মুখরাম শর্মা রচিত গল্পটি ছবিতে রূপান্তরিত করেছেন পরিচালক জ্যোতি স্বরূপ। দত্তারাম এর সুরকার।

* * *

এ সপ্তাহের দ্বিতীয় হিন্দী ছবি 'ইনসান জাগ উঠা'। শক্তি সামন্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন মধুবালা ও সুনীল দত্ত। পার্শ্ব চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন নাজীর হোসেন, বিপিন গুপ্ত, মিনু মমতাজ, নিশি, সুন্দর, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি। সরোজ মিত্র ও নবেন্দু ঘোষ যথাক্রমে এর গল্প লেখক ও চিত্রনাট্যকার। শচীন দেব বর্মণ সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন।

* * *

আঘাত-সংঘাতে ভরা এই পৃথিবীতে কত বিচিত্র রকমের মানুষের আনাগোনা। ক্ষণিকের দেখাশোনায় যতটুকু পরিচয়, তাই নিয়েই কারবার চলে সংসারে। কবির ভাষায় 'যে সূত্রে গাঁথা রবে সহস্রটি প্রাণ'—মিলনের সেই যোগসূত্রটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বনফুলের 'কিছুক্ষণ' কাহিনীটির মধ্যে রয়েছে সেই সূত্রেরই ইঙ্গিত।

এই বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে সানরাইজ ফিল্মস তুলেছেন ততোধিক অভিনব ছবি 'কিছুক্ষণ'—আগামী সপ্তাহে যার মুক্তি ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বজোড়া মানব বৈচিত্র্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে এক ট্রেন ভর্তি যাত্রীর আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় তারা একটি ছোট্ট ষ্টেশনে এসে

আটকে পড়েছে। এই অভিনব পটভূমিতে ছবির কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। ষ্টেশন ও রেল লাইন সমেত গোটা একটি ট্রেন লেগেছে ছবিটি তুলতে। শিল্পী সমাবেশও করতে হয়েছে প্রচুর। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, অসীমকুমার, জীবেন বসু, নিভাননী, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতির নাম।

বনফুল-অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন। নচিকেতা ঘোষের সুরারোপেও ছবিটির বৈচিত্র্য বেড়েছে।

* * *

অন্যান্য মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে এস বি ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনালের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', ইণ্ডো বর্মা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'ছবি', ইংকা প্রোডাকশন্সের 'নৃত্যের তালে তালে' এবং চিত্রেশ্বরীর 'ভয়'।

শিবরাম চক্রবর্তীর শিশু কাহিনী অবলম্বনে তোলা 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' আর দু' এক হপ্তার মধ্যেই চিত্রামোদীদের মুখে হাসি ফোটাতে আসছে। 'অযান্ত্রিক'-খ্যাত ঋত্বিক ঘটক এর পরিচালক। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি বড়দের ভূমিকাগুলি রূপায়িত করেছেন। আর নতুন প্রতিভার চমক নিয়ে আসছে ক্ষুদে অভিনেতা পরম ভট্টারক লাহিড়ী। সে-ই এ ছবির শিশু-নায়ক।

'ছবি' শরৎচন্দ্রের একটি বিখ্যাত গল্পের চিত্ররূপ। বর্মায় গিয়ে এর বহিদৃর্শ্যাবলী তুলে আনা হয়েছে। মালা সিংহ, আশীষকুমার, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, নিভাননী প্রভৃতি এর মুখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন নীরেন লাহিড়ী।

সুধীরবন্ধু পরিচালিত নাচ-গানে ভরা ছবি 'নৃত্যের তালে তালে' একাধিক নূতনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। রাগিনী, সুকুমারী ও গোপীকৃষ্ণ—দক্ষিণ ও উত্তরের এই তিন নৃত্য প্রতিভার সঙ্গে বাংলার মরমী শিল্পীগোষ্ঠীর ত্রিবেণী সংগম হয়েছে এই ছবিতে। শেষোক্ত দলে আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, সন্ধ্যা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

'ভয়' গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু রচিত ও পরিচালিত একটি রোমাঞ্চকর ছবি—বাঙলায় যার একান্ত অভাব। এর চিত্র গ্রহণ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। অসিতবরণ, বীরেশ্বর সেন, শিশির মিত্র, মিহির ভট্টাচার্য, সবিতা বসু, শিপ্রা মিত্র প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছেন।

* * *

রথযাত্রার পুণ্য লগ্নে তারা প্রোডাকশন্স তাদের প্রথম ছবি 'পঞ্চমিত্র'-এর শুভ মহরৎ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন করেছেন। সুনীত মুখোপাধ্যায় ও শ্যাম মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে এর কাহিনীকার ও পরিচালক। তন্দ্রা বর্মণ, তপতী ঘোষ, পদ্মা দেবী, জহর গাংগুলী, তরুণকুমার, তমাল লাহিড়ী, জহর রায়, হরিধন প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

আবেগানিবিড় চিত্রকাব্য

একটি সার্থক ও সুন্দর শিল্পসৃষ্টির স্বাক্ষর নিয়ে এসেছে বিমল রায় প্রোডাকশনসের হিন্দী ছবি 'সুজাতা'। সুসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ও সুদক্ষ রূপকার বিমল রায়ের শুভ যোগাযোগে এই ছবির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এক অচ্ছুৎকন্যার অশ্রুসজল কাহিনীকে ঘিরে যে নাটকীয় রস এর মধ্যে উৎসারিত হয়েছে তা আপ্লুত করে দর্শকের মনকে, তার মর্মমূলে শিহরণ জাগায়।

সুজাতা অচ্ছুৎকন্যা। পৃথিবীর বুকে চোখ মেলবার কিছুদিনের মধ্যেই সে হয়ে পড়ে পিতৃমাতৃহীন অনাথ। স্বজাতিদের চেষ্টায় তার আশ্রয় জোটে ব্রাহ্মণ এঞ্জিনীয়ার উপেন্দ্রনাথের বাড়িতে। তাঁর একমাত্র মেয়ে রমার সংগে একই বাড়িতে সে বড় হয়। সুজাতাকে গভীরভাবে স্নেহ করেন উপেন্দ্রনাথ; তাঁর স্ত্রী চারুদেবীর অন্তরেও সুজাতার প্রতি ভালবাসার অভাব নেই। কিন্তু আজীবনের সংস্কার ও সমাজের অনুশাসনের ফলে সুজাতা কোনদিনই তাঁদের মেয়ে বলে স্বীকৃত হয় না, মেয়ের মতো বলেই তার পরিচয়।

'মেয়ে' আর 'মেয়ের মতো'-এর এই ব্যবধান রমা আর সুজাতার জীবনে শৈশব থেকে প্রকাশ পেয়েছে জীবনযাপনের দুই ভিন্নমুখী ধারায়। রমার মতো বিলাস-ঐশ্বর্য আর বাইরের জীবনের আনন্দধারার অধিকার সুজাতা না পেলেও সে উপেন্দ্রনাথের পরিবারের সেবার অধিকারের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিয়েছে তার জীবনের সব আনন্দ ও সার্থকতার উৎস।

কিন্তু যেদিন সে জানতে পারল যে, সুজাতা নাম তার জীবনে একটি বিরাট পরিহাসের মতো এবং নীচকুলে তার জন্ম, সেদিন থেকেই তার জীবনে এল বেদনার প্রহর গুনে গুনে দিন কাটাবার পালা। এমনি দিনেই তার কুণ্ঠিত জীবনে আনন্দের পসরা নিয়ে প্রবেশ করল অধীর। বিদ্বান, চরিত্রবান ও অভিজাত পরিবারের একমাত্র বংশধর এই অধীরের সংগে রমার বিয়ের কথা প্রায় পাকাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুজাতাকে প্রথম দিন অধীর দেখল এক পরম বিস্ময়ের চোখে—শুচিস্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তি এক কন্যা, কি এক অব্যক্ত

বেদনায় যেন শান্ত, মগ্ন, হাতে তার প্রস্ফুটিত চন্দ্রমল্লিকা। অধীর ভালোবাসল সুজাতাকে; অস্পৃশ্যা অধীরের প্রেমের স্পর্শে পেল এক আনন্দলোকের সন্ধান।

আদর্শবাদী অধীরের কাছে কোন মানুষই অস্পৃশ্য নয়। তাই যখন সে সুজাতাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার প্রস্তাব করল, ভয়ে আর সংকোচে কেঁপে উঠল সুজাতার মন। তার বেশী করে মনে হল উপেন্দ্রনাথ ও চারু দেবীর কথা—যাঁরা অধীরের মতো সুপাত্রের হাতে রমাকে সম্প্রদান করবেন বলে আশায় দিন কাটাচ্ছেন। সুজাতা নিজের চোখের জল গোপন করে অধীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, রমাকে গ্রহণ করবার জন্য তাকে অনুনয় করল। কিন্তু অধীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার সংকল্পের কথা যখন জানলেন চারু দেবী, তখন তিনি ভুল বুঝলেন সুজাতাকে। উত্তেজনার বশে সুজাতাকে তিরস্কার করতে গিয়ে তিনি আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। অন্যের রক্ত দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেল কারোর রক্তের সংগেই তাঁর রক্তের মিল নেই, একমাত্র সুজাতার রক্তের সংগেই তাঁর রক্তের মিল। সুজাতার রক্তেই বেঁচে উঠলেন চারু দেবী। ক্রমে ক্রমে জানতে পারলেন তিনি সুজাতার উদারতা ও আত্মত্যাগের কথা। মায়ের অপার স্নেহ দিয়ে সুজাতাকে টেনে নিলেন নিজের বুকে; অধীরের জীবনের সংগে গেঁথে দিলেন তার জীবনকে। রক্তঝরা বেদনায় সুজাতা যা জানাতে পারেনি সংসারকে, রক্ত দিয়ে সে জানিয়ে দিল যে, সে সত্যিই সুজাতা।।

সুবোধ ঘোষের এই আবেগনিবিড় উপাখ্যানটিকে দুর্বার নাট্য আবেদন ও নিবিড় মানবিক রসে মণ্ডিত করে রজতপটে পরিবেশন করেছেন পরিচালক বিমল রায়। তিনি ছবিতে একদিকে যেমন এক অস্পৃশ্যা, সমাজ লাঞ্ছিতা নারীর জীবন-ভাষ্যটিকে বেদনার প্রলেপে ও মানবিকতার বিচ্ছুরণে অপূর্ব মরমী করে তুলেছেন, তেমনি নিসর্গ সৌন্দর্যের অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় রচনা করেছেন একটি অভিনব চিত্রকাব্য। মানুষের সমাজের কাছে ব্যথা পেয়ে সুজাতার বেদনা-বিধুর মন যেন মধুর সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায় প্রকৃতির অকৃপণ সমবেদনায়। সুজাতার অস্ফুট বেদনায় প্রকৃতি যেন কাঁদে, তার হাসিতে ফুল পাপড়ি মেলে। ফুলের মতোই শুচি-শুভ্র যেন এই চরিত্রটি, ফুলের গন্ধে সুরভিত। পরিচালক বহিঃপ্রকৃতির বর্ণাঢ্য ও রূপাঢ্য পরিবেশে ছবিতে একের পর এক দৃশ্য-কাব্য, ব্যঞ্জনা ও প্রতীকের সৃষ্টি করে এমন একটি গীতিময়তা এনে দিয়েছেন, যার ফলে সামান্য এক অচ্ছুৎকন্যার কাহিনী একটি অসামান্য ব্যথার কবিতা হয়ে ধরা দেয় রসজ্ঞ দর্শকদের কাছে। সুজাতার ব্যথা-ভরা জীবনে প্রথম প্রেমের স্পর্শ যে আনন্দলোকের বার্তা নিয়ে আসে, তার ব্যঞ্জনা কতকগুলি দৃশ্যবিন্যাস ও সুরের ঝংকারের মধ্য দিয়ে পরিচালক অনবদ্য-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়াও পরিচালকের কবিমন, রূপরীতির সুসমঞ্জস ব্যবহার ও সর্বোপরি পরিমিত নাট্য-বোধের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে ছবিটির সর্বাংগে।

সামগ্রিকভাবে একটি অভিনব চিত্রসৃষ্টি হলেও ছবিটির কয়েকটি ছোটখাট বৈসাদৃশ্য মনকে পীড়া দেয়। বাঙালী পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতেই এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। রমাকে সর্বক্ষণ যে-পোশাকে দেখা গেছে বাঙালী দর্শকের কাছে তা দৃষ্টিকটু লাগবে। রমার জন্মদিনের নাচ-গানের দৃশ্যটিও ছবির সর্বাংগীণ রুচির দিক দিয়ে সহজগ্রাহ্য নয়। ছবির নাট্যরসের হানি না করলেও বার বার ছবিতে মহাত্মা গান্ধীর ফটো মূর্তি ও পাথরে খোদাই বাণী যেভাবে দেখানো হয়েছে এবং অধীরের সংলাপে মহাত্মা গান্ধীর জীবনের একটি ঘটনা যেভাবে স্থান করে নিয়েছে, তাতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রচারধর্মিতার আভাস মেলে।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য এ-ছবির একটি বিশেষ সম্পদ। নাম-ভূমিকায় নূতন যে দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে চরিত্রটিকে রূপায়িত

করেছেন, তা তাঁর শিল্পীজীবনের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। চরিত্রটির অস্ফুট অন্তর-বেদনা, আবার প্রেমের স্পর্শে ক্ষণিকের শান্ত প্রাণাবেগ, চরিত্রটির স্বাভাবিক নম্রতা ও শান্তভাব তিনি অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপেন্দ্রনাথের চরিত্রে তরুণ বসুর অভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবে। পিতৃহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে তিনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। অধীরবেশী সুনীল দত্তের অভিনয়ও অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। চরিত্রটিতে তিনি একান্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিত্ব ও সংযম আরোপ করেছেন। আচার-পরায়ণা গিরিবালার ভূমিকায় ললিতা পাওয়ারের অভিনয়ও এক কথায় চমৎকার। চারু দেবীর ভূমিকায় সুলোচনা ও রমার চরিত্রে শশিকলার অভিনয় প্রাণবন্ত। পার্শ্ব-চরিত্রে অসিত সেন, পল, মহেন্দ্র, মণি চ্যাটার্জি, বৈজ শর্মা, বেবী ফরিদা ও বেবী শোভার নাম উল্লেখযোগ্য।

সুরকার শচীন দেববর্মণ তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় নতুন করে দিয়েছেন এ-ছবিতে। তাঁর সুরারোপিত আবহ-সংগীত ছবির নাট্যমুহূর্তে রচনায় যেভাবে সহায়তা করেছে, তা অতুলনীয়। তাঁর দেওয়া সুরে গাওয়া কয়েকটি গান ও গানের টুকরো টুকরো অংশ ছবিটিকে গীতিময় করে তুলেছে। এক্ষেত্রে পরিচালকের কৃতিত্ব হল, তিনি প্রখ্যাত সুরকারের সুরসৃষ্টি দিয়ে ছবিটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন সুকল্পিত প্রয়োগের ফলে। 'কালীঘটা ছায়ে মেরা জিয়া তরসায়ে' ও 'জ্বলতে হ্যায় জিসকে লিয়ে তেরি আঁখো'—গান দুটি সুরে ও কণ্ঠদানে অপূর্ব।

কমল বসুর পরিচালনায় মণ্টু বসুর আলোকচিত্র ছবিটিকে মায়াময় করে তুলেছে। আলো-আঁধারের এমন কবিত্বপূর্ণ বিন্যাস খুব কমই দেখা যায়। তেমনি অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সম্পাদনায় অমিত বোস, শিল্পনির্দেশে সুধেন্দু রায় ও রূপসজ্জায় বিজয় কুমার। আঙ্গিক পারিপাট্য ও সমগ্র কলাকৌশলের দিক দিয়ে ছবিটি উঁচুদরের।

চিঠিপত্র

বিদেশে ভারতীয় ছবি ও শিল্প

মহাশয়,

"দেশ"-এর ২৯শে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় শ্রীমতী সোনালী দাসগুপ্ত "কান ফেস্টিভ্যাল-এর চিঠি"-তে মাঝে মাঝে যে মন্তব্য করেছেন তার অনেকগুলোর সংগে একমত হতে পারলাম না। গোড়াতেই তিনি লিখেছেন—"দেশী ছবি যখন কান, ভেনিস, এডিনবরা বা কার্লোভিভারীতে যায়, তখন বাইরে যাই ঘটুক, দেশে কেবল তার বিজয়ের রটনাই হয়"—একথাটা হয়তো একান্তই "লাজবন্তী" সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেননা "দো বিঘা জমিন", "পথের পাঁচালী", "কাবুলিওয়ালা", "অপরাজিত", "দো আঁখে বারাহ্ হাত" বাস্তবিকই যে এদেশে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছে, তা এদেশের পত্রপত্রিকা মারফত প্রায়ই চোখে পড়ে।

এই কিছুদিন আগেই এখানে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রেস কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। নরওয়ে মোসন পিকচার্স এসোসিয়েশনের সভানেত্রী সমেত জার্মান চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের কাছে ভারতীয় ছবির অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে শুধু ভেবেছি—আমাদের ভালো ভালো ছবি কি

বিদেশে নিয়মিত পরিবেশন করা সম্ভব নয়?

ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রীমতী দাশগুপ্তের নিজের কথায় "এদেশের অনেকেরই ধারণা যখন curry, Yoga, Sacred cow. Suthee. child marriage.
"তেই সীমাবদ্ধ তখন আমাদের প্রাচীন মন্দির ইত্যাদি তো এরা ঘেঁটে আর কিছু বাকী রাখেন নি"—কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে না কি? ভারতের প্রাচীন মন্দির ইত্যাদি সম্পর্কে হয়তো প্রাচ্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিছুসংখ্যক অধ্যাপক ওয়াকিবহাল। কিন্তু সাধারণের মধ্যে তার বহুল প্রসারের কতখানি আবশ্যক, তা পশ্চিম জার্মানীর এসেন শহরে "ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের শিল্প"—এই নামের প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা সহজেই প্রমাণ করে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও পরবর্তী মুসলমান যুগে আমাদের শিল্পকলার যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছিল, তা পাশ্চাত্যের জানবার আছে বৈকি এবং জানাবার দায়িত্ব যে আমাদের, একথা নিশ্চয়ই শ্রীমতী দাসগুপ্ত অস্বীকার করবেন না। খাজুরাহো, কোনারক, তাঞ্জোর মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সকল সময়ে সব দেশের পক্ষেই বিস্ময়ের বস্তু—তা নিঃসন্দেহ।

পরিশেষে "পঁয়ত্রিশ হাজার লোক পিঁপড়ের মত একটার পর একটা পাথর বয়ে চলেছে"—এর মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের বাস্তবিকই কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি? এ দেশের যে কোন সংগঠনমূলক কাজের সংগে যাঁরই এতটুকু পরিচয় আছে—এই ছবি থেকে নিতান্তই দুঃখের সংগে স্মরণ করবেন—আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই বিরাট শ্রমকে কত সহজে আরও কার্যকরী করা সম্ভব হতো। এই সংগে "মেয়ে কুলী" নিয়োগ আমাদের বেকার সমস্যার ভয়াল রূপটাই বড্ড বেশী করে মনে করিয়ে দেয়। ইতি

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য,
ল্যুবেক, জার্মানী।

বিবিধ সংবাদ

গত ৬ই জুলাই বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী এম বি বিলিমোরিয়া ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বি-কম্ পাশ করে তিনি সিনেমা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। পরিবেশনার ক্ষেত্রেই তাঁর কর্মশক্তির ব্যাপ্তি ঘটে এবং বোম্বাইয়ে এম বি বিলিমোরিয়া এণ্ড সন্, কলকাতায় বিলিমোরিয়া এণ্ড লালজী এবং দিল্লিতে বিলিমোরিয়া এণ্ড ছোটুভাই তাঁর ব্যবসায় সাফল্যের নিদর্শন বহন করছে। এগুলি ছাড়া তিনি আরো বহু প্রতিষ্ঠানের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। উপর্যুপরি দু বছর তিনি ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। পার্শী সম্প্রদায়ের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি মেংগুলি সর্বজনিক হাসপাতাল ও ধর্মশালায় দু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একটি মাত্র পুত্র রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী বহু পূর্বেই লোকান্তরিত হন।

* * *

বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচিত হয়েছে ফ্রান্সের "লে কুজাঁ"। জাপানী পরিচালক কিরা কুরোসয়া শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান অর্জন করেছেন "দি হিডন্ ফরেস্ট" ছবিতে তাঁর কৃতিত্বের জন্যে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ফ্রান্সের জাঁ গাবা ("আর্চিমেডি দি ভ্যাগাবণ্ড") ও হলিউডের শার্লি ম্যাকলেন ("আস্ক এনি গার্ল")। ভারতের "রাধা-কৃষ্ণ" ছবিটি ডকুমেণ্টারি পর্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

* * *

বিশ্বরূপা মঞ্চে সম্প্রতি প্রবোধকুমার সান্যালের "বনহংসী"-র সার্থক অভিনয় করে নবগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বহুমুখী' রসিকচিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। নটকের সামগ্রিক অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। অতনু, দ্বিজেন ও দীপেনের চরিত্রে যথাক্রমে সুভাষ আচার্য, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ননী হালদারের অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বিভূতি দাশ পরিচালনায় কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবার সত্যি সত্যিই উদ্যোগী হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মুখপাত্র স্টেডিয়াম সম্পর্কে সম্প্রতি যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা থেকে জানা যায়ঃ—

(১) ভারত সরকার স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য এডেনবরা কোর্সের রেড রোড সংলগ্ন পনর একর জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দখল নিতে বলেছেন।

(২) এক পক্ষকালের মধ্যে রাজ্য সরকার এই জমি দখলের ব্যবস্থা করবেন।

(৩) স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারে এমন ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) স্টেডিয়াম নির্মাণের আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকা। এই টাকার আধাআধি দেবেন ভারত সরকার। বাকী অর্ধেক আসবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে।

(৫) পরিকল্পনা রচনা ও অনুমোদনের পর যত শীঘ্র সম্ভব স্টেডিয়ামের কাজে হাত দেওয়া হবে।

(৬) এই উদ্দেশ্যে আগামী বিধান সভার অধিবেশনে একটি বিলও আনা হবে।

(৭) বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারকে চেয়ারম্যান এবং রাজ্যপালের অন্যতম সচিব শ্রীসৌরেন সেনগুপ্তকে সম্পাদক নির্বাচন করে এক স্টেডিয়াম কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে সব সময় সাহায্য করবেন।

খুবই সুখের কথা। এধরনের ছক বাঁধা কথা শুনলে স্টেডিয়াম নির্মাণের বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ক্রীড়ামোদীর না আনন্দ হয়? কিন্তু তবু মনের কোণে একটু সন্দেহ থেকে যায়। কারণ স্টেডিয়াম সম্পর্কে এ পর্যন্ত এত টালবাহানা করা হয়েছে আর এত প্রতি-শ্রুতি ভাংগা হয়েছে যে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। এক সময় মনে হয়েছিল ক্রিকেট স্টেডিয়ামও আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল। এখন খেলার সময় সে ভিত্তি প্রস্তর কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ক্রিকেট স্টেডিয়াম খানিকটা খাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু সিকি সমাপ্ত সে স্টেডিয়াম ক্রিকেট পরিচালকদের নিদারুণ ব্যর্থতার সাক্ষী হিসাবেই দাঁড়িয়ে আছে। যাক কোনো শুভ কাজের আগে অপ্রীতিকর ও অলক্ষুণে কোন কথা না বলাই ভাল। তবু সাংবাদিক হিসাবে নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে যা হয়তো অনেকের কানেই তিক্ত লাগবে। আবার কেউ হয়তো কথাটা ভেবেও দেখবেন।

আমার প্রথম ও প্রধান আপত্তি স্টেডিয়ামের স্থান সম্পর্কে। এমন জায়গায় স্টেডিয়াম রচনা হওয়া উচিত ছিল শহরের সবদিকের লোক যেখানে একটি 'রুট' ধরে উপস্থিত হতে পারে। বলা বাহুল্য এসপ্ল্যানেড ও কর্মচঞ্চল ডালহৌসী অঞ্চলের সন্নিকটবর্তী ময়দান এলাকাই যে এ সম্পর্কে সবচেয়ে উপযোগী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এডেনবরা কোর্সে স্টেডিয়াম হলে এক খিদিরপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছাড়া আর কোন অঞ্চলের লোকই এক 'রুট' ধরে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হতে পারবে না। এতে কলকাতার সমস্যা সংকুল যানবাহনের উপর আরও চাপ পড়বে। ডালহৌসী অঞ্চলের অফিস কর্মীদেরও যানবাহনে করে স্টেডিয়ামে পৌছুতে হবে। কিন্তু ইডেন উদ্যানে, বর্তমান ক্যালকাটা মাঠে বা রাজভবনের সম্মুখস্থ মহমেডান মাঠে স্টেডিয়াম হলে অফিস কর্মীরা সোজা অফিস থেকে হেঁটে গিয়ে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হতে পারতেন। শহরের সব দিকের অধিবাসীও এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ট্রামে বা বাসে এসে স্টেডিয়ামে পৌছুতে পারত। কিন্তু এডেনবরা কোর্সে যেতে হলে একবার গাড়ী বদলে তার পর স্টেডিয়ামে পৌছুতে হবে। যানবাহনের এই সমস্যা অনেকের উৎসাহেও ভাটা আনতে পারে।

আমার যতদূর জানা আছে, তাতে খেলোয়াড়কুল এবং ক্রীড়াপরিচালকরা এডেনবরা কোর্সে স্টেডিয়াম নির্মাণের পক্ষপাতী নন। কিন্তু রাজ্য সরকারের আগ্রহের বিরুদ্ধে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেননি। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে দেশ নেতারা যেমন যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন এবং এজন্য দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতেও দ্বিধা বোধ করেননি, আজ স্টেডিয়াম সম্পর্কেও সেই অবস্থা। দেশ ব্যবচ্ছেদের পর দেশ নেতারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তারা কি ভুলই করেছেন! আমার মনে হয় এডেনবরা কোর্সে স্টেডিয়াম রচনা করা হলেও উদ্যোগীদের পরে আপসোস করতে হবে।

কেন? এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে স্টেডিয়াম খাড়া করার বাধা কোথায়? সামরিক দিক দিয়ে কি অসুবিধা আছে? ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে যদি বাধা না থাকে, তবে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বাধা হবে কেন? ক্যালকাটা মাঠ বা মহমেডান স্পোর্টিং মাঠেই বা স্টেডিয়াম হলে কি ক্ষতি হবে। সামরিক

প্রয়োজনের এক যুক্তি দেখিয়ে ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ এ সব জায়গা ছাড়তে রাজী হননি বলে শুনেছি। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এ যুক্তি খণ্ডনের কোন চেষ্টা হয়েছে কি? এখনো সময় আছে। খেলোয়াড়কুল, ক্রীড়ামোদী এবং ক্রীড়াপরিচালকদের জোর দিয়ে কথাটা বলা দরকার। না হলে পরে অনুশোচনা করতে হবে।

আমার দ্বিতীয় আপত্তি স্টেডিয়ামের দর্শক আসন সম্পর্কে। কলকাতার মত বিরাট শহরের পক্ষে পঞ্চাশ হাজার দর্শক বিশিষ্ট ক্রীড়ানিকেতন নিতান্তই অপ্রতুল। অনেকে বলতে পারেন, মরশুমের কয়েকটি বড় খেলা ছাড়া অন্য খেলায় এখনকার মাঠও তো কিছু কিছু খালি থাকে। কথাটা অস্বীকার করি না। কিন্তু এর উত্তরে বলি মরশুমের বড় বড় খেলার জন্যই তো স্টেডিয়াম। আর অন্য খেলায় মাঠ যে কিছু কিছু খালি থাকে তার প্রধান কারণ মাঠ সম্পর্কে সাধারণ ক্রীড়ামোদীর আতঙ্ক। আজ দর্শক যদি জানে বিনা কষ্টে পুলিসের ঘোড়ার তাড়া না খেয়ে তারা সহজেই টিকিট কিনে মাঠে ঢুকতে পারবে আর টিকিটের দাম যদি বেশী না হয়, তবে মাঠে দর্শকের অভাব হয় না। লাঞ্ছনা ভোগের আতঙ্কেই বহু দর্শক আজ মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। স্টেডিয়াম হলে এ'দের মাঠে যাবার অনিচ্ছার বদলে হয়তো আবার স্পৃহাই দেখা দেবে। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার দর্শকের জন্য স্টেডিয়াম হলে বিশেষ সুরাহা হবে না।

লণ্ডনের বিখ্যাত ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে ৮০ হাজারের মত দর্শক আসন আছে। টেনেটুনে এখানে বসে প্রায় এক লাখ দর্শক খেলা দেখতে পারে। কিন্তু বড় খেলার সময় এখানেও টিকিটের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। আমাদের এখানে মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলের খেলা দেখবার জন্য টিকিটের যে চাহিদা হয় লণ্ডনে বড় খেলার সময় টিকিটের চাহিদা হয় এর চেয়ে অনেক বেশী। তাই বলছি কলকাতায় খেলোয়াড় বাড়ছে, ক্লাব বাড়ছে, খেলার সংখ্যা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, শহরেরও আয়তন বাড়ছে। এ অবস্থায় ৫০ হাজার দর্শক আসনবিশিষ্ট স্টেডিয়াম না করে আরও একটু বড় আকারে স্টেডিয়াম করালেই ভাল হয়। কারণ একটি স্টেডিয়াম করতেই যখন পঁচিশ তিরিশ বছর কেটে গেল তখন বড় আকারের স্টেডিয়ামের প্রয়োজন বোধ হলে, তখন সেই স্টেডিয়াম করতে আবার কত বছর কাটবে তার ঠিক কি?

আরও একটি কথা। স্টেডিয়াম বা একটা ক্রীড়ানিকেতন খাড়া হলে সেটা যে শুধু খেলাধুলোর জন্যই মার্কা করা থাকবে তা নয়। অনেক সভা সমিতিরও আসর বসবে সেখানে। আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কোন সভার আয়োজন করতে হলে ময়দানে ত্রিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। এই সভায় জনসমাগমও হয় বিপুল। শহরে একটি বড় আকারের স্টেডিয়াম থাকলে সেখানেই সভার আয়োজন করা যেতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু যখন সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়ামেই তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। মোটের উপর একটি বড় আকারের স্টেডিয়াম হলে সরকারের লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। আর এই স্টেডিয়ামে প্রবেশের দক্ষিণা সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হলে খরচের টাকাটাও তাড়াতাড়ি উঠে আসবে। আশা করি, রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় কথাগুলো ভেবে দেখবেন।

লণ্ডনের চিঠি

[বেরী সর্বাধিকারী]

(বিমান ডাকে) লণ্ডন, ১৩ই জুলাই।

উইম্বলডনে রমানাথন কৃষ্ণণ ও এলেক্স অলমেডোর খেলার খবর আগেই পাঠিয়েছি। এ খেলাকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডের টেনিস মহলে কি পরিমাণের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল তাও জানিয়েছি। তারপর এক সপ্তাহ 'দেশের' জন্য কিছু লিখতে পারিনি। এর মধ্যে উইম্বলডনের খেলা শেষ হয়ে গেছে। লীডসের হেডিংলী মাঠে তৃতীয় টেস্টে ভারত আবার শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে। পর পর তিনটি টেস্টে জিতে ইংলণ্ড পেয়েছে 'রাবার'।

'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম শর্মা'। এই রাম শর্মা কে ছিলেন সে বিষয়ে আমার ধারণা নেই। তবে তিনি যে বিজ্ঞ লোক ছিলেন সে বিষয়ে সকলেই একমত। ইংলণ্ডের ক্রীড়া সমালোচকদের ব্যাপারে রাম শর্মার কথা বলা চলে। টেনিস পটিয়সী ক্রিশ্চিন ট্রুম্যান যখন পর পর সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী ও ফ্রান্সের টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হলেন তখন ইংলণ্ডের ক্রীড়া সমালোচকদের কি আস্ফালন! তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত ক্রিশ্চিনি এবার উইম্বলডন জিতবেই। সাংবাদিকরা এ কথা বলতেও দ্বিধা করেন নি যে সুজানে ল্যাংলেনের পর এত বড় টেনিস পটিয়সী আর দেখা যায় নি। টেনিস সম্রাজ্ঞী নামে খ্যাত ফ্রান্সের মহিলা খেলোয়াড় সুজানে ল্যাংলেনের সঙ্গে যার তুলনা করা হল তিনি কিন্তু ইংলণ্ডের সাংবাদিককুলের মুখে চুন কালি লেপে তৃতীয় রাউণ্ডে মেক্সিকোর ইওলা র‍্যামিরেজের কাছে হেরে মরলেন। তাতে আবার একদল সাংবাদিক চটে গিয়ে লিখলেন হারার জন্য দোষ ক্রিশ্চিনের নয়। দোষ কর্মকর্তাদের। কেন ক্রিশ্চিনকে আগে থেকে এত বড় করে দেখা হয়েছে? কেন তাঁকে দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য বিজয়িনীর তালিকায় শীর্ষস্থান। এই পুরা দায়িত্বের কথা মনে ভেবেই ক্রিশ্চিন ভাল খেলতে পারেন নি। ইংলণ্ডের আশা ভরসাও ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। এবার তাদের লেখায় কান্নার সুর। উষ্মাও যথেষ্ট। বললেন এক ফোটা মেয়ে। বয়স তোমার ১৮ পার হয়নি। দেখতেই না হয় খানিকটা লম্বা। কিন্তু এখনো তোমার শেখার অনেক আছে। কিছু না শিখেই তুমি উইম্বলডন জিততে চাও। উইম্বলডন জয় করা অত সোজা নয়। বামন হয়ে আকাশের চাঁদে হাত দেবার শখ কেন? বুঝুন ব্যাপারখানা। যারা ক্রিশ্চিনকে চাঁদের দেশে পৌঁছে দিয়েছিলেন তারাই আবার তাকে টেনে নামালেন।

বেচারা ক্রিশ্চিন আর কি করেন! ধীর স্থির এবং শান্তভাবেই বললেন ভাল খেলতে পারিনি হেরে গেছি। হারার জন্য সাতসতেরো ছুতো দেখালেন না। কিন্তু ক্রিশ্চিনের কথা কে শোনে।

এক শ্রেণীর সাংবাদিক আবার ক্রিশ্চিনের হারার জন্য দায়ী করলেন ইংলণ্ডের উঠতি টেনিস খেলোয়াড় মিলি নাইটকে।

স্পষ্ট করেই বললেন যত নষ্টের গোড়া ঐ নাইট ছোড়াটা। ও ইওলা র‍্যামিরেজকে আগাগোড়া তালিম দিয়ে ক্রিশ্চিনের দুর্বলতার কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। নাইটের সঙ্গে ইওলার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভাবে ভঙ্গীতে একটা রঙীন ছবি আঁকলেন। এই হচ্ছে ইংলণ্ডের সাংবাদিকতার নমুনা। এদের মতামতই আবার আমাদের দেশের কাগজে ফলাও করে বের হয়। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার ব্যাপারেও এ ধরনের সাংবাদিকতার নমুনা আছে ভুরি ভুরি। সে কথায় পরে ঘুরে আসছি। তার আগে উইম্বলডন সম্পর্কে আর দু'চারটি কথা বলা দরকার।

এবার উইম্বলডনের ফাইন্যাল খেলা দেখার আমার সুযোগ ঘটেনি। কারণ তখন ব্যস্ত ছিলাম লীডসে ভারত ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলার বিবরণ লেখার জন্য। তবে ফাইন্যাল খেলা দেখিনি সেজন্য দুঃখ নেই। কারণ আগেই ফাইন্যাল খেলার চেয়ে ভাল খেলা দেখেছি কৃষ্ণণ ও অলমেডোর মধ্যে। এখানে তার পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

টেনিস প্রতিযোগিতা হিসাবে উইম্বলডন যে জগতে অতুলনীয় এ কথা বলাই বাহুল্য। খেলায় মানের কথা নয়। আভিজাত্যের কথা। উদ্যোগ আয়োজনের কথা। নিখুঁত

ব্যবস্থাপনার কথা। কর্মচঞ্চল লণ্ডন মহানগরীর নিরালা প্রান্তে বিরাট উইম্বলডন পার্ক। মনোরম পরিবেশ। সবুজ মাঠ, সবুজ গাছ, নানা রঙের ফুল। যেন একটা বিরাট সুন্দর সাজানো বাগান। তার মাঝে ১৪টি কোর্টে ভেলভেট ঘাসের সবুজ আস্তরণ। কোর্টের দুদিক দিয়ে রাস্তা। যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও, দাঁড়িয়ে খেলা দেখ। খেলা পছন্দ হলে বসে পড়। সব কোর্টেই বসবার জায়গা আছে। বাছাই করা ভাল ভাল খেলা হয় সেণ্টার কোর্টে। ১৪টি কোর্টের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। পাকা স্টেডিয়াম। বসবার জায়গাও প্রচুর। দর্শনীও বেশী। কালোবাজারেও এখানকার টিকিট বিক্রী হয়। একটা বড় ইলেক্ট্রিক স্কোর বোর্ডের দিকে তাকালে সব খেলারই ফলাফল জানা যায়।

উইম্বলডনের আকর্ষণ শুধু এতে নয়। এর মোহ মাধুর্যের আরও কারণ আছে। এ যেন এক বিরাট টেনিস মেলা। রং বেরংয়ের বড় বড় ছাতা শামিয়ানা। সেখানে রং বেরংয়ের পোশাক পরা দর্শকদের মুখে অনবরত ঢুকছে চা-কফি-বিয়ার-হুইস্কি-স্যাণ্ডুইচ-আইসক্রীম প্রভৃতি নানা জাতীয় চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়। শামিয়ানার নীচে সব সময়ই প্রজাপতির মেলা। টেনিসের আকর্ষণ তো আছেই। তার উপর এই পরিবেশ, উৎসবের এই আনন্দময় ভাব উইম্বলডনের অন্যতম আকর্ষণ। আর সুন্দরীদের সাজ পোশাকের তো কথাই নেই। ইংলণ্ডের মেয়েদের সাজ পোশাকে শালীনতার বাঁধ অনেকদিন আগেই ভেঙে গেছে। তবু উইম্বলডনে এই সাজ পোশাক নিয়েই আলট্রা মডার্ণ হবার কি প্রচেষ্টা। বিচিত্র পোশাকের মধ্যে মেয়েদের স্বল্পতম অংগবাস, বেতের হ্যাট, লেসের বক্ষাচ্ছাদন উইম্বলডনের আর এক বৈশিষ্ট্য। আনকোরা নতুন দর্শকের পক্ষে উইম্বলডনকে 'নন্দন কানন' বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। সব কিছু মিলেই উইম্বলডনের এত আদর। দূর দেশ থেকে প্রতিযোগী আসেন, আসেন দর্শক হাজারে হাজারে। উইম্বলডনের তৃষ্ণা তাদের বক্ষজুড়ে। তৃষ্ণা মেটে খেলা দেখে, পরিচিত অপরিচিতের সংগে আলাপ আলোচনা করে। ভাষা না জানলেও ক্ষতি নেই কথাবার্তা চলে চিরন্তন ভাষায়—ইংগিতে ভংগিতে, হাস্য ঠাট্টায়, আঁখির ঝলকে।

হেডিংলী মাঠে তৃতীয় টেস্টে ভারতের পরাজয়ের ক্ষেত্রে কিছু নতুনত্ব নেই। যথা পূর্বং তথা পরম। তবে একটু রকমফের আছে বৈকি! ট্রেণ্ট ব্রিজ ও লর্ডস মাঠে তবু ভারতীয় দল সময়ে বেশ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল। কি বোলিং কি ব্যাটিংয়ে। লর্ডসে তো এক সময় বেশ আশারই সঞ্চার হয়েছিল। বুঝি ভারতের এই দুর্বল দলই ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। কিন্তু একটু আশার পরই আবার নৈরাশ্যের বেদনায় ভরে গেল আমাদের বুক। হেডিংলীতে আশা-নিরাশার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল সমর্থকদের নৈরাশ্যের মধ্যে রেখেই পরাজয় স্বীকার করেছে।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের খেলোয়াড়রা বলির ছাগের মত কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আউট হন। হেডিংলীতে দেখলাম সাধারণ ধরনের স্পিনেও আমাদের খেলোয়াড়দের কাঁপুনি কম নয়। স্ট্যাথাম দলে নেই। তবুও আমাদের তথাকথিত মহারথীরা রোডস নামক একটা ছোকরার বলও খেলতে পারলেন না। টসে জিতে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের মোট রান হল মাত্র ১৬১। এর মধ্যে শেষের দিকে ব্যাটসম্যানরা অর্থাৎ আমাদের তিনজন বোলার তাড়ু মেরে করলেন অর্ধেক রান। তারপর ইংলণ্ডের ব্যাটিং। কাউড্রে করলেন ১৬০ রাণ। গোড়ার দিকে তিনি তিনবার ক্যাচ তুললেন আমাদের ফিল্ডাররা তার সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না। ইংলণ্ডের রান হল ৮ উইকেটে ৪৮৩। পিটার মে এই রানেই ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। তারপর শুরু হল আমাদের দ্বিতীয় ইনিংস। এবার ১৫৯ রানেই আমাদের সব খেলোয়াড় আউট হয়ে গেলেন। পুরো তিন দিনেরও কম সময়ে খেলা শেষ হয়ে গেল। আমরা পরাজয় স্বীকার করলাম এক ইনিংস ১৭৩ রানে। এর নাম কি টেস্ট খেলা? উমরিগর অবশ্য এ টেস্টে ভালই খেলেছেন, মানে মন্দের ভাল। শেষদিকে গুপ্তেও মন্দ বোলিং করেন নি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তৃতীয় টেস্টে আমাদের ব্যর্থতা ইংলণ্ডের সাংবাদিকদের কাছে আমাদের আরও খেলো করে দিয়েছে।

কিছু আগে ইংলণ্ডের সাংবাদিকদের সততার কথা বলছিলাম না? টেস্টে আমরা খুব খারাপ খেলেই হেরে গেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু সাংবাদিকরা এতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। তৃতীয় টেস্টে আম্পায়ারিংয়ের অমার্জনীয় ত্রুটি সম্পর্কে অনেক সাংবাদিক মতামত প্রকাশ করলেও বহু সংবাদপত্রই কিন্তু এ সম্বন্ধে নীরব।

এ খেলায় আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক লী যে ভুলচুক করেছেন তার তুলনা বিরল। আর সে ভুলের মাশুল জোগাতে হয়েছে আমাদের ছেলেদেরই। গুপ্তের বলে পার্কহাউস এল বি ডবলিউ আউট হয়েছিলেন লী সে এল বি ডবলিউ না-মঞ্জুর করেছেন। ট্রুম্যান উমরিগরের ক্যাচ ধরলেন মাটি থেকে। এবার কিন্তু লী আউট দিলেন। অবশ্য লী প্রথমে দো-মনা করেছিলেন কিন্তু ট্রুম্যানের হুমকিতে হাত না তুলে পারলেন না। কাউড্রেও একবার সুরেন্দ্রনাথের বলে এল বি ডবলিউ হয়েছিলেন, আর একবার অতি অল্পের জন্য হয়েছিলেন রান আউট, দুইবারই লী মুখ ফিরিয়ে রইলেন। লীর এই সব সিদ্ধান্ত এত বেশী একতরফা হয়েছে যে অনেক ইংরেজ সাংবাদিক মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু অনেকেই নীরব। এক সময় ইংলণ্ডের আম্পায়াররা জগতের সেরা ছিলেন। কিন্তু আজ তাদের সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে।
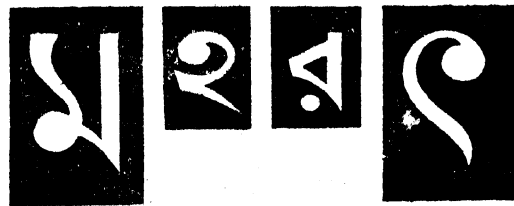
দেশী সংবাদ

৬ই জুলাই—রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিপর্যস্ত কেরালার জনগণ আজ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে চায়। কংগ্রেস, পি এস পি ও কম্যুনিস্ট শাসনের যে অভিজ্ঞতা তাহাদের হইয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রপতির শাসনকেও অনেকে বরণীয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ময়দানে রেড রোডের পার্শ্বে এডেনবরা কোর্সে স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদন জানাইয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঐ স্থানে জমির দখল হইতে সম্মতি দিয়াছেন।

৭ই জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ তাঁহার মাসিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, কেরালায় তিনি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ এড়াইতে চাহেন, তবে "যদি সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।" তিনি বলেন, "কি করা হইবে এখন আমি তাহা বলিতে পারি না।"

৮ই জুলাই—অদ্য নয়াদিল্লিতে সংসদ সদস্যদের সর্বদলীয় খাদ্য কমিটির পুনরায় বৈঠক বসে। জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য রেশনিং, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সংগ্রহের ব্যাপারে কার্যের যে নমুনা দেখা গিয়াছে, কমিটির প্রায় সকল সদস্যই তাহার কঠোর সমালোচনা করেন।

৯ই জুলাই—অজন্তার একটি গুহায় একটি বিশ্ব-মানচিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই মানচিত্রে বহু এলাকা ভাল্লুক প্রতীক চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে। এই বিশ্ব-মানচিত্র হইতে শুধু যে প্রাচীনকালের ভারতবাসীর ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিত সাংস্কৃতিক যোগ কিরূপ ছিল তাহাও জানা যায়।

অদ্য মধ্যরাত্রি হইতে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম টিকেটের মূল্য ১০ নয়া পয়সা হইবে। ইহার ফলে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি হইবে। বর্তমানে বৎসরে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার প্ল্যাটফর্ম টিকেট বিক্রয় হয়।

১০ই জুলাই—কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার পদে যে কোন সরকারী অফিসার বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসারের নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে অর্ডিন্যান্স সম্প্রতি জারী হইয়াছে তাহাতে মেয়রসহ কলিকাতা পৌর সভার সকল দলের প্রতিনিধিকে এমন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে যে, "সরকার যদি ১০ দিনের মধ্যে ঐ অর্ডিন্যান্স বিনাসর্তে প্রত্যাহার" না করেন তাহা হইলে সরকারের বিরুদ্ধে "সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেও পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না" বলিয়া তাহারা আজ পৌর সভার অধিবেশনে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

১১ই জুলাই—অবিরাম প্রবল বারিপাতে কালিম্পংয়ে ধস নামিবার ফলে গতকল্য অন্ততঃপক্ষে দশজনের শোচনীয়ভাবে প্রাণনাশ হইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে। দার্জিলিং জেলার অন্যান্য কতকগুলি স্থান হইতেও ধস নামিবার সংবাদ পাওয়া যায়।
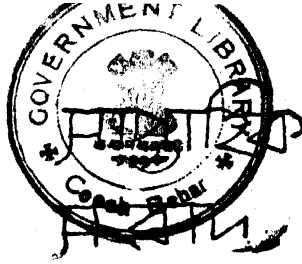
কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া পৌর সভা গতকল্য যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তদ্বিষয়ে রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র অদ্য এইরূপ মন্তব্য করেন যে, বর্তমান অবস্থায় অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

খড়দহের অন্তর্গত অম্বিকাপুরের সুধীরচন্দ্র রায়ের নালিশ অনুযায়ী ব্যারাকপুরের মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জি সি চ্যাটার্জির আদালতে প্রাক্তন কম্যুনিস্ট এম এল এ অম্বিকা চক্রবর্তী ও অপর ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা উদ্বাস্তু ঋণের ব্যাপারে তছরূপ ও প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগমূলক চার্জশীট পেশ করা হইয়াছে।

১২ই জুলাই—কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ হইবে না, এই দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ত্রিবান্দ্রম যাত্রার পূর্বে অদ্য নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেন যে, বর্তমান আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে তাঁহার সরকার কর্তৃক মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সহকারী সম্পাদক একটি প্রেসনোটে জানাইতেছেন, ১৯৫৮ সনের পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী ১৯৬০ সনে প্রাইভেট স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষা দশ শ্রেণীযুক্ত সমস্ত অনুমোদিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এবং বালকদের জন্য নির্বাচিত উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাদের তালিকা শীঘ্রই স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই জুলাই—সোভিয়েট রাশিয়া আজ ঘোষণা করে যে, সে মহাশূন্যে আর একটি রকেট প্রেরণ করিয়াছিল। রকেটে দুইটি কুকুর ও খরগোশ জাতীয় একটি প্রাণী ছিল। রকেটটি নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যাবর্তনের পর প্রাণী তিনটির অবস্থা ভালই আছে।

৭ই জুলাই—বর্তমান বৎসরে যে সকল ভূম্যধিকারী তিব্বতের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য হংকং-এ প্রকাশিত সরকারী প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁহাদের জমি বাজেয়াপ্ত হইবে।

একটি সোভিয়েট সংবাদপত্রে সোভিয়েট বিজ্ঞানী কলম্যান বলিয়াছেন যে, মানুষের চিন্তাধারা সরাসরি চালান দেওয়া যাইতে পারে এমন একটি যন্ত্র বিজ্ঞানীরা 'খুব সম্ভব' তৈয়ারী করিতে পারিবেন। এই যন্ত্রের মাধ্যমে একজনের মস্তিষ্ক হইতে অপরের মস্তিষ্কে চিন্তাধারা প্রবাহিত করা যাইবে।

৮ই জুলাই—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভের উক্তি উল্লেখ করিয়া আজ নিউ-ইয়র্কে বলা হয় যে, চীন যদি ফরমোজায় আঘাত হানিতে উদ্যোগী হয়, তবে রাশিয়া সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করিয়া চীনকে সাহায্য করিবে এবং এজন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের ঝুঁকি লইবে। শ্রীখ্রুশ্চেভ নাকি একথাও বলিয়াছেন যে, ফরমোজা দ্বীপ উড়াইয়া দিতে পারিবে এমন অসংখ্য রকেট চীনকে সরবরাহ করা হইয়াছে। চীনের মূল ভূভাগে উপকূল রেখার পশ্চাতে এ সকল রকেটের ঘাঁটি স্থাপন করা হইয়াছে।

৯ই জুলাই—জর্ডনের শিক্ষামন্ত্রী শেখ মহম্মদ আমিন শাঙ্কিটি আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর লিখিত 'গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিস্টোরী' বইটি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি রাজস্ব কমিশন ভূতপূর্ব জমিদারদের যে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ পাওনা হইয়াছে, অবিলম্বে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দিতে হইবে বলিয়া সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন বিশেষভাবে এই প্রস্তাবও করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভূতপূর্ব জমিদার পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতের নাগরিক হইয়াছেন তাঁহাদিগকে কিছুতেই ক্ষতিপূরণ হিসাবে নগদ টাকা দেওয়া চলিবে না।

১০ই জুলাই—আজ ওয়াশিংটনে ভারত সরকার ও মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশনের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তিতে ভারতকে ১৫ টন "ভারী জল" লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের আণবিক শক্তি গবেষণার কাজে ইহা ব্যবহৃত হইবে। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের চুক্তিতে এই প্রথম আবদ্ধ হইল।

১১ই জুলাই—হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে মানবতার সেবার জন্য সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

১২ই জুলাই—ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, আগামী ১৫ই জুলাই, বুধবার বিশ্বব্যাংক দুই দফায় ভারতকে ৬ কোটি ডলার ঋণ দিবেন। ইহার মধ্যে ৫ কোটি ডলার রেলওয়ে উন্নয়নের জন্য এবং ১ কোটি ডলার শিল্পক্ষেত্রে দেয়া হইবে।

একাদিক্রমে ২৬ বৎসর অভিনয় চলিবার পর ভিক্টোরিয়ান আমলের গীতিনাট্য "ড্রাঙ্কার্ডের" উপর শেষবারের মত যবনিকাপাত হইবে আগামী ১০ই অক্টোবর।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সাবধান!

আজকের সর্দি কাল ফ্লু, ব্রঙ্কাইটিস কিম্বা নিউমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে!

গুরুতর কোন রোগে পড়বার আগেই তাড়াতাড়ি আপনার সর্দি সারিয়ে ফেলুন। সর্দি সারাবার জন্য বিশেষভাবে তৈরী এই শক্তিশালী ওষুধটি মালিশ করুন।

আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহেলা করবেন না! হাঁচি, নাক দিয়ে কাচা জল পড়া কিম্বা গলা খুসখুস্ করা সর্দির এইসব লক্ষণ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোবার সময় বুকে গলায় ও পিঠে ভিকস্ ভেপোরাব মালিশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে নাকে গলায় ও পিঠে একটা স্নিগ্ধ আরাম অনুভব করবেন। তারপর সারারাত যখন আপনি অকাতরে ঘুমুবেন, এই পরীক্ষিত ওষুধটি আপনার সর্দির যন্ত্রণা দূর করতে থাকবে। সকালে দেখবেন আপনার সর্দি ভালো হয়ে গেছে ও আবার আপনি সুস্থ বোধ করছেন।

ভিকস্ ভেপোরাব 2 দু'ভাবে সর্দি সারায়!

1 এটি নাকের মধ্য দিয়ে কাজ করে।

2 এটি ত্বকের মধ্য দিয়ে কাজ করে।

ভিকস্ ভেপোরাব থেকে যে শক্তিশালী ওষুধের বাষ্প বেরোয় তা' আপনি শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে আপনার নাকের ও গলার যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।

ভিকস্ ভেপোরাব লাগালে বুকে গরম লাগে ও আরাম বোধ হয় —দম আটকানো ভাব ও যন্ত্রণা দূর করে দেয়। আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন!

নতুন সবুজ টিন

বড় নীলরঙের শিশি

ভিকস্ ভেপোরাব

বুকে, গলায় ও পিঠে মালিশ করুন! সকলের পক্ষে উপকারী! VR 6 BG

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিশ্বাসে যাঁরা অটল
"ভোর হইতে রাত্র অবধি টাটা কোম্পানীর বোম্বাই অফিসে শেয়ার খরিদ্দারগণের অবিশ্রান্ত ভিড় লাগিয়া যায়। বৃদ্ধ ও যুবা, ধনী ও গরীব স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যাহার যাহা ক্ষমতা সেইমত পুঁজি লইয়া আসে। তিন সপ্তাহের শেষে কারখানা গড়িবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় দুই কোটি টাকার (১,৬৩০,০০০ পাউণ্ড) প্রতিটি পাই ৮০০০ ভারতীয় নরনারীর নিকট হইতে উশুল হইয়া যায়।"
—এ্যাক্সেল সাহলিন
এই ভাবে দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে ১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্ট ভারতবর্ষে ভারী যন্ত্রশিল্পের প্রথম উত্তম টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর পত্তন হয়। আজ টাটা স্টীল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উৎপাদক। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। ১৯২০ সালের পর থেকে কয়েক বছর যখন কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে তখনও বহু দৃঢ়চেতা অংশীদারগণের আস্থা এতটুকু টলেনি এবং দেশে নতুন শিল্প গড়ার জন্যে তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করেন।
টাটা স্টীল
১৩-বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ নিবাসী ৭৯ বৎসর বয়স্ক শ্রীরাস বিহারী লাহা। ইনি কোম্পানীর একজন প্রথম অংশীদার, এবং এখনো কোম্পানীতে এঁর শেয়ার আছে।
TN 3726
The Tata Iron and Steel Company Limited

সূচীপত্র

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

Rexona
BLENDED WITH CADYL

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday 25th July, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৯ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৮ শ্রাবণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

অধ্যাপক সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় অনেক মত প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতা শহরে যে অধ্যাপক সম্মেলন হইয়া গেল, সেই উপলক্ষে আমরা আর একবার আমাদের মতামত গুছাইয়া বলিবার সুযোগ পাইলাম। এতগুলি মনীষী অধ্যাপকদের সমাবেশে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসমস্যা তথা শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিতে পাইব। ভাবিয়াছিলাম, অবিশেষজ্ঞগণের মনের অন্ধকার বিশেষজ্ঞগণের জ্ঞানের আলোকপাতে কথঞ্চিৎ পরিষ্কার হইবে। কিন্তু নিতান্ত নৈরাশ্যের কথা এই যে, মনীষী অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের অভিভাষণ ও বক্তৃতাদি মূল সমস্যা সমাধানের কোন নূতন ইঙ্গিত দিতে পারে নাই। অন্তত আমাদের সেইরূপ ধারণা। ইহাতে অত্যন্ত পুরাতন কথাটাই আর একবার প্রমাণ হইয়া গেল যে, শিক্ষাজগতের বিশেষজ্ঞগণ হয় সমস্যার প্রকৃত রূপ অবগত নহেন কিম্বা অবগত হওয়া সত্ত্বেও যে কারণেই হোক তাহা খুলিয়া বলিতে অসম্মত। ইহা শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাহারও পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

অবশ্য চিরাচরিত প্রথায় সম্মেলনে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে শিক্ষকগণের বেতনের উচ্চতর হার নির্ধারণ অন্যতম। যে বিষয়ে মতভেদ নাই, তাহা আর সমস্যা নয়। কাজেই আমরাও প্রস্তাবটি সমর্থন করিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গেই বলিতেছি যে, প্রস্তাবিত বেতনের হার গৃহীত হইলেও শিক্ষার প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবার আশা নাই। শিক্ষার প্রকৃত ও সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা অন্য ও অন্যত্র। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতি অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করিয়াছে—শিক্ষাক্ষেত্রেও বটে। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ শিক্ষাব্যবস্থার মূল সমস্যা, আর এই মূল সমস্যা হইতেই যাবতীয় উৎকট সংকটের উদ্ভব। অথচ এই কথাটা সম্মেলনের মনীষী অধ্যাপকগণ এড়াইয়া গিয়াছেন। এত বড় স্থূল ব্যাপারটা তাঁহারা জানেন না বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরোধিতাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীকেশবেশ্বর বসু বলেন যে, যেহেতু সরকার অর্থব্যয় করেন, সেই জন্যই যে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিবেন এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন, ইহা অবাঞ্ছিত ও "বিপজ্জনক"। বসু মহাশয়ের উক্তি মূলত সত্য। শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ, সরকারী নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্যতম সরকারী বিভাগে পরিণতকরণ আমরা কখনও সমর্থন করি নাই (কি পশ্চিমবঙ্গে কি কেরলে—সর্বত্র)। এই জন্যই প্রস্তাবিত জনকল্যাণ বিলের আমরা সমর্থক নই, যদিচ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের মত একেবারে রে রে রে রবে তর্জন করিয়াও উঠি নাই। আমরা এই বিল এই কারণে সমর্থন করি না যে, ইহা সরকারী প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সামিল। বরঞ্চ আমরা অন্যায় ও হানিকর ধর্মঘটও সহ্য করিব, তথাপি শিক্ষাজগতকে সরকারী প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত হইতে দিব না।

কাজেই দেখা যাইতেছে অধ্যাপক সম্মেলনের সহিত আমরা একমত। আমরা কেহই শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী হস্তক্ষেপ চাই না। কিন্তু আমরা আরও বেশী দূর যাইতে চাই, শুধু সরকারী হস্তক্ষেপ নয়, খোদ রাজনীতির হস্তক্ষেপের আমরা বিরোধী। অধ্যাপক সম্মেলন কি ততদূর যাইতে রাজি আছেন? নীরবতা দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা রাজি নহেন। দলীয় রাজনীতি আজ পাঁচ আঙুলে শিক্ষাব্যবস্থার হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিতে উদ্যত—এই সুবিদিত সত্যটা ঢাকিয়া রাখিয়া কী ফল? ইহার বিষক্রিয়া শিক্ষাব্যবস্থার সব অঙ্গে যে জড়াইয়া পড়িয়াছে! শিক্ষকের মুখোসধারী রাজনীতিকগণ আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বত্র বাসা বাঁধিয়াছেন। যে শিক্ষক আজ রাজনীতিক শিক্ষকের কাছে, ছাত্রের কাছে, অভিভাবকের কাছে, খাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁহারই মান সম্মান প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। ইহা সত্য কি না অধ্যাপক সম্মেলন বলুন। রাজনীতিক দালালী করিয়া কোনও শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষকতা কার্য করা সম্ভব কি না অধ্যাপক সম্মেলন বলুন। এই শ্রেণীর শিক্ষকেরাই ক্রমে ছাত্রসমাজের কাছে আদর্শ হইয়া উঠিতেছেন কি না অধ্যাপক সম্মেলন বলুন। আরও বলুন, যে-শিক্ষক আজ একান্তভাবে শিক্ষাব্রতী, সে আজ কার্যত অবহেলিত, উপেক্ষিত কি না! সরকারী হস্তক্ষেপ যদি অবাঞ্ছিত হয়—দলীয় রাজনীতিকের হস্তক্ষেপও সমান অবাঞ্ছিত। শুধু সরকার নিরস্ত হইলেই চলিবে না, ইঁহাদেরও নিরস্ত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই সব দলীয় রাজনীতিকের হস্তক্ষেপেই সরকারের হস্তও উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা চাই দুজনের হস্তই নিরস্ত হোক, অধ্যাপক সম্মেলন চান যে কেবল সরকারের হস্তখানা নিরস্ত হোক। আমরা সমস্যার আমূল সমাধান চাই—অধ্যাপক সম্মেলন ততখানি চান বলে মনে হয় না। কতখানি চান তাহা দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, সমাধানের অন্য পথ নাই।

প্রসঙ্গত

শব্দ যেকালে ব্রহ্ম ছিল (বাইবেলেও বলে, ওঅর্ড ওঅজ্ গড) সেকালে হাংগামা ছিল কম। অন্তত চোখ দুটির পরিশ্রম অল্প ছিল। একমাত্র শ্রুতিই ছিল স্মৃতির সহায়। কোন রচনার পক্ষে মরমে পশার একটা মাত্র রাস্তা ছিল—কান। লিপি এসে চোখের কাজ বাড়িয়ে দিল, কান অবশ্য পাতলা হল, কিন্তু মানুষের ভাবনা বাড়ল বই কমল না। লেখাগুলি মনে রাখার দায় ঘুচল, আর মুখস্থ-বিদ্যাই যে একমাত্র বিদ্যা নয়, এর প্রমাণ মিলল; তবু দায়িত্বও রীতি-মত ভারী হল। বানান-শেখাই একটা সমস্যা, তদুপরি অনেক গুছিয়ে লেখার আর্টও আয়ত্ত করা সোজা নয়। কেন না, কানকে এক-বার ফাঁকি দিতে পারলেই পাশ, কিন্তু চোখে বারবার ধরা পড়ে। তার পাহারাও কড়া। সেই স্মৃতি-শ্রুতির আমলই যেন ভাল ছিল, যখন 'লেখাপড়া' কথাটির প্রচলন আদৌ ছিল না। পড়াশোনা—এই পদটিও অর্থহীন ছিল। সেই যুগ শুধু শোনার।

লিপির জটিলতা আমদানি করে আমাদের কতটুকু লাভ হয়েছে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কেন না, ভাল হক, মন্দ হক, ও বস্তুটির হাত থেকে ত্রাণ নেই, ওকে ঘষা-মাজা করে কতটা উপযোগী করে নেওয়া যায়, তাই নিয়েই যত গবেষণা। দোষমুক্ত কোন লিপিই নয়, বানানে উচ্চারণে নানা ভাষাতেই বিস্তর ফারাক; উচ্চারণ প্রায়ই স্বাধীনচিত্ত, বানানের ছায়েবানুসারিণী হতে তার বিশেষ আপত্তি। ব্যতিক্রম আছে, যথা জর্মন, যথা সংস্কৃত। কিন্তু বাংলা নয়। আমাদের লিপির বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় 'শ'-য়ে 'স'-য়ে তফাৎ, বা 'ন'-য়ে 'ণ'-য়ে, আদৌ গুণকর্ম বিভাগশঃ নয়, তবু ওদের মত "পিসি চল যাই" লিখে আমাদের 'সাইকোলজি' পড়তে হয় না, বাঁচোয়া এই। এই উৎকর্ষ নিয়ে আমাদের মনে বিলক্ষণ অহংকার ছিল বা আছে। তবু কালের গতিকে এ-কথাও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রূপ আর ধ্বনির রাজযোটকই লিপির পক্ষে সব নয়। তাকে আরও সাবলীল হতে হবে, জটিলতার জট ছাড়াতে হবে। এ-প্রয়াস একেবারে যে হয়নি, এমন নয়। হয়েছে, তার প্রমাণ এই রচনাটিতেই অনুসৃত বানান-পদ্ধতি। এটি আধুনিক, যদিও এখনও, অনুমোদিত হবার এত বছর পরেও, সার্বজনিক নয়। সংস্কার প্রয়াসেরই অন্য প্রমাণ এই পৃষ্ঠাতেই ব্যবহৃত লাইনো-হরফ। কিন্তু সার্বিক সমাধান উভয়েই অনুপস্থিত।

একালের প্রয়োজন মেটাতে হলে লিপিকে সর্বার্থসার্থক হতে হবে। আমাদের লিপি টেলিগ্রাফে বা টাইপরাইটারে ঝর্ঝর ধারায় ঝরে পড়ে না। চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সাফল্য সামান্যই, এবং, এই লিপির যা গঠন পদ্ধতি তাতে সাফল্য আংশিক হতে বাধ্য।

এই গতির যুগে, তারে-বেতারে জড়ানো দুনিয়ায় অন্যান্য প্রাগ্রসর দেশের সঙ্গে আমরা পাল্লাই দিতে পারব না, যদি লিপি-পদ্ধতির মৌল সংস্কার না হয়। চাঁদ বা ফুলের ছাঁদের অক্ষরে তিলে তিলে কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, কিন্তু দ্রুততাই যেখানে আসল কথা—যথা সাংবাদিক রচনা —সেখানে অন্যতর পদ্ধতির উদ্ভাবন আবশ্যক। এই লিপিমালায় সাংকেতিক সংবাদ প্রেরণও দুঃসাধ্য—যদিও অল্পসল্প কিছু-কিছু কাজ হয়েছে।

অতএব বহুকাল থেকে চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা ভাবছেন, কী করে আমাদের লিপিকে গড়ে-পিটে যন্ত্রযুগের উপযোগী করে তোলা যায়। কেউ কেউ একদা রোমক লিপির হয়ে ওকালতি করেছিলেন, কিন্তু সে-প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন পায়নি। অথচ রোমক লিপির পক্ষে যুক্তি যথেষ্টই ছিল; পৃথিবীর বহু সভ্য দেশেই এই লিপি প্রচলিত এবং বর্ণমালার মাধ্যমে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে সরু একটি সেতু তৈরি হতে পারত। দেহের বর্ণে যারা আমাদের থেকে আলাদা, লেখার বর্ণে তারা খানিকটা কাছে আসত।

উৎসাহী ব্যক্তিরা যে একেবারে হাল ছেড়ে দেননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'য় অধুনা প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এবং কয়েকটি পত্রে। এক কথায় এইটুকু মাত্র বলতে পারি, নতুন "স্কীমটি" ইনটারেস্টিং। সর্বাংশে গ্রহণীয় না হোক, আলোচনা-যোগ্য। এটিরও ভিত্তি রোমক লিপি, কিন্তু কথঞ্চিৎ সংশোধিত এবং নতুন কয়েকটি চিহ্ন-সম্বলিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এতে বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণ-প্রবণতাকে শুধরে নেবার চেষ্টা আদৌ নেই। যিনি যেভাবে খুশি সেভাবে পড়ুন, লেখাটা ইউনিফর্ম হলেই হল।

*

তবু আশংকা করি, এ প্রস্তাবও বহুর মনঃপুত হবে না। নতুন বর্ণমালা আমদানি সম্পর্কে সাধারণের বিরূপতার একটি কারণ অবশ্যই এই যে, বিদেশী সব-কিছুর প্রতিই আমাদের মনে একটি সংশয়িত ভীরুতা আমরা লালন করে থাকি। একটি অনিচ্ছুক দ্বিধা যে-কোন সংস্কার-প্রয়াসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে বর্ণমালা-পরিবর্তনের চেষ্টা মাত্র এই কারণেই ব্যর্থ হয়নি। যাঁরা এ-কাজে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরাও খানিকটা রফা করেই এগোতে চেয়েছেন। বানান-পদ্ধতিতে হাত দিতে চাননি। একদিকে 'স্ট্যাটাস কুও' আর এক দিকে "একটা নতুন কিছু কর।" রইলই বা তিনটে 'শ'। দুটি 'ন'-ও বহাল থাকুক। হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও টনটনে থাক; অর্থাৎ জাতিভেদের ব্যাপারেও আমরা যেমন যুক্তি ছেড়ে জটিলতা নিয়েই আছি, বর্ণ-মালার ব্যাপারেও তেমনই। নির্ধনের বাইরের ঠাটের মত নির্ধ্বনি অক্ষরের সমারোহ এবং বানান-বিভ্রাট।

*

সংস্কার-প্রয়াসীরা অবশ্য একটা কথা ভুলে যান, যার উল্লেখ না করে পারছি না। প্রতিটি শব্দের যেমন ধ্বনিরূপ আছে, লিপিমালার প্রসাদে আছে তেমনই দৃশ্যরূপ। চোখ তাতে অভ্যস্ত হয়, তাকেই স্বীকার করে। ধ্বনি দূরে থাক, অর্থের দিক থেকেও যথাযথ নয় এমন শব্দ আমরা প্রায়শই ব্যবহার করি দৃশ্যরূপের মোহে। বিশেষত এই মনে-মনে পড়ার যুগে আঁখিরুচিকে অস্বীকার করতে পারেন কোন্ পাঠক? নতুন বর্ণমালার বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে কতকটা এই অপরিচয়ের কারণেও। চেনা কবিতাকেও তখন যেন আর চিনতে পারি না। 'সোনার তরী'কে অন্য হরফে বাঁধতে পারি, কিন্তু সেই ছন্দটি যেন বেজে ওঠে না, গগনে মেঘ ঠিক সেই সুরে গর্জে ওঠে না।

তবু সন্দেহ নেই, কালের দাবি মেটাতে হলে কিছু করতেও হবে। অন্তত আগামী কালের কথা চিন্তা করে। কিন্তু এ ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কর্মপন্থা কী? জনমত গঠন? এ-পথে সাফল্য আসবে বলে মনে করিনে। যে-দেশে আইন পাশ করেও বিধবা-বিবাহের ব্যাপক প্রচলন হয়নি, সে-দেশে পুরনো লিপিমালার নির্বাসন বিপ্লবতুল্য এবং রিভল্যুশন বাই কনসেন্ট-এর কল্পনা অন্তত এ-দেশে আকাশকুসুম মাত্র।

কাজ সহজ নয় এবং জগন্নাথের রথ নড়াতে পারে একমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সরকারের হুকুম, তাও একমাত্র স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায়। তুরস্কে এর ঐতিহাসিক নজীর আছে। যে-সরকারকে সকলের ভোট নিয়ে চলতে হয়, সে এতখানি পারে না।

তবে খানিকটা বোধহয় পারে। সহ-অবস্থিতির একটা ফর্মুলা বার করতে পারে। দুটি বানান-নিয়ম চলেছে, সাধু ও চলিত দুটি ভাষাও—তেমনই দুটি লিপিও চলুক না। অতীতের সাহিত্য যেমন আছে তেমনই ধরা থাক পুরনো অক্ষরে, আগামী-কালের লেখা রচিত হক নতুন লিপিতে। কেউ কেউ কিছুকাল হয়ত দুটোতেই লিখবেন, পরে পুরনোকে ছেড়ে নতুনকেই নেবেন।

কিছুকাল পূর্বে আমাদের শশধরদা (ডক্টর শশধর সিংহ) অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনের ন্যাশানাল হসপিটাল ফর্ নারভাস্ ডিজীজেস্-এ ছিলেন: সেই সময়কার তাঁর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তা-ভাবনার কথা তিনি "দেশ" পত্রিকায় কিছু কিছু লিখেছেন। এই হাসপাতালে নার্সের কাজ করার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ থেকে মেয়ে-পুরুষ আসে। এদের কয়েকজনের কথা রোগী হিসাবে যাদের সেবা পেয়েছেন, শশধরদা লিখেছেন খুবই প্রশংসা করে। তাদের কথা লিখতে গিয়ে তাদের দেশ এবং জাতির কথাও এসে গেছে। যেমন, একটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান মেয়ের কথা প্রসঙ্গে শশধরদা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সামাজিক উন্নত অবস্থার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিতে দেখলে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির মতো উচ্চ জীবনযাত্রার বৈষয়িক মান আর কোথাও নেই। সেখানে দারিদ্র্য নেই। ধনদৌলতে সকলে সমান নয় বটে, কিন্তু অসাম্যও কুৎসিতরূপে চোখে পড়ে না, জৈবিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং চিত্তবিনোদনের সাংস্কৃতিক উপকরণ সর্বসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে। সামাজিক ভেদাভেদ যা আছে, তা মনুষ্যত্বের পক্ষে পীড়াকর নয়। দৈহিক স্বাস্থ্য এবং আয়ুর মান পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। অর্থাৎ যা যা থাকলে কোন সমাজকে সুখী বলে কল্পনা করা যায়, স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে সবই এমন পরিমাণে আছে, যেমন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। বলতে গেলে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বা ওয়েলফেয়ার স্টেটের যা কিছু কাম্য সবই প্রায় স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলির লাভ হয়েছে। তবুও—

একটা "কিন্তু" আছে। বাইরে থেকে দেখলে যেখানে সমাজ বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য এবং গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শের এতো কাছাকাছি পৌঁছেছে দেখা যায় সেখানে আত্মহত্যার হার এত বেশি কেন? বিবাহ-বিচ্ছেদের হারই বা এতো বেশি কেন? এবং অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধিই বা আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে কেন? এর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধিটা ওদেশের লোকের চোখে তেমন একটা সমস্যার বিষয় না হতে পারে। এক স্ত্রী বা এক পুরুষের প্রতি একনিষ্ঠতা যেখানে আর সমাজের দৃষ্টিতে আবশ্যক নয়, বিবাহ-বন্ধনের বাইরে যৌন সম্পর্ক যেখানে প্রায় চলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে এবং কোন পক্ষেরই আর্থিক নিরাপত্তা যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা ব্যাহত বা সংকুচিত হবার আশংকা নেই, সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে হয়ত একটি সামাজিক তথ্য, স্ট্যাটিস্টিক্সের ব্যাপার মাত্র বলে মনে হবে, সমস্যা বলে মনে হবে না। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান অর্থাৎ মাতাল এবং অ্যালকহলিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি মদ্যপায়ী জাতির পক্ষেও একটা ভাবনার বিষয়। পরিমিত মদ্যপান পাশ্চাত্যে সাধারণ জীবনের অঙ্গ বলে ধরা যায়। সুরা জীবনোপভোগের নিত্য উপকরণের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু মাতলামি, ড্রাংকেন্‌নেস্, অ্যালকহলিজম—এগুলি পাশ্চাত্যেও অনাচার এবং ব্যাধির মধ্যে পড়ে এবং এগুলি যখন বাড়তে দেখা যায়, তখন বুঝা যায় যে, ব্যক্তি এবং সমাজের জীবনের ভিতরে কোন বিষের ক্রিয়া চলছে। ব্যক্তি যদি সুখী হয়, যদি তার জীবন বিশেষভাবে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব বা শূন্যতার দ্বারা পীড়িত না হয় তবে তার পক্ষে নেশা দিয়ে নিজকে ভোলাবার দরকার হয় না, বিশেষত চিত্তবিনোদনের অন্যান্য উপকরণ যেখানে সুলভ। আবহাওয়া এবং জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মদ্যপান যেখানে সমাজ-জীবনের অঙ্গ বলে স্বীকৃত, সেখানেও তার একটা মোটামুটি সীমানা ঠিক করা আছে। দু-পাঁচশো জন তা অতিক্রম করবেই, কিন্তু যদি দেখা যায় যেখানে জীবন ধারণ এবং জীবন উপভোগের সমস্ত রকম উপকরণের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নেশাভিভূতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ প্রাচুর্যের মধ্যে কোথাও একটি ফাঁক

আছে যেটা পূরণ করতে অনেককে নেশার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

এর চেয়েও আশ্চর্য ও ভয়ের কথা এই যে, জীবনধারণের ব্যবস্থা যেখানে সর্বদিক দিয়ে এতো ভালো, সেখানে আত্মহত্যার সংখ্যা এতো বেশি কেন? বাহ্যিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার মধ্যেও মানুষ অসুখী থাকতে পারে এবং জীবনধারণ অসহ্য বোধ করে আত্মহত্যাও করতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক সুখসাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যেখানে খারাপ, সেখানকার চেয়ে যেখানে ভালো, সেখানে আত্মহত্যার আনুপাতিক হার বেশি হবে কেন? হাতের কাছে কাগজপত্রগুলো নেই। মনে করতে পারছি না কোন্ বয়সের লোকের মধ্যে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা বেশি। তবে এরূপ বোধ হয় নয় যে, বুড়োরাই বেশি আত্মহত্যা করে। তাহলে কেউ কেউ বোধ হয় বলতেন যে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জীবনও এমন একঘেয়ে হয়ে উঠতে পারে যে, তার একঘেয়েমি মেটাবার জন্য মৃত্যুবরণও কারো কারো কাছে শ্রেয় মনে হয়। কিন্তু স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে বুড়োদের সংখ্যা বেশি না-ও হতে পারে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক লোকরাই হয়ত বেশি সংখ্যায় আত্মহত্যা করছে।

আত্মহত্যার কথা শুনলে আমাদের ক্ষিদের জ্বালা, রোগের জ্বালা অথবা প্রেমের জ্বালার কথা মনে আসে। যেখানে কারোই অন্নবস্ত্রের অভাব নেই, রোগ থাকলেও তার প্রতিকার যেখানে সহজলভ্য (গড়পড়তা উচ্চ আয়ুর হার পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতর—তার প্রমাণ) এবং যে সামাজিক ব্যবস্থা এবং নৈতিক অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেমের জন্য আত্মহত্যা সংঘটিত হয় বলে আমরা জানি তার সঙ্গে ওদেশের বর্তমান অবস্থার যখন মিল নেই, তখন ব্যাপারটা আমাদের কাছে আরো আশ্চর্যজনক লাগে। তবে তো দেখা যাচ্ছে যে, ভালভাবে বাঁচবার উপকরণের প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও জীবন দুঃসহ বোধ হতে পারে। শুধু তাই নয় যে দেশে বৈষয়িক দুঃখকষ্ট আছে, সেখানকার চেয়ে যেখানে সেই দুঃখকষ্ট নেই সেখানকার লোকদের মধ্যে অনুপাতে মৃত্যুকামীদের সংখ্যা বেশি। (অবশ্য তার জন্য একথা কেউ যেন মনে না করেন যে, অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য সম্পাদন, রোগের চিকিৎসা বিধান ইত্যাদি কাজকে আর গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। কোনো ঐন্দ্রজালিক উপায়ে আমাদের বৈষয়িক অবস্থা যদি স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ানদের মতো হয়ে যায় এবং তার ফলে তাদের মতো আমাদেরও আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়, তাহলেও ঘাবড়াবার কিছু নেই, কারণ বর্তমানে না খেয়ে বা বিনা-চিকিৎসায় রোগে ভুগে যারা মরছে তাদের তুলনায় সম্ভাব্য বৃদ্ধিসমেত আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা অতি নগণ্যই হবে।) হয়ত এমন কিছু লোক জন্মায়, যারা দুঃখকষ্টের (অন্ততপক্ষে অন্যের দুঃখকষ্টের) সঙ্গে "পাঞ্জা কষতে" না পারলে জীবন অসার বলে বোধ করে! অথবা হয়ত ক্ষুদ্র দেশ সে যত আরামেই থাক সকলের মন ভরতে পারে না, কারো কারো মনের পিপাসা হয়ত জাতীয় প্রতাপ এবং মহিমার অংশ না পেলে মেটে না. অথবা হয়ত "জীবনযাত্রার মান" এই কথাটাকেই আর একটু চিরে দেখা দরকার।

২০।৭।৫৯

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

ষোল

সে কালে আমাদের বাড়ির একটা নাম-ডাক —থাড়ি! ডাক-নাম—ছিল, যে-নাম দিলেই ডাক-যোগে পত্র প্রেরণ করা চল্‌ত। কে যে "শোভাবাজার রাজবাটী" নামটা প্রথমে চালু করেন তা আমার জানা নেই। যতদূর শুনেছি, শোভারাম বসাকের নাম থেকে শোভাবাজার নাম হয়েছে, যেমন জদুবাবুর বাজারকে এখন অনেকেই জগুবাজার বলে। প্রমথ চৌধুরী আমায় যত চিঠি লিখেছিলেন, সবগুলোতেই কেবল ঐ ঠিকানা। ইংরিজি (অর্থাৎ রোমান) অক্ষরে SOBHABAZAR RAJBATI বানানটাই বাংলা উচ্চারণের অনুমত, এবং উনি এই বানান-ই লিখতেন। কিন্তু আমরা, আমাদের বাড়ির যাঁরা, SOVABAZAR বানান লিখতুম। একবার বিলেত থেকে চিঠি পেলুম, তাতে ঠিকানায় লিখেছে GOVA-BAZAR বানান,—নিশ্চয়ই কোনো গবা-ছেলের কাণ্ড। কিন্তু চিঠি ঠিক এসেছে। "80 VABAZAR RAJBATI, CALCUTTA", লেখা খামও যথাসময়ে পেয়েছি। এ-ভুল হয়েছিল "S"-কে "8" পড়ার দোষে, কিন্তু লণ্ডনের ভুল খণ্ডন করে নিয়েছিল কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিস। আর একবার থানকয়েক স্টীল-এনগ্রেভিং আনানো হয় বিলেত থেকে। অর্ডারী চিঠিতে আমাদের রাস্তার নাম দেওয়া ছিল—RAJA NOBO KISSEN STREET, আর মাল যখন এল তখন দেখি ওপরে ঠিকানা লেখা আছে RAJA NOBO KISSING STREET, খাড়া-খাড়া অক্ষরে, যে-অক্ষরকে সেকালে মেয়েলী অক্ষর বলা হত। তথাপি ডেলিভারি হয়েছিল ঠিক্‌-ঠিক্‌।

ভুল সব মানুষেরই হয়। ভুল দেখা, ভুল শোনা, ভুল পড়া, ভুল লেখা, আমাদের প্রত্যহই হয়ে থাকে, তবুও নিজের ভুল নিজে বোঝা শক্ত। বুঝলেও তা স্বীকার করে ক'জন? অথচ, স্বীকার না করলে অপরে তাকে ভুল বুঝতে পারে। যাঁরা যথার্থ বড় হয়েছেন বা বড় হবার উপযুক্ত, তাঁরা নিঃসংকোচে নিজের ভুল-চুক্‌ মেনে নেন। যারা মানতে চায় না, তারা নিম্নস্তরের মানুষ। গান্ধিজী পলিটিক্‌সে ভুল করার পর সে-ভুল স্বীকার করতেন বলে লোকে নির্বিবাদে তাঁকে 'মহাত্মা' বলতো।

পোস্ট অফিসের কাজ আর টেলিগ্রাফ্‌

অফিসের কাজ অনেকটা এক ধরনের। আজকাল আবার এক্সপ্রেস চিঠি হয়েছে যা বিলি করা হয় ডাক-পিয়ন দিয়ে নয়, টেলিগ্রাফ-পিয়ন দিয়ে। এক কথায়, এ-সব চিঠিকে 'ডাক-তার' পত্র বলা যেত, যদি-না 'ডাক্তার' শব্দটি আমাদের ভাষায় এতটা স্থান নিয়ে বসে থাকত। পোস্টস্ অ্যান্ড টেলিগ্রাফ্‌সের একজনই কর্তা থাকেন, তার কারণ উভয়েরই উদ্দেশ্য বার্তা-বহন। সে-বার্তা যদি প্রেরকের কলম থেকে পত্রে রেখা-রূপ পেয়ে থাকে, ডাক-ঘরের কাজ হচ্ছে সে-পত্রকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যথারীতি পেঁৗছে দেওয়া—পত্র-বাহকের যা কর্তব্য তাই। টেলিগ্রাফ্ অফিসের কর্তব্য হচ্ছে, তার-যোগে সাংকেতিক শব্দ শুনে তদনুযায়ী বার্তা লিখে নেওয়া ও যথাস্থানে অবিলম্বে পেঁৗছে দেওয়া। এ-কার্যে যাঁরা নিযুক্ত থাকেন, তাঁদের যুগপৎ শ্রুতিধর ও লেখনীধর হওয়া চাই, নতুবা ভ্রান্তি ও বিভ্রাট্। ডাক-যোগে পাওয়া যায় পত্র-দাতার আপন ভাষায় আপন বক্তব্য, সবিস্তার, যার সংক্ষিপ্তসার মাত্র আসতে পারে তার-যোগে কেননা 'তার করায়' খরচ ঢের বেশি। সংস্কৃত সাহিত্যের সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায় যে, তার-যোগে যা পাই তা 'সূত্র', আর ডাক-যোগে যা মেলে তা 'ভাষ্য'। সুতরাং তার-যোগে প্রাপ্ত সংবাদে যদি ভুল থাকে, সে-ভুল শোধ্‌রানো মুস্কিল। একটা ঘটনা বলি।

১৯৩০ সালে, আফ্রিকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে যখন আমি বোম্বাই শহরে অধুনা স্বর্গগত ডক্টর সুবোধ মুখুয্যের বাসায় অতিথি হয়ে আছি, তখন একদিন দুপুর বেলায় একখানি টেলিগ্রাম এল ওঁর নামে। ঢাকা থেকে তার করেছেন অধ্যাপক ডক্টর রমেশ মজুমদার। সুবোধবাবু তখন রেলওয়ের ডেপুটি অডিটার জেনারেল। টেলিগ্রাম নিয়ে ছুটলুম তাঁর অফিসে। টেলিগ্রামে রমেশবাবু বলছেন, ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজনকে বিলেতে পাঠানো হচ্ছে, তিনি বোম্বাই পেঁৗছবেন পরদিন প্রাতে, AIR MAIL-এ। বোধহয়, ATTEND STATION-ও লেখা ছিল। সুবোধবাবু তাঁর ওয়াকিব-হাল অফিসরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঢাকা থেকে বম্বেতে কোনো AIR MAIL আসে কিনা, এবং যদি আসে তা ক'টার সময়ে। সকলেই মাথা চুল্‌কে বললেঃ কৈ, কোনো AIR MAIL আসে বলে তো শুনিনি। —কী কী MAIL আসে? অবশ্য কলকাতা হয়ে আসে, কেমন না? —এ প্রশ্নের উত্তর এলঃ কলকাতা হয়েই ও আসবে, তাছাড়া উপায় কি? কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে দুটো মেল আসে, একটা নাগপুর দিয়ে, আর একটা এলাহাবাদ দিয়ে। প্রথমটা B N R......

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে সুবোধ বাবুকে বললুমঃ আমি ত কলকাতা থেকে এখানে আসি এলাহাবাদ দিয়ে, বম্বে মেলে।

সুবোধ বাবু বুঝিয়ে দিলেন, সেটা হচ্ছে E I R মেল। অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে।

এতক্ষণে একটু আশার আলো পেলুম। ভাবলুম, হয়তো টেলিগ্রামে ভুল করে EIR-কে AIR লিখেছে। প্রতীক্ষায় থাকা যাক EIR MAIL-এর। সুবোধবাবুও এ-প্রস্তাবে রাজী হলেন।

এই আশা-প্রতীক্ষার পটভূমিকায় মনে পড়ে গেল আমার ঠাকুরদাদার লেখা একটি উপন্যাস। যার নাম ছিল "রত্নগিরি—আশা-প্রতীক্ষা"। বইটির ছাপা আরম্ভ হয় বাংলা ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে, আর শেষ হয়েছিল ১২৯০ সালের ৩০শে আষাঢ়—অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক ছিয়াত্তর বছর আগে। কিন্তু এ-পুস্তক মতান্তর আনলেও কোনো মন্বন্তর আনে নি, কারণ এর ভাষা ছিল মামুলি 'সাধু-ভাষা'। উনি কেন যে 'গুপ্ত কথা'-র চোস্ত চলিত-ভাষাকে ত্যাগ করে সাধু-ভাষার আশ্রয় নিলেন তা জানি না। নিশ্চয়ই সাধু-সঙ্গের উদ্দেশ্যে নয়। আমার অনুমান, তখনকার সাহিত্যরথীরা গুপ্তকথার ভাষাকে সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন বলে স্বীকার করছিলেন না, সেইজন্যে ওঁর নূতন প্রয়াসে উনি মামুলি ভাষাকে অবলম্বন করেন। সাধারণ পাঠকের কাছে গুপ্তকথা যে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিল, তার প্রমাণ, লেখকের জীবদ্দশাতেই এ-উপন্যাসের বারোটা সংস্করণ বেরিয়েছিল। "রত্নগিরি" তেমন আদর পায়নি, যদিচ বিখ্যাত গল্প-শিল্পী 'প্রভাত মুখুয্যে যখন 'রত্নদীপ' রচনা করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি "রত্নগিরি" চেয়ে নেন্ আমার পিতৃদেবের কাছে, ডাক-যোগে, এবং পাঠান্তে পত্র লেখেন পুস্তকটির সুখ্যাতি করে। হিসেব করে দেখ্‌ছি, "রত্নগিরি" সম্পূর্ণ হবার সময়ে প্রমথ চৌধুরীর বয়স ছিল প্রায় পনের বছর। এই সময় বরাবর উনি "গুপ্তকথা" পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে, এবং তখন থেকেই ওঁর শখ হয় যে, বড় হলে উনিও ঐরকম চলিত বাংলায় রচনা করবেন।[১] এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে বেশি দেরি হয় নি, কারণ বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লেখা ওঁর "কথার কথা"—শীর্ষক প্রবন্ধেই উনি চমৎকার চলিত ভাষায় বলেছেন[২]ঃ "বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।" কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম্ প্যাঁচার নক্‌সা লিখেছিলেন 'চলিত' বাংলায়, কিন্তু তাঁর সম্পাদনায় সুসম্পন্ন মহাভারতের অনুবাদ রচিত হয়েছিল 'সাধু' বাংলায়। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, ঐ অনুবাদ-কার্য সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তায় এবং (বাবার মুখে শোনা) ঐ-সব পণ্ডিত জোগাড় করে দেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। এ-সম্বন্ধে যে-কাহিনী পিতৃদেবের কাছে শুনেছিলুম সে হচ্ছে এইঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ একবার বর্ধমানে বেড়াতে যান। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তখন মহাভারতের অনুবাদ করাচ্ছিলেন। কালী সিংহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কবে সে-অনুবাদ সম্পূর্ণ হবে। উত্তরে মহারাজাধিরাজ না-কি বলেনঃ তুমি ছেলেমানুষ, তোমায় আর কি বল্‌ব? মহাভারত একটা মহাগ্রন্থ। তার অনুবাদ-কার্য শেষ হতে অনেক সময় লাগবে। আমি নিজে সেটা দেখে যেতে পারবো কিনা সন্দেহ। —এ-উত্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ সরাসরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ছুটে যান।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতানুবাদ আরম্ভ হয় ১৭৮০ শকাব্দে আর শেষ হয় আট বৎসর পরে। উপসংহারে তিনি বর্ধমান-রাজবাটীর উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলেন নি, তবে ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করছিলেন এবং কালীপ্রসন্নের উৎসাহের ফলে নিজের অনুবাদ-কাজ বন্ধ করলেন, এ-কথা বলা আছে। এই উপসংহারে তিনি অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহীদের নাম করেছেন, যাঁরা তাঁকে অনুবাদ-কার্যে সাহায্য করেছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে দেহাবসান হয়। এবং তাঁর বহু-শ্রমে ও বহু-ব্যয়ে অনূদিত বাংলা মহাভারত মুদ্রিত করে তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন, যেমন তাঁর পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম বিতরণ করেছিলেন। এ-রীতি আমাদের সময়ে অনুসরণ করলেন কালীঘাটের 'গুরুপদ হালদার।

বোম্বাই শহরের ইংরিজী ১৯৩০ সালের একটা ঘটনা বলতে বলতে মধ্যিখানে থেমে গিয়ে এতক্ষণ ধরে অন্য কথা কইছি, তার জন্যে আমি মার্জনা ভিক্ষা করবো না। সবুজ-সভার বৈঠকে আমরা এইভাবেই কথাবার্তা কইতুম, এবং ও-ভাবে কথার পিঠে কথা এসে যায় সব বৈঠকেই। তবে, ঠুংরির বিস্তারে গায়ক গানের মুখটাতে ফিরে আসেন সুদূর ভ্রমণের পরে, মোলায়েম ভাবে। আমি ঠুংরির এই চাল ভালবাসি এবং সাহিত্যে সেটা চালু হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। বিশেষতঃ যখন মৌখিক ভাষাকে আমরা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছি, তখন কথোপকথনে প্রসঙ্গ-পরিবর্তনের

---

১ দেশ, ২১ চৈত্র ১৩৬৫, পৃ ৬৬২-৩
২ প্রবন্ধ-সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৩

রীতিকেই বা কেন পায়ে ঠেলে রাখব? মানব-চিত্তের একটা সহজ প্রবৃত্তিকে চেপে রেখে লাভ কি?

সুতরাং বোম্বাইয়ের হাওয়ায় ফিরে যাবার আগে একটু কলকাতার হাওয়া খেয়ে নিতে ক্ষতি কিছু দেখছি না। বরঞ্চ বৃদ্ধি আছে, কারণ হাওয়াবদল করলে শরীর-মন চাঙ্গা হয়। কালী সিংহের বাংলা মহাভারত কলকাতাতেই লেখা হয়েছিল কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সবুজ পত্রে কলকাতার 'গেলুম' 'খেলুম' ইত্যাদিকে সম্মানের স্থান দিয়েও কালী সিংহের মহাভারতকে আমলে আনতেন না। তাঁর চোখে গোড়ার দিকে বর্ধমান-রাজবাড়ির বাংলা মহাভারত বেশি প্রামাণ্য ছিল। কিন্তু শেষোক্ত অনুবাদটি যে সব সময়ে মূলানুগত হয় নি, এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাঁর বিলম্ব হয়েছিল। এঁর মুখেই শুনেছিঃ যখন প্যারিস থেকে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক হয়ে আসেন, তখন লেভি আর প্রমথবাবু এই দুজনের মধ্যে মহাভারতের একটি উক্তি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রমথবাবু বর্ধমানের অনুবাদ থেকে সেই অংশ লেভিকে পড়ে শোনান, কিন্তু লেভি বললেন, উঁহু! মূল মহাভারতে ও কথাই নেই। মূল (অর্থাৎ যে-আদর্শ নীলকণ্ঠের টীকায় ব্যবহৃত) অনুসন্ধান করে প্রমথবাবু দেখলেন, লেভির কথাই ঠিক, বর্ধমানের অনুবাদে টীকাকারের মন্তব্যকে মূল-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই আবিষ্কারের পর প্রমথ চৌধুরী বর্ধমানের আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করলেন, ভরতচন্দ্রের মতন তাঁকে কারাবাস করতে হয় নি।

যতদূর স্মরণ আছে, এই লেভি-চৌধুরী ঘটনা ঘটে ইংরিজী '২৭ কি '২৮ সালে। সুবোধ মুখুজ্যে আর প্রবোধ বাগচী তখন ফ্রান্স থেকে ফিরেছেন, 'ডক্টর' উপাধি পেয়ে। বিশেষ করে এই দুজনের উদ্যোগে আমরা একটা সংস্কৃতি-সমিতি করেছিলুম যার সভাপতি হলেন প্রমথ চৌধুরী। ডক্টর সুনীতি চাটুয্যে, ডক্টর কালীদাস নাগ, ইত্যাদি যাঁরা ফরাসী ভাষায় অনুরাগী— আমাদের দলে ছিলেন।

এই সমিতির বৈঠক বসত দু-সপ্তাহ অন্তর। বৈঠকের স্থান ছিল আশুতোষ বিল্ডিং-এর দোতলায়। ঐ বাড়ির অন্যান্য ঘরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস আর ল'-ক্লাস বসত। আমি তখন সেই ল'-ক্লাসেও যেতুম—কোঁচে গণ্ডূষ করে। একদিন প্রবোধ বাগচী আমায় বললেন, একজন ইতালীয় পণ্ডিত—নাম তুচ্চী (Tucci)—আসছেন আমাদের বৈঠকে, এবং আমায় সেদিন উপস্থিত থাকতেই হবে। —কি মুশকিল! আমায় যে সেদিন সেই সময়েই ল'-ক্লাসে মুট্-কোর্ট (moot-court) করতে বলেছেন আমাদের অধ্যাপক শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী! ব্যবস্থা হল, মুট্-কোর্টেই আমি প্রথমে যাব, তারপর বাগচী একটা চিঠি পাঠাবেন হীরালালবাবুর কাছে, আমাকে ছুটি দেবার অনুরোধ জানিয়ে। হীরালালবাবু অত্যন্ত ভদ্রলোক, তিনি নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন। —বাগচীর চিঠি পেয়েই তিনি ইংরিজীতে বললেনঃ রোমের অধ্যাপক তুচ্চীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে অমুক সমিতি থেকে, সেখানে আপনার উপস্থিতির জন্যে আমার অনুমতি চাইছেন ডক্টর প্রবোধ বাগচী। ইউ মে গো, মিস্টার দেব।

তখন আমি সেজেছি ব্যারিস্টার, আর হীরালালবাবু হয়েছেন জজ। তাঁকে খুশী করবার জন্যে যতবার পারছি ততবার 'মি-লর্ড' 'মি-লর্ড' করছি। অভিনয়ে যাতে রস-ভঙ্গ না হয়, এই ভেবে সবিনয়ে বললুমঃ

—Your Lordship will now kindly permit my junior to continue my argument. I have a case in the other Court.

বলা বাহুল্য, আর একজন সহপাঠীকে

তৈরী রেখেছিলুমে আমার 'জুনিয়র' হবার জন্যে। তাই আমি সায়েবী কেতায় গন্তব্য-স্থানের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দি আদার কোর্ট-এ চলে গেলুম।

সিল্ভাঁ লেভিকেও আমরা ঐ-সময় বরাবর একটা রিসেপ্শন দিয়েছিলুম। তদুপলক্ষে বৈঠক বসেছিল আমাদেরই বাড়িতে। সকলে মিলে আমরা যখন প্রফেসর লেভিকে রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরী দেখাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে দেখি প্রফেসর রাধাকৃষ্ণন্ আসছেন। তিনি আমাদের সমিতির সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু ঋজু-স্বভাব দার্শনিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আমার খুব ভাল লাগত, এবং আমাদের পাড়ায় তিনি প্রায়ই আসতেন। আমরা দল বেঁধে সস্ত্রীক লেভি সায়েবকে নিয়ে যাচ্ছি দেখে তাঁর ড্রাইভার গাড়ির গতি মন্থর করলেন। সুযোগ পেয়ে তাঁর গাড়ি থামিয়ে তাঁকে পাকড়াও করে নিয়ে গেলুম, লাইব্রেরী দেখাতে। তিনি অ-নিমন্ত্রিত হয়েও আমাদের ডাকে সাড়া দিলেন। শব্দকল্পদ্রুম লেখা হত যে-ঘরে, সেই ঘরের সামনে লেভি ও তাঁর সহধর্মিণী কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন, স্বর্গগত লেখকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। উঠোনে আমাদের সকলের এক-সঙ্গে একটা ছবিও তোলা হয়েছিল, এবং দু টাকা দিলে তার এক কপি পাওয়াও যেত। কিন্তু গেঁতোমীর জন্যে আমার আর সে-ছবির কপি নেওয়া হয় নি। হুমায়ুন কবির যখন স্টেট্ স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে যান, তাঁকেও আমাদের সমিতির বৈঠকে ডেকে কিছু সিঙ্গাড়া-সন্দেশ খাওয়ানো হয়েছিল, বিলেতে যাচ্ছেন বলে ততটা নয়, যতটা তাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমাদের মনকে আকর্ষণ করার ফলে। যেদিন ঐ ছবি তোলা হয়, সে-দিন কবির সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর স্মৃতি-চিত্র আমাদের অনেকের মানস-পটে অঙ্কিত ছিল।

এতক্ষণ প্রতীক্ষায় রেখেছি পাঠককে বোম্বাই শহরের সেই AIR MAIL-এর হেঁয়ালীর মধ্যে। এর চাইতে বেশিক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছিল আমাদের— অর্থাৎ আমি ও সুবোধ মুখুয্যে যখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, সত্যি-সত্যি EIR MAIL-এ চড়ে রমেশ মজুমদারের ঢাকাই ছাত্র বোম্বাই-এ আসবেন কি না। লেখক আর পাঠকের সহযোগিতা থাকলে তবেই ত লেখা যায়।

আর প্রতীক্ষার প্রয়োজন নেই। EIR MAIL এসেছে। যে-ভদ্রলোকের ঢাকা থেকে আসবার কথা, তিনিও এসেছেন। তাঁর নামটি ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে, তিনি আত্মপরিচয়ে বলেছিলেন, তাঁর প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, এবং রমেশবাবুর অভয়বাণীতে আস্থা রাখার ফলে **প্রথম মুরগী খান্।**

হঠাৎ মনে পড়ল বিপিনচন্দ্র পালের একটি আত্মকথা। কোন্ পত্রিকায় বেরিয়েছিল তা ভুলে গেছি, কিন্তু একটা হেডিং স্পষ্ট মনে আছেঃ **প্রথম মুরগী খাইলাম।** বোধ হয়, মুরগী না খেলে উনি বাগ্মী হতে পারতেন না। মুরগীর ডিম খেলে গানের জন্যে গলা খোলে। অতএব, সে-ডিমের মাংস যদি গলার তলায় যায়, তার কার্যকরী ক্ষমতা আরও বেশি হওয়া উচিত। আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ আছে কেবল গ্রাম্য-কুক্কুট খাওয়ায়, বন্য-কুক্কুট অভক্ষ্য-পর্যায়ে পড়ে না। সুসঙ্গ রাজবাড়িতে একবার আমার বন্য-কুক্কুট ভক্ষণের সৌভাগ্য হয়েছিল। অত্যন্ত সুস্বাদু মাংস। মহাভারতে দেখি যুদ্ধের দেবতা স্কন্দ (ওরফে কার্তিকের মহাসেন) কিভাবে জন্মগ্রহণ করেন। "ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; এই রুদ্র-রূপে অনল কর্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেতপর্বতে কৃত্তিকাগণের প্রযত্নে স্কন্দদেব জন্মগ্রহণ করেন; এইজন্য তিনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।... শ্রীমান্ পাবকনন্দন অজীর্ণ-রক্তাম্বর পরিবেষ্টিত কলেবর হইয়া লোহিত বসন-ময়সংবলিত অংশুমানের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রথে অগ্নিপ্রদত্ত কুক্কুট কেতুভূত হইয়া কালানলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।"

[বন-পর্ব, ২২৭ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

'অগ্নিপ্রদত্ত কুক্কুট' যৌধেয়-গণের মুদ্রায় অঙ্কিত দেখা যায়। কুক্কুটকে তাই স্কন্দের 'বাহন' বলা হয়। এই 'বাহন' শব্দের একটা অর্থ 'ভোজন'। অগ্নিকে 'হব্য-বাহন' বলা হয়, তার কারণ তিনি হব্য-দ্রব্যের ভোজন-কারী। সুতরাং তাঁর পুত্র স্কন্দকে কুক্কুট-বাহন করার সমীচীন ব্যাখ্যা হবে এই যে, স্কন্দ অগ্নি-সহযোগে কুক্কুট-ভোজনকারী। প্রকারান্তরে বলা হল, যুদ্ধ করতে গেলে মুরগী খাওয়া দরকার। আর, বাগ্-যুদ্ধ যে অস্ত্র-যুদ্ধের সহচর, এ-সত্যের ভূরি প্রমাণ মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বর্তমান সুতরাং বাগ্মী বিপিন পালের মুরগী খাওয়া সার্থক হয়েছিল।

ভোজন-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করতে হলে মধুরেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু কী মিষ্টান্ন দেওয়া যায়? এখনো আঁবের সময় পার হয়ে যায় নি। বোম্বাই আঁবই সবচেয়ে মিষ্টি, তবে এ-বছরে আর পাওয়া যাবে না। একটা সরেশ সন্দেশ পরিবেশন করি—বোম্বাই শহরের কীর্তি। ডাক-বিভাগের একজন অফিসারের কাছে শোনা। প্রধানতঃ ঐ শহরেই সমুদ্রপার থেকে P & O LINER-এর মেলে পত্রাদি আসে ভারতবর্ষে ডাক-বিলি করবার জন্যে। একবার বিলেত থেকে চিঠি এল, তার খামের ওপর শুধু একটি পাখি আঁকা আর BOMBAY লেখা। এ-ছাড়া আর কিছু ঠিকানা নেই। ডাক-ঘরের কর্তারা স্থির করতে পারলেন না, পত্রটি পাঠাবেন কাকে। একজন পিয়ন, যার কাজ ছিল চিঠি-পত্র বাছাই করে নির্দিষ্ট ব্যাগে ভরে দেওয়া, বুদ্ধি খরচ করে সেই চিঠিটি গভর্নরের ব্যাগে পুরে দিল। গভর্নর চিঠি খুলে পড়লেন। পোস্ট অফিসের কর্তাদের তলব করলেন। তাঁরা তো ভয়ে জড়-সড় হয়ে লাট-ভবনে হাজির। "কে এই চিঠি আমার ব্যাগে পুরে দিয়েছে?" থতমত খেয়ে তাঁরা সত্যি কথাই বললেনঃ অমুক পিয়ন। সে-পিয়নের ডাক পড়ল তৎক্ষণাৎ। সদাশয় গভর্নর তার বুদ্ধির তারিফ করলেন, পদোন্নতিরও ব্যবস্থা হল। গভর্নরের নাম ছিল BIRD, এবং তাঁর স্বদেশ থেকে তাঁরই এক বন্ধু ঐ পত্র পাঠিয়েছিলেন।

এই ডাক-পিয়ন যে পক্ষী-তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল, তা থেকে অনুমান করা যায়, হয়তো সে পূর্বজন্মে মিশর-বাসী ছিল, নতুবা পাখি-আঁকা চিঠি যে BIRD নামধারী মানুষের প্রাপ্য, এ-সিদ্ধান্ত করলে কেন? অবশ্য 'ইণ্ডিয়া'তেও মিশরের মতন সুন্দর পাখি অনেক দেখা যেত, হাজার দুই বছর আগে, এবং পূর্বেই বলেছি,১ মিশরের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পাখির স্থান ছিল উচ্চে। কিন্তু পাখি বাসা চিরকালই বাঁধে যেখানে তারই নাম হওয়া উচিত পাখি-স্থান। যেখানে সবুজ পাতার ডাক শোনা যায় পত্রের প্রত্যেক শিহরণে। (ক্রমশ)

---

১ দেশ, ৫ আষাঢ়, ১৩৬৬
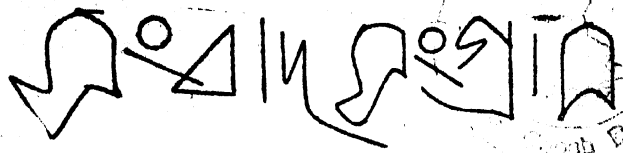
অজিতকুমার দাশ

তিব্বতের ঝড় শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে দুবার নেপালে যাতায়াত হয়ে গেল।

আমার এই পথ চলতেই আনন্দ। চলমান পৃথিবীর জলছবি তুলতে তুলতে চলা।

লাসাতে লড়াই শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২০শে মার্চ বেরিয়ে পড়েছিলাম। তারপর থেকে একটানা ঘুরেই চলেছি। কালিম্পং-গ্যাংটক। তিব্বত রোড ধরে সিকিম-তিব্বত সীমান্তে। আবার গ্যাংটক ও কালিম্পং। আবার গ্যাংটক। দালাই লামার ভারত সীমান্তে প্রবেশ করার খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর রাতে এক জীপ ড্রাইভারকে খোসামোদ করে গ্যাংটক রোড ধরে কালিম্পং আসা। পরের দিন কলকাতা। রাতটা কলকাতায় কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে তেজপুর।

ভাগ্য ভাল দমদম থেকে আসাম বা উত্তরবঙ্গে কোন রাতে উড়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হয় দমদম নামটার যেন একটা সার্থকতা আছে। দম-দাম করে ঘুরে বেড়াবার দম, আরও দম—এই দাবী নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে দমদম।

ঊর্ধ্বশ্বাসে তেজপুরে পৌঁছে নেফার সীমান্তে ছুটে চলা। গাড়ির দুর্ভিক্ষ। ট্যাক্সি নেই তো বয়েই গেল। গাড়ি চাইই। প্রতিদিন ফুটহিলস্‌এ যাতায়াত ১০০ মাইল আর গুজবের অনুগমনে আরও ১০০ মাইল। সুতরাং গাড়ির মালিকদের নীলামের সামনে দাঁড়াই করজোড়ে।

এক পাগলা হাওয়া যেন সবাইকে তাড়া করে চলে। ঝড় যদি ওঠে, ঝড়কে সাথী করেই চলতে হবে। ক্লান্তি বা বিরক্তির বিলাসিতা চলবে না। নিত্য নতুন মতলবে ধাবমান পৃথিবীর যত অতি চালু আর একান্ত অচল লোকগুলির চাল চলন ও চুলোর চুলচেরা হিসাব রাখার জনাই আমাদের চলা। পথ চাওয়া পথ-নির্দেশে চেষ্টা বা অপচেষ্টাই কি 'নিজস্ব সংবাদদাতাদের' পেশা। পেশাকে যদি নেশাতে দাঁড় করান যায় তবেই এই নাগপাশ থেকে রক্ষা। নয়তো খবর পাঠাতে গিয়ে, টীকার টুকিটাকি চেষ্টা করতে গিয়ে কেবল বারবার নিজের অবসন্ন দেহ, ভাঙ্গা হাঁটুযুগল আর টাইপরাইটার-ক্লান্ত আঙ্গুলগুলোর খবর এসে পরে। সুতরাং নিজস্ব সংবাদদাতা নামক দ্বিপদী জীবগুলির সামনে দুটি অতি সহজ সরল পথ, পেশাকে নেশার পর্যায়ে এনে পৌঁছে দেয়া, নয়তো নাশ হওয়া।

আত্মরক্ষার একান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনে আমি আপাতত তাই পেশা ও নেশার মধ্যে একটা সন্ধির চেষ্টায় আছি। নয়তো ১৮ই এপ্রিল বিকালে দালাই লামাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে ভোর ৪টায় আবার এক মালবাহী প্লেনে শিলিগুড়ি থেকে ১৫।২০ মাইল দূরে এক চা বাগানের কাছে নেমে, ভোর আটটার আগে চোখভরা ঘুম আর গা ভরা ঘাম বয়ে শিলিগুড়ি স্টেশনে, 'কোন অভিযোগ নেই' (দুনিয়া বা দালাই লামার ওপর) এমনি একটি ভাব নিয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হত না।

মশারী বা পাশ-বালিশের মাপে ও ছাঁটে তৈরী ভারতীয়দের জামা পরা শরণার্থী রূপে তিব্বতী লামা

পেশা পরিপূর্ণ নেশা হয়ে পড়ারও ভয় আছে। নেশা মাত্রাজ্ঞান নাশ করে। কুমারী মেরিলিন সিলভারস্টোনের তাই হয়েছিল। নিউইয়র্ক থেকে আসা ফ্রী লান্স ফোটোগ্রাফার লাইফ ম্যাগাজিনের হয়ে দালাই লামার ছবি তোলার কাজ নিয়ে দিল্লী থেকে তেজপুর এসেছিলেন। ওর যে একটা গণ্ডগোল হবে তা দালাই লামা ফুটহিলে নামার কিছুক্ষণ আগেই আমি ভেবেছিলাম, একান্ত ভারতীয় বা বঙ্গীয় দিব্যদৃষ্টিতে দেখে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই। ফুটহিলে একটু উঁচু জায়গা দেখে ছবি তুলবার সুবিধার জন্য আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় আসাম রাইফেলের একজন অফিসার ডেকে বললেন, প্রেসের লোকদের জন্য আমরা একটু চা আর জলখাবারের ব্যবস্থা করেছি। শুনে জিভে জল আর ধড়ে প্রাণ এল। দালাই লামা আসবেন বেলা ৯টার আর আমাদের রাত তিনটেয় রওনা করে আনা হয়েছিল। জায়গা ছেড়ে গেলেই অন্যেরা মেরে দেবে। আমি বললাম, আমি যাব না, তুমি যাও, যদি কিছু খাবার আনবে বল তো তোমার জায়গা রাখব। বুকে আধ ডজন ক্যামেরা (১২০ ও ৩৫ মিলিমিটার, কালো ও রঙ্গীন, ওয়াইড অ্যাঙ্গল ও টেলি-ফোটো লেন্স লাগান) আর ফ্যাক্টরীর চিমনীর মত একটা জুম লেন্স ঝুলিয়ে থপথপ করে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে বিজয়গর্বে ফিরে এল দুহাত ভর্তি আর্মি ব্রেড, মাখন আর অন্তত ১ ডজন অতি পুরুষ্টু পাকা কলা নিয়ে।

দেখেই চমকে উঠলাম। বললাম, করেছ কি, কলা অতি অযাত্রা, হয় ফেলে দাও নয় তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল। আমি নিজেও সাহায্য করলাম গোটা দুই চটপট খেয়ে নিয়ে। (পরে দেখেছি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ফোটোগ্রাফার বিশু বাবু, সম্ভবত বন্ধুবর অমিতাভ দাশগুপ্তের নির্দেশে) আমার আধখানা খাওয়া কলা হাতে একটা ছবি তুলেছিলেন। যেন তেজপুরে, ফুট হিলসে কেবল কলাই খেলাম! পোড়াকপালী মেরিলিন শুনল না, কিছু কলা খেল, সুগৃহিণীর মত কিছু সঙ্গে রাখল।

কলা যে কত দেরিতে কলা দেখাতে পারে তা পরের দিন শিলিগুড়িতে প্রমাণ হল। দালাই লামার গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

নেফা ফুটহিলসে পৌঁছে পিঠের বোঝা নামিয়ে গুছিয়ে নিচ্ছেন এক তিব্বতী পিঠে ঝোলান বৌদ্ধমূর্তি

মোরিলিনের লাফ দিয়ে গাড়িতে ওঠার খবর সবাই জানে।

ঝড়ের জন্য সেদিন কলকাতার প্লেন এল না। পরের দিন, আমবাড়ির কাছে এয়ার-স্ট্রীপে প্লেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। হন্তদন্ত হয়ে মোরিলিন এল। মেরী ভাব মরে গেছে। দেখে অবাক হলাম। এত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়া দেখে। আমবাড়িতে তেজপুরের পরিচিত মুখ দেখে এগিয়ে এল। বললাম, মরতে ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে গিয়েছিলে কেন? বলল, "আমি আর কনারী (টাইম লাইফের ভারতের ম্যানেজার) প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিলাম, যদি ট্রেনে লাফ দিয়ে উঠে চলে যাই কয়েকটা এক্সক্লুসিভ ছবি হবে। ঠিক এমনি সময় ট্রেনটাও ছাড়ল। আর আমিও কী জানি কি হল, লাফ দিয়ে চড়ে বসলাম। মাথার ঠিক ছিল না।" মাথা খারাপ না হলে যে অমন কাজ কেউ করতে পারে তা ত আমিও বিশ্বাস করি না। বললাম, "Think of those beautiful bananas, you were warned!"

মোরিলিন কিন্তু এরপরেও ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে লাগল। পুলিস নাকি অজস্র জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এবার ভয়ানক রাগ হল, মাথা দেখছি এখনও ঠিক হয়নি। বললাম, "আজ গর্বের সঙ্গে বুঝতে পারছি আমাদের পুলিস বড় সভ্য ও সংযত যে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পেট ভরে খাইয়ে, রাতে ঘুমাতে দিয়ে, ভোরে বিদেয় করেছে। আর কোথাও হলে, তোমার দেশেও এত সহজে ছাড়া পেতে না।"

এরপরে যা শুনলাম, তাতে মোরিলিনকে

সব পেছনে ফেলে, সযত্নে জামার মধ্যে লুকিয়ে এনেছেন—শখের কুকুর ছানাটিকে অন্য তিব্বতী শরণার্থী

কনগ্রাচুলেট না করে পারলাম না। বলল, বিনা টিকিটে দালাই লামার স্পেশাল ট্রেনে চড়ার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ ওর কাছ থেকে ১০৲ আদায় করেছে, পেনাল্টি শুদ্ধ ভাড়া বাবদ। বললাম, টাকার রসিদ দিয়েছে তো! ভাগ্যবতী তুমি। ওই সোভেনিয়রটা বাড়ি গিয়ে বাঁধিয়ে রেখ।

রেলকর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটি অভিযোগ আছে। ১০৲ দিয়ে যে দালাই লামার গাড়িতে এক স্টেশন যাওয়া যায় একথা আমাদের জানাননি কেন? না কি শুধু মেয়েদের বেলা এই নিয়ম?

যাক সে কথা। দালাই লামাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে তেজপুর থেকে সেদিনই সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে সেই রাতেই ভোর ৪টায় স্পেশাল প্লেনে শিলিগুড়ি গিয়ে আবার দালাই লামার দর্শন পেতে হল। আবার কলকাতা হয়ে তেজপুর—প্রথম তিব্বতী শরণার্থীদের পথ চেয়ে।

তাঁরাও এলেন। কেউ পিঠে করে আনলেন বুদ্ধের মূর্তি, কেউ বা সঙ্গীদের দৃষ্টি এড়িয়ে জামার ভাঁজে লুকিয়ে আনলেন অতিপ্রিয় কুকুরটিকে। "Isn't it cute?" মন্তব্য করলেন জার্মান তরুণী লেখিকা ও সাংবাদিক কুমারী রমি। পোলিওতে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া এক জোড়া পা নিয়েই ভকস্ ওয়াগনে করে একা পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়েছেন।

মিশামারী শিবিরে শরণার্থীদের থাকা খাওয়ার খুঁটিনাটি খবর নিয়ে, মশারি আর পাশ বালিশের ছাঁটে ও মাপে তৈরী আমাদের দেওয়া জামা পরা লামাদের ছবি তুলে যখন ফিরলাম তখন কলকাতাতেই ঠাণ্ডা লড়াইএ শহর গরম। একই সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে তিব্বত কনভেনশনে জয়প্রকাশ নারায়ণের নতুন দাবী—ওদিকে রাজপথে জ্যোতিবাবু, ভূপেশবাবুর পরিচালনায় চীন-ভারত মৈত্রী গণ-মিছিল।

মুশৌরীতে দালাই লামার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর্ব শেষ করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু বললেন—নেপালে যাব। মহারাজা মহেন্দ্রর নিমন্ত্রণ রক্ষা করব।

সুতরাং তেজপুর নেফা ফুটহিলের যাত্রার দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে আমারও আবার নেপাল সফর শুরু হল।

আসল কথা বলতে কি, এই সফর কথাটা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চুরি করা। 'নয়া নেপালের' শুরু হ'ল 'নয়া সফর'—বারবার নেপালীদের নয়া দায়িত্বের কথা মনে রাখতে হবে, কাজ করতে হবে, অফুরন্ত অবসর-প্রীতির অবসান ঘটাতে হবে, অবসাদবিহীন ভাবে এ কথা তিনি বলে চলেছিলেন।

নেপাল সফর অবশ্য আমার কাছে নয়া কিছু নয়। ১৯৫৩ সালে সেটা নয়া ছিল। এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং হিলারীকে এগিয়ে আনার জন্য কাঠমাণ্ডু, বনেশা হয়ে

নামচে বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। পাহাড় পর্বতের চড়াই উৎরাইএর পথে সেই আমার হাতে খড়ি। তারপর ১৯৫৪ সালে খোস-বানী, বিরাট নগর, ধারনি-বাজার, ধানকুটা হয়ে আবার হিলারীর নূতন অভিযানের দুর্ঘটনার খবর নিতে, কাঠের বাক্সে বসে বসে বরফে হাত পা-র আঙ্গুল খসে পড়া ম্যাকফারলেনের শেরপাদের কাঁধে চেপে ফেরার খবর ও ছবির জন্য। এখন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়া ফোটোগ্রাফার বন্ধু গণেশ সিংহকে সঙ্গে নিয়ে গেছি। ১৯৫৫তে দার্জিলিংএর পথে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজয়ী (নেপালের গ্রামবাসীদের অনুরোধে এ'রা শীর্ষের কিছুটা নীচের থেকেই নেমে এসেছিলেন) ডাঃ চার্লস্ ইভানস্-এর ব্রিটিশ দলের নামার পথে আবার গিয়েছি। আবার ১৯৫৬তে কাঠমান্ডু থেকে পোখরা গিয়েছি। মানাস্লু বিজয়ী জাপানী দলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। ১৯৫৬তে বৌদ্ধ জয়ন্তী ও বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত সমাবেশে এসেছিলাম।

মাঝে কিছু ফাঁক পড়েছিল। এবার তিন সপ্তাহে দুবার হয়ে গেল—প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নেপাল সফর ১০ই থেকে ১৪ই জুন। আবার নেপালে নতুন শাসনতন্ত্রের, প্রথম প্রজাতন্ত্রের হালখাতা দেখতে। ৩০শে জুন—১লা জুলাই।

গত অক্টোবর মাসে শ্রীনেহরু যখন তিব্বত-পথ দিয়ে নাথুলাতে সিকিম-সীমান্ত অতিক্রম করে তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভুটান গিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে নাথুলা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। দলে মিশে তিব্বতের মধ্যেও কয়েক ফুট 'অণু-প্রবেশ' করবার সৌভাগ্যও আদায় করেছিলাম।

ভুটানের পর হিমালয়ের পাদদেশে ভারতের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রে নেহরুর সফর হল এই নেপাল আসা।

নয়া নেপালের 'নিউ লুক' দেখতে আসা। সফরের রাজনৈতিক লাভ লোকসানের 'ব্যালেন্স শীট' আর 'প্রফিট এন্ড লস্ একাউন্ট' মেলানর জন্য সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের 'নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের' ঘটনা ও রটনার জট ছাড়ানর, উক্ত ও উহ্যের মালা গাঁথার অ্যাডভেঞ্চার।

নেপালের সেই মামুলী পথ। পাটনা হয়ে উড়ে যাওয়া। এবার পাটনা এয়ারপোর্টে শুধু একজনকে দেখলাম না। হয়তো ছুটিতে আছেন। এক বাঙ্গালী মহিলা প্রিভেণ্টিভ্ অফিসার। বীরাঙ্গনা। সব জাঁদরেল পুরুষ যাত্রীগুলির বিছানাপত্র, স্যুটকেশ খুলে দেখবেন। কেউ রেহাই পাবে না। এখানে '(অ)বিশ্বাসে লভয়ে বস্তু।' এমনি বেশ শান্ত সংযত। কিন্তু একেবারে আদি ও অকৃত্রিম নারী। সন্দেহ বিলাসিনী।

যাত্রা শেষে আর্মি ক্যাম্পে আসাম রাই ফেলসের দেয়া চা পানরত তিব্বতী দল

আগে দেখা হলে পরিচিত মুখ দেখে হয়তো বলেছি, কি কেমন আছেন? বাস্, হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সন্দেহজনক মতলবে ভাব জমাতে এসেছি। যদি না দু'একটা ছোটো-খাটো জিনিস দেখা এমনিতে বাদ হতে পারত আর তাও হল না। সব খুলতে হবে।

মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে পাটনার পরই যাদের হাতে তাড়া খেয়েছি তাদের কথা মনে পড়ে। ১৯৫৭ সাল। কাঠমাণ্ডুর রাজ-প্রাসাদ 'নারায়ণ হিতি'র সামনের রাস্তা দিয়ে চলেছি—আমি আর বন্ধু পি টি আই-এর স্থানীয় প্রতিনিধি স্বদেশবাবু। নিরিবিলি পথ। বিকেলবেলা হঠাৎ, যেমন করে কঞ্চি হাতে মফঃস্বল শহরে ছাগল তাড়িয়ে নেয়, ঠিক তেমনি ছোট লাঠি হাতে দুদিক থেকে দুটি নেপালী মেয়ে ছুটে এল আমাদের তাড়া করে। কি ব্যাপার? স্বদেশবাবু বললেন, ব্যাপার গুরুতর। এরা কাঠমাণ্ডুর মেয়ে পুলিস। আমরা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় হাঁটছি, তাই শুধরে দিতে এসেছে। কিন্তু ফুটপাথ কোথায়? স্বদেশবাবু রাস্তার প্রায় কল্পিত দুফালি সরু অংশ দেখালেন, ক্ষমা চেয়ে ফুটপাতে উঠলাম। আর পাশাপাশি যাওয়ার জায়গা নেই। অগত্যা স্বদেশবাবুর পেছনে আমি চললাম।

এই হল নয়া নেপালের প্রমীলাবাহিনী। আসলে নেপালে পুরুষের চাইতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী। প্রথম নির্বাচনে মেয়েরাই বেশী ভোট দিয়েছে এবং সবাই স্বীকার করেন যে, যথেষ্ট রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছিল। মনে হয় নেপালী মেয়েরা ভোটে নিজেদের অতি প্রিয় অস্ত্রটির বহুল ব্যবহারে রাজনীতিক কলুষ ও অবান্তর কোলাহল মুক্ত করে দিয়েছেন। ডাঃ কে আই সিং, টংকাপ্রসাদ আচার্য প্রভৃতি কম্যুনিস্ট পার্টির সভাপতি সম্পাদক প্রভৃতি সব হেরে গেছেন। অবাঞ্ছিত লোকগুলিকে যেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে।
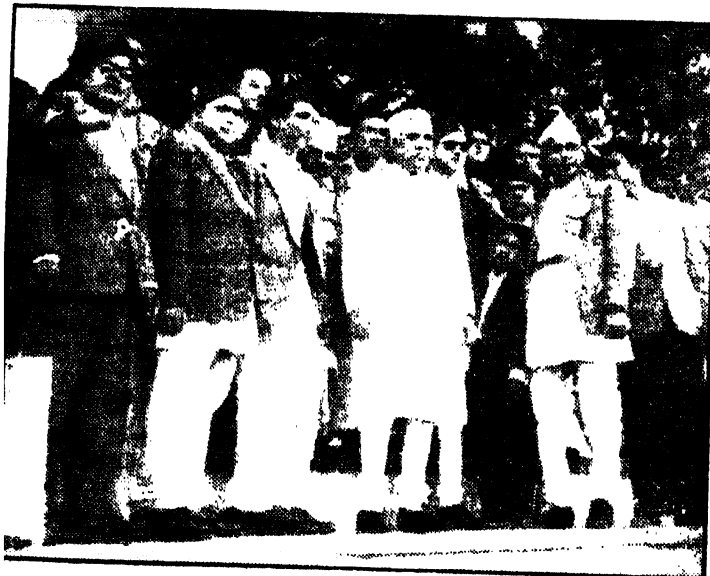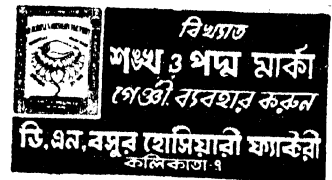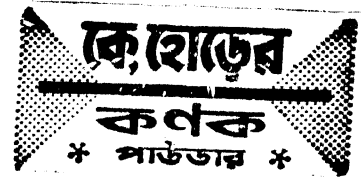
—আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

নেপালে জনসাধারণের সঙ্গে শ্রীনেহরু

হাড় জিরজিরে রোগা ছেলের মতো ইট-বের-করা দেয়ালের গলি। দু পাশেই শুধু দেয়াল, জানালা নেই, দরজাও না। গলিটা খুব নির্জন। জগদীশ নিঃশ্বাস টানলে গন্ধটা পায়। অত্যন্ত মৃদু মাটির গন্ধের সংগে ভিজে শ্যাওলার গন্ধ। গন্ধটা মিষ্টি। শরীর অবশ করে দেওয়া নেশার মতো আমেজ যেন গন্ধটার সংগে মিশে থাকে। যেন এইখানে দাঁড়ালে অনেক পুরনো কথাকে মনে পড়বে।

রোজ নয়, কিন্তু কখনো কখনো সন্ধ্যাবেলা এই গলিটা দিয়ে হেঁটে আসতে জগদীশের গাটা ছমছম করে। ভয় নয়, কেমন বিচিত্র একটা অনুভূতি। একটা টিমটিমে আলো গলিটার কোণে দাঁড়িয়ে জ্বলে। মাটির ওপর নিজের পায়ের শব্দটা অনেক বড় হয়ে তার কানে লাগে। গলিটাকে মনে হয়, একটা প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক গুহার মতো। নিজেকে মনে হয় কোন এক প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো, যে অনেক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে পরিশ্রান্ত হা-ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ একটা অনাবিষ্কৃত আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। এই সেই গুহা যেন। চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু যেন অনুভব করা যায়, দেয়ালে বিচিত্র সব ছবি খোদাই করা। একটা পবিত্র শুদ্ধ হাওয়া গুহাটার ভেতর খুব মৃদু হয়ে বইছে। আর কেবলই মনে হয়, যারা এই গুহাকে পেছনে ফেলে চলে গেছে, তারা আর ফিরে আসবে না। কেন তারা ফিরে আসবে না? জগদীশ ভাবে। তারপর মনে হয়, বোধহয় প্রিয়জনদের কাছ থেকে একবার বিদায় নিয়ে গেলে আর ফিরে আসতে নেই।

জগদীশের ইচ্ছে হয়, এইখানে হাঁটু গেড়ে সে, যারা চলে গেছে তাদের মংগলের জন্য সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। সত্যিই সে প্রার্থনা করতে বসে না, কিন্তু কথাটা মনে হলেই কেন যে সে নিজেই জানে না, তার কান্না পায়। তার ষোলো বছরের অপরিণত ছিপছিপে দেহটা সেই কান্নার আবেগে কাঁপতে থাকে, কুঁকড়ে যেতে চায়, আর তারপর গলার কাছে একটা দলা-পাকানো দুঃখকে অনুভব করতে করতে সে দৌড়তে আরম্ভ করে। গলির শেষে বাঁ দিকে মিত্তিরদের পোড়ো বাড়িটার উঠোনটা ডিঙিয়ে বাবুপাড়ায় ঢুকে পড়ার পর সে স্বস্তি পায়।

গোপালদার মনোহারী দোকানে একটা মস্ত বড় হ্যাজাক জ্বলে। রাস্তাটা সেখানেই দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। আলোটা রাস্তাটার অনেকখানি পর্যন্ত উজ্জ্বল করে রাখে। এই আলোটা দেখলে বেশ ভাল লাগে, মোড়ের মাথায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গল্প করে। গোপালদার দোকান থেকে মৃদু ধূপের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আর তখন শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি অনুভব করতে করতে জগদীশের বাড়ির কথা মনে হয়।

বিকেল বেলায় বাড়ি ফিরে আসাটা বিশ্রী। বিকেল বেলাতে যেন মাকে ভীষণ গম্ভীর আর রাগী বলে মনে হয়। যেন একটু ছুঁতে গেলেই মা ভীষণভাবে ধমকে দেবে। বোধহয় এ-সময়টাতে মা সাজগোজ করে থাকে বলেই ওরকম মনে হয়। ভাবতে ভাবতে জগদীশ বাড়ি ঢুকল।

খিদে পেয়েছে। ভয়ংকর। কলতলার দিকে

যেতে যেতে জগদীশ চেঁচিয়ে বলল, খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে। মা কোথায় আছে না জেনে, না ভেবেই সে চেঁচাল। বিকেল বেলা মাকে সাজগোজ করতে দেখলে ভালো লাগে না। সাজগোজ করলেই মায়েরা যেন গম্ভীর হয়ে যায়। কলতলার আবছা অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে জগদীশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হল, সে মাকে খুব ভালবাসে। খুব। হঠাৎ কেন যে কথাটা মনে হল, তা সে বুঝতে পারল না। এমনি হঠাৎ হঠাৎ কতগুলো অদ্ভুত কথা মনে হয় যে, তার হাসি পায়। মগটা জলে ডুবিয়ে তারপর তুলে তারপর আবার ডুবিয়ে জলের গুবুগুবু শব্দটা শুনল সে। সাবানটা কোথায়। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভালো করে। সাবানটা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে খুঁজতে সে ভাবলো কত অদ্ভুত ইচ্ছেই যে মনে আসে।

এই ঘর জগদীশের। ঘরটা ছোট। একটা করে খাট, চেয়ার, টেবিল।

পা দুটোকে নিয়ে অস্বস্তি। টেবিলের তলা দিয়ে পা দুটো ভালো করে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না—ওপাশের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে যায়। শরীরটাকে কিছুতেই একভাবে রাখা যায় না। শরীরটাকে মোচড়াতে ইচ্ছে করে, ভাঁজে ভাঁজে ভাঙতে ইচ্ছে করে, আর একটা অস্থিরতা যেন ক্রমাগত বুকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। পড়ার বই খোলা থাকে, কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করে না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ঘরটাকে শূন্য নিরর্থক মনে হয়। একটা কিছু যেন ঘটা উচিত, অথচ যা কিছুতেই ঘটছে না। একটা কিছু করা দরকার, কিছু একটা করতে হবে ভাবতে ভাবতেই ঘুম এসে যায়। আর তারপর ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে চেয়ার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যেতে যেতে সারাদিনের ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে এক সময়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। অদ্ভুত সমস্ত স্বপ্ন।

কে যেন তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারল না কে তাকে ডেকেছে। আবছা আবছা গলার স্বরটা কানে ঢুকেছিল, নিজের নামটা শুধু বুঝতে পারছিল। রাত বেশ হয়েছে, খেতে যেতে হবে। ঘুম থেকে উঠে উঠোন ডিঙিয়ে রান্নাঘরে খেতে যেতে একদম ইচ্ছে করে না। বরং রাগ হয়। বাড়ির সকলের ওপর রাগ করতে ইচ্ছে হয়। কি দরকার ছিল ডাকবার, এক রাত না খেয়েও বেশ থাকা যেতো।

বাঁ পাশে বাবা, ডান পাশে মিণ্টু, বেবী, সামনে জলচৌকির ওপর মা বসে। একটা হ্যারিকেন মেঝেতে রাখা। কালি পড়ে হ্যারিকেনটা আবছা হয়ে এসেছে বলে কিংবা সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে বলে কারুর মুখই ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না জগদীশ। রান্নাঘরের দেয়ালে তাদের মস্ত মস্ত ছায়াগুলো দুলছে, কাঁপছে। জগদীশের মনে হল যেন তারা সবাই—বাবা, সে, পিণ্টু, বেবী সবাই মাকে ঘিরে বসেছে একটা গল্প শুনবে বলে। তারা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মা গল্পটা বলতে বলতে হঠাৎ থেমেছে—আবার এক্ষুণি শুরু করবে।

জিভে কোনো স্বাদ পাচ্ছে না সে। পাতে কাঁটা তরকারি তাও যেন গুণতে ইচ্ছে করছে না। বিশ্রী লাগছে।

—আর দুটি ভাত দেবো তোকে? মা বলল।

—না, খিদে নেই।

—বাইরে থেকে কি সমস্ত ছাইপাঁশ খেয়ে আসিস, রাতে তাই খেতে পারিস না।

পিঁড়িটা ঠিকমতো মেঝেতে বসেনি। ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাত তুলতে গেলে শব্দ হচ্ছে ঠক্, পেছন দিকে হেলে মুখের গ্রাসটাকে গিলতে গেলে শব্দ হচ্ছে ঠক্। ইচ্ছে করেই বার-কয়েক সামনে পেছনে দোল খেলো জগদীশ। শব্দ হল ঠক্ ঠক্, ঠক্-ঠাক ঠক্......

—শান্ত হয়ে বসে খেতে পাবো না? বাবার গলাটা ভারী আর গম্ভীর। পোড়া কেরোসিনের গন্ধটা বিশ্রী লাগল জগদীশের। সে খাওয়া বন্ধ করল। পিণ্টু বেবীকে কি যেন ফিস ফিস করে বলল। বেবী শব্দ করে হাসল। ওরা এতো রাত পর্যন্ত জেগে আছে কি করে—জগদীশ ভাবল।

ভাত খেয়ে উঠবার পর ঘুমটা যেন কোথায় পালিয়ে যায়। আর যেন ঘুম আসবে না। অথচ শুতে হবে, রাতজাগা চলবে না। নরম বিছানা, ধবধবে সাদা চাদর। জগদীশ হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে সলতেটাকে কমিয়ে দেয়। ঘরটা প্রায় অন্ধকার।

এই ঘরে যেন একটা উৎসবের গন্ধ লেগে আছে। যেন অনেকদিন আগে এইখানে এক বিত্তশালী সুখী পরিবার থেকে গেছে। বাইরে অন্ধকার জমাট। এপাশে ওপাশে বাড়িগুলো নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আর ঠিক এই সময়ে হাল্কা তন্দ্রার মধ্যে অপষ্টভাবে জগদীশের মনে হয়, এইখানে সে অনেক-

দিন আগে একবার এসেছিল। বাড়িটা বেশ বড়ো। প্রত্যেক ঘরের ছাদে আর দেয়ালে পুরনো আমলের অদ্ভুত সব নক্‌শা কাটা। আগের দিনের বড়লোকদের বাড়ির মতোই। এখন এত বড় বাড়িটায় তারা কয়েকজন মাত্র মানুষ—পুরো বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু অনেক বছর আগে এখানে একটা মস্ত পরিবার থাকত। অনেক টাকা ছিল তাদের আর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েগুলো হাসি-খুশী মোটাসোটা ছিল। মেয়েগুলো ছিল খুব সুন্দরী। খুব ফরশা, গোলগাল, লম্বাটে ডিমের মতো মুখ, একটু পুরু লাল ঠোঁট, অসাবধানে এসে পড়া একটু লালচে আভার চুলগুলো তাদের সাদা কপালের ওপর খেলা করত।...ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময়ে থামে জগদীশ। ঠিক এরকম মেয়ে যেন সে কোথায় দেখেছে। কোথায় দেখেছে যেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রাখী আর পাখী। রথতলার মেলার মাঠটা ছাড়িয়ে যেতে সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড জমিদার বাড়িটাকে তারা বহুবার সবিস্ময়ে দেখেছে। রাখী আর পাখী ও বাড়ির মেয়ে। ওরা বড়লোক, গাড়ি করে স্কুলে আসে। বেবী স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বহুবার রাখী আর পাখীর গল্প তাদের সবাইকে শুনিয়েছে। ওরা আজে বাজে মেয়ের সঙ্গে মেশে না, রোজ টিফিনে বাড়ি থেকে চাকর ওদের খাবার নিয়ে আসে, প্রত্যেকবার ছুটিতে ওরা বাইরে বেড়াতে যায় রিজার্ভ করা গাড়িতে। এমনি আরো কতো কি। বেবীটা বাড়িয়ে বলে, সত্যিই কি আর ওদের অত দেমাক! জগদীশ তো দেখেছে ওদের।

রোদটা সোজা হ'য়ে নেমেছে। ভেতরকার ছায়া ছায়া অন্ধকার আর নেই—গলিটাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঁচু হ'য়ে থাকা ইঁটগুলোর খাঁজে খাঁজে ছায়া আলো দিয়ে তৈরী অদ্ভুত নক্‌শা। বাইরে এখন গরম ধুলো ওড়া বাতাসের ঝাপটা, কিন্তু এই গলিটার ভেতরটা ঠাণ্ডা। দেয়াল দুটো দুধারে অনেক উঁচু। বাতাস ঢুকতে পারে না এই গলিটায়, তাই বোধহয় ঠাণ্ডা। পায়ের নীচে মাটিটা স্যাঁতস্যাঁতে। এখন এই গলিটাকে ঠিক গির্জার মতো দেখাচ্ছে। গির্জার মতো পবিত্র, শান্ত ঠাণ্ডা। গির্জার মতো মস্ত বড় আর উজ্জ্বল। ধারে কাছে কেউ নেই। কেউ আসে না। জগদীশ মাটির ওপর বসল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। একটা ইঁদুর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কোথা থেকে যেন ছুটে এলো। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াল তারপর চকচকে সরু লেজটাকে বর্শার ফলার মতো পেছন দিকে উঁচিয়ে রেখে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। ইঁদুরটা বেশ আছে জগদীশ ভাবল।

এখন ভর-দুপুর। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায় আকাশটা জ্বলছে। দুপুরটা ঝিম্‌ ঝিম করছে চারধারে। জগদীশ ভাবল তার ঘুম পাচ্ছে, নেশার মতো ঘুম। আচ্ছন্ন বা। সে যেন একা, ভীষণ একা। দেয়ালে অনেকগুলো শুঁয়োপোকা জড়াজড়ি করে আছে। জগদীশ তাকিয়ে রইল। বহু পুরনো একটা ছবিকে তার মনে পড়ছে। যখন আরো ছোট ছিল সে তখন এই ছবিটাকে সে বোধহয় মনে মনে তৈরী ক'রে নিয়েছিল। ঠিক ছবি নয়—খানিকটা কল্পনা আর খানিকটা স্বপ্নের মিশেল। তার চারদিকের এখনকার চেহারাটা সেই পুরনো ছবিটাকে তার মনে জাগিয়ে তুলছে। একটা অস্পষ্ট, গম্ভীর অথচ স্থির ছবি। একটি মেয়ে, তার লাল চুল, নীল চোখ, বাদামী ঠোঁট। আর একটা গীর্জার অভ্যন্তর, লম্বা জানালা, গোল খিলান, কাঁচের শার্শি, মোমবাতি। সে যেন হাঁটু গেড়ে মোমবাতি জ্বলা বেদীটার সামনে বসে আছে। মেয়েটি তার কানে কানে খুব কাছ থেকে প্রার্থনার মন্ত্র বলে দিচ্ছে। সে তার গায়ের মিষ্টি কোমল গন্ধ পাচ্ছে। ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছে। মেয়েটা গানের সুরের মতো কথা বলছে। কিন্তু কথাগুলো সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। মেয়েটি আরো কাছে আসুক। আরো। কি বলছে ও? আর কেনই যে বলছে! কাঁচের শার্শিটার বাইরে শেষ বেলার সূর্য ডুবে যাওয়া ম্লান ছাই ছাই আলো। জগদীশ চাইছে মেয়েটা আরো কাছে আসুক। সে তাকে স্পর্শ করুক।

কী বিষণ্ণ এই ছবি। জগদীশ ভাবল। ছবিটাকে তার ভালো লাগে না। কিন্তু ছবিটা আছে। থাক্‌বে। কতদিন থাকবে কে জানে। হয়ত আজীবন। জগদীশ জানে না। সন্ধ্যাবেলা বাতি না জ্বালিয়ে পড়ার ঘরে একা একা বসে থাকলে এই ছবিটাকে মনে পড়ে। মনটা বিষণ্ণ উদাস হ'য়ে যায়। ছবিটা কখনোই সত্যি হ'য়ে আসবে না জগদীশ সেটা বুঝতে পেরেছে বড় হ'য়ে।

এই গলিটা অনেক পুরনো কথাকে মনে পড়িয়ে দেয়। বোধহয় ভিজে মাটি আর শ্যাওলার ভারী গন্ধ আর পলেস্তারা খসে যাওয়া পুরনো দেয়ালগুলোর জন্যেই ওরকম হয়। এখানে এসে বসলেই মনে হয় যেন এখানে সে আর নেই, সে যেন অনেক পুরনো দিনগুলোয় ফিরে গেছে। এই দেয়ালগুলোর যদি প্রাণ থাকত কিংবা প্রাণ আছে একথা যদি জগদীশ বিশ্বাস করতে পারতো তবে বেশ হত। ছেলেবেলায় যে যখন প্রথম পড়েছিল যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে তখন কথাটা তার ভালো লেগেছিল। ঠাকুমাকে বলতেই ঠাকুমা বলেছিলেন শুধু উদ্ভিদ কেন পাথর পাহাড় নুড়ি এসব কিছুরই প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ আছে, ভালোমন্দের অনুভূতি আছে। ঠাকুমার কথাটা তার বিশ্বাস হয়েছিল। অনেক বাধা পেয়ে ঘা খেয়েও সেই বিশ্বাসটা মনের কোণে

তাঁদের বিশ্বাসটা দিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে কেমন করে সে নিজেই জানেনা সেই বিশ্বাসটা হারিয়ে গেল। ঠাকুমারা মরে গেলেই কিংবা হয়ত বয়স বাড়লেই এই অদ্ভুত বিশ্বাসগুলো ভেঙে যায়। কিন্তু এই বিশ্বাসগুলো যখন ভেঙে যায় তখন ভালো লাগে না, মন-খারাপ লাগে। যেন অনেক দিনের পুরনো বন্ধুরা আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে এরকম মনে হয়। মন তখন যেন চায় এই বিশ্বাসগুলো আবার চুপি চুপি ফিরে আসুক। সে বিশ্বাস করতে পারুক যে এই দেয়ালগুলো, এই মাটি, ওই মিত্তিরদের ভাঙা পোড়ো বাড়িটার ভেতরেও প্রাণ আছে। ওদেরও যেন প্রিয়জন আছে যারা চলে গেলে ওরা দুঃখ পায়। সেই প্রিয়জনদের কথা ওরা জগদীশকে বলুক।...এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই যেন জগদীশ নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেল। ছট্‌ফট্‌ করে উঠে দাঁড়াল। বিকেল হয়ে আসছে এক্ষুনি মাঠে যেতে হবে। দল বেঁধে তাকে খুঁজতে এসে বোধহয় ফিরে গেছে বন্ধুর দল।

সন্ধ্যাবেলা রত্না এল। রত্না বেবীর চেয়ে একটু বড়ো আর জগদীশের চেয়ে দু এক বছরের ছোট। কাছাকাছি বাড়ি, কিন্তু রত্না যে রোজ আসে তা নয়। কেন যে আসে না তা জগদীশ জানে না। আগে কিন্তু আসতো।
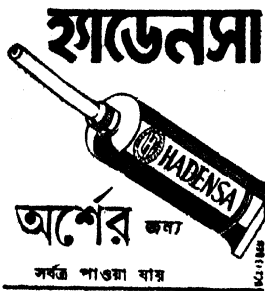
হ্যারিকেনটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল। রত্নাকে শাড়ি পরতে এর আগে দেখেনি জগদীশ। নীল রঙের ফ্রকটাকে ব্লাউজের মতো নীচে পরেছে, তার ওপর নীল শাড়ি। চেনা রত্নাকে অচেনা মনে হচ্ছে।

এই, বেবী কোথায় রে? রত্না জিজ্ঞেস করল। খুব ভালো করে জগদীশের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল। ওর মুখটা লাল লাল। গলার স্বরটা ক্ষীণ লজ্জার সুরে কাঁপল, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বাতাসের শরীরের সঙ্গে মিশে গেল এবং তারপরেও যেন কাঁপতে লাগল।

—কেন, বেবীকে দিয়ে কি হবে? জগদীশ অনেকক্ষণ পরে বলল।

—তা দিয়ে তোর দরকার কি! ভারি সর্দার হয়েছিস আজকাল।

—হয়েছিই তো। জগদীশ হেসে হেসেই বলল।

—থাক্‌ তোকে বলতে হবে না। আমি মাসীমার কাছে যাচ্ছি।

—না, মাও জানে না বেবী কোথায় আছে। শেষ কথাটা কানে নিল না রত্না।

রত্না ঘরে দাঁড়াল। দরজার দিকে। এক পা এগোলো। জগদীশ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। একটা কিছু করা দরকার, না হ'লে ও চলে যাবে।

জগদীশ বলল,—দাঁড়া, এইখানে বোস্‌। আমি বেবীকে খুঁজে আনছি।

—ইস্‌, দাঁড়াবো না, আমাকে মীরাদের বাড়ি যেতে হবে।

—বুঝতে পেরেছি, শাড়িটা দেখাতেই এসেছিলি, বেবীকে খুঁজতে নয়।

রত্না শরীরটাতে একটা মোচড় দিল। ঘুরে একটু রুখে-দাঁড়ান ভঙ্গীতে মাথাটা সোজা করে চোখের কোন দিয়ে জগদীশের দিকে তাকাল। এই ভঙ্গীটা তার চেনা। ছেলেবেলায় খেলতে খেলতে রেগে গেলে জগদীশের দিকে অমনি ভাবে রুখে দাঁড়াত রত্না। ভঙ্গীটা দেখে জগদীশ বরাবর হাসতো, ভয় পেত না।...কিন্তু আজ রত্নাকে অচেনা মনে হচ্ছে। যেন নতুন কোন মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম আলাপ হচ্ছে তার। জগদীশ ভয় পেল যেন। বুকের কাছটা একটু কাঁপল। দৃষ্টিটা পিছলে নামল যেখানে শাটিনের নীল রঙের ফ্রকটা বুকের কাছে সামান্য একটু টাল খেয়েছে। শাড়ির ওপর থেকেও বোঝা যায়। জগদীশ মেঝের দিকে তাকাল।

জগদীশ চোখ না তুলেও বুঝতে পারল রত্না হাসছে। খুব মৃদু সে হাসিটা। হাসিটা অদ্ভুত—যেন অনেক কথা ঐ হাসিটার ভেতর বলা থাকে কিন্তু সেগুলো যে কি তা জগদীশ বুঝতে পারে না। রত্নার পায়ের শব্দটা এগিয়ে এল। জগদীশ মুখ তুলল।

রত্না হাসছে না। রত্না ভীষণ গম্ভীর।

জগদীশ তাকাল। তাকিয়ে রইল।

রত্না বলল,—লজ্জা করল না ও কথা বলতে? বাঁদর কোথাকার!

জগদীশ ভীষণ অবাক হল। হঠাৎ কোথা থেকে এত সাহস পেল রত্না। জগদীশের হাতদুটো নিস্‌পিস্‌ করে উঠল। দাঁতে দাঁত চাপল জগদীশ। আর একটা কিছু বললেই...। কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে রত্না তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো হ'য়ে গেছে। যেন রত্নার কাছে সত্যিই সে ছেলেমানুষ। ও এত বড় হয়ে গেল কেমন করে? নিজেকে খুব অসহায় লাগল তার। কিছু একটা করতে হবে ভেবেও সে চুপ করে বসে রইল। না, রত্নার গায়ে হাত দেওয়া যায় না। ওকে অনেক বড়ো মনে হচ্ছে। বড়ো মেয়েদের গায়ে হাত দিতে নেই। ওর বেনী দুটো সামনের দিকে ছাড়া রয়েছে। ইচ্ছে করলে জগদীশ ওই বেনী দুটোতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু কেন যেন জগদীশের ইচ্ছে হল না।

রত্না চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ। জগদীশ অবাক হলেও কথা বলল না। রত্না ওর বেনী দুটো নিয়ে নাড়া চাড়া করলো কিছুক্ষণ। তারপর হাসল। সেই অদ্ভুত হাসিটা—যেন অনেক কথা ঐ হাসিটার ভেতর বলা থাকে, কিন্তু সেগুলো যে কি তা জগদীশ বুঝতে পারে না। জগদীশ চুপ করে রইল।

—কিরে কথা বলছিস না যে! রত্না বলল।

—এমনিই।

—ইস্‌ এমনি বইকি! নিশ্চয়ই তুই—

রত্নার চোখের দিকে এবার স্পষ্ট করে তাকাল জগদীশ। রত্না যেন ভীষণ অবাক হয়েছে। খুব বড়ো বড়ো চোখে তার দিকে তাকিয়ে সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসছে রত্না। অবাক হওয়ার সঙ্গে সব-বুঝে-ফেলেছি ধরনের একটা ভাব। জগদীশ ভাবল, বোধহয় রত্না আশা করেছিল যে সে রেগে যাবে। রেগে গিয়ে ঠিক আগের মতোই ওর বেনী ধরে টেনে কিংবা হাত মুচড়ে দিয়ে কিবা চড় মেরে শোধ নেবে জগদীশ। কিন্তু তা করেনি বলেই যেন অবাক হয়েছে ও। কিন্তু ওতো জানে না ওকে আজ কতো বড়ো আর অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রত্না বলল, বোকার মতো মুখ করে বসে আছিস্‌ কেন?

জগদীশ চুপ করে রইল। রত্না এগিয়ে এল আর তারপর জগদীশের চেয়ারের মুখোমুখী খাটের একপাশে খুব সন্তর্পনে বসল।

—ইস্, রাগ হয়েছে বাবুর। রত্না আবার বলল। জগদীশ খুব স্পষ্টভাবে একটা সুগন্ধ পেল। পাউডার স্নো আর বোধহয় তেলের গন্ধ। গন্ধটা চেনা। তবু যেন জগদীশ অস্বস্তি বোধ করল। কেমন যেন সঙ্কোচে জড়োসড়ো হয়ে বসল সে। রত্নাটা এত কাছাকাছি এসে বসেছে যে ওর দিকে ভালো করে তাকাতে পারছে না জগদীশ।

যেন খুব গোপন একটা কথা কানে কানে বলবে এইভাবে মুখটা জগদীশের কাছে এগিয়ে আনল রত্না। রত্নার মুখটা খুব কাছাকাছি যেন তাকে ছোঁয়-ছোঁয়। জগদীশ একটা ঠাণ্ডা ভয়কে তার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতে অনুভব করল। কেমন জ্বালা করল বুকটা। বুকটা জ্বালা করল আর কাঁপতে লাগল। রত্নার মুখটা হাসি হাসি। রত্না বলল,—এই, একটা কথা বলবি?

নিজের মুখটা দূরে সরিয়ে নেবার জন্য একটু পেছন দিকে হেলে জগদীশ প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল,—কি?

রত্না বলল—কাছে আয়না, অমন হেলছিস কেন?

হ্যারিকেনটা বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। জগদীশ ভাবল। আলোটা আরো কম হলে—আরো কম হলে কি যে হ'ত সে ভেবে পেল না। রত্নার মুখটা লাল লাল। যেন কি একটা কথা নিয়ে মনে মনেই ও লজ্জা পাচ্ছে। জগদীশ সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকল; প্রায় কাঁপা গলায় বলল—কি বলছিস্ বল্ না।

—ঠিক বলবি তো?

—হ্যাঁ।

—আজকে,—আজকে আমায় কি রকম দেখাচ্ছে রে!

জগদীশের হঠাৎ হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। খুব জোরে। হাসিটাকে সে বুকের ভেতর অনুভবও করলো, কিন্তু কিছুতেই সেটা ঠোঁটে এলো না। হাসিটা বুকের ভেতরই কাঁপতে কাঁপতে মরে গেল। জগদীশ উজ্জ্বল চোখে রত্নার দিকে তাকাল। যেন রত্না তাকে অনেক সম্মান দিয়েছে। এই যেন প্রথম নিজের মূল্য বুঝতে পারল জগদীশ। জগদীশ খুশী হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হল,—রত্নাটা কি ছেলেমানুষ।

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল জগদীশ। বারান্দায় পায়ের শব্দ। মা আসছে। মার পায়ের শব্দটা জগদীশের চেনা। একটু যেন চমকে উঠল জগদীশ। অথচ চমকানোর কোন দরকারই ছিল না, কেননা সে এমন কিছু করছে না যে—। মনে মনে তার নিজের ওপর রাগ হ'ল। সে কিছুই বলল না রত্নাকে।

—একি, রত্না কখন এলি? ঘরের দরজা থেকেই মা জিজ্ঞেস করল।

—এই মাত্র। রত্নার উত্তর।

কি মিথ্যুক—জগদীশ মনে মনে ভাবল। মিথ্যে কথা বলবার কোন দরকার ছিল কি রত্নার। ও তো অনেকক্ষণ এসেছে;—সেকথা বললেই বা কি হ'ত।

মা ঘরে এল। হাতে এক রাশ ধোয়া শুকনো জামাকাপড়। সেগুলো আলনায় ভাঁজ করে রাখবার জন্য এগিয়ে যেতে যেতেই মা রত্নাকে বলল—তুই ও'ঘরে যা, আমি আসছি।

রত্না চলে গেল। যাওয়ার সময় দরজা থেকে ঘুরে জগদীশের দিকে তাকাল। ওর তাকানর মধ্যে একটু হাসি ছিল। জগদীশ ভাবল।

মার মুখটা গম্ভীর, রাগ রাগ। রোজ এই সময়টাতে যেন মাকে ভীষণ রাগী, আর গম্ভীর বলে মনে হয়। যেন একটু ছুঁতে গেলেই মা ধমকে দেবে। বিকেলবেলা গা ধুয়েছে মা। সাবানের মৃদু গন্ধ। খোঁপাটা পরিপাটি করে বাঁধা, পরনের শাড়িটা ধপ্-

ধপে পরিষ্কার। এইরকম সাজপোশাকে মাকে যেন ভাল লাগে না, যেন মা মা মনেই হয় না। যেন অন্য বাড়ি থেকে কোন ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছে। কাজ করতে করতে যখন মার চুল এলোমেলো হয়ে যায়, কাপড়টা নোংরা আর হলুদের ছোপধরা হয়, আর মুখে ঘাম জবজব্ করতে থাকে, তখন যেন মাকে ভীষণ ভালো লাগে, আদর করতে ইচ্ছে হয়। বারবার মনে হয় মার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে। বোধ হয় মা'র কষ্টের জন্যেই তখন মাকে অত ভাল লাগে।

মা জগদীশের দিকে তাকাল। বলল,—তুই পড় না। রাতদিন বসে বসে কি যে ভাবিস ছাইভস্ম।

—মা, তুমি আমার কাছে একটু বসবে? জগদীশ বলল।

—কেন রে!

—এমনিই। ভাল লাগছে না। বোসো না।

—বসবো কি করে, ও ঘরে রত্না বসে আছে একা একা।

—কেন, বেবী আসে নি?

—কোথায়, দেখছি না তো। তার তো আড্ডার শেষ নেই।

—তাহ'লে রত্নাকেও এই ঘরে ডাকো।

মা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাল তার দিকে। যেন হঠাৎ তাকে নতুন করে দেখছে মা। কেমন যেন একটা সন্দেহ মার চোখে। যদিও হ্যারিকেনের আলোতে মার মুখটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তবুও জগদীশের মনে হ'ল মার মুখটা যেন বদলে গেল। মা খুব গম্ভীর হলো। মা খুব আস্তে বলল,—না। তুমি পড়ো।

মা চলে গেল।

নিজেকে ভীষণ বোকা বলে মনে হ'ল জগদীশের। মাকে যেন সে বুঝতেই পারল না। তারপর আস্তে আস্তে সে অনুভব করল যে, একটা বিরক্তি মেশানো ক্ষোভ আর লজ্জা তার মন জুড়ে বসেছে। তার রাগ হ'ল। ইচ্ছে হ'ল একটা কিছু ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে রাগটা মেটায়। তারপর কেমন একটা হতাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে সে টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে মুখ গুঁজল। একবার ইচ্ছে হ'ল এ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দায় কিংবা ও ঘরে। তারপর একটা সংকোচ এল। না, যাওয়া যায় না। একটা যেন অলিখিত অকথিত আইন আছে। সে আইনটা আঙুল উঁচিয়ে বলল, না তুমি যাবে না। সে অনুভব করল, খানিকটা স্বাধীনতা সে হারিয়ে ফেলেছে। বুকটা জ্বালা করছে। আজকের বিকেলটা যেন খুব ভালো হতে গিয়ে খুব খারাপ হয়ে গেল।

জগদীশ ভেবেছিল রত্না চলে গেছে। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল তা সে জানে না। খুব বেশীক্ষণ নয় নিশ্চয়ই। পিঠে কিল খেয়ে উঠে দেখল, রত্না। রত্না হাসছে।

পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে জগদীশ বলল,—মারলি কেন?

—এমনিই।

—হাসছিস কেন?

—এমনিই।

—তোকে মারলে কেমন হয়?

—ইস্। মারা এতো সোজা!

রত্না ঘুরে দাঁড়াল। রত্না চলে যাবে। দরজাটা খোলা। হ্যারিকেনটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। জগদীশের মনে হ'ল রত্নার সঙ্গে কার যেন মিল আছে। ঘুরে দাঁড়ানোর ভংগী আর হাসিটার সঙ্গে কার যেন মিল আছে। কার? কে জানে। কে জানে কেন শরীরে কাঁটা দিল তার।

—কালকে সকালে আবার আসব আমি। বেবীকে থাকতে বলিস্। বলতে বলতে দরজার চৌকাঠের ওপাশে একটা পা বাড়াল রত্না।

—দাঁড়া, তোকে একটা কথা বলা হয়নি। জগদীশ তাড়াতাড়ি বলল।

—কি?

—রাখী আর পাখীদের চিনিস?

—হ্যাঁ। কেন?

—তোকে দেখতে ঠিক রাখীর মতো লাগছে। কেন যে হঠাৎ কথাটা বলল জগদীশ তা সে নিজেই বুঝল না।

রত্না বলল যা।

রত্না লাল হ'ল একটু, যেন খুশী হ'ল। তারপর একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—রাখীর বিয়ে, জানিস্?

জগদীশ চমকে উঠল। কথা বলল না, বলতে পারল না। রত্না নিজেই আবার বলল,—এ মাসের সাতাশে।

—তুই কি ক'রে জানলি? জগদীশ অবিশ্বাসের সুরে বলল।

—বলব কেন? রত্না যেন মজা পেয়ে হাসল। চলে গেল।

তার বুকের ওপর দিয়ে খুব ভারী পায়ে কে যেন মাড়িয়ে গেল। বুকটা মোচড় দিল, তারপর শূন্য হয়ে গেল। দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। খুব জোরে চিৎকার দিতে গিয়েও পারল না সে। সে যেন মরে যাচ্ছে আর মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েও সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার চারপাশে অনেক লোক। তাদের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না। তারা সব অশরীরী মূর্তির মতো নিঃশব্দে তার চারপাশে ঘুরছে ফিরছে, আর চাপা গলায় কথা বলছে। কি এত কথা ওদের। কোথা থেকে যেন মৃদু আর গভীর নীল আলো ঘরটার মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরটা ভীষণ ঠান্ডা। কে যেন খুব কাছে এল আর চাপা গলায় তাকে জানাল যে, তার মা-ও মরে গেছে। জগদীশের ভীষণ কান্না পেল। কিন্তু সে কাঁদতে পারছে না! তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দরজা খুলে কারা যেন ঘরে ঢুকল একটা দেহকে বহন করে নিয়ে। জগদীশ টের পেল ঐ দেহটা তার মার। মা মরে গেছে। ওরা মার দেহটা ঠিক তার পাশেই শুইয়ে রাখল। জগদীশ ভাবল, তার যেন বিশ্বাস হ'ল মা আবার বেঁচে উঠবে। ঠাকুমা যখন মরে গিয়েছিল তখনো জগদীশ ঠিক এ কথাটাই ভেবেছিল, ঠাকুমা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে আবার। যেমন করেই হ'ক। কিন্তু ঠাকুমা বাঁচেনি। তার শিয়রে বসে বাবা যেন কাঁদছে। জগদীশ চোখ তুলল। রাখী আর পাখী। আর তার পায়ের কাছে বসে রত্না। ওরা সবাই কাঁদছে। জগদীশ একটুও অবাক হল না। যেন সে এরকমটাই ভেবেছিল। জগদীশের কান্না পাচ্ছে। যেন কাঁদতে পারলেই সব দুঃখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু কে যেন তার গলাটা চেপে ধরে আছে। কিছুতেই সে কাঁদতে পারছে না। রাখী পাখী রত্না তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা জগদীশকে মরে যেতে দেখছে। জগদীশ দাঁতে দাঁত চাপল। সে মরবে না, কিছুতেই না......

ঘুম ভেঙে তড়বড় করে উঠে বসল জগদীশ। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকটা ধড়ফড় করছে। হ্যারিকেনটা তেমনি জ্বলছে। বইগুলো খোলা। জগদীশ উঠে দাঁড়াল। খুব আশ্বস্ত হয়ে সে অনুভব করল, মা-বাবা পিন্টু বেবী সবাই জেগে আছে। বেঁচে আছে। এখনো খাওয়ার ডাক পড়েনি।

মা ডাকছে। জগদীশ উত্তর দিল না। মা এ ঘরে এল,—ওমা, তুই জেগে আছিস! আমি ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিস্। খেতে যাবি না!

—হুঁ।

—আয়, সবাই বসে আছে তোর জন্যে।

—তুমি আমার কাছে এসো একটু।

মা কাছে এল,—কেন রে; শরীর-টরীর খারাপ নয় ত'?

জগদীশ মাকে ছুঁলো। মাকে খুব ভাল লাগছে। মা বেঁচে আছে। মা হাসছে।

জগদীশ মার কাঁধে মুখটা গুঁজে দিল,—মা, মা, মা, মাগো, মামণি-গো।

তার চোখে জল এল হঠাৎ। কেন যে কান্না পাচ্ছে তার তা সে বুঝতে পারল না। কান্নাটা বুক ছাপিয়ে, গলা ছাড়িয়ে, শিরায় শিরায় আলোড়ন তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গলাটা বুজে আসতে চাইছে।

—কি হ'ল তোর হঠাৎ?

জগদীশ কথা বলতে পারল না। জগদীশ কান্নাটাকে প্রাণপণে চেপে রাখল।

দুপুর। ঘরটা বিশ্রী গরম। ঘর থেকে জগদীশ বাইরে এল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল।

মিত্তিরদের নির্জন পোড়ো ভিটেটা প্রায় নিঃশব্দে ডিঙিয়ে গলিটার ভেতর এসে দাঁড়াল সে। মাটির ওপর বসলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে। একটা নরম ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস যেন তাকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরল। খুব ভাল লাগল তার। দুপুরের রোদ্দুরটা চোখ রাঙিয়ে তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। গলিটা স্নেহশীলা ঠাকুমার মতো, মায়ের মতো তাকে আগলে নিল। দুপুরটা গলির বাইরে দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে।

জগদীশ চুপ করে বসে রইল। জগদীশের মনে হ'ল এই দেয়াল দুটো একদিন ভেঙে পড়বে, কিংবা কেউ এসে ভেঙে ফেলবে। কোন কিছুই চিরকাল থাকে না। থাকবে না। যেদিন এ দেয়াল দুটো ভেঙে পড়বে সেদিন জগদীশ খুব দুঃখ পাবে, খুব কষ্ট হবে তার। এই দেয়াল দুটো তাকে অনেকদিন আশ্রয় দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে। পোষা কুকুরছানা মরে গেলে সকলের সামনে কাঁদতে না পেরে এইখানে এসে কেঁদেছে ছেলেবেলায়। কতবার ডাশা পেয়ারা, কাঁচা আম কিংবা মা-বাবার চোখের বিষ তার ধনুকটা ছেলেবেলায় এইখানে এসে লুকিয়ে রেখেছে সে। কেউ টের পায়নি। এই দেয়াল দুটো তার বিশ্বস্ত আত্মীয়ের মতো, সমবয়স্ক বন্ধুর মতো তাকে সংগ দিয়েছে। কিন্তু একদিন এই গলিটাও ধ্বংস হয়ে যাবে, মরে যাবে। যেভাবে তার ঠাকুমা মরে গেছে। কেউ বেঁচে থাকবে না। মা, বাবা, বেবী, পিণ্টু, রত্না, রাখী, পাখী—এরা সবাই একদিন মরে যাবে। শেষ হয়ে যাবে।

ঠাকুমাকে সে ভয়ংকর ভালবাসতো। একদিন রাত্রিবেলা কে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। সবাই কাঁদছিল। জগদীশকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে মা কাঁদছিল। জগদীশ ভেবেছিল ওরা বোকার মতো কাঁদছে। আসলে ঠাকুমা বেঁচে উঠবেই। ঠাকুমা কি মরে যেতে পারে? দূর, তাই কখনো হয়! ঠাকুমার ফিরে আসার অপেক্ষায় জগদীশ অনেকদিন উৎকণ্ঠ হয়েছিল।

কেন যে এমন হয়! ঠাকুমা মরে যায়, রাখী-পাখীদের বিয়ে হয়ে যায়, দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ে।

অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া অনুভূতির সংগে সিরসিরে বাতাসের মতো কিছু যেন একটা বুঝতে পারল জগদীশ। যেন বুঝতে পারল এগুলোকে হতেই হয়। রত্না-রাখী-পাখীরা একদিন বড় হবে তারপর বড় হতে হতে একদিন ঠাকুমার মতো বুড়ি হয়ে একদিন মরে যাবে। মনে হতেই যেন কেমন খারাপ লাগল তার।

গলিটা শূন্য। জগদীশের মনে হ'ল তার চারদিকের জগৎটা যেন একটা খোলস ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে নতুন হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। চোখ বুজে সে দেখতে পাচ্ছে পুরনো পৃথিবীটা যেন দূরে দূরে সরে যেতে যেতে তার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। জগদীশের ঘুম পেল।

সে যেন সেই গির্জাটার ভেতর বসে আছে। সামনে মোমবাতি জ্বলা বেদী। খুব কাছ থেকে সেই মেয়েটি তার কানে কানে প্রার্থনার মন্ত্র বলে দিচ্ছে। আজ তার আর ঘুম আসছে না। সে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি রত্না! না, রত্না নয়, বোধ হয় রাখী। হাঁ, রাখীই, যার বিয়ে হয়ে যাবে এ মাসের সাতাশে। জগদীশের দুঃখ হ'ল। মেয়েটি হাসছে। হাসতেই মেয়েটার মুখটা যেন তার মায়ের মতো হয়ে গেল। জগদীশ আশ্চর্য হয়ে দেখল মেয়েটির মুখে রত্না রাখী-পাখী আর তার মা—সকলেরই মুখের আদল যেন আছে। সবাই মিলে যেন এই মেয়েটি।

মেয়েটা আরো কাছে এল। তাকে ছুঁ'ল। জগদীশ চমকে উঠল। তার চোখের সামনে থেকে একটা মস্ত পর্দা যেন হঠাৎ সরে গেল। তখন রাখী পাখী আর রত্নাদের সব রহস্য যেন তার জানা হয়ে গেছে। এখন যেন অনেক অনেক কিছু, জগদীশ যা এতদিন বুঝতে পারত না। তা যেন বুঝতে পারছে। জগদীশকে ভেঙে ধ্বংস করে আবার যেন কে তাকে বাঁচিয়ে তুলছে।

জগদীশ জেগে উঠল। প্রবল যন্ত্রণার মতো একটা কান্না তার বুক থেকে উঠে আসছে। এই কান্নাটাকে জগদীশ এতদিন চেপে রেখেছিল। ইঁটের খাঁজে হাত দুটোকে চেপে ধরল সে। ঝুর ঝুর করে বালি পড়ল। বালি পড়তেই লাগল,—জগদীশের মাথায়, গায়ে চোখে।

জগদীশ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নার মধ্যে খুব সামান্য, ছুঁচের মুখের মতো ছোট্ট একটু সুখ ছিল।

দুপুরটা ঘন হয়ে তার রক্তের মধ্যে জ্বলতে লাগল।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

বাসে দাঁড়াবার জায়গা আছে, কিন্তু বসবার আসন একটিও খালি নেই। আশে-পাশের কয়েকজন সহযাত্রী শুধু সংগী নয় অসীমের একেবারে অংগাংগী হয়ে রয়েছেন। বিশ্রী একটা গন্ধ বার বার নাকে আসছে। হতে পারে এ গন্ধ ঘামের—যে ভদ্রলোক ঈষৎ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর মুখ-গহ্বরের কিংবা আর এক ভদ্রলোকের হাতে যে একটি পুঁটুলি ঝুলছে তারই আঁশটে গন্ধ। দাঁড়িয়ে যেতে যেতে শুধু বাসের গতিটাই অনুভব করছে অসীম, মাঝে মাঝে আকস্মিক ঝাঁকুনিতে সেই অনুভূতির তীব্রতা বাড়ছে, কিন্তু এই অপূর্ব রথ থেকে পথও দেখবার জো নেই—পথের দুদিকে কি আছে না আছে তা-ও আর চোখে পড়ছে না। অসীমের মনে হল এরই নাম জনতা, জন-গণের তাল। এই ভিড়ের মধ্যে থেকেও এদের প্রত্যেকেই অসীমের মতই স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন, নিঃসংগ এবং আত্মচিন্তায় মগ্ন। এ ছাড়া উপায় নেই। মানুষ একই সংগে একক এবং দশজনের সংগে দশজনের মধ্যে একজন। বাকি ন'জনের সংগে তার সম্বন্ধ কখনো প্রতিযোগিতার, কখনো ঔদাসীন্যের, কখনো সহযোগিতার। এই ন'জনের মধ্যেও কেউ আত্মীয়, কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, কেউ একেবারে কেউ না। নারী আর পুরুষের সম্পর্কের মত ব্যষ্টি আর সমষ্টির সম্পর্কও বিচিত্র আর জটিল। সে সম্পর্ক পরিবারের মধ্যেই হোক, সমাজেই হোক আর রাষ্ট্রেই হোক তার জটিলতা কোনদিনই উন্মোচিত হবে না। এক গিঁট খুলবে, আর একটি গিঁট পড়বে। যতদিন সমাজ আছে, সংসার আছে এই গিঁট খোলা, গিঁট বাঁধার পালা চলতেই থাকবে। কারণ এই গ্রন্থির মধ্যেই যত রস, যত রহস্য।

হঠাৎ অসীমের দার্শনিকতা বাধা পেল। এতক্ষণ মনশ্চক্ষে একটি তত্ত্বকে দেখছিল, এবার প্রচণ্ড গোলমাল শুনে দুটি চোখ ফের সহযাত্রীদের দিকে খুলে ধরতে বাধ্য হল।

সেই মাছের পুঁটলিটা নিয়েই গোলমাল শুরু হয়েছে। মৎস্যরসিকের পাশের ভদ্রলোক আঁশটে গন্ধ পছন্দ করেন নি। তিনি বললেন, 'আরে মশাই, আপনার পুঁটলিটি সরিয়ে রাখুন। বার বার আমার জামায় এসে লাগছে।'

যাঁর হাতে মাছ, তিনি প্রথমে না শুনবার ভান করেছিলেন; দ্বিতীয়বার শুনেও কথা বলেননি, তৃতীয়বার আর প্রতিবাদ না করে পারলেন না। 'জামা জামা আপনার এক বাতিক হয়েছে। আপনার জামায় মোটেই লাগেনি, আমার খেয়াল আছে।'

ভদ্রলোক চটে উঠলেন, 'কি বললেন, বাতিক? জামা গায়ে দেওয়াটা যদি আমার বাতিক হয়, এই বাসের ভিড়ের মধ্যে অমন পচা মাছের থলি নিয়ে যাওয়া তার চেয়েও খারাপ বাতিক।'

মাছকে পচা বলায় মাছের মালিক রীতিমত অপমানিত বোধ করলেন। যিনি পচা বলেছেন, তাঁর নাকের সামনে থলিটা উঁচু করে ধরে বললেন, 'একবার শুঁকে দেখুন পচা না টাটকা। তিন টাকা সেরের পোনা, পচা বললেই হল! মাছ থেকে মাছের গন্ধই বেরোয়, আলু-পটলের গন্ধ বেরোয় না।'

যাঁর নাকের ওপর কটাক্ষ করা হয়েছে, তিনি চোখ-মুখ বিকৃত করে মার-মূর্তি ধরলেন, 'তোমার এত বড় স্পর্ধা, ওই পচা রাবিশগুলি আমার মুখের সামনে নিয়ে এসেছ। তোমার ওই মাছের পুঁটলি আমি যদি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই, কে কি করতে পারে।'

পুঁটলির মালিক বললেন, 'একবার দেখই না ছুঁড়ে। হাত দিয়ে দেখ না একবার।'

হাত দিলে নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। কিন্তু আর পাঁচজনের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হল। পিছন থেকে কে একজন বললেন, 'বাধা দিলেন কেন, বেশ তো চলছিল। কে বলে বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র্য নেই। আমি রোজ এই বাসে যাতায়াত করি, আর নিত্য নূতন মজা দেখতে দেখতে যাই।'

আর একজন সহযাত্রী বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। এদিকে খুনো-খুনি হয়ে যায়, আর আপনি মজা দেখছেন। গোলমালটা আরো পাকালে বাসটা আর চলত না সে খেয়াল আছে?'

দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী একটু দূরে দূরে থেকে এখনো পরস্পরকে বাক্যবানে বিদ্ধ করে চলেছেন। তা দেখে আর একজন বিবেচক ভদ্রলোক বললেন, 'আরে যেতে দিন যেতে দিন। কয়েক মিনিট পরে কে কোথায় চলে যাবেন তার ঠিক নেই। কারো সংগে কারো দেখাই হবে না। একথা যে মানুষ কেন ভুলে যায়, আমি বুঝতে পারি না। বাসটা যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জায়গা নয়—।'

তাঁর পাশের প্রৌঢ় যাত্রীটি বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে মশাই স্থায়ীভাবে বাস করতে তো এই সংসারেও কেউ আসিনি। দুদিনের মেয়াদের কথা কে না জানে? তবু কি কেউ ঝগড়াঝাঁটি লাঠালাঠি করতে বাকি রাখে?'

দুই সহযাত্রীর মধ্যে তত্ত্বালোচনা চলতে লাগল।

অসীম লক্ষ্য করল তার মত বেশিরভাগ যাত্রীই আত্মচিন্তায় বিভোর, বাসের মধ্যে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয়।

ট্রামে-বাসে যাতায়াতের সময় চার জাতের যাত্রীকে দেখেছে অসীম। একটু কিছু হলেই যারা উত্তেজিত হয়। কথা কাটাকাটি থেকে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত যারা করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় জাতের লোক বিচার করতে আসে, মীমাংসা করতে আসে। কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তারা সক্রিয় সংস্কারক। আর এক শ্রেণীর মানুষ বসে বসে মজা দেখে, না হয় তত্ত্বালোচনা করে। চতুর্থ শ্রেণীর লোক সেটুকুও করে না। যতক্ষণ না তাদের নিজের গায়ে বাধা লাগে, ততক্ষণ তাদের মনে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। অসীম নিজে এই শ্রেণীর মানুষ। এই নিষ্ক্রিয় স্বভাবের জন্যে নিজেকে সে ঘৃণা করে। তবু সক্রিয় হওয়া তার সাধ্যের অতীত। জাত বদলানো জন্ম বদলাবার মতই কাল্পনিক ব্যাপার। তা নিয়ে শুধু জল্পনা করা যায়, আর কিছু করা যায় না।

বরানগরের মোড়ে নেমে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হল। এক ভদ্রলোককে বাড়িটার নিশানার কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, 'এই তো কাছেই। এর জন্যে আবার বাসে উঠবেন কেন, হেঁটে যান। বাসে গিয়ে সুবিধা হবে না।'

সুবিধা থাকলেও বাসে উঠত না অসীম। লোকের চাপে পিষ্ট আর পিণ্ডাকৃতি হয়ে এতক্ষণ যেভাবে এসেছে তার চেয়ে নিজের প্রত্যংগগুলির সাহায্য নেওয়া ভাল। এর চেয়ে মফস্বলের সেই দ্বিচক্র যানটিও মন্দ নয় অসীমের। ভিড় নেই চাপ নেই শরিক নেই। সেই রথের সে নিজেই রথী নিজেই সারথি।

ও অঞ্চলে সাইকেল ছাড়া দ্বিতীয় যে দিব্যযান আছে, তার নাম গরুর গাড়ি। সে গাড়িতে পারতপক্ষে অসীম ওঠে না। সাইকেলই চালায়। এই একটিমাত্র পরিশ্রমের কাজ সে করতে পারে। এতে তার ক্লান্তি নেই। অফিসের কাজ ছাড়াও সে বেরোয়।

বরং তাতেই আনন্দ বেশি। সেই ভ্রমণেই দর্শন আর মনন চলে। চাউলের চোরা-কারবারের তদন্তের সময় সে সব অচল।

জনবিরল জায়গাটা আস্তে আস্তে সয়ে গেছে অসীমের। অনুর্বর পাহাড়ী অঞ্চলের শান্ত নির্জন গাম্ভীর্য তার প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে গেছে। মানসী যদি কখনো সেখানে বেড়াতে যায়, হয়তো তার ভালোই লাগবে। কয়েকটা দিন কলকাতার হট্টগোলের বাইরে গিয়ে তার কান জুড়াবে, চোখ জুড়াবে। আর যদি স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করতে রাজী হয় মানসী? না তা সে কখনোই হবে না। এই পাণ্ডববর্জিত গ্রাম, যেখানে রেডিও নেই, সিনেমা নেই, ট্রাম বাস, সভ্যতা সংস্কৃতির বিদ্যুৎদীপ্তি নেই, সেই গণ্ডগ্রামের অন্ধকারে মানসীর মত নাগরিকা যেতে রাজী হবে কেন। কে জানে অন্য আপত্তির চেয়ে মানসীর পাড়াগাঁয়ে যাওয়ার আপত্তিটাই বড়, দুর্নীতি দমনের দারোগার গৃহিণী হওয়ার লজ্জাটাই প্রধান। মানসী যে তার জীবিকা পছন্দ করে না তা জানতে তো অসীমের আর বাকি নেই। নিজের কাজকে অসীম নিজেও ভালোবাসেনি। হয় তো সেই জন্যেই মানসী অপছন্দ করতে সাহস পেয়েছে। এই সংসারে যে নিজে সগর্বে বুক ঠুকে বলতে পারে 'আমি যা করেছি তাই ভালো, আমি যা হয়েছি তার চেয়ে মহত্তর কিছু আর নেই, আমি যা কিছু বলি তাই সবচেয়ে সারবান, সে-ই জয়ী হয়। তার দর্পকে যাচাই করবার সাহস অনেকেরই থাকে না। আর যে নিজে ভীরু, নিজের দীনতায় নিজেই কুণ্ঠিত, সংকুচিত তাকে সবাই কোণঠাসা করে। পৃথিবীতে কোথাও তার জায়গা হয় না। কেউ তাকে ঠাঁই দেয় না। না ঘরে না হৃদয়ে। লজ্জা মেয়েদের ভূষণ, আর অহংকার পুরুষের অলংকার। তা যদি শূন্যে কুম্ভের ঝংকার হয় তাতেও ক্ষতি নেই।

বাড়িটা নতুন। একতলায় খোঁজ নিয়ে অসীম শুনল শংকর মুখুজ্যে দোতলায় থাকে। উঠে গিয়ে কড়া নাড়তেই পুরনো বন্ধু বেরিয়ে এল। দেখলে আগের চেয়ে মোটাসোটা হয়েছে শংকর। শুধু পুষ্ট নয়, হৃষ্টও। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, পরনে সিলকের পাঞ্জাবি। বোধ হয় বেরোবার উদ্যোগ করছিল। এক মুহূর্ত দেরি হলে অসীম আর ওর নাগাল পেত না।

শংকর প্রথমে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর হেসে বলল, 'আরে তুমি। এসো ভিতরে এসো। কবে এলে।'

অসীম বলল, 'আজই।'

'আজই! কোথায় উঠেছ?'

'বেলগাছিয়ায়। তোমাদের পুরোন বাড়িতে।'

শংকরের মুখ মুহূর্তের জন্যে ছায়াচ্ছন্ন হল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে বলল, 'বুঝেছি। মানসীর অনুরোধে?'

অসীম লক্ষ্য করল চশমার আড়ালে শংকরের চোখ দুটিও পরিহাসে তরল হয়ে উঠেছে। প্রথমে একটু বিব্রত হয়ে লজ্জিত হল অসীম, তারপর যেন সেই লজ্জা আর ভীরুতাকে ঢাকবার জন্যেই আরো স্পষ্ট গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ও স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিল।'

শংকর তেমনি তরল স্বরে বলল, 'তাই নাকি? তাহলে তো ওর সাহস আর বাবার উদারতা দুইই বেড়েছে দেখছি। বেশ বেশ। শুনে খুব খুশী হলাম। আমিও এই চাই। আমার বেলায় বাবা অবশ্য এই ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারেননি।'

অসীম কোন জবাব না দিয়ে শংকরের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকল। সাজানো গুছানো পরিপাটি বসবার ঘর। ছোট একখানা গোল টেবিলকে ঘিরে কুশন আঁটা খানতিনেক নিচু চেয়ার। শংকর একটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো।'

পুরোন বন্ধুর মুখোমুখি বসল অসীম। বহুদিনের অদর্শনে যে দূরত্বের ব্যবধান মাঝখানে জমেছিল তা যেন এক মুহূর্তে ঘুচে গেল। যদিও স্বাচ্ছন্দ্যে মর্যাদায় সুখে স্বচ্ছলতায় শংকর অনেক উঁচুতে, কিন্তু এই মুহূর্তে অসীমের কিছুই মনে পড়ছে না, যদিও জীবনদর্শন এবং খুঁটিনাটি আচার-আচরণে শংকরের সঙ্গে অসীমের তেমন মিল নেই, তবু প্রবাস থেকে এসে একজন

পুরোন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য এই ব্যস্ত শহরে কম কথা নয়।

শঙ্কর অসীমের দিকে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

অসীম হেসে মাথা নাড়ল।

শঙ্কর একটু বিস্মিত হবার ভঙ্গিতে বলল, 'সেকি। সব ছেড়ে দিয়ে বসেছ নাকি! আগে তো খেতে।'

অসীম বলল, 'আজকাল আর খাইনে।'

শঙ্কর হাসল, 'না খেলে অবশ্য পয়সা বাঁচে। অনেক টাকাই আমার ছাই হয়ে উড়ে যায়। সবই নিজের রক্ত জল করা টাকা, পৈতৃক সম্পত্তি নয়, কিন্তু অত ভাবতে গেলে জীবনে কিছু ভোগ করা যায় না। উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চয় করতে হলে জীবনে বহু অপচয়েরও দরকার হয়। কী বলছ?'

অসীম প্রতিবাদ না করে বলল, 'হুঁ।'

শঙ্কর বলল, 'যাকগে। তোমার খবর কি বল। কোথায় আছ কী করছ।'

অসীম নিজের কাজ আর কর্মস্থলের নাম উল্লেখ করল।

শঙ্কর বলল, Anti corruption?

অসীম বলল, 'হ্যাঁ। হাসছ যে।'

শঙ্কর বলল, 'ভাবছি তোমরা করাপশনের বিপক্ষে না পক্ষে? তুমি পার ওসব কাজ?'

অসীম বলল, 'মোটেই পারি না।'

শঙ্কর বলল, 'তবে করছ কেন?'

অসীম বলল, 'অন্য কাজ খুঁজে নেওয়া আমার পক্ষে আরও কঠিন।'

শঙ্কর হাসল, 'তুমি যদি কাজের যোগ্য হও কাজই তোমাকে খুঁজে নেবে। তোমার নিজের খুঁজতে হবে কেন? কিন্তু যা তোমার পছন্দ নয়, যাতে তোমার মন বসে না সেখানে মুখ গুঁজে পড়ে থাকাও কোন কাজের কথা নয়।'

অসীম বন্ধুর মুখে নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে খুশি হয়ে বলল, 'কিছুদিন ধরে আমিও তাই ভাবছি।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'আমি তো ভাবতেই পারি না তোমার মত মানুষ ওসব কাজে দুদিনের বেশি টিঁকে আছে কি করে। আর তুমি বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছ। দেখ, সব সয় বলে নাকি শরীরের নাম মহাশয়। কিন্তু মনের ওপর যদি সেই প্রবচন খাটাও তাহলে সব মরুভূমি হয়ে যাবে। কিছুদিন আগেও তো নর্থ বেঙ্গলে ছিলে। এবার বুঝি ঠেলে একেবারে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে?'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ।'

শঙ্কর হাসল, 'ভালোই তো। ঘুরে ঘুরে নানা জায়গার জল বায়ুর স্বাদ নাও। জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ুক।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তুমি আমাদের লাইনে থাকলেই ভালো করতে। পড়তে পড়তে কী যে তোমার দুর্মতি হল এম-এ'র কোর্সটা শেষ না করেই পালালে।'

অসীম অনুগত ছাত্রের মত বলল, 'এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি।'

শঙ্কর হাসল, 'তাই যদি ভেবে থাক, ভুলটা শুধরে নাও। এখনো সময় আছে। কোন-রকমে কলকাতায় চলে এসো। আমি তোমাকে হেলপ করব। অবশ্য আমার কাছে পড়তে যদি তোমার লজ্জা না হয় আর আমার সাবজেকটে যদি তোমার রুচি থাকে—।'

অসীম বলল, 'কিন্তু এই বয়সে—।'

শঙ্কর বলল, 'বিয়ে থা করনি, তোমার আবার বয়স কিসের? তাছাড়া অজরামরাবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। আমাদের বিদ্যাদান আর গ্রহণ সবই তো এখন অর্থ-করী। মুখে আমরা অর্থকে যত তুচ্ছ করি, মনে মনে তত গৌরব দিই। অর্থ গৌরবই সব চেয়ে বড় গৌরব। শুধু কাজের নয় জীবনেরও।'

অসীম হাসল, 'অর্থের মাহাত্ম্য তুমি ভালো করেই বুঝেছ। শুনেছি অনেক টাকা রোজগার কর।'

শঙ্কর বলল, 'অনেক নয় কিছু। তাও পায়ের ওপর পা তুলে বসে হয় না। উদয়-অস্ত খাটতে হয়। শুধু উদয় অস্তই বা বলি কেন। সূর্যাস্তের পরেও অর্ধরজনী পর্যন্ত বিদ্যাদান করে তবে ঘরে ফিরি। তিনটে কলেজ পাঁচটা শিফট। কিন্তু ন দুঃখ পঞ্চভিঃ সহ। আমার সঙ্গে অনেকেই আছেন। অন্তত জন পঁচিশেককে আমি চিনি। শুধু কি পড়ানো? রাশ রাশ খাতা দেখা, নোট বই লেখা, আমরা কী না করি। তবু তো কুলোয় না। কী করে কুলোবে। আয় যত ব্যয় তার চেয়ে বেশি, সুযোগ সম্ভাবনা আরো বেশি। আর পাঁচ-জনে যখন ভোগ করছে তুমি কেন করবে না? তোমার সামনে ভোগের হাজার উপকরণ মেলে ধরে আমি বলব, ভোগ কোরো না, হিংসা কোরো না সন্ন্যাসী হয়ে থাক, তা কি হয়? কিনবার ক্ষমতা না বাড়িয়ে বলব চুরি কোরো না, ডাকাতি কোরো না, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ো না এ সদুপদেশ কে শুনবে?'

অসীম বলল, 'এইসব দেখে শুনে আমার মনে হয়, আমি সেই আদিবাসীদের মধ্যেই বেশ আছি। তাদের এসব সমস্যা নেই।'

শঙ্কর হেসে উঠল, 'এবার তুমি ছেলে-মানুষের মত কথা বলছ। আদিবাসীদের সেই আদিম বাসস্থানে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর এ প্রার্থনা এখন আর কবিরাও করেন না। তপ তপস্যা যা করতে হয় তোমাকে এখানে বসেই করতে হবে। এই ভোগ সম্ভোগের মধ্যেই।'

"দাদাবাবু, বউদি আপনাকে ভিতরে ডাকছেন।'

চৌদ্দ পনের বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা আধময়লা গেঞ্জি। বয়সের তুলনায় চেহারা বেশ লম্বা।

তার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর হেসে বলল, 'তোর বউদিকেই বরং এখানে ডেকে দে গোকুল। বলগে আমার বন্ধু অসীমবাবু এসেছেন। আমি আজ আর টিউশনিতে যাব না।'

গোকুল চলে গেলে অসীম বলল, 'তুমি বুঝি সেই জন্যেই বেরোচ্ছিলে। আমার জন্যে কাজের ক্ষতি হল।'

শঙ্কর বলল, 'আরে রেখে দাও কাজ। তবু এই উপলক্ষে বিশ্রামের সুযোগ হল একটু। বেশি নয় সপ্তাহে দু একটা অফ পিরিয়ডএ সময় থাকে। সেগুলি ট্যুইশনে ঠাসা। গোচারণ করে করে একেবারে যখন হয়রাণ হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে কামাই করি। হেতু লিখি সেই পেটের অসুখ আর মাথা ধরা। যখন ছাত্র ছিলাম তখনও ওই দুটি রোগ ছিল স্কুল কলেজ থেকে পালাবার সহায়। এখন মাস্টার হয়েও ওই দুটি রোগেরই শরণ নিই।' শঙ্কর হাসতে লাগল।

দু-তিনটি বুক শেলফে অর্থনীতির বই। কাঁচের আলমারিতে শ্বেত-পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি, এক জোড়া হাতী, মোষের শিং-এর তৈরি শৌখীন ধূপদানি, মাঝখানের তাকে কয়েক খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী। দেয়ালের তাকে নীল রঙের ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি রেডিও সেট। জানলায় দরজায় গেরুয়া রঙের পর্দা। দুই ঘরের মাঝখানে প্রলম্বিত বড় পর্দাটিতে কারুকার্যে খচিত হংসমিথুন।

মানসীদের বাড়ির তুলনায় এ ঘর অনেক পরিচ্ছন্ন। গৃহসজ্জায় নিপুণ হাত এবং শিল্পরুচির পরিচয় স্পষ্ট। কিন্তু এই সুখ-নীড় গড়বার জন্যে অনূঢ়া কয়েকটি বোন আর বুড়ো বাপ-মাকে প্রতিপালনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে শঙ্কর! অসীমের মনে হল এত রূপ আর রুচির পিছনে এক নিষ্ঠুর স্বার্থপর মন লুকিয়ে রয়েছে।

পর্দা সরিয়ে এবার বাইশ তেইশ বছরের একটি তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে ঘরে ঢুকল। কন্যা নয় বধূ। সিঁথিতে ক্ষীণ সিঁদুরের রেখা। গায়ের রং মাজা গৌর। পরনের শাড়িতে চাঁপা ফুলের রঙ। সে যখন দুহাত তুলে নমস্কার করল, অসীমের মনে হল এই ধরনের আঙুলের গড়ন দেখেই প্রাচীন কবিদের চাঁপার কলির কথা মনে হয়েছে।

শঙ্কর স্ত্রী আর বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'বিয়ের সময় কাউকেই বলতে পারিনি। আর অসীমের তো কোন পাত্তাই ছিল না। তুমি বোধ হয় তখন মালদ

দিনাজপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। তবে নন্দিতাকে তুমি বোধহয় দেখেছ।'

অসীম একটু হাসল, 'তা দেখেছি বইকি। কলেজ স্ট্রীটে কয়েকবার, চৌরঙ্গীতে একবার।'

নন্দিতা লজ্জিত হয়ে মাথা নোয়াল।

অসীমের মনে হল এদের প্রাক-বিবাহ যুগের কথাটা না তোলাই বোধহয় ভালো ছিল। ও প্রসঙ্গ তুলে সে সুরুচির পরিচয় দেয়নি।

খোঁপায় একটি বেলফুলের কুঁড়ি। আজ কি এদের কোন বিশেষ অনুষ্ঠান? না কি প্রতি রাত্রিই এদের শুভরাত্রি, সব শয্যাই ফুলশয্যা।

একটু বাদেই নন্দিতা উঠে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল, 'আমি এক্ষুনি আসছি। আপনি এতক্ষণ ধরে এসেছেন, উনি আমাকে কিছু জানান নি। আমি ভাবলাম কোন ছাত্র টাত্র বুঝি—।'

অসীম হেসে বলল, 'আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন। শংকরদের কাছে আমরা সবাই ছাত্র।'

নন্দিতা ফের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হল।

শংকর স্মিতমুখে বলল, 'অমন করে ঠকছিলে যে। আমি কি খুব লম্বা লেকচার দিয়েছিলাম? একেবারে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মেয়াদের?'

অসীম বলল, 'না, অত লম্বা হয়নি।'

শংকর হেসে বলল, 'পেশাগত অভ্যাস তো আছেই। কিছুটা বোধহয় পৈতৃক—। বাবাও খুব কথা বলেন তাই না?'

অসীম বলল, 'বুড়ো হয়েছেন তাতো একটু বলবেনই। ওঁরা কিন্তু খুব দুঃখ করলেন শংকর।'

শংকরের মুখ গম্ভীর হল। 'দুঃখ! কিসের দুঃখ!'

অসীম একটু ইতস্তত করে বলল, 'মানে তোমার এই আলাদা হয়ে আসাটা ওঁরা ঠিক সইতে পারেন নি। ভিতরে ভিতরে খুবই আঘাত পেয়েছেন।'

'আঘাত পেয়েছেন?' আহত বাঘের মতই গর্জে উঠল শংকর। 'আঘাত পেয়েছেন? জানো আমাকে ওঁরা এভাবে সরে আসতে বাধ্য করেছেন? দিনের পর দিন কী যে কাণ্ডকারখানা হয়েছে তা তুমি বাইরে থেকে ধারণা করতে পারবে না। কিন্তু অসীম, একান্নবর্তিতার নামের আড়ালে আমি অমন পৃথক মন, পৃথক রুচি, পৃথক শিক্ষাদীক্ষার দুই আলাদা যুগকে বেঁধে রাখতে চাইনে। আর সে বাঁধন কিসের? ছোট ছোট ঈর্ষা দ্বেষ, হিংসা বিদ্বেষের। আমি দিনরাত্র পরিশ্রম করি। আর সেই পরিশ্রমের বদলে আমি সুখ চাই, স্বাচ্ছন্দ্য চাই, নিজের পছন্দমত বেঁচে থাকতে চাই।'

অসীম বলল, 'তা সবাই চায় শংকর। কিন্তু কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তেও হয়। আর সুখের কথা বলছ, সেই সুখ যদি শুধু বস্তুর মধ্যেই হত, চেয়ার টেবিল খাট আলমারি বুকশেলফ রেডিওসেটের মধ্যে পাওয়া যেত তাহলে আর মানুষ কয়েকটি ব্যক্তিকে নিয়ে পরিবার গড়ত না। আমার তো মনে হয় সুখ মানে অন্তত কয়েকজন মানুষের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক গড়ে তোলার সুখ। শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসার সুখ। সে সম্পর্ককে আমি অটুট বলছিনে, অনড় বলছিনে। তা মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙে, আবার প্রতি মুহূর্তেই আমরা তা গড়ে তুলি। যে ব্যক্তিত্বের আমরা বড়াই করি অন্তত আর দু-একজন ব্যক্তির মধ্যে তাকে ব্যক্ত না দেখলে আমরা বাঁচি না, টের পাই না যে আমরা আছি।'

শংকর হাসল, 'তুমি আছ বটে, কিন্তু এক পুরোন ধারার বাহক হয়ে আছ। এযুগেও যেমন আদিবাসীরা আছে তেমনি। ওসব তত্ত্বকথা থাক, আসল কথায় এসো। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে অন্তত দু-একটা দিন থাকো তাহলে বুঝতে পারবে বাড়িটা কী বস্তু।'

অসীম হেসে বলল, 'একটা দিন তো প্রায় কাটিয়েই দিলাম। আমার তো তেমন সাংঘাতিক কিছু বলে মনে হল না। মেসোমশাইর মত অমন অমায়িক ভদ্রলোক আর মাসীমার মত অমন—।'

শংকর বাধা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার মা ও-পাড়ার ছেলেদের আর আমার বন্ধুদের মাসীমা হিসাবে আদর্শ ভদ্রমহিলা। কিন্তু আশ্চর্য মা হিসাবে প্রায়ই বিমাতার মত ব্যবহার করে থাকেন। আর শাশুড়ীর মত ভূমিকায় খোদ একটি অসূয়াবতী সপত্নী।' অসীম বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ কি যা তা বলছ। তোমার মুখে কিছু আটকায় না।'

খাবারের প্লেট হাতে নন্দিতা ঘরে ঢুকল। গোকুল নিয়ে এল ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম।

অসীম বিব্রত হয়ে বলল, "এত কী এনেছেন।"

নন্দিতা মৃদু হেসে বলল, "এত আর কোথায়। সামান্যই তো।"

শংকর বলল, "আরে খাও, খাও। কতদিন পরে দেখা। তোমার জন্যে আমি টিউশনিটা কামাই করলাম। বড়লোকের বাড়ি বড়লোকের ছেলে। টুলো পণ্ডিতের বেশে গেলে পাত্তাই দেবেনা। তাই এই সাজসজ্জা, বুঝেছ? আমার বেশবাস নিয়ে তোমার বন্ধুপত্নী প্রায়ই কটাক্ষ করে। কিন্তু বেশ যে কিসের জন্যে তা আমিই জানি। আজকাল শুধু চেনাবামন হয়েই দক্ষিণা মেলে না, পৈতেটা বেশ ভালো করেই ঝুলিয়ে চলতে হয়।"

চামচে করে ওমলেটের টুকরো মুখে তুলতে তুলতে অসীম বলল, হ—

শংকর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, "ভালো কথা, অসীম আমার ছেলেকে দেখলে না? নন্দিতা, আমার বন্ধুর সঙ্গে তার বন্ধুপুত্রের পরিচয় করিয়ে দাও।"

নন্দিতা স্বামীর এই উচ্ছল প্রগলভতায় লজ্জিত হয়ে বলল, "এখন থাক। ও এখন ঘুমুচ্ছে।"

শংকর বলল, "তাহলে আজকের মত ঘুমন্ত মুখই দেখিয়ে দিয়ো। দেখ অসীম, তুমি তো ভয়ে ভয়ে বিয়েই করতে পারলে না। আর আমি—তোমার চেয়ে এক পুরুষ সিনিয়র হয়ে গেলাম।"

নন্দিতা লজ্জিত হয়ে বলল, "কি যা তা বলছ।"

পিতৃত্বের জন্যে বন্ধুর গর্ব আর আত্মপ্রসাদ দেখে অসীম একটু বিস্মিত হল। মনে মনে হাসলও। নিজের ছেলেকে আদর করবার সময় নিজের বাপের কথা কি

শঙ্করের মনে হয় না? এই উচ্ছল আনন্দ ওর বুড়ো বাপকেই যেন বেশি মানাত। কিন্তু ব্যথিত অভিমান ক্ষুব্ধ নিজের সেই বাবার কথা শংকরের বোধ হয় এখন আর মনে নেই। ও এখন একই সংগে ওর ছেলের বাপ আর ঠাকুরদা হয়েছে।

একটু বাদে নন্দিতা ফের উঠে গেল। কিন্তু অসীমকে সহজে উঠতে দিল না শংকর। বসে বসে গল্প করতে লাগল। পারিবারিক প্রসংগই বেশি। শংকর নিজের পছন্দমত ভালোবেসে বিয়ে করেছে একথা সে অস্বীকার করে না। কিন্তু তার পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের চোখে সেই ভালোবাসাটাই এক মহা অপরাধ হয়ে রয়েছে। যেন একটি মেয়েকে ভালোবাসলে বাবা-মা-ভাইবোনের ওপর আর কোন মমতা থাকে না। শুধু বাপ-মা নয়, গোড়া থেকেই শংকরের বোনদের মনোভাবও ওইরকম। মা যখন বলেন, আইবুড়ো বোনদের বিয়ে না দিয়েই সে নির্লজ্জ স্বার্থপরের মত বিয়ে করেছে তখন বোনরা কেউ প্রতিবাদ করে না। কিন্তু শংকর নিজে জানে অত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করে তার উপায় ছিল না। নন্দিতাকে তার বাবা-কাকা প্রায় জোর করেই আর এক জায়গায় বিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে ফেলেছিলেন। নন্দিতার আর এক অপরাধ ধনী ব্যারিস্টারের মেয়ে হয়েও সে বিয়ের সময় ধন-দৌলত পণ-যৌতুক সংগে করে নিয়ে আসতে পারেনি তাতে তার ননদদের কিছু সাহায্য হত। কিন্তু সংগে লক্ষ্মীর ঝাঁপি কি করে আনবে নন্দিতা? অমন কড়া পাহারার ভিতর থেকে সে যে নিজে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তাই তো ঢের। জাতে অবশ্য নন্দিতার বাবা কুলীন বামুন নয়, কিন্তু অর্থের কৌলীন্য তাঁদের অনেক বেশি। শংকরের মত একজন গরীব প্রফেসরের হাতে কন্যাদানে তাঁদের মন ওঠেনি। কিন্তু নন্দিতা এ ব্যাপারে বাবা-কাকার মান রাখার চেয়ে নিজের মনের গতিকেই বেশি অনুসরণ করেছে। ফলে তার বাপের বাড়ির দোর একেবারে বন্ধ না হয়ে গেলেও বাড়ির মালিকদের হৃদয়দুয়োর অবরুদ্ধই রয়েছে। যে মেয়ে তার জন্যে নিজের বাপকে ছেড়েছে, মাকে ছেড়েছে সমাজকে ছেড়েছে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবার দায়িত্ব কি সম্পূর্ণ শংকরের নয়? নিজের বাপ-মা-বোনদের শ্লেষ-বিদ্রূপ, ব্যংগ-কৌতুক অনাদর-অপমানের হাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করার ভার সে ছাড়া আর কে নেবে? আর এ-ভার না নিতে পারলে শংকরের নিজেরই বা সুখ কোথায়? তারই বা আত্মগৌরবের তাতে কতটুকু বাকি থাকে? বাপ-মার ওপর তার নিশ্চয়ই কর্তব্য আছে, কিন্তু একটি মেয়ে যেহেতু তার স্ত্রী, আর তার ওপর স্বাভাবিক মমতার জন্যে যেহেতু স্ত্রৈণ অপবাদের ভয় আছে সেই-জন্যেই সে নন্দিতার ওপর উদাসীন হতে পারে না, সেই মেয়েটির মানসিক অস্বস্তির কারণগুলি তাকে দূর করতেই হয়।

তাছাড়া শংকরের বাবা-মারই বা এতে অত লজ্জা আর দুঃখ পাবার কি আছে? সে যদি অন্য কোথাও চাকরি করত তাহলেও তো স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়েই তাকে থাকতে হত। বরং এইভাবে থাকলেই সাধারণ সৌজন্য আর ভদ্রতাটুকু বজায় থাকবে। একসংগে থাকলে শুধু অপ্রীতিকর সান্নিধ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাছাড়া নন্দিতার অভিমান বড় বেশি। সে মুখে কিছু বলে না কিন্তু সামান্য আঘাতে মনে বড় কষ্ট পায়। পাছে বাপ-মা কি ওইদিককার কোন আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখা হয়, আর তাঁরা তাকে ভালো চোখে না দেখেন সেই ভয়ে নন্দিতা দক্ষিণ-কলিকাতা থেকে একেবারে উত্তরপ্রান্তে চলে এসেছে। আসল নগর থেকে বরানগরে। অবশ্য এখানে নন্দিতার এক মামাত বোন আছেন। তাঁর বিয়েটাও সমাজসম্মতভাবে হয়নি। নন্দিতার ওপর তাঁর সহানুভূতি আছে। তাছাড়া যেসব কলেজে শংকরের কাজ সেগুলিও শহরের উত্তরপ্রান্তে কি আরও উত্তরে। তাই অনেক অসুবিধা হলেও এখানেই পড়ে আছে শংকর। সব সুখ, সব স্বাচ্ছন্দ্য তো একসংগে মেলে না। যতটুকু জোটে আর যতখানি কেড়ে নেওয়া যায় ততখানিই লাভ।

রাত বেড়ে যাচ্ছিল অসীম এবার বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এরপর হয়তো আর বাসটাস কিছু মিলবে না।

যাওয়ার সময় নন্দিতা ফের এসে দাঁড়াল, হেসে বলল, "কাল কিন্তু আপনাকে সন্ধ্যাবেলায় অবশ্য আসতে হবে।"

একটু লম্বাটে ধরনের মুখ। দাঁতগুলি সমান সুগঠিত। হাসলে বেশ দেখায়।

অসীম স্মিতমুখে বলল, "এইতো এলাম, আবার কাল কেন। কাল কোথায় থাকব তার ঠিক নেই।"

নন্দিতা বলল, "যেখানেই থাকুন, কাল এখানে একবার আসবেন।"

অসীম হেসে বলল, "কেন কাল কি?"

নন্দিতা স্বামীর দিকে তাকালে।

শংকর বলল, "লজ্জা কি বলেই ফেলনা।"

অসীম বলল, "ম্যারেজ অ্যানিভারসারি বুঝি?"

নন্দিতা স্মিতমুখ একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, "না।"

অসীম শংকরের দিকে তাকাল, "তবে?"

শংকর হেসে বলল,"তোমার দৌড় ওই অ্যানিভারসারি পর্যন্ত। কাল পিপসুর জন্মদিন।"

অসীম হেসে বলল, "ও তাই বল।"

এই দুই নতুন প্রসন্নমুখ জনক-জননীর পাশে হঠাৎ আর একজোড়া বাপ-মার রেখা-কুঞ্চিত মুখ অসীমের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অসীম আস্তে আস্তে বলল, "আচ্ছা আসব। আসতে চেষ্টা করব।"

শংকর জোর দিয়ে বলল, "না না চেষ্টা নয়, আসতেই হবে। আচ্ছা এক কাজ কর না। বেশ রাত হয়েছে। আজ এখানে থেকে যাও। থাকবার জায়গার তো অভাব নেই।"

অসীম বলল, "কিন্তু আমি ওদের কথা দিয়েও এসেছি। ওরা অপেক্ষা করে থাকবে।"

"অপেক্ষা করে থাকবে? ও, বুঝতে পেরেছি।"

শংকরের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল।

অসীমের মনে হল শুধু কৌতুক। তাছাড়া আর কিছু নেই। শংকর নিজে ভালোবেসে বিয়ে করেছে তবু আর একজনের ভালোবাসা তার মনে কৌতুক ছাড়া আর কোন রসই সঞ্চার করে না।

অসীম সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবল, এও বড় কম কৌতুকের কথা নয়।

(ক্রমশ)
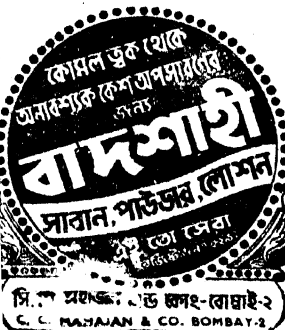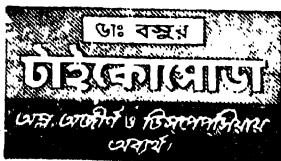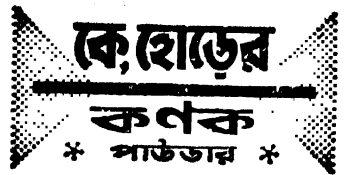
একটা ঘরে দেখছি নানারকমের মাটির তৈরি জন্তু জানোয়ার। চট্ করে দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয়—জীবন্ত।

ছোট্ট একটি ভেড়ার ছানাকে ধরবার জন্যে একটা শেয়াল পা টিপে টিপে এগ্নচ্ছে। তার পেছনে তিনটে তিন রকমের কুকুর ছ্নটছে শেয়ালটাকে ধরবার জন্যে।

ঘরের এক কোণে একটি ছাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চারটি বাচ্চাকে দ্নধ খাওয়াচ্ছে।

ওদিকে একটি ছেলে হামাগ্নড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেয়ালের গায়ে একটি টিক্‌টিকি ছ্নটেছে একটা বিছে ধরবার জন্যে।

এটা হল নির্জীব মাটির প্নতুলের ঘর।

তার পাশের ঘরে সব জীবন্ত জীবের সমারোহ। দেয়াল-জোড়া পাতলা জাল-দেওয়া কাঠের র‍্যাক্। আর সেই পাঁচতলা র‍্যাকের ভেতর প্রায় শ'খানেক গিনিপিগ্ ছ্নটে বেড়াচ্ছে। র‍্যাকের ওপর তিনটে বড় বড় সাপের ঝাঁপি।

ম্নখপোড়া একটি বাঁদর খেলা করছে ঘরের ভেতর। তার গলায় একটি ঘ্নঙ্নর বাঁধা।

বাঁদরটিকে বেঁধে রাখা হয় নি। সম্প্নর্ণ স্বাধীন সে। ইচ্ছামত ঘ্নরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তব্ন সে পালায় না।

সবচেয়ে বিচিত্র দেখলাম একটি বক।

পরের দিন দ্নপ্নরে দেখলাম আমার বিমাতা বাড়ির খোলা ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছেন, ট্নল্‌ট্নল্! ট্নল্‌ট্নল!

প্রথমটা ব্নঝতে পারি নি। দ্নরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শ্নধ্ন। দেখলাম, সাদা একটি বক কোত্থেকে উড়ে এসে বসল ভাঙা ছাতের আলসের ওপর।

মা বললেন, এসো, আমাকে কৃতার্থ করবে এসো। খেতে দিইনি শ্ননলে তোমার বাব্ন এসে আমার অপমানের কিছ্ন বাকি রাখবেন না।

বকটি দেখলাম, লম্বা লম্বা পা তুলে তুলে মার পায়ের কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। মা হাতে করে একম্নঠো ভাত এনেছিলেন তার জন্যে। সেগ্নলি তিনি ছড়িয়ে দিলেন। বকটি নাচতে নাচতে খ্নঁটে খ্নঁটে ভাত খেতে লাগল।

ভারি মজা লাগল দেখতে। বকের নাম ট্নল্‌ট্নল্। বকের নাকে একটি নোলক। দ্ন-পায়ে দ্নটি ছোট ছোট রিং।

খাওয়া শেষ হতেই ট্নল্‌ট্নল্ উড়ে চলে গেল।

মা'র নজর পড়ল আমার দিকে। বললে, কি দেখছিস? এই সব তোর বাপের কীর্তি।

বাবার সংগে তখনও আমার দেখা হয় নি। জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা কখন আসবেন?

মা বললেন, কি জানি বাবা, যিনি আসবেন তিনিই জানেন।

এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন কথা বলতে।—সেদিন তখন খেতে বসেছিল তোর বাবা, খবর এল লোকপ্নরের একটি ছেলেকে গোখ্‌রো সাপে কামড়েছে। বাস্, যেমন বসেছিল তেমনি উঠল, খাওয়া আর হল না। কি সব জড়িবড়ি পকেটে নিয়ে ছ্নটল সেই লোকটার সংগে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর জন্যে বাবাকে ওরা টাকা দেবে?

মা বললেন, দিলেও নেবে না তোর বাবা। বলে, এর জন্যে টাকা নাকি নিতে নেই।

—ছেলেটা যদি বেঁচে যায়, তব্ন নেবে না?

—মরে আবার কখন? সবাই তো বাঁচে।

বলতে বলতেই বাবা এলেন।

একটা ছেলে এসে খবর দিলে।—'ফ্নল-বাব্ন এল!'

আমার বাবাকে ব্নঝি এখানে সবাই ফ্নল-বাব্ন বলে। তিনি তাঁর বাবার চতুর্থ সন্তান।

খবরটা পেয়ে মা আমাকে বললেন, 'দেখবি আয়!' খোলা ছাতের দক্ষিণদিকের আল্‌সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীচে তাকিয়ে দেখলাম, একটা গর্নর-গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। বাবা নামলেন সেই গাড়ি থেকে। দ্নটো ঝ্নড়ি-ভর্তি নানা রকমের তরিতরকারি আনাজ নামানো হল। ছোট একটি চুপ্‌ড়িতে অনেকগ্নলি হাঁসের ডিম। আর সবার শেষে দড়ি দিয়ে বাঁধা সরা-ঢাকা একটা মাটির হাঁড়ি।

হাঁড়িটা গাড়োয়ান কিছ্নতেই হাত দিয়ে ছোঁবে না। বাবা নিজেই সেটা নামিয়ে রাখলেন পথের পাশে।

মা বললেন, হয়েছে!

তাঁর ম্নখের দিকে তাকালাম। ম্নখখানা কেমন যেন হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

মা বললেন, সেই সাপটাকে ধরে এনেছে।

—কোথায়?

বললেন, ওই যে ওই হাঁড়ির ভেতর।

এই বলে তিনি সেইখান থেকেই বোধ করি বাবাকে উদ্দেশ করে বললেন, ও-হাঁড়ি আর ওপরে তুলো না। যেখানে হ'ক রেখে এসো।

বাবা জবাব দিলেন, অতি উৎকৃষ্ট কালীয় নাগ। দেখবে না? বড় ভাল জাতের সাপ।

মা বললেন, তুমি দেখেছ তো? তাহলেই হবে। আমাদের আর দেখে কাজ নেই।

সাপের হাঁড়িটা নীচে কোথায় যেন রেখে দিয়ে বাবা ওপরে এলেন। বললেন, সাপটা আমি নিয়ে এলাম ইয়াসিন ওস্তাদের জন্যে। ওর বিবি বলেছিল, সাপ আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বাবু, যদি একটা সাপ-টাপ পাও তো ওকে দিও।

মা বললেন, ইয়াসিনের সাপ তো আছে।

বাবা বললেন, দুটো সাপ ছিল। দুটোই মরে গেছে।

—কি বিপদ যে কোন্‌দিন হবে কে জানে! সাপ-টাপগুলো আর ধরো না। চা খাবে এসো।

এই বলে স্টোভ জেলে মা চা করতে বসলেন, আর বাবা বলতে লাগলেন সাপটাকে কেমন করে ধরলেন, তার গল্প।

বললেন, যে-ছেলেটাকে কামড়েছিল, আমি যখন গেলাম, তার আর কিছু ছিল না। অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি। তাই তো এত দেরি হল।

আর ঠিক সেই সময় ওদিকে আবার আর এক বিপদ! হৈ হৈ করে একদল ছেলে ছুটে এল—হাতে লাঠি, সাবল, বর্শা। এসেই বললে, আপনি একবার আসুন চট্ করে।

সাপটাকে তারা নাকি খোঁচা মেরে মেরে আর ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তেঁতুল গাছ থেকে নামিয়েছে। কিন্তু কেলে গোখ্‌রো সাপটা এত বড় আর এত তেজী যে, কেউ তার কাছে যেতে পারছে না। দূরে থেকে যতবার তাকে মারবার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই সাপটা ফণা তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আর কেউ কাছে যায় নি। অত অত লোক দেখে সাপটাও তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েছে রমণ মোড়লের খামারে। খামারের একদিকে গরুর গোয়াল, আর একদিকে দুটো বড় বড় খড়ের গাদা। কোথায় যে সে ঢুকেছে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। রমণ মোড়ল সবাইকে গালাগালি করছে। বলছে, মারতেই যদি না পারবি তো ওকে নামাতে গেলি কেন গাছ থেকে?

কাঁদ-কাঁদ হয়ে একটা লোক আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে এল। শুনলাম সে রমণ মোড়লের ছোট ভাই। বললে, আমাকেই ওই সাক্ষাৎ যমের সামনে যেতে হবে হুজুর! গরু বাঁধতে হবে। গাই দুইতে হবে। খড়ের গাদা থেকে খড়ও টানতে হবে। এখন আপনি না বাঁচালে আমি তো গেলাম।

অনেক করে বোঝালাম তাদের। বললাম, মানুষের ভয়ে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তার ওপর আজ ও দেখেছে এতগুলো মানুষ ওকে তাড়া করেছে। প্রাণের ভয়ে এখন ও যেখানে গিয়ে লুকিয়েছে, সেখান থেকে সহজে ও বেরুবে না। তোমার কোনও ভয় নেই।

লোকটার বোধ হয় বিশ্বাস হল না। বললে, ওই তো রুগী আপনার উঠে বসেছে। আপনি চলুন হুজুর। সাপটাকে আপনি শুধু বের করে দেবেন। আপনি কড়ি চালতে জানেন। আমরা জানি।

মনে মনে হাসলাম। কড়ি চেলে সাপ বের করেছি অনেক। কিন্তু কড়ি চালা-

টালা সব বাজে কথা। মন্ত্র-তন্ত্র, কড়ি চালা, হাত চালা—সব-কিছু লোকজনের বিশ্বাসের জন্যে। তবু বললাম, সবই জানি মোড়ল, কিন্তু ও সাপ আজ যদি কাউকে কামড়ায় তো আমি তার জীবনের জন্যে দায়ী রইলাম। সাপ আর বাঘ কখনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। তাড়া-খাওয়া সাপ তো থাকবেই না। এতক্ষণ দ্যাখোগে হয়ত তোমাদের খামার থেকেও সে পালিয়েছে।

মোড়ল বললে, আজ্ঞে না, পালাতে পারবে না। খামারের আশে-পাশে আমরা লোক রেখে এসেছি।

এই কথা বলতে না বলতেই একটা ছেলে ছুটে এসে খবর দিলে—সাপটা বেরিয়েছিল, আমাদের দেখে আবার ঢুকে পড়ল। কোথায় ঢুকেছে আমরা দেখেছি। তোমরা এসো। এক্ষুনি তাকে মেরে ফেলব।

ছেলেরা শুনলে না কিছুতেই। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে। তাদের দিয়ে প্রথমে একটা হাঁড়ি আনালাম। আর হাঁড়ির মুখে ঢাকা দেবার জন্যে একটা সরা। বললাম, কেউ তোমরা মারতে পারবে না ওকে। সাপটাকে আমি জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাব।

ইয়াসিনের কথা তখন আমার মনে হয়েছে।

ওরা যে জায়গাটা দেখিয়েছিল, আমি জানি সাপ সেখানে নেই। কান পেতে শুনতেই তার নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল ঠিক তার উল্টো দিকে। পুরনো একটা খড়ের গাদার পাশে অনেকগুলো থোয়া ইঁট জড়ো করা ছিল। সাপটা গিয়ে ঢুকেছিল তারই তলায়। ছেলেদের বললাম, তোমরা আস্তে আস্তে এই দিকের ইঁট-গুলো সরাও।

মস্ত এক লাঠি হাতে নিয়ে একজন জোয়ান ছোকরা ইঁট সরাবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু ইঁটে হাত দিতে গিয়ে সাপটার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ যেই তার কানে গেছে, অমনি সে সেখান থেকে ছিটকে একেবারে দশ হাত দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাপ্‌স্‌! যে রকম গর্জন করছে, এক্ষুনি ও তেড়ে এসে কামড়ে দেবে। আমি পারবো না ইঁট সরাতে।

ছেলেদের অনেক করে বোঝালাম। বললাম, ওটা ওর রাগের গর্জন নয়, ওটা ওর ভয়ের দীর্ঘনিশ্বাস। খুব ভয় পেলে ওরা ওইরকম করে। আমি রয়েছি, তোমাদের কোনও ভয় নেই। আমি ওকে ধরে ফেলব।

হাতে আমার ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারলে না।

আমি চাই ইঁটগুলো এমনভাবে সরিয়ে ফেলতে যেখানে সাপটা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। না পারবে মুখটাকে কোথাও গুঁজে ফেলতে, না পারবে লেজ দিয়ে কোনও কিছু জড়িয়ে ধরতে।

ছেলেরা কেউ এগিয়ে এল না। লাঠি-সোঁটা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করতে লাগল।

মা এই সময় আমাদের দুজনের মুখের সামনে দু'কাপ চা নামিয়ে দিলেন। বললেন, সাপ ধরার গল্প আর শুনিসনি বাব। ও-সব শুনলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

বাবা বললেন, তোমাকে তো শোনাইনি।

মা বললেন, শুনতে আমি চাই না। কিন্তু ওকেই-বা শোনাচ্ছ কেন? ওকেও কি নিজের পাটে বসাবে নাকি?

—না না সব কিছু জেনে রাখা ভাল।

মা বললেন, তোমার ওই বিদ্যেগুলো ওর না জানলেও চলবে।

এই বলে তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

আমি কিন্তু তখন শোনবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর? ইঁটগুলো কে সরালে?

চা খেতে খেতে বাবা বলতে লাগলেন, আমাকেই সরাতে হল। একটি একটি করে সরাতে সময় লাগল অনেক। মাটির হাঁড়িটা হাতের কাছে এনে রাখলাম। ছেলেদের সাবধান করে দিলাম—কেউ যেন ঢিলটিল না ছোঁড়ে। নিজের বসবার দাঁড়াবার সুবিধে করবার জন্যে অনেকগুলো ইঁট সরিয়ে ফেললাম। সাপটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম, সেখানকার খান দুই ইঁট সরাবো শেষে। কিন্তু সাপটাকে দেখতে পেয়েই বোধ করি একটি ছেলে চীৎকার করে উঠল—সরে যান। মুখ বাড়িয়েছে।

কালীয় নাগ খুব তেজী সাপ। ছেলেটা যেই চীৎকার করেছে, সাপটাও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে ইঁটের ফাঁকে ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই মারলে এক ছোবল। ছোবলটা ফট্‌ করে লাগল গিয়ে একটা ইঁটের ওপর। ভালই হল। ইঁট দুটো আগে সরিয়ে ফেললে সাপটা ছোবলের জায়গা পেতো। আমি আর এক সেকেন্ডও দেরি করলাম না। ধরে ফেললাম সাপটাকে। ধরবার ভারি একটা মজার কায়দা আছে। ডান হাত দিয়ে মুখখানা চেপে ধরেই সঙ্গে সঙ্গে লেজটা ধরতে হয় বাঁ-হাত দিয়ে।

নইলে লেজটা যদি একবার সে হাতে জড়াতে পারে তো বাস্, আর রক্ষা নেই। এমন জোরে চাপ দেবে যে, যত বড় জোয়ানই হোক্, হাতের মুঠো তার আলগা হয়ে যাবেই। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোবল্ মেরে দেবে বিষ-দাঁত দুটো বসিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি করলেন?

—লেজে ধরে তুলে ওদের মাথাটা নীচের দিকে করে বারকতক ঝাঁকানি দিলেই ওদের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, সহজে আর মাথা তুলতে পারে না। সেইরকম করেই ওকে হাঁড়িতে পুরে নিয়ে এসেছি। কাল ইয়াসিনকে দিয়ে আসব। বিষ-দাঁত ভেঙে ও খেলা দেখাবে।

পরের দিন সকালে বাবা নিজেই যাচ্ছিলেন ইয়াসিনের বাড়ি। আমি বললাম, আমি সঙ্গে যাব। সাপটাকে দেখবো।

বাবা বললেন, চল্।

মা এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে। বললেন, লেখাপড়া কি তুই ছেড়ে দিয়ে এসেছিস নাকি?

বললাম, না তো!

মা বললেন, কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছিস, ভেবেছিলাম দু'চারদিন থাকতে বলব, কিন্তু যে রকম দেখছি তাতে তো বলতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

মা বললেন, বুঝতে পারছো না? বাপ-ব্যাটায় চলল সাপের হাঁড়ি নিয়ে ইয়াসিন-সাপুড়ের বাড়ি। লোকে দেখলে কি বলবে বল তো? আর এই কথা যদি রায়সাহেবের কানে গিয়ে ওঠে!

—উঠুকগে। আয়!

বাবা জুতো পায়ে দিলেন। আমিও চললাম তাঁর পিছু পিছু।

সাপের হাঁড়িটা হাতে করে নিয়ে যেতে রাজি হল না কেউ। এক টুকরো দড়ি দিয়ে হাঁড়ির মুখটা বেঁধে বাবা নিজেই সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। বললেন, বেশিদূরে নয়। চল্।

পায়ে-চলা মেঠো পথ ধরে মস্ত বড় একটা পুকুরের পাড়ে গিয়ে উঠলাম। ঘাটের কাছে একটুখানি পরিষ্কার জল। বাকিটা সব ঢলা ঢলা পদ্মপাতা আর পদ্মফুলে ভরা। ওদিকে পাড়ের ওপর সারি সারি তালের গাছ। পদ্মপাতার ধারে ধারে কয়েকটা পানকৌড়ি সাঁতার কাটছে, আর কয়েকটা শুধু ডুবছে আর উঠছে। বেশ লাগছিল দেখতে। দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

বাবার ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, তিনি তখন অনেক দূরে চলে গেছেন।

ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি সুমুখে ছোট্ট একটি নদী। নদী না বলে খাল বলাই ভাল। বালির ওপর দিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের ধারা ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। ওপারে কয়েকটা বড় বড় গাছ ছায়া ফেলেছে সেই জলের ওপর।

এপারে গাছ নেই, সারি সারি শুধু ফসলের ক্ষেত। আর সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমরা চলেছি আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, খালের একটা দিকে প্রচুর জল জমা হয়ে আছে, আর কয়েকজন চাষী সেই জল তুলে নালা কেটে ক্ষেতে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেখেই একজন বললে, পেন্নাম গো মুখুজ্যেমশাই। কোথায় ধরলেন ওটা?

বাবা বললেন, লোকপুরে।

কে একজন বলে উঠল, এখানে ছেড়ে দেবেন না যেন।

—না। এটা ইয়াসিনকে দিতে যাচ্ছি।

সামনেই ইয়াসিনদের গ্রাম। পরিচ্ছন্ন একটি আম-বাগানের ভেতর খান-পাঁচেশেক মাটির ঘর। খালের একেবারে ধার ঘেঁষে ইয়াসিনের বাড়ি।

উঠোনে একটি নিমগাছের তলায় ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চাগুলিকে বাঁশের একটি চুপড়ি চাপা দিচ্ছিল ইয়াসিন। বাবাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, সেলাম গুরুজী।

হাঁড়িটা বাবার হাত থেকে নিয়ে বললে, খবর পেলে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসতাম বাবু, আপনি কেন এত কষ্ট করলেন আমার জন্যে।

ঘরের কোণে একটা ন্যাড়া প্রাচীরের কোলে একটুখানি ছায়া পড়েছিল, সেইখানে গিয়ে হাঁড়িটা ইয়াসিন নামিয়ে রাখলে।

—সেলাম গো বাবুজী!

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, ভিজে কাপড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। কাঁখে মাটির কলসীতে এক কলসী জল নিয়ে খাল থেকে সদ্য স্নান করে উঠে এসেছে

বলেই মনে হল। পিঠে একপিঠ ভিজে চুল, ফরসা গায়ের রং। আঁটসাঁট গড়ন।

এই কি ইয়াসিনের বৌ নাকি?

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ওষুধটা খেয়েছিলে? কেমন আছ এখন?

টানা টানা চোখ দুটি তুলে মেয়েটি এক গাল হেসে বললে, খুব ভাল আছি। আপনার ওষুধ খেয়ে আমার সব ভাল হয়ে গেছে। কেন, মিঞা-সাহেব আপনাকে বলে নাই?

বাবা বললেন, না, বলে নি।

মেয়েটি বললে, কি গো তুমি যে সাপ নিয়ে একেবারে মশগুল হয়ে গেলে? মোড়া দুটো বের করে দাও। ও'রা দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

—এই দ্যাখো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলেই ইয়াসিন ঘরের ভেতর থেকে বাঁশের দুটি মোড়া বের করে এনে নিমগাছের ছায়ায় পেতে দিয়ে বললে, বসুন।

ইয়াসিনের বিবিসাহেবা ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে তাকালো একবার। থমকে থামল। মনে হল কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও আর করলে না। ডাকলে, মিঞা-সায়েব, শোনো!

বলেই সে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাবার সমুখে মাটিতে উবু হয়ে বসল ইয়াসিন। জিজ্ঞাসা করলে, সাপটাকে তো এখনও কামানো হয়নি?

বাবা বললেন, না। বিষদাঁত ভাঙবার সময় পাই নি। খুব ভাল জাতের কালীয় নাগ। অনেকদিন তুমি খেলা দেখাতে পারবে।

ইয়াসিন বললে, বিষদাঁত আমি এক্ষুনি ভেঙে দিচ্ছি। এলেন যখন এত কষ্ট করে আর একটু বসুন গরিবের্ণী!

বাবা বললেন, তোমার বিবি কি জন্যে ডাকছে তোমাকে। যাও শুনে এসো কি বলছে।

ইয়াসিন বললে, যাই। ভিজে কাপড়টা ছাড়ুক।

এই বলে সে উঠে গেল তার বিবিসাহেবার কাছে।

বিবিসাহেবা কি বললে শোনা গেল না, কিন্তু ইয়াসিনের জবাবটা স্পষ্ট শোনা গেল। ইয়াসিন বললে, গাঁয়েরই কেউ হবে। ও'র তো শিষ্য-সাকরেদের অভাব নাই।

বলেই সে আমাদের কাছে এসে বললে, শুধোচ্ছে—আপনার সঙ্গের উটি কে?

এই বলে সে আমাকে দেখিয়ে দিলে।

বাবা বললেন, আমার ছেলে।

—আরে!

ইয়াসিন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আর তার বিবিসাহেবা ঘরের ভেতর থেকেই বলে উঠল, ওমা! তাই নাকি?

বিবিসাহেবা বেরিয়ে এল।

—দ্যাখো দেখি, আজ আমার কত ভাগ্যি। এসো এসো তুমি এইখানে এসো।

বললাম, এই তো বেশ আছি। নিমগাছের তলায় সুন্দর হাওয়া বইছে।

হাওয়া ওখানেও বইবে তুমি এসো। বলে সে আমার কাছে এসে বললে, ওঠো।

উঠে দাঁড়ালাম। যে মোড়াটায় বসেছিলাম সেই মোড়াটা সে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে যেতে হল তার সঙ্গে। বললে, ওরা এখন সাপটার বিষদাঁত ভাঙবে। ও-সব দেখো না। খুব খারাপ লাগবে।

বললাম, সাপটাকে দেখবো যে!

ঘরের সমুখে পরিচ্ছন্ন ঢাকা-দেওয়া বারান্দার ওপর মোড়াটি পেতে দিয়ে বললে, বেশ তো, কামানো হয়ে যাক, ভাল করেই দেখবে। কথা কইবার লোক পাই না, বোসো না, দুটো কথা কই। আমি একটু চা তৈরি করি, মুরগীর ডিম খাও তো?

সর্বনাশ! এ বলে কি?

বললাম, না না—ও-সব কেন?

—আমার হাতে খেতে না বুঝি?

মেয়েটি তার সেই আয়ত দুটি কালো চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালে। টানা টানা দুটি ভুরুর মাঝখানে কাচপোকার একটি টিপ জ্বল জ্বল করছে।

আমি বোধ করি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। মেয়েটি বুঝতে পারলে। বললে, ভয় নেই, বাবাটি তোমার মহাদেব, নীলকণ্ঠ। ও'র জাত-বিচার নাই।

বলেই সে জোরে জোরে বোধ করি আমার বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, ও মুখুজ্জেবাবু, শুনেছেন? ছেলে যে চা খেতে চাচ্ছে না।

ওরা তখন সাপের হাঁড়িটা গাছের তলায় নিয়ে গেছে। ইয়াসিন একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো কি-সব যন্ত্রপাতি যেন বের করছে।

বাবা বললেন, ইচ্ছে হয়তো খা। আর ইচ্ছে যদি না হয় তো থাক্ না।

চালার একদিকে দড়ির একটি শিকে ঝুলেছিল। সেই শিকেয়-টাঙানো চুপড়ি থেকে কয়েকটি মুরগীর ডিম বের করলে বিবিসাহেবা। বললে, কি? ইচ্ছে হবে?

বললাম, হবে।

কয়লার উনোনটা গম্ গম্ করে জ্বলছিল।

সেই উনোনের কাছে এসে বসল সে। পরনে একরঙা একটি শাড়ি— কোমরে বেশ আঁট করে জড়ানো। পিঠের চুল মাটিতে লুটোচ্ছে। চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েই সে ডিমগুলি পরিষ্কার করে ধুতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে? তোমার আর ভাই-বোন আছে?

বললাম, না। আমি একা।

—তোমার নাম কি?

বললাম, আমার দুটো নাম। এখানে সবাই আমাকে শ্যামল বলে ডাকে।

মেয়েটি ফিক্ করে একবার হাসলে। হাসলে আরও সুন্দর দেখায় তাকে। মুক্তোর মত দাঁতের সারি। তার ওপর গালে দুটি টোল পড়ে দেখলাম। ইয়াসিনের চেয়ে বয়স ওর অনেক কম।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসলে যে?

মেয়েটি মাথা নীচু করে বললে, আমারও দুটো নাম। একটা নাম শিবানী, একটা নাম নুরজাহান।

শিবানী? মুসলমান মেয়ের নাম তো শিবানী হয় না।

মেয়েটি মুখ তুললে। চাপা হাসি তার মুখে যেন লেগে রয়েছে। বললে, কে বললে আমি মুসলমান? আমি হিন্দুর মেয়ে।

মেয়েটিকে দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বললাম, ইয়াসিন মিঞা তাহলে তোমাকে বিয়ে করেনি?

মেয়েটি ঘাড় কাত করে বললে, হ্যাঁ। বিয়ে করেছে। বিয়ে না করলে আমি আসি কখনও?

—হিন্দুর মেয়ে হয়ে মুসলমানকে বিয়ে করলে? কেন করলে?

মুখ নামিয়ে কাজ করতে করতে মেয়েটি আবার মুখ তুলে হাসলে। বললে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ। কেন বিয়ে করে জানো না? থাক্, তোমাকে সেসব আর শুনতে হবে না। তুমি তোমার কথা বল। আমি শুনি। সন্ধ্যা কেমন ভালবাসে?

আমি কিন্তু কিছুতেই তাকে ছাড়লাম না। বললাম, বল তুমি কেন বিয়ে করলে। তোমাকে বলতেই হবে।

—যদি না বলি?

—আমি খাব না কিছু। চললাম। বলেই ওঠবার ভান করলাম একটুখানি।

শিবানী বললে, বোসো বোসো, রাগ করো না। বলছি।

বলেছিল সে তার জীবনের ইতিহাস। বলবার আগে সে কিন্তু আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, তার আগে বল তুমি আমাকে ঘেন্না করবে না।

বলেছিলাম, না ঘৃণা করব না। তুমি বল।

—বল তুমি এখানে আসবে মাঝে-মাঝে।

বলেছিলাম, যদি এখানে থাকি তো আসব।

—ও মা, তুমি এখানে থাকো না বুঝি?

—না। আমি থাকি আমার মামার-বাড়িতে।

তবু সে বলেছিল। বলেছিল, সে নাচতে জানে, গাইতে জানে। এই নাচ-গানের জন্যেই সে ঘর ছেড়েছিল। মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামে তার বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গিয়েছিল। বুড়ী এক পিসিমা তাকে মানুষ করেছে। তার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, ছিল না শুধু তাকে ধরে রাখবার মানুষ। তাই সে কম বয়সেই পালিয়েছিল ঘর ছেড়ে। কত দেশ কত জায়গা সে ঘুরেছে, কোথাও বেশিদিন টিকতে পারেনি। শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে পান্না দাসীর ঝুমুরের দলে চাকরি নিয়েছিল। সেরা গাইয়ে সেরা নাচিয়ে বলে তখন তার খুব নাম। পান্না দাসী নিজের মেয়ের মতন ভালবাসতো তাকে। বেশ শান্তিতে ছিল তার কাছে। কিন্তু শান্তিতে থাকতে ভগবান তাকে দিলে না। একদিন অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিলে ওই মিনসে ইয়াসিন। ইয়াসিনের তখন ছোকরা বয়েস। মাথায় বাবরি চুল, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, হাত দুটো লোহার মত শক্ত। ঝুমুরের দল এখান-ওখান ঘুরতে ঘুরতে বীরভূম জেলার ছোট একটি শহরের মতন জায়গায় বাসা বেঁধেছে। রাত্তিরে কাজ করে দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছিল সে দলের আরও তিনটে মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাপ-খেলানো তুবড়ি বাঁশীর আওয়াজ শুনে। সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শিবানীও গেল তাদের পিছু পিছু। দেখলে সাপের দুটো ঝাঁপি সামনে নামিয়ে রেখে বাড়ির উঠোনে ছোট একটা পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন তুবড়ি বাঁশী বাজাচ্ছে। মেয়েদের দেখে বাঁশী থামিয়ে বললে সাপের খেলা দেখাবো।

শিবানী এগিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে কি নেবে?

বলে যেই সে তার চোখের দিকে তাকিয়েছে মাথাটি তার ঘুরে গেল। ইয়াসিনও তাকিয়ে রইল তার দিকে। বললে, যা দেবে।

শিবানীর মনে হল লোকটা যেন তার কতকালের চেনা।

সাপের খেলা দেখানো হল।

কিন্তু কে দেখবে তখন সাপের খেলা? শিবানী তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের দিকে। ইয়াসিনও ঘন ঘন তাকাচ্ছে শিবানীর দিকে। সেই সুযোগে একটা সাপ পালিয়ে যাচ্ছিল ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে।

মেয়েগুলো চেঁচিয়ে লাফিয়ে ঝাপটা-ঝাপটি করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুললে সাপের ভয়ে। ইয়াসিন সাপটাকে ধরে ফেললে। সাপটাকে হাতে নিয়েই সে এগিয়ে এলো শিবানীর কাছে। শিবানী তখন বাঁহাত দিয়ে চালার একটি খুঁটি জড়িয়ে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। বললে, সাপটাকে রেখে এসো আগে।

ইয়াসিন হাসতে হাসতে সাপটাকে ঝাঁপিতে ঢোকালে। শিবানীর আঁচলের খুঁটে বাঁধা ছিল একটা রুপোর টাকা। সেইটে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ইয়াসিনের গায়ে। বললে, আর এসো না।

বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে তার বিছানায়।

সেদিন রাত্রে ঝুমুরের আসরে গান যখন খুব জমে উঠেছে, শিবানী হঠাৎ তাকিয়ে দেখে আসরের একপাশে বসে আছে ইয়াসিন। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে অসভ্যের মত। ইয়াসিনের গায়ে জামা, পরনে ফরসা ধুতি। তাকে আর তখন সাপুড়ে বলে চেনবার জো নেই।

প্যালা পড়ছে চারিদিক থেকে। ইয়াসিন তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলে একটা টাকা। মনে হল সে যেন তারই দেওয়া সেই রুপোর টাকাটি ফেরত দিলে। তারপর ক্রমাগত সে ছুঁড়তে লাগল টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি। কত যে দিলে কে জানে। এত পয়সা সে পেলে কোথায়?

তিন রাত্রি ঝুমুরের আসর বসল। প্রতিটি রাত্রেই ইয়াসিনকে দেখা গেল

ঠিক এক জায়গায় বসে। পালাও দিলে ঠিক সেইরকম করে।

কিন্তু দিনের বেলা একদিনও সে সাপ খেলাতে এল না।

তার পরের দিন বিশ্রাম। ক্লান্ত হয়ে সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোলো শিবানী। রাত্রে সেদিন কাজকর্ম কিছু নেই। পরের দিন সকালেই সেখানকার ডেরা তুলে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। পান্না দাসী সন্ধ্যে থেকে তার মদের পাঁট নিয়ে বসল। কাজ যেদিন না থাকে, সেদিন সে প্রাণভরে মদ খায়, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। মেয়েরা কেউ ও-সব খায় না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। শিবানীর খাতির একটু বেশি। আলাদা ঘরে তার বিছানা। একজন দাসী আছে সেবা করবার জন্যে। কাজ যেদিন না থাকে, তার গা-হাত-পা টিপে দেয়। সেদিন কিন্তু দাসী আর এল না। পান্না দাসীর কাছে সেও বোধ করি একটু প্রসাদ পেয়েছে।

খেয়েদেয়ে শিবানী যখন ঘরে খিল বন্ধ করে শুলো, রাত তখন মাত্র দশটা। রাত জাগা অভ্যেস, এত সকাল সকাল ঘুম আসবে কেন? শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল ইয়াসিনের কথা। লোকটা কি সত্যিই সাপুড়ে? সাপুড়ে এত পয়সা পেলে কোথায়?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল একটা ঝাঁকানি খেয়ে। খোলা জানলার পথে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চোখ চেয়ে তাকিয়েই দেখে ইয়াসিন বসে আছে তার শিয়রের কাছে। ধড়মড় করে উঠে বসে চীৎকার করতে গেল শিবানী। ইয়াসিন বললে, চুপ্।

—ঘরের খিল খুললে কেমন করে? তুমি কি জন্যে এসেছ এখানে?

ইয়াসিন বললে, খিল কেমন করে খুললাম সেসব জানবার তোমার দরকার নেই। আমি এসেছি তোমাকে নিতে। তুমি চল আমার সঙ্গে।

—তোমাকে জানি না চিনি না, তোমার সঙ্গে গিয়ে কি মরব?

—তাহ'লে কি তুমি চাও—আমি মরি?

—তুমি মরবে কেন?

ইয়াসিন বললে, তোমাকে ভালবেসে।

—তুমি আমাকে ভালবাসো?

—তোমার মনকে শুধোও।

শিবানী বললে, দূর! দূর! তুমি সাপুড়ে।

ইয়াসিন বললে, আমি সাপুড়ে নই। আমার জমি আছে, আমার বাড়ি আছে। তোমাকে এরকম করে ঘুরে বেড়াতে আমি দেবো না।

শিবানী বললে, আমি যদি না যাই?

ইয়াসিন বললে, আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আর বেশি কথা বলবার সময় নেই। তোমার কি আছে নেবে তো নাও সঙ্গে, আর না যদি নেবে তো এমনিই চল।

—কাউকে জানিয়ে যাব না?

—না। ইয়াসিন বললে, তুমি ছাড়া দল চলবে না। জানিয়ে গেলে ওই বুড়ী মাগী তোমাকে যেতে দেবে না। কান্নাকাটি করবে।

গয়নাগাঁটি শিবানীর গায়েই ছিল। বাক্স খুলে কয়েকখানা কাপড়-জামা আর টাকা-কড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ইয়াসিনের সঙ্গে।

সেই যাওয়া তার শেষ যাওয়া।

ইয়াসিন শুধু সাপুড়ে ছিল না। সাপ খেলানো ছিল তার ছল। সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে বড়মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে আট-ঘাট সব জেনে আসত। তারপর সুবিধে বুঝে রাত্রে গিয়ে চুরি করত সেই বাড়িতে। চুরি-ডাকাতি রাহাজানিই ছিল তার পেশা। দু-দুবার জেল খেটেছে ইয়াসিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও কি সে চুরি ডাকাতি করে নাকি?

শিবানী বললে, না। আমাকে নিকে করে ঘর বাঁধবার পর ও-সব কাজ তার বন্ধ করে দিয়েছি। ওর ভাবনা কি? দশ বিঘে জমি আছে। নিজের হাতে চাষ করে। তারপর চাষের কাজ যখন থাকে না, তখন সাপের খেলা দেখায়।

কালীয় নাগের বিষ-দাঁত ভেঙে তখন তাকে ঝাঁপিতে পুরেছে ইয়াসিন।

সবাইকে চা আর ডিমসেদ্ধ খাইয়ে শিবানী বললে, সেখাও এবার তোমাদের সাপ।

সাপটা বোধ করি কাতর হয়ে পড়েছিল একটুখানি। ঝাঁপির ঢাকাটা খুলে ফেললে ইয়াসিন। সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। কিছুতেই মুখ তুললো না।

বাবা বারকয়েক খোঁচা মারলেন হাত দিয়ে।

খোঁচা খেয়ে সে ফোঁস করে উঠে দাঁড়াল ফণা তুলে। বারকতক ছোবল মেরেই আবার সে ফণা গুটিয়ে ঢুকে পড়ল ঝাঁপির ভেতর।

বাবা বললেন, এখন ওর যন্ত্রণা হচ্ছে। চার পাঁচদিন ও ভাল করে মাথা তুলবে না।

শিবানী বললে, যদি এখানে থাকো তো আবার এসো।

বললাম, আসব।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাবাকে বললাম, জঙ্গলের ওপারে যে ইস্কুলটা আছে, ওখানে আজ একবার যাবেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে?

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

—এইখানে পড়ব ভাবছি।

—রাণীগঞ্জে কি হল?

জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, বুঝেছি। কিন্তু রোজ এতটা পথ জঙ্গল পার হয়ে যেতে-আসতে কষ্ট হবে না তোমার?

বললাম, না।

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে শুনিলাম, পাকিস্তানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শুধু জীববিদ্যা, না এতে পাচার-বিদ্যার কারসাজিও আছে তা ঠিক বোঝা গেল না।"

• • •

পাকিস্তানের অন্য এক সংবাদে শুনিলাম যে, করাচী হইতে রাজধানী (বেদখাধানী) রাওয়ালপিণ্ডিতে লইয়া যাওয়ার সলা-পরামর্শ চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"এবারে পিণ্ডি চটকাবার ষোল আনা সুযোগ"!!

• • •

কোন একটি নির্বাচনকেন্দ্রের ব্যালট বক্স সম্বন্ধে সংবাদে জানা গেল—প্রিসাইডিং অফিসার যতগুলি ভোট বিলি করিয়াছেন, তার চেয়ে বেশি ভোট ব্যালট বক্সে পড়িয়াছে। —"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

• • •

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলিয়াছেন, তাঁহার দিল্লী গমনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। —"সকলেরই কথা সাধারণে এখনও জানতে পারেনি; উনি

শুধু একটি তথ্য-ই আবিষ্কার করেছেন, মাছ ও সর্বপ্রকারের মাংসের ভোজ দিয়ে নেহেরুজী অতিথি সৎকার করেছেন এবং নাম্বুদ্রিপাদ নিরামিষভোজী নন"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

"**দু**র্গাপুর হইতে গ্যাস প্রেরণের ব্যবস্থা বানচাল"—একটি সংবাদ-শিরোনামা। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"একেই বুঝি রকফেলারী ভাষায় বলে "গ্যাস" দেওয়া"!!

• • •

শুনিলাম কলিকাতায় নাকি মস্কোর অনুকরণে একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। —"স্টেডিয়ামের ব্যাপারে আমরা এখন কানামামা হলেও খুশী। কিন্তু আমাদের ভয় হয় মস্কোর অনুকরণ করতে গিয়ে স্টেডিয়ামের বদলে না ঘণ্টা-ই আসে"—মন্তব্য বিশুখুড়োর।

• • •

আচার্য তুলসীর প্রভাবে কলিকাতার নাকি প্রায় হাজার লোক ভেজালের বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের

জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"অতি উত্তম সংবাদ। কিন্তু ভেজালের ব্যাপারে যেথা তুলসীপাতা যে দুর্লভ"!!

• • •

রেঙ্গুনের সংবাদে শুনিলাম সেখানে এক অন্ধ পুরুষ একটি অন্ধ তরুণীকে লইয়া পলাইয়া গিয়া মান্দালয়ের এক পুলিস-ফাঁড়িতে তরুণীটিকে বিবাহ করিয়াছেন। —"তরুণী নিয়ে যাঁরা সাধারণত পালিয়ে যান তাঁদের কেউ চক্ষুষ্মান হলেন বলে তো শুনিনি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম স্বামী ও স্ত্রী পৃথক পৃথক দুই শয্যায় শয়ন করিলে নাকি বিবাহ-বন্ধন দীর্ঘকাল অটুট থাকে। আমাদের বিশুখুড়ো বলিলেন—"তার চেয়ে গিন্নীদের পিত্রালয়ে রাখার ব্যবস্থা করলে আরো ভাল হয়, বিবাহ-বন্ধন তো অটুট থাকেই, তাছাড়া মাসিক-পত্রের বাজারে অন্য দিকের সুবিধেটাও বড় কম হয় না"!!

• • •

হলিউডে একটি পতিপত্নী একাদিক্রমে ২৬ বৎসর চলিয়া সম্প্রতি তার যবনিকাপাত হইয়াছে —"সংবাদ শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে শুনলাম প্রতিটি শোতে দর্শকদের নাকি বিয়ার পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। ২৬ বছর নাগাড়ে চলার কারণ হয়ত বিয়ার নয়, কিন্তু সত্যি সত্যি আর বিস্ময় বোধ করলাম না"—বললেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

জাপানের একটি শ্রমিকের পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল প্রকার শ্বেতসারবহুল খাদ্যকে মদে

পরিণত করার পক্ষে এই পাকস্থলী হইল একটি ভাটিখানা। আহারের পরেই লোকটি নাকি মদ না খাইয়াও মাতাল হইয়া পড়ে। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"আহা, এইরকম একটি পাকস্থলী যদি ভগবান দিতেন"!!

• • •

আফ্রিকা সরকারের নির্দেশ—কোন কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তার শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করিতে পারিবেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কাটাকুটির পর কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তার যদি হঠাৎ দেখে ফেলেন শ্বেতাঙ্গের নাড়িভুঁড়ি সব কৃষ্ণাঙ্গেরই মতো, তাহলে যে জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাবে"!!!

সাদা মেঘ দাবি করে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাদা মেঘ দাবি করে ঃ একমাত্র আমাকেই দ্যাখো,
খুব ভালো ক'রে বোঝো আমি ছাড়া কেউ নেই তোমার,
বিমল রক্তের নিচে প্রতিশ্রুতি রাখো যে কখনো
একদিক দেখবে না, দুই দিক তিন দিক দেখবে-
কারণ সত্যের মুখ নিরপেক্ষ, আদিগন্ত, আর
তার বিকিরণ লেগে সৌন্দর্যের মুখ অপরূপ।

সাদা মেঘ দাবি করে ঃ আমাকেই একমাত্র দ্যাখো,
শংকরাচার্যের কাছে রামানুজ আচার্যের কাছে
গিয়ে ফের পরক্ষণে ফিরে এসো। অভিজ্ঞতার
সব কালি মুছে দিয়ে কবিতা লিখতে জানি আমি;
কবিতা লিখতে আর কোনো কবি জানে না, জানে না
তারা হয় সত্য বলে নয়তো সুন্দর করে বলে,
সত্য ও সুন্দর তারা একশব্দে বলতে পারে না।

সাদা মেঘ দাবি করে ঃ শব্দ সব, শব্দই সোপান,
বাষ্পিত পুষ্পের স্তর পার হ'য়ে পার হ'য়ে সবাই
পরিণত অম্বুবাহ হ'য়ে যায়, প্রৌঢ় হ'য়ে যায়,
কারণ প্রৌঢ়তা মানে পরিণতি। দায়িত্ববিহীন
বালক বা স্থবিরের শ্লথ ব্যবহারে সুকুমারী
শব্দ মুখ ঢেকে থাকে। শব্দ নারী। নারী চিরন্তনী,
সাময়িক যুবকের অমোঘ ঝংকারে সেই নারী
হঠাৎ দয়িতা হয়, সুর তার সমস্ত শরীর,
স্পর্শাতীত, অতীন্দ্রিয়। শব্দেরও ইন্দ্রিয় স্পর্শাতীত,
অতীন্দ্রিয়। পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অরণ্যের
সমুদ্রের স্তরে-স্তরে শহরের শহরতলির
ঘরে-ঘরে আঞ্চলিক সরস্বতী মনসামঙ্গলে
পূর্ববঙ্গগীতিকায়, প্রেমিকের বুকের শিকড়ে
বধূর মুখের পাশে সম্মিলিত নারীর গুঞ্জনে
মাতাল বন্ধুর স্পষ্ট শুভেচ্ছার অস্পষ্ট সংলাপে
ঢেউ-লেগে-শক্ত-হওয়া বিরহীর ডাকবাংলোয়
আর ঘাস-ওঠা মাঠে সরস্বতীর পরিশ্রমে
ক্লিষ্ট পৃথিবীর ধাতু গলে যায় পৃথিবীর মাটি
শক্ত হয়ে যায়, শব্দ জুঁইশাদা মেঘ হ'য়ে আসে॥

স্বর্গ কোনদিকে ভাবি

আলোক সরকার

স্বর্গ কোনদিকে ভাবি। ঈশ্বর আছেন ওই বাজারের পাশের ডুমুর
গাছটার নিচে। সকলেই হাত পেতে পয়সা নেয়।
আমিও নিয়েছিলুম যেন অন্ধ এক। অকম্পিত বিষাদের সুর
ভাবি প্রশ্ন করি দূর পথের বন্ধুকে, ভয় আনে অনাত্মীয়
মুখের আড়াল।
অথচ নিশ্চয়ই জানি যে-কোনো একটি লোক মুহূর্তেই
সব ব'লে দেয়।

সারাদিন ঘরের আকাশে সাদা মেঘ ওড়ে। কী ক'রে যে যাবো
একটি লোকের কাছে। শান্ত স্পষ্ট সোনা
মাঠের উপরে ভ্রান্ত ধুলো ওড়ে, বিগত জন্মের যেন,
কোথায় হারাবো ?
একটি মুদ্রাও আমি ব্যয় করিনি তো, সঞ্চিত সম্পদ
বাড়ি কঠিন কামনা
কোন বিনিময়ে আলো। সংবেদনী রৌদ্র অন্তরাল।

এক মুহূর্তেই হয়। কেন যে হবে না দ্যাখো নিবিড় সকাল
আমাকে স্বর্গের দেশে নিয়ে যেতে পারে। ফুল-ফল নিমগ্ন প্রহর
প্রার্থনা অথবা দুই হাত ধরা ভালোবাসা। আমি
ম্লান জ্যোৎস্না, বিবর্ণ নীরব দেখি, শঙ্কিত অন্তর—
ঘরের দেয়ালে দুটি মোমবাতি জ্বলে, মোমবাতি জ্বলে,
আলো জর্যার্ড বাদামী।

আর মন হয় ঊর্ধ্বমুখী। এইভাবে আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েছি কম করেও অন্তত পঞ্চাশ বারবার।

কিন্তু এ-উচ্ছ্বাস থাক। ঠাকুরের কৃপার কথা পরে আরো লিখতে হবে—কেবল লিখব দৃষ্টান্ত দিয়ে তবে, নইলে হয়ত অনেকে মৃদু হাসবেন, "হায় রে বিশ্বাস—the old old story!"—বলে। তবে সবচেয়ে সুন্দর সত্যই তো সবচেয়ে পুরোনো—প্রতি সকালে নিশার বুক চিরে ঊষার আলো, পঙ্কের বুকে ছেয়ে পঙ্কজের হাসি। কবির ছন্দ গুণীর সুরবিলাস, বন্ধুর প্রীতি—সর্বোপরি মহত্ত্বের ছোঁয়াচে প্রাণে সব ছাড়বার উচ্চাশা জেগে ওঠা এদের মধ্যে কোনটি সনাতন নয়—অথচ আশ্চর্য এই যে, আজো মনে হয় চিরনবীন!

কিন্তু তবু প্রতি পথেই আলো-আঁধারী, প্রতি হৃদয়েই দুটো উল্টো টানের দ্বৈরথ-যুদ্ধ, প্রতি আশার ওপিঠেই নিরাশা, হর্ষের ওপিঠে বিষাদ, সুখের ওপিঠে অবসাদ—এও তো না মেনে পারি না। সব পেয়েছির দেশে আমাদের শুধু যে জন্ম হয়নি তাই নয়। সব পেয়েছির দেশে জন্মালে আমরা হারাতাম জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ—বড়র জন্যে ছোটকে ছাড়বার দুর্নিবার অভীপ্সা।

বিলেতে এইসব কথা আমার নিরন্তরই মনে হত। কিন্তু তবু বিলেতের আবহাওয়ায় আমার বৈরাগ্যপ্রবণতা একটু একটু করে ইহলৌকিকতার দিকেই মোড় নিয়েছিল বলব—যার ফলে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু একটু করে বদলে গিয়েছিল বৈকি। যতই কেন না "বৈরাগ্যমেবাভয়ং" জপ করি—য়ুরোপের প্রাণশক্তির ঝলকানি ও অজস্রতা আমাকে সময়ে সময়ে সত্যিই উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলত। মনে হ'ত এত শক্তি এরা পেল কোথা থেকে, আর কেনই বা এরা চলেছে সমাপ্তিহীন, যতিহীন, দুরন্ত নিরন্তর [illegible] শক্তির জয়যাত্রায় [illegible]

[illegible] চাঞ্চল্য, [illegible] ছেলেবেলাকার [illegible] একটু একটু করে দূরে সরে গেল [illegible] টেনিসনের কবিতা—আমার মনকে একটু একটু করে [illegible]:

Ring out the old, ring in the new,
Ring, happy bells, accross the snow!
The year is going, let him go,
Ring out the false, ring in the true!

[illegible]

সুভাষ এ-জাতীয় কথাটি [illegible] আরো এইজন্য যে, সে চাইত যেন আমরা গতানু-গতিক ধার্মিকতাকে সাত্বিকতা বলে ভুল না করি। একথা আগে বলেছি, তবু সুভাষের কথা তুললাম এই জন্য যে য়ুরোপের দুর্দমা প্রাণশক্তির স্পন্দন ও সর্বান্তঃকরণেই বরণ করেছিল। আমার

শোনা দেব কোত্থেকে? কিন্তু সে মুখ ছোটায় একতরফা, যাকে বলে অহৈতুকী কলভাষিনী—আমি শুনি বা না শুনি একটুও যায় আসে না তার।

ফলে মাসখানেকের মধ্যে আমার এত ফরাসী ভাষা শোনা হল যে, দেখি কি, কানও তৈরি হয়ে গেছে আর ঐ সঙ্গে বলাও রপ্ত হয়ে গেছে—শুনতে শুনতেই। মাদাম এর্ন্‌স্ট ভারি খুশি আমার উন্নতি দেখে। এই স্নেহময়ীকে আমি ভুলব না। আমার এক অসুখের সময় তিনি যে আমার কী অক্লান্ত সেবা করেছিলেন—কিছুতেই নার্সিং হোমে যেতে দেন নি। আমার বিছানার পাশে বসে তাঁর কত দুঃখের কথাই যে বলতেন—ভালোবেসে কীভাবে ঘর ছাড়েন, ধনীর কন্যা হয়ে কীভাবে প্রেমিকের জন্যে দুঃখ পান কলঙ্কবরণ করেন...... ইত্যাদি। সে এক বিচিত্র নাটকীয় কাহিনী। শুনতে শুনতে ভাবতাম সগর্বে: "এবার রবির কাছে গিয়ে চাল মারতে পারব বটে। বা বা বা!" কিন্তু সে অন্য কথা।

জান ছিল তাঁর নয়নতারা। কিন্তু তিনি তাকে শাসন করতেন খুবই। সে আমার কোলে বসে যখন অনর্গল বকে চলত, ধমকাতেন: "এবার ওঠ দুষ্টু মেয়ে—মঁসিয়ে বোঝার কষ্ট হয় না বুঝি?" জান পিঠ পিঠ উত্তর দিত: "নারে! মঁসিয়ে বোঝা তোমার মতন দুর্বল নাকি? আর আমি তো ছেলে-মানুষ হালকা।"

অনতিকাল হাসি গল্প স্নেহ প্রীতির আবহে কাটল মাসখানেক। মাঝে মাঝে সুভাষ সেখানে আসত। তার সঙ্গে একটি ছবি তুলি জান মাঝে দাঁড়িয়ে। ছবিটি আমার The Subhash I knew বইটিতে ছাপা হয়েছে। সুভাষকে দেখে মাদাম এর্ন্‌স্ট মুগ্ধ। কিন্তু মুশকিল—তিনি একটুও ইংরেজি জানতেন না। আমি বাহাদুরি দেখাতে হলাম দোভাষী। সুভাষকে তিনি লাঞ্চে ডাকলেন। সুভাষ আমার ফরাসী ভাষায় দ্রুত উন্নতি দেখে চমৎকৃত। সে কী আনন্দ আমার—যাকে এ যাবৎ কেবল আমিই একতরফা তারিফ করে এসেছি অবাক হয়ে—সে কিনা আজ আমাকে তারিফ করছে সবিস্ময়ে! খুশ যাকে বলে। কিন্তু সুভাষ এর পরে আরো ছোবল হানল: "এই-ই তো চাই দিলীপ, কেবল এবার জর্মান ভাষা শেখো।"

আমি ওকে বললাম: "ভাই, আমি ফরাসি ভাষা শিখতে এত কষ্ট করেছি শুধু সামনের বছরে রোলাঁর সঙ্গে আলাপ করব বলে। তোমার জর্মান ভাষা বড় কটমট, ফরাসী ভাষার মতন সুন্দর নয়।" সুভাষ কি ছাড়বার পাত্র—কেবল বলবে জর্মান ভাষা আশ্চর্য ভাষা—আর গানে তো ওরাই সবার বড়। এ-যুক্তি দিলেই হার মেনে বলতে

আজকাল তারাই ঠেঙায় প্রফেসরদের, বুঝলে? তুমি ব্যারিস্টার হও। বুদ্ধি আছে, টাকা আছে, মুরুব্বি আত্মীয় আছে, লোকেন পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এস পি সিংহ, আশু চৌধুরী তোমার পিতৃবন্ধু—তোমার ভাবনা কি? কম্পিটিশন? ওহে কম্পিটিশন নেই কোথায়? আর এ জেনো, যে প্রতিযোগিতা যতই হোক না কেন প্রতিভাকে কেউ ঠেকাতে পারে না।"

আর যাবে কোথা? আমি মিডল টেম্পল-এ আড়াই শো পাউন্ড জমা দিয়ে উকিলি ডিনার খাওয়া শুরু করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম কেম্ব্রিজে এল এল বি পড়তেঃ দিলীপকুমার রায় এম এ, এল এল বি ক্যান্টাব, বার এট্ ল, আ মরি মরি—কী চোখ-জুড়ানো সারসার উপাধি-ভূষণ রে—ঠিক যেন "শিরে শিখিচূড়া গলে বনমালা অধরে মধুর বাঁশি!"

এমন সময়ে শ্রীশরৎ দত্ত গর্জে উঠলেনঃ "সুভাষকে ভালোবাসলে তার মতন হওয়া চাই—ঝাঁপ দিতে হবে burning your boat!"—যে কথা বলেছি ইতিপূর্বে মনে বাজল—ঠিকই তো—"যে না করে ভয়—তারি জয় জয়!" অকুতোভয়ে ঝোঁকের মাথায় ব্যারিস্টারি পড়াও দিলাম ছেড়ে পঞ্চাশ পাউন্ড দণ্ড দিয়ে (২৫০ পাউন্ড জমা দিয়েছিলাম বার-এ, ফিরে পেলাম ২০০ পাউন্ড!) অতঃপর এক ইংরাজ বন্ধুর পরামর্শে ঠিক করলাম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট হওয়াই পন্থা। ফের ৫০০ পাউন্ড জমা দেব দেব এমন সময়ে হবি তো হ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির লণ্ডনে! তিনি বিষম তিরস্কার করলেন—(কী বললেন পরে বলছি)—অমনি "ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা।" কে জানত পিতৃদেব এ-হাসির গানটি লিখেছিলেন তাঁরই কুলতিলকের কথা ভেবে! কিন্তু এখন করি কী? সংগীত? না, আর কিছু? ভাবছি এমন সময়ে লণ্ডনে দেখা হল মহাত্মা গান্ধির প্রিয়বন্ধু পোলাকের সঙ্গে। মুগ্ধ হলাম তাঁর দীপ্ত ব্যক্তিরূপে তথা আদর্শবাদে। তিনি একদিন বক্তৃতা দিলেন গান্ধিজীর সম্বন্ধেঃ সাউথ আফ্রিকায় দীন দরিদ্র শ্রমিকদের জন্যে তাঁর প্রাণপাত করে আন্দোলন, মার খাওয়া, জেলে যাওয়া কী নয়? আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম, তাঁকে বললাম শ্রমিকদের হয়ে আমিও লড়ব। "দীন দুঃখীর সেবা এই-ই তো চাই" বললেন পোলোক। সে সময়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু লণ্ডনে, তিনিও উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিলেন পার্সী লেবর লীডার ওয়াডিয়া সাহেবের কাছে। জ্বলন্ত উৎসাহ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম উপদেশ নিতে—কীভাবে শ্রমিকদের সেবা করা যায়। কিন্তু হায় রে, অভাগা যেখানে যায় সমুদ্র শুকোয়ে যায়। তাঁর হাসিহীন মুখ ও রসহীন কণ্ঠস্বর আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি মারল—লেবর লীডরের এই পরিণতি! বাপরে লেবর আমার মাথায় থাক আমি লেবর চাই আর কাউকে। অবশেষে এক ফার্মারের সঙ্গে দেখা—প্রকাণ্ড ফার্মে। দেখে খুব ভালো লাগল—খোলা হাওয়া—উদার আলো—মাঠ বন বীথিকা এই-ই তো চাই প্রকৃতির সহবাস। ঠিক করলাম কেম্ব্রিজে ডিগ্রি নেব ইনটেন্সিভ এগ্রিকালচারের। কিন্তু এক রবীন্দ্র-ভক্ত আমাকে ধমকে মনে করিয়ে দিলেন "ঘরে বাইরে"তে নিখিলেশের কৃষি উৎসাহের কথা—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল "জীবনস্মৃতি"তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অদর্শের টানে নানা ব্যবসা ফেঁদে ফতুর হওয়া। মন ফের দোলায়মান—কী করি কী করি? শেষে ঠিক করলাম বটে সংগীত নেওয়াই পন্থা—কেবল মন খুঁত খুঁত করেঃ সংগীত তো শখের জিনিস—আমাদের দীন দরিদ্র দেশে এ রঙিন বিলাস কেন? সুভাষ বসল দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে—আর আমি কিনা শৌখিন গাইয়ে হয়েই জীবন কাটাব? ভাবতে ভাবতে কেমন যেন নিরাশা এসে গেল। মনে হল আমার মতন অস্থিরমতির পক্ষে কোন কিছুতেই লেগে থাকা সম্ভব হবে না—সুতরাং আমার সিদ্ধি নৈব নৈব চ—"মতি স্থির নাই যার—তারে কে দিশা দেখাতে হায় পারে?" জীবনের অনিশ্চিতার এই ঘনায়মান অন্ধকারেই আমার দেখা রোলাঁর সঙ্গে—তিনিই প্রথম আমার অস্থির বিবেককে শান্ত করেন বুঝিয়ে যে আদর্শ শৌখিন আদর্শ নয়—সংগীতের আলো মানুষের বস্তুতান্ত্রিকে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক—পরমানন্দের অভ্রান্ত দিশারি।

(ক্রমশ)

ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়বে তার বুকের উপর। কাল এমন আশঙ্কাই দেখা দিয়েছিল চম্পির মনে। তাই প্রবল অস্বস্তি চোর-কাঁটার মত বিঁধছিল কাল। না, আজ সে আর ছেঁড়া কাপড় পরে যাবে না।

বরঞ্চ ছোটকাকীমার কাছ থেকে একখানা ভাল শাড়ি চেয়ে নেবে। জামাও চাইবে একটা। আর যাওয়ার আগে সাবান মেখে গা-টাও ধুয়ে নেবে। কাল বড় ঘেমেছিল সে। সুহাসবাবুর অত কাছাকাছি তার ঘাম-প্যাচপ্যাচে শরীরটা নিয়ে বসে সে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তোরঙ্গে তার একখানা সাবান লুকোনো ছিল। বড়দাদা মাস কয়েক আগে যখন বাড়ি এসেছিল, সেই সময় চম্পি সাবানখানা চুরি করে সরিয়ে রেখেছিল। ঘিয়ে রঙের একখানা সাবান। বঙ্গলক্ষ্মী টার্কিশ বাথ। এ পর্যন্ত একদিনও সে ওটা ব্যবহার করেনি। আজ সে সাবান মেখে গা ধোবে।

কিন্তু সাবানখানা গেল কোথায়? তোরঙ্গ ওলট-পালট করেও চম্পি সাবান পেল না। বারে! কে নেবে সে সাবান? কে নিল? একবার, দুবার, তিনবার, সে বাক্স হাতড়াল। পেল না। কাপড়-চোপড়ের ভাঁজের মধ্যে নেই ত। চম্পি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ-করা নানান রকম কাপড়ের টুকরো, গরম জামা, সিগারেটের বাক্স, সব নামিয়ে নামিয়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখল। না নেই। চম্পির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল প্রায়। কোথায় রাখল সে? নাকি কেউ গাপ মেরেছে? জিনিসটা সামান্য একটুকরো সাবান হতে পারে, কিন্তু চম্পির কাছে ওর মূল্যই অসাধারণ। শখের জিনিস বলতে ঐটুকুই তার সম্বল ছিল। কতদিন তার মনে হয়েছে একটু মাখি, একটু মাখি। কিন্তু অযথা জিনিসটা খরচ করতে সে চায়নি। বেশ একটা মৃদু গন্ধ ছিল। বার-কয়েক শুঁকে শুঁকে সে আবার সেটা বাক্সবন্দী করে রেখে দিয়েছিল। আজ তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। শূন্য চোখে সে খোলা তোরঙ্গের ডালার দিকে চেয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে খসখস শব্দ পেয়ে তার সম্বিত ফিরে এল। দেখল যূথী গা ধুয়ে ছোটকাকীমার ভাল একটা জামা আর লাল টুকটুকে একটা সিল্কের কাপড় পরে আয়নার সামনে এসে চুল আঁচড়াতে বসল।

চম্পি একটু অবাক হল। যূথী যে হঠাৎ পটের বিবি সাজতে বসল। বাব্বাঃ, ঢং কত! আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার করে মুখখানা দেখছে! রূপের গরবে মাটিতে আর পা পড়ে না। তা রূপসী এখন যাচ্ছেন কোথায়? ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে। কিন্তু করল না।

[illegible]

চুরি করলি?

যূথী [illegible] আর কোনদিন। একটুখানি মাখিছি।

তাই বা মাখবি কেন? ও কি তোর জিনিস?

জলে দাঁড়িয়ে চম্পি ভাবল, এই তাহলে আমি। সকলের গলার কাঁটা, পরিবারের অনাবশ্যক এক বোঝা। সংসারের অবাঞ্ছিত এক জঞ্জাল। আমার জন্যে কারো চোখে ঘুম নেই, কারো মনে শান্তি নেই। কোথাও ছিটেফোঁটাও স্নেহ-ভালবাসা নেই। ভবিষ্যতে আলোর ইশারা নেই। আমার রঙ যেমন কালো, ভবিষ্যৎটাও তাই।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। জন্মক্ষণে কে যেন প্রকাণ্ড একটা দোয়াত উপুড় করে চম্পির অদৃষ্টের লিখনের উপর কালি ঢেলে দিয়েছিল। সেই কালি ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে, এখন গড়িয়ে পড়ছে পুকুরে। পুকুরের জল তাই গাঢ় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। এক আঁজলা জল উপরে তুলে চম্পি আস্তে ছেড়ে দিল। জল নয়, কালি। আবার এক আঁজলা জল নিয়ে ওর হাতের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। সবই যে অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে অনায়াসে মিশে যেতে পারবে চম্পি। চিরতরে। সেই ভাল। সবাই ত তাই চায়। যে-কঠিন সমস্যা সে সৃষ্টি করেছে তাদের সামনে, না সমস্যা সে সৃষ্টি করেনি, করেছে তার অদৃষ্ট। একই বাবা, একই মা, তার আর যূথীর, একই উরসে, একই গর্ভে তার আর যূথীর জন্ম, তবু কেন তার ত্বকে এত কালি, আর যূথীর ত্বকে এত সোনা? কেন? এ-যে তার অদৃষ্ট। মেজদিও ত কালো ছিল, বড়দির রঙও এমন আহামরি কিছু নয়, তবু বিয়ে কি তাদের আটকেছে? না। তবে তার বেলাতেই বা এমন পৃথক ফল হল কেন? অদৃষ্ট। তার রঙও কালো, তার বাবার টাকাও ফুরিয়ে গেল। বেশ মজা। সবই তার দোষ। তার ছাড়া আর কার? দোষ তার অদৃষ্টের।

পুকুরের কোন ঘাটেই এখন কেউ নেই। থাকলেও ক্ষতি ছিল না। কারোর নজরে সে পড়ত না। সে যে আপন রঙে মিশে গেছে ঠিক এমনি মিশে মিশেই সে একেবারে পুকুরের তলায় পৌঁছে যাবে। সে আর কাউকে বিরক্ত করবে না, কার বাপ অশান্তির কারণ হবে না, কারোর অন্যায় গঞ্জনাও আর সইতে হবে না।

পুকুরের একেবারে নিচে, গহন তলে, চির অন্ধকারে তার জন্যে এক শান্তিময় বিছানা পাতা আছে। সেই ছায়ায় তার মনের জ্বালা জুড়োবে। যূথী নিষ্কণ্টক হবে। সবার মাথার ভাবনার আর কেউ থাকবে না। পথ আটকে থাকবে না কেউ। দেখতে আসবে যূথীকে, এবার যখন যূথীকে দেখতে আসবে কেউ, দেখামাত্র পছন্দ করে যাবে। চম্পির মত একশ গণ্ডা আজে বাজে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না যূথীকে। কি সব বোকার মত প্রশ্ন। পায়েসে কতখানি নুন দিতে হয়? চম্পির মনে পড়ল দ্বিতীয়বার তাকে যারা দেখতে এসেছিল, এক দোজবরে পাত্রের জন্য, তাদের মধ্যে একজন, এক হাড়গিলে, বোধ-হয় বরের বন্ধু, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বল দিদি, পায়েসে কতখানি নুন দিতে হয়? চম্পির তখন মনে হয়েছিল, ঠাস করে তার গালে এক চড় মারে। সেবার সেই দোজবরে পাত্রও চম্পিকে পছন্দ করেনি। করেছিল, তবে নগদ চার হাজার টাকা আর দুটো ভরি সোনা চেয়েছিল। হায়রে, কালো হওয়া কি এতই অপরাধ যে, দোজবরেও টাকার খাঁই ছাড়ে না।

চম্পি আর একটু গভীর জলে নেমে গেল। থুৎনি পর্যন্ত ডুবল তার। শ্যাওলার গন্ধ নাকে এসে লাগছে। একটা ছোট মাছ কুটুস করে তার গলায় কামড় দিয়ে পালিয়ে গেল।

কালো আর ফর্সার তফাৎটা কতখানি? কত-ক্ষণ সে তফাৎ থাকে? চম্পির বড় জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে, যে-লোক

কোলে ঠাঁই দের। অপমৃত্যু স্বেচ্ছায় সে আর ঘটাতে যাবে না। ওতে বড় যন্ত্রণা। আজই সে টের পেয়েছে। সে বড় বিকট। বড় ভয়ংকর। না না, ও পথ আর মাড়াবে না চম্পি।

আত্মহত্যাতেও তার রুচি নেই, সংসারে ফিরতেও তার আগ্রহ নেই। নিজের অসহায়তা যে কী পরিমাণ বড়, চম্পি সেই কথাই ভাবতে লাগল। সে যেন ধোপার কুকুর। যার ঘরও নেই, ঘাটও নেই। সে যেমন মরেও নেই, তেমনি বেঁচেও নেই। সে নিরন্তর এক অপমৃত্যুর মধ্যেই যেন বেঁচে আছে। ছিলও তাই। এই অবস্থা ত সে মেনেই নিয়েছিল। যাবতীয় আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়ে পীড়াদায়ক বর্তমানের সঙ্গেই ত সে সন্ধি করেছিল। তার মধ্য থেকেই উনিশ বিশ রকমফের বের করে নিয়েছিল। নতুন দুঃখ না পাওয়াকেই সে সুখ নাম দিয়েছিল।

বেশ ছিল চম্পি। কিন্তু হঠাৎ তার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। শৈল, শৈলদি এর জন্য দায়ী। আর আর হ্যাঁ তিনিও দায়ী। সকাল থেকে মনে মনে যে এত গান সে গেয়েছে, শুনিয়েছে এক-জনকে, সে একজন কে? শৈলদি? না। তবে? না তার নাম উচ্চারণ করবে না চম্পি। নিজেকেও সে শোনাতে চায় না। সেটা রূপকথার কাহিনী হয়েই থাক।

আগাগোড়া ব্যাপারটাই কি রূপকথার মত নয়? যে-ঘটনা জীবনে ঘটে না, তাই ত রূপকথা। কল্পনায় যার জন্ম, কল্পনায় যার বসবাস। চম্পির রূপ নেই, কিন্তু গুণ ত আছে। কতদিন চম্পি কল্পনা করেছে, সেই গুণ দিয়েই সে মুগ্ধ করবে তার মনের মত মানুষকে। সে যেমন যেমন কল্পনা করেছে ঠিক অবিকল তারই রূপ দিয়েছে সুহাস। সুহাসের মুগ্ধ নয়ন, (সইলো, ও দুটি নয়ন, আমার আসা যাওয়ার পথে কেন তাকায় অনুক্ষণ। সত্যি কি সুহাস অনুক্ষণ চেয়ে-ছিল তার দিকে?) সুহাসের কথা, সুহাসের ব্যবহার চম্পির কল্পনাকে মূর্ত করে তুলেছে। সুহাস কি তবে তার মনের মত মানুষ? একথা যে চিন্তা করাও হাস্যকর। কোথায় সুহাস আর কোথায় চম্পি। সুহাস আকাশের চাঁদ আর চম্পি পুকুরের শ্যাওলা। চাঁদ আকাশে থাকে। সে হয়ত জানেও না তার অপার করুণা আলো হয়ে পাড়াগাঁয়ের পুকুরে ভাসমান এক শ্যাওলার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কত শত সহস্র জায়গাতেই ত চাঁদের কিরণ পড়ে। চাঁদ কি তার হিসেব রাখে। কিরণ ছড়ানই যে চাঁদের অভ্যাস। তারপর শ্যাওলা যদি সেই আলো পেয়ে ভাবে, চাঁদ আমার, তার এই কিরণ সে শুধু আমাকেই দিচ্ছে, তবে সে কি পাগলামি নয়? চম্পি ত পাগল হয়নি। ভাল কথা বলা, ভদ্রতা জানান, সুহাসের অভ্যাস। মন রেখে কথা বলা সুহাসের অভ্যাস। সেই অভ্যাসকে যদি চম্পি অন্য কিছু বলে ভাবে......বয়ে গেছে চম্পির অন্য কিছু ভাবতে। সে কি নিজের ওজন বোঝে না?

ঘোষে যদি ভূরে মুখী শৈলদির বাড়ি যাবে শুনে সে অমন ক্ষেপে উঠল কেন? কক্ষনো না, কক্ষনো না। শৈলদির বাড়িতে যাবে বলে সে মুখীর উপর রাগ করেনি। রেগেছে মুখী তার সম্পত্তি চুরি করছে বলে। রেগেছে মুখী চম্পিকে [illegible] করছে বলে। আর দেখবে না, [illegible] কেমন হাসছে। [illegible] থেকে কাপড় [illegible] ঝুলেছে। এই [illegible] চম্পি। তুই যে এমন [illegible] কাকে ভোলাবি? সুহাসকে। [illegible] সাজ দেখে সে [illegible] ভুলবে না। [illegible] কলকাতায় [illegible] করে। যদি রেগে থাকে চম্পি, ত এই সব কারণেই রেগেছে।

যার যার ওজন তার নিজের বুঝে চলাই উচিত। অন্তত চম্পি ত তাই মনে করে।

ঘপাং করে পুকুরে একটা মাছ ঘাই মেরে উঠল। চম্পির থেকে বেশি দূরে নয়।

চম্পি চমকে উঠল। অনেকক্ষণ ঘাটে এসেছে সে। এবার তাকে উঠতে হবে। চম্পি এবার মাঝপুকুরে চাইল। এখানে এখন ত আর তেমন অন্ধকার নেই। সে যদি ডুবেই যেত, কি হত তাহলে? নিশ্চয়ই আরও খানিকটা পর থেকে খোঁজাখুঁজি হত। পুকুর ঘাটেও লোক জড় হত। কি করে জানত তারা, চম্পি ডুবে মরেছে? কেউ ত তাকে ঘাটে আসতে দেখেনি। চম্পির মনে হল, সে যেন জলের তলায় শুয়ে শুয়ে
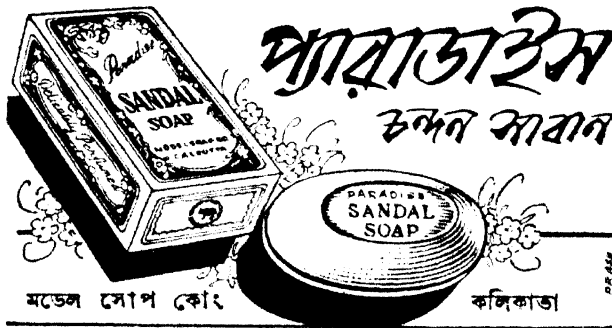
দু হাজার বছরেরও আগে রোমের যানবাহন—ঘোড়ার হ্রেষা, গাড়ির শব্দ, পাল্কীবাহকদের চিৎকার পথচারীদের গণ্ডগোল, জুলিয়াস সীজারকে এতই বিরক্ত করেছিল যে, তিনি রেগেমেগে আদেশ দিয়েছিলেন দিনেরবেলা কোন বোঝাই গাড়ি শহরের রাস্তা দিয়ে চলতে পারবে না। সেই অপরিসর রাস্তা দিয়ে আজ আড়াই লক্ষ মোটরগাড়ি, বাস, মোটরসাইকেল, ভেসপাস ও ল্যাম্ব্রেটার ভিড় ইটালির পথচারীদের জুলিয়াস সীজারের চাইতে কম বিরক্ত করছে না। মোটরগত প্রাণ পৃথিবীর অন্যান্য শহরের রীতির মত ইটালিও গাড়িতে গাড়িতে অব্যাহত সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইটালিতে প্রকৃতপক্ষে যানবাহন-নিয়ন্ত্রক কোন আইন ছিল না। এক কথায় অরাজক বলা চলে। গত বৎসর ইটালির পুলিস অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখেছে ইটালির ১,৪০০,০০০ মোটরগাড়ির ড্রাইভার কিভাবে ২০০,০০০ লক্ষ ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ৭,১৪৫ জন পথচারীকে মেরে ফেলল। এই মৃত্যুহার মোটরগাড়ির অনুপাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৯ গুণ। রোমানরা ঠাট্টা করে বলে, একমাত্র নারী ধর্ষণের অপরাধেই ড্রাইভারদের জেল হওয়া সম্ভব, অন্য কোন কারণেই নয়। ইটালিতে গাড়ির গতি-নিয়ন্ত্রক কোন আইন নেই, গাড়ি চালাবার লাইসেন্স সাময়িকভাবেও বাতিল করার কোন অধিকার পুলিসের নেই, রাস্তার ডানধার ঘেঁষে চলবারও কোন বাধা-বাধকতা নেই। একজন মোটরচালক এক-দিনে পাঁচটি বিভিন্ন মোটর দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু ঘটিয়েছিল, কিন্তু সেজন্য তাকে এমন কি মোটা জরিমানাও দিতে হয়নি। পোপ দ্বাদশ পায়াস যখন ভাটিকান থেকে গ্রামাঞ্চলে যেতেন, তখন তিনি নিজে ঘড়ি ধরে তাঁর গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে চালককে বাধ্য করতেন। গাড়ি যত ছোট, তত চালক তত [illegible] মালবাহকেরাই গাড়ির [illegible] [illegible] ইটালিতে [illegible] নেই। এই চিন্তাধারার মূলে অন্য কোন কারণ নেই শুধু একমাত্র কারণ এই যে মানুষের চাইতে অধিক [illegible] সবায়ের।

জুলিয়াস সীজারের আমল থেকে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই সর্বপ্রথম গাড়ির বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা হল। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে [illegible] নিয়ন্ত্রণের জন্য ১২৬টি [illegible] সর্বপ্রথম এক আইন চালু হয়েছে। এই আইনে শহরে গাড়ির গতি সর্বোচ্চ ৩০ মাইলের মধ্যে বাঁধা হয়েছে। [illegible] [illegible] নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। [illegible] ঘণ্টাই গাড়ি থামার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশ না মানলে মোটা জরিমানা ও লাইসেন্স বাতিল—দুটোই হতে পারবে।

ইটালির মোটরচালকেরা অবশ্য এই আইনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি আইন যেরকম কঠোর হওয়া উচিত ছিল সেরকম হয়নি। বিশেষ করে শহরের বাইরে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণের কোন বিধান না থাকাটা অনুচিত হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন।

নেপলস উপসাগরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসের মুখগহ্বরের ফটো এর আগে কখনো এত ভাল তোলা সম্ভব হয় নি। ভিসুভিয়াসের বিরাট মুখগহ্বরের যখন সন্ধান পাওয়া যায় তার অনেক আগে—প্রাগৈতিহাসিক যুগে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে এর উচ্চতা হ্রাস পায়। আজ এর উচ্চতা ৩৬০ ফিট। বিস্ফোরণের আগে এর উচ্চতা প্রায় দ্বিগুণ ছিল বলে অনুমান করা হয়। ৭৯ খৃস্টাব্দে ভিসুভিয়াসের বিস্ফোরণেই পম্পাই, হার্কিউলেনিয়াম প্রভৃতি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এর পর ১৬৩১ খৃস্টাব্দের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পূর্ব পর্যন্ত ভিসুভিয়াস খুব চিন্তার কোন কারণ ঘটায় নাই। ১৬৩১ খৃস্টাব্দের বিস্ফোরণের পর থেকে সে খুব যে শান্ত আছে এমন নয়। তবে যখন শান্ত থাকে তখন ভিসুভিয়াসে উঠে মুখগহ্বরের পাশে দাঁড়ানও যায়। তবে বর্তমানে ইটালিয়ান সরকার ভিসুভিয়াসে উঠা একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন কারণ এর মুখগহ্বরের ভিতর দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার খুব একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া কবিতাগুলি যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখিত, তা মনে হয় না। গীতি কবিতার সুর যে কটি কবিতায় উপস্থিত, সেই সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রভাব বিদ্যমান। কয়েকটি কবিতার অহেতুক দৈর্ঘ্য পীড়াদায়ক। প্রচ্ছদপট কাব্যগ্রন্থের উপযোগী নয়। ৫৮৭।৫৯

অচিনতলা—মুকুল সেনগুপ্ত। কাব্যম, ৪৬।১, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬। এক টাকা।

এই চব্বিশটি রোমান্টিক কবিতার মধ্য দিয়েই এই প্রকৃতিতন্ময় তরুণ কবির কোমল হৃদয় ধরা পড়েছে। যদিও কবিতাগুলি এখনও পরিণত হাতের অপেক্ষা রাখে এবং গীতিময় প্রেমের হালকা কবিতা মাত্র সুরের ছন্দপতন ঘটিয়েছে। তবু একথা আমাদের মনে হয়েছে মুকুলবাবুর ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। ১।৫৯

উপন্যাস

মেঘমেদুর—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। [illegible] ১২।১ [illegible] চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৪। দুই টাকা।

[illegible] ৪২৩।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

সাহিত্যের সমস্যা—[illegible] চৌধুরী।
M. N. Roy Philosopher—Revolutionary—Sibnarayan Ray.
Afro-Asian Soldarity: An Idea Betrayed?—Dantius Shavaksha Jhabvala.
Sino-Yugoslava Relations: A Barometer of Peaceful Co-Existance?—Karl Reyman and Shen-yu Dai.
Hindi Vs. Sanskrit—Dr. Suniti Kumar Chatterjee.
Language Problem in India—C. Rajagopalachari.
Thoreau, Tolstoy and Gandhiji—Pyarelal.
ভগবৎ প্রসঙ্গ—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ।
বিশ্বশান্তির পথে—শ্রীসনৎকুমার ভট্টাচার্য।
সেই পুরাতন কথা (১ম খণ্ড)—ইভান গনচারভ অনুবাদক অশোক গুহ।
রোদ জল ঝড়—দক্ষিণারঞ্জন বসু।
Anna Karenina — Leo Tolstoy.
The Arab Dawn—R. K. Karanjia.
The Dictionary of Palmistry—J. S. Bright.
Fortitude—Hugh Walpole.
The great short stories of Guy de Maupassant.
Letter-writing Improved — J. S. Bright.
The Power of Darkness—Mulk Raj Anand.
টি বি সম্বন্ধে—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর

আপত্তিকর প্রচার

শহরের অলিগলি ও রাজপথে এবং প্রেক্ষাগৃহে ছায়াছবির প্রায়শ দৃষ্টকটু আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ প্রাচীরপত্র ও স্থির চিত্রের প্রতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় একটি ঘরোয়া বৈঠকে এসম্বন্ধে প্রতিনিধি স্থানীয় চলচ্চিত্রসেবীদের সঙ্গে সরকারী নীতির কথা আলোচনা করেন। চলচ্চিত্র শিল্প ও সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই আপত্তিকর পরিস্থিতির কোন প্রতিকার করা সম্ভব কিনা এটাই ছিল উল্লিখিত বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়।

এবিষয়ে বেঙ্গল মোসন পিকচার এসোসিয়েশন একটি বিবৃতিতে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন। ছায়াছবির আপত্তিজনক স্থির চিত্র ও প্রাচীরপত্র সম্বন্ধে সরকারী উদ্বেগের যৌক্তিকতা অস্বীকার না করে তাঁরা তাঁদের তথ্যপূর্ণ বিবৃতিতে সরকারী অভিযোগ কিছুটা খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছবির প্রাচীরপত্র নিয়েই মুখ্যত অশালীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

এবিষয়ে বি এম পি এ তাঁদের বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, ভারতে তৈরী পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে সেন্সর বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছবির সংখ্যা খুবই কম। বরং বিদেশাগত চিত্রগুলির মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছবির সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৫৭ ও ৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মোট ছবির সংখ্যা যথাক্রমে উভয় বছরেই ২৯৫টি। এর মধ্যে '৫৭ সালে মাত্র ৯টি এবং '৫৮ সালে আরও কম মাত্র ২টি ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বিদেশাগত ছবির মধ্যে '৫৭ সালে মোট ৩১৩খানি ছবির মধ্যে ৮২টি ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছাড়পত্র পায় এবং '৫৮ সালে ২৫৭টির ছবির মধ্যে ৯৮টি ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত থাকে।

বি এম পি এ তাঁদের বিবৃতিতে আরও বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী অনুযায়ী রুচিবিগর্হিত অশোভন ও আপত্তিকর উপাদান সম্বলিত কোন ছবিই সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেতে পারে না। অতএব মুক্তিপ্রাপ্ত কোন ছবির এমন কোন স্থির চিত্র থাকতে পারে না যেটা আপত্তিজনক। কারণ স্থির চিত্রগুলি সংশ্লিষ্ট ছবির অংশ থেকেই নেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছবিতেও এই সকল নিষিদ্ধ উপাদান থাকা সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর জন্যই বিশেষ কোন ছবিকে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সিনেমা রেগুলেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রেক্ষাগৃহের লাইসেন্সে যে সর্ত দেওয়া থাকে, সেই অনুসারে অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত স্থির-চিত্র সিনেমা গৃহে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে আপত্তিকর ও অশালীন স্থির-চিত্র ও প্রাচীরপত্রের প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের সম্ভাবনা কম।

তবুও বি এম পি এ ছায়াছবির প্রচার পরিকল্পনায় কতগুলি বিশেষ নীতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। এই বিশেষ নীতিগুলি হল: (১) ছায়াছবির বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট ছবির রুচি ও নৈতিক আদর্শের মূল ভাব অনুযায়ী হবে; (২) বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে না; (৩) বিজ্ঞাপনে অপরাধ বৃত্তির উত্তেজক কিছু থাকবে না এবং অপরাধ উপাদানের কোন বিস্তৃত বিবরণ থাকবে না; (৪) বিজ্ঞাপনে কোন কুরুচির ইঙ্গিত থাকবে না; (৫) মানুষের পক্ষে অসম্মানজনক ও মানবীয় নীতির অবজ্ঞাজনক কোন কিছু বিজ্ঞাপনে

থেকে পালিয়ে"-র পরিচালক। অনেকগুলি নতুন মুখ এই ছবিতে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরম ভট্টারক ও কৃষ্ণজয়া এই দুটি শিশু-শিল্পীর নাম। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন পদ্মা দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নীতিশ পণ্ডিত, জহর রায়, সীতা মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। সলিল চৌধুরী এই ছবিতে সুর-যোজনা করেছেন।

বেঙ্গল ফিল্ম ব্যুরোর ঐতিহাসিক চিত্র "টিপু সুলতান" এ সপ্তাহের একমাত্র হিন্দী ছবি। জগদীশ গৌতমের পরিচালনায় এতে অভিনয় করেছেন জয়রাজ, অনীতা গুহ, সুরেশ, রামমোহন, কৃষ্ণাকুমারী রূপমালা প্রভৃতি। এস ডি বাতিশ এর সুরকার।

শিশুর চোখে শহর

পত্রানুশৈলিকতার [illegible] চিত্র-ধর্মী ও [illegible] ছবির [illegible] কাটা থেকে এস দি ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল এই সপ্তাহে উপহার দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত তাঁদের চতুর্থ নিবেদন, "বাড়ি থেকে পালিয়ে"।

শিবরাম চক্রবর্তীর একটি শিশু-কাহিনীর এই চিত্ররূপের কিশোর নায়ক কাঞ্চন। [illegible]

[illegible] এসে মিলিত হল মিনির সঙ্গে, মিনির বাবা ও মার সঙ্গে এবং নতুন বন্ধু হরিদাসের সঙ্গে। ইতিমধ্যে মিনির অসুস্থ মার মৃত্যু তার মনে দাগ কাটল গভীরভাবে—তার মনে দাগ কাটল আরও বেশী করে পাষাণ নগরীর নির্মমতা আর সেই সঙ্গে মিনির দূরে চলে যাওয়া। শেষে যখন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে সে জানতে পারল যে, বাড়িতে তার মা মৃত্যুশয্যায় তার

থেকে নাগরিক জীবনের নয়নাভিরাম দৃশ্য-রচনা এবং সর্বাঙ্গীণ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর অংগসজ্জা ছবিটিকে বিশিষ্ট শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে।

কিশোর নায়কের ভূমিকায় শ্রীমান পরম ভট্টাবরের অভিনয়ে শিশুমনের বিভিন্ন ভাব ও কল্পনার অভিব্যক্তি এবং স্বাভাবিক চঞ্চলতা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শিশু-শিল্পীদের মধ্যে মিনির চরিত্রে কৃষ্ণচূড়ার স্বচ্ছন্দ অভিনয় দর্শকমনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। হরিদাসের ভূমিকাটি কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণবন্ত অভিনয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নায়কের মার চরিত্রে পদ্মা দেবীর সংবেদনশীল অভিনয় বিশেষভাবে রেখাপাত করে মনে। নায়কের বাবার চরিত্রের বৃদ্ধ ভ্রাতা জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। অন্যান্য প্রধান পার্শ্বচরিত্রে সীতা মুখোপাধ্যায়, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীমান দীপক, বিজন ভট্টাচার্য ও নীতি পণ্ডিত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সলিল চৌধুরীর সংগীত পরিচালনা এ-ছবির একটি বিশেষ সম্পদ। তাঁর রচিত বিভিন্ন দৃশ্যের ভাবানুগ আবহ-সংগীত প্রশংসার দাবি রাখে। ছবির কটি গানও সুখশ্রাব্য।

আলোকচিত্রে দীনেন গুপ্ত তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর ক্যামেরায় গ্রাম্য-জীবনের প্রাকৃতিক রূপ ও শহরের চলমান জীবন কখনও কাব্যিক, আবার কখনও বা বাস্তবরূপে ধরা দিয়েছে। শব্দগ্রহণের কাজ আশানুরূপ হয় নি। অন্যান্য কলা-কৌশলের কাজ ও আঙ্গিক পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

বাঙলা ছবিতে বোম্বাই অনুপান

মহানগরীর অন্ধ গলির আলো-বাতাসহীন অন্ধকারে জীবন-বিকাশের সুন্দর সহজ পথটি যারা হারিয়ে ফেলেছে, রাজপথের মুক্ত আলোয় তাদের সেই পথ নতুন করে খুঁজে দেওয়ার কাহিনী নিয়েই তৈরী এ্যাকশন ফিল্মস-এর 'গলি থেকে রাজপথ'।

কাহিনীর নায়ক রাজেন। দুষ্কৃতীর দলে ভিড়ে রাজেন জেল খাটার পর বাইরে বেরিয়ে এসে [illegible]। [illegible] ছোঁয়া। রাজেন এক পাপচক্রের সঙ্গে জড়িত। সেখানকার [illegible] নিয়ে সে [illegible] ও [illegible] সঙ্গে তার [illegible]।

বড় রাস্তার [illegible] একটি সে ও তার দলের [illegible] সঙ্গে নিয়ে [illegible]। তাঁর কাছে একটির পর একটা মিথ্যে মামলা নিয়ে হাজির [illegible] নিজেদের [illegible] জাহির করবার চেষ্টা করে। সেই [illegible] কাছে এই দুই চতুর [illegible] প্রথম থেকে ধরা পড়ে। কিন্তু জনদরদী [illegible] চেষ্টা করে চলেন তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে। তাঁর অপত্যস্নেহ [illegible] মায়া পড়ে যায় এদের উপর।

মঞ্চশিল্পী মালা রাজেনদের গলিতে এসেছে নতুন। প্রথম থেকেই রাজেনের প্রতি সে বীতরাগ। কিন্তু সেদিন রাজেন তাকে সিনেমা-জগতের এক দুষ্ট দালালের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হল, সেদিন মালা অপ্রত্যাশিতভাবেই তাকে মন দিয়ে ফেলল। কিন্তু অচিরেই এই অনুরাগ শুকিয়ে যায়, যখন মালা জানতে পারে রাজেনের চৌর্যবৃত্তির কথা। রাজেনও যে তখন থেকেই মালার প্রণয়ের প্রভাবে পড়ে নতুন সুস্থ জীবন গড়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে ব্যাপৃত করে তুলেছিল, সে সংবাদ মালা রাখে নি।

মালার ঘৃণা রাজেনের জীবনে নিয়ে আসে বিরহের অধ্যায়। একদিন বিবেকের অনুশাসনে সে সব কথা খুলে বলে সেই মানব-দরদী ব্যবসায়ীর কাছে। তিনি চান রাজেনের জীবন যেন নষ্ট না হয়। তাই তিনিই অগ্রণী হয়ে মালাকে বলেন রাজেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা, তার মানুষ হওয়ার চেষ্টার কথা। মালা রাজেনকে আবার কাছে টেনে নেয় এবং তারা আদর্শবাদী ব্যবসায়ীর সহৃদয়তায় উঠে আসে সংকীর্ণ গলি থেকে রাজপথের প্রশস্ত আশ্রয়ে।

অন্ধ গলির অধিবাসী ছবির পথভ্রষ্ট নায়কের প্রাণধারণের প্রণালী ও পাপ-দগ্ধ কাহিনীকার-পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী যে উপাদান ও আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে হিন্দী কাটিং-ছবির প্রভাব সুস্পষ্ট—মদ্যপান, জুয়াখেলা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় কিছুই বাদ পড়ে নি, এমন কি নায়ক উত্তমকুমারের মুখে 'রক-এন-রোল' গান এবং হেলেনের ঘাগরা-ঘোরানো নাচ পর্যন্ত।

পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছবির কাহিনীকারও। গল্পটি আটপৌরে ছক-বাঁধা, তবে এর অন্তরের গতি ও সহজ সংলাপ দর্শকের আগ্রহ আকর্ষণ করে রাখে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। নায়ক-নায়িকার প্রণয়োপাখ্যানটিও সহজগ্রাহ্য। [illegible]

[illegible]

[illegible] চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনে রেখা-

পাত করে। অন্যান্য ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, নিভাননী ও একটি লম্পটের চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। পাপ-চক্রে যাঁরা হাসি ও রসের জোগান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জহর রায়, পরিতোষ রায়, নৃপতি দে এবং হেলেন। হেলেনের নাচ বিশেষ একশ্রেণীর দর্শকের কাছে আদরণীয় হবে।

সুধীন দাশগুপ্তের সুরারোপ—গানে ও আবহসংগীতে—বিশেষত্ববর্জিত। আলোক-চিত্রে দীনেন গুপ্ত কয়েক জায়গায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজও বেশ পরিচ্ছন্ন। সুনীতি মিত্রের শিল্প-নির্দেশ ছবিটির আঙ্গিক সৌষ্ঠব বর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

নাট্যাভিনয়

গীতবিতানের "বর্ষামঙ্গল"

"নকল-বাউলে"র একতারায় কবি শুনতে পেয়েছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তর-মিলনের সুর। তিনি জানতে চেয়েছিলেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ অঙ্গন নববর্ষার মুক্ত জলধারায়

ভেসে যেত—অমর্ত্য, অনন্ত জীবনের জোয়ারে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে এমনি অপরূপ, আত্মিক মিলন-উৎসব বিভিন্নরূপে ঘটে চলেছে, ধরিত্রীর সব ঋতু-বৈচিত্র্যে তারই সুর বেজে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গানে ও কাব্যে। "বর্ষামঙ্গল" এই মিলন উৎসবেরই অভিসার, ঋতু আবাহনের পালা।

সুখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "গীত-বিতান" গত রবিবার, মঙ্গলবার ও বুধবার নিউ এম্পায়ারে কবিগুরুর বর্ষা-সংগীতের মাধ্যমে এবং নৃত্য সহযোগে "বর্ষামঙ্গল" নিবেদন করলেন। মোট বাইশটি রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে তৈরী এই সুন্দর গীতি-নৃত্যের অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মন সুর, ভাব ও ছন্দের এক বিরল রসা-স্বাদনে আপ্লুত করে। দরদী কণ্ঠে গাওয়া একক ও সম্মেলক সংগীত এবং সেই সঙ্গে পরিমিত ও ভাবোদ্দীপক নৃত্যচ্ছন্দ ঋতু উৎসবটিকে বিশেষভাবে উপভোগ্য করে তোলে।

"আজি তোমায় আবার চাই শোনাবারে", "মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো" ও "বন্ধু রহো রহো সাথে" একক গান তিনটি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। মঞ্জুশ্রী সরকারের (চাকী) একক নৃত্যাংশ দর্শকদের মুগ্ধ করে। সংগীতে [illegible] গুপ্ত, চন্দ্রা চৌধুরী ও আরতি গুপ্ত এবং আবৃত্তিতে সুনীমা দাশগুপ্ত প্রশংসা অর্জন করেন।

আলোকসম্পাত, আবহসংগীত ও শিল্পী-দের রূপসজ্জা বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গীতবীথির "তাসের দেশ"

"তাসের দেশ" রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য। রূপকচ্ছলে ভারতীয় সমাজজীবনের অচলায়তন অন্ধ সংস্কারকে আঘাত করেছেন কবি। এই নাটিকাটির সাহায্যে কবি আমাদের সংস্কারবদ্ধ মৃতকল্প জীবনে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন।

বিধাতার নিয়মে মানুষ জন্মায় [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ম ভাঙে, কালে কালে [illegible] [illegible] আইনের। নিয়মপন্থীদের [illegible] [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible]—রাজা সাহেব, বিবি, গোলাম, ছক্কা, পঞ্জা, হরতনী, ইস্কাবনী, তারা সবাই নিয়মের [illegible] তাস দেশের ভিত্তিভূমি হলো অন্ড। রাজপুত্রের যৌবনসুরের মন্ত্রণায় একদিন না একদিন [illegible] [illegible] [illegible] তাসের দেশ যে—একটুকু [illegible] [illegible] সেই [illegible] ভেঙে। [illegible] এই [illegible] তাসের দেশ-এ।

গীতবীথির শিল্পীগোষ্ঠীর গত ১২ই জুলাই নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-নাথের এই রূপক নাট্যটির অভিনয় আমাদের আনন্দ দিয়েছে। নাচ, গীত, অভিনয় মনোরম বিচিত্র রঙের বেশভূষা, বিচিত্র স্টেজের সেট—সব মিলিয়ে তাসের দেশকে উপভোগ্যভাবে রূপ দিয়েছেন এই গীতবীথি সম্প্রদায়।

অভিনয়ে তাসরাজ্যের রাজা, রানী, ছক্কা, পঞ্জা, দহলানী, দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের অভিনয় ও গান প্রশংসার দাবী রাখে। হরতনী অভিনয়ে ও গানে দুর্বল মনে হলেও রুইতন বেশ ভালোই। সম্মেলক গানগুলি উপভোগ্য।

পরিচালক সুবিনয় রায় কঠিন এই রূপকনাট্যকে যথাযথ জাঁকজমকসহকারে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছেন।

* * *

বিদেশে ভারতীয় ফিল্মের জনপ্রিয়তা কিভাবে প্রসার লাভ করছে তা বোঝা যাবে সদ্য প্রকাশিত একটি সরকারী বিবৃতি থেকে। তাতে বলা হয়েছে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আনছে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। আজকাল হিন্দী ছবির প্রায় ২৫ শতাংশ আয় বিদেশ থেকে সংগৃহীত হয়। প্রাক-স্বাধীন ভারতে এই রকম আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ থেকে ৫ শতাংশ।

খেলার নামে খেলার বেসাতি, শিক্ষার অভাব, খেলাধূলোর ঢিলেঢালা শাসন ব্যবস্থা আরও কত কি! সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আজ শুধু একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো। সেটি হচ্ছে অত্যধিক খেলার ফলে দেহের আড়ষ্টতা এবং তারই ফলে খেলায় নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের অভাব।

ফুটবল অত্যধিক শ্রমক্লান্ত খেলা। ফুটবল খেলতে যতখানি পরিশ্রম করতে হয় অন্য কোন খেলায় এতখানি পরিশ্রম করতে হয় বলে আমার জানা নেই। হকিতে অধিকতর গতিবেগের প্রয়োজন হয় সত্য। কারণ ছোট বল চলে বিদ্যুৎগতিতে কিন্তু ফুটবলেও কম গতিবেগের প্রয়োজন হয় না। গতিবেগ ত আছেই তা ছাড়া প্রতিবার ফুটবল কিক করতে দেহের যতখানি শক্তি ক্ষয় হয় অন্য কোন খেলায় এত শক্তি ক্ষয় হয় না। এমন যে শ্রমক্লান্ত খেলা ফুটবল রক্ত মাংসে গড়া মানুষের পক্ষে সপ্তাহে ক'দিন খেলা সম্ভব? ইউরোপ অঞ্চলের শীতপ্রধান দেশেও সপ্তাহে একদিন কি দুই দিনের বেশী খেলা হয় না। আর আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান কলকাতা শহরে একজন প্রথম ডিভিসনের খেলোয়াড়কে সপ্তাহে পাঁচ ছয়দিনও ফুটবল খেলতে হয়। শুধু ক্লাবের পক্ষে খেলাই খেলা নয়। অফিসের খেলা আছে, কলেজের খেলা আছে, পাওয়ার লীগের খেলা আছে। আর ফুটবল মরসুমও ত ছোট নয়। দীর্ঘস্থায়ী ফুটবল মরসুম।

লীগের পর ছোট ছোট নক আউটের খেলা আছে, নামডাকের আই এফ এ শীল্ডের খেলা আছে, বাইরের আছে রোভার্স, ডুরাণ্ড, টিস ক্লথ মিল, শাহু, মেমোরিয়াল, শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপ প্রভৃতি ছোট বড় সব নক আউট। তারপর এখানে ওখানে ছোট ছোট খেলার সংখ্যাও কম নয়। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের শরীরের কত সয়? যন্ত্রের অবসাদ আছে আর মানুষের হবে না? মানুষের অবসাদ আছে, ক্লান্তি আছে, মানসিক প্রতিক্রিয়া আছে।

বেশী খেলার কুফল কতখানি সম্প্রতি টেনিস খেলার এক ঘটনা থেকে তা ভাল-ভাবে উপলব্ধি করা গেছে। ফেডারেশন ফ্লাশিং-মেডো এবং নিউপোর্টে আমেরিকার প্রতিনিধি এলেক্স অলমেডো যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এমেচার টেনিস খেলোয়াড় সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন-শিপের আগে ও পরে অলমেডোকে ভারতের খেলোয়াড় কৃষ্ণনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে অলমেডো স্ট্রেট সেটে হেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ শ্রেণীর টেনিস খেলোয়াড় আবে সেসনের কাছে। ফলে অলমেডোকে পদে পদে দর্শকদের বিদ্রূপ ধ্বনি সহ্য করতে হয়েছে। শুধু তাই নয় অলমেডো এত খারাপ খেলেছেন যে ক্লেকোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপের কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়ে ডাবলসের খেলা থেকেও অলমেডোর নাম কেটে দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়, উইম্বলডনের সদ্য চ্যাম্পিয়ন এলেক্স অলমেডো, যার খেলা দেখবার জন্য দর্শকদের এত উৎকণ্ঠা আবার তার খেলা দেখবার জন্যই দর্শকদের এত অনীহার কারণ নাকি অলমেডো ভাল খেলতে পারেননি। দর্শকদের একেবারে নিরাশ করে দিয়েছেন। হয়তো অন্য কারণও আছে। কিন্তু অলমেডো নিজেই স্বীকার করেছেন অত্যধিক শ্রমকাতরতায় তিনি মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। আমেরিকার ডেভিস কাপ টীমের অধিনায়ক মিঃ জোন্সও বলেছেন,—অলমেডো আমেরিকা থেকে ইউরোপ এবং ইউরোপ থেকে আমেরিকা যাতায়াত করেছেন। এই দীর্ঘপথ ভ্রমণের একটা ক্লান্তি আছে। তাছাড়া উইম্বলডনের সাম্প্রতিক সাফল্যের ফলে তাকে যেভাবে সম্বর্ধনা করা হয়েছে তাতে তার মনের উপরও কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। সর্বোপরি দেহের উপর অত্যধিক চাপ পড়েছে। অলমেডোর ভাল খেলতে না পারার এই একমাত্র কারণ। অন্য কারণও হয়তো আছে। কিন্তু অত্যধিক খেলা এবং অত্যধিক পরিশ্রমই যে অলমেডোর ভাল খেলতে না পারার প্রধান কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাই বলছিলাম বেশী খেলার কুফল অনেক। আমাদের দেশের ফুটবল কর্তৃপক্ষরা কথাটা একবার ভেবে দেখবেন কি?

• • •

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রিস্ট, ভারত সফরের শেষে এবং পাকিস্তান সফরের আগে অধিনায়ক গ্রুপ আলেকজাণ্ডার যাকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তিনি সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের ডেলী মেলের প্রতিনিধির কাছে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ হিসাবে এক বিবৃতি দিয়েছেন। গিলক্রিস্টকে দেশে ফেরত পাঠাবার প্রকৃত কারণ এতদিন জানা যায়নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট বোর্ড ও সমর্থকদের নীরব ছিলেন, আর তাছাড়া আলেকজাণ্ডার ত মুখই খোলেননি। সম্প্রতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড গিলক্রিস্টের উপর আর এক দফা শাস্তি দিয়েছেন। এর ফলে আগামী শীতকালে ইংলণ্ড টিম যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করবে তখন গিলক্রিস্ট ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে খেলতে পারবেন না। তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

গিলক্রিস্ট এখন সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে মিডলটন ক্লাবের পেশাদার খেলোয়াড়। তার উপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ডের নতুনভাবে আরোপিত শাস্তির কথা শুনে তিনি বলেছেন—'আমি যেখানে আছি সেখানেই সুখী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলার জন্য আমার লালসা নেই। আমি আগামী ৪ বছরের জন্য ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে 'বেকাপ' ক্লাবে খেলব বলে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোর্ডের নয়া শাস্তি আমাকে মোটেই বিচলিত করতে পারেনি।'

ভারত থেকে গিলক্রিস্টকে ফেরত পাঠাবার কারণ হিসাবে গিলক্রিস্ট ডেলী মেলের প্রতিনিধির কাছে বলেছেন—'আমার সংগে অধিনায়ক আলেকজাণ্ডারের অনেকদিন থেকে মন কষাকষি চলছিল। আমাকে যখন ভারত থেকে দেশে ফেরত পাঠান হয় তখন অবস্থা চরমে পৌঁছয়। দ্বিতীয় টেস্টে আমাকে যখন দল থেকে বাদ দেওয়া হয় তখন থেকেই গোলমালের প্রকৃত সূচনা হয়। আলেকজাণ্ডারের আচরণ [illegible] বলব, [illegible] ছিলেন আমাদের দলের অন্যতম খেলোয়াড়। একদিন আমার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বল [illegible] হাতে লাগে। তিনি [illegible] এমন ভাব দেখান যে আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই খেলোয়াড় আমার দল আমার পাশ নিয়েই [illegible] [illegible] তারপর [illegible] আমার কাছে এসে বলেন, আমার [illegible] কেমন লাগল?' এতে [illegible] আরও বেড়ে যায়। তারপর আমি [illegible] যে বলটি করেছিলাম সেটি [illegible] আমার [illegible] সহায়তায় [illegible]। বলটি তাঁর মাথা ছুঁয়ে চলে যায়। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে আমি বলেছিলাম আমার 'বিমার' আপনার কেমন লাগল? এই সময়ে আমি মাত্র ১২ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ অবস্থাতেই আমাকে

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৬ বর্ষ

(২৭ সংখ্যা হইতে ৩৯ সংখ্যা পর্যন্ত)

টেক-এ এমন কি আছে যা অন্য টুথব্রাশে নেই ?

চোখ বুজে বলা যায়—কেননা একমাত্র 'টেক' টুথব্রাশেই পাবেন—

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

(সি ৪৩১৬)

সূচীপত্র

ব্রীজ
Breeze
Breeze

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পুস্তক পরিচয়—	... ...	৫৯
রঙ্গজগৎ—চন্দ্রশেখর	... ...	৬২
খেলার মাঠে—একলব্য	... ...	৬৯
সাপ্তাহিক সংবাদ—	... ...	৭২

প্রচ্ছদ—শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 1st August 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪০ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৫ শ্রাবণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কেরল সমস্যার আর এক দিক

কেরলে 'গণঅভ্যুত্থানজাত' সমস্যা একটা সংকটের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন আর ইহা সমস্যা নয়, মহাসঙ্কট; এখন আর ইহা কেবল স্থানীয় সমস্যা নয়, সর্বভারতীয় ব্যাপার। ভারত সরকার কিভাবে ইহার সমাধান করিবেন কিম্বা অন্য কিভাবে ইহার সমাধান হইবে জানি না, কিন্তু এই উপলক্ষে কতকগুলি গুরুতর চিন্তনীয় বিষয় দেখা দিতে শুরু করিয়াছে।

বিষয়টি হইতেছে গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীন রাজনৈতিক দলের স্থান আছে কি না অর্থাৎ থাকা উচিত কি না। মৌখিক আনুগত্য ঘোষণা আর যথার্থ আস্থা এক বস্তু নয়। একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে 'দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া' গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। অবশ্য 'অমৃতসর প্রস্তাবের' কথা আমরা ভুলি নাই, যে প্রস্তাবে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রস্তাবকে আন্তরিকতার প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে কিছু বাধা আছে। যেহেতু এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার অল্পদিন ব্যবধানে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদিপাদ 'গৃহ-যুদ্ধনীতির' ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, কেরল মন্ত্রি-সভাকে গদিচ্যুত করিবার 'ষড়যন্ত্র' যদি হয়, তবে 'গৃহযুদ্ধ' বাধিয়া যাইবে। বস্তুত 'দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া' 'অমৃতসর প্রস্তাবের' আগে ও পরে স্ববিরোধী এমন সব কথা বলিয়াছেন যে, পার্টির প্রকৃত মনোভাব অনুমান করা কঠিন হইত — যদি না অন্য প্রমাণ থাকিত। কথার অপেক্ষা যদি আচরণের মূল্য অধিক হয় (স্মরণীয়—তেলেংগানা, কাকদ্বীপ, বড়কমলপুর), তবে বিশ্বাস না করিয়া উপায় থাকে না যে, 'দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া' মুখে যাহাই বলুন, গণতন্ত্রে ও অহিংসায় বিশ্বাসী নহেন। তদুপরি যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের সহিত পার্টি-ছড়ায় তাঁহারা আবদ্ধ, তাহাও গণতন্ত্র ও অহিংসায় বিশ্বাসের পরিপন্থী। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম হিংসা ও শ্রেণীদ্বন্দ্বে বিশ্বাসী — বস্তুত এই দুইটিই তাহাদের অস্তিত্বের মূল শিকড়। আর সেই মহীরুহের শাখারূপী 'দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া'র যে মূলের গুণ বর্তাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে সেই সংগে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম সর্বদাই গণতন্ত্রের (নব গণতন্ত্র বা নিউ ডেমোক্রেসী) প্রতি আস্থা ঘোষণা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহাদের ক্ষমতা লাভের কৌশল মাত্র। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 'গণতান্ত্রিক নীতি' অনুসরণ করিয়াই তাহা গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। আপাতত দুটি উদাহরণ দিতেছি। ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় যে নির্বাচন হয়, লেনিনের বলশেভিক দল তাহাতে ২৬% ভোটের বেশী পায় নাই, কেরেনস্কির দল ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিভাবে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করিয়া বলশেভিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল, তাহা আজ ইতিহাসের কথা। চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারও কম্যুনিস্ট পার্টির 'গণতান্ত্রিক নীতি' অনুসরণের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম বুঝিয়াছে যে, গণতন্ত্রের সার গ্রহণ না করিয়াও তাহার মুখোশটা ব্যবহার করা চলে, আর সেই মুখোশ ব্যবহার করিয়া গণতন্ত্রের বিনাশ সাধন অতি সহজ ব্যাপার।

'দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া' কেরলের ক্ষেত্রে সেই একই খেলা খেলিতেছে আর ভারত সরকার যদি শীঘ্র সক্রিয় হইয়া না ওঠেন, তবে একই পরিণাম ঘটিতে বাধা নাই। কেরলের আপামর জনসাধারণ যখন সরকারী দৌরাত্ম্যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, কেরল সরকার তখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন, আমরা 'গণতন্ত্রকে রক্ষা' করিতেছি। শুধু তাহাই নয়, দুর্গত জনসাধারণই যে গণতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছে, ইহা বলিতেও কেরল সরকারের মুখে বাধিতেছে না। কেরলের জনসাধারণের অবস্থা আজ রক্ত ও অশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে কেরল সরকারের আচরণ ও ঘোষণার বৈষম্যকে প্রহসন বলিয়া উপভোগ করিতে পারিতাম। ঘোষণায় ও আচরণে—গণতন্ত্রের বুলি ও গণতন্ত্রের নাশ—double standardএর দুমুখো অসিচালনায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম তথা দি কম্যুনিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া অত্যন্ত পারদর্শী। এ হেন একটি দল ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে ইহাই গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। সমস্যার গুরুত্ব লঘু করিবার চেষ্টা বৃথা। কিভাবে ইহার সমাধান হইবে জানি না। কিন্তু এই সমস্যার মীমাংসা না হইলে দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত যে বিপন্ন হইবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ যেন না থাকে।

প্রসঙ্গত

খাদ্য-সমস্যা নিয়ে কখনও সরকারের সাফাই গাইনি, না তাঁদের নীতির, না কর্ম-পদ্ধতির। বরং প্রথমটা নড়বড়ে এবং দ্বিতীয়টা দ্বিধাগ্রস্ত বলে মাঝে মাঝে কটাক্ষ করেছি। প্রথম থেকেই একটা অস্থিরতা নিয়ে সরকার অগ্রসর হয়েছিলেন যার পরিণাম কারও পক্ষেই সুখকর হয়নি। না সরকারের, না সাধারণের। মূল্যকে বাঁধতে গিয়েও সরকার বাঁধতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দিয়েও সুফল হয়নি। যে ফেরায় তাকেই যেন ঘটা করে নাটকীয় সুরে সরকার মুক্তি দিলেন। রেশনের ভিত্তিতে সরবরাহ নীতিও সমালোচনা মুক্ত হয়নি।

ক্লেশ এবং আশঙ্কা দুই-ই আছে। আশঙ্কা শুধু সরকারী অসাফল্যের জন্যই নয়। বিরোধী কোন কোন দলের কার্য-কলাপও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা কর্তব্য, অন্যথা আমাদের, রাজনীতির সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ জড়িত নেই, সেই সাধারণের একচক্ষু হরিণের দশা হবে।

একথা খোলাখুলি বিচার করার সময় এসেছে যে, খাদ্য নিয়ে অব্যবস্থিতচিত্ত খাম-খেয়ালী করে সরকার যদি ভুল করে থাকেন এবং সে-কারণে নিন্দনীয় হন, তবে সেই খাদ্য সমস্যাকেই দলীয় সুযোগ এবং প্রতি-পত্তি-বৃদ্ধির কাজে লাগানোর জন্য বিরোধী দলের আগ্রহ এবং আয়োজন অশোভন।

অথচ, লক্ষণ দেখে সন্দেহ থাকে না, বিরোধী দলগুলি যেন এই একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। কঠোর ভাষায় তাঁরা সরকারের যত খুশি সমালোচনা করতে চান করুন না, কিন্তু ঘন ঘন মিছিল, হরতাল আর প্রতিবাদ-দিবস পালন করে কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? কাগজে-কলমে পরি-কল্পনা করলেই খাদ্য ফলে না সন্দেহ নেই, নিত্য-নূতন দপ্তর সৃষ্টি করলেও না (সরকার যা করে থাকেন)।

এবারে প্রশ্ন করা যেতে পারে, হরতাল করলেই কি ফসলের ফলন বাড়ে? বাড়ে না। বিরোধী দলগুলিরও অবশ্যই সেকথা জানা আছে। তবু তাঁরা গঠনমূলক কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করে আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলেন কেন?

এর একমাত্র যে উত্তর মনে আসে, তা হল, হাত-তালির লোভে। কাজ করে এ-বস্তুটি সহজে মেলে না, কিন্তু সমালোচকদের কপালে মেলে। বাম-মার্গীরাও সেই সোজা রাস্তাটা ধরেছেন।

তবু একটা কথা এঁদের স্মরণ রাখতে বলি। সরকার পারেননি, কিন্তু এঁরাও যে পারবেন এমন ভরসা কম। আজ অবধি এঁদের জমার খাতায় কোন বস্তু গড়ে তোলার হিসাব লেখা পড়েনি।

এঁরা বলবেন, দোষ এঁদের নয়। এঁরা সুযোগ পাননি। কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় দোষ-গুণের কথা উঠছে না, অবস্থা কী, তাই বলতে চাইছি।

বৃটেন বা আমেরিকার বিরোধী দলগুলির সঙ্গে এদেশের বিরোধী দলগুলির এখানেই মৌল প্রভেদ। ওদেশে আজ যারা বিরোধী, গতকাল তারাই হয়ত গদীতে ছিল। তখন কর্মনৈপুণ্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় হয়ত দিয়েও থাকবে। অতএব এরা শুধু কী চায় তাই বলে না, কী করতে পারে, সাধারণকে সে-কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের বাগাড়ম্বরের সুযোগ অতএব অল্পই, প্রয়োজনও স্বভাবতই কম।

সেদিক থেকে আমাদের বিরোধী দলগুলি সৌভাগ্যবান। তাঁরা যখন মুখ খোলেন, তখন পুরানো অক্ষমতার নজীর কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় না।

*

কোন-কোন বিরোধী দল যে সর্বদলীয় খাদ্য উপদেষ্টা কমিটির সভা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভিতরে থেকে যদি কোন ফল নেই মনে হয়, তবে বেরিয়ে আসাই ভাল। বিশেষত সরকার যদি বড়-বড় নীতি-নির্ধারণে কমিটির পরামর্শমত না চলেন, তবে শুধু চেয়ার দখল করে থেকে লাভ কী।

সেদিন কম্যুনিস্ট, আর এস পি আর এস ইউ সি—এই তিনটি দলের প্রতিনিধি সভা থেকে বেরিয়ে আসেন। পি এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিরা আসেননি। তার মানে এই নয় যে এঁরা সরকারী খাদ্যনীতির সমর্থক বা অনুরাগী। তবে কম্যুনিস্টরা যতদূর যেতে চান, এঁরা ততদূর অবধি সহযাত্রী হতে বোধহয় রাজী নন। এই ঘটনার ভিতর দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ঐক্যে চিড়-খাওয়ার চিহ্নটা স্পষ্ট হল কিনা, সেকথা এখনই বলা দুষ্কর। বিশেষ করে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হতে যখন বিশেষ বাকী নেই। আর কে না জানে যে, অ্যাডভার্সিটি অর্থাৎ দুর্দিনের মত নির্বাচনের কালেও 'স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ' দেখা যায়, অপরিচিতেরা পরস্পরের সঙ্গী হয়।

*

টলারেন্স আর সহিষ্ণুতা পরম ধর্ম, এ-বিষয়ে সংশয় নেই এবং এ-বস্তুটি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে বলে আমাদের যে-গর্ব তাও অহেতুক নয়। আবহমান কাল ধরে এদেশে বাঘে-গরুতে কেবল প্রবাদে নয়, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও জল খেয়ে আসছে।। বাঘ যে কখনও গরুর ঘাড় মটকাতে চায়নি, তা নয়, তবে শেষ অবধি পোষ মেনে তৃষ্ণা নিবারণেই মন দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের; পরবর্তীকালে খৃষ্টীয় ধর্মমতের।

সহাবস্থিতির এই নমুনা ভাল। কিন্তু সর্বত্র নয়। অর্থাৎ বস্তু নির্গুণ, কেবল পাত্রভেদে সে ভাল বা মন্দ চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। আধুনিক রাজনীতিতে সহাবস্থিতি প্রায় একটা 'ক্রীডের' মর্যাদা পেয়েছে। 'হয় পার্থ, নয় কর্ণ ধরা হতে লইবে বিদায়'—এ-কথা কূটনৈতিক নাট্যের কোন নায়কই অধুনা, স্বগত যদি-বা বলেন, প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন না—না ক্রুশ্চেভ, না আইসেনহাওয়ার।

আবার সহ-অবস্থিতির যে নমুনা জাতি-ভেদে দেখি, তা কদাচ সমর্থনযোগ্য নয়। আমাদের সব শহরে বস্তির পাশা-পাশি প্রাসাদের সহাবস্থিতি অস্বস্তিকরও নয়। যদিও ব্যাপারটি সনাতন।

শুনেছি, এতদিনে এই সনাতন ব্যবস্থার মূলে কুঠার পড়বে। বস্তি উৎসাদনের যে-পরিকল্পনা সরকার করেছেন, কার্যে পরিণত হলে আমাদের নাগরিক জীবনের কলঙ্ক-চিহ্নগুলির বিলোপ ঘটবে।

প্রশ্ন যেন হতে চায় না। বস্তি থাকবে না? অর্থাৎ থাকবে না সেই মাথা-ছোঁয় খাপরার চাল, ভয়ে ভয় যার জড়োসড়ো হয়ে এ ওর গায়ে ভর দিয়ে থাকে? কী গতি তবে হবে নিরাশ্রয় মাছির আর উদ্বাস্তু মশা, পোকামাকড়ের? কালি, ধোঁয়া, ধুলো আর কাদা ইত্যাদি মিলিয়ে বস্তিতে যে পঞ্চভূত বিরাজমান, তারা কোন্ চুলোয় মিলিয়ে যাবে?

বস্তিকে আমরা ভালবাসিনি। বস্তি আমাদের লজ্জার। তবু যদি তার চিরতরে অবলোপ ঘটে, তবে তার কোনো চিহ্ন কি আমরা ধরে রাখব না, যাদুঘরে প্রাগৈতিহাসিক নানা প্রাণীর যেমন রেখেছি? অবাঞ্ছিতের বিদায়ের ক্ষণেও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। হয়ত সেইটাই কোনও মানী আত্মজের ঘরে কেউ সযত্নে এবং মমতায় তুলে রাখবেন খাপরার একটি টুকরো, বাঁশের খুঁটি আর নমুনা হিসাবে খানিকটা নর্দমার জল। কিন্তু ধোঁয়া আর অন্ধকার? তারও কি কিছুটা পাত্রে, কাঁচের বাক্সে রাখা সম্ভব হবে? ঐটুকু নইলে যে সম্পূর্ণই হবে না।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৬

বেলগাছিয়ার তিনতলা ফ্লাট বাড়িটার সামনে ফের এসে যখন দাঁড়াল অসীম রাত দশটা বেজে গেছে। শহরতলী জনবিরল। পরিশ্রান্ত একদল যাত্রীকে নিয়ে একটি দোতলা বাস গন্তব্যে পৌঁছবার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিল। রিক্সা-স্ট্যাণ্ডে একটি রিক্সা-ওয়ালা নিজের গাড়িতে উঠে বসে বিড়ি টানছে। সে আর এখন সারথি নয় রথী। তিনতলা বাড়িটায় কতগুলি ফ্লাট কে জানে। রাস্তার দিকের কয়েকটি ঘরের জানলা খোলা। ভিতরের আলো দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি ঘরের জানলা বন্ধ। ওদের কিছুই দেখা গেল না, জানা গেল না। প্রায় পুরো একটা দিন এই বাড়িতে কেটে গেল অসীমের। কিন্তু নিচেরতলার একটি পরিবারের কয়েকটি মানুষ ছাড়া আর কারো সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হল না। শুধু একটি দিন কেন এক জীবন পাশাপাশি কাটালেও একজন তার পাশের ঘরের আর একজনকে না-ও চিনতে পারে। এমন কি চিনবার জন্যে কোন আগ্রহ পর্যন্ত হয় না। পৃথিবী বিপুলা। কিন্তু তোমাকে ধরবার জন্যে তোমার ধারণার জন্যে অল্প একটু জায়গাই যথেষ্ট। আশেপাশের কয়েকটা বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই। সব বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু বাদে এই তেতলা বাড়িটারও ওই দশা হবে। একতাল কাদার মত ঘুমন্ত মানুষগুলিকে নিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে। সেও কি ঝিমোবে, ঘুমোবে, স্বপ্ন দেখবে? প্রাণীর মত বস্তুরও কি স্বপ্ন আছে? আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা আছে? •

দোরের সামনে এসে আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল অসীম। এ-বাড়ির দোতলা তেতলার ফ্লাটগুলির আর যারাই ঘুমিয়ে পড়ুক, এই সাত নম্বর ফ্লাটের বাসিন্দারা কেউ ঘুমোয়নি। ভিতর থেকে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। মনোমোহন কাকে যেন বকাবকি করছেন। 'এই তোর বাড়ি ফেরার সময় হল? দিন নেই রাত নেই কেবল আড্ডা, কেবল আড্ডা।'

আর একবার কড়া নাড়তেই মানসী এসে দরজা খুলে দিল।

অসীম ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে বকছেন মেসোমশাই? আমাকে নাকি?'

মানসী মঞ্জু মায়া একসঙ্গে হেসে উঠল। সুহাসিনীও একটু হেসে বললেন, 'আমার অসীমের কথা শোন।'

মনোমোহন সপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'না বাবা, তোমাকে কেন হবে? বলছিলাম নন্দুটাকে। এতক্ষণ পরে শ্রীমান ঘরে ফিরলেন। এই রাত দশটায় ভেবে দেখ একবার। সেই যে তোমাদের পৌঁছে দিয়ে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে ছেলে বেরিয়েছে, আর সারাদিনের মধ্যে তার দেখা নেই। ঠিক একেবারে দাদার পথের পথিক হচ্ছে। দাদা তো 'লভ ম্যারেজ' করে প্রেমিক সাজাহান হয়েছেন, এখন ছোট ভাইটিও ওইরকম কিছু একটা ঘটিয়ে বসলেই হল। বাড়িটা তাহলে সত্যিই একখানা গুপ্ত বৃন্দাবন হতে পারে।'

অসীম লক্ষ্য করল মানসী মুখ নিচু করেছে। সে নিজেও কিসের একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মনোমোহনের লক্ষ্য কি তাহলে শুধু নন্দু নয়? আরো কেউ কেউ? তিনি কি কৌশলে ঝিকে মেরে বউকে শেখাচ্ছেন? ছেলেকে গাল দিয়ে ছেলের বন্ধুকে?

সুহাসিনী স্বামীকে বাধা দিলেন, 'আঃ, কী যা তা বলছ। নন্দু দেরি করে ফিরেছে তাকে সেজন্যে বকতে হয় বকো। আবার আর পাঁচটা বাজে কথা কেন।'

মানসীও বাপের কথার প্রতিবাদ করল, 'সত্যি, ওসব কিসে আসে। নন্দু যে পরীক্ষার নম্বর নম্বর করে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে আমরা সবাই জানি।'

মনোমোহন বললেন, 'থাম থাম। তোরা একজনের দোষ আর একজনে ঢাকতে ওস্তাদ। এই করে করেই তো তোরা সব নষ্ট করলি। তোর সবাই ভালো। তুই ভালো, তোর দাদা ভালো, ছোট ভাই ভালো, দিদিরা ভালো, মন্দ শুধু আমার এই কপাল।'

নিজের কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন মনোমোহন। তারপর আলনায় ঝোলানো আধময়লা পাঞ্জাবির ঝুল পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অন্য সুরে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার অসীমকে খেতে-টেতে দেবে না কি?'

সুহাসিনী বললেন, 'তুমি থামলেই দিতে পারি। সেই থেকে যে ঝড় বইয়ে চলেছ।'

মনোমোহন নিজেও বোধ হয় এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবার বাইরে গিয়ে বিড়ি ধরালেন।

অসীম একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'নতুন আসামী কোথায়? তাকে দেখছিনে যে?'

মানসী বলল, 'সে ও ঘরে পালিয়ে রয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে। কেউ যখন বকাবকি করে একেবারে ঘরের দেয়াল হয়ে থাকে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। তখন মনে হয় তার মত শান্ত ছেলে আর দুটি নেই। কিন্তু আসামী শুধু আজ একজন নয়, দুজন।'

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'দ্বিতীয় জন কে?'

মানসী হাসল, 'কে আবার? মেজদি। সে হল আসামিনী। সেও আজ বাবাকে চটিয়ে দিয়েছে। তার ওপর দিয়েও বর্ষণ এতক্ষণ কম হয়নি।'

অসীম বলল, 'ও তাকে তো সন্ধ্যাবেলা সব দেখতে এসেছিল। কী হল?'

সুহাসিনী জবাব দিলেন, 'নতুন আবার কি হবে। পরে সব শুনবে অসীম। চল এবার তোমাদের খেতে দিই।'

সুহাসিনী এ-বেলাও দু-তিনটি নতুন তরকারি রেঁধেছেন। অবশ্য বেশিরভাগই নিরামিষ। আমিষ ছাড়া অন্য খাবার অসীম পছন্দ করে না। কিন্তু রান্নার গুণে তার রুচি বদলেছে। পাঁচপাড়ার সেই শিবির-জীবনে এসব তো আর জোটে না। কোন রকমে কিছু সিদ্ধ করে নেয়। তার সেই আদিবাসী পাচক সব রান্না অনার্যদের মতই রাঁধতে চায়। নিজের খেয়ালখুশি মত চলে। বেশি কিছু বললে কাজ ছেড়ে চলে যায়। আবার তাকে সেধে ডেকে আনতে হয়।

এবেলাও কিছুতেই মাধুরী মানসী পংক্তি ভোজনে বসল না। তারা পরিবেশিকা হয়েই রইল। মাধুরী নামে মাত্র পরিবেশিকা। খাবার ঘরে সে প্রায় এলই না। দু-একবার যদিবা তার মুখ দেখা গেল তা বিষাদগম্ভীর।

নন্দুও মুখ ভার করে নিঃশব্দে খেয়ে যেতে লাগল। দুপুরবেলার সেই হাসি কৌতুক আর আনন্দের উৎস যেন এখন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

অথচ এই কয়েকঘণ্টার মধ্যে এই পরিবারে এমন তো কিছু ঘটেনি। নন্দু বাড়িতে দেরি করে ফিরেছে আর সন্ধ্যাবেলায় মাধুরীকে একদল লোক এসে দেখে গেছে। এ পরিবারে নিশ্চয়ই এ ঘটনা এমন কিছু নতুন নয়। তবু সামান্য কারণে মানুষের মন এমন বদলে যায়, তার চালচলন এমন রূপান্তরিত হয় যে তাকে একেবারে অন্য মানুষ বলে মনে হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি পারিবারিক আবহাওয়াও দিনের সব প্রহরে একরকম নেই। সম্পর্কের এক আধটু অদল-বদলের সঙ্গে সঙ্গে তারও রঙের বদল হচ্ছে, রূপের বদল হচ্ছে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। যারা সেই পরিবারে বাস করে তারা হয়তো এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন তেমনভাবে বুঝতে পারে না। কিন্তু বাইরের কোন লোক এলে সে নিশ্চয়ই অনুভব করে। বুঝতে পারে পর পর ঔদার্য আর সংকীর্ণতার পটপরিবর্তন।

এঁদের নীরবতা আর গাম্ভীর্য দেখে অসীমের মনে হল সে দিনের বেলা বিদায় নিলেই ভালো করত। রাত্রির আতিথ্য নেওয়া তার ঠিক হয়নি। এঁরা ভদ্রতা করে সৌজন্য দেখিয়েছেন। কিন্তু সে এখানে রাত্রেও থাকে তা হয়তো মনোমোহনবাবুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না।

অসীম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিল, মনোমোহনই প্রথম কথা বললেন, 'তুমি বুঝি বরানগরে গিয়েছিলে?'

অসীম বলল, 'হ্যাঁ'।

'দেখা হল? বাড়িতে ছিল?'

'হ্যাঁ। শংকর এখন আর একটু হলেই বেরিয়ে পড়ত। পড়াতে যাচ্ছিল।'

মনোমোহন বললেন, 'দিনরাতই তো পড়ায়। শুনি দু-হাতে টাকা আনে, চার হাতে খরচ করে। কিন্তু তাতে আমার কি। এই বুড়ো বয়সে সংসার চালাবার জন্যে আমাকে টিউশনি করতে হয়। কিন্তু আমার তো আর অত বিদ্যা নেই। উঁচু ক্লাসের টিউশনি আমার জুটবে কেন। তাছাড়া আজকাল কতরকম সব কোর্স হয়েছে পড়িয়ে সামালও পাইনে। এসব পড়াতে গেলে ছেলেদের মাথা খারাপ হয়, আর আমাদের মত বুড়োদের মাথাও ঠিক থাকে না।'

অসীম এবার একটু হেসে বলল, 'মেসোমশাইর কি পড়ানো টড়ানো অভ্যাস আছে?'

মনোমোহন বললেন, 'ছিল না। পেটের দায়ে অভ্যাস করে নিতে হয়েছে। আগে ছিলাম মফস্বলের পোস্টমাস্টার। মেজাজ যখন খারাপ থাকত পোস্টকার্ড এনভেলপের ওপর জোরে জোরে সীল মারতাম। রিটায়ার করে হয়েছি পড়ার মাস্টার। অংক ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সব পড়াই। কিন্তু ধরো ছেলেমেয়েগুলির কাণ্ড দেখে সেই পোস্টমাস্টারের হাত নিসপিস করে। ইচ্ছা করে পিঠের ওপর বিরাশিক্কা ওজনের একেকটা কিল বসিয়ে দিই।'

এবার মেয়েরা হেসে উঠল।

সুহাসিনী চাপা দিতে গিয়ে বললেন, 'খবরদার অমন কাজও কোরো না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো জানো না। তাদের গায়ে হাত দিতে গেলে তারা তোমাকে আস্ত রাখবে না।'

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেলে মাধুরী হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, 'অসীমদা, সারাদিন আজ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। চলুন, একটু ছাদের ওপর থেকে ঘুরে আসি।'

অসীম খুশি হয়ে বলল, 'বল কি এত রাতে ছাদ! তাছাড়া এ-বাড়ির ছাদ আছে নাকি?'

মাধুরী বলল, 'ছাদ আছে। কিন্তু আমাদের একতলার বাসিন্দাদের তা বেশি ভোগদখলে আসে না। সবদিন মনেও থাকে

না ছাদের কথা। ভিজে কাপড়চোপড় আমরা নিচেই মেলে দিই। কিন্তু একেকদিন ওপরে উঠতে বড় ইচ্ছা করে।'

অসীম বলল, 'সে তো স্বাভাবিক।'

মাধুরী একা গেল না। মানসীকে ডেকে বলল, 'চল যাই ছাদ থেকে ঘুরে আসি।'

মনটা যেন তেমন খুশি হল না। মুখ ভার করে বলল, 'তোমরা যাও।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আরে আমরা তো যাবই। তুইও চল। এত রাতে দলে ভারি না হলে কি আর ছাদে যাওয়া চলে?'

এই রাতে মেয়েদের ছাদে যাওয়ার প্রস্তাবটা মনোমোহনও প্রসন্ন মনে নিলেন না।

তিনি আপত্তি করে বললেন, 'কেন আবার ছাদ ছাদ করছিস। রাত প্রায় দুপুর। যা এখন সব শুয়ে পড়গিয়ে। কাল তো আবার অফিস আছে, স্কুল আছে।'

মাধুরী বলল, 'সেজন্যে ভাবতে হবে না বাবা। কাল তো আর স্কুল কামাই করবার [illegible] কারণ থাকবে না। ছাদটা অসীমদাকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি। আমরা যাব আর আসব।'

[illegible] বললেন, 'বেশ চটপট যাও। তুমিই বা অত বাধা দিচ্ছ কেন। রাত ভরে তো গরমে ছটফট করে। দু মিনিট যদি একটু খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে চায়, তোমারই বা আপত্তির কি আছে।'

অসীম বলল, [illegible] মাধুরী। [illegible] মনোমোহন [illegible] বললেন, [illegible] অসীম। যাও যাও [illegible] আমি এমনই বলছিলাম। এগারোটা [illegible] কিন্তু তোমরা [illegible] তোমাদের কাছে এগারোটা [illegible] তোমাদের বয়সে [illegible] না [illegible]। [illegible] থেকে [illegible] দিয়েছি না। তাই [illegible] — যাও যাও, ঘুরে এসো।'

মনোমোহন এমন অস্বস্তি দেখাতে লাগলেন যেন ওই মেয়েদের নিয়ে অসীম ছাদে বেড়াতে না গেলেই তিনি বড় অসন্তুষ্ট হবেন।

অসীম অগত্যা ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

তিনতলায় বাড়িওয়ালার এক আত্মীয় থাকেন। তিনিই এ বাড়ির কেয়ারটেকার। তাঁর কাছে ছাদের চাবি। সে চাবি যখন তখন [illegible] তাঁর হাতে তিনি দেন না। এ ব্যাপারে [illegible] পক্ষপাত আছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে অসীম বলল, 'তোমরা বুঝি রোজই [illegible] না?'

মানসী হাসল, 'আমার চেয়ে দিদির ওপরেই ব্রজবাবুর টানটা বেশি। [illegible] ভদ্রলোক, [illegible] বিপত্নীক। দিদিকে [illegible]-ভাবে গোটা ছাদ আর ছাদের লাগা ঘরখানার মালিকানা দেবার বাসনা।'

অসীম হেসে বলল, 'ভালোই তো।'

মাধুরী ধমক দিয়ে বলল, 'কি যে সব সময় ফাজলেমি করিস। ব্রজবাবু বেশ ভদ্রলোক। এসিডিটির রোগী। কঙ্কালসার চেহারা। কারো সাতে পাঁচে থাকেন না। মানসী তাঁকে নিয়েও—।'

মানসী হেসে বলল, 'যাঁরা সাতে নেই পাঁচে নেই তাঁরাই তো নাচেন বেশি।'

মাধুরী ওদের দুজনকে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রজবাবুর কাছ থেকে ছাদের চাবিটা চেয়ে আনল।

একটু বাদেই সংকীর্ণ সিঁড়ি আর ছোট দরজা পার হয়ে অসীম প্রশস্ত ছাদে বিরাট আকাশের নিচে মুক্তি পেল।

মাথার ওপরে যে তারায়ভরা এমন এক বিচিত্র বিস্ময়কর বিপুল রহস্যের আধার রয়েছে তা সব সময় মনে থাকে না, চোখেও পড়ে না। অসীম ভাবল, শুধু কি আকাশ? আকাশ তো অনেক দূরে। অনেক উঁচুতে। কিন্তু যে মাটির ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটে সেই মাটির স্পর্শও কি সব সময় পায়? তার মমতা কোমলতা মাধুর্যের স্বাদ সমস্ত সত্তায় মেখে নিতে পারে? পারে না মানুষ নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত, আরো পাঁচটা স্থূল প্রয়োজনের চিন্তায় চেষ্টায় এত অস্থির যে প্রকৃতির দিকে তাকাবার তার অবসর নেই। শুধু কি প্রকৃতির সম্পদ? স্নেহ ভালোবাসা বন্ধুত্ব? সেই হৃদয়ের সম্পদও সর্বক্ষণের নয়, কোন কোন ক্ষণের, দুর্লভ মাহেন্দ্রক্ষণগুলির জন্যে। শুধু সেই ক্ষণগুলিতেই মানুষ মহৎ সে দাতা, গ্রহীতা।

আলিসার ধারে মানসী অসীমের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর আবছায়ায় মূর্তিটি এই বিরাট আকাশের নিচে শুধু যেন এক অস্তিত্বের ইশারা।

মানসী আস্তে আস্তে বলল, 'ছাদের কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। কিন্তু বলতে ভরসা পাইনি। পাছে বাবা হৈচৈ করেন। দেখলে না এতেই কি রকম আপত্তি করতে লাগলেন। তবু দিদির কথা বাবা শেষ পর্যন্ত ফেলতে পারেন না। দিদি অমনিতে খুব শান্ত, ঠান্ডা। কিন্তু ভিতরে, ভিতরে খুব জেদী মেয়ে। বাবা সেই জেদকে ভয় করেন।'

অসীম বলল, 'তাই নাকি?'

মানসী বলল, 'হ্যাঁ। এই আজই যে কান্ডটা করল। দিদি গোড়া থেকেই নিষেধ করেছিল। তাকে যেন কেউ দেখতে না আসে। দিদি আর ওসব পছন্দ করে না। দলে দলে লোক আসবে আর তাকে অপছন্দ করে চলে যাবে ওর বয়সী মেয়ের পক্ষে তা সহ্য করা শক্ত। বাবা নিজেও তা বেশ বোঝেন। কয়েকমাস চুপচাপ থাকেন। কিন্তু হঠাৎ একেক সময় কি যেন হয়। বাপ হিসাবে নিজের দায়িত্বের কথা মনে পড়ে। দিন নেই রাত নেই ছেলের খোঁজ করেন, আমাদের না বলে মেজদির ঠিকুজী কোষ্ঠী পকেটে নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যান। আলাপ-আলোচনা দেখা সাক্ষাতের পালা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না।'

অসীম বলল, 'সত্যি ব্যাপারটা বড়ই—।'

মানসী বলল, 'আজও তাই হল। গোড়া থেকেই মেজদির মেজাজ ঠিক ছিল না। যাওয়ার সময়েই তো তুমি তা দেখে গিয়েছিলে। তুমি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি করে জন পাঁচেক এসে হাজির। ছেলের দাদা বউদি, দিদি, ভগ্নীপতি, আবার একজন বন্ধুকেও জুটিয়ে এনেছেন। মানে ওঁদের পক্ষে একটা একসকারশন, আউটিং-এর মত। মা অবশ্য গোড়া থেকেই তৈরি ছিলেন। জল খাবার টাবার করে রেখেছিলেন। তবু দোকান থেকে আরও কিছু মিষ্টি আনাতে হল। তাঁরা ধীরে সুস্থে চা টা খেলেন। তারপর অনুমতি দিয়ে বললেন, 'তাহলে নিয়ে আসুন।'

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'মাধুরী কি আসে নি?'

মানসী বলতে লাগল, 'এসেছিল। তবে অন্য দিন বিকেলে যেটুকু টয়লেট করে, আজ তাও করেনি। হাতে ছগাছা চুড়ি জোর করে পরিয়ে দিয়েছিলাম। আর ধমকে টমকে মা চুলটা বেঁধে দিয়েছিলেন। সবচেয়ে সস্তা একখানা তাঁতের শাড়ি দিদি নিজেই বেছে নিল। কিছুতেই তাকে অন্য শাড়ি পরাতে পারলাম না। দিদি বললে, আমি অত সাজতে পারব না। মা ধমক দিয়ে বললেন, কখনো কি সাজিসনে? দিদি জবাব দিলে নিজের ইচ্ছায় নয়। ভারি জেদী মেয়ে। কিন্তু যাঁরা দেখতে এসেছেন তাঁরা তো আর কারো জেদ দেখতে আসেননি। তাঁরা কুমারী মেয়ের রূপ লাবণ্য লালিত্য নম্রতা দেখতে এসেছেন। তাঁদের চোখ দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম তাঁরা খুশি হননি। বেশ তো খুশি হননি, উঠে চলে যান। তা নয় শক্ত শক্ত সব প্রশ্ন। সবজান্তা সেই বন্ধুটিই মুখপাত্র। দিদি মাস্টারী করে শুনে বেছে বেছে সেই মাস্টারী সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দিদি সাহিত্য কিভাবে পড়ায় ইতিহাস কিভাবে পড়ায়, ইতিহাসেও সাহিত্যের আমেজ আনতে পারে কিনা, নাকি শুধু নাম ধাম সন তারিখ মুখস্থ করায়,—আগের দিনের পড়া পরদিন এসে ক্লাসে রিকাপিচুলেট করে না কি হঠাৎ শুরু করে দেয় এই সব।'

অসীম বলল, 'ভদ্রলোক নিজে কি করেন?'

মানসী বলল, 'তা জানিনে। ছেলে শুনেছি ওভারসিয়ার। ছেলের বন্ধুর খোঁজ নিইনি। ফেরায় ফেরায় দিদি মনে মনে বিরক্ত হয়ে মুখে একটু হাসি টেনে বলল, ওসব কথা তো বি টি পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে এসেছি। আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকলে তাই করুন। ভদ্রলোক অমনিই তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, না আমার আর কিছু জানবার নেই। মেয়েরা তবু গান শুনতে চাইলেন। দিদি বললেন, আমি গান জানি না। মা বললেন আহা মাঝে মাঝে গেয়েও তো থাকিস। যে নতুন মহিলা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন জানেন দিদি, একা একা একেক সময় বেশ গায়। গলাটাও ভাল, কিন্তু বড় মেজাজী। একটা গান শুনিয়ে দাও না মাধুরী, ওঁরা যখন অত করে বলছেন। কিন্তু দিদির মন-মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে রয়েছে। কিছুতেই গলা খুলল না। ওকে হারমনিয়মের সামনে বসানোই গেল না।'

অসীম বলল, 'তারপর?'

মানসী বলল, 'তারপর আর কি। ও'রা বিদায় নিলেন। বললেন, পরে খবর

দেনেন। কিন্তু তাঁদের মুখ দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি খবর দেওয়ার আর কিছু নেই।' তারপর ওঁরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা খুব চেঁচামেচি শুরু করলেন। তাঁকে এমন অপমান করবার কী মানে হয়। দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা যদি দিদির নাই ছিল তাহলে তো স্পষ্ট করে বলে দিলেই হ'ত। ওঁদের এন্টারটেইন করতে মিছামিছি কতকগুলি টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট। ওঁদের অপমান করা মানে বাবাকেই অপমান করা। কারণ বাবাই ওঁদের ডেকে এনেছেন। মা দিদির পক্ষ নিয়ে বললেন কেউ তাঁদের অপমান করে নি, তুমি মিছামিছি ওকে দুষছ। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। তুমি আসবার একটু আগে তা থেমেছে।'

অসীম হঠাৎ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'বা রে, মাধুরী কোথায় গেল। ও তো ওইদিকে এগোচ্ছিল।'

মানসী বলল, 'তাহলে বোধ হয় নেমে গেছে। না হয় কুঞ্জবাবুকে কথায়বার্তায় আটকে রেখেছে। আমাদের সুযোগ দেওয়ার জন্যেই ওর এত কাণ্ড। কিন্তু ও বোধ হয় জানে না আমরা শুধু ওর কথা নিয়েই আলোচনা করছি। ওর সামনে বলতে পারতাম না, এমন একটা কথাও বলিনি। ওর সরিয়ে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না।'

অসীম বলল, 'তাইতো দেখছি। এসে অবধি তুমি তোমার দিদির কথাই বলছ। আর কোন কথা বলবার কি তোমার গরজ তোমার নেই।'

মানসী বলল, 'আছে কি না আছে কী করে জানাব। আমিও তো দেখছি আমার চেয়ে দিদির কথা জানতেই তোমার আগ্রহ বেশি। সব আমার দিকেই [illegible] তোমার আর কোন মন নেই। সেই তো স্বাভাবিক। আমার চেয়ে দিদির অনেক [illegible], ও দেখতেও ভালো। [illegible]'

অসীম বলল, '[illegible]?'

মানসী একটু হাসল, 'তাছাড়া ও [illegible] হয় অনেক বেশি womanly woman. তোমরা তো তাই চাও।'

অসীম একটু অবাক হয়ে বলল, 'মানসী, কথাগুলি যেন হিংসের মত শোনাচ্ছে।'

মানসী হেসে বলল, 'তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। দিদির অনেক গুণকে আমি হিংসে করি সত্য কিন্তু ওকে হিংসে করব কেন? ওকে আমি ভালবাসি সবচেয়ে ভালবাসি। ও যেন আমার সেকেন্ড সেল্ফ, আমি ছাড়া ওর বন্ধু নেই, আর ও ছাড়া আমার শুধু আর একজন আছে। আমি ওকে ভালবাসি। সমস্ত দুঃখ থেকে আমার স্নেহ দিয়ে ওকে আমি আগলে রাখতে চাই। সব সময় হয়তো পারি না, কেউই তা পারে না। দুঃখ মানুষকে পেতেই হয়। অন্যের দেওয়া দুঃখ, নিজের দেওয়া দুঃখ। সব দুঃখ থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে? বাঁচানো বোধ হয় উচিতও নয়। কিন্তু একেক সময় মনে হয় আমি যেন ওর জন্যে সব দিতে পারি। সব স্বার্থ, সব সুখ—।'

অসীম একটু চমকে উঠে বলল, 'মানসী এসব কথা তুমি আজ কী বলছ, এসব আজ তোমার মনেই বা কেন এল। আমি তো তোমার স্বার্থত্যাগের কথা শুনতে আসিনি। বরং আমি চাই নিজের স্বার্থকে তুমি ভালো করে প্রতিষ্ঠিত কর, তাতে আমারও স্বার্থ।'

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল। মাধুরী নয়, মনোমোহন উঠে এসেছেন। তিনি আরো এগিয়ে এলেন। মুহূর্তের জন্যে সেই আবছা অন্ধকারে তার চোখ দুটি যেন জ্বলতে লাগল। কিন্তু একটু বাদে তিনি বেশ শান্ত বাৎসল্যভরা মধুর স্বরে বললেন, 'মানু, তুমি এবার নিচে যাও। কোথায় কার বিছানা হবে তা নিয়ে তোমার মা আর দিদি

এখনো হিমসিম খাচ্ছে। যাও, তাদের সাহায্য কর গিয়ে। তাছাড়া রাতও তো কম হয় নি।'

মানসীর স্থির শক্ত মুখ দেখে অসীমের মনে হল সে যেন কিছু বলবে। রূঢ় তীব্র-ভাষায় তার বাবার আচরণের প্রতিবাদ করবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। মানসী তার বাবাকে কোন কথা না বলে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নামবার আগে পিছন ফিরে শুধু একবার বলে গেল, অসীমদা চলে এসো।'

কিন্তু মনোমোহন ততক্ষণে অসীমের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখেছেন, 'আচ্ছা, দু-মিনিট বাদেই না হয় যেয়ো অসীম। ওদের বিছানা-টিছানার হাংগামা মিটুক, তারপরে আমরা নামব।'

অসীম বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

বলেই তার মনে হল কথাটা বড় বোকার মত বলা হয়ে গেল। কিন্তু ছুঁড়ে দেওয়া তীরের মত কথাকেও তো আর ফিরানো যায় না।

মনোমোহন পূর্ণ সুযোগ নিলেন, হেসে বললেন, 'তাই ভেবেছিলে বুঝি? কিন্তু বাবা বুড়ো মানুষের চোখে কি আর অত সহজে ঘুম আসে? নানা চিন্তায়-দুশ্চিন্তায় ঘুমের আর লেশমাত্রও থাকে না। দারুণ ইনসোমনিয়ায় ভুগছি। দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার বেশি কিছুতেই ঘুম হয় না। ঘুম তোমাদের বয়সী ছেলেদের জন্যে। ঘুমও তোমাদের, স্বপ্নও তোমাদের। আমাদের ভাগে এখন অনিদ্রা, তন্দ্রা আর দুঃস্বপ্ন। আর সেই মহানিদ্রার প্রতীক্ষা।'

অসীম একটু বিরক্ত আর বিরস মুখে বলল, 'চলুন এবার নিচে যাই।'

মনোমোহন বললেন, 'হ্যাঁ চল। দেখ, নিচে যেতে আর ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে হাঁফ ধরে যায়। একেক সময় ভাবি ছাদেই ঘুমোই। গরমের সময় এত বড় ছাদে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোতে যে কি আরাম, তা কি আর বুঝিনে? ইনসোমনিয়ার রোগীরও তাতে লাভ আছে? ঘুম যদি না আসে আকাশের দিকে চেয়ে তারা গুণে গুণেই রাত ভোর করে দেওয়া যায়। কিন্তু কেয়ারটেকারের ভারি আপত্তি। সবাই তাহলে চাইবে। সবাই মাথায় উঠে বসবে।' একটু থেমে বললেন, 'আর হ্যাঁ, আমি তোমাদের ডাকতে এসেছি বলে তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

অসীম গম্ভীরভাবে বলল, 'মনে করবার আর কি আছে।'

মনোমোহন বললেন, 'সত্যিই কিছু নেই। আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, যে জানাশোনা তাতে তুমিও কিছু মনে করতে পার না, আমিও কিছু মনে করতে পারি না। আমি আমার মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। ওরা নিজেরা স্বাধীনভাবে ঘোরে-ফেরে, যে কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে পারে বন্ধুত্ব করতে পারে, কোন বাধা নেই। সেকেলে মতে সেকেলে পথেই যদি চলতাম তাহলে ওরা প্রত্যেকে এতদিন দু-তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর করত। কিন্তু আমি ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করিনি।'

অসীম কোন মন্তব্য করে কিনা মনোমোহন একটু থেমে দেখে নিলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'কিন্তু সংসারে সবাই তো আর অসীম দাশগুপ্তও নয়, মনোমোহন মুখুয্যেও নয়। পাঁচজনের মন এখানে পাঁচ রকম। এই একখানা বাড়ির মধ্যেই যে কত রকমের কত স্তরের মানুষ আছে, তা তুমি ভাবতে পার না। কিন্তু এতগুলি আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ের বাপকে অনেক ভেবে অনেক দিকে চোখ রেখে চলতে হয়।'

'বাবা!'

মানসী নয়, মাধুরী এসে দাঁড়িয়েছে। যে মাধুরী শুধু ছাদটা দেখিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল, বোন আর তার বন্ধুকে নিভৃত আলাপের ব্যবস্থা করে যে আর অপেক্ষা করেনি, সেই আবার ফিরে এসেছে।

অসীম নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

মাধুরীও অসীমকে কিছু বলল না। মনোমোহনকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি আবার ওপরে এলে কেন বাবা?'

মনোমোহন আমতা আমতা করে বললেন, 'এলাম যে কেন—'।

মাধুরী বলল, 'না, তোমার আসবার কোন দরকার ছিল না। আমিই তো ছিলাম। চল, তোমাদের বিছানা-টিছানা সব ঠিক করে দিয়েছি।'

তারপর অসীমের দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'চল।'

মনোমোহনের খাটের ওপরই অসীমের বিছানা পাতা হয়েছে। মাধুরী এসে মশারী খাটিয়ে দিতে দিতে বলল, 'মিছিমিছি কত রাত হয়ে গেল। ওখানে বোধ হয় তুমি সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়।'

অসীম বলল, 'না, না, সবদিন তা হয় না। রাত হয়।'

'রাত জেগে কি কর? রিপোর্ট লেখ?'

অসীম বলল, 'রিপোর্টের কাজ দিনেই শেষ হয়ে যায়। রাতে এক-আধটু পড়ি। ওখানে সভ্যজগতের সঙ্গে পরিচয় তো ওই ছাড়া আর কিছুতে হয় না।

মাধুরী হেসে বলল, 'রোগটা তোমারও আছে তাহলে?'

মাদুর আর বালিশ বগলে করে মনোমোহন এসে হাজির হলেন, 'আমার বিছানা কোথায় পেতে দিয়েছিলি মাধু?'

'কেন, এই প্যাসেজের মধ্যে—। মা তো তাই বলল।'

মনোমোহন বললেন, 'না না, ওখানে আমার ঘুম হবে না। এই গরমের মধ্যে—। তাছাড়া এই ঘরের মেঝেতেই আমাকে দাও। পাখার হাওয়া আছে। বেশ থাকব।'

নিজের বিছানা নিজেই পেতে নিলেন মনোমোহন।

মাধুরী হেসে বলল, 'কিন্তু তুমি এ ঘরে থাকলে সারারাত বক বক করবে। অসীমদাকে একটুও ঘুমোতে দেবে না।'

মনোমোহন এবার উষ্ণ হলেন, 'অসীমদার ঘুমের জন্যে বুঝি শুধু তোদেরই দরদ? আর আমার কোন ভাবনা নেই, না?' তারপর অসীমের দিকে চেয়ে একটু হেসে নরম সুরে বললেন, 'তুমি ভেব না অসীম, আমি আর তোমাকে একটুও ডিস্টার্ব করব না। মাধুরী, তোদের বিশ্বাস না হয় আমার দুই ঠোঁট স্টিচ-সুতোয় সেলাই করে দে না।'

অসীম বিব্রত হয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, এ কি বলছেন আপনি মেসোমশাই। আপনি এ ঘরেই থাকুন, আমার কোন অসুবিধে হবে না। আমিই বরং আপনাদের অসুবিধে ঘটাচ্ছি। আপনি ওপরে উঠে আসুন, আমি নিচে নামি। মেঝেয় ঘুমোবার আমার বেশ অভ্যাস আছে।'

মনোমোহন প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'না না না, তাই কি হয়? তুমি হলে অতিথি নারায়ণ। তোমার জাত নেই বয়স নেই, তুমি অতিথি। মাধুরী তোরা এখন যা। অসীমের সঙ্গে আমার খুব আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে। কারোরই কোন অসুবিধে হবে না।'

মাধুরী অসীমের দিকে অসহায় ভঙ্গিতে একটু হাসল। তারপর বলল, টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস রইল, আর যদি কিছুর দরকার হয়—।'

অসীম বলল, 'আর কিছুর দরকার হবে না।'

মনোমোহন বললেন, 'যদি কিছুর দরকার হয় আমিই তো আছি।'

মাধুরী চলে গেলে তিনি উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, সুইচ অফ করে দিলেন। তারপর আর একবার অভয় দিয়ে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও অসীম, আমি তোমাকে মোটেই ডিস্টার্ব করব না।'

অসীম ভাবল, ভদ্রলোক যদি বেশি উৎপাত না করে তাহলে কেউ আর তার ঘুমের ব্যাঘাত করতে পারবে না।

(ক্রমশ)

যাথেত পাঁপ ফুলের কুঁড়ি সংগ্রহ করে তার থেকে আঠালো একটা পদার্থ বের করে নেয়। এই আঠালো জিনিসটিই হচ্ছে আফিম। সংগৃহীত এই কাঁচা আফিমের কিছু অংশ তারা নিজেরা ব্যবহার করে। যখন কোন মিয়ো বালক ব্যথায় কষ্ট পায়, তখন তার মা তার মুখে আফিমের ধোঁয়া দিয়ে ব্যথা লাঘবের চেষ্টা করে। মিয়ো পুরুষেরা তো আফিমের ধূমপানকে মদ, তামাক ইত্যাদির বিকল্প হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এক কথায় বলা চলে, আফিমই তাদের পলায়নী মনোবৃত্তির একমাত্র সহায়ক।

প্রত্যেক বছর মার্চ মাসের গোড়ার দিকে মিয়ো উপজাতিরা লাওসের ছোট শহর জিংগাখোয়াংগে তাদের উদ্বৃত্ত পণ্য নিয়ে যায় বিক্রি করতে। সেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কাছে তারা প্রতি কিলোগ্রাম কাঁচা আফিম মাত্র ৩০ ডলারে বিক্রি করে আসে। এর পর থেকেই এই কাঁচা আফিম গোপন পথ ধরে আর ধাপে ধাপে বাড়াতে থাকে এর কাঞ্চন কৌলীন্য। ঘোড়ার ক্যারাভানে বা ছোট ছোট বিমানে করে এই কাঁচা আফিম চালান যায় হংকং এবং ব্যাংককে। ফরাসীরা কম্যুনিস্ট ভিয়েৎ-নামের বিরুদ্ধে পাঁচ বছর স্থায়ী যুদ্ধের দরুণ জংগলের মধ্যে যে সব বিমান ক্ষেত্র তৈরি করেছিল তা এখন এই সব কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। হংকং এবং ব্যাংককের চীনা ব্যবসায়ীরা প্রতি কিলোগ্রাম কাঁচা আফিমের দাম দেয় ১০০০ ডলার করে। এর পর থেকেই শুরু হয় কাঁচা আফিমের রকমফের। হয় মরফিয়া, হয় হেরোইন। আর ধূমপানের উপযোগী করেও আফিমের আর এক দফা রকমফের হয়। তখন প্রচুর মুনাফার আশায় চোরাকারবারীরা এই মাদক দ্রব্য এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরে পাচার করে দেয়।

যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব কিছুকেই পাশ কাটিয়ে এই জমজমাট ব্যবসা চলে আসছে এতদিন ধরে।

লাওসের ইতিহাসে এই প্রথম এই অভ্যাস ও এই ব্যবসা রোধ করার জন্য একটা নৈতিক চাপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ, যারা সাম্রাজ্য-বাদীদের হাত থেকে এর শাসন কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে—তারা তো চাপ দিচ্ছেই। তদুপরি জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহে লাওসের স্কুলের ছেলেরা এই পাপ দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে।

•

আজকাল লণ্ডন বা অন্যান্য বড় শহরের রাস্তায় ছড়ি হাতে ভ্রমণকারী লোকের সংখ্যা বিরল হয়ে এসেছে দেখা যায়। ছাতাধারী লোকের সংখ্যা কিছু বাড়লেও ছড়িধারী লোকের সংখ্যা কমে এসেছে বলেই মনে হয়।

ছড়ির সংখ্যা এমনভাবে কমে গেল কেন? প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ছড়িধারীর সংখ্যা খুবই বেশি ছিল। তখন সব বয়সের লোকের হাতেই ছড়ি দেখা যেত। তখন যেন খুব চটপটে ভাব দেখানর জন্যই ছড়ির বহুল প্রচলন ছিল।

কেউ কেউ বলেন, দু দুটো মহাযুদ্ধই বৃটেনে এর প্রচলন কমাতে সাহায্য করেছে। এখন সমুদ্রতীরে বা গ্রাম্য রাস্তায় ওঠানামা বা বেড়াবার সময়ই কেউ কেউ লাঠি ব্যবহার করে থাকেন। এখন তাঁরা তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার মত নিশ্চয়ই শৌখিনতার বশে লাঠি ব্যবহার করেন না।

এমন কি আজকাল চোরাকারবারীদেরও নিষিদ্ধ জিনিস পাচারের জন্য ফাঁপা লাঠি ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

ছুটিকাটায় ডিউক অব এডিনবার্গ যখন পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে যান, তখন মাঝে মাঝে তিনি লাঠি ব্যবহার করে থাকেন। হয়ত এই থেকেই আবার লাঠির প্রচলন শুরু হতে পারে।

৮ম হেনরীই প্রথম ইংল্যাণ্ডে লাঠির প্রবর্তন করেন। তাঁর রকমারি বেড়াবার লাঠি ছিল তার মধ্যে অনেকগুলোতেই সোনার কাজ করা ছিল।

বর্তমান মহারানীর ঠাকুরদাদা পঞ্চম জর্জ এর বেড়াবার লাঠির আস্তানা এক সংগ্রহ ছিল। এর মধ্যে অনেকগুলিই তিনি উপ-ঢৌকন পেয়েছিলেন। এর মধ্যে কতকগুলির বাস্তবিক সত্যিই সম্পদ। বাকিংহাম প্রাসাদে এর জন্যই এক সংগ্রহ করতে হয়েছে। সবচেয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার মহারানী ভিক্টোরিয়া বৃদ্ধ বয়সে যে সব লাঠি ব্যবহার করেছিলেন তা এবং সেই ঐতিহাসিক লাঠি যা দিয়ে চীনা বিদ্রোহের সময় সেনাপতি গর্ডন আত্মরক্ষা করেছিলেন—রক্ষিত আছে।

এই লাঠির প্রচলন যে বহু বেশি দিন হল হয়েছিল তা নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভদ্রমহোদয়গণ তরবারিই ব্যবহার করতেন। এমন কি তাঁদের অনুচরদের হাতেও তরবারিই শোভা পেত। ১৭০৫ সালেই দেখা গেল তরবারির উপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে এবং তার পরিবর্তে ওক কাঠের মোটা মোটা মাথাওয়ালা এবং কুৎসিতদর্শন মুখ খোদাই করা লাঠির ওপর ঝোঁকই পড়েছে বেশি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেশ রং করা মালাক্কার বেতের লাঠির প্রচলন হয়। এইসব বেড়াবার লাঠির মাথা নানা কারুকার্যখচিত হাতির দাঁতের তৈরি ছিল। খোঁড়া লোকেদের জন্য ক্রাচের প্রচলন হয় আরও পরে। প্রায় ১৮৮০ সালের কাছাকাছি।

বত্রিশ

চম্পিকে ওরা কেউ দেখল না। না সুহাস, না যূথী।

অথচ চম্পি ওদের এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটের পাড় থেকে ওদের পাছ-দুয়ার এমন কিছু দূর নয়, মাঝখানের ফাঁকা রাস্তাটা শুধু। প্রায় ডিঙি মেরেই পার হওয়া যায়। তারা ভরা আকাশ এমন কিছু অন্ধকার নয়, পুকুর পাড়ের আকন্দ গাছগুলোও এমন বৃহৎ বনস্পতি নয় যে তার আড়ালেও ঢাকা পড়বে চম্পি।

চম্পি দাঁড়িয়েই থাকল। ভরা ঘড়াটা কাঁখে চম্পির সেই স্থির নিশ্চল মূর্তি যদি কেউ দেখতে পেত, তাহলে নিশ্চয়ই মনে করত, কেউ বুঝি বা পাষাণের এক প্রতিমা দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। চম্পি নিজেই শুধু জানে [illegible] সারাদিন ধরে যে সুন্দর মূর্তিখানি সে তার মনে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল সেটাও তেমনি পাথর হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ [illegible] তার মধ্যে [illegible] একটা চম্পা [illegible] তার সর্বশরীরে [illegible] এত ভারী [illegible] তার আর কোন বোধ নেই।

[illegible] তার চোখের উপর সুহাস আর যূথী যে [illegible] করল, যেরকম [illegible] করল সুহাস, চম্পি তা কি সহ্য করতে পারত? [illegible] সে জলে ঝাঁপ দিল না? [illegible] তার মনটা [illegible] উঠল না? সে সব কিছুই হল না। চম্পির রক্ত-মাংসের শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে [illegible] এক সীসের মূর্তি হয়ে গেল।

তাই, সুহাস যখন হঠাৎ যূথীর হাত একবার যখন নিজের মুঠিতে চেপে ধরল, সমস্ত সোহাগ গলায় ঢেলে দিয়ে সুহাস যখন যূথীকে বলল, তোমার মত এত সুন্দর আমি আর দেখিনি যূথী, কি নরম তোমার হাত' এই কথা বলে সুহাস যখন যূথীকে একটু টানল, আর ঘোর লাগা যূথী যখন তার বুকের কাছে এগিয়ে গেল, সুহাসের দুখানা হাত যূথীর মুখখানাকে ধীরে ধীরে তুলে ধরল আর সুহাসের মুখখানা সেই নির্জন পরিবেশে একটিমাত্র জোনাকি [illegible] মত [illegible] নেমে এল, যূথী 'যাঃ অসভ্য' বলে চট করে সরে গেল, তার পর কেমন জড়ান জড়ান স্বরে বলল, 'কাল দুপুরে যাব', সুহাস [illegible] সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়েছিল, তার আগেই যূথী বাড়ির ভিতরে বিদ্যুৎবেগে ঢুকে পড়ায় সে হাত দুখানা বাতাসে চক্কর কেটে মালিকের দুপাশে যেন ডানা গুটিয়েই বসে পড়ল, এসব দেখা সত্ত্বেও চম্পি চঞ্চল হল না। অথবা এসব কিছুই সে দেখতে পায়নি, এসব কোন কিছুই ঘটেনি। কে যেন একজন এসেছিল তাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত, ঐ যে দুলে দুলে পুকুরপাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঘাট ফাঁকা, পথ ফাঁকা, সব ফাঁকা। সব ফাঁকি। ফাঁকির খেলা। এ পৃথিবীতে সুহাস বলে কোন ভদ্রলোক নেই, কলকাতা বলে কোন উদার শহর নেই, বিশ্বাস বলে, ভাল বলে, কোন বস্তু নেই।

তবে চম্পি আর খামাখা এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? ভারী মন, ভারী ঘড়া বয়ে

জোর শংখর আর একটা জামা হ'ত। তাতে কি সংসারের পেট ভরতো। এই জিনিসটা ভূষণ কেন যে বোঝে না, গিরিবালা শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না।

এই যে, আজ একদানা চাল নেই ঘরে, উনুনে আগুন দিয়ে চুপচাপ বসে আছে গিরিবালা, কখন বটঠাকুর আনবেন চাল, তারপর রান্না হবে, এ ব্যাপারটা কি ভূষণ কোনদিনই বুঝবে না। নিজেকে নিয়েই মেতে আছে। দুবেলা ভাতও যদি না জোটে তবে ও ছাতার নাড়ি টিপে হবেটা কি? কিন্তু একথা ভূষণকে বলাই বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণ এমন একটা ব্যবসা ফেঁদে বসবে, তার জের সামলাতে অস্থির কাণ্ড হবে।

ব্যবসাই কি এর মধ্যে কম করল ভূষণ! মাছের ব্যবসা করতে গিয়ে দেড়শ টাকা গুণগার এই ত সেদিন দিল। গিরিবালার গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা এনে কাকে যেন দিল আর সে টাকা নিয়ে উধাও। ভূষণ সে টাকা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থাও করল না। গিরিবালা বার দুয়েক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল পুলিসে-টুলিসে খবর দিয়েছে নাকি ভূষণ।

ভূষণ অবাক হয়ে বলেছিল, পুলিস! পুলিস টাকা উদ্ধার করে দেবে, তবেই হয়েছে। কখনও দিয়েছে শুনেছ? আর তা ছাড়া সে ব্যাটা টাকা চুরি করে কত যে লোকসান দিল সেটা একবার ভেবে দেখ। ব্যবসাটা টিকিয়ে রাখতে পারলে অমন কত দেড়শ টাকা ও ত মাসে মাসে রোজগার করতে পারত। চুরি করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা নিজের জরিমানা নিজেই করেছে।

ব্যস্ হয়ে গেল মাছের ব্যবসা। তারপর ঠিকেদারি করবে বলে দিনকতক লাফাল ভূষণ। চম্পির অসুখটা হতে আর সেদিকে মন দিতে পারেনি। এখন গিরিবালা দেখছে, কদিন ধরে ভূষণ আবার কে জানে কি সব হিসেব কষতে লেগেছে। কি যে এবারে তার মাথায় খেলছে ভূষণই জানে।

অভাব অনটনের সংসারে ভূষণ যে পয়সা আনতে পারছে না, বউ-ছেলেকে খাওয়ানোর মত রোজগার যে তার নেই, একথা স্পষ্ট করে না বললেও বড়জা ঠারে-ঠোরে জানাতে কসুর করেন না। আর লজ্জায়, দুঃখে গিরিবালার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কখনও কখনও তার মনে হয় ভূষণকে এসব বলে। কিন্তু ভয় পায়। যদি চটে যায় ভূষণ। তাই ত সে সব কিছু সহ্য করে যায়।

কিন্তু কাঁহাতক আর সহাই বা হয়। আজ মনে মনে গরম হয়ে উঠল গিরিবালা। এতখানি বেলা হল, এখনও পর্যন্ত সে কিছু মুখে দিতে পারে নি। চম্পি আর বড় জা-ও তাই। কিছু খুদ ছিল ঘরে, সকালে তাই দিয়ে জাউ রেঁধেছিল। বটঠাকুর, ভূষণ, দেসমশাই আর যূথী তাই খানিকটা করে খেয়েছেন। শংখকেও একটুখানি দিয়েছিল। আর একটু তার জন্য তুলে রেখেছিল। একটু আগেই খিদের চোটে চেঁচাচ্ছিল শংখ। জাউ আর মুখে তুলল না। অতিকষ্টে তাই তাকে গিরিবালা ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙলেই ত খাই খাই করবে, তখন কি দেবে গিরিবালা। দুধ যেটুকু হয় তাতে শংখর পুরো পেট ভরে না।

হঠাৎ বড় ভাসুরের গলা শুনল গিরিবালা। বিলাস চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়িতে ঢুকছেন।

ওগো কনে গেলে সব। শোন, সব্বনাশ হয়েছে।

গিরিবালার বুক ধ্বক করে উঠল। কি সর্বনাশ আবার হল? বুক দুর দুর করতে লাগল তার।

দামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। যূথীও বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

দামিনী একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে! কি হয়েছে!

চম্পিকে একজন দেখতি আয়েস্থেন যে! ইস্কুলি বসায়ে রাখে আইছি। অতি সজ্জন ব্যক্তি। তা নাও ব্যবস্থা ট্যাবস্থা কর।

গিরিবালা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাব্বাঃ, বটঠাকুরের কথার ছিরিই আলাদা।

বল কী?

দামিনী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

কই, সকালে ত জানাও নি।

জানাব কি, এর আর জানাব কি?

বিলাস চটে উঠলেন।

আমি কি নিজেই জানতাম। ডাক্তার যাব বলে ত বেরলাম। বক্সীবাড়ির কাছাকাছি যাতিই দেখা হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। কলি চিনা চিনা ঠ্যাকছে, মানুষটা কিন্তু। উনিই দেখি হাঁ করে আমার মুখির দিকি চায়ে আছেন। হঠাৎ মনে পড়ল কালিপাড়ার মামাগের ওখেনে দেখিছি। কতিই বললেন, হাঁ। আমারেও চেনলেন। আমাগের সঙ্গে কেমন যেন কুটুম্বিতেও আছে। মামাগের সম্পর্কে ভাই হন উনি। বললেন, ওর ভাইপোর জন্যি কনে যেন পাত্রী দেখতি আইছিলেন। তা সে মেয়ে পছন্দ হয় নি। আমার বয়স্থা মেয়ে আছে শুনে দেখতি চালেন।

গড় গড় করে বলে গেলেন বিলাস। দামিনী হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারলেন না।

বললেন, তা এতক্ষণ করছিলে কি? ছিলে কনে?

কেন, ইস্কুল বাড়িতি বসে ছিলাম। বেশ ঠান্ডা তু জায়গাটা, আর নিরিবিলি। দুকথা আলোচনা হল শাস্তর নিয়ে। ভাগবত-টাগবত বেশ পড়া আছে বুঝলাম। আমার সেই উদ্ধব তত্ত্বটাও শুনোয়ে দিলাম— বুঝলে? সেই যে গো শান্তিপুরির গুসাঁইরি যা দিয়ে পাড়ু করিছিলাম সিবার, মনে নেই।

দামিনীর সর্বশরীর তেলে-বেগুনে জ্বলে গেল। ইচ্ছে হল গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। লোকটাকে নিয়ে যে কি করবেন

দামিনী বুঝতে পারলেন না। সারাটা জীবন তাঁকে এমনিভাবে জ্বালিয়ে যাচ্ছে বিলাস। ধান আনতে বের হল, জানে এক বিন্দু দানা নেই ঘরে, তা না করে পথের মধ্য থেকে লোক জুটিয়ে শাস্তর আলোচনা হচ্ছে এতক্ষণ ধরে। আবার বলে মেয়ে দ্যাখাও। দেড় পহর বেলা হল। এখন কি করবেন দামিনী? মাথা খুঁড়ে মরবেন?

শাস্তর ত সবাই পড়ে, আপন মনেই বলে চলেছেন বিলাস, মর্ম বোঝে কয়জন। সেইটেই হল গিয়ে কথা। সেটা বুঝতি হবে। বলি, রাধা নয়, চন্দ্রাবলী নয়, ললিতা-বিশাখা নয়, জোর দিচ্ছি উদ্ধবের উপর। কেন?

রাখ দিনি তুমার উদ্ধব। এই ভর-দুপুরে অশৈলে আর দাড়ায়ে না। যে উদ্ধবকে এখন আনিছ, তার ব্যবস্থা কর।

বিলাস বললেন, ব্যবস্থা ত করবা তুমরা। চম্পিরে একটু সাজায়ে গুজায়ে রাখ। আমি একটু পরেই ও'কে নিয়ে আসছি।

দামিনী হতাশ হয়ে বললেন, তাইলিই কি হবে? খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করতি হবে না? সে কাজ করবে কিডা?

বিলাস এবার চটে গেলেন, কও কি, বাড়িতি এতগুলোন মেয়েলোক থাকতি, কুটুম-সাক্ষাতের খাওয়ানোর ব্যবস্থা আমারে করতি হবে? হায়রে কি সব কুড়িকুষ্টি হইছে।

দামিনী বললেন, ঘরে কি কিছু আছে, যে ব্যবস্থা করব। বলি জিনিসপত্তর আনে দিছ ত।

বিলাস খাঁক খাঁক করে উঠলেন, কাঁদিনির থে তুমি আইছ, কোঁদিনির যে ঘরে কি কিছু থাকবার জো আছে?

দামিনী জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। বিলাস কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে হঠাৎ যূথীকে বললেন, যূথী ধামাটা আন দিনি।

যূথী ধামা এনে দিতেই বিলাস হন হন করে পুকুর-পাড় দিয়ে কলুপাড়ার দিকে রওনা দিলেন।

ভুবন যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল, তখন খাওয়াদাওয়া সেরে বগলাকান্তবাবু একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। ভুবন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে গেল।

বগলাকান্তবাবুর বয়েস বছর চল্লিশেক হবে। মাথায় টাক। দিব্যি ভুঁড়ি। বেশ মোটাসোটা মানুষটি।

বিকেল নাগাদ মেয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত করা হল। সাবান মেখে চান করল চম্পি। সেই সাবান, যূথীর সঙ্গে যা নিয়ে একদিন তার ঝগড়া হয়েছিল। গিরিবালা আর যূথী সাজিয়ে দিল তাকে। কাকীমার কাপড়ে বেশভূষা করতে আজ আর চম্পির মানে লাগল না। ভীরু পায়ে এসে সে

বগলাকান্তবাবুর সামনের আসনে বসল। মুখ নিচু করে।

বগলাকান্ত চম্পির স্বাস্থ্যখানা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

একগাল হেসে বললেন, বেড়ে স্বাস্থ্য বটে বিলাসবাবু, আপনার মেয়ের। হ্যাঁ বাড়ির বউ হবে এমন ধারা। যাতে স[illegible] চোট সামলাতি পারে। ওসব ফ্যাশানে ধরনের মেয়ে মশাই আমাদের বাড়ি দু'চক্ষের বিষ।

বিলাস বগলাকান্তের কথা শুনে মোহি[illegible] হয়ে গেলেন। কালো রঙের কথা তুল[illegible]

বগলা যে তাঁদের অপ্রস্তুত করছেন না, চম্পির অন্তত একটা জিনিসও তাঁর ভাল লেগেছে, বিলাস এতেই খুশি।

হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, এ যা দেখতিছেন এ ত মা'র আমার অর্ধেক স্বাস্থ্য। ডবল নিউমোনিয়ায় পঁয়তাল্লিশ দিন ভুগিছে। ফিরে যে পাব, সে আশা ত ছাড়েই দিছিলাম। তারপরে মার আগের স্বাস্থ্য আর ফিরে আসে নি। ভাল খাতি পায় না, ভাল যত্ন পায় না ত।

পাবে পাবে, বিলাসবাবু।

বগলাকান্তবাবু হাসতে লাগলেন।

আমাগের বাড়ির বউগের খাবার অভাব হয় না। এই দুর্বছরেও চারটে গোলা একেবারে ধানে ভরা। দুটো পুকুরির মাছ আর আটটা দুধেল গাই। থাক না কে কত খাবে। বগলা বিশ্বেসের খাবার অভাব নেই। আপনার কাজিপাড়ার মামাগের জিজ্ঞেস করে দ্যাখবেন। আর যত্নের কথা? হাঃ হাঃ হাঃ। বাড়ির বউ আমাগের মাথার মনি। ঘরের লক্ষ্মী যে মশাই। জিজ্ঞেস করবেন আপনার মামারে। বগলা বিশ্বেসের কথা এক বর্ণও যদি মিথ্যে হয়!

বিলাস একেবারে গলে গেলেন। সমানে দু'হাত কচলাতে লাগলেন।

বললেন, আমার মেয়ে আপনাদের ঘরে পড়বে, আমার কি এমন ভাগ্য।

কেউ বলতি পারে না সেকথা। বগলা-বাবু বললেন। যে যার কপালে খায়। আপনার মেয়ের কপালে যদি আমাগের বাড়ির অন্ন মাপা থাকে, তবে সে কি কেউ ঠেকাতে পারবে? আপনিউ পারবেন না, আমিউ না, এমন কি আমার ভাইপোডাউ না। ভবিতব্য মশাই, সবই ভবিতব্য।

সে ত ঠিক, সে ত ঠিক। বিলাস সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন।

বগলাকান্ত বললেন, যদি কিছু মনে না করেন ত আপনার মেয়ের হাতখান একবার দেখি। আমার আবার ওসব চর্চা আছে কি না। মেয়ে দেখতি আসে বাজে ফাৎরামো আমি পছন্দ করিনে। চুল দ্যাখা, দাঁত দ্যাখা। কি সব অসভ্যতা। এ কী গোহাটায় আইছি যে, দাঁত দ্যাখব।

বগলাকান্তের কথার ধরনে অন্দরে বাইরে হাসির ধুম পড়ে গেল।

বগলাকান্ত বললেন, তবে হ্যাঁ, কিন্তু মাথার সিঁথা দেখতি হবে বৈকি? স্বচক্ষেই দ্যাখলাম, ইয়ার ভাগ্য-রেখাটা মাথা হইতেই ঢুকে গেছে। দেখি তুমার হাতখানা?

বগলাকান্তবাবু প্রথমে চম্পির ডান হাতখানা চিৎ করে নিজের বাঁ হাতের তালুর উপর রাখলেন। বার দুয়েক মোলায়েম করে টিপলেন। এমনভাবেই টিপলেন যে চম্পির শরীর শিরশির করে উঠল। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। চম্পির পাঞ্জাটা তারপর উল্টে দিলেন। আবার বার দুয়েক টিপলেন। প্রত্যেকটি আঙুলের ডগা দেখলেন। তারপর পাঞ্জাটা আবার উল্টে দিলেন। করতলের রেখাগুলো দেখলেন। বার তিনেক চম্পির আঙুলগুলো মুড়ে দিলেন। এমনিভাবে ডান হাত দেখা হল। তারপর বাঁ হাত দেখা হল। তারপর এক-সঙ্গে দুখানা হাত দেখা হল। অপরিচিত পুরুষ হাতের টিপুনি খেতে খেতে চম্পির হাত ঘেমে উঠল। বুক থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাত দেখার পালা শেষ হতে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বগলাকান্তবাবু এতক্ষণ তন্ময় হয়ে হাত দেখছিলেন। এবার বিলাসের দিকে চেয়ে হাসলেন।

বললেন, আপনার মেয়ের লক্ষণ খুব ভাল। যে-ঘরেই যাক সুখী হবে।

বিলাসের চোখ ছলছল করে উঠল।

বললেন, কিন্তু ওর কোন ঘরে দেবার মত সামর্থ্যই যে আমার নেই।

বগলাকান্তবাবু বললেন, ভবিতব্যের উপর হাত আছে কার? যে ঘরে যাওয়া ওর কপালে লিখা আছে সে ঘরে ও যাবেই। আপনি আমি চাই আর না চাই। হ্যাঁ, আমাগের দেশের অব একটা নিয়ম আছে।

বলেই পকেটে হাত দিয়ে এক জোড়া সোনার বালা বের করলেন।

বললেন, এই বালা যদি আপনার মেয়ের হাতে ওঠে বুঝবেন, মায়ের আশীর্বাদ হয়ে গেল। তারপর আপনারা গিয়ে দেখে যান বাড়িঘর, দেখে এসে যে-দিন ধার্য করবেন, সেইদিনই এসে আমার টোপর মাথায় আমাগের ঘরের বউ তুলে নিয়ে যাব। দেখি তুমার হাত।

চম্পি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। দামিনী না, বিলাস না, কেউ না। এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটে নাকি? এমন লোকও আছে নাকি? উনি মানুষ না দেবতা?

চম্পি একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। অনেক-দিন পরে তার মনে আবার চঞ্চলতা দেখা দিল। বগলাকান্তবাবু একটা বালা নিয়ে চম্পির হাতে পরাতে লাগলেন। বালার মাপটা কিছু ছোট। বগলাকান্তবাবু চম্পির হাত টিপে টিপে নানা কসরৎ করে নিপুণ-ভাবে বালা পরাতে লাগলেন। চম্পি টের পেল বগলাকান্তবাবুর হাতের তালুও ঘেমে উঠেছে। একটা চাপা উল্লাসে ঐ বয়স্ক হাতদুটোও থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। চম্পির চোখও হঠাৎ একবার বগলাকান্ত-বাবুর চোখে পড়ল। সেখানেও যেন দুটো আগুনের শিখা জ্বলছে। (ক্রমশ)

এসে পড়ে। তার প্রমাণ—খামের ওপর ডাক-ছাপ—আজও আমার কাছে রয়েছে। এই লিখিত প্রমাণ সমেত খামগুলি আমি খেয়াল করে রেখে দিয়েছি, তার জন্যে আমার মেজাজকে যদি কেউ খাম-খেয়ালী বলে, আমি নিরুত্তর থাকবো। এ প্রসঙ্গে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে ডাক-যোগে নিয়মিত পত্রালাপের সুযোগ পাওয়ার দরুণই আজ প্রমথ চৌধুরীর লেখা চিঠি সামনে রেখে আমি সবুজ পাতার ডাকে মনোযোগ দিতে পেরেছি।

তে হি নো দিবসা গতাঃ। তখন আর এখন আকাশ আর পাতাল। স্বাধীনতা না-কি পেয়েছি। কেমন তা বলি।

বছর ৪।৫ আগে, আমার কলেজের সহপাঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর নলিনীমোহন বসুকে একখানা এক্সপ্রেস্ পোস্ট কার্ড পাঠাই তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়ির ঠিকানায়। উপলক্ষ্য, আমার পায়ে হঠাৎ ব্যথা হওয়ায় তাঁর ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমি অক্ষম, এই সংবাদ তাঁকে সময়মত জানানো। যেদিন দ্বিপ্রহরে সেখানে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন, সেইদিন সকাল সাতটায় হাটখোলা ডাক-ঘরে আমার চিঠি দেওয়া হল। আমি ত এধারে নির্ভাবনায় বসে আছি। ওধারে যে নিউ আলিপুরে আমার বন্ধুটি সস্ত্রীক 'হা-পিত্যেশ' নামক ধর্ম আচরণ করছেন, তা কি আমি জানি? তিন দিন পরে তাঁর এক চিঠি পেয়ে ত আমি অবাক্। দেখলুম, এক্সপ্রেস্ ডাকের চাইতে অর্ডিনারী ডাক শীঘ্রগতি। আমার চিঠি ওর কাছে পৌঁছতে দু'দিন লেগেছিল। ভারী রাগ হল। অনেককাল থোড়-ছেঁচ্‌কি খাইনি (কারণ থোড় কুটতে জানি না), তাই- বন্ধুকে বলে দিয়েছিলুম যেন ভাতের সঙ্গে আমায় সেদিন থোড়-ছেঁচ্‌কি দেওয়া হয়। থুড়ে চিঠি লিখে দিলুম পশ্চিমবঙ্গের পোস্ট-মাস্টার-জেনারেলকে। উত্তর পেয়ে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অনুরোধ জানানো হয়েছে, আমার নালিশী-পত্রের কভার যেন পাঠাই। পোস্ট কার্ডের আবার কভার কি? তা ছাড়া, আমিই ত চিঠি দিয়েছিলুম। যাঁর কাছে চিঠি গেছে, তাঁর কাছেই চিঠি আছে: ওর নাম-ধাম পূর্ব-পত্রেই জানিয়েছি; ফের জানাচ্ছি: ওঁরা সেখানে এবং নিউ আলিপুরের ডাকঘরে খোঁজ করুন না।—এ-সব যুক্তি পাত্তা পেলে না। ভদ্রলোকের এক কথা—কাভার চাই-ই-চাই, নতুবা তদন্ত করবেন কি করে? দেখলুম, P M G-র এক বুদ্ধিমান্ কেরানী আমার সঙ্গে এই প্রকার পত্রালাপ

চালাচ্ছেন। ভাবলুম, এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কাবার করাই হবে সঙ্গত তদন্ত। এ-স্বাধীনতার ঠেলা সামলানো দায়।

কেউ হয়তো বলবেন : কেন মশায়? টেলিফোন ত ছিল। টেলিফোনে কথা কয়ে সবুজের বৈঠক বসানো যেত না?—আমার উত্তর হবে : এ-প্রশ্ন অনেকটা সেই ধরনের, যে-ধরনের কথা ফ্রান্সের রানী বলেছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে। রুটির অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে শুনে সেই রানী নাকি প্রশ্ন করেন : রুটি যদি না থাকে, কেক খায় না কেন?—আমাদের একটা সংস্কৃত বচন আছে : 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।' কিন্তু অনুষ্টুভ্ ছন্দের মান রক্ষা করে কোনো পণ্ডিত এখনও বলেন নি : 'গুড়াভাবে হি শর্করাম্'।

টেলিফোন সবুজ-পত্র-যুগে যে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু কজনের বাড়িতে? তখনকার টেলিফোনে কানেক্শন (Connexion) পাওয়াও অনেক সময়ে দুষ্কর হত। ফিরিঙ্গি মেয়েদের মর্জির ওপর নির্ভর। ৩০।৩২ বছর আগে রায় বাহাদুর প্রিয় মুখুজ্যের মুখে শুনি যে, তিনি একবার টেলিফোনে ঠাট্টা করেছিলেন একটি ফিরিঙ্গি মেয়েকে। যখন সে বললে : এনগেজ্ড্ (engaged), উনি তৎক্ষণাৎ বললেন : আই কনগ্রাচুলেট ইউ, মিস্ (I congratulate you Miss!) মেয়েটি প্রত্যুত্তর দিয়েছিল : ইউ আর নটি (You are naughty), কিন্তু তার পরেই 'কানেক্শন' দিলে খোশ-মেজাজে। টেলিফোনের আর এক দোষ ছিল সেকালে। 'হ্যালো, হ্যালো' করতে করতে অনেকবার ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়েছি। যখন শব্দতত্ত্ব কিছুই জানতুম না, তখন এক-একবার ভেবেছি, "হ্যালো" শব্দটা বোধ হয় বাংলা "হ্যা লো"-র নব্য-ভৌতিক সংস্করণ, ভূত-পেত্নীর সানুনাসিক উচ্চারণ থেকে নাকের কাজ বাদ দিয়ে তৈরী করা, পাছে লোকে শুনে ভুল করে যে, অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর প্রেতলোক থেকেই আমাদের কানে আসছে যন্ত্রসহযোগে। পরে যখন অল্প-স্বল্প রিসার্চ করেছি, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদিন হাসিমুখে আমায় বললেন : "জানো হারীত, আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে 'ডিস্কভার' করেছিলেন সার উইলিয়ম জোনস, যাঁর বিশেষ উদ্যোগে কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়? তিনি কালিদাসের শকুন্তলা-নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।" এ-কথা শুনে শকুন্তলা-নাটক আর একবার পড়লুম এবং এবার তার প্রাকৃত অংশটার ওপর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, কেননা শাস্ত্রী মশায় তখন প্রায়ই বলছিলেন যে, নবাবিষ্কৃত ভাসের নাটকগুলোয় যে প্রাকৃত পাওয়া গেছে, তার চেয়ে কালিদাসের প্রাকৃত অর্বাচীন। হঠাৎ মনে এল টেলিফোনের বহু-শ্রুত 'হ্যালো', যখন কালিদাসে পড়েছি 'হলা সউন্দলে', অর্থাৎ 'হ্যালো, শকুন্তলা'! তখনই সন্দেহ করলুম, হয়ত বা সে-সময়ে জোনস সাহেব শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ করছিলেন, কলকাতায় বসে সাহেবেরা—যাঁরা কিছু কিছু বাংলা শিখতে বাধ্য হতেন—বাঙালী মেয়েদের "ওলো, হ্যালো" শুনে থাকবেন, এবং তারই নকল করে 'হ্যালো' শব্দটি ইংরিজীতে চালু করেন। এখন ভাবছি, এ-থিওরি ছেড়ে দেওয়াই ভাল, কারণ ইংরেজরা আমাদের মেয়েলী ভাষা বা 'জনানী বুলি'কে এভাবে পুরুষের ব্যবহারে লাগালে কি তাদের খাতির থাকত? তবে হ্যাঁ, সাহেবরা এ-কাজ করতে ভয় পেলেও মেমরা হয়ত ভয় পান নি এবং মেমদের অনুকরণে টেলিফোনের মেয়েরা সে-কাজ করে থাকতে পারেন। টেলিফোন-সেণ্টার যে সেকালে

উচ্ছ্বসিত সে-স্থানে নিবিড় স্তব্ধতা বিছিয়ে গেল। প্রখর আলোক থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অরবিন্দ কয়েক মুহূর্তে কি যেন ভাবলেন—কয়েক মুহূর্তে মাত্র—তারপর বললেন—'আমি চন্দননগর যাব।

রামবাবু বললেন—'এক্ষুণি?'

অরবিন্দ উত্তর করলেন—'এক্ষুণি—এই মুহূর্তে।'

অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন, এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেন। তাদের কিছু পশ্চাতে বেরুলেন বীরেন তাঁদের অনুসরণ করে এবং বীরেনের কিছু পশ্চাতে বেরুলাম আমি বীরেনকে অনুসরণ করে।...সে যা হোক, প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাজ চলে আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌঁছলাম।" (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫২)।

সুরেশচন্দ্রও দেব মহাশয়ের গল্পের সমর্থন করছেন না। বরাবর ধর্ম-কর্ম-যোগিন আপিস থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তিনজন সহচর ছিল—এঁরা কি তাহলে হঠাৎ মাঝপথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন, বলতে চান দেব মহাশয়?

আসলে হারীতকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে যে পুরোনো কথা লিখেছেন তার মূলে প্রামাণ্য উপাদান নেই। ইতি—

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরী

'জাতের নামে বজ্জাতি'

সবিনয় নিবেদন—

৫ই আষাঢ়ের 'দেশ'-এ 'গানের আসরে' শার্ঙ্গদেব মুকুন্দ দাসের যে-কয়টি বলিষ্ঠ রচনার নমুনা পরিবেশন করেছেন, সেগুলির মধ্যে 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি দেখে বিস্মিত হলাম। উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে এই গানটিই 'দেশ'-এর প্রায় এক কলম আসন অধিকারের মর্যাদা লাভ করেছে। গানটি কিন্তু মুকুন্দ দাসের নয়; —ওটি নজরুল ইসলামের লেখা।

এ-গানটি নজরুল প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর পূর্বে রচনা করেন। তিনি স্বয়ং এবং আরো অনেক গায়ক বহু আসরে গেয়ে সেকালে গানটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। হয়তো সেই সময়েই মুকুন্দ দাস তাঁর 'পল্লীসেবা' নাটকের কোনো বিশেষ পরিবেশকে প্রস্ফুট করবার জন্যে নজরুলের এ-গানটি গ্রহণ করেছিলেন। মুকুন্দ দাস স্বরচিত গান ছাড়াও অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির চিত্তাকর্ষক গান তাঁর যাত্রার আসরে গাইতেন। সে সমস্ত গানই মুকুন্দ দাসের রচনা বলে মনে হওয়াটা শ্রোতাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

কেবল শার্ঙ্গদেবই নন—আরো এমন দু-চারজন লোক আছেন দেখি, যাঁরা মনে করেন, 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটি মুকুন্দ দাসেরই রচনা। সাহিত্য-সরস্বতী, বিদ্যাভূষণ, পুরাতত্ত্ববিদ ও বি-এ উপাধিধারী শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য মহাশয় তাঁর 'বিপ্লবী বাঙলা বা স্বাধীনতার ইতিহাস' গ্রন্থের ২০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'এককাল পরেও মুকুন্দ দাসের একটি বিখ্যাত গানের কয়েকটি পদ সুরাগত বীণার ঝঙ্কারের মত কানে বাজছে।' এই কথা বলে তিনি নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানের কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন।

শার্ঙ্গদেব তাঁর প্রবন্ধে গানটির যতটা ছেপেছেন, তার মধ্যেও অনেক ভুল আছে। নিম্নে পুরো গানটি দেওয়া হল—পাঠক-পাঠিকারা 'দেশ'-এ প্রকাশিত গানটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত
ছেলের হাতের নয় ত মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি,
ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা
এক জাতিকে একশ' খান।
এখন দেখিস ভারত-জোড়া
পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু
জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥
জানিস নাকি ধর্ম সে যে
বর্মসম সহনশীল

তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে
ছোঁওয়া-ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল।
যে জাত ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নমে,
রইবে মানুষ, নাই পরোয়া॥
দিন-কানা সব দেখতে পাসনে
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে,
কেমন ক'রে পিষছে তোদের
পিশাচ জাতের জাঁতাকলে।
(তোরা) জাতের চাপে মারলি জাতি,
সূর্য ত্যজি নিলি বাতি,
(তোদের) জাত-ভগীরথ এনেছে জল
জাত-বিজাতের জুতো ধোওয়া॥
মনু ঋষি অণু সমান
বিপুলে বিশ্বে যে বিধির,
বুঝলি না সেই বিধির বিধি
মনুর পায়েই নোয়াস্ শির।
ওরে মূর্খ, ওরে জড়,
শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
(তোরা) চিনলিনে তা চিনির বলদ,
সার হ'ল তাই শাস্ত্র বওয়া॥
সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর,
(এ) বিশ্বমায়ের বিশ্বঘর,
মায়ের ছেলে সবাই সমান,
তাঁর কাছে নাই আত্মপর।
(তোরা) সৃষ্টিকে তাঁর ঘৃণা ক'রে
স্রষ্টায় পূজিস জীবন ভ'রে,
ভস্মে ঘৃত ঢালা সে যে
বাছুর মেরে গাভী দোওয়া॥
বলতে পারিস বিশ্বপিতা
ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁওয়া
অশুচি হন জগন্নাথ?
ভগবানের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে
মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া॥
ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট
নাই সেখানে জাত-বিচার,
(তোর) পৈতে টিকি টুপি টোপর
সব সেথা ভাই একাকার।
জাত সে শিকেয় তোলা র'বে,
কর্ম নিয়ে বিচার হবে,
(তা'পর) বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে
নরক কিংবা স্বর্গে থোওয়া॥
(এই) আচার-বিচার বড় ক'রে
প্রাণ-দেবতায় ক্ষুদ্র করা,
(বাবা) এই পাপেই আজ উঠতে বসতে
সিঙ্গিমামার নাচন দেখা!
(তাই) নাইক অর্থ নাইক বস্ত্র,
নাই সম্মান, নাইক অস্ত্র,
(এই) জাত-জাহাজীর জাতে আছে
আরো অনেক দুঃখ সওয়া॥

শ্রীনি[illegible] সরকার
পণ্ডিচেরী

ট্রামে-বাসে

সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগের বিশেষজ্ঞদের হাতে কোন কাজ নাই। ঋণ দানের দলিলদস্তাবেজ লইয়াই তাঁদের দিন কাটে। —"অন্য কাজও আছে বৈকি। সেটা হলো অক্কুর সংবাদ পাওয়ার মহড়া। হাতে টাকা এলেই মৎস্য-বিভাগ ফেটেফে মেরে দেবেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

আমেরিকা নাকি সম্প্রতি বর্ণীকরণ মন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—

"কলকাতা ময়দানের হালচাল দেখার পর বর্ণীকরণে বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায় কোথায়"

• • •

যেসব মহিলার চাকরি করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয় তাঁদের ছুটিছাটা এবং নানারকম অসুবিধা লইয়া সম্প্রতি আলোচনা হইয়াছে। [illegible] ওপর পা তুলে দিয়ে [illegible] করেন তাঁদের সংখ্যাও কিছু বড় কম নয়। ঐ ছাড়াও নিয়ে সমস্যা সমাধানের [illegible] চেষ্টা করা হইতেছিল। কিন্তু বর্তমানে [illegible] অচল" বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর একটি ছাগল-নিরোধ অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। ইহার অনুসারে বারো-মাস পর মাঠেঘাটে ছাগল চরান এবং আঠার মাস পর ছাগল রাখা দণ্ডনীয় হইবে। শ্যামলাল বলিল "অবিভক্ত বাংলার লীগ মন্ত্রিসভা একবার ছাগলের বয়স নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন অর্থাৎ সাবালক না হলে ছাগল কাটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সেটার একটা মানে করা গিয়েছিল কিন্তু ছাগলের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক জেহাদের অর্থ উদ্ধার করতে অনেকেই শুনেছি আতঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বুলোচ্ছেন"!!

• • •
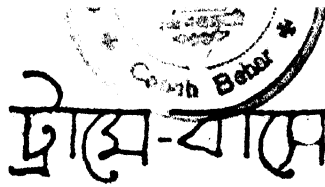
গ্রীসের সবচেয়ে পুরাতন ও নামজাদা পকেটমার কোর্টিস ৮৫ বৎসর বয়সে ধরা পড়িয়াছেন। —"মনে হয় ধরা দিয়েছেন; হয়ত ফাঁকা পকেট হাতড়ে হাতড়ে হয়রান হয়েই তিনি পুলিসের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন" মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

• • •

হাওড়া রেল স্টেশনে কোন্ গাড়ি কখন ছাড়বে তা মাইকের মারফতে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা সংগীতের মাধ্যমে সম্ভব কিনা তা নাকি বিবেচনা করা হইতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন "গানের সঙ্গে নাচের কথাটাও বিবেচনা করে দেখবেন। প্ল্যাটফরমে নাচের ব্যবস্থা হলে অনেকে হয়ত গাড়ি ফেল্ করতে রাজী হয়ে যাবেন সুতরাং অরসিকের পক্ষে গাড়ি চড়া সহজ হবে"।

• • •

প্রায় সাতশত বৎসর আগে ইস্তাম্বুলে এক রসিক চূড়ামণি ছিলেন। তাঁর নাম নাসিরুদ্দিন হোজা। সম্প্রতি আকশির

শহরে তাঁর স্মরণ উৎসব হইয়া গেল। —"রসিকচূড়ামণি বেঁচে থাকলে নিজেই বলতেন হোজা এতদিনে [illegible] পেল"—বলেন আমাদের বিশুখুড়ো।

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ বোম্বাইর ভিক্ষুকরা নাকি গড়ে দৈনিক দশ-হাজার টাকা রোজগার করে। —"তারা আয়-কর দেয় কি না তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

আন্তর্জাতিক শল্য চিকিৎসক সম্মেলন ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাহারও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খোয়া গেলে বদলে তাহার পায়ের আঙ্গুল আনিয়া জুড়িয়া দেওয়া

সম্ভব। —"পায়ের আঙ্গুলের দাম কানাকড়িও নয়। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী ব্যাপারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন একটি অনিবার্য কর্ম সুতরাং এ সংবাদ [illegible]"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

আমেরিকা হইতে ৭২ জন বর লইয়া একটি জাহাজ ছাড়িয়াছে। জাহাজটি লণ্ডনে পৌঁছিলেই তাঁহাদের বিবাহ হইবে। —"কোলকাতা হলে এই উপলক্ষে মস্ত মিষ্টির বাজারে [illegible] সেন্ট হয়ে যেতো"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এই কৃষ্ণচূড়া

রাজলক্ষ্মী দেবী

যদি এই কৃষ্ণচূড়া না থাকতো, তাহলে জগৎ
এতোটা সুন্দর, সুস্থ হতো কি? পুরোনো সে শপথ
ভুলে গেলে তুমি আমি কারো আজ নেই কোনো ক্ষতি—
তবু মনে আছে বলে পৃথিবী অগাধ ইচ্ছামতী

যদি এই কৃষ্ণচূড়া থরোথরো ইচ্ছা নিয়ে জেগে
আবার রঙিন হয় আবীর মাখাতে গিয়ে মেঘে—
এতোকাল পরে সেই আবেগের নেই কোনো মানে;
—তবু কেন স্বপ্ন,—কেন শোভা—সখী কৃষ্ণচূড়া জানে।

প্রতীক

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাটা দুপুর গঙ্গাফড়িঙের পিছনে পিছনে
হাওয়া ছুটোছুটি করে। শূন্যে শূন্যে যোগিয়ার সুর
সংহত হয়েছে ওই একপাশে পরম নির্জনে,
নিসিন্দা গাছের নীচে স্বপ্নভারাতুর।

সুপ্তির অন্তরে স্মৃতি, ছবির রেখায় বহ্নি জ্বলে।
বাসনা বেদনা দিকে দিকে
সুরে সুরে ক্ষুব্ধ হয়। দেখ মহামৌনকে সকলে
বিচিত্রিত করে ওই অফুরন্ত স্পন্দিত প্রতীকে!

রূপকথা

আরতি দাস

থৈ থৈ সায়রের জলে
আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ডুবে আছে অনেক অতলে।
হয়ত হতেও পারে, হয়ত এ একেবারে মিছে
তবুও রয়েছে পথ থৈ থৈ সায়রের নীচে।

সেই পথ নিরালা নিঝুম
শহরের মাঝখানে দুই চোখে ঘুম
পড়ে থাকে। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজায়
দূরে কেউ। রোদ গেছে নারকেল গাছের মাথায়।
জলের অতলে ডুবে জল সিঁচে সিঁচে
যদি যেতে পারো কেউ
দেখবে এসব কথা নয়, নয় একটুও মিছে,
সে শহর জলে ডুবে গেছে
বাড়ি ঘর মাঠ ঘাট নদীতে ঝোলানো সাঁকো
[illegible] সব জলে আছে।
চারিদিক নির্জন, ফাঁকা
সে শহরে নেই কেউ
একেবারে নিঃঝুম একা।

সারাদিন খুঁজে খুঁজে বন্দরে যদি ফেরো আজ
দেখবে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল মস্ত জাহাজ
নাবিকেরা নেই কোনো যাত্রীও আসবে না ভুলে
বহুদূর থেকে ঢেউ ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো হয় সেই উপকূলে
সে শহর নিঃঝুম
সে পথের চোখে ঘুম
ঘাস গাছ রোদ্দুর ভরা ফলে ফুলে
এই সবই ডুবে আছে সায়রের জলে
সায়রের জলে আর থৈ থৈ মনের অতলে।

শীতল নিবাসের সংগে কিন্তু আমার একটা বড় বেদনাদায়ক স্মৃতি জড়িত। ১৯৫৩ সালের কথা। এভারেস্ট বিজয়ী ব্রিটিশ দলকে শীতল নিবাসে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানর উৎসব। সন্ধ্যায় সম্বর্ধনা শুরু হল। ভারতীয় অভারতীয় সব সংবাদদাতা নিমন্ত্রিত। সম্বর্ধনা মানে ককটেল। মদের অফুরন্ত ব্যবস্থা। হাসি ঠাট্টা, চটুল আনন্দে মেশায় নিমন্ত্রিতরা মশগুল। অতিথিবৎসলা দূতাবাসের সেক্রেটারী-পত্নীরা তৎপর। সবে পাহাড় থেকে নেমেছি। দেশের খবর কমই জানি। আমাকে এক পাশে ডেকে একজন বন্ধু বললেন, শুনেছ আজ সকালে অল ইণ্ডিয়া রেডিও বলেছে, শ্যামাপ্রসাদ মারা গেছেন। মৃতদেহ কলকাতায় আনা হচ্ছে।

শুনে আমার অবসন্ন দেহ শোকে দুঃখে কাঁপতে লাগল। শ্যামাপ্রসাদ চলে গেলেন। বাংলাদেশের ভারতীয় নেতৃত্ব সেই যে পংগু হ'ল, এখনও কি তার পূরণ হয়েছে? কিন্তু ছিলেন না হয় শ্যামাপ্রসাদ বিরোধী দলের নেতা, নিঃসংশয়ে তিনি প্রখ্যাত ভারতীয়। আদর্শের সংগ্রামে বিরোধী দলের মধ্যে বন্দী অবস্থায় অকালে প্রাণ বিকিয়ে দিলেন। তাঁর মৃত্যুদিনে দূতাবাসের উৎসবটা শেষ মুহূর্তেও বাদ দিলে প্রোটোকোলের কতটুকু ক্ষতি হ'ত। যদি সম্বর্ধনাটা থাকতই বা, উৎসবের মাত্রাটা কমালে সেদিন কি ছিল, আজও সে প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

শীতল নিবাসে নেহরুর প্রেস কনফারেন্সের ১৪ দিন পরে কাঠমাণ্ডুতে আবার এলাম নেপালের নূতন প্রজাতন্ত্রী শাসন-তন্ত্র প্রবর্তন ও গণভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রতিনিধি সভার উদ্বোধন উৎসবের খবরের জন্য—'নেপাল কোন্ পথে?' এর উত্তরের চেষ্টায়।

ফিরে এসেছি চঞ্চল মন নিয়ে। ৪টি দিন ধরে প্রতি বিরোধী দলের নেতা—ডাঃ কে, আই, সিং (ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক পার্টি), জেনারেল রাণা মৃগেন্দ্র সামশের (গুর্খা পরিষদ), শ্রীতুলসীলাল অমাত্য (প্রতিনিধি সভার কম্যুনিস্ট দলের নেতা)। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা এবং তাঁর ভাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালার সংগে স্বতন্ত্রভাবে দেখা করে একটি প্রশ্নেরই উত্তর চেয়েছি,—প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সফর কি ভারত-নেপাল সম্পর্ককে উন্নত করতে সাহায্য করেছে? একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালা মনে করেন, নেহরুজীর সফরে লাভ হয়েছে—"many doubts have been dispelled." অনেক সন্দেহ সাধারণ লোকের মন থেকে দূর হয়েছে। কিন্তু আর সবাই বলেছেন একবাক্যে, যদিও আলাদা আলাদা সময়ে, যে, নেহরুজীর সফর রাজনৈতিক সফর হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে। ডাঃ কে আই সিং-এর ভাষায়, "It has been a total failure." এদের রাগ, অভিমানও বলা যেতে পারে, শ্রী নেহরু বিরোধী নেতাদের সংগে কোনও আলোচনা করেননি—ভারত সম্পর্কে নেপালী জনগণের এক বিরাট অংশের মন জানতে।

এদের সামনে নালিশ নিবেদন করেছি—নেহরুজী নেপাল সরকারের অতিথি। নেপালের প্রেসে নেপাল সরকারই স্থির করেছেন—কার সঙ্গে দেখা হবে না হবে তাঁরাই স্থির করেছেন। যদি উনি প্রতিটি নেতাকে ডেকে ডেকে আলাপ আলোচনা করতেন তবে সমালোচনার [illegible] হয়ত political bossing [illegible] করতে এগোতেন।

এর উত্তরে কে আই সিং বললেন—'মোটেই না। নেহরুজী রাজকীয় নিমন্ত্রণে এসেছেন—মন্ত্রিসভার বা সরকারের নিমন্ত্রণে নয়। সরকার [illegible] নেপালী কংগ্রেসের [illegible]—প্রধানমন্ত্রীর [illegible] নেহরুজী কি [illegible] আলোচনা করতেন না?'

তবু অবশ্যই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ভোজসভায় বহু নেতাই নিমন্ত্রিত ছিলেন। কোন নেপালী নেতাই বাদ পড়েননি। তবে সেটা পার্টি [illegible], ডিনার, ঘরোয়া আলোচনা নয়।

ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক নেপালী-দের। ভাবের ঘরের লোক। [illegible] হয় কি—মন্দির রাস্তা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দেখলাম নেহরুজী তাঁর পাশে মহারাণী। রাণীর পাশে মহারাজ রাত্রে ১১ পর্যন্ত ডিনার খেলেন, অন্যান্য [illegible] তখন সকলে ডাকার অবস্থা ছিল বলেই যেন দেখলাম, ভালই খেলেন। আমরা নেহরুজীর বক্তৃতা ও শ্রী কৈরালার উত্তরের প্রতিটি বাক্য গলাধঃকরণ করে টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটলাম।

গভীর রাতে আমাদের অভিযান শেষ হল। ভোর হতে না হতে দেখি, এক বন্ধু হন্তদন্ত হয়ে আবার টেলিগ্রাফ অফিসে ছুটেছেন। কী ব্যাপার, কিছু ফেল করল নাকি? মুখ দেখে তো তা মনে হয় না। বললেন, আগের দিন রাতের একটা ভুল শুধরে দিয়ে আরেকটা টেলিগ্রাম করতে ছুটেছেন। ছোট্ট একটি ইংরাজী অক্ষরের ব্যাপার—অথচ তাই নিয়ে দু রাজ্যের মহারাণী, প্রধানমন্ত্রী বিশ্রীরকমভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী কৈরালার বক্তৃতা বিবরণ পাঠাতে গিয়ে বন্ধুটি আগের দিন রাতে লিখেছিলেন "..........Koirala said at dinner by Nehru proking Queen Nepal" রাজা ও রাণীর সম্মানার্থে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দেয়া নৈশভোজে শ্রী কৈরালা বললেন......" প্রেস টেলিগ্রামে শব্দ বাঁচাবার জন্য for-এর বদলে pro একটা prefix হিসাবে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। proking ব্যবহৃত হয়েছিল for king-এর বদলে। কিন্তু কপাল দোষে টাইপ করবার সময় proking-এর r অক্ষরটি বাদ পড়ে যায় আর কথাটি দাঁড়ায়—Koirala said at dinner by Nehru poking Queen Nepal—অর্থাৎ রাণীকে খোঁচাতে নেহরু যে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন তাতে কৈরালা বললেন—"

আমরা শুনেছি নেহরুর পাশেই বসেছিলেন মহারাণী।

দু দিন পরে আবার কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে [illegible] আমাদের মহারাণী poked [illegible] প্রধানমন্ত্রীর [illegible] এবং না [illegible] poked [illegible] নেপালের [illegible] একটি অংশ।

[illegible] ভারতবিরোধী [illegible] নেপালী [illegible] নির্বাচন করে [illegible] ভারতের বিরুদ্ধে [illegible] নতুন উস্কানিতে ভাঙন আসর জমানোর চেষ্টা করছে।

ওদের ভাঙন আসর হয়তো আর জমবে না কখনই। কিন্তু অনেক নেপালীর মন ভাঙাতে ওরা সমর্থ হয়েছে। ●

হিমালয়ের পাদদেশে, ভারতের অতি বন্ধুরাষ্ট্রে বৈদেশিক নীতি নতুন অগ্নি-পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে। নেফা থেকে [illegible] লাদাখ থেকে নেপালে যাতায়াতে গত ৩ মাসে এই কথাই বারবার মনে হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর এই ১২ বছরে আমরা নেপাল, সিকিম, ভুটান—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এইসব বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে অনেক অঢেল অর্থনৈতিক সাহায্য করে আসছি। নেপালের অর্থনৈতিক দুর্দশায় আমাদের অবদান প্রায় অনবদ্য—অপরিমিত। আরও অনেক নতুন সাহায্যের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।

দেবার ব্যাপারে আমাদের ভাবটা যেন "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।"

খুব ভাল কথা।

তবে এখন ভাববার সময় এসেছে। আমাদের এই নীতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের বদলে অপরপক্ষ যেন শেষের কবিতার শেষ কথাটুকু স্মরণ করিয়ে না বলে—

"হে বন্ধু, বিদায়।"

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগ্রাফ লেখক কর্তৃক গৃহীত]

রাণা ও রাজপরিবারের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে শ্রীনেহরু

নেপালের নূতন শাসনতন্ত্রের সূচনায় মহারাজা মহেন্দ্র তাঁর বাণী পাঠ করছেন

বিনিময়ে তাঁদের কর্তব্য করে যান এবং সবই যেখানে চলে, সেই বাজারে এসব মালও পড়ে থাকে না।

অবস্থা যখন এইরকম, তখন বাংলা গানে নতুন প্রতিভার বিকাশ কিভাবে ঘটতে পারে, সেইটা ভেবে দেখাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। বস্তুত গত পনের ষোলো বৎসর যাবৎ বাংলার সংগীতে নতুন এবং সার্থক কম্পোজিশনের চেষ্টা খুব কমই হয়েছে। কেউ কেউ হয়ত এমন গান রচনা করেছেন, যা যথার্থই সুন্দর অথবা এমন গীতি-প্রবন্ধাদির পরিকল্পনা কোন কোন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি করেছেন, যেগুলি নিঃসংশয়ে মহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু সামর্থ্য বা পৃষ্ঠপোষকের অভাবে তাঁরা তাঁদের শিল্পকে সর্বসমক্ষে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। কিন্তু, ব্যর্থকাম হয়ে পেছিয়ে থেকে চলবে না, সংগীত রচনার ব্যাপারে সৌখিন সম্প্রদায়কে আবার এগিয়ে আসতেই হবে, নইলে আমাদের সংগীতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সংগীত যাঁদের সাধনার জিনিস এবং সঙ্গীতকারের শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মন যাঁদের পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে, তাঁদের সৃষ্টি পেশাদার প্রতিষ্ঠানের গতানুগতিক সৃষ্টির চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হতে বাধ্য এবং এইসব শ্রেষ্ঠ গীতি-কলাকে আবিষ্কার করে প্রেরণা দ্বারা তুলে ধরা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। একমাত্র এই উপায়েই বাংলা গানকে প্রকৃত রসজ্ঞ সমাজের উপযুক্ত করে তুলতে পারা যাবে। বাধা দুস্তর একথা ঠিক, কিন্তু সে বাধাকে অতিক্রম না করতে পারলে উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে আধুনিক নাট্য জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে, তার কথা স্বতই মনে আসে। থিয়েটারের অবনতি যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তা কারুর অবিদিত নেই। এই অবনতির প্রধান কারণ নাট্য জগতে প্রতিভার অবনতি। আমাদের সৌভাগ্য যে এই অবনতির চরম যুগে এমন কয়েকজন প্রতিভাবান নাট্য-শিল্পীর উদ্ভব হল, যাঁদের বলিষ্ঠ পরিকল্পনায় নতুন সৃষ্টির নতুন আলোকের সন্ধান পাওয়া গেল। সামর্থ্যের অভাবে তাঁদেরও কম দুর্গতি ভোগ করতে হয়নি এবং এখনো হচ্ছে, কিন্তু অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে তাঁরা জনগণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। অচিরে বাংলার রংগমঞ্চ তাঁদের দখলে আসবে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই অভিযান সার্থক হতে পেরেছে, কেননা, এর মূলে রয়েছে উপযুক্ত প্রতিভার সংযোগ। আধুনিক যুগে প্রতিভাবান সংগীত-শিল্পীদেরও ঠিক এইভাবেই এগিয়ে আসতে হবে। নিজের পথ তাঁরা নিজেরা প্রস্তুত করতে থাকুন, নতুন শিল্পী উদ্ভাবন করুন এবং তাকে সার্থকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে থাকুন। প্রথম প্রথম কনসার্ট দিতে তাঁদের হয়তো বেগ পেতে হবে জানি, কিন্তু প্রতিভার স্বাক্ষর কখনো মুছে যাবার নয়, নিষ্ঠা ও সততা থাকলেই সঙ্গীতকারের শিল্প সম্পদ জনগণের গ্রহণীয় হবে—একথা নিশ্চিত বলা যায়। কিন্তু যে ভুল একবার করা হয়েছে, সে ভুল যেন দ্বিতীয়বার না ঘটে, অর্থাৎ সংগীতের অর্থকরী দিকটাই যেন সর্বপ্রধান না হয়ে ওঠে—তার আর্টের প্রাধান্য যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ক্ষুণ্ণ না হয়।

এই প্রসঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কথা স্বতই মনে আসে। এইটিই একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান, যা ব্যবসায়ীদের করায়ত্তগত নয়। সংগীত সম্পর্কে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা রেডিও প্রতিষ্ঠান যথেষ্টভাবে দিতে পারেন। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে চলেছে, তাঁরা সেই নিয়মে না চলে অনুসন্ধান করে প্রকৃত প্রতিভাবান শিল্পীদের সুযোগ দিতে পারেন। এটা কিভাবে করতে হবে সেটা তাঁরাই ভাল বোঝেন, কেননা, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ধারাটা তাঁদেরই হাতে ন্যস্ত আছে। এই নির্বাচনের দায়িত্বটা যাঁদের হাতে, প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের [illegible] সমর্থ হলেন। রেডিও প্রতিষ্ঠানের [illegible] যদি নতুন নতুন শিল্পী তৈরি হন, এবং সংগীতে নতুন এবং সার্থক সৃষ্টির প্রচলন হয়, তবে তার চেয়ে দেশের দিক থেকে ভাল কিছুই হতে পারে না।

আর একটি কথা—শুধু শিল্প-সৃষ্টিই নয়, আমাদের সংগীতশিল্পের স্বরূপ নির্ণয় করে সেটি বাঁচিয়ে রাখবার ভারও বিবিধ সংগীত প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন শিল্পীরাই অগ্রসর হয়েছেন, এটা সুখের বিষয়, কিন্তু এ-কাজটি আরও ব্যাপকভাবে হওয়া আবশ্যক। বাংলা গানের ঐতিহ্য রক্ষার কোন ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত হয়নি। প্রাচীন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিবিধ বাংলা গানের কোন স্বরলিপিই নেই—অতএব বাংলা গানের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তরুণ সম্প্রদায় গ্রহণ করতে অসমর্থ। এই উপলব্ধির অভাবেই তরল সংগীতের চটুল বৈচিত্র্যগুলিকে বাজার ক্ষেত্রে প্রকৃত সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকৃত সংগীতবোধ যত জাগ্রত হবে, ততই বাজারের কৃত্রিম গানের চাহিদা কমে আসতে থাকবে এবং সার্থক শিল্প সম্বন্ধে ঔৎসুক্য বেড়ে উঠবে।

হয়ে কোন্ মুখে বিলেতে আসতে না আসতে খদ্দর ছেড়ে একেবারে পুরোদস্তুর "বিলিতি বাঁদর" সাজি? আমার হাতে অবশ্য প্রচুর টাকা ছিল—মেজমামা জমা ক'রে দিয়েছিলেন লয়েডস্ ব্যাঙ্কে। আমি খরচও করতাম দু'হাতে—কিন্তু বই কিনেই বেশি—তার পরে বন্ধুবান্ধবদের খাইয়ে ও থিয়েটারে তাদের নিয়ে গিয়ে। বেশভূষায় আমি উদাসীনই ছিলাম খানিকটা—আরো সত্যেনের প্রভাবে—যে চুল আঁচড়াতেও ভুলে যেত। শৌখিনবাবু তবু নাছোড়বান্দা। শেষে কী করি, একটা সাদামাটা নীল সুট তৈরি করলাম—কিন্তু ড্রেস সুট—নৈব নৈব চ। সাড়ে তিন বৎসর বিলেতে আমি দু-তিনটি সুটেই চালিয়ে দিয়েছিলাম, একথা বললে সত্যের একটুও অপলাপ হবে না। কাজে কাজেই নাইট ক্লাবেও আমার যাওয়া হয় নি। তাছাড়া তখন নাইট ক্লাব বলতে কী বোঝায় সত্যিই জানতাম না। শৌখিন বাবু যে বর্ণনা দিলেন শুনে একটু অবাকই হলাম; কারণ অনেক ইংরাজী নভেল পড়া থাকলেও নাইট ক্লাবের বর্ণনা কোন নভেলে পড়ি নি তখন পর্যন্ত। তাই ও'র কাছে নাইট ক্লাবের বর্ণনা শুনে ঔৎসুক্য জাগা সত্ত্বেও কেমন যেন ভয় খেয়ে গেলাম, মাঝে মাঝে ড্রেস সুট তৈরি করিয়ে সে হররার রসাতলে যেতে ইচ্ছে হলেই মনে পড়ত সুভাষের কথা: "আগুন নিয়ে খেলা ভাল নয়।" তাছাড়া দুদিন বাদেই সুভাষ এল ব'লে—তার চিন্তায়ই তখন আমার মন ভ'রে আছে কানায় কানায়—নাইট ক্লাবের হাত-ছানির সাধ্য কতটুকু? একটু উস্কে দিলেই প্রলোভনের চিন্তাচরেরা মানুষ হার।

ঠিক এই সময়ে লণ্ডনে আমার দ্বিতীয় প্রথম বন্ধু—তাই বলি তার কথা।

তার নাম রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সাথে আমার খানিকটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও ছিল—এইভাবে: আমার কোন মায়ার বিবাহ হয়েছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ভবশংকরের সাথে। রবি ছিল স্যার সুরেন্দ্রনাথের নাতজামাই। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও ভবশংকর আমার বিলেত যাবার আগেই লণ্ডনে এসে পড়ে রবিকে বলেছিলেন আমার দেখাশুনো করতে। ১৯১৮ সালে আই সি এস পাশ করে রবি সে সময়ে লণ্ডনে [illegible]

[illegible]

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] পারেন না ও কোন ইউনিভার্সিটি কলেজের পাঠ [illegible] না হোক [illegible] ধীরে ধীরে অধঃপাতে যান। তার কাছে এই [illegible] ছলনার নানা রোমহর্ষক কাহিনী

শুনে প্রথম প্রথম আমার মনে হ'ত যে, ও বাড়িয়ে বলছে; কিন্তু পরে নানা সূত্রে এদের কীর্তিকলাপের কিছু-কিঞ্চিৎ চাক্ষুষ করার পরে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, এ বিষয়ে সে ছিল নির্মোহ সত্যদ্রষ্টাই বটে।

কিন্তু এ-চৈতন্য আমার একদিনে হয় নি, হয়েছিল ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, এক এক করে নানা সরল স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পরে। তবে আমি যখন বেদনা বোধ করতাম, রবি সাগ্রহে হেসে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলত: "তুমি আজো অত্যন্ত ছেলেমানুষ আছ দিলীপ, কিছু মনে কোরো না।" আমি এতে রাগ করতাম; কিন্তু যখন বিলিতী মেয়েদের নানা অভাবনীয় কীর্তিগাথা দেখে চমকে উঠতাম, তখন মানতে হ'ত বৈকি যে,

রবি মিথ্যে বলে নি। তবে বার বার এ-জাতীয় ড্রামার চমকে চোখ-ফোটার পরে শনৈঃ শনৈঃ আমার কেমন যেন অবিশ্বাস এসে যায় তথাকথিত রোমান্সে—যাকে বই পড়ে মনে হত অতি উপাদেয়। কীভাবে আমার চোখ ফোটে তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি একটু পরেই একটি নাটকীয় ঘটনার অবতারণা করে, কিন্তু তার আগে রবির সম্বন্ধে আর একটু ব'লে নিই।

সুভাষ লণ্ডনে এসে পৌঁছবার আগে আমি সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতাম রবির স্নেহসঙ্গে। কত রাতের পর রাত প্রশস্ত বিছানায় শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলেছে রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত—যতক্ষণ না ঘুমে আমাদের চোখ জড়িয়ে এসেছে। তার পর আবার সকালে উঠেই প্রাতরাশের টেবিলে জের টেনে চলা গত রাতের কথালাপের। নিবান্ধব দেশে হঠাৎ বন্ধু পেয়ে কী আনন্দ যে পেতাম সে বলে বোঝাতে পারব না! মহানন্দের আর একটা কারণ—রবি বিলিতী সভ্যতাকে সত্যিই ভালবেসেছিল ব'লে ইংরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে তার খানিকটা অন্তর্দৃষ্টিও জেগেছিল বলব। কিন্তু জাগলে হবে কি, বিলিতী সভ্যতা যে ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার এই সাহেবী মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারতাম না। কেবল তার একটি কথা আমাকে সত্যিই ভাবিয়ে দিয়েছিল সে প্রায়ই বলত: "একটু চোখ চেয়ে দেখতে শেখ দিলীপ, এরা সভ্যতার নানা টেকনিককে আবিষ্কার করে কীভাবে এগিয়ে গেছে। তাই তো বলি এদের কাছ থেকে এই এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটা আমাদের আয়ত্ত করাই চাই।"

আমি ঠুকতাম: "কিন্তু তাই বলে অনুকরণ?"

রবি বলত রেগে: "এসব বুলি ছাড়ো। অনুকরণ আবার কী? দেশলাই যে জাত প্রথম আবিষ্কার করেছিল সে-জাত কিছু শীলমোহর করে সে আবিষ্কারকে পেটেণ্ট স্বত্ব নেয় নি। মানুষ যেখানেই প্রগতির মুখে যা কিছু উপলব্ধি করেছে, সে উপলব্ধির শরিক হয়েছে সব দেশের মানুষ। গ্রীকরা তাদের সভ্যতায় যা যা আবিষ্কার করেছিল তার জের টেনেই না রোম থেকে ফ্রান্স, ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড, ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা বড় হয়ে উঠেছে। তুমি আজ হ্রদের মধ্যে একটি ঢিল ফেললে একটি বিন্দু পরিমাণ স্থানে, কিন্তু সেই আঘাত বৃত্তাকারে ছড়াতে ছড়াতে শেষকালে কোথায় যে ঠেকবে বলতে পারো আগে থেকে?"

রবির এই কথাটি আমি আজো ভুলি নি। এমনিতর আরো অনেক ভাবের কথাই ও গুছিয়ে বলত, যা আমার আজ মনে নেই।

না থাকুক, তার কাছে ঋণ আমার অবশ্য স্বীকার্য—তার সঙ্গে নানা বিষয়ে মতে না মেলা সত্ত্বেও। কারণ তার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে আমি একটা পুরোনো সত্য যেন আবার নতুন করে উপলব্ধি করি: যে স্নেহ প্রীতি যেখানে স্বতঃ-উৎসারিত, সেখানে [illegible] ধরে দেখিয়ে দিতে আসে না। তার উপর সে সময়ে [illegible] ও [illegible], কেবলই মনে পড়ত বেকনের একটি প্রবচনের উক্তি:

"A crowd is not a company, and faces are but a gallery of pictures, and talk but a tinkling cymbal when there is no love."

রবিই আমাকে সবপ্রথম [illegible] সহজ প্রীতির ডাকে কাছে টেনে নিয়ে ভরসা দেয়, নির্দেশ দেয়, চোখ খুলে দেয়। তার শরীরের অভিজ্ঞতার [illegible] লণ্ডনের অনেক কিছুই আমাকে চিনিয়ে দিত। সেই দিনের পর দিন [illegible] থিয়েটার, মিউজিক হল, ন্যাশনাল গ্যালারি, রিজেন্ট পার্ক, হ্যাম্পস্টেড হীথ, হ্যাম্পটন কোর্ট, ব্রিটিশ মুসিয়ম, [illegible], পিকাডিলি, হোয়াইটচ্যাপেল—সর্বোপরি লণ্ডনের টিউব ট্রেন বাস প্রভৃতি উপভোগে আমার মনে হত যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিন দেখিয়ে চলেছে অঘটনের পর অঘটন—কিন্তু এ-সব চমক তো ক্ষণিকের—কাজেই আসতেও যেমন যেতেও দেরি নি—ওতে কি আর স্নেহবুভুক্ষুর মন ভরে?

আমি জোর করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয় আমার উপবাসী অসহায় অবস্থা দেখেই রবির মন গলে উঠেছিল "আহা"! নৈলে সে হয়ত নানা সময়ে তার পড়াশুনো ও কাজকর্ম রেখে আমাকে তার স্নেহসঙ্গ দিয়ে সাবধান করে দিত না, নানা বিষয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত না—কত রকম ফ্যাড-ফ্যাশনে লণ্ডনে সভ্য-ভব্য বেশ পরে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া

নানাভাবে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে তার যেন আরো মায়া পড়ে গিয়েছিল আমার 'পরে, তাই বলত প্রায়ই ইংরাজী প্রবচনের বাঙলা তর্জমা ক'রে: "মনে রেখো হে, সংসারে যা চকচক করে, তা-ই সোনা নয়।" সে সময়ে ঠিক এমনি একটি দিশারিরই আমার দরকার ছিল। এ-ও আমার জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—যা বারবারই ঘটছে—নানা বিধুর অসহায় ক্ষণেই এগিয়ে এসেছেন নানা অভিভাবক ওরফে রক্ষাকর্তা—একের পর এক যাকে ভগবানেরই করুণা ব'লে চিনতে আমাকে কোনদিনই বেগ পেতে হয় নি।

এবার বলি ড্রামাটির কথা। নামগুলি গোপন রাখতেই হবে, কারণ সহজেই অনুমেয়।

এ-নাটকের সব-কুশী তিনজন: নায়িকা ইংরাজ তরুণী, নায়ক দুটি বাঙালী যুবক। যথাক্রমে নাম দেই ডোরা দেবী, গম্ভীরবাবু ও শৌখিনবাবু—যাঁর কথা একটু আগেই বলেছি।

ঘটনাটি কিছু নতুন নয়—সেই চিরকেলে ত্রিকোণ—একটি মেয়েকে নিয়ে দুদিকে দুজনের টানাটানি। কিন্তু পরিস্থিতিটি দাঁড়িয়েছিল একটু চমকপ্রদ ভঙ্গিতেই বলব। ফেনিয়ে বলতে সাধ যায়, কিন্তু কাহিনী সামুলি ব'লে যথাসম্ভব কাটছাঁট করব।

গম্ভীরবাবুর গাম্ভীর্যের সীমা ছিল না। রবি তাঁকে নিয়ে খুবই হাসাহাসি করত। গম্ভীরবাবু অসামান্য ভারিক্কি হওয়া সত্ত্বেও তাকে একটু সমীহই করতেন—আই সি এস যে, সমীহ না ক'রে উপায় কি? কিন্তু আমাকে তিনি ভারিক্কি চালে নানা উপদেশ দিতেন বিলিতী কেতা সম্বন্ধে। ওদিকে মুখফোঁড় রবি কথায় কথায় ফোড়ন দিত তার সব বক্তৃতাকেই—"ডোন্টু টক থ্রু ইওর হ্যাট" ব'লে। গম্ভীরবাবু ধমক খেয়ে আরো গম্ভীর হয়ে যেতেন, কিন্তু আমাকে নিরীহ দেখে চাইতেন তার কবল থেকে মুক্ত ক'রে নিজের মুঠোর মধ্যে করতে। কিন্তু এবার বিষ্কম্ভক থেকে নাট্যলোকে অবতরণ করবার সময় এল।

একদিন ক্রমওয়েল রোডে ভারতীয় আবাসে আমার গান হল। শৌখিনবাবু যথাবিধি সজোরে হাততালি দিলেন। ভবশংকরও ছিল সে সভায়। সভা শেষ হ'লে ভবশংকর তাঁকে নিমন্ত্রণ করল তাদের এক্‌ওয়ার রোডের সুরম্য ফ্ল্যাটে।

শৌখিনবাবু সাক্ষাৎ স্যার সুরেন্দ্রনাথের পুত্রের নিমন্ত্রণ পেয়ে আরো প্রসাধন ক'রে ড্রেস স্যুট প'রে এসে হাজির। গম্ভীরবাবুও ছিলেন সেখানে। দুজনের দেখা—যার ফল হ'ল সুদূরপ্রসারী। তিনি নিমন্ত্রণ করলেন আমাকে ও শৌখিনবাবুকে।

বললেন: "আমি আছি একটু চমৎকার গ্রামে—লণ্ডন থেকে দশ-বারো মাইল। আসুন না সেখানে একদিন। আমার ল্যান্ডলেডি চমৎকার রাঁধেন।" আমি যাব ব'লে ধন্যবাদ দিয়ে শুধালাম: "লণ্ডন ছেড়ে গ্রামে থাকেন কেন?" তিনি আরো গম্ভীর হয়ে বললেন: "নিরালা কি না—পড়াশুনোর সুবিধে।" কিন্তু রবিকে এসে বলতেই সে হেসে বলল: "জানি হে সেখানকার কাণ্ড। ও পড়াশুনো কিছু করে না। থাকে সেখানে শুধু ডোরার জন্যে।"

(বলা বাহুল্য ডোরা ব'লে যাকে ডাকছি তার আসল নাম ছিল অন্য।) ডোরা গম্ভীরবাবুর বন্ধ্যা ল্যান্ডলেডির মেয়ে। অতি-তরুণী, অতি-চপলা, অতি-প্রফুল্লা—সবই অতি, কেবল সৌন্দর্যে নয়। না, সে মোটেই সুন্দরী ছিল না। তবে যৌবনের উল্লাসে অনেককেই টানবার মতো সিদ্ধি-লাভ করেছিল। এসব কথা রবির কাছেই শুনেছিলাম ড্রামাটি ঘোরালো হয়ে ওঠার পরে।

হ'ল কি, আমি একবার সেই গ্রামে গম্ভীরবাবুর আতিথ্য স্বীকার ক'রে তার নিমন্ত্রণ রবিকে। সেও এসে রইল কিছু-দিন আমাদের সঙ্গে। সে কী যে খুশী! আরো খুশী ডোরা। রবিকে সে সত্যই পছন্দ করেছিল। কিন্তু রবি তার দিকে ফিরেও তাকাত না। সে ছিল চিরন্তন প্যারিস—উচ্ছল ডোরার না ছিল বুদ্ধির সম্পদ, না রূপের চটক। "শুধু মাংসের আকর্ষণ আমার জন্যে নয় দিলীপ," বলত রবি প্রায়ই হেসে। ইংরাজী নানা ইডিয়মও এইভাবে তর্জমা ক'রে আমাকে বলে হাসাত: "নির্বোধের নন্দনে আছে"—living in fool's paradise. —বলত শৌখিনবাবুর সম্বন্ধে। কবরের মতন কাঙাল—তুমি আজ কি গ্রেভ—

করে উঠল বজ্রী বাসব, 'চিকিৎসক বৈদ্যকে সোমার্হ করলে নিশ্চয় বজ্রাঘাত করব আমি।' ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না উগ্রতেজা মহর্ষি। মন্ত্রোচ্চারণ করে তিনি সোমপাত্র উত্তোলন করলেন। উদ্যত হল ইন্দ্রের অশনি। কি ভীষণ সে বজ্র! দধীচি মুনির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্র, কোটি সূর্যের মত সমুজ্জ্বল, কল্পান্তের মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ঘোর নাদ।'

একটু থামল মহামদ। বিস্মিত, সভীত সভাতল—চোখে নির্বাক কৌতূহলী জিজ্ঞাসা। চকিতে চতুর্দিক লক্ষ্য করে বলে চলল সে, 'মুহূর্তে আশ্চর্য কান্ড সংঘটিত হল। অশনি উদ্যত দেখে রুদ্রতেজা ঋষির নয়নে কোপবহ্নি জ্বলে উঠল। 'তিষ্ঠ'—এই কথা বলে, আমাকে স্মরণ করে ত্বরিতে তিনি হুতাশনে মন্ত্রপূত হবি আহুতি দিলেন।'

'আপনাকে!' বিস্ময়ে প্রশ্ন করল মন্ত্রী, 'আপনাকে কেন?'

সদম্ভ গম্ভীর নাদে সভাতল কাঁপিয়ে বলল মদ-দর্পিত মহামদ, 'আমি তো তুচ্ছ নই। স্বয়ং মহামদ—মহাঘোর, মহাভয়ঙ্কর। সুদীর্ঘ আমার বাহু, বিশাল আমার দেহ—আমি ত্রিভুবন আক্রমণে সমর্থ।'

গর্বিতলোচনে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে। সত্যি অতি বিশাল সে দেহ। গিরিশৃঙ্গের মত সমুন্নত গ্রীবা, অনলোজ্জ্বল নয়ন, বিকট করাল বদন। সে দেহের পরিমাণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা সেই দেহে—মনে হয়, গ্রাম, নগর, জনপদ, দেশ, মহাদেশ, সসাগরা বসুন্ধরা, এমনকি চতুর্দশ ভুবন গ্রাস করেও তৃপ্তি নেই। ভয়ে, নিরুদ্ধনিশ্বাসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সভার সমস্ত দর্শক। দ্রুত বলতে লাগল মহামদ, 'স্মরণমাত্র নিমেষে কোটিযোজন পথ অতিক্রম করে, যজ্ঞশিখায় যজ্ঞপুরুষের মতই আবির্ভূত হলাম আমি। স্তম্ভিত যজ্ঞস্থল—নির্বাক সুরাসুর—স্তব্ধ উদ্গাতা, অধ্বর্যু। নয়নের ইঙ্গিত মাত্র করলেন ঋষি। ক্রোধে আরক্ত হলাম আমি—এত দর্প শতক্রতু ইন্দ্রের! দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে, ঘোর গর্জনে অগ্রসর হলাম বজ্রায়ুধের প্রতি।'

বজ্রবাহু উত্তোলন করে সত্যিই প্রচন্ড গর্জন করে উঠল বলদর্পিত মহামদ—মনে হল, এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল প্রলয়-কালীন সহস্র বজ্র। বিরাট মুখগহ্বরে সিত, তীক্ষ্ণ দশন নীল সমুদ্রশীর্ষে শুভ্র ফেনার মত জ্বলজ্বল করে উঠল, রক্ত শুশুকের মত চকিতে প্রকাশিত হল তার রক্তাভ লোলরসনা। সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করল সভাজন। কবির চোখে দুঃস্বপ্ন। আসন্ন বুঝি যুগান্তের প্রলয়! অট্টহাস্যে সভা সচকিত করে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বলল মহামদ, 'কোথায় ইন্দ্র! কোথায় ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র! স্তম্ভিত বাহু, স্তব্ধ অমোঘ বজ্র। শুষ্ক তালু, বিশুষ্ক রসনা—হা হতোস্মি' বলে করুণ আর্তনাদ করে ঋষিকে লক্ষ্য করে কাতরকণ্ঠে বলল পুরন্দর, 'প্রসন্ন হোন, রক্ষা করুন। আপনার সংকল্প সত্য হোক—দেবতার মতই অশ্বিনীকুমারদ্বয় গ্রহণ করুক হোমের সোমভাগ। দুরন্ত মহামদকে নিবারণ করুন, মহর্ষি!'

'তারপর তারপর!' সাতঙ্ক সহস্র প্রশ্ন। সদাপ পদচাপে ভূমি কম্পিত করে, বিরক্তিভরে বলল মহামদ, 'তারপর আর কি? কামিনীর মত কোমল ঋষির মন! ভীরু অব্যবস্থিত চিত্ত। মুহূর্তে তুষ্টি, মুহূর্তে রুষ্টি। ইন্দ্রের কাকুতিতে ক্রোধশান্ত হয়ে, হস্ত সঙ্কেতে আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন আমাকে। বাধ্য হয়ে নিরস্ত হলাম।'

হতাশায় বাহু সংকুচিত করল মহামদ। দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল কবির। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল সে, 'অসীম ক্ষান্তি মহারাজের! ক্ষমতাবান হয়েও ক্ষমার অবতার।'

'দ্বিতীয় বশিষ্ঠ ইনি'—বলল সভাপণ্ডিত। সদস্যগণ বলল, 'কি রোমাঞ্চকর কান্ড! তারপর কি হল?'

কৌতূহলী সদস্যদের লক্ষ্য করে বলল কবি, 'এর পরেও কি শুনতে চাও এই লোক-শ্রুত কাহিনী? তাহলে আমি বলছি, শোন। আমি কল্পলোকে কল্পনার জাল বুনি,

অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা আমার প্রজ্ঞা। তারপর, মহারাজের এই বিজয় কীর্তি দেখে, স্বয়ং ইন্দ্র এসে তার স-কিরীট মস্তক আনত করল এই রাজচূড়ামণির চরণতলে; চরণ স্পর্শ করতে ভয় পেল পুরন্দর। তার কিরীটের রত্নপ্রভায় কেবল সমুজ্জ্বল হল মহারাজের পাদপীঠের সন্নিহিত ভূমি। স্তুতিতে মুখর হল গন্ধর্ব, চারণ। অপ্সরী আর কিন্নরীদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রাণী, বিহ্বলার মত—

'না, তা নয়'—বাধা দিয়ে ভ্রূভঙ্গী করে উঠল মহামদ। কবি যেন কেঁচো হয়ে গেল। মদঘূর্ণিত লোচনে গর্জন করে উঠল মদোদ্ধত রাজা, 'ইন্দ্রের অর্ধাসন আমি কামনা করি না, তুচ্ছ ইন্দ্রত্ব, তুচ্ছ ইন্দ্রাণীর সেবা। আমি বিস্মিত হলাম চ্যবন মুনির ব্যবহার দেখে। সমুচিৎ এই কর্মের পুরস্কারস্বরূপে তিনি বললেন কিনা, 'আজ থেকে স্ত্রী, পান, অক্ষ ও মৃগয়াসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তোমার অধিকার বিস্তৃত হল। ধার্মিকের নিলয়ে তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। অধার্মিকের হৃদয়ে স্থায়ী হোক তোমার আসন। যাও বৎস, এই অধিকার ভোগ কর।' ঘৃণায়, তাচ্ছিল্যে বিকৃত হয় বিকট আনন। নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে রুষ্ট মহামদ 'ঋষিকাদের স্বার্থপর, সংকীর্ণচেতা ব্রাহ্মণ! মহামদের অধিকার কেবল অধর্মভূমিতে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? মহামদ কি হীনবল? যার আক্রমণে সন্ত্রস্ত ইন্দ্রের বজ্র—

ক্রোধে উন্মত্ত হয় সে। [illegible] ঘূর্ণিত-কুণ্ডের মত চক্ষু, দেহে নির্গত হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-নিশ্বাস। প্রকাণ্ড দেহটা যেন স্ফীত হতে থাকে। মেঘগর্জনের মত স্বর, দেহজ বিস্তৃত বাহু। মনে হয়, মাথা যেন আকাশ স্পর্শ করে। সিংহনাদে বলে মহামদ, 'বিশ্বজগতে সম্রাট আমি, সার্বভৌম সম্রাট আমি। আমার দণ্ড ঋষি-নির্দিষ্ট সীমা থেকে বহুদূর বিস্তৃত। ধর্মরাজকে অতিক্রম করেছি আমি। শান্তি ও সংযম আমার পদতলে অস্থির। গ্রাম নয়, জনপদ নয়, মহাদেশ নয়—সপ্তলোকে আমার অবাধ অধিকার। আমি মন্দমতিকে মদোদ্ধত করি, বিশ্বামিত্রকে স্বর্গভ্রষ্ট করি। আমার পরাক্রমে স্তব্ধ ইন্দ্রের বজ্র। আমার সমান কে?'

'কেউ নয় মহারাজ!' প্রলাপে, হুঙ্কারে মহাকোলাহল ওঠে সভাস্থলে। এমন সময় সমস্ত কোলাহলকে অতিক্রম করে জলদ-প্রতিম স্বরে বাইরে নিনাদিত হয় এক মহা-গম্ভীর নাদ—'অয়মহং ভোঃ'

'কে?'—বিস্মিত প্রশ্ন শেষ হতে না হতে সভায় প্রবেশ করেন প্রবৃদ্ধ মহাকালের মত বিপুলকায় এক বৃদ্ধ। দেখতে অনেকটা মহামদেরই মত। তবে, মহামদ যুবক, ইনি বার্ধক্যভারে ঈষৎ নত; মহামদের গাঢ় রক্তের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এঁর বর্ণ তাম্রাভ; মহামদের রক্তবর্ণ দীপ্ত চক্ষু, এঁর নয়ন কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ; যেন শ্বেতস্ফটিকে একটি ম্লান নীলা। ইনিও মহামদের মত উদ্ধত, দাম্ভিক—তবে ভূয়োদর্শন ও বহু দর্শনের একটা স্থৈর্য এঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। তুলনায় মনে হয়, মহামদ তমোগুণ রজঃ, ইনি রজোগুণ সত্ত্বমূর্তি।

সিংহাসন ত্যাগ করল না গর্বিত মহামদ। মানীর মর্যাদাসীমা লঙ্ঘন করাই তার স্বভাব, মদোদ্ধতায় পাত্রাপাত্র বিচারহীন। বৃদ্ধ এগিয়ে চললেন সিংহাসনের দিকে। বাধা দিয়ে বলল মন্ত্রী, 'ওইখানেই অপেক্ষা করুন, মহারাজ ক্রুদ্ধ হতে পারেন।'

সবিস্ময়ে বললেন বৃদ্ধ, 'এটা কি মহারাজ মহামদের সভা নয়?'

'যারই হোক, এটা এমন একজনের সভা, যাঁর নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মস্তক আনত করে'—গম্ভীরস্বরে বলল মন্ত্রী।

'অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী যাঁর সেবা করে ধন্য হয়'—চটুল বাক্যে বলল কবি। দেব ভাষায় বলল সভাপণ্ডিত, 'যস্য নাস্তি ত্রিলোকে তুল্য।'

'তুই নাকি!' সহাস্যে বললেন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের [illegible] মহামদের দন্তপংক্তির ন্যায় তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু সমুজ্জ্বল। শুভ্র ভ্রূ আকুঞ্চিত করে বললেন তিনি, 'আমি কম নই। আমার তপোবল দিয়ে আমি শত শত বিষ্ণু, শত শত রুদ্রকে নিপাত করতে পারি। সংসার বৃক্ষের আদি মূল আমি।'

'এত স্পর্ধা!' সদম্ভে গ্রীবাভঙ্গী করে বলল মহামদ: 'কে তুমি এমন শক্তিমান? জানো আমার পরিচয়? এ কল্পনা নয়, কাহিনী নয়, ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করেছি আমি।'

'জানো, স্রক চন্দনে এঁকে বরণ করেন স্বয়ং ইন্দ্রাণী?' বলে কবি।

'জানো, অহংকার-মূল বংশের কুল-প্রদীপ ইনি?' বলে সভাপণ্ডিত।

'অহো, তাহলে তুমিই মহামদ!' রাজাকে লক্ষ্য করে সোল্লাসে বললেন বৃদ্ধ। 'তোমাকেই খুঁজছি আমি। আমি তোমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ "অহংকার।"'

'আপনি!' একটু নত হল মহামদ। কবি বলল, 'আগে তা বলতে হয়। মহারাজের হয়ে নমস্কার।' পণ্ডিত বলল, 'স্বাগতম্ সুস্বাগতম্'। মন্ত্রী সসম্ভ্রমে বলল, 'আসন গ্রহণ করুন, পিতামহ।'

আসনে বসলেন প্রবৃদ্ধ অহংকার। বহু-দিন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন তিনি, আজ হঠাৎ ফিরে এসেছেন। কুশল বাচন শেষ করে মহামদকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'সাধু! সাধু! দেখছি বেশ বড় হয়েছ। দ্বাপর যুগের শেষে তোমার জন্ম, তখন

নাশ—আর 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'। মূঢ়ের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উপদেশও তাদের ক্রোধের কারণ। —তবুও শান্তকণ্ঠেই বললেন প্রবুদ্ধ অহংকার, 'ভয়ের কারণ উপস্থিত বলেই আমি এসেছি। তোমার প্রপিতামহ মনের সুমতি নামে যে পত্নী, তিনি ধর্মকুলে আশ্রয় নিয়েছেন। তার বিবেক নামে এক পুত্র জন্মেছে। সেই বিবেকের কন্যা 'পরশ্রী-ভাবনা'। শুনেছি, অতি আশ্চর্য তার রূপ, আশ্চর্য তার শক্তি। বিবেকের সৌন্দর্যলক্ষ্মী, শক্তির মূলাধার 'পরশ্রীভাবনা'—

কথা শেষ হয় না। ক্রোধে জ্ঞানহারা হয় মহামদ। পরের শ্রী-গৌরবে সে অসহিষ্ণু। বিশেষত নিজে কুরূপ, অন্যের রূপ-স্তুতিতে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। নিদারুণ রোষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে থাকে সে। আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান বৃদ্ধ পিতামহ। বহুদর্শী তিনি, বংশের প্রকৃতি তাঁর অজানা নয়। ক্রোধ, পারুষ্য, অবিবেক, হিংসা—প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ মহামদের। অপেক্ষা করলে হয়তো অপমানিতও হতে পারেন, তাই সত্বর বিদায় নিলেন অহংকার, মুখে বললেন, 'আমাদের বংশে দৈববাণী আছে, সুমতি-কুল থেকে কুমতি-কুল নির্মূল হবে। পাপগ্রহ তোমার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে—তোমার পক্ষে এ অতি দুঃসময়। আবেদন রেখো। আশীর্বাদ করি, তোমার মঙ্গল হোক।'

প্রদোষকে যেমন আশ্রয় রেখে যেমন বিদায় গ্রহণ করেন দিনান্তের সূর্য, তেমনি মহামদকে সন্ধ্যা আর কৃষ্ণশ্রীর নিকট মহামদকে রেখে বিদায় গ্রহণ করেন প্রবুদ্ধ অহংকার। ক্রোধে কাঁপতে থাকে মহামদ। তার বিরাট দেহটা আরও বিরাটাকার ধারণ করে, যেন মেঘের ওপর বিদ্যুৎ হয় প্রলয়কালীন মেঘ। রক্ত নয়ন জোড়াটি, ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টি। সেই প্রলয়ংকর নয়ন মেলে সে লক্ষ কোটি যোজন বিশ্বের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

সহসা দূত প্রবেশ করে সীমান্তের দূত, করজোড়ে নিবেদন করে, 'মহারাজ, অশুভ বিপদ। সীমান্তের ধর্মরাজ্যে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে।'

'বিদ্রোহী!'—রক্তলোচনে চেঁচায় মহামদ।

'অকারণে কে বিদ্রোহ, দুর্মদ!'

'অশান্ত! দুর্মদ! আমার ভাণ্ডার শস্যে ঐশ্বর্যে ভরে দিতে পারোনি? রত্ন-মাণিক্য ছড়িয়ে বশ করতে পারোনি তাদেরও?'

'অর্থ বিতরণে ত্রুটি করা হয়নি, মহারাজ! মনে হয় সর্বশ্রী তাদের আয়ত্ত, কুবেরের ঐশ্বর্য তাদের অধিকারে।'

'এতদূর! শক্তিবল কি কম মহামদের? শক্তি প্রয়োগ করতে পারোনি তাদের ওপর?'

'সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হয়েছে, মহারাজ! কোথা থেকে যেন বিশ্বের পুঞ্জিত শক্তি ভর করেছে তাদের ওপর। উল্কার মত জ্বালাময়,

ধূমকেতুর মত গতি, বজ্রের অধিক শক্তি!'

'স্তব্ধ হও'—সিংহনাদে গর্জন করে ওঠে মহামদ। সে গর্জনে শ্রুতিমূল যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। ঈর্ষায় আরক্ত মহামদের অগ্নিময় অক্ষিগোলকে যেন বিস্ফুরিত আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। মদস্খলিত কণ্ঠে বলে সে, 'জানো, কে আমি? কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অন্যের প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করছ সংবাদবাহক?'

কম্পিত কণ্ঠে বলে দূত, 'জানি মহা-রাজ! বিশ্বের মহামদ—মহাভয়ংকর! ত্রিলোক-বিজয়ী শক্তি, ত্রিলোক-আকর্ষণকারী ঐশ্বর্য! কিন্তু তার চেয়েও—

দূতের বাক্য শেষ হয় না। মহাদম্ভে হুংকার করে ওঠে মহামদ, 'আমি দেখব, কত তাদের শক্তি। সৈন্য সজ্জিত কর সেনাপতি, চল, দেখি কত বিদ্রোহীদের তেজ।'

সভা ভেঙ্গে যায়। তুমুল আস্ফালন আর উগ্র কোলাহলে পূর্ণ হয় গগনতল। বন্দীর স্তুতি মিলিয়ে যায় রণদামামার নির্ঘোষে। নিমেষে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে যাত্রা করে চতুরংগ সেনা। সৈন্যদলের পুরোভাগে দুর্মদ মহামদ।

মহামদের রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় তীর্থ-রাজ চক্রতীর্থ। এপারে বিশাল প্রান্তর, ওপারে সেই ধর্মতীর্থ, মধ্যে খরস্রোতা নদী। শম, দম, যম ও নিয়মে শান্তিময় ধর্মনিকেতন। সেখানে মদোদ্ধতা নেই, নেই তামসিক অহংকার। লোভ ও তৃষ্ণা, ক্রোধ ও হিংসা বর্জিত পুণ্যের রাজত্ব। বেদবিহিত আচরণ, ধর্মবিহিত কর্ম, শাস্ত্র-বিহিত নিয়মে প্রতিষ্ঠিত তপস্যাস্থল। সেখানে রয়েছেন—আর্য ব্রহ্মবিদ্যা, দেবী শ্রদ্ধা, রয়েছেন বিবেক, সন্তোষ। গৃহে গৃহে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দেন শান্তি, মিত্রা, অনসূয়া। মহামদ অতিমদে স্ফীত হয়ে এই রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেছিল হেতুবাদী চার্বাক আর ব্যভিচারী কাপালিকের সহায়তায়। আজ সেই অংশ বিদ্রোহী।

মহাদম্ভে বিদ্রোহ দমন করতে এল মহামদ। সৈন্যের কোলাহলে, হয়, হস্তী, রথী, পদাতির 'হুং' হুংকারে পূর্ণ হল আকাশ। এপারে মহামদের অজেয় বাহিনী, ওপারে ধর্মব্যূহ—শান্তিরক্ষায় তৎপর মিত্রা, অনসূয়া, সন্তোষ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হতেই মহামদের সৈন্যদল ধর্মচক্র আক্রমণ করল। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড হয়ে ওঠে অসুর শক্তি। আসুরিক শক্তিই মহামদের। ক্রোধের পীড়নে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শান্তির নীড়। নির্মম, নির্দয় ক্ষমাহীন পীড়ন। হুংকার-গর্জনে হিংসার মত্ততা। প্রান্তর বিদীর্ণ করে উঠল মর্ম-বিদারী আর্তনাদ। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর মহা-মদ। আজ তার কালভৈরবের মূর্তি—ভ্রূকুটি-কুটিল, উগ্র, ভয়াল। রাত্রি যত গভীর হয়, তত তার প্রমত্ত দাপট। অস্থির মস্তিষ্ক। বন্ধনমুক্ত দিগ্‌গজ-মুখে মদান্ধক গর্জন। উন্মাদ মাতাল—ভীষণ তার আকৃতি। শান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—যেন অশান্ত ক্রোধান্ধ কৃতান্ত। সারারাত্রি কালরাত্রির প্রলয়—সংহারলীলায় সংহত সৃষ্টি। চতুর্দিকে মহামদের জয়ধ্বনি। বিপর্যস্ত যেন ধর্ম-রাজ্য—মূর্ছিতা মিত্রা, শান্তির আনন্দ-নীড়ে অশান্ত ক্রন্দন, অশ্রুছলছল অনসূয়ার নয়ন।

কালরাত্রি সুচিরস্থায়ী নয়। রাত্রিশেষে উষার শুভ্র রেখা দেখা দেয় পূব আকাশে। জ্যোতির্ময় সূর্যের অগ্রদূতী উষা—করুণার কমকান্তি, অমৃত ও অভয়ের বাণীবাহিকা। তার চরণে মস্তক আনত করে সমস্ত অন্ধকার। মহাপাপের অন্ধকারের মতই মহামদের সৈন্যদল—উদ্যত বাহু, উন্মাদ উদ্ধত্য। তাদের সম্মুখে ধর্মব্যূহ থেকে এসে দাঁড়াল উষার মত জ্যোতির্ময়ী এক নারী। কাঞ্চনপ্রভায় ভাস্বর অংগ, কুঞ্চিত কুন্তলে মহাকাশের নীলিমা, আয়ত নয়নে সুধাসাগরের পীযূষধারা। নবনীর মত কমনীয় কি স্নিগ্ধ কান্তি! নয়ন যেন জুড়িয়ে যায় মদোদ্ধত সৈন্যদলের। স্তব্ধ মদমত্ত গর্জন, শান্ত অস্ত্র ঝনৎকার, স্তম্ভিত শক্তি—যেন মুহূর্তে মন্ত্রশান্ত সহস্র ভুজংগ।

মহামদেরও কেমন যেন বিহ্বলতা! কিন্তু সে নিমেষের তরে। সৈন্যদলের ক্লীবত্ব তাকে উন্মাদ করে তোলে। আরক্ত নয়নে সে দাঁড়ায় সেই নারীর সম্মুখে, মেঘমন্দ্রে গর্জন করে বলে, 'জানো, বিশ্বত্রাস আমি মহামদ? জগতে অজেয়। ইন্দ্রের বজ্র প্রতিহত হয় আমার তেজে?'

'জানি, জানি বলেই তো এসেছি আমি' —বীণা-নিক্বণ কণ্ঠে বলে বরবর্ণিনী, 'আশ্চর্য তোমার শক্তি, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা! ইন্দ্রের চেয়েও অমিত তেজ, কুবেরের অধিক অমেয় ঐশ্বর্য, বরুণের চেয়েও বিরাট গাম্ভীর্য! তোমার সমকক্ষ কে? তোমার প্রীতে বড় আনন্দ আমার!'

স্ফুরিত মহামদ। মনে মনে সে, স্ফুর্তি-বারে তার আনন্দ। কিন্তু স্তাবকদের মুখেও সে এমন স্তুতিবাদ শোনেনি। তাদের স্তুতি মহামদকে মাতাল করে তোলে, কিন্তু এ স্তুতির এ কি স্নিগ্ধমধুরতা! অরুণ-স্বর্ণ যেমন গৌরীশঙ্কর সীমায় এসে পৌঁছে কঠিন তুষার, তেমনি অবস্থা মহামদের। সে মোহিত হয়ে যায় যেমন সুরের মোহিনী মায়ায়। স্মিত-সস্মিতে বলেন নারী মঞ্জু-ভাষিণী 'তোমার প্রীতি বড় আনন্দ আমার। শুভ্র স্ফটিকের যেমন সূর্য—রশ্মি নীল, জর-দের রঙ গায়ে মেখে, আমার তেমনি সুখ

'পরের ঐশ্বর্য চিন্তায়। কি বিরাট তোমার দেহ, কি বিপুল তোমার শক্তি!'

বিস্মিত হয়ে যায় মহামদ। কে এই মধুর-ভাষিণী? এ কি তার শত্রু? শত্রু যদি, এর নয়নে রোষারুণ কোথায়, রণচণ্ডীর মত অট্টহাস কোথায়, মুহুর্মুহু গর্জন কোথায়? এর নয়নে অশ্রুসজল স্নিগ্ধতা, অধরে ভুবন-ভুলানো হাসি, কণ্ঠে মধুর মঞ্জুভাষা। কেমন যেন মোহগ্রস্ত মহামদ, যেন বাঁশীর মোহন সুরে মুগ্ধ কালফণী।

মৃদারায় ঝঙ্কৃত হয় বীণার তার—কঠিন অথচ সুহাস্য-সম্মিত বাক্যে বলে লাবণ্যময়ী ললনা, 'এত পেয়েও কতটুকু পেলে তুমি? চাওয়ার কি শেষ আছে? মানুষ ইন্দ্রত্ব কামনা করে, ইন্দ্র কামনা করে ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মা কামনা করেন ব্রহ্মলোক। কিন্তু শান্তি কোথায়? তুমি শক্তিমান—শক্তির শেষ সীমা দেখেছ কি? তুমি ঐশ্বর্যশালী—ঐশ্বর্যের শেষ পেয়েছ কি? উগ্র মদ, বিপুল দম্ভ মানুষকে মাতাল করে তোলে—উৎকট পীড়নে পীড়িত সৃষ্টি—

কাঁপতে থাকে বীণার তার। বেদনার অনুরণন। করুণাময়ীর নয়নে চিক্ চিক্ করে অশ্রু। গভীর কণ্ঠে সে বলে, 'দম্ভ, দর্প, অভিমানিতায় জগতে কে স্থির প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে? গর্বিত বলিরাজ, বিশ্ব-ত্রাস রাবণ—বলতে পারো, কার পতন হয়নি? অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পতন, মদের শেষাঙ্ক মৃত্যু।'

কাঁপছে মহামদ। ইন্দ্রের বজ্রমুখে যে স্থির, মঞ্জুভাষিণীর বাণীমুখে সে অস্থির। ভয়ে নয়, ক্রোধে। কি দম্ভ এই সামান্যা নারীর! অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পতন? মদের শেষাঙ্ক মৃত্যু? বিস্ময় দেহ আন্দোলিত করে শিরা উপশিরায় জাগে ক্রোধের প্রথম শিহরণ। সেই শিহরণকে উপেক্ষা করে এবার বজ্রস্বরে ধ্বনিত হয় কোমল নারীকণ্ঠ, 'সব বিফল হয়ে যাবে বীণা, শেষ পরিণাম স্মরণ কর মহামদ। অভিমানে স্ফীত হয়েছ তুমি। মদে তুমি অন্ধ, দম্ভে তুমি ভ্রান্ত, হিংসায় আচ্ছন্ন তোমার বুদ্ধি। তোমারও পতন আসন্ন।'

'পতন আসন্ন?' মহাক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় মহামদ। বিরাট বপুতে বিপুল কম্পন—রক্তে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ। প্রচণ্ড গর্জন করে সে অগ্রসর হয় কোমলাঙ্গীর প্রতি। নবনীর মত কোমলতার কণ্ঠ চেপে ধরবে সে।

প্রলয় মেঘের মুখে শান্ত, স্থির চন্দ্র-লেখার মত মহামদের উদ্যত আক্রমণের মুখে দাঁড়ায় মোহিনী তন্বঙ্গী। কি অপরূপ লাবণ্য! দেহে স্নিগ্ধ চন্দ্রকান্তি, নয়নে সন্ধ্যার কাজল, অধরে প্রভাত অরুণের রক্তরাগ। সর্বাঙ্গে অনমনীয় শক্তি-দীপ্তি। সৌম্যা, সৌম্যতরা অথচ বজ্র-কঠিন দৃঢ়তা।

মহামদের মস্তিষ্কে যুগান্তের মেঘডম্বর, সঘন আলোড়ন। কে এই নারী? কে এই রুদ্ররূপা রূপসী? বিদ্যুতের মত চকিতে চমক দিয়ে যায় পিতামহের বাণী,—বিবেক-কন্যা 'পরশ্রীভাবনা'—অদ্ভুত তার রূপ, আশ্চর্য তার শক্তি। মরিয়ার মত চীৎকার করে ওঠে মহামদ, 'কে তুমি! কে তুমি!'

শান্ত, মধুর কণ্ঠে বলে তন্বী, 'আমি পরশ্রীভাবনা।'

'পরশ্রীভাবনা? আমাদের বংশের শত্রু? শত্রুপক্ষের কন্যা?'—উন্মাদের মত গর্জন করে ওঠে মহামদ। উচ্চৈস্বরে দ্রুত বলে পরশ্রীভাবনা, 'না—না, শত্রু নই। শত্রু কেন? তুমি আমার পর নও। তুমি যে আমারই—

কথা শেষ হয় না। কোন কথাই শুনতে পায় না মহামদ। ক্রোধান্ধ গর্জনে শোনা যায় না কোন কথাই। একটি অতি স্থির বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হয় চক্রনেমি, 'পরশ্রীভাবনা'কে কেন্দ্র করে তেমনি প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হয় মহামদের মস্তিষ্ক। ঘূর্ণিত মুষ্টিবদ্ধ বাহু, রোম—বিঘূর্ণিত বসুন্ধরা। ঘোর মত্তক-প্রেতের মত সে অগ্রসর হয়। শূন্যে উত্থিত পদ, শূন্যে উদ্যত বাহু। শত্রুকন্যাকে মুষ্টিবদ্ধ করে পিষ্ট করতে চায় সে। কিন্তু লাগে যেন শক্তি—বিদ্রোহী বুদ্ধি, বিদ্রোহী কর্মেন্দ্রিয়। শিথিলতায় স্খলিত চরণ, মহা-শূন্যে ব্যর্থ বাহু আস্ফালন। উৎকট মনস্তাপ। তবু ঘোর গর্জন করে সে অগ্রসর হয়, কিন্তু পদস্খলিত হয়ে আবারও বিকট গর্জন করে ছিন্নমূল বনস্পতির মত ভূমিতে লুণ্ঠিত হয় সে।

অন্তরে মুক্ত করুণা-নির্ঝর, নয়নে উচ্ছল বেদনাশ্রু—পরশ্রীভাবনা দ্রুত এগিয়ে আসে, দু'হাতে কোলে তুলে নেয় তার মূর্ছিত মস্তক, গভীর মমতায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেয় তার সর্বাঙ্গে।

অনাদি প্রকৃতি, যার ভুবনমোহিনী মায়া আকর্ষণ করে অনঙ্গ পুরুষকে, ভোগের বিষপাত্র তুলে ধরে অধরে—সে-ই তো আবার স্নিগ্ধ সৌম্যের মত রসধারা নিঃসৃত করে সাগর বনস্পতি, মধুময় করে সংসার। সম্পদে অধরা, বিপদে গভীর মমতা, মঙ্গলায় কাতরতায়, ঔদার্যে শান্তি, পরশ্রীভাবনাময় প্রেম। এই প্রেমের শাশ্বত সকলী জগৎচরাচর—তারই অরুণ-স্পর্শে বিগলিত মদ-তুষার। *

---

* মদোৎপত্তির ইতিহাস রয়েছে দেবী-ভাগবত-এর ৭ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়; মদ-বিনাশের কল্পনা করা হয়েছে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের ছায়ায়।

ইতালীয় টেলিভিশনে অনুষ্ঠিত "কানজোনীস্‌সীমা'র দৃশ্য

নেশা হল টাকার নেশা, টাকার দম্ভ। রোমে এক মহিলা শাড়ির দোকান খুলেছেন। মেমসাহেবরা দাম শুনে অতি সস্তা বলে কিনতে চান না।

ইতালীর টেলিভিশনে যে ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়, তাতে জনসাধারণকে লোভ দেখান হয় পাবলিসিটির ও টাকার। সস্তা জিনিস প্রচার করতে 'ট্যালেণ্ট' বা 'জিনিয়াসের' তো প্রয়োজন হয় না। সিনেমা-জগতে যে ট্র্যাজেডি এক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ প্রযোজক ও পরিবেশকদের কৃপায় জন-সাধারণকে দেখতে হয় কেবল সস্তা জিনিস আর দোষ হয় জনসাধারণের রুচির। ইউরোপে ফ্রান্স এই কুরুচি থেকে কিছুটা বেঁচে আছে, তবে ইতালীতে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। ফরাসী জনসাধারণ চায় জানতে ও শিখতে; ইতালীয় জনসাধারণ যে কোনপ্রকারে চায় ফূর্তি করতে ও তামাশা দেখতে।

যাই হোক, জনসাধারণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইতালীয় টেলিভিশনে যা প্রচার হচ্ছে তাতে জনসাধারণের রুচি নেমে যাচ্ছে আরও নিম্নস্তরে। অথচ টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের যে সম্ভাবনা আছে, তা করলে জগতের অনেক মঙ্গলসাধন হতে পারত। অবশ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের দুর্ব্যবহার তো গুরুতর ক্ষেত্রেও হচ্ছে।

এই সব অনুষ্ঠানের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য হল "Il Musichiere" বা "ইল্ ম্যাজিকীয়েরে" নামের প্রতিযোগিতা বা quizz অনুষ্ঠান। এক বছরের উপর এই ম্যাজিকীয়েরে চলেই চলেছে। এতে পুরস্কারস্বরূপ দেয়া হচ্ছে কোটি কোটি লীরা। প্রতি সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় চারজন। দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতার পর যে জেতে সে থাকে আবার যোগ দেবার জন্য। ফিল্ম বা জনপ্রিয় গানের একটুকরো বাজান হয়—তার ক-এক সেকেণ্ডের মধ্যে সেই গানের নাম বা কথা যে বলতে পারবে তার জিত। গান জানুক বা না জানুক, জিতবার বিন্দুমাত্র আশা নেই জেনেও এতে যোগ দিচ্ছে দরজী, ধোপা, নাপিত যার তার। কারণ এর পাবলিসিটি প্রচুর, এছাড়া টেলিভিশনের পর্দায় দেখা দেবার গ্ল্যামার। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পুরস্কারের সর্বোচ্চ অংক হল ৯০০০০০০ লিরা। এমন কি শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাও টাকার লোভে গান চিনবার বিদ্যা রপ্ত করতে জীবনপাত করছে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে জুয়াখেলার যে উত্তেজনা রয়েছে, তা মানুষের অবচেতন মনকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। টাকা ও পাবলিসিটির লোভ দেখিয়ে দর্শক আকর্ষণ করার এই কল হল মার্কিন রুচির দান। এই ধরনের অনুষ্ঠান একাধিক। টাকার লোভে হলেও যদি এর দ্বারা কোনরকম জ্ঞান সঞ্চয়ের উপায়ও থাকত, তাহলেও না হয় কিছুটা কৈফিয়ত মিলত।

ইতালীয় জনসাধারণের মধ্যে রুচির অবনতি ও বিকার বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেছে। বিদেশীকেও তা পীড়া দেয়। কারণ রঙ্গজগতে এদের দান পৃথিবী-বিখ্যাত, সাহিত্য ও শিল্পকলা না ধরলেও। গ্রীক ও রোমান থিয়েটারের যুগ থেকে শুরু করে গোলদোনী ও পিরান্দেল্লো প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের ধারায় যে মোড় ঘুরেছিল তা সমস্ত পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চকে প্রভাবিত করে। আজও পাশ্চাত্যে দুজন বিখ্যাত নাট্যকার ইতালীয়,—বেত্তী ও দিয়েগো ফাব্রী। নেপলস্ এর নাট্যমঞ্চে যে অপূর্ব অভিনেতা অর পুলচিনেল্লা ইত্যাদি চরিত্র ছিল তা আজ অদৃশ্যপ্রায়। এদেয়া দে ফিলিপ্পোর নাটক ইতালীয় নাটকের মধ্যে আর এক নতুন ধারা এনেছিল। আর ইতালীর অপেরার কথা তো নতুন করে তোলার প্রয়োজন নেই। অথচ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে যা দেখা যায় তা জুয়া খেলার নামান্তর মাত্র।

প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে চলছে নিম্নস্তরের প্রতিযোগিতা আর অসম্ভব অবিশ্বাস্য ভঙ্গিমায় গানের নামে গণ্ডগোল। এছাড়া আছে জীবনেও যার নাম শোনেন নি এমন সমস্ত "ওয়েস্টার্ন" বা "ক্রাইম-থ্রিলার" ফিল্ম। টেলিভিশনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও

গায়ক অরিল্লিও ফিয়েরুরো এবং তার দল। সবাই ফিয়েরুরোর মুখের মত মুখোশ পরেছে

বৈদেশিকী

নেপালে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হল। তার গঠনটি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়। দুইটি পরিষদের মধ্যে একটির—তথাকথিত উর্দ্ধতনটির—অর্ধেক সদস্য রাজার মনোনীত এবং সে পরিষদটির ক্ষমতাও বেশ আছে। অন্যভাবেও রাজার ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ হতে পারে এমন ফাঁকও শাসনতন্ত্রের মধ্যে অনেক আছে। তাহলেও মোটামুটি গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপরেই নেপালের নব রাজনৈতিক জীবন গড়া শুরু হল বলা যায়। শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিকতায় যে অসম্পূর্ণতা আছে তা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গণতন্ত্রবাদীদের উপায় ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলির গত কয়েক বছরের কার্যকলাপের চিত্রের সুযোগ নিয়েই শাসনতন্ত্রে রাজার ক্ষমতার স্থান একটু বেশি রাখা সম্ভব হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, [illegible] নির্ভরযোগ্যতা নয়, জনপ্রতিনিধিদের হাতে পুরো ক্ষমতা দিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে—এইরকম যুক্তির পরিপোষক একটা অবস্থা তৈরী হয়েছিল বলেই নতুন শাসনতন্ত্রে রাজার একটা ক্ষমতা সংরক্ষণ করা সহজ হয়েছে।

ঐরকম আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য রাজনীতিকদের দায়িত্ব অবশ্যই আছে। তার মধ্যে নেপালী কংগ্রেসের দায়িত্বই প্রধান। নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্ব যদি আত্মকলহের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হত তাহলে পরবর্তী কয়েক বছর সেখানের রাজনৈতিক দাবা খেলা চালাবার এত সুযোগ উপস্থিত হত না। তবে এখন বোঝা যাচ্ছে যে নেপালী কংগ্রেসী নেতাদের ভুল এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে খেলাটি খেলা হয়েছিল তার মধ্যে ফাঁকিটা কত বড়ো ছিল। নেপালী কংগ্রেসের নেতাদের নিজেদের দোষ যাই থাক, জনসাধারণের হৃদয়ের সঙ্গে নেপালী কংগ্রেসের যোগ যে কোনো সময়েই ছিন্ন হয় নি, সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ গত কয়েক বছর ধরে নেপালের রাজনৈতিক খেলা এমন কায়দায় চালানো হয়েছে যেন নেপালের জনসাধারণের আস্থা [illegible] ছিন্ন হয়ে গেছে, সব নেতারই যেন এক অবস্থা অর্থাৎ কেউই যেন আর নেপালের জনসাধারণের বিশেষভাবে আস্থাভাজন নয়।

রাজা আজ এঁকে কাল ওঁকে ডেকে মন্ত্রিমণ্ডলী চালাতে লাগলেন এবং একটার পর একটা হয়েই বাতিল হতে লাগল। ততই রাজনৈতিক দলগুলি অকেজো প্রমাণিত হতে লাগল এবং রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান ধারকরূপে প্রতিভাত হতে লাগলেন অথবা খবরের কাগজের লেখা থেকে সেই রকম বোধ হতে লাগল।

এই খেলায় যে কতো রকম বিচিত্র চাল চালা হয়েছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। নমুনা স্বরূপ ডাঃ কে. আই. সিংএর কথা ধরা যাক। ইনি নেপালী কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বকালে নেপাল সরকারের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়করূপে দেখা দিলেন। কার বা কাদের স্বার্থে এই বিদ্রোহ, কী তার উদ্দেশ্য কিছুই স্পষ্ট হল না। বিদ্রোহ দমন হল, কিন্তু ডাঃ কে. আই. সিং অক্ষত দেহে নেপাল থেকে পালালেন। কিছুকাল পরে জানা গেল যে, তিনি পিকিংএ উদয় হয়েছেন। তারপর কাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হল, কিছুদিন পরে দেখা গেল রাজার অনুমতিক্রমে ডাঃ সিং নিরাপদে নেপালে ফিরেছেন। তারও কিছুকাল পরে রাজা তাঁকে একেবারে প্রধান মন্ত্রীর পদে বসালেন। অবশ্য সেটা বেশি দিন টেকে নি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে

আশ্চর্য হতে হয়। কারণ পৃথিবীতে এ রকম রোমাণ্টিক ব্যাপার কচিৎ ঘটে থাকে এবং ঘটলে সাধারণের নিকট সেটা খুবেই চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু এখানে দেখা গেল জনসাধারণের মনের উপর ডাঃ কে, আই সিংএর প্রভাব কিছুই পড়ে নি। সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়ক দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে আশ্রয় নিলেন, তারপর দেশে ফিরে এসে রাজার আহবানে প্রধান মন্ত্রী হলেন—জনসাধারণের কাছে এই রকম লোকের আকর্ষণ উবে গেল, এটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। নির্বাচনে ডাঃ কে, আই, সিং কিছুই করতে পারলেন না। এই থেকে বুঝা যায় জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল যে, এই লোকটির সমস্ত কিছুর অন্তরালে কী একটা ফাঁকির ব্যাপার আছে। তা না হলে এই রকম চটকদার ব্যক্তির নির্বাচনে অসাফল্য সম্ভব হত না।

ডাঃ কে, আই সিংএর ভিতরকার ব্যাপারটা হয়ত একদিন পুরোপুরি জানা যাবে। কিন্তু সে যাই হোক, আপাতত তিনি নিরস্ত হবার নন। তাঁর এখন প্রধান কাজ হবে মনে হয়, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নেপালে বিশেষ প্রচার করা এবং নেপালী কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট নেপালকে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রভাবাধীন করতে যাচ্ছেন এই কুৎসা রটনার দ্বারা নেপালী কংগ্রেসকে অপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা। সম্প্রতি একটি প্রকাশ্য সভায় ডাঃ সিং বলেছেন যে, ভারত নেপালকে একটি ভারতের "কলোনী" বানাচ্ছে, তার এবং কইরালা গভর্নমেণ্ট তার সহায়ক হতে যাচ্ছেন। এই অপবাদের জন্য নেপালী রাজনীতিতে এই প্রথম ব্যবহৃত হচ্ছে না। এই অস্ত্র যাঁরা ব্যবহার করছেন বা পূর্বে করেছেন তাঁরা নেপালের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের প্রতি প্রকৃত দরদ বশত করছেন এরূপ মনে করারও কোনো কারণ নেই। এর পিছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এঁরা বড়ো বেশি আগেভাগে আত্মপ্রকাশ করে ফেলছেন। তাতে কইরালা সরকার সাবধান হতে পারবেন।

তবে নেপালী কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিরোধীরা বহুকাল থেকেই নেপালী কংগ্রেসকে ভারত-ঘেঁষা বলে "অপবাদ" দিয়ে আসছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে নেপালী কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ হয়েছে। ভোটদাতারা নেপালী কংগ্রেসের এই "অপবাদের" কথা জানত কি না জানি না, যদি জেনে থাকে তাহলে সেটা নেপালী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে না গিয়ে হয়ত তার পক্ষেই কাজ করেছে। কারণ কোনো সরল বুদ্ধি নেপালীর নিকট এটা নিশ্চয়ই একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে নেপালের সঙ্গে অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের যে রকম সম্বন্ধ ভারত-বর্ষের সঙ্গে ঠিক তেমন হতে পারে না, তার চেয়ে আরো নিকট ও আত্মীয়ের মতো হতে বাধ্য। জাতি, ধর্ম, ভাষা কৃষ্টি—সব বিষয়েই ভারত ও নেপাল পরস্পরের আত্মীয়। নেপালের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ অনুরাগ রেখেও নেপালীরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে ভারত ও নেপালের যে সম্বন্ধ সেটা দুই সাধারণ বিদেশী রাষ্ট্রের ভিতরের মতো ঠিক নয়, হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। ভারত ও নেপালের নিরাপত্তা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্যই নেপালের উন্নতি ও স্বাধীনতার মূল্য ভারতের কাছে যতো বেশি এতো আর কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে নয়। নেপালী কংগ্রেস নেতারা যদি ভারত-নেপাল সম্বন্ধের এই বৈশিষ্ট্যের মূল্য বোঝেন তবে সেটা তাঁদের সুবুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেমের লক্ষণ বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত।

নির্বাচনে নেপালী কংগ্রেসের জয়লাভে এই আশার উদ্রেক হয়েছে যে গণতান্ত্রিকতার দিক থেকে নেপালের কনস্টিটিউশনে যে অপূর্ণতা রয়েছে কার্যত তাতে বিশেষ কিছু এসে যাবে না। জনমতের ইঙ্গিত এবং এতো গোলমালের পরেও যখন এতো সুস্পষ্ট তখন তার বিরুদ্ধে নূতন ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা অল্প। অপর দিকে নেপালী কংগ্রেসের নেতারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ রাখবেন যে, যে-আস্থা জনসাধারণ তাঁদের প্রতি দেখিয়েছে তার সম্মান রাখা চাই।

২৭।৭।৫৯

কাব্যকাহিনী

প্রণয়ী পঞ্চক: সুশীল রায়। প্রকাশক: নতুন প্রকাশক। ১৩১১ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা: ১২। দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ধ্রুপদী সাহিত্যের আবেদন চিরকালের। বিশেষ করে সে সাহিত্য যদি মহাভারত হয়!

মহাভারত শুধু কাব্যই নয়। কাব্যের স্বাদকে উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় জীবনের একটি আকর গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

মহাভারত—একটি মাত্র আধারে উপন্যাস, কাব্য, ধর্ম, রাজনীতি, জীবননীতি এবং দর্শন। ভারতীয় জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে আছে এই একটি মাত্র গ্রন্থ।

মহাভারতের মূল কাহিনীটির পাশে ছোট ছোট অসংখ্য শাখাকাহিনী। শাখাকাহিনী-গুলি মূল প্রবাহটিকে বেগবান, সরস এবং ঋদ্ধ করেছে। এই কাহিনীগুলির যারা কুশীলব তাদের চরিত্র বিচিত্র, তাদের আখ্যান মনোহর। সুশীল রায় মহাভারতের শাখাকাহিনীগুলির মধ্য থেকে পাঁচটি প্রণয়-কথা বেছে নিয়েছেন। প্রণয়িনী সুলভা, প্রণয়িনী সুভদ্রা, প্রণয়িনী মাধবী, প্রণয়িনী শ্রুবাবতী এবং প্রণয়িনী উর্বশী।

পাঁচটি প্রণয়কথা একসূত্রে গ্রথিত করে নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রণয়ীপঞ্চক'।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের যে বিরাট উর্বর ক্ষেত্রটিকে উপস্থিত করে দিয়েছিলেন, এখন পর্যন্ত সেখানেই আবাদ চলছে। বলতে দ্বিধা নেই, গীতিকাব্যের ফসল আমরা কম তুলি নি।

আখ্যায়িকা বা কাহিনী-কাব্যের দিকটি আমাদের সাহিত্যে আজও উপেক্ষিত আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে দিকে বিশেষ মনো-যোগী হন নি। সুশীল রায় প্রাচীন কাব্য থেকে যে পাঁচটি প্রণয় কাহিনী বেছেছেন একমাত্র উর্বশী ছাড়া বাকীগুলি তেমন আলোচিত নয়। কাহিনীকাব্যের ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সুশীলবাবু আধুনিক সাহিত্যে একমাত্র সৎ এবং নিষ্ঠাবান কবি। প্রণয়কথা যুগে যুগে এক। কিন্তু যুগে যুগে তার উপস্থাপনের রীতি ভিন্ন। কারণ প্রকাশভঙ্গি, কলাবিধি, বদলে যায়।

প্রাচীন কালের কাব্যকে নতুন কালের

সংগীত

নামকীর্তন—শ্রীগণপতি পাঠক। ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা ৬, দাম ৮০।

কীর্তনের দুটি শাখায় মুকুন্দ কৃষ্ণ ও কালীকে বন্দনা করা হয়। উপরোক্ত পুস্তিকাটি শ্যামাভক্তদের প্রতি দৃষ্টি রেখে গণপতি পাঠক কর্তৃক সম্পাদিত। অধিকাংশই সংগীত, মাঝে মাঝে কিছু কাহিনী সন্নিবেশিত। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি ভক্ত কবিগণের রচনা গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

৪৮২।৫৮

ভজন পরিচয়—সংগীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ২১, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩.৫০ ন প

যদুভট্ট, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবীর, সুরদাস, ব্রহ্মানন্দ, নানক—সুরসাধক বা সংগীতজ্ঞরূপে জনসমাজে পরিচিত নয়। এঁরা ছিলেন ভক্ত, সর্বত্যাগী সাধক, সংসারনিস্পৃহ ঈশ্বরপ্রেমিক। তাঁদের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে কথায় আর সুরে। কথায় আর সুরে সংযোজিত আছে সাধকদের জীবন ও সাধনালব্ধ সত্য। তুলসীদাসের জ্ঞান ও ভক্তির কথা, মীরার প্রেম-ভক্তি, গিরিধারী গোপালের জন্য মর্মস্পর্শী আকুতি, কবীর, নানক, সুরদাস, ব্রহ্মানন্দ, যদুভট্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের শিক্ষা-উপদেশ তাঁদের রচিত ভজনে বিধৃত। আর এই কারণেই শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উচ্চ, নীচ ও সম্প্রদায়ভেদে প্রত্যেকের নিকট ভজনের আবেদন অসামান্য।

উপরোক্ত সন্ত মহাপুরুষের ২৭টি ভজনের তাল উল্লেখসহ স্বরলিপি দান করেছেন প্রবীণ সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য। এই গ্রন্থ দ্বারা সংগীত-শিক্ষার্থীগণ পরম উপকৃত হবেন, আশা রাখি।

২২২।৫৯

রম্যরচনা

দিল্লির ডাকে—বিক্রমাদিত্য। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। সাড়ে তিন টাকা।

বিক্রমাদিত্য নামের আড়ালে থেকে যিনি তাঁর ক্ষুরধার কলমে উদ্‌ঘাটিত করেছেন আনোখীলাল পার্লামেন্টিয়ানের কাহিনী, তাঁরই আরেকটি অনবদ্য রচনা আলোচ্য গ্রন্থখানি। এর বিষয়বস্তু দিল্লির সমাজ। এই সমাজের সাথে তাঁর পরিচয় যে গভীর, একে যে তিনি খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, বইখানি পড়লে সেকথাই মনে হয়। তাঁর সহজাতসিদ্ধ হালকা সুরের মধ্য দিয়েই তিনি এই সমাজের দোষত্রুটি সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন এই সমাজজীবনের পটভূমিকায় বিচিত্র ও বিস্ময়কর কয়েকটি নরনারীর ছবি। তাঁর এই প্রচেষ্টা বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক এবং সার্থকও।

বইখানি পাঠকমাত্রেরই ভালো লাগবে।

৬১৭।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

Lokamanya Tilak—G. P. Pradhand & A. K. Bhagwat.

Poetry (Indian Issue) January 1959—Editor Henry Rago.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রশ্ন ও উত্তর।

আশীর্বাদ—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

বাসর—উত্তম পুরুষ।

শিক্ষা সঙ্গিতা ১ম খণ্ড—শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিব্য-জীবন প্রসঙ্গ—অনির্বাণ।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর বৈঠক—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গদাধর (ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-লীলা কাহিনী) ২ খণ্ড—অজাতশত্রু।

জেবউন্নিসা (ঐতিহাসিক নাটক)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মা মনি—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত।

সাবিত্রী (৩য় পর্ব, ৩য় সর্গ)—শ্রীঅরবিন্দ।

অপরূপা—স্বরেশচন্দ্র শর্মাচার্য।

কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

কলির শেষ—শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের গৌরব মোহনবাগান ক্লাব ও উহার খেলোয়াড়বৃন্দ।

তিন তাসের খেলা—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর

বর্ণবহুল ক্ষণকাল

পৃথিবীর বুকে মানুষ একদিন এল,—দিন কয়েকের জন্য হাসল, কাঁদল—আবার চলে গেল। মানুষের অন্তহীন যাওয়া-আসার পদধ্বনি ও খণ্ডকালের হাসি-কান্নার কলরবে নিত্য মুখরিত ধরণীর এই সদা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ভাবরূপ কাহিনীকার বনফুল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন একটি অখ্যাত রেলওয়ে স্টেশনের আঙিনায় তাঁর একটি অনন্যমধুর ছোট গল্পে। বনফুল-অনুজ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সানরাইজ ফিল্মস-এর "কিছুক্ষণ" এই আশ্চর্য উপাখ্যানেরই একটি মরমী চিত্ররূপ।

বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র মানসের ছায়াপাতে বর্ণবহুল ক্ষণকালই যেন এই কাহিনীর প্রকৃত নায়ক। যাদের ঘিরে সীমিত কালের মধ্যে অসীমের ইশারা তারা দুর্বিপাকে কিছুক্ষণের জন্য আটকে-পড়া একটি রেলগাড়ির যাত্রীদল। নানা জাতি ও প্রকৃতির সব মানুষ ক্ষণকালের জন্য ভিড় জমায় জনবিরল এক স্টেশনের প্রাঙ্গণে। চলমান এক জীবন-চক্র পথভ্রষ্ট হয়ে যেন থেমে যায় গোত্রহীন এই স্টেশনে। অল্প অবকাশের মধ্যে যাত্রীরা মেলে ধরে তাদের বহুরূপী মানসিক মানচিত্র। দরদী দ্রষ্টার মতো এই মানচিত্রের রূপ, রঙ ও রেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সুবিমল। কলকাতা মেডিকেল কলেজের হাউস-সার্জন সে। ভোরের ট্রেন ধরবার জন্য এসে সে-ও আটকে পড়ে স্টেশনে—আর নিজেকে মিশিয়ে দেয় অনন্ত মানুষের মিছিল থেকে অল্পকালের জন্য ছিটকে পড়া এই বিচিত্র মানুষের দঙ্গলে।

বহুজন আর বহুমনের এই ভিড়ের মধ্যে সুবিমলের পরিচয় হয় অন্তরে হৃতসর্বস্ব এক সজ্জন প্রৌঢ়ের সঙ্গে। বিধবা তরুণী কন্যার হাত ধরে স্টেশনের এক প্রান্তে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সুবিমলের আন্তরিকতার স্পর্শে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাঁর মনের পুঞ্জীভূত ব্যথার কাহিনী। একমাত্র উপযুক্ত ছেলে তাঁর পাগলা-গারদে, দুঃখিনী কন্যা তার বঞ্চনা-বিড়ম্বনার ইতিহাস লুকিয়ে রাখতে চায় আচার-নিষ্ঠার অন্তরালে।

এই বিচিত্র মানবস্রোতে সুবিমলের মন ছুঁয়ে যায় গাড়ির ইঞ্জিন চালকের ছোট্ট ফুটফুটে মা-মরা মেয়েটি। তার দৃষ্টির সামনে শোভাযাত্রা করে আসে স্বাভাবিক ও অদ্ভুত ধরনের সব লোক—আসে এক কাবুলিওয়ালা, যে শুধু ভদ্র আচরণের কাছেই মাথা নোয়াতে অভ্যস্ত, এবং এক কৃপণ বৃদ্ধ ক্ষিদের জ্বালায় যার নাতি চুরি করতে বাধ্য হয়; আসে আরও অনেকেই যাদের মধ্যে বিয়ের দলের বর-বধূ, অভব্য তরুণের দল ও উন্নাসিক খৃস্টান যুবক সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে মুনাফা শিকার করতে এগিয়ে আসে এক ধড়িবাজ ব্যবসায়ী। গাড়ির কামরায় বৃদ্ধা মা ও সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে রেখে সে মেতে ওঠে কালোবাজারে পয়সা রোজগারের ফিকিরে। তার দুরভিসন্ধিতে বাধা দিতে গিয়ে তারই হাতে প্রহৃত হয় সুবিমল। কিন্তু স্টেশনেই তার স্ত্রীর প্রসবকালে সুবিমলই যখন সকলের আগে এগিয়ে যায়, তখন ব্যবসায়ীর মনে জাগে অনুতাপ এবং সে ক্ষমা ভিক্ষা করে মানব-দরদী যুবকের কাছে।

কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে আসে মাধবী—ডাক্তারী পড়া মেয়ে। পূর্ব পরিচিত সহকারী স্টেশন মাস্টার মাখনবাবুর কোয়ার্টারে মাধবীকে নিয়ে আসে সুবিমল। সদানন্দ বন্ধুবৎসল মাখনবাবু অতিথি আপ্যায়নের এই দুর্লভ সুযোগ

পরমানন্দে মেতে ওঠেন। কিন্তু মাধ্বী চায় না মাখনবাবুর আচারনিষ্ঠ স্ত্রী বিনোদিনীকে ঠকাতে। তাই কথায় কথায় সে খুলে বলে তার জন্মপরিচয়—মুচির মেয়ে সে, ধর্মে খৃষ্টান। বিনোদিনীর সংস্কারবদ্ধ মন এতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার কটূকথায় মাধ্বী অপমানিত হয়ে ভরদুপুরে না খেয়েই চলে যায় তাদের বাড়ি থেকে। মাখনবাবুর উদার মন এতে ব্যথা পায়, ব্যথা পায় সুবিমলও।

গ্রামের নির্জন পুকুরঘাটে মাধ্বীর সঙ্গে আবার দেখা হয় সুবিমলের। অল্পকালের সান্নিধ্য নির্মল বন্ধুত্বের রূপ নেয় উভয়ের মধ্যে সহজেই। তাই মাধ্বীর আগ্রহে উঁচু গাছ থেকে ফুল পাড়তে দ্বিধা জাগে না সুবিমলের মনে। বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে সেই পথে ফিরছিল গ্রামের ধাই বুড়ী। বুড়ী ওদের স্বামী-স্ত্রী বলেই ধরে নিয়েছিল। আঁকশি দিয়ে একগোছা বনফুল পেড়ে দিয়ে সে নিজের সরলতায় সুবিমলকে বলে ফুল পরিয়ে দিতে মাধ্বীর খোঁপায়। সলজ্জ হয়ে ওঠে মাধ্বী ও সুবিমলের মন। ক্ষণিকের জন্য বুঝি বুড়ী রাঙিয়ে দিয়ে যায় তাদের অন্তর।

মনের দিক দিয়ে আরও কাছাকাছি ওরা সরে আসে পরস্পরের কাছে। সুবিমল মাধ্বীর কাছ থেকেই জানতে পারে তার জীবনের ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনী, তার সত্যিকারের জন্মপরিচয়—ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়েও কেমন করে মুচির ঘরে সে লালিত-পালিত হয়। সুবিমল জানতে পারে মাধ্বীর ভবিষ্যত স্বপ্নের কথা, যার সামনে সে তার আশা-অভীপ্সার ঐক্য খুঁজে পায়। ওদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের টুকরো টুকরো মুহূর্তে বেজে ওঠে একতারে বাঁধা তাদের মনের সুর।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের বেদনার বাঁশী বেজে উঠতেও বিলম্ব হয় না। গাড়ি ছাড়ার সময় এগিয়ে আসে। গ্রামের সেই ধাই বুড়ীর [illegible] দেহ বয়ে নিয়ে আসে গাড়ির এক [illegible] যাত্রী, যে অবসর ক্ষেপণ করতে বনে গিয়েছিল শিকারের সন্ধানে। বনের মধ্যে কাঠ কুড়োতে গিয়ে বুড়ীর গায়ে লাগে গুলী। প্লাটফর্ম থেকেই বুড়ী যাত্রা করে পরপারের দিকে। দূর থেকে ভেসে আসে নবজাতকের কান্না, যার জন্ম হয়েছে স্টেশনেরই একধারে। এমনিভাবেই চলে ভবের স্টেশনে যাওয়া-আসার নিত্য খেলা। যাত্রীরা যে যার কামরায় গিয়ে বসে তাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে। সজল চোখে মাধ্বী বিদায় জানায় সুবিমলকে। সুবিমলের চোখের সামনে দিয়ে হাসি-কান্নায় ভরা বিচিত্র ক্ষণের এক পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ক্ষণকালের পটে অনন্তকালের জীবন-চক্রের এক সার্থক প্রতিফলন আনন্দ-বেদনার অজস্র টুকরো মুহূর্তে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এই ছবিতে। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রথম স্বাধীন পরিচালন

প্রয়াস স্মরণীয় হয়ে থাকবে দর্শকদের মনে এক বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসাবে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আঙ্গিকের এই উপাখ্যানে নানাজাতীয় যে-সব চরিত্র ভিড় করে এসেছে, তাদের প্রত্যেকটির স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য ও মর্ম-কথা পরিচালক সূক্ষ্ম রসানুভূতি দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে তুলেছেন চিত্রপটে। ফলে জীবনভাবনার বিচ্ছুরণে বিক্ষিপ্ত চরিত্রগুলির ভিড় ছবিতে কোলাহলের সৃষ্টি করে না, গড়ে তোলে একটি অন্তর্লীন নাট্যরসের ঐকতান। গ্রামের ধাই বুড়ীর আঁকশি দিয়ে মার্থা ও সুবিমলকে ফুল তুলে দেওয়া এবং পরে সুবিমলকে বলা—পরিয়ে দাও না মাথায়, লজ্জা কি! ছোট্ট এই দৃশ্যটি এমন গভীর রসের প্রলেপ দিয়ে যায় ছবিতে যে কিছুক্ষণের জন্য চেনা ও জানা তিনটি চরিত্র নিবিড়ভাবে ধরা দেয় পরস্পরের কাছে, আর সহসা অনুরাগের আবিরে যেন মার্থা ও সুবিমলের চকিত পরিচয় রক্তিম হয়ে ওঠে। পরিমিতি ও রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক আরও অনেক দৃশ্য ও চরিত্র উপস্থাপনে, যার ফলে ইঞ্জিন ড্রাইভারের ছোট্ট মেয়েটিও তার নীরব চোখের চাহনিতে দর্শকমনে মায়া জাগিয়ে যায়, মার্থা ও সুবিমলের নিবিড় সান্নিধ্য অনন্ত-রঞ্জিত অনুরাগের ছোঁয়া দিয়ে যায় মনে, আর সরল প্রেমাস্পদা তার ক্ষণকালের উপস্থিতিতে একটি চিরকালীন চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। মিষ্ট পরিমিতি জ্ঞান ও ভাবাশ্রয়ী দরদী মন দিয়ে রূপকার অন্তর্দৃষ্টি ও বহুমুখী করে তুলতে পেরেছেন তাঁর ছবিকে যাতে একটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বৃদ্ধার মৃতদেহ ও অন্যত্র নবজাতকের কান্না কাহিনীর মর্মস্পর্শে—জীবন স্টেশনের ভাবরূপ—তন্ময় করে তোলে। আর কিছুক্ষণের জন্য মিলে-যাওয়া, জড়িয়ে-যাওয়া চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া এক বেদনা-বলয় সৃষ্টি করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তবে ক্ষণিকের জন্য এই যে মিলে-যাওয়া ও জড়িয়ে-যাওয়া তার মধ্যে যাত্রীদের স্থিতিকালের অনিশ্চয়তা এবং পুনরায় যাত্রারম্ভের আগ্রহের সুরটি বেজে ওঠেনি। এক পরম নিশ্চিন্ততা যেন আশ্রয় করেছে যাত্রীদের মনে যাদের কিছুক্ষণের জন্য আটকে থাকার মধ্যে ফিরে যাওয়ার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ফলে পথের কাহিনী ঘরের কাহিনী হয়ে উঠেছে। গাড়ি আটকে যাওয়ার এই দুর্বিপাকের দরুণ স্টেশন কর্তৃপক্ষের মধ্যেও যে অস্থিরতা দেখা যেতে পারত, ছবিতে তারও অভাব। ছবির প্রথমাংশও একটু বিবরণধর্মী হয়ে পড়েছে।

কাহিনীর পটভূমিকার দিক দিয়ে ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশন, একটি আটকে-পড়া

ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপায়নে অংশ গ্রহণ করবেন আশীষকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, সন্ধ্যা রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায় ও আরও অনেকে।

সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অভিজিৎ।

দীপান্বিতা পিকচার্সের প্রথম নিবেদন "হিসাব-নিকাশ"-এর শুভ মুহূর্ত উৎসব গত শুক্রবার রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে পালিত হয়। অমল দত্তের পরিচালনাধীনে ছবিটির মুখ্য চরিত্রগুলিতে রূপদান করবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, অজিতেশ বসু, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও মাঃ তিলক। সংগীত-পরিচালনায় থাকবেন খগেশ মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব ঘটছে অনেকদিন পর। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রযোজনায় তিনি পরিচালনা করছেন রহস্য-ঘন ছবি "চুপি চুপি আসে"। কাহিনীর রচয়িতাও প্রেমেন্দ্র মিত্র। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার প্রভৃতি।

বর্তমান বিচিত্র সমাজ-মানসের প্রতিফলনে রসোত্তীর্ণ উপন্যাস "কিনু গোয়ালার গলি"র চিত্ররূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন স্ক্রীন প্লে প্রোডাকশন্স। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ রচিত এই উপন্যাসের চিত্রায়ণ-পরিচালনা করবেন সুপ্রসিদ্ধ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ও সি গাঙ্গুলী। ছবিতে অনেক নতুন শিল্পীর সঙ্গে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতরণ করবেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্রের দায়িত্ব নিয়েছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত।

নাট্যাভিনয়

মিনার্ভা থিয়েটারে "ছায়ানট"

লিটল থিয়েটার গ্রুপের পরিচালনাধীনে পুনরুদ্বোধিত মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে এই সুখ্যাত নাট্যসংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত "ছায়ানট" পটভূমি ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে নাট্যামোদীদের কাছে এক অনাস্বাদিত রসের পসরা নিয়ে এসেছে।

উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত এই নাটকের অভিনব কথাবস্তু গড়ে উঠেছে টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র জগৎকে কেন্দ্র করে। হলিউডের অনুকরণে যাকে বলা হয়ে থাকে "টলিউড", তারই একটি বাস্তবানুগ প্রতিভাস গোটাকয়েক অভিনব চরিত্রের আচার-আচরণ, দৈন্য দুর্বলতার ভেতর দিয়ে চমৎকার নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন নবীন নাট্যকার।

এই নাটকে আছেন টলিউডের "প্রডিউসার" যিনি অল্প শিক্ষিত হয়েও তাঁর ভয়ংকরী অল্পবিদ্যা জাহিরে সদাব্যস্ত, "বক্স-অফিসে"র চাইতে বড় স্বার্থ যাঁর কাছে আর কিছু নেই, যাঁর হিসাবের খাতায় শিল্পী জমা অথবা খরচের পাতায় শুধু মাত্র একটি অংকের আঁচড়। এই "প্রডিউসার"কে রাহুর মতো ঘিরে রয়েছেন "ক্লাউন"-সদৃশ পরিচালক—মুখে যাঁর

জে এম পিকচার্সের 'উত্তর মেঘ'-এর একটি মিলন-মধুর দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

সর্বক্ষণ সিগারেট জ্বলছে, "বক্স-অফিসে"র নির্দেশ অনুযায়ী যিনি শিল্পীকে তোষামোদ অথবা তিরস্কার করে থাকেন, "প্রডিউসার"কে হাতে রাখার ফন্দি-ফিকিরে যিনি যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত নিজের কাজে ততটুকুই যিনি নাবালক, খেয়াল-খুশিমতো কাহিনীর সেন্টিমেন্ট বা ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করতে যিনি মোটেই দ্বিধা করেন না। এই পরিচালকের কারবার যাদের নিয়ে তাদের পুরোভাগে আছেন বহুবল্লভা এবং দর্শকমনলোভা "স্টার" অভিনেত্রী সুচরিতা। দ্রুত অপস্রিয়মান যৌবনের চটক নানা উপচারের দ্বারা বাঁচাবার প্রয়াস তার চলাফেরা, হাবভাব ও বেশ বিন্যাসে, সময়ানুবর্তিতার কদর থাকে না বলে স্টুডিওতে এসে তাকে অপেক্ষমান সহকর্মীদের শুভপ্রভাত জানাতে হয় মধ্যাহ্নে। পেরিয়ে গেলে, জনপ্রিয় অভিনেতা অনিলকুমারের অবজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে যিনি নতুন শখের শিল্পীকে রাতারাতি নায়ক করে দেন, বিবাহিত জেনেও তাকে বাইরের উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দিকে আকর্ষণ করেন যিনি এবং পরে যখন নায়ককে করতলগত করতে গিয়ে ঠোকর খান তখন আবার ধাওয়া করেন নবাগত শিল্পীর পেছনে।

"ছায়ানটে"র নট মনোজকুমার—আসল নামের আদি ও অন্ত ছেঁটে দিয়ে হয়েছে এই গোত্রহীন নামকরণ। তার অভ্যুদয় ও পতন নায়িকার মর্জির ওপর নির্ভর করেই চলে। কাহিনীর নটরাজ মনোজকুমার, তার স্ত্রী পারিজাত ও সুচরিতাকে কেন্দ্র করে। পারিজাতও ছিল অভিনেত্রী, কিন্তু নায়িকা নয়। শিল্পী জীবনের ছাড়পত্র পেল সে নিজের দেহের বিনিময়ে, প্রযোজকের লালসা মিটিয়ে। পরে যখন উচ্ছিষ্টের মতোই সে পড়ে রইল স্টুডিয়োর দরজায়, তখন মনোজ তাকে ঘরে এনে স্থান দিল সহধর্মিণীর মর্যাদায়। তারপর একদিন মনোজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল জনপ্রিয় নায়ক হিসাবে। মনোজ-সুচরিতার নাম "বক্স-অফিস" সাফল্যের গুহ্যমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। মনোজের জীবনেও আসে পরিবর্তন। সুচরিতার সঙ্গে গোপন অন্তরঙ্গতার তপ্ত স্বাদ তার দেহ-মনে, সুচরিতা গায়ে হেলে পড়ে তার সঙ্গে কথা কয়। "পাব্লিসিটি"র মোহ পেয়ে বসে মনোজকে, পিতৃপরিচয় দিতে সে কুণ্ঠিত, সিনেমার কাগজের মারফত সে তার আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনের সংবাদ ফলাও করে জানাতে চায় তার অনুরাগীদের, সুচরিতাকে নিয়ে কোন "স্ক্যান্ডাল" ছাপলে যদি তার কদর বাড়ে তাতেও তার আপত্তি নেই এবং ব্যায়ামের অঙ্গ-ভঙ্গিতেও সে ছবি ছাপাতে প্রস্তুত। তারপর একদিন আসে তার পতনের পালা, যখন অভিনয়ের সুযোগের জন্য সে স্টুডিয়োর দরজায় দরজায় আবার ধরনা দেয়। বহুজনতোষিণী সুচরিতা বুঝি অলক্ষ্যে ভালোবেসে ফেলেছিল মনোজকে। একদিন সেও ভাগ্যবিড়ম্বিত মনোজকে অর্থসাহায্য করে অবরুদ্ধ বেদনায় তার কাছ থেকে বিদায় নেয়। চলচ্চিত্রাকাশে তখন নজরে পড়বার মতো দুটি তারকা—সুচরিতা ও সন্দীপ।

কাহিনীতে স্থান পেয়েছে চলচ্চিত্র জগতের আরও অতিপরিচিত কয়টি চরিত্র—

সহকারী পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার, সংগীত পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট অনেকে। চলচ্চিত্র জগতের সান্নিধ্যে যে-সব সাংবাদিক ঘোরা-ফেরা করেন তাঁরাও বাদ পড়েন নি। বিচিত্র ধরনের চরিত্র ও স্টুডিয়োর অভ্যন্তরের নানা জাতীয় ঘটনার একটি একান্ত বাস্তবনিষ্ঠ বিন্যাস ফুটে উঠেছে এই নাটকে। পরিচালক ও নাট্যকার তির্যক আলোকসম্পাতে পরিস্ফুট করে তুলেছেন "টালিউডে"র উন্নাসিকতা, মানসিক দৈন্য ও বিবর্ণ মানসিকতা। ব্যঙ্গ ও শ্লেষের স্পর্শে শাণিত হয়ে উঠেছে শিল্প সেবা ও সাধনার নামে টালিউডের ব্যভিচার।

কিন্তু ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ এই নাটকের মূল সুর নয়। হাসি ও কৌতুকের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে এই নাটকের প্রতি দৃশ্য, ঘটনা ও সংলাপে যা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এক অনন্যসুলভ চিত্তবিনোদনের আমেজে দর্শকমনকে পুলকিত ও স্পন্দিত করে রাখে। এই নাটকের মূল্য বৈশিষ্ট্য হল এতে আমোদের আয়োজনকে ছাপিয়ে ওঠে না আদর্শ প্রচারের কোন ব্যগ্রতা, রসকে অতিক্রম করে না শ্লেষ, বাস্তবের ব্যঙ্গ আড়াল করে রাখে না বক্তব্যকে।

টালিগঞ্জের বিচিত্র চলচ্চিত্র জগতের ভাব-ধারা, তার বিচিত্ররূপী বাসিন্দা ও তাদের জীবনের অভিলাষ, উচ্চাশা ও অন্তর্লীন ট্রাজেডির এক মনোরম আলেখ্য এই "ছায়া-নট" যা একটি পরম রমনীয় ও উপভোগ্য নাট্যনিবেদনের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে নাট্যরসিকদের কাছে।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকার্যের দিক দিয়ে এ-নাটকের বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। "প্রডিউসার"-এর ভূমিকায় উৎপল দত্তের অভিনয় ভূয়সী প্রশংসা পাবার যোগ্য। একটি অতি চেনা চরিত্রকে একান্ত নিপুণতার সঙ্গে তিনি মঞ্চের ওপর ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর পরেই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন চিত্র-পরিচালকরূপী রবি ঘোষ। তাঁর সহজ, সরল কৌতুকাভিনয় প্রেক্ষাগৃহে হাসির বন্যা ছুটিয়ে দেয়। সুচরিত্রাভিনেত্রী শোভা সেনের সাবলীল অভিনয়ে চিত্রতারকার স্বভাব-চরিত্র ও উন্নাসিকতা বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে। পারিজাতের ভূমিকায় নীলিমা দাসের অভিনয়ও চরিত্রানুগ। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে নায়ক মনোজকুমারের চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চিত্রনাট্যকারদ্বয়ের চরিত্রে সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না দত্তের বাস্তবানুগ অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে আর যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সংগীতকারদ্বয়ের ভূমিকায় বিমান মুখোপাধ্যায় ও পরেশ গোস্বামী, ব্যবস্থাপকের চরিত্রে কমল মুখোপাধ্যায় ও চিত্রসাংবাদিক-রূপী উমানাথ ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রে নিমাই ঘোষ, সুনীল রায়, ইন্দ্রজিৎ সেন ও তরুণ মিত্র প্রশংসার দাবী রাখেন।

প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিক দিয়েও নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক দৃশ্য-সজ্জা ও আঙ্গিক পারিপাট্য কৃতিত্বপূর্ণ। বিশেষত স্টুডিয়োর সেটের দৃশ্যটি অতুলনীয়। মঞ্চে এমন বাস্তবানুগ দৃশ্য-বিন্যাস কম দেখা যায়। দৃশ্যসজ্জার জন্য রহমৎ আলি ও সমীরণ দত্ত ধন্যবাদার্হ। আলোকসম্পাত ও আবহ-সংগীতের কাজ যথাযথ।

"বিশ্বরূপা মার্কিউরি"

বাংলার নাট্য আন্দোলনের প্রসার ও সংহতির জন্যে বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন সে সম্বন্ধে নাট্যামোদীরা অবহিত আছেন। ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা "বিশ্বরূপা মার্কিউরি" তাঁদের বহুবিধ নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম পরিচয় হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা আঙ্গিক সজ্জা এবং বিষয়-বস্তুর সম্পদে সুধীজনের ও নাট্যামোদী-দের অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা লাভ করবে নিঃসন্দেহে।

প্রথম সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" নাটকের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ, বিধায়ক ভট্টাচার্যের পূর্ণাঙ্গ নাটক "খেলা" এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকদের সারগর্ভ প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পত্রিকাটিকে মূল্যবান করেছে। নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্যের এমন একটি উৎকৃষ্ট ধরনের পত্রিকা শুধু নাট্যামোদী নয়, সাধারণ পাঠকদেরও অভিনন্দন লাভে সমর্থ হবে। প্রথম সংখ্যায় ৮টি সুদৃশ্য আর্ট প্লেট পত্রিকাটির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে। ছাপা এবং ব্যবহৃত কাগজ সুন্দর। ("বিশ্বরূপা মার্কিউরি" প্রথম বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, ২-এ, রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬; নরেন্দ্রনাথ সাহা (ইংরেজী বিভাগ), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও বিধায়ক ভট্টাচার্য (বাংলা বিভাগ) ও ডি কে জৈন (হিন্দি) কর্তৃক সম্পাদিত; লক্ষ্মণেশ্বর সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।)

বিবিধ সংবাদ

গত ২২শে জুলাই প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক যুব উৎসবে যোগ দিতে ভিয়েনায় যাত্রা করেছেন। তিনি সেখান থেকে যাবেন মস্কোতে, তারপর আসবেন ভেনিসে। এই যাওয়া-আসার ফাঁকে লণ্ডন ও প্যারিসেও ঘুরে আসবেন তিনি। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁর দেশে ফেরার কথা। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে তাঁর নতুন ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। প্রধান পুরুষ চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার ভূমিকায় সম্ভবত একজন নতুন শিল্পী আত্মপ্রকাশ করবেন।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় সপরিবারে মস্কো অভিমুখে রওনা হয়েছেন। সেখানকার চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি বিচারক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। তারপর ইউরোপের দ্রষ্টব্য দেশগুলি ভ্রাম্যমানেই দৃষ্টিতে এক লহমায় দেখে নিয়ে তিনি আগস্টের শেষাশেষি বোম্বাইতে ফিরে আসবেন। বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠানের পতাকাতলে 'পরখ' ও 'উসনে কহা থা' এই দুটি হিন্দী ছবি তোলা হচ্ছে। এই বছরের শেষের দিকে তিনি 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' অবলম্বনে একটি বাংলা ছবিও তুলবেন। এ ছবিখানি সম্ভবত কলকাতাতেই নির্মিত হবে।

খেলার মাঠে

একলব্য

১৯৫৬ সালের ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স সমস্ত দেশকে পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট খেলার যে অধিকার দিয়েছিলেন তার ফলে ক্রিকেটের উচ্চ মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুন্ন হয়েছে। বিশেষ করে, ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের মত শক্তিহীন দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, ইংলন্ড বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট খেলা একরকম প্রহসনেই পরিণত হয়েছে। ইংলন্ডে ভারতীয় দলের এবারকার শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে অনেক ক্রীড়াসাংবাদিকই শক্তিহীন দলের সঙ্গে টেস্ট খেলার সময় কমাবার জন্য ওকালতি করেছিলেন। কিন্তু ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সাম্প্রতিক অধিবেশনে এই সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং খুবই সন্তোষজনক। এখন ঠিক হয়েছে টেস্ট খেলার মোট স্থায়িত্বকাল ৩০ ঘণ্টার বেশী হবে না আর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুইটি পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা ঠিক করবে তারা তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন বা ছয়দিনের টেস্ট খেলবে কিনা। এই সিদ্ধান্ত [illegible] আমাদের [illegible] হবে [illegible]।

[illegible] ক্রিকেট আইনের এই ২৬ নম্বর ধারা অর্থাৎ বোলারদের বল ছুঁড়ে দেওয়া বা বল করবার সময় নির্দিষ্ট সীমারেখার ওপারে [illegible] অনেকদিন [illegible] আম্পায়ারদের উপর [illegible] আইনের [illegible] হচ্ছে না। অথচ ক্রিকেট খেলার পক্ষে এ একটি মস্ত বড় সমস্যা। থ্রোয়িং ও ড্রাগিং সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স যে সিদ্ধান্ত [illegible] না ছুঁই পানি [illegible]। ইংলন্ডের সাংবাদিকবৃন্দ এতে [illegible] খুশী হতে পারেন নি। তবে সাংবাদিকেরা ২৬ নম্বর আইনের [illegible] না হলেও [illegible] মধ্যেই যে থ্রোয়িং ও ড্রাগিং সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

• • •

নিখিল ভারত অলিম্পিক কমিটি ঠিক করেছেন রোম অলিম্পিকে তারা ৬০ জনের বেশী প্রতিনিধি পাঠাবেন না। অ্যাথলেটিকসের জন্য ৮ জন, ফুটবলের জন্য ১৮ জন, হকি খেলার জন্য ১৮ জন এবং কুস্তির জন্য ৫ জন প্রতিযোগী রোমে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া কোচ ও কর্মকর্তা হিসাবে ৯ জন এবং চীফ দি মিশন ও তার সাহায্যকারী যোগাযোগ অফিসার নিয়ে মোট ৬০ জন প্রতিনিধি ভারত থেকে রোমে যাবেন। ভলিবল, ভারোত্তোলন, বাস্কেটবল, মুষ্টিযুদ্ধ, রাইফেল স্যুটিং এবং সাঁতারের জন্য ভারত থেকে কোন প্রতিনিধি পাঠান হবে না।

একমাত্র হকি ছাড়া খেলাধুলার কোন বিষয়েই ভারতের ক্রীড়ামান অলিম্পিকমানের কাছাকাছিও নয়। অবশ্য অ্যাথলেটিকসে আমরা আগের চেয়ে অনেক উন্নতি করেছি এবং অ্যাথলেটিকসে আমাদের যা কিছু আশা ভরসা একমাত্র দৌড়বীর মিলখা সিংকে নিয়ে, আর কারো উপরই কিছু ভরসা নেই। কিন্তু অ্যাথলেটিকসে যখন আমরা ৮ জন প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি, ফুটবলের জন্য পাঠাচ্ছি ১৮ জন, কুস্তির জন্য ৫ জন তখন অন্যান্য খেলাধুলার জন্য প্রতিনিধি পাঠাব না কেন? অন্যান্য [illegible] প্রতি ভারতীয় অলিম্পিক [illegible] বিমাতৃসুলভ মনোবৃত্তির [illegible]।

অলিম্পিকে জয়লাভই অলিম্পিকের আদর্শ নয়। অলিম্পিকে যোগদান করা এবং সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই অলিম্পিকের আদর্শ। সে আদর্শ যদি মানতে হয় তবে বিভিন্ন খেলাধুলায় আমাদের যারা ভাল তাদেরও প্রেরণ করা উচিত। স্বীকার করি বিদেশী মুদ্রার অভাব আমাদের প্রতিনিধিদের বাইরে পাঠাবার এক বড় সমস্যা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নানাভাবে বিদেশী মুদ্রার কি অপচয় করা হচ্ছে না। অন্য প্রয়োজনের কথা না হয় বাদ দিলাম। শুধু প্রমোদ ভ্রমণের জন্যও এখন বহু বিদেশী মুদ্রার অপচয় হচ্ছে। অথচ ৪ বছর অন্তর একটি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সমস্ত বিষয়ে প্রতিনিধি পাঠাতে পারছি না। হেলসিঙ্কি এবং মেলবোর্ন অলিম্পিকেও আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। অলিম্পিক কমিটির মতিগতির কথা যা আমাদের জানা আছে তাতে আমরা হাজার [illegible] করলেও তারা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভাঙবেন না। এ সম্বন্ধে খেলোয়াড় মহল থেকেই আন্দোলন হওয়া উচিত। তবে জোরালভাবে প্রশ্নটা উঠলেও কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে।

• • •

সপ্তাহ দুই আগে কালিম্পংয়ে [illegible] ফলে ৯ জন ফুটবল খেলোয়াড়ের একটি দল জীবনের খেলা সাঙ্গ করেছে। [illegible] দুর্ঘটনায় ফুটবল খেলোয়াড়দের মৃত্যুর সংবাদ এই প্রথম নয়। গতবার ইংলন্ডের ভরা ফুটবল মরসুমে বিমান দুর্ঘটনায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের [illegible] খেলোয়াড় জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। তারও অনেক আগে বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইটালীর জাতীয় ফুটবল দল বিমান দুর্ঘটনায় একেবারেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

কালিম্পংয়ে যারা খাদের নীচে পড়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের কোন পরিচয় জানা যায়নি। নামধাম বিহীন একটি ফুটবল দলই হবে। কিন্তু যে দলই হক, খেলোয়াড়দের বিপর্যয়ের জন্য ক্রীড়াসাংবাদিক হিসাবে তাদের প্রতি সমবেদনা থাকা স্বাভাবিক। মৃত খেলোয়াড়দের আত্মার শান্তি হোক, এই কামনা করি।

লণ্ডনের চিঠি

বেরী সর্বাধিকারী

লণ্ডন, ২৭শে জুলাই—গত সপ্তাহে 'দেশের' জন্য কোন লেখা পাঠাতে পারিনি। এ সপ্তাহে যা লিখছি, তাও পাঠকদের কাছে খাপছাড়া বলে মনে হবে। কারণ আমি লিখছি চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলার দোষ। আমার এ-চিঠি যখন পাঠকদের হাতে পড়বে, তখন চতুর্থ টেস্ট খেলার জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু উপায়ই বা কি?

যাই হক, চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করতে হচ্ছে। আমি এখন যে 'ওল্ড ট্রাফোর্ড' মাঠে বসে চিঠি লিখছি—এ-মাঠটি ম্যাঞ্চেস্টারের শহরতলীতে অবস্থিত। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে দূরত্ব প্রায় আট মাইল। যেমন আমাদের চৌরঙ্গী থেকে বরানগর। ম্যাঞ্চেস্টার, সুতো, কাপড় ইত্যাদির কল-কারখানার জন্য বিখ্যাত। কারখানাও যত, ধোঁয়াও তত। বোধ করি, এক শেফিল্ড ও লিভারপুল ছাড়া সারা ইংলণ্ডে এমন ধোঁয়াটে ও অপরিচ্ছন্ন শহর আর নেই। তবে 'ওল্ড ট্রাফোর্ড' শহরের উপকণ্ঠে এই যা রক্ষে।

ম্যাঞ্চেস্টারের ভীষণ এক বদনাম আছে। টেস্ট খেলার নামেই নাকি এখানে 'বাদল ঝর ঝর মাদল বাজে'। এইজন্যই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় লিয়ারী কনস্টান্টাইন একবার বলেছিলেন, ম্যাঞ্চেস্টারকে টেস্ট খেলার আয়োজনের অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হক। কনস্টান-টাইনের হাতের কাছে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট খেলা পণ্ড করবার অনেকগুলি নজির ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নজির ১৯৩৪ সালের। সেবার ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা। প্রথম চারদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত। এক মিনিটও খেলা হল না। কি দর্শক, কি খেলোয়াড়, সবাই নিরাশ হলেন।

'ওল্ড ট্রাফোর্ড' সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম তিক্ত নয়। অবশ্য ১৯৩৪ সালের কথা আলাদা। আমাদের অর্থাৎ ভারতের ১৯৪৬ ও ১৯৫২ সালের সফরে এবং অস্ট্রেলিয়ার ১৯৪৮ ও ১৯৫৩ সালের সফরে বৃষ্টি-দেবতা খেলায় যথেষ্টই ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছেন। ভেবেছিলাম, এবার বুঝি ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে এক নতুন রেকর্ড হল। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারের ঐতিহ্য যাবে কোথায়? প্রথম তিন দিন খেলার সময় অবশ্য বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু রবিবার খেলার বিরতির দিন বেশ দু-এক পশলা হয়ে গেছে।

অবশ্য আবহাওয়া সম্পর্কে এবারের কথা আলাদা। ইংলণ্ডের অনেক কিছুই বদলে গেছে। তার মধ্যে বোধ করি আবহাওয়া অন্যতম। এই গ্রীষ্মকালেও ইংলণ্ডে বৃষ্টি খুব কম। গত আড়াই মাসের মধ্যে ক'দিন বৃষ্টি হয়েছে, আঙুলে গুনে বলা যায়। আমাদের ভারতের মত এখানেও এবার রোদের ঝিকিমিকি। অসহ্য গরম। এদেশের পোশাক, এদেশের চাপা ঘরবাড়ি গরমের জন্য তৈরী হয়নি। কিন্তু এবারকার গরমে পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি পাল্টাবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। লীডস টেস্টের সময় কি প্রচণ্ড গরম! আমরা, ভারতীয়রাও রাত্রে ঘুমুতে পারিনি। এ-কষ্ট অবশ্য আমাদের পুষিয়ে যেত, যদি আমাদের ছেলেরা ভাল খেলতে পারতেন। কিন্তু এবার এমন চমৎকার আবহাওয়া পেয়েও আমরা সবচেয়ে খারাপ খেললাম, এইটাই আপসোস।

'ধান ভানতে প্রায় শিবের গীত' আরম্ভ করে বসেছি। হ্যাঁ, তিনটি টেস্ট খেলায় পরাজয়ের পর ওল্ড ট্রাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টের জন্য আর কোন উত্তেজনা অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষে খেলায় কিছুটা উত্তেজনা এসেছে আমাদের প্রতি ইংলণ্ডের নতুন অধিনায়ক কলিন কাউড্রের 'দরদের' জন্য। প্রথম ইনিংসের খেলায় আমরা ২৮২ রানের পেছনে ছিলাম। সে অবস্থায় আমাদের 'ফলো-অন' করালে আমাদের ইনিংসে পরাজয়েরই আশংকা ছিল। কিন্তু কলিন কাউড্রে আমাদের 'ফলো-অন' না করিয়ে খেলাটিকে চতুর্থ বা পঞ্চম দিন পর্যন্ত টেনে নেবার জন্য নিজেরাই আবার ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করলেন। এতে ইংরেজ ক্রীড়া-সাংবাদিকরা কাউড্রের উপর বেশ চটে গিয়েছেন। অনেকের লেখাতেই কাউড্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নাকি টেস্ট খেলার মর্যাদাহানি করেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। আজ যে অবস্থা, তাতে যদি ভারত এ-খেলায় জেতেও, তাতেও তার মর্যাদা বাড়বে না। হারলে আরও হাস্যাস্পদ হবে। মোট কথা, আমাদের ক্রিকেটের 'নাবালক' ভেবে ইংলণ্ড আমাদের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। আর ক্রিকেট নেমে এসেছে 'প্রহসনের' পর্যায়। কিন্তু এর জন্য দায়ী তো আমরাই। আজ খেলোয়াড়দের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দাঁড় ধরতে কেবল শিখেছে—এমন কয়েকজন দাঁড়ীকে একজন কাচা 'হাল'-র জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে অকূলপাথার পার হতে বললে যে ফল হয়, আমাদেরও হয়েছে তাই। এর জন্য দাঁড়ী-হালির দোষ দেওয়া ঠিক নয়। দোষ তাঁদের, যাঁরা এই দাঁড়ী-হালির কাণ্ডারী। ইংলণ্ডের ক্রিকেট পাথারকে এবার অকূল বলা যায় না। হাল ধরবার একজন পোক্ত লোক থাকলে এই উঠতি দাঁড়ীদের নিয়ে জিততে না পারলেও ইংলণ্ড-পাথারে অনেক ভাল পাড়ি জমান যেত।

শুধু কী খেলার ক্ষেত্রেই গলদ? পরি-চালনা ব্যবস্থার মধ্যেও নিদারুণ ত্রুটি

রয়েছে। ধরুন না, এই মঞ্জরেকারের কথা। মঞ্জরেকারের হাঁটুতে 'কার্টিলেজ' অপারেশন হয়েছে। তাঁর হাঁটু সেরেও যাবে। কিন্তু এখানকার মাতব্বরেরা কি কারণে তাঁর অপারেশনে এত দেরি করলেন? বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী এক মাস আগে অপারেশন করালে এতদিন মঞ্জরেকার সুস্থ হয়ে উঠতেন। হয়তো খেলতেও পারতেন। অথচ দলের অন্যতম ভরসা যে মঞ্জরেকার, তাঁকে সময়মত অপারেশন না করিয়ে সারা ইংলণ্ড খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘোরান হল। তাতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। আগে অপারেশন করালে সুস্থ হতে যেখানে মঞ্জরেকারের দু-তিন সপ্তাহ সময় লাগত, এখন সেখানে সময় লাগবে দু-তিন মাস। এর অর্থ, দল থেকে এবারের মত মঞ্জরেকারের 'নির্বাসন'। শুনেছি, এখানকার মাতব্বরেরা দেশের কর্তাদের 'হুকুমের' প্রত্যাশায় ছিলেন। তাঁদের অবশ্য আঠারো মাসে বছর। তাই এত দেরি। অব্যবস্থার নমুনা আর কি?

কী ভাগ্যি হায়দরাবাদের আব্বাস আলী বেগকে হাতের কাছে পাওয়া গেছে। এই আব্বাস আলী বেগকে দলে নেওয়ার জন্য আমাদের ম্যানেজার বরোদার মহারাজা ফতে সিং কি জেদই না দেখিয়েছেন; অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁকেই 'মান বাঁচাতে' হল।

আব্বাস আলী বেগের খেলার কথা আগেই বলেছি। রনজি প্রতিযোগিতায় প্রথম আবির্ভাবে হায়দরাবাদের পক্ষে তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন। তারপর ১৯৫৮ সালে রিপাবলিক ডে-তে তাঁর খেলা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অমরনাথের কাছ থেকে বেগের খেলা শিক্ষা। খেলার মধ্যেও অমরনাথের ছাপ আছে। একটা কথা আছে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। এখানে আসবার পর তাঁর খেলা অনেক উন্নত হয়েছে। সাহসে ভরা সুন্দর খেলা। এর মধ্যে বেগ হাজারের উপর রান করেছেন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পক্ষে ইয়র্কশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে তাঁর সেঞ্চুরি এবং ফ্রি ফরেস্টার্স'র বিরুদ্ধে নট আউট থেকে ২২১ রান সংগ্রহ বিশেষ করেই বলবার মত ছিল। ভারতে থাকলে এই বেগই হয়তো 'পোচ্চা' খেতেন। বরোদার মহারাজা এখানে একদিন আমাদের সংবর্ধনার নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ বলেছিলেন দেশবিভাগজনিত ক্ষতি। অর্থাৎ দেশ ভাগ হবার ফলে আমাদের অনেক ভাল খেলোয়াড় পাকিস্তানের ভাগে পড়েছেন। মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, আজ যাঁরা পাকিস্তানের পক্ষে খেলছেন, দেশ ভাগ না হলে তাঁদের কজন ভারতীয় দলে স্থান পেতেন? যাক, অপ্রিয় কথা বেশি বলে লাভ নেই।

এই টেস্ট খেলার বিশদ আলোচনা টেস্ট খেলার পরে করা যাবে। তার আগে টেস্টের আগের চারটি খেলার কিছু আলোচনা করা যাক। তৃতীয় টেস্টে আমাদের এক ইনিংস ও ১৩৭ রানে হারিয়ে ইংলণ্ড দল পর পর তিনটি টেস্টে জয়ের গৌরব অর্জন করবার পর আমরা ইংলণ্ডে চারটি ম্যাচ খেলেছি। এর মধ্যে নটিংহামশায়ার, ইয়র্কশায়ার ও সারের সঙ্গে আমরা খেলা 'ড্র' করেছি। আর মিডলসেক্সকে হারিয়েছি চার উইকেটে। ইংলণ্ড সফরে এবার এটা আমাদের দ্বিতীয় জয়। নটিংহামের বিরুদ্ধে উমরিগর, ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে অধিনায়ক গাইকোয়াড় এবং মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে আব্বাস আলী বেগ সেঞ্চুরি করেছেন। এ ছাড়া ইয়র্কশায়ার, সারে ও মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে পঙ্কজ রায়ের রান-সংখ্যা ৮২, নট আউট ৬৩ ও ৫১ রান উল্লেখের দাবি রাখে। সারের বিরুদ্ধে বোরদের দুই ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি এবং মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরির কথাও কম বলবার বিষয় নয়, কিন্তু যত জনই যত খেলুন, আব্বাস আলী বেগের খেলাই আমাকে আনন্দ দিয়েছে বেশী। মাত্র দু ঘণ্টায় বেগ মিডলসেক্সের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্য-ভরা সুন্দর ব্যাটিং। অযথা তাড়াহুড়া নেই। কিন্তু মারের বল মারের বল তাড়াতেও নেই কোন কার্পণ্য। বেগের সুন্দর সেঞ্চুরি। আমাদের ছেলেদের পিছিয়ে থেকে সাত উইকেটে ৩৭৩ রান করবার পর পি রায়ের ইনিংস ডিক্লেয়ারের ঘোষণা।

তারপর সুরেন্দ্রনাথের প্রথম ওভারেই মিডলসেক্সের দুটো উইকেট পড়ে যাবার ঘটনা সেদিন অনেকের মুখেই হাসি ফুটিয়েছিল। ঠিক দু মাস আগে কিন্তু এরকম সুন্দর আবহাওয়া সত্ত্বেও গাইকোয়াড় টস জিতেও এম সি সি-কে প্রথম ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। তার ফলে আমাদের মুখের হাসিও মিলিয়ে গিয়েছিল। সে-হাসি ফিরে আসতে প্রায় দু মাস সময় লেগেছে। আবার হয়তো হাসি মিলিয়ে যাবে। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আর যে দু মাস আমরা এদেশে সফর করব, সেই দু মাস যদি আমরা হাসি-খুশির মধ্যে কাটাতে এই মনোভাব নিয়ে খেলার মত খেলা খেলতে পারি, তাতেও অনেকটা মুখ রক্ষা হবে। তাতেও হয়তো অনেকের মুখে হাসি ফুটবে!

দেশী সংবাদ

২০শে জুলাই—আজ নয়াদিল্লির রাজনৈতিক মহল হইতে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত ৩রা আগস্ট সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া বর্তমান মাস শেষ হইবার আগেই কেরলের অবস্থা সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণ ও কর্তৃপক্ষ আপোষে বিরোধ-মীমাংসায় সম্মত হওয়ার ফলে দিল্লি, বোম্বাই, কলিকাতা ও অন্যান্য কেন্দ্রে ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণের এক মাসব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

২১শে জুলাই—গতকল্য রাত্রে কলিকাতার বার মাইল দূরে রিষড়ার এক বনস্পতি দ্রব্য উৎপাদন কারখানায় গ্যাস সিলিণ্ডার ফাটিয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে প্রায় এক মাইল পরিধিব্যাপী সমগ্র অঞ্চল প্রকম্পিত হইয়া উঠে। সিলিণ্ডারের ভাল্বের নিকট কর্মরত একজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্গাপুরে কয়লাচুল্লী প্ল্যান্টের ইউনিটটিতে কাজ শুরু হইয়াছিল, উহার তিন জায়গায়ও মারাত্মকভাবে চিড় খাওয়ায় উহা অচল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই প্ল্যান্টটি মেরামত করিয়া পুনরায় চালু করিতে সরকারকে অন্ততঃ ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

রাজকোট প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ [illegible] পাউণ্ড ওজনের ১৬ ফুট লম্বা অদ্ভুত ধরনের একটি মৎস্য জামনগরের নিকট জনৈক ধীবরের জালে ধরা পড়িয়াছে। উক্ত মৎস্যটির মাথা, দেহ ও বুকের গড়ন মানুষের মতন।

২২শে জুলাই—অদ্য কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, জীবনবীমা কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস কর্তৃক শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা পরিচালিত ছয়টি কোম্পানীর বহু শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে শ্রী এল এস বৈদ্যনাথনের কার্যের জন্য তাঁহাকে কঠোর ভর্ৎসনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে চাকুরি হইতে [illegible] করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২৩শে জুলাই—অদ্য [illegible] এলাকার গান্ধী [illegible] নিকট প্রকাশ্য রাজপথে এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে [illegible] নামক বাইশ বছরের এক যুবকের দেহ বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের কাশীপুর স্টোর্স হইতে সম্প্রতি প্রায় ৮০ হাজার টাকা মূল্যের বাইশ হাজার পাউণ্ড [illegible] পাচার করিয়া দেওয়ার এক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত স্টোর্সের অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী উপরোক্ত অভিযোগের সহিত জড়িত সন্দেহে ধরা পড়িয়াছেন। আরও কয়েকজন কর্মচারীও নাকি এই অভিযোগের সহিত জড়িত আছেন।

প্রকাশ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী পরিবহণ ব্যবস্থা তথা স্টেটবাস পরিচালনা ব্যবস্থা একটি আধা সরকারি-শাসনশীল বোর্ডের হাতে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৪শে জুলাই—অদ্য কলিকাতা পৌরসভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে পৌর কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তনের প্রশ্ন লইয়া সভাগৃহের ভিতরে ও বাহিরে এমন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা কলিকাতা কর্পোরেশনের পূর্বতন ঐতিহ্যকে ম্লান করিয়াছে।

সুধীর সরকার নামক একজন যুবককে চব্বিশ বৎসর পূর্বে একটি কুকুর কামড়ায়। গত বুধবার ২২শে জুলাই সদর হাসপাতালে জলাতঙ্ক রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর চারদিন পূর্বে তাঁহার রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে। তাঁহাকে যখন কুকুরে কামড়াইয়াছিল তখন তাঁহাকে জলাতঙ্কবিরোধী ইনজেকশনের দ্বারা চিকিৎসা করান হয় নাই।

২৫শে জুলাই—আজ রাজধানীতে কেরলের পরিস্থিতি সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ৯০ মিনিটেরও অধিককাল ধরিয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে কেরলের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক খাদ্যাবস্থা বিষয়ে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া কলিকাতার সরকারীসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৬শে জুলাই—পশ্চিমবঙ্গে চাউলের [illegible] বিনিয়ন্ত্রণের পর বি ও সি শ্রেণীর রেশন কার্ডের মালিকদিগকে চাউল সরবরাহ না করার সিদ্ধান্তের ফলে [illegible], অর্ধাহার, অনাহারে কাটিয়া চলিয়াছে। [illegible] তাঁহারাই এ শ্রেণীর রেশন কার্ড পাইয়া থাকেন। সরকারের নূতন নির্দেশ অনুসারে এ শ্রেণীর রেশন কার্ডেই চাউল দেওয়া হইবে। বি ও সি শ্রেণীর রেশন কার্ডে চাউল দেওয়া হইবে না।

বিদেশী সংবাদ

২০শে জুলাই—পশ্চিম জার্মান সরকার [illegible] পররাষ্ট্র মন্ত্রী [illegible], [illegible] ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার জন্য পাশ্চাত্য [illegible] মন্ত্রীরা যে নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো তাহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

২১শে জুলাই—নিউ ইয়র্কের খবরে প্রকাশ, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ভারতকে মোট পাঁচ লক্ষ ডলারের অধিক পরিমাণ অর্থ সাহায্য হিসাবে মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া আজ ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারত ছাড়া ব্রহ্ম ও পাকিস্তানকেও প্রচুর সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২২শে জুলাই—কম্যুনিস্ট দেশসমূহের উপকূলের পাহারার মধ্যে যাহারা টহলদারিতে নিযুক্ত হইয়াছে, সে সকল মার্কিন বিমানকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে কোন সময় যুদ্ধের জন্য তাহাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেননা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ও চীন-সোভিয়েট রাষ্ট্রজোটের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে লড়াই শুরু হইতে পারে।

২৩শে জুলাই—ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেসের জনৈক রিপাবলিকান সদস্য গত ৩রা জুন প্রতিনিধি পরিষদের বায়বরাদ্দ কমিটির সভায় বলেন, মার্কিন যুক্ত সেনানীমণ্ডলীর অভিজ্ঞগণ যত সৈন্য পাকিস্তানের পক্ষে প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, পাকিস্তান তাহার চেয়েও বেশীসংখ্যক সৈন্য পাইয়াছে।

বৃটিশ সরকারের মধ্য আফ্রিকান নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া বিরোধী শ্রমিক দল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গতকল্য রাত্রে তাহা কমন্স সভায় ২৮৭—২৩৭ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

ইউরোপে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক জেনারেল নরস্টাড প্রতিনিধি পরিষদের বায়বরাদ্দ সাব-কমিটিতে বলিয়াছেন যে, সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের মোকাবিলা করার মত আণবিক অস্ত্রশস্ত্র তাঁহার বাহিনীর নাই।

২৪শে জুলাই—বিগত চার বৎসর ধরিয়া আলজিরিয়াতে যে বিদ্রোহ চলিতেছে আজ তাহার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বৃহত্তম সামরিক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। আজ কুড়ি হাজার ফরাসী সৈন্য অকস্মাৎ কাবিলী পর্বতমালার উপর বিদ্রোহীদের ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবহারজীবী কমিশন আজ চীনা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে তিব্বতী জাতি ও বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করিতেছে এবং রীতি-নীতি [illegible] লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

২৫শে জুলাই—জাপান সুন্দরী আকিকো কোজিমা অদ্য রাত্রিতে বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হইয়াছেন। কোজিমার বয়স ২২ বৎসর। তিনি টোকিওর একজন ফ্যাশন মডেল। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া গণ্য হইলেন।

২৬শে জুলাই—ঢাকার খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন প্রাক্তন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে সরকারী পদ অপব্যবহারের অভিযোগ অনুযায়ী মামলা শীঘ্রই বিচারের জন্য বিশেষ একটি ট্রাইব্যুনালের নিকট উপস্থিত হইবে। প্রাদেশিক সরকার ইতিপূর্বেই অযোগ্য রাজনীতিকদের সংখ্যা প্রায় এক ডজনের কম হইবে না বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা ঃ বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল ঃ (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক ঃ শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন ঃ ২৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

দি বাকিংহাম এণ্ড কর্নাটিক কোম্পানী লিমিটেড
দি বাঙ্গালোর উলেন, কটন এণ্ড সিল্ক মিলস কোম্পানী লিমিটেড
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌: বিনী এণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ

BY 535A

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 8th August 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২২ শ্রাবণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

কবিগুরু স্মরণে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সম্বৎসরের, সমস্ত জীবনের সঙ্গী। তবু যে বিশেষভাবে দুটি দিন মনে পড়ে, তার কারণ দিন দুটি তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বারা চিহ্নিত। নদী যেখানে পর্বত হইতে নির্গত হয় আর যেখানে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করে দুটিই পবিত্র, দুটিই তীর্থ। আজ এমনি একটি তীর্থে বসিয়া সশ্রদ্ধভাবে কবিগুরুকে স্মরণ করিতেছি। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, অল্প স্বল্প ঋণের কথাই মনে পড়ে, কিন্তু যিনি অজস্রধারে বিত্তসম্পদ দান করিয়া সমস্ত দেশকে ঋণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ঋণ কি গণিয়া দেখা সম্ভব! বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণ কি বিপুল তাহার স্পষ্ট ধারণা কাহারো আছে কিনা জানি না। আমরা তাঁহার সৃষ্ট জগতে জন্মিয়াছি, পূর্বে কি ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞানে জানি না, অতুল সম্পদকে অত্যন্ত সহজে পাইয়াছি বলিয়াই দাতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সব সময়ে সচেতন হইবার অবকাশ পাই না। কিন্তু যখন সচেতন হইয়া উঠি বুঝিতে পারি যে, সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য একটি বিশাল দেশকে মাতৃক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের শৈশব হইতে অন্তিমকাল পর্যন্ত, আমাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, মহত্ত্বের প্রতি আমাদের আগ্রহ, হীনতার প্রতি আমাদের জুগুপ্সা, আমাদের আলোর প্রতি উন্মুখতা, অন্ধকারের প্রতি বীতরাগ, সমস্তই এই অভয় মাতৃক্রোড়ে বিধৃত ও লালিত হইতেছে। রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া আর এমন কথা কোন্ সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা তো জানি না। প্রাচীন গ্রীকগণের পক্ষে হোমারের কাব্য এইরূপ মাতৃক্রোড় ছিল। কিন্তু বর্তমান জগতে সাহিত্য যে একটি দেশকে মাতৃক্রোড় দান করিতে সক্ষম না দেখিলে বিশ্বাস হইত না, দেখিয়াও যে সব সময়ে বিশ্বাস হয় না, তার কারণ ইতিহাসে এমন নজীর অধিক নাই। এই অর্থেই রবীন্দ্র সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য, এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবি। কোন সঙ্কীর্ণ অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে রাজি নই।

রবীন্দ্র সাহিত্য আমাদিগকে মাতৃক্রোড়ে ধারণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, আমাদের জন্য নৈসর্গিক জগৎকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। কবির একটি প্রিয় শব্দ বিশ্বকর্মা—কবি বিশ্বস্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে যদি বিশ্বকর্মা না হন তবে আর কে? বাংলাদেশের নিসর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আকাশে গ্রহনক্ষত্রের আবর্তন হইতে ধরণীর ধূলিকণার চঞ্চলতা অবধি, ঋতুচক্রের চংক্রমণ হইতে উদ্ভিদ্যমান তরুলতার জীবন রহস্য অবধি, এমন একটা দৃশ্য, একটা বস্তুও কি আমাদের চোখে পড়ে যাহা কবিগুরুর প্রতিভার রসায়নে উজ্জ্বলতর নয়, সুন্দরতর নয়, স্বমহিমায় স্পষ্টতর নয়! যাহা ছিল না তাহাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাকে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা অর্থহীন ছিল তাহার মধ্যে অর্থের আরোপ করিয়াছেন। তিনি জগৎপরিধি প্রশস্ততর করিয়া দিয়া চিরকালের জন্য আমাদের দিনরাত্রির মূল্য বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন।

আর শুধু কি তাই? নিসর্গলোক হইতে দৃষ্টি অন্তর্লোকে ফিরাইলে দেখিতে পাই সেখানেও তাঁহার সোনার কাঠি নূতন জগৎ সৃষ্টিতে নিযুক্ত। কাব্য, কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রভৃতির সোনার কাঠির স্পর্শে মহলের পরে মহল তিনি খুলিয়া দিয়াছেন আমাদের অন্তরলোকে। সহসা বাঙালী জাগিয়া উঠিয়া আপনার প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, পাঁচালী ধামালী সেবিত জীবনে গুপ্ত ছিল এ কী অমূল্য সম্পদ! ভিতর হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিলাম। যে জাতির রাজ্য সাম্রাজ্য বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপনের বিবেক কিছুই ছিল না তাহার মনে অসীম স্পর্ধা দুর্জয় সাহস সঞ্চারিত হইয়া গেল, বাহিরে কাঁচা থাকিয়াও আমরা অন্তরে পরিণতি লাভের পথে অগ্রসর হইলাম। এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল যে ক্ষণজন্মা পুরুষের প্রতিভার কাছে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিবার কিছু অর্থ হয় কি! তাঁহাকে শ্রদ্ধার বিস্ময়ে স্মরণ করিতে পারি, আর পারি সেই সংকল্প অর্জনের চেষ্টা করিতে তাঁহার জন্ম যেন ব্যর্থ না হয় আমাদের অপকৃতার্থতার ফলে। তিনি বলিয়াছেন "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ।" জরা হইতে, জড়তা হইতে, সকল প্রকার দাসত্ব হীনতা হইতে জাগিবার চেষ্টাতেই তাঁহার বাণীর সার্থকতা আমাদের জীবনে। আজকার দিন সেই সংকল্প গ্রহণের আর একটি উপলক্ষ্য।

প্রসঙ্গত

কেরল সরকারের অপসারণের পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু পার্লামেণ্টারী দলের সভায় বিষয়টি বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ব্যাপারটা যাতে এতদূর না গড়ায় সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু কোনো পক্ষই তাঁর কথায় কান দেননি। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, কেরলের কমিউনিস্ট সরকারও কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপই বাঞ্ছনীয় বোধ করলেন। বস্তুত কেরলের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল যে, কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে শুধু জনসাধারণ এবং বিরোধী দলই নয়, কেরলের কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কেরলের বাইরে স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যত তর্কই উঠুক, প্রচণ্ড কালবৈশাখীর শেষে শ্রান্ত নিঃঝুম কেরলের অভ্যন্তরে শ্রীনেহরুর এই উক্তিই সংগ্রামপরায়ণ উভয় পক্ষই সমর্থন করবেন: এছাড়া আর উপায় ছিল না। ঠিক সময়ে ঠিক ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়েছে।

সংগ্রাম যখন আরম্ভ হয় তখন তা কতকগুলো নির্দিষ্ট দাবীর মধ্যে সীমিত ছিল। কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের মনের মধ্যে বিক্ষোভ ছিল যথেষ্টই। তবু তার একটা সীমাও ছিল। কিন্তু সরকারী দমননীতি দেখতে দেখতে সেই সীমারেখা দিয়ে গেছে। তখন একটা সীমাহীন বিক্ষোভ তরঙ্গের পরে তরঙ্গে সমগ্র কেরলভূমি এমন করে মথিত এবং বিপর্যস্ত করে তুললে যে, সাধারণ মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। শ্রীনেহরু গেলেন সেই কালবৈশাখীর মুখে শান্তি আনবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল। অবস্থা তখন আর কারও আয়ত্তের মধ্যে নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি হল হাউই-এর মত। তাকে থামানো যায় না, দমানোও যায় না।

*

কেরলের কম্যুনিস্ট সরকার ভুল করেছিলেন, আন্দোলনকে দমাতে গিয়ে। হাওয়া দিয়ে যেমন আগুন নেভানো যায় না, চাবুক এবং বেটন, জেল এবং জরিমানা দিয়েও তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলন নেভানো যায় না। তাতে করে আন্দোলনের আগুন শুধু বিস্তৃতি লাভ করে। তাতে করে দমনকারীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় শুধু। কেরলেও তাই হচ্ছিল। মাটি কম্যুনিস্ট সরকারের পায়ের তলা থেকে সরে বিরুদ্ধপক্ষের পায়ের তলায় জমেছে, এ ইঙ্গিত শ্রীনেহরু করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যদি এখনও হস্তক্ষেপ না করতেন, আন্দোলন যদি আরও কিছুকাল চলত, তাহলে, আমাদের আশঙ্কা, কেরলে কম্যুনিজমের চিহ্ন থাকত না। নেহরুজী এবং তাঁর সরকার সংগ্রামের সূচনা থেকে কোনোদিনই কেরল সরকারকে বিব্রত করতে চাননি,—না কাজের দ্বারা, না কথার দ্বারা। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের বিভিন্ন উক্তিতে (অবশ্য সর্বশেষ উক্তি ছাড়া) তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। শ্রীনেহরু অবশেষে শেষ রক্ষাও করে দিলেন। এর জন্যে সকল দিক থেকেই তিনি ধন্যবাদার্হ।

*

শ্রীনেহরু এই প্রসঙ্গে, কেরল ঘটনার শিক্ষা হিসাবে, একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, তা যেন কারও দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। তিনি কাছে থেকে এবং দূরে থেকে কেরলের ঘটনা উদার দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। কেরলের সরকারকে অপসৃত করে তিনি উৎফুল্ল হননি। ভাবীকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তিনি অনুধাবন করেছেন। তিনি বলেছেন, সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের মধ্যে যদি মতের আদান-প্রদান না থাকে, গরিষ্ঠ দল যদি লঘিষ্ঠ দলের অভিমতকে মর্যাদা না দেন, তাহলে গণতন্ত্র বিকল হয়ে যায়। গণতন্ত্রের মূল তত্ত্বই হল উভয় দলের মধ্যে মত-বিনিময়। কেরল সরকার এইখানে প্রকাণ্ড ভুল করেছিলেন বলেই তাঁদের এই বিপর্যয়। এর থেকে অন্যান্য রাজ্যসরকারেরও শিক্ষা লাভের প্রয়োজন আছে।

*

অশীতিবর্ষ বয়সে শ্রীরাজগোপালাচারী আবার নতুন উদ্যমে নতুন দল গঠনে নেমেছেন। "স্বতন্ত্র দলের" প্রারম্ভিক কাজ শেষ হয়ে এল। সম্প্রতি বোম্বাইতে এই দলের প্রস্তুতি সম্মেলনে দলের মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। সে নীতি কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেছেন, স্বতন্ত্র দলের বিরোধিতা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যতখানি উগ্র হয়ে উঠেছে, তার চেয়ে বেশি উগ্র হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। দলের যে নীতি রাজাজীর বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয়েছে তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি প্রগতিপন্থী নন। সমাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে তিনি প্রগতিপন্থী হতে চানও না। শুধু আধুনিক বলেই আধুনিকতার তিনি পক্ষপাতী নন। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী এবং কম্যুনিজমের বিরোধী। এবং, তাঁর মতে, তিনি যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী দল গঠনে মনোযোগী হয়েছেন, সে এইজন্যে যে, "কংগ্রেস কম্যুনিস্ট হয়ে আসছে" সম্ভবত বৃহৎ শিল্প এবং ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক মতবাদের জন্যেই তাঁর মনে এই সন্দেহ হয়েছে। এবং এই মতবাদের উগ্র সমর্থক হিসাবেই নেহরুজীর উপর তিনি বিশেষভাবে অপ্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু একটা সত্য কথা তিনি বলেছেন। ধর্ম তার শ্রেষ্ঠ আসন থেকে চ্যুত হয়েছে এবং অর্থ ও সম্পত্তি সেই আসন অধিকার করেছে। তার ফলে লোভ পর্বতপ্রমাণ হয়েছে। এর জন্যে দায়ী যেই হোক, ব্যাপার ভয়ের।

হাস্যকর ব্যাপার কি হতে পারে। সংগতিহীন সামঞ্জস্যহীন মানুষ এক সৃষ্টিছাড়া জীব। যে মানুষ এই মুহূর্তে উদার, পরমুহূর্তে সে সংকীর্ণ। যে এক বিষয়ে উদাসীন, আর এক বিষয়ে সে পরম আসক্ত। যে মানুষ একজনের কাছে সরল আর একজনের কাছে সে কুটিল। একজনের যে প্রিয়, আর একজনের সে পরম শত্রু। শুধু তাই কেন, একই ব্যক্তির সে প্রিয় এবং শত্রু। একই আধারে প্রেম আর দ্বেষ-বিদ্বেষ মিশে রয়েছে। কখন যে কোনটা উপচে পড়বে মানুষ কি তা জানে না? সে কি প্রবৃত্তির হাতের পুতুল? তার পদতলে দাসানুদাস?

মনোমোহনের মত রক্ষণশীল মানুষ নিজের মেয়েদের তো পাহারা দেবেনই, অসীম এমন কতজনকে জানে যাঁরা পরের বেলায় কোন বাঁধনই মানেন না, তাঁরাও নিজের স্ত্রী-কন্যাকে অন্যের স্পর্শ থেকে অন্যের দৃষ্টি থেকে প্রাণপণে আড়াল করে রাখেন। কামিনী যেন কাঞ্চনের মতই সিন্দুকে তুলে রাখবার ধন। কিন্তু যারা হাত বাঁধে, পা বাঁধে, তারা কি মন বাঁধতে জানে। এই মনোমোহন যদি নিজের মেয়ের মনকে চিনতেন তাহলে এমন টহলদার হয়ে রাত জাগতেন না। ভবানী ভ্রূকুটি ভঙ্গী ভবই বুঝতে পারেন, ভূধর পারেন না। মানসীকেও তাঁরা কতখানি বুঝতে পারেন মনোমোহন? তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নের কতটুকু খোঁজ রাখেন? রাখা অসম্ভব। মানসী তাঁর আত্মজা, [illegible] তো নয়। সৃষ্টি আর লয়ের মাঝখানে স্থিতিটাই বৃহৎ, ব্যাপ্ত, রস এবং রহস্যের আধার। আর এই স্থিতির মধ্যে যে হৃদিস্থিতা সেই সাক্ষাৎসার।

'আচ্ছা অসীম!'

অনিদ্রার রোগী মনোমোহন তাঁর প্রতিজ্ঞা ভেঙেছেন। ভাঙবেন একথা অসীম জানত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? দ্বিতীয় ডাকেও সাড়া দিল না অসীম।

তৃতীয়বারে মনোমোহন কণ্ঠ আর হৃদয় দুই-ই তুলে ধরলেন, 'বাবা অসীম, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

অসীম মনে মনে বলল, 'আপনার মত লজ্জাহীন, বিচার-বিবেচনাহীন মানুষের ঘরে কারো কি ঘুমোবার জো আছে!' মুখে সাড়া দিয়ে বলল, 'না ঘুমুইনি।'

মনোমোহন শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'জানি অসীম, তুমি ঘুমোতে পারনি। যারা ভাবুক, চিন্তাশীল রাত্রে তাদের তো ঘুমোবার জো নেই বাবা। তাদের permanent night duty. তাছাড়া, যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। একথা আমি তোমার মাসীমাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারিনি অসীম। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করেও বোঝাতে পারিনি।'

অসীম সাড়াও দিল না, সায়ও দিল না। মৌন থেকে এই ইশারাই দিতে চাইল যে, রাত দুপুরে দার্শনিক অদার্শনিক কোনরকম আলোচনায় তার সম্মতি নেই।

কিন্তু অসীম সাড়া দিল কি দিল না তা লক্ষ্যই করলেন না মনোমোহন। তিনি নিজের ঝোঁকে বলে চললেন, 'আচ্ছা, অসীম, এই সমাজের কি হবে বলতে পার?'

জবাব না দিয়ে নিষ্কৃতি মিলবে না, অসীম তাই বলল, 'কোন্ সমাজের কথা বলছেন?'

মনোমোহন বললেন, 'আরে যার মধ্যে আমরা বাস করছি তার কথা ছাড়া আর কিসের জন্যে এত রাত্রে আমার মাথাব্যথা হবে বল?'

অসীম বলল, 'তা ঠিক।'

মনোমোহন বললেন, 'আমার এমনিতেই ঘুম কম। কিন্তু এই হতভাগা দেশটার কথা যখন ভাবি তখন ঘুম একেবারেই ছেড়ে যায়।'

অসীম একটু তরল সুরে বলল, 'ঘুমের যদি সত্যই ব্যাঘাত হয় বলে মনে করেন তাহলে দেশ আর সমাজের কথা রাত্রে মোটেই ভাববেন না মেসোমশাই। ওসব চিন্তা দিনের বেলার জন্যে রেখে দেবেন।'

মনোমোহন একটু চুপ করে থেকে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'অসীম তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ। তোমার তো মেয়ের ভার ঘাড়ের ওপর নেই, আমার চোখের ঘুম কিসে যে কেড়ে নিয়েছে তা তুমি বুঝবে না।'

অসীম চুপ করে রইল।

মনোমোহন বলতে লাগলেন, 'আমার মেয়েরা রূপসী না হলেও কুশ্রী তো কেউ ওদের বলতে পারে না। যাকে বলে লাবণ্য, শ্রী তা ওদের যথেষ্ট আছে। লেখাপড়াও শিখিয়েছি। অবশ্য ওরা নিজেরাই কষ্ট করে শিখেছে। গরীবের ঘরের মেয়ে। নিজেরাই প্রাইভেট টিউশনি করে পড়ার খরচ চালিয়েছে। আমি ওদের সবটা দিয়ে উঠতে পারিনি, কলেজের মাইনে টাইনেও মাঝে মাঝে বাকি পড়েছে। কিন্তু তাই বলে ওরা কেউ উচ্ছন্নে যায়নি, পড়াশুনায় ফাঁকি দেয়নি। ভালোভাবেই পাশ করে বেরিয়েছে। শুধু মোটা মুখস্থ করা পাশ না, লেখাপড়া ওরা যে শৌখিন ভাবে তা শিখেছে তার মধ্যে ভেজাল নেই। বুঝেছ অসীম?'

অসীম বলল, 'হুঁ।'

মনোমোহন বলতে লাগলেন, 'আজকাল লেখাপড়া শিখেছে বলে, কি চাকরি বাকরি করে বলে ওরা যে বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে তা ভেব না। ওরা সব কাজ জানে, ঘর-সংসারের সব কাজ নিজের হাতে করে। রান্না-বান্নায়, সেলাই-ফোঁড়াইয়ে সমান উৎসাহ। বিলাসিতা বাবুগিরি করবার মত পয়সা তো ওদের বাপের নেই, ওরা সে সব শিখবে কোথায়? শেখেনি, ভালোই হয়েছে। আলস্য আমার চক্ষুশূল।

মাধুরীর হাতের রান্না তুমি আজ খেয়েছ, ওর হাতের সেবাও তুমি দেখে থাকবে। তুলনা হয় না, বুঝলে অসীম তুলনা হয় না। এতদিনের যে পাকা গিন্নী ওর মা, সে-ও ওর কাছে হার মানে। যাকে বলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তাই। বুঝেছ?'

অসীম বলল, 'হুঁ।'

মনোমোহন ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু হলে হবে কি, এই পোড়া দেশে এমন একজন কেউ এসে বলল না, আপনার লক্ষ্মীটিকে আমার ঘরে দিন, সে এসে আমার ঘর আলো করে তুলুক। চিত্তকে আনন্দে ভরে দেয় বলেই তো মেয়ের নাম নন্দিনী। মেয়ে হল রত্ন। কিন্তু সেই রত্নকে আমাদের দেশ চিনল না। সে যেন পাথরের নুড়ি। এমনি তার অনাদর, এমনি অবহেলা। যারা রত্ন যাচাই করতে আসে তারা জীবনেও কোনদিন রত্ন দেখেনি, তাই তাদের চোখে সবই কাচ। তারা জানে না তাদের নিজের চোখগুলিও পাথরের। সেই তো সে চোখে লজ্জা নেই, মায়া-মমতা নেই, মানুষের যা থাকে তার কিছুই নেই।'

কোন্ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি মনোমোহনের আজ মনে পড়ছে তা বুঝতে বাকি নেই অসীমের। মাধুরী এবারও অমনোনীতা হয়েছে। তার জন্যে প্রথমে মেয়ের ওপরই রাগ করেছিলেন মনোমোহন, এবার পক্ষ পরিবর্তন করেছেন। কিংবা আসল রাগটা কখনোই নিজের মেয়ের ওপর ছিল না। শুধু একটা আবরণ ছিল মাত্র। এখন তা সরে গেছে।

অসীম সহানুভূতির আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'মাধুরীর গুণ আছে।'

মনোমোহন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু কে সেই গুণের দাম দেবে বল? দাম তো দেবেই না বরং টাকা চায়। ওর শরীরের সামান্য খুঁতটুকু খুঁড়ে আছে তার জন্যে টাকা, গুণ থাকলে তার জন্যে টাকা। নাকটা যেমন উঁচু নয় তার জন্যে খুঁত পড়ল, পটে আঁকা ছবির মত চোখ নয়, তার জন্যে দশও আরো পাঁচশ কি প্রতিবন্ধক ছিল ছবি। এই হল এদের মনোবৃত্তি, বুঝলে অসীম। অথচ সমাজে এরাই শিক্ষিত বলে, ভদ্র বলে গর্ব করে, নিজেদের প্রগতিশীল বলে জাহির করে বেড়ায়। শিক্ষা সংস্কৃতি প্রগতির নমুনা তো এই। দেখা হয়ে গেছে। আমার একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে।'

অসীম এবারও কোন কথা বলল না। কিন্তু সাড়া না দিলেও সে যে সহানুভূতি তা মনোমোহন টের পেয়েছেন।

মনোমোহন বলে যেতে লাগলেন, 'এক এক সময় মনে হয় কি জানো? ওকে পরিষ্কার বলে দিই, মা, পারলাম না। তুই তোর নিজের পথ দেখ, স্বয়ম্বরা হ। নিজে পছন্দ করে ভালোবেসে একজনকে বিয়ে কর। কিন্তু বাপ হয়ে তো তা বলা যায় না। ওর মা ওকে ঘরের কাজ শিখিয়েছে, আমি লেখাপড়া, সভ্যতা ভব্যতা যতদূর পারি শিখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও বিদ্যা তো বাপ হয়ে শেখানো যায় না।'

অন্য সময় হলে অসীম হয়তো বলত, 'মেসোমশাই, ও বিদ্যা শেখে না কোন মানুষ, নয়ন আপনি করে নয়নের কাজ বুকে যার থাকে সেই বোঝে।'

কিন্তু এই মুহূর্তে কথাগুলি মনে হলেও মুখ দিয়ে কথাগুলি বেরোল না অসীমের। বরং কিসের একটা অনির্দিষ্ট বেদনায় তার মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। একটু আগের মনোমোহনের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা তার আর মনে পড়ল না, এমন কি, তিনি যে অনর্গল কথা বলে তাকে একটুও ঘুমোতে দিচ্ছেন না সেই অভিযোগ পর্যন্ত ভুলে গেল।

একটু বাদে মনোমোহন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'ছেলেটা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় অন্যায় করে ফেললাম। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। বকে বকে ওর ঘুমের ব্যাঘাত করে তবে ছাড়লাম। কী যে অভ্যাস হয়েছে। কিন্তু কাউকে না কাউকে মনের সব কথা বলতে না পারলে যেন শান্তি পাওয়া যায় না। মনে হয় বুকের ভিতরে যত কিছু জমেছে সব ঢেলে

উজাড় করে দিই। কিন্তু বলতে যাওয়া ভুল। বলে বলে কিছুতেই শেষ করা যায় না। ফের জমে। আবার বলতে ইচ্ছা করে। তখন ঘরের মানুষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে যায়। সব কথা মানুষকে না শুনিয়ে যদি খানিক খানিক গাছগাছালিকে শোনাই, খানিক পশুপক্ষীকে—তাহলে মন্দ হয় না।'

অসীম স্তব্ধ হয়ে মনোমোহনের স্বগতোক্তি শুনতে লাগল। সংকল্পের পর তিনি বোধ হয় এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। খানিক বাদে তাঁর আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আরো কিছুক্ষণ বাদে শুধু নাকের শব্দ শোনা যেতে লাগল।

অসীম হাসল। এতক্ষণে অনিদ্রার রোগীর একটা সুরাহা হল।

কিন্তু একবার ঘুম চটে গেলে সহজে অসীমের ঘুম আর আসতে চায় না। তাছাড়া, অন্যের নাসিকাধ্বনি আর এক-জনের নিদ্রার পক্ষে অনুকূল নয়। এপাশ ওপাশ করা ছাড়া বাকি রাতটুকু আর বোধ হয় কিছু করবার থাকবে না অসীমের।

জীবনের আর একটি দিন শেষ হল। একটি দিন আর একটি রাত। রাতকে আর আলাদা করে কেউ দেখে না, উল্লেখ করে না। দিনের তারিখটির মধ্যেই তাকে গুঁজে দেয়। কিন্তু রাতগুলি মানুষ ঘুমিয়ে কাটায় বলেই তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টের পায় না। যারা মাঝে মাঝে জাগে, জেগে জেগে দেখে তারাই বুঝতে পারে রাত্রির আলাদা সত্তা আছে। তাতে শুধু বাইরের প্রকৃতির রূপ আর রং বদলায় না, মানুষের ভিতরের প্রকৃতিকেও রূপান্তরিত করে। বাইরের পৃথিবী আঁধারে আবৃত হয়, মনের গভীরে আর এক গোলার্ধ উদ্ঘাটিত হবে বলে।

আর একটা দিন কাটল। কাল কি অসীম ভাবতে পেরেছিল এইদিনটা ঠিক এইভাবেই কাটবে? এইভাবে এই মানুষগুলির সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মনে এইসব অনুভূতির উদ্রেক হবে? ভাবতে পারেনি। ভবানীপুরে তার এক বন্ধুর ওখানেই উঠবে ঠিক করে এসেছিল। মানসী সব বেঠিক করে দিল। বন্ধুর ওখানে উঠলে নিশ্চয়ই এসব ঘটত না। হয়তো সত্যিই ডালহৌসী স্কোয়ারে যেতে পারত। চাকরির ব্যাপারে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য কি কর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে এক-আধটু চেষ্টা চরিত্র করা যেত। দিনের এই ছকটিতে পাশার ছকে অন্য দান পড়ত, গুটিগুলি অন্য চালে চলত। বাসনা, বাক্য, কর্ম, মনন এই হল চতুরঙ্গ।

কোন কোন দিনের কিছু কিছু পরি-কল্পনা থাকে। অফিসের ডায়েরিতে নির্দিষ্ট থাকে সেই কর্মসূচী। কিন্তু আজকের এই ছুটির দিনটিকে সে আগে থেকে লিপিবদ্ধ করেনি, পরিকল্পনায় গেঁথে রাখেনি, শুধু কল্পনায় ছেড়ে দিয়েছে। যা ঘটবার ঘটুক, যা হবার হোক। সারাদিন অবশ্য এমন কিছুই ঘটেনি যা অভাবিত। কিন্তু কোন পদক্ষেপ, কোন বাক্যাংশ সে ভেবে রেখেছিল একথাও বলা চলে না। ভাবা থাকে না বলেই জীবনে এত দুঃখ, এত আঘাত, এত বঞ্চনার পরেও এত বিস্ময়, এত রস, এত রহস্য অবশিষ্ট থাকে।

অসীম নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চায় না। নিতান্ত কৌতুকে ছাড়া গণৎকারের কাছে কোনদিন সে হাত মেলে ধরেনি। সে জানতে চায় না। আগামী দিনটির পাতা সে আজই পড়ে ফেলতে চায় না। অজ্ঞাত অপঠিত সেই পাতাটি রহস্যে ঢাকা থাকুক, রঙীন খামে মোড়া প্রিয়ার চিঠির মত।

মনে আছে, ক্লাস নাইনে একদিন অঙ্কের মাস্টারমশাই জানকীবাবু জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, 'ওহে সেকেন্ড ক্লাসের বাবুরা, ভবিষ্যতে তোমরা কে কি হবে ঠিক করেছ?'

কেউ বলেছিল ডাক্তার, কেউ বলেছিল, ইঞ্জিনীয়ার, কেউ প্রোফেসর, যারা দুঃসাহসী ডানপিটে তাদের কেউ কেউ জাহাজের ক্যাপটেন কি উড়োজাহাজের পাইলট হবার সাধ জানিয়েছিল। শুধু অসীম বলেছিল, 'আমি জানিনে।'

একথা শুনে মাস্টারমশাই ধিক্কার দিয়ে-ছিলেন, 'ছি ছি ছি। হতে পার কি না পার সাহস করে কথাটা বলতে পারলে না?' সহপাঠীরা হেসে উঠেছিল। দু একজন বন্ধু চুপে চুপে উৎসাহ দিয়েছিল, 'বল না, বলে দেনা একটা কিছু।'

কিন্তু অসীম কিছুই বলতে পারেনি, কিছু হওয়াটা বোধ হয় তার মনঃপূত হয়নি।

জীবন সেই অসংকল্পের শোধ নিয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে যে যা হতে চেয়েছিল হয়তো সবাই তা হতে পারেনি। কিন্তু অনেকেই কিছু না কিছু হয়েছে। যে উকিল হতে চেয়েছিল সে প্রোফেসর হয়েছে, যে ডাক্তার হবে বলে ভেবেছিল সে গেছে ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে, কোথাও না কোথাও সবাই গিয়ে পৌঁছেছে। অসীমেরই শুধু কোন গন্তব্য নেই। সে অর্ধপথে লেখাপড়া বন্ধ করেছে, কোন কাজে সে মন বসাতে পারেনি। কয়েক-বার অফিস বদলেছে কিন্তু তাতে কি স্বভাব বদলায়? কতবার কল্পনা করেছে, সেও ভাস্করের মত নিজের জীবনকে একটা বিশেষ রূপ দেবে, পাথর কুঁদে কুঁদে মনোহর মূর্তি গড়বে, সেও হবে স্বপরি-কল্পিত, স্বনির্মিত মানুষ। কিন্তু আসলে সে আর পাঁচজনের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। পাঁচজন মানে পরিবেশ, পারি-পার্শ্বিক। সে তার হাতে কাদার পুতুল। Creature of circumstance. অমনিতে সে নিয়তি মানে না, অদৃষ্ট মানে না, শুধু স্বয়ং কর্তৃত্বে, শুধু পুরুষকারে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস শুধু একটা ফ্যাশন, শুধু আধুনিক বলে নিজের পরিচয় দিতে পারবার আত্মপ্রসাদ। চলবার সময় পুরুষকারকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে চলে। সবদিক থেকে অন্যনির্ভর পুরুষের কোথায় পুরুষকার, কোথায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব? পুরুষ শুধু আকারে, পৌরুষ শুধু বাক্যে আর বিতর্কে। আর কোথাও তার পুরুষকারবাদের অস্তিত্ব নেই। তাই সে যা হতে চায়নি তাই হয়েছে এবং হওয়ার পরেও বলছে চাইনে চাইনে।

অসীমের মনে হল, তার এই দ্বিধা মানসীকেও দুর্বল করেছে। তার ভালো-বাসাকে, অসীমের ওপর তার আকর্ষণকে দুর্বল করেছে। বরং গোঁয়ার, একগুঁয়ে পুরুষকে মেয়েরা ভালোবাসে। যে লড়াই করতে জানে, নিজেকে জোর করে জাহির করতে জানে তার গলাতেই তারা বরমালা দেয়। আর যার আত্মবিশ্বাস নড়বড়ে, তাকে তারা মোটেই বিশ্বাস করে না। তারা গাছের মত, পাহাড়ের মত শক্ত আর অবিচল কিছুর ওপরই নির্ভর করতে চায়।

হয়তো মনস্বীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তেমন সঞ্চারিত করে দিতে পারেনি অসীম। তাই বছরের পর বছর তারা একই জায়গায় রয়ে গেছে। না এক জায়গায় কেউ থাকতে পারে না। হয় এগোতে হবে, না হয় পিছোতে হবে। হয় উঠতে হবে না হয় নামতে হবে। তারা পিছিয়েছে, তারা নেমেছে। তাদের সম্পর্কের উত্তাপ কমে যাচ্ছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নিজের মধ্যে বাজনার সেই আগুন সেই বহ্নিই মনস্বী তার নতুন সংসারে দেখতে দিচ্ছে। নিজের দিকে না চাইলে সে একদম থেকে নড়তে পারে না। কিন্তু নিজে হয়ে যাওয়ার পরেই কি পারবে? তখন কি বলবে না, আমি চুপ করে ঘরের কোণে পাপ আর তুমি বুড়ো বয়সের কান্না কাঁদো। দুনিয়াকে কে দেখবে? মানুষের পরার্থ-পরতার কি শেষ আছে? স্বার্থপরতা এক জায়গায় এসে থামে, কিন্তু পরার্থপরতা থামতে জানে না।

মানুষ না থামলে ঘর বাঁধবে কি করে? শংকর আর নন্দিতা থেমেছে, তারা ঘর বেঁধেছে। সেই স্বার্থপরের ঘরে নতুন করে পরার্থপরতার জন্ম হচ্ছে। তাদেরও এক-জনের জন্যে আর একজন ছাড়তে, ছেলে-মেয়ের কল্যাণে আত্মোৎসর্গের জন্যে তৈরী হচ্ছে। বেশ করেছে শংকর। যাকে সে ভালোবাসে তাকে তার পুরোনো পারিবারিক ভূমি থেকে উপড়ে নিয়ে এসেছে। মনের জোর আছে শংকরের, বাহুর জোর আছে। আর যার জোর আছে সে স্বার্থপর হতে ভয় পায় না। কিংবা যে স্বার্থপর হয়, সেই

নিজের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে জানে। সংসারে যাঁরা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধনবান, খ্যাতিমান তাঁরা সবাই স্বার্থপর। ভদ্রভাষায় আত্মকেন্দ্রিক বলা যায়। তাতে শব্দ বদলায়, অর্থ বদলায় না। তাঁরা সবাই স্ব-কে গঠন করতে তৎপর। অসীমও স্বার্থপর। আত্মগঠনে নয়, আত্মপঠনে।

অসীম যদি শংকরের মত দৃঢ়মনা, বলবান পুরুষ হত, বেশ হত। তাহলে সেও মানসীর দ্বিধা দৌর্বল্যকে তুচ্ছ করে, তার দায়িত্ব কর্তব্যকে দু পায়ে মাড়িয়ে তাকে এখান থেকে ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু শংকরের মত অসীমের সেই জোর তো নেই। নন্দিতার মত মানসীর সেই দৈহিক সৌন্দর্যই কি আছে? শংকরের স্ত্রী সত্যিই রূপবতী। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই অসীম তাকিয়ে দেখেছে একবার, লুকিয়ে দেখেছে অনেকবার। যতক্ষণ দেখেছে ততক্ষণ পৃথিবীর কোন কথাই আর ভাবেনি। চাকরির কথা নয়, মানসীর কথা নয়। শংকরের নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতার সমালোচনা পর্যন্ত করতে ভুলে গেছে। রূপ সব ভোলায়। যে মেয়ে বলে, রূপে তোমায় ভোলাব না সে মনে মনে জানে, তার রূপ নেই। ভালোবাসা ভোলায় না পথ দেখায়। কিন্তু মানুষ পথ দেখতেও চায়, ভুলতেও চায়। তার চাওয়ার মধ্যে এই উল্টো পাল্টা দুটো বিরুদ্ধ দাবীই থাকে। সে পথও চায়, বিপথও চায়। পথেও যায়, কুপথেও যায়। তার জন্যে নিজের কাছে পরের কাছে দুর্নাম হয়ে যায়, তবু লজ্জা হয় না।

নন্দিতার পাশে মানসী একেবারেই দাঁড়াতে পারে না। তার রূপ নেই। তার যা রূপ তা শুধু অসীমের চোখে। কিন্তু তার চোখে শংকরের কাজল নেই, [illegible] চোখ আর ভালোবাসারই চোখ। [illegible] [illegible] সে মানসীর কোন [illegible] রূপ বাড়িয়ে [illegible] পারে না। মানসী তা জানে। হয়তো সেইজন্যেই সে নন্দিতার মত নিজের রূপচর্চা হতে চায় না। হয়তো সেইজন্যেই গুণকে আঁকড়ে ধরতে চায়। গুণ আর কি। মানসী গাইতে জানে না, নাচতে জানে না, অন্য কোন বিশেষ গুণ দেখবার নেই। বি এ পাশ করে লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কাজ নিয়েছে। বিদ্যের বাজারে তার রূপ ক'জনের চোখে পড়বে না এই গুণটুকুও কি ক'জনের চোখে পড়বে। কিন্তু শুধু এই গুণটি কি এত কারো মনে বাসনা আর ভালোবাসার উদ্রেক করবে? মানসী জানে এই গুণেই তার সাফল্য নয়। ওই নিজের ঘরের মধ্যে সে পরার্থপরতায় বড়। স্বার্থ চায় সব স্বার্থ আর সুখ ত্যাগ করে দান-ধর্মের খ্যাতি লাভ করতে চায়। অসীমের কাছে সহজে ধরা দিতে চায় না পাছে সহজে ছাড়া পেতে হয়।

না কি অসীমের মত মানসীরও আত্ম-প্রত্যয় তার বাবার দাঁতের মত ঠকঠক করে নড়ে? অসীমের দুচোখকে কি বিশ্বাস করে না মানসী, হৃদয়কেও সন্দেহ করে? নইলে তার ছোটবোন মঞ্জুর সঙ্গে অসীমকে কথা বলতে দেখলে তার অত ঠাট্টা করবার ঝোঁক বাড়ে কেন? মাধুরীর কথা সে ও বার বার তোলে তা কি শুধুই পরিহাস? মাধুরীর কোন কোন প্রত্যঙ্গ কোন কোন গুণকে কি ও সত্যিই ঈর্ষা করে না, ভয় করে না? সে যে দিদির জন্যে সব স্বার্থ সব সুখ বলি দিতে চায় তা কি উদারতায় না অভিমানে? নৈরাশ্যে আর পরাজয়ের আশংকায়? 'তোমরা তো womanly womanই চাও।' মানসী তখন বলেছিল, মানসী মাধুরীর চেয়ে বেশি রোজগার করে, নিজের পরিবারের ওপর তার আধিপত্য বেশি, তবু তার দিদি যে দেহেমনে বেশি নারীত্বের অধিকারিণী একথা সে ভুলতে পারে না। হয়তো সেইজন্যেই তার বাবা মার মত মানসীও তার দিদিকে তাড়াতাড়ি পার

[illegible] চায়। মাধুরীর পার হওয়া যে কঠিন, খেয়া নৌকো আধ গাঙে যেতে না যেতেই বার বার পারে ফিরে আসে তাতে তাও দেখানো চলে। এক ঢিলে দুই পাখি মরে। দুই পাখি। মানসী আর মাধুরী এরাও দুই পাখি। ঠোঁটে করে একজন আর একজনের ঠোঁটে ফল তুলে দেয়। আবার সেই একই ঠোঁটে একজন আর একজনের ঠোঁট ঠোকরায়। একই ঠোঁটের দুই কৃত্য দুই কীর্তি।

কিন্তু ছি ছি ছি। এসব কি করছে অসীম। যাকে সে ভালোবাসে মনে মনে তারই সর্বাঙ্গে কালি লেপে দিচ্ছে। যার চেয়ে বড় আর কেউ নেই, আপন কেউ নেই তাকেই সে ছোট করছে। তাতে সে কি নিজেই হীন হয়ে যাচ্ছে না? কাউকে হীন ভাবা মানে নিজের মনে সেই হীনতাকে সঞ্চারিত করা, সেই হীনের সঙ্গে লীন হয়ে বসে অসীমের কোন কোন সময় বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে সে ছাড়া পৃথিবীর সবই অবাস্তব, তারই কল্পনার সৃষ্টি। সে কাউকে বড় করেছে, কাউকে ছোট, কাউকে মহৎ করেছে, কাউকে দীন। তার এই কল্পিত পৃথিবীতে দীনতা হীনতা ক্ষুদ্রতা সংখ্যায় আর পরিমাণে যদি বেশি হয় সে তার নিজেরই কল্পনার দৈন্য, সৃষ্টিশক্তির অনুদারতা। এই যে চারদিকে যত মুখ দেখছে অসীম সুন্দর কুৎসিত, প্রসন্ন আর বিমুখ সবই তো তার কল্পনার সৃষ্টি। অসীম ভাবছে বলেই তারা আছে, অসীম দেখছে বলেই তারা আছে। প্রতিটি মুখ, প্রতিটি হৃদয় প্রতিটি মন অসীমের মানস বিন্দু, চিন্তার স্ফুলিঙ্গ। মাঝে মাঝে ভাবতে ভালো লাগে, কল্পনা করতে ভালো লাগে। সকলের নীচে থেকে সকলের ওপরে উঠতে গেলে এই জগৎটাকে নিজেরই কল্পনার জগৎ মনে করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। দাস হয়েও তাহলে নিজের প্রভুত্বকে জাহির করা যায়। বাস্তবে মানুষের দাসত্বের শেষ নেই। সে প্রাকৃতিক নিয়মের দাস, সামাজিক আচারের দাস, রাষ্ট্রীয় আইনের দাস, আর যে প্রবৃত্তি বার-বার এই নিয়ম রীতি নীতি আর আইনকে লঙ্ঘন করে তার সে দাসানুদাস। কিন্তু কল্পনায় সে প্রভু। এই বাস্তব জগৎকে তার নিজের সৃষ্টি বলে যখন সে কল্পনা করে তখনই তার অখণ্ড প্রভুত্ব, একমাত্র তখনই সে অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

নিজের বিছানায় শুয়ে সবাইকে লুকিয়ে নিজের মনে মনে অসীমের [illegible] হতে লজ্জা নেই। কল্পনা ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? পৃথিবীর এক ভাগ স্থল, তিন ভাগ জল। মানুষের বিচরণক্ষেত্রেও এক ভাগ বস্তু তিন ভাগ কল্পনা। সে কল্পনা ন্যায় নীতির বন্ধনহীন। হয়তো বস্তুর থেকেই তার জন্ম। কিন্তু জন্মদাতাকে ভুলতে তার দেরি হয় না, মেয়েরা যেমন স্বামীর ঘরে গিয়ে বাপকে ভোলে।

মানসী তুমি কবে ভুলবে?

মানসী। মানসীর ওপর বড় অবিচার করেছে অসীম। অবশ্য মনে মনে। কিন্তু অবিচার করেছে বলেই তো, নিষ্ঠুর হতে পেরেছে বলেই তো সে এই মুহূর্তে আরো কাছে এসেছে। মানে অসীম তাকে পরম মমতায় নিজের কাছে আনতে পেরেছে। মন যখন নির্মম তখন কেউ কারো নয়, যখন মমতায় ভরা তখন সবাই তোমার। মম শব্দটির মত মোহমাখা এমন মধুর কথা নেই। ছেলেবেলায় অসীম মমকে পড়তে [illegible] বাবা মমকে শব্দের [illegible] দিয়েছিলেন। কিন্তু মমতায় মোমেরই মত কোমলতা, মোমের মতই আলো।

ঘুমের আগে আরো কি ভেবেছিল ঘুম ভাঙবার পরে তা আর ভালো করে মনে পড়ল না অসীমের। হয়তো সে ভাবনার কোন ভাষা নেই, ভাষা থাকলেও কোন ব্যাকরণ নেই। সে ভাষায় পূর্ণ বাক্য তো ভালো, বাক্যাংশও হয় না। সে ভাষায় সব শব্দ অর্থগৌরব বহন করে না। 'বাগর্থা-বিবসম্পৃক্তৌ পার্বতীপরমেশ্বরৌ' এ কাব্য অচল। এখানে হর আর পার্বতী সম্পর্ক বদলে নিচ্ছেন। ঘুমের আগে আর কী ভেবেছিল মনে পড়ে না অসীমের। ঘুমের মধ্যে কী দেখেছিল, বলেছিল তাও যেন ছাড়া ছাড়া মনে পড়ছে। জায়গাটা বড় সুন্দর। অনেকটা পাহাড়ের মতই কিন্তু পাহাড় নয়। পাহাড় আছে, নদী আছে। আবার কলকাতা শহরের ট্রাম বাসও চলছে। [illegible]। অসীম বাসে ওঠেনি, ট্যাক্সিতে চেপেছে। স্বপ্নেই যদি দেখল নিজের গাড়ি হলে ক্ষতি ছিল কি? সেই ট্যাক্সিতে করে অসীম নদীর ধার দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। স্বপ্নের বিষয় নিঃসঙ্গ নয়। পাশে আর একজন আছে। তার পরনে রক্তবর্ণের চেলি, ঘোমটা নাকের উপর ছাড়িয়েছে। অসীম বারবার সেই ঘোমটা তুলে ধরতে চেষ্টা করছে আর হেসে হেসে বলছে, এ কি উৎসবের আয়োজনের লজ্জা। [illegible] মুখ খোলো। কিন্তু নববধূ কিছুতেই মুখ খুলতে দিচ্ছে না। আর অসীমের মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে হয়তো সে নয়, হয়তো চেনা কেউ নয়। কিন্তু তাই হোক সে অপূর্ব সুন্দরী। সেইজন্যেই কি অসীম তেমন আপত্তি করছে না? নিজের হৃদয়-হীনতাকে ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু গাঁটছড়াটা খুলে দিচ্ছে না?

ঘরের মধ্যে এবার ভোরের আলো এসে পড়েছে। একটু একটু শব্দ, নারীকণ্ঠের ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা। মাধুরী না মানসী? মঞ্জুও হতে পারে। অত যখন মিষ্টি গলা—মঞ্জুই। বাইরে সশব্দে একটা বাস চলে গেল। এই কি প্রথম বাস?

ঘরের মধ্যে অনিদ্রার রোগীটির এখনো নাক ডাকছে। অসীম মশারীর ভিতর দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল।

(ক্রমশ)

সঙ্গে আমাদের কণামাত্র পরিচয় নেই। আমার জানামতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পাবনা জেলার কবি ইসমাইল হুসেন শিরাজী (নজরুল ইসলাম এঁর কাছে একাধিক বিষয়ে ঋণী বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন) তুর্কীকে সাহায্য করার জন্য একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে সেদেশে গিয়েছিলেন এবং তুর্কী রাজনীতি, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তুর্কীর সভাকবি হামিদ পাশার সঙ্গে সে সময়ে তাঁর হৃদ্যতা হয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার পরিচয় করিয়ে দেবার পূর্বেই ইংরেজের চাপে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়।১

তুর্কীর বাইরে ইরান আফগানিস্থান, উজবেক, আজারবাইজান, তথা গ্রীস, বুল-গারিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি দেশে নসরুদ্দীন খোজা সুপরিচিত। ইরানের স্বর্ণযুগের একাধিক সুরসিক কবির উপর তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট। বল্কানের বাইরে ইয়োরোপে তিনি জর্মনিতে সবচেয়ে বেশী ভক্ত পাঠক পেয়েছেন। ইংরিজী এন-সাইক্লোপীডিয়াতে তাঁর নাম নেই, জর্মন সাইক্লোপীডিয়া আকারে ইংরিজীর অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেটাতে তাঁর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র আছে। আর একাধিক অনুবাদ জর্মন ভাষাতে তো আছেই। অবশ্য আজকের দিনের রুচি দিয়ে বিচার করলে তাঁর বহু জিনিস শুধু কুটনীরসাশ্রিত লাতিনেই অনুবাদ করা যায়!

খোজার জীবনী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার উপায় নেই। কারণ তাঁর জীবন ও তাঁর হরেক রকমের রসিকতা এমনই জড়িয়ে গিয়েছে যে তার জট ছাড়ানো অসম্ভব। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ষোল আনা পরিমাণ কিংবদন্তী বিশ্বাস করলে আমাদের কালি-দাস সম্বন্ধে প্রচলিত সব কটাই বিশ্বাস করতে হয়। এমন কি তিনি পাঁচ শ' না সাত শ' বছর আগে জন্মেছিলেন সেই সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান এযাবৎ হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে খোর্তো গ্রামে তাঁর জন্ম, সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং আকশেহিরে তাঁর মকবরহ্ বা সমাধি-সৌধ দেখানো হয়। ইনি যে সুপণ্ডিত এবং সুকবি ছিলেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকলে 'ইমাম্' (ইংরিজিতে অন্ততপক্ষে বিশপ) হওয়া যায় না। অন্যান্য একাধিক ব্যাপারেও তিনি সমাজের অগ্রণীরূপে তুর্কী এবং তুর্কীর বাইরে সুপরিচিত ছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁর নামে প্রচলিত গল্পের কটি তাঁর নিজস্ব ও কটি অন্যের শিরোপা পাওয়া, সে-বিচার অসম্ভব। দেশবিদেশের পণ্ডিতগণ হার মেনে বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচলিত গল্প যে 'বিক্রমাদিত্য সাইকল', খৈয়ামের নামে চলিত-অচলিত চতুষ্পদী 'খৈয়াম চক্র' নামে অভিহিত করেছেন ঠিক সেইরকম এখন খোজার নামে লিখিত, পঠিত, শ্রুত গল্পকে 'খোজা চক্র' নাম দিয়ে দায়মুক্ত হন। কিন্তু গল্পগুলো বিশ্লেষণ করে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তার অনেকগুলোই আরবভূমি, প্রাচীন ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছে। সিরিয়াক এবং প্রাচীন বল্কানেও এর অনেকগুলো প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সে-সব বাদ দিলেও খোজার তহবিলে প্রচুর হাস্যরসের উপাদান উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এবং তার চেয়েও বড় কথা—সুখে দুঃখে, উৎসবে-ব্যসনে, মসজিদে-সরাইয়ে, বাজারে-বৈঠকখানায় খোজা যে ভাবে তাঁর গল্প, আচরণ, ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তারই একটি অতি সুস্পষ্ট হাস্য-ময়, সদানন্দ, দরদী ছবি তুর্কীদের বুকের ভিতর আঁকা। আজ যদি বেইরুৎ থেকে ফিরিশতো (দেবদূত) ইস্তাম্বুলে নেমে বিশ্বজনের কাছে সপ্রমাণ করে যান যে ইমাম নসরুদ্দীন খোজা নামক কোনো ব্যক্তি এ ধরায় জন্মগ্রহণ করেননি তবুও তুর্কীর লোক অচঞ্চল চিত্তে সেই হুজুরীরই হাতে করবে, বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথার ভিতরেই খোজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে, এবং যদি সেখানে একাধিক তুর্ক উপস্থিত থাকে, এবং আপনি যে খোজাকে চেনেন না সে-কথা বুঝতে পারে তবে আপসে পাল্লা লেগে যাবে কে কত বেশী খোজার গল্প বলতে পারে। এদেশে যেমন কিছুর রবীন্দ্র ভক্ত আছেন যাঁরা প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপরসগন্ধস্পর্শ বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো গান, বা একাধিক গান দিয়ে প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি জীবনের সুখ দুঃখ, বিপদ আপদ, দুর্ঘটনা লটারি লাভ—সব কিছুই

---

১ 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্রকে (ইনি 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের বড় মেয়ে) শিরাজী একটি কবিতা ও ছবি পাঠালে পর তিনি (কুমুদিনী) লেখেন, "আপনার কবিতা ও ছবি পাইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। আপনার কবিতাটি 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হইবে। তুরস্কের নারীদিগের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, স্বদেশের কার্যে ও উন্নতিতে তাহাদের সাহায্য-দান, তাহাদের শিক্ষা ও স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখা শীঘ্রই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুবক আহতদিগের সেবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্যের বিবরণ লিখিবেন।"
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

খোজার কোনো না কোনো গল্প দিয়ে রসরূপে প্রকাশ করা যায়। কারণ খোজা শুধু এলোপাতাড়ি রস সৃষ্টি করে থামেননি—তার মারফতে খোজার পরিপূর্ণ জীবনদর্শন বা 'ভেল্টআনশাউউ' পাওয়া যায়।

খোজার গল্প তিন রকমের। সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি যেখানে চালাকী করে অন্যকে বোকা বানাচ্ছেন, কিম্বা মারাত্মক উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করছেন তার সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এন্তের গল্প আছে যেখানে তিনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়েট, গড়ুলস্য কুতব মিনার। এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে বোঝা যায় না, তিনি বোকা না আমরা বোকা।

যেমন মনে করুন, খোজাকে অমাবস্যার রাতে শুধানো হল, পূর্ণিমার চাঁদ গেল কোথায়? খোজা এক গাল হেসে উত্তর দিলেন, 'তাও জানো না, পূর্ণিমার চাঁদকে প্রতি রাত্রে ফালি ফালি করে কেটে নেওয়ার পর এখন সেগুলো গুঁড়ো করে আকাশের তারা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

খোজা বোকা বনছে চান, না বানাতে চান?

অবশ্য খোজার পরিচিতদের [illegible] ছিল। এই [illegible] দিয়ে তিনি যে [illegible] সৃষ্টি করতে চান নি, [illegible] তুলনা দিয়ে [illegible] সৃষ্টি করতে চান [illegible] [illegible]—

প্রিয়া [illegible] মুখ দেখে

মনে হল [illegible] মুখ,

[illegible] পিছনে পিছনে ছুটেছি।

[illegible] একটি [illegible] দিয়ে না। [illegible] নেই, [illegible] নেই, একটি [illegible] [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] [illegible] নয়।

বরং, না হয় মেনে নেওয়া গেল, চাঁদকে গুঁড়ো করে খোজা ইচ্ছা করেই বোকা বানাচ্ছেন। কিন্তু এখন যেটা বলছি সেটাতে খোজা কি?

লোকের বাড়ির দাওয়াতে খোজা খেলেন এক নূতন ধরনের মিষ্টি কাবাব। অতি যত্নে এক টুকরো কাগজে লিখে নিলেন তার রেসিপি কিংবা পাকপ্রণালী, কিংবা যাই বলুন। [illegible] দুটি রাখলেন, জোব্বার ভিতরে [illegible] পকেটে। রাস্তায় বেরিয়েই গেলেন তাঁর প্যারা কসাইয়ের দোকানে। আজ সন্ধ্যায়ই গিন্নীকে শিখিয়ে দেবেন কি করে এই অমূল্যনিধি রাঁধতে হয়। আর খাবেনও পেট ভরে। বন্ধুর বাড়িতে মেকদারটা একটু কম পড়েছিল। গোশ্‌ৎ কিনে খোজা রাস্তায় নামলেন।

হঠাৎ চিল এসে ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে হাওয়া।

খোজা চিলের পিছনে ছুটতে ছুটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে চিলকে বলতে লাগলেন, 'আরে করছ কি? শুধু মাংসটা নিয়ে তোমার হবে কি? রেসিপিটা যে আমার পকেটে রয়ে গেছে। কী উৎপাত! দাঁড়াও না।'

কিন্তু এভাবে গল্পের পর গল্প বলতে থাকলে খোজার সম্পূর্ণ গ্রন্থ নকল করে দিতে হয়। সম্পাদক আপত্তি জানাবেন।

এবারে তাহলে যে ধরনের গল্পের জন্য

খোজা সুপ্রসিদ্ধ তারই একটি নিবেদন করি।

কথিত আছে, একদা খোজা জন্মভূমি তুর্কীর প্রতি বিরক্ত হয়ে দেশত্যাগ করে ইরান দেশে চলে যান। এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই নেই। কারণ খোজা ছিলেন কান্ডজ্ঞানহীন পরোপকারী—আমাদের বিদ্যাসাগরের মত দাগা খাওয়া বিচিত্র নয়।

তা সে যাই হোক,—লোকমুখে ইরানের রাজা সে খুশ-খবর শুনে বে-এক্তেয়ার। তড়িঘড়ি লোকলশ্‌করসহ উজীর-ই-আজমকে পাঠিয়ে দিলেন খোজাকে পরম যত্ন সহকারে রাজদরবারে নিয়ে আসতে। খোজা আসামাত্র তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান ত্যাগ করে বাদশা তাঁকে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। মাথায় সোনার তাজ পরিয়ে দিলেন, গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে দিলেন, কোমরবন্ধে দমশ্‌কী তলওয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে জয়জয়কার।

সভাভঙ্গের পর বাদশা নিভৃতে ইতি-উতি করে, আশ-কথা-পাশ-কথা কাড়ার পর অতি সন্তর্পণে তাঁর জাগীরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। খোজা করজোড়ে 'সে কি শাহ-ইন-শাহ, আপনার যে পূত পবিত্র...... ইত্যাদি'১ বলে তিনি নিবেদন করলেন, রাজসম্মানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

বাদশাহ বিস্তর চাপাচাপি করার পর খোজা বললেন, 'হুজুরের যখন নিতান্তই এ হেন বাসনা তবে হুকুম জারী করে দিন কাল সকাল থেকে যারা বউকে ডরায় তারা আমাকে একটি করে ডিম প্রতি সকালে দেবে।'

দীন-দুনিয়ার মালিক বাদশা তো তাজ্জব। 'ওতে আপনার কি হবে? আমি খবর পেয়েছি, আপনি দান-খয়রাতে দাতা-কর্ণ।'

খোজা এলবুর্জ পাহাড়ের মত অচল অটল। তবে তাই সই। ইরানী ভাষায় বলতে গেলে আলোচনার কার্পেট তখন রোল্ করে গুটিয়ে ঘরের কোণে খাড়া করে রেখে দেওয়া হল।

পরদিন ফজরের নমাজের সময় থেকেই হৈ হৈ রৈ রৈ। এস্তেক রাজবাড়িতেও মমলেট-অমলেট নেই। কি ব্যাপার? যাদের বাড়িতে মুর্গী নেই তারা ফজরের-আজানের পূর্বেই ছুটেছে বাজার পানে। ডিম কিনে ধাওয়া করেছে খোজার ডেরার দিকে।

সেখানে তাই তাই ছুন্দো ছুন্দো আণ্ডার ছয়লাপ! আণ্ডার নবীন ব্রহ্মাণ্ড!

পাইকিরী ব্যবসায়ীরা চতুর্দিকে বসে!

সাতদিন যেতে না যেতে খোজা চাউস তেতলা হাওয়া-মঞ্জিল হাঁকালেন। শঙ্কাধিক-কাল মধ্যেই বোখারার কার্পেট, সমরকন্দের রেশমী তাকিয়া, মুরাদাবাদী আতরদান গোলাপ-পাশ, বিদরী আলবোলা; রাজ-স্থানের গোলাপী মার্বেলের ফোয়ারা, সরন-দীপের (স্বর্ণদ্বীপ সিংহল) হাতির দাঁতের চামর, বাজনী!

বাদশা তো আরো তাজ্জব মানলেন!

কুলোকে বলে দু'একজন অমিতবীর্য অসীমসাহসী শের-দিল রুস্তম নাকি ডিম নিয়ে যায়নি দেখে তাদের (অথবা তার) স্ত্রী নাকি শুধিয়েছিল, 'ওঃ! তুমি বুঝি আমাকে ডরাও না?' তার পর আর দেখতে হয় নি।

ইরানের বাদশা খুশীতে তুর্কীর খাস খলীফাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

এমন সময় রাজার কপালে বজ্রাঘাত। খোজা তিন মাসের ছুটি চান,—দেশ থেকে বউ-বাচ্চা নিয়ে আসবেন ফের। খোজা মারাত্মক একবগ্‌গা। রাজা আর কি করেন, অতি অনিচ্ছায় ছুটি দিলেন। অবশ্য, তিন মাস বিস্তর ঢাকার পর যখন বিদায় ... যাবার সময় বললেন, 'দোস্ত! দেরী করবেন না, আপনার বিরহে আমার—' বাদশার গলা জড়িয়ে এল। ততদিনে তাঁদের সম্পর্ক আর রাজা-প্রজায় নয়—দোস্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুমাসের কয়েকদিন পূর্বেই খোজা রাজ-সভায় পুনরায় উপস্থিত। রাজা পরমানন্দে রাজোচিত ভাষায় শুধালেন, 'তবে কি পুণ্যশ্লোকা বেগম সাহেবা স্ব-ভবনে অবতীর্ণা হয়েছেন?'

খোজা বললেন, 'হাঁ হুজুর! তবে ঠিক না, ভবনটি তাঁর উপর অবতীর্ণ হলেই হত আরো ভালো।'

তদ্দণ্ডেই সভাভঙ্গের হুকুম জারী। বাদশা নিয়ে গেলেন খোজাকে অন্দরমহলে।

'শতেক বছর পরে বঁধুয়া আইল ঘরে—'

বাদশার তখন ঐ হাল। দোস্তের সঙ্গে নিভৃতে বহুৎ বহুৎ হাস্য কুহু কুহু করলেন।

দু-পাত্র শিরাজী খেয়ে বাদশা খোজার কাছে গিয়ে বললেন, 'দোস্ত! রাজ্যের আর সকলের সঙ্গে আমার রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। তারা আমার কাছ থেকে চায়; আমি তাদের দি। কিন্তু আপনি আমার দোস্ত—আপনার সঙ্গে দোস্তীর সম্পর্ক। দোস্ত যখন দেশে ফেরে, তখন দোস্তের জন্য ... করে বললেন, 'এই ... কিছু একটা সওগাত আনে। আপনি তো আনেন নি।'

১ ইরানে বাদশার সামনে কোন্ মন্ত্র দিয়ে নিবেদন আরম্ভ করতে হয়, তার পুরো বিবরণের জন্য 'দেশে-বিদেশে' অধ্যায় পশ্য।

বলে বাদশা খাঁটি খাঁটি করে বিস্ত্রী রকমের হাসতে লাগলেন।

মা-হক্‌ কেইন্‌দৎ হলো মানুষ যে রকম সেনকাতুর কণ্ঠে কাঁদিয়ে ওঠে, খাজা সেই-রকম বললেন, 'জাঁহাপানা হুজুর দুনিয়ার ইমান-ইনসাফের মালিক, এ সংসারে আল্লা-তালার ছায়া (জিল্লুল্লা)—আমার উপর অবিচার করবেন না। এসেছি, আলবৎ এসেছি। দেশে পৌঁছে সজ্জনের পয়লা হুজুরেরই সওগাত সংগ্রহ করেছি। আজ সঙ্গে আনি নি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় নিয়ে আসবো।'

একেই বলে দোস্ত্!

উদ্‌গ্রীব হয়ে শুধালেন, 'কি? কি? আমার যে তর সইছে না। আঃ, জীবনে এই প্রথম কিছু-একটা পেলুম।'

খাজা বললেন, 'নিজের আনা সওগাতের প্রশংসা করতে বাধছে, কিন্তু সত্যি হুজুর—অপূর্ব, অতুলনীয়। একটি অপরূপ সুন্দরী তুর্কী তরুণী আপনার জন্য এনেছি হুজুর। ১'

তারপর খোজা উচ্ছ্বাসিত হয়ে সেই তরুণীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, একেবারে আমাদের বিদ্যাপতি স্টাইলে, নখ থেকে শির পর্যন্ত—যাকে বলে নখ-শির বর্ণন। 'ওহো হো হো,—একটি তন্বঙ্গী চিত্রায় পায় যেন। কী গড়ন, কী চলন!'

বাদশা বললেন, 'আস্তে।'

কিন্তু খোজাকে তখন পায় কে, তিনি তো জোশে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'চিকুর কেশ তো নয়, যেন অমা-যামিনীর অন্ধকার—অপূর্ব, নিবিড়, মনোমোহিত নয়।'

---

(১) ইরানে তুর্কী রমণীর বড়ই কদর।
'হে তরুণী হে তুরস্কী, হে সুন্দরী সাকি
এইবার মম হৃদয় হরণ করিয়াছ তুমি,
তব কপোলের ঐ কৃষ্ণ তিল লাগি
বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি।'

অনুবাদটি ভালো নয়। কিন্তু হাফিজের এই কবিতাটি এতই বিখ্যাত যে, তার একাধিক ইংরিজি অনুবাদ আছে।—

"If that unkindly Shirazi Turk
would take my heart in her hand,
'I'd give Bukhara for the mole upon
her cheek, and Samarkand."

কিম্বা

"Sweet maid, if thou wouldst charm
my sight;
And bid these arms thy neck infold:
That rosy cheek, that lily hand
Would give thy poet more delight
Than all Bokharas Vaunted gold.
Than all the gems of Samarkand."

উৎসাহীদের জন্য ফার্সীটা দিচ্ছি:

'অগর আন্ তুর্ক্-ই-শিরাজী
বদস্ত্ আরদ্ দিল-ই মারা
ব-খাল-ই হিন্দোশ্ বখ্শম্
সমরকন্দ ওয়া বুখারারা।'

কথিত আছে এ দোঁহা লিখে হাফিজকে তৈমুরের কোপের সামনে বিপদে পড়তে হয়েছিল। সেটা বারান্তরে হবে।

উৎসাহের তোড়ে খোজা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যেন রাজকবি দরবারের সবাইকে শুনিয়ে কবিতা পাঠ করছেন।

বাদশা ব্যাকুল হয়ে খোজার জোব্বা টেনে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'চুপ্, চুপ্। আস্তে আস্তে—পাশের ঘরে বেগম-সায়েবা রয়েছেন।'

ঝুপ্ করে বসে পড়ে খোজা বিনয়নম্র কণ্ঠে বললেন, 'হুজুর, কাল সকাল থেকে একটি করে আণ্ডা পাঠিয়ে দেবেন। আমার পাওনা।'

এইখানেই খোজা-কাহিনী শেষ করলে ঠিক হত। কিন্তু তাহলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি পরলোকগমনের পূর্বে যে শেষ রসিকতাটি করে গিয়েছেন, সেটি বাদ পড়ে যায়। কারণ সেটি আজও প্রথম দিনের মত তাজা, অতিশয় নব—ফার্সীতে যাকে বলে 'তাজা-ব্-তাজা, নৌ-ব্-নৌ'১। দ্বিতীয়ত, আণ্ডার গল্পটি আমি শুনেছি আমার সর্ব-কনিষ্ঠ ভগিনী লুৎফুন্নিসার কাছ থেকে। আমার মত তার পায়েও চক্কর আছে। সে শুনেছে, লাহোর না পেশাওয়ার কোথায় যেন। এর থেকে এটাও বোঝা যায়, খোজার গল্প মুখে মুখে কতখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বাঙলা দেশেও পৌঁছল। সপ্তদশ অশ্বারোহী গাঁজা; দশ বাদ দিয়ে সপ্ত শতাব্দীতেই হয়।

এবারে শেষ গল্প। এটাতে আপনি আমি সবাই আছি।

যেমন মনে করুন, দৈবযোগে আপনি পৌঁচেছেন আক্শেহিরে। স্বভাবতই আপনার মনে বাসনা, দিলে ইরাদা জাগবে খোজার গোরস্তান দেখবার জন্য। একাই বেরিয়ে পড়ুন; কিচ্ছুটি ভাবনা নেই, সবাই রাস্তা চেনে।

সেখানে গিয়ে দেখবেন, সামনে এক বিরাট দেউড়ি—প্রবেশদ্বার। কোথায় লাগে তার কাছে ফতেহ্-পুর-সিক্রিতে আকবর বাদশার বুলন্দ্-দর্ওয়াজ্। একেবারে শিশু। তা না হয় হ'ল, কিন্তু অবাক হবেন দেখে যে বন্ধ দরজায় এক বিরাট তিন মণ ওজনের তালা!

গোরস্থানে আছেই বা কি, যাবেই বা কি? এই ভারতবর্ষেই লুটতরাজের ফলে যা কিছু ইমারৎ বেঁচে আছে, সেগুলো হয় কবর নয় মসজিদ—ওসবে লুটের কিছু নেই বলে। তিন মণী তালা দিয়ে খোজার দেহরক্ষা—অন্যার্থে—করা হচ্ছে, মিশরী মমীর মত? কিন্তু ইসলামে তো হেন ব্যবস্থা নেই।

নাচার হয়ে তালাটা বন্ধ জোরে বার কয়েক ঠুকলেন, এদিক ওদিক গলা বাড়িয়ে চেঁচামেচি করলেন।

তখন দরাজ-দেউড়ির একপাশ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল পাহারাওলা। আপনাকে সবিনয় নিবেদন করবে,

'কি হবে ঐ বিরাট তালা খুলে। ওটা কখনো খোলা হয়নি। চলুন পাঁচিল ডিঙিয়ে যাই।'

মানে?

একশ' ফুট উঁচু দেউড়ি—চতুর্দিকের পাঁচিল উঁচুতে এক ফুট হয় কি না হয়!

মানে?

খোজার আখেরী-শেষ-মস্করা। উইলে এইভাবে তৈরী করবার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে চেয়েছিলেন, 'এ জীবনে আমরা সামনের দিকটা আগলাতেই ব্যস্ত। ইতি-মধ্যে আর সব দিক দিয়ে যে বেবাক কিছু চলে যায়, তার খবর রাখিনে।'

*

আমি আক্শেহির যাইনি। কাজেই হলপ খেয়ে বলতে পারবো না, খোজার দর্গা এই পদ্ধতিতে নির্মিত কি না। যদি না হয় তবে বুঝবো খোজা আরো মোক্কম রসিক। বিন খর্চায় আমাদের এখনো হাসাচ্ছেন আর বোকা বানাচ্ছেন।

১ সত্যেন দত্তের অনুবাদ আছে।

ভূষণ আর বোসমশাই মাঝে পড়ে অতিকষ্টে সে ঝামেলা সামাল দিল। মাঝখান থেকে গিরিবালার ঘরখানা ক'দিনের জন্য হাত-ছাড়া হল। শংখকে নিয়ে গিরিবালাকে আশ্রয় নিতে হল ভাঁড়ার ঘরের একপাশে।

এত কাণ্ড যে ঘটে যাচ্ছে বাড়িতে, তার আঁচ একজনের গায়ে কিন্তু একটুও লাগল না। সে চম্পি। সে আশ্চর্য শান্ত, আশ্চর্য ধীর। আজ এই বাসরঘরের কোন চাঞ্চল্য তাকে স্পর্শই করছে না যেন।

সেই আশীর্বাদের দিনই সে যা একটু চঞ্চল হয়েছিল। কিন্তু বিলাস আর বোসমশাই পাত্তরকে আশীর্বাদ করে এসে যখন জানালেন, পাত্তর বগলাকান্ত নিজেই, তখন বাড়িতে তা নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সোরগোল, ঘোঁট ইত্যাদি চললেও চম্পি আশ্চর্যরকম শান্তই হয়ে গেল। বরং এই রকম কিছু না হলেই সে যেন অস্বস্তিতে ভুগত। এখন যেন সে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করল। হ্যাঁ, এ আর স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, কোন হুঁশিয়ার শহুরে যুবকের ছলনা নয়। এ হচ্ছে এক বৃদ্ধ তেজবরের অমোঘ সিদ্ধান্ত। বেশ ভেবেচিন্তে, যাচাই বাছাই করে চম্পির হাতে বালা পরিয়ে দিয়ে গেছেন বগলাকান্ত বিশ্বাস। চম্পির বিশ্বাস হয়েছে, এবার তার গতি হল। সব সংশয় মিটে গেছে তার, তাই সে এত শান্ত, এত ধীর।

বিলাস অবশ্য আশীর্বাদ করে ফিরে এসে কৈফিয়ত একটা দিয়েছিলেন। খুব বেশি বাজে কথা নাকি বলেনি বগলাকান্ত। চারটে গোলা সত্যিই আছে বাড়িতে, দুটো পুকুর, গোটাকতক আম-কাঁঠালের বাগান। বড় রকমের তেজারতি কারবার আছে তার। আর আছে আগেকার দুই পক্ষের দুই ছেলে। বড়টার বয়েস তের, ছোটটার সাত। দুই পক্ষই এই দুটো চিহ্ন রেখে গত হয়েছেন। কোনরকম বদ দোষ নেই তার আর নেই ভাইপো। ঐটুকু যা ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন বগলাকান্ত। সম্ভবত একটু লাজুক প্রকৃতির কিনা, নিজের জন্য মেয়ে দেখতে এসেছেন একথা বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন। আর কি রকম সজ্জন দ্যাখ! পাঁচ শ টাকা বিলাসের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন আসবার সময়। শুভকাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য। চম্পি সুখেই থাকবে।

দামিনী বড় রকমের একটা কান্নার তোড়জোড় করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সব শুনে দামিনীর কান্না মাঝপথেই বন্ধ হয়েছিল। এ চম্পির শিবপুজোর ফল। শিবের মতই বর হল চম্পির। ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে।

বাসরঘরের ক্রিয়াকাণ্ড আরও কতক্ষণ চলত কে জানে? বিমলার চাকনাচোকন, কড়ি খেলান শেষ হল। পাড়ার দুটি পাঁচটি এয়ো নানারকমে জামাই ঠকানো প্যাঁচ একে একে ঝাড়ল। দুখী রূপের বাহার খুলে নাকেকেঁদে বগলাবাবুর গায়ে হাসতে হাসতে ঢলে ঢলে পড়ল। অবশেষে বুদ্ধী বাড়ির বালবিধবা ক্ষান্ত দিদি আসরে নামলেন।

বললেন, ও বর, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকলি ত বিয়ে করতি আইছ। বলি যুবতী কনে সামলাতি পার কেমন দেখি! কোলে তোল দিনি? এ মুখির মিষ্টি ও মুখি তুলে দাও।

এতক্ষণ কি আড়ালে একঘেয়ে মস্করা সব হচ্ছিল। বিরক্ত লাগছিল বগলাকান্তবাবুর। প্রথমবার তাঁর যখন বিয়ে হয়, তখন বোধ হয় চম্পির জন্মই হয়নি। তখনও এই একই ধরনের রসিকতা সব হয়েছিল। সব যেন একই ছকে কাটা। তফাৎ, তখন বয়েস ছিল কম, টাক ছিল না, ভুঁড়ি ছিল না, প্রথম বিয়ে, বেশ ভালই লেগেছিল। কে যেন গালে ঠোনাও মেরেছিল। দ্বিতীয় বিয়ের বয়েসও ত প্রায় বছর দশেক হল। তখনও বগলাকান্তবাবুকে এই একই রসিকতার তাড়না সহ্য করতে হয়েছিল। এবারও তাই। সেই কারণেই এতক্ষণ কোন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ক্ষান্ত দিদির কথায় নড়েচড়ে বসলেন। হ্যাঁ, এতক্ষণে তবু একটা কাজের কথা শোনা গেল। চম্পির হাত দুটো খুব নরম। মনে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে নিরিবিলি পাবার জন্য মনটা আনচান করে উঠল। আর কতক্ষণ জ্বালাবে এরা।

বগলাবাবু বললেন, অনেক হয়েছে, ইবারে বিশ্রাম চাই। আপনারা ক্ষ্যামা দ্যান।

ক্ষান্ত দিদি বললেন, ওলো, বুড়োর যে আর তর সচ্ছে না। অবোসটা বুঝি চাড়া দিয়ে ওঠছে। তা হবে না, পরীক্ষে দিতি হবে। না হলি ছাড়ব ক্যান। এই গ্যাঁট হয়ে বসলাম সব।

সবাই খিলখিল হেসে এর গায়ে ও গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিমলা মুখ টিপে হেসে বলল, নাও ভাই নাও, এইটোয় পাস করলিই ছুটি।

বগলাকান্তবাবু বৃথা বাক্যব্যয় না করে জড়সড় চম্পিকে টেনে নিলেন কোলে। এত লোকের চোখের সামনে যে অপ্রতিভতে, লজ্জায় বিরক্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল চম্পি। একটা সন্দেশ হাতে তুলে বগলাকান্তবাবু বাকীটা চম্পির মুখে জোর করে গুঁজে দিলেন। গালের মধ্যে গুড়ের আবর্জনা নিয়ে চম্পি মুখখানা গোঁজ করে থাকল। সারা হাসির রোল উঠল। ক্ষান্ত দিদির মনের ক্ষোভ চোখে গিয়ে জড় হল।

এক পা জানালা দিয়ে সে বসে উঠল, চল নিরিবিলি চল। ওলো চল সব। যার যার বাড়ি হাঁটা দে। আমরা এখন থাকলি ওদের গায় ফোস্কা পড়বেন, কি বল গো বর।

সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চম্পি সরে বসল। তবুও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে ইচ্ছে করছিল। এতক্ষণে তার ভয় জাগল মনে। এ সুহাস নয়, (হঠাৎ তার সুহাসের কথা মনে পড়ল) যে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলেই তাকে নিস্তার দেবে। বগলাকান্তবাবু উঠলেন, দরজাটা বন্ধ করলেন।

গরমের জামাটা খুলতে খুলতে বললেন, কতক্ষণ আর সং সেজে বসে থাকা যায়।

গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন একটানে। লোমভর্তি একটা দেহ আর ভুঁড়ি নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করল।

অন্ধকারের ক্ষতি ও তাকে

বিষ্ণু দে

স্বর্ণলতার ঝোপে জ্বলে যাক জোনাকি পোকা,
রজনীগন্ধা দাঁড়িয়ে থাকুক কয়েক থোকা,
পাহাড়ের আড়ে পালিয়েছে বুঝি, পালালই বা,
বিভাবরী তাকে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা।
অন্ধকারের আড়ায় সে বুঝি আঁচল পেতে
গোলাপী পথের বাঁকে বাঁকে আর সবুজ খেতে
পালিয়েছে ঐ যেখানে নীরব সন্ধ্যাতারা,
ভাবে ঘরে গিয়ে কাটাবে রাত্রি তন্দ্রাহারা।
তাহলে এবারে ক্ষান্তি মানো হে, ক্ষান্তি মানো,
গ্রামের কোথাও আশ্রয় চাও, ঘুমের দানো
মাটির দাওয়ায় নামাও এবং রাত্রিটাকে
বিলিয়েই দাও পাহাড়-পারানি পলাতকাকে।
দিন যাকে দিলে কয়েক ক্রোশের পাড়ির পাকে
পাশাপাশি দিও অন্ধকারের ক্ষতিও তাকে।

হাঁসের কান্না

আরণ্যক

অনেক দূর, আরও আরও দূরে
পাহাড়ের চূড়ায় বাঁশপাতা ছাওয়া ঘর,
যেখান দিয়ে জ্যোৎস্না রাতে বুনো হাঁসেরা উড়ে যায়,
আর জংলী কুমারী মেয়েরা আকাশের নীচে
গুণ গুণে গান করে আগুন পোহায়
অজানা ভাষায় অচেনা সুরে,
সেইখানে নিশ্চিন্ত নিঃসংগ বিলাসে সর্বাংগ মুড়ে
গা ঢেলে দাও।
নরম আঁচে পা ছড়িয়ে
আগুনের দিকে চেয়ে চেয়ে শোন
চিতাবাঘের ভয়ে কনিষ্ঠ হরিণের
কর্কশ চিৎকার অবিরাম।

কিন্তু, কার কাছে রেখে যাবে অনেক গোপন কথা,
তোমার চতুর কামনার চোরকুঠরীর চাবি?
শহরের গলিতে গলিতে আদায়ের ভার,
সুসভ্য কারসাজি কার হাতে দেবে?
কোথায় সে সৎ বন্ধু যার হেফাজতে
অশ্লীল কাব্যসংকলন, কষ্টিপাথরের
বন্ধকাম মূর্তির সংগ্রহ, আর......আর
কচি রোদ যার মুখে দেখে
উচ্ছ্বাসে মনে পড়েছিল ঈশ্বরকে
তার উলংগ ছবিগুলো? কাকে সঁপে যাবে
তোমার গোপন কুষ্ঠের প্রামাণ্য মলম?

তবু, তবুও, যাও সেই পাহাড়ের চূড়ায়,
সেখানে আকস্মিকের নিরিখে নিজের সামনে দাঁড়াও,
স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে দাঁতাল হাতীর কবর খোঁজ
চেন প্রজাপতি পরগাছা বিষাক্ত ছত্রক
ঠোঁটে গালে আঙুলের ডগায় অনুভব কর
হলুদ-সবুজ মখমলের মত শ্যাওলায়
পুরু নির্বোধ সহানুভূতি।
তুমি কান পেতে রেখ, হয়ত শুনতে পাবে
অনেক রাতে সেই ঠাণ্ডা চালাঘরে,
তোমারই আঘাতে ডানা ভাংগা
বুনো হাঁসের কাংস্য কান্না।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

আটাশো
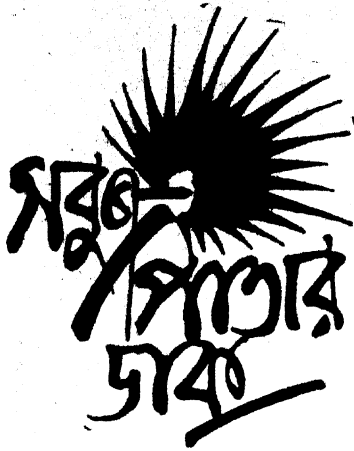
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন প্রমথ চৌধুরী, একথা আমি পূর্বেই বলেছি।[1] প্রমথবাবুর ১৬।৩।১৭ তারিখের পত্রে[2] উনি সময়মত জানিয়ে দিলেন তার পরদিন (১৭ই) ওঁর ওখানে 'ঠাকুর-দর্শন' মিলবে না। ঐ পত্রেই উনি যে-আশা দিয়েছিলেন তার প্রতীক্ষায় রইলুম, এবং সবুজ পত্রের জন্যে আমার একটি লেখা ডাকযোগে পাঠালুম। আবার পুনর্দিন উপরি-উপরি চিঠি উনি আমায় লেখেন :—

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২২।৩।১৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার লেখাটি পেয়েছি। এ লেখাটির সম্বন্ধে আমার তোমাকে কিছু বলবার আছে। আসছে শনিবার বিকেলে আমার এখানে এসে মুখে বলব। আশা করি, এতদিনে তোমার উপন্যাসের পূজো শেষ হয়েছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৩।৩।১৭
শুক্রবার

কল্যাণীয়েষু,

কাল নিশ্চয়ই এসো। রবিবাবু মহাশয় এখন এখানে উপস্থিত আছেন, কাল বিকেলেও থাকবেন। তিনি পরশু সকালেই আবার বোলপুর চলে যাচ্ছেন। তোমার বন্ধু সিংহকে সঙ্গে নিয়ে এসো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

বোলপুরে! বোলপুরে! "পরশু সকালেই 'আবার'" সেখানে চলে যাবেন। কেন গো এত যাবার তাড়া কেন? জোড়াসাঁকো কি ভাল লাগছে না? অশরীরী রবি-ঠাকুর এখনও কেবল আমার মন-ঠাকুর হয়ে মন-গড়া নৈবেদ্য সাজিয়ে আছেন সুরের রানী ভৈরবী রাগিনীর নিবিড় আলিঙ্গনে। কানে শুনছি সে-সুরের রেশ :

তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে,
নীরবে করিতে ভকতি,
বল দাও, মোরে বল দাও,
প্রাণে দাও মোর শকতি।

কলকাতার কোলাহল কি কবির অসহ্য হচ্ছিল? না, সংসার-তাপ-সহন-শক্তি আসেনি কে তাঁর চিত্তে? সর্বকালীন রাগিণী ভৈরবী আবার তাঁর বাণী বহন করে নিয়ে এল আমার কানের পিছনে মনের পটে :

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ,
তখন, হে নাথ,
প্রণমি তোমায়,
গাহি বসে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপচার,
পুষ্প-বিহীন পূজা আয়োজন,
ভক্তি-বিহীন তান।

পুষ্প-বিহীন পূজা বৃথা, যদি অন্তরযামী ক্ষমা না করেন। ফুল হচ্ছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। তাঁর যে-ভাবকেই শিল্পীর মন—কবির মন—রূপ দেয়, জীবের আদর্শকে বরণ করে প্রতিমা গড়ে, সে-ভাবের কাছে ভক্তি নিবেদন করতে হলে আমরা তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে থাকি। শিল্পী নন্দলাল বসুকে একবার জিজ্ঞেস করে-ছিলুম : আপনি অমন চমৎকার পা আঁকেন কি করে? তিনি উত্তর দিলেন : চরণ যে ভক্তির স্থান।

তবে কি রবিবাবু ফুলের লোভে বোল-পুরে বার-বার যেতে চাইতেন? শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন আমায় একবার বলেন যে, সেখানে উঁহার ফুলের

[1] দেশ, ২৮ চৈত্র ১৩৬৫, পৃঃ ৭৩১।
[2] দেশ, গত সংখ্যা।

প্রচুর বৈষ্ণব 'টেগোর'-নামের মহিমা কীর্তন করে। কথায় খেলায় আমি সেন-মহাশয়ের কাছে অনেকবার হার মেনেছি, বিশেষত যখন (রবীন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পরে) তাঁর অতিথি হয়ে বোলপুরে থেকেছি। তবু বাংলা শব্দকোষ দেখতে ইচ্ছে হল। টগর-প্রসঙ্গে যোগেশ বিদ্যানিধি মশায় বলছেন : "গাছ ক্ষীরী, মানুষের সমান উচা হয়। পাতা মৎস্যাকার, ফুল সাদা, রাত্রে সুগন্ধ।"

টগরের সঙ্গে 'টেগোর'-এর যে শব্দগত মিল, তার সঙ্গে যোগ করা যায় রূপ-গত সাদৃশ্য, কেননা টগর-গাছ মানুষের সমান উঁচু। রসের দিক থেকেও এ-ফুল কবির সান্নিধ্য চাইতে পারে। কারণ সে "ক্ষীরী", অর্থাৎ তার মধ্যে রস আছে। গন্ধে—সুগন্ধে—সে রবীন্দ্রনাথের পিয়ারী রজনীগন্ধার সমধর্মী। টগর আর রজনীগন্ধা, এ দুই ফুলেরই রং সাদা, আর কে না জানে যে সাদা রং তারই, যে রবির আলোর সাতটা রংকে একসঙ্গে পেয়েও পাঠিয়ে দেয়

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে, ধরা দেয় আমাদের চোখে? সে-আলো কখনো-সখনো ইন্দ্রধনুর সাত-রঙা সাজে আকাশকে সাজায়, আর আমরা তাকে বলি রাম-ধনু। কেন? রাম যে ছিলেন সূর্যবংশীয়, বিষ্ণুর অবতার এবং বিষ্ণু ত রবির নামান্তর। কবি-রবিঠাকুরই গেয়েছেন :

"রবির আলো সাড়া দিল আকাশ-পারে,
ছড়িয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।"

আবার ভৈরবীর মাতে রব :

"আপন সুরে আপনি মাতে
সাথী হল আপন সাথে,
সব-হারা যে সব পেল সে
কূলে কূলে হে নটরাজ!"

আমি কি আখর দিতে পারি—"ফুলে ফুলে, হে নটরাজ?"

কীর্তনেই আখর দেওয়ার রীতি আছে, এ-ধারণাটা বোধ হয় ভুল। হিন্দুস্থানী গানেও ঐ জাতীয় অলংকার দেখা যায়। বাবা একটা গান গাইতেন, যার মুখটা মনে আছে :

পিয়া পিয়ারে কেডুলা
মানার কোনে জোড়ি দেলে সড়া
নর্টাড়ি দেলে সড়ারে সাঁইয়া,
জোড়ি দেলে সড়া।

এর পরে যেন আছে :

চার তরফ দোকান বনায়া,
বিছায়ে রহ ময়দান,
আওয়েগা মোগলকা সেড়কা,
খেলেগা চৌগানা।
হাতমে দৌড়ি কাণ্ডনিয়া
সুর বনাওয়ে যাও
বান্দামে মিল্ পিয়া রে সাঁইয়া
ছাঁইয়া ভরকে দেও......

এই শেষের দিকে বিকল্প ছিল :

বান্দামে গুজরিয়া পানি
ছাঁইয়া ভরকে দেও......

গানটি উড়িয়ে শেখা, সুতরাং ভাষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা খুব। কেউ সংশোধন করে দিলে খুশী হব।

গানের মানে না-বুঝে আমরা যদি গান গাই, সেটা অমিয় সান্যালের ভাষায় "কণ্ঠ-বাদন"। গানের কথা ভুলে গেলে গায়করা কথার ফাঁকটুকু বুজিয়ে দিতেন নিরর্থক শব্দ দিয়ে, অবশ্য সুর-তাল বজায় রেখে। তার থেকে "তেলেনা"র সৃষ্টি। এই অগতির গতি—যাকে হয়তো ইংরেজীতে 'বাই-প্রডাক্ট' বলা যায়—একটা সাংগীতিক স্থিতিশীল রূপ পেয়েছে। "ওস্তাদ জী, একটা তেলেনা শোনান"—এ-ধরনের অনুরোধ সমঝদার শ্রোতাদের মুখ থেকে বেরুত। বাবার কাছে শুনেছি, নুলো-গোপাল-জীর একটি বিশেষ ঢং ছিল এই যে, গানের এক-কলি গেয়ে তার পরেই সেই কলির 'তেলেনা' ধরতেন অনেক সময়ে। আবার গানের অন্য কলি শুরু করতেন। সেকালের শ্রোতারা এরকম পরিবেশনে আনন্দ পেতেন। বাইজীদের সংগে যাঁরা সারিঙ্গী থাকেন তাঁরাও গানের অংশবিশেষকে যন্ত্রযোগে এইভাবে পরিবেশন করে থাকেন। যন্ত্রের সাহায্যে সুরের বিস্তার যত সহজ হয়, তত সহজে সম্ভবত শুধু গলায় হয় না। বিস্তারবহুল সংগীতের ইতিহাস এই দিক থেকে আলোচনা করার যোগ্য।

আধুনিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাইকের মাধ্যমে শোনা যায় : এইবার রবীন্দ্রনাথের অমুক গান গীটারে বাজিয়ে শোনাচ্ছেন অমুক। —তখন শ্রোতাদের স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কথা ও সুর, একসংগে। তখন শ্রুতির আর স্মৃতির মধ্যে যেটুকু বিরোধ অনুভূতির মধ্যে আসে, তার সমাধান করতে আমরা বাধ্য হই।

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুর ওত-প্রোতভাবে জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-গানে ও-দুয়ের সংযোগ জন্মগত। কীর্তন গানেরও অনুরূপ ঐতিহ্য। হিন্দুস্থানী গানেরও এক সময়ে ঐ ধারা ছিল নিশ্চয়। নইলে তার কদর থাকত না। যে-সব হিন্দুস্থানী গান আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি, তার মানে বোঝবার চেষ্টা করিনি, কারণ সে-সব গানের সুরের বিস্তারই কানে এত ভাল লাগত যে, তার অর্থ হৃদয়ংগম করা প্রয়োজন মনে হয়নি। ভাষা-জ্ঞানের জন্যে ব্যাকরণ চাই, এই অর্ধসত্যটিকে আমাদের পূর্ণ-সত্যরূপে গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল দু দুটো ভাষা নিয়ে—সংস্কৃত আর ইংরিজী—কেননা বাংলা মাতৃভাষা, সুতরাং ব্যাকরণ-বিভীষিকার স্থান সেখানে ছিল না। এর ওপর যদি হিন্দী ব্যাকরণশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হত, তাহলে ভার বহন করতে পারতুম না।

এখন কলকাতার অনেক মেয়ে গান শিখছে, আর 'ক্লাসিকাল' গান ভাল করে গাইতে গেলে যে হিন্দী-ভাষা শেখা উচিত, এ-ধারণাও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সেদিন একটি মেয়ে আমার কাছে ঐ উদ্দেশ্যে একটু হিন্দী শিখতে এল। যত বলি, হিন্দীভাষায় আমার জ্ঞান অতি সামান্য—দরওয়ান, ফিরিওয়ালা, ইত্যাকার লোকদের মুখে শুনে শেখা—ততই সে আবদার করে যে, আমার কাছে হিন্দী সে শিখবেই শিখবে। মেয়েটি পাড়ায় থাকে, দূর সম্পর্কে নাতনী, কাজেই রাজী হলুম। দেখি, একটা হিন্দী ব্যাকরণও এনেছে। যা পারলুম, শেখালুম। কেবল গানের জন্যে হিন্দী শেখা যখন তার উদ্দেশ্য, তখন আপত্তি করতে মন সরল না। এর পরে যদি কোনো পাথুরিয়াঘাটের গলায় সে মালা দেয়, তাতেই বা আমার আপত্তি কি?

১৯৪৭ সালের ভারত-বিভাগের পূর্বে

পাঞ্জাবীরা অনেকে বাংলা শিখছিলেন, রবীন্দ্র-সংগীতকে আয়ত্তে আনবার জন্যে। একথা ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি, তখন ভাবি যে, ঐ ঘটনা না ঘটলে হয়তো সারা ভারতে রবিঠাকুরের গানের ভাষা মধুর সুরের বাহন হয়ে ভ্রমণ করত। এখনও কি তা হয় না? এখনকার আমলে আমাদের যে-কর্তারা দিল্লী থেকে শাসনকার্য চালাচ্ছেন, তাঁদের চিত্তে যে বাংলাবিদ্বেষ নেই, তার প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় যখন অনেক তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন"-কে ভারতের 'জাতীয় গান' (ন্যাশনাল সং) হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এখানে বসে দ্বিতীয় প্রমাণ পেলুম, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ছাঁকা তিন কোয়ার্টার ধরে বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। তৃতীয় প্রমাণ, দিল্লীতে যাঁরা শিক্ষা-বিভাগে কুট-স্থান অধিকার করে আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাঙালী কবি এবং তাঁরই হাতে ভার পড়েছে ভারতের সংস্কৃতি সাধনের পথ পরিষ্কার করে দেওয়ার। তা ছাড়া, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সভাপতি চিন্তামণ দেশমুখ সংস্কৃত কবিতা ত লেখেনই, উপরন্তু তিনি নাকি বাংলা ভাষা খুব ভাল জানেন এবং বাংলা সাহিত্যে অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমরা যদি তাঁর স্মৃতিকে যথার্থ সম্মান দিতে চাই, তা হলে উচিত হবে তাঁর মাতৃভাষাতেই সে-সম্মান জ্ঞাপন করা। দেখা যাক, ঠাকুরে ভক্তি কার কত এবং কিভাবে তা প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু এখন সে-সব কথা প্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯১৭ সালে তাঁর সংগে চাক্ষুষ পরিচয় হবার আগে আমি তাঁকে পেয়েছিলুম প্রধানত গানেরই মাধ্যমে। তাঁর গীতাঞ্জলি, রামায়ণী কথার ভূমিকা, প্রাচীন সাহিত্য, গল্পগুচ্ছ আর দু-চারটে অন্য রচনা মন দিয়ে পড়েছিলুম। উনি বাংলা কবিতার জন্যে নোবেল প্রাইজ পাননি, পেয়েছিলেন ইংরিজী গদ্য অনুবাদের জন্যে। যদিও সেটা ঠিক অনুবাদ হয়নি, তথাপি সেই গদ্য রচনার মধ্যে যে রস ও ভাবের ধারা ছিল, তারই তারিফ করেছিলেন সমস্ত ইউরোপীয় মনীষীরা। যদি তাঁরা বাংলা শিখতেন তাহলে না-জানি কত প্রশংসাই করতেন কবির মাতৃভাষাশ্রিত ছন্দোবদ্ধ রচনার। সে-সময়ে একটা ভুল ধারণা আমরা পোষণ করছিলুম যে, রবি ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় বাংলা ভাষার একটা বিশিষ্ট স্থান বিশ্বের দরবারে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। আসলে তা এখনও হয়নি। তবে হবার জোগাড় হচ্ছে। মস্কোতে খুব জোর ব্যবস্থা হয়েছে বাংলা পড়াবার। রুশ দেশের লোকেরা ভাষা-শিক্ষায় চিরকালই পারদর্শী। তাঁদের জিভের আড় নাকি এমন যে সব-রকম শব্দই অল্প আয়াসে উচ্চারণ করতে পারেন। ইংরেজরা আমাদের ত-বর্গ মুখ দিয়ে বের করতে পারেন না; ফরাসীরা তেমনি ট বর্গের উচ্চারণে অপটু। জর্মানদের দেশে আঞ্চলিক উচ্চারণ ভেদ থাকায় ওদের কেউ কেউ বলেন 'ত', কেউ বলেন 'ট'।

প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য হয়েও আমি জর্মান ভাষার প্রতি তাঁর মতন বিরূপ হতে পারিনি। বিশেষতঃ যখন দেখলুম (ইংরিজী অনুবাদের মাধ্যমে) যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের গবেষণায় অনেক সারগর্ভ কথা পাওয়া যায়। সত্যেন বোসের কাছে ঐ জাতীয় প্রবন্ধ (যার ইংরিজী অনুবাদ হয়নি) পড়াতে যেতুম। যাকোবি (Jacobi), লুডের্স (Luders) প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের কৌটিল্য, অশোক ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণায় যে-সব যুক্তি দেখলুম, তার ফলে জর্মান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেল আমার মনে।

কিন্তু জর্মান ভাষা শিক্ষা করতে গেলে যে-ধৈর্যের দরকার সে-ধৈর্য আমার ছিল না। একটি জর্মান ব্যাকরণ সত্যেনের কাছ থেকে উপহার পেলুম বটে, কিন্তু সেটা পড়ে মনে রাখা আমার সাধ্যাতীত বোধ হল। সে-ব্যাকরণের অক্ষর দেখতে দেখতে আমার চোখের সুখ ঘুচে গেল। অক্ষর যে চক্ষুশূল হতে পারে এ-অনুভূতির উদয় হল যে-মুহূর্তে, সেই মুহূর্তেই জর্মান ব্যাকরণ আমার পাঠ্য পুস্তকের বহির্ভূত হয়ে যায়। অথচ বাল্যকালে ঐ 'কাঁকড়া এ-বি' শিখতে কত ভালবাসতুম। তখন এই 'কাঁকড়া এ-বি' অক্ষর দিয়ে কলকাতার ইংরিজী খবরের কাগজের প্রথম পাতায় সংবাদ-পত্রের নাম মুদ্রিত হওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল, এখনও সেরীতি অনুসৃত হচ্ছে। এতে রাগ করা অনুচিত, কারণ ও অক্ষরকে Old English type বলা হলেও আসলে ওটি জর্মন এবং আমাদের দেশ যে কমনওয়েলথের অন্তর্গত, সে কমনওয়েলথের কর্ত্রী হচ্ছেন জর্মান বংশীয়া। যে-সময়ে প্রমথ চৌধুরীর কাছে বাংলা সাহিত্যে আমার হাতে-খড়ি হয়, সেই সময় বরাবর বিলেতের লোকেরা মহা হৈ-চৈ লাগিয়েছিল যে, তাদের রাজা এবং রাজার আত্মীয়-আত্মীয়ারা রাজপ্রাসাদের অন্দরে জর্মান ভাষায় কথোপকথন করে থাকেন, যদিও জর্মনরা তখন ইংরেজদের পরম শত্রু। এই হৈ-চৈ বন্ধ করার জন্যে রাজপ্রাসাদের অধিবাসীদের ঐ বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়।

একটা কথা এই সুযোগে বলে নিই। যদিও ইংরেজ জাতকে অনেকদিন শাসন করে আসছেন এই জর্মান রাজবংশ, তবু কাউকে স্বীকার করতে শুনিনি যে, ইংরেজরা পরাধীন। অথচ ছেলেবেলা থেকে ইতিহাসে পড়ে আসছি যে, ভারত কুতুবুদ্দীনের আমল থেকে পরাধীন। সিংহাসনে কে রাজা হয়ে বসে আছেন, তাই দেখে যদি স্বাধীন-পরাধীন বিচার করা যায়, তাহলে ইংরেজদের নজীর অনুযায়ী আমরা কুতুবুদ্দীনের সময়েও স্বাধীনতা হারাইনি, বলতে হয়। ইংরেজের তৈরী ভারতের ইতিহাসে আর একটি মারাত্মক নামকরণ আছে। কুতুবুদ্দীনের পর থেকে নাকি মহামেডান পিরিয়ড। তার আগে ছিল হিন্দু পিরিয়ড, আর [illegible] পরে এল বৃটিশ পিরিয়ড। রাজা কি ধর্ম মানতেন তাই দেখে যদি পিরিয়ড ভাগ করা যায়, তাহলে বৃটিশ পিরিয়ডকে খৃস্টান পিরিয়ড বলা উচিত। এইখানেই এসব নামকরণের অসংগতি ধরা পড়ে। আমি বলতে চাই, মহামেডান পিরিয়ড কথাটি উঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এক ঔরংজেব ছাড়া আর কে 'মহামেডান'-রূপে [illegible]?

রবিবাবু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ওঁর এবং প্রমথবাবুর মনে একটা নব-উদ্যমের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল নিশ্চয়। সবুজপত্র তার সবুজপত্র সেই নব-জাগরণের প্রতীক। 'যেদিন পড়িয়ে পাতা-ঝরা তপোবনে উঠিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস', সেদিনই হল নূতন জীবনের সূচনা। সেই দিন থেকে দিকে দিকে এল সবুজ পাতার ডাক। সেই যে সবুজ রং, যাকে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিল কাঁচা-সবুজের মধ্য-মণি, কবির মনেতে রাঙা রেখেছিল শান্তির নিদেশন। সে রং-এর ভিতরে অন্তরে ছিল কত সুমধুর সুর, কত বিচিত্র ভাষা, সেটা পারিবারই উচিত, কুশলের সুধা বাণী।

(ক্রমশঃ)

গ্রামখানে অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে, তারপর গঞ্জের পাকা রাস্তাটা হেলে-সাপের মত নির্জীব। বাস যদি আসে কখনো সখনো, লরী আসে গঞ্জের ধান-চাল লুট করতে; গরুরগাড়ির লোহাবাঁধান চাকার শব্দটা ওরই মধ্যে যাহোক পা-টেপার মত পাকা রাস্তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। পাথরকুচির সাথে কাঁচা পিচ মেশান হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনো আছে সারা গায়ে দাদের মত। খানা-খন্দ অসংখ্য। গাড্ডায় পড়লে আর উপায় নেই, অনেক হাঙ্গামা, 'ভক' লাগান, কাছি টানাটানি হৈ-চৈ!

তবু পায়ে-হাঁটা কাঁচা পথটা ফুরিয়ে গেলে পাকা রাস্তায় উঠে পথচারী উৎফুল্ল কণ্ঠেই বলে, "নে পা ধুয়ে নে, অর কি পাকা রাস্তা এবার! ধর ধর আয়!"

হাঁটুভোর কাদা ধুতে অনেক সময় যায়। হানা-মগরার চাতালে দাঁড়িয়ে খালের জলে এক ঠ্যাঙ বাড়িয়ে পা-ধোয়া মুখের কথা নাকি! তারপর এতখানি পথের মেহনত কম নাকি! কাদা কি শুধু পায়ে, সর্বাঙ্গে ছিটে আছে। বামুন সিঁথি, বোন-বোনাই, হিঞ্চেবেড়ের কাদা বিখ্যাত, একেবারে মাখন কাল কাই কাই! বর্ষার সময় সে এক কাণ্ড-কারখানা! কি কষ্ট হাটে-বাজারে আসার!

মজাও আছে। মল্লিকপুরের* বাবুদের বাড়ির মেয়েরা আজকাল হেঁটে 'ইস্টিশানে' আসা-যাওয়া করেন। শুকোর সময় যা হোক গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তেনারা সব আসেন, বর্ষার সময় বড় বগড় হয়—কাদায় ল্যাটোপ্যাটা হৈস-স কি একখান অবস্থা হয় পাকা রাস্তা পর্যন্ত আসতে। দু-প্রস্থ পোশাক লাগে যে বর্ষায়। এত মেহনত, এত খেয়ার বাবুদের বাড়ির মেয়েরা পা ধুয়ে সব ভুলে যান, কি হাসহাসি করেন পাকা 'অস্তায়' উঠে। মেঘলা আকাশটাও দাঁত হাসে। খালের জল আলতা-রাঙা।

সড়কটা পাকা করে দেবার একবার কথা উঠেছিল. ওধারে শ্যামগঞ্জ আর এধারে ফলতাগঞ্জ দুমাথা জুড়ন করে পাকা স্যাংশন। বাবুরা গাঁয়ে থাকলে তবু আশা ছিল, এখন তো তেনারা বহুকাল গ্রাম ছেড়েছেন—কাঁচা রাস্তায় বলে মাটি পড়ে না, তাবার পাকা!...

শীত ফুরিয়ে ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে, কাঁচা-পাকা চুলের মাথায়। দেখতে দেখতে কি চৈত্র সকাল থেকে। বুনোবাঁশিতে মাঠের ধান সব খুঁটে খেয়ে গেছে। আলের ধারে ইঁদুর গর্তগুলো এখন সাপের বাসা, ধান-কাটা মরসুমে বড় বড় গর্ত বানিয়ে দু-পাঁচটা করে ফসলের জুটিয়েছিল ধাড়ী-গুলো—কথায় বলে যে পোষ মাসে ইঁদুরের বিশটা মাগ।

বিনোদের এখন থেকেই দুর্ভাবনা। একটা মাসেই পক্ষীশ্বর. দাঁতে বিষ যেন। কি না কাজ নেই, মন বসে বসে খাচ্ছে। 'চোত্তির' মাসেই এই, এখনো সম্বচ্ছর আছে—চাষের দেরি ঢের। চাষার মেয়ে বোঝে না, চৈত্রেই কোন কাজ জোটে না চাষী মজুরের। ধানচালের কারবার চৌনকায় পাঁচ মাস। শিবদাস হালদার কি কাণ্ডটা করলে, মাঠ থেকে ধানগুলো তাদের দিয়ে তুলিয়ে নিয়ে কেমন 'গাদা' করে রেখে দিয়েছে, ঝাড়ন-মাড়ন করালে না; কি না মজুরী বেশি, আরো কমুক। ওরা কদিন আশায় আশায় ঘুরেছে, আজ নয় কাল—; ফাল্গুন মাসও শেষ হলো, শিবদাস হালদার স্থির হয়ে আছে, নড়ে না, চড়ে না। রাগ করে বিনোদ বলেছিল, "তখন তো খুব খোশামুদি—ধানগুলো বরবাদ হচ্ছে, তোমরা লেগে যাও, ডবল মজুরী দেব, বাপসকলরা। এখন?"

শিবদাস হালদার ক্রোধ বুঝিয়ে বলেছিল, "পোষাবে না. তা বলে সাত সিকে রোজ দিতে হবে? ও শালার আছে বেশ, থাক! পস্তাতে দেখা যাবে!"

কেন সাত সিকে দেবে না জনমজুরী? চালের দরটা কত, সে খেয়াল আছে! মোটা চাল দশ আনা, বার আনা হাটে-বাজারে!

পারলে বিনোদ শিবদাসের ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিত। মটকা মেরে খামারে পালা সাজিয়ে রাখা বার করে দিত! শালা বলে কিনা পাঁচ সিকে মজুরী ধান-ঝাড়ুর! তাদের গতর খুব সস্তা দেখেছে! সব থেকে মেহনত ধান-ঝাড়ুর! নড়া ছিঁড়ে যায়। বলে বিশ ঘা লাগাও, বিচালিতে ধান থাকছে!

খুঁজে খুঁজে হারি-পারি, কোথাও কাজ নেই, মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে! গঞ্জও কানা, এক মুঠো ধান নেই যে সেখানে কাজ-কারবার চলবে, দুটো জন-মজুর কাজে কাম্ব খাবে! ধানের আড়ত ভোঁ-ভাঁ। ফড়েটা সব শেষ করে দিয়েছে।

"খোকা ঘুমল পাড়া জুড়ল, বর্গী এল দেশে—বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কিসে!" অবাক হয়ে যায় বিনোদ, ধান সব গেল কোথায়—এই সেদিন দেখেছে কত, কিবা মূল্য ছিল। দুচার বস্তা এমনি

দাস হালদারের ঠাকুরদা লোককে ডেকে ডেকে ধান দিয়েছে, কাজ বেঁধে রেখেছে—কোন তাগাদা নাই, লেখাজোকা নাই! তাঁর নাতি কিনা ধানের বাড়ি দেয়—এক মণে দেড় মণ উসুল, নয় তো চাষে খেটে মর উপোস করে! একের নম্বর চশমখোর তৈরী হয়েছে শিবদাস হালদার! ছিটেফোঁটা ধান ছাড়ে না মুখের কথায়। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই, কথার কোন মূল্য নেই! এই সেদিন শিবদাস বলেছে, "আর কিছু চাও দিতে পারি ওটি বাদ! পেটে খেয়ে আর ওগরাবে না, আমার জানা আছে! কেন বাপু শুধতে পারবে না, যাও! দু-পাঁচ টাকা দিচ্ছি নাও বরং—"

টাকায় কি হবে! ওর চেয়ে এক বস্তা ধান পেলে অনেক সুবিধে। গায়ে-গতরে শোধ দিতে রাজী! চাই কি দেড়া ধান ফলিয়ে দেবে বিঘে ভূমিতে! "এক গুণ দিলে তিন গুণ ফলবে।" শোনে নি কোন কথা শিবদাস হালদার। মানুষ বলে গণ্য করে না বিনোদকে এখন। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিল বিনোদ—চাষের সময় দেখে নেবে, তেল-তামাকে তুষ্ট হবে না! চাষ ওঠে কেমন করে দেখবে! একা বিনোদ চারজন মজুরের কাজ করতে পারে!

সে যাক। আজ কিছু ধান যোগাড় করতেই হবে। দু সন্ধ্যা উপোস গেছে! পুকুরের গেঁড়ি-গুগলিতে পেট ভরে না আর। খিদেয় তিনটে ছেলে টাক-টাক করে, শেষ তাদের জন্যে, যারা মাঠে ধান ফলায়, মহাজনের ঘরে ধান তুলে দেয়। 'চোং কিস্তি' তাদের জন্যে পেটে কিল! কত ফন্দি-ফিকির আর আঁটাবে, 'খোরোর' চারটে মাস হাড় শুকিয়ে দেবে!

বটতলার মাঠ থেকে কোটালডাঙার ধান-কলের শব্দ পাওয়া যায়। ফট্-ফট্ করে আওয়াজ হয় রাতদিন। লোকে বলে 'ভট্ভটিয়া'। দশ আনা পয়সায় দেড় মণ ধান ভেনে-কুটে দেয় কলে, অনেক লাভ 'বানি দেওয়ার' চেয়ে—দেড় মণ ধানে এক মণ আড়াই সের চাল পাওয়া যায়, তার ওপর খুদ-কুঁড়োটা ফাউ! দেবে কোটাড়িরা তেমনি হয়েছেও, দু-পাঁচখানা গ্রাম অন্তর অন্তর কল বসেছে, ঢেঁকির পা খোঁড়া! ঢেঁকিছাঁটা চালের আর কোন সমাদর নেই! অচ্ছা কল হয়েছে! বিষ্টু ঘোষ কোঠা বাড়ি তুলেছে 'কল' বসিয়ে! বাপ-ঠাকুর্দা যা পারেনি ছেলে তাই [illegible] বেরিয়েছে, কোটালডাঙার বিষ্টু ঘোষকে কাক-পক্ষীও চেনে!

বিনোদও চেনে। [illegible] হালদারের চালের বস্তা মাথায় করে বিষ্টু ঘোষের কলে ভানতে গেছে। লোকটার একটা গুণ আছে, সবাইকে সমান খাতির করে, নমস্কার ঠিক মনে রাখে। দূর থেকে দেখা হলে আপ্যায়িত সুরে অভ্যর্থনা করে, "এস এস সর্দারের পো! তামাক খাও।"

মেয়েদেরও সমাদর করে, "[illegible] কি খবর, এতদিন পরে? ভাল তো সবাই!" দেয়। বিষ্টু ঘোষ নিজের [illegible] চলে, "আপনার আসতে অনেক কষ্ট না খুড়ীমা? ঐ তো বোসপাড়াতে রাধানাথ কল করেছে, তোমাদের অনেক সুবিধে!"

খুড়ীমা মানতে রাজী নন। বেনেপাড়া আর কোটালডাঙা এমন কি আর হের-ফের, রাস্তা সমানই! এ তবু পাকা রাস্তার ওপর, এসে পা ছড়িয়ে খানিক বসা যায়! রাধানাথের কল ঐ নামেই, দো-চালা খড়ের চালার মধ্যে গাদাগাদি—কল চললে কানে তালা লেগে যায়! কাজে-পিঠে কেমন [illegible] যেন! রাধানাথ লোকটারও কেমন রস-কস নেই। [illegible] মত খোঁচিয়ে আছে।

বিষ্টু ঘোষের দয়া-দাক্ষিণ্য আছে। অসময়ে হাতে-বরাবর পাওয়া যায়। না বলে না বড় একটা! দু-একবার কাজ-কারবার করে দেখেছে বিনোদ, বিষ্টু ঘোষ অবিশ্বাস করে নি। শিবদাস হালদারের মত নয়, [illegible]

[illegible]

বিষ্টু ঘোষ সে-সময় দেখেছেন, বাসের ভয়ে রেলের মুখ শুকিয়ে তুলসী পাতা! রেলের টি-আই বাবু সব তখন জেণ্টেলম্যানদের খোশামোদ করতে আসতেন। ঐ ভূতনাথ-বাবুর জন্যে রাত দশটায় স্পেশাল আসতো —কোনো প্যাসেঞ্জার! কথায় বলে না, রেলে চুরি না হলে লাইনগুলো সব সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া যেত!

আরো কত গল্প আছে। বিনোদের খুব বেশী সুযোগ হয়নি রেল চড়বার, পাকা রাস্তায় উঠে কুটুমবাড়ি যাবার নাম করে কখনো যদি রেল চড়েছে, তা-ও কতটা—দুটো 'ইস্টাশন' কি দু কোশ পথ! তার-পর রেল সিটি দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তারা যেমন বড় নয়, তাদের রেলটাও তেমন বড় নয়, বেশ মানানসই ছিল কিন্তু! বাবুদের কুটুমরা কেবল হাসাহাসি করতেন—রেল নয় দেশলাই-এর খোল যেন! একটা গল্প কলকাতায় বাবুরা বলতেন—কবে নাকি রেল উল্টে পড়েছিল একটা বকনা বাছুর চাপা দিয়ে। হেসে বাঁচেন না বাবুরা!

বিষ্টু ঘোষ বললেন, "যাক্, অসুবিধে কিছু নেই......বরং অনেক সুবিধে হবে।

ভরবে, পাকা রাস্তা ডবল ধান ফলাবে, রোজগার বাড়বে? রেলের বদলে বাস চলবে, তাতে তোমার লাভ কি! বাস ধরে জল খেও পেট ভরবে!

যত সব দালাল জুটেছে। গবর্নমেণ্টও হয়েছে তেমনি—যা বোঝাচ্ছে, তাই বুঝছে। চোখ বুজিয়ে আছে! নিজস্ব কোন চোখ নেই! বলে ধানচালের এই অবস্থা, রাস্তা বানাবার জন্যে হুটোপাটি। কমখানি পথ নাকি শ্যামগঞ্জ! আট-ন' কোশ! একে দেশে ধান নেই, জমি নেই! যা আছে তাকেও বরবাদ করতে হবে? বুদ্ধি বটে!

হবে না কি, নিশ্চয়ই একটা হটুগোল হবে! মুখের কথায় অমনি সব জমি ছেড়ে দেবে! ছেলের হাতে মোয়া! পড়ুক না কোদালের ঘা, মাটি পাথর হয়ে আছে! রক্ত দিতে হবে। বিষ্টু ঘোষ যত সোজা ভাবছে, অত সোজা নয়। অনেক কষ্টের মাটি তোমার কথায় অমনি খেলনা তৈরী হবে! তুমি কে হে?

খিদেয় নাড়ি জিভ টানছে। জগন্নাথপুরের পোল পেরিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকল বিনোদ। পায় তো চেয়ে একঘটি জল খেয়ে নেবে। আর একটু কষ্ট করলে নিতাই মেটের বাড়ি যেতে পারে। আলাপী লোক, জলের সঙ্গে কি আর কিছু দেবে না।

দুধের কারবার করে নিতাই। ভোরে উঠে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুধ সংগ্রহ করে কোলকাতায় চালান দেয়। তার মত নয়, দু পয়সা করেছে।

ভাগ্য ভাল বিনোদের, পথেই নিতাই-এর সঙ্গে দেখা। নিতাই খাতির করলে আলাপ করে, "কি ব্যাপার, আজ্ঞে কি মনে করে?"

বিনোদ হেসে বললে, "এমনি এলাম তোমাদের দেখতে!"

নিতাই ডাকলে, "এস এস।"

জল এল, দুখানা বাতাসা এল, পান এল, তামাক এল। নিতাই অতিথির সৎকার করলে সাধ্যমত। বিনোদ পরিতৃপ্ত হল। তারপর গল্প হল। অনেক সুখ-দুঃখের, দুঃখের কথা উভয়ের। নিতাই বললে, "দুধের কারবার আর চলবে না। বছর ভোর গায়ে দাদন দেওয়া আছে, বলে গাই বিয়োয় না, আর যাও বা বিয়োয় এক ছটাক দেড় ছটাক দুধ হয় টেনে কষে। হঠাৎ বাঁটের দুধ সব শুকিয়ে গেছে। যুদ্ধের বছর থেকে সব যেন কেমনতর শুরু হয়েছে। মাঠের ধান, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ সব উবে গেছে। আর বাঁচতে হবে না।"

বিনোদ সায় দিলে, "এই সেদিন গেরামে ঘটি ঘটি দুধ দেখিনি, কাজে কম্মে ঘড়া-ঘড়া দুধ মিলতো! এক খামচা নুনের জন্যে এক ঘটি দুধ দিয়ে যেত এলোকেশীর মেয়ে, ঠিটে বামনীর নাতনী। হুঃ, দুধের ভাবনা। জমিদার বাড়িতে দুধের সর খাওতো মা-লক্ষ্মীরা! দুধপুকুরে স্নান করতো তেনারা!"

এখন এক টাকায় দেড় সের দুধ মেলা-পারে। তাও কত কান্ড-কারখানা করে, খোশামোদ-বরামদ করে সংগ্রহ করতে হয়, দুধের কেড়ে নিয়ে ভোর থেকে গাই-বাছুরের পিছন পিছন ছুটতে হয়।

নিতাই বললে, "তার ওপর রেল বন্ধ হলে কারবার লাটে! বাস চললে যেটুকু দুধ সংগ্রহ হবে চললে ঐ বাসের মধ্যেই যাবে। দুধ তো আর গড়ের নাগরি নয় ঠাসাঠাসি করে বাসে পৌঁছে দেবে।"

ভাবনার কথা! বিনোদ চুপ করে রইল। নিতাই মেটের কর্মান্তরের কি পরামর্শ দেবে? নিজের ভাবনায় সে অস্থির। মনে হচ্ছে রেল-ওঠায় আরো কাল হবে!

নিতাই বললে, "বাস হয়ে আরো ভোগান্তি। মাল-লরীতে রাতদিন মাল চালান হবে! কিছু থাকবে না দেখবে! এবার সব গেরামে টান পড়বে। বাজার আগুন হয়ে যাবে।"

বিনোদ বললে, "ঘোষ মশাই বলছিল লোকের সুবিধে হবে—ফলতাগঞ্জ জাগবে, কাজ-কর্ম হবে!"

নিতাই বললে, "জেগে আর কি হবে! দেশের লোক মরবে, দেখছো তো ধান-চাল এখন থেকেই নেই। বাস-লরী হলে টের

শেষাংশ ১৮

বিনোদ বললে, "কিছু কি সুবিধে হবে না সত্যি, এমনি রাস্তা করছে? এত জমি যাবে—"

নিতাই বললে, "হাঁ বাবুদের খুব সুবিধে হবে, পাকা রাস্তা ধরে গেরামে আসবেন জুতো পায়ে—বর্ষায় কাদা নেই, গ্রীষ্মে ধুলো নেই! সুবিধে কত!"

বিনোদ হঠাৎ কঠিন হয়ে বললে, "কেউ বাধা দেবে না?"

নিতাই বললে, "বাধা আর কবে দেবে, ওধারে তো মাটি কাটা শুরু হয়ে গেছে—তিন লাখ মাটি পড়ে গেছে!"

বিনোদ বললে, "কোথায়?"

নিতাই বললে, "মামুদপুর, শাতল, মল্লিকপুর!"

বিনোদ চুপ করে গেল। কেমন স্তব্ধ যেন, এ-সংবাদের তারা কেউ নয়—কোন দরকার নেই তাদের এ-সংবাদ জেনে। শুধু মাটি কাটার মজুরীর খবর তারা জানতে পারে।

নিতাই বললে, "তাল তাল অনেকদিন থেকে ঠিক হয়েই ছিল, এখন মাটি পড়ছে!"

বুঝি বাকরোধ হয়ে গেছে বিনোদের। রাস্তা তৈরী আর বন্ধ করা যাবে না। পড়ন শুরু হয়েছে। কার মাথা কে ফাটাবে, কোন্ কোদালের ঘা কার মাথায় পড়বে? আর কবে রাস্তা পাকা হবে এখনি নতুন করে?

সব যেন মিথ্যা মনে হয় বিনোদের। তার সঙ্গে কোন কিছুর যোগাযোগ নেই। [illegible] [illegible] [illegible] সব চলে যাবে।

নিতাই বললে, "তোমার জমি-টমি [illegible]!"

এই [illegible] [illegible] বিনোদের. [illegible] [illegible] [illegible]! সেই ভাবনার [illegible]!"

নিতাই বললে, "[illegible]! তখন ঘোড়ায় চড়ে [illegible] [illegible]!"

বিনোদ হাসলো। মনে মনে [illegible] এক কাঠা জমি না থাকার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে। যাদের জমি আছে পাকা রাস্তার গর্ভে গিয়ে নবরূপ দেবে তাদের জন্যে মনে মনে শোক করলে।

নিতাই বললে, "ঐ যে তোমাদের গেরামে দুলালের মা, না-খেয়ে না-দেয়ে, খুঁটে বেচে মণ্টুবাবুর দেড় বিঘে জমিটা হাজার টাকা পণে কিনেছিল, সেটা গেল। বেচারি বুক চাপড়াচ্ছে। পুত্র শোকের বাড়া!"

বিনোদ বললে, "মণ্টুবাবু দম দিয়ে আরো দেড়শো টাকা নিয়েছিল!"

নিতাই বললে, "গরীবের মার অমনি হয়—উঠতে-বসতে। বেঁচেছো তোমার জমি নেই।"

এবার একটু ক্ষুণ্ণ হয় বিনোদ। বার বার তোমার জমি নেই শুনতে তার ভাল লাগে না। তা বলে নিতাই এমন কেউকেটা নয় তার চেয়ে। না-হয় দুধ বেচে দু-পাঁচ বিঘে জমি করেছে!

একদিক থেকে নিতাই কিন্তু ঘোষ নয়। শোনবামাত্র চাইবামাত্র পাঁচ সের দুধ দিলে। কোন সম্পর্ক নেই বিনোদের সঙ্গে, ভিন্-গেরামের লোক, তা-ও দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছে করলে দুবেলা তাগাদা দিতে পারবে না।

নিতাই বললে, "ধান-চালের অবস্থা খুব খারাপ। তার ওপর এ বছর ফলেছে তো কম, কোন কোন জমিতে কাস্তে দিয়ে যেতে হয়নি। বন্দরতলার মাঠের গোটাটা নোনা ফুটে আছে। খুব মার খেয়েছে।"

বিনোদ বললে, "আমাদের ই-দিকটা কিন্তুক ফলেছিল ভাল। এক চাটে সব হলু, করে। মল্লিকপুর, শ্যামাসুন্দরপুর, বেনেবাটি বেশ ধান হয়েছে।"

নিতাই বললে, "ভুর বাঁধ! রাস্তার এপারে ওপারে বৃষ্টির কার্পণ্য। যেখানে মেঘ সেখানে জল ঢেলেছে এবার; বর্ষা নয়, চাষের সময়টা যেন শরৎকাল গেল। তোমাদের ওদিকে মেঘ দেখে আমরা হা-পিত্যেশ করে থেকেছি। বর্ষা কখনো এমনি হয়। কথায় বলে বর্ষার গাঁতায় বাঘ শিকার ধরতে বেরোয় না। বলে কাকে কত কেথায়, সব উল্টো হচ্ছে। চাষবাস আর সুবিধে হবে না।"

বিনোদ বললে, "পরের জন্যে চাষ হবে। সর্বনাশ তো সহজে খাল হচ্ছে এবার!"

নিতাই বললে, "ও তোমার রেখে দাও, ঢের দেখা আছে, চাষের সময় একফোঁটা জলও ওঠে না। চাষ হবে কি না হবে কার ভাবনা। তোমার জমি তোমার ভাবনা, কোথায় ডুবাবে, কোথায় বাঁচাবে, কোথায় মারবে!"

বিনোদ সায় দিলে, "তার ওপর তোমার যা দু-পাঁচ কাঠা জমি আছে, তার ওপর টান! পাকা রাস্তায় ধান ফলাবেন!"

নিতাই বললে, "সেদিন ধরিনি রায়-মশায়কে—বললুম এটা কি হচ্ছেন, সবাই বেচে পাকা সড়ক চান। দিব্যান্তটা কি? রায়মশায় বললেন, পাকা রাস্তা হলে অনেক

সুবিধে—দূরান্তরের লোক এক হবে, গেরামে গেরামে সংযোগ হবে, লোকে গিয়ে শ্যামগঞ্জের মিলে কাজ করতে পারবে, কল-কারখানা হবে। সব কথা মনে নেই, কিন্তু সব ভবিষ্যতের কথা, হবে!"

বিনোদ বললে, "সব 'কলম্যান'! কার-খানার কুলি, চটকলের মজুর। একটা দুর্ভিক্ষ গেচে আর একটা হবে তুমি দেখে নিও। কলির শেষ।"

নিতাই বললে, "রায়মশাই সে-কথা বলেন না। বেশ বলতে পারেন, প্রাণ জুড়িয়ে দেন—মনে হয় সব বুঝি সত্যি এই এলো বলে। শোননি বুঝি তাঁর কথা কখনো। বুঝিয়ে জল করে দেবে একেকবারে।"

বিনোদ বললে, "শুনে কাজ নেই, যেত আমার এক ছটাক জমি দেখাতুম মজা। পাকা রাস্তা নয়, বুকের ওপর বাঁশ-গাড়ি।"

নিতাই বললে, "গরিব মেরে কাছারী গরম! চিরকালই এমনি এমনি চলবে!"

মাঠের ওপর দিয়ে পথ সোজা। জগন্নাথ-পুর, সরারহাট, সুজাপুর, পাঁচলোকী, মহিরামপুর, তারপর পাকুড়তলা! অনেকটা পথ! ঠিক দুপুর, খাঁ-খাঁ রোদ! নিজের মনে অবাক হয়ে যায় বিনোদ, নিতাই মেটে কোথাকার কে, তাকে আজ চাল ধার দিয়ে বাঁচালে! দুবেলা পেট চলবে! কে যে কখন কার উপকার করে বোঝা যায় না! এত স্বার্থের সম্পর্ক শিবদাস হালদারের সঙ্গে একেবারে ও ঘাড় পাতলে না! বিন্দু ঘোষকে এত আপনার মনে করে সে-ও না। বড় আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার! নিতাই মেটে কি স্বার্থে চাল ধার দিলে?

গামছায় বাঁধা চালের পুঁটুলিটা মাথায় যেন ভার লাগছে। পাঁচসের নয় বুঝি পাঁচ মণ! মাঠের রাস্তার ওপর সাবধানে পা ফেলতে হয়। চোখের ওপর রোদের পর্দাটা কাঁপছে। মাথা ঘুরে পড়ে বুঝি! মুখ থুবড়ে!

চালের পুঁটুলিটা কোন রকমে দাবার ওপর নামিয়ে বিনোদ বসে পড়ল। ক্লান্ত! বুঝতে পারল না হঠাৎ এত কষ্ট হল কেন। পরিশ্রমটা কিসের? জল দিতে বসে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল বিনোদ!

তারপর কতক্ষণ পরে সুন্দরীর মা এসে ডাকলে, "ও পটলের বাবা, আর কত ঘুমবে......ওঠ খাই-দাই কর!"

চোখে বুঝি তখনো ঘুম জড়িয়ে ছিল। অদ্ভুত লাগছে সুন্দরীর মার গলাটা। খাবার জন্যে এত খোশামোদ! ব্যাপারটা কি? ছেলে-মেয়েগুলোরও সাড়া নেই। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা সুন্দরীর মা!

হঠাৎ কেমন হয় বিনোদের, ভাতে অরুচি যেন! সুন্দরীর মাও অবাক! কি হ'লো মন্দটার?

সুন্দরীর মা জিজ্ঞেস করলে, "খাচ্ছো না কেন? ভাত পাকাচ্ছ কেবল!"

বিনোদ উত্তর দিলে না, স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইল।

সুন্দরীর মা বুঝি ভয় পায়, হাউমাউ করে উঠতে বিনোদ গর্জন করে ওঠে, "খবরদার! হারামজাদি!"

ভাতের থালাটা পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললে, "গেলো, গেলো! আশা মিটিয়ে গেল।

শিবদাস হালদার এখনো ধানের গাদা ভাঙলো না। খামার ভর্তি! সাতসিকে মজুরী সে কিছুতে দেবে না, চাষের সময় দের বস্তা এখনো দেবে, অত বোকা নয়! থাক্ না ধান গাদা দেওয়া! ক্ষতি কি!

চালের দাম উঠছে, উঠুক! তা বলে মজুরী বাড়াতে হ'বে! অত খাতির নেই। এস বাবা রাজী থাক তো কাল থেকে লেগে যাও—নগদ পাঁচ সিকে, কম্‌সে কম আট পোণ ধান ঝেড়ে দিতে হ'বে! ফুরনে লাগতে পার আড়াই টাকা কাহন!

বিনোদ একা নয়, অনেকেই শিবদাস হালদারের খামারে ঘোরাঘুরি করেছে। "বসে আছি না হয় বেগার খাটি!" বলাবলি করছে মজুরগুলো! শিবদাস হালদার নির্বিকার! আর কোথাও কাজ থাকলে তো? পাঁচ সিকে তো অনেক বেশী! টাকা টাকায় গতর খাটাতে হ'বে। অত দরকষাকষি চলবে না। শিবদাস হালদারের হাসির অর্থ, আর কেন ঘুর-ঘুর, লেগে পড়!

এক এক সময় হালদার খুবই রেগে যায়। তেড়ে-মেড়ে বলে, "সাত সিকে কেন দুটাকা মজুরী দিতে হয় সে-ও-বি আচ্ছা, তবু তোদের কাজে লাগাবো না! বেরোও!"

হঠাৎ অবস্থা ঘুরে গেল। শিবদাস মশাই-এর খামারে আর জন-মজুর উঁকি মারে না। বড় মনক্ষুণ্ন হালদার মশাই! খবর নিয়ে তিনি জেনেছেন, গ্রামের সব মজুর মাটি-কাটার কাজে লেগে গেছে! নতুন রাস্তা অনেকটা এগিয়ে এসেছে! গ্রামের কাছাকাছি নারাণখেড় পর্যন্ত মাটি ফেলা হ'য়েছে। বর্ষা আরম্ভ পর্যন্ত কাজ চলবে!

শিবদাস হালদার ব্যস্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ আর এক উপদ্রব আরম্ভ হ'লো! মাঠের ধান কেটে উঠেছে, শুকিয়ে রস মরে অর্ধেক হয়ে গেছে! আর ফেলে রাখা যায় না! গাদায় ইঁদুর লেগেছে!

কিন্তু মজুর কোথায়? কাউকে যে ধরতে পারে না। ভোর থেকে মজুরদের টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না—কাওড়া পাড়া, বাগদী পাড়া, মুসলমান পাড়া খাঁ-খাঁ!

মেয়েদের জিজ্ঞেস ক'রলে, বলে, "রাস্তা বানাচ্ছে গো! তাত ওঠবার আগে কাজ থেকে উঠে আসবে!"

ঘুরে ঘুরে বিরক্ত ধরে যায় শিবদাস হালদারের। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে! আজ বড় সব কাজ পেয়েছে, সারা বছর কে তাদের চালায় দেখা যাবে। ন্যাজ খাড়া করে সব মাটি কাটতে ছুটেছে! ধান চাষ কি দেশ থেকে উঠে যাবে? চিরকাল রাস্তা বানাবে? দেখা যাবে! নিমকহারাম শালারা!

যতই রাগ হোক শিবদাস হালদারের নতুন রাস্তার অগ্রগতিটা দেখবার ইচ্ছে হয়। রাস্তা নিয়ে সে অত মাথা ঘামায়নি, তার স্বার্থে ঘা লাগেনি। যাদের জমি গেছে তারা অনেক ছোটাছুটি করেছে, গোলমাল করেছে—ধরাধরি তদ্বির তাগাদা করেছে, কিছুই হয় নি শিবদাস হালদার শুনেছে। ভাগ্যে পুব খোপের জমিগুলো অনেক আগেই বেচে দিয়েছিল, গেলে এখন অনেক যেত! হয়তো পাগল হ'য়ে যেত! ধান-জমি না, বুকের পাঁজরা এক-এক খনা! রাস্তা বানিয়ে কি হচ্ছে কে জানে, বাবুদের কি মতলব বাবুরাই জানে!

গ্রামের বাইরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তাটা টেরা-বাঁকা, খানা-খন্দ, গরুর গাড়ি চলে চলে গর্ত হ'য়ে গেছে। আজ দু'বছর মাটি পড়েনি এক ঝুড়ি! বোর্ড সরকার নিজে নিয়েছে নিজের হাতে। কি হচ্ছে কে জানে! এই সব দেখে-শুনেই বুঝি—

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একটু তফাতে এসে দাঁড়াল শিবদাস হালদার। বটতলার সামনে [illegible]-সাঁকোর ওপর। বেলা পড়েনি এখনি, এরি মধ্যে যেন খাঁ-খাঁ করছে গ্রাম। কাজ থেকে সারার পর মুড়ি [illegible] [illegible] যেন নিঝুম। শিবদাস [illegible] দুই ভুরুর ওপর ডান হাতের চেটো উপুড় করে চেয়ে দেখলে। ফাঁকা মাঠ কতদূর—তারপর সবুজ রেখা! কোথায় মাটি কাটা হচ্ছে, রাস্তা বানাচ্ছে গাঁয়ের জোয়ান মদ্দগুলো? ঐ দূরে বুঝি কটা মানুষের ছায়া উঠছে নামছে, রোদে কাঁপছে। শিবদাস হালদার আন্দাজ ক'রতে চেষ্টা করে কতদূর, কোন গাঁ ওটা?

আজ এই অবস্থা, তারপর বাস-লরী চললে তো আর কথাই নেই। জন-মজুর মিলবে না। বাপ নব্বুই ফুট চওড়া রাস্তা, আরে বাবা ক'খানা গাড়ি পাশাপাশি যাবে, কি রাজসূয় হবে! শ্যামগঞ্জ আর ফলতাগঞ্জ একেবারে গম্-গম্! গাঁয়ের বৌঝি, ছেলে-ছোকরার মাথা বিগড়বে! গোল্লায় যাবে দেশ!

মুখে অস্ফুট শব্দ করে গালাগাল দিলে শিবদাস হালদার। রাস্তা হচ্ছে না কবর খুঁড়ছে! জানে এসব বড় বড় রাস্তার কাণ্ডকারখানা, চকমানিকের ওপারে বিরজা-পুরে দেখে এসেছে শিবদাস। সব কুলিমজুর, হৈ-হল্লা, বেয়েড়েপনা অষ্ট প্রহর! ফোতো বাবু সব!

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দৃষ্টি নামালে শিবদাস হালদার। কেমন যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে তার। কিছুতেই বুঝতে পারছে না, এত ধানের জমি নষ্ট করে পাকা রাস্তা বানিয়ে লাভ কি, আর বাস-লরী চলে যাদের জমি গেল তাদের সান্ত্বনা কি? এ সব বাবুদের কারসাজি!

মানুষগুলোর কোন ভাবনা নেই, শিবদাসের মনে হ'লো—ঝোড়া-কোদাল নিয়ে অগণিত মানুষ সব বেরিয়ে পড়েছে মাঠে, পিঁপড়ের সারের মত থিক্ থিক্ করছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

শিবদাস হালদারের দৃষ্টি ভ্রম হ'লো নাকি, পায়ের তলার মাটিটাও যেন কাঁপছে, আস্তে আস্তে বুঝি চওড়া হ'য়ে যাচ্ছে রাস্তা। এই সেদিনও বাবুদের বাড়ির মেয়েরা কাদার ওপর লুটোপুটি খেয়ে তবে ইস্টিশনে গেছেন, পিছন পিছন শিবদাস এসে দেখেছে, কাদার মধ্যে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের পায়ের আলতার ছোপ লেগেছে। একটু আতরের গন্ধ বুঝি চারদিকে, মেঘলা আকাশ থম্‌থমে। ক্ষতি কি রাস্তায় কাদা হ'লে বর্ষার দিনে? এই তো রাস্তা ছিল জেলা বোর্ডের, ওকে সংস্কার করলে হ'তো না! কে জানে কি মতলব সব। তারা কিছু জানে না, বাবুরাই সব করাচ্ছেন, যেমন বুঝছেন!

পিছন ফিরে নিজের মনে শিবদাস বললে, আর সুবিধে নয়। চাষবাসের কাল শেষ হ'লো। চৈত্রমাসেই লোক পাওয়া যায় না, চাষের সময় কাঁদাবে। শ্যামগঞ্জের চটকলে যাওয়ার তো কত সুবিধা এখন! পায়ে হেঁটে যাবে সব, না, বাস চলবে—আর কদিন বা!

বিনোদ এসে সামনে দাঁড়াল। শিবদাস হালদার চোখ তুলে বললে, "কি ব্যাপার? তুমি?"

ম্লান হেসে বিনোদ বললে, "আপনার খোঁজে! আপনি গেছলেন আমাদের পাড়ায়?"

শিবদাস বললে, "হাঁ, তা তুমি যাওনি রাস্তা তৈরী করতে, মাটি কাটতে?"

বিনোদ চুপ করে রইল। শিবদাস বললে, "কি? তোমাকে নেয়নি বুঝি!"

বিনোদ বললে, "না, আমিই যাইনি। যাবও না।"

শিবদাস বললে, "কেন? সরকারী রাস্তা, নগদ মজুরী, যাবে না কেন?"

বিনোদ উত্তেজিত স্বরে বললে, "গতর থাকলে অমন ঢের ঢের নগদ মিলবে। তা বলে বেইমানী করবো, মাটি কেটে রাস্তা বানাব! চাষের জমি বরবাদ!"

শিবদাস আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে বিনোদের। সত্যি বলছে না, রহস্য করছে? চাষী-মজুরের আবার চাষের জমির জন্যে ভাবনা কেন—কি স্বার্থ ভূমিহীন দিনমজুর বিনোদ সর্দারের?

শিবদাস হালদার বললে, "তুমি আমার খামারের ধানগুলো ঝাড়া-মারার ব্যবস্থা করতে পার বিনোদ? ইঁদুরে-বাঁদরে বরবাদ করলে!"

বিনোদ রাজী হ'লো। সেই জন্যেই সে হালদার মশাই-এর খোঁজে এসেছে। একলাই সে শিবদাসের কাজ তুলে দেবে, স্বামী-স্ত্রী আর দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে কাল থেকে কাজে লাগবে। কোন ভাবনা নেই হালদার মশাই-এর। ওরা মাটি কাটছে বলে গেরামের কাজ আটকে থাকবে না।

মজুরীর কথা আর তুললে না শিবদাস হালদার। তার বরাতে ভাল যে, এক কথায় বিনোদ রাজী হয়ে গেল। যে সর্বনাশা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে তাতে আর লোক পেতে হ'বে না, সব ছুটেছে ঐ ধারে—গ্রাম ছাড়িয়ে ওর কত দূরে চলে যাবে তার ঠিক নেই, গ্রামের কাজ-পাঠ সব পড়ে থাকবে!

শিবদাস হালদার বললে, "খুব জব্বর রাস্তা হ'চ্ছে নাকি! গরু বাজার এক, ইয়া পাঁচ ঢালা, চওড়া!"

বিনোদ বললে, "মাঝখান থেকে খ্যালটা তুলে নিলে বুঝি করে! কি অসুবিধে দেখুন না টাইমের! বলতে পারেন কত বেলা এখন? নটার ট্রেন থাকলে বলা যেত না?"

সময় আন্দাজ করার অসুবিধাটা স্বীকার করলে শিবদাস হালদার। কদিন ট্রেন চলছে না এ তল্লাটে, সব যেন কেমন নিস্তেজ আছে—গৃহে শিশুমৃত্যুর মত! সব মিলিয়ে বোবা যেন! কিছু ভাল লাগে না। এই বটতলার মাঠে এসে দাঁড়ালে রেল দেখা যেত, সিটি দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে রূপনারায়ণের দিকে চলেছে। ঘন গাছ-পালার মধ্যে ঐ ফাঁকটুকুতে কত রহস্য যেন দিন—প্রহরে প্রহরে রেল দেখা যেত!

শিবদাস হালদার বললে, "তা যা বলেছ! সকাল-সন্ধে-দুপুরের আর আন্দাজ নেই! সব একাকার!"

সূর্যের দিকে মুখ তুলে দেখলে শিবদাস হালদার—চোখ ঝলসে গেল বুঝি! বিনোদ বললে, "বেলা দশটা হ'বেন হয়তো!"

অনেক দূর এগিয়ে এসেছে নতুন রাস্তা! বটতলা মাঠের পুব দিকে সুরূপপুরের কোল ঘেঁষে মুখুজ্জেদের মাঠের বুকের ওপর দিয়ে রাস্তা এগিয়ে আসছে। আজ এক রকম, কাল এক রকম! অবাক লাগে দেখতে, কে বলবে এমন একটা কাণ্ড-কারখানা কি করে হল! ধূ-ধূ মাঠের ওপর মেঘের ছায়া যেন, রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরির খেলা! মাটি পড়ছে, কোদাল চলছে—ঘর্মাক্ত মানুষগুলো উঠছে নামছে! কালো কালো পিপড়ের সার যেন।

বিনোদের কুঁড়ে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আর একটু, আর একটু করে কতটা এগিয়ে এল নতুন রাস্তা! দু'পা বাড়ালেই—

শিবদাস হালদারের খামারে কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে কাজ তুলে দিয়েছে বিনোদ। মজুরী ভালই দিয়েছে হালদার—এক টাকা দশ আনা, কোন তঞ্চকতা করেনি! আর দাতাকর্ণ হ'য়ে গিয়েছে শিবদাস হালদার, দু'বস্তা ধানও ধার দিয়েছে! চাষের সময় শোধ দিলেই চ'লবে। কোন তাড়া নেই, হালদার মশাই বলেছে, যখন খুশি পেলেই হল।

খবর ফেরে পড়েছে শিবদাস হালদার। জানত ঢুকে গেছে চাষবাসের, নতুন রাস্তার ঠেলা। কথা দিয়েছে বিনোদ—চিরকাল সে চাষের কাজ করবে, ও রাস্তা-ঘাটের লোভ তার নেই! বেইমানী করবে না!

ক'দিন আবার কাজ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গামছা গায়ে ঘুরে বেড়ান কেবল। ওরা সবাই কাজ করছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নতুন রাস্তা তৈরী করছে—যে রাস্তায় অনেক সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। বিনোদ কেবল নিষ্কর্মা, অলস সময় কাটাচ্ছে।

সুন্দরীর মা তাড়া দেয়, "তুমি ওদের সঙ্গে লেগে পড় না, দু' কোদাল মাটি তুলে যদি দু' মুঠো ভাত হয় মন্দ কি!"

বিনোদ মারতে কেবল বাকি রাখে। সব নিমকহারাম, শিবদাস হালদার মশাইকে কি বলেছে মনে নেই। সাঁওতাল কুলি নাকি সর্দাররা! চাষের জমি বরবাদ করে রাস্তা বানাচ্ছে যারা তাদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা নেই। বেইমান!

সুন্দরীর মা ঠোক্কর দেয়, "ক' ছটাক জমির আছে তোমার শুনি! তোমার অত মাথা গরম!"

[illegible] বিনোদ বললে, "আছে বইকি, অনেক আছে!"

সুন্দরীর মা হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিলে। চালের সামনে পিঁড়িটা তুলে নিয়ে [illegible]। সুন্দরীর মা সামনে [illegible]। [illegible]

সন্ধ্যে সময় থেকে ঝড়বৃষ্টি হল। কাল-বৈশাখী। বিনোদের কুঁড়ের অবস্থা কাহিল। মাথার চাল উড়ে গেল। [illegible] দেওয়াল খাড়া কেবল। সর্বনাশ-পাড়া [illegible]! একেবারে ঝড়ের মুখে পড়েছে পাড়াটা।

ছেলেপুলে আর সুন্দরীর মাকে রাতটার জন্য হালদার পাড়ায় পাঠিয়ে দিলে বিনোদ। বললে, "আমি একা থাকি [illegible], [illegible] হবে—হালদার মশাইকে [illegible] জন্য!"

পাড়া [illegible] শিবদাস হালদারের। অসময়ে বিনোদের কাজের কথা ভেবে হয়তো আশ্রয় দেবে। খুব আশা করে পাঠিয়েছে বিনোদ। একটা রাতের মকদ্দমা! কাল সকালে কুঁড়ের নতুন চাল বাঁধবে বিনোদ। এ বছরে ঝড়টা যেন বেশী! হবে না? হবেই তো! যা অনাসৃষ্টি হচ্ছে সব—মানুষের মুখের আহার নেই, রাস্তা বানাচ্ছে ধানজমি কেটে! ভগবান সহ্য করবে কেন! কলির শেষ আর সাধে বলেছে! তবে এ বছর চাষের সূচনা ভাল—বৈশাখ মাসে ফোঁটা পড়েছে, মাটি ভিজেছে!

একলা ঘরে বিনোদের ঘুম হয় না। মাথার ওপর আকাশটা তারায় ছাওয়া, বড় সপ্রতিভ যেন। উঠে বসল বিনোদ। একটা শ্যাল্ বুঝি সরে গেল উঠানের ওপর দিয়ে। মজা পেয়েছে, ভাঙা কুঁড়ে, হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। পারলে বুঝি ঘুমন্ত মানুষই তুলে নিয়ে যাবে।

বিনোদ বেরিয়ে এল। চালহীন কুঁড়ের দরজায় শিকল তুলে দিলে। আকাশ পরিষ্কার, এক ফোঁটা চাঁদ আটকান—ঝাপ্সা জ্যোৎস্না যেন! ঝড়ের পর অদ্ভুত দেখাচ্ছে সব।

নতুন রাস্তার দিকে বিনোদ এগিয়ে চলল। ঝপ্-ঝাপ্ আওয়াজ হল। কতক্ষণ কেটে গেল! চাঁদের মুখে হঠাৎ এক টুকরো মেঘ আড়াল করলে।

কারা যেন আলাপ করতে করতে নতুন রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। মল্লিক-পুরের ওধার থেকে। বিনোদ চুপটি করে ঝোড়াটা মাথায় চাপিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশ্বাস বন্ধ।

আরো কাছে এল পথচারীদের আলাপ। সামনে রাধাপুরে! কত কাছাকাছি হয়ে গেছে গ্রামগুলো। বিনোদ খুঁপি গেড়ে বসল মাটি-কাটা চৌকার ভেতর। কোদালটা মাটির মধ্যে গেড়ে দিলে।

খুব জোর শব্দ উঠলো, "কে ওখানে? কে? কে? রাস্তার ধারে কি করছো?"

মার মার করে সমবেত শব্দ এগিয়ে এল।

ঝোড়া-কোদাল ফেলে বিনোদ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। প্রাণপণ। পিছনের দলের মধ্যে একজন বুঝি তাড়া করলে, "চোর! চোর!! চোর!!! ধর! ধর!"

অনেকদূর থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে এল—চোর! র-র-র!!

কত মাঠ পেরিয়ে বিনোদ বুঝি তখনো ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে—উধাও! উধাও! উধাও!

পিছনের দলটা সামনে এসে বিনোদের পরিত্যক্ত ঝোড়া-কোদাল তুলে ধরে কিছু আন্দাজ করতে না পেরে সকৌতুকে হেসে উঠল। অট্টহাসি মাঠ ফাটিয়ে!

"শালার কাণ্ড দেখেছো, রাস্তা কাটছিল! মাটি নেবার আর জায়গা পেলে না! রেখে দাও ঝোড়া-কোদাল, কাল থানায় জমা দেবে! কোন্ শালা এমন চৈতন! রাস্তা কেটে তোর লাভটা কি?"

আর সবাই হাসলো। মাটি কেটে নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে, খোয়া পড়বে, পিচ পড়বে, কলকারখানার সমৃদ্ধি গাঁয়ে গড়িয়ে আসবে। যোগাযোগ হবে।
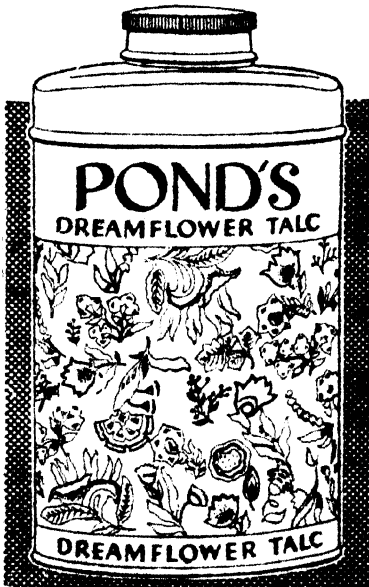
সারাদিন ভোরের মত স্নিগ্ধ ও সজীব
রাখে—
পণ্ড্‌স
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
সারাদিন স্নিগ্ধ ও সতেজ থাকতে হলে
স্নানের পর পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার
ব্যবহার করুন!
পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার ভারি
কোমল, মিষ্টি গন্ধে ভরপুর ও ঘাম
শুষে নেয়—এতে দিনভোর ঝরঝরে ও সতেজ
মনে হবে!

দিলীপকুমার রায়

১১

রোলাঁ সম্বন্ধে আমি লিখেছি আমার তীর্থংকর-এ ও অ্যামং দি গ্রেট-এ। তাঁর দৃপ্ত অথচ সুকুমার ব্যক্তিরূপ আমার মনের পরে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "জাঁ ক্রিস্তফ" পড়েই আমি তাঁকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠি। পরে ফরাসী ভাষায় তাঁর Musiciens d'Aujourd'hui, Musiciens d'Autrefois, বীটোভেন ও টলস্টয়ের জীবনী পড়ে এ ঔৎসুক্য আরো গভীর হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় লাভ—তাঁর ব্যক্তি-রূপের সংস্পর্শলব্ধ সাংগীতিক প্রেরণা। বলতে কি, আমাদের সংগীত আমাকে আশৈশব মুগ্ধ করলেও আমি রোলাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এলে হয়ত আমাদের সংগীতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এত শীঘ্র পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠতে পারতাম না। বলে না—বিদেশে যে না গেছে সে স্বদেশকে চেনে না? গ্যেটে আরো বলতেন যে, বিদেশী ভাষা না শিখলে কেউ কখনো তার মাতৃভাষার মহিমা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না। সংগীতের দিক দিয়েও একথা খাটে, অর্থাৎ য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে তবে আরো বুঝতে পারা যায় কোথায় ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য। স্মৃতিচারণে সাংগীতিক গবেষণা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে আমি এ সম্পর্কে আজ এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে রোলাঁর আন্তরিক তারিফ পেয়ে আমার সাংগীতিক চেতনার মধ্যে যেন একটা অভিনব স্পন্দন জেগেছিল। আমি কোনদিনো ভুলব না তাঁর প্রশস্তি আমার গাওয়া মালকোষ রাগ সম্বন্ধে। তাঁর উচ্ছ্বাসটি ছিল এত গভীর যে, এ প্রসঙ্গে কিছু বলা অবান্তর হবে না।

ফরাসীরা "জুর্নাল" অর্থাৎ দিনপঞ্জিকা লিখতে বড় ভালবাসে। তাতে দিনের পর দিন লিখে রাখে কার সঙ্গে কবে কোথায় দেখা হয়ে কী কথা হ'ল। যথা গাঁকুর ভ্রাতৃযুগলের জুর্নাল, আমিয়েলের জুর্নাল, জুল রেনার-এর জুর্নাল—আরো কত আছে। রোলাঁ আমাকে বলেছিলেন তিনি নিয়মিত দিনপঞ্জিকা লিখে রাখছেন—প্রকাশ হবে তাঁর দেহান্তের পরে।

মাদাম রোলাঁ স্বামীর মরণোত্তর আশা পূর্ণ করেছেন—১৯৫১ সালে তাঁর আটাশ বৎসর ধরে লেখা দিনপঞ্জিকা ছাপিয়ে। এ বৃহৎ ডায়েরিটি পড়তে পড়তে বিস্মিত হ'তে হয়ঃ রোলাঁর কত কষ্টই না করতে হয়েছিল এত সব খুঁটিনাটি লিখে রাখতে! জগতের কোথা থেকে কোথা থেকে না দর্শনার্থী আসত তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে! তিনি যেন সুইজর্লণ্ডের একটি আকাশ-মিনারে আসীন হয়ে পাখির মতনই বিশ্ব-লীলার খবর নিতেন রকমারি মানুষের মাধ্যমে। এতে কে কবে কার সম্বন্ধে কী বলেছিল সব খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন তিনি! সাময়িক বুদ্বুদে বার্তা বিলাসকে চিরস্মরণীয় করে রাখার বিপুল অধ্যবসায় নিদর্শনরূপে এ জার্নালের জুড়ি নেই।

কিন্তু সাময়িক বিলাস ক্ষণায়ু হলেও কিছুদিন রসের যোগান দিতে পারে—সাময়িক রস যে পরে স্মরণীয় হ'তে পারে কে না জানে? তাই দিনপঞ্জিকাটি পড়তে মোটের উপর ভালোই লাগে। এতে আমার সম্বন্ধেও নানা মন্তব্য করেছেন তিনি—আমার নিন্দাও করেছেন বৈকি, যদিও প্রশংসাই আছে বেশি—ভাগ্যবশে। কিন্তু যা বলছিলাম।

আমি একদিন মালকোষে একটি গান গেয়েছিলাম তাঁর কাছেঃ "রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায়"......এর সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য লিখেছেন ১৮৭ পৃষ্ঠায়—এখানে অনুবাদ দিচ্ছিঃ

"দিলীপকুমার আমাকে দুটি সুন্দর গান শোনালেন—শুনলে অভিভূত হ'তে হয় বৈকি। গানটির সুরবিহার থেকে ঝরে পড়ছে উন্মাদনা, মিনতি, করুণা—মনকে চমকে দেয়। কখনো কণ্ঠ তার সপ্তক থেকে অবতরণ করে মন্দ্র সপ্তকে তার পরেই আবার ফিরে আরোহণ করে দ্বিগুণ পুলকোচ্ছ্বাসের স্তরে।" কুড়ি পৃষ্ঠায় লিখছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে (২০শে এপ্রিল, ১৯২১)ঃ

"তিনি তাঁর দুটি গান গেয়ে আমাদের শোনালেন। সুর দুটি অতি পরিষ্কারভাবে গ্রথিত ও ছন্দিত, আমাদের য়ুরোপীয় সুরের আমেজ আসে—বিশেষ চিত্তাকর্ষক নয় কিন্তু মনেরাখা বা লোকপ্রিয় ভঙ্গিতে গাওয়া সহজ। (আমার মনে হয় বৈকি যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত তেমন মৌলিক নয়, এও মনে হয় যে, ভারতের নিজস্ব সংগীত—যা গত বৎসরে দিলীপ-কুমার আমাদের শুনিয়েছিলেন—তার সাংগীতিক মূল্য অনেক বেশি।)"

ভারতীয় রাগসংগীতের মহিমা সম্পর্কে তিনি আরো অনেক কথাই আমার কাছে বলেছিলেন। একটি বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনদিনই একমত হতে পারি নি—যে জন্যে অনেকেই আমার 'পরে রাগ করেছেন—যে, আমাদের গানের কাঠামোকে য়ুরোপীয় গানের মতন অনড়, অচল করলে আমাদের সাংগীতিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। আমি বরাবরই এই মত পোষণ করে এসেছি যে, আমাদের গানে সুরকে নিয়ে খেলানোর অবকাশ না থাকলে (যার আমি নাম দিয়েছি সুরবিহার—ইমপ্রোভিসেসান) তার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবেই যাবে। এও আমি কবিকে বলতাম যে, সুরবিহারহীন গান শুনে য়ুরোপীয়রা বলবেনই বলবেন: "এ আর নতুন কী? এ তো আমাদের গানেও আছে—অনড় অচল মেলডির কাঠামো। তোমাদের গানে নতুন কী আছে তাই জানতে চাই।" দ্রষ্টব্য—রোলাঁ রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে ঠিক এই মন্তব্যই দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিলেন—(তীর্থংকর ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যে, সুরবিহারের অবকাশ না থাকলে আমাদের সংগীতের একটি প্রধান গৌরবই লুপ্ত হবে। এছাড়া তিনি তাঁর নানা আলাপে তথা পত্রে খুব জোরালো সুরেই আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, য়ুরোপে আমাদের সংগীতের আদর হবেই হবে—কেবল ছড়িয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। আমাদের সংগীতের নানা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি নিপুণ ভঙ্গিতে যে-সব ব্যাখ্যা করতেন, তা থেকে আমি সত্যিই আমাদের সংগীতের মহিমাকে যেন নতুন নতুন চোখে দেখতে শিখেছিলাম। কিন্তু সে-বিবরণ আমার তীর্থংকরে লেখা হয়েছে বলে আমি আজ শুধু বলব তাঁর কাছ থেকে আমি ঠিক কী লাভ করেছিলাম।

সবাই জানেন যে, রোলাঁ আর্টকে ভালবেসেছিলেন ফরাসীদের মতনই মনে-প্রাণে। এ সম্বন্ধে তাঁর তরুণ মনের জল্পনা-কল্পনা তিনি টলস্টয়কে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ পত্রে; উত্তরে টলস্টয় তাঁকে একটি স্নেহপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন—যে কথা আমি তীর্থংকরে লিখেছি। রোলাঁ আমাকে টলস্টয়ের নিজের হাতে লেখা লিপিটি দেখিয়েছিলেন একাধিকবার। অতঃপর এ সম্পর্কে তিনি নিজে আমাকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই থামব। উদ্ধৃতিটি তীর্থংকরে দেওয়া সত্ত্বেও ফের উদ্ধৃত করতে যাচ্ছি, কেননা এ লাইন কটির মধ্য দিয়ে বড় চমৎকার ফুটে উঠেছে তাঁর একটি গভীর আন্তর অনুভূতি। এ অনুভবের এজাহার আজকের দিনের মানুষের কাছে কম নয়—আরো এই জন্যে যে এ-যুগের মানুষ সচরাচর মানস যুক্তিতর্ককে প্রায় দেবতার বেদীতে বসিয়ে প্রণামী দেওয়াতে মনে করে থাকে পরমপুরুষার্থ। যুক্তির ব্যবহারিক মূল্য কেউই অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতেই হবে যে, যুক্তি আমাদের পথচলায় আলো দেখায় খানিকদূর পর্যন্ত, তার পরে গভীরতর পথের দিশারি যে হতে পারে তার নাম মানস যুক্তির সতর্কতা নয়—আন্তর অনুভবের এজাহার। তাই রোলাঁর প্রাণোপলব্ধ ওই সত্যটি আমার হৃদয়ের তারে এক অপূর্ব অনুরণন তুলেছিল যার স্মৃতি আমি আজো ভুলতে পারি নি। রোলাঁ আমাকে লিখেছিলেন (তীর্থংকরে পুরো চিঠিটি প্রথমেই ছাপা হয়েছে):

"খাঁটি শিল্পীর জীবন আত্মাহুতিময়ী দুঃখের সাধনা এমন কথা আমার কোনদিনই মনে হয় নি। আমি যে জানি—য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সবাই বেদনাসঙ্কুল—hommes de douleur..... টলস্টয় আমাকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে বলেছিলেন যে, খাঁটি শিল্পীর সঙ্গে মেকি শিল্পীর তফাৎ এইখানেই—'Qu'ils doivent sacrifier a leur foi, a leur art leur bonheur terrestre' অর্থাৎ শিল্পীরা যেন তাদের বিশ্বাসের জন্যে, তাদের শিল্পের জন্যে ছাড়তে পারে তাদের ঐহিক সুখশান্তি।" বীটোফেনের একটি উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন: "Musik ist hoehere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie" অর্থাৎ সংগীত সব প্রজ্ঞা ও দর্শনের চেয়ে বেশি পারে সত্যের দীপ্ত প্রকাশ সাধন করতে।

কথাটা কিছু নতুন নয়, কিন্তু যে মানুষ কোন সত্যকে তার সমস্ত জীবন দিয়ে বরণ করেছে, তার মুখে সে সত্যের অঙ্গীকার মানায়ও বেশি, অপরের জীবনে সক্রিয়

বিবেকানন্দের মূল্যায়নে তিনি অক্ষম ছিলেন স্বভাবের গোড়াকার গড়নে। রোলাঁ বড়-জোর একটু আভাস পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের কর্মী ও বাণীবাহ (মিশনারি) রূপের—কিন্তু সাত্ত্বিক ত্যাগী ও বৈরাগী দার্শনিক রূপের কোন হদিশই পায় নি রোলাঁর রাজসিক মনের চঞ্চল দৃষ্টি।

কিন্তু তাঁর কাছে যা পাই নি, তা দিয়ে তাঁর মহিমাকে মাপা চলে না, তাঁর কাছে কী পেয়েছি সেইটুকু দিয়েই তাঁকে বিচার করতে হবে—নইলে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। আমি তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তির উল্লেখ করলাম শুধু একটি কারণেঃ আমরা এই দুই মহাপুরুষের সম্বন্ধে তাঁর নানা মতামত নিয়ে একটু বেশি অশোভন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকি—খানিকটা যেন য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবীর সার্টিফিকেটের জোরে আমাদের তত্ত্বজ্ঞদের গৌরব বাড়াতে—ঠিক যেমন আমরা ধর্মের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সমর্থন চাই বিজ্ঞানের দিক্‌পালদের কাছ থেকে। এ-ভুল বুদ্ধিবাদীরা করেন করুন, কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্মপথের পথিক তাঁদের যেন এই আত্মপ্রত্যয় কোনদিন ম্লান না হয় যে সংসারে সবচেয়ে বড় তত্ত্ব হ'ল ভাগবত তত্ত্ব, সুতরাং ভাগবত সাধক যেন বিজ্ঞান বা শিল্পসাধকের কাছে সুপারিশপত্রের জন্যে ভুলেও হাত না পাতেন। শিল্প সম্বন্ধে রায় দিন শিল্পী, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিজ্ঞানী, সাহিত্য সম্বন্ধে সাহিত্যিক, অর্থনীতি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রবিৎ—কেবল যোগী ও ধার্মিকের সম্বন্ধে রায় যেন দেন শুধু তাঁরাই যাঁরা যোগের ও ধর্মের মর্মজ্ঞ। এবার বলি বার্টরান্ড রাসেলের কথা।

আমার য়ুরোপে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই মহামতিকে—যেমন ভারতে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল শ্রীঅরবিন্দকে। আমার রাসেল-ভক্তির দরুণ আমাকে অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন—কেবল সি পি রামস্বামী বা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতন দু-একজন মনীষী ছাড়া। রামস্বামী আমার 'আমং দি গ্রেট' পড়ে আমাকে এক উচ্ছ্বসিত পত্র লেখেন, তাতে এক জায়গায় লিখেছিলেন (অনুবাদ দিচ্ছি):

"অনেকেই আপনাকে দুষতে পারেন আপনি আস্তিক গুরুর শিষ্য হয়ে নাস্তিক রাসেলকে কেমন করে এত ভক্তি করতে পারলেন বলে। কিন্তু আমি আপনার মনের এই আশ্চর্য ঔদার্যের জন্যেই আপনাকে বেশি করে সাধুবাদ দিই।"

দুঃখের বিষয়, আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বিদ্রূপ করতেন—"নাস্তিককে ভালবেসে দিলীপ দেবদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায় বা!" কিন্তু আমি এ বিষয়ে ছিলাম একান্ত নিঃসংশয়—কেননা শ্রীঅরবিন্দকে যে মনে-প্রাণে গুরু বলে বরণ করেছে, সে যে রাসেলের নাস্তিক্যবাদের মোহে দ'-য় মজতেই পারে না এ আমি নিশ্চয় করে জানতাম। তাই বলাই বাহুল্য যে, ধর্মকে নিয়ে রাসেলের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণদাঁতে আমার মর্মভেদ করা দূরে থাকুক, চর্মভেদও করে নি। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা চিঠিতে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গভীর ব্যাখ্যায়—কেন রাসেল ভাগবত সত্যের বিচারে পদে পদে ভ্রম-প্রমাদে পড়েছেন—অর্থাৎ এ বিষয়ে অপরোক্ষ অনুভব উপলব্ধি না থাকার দরুণ। সমাজ, রাষ্ট্র, ঐহিক শিক্ষা রাজনীতি, যুক্তিবাদ প্রভৃতি নানা রাজ্যেই রাসেলের নির্দেশে আমার মন সায় দিয়ে এসেছে পুরোপুরি। তাঁর বুদ্ধির আশ্চর্য দীপ্তিতে আমি অভিভূত হয়েছি বারবারই। কিন্তু পরমার্থীপথে তাঁকে দিশারি করব আমি কেমন করে শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ করার পরে?

কিন্তু তবু তাঁকে আমি সত্যিই ভালো-বেসেছিলাম তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের জন্যে। উপায় কি? উর্দুতে একটি শের (শ্লোক) আছে:

ইশক পর জোর নহীঁ হৈ আতিশ গালিব:
কে লগায়ে ন লগে ঔর বুঝায়ে না বুঝে।

অর্থাৎ

প্রীতি বিচিত্র প্রেমের আগুন:
জ্বালে না যখন জ্বালানো দায়।
আবার সে জ্বলে উঠলে—দারুণ
সে শিখা কে পারে
নিভাতে হায়?

রাসেলের লেখা যেদিন কেম্ব্রিজে প্রথম পড়ি—Principles of Social Reconstruction সেইদিন থেকেই তাঁকে ভালো-

জন্যোই বৃদ্ধ আপ্তবাক্যে আছে মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। তাই রাসেল যে নানা সময়ে তাঁর নানা ধারণাকে ভুল ব'লে চিনতে পারা মাত্রই তাকে ভুল ব'লে স্বীকার করেছেন, এতে তাঁর প্রতি ভক্তি আমার বেড়েছে বৈ কমে নি।

কিন্তু তাই ব'লে মানতে পারি না যে, তাঁর সত্য নির্ধারণের গোড়াকার ভিত কাঁচা ছিল। পদে পদেই আমরা বহু বহু আলোকবাণীই পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে—আজ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে: তাঁর সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম, ঔদার্য, জ্ঞানোৎসাহ, শিল্পপ্রীতি নির্লোভ মন......কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলব?

য়ুরোপের এ-যুগের মনীষীদের মতে নির্লোভের এমন বাণীবাহ বেশি দেখা যায় না—মনে প'ড়ে যায় উপনিষদের "মা গৃধঃ"। তাঁর আর একটি বাণী: "কোনো না স্বৈরাচারী একনায়কদের সুরে যে, আমি যে-পথের পথিক তার পরিপন্থীর মুণ্ডপাত করবার আমার জন্মগত অধিকার আছে এই যুক্তিতে যে, আর সবাই ভ্রান্ত হতে পারে কেবল আমি অভ্রান্তিতে অচলপ্রতিষ্ঠ।" কিন্তু এ-ছাড়া আরো কত শুভনীতিরই না দীক্ষা দিয়েছেন তিনি তাঁর আজীবন সত্য সাধনায়—আত্ম-আবিষ্কারে: মানুষ সার্থক হয় সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তিকে বরণ করলে, দুঃখ পায় হাতিয়ে নেবার প্রবৃত্তিকে আমল দিলে; আমাদের পরম সংস্কার দিশা দেয় শুভ বুদ্ধি শুভ বাসনা, যুক্তি শুধু দেখাতে পারে—সে-বাসনা চরিতার্থ হবে কোন পথে চললে; যতরকম দুষ্প্রবৃত্তি আমাদেরকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধ্বংসপথের যাত্রী করে তাদের মধ্যে সেরা দানব হ'ল নিষ্ঠুরতা—হিংস্রতাই বটে: আমরা আজো সরল ও নিরভিমান হতে শিখিনি বলেই দেখতে পারি না, অন্য অনেক ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির পাঁক ও কাঁটা জড়ো করার মোহে মানুষের জীবনে সৌন্দর্য, সরল আনন্দ, বিশ্বলীলা সম্বন্ধে জানবার ঔৎসুক্য ও মানবপ্রীতি এই চারটি মূল মন্ত্রকে বরণ করলে তবেই জীবন সার্থক হয়: শুভবুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের নির্দেশে চলে যে প্রেম তাকে বিপাকে পড়তে হয় না:—এই রকম আরো কত অনস্বীকার্য নীতির না তিনি উদ্গাতা!

কিন্তু রাসেল বহুগুণে গুণবান হলেও আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে তাঁর যে গুণটি সে হ'ল তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা। গভীরতম সত্য যে অন্তর্যামী ভগবান, এ-মন্ত্রের দ্রষ্টা তিনি আজো হতে পারেন নি বটে, কিন্তু যাকে সত্য বলে চিনেছেন তাকেই মনের প্রাণের পরম উপাস্য বলে অভিনন্দন করতে তিনি কখনো এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি। যদিও—সবার চেয়ে বড় জ্ঞান হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান, সবার চেয়ে বড় প্রেম ভগবৎ প্রেম, সবার চেয়ে বড় সত্য ভগবৎ-কৃপা—পরাৎপরের এ-পরম বিশ্বতত্ত্বে তিনি কান দিতে পারেন নি অবোধ বুদ্ধির কল্পনায় দিশাহারা হওয়ার দরুণই। কিন্তু সমাজে যে মানবিক পরার্থ নিষ্ঠাকে, পরমত-সহিষ্ণুতাকে, সৎসাহসকে স্বাধীন চিন্তাকে—সর্বোপরি অনিষ্ঠুর সার্বভৌম মানবপ্রীতিকে তিনি চিরদিন সর্ববরেণ্য ব'লে অক্লান্ত উৎসাহে প্রচার করে এসেছেন, তার জন্যে প্রতি বিশ্ব-মানবতাবাদী তথা অধ্যাত্মবাদীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাই কি তাঁর প্রাপ্য নয়?

কিন্তু তাঁর আর একটি আশ্চর্য প্রতিভার জন্যেও তাঁকে আমি কম ভালোবাসিনি: তাঁর আশ্চর্য অফুরন্ত রসিকতা। মনে আছে রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলে-ছিলেন যে, রাসেলের মতন রসিক তিনি দুটি দেখেন নি। আমার নিজের মনে হয় যে, অবিমিশ্র রসিকতায় বার্নার্ড শ ও পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল রাসেলের চেয়ে কম ছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ে রুচিভেদে নানা মানুষের মধ্যে মতভেদ হলেও একথা সবাই আজকের দিনে মানতে বাধ্য যে, রাসেলের রসিকতার উৎস বার্ধক্যের মরু-পথেও এতটুকু নিস্তেজ হয় নি—এমন কিছুই নেই যা নিয়ে দরকার হলেও তিনি হাসাতে না পেরেছেন। [illegible] নীতি-বাগীশরা হাসিকে ছেলেমানুষি নাম দিয়ে দিয়ে তাকে ঠেকাতে পারেন—ঠেকাতে থাকেন প্রায়ই—কিন্তু হাসতে না পারলে যে ধাঁধিয়ে দেখলে চরিত্রের অভিব্যক্তিই সূচনা করে এ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানবানদের মধ্যে মতানৈক্য নেই। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখে-ছিলেন, যখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রগলভতা করার পরে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম:

"Don't worry. For there is laughter in the Kingdom of Heaven though there may be no marriage there" *

এ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের একটি চমৎকার মন্তব্য আছে তাঁর—

Laughter was given by the Gods to man and it was one of their choicest gifts.... He who cannot laugh, he whose devotions are too serious for the healing waves of laughter, had better look out: there are breakers ahead."

অর্থাৎ দেবগণ মানুষকে হাসির বরদান দিয়েছেন—যার জুড়ি মেলা ভার। যে মানুষ হাসতে ভুলে গিয়ে মেঘলা মুখে ব'সে থেকে কৃতকৃত্য হতে চায় তার অবস্থা সঙ্গীন—ভরাডুবি হল ব'লে।

তাই হাসিকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বিপদ সমূহ। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ রাসেলের সুহাস্যের দুটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই মধুরেণ সমাপয়েৎ করব।

* বাইবেলের একটি বাণীকে রসিক শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে লিখেছিলেন তাঁর অসমাপ্ত ভঙ্গিতে—আমার Sri Aurobindo Came To Me দ্রষ্টব্য

কিছুদিন আগে রাসেল লিখেছেন একটি অপূর্ব স্মৃতিচারণ তাঁর অতুলনীয় সরস ভঙ্গিতে। (এমন আশ্চর্য সরস ইংরাজী গদ্য ই বা বার্নার্ড শ' ছাড়া আর কে লিখতে পেরেছে এ-যুগে?) বইটির নাম 'পোর্ট্রেটস্ ফ্রম মেমারি।' এতে একটি নিবন্ধ আছে—হোপ্‌স্‌ঃ রিয়েলাইজড্ এ্যান্ড ডিস-অ্যাপয়েন্টেড। এতে রাসেল আশৈশব কোন্ কোন্ প্রকারের আবহে গড়ে উঠেছিলেন তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে শেষে লিখেছেন, কোনো কোনো দিকে ইংলণ্ডে সভ্যতার প্রগতি হয়েছে বৈকি—যথা, মেয়েরা ভোট দেবার ক্ষমতা পেয়েছে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে জবাই না করে সাম্য-তান্ত্রিক মতবাদ খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শ্রমিকদের অবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছে, মানুষের মৃত্যুর হার অনেক কমেছে—সব জড়িয়ে অন্তত ইংলণ্ডে মানুষ আজ আগেকার চেয়ে বেশি সুখী বৈকি। কিন্তু তার পরেই লিখছেনঃ

"হায় রে, বিশ্বসভ্যতার রঙ্গমঞ্চে দেখি একেবারে বিপরীত ছবিঃ রুশ জারদের যে একচ্ছত্র স্বৈরাচারে (ডেসপোটিসম্) প্রগতি-পন্থীদের আতঙ্ক হ'ত তার স্থলে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক ঢের বেশি প্রবল ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচার। অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য—যা আগে ছিল পশ্চাৎপন্থী—আজ দাঁড়িয়েছে মস্কোর হুকুমবরদার (অর্থাৎ পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি প্রভৃতি) চীন হয়ে উঠছে এক দারুণ হুংকারী রণশক্তি। আমেরিকা—যা পঞ্চাশ বৎসর আগে ছিল লিবারালদের স্বর্গরাজ্য—আজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে উল্টো—যদিও হয়ত শেষ পর্যন্ত আমেরিকা সামলে নিতেও পারে। সর্বোপরি, দিন-দুনিয়ার উপরে গর্জন করছে আণবিক যুদ্ধের মহাভয়!"

এ-হেন পরিস্থিতিতে লিখছেন তিনি—তাঁর মনোগহনে দুটি স্বর নিরন্তরই ঝগড়া করেঃ "একটি হ'ল লেখকের আশাশীল মন যে বলে—রাষ্ট্রসমস্যা নিয়ে প্রাণপণ লেখার প্রয়োজন আছে—সবাইকে সহিষ্ণু ভঙ্গিতে বোঝানো দরকার, যুক্তি দিয়ে দেখানো দরকার—কোন্ পথে মানুষের মুক্তি, কোন্ পথে ধ্বংস। আর একটি হ'ল নিরাশার অবিশ্বাসের ব্যঙ্গহাসি রাসেল যার নামকরণ করেছেন—ডেভিলস্ অ্যাডভোকেটঃ সে বলে সর্বনেশে বিদ্রূপের সুরে (৬৭ পৃষ্ঠা)ঃ

"হে রাসেল তুমি দেখতে পাচ্ছ না কি যে, জগতে যাহা ঘটছে কিছুই তোমার তোয়াক্কা রাখছে না? বিশ্বমানব আজ বাঁচবে না মরবে নির্ভর করছে ক্রুশ্চেভ, মাওৎসেতুং ও মিস্টার জন ফস্টার ডালেসের খুশখেয়ালের উপরে।' এ'রা যদি বলেন 'মরো', আমরা মরব, যদি বলেন 'বাঁচো' আমরা বাঁচব। এ'রা কেউই তোমার বই পড়েন না—আর পড়লেও বলবেন অর্বাচীন। হয়েছে কি, তুমি পেছিয়ে পড়েছ ঠাকুর, তাই এখনো মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে মিথ্যে মাথা বকাচ্ছ।"

লিখে রাসেল মন্তব্য করছেনঃ "হয়ত শয়তানের উকিল বলেছেন ঠিকই, কিম্বা হয়ত ভুল। হয়ত স্বৈরাচারী হাকিমেরা (ডিক্টেটার) দেখতে যত দুর্দান্ত আসলে তত নন। হয়ত খতিয়ে লোকমতে তাঁরা টলতেও পারেন—অন্তত খানিকটা। হয়ত বইটই লেখা লোকমত গ'ড়ে তোলার সহায়তা করতেও পারে—কে বলতে পারে? এইসব ভেবে-চিন্তে আমি এখনো সমানে বই লিখে চলেছি নিরুৎসাহী দুঃখবাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সত্ত্বেও, যদিও এতে করে কোন সত্যিকার সুফল ফলছে কি না বলতে পারি না।"

মানুষ অনেক কিছুই পারে, কিন্তু অপরের দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝতে পারে না সহজে। রাসেল এই পারার বড় পক্ষপাতী। এই কারণেই তিনি এত বেশি সংশয়ের ওকালতি করেন। বলেন যে, আমরা যদি সংসারের নানা বিষয়ে একটু কম নিশ্চিত হ'তাম তবে জগতে অনেক গোঁড়ামির নিষ্ঠুরতা লোপ পেত। খাঁটি ধার্মিকদের সম্বন্ধে একথা সত্য না হলেও (কেন না খাঁটি ধার্মিকরা কখনো অপরের উপর চড়াও হন না—স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস করে যথাসম্ভব নিরালায় আত্মশোধনের পথেই চলে যাবেন)। সংসারের সাড়ে পনের আনা রাজনৈতিক দলপতি তথা নিষ্করুণ একনায়কদের সম্বন্ধেই একথা খাটে না কি সাড়ে ষোলো আনা? আমার মন বলে—খাটে। তাই রাসেলের এ-দীক্ষাও আমি সাদরেই বরণ করে নিয়েছি।

কিন্তু সবার উপরে—আবার বলি—তাঁকে আমি বহুবারই প্রণাম করেছি তাঁর অলোক-সামান্য সত্যব্রত ও শুভৈষী চরিত্রের জন্যে। এমন সত্যাশ্রয়ী ভাবুক ও বহুপ্রতিভ পথিকৃৎ এ মিথ্যামুখর বিপথগামী যুগে খুব কমই দেখা যায়—বিশেষ করে চিন্তাশীল প্রতিভাধরদের মধ্যে। সত্যপরতা সম্বন্ধে তাঁর একটি ভারি মজার রসিকতা উদ্ধৃত করেই রাসেল-পর্বের সমাপ্তি টানব।

রাসেলের এক বন্ধু ছিলেন জি ই মুর। রাসেল তাঁকে এক সময়ে সমীহ করতেন শুধু প্রতিভাধর বলে নয় পরম সত্যনিষ্ঠ বলে। এঁর সম্বন্ধে রাসেল লিখছেন (৬৮ পৃঃ)।

"মুর-এর ছিল এক অনুপম পবিত্রতা। আমি মাত্র একটিবার তাকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়েছিলাম—তাও ফন্দি এঁটে। হল কি, একদিন আমি তাঁকে এমনিই জিজ্ঞাসা করে বসলামঃ মুর! তুমি কি সর্বদাই সত্য কথা বলে থাকো?' সে জবাব দিলঃ 'না।' আমার ধ্রুব বিশ্বাস মুর সারাজীবনে কেবল এই একটিমাত্র মিথ্যা কথা বলেছে।"

স্মৃতিচারণে হয়ত অ-স্মৃতির কথা কিছু এসে গেল। কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল—আরো এই জন্যে যে, রাসেলকে কেন ভালবেসেছি, সেকথা খানিকটা ফলিয়ে না বললে আমার রাসেল-ভক্তির পাশাপাশি গুরুভক্তির চিত্রটি ঠিক ফুটত না—আমার মতে। (ক্রমশ)

ভুতোদা বনাম আপিসের মেয়ে

বিমল আর বিনয় বসেছিল। উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন ভুতোদা।
ভুতোদা: ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কালে কালে কি হোল!
বিমল: আবার কি হোল?
ভুতোদা: জানিস আমাদের ছোটবেলায় বড়লোকের বাড়ীর বৌ মেয়েদের পাল্কী শুদ্ধু নদীতে ডুবিয়ে আনা হোত যাতে মুখ কেউ না দেখতে পায়। আর এখন বুড়োধাড়ী মেয়েরা সব আপিসে কাজ করে বেড়াচ্ছে?
বিনয়: তাতে আপনার হোল কি?
ভুতোদা: আমাদের মধুপুরের কেলো এখানে এক সদাগরী আপিসে কাজ করে। কাল গিয়েছিলাম দেখা করতে। ঢোকার মুখেই এক রংচং মাথা আধুনিকা পথ আটকালো। ইংরিজীতে চটাং চটাং করে কি বলল। আমি বললাম "মা লক্ষ্মী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বলল "ও, মিষ্টার রে—আপনার শ্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বসুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?'
বিমল: ঠিকই তো বলেছে।
ভুতোদা: কাজকরা মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরাজি বুলি।
বিমল আর বিনয়ের একবার চোখে চোখে চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।
বিনয়: ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুননা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পারের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।
ভুতোদা: তা যাব এখন।
বিকালে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা, বিমল আর বিনয়।
বিনয়: এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।
ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ
মিলি: কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?
ভুতোদা: (ভয়পেয়ে): না, না, তা কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজ কর্ম্ম করাই পছন্দ করি।
মিলি: (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা।
বিমল: মিলি, আমাদের খাওয়াবিনা?
মিলি: নিশ্চয়ই।
মিলি সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষীই মনে হচ্ছে।
বিমল: (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ে। কাছে যাবেননা। কামড়ে দিতে পারে।
ভুতোদা: থাম্।
খেতে বসে
ভুতোদা: খাবার তো অনেক করেছো মা মাছের ঝোল, মাংস, আলুপটলের ডালনা। ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।
মিলি: না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।
ভুতোদা: তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।
মিলি: খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।
ভুতোদা: বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। না, পড়ে আর কিছু থাকলনা। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা! তেল তো মনে হচ্ছেনা।
বিমল: কি দিবে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।
ভুতোদা: (চটে)—আবার রসিকতা করছিস?
মিলি: না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' রাঁধা।
ভুতোদা: আমি তো জানতাম ভাজাভুজি মিষ্টি কিষ্টিই 'ডালডায়' হয়।
মিলি: না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।
বিনয়: শেম শেম ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।
ভুতোদা: আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার মেয়ে কাজ করে তাঁদের মধ্যে এমনটি—
মিলি: না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ করার জন্যেই। বাড়ীর কাজে তারা কোন অংশে খারাপ নয়।
বিমল: ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি,

ভারত-পাক সীমান্ত বাণিজ্যে অচল অবস্থা অব্যাহত বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"দিল্লীর সাম্প্রতিক বৈঠকের পর সাধারণের ধারণাও তাই। কিন্তু অন্য বাণিজ্যের কথা জানিনে, সীমান্তে পাচার-বাণিজ্য অবাধেই চলছে; অচল অবস্থাটা শুধু দিল্লীর বৈঠকখানায় কাগজ-পত্রে"!!

• • •

পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব খয়রাত হোসেন অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সাহায্য পাইবার অনুপযুক্ত রাজনৈতিক সমর্থকদের হাতে তিনি ৫৯ হাজার টাকা তুলিয়া দিয়াছেন।—"খয়রাত হোসেনের খয়রাতি"—সংক্ষেপে মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

কেরলে মন্ত্রিসভা বাতিল হইয়া যাইবার পর রাজ্যপাল প্রাক্তন মন্ত্রীদের চা দিয়া আপ্যায়ন করিয়াছেন।—"তিনি

নিশ্চয়ই জানেন, মানসিক উদ্বেগে চাঙ্গা করে তুলতে চায়ের জুড়ি নেই, অন্তত চা-করেরা তাই বলেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

সংবাদে প্রকাশ, কয়েকজন সিপাহীর মধ্যে তাস খেলায় কথা কাটাকাটির ফলে একজন সিপাহী নাকি অকস্মাৎ গুলি চালায় এবং তাহাতে দুইজনের মৃত্যু হয়। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা তাসে কাটথ্রোটের কথাই শুনেছি, গুলি চালাবার কথা শুনিনি তো"!

• • •

নি বুল-খ্রুশ্চেভ সাক্ষাৎকারের সংবাদে বলা হইয়াছে, তাঁহারা খানাপিনার পর নৌকাতে ভ্রমণ করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"এপর্যন্ত 'নৌকা বিহারের' সংবাদই পেয়েছি; ত্রাসে আছি 'নৌকা ডুবির' খবর কখন আসে"!!

• • •

উত্তর প্রদেশ আইনসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের উদ্বোধনে রাজ্যপাল শ্রী ভি ভি গিরি তাঁহার ইংরেজীতে লিখিত বক্তৃতা পাঠ আরম্ভ করা মাত্রই ২৩ জন সোস্যালিস্ট সদস্য মৌখিক প্রতিবাদ জানাইয়া সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। "বুঝতে বেগ পেতে হয় না তাঁরা 'আংরেজী হটাও' আন্দোলনেরও সদস্য। শেষ পর্যন্ত 'সোস্যালিস্ট' শব্দ নিয়ে টানাটানি শুরু হবে না তো"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

ইতালীতে ফরাসী বাণিজ্য দূত মহাশয়ের তর্জনীটি একটি লরির ধাক্কায় জখম হয়। মামলা রুজু করিয়া তিনি খেসারত বাবদ দুই হাজার তিনশত পাউণ্ড পাইয়াছেন। তাঁহার দাবির স্বপক্ষে বলা হইয়াছে যে, তর্জনীটি জখম হওয়ায় তাঁহার করমর্দনের কাজ ব্যাহত হইতেছে।—"শুধু করমর্দন কেন, কর-পীড়ন এবং তারপর ধরাপরস্থলিতে তর্জন এবং তর্জনীর প্রভাব সর্বত্র স্বীকৃত"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

• • •

সংবাদে শুনিলাম, কসাইদের জন্য বিশেষ ধরনের ছুরি প্রস্তুত করা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"হাটে-

বাজারে যাঁরা গলা কাটার কাজ নিয়েছেন তাঁদের ছুরি কোথা থেকে আমদানী হচ্ছে জানতে পারলে সহজ হওয়া যেতো"!!

• • •

ওয়েলিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জোর সাবুর্গী নামক জনৈক গল্‌ফ খেলোয়াড় একটি গল্‌ফ-এর বল মারিয়া ২৬ মাইল দূরে পাঠাইয়াছেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"এই বল-এর অর্থ গুলি, বিকল্পে গুল্‌-ও বলা যায়"!!

• • •

চতুর্থ টেস্টে আব্বাস আলি বেগ-এর খেলায় অনেকটা উন্নয়ন করিয়াছে। ক্রিকেট সমালোচকেরা বলিতেছেন—বেগকে দলভুক্ত করা খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দেরি হইয়া গেল। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরাও সমালোচকদের সংগে একমত। কিন্তু ক্রিকেট রাজনীতিকদের নীতি হলো—ন বেগান ধাবতি ধীমান"!!!

• • •

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমে রং দেওয়া হইতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী

বলিলেন—"বর্ণচোরা আম কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তিনি হয়ত স্বপ্নেও এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু তা-ও হলো; জয় হিন্দ"!!
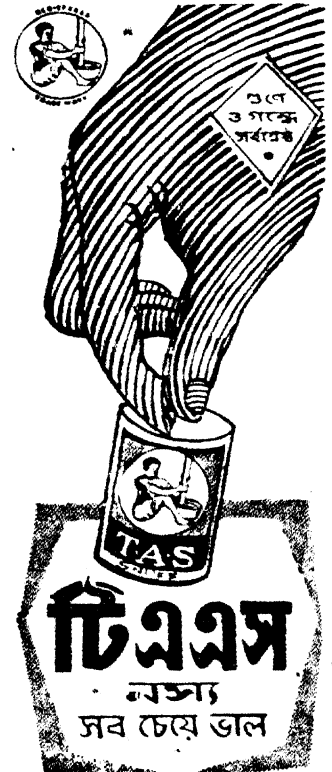
সম্মিলিত দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরা এমন কিছু একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিস নয়, কেননা হীরাই তাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। হীরা এবং নানাবিধ মূল্যবান পাথর সম্মিলিত দক্ষিণ আফ্রিকার ৩টি প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ৩টি প্রদেশ হচ্ছে ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং কেপ। এর সংগে দক্ষিণ আফ্রিকাও আছে যার ২টি প্রদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক উৎপাদক দেশ হিসাবে খ্যাত। এর শাসন কর্তৃত্ব

লণ্ডনের ক্রিস্টিতে চিরকালের চিরসুন্দর হীরক প্রদর্শনীতে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের হীরক অলংকারসমূহের একাংশ

বর্তমানে সম্মিলিত দক্ষিণ আফ্রিকারই হাতে। মধ্য আফ্রিকার বেলজিয়ান কংগোও পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম হীরক উৎপাদক দেশ।

দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হীরকখনিগুলি দেখবার সুযোগ যে কোন ভ্রমণকারীর পক্ষে একটা স্মরণীয় ঘটনা। তাদের কাছে কোনদিনই এর স্মৃতি মলিন হবে না। এইসব খনিতে এলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয় এমন সব হীরা দেখে যার ওজন তখন ক্যারেটে নয়—পাউণ্ডে নির্ধারিত হয়। আফ্রিকার এই ৮টি খনিতে খুব কম করেও বছরে ৩৫ লক্ষ ক্যারেট বা পৌনে এক টন হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়।

জোহান্সবার্গের ৬০ মাইল উত্তর পূবে ট্রান্সভালের প্রধান হীরকখনি। এই খনিতে ৫০০ ইউরোপীয় ও ২৫০০ আফ্রিকান চাকরি করে। ৬ মাস চাকরির চুক্তিকালে এদের খনি সন্নিহিত বাসভবনে থাকতে হয়। এই ৬ মাসের চুক্তিকালে খনিতে কাজ করতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন কারণেই বাসভবনের এলাকা ছেড়ে বাইরে যেতে পারে না। একমাত্র পুরনো কর্মচারীদেরই হীরা নাড়া-চাড়া করবার অধিকার আছে—আর অন্য সবাই সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই খনি থেকে বছরে যে ১৫ লক্ষ ক্যারেট হীরা উত্তোলিত হয় তার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ হীরা আর ৮০ ভাগ অন্যান্য মূল্যবান পাথর। এই উৎপাদন বজায় রাখার জন্য প্রতি বছর ৫০ লক্ষ টন মাটি কাটতে হয়। ফলে এই খনির গভীরতা দাঁড়িয়েছে ১০০০ ফুটেরও বেশি।

১৯০৩ সালে টমাস কুল্লিনান এই খনি প্রথম আবিষ্কার করেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অকল্পনীয় মূল্যের হীরক এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৫৫ বছর আগে যেখানে কুল্লিনান হীরকটি পাওয়া গেছে সেখানে একটি চিহ্ন করে রাখা হয়েছে। অসংস্কৃত অবস্থায় এর ওজন ছিল সোয়া পাউণ্ড। এত বড় হীরা আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু হীরক খনি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এটি একটি খুব বড় হীরার অংশ মাত্র। তাঁরা আশা করেন এর বাকী অংশ একদিন-না-একদিন পাওয়া যাবে। কুল্লিনান হীরকখণ্ডটি প্রকৃতপক্ষে খনির ভূপৃষ্ঠে পরিদর্শনকারী ম্যানেজার মিঃ ফ্রেডারিক ওয়েলসই প্রথম আবিষ্কার করেন। এর জন্য তাঁকে ২ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এই হীরা দেড় লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে কিনে নেন। আর এখন যদি এই হীরার বাজার মূল্য যাচাই করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, এর দেড় লক্ষ পাউণ্ড ক্রয়মূল্য বর্তমান মূল্যের সামান্য এক ভগ্নাংশ মাত্র। ১৯০৭ সালে এই হীরকখণ্ডটি সপ্তম এডওয়ার্ডকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। পরের বছর আমস্টার্ডামে এই হীরা কেটে যখন পালিশ করা হল তখন এর থেকে ৯টি বড় হীরকখণ্ড এবং ৯৬টি ছোট ছোট হীরা পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড় খণ্ডটির ওজন দাঁড়াল সাড়ে তিন আউন্স বা ৫৩০ ক্যারেট। পরে অবশ্য এই হীরকখণ্ডটির নামকরণ করা হয়েছিল 'স্টার অফ আফ্রিকা' এবং এটি বৃটিশ রাজদণ্ডের শোভা বর্ধন করে আসছে।

১৯০৫ সালে ৭২৬ ক্যারেট ওজনের আরও একটি বড় হীরা পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই হীরকখণ্ড দেড় লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রি করা হয়। এর থেকে মোট ৩৫১ ক্যারেট ওজনের ১২টি হীরকখণ্ড বের করা হয়। কেটে পালিশ করতেই এর প্রায় অর্ধেক ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। পরে এই ১২টি হীরাই প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে বিক্রি করা হয়েছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের ক্রিস্টিতে আফ্রিকার এইসব হীরকখনি থেকে আহৃত চিরকালের চিরসুন্দর হীরকের তিন সপ্তাহব্যাপী এক প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এই প্রদর্শনীতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দামের হীরা প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে ব্যক্তিগত সংগ্রহ, পৃথিবীর ৬টি বড় বড় হীরক ব্যবসায়ীর সংগ্রহ, আর তাছাড়াও ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সংগ্রহ স্থান পেয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের মধ্যে বিশেষ করে রানী ২য় এলিজাবেথ ও তাঁর মাতার হীরক অলংকারই বেশি ছিল। এই প্রদর্শনীতে হীরকখচিত অলংকারের মধ্যে রানী আলেকজান্দ্রিয়ার টায়রা, রানী ২য় এলিজাবেথের ২১তম জন্মদিবস ও বিবাহের সময় সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়নের সরকার যেসব হীরকখণ্ড উপহার দিয়েছিলেন তা, ১৯০৭ সালে ৭ম এডওয়ার্ডকে যে কুল্লিনান হীরকখণ্ড উপহার দেওয়া হয়েছিল—সবই স্থান পেয়েছিল।
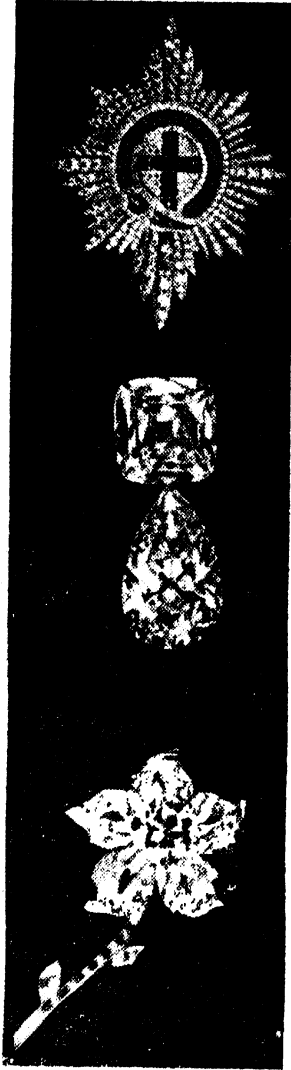
চক্রদত্ত
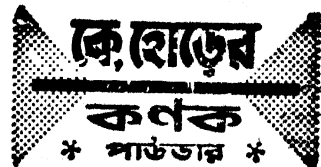
আজকাল কতরকমের যে অ্যাণ্টি-বায়োটিক ওষুধ বার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এইসব ওষুধে অনেক বড় বড় রোগ সেরে যায় সন্দেহ নেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ইণ্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটির ডাঃ ইউজিন ওয়েনবার্গ বলেন যে, ব্যাকট্রাসিন নামক অ্যাণ্টি-বায়োটিক ওষুধের সঙ্গে কিছু জিংক ব্যবহার করলে একাধারে ওষুধটির জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা ১০০ থেকে ৪০০ গুণ বেড়ে যায় এবং রোগ সারান ছাড়া অন্য কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এইভাবে জিংক মিশ্রিত ব্যাকট্রাসিন নামক নানারকম জীবাণু প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া মানুষের খাদ্য হিসাবে যে সব জীবের প্রয়োজন সেগুলির পুষ্টি সাধনের কাজেও লাগে।

*

চাষবাসের জন্য জমি তৈরী করার কাজে যেমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তেমনি বীজ সংরক্ষণের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার হয়। রাশিয়ায় গম চাষের সময় দেখা গিয়েছিল বীজ-গমে একরকম বিশেষ ক্ষতি-কারক ছত্রক লাগার জন্য গম চাষের বিশেষ অসুবিধা হয় এবং এই অসুবিধা দূরী-করণের জন্য রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। লেনিনগ্রাদের "প্ল্যাণ্ট প্রোটেকশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট" বীজ-গম রক্ষণের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এরা জানিয়েছে যে, জলের মধ্যে কিছুটা "পলিমারস" গুলিয়ে নিয়ে ঐ মিশ্রিত তরল পদার্থের মধ্যে যে কোনও বীজ দু তিন মিনিট ডুবিয়ে রাখলেই বীজগুলির গায়ে একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে। অবশ্য এই আবরণের গায়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকায় বায়ুচলাচলের পথ বন্ধ হয় না। ফলে ঐ পদার্থের আস্তরণটি বীজ সংরক্ষণের সহায়তা করে অথচ অঙ্কুরিত হওয়ার পথ বন্ধ করে না। আজকাল আবার ঐ পদার্থের সঙ্গে কিছুটা কীট-পতঙ্গ নাশক ওষুধও ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে সংরক্ষিত বীজগুলি বপনের পর বেশ সুস্থ চারা উৎপন্ন হয় কিন্তু এই পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে যখন অন্য রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বীজগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হত তখন এত সুফল পাওয়া যেত না।

*

আমেরিকায় নৌবহরের নতুন জেট-চালিত এরোপ্লেন ম্যাকডোনাল্ড এফ.

ম্যাকডোনাল্ড এফ, চার, এইচ

চার, এইচ, শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী গতিসম্পন্ন। বর্তমানের সর্বাপেক্ষা গতি-সম্পন্ন উড়োজাহাজ "ম্যাকের" চেয়েও বেশী গতিসম্পন্ন এই নতুন উড়োজাহাজটি সব রকম আবহাওয়াতেই এটি উড়তে পারে।

*

সূর্যরশ্মি শরীরের পক্ষে বিশেষ উপ-কারী তা আমরা অনেকেই জানি কিন্তু অতিরিক্ত রৌদ্রতাপে যে শরীরের খুব ক্ষতি সাধন হয় তাও আমাদের অজানা নয়। পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষকগণ 'ট্রায়ামসিনলোন' নামে একটি ওষুধ আবিষ্কারের খবর দিয়েছেন। এটি অতিরিক্ত রৌদ্রদগ্ধ রোগীর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। রৌদ্রদগ্ধ হওয়ার দরুণ গায়ের ব্যথা, জ্বর কিংবা সর্দিগর্মি হলে 'ট্রায়ামসিনলোন' খেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ঐ উপসর্গগুলি দূরীভূত হবে।

*

"কলা খাওয়া" বিশেষ করে "কাঁচকলা খাওয়ার" কথা আমরা বাংলাদেশেই বলে থাকি। আসলে কলা একটি অতি উপাদেয় খাদ্য ত বটেই, বিশেষ পুষ্টিকরও। অতি অভিজাত পরিবারেও কলাকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় না বরং আহারান্তে যে ফল খেতে দেওয়া হয়, তার মধ্যে কলা বিশেষ সমাদৃত হয়ে থাকে। প্রায় সারা বছর ধরেই কলা পাওয়া যায়। শোনা যায়, ভারতে ষাট রকমের কলার জন্ম হয়। অবশ্য তার মধ্যে মাত্র বারো রকম বিভিন্ন ধরনের কলা বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, কলা একটি পুষ্টিকর খাদ্য। এর মধ্যে 'এ', 'বি' 'বি' ও 'বি২' ভিটামিন পাওয়া যায় এবং স্টার্চও প্রচুর পরিমাণে আছে। একটি কলার মধ্যে জলীয় পদার্থ ৬১·৪, প্রোটীন ১·৩, স্নেহ পদার্থ ০·২, এবং খনিজ পদার্থ ০·৭, শর্করা জাতীয় পদার্থ ৩৬·৪, ক্যালশিয়ম ০·০১, ফসফরাস ০·০৩, লোহা ০·৪ ভাগ আছে আর ক্যালরি ১৫৩ ভাগ।

একটি অসামান্য রচনা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আজকাল অনেক বাঙালী লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় মনোনিয়োগ করেছেন। গত ৫।৭।১০ বছরের মধ্যে অনেক-গুলো উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কিছুকাল হ'ল সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাটি বাঙালী লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আর তা নিয়ে একাধিক উপন্যাস বা অনেক ছোট গল্প লিখিত হয়েছে।

গজেন্দ্রবাবুর বহ্নিবন্যা সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লিখিত সব-চেয়ে বৃহৎ আর সবচেয়ে তথ্যবহুল উপন্যাস। ইতিহাসের বিচারে বইখানিকে সবচেয়ে প্রামাণ্য বলা যেতে পারে। যে দু'টি তিনটি ক্ষেত্রে লেখক স্বীকার করেছেন যেসব জায়গা ছাড়া আর কোথাও তিনি ইতিহাসের সত্য থেকে ভ্রষ্ট হননি। ইতিহাসের সত্য অবিকৃত রেখে রসবস্তু গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ, আর গজেন্দ্রবাবু তাতে সক্ষম হয়েছেন নিশ্চয়।

সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে এখানা প্রথম উপন্যাস হলেও তাঁর প্রথম রচনা নয়। অনেক ছোট গল্প লিখেছেন তিনি এবিষয়ে—আর সেগুলোর সৃষ্টি সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকীর প্রেরণায় শুধু নয়—অনেক বছর আগে তিনি একাধিক ছোট গল্প লিখেছেন এবিষয়ে। কালের হিসাবে কোন কোনটা কুড়ি বছর আগে। কাজেই আধুনিক ঐতিহাসিক রস-রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে অন্যতম Pioneer বলা অন্যায় হবে না। বহ্নিবন্যা গজেন্দ্রবাবুর ঐতিহাসিক অগ্রহের চরম ফল। রসরচনার স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে বিপুল অধ্যয়ন ও ভূয়োদর্শিতা—আর সমস্ত মিলে গড়ে তুলেছে ৪৭৯ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ উপন্যাসখানাকে।

ইদানীং কালের পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক বেধে গিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ নিয়ে। অনেকে বলেন, ব্যাপারটার মূল্য শুধু ঐতিহাসিক নয়, তার চেয়েও বেশী। কেননা, এটা হচ্ছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম পর্ব। আবার অনেকে বলেন, ব্যাপারটার উপরে ওরকম রঙচড়ানো বস্তুর অপব্যবহার মাত্র। ছোটখাট বিদ্রোহ সে যুগে অনেক হয়েছে ব্যক্তিগতে বা গোষ্ঠিগতে সুবিধা-অসুবিধার প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাতে—সিপাহী বিদ্রোহ সেই জাতের ঘটনা, তবে কিছু বড়। অর্থাৎ তর্কটা রাজনীতি বনাম ইতিহাস সংক্রান্ত। গজেন্দ্রবাবু এই দু'টি মতামতের কোনটিকেই গ্রহণ করেননি, ভালই করেছেন যেহেতু সাহিত্যিক ঐতিহাসিকও নয় রাজনীতিকও নয়—ও দুই থেকে আলাদা। সাহিত্যিকের কাজ মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্রাঙ্কন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল আবর্তে বিচিত্র স্বভাবের বিচিত্র স্বার্থের ছোটবড় ভালমন্দ যেসব নরনারী পড়ে গিয়ে আবর্তিত হচ্ছিল, তাদেরই কয়েকজনের সুখ-দুঃখের ছবি তিনি এঁকেছেন। আর সে চেষ্টায় যে তিনি সফল হয়েছেন, তার প্রমাণ বইখানা পড়বার সময়ে তাদের সুখ-দুঃখে আমরা বিচলিত হতে থাকি।

বহ্নিবন্যার প্রধান ঘটনাস্থান কানপুর সহর যদিও শেষের দিকে লখনৌ সহরে এসে পড়েছে। বস্তুতঃ বইখানার উপসংহার লখনৌ সহরেই। তবে কানপুর সহরকেই ঘটনাস্থল বলতে হয়। এখানেই বীজবপন, অঙ্কুরোদ্গম,—তারপরে কালক্রমে বনস্পতির শাখাপ্রশাখা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—একখানা গিয়েছে লখনৌ সহরে।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রী দুই শ্রেণীর: ঐতিহাসিক আর কাল্পনিক। ঐতিহাসিক পাত্রের মধ্যে আছে নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, আজিমুল্লা, নানকচাঁদ প্রভৃতি ভারতীয়, মিডল, ওয়ালেস প্রভৃতি স্বল্পখ্যাত গোরা সৈনিক। আর কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে আছে আমিনা বা হুসেনী, সর্দার খাঁ, কানাইয়া লাল, কালিকাপ্রসাদ, মৃত্যুঞ্জয় হীরালাল প্রভৃতি। শেষোক্ত দুই জন বাঙালী। শুধু তাই নয় কাল্পনিক অংশের নায়ক বলা যেতে পারে এই সুদর্শন বাঙালী যুবককে—কাল্পনিক অংশের নায়িকা আমিনা বা হুসেনী। আর ঐতিহাসিক অংশের নায়কনায়িকা কেউ আছে মনে হয় না—থাকলে সিপাহী বিদ্রোহের পরিণাম অন্যরকম হ'তো। বহুখ্যাত নানাসাহেবকেও নায়কের মর্যাদা গজেন্দ্রবাবু দেননি। যেহেতু কোন বিচারেই সে মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য নয়।

ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী লিখতে গিয়ে অনেক সময়ে লেখক ভুল রীতি গ্রহণ করেন। তিনি ইতিহাসের ঘটনাকেই প্রাধান্য দেন, ফলে বইখানা না-ইতিহাস না-কাহিনীতে দাঁড়ায়। মনে করুন, প্রকাণ্ড বটগাছ তাতে আছে পাখীর বাসা। ঝড় এলো। তখন লেখক কি করবেন? তিনি ঝড়টাকে আর বটগাছটাকেই বড় করে আঁকবেন? তাহলেই ভুল হ'ল। তিনি পাখীগুলোর উপরে ঝড়ের প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, তাদের উদ্বেগ, আশঙ্কা, দুঃখ আঁকতে হবে লেখককে—ঝড়টাকে আভাসে অবশ্য দেখাবেন। গজেনবাবু শেষোক্ত রীতি অবলম্বন করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ সুরু হ'ল—তার প্রতিক্রিয়া ঘটলো পাত্রপাত্রীদের মনের উপরে। আমিনার পুঞ্জীভূত ব্যক্তিগত রোষ, ইংরাজ জাতটার উপরে রোষ এতদিনে যেন চরিতার্থতার পথ একটা খুঁজে পেলো। বহ্নিবন্যা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু বিবিঘরে শ্বেতাঙ্গ নারী ও শিশুদের হত্যা—আমিনার ব্যক্তিগত ক্রোধ-চরিতার্থের ফল বলে তিনি অঙ্কিত করেছেন। ভুল করেছেন মনে হয় না। কেননা ঐ রকম একটা নিরর্থক নারকীয় ব্যাপার কেন ঘটলো, সঠিক কেউ বলতে পারে না। শেষ দায়িত্ব নিঃসন্দেহে নানাসাহেবের, কিন্তু হুকুমটা তাঁর মুখ থেকে একরকম জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। গজেনবাবু দেখিয়েছেন যে, বহুবিধ ছলাকলায় নানাকে মুগ্ধ করে আমিনা হুকুমটা আদায় করে নিয়েছিলো। যে ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা আছে তার একটা নূতন কারণ নির্ণয় করবার অধিকার লেখকের আছে বলেই মনে হয়। উপন্যাসের উপসংহার অদৃষ্টের বিড়ম্বনাপূর্ণ। ইংরাজ সৈন্য যখন লখনৌ সহর অধিকার করতে উদ্যত তখন আমিনা ওয়ালেস নামে একজন গোরা সৈনিকের গুলীর আঘাতে নিহত হ'ল। ওয়ালেসের সঙ্গে আমিনার ছিল কৈশোর-প্রেমের সম্বন্ধ। তারপরে ভুল বোঝাবুঝির ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো—ওয়ালেসকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে আমিনা সমস্ত ইংরাজ জাতটার উপরে হাড়ে চটে গিয়েছিলো। ওয়ালেস বিশ্বাসঘাতকও নয়, সে আমিনার উপরে বিরূপও নয়—ভুল বোঝাবুঝিতেই এই বিচ্ছেদ। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা আর কাকে বলে।

এই সুদীর্ঘ জটিল কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে গিয়েছে যুবক হীরালালের নবীন জীবন। সে প্রাণে বেঁচে রইলো, কিন্তু নিতান্তই মরে গিয়ে।......

কাহিনীবিন্যাসে এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে সরু মোটা নানা উপকাহিনীর তন্তু মিশিয়ে বিচিত্র জাল বুনতে গজেনবাবুর জুড়ি বাংলা সাহিত্যে নেই বললেও চলে। এটি অসামান্য ক্ষমতা। অনায়াসে গল্পের সূত্র টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সাহিত্যিক সব ক্ষমতার মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে দুর্লভ ও কঠিন। সেই দুর্লভ ও কঠিন ক্ষমতায় গজেনবাবু অদ্বিতীয়। তাঁর গল্পের গাঁথুনি দেখতে দেখতে অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। বহ্নিবন্যা উপন্যাসের প্রারম্ভ—হীরালাল ও মৃত্যুঞ্জয়ের কানপুর যাত্রা, পথিমধ্যে ছদ্মবেশী আমিনা কর্তৃক জলমগ্ন হীরালালের উদ্ধার এবং সেই সূত্রে ইতিহাসের একটি স্থূল সূত্রের সঙ্গে হীরালালের ব্যক্তিগত জীবনের যোগ—বর্ণনায় লেখক অসাধারণ মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। এই ঘটনাকে কিভাবে কাহিনী আরম্ভ করতে হয়, তার একটি আদর্শ বা Model বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বহ্নিবন্যা ঋতুর ফসল নয়, স্থায়ী বনস্পতি।

বহ্নিবন্যা : লেখক—গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৭৯।
মূল্য—৮॥৹

(আকাশবাণী)

বৈদেশিকী

ব্রিটেনে ছাপাখানাকর্মীদের ধর্মঘট সাত সপ্তাহ পরে মিটল। কর্মীদের দাবি ছিল—শতকরা দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি এবং ৪০ ঘণ্টায় সপ্তাহ। শতকরা সাড়ে চার টাকা বেতন বৃদ্ধি এবং ৪২ ঘণ্টায় সপ্তাহের শর্তে নিষ্পত্তি হয়েছে। এই সাত সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘটের জন্য মালিক, শ্রমিক ও ইউনিয়নগুলিকে মোট মূল্য দিতে হয়েছে নাকি ৪০ কোটি টাকা। কাজ বন্ধ থাকার জন্য মালিকের আয়ও বন্ধ ছিল, শ্রমিকরা বেতন পাননি এবং ইউনিয়নগুলিকে শ্রমিকদের ভাতা দিতে হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য যে-সুবিধা হল তাতে শ্রমিকদের বর্তমান ক্ষতি পুষিয়ে যাবে বলে তাঁরা নিশ্চয়ই মনে করছেন। মালিকদের ক্ষতি শেষ পর্যন্ত খরিদ্দারের কাছ থেকে উশুল হবে। ইউনিয়নগুলির ধনভাণ্ডারও আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু এই লড়াইয়ে নিরপেক্ষ হয়েও যাদের কাজকারবার বিঘ্নিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের ক্ষতির আর পূরণ হবে না।

লণ্ডনের (এবং ম্যানচেস্টার থেকে ছাপা) বড় দৈনিক কাগজগুলি যাদের ওদেশে "ন্যাশনাল ডেইলি" বলা হয় সেগুলির কাজ এই ধর্মঘটের দ্বারা ব্যাহত হয়নি, কারণ তাদের ছাপার ব্যবস্থা আলাদা। তাদের কিছু অসুবিধা হয়েছে, তবে সেটা আর একটি ধর্মঘটের দরুণ। ছাপাখানাকর্মীদের ধর্মঘট চলতে চলতে ছাপার কালি তৈরীর কারখানার কর্মীদের ধর্মঘট শুরু হয়। তাতে কালির টান পড়ে। কোনো কোনো "ন্যাশনাল ডেইলি"র মজুত কালি ফুরিয়ে আসে। তখন একটা সংকট উপস্থিত হয়, কারণ ন্যাশনাল কাগজগুলির মধ্যে যে চুক্তি আছে তাতে এরূপ অবস্থায় একটা কাগজ বন্ধ হলে অন্যগুলি চলতে পারে না। তখন একমাত্র উপায় হলো সকলের মোট মজুত কালি পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে ব্যবহার করা। কিন্তু তাতেও মুশকিল ছিল যদি না ন্যাশনাল সোসাইটি অব অপারেটিভ প্রিন্টারস্ অ্যাণ্ড অ্যাসিস্টান্টস্ (National Society of Operative Printers and Assistants) সম্মতি দিত। সুতরাং "ন্যাশনাল ডেইলি"গুলো চলেছে, তবে তাদেরও পাতা কমাতে হয়েছে। তাতে কাগজগুলির বিজ্ঞাপনের আয় কিছু কম হয়েছে—তার মোট পরিমাণ হয়ত এক কোটি সোয়া কোটি টাকা হবে।

কিন্তু শক্ত ঘা খেয়েছে লণ্ডনের বাইরের দৈনিকগুলি যাদের "প্রভিন্সিয়াল" বলা হয় এবং সাপ্তাহিক কাগজগুলি, লণ্ডনের এবং বাইরের। এরাও এই লড়াইয়ে প্রকৃতপক্ষে "নিরপেক্ষ", কারণ ঝগড়াটা কাগজগুলির সঙ্গে নয়, ঝগড়াটা ছাপাখানার মালিক ও ছাপাখানার কর্মীদের মধ্যে, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগজের মালিক ছাপাখানার মালিক নয়। ছাপাখানা পয়সা নিয়ে কাগজ ছেপে দেয়। কিন্তু এই ধর্মঘটে এই কাগজগুলোই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো যদিও এরা বাদী বিবাদী কোনটাই ছিল না। শুনা যাচ্ছে, এই ছাপাখানার ধর্মঘটের জন্য কাগজ বন্ধ থাকার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার দরুণ দৈনিক সাপ্তাহিক মিলে হয়ত ১৫০ খানা কাগজ বন্ধই হয়ে যাবে। অবশ্য তাদের মধ্যে সাপ্তাহিকের সংখ্যাই বেশি হবে। অনেক ছোট ছোট কাগজ যেগুলি পারিবারিক কারবারের মত চালানো হত সেইগুলির পক্ষেই এই ধাক্কা সামলানো বেশি শক্ত হবে। ছয় সাত সপ্তাহের আয় নষ্ট হয়ে যাওয়া সাপ্তাহিক কাগজের পক্ষে একটা কঠিন আঘাত। তাতে অনেক ছোট কাগজেরই অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা। "প্রভিন্সিয়াল" দৈনিক কাগজ যেগুলি ক্ষতি সামলে নিতে পারে সেগুলির পক্ষেও অনেক জায়গায় একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। যতদিন ধর্মঘট চলছিল ততদিন স্থানীয় দৈনিক কাগজগুলি বন্ধ ছিল, তখন অনেক ক্ষেত্রে তাদের "বাজারে" "ন্যাশনাল" কাগজগুলি ঢুকে পড়েছে, এখন তাদের হটাতে হবে বেশ খানিকটা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার

সম্মুখীন হতে হবে। বৃটিশ সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে "প্রভিন্সিয়াল" দৈনিক এবং সাপ্তাহিকগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। লণ্ডনের "ন্যাশনাল" দৈনিক এবং রবিবারের কাগজগুলির কোনো কোনো বিষয়ে পরিপূরক এবং কোনো কোনো বিষয়ে প্রতিষেধক হিসাবে স্থানীয় দৈনিক ও সুচিন্তিত সাপ্তাহিকগুলির মূল্য অপরিমেয়। এই কাগজগুলির ঘা খাওয়া এবং দুর্বল হওয়া বৃটিশ সংবাদপত্র জগৎ তথা বৃটিশ সমাজের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতিকর। সবকিছু কেন্দ্রীভূত করার দিকে যে টান তাতে অনেক বৈচিত্র্যেরই ক্রমশ মূলোৎপাটন হচ্ছে, সেই টান থেকে নিজেদের কোনোরকমে বাঁচিয়ে যারা এখনো টিঁকে আছে তাদের ওপর এইরকম অপ্রত্যাশিত আঘাত সত্যই বেদনাজনক।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। আমাদের দেশে অনেকগুলো ভাষা বলে আমরা অনেক সময় বিপন্ন বোধ করি। কিন্তু এর একটা সান্ত্বনার দিকও আছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষা আছে এবং থাকবে বলেই এখানে "মনোপলি" বা একচেটিয়ামির দৌরাত্ম্য স্বভাবতই কখনো নিরংকুশ হয়ে দেখা দিতে পারে না। কোনো এক জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি সংখ্যায় কোনো কাগজ ছেপে দেশময় চালাবার চেষ্টা এখানে কোনোদিন সফল হবে না। সেটা কোনো ধনপতি অথবা রাষ্ট্রপতির দ্বারাই সম্ভব নয়। আমাদের বিভিন্ন ভাষাই তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। আমাদের ভাষার বহুত্বের মধ্যে মনোপলি-রোধের একটা গ্যারাণ্টি নিহিত আছে। তবে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে পৃথক পৃথক মনোপলি বা পুরো মনোপলি না হলেও মনোপলির প্যাটার্ন দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। তার জন্য সতর্ক থাকা দরকার।

বৃটেনের ছাপাখানার ধর্মঘটের ধাক্কা কেবল সংবাদপত্র জগতের উপরই এসে পড়েনি, পুস্তক প্রকাশকদের কাজও যথেষ্ট গড়বড় করে দিয়েছে। আগামী দু মাসের মধ্যে যে-সব বই বার করার কথা ছিল সেগুলো বার করতে হয়ত ছ' মাস দেরী হয়ে যাবে। প্রকাশন ব্যবসার আবার নরম্যাল-এ পৌঁছতে নাকি এক বছর লাগবে। সংবাদপত্র বিলি করার ব্যবসা যাদের—নিউস এজেণ্টস্—তাদেরও এই ধর্মঘটে বেশ ঘা দিয়েছে। পঞ্চাশ হাজার নিউজ এজেণ্টের প্রতি সপ্তাহে নাকি মোট আড়াই কোটি টাকা আয় মারা গেছে।

কাগজ তৈরীর কারখানার কর্মীদের ধর্মঘটও মিটে গেছে—সেক্ষেত্রেও শতকরা সাড়ে চার টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছে এবং ৪২ ঘণ্টায় সপ্তাহ নির্দিষ্ট হয়েছে।

৩।৮।৫৯

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

নীলকণ্ঠী: সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। **প্রকাশক**: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা: ৬। দাম: পাঁচ টাকা।

সাহিত্যের একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা আছে। সেটি হল সমাজ জিজ্ঞাসা। লেখক যে সমাজে বাস করেন, স্বাভাবিক নিয়মেই তার চিত্র তাঁর বৃত্তির উপর ছাপ রাখে।

এই সমাজ বা প্রতিবেশের নিয়ত বিবর্তন চলছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক পরস্পরবিরোধী এবং পরস্পরনির্ভর অসংখ্য জটিল ফোর্স বা শক্তির যোগফল হল সমাজ। লেখক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজকে সাহিত্যে ধরতে চেষ্টা করেন।

সুধীরঞ্জন এতদিন 'অন্য নগর' দূরের মিছিলের কথকতা করেছেন। ইদানীং নিজের প্রতিবেশের উপর তাঁর দৃষ্টি ফিরেছে। খুবই আশার কথা। সাহিত্যিকের উপর কতকগুলি অলিখিত দায়িত্ব চাপানো থাকে। নিজের সমাজের কথা বলা সেই দায়িত্বগুলির অন্যতম।

সুধীরঞ্জনের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'নীলকণ্ঠী'। জীবনে যন্ত্রণায় অস্থির একটি মেয়ে, তার চারপাশে অফুরন্ত হতাশা। এই হতাশাকে ঠেলে ঠেলে সেই মেয়েটি, যার নাম ঊর্মিলা, চেয়েছিল এমন একটি জীবন যা প্রত্যয়ে উজ্জ্বল, বিশ্বাসে সুন্দর। ঊর্মিলার যন্ত্রণা, হতাশা এবং সংগ্রামের ইতিহাস 'নীলকণ্ঠী'।

লেখক যে বিষয়বস্তু বেছেছেন, পাঠকের কাছে তার সহজ এবং স্বাভাবিক আবেদন আছে। ঊর্মিলার জীবন যন্ত্রণা তিনি পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন।

কিন্তু কাহিনী উদ্ঘাটনের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছে। একটির উল্লেখ করব। দিব্যনাথের সঙ্গে ঊর্মিলার জীবন বাঁধা পড়বে, ঠিক সেই মুহূর্তে অজয়কে যেন দৈবপ্রেরিত মনে হয়।

জীবনে অবশ্যই নাটক আছে। কিন্তু শিল্পরীতিতে অতি-নাটকীয় আকস্মিকতা নিঃসন্দেহে দুর্বলতার লক্ষণ।

পরিশেষে আর একটি কথা। সুধীরঞ্জন অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। এখন তাঁর এ কথা ভাবার সময় হয়েছে, উপন্যাস শুধু পর্যবেক্ষণ নির্ভর নয়। জীবনে গভীর তরণ এবং গভীর চরণ না হলে উপন্যাসে হয়ত আর সবই আসে, শুধু মহত্ত্বটুকু ছাড়া। (১৮২/৩৯)

কঙ্কপথ—সুনীল সরকার। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা—১২। দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির লেখক অতি-পরিচিত না হলেও এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে পাঠক সমাজে যে স্বীকৃতি পাবেন, এ আশা করাটা বোধ হয় ভুল হবে না। ঘটনা-প্রবাহে অনেক সময়ে দৈব যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল হলেও বইখানি মোটামুটিভাবে সুখপাঠ্য। ট্যাক্সি ড্রাইভার শশাংকর বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী লেখক গড়ে তুলেছেন, যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও আশার সুরের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিণতি ঘটিয়েছেন, তা পাঠক মাত্রকেই তৃপ্ত করবে। শশাংক, শান্তা প্রভৃতি চরিত্র চিত্রণও বেশ উপভোগ্য হয়েছে। লেখকের ভাষাটিও বেশ সুন্দর।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট ভালোই। আমরা বইখানির যোগ্য সমাদর কামনা করি। ১৩৫।৫১

বাঁধ—রবি গুহ মজুমদার। ডাক পাবলিশার্স, ১।১।১, হাজরা রোড, কলিকাতা ২৬। সাড়ে তিন টাকা।

একটি প্রেমমূলক উপন্যাস। ভাষা ভাল, সংলাপ রচনায় লেখকের অনায়াস-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়। কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনায় শৈথিল্য, ঘটনা-বিন্যাসের অতিনাটকীয়তা, এবং লেখকের যদৃচ্ছ সংক্রমণশীল মনোভাবের প্রভাবে সমগ্র রচনাটিই অতি সাধারণ হয়ে পড়েছে। তাই নায়িকা নমিতার পরিণতিতে একটি সংবেদনশীল রসিকমনের ছাপ খুঁজে পাওয়া গেলেও গ্রন্থের শুরুতে ঘটনাস্রোতের কাছে তার আত্মসমর্পণ অস্বাভাবিক মনে হয়; তার গানকে ভাল লাগায় দিব্যেন্দুর তাকে বিয়ে করা অথচ বিয়ের পরই নমিতাকে গান শেখার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা কেমন বিসদৃশ লাগে; হঠাৎ মঙ্গলাময়ীর ছেলে ভুলোকে

কেন্দ্র করে দিব্যেন্দুর নমিতাকে ছেড়ে চলে এসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা এবং নমিতারই বন্ধু মায়াকেই বিয়ে করা অথবা মায়ার দাদা বিরূপের সাথে নমিতার শিফু-পুরে দেখা হওয়া এবং পরে তারই আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি অতিনাটকীয়তা এবং লেখকের খেয়ালী কল্পনাবিলাস ও দায়িত্ব পালনে অসহিষ্ণু মনোভাবেরই সাক্ষ্য বহন করে। লেখকের ভবিষ্যৎ রচনা নিষ্ঠায় ও বৃহত্তর জীবনবোধে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এটাই আশা করি। ১৩৩।৫৯

কবিতা

রাত কাজ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। ইশারা প্রকাশনী, ৩১, হেমচন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—২৩। মূল্য চার আনা।

কলকাতার কবিতা—শ্রীকালিদাস ঘোষ। সৃষ্টিলোক, ৩২/১-বি, কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা—১৯। আট আনা।

কাব্য-কাহিনী—শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়। ৬/১, সুইনো স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। মূল্য এক টাকা।

আলজিরিয়া—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। ষাট নয়া পয়সা।

বিপ্লবের স্বপ্ন—দেবদূত। ১৯, কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা—২৮। মূল্য ছয় আনা।

ছন্দবীথিকা—বাগবুলে ইসলাম। দেবালয়, ২৪ পরগণা। বারো আনা।

অধুনা বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে। তবু মনে প্রশ্ন জাগে, দু-চারটি কবিতা রচনার পরই নবীন কবিরা কেন স্বল্পায়তন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রলোভন জয় করতে পারেন না। উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির ছাপা, বাঁধাই, সজ্জা প্রভৃতিতে কোথাও আধুনিককালের বিদগ্ধ রুচির পরিচয় নেই। তবু এর মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রাত কাজ' পড়ে আনন্দ পেলাম। কবি শক্তিমান। যদি অনুশীলন করেন, এ'র কাছ থেকে আরো ভালো কবিতা আমরা পাব, এ-আশা অযৌক্তিক নয়। 'কারখানা', 'রাত কাজ' বলিষ্ঠ রচনা।

কালিদাস ঘোষ-এর কলকাতার কবিতায় চির-পুরাতন চিরনূতন কলকাতার কয়েকটি পরিচিত খণ্ড খণ্ড ছবি পাই। কিন্তু শুধুমাত্র ছবি দেখাই কি কবির কাজ? কবিমনের প্রলেপ কোথায়?

তমোনাশ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্য-কাহিনী'তে কয়েকটি কাহিনীমূলক কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বহুস্থলে মাইকেল মধুসূদনের রচনার অক্ষম অনুকরণ লক্ষ্য করলাম।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের আলজিরিয়া সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রচনা। আলজিরিয়ার ঘটনাবলী কবি-মনকে ব্যথিত করেছে। 'কি করে ভুলি', 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে' সকলেরই ভালো লাগবে।

দেবদূত বিরচিত 'বিপ্লবের স্বপ্ন' কাঁচা হাতের রচনা, ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস-সর্বস্ব।

বাগবুলে ইসলামের 'ছন্দবীথিকায়' কয়েকটি মিষ্টি সুরের কবিতা আছে। কবির আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনের জন্যে কবিতা কটি পড়তে ভালো লাগে। তবে কবি এখনো আধুনিক কবিতার মেজাজ এবং মর্জি আয়ত্ত করতে পারেন নি।

২৯৭।৫৯, ৬৬৮।৫৬, ৩৬।৫৮, ৩।৫৯, ২৬৫।৫৭, ৪০।৫৭।

আশাবরী—শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য দুই টাকা।

এ মনের নানা রঙ—শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়। মূল্য দুই টাকা।

ঢেউ কন্যা—শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়। প্রান্তিক পাবলিশার্স, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। এক টাকা।

কয়েকটি সনেট, কিছু গদ্য কবিতা, দু-চারটি গান ও গীতি-কবিতার সমন্বয়ে অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আশাবরী' কাব্যগ্রন্থটি রচিত। কিন্তু সমস্ত কবিতা পাঠ করে বলিষ্ঠ আশার আলো দেখতে পেলাম না। সূর্যাস্ত, পরমা, অঘ্রাণে, ফাল্গুনে ইত্যাদি কবিতায় কবিতা রচনায়

প্রথম প্রয়াসের লক্ষণ বর্তমান। ছাপা বাঁধাই ভালো। প্রচ্ছদপট মনোরম।

কবির মনের নানা রঙের ছাপ পড়েছে জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'এ মনের নানা রঙ' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়। কিন্তু কবিতাকে কবিতার স্তরে উঠতে হবে। সেই বিচারে এই কাব্যগ্রন্থ নৈরাশ্যজনক। চেষ্টাকৃত অশ্লীলতাও চোখে পড়ল, যেমন—'স্মৃতি' কবিতা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থত্রয়ের মধ্যে ভালো লাগলো শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের 'ঢেউ কন্যা।' এই কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। দোষত্রুটিও আছে। তবু কবিতা পাঠের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই না, যখন পাঠ করি [illegible], [illegible] কবিতা, সূর্য-[illegible] প্রভৃতি কবিতা। ছন্দ, উপমা, [illegible]-[illegible] সম্বন্ধেও কবি সদা সচেতন—এ আশাও আনন্দের বিষয়।

১৬৯।৫৯, ১১১।৫৯, ৬৭২।৫৭

ছোট গল্প

[illegible] সিঁড়ি—[illegible] ১১ [illegible] তিন টাকা [illegible]।

[illegible]

প্রভৃতি গল্পে মানবপ্রকৃতির যে বিভিন্ন ও বিচিত্র উচ্ছ্বাসের আলোচনা হয়েছে, তা একদিকে যেমন জীবনের কালোচ্ছ্বাসে ভরা, তেমনি আবার জীবন-বীক্ষা এবং মনন-শীলতায়ও সমৃদ্ধ। তাই তার সৃষ্ট সেলিনা, জোহরা, সলিমুদ্দে, লীনা প্রভৃতি চরিত্র দেশকালের সীমা পেরিয়ে আমাদের মনেও সাড়া জাগায়। 'আতুড় ঘর' প্রভৃতি গল্প এক সংবেদনশীল মনের ছোঁয়ায় সমুজ্জ্বল।

আমরা এই তরুণ লেখকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করি। ১৯০।৫৯

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

দশমাশ্চর্য পারমানবিক শক্তি—কার্লটন পার্লে। অনুবাদক কুনাল কুমার।
বক বধ পালা (ছোটদের নাটক)—লীলা মজুমদার।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ (ছোটদের নাটক)—প্রশান্ত চৌধুরী।
প্রথম প্রত্যয়—নবনীতা দেব।
কালবৈশাখী—শ্রীমোহনকালী বিশ্বাস।
বৃষ্টিমুখর—আবদুস সত্তার।
জুলেখার মন—মহম্মদ মাহফুজুল্লাহ।
উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রবেশিকা (২য় খণ্ড)—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
নূতন বাঁকে—শ্রীবিজয়চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।
ফাংশন—শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)।
কথাকলি—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।
শকুন্তলা—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী।
নীল নীল চোখ—শ্রীমানব গঙ্গোপাধ্যায়।
নাচ গান ছড়া—শ্রীশৈলেন্দ্রলাল ধর।
তানপুরিটি—সুনীল ঘোষ।
শেষনাগ—শক্তিপদ রাজগুরু।
প্রবাসের আশীষ—শিবনারায়ণ রায়।
গ্রন্থাগার প্রচার—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্রশেখর

পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

রংগজগতের বহুমুখী আমোদ-আয়োজনের মধ্যে বর্তমান কালে চলচ্চিত্রের জুড়ি আর নেই। এই আমোদ-মাধ্যমটির সংগে সমাজ-মানসের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অবিচ্ছেদ্য রূপ নিতে চলেছে। চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসার ও প্রভাব থেকে শিশুদের সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা একালে দুরতিক্রমনীয়কে অতিক্রম করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সামিল বলেই গণ্য হবে। বরঞ্চ এই প্রমোদ-মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শিশুদের মানসিক গঠনের উপযোগী নির্দোষ আমুদে ও শিক্ষামূলক ছবি তৈরীর দিকে সমবেত ও একক প্রয়াসের প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য। বর্তমান চলচ্চিত্র-শিল্পে এ ব্যাপারে কোন কোন প্রযোজক যে অগ্রণী হয়ে আসেননি তা নয়।

তবে শিশুচিত্রের ব্যবসায়িক অসাফল্য এই সব প্রযোজকদের উৎসাহকে অনেকাংশে স্তিমিত করে দিয়েছে। ফলে চলচ্চিত্র-শিল্পের আনন্দমেলায় এমন আয়োজন সুলভ হয়ে উঠছে না যা সানন্দে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

সুখের বিষয়, আমাদের জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা সম্প্রতি নির্দোষ আমুদে ও শিক্ষামূলক শিশুচিত্রের ব্যাপক প্রযোজনার আশু প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। বিপুল অর্থব্যয়-সাপেক্ষ যে পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি হাত দিয়েছেন তাতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে অন্তত একশোটি শিশুচিত্রগৃহ নির্মাণের সংকল্পটি পুরোভাগে স্থান পেয়েছে। এবং এই সকল চিত্রগৃহে ঈপ্সিত শিশুচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থার জন্য চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারেও বিভিন্ন প্রাদেশীয় সরকার প্রস্তুত হচ্ছেন। পশ্চিমবংগ সরকারও এই শিশু-কল্যাণ যজ্ঞের ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত প্রস্তুতিতে সম্প্রতি হাত দিয়েছেন। কয়েক-দিন আগে পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চলচ্চিত্রসেবীদের সংগে এই সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি তিনি রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সংগেও এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেছেন। প্রস্তুতির মধ্যে ব্যগ্রতা একটি শুভ-লক্ষণ সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যগ্রতার সংগে নিষ্ঠা, সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতার যোগ-সাধন যদি প্রস্তুতির ভিত্তি হয়ে না দাঁড়ায় তবে ঈপ্সিত সৌধের ভিত্তি-প্রস্তর পর্যন্ত স্থাপিত হতে পারে, তার ওপর সৌধ গড়ে ওঠে না। সাধ সাধ্যের সীমানায় কখনও পৌঁছুতে পারে না। পরিকল্পিত শিশু-চিত্রগৃহের ভিত্তি-প্রস্তর একদিন হয়তো মহা আড়ম্বরে স্থাপিত হবে, কিন্তু ভিত্তির ওপর পরিকল্পনার মূর্তি যদি গড়ে তুলতে হয়, তবে সরকারের পক্ষে এমন সংস্থা ও অভিজ্ঞ মহলের সহযোগিতা দরকার যাদের সুবিবেচনা, কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা পরি-কল্পিত সংগঠনী কার্যে প্রকৃত দিশারী হতে পারে। শিশুচিত্র প্রযোজনার সংকল্প মহৎ; কিন্তু মহৎ সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণের পথে সরকার তাঁদেরই মতামত নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করে নিতে পারেন, যাঁরা এমনি সাধু সংকল্পকে রূপ দিতে গিয়ে নিদারুণ তিক্ততা ও অর্থক্ষতির মধ্য দিয়ে সত্যিকারের কার্যকরী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সরকারী পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই প্রসংগে বেংগল মোশন পিক-চার এসোসিয়েশন সরকারের কাছে যে-কয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেগুলির সারবত্তা সন্দেহাতীত। প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল, শিশুচিত্রের সরকারী ও বেসরকারী যুগ্ম প্রযোজনার পরিকল্পনা। সমানভাগে যুগ্ম-প্রযোজনায় নিয়োজিত অর্থে তৈরী ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর অর্জিত অর্থ থেকে সরকার তার অংশ আদায় করে নিতে পারবেন এবং লভ্যাংশ বেসরকারী প্রযোজকের প্রাপ্য বলে স্থিরীকৃত থাকবে। প্রদর্শিত ছবির আমোদ-করও বেসরকারী প্রযোজকের প্রাপ্য বলে ধরে নেওয়ার পরামর্শও বি-এম-পি-এ তাঁদের প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন। চিত্রগৃহ নির্মাণের সমস্যা সম্পর্কে বি-এম-পি-এ যে সমুচিত পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা বলেছেন যে, সরকার যদি দুই লক্ষ টাকার ঋণ তাঁদের অনুকূলে

মঞ্জুর করেন, তবে এই সংস্থা মধ্য কলিকাতায় একটি আদর্শ শিশুচিত্রগৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। বিভিন্ন স্থায়ী চিত্রগৃহেও সময়ের পরিবর্তন করে ও বিশেষ লাইসেন্স দিয়ে শিশুচিত্র প্রদর্শনীর পরামর্শ দিয়েছেন বি-এম-পি-এ।

বি-এম-পি-এ'র এই সকল সুচিন্তিত অভিমত সরকারী পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে অশেষ উপকারে আসবে বলেই আমরা মনে করি। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্যোগে রাজ্য সরকার গ্রামে গ্রামে নানাবিধ আমোদ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে লোকরঞ্জনের ব্রতও গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য—আমোদের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি জনগণকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা ও শিক্ষা দেওয়া। শিল্পকলার মধ্য দিয়ে সরকারী দায়িত্বের এই সম্পাদন—শিশুচিত্রের ব্যাপারেই হোক, আর লোকরঞ্জন-ক্ষেত্রেই হোক—সুষ্ঠুরূপ নিতে পারে যখন তা যোগ্যব্যক্তি বা সংস্থার হাতে ন্যস্ত হয়। স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে চাপা পড়ে সরকারী পরিকল্পনার অপমৃত্যু বা শুধু আলোচনার ভেতর দিয়ে মহৎ সরকারী ব্রতের অবসান যে কখনও ঘটেনি তা নয়। বহু শুভব্রতের সার্থক উদ্‌যাপনের জন্য সরকার যেমন ধন্যবাদার্হ, তেমনি শুভ সংকল্প রূপায়ণে ব্যর্থতার জন্যও সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। আমরা আশা করব শিশুচিত্র সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা দূরদর্শিতা, বাস্তব জ্ঞান ও নিষ্ঠার অভাবে যেন শূন্যে মিলিয়ে না যায়।

চিত্রালোচনা

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ কাহিনীই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে—কোন কোন গল্প একাধিকবার। তবে এখনও কয়েকটির চিত্ররূপ দেওয়া বাকী আছে। এতদিন 'ছবি' গল্পটি তাদেরই অন্যতম হয়ে ছিল। সম্প্রতি এই মনোজ্ঞ গল্পটির ছবি তুলেছেন ইন্দো-বার্মা ফিল্ম কর্পোরেশন।

প্যাগোডার দেশ বর্মা এই কাহিনীর ঘটনাস্থল। 'ছবি'র অনেকাংশ তোলা হয়েছে রেঙ্গুনে—সঙ্গে সঙ্গে বর্মী ভাষায় একটি পৃথক সংস্করণও। বর্মী সংস্করণের নির্মাতা অবশ্য আলাদা—রেঙ্গুনেরই একটি প্রযোজক প্রতিষ্ঠান। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই ধরনের আন্তর্জাতিক যৌথ-প্রচেষ্টা এই প্রথম।

'ছবি'র বাংলা সংস্করণ এই সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। মালা সিংহ, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, আশীষকুমার, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি এর মুখ্য ভূমিকাগুলিতে রূপ দিয়েছেন। পরিচালনা করেছেন নীরেন লাহিড়ী। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব রবীন চট্টোপাধ্যায়ের।

* * *

এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবির সংখ্যা তিন—প্রকাশ পিকচার্সের 'গুঞ্জ উঠি সানাই', এস পি পিকচার্সের 'কানাইয়া' ও দেশাই ফিল্মসের 'ফ্লাইং রানী'।

এক সানাই-বাদকের প্রেম ও বিরহের কাহিনীকে ভিত্তি করে তোলা হয়েছে পরিচালক বিজয় ভট্টের নবতম চিত্রাবদান 'গুঞ্জ উঠি সানাই'। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার, অমিতা, উল্লাস, আই এস জোহর ও অনীতা গুহ। বিসমিল্লা খাঁ ও তাঁর সম্প্রদায়ের অপূর্ব সানাই-বাজনা এ ছবির বিশেষ আকর্ষণ। সুর যোজনা করেছেন বসন্ত দেশাই।

রাজ কাপুর ও নূতন অভিনীত 'কানাইয়া'—ও দুটি তরুণ হৃদয়ের প্রেমাবেগমণ্ডিত একটি কাহিনীর চিত্ররূপ। ওমপ্রকাশ এর লেখক ও পরিচালক। সুরসৃষ্টি করেছেন শংকর ও জয়কিষণ।

অখিল চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন 'কলঙ্কী চাঁদ'-এর প্রধান দুটি ভূমিকায় নবাগতা দীপিকা দাশ ও অসিতবরণ

'ফ্লাইং রানী' একটি সাধারণ 'স্টান্ট'-ছবি, যার চরিত্র ও ঘটনাস্থল কাল্পনিক এবং মারামারি হানাহানির ভেতর দিয়ে যার বিষয়বস্তুর বিন্যাস। এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে নিশি, সমর রায়, প্রকাশ, নাজী, রাম-সিংহ প্রভৃতিকে নিয়ে। নানুভাই ভকিল ও বি এন বালী যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

* * *

আর্ট এন্ড কালচার পিকচার্সের 'অগ্নি-সম্ভবা' আর দু' এক হপ্তার মধ্যেই মুক্তি পাবে। মানুষের জীবনকে একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছে সুশীল মজুমদার পরিচালিত এই সমাজ-সচেতন ছবিটির মধ্যে। ভূমিকালিপির পুরোভাগে রয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল-কুমার, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য অবধূতে রচিত 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে'। আগামী সপ্তাহেই এর মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে। নির্মল দে'র পরি-চালনাধীনে এতে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর মেয়ে বাসবী, ছবি বিশ্বাস, প্রেমাংশু বসু, কেতকী দত্ত ও তপতী ঘোষ।

নালন্দা ফিল্মসের বৌদ্ধযুগীয় ছবি 'আম্রপালী'-ও মুক্তির দিন গুনছে। শ্রীতারাশঙ্কর পরিচালিত এই ছবিতে ভারতের অতীত মহিমাকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগতা সুপ্রিয়া চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে যাঁরা চিত্রাবতরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী, নীতীশ মুখো-পাধ্যায়, শ্যাম লাহা, হরিধন মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ, বিভু ও বাবুয়া।

* * *

নবগঠিত পুতুল প্রোডাকশন শচীন সেন-গুপ্তের 'মরুতৃষা' অবলম্বনে একটি ছবি তুলছেন। বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে স্টুডিওতে কাজ শুরু করেছেন এ'রা। এই ছবিতে জহর রায়কে একটি নতুন ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে। কান্তি গুপ্ত চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং ছবিটি পরিচালনা করছেন।

সুরের আগুন

হিন্দী ছবির একটি মামুলী প্রণয়োপাখ্যানের ছন্দহীন ঘটনা-আবর্ত ও হাসি-কান্নার অকারণ কলরব ছাপিয়ে উঠে প্রেমের মধুচ্ছন্দটি শানাই-এর অবিরাম সুর-মূর্ছনার মধ্য দিয়ে কেমন নিবিড় ঐক্যতানের সৃষ্টি করতে পারে তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেলে প্রকাশ পিকচার্স-এর 'গুঞ্জ উঠী শেহনাই' ছবিতে।

ছবির প্রেমকাহিনীর নায়ক কিষণ। কিশোর বয়স থেকেই শানাই-এ তার সুর-সৃষ্টির অপরূপ দক্ষতা দেখে সংগীত-সাধক রঘুনাথজী তাকে প্রিয়শিষ্য করে নেন। কিষণের আশ্রয় জোটে গুরুজীর গৃহেই। সেই গ্রামে কিষণের শানাই-এর সুরে পাগলিনী কিশোরী গোপী। রঘুনাথজীর একমাত্র কন্যা রামকেলীও কিশোর বয়স থেকেই অনুরক্ত হয়ে পড়ে এই সুর-সাধকের প্রতি।

কৈশোরের গণ্ডি অতিক্রম করে কিষণ, আর এই সংগে গুরুজীর শিক্ষায় তার প্রতিভারও ঘটে আশ্চর্য বিকাশ। প্রতিভার বিকাশের সংগে সংগে কিষণের জীবনে আসে প্রেম। কিষণের শানাই-এর সুরে অভিসারিকা গোপী কুল-মানের বাঁধন তুচ্ছ করে ছোটে নদীতীরে নির্জনবনের প্রান্তরে। কিষণ সুরের আগুন জ্বালিয়ে দেয় গোপীর মনে, জীবনে। নিজের ঘরে বসে শোনে রামকেলী কিষণের অনুরাগের রাগিণী, আর গানের সুরে গোপীর আত্মনিবেদন। কিষণ ও গোপীর সুখে সুখী রামকেলী। প্রেমাস্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েও সে নিবিড় স্নেহ ও মমতা দিয়ে নিজের হাতে তুলে নেয় এই প্রতিভাবান শিল্পীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার।

কিষণ ও গোপীর সুখমিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় গোপীর মার শাসন আর তার প্রণয়াকাংক্ষী এক কুচক্রীর ষড়যন্ত্র। কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের ফলে তাদের গোপন প্রেমের কথা ফাঁস হয়ে যায় গ্রামবাসীদের কাছে। কিষণ তার গুরুজীর কাছে হয় লাঞ্ছিত। গুরুজীর মনের অভিলাষ ছিল কিষণের হাতে রামকেলীকে সমর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্তে একদিন চোখ বুজবেন।

গুরুজীর অবজ্ঞা ও সমাজের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে কিষণ চলে যায় লক্ষ্ণৌতে শেখরের কাছে। শেখরের সংগেই গোপীর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। শেখর লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশনে সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক। গোপীকে গ্রামে একদিন দেখতে এসে শেখর কিষণের শানাই বাজনা শুনে মুগ্ধ হয় এবং তাকে আমন্ত্রণ জানায় রেডিওতে যোগ দিতে। গোপীর সংগে পরস্পরের যোগাযোগের কথা উভয়ের কাছেই অজ্ঞাত ছিল।

সমাজ-লাঞ্ছিত কিষণ লক্ষ্ণৌতে পৌঁছে দেখে রামকেলী গোপনে তার সংগ নিয়েছে। রেডিওর মারফত শেখরের যশ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশে। রামকেলী ছায়ার মতো জননী ও ভগ্নীর বুকভরা স্নেহ নিয়ে সংগে সংগে রয়েছে শেখরের। রামকেলী দূর থেকেও চেষ্টা করে যাতে গোপী ও কিষণ পরস্পরকে পেয়ে সুখী হয়। কিন্তু তার সব চেষ্টার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় গোপীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সে গ্রামের ডাক পিয়ন। তারই কারসাজিতে রামকেলী ও কিষণের কোন সংবাদই এসে পৌঁছয় না গোপীর কাছে। গোপীর কোন সংবাদও পায় না ওরা।

শেষ পর্যন্ত শেখরের সংগেই গোপীর বিয়ে ঠিক হয় একদিন। শেখরের একান্ত অনুরোধে কিষণ তার বিয়েতে বাজাতে আসে শানাই। কিষণের শানাই-এর আওয়াজ পেয়েই গোপী বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ না হতেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশায় কিষণ ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার শানাই; ভ্রাম্যমাণ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মনের আগুন নেবানোর জন্য মদ ধরে। অনেক খুঁজে রামকেলী সন্ধান পায় কিষণের। কিষণ বলে যে গোপীর বিয়ের পর থেকেই তার শানাই-এর সুর থেমে গেছে। কিন্তু কিষণ যখন রামকেলীর কাছে শোনে গোপীর নিদারুণ অবস্থার কথা—মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে গোপী চলৎশক্তিহীন ও নির্বাক হয়ে পড়েছে ও অসাড় দেহ নিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন শানাই হাতে তুলে নেয় কিষণ। গোপীর দরজায় গিয়ে আকুল-করা সুরে বাজায় তার শানাই। তার শানাই-এর সুরে গোপীর মুখে ভাষা ফোটে, তার শরীরে চলৎশক্তি ফিরে আসে। গোপীর অভিভাবকেরাও চান যে সে কিষণকে পেয়ে সুখী হোক,—কারণ শেখরের সংগে তার বিয়ে সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু গোপীর মন থেকে বিয়ের সংস্কার দূর হয় না এবং কিষণের সংগে তার মিলন অসম্ভব বলে সে রওনা হয় লক্ষ্ণৌতে স্বামীর আশ্রয়ে। পথেই তার মৃত্যু ঘটে। গোপীর বিরহে কাতর কিষণ নির্জনে বসে শানাই বাজাবার সময় দেখে গোপী যেন আগের মতোই নেচে-গেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গোপীর দিকে ছুটে যেতেই উঁচু পাহাড়ের টিলা থেকে সে ছিটকে পড়ে গভীর অতলে—আর ফিরে আসে না পৃথিবীর বুকে। গোপী ও কিষণের সমাধির উপর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায় বিরহিণী রামকেলী।

ছবির প্রধান আকর্ষণের দিক হল মিঞা বিসমিল্লা খাঁয়ের শানাই। এই প্রসিদ্ধ শিল্পী তাঁর শানাই-য়ে ছবিটিকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কারে আবেগমণ্ডিত করে তুলেছেন তার তুলনা বিরল। মুখ্যত একই ধরনের যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমে কোন ছবি যে এক দুর্বার সাংগীতিক আবেদন নিয়ে আসতে পারে তার দৃষ্টান্ত সহজলভ্য নয়। সানাই-য়ে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আলাপ-তানের মূর্ছনায় মিঞা বিসমিল্লা খাঁ ছবিতে সুরের এমন এক নিবিড় ঐকতান সৃষ্টি করে তুলেছেন, যার রেশ প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসার পরেও বহুক্ষণ দর্শকমনের মনে অনুরণিত হতে থাকে। ছায়াছবিতে এক অনাস্বাদিত সুরলোকের আভাস আনতে সক্ষম হয়েছেন এই সুখ্যাত শিল্পী, এবং তাঁর সংগে ছবির সুরকার বসন্ত দেশাই। কাহিনীর রসবিন্যাসে মিঞা বিসমিল্লা খাঁয়ের অসামান্য প্রতিভার যথাযথ সুযোগ গ্রহণের জন্য ছবির পরিচালক বিজয় ভাট-ও রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হবেন।

অন্যথায় ছবির কাহিনীর অসংগতি ও বৈসাদৃশ্য, এবং এর সামগ্রিক বিন্যাসে যুক্তি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও পরিমিত জ্ঞানের অভাব বিদগ্ধজনের কাছে পীড়াদায়ক বলেই মনে হবে। ছবিতে বহুল ব্যবহৃত উপাদানেরও অভাব নেই। ছবির বিয়োগান্ত প্রণয়-কাহিনীও ঘটনা পরম্পরায় এমন বিবর্ণ নাট্যরসে মণ্ডিত যে তা মনে দাগ কাটে না।

কিষণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাজেন্দ্রকুমার। শিল্পীর অন্তর-অভীপ্সার রূপ তাঁর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও প্রেমিকের আশা-হতাশার অভিব্যক্তি তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোপীবেশিনী অমিতা বিরহিণীরূপে মন যতটা জয় করে নেন, নাচ-গান ও প্রিয়-মিলন সুখের মধ্যে দর্শকমনে তিনি ঠিক

তততা রেখাপাত করতে পারেন না। রাম-কেলীর চরিত্রটি অনীতা গুহের অভিনয়ে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। চরিত্রের বঞ্চনা-ব্যথা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। রঘুনাথজীর চরিত্রে উল্লাসের অভিনয় অতি-অভিনয়ের দোষে দুষ্ট। অন্যান্যদের মধ্যে গোপীর মা ও মাতুলরূপে লীলা মিশ্র ও মনমোহন কৃষ্ণ, শেখরবেশী প্রতাপ বনমালী, গোপীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর চরিত্রে আই, এস জোহর, কিশোর বয়সের গোপী ও কিষণের ভূমিকায় যথাক্রমে শোভা ও ললিতকুমারের অভিনয় মনোগ্রাহী।

বসন্ত দেশাই-এর সুরারোপে কয়েকটি গান চিত্তাকর্ষক। আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশ প্রশংসনীয়। সর্বাঙ্গীণ কলাকৌশল ও অঙ্গসজ্জার দিকও বেশ পরিচ্ছন্ন।

শিশু রংমহলের প্রসার

শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষকে সভাপতি করে শিশু রংমহলের পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্র সম্প্রতি গঠিত হয়েছে। সি এল টি-এর জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতির একটি শাখা হিসাবে বোম্বাই ও দিল্লি কেন্দ্রের মতো পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রও শিশু রংমহলের প্রসারকল্পে এখন পুরোপুরিভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর সংহত রূপ দেওয়া ও বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয়কেন্দ্র স্থাপন করা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের প্রধান দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হবে।

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় শিশু রংমহলের যে উৎসব শুরু হবে সেই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কার্যালয়ে (২, তিলক রোড) সম্প্রতি একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। সি এল টি-এর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে এই সভায় শিশু রংমহলের আগামী উৎসবের কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন।

সি এল টি-এর প্রধান কর্মকেন্দ্র গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে একযোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ক্লাস-ঘরে গাওয়া গান ও ছড়ার গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই এই রেকর্ডগুলো সাধারণের হাতে পৌঁছবে। এ-সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্য সি এল টি-এর প্রধানকেন্দ্রের গবেষণা শাখার তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্র একটি বিশেষ কার্যসূচীর ব্যবস্থা করছেন।

একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

থিয়েটার সেণ্টারের পঞ্চম একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও নাট্যরসজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এই বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। প্রতিযোগিতায় প্রথম তিনটি স্থান যে তিনটি দল অধিকার করবেন, যথারীতি তাঁদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার শেষ তারিখ ২৪শে আগস্ট। প্রতিযোগিতার নাটকগুলি অভিনীত হবে থিয়েটার সেণ্টারের নিজস্ব মঞ্চে। প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সকল তথ্য বিশদভাবে জানা যাবে সেণ্টারের সম্পাদকের (৩১, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ) কাছে।

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে নানাকথা নানাজনে বলে থাকেন। তার কিছুটা প্রশংসাসূচক, কিন্তু অধিকাংশই ছবির ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা। ভারতীয় ছবি যে কম্যুনিজম্-এর বিষ দেশে-বিদেশে ছড়াচ্ছে একথা কিন্তু কারুর জানা ছিল না এতদিন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান শহর জোহান্সবার্গের একটি ইংরেজী সংবাদপত্রে সম্প্রতি এই তথ্য পরিবেশন করেছেন 'সাউথ আফ্রিকান

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'শুভ বিবাহ" ছবিতে কনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী।

মুসলিম' ছদ্মনামধারী জনৈক পত্র লেখক উদাহরণ হিসাবে তিনি নাম করেছেন 'মাদার ইণ্ডিয়া' ও 'ইনসানিয়ৎ' এই ছবি দুখানির। আরো মজার কথা এই যে যে-সংবাদপত্রে এই চিঠিখানি বেরিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সেন্সর বোর্ড তার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছেন হিন্দী ও তামিল ভাষায় অভিজ্ঞ একজন দোভাষীর সন্ধান দিতে, যিনি ভারতীয় ছবি সেন্সর করার ব্যাপারে বোর্ডকে সাহায্য করতে পারবেন। 'সাউথ আফ্রিকান মুসলিম-টির যে এবার একটা হিল্লে হবে তা অনায়াসে আশা করা যায়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এর পরও কি আশা করবার কিছু আছে?

* * *

পার্লামেন্টে এবং গণ্যমান্য নেতাদের মুখে মুখে ভারতীয় ফিল্মের বিরূপ সমালোচনাও কম শোনা যায় না। এঁদের অনেক অভিযোগই অজ্ঞতা প্রসূত। ফিল্মব্যবসায়ীদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়া তাই স্থির করেছেন যে, দিল্লিতে নিয়মিতভাবে পার্লামেণ্টের সদস্য ও অন্যান্য নেতাদের জন্যে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভুল ধারণার নিরসন করবেন। সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফিল্ম ফেডারেশনের এই নব অভিযান আরম্ভ হবে।

* * *

ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এ বছরে ভারত থেকে দুখানি ছবি পাঠানো হয়েছে। দুখানিই বাংলায়—সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন্সের 'অপুর সংসার' ও এল বি ফিল্মস্‌ ইণ্টারন্যাশনালের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। শেষোক্ত ছবিটি প্রাথমিক প্রদর্শনীর পর মূল উৎসবে দেখানো হবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে—এই মর্মে এল বি ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল উৎসব কমিটির সভাপতির কাছ থেকে তারবার্তা পেয়েছেন।

নতুন রেকর্ড

'হিজ্‌ মাস্টার্স ভয়েস' এন ৮২৮৩১: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান—'তুমি মেঘলা দিনের' ও 'দুটি ঐ কাঁকনের ছন্দ'। এন ৮২৮৩২ ঃ দুখানি আধুনিক গান 'জনপদের ছাড়িয়ে সীমা' ও 'নবীন রাঙাতে কেন এলে'—গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এন ৮২৮৩৩ঃ 'সুকুমার রায়ের জনপ্রিয় দুটি কবিতা 'বাবুরাম সাপুড়ে' ও 'এই দুনিয়ায় সকল ভালো'—সুরের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন সুরে সিংহ। এন ৮২৮৩৫ ঃ চণ্ডিদাস ও জ্ঞানদাস রচিত দুখানি কীর্তন গান 'সখি, কহিও নিঠুর কালো' ও 'কেন গেলাম যমুনায়'—গেয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ। এন ৭৬০৮৬ এবং ৭৬০৮৭ঃ রেকর্ড দুখানিতে 'শশীবাবুর সংসার' বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলম্বিয়াঃ জি ই ২৪৯৫৭ঃ শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুখানি আধুনিক গান—'সাগরের দুটি ঢেউ' ও 'ওগো লজ্জাবতী'। জি ই ২৪৯৫৮ঃ 'এই গান এই সন্ধ্যা' ও 'নীল প্রজাপতি' আধুনিক গান দুখানিকে পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী গায়ত্রী বসু। জি ই ২৪৯৫৯ঃ শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের আধুনিক গান—'কেন চলে যাবে' ও 'ফুলের কানে কানে'। জি ই ৩০৪২২ঃ ঠাকুর হরিদাস বাণীচিত্রের দুখানি গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শিল্পীরা। জি ই ৩০৪২৫ঃ মান্না দে ও লতামঙ্গেশকারের কণ্ঠে 'দীপ জেলে যাই' বাণীচিত্রের দুখানি গান।
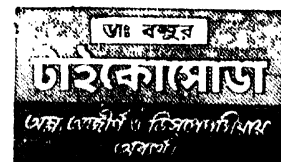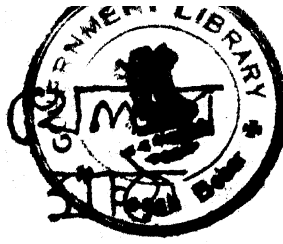
একলব্য

জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব এবার লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। সংগে সংগে কলকাতার ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নিয়ে দর্শক-সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং গুজব-গবেষণায়ও ভাটা পড়েছে। ময়দান পাড়া এখন শান্ত। অবশ্য চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়ে গেলেও লীগের কয়েকটি খেলা এখনও বাকী আছে। কিন্তু এসব খেলা একটা বড় ভোজের পর কাঙ্গালী ভোজের ব্যাপারের মত নিতান্তই একটা মামুলী অনুষ্ঠান। খেলায় না আছে উৎসাহ-উদ্দীপনা, না আছে খেলায় আকর্ষণ। আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হতেও প্রায় তিন সপ্তাহ বাকী। সুতরাং লীগের বাকী কয়েকটি খেলা এবং অফিস ও আই এফ এ-র ছোট ছোট নক আউট প্রতিযোগিতাই লীগ ও শীল্ড খেলার মধ্যবর্তী সময়ে ময়দানের যা-কিছু আকর্ষণ। আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত এমন ঢিলে তালে চলবে কলকাতার ফুটবল মরসুম। আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভের সংগে সংগে গড়ের মাঠ আবার সরগরম হয়ে উঠবে।

• • •

লীগ খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা তথা সারা বাংলার ক্রীড়ামোদী মহলে কত যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা কারো অজানা নেই। চ্যাম্পিয়নশিপের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কত গলির মোড়ে কত গুলতান চলে, কত রেস্তোরাঁর চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠে, কত গুজব, কত গবেষণা, দর্শক-সমর্থকদের কত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব শহর-গ্রামকে সরগরম করে রাখে তা সবারই জানা আছে। বস্তুত এক এক দলে খেলেন বিশ-কুড়িজন খেলোয়াড় আর তাদের খেলা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে অগণিত সমর্থকদের। খেলোয়াড়রা খেলেন মাঠে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় তাঁদের মাথা ঠোকাঠুকি হয়। আর প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থকদের মাথা-ঠোকাঠুকি হয় দেবস্থানে। প্রিয় দলের সাফল্য কামনায় দেবস্থানে মাথা কুটতে গিয়ে তাঁরাও মাথা-ঠোকাঠুকি কম করেন না। কেউ বলে—'মা এবার যেন মোহনবাগান লীগ বিজয়ী হয়'। কেউ বলেন—'মা এবার যেন ইস্টবেংগল লীগ পায়'। মা কার কথা শুনবেন? কার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন? সুতরাং তাঁর নিরপেক্ষ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। হয়তো দুইজনকেই আশীর্বাদ করে বলেন, যে যোগ্য সেই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করবে। কিন্তু প্রতিবারই কি যে যোগ্য সে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে? যোগ্যের যোগ্যতার সংগে কিছুটা হয়তো অদৃষ্টেরও সহায়তা থাকে। আবার অদৃষ্টের পরিহাসে যোগ্যও অনেক সময় অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হয়। অদৃষ্ট এবং পুরুষকারকে নিয়েই জীবনসংগ্রাম। ক্রীড়া-ক্ষেত্রের সংগ্রামেও এর ব্যতিক্রম নেই। মোহনবাগান ক্লাব এবার কিন্তু যোগ্য দল হিসাবেই লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। অদৃষ্ট তাদের লীগ জয়ের সম্মান থেকে বঞ্চিত করেনি, তবে অপরাজিত থেকে লীগ জয়ের গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। লীগের ২৮টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান ক্লাব পরাজিত হয়েছে মাত্র একটি খেলায় তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেংগল ক্লাবের কাছে। এ পরাজয়ের কারণ হিসাবে আর কোন তিক্ত আলোচনা করতে চাই না। কারণ রেফারীর ভুলচুকের কথা বাদ দিলেও মোহনবাগান এ খেলায় পেনাল্টি পেয়েও গোল শোধ করতে পারেনি। তাই মোহনবাগানের অদৃষ্টকেই দায়ী করছি। অদৃষ্টের একটুখানি হেরফেরে মোহনবাগানের লীগ জয়ের গৌরব পুরো-পুরি ষোলকলায় পূর্ণ হয়নি। একটুখানি খুঁত থেকে গেছে। লীগ জয় মোহনবাগানের

১৯৫৯ সালের প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব

পক্ষে নতুন সম্মান নয়। এর আগে মোহনবাগান ক্লাব আরও ৭ বার লীগ বিজয়ী হয়েছে। তবে ইস্টবেংগলের কাছে ঐ খেলায় পরাজিত না হলে মোহনবাগান ক্লাব তাদের গৌরবোজ্জ্বল ফুটবল ইতিহাসে এতদিন যে সম্মান অর্জন করতে পারেনি সেই অপরাজিত চ্যাম্পিয়নের সম্মান অর্জন করতে পারত।

* * *

লীগের চক্র বক্রগতিতে চলে বলে একটা কথা আছে। খেলা আরম্ভের পর এক এক সময়ে একটি দল থাকে শীর্ষস্থানে। অবশ্য তিন চারটি প্রধান ক্লাবকে নিয়েই এই চক্রের আবর্তন। কিন্তু লীগের চাকা এবার বেশী ঘোরেনি। মাঝামাঝি খেলার পর মোহনবাগান ক্লাব বেশ খানিকটা এগিয়ে। এক সময়ে মনে হয়েছিল দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর চেয়ে বেশ কিছু পয়েন্টের ব্যবধানে এবং দুই একটি খেলা হাতে রেখেই মোহনবাগান লীগ বিজয়ী হবে। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, লীগের শেষমুখে মোহনবাগান আগের মত খেলতে পারেনি এবং শেষ খেলাতেই তাদের লীগ জয়ের সম্মান অর্জন করতে হয়েছে। খিদিরপুর ক্লাবের সংগে মোহনবাগানের শেষ খেলায় মাঠের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকদিন মনে রাখবার। সেদিন মাঠে কি উৎসাহ-উদ্দীপনা! সাধারণ ধরনের একটি ক্লাবের সংগে মোহনবাগানের খেলায় এর আগে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়নি। এমন জনসমাগমও হয়নি। খিদিরপুরের বিরুদ্ধে মোহনবাগান জয়ী হবার পর মাঠে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। কেউ বিউগিল বাজিয়ে বিজয়ী খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানায়, কেউ খেলোয়াড়দের মাথায় করে নাচে, কেউ করে তোপধ্বনি, কেউ আকাশে হাউই বাজি ছোড়ে। ফুটবল লীগের বিজয় উৎসব নিয়ে দর্শক-সমর্থকদের এমন আনন্দের অভিব্যক্তি বড় দেখা যায় না। সম্বর্ধনায় সম্বর্ধনায় খেলোয়াড়দের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বোধ হয় আর একবার মোহনবাগানের হয়ে এমন আনন্দের বান ডেকেছিল—সে ১৯১১ সালের কথা। সেবার মোহনবাগান জিতেছিল সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সামরিক দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের সে জয়কে ভারতবাসীমাত্রেই জাতীয় জয় হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সেদিন যিনি মোহনবাগান ক্লাবের ব্যূহ রক্ষা করেছিলেন অতীতদিনের সেই খ্যাতিমান গোলরক্ষক হীরালাল মুখার্জি এবারকার লীগ জয়ের পর এগিয়ে এসে বিজয় উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান হিসাবে ক্লাব পতাকা উত্তোলন করেন। মোহনবাগানের বর্তমান কীর্তির সংগে অতীত কীর্তির কথা স্মরণ করে সমর্থকরা পুলকিত হয়ে ওঠে।

* * *

ফুটবল একজনের খেলা নয়। দলগত খেলা। দলের সাফল্যের ক্ষেত্রে সবারই কিছু না কিছু দান থাকে। তাই মোহনবাগান ক্লাবের এবারকার সাফল্যের মূলে সব খেলোয়াড়েরই কৃতিত্বের কথা স্বীকার্য। তবুও এইসব খেলোয়াড়ের মধ্যে দুই একজনের খেলা এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে, তাঁরাই মোহনবাগান ক্লাবকে সাফল্যের পথে পৌঁছে দিয়েছেন একথা বললে খুব ভুল বলা হয় না। এই প্রসংগে সবচেয়ে আগে যাঁর নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন চুনী গোস্বামী। জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড়। ফুটবলের একজন সুনিপুণ শিল্পী। চুনী গোস্বামী সম্বন্ধে আমি এখন যে মন্তব্য করছি সে মন্তব্য আমার আগের বক্তব্যের সংগে পরস্পরবিরোধী হলেও আমার বলতে দ্বিধা নেই, চুনী গোস্বামীর ক্রীড়ানৈপুণ্য ছাড়া মোহনবাগান ক্লাবের এবার লীগ জয় করা সম্ভব হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। চুনীর পরেই আমি নাম করতে চাই সেণ্টার হাফব্যাক জারনেল সিংয়ের। জারনেল সিং প্রথমদিকে অবশ্য ভাল খেলতে পারেননি। কিন্তু শেষদিকে তিনিই ছিলেন রক্ষণভাগের প্রধান স্তম্ভ। অধিনায়ক এস গুহ, লেফট ব্যাক এ রহমান, গোলকিপার এস শেঠও এবার ভাল খেলেছেন। আগেই বলেছি, ফুটবল একজনের খেলা নয় এবং দলের সাফল্যের ক্ষেত্রে সবারই কিছু-না-কিছু দান আছে তাই আর পৃথকভাবে কারো নাম করতে চাই না। এই সংগে মোহনবাগানের সমস্ত খেলার ফলাফল, গোলদাতাদের নাম এবং ৮ বারের লীগ জয়ের খতিয়ান দিয়ে ফুটবল লীগ সম্বন্ধে লেখা শেষ করছি।

২৮টি খেলার ফলাফল

বিভিন্ন ক্লাবের সংগে মোহনবাগানের প্রথম ও ফিরতি লীগের খেলার ফলাফল দেওয়া হল:—

পুলিস	২—০	ও	৫—০
হাওড়া ইউনিয়ন	১—১	ও	২—০
উয়াড়ী	১—০	ও	৩—০
খিদিরপুর	১—০	ও	২—০
বালীপ্রতিভা	০—০	ও	৩—১
রাজস্থান	২—০	ও	৩—০
জর্জ টেলিগ্রাফ	১—০	ও	১—১
এরিয়ান্স	৩—০	ও	০—০
মহঃ স্পোর্টিং	১—০	ও	০—০
ইণ্টার ন্যাশনাল	১—০	ও	৩—০
ইস্টার্ন রেলওয়ে	২—০	ও	০—০
স্পোর্টিং ইউঃ	৩—০	ও	৪—০
বি এন আর	১—০	ও	২—০
ইস্টবেংগল	২—০	ও	০—১

৮ বারের সাফল্যের খতিয়ান

সাল	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৩৯	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪৩	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
১৯৪৪	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	২৬	১৯	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৯

মোহনবাগানের গোলদাতা

চুনী গোস্বামী—১৪; এন সরকার—৯; কে পাল—৯; বালসুব্রহ্মনিয়াম—৫; এস ব্যানার্জি—৪; আর কুণ্ডু—৩; জারনেল সিং—৩; নারসিয়া—১; রহমান—১।

* * *

অলিম্পিক ফুটবলের জন্য ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটি ১৭ জন খেলোয়াড় ও অতিরিক্ত ১১ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করেছেন। অলিম্পিক ফুটবলের প্রাথমিক খেলায় ভারতকে আফগানিস্থানের সংগে দুটি ম্যাচ খেলতে হবে। প্রথম খেলা হবে আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে। দ্বিতীয় খেলা হবে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কাবুলে প্রথম খেলাটির আয়োজন চলছে।

অলিম্পিক ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় রোমে এবার ১৬টি দেশকে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী দেশ ইটালী এর মধ্যে অন্যতম। বাকী ১৫টি দেশকে অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতার খেলার জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ইটালী সহ এবার ৫০টি দেশ অলিম্পিক

ফুটবলে অংশ গ্রহণ করছে। প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা এত বেশী হবার জন্যেই অনেকটা বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী মূল প্রতিযোগিতায় দেশ বাছাইয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। মূল প্রতিযোগিতায় ইটালী ছাড়া আফ্রিকা অঞ্চল থেকে খেলার সুযোগ পাবে ২টি দেশ, ইউরোপ অঞ্চল থেকে ৭টি দেশ এবং এশিয়া ও আমেরিকা অঞ্চল থেকে ৩টি করে দেশ। কোন্ অঞ্চলে কোন্ কোন্ দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নীচে তার তালিকা দেওয়া হল:

এশিয়া অঞ্চলের ১১টি দেশ

কোরিয়া—জাপান; অস্ট্রেলিয়া—ইন্দোনেশিয়া; তাইল্যাণ্ড—জাতীয়তাবাদী চীন, আফগানিস্থান—ভারতবর্ষ; তুরস্ক—লেবানন ও ইরাক।

আমেরিকা অঞ্চলের ১০টি দেশ

মেক্সিকো—আমেরিকা; সুরিনাম—ডাচ-এন্টিলেস; ব্রেজিল—কলম্বিয়া; আর্জেন্টাইন—চিলি; উরুগুয়ে—পেরু।

আফ্রিকা অঞ্চলের ৫টি দেশ

নাইজেরিয়া—ঘানা; ই থি ও পি য়া—উগাণ্ডা; ইজিপ্ট—মাল্টা—টিউনিশিয়া।

ইউরোপ অঞ্চলের ২১টি দেশ

আইসল্যাণ্ড—ডেনমার্ক—নরওয়ে; ফিনল্যাণ্ড—পোল্যাণ্ড—জার্মানী; রাশিয়া—রুমেনিয়া—বুলগেরিয়া; যুগোশ্লাভিয়া—গ্রীস—ইস্রায়েল; ইংল্যাণ্ড—আয়ারল্যাণ্ড—হল্যাণ্ড; ফ্রান্স—সুইজারল্যাণ্ড—লুক্সেমবার্গ; অস্ট্রিয়া—চেকোস্লোভেকিয়া—হাঙ্গেরী।

ইটালী সমেত মূল প্রতিযোগিতার ১৬টি দেশকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হবে এবং প্রতি গ্রুপের বিজয়ী হবে সেমি-ফাইনালে খেলার অধিকারী।

এবার অলিম্পিক ফুটবলে যত বেশী এবং যত শক্তিশালী দেশ অংশ গ্রহণ করেছে অন্য কোনবার এত শক্তিশালী দেশ অংশ গ্রহণ করেনি। যদিও বিভিন্ন দেশের যেসব খেলোয়াড় গত বিশ্বকাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন অলিম্পিকে তাদের যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—তবুও ফুটবল খেলা হবে রোম অলিম্পিকের এক প্রধান আকর্ষণ। খেলাতেও উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য আশা করা যায়।

গত মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করেছিল। ভারতীয় দল দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার সুযোগ পেয়ে প্রথম খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে। সেমি ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করে ১—৪ গোলের ব্যবধানে। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্য বুলগেরিয়ার সঙ্গে ভারতের খেলায় ভারতীয় দলকে—৩—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়।

ভারতীয় দলে এবার যারা নির্বাচিত হয়েছেন এর মধ্যে থঙ্গরাজ নারায়ণ, লতিফ, কেম্পিয়া, পি কে ব্যানার্জী, দামোদরন ও বলরাম মেলবোর্ন অলিম্পিকেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবারকার দল গঠন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে হলে নির্বাচিত সমস্ত খেলোয়াড়দের গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্ত খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বর্তমান ক্রীড়ামান সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। কিন্তু কলকাতার যে কয়জন খেলোয়াড়কে নির্বাচিত করা হয়েছে প্রায় প্রতিদিনই তাদের খেলা দেখার আমার সুযোগ ঘটেছে। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কলকাতার খেলোয়াড়দের নির্বাচনও ত্রুটিশূন্য হয় নি। আমার মতে ব্যাক এস গুহ অপেক্ষা রহমানের বর্তমান ক্রীড়ামান অনেক উন্নত। হাফব্যাক হিসাবে কেম্পিয়ার নামডাক আছে কিন্তু খেলার ক্লাস নেই। অবশ্য কলকাতার মাঠে এখন ভাল রাইট হাফের অভাব। ইস্টবেঙ্গলের লেফট্ হাফ রাম বাহাদুর দুই হাফেই সমান দক্ষ। রাম বাহাদুরকে লেফট্ হাফ হিসাবে নির্বাচিত না করে রাইট হাফ হিসাবে নির্বাচিত করলে ভাল হত। লেফট্ হাফে খেলতে পারতেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মহম্মদ আলী। লেফট্ হাফ হিসাবে মহম্মদ আলী কোন অংশেই রাম বাহাদুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট নন। হাফব্যাকের মত ফরোয়ার্ডেরও একই সমস্যা চুনী গোস্বামী এবং বলরাম দুইজনই সুনিপুণ লেফট্ ইন। কাউকেই অলিম্পিক দল থেকে বাদ দেওয়া যায় না। চুনী রাইট ইনেও ভাল খেলতে পারেন। কিন্তু বলরাম রাইট ইনে সুবিধা করতে পারেন না। এ অবস্থায় চুনীকে রাইট ইন হিসাবে এবং বলরামকে লেফট্ ইন হিসাবে নির্বাচিত করলে সুফল পাওয়া যেত। রহমতুল্লাকে রাইট ইন হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কিন্তু রহমতুল্লা তার আগের ক্রীড়ানৈপুণ্য অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছেন।

অধিনায়ক নির্বাচন হিসাবে আমার বলবার বিশেষ কিছু নেই। আগের তিনটি অলিম্পিকে বাংলা দেশের খেলোয়াড়দের অধিনায়ক করা হয়েছে। লণ্ডন অলিম্পিকে টি আও, হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এস মান্না এবং মেলবোর্ন অলিম্পিকে এস ব্যানার্জী অধিনায়ক ছিলেন। তিনজনই বাংলা দেশের এবং মোহনবাগানের খেলোয়াড়। সুতরাং অন্য রাজ্যও অধিনায়কের দাবী করতে পারে। হয়তো করেছেও। তাই নির্বাচকমণ্ডলী হায়দরাবাদের প্রাক্তন এবং বর্তমানে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড় লতিফকে অলিম্পিক দলের অধিনায়ক মনোনীত করেছেন। বাংলার খেলোয়াড় পি কে ব্যানার্জী হয়েছেন সহ অধিনায়ক।

নীচে অতিরিক্ত খেলোয়াড় সমেত অলিম্পিক ফুটবল দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হইল:—

গোলরক্ষকদ্বয়—থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস) এবং নারায়ণ (বোম্বাই)।

ব্যাকগণ—এস নায়ার (সার্ভিসেস), এস গুহ (বাংলা) এবং এ লতিফ (বোম্বাই) (অধিনায়ক)।

হাফব্যাকগণ—কেম্পিয়া (বাংলা), কালিম (হায়দরাবাদ), জার্নেল সিং (বাংলা), রামবাহাদুর (বাংলা) এবং ইউসুফ (হায়দরাবাদ)।

ফরোয়ার্ডগণ—পি কে ব্যানার্জি (বাংলা) (সহ-অধিনায়ক), দামোদরণ (বাংলা), সি গোস্বামী (বাংলা) বলরাম (বাংলা), ক্যাপ্টেন এম লাহিড়ী (সার্ভিসেস), জাফর (বোম্বাই) এবং রহমতুল্লা (বাংলা)।

অতিরিক্ত খেলোয়াড়গণ—

গোলরক্ষক—ভি ভার্গিস (কেরালা)।

ব্যাকদ্বয়—ত্রিলোক সিং (সার্ভিসেস) এবং টি এ রহমন (বাংলা)।

হাফব্যাকগণ—আমেদ হোসেন (বাংলা), বালকৃষ্ণন (কেরালা), মহম্মদ আলী (বাংলা) এবং মমতাজ (সার্ভিসেস)।

ফরোয়ার্ডগণ—নারায়ণ (বাংলা), কানন (বাংলা), জুলফিকার (হায়দরাবাদ) এবং ভারানন্দ (বাংলা)।

সূচীপত্র

(সি ৮১৪০)

"ওঃ সেই কত বছর আগে আপনার
এই প্যাণ্ট করে দিয়েছিলাম"
"হ্যাঁ, পাঁচ বছরের ওপর !
আর তাই তো আমি
সবসময়ই চাই—
বিনীর
ড্রিল"
বিনীর ড্রিল উৎকৃষ্ট তুলোয় তৈরী
হয়—সাদা বা খাকী রঙের—খুবই
টেকসই, বারবার কাচার
পরও নতুনের মতো দেখায়।
আপনার দর্জীকে জিজ্ঞেস ক'রে
দেখুন—সেও বলবে যে এই
ড্রিলই বাজারের সেরা।
মনে রাখবেন—বিনীর কাপড়
সবসময় কণ্ট্রোল দরে বিক্রি হয়।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa
Saturday, 15th August, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৯ শ্রাবণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

স্বাধীনতা উৎসবের সঙ্কল্প

স্বাধীনতা লাভের উৎসব দিন পুনরায় সমাগত। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে পনরই আগস্ট তারিখে ভারত নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। এই সার্থক ঘোষণার পশ্চাতে বহু শতাব্দীর স্বপ্ন ও লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সংকল্প পুঞ্জীভূত। চৌদ্দই আগস্ট তারিখে ইতিহাসের একটি অধ্যায় সমাপ্ত হইয়া পনরই তারিখে নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। তাই প্রতি বৎসর পনরই আগস্ট আমাদের যুগপৎ নূতন পুরাতনের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাইয়া দেয়; 'কি ছিল' এবং 'কি হইল'র সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া অতীত ও উপচীয়মান ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সুযোগ আমরা লাভ করি। এমন সুযোগ অল্প জাতির ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যখন কালের নিয়মে ১৯৪৭ সাল দূর অতীতে গিয়া পড়িবে তখনও ইহার মূল্য কিছুমাত্র কমিবে, মনে হয় না। কিন্তু তাহাকে শুধু ঐতিহাসিক মূল্য মনে করিবার হেতু নাই। ১৭৫৭ সাল, ১৮৫৭ সাল যদি এখনও হৃদয়ে জীবন্ত স্পন্দন তুলিতে সমর্থ হয়, তবে ভাবী শতাব্দীর ভারতীয়গণের হৃদয়ে ১৯৪৭ সালও জীবন্ত স্পন্দন জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে, আর সে স্পন্দনের ছন্দ যে দ্রুততর হইবে তাহা সুনিশ্চিত, কারণ এই রকম একটি শুভ দিনের ধ্যান করিতে করিতেই লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, প্রত্যেক বৎসরে পনরই আগস্ট ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে নূতন ও পুরাতনের সীমান্তে দাঁড় করাইয়া দেয়—দুই দিকে তাকাইবার সুযোগ মেলে। এখনও আমরা যথাসাধ্য সেই কাজটি করিতে চেষ্টা করিব।

বৃথা আত্মগৌরব না করিয়াও বলা চলে যে ভারতের স্বাধীনতা লাভে এশিয়ার বহু দেশের স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হইয়াছে, পরোক্ষে ভারত তাহাদের স্বাধীনতা লাভের নেতৃত্ব করিয়াছে। এশিয়াস্থ সাম্রাজ্যবাদের খিলানস্বরূপ ছিল ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্য। সেই খিলান ধসিয়া যাইবার পরেই ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি এমন শিথিল হইয়া গেল যে, আর দুই চারি বৎসর আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিবার পরে সে দুই সাম্রাজ্যও লোপ পাইল। ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয় উপদ্বীপ, সুদান, সিংহল, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতা লাভের অনিবার্য পরিণাম মাত্র। কাজেই এই বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি যে, আমরা একাকী অগ্রসর হই নাই, সৌভাগ্যের পথে আর পাঁচজন প্রতিবেশীকে লইয়া অগ্রসর হইয়াছি।

বৃহত্তর পৃথিবীর রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহার মর্যাদা আজ অপ্রতিহত। ক্ষাত্রবলে ও বৈশ্যবলে ন্যূন হইয়াও ভারত যে এই স্পৃহনীয় পদবী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ রাজনৈতিক আচরণে ভারতরাষ্ট্র moral value-কে বিসর্জন দেয় নাই। রাজনীতিতেও যে সত্যের স্থান আছে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ তাহা যেন ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়াছে, সকলেরই ভাব 'মুখে বলি হরি অন্য মনে করি ভাবনা'। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারতই পররাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে মনে ও মুখে এক।

কিন্তু একটি কৃষিপ্রধান দেশকে স্বল্প সময়ের মধ্যে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করিতে গেলে যে-সব সমস্যা ও কষ্ট অনিবার্য, তাহা মাঝে মাঝে আমাদের মনে অবসাদ আনিয়া দেয় স্বীকার করিয়া লইয়াও একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে চাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও প্রকৃত স্বাধীনতা এখনও লাভ করে নাই। তাঁহারা বলেন, এখনও আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ অর্থাৎ ভাতকাপড়ের পুরাপুরি সংস্থান করিতে সক্ষম হই নাই; এখনও আত্মিক স্বাধীনতা লাভ অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে চরিতার্থতা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। কথাগুলি মিথ্যা নয়, কিন্তু বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে সত্যও নয়। পৃথিবীতে এমন কোন্ দেশ আছে, যাহা এই ত্রিবিধ স্বাধীনতা লাভে সফলতা অর্জন করিয়াছে। যাহার ভাতকাপড়ের স্বাচ্ছল্য আছে, তাহার মুখ খুলিবার অধিকার নাই, যাহার মুখ খুলিবার অধিকার আছে, তাহার ভাতকাপড়ের টানাটানি। পৃথিবীর সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহে অদ্যাবধি যাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, সদ্যলব্ধস্বাধীনতা ভারতকে তাহার অভাবের জন্য দায়ী করা সুবিচার নয়। ঘটনা বিশেষের দ্বারা বিচার না করিয়া ঘটনাস্রোতের দ্বারা বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারত অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার দিকে। সেই গতি অপ্রতিহত থাকুক, বর্ধিত হোক—আজিকার শুভ দিনে এই সঙ্কল্প যেন [illegible] করিতে পারি।

পাঁচ বৎসর পূর্বে এমনি একটি বারোই আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় পরলোকগমন করেন। কিন্তু তিনি বেঁচে রয়েছেন তাঁর কীর্তির মধ্যে। সেই কীর্তি তাঁরই সৃষ্টি: দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড। এবং এই কীর্তিই তাঁর জীবন। সুতরাং বলা যেতে পারে, তাঁর জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁর মৃত্যুদিনটিকে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি এই কথা যে,

মৃত্যু অকালে তাঁকে হরণ করে নিয়ে না গেলে তিনি আরও অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন।

তাঁর জীবন সামান্য অবস্থা থেকে অসামান্য অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল। মনে পড়ে, কলেজ স্কোয়ারের সেই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে শিশু আনন্দবাজার পত্রিকা। শিশু, কিন্তু সতেজ। সম্মুখে পর্বতপ্রমাণ বাধা। ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রসার হল বাংলার ঘরে ঘরে। কলেজ স্কোয়ার থেকে আনন্দবাজার উঠে এল বর্মন স্ট্রীটে। তার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্রকাশিত হল দেশ এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড। আজ সুতারকিন স্ট্রীটের বিরাট ভবনে উঠে এসেছে তিনখানি পত্রিকা।

স্রষ্টার জীবন তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। সুরেশচন্দ্রের জীবনও এই পত্রিকা তিনখানির সঙ্গে জড়িত। সেই মহৎ জীবনের মৃত্যু নেই, মৃত্যুকে অতিক্রম করে তিনি অমর লোকে পৌঁছেছেন। সেই লোক আমাদের সৃষ্টির বাইরে নয়। আজ তাঁর মৃত্যু-তিথিতে দাঁড়িয়ে যদি আমরা পিছনে এবং সামনের দিকে চাই তাহলে সেই জীবনের স্পর্শ পাব যেখানে পরবর্তী মানুষের অনেক কৃতজ্ঞতা

প্রসঙ্গত

সুরেশচন্দ্রের পার্থিব জীবনের ছেদ যেখানে পড়েছে, তাঁর কাজ এবং কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছেদ সেখানে পড়েনি। আজ স্বাধীনতার দ্বাদশ বর্ষ পূর্তির দিনে এই কথাই বারংবার স্মরণ করি যে, তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার এবং অপূর্ণ আশা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদেরই। সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই।

*

কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্য-সমস্যা ধূম্র-সমস্যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। অন্য ঋতুতে এই সমস্যা তত বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যতটা হয় শীতকালে। সে সময় ভোর থেকে আটটা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সমস্ত শহর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কাছের লোক চেনা যায় না, এমন অবস্থা হয়। অতিদীর্ঘকাল থেকেই এ নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। এর একমাত্র প্রতিকার সম্ভব যদি রান্নার কাজে সস্তায় গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এতদিন সে সম্ভাবনা ছিল না বলে সমাধানের চেষ্টাও করা হয়নি। ভরসা জাগল প্রথম যখন দুর্গাপুরে কোকচুল্লী থেকে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা হল। কোকচুল্লী পরিকল্পনার রচয়িতাগণ আশাও দিলেন, কলিকাতার ধূম্র-সমস্যার এইবারে পূর্ণ সমাধান হবে। সস্তায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এখন শোনা যাচ্ছে, তা আর হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার তা অনুমোদন করেন নি। হাজার ঘনফুট তিন টাকা থেকে সওয়া তিন টাকা দাম হলে কলিকাতা শহরে গৃহস্থ-ঘরে গ্যাস চালু হয়ে যেত। ধোঁয়ার হাত থেকে নাগরিক পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচত। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজী হননি। তাঁরা মূল্য ধার্য করেছেন, হাজার ঘনফুট পাঁচ টাকা থেকে সওয়া পাঁচ টাকা। অর্থাৎ এখন যা আছে তাই। সরকারী অর্থের অপব্যয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কোটি কোটি টাকা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। অথচ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে এই অত্যন্ত সঙ্গত অর্থব্যয়ে কেন কর্তৃপক্ষ রাজী হচ্ছেন না কে জানে!

*

কলিকাতার নাগরিকের সমস্যা অবশ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-সমস্যাও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। মাথা গোঁজবার একটুখানি ঠাঁই পাওয়া দুষ্কর। সরকারী গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা যতদূর এগিয়েছে তাতে এই গুরুতর সমস্যার প্রান্তটুকুও স্পর্শিত হয়নি বলা চলে। মরশুম পড়ে গেছে বাড়িওয়ালাদের। একখানি পশুরও অযোগ্য বাসকক্ষ, তাও ভাড়া পঞ্চাশ টাকার নিচে নয়। তার উপর সেলামি এবং অন্যান্য উৎপাতও আছে। অনেককাল থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের উৎখাত করারও নানা ষড়যন্ত্র চলছে। 'ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণে'র মামলার সংখ্যা থেকে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'খানিকটা পরিচয়' বলা হল এইজন্যে যে, অনেক ক্ষেত্রে বাড়িওয়ালা নিজেই আইনের ভার গ্রহণ করেন। হামলা করেই ভাড়াটিয়াকে হয় বিতাড়িত করেন, নয় বেশি ভাড়া দিতে বাধ্য করেন। সে সমস্ত আর আদালত পর্যন্ত যায়ই না। আইন আছে অবশ্য। কিন্তু আইনের চক্ষে ধুলো দেবার উপায়েরও অভাব নেই। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষভাবে অবহিত হবার সময় এসেছে।

*

গৃহ-সমস্যার পরেই আসে অন্ন-সমস্যা। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেবার প্রাক্কালে সকলে স্বভাবতই আশঙ্কা করেছিল যে, এর ফলে চাল হয়তো অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য হবে, কিন্তু মূল্য অসম্ভব বেড়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী ভরসা দিয়েছিলেন, মূল্য হয়তো একটু বেড়েই অল্পদিনে স্থির হয়ে যাবে। স্থির হয়েছে অবশ্য, কিন্তু মূল্য নয়, আমাদের চক্ষু এবং সেই সঙ্গে নাড়ী-স্পন্দনও। চালের দাম উঠেছে পঁয়ত্রিশ টাকা। আশঙ্কা হচ্ছে, আরও উঠবে। রেশনের চাল আর একটু ভালো হলে, ওজনে কাঁকর কম হলে, খোলা বাজারে চালের দাম বাড়ত না। কিন্তু যে কারণেই হোক, রেশনের চালে কাঁকর বন্ধ হবে না। খোলাবাজারীদের অবস্থা হয়েছে উপবাসী ছারপোকার মতো। নানা সঙ্গত-অসঙ্গত কৈফিয়তের অন্তরালে তাঁরা গত কয়েক মাসের লোকসান না পুষিয়ে নিয়ে ছাড়বেন না। আউশ উঠলে চালের দর একটুখানি নামতে পারে। কিন্তু তার এখনও অল্প দেরি আছে। নদীয়ার আউশ উঠেছে। তার ফলে বর্ধমান-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে নদীয়ার টান একটু কমেছে। দামও ওই অঞ্চলে অল্প নেমেছে। বর্ধমান-মুর্শিদাবাদের আউশ উঠলে দাম আরও কিছু নামতে পারে। আশ্চর্য, কলকাতার বাজারে এর কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা

বৈদেশিকী

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যলাভের প্রয়োজনীয়তার উপর যাঁরা একান্ত জোর দেন তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গত বছরটি (স্বাধীনতালাভের দিন—১৫ই আগস্ট থেকে বছরের হিসাব ধরে) তেমন মন্দ যায়নি। এক সময়ে বহির্জগতের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে যে দারুণ অর্থসংকট দেখা দিয়েছিল তার উপশম হয়েছে। পূর্বের ঋণদাতারা আরো ঋণদানের যে ব্যবস্থা করেছেন বা সে বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংকটের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী অর্থ মোটামুটি পাওয়া যাবে বলে সরকারী মহল ভরসা করছেন। বৈদেশিক ব্যাপারের অর্থনৈতিক দিকে এই [illegible] সুরাহা দেখার সঙ্গে কিন্তু সরকারের বৈদেশিক নীতির প্রতিষ্ঠা [illegible] হিসাবের মিল নেই। কারণ ভারতের বৈদেশিক নীতির প্রতিষ্ঠা প্রচারের দিক থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালকে সুবৎসর বলা চলে না।

পশ্চিমা বা সোভিয়েট এক কারো সঙ্গেই না জড়িয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে রেষারেষি হ্রাস এবং বিশ্বশান্তির পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক [illegible] ব্যাপারে ন্যায় [illegible] নিরপেক্ষ নীতি উভয়ের চোখে ভারতের মান বাড়িয়েছে, এই পথে [illegible] ভারত একটা বেকায়দায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। [illegible] প্রচারের পক্ষে গত বছর খুব সুবিধার সময় ছিল না। দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বে মাঝে মাঝে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন উভয়পক্ষই কোনো মধ্যবর্তীর কাছে সাহায্য চায়। তখন মধ্যবর্তীর দৌত্য বাড়ে কিন্তু সেটা তার স্বকীয় নিজস্ব শক্তি বা গুণের ফল বলে ধরে নিলে ভুল হবে। এবং আরো বেশি ভুল হয় যদি [illegible] নিয়ে লড়াই করলে বা নিজেকে অত্যধিক বাহবা দিলে। তাতে [illegible] নানা অঞ্চলে বিরাগ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

নিজের স্বার্থচিন্তা রহিত হয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা কোনো গভর্নমেন্টের পক্ষেই সম্ভব বলে কেউ যখন বিশ্বাস করে না তখন নিরপেক্ষতার বড়াই বা বিশ্বশান্তির সেবক হিসাবে মধ্যবর্তীর ভূমিকা গ্রহণে অত্যুৎসাহ প্রদর্শনের বিপদ আছে। বরং নিজেদের নিরপেক্ষতার দিকে দৃষ্টি

আকর্ষণ বা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন যত কম হয় এবং যতটা সম্ভব চুপচাপ থাকা যায় ততই ভালো। গত বছর ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির গরিমা প্রচার অপেক্ষাকৃত সংযত ছিল, তাতে বোধ হয় বৈদেশিক আর্থিক সাহায্যের অন্বেষণকারীদের কাজে কিছু সুবিধাই হয়েছে।

ইরাকী বিপ্লবের পরে লেবাননে মার্কিন সৈন্য এবং জর্ডনে বৃটিশ সৈন্য অবতরণের পর সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যে-শীর্ষ সম্মেলন ঘটাবার চেষ্টা করেন তাতে মিঃ খ্রুশ্চেভ শ্রীনেহরুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং শ্রীনেহরু যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সোভিয়েটের প্রস্তাব নিষ্ফল হয়। আমেরিকা রাজী হয় না, এদিকে চীনেরও বোধ হয় সোভিয়েট প্রস্তাবে আপত্তি ছিল যার জন্য মিঃ খ্রুশ্চেভ শেষ পর্যন্ত তেমন পীড়াপীড়ি করেন নি। তারপর থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিকে উঁচিয়ে ধরে "প্রেস্টিজ" আহরণের সুযোগ ঘটে নি। বরঞ্চ যা ঘটেছে তাতে "প্রেস্টিজে"র বিলক্ষণ ঘাটতি হয়েছে এবং যে-ব্যাপারে হয়েছে সেটা মোটেই পরস্মৈপদী ব্যাপার নয়, একেবারে ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ব্যাপার।

বলা বাহুল্য, আমরা তিব্বতের কথা স্মরণ করছি। চীন সরকার কর্তৃক তিব্বতের স্বাধিকার-বিনাশ এবং তিব্বতীদের প্রতি নৃশংস দমননীতির প্রয়োগ, ১৯৫৪ সালের তিব্বত সম্বন্ধীয় চীন-ভারত চুক্তির ভিত্তি ধ্বংস এবং তিব্বতের স্বাধিকার রক্ষার বিষয়ে চীন কর্তৃক স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ভারত সরকারের সবিনয় প্রতিবাদের উত্তর এবং দলাই লামার স্বদেশ ত্যাগ ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কে ভারতবাসী এবং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পিকিং কর্তৃক অপমানকর কটূক্তি এবং মিথ্যা প্রচার—ইত্যাদির আঘাত ভারতবাসীর পক্ষে কেবল বেদনাদায়ক হয়েছে এবং ভারতের স্বার্থের পক্ষে হানিকর হয়েছে। তেমনি ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির "প্রেস্টিজ"ও তাতে খুব ঘা খেয়েছে। পিকিং সরকার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিব্বত সম্বন্ধে কারো কোনো কথাই তাঁরা গ্রাহ্য করেন না, উপরন্তু যত বিনয়ের সঙ্গে এবং মিত্রতার দোহাই দিয়েই করা হোক না কেন, চীনা নীতির বিন্দুমাত্র সমালোচনা ভারতের পক্ষে বেয়াদবি বলে গণ্য হবে।

১৯৫০ সালে চীন সরকার যখন সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা তিব্বতী স্বাধীনতা নষ্ট করতে আরম্ভ করেন তখন ভারত সরকারের সংযত এবং বন্ধুসুলভ আপত্তি পিকিং কর্তৃক অপমানিত হয়। ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত তিব্বতে চীনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন কিন্তু তখনও তিব্বতীদের স্বাধিকার একেবারে নষ্ট হবে না এই আশা ছিল। পূর্বে তিব্বতে ভারত সরকার কতকগুলি সুবিধা উপভোগ করতেন, ১৯৫৪ সালের চুক্তিতে সেগুলির অধিকাংশই ত্যাগ করতে হয়, তীর্থ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পারস্পরিক সুবিধার জন্য দু' একটিমাত্র সংরক্ষিত থাকে। বোধ হয় এইটুকুর জন্যই ভারত সরকার ১৯৫৪ সালের চুক্তি করেন—যে চুক্তিতে একটি জাতির স্বাধীনতা হরণের ভিত্তির উপর "পঞ্চশীলে"র মায়াগৃহ রচিত হয়। সেই ১৯৫৪ সালের চুক্তিতে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের স্বীকৃতির যে অবশেষটুকু ছিল তাও আর থাকছে না। ভারতীয়গণের পক্ষে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সম্প্রতি ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের উপর যে আঘাতটি হানা হয়েছে সেটি বোধ হয় সবচেয়ে মারাত্মক হবে। সেটি হচ্ছে তিব্বতে তিব্বতী মুদ্রা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রারও প্রচলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর দ্বারা ১৯৫৪ সালের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হল।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ পিকিং সরকার গ্রাহ্য করবেন সে সম্ভাবনা নেই। সশস্ত্র প্রতিবাদ যখন চিন্তনীয় নয় এবং কোনো মৈত্রীর দোহাইতেই যখন চীনা চিঁড়া ভিজবার নয় তখন ভারত সরকারের অসহায় ক্রোধ ধৈর্যের দ্বারা আবৃত করা ছাড়া উপায় কী? এর উপর আবার ম্যাপ দিয়ে চিমটি কাটা আছে। চীনা ম্যাপে ভারতের জায়গা ঢোকানো আছে, তার নকল সোভিয়েট সরকার কর্তৃকও প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিবাদ জানানো হয় কিন্তু তার উত্তর আসে না, ম্যাপগুলি আগের মতোই চলতে থাকে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, পিকিং সরকার ভারত সরকারের সম্বন্ধে "গরু মেরে জুতো দান"টুকু পর্যন্ত করতে প্রস্তুত নন। পিকিং-এর বোধ হয় ধারণা যে, ভারত সরকারের পক্ষে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করা যখন কল্পনাতীত তখন ভারত সরকারের আর করার কী আছে? হয়ত বর্তমান ভারত সরকারের কিছু করার নেইও। কিন্তু চীনের আটম বোমা তৈরীর উদ্যোগের গুজব যদি সত্যিও হয় তাহলেও কি এটা সম্ভব যে তিব্বতের ব্যাপারে কোটি কোটি ভারত এবং এশিয়াবাসীর মনে যে ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তার কোনোই ফল হবে না?

যাই হোক, ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির "প্রেস্টিজ" অথবা "প্রেস্টিজ" বলে যা লোককে ভাবতে শেখানো হয়েছে তার পক্ষে গত বছরের ঘটনাবলী অনুকূল ছিল না। এখনও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিরপেক্ষ বা মধ্যবর্তীদের দর (মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করার জন্য—দর) বাড়াবার পক্ষে অনুকূল হবার দিকে এরূপ মনে হচ্ছে না। দু মাস ধরে একটা "জেনেভা" হয়ে গেল, তারপর স্বয়ং খ্রুশ্চেভ যাচ্ছেন আমেরিকায় এবং তার আগে স্বয়ং আইসেনহাওয়ার য়ুরোপে এসে মিত্রদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। মধ্যবর্তীদের আর কাজ রইল কী? অথবা এবার সত্যিকারের কাজের হয়ত সন্ধান মিলবে।

১০।৮।৫৯

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

উনিশ

রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস ছিল, কেউ তাঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতে চাইলে আলাপার্থীকে বোলপুরে আহ্বান করা, অবশ্য যদি সে-আহ্বানে অপর কোনো বাহ্যিক বা আন্তরিক বাধা না থাকে। এ-অভ্যাসের পিছনে ঠিক্ কিরকম মনোভাব ছিল তা বলতে পারি না। তবে খানিকটা বোধ হয় সেই কলুর মতন, যার ঘানিতে না বসলে গান বেরুত না।

আঃ! রবিবাবুকে কলুর সঙ্গে তুলনা? কোনো ভক্তের মনে কষ্ট দিতে চাই না, তাই একটু বুঝিয়ে বলি। রবিবাবু কি বাঙালী ছিলেন? বাঙালীরা যে তেলে-জলে মানুষ, একথা বাংলা প্রবাদেই অবিসংবাদিত রূপ পেয়েছে। নৃতত্ত্ববিৎ নির্মল বোস—যিনি মহাত্মা গান্ধীকেও বাংলা শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন—ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে মূলানুসন্ধান করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে, বাঙালীদের অনেকদিন থেকেই তেল হয়ে আছে আহারের অপরিহার্য উপাদান, এবং তিলকে পেষণ করার যন্ত্র পরীক্ষা করলে ভারতের অন্য অন্য জাতের সঙ্গে বাঙালীদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বের করা যেতে পারে। তিল থেকেই তৈলের প্রথম উৎপত্তি, এ-সত্য 'তৈল' শব্দের ব্যুৎপত্তি করলেই বোঝা যায়। সুতরাং 'সর্ষের-তেল' জিনিসটা 'সোনার-পাথর-বাটি' জাতীয় হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আপত্তি করা উচিত নয়, কারণ সোনার বাংলার যে পথে-পথে পাথর ছড়ানো।

নৃতত্ত্ব-জ্ঞানের দিক্ থেকেও বাঙালীর মিশ্র সংস্কৃতির ধারা অনুভব করা যায়। তবু কষ্টিপাথরে সোনা কষে নিয়ে তবে আমাদের সেকরা-রা গয়না গড়াতে বসে। এবং 'কলু'-শব্দটি যেমন জাতি-বাচক 'কোল্' শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন নির্মল বোস, তেমনি 'সেকরা' শব্দটির সঙ্গে ব্যাবিলোনীয় 'সেক্কার' শব্দের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন বোস, সবুজ-সভার সভ্য হবার পরে, এবং এ-সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ শব্দ-তাত্ত্বিক সুনীতি চাটুয্যে, অবশ্য সবুজ-দলে ভর্তি হবার পরে। আর আমিও ১৯৩০ সালে বোম্বাই গিয়ে আবিষ্কার করি যে, সেখানে যত সেকরা আছে সকলেই বাঙালী, যেমন ঐ-বছরেই আফ্রিকার দার-এস-সালেম শহরে দেখি ও শুনি যে, সেখানকার হাতীর দাঁতের তৈরী জিনিস সবই 'সিংহলী' শিল্পীদের কারু-কার্য-প্রসূত। সে শিল্পীদের ধমনীতে বাঙালী-রক্ত এখনো কিছু আছে কি-না তার বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান করার সময় আসেনি। বাঙালী বিজয়-সিংহ 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়', সত্যেন দত্তের এ-দাবী এখন সিংহলে কবি-কল্পনার কোঠায় পড়ে

যাবার উপক্রম হয়েছে।

সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন:

"মা, আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে যুতে দিয়ে, মা,
পাক দিতেছ অবিরত,
বলো, কি-দোষে করিলে আমায়
ছটা কলুর অনুগত?"

এখানে ছটা কলু হচ্ছে ছয় রিপু। রামপ্রসাদ জানতেন না নির্মল বোসের কলু-কোল ব্যুৎপত্তি। তিনি হয়তো ভেবে থাকবেন কলু ও কলুষ এ-দুই শব্দ পরস্পরের জ্ঞাত-ভাই। অনেক প্রাচীন শিলালিপিতে 'কলি-কলুষ' এই সমস্ত পদ পাওয়া যায়, এবং কলির কলঙ্ক মোচন করতে পারার ক্ষমতা কেবল সত্যেরই আছে, যদি যুগ-প্রবর্তক কল্কী-অবতারের আবির্ভাব হয়।

কলুর মুখে কেউ 'অনুভূতি'-শব্দটি শুনেছেন? আমি শুনেছি একবার। তখন আমি কৃষ্ণনগরে সংগীতজ্ঞ ডাক্তার অমিয় সান্যালের অতিথি। তেল খারাপ হচ্ছে, সুতরাং যে-কলু সে-তেল দিচ্ছিল, তাকে বরখাস্ত করা হবে, এই ভাবের ইঙ্গিত অমিয়বাবু তাকে দেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ধরা হয় অন্য কলুর দেওয়া তেল, যার গন্ধ আমাদের নাকে ঠিক সর্ষে সর্ষের মতন লেগেছিল। কলুর পো এই দুরকম তেল একটু করে রগড়ে দিলে আমাদের দু দু'গুণে চার হাতে, আর বললেঃ "শুঁকে দেখুন, প্রভেদ বুঝতে পারবেন। আপনাদের অনুভূতির উপর আমি নির্ভর করছি।" আমরা দুজনে মিলে চতুর্ভুজের সাযুজ্য অনুভব করেছিলুম কি-না তা মনে নেই। তবে যে-কলু এই ভাষা প্রয়োগ করলে, সে-কলুকে বহাল রাখা হল। কিছু শ্রদ্ধা তার প্রাপ্য, এ-বিষয়ে দ্বিমত হয়নি। এর পর আমাদের নাকের ওপর এত অবিশ্বাস জন্মালো যে, নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোনো ছাড়া কোনো গত্যন্তর দেখলুম না।

এই কলু-শ্রদ্ধার সঙ্গে নাকের কথা যখন উঠল, তখন একটু 'পেত্নী-তত্ত্ব' (প্রেত-তত্ত্ব) শব্দের ভৌতিক প্রকৃতি আলোচনা করে নিই। শ্রদ্ধা থেকে যে শ্রাদ্ধ এসেছে, একথা সকলেই মানে, আর 'নাক' মানে যে 'স্বর্গ', একথা অমর কোষে পাওয়া যায়। আমাদের স্বর্গগত পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় শ্রাদ্ধ-কার্যে। "বৈদিক যুগ"-এর শেষের দিকে—গৃহ্য-সূত্রে—এই পিতৃ-পুরুষ-পূজার প্রথম উল্লেখ পাই। আমার মনে হয়, এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানটি চীন-দেশের পিতৃ-পুরুষ-পূজা থেকে আমাদের দেশে এসেছে।

কলুর ঘানি তাহলে অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। কলুজাতের ওপরও আমাদের বাঙালীদের খুব শ্রদ্ধা থাকা উচিত, কারণ তারা সমাজের জন্য বিশেষ কল্যাণকর কাজ করে। দেহ-ধারণ করতে হলে তেল কিংবা ঘী কিংবা চর্বি খাওয়া চাই। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত মাছ খান, এবং তাঁদের ব্রহ্মতেজ বজায় রাখতে গেলে এখানে ও একালে গব্যঘৃতের দুষ্প্রাপ্যতাবশত তৎপরিবর্তে সর্ষপ-তৈল প্রয়োজন। সব সময়ে মাছের তেলে মাছ ভাজা যায় না। কেবল ইলিশ মাছেই সেটা সম্ভব এবং প্রায়ই সে-মাছ ঐভাবেই ভাজা হয়। বোলপুরে থাকতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ ইলিশ মাছের কাঁটা ছাড়াচ্ছেন কাঁটা দিয়ে, সুন্দরভাবে। একেই বলা যেতে পারে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার করা।

হ্যাঁ, একটা বড় কথা বলবার ছিল। রবীন্দ্রনাথ খাবার টেবিলে বসে ছুরি-কাঁটা-চামচ এ-তিনেরই সুষ্ঠু প্রয়োগ করতেন, এটা বড় কথা নয়। তাঁর মতন সৌন্দর্যের উপাসক তাছাড়া আর কী করবেন? বড় কথা ওঠে এই থেকে। আধুনিক 'সুসভ্য' জাতি বলে যাদের আমরা জানি ও মানি, তারা কি সকলে স্বীকার করেন যে, এই তিন প্রহরণের মধ্যে কাঁটা জিনিসটা চীন দেশ থেকে নেওয়া? চীনারা কাঠি দিয়ে চমৎকারভাবে ভাত খায়; 'প্রবোধ বাগচী'ও এভাবে খেতে শিখেছিলেন চীন দেশে গিয়ে। ইউরোপীয় কাঁটা বা fork-এ কেবল কাঠির সংখ্যাধিক্য আছে এবং সে-কাঠি ধাতু-নির্মিত। ওরা যে-বাসনে খান সে-বাসনের আজও নাম আছে—'চায়না-ওয়েআর' অর্থাৎ চীনা বাসন। কিন্তু ছুরির প্রয়োগ খাবার সময়ে কেন? আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা নিজেদের সভ্যতাকে রক্ষা

করবার জন্যে কিঞ্চিৎ বর্বরতা বজায় রেখেছেন, যে-বর্বরতার প্রভাব আহারের সময়ে ছুরিকাঘাতে মূর্ত হয়ে ওঠে। আমরা বেশি সভ্য, তাই মাংস-কাটার কাজটা রান্নার আগেই সেরে ফেলি, সায়েবদের মতন খাবার টেবিলে বসে প্রাণী-হত্যা-কার্যের শেষ পর্যায়ের জের টেনে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিই না। তবে ফল ছাড়িয়ে পরিবেষণ করার যে-রীতি বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তার পক্ষপাতী আমি নই, কারণ ফল ছাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ না খেলে আস্বাদ ভাল থাকে না। বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথের মতন খাবার সময়েই ছুরি দিয়ে ফল ছাড়িয়ে নেওয়াটাই সংগত মনে হয়। ও কার্যে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল এত কুশলী যে, কখনো দেখিনি তাঁর হাতে ফলের রস চটচটে করছে বলে তিনি ফল ছাড়ানোর পর জল চাইছেন।

টেবিলে ছুরি রাখায় এইজন্যে আমি আপত্তি করছি না। যার জীবন নিষ্ফল, বা যার মনে ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, তার কাছে এ-ছুরি রেখে ফল কি? বরং অপব্যবহারের সম্ভাবনা বর্তমান। কলকাতার রেস্তোরাঁয় খান এমন লোকও দেখেছি, যিনি ছুরি দিয়ে ঝাল নিয়ে জিভে লাগাচ্ছেন। একটু বেসামাল হলে জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হতে পারে, সে হুঁস নেই। ব্যাপারটাকে বিলাতি-বিলাসী অভ্যাসের সমাচার-স্বরূপ বলা যেত, যদি সাহেবদের আহারের সমতুল্য জ্ঞান করার সংগত কারণ থাকত। আসল কথা, আমাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি দক্ষিণ হস্তেই সুসম্পন্ন করে, বাম হস্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। আর, ওদের উভয় হস্তই ভোজন-ক্রিয়ায় যোগ দেয়, এবং দক্ষিণ হস্তে ছুরিকাস্ত্র থাকার সার্থকতা অনুভব করে অধিকাংশ মুখের গ্রাস আসে বাঁ-হাতের কাঁটা থেকে। ছুরির কাজ না থাকলে তখন ছুরি সরিয়ে রেখে কাঁটা চামচ দিয়ে [illegible] খাওয়ার বিকল্প নিয়ম রয়েছে। [illegible] ডান হাতে চামচ দিয়ে পান-[illegible]র [illegible] পাত্রে সুপ খাওয়ার সময়, এবং চামচ হচ্ছে চমস-এর বংশধর।

মৌর্যরাজ অশোক ঐভাবে সুপ খেতেন কিনা তা জানা নেই, যদিও তিনি পাথরে খোদাই করে লিখিয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর মহানসে অর্থাৎ রন্ধনশালায় মৃগ-ময়ূর নির্বন্ধে সমাহৃত হত, 'সুপাথায়'। রাজা অশোকের সব নিয়ম আমরা জানি না। কিন্তু শেষে মোটে একটা মৃগো এই দুই জাতীয় জীবকে বলিদান করার পর বোধ হয় রান্না করার ব্যবস্থা ছিল—যেমন বাইবেলে (Levi tiens 5, F) দুটি পাখি কিংবা একটি ভেড়া বলি দেবার কথা আছে —বিশেষত যখন ঐ শিলালিপির অব্যবহিতই উল্লেখ আছে, জীবকে 'আরভ্ভ' অর্থাৎ বধ করে বলি দেওয়া প্রসঙ্গের।

অশোক কিন্তু বরাবর মাংস খাননি।

উনি যে শিলালিপিতে মৃগ-ময়ূরের সূপের কথা বলেছেন সেই শিলালিপিতেই বলছেন যে, এর পর থেকে কোনো প্রাণীকেই ঐ উদ্দেশ্যে হত্যা করবেন না। এইভাবে 'ধম্মলিপি' লেখানো শুরু করেন, যখন উনি দ্বাদশ-বর্ষাভিষিক্ত। একথা ও'র স্তম্ভ-লিপিতে পাই, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বলছেন যে, ঐ স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হয়েছে যখন উনি ষড়্‌বিংশতি-বর্ষাভিষিক্ত। সুতরাং ও'র অভিষেক থেকে হিসেব করলে, ও'র রাজ্যারম্ভের ১২শ ও ২৬শ বছরের অন্তর্বর্তী কোনো সময়ে উনি কোনো ধম্মলিপি লেখান নি। যে চতুর্দশ ভাগে সম্পূর্ণ ধম্মলিপিকে আমরা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা দেখি, তার মধ্যে অশোকের রাজ্যাভিষেকের পর ১৩শ বছরের ঘটনা বর্ণিত আছে, যে ঐ বছরে তিনি ধর্মমহামাত্র নামক কর্মচারী সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব এ-ধম্মলিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল ও'র ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করার পরে। আবার ও'র ২৭শ বছরে লেখা স্তম্ভলিপিতে স্বকৃত কল্যাণ-কর্মের যে-তালিকা আছে তার মধ্যে কূপ-খনন, বৃক্ষ-রোপণ ইত্যাদির উল্লেখ দেখি—যেমন পর্বতস্থ ধম্মলিপিতেও পাই —কিন্তু পশু-চিকিৎসা, মনুষ্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা যে করেছিলেন তার নাম-গন্ধও নেই। স্পষ্টই বোঝা যায়, পর্বতস্থ ধম্মলিপি অশোকের অভিষেক হবার অন্তত ৩০।৩২ বৎসর পরে লেখা। এই ধম্মলিপিরই প্রথমাংশে অশোক জীব-বলিদান করা বারণ করছেন এবং নিজের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তাঁর স্বকীয় রন্ধন-শালায় সূপ রান্না করার জন্যে যে-তিনটি প্রাণী বধ করা হচ্ছিল তা আর হবে না।

বহুকালের অভ্যাস ত্যাগ করতে গেলে ধৈর্য থাকা চাই। জীব-হত্যা নিবারণ করার চেষ্টা অশোকের আগে যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কৃতকার্য হননি। কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্রে 'সূনাধ্যক্ষ' অধ্যায়ে মৃগপশু-পক্ষি-মৎস্য-দের বধ-বন্ধ-হিংসা সম্বন্ধে দণ্ড-বিধান আছে। 'হিংসা' আর 'বধ' এখানে একার্থবোধক নয়। হিংসার ধাতুগত অর্থ, হননেচ্ছা: সেই ইচ্ছা নিয়ে আঘাত করার নাম হিংসা। এখন দেখা যাচ্ছে, কৌটিলীয় বিধানে জরিমানার ব্যবস্থা ছিল তাদের, যারা রাজার 'বিহার-পক্ষী'কে হিংসা বা আবাধ (=বন্ধন) করবে, এবং বিহার-পক্ষীদের অন্তর্গত ছিল ময়ূর, হংস, চক্রবাক্, শুক, শারিকা ইত্যাদি। বিহার-পক্ষীরা ছিল রাজার মৃগয়ার লক্ষ্য-ভূত। সুতরাং তাদের হিংসা বা বন্ধন করবার অবাধ অধিকার সাধারণ লোকের ওপর দেওয়া যেত না। অশোকের স্তম্ভলিপিতে শুক-শারিকা-হংস-চক্রবাক্ প্রভৃতিকে অবধ্য করা হয়েছে, এ-কথা বলা আছে। অর্থাৎ, রাজা নিজেও বিহার-যাত্রা উপলক্ষে এ-সব পক্ষীদের বধ করতে পারবেন না।—এইভাবে তিনি ধীরে ধীরে আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু ধর্মের নাম করে পশু-বধ করাটা তাঁর অসহ্য হওয়ায় হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন জীব-বলি-দান। বৈদিক যজ্ঞে বৃষ-পাকের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের বাসিষ্ঠ ও ভারদ্বাজ মণ্ডলে সবচেয়ে বেশী। স্ট্যাটিস্টিক্সের বিচারে এ-নির্দেশকে আমরা প্রশান্তভাবে গ্রহণ করতে পারি ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে কারা-কারা গরু খেতেন বেশি, সে-সম্বন্ধে প্রমাণরূপে। বসিষ্ঠ-বংশীয়েরা যে সাদা-চামড়ার জাত, এ-কথা ঋগ্বেদেই আছে। তাঁরা চুল বাঁধতেন, ডান-দিকে বিনুনী করে। ১৯৩১ সালে জর্মনীতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, তাঁরা হচ্ছেন প্রতীচ্য ইতিহাসের 'কেফ্‌টি' এবং বাইবেলের 'কাফ্‌তর'। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, তাঁরা ছিলেন সেকালের সায়েব। সুতরাং গরু ত খাবেন-ই। কৌটিল্যের সময়ে বৎস-বৃষ-ধেনুকে অবধ্য করা হয়েছে। কিন্তু ষণ্ডকে অবধ্য করলেন অশোক। সম্ভবত মৌর্য রাজ্যে যে-সব সাদা বা কালো সায়েব ছিলেন তাঁরা ষণ্ড বধ দ্বারা নিজেদের গোমাংস-ভক্ষণ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতেন, এবং অশোকের বিধানে তাঁদের প্রবৃত্তি-মার্গ থেকে নিবৃত্তি-মার্গে চলে যেতে হল।

এ-সব কথা পড়তে পড়তে যদি কারও হাই ওঠে, আমার আপত্তি নেই। কেননা, শিশুকাল থেকে ইংরিজী-বাংলা দুই-ই পড়তে হয়েছে, এবং বাংলা 'হাই' আর ইংরিজী 'high' এ-দুই শব্দের উচ্চারণ যে এক, সে-কথাও শুনেছি। তার ফলে মনের গোপন কোণে একটা ধারণা থেকে গেছে যে, ও-দুই শব্দের মধ্যে অর্থ-সাদৃশ্যও আছে। আমাদের হাই ওঠে, এবং আমরা হাই তুলি। সুতরাং এ-ব্যাপারে উচ্চাভিলাষ ও ঊর্ধ্বগতি বর্তমান। অধঃপতনের সম্ভাবনা কোথা?

পুরাতত্ত্বের যে-প্রসঙ্গ এতক্ষণ আলোচনা করছিলুম, সে-প্রসঙ্গ সবুজ পাতার ডাকে অপ্রাসঙ্গিক নয়। গোমাংস-ভক্ষণ করায় অভ্যস্ত ইংরেজরা কিছুদিন পূর্বে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, যখন কলকাতায় ঐ মাংসের অভাব হয়। স্টেটসম্যানে বড় অক্ষরে হেডিং বেরুল: No Beef in Calcutta! বাবার মুখে শুনেছিলুম, কলকাতায় বেশির ভাগ গরু মারা হয় সায়েবদের খাবার জন্যে। টিপু সুলতানের এক বংশধরের বাড়িতে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে শুনলাম, উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা গোমাংস-ভক্ষণ করেন না, কারণ সেটা সবচেয়ে সস্তা! তাঁদের সবুজ পাতার ওপর টান বেশি, তাই শাক-সবজী খেতেই ভাল লাগে। আর যে-রকম মিষ্টান্ন তাঁদের বাড়িতে তৈরী হয় তার তুলনা হিঁদু-বাড়িতে পাইনি।

পুরনো রীতি, নতুন যোজনা

দীপংকর চট্টোপাধ্যায়

এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পর গত বারো বছরের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে, এবং ঘটতে চলেছে। আমাদের সংবিধানে যুগোপযোগী নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং দেশের শাসনযন্ত্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খুব সম্প্রতি এমন কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের কথা উঠেছে যেগুলিকে নিছক আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে একটি বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শে উত্তরণের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জাতীয় সরকার ক্রমশ দেশের প্রধান প্রধান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তিগুলির উপর সচেতন নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের নীতিকে মেনে নিচ্ছেন। পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি (Planned economy) গ্রহণ করলে যে এই নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, এ তো জানা কথা। কিন্তু এই তত্ত্বের দিকটুকু বাদ দিলেও আবেগগত দিক থেকে দেখলে নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের মত দেশে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বিচ্ছেদ প্রায় ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রাষ্ট্রনিরপেক্ষতাকেই অনেক সময় আমাদের সুপ্রাচীন সমাজের টিকে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতার মূল কারণ হিসেবে দাবী করা হয়ে থাকে। আমাদের সামাজিক অনুশাসন নীতি শত শত বছরের পরেও কাজ করেছে অব্যাহত। সম্প্রতি কালে ইংরেজী শাসনের ফলে সর্বপ্রথম এই সনাতন সমাজের ভিত্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। অনেকটা এই নাড়ার প্রভাবেই আমরা বেঁচে থাকার নিছক টিকে থাকার চেয়ে ব্যাপক এবং বৃহত্তর কোন আদর্শের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। তবে, ইংরেজ তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় নি বলেই সমস্ত সমাজের উপরে তার প্রভাব খুব বেশী বিস্তৃত হয় নি। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইংরেজ শাসকদের সচেতন প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এমন কি নিজের দেশেও তারা আজ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পনার প্রচলন করে নি। সুতরাং এদেশের ইতিহাসে কংগ্রেসী সরকারের সমাজমুখীন উদ্যম নিঃসন্দেহে নতুন। এবং যেহেতু এই ধরনের উদ্যমের সাফল্য বহুলাংশে দেশের মানসিক বাতাবরণের উপর নির্ভর করে, সেইহেতু এ প্রসঙ্গে উক্ত বাতাবরণ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার।

স্বীকার করতে হবে যে এপর্যন্ত যেসমস্ত পরিবর্তন বিধিবদ্ধ হয়েছে বা হচ্ছে তার অনেকটাই কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামোকে স্পর্শ করেছে, সমাজদেহের মজ্জায় গিয়ে মেশে নি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা নিতান্ত ঝাপসা, সমবায় কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ অহেতুকভাবে প্রখর। স্বীকার করতে হবে যে গণতান্ত্রিক প্রত্যয় আমরা আন্তরিক অনুসন্ধান থেকে ততটা পাই নি—যতটা পেয়েছি বিদেশী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসেবে। আর এই সামান্য প্রত্যয়টুকুও আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একথাও স্বীকার করা ভাল যে আমাদের সমাজের গড়ন মূলত গণতন্ত্রের বিরোধী। এসমাজ বর্ণভেদ জাতিভেদ ভাষাভেদ গোষ্ঠীভেদ ইত্যাদি শতরকমের বিভেদে এখনও জর্জরিত। নতুন সমাজ গড়বার পক্ষে এসমস্ত প্রবণতার প্রত্যেকটিই বিপজ্জনক। অপরপক্ষে দেশের অধিকাংশ লোক

অশিক্ষিত এবং দরিদ্র, সেদেশে পরিকল্পনার নামে শাসকশ্রেণীর পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়বার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় থাকে। এদেশে গণতান্ত্রিক সংগঠনের পরীক্ষার সম্মুখে এসমস্ত বাধা নিঃসন্দেহে রয়েছে। হয়ত এখনও বেশ কিছুকাল থাকবে। শুধু একথা আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে এদেশের ভবিষ্যৎ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করছে। নিতান্ত ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আমাদের এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কোন অজুহাতেই এর থেকে পালানো যাবে না। শুধু তাই নয়, আগামী পাঁচদশ বছরের মধ্যে আমাদের বর্তমান অবস্থার অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যগুলি যতই প্রকট হয়ে উঠবে, এই শ্রেণীর সমস্যাও ততই আরো প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করবে।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের থেকে আমাদের অধুনাতন সমস্যাগুলির চারিত্র অনেকটা ভিন্নধরনের। ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের প্রশ্নই আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছিল। জাতীয় সমস্যা বলতে তখন পর্যন্ত আমরা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাই বুঝতাম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প প্রমুখ অন্যান্য সমস্যা এই বৃহত্তর সমস্যার কাছে খর্ব হয়ে গিয়েছিল। পরাধীন দেশের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পেলে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণটি যাই হোক, একথা স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাই আমাদের সমগ্র দেশের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

অবশ্য দেশের লোকের একটা বড় অংশ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না, তবু সর্বাঙ্গীণভাবে দেখতে গেলে এই স্বাধীনতার চিন্তাই দেশের মানসিক পরিমণ্ডলের উপর একচ্ছত্রভাবে রাজত্ব করেছিল। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত—এই দুই স্তরেই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ভালমন্দ চূড়ান্তভাবে বিচার করা হত রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের মানদণ্ডে। এছাড়া অন্য কোন সুপ্রচলিত মানদণ্ড ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দেশের পুলিস এবং সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের শত্রু, তাই আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা পুলিসকে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম, সে ঘৃণার রেশ আজও সম্পূর্ণ যায় নি। দেশের নেতারা ছেলেদের স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ অনায়াসে দিয়েছিলেন, কেননা বিষয়টিকে তাঁরা অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন নি, দেখেছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক অস্ত্র হিসেবে।

অপর পক্ষে স্বাধীনতার পরে আমরা যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং হচ্ছি, সেগুলির প্রধান ঝোঁক রাজনীতির উপর ততটা নয়, যতটা সমাজনীতি এবং অর্থনীতির উপর। গোটা পরিকল্পনা জিনিসটাই অর্থনীতির ব্যাপার। সমাজগঠনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্রমশ আমাদের এমন সব বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যা দূরীকরণের শিক্ষা আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে পাই নি। গান্ধীজী অবশ্য অস্পৃশ্যতা নিবারণ, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদির উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ব্যাপকভাবে সামাজিক কুসংস্কার এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার অবকাশ পাননি। এদেশের যা প্রধান সমস্যা সেই ভূমি সমস্যার সমাধানেও একমাত্র স্বাধীনতার পরেই হাত দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব ব্যাপারেও আমাদের ঐতিহ্য এবং সামাজিক কুপ্রথা যে কতবড় বাধা তার পরিচয় অতি সম্প্রতি পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যতই মহৎ হোক না কেন, এই ঐতিহ্যগত মানসিকতাকে তা বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে বরং সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে এই মানসিকতাকে সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, সময় সময় প্রশ্রয়ও দেওয়া হয়েছে। অথচ নতুন সমাজ গঠনের কাজে এ সমস্ত বাধার সঙ্গে আপোষরফা করে চলা সম্ভব নয়।

মোট কথা, আমরা ক্রমশই বুঝতে পারছি, জাতি গঠনের কাজে আমাদের এতদিনকার প্রচলিত রাজনীতিঘেঁষা কর্মপদ্ধতির অবদান চূড়ান্ত নয়। আমাদের প্রাক স্বাধীনতা যুগের রাজনীতির প্রধান অবলম্বন ছিল বিক্ষোভ (agitation)।

এই বিক্ষোভমূলক দলীয় রাজনীতির আওতায় আমাদের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। গভীর অধ্যয়ন এবং চিন্তার ঐতিহ্য থেকে আমাদের রাজনীতি বহুলাংশে বঞ্চিত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নেতাকে বাদ দিলে আমাদের নেতৃবর্গের মধ্যে উচু-দরের বুদ্ধিজীবী খুঁজে পাওয়া দুরূহ। তাতেও হয়ত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে বুদ্ধিকেন্দ্রিক মানসিকতার প্রতিই বেশ একটু বিরূপতা ছিল। দেশের সাধারণ লোকের উপরে গত যুগের বিক্ষোভমূলক রাজনীতির ছাপই বেশী করে পড়েছে। এমনকি বস্তুতর চেতনার অভাবে নিছক সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিও অনেক সময় জাতীয়তার নামে দেশের লোকের মনোহরণ করেছে। বিশেষ করে মূলনীতির ব্যাপারে আমাদের জনসাধারণ কোনদিনই নেতৃত্বকে প্রশ্ন করতে শেখেনি, নেতারাও তাদের কাছে কেবল আনুগত্যই আশা করেছেন। ফলে এদেশে রাজনীতির যে ছক গড়ে উঠেছে, তার প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বিক্ষোভকারীর প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য। কালক্রমে এই দুটি উপাদানই আমাদের মানসিক অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে, যদিও যে অবস্থার মধ্যে এই অভ্যাসের জন্ম হয়েছিল, তা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। এখনও আমাদের দেশে হরতাল, ধর্মঘট বা রাজনৈতিক মিছিলের নামেই সবচেয়ে সহজে লোক জোটানো যায় এবং একমাত্র এই ধরনের কর্মসূচীর সাহায্যেই নেতারা সবচেয়ে বেশী লোককে আকৃষ্ট করতে পারেন। বিরোধী দলের নেতারা এই অবস্থার সুযোগ নিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অবস্থার পরিবর্তনে সেদিনকার নেতৃবর্গের অনেকেই আজ দেশের শাসকগোষ্ঠীর শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এটা স্বাভাবিক হলেও এর ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। আইন অমান্য এবং অসহযোগের নির্দেশ শুনতে এদেশের লোক এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, হঠাৎ তারা নেতৃবর্গের নতুন গঠনমূলক নির্দেশ বা অনুশাসনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। অনেক সময়ই এধরনের নির্দেশকে তারা নেতাদের নবলব্ধ পদমর্যাদার আনুষঙ্গিক বিলাস বলেই ভুল করছে। ক্ষমতার প্রতি বিমুখতাও অনেকাংশে এই ভুল বোঝার কারণ। অন্যদিকে নেতারা জনসাধারণের থেকে আগের চেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এ-অবস্থায় তাঁদের আন্তরবাক্য লোকের মনকে স্পর্শ করতে পারছে না। যথার্থ গঠনমূলক কাজে শৃঙ্খলার সঙ্গে আত্ম-নিয়োগ করবার অভিজ্ঞতাও তাদের নেই।

নেতাদের কথায় কোন সুরাহা হচ্ছে না।

সুরাহা না হওয়ার মানে এ নয় যে, দেশের জনসাধারণ রাজনীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ হয়ে পড়েছে। অভ্যাসবশত রাজনীতির পুরনো পদ্ধতির প্রতি তাদের আনুগত্য অনেকাংশেই বর্তমান আছে। কেবল একা কংগ্রেসের বদলে একাধিক দল এসে সে-জায়গা দখল করেছে। বৃহত্তর কোন সংগ্রামের তাগিদ আর নেই, তার বদলে ছোট ছোট গোষ্ঠীর ছোট ছোট স্বার্থকে সংরক্ষিত করবার জন্য নানা খুচরো আন্দোলন লেগে আছে। এইসব ক্ষুদে আন্দোলনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবার জন্য লোকের অভাব হয় না। নিছক মজা দেখবার মনোবৃত্তি ত আছেই, উপরন্তু ছিটেফোঁটা বখরার লোভে অনেকেই এগিয়ে আসে। সামান্যতম কারণে, অনেক সময় হাস্যকর অজুহাতে এই সমস্ত আন্দোলন চলতে থাকে। এমন কি প্রাক স্বাধীনতা যুগের কোন কোন নামকরা নেতাও স্কুল কলেজের ছেলেদের প্রকাশ্যভাবে শিক্ষককে অপমান

করাতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে অকেজো করে তুলতে প্রেরণা দিচ্ছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত দশ বারো বছরে জাতি গঠনের কাজে দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা হ্রাস পেলেও রাজনীতিকদের সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। সভা-সমিতিতে তো বটেই, এমনকি দুর্গা-প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করতেও রাজনৈতিক নেতাদের ডাক পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় বিচিত্রানুষ্ঠানে তাঁরাই হন প্রধান অতিথি। পণপ্রথা থেকে শুরু করে আদর্শ খাদ্য তালিকা পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় এ'দের বক্তৃতার অংগীভূত হয়ে থাকে। এমনকি সাহিত্যিক এবং বিদ্বজ্জনদের সম্মেলনও এ'দের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ থেকে বঞ্চিত হয় না। ত্রিশ বছর আগেও নিজেদের এক্তিয়ারের বাইরে নানা ক্ষেত্রে এ'দের এতখানি প্রতিপত্তি ছিল না।

এই অবস্থার কারণ কি? একটা কারণ বোধ হয় এই যে দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেই আজকাল সাহায্য এবং সুবিধা বিতরণ করবার বাস্তব ক্ষমতা অর্জন করেছেন। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানমাত্রেই চায় এই সাহায্য ভোগ করতে। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের সংগে সংশ্লিষ্ট নন, তাঁরাও নানাস্থানে শক্তির আসন (positions of streangth) দখল করেছেন বা করবার সম্ভাবনা রাখেন। বিরোধী দলগুলিও সরকারের সংগে দরাদরি করবার ক্ষমতা (bargaining capacity) রাখে, সুতরাং তারা অবহেলা নয়।

সেভাবেই হোক রাজনীতি এবং রাজনীতিকের আকর্ষণমূল্য (glamour value) সমাজে আশ্চর্যভাবে বেড়ে গেছে। নানা কারণে পেশা হিসেবেও রাজনীতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগেকার আমলে রাজনীতি করতে হলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হত, আজকাল সেটা প্রায় নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অপরপক্ষে অপরিমিততর ক্ষমতা অর্জন করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তাই এ লাইনে ভিড় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা এবং উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন, তাঁদের কথা বলছি না। তাঁদের মধ্যে বহু গুণী আছেন যাঁরা স্বভাবতই আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। তাঁরা ছাড়াও আরো অনেকে অন্যান্য নানা পেশা থেকে এ লাইনে ভাগ্যান্বেষণে নেমেছেন। বিশেষ করে রাজনীতিই একমাত্র জনচিত্তমোহকর পেশা যাতে যোগ্যতার ন্যূনতম মান বলে কিছু নেই, নির্বাচক বোর্ড নেই, কঠিন ইণ্টারভিউ নেই।

পেশাদারী রাজনীতির এই ভাসমান প্রার্থীদের স্বার্থের সংগে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অনেক জায়গাতেই বিরোধ আছে। দেশ গঠনের কাজে এগোতে হলে যে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার প্রয়োজন, সে আবহাওয়ায় অন্ততঃ এ'দের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এ'রা স্বভাবতই চান দেশের কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু গণ্ডগোল লেগে থাকুক, যাতে লোকচিত্তের উত্তেজনাকে মূলধন করে এ'রা ব্যক্তিগত প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। লোকমনের সংস্কার বিমুখতা এবং জাড্য এ'দের পক্ষে মস্ত বড় সম্বল। তাই আজ সমবায় গঠনের নামে দেখতে পাচ্ছি এমনই একদল পেশাদার দেশপ্রেমিক সর্বাগ্রে 'হায় হায়' রব তুলেছেন। সমবায়ের যৌক্তিকতা এ'দের কাছে গৌণ ব্যাপার, আসল কথা হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে এই ব্যাপারে 'হায় হায়' করলে সবচেয়ে সহজে সবচেয়ে বেশী লোকের সমর্থন পাওয়া যাবে। এই পেশাদারী রাজনীতির সমস্যা এযুগের গণতন্ত্রের একটা মস্তবড় সমস্যা, বিশেষ করে আমাদের মত অনগ্রসর দেশে।

সবচেয়ে আফসোসের কথা হচ্ছে এই যে, রাজনীতির মর্যাদা বাড়লেও সংগে সংগে আর পাঁচটা উৎপাদনশীল পেশার (productive occupation) মর্যাদা সমানভাবে বাড়েনি। উৎপাদনশীল পেশা

বলতে আমরা সেই সমস্ত অসংখ্য ছোটবড় পেশার কথা বলছি, যেগুলি সাক্ষাৎভাবে দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করছে। ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, কারখানার কর্মী, খনির মজুর কৃষক ইত্যাদি জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্মী নিজেদের পরি-শ্রমের দ্বারা আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে সাহায্য করছেন, দেশের আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি করছেন, তাঁদের নিজের নিজের পেশায় থেকে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে কতটুকু মর্যাদা লাভ করছেন? বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কেননা দেশ গঠনের কাজে এখনও তাঁদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নেহাৎ বড় চাকরি বা আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করতে না পারলে সমাজ বা সরকারের কাছ থেকে এ'রা কতটুকু স্বীকৃতি পান? শুধু মাঝে মাঝে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে পদ্মভূষণ ইত্যাদি খেতাব দিয়ে কি হবে? এখনও দেশের যা অবস্থা তাতে একজন বেশ ধীশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানী তাঁর পরিচিত মহলের বাইরে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত হয়েই জীবন কাটান। টাকার দিক দিয়ে বুদ্ধি-জীবীমাত্রকেই আত্মত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, যদি না দৈবাৎ এমন কোন মোটা মাইনের চাকরি জুটে যায়, যাতে বুদ্ধিতে ক্রমশ মরচে পড়তে থাকে এবং সেই বুদ্ধির মালিক অনটন থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

সাম্প্রতিক কালে অনেক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শিক্ষক কিংবা বুদ্ধিজীবী রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন বলে অনেকে দুঃখ করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রচণ্ড অপচয় যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে জন-সাধারণের মধ্যে হাজার হাজার বছরের মানসিক জাড্য এবং পঙ্গুতা দেবতার মত পুজো পেয়ে আসছে, সেখানে নতুন সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পত্তন করতে হলে বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করতে হবে। একথা জলের মত সোজা যে, শুধু ভোটের জোরে একটা নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না, তার জন্য সর্বসাধারণের মনকে জাগ্রত করতে হবে। এমন মানসিক পটভূমিকা রচনা করতে হবে যাতে দেশের সব সমস্যার চূড়ান্ত আপীল বুদ্ধির আদালতেই উপস্থাপিত হয়। কিন্তু একাজ করবে কে? বুদ্ধিজীবীরাই এদেশের জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে অপরিজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত (ব্যক্তি হিসেবে না হলেও শ্রেণী হিসেবে)। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এদেশে কলম চালাতে গেলে পেট চলত না। এখন হয়ত চলে, যদি উপন্যাস বা ছোট গল্প লেখা যায়। সাহিত্য হিসেবে উপন্যাস বা ছোট গল্পকে আমরা মোটেই ছোট করছি না, কিন্তু এক-মাত্র কাহিনীপ্রধান কথাসাহিত্যকে অবলম্বন করে একটা দেশের মন কখনো সাবালক হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মহলেই এই অবস্থা, তার নীচে তো সেটুকু চাহিদার আশা করা অবান্তর। তাই এদেশে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লোকে চেনে বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ হিসেবে, ডাঃ মেঘনাদ সাহাকে চিনেছিল পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে। এ'রা রাজ-নীতিতে নামায় এ'দের কাজের কতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্ন। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে জনসাধারণের শ্রদ্ধার এই একমুখী ঝোঁক আরো কতদিন চলবে?

আসল কথা আমাদের মানসিক অভ্যাসটাই বদলাচ্ছে না। গত পঞ্চাশ ষাট বছরের ঐতিহ্যে আমরা যেসব কাজকে মূল্য দিতে শিখেছি, তার মধ্যে প্রধান দুটি কাজ হচ্ছে রাজনীতি এবং রাজকার্য। রাজনীতিকদের সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। দেশের আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা প্রধানত এ'দের জন্যেই বরাদ্দ ছিল। এ'দের আত্ম-ত্যাগ এবং দুঃখবরণকে আমরা অস্বীকার করছি না, আমরা বলছি সাধারণ মূল্য-

বোধের কথা। আর রাজকার্যে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন, অর্থাৎ বিদেশীর শাসনযন্ত্রকে পোক্ত করতেই যাঁরা নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁরা দেশের লোকের শ্রদ্ধা কিছু কম পেলেও ভয় এবং ভয়জনিত ভক্তি যথেষ্টই পেতেন। এর বাইরে সাধারণ শিক্ষক অধ্যাপক ইত্যাদির সম্মান ছিল, কিন্তু সেটা অনেকটাই শুকনো সম্মান, তার সংগে অর্থ বা ক্ষমতার যোগ ছিল না। এমন কি মাস্টারদের যতই শুকিয়ে রাখা যাবে, তাঁরা ততই উৎকৃষ্ট শিক্ষা বিতরণ করবেন, এমন একটা সংস্কারই আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এখানে শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার করা হত পাণ্ডিত্য দেখে ততটা নয় যতটা খালি পা আর খালি গা দেখে। ডাক্তারদের সম্মান ছিল না তা নয়, কিন্তু নবযুগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিনিধি হিসেবে নয়, প্রাণের দায়ে। আর ইঞ্জিনীয়ারদের তো অনেকেই পাশ করা মিস্ত্রী বলে মনে করতেন। পেশা হিসেবে ওকালতি রীতিমত সম্মানজনক ছিল, কারণ বিদেশী শাসন কবলিত দেশে এঁরাই যৎসামান্য স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারতেন এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন।

মোটামুটিভাবে এই ছিল স্বাধীনতা লাভের আগে আমাদের সাধারণ সামাজিক মূল্যবোধের ছক বা প্যাটার্ন। স্বীকার করতে হবে, এ প্যাটার্ন মূলত ঔপনিবেশিক সমাজের প্যাটার্ন। এর ভিতর একটি অনগ্রসর দেশের অর্ধজাগ্রত চেতনার সমস্ত দোষ গুণ বর্তমান। বহু বছরের অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে এই মূল্যবোধের জন্ম। এর ঝোঁকগুলি (emphasis) সবদিক ঠিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলেনি। স্বাধীনতার আগে দেশের সম্বন্ধে একটা ঝাপসা মমত্ববোধ আমাদের অনেকেরই মধ্যে ছিল, প্রেরণারও ঘাটতি ছিল না। কিন্তু সেই প্রেরণার কোন স্পষ্ট আকার ছিল না। আর নিছক আবেগ বা প্রেরণা কখনোই কোন দেশকে বেশী দূর এগিয়ে দিতে পারে না। স্বাধীনতার আগে আমরা টেলিগ্রাফের তার কেটেছি, কিন্তু একটা টেলিগ্রাফের পোস্ট বসাতে যে কি পরিমাণ প্রচেষ্টার দরকার হয়, তা কেউ আমাদের বলে দেয়নি। যাঁরা বহু পরিশ্রমে ও বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন তাঁদেরও আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। নিজেদের বসতবাড়িটুকু তৈরী করতেও আমরা প্ল্যান করা দরকার মনে করিনি। কারণ দেশকে ভালবাসতে হলে তার প্রয়োজন ছিল না। এখন হঠাৎ আমরা শুনছি গোটা দেশটাকে প্ল্যানের মাপ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। বলা বাহুল্য, আমাদের মধ্যে অনেকেই একথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারছেন না। এর আগে আমরা অনেকে একসঙ্গে দলবেঁধে পুলিসের হাতে মার খেয়েছি, তাতে আশ্চর্য হইনি। কিন্তু এখন আমাদের একসঙ্গে দলবেঁধে জমি চাষ করতে বলা হচ্ছে, এতে আমরা আশ্চর্য হচ্ছি, ক্ষুব্ধও হচ্ছি। এতকাল নেতারা আমাদের বুদ্ধির কাছে আবেদন করেননি, আবেদন করেছিলেন শ্রদ্ধার কাছে, আবেগের কাছে। সাড়া অপ্রত্যাশিতের পেয়েছিলেন। এখন তাঁরা যেসব কথা বলছেন, তার একমাত্র সম্ভাব্য আবেদন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। দেশ সেবার ক্ষেত্রে সেই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাকেই আমরা এতকাল অবহেলা করে এসেছি। একটা মানচিত্রের গায়ে চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি এঁকে তার পূজো করাকেই আমরা দেশসেবা বলে মনে করেছি। এখন নানাভাবে আমাদের সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগছে। এবং এই একটা বিশ্বাসে আঘাত লাগায় আমাদের দেশপ্রেমের সমস্ত বনেদটাই টলতে শুরু করেছে।

আজকে সমবায় কৃষি এবং ভূমি সংস্কারের নামে যে আপত্তির ঝড় উঠেছে, এটা একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। আমাদের সমাজ চেতনার দুর্বলতাকে, চিন্তার দৈন্যকে আর শুধু কথা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না। মূলগত দোষের প্রতিকার মূল থেকেই করতে হবে। এই প্রতিকারের কাজে রাজনীতিকদের প্রচার যেমন কাজে লাগবে, তার চেয়ে অনেক বেশী কাজে লাগবে সাধারণভাবে শিক্ষিত সমাজের এবং বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব। দেশের সাধারণ মানুষের সংগে এই বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছেদ ঘোচাতে হবে। সাহিত্য শিল্প এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেশের লোকের সৌন্দর্যবোধ, সমাজবোধ এবং বাস্তববোধকে বিকশিত করতে হবে। যে-মন এতকাল রোমাঞ্চকর অকাজের ভিতর দিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণায় অভ্যস্ত ছিল, তাকে এখন অ-রোমাঞ্চকর নানা কাজের মধ্যে ধাতস্থ করে তুলতে হবে। আবেগ থেকে বুদ্ধিতে, উচ্ছ্বাস থেকে উপলব্ধিতে, আত্মত্যাগের উন্মাদনা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থৈর্যে উত্তীর্ণ হওয়ার যে সংগ্রাম, তাকেই আমাদের নতুন স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা দিতে হবে। তা না হলে কোন কোন ভবিষ্যৎদর্শী নেতা যখন বলবেন 'সমবায় প্রথায় চাষ ছাড়া গতি নেই', তখন কোন কোন অতীতদর্শী নেতা বলবেন 'সমবায় প্রথা চালু হলে আর গতি থাকবে না।' এবং সাধারণ লোকে ভাববে, এঁদের কথাবার্তা একেবারে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। এমন দিন আসা দরকার যখন তারা এসব প্রশ্নের উত্তর ভক্তিভরে কারো কাছে না চেয়ে নিজেদের বুদ্ধির কাছে, বিদ্যার কাছে এবং শ্রমের কাছেই চাইবে।

ট্রামে-বাসে

ডি মক্রেসি সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন,—ইহা অনেকটা রথের মত। সকলে আসিয়া রশিতে হাত লাগাইবে তবে রথ চলিবে।—"তারপর রথ, পথ, রশি সকলে বলতে থাকবে আমি দেব, আমি দেব; আর হচ্ছেও তাই"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

*　　*　　*

শ্রী নাম্বুদ্রিপাদ সরকারী কর্মচারীদের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় নাকি বলিয়াছেন—"আবার ফিরিয়া আসিও
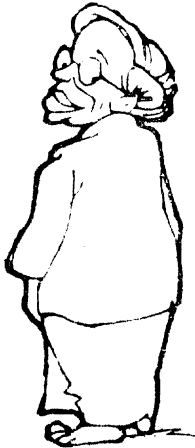
চাই"। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"হয়ত তিনি কথাটা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন:—আবার যদি ইচ্ছা কর, আবার আসি ফিরে.....কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি, আঘাত খেয়ে বাঁচি কিংবা আঘাত খেয়ে মরি"।

*　　*　　*

কে রলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে কমিউনিস্ট সদস্যগণ কতিপয় অদলীয় সদস্যের সঙ্গে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। ঘটনাটা ঘটিয়াছে লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বর্ষা সমাগমে তাঁরাও হয়ত ভেবেছেন—সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব"।

*　　*　　*

রা শ্যার প্রধানমন্ত্রী খ্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে তিনি নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ করিবেন। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো কথা। হাটে হাঁড়ি ভাঙার চেয়ে আলাপ-আলোচনা ঘরে-ঘরে হওয়াই ভালো"!!

*　　*　　*

"**রা** জ্য পুনর্বাসন দপ্তরে দুর্নীতির দুষ্ট চক্র"—একটি সংবাদ-শিরোনামা। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"দুষ্ট চক্র, মধুচক্র প্রভৃতি চক্র দেখেছি, চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলেছে, ফলে দশ চক্রে ভগবান ভূত"!

*　　*　　*

"**দু** র্গাপুরে বহু আশংকিত কোক চুল্লী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবার আশংকা"—অন্য একটি সংবাদ-শিরোনামা।—"চুল্লীর সমস্যা শুধু দুর্গাপুরে নয়, কল্যাণীপুর, রসুলপুরেরও ঐ এক সমস্যা। চুল্লী আছে, রান্না-বান্না চুলোয় গেছে"—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

*　　*　　*

"**টি** নে মাছ সংরক্ষণ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলাম।—"মনে হয়, প্রবন্ধটি সরকারী মৎস্য বিভাগের জন্যই লেখা, কেননা মাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল একমাত্র তাঁরাই"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

*　　*　　*

কে ন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর রাশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, সেখানে শিশুরা পর্যন্ত ভারত-এর খোঁজ রাখে; জিজ্ঞাসা করিলে বলে ভারত "শান্তির দেশ"। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"অনুমান করছি রাশিয়াতে ভারত সম্বন্ধে শিশুদের রূপকথা রচনা করা হয়েছে। ছোটবেলা রূপকথার মাধ্যমে আমরা তেপান্তরের মাঠের কত খবরই না পেয়েছি"!!

*　　*　　*

প্রে সিডেন্ট আইসেনহাওয়ার-ও রাশিয়া পরিভ্রমণে যাইতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মাঝে মাঝে বৈঠক হওয়া উচিত—"কিন্তু বৈঠকে চাই ফরাস, ফরাশ এবং আনুষঙ্গিক আরো-

কিছু। তা নইলে বৈঠক শুধু ওঠা-বসাতেই শেষ হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*　　*　　*

সং বাদে জানা গেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি পাকিস্তানকে উভচর সামরিক যান-এর সাহায্য দান করিয়াছেন।—"একটি শাঁখারীর করাত দিলে আরো ভালো হতো, দু'দিকে কাটতো তাঁদের আসে ভালো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

*　　*　　*

আ সাম, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে চাউলের দাম পশ্চিমবঙ্গের চাউলের দাম অপেক্ষা কম। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু হইলে এরূপ ক্ষেত্রে তাহা অনেক সময় ফলপ্রসূ হয় বলিয়া একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, ১৮৭৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন এই অবাধ বাণিজ্য নীতি স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে—স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ ইতিহাস হইতে সে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন কি? বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"না, সে শিক্ষা গ্রহণ করবেন না, করা সম্ভব নয়। কেননা, তাঁদের পাঠ্যবস্তু হলো ভূগোল, ইতিহাস নয়"।

তিন দিন তিন রাত্রি

*** নরেন্দ্রনাথ মিত্র ***

৮

মাধুরী চোখ মেলে দেখল আর সবাই উঠে পড়েছে। বালিশে কুলোয়নি বলে ছোট একটা পাশবালিশ মাথার তলায় দিয়ে শুয়েছিল মানসী। মাথার চাপে সেই গোল বালিশটা চেপ্টা হয়ে পড়ে আছে। ওদিকের ঢালা বিছানায় শুয়েছিল মা, মায়া, মঞ্জু আর মিনু। মা পাঁচটার সময় উঠে ওদের টেনে তুলেছেন। ওদের মর্নিং স্কুল। মঞ্জুর আর মিনুর। সকালে ওঠা ওদের অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু হয়নি। মা তাড়া না দিলে ওরা আর ওঠে না। মায়া অবশ্য আই-এ পরীক্ষা দিয়ে ক'মাসের জন্য জিরিয়ে নিচ্ছে। ওর সাত তাড়াতাড়ি না উঠলেও চলে। কিন্তু মা ওকেও তুলে দেন। ঘর-সংসারের কাজকর্ম আছে। না উঠলে চলবে কেন। তাছাড়া সকালের চায়ের পাটটা আজকাল মায়ার হাতেই এসে পড়েছে। চা করা ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে মায়া। বিছানা তোলা, ভাই-বোনদের নাওয়া-খাওয়া, মায়ের ফাইফরমাস খাটা। মুখে কথাটি নেই। আর ভারি লজ্জা। বাড়িতে ঠিক ছায়ার মত আছে। ওর জন্যে ভারি মমতা হয় মাধুরীর। ছেলেবেলায় সেও ওইরকম ছিল। অমনি মুখ-চোরা অভিমানী। মঞ্জুটা হয়েছে ফাঁকিবাজ আর বাবু। মাধুরী হাসল। ওর ভাগের কাজ মায়ার ঘাড়ে এসে পড়ে। বাবা বলেন মঞ্জুটাকে তোরা বিলাসের ডিব বানিয়ে ছাড়ছিস। বাবা সাজগোজ একেবারে পছন্দ করেন না। আহা কী-ই বা এমন সাজে। কাচের চুড়ি আর পুঁতির মালা আর চুল বাঁধবার রঙীন ফিতে। গয়নার মধ্যে এই তো সম্বল। আর দিদিদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে চুরি করে যা একটু স্নো-পাউডার নিতে পারে। এই নিয়ে বকুনির কোন মানে হয় না। বাবা মাঝে মাঝে সত্যিই ওদের ওপর বড় রাগ করেন। বুড়ো হলে বোধ হয় ওইরকমই হয়। বুড়ো হলে মানুষ নিজের যৌবনের কথাটা ভুলে যায়। বাবার জন্যে কিছুই করবার জো নেই। মাধুরী ভেবেছিল পরীক্ষার পর মায়া আর নন্দকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়। নিজেদের তেমন আত্মীয়স্বজন বাইরে কেউ নেই যাদের কাছে পাঠানো যায়। বন্ধুবান্ধবই ভরসা। শর্মিলা থাকে ভুবনেশ্বরে। সেখানে ভালো চাকরি করে ওর বর। অবস্থা ভাল। এখনো ছেলেপুলের ঝামেলা হয় নি। মাধুরী ভেবেছিল মায়াটাকে শর্মিলার কাছে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। অত বড় মেয়েকে কি যেখানে সেখানে যার তার কাছে পাঠানো যায়? অথচ শর্মিলা মাধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক-সঙ্গে বি এ পর্যন্ত পড়েছে। বিয়ের পরেও ভুলে যায় নি। এখনো চিঠিপত্র লেখে। কলকাতায় এসে মাধুরীর জন্যে কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসে। কোন বার শাড়ী, কোন বার ব্যাগ। সেবার এনেছিল হর-পার্বতীর যুগল মূর্তি। মাধুরী হেসে বলেছিল, 'ও মূর্তি দিয়ে আমি কি করব? ওটা তুই রাখ।' শর্মিলা বলেছিল, 'কেন, তুই কি চিরকাল এমন সন্ন্যাসিনী থাকবি নাকি?' মাধুরী বলেছিল, 'চিরকাল।' শর্মিলা মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল, 'চিরকাল রব আমি প্রেমের কাঙাল এবং সন্ন্যাসিনী থাকব। আইডিয়াটা ভাল।'

'ও মাধুরী, তুই এখনো উঠলিনে। দেখ দেখি কত বেলা হয়ে গেল।'

সুহাসিনী এসে দাঁড়িয়েছেন। বিছানা তুলবেন।

মাধুরী হেসে মায়ের দিকে তাকালো। এই ভোরবেলায় মার মুখখানাও কেমন নরম মনে হচ্ছে। নরম আর স্নিগ্ধ। দিনের শুরুতে মানুষকে শিশুর মত দেখায়। জীবনের শুরুতে যেমন।

'অমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছিস কেন? ওঠ এবার।' আর একবার তাড়া দিলেন সুহাসিনী।

মাধুরী বলল, 'খুবই বেলা হয়ে গেছে নাকি মা?'

সুহাসিনী বললেন, 'হয় নি? ছটা কখন বেজে গেছে। সবাই উঠে পড়েছে। অসীম তোর খোঁজ করছিল।'

মাধুরী বলল, 'অসীমদা? আমায়?'

সুহাসিনী বললেন, 'হ্যাঁ। খোঁজ করছিল তুই কখন উঠিস। বেলা আটটায় না নটায়। তোকে বেডটি দিতে হয় কিনা।'

মা হাসলেন।

মাধুরী হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ দিতে হয়। বল গিয়ে সে যেন দিয়ে যায় এসে।'

মার হাসিভরা মুখখানা এবার একটু কি গম্ভীর দেখাচ্ছে? কেন, মাধুরী কি

অশোভন কিছু বলে ফেলল? খুব বেশি চঞ্চলতা প্রকাশ করে ফেলেছে? কিন্তু অসীম তো এ বাড়িতে সকলেরই বন্ধু। বন্ধুকে নিয়ে কি মানুষ হাসি-তামাসা করে না? আর মা, মা-ও তো আজকাল মাধুরীর বন্ধু। কোন্ কথাটা মার সঙ্গে তার এখন না হয়? কোন্ কথাটা বলতেই বা সে বাকি রাখে?

সুহাসিনী মঞ্জুদের ছাড়া বিছানায় হাত লাগিয়েছেন দেখে মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বলল, 'তুমি কেন মা, ওরা কোথায় গেল। তুমি যাও, আমি তুলছি।'

সুহাসিনী বললেন, 'না বাপু, তুমি তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, ওরা বসে আছে।'

ওরা মানে মানসী মায়া মঞ্জু নন্দু আর অসীমও আছে। সেই কালকের অতিথি। এক তিথি পার করে দিয়েও আজও যে যায় নি। নিজেই যায় নি নাকি যেতে দেওয়া হয় নি? তাই তো হয়। একজন এগিয়ে আসে আর একজন এগিয়ে আনে। নাহলে কি রাখা যায়? না হলে কি থাকা যায়? কিন্তু কেউ কারো জন্যে বসে আছে শুনলে বড় ভালো লাগে। 'আমি বসে আছি তোমার আশে—।' না অন্য কোন আশায় নয়। শুধু একসঙ্গে চা খাবে বলে। সেইটুকুই যথেষ্ট। তাই যে থাকে সে-ও বন্ধু। এই পৃথিবীতে এক ফোঁটা সান্নিধ্য, এক ফোঁটা মাধুর্য যে দেয় সেই আপন। মাধুরী আর কিছু চায় না। আর বেশি কিছু নয়। সমুদ্রের বেলায় ঝিনুক কুড়াবার মত এই সংসার সিন্ধুর তীরে অগুনতি মধুর মুহূর্তগুলি তুলে তুলে নাও। পুঁতির মালার মত গেঁথে রাখ।

মার আপত্তি না শুনে মাধুরী তাঁর সঙ্গে বিছানা তুলতে শুরু করল। মাধুরী গুটিয়ে বালিশগুলি জড়ো করে রাখল বড় ট্রাংকটার ওপর।

মাধুরী বলল, 'মা, এবার এ ঘরে একটা তক্তপোষ পাততে হবে।'

মা বললেন, 'হুঁ সবই হচ্ছে।'

একখানা তক্তপোষ কিনবার মত টাকা তাদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এ ঘরে পাতলে ঘরটা একেবারে জুড়ে যায়। তাই পাতা হয়নি। কিন্তু মাধুরী এখন ভাবছে একখানা তক্তপোষ পাতলেই সুবিধে বেশি হত। বিছানাগুলি তার ওপর গুটিয়ে রাখা যেত। কিন্তু বাবা তা কিছুতেই কিনতে দেবে না। মা যা করতে চাইবেন বাবার তাতে আপত্তি এবং ভাইসি-ভার্সা। অদ্ভুত দাম্পত্য-জীবন দুজনের।

মাধুরী এবার বাথরুমের দিকে এগোল। ভাগ্য ভাল, দোরটা খোলা আছে। দোর বন্ধ দেখলে মাধুরীর মেজাজ বিগড়ে যায়। ভিতরে যেই থাকুক তাকেই মনে হয় পর। দু-চার মিনিট কাটতে না কাটতে মনে হয় পরম শত্রু। এর আগে যে ভাড়াটে বাড়িটায় ছিল সেখানে একই বাথরুমের ছিল তিন শরিক। এখানে গোটা পরিবারের জন্য পুরো একটি বাথরুম মিলেছে। তবু শরিকিয়ানা যায়নি। এখন স্নানের ঘর স্নানের জল নিয়ে মনে মনে ভাগাভাগি চলে বাবার সঙ্গে, মার সঙ্গে, মানসীর সঙ্গে। বিশেষ করে মানসীর সঙ্গে। মানসী দেবী যদি একবার বাথরুমে ঢুকলেন আর বেরোতে চান না।

টুথপাউডারের কৌটোটা বাইরের তাকের ওপর রেখে মাধুরী টোকা দিতে লাগল। কৌটোয় কি কিছু আর নেই নাকি? না, এদের নিয়ে আর পারা গেল না। বাক্সে হাত দেবে তাই নেই। মা বলেন, 'গৃহস্থের বাড়িতে নেই বলতে নেই। বল বাড়ন্ত।' কিন্তু যাই বল, কথাটার মানে একই দাঁড়ায়।

তবু মার মুখে ওই উল্টো বাড়ন্ত কথাটা শুনতে সময় সময় বড় ভালো লাগে। শব্দ আর প্রতিশব্দ অর্থে এক হলেও ধ্বনিতে আলাদা। অনেক মিথ্যেকথাও শুনতে ভাল লাগে। এই যেমন তার এই বাঁহাতের তালু দেখে একজন পামিস্ট বলেছিলেন—'তুমি রাজরানী হবে।' এই গণতন্ত্রের যুগে কোথায় রাজা, কোথায় বা রানী। তবু রাজ-রানী কথাটা রয়ে গেছে। ভিখিরীর মুখে, জ্যোতিষীর মুখে, আশীর্বাদকারীর মুখে আর যে মাস্টারনী হয়েও মাঝে মাঝে রানী হতে চায় তার মনে।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। অল্প পাউডারে তাড়াতাড়ি দাঁত মাজা শেষ করল মাধুরী। ওরা সবাই তার জন্যে বসে আছে। ছি ছি ছি, আজ অনেক আগেই তার উঠে পড়া উচিত ছিল। হাজার হোক বাইরের এক ভদ্রলোক বাড়িতে আজ গেস্ট। এই সময় মাধুরীর বয়সী একটি মেয়ে যদি পড়ে পড়ে ঘুমোয় বড় বিশ্রী দেখায়। আর মার সামনে ওই বেড-টি খাওয়াবার কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু সত্যিই কি কোন পুরুষ কোন ঘুমন্ত মেয়ের সামনে বেড-টি হাতে নিয়ে সাধাসাধি করে? তিনতলার রমা-বউদি নাকি তার স্বামীর বিছানায় একেকদিন চা দিয়ে আসে। কিন্তু বিপরীত প্রীতির কথা তো মাধুরী শোনেনি, কোন গল্প উপন্যাসেও পড়েনি। ভাবতে কিন্তু মন্দ লাগছে না। একজন লোক মানে ভদ্রলোক—চাকরবাকর নয়—তার সামনে চায়ের কাপ নিয়ে তাকে আদর করে ডাকছে। মাধুরী নিজের মনেই হাসল। তারপর নিজেকেই নিজে ধমক দিল, 'ছিঃ, তোমার আজ হল কি? কেন এত চঞ্চলতা, এত চাপল্য?' ক্লাসের দুরন্ত ছাত্রীদের যেমন ধমকায়, তেমনি মাধুরী নিজেকে ধমকাল। শিক্ষিকা মাধুরী ছাত্রী মাধুরীকে ধমকাচ্ছে। একই মাধুরীর মধ্যে দুই মধুরা।

দেয়ালে ছোট একখানা আয়না টাঙানো। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মাধুরী একবার সেই আয়নার দিকে তাকাল। শুধু মুখ দেখে তৃপ্ত হল না, ছোট মেয়ের মত দাঁতগুলি বের করল। পরিষ্কার সুন্দর মাজা দাঁত। সামনের একটি দাঁতের ওপর পাশের দাঁতটি একটু উঠে গেছে। কে যেন বলেছিল তাতে আরো ভাল দেখায় মাধুরীকে। ওই বঙ্কিম দাঁতেই বুঝি তার ব্যক্তিত্ব। মাধুরী হাসল।

'মাধুরী!'

এবারও মার গলা শোনা গেল। আজ মার মুখ দেখে, তাঁর ডাক শুনে উঠেছে। তিনি আজ সারাদিনই ডাকবেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মাধুরী শোবার ঘরে ঢুকল। বাসি শাড়ি আর ব্লাউজ বদলে দ্রুতপায়ে চলে এল চায়ের আসরে। সরু বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে পাতা সেই পড়ার টেবিলটা এখন চায়ের টেবিলে রূপান্তরিত হয়েছে। বইগুলি অপসারিত। নিশ্চয়ই নন্দুর কাণ্ড। শুধু বইই সরায়নি। বাবার ঘরের বেঞ্চখানাও টেনে নিয়ে এসেছে। বাক্স-টাঙ্কসগুলি বোধ হয় মাটিতেই নামিয়ে রেখে এল। বাবা দেখলে বকাবকি করবেন সে ভয় নেই। প্রধান অতিথিকে একখানা চেয়ার দেওয়া হয়েছে, আর ওরা সব পাশা-পাশি বসেছে বেঞ্চে। বাবা এখন নেই। তাঁর বোধ হয় মর্নিং ওয়াক এখনো শেষ হয়নি। দেখে মাধুরী যেন স্বস্তিবোধ করল। বাবাকে অবশ্য সে ভালবাসে। খুবই ভালবাসে। কিন্তু অনেক সময় গুরুজনদের নেপথ্যে রেখেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। আড়ালে থেকেই যেন তাঁদের বেশি সামনে এসে দাঁড়াতে গৌরব দেওয়া যায়।

অসীমই প্রথমে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে, ঘুম ভাঙলো তোমার? বসে থেকে থেকে আমাদের চা যে জুড়িয়ে গেল।'

মাধুরী বলল, 'ইস, চা খাওয়া তো শুরুই হয়ে গেছে দেখছি। তবে নাকি সব বসে আছ।' তারপর একটু হেসে বলল, 'চা জুড়োলে তো ক্ষতি নেই। সঙ্গে সঙ্গে আর এক কাপ গরম করে দেওয়া যায়। যারা খাচ্ছে তারা না জুড়োলেই হল।'

মানসীর দিকে তাকিয়ে মাধুরী ফের একটু হাসল।

মানসী একটু লজ্জিত হল। ছোট ভাই-বোনদের সামনে কথাটা বলা কি মাধুরীর ঠিক হয়নি? কিন্তু আসল মানে তো মঞ্জু নন্দু আর বুঝতে পারবে না। যাদের জন্যে বলা তারাই শুধু বুঝবে।

একটু সরে গিয়ে দিদিকে বসবার জায়গা করে দিতে দিতে মানসী বলল, 'আমার দিকে চেয়ে ওসব কথা বলা হচ্ছে যে। আমি কি জুড়িয়ে গেছি নাকি?'

মাধুরী বলল, 'ওরে বাবা তুই আবার জুড়োবি। তুই তো টগবগ টগবগ করে ফুটছিস। কেটলির জলের মত।'

মানসী কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। ওকি রাগ করল? আজ মাধুরীর ঠাট্টা-তামাশা কেউ কি সহজভাবে নেবে না?

মায়া পরিবেশনের ভার নিয়েছে। চায়ের সঙ্গে আপাতত এসেছে গরম কচুরি আর সিঙাড়া। ঘরের খাবার মা একটু পরে করে দেবেন। মাধুরী যদি আরো ভোরে উঠত, তাহলে সে নিজেই করে দিতে পারত। মানসী যেন কি। ও কেন খাবারটাবার করে দিল না? শুধু সামনে বসে থাকলেই হয়? মানুষকে আদরযত্ন করতে হয় না?

মঞ্জু বলল, 'জানো মেজদি, এতক্ষণ আমাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল জানো?'

মাধুরী চায়ে চুমুক দিয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল জানে না।

মঞ্জু বলল, 'নন্দুদা তো দিব্যি এই রেস্টুরেন্ট খুলেছে। এর নাম নাকি হবে মাধুরী রেস্তরাঁ।'

'কে? কে বলেছে একথা?'

মাধুরী প্রথমে মানসী তারপর অসীমের মুখের দিকে তাকাল, 'কে বলেছে?'

এরই মধ্যে দাড়িটাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়েছে অসীম। আটপৌরে আবরণ হিসেবে গেরুয়া রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছে। ওর গৌরবর্ণের সঙ্গে মানিয়েছে ভালো। ঝিনুকের বোতামগুলি সব আটকায়নি। ভিতরের জালি গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। তার ফুটোয় ফুটোয় রোমশ বুকের আভাস। শক্ত খাড়া খাড়া চুলগুলি গুছিয়ে এই সকালেই আঁচড়ে নিয়েছে। সব চুলই অবশ্য চিরুনির শাসন মানে নি। চেহারাটা ছিপছিপে বলে আগে বড় রোগা রোগা লাগত। এখন কিন্তু সেই অসহায় ভাবটা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে বেশ একটু তীক্ষ্ণতা এসেছে। মোটা হলে এটুকু থাকত না।

অসীম হেসে বলল, 'বাবা, কি সন্ধানী চোখ। আসলে পুলিসের চাকরি তোমারই নেওয়া উচিত ছিল মাধুরী। স্বীকার করছি কালপ্রিটকে ধরে ফেলেছ। আসামী আমিই।'

মাধুরী লজ্জিত হল। ও কি বেশিক্ষণ অসীমের দিকে তাকিয়ে ছিল? একটু বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সব সময় দোষ কবুল করলেই শাস্তি এড়ানো যায় না। আমার নাম নিয়ে ঠাট্টাতামাসা? ভারি সাহস তো তোমাদের। কেন মানসীও তো এখানে আছে। ওর নামেই নাম রাখ। রেস্টুরেন্টের নাম রাখ মানসী কেবিন। শোনাবে ভাল।'

মানসী প্রতিবাদ করে বলল, 'আবার আমাকে নিয়ে পড়লি কেন দিদি?'

একটা সিঙাড়ার প্রায় আধখানা মুখের মধ্যে রেখে নন্দু অস্পষ্টভাবে বলল, 'বেশ তো ওদের যদি সবাইরই আপত্তি থাকে অসীমদা, রেস্টুরেন্টের নামটা আমার নামেই থাকবে। আমার নামটা মনে আছে তো অসীমদা?'

অসীম হেসে বলল, 'শুভংকর তো?'

নন্দু বলল, 'হ্যাঁ, ওই নামটা হবে দোকানের। আর আমার ডাকনামটা ইউজ করব প্রোপ্রাইটার হিসাবে। জানেন, আমার একটা সত্যিই রেস্টুরেন্ট খোলবার ইচ্ছা আছে। এ পাড়ায় ভালো কোন রেস্টুরেন্ট নেই। খুলতে পারলে কিন্তু বেশ চলে।'

মাধুরী বলল, 'হতভাগা, তোর কপালে তাই আছে।'

অসীম বলল, 'আঃ ডিসকারেজ করছ কেন মাধুরী। বাঙালীর ছেলে ব্যবসাবাণিজ্য করতে চাইছে ভালই তো। নিশ্চয়ই চলবে নন্দু, খুব চলবে। তোমার এক দিদি ম্যানেজার হবে, আর এক দিদি কাউন্টারে

বসবে আর মঞ্জুটা বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে সার্ভ করবে।'

মাধুরী একটু অবাক হল। খুশিও হল। শুধু তার মনেই আজ হালকা হাওয়ার স্রোত বইছে না। অসীমদার চলন-বলনেও আজ খুব চপলতা এসেছে। ওর স্বভাব তো এমন ছিল না। বদলালো কি করে? মানুষ বদলায়। এক এক সময় এক এক রকম হয়। হয় বলেই দেখতে ভাল লাগে। অসীমদাকেও বেশ লাগছে এখন। কিন্তু মানসীটা অত গম্ভীর হয়ে আছে কেন। ও কোন কথা বলছে না। আহা বলবে কি। বেচারা যার সঙ্গে কথা বলবে, যেসব কথা বলবে তার সুযোগ-সুবিধাই মেলেই হচ্ছে না। কাল সারাদিন অসীমদাকে কেউ না কেউ ঘিরে রেখেছে। কখনো মা, কখনো মঞ্জু, কখনো বাবা। বিকেলে তো অসীমদা বেরিয়েই গেল। বাড়িতে আরো ভিড় বাড়বে বলে পালালো। তারপর রাত্রে ছাদে যাবার যদি-বা একটু সুযোগ মাধুরী করে দিয়েছিল বাবা গিয়ে হানা দিলেন। ছি ছি ছি, তাঁর তো লজ্জা হয়নি, মাধুরী লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু কাল যে সুযোগ হয়নি আজ ওদের সেই সুযোগ করে দেবে মাধুরী। আজ সবাইকে আগলে রাখছে। ওদের সুযোগ দেবে ঘুরে বেড়াবার, সবার আড়ালে মনের কথা বলবার।

চা খাওয়া শেষ হতে না হতে মা আবার এলেন। লুচি-পরোটা নয়, ক'খানা স্যান্ডউইচ করে নিয়ে এসেছেন। মাধুরীর কাছেই শিখেছেন এটা তৈরি করতে। কখনো-বা তিনি এল কখন পাউরুটি। অবাক কাণ্ড! এখানে বসে গল্প না করে মাধুরীর নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু খাবার দেখে অসীম যেন আঁতকে উঠল। 'না মাসীমা, আমাকে একখানাও দেবেন না, একখানাও নয়। কাল থেকে কেবলি খাচ্ছি। মেরে ফেলতে চান নাকি?'

সুহাসিনী মৃদু হেসে বললেন, 'দেখ, দুখানি খেয়ে। ঠিক হয়েছে কিনা দেখ। আমার মেয়েরা ভাবে এসব আমি করতে জানিনে। আমি কেবল যেন শাক-চচ্চড়ি, ঝোল, তরকারি রাঁধতেই জানি। তোরা জিনিসপত্তর এনে দিয়ে দেখ তখন যদি না পারি—।'

মাধুরী হেসে বলল, 'তুমি সব পার মা। রান্নায় তোমার অলৌকিক প্রতিভা। তবে এ কালের অনেক রান্না তুমি আমার কাছ থেকে শিখেছ। সেকথাও স্বীকার কোরো।'

সুহাসিনী হেসে বললেন, 'মাধুরী সেই গর্বেই অস্থির। কিন্তু জানো অসীম, শৌখীন রান্নার চেয়ে কঠিন রান্না হল নিত্য তিরিশ দিনের আটপৌরে রান্না। যে ডাল কর্তার আর ছেলেমেয়েদের কিছুতেই মুখে রুচতে চায় না, সেই ডালকে—'

অসীম পাদপূরণ করে বলল, 'রুচিকর করে তোলা। নিশ্চয়ই মাসীমা। সে কাজ বড় কঠিন। আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

সুহাসিনী একথার জবাব না দিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও নন্দু, তুই যে এখনো বসে আছিস? বাজারে যাবি কখন? মানসীকে নটার মধ্যে ভাত দিতে হবে। সে খেয়াল আছে?'

নন্দু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যাচ্ছি মা। অসীমদা, কি মাছ খাবেন বলুন?'

অসীম হেসে বলল, 'আজ আর এ বাজারের কোন মাছ খাব না নন্দু। আমি এবার বিদায় নেব।'

নন্দু বলল, 'বললেই হল বিদায় নেব? না না না, তা হবে না, কিছুতেই হবে না।'

সুহাসিনী বললেন, 'তুই বাজারে চলে যা। আর দেরি করিসনে।'

নন্দু বলল, 'অসীমদাকে কিন্তু ছেড়ে দিয়ো না মা।'

সুহাসিনী ভরসা দিয়ে বললেন, 'তোর কোন চিন্তা নেই। তুই বাজারটা চট করে নিয়ে আয়। তোমরা বোসো। যাই, আমি ওকে বাজারের থলি আর টাকা দিয়ে আসি।'

সুহাসিনী নন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দিকে গেলেন।

অসীম মাধুরীর দিকে চেয়ে বলল, 'মাসীমাকে বুঝিয়ে বোলো, আমি সত্যিই থাকতে পারব না। আমার জরুরী কাজ আছে।'

মাধুরী বলল, 'দশটার আগে তো আর অফিস-আদালত কিছু খুলছে না। জরুরী কাজ তখন যা দরকার হয় কোরো। এখন তুমি কিছুতেই ছাড়া পাবে না।'

হঠাৎ মানসী উঠে দাঁড়াল।

মাধুরী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও কিরে, এখনই কোথায় যাচ্ছিস?'

মানসী সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বলল, 'কাজ আছে।'

মাধুরী হেসে বলল, 'বাপরে বাপ তোরা কি সবাই আজ কাজের মানুষ হয়ে উঠলি নাকি? আমার কিন্তু আজ আর কোন কাজে মন বসছে না।'

মানসী বলল, 'তাইতো দেখছি।'

তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মঞ্জু আর মিনু অনেকক্ষণ উঠে পড়েছে। ওরা স্কুলে যাবে। মায়া আছে মার পায়ে পায়ে। এই মুহূর্তে ধারে-কাছে আর কেউ নেই।

মাধুরী অসীমের দিকে আর একটু সরে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'কী হয়েছে তোমাদের?'

অসীম হেসে বলল, 'হবে আবার কি?'

মাধুরী মনে মনে হাসল। সহজে কথা আদায় করা যাবে না। পুলিস অফিসারকে এক কাপ চা ঘুষ দেওয়া যাক। পটে কি আর চা আছে?

মাধুরী বলল, 'আর এক কাপ চা খাবে নাকি?'

অসীম বলল, 'এক কাপ নয়, আধ কাপ চলতে পারে।'

মাধুরী বলল, 'দেখি এক কাপই বোধ হয় আছে।'

অসীম হেসে বলল, 'তাহলে তো ভালোই হল। তুমি অর্ধাংশ ভাগিনী হও।'

মাধুরী বলল, 'আহাহা!' আরো জুৎসই জবাব দিতে যাচ্ছিল, বলতে যাচ্ছিল, 'তোমাদের অর্ধাংশ কি অফুরন্ত? ভগ্নাংশ নয় পুনঃপৌনিক?' কিন্তু বলা হল না। মা এসে পড়লেন।

তার আগে আধকাপ চা দিয়েছে অসীমকে আধকাপ নিয়েছে নিজে। কিন্তু সুহাসিনীকে দেখে মাধুরী ভদ্রতা করে বলল, 'তুমি চা খেলে না মা? খাবে? করে আনব?'

সুহাসিনী হেসে বললেন, 'বাঃ রে মেয়ে। তোর বাবা যে এখনো এলেন না, চা খেলেন না। কোথায় এত দেরি করছেন কে জানে।'

মাধুরী লজ্জিত হয়ে একটু জিভ কাটল, 'ওমা, তাইতো!'

বেশির ভাগ দিনই দেরিতে ওঠে বলে বাবা মার সঙ্গে মাধুরী চা খায়। মানসীরা আগেই খেয়ে নেয়। কিন্তু ছিছিছি, বাবার কথাটা আজ মাধুরীর মনেই নেই।

মুখে কিন্তু অপরাধটা স্বীকার করল না মাধুরী, হেসে বলল, 'মা, বাবা বোধ হয় পার্কে কাউকে পেয়ে ক্লাস খুলে বসেছেন। ও'র তো বিষয়ের অভাব নেই। মনু থেকে মার্কস পর্যন্ত বাবা সব সংহিতারই খবর রাখেন। তুমি কতক্ষণ আর দেরি করবে। চা করে দিচ্ছি খেয়ে নাও। বাবা এলে আবার না হয় সেকেন্ড কাপ তাঁর সঙ্গে খেয়ো।'

সুহাসিনী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'বড্ড ফাজিল হয়েছিস তো। যাই, দেখি গিয়ে মায়া কি করছে। তুই আজ স্কুলে যাবি না?'

মাধুরী বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। কাল তোমরা আমাকে ধরে বেঁধে রাখলে। কিছুতেই যেতে দিলে না। পাছে সময় মত না আসি। কি কোথাও পালিয়ে টালিয়ে যাই। আজ কামাই করব কোন দুঃখে?'

সুহাসিনী একথার কোন জবাব না দিয়ে স্মিত মুখে ভিতরের দিকে চললেন।

মাধুরী জানে মার এখন অনেক কাজ। ঠিকে ঝি যদিও বাসন মেজে দিয়ে গেছে। কিন্তু বাটনা মা নিজেই বেটে নেবেন। রাণুর মার বাটনা মাধুরীর মার পছন্দ হয় না। মানসী অফিসে বেরোচ্ছে। ওকেও তাড়াতাড়ি একটা ডাল তরকারি কিছু নামিয়ে দিতে হবে। এখান থেকে তেত্রিশ নম্বর বাসে মানসীর পুরো এক ঘণ্টা লাগে অফিসে গিয়ে পৌঁছতে। এদিক থেকে মাধুরীর বেশ সুবিধা আছে। পনের বিশ মিনিটের বেশি লাগে না বীরনগর কলোনীর স্কুলে গিয়ে পৌঁছতে। হাজিরাও আধ ঘণ্টা পরে। সাড়ে দশটায়। কিন্তু এসব সুবিধা তো আর সুবিধা নয়। সব অসুবিধা দূর হয় টাকায়।

মাইনে মানসীর বেশি। মর্যাদাও। কি বাড়িতে, কি বাড়ির বাইরে। তা হোক। মানসী বেশির ভাগ টাকা—হাত খরচ ছাড়া সব টাকাই বাড়ির সকলের জন্যেই খরচ করে বাইরের কারো জন্যে করে না। নিজের কোন খেয়ালও ওর নেই। নেই শাড়ি, গয়না, থিয়েটার, সিনেমার শখ। ওর একমাত্র সুখ যে কিসে তা যে কোথায় তা কি মাধুরীর অজানা আছে? যে কোন তাদের জন্য এতখানি ছাড়তে পেরেছে তার জন্যে মাধুরী কি একটু লজ্জাসরম ত্যাগ করতে পারবে না? একটু বেহায়া হতে পারবে না?

'অসীমদা তোমার আজ কিছুতেই যাওয়া হবে না।'

অসীম বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না মাধুরী, আমার আজ সত্যিই কাজ রয়েছে।'

মাধুরী বলল, 'কিন্তু তুমি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তবে এসেছ। আবার কাজের কথা কেন। কলকাতায় যারা বার মাস থাকে তারা বার মাস কাজ করে। কিন্তু তুমি তো তা নও। তুমি এসেছ দুদিনের ছুটিতে।'

অসীম হেসে বলল, 'দুদিনেই তের পার্বণ সারতে বলছ?'

মাধুরী বলল, 'নিশ্চয়ই সারবে। তুমি মফঃস্বল থেকে এসেছ, তুমি থিয়েটার দেখবে, সিনেমা দেখবে।'

অসীম বলল, 'জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেণ্ট। বলে যাও, বলে যাও।'

মাধুরী লক্ষ্য করল অসীমের হাসিতে খুশির আমেজ, দু-চোখে দুষ্টুমি।

মাধুরী বুঝতে পারল আজ আর অসীমদা কোথাও নড়ছে না। যাই যাই করছে, কিন্তু যেতে পারবে না। মানসীকে গিয়ে সুখবরটা জানিয়ে আসতে হবে। সে যেন কোন চিন্তা না করে। শুধু আজ নয়, অসীমদা ছুটি যে কদিন আছে মাধুরী ওকে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করবে। তারপর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও অসীমদা এখানে দু-একদিন ওভার স্টে করতে চাইবে। না যদি চায় মানসী যেন মাধুরীর নাক ফিরিয়ে রাখে।

উঠতে যাচ্ছিল মাধুরী, অসীম বাধা দিয়ে বলল, 'আমাকে থাকতে বলে তুমি চলে যাচ্ছ যে।'

মাধুরী মুখ টিপে হেসে বলল, 'আসছি, একজনকে একটা কথা বলে আসছি।'

জবাবে অসীম কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কথা পাল্টে নীচু গলায় বলল, 'মেসো মশাই এসেছেন।'

মাধুরী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সত্যিই তাই। বাবা। গায়ে ফতুয়া। এত করে বলেছে বাবা পাঞ্জাবি পরে যাও, কিছুতেই পরবেন না। হাতে লাঠিটাঠি নেই। বয়স ষাট পার হয়ে গেলেও নিজে এখনো লাঠির মত শক্ত সোজা। গর্ব করে বলেন, প্রথম বয়সে ব্যায়াম করেছেন, আদা আর ভিজানো ছোলা খেয়েছেন তারই ফল।

মনোমোহন একেবারে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'এই যে, মাধুরী এই যে অসীম।' তার কাঁধে হাত রাখলেন তিনি।

বেশ একটু কেঁপে উঠেছে অসীমদা। ঘাবড়ে গেছে। বাব্বা কী ভীতু। এই সাহস নিয়ে তুমি দারোগাগিরি কর। এই সাহসের সম্বন্ধে অত সাধ, স্বপ্ন, জল্পনা কল্পনা? মাধুরী নিজের মনে হাসল।

মনোমোহন বললেন, 'অসীম, আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। তোমাকে এসে দেখতে পাই কি না পাই।'

অসীমদা বেশ লজ্জা পেয়েছেন ঠিক জবাবটি খুঁজে পাচ্ছে না। মাধুরী তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। মনোমোহনের

দিকে ফিরে তাকিয়ে সস্নেহ ধমকের সুরে বলল, 'বাবা, এই তোমার তাড়াতাড়ি ছুটে আসা? সাতটা বাজিয়ে দিয়ে তবে তুমি এলে? এদিকে মার চা খাওয়া হচ্ছে না। সকালে উঠে চা না খেলে মার মাথা ধরে তা জানো?'

মনোমোহন বললেন, 'কেন, তোর মা চা খায়নি কেন?'

মাধুরী বলল, 'কেন আবার। তুমি চাটা খেলে না—'

মনোমোহন বললেন, 'ঈস, তোর মা যে সতীসাধ্বী গান্ধারীকেও ছাড়িয়ে গেল। আমি চোখ বুজলে তোর মা চোখে গামছা বেঁধে কানামাছি খেলবে।' হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন মনোমোহন। অসীম আর মাধুরীও হাসল।

কিন্তু কথাটা যতই হেসে উড়িয়ে দিন না বাবা ভিতরে ভিতরে যে খুব খুশি হয়েছেন তা মাধুরী জানে। মেয়েদের কষ্ট দিয়ে পুরুষে সুখ পায়। তা সেকালের পুরুষই হোক আর একালের পুরুষই হোক।

মনোমোহন বললেন, 'মাধুরী উঠছিস যে, বোস এখানে। জানিস জীবনবাবুর সঙ্গে আজ ঘোর তর্ক হয়ে গেল। সত্যিকারের ধর্ম বস্তুটা কি। ধর্মাচরণ কি খোল করতাল নিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে করবার ব্যাপার, না নিজের ঘরে বসে ভিতরে ভিতরে—।'

মাধুরী তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে বলল, 'তোমার চা করে নিয়ে আসি বাবা।'

বেচারা অসীমদা কিছুক্ষণ ধর্মতত্ত্ব শুনেছে। যেমনি যাই যাই করে ছটফট করছিল তেমনি বুঝুক মজা। এই নিয়ে বাবা ঘণ্টা তিনেক দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারবেন। দেখা যাক একজনকে আটকে রাখার ব্যাপারে ধর্মের জোরই বেশি না অধর্মের। মাধুরী মনে মনে ফের একটু হাসল।

নন্দু বাজার নিয়ে এসেছে। মা আর মায়া তাই নিয়ে ব্যস্ত। থলি একেবারে উপুড় করে ঢেলে ফেলা হয়েছে। মায়া তরকারি কুটতে বসেছে। মা আঁশবটিতে মাছ কুটছে। নন্দ আজও ইলিশ মাছ এনেছে। বাব্বা এমাসে বড্ড বেশি খরচ হয়ে যাবে। হোক, ছিঁচছি, হোক।

'মায়া, কেটলিটা কোথায় রে। বাবার জন্যে চা করতে হবে।'

মায়া বলল, 'চয়ের জল আমি চাপিয়ে দিয়েছি মেজদি। তুমি একটু তেতলায় যাও।'

'কেনরে?'

'রমা বৌদি তোমাকে খবর দিয়েছে। কি নাকি জরুরি দরকার।'

'যাচ্ছি', মানসী কোথায় রে? তাকে একটা কথা বলে যাব।'

মায়া একটু হেসে বলল, 'মেজদি ঘরেই আছে। সে নাকি আজ আরও সকালে বেরোবে।'

মাধুরী বলল, 'হুঁ।'

মানসীকে খুঁজতে হল না। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চুল খুলছে। পায়ের কাছে গন্ধতেলের শিশি।

মাধুরী গিয়ে হাসিমুখে তার সামনে দাঁড়াল, 'এত যে সাততাড়াতাড়ি, কী হল তোর?'

মানসী গম্ভীর ভাবে বলল, 'দরকারী কাজ আছে। আগেই বেরোতে হবে।'

'কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিস। অসীমদা আজ আর যাচ্ছে না। আজ না, কাল না, পরশু না।'

মানসী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তাতে আমার কি।'

'ওরে বাবা! তোর আজ হল কি বল তো। রাগে যে একেবারে টগবগ করে ফুটছিস।'

মানসী এবার একটু হাসল, 'দিদি, আমি কেটলীর জল, টগবগ করেই ফুটি। কিন্তু কিন্তু তুই যে আজ ভোরে দিব্যি একটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিস।'

মুহূর্তের জন্যে মাধুরী গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই একটু হেসে ছোট বোনের গালে সস্নেহে ছোট্ট একটি চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। আমি যদি ফুল হই, ঘেঁটু ফুল। তুই পদ্ম, অধুনা কুপিতা পদ্মিনী। যাই দেখে আসি রমা বউদি কেন ডেকে পাঠাল।'

মানসী বিনুনী খুলতে খুলতে মাথা কাত করল, কথা বলল না।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মাধুরী ভাবল মানসী ওকথা বলল কেন। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্যে যেন তেমন গরজ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গৌণ প্রশ্ন এসে প্রধান জিজ্ঞাসাকে ঢেকে দিল রমা বউদির কী দরকার? (ক্রমশ)
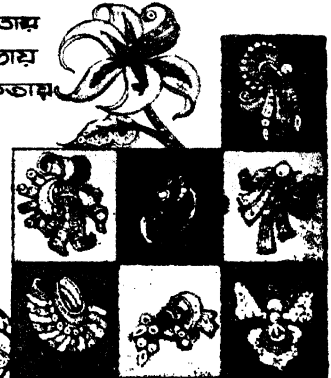
গানের আসর

শাঙ্গর্দেব

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এক একটি করে বছর যাচ্ছে এবং আমরা চিন্তা করে দেখছি কতখানি আমাদের উন্নতি হয়েছে বা কতটুকু আমরা এগিয়ে এলুম। এবছরও স্বতই একই চিন্তা মনে উদিত হয়েছে কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মত এবারও খুব উৎসাহ প্রকাশ করতে পারছি না—ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি—কবে নব নব প্রতিভার উদয় হবে যাঁরা আমাদের আশাকে সফল করে তুলবেন।

আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার প্রশ্ন। শিক্ষার অসম্পূর্ণতাই সংগীত সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতার প্রধান কারণ। আমরা এমন শিক্ষা দিতে পারছি না যাতে করে তরুণ শিল্পীদের মনে সংগীতচিন্তার উদয় হয় এবং নবতর সৃষ্টিতে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন। বস্তুত এদিকে আমরা মাথা ঘামাই নি কিন্তু বিদ্যালয়ের পর বিদ্যালয় এই শহরে প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। এইসব বিদ্যালয় থেকে ছেলেমেয়েরা গান বাজনা শিখে বেরুচ্ছে কিন্তু যা শিখছে ঠিক তারই উদ্গীরণ ছাড়া আর কিছু তারা করতে পারে না কেন? এগিয়ে যাবার চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই কেন—এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় করে দেখা দিয়েছে। তবে যথানিয়মে যেটুকু তারা শিখতে পারছে তার মূল্যকেও আমরা লঘু করে দেখছি না—আমাদের আশা যে, তারা গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠুক এবং সংগীতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করুক।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিশিষ্ট সুরকারদের রচিত সংগীত প্রচারে সাধারণ বিকৃতি অতিশয় পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। এই ইচ্ছানুরূপ সংগীত পরিবেশনের মূলে যে অনভিজ্ঞতা তাকে এইসব সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছেন। এ যুগে শিল্পীরা গাইবার আগে একটু ভাবেন সুরটা রীতিসম্মত হচ্ছে কিনা। অবশ্য ভুল ত্রুটি হয় কিন্তু ঠিক নিয়মে সংগীত পরিবেশনের একটা চেষ্টা যে আছে এটা অস্বীকার করলে শিল্পীদের প্রতি অবিচার করা হবে। এই সংগীতবোধটি কলকাতায় রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের আগে ছিল না। এটি তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফল বলে মনে করি। তাঁরা অবশ্য কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বোধটি জাগ্রত করেছেন কিন্তু একটি বিষয়ে একটি বোধ জাগ্রত হলে স্বাভাবিক নিয়মেই সেই বোধটি অপর ক্ষেত্রেও জাগ্রত হয়ে থাকে। কিন্তু এটাও ঠিক যে সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য নয় যেমন যথানিয়মে আমরা একজন সুরকারের সংগীত পরিবেশন করব তেমনি সুরবিস্তারের অনুপম সুযোগকে যদি অবহেলা করি তাহলেও আমাদের সংগীতে দৈন্য আসতে বাধ্য। বস্তুত দিলীপকুমার রায় মহাশয় বহুকাল ধরে যে সুরবিহারের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করে আসছেন সে বিষয়ে অন্তত ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁকে প্রচুর সমর্থন করি। সংগীতের বিকাশের দিক একটা মস্ত বড় দিক, সে দিকে যত উন্নতি হয় ততই ভাল। এখানেও শিক্ষা সংস্কৃতি এবং রসবোধের প্রশ্ন ওঠে। সুরবিহারের জন্যও মনের যথেষ্ট পরিণতি দরকার, নইলে অশিক্ষিত-পটুত্বের দৌড় আর কতটুকু। তাই বলছিলাম, শিক্ষার প্রশ্ন একটি মস্ত বড় প্রশ্ন যার সমাধানে আমরা বিলক্ষণ তৎপর হইনি।

যখনই একটি করে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তখনই আনন্দ হয়—ভাবি, এর থেকে কিছু পাব—অদূর ভবিষ্যতে এর সাফল্য বর্ণনা করবার সৌভাগ্য হবে। কিন্তু এ পর্যন্ত অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রদান করা আমাদের সম্ভব হয় নি, সেজন্য দুঃখ আমাদের যথার্থই গভীর। কলকাতার সরকারী তত্ত্বাবধানে ওয়েস্ট বেঙ্গল একা-ডেমি অফ মিউজিক ডান্স এণ্ড ড্রামা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন এমন একটা বিরাট আশা আমাদের মনে ছিল, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর চলে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এমন কিছুই হল না যা আমাদের মনে এতটুকু আশার সঞ্চার করতে পারে। বৎসরাধিক পূর্বে এদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছিলুম এবং আজও আমাদের ধারণা পাঁচটার মত কোন যোগ্যতার পরিচয় তাঁদের কাছ থেকে আমরা পাইনি। যদি আর পাঁচটা ইস্কুলের মত এখানেও ঐ একই টিউশনির ব্যাপার চলে তাহলে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠানের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন কোন যোগ্যতার পরিচয় আজ পর্যন্ত পেলাম না যাতে তাঁদের একাডেমি নামের একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এর পিছনে সরকারের সার্থকতা আছে বলেই সেটা আমাদের বিশেষভাবে বলতে হচ্ছে।

বস্তুত এই ক' বছরেই দেখলাম, সরকারী প্রচেষ্টার চেয়ে বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যম অনেক বেশি সফল হয়েছে। আজও কোন কোন প্রতিষ্ঠান আছেন যাঁরা সরকারী মুষ্টিভিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে চলেছেন। সামান্য সাহায্যটা তাঁদের কাছে বড় নয় জানি, তাঁরা চান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, কেননা এর মূল্য হচ্ছে বড়রকমের পাবলিসিটি। কিন্তু, প্রচারের এই উপায় অবলম্বনের ফলে যদি কেবলমাত্র বাইরের প্রচার বাড়ে এবং শিক্ষার সাফল্য আশানুরূপ না হয় তাহলে তার কোন সার্থকতা নেই। একটি প্রতিষ্ঠানের খবর অন্তত আমি জানি যা সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে দাঁড়াতে পেরেছে এবং ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। আজকের দিনে এইরকম স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠানকেই আমরা সর্বোত্তম সাধুবাদ প্রদান করি।

এই উপলক্ষে সরকারী মহল যেন একথা মনে না করেন যে, আমরা তাঁদের সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করি। আমরা বহুবার তাঁদের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সমর্থন ঘোষণা করেছি কিন্তু, আমলাতান্ত্রিক অযোগ্যতার জন্য যদি একটা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় অথবা একটা প্রচেষ্টা যোগ্য পরি-কল্পনার অভাবে নষ্ট হয় তবে সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখেই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে হবে। কিছু-কালের মধ্যেই রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য-সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত হবার কথা আছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা সুগভীর আশা পোষণ করি। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সফল হলে যথার্থ সুখী হব। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সরকারী অর্থানুকূল্যে যে কয়েকটি সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিরও যথোচিত প্রশংসা আমরা করেছি। কিছুদিন পূর্বে শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের লেখা রাগ এণ্ড রাগিণীজ নামক ইংরেজি গ্রন্থটি প্রকাশে সহায়তা করে সরকার আমাদের প্রশংসা-ভাজন হয়েছেন।

আমাদের ধারণা, স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর সামর্থ্যে বিশ্বাসী হন। সেই বিশ্বাস আসে জ্ঞান থেকে। অতএব আমাদের আবেদন এই যে, প্রত্যেক শিল্পী জ্ঞানের পরিধি বিস্তারিত করুন, সত্যিকারের রসের সন্ধান করুন—কেউ আমাকে তুলে ধরবে বা কারুর সহায়তা আমি পাব—এই ধারণাটাই আসে দুর্বল বা পরাজিত মনোবৃত্তি থেকে। আজকের এই স্বার্থ-কণ্টকিত সমাজে—"একলা চল রে" হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্লোগান। স্বার্থের কাঁটা দু' পায়ে এক এক করে মাড়িয়ে যান, দেখবেন আপনার নিঃস্বার্থ দান আপনাকে গৌরবের আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

শৃঙ্খলা, নীতির অনুশাসন? প্রথমে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হল তার আনন, পরমুহূর্তে ক্রোধের ত্রিবলি-কুঞ্চন দেখা দিল ললাটে। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে সে দমন করল রোষারুণ। দুর্ভগা কালকন্যা, আর সে কালের আজ্ঞাবহ অনুচর। যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠেই বলল সে, 'একি বলছ দুর্ভগা! সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নী। নিয়মের রাজত্বে ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন অবৈধ। সমাজ-শাসন লঙ্ঘন করা অনুচিত।'

'মিথুন-সম্ভব সমাজে এ তো অনিয়ম নয়, অন্তক। স্বামী-স্ত্রীরূপে সহোদর সহোদরার মিলন সেখানে বিধি-সঙ্গত।'—নম্রকণ্ঠেই বলে কামমোহিতা দুর্ভগা।

ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যেতে চায়। শাস্ত্রবিদ্, নীতিধর মৃত্যু। গর্জন করে উঠতে চায় তার কণ্ঠ। দুর্ভগাও জানে, কৃতান্ত কালানুচর হলেও কামানুচর নয়। শাস্ত্রের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তাই শাস্ত্রানুসারেই বলে দুর্ভগা, 'তুমি নীতিবিদ্, শাস্ত্র তোমার নখদর্পণে। প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করা শাস্ত্রজ্ঞেরই কর্তব্য। রতিকাম আমি, আমাকে রতিদান কর।'

মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে দুর্ভগা। তার কুব্জ দেহ আরও নত হয়। শত্রুকেও দুর্বল করে কাম। দুর্বলার মত কাতরকণ্ঠে আবার সে বলে, 'আমি কামমোহিত, আমি আর্ত। আর্তকে রক্ষা করা ধার্মিকের কর্ম। তুমি ধর্মধীর, আমাকে রক্ষা কর।'

দুর্ভগার বাক্যে ঈষৎ চঞ্চল হয় মৃত্যু। এ শাস্ত্র কোথা থেকে শিখল কালকন্যা? আজন্ম দুর্বিনীতা, দুর্নীতিপরায়ণা দুর্ভগা। তার মুখে আর্তত্রাণের নীতিবাক্য! কিন্তু পরমুহূর্তেই বোঝে অন্তক, বৈড়াল-ব্রতিক অধর্ম। ধর্মের ছদ্মবেশে সে প্রতারণা করে, নীতির মোহন মূর্তি ধরে ছলনা করে পাপাচার। তাই দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে মৃত্যু, 'কামনার ভ্রান্তবুদ্ধি তুমি। কদর্য লালসা-লিপ্সা পূর্ণ করার জন্যই তোমার শাস্ত্রের দোহাই। বিধাতার নিয়ম-বিচারের পদ্ধতি এ নয়।'

'নিয়ম!'—দুর্ভগার মর্মবিদারক কণ্ঠে ব্যঙ্গ প্রধূমিত হয়, খুলে যায় দুষ্টার ছদ্ম আবরণ। কুঞ্চিত শুভ্র ভ্রূরেখা, লোলিত ওষ্ঠে বক্রকুটিল শ্লেষঃ 'কামনা নিয়ম মানে না অন্তক। তার আর এক নাম অনিরুদ্ধ, অ-নিরুদ্ধ তার গতি। ওগো নীতিধর, তোমার বিধাতাও এই কামনার অধীন হয়ে স্বীয় কন্যার পশ্চাৎ ধাবন করেন।'

শেষ হয় না দুর্ভগার উক্তি। বিধাতার প্রতি কটাক্ষে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে অন্তকের বিশাল কৃষ্ণ বপু। ললাটে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি রক্তাক্তলোচনে বহ্নিদৃষ্টি যুগাবসানের সংবর্ত মেঘের মত ক্রোধে গর্জন করে ওঠে সর্বহর মৃত্যু, 'আসঙ্গ-লিপ্সু ললনা তুমি, অতি অশ্লীল—জঘন্য তোমার ইঙ্গিত।'

চলে যেতে উদ্যত হয় তিক্ত-বিরক্ত অন্তক। বাধা দিয়ে বলে কামপ্রমত্তা কাল-কন্যা, 'রতার্থিনী আমি, আমাকে গ্রহণ কর।'

'অতি অভদ্র তুমি'—বিরক্তিভরে দৃপ্তকণ্ঠে বলে অন্তক। সুদীর্ঘ, বলবাহু দিয়ে সম্মুখের বাধা অপসারণ করতে চেষ্টা করে সে। উৎকট লালসা তবু ঘৃণ্য আসঙ্গ-কামনার আলিঙ্গন-লিপ্সু হয়ে ছুটে আসে, যেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসে হিংস্র কামোন্মত্ততা। কামিনী যেন ক্ষুধিতা বাঘিনী। প্রাণপণ শক্তিতে তার আক্রমণ প্রতিহত করে ঘৃণায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় চলে যায় অমিত শক্তিধর, কামরিপু কালানুচর।

পুঞ্জিত রোষে ফুলে ওঠে দুর্ভগা। সুস্বেচ্ছ কালের নন্দিনী সে, কালকন্যা। আত্মদম্ভে আবাল্য স্বেচ্ছাচারিণী। তিনশত ষাট সহোদর, তিনশত উনষাট সহোদরা তার স্বেচ্ছায় দাস-দাসী। জীবনের প্রথম কামনা অন্তর মন্থন করে মহাতরঙ্গের মত উত্তাল হয়ে উঠেছে, উন্মাদ তার গতি, বিপুল তার আবেগ। সেই প্রেমধারার গতিমুখে কঠিন বাধা। নিজের মনেই গর্জন করে উঠল প্রত্যাহত কামনা। সম্ভোগের প্রথম কামনা, কালনাগিনীর শয়ংবরের প্রথম অভিজ্ঞায় যে ব্যর্থ করেছে, তার ওপর শক্তির তেজ দেবার জন্য উদ্যত হল শঙ্খিনী।

বিষোদ্গারে ত্রুটি করেনি বিষকন্যা। প্রমাদ ও মোহসৃষ্টিতে সে নিপুণা। সে প্রমাদ সৃষ্টি করেছে, মোহ সৃষ্টি করেছে—কিন্তু প্রমত্ত বা মোহিত হয় নি নির্মোহ মৃত্যু। কামোন্মত্তা উদগ্র কামনায় প্রয়োগ করেছে অথর্ববেদোক্ত আভিচারিক বিদ্যা। ব্যর্থ হয়েছে মন্ত্র। দুর্ভাগার দুর্ভাগ্য, মৃত্যুকে সে স্বামি-রূপে পায় নি।

অভিচার মন্ত্রের অসাধারণ শক্তি, ত্রৈলোক্য-আকর্ষণকারী তার ক্ষমতা। কিন্তু প্রয়োগ-কৌশলে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে মন্ত্রীকেই তা প্রত্যাঘাত করে। অতি ভীষণ ব্যর্থ মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। দুর্ভাগার ব্যর্থ আভিচারিক মন্ত্র তেমনি নিজের দুর্ভাগ্যেরই পরিপোষক হয়েছে। দুর্দম কামনা, আরও দুর্দম ব্যর্থ কামনার বেগ। এককে না পেয়ে অন্যকে কামনা করে সে কামনা ব্যর্থ হলে আরেক। এমনি করে সে ত্রিভুবন-প্রার্থী হয়ে ওঠে। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—শুধু চাওয়া আর চাওয়া। মৃত্যুকে পতিরূপে না পেয়ে, তেমনি উন্মাদ হয়েছে দুর্ভাগা। অতৃপ্ত কামনা অন্য পতিলাভে প্ররোচিত করেছে তাকে। দুর্দম লালসা বিস্তৃত হয়েছে স্বর্গে দেবলোকে, মর্ত্যে মনুষ্যসমাজে, পাতালে নাগলোকে। পতি খুঁজে পায় নি দুর্ভাগা। বিকৃত, কদাকার তার দেহ—কালপেঁচা ভয়ঙ্করী। কুটিল তার গতি, অতি কুটিল প্রকৃতি। সর্বত্রই প্রত্যাখ্যান, গঞ্জনা, বিদ্রূপ। 'আমার পতি হও তুমি'—এই প্রার্থনা নিয়ে দুর্ভাগা উপস্থিত হয়েছে স্বর্গে। শিব-লোকে, স্ত্রী দেবতা তার নটিনীর বেশ দেখে হাসায়, উপহাসে দূরে সরে দিয়েছে। কৌতুকে অনুগ্রহে সে উপস্থিত হয়েছে দানবরাজ্যে, যাকে দেখেছে, তাকেই নিবেদন করেছে, 'আমার পতি হও তুমি।' সৌন্দর্যে ভোগলিপ্সু দানব ক্রোধ-কম্পিত লোচনে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। পাতালেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে নাগকন্যা। মর্তের মানুষ তাকে দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে, দেখলেই দূরে থেকে পালিয়ে যায়। 'আমার পতি হও তুমি'—একথা বলবারই সুযোগ পায় না দুর্ভাগা।

দুর্বহ যেন দুর্ভাগার জীবন। কোটরগত চক্ষু, চোখের কোণে কালিমা, কুঞ্চিত গণ্ড, কুঞ্চিত চর্ম, বিবর্ণ শিরাল অঙ্গ। দেহে যুগান্তের শ্রান্তি। লম্বদন্ত চিবুক যষ্টি ভর করে নিঃসঙ্গ সে ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়ায়, মুখে শুধু একটি উৎসুক প্রার্থনা, 'আমার পতি হও তুমি।' কেউ তার পতি হয় না, কেউ তাকে গ্রহণ করে না। কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না সে। বার্ধক্যে কম্পিত অঙ্গ, ক্রোধে স্খলিত চরণ। অতৃপ্ত কামনার বহ্নিতে সে রুক্ষ, শুষ্ক—যেন শাস্তিভৈরব মরুভূমি। জীবন শূন্য হাহাকার। পতি সে পায় না।

নৈরাশ্যের স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়, তবু সে আশা পরিত্যাগ করে না। অনির্বাণ আশার দীপ, স্তিমিতজ্যোতি নয়নেও আশার সন্ধানী আলো। সেই আলো নিয়ে পতির অন্বেষণে ভুবন পরিক্রমণ করে পতিংবরা দুর্ভাগা। শ্যামল ভূতল ভাল লাগে না তার, শ্যামলতায় বিরক্তি—ধূসরতায় আসক্তি। বিশ্বের আনন্দনিকেতনে সে শান্তি পায় না। সে জানে, আনন্দ-নিকেতনে সুদুর্লভ তার স্বামী। জীবনের মত্ত কোলাহলে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। দুর্ভাগা পতি খুঁজে ফেরে শীতের নীহারময় তমসায়। নিষ্পত্র, শুষ্ক শীতের ধূসর প্রকৃতি, বুকে তার সীমাহীন রিক্ততা। সে-ও যেন দুর্ভাগার মত পতিহীনা। সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে দুর্ভাগার অন্তর। প্রদোষের থমথমে রহস্যঘন আধো আলো, আধো ছায়ায় সে ক্ষণেক থমকে দাঁড়ায়। অসূর্যপ্রিয়া সন্ধ্যা, বুকে যেন তার কিসের অভিযোগ—মুখে বিষাদের ছায়া। পতিমতী হয়েও সন্ধ্যা কি সুখী নয়? স্বামীর সোহাগে কি বঞ্চিতা সন্ধ্যা? কেমন যেন মায়া হয় দুর্ভাগার।

শিথিল গতিতে সে কখনো এসে উপস্থিত হয় নির্জন শ্মশানভূমিতে। নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে কয়েকটি চিতা। গলিত স্বর্ণপিণ্ডের মত ক্রব্যাদ অগ্নি যেন শ্মশানের রক্তাক্ত নয়ন। কোন চিতা নির্বাপিতপ্রায়, অগ্নিকুণ্ডে আলোহিত দীপ্ত। প্রিয়জনের সদ্য শোকের অশ্রু মুছে গেছে, বক্ষে বক্ষে নিভন্ত চিতার তপ্তশ্বাস। কোথাও বা ধূমে আচ্ছন্ন মরুস্থল। শ্মশান-ধৌত জল থেকে ওঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দূরে হরিধ্বনির সঙ্গে শিবাধ্বনি—কালের যেন অভিশাপ। অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করছে রিক্ত শ্মশান, নিভন্ত চিতা, ধূম্রাচ্ছন্ন সমীরণ—অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করছে 'প্রিয়-বিরহিত শোকার্ত মানুষ। মৃত্যুকে উদ্দেশ করে অভিশাপ দিচ্ছে নিখিল ভুবন, 'এমনি চিতা জ্বলুক তোমার বুকে, এমনি রিক্ত হও তুমি!' নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে উল্লসিত হয় দুর্ভাগা। এই ভয়াবহ স্থানে একটু আশার আলোও দেখতে পায় সে। সে শুনেছে, শ্মশান-নিবাসী অসংখ্য প্রেত-পিশাচ। তারা হয়তো দুর্ভাগাকে গ্রহণ করতে পারে। শংখচূর্ণী প্রেতিনী কোন্ দিকে? অথবা স্বামীর প্রেতাত্মা শংখচূর্ণী। সে-ও সৌভাগ্যবতী—তার স্বামী ছিল। দুর্ভাগা স্বামি-হীনা। ক্ষীণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে সে সৌভাগ্যবতী শাকচুন্নীকে দেখতে চায়। তার সিঁথিতে এখনও কি এয়োতি-চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে?

তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে দুর্ভাগার বুক থেকে। সে রূপহীনা, কদাকার, তাই কেউ তাকে গ্রহণ করে না। মৃত্যু বলেছে, সে অভব্য—অভদ্র তার আচরণ। সে ভেবে পায় না, আচরণে কোথায় তার অভদ্রতা।

দু'শ বংশগত, আচরণ স্বভাবগত। হয়তো বক্রকুটিল মেয়ের মত বক্রকুটিল তার আচরণ। এ জগতে নির্দোষ কে? ওই তো এখন কৃষ্ণবসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বসেছে অনেক কুক্রিয়ার লীলা পৃথিবী। সেও পতিমর্তে, দৌপিদার পত্নী। দূরে দুশ্চরিত্রা মঘা, অশ্লেষা। পাপ নক্ষত্র তারা, তবু পরিত্যক্তা নয়—স্বামি-হীনা নয়। কুচরিত্রা হোক, নির্লজ্জা হোক, পুংশ্চলী হোক বা হোক স্বৈরিণী—এ জগতে কে পতি-বঞ্চিতা? দুর্ভাগার মত দুর্ভাগা কার? বিধাতার দুয়ারে সে অভিযোগ করে—কেন, কেন এই অভিশাপ?

আর কেন ভাবতে পারে না দুর্ভাগা। ক্লান্ত, ভাবনায় ক্লান্ত সে। ক্লান্তিতে লাঠিতে ভর করে সে বসে। দু চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, মাথা ঘোরে। সোজা হয়ে বসতে পারে না, বসলেই মাথাটা নুয়ে পড়ে। দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে সে ভাবে। দেখলে মনে হয়, অনাদিকাল ধরে ভাবছে যেন একটা নির্জন তেমাথা। একটু ঘুম হলে কিছুটা

শান্তি পেত সে, কিন্তু ঘুম তার চোখে নেই। সুযোগ পেয়ে নিদ্রাও পরিত্যাগ করেছে তাকে। মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোর—তাও মুহূর্ত মাত্র।

কালচক্র আবর্তিত হয়। কোথা দিয়ে চলে যায় দিন—ব্রহ্মার সত্ত্বময় তনুর বিগ্রহ; কোথা দিয়ে চলে যায় রাত্রি—কমলযোনির তমোময় তনুর প্রতিমা। আবর্তিত হয়—প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা। ঋতুর অয়নে ফুল ফোটে, ফুল শুকিয়ে যায়—হরিৎ হয় হরিদ্রাবরণ। দুর্ভগা তবু খোঁজে, তবু প্রতীক্ষা করে—জরতীর নয়নে পতির স্বপ্ন।

সহসা সেদিন নিশীথ রাত্রে কিসের শব্দে সচকিত হয় দুর্ভগা। কানে সে ভাল শোনে না। তবু একহাতে বাঁ কান ঢেকে, ডান কানে সে শুনতে চেষ্টা করে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ ধ্বনি। অনেক দূরে যেন দেখা যাচ্ছে একটি জ্যোতিরেখা। সেই জ্যোতিশ্চক্রে অস্পষ্ট শব্দঝঙ্কার! দুর্ভগা শুনেছে, সুসূক্ষ্ম ঘন জ্যোতির মধ্যে বিকীরণ ধ্বনিরূপ নাদ। বহির্বিশ্বে ঐ নাদই শব্দব্রহ্ম। তাহলে কি ধ্বনিরূপে নেমে আসছেন স্বয়ং ব্রহ্মা? তার আবেদন তাহলে পৌঁছেছে বিধাতার দ্বারে? সোৎকণ্ঠ দুর্ভগা।

তখন সপ্তর্ষিলোক থেকে নেমে আসছেন দেবর্ষি নারদ। মুখে সুমধুর হরিগুণ গান। ঋষির দেহ-বিচ্ছুরিত দীপ্তি উদ্ভাসিত করে পড়ছে মর্ত্যে—তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত মধুর গীতের অস্পষ্ট ঝঙ্কার সুধা বর্ষণ করছে দুর্ভগার হৃদয়ে। ছায়াপথ বেয়ে নয়, শূন্যপথে তিনি এসে দাঁড়ালেন দুর্ভগার সম্মুখে।

বিস্মিত দুর্ভগা। কেউ তার কাছে আসে না, কেউ তাকে চায় না। বিশ্বসংসারে সে পরিত্যক্ত। করুণার আশীর্বাদ, কে এই করুণাময়—তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন? জ্যোতির্মণ্ডিত দেহ, নবনীর মত কমনীয় রূপ। পরিধানে শ্বেতশুভ্র বসন, স্কন্ধে লম্বিত দুগ্ধধবল উত্তরীয়। চোখে-মুখে প্রশান্ত হাসির ছটা। ইনিই কি তার বিধি-নির্দিষ্ট পতি?

উত্তেজনায় কম্পিত শিথিল দেহ, অন্তর-তলে অনির্বচনীয় পুলক। আবেগে যষ্টি ভর করে উঠে দাঁড়ায় দুর্ভগা। তার লুলিত গণ্ডে যেন রক্তের ছোপ লাগে, বিশুষ্ক ওষ্ঠে হাসির রেখা, কম্প্রকণ্ঠে গদগদ ভাষ, 'তুমি কি আমার পতি হবে ঋষি?'

প্রথমে বিব্রতবোধ করেন তপোধন নারদ। তিনি জানেন দুর্মুখা দুর্ভগার স্বভাব। অতি নির্লজ্জ, অভদ্র তার আচরণ। ব্যর্থ হলেই অভিশাপ বর্ষণ করে। প্রথমে একটা কৌতুক শ্লেষ উচ্চারিত হতে চায় নারদ-বাক্যে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করেন তিনি। করুণার প্রতিমূর্তি—স্নেহ-প্রবাহে আপ্লুত তাঁর অন্তর। বেদনার্ত হৃদয়, অশ্রু-ছলছল নয়ন—তিনি ভাবেন, সত্যিই তো অনাথ দুর্ভগা। ত্রিজগতে সে প্রত্যাখ্যাতা, স্বামি-বঞ্চিতা। তার মত হতভাগিনী কে?—নীরব, নিষ্পন্দ স্তব্ধ নারদ, নয়নে করুণাধারা।

ঋষিকে নীরব দেখে আবার নিরাশার আঁধার ঘনীভূত হয় দুর্ভগার মনে, তবে কি ইনিও প্রত্যাখ্যান করবেন তাকে? শক্তি সঞ্চয় করে শেষ চেষ্টা করে দুর্ভগা, মুখে বলে, 'রতিকাম নারী আমি, জগতে কেউ আমার পতি হতে চায় নি, রূপহীনা বলে কেউ গ্রহণ করে নি আমাকে। কৃপালু ঋষির করুণা থেকেও কি বঞ্চিত হব আমি?'

সকাতর কম্প্রকণ্ঠ। বিশ্বের বেদনায় মথিত করুণ আবেদন।

হলেন তপোধন। স্বভাব-কোমল যাঁর হৃদয়, সামান্য কাতর প্রার্থনাতেও সহজে বিগলিত হন তাঁরা। সুধামাখা কণ্ঠে বলেন করুণকান্ত দেবর্ষি, 'আমি তোমার পতি হব না, তবে পতি নিশ্চয়ই পাবে তুমি। সৃষ্টির অভিশাপ হলেও বিধাতার সৃষ্টিতে তুমি অবাঞ্ছিত নও। প্রবল তোমার সম্ভোগ-কামনা, ব্যর্থতায় তুমি ক্লান্ত। পাঞ্চালপুরী আক্রমণ করতে আসছে দুর্ধর্ষ যবনসেনা। অধ্যক্ষ তার যবনেশ্বর। তুমি তাঁর কাছে যাও, তাঁর কাছেই আশ্রয় পাবে তুমি। আমি

রূপ ক ... াসনা অবশ্যই বক্ষ ... ার আলো ... যেমন স্তিমিত- ... মাঝে মাঝে নিভতে নিভতেও জ্বলজ্বল করে। দুর্বল দেহে সে অনুভব করে নূতন উত্তেজনা, নির্জীব রক্তকণায় নবচাঞ্চল্য। যষ্টি তুলে সে নমস্কার জানায় ঋষিকে, স্পর্শ করে না। দেবতা ও ধৃতব্রত যোগীকে স্পর্শ করার অধিকার নেই তার। অন্তরীক্ষপথে অন্তর্ধান করেন পরমহংস নারদ। কালদণ্ড যষ্টি ভর করে আবার পতির সন্ধানে অগ্রসর হয় পতিংবরা কালকন্যা। নবোষার আলোক তখন দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে।

সারাদিন ঘুরেছে দুর্ভগা। সে ঘুরেছে কঙ্করময় পার্বত্যপথে—উপলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চরণ; সে ঘুরেছে জনশূন্য, জলশূন্য মরুর উপর দিয়ে—মধ্যাহ্ন সূর্যের খর কিরণে দগ্ধ হয়েছে পদতল। পিপাসায় শুষ্ক তালু, রসনায় দারুণ তৃষা। সে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে মরুর বুকে মরীচিকা দেখে। তবু সে চলেছে। বুকে স্বামি-সঙ্গ লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। অবশেষে সে এসে দাঁড়িয়েছে ভবাটবীর বিশাল প্রান্তরে। এর পরেই পাঞ্চালরাজ্য পুরঞ্জনপুরী। কিন্তু কোথায় যবনেশ্বর? কোথায় তার সৈন্যদল? সম্মুখে খাঁ খাঁ করছে অপরাহ্ণের নির্জন প্রান্তর। আর চলতে পারে না সে। নাসায় শ্রান্তির অগ্নিজ্বালা, নাভিমূল কাঁপিয়ে উঠছে তপ্তশ্বাস, নিঃশেষ যেন সমস্ত উদ্যম। সত্যের বাঙ্‌মূর্তি ঋতম্ভরা ঋষি—তাঁর বাক্য তো মিথ্যা হতে পারে না। নিশ্চয় পাঞ্চাল নগর আক্রমণ করতে আসবে তার পতি। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে দুর্ভগা।

সহসা প্রান্তর কাঁপিয়ে এল কার দল। বিভীষণ মূর্তি সব সেনা। কারো মুখে অট্টহাস্য, কারো মুখে চিৎকার। বক-উলূকের মত কারো বদন, কেউ বা তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা ঘোরদর্শন। শেষ সূর্য-রশ্মিপাতে জ্বলন্ত অনলের মত সমুজ্জ্বল খড়্গ, কারো হাতে বজ্র দণ্ড। রথের ঘর্ঘর অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ, অস্ত্রের ঝনৎকার—সব মিলিয়ে মুখর হল প্রান্তর। দুর্ভগার অন্তরে নববিবাহের বধূর মত পুলক-কম্পন। পাঞ্চাল পুরনারীর শঙ্খ ধ্বনিতে দুর্ভগার নিকট ওই শুভ মঙ্গলিক। বাদ্যভাণ্ডের সমারোহে সমাগত বরযাত্রী। নবউৎসাহে উঠে দাঁড়াল দুর্ভগা। সত্যমূর্তি ঋষি, সত্যময় তাঁর বচন। দুর্ভগার তিমির নয়নে খর সন্ধানী দৃষ্টি, —কোথায় সৈন্যাধ্যক্ষ যবনেশ্বর?

ওই যে অশ্বের পৃষ্ঠে আরূঢ়—নীলগিরির মত কৃষ্ণকায় দেহ, তুরঙ্গ পৃষ্ঠে পর্বতের মত বিশালকায় এক মূর্তি। উনিই যবনেশ্বর—দুর্ভগার দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত পতি। বিবাহের কন্যার মত দুর্ভগার হৃদয়ে দুরু দুরু কম্পন, একটা অব্যক্ত-করা আনন্দানুভূতি। বহুকালের ন্যুব্জ দেহ ঈষৎ ঋজু হয়ে ওঠে। মুহূর্তে মলিন চীর সম্বৃত করে নেয় দুর্ভগা। কতকালের জটিল কেশ! কম্পিত হস্তে স্পর্শ করে সে। তারপর যষ্টি ভর করে বিহ্বলার মত অগ্রসর হয়, চিরকালের অভিসারিকা—চকিতা, উৎকণ্ঠিতা, আনন্দকম্পিতা।

মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে, যেন চিরন্তনী নববধূ। হৃদয়ে সভয় আনন্দ-

স্পন্দন, যেন নাগরদোলায় আন্দোলিতা নাগরী। আনত চিবুক উঁচু করে, অনেক কালের বিবর্ণ মুখ, ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে উপরের দিকে তাকাল দুর্ভগা। সলজ্জ নববধূর মুখচন্দ্রিকাঃ কম্পিত ব্রীড়াকুঞ্চিত নেত্রপল্লব—আবেশময় চাহনি। স্খলিত বচনে দুর্ভগার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে নিখিল নারীহৃদয়ের চরম কামনা, 'তুমি কি আমার—

কথা শেষ হল না, নিমেষে নিভে গেল বাসরকক্ষের উজ্জ্বল আলো। নববধূর চোখে কালরাত্রির অন্ধকার! কে এ? এ যে কালের কৃতকপুত্র সেই মৃত্যু! যে ব্যর্থ করে দিয়েছে দুর্ভগার জীবনের রঙীন স্বপ্ন, জীবনের সর্বপ্রথম কামনা; যার জন্য দুর্ভগার এত দুর্ভোগ—ত্রিলোকে সে পরিত্যক্তা!

'মিথ্যা ঋষিবাক্য!'—বুকভাঙা আর্তনাদ করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল দুর্ভগা। মনে হল, ঋষির বাক্য যেন বজ্র হয়ে নেমেছে তার বুকে; মনে হল, প্রবল ভূমিকম্পে সরে যাচ্ছে পায়ের মাটি; মনে হয়, বিদেশী প্রেতিনীর মত দুর্ভগা আশ্রয় নিয়েছে মহাশ্মশানের অনাদৃত শূন্যতলে।

[illegible] মৃত্যু— [illegible] [illegible] তার [illegible] করে, [illegible] ভগ্নীর [illegible] স্নেহের প্রতি। ভগ্নী দুর্ভগা—[illegible], [illegible], ত্রিভুবনে পতি খুঁজে পেল না সে।

[illegible]

[illegible] ভূমিতে লুটিয়ে কাঁদছে চির-[illegible] তবুই ভগ্নী—তার শূন্য হৃদয়ে [illegible]। ধীরে মহিষপৃষ্ঠ থেকে নেমে আসে, ধীরে দাঁড়ায় ভূলুণ্ঠিতা দুর্ভগার সামনে—অতি ক্ষীণ, অতি শুষ্ক, কঙ্কাল-সার তনু। অশ্রু-সজল, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে মৃত্যু, 'ওঠ দুর্ভগা, ঋষিবাক্য কোনদিন ব্যর্থ হয়নি ব্যর্থ হয় না। পতি নিশ্চয় লাভ করবে তুমি। [illegible]; সেই [illegible] প্রত্যেক প্রাণীকে তুমি সম্ভোগ করতে পারবে। পতিরূপে তোমার ভোগ্য হবে যৌবন-অতিক্রান্ত যে-কোন জীব। সংযত, মিতাচারী, ধর্মশীল ধার্মিককে বশ করতে তোমার বিলম্ব হবে, কিন্তু কামাসক্ত যারা কার্যাকিংকর, অমিতাচার ভোগে যারা আকণ্ঠ লিপ্ত—তাদের অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারবে তুমি। তোমার আর এক নাম হবে জরা। কালের অবাধ সংমিশ্রণে প্রত্যেক প্রাণী জরার বশ হবে। তোমার ভোগ পূর্ণ হলে তারা আসবে আমার অধিকারে। আমার অগ্রদূতী বলে ত্রিলোকে মৃত্যুদূতী নামেও বিখ্যাত হবে তুমি। যাও, আমারই সৈন্যদলে আছে প্রজ্বার আর স্মৃতিহরা। তাদের সহায়ে সৃষ্টির রাজ্যে পতিসম্ভোগ কর, পাঞ্চালরাজ্যে বিস্তার কর তোমার অধিকার।

এই কথা বলে ধীরে চলে যায় মহিষ-বাহন মৃত্যু। গোধূলির শেষ আলোয় উৎসাহে ঈষৎ ঋজু হয়ে দাঁড়ায় কুব্জা দুর্ভগা। গোধূলির বসুমতী যেন জরারই প্রতিমূর্তিঃ নির্বাপিত প্রদীপের শেষ দীপ্তির মত তৃপ্তির হাসি তার ম্লান মুখে। দুর্ভগার লুণ্ঠিত ওষ্ঠে সেই হাসি। আর সে পতি-বঞ্চিতা নয়, সকল প্রাণীর ওপর তার পত্নীত্বের অধিকার। সেই অধিকার গ্রহণ করার জন্য যষ্টিতে ভর করে অগ্রসর হয় মৃত্যুদূতী।

তখন পাঞ্চাল পুরী থেকে বেরিয়ে আসছেন পাঞ্চালরাজ অমিত-বিক্রম পুরঞ্জন। ভোগবতী সদৃশ মনোরম পুরীতে এতদিন অতি সুখে তিনি রাজত্ব করেছেন। আজ শত্রু আক্রমণ করতে এসেছে সেই পুরী! সহসা যেন শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনিঃ বিদ্রোহী পঞ্চ মন্ত্রী, পঞ্চ সেনাপতি। ম্লান নয়নদীপ্তি, চোখের কোণে গাঢ় কালিমা রেখা। সহস্র বলিকুঞ্চিত তার সতেজ দেহ —পলিত কেশ, স্খলিত দন্ত, শিথিল অস্থি-গ্রন্থি। সর্বাঙ্গ দেহে ক্রোধের অস্থির কম্পন, মুহুর্মুহু স্খলিত চরণ। কে যেন তার হাতে তুলে দিয়েছে একটি যষ্টি। সেই যষ্টিতে ভর করে আসছেন তিনি—অসহিষ্ণু বিরক্ত, ক্রোধান্বিত।

দূরে মহিষ-পৃষ্ঠে বসে তৃপ্তির হাসি হাসছে অন্তক মৃত্যু। দুর্ভগার পতি-সম্ভোগ শুরু হয়েছে তাহলে। অদ্ভুত তার পতিপ্রেম, অপূর্ব পরিচর্যা! মনের সাধ মিটিয়ে গভীর প্রেমে, পরম যত্নে নিজের হাতে তিল তিল করে পতিকে সাজিয়ে নিয়েছে মৃত্যুদূতী জরতী দুর্ভগা।*

* শ্রীমদ্ভাগবত—৪র্থ স্কন্ধ ২৭-২৮ অধ্যায়

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

২০

সুভাষের ইংলণ্ডে একটিমাত্র ইংরাজ বন্ধু লাভ হয়েছিল খানিকটা আমার জন্যেই। মানে তাকে আমি একরকম জোর করেই নিয়ে যাই "লী-অন্-সী" বলে একটি মনোরম সমুদ্রতীরে। লণ্ডনের কাছে একটি বন্দর আছে সাউথ-এণ্ড—উচ্চারণ সাদেণ্ড—লী-অন-সী থেকে মাইলখানেক দূরে। সেখানে হার্টফোর্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিস্টার বেট্‌স্ একটি অতি মনোরম নিলয়ে বাস করতেন—স্ত্রী দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে। তাঁকে আমার কী যে ভালো লেগে গেল—কী বলব! দেশে ইংগভারতীয়দের দুঃশীলতা দেখে দেখে সময়ে সময়ে আমার মনে হ'ত, সত্যিই যে বিদেশীর সঙ্গে লেন-দেনে ওরা বুঝি সদাসচেষ্ট থাকে উন্নাসিক হবার—যাকে বলে স্নব। তাই মিঃ বেট্‌সকে দেখে মন যেন আরো বেশি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এর আগে আই-সি-এস অ্যাণ্ডারসন সাহেবের সঙ্গে কেম্ব্রিজে আলাপ হয়েছিল—কিন্তু তাঁকে আমার ভালো লাগলেও তিনি ইংরাজদের জন্মগত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে প্রায়ই চাল মারতেন বলে সুভাষ মাঝে মাঝেই আমাকে ধমকাত: "কেন যাও তাঁর অ্যাট হোম-এ? জানো না উনি ছিলেন আমাদের দেশে আই-সি-এস দলবলের বড়কর্তা? এ'রা কি কখনো আমাদের সত্যি সম্মান করতে পারেন মনে করো? না দিলীপ, যতদিন আমরা স্বাধীন না হব, ইংরাজরা আমাদের মধ্যে ভালো কিছুই দেখতে পাবে না।" একথা পরে শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনি আরো গভীর ভাষায়: ভারতের স্বাধীন হওয়া দরকার এইজন্যে যে, আমরা স্বাধীন না হ'লে ভারতের আত্মার বাণীকে এরা হেসে উড়িয়ে দেবেই দেবে—দাসজাতির আবার আত্মা কী—এই বলে। কথাটা কিছু নতুন নয়—পিতৃদেবের মুখেও তো শুনেছিলাম বাল্যকালেই। রবীন্দ্রনাথেরও কোন্ একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম এই ধরনের কথা। তাছাড়া, সে-সময়ে আমাদের দেশে অসহযোগ জ্বলে উঠেছে আরো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর—যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজদের তিরস্কার ক'রে তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ফলে কেম্ব্রিজেও দেখতাম, ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরাজ ছাত্ররা বড় একটা মিশতে চাইত না। সুভাষ বলত কথায় কথায়: "যতদিন না আমরা স্বাধীন হব দিলীপ, ততদিন এরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে সমান সমানভাবে মিশবে না—আর যতদিন ওরা পিঠ চাপড়ে মিশবে — অ্যাণ্ডারসনের মতন — ততদিন আমিও ওদের ছায়া মাড়াচ্ছি না।"

কাজেই মন আমার একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মিঃ বেট্‌সের মতন পদস্থ ইংরাজের সদাচরণের জন্যে। কিন্তু শুধু সদাচরণই নয়—তিনি যেন নিরন্তরই সজাগভাবে চাইতেন তাঁর দেশবাসীদের দুরাচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতে। তাই ছুটিতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রায়ই তাঁর ওখানে ডাকতেন। প্রথমবার আমি অতিথি হই "পেইং গেস্ট" হয়ে, দ্বিতীয়বার—সম্মানিত অতিথি। তৃতীয়বার মনোরম শহর সেভেন-ওক্‌স-এ তাঁর অতিথি হই—১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার বিলেতে যাই।

মহোল্লাসে সুভাষকে ধরে নিয়ে গেলাম। তাঁকে দেখে তখন সুভাষও মুগ্ধ—তিনিও তেমনি সুভাষকে দেখে উচ্ছ্বসিত। বলতেন আমাকে প্রায়ই যে, এ-মৌকর যুগে এমন খাঁটি মাল এত বিরল যে, স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস হ'তে চায় না যে, নিখাদ সোনার দেখাও মিলতে পারে এ-গিল্টির যুগে।

মিঃ বেট্‌সকে আমি কোনোদিন ভুলব না আরো এইজন্যে যে, তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন যেমন গ্রীষ্মের তপ্তমাটির কাছে আসে প্রথম বর্ষার ধারা। বিলেতের ইংরাজ ছাত্রদের উদ্ধত ভারতবিমুখতায় আমাদের সকলেরই মন উঠেছিল বিষিয়ে। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড য়ুনিয়নে প্রায়ই বক্তৃতা হ'ত—ভারতবাসী স্বরাজের যোগ্য নয়, ইংরাজরাই তাদের হাতে ধরে শেখাচ্ছে সভ্যতা কাকে বলে...... ইত্যাদি। আমি যদিও সুভাষের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হ'তে পারিনি যে, ইংরাজদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রের না মেশাই ভালো, কিন্তু

মিশতে চাইলেই কি মেশা যায়? ওরা আমাদের মনে মনে দুষছে আমরা অকৃতজ্ঞ বলে, আমরাও ওদের শাপ দিচ্ছি ভারতের রক্তশোষক বলে। মিসেস ধর্মবীরের সংগে দেখা হয়ে আরাম পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু তিনি তো আধা-ভারতীয়—হিন্দু মতেই বিবাহ করেছিলেন, ভারতীয় স্বামীর মধ্য দিয়ে ভারতকে ভালোবেসে। তাই তাঁর সৌহার্দ্য খাঁটি হওয়া সত্ত্বেও সুভাষের কথা অপ্রমাণ করে না যে, পরাধীন জাতির সংগে শাসক জাতির সৌহার্দ্য অসম্ভব। মিঃ বেট্‌সই প্রথম একথার অকাট্য প্রতিবাদ হয়ে এসে আমাদের কাছে হাজির দিলেন। তাঁর সংগে দিনের পর দিন কত হাসি তর্ক গল্প আলোচনা চলত যে! সৌহার্দ্য যাকে বলে।

আর শুধু সৌহার্দ্যই তো নয়—তাঁর কাছে শিখবারও ছিল যে প্রচুর। কত গুণেই যে ছিল এই মানুষটির! তবে তাঁর কথা আমি বলেছি আমার "ভাবি এক হয় আর" উপন্যাসটিতে, তাই সেসবের পুনরুক্তি না ক'রে শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, তাঁর সম্বন্ধে যা যা লিখেছি তার সাড়ে পনের আনা না হোক্, অন্তত চোদ্দ আনা সত্যি।

আমার মন চিরটাকাল না ভেবেচিন্তেই অপরের প্রভাব সাগ্রহে বরণ ক'রে নেয়—একথা বলেছি বহুবারই। তাই মিঃ বেট্‌সের প্রভাবে প'ড়ে হ'ল আমার আর এক অভাবনীয় পরিণতি—আমি ঠিক করলাম, পাঁচশো পাউন্ড জমা দিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যান্ট আপিসে ভর্তি হয়ে দেশে ফিরে প্রচুর টাকা রোজগার ক'রে সংগীতের একটি অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আরঃ হবি তো হ', ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ এলেন লণ্ডনে। খবর পেয়ে আমি মাঝে মাঝেই ছুটতাম তাঁর সংগ পেতে। তিনি থাকতেন সাউথ কেনসিংটনে একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে। কলকাতায় তাঁর সংগে দেখা হয়েছিল শরৎদার সূত্রে একথা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু যথার্থ ঘনিষ্ঠতার বনেদ গাঁথা হয় প্রথম বিলেতে—শুধু তাঁর ডেরায়ই নয়, নানা ইংরাজ মনীষীর বাড়িতেও বটে। তাঁর মাধ্যমেই আমার আলাপ হয় চিত্রী রথেনস্টাইন, কবি য়েট্‌স, নিকোলাস রোয়েরিখ প্রমুখ শিল্পী তথা মনীষীর সংগে। তাঁরা কবির সংগে যখন কথাবার্তা কইতেন শুনতে শুনতে আমি পুলকিত হয়ে উঠতাম। কী সম্মানই না তাঁরা করতেন ভারতের এই অপরূপ সংস্কৃতি-দূতকে! রবার্ট লিন্ড তাঁকে দেখে পরে একবার লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে handsome বলা চলে না—বলতে হয় beautiful. তিনি Y. Y. উপনামে প্রতি সপ্তাহে একটি ক'রে রসাল প্রবন্ধ লিখতেন "নেশন" সাপ্তাহিকীতে। তাঁর কয়েকটি রসিকতা আমি আমার খাতায় টুকে রেখে-ছিলাম, যথাঃ

"Nothing could be more absurd, however, than to regard a belief in ghosts as absurd."

প্রসংগটা যখন উঠল তখন কিছু লিখিই না কেন এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে। ব্যাপারটা এই যে, এই সময়ে আমি ইংল্যান্ডে বকম্যারি ভৌতিক কাণ্ড নিয়ে মহোৎসাহে চর্চা করা শুরু করেছি। উচ্ছ্বাসী স্বভাব তো, যা-ই মন টানত তাতে লিপ্ত হতাম সোৎসাহে। সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির লেখাপড়া শুরু করলাম খোঁজ খোঁজ কোথায় কী বইপত্র আছে! মহোৎসাহে কেম্ব্রিজ লাইব্রেরিতে গিয়ে স্যর উইলিয়াম ক্রুকস-এর ডকুমেন্টারি প্যাম্ফলেট, স্যর উইলিয়াম ব্যারেট, স্যর অলিভার লজ, মায়ার্স আর অনেক খ্যাতনামা কৃতবিদ্যদের বই প'ড়ে ফেললাম। এমন কি, প্যারিসে গিয়েই এক নামজাদা সাইকিক-এর সংগে আলাপ করলাম—ভূতের কথা উঠল আমারই এক চিঠিতে। তারা বড় কী! বই দেখেশুনে শেষে ঠিক করলাম, রবার্ট লিন্ড ঠিকই বলেছেন আমরা নানা কুসংস্কারে ভরা বলেই দেখেও দেখি না যে, ভূত মানাকে কুসংস্কার বলাটা গোঁড়ামির, সুতরাং এও আর এক কুসংস্কার। তাছাড়া, জ্ঞানের রাজ্যে অস্পৃশ্য বলে কিছু আছে এমন কথা মানলে বিজ্ঞানের আদিম প্রেরণাকেই নামঞ্জুর করতে হয়।

এখানে একটি কথা বলে রাখি—নৈলে কেউ কেউ আমাকে হয়ত ভুল বুঝতেও পারেন। কথাটা এই যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব (spirituality) ও প্রেততত্ত্ব (occultism) সমার্থক নয়। প্রথমটির যোগাযোগ সাক্ষাৎ ভগবানের সংগে, দ্বিতীয়টি ভগবান
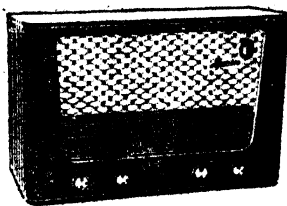
ও জীবের মধ্যে নানা অদৃশ্য জগৎ আছে তাদের সঙ্গে। যোগীদের মধ্যে কখনো কখনো নানান্ অলৌকিক বিভূতির আবির্ভাব হয়, এইসব নেপথ্য শক্তির সংস্পর্শে, আবার কখনো কখনো নানা শুভংকর দিব্যশক্তির আবির্ভাব হয় ভগবানের প্রত্যক্ষ বরে। তাই বড় যোগীরা অনেক সময়েই নেপথ্যতান্ত্রিক হওয়ার সমর্থন করেন—জীবনের উপর কাজ করতে, যথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life Divine-এ লিখেছেন যে, আধ্যাত্মিক মানুষকে পূর্ণায়ত হ'তে হ'লে তাঁর আন্তরলোককে সমৃদ্ধ করতে হবে মূলত চারটি পথের খবর রেখে: ধর্ম, নেপথ্যতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। তাঁর ভাষায়:

"There are four main lines which nature has followed in her attempt to open up the inner being : religion, occultism, spiritual thought and an inner spiritual experience."

এখানে তাঁর ভাবধারার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তার দরকারও নেই—কেননা যাঁরা অন্বেষু, তাঁরা Life Divine-এর The Evolution of the Spiritual Man অধ্যায়টি সহজেই আনন্দে পড়ে যা কিছু জানার আছে জেনে নিতে পারেন। আমি নিজে এ বিষয়ে কিছু খবর রাখি বটে, কিন্তু সেসব কথা লেখার এখনো সময় হয়নি, যদিও কিছু খবর দেবার লোভ সংবরণ করতে পারিনি বলে "অঘটন আজো ঘটে" প্রকাশ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু এ বইটির প্রধান উপজীব্য নেপথ্যতত্ত্ব নয়—সাক্ষাৎ ভগবানের প্রসাদ, করুণা, ভক্তের সঙ্গে আদানপ্রদান। যাক সে, এ সম্বন্ধে পরে আরো বিশদ করে লিখতেই হবে বলে এখন শুধু এই গৌরচন্দ্রিকাটি গেয়েই থামি—পালাগান শুরু হবে যথাকালে। এখন রবীন্দ্রনাথের হারানো খেইয়ে ফিরে আসি।

আমি এই সময়ে খানিকটা মন স্থির ক'রেই ফেলেছিলাম যে, আমার কুষ্ঠিতে সন্ন্যাসী হবার স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকলেও মামুলি সন্ন্যাসী হওয়া আমার চলবে না কিছুতেই—কারণ একে আমার স্বভাবে কর্মের তাগিদ প্রচণ্ড তার উপর প্রাণলোকে উচ্চাশা এসে হাজির দিয়েছে যে জগতে কীর্তিপ্রতিষ্ঠ হ'তেই হবে। আর ঠিক কিনা এই সময়ে দেখা এমন এক মহা-কীর্তিমানের সঙ্গে—দিনদুনিয়ায় যাঁর কীর্তির জুড়ি মেলা ভার! (রোলাঁ ও রাসেলের সঙ্গে তো তখনো দেখা হয়নি) তাঁর বহুমুখী কীর্তি, ব্যক্তিরূপ প্রতিভা-দীপ্ত মুখ, কথার ভঙ্গি—সবই আমার যেন চোখ খুলে দিল, মন উঠল গান গেয়ে: এই-ই তো চাই—এ'র তো নাম সার্থকতা! পরে রোলাঁ আমাকে একটি পত্রে কবির সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "Quelle harmonie!"—কী সুষমা!

সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন"এ আছে:

"All problems in life are essentially problems of harmony."

সত্যিই তো—মনে হ'ল আমার—সব বাধা জয় করে যে জীবন ফুলের মতন ফুটে উঠতে পারে তারি তো নাম সার্থক জীবন! রবীন্দ্রনাথকে দেশের পরিবেশে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর রূপে, মধুর কণ্ঠে, মৃদু রসিকতায়। কিন্তু বিলেতে তাঁকে গৌরবে অচলপ্রতিষ্ঠ দেখলাম যার তার মাঝে তো নয়—বড় বড় মনীষী গুণী তার্কিকদের সভায়। কী আত্মমর্যাদা জ্ঞানই ছিল তাঁর। কোথাও কি পান থেকে কোনোদিন চুনটি খসেছে!

আত্মমর্যাদার কথা বলতে একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমি একদিন তাঁর ওখানে সাউথ কেনসিংটনে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি এমন সময়ে কয়েকটি ভারতীয় ছেলে এল দরবার করতে। কী? না, জালিয়ান-ওয়ালাবাগে হাজার বারোশো নিরস্ত্র নরনারী জেনারেল ডায়ারের গুলিতে মরেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় তাঁকে সভাপতি হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল বিরক্তিতে। তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন: "তোমাদের কি লজ্জা করে না একটুও? জালিয়ানওয়ালাবাগে আমরা পশুর মত মার খেয়েছি—হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে অনেকে প্রাণ বাঁচিয়েছিল—এই কথা এখানে হাটে বাজারে প্রচার করতে চাও?—আমাদের চরম অপমানের কথা ঘোষণা করবে বড় গলা ক'রে? ভাবো কি এ-ধরনের আন্দোলনে সুফল ফলবে? ফলতে পারে কখনো? এরা শুনে বলবে: যারা এহেন
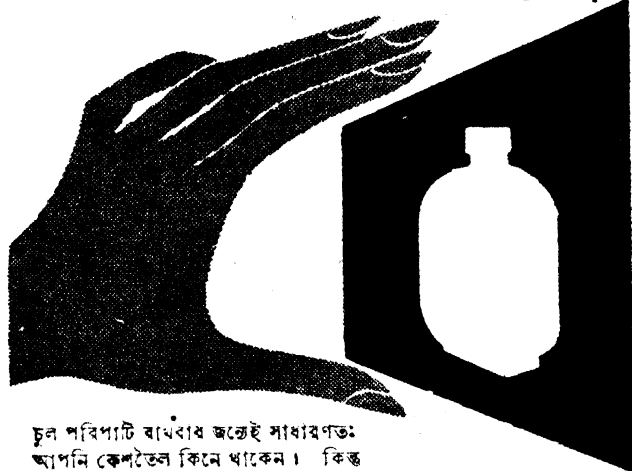
পাশবিক অত্যাচার মুখ বুজে সয়—হামাগুড়ি দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে কোনোমতে প্রাণ বাঁচায় তারা অমানুষ—কাজেই তাদের জন্তুর মতন গুলি করা ঠিকই হয়েছে। যাও তোমরা—দেশের প্যানি ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতেই যদি কোমর বেঁধে থাকো তবে সে-ঢাকীদের মধ্যে আমাকে ভর্তি করবার মিথ্যে চেষ্টা কোরো না।"

কবির ক্রুদ্ধ রাঙা মুখ আজও মনে পড়ে। এত তীক্ষ্ণ কথাও তাঁর মুখে কখনো শুনিনি। ওরা চ'লে যাবার পরে আমাকে বললেন: "দিলীপ, পেট্রিয়ট হ'লে কি জাঁক ক'রে বোকা বনতেই হবে? আমরা এ-স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা হীনতা ভীরুতো প্রচার ক'রে এদের আদর কুড়তে ছুটব? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলে-ছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদের এসে ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ব'লে—কাঁদুনি গান নি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়ে-ছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত বড় দীনহীন। বলতেন: 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড় ক'রে দেখো না।' আমেরিকানদের সামনে এসে তিনি মাথা উঁচু ক'রেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে দাও গো' ব'লে, তাহ'লে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।"

যাহোক এবার আমার নিজের কথা পাড়ি।

মনে আছে এ-ঘটনার পরেই তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়—আমি কী করব তাই নিয়ে। আমি তাঁকে বলি আমার সদা-দোদুল্যমান মনকে নিয়ে বিপদে পড়ার কথা। তিনি সব শুনে হেসেই অস্থির। এ রকম ডাক শুনলে মতিভ্রম না হয় কে—করেছিলেন এই ধরনের একটা ঠাট্টা। কিন্তু সে যাক। শেষটায় তাঁকে বললাম আমতা আমতা ক'রে বন্ধু বেটসের কথা: চার্টার্ড আকাউন্ট্যান্ট হ'লে না কি বিস্তর উপায় করা যায়—সেই টাকার সঙ্গে আমার নিজের আয় যা কিছু আছে সব জুড়ে এক সংগীতের আকাডেমি গ'ড়ে তুলবার অভিপ্রায়। শুনেই কবি হেসে কুটি কুটি, বললেন: "বলো কি হে! শেষে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট—তুমি? পাঁচশো পাউন্ড জমা দিয়ে articled হবে? দিলীপ দিলীপ! You are the limit!"

তাঁর এ-বাক্যের সফলতায় নিশ্চয় লালচে হয়ে উঠেছিলাম, কারণ তিনি আমার দুরবস্থা দেখে ঠাট্টার সুর ছেড়ে তৎক্ষণাৎ ধরলেন স্নেহের সুর। তিনি আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন: "মানুষকে ঠাট্টা করে সে-ঠাট্টা নিজে উপভোগ করবার সময়ে কিন্তু দেখো—যাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ সেও উপভোগ করছে কিনা। অর্থাৎ যাকে বলে laugh with him—not at him") বললেন: "শোনো দিলীপ! তোমার সঙ্গে কলকাতায় বেশি দেখা হয়নি বটে, কিন্তু তোমার অনেক খবর রাখি। তুমি গান-পাগল শুনে অবধি তোমাকে আরো স্নেহ ক'রে এসেছি প্রথম থেকেই। কিন্তু এত সদাদোদুল্যমান হ'লে তো বলতে পারবে না: 'শসাং মে গৃহ্যমাণস্ম্'। শরৎ-এর কাছে শুনেছি, তোমার বাবা তোমার জন্যে যথেষ্ট রেখে গেছেন, তার পরে তোমার দাদার সে-সম্পত্তি খাটিয়ে নাকি চতুর্গুণ ক'রে

তুলেছেন। তাই তোমার নেই অম্লাচন্তা চমৎকারা। এহেন তুমি গানকে শুধু নেশাই রাখবে? পেশাও করবে না? গান গেয়ে আমাদের মাতিয়ে দেবে না? এ যে তোমার স্বধর্ম তা-ও কি ভেবে-চিন্তে বুঝতে হবে? তুমি যে গানকে সত্যি ভালোবেসেছ—না জানে কে?"

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম: "গান ভালো না বাসে কে বলুন? কিন্তু শুধু গান ভালোবাসলেই তো হবে না—প্রতিভা ব'লেও কি কিছু নেই। আমি জানি, আমার সুকণ্ঠ আছে, কিন্তু যদি ধরুন প্রতিভা—মানে সৃষ্টির প্রতিভা—না থাকে?"

কবি আমার কাঁধে স্নেহভরে হাত রেখে বললেন: "অত পরিণাম চিন্তা নাই করলে। আর ধরো যদি গানে সৃষ্টির প্রতিভা তোমার নাই থাকে—তাহলেই বা কী। গান গাওয়ায় সিদ্ধি ঠেকায় মারে কে? এদেশেও কি গায়ক মাত্রেই কম্পোজার নাকি? না শোনো, যত সাত পাঁচ না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ো না হে! শরৎ-এর কাছে শুনেছি, তুমি নাকি কচি বয়স থেকে পড়েছ মহাভারত পড়েছ। তাহলে গীতায় পড়ো নি কি যে, মানুষের কর্মেই অধিকার—কর্মফলে নয়, তাছাড়া, সংসারে অনেক যারা পৌঁছতে পারে না তারাও লক্ষ্যমুখে চলতে শুরু করলে সেই চলার সাধনার মধ্যে দিয়ে কি কিছুই পায় না ভেবেছ? না না না। সর্বনাশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কিছুতেই না। তুমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে কলম উঁচিয়ে টাকা আনা পাই হিসেব করছ এ আমি ভাবতেই পারি নে। তোমার ঈশ্বর বন্ধু তোমাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবার উপদেশ দিয়েছেন—গান কী বস্তু তিনি জানেন না বলে। হিসেবি হতে পারে তারাই—যারা গাইতে পারে না। লেনদেনিতে টাকা হয় বটে, কিন্তু গান হয় না সিন্দীপ। তাছাড়া, ও-কাজে কী খাটুনি জানো না তো—ও সর্বনেশে হিসেবের কথাকে মনেও ঠাঁই দিও না হে, দিও না—কথা শোনো।"

এর পরেও মন আমার দুলেছিল জের বার্লিনে বিখ্যাত মানব রায়ের সঙ্গে দেখা করে। তিনি বলশেভিকদের—বিশেষ করে লেনিনের এমনি গুণগানই করলেন যে, মনে হল রাশিয়ায় যাই—দেখে আসি ওরা কী অপূর্ব নবমুক্তি রাজ্য গড়ছে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে আমার মনের শেষ দুর্দিন যায় থেমে—যেকথা আগে বলেছি। পরের ঘটনা বলা হয়ে গেছে—আগের অধ্যায়ে। যাক্।

কবে কোন্ তারিখে ঠিক কোন্ ঘটনা ঘটেছিল নিশ্চয় করে বলতে পারব না। তবে ভরসা এই যে, আমার স্মৃতিশক্তি সত্যিই আশ্চর্যরকম পটু ছিল ছেলেবেলা থেকেই। আমাকে যাঁরাই একটু কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরাই একথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমি বলবার চেষ্টা করি নি বা যা তিনি বলেছিলেন—বলেছি ভাবটা—এবং নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, সেখানে মনগড়া কোনো কথা লিখি নি। তাছাড়া তাঁর কথা মনে রাখা আমার পক্ষে খুব দুঃসাধ্য মনে হয়নি কোনোদিনই, কারণ শুধু এই নয় যে, তাঁর মতন গুছিয়ে বাংলা বলতে আমি আর কাউকে শুনি নি—এও বটে যে, তাঁর নানা কথা নিয়ে নানা লোকের সঙ্গেই আলোচনা করেছি সোৎসাহে—তাই মনে দাগ বসে গেছে। কিন্তু এবার আমার জীবনের ইংলণ্ড পর্বের সমাপ্তি টানি।

১৯২১ সালের জুলাইয়ে সুভাষ দেশে ফেরে, আমিও যাই জর্মানীতে। একথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না যে, সুভাষের সঙ্গে যতদিন ইংলণ্ডে ছিলাম ততদিন আমার সাড়ে পনের আনা না হোক, বারো আনা মন সে-ই জুড়ে বসে ছিল। ফলে সে ইংলণ্ডে থাকতে আমি আর কোনো বন্ধু-বান্ধবীর দিকে চোখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসত পাই নি। কিন্তু এজন্যে

আমার খেদ নেই একটুও—কারণ সে যে আমাকে দীক্ষা দিয়েছিল প্রেমের মন্ত্রের—যার চেয়ে বড় মন্ত্র আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি। আমার উচ্ছ্বাস-আবেশ-উচ্ছল কৈশোর জীবনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি—ভাগবত ভক্তি, তার পরেই সুভাষের প্রতি ভালোবাসা। সে-ভালোবাসা যেন আমাকে নেশার মতন পেয়ে বসেছিল। আজো যেন সেই পুলকশিহরণের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারি।

যাহোক, সুভাষ চ'লে যাওয়ার পর একদিকে যেমন শূন্যতা এসে মনকে ব্যথিয়ে তুলল, তেমনি অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ এল—য়ুরোপের নিকট পরিচয় পেয়ে—যৌবনের দীপ্ততর মুক্ততর চোখে রোলাঁ, রাসেল ও বহুজাতের য়ুরোপীয় নরনারীর মধ্যে—তবে ইংলণ্ডে নয়, কন্টিনেন্টে।
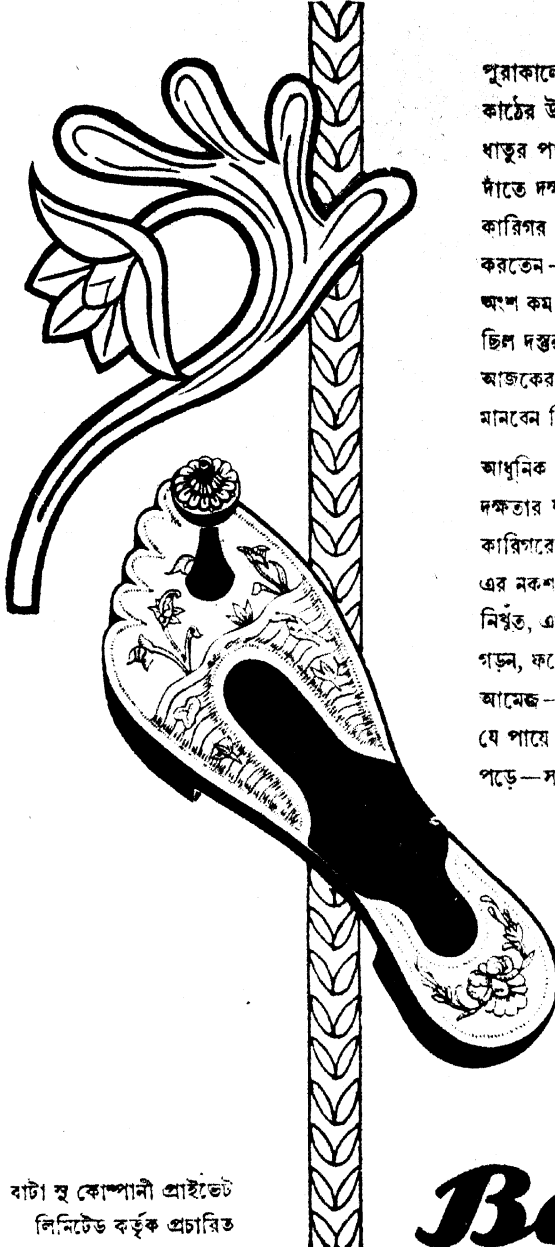
(ক্রমশ)

গোড়ায় গলদ

শ্রীকানাইলাল বসু

দেশের দশের উন্নতি আর মঙ্গল—স্বাধীনতার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমাদেরও তাই। উন্নতির কাজ যাতা করে বা এলোমেলোভাবে হয় না—হয় পরিকল্পনা মাফিক চললে। কাজেই স্বাধীনতা হয়ে এতক কত রকম পরিকল্পনার কথাই যে শোনা যাচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মূলগুলো হল প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা—তার মধ্যে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য যোজনা (যোজনা-পরিকল্পনার অতি আধুনিক শব্দচয়ন)।

সবই হচ্ছে, কিন্তু আসল কাজের কাজ কতটা হয়েছে সেইটাই যে তলিয়ে দেখা দরকার। এগার বার বছর হলো স্বাধীনতা এসেছে—এখনও যে লোকে ঠিকমত খেতে পরতে পায় না! কিন্তু কেন? উত্তর খুব সোজা আর সরল। আমাদের এগিয়ে চলার কাজের গোড়াতেই যে গলদ রয়ে যাচ্ছে—যার জন্যে আমরা কাজ করেও সন্তোষজনক ফল পাচ্ছি না আজও। তাইতো প্রয়োজন আরও তলিয়ে দেখবার—গলদটা কোথায়?—গলদটা কি? সেটা যে শোধরাতেই হবে—না হলে তাসের ঘরের মত সবই যে শেষে পণ্ড হবে।

আসলে ভুল হয়েছে পরিকল্পনা রচয়িতাদেরই। সে ভুল পরিকল্পনা রচনায় নয়—সে ভুল হয়েছে যার জন্য পরিকল্পনা তাকেই বুঝতে। ভারতকে বুঝতে তাদের ভুল হয়েছে। চকচকে পেতলকে সোনা বলে ভুল করলে যে ভুল হয় তাদেরও তাই হয়েছে। চাকচিক্যভরা দুটো শহর ভারত নয়—গ্রাম ভারতই সত্যিকারের ভারত। দেশের প্রতি পাঁচজন লোকের মধ্যে চারজন লোক এই গ্রাম-ভারতেরই বাসিন্দা। জন্ম, কর্ম, মৃত্যু—সবই তাদের এখানেই। পরিকল্পনা রচয়িতারা এই সহজ সরল সত্যটাকে বুঝতে পারেন নি—আবিষ্কার করতে পারেন নি আসল ভারতকে—তাই তো আজ দিকে দিকে এত গলদ, হিসেবে এত গরমিল। পরিকল্পনার মধ্যে আছে গ্রামীন উন্নতির কথা, আছে কৃষির উন্নতির কথা। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেটা গ্রামীন উন্নতির মুখোস পরা শহরাঞ্চলের উন্নতি— গ্রামটা বাইরের ঠাট—আসল উদ্দেশ্য শহর। কাজেই কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আজ না হয়েছে গ্রামের উন্নতি—না হয়েছে কৃষির উন্নতি—চাষী যে গরিব সেই গরিবই রয়ে গেছে। অথচ প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় আমাদের বেড়েছে শতকরা আঠার ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে হয়তো আরও বেড়ে হবে শতকরা পঁচিশ ভাগ। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? জাতীয় আয় বাড়াতে গ্রামীন-ভারতের প্রধান উপজীবিকা যে কৃষি—তার কতটুকু উন্নতি হয়েছে? উন্নতি তো দূরের কথা বরং অবনতিই হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে জাতীয় আয় বাড়ে নি উল্টে কমেছে আর তার প্রধান কারণ গ্রামীন ভারতের আর্থিক অবনতি—গ্রামীন ভারতের প্রধান উপজীবিকা যে কৃষি তার অবনতি।

ভারতের শতকরা বিরাশী ভাগ লোক গ্রামীন ভারতের বাসিন্দা। কিন্তু এই গ্রামীন ভারতের আসল সমস্যা কি—কি তার সমাধান,—পরিকল্পনা রচয়িতারা হয় সেটা বুঝতে পারেন নি নয়তো বুঝেও গুরুত্ব দেন নি। তাই আজকে দেশের আর্থিক অবস্থায় এই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এর পরও দেখা যাচ্ছে পরিকল্পনা রচয়িতাদের কৃষির দিকে নজর নেই, ঝোঁক আছে শিল্পোন্নয়নের দিকে বেশী—শিল্পোন্নয়নের মারফৎ তাঁরা দেশের লোকের রুজি-রোজগারের রাস্তা করে দিতে চাইছেন। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বড় শিল্প যে কৃষি আর সেটা তো গ্রামীন ভারতেই রয়েছে! এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে কেন সেখানে প্রথমেই নতুন করে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার এই অবাস্তব পরিকল্পনা? আগে গ্রামের কৃষির যতটা উন্নতি করা সম্ভব, ততটা হোক—অন্ততঃ তাকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হোক—তারপরেই তো উঠবে সেখানে অন্য শিল্প গড়বার প্রশ্ন—সেইটাই তো স্বাভাবিক। একথা ভুললে চলবে কি করে যে, ভারত কৃষি প্রধান দেশ—কৃষিই এখানে মূল আর সবচেয়ে বড় শিল্প। ভারতের সমস্ত লোককে এই কৃষিই খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে—বিভিন্ন কলকারখানা শিল্পের জন্য যোগাচ্ছে কাঁচা মাল—এই কৃষিজাত জিনিসের বাড়তি উদ্বৃত্ত দিয়েই ভারতকে রোজগার করতে হয় বৈদেশিক মুদ্রা, যা দিয়ে তাকে কিনতে হয় অন্যান্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। শুধু তাই নয়, ভারতের জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ যোগায় এই কৃষিই।

এ তো গেল আর্থিক স্বরূপ। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে—গ্রামীন উন্নতির আড়ালে শহরাঞ্চল ধাঁচের উন্নতির ওপর এই যে একটা প্রচ্ছন্ন ঝোঁক—এটা ভারতীয় ঐতিহ্য বিরোধী। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র—সব কিছুর সঙ্গেই হয় প্রত্যক্ষ নয়তো পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে আছে আর্থিক অবস্থার প্রভাব—আর এই সব নিয়েই তো ঐতিহ্য। কাজেই ঐতিহ্য বিরোধী কোন কাজে সত্যিকারের মঙ্গল হতে পারে না। ভারতবাসীর দারিদ্র্য আর ধর্মীয় ঐতিহ্য এই দুটো প্রধান বিষয়ের ওপর নজর রেখেই যা-কিছু করবার করতে হবে।

দুটোর যে কোনটার উপেক্ষা সমস্যার সমাধান তো করবেই না—উপরন্তু অবস্থা করে তুলবে আরও ঘোরালো। দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করলে সমস্যার সমাধান হবে অবাস্তব—আর সামাজিকতায় ভরা ধর্মীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করলে দেশের লোক হবে মনক্ষুণ্ণ, সহযোগিতা হবে দুর্লভ। পরিকল্পনা রচয়িতারা এই দুটির কোনটিকেই তাদের ন্যায্য পাওনা দিয়েছেন কি না সন্দেহ।

খাবার জিনিসের উৎপাদন সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রশ্ন বা কৃষি সমস্যাই যে ভারতের মূল সমস্যা—এই সমস্যার সমাধানের ওপরই যে ভারতের সত্যিকারের কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করছে—এই বিষয়টা বহুদিন যাবতই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হচ্ছে। এই সব আলোচনার ফল স্বরূপ পাওয়া গেছে শুধু সরকারী উপেক্ষা। ১৯৪৯ সালে সরকার বল্লেন যে, দেশে বড় রকম একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে বা কেন্দ্রীয় মজুতের জন্য দরকার না হলে সরকার ১৯৫১ সালের পর আর খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানী করবেন না। তারিখের সীমারেখা হিসেবে ১৯৫১ সালকে ঠিক করা হল এই জন্য যে, ঐ বছর থেকেই শুরু হল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ। উর্বর সরকারী মস্তিষ্কে খেললো—একবার যখন পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে তখন কাজ এগুবার সংগে সংগে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়বে—আর তা হলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করতে হবে না। কিন্তু তাঁরা এটা বুঝলেন না যে, কাগজে কলমের হিসেব আর বাস্তবের হিসেবের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ আছে। তাই বাস্তবে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ হল না বা বন্ধ করা গেল না। আরও খুলে বললে দাঁড়ায়, এই যে আমদানী বন্ধ তো হলোই না বরং পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগের প্রথম তিন বছরে যে পরিমাণ আমদানী হচ্ছিল শুরু হওয়ার পরের তিন বছরে সেটা আরও অনেক বেড়ে গেল। এমনিই মাহাত্ম্য পরিকল্পনার! ১৯৪৮, '৪৯, আর '৫০ সালে আমরা বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করেছি যথাক্রমে আটাশ, সাঁইত্রিশ আর একুশ লাখ টন। পরিকল্পনার পরের তিন বছরে (১৯৫১, '৫২, '৫৩) করেছি যথাক্রমে সাতচল্লিশ, উনচল্লিশ আর কুড়ি লাখ টন। কপাল গুণে আর প্রকৃতির দয়ায় ১৯৫৪ আর ১৯৫৫ সালে ভাল ফসল হলো—ফলে আমদানী কিছুটা কমলো বটে তবে একেবারে বন্ধ হল না। আমদানী হল মাত্র যথাক্রমে আট আর সাত লাখ টন। কিন্তু তার পরের বছরেই আবার যে কে সেই—খাবার জিনিসের জন্য সেই আমদানীর স্মরণাপন্ন হওয়া। ১৯৫৬ সালে আমদানী হল চোদ্দ লাখ টন—১৯৫৭তে হল ছাব্বিশ লাখ আর ১৯৫৮তে

হল আরও বেশী। এই সব আমদানীর মানে হচ্ছে বছরে গড়ে প্রায় একশ পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা খরচ। টাকার অংকটা কি সামান্য? কিন্তু এই যে গরমিল এর কারণ কি? প্রধান কারণ সরাসরি দুটো। প্রথমটা পরিকল্পনা রচয়িতারা গোড়াতেই গলদ করে বসেছেন। বাড়ি করতে হলে ভিতকে প্রয়োজনীয় প্রাধান্য, গুরুত্ব, অগ্রাধিকার সব কিছুই দিতে হবে—না দিলে বাড়ি হবে না—জোর করে করতে গেলে [illegible] হবে। তেমনি ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্ হল কৃষি—তার প্রাধান্য, তার গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই—অস্বীকার করলে সত্যিকারের উন্নতি হবে না কিছুতেই। এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে না পারার ফলেই তো আজ এত গোলমাল। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, একে তো কৃষিকে তার পাওনা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি উপরন্তু কৃষির জন্য যা কিছু এযাবৎ করা হয়েছে—সবটুকুই হয়েছে ভুল রাস্তায়। [illegible]

[illegible] দেশবাসী বিনা বাক্যব্যয়ে তা করেছে। কিন্তু সবেরই তো সীমা আছে। আজ বার বছর পরে উন্নতির এইতো নমুনা! ভুল পথে এগুলো অনন্তকাল আত্মত্যাগ স্বীকার করলেও অভীষ্ট লাভ হবে না। তবু নিরুৎসাহ হবার কিছু নেই। ভুল শুধরে নিয়ে আবার কাজ শুরু করলে উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে এবং ভারতবাসীও হবে রাজী।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এল। পরিকল্পনা কমিশন এখন থেকেই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করবার তোড়জোড় শুরু করেছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে গত মার্চ মাসে ভারতের নামকরা অর্থনীতিবিদেরা সব একত্র হয়ে পরিকল্পনার বিভিন্ন কাজ করবার জন্য কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক কমিটি গঠন করেছেন। আরও জানা গেছে যে, কৃষি আর সেচের পরিকল্পনার কাজের জন্য আলাদা আলাদা দপ্তর করা হয়েছে। পুরোনো ভুলের আবার কি পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? কৃষি আর সেচের সম্পর্ক যে অংগাংগিভাবে জড়িত সরকার আজও তা কি উপলব্ধি করতে পারছেন না? আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত দপ্তরে পরস্পরের সহযোগিতা যদি না থাকে তো সবই পণ্ড হবে—আর কাজ যেভাবে শুরু হতে চলেছে তাতে সে সম্ভাবনাই বেশী।

ভুল আরও আছে। প্রকাশিত খবরে দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা কমিশন এবারেও শিল্পকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য, অগ্রাধিকার আর গুরুত্ব দিচ্ছেন—কিন্তু কি করে লক্ষ্যে পৌঁছন যাবে—পৌঁছবার ক্ষমতা বা রসদ আদৌ ভারতের আছে কিনা সেদিকে তেমন নজর দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। কৃষি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে বাড়তি উৎপাদনের লক্ষ্য হিসেবে ধরেছেন খাদ্যশস্য এগার কোটি টন, তুলো আশী লাখ টন, পাট পঁয়ষট্টি লাখ, চিনি নব্বই লাখ, বিভিন্ন তেলের বীজ নব্বই লাখ টন। যাঁরা সেচ নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাঁরা মনে করছেন, তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে তাঁরা প্রায় সতের লাখ একর নতুন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কাগজে কলমের এই হিসেব বস্তুতে কি দাঁড়াবে সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ক্ষমতা না জেনে কাজ নেবে দেশের মধ্যে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচয়িতারা আজ ডেকে এনেছেন—ঠিক সেই একই ভুল তাঁরা আবার করতে চলেছেন। বস্তুতে দেখা যায় যে, কমিশনের কতকগুলো নিজস্ব মনগড়া ধারণা আছে—বাস্তবের সঙ্গে তার যোগাযোগ বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাক বা না থাক—তাঁরা সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই চলবেন। পরিকল্পনা কার্যকরী করবার ক্ষমতা বা রসদের প্রশ্ন দেখা দিলেই কি কমিশন, কি সরকার উভয়েই সেই বাঁধা-ধরা ছকের আশ্রয় নেবেন—যেমন বিদেশ থেকে টাকা ধার করা,

ঘাটতি ব্যয়, নতুন বা বাড়তি হারে কর বসানোর মাত্রা বাড়ানো ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা ভুলেও একথা চিন্তা করেন না যে, কোন্ পন্থাটা দেশের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সংগে খাপ খাবে—কি খাবে না। ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেও দেখা যাচ্ছে, যে পন্থা বদল করবার তেমন কোন আগ্রহ বা চেষ্টাও তাদের নেই। যেমনকার ব্যর্থতা তেমনই পড়ে রইল—বরং সমবায়ের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষির ওপর নতুন করে পরীক্ষা চালানোর জন্য তাঁরা খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

ইতিহাস শুধু অতীতের ঘটনা চোখের সামনে তুলে ধরে তা নয়—উপরন্তু লোককে শিক্ষাও দেয়—তবে তা নিতে জানা চাই। চোখের সামনে রয়েছে চীন। আমাদের আজকের পরিকল্পনা রচয়িতাদের মত চীনও একদিন দেশের ঐতিহ্য ভুলে, দেশের সামর্থ্য ভুলে আমাদের মত ভাবের আবেগে, রুটীর আগে ইস্পাতকে যায়গা দিয়েছিল —প্রাকৃতিক সারকে অবহেলা করে তুলে নিয়েছিল রাসায়নিক সার—ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থাকে, পুকুরকে, কূপকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে বড় বড় নদী উপত্যকা পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠেছিল। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও লাভ হল কি? কৃষির উৎপাদন শতকরা এক ভাগও বাড়ল না। চীনের পরিকল্পনা রচয়িতারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, বদলালেন পন্থা। দেশের উপযোগী প্রাকৃতিক সার, ছোট ছোট খাল, নানা কূপের সাহায্য নিলেন দেশের কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য। ফল হল অবিশ্বাস্য। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ল শতকরা নব্বুই ভাগ অন্যান্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়ল শতকরা একশ ভাগ। কোথায় রইল গালভরা বড় বড় পরিকল্পনার কথা! এটা সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র কারণে—যে চীনের পন্থা দেশের সামাজিক আর্থিক অবস্থার উপযোগী ছিল—পরিপন্থী ছিল না—যা হচ্ছে আমাদের দেশে।

চীনে যে জিনিস সম্ভব হতে পারে আমাদের দেশে যে তা হতে পারে না—সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত। দরকার দৃষ্টি-ভংগীর পরিবর্তন—দরকার ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা, আর্থিক সংগতির উপযোগী বাস্তব পন্থা। দরকার মূলধনের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার—মূলধন শুধু উদ্বৃত্ত টাকাই নয়—কৃষি মূলধন বলতে বোঝায় চাষী নিজেই, তার জমি, তার চাষের সরঞ্জাম, তার খাটবার ক্ষমতা, সব কিছুই বোঝায়—আর এই সবের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের ওপরই উৎপাদনের কমা বাড়া নির্ভরশীল। দেরী হলেও এখনও সময় আছে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করবার।

চৌত্রিশ

দেশে কিছু করে উঠতে পারল না বলে যে ভূষণ দেশ ছেড়ে শ্রীহট্ট যেতে মন করল, তা কিন্তু নয়। এখানে সে যে কিছুই করতে পারেনি, সে কথা সত্য নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সে পসার জমিয়ে নিয়েছিল। তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাক আসতে শুরু করেছিল দূর দূর গ্রাম থেকেও।

চিকিৎসা করাটাই তার আয়ত্তের মধ্যে আছে। সেটা তার দায়িত্ব, সে তাই প্রাণপণে চিকিৎসা করে গিয়েছে। তার বদলে পয়সা সে অবশ্য পায়নি। পেয়েছে খুবই সামান্য। সে-প্রাপ্য না পাওয়াটা, তবে তার জন্য ভূষণকে দায়ী করা বৃথা। কারণ টাকা দেবার কথা তার রোগীদের, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেনি, করতে পারেনি।

তাহলে কি এটা বলা ঠিক হবে, তুমি কিছুই করতে পারছ না দেশে?? ভূষণ, তুমি কিছুই করতে পারনি। না-না তা কেন? ভূষণ নিজের মনকেই বলল, তার যা সাধ্য তা করেছে। শত অসুবিধা উপেক্ষা এবং উপহাস সহ্য করেও সে কি জনহিতের জন্য নানা রকম আবিষ্কারের চেষ্টা করেনি? সে কি ডাক্তারি ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে টাকা রোজগারের চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে কখনও? কখনও না। কস্মিনকালেও সে ক্ষান্ত দিত না।

না ব্যাপারটা তা নয়। ব্যর্থ হয়ে অথবা অভাবের তাড়নায় সে দেশ ছাড়ছে না। ব্যর্থতা কাকে বলে ভূষণ জানে না। ভূষণের দুনিয়ায় অভাব বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবে যে সে ভূপতির চিঠি পাওয়া মাত্র যাব-যাব বলে নেচে উঠল, তা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ভূষণের রক্তে প্রচণ্ড এক নেশা আছে। চঞ্চলতার নেশা। এই নেশা কখনও তাকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। তাকে শুধু ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এই নেশা তাকে দিওয়ানা বানিয়েছে, সন্ন্যাসী করে ছেড়েছে। সংসার পাতার পর অনেকদিন ঘুমিয়েছিল সেটা। সেজদার চিঠিখানা সেই ঘুমন্ত নেশাটাকে যেন উস্কে দিল। জাগিয়ে দিল। আর ভূষণের কাছে এই বহুদিনের অভ্যস্থ সীমানায় চলাফেরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে লাগল।

সত্যি বলতে কি, যেদিন ভূপতির চিঠিখানা হাতে পেয়েছে ভূষণ, সেইদিনই সে শ্রীহট্টের অজানা এক চা-বাগানে চলে গেছে। এই যে, যে-ভূষণকে সবাই এখানে দেখছে, সেটা কিন্তু আসল ভূষণ নয়, তার খোলস।

কিন্তু খোলসটাই বা অনর্থক একটা মাস এখানে পড়ে থাকল কেন? ভূষণ মনে মনে তাতেই বিরক্ত হয়ে উঠল। ভূষণ যে তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না, বলাই বাহুল্য, তার প্রধানতম কারণ গিরিবালা। গিরিবালা খুবে বেগ দিয়েছে তাকে। অচেনা জায়গায় যেতে তার বড় ভয়। আরে অচেনা বলে কিছু আছে নাকি জগতে? আজ যে অচেনা কাল সেসব লোক অন্তরঙ্গ। কিন্তু কূপমণ্ডূকে গিরিবালা, জগতের কোন কিছুই দেখেনি, তাই কিছুই সে জানে না।

যাহোক, অনেক কষ্টে সে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছে গিরিবালাকে। গিরিবালার ভয় সে অনেকটা ভেঙেছে, ভূষণ এতেই খুশী। আর সে অনর্থক বিলম্ব করতে চায় না।

ভূষণের মন বলছে, ওই চা-বাগানে গেলেই তার অনেক স্বপ্ন সফল হবে। প্রথমত, বাঁধা একটা রোজগার থাকায় সংসারের ভাবনা তাকে ভাবতে হবে না। নিশ্চিন্ত মনে সে তার অসমাপ্ত গবেষণাগুলো একে একে শেষ করে ফেলতে পারবে।

আপাতত, সে স্থির করল, তার দুটো ওষুধের আলমারীর একটা (অপেক্ষাকৃত খারাপ যেটা) বিক্রী করে দেবে। বাকীটা বাড়িতে এনে রাখবে। সাইকেলটা সে নিয়েই যাবে সঙ্গে করে। আলমারির খদ্দেরও পেয়ে গিয়েছে ভূষণ। মহিন্দির কম্পাউন্ডার সরকারী হাসপাতাল থেকে পেনসন নিয়ে এখন ডাক্তার হয়ে বসতে চায়। বুড়ো বড় কঞ্জুষ। প্রথমে দামটা এতই কম হেঁকেছিল যে, ভূষণ পত্রপাঠ তাকে বিদায় করে দিয়েছিল। তারপর ভূষণ দেখল, সে আলমারির খদ্দের জোটান শক্ত। শেষ পর্যন্ত মহিন্দির বুড়োই দাঁও মারল। ষাট টাকার ভাল কাঠের আলমারি বিক্রী হল—মাত্র পঁচিশ টাকায়। যাক, তার জন্য ভূষণ হা-হুতাশ করল না। বরং ভালই হল, সে ভাবল, তবু ত ওষুধই থাকবে ওর ভিতর।

বাস, এখন সে মুক্ত। এবার সে কলকাতায়

যাবে। সেজদার কাছ থেকে নির্দেশ নেবে। তারপরে চলে যাবে শ্রীহট্ট। হ্যাঁ, আর-একটা কাজ বাকী। কলকাতায় যাবার আগে গিরিবালাকে তার বাপের বাড়িতে রেখে যাবে। ফিরতি পথে এসে ওদের নিয়ে যাবে সে। ব্যস্, সব ব্যবস্থা পাকা। তবে সামান্য একটা কাজ বাকী আছে। কিছু টাকা সংগ্রহ করা। ভূষণের কলকাতায় যাওয়া, গিরিবালাদের শ্বশুরবাড়ি পাঠান, এমনি সব কাজের জন্য কিছু টাকার দরকার। ভূষণ প্রথমে ওর পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা করল, পারল না। ধার পাওয়া সম্ভব নয়, সে জানে। আলমারি বেচে সে অবশ্য কিছু পেল। কিন্তু আরও কিছু চাই ত। শেষ পর্যন্ত অগতির গতি, গিরিবালার গহনায় হাত দেওয়া ছাড়া আর উপায় দেখল না ভূষণ।

কিন্তু প্রস্তাবটা সরাসরি গিরিবালার কাছে পেশ করা খুব সহজ ঠেকল না। কারণ বাক্সের গহনা যা ছিল, গিরিবালা তা ধরে দিয়েছে কয়েকবার, মাছের ব্যবসা, কণ্ট্রাক্টরি, ডাক্তারখানার বাকী ভাড়া এবং দোকান দেনা শোধ, চম্পির বিয়ে, এই সব নানান খাতে গিরিবালার ভোলা গহনাগুলো একে একে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কোনবার গিরিবালা স্বেচ্ছায় দিয়েছে 'সুদ সমেত আসল' ফেরত পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে। মাছের ব্যবসার সময় ভূষণ যখন গিরিবালার আর্মলেট জোড়া নেয়, তখন বলেছিল, লাভের টাকা দিয়ে (ভূষণ তখন হিসেব করে দেখেছিল, একশ টাকা লাগালে আড়াইশ টাকা ঘরে আসছে) আর্মলেট ত ফিরিয়ে দেওয়া হবেই গিরিবালাকে, তার উপর সুদ হিসেবেও একটা গহনা দেওয়া হবে তাকে, তার যা পছন্দ।

গিরিবালা আপত্তি করেনি, আর্মলেট জোড়া বের করে দিয়েছিল। গিনি-সোনার আর্মলেট। গিরিবালা বলেছিল, সুদের টাকায় তাকে একছড়া মটরমালা গড়িয়ে দিতে হবে, দেশী স্যাকরার গড়ান হলে চলবে না, কলকাতার বি সরকারের দোকানের জিনিস চাই। ভূষণ তাতেই ঘাড় নেড়েছিল।

সেই কোন্ ছোটবেলায় গিরিবালা বি সরকারের মটরমালা দেখেছিল, সে-কথা বড় হয়েও ভুলতে পারেনি। সে তখন ডোমারে। বাবার কর্মস্থলে। তখন তার মা-ও বেঁচে। হঠাৎ একদিন সাজ-সাজ রব পড়ে গেল সেখানে। ম্যানেজারবাবুর বড় মেয়ে লক্ষণার মুখে গিরিবালা শুনল, "পুজো স্পেশাল" আসবে। পুজো স্পেশাল কি, অজ্ঞ গ্রামের মেয়ে গিরিবালা তা জানত না। লক্ষণাই বলল, সে নাকি দারুণ জিনিস। আসলে রেলগাড়ি হলে হবে কি, প্যাসেঞ্জার যায়

মা [illegible]তে। গাড়িগুলো সব দোকান-পসারে ভর্তি। ম্যাজিক, বাইস্কোপ, কাপড়, পোশাক, গহনা, কলকাতার খাবার, মনোহারি জিনিসে ঠাসা। সত্যিই তাই। পুজো স্পেশাল দেখে গিরিবালার গ্রাম্য নাবালক চোখে যেন স্বপ্ন নেমে এসেছিল। মনে মনে সে ট্রেন-সুদ্ধ সব জিনিস নিতে ইচ্ছে করেছিল। তবে সব চাইতে তার মন কেড়েছিল বি স্বর্ণকারের দোকানের মটরমালা। সেদিন জিনিসটা কিনতে পারেনি সে। পারেনি বলেই মটরমালা পাবার বাসনা এত অক্ষয় হয়ে আছে।

ভূষণ একথা জানত। একথাও জানত, গিরিবালার আর্মলেট বেচা টাকায় তিন থেকে চার চালান মাছ আনতে পারলেই লাভের টাকা থেকে অনায়াসে মটরমালা গড়িয়ে নেওয়া যাবে। ফাঁকা কথা বলবার লোক নয় ভূষণ। সময়মত ছিপের কাছ সে বসিয়ে দিতে পারে [illegible] ব্যবসাটা চালু করতে পারলে, সাত পেটি করে মাছ দৈনিক চালান আনতে পারলে, সামান্য মাত্র লাভে [illegible] বিক্রী করলেও মাসে [illegible] দেড় হাজার টাকা লাভ থাকবে তার। তার থেকে আরও পঁচিশ টাকা [illegible] দিয়ে যাও না হয়, তবে ত এক হাজার টাকার [illegible] মন ছিল না। [illegible] গিরিবালার নামটাই খুঁজছিল [illegible] গিরিবালার গহনা [illegible] করেছে ভূষণ, [illegible] গিরিবালাকেই [illegible] গিরিবালাকেই [illegible] কোন-না-কোন [illegible] দাঁড়িয়ে গেছে। তাই গিরিবালার কোন গহনাই [illegible] ফিরে আসেনি।

[illegible] গিরিবালা [illegible] যদিও [illegible] ভূষণ, গিরিবালা [illegible] তবুও না হয় [illegible] একটা আনন্দ ছিল। এখন যে কারণ ভূষণকে গিরিবালার গহনা চাইতে হবে তাতে ত লাভের আশাও নেই, বরং হবার আনন্দও নেই।

[illegible] কি রাজী হবে গিরিবালা? কিভাবে পাড়া হয় কথাটা?

ভূষণ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। অন্য দিন, এতক্ষণ তার নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। আজ চোখের পাতা আর এক হতে চাইছে না। বাবার জন্য ছটফট করছে তার মন। সময় ত আর মোটেই নেই। অথচ এদিকে সে পথেরই জোগাড় করে উঠতে পারছে না। সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ে গিয়েছে ভূষণ।

গিরিবালা কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে যখন ঢুকল, তখনও লজ্জা যেন জিউলিগাছের আঠার মত তার সারা গায়ে লেপটে আছে। বড়-জায়ের চোখকে শেষ পর্যন্ত সে আর ফাঁকি দিতে পারল না। তার রকম সকম দেখে বড়-জায়ের বুঝি সন্দেহ হয়েছিল। একটু আগে এমন জেরা করতে শুরু করলেন যে, গিরিবালা লজ্জায় মুখ নামিয়ে সবই স্বীকার করে ফেলল।

দামিনী হাসতে হাসতে বললেন, তা ভাল। ঠাকুরপোরে বলেছিস ত?

গিরিবালা কথা বলল না, মুখ নিচু করে এ'টো থালে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল।

দামিনী ধমক দিলেন, ওকি করিস। থালে আঁক কাটে না, দেনা হয়। এমনিই ত ধার-দেনার সীমা-সংখ্যা নেই।

তারপর তিনি নরম গলায় আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন।

বললেন, ওরে ও বোকা মাধাই, একথা লুকোয়ে রাখিছিলি ক্যান? ও কি চাপা থাকে?

গিরিবালা বলতে পারল না, সে নিজেও বুঝতে পারেনি আগে। দামিনীর আজকের ব্যবহার খুব ভাল লাগল গিরিবালার। মাঝে মাঝে এদের ব্যবহারে-আচরণে খুবই ধাঁধা লেগে যায় গিরিবালার। সে বুঝে উঠতে পারে না, এদের কোন্ মূর্তিটা আসল। কখনও এদের ভাব দেখে কথা পায়, কখনো আনন্দে ভাসে। এ-বাড়ির লোকগুলো যেন একটা দেহের খাপে দুটো করে রূপ ভরে রেখেছে। একটা যদি রণচণ্ডী, তাহলে অন্যটা বরদা জগদ্ধাত্রী।

গিরিবালা ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল, ভূষণ জেগে আছে। নইলে তার নাক ডাকছে না কেন? তার কেমন যেন মনে হতে লাগল, বড়-জায়ের মত ভূষণও বুঝি টের পেয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। সে আর ভাল করে ভূষণের দিকে চাইল না। সোজা নিজের জায়গায় গিয়ে শংকরকে কোলে তুলে নিল। তার কাঁথাটা বদলে দিতে না দিতেই সে উঁ আঁ করে উঠে পড়ল। বড্ড পাজী হয়েছে ছেলেটা। আগে কেমন সারারাত [illegible]। এখন দিনে ত বটেই, রাত্রেও তার [illegible] শেষ হয় না যেন। মাঝে মাঝে গিরিবালার মনে হয়, ও বুঝি ক্লান্ত হতে জানে না।

[illegible] খুঁত খুঁত করছে আর হাত দিয়ে গিরিবালার কাপড় টানছে। তার আর তর সইছে না কিছুতে। গিরিবালার মনে মনে হাসি পেল। দাঁড়া বাবা, দাঁড়া। একটু সবুর কর। উঃ, কি যে করে! একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। বাবা, বাবা!

ক্লান্ত গিরিবালা সেমিজের বোতাম খুলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। শংকর [illegible] মেরে, ঢু মেরে গিরিবালাকে অস্থির করে তুলে হঠাৎ কাম্য বস্তুটির নাগাল পেল। তখন শান্ত হয়ে চুকচুক করে মাই খেতে লাগল। গিরিবালা তার সারা গায়ে মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে মনে বলতে লাগল, বুড়ো খোকা,

এখন ত আমারে তিষ্ঠতিউ দ্যাও না, এর পর ভাগিদার জুটলি কি করবা?

যে সন্দেহ গিরিবালার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, দামিনীর মুখে প্রকাশ্যে তার সমর্থন পেয়ে সে প্রথম দিকে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেই ভাবটা কাটলে গিরিবালার শরীরে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে থরথর করে তাকে খানিকটা কাঁপিয়ে দিল। পরমুহূর্তেই পুরনো কথা মনে পড়ল। আতঙ্ক তৎক্ষণাৎ তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

গিরিবালার ভয় আরও বাড়ল বিদেশে যাওয়ার কথা ভেবে। আগেরবার সে ত বাপের বাড়িতে ছিল, আপনার লোকেদের মধ্যে, তাই সে অমন ধকলটা সহ্য করতে পেরেছিল। এবার সে কোন্ মগের মুলুকে যাচ্ছে! কেউ থাকবে না সেখানে, কেউ দেখাশোনা করতে পারবে না......না-না, সেখানে গেলে আর বাঁচবে না গিরিবালা। সেই ভয়ঙ্কর দিনটা যখন আসবে, তখন... তখন গিরিবালা মরেই যাবে।

কেন তাকে এই অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিল ভূষণ। এই সমস্ত গণ্ডগোল পাকাবার জন্য সে বারবার ভূষণকেই দায়ী করতে লাগল।

কি, ঘুমিয়ে গেলে নাকি?

ভূষণের আওয়াজ পেতেই গিরিবালা নড়ে চড়ে শুল। আবার সোহাগ জানান হচ্ছে। গিরিবালা চটল না কিন্তু। তার ভালই লাগল। সেই মুহূর্তে এমনও ভাবল, ভূষণকে দেবে নাকি খবরটা। খবরটা শুনলে সেও কি গিরিবালার মত হকচকিয়ে যাবে?

একটা জিনিস লক্ষ্য করল গিরিবালা, শঙ্খের বেলাতে এই সব ব্যাপারে সে যে-রকম লজ্জাবতী লতা গোছের ছিল, এবারে আর ঠিক তেমনটি নেই। শঙ্খ তার লজ্জার ভার অনেকটা লাঘব করে দিয়েছে। শঙ্খর বেলায় তার লজ্জাটা যত প্রবল ছিল, ভয় বা আতঙ্ক ততটা ছিল না। ব্যথা উঠবার পর সে ভয়ে কাবু হয়ে পড়েছিল। সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার আভাস মাত্রও তার স্মৃতিতে নেই। আছে প্রবল আতঙ্কের সেই অনুভূতিটা। আজ খবরটা প্রকাশ হবার পর সে লজ্জা পেয়েছিল ঠিকই। তবে তার পরিমাণ সামান্যই। আসলে তার ঘাড়ে এখন ভয়ই চেপে বসছে।

এর আগেরবার কি ভূষণকে গোপন কথাটি জানাবার বাসনা তার মনে কখনও হয়েছিল? ও বাবা, সে বলে তখন পাতালে লুকোতে পারলে বাঁচে! স্বামীর সঙ্গে প্রথম রাত্রি-বাসের পর গিরিবালা পরদিন সকালে যেমন কারও সামনে মুখ তুলতে পারেনি লজ্জায়, তেমনি লজ্জা পেয়েছিল শঙ্খের বেলায়, প্রথম যখন ব্যাপারটা ধরা পড়ল তার কাছে। মানুষের কত পরিবর্তন হয়! আশ্চর্য।

এবার ব্যাপারটা এত সহজ ঠেকবে তার কাছে, গিরিবালা তা আগে ভাবতে পারেনি। ভূষণের কাছে খবরটা দেবার কথা এখন সে কত সহজে ভাবতে পারল।

ভূষণ বলল, কিগো, কথা বলছ না কেন? শোন তোমার সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ আছে।

ভূষণ গিরিবালার দিকে একটু সরে গেল। ভূষণও কি টের পেয়েছে নাকি? গিরিবালা উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভূষণ বলল, শোন, আশ্বিনের বোনাস টাকা আজ ত পেলাম। মাসের পঁচিশ টাকা পাওয়া গেল। ওতে ত সব খরচ কুলোবে না। আমি কলকাতায় যাব, তোমাকে রেখে আসব তোমাদের বাড়িতে। তারপর ধর, একদিন পরে আবার যাচ্ছি ওখানে, তোমার হাতেও ত কিছু টাকার দরকার। জামা-কাপড়ও কিনতে হবে কিছু। যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ শুধু তোমার আমার কাপড় কিনলেই ত চলবে না, মা, বৌদি, যূথী, বড়দা ওদেরও ত কারো কাপড়-চোপড় নেই, তাও ত কিনতে হবে।

বাগানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তোমার অবিশ্যি আর কোন ভাবনা থাকবে না।

ভূষণ কথাটা খুব জোর দিয়েই বলল।

কারণ, সেখানে ত বাঁধা মাইনের সংসার। আজ দু টাকা পেলাম ত দু দিন নেই কিছু, এমন ত নয়। এ একেবারে ফার্স্ট ডে অব দি মন্থ পয়লা তারিখেই একসঙ্গে সব টাকা পেয়ে যাচ্ছ তুমি। তারপর যেমন ইচ্ছে, যত ইচ্ছে খরচ কর। মাইনের চাকরির এই একটা মস্ত সুবিধে। টাকা-পয়সার ভাবনা ভাবতে হয় না। ফুরিয়ে গেল টাকা,

প্রকারান্তরে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে। বেজায় চটে গেল গিরিবালা।

বলল, বুঝবা কি করে? তুমি কি কোনও দিন আমারে বুঝবার চিন্তা করিছ? আমার সুখ-অসুখ কিছুই ত তুমার চোখে পড়ে না। ভাব, আমি বোকা, কিছুই বুঝিনে। সব বুঝি। বুঝেও কিছু বলিনে। তেমন তেমন ঘরের পাল্লায় পড়লি বুঝতে ঠ্যালাখানা।

ভূষণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আহা-হা, এত রাত্রে আবার গোলমাল বাড়ান কেন? কি হয়েছে, তাই বল না। আজে বাজে কথা বলে লাভ কি?

গিরিবালা রাগে ফুলতে লাগল।

আমি একটা কথা বললিই ত তুমার গায় ফোস্কা পড়ে। আমার আর সহ্য হয় না। দ্যাখ, আমারে বাপের বাড়ি পাঠায়ে দ্যাও। দিয়ে যেখেনে ইচ্ছে সেখেনে যাও।

এবার ভূষণ ঘাবড়ে গেল। এত রাগতে সে গিরিবালাকে কখনও দেখেনি। গিরিবালা ততক্ষণে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে লেগেছে। এ ত আচ্ছা ফ্যাসাদ! এত রাত্রে, কোথায় অল্প কথায় কাজ সারতে গেল ভূষণ, ফল হল উল্টো।

যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় বলল, দ্যাখ, তোমার মনে ব্যথা দেবার জন্য আমি ওকথা বলিনি। তোমার শরীর খারাপ বললে কিনা, আমি তাড়াতাড়ি সেইটেই জানতে চাইছিলাম।

গিরিবালা চুপ করে গেল। তার অভিমান তখনও যায়নি।

বলল, আমার কথা ত তুমার বিশ্বাস হবে না। তুমি বরং কাল বড়দিদির জিজ্ঞেস করে নিও।

ভূষণ সুর নরম দেখে গিরিবালাকে খুব কাছে টেনে নিল।

বলল, এটা কি একটা কথা হল। তোমার কথা তোমার মুখ দিয়ে শুনতেই আমার ভাল লাগে।

ওরে বাসরে! কথার কায়দা কত! ভূষণের বলার ঢং-এ গিরিবালা হেসে ফেলল। হঠাৎ তার লজ্জাও হল। ইতস্তত করল খানিক।

তারপর বলল, যাও, একথা বলা যায় না, বুঝে নিতি হয়।

বলেই ভূষণের বুকে মুখ লুকালো।

ফিস ফিস করে বলল, তুমি কিরকম ডাক্তার গো, ঘরের লোকের উপর বুঝি চোখ পড়ে না?

পঁয়ত্রিশ

গিরিবালা বুঝি এত আনন্দ আর কখনও পায়নি। অথচ নৌকো চড়ার ভয় তার বরাবরের। কিন্তু আজ, এই পরিষ্কার চকচকে দিনটিতে নৌকোয় চড়তে তার তেমন ভয় হচ্ছে না ত।

অথচ সকালে বাড়ি থেকে ওরা যখন বিদায় নেয়, গিরিবালার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। শাশুড়ী শংখকে বুকে নিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন। যেন কেউ মারাটারা গেছে এমনি ভাবখানা তাঁর। বড়জা কেঁদেছেন গিরিবালাকে বুকে চেপে ধরে। গিরিবালা নিজেও কেঁদেছে। না কেঁদে পারেনি। একবার একটানা তিন বছর ছিল এই বাড়িতে। এবাড়ির সব কিছুই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

যতদিন এ বাড়িতে ছিল, ততদিন এর অবহেলা, এর উপেক্ষা তার প্রাণে বড় বাজত। এই বাড়িতে এসেই গিরিবালা টের পায় অভাব কাকে বলে। বাপের বাড়িতে তাকে কখনও না খেয়ে থাকতে হয়নি, চালের পিত্তোশে উনুন কোলে করে বসে থাকতে হয়নি। এ বাড়িতে ওসব যেন ইদানীং নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। ঈর্ষা বেষ কাকে বলে, এ বাড়িতে এসে তার পরিচয়ও পেয়েছে। গিরিবালা তার শখ-সাধের শাড়িগুলো একখানা একখানা করে ছিঁড়েছে, গয়নাগুলো এক এক করে অদৃশ্য হয়েছে। অনেক সময় পালাই পালাই করে তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। তবু কি আশ্চর্য এবাড়ি ছেড়ে যাবার সময় হলে দেখল, সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। বাপের বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় সে যেমন কষ্ট পেয়েছিল, অবিকল তেমনই ব্যথা। যে যূথীকে সে দেখতে পারত না মোটে, সেই যূথীর জন্যও সে দেখল তার প্রাণ পুড়ছে। আর মনে পড়ল চাঁদপুর কথা। দুরন্ত অভিমানী সেই মেয়েটা, যে বিয়ের পর বিদায় নেবার সময় এক ফোঁটা কাঁদেনি, যে অষ্টমঙ্গলায় এসে দু দিনের মাথায় আবার ফিরে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি, আর আসেওনি, চিঠি চোপাটিও লেখেনি।

নৌকো একটু দূরে উঠতেই গিরিবালা চমকে গেল। দেখল একটা পুলের তলা দিয়ে নৌকোটা যাচ্ছে। একটু আগেই ছেড়েছে নৌকোখানা। ঝিনেদার সীমানা এখনও ছাড়ায়নি।

ভূষণও খুব খুশী। তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অবশেষে সে অনন্ত জীবনের শিকড় ছিঁড়তে পেরেছে। বেরিয়ে পড়েছে পথে। এখন আপাতত সে শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছে গিরিবালাদের বাসায়। ওখান থেকে সে যাবে কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীহট্ট। তারপর শ্রীহট্ট গিয়ে সে গিরিবালাদের আনা-নেওয়া সম্পর্কে একটা বন্দোবস্ত করবে। এই ঠিক করেছে ভূষণ। এতে সে গিরিবালার সম্মতিও পেয়েছে।

পুলের তলা দিয়ে ওরা যাচ্ছে আর উপর দিয়ে যাচ্ছে বেতো ঘোড়ার একা। ভূষণের চোখের উপর দিয়ে এই পুলটা তৈরী হয়েছে। দেখতে দেখতে বছর পাঁচেক হয়ে গেল।

ভূষণ গিরিবালাকে বলল, এই পুলের উপর দিয়ে চাঁদপুর শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়।

গিরিবালা অমনি ছইয়ের বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ভূষণ বলল, এই পুলটা কে বানিয়েছেন জান? যতীনদা। বাঘা যতীন।

গিরিবালা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ভূষণের দিকে। যতীন নামে তার কোন ভাসুর আছে, সেত তা শোনেনি এর আগে।

ভূষণ বলল, বাঘা যতীনের নাম শোনোনি?

গিরিবালা ঘাড় নেড়ে জানাল, না। ভূষণ তার অজ্ঞতায় হাসতে লাগল।

ছোট। ওসব হেঁয়ালির কথা কি বুঝি। তবু তাঁর কথা শুনে আমরা পরমানন্দে শরীর তৈরি করতে লেগে গিয়েছিলাম। তারপর একদিন শুনি যতীনদা উধাও। কেউ তাঁর কোন খোঁজই পেল না। বউদিরা বাসা তুলে দিয়ে বোধ হয় বাপের বাড়িই চলে গেলেন। তার প্রায় এক বছর পরে একদিন কি হৈ হৈ। শুনলাম, বালেশ্বরে জন চারেক সাগরেদ নিয়ে যতীনদা ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

ভূষণ চুপ করল। বর্ষা অকালে শেষ হয়ে আসছে নাকি? আকাশ যেন এরই মধ্যে শরতের আগাম বার্তা শোনাতে শুরু করেছে। এই চকচকে রোদ, মুহূর্তে একটা জলভরা কালচে মেঘ তাকে একটুক্ষণের জন্য ঢেকে দিয়ে ভেসে চলে গেল। জলো হাওয়া বইছে। ভরা নদী, এখানে ওখানে দু-চারটে করে লাল শালুক মুখ বাড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ভিখারী চিল করুণ স্বরে ডাক দিয়ে জেলেদের কাছে কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সব দুঃখ বেদনা ছাপিয়েও আনন্দের বস্তু গিরিবালার মনে লাগছে। সে এটা চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই। শশধর সেই থেকে ঘুমচ্ছে। ভূষণ উদাস চোখে ভাবছে। একটা মাঝি হাল ধরে বসে তামাক খাচ্ছে। কড়া তামাকের গন্ধ ছইয়ের ভিতর ঘুরপাক মারছে। অন্য মাঝিটা নদীর পাড় দিয়ে গুণ টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কখনও তাকে দেখা যায়, কখনও সে মিলিয়ে যায়।

ধোপাঘাটার বাঁক পার হয়ে এসেছে তারা। পরহাটির কাছে এসে পড়েছে। ওই যে ওপারে ছলিমদ্দো চৌধুরীর বিরাট বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। নদীর ভিতর থেকে বাড়িটা যেন গেঁথে তোলা হয়েছে। কে ছলিমদ্দো চৌধুরী, কতকালের বাড়ি এটা, তা জানে না গিরিবালা। এই গ্রামের নামটাও সে শুনেছে, মনে নেই। কিন্তু ছলিমদ্দো চৌধুরীর বাড়ি তার মনে অক্ষয় করে খোদাই করা হয়ে গেছে। বাড়িটা দেখে কেমন যেন গা ছমছম করে গিরিবালার। সেই ছোটবেলাতেও করত, এখনও করছে।

বাকাঁড়ির বাঁকে গিয়ে মাঝিরা নৌকো বাঁধল। একটু জিরোবে ওরা। খাবে। তারপর ছাড়বে নৌকো। বাপের বাড়ির ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। গাড়িতে গেলেই হত। ভূষণও প্রথমে তাই ভেবেছিল। কিন্তু এই নৌকোখানা যার, সেই বুড়ো সাধল। সে বুঝি ভূষণের রোগী। অনেক চিকিৎসা করেছে ভূষণ। ওরা পয়সা কড়ি দিতে পারেনি। ভূষণ দেশ ছেড়ে চলে যাবে শুনে জলভরা চোখে দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে। তারাই জোর করল, গতরে খেটে ভূষণের ঋণ কিছুটা শোধ দেবে বলে।

ভূষণ ওদের খাওয়াতে নিয়ে গেল। গিরিবালার মনও অস্থির হয়ে উঠেছে। এখনও অনেকটা পথ বাকি। বাকাঁড়ি ছাড়ালে হরিশঙ্করপুর। মাধববাবুর বাঁধান ঘাট। এখানকার ইস্কুলে সুধাময় পড়ত। তার ছোটমামা ছিলেন হেড মাস্টার। তারপর পড়বে বোসেদের ঘাট। কে পি বোসের অ্যালজেবরা না কি, সেই তাদের ঘাট। কে পি বোসকেও চেনে না গিরিবালা, অ্যালজেবরা সাপ কি ব্যাঙ তাও জানে না, তবু শিশুকাল থেকে যতবার এই পথে সে গিয়েছে, ততবার কথাটা শুনেছে। শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

হরিশঙ্করপুর ছাড়ালে আরপাড়ে মধুপুর সেখানে। সেই হল অর্ধেক পথ। মধুপুরের পর গোবিন্দপুর, সতুলে, ওপারে কড়ইতলা। কড়ইতলার কালী খুব জাগ্রত। কড়ইতলার পর পলেনপুর, তারপর পাইকপাড়া। পাইকপাড়ার উল্টোপারে লোহাজঙ্গা। গোপাল বিশ্বেসদের বাড়ি। ঘাটের উপরই নবীন তাঁতির ঘরখানা। অনেক সময় নৌকোর থেকে তার গানও শোনা যায়। ছোটকাকার খুব বন্ধু। এই লোহাজঙ্গার ঘাট পার হয়ে খানিকটা এগোলেই তাদের গ্রামের কামারদের ঘাট।

ভূষণরা গেল তো সেই গেলই। ফেরার ত নামগন্ধও নেই। নৌকো বাঁধা থাকায় হাওয়া চলছে না। গলগল করে ঘামছে গিরিবালা। শশধরও উঠে পড়ল। সে ত প্রায় চান করে উঠেছে। গিরিবালা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এমন সময় ভূষণ রসগোল্লা, দই, চিঁড়ে, সবরি কলা নিয়ে হাজির হল।

বলল, খিদে পেয়েছে নাকি? এস এগুলো খেয়ে নিই।

পাগল হয়েছ নাকি ভূষণ! মুসলমানের নৌকোয় চড়েছি না হয় ... ভূষণের কোন ... নেই, সে থাক। গিরিবালা বাড়ি গিয়ে চানটান না করে একটা দানাও কিছু মুখে দেবে না।

... বলল, তুমি খাও। আমার খিদে পায়নি।

বলেই গিরিবালা একপাশে শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ঘুম এসে গেল তার।

গিরিবালার বাপের বাড়ির ঘাটে যখন ওদের নৌকো লাগল, তখন সন্ধ্যে হয় হয়। লম্বা ... বেলা শেষ হতে বেশ সময় লাগে। ঠিক ওদের নৌকোর পাশ ঘেঁষেই ... নৌকো এসে লাগল। গোটা কতক ছেলে লাফিয়ে লাফিয়ে নামল ... একজনের হাতে একটা ফুটবল। কানে বিড়িগোঁজা।

সে ছোকরা গিরিবালাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল।

আরে বাস, এযে দেখি বড়দিদি। একেবারে দুর্গাঠাকরুণের মত চিহারা করে ফেলিছ যে।

বলেই ফুটবল বগলে করেই ঢিপ্‌ করে একটা প্রণাম করল গিরিবালাকে।

গিরিবালা বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, ও ... নরা! কত বড়ডা হয়ে গিছিস! গিছিলি কনে?

নরা ভূষণের দিকে একবার চেয়ে গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, ম্যাচ খেলতি। আজ মধুপুর পলেনপুরে খেলা ছিল কিনা। পলেনপুরে আমাগেরে হারার করে নিয়ে গিছিল।

গিরিবালার খুশিভরা অবাক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল নরা।

শেষে একটি গ্রন্থপরিচয় লিখে দিয়েছেন, তাতে রচনাগুলির বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যাবে। এতে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সাহিত্যসাধকচরিতে ব্রজেনবাবুর সংগৃহীত তথ্য ছাড়াও আরো কিছু কিছু সংবাদও এতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট ছাপা, বাঁধাই এবং সুসম্পাদনার গুণে বইটি যে-কোনো গ্রন্থাগারে অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। আমরা পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের প্রত্যাশায় থাকলাম। ২৩৪।৫৯

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫নং, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩৷৷০।

ইতিপূর্বে শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের নানারকম সংবাদ দিয়ে একাধিক বই লিখেছেন। এবার তিনি সেই শ্রেণীর আর একটি গ্রন্থ রচনা করে রবীন্দ্র-মানসের উৎসের একটি আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিস্থলে রবীন্দ্রনাথ জমিদারি কাজের জন্য শিলাইদহে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। সোনার তরী চিত্রা কথা চৈতালি কল্পনা প্রভৃতি কাব্য, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র এবং অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের গদ্য রচনার যুগ ছিল সেটা। এই পল্লীজীবন এবং পল্লীপ্রকৃতির পটভূমি রয়েছে এইসব রচনায়। যেসব মানুষ, যেসব সঙ্গী এবং সমাজ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভব শক্তিকে প্রখরতর হয়ে উঠতে পরোক্ষে সহায়তা করেছিল, তাদের একটি নিবিড় বর্ণনা পাওয়া যায় শচীনবাবুর রচনাতে। এ বর্ণনা গল্পের মতো সুখপাঠ্য এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় উজ্জ্বল। কালী চক্রবর্তী, মেহের সর্দার, মুন্সীবাবু, আনন্দ ব্যাপারী, তুণ্টুলাল প্রভৃতি ব্যক্তির চরিত্র যেমন একদিকে তিনি এঁকেছেন, আর একদিকে দিয়েছেন নানা কিংবদন্তী-আশ্রিত প্রাকৃতিক শোভায় রমনীয় পদ্মা-গোরাই লাঞ্ছিত শিলাইদহের ছবি, আবার গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের সঙ্গে বাবুমশাই রবীন্দ্রনাথের আচরণ ও কীর্তির ঘনিষ্ঠ বিবরণও তিনি দিয়েছেন। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-কবিমানসের পক্ষে এ-সব জানা প্রয়োজনীয়।

যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণ-পরায়ণ পাঠক তাঁরা যেমন এই বইখানি সহায়ক গ্রন্থরূপে গ্রহণ করবেন তেমনি যে পাঠক শুধু গল্পপিপাসু, তিনিও এই বইটি সমানভাবেই উপভোগ করবেন। ২৩৯।৫৯

দর্শন

চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। পুরোগামী প্রকাশনী, ১০০।১, ভূপেন্দ্র বোস এভিনু্য, কলিকাতা—৪। মূল্য পাঁচ টাকা।

দর্শনের দেশ ভারতবর্ষে চার্বাক দর্শনের বিশেষ কোনো বই নেই। মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে (চতুর্দশ শতাব্দী) চার্বাক মতের সুসম্বদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া ষড়দর্শন সমুচ্চয় গ্রন্থে হরিভদ্রসুরি, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কৃষ্ণ মিশ্র, সদানন্দ যতি অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে চার্বাক মতের আলোচনা করেছেন। কিন্তু এঁরা এবং আরো কেউ কেউ চার্বাক মতের উল্লেখ করলেও এগুলি সবই পরোক্ষ আলোচনা। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জয়রাশি ভট্টের 'তত্ত্বোপপ্লব সিংহ' নামে একটি বই বরোদা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের রচনাকাল অষ্টম থেকে নবম শতাব্দী। আদি চার্বাক দর্শনের এই একটি বই-ই পাওয়া গিয়েছে।

নির্দিষ্ট গ্রন্থের অভাবে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বচনায় খণ্ডন করবার জন্য সাধারণে চার্বাক মতের যেসব উদ্ধৃতি

ছবির পর্দায় "ছবি"

"ছবি" শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অবসরক্ষণে খেয়াল-খুশিতে লেখা হয়তো, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্য-জীবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নে যে অসামান্য শিল্পকর্মের প্রকাশ তারই একটি সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ উন্মেষ "ছবি"তে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। কথা-শিল্পীর লেখনীর আঁচড়ে আঁকা মানুষের জীবনের এক ফোঁটা কান্না আর এক টুকরো হাসির একটি আবেগমধুর আলেখ্য এই "ছবি"।

মা-শোয়ে ও বা-থিন শরৎচন্দ্রের মরমী কল্পনার পটে আঁকা দুটি সুন্দর বিকাশোন্মুখ জীবন। পিতার মৃত্যুর পর ধনীকন্যা মা-শোয়ের ভার নেন বা-থিনের পিতা বা-কো। মা-শোয়ে ও বা-থিন তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা বাড়িয়েছে। অল্পকালের মধ্যেই বা-কো পরপারের ডাকে তাদের ছেড়ে চলে যান।

চন্দ্রশেখর

বা-থিন শিল্পী—ছোটবেলা থেকেই সুন্দর ছবি আঁকার হাত তার। শিল্পীর তুলির টানে টানে রূপ ঝরে পড়ে কত বর্ণ ও রেখার সম্ভারে। মা-শোয়ে মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকে শিল্পী আর তার শিল্পের দিকে। বড় হবার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে শিল্পীর মনে। বা-থিনের তুলির টানে মা-শোয়ের জীবনের পটেও যেন অঙ্কিত হয়ে যায় কত ছবি— রঙীন আশার আর মধুর কল্পনার নিত্যনতুন ছবি। মিলনের আকুতি নিবিড়ভাবে জেগে ওঠে মা-শোয়ের মনে।

কিন্তু আকুতির সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতির কঠিন পরীক্ষা বসন্তের বিহ্বল আবেশের মধ্যেও ঝরা-পাতার শুষ্ক দিনগুলিকে অনেক সময় কেমন অলক্ষ্যে সাজিয়ে আনে মা-শোয়ের সবুজ মন তা তলিয়ে দেখেনি। তার জীবনের মধুমেলায় শুধু খুশির হাওয়া, আবেগের উচ্ছ্বাস, মিলনের তৃষ্ণা। বা-থিনের নিরুচ্ছ্বাস প্রেমকে সে মনে করল উপেক্ষা, মা-শোয়ের পিতার কাছে তার পিতৃঋণ শোধের কর্তব্যবুদ্ধিকে সে ভাবল অহঙ্কার, যৌবনের উদ্দামতার সামনে তার স্থিতনিষ্ঠ আবেগকে সে ধরে নিল নির্লিপ্ততা বলে।

বা-থিনের কঠিন মনকে আঘাতে আঘাতে নুইয়ে আনবার জন্যই বুঝি অভিমানিনীর বাধলো না পো-থিনের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে। বাৎসরিক ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে পো-থিন দেশাচার অনুযায়ী সুন্দরী শ্রেষ্ঠীকন্যা মা-শোয়ের গলায় পরিয়ে দেয় মালা। শোভাযাত্রা করে

কাহিনীর পরিক্রমা ছিল যেখানে মুখ্যত নায়ক-নায়িকার মানসলোকে, ছবিতে সেখানে ঘটনাবৈচিত্র্য স্থান পেয়েছে। কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসে যে অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর পরি-প্রেক্ষিতে সেগুলি পীড়াদায়ক। রাজদরবারে বা-থিনের আঁকা ছবির সমাদর নিয়ে শরৎ-চন্দ্রের গল্পে যেখানে মা-শোয়ের আনন্দ ও উৎসাহ দেখা যায়, ছবিতে রানীকে এনে রাজ-দরবারে বা-থিনের ছবির সমাদর উপলক্ষ্য করে মা-শোয়ের মনে দেখানো হয়েছে ঈর্ষার জ্বালা। বা-থিনকে দেওয়া রানীর আংটি নিয়ে যে 'মেলোড্রামা'র সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি ছবির নাট্যরসের দিক দিয়ে সার্থক হয়নি। এই ছবিতে বা-থিনের পিতার চরিত্রটি যেভাবে আঁকা হয়েছে তাও কষ্ট-কল্পিত। বন্ধুর কাছে নিজের অর্থঋণ শোধ করতে না পেরে তার অশান্তি, আবার সব কিছুই দান করে দিয়ে ছেলের ঘাড়ে শুধু ঋণের বোঝা চাপিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা এবং পরে পিতৃদত্ত বাড়ি বিক্রী করেই ছেলের সেই ঋণ শোধ—সমস্ত ব্যাপারটি যেমন অযৌক্তিক তেমনি কৌতুকাবহ বলে মনে হয়। কৌতুকের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় তার মৃত্যুর দৃশ্যটি—যেন কোন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন!

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী মূল কাহিনীর

ইন্ডো-বার্মা ফিল্ম কর্পোরেশানের "ছবি"র দুটি প্রধান চরিত্রে বিকাশ রায় ও মালা সিংহ।

যে পরিবর্তন করেছেন তার মধ্যে মা-শোয়ের পোশাকে মদের গন্ধ পেয়ে বা-থিনের বর্মা চুরুটের পরিবর্তে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি প্রশংসনীয়। সামগ্রিকভাবে শরৎচন্দ্রের এই প্রেমোপাখ্যানটি প্রেমিক-প্রেমিকার জটিল মনোবিশ্লেষণের রূপ না নিয়ে বাংলা-ছায়াছবির তরল রোমান্সের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে বেশী—এমনকি শেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার চিরাচরিত এবং শরৎ-কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে অবাঞ্ছিত আলিঙ্গন এবং যখন তখন গানও এ-থেকে বাদ যায়নি। ছবির পার্শ্ব চরিত্রগুলিও—বিশেষত "আর্ট স্কুলে"র শিক্ষক, রানী, মা-শোয়ের দূর সম্পর্কীয় ভগ্নী ও মাসী বিশ্বাসযোগ্য রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় নি ছবিতে।

বর্মার বহিদৃশ্য এ-ছবিতে থাকলেও কাহিনীর বর্মী পটভূমি এ-ছবিতে রূপ নেয়নি। বর্মার দৃশ্যগুলি ভ্রমণ-চিত্রের দৃশ্যের মত পর পর সারি বেঁধে এসেছে, কাহিনীর পটভূমি হয়ে উঠতে পারে নি। তদুপরি কাহিনীর কালের দিক দিয়ে—যখন দেশে বৃটিশ শাসনের পূর্বে রাজা-রানী ছিল—তখন বর্মার শহরে দোকানের ইংরেজী সাইনবোর্ড, পাত্র-পাত্রীর মুখে "আর্ট স্কুল" শব্দ, মোটর ট্রাক প্রভৃতি খুবই বেমানান লাগে।

অভিনয়ের দিকে ছবিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন মা-শোয়েরূপিণী মালা সিন্হা। ধনীকন্যার খামখেয়ালী স্বভাব ও প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস ও আবেগ তিনি সুনিপুণ-ভাবে ফুটিয়েছেন। মা-শোয়ের চরিত্রটির জটিল মনস্তত্ত্বের রূপ তাঁর অভিনয়ে শেষের

দিকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। বা-থিনরূপী আশীষকুমার মূল চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব ছবিতে আরোপ করতে না পারলেও মোটামুটি স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন ও ঐ ভূমিকায় বেশ মানিয়ে গেছেন। পো-থিনে'র চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় সত্যই প্রশংসনীয়। চরিত্রটির স্বার্থান্ধতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ তিনি দক্ষতার সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন।

থিনের পিতার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনোগ্রাহী। অন্যান্য বিশেষ পার্শ্ব-চরিত্রে ভানু চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, নিভা-নী ও সবিতা ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনায় রবীন চট্টোপাধ্যায় বহু-সংগীতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর আরোপিত গানগুলি সুশ্রাব্য।

আলোকচিত্রে বিদ্যাপতি ঘোষ তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। শব্দধারণ ও শিল্প-নির্দেশে যথাক্রমে নৃপেন পাল ও বটু সেন প্রশংসার দাবী রাখেন। অন্যান্য কলাকৌশল ও অংগসজ্জার দিকও নিন্দনীয় নয়।

"প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ"

কর্মীর জীবনগাথা যেমনি তাঁর বহুমুখী ও বহির্মুখী কর্মধারার মধ্যে ব্যাপ্ত, কবির জীবনচরিত তেমনি লিপিবদ্ধ তাঁর কাব্যে। কবিপরিচয় উদ্‌ঘাটনে এই সত্যোপলব্ধির পরিচয় মেলে আশিস মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ" নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্রে। চিত্রটি গত ৭ই আগস্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধান-বার্ষিকী উপলক্ষে ফিল্মস ডিভিশন (পশ্চিমবংগ শাখা)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটির তিনটি সংস্করণ— হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী। "প্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ"-এর বাংলা সংস্করণ বাঙালী দর্শকদের মনে এক মহৎ অনুভূতির স্পর্শ নিয়ে আসে সহজেই। প্রযোজক-পরিচালক-চিত্রনাট্যকার আশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর এই প্রামাণ্য চিত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের উন্মেষ, বিবর্তন ও পরম অনুভব এবং নিসর্গ প্রকৃতির সংগে নিবিড় আত্মিক ঐকানুভূতির সক্ষ্ম স্বরূপটি ছন্দোবদ্ধ গীতিময়তা ও ব্যঞ্জনা-শ্রয়ী রূপরীতির মধ্য দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। বহিঃপ্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্যের সংগে সংগে কবিমনের আনন্দ-বেদনার মধুর অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত কবিতা ও গানে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বাঙময় হয়ে উঠেছে, সেগুলিরই কয়েকটি ছত্র ও চরণ আবৃত্তি ও সুরে কবির অন্তরলোকের একটি ক্ষণিকের পরিচয় দর্শকের কাছে তুলে ধরে এই প্রামাণ্যচিত্রটিতে। পরিচয় ক্ষণিকের হলেও এর আবেদন চিরন্তন।

আংগিক ও শিল্পসুষমার দিক দিয়েও প্রামাণ্যচিত্রটি অসামান্যতার দাবী নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ঋতুতে নিসর্গ-প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও কোমল রূপ সুন্দর দৃশ্যকাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে বিচিত্র দৃশ্যরাজির উপস্থাপন ও নির্গমন অনেক ক্ষেত্রে চোখের পলকের সংগে সংগে ঘটে যায় বলে দৃশ্য-কাব্যের পুলক মন নাড়া দেবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রামাণ্য চিত্রটির পরিক্রমা মূলত কবির ধ্যানলোকে তাঁর অননুকরণীয়

ভাষা ও ভাবের পথ ধরে। অতএ অবাঙালীদের কাছে এ প্রামাণ্যচিত্রের মূল রস কতটুকু আবেদন নিয়ে আসবে তা সন্দেহের অবকাশ আছে।

সংগীত পরিচালনায় শুভ গুহঠাকুরত অনিন্দ্যকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নেপথ্য-ভাষণে সবিতাব্রত দত্ত চিত্রনাট্যের রস দানা বাঁধার সহায়তা করেছেন। আলোকচি... কানাই দে'র কাজ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের অংশগুলি সুনির্বাচিত।

চিত্রালোচনা

মাত্র দুখানি হিন্দী ছবি এবারকার স্বাধীনতা দিবসের সওগাত। চলতি বাংলা ছবিগুলির জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকায় এ সপ্তাহে নতুন কোন বাংলা ছবি মুক্তি পেল না। আগামী সপ্তাহে এম এম মুভিজের নতুন ধরনের হাসি-অশ্রুভরা কথাচিত্র "এ জহর সে জহর নয়"-এর মুক্তি ঘোষিত হয়েছে। আগস্ট মাসের মধ্যেই মেট্রোপলিটান পিকচার্সের "নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে", আর্ট অ্যান্ড কালচার পিকচার্সের "অগ্নিসম্ভবা" এবং নালন্দা ফিল্মসের "আম্রপালী"রও দর্শন মেলবার সম্ভাবনা।

এ সপ্তাহের নতুন হিন্দী ছবি দুটির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় গোয়েল সিনে করপোরেশনের "চিরাগ কাঁহা রোশনী কাঁহা" ছবিটির। ভারতীয় নারীর মহানুভবতার এক আবেগপূর্ণ কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে এর মধ্যে। মীনাকুমারী, রাজেন্দ্রকুমার, মিনু মতাজ ও হনি ইরাণী প্রধান ভূমিকাগুলিতে রূপ দিয়েছেন। দেবেন্দ্র গোয়েল ও ...বি যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার। বসন্ত পিকচার্সের "চন্দ্রসেনা" (অপর ...ন "হনুমান পাতাল পরাক্রম") এ সপ্তাহের ...তীয় আকর্ষণ। যথোচিত জাঁকজমকের ...ঙ্গে একটি সুপরিচিত পৌরাণিক ...হিনীকে ছবির পর্দায় তুলে ধরেছেন ...যোজক হোমী ওয়াদিয়া। দক্ষিণ ভারতের ...ত্যপটিয়সী অভিনেত্রী গিরিজা এতে প্রথম ...বতরণ করেছেন। মহীপাল ও কাঞ্চন-...লাকে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে। আর দেখা ...বে পদ শাস্ত্রীকে মহাবীর হনুমানের ...মিকায়। বাবুভাই মিস্ত্রি ছবিটি পরি-...লনা করেছেন এবং এতে সুর দিয়েছেন ...ণজী বিরজী।

* * *

...জকের হাজারো সমস্যায় উৎপীড়িত, ...হারা মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে রচিত ...ছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মর্মস্পর্শী উপাখ্যান ...ডমাস্টার"। ধনিক ও শ্রমিক উভয়ে ...। গড়ে তুলতে চাইছে যে সমাজ-...থা, কুসুমপুর এম ই স্কুলের প্রাক্তন ...মাস্টারের শিক্ষা ও আদর্শের কোন ...নেই সেই নয়া সমাজে। আজীবনের ...নীতিবোধ ও দৈন্য পীড়িত সংসারের ...া স্বাচ্ছন্দ্য এ দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে ...তাঁকে। সে সংসারে তাঁর রয়েছে ...ধর্মপত্নী স্ত্রী 'মাস্টারের বৌ', শিশু-...মার উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ে—যে লক্ষ্মীর ...ালী পড়ে সংসারের মঙ্গলকামনায় ...ত পিতার পকেটে গুঁজে দেয় পুজোর ...।

...গামীর পরিচালনায় রীতেন অ্যান্ড ...নীর "হেডমাস্টার"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ ...। এখন চলেছে তার মুক্তির প্রস্তুতি। ...মিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, ...ী সেজেছেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ...ষোড়শী কন্যার ভূমিকায় দেখা দেবেন ...ন রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে ...রণ করেছেন শোভা সেন, শিশির

বটব্যাল, গঙ্গাপদ বসু ও আর একটি নতুন শিল্পী শ্যামল ঘোষাল।

* * *

গত সোমবার নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সরকার প্রোডাকশন্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য "নতুন ফসল"-এর শুভ-মহরৎ অনুষ্ঠিত হয় ফিল্মজগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর একটি হৃদয়গ্রাহী কাহিনীকে ভিত্তি করে বিনয় চট্টোপাধ্যায় এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। দিলীপ সরকারের প্রযোজনায় ও হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হবে। গত সোমবার থেকেই এর নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হয়েছে। মুখ্যাংশে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন। সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তন নিউ থিয়েটার্সের স্বনামধন্য সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল।

* * *

সুখেন ধরের পরিচালনায় এস ডি প্রোডাকশন্সের "হাসপাতাল" চিত্রের কাজ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান চিকিৎসা সংকটকে কেন্দ্র করে এর আখ্যানভাগ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য। এর বিভিন্নাংশে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, শোভা সেন, কাজরী গুহ, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। অজিত ঘোষ সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হেমন্তকুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মিন্টু দাশগুপ্ত কণ্ঠদান করছেন এই ছবিতে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে "হাসপাতাল" নামেই আর একখানি ছবি তোলা হচ্ছে এন সি এ প্রোডাকশন্সের পতাকাতলে। সুশীল মজুমদার এই ছবিটির পরিচালক। এর মুখ্যাংশে নির্বাচিত হয়েছেন অশোককুমার ও সুচিত্রা সেন।

* * *

এ. ভি. এম ও প্রভাত প্রোডাকশন্সের যুগ্ম নিবেদন "আকাশ পাতাল"এর চিত্রগ্রহণের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। ছবিটির বেশীর ভাগ অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে মাদ্রাজে এ. ভি এম স্টুডিওতে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, দুর্গা খোটে, অচলা সচদেব, তপতী ঘোষ, তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, বাণী হাজরা, নবাগতা পাপিয়া ঠাকুর। ছবির সুরকার নচিকেতা ঘোষ।

গৌতম চিত্রমের প্রথম প্রয়াস "অবাক পৃথিবী"র চিত্রগ্রহণ বিশু চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। বিধায়ক ভট্টাচার্যের একটি সমাজ-সমস্যামূলক কাহিনীর

ভিত্তিতে নির্মীয়মান এই ছবির প্রধান শিল্পীজোড় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ।

গান-বাজনা

১৪ই আগস্ট থেকে আরম্ভ করে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী সংগীত সম্মেলন নামে ভারতীয় মার্গ সংগীত ও উচ্চাংগ নৃত্যের এক বিরাট আয়োজন করা হয়েছে পার্ক সার্কাস ময়দানে। কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনের উদ্বোধক। পাঁচ দিনে মোট ছয়টি বৈঠক বসবে সম্মেলনের। শেষের চার দিন সারারাত ধরে অধিবেশন চলবে।

যাঁরা এই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য সম্মতি জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত শিল্পীদের নাম উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্রসংগীতে—আলাউদ্দীন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ হোসেন খাঁ, ইমরাৎ খাঁ, শান্তাপ্রসাদ, কিষেণ মহারাজ, কেরামতুল্লা, সগিরুদ্দীন প্রভৃতি।

কণ্ঠসংগীতে—বড়ে গোলাম আলী খাঁ, আমীর খাঁ, দাগর ভ্রাতৃবৃন্দ, ভীমসেন যোশী, হীরাবাঈ বরোদেকার, সুনন্দা পট্টনায়ক, গিরিজা দেবী, তারাপদ চক্রবর্তী, কল্পনা ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

নৃত্যে—রোশনকুমারী, দময়ন্তী যোশী, জাভেরি ভগিনবৃন্দ, শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়, ভারতী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

আলি আকবর ও রবিশঙ্করের যুগলবন্দী যন্ত্রবাদ্য এই সম্মেলনের অন্যতম বিশিষ্ট আকর্ষণ।

• • •

বিখ্যাত তবলিয়া ওস্তাদ মসীদ খাঁ সম্প্রতি একটি প্রীতি-অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে কলাকার মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে ৫০১ টাকার একটি তোড়া ও মানপত্র এবং শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের তরফে ওস্তাদ মসীদ খাঁর একটি তৈলচিত্র উপহার দেওয়া হয়। তারপর সারারাত্রিব্যাপী একটি সংগীতানুষ্ঠান হয়। তাতে যোগ দেন ওস্তাদ মসীদ খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ইমরৎ হোসেন খাঁ, কানাই দত্ত, বাহাদুর হোসেন খাঁ, কেরামত খাঁ, শ্রীমতী স্বরূপলতা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীরা।

বিবিধ সংবাদ

গত ৩রা আগস্ট মস্কোর ১৫,০০০ হাজার আসন সম্বলিত প্যালেস অব স্পোর্টস-য়ে প্রথম মস্কো বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়। পরের দিন থেকে ক্রেমলিন থিয়েটারে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো শুরু হয়। প্রথম দিনে যে সমস্ত ছবি প্রদর্শিত হয় সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর" তাদের অন্যতম। প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় ব্যতীত, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার বিভাগের সেক্রেটারী আর কে রামধ্যায়ানী এবং ফিল্মস ডিভিশনের প্রধান প্রযোজক এজরা মির এই চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছেন। উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনীও একই সংগে আরম্ভ হয়েছে। রবার্টো রোজেলিনির প্রামাণ্য চিত্র "ইণ্ডিয়া" (এ-বছরের কান উৎসবে প্রদর্শিত) মস্কো উৎসবে ইতালি থেকে প্রেরিত ছবিগুলির অন্যতম।
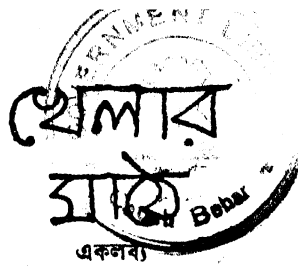
দিন যায়, রাত্রি আসে, যায় নিশি, আসে দিন। এমনিভাবে বছর বছর স্বাধীনতা লাভের পুণ্য দিনটি ঘুরে ফিরে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। আবার চলে যায়। স্বাধীনতা লাভের পুণ্য দিনটি আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা হৈ-হল্লা করে কাটিয়ে দিই। আর হৈ-হল্লার পর অবসর সময়ে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে জাতীয় জীবনের উন্নতি অবনতির নানা চিত্র। একটা জাতির উন্নতি অবনতি বলতে তার সামগ্রিক উন্নতি অবনতিই বোঝায়। খেলাধুলাও এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশের হিতকামী ব্যক্তি এবং সমাজদরদীরা হয়তো আজ জাতীয় জীবনের অধিকতর প্রয়োজনীয় সমস্যার কথা ভেবে দেখছেন, হয়তো ভাবছেন প্রাক স্বাধীনতাকালে আমাদের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে স্বাধীনতার কালে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে কি না? একজন ক্রীড়াসাংবাদিক হিসাবে স্বাধীনতা দিবসের শুভ লগ্নে আমি ভাবছি, আমাদের ক্রীড়ামানের কথা। অর্থাৎ আমাদের খেলাধুলার মান আগে উন্নত ছিল না এখন উন্নত হয়েছে? অবশ্য আগে কি পেয়েছিলাম আর এখন কি পেয়েছি তার হিসাব মিলাতে গেলে অনেক কথারই অবতারণা করতে হয়। সুতরাং সে চেষ্টা করবো না। সংক্ষেপে ক্রীড়ামান সম্বন্ধে এইটুকু বলবো, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের খেলাধুলার মান কোন কোন বিষয়ে নিম্নমুখী হলেও সামগ্রিক মান আগের চেয়ে উন্নত।

কথাটা হয়তো অনেকের কানে কটু শোনাবে। যদি বলি, টীমস গেম অর্থাৎ ক্রিকেট, ফুটবল, হকিতে আমরা পিছু হটেছি কিন্তু ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের খেলাধুলায় যেমন অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাঁতার, ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস, রাইফেল সুটিং প্রভৃতিতে আমরা উন্নতি করেছি; তবুও কথাটা অনেকের ভাল লাগবে না। কারণ, গত বছর শীতকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং বর্তমানে ইংলণ্ডে আমাদের ক্রিকেট খেলার নৈরাশ্যজনক ফলাফল নিয়ে দেশময় এমন শোক-হুতাশ আরম্ভ হয়েছে যে, খেলাধুলার কোন ক্ষেত্রে আমাদের কিছু উন্নতি হয়েছে এ কথাটা কেউ বিশ্বাস করতে রাজী নন। কিন্তু যে নৈপুণ্য গাণিতিক হিসাবের মধ্যে ধরে রাখা যায় তাতে [illegible] অবিশ্বাস করলে চলবে না। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ও সাঁতারের বিভিন্ন বিষয়ের সময়ের হিসাব দিয়ে আমি দেখিয়ে দিতে পারি, স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিটি বিষয়েই আমরা উন্নতি করেছি। ব্যাডমিণ্টন, টেবিল টেনিস এমন কি টেনিস খেলার মানও উন্নত। ভলিবল খেলাতেও উন্নতি ছাড়া অবনতি হয়নি। রাইফেল সুটিংয়ে অতি অল্প সময়ে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তা অভাবনীয়। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য, বিশ্বের ক্রীড়ামানের অগ্রগতির সংগে তাল রেখে আমরা এগুতে পারিনি। বিশ্ব এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। আমরা এগুচ্ছি ঢিমে তালে। তবে এগুচ্ছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনস্ত আমাদের টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ভ্রবনী ও এলেক্স অলমেডোকে পরাজিত করেছেন। এর আগে আমাদের কেউ বিশ্বশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করতে পেরেছেন কি? আজ দৌড়বীর মিলখা সিংয়ের জুড়ী সারা বিশ্বে মাত্র দুচারজন। এর আগে ভারতে মিলখা সিংয়ের মত কোন দৌড়বীর সৃষ্টি হয়েছে কি? টেবল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন এবং রাইফেল সুটিংয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। এমন কি, টীমস গেমেও আমাদের বিচ্ছিন্ন প্রতিভার স্বাক্ষর অস্পষ্ট নয়। হকিতে এখনো আমরা বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ফুটবলে গত অলিম্পিকে আমরা লাভ করেছি চতুর্থ স্থান। ক্রিকেটে আমাদের আব্বাস আলী বেগের খেলার কুণ্ঠাহীন সুখ্যাতি করেছেন বিদেশী ক্রিকেট সমালোচকরাই। কেউ তাকে সামনে রেখে রণজি, দলিপ ও ব্র্যাডম্যানের অবিস্মরণীয় শিল্পকর্মের কথা স্মরণ করেছেন। লেগব্রেক বোলার হিসাবে আমাদের সুভাষ গুপ্তে এখনো বিশ্বশ্রেষ্ঠ বোলারদের সমান অধিকার করে আছেন; তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ক্রিকেট খেলায় আমরা অনেকখানি পিছু হটেছি। আগে আমাদের দেশের ক্রিকেট খেলা ছিল রাজা মহারাজা এবং তাদের আশ্রিত কতিপয় বিত্তশালী ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখন ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ক্রিকেট খেলা ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের মধ্যে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণে। তবুও খেলায় উন্নতি নেই। এর কারণ কি? সবাই স্বীকার করবেন, এর জন্য খেলোয়াড়রাই শুধু দায়ী নন। খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশী দায়ী খেলার মাতব্বরেরা। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কায়েমী স্বার্থের লড়াই আজ ক্রিকেটকে পঙ্গু করে তুলেছে।

* * *

খেলাধুলার উন্নতির ক্ষেত্রে যখন কর্মকর্তাদের দায়িত্বের কথা এসে পড়েছে, তখন এই সম্পর্কে সরকারের দায়িত্ব সম্বন্ধেও কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেকেরই ধারণা স্বাধীনতা লাভের পর খেলাধুলার উন্নতির জন্য সরকারের যেটুকু করা উচিত ছিল আমাদের জাতীয় সরকার সেটুকু করেননি। কথাটা হয়তো আংশিক সত্য। কারণ ইউরোপ অঞ্চলের ছোট ছোট দেশে যেখানে দশ বারোটি করে স্টেডিয়াম আছে সেখানে আমাদের এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষে আজও একটি পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি। সরকারী প্রচেষ্টায় খেলাধুলা সম্পর্কে সাধারণের যেটুকু আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তাও আকিঞ্চিৎকর। আজ সোভিয়েট-রাশিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়ানুষ্ঠান 'স্পার্টাকিয়েডে' এক কোটি বিশ লক্ষ তরুণ-তরুণী অংশ গ্রহণ করছে। আর আমাদের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই সংখ্যার কত ন্যূনতম ভগ্নাংশ অংশ গ্রহণ করে তা কারো অজানা নেই। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য আগের চেয়ে আমাদের দেশে খেলাধুলার জনপ্রিয়তা বেড়েছে বই কমেনি। আর জাতীয় সরকার নানা সমস্যায় বিব্রত থেকেও খেলাধুলার জন্য যেটুকু করেছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তাঁরা প্রশংসার দাবী করতে পারেন। খেলাধুলার উন্নতির জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার মারফৎ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স অনুমোদন করা হচ্ছে। খেলোয়াড়দের বিশেষ ছুটি মঞ্জুরের নীতি গৃহীত হয়েছে। রাজকুমারী অমৃত-

---

কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ কোচ এনে খেলোয়াড়দের উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। টাকাটা আসছে জাতীয় কোষাগার থেকেই। প্রতি স্কুলের জন্য একটি করে খেলার মাঠ এবং প্রতি শহরের জন্য একটি করে স্টেডিয়াম গড়বারও পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে এ পর্যন্ত সরকার যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার পরিমাণও কম নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ধাপে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে সরকার আরও এক কোটি টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা করেছেন। সুতরাং খেলাধুলোর উন্নতির জন্য সরকার তার দায়িত্ব পালন করেননি, একথা বলা খুবই অন্যায়। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারও নিজ নিজ রাজ্যে খেলাধুলোর জন্য কিছু করেননি এমন নয়। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যালকাটা স্পোর্টস বিলকে নতুন করে তৈরী করছেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও নানাভাবে খেলাধুলোয় সাধারণকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। এরা প্রতি বছর স্বাধীনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য গুণীজনদের সংগে ক্রীড়াবিদদেরও সম্বর্ধনা করে খেলাধুলোয় উৎসাহ দিয়ে আসছেন। এর আগে কীর্তিমান ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল ও রেভারেন্ড সুধীর চ্যাটার্জি এবং অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি ক্রিকেট খেলোয়াড় শৈলজা রায়কে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এবার সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন অতীত দিনের চৌখস খেলোয়াড় সন্তোষ মজুমদারকে। বাঙলার ক্রীড়া মহলে যিনি ছনে মজুমদার নামে পরিচিত।

সুতরাং খেলাধুলোর উন্নতির ক্ষেত্রে সরকার ও দেশনেতাদের উৎসাহের অভাব নেই। অভাব সুষ্ঠু পরিকল্পনার। যারা বিভিন্ন খেলাধুলোর মাতব্বর হয়ে বসে আছেন তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কায়েমী স্বার্থের লোভই আজ আমাদের খেলাধুলোর উন্নতির পথের প্রধান অন্তরায়। কথাটা রাষ্ট্রের কর্ণধাররা না বোঝেন, এমন নয়। বোধ করি এই জনাই ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল নতুনভাবে গঠিত হচ্ছে, বোধ করি এইজনাই সরকারের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হয়েছে।

খেলাধুলোর উন্নতির জন্য শিক্ষাবিদদেরও আগ্রহের অভাব নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের কাছে সম্প্রতি যে সর্বাত্মক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে তাতে

'ভারতশ্রী' কমল ভাণ্ডারী

বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য তালিকায় খেলাধুলোকে আবশ্যিক করার প্রস্তাব আছে। বলা হয়েছে সাধারণ শিক্ষার সংগে সংগে কলেজে অধ্যয়ন কালে খেলাধুলো ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। অন্যান্য পরীক্ষার সমষ্টিগত নম্বরের সংগে খেলাধুলো বিষয়ে প্রাপ্য নম্বরও যুক্ত হবে। পরিকল্পনা মত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক মাঠের ব্যবস্থা থাকবে এবং ডিগ্রী কোর্স পর্যন্ত খেলাধুলো থাকবে পাঠ্য তালিকার আবশ্যিক বিষয়। এই পরিকল্পনায় বিদেশ থেকে উপযুক্ত কোচ আনার সুপারিশ আছে। তাছাড়া আছে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বৃত্তির ব্যবস্থা। সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল গঠন করে মাঝে মাঝে প্রীতি খেলার আয়োজন এবং বিদেশ সফরের ব্যবস্থার কথাও পরিকল্পনা থেকে বাদ যায়নি। এই পরিকল্পনা মত কাজ হলে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে ভারত অনেকখানি এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। একদিনে বা এক দুই বছরে কোন বড় কাজ হয় না। তবে দেশের শিক্ষাবিদ ও জাতীয় সরকারের খেলাধুলো সম্পর্কে এই আন্তরিকতা বজায় থাকলে একদিন সুফল ফলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

* * *

কথায় বলে, 'শরীরং ব্যাধি মন্দিরম'। আবার 'স্বাস্থ্যই সুখের মূল' একথাও ধ্রুব সত্য। আজ একজন বাঙ্গালী ব্যায়ামবীরের জীবনী আলোচনা করছি, যিনি নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলনের দ্বারা দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক স্বাস্থ্য গঠন করে 'বিশ্বশ্রী' খেতাব লাভের জন্য ইউরোপ যাত্রা করছেন। ইনি আর কেউই নয়—ব্যায়ামবীর কমল ভাণ্ডারী।

কমল ভাণ্ডারীর জন্ম হয় ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। এর বাবার নাম হরিদাস ভাণ্ডারী। বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে কমল। শিশুকাল থেকেই খেলাধুলো, শরীর চর্চা ও ব্যায়ামানুশীলনে কমলের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। যখন তার বয়স সাত আট বছর তখন থেকেই সে সমবয়সীদের সংগে কুস্তি লড়তে আরম্ভ করে। সমবয়সীদের মধ্যে কেউই কমলকে কুস্তিতে পরাজিত করতে পারত না। কমলও উৎসাহিত হয়ে শরীর চর্চার সাধনা করে যেত। পড়াশুনাতেও তার আগ্রহ কম ছিল না। তবে স্কুলের বই ছাড়া মনীষীদের জীবনী পড়তেই তার বেশী ভাল লাগত। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পড়বার পর কমলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, সুস্থ দেহ না হলে সুস্থ মন হয় না। আর দেহকে সুস্থ রাখতে হলে শক্তির সাধনার প্রয়োজন, প্রয়োজন নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলনের। ১২/১৩ বছর বয়সের সময় কমল ভাণ্ডারী তার নিজ গ্রামে এক আখড়া খুলে বসলো। সে আখড়ায় কমল একাই ব্যায়ামচর্চা করে না। সমবয়স্ক পাড়াপড়শী অনেকেই সেখানে এসে শক্তির সাধনা করতে।

এই সময়ে বালীগঞ্জ লেকের ধারে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের শিবির স্থাপিত হয়েছিল। কমল ভাণ্ডারী নিজের দলবল নিয়ে এই শিবিরে যোগ দিল। এখানে তার দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার প্রথম সুযোগ ঘটলো। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কমল লাভ করলো 'শিবিরশ্রী' খ্যাতি। ১২০০ ছেলের মধ্যে সে হল সবচেয়ে সুগঠিত দেহের ব্যায়ামবীর। এই সম্মান তার জীবনে এক নতুন আলোড়ন এনে দিল। কি করে দেহকে আরও সুগঠিত করা যায়, কিভাবে দেহের শ্রী বাড়ানো যায় এই চিন্তায় এখন সে বিভোর। নিয়মিত ব্যায়ামানুশীলনের ফলে তার দেহ ক্রমেই সুন্দর হতে সুন্দরতর হতে লাগল।

কমলের বাবা আগে ব্যায়ামে বিশেষ উৎসাহ দিতেন না। কিন্তু যখন দেখলেন বারো শ' ছেলের মধ্যে তাঁর ছেলে শ্রেষ্ঠ দেহীর সম্মান পেয়েছে তখন খুবই আনন্দ হল। আর পুত্রের অমন স্বাস্থ্য দেখলে কোন্ পিতার না গর্ব হয়? কমলের বাবা এর পর থেকে কমলকে ব্যায়ামে উৎসাহ

দেশী সংবাদ

৩রা আগস্ট—অদ্য লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন কম্যুনিস্ট সদস্যগণ কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে দুই একজন অদলীয় সদস্য সহ বাহির হইয়া যান।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সহস্রাধিক আনট্রেণ্ড ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষকের উপর কর্মচ্যুতির খড়্গ ঝুলিতেছে বলিয়া জানা যায়। এই রাজ্যে ১৪ শত জুনিয়র হাইস্কুলের আট নয় শত এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের প্রায় ২ শত আনট্রেণ্ড ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষকের আগামী ৩১শে আগস্টের পর আর চাকুরি থাকিতেছে না।

৪ঠা আগস্ট—আজ লোকসভায় বিরোধী দলের সদস্যগণ দেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রশ্নোত্তরের সময় বিরোধীদলের সদস্য-গণ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের জনৈক পদস্থ অফিসারের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও স্বার্থে ঐ বিভাগে দুর্নীতির 'দুষ্টচক্র' গড়িয়া উঠার গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগ হইতে সম্প্রতি ব্যাপক তদন্ত চালান হইতেছে বলিয়া বিশ্বস্ত-সূত্রে জানা গিয়াছে।

৫ই আগস্ট—কেরালা সম্বন্ধে লোকসভায় শীঘ্র আলোচনা আরম্ভ করাইবার জন্য অদ্য কম্যুনিস্ট সদস্যরা লোকসভায় অধ্যক্ষ ও প্রধান-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত উগ্র বাকযুদ্ধ চালাইয়াও সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই।

আজ লোকসভায় আইনমন্ত্রী শ্রী এ কে সেন পণপ্রথা নিষিদ্ধ করণের বিল উত্থাপন করিলে অনেকেই উহা সমর্থন করেন। কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কেরালা সরকারকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার নিবারক নিরোধ আইন অথবা ফৌজদারী কার্যবিধির নিবারক নিরোধ সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রয়োগ করিতে পারেন।

৬ই আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় বলেন, তিব্বতস্থ চীনা কর্তৃপক্ষ এক আদেশ বলে তিব্বতে তিব্বতী এবং ভারতীয় মুদ্রা অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীনেহরু বলেন যে ইহা ১৯৫৪ সালের তিব্বত সম্পর্কে চীন-ভারত-চুক্তির অনুকূলে নয়।

৭ই আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ তাঁহার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, চীন সরকার ভারতীয় এলাকার এক বৃহৎ অংশকে চীনের এলাকারূপে প্রদর্শন করিয়া যে মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে ভারতীয় লিপি সম্বন্ধে তাঁহাদের পক্ষে অদ্ভুত নিরবতা বর্তমান। তিনি আরও বলেন যে, চীনাদের প্রাক্-কম্যুনিস্ট যুগ হইতে অপরের এলাকার বৃহৎ ভূখণ্ডকে নিজেদের বলিয়া দেখাইবার অভ্যাস আছে বলিয়া মনে হয়।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলসমূহ সম্পূর্ণানন্দ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যুক্তভাবে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, আজ উহার পক্ষে ১১২ ভোট এবং বিরুদ্ধে ২৮৫ ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৮ই আগস্ট—সম্প্রতি কয়েকদিন ধরিয়া মুষল-ধারে বর্ষণের দরুণ ডি ভি সি নৌবহ খালের জলস্ফীতি এবং কয়েকটি স্থানে ভাঙ্গনের ফলে হুগলী ও হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এক বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মাঠে রোয়া আমন ধানের গুরুতর ক্ষতি ঘটিবার আশংকা দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্পর্কে কলিকাতার একটি বাংলা দৈনিকে (যুগান্তর) সম্প্রতি প্রকাশিত বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। গত শুক্রবার সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভায় ঐ বিবরণ "অসত্য, বিদ্বেষপ্রসূত এবং মানহানিকর"রূপে উল্লেখ করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯ই আগস্ট—আজ বিকালে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের পরি-সমাপ্তি হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাদিগকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা আজ সম্মেলনে পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আগামী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় (১৯৬০ সাল) প্রায় সওয়া লক্ষ পরীক্ষার্থী হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ মহল মনে করিতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

৩রা আগস্ট—আজ মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ আগামী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরি-দর্শনে যাইবেন। শ্রীখ্রুশ্চেভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর এই বৎসর শরৎকালে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার রাশিয়া পরিদর্শনে যাইবেন।

১৯৫৪ সালে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ লিনুস সি পলিং আণবিক অস্ত্রবিরোধী পঞ্চম বিশ্ব সম্মেলনের প্রারম্ভিক অধিবেশনের প্রতিনিধি-গণকে অদ্য বলেন যে, সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করিতে ২০ মেগাটনের মাত্র চারি হাজার আণবিক বোমাই যথেষ্ট হইবে।

৪ঠা আগস্ট—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে শ্রীখ্রুশ্চেভ রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের অফিসার-গণ সুনিশ্চিতভাবে মনে করেন। কোন কোন পর্যবেক্ষকের মতে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ বিতর্কেও শ্রীখ্রুশ্চেভ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পরিষদের অধিবেশন আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর শুরু হইবে।

৫ই আগস্ট—বৃহৎ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঘোষণা করেন যে, অদ্য তাঁহাদের আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য আরও যে আলোচনার প্রয়োজন হইবে, বর্তমান আলোচনা তাহার পথ প্রশস্ত করিবে।

লাওসে সাম নেউয়া শহরের কম্যুনিস্টদের হাতে পতন ঘটিয়াছে বলিয়া বে-সরকারী সূত্রে সংবাদ পাওয়ার পর উত্তর লাওসের সীমান্ত সংলগ্ন থাইল্যাণ্ড প্রদেশসমূহের গভর্নরগণকে সীমান্তে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬ই আগস্ট—থাইল্যাণ্ডের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল থানোম কীত্তিকাচোরণ অদ্য বলেন, থাই সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্তুত থাকিতে বলা হইয়াছে। লাওসের রাজধানী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, লাওসের উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে।

৭ই আগস্ট—সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস'-এর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ রুশ মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট এক বাণী পাঠাইয়াছেন।

৮ই আগস্ট—রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেণ্টকে ভারত জানাইয়াছেন যে, পাকিস্তান এই বৎসর অধিকৃত কাশ্মীরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাকিস্তান ভারতীয় অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর বে-আইনীভাবে দখল করিয়া আছে। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে উহা আরও অধিক বেআইনী হইতেছে।

৯ই আগস্ট—শহর ও শহরতলীর বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া অবিরাম প্রবল বারিপাতের ফলে মধ্য দক্ষিণ ফরমোজায় বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ২৭ জনের জীবনহানি ও ২২৪ জন নিখোঁজ হইয়াছে বলিয়া আজ সরকারীভাবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নেপালের অর্থমন্ত্রী জেনারেল সুবর্ণ সমসের নূতন আর্থিক বৎসরের জন্য তাঁহার বাজেটে বলেন যে, নেপাল সরকার নেপালে ভারতীয় মুদ্রাপ্রচলন বন্ধ করিতে চান।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।